প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

৪০শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড

কার্ত্তিক—চৈত্র

১৩৪৭

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত

বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা আট আনা

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্র-সূচী

বধূ
শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪০শ ভাগ ২য় খণ্ড | কার্ত্তিক, ১৩৪৭ | ১ম সংখ্যা

ছেলেবেলা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বয়স আমার বুঝি হয়তো তখন হবে বারো,
অথবা কী জানি হবে দুয়েক বছর বেশি আরো।
পুরাতন নীলকুঠি দোতলার পর
ছিল মোর ঘর।
সামনে উধাও ছাত
দিন আর রাত
আলো আর অন্ধকারে
সাথীহীন বালকের ভাবনারে
এলোমেলো জাগাইয়া যেত,
অর্থশূন্য প্রাণ তারা পেত,
যেমন সমুখে নিচে
আলো পেয়ে বাড়িয়া উঠিছে
বেতগাছ ঝোপঝাড়ে,
পুকুরের পাড়ে
সবুজের আলপনায় রং দিয়ে লেপে।
সারি সারি ঝাউগাছ ঝরঝর কেঁপে
নীলচাষ আমলের প্রাচীন মর্ম্মর
তখনো চলিছে বহি বৎসর বৎসর

বৃদ্ধ সে গাছের মতো তেমনি আদিম পুরাতন
বয়স-অতীত সেই বালকের মন
নিখিল প্রাণের পেত নাড়া
আকাশের অনিমেষ নয়নের ডাকে দিত সাড়া
তাকায়ে রহিত দূরে।
রাখালের বাঁশির করুণ সুরে
অস্তিত্বের যে বেদনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে
নাড়ীতে উঠিত নেচে।
জাগ্রত ছিল না বুদ্ধি, বুদ্ধির বাহিরে যাহা তাই
মনের দেউড়ি পারে দ্বারী কাছে বাধা পায় নাই।
স্বপ্ন জনতার বিশ্বে ছিল দ্রষ্টা কিংবা স্রষ্টা রূপে
পণ্যহীন দিনগুলি ভাসাইয়া দিত চুপে চুপে
পাতার ভেলায়
নিরর্থ খেলায়।

টাট্টু ঘোড়া চড়ি
রথতলা মাঠে গিয়ে দুর্দাম ছুটাত তড়বড়ি,
রক্তে তার মাতিয়ে তুলিত গতি,
নিজেরে ভাবিত সেনাপতি
পড়ার কেতাবে যারে দেখে
ছবি মনে নিয়েছিল এঁকে।
যুদ্ধহীন রণক্ষেত্রে ইতিহাসহীন সেই মাঠে
এমনি সকাল তার কাটে।

জবা নিয়ে গাঁদা নিয়ে নিঙাড়িয়া রস
মিশ্রিত ফুলের রঙে কী লিখিত, সে লেখার যশ
আপন মর্মের মাঝে হয়েছে রঙিন,
বাহিরের করতালিহীন।

সন্ধ্যাবেলা বিশ্বনাথ শিকারীকে ডেকে
তার কাছ থেকে
বাঘশিকারের গল্প নিস্তব্ধ সে ছাতের উপর
মনে হোত সংসারের সবচেয়ে আশ্চর্য খবর।

দম্ করে মনে মনে ছুটিত বন্দুক
কাঁপিয়া উঠিত বুক।
চারিদিকে শাখায়িত সুনিবিড় প্রয়োজন যত
তারি মাঝে এ বালক অরকিড্ তরুকার মতো
ডোরাকাটা খেয়ালের অদ্ভুত বিকাশে
দোলে শুধু খেলার বাতাসে।
যেন সে রচয়িতার হাতে
পুঁথির প্রথম শূন্য পাতে
অলংকরণ আঁকা, মাঝে মাঝে অস্পষ্ট কী লেখা,
বাকি সব আঁকাবাঁকা রেখা।

আজ যবে চলিতেছে সাংঘাতিক হিসাবনিকাশ,
দিগদিগন্তে ক্ষমাহীন অদৃষ্টের দশন-বিকাশ,
বিধাতার ছেলেমানুষির
খেলাঘর যত ছিল ভেঙে সব হ'ল চৌচীর।
আজ মনে পড়ে সেই দিন আর রাত,
প্রশস্ত সে ছাত,
সেই আলো সেই অন্ধকারে
কর্মসমুদ্রের মাঝে নৈষ্কর্ম্য দ্বীপের পারে
বালকের মনখানা মধ্যাহ্নে ঘুঘুর ডাক যেন।
এ সংসারে কী হতেছে কেন,
ভাগ্যের চক্রান্ত কোথা কী যে
প্রশ্নহীন বিশ্বে তার জিজ্ঞাসা করেনি কভু নিজে

এ নিখিলে যে জগৎ ছেলেমানুষির
বয়স্কের দৃষ্টিকোণে সেটা ছিল কৌতুক হাসির
বালকের জানা ছিল না তা।
সেইখানে অবাধ আসন তার পাতা।
সেথা তার দেবলোক, স্বকল্পিত স্বর্গের কিনারা,
বুদ্ধির ভৎর্সনা নাই, নাই সেথা প্রশ্নের পাহারা,
যুক্তির সংকেত নাই পথে
ইচ্ছা সঞ্চরণ করে বল্‌গামুক্ত রথে॥

জলচর

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মোর চেতনায়
আদি সমুদ্রের ভাষা ওংকারিয়া যায় :
অর্থ তার নাহি জানি,
আমি সেই বাণী।
শুধু ছলছল কলকল,
শুধু সুর, শুধু নৃত্য, বেদনার কলকোলাহল,
শুধু এ সাঁতার
এপারে কখনো চলা কখনো ওপার,
কখনো বা অদৃশ্য গভীরে,
কভু বিচিত্রের তীরে তীরে।
ছন্দের তরঙ্গ দোলে
কত যে-ইঙ্গিত ভঙ্গী জেগে ওঠে, ভেসে যায় চলে।
স্তব্ধ মৌনী অচলের বহিয়া ইশারা
নিরন্তর স্রোতোধারা
অজানা সম্মুখে ধায়, কোথা তার শেষ
কে জানে উদ্দেশ।
আলো-ছায়া ক্ষণে ক্ষণে দিয়ে যায়
ফিরে ফিরে স্পর্শের পর্যায়।
কভু দূরে কখনো নিকটে
প্রবাহের পটে
মহাকাল দুই রূপ ধরে
পরে পরে
কালো আর সাদা।
কেবলি দক্ষিণে বামে প্রকাশ ও প্রকাশের বাধা।
অধরার প্রতিবিম্ব গতিভঙ্গে যায় এঁকে এঁকে,
গতিভঙ্গে যায় ঢেকে ঢেকে॥

তিরোলের বালা

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মার্টিন কোম্পানীর ছোট লাইন।

গাড়ী ছাড়বার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, এখনও ছাড়বার ঘণ্টা পড়ে নি, এ নিয়ে গাড়ীর লোকজনের মধ্যে নানা রকম মতামত চলছে।

—মশাই, বড়গেছে নেমে যাব প্রায় পাঁচ মাইল। চারটে বাজে—এখনও গাড়ী ছাড়বার নামটি নেই—কখন বাড়ী পৌঁছব ভাবুন তো?

—এদের কাণ্ডই এই রকম—আসুন না সবাই মিলে একটু কাগজে লেখালেখি করি। সেদিন বড়গেছে ইষ্টিশানে দুটো ট্রেনের লোক এক ট্রেনে পুরলে—দাঁড়াবার পর্য্যন্ত জায়গা নেই—তাও কদমতলায় এল এক ঘণ্টা লেট্।

—ঐ আপিসের সময়টা একটু টাইমমত যায়—তার পর সব গাড়ীরই সমান দশা—

—আঃ কি ভুল যে করেছি মশাই এই লাইনে বাড়ী ক'রে। রিটায়ার করলাম, কোথায় বাড়ী করি, কোথায় বাড়ী করি, আমার শ্বশুর বললেন, তাঁর গ্রামে বাড়ী করতে—

—সে কোথায় মশাই?

—এই প্রসাদপুর, যেখানে প্রসাদপুরের ঠাকুর আছেন, মেয়েদের ছেলেপুলে না হ'লে মাদুলি নিয়ে আসে, হাওড়া ময়দান থেকে পঁচিশ মাইল, বেশী না। ভাবলাম কলকাতার কাছে, সস্তাগণ্ডা হবে পাড়াগাঁ জায়গা, শ্বশুর-বাড়ীর সবাই রয়েছেন—তখন কি মশাই জানি? তিন-চার হাজার টাকা খরচ ক'রে বাড়ী করলুম, এখন দেখছি যেমনি ম্যালেরিয়া, তেমনি যাতায়াতের কষ্ট, পঁচিশ মাইল আসতে পঁচিশ খেলা খেলছে এই ষ্টুপিড গাড়ীগুলো—

—পঁচিশ কি স্যর, তিন পঁচিশং পঁচাত্তর খেলা বলুন! আমারও পৈতৃক বাড়ী ঐ প্রসাদপুরের কাছে নরোত্তমপুর। ডেলি প্যাসেঞ্জারি করি, কান্না পায় এক-এক সময়—

আমি যাচ্ছিলাম চাঁপাডাঙা। লাইনের শেষ স্টেশন। এদের কথাবার্ত্তা শুনে ভয় হ'ল। চাঁপাডাঙা স্টেশন থেকে চার মাইল দূরে দামোদর নদীর এপারেই আমার এক মাসীমা থাকেন, মেসোমশায় নাকি মৃত্যুশয্যায়, তাই চিঠি পেয়ে মাসীমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সেখানে চলেছি। যে রকম এরা বলছে তাতে কখন সেখানে পৌঁছব কে জানে?

কামরার এক কোণের বেঞ্চিতে একটি যুবক ও তার সঙ্গে একটি সতেরো-আঠারো বছরের সুন্দরী মেয়ে বসেছিল। মেয়েটির পরনে সিল্কের ছাপা-শাড়ী, পায়ে মাদ্রাজী চটি, মাথার চুলগুলো যেন একটু তেলাগোছা ভাবে বাঁধা—সে জানালা দিয়ে বাহিরের দিকে চেয়ে ছিল, যুবকটি মাঝে মাঝে সকলের কথাবার্ত্তা শুনছে, মাঝে মাঝে বাইরের দিকে চেয়ে ধূমপান করছে।

গাড়ী ছেড়ে তিন-চারটে স্টেশন এল। পান, পটল, আলু, মাছের পুঁটুলি হাতে ডেলি প্যাসেঞ্জারের দল ক্রমে নেমে যাচ্ছে। বাকি দল এখনও সামনাসামনি বেঞ্চিতে মুখোমুখি বসে কোঁচার কাপড় মেলে তাস খেলছে। মাঝে মাঝে ওদের হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে এঞ্জিনের ঝক্‌ঝক্ শব্দ ভেদ ক'রে—টু হার্টস্! নো ট্রাম্প! থ্রি স্পেডস্!

যখন জাঙ্গিপাড়া গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে, তখন বেলা যায়-যায়। জাঙ্গিপাড়া স্টেশনের সামনে বড় দীঘিটার ধারের তালগাছগুলোর গায়ে রাঙা রোদ।

শেষ ডেলি প্যাসেঞ্জারটি জাঙ্গিপাড়ায় নেমে যাওয়াতে গাড়ী খালি হয়ে গেল—একেবারে খালি নয়, কারণ রইলাম কেবল আমি। কোণের বেঞ্চির দিকে চেয়ে দেখি সেই যুবক ও তার সঙ্গিনী মেয়েটিও রয়েছে।

এতক্ষণ ডেলি প্যাসেঞ্জারদের গল্পগুজব শুনতে শুনতে আসছিলাম বেশ, এখন তারা সবাই নেমে গিয়েছে, আমি প্রায় একাই—এখন স্বভাবতই যুবক ও মেয়েটির প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হ'ল। মেয়েটি বিবাহিতা নয়। সে তো বেশ দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। তবে ওদের সম্বন্ধ

কি ভাইবোন? কিংবা মামাভাগ্নী? মেয়েটি বেশ সুন্দরী। ছোক্‌রা মেয়েটিকে ভুলিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে না তো? আশ্চর্য্য নয়। আজকালের ছেলেছোকরাদের কাণ্ড তো?

যাক গে আমার সে-সব ভাবনার দরকার কি? নিজের কি হবে তার নেই ঠিক। সন্ধ্যা তো হয়ে এল। মাসীমাদের গ্রাম স্টেশন থেকে দুই-তিন মাইল, পথও সুগম নয়। ট্রেন আঁটপুর এসে দাঁড়াল, জাঙ্গিপাড়ার পরের স্টেশন। আবার ছাড়ল, বড় বড় ফাঁকা রাঢ়দেশের মাঠে সন্ধ্যা নেমে আসছে, লাইনের ধারে ক্বচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষাগাঁ। লাউলতা চালে উঠেছে। একটা ছোট্ট গ্রাম্য হাট ভেঙে লোকজন ধামা-চেঙারি মাথায় ফিরছে—আবার মাঠ, জামগাছের মাথায় কালো কালো বাদুড় উড়ে এসে বসছে, খালের পারে মশাল জ্বেলে জেলেরা মাছ ধরবার চেষ্টা করছে।

আবার সহযাত্রীদের দিকে চাইলাম।

দু-জনে পাশাপাশি ব'সে আছে। কিন্তু দু-জনেই জানালার বাইরে চেয়ে রয়েছে। একটা কথাও শুনলাম না ওদের মধ্যে।

ছেলেটা মেয়েটাকে নিয়ে পালাতে পালাতে দু-জনের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে। বেশ সুন্দর চেহারা দু-জনেরই। না, মামাভাগ্নী বা ভাইবোন নয়। নিয়ে পালানোই ঠিক। কিন্তু এদিকে কোথায় যাবে ওরা। মার্টিন কোম্পানীর ছোট লাইন তো আর দুটো স্টেশন গিয়ে রাঢ়দেশের অজ পাড়াগাঁ আর দিগন্তব্যাপী মাঠের মধ্যে শেষ হয়েছে। এ দুটি শৌখিন পোষাক-পরা তরুণ তরুণীর পক্ষে সে অঞ্চল নিতান্ত খাপছাড়া ও অনুপযোগী।

যাক্‌ গে, আবার কেন ও-সব ভাবনা?

পিয়াসাড়া স্টেশনের সিগন্যালের সবুজ আলো দেখা দিয়েছে। সামনে ভয়ানক অন্ধকার রাত্রি, নিতান্ত দুর্ভাবনায় পড়ে গেলাম, রাঢ়দেশের মাঠের উপর দিয়ে রাস্তা, সঙ্গে ব্যাগে কিছু টাকাকড়ি আছে, শুনেছি হুগলী জেলার এদিকে চুরি-ডাকাতি নাকি অত্যন্ত বেশী। মেসোমশায়ের চিকিৎসার জন্যে মাসীমা কিছু টাকার দরকার ব'লে লিখেছিলেন। মা-ই টাকাটা দিয়েছেন। ধনে-প্রাণে না মারা পড়ি শেষকালে।

হঠাৎ আমার সহযাত্রী যুবকটি আমার দিকে চেয়ে বললে—চাঁপাডাঙা ইষ্টিশান থেকে নদীটা কত দূরে বলতে পারেন সার্‌?

—নদী প্রায় আধ মাইল।

—নৌকা পাওয়া যায় খেয়ার?

—এখন নদীতে জল কম। তবে নৌকোও বোধ হয় আছে।

যুবকটি আর কোন কথা না ব'লে আবার বাহিরের দিকে চেয়ে রইল। আমার অত্যন্ত কৌতূহল হ'ল এক বার জিজ্ঞেস করে দেখি না, ওরা কোথায় যাবে। কিন্তু ওদের দিক থেকে কথাবার্ত্তার কোন ভরসা না পেয়ে চুপ ক'রে রইলাম।

পিয়াসাড়া স্টেশনে এসে গাড়ী দাঁড়াল। বিশেষ কেউ নামল উঠল না, ছোট স্টেশন। যুবকটি আমায় জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, সার্‌ ওপারে গাড়ী পাওয়া যায়?

আমি ওর দিকে চেয়ে বললাম—কি গাড়ীর কথা বলছেন?

—এই যে-কোন গাড়ী—মোটর-বাস কি ঘোড়ার গাড়ী।

লোকটা বলে কি! এই অজ পাড়াগাঁয়ে ওদের জন্যে মোটরের বন্দোবস্ত ক'রে রাখবে কে বুঝতে পারলাম না। বললাম—না মশায়, যতদূর জানি ও-সব পাবেন না সেখানে। পাড়াগাঁ জায়গা রাস্তা-ঘাট তো নেই।

এবারও ওদের গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে আমার কৌতূহল অতি কষ্টে চেপে গেলাম।

কিন্তু যুবকটি পরমুহূর্ত্তেই আমার সে কৌতূহল মেটাবার পথ পরিষ্কার ক'রে দিলে। জিজ্ঞেস করলে—ওখান থেকে তিরোল কতদূর হবে জানেন সার্‌?

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে ওর মুখের দিকে চাইলুম।

—তিরোল যাবেন নাকি? সে তো অনেক দূর বলেই শুনেছি। আমিও এদেশে প্রায় নতুন, ঠিক বলতে পারব না—তবে পাঁচ-ছ ক্রোশের কম নয়। যুবকের মুখে উদ্বেগ ও চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। আমার দিকে

একটু এগিয়ে বসে বললে—যদি কিছু মনে না করেন সার্, একটা কথা বলব ?

তবে ইলোপমেন্টই হবে। যা আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু তিরোলে কেন ? সেখানে তো লোকে যায় অন্য উদ্দেশ্যে।

বললুম—হ্যাঁ, বলুন না—বলুন—

যুবকটি মেয়েটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গলার স্বর নামিয়ে বললে—ওকেই নিয়ে যাচ্ছি তিরোলে। পাগলা কালীর বালা আনতে ওরই জন্যে—আমার বোন, কাল অমাবস্যা আছে, কাল বালা পরা নিয়ম—

বাধা দিয়ে বললাম—মেয়েটি কি—

—চুপ ক'রে আছে এখন প্রায় দু-মাস, কিন্তু যখন খেপে ওঠে তখন ভীষণ হয়ে ওঠে, সামলে রাখা কঠিন। এত রাত যে হবে বুঝতে পারি নি, সবাই বলেছিল স্টেশন থেকে বেশি দূর নয়—

—আপনারা আসছেন কোত্থেকে ?

—অনেক দূর থেকে সার্, ধানবাদের কাছে সয়লাডি কলিয়ারি—এ-দিকের খবর কিছুই জানি নে—লোকে যেমন বলেছে তেমনি শুনেছি—কি করি এখন ? ঐ মেয়ে সঙ্গে, বিদেশ-বিভূঁই জায়গা, বড় বিপদে পড়ে গেলাম যে !

চুপ ক'রে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করলাম।

ছোকরা বিপদে প'ড়ে গিয়েছে বেশ। ওর কথা শোনার পর থেকে মেয়েটির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি, চমৎকার দেখতে মেয়েটি। ধপধপে ফর্সা রং, বড় বড় চোখ, ঠোঁটের দুটি প্রান্ত উপরদিকে কেমন একটু বাঁকান, তাতে মুখশ্রী আরও কি সুন্দর যে দেখাচ্ছে ! অমন সুন্দরী মেয়ে নিয়ে এই বিদেশে রাত্রিকালে মাঠের মধ্যে দিয়ে পাঁচ-ছ ক্রোশ রাস্তা গাড়ীভাড়া ক'রে গেলেও বিপদ কাটল বলে মনে করবার কারণ নেই।

এক চাঁপাডাঙাতে কোথাও থাকা। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে অপরিচিত লোকদের বিশেষ ক'রে যখন শুনবে যে মেয়েটি পাগল—তখন ওদের রাত্রে আশ্রয় দেবার মত উদারতা খুব কম মানুষেরই হবে।

যুবকটিকে বললাম—চাঁপাডাঙাতে কোন লোকের বাড়ী আশ্রয় নেবেন রাত্রে—তার চেষ্টা দেখব ?

—না সার্, ওকে অপরিচিত লোকের মধ্যে রাখতে পারব না, তাহ'লেই ওর মেজাজ খারাপ হয়ে উঠবে। আমি ছাড়া আর কারও কাছে ও খাবে না পর্য্যন্ত। যে-কোনও তুচ্ছ ব্যাপারে ও ভীষণ খেপে উঠতে পারে—সে-ভরসা করি নে সার্—ওর সে মূর্ত্তি দেখলে আমি ওর দাদা, আমি পর্য্যন্ত দস্তুরমত ভয় পাই—সে না দেখাই ভাল। ও অন্য মানুষ হয়ে যায় একেবারে—

চাঁপাডাঙা স্টেশনে গাড়ী এসে দাঁড়াল।

রাত্রির অন্ধকার এখনও ঘন হয়ে নামে নি, তবে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর রাত্রি, অনুমান করা যায়, কি ধরণের অন্ধকার হবে আর একটু পরে।

চাঁপডাঙা স্টেশনের কাছে লোকের বাড়ীঘর বেশী নেই। খানকতক বিচুলি-ছাওয়া ঘর, অধিকাংশই পান-বিড়ি, মুড়িমুড়কি কিংবা মুদিখানার দোকান। একটা সাইকেল-সারানোর দোকান। একটা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা, ডাক্তারখানার এক পাশে স্থানীয় ডাকঘর। একটা পুকুর, পুকুরের ও-পারে দু-একখানা চাষাভূষো লোকের ঘর।

আমরা টিকিট দিয়ে সবাই স্টেশনের বাইরে এলাম। সামনেই দু-তিনখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ী দেখে আমার দুর্ভাবনা অনেকটা কমে গেল, কিন্তু যখন তাদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম নদীর ধার পর্য্যন্তই তারা যায়, নদী পার হবার উপায় নেই গরুর গাড়ীর—তখন আমি আমার সঙ্গীটিকে বললুম—কি করবেন, নয়ত ইষ্টিশানেই থাকবেন রাতে ?

—না সার্, কাল অমাবস্যা, আমায় তিরোল পৌছতেই হবে কাল। এখানে থাকলে কাজ হবে না। আপনি আর একটু কষ্ট করুন, আমার সঙ্গে চলুন। আপনাকে যখন পেয়েছি, ছাড়তে পারব না। আপনি না দেখলে কোথায় যাই বলুন।

আমি বড় বিপদে পড়ে গেলাম।

ওদিকে মেসোমশায়ের অসুখ, সেখানে পয়সা-কড়ি নিয়ে যত শীগ্‌গির হয় পৌছনো দরকার। এদিকে এই বিপন্ন যুবক ও তার বিকৃতমস্তিষ্কা তরুণী ভগিনী। ছেড়েই বা এদের দিই কি ক'রে এই অন্ধকার রাত্রে ?

তা হয় না। সঙ্গে যেতেই হবে, মেসোমশায়ের অদৃষ্টে যা ঘটুক।

গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানেরা কিন্তু ভরসা দিল। তিরোলের বাঁধা রাস্তা, নদী পেরিয়ে গাড়ী পাওয়া যায়, পালকি পাওয়া যায় একটু খোঁজ করলেই, হরদম লোক যাচ্ছে সেখানে, ভয়ভীত কিছু নেই—নদীর খেয়া থেকে বড় জোর দু-ঘণ্টার রাস্তা।

নদীর ধার পর্য্যন্ত একখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ীতে আমরা তিন জন এলাম। সারা ট্রেনে মেয়েটি কথা বলে নি, অন্ততঃ আমি শুনি নি। ছইয়ের মধ্যে বসে সে প্রথম কথা কইল। যুবকটির দিকে চেয়ে বললে—দাদা, আমার শীত করছে—তোমার শীত করছে না?

সুন্দর গলার স্বর—যেন সেতারে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। আমি সহানুভূতির চোখে তরুণীর দিকে চাইলাম, আহা, এমন সুন্দর মেয়েটি কি অদৃষ্ট নিয়েই জন্মেছে! বললাম—শীত করতে পারে, নদীর হাওয়া বইছে—সঙ্গে কিছু আছে গায়ে দেবার?

যুবকটি বললে—না, গায়ে দেবার কিছু ধরুন এ-বোশেখ মাসে তো আনি নি—বিছানার চাদরখানা পেতে গাড়ীতে ব'সে ছিলাম—ওখানা গায়ে দে—

মেয়েটি আবার বললে—কি নদী দাদা?

বেশ স্বাভাবিক সুরে সহজ ধরণের কথাবার্ত্তা।

আমিই বললাম—দামোদর।

মেয়েটি এবার আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—বল্লভপুরে যে দামোদর? আমি জানি, খুব বড় নদী—না দাদা? ছেলেবেলায় দেখেছি—

যুবকটি আমায় বললে—দামোদরের ধারে বল্লভপুর বলে গ্রাম, বর্দ্ধমান জেলায়, সেখানে আমার মামার বাড়ী কি না? পূর্ণিমা—মানে আমার এই বোন সেখানে দু-বার গিয়েছিল ছেলেবেলায়—তার পর—

খেয়ায় নদী পার হবার সময় পূর্ণিমা ওর দাদাকে বললে—ভয় করছে দাদা—ডুবে যাব না তো? ও দাদা—নৌকো দুলছে যে—

—ডুবে যাবি কেন? চুপ করে ব'সে থাক—দুলছে তাই কি?

ওপারে গিয়ে আমরা দেখি গাড়ীঘোড়া তো দূরের কথা, একটা মানুষ পর্য্যন্ত নেই। খেয়ার মাঝি লোকটা ভাল, সে আমাদের অবস্থা দেখে বললে—দাঁড়ান বাবু-মশাইরা, শামকুড়ের গোয়ালাপাড়ায় গরুর গাড়ী পাওয়া যায়—আমি ডেকে দিচ্ছি—আপনারা নৌকোতেই বসুন—

পূর্ণিমা বললে—দাদা, কিছু খাবে না? খাবার রয়েছে তো—

পরে আমার দিকে চেয়ে বললে—আপনিও খান, খাবার অনেক আছে—

ওর দাদা বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দে না, ওঁকে দে—তুইও খা—কিছু তো খাস নি—পৌঁছতে কত রাত হয়ে যাবে।

পূর্ণিমা একটা ছোট্ট পুঁটুলি খুলে আমাদের সবাইকে লুচি, পটলভাজা, আলুচচ্চড়ি ও মিহিদানা পরিবেশন ক'রে দিলে।

বললে--দেখ তো দাদা, মিহিদানা খারাপ হয়ে যায় নি?

আমি বললাম—এ কোথাকার মিহিদানা?

পূর্ণিমা বললে—বর্দ্ধমান থেকে কেনা আসবার সময়। খারাপ হয় নি? দেখুন তো মুখে দিয়ে—

আজ যখন বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম, তখন ভাবি নি এমন একটি সন্ধ্যার কথা, ভাবি নি যে দামোদর নদীর উপর নৌকোতে ব'সে একটি অপরিচিত যুবক ও একটি অপরিচিতা তরুণীর সঙ্গে ব'সে খাবার খাব এ-ভাবে। কেমন একটি শান্ত পরিবেশ, যেন বাড়ীতে মা বোনের মধ্যেই আছি—বড় ভাল লাগছিল এদের।

কিন্তু পরবর্ত্তী মর্ম্মন্তুদ অভিজ্ঞতার পটভূমিতে ফেলে আজ যখন আবার সেই সন্ধ্যাটির কথা ও আমার সেই তরুণ সঙ্গীদের কথা এখন ভাবি—তখন মনে হয় সেদিন তাদের সঙ্গে না-দেখা হওয়াই ভাল ছিল। একটা দুঃখজনক করুণ স্মৃতির হাত থেকে বাঁচা যেত তাহ'লে।

আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে, এমন সময় গরুর গাড়ী নিয়ে খেয়ার মাঝি ঘাটের ধারে দামোদরের বিস্তৃত বালির চরে এসে হাজির হ'ল। তিরোল যাবার ভাড়া ধার্য্য ক'রে আমরা গাড়ীতে উঠে পড়লাম, খেয়ার মাঝিকে তার পরিশ্রমের জন্যে কিছু বকশিশ দেওয়াও বাদ গেল না।

ভাড়ম্যার মন্দির

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসুর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৭.

বৌদ রাজ্যে অবস্থিত গন্ধরাডির যুগল মন্দির
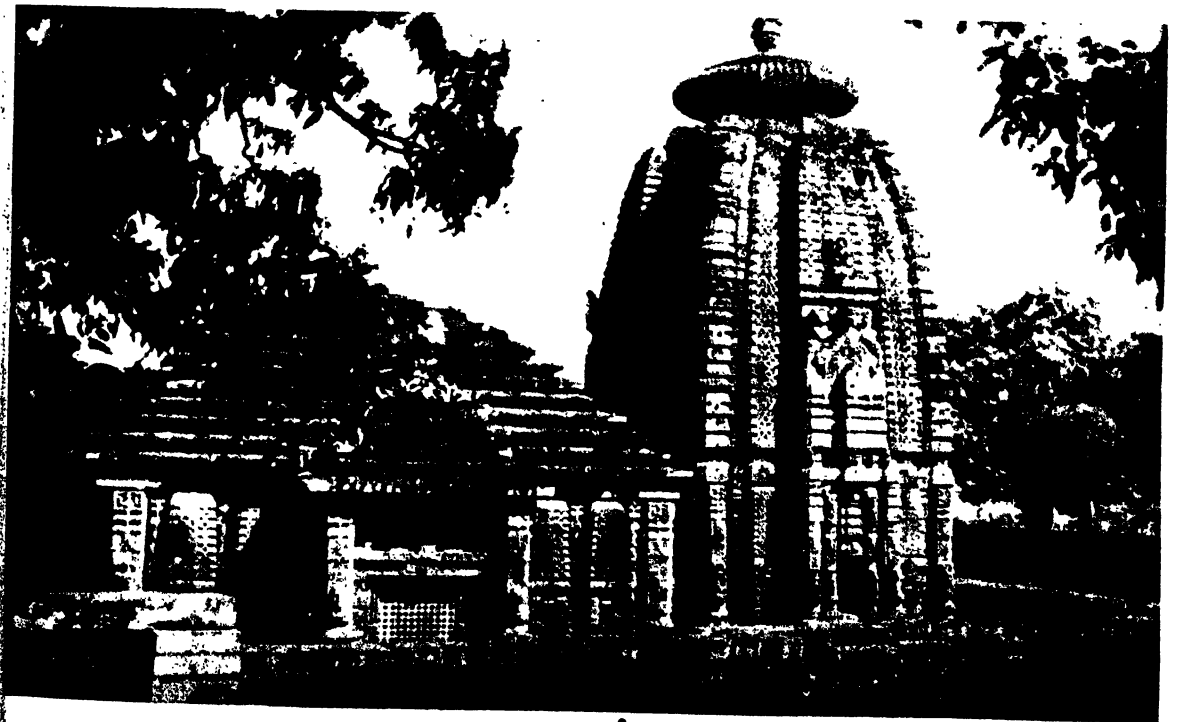
ভুবনেশ্বরের নিকট ধৌলিতে উৎকীর্ণ অশোকলিপির উপরে "গজতম" মূর্ত্তি।   দূরে ধৌলি পর্ব্বত

সোনপুর রাজ্যে বৈদ্যনাথের পার্শ্ববর্ত্তী কোশলেশ্বর মন্দিরের পাশে খোলা বারান্দা
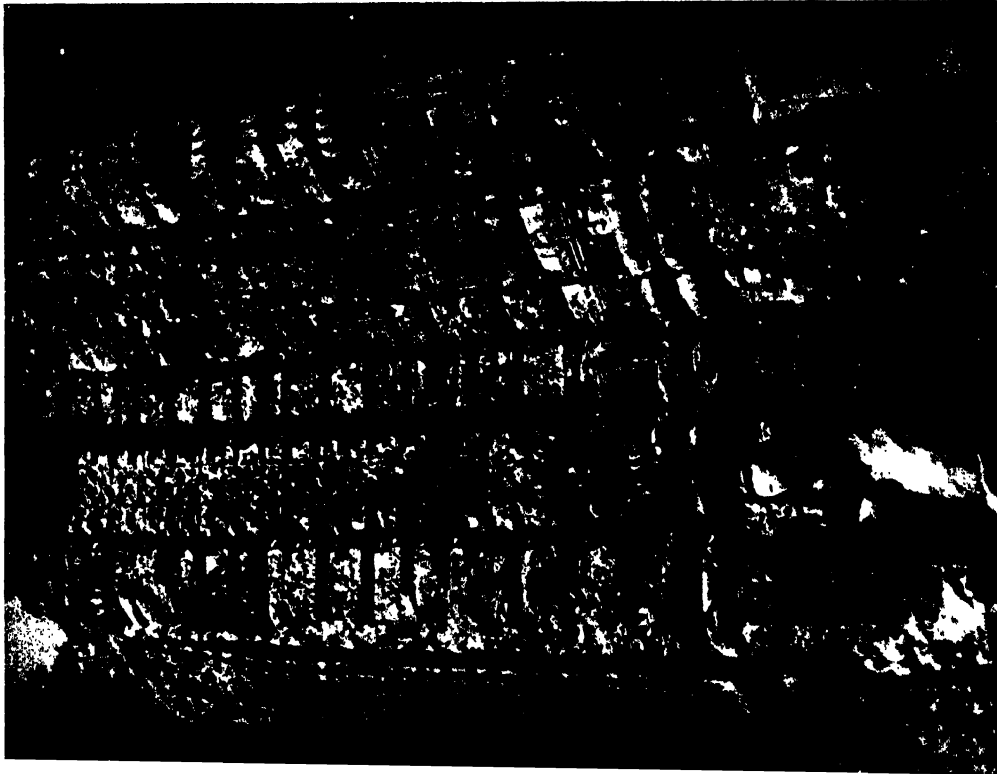
বৌদ রাজ্যে অবস্থিত রামনাথ মন্দিরের শিখর।
মুক্তেশ্বরের মত কারুকার্য্যে মণ্ডিত।

বড়ম্বা রাজ্যে অবস্থিত সিংহনাথ মহাদেবের মন্দির। এখানকার পূজারিগণ
অনার্য্যবংশসম্ভূত মালীজাতির লোক।

উড়িষ্যার মূর্ত্তি
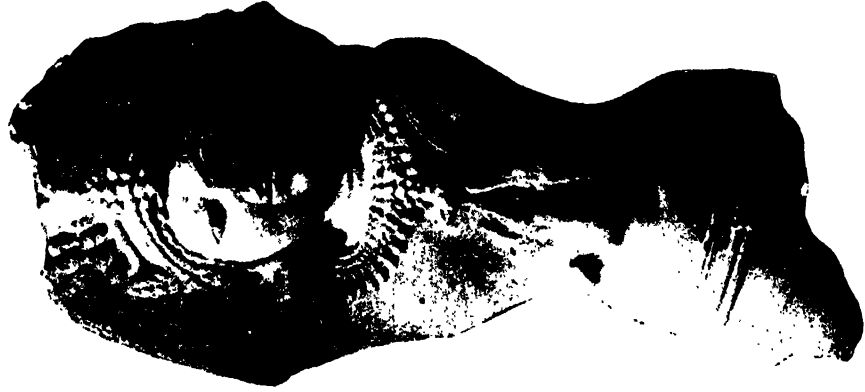
যাজপুর শহরে প্রাপ্ত খণ্ডিত গরুড়মূর্ত্তি

সপ্তমাতৃকার অন্তর্গত কৌমারীমূর্ত্তি, সড়ইকলা রাজ্য
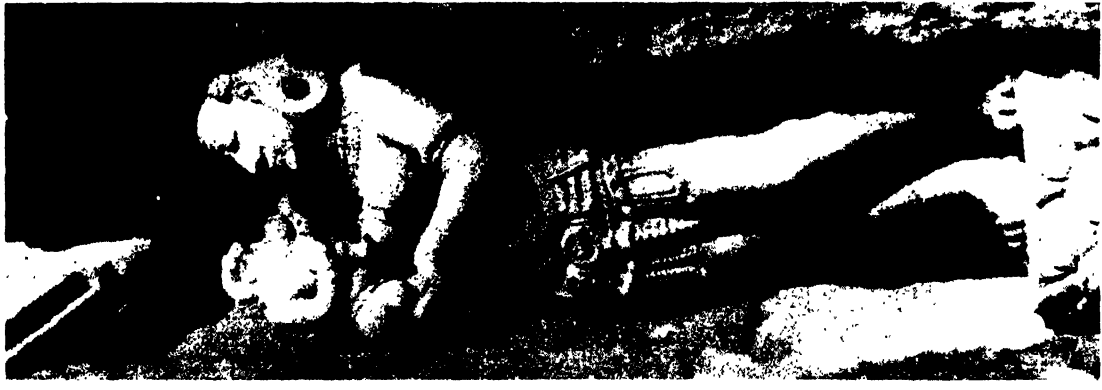
মাতৃমূর্ত্তি

গাড়োয়ান বললে—বাবু, ভুল হয়ে গিয়েছে—বাড়ী থেকে তামাকের টিনটা নেওয়া হয় নি—গাড়ী গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে যাই—বেশী দেরী হবে না বাবু—

শামকুড় গ্রামের মধ্যে গাড়ী ঢুকল। আমবাগান, বাঁশবন, লোকের বাড়ীঘরের পেছন দিয়ে রাস্তা, ঘরের দাওয়ায় মেয়েরা রান্না করছে, তার পর আবার মাঠ, আখের ক্ষেত, পাটক্ষেত, মাঠের মধ্যে দিয়ে চওড়া সাদা রাস্তা আমাদের সামনে বহুদূর চলে গিয়েছে। রাঢ়দেশের মাঠ, বনজঙ্গল খুব কম, এখানে-ওখানে মাঝে মাঝে দু-চারটে কলাগাছ ছাড়া।

পূর্ণিমা আমায় বললে—আপনার মাসীমার বাড়ী এখান থেকে কত দূর হবে?

—সে তো এদিকে নয়—দামোদরের ও-পারে। স্টেশনের পূবদিকে প্রায় দু-ক্রোশ দূরে—

—আপনাকে আমরা কষ্ট দিলাম তো!

—কি আর কষ্ট?...আপনাদের কাজ শেষ হয়ে গেলে কাল আপনাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে মাসীমার বাড়ী গেলেই হবে—

পূর্ণিমা মুখে আঁচল দিয়ে ছেলেমানুষি হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলে হঠাৎ। বললে—কি আর কষ্ট? না? আমাদের কাজ শেষ হ'লে আমাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে—হি-হি-হি—

ওর হাসির অদ্ভুত ধরণের উচ্ছ্বাস ও সৌন্দর্য্য আমাকে বড় মুগ্ধ করলে, এমন হাসি কোন দিন আমি হাসতে দেখি নি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল এ অপ্রকৃতিস্থের হাসি। স্থিরমস্তিষ্ক মেয়ে হ'লে এ-ধরণের হাসত না, অন্ততঃ এ-জায়গায় ও এ-অবস্থায়।

হঠাৎ ওর দাদা অন্ধকারের মধ্যে আমার গা টিপলে।

ব্যাপার কি? আমার ভয় হ'ল। মেয়েটি ভাল অবস্থায় আছে তো? আমি কোন কথা না ব'লে চুপ করে রইলাম। কি জানি মেয়েটির কেমন মেজাজ, কোন্ কথা তার মনে কি ভাবে সাড়া জাগাবে যখন জানি না তখন একদম কথা না বলাই নিরাপদ।

মনে মনে ভাবলাম, এমন সুন্দর মেয়ে কি খারাপ অদৃষ্ট নিয়েই এসেছিল পৃথিবীতে, যে তার অমন সুন্দর প্রাণভরা হাসি, তাতে মনে আনন্দ না এনে আনে ভয়!

গাড়ীতে কিছুক্ষণ কেউ কথা বললে না—সবাই চুপচাপ। মাঠ ভেঙে গরুর গাড়ী আপন মনে চলছে, বোধ হয় আমার একটু তন্দ্রাবেশ হয়ে থাকবে, হঠাৎ কেন যেন ঘুম ভেঙে গেল। গাড়ীর ছইয়ের মধ্যে অন্ধকারে, আমার মনে হ'ল সেই অন্ধকারের মধ্যে তরুণী এবং তার দাদার মধ্যে যেন একটা হাতাহাতি ব্যাপার চলছে।

তরুণীর মুখের কষ্টকর 'আঃ' শব্দ আমার কানে যেতেই আমি পেছন ফিরে চাইলাম ওদের দিকে, কারণ আমি বসেছি ছইয়ের সামনে, আর ওরা বসেছে গাড়ীর পেছন দিকটায়, সেদিকে বেশী অন্ধকার, কারণ ছইয়ের ও-দিকটা চাচের পর্দ্দা আঁটা।

আমি কোন কথা বলবার পূর্ব্বেই যুবকটি চাপা উদ্বেগের সুরে বললে—ধরুন, ওকে ধরুন, ও গাড়ী থেকে নেমে পড়তে চাইছে—

চাপা সুরে বলবার কারণ বোধ হয় গাড়ীর গাড়োয়ানের কানে কথাটা না যায়।

আমি হতভম্ব হয়ে মেয়েটির গায়ে কি করে হাত দেব ভাবছি, এমন সময় যুবকটি বেদনার্ত্ত কণ্ঠে 'উহু-হু-হু' ব'লে উঠল। পরক্ষণেই বললে—কামড়ে দিয়েছে হাত—ধরবেন না, ধরবেন না—

ততক্ষণ গাড়োয়ান গাড়ী থামিয়ে ফেলেছে। আমাদের দিকে চেয়ে বললে—কি বাবু? কি হয়েছে?

গাড়োয়ানের কথার উত্তর দেবার সময় বা সুযোগ তখন আমার নেই। কারণ মেয়েটি আমায় ঠেলে বাইরের দিকে আসতে চাইছে অন্ধকারের মধ্যে।

ওর দাদা বললে—ওর চুল ধরুন—গায়ে হাত দেবেন না, কামড়ে দেবে—

কিন্তু আমি কোন কিছু বাধা দেবার পূর্ব্বেই মেয়েটি আমাকে ঠেলে গরুর গাড়ীর সামনের দিকে গিয়ে পৌছল এবং গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে পড়ল।

হতভম্ব গাড়োয়ান গরুর কাঁধ থেকে জোয়াল নামাবার

পূর্ব্বেই আমি ও মেয়েটির দাদা দু-জনেই গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়লাম।

মাঠের মধ্যে অন্ধকার তত নিবিড় নয়, কিন্তু মেয়েটির কোন পাত্তা কোন্ দিকে দেখা গেল না।

আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে এবং বোধ হয় মেয়েটির দাদারও—

এই সময়ে কিন্তু আমাদের গাড়োয়ান যথেষ্ট সাহস ও উপস্থিত-বুদ্ধির পরিচয় দিলে। সে ততক্ষণে ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরেছে। তিরোলে যারা যায়, তাদের মধ্যে কেউ না কেউ যে অপ্রকৃতিস্থ থাকবেই, এ তথ্য তাদের অজানা নয়, তবে আমাদের তিন জনের মধ্যে কে সেই লোক, এটাই বোধ হয় সে এতক্ষণ ঠাওর করতে পারে নি।

গাড়োয়ান তাড়াতাড়ি বললে—বাবু শীগ্‌গির চলুন কাছেই পাতিহালের খাল—সেদিকে উনি না যান, টিপ-কলের আলোটা জ্বালুন—

এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছি আমরা, যে যুবকের পকেটে টর্চ্চ রয়েছে, সে-কথা দু-জনের কারও মনে নেই।

সবাই ছুটলাম গাড়োয়ানের পিছু পিছু। প্রায় দু-রসি আন্দাজ পথ ছুটে যাবার পরে একটা সরু খালের ধারে পৌছলাম, তার দু-পাড়ে নিবিড় বঁষাড় ঝাড়। তন্ন তন্ন ক'রে ঝোপঝাড়ের আড়ালে খুঁজে, চীৎকার ক'রে ডাকা-ডাকি ক'রেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

সব ব্যাপারটা এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে গেল যে এতক্ষণ ভেবে দেখবারও অবকাশ পাওয়া যায় নি জিনিসটার গুরুত্ব কতটা বা এ থেকে কত কি ঘটতে পারে।

পূর্ণিমার দাদা প্রায় কাঁদ-কাঁদ সুরে বললে—আর কোন দিকে কোন জলা আছে—হ্যাঁ গাড়োয়ান?

—না বাবু, কাছেপিঠে আর জল নেই তবে খালের ধারে আপনাদের মধ্যে এক জন দাঁড়িয়ে থাকুন, আমরা বাকি দু-জন অন্য দিকে যাই—

আমিই খালের ধারে রইলাম, কারণ যুবকটি একলা অন্ধকারে, যত দূর বুঝলাম, দাঁড়িয়ে থাকতে রাজি নয়।

ওরা তো চলে গেল অন্য দিকে। আমার মুশকিল এই যে সঙ্গে একটা দেশলাই পর্য্যন্ত নেই। এই কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর রাত্রের অন্ধকারে একা মাঠের মধ্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কি জানি?

সেখানে কতক্ষণ ছিলাম জানি না, ঘণ্টাখানেক বোধ হয় হবে, তার বেশীও হয়ত। তার পর খালের ধার ছেড়ে মাঠের দিকে এগিয়ে গেলাম। এদের ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছি নে।

এমন সময় দূরে আলো দেখা গেল। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের গলাটা শুনলাম—বাবু, বাবু—

আমার সাড়া পেয়ে ওরা আমার কাছে এল। গাড়োয়ানের সঙ্গে কয়েকটি গ্রাম্য লোক—ওদের হাতে একটা হারিকেন লণ্ঠন।

ব্যস্তভাবে বললাম—কি হ'ল? পাওয়া গিয়েছে?

যার হাতে লণ্ঠন ছিল, সে-লোকটা বললে—চলেন বাবু। সব রয়েছেন তেনারা আমার বাড়ীতে ব'সে। আমি বাবু গোয়াল ঘরে গরুদের জাব কেটে দিতে ঢুকেছি সন্দের একটু পরেই—দেখি গোয়াল ঘরের এক পাশে একটি পরমাসুন্দরী ইস্ত্রিলোক। তখন আমি তো চমকে উঠেছি বাবু! ইকি! তার পর বাড়ীর লোক এসে পড়ল। তার পর এনারা গিয়ে পড়লেন। তাঁদের আমরা বাড়ীতে বসিয়ে আপনার খোঁজে বেরুলাম। অন্ধকারের মধ্যে ভদ্দরলোকের ছেলের এ কি কষ্ট! চলুন গরীবের বাড়ী। দুটো ডাল-ভাত রান্না ক'রে খান। দিদি-ঠাকরুণের মাথাটা ভাল যদি হ'ত একটু, তো দিদিঠাকরুণ একেবারে লক্ষ্মীর পিরতিমে! আমাদের বাড়ীতে তাঁর পায়ের ধুলো পড়েছে—আপনারা সবাই ব্রাহ্মণ শোনলাম—কতকালের ভাগ্যি আমাদের। দুটো ভাত সেবা ক'রে আজ রাতে শুয়ে থাকুন—কাল ভোরে আমি আমার গাড়ীতে তিরোল পৌছে দেব আপনাদের। অমন হয়।

গ্রামের মধ্যে লোকটার বাড়ী গিয়ে পৌছলাম।

বাড়ীটার কথা এখানে একটু ভাল ক'রে বর্ণনা করা দরকার। কারণ এর পরবর্ত্তী ঘটনার সঙ্গে এই বাড়ীর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এক-এক বার ভাবি সে-রাত্রে যদি সেখানে থাকবার প্রস্তাবে রাজি না হয়ে ওদের নিয়ে সোজাসুজি তিরোল নিয়ে যেতুম!

আসলে নিয়তি। নিয়তি যাকে যেখানে টানে।

তিরোল গেলেই কি নিয়তির হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যেত? ভুল।

বাড়ীটা ও-দেশের চলন-মত মাটির দেওয়াল, বিচুলিতে ছাওয়া। বাইরে বেশ বড় একখানা বৈঠকখানা ঘর, তার দুই কামরা, মাটির দেওয়ালের ব্যবধান। সামনে খুব বড় মাটির দাওয়া, তার সামনে উঠান—উঠানের পশ্চিম ধারে ছোট একটা ঘাট-বাঁধানো পুকুর। বৈঠকখানার দুটো কামরার মধ্যে যেটা ছোট, সেটার পেছনের দোর খুলে কিন্তু বাইরের উঠানে আসা যায় না—সেটি অন্তঃপুরে যাতায়াতের পথ।

গৃহস্বামীর নাম রসিকলাল ধাড়া—জাতিতে কৈবর্ত্ত। সুতরাং তাদের রাঁধা ভাত আমাদের চলবে না! রসিকলালের একান্ত অনুরোধে আমরা রান্না করতে রাজি হ'লাম। জিনিসপত্র, দুধ, শাকসব্জী ছ-জনের উপযোগী এসে পড়ল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রান্না করলে পূর্ণিমা। পূর্ণিমা আবার সেই আগেকার শান্ত, স্বাভাবিক মূর্ত্তি ধরেছে। তার কথাবার্ত্তা, রান্নার কৌশল, সহজ ব্যবহার দেখে কেউ বলতেও পারবে না কিছুক্ষণ আগে এ গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে পালিয়েছিল।

খেতে বসবার কিছু আগে পূর্ণিমা যেখানে রাঁধছে, সেখানে উঁকি মেরে দেখি গ্রামের অনেক মেয়ে ওকে দেখতে এসেছে, নানা-রকম কথাবার্ত্তা জিগ্যেস করছে, বুঝলাম পূর্ণিমার কাহিনী ইতিমধ্যে গ্রামময় রটে গিয়েছে।

রাত এগারোটা প্রায় বাজে, পূর্ণিমা এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেল খেতে।

আমি বল্লুম—সকলের সঙ্গে আলাপ হ'ল, পূর্ণিমা!

পূর্ণিমা সলজ্জ হেসে বললে—ওরা সব এসেছে কেন জানেন, না কি আমায় সবাই দেখতে এসেছে। আমি বললাম, আমি ভাই আপনাদের মতই মেয়ে, দুখানা হাত, দুখানা পা, আমায় দেখবার কি আছে?

ওর দাদা বললে—আর কি কথা হ'ল?

—আর কিছু না। আমাদের বাড়ী কোথায়, আমার বয়স কত—এই জিগ্যেস করছিল।

তার পর বেশ দিব্যি সহজভাবেই বললে—আর বলছিল তোমার বিয়ে হয় নি?

আমি বললাম, এ-বছর আমার বিয়ে দেবেন বলেছেন বাবা।

ব'লেই সে আমাদের পাতে ডাল না কি পরিবেশন করতে আরম্ভ করলে।

আমি তো অবাক, ওর দাদার দিকে চাইতে সে বেচারী আমায় চোখ টিপলে। পাগল হোক, উন্মাদ হোক, মেয়েদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাবে কোথায়? বড় কষ্ট হ'ল ভেবে, অভাগীর ও-সাধ এ-জীবনে পূর্ণ হবার নয়।

কিন্তু এ ধরণের দু-একটা বেফাঁস কথা ছাড়া পূর্ণিমার অন্য সব কথাবার্ত্তা এমন স্বাভাবিক যে, কেউ তার মধ্যে এতটুকু খুঁৎ ধরতে পারবে না। ওর গলার সুরটা ভারি মিষ্টি—খুব কম মেয়ের গলায় এমন মিষ্টি সুর শুনেছি। এমন একটি সুন্দর চালচলন, নিজের দেহটা বহন ক'রে নিয়ে বেড়ানোর সুশ্রী ধরণ আছে ওর যে ওকে নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর মেয়ে বলে কেউ ভাবতে পারবে না।

আমায় বললে—আপনাকে আমরা তো বড় কষ্ট দিলুম আমাদের ময়নাডিতে যাবেন কিন্তু এক বার দাদা—

—বেশ যাব বইকি দিদি, নিশ্চয়ই যাব—

—এই পূজার সময়েই যাবেন। আমাদের ওখানে দুখানা পূজো হয়, একখানা কলিয়ারীর বাবুরা করে আর একখানা বাজারে হয়। শখের থিয়েটার হয়,—

ওর দাদা এই সময় বললে—আর একটা জিনিস দেখবেন সাঁওতালের নাচ, সে একটা দেখবার জিনিস—

—আসুন পূজার সময়—ভারি খুশী হব আমরা আপনি এলে।

পূর্ণিমা উৎসাহের সঙ্গে বললে—তা হ'লে কথা রইল কিন্তু দাদা। বোনের নেমতন্ন রাখতেই হবে আপনার—

এই সময় গৃহস্বামীর মেয়ে দুধ নিয়ে এসে পূর্ণিমাকে বললে, আমাদের সকলকে দুধ দিতে।

পূর্ণিমা বললে—তা হ'লে একখানা দুধের হাতা নিয়ে এস খুকী—ডালের হাতায় তো দুধ দেওয়া যাবে না?

পূর্ণিমার এই সব কথাবার্ত্তার খুঁটিনাটি আমার খুব মনে আছে, কারণ পরে এই কথাগুলি মনে মনে আলোচনা করবার যথেষ্ট কারণ ঘটেছিল।

আহারাদির প্রায় আধ ঘণ্টা পরে আমরা সবাই শুয়ে

পড়লুম—পূর্ণিমা তার দাদার সঙ্গে বাইরের ঘরের ছোট কামরাটায় এবং আমি বড় কামরাটায়।

এবার আমি আমার নিজের কথা বলি। শরীর ও মন বড় ক্লান্ত ছিল—অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু কতক্ষণ পরে জানি নে এবং কেন তাও জানি নে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার বুকে যেন পাথরের ভারি বোঝা চাপিয়েছে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে যেন কষ্ট হচ্ছে। ভাবলুম নিশ্চয়ই নদীর হাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছে কিংবা ওই রকম কিছু। অমন হয়। আবার ঘুমোবার চেষ্টা করি, এমন সময় আমার মনে হ'ল পাশের কামরায় কি রকম একটা কৌতূহলজনক শব্দ হচ্ছে। হয়তো পূর্ণিমার দাদার নাক-ডাকার শব্দ। অদ্ভুত রকমের নাক-ডাকা বটে—যেন গোঁঙানি বা কাৎরানির শব্দের মত। একটু পরেই আর শব্দ শুনতে লুম না—আমিও পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমার ঘুম ভাঙল খুব ভোরে।

পাশের কামরার দোর তখনও বন্ধ। আমি উঠে হাতমুখ ধুয়ে মাঠের দিকে বেড়াতে গেলুম। আধ ঘণ্টা বেড়ানোর পরে ফিরে এসে দেখি তখনও ওরা কেউ ওঠে নি—এমন কি বাড়ীর লোকও না। আরও আধ ঘণ্টা পরে গৃহস্বামী রসিক ধাড়া উঠে বাইরের ঘরের দাওয়ায় এসে বসল। আমায় বললে—ঘুমুলেন কেমন বাবু? মশা কামড়ায় নি? এঁরা এখনও ঘুমুচ্ছেন বুঝি? রসিকের সঙ্গে কিছুক্ষণ চাষবাসের গল্প করলাম। তার পর সে উঠে কোথায় বেরিয়ে গেল।

এদিকে প্রায় আটটা বাজল। তখনও পূর্ণিমা বা তার দাদার ঘুম ভাঙে নি। সাড়ে আটটার সময় রসিক ফিরে এল। গ্রীষ্মকাল, সাড়ে আটটা দস্তুরমত বেলা, খুব রোদ উঠে গিয়েছে চারিধারে। রসিক আবার জিগ্যেস করলে—এঁরা এখনও ওঠেন নি? আমি বললাম—কই না, ওঠে নি তো। গরমে সারারাত ঘুম হয় নি বোধ হয়, ভোরের দিকে ঘুমিয়েছে আর কি।

আমার কাহিনী শেষ হয়ে এসেছে। বেলা ন'টার সময়ও যখন ওদের সাড়া-শব্দ শোনা গেল না তখন আমি দরজায় ঘা দিলাম। ঘরের মধ্যে মানুষ আছে বলেই মনে হোল না। তখন বাধ্য হয়ে আমি পশ্চিম দিকের ছোট জানালাটা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে গেলাম—ঘরের মধ্যে একটি মেয়ে নিদ্রিতা, এ অবস্থায় জানালা দিয়ে চেয়ে দেখতে দ্বিধা বোধ করছিলুম কিন্তু এক বার দেখাটা দরকার। ব্যাপার কি ওদের?

জানালা দিয়ে যা দেখলাম তাতে আমি চীৎকার করে উঠেছিলাম বোধ হয়, ঠিক বলতে পারি নে। কারণ আমারও কিছুক্ষণের জন্যে বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, কি যে ঘটেছে, কি না ঘটেছে আমার খেয়াল ছিল না।

জানালা দিয়ে যা দেখলুম তা এই।

প্রথমেই আমার চোখে পড়ল ঘরে এত রক্ত কেন? চোখে ভুল দেখলাম না কি? কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। ঘরে এক খানা চৌকি পাতা, পূর্ণিমার দাদা চৌকির উপরকার বিছানায় উপুড় হয়ে কেমন এক অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে শুয়ে, বিছানা রক্তে ভাসছে, মেজেতে রক্ত গড়িয়ে পড়ে মেজে ভাসছে—আর পূর্ণিমা দেওয়ালের ধারে মেজের ওপর পড়ে আছে, জীবিতা কি মৃতা বুঝতে পারলাম না। একটা পাশবালিশ চৌকির ওপর থেকে যেন ছিটকে পূর্ণিমার দেহের কাছে পড়ে, সেটাও রক্তমাখা।

আমার চীৎকার অনেক দূর থেকে শোনা গিয়েছিল নাকি। লোকজন চারি ধার থেকে এসে পড়ল। আমার জ্ঞান ছিল না, মাথায় জলটল দিয়ে আমায় সকলে চাঙ্গা করে দশ-পনেরো মিনিট পরে।

এদিকে দরজা ভেঙে সকলে ঘরে ঢুকল। তারা দেখলে পূর্ণিমার দাদার গলায়, কাঁধে ও হাতে সাংঘাতিক কোপের দাগ, আগের রাত্রে কুটনো কোটার জন্যে একখানা বড় বঁটি গৃহস্থেরা দিয়েছিল—সেখানা রক্তমাখা অবস্থায় বিছানার ওপাশে প'ড়ে, পূর্ণিমার শাড়ী-ব্লাউজে কিন্তু খুব বেশী রক্ত নেই, কেবল শাড়ীর সামনের দিকটাতে যেন ছিটকে-লাগা রক্ত খানিকটা। হতভাগিনী রাত্রে কোন সময় এই বীভৎস কাণ্ড ঘটিয়েছে, নিজের হাতে ভাইকে খুন ক'রে ঘরের মেজেতে অঘোর নিদ্রায় অভিভূতা। দিব্যি শান্ত, নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমুচ্ছে, আমার যখন জ্ঞান হয়ে ঘরে ঢুকেছি

তখনও। ঘুমন্ত অবস্থায় ওকে দেখাচ্ছে কি সুন্দর, আরও ছেলেমানুষ, নিষ্পাপ সরলা বালিকার মত।

নারীর প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসমূর্ত্তি সেই ভয়ানক প্রভাতে এক মুহূর্ত্তে আমার চোখের সামনে যেন ফুটে উঠলো, পলকে যে প্রলয় ঘটায়, এক হাতে দেয় প্রেম, অন্য হাতে আনে মৃত্যু, এক হাতে যার খড়্গ, অন্য হাতে বরাভয়।

অতঃপর যা ঘটবার তাই ঘটল। পাড়ার লোক, গ্রামের লোক ভেঙে পড়ল। পুলিস এল—আমি মেয়েটির অবস্থা সম্বন্ধে যা জানি খুলে বললাম। তাদের জেরার প্রশ্নোত্তর দিতে দিতে আমার মনে হ'ল হয়তো বা আমিই পূর্ণিমার দাদাকে খুন ক'রে থাকব। ঘুমন্ত মেয়েটির পাশ থেকে ওর দাদার মৃতদেহ সরানোর ব্যবস্থা আমিই করে দিলাম—মৃতের সকল চিহ্ন, রক্তাক্ত বস্ত্র, বঁটি, বিছানা। উন্মত্ততার ঘুম সহজে ভাঙে নি তাই রক্ষে—দুপুর পর্য্যন্ত পূর্ণিমা নিরুদ্বেগে ঘুমুল। পুলিসকেও কষ্ট করে ওর ঘুম ভাঙাতে হোল।

আমি ওর পাশে দাঁড়ালুম এই ঘোর অন্ধকার রাত্রে। অসহায় উন্মাদিনীর আর কে ছিল সেখানে? যদিও ওর অবস্থা দেখে চোখের জল ফেলে নি এমন লোক সে-অঞ্চলে ছিল না, কি মেয়ে কি পুরুষ—এমন কি থানার মুসলমান দারোগাবাবু পর্য্যন্ত।...

সয়লাডি কলিয়ারীতে টেলিগ্রাম করা হ'ল। ওর বাবা এলেন, তাঁর সঙ্গে এলেন তাঁর তিনটি বন্ধু। ওঁদের মুখে প্রথম শুনলুম পূর্ণিমা বিবাহিতা, পাগল ব'লে স্বামী নেয় না—সে কখনও জানে সে বিবাহিতা, কখনও আবার ভুলে যায়। পূর্ণিমার মা নেই তাও এই প্রথম শুনলাম।

ভদ্রবংশের ব্যাপার, এ নিয়ে খুব গোলমাল যাতে না হয়, শুরু থেকেই তার ব্যবস্থা করা হ'ল। খবরের কাগজে ঘটনাটি উঠেছিল—কিন্তু একটু অন্য ভাবে। কয়েকটি প্রভাবশালী লোকের সহানুভূতি লাভ করার দরুণ ব্যাপারের জটিলতার হাত থেকে আমরা অপেক্ষাকৃত সহজে রেহাই পেলাম।

পূর্ণিমাকে রাঁচি উন্মাদ-আশ্রমে দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। ওর বাবাও দেখলুম ওকে আর বাড়ী নিয়ে যেতে রাজি নয়। শ্রীরামপুর কোর্টের প্রাঙ্গণ থেকে ওকে মোটরে সোজা আনা হ'ল হাওড়া। হাওড়া থেকে রাঁচি এক্সপ্রেসে যখন ওঠান হচ্ছে—তখন একগাল হেসে ও আমার দিকে চেয়ে বললে—আমাদের সয়লাডিতে আসবেন কিন্তু এক দিন? মনে থাকবে তো?

ওর বাবাকে বললে—দাদা কোথায় বাবা? দাদাকে দেখছি নে। দাদার কাছে কানের দুল দুটো খোলা রয়েছে, কান বড্ড ন্যাড়া ন্যাড়া দেখাচ্ছে—

এ-সব কয়েক বছর আগেকার কথা। অনেকেই বুঝতে পারবেন আমি কোন্ ঘটনার কথা বলছি। মানুষ চলে যায়, স্মৃতি থাকে। জীবনের উপর কত চিতার ছাই ছড়ান, সেই ছাইয়ের সূক্ষ্ম স্তরে বহু প্রিয়-পরিচিত জনের পদচিহ্ন আঁকা।

এই শ্যামলা পৃথিবী, রৌদ্রালোক, পরিবর্ত্তনশালী ঋতু-চক্রের আনন্দ থেকে নির্ব্বাসিতা সে হতভাগিনীর কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে তখন ভাবি সে নেই, এত দিনে সুদূর রাঁচির উন্মাদ-আশ্রমে তার অভিশপ্ত জীবনের অবসান হয়ে গেছে—ভগবান্ আর ওকে কতকাল কষ্ট দেবেন?

বলা বাহুল্য, এই কাহিনীর মধ্যে আমি সব কাল্পনিক নাম ধাম ব্যবহার করেছি, কারণ সহজেই অনুমেয়।

ভক্ত কুম্ভনদাসজী

শ্রীগোকুলনাথজীর (১৫৬৮ খ্রীঃ) বৈষ্ণববার্ত্তা হইতে গৃহীত

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের পাশেই যমুনাবতী গ্রাম। এক সময়ে এই গ্রামের পাশ দিয়া যমুনা প্রবাহিত ছিল, তাতেই গ্রামের নাম যমুনাবতী। এই গ্রামেই ভক্ত কুম্ভনদাসের বাস। কিছু দূরে পরাসোলী গ্রামে তাঁহার কিছু ক্ষেতখামার ছিল, তাহাতেই কোনো মতে কুম্ভনের চলিত। কুম্ভন শূদ্র, কিন্তু মহাপ্রভু বল্লভাচার্য্যের কৃপাপাত্র হওয়ায় তিনি জাতিতে তখনকার প্রধান আট জন কবি অর্থাৎ অষ্টছাপের মধ্যে এক জন হইলেন।

কুম্ভনদাস বড়ই গরীব। সাতটি সন্তান, অথচ সামান্য একটু জমিজমা। প্রাণপণে চাষ-আবাদ করিয়াও অভাব ঘুচিত না। অতিকষ্টে সংসার চালাইতেন। বল্লভাচার্য্যের পুত্র গোস্বামী বিঠ্ঠলনাথ তাঁহার অবস্থা জানিতেন। তাই এক বার দ্বারকা যাইবার সময় কুম্ভনকে তিনি বলিলেন, "তুমিও সঙ্গে চল।" সেই দেশে তাঁহাদের বহু ধনী শিষ্য। সেখানে গেলে বল্লভের কৃপাপাত্র ভক্ত কবি বলিয়া কুম্ভন সকলের কাছে যাহা শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে পাইবেন তাহাতেই কুম্ভনের অভাব ঘুচিবে, এই ছিল গোস্বামীজীর অভিপ্রায়। তিনি কুম্ভনকে খুলিয়া বলিলেন, "শুনিতে পাই, তোমার বড় টানাটানি। সেখানে গেলে তোমার যাহা সিদ্ধি হইবে তাহাতেই তোমার চলিয়া যাইবে।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া কুম্ভনজী তো সঙ্গে চলিলেন। অপ্সরা-কুণ্ড পর্য্যন্ত যাইয়াই কুম্ভন ঠাকুরকে যে গোকুলে ফেলিয়া রাখিয়া দূরে যাইতেছেন সে বিরহ-দুঃখে একেবারে ব্যাকুল হইলেন। বিরহবশে এক নিভৃত স্থানে কুম্ভনদাস বিচ্ছেদের গান গাহিতেছেন আর তাঁর দুই চক্ষু বাহিয়া অবিরল ধারা ঝরিতেছে। তাঁহার গান দূর হইতে শুনিয়াই গোস্বামীজী বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "কুম্ভন, তোমার বিদেশ-যাত্রার দণ্ড হইয়াছে, তুমি শীঘ্র গোকুলে ফিরিয়া যাও। তুমি যেমন ঠাকুরের জন্য ব্যাকুল, তেমনি ঠাকুরও নিশ্চয় তোমার জন্য ব্যাকুল। তাই আর বিদেশ-যাত্রায় কাজ নাই, তোমার প্রিয়তমের সঙ্গে গিয়া মিলিত হও।"

কুম্ভনদাসের দারিদ্র্যের তো অন্ত নাই, অথচ সাতটি পুত্র। এক বার গোঁসাইজী কুম্ভনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কুম্ভন, তোমার কয়টি পুত্র?" কুম্ভন বলিলেন, "দেড়টি।" "দেড়টি পুত্র আবার কেমন কথা?" কুম্ভন কহিলেন, "পুত্র চতুর্ভুজ দাস আপনার কৃপাপাত্র ও ভক্ত কবি, তাই তাকে পুরা বলিয়া ধরি। আর পুত্র কৃষ্ণদাস ঠাকুরের কাছে কীর্ত্তন করে, ঠাকুরের সেবা করে, তাই তাকে আধা ধরি। আর-সবার মধ্যে এমন তো কিছু নাই যে গণনা করা যায়।"

কুম্ভন তাঁহার সন্তানদের স্নেহ করিতেন খুবই। এক বার কৃষ্ণদাস শ্রীনাথজীর মন্দিরের গরু চরাইতে গিয়াছেন, এমন সময় বাঘ আসিয়া আক্রমণ করিল। ঠাকুরের ধেনু বাঁচাইতে গিয়া কৃষ্ণদাস আপনার প্রাণ দিলেন। সেই খবর যখন কুম্ভন শুনিলেন তখন একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কাহারও কথায় আর সাড়া দেন না। অতিকষ্টে গোঁসাইজী কুম্ভনের চৈতন্য সম্পাদন করেন।

অর্থে দরিদ্র হইলেও কুম্ভন ভাব-ঐশ্বর্য্যে ধনী ছিলেন। দেশ জুড়িয়া তাঁহার গান ও কবিতার সমাদর হইল। কলাবতের মুখে তাঁহার অপূর্ব্ব সব গান শুনিয়া বাদশাহ আকবর মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই গানের রচয়িতা কে? যে-যুগে এই রচয়িতা জীবিত ছিলেন, সেই যুগ ধন্য।" লোকেরা বলিল, "হুজুর, এই সব গানের রচয়িতা ভক্ত কুম্ভনদাস এখনও জীবিত।" কুম্ভনদাস জীবিত আছেন শুনিয়া আকবর অতিশয় প্রীত হইলেন। জিজ্ঞাসা

কহিলেন, "কোথায় তিনি বাস করেন?" উত্তর শুনিলেন, "তিনি গোকুলে যমুনাবতী গ্রামে বাস করেন।" আকবর বলিলেন, 'তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলে কি তিনি দয়া করিয়া আসিবেন?"

আকবরের প্রেরিত ঘোড়া এবং পাল্‌কী কুম্ভন দাসের জন্য রওয়ানা হইল। কুম্ভন তখন চাষবাসের জন্য পরাসোলী গ্রামে ছিলেন। দিল্লীর লোক যমুনাবতী হইতে পরাসোলী গিয়া উপস্থিত হইল। দিল্লীর রাজপুরুষেরা কহিল, "তোমার জন্য এই সব যানবাহন উপস্থিত, বাদশাহ তোমাকে স্মরণ করিতেছেন।" কুম্ভন বলিলেন, "আমি বনবাসী সামান্য লোক, রাজসেবার আমি কি বা জানি! আমাকে তাঁহার কিসের প্রয়োজন, আমার জন্য কেনই বা এই সব যান-বাহন পাঠান হইল?" রাজপুরুষেরা কহিল, "বাবা, আমরা সে-সব কিই বা বুঝিব? বাদশাহ আমাদিগকে কহিলেন, 'কুম্ভন দাসজীকে লইয়া আইস' আমরা তাই আসিলাম। পাল্‌কী আছে, ঘোড়া আছে, যাহাতে খুশি চলুন। আপনার যাইবার জন্য যে-কোনো ব্যবস্থা আমরা করিতে প্রস্তুত, কিন্তু দয়া করিয়া চলুন।"

কুম্ভনদাসজী বুঝিলেন, না গেলে চলিবে না তাই পাদুকা পরিধান করিয়া তখনই পদব্রজে রওয়ানা হইলেন। রাজপুরুষেরা বলিল, "বাবা পাল্‌কীতে উঠিয়া চলুন।" কুম্ভন বলিলেন, "ভাই, পাল্‌কীতে তো জীবনে কখনও উঠি নাই, তাই হাঁটিয়াই না-হয় ফতেপুর সিক্রী যাইব।" দিল্লী হইতে ফতেপুর কুম্ভনদাসের পক্ষে অনেক অল্প পথ ও যাওয়া সহজ, তাই বোধ হয় বাদশা নিজেও দিল্লী হইতে আসিয়া ফতেপুর সিক্রীতে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

কুম্ভন সিক্রী পৌঁছিলেন। রাজপুরুষেরা বাদশাহকে কুম্ভনের আগমনবার্তা দিলেন। বাদশা কহিলেন, "যাও, তাঁহাকে লইয়া আইস।" কুম্ভন আসিলে বাদশাহ তাঁহাকে আদর করিয়া নিকটে বসাইলেন। কুম্ভন বসিলেন। সেখানে স্বর্ণরত্নাদিখচিত চন্দ্রাতপ, মুক্তার ঝালর প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যের ছড়াছড়ি। এই সব ঐশ্বর্য্য দেখিয়া দরিদ্র কুম্ভনের পক্ষে অভিভূত হইয়া পড়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি মনে মনে বড়ই দুঃখে ভাবিতে লাগিলেন, "হায় হায় কেন এই সব বৃথা আড়ম্বর! ইহা হইতে তো আমার ব্রজভূমির বনের তরুলতাও অপরূপ সুন্দর! কি তাহার জীবন্ত ফলফুলপল্লবের সরস শোভা, কি পাখীর গান, ফুলের গন্ধ, মন্দ মন্দ সমীরণ! ইহারই নাম না কি ঐশ্বর্য্য। হায় হায় আমার প্রভুর প্রেমসরস লীলাভূমির সঙ্গে কি ইহার তুলনা!" কুম্ভনের মনে মনে এইরূপ ভাবেরই তরঙ্গ তখন চলিয়াছে।

এমন সময় বাদশাহ বলিলেন, "কুম্ভনদাসজী তুমি ধন্য, ভগবানের উদ্দেশ্যে বহু গীত তুমি নাকি রচনা করিয়াছ। তাহার কিছু শুনাইয়া আমাদিগকেও তুমি ধন্য কর।" কুম্ভন ভাবিলেন "আমার গান তো আমার একলার রচনা নহে। প্রভুর লীলারসভূমির স্পর্শ না পাইলে, ভক্ত রসিকজনের সঙ্গ না পাইলে সেই সব ভাগবত বাণী কেমন করিয়া এই হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত হইবে?"

বাদশাহ তো ভক্তিনম্রহৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু আশেপাশে সভাসদেরা নানা ভাবে গানের জন্য কুম্ভনকে উত্যক্ত করিয়া তুলিলেন। একে ব্রজভূমির বিরহ, তার উপর রাজ-ঐশ্বর্য্যের বর্ব্বর আড়ম্বর, এবং তার সঙ্গে এই সব ক্ষুদ্রাত্মাদের যত বাক্যবাণ। ক্ষতবিক্ষতচিত্তে কুম্ভন দাসজী গাহিলেন, "ভক্তন কৌ কহা সীকরী কাম" অর্থাৎ সীকরীতে ভক্তদের কি কাজ। এখানে আসিতে বৃথা কষ্ট তার উপর "বিসর গয়ো হরিনাম" হরিনামই যাইতে হয় ভুলিয়া। এবং

> জাকো মুখ দেখে দুখ লাগে তাকো করণ পরী পরণাম।
> কুম্ভন দাস লাল গিরিধর বিন যহ সব ঝুঠো ধাম॥

অর্থাৎ "যাহাদের মুখ দেখিলে হয় দুঃখের উদয় তাহাদিগকে করিতে হয় প্রণাম। কুম্ভনদাস বলেন, আমার প্রেমময় ঠাকুর বিনা মিথ্যা এই সব ধাম।"

এমন গান শুনিয়া চারি দিকের লোকেরা আর গানের কথা তুলিতেই অগ্রসর হইল না। বাদশাহ সব বুঝিলেন। তিনি মনে মনে অনুভব করিয়া কহিলেন "ভগবানেই ইহার সাচ্চা প্রেম, ইহার কেন এই রাজ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ভাল লাগিবে?" এই বলিয়া তিনি সাদরে কুম্ভনদাস-জীকে বিদায় দিলেন। ফিরিবার পথে কুম্ভন ক্রমাগত

ভাবিতে লাগিলেন, "কতক্ষণে আবার আমার ঠাকুরের শ্রীমুখ দেখিব ?" সঙ্গে সঙ্গে গান করিলেন,

কবহু দেখহোঁ ইন নৈনমু !
সুংদর শ্যাম মনোহর মূরত অংগ অংগ সুখ দেনমু ॥
বৃন্দাবন বিহার দিন দিন প্রতি গোপ বৃংদ সংগ লেনমু ।

* * *

কুংভন দাস কিতে দিন বীতে কিয়ে রেণু সুখ সেনমু ।
অব গিরধর বিন নিস ওর বাসর মন ন রহত ক্যোঁ চেনমু ॥

কবে আমার হেরিব এই নয়নে !
সুন্দর শ্যাম মনোহর মূর্ত্তি, অঙ্গে অঙ্গে পাইব কত আনন্দ !
প্রতিদিন বৃন্দাবনে বিহার, প্রতিদিন পাইব আমার
গোপবৃন্দ সঙ্গ !
কুম্ভনদাস, কত দিন তো হইয়া গেল সেই ধূলায়
সুখ-শয়নে আছি
বঞ্চিত, এখন গিরিধর বিনা দিনরাত্রি আর নাই মনে
কোন সুখশান্তি ।

আর এক সময় রাজা মানসিংহ বহু যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া দেশে ফিরিতেছেন। তখন তাঁহার মনে হইল, "বহু দিন পরে দেশে ফিরিলাম, এক বার মথুরা-বৃন্দাবন হইয়া যাই না কেন ?" আগরার পথে তিনি মথুরা আসিলেন। বিশ্রাম-ঘাটে স্নান করিয়া কেশব রায় দর্শন করিয়া তিনি বৃন্দাবন চলিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল। কিন্তু বৃন্দাবনের মহন্তেরা যখন শুনিলেন মানসিংহ আসিতেছেন তখন তাঁহারা আপন আপন ঠাকুরকে বহু বস্ত্র রত্ন আভরণ পরাইয়া রাখিলেন। গ্রীষ্মকাল। ঠাকুরদের আবার বেশভূষার এইরূপ বাহুল্য ! মানসিংহ যেন আরও গরমে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাই মন্দিরের পর মন্দির তিনি খাড়া হইয়াই দর্শন করিলেন এবং ভীষণ গরমে দগ্ধ হইয়া আপন শিবিরে ফিরিলেন। শিবিরে ফিরিয়া মনে করিলেন, "এখনই এখান হইতে যাত্রা করিলে ভাল হয়।"

যাত্রা করিয়া তৃতীয় প্রহরে ভীষণ গরমের দিনে তিনি গোবর্দ্ধন গ্রামে আসিলেন। মানসী গঙ্গার উপর শিবির সন্নিবেশ করিয়া হরদেবজীর মন্দিরে গেলেন। সেখানেও বৃন্দাবনের মতই আড়ম্বর মহন্তেরা করিয়া রাখিয়াছেন। মানসিংহ সেখানেও দর্শন করিয়াই রওয়ানা হইলেন। তখন কে একজন বলিল, "এখানে গোবর্দ্ধননাথ ঠাকুর অতি মনোহর মূর্ত্তি, সেখানে একবার দর্শনে চলুন।" মানসিংহ বলিলেন, "অবশ্যই যাইব। গোবর্দ্ধননাথজী তো ব্রজের রাজা, সেখানে কি না গেলে চলে ?"

তাই সেখান হইতে মানসিংহ গোপালপুর গ্রামে আসিলেন। আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরের দর্শন হইবে কখন ?" সকলে বলিলেন, "উত্থাপনের দর্শন হইয়া গিয়াছে, এখন ভোগের দর্শন হইবে।" ইহা শুনিয়া দর্শনের জন্য মানসিংহ গিরিরাজের উপর উঠিলেন। গ্রীষ্ম-কাল, পথশ্রম, বহুদূর-পর্য্যটনের ক্লান্তি, গরমে মানসিংহ একেবারে ব্যাকুল হইলেন। এমন সময় ঠাকুরের মন্দির খুলিল, মানসিংহকে ঠাকুরের ভিতরের ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে গোলাপজলের ধারা ও জলের ঝরণায় ঘরখানা অতি শীতল ছিল। মানসিংহের সকল তাপ যেন দূর হইল, তিনি বড়ই শান্তি পাইলেন। ঠাকুরের শ্রীমুখ দেখিয়াও বড় আনন্দ হইল। এই মন্দির ও শ্রীমূর্ত্তির কথা তিনি অনেক শুনিয়াছিলেন, আজ তাঁহার চক্ষুকর্ণের বিবাদ ঘুচিল।

ঠাকুরের সম্মুখে মৃদঙ্গবাদ্যসহ অপূর্ব্ব কীর্ত্তন চলিতে-ছিল। কুম্ভনদাসজী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মধুর ভাবে এই পদ গাহিতেছিলেন,

"রূপ দেখ নৈনা পল লাগে নহী ।
গোবর্দ্ধনকে অংগ অংগ প্রতি
নিরখি নৈন মন রহত তহী ।

"রূপ দেখিয়া নয়নে আর লাগে না পলক। তাঁহার প্রতি অঙ্গের যেখানেই নয়ন পড়ে সেখানেই যেন চায় লাগিয়া থাকিতে।' ইত্যাদি।

তার পর কুম্ভনদাস ধরিলেন,

"আবত মোহন মন জু হর্যো হৈ।"

"আসিতেই যেন মোহন আমার মন কে করিলেন হরণ"— ইত্যাদি।

দর্শন হইয়া গেল। মানসিংহ আপন শিবিরে ফিরিয়া গেলেন। কুম্ভনও সন্ধ্যা-আরতি দর্শন করিয়া সপুত্র আপন ঘরে ফিরিলেন। মানসিংহ শিবিরে ফিরিয়া

গোবর্দ্ধন-দর্শনের কথা সকলকে শুনাইতে শুনাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরের আগে গান করিতেছিলেন কে?" তখন কে এক জন বলিলেন, "উনি এক জন ব্রজবাসী, নাম কুম্ভনদাস। হয়ত বা শুনিয়াছেন এক বার বাদশাহ তাঁহাকে লইয়া গিয়া আলাপ করিয়াছিলেন।" মানসিংহ কহিলেন, "যদি এক বার ইঁহার দেখা পাই তবে বড় ভাল হয়।"

গিরিরাজ-পরিক্রমায় বাহির হইয়া রাজা পরাসোলী গ্রামে আসিলেন। তখন সেখানে কুম্ভনদাস স্নান করিয়া উঠিয়াছেন, তাঁহার অন্তরের ঠাকুর তাঁহার কাছে উপস্থিত এবং তিনি তাঁহার ঠাকুরের সঙ্গে অন্তরের কথা কহিতেছেন। কুম্ভনের কাছে একটি ছোট বালিকা বসিয়া আছে, সে কুম্ভনের ভাইঝি। এমন সময় কুম্ভনের গৃহে মানসিংহ উপস্থিত হইলেন। মেয়েটি জানাইল, "রাজা আসিয়া বসিয়াছেন।" কুম্ভন বলিলেন, "বল্ তো মা, এখন আমি কি করি? ঠাকুর আমার যে আসিয়াছিলেন তিনি সরিয়া গেলেন, আগে তাঁর সঙ্গে আমার অন্তরের কথা বলিয়া লই, ততক্ষণ তুই বসিয়া রাজার সঙ্গে কথা বল্।"

এমন সময় কুম্ভন তাঁহার ঠাকুরের বাণী শুনিতে পাইলেন। তাঁহার ভাইঝিকে বলিলেন, "মা গো, আমার আরসীটা এক বার আন্ দেখি, তিলক করিয়া লই।" মেয়েটি বলিল, "আরসীটাকে বাপু মহিষের বাছুরে খেয়ে গেছে।"

মেয়েটি এধারে আসিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও মেয়েটি, বাছুরে কি খেয়েছে? আরসী? আরসী আবার বাছুরে খায় কি করে?"

মেয়েটি কিছুই না বলিয়া একটি কাঠের পাত্রে জল ভরিয়া কুম্ভনদাসের কাছে দিল। তিনি তাহাতে মুখ দেখিয়া যথাস্থানে তিলক কাটিয়া লইলেন। রাজা বুঝিলেন, এই পাত্রের জলটুকুই কুম্ভনের আরসী। এই আরসী আগেই দেওয়া হইয়াছিল। বাছুরে জলটুকু খাইয়া ফেলায় আবার জল দিতে হইল।

এই অবস্থা দেখিয়া রাজা আপন সোনার আরসীটি কুম্ভন দাসকে দিলেন। বলিলেন, "বাবা, এখন হইতে এই আরসীতেই মুখ দেখিয়া আপনি তিলক করিবেন।" কুম্ভন বলিলেন, "বাবা, আমার এই খড়ের ঘরে কি এই আরসী সাজে? এই আরসী লইয়া কি আমি চোর-ডাকাত সামলাইয়া মরিব? তোমার আরসী তোমারই থাকুক, আমি ইহা লইয়া করিব কি?"

কুম্ভনজীর দারিদ্র্য, পর্ণকুটীর সবই তো দূর হইতে পারে। তাই মানসিংহ সোনায় পূর্ণ একটি থলে তাঁহার কাছে উপস্থিত করিলেন। কুম্ভন বলিলেন, "বাবা, বৃথা এই থলে কেন আমি লইব? আমার ঠাকুর তো আমাকে একটি সম্পদের থলে আগেই দিয়াছেন। এই যে আমার জমিটুকু তাতে যে আমরা বাপ-বেটায় শ্রম করি সেই তো তাঁর দেওয়া প্রসাদ। তাতেই তো আমাদের দিন চলিয়া যায়। তাঁহার সেই থলেটা থাকিতে আর কেন তোমার থলেটা লই?"

রাজা বলিলেন, "তবে এখানকার জমিদারী আপনাকে লিখিয়া দান করি।" কুম্ভন বলিলেন, "বাবা, আমি তো ব্রাহ্মণ নহি যে তোমার উদকপূর্ব্ব দান লইব!" রাজা বলিলেন, "বাবা, আমার যোগ্য কিছু তো আজ্ঞা কর। এমন কিছু সেবা আমাকে করিতে বল যাহা পালন করিয়া আমি ধন্য হই।" কুম্ভন বলিলেন, "বাবা, আমি বলিলেই কি তুমি করিবে?" তখন কুম্ভনদাস বলিলেন, "আমার মত দীন-দরিদ্রের কাছে তোমরা আসিও না। আমাদের সামান্য এটুকু হৃদয় ও অন্তরের ভাবভক্তি। ঠাকুরের সেবাতেই তাহাতে টানাটানি চলে। তার মধ্যে যদি বড় বড় সব রাজরাজড়া আসেন তবে আমরা একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়ি।"

রাজা সাশ্রুনেত্রে দণ্ডবৎ করিয়া বিদায় লইলেন। বাহিরে গিয়া কহিলেন, "সারা পৃথিবী তো ঘুরিয়া মরি এমন ভগবদ্ভক্ত তো কোথাও দেখি নাই।" এই বলিয়া রাজা চলিয়া গেলেন। কুম্ভনদাস তাঁহার ঠাকুর ও ঠাকুরের সেবা লইয়া তাঁহার দীন কুটীরে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

কমলাকান্তের পত্র

শাশ্বত

শ্রীচারুচন্দ্র রায়

প্রসন্ন গাভী-দোহন কচ্ছিল। দোহন-কার্য্যটাই শাশ্বত। যাহার রস আছে তাহাকে দোহন করিবে, বা শোষণ করিবে, সে, যাহার রস নাই, যে শুষ্ক—এ ব্যবস্থা সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই চলে আসছে, এবং সৃষ্টির শেষও সেই দিন হবে যেদিন যে দোহন করবে এবং যাকে দোহন করবে এ-দুইয়ের কেউ থাকবে না, সকলেই সমান রসহীন হয়ে দাঁড়াবে। সৃষ্টির প্রাণরস, প্রলয়ের প্রেরণা রসহীনতা।

কিন্তু এ-সব কথা আমি প্রসন্নকে শোনাতে আসি নি। প্রসন্ন এ পুরাতন কথা জানে—যেদিন তার শ্যামলী-ধবলী আর দুধ দেয় না, সেদিন তাদের পিঁজরাপোলে পাঠাবার আয়োজন করতে হয়, অথবা Purgatory-র মতও মধ্য পথে দিনকতক অবস্থানের অবসরও যদি না থাকে, হয়ত সোজা ভাগাড়ে পাঠাবার জোগাড় করতে হয়। আমার উপরোক্ত তত্ত্বকথাগুলো সেজন্য প্রসন্নকে নূতন ক'রে বলবার প্রয়োজনই ছিল না। আমি তাকে বলতে এসেছিলাম অন্য কথা। আমি বললাম—প্রসন্ন, তুমি সনাতন, তুমি চিরন্তন, তুমি সর্ব্বব্যাপী, তুমি চরাচর পরিব্যাপ্ত ক'রে বিদ্যমান—"জগৎ তোমাতে, তোমারি মায়াতে, মোহিত কমলাকান্ত।"

প্রসন্ন গরুর বাঁটে টান বন্ধ না ক'রেই ব'লে উঠল—"থাম থাম, দুধ চমকে যাবে—"

হঠাৎ একটা আশ্চর্য্য কিছু ঘটলে মানুষ চমকে ওঠে বটে, গরুটা চমকে উঠতেও পারে; কিন্তু দুধ, যেটা চৈতন্যহীন জড়পদার্থ সেটা চমকাবে কি? আমার কথাগুলো কি এতই বিস্ময়কর যে সে অঘটনও ঘটাতে পারে? কিন্তু প্রসন্নর কথার উত্তর দেওয়ার তখন আমার সময় ছিল না। উত্তর দিয়ে প্রসন্নর প্রতি-উত্তরকে খুঁচিয়ে তোলবারও আমার সাহস ছিল না। সে কিছু না হয় ত, একটা দুর্ব্বাক্য বলেও আমার মুখ বন্ধ করার চেষ্টাও করত। কিন্তু মুখটা তখন আমি কিছুতেই বন্ধ করতে পারি না। আমি বলে চললাম—"প্রসন্ন, তুমি সাক্ষাৎ প্রকৃতির অংশ, তুমি জড়প্রকৃতি ও জীবপ্রকৃতির, উভয়েরই প্রতীক। তুমি ধন্য।"

প্রসন্ন কথার উত্তর দিলে না। গরুর তুলতুলে টুকটুকে বাঁট থেকে তার আঙুলের চাপে, শুভ্র ক্ষীরধারা মধুর মূর্চ্ছনায় দুধের কেঁড়ের ভিতর প্রবিষ্ট হ'তে থাকল। প্রসন্ন আমার কথায় কানই দিলে কি না বোঝা গেল না। কিন্তু আমি থামলাম না। আমি যেন কবির প্রেরণার মত ভিতর থেকে একটা ঠেলা অনুভব ক'রে ব'লে চললাম, "কবি কি কে শুনলে বা না শুনলে তার অপেক্ষা করেন? তিনি ত বলেন I sing because I must. সেই রকম আমিও I speak because I must.

"প্রসন্ন, আমি তোমাকে জড়ে অজড়ে সর্ব্বত্র প্রতিফলিত দেখতে পাই। জড়ের মতই তোমার এক দিক ভাঙলে আর এক দিক নির্ব্বিকারই থাকে, বাড়ির এক কোণ বজ্রাঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলেও অপর কোণ যেমন পূর্ব্ববৎই বিকারবিহীন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আবার কোন সময় তোমার চৈতন্যের এক কোণ একটা ছুঁচের ডগায় বিদ্ধ হ'লে তোমার সমস্ত সত্তা চঞ্চল হয়ে ওঠে। এই যে জড় ও জীব প্রকৃতির বিভিন্ন আচরণ তা তোমারই ভিতর আমি দেখতে পাই। Flower in a crannied wall দেখে কবি বলেছিলেন, "তোমার সমস্তটা বুঝতে পারলে আমি বুঝতে পারতাম What God and man is." একটা ফুল দেখে কবির যা মনে হয়েছিল, হে প্রসন্ন নাম্নী গোয়ালিনী, তোমার মত গোটা মানুষকে দেখে যে আমার তাই মনে হবে, এ যদি আশ্চর্য্যের বিষয় হয় তা হ'লে কেউ কমলাকান্তকে বুঝতে পারে নি বলতেই হবে।

প্রসন্ন কালিন্দীর বাঁট টেনেই চলেছে, তারই মধ্যে ব'লে উঠল—কি বকছ?

—বকছি না, বলছি তুমি সন্ধ্যায় তুলসীতলায় প্রদীপ জেলে গড় ক'রে উঠেই, যে তোমার দুধ খেয়ে টাকা মেরে দিয়েছে তার চৌদ্দ পুরুষের খোয়ার করতে থাক, সেটা তোমার জড়ধর্ম্ম। গড় করবার সঙ্গে অর্থাৎ জোড়-হাত ক'রে গললগ্নীকৃতবাস হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকানতে তোমার শরীরটা বেঁকে-চুরে দুমড়ে গেলেও তোমার সত্ত্বার অন্য কোন দিকে তার সাড়া পৌঁছায় না, তোমার হৃদয়ের একটা কোণও নরম হয়ে দুমড়ে পড়ে না। যদি তা হ'ত তা হ'লে প্রণাম করবার কসরতের পরেই তোমার টাকা মেরে দেওয়ার জন্য এত বেদনা তোমাকে আচ্ছন্ন করত না। তুমি মাথাটা নীচু করেই পরমুহূর্ত্তে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে আস্ফালন করতে লেগে যেতে না—

টাকা মেরে দেওয়ার কথাটা প্রসন্নর কানে ঠিক বেজে ছিল, কেন-না সে বলে উঠ্‌ল, "দুধ খাবে পয়সা দেবে না, মুখে নুড়ো জেলে দোবো না—"

—দিও নুড়ো জেলে, কিন্তু ঠিক তুলসীতলায় গড় ক'রে উঠেই সে-কাযটা যেন একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যায় না কি?

—হোক তাড়াতাড়ি—

—তা বটে, কেন না তার নজীর আছে, ছোট বড় অনেক নজীর আছে। সে সকল নজীরেরই তুমি একটা typical নজীর, তাই ত তোমাকে বলি তুমি একটা প্রতীক, তুমি আমার Flower in the crannied wall, তোমাকে দেখে সমগ্র দেব-মানবের সম্বন্ধ ও আচরণ আমি বুঝি, ক্ষুদ্র প্রসন্ন গোয়ালিনীকে দেখে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে বোঝা যায়, infinitessimalকে দেখে যেমন infiniteকে বোঝা যায়।

এই দেখ না, ধ্যানস্থ মহাদেব "আত্মানম্ আত্মনি অবলোকয়ন্" তথা, "অন্তঃ পরমাত্ম সংজ্ঞং পরং জ্যোতিঃ দৃষ্ট্বা," বীরাসন শিথিল করিয়া, নেত্র উন্মীলন মাত্র দেখিলেন,

পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব

পার্ব্বতীকে, এবং তাঁহার ত্রিনয়ন পার্ব্বতীর বিম্বাধরোষ্ঠে নিবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার প্রেমসিন্ধু উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি পরক্ষণেই দেখিলেন,

চক্রীকৃত চারুচাপং
প্রহর্ত্তুমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিম্

অমনি তাঁর আত্মদর্শন কোথায় ভাসিয়া গেল, পরমাত্ম-দর্শন কোথায় অন্তর্হিত হইল এবং

স্ফুরন্নুদর্চ্চি সহসা তৃতীয়া
দক্ষ্ণঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত,

এবং ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি
যাবদ্গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্র জন্মা
ভস্মাবশেষং মদনং চকার

আত্মদর্শনের পরই প্রচণ্ড ক্রোধ, পরমাত্ম-দর্শনের পরই উচ্ছ্বসিত কাম। যদি যোগীবর মহাদেবেরই এই, ত অন্য পরে কা কথা।

আবার দেখ, গঙ্গার ঘাটে গঙ্গার মাটিতে গড়া শিবের প্রতীকের মাথায় বিল্বপত্র দিয়ে, "ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত গিরিনিভং" মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতেই পূত ভাগীরথী সলিলে সদ্যস্নাতা পূজারিণীর, স্নানার্থী উদ্দাম ছেলের পাল গায়ে জলের ছিটে দিয়েছে ব'লে, তাদের পিতৃপিতামহের বংশলোপ কামনা করতে কিছুমাত্র বাধে না। বিশ্বব্যাপী ভগবৎ আরাধনার সঙ্গে সঙ্গে এবং পরে মানুষ-মারার আয়োজন পুরা দমেই চল্‌তে থাকে, "piety speeches" ও "blood-stained battlefields" বেশ পারম্পর্য্য রক্ষা করেই চলে। অতএব তোমার তুলসীতলায় গড় করবার পরই তোমার খাতকের মুণ্ডপাত করার বিচিত্রতা কি? এই প্রথাই ত আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তম্ চলে আসছে। মা কালীর কাছে মকদ্দমা জিতের জন্য জোড়া পাঁঠার মানত, জয় কামনা অর্থাৎ শত্রুর নিপাত কামনা ক'রে মন্দিরে মন্দিরে প্রার্থনা, নগর-সঙ্কীর্ত্তনের বহর, মারণ-যজ্ঞ, এ-সব যে-পর্য্যায়ের ক্রিয়া, তোমার নিত্য আরাধ্য ষষ্ঠী-মাকাল-মাকণ্ডের পূজাও সেই পর্য্যায়ের অনুষ্ঠান। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, মানুষের মন, প্রসন্ন গোয়ালিনী থেকে আরম্ভ ক'রে জগতের প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড ধুরন্ধর পর্য্যন্ত কেমন এক ছাঁচে ঢালা। আমি তাই পৃথিবীময় ঘুরে বেড়িয়ে মানব-মনের ক্রিয়া বা মনুষ্য-চরিত্রের বিকাশ পর্য্যবেক্ষণ না ক'রে, তোমারই গোয়াল-ঘরে বাস ক'রে, হে প্রসন্নরূপিণী

গোয়ালিনী, তোমাকেই পর্য্যবেক্ষণ ক'রে আমার বিশ্ব-পরিদর্শন কার্য্য সমাধা করি।

প্রসন্ন তখন দুধের কেঁড়ে তার হাঁটুদ্বয়ের মধ্য থেকে নামিয়ে একটু দূরে, অর্থাৎ কালিন্দীর চাটের বাহিরে স্থাপন করলে। দুধের শুভ্র ফেনরাশি কানায় কানায় উপচে পড়ছে। সে তার পর ছাঁদন-দড়িগাছটা ডান হাত দিয়ে অবলীলাক্রমে খুলে দিলে। বাছুরটাকে ছেড়ে দেওয়ায় সে দ্রুত ছুটে গিয়ে কতই না আগ্রহে মাতার শুষ্ক স্তন চুষতে লাগল। ছাঁদন-দড়ি না বাঁধলে গো-দোহন বা গো-শোষণ সম্যক্ সমাধা হয় না, গো শব্দের সকল অর্থেই। দোহন বা শোষণের পর ছাঁদন খুলে দেওয়া এবং গো-বৎসের সাগ্রহ চোষণ-কার্য্য আর এক বিরাট্ চিত্র আমার চোখের সামনে খুলে দিলে। নিঃশেষ ক'রে শোষণ ক'রে ভূমির রস, হৃদয়ের রস, দেহের রস নিঃশেষ ক'রে পান ক'রে নিয়ে, গোঁজ ও গলার দড়িগাছটা যথারীতি কায়েমী রেখে, ছাঁদন খুলে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া, আর দোহন-অবশেষ দু-ফোঁটা মাতৃদুগ্ধ পান করবার অবসর দেওয়াকে চূড়ান্ত দান ব'লে গৌরবান্বিত করা হচ্ছে—সেটা যে কত বড় বিদ্রূপ, তারই ছবি আমার মানস চক্ষে ফুটে উঠল ঐ শীর্ণকায়া কালিন্দী-কন্যার পুচ্ছহেলন দেখে।

প্রসন্ন দুধের কেঁড়েটা কাঁকে তুলে নিয়ে বললে, "এস, অনেক বকেছ, একটু ধারোষ্ণ দুধ খাবে এস।"

আমি বললাম, "প্রসন্ন ও চোরাই দুধ আমি আর খাব না, বাছুরকে বঞ্চিত ক'রে তোমার ব্রাহ্মণ-সেবায় কি পুণ্য হবে?"

প্রসন্ন। এই চোরাই দুধ খেয়েই তো এত দিন আফিমের বিষ কাটল, আজ আমার পুণ্যের জন্য এত মাথাব্যথা কেন?

আমি দেখলাম, আফিম খেলে যে দুধ খেতে হয় এটা শাশ্বত। দুধ খেতে গেলে বাছুরের মুখের দুধ কেড়ে নিতে হয় এটাও শাশ্বত। কারণ এক জন মরে আর এক জন বাঁচবে এই হ'ল এ-দুনিয়ার শাশ্বত নিয়ম। কেউ কাউকে না মেরে সবাই বাঁচবে সেটা স্বর্গরাজ্যের কথা। পৃথিবীতে সে স্বর্গরাজ্য আনয়নের অনেক দুঃস্বপ্ন আজ "ওঁতোর চোটে" মানুষ লক্ষ বারের বার দেখতে লেগেছে বটে, কিন্তু সেটা অন্যান্য বারের মত দুঃস্বপ্নই থেকে যাবে। অতএব "প্রশ্ন ইহাই এখন" যে, হয় কমলাকান্ত বাঁচবে, না হয় বাছুর বাঁচবে, তখন এ শাশ্বত প্রশ্নের যে শাশ্বত মীমাংসা হয়ে আছে, সেটাকে আজ হঠাৎ উল্টে কি ক'রে দেওয়া যায়!

আমি বিনা বাক্যব্যয়ে প্রসন্নর অনুসরণ করলাম। এক বার পিছনে চেয়ে দেখি, কালিন্দীর কন্যা অনেক ঢুঁ মেরেও মা'র বাঁট থেকে এক ফোঁটাও আর দুধ বার করতে পাচ্ছে না। কালিন্দীও বিরক্ত হয়ে চাট্ মারতে সুরু করেছে।

পশ্চাতে এই দৃশ্য আর সম্মুখে প্রসন্নর কক্ষে উপচে-পড়া দুধের কেঁড়ে দেখে আমার মনে পড়ল কবির দু-ছত্র কবিতা—

I look before and after
And pine for what is not.

কিন্তু এ দুঃখও শাশ্বত।

"কমলাকান্ত"

অধ্যাত্মে ও বিজ্ঞানে

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

২

বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের—অন্ততঃ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির, জয়জয়কার। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত, তার একান্ত জড়দৃষ্টি, সর্ব্বতোভাবে যদি না-ই সত্য হয়, তবুও বলা হয়, তার পদ্ধতি, জ্ঞান আহরণের জন্য, সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের জন্য যে-প্রণালী যে-যন্ত্র সে আবিষ্কার করেছে তা নির্দ্দোষ নিখুঁৎ; বিজ্ঞানাতিরিক্ত ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য—শুধু প্রযোজ্য নয়, অবশ্য প্রযোজ্য, খাঁটি সত্যকে যদি আবিষ্কার করতে হয়। তাই সমাজতত্ত্বে, শিক্ষাতত্ত্বে, মনস্তত্ত্বে, এমন কি আধ্যাত্মিক তত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ আজকালকার অপরিহার্য্য রীতি হয়ে উঠেছে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি ঠিক কি? অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কাকে বলি আগে তা একটু জানা দরকার। বৈজ্ঞানিক যুগের আগে, এই অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরই চল ছিল শাস্ত্রালোচনায়, জ্ঞানচর্চ্চায়। তার প্রথম ধারা হ'ল, কোন লোকের কথা, কোন বিশেষ গ্রন্থের কথা আপ্তবাক্য নামে বিনা দ্বিধায় সত্য ব'লে গ্রহণ করা। এবং এক বার কোন (তথাকথিত) সত্যকে এই ভাবে গ্রহণ করলে, তার হ'তে অনুমিত তার সমন্বিত অন্যান্য সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য সত্য ব'লে স্বীকার করা; আর তার বিপরীত বা বিরোধী যা কিছু তাকে অসত্য ব'লে মেনে নেওয়া। এই যেমন একটা আপ্ত-বাক্য হ'ল—"ভগবান্ এক আছেন যিনি বিশ্বের স্রষ্টা পাতা হর্ত্তা—যিনি পরম কারুণিক পরম ন্যায়নিষ্ঠ পরম বিচারক" ইত্যাদি—এই মূলসূত্র থেকে নির্গত হয় আরও বহুল বিবিধ সিদ্ধান্ত, যথা, স্বর্গ সম্বন্ধে, নরক সম্বন্ধে, পরলোক সম্বন্ধে, জন্মান্তর সম্বন্ধে, ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের ক্ষয়, সাধুর পরিত্রাণ দুষ্কৃতের বিনাশ অর্থাৎ একটা সমগ্র পুরাণ। অথবা আর একটি আপ্তবাক্য—আধ্যাত্মিক ছেড়ে যদি লৌকিক জগতের কথা ধরি—এই যেমন চন্দ্রগ্রহণ হ'ল চন্দ্রের রাহু নামক রাক্ষসের গ্রাসে পড়া—এ সম্পর্কে রাহু চন্দ্রকে কেন গ্রাস করে, কি রকমে আবার ছেড়ে দেয় ইত্যাদি সমস্যারও মীমাংসা রয়েছে।

এ-সব হ'ল বাস্তবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই এমন কল্পনার, জল্পনার বিষয় মাত্র। কিন্তু এ ছাড়া আছে আর এক রকম অবৈজ্ঞানিক ধারা—একটি মাত্র উদাহরণের জোরে একটা সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা, একটি বা অল্প কয়েকটি ঘটনা হ'তে একটা সার্ব্বভৌমিক সত্যে পৌঁছা। এই যেমন একটি সাধারণে প্রচলিত মতবাদ যে অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় বর্ষাকালে বেশী জল হয়। এ-কথা সাধারণ সত্য হিসাবে প্রমাণসহ নয় (আবহবিজ্ঞান বলছে), যদিও এক-আধ বার ও বিশেষ ঘটনাটি হয়ত ঘটেছিল।

এই দুটি অবৈজ্ঞানিক ও ভুল পথ সংশোধন ক'রে বৈজ্ঞানিক স্থাপন করেছেন তাঁর বিজ্ঞানের দুটি মূল স্তম্ভ—পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ। এই দুটি প্রক্রিয়া নিয়েই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিশেষত্ব। শোনা কথা মানা নয়, কারো উক্তি মানা নয়—জিনিসকে করা চাই পর্য্যবেক্ষণ। তার পর এক বার পর্য্যবেক্ষণ নয় বহু বার পর্য্যবেক্ষণ, বহু বস্তুর পর্য্যবেক্ষণ, বহু ভাবে পর্য্যবেক্ষণ, জিনিষকে কষে দেখা, বাজিয়ে নেওয়া—এর নাম হ'ল পরীক্ষণ। পর্য্যবেক্ষণে জিনিস প্রত্যক্ষ করি এবং পরীক্ষণে প্রত্যক্ষকে যাচাই ক'রে নিই।

কিন্তু এখানে একটা গোড়াকার প্রশ্ন করা যেতে পারে। পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ আবশ্যক ও অপরিহার্য্য, মেনে নিলাম—কিন্তু কে পর্য্যবেক্ষণ করবে? তার উপরই কি সব নির্ভর করে না? এক-এক মানুষ এক-এক রকমে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করে—সুতরাং মানুষের ব্যক্তিগত অংশটা এ-ক্ষেত্র হ'তে বাদ দিয়ে রাখতে হবেই। তা ছাড়া, জিজ্ঞাসা করতে হবে, নির্ণয় করতে হবে মানুষের কোন্ অঙ্গ বা বৃত্তি পর্য্যবেক্ষক বা পরীক্ষক? বিজ্ঞান অবশ্য ব্যক্তিবিশেষকে বাদ দিয়ে এক কাল্পনিক সাধারণ

দ্রষ্টার কথা বলছে—কিন্তু এখানেও জিজ্ঞাস্য সে কাল্পনিক দ্রষ্টার দৃষ্টির স্বরূপ কি ? তার দৃষ্টির যে আলোকপাত তার গুণ কি প্রসার কি ?

বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিশেষত্ব এই যে, সে একটা বিশেষ অঙ্গ বা বৃত্তিকেই পর্য্যবেক্ষক ও পরীক্ষক ক'রে স্থাপন করেছে। পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করে ব'লেই, এ দুটি প্রক্রিয়ার জন্যই যে বিজ্ঞান বিজ্ঞান তা ঠিক নয়—অন্যান্য জ্ঞানেও এ দুইটি প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করা হয় ও গ্রহণ করা যেতে পারে। বিজ্ঞান বরং বিজ্ঞান কারণ সে এই দুটি প্রক্রিয়াকে গ্রহণ করেছে একটা বৃত্তি-বিশেষের ধর্ম্ম হিসাবে এবং ফলে একটি বিশেষ ক্ষেত্র বা পরিধির মধ্যে তাদের আবদ্ধ রেখেছে। এই পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ হওয়া চাই স্থূল ইন্দ্রিয়ের—অন্ততঃ পক্ষে স্থূল ইন্দ্রিয়কে যন্ত্র-রূপে গ্রহণ করে, স্থূল ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে।

অবশ্য স্থূল ইন্দ্রিয় যথাসম্ভব একান্তভাবে পর্য্যবেক্ষক (এবং কিছু দূর) পরীক্ষকও হয়েছে ইতর প্রাণীর মধ্যে। কিন্তু মানুষের মধ্যে পর্য্যবেক্ষক ও পরীক্ষক হয়েছে মন-বুদ্ধি—(ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী) মনবুদ্ধি। এবং এই জন্য তার পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ পেয়েছে একটা পরিণতি ও পূর্ণতা যা ইতর প্রাণীতে নেই। তবুও স্থূল ইন্দ্রিয়ই হ'ল মানুষের প্রধান যন্ত্র। ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় ক'রে মনবুদ্ধির সম্যক্ পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণকেই অন্য কথায় বলে যুক্তিবাদ। পর্য্যবেক্ষণের পরীক্ষণের কর্ত্তা যে আর কেউ বা কিছু হ'তে পারে বিজ্ঞানে তা মানে না—মানলে বিজ্ঞান অবৈজ্ঞানিক হয়ে পড়ে। ইন্দ্রিয়ের পর্য্যবেক্ষণ পরীক্ষণ বিবর্জ্জিত মনবুদ্ধির নিজস্ব যে জল্পনা তা আর এক রকম যুক্তিবাদ, তাকে বলা যেতে পারে তর্কবাদ ; তারই উদাহরণ দিয়েছি ইতিপূর্ব্বে—তা অবৈজ্ঞানিক, বৈজ্ঞানিক যুক্তি নয় (যদিও দর্শনে, তত্ত্ববাদে তার স্থান হ'তে পারে)।

ভারতীয় মনস্তত্ত্ব—উপনিষদ উপলব্ধি—এ-বিষয়ে অতি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছে। মানুষের, জীবের আধারে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করে যে জিনিসটি তার নাম পুরুষ। কেবল পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ নয়, এই পুরুষের ধর্ম্মকর্ম্ম (গীতার ভাষায়) চতুর্ব্বিধ—তদনুসারে সে হ'ল (১) সাক্ষী, (২) অনুমন্তা, (৩) ভর্ত্তা, (৪) ভোক্তা। এই যে পুরুষ তার আছে আধারে স্তর-বিভেদে বিভিন্ন আসন বা পীঠস্থান—প্রধানতঃ এই তিনটি—দেহে, প্রাণে, মনে। পুরুষ অর্থ চেতনার কেন্দ্র—দেহগত পুরুষ দেহের অধিষ্ঠাতা, প্রাণগত পুরুষ প্রাণের অধিষ্ঠাতা, মনোগত পুরুষ মনের অধিষ্ঠাতা। পুরুষের—চৈতন্যময় সত্তার এই ভাবে ক্রমবিকাশ ক্রমপরিণতি হয়ে চলেছে। মন পর্য্যন্ত মানুষের সহজ সাধারণ অবস্থা। মনের উপর হ'ল বিশুদ্ধ বুদ্ধি বা উত্তর-মানস, তারই নাম "বিজ্ঞান" (বাংলায় প্রজ্ঞান বললেই ভাল হয়, কারণ বিজ্ঞান অর্থে আমরা বুঝি জড়বিজ্ঞান, সায়ান্স)—বিজ্ঞানময় বা প্রজ্ঞানময় পুরুষের উচ্চতম স্বরূপ হ'ল অধ্যাত্ম-চেতনা, অধ্যাত্ম-সত্তা। মানুষের জ্ঞানজগতে যে সৃষ্টি যে সংগঠন তার আরম্ভ মনোময় চেতনা দিয়ে এবং তার সম্যক্ পরিণতি প্রজ্ঞানময় পুরুষে। প্রত্যেক পুরুষকে কেন্দ্র ক'রে ব্যক্তির মধ্যে এক-একটি স্তর গঠিত হয়েছে, তা ছাড়া সমষ্টির মধ্যে এক-একটি শ্রেণী বা জগৎ পর্য্যন্ত সংগঠিত হয়েছে। অন্নময় পুরুষকে কেন্দ্র ক'রে জড়জগৎ, প্রাণময় পুরুষকে কেন্দ্র ক'রে প্রাণীজগৎ, মনোময় পুরুষকে কেন্দ্র ক'রে মানব জগৎ। আর প্রজ্ঞানময় পুরুষকে কেন্দ্র ক'রে অধ্যাত্ম-জগৎ। প্রজ্ঞানেরও উপরে স্তরে স্তরে ঊর্দ্ধতর চেতনা সব আছে এবং তৎ তৎ স্তরের পুরুষকে আশ্রয় ক'রে এক-এক প্রকৃতি সৃষ্ট হয়েছে—এই ঊর্দ্ধতর স্তরের সংখ্যা উপনিষদে বলেছে তিনটি—আনন্দময়, চিন্ময় ও সন্ময় পুরুষ ; এই তিনটি একত্র-সংযুক্ত, এদের নিয়েই হ'ল সচ্চিদানন্দ। ঋগ্বেদে এরই নাম "ত্রিধাতু"।

বৈজ্ঞানিক আশ্রয় করেছেন মনোময় পুরুষকে এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন অন্নময় লোকে, জড়স্তরে এবং তার যন্ত্র বা হাতিয়ার স্বরূপ ব্যবহার করেছেন ইন্দ্রিয়-সমবায়কে অর্থাৎ বহির্ম্মুখী প্রাণশক্তিকে। এই ইন্দ্রিয় উপকরণরাজিকে—বস্তু ঘটনা বা তাদের অনুভূতি প্রতীতিকে—এনে ধরেছে মনোময় পুরুষের সম্মুখে, ইনিই তাদের পর্য্যবেক্ষণ পরীক্ষণ ক'রে চলেছেন এবং সেই অনুসারে গ'ড়ে তুলেছেন সৃষ্টির এক ব্যাখ্যা এক ছক। কিন্তু এ ব্যাখ্যা এ ছক আপেক্ষিক। এ-কথা ধরা

পড়ে যদি আমরা দেখি দৃষ্টির কেন্দ্র সরিয়ে ধরলে কি ফল হয়।

প্রথমতঃ মন থেকে দৃষ্টিকেন্দ্র যদি নামিয়ে ধরি প্রাণে—প্রাণময় পুরুষের দৃষ্টি দিয়ে যদি দেখা যায় জগৎ তার ছক হয় অন্য রকমের। ইতর প্রাণীর দৃষ্টি হ'ল প্রাণময় পুরুষের দৃষ্টি—তাতে জগৎটা কি রকম রূপ নেয় সে-সম্বন্ধে গবেষকেরা বৈজ্ঞানিকেরা কিছু আন্দাজ করতে চেষ্টা করেছেন—অনেকে বলেছেন যেমন, তাদের জগৎ দ্বিমাত্রিক, মানুষের মত ত্রিমুখ নয় (তাদের দৃষ্টি যুগপৎ দুই দিকে মাত্র চলে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে—সেই সঙ্গেই উচ্চে নীচে চলে না) অথবা তাদের বর্ণবোধ নেই তারা দেখে শুধু আলো আর বিভিন্ন গাঢ়তার ছায়া। সে যা হোক ইতর প্রাণীর জগৎ যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাতে সন্দেহ নেই। আরও নীচে নামলে, শুধু দেহজ পুরুষের দৃষ্টিতে জগতের চিত্র হবে তৃতীয় প্রকারের, হয়ত একমাত্রিক অস্তি মাত্র কিছু—মনোময় পুরুষের বা প্রাণময় পুরুষের জগৎ হ'তে সম্পূর্ণ অন্য ধরণের।

নীচের দিকে না গিয়ে আমরা চলি যদি ঊর্দ্ধে—যেদিকে চলা সহজ ও স্বাভাবিক—পুরুষ চেতনাকে যদি উন্নীত করে ধরি, মনোময় কেন্দ্র হ'তে উত্তীর্ণ হই প্রজ্ঞানময় কেন্দ্রে, তবে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে আর এক প্রচ্ছন্ন বাস্তব প্রকাশ পায়। মনোময় পুরুষ স্থূল ইন্দ্রিয়কে ধরে কেবল পরিচয় পায় জড়বস্তুর, অন্য সব বস্তুকেও দেখে এই জড়েরই রূপান্তর হিসাবে।* প্রজ্ঞানময় পুরুষের দৃষ্টিতে দেখি একটা জগৎ যেখানে বস্তু আর জড় নয় কিম্বা জড়েরই সূক্ষ্মরূপ তেজমাত্র (বিদ্যুৎকণা কি আলোকণা) নয়, বস্তু হ'ল চৈতন্যকণা; ইন্দ্রিয়ের মধ্যেও পাওয়া যায় আর এক সূক্ষ্মতর, অন্তরতর চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের খেলা। এই চৈতন্যকণা বা চিন্ময় তরঙ্গরাজির ধর্ম্মকর্ম্ম গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ পরীক্ষণই হ'ল অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অঙ্গ।

প্রজ্ঞানময় পুরুষের দৃষ্টি—পরিধি হিসাবে এবং গভীরতা হিসাবেও স্থূল ইন্দ্রিয়লব্ধ বাস্তবের স্তরে আবদ্ধ ও পরিচ্ছিন্ন নয়। অতীন্দ্রিয় বস্তুর, অতীন্দ্রিয় বিধানের সাক্ষাৎকার তার হয়; আর ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়রাজিকেও সে দেখে এই অতীন্দ্রিয়ের বৃহত্তর পরিধি, গভীরতর গাঢ়তার মধ্যে রূপান্তরিত করে, মিলিয়ে ধরে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ইতিহাস হ'ল মনোময় পুরুষের ক্রমিক দৃষ্টি প্রসার। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর চলাচলের একটা সূত্র দিলেন টলেমি; তাকে ভেঙে একটা বৃহত্তর সূত্র দিলেন কোপরনিকস; কোপরনিকসকেও আরও বৃহত্তর সূত্রে অঙ্গীভূত ক'রে নিল নিউটনীয় সূত্র। পরিশেষে আজ নিউটনীয় সূত্রকেও গ্রস্ত অঙ্গীভূত ক'রে স্থাপিত হয়েছে আরও বৃহত্তর আইনস্টাইনীয় সূত্র। এ পর্য্যন্ত এসে মনে হয় বিজ্ঞান যেন পৌঁছেছে তার শেষ সীমায়। এখন যদি তাকে আরও এগিয়ে চলতে হয়, সত্য সত্যই নূতন আবিষ্কার করতে হয় তবে একান্ত জড়ের সীমানা তাকে অতিক্রম করতে হবে। অন্য কথায়, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ও গবেষণায় মানুষ তার ইন্দ্রিয়াশ্রিত মনোময় পুরুষের দৃষ্টি চরমে প্রসারিত করেছে; এখন পূর্ণতর গভীরতর দৃষ্টির জন্য দ্রষ্টার চাই একটা নূতন ও অভিনব স্থিতি—আর তাই হ'ল প্রজ্ঞানময় স্থিতি।*

---

* দার্শনিক বা তাত্ত্বিক—বিশুদ্ধ ভাব বা চিন্তা নিয়ে যাঁদের কারবার—তাঁদের দৃষ্টিকেন্দ্র হ'ল মনের উচ্চতর স্তরে এবং প্রজ্ঞানের নিম্নতন স্তরে, উভয়ে যেখানে মিশেছে, মনোময় পুরুষে যেখানে প্রজ্ঞানময় পুরুষের প্রভাব ও আলোক পড়েছে। এই অন্তর্বর্ত্তী মিশ্রিত জগৎ বেশির ভাগ হ'ল জল্পনা-কল্পনার, অনুমানের প্রস্তাবনার, বিচার-বিতর্কের ক্ষেত্র।

* আধুনিক বিজ্ঞানে জড়কণা যে চৈতন্যকণার কতখানি সমধর্ম্মী হয়ে উঠেছে তা দেখাবার জন্য জনৈক বৈজ্ঞানিক দুটি আধুনিক তত্ত্বের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রথমতঃ জড়-কণার স্থিতি সম্পর্কে দেশ ও কাল সম্যক্ নির্ণয় করা যায় না—ও দুটি অস্পষ্টভাবে, মোটামুটি হিসাবে ছাড়া যথাযথ পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিমাণের মধ্যে ধরা যায় না। চৈতন্যকণার (একটি চিন্তা যেমন) সম্বন্ধেও ঐ কথা কি প্রযোজ্য নয়? দ্বিতীয় কথা, কোন জড়কণাকে স্বরূপতঃ পর্য্যবেক্ষণ করা যায় না, পর্য্যবেক্ষণ-পদ্ধতিই তাকে পরিবর্ত্তিত ক'রে ফেলে। সেই রকম চেতনার কোন বৃত্তিকেও পর্য্যবেক্ষণ করতে গেলে সে বৃত্তি তখনই পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়—ক্রোধের সময় যদি ক্রোধের বৃত্তিকে দেখতে যাই, তবে ক্রোধের মাত্রা হ্রাস পাবেই। জড়কণা ও চৈতন্যকণায় এ বোধ হয় অতি স্থূল রকমের সারূপ্য ও সাদৃশ্য। বৈজ্ঞানিককে বাধ্য হয়ে কোন পথে চলতে হয়েছে দেখাবার জন্য এই উদাহরণটির উল্লেখ করা গেল।

বৈজ্ঞানিককে তার জ্ঞানযন্ত্রের সম্যক্ প্রয়োগের জন্য একটা অনুশীলনের ধারা অনুসরণ করতে হয়,—সে অনুশীলনের দুটি সাধারণ সূত্র আমরা জানি পর্য্যবেক্ষণ আর পরীক্ষণ। তবে প্রধান কথা, এই পর্য্যবেক্ষণ-পরীক্ষণ চলে আবার একটা বিশেষ প্রণালী ও পদ্ধতি ধ'রে। মনোময় পুরুষই পর্য্যবেক্ষক ও পরীক্ষক—যদিও এই পর্য্যবেক্ষক ও পরীক্ষকের সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বচ্ছন্দ গতি দেওয়া হয় নি—ইন্দ্রিয়ানুভূতির কাঠামে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে, অন্ততঃ বাঁধতে চেষ্টা করা হয়েছে। এই চেষ্টা অর্থাৎ দুশ্চেষ্টা হয়েছে ব'লেই আধুনিক বিজ্ঞান নানা আত্ম-বিরোধের মধ্যে এসে পড়েছে—সে-সকল আত্মবিরোধের সম্যক্ মীমাংসা জড়াশ্রয়ী মনোময় পুরুষের দৃষ্টি দিয়ে হবে না; সে-মীমাংসার জন্য উঠতে হবে উপরে।

কিন্তু প্রজ্ঞানময় পুরুষেও অধিষ্ঠিত হ'তে হ'লে প্রয়োজন একটা অনুশীলন—তারই নাম যোগসাধনা। সত্যোপলব্ধির, বাস্তব-নির্ণয়ের জন্য প্রজ্ঞানময় পুরুষের উপর ইন্দ্রিয়ানুভূতির শাসন প্রয়োজন হয় না—প্রয়োজন তো হয়ই না, সে তার মুক্ত অন্তদর্শনের পথে চলে, ইন্দ্রিয়ের মধ্যেও জাগ্রত করে এক অন্তর্দৃষ্টি। মনোময় পুরুষের এক অন্তর্দর্শন আছে বটে—ইংরেজীতে যাকে বলে introspection; কিন্তু তা হ'ল মন যে স্তরে তার সেই নিজের স্তরে দাঁড়িয়েই চারি দিক্ দৃষ্টিপাত—সে-দৃষ্টিতে ধরা পড়ে কেবলই কার্য্যপরম্পরা, কার্য্যের অন্তরালে কারণের মূল উৎসের সন্ধান তাতে পাই না। অধ্যাত্মের প্রজ্ঞানময় পুরুষের দৃষ্টি হ'ল একটা উর্দ্ধতর (বা গভীরতর) স্তর হ'তে নিম্নতর (বা বাহ্যতর) স্তরে দৃষ্টি, কারণের জগৎ থেকে কার্য্যের জগতে দৃষ্টি। আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞাময় দৃষ্টিতে তাই স্বতঃই উদ্ভাসিত হয় জিনিষের কারণ বা হেতুপরম্পরা, তার পিছনের প্রচ্ছন্ন কলকব্জা।

ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী মনোময় পুরুষ দিয়েছে এক বাস্তবের পরিচয়—কিন্তু সে একটি বাস্তব মাত্র। এ ছাড়াও আরও বাস্তব আছে। অধ্যাত্ম পুরুষ যে-জগতের পরিচয় দেয়, তাও তেমনি বাস্তব, হয়ত আরও বেশী বাস্তব—কারণ জড় বাস্তবের নিভৃত মূলই সেখানে। একটি আর-একটির বিপরীত নয়, একটি আর-একটিকে অপ্রমাণ করে না। তবে বৈজ্ঞানিক যখন প্রজ্ঞানী হয়ে উঠবেন তখন তাঁর জড়াশ্রয়ী সঙ্কীর্ণ সূত্র চৈতন্যের বৃহত্তর সূত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, আবশ্যক-মত পরিবর্ত্তিত সংশোধিত হবে।

পরম মুহূর্ত্ত

শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী

ভেবে দেখ ভাল ক'রে, যা চাহিছ সে কি দেয়া যায়?
দুর্বল মুহূর্ত্ত পেয়ে প্রতিশ্রুতি কোরো না আদায়!
চিরতরে মন চাও? মন কার রহে নিজ বশে?
আমার যা নয়, বল, তোমারে তা দিব কি সাহসে?
বাইশ বছর আজ; আরো কত দিন আছে পড়ে;
হৃদয়-পদ্মার কূল প্রতিক্ষণে ভাঙে আর গড়ে,
দিশাহারা গতি তার, শতধারা শতদিকে ধায়;
সে বেগ রুধিতে পারি এমন তো দেখি না উপায়।

তুমি কি বলিতে পার তোমার এ লাবণ্য অক্ষয়?
অচঞ্চল প্রেম তব, যা দিয়ে করেছ মোরে জয়?
সম্মুখে দেখেছ চেয়ে পথে কত দুর্যোগ আঁধার?
জান কি কেমনে কাটে দিনগুলি ব্যর্থ প্রতীক্ষার?
তবু যদি দ্বিধাহীন, তবু যদি অধীর অন্তর;
এস তবে বক্ষে মোর নিয়ে তব একান্ত নির্ভর।
কানে কানে গুঞ্জরিব প্রেমের চরম সত্যকথা—
মুহূর্ত্তের ভালবাসা জয় করে অনন্ত ব্যর্থতা।

পূজারিণী

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

নীলাঙ্গুরীয়

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(৪)

কাজ আরম্ভ হইল।

আমি পৌঁছিবার একটু পরেই মীরা আমায় তরুর ঘরে লইয়া গিয়া বলিল, "কাজ আপনার শক্ত মাষ্টার-মশাই, ছাত্রীটি বড় সোজা নয়; একটু দেখেশুনে নেবেন।"

তরুর পিঠে হাত দিয়া হাসিয়া বলিল, "তোমার পরিচয় দিয়ে দিলাম একটু, বাকিটুক মাষ্টার-মশাই নিজেই টের পাবেন।"

এর পর আমার ঘরে একটু আসিল। বেয়ারাকে আমার জন্য আসবাবপত্রের দু-একটা উপদেশ দিয়া, কোন অসুবিধা হইলে সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে জানাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া উপরে চলিয়া গেল।

আমি কিন্তু দু-দিন হাজার চেষ্টা করিয়াও শক্ত সহজ কোন কাজেরই বিশেষ সন্ধান পাইলাম না।—আমি সকালে বিছানা হইতে উঠিয়া তরুকে দেখিতে পাই না। স্নান করিতে করিতে শুনি তরু মোটরে করিয়া কোথা হইতে আসিল, দু-একটা কি কথা বলিতে বলিতে তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেল। আহার করিয়া উঠিয়া ঘরে তোয়ালে লইয়া মুখ মুছিতেছি, তরু খট্ খট্ করিয়া নামিয়া মোটরে করিয়া বাহির হইয়া গেল। ব্যাপারখানা কি?

মীরার সঙ্গে দেখা হইতেছে না। চেষ্টা করিয়া দেখা করিতে বাধ-বাধ ঠেকিতেছে। বেয়ারাটাকে কি অন্য চাকর-বাকরদের জিজ্ঞাসা করিতে মন সরিতেছে না;—দু'বেলা দিব্য রাজার হালে খাওয়া-দাওয়া করিতেছি, অথচ আসল যা কাজ সে-সম্বন্ধেই কোন জ্ঞান নাই, ওদের সামনে এটা প্রকাশ করা কেমন হইবে বুঝিতে পারিতেছি না। বড়লোকের চাকরদেরও ভাবগতিক একটু অন্য রকম। দেখাই যাক না, যদি এমনই ব্যাপারটার হদিস হয় কোন।

বিকালে কি কাজ, কিংবা কোন কাজ আছে কি না এখনও টের পাই নাই। তাহার কারণ প্রথম দিন আমার বিকালবেলার দিকে একবার পুরনো বাসায় যাইতে হইয়াছিল, ছাতাটা ভুলিয়া আসিয়াছিলাম লইয়া আসিতে। ফিরিতে রাত হইয়া গেল। প্রথমটা ত কাগজ পড়ার জন্য ধরা পড়িলাম। সেটা শেষ হইলে ছাত্রছাত্রীরা ধরিয়া বসিল—আহার করিয়া যাইতে হইবে। নূতন চাকরি, কাটান দেওয়ার ঢের চেষ্টা করিলাম, সফলও হইতাম, কিন্তু বড় ছাত্রীটি এদিকে একটু চতুর হইয়াছে, বলিল, "না মাষ্টার-মশাই, আপনি যান, ওদের কথা শুনবেন না।…তোমরা ব্যারিস্টারের বাড়ীর মত ভাল খাবার দিতে পারবে ওঁকে?"

কৃত্রিম রোষের সহিত ওদের কথাটা বলিয়া আমার পানে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল।

চার বৎসরের সম্বন্ধ এদের সঙ্গে, পূর্বে তাহাতে বৈষভাবও ছিল, ক্লান্তিও ছিল, এই নূতন বিচ্ছেদে কিন্তু সব গিয়া শুধু স্নেহটুকু গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। আর 'না' বলিতে পারিলাম না। প্রথম রাত্রেই দেরি,—বেশ একটু কুণ্ঠার সহিত বাসায় ফিরিলাম। আহার করিব না শুনিয়া মীরা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল—শরীর ভাল আছে তো?

মোট কথা বিকালে বা সন্ধ্যার পর তরুকে লইয়া আমার কি ডিউটি প্রথম দিন সেটুকুও জানা গেল না।

দ্বিতীয় দিন বিকালে মীরার সঙ্গে দেখা হইল—আমার ঘরেই। পুরনো বাসা হইতে রিডাইরেক্ট হইয়া বাড়ী হইতে একটা চিঠি আসিয়াছে—না যাওয়ার জন্য সবাই বিশেষ চিন্তিত;—সেই চিঠিটার জবাব দিতেছিলাম, মীরা তরুকে

সঙ্গে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, "আপনার ছাত্রীকে আজ একটু ছেড়ে দিতে হবে মাষ্টার-মশাই, ডক্টর মল্লিকের ওখানে পার্টি আছে একটা, আসতে বোধ হয় রাতও হয়ে যেতে পারে।"

আমি লজ্জিতভাবে বলিলাম, "তা যাক।"

লজ্জিত ভাবে এই জন্য যে এই দু-দিনের মধ্যে ওকে আমি ধরিয়া রাখিলাম কখন যে ছাড়িয়া দিতে হইবে? ওরা চলিয়া গেলে বাড়ী না-যাওয়ার কারণ জানাইয়া চিঠিটা শেষ করিলাম; তাহার পর একটু চিন্তা করিয়া 'পুনশ্চ' দিয়া লিখিলাম—"কিন্তু বোধ হয় শীঘ্রই আসিতেছি, কেন-না কয়েকটা কারণে এমন সুবিধার চাকরিটা রাখিতে পারিব কি-না ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।" চিঠিটা কাছেই একটা ডাকবাক্সে দিয়া আসিলাম।

বাস্তবিকই দুই দিনেই যে-রকম ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে বসিয়াছে, তাহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে এ-চাকরি চলিবে না। প্রথমত, এই আভিজাত্যের আবেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছি না; দ্বিতীয়ত, একটা রহস্য রহিয়াছে—বাড়ীর মধ্যেই কোথাও এক জন গৃহকর্ত্রী আছেন, কিন্তু তাঁহার অস্তিত্বের কোন পাকা রকম নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না, মীরাই তো দেখিতেছি সর্বময়ী। ব্যাপারটার সঙ্গে হয়ত আমার চাকরির কোন সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ নাই, কিন্তু তবুও যেন একটা অস্বস্তি বোধ হইতেছে। আর, সকলের উপর অসহ্য হইয়াছে এই জগদ্দলের মত অবসরের বোঝা। তরু ভোরে কোথায় যায়? টুইশ্যন পড়িয়া আসিতে? দুপুরে কোথায় যায়? স্কুলে? তবে অমন মোটা মাহিনা দিয়া আমায় রাখা হইল কেন? কাজের অভাবে বাড়ীটার সঙ্গে কোনই যোগসূত্র অনুভব করিতে পারিতেছি না। আচ্ছা বড়মানুষি চাল—লোক রাখিল, তাহার কাজ ঠিক করিয়া দিবে না! ঠিক উল্টা একেবারে—এর আগে সব জায়গাতেই গার্জেন-উপগার্জেনের দল হুমড়ি খাইয়া থাকিত—একটা মুহূর্ত্তও ফাঁকি দিতেছি কি না। সেও শতগুণে ভাল ছিল কিন্তু।

রহস্যটা সেই দিনই কতকটা পরিষ্কার হইল।

চিঠিটা ফেলিয়া কথাগুলা মনে তোলপাড় করিতে করিতে বাগানে গিয়া একটা লোহার বেঞ্চিতে বসিলাম; বাহির হইতে বাগানটা যেমন অতি কৃত্রিমতায় বিসদৃশ বোধ হইতেছিল, এখন ততটা মনে হইতেছে না। বরং মনে হইতেছে এই ভাল। ঘাড়-রগ-ঘেঁষিয়া-চুলছাঁট লোকের গায়ে যেমন আলখাল্লা মানায় না—কাটাছাঁটা বাহুল্যবর্জিত পাঞ্জাবীই শোভা পায়, এ-বাড়ীর পক্ষে এ-বাগানও কতকটা সেই রকম। আমার বেঞ্চের পাশটাতেই একটা গোলাপের বেড। হাতের কাছের গাছটিতে গুটি পাঁচ-ছয় ফুল ফুটিয়াছে। বাড়ীর মধ্যেকার হাওয়াটা যেন চিন্তায় চিন্তায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, লাগিল বেশ। গন্ধ-লুব্ধ হইয়া একটি ফুল আলগা ভাবে তুলিয়া ধরিয়াছি—পাপড়িগুলি ঝুরঝুর করিয়া ঘাসের উপর ঝরিয়া পড়িল। আমি শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। একবার চারিদিকে চাহিয়া নিঃশব্দে স্থানটি ত্যাগ করিব ভাবিতেছি, এমন সময় বারান্দা হইতে বেয়ারা ডাক দিল—"মেমসায়েব আপনাকে ডাকছেন একবার মাষ্টার-মশা।"

আমি দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম, চোখ দুইটা অবাধ্যভাবেই একবার ছিন্ন পাপড়িগুলার উপর গিয়া পড়িল। মেমসাহেব দেখিয়াছে, দুইটা কটু কথা বলিবে; যদি শত মোলায়েম করিয়াও বলে ত বুঝাইয়া দিবে—ফুলগাছসুদ্ধ টানিয়া নাকে চাপিয়া গন্ধ লওয়াটা যে-রুচির পরিচয়, এ বাড়ীতে সে রুচির স্থান নাই।

অথচ ধর্ম জানেন আমার কোন দোষ নাই। ফুলটি ছিল ফোটার শেষ অবস্থায়, একটু পরে আপনিই ঝরিত, রূপে লুব্ধ করিয়া আমায় নিমিত্তের ভাগী করিল মাত্র।

বেয়ারার মুখের পানে অপরাধীর মত চাহিলাম,—এমনই অভিভূত হইয়া গিয়াছি যে তাহারই শরণাপন্ন হইয়া বলিয়া ফেলিতাম, "এ যাত্রাটা আমায় বাঁচাও কোন রকমে।"

বেয়ারা বলিল, "ওপর ঘরেই রয়েছেন তিনি, আসুন আমার সঙ্গে।"

নিরুপায় হইয়া অগ্রসর হইলাম।

মনে মনে কিন্তু স্থির করিয়া ফেলিলাম—আজই এ

কাজে ইস্তফা দিয়া বাড়ী চলিয়া যাইব। মীরাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়ানও আর ভাল লাগে না, একটা গোলাপ আপনি পড়িয়াছে ঝরিয়া তাহার জন্য কালা মেমসাহেবের লাঞ্ছনাও সহ্য হইবে না; এর অতিরিক্ত যে-সব বিড়ম্বনা —সে ত আছেই। চাকরটা পর্যন্ত চলিয়াছে—যেন একটা কয়েদীকে বিচারাসনের সামনে হাজির করিতেছে!

বেয়ারা গিয়া পর্দার সামনে মুখটা বাড়াইয়া বলিল, "মাষ্টার-মশা এসেছেন মা।"

ভিতর হইতে আদেশ হইল, "আসতে বল্।"

বেয়ারা দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া পর্দাটা তুলিয়া ধরিল। আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

আদেশ হইল—"ব'সো ঐ সোফাটায়।"

আমি ঘাড়টা সেই রকম গোঁজ করিয়াই আড়চোখে পিছনের সোফাটা দেখিয়া লইয়া কয়েক পা গিয়া বসিয়া পড়িলাম। সেকেণ্ড কয়েক চুপচাপ। মনে মনে মহলা দিতেছি,—প্রথমে বুঝাইব প্রকৃতই ফুলটি আমি জানিয়া নষ্ট করি নাই। কালো মেমসাহেবী মেজাজ নিশ্চয় বুঝিতে চাহিবে না। না চায়, বলিব—চাকরি দিয়া ফুলের জন্য ক্ষতিপূরণ করিলাম। এ অশান্তির এইখানেই ইতি করিয়া দিব।

প্রশ্ন হইল—"তোমায় বাগান থেকে ডেকে নিয়ে এল?"

মুখ না তুলিয়াই উত্তর করিলাম—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আচ্ছা উজবুক ত রাজুটা, আমায় এসে বললেই পারত তুমি বাগানে রয়েছ। আমার এমন কিছু তাড়াতাড়ি ছিল না।"

শান্ত, একটু অনুতপ্ত কণ্ঠস্বর। বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া আরও বিস্মিত হইয়া গেলাম। প্রথমেই সামনে দেওয়ালের উপর একটি গণেশ-জননীর মূর্তির উপর নজর পড়িল এবং তাহার পরই শব্দ অনুসরণ করিয়া যাঁহার উপর নজর পড়িল তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল যেন পটের মূর্তিটিই নীচে নামিয়া আসিয়াছেন।

বয়স বোধ হয় পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ হইবে; চওড়া, টকটকে রাঙা পাড়ের একটা গরদের শাড়ী পরা, সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর, মাথার কাপড়ের পাড়ের সঙ্গে রঙে রঙে একেবারে মিলিয়া গিয়াছে, হাতে সোনার চুড়ির সঙ্গে দু-গাছি শাঁখা।

মুখটা ঈষৎ ক্লান্ত, মনে হয় যেন অসুস্থ রহিয়াছেন। ঘরের এক পাশে কৌচের উপর দৃষ্টি পড়িতে, ঠেলিয়া জড়করা একটা র‍্যাগ দেখিয়া মনে হইল কৌচেই শুইয়া ছিলেন এতক্ষণ, ওদিকে আমায় ডাকিতে পাঠাইয়া কুশন-চেয়ারটায় আসিয়া বসিয়াছেন।

ঘরটা বেশ প্রশস্ত। নীচে আসবাবের বাহুল্য নাই, উপরে ছবির কিছু বাহুল্য আছে, এবং বাড়ীর হিসাবে দেখিতে গেলে বিশেষত্বও আছে। চোখে পড়ে জগদ্ধাত্রী, গণেশ-জননী, কালীঘাটের একটি রাঙায়-কালোয় জলজ্বলে কালীর পট, রবিবর্মার আঁকা একখানি শতদলের উপর কমলা-মূর্তি।

অর্থাৎ আমি, অথবা যে-কোন বাঙালী গৃহস্থ-পরিবারের ছেলে যাহাতে অভ্যস্ত, ঘরের মানুষটি হইতে আরম্ভ করিয়া মায় পট-ছবি সমেত ঠিক সেই রকম একটি পারিপার্শ্বিক। পরিবর্তনটাও এত অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক যে মনে হয় হঠাৎ এর মধ্যে যাদুবলে কিছু একটা যেন হইয়া গিয়াছে, আমার এই বাগান হইতে উঠিয়া আসিবার অবসরটুকুতে। দুই-তিন দিনের যে আড়ষ্ট ভাবটা মনে জমা হইয়া উঠিয়াছিল, অনুভব করিলাম সেটাও হঠাৎ অপসৃত হইয়া গিয়াছে। লিখিতে দেরি হইল, কিন্তু আমার এই ভাবান্তরটা ঘটিতে মোটেই দেরি হয় নাই। মুখ তুলিয়া প্রথমটা বিস্মিত হইয়া গেলাম, তাহার পর অল্প হাসিয়া বেশ সহজ ভাবেই বলিলাম, "ডেকে আনাতে কি আর অন্যায় করেছে?"

"এখন মরশুমী ফুলে বেশ চমৎকার হয়েছে বাগানটি, তাই বলছিলাম।" হাসিয়া বলিলেন, "আমায় ডাকতে গেলে আমি তো চটতাম।"

একটি বিরতি দিয়া প্রশ্ন করিলেন, "তুমিই তাহ'লে নতুন টিউটার এসেছ?"

উত্তর করিলাম—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"শুনলাম। দু-দিন থেকে ভাবছি ডাকব, শরীরটা ঠিক ছিল না; হয়ে ওঠে নি।"

আবার একটু হাসির সঙ্গে বলিলেন, "মীরা বলছিল, 'মুখচোরা ভালমানুষ লোকটি, উনি তরুকে পড়াবেন কি না, তরুই উল্টে ওঁর মাস্টারি করবে।'...জিগ্যেস করলাম—তবে রাখতে গেলি কেন ওঁকে?"

আমি কৌতূহলে মুখ তুলিয়া চাহিতে হাসিয়া বলিলেন, "সে উত্তর তোমার আর শুনে কাজ নেই বাপু।"

তাহার পর বোধ হয় আপত্তিজনক কিছু একটা মনে করিয়া লইতে পারি ভাবিয়া বলিলেন, "উত্তর আর কি? দুষ্টুমি।—'তরুর হাতে নাকাল হবেন, দিব্যি দেখব ব'সে ব'সে—গোবেচারি কেউ নাকাল হচ্ছে দেখতে বেশ লাগে।' ওর কথা সব সময় ধরা হয় না বাড়ীতে; ওঁকেই মাঝে মাঝে ঠাট্টা ক'রে বসে। যাক, তোমার ছাত্রী পড়ছে কেমন?"

হাসিয়া বলিলাম, "আমি তাকে ভাল ক'রে দেখিই নি এখনও।"

"তাই নাকি?—তা ওর দোষ দেওয়া যায় না।"

মিসেস রায় একটু চুপ করিয়া গেলেন। মুখে যে একটা লঘু প্রসন্নতার ভাব ছিল সেটা ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া মুখটা চিন্তায় একটু গম্ভীর হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে বলিলেন, "কখন যে পাবে তা আমিই ভেবে উঠতে পারি না। বাপেতে আর মেয়েতে মিলে সংকল্প করেছে এদিকে এশিয়া আর ওদিকে ইউরোপ—এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু ভাল আছে বেছে বেছে তরুর মধ্যে বোঝাই করতে হবে। আমার মত অন্য রকম, তাই ওসব কথার মধ্যে আর থাকি না, বলি তোমাদের যা ইচ্ছে কর গে বাপু।"

আমি জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, "আপত্তি না থাকে তো আপনার মতটা জানতে পারি কি?"

মিসেস রায় যেন আরও গম্ভীর হইয়া গেলেন, বলিলেন, "আমার মত ওদের এক জন শ্রেষ্ঠ কবির যা মত তাই। ওদের সঙ্গে আর কিছুতেই মেলে না, শুধু এই-খানটাতে মেলে,—'ঈষ্ট্ ইজ্ ঈষ্ট এণ্ড্ ওয়েষ্ট ইজ্ ওয়েষ্ট, দি টোয়েন শ্যাল নেভার মীট'—East is East and West is West, the twain shall never meet.

আমি অতিমাত্র আশ্চর্য হইয়া মুখের পানে চাহিলাম। ইংরেজীর এমন বিশুদ্ধ উচ্চারণ আমি বাঙালী মেয়ের মুখে এর পূর্বে কখনও শুনি নাই, অন্ততঃ কাছাকাছি যদি কিছু শুনিয়াও থাকি তো তাহা অতি মেমসাহেবিয়ানাদুষ্ট। মিসেস্ রায় কথাটা বলিলেন অতি সহজভাবে, তাহাতে যেমন এক দিকে কৃত্রিমতাও ছিল না, অন্য দিকে তেমনই নিখুঁৎ বলিতে পারার জন্য আমার এই যে বিস্ময়, এজন্য স্ত্রীলোক বলিয়া বিন্দুমাত্র সঙ্কোচও ছিল না। খুব বেশী জানার মধ্যে যেমন একটা অনায়াস অবহেলা থাকে—ভাবটা অনেকটা সেই রকম। আমিই বরং একটু অপ্রতিভ হইয়া মুখে বিস্ময়ের ভাবটা মিলাইয়া লইলাম।

তিনি স্থিরদৃষ্টিতে সামনে একটু চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর একটু স্মিত হাস্যের সহিত বলিলেন, "এরা আমার কথা মানতে চায় না, মীরা ঝগড়া করে, মীরার বাপও ঝগড়া করেন। আমাদের এই রাজায় রাজায় ঝগড়া, মাঝখান থেকে তরু-উলুখড়ের প্রাণ যায়। ওকে বিলাত পাঠান হবে—সয়েটোতে জুনিয়ার কেম্ব্রিজের জন্যে হাতেখড়ি চলছে; অথচ সকালবেলায় উঠে নেয়েটেয়ে বেচারীকে লক্ষ্মী পাঠশালায় গিয়ে শিবপূজোর জন্যে চন্দন ঘষতে হয়। স্কুলে ওদের মিউজিক-ক্লাস সেরে এসে বাড়ীতে বিকেলে কীর্তন। আমি বলি—আপাততঃ একটা জিনিসে পাকা হোক, তার পর অন্যটা ধরলেই চলবে,—আগে কীর্তনটা আয়ত্ত ক'রে নিক না হয়।... বলেন—'না, তাহ'লে ঝোঁকটা এক দিকে চলে যাবে, বেশ সরলভাবে নতুন জিনিসকে তুলে নিতে পারবে না'।"

আমি বেশ নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন করিলাম, "কথাটা কি সত্যি নয়?"

মিসেস্ রায় কৌতুকচ্ছলে হাস্য করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "নাঃ, আমার কপাল মন্দ; মীরার মুখে তোমার বর্ণনা শুনে মনে হ'ল বোধ হয় এত দিনে স্বপক্ষে একটি মানুষ পেলাম, তুমিও দেখছি ঐ দলেই!"

তাহার পর আবার গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "না, আমি সে-কথা বলছি না, বলছি—মিলতে গেলে ঐক্যের দিকগুলোয় ঝোঁক দিতে হবে, কিন্তু তা তো করা হয় না, বিরোধের দিকগুলোয় দেওয়া হয় জোর। এটা কি রকম তার জন্যে বেশী দূর না গিয়ে তরুর ব্যাপারটাই ধরা যাক না।—ওকে এমন সুযোগ দেওয়া হবে যাতে ও একেবারে

অতি আধুনিক ইংরেজ যুবতী হয়ে উঠতে পারে। ও যখন কলেজে যায় তখন ওকে দেখলেই বুঝতে পারবে এ-বিষয়ে আমাদের কোন দিক দিয়ে ত্রুটি নেই। এদিকে যাতে আবার বেশী দূর না এগোয়, অর্থাৎ দিদিমা ঠাকুরমাদের কথা ভুলে কোন কেম্ব্রিজ ব্লুর গলায় মালা না দিয়ে বসে, সেজন্য তাকে দিয়ে শিবের মাথায় ও গঙ্গাজল ঢালান হচ্ছে। এ-মনস্তত্ত্ব তোমরা যদি বোঝ তো বোঝ, আমি একেবারেই বুঝি না; কেন না ঠাকুরমা-দিদিমাদের আদর্শ আর বিশ্বাস যদি মানতে হয় তো সেই আদর্শে গড়া শিবঠাকুর ওকে ঠেকাবার জন্যে হিমালয় ছেড়ে কেম্ব্রিজের দিকে এক পাও বাড়াবেন না—তার কারণ, গেলেই তাঁর নিজের জাত যাবে, আর ভক্তের খাতিরে যদি সেটাও না গ্রাহ্য করেন তো এই জন্যে যে কেম্ব্রিজে টাটকা বিল্বপত্র একেবারেই পাওয়া যাবে না।

এই এক ধরণের মিলন। আর এক ধরণের আছে—নিজেদের সব ছেড়ে ওদের সব নেওয়া, মনে-প্রাণে সাহেব হয়ে গিয়ে উদয়াস্ত গায়ে সাবান ঘষতে থাকা। কিন্তু একে তো আর মিলন বলা যায় না, এ আত্মসমর্পণ; বরং আত্মসমর্পণের মধ্যেও আত্মার কিছু বিভিন্নতা বজায় থাকে বোধ হয়; এ একেবারে আত্মবিলয়—ওরাই রইল, বরং পুষ্ট হ'ল, তুমি গেলে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে। এটা সেই মনোভাব যার জন্যে মুখ থেকে বেরোয়—টু লারন্ ইংলিশ, রীড ইংলিশ, স্পীক ইন্ ইংলিশ, থিংক ইন্ ইংলিশ, এণ্ড ইভন্ ড্রীম ইন্ ইংলিশ" (To learn English, read English, speak in English, think in English, and even dream in English)—কে বলেছিলেন কথাটা? রমেশ দত্ত না মাইকেল?—কিন্তু কেন তা করব? মায়ের দুধের সঙ্গে যে-ভাষা আমার জিবে মিলিয়ে রয়েছে তাকে তাড়াতে যাব কোন্ দুঃখে? এই আত্মবিলোপের জাত আমরা—ভাষার দিক্ দিয়েও আত্মবিলোপ, সভ্যতার দিক দিয়েও আত্মবিলোপ।"

মিসেস্ রায় সোজা হইয়া বসিয়াছিলেন, ক্লান্তভাবে সোফায় পিঠে হেলান দিয়া একটু চুপ করিলেন; চোখ দুইটি অনমনস্ক ভাবে সামনে দেয়ালের কমলার ছবির উপর নিবদ্ধ।

আমার চোখ দুইটি নিজে হইতেই কৌচের উপর গিয়া পড়িল।

মিসেস্ রায় অসুস্থ, তাহার উপর হঠাৎ মনের এই আবেগ। বলিলাম, "আপনি এখন একটু আরাম করলে ভাল হ'ত। আপনার কথার প্রতিবাদ করা যায় না, অন্তত ভেবে চেষ্টা করতে হয়…এখন আমি আসি, আবার যখন আদেশ করবেন, আসব।"

উঠিতে যাইব, কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া উঠিতে পারিলাম না। হাতের মধ্যে মুখের দুইটি পার্শ্ব ঈষৎ চাপিয়া, স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন মিসেস্ রায়,—বুঝিলাম আত্মস্থ; আমার এতগুলা কথার একটাও কানে যায় নাই। একটু পরে কমলার মূর্তি থেকে ধীরে ধীরে প্রশান্ত চক্ষু দুইটি নামাইয়া আমার উপর ন্যস্ত করিয়া বলিলেন, "হতেই হবে।"

বুঝিলাম এখনও ঘোরটা কাটে নাই। তখনই যেন সচকিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "বলছিলাম হ'তেই হবে; অর্থাৎ এই আত্মবিলোপের প্রতিক্রিয়া এক দিন আসবেই। তাই কৈলাস আর কেম্ব্রিজের এই জগাখিচুড়ি।"

আমি যেন কিছু একটা বলিবার জন্যই বলিলাম, "কিন্তু এই একেবারে আত্মবিলোপের ভাবটা যেন যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে।"

মিসেস্ রায় বলিলেন, "মোটেই নয়। পুরো দমেই চলেছে এখনও। যেটাকে তুমি যাওয়া বলছ, সেটা হচ্ছে ঐ দুটোতে মিলে তালগোল পাকিয়ে যাওয়া।

আমি বলিতে যাইতেছিলাম, "আজকাল জাহাজ থেকেই সুট ছেড়ে ধুতিচাদর প'রে আমাদের দেশের ছেলেরা নামছে এমন উদাহরণ বিরল নয়।"

মিসেস রায় শেষ করিতে না দিয়া যেন একটু অসহিষ্ণু ভাবেই বলিয়া উঠিলেন, "তুমি জান না তাই বলছ, আমি খুব জানি—আমার নিজের ছেলে এই রকম আত্মবিলুপ্ত, আর এই আমার ছোট মেয়েকে এরা…"

এমন সময় একটা ছোট্ট জাপানী কুকুর ত্রস্তভাবে ঘরে ঢুকিয়া মিসেস্ রায়ের পায়ের কাছে লুটিয়া গড়াইয়া একশা হইয়া পড়িল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মীরা আর তরু এক

রকম হুড়োমুড়ি করিতে করিতেই আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

৫

এ এক সম্পূর্ণ অন্য মীরা।

এমন কলহাস্য আর লুটোপুটি করিতে করিতে প্রবেশ করিল যেন তরুর বড় বোন নয় মীরা, পরন্তু সমবয়সী সঙ্গী। পরে বোঝা গেল মাকে দখল করিবার জন্য মোটর হইতে নামিয়াই ওদের রেস্ আরম্ভ হইয়াছে। তরু ছোট বলিয়া ক্ষিপ্রগতি, সেজন্যও, এবং দুয়ারের পর্দার সঙ্গে মীরার আঁচল একটু জড়াইয়া যাওয়ার জন্যও সে-ই গিয়া আগে মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। মীরা কাছে গিয়া ক্ষণমাত্র চিন্তা করিল, তাহার পর বলিয়া উঠিল, "ঐ যাঃ, বাবা এসে বলবেন কি? তোমার হার্ম্যানের বাড়ীর অমন ফ্রকটা যে একেবারে···"

"কি হয়েছে, এ্যাঁ!"—বলিয়া তরু সভয়ে দাঁড়াইয়া উঠিতেই মীরা তাড়াতাড়ি মায়ের কোলে তাহার স্থানটা দখল করিয়া লইয়া মুক্তকণ্ঠে হাস্য করিয়া উঠিল।

তরু ঠকিয়া গিয়া একটু থতমত খাইয়া গেল, অনুযোগের স্বরে বলিল, "ওঠ দিদি, এ বেইমানি। হেরে গিয়ে···"

মীরা মায়ের কোলে মুখ গুঁজিয়া উত্তর করিল, "তোমারও এটা বেইমানি।"

"আমার বেইমানি কিসে?"

"বেইমানি নয় মা?—তোমার আদর খাওয়ার পালা আগে আমার। ও পরে জন্মেছে, আমার থেকে যা এঁটোকুটো বাঁচবে তাই নিয়ে ওকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আমি তোমার লোভে যখন আর-জন্মে তাড়াতাড়ি ম'রে বসলাম, ও কাদের মায়ায় পড়েছিল?—যাক্ না তাদের কাছে।···তুমি আমার পিঠে হাত বুলিয়ে আদর কর তো মা—মীরা আমার লক্ষ্মীমেয়ে, সোনা মেয়ে..."

তরু ভ্যাংচাইয়া বলিল, "কেলে সোনা!···"

মীরা সেই ভাবে মুখ গুঁজিয়াই দুষ্টামি করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "'মীরা আমার কালো সোনা; জগৎ মাঝে নাই তুলনা'···বল না মা···"

এরা জায়গাটা দখল করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কুকুরটা সরিয়া গিয়া দূরে, ঘরের কোণে একটা চেয়ারের নীচে আশ্রয় লইয়াছিল। দুইটি থাবার উপর মুখ রাখিয়া, চোখ তুলিয়া ব্যাপারটা অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিতেছে। তরু কতকটা নিরুপায় ভাবে মীরার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে, বোধ হয় সুযোগের দিকেও নজর আছে। মীরা মেঝেয় আঁচল লুটাইয়া মায়ের কোলে মাথা গুঁজিয়া কচি মেয়ের অভিনয় করিতেছে,—তরুর রাগটাতে ইন্ধন জোগাইবার জন্য ঈষৎ গ্রীবা বাঁকাইয়া এক-এক বার তাহার দিকে উঁকি মারিতেছে। মিসেস্ রায়ের একটা হাত মীরার বেণীর উপর। মুখে মৃদু হাস্যের সঙ্গে খানিকটা কৌতুকের ভাব মিশিয়া গিয়া অনির্বচনীয় একটা মাধুর্যের সৃষ্টি করিয়াছে, নিজের মাতৃত্বের রসে যেন তল্লীন হইয়া গিয়াছেন। ওঁর মাথার উপর গণেশ-জননীর ছবিটা—তুষারমৌলি হিমালয়, তার সানুদেশে একটি শিলাখণ্ডের উপর শিশু গণপতিকে কোলে লইয়া পার্বতী, চোখ দুটিতে বিশ্বের সব বাৎসল্য আসিয়া যেন পুঞ্জীভূত হইয়াছে; পাশে রক্ষী ও বাহন পশুরাজ।

আমার অবস্থিতিটাও বোঝা দরকার।—

আমি ঘরটার একটু অন্য প্রান্ত ঘেঁষিয়া একটা নীচু সোফায় বসিয়া আছি। আমার সামনে একটা বেশ মাঝারি রকমের গোল মার্বেলের টেবিল। তাহার মাঝখানটিতে বড় একটা পিতলের পাত্রে একরাশ সদ্য-প্রস্ফুট শাদা লিলি; আশেপাশে কয়েক রকম মাউন্টে বসান কয়েকটা ফটো। মোট কথা আমি এমনই কতকটা প্রচ্ছন্ন ছিলাম, তাহার উপর দোরটা আবার ঘরের মাঝামাঝি—প্রবেশ করিয়া ঝোঁকের মাথায় সটান ওদিকে চলিয়া গেলে আমায় না-দেখিতে পাইবারই কথা। ওরা নিজের আবদারের খেলা লইয়া দু-জনেই বরাবর আমার দিকে পিছন ফিরিয়া আছে। মিসেস্ রায় দু-এক বার গোপনে আমার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন—মানে তাহার নিশ্চয়ই এই—দরকার নেই জানিয়ে তোমার উপস্থিতির কথাটা, চুপ ক'রে দেখ না তামাশাটা।

যিনি এত গম্ভীর প্রকৃতির বলিয়া এইমাত্র পরিচয় পাইলাম, তাঁহার মধ্যে এই দুর্বলতা দেখিয়া খুব কৌতুক বোধ করিতেছিলাম। উনিও যেন ইহাদের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছেন। বোধ হয় ইচ্ছা নয় যে সন্তান লইয়া তাঁহার এই নবমাতৃত্বের খেলায় কোন বাধা উপস্থিত হয়।

মা যেমন সন্তানদের বয়স হইতে দেয় না; সন্তানেরাও তেমনই মায়েদেরও নিজেদের বয়সের সঙ্গে টানিয়া রাখে।

মিসেস্ রায় তরুর হাতটা ধরিয়া নিজের দিকে একটু আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার এই সোফাটার হাতলের উপর এসে বরং ব'সো তরু, বড় বোনের সঙ্গে কি জেদাজেদি করে?···তোরা কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে এলি কেন, বললি নি তো মীরা?"

তরু মায়ের আহ্বানে রাজি হইল না। মুখটা গোঁজ করিয়া নাকী সুরে বলিল—"সত্যি বলছি দিদি, নৈলে .."

মীরা ওদিকে কান না-দিয়া বলিল, "ভাল লাগছিল না মা একেবারে—মাথাব্যথার নাম ক'রে পালিয়ে এলাম।··· মাথাব্যথাটা কি চমৎকার জিনিস মা!"

মিসেস্ রায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "চমৎকার কি রে! সত্যি করে নি তো মাথাব্যথা?"

মীরা হাসিয়া বলিল, "এই দেখ মা'র বুদ্ধি! সত্যি হ'লে কখনও চমৎকার হয়? চমৎকার বলছিলাম—এর জোরে স্কুল থেকে পালিয়েছি, পার্টি থেকে পালাচ্ছি—ব্যথা করবার জন্যে মাথাটা যদি না থাকত তা হ'লে কি অবস্থাটাই যে হ'ত ভাবতে মাথা গুলিয়ে যায়।"

মিসেস্ রায় হাসিয়া চকিতে এক বার আমার পানে চাহিলেন। তরু বলিল, "মাথাব্যথা না হাতী; কিসের জন্যে মাথাব্যথা আমি সব জানি।"

মীরা গম্ভীর হইয়া বলিল, "আচ্ছা, জান তো চুপ ক'রে থাক মশাই। তুমি আজকালএকটু বেশী ফাজিল হয়ে পড়েছ তরু।"

তরু বলিল, "তুমি সর না।"

মীরা মায়ের হাঁটু দুইটা আরও জড়াইয়া বলিল, "না, সরব না।"

একটু চুপচাপ গেল। মিসেস্ রায়ের স্মিতহাস্যটা আরও একটু ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমার উপস্থিতিটা যে কারেচক্রে এখনও অপরিজ্ঞাত ইহাতে মুখে কৌতুকের ভাবটাও আরও স্ফুটতর। একটু যেন সঙ্কোচ কাটাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "কে কে এসেছিল পার্টিতে?—মিষ্টার লাহিড়ীর বাড়ীর সবাই এসেছিলেন? নীরেশ এসেছিল?"

শেষের এই প্রশ্নটুকুতে মীরা যেন মুখটা আরও একটু গুঁজিয়া লইল।

প্রশ্নটা অনির্দিষ্ট ভাবে করিলেও আসলে মীরাকেই করা হইয়াছিল। কন্যার সঙ্কোচে, শুধরাইয়া লইবার জন্য মিসেস্ রায় আবার তরুর দিকে চাহিয়া প্রশ্নটার পুনরুক্তি করিলেন, "আমাদের নীরেশ এসেছিল তরু?—কে কে সব এসেছিল?"

পিছন ফিরিয়া থাকিলেও বুঝিলাম তরু হাতের রুমালটার একটা কোণ দাঁতে চাপিয়া রুমালটাতে মুঠার টান দিতে দিতে মসৃণ করিতেছে, এই নবতর প্রসঙ্গে সে যেমন মায়ের কোল ভুলিয়াছে তাহাতে তাহার চোখে মুখে যে একটা কৌতুকের হাসিও ফুটিয়া উঠিয়াছে, না দেখিতে পাইলেও এটা আমি আন্দাজ করিতেছি। মাথাটা নাড়িয়া উত্তর করিল, "না, নীরেশ-দা আসেন নি মা, তবে নিশীথ-দা আগেই এসেছিলেন, আমাদের মোটর পৌঁছতে মিসেস্ মল্লিকের সঙ্গে তিনিই এসে নামালেন আমাদের, আবার দিদি যখন মাথাব্যথা ব'লে···"

মীরা মায়ের কোলের মধ্যে মুখটা একটু ঘুরাইয়া বলিল, "একটু অতিরিক্ত ফাজিল হয়েছ তুমি তরু। তুমি এখানে কেন? তোমার মাষ্টার-মশায়ের কাছে যাও।"

তরু কোলের কথা ভুলিয়া গিয়াছে; অন্যমনস্ক ভাবে গিয়া মায়ের সোফার হাতলের উপর বসিয়া মায়ের বুকে লুটাইয়া তর্কের সুরে বলিল, "বা—রে, আর তুমি কেন এখানে?"

মীরা বলিল, "আমার ঢের কাজ আছে।···আমি তোমার পড়ার সম্বন্ধে মার সঙ্গে পরামর্শ করব।"

আমি এদিকে বেজায় অস্বস্তিতে পড়িয়া গিয়াছি। যতটা আন্দাজ করা গিয়াছিল তাহার চেয়ে বেশী সময় আমার উপস্থিতিটা অজ্ঞাত রহিল। ইহার মধ্যে কথায় কথায় নীরেশ লাহিড়ীর ও নিশীথের সম্বন্ধে যে প্রসঙ্গটুকু আসিয়া পড়িল সেটুকু শোনা আমার উচিত হয় নাই,

তাহার উপর আবার আমারও উল্লেখ হইয়া গেল। মিসেস্ রায় কথাটা প্রকাশ করিতেছেন না; অথচ আমি যে হঠাৎ কি করিয়া নিজেকে এদের সামনে ধরিব, মোটেই ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছি না। নিজেকে প্রকাশ করিলেই এতটা সময়ের অপ্রকাশের অপরাধ লইয়াই প্রকাশ করিতে হইবে; অথচ সেই অপরাধটা প্রতি মুহূর্তেই বাড়িয়াও যাইতেছে।

এদিকে, হঠাৎ দু-জনের যে-কাহারও দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবার ফাঁড়াটা মাথায় ঝুলিতেছে। মীরা যে-কোন মুহূর্তেই উঠিয়া পড়িতে পারে, কিংবা এদিকে ফিরিয়া চাহিতে পারে। তরুর নজরে ত পড়িয়া গিয়াছিলাম বলিলেই হয়;—আগাইয়া গিয়া এদিকে পিছন ফিরিয়াই মায়ের বুকে লতাইয়া পড়িল; তাহা না করিয়া সোফার হাতলে বসিয়া এই দিকে মুখ করিয়াই ত বোনের সঙ্গে তর্ক চালাইবার কথা। ও-ও বোধ হয় মাকে যথাসাধ্য দখল করিল; কিন্তু এদিকে সোজাসুজি একবার মুখ করিলে আমার ধরা পড়িয়া যাওয়া অনিবার্য।

মিসেস্ রায় এখনও কথাটা ভাঙিতেছেন না কেন? সন্তান লইয়া এই মোহ ওঁকে কি আমার নিদারুণ অবস্থা সম্বন্ধে এতই অচেতন করিয়া তুলিয়াছে?···ঘামিয়া উঠিতেছি।

মীরার কথায় তরু উত্তর করিল, "বেশ ত, আমার পড়ার কথাই ত?—কর না পরামর্শ, শুনি।"

মিসেস্ রায়ের একটি হাত তরুর মাথায়, একটি হাত মীরার বেণীর উপর,—দুইটিই ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছে। বাৎসল্যের স্রোত যেন দুইটি ধারায় নামিয়া আসিতেছে।

মীরা বলিল, "নিজের সম্বন্ধে সব কথা শোনা চলে না।"

তরু বলিল, "খুব চলে।"

মীরা বলিল, "ধর, যদি তোমার বিয়ের কথা হ'ত, থাকতে ব'সে?"

তর্কটার গলদ খুব স্পষ্ট; কিন্তু উত্তর দিবার উপায় ছিল না এবং সেইখানেই মীরার জিৎ। তরু মুখটা আরও গুঁজিয়া অনুযোগের সুরে বলিল, "মা!"

তাহার পর কোলের মধ্যেই মুখটা একটু ঘুরাইয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "মাষ্টার-মশাই বেড়াতে গেছেন, তাঁকে এখন পাব না।"

মীরা বলিল, "যান নি বেড়াতে, তোমার মাষ্টার-মশাই ভয়ানক কুণো।"

মিসেস্ রায় কন্যাদ্বয়ের মাথার উপর দিয়া আমার পানে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন।

তরু অনুযোগ করিল, "দেখছ মা, মাস্টার-মশাইয়ের নিন্দে করছে দিদি?"

হার-জিতের দিক্ পরিবর্তন হইয়াছে;—মীরা আরও রাগাইয়া বলিল, "তোমার মাস্টার-মশাই ভালমানুষ, মুখচোরা, লাজুক;—অমন মানুষেরা নয় বোমা করে, নয় বেকার কবি হয়,—দু-জনের এক জনকেও আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না। সুতরাং যখনই তাঁর কথা উঠবে, তখনই নিন্দে ভিন্ন সুখ্যাতি বেরুবে না আমার মুখ দিয়ে।"

তরু মুখ ঘুরাইয়া দিদির মুখের উপর দৃষ্টি নত করিয়া একটু হাসিল, ভ্রূ উঁচাইয়া বলিল, "ইস্, আমি যেন জানি না···"

মীরা মুখটা তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "কি জান, শুনি?"

সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা থাক্, যেন বাচালগিরি করে না।"

তরু শেষের হুকুমটা কানে তুলিল না, বলিল, "তুমি এই দু-জনকেই বেশী পছন্দ কর।"

আমার তখন যে কি অবস্থা! তরুর দৃষ্টিটা শুধু একটু তুলিতে দেরি!

মিসেস্ রায়ও যেন ফাঁফরে পড়িয়া গিয়াছেন;—কথাটার যে এমন ভাবে মোড় ফিরিবে, আর এত অতর্কিতে—মোটেই আশঙ্কা করেন নাই। আমার মুখের দিকে আর চাহিতে পারিতেছেন না। তরুকেও মানা করিতে পারিতেছেন না। তরু নিতান্ত নিরীহভাবে তর্কের ঝোঁকে কথাটা বলিতেছে,—মানা করিতে গেলেই কোথায় আপত্তির প্রচ্ছন্ন কারণ আছে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। সেটা হইবে আরও বিসদৃশ।

মীরা ধমকাইল, "চুপ কর্ তরু; তোমার কানে ধ'রে বলতে গিয়েছিলাম।···"

তরুর জয়ের নেশা লাগিয়াছে। মায়ের দিকে চাহিয়া

বলিল, "সত্যি বলছি মা, দিদি ওর সই রমাদিকে বলেছেন—ওঁর ভাল লাগে কবি, নয় ত···হ্যাঁ সত্যি বলছি,—রমাদির বোন সতী আমায় বলেছে···"

মীরা অসহিষ্ণু ভাবে বলিয়া উঠিল, "তরু!···"

তরু মায়ের ঘাড়ে মুখ গুঁজিয়া বলিল, "বাঃ, এতে ধমকের কি আছে মা? উনি বলছেন মাস্টার-মশাইকে দু-চক্ষে দেখতে পারেন না; আমি দেখাব না যে···আচ্ছা, এবার বল তো দিদি—সেদিন···"

দিদির দিকে মুখ তুলিয়া ফিরিতে গিয়া তরু স্তম্ভিত বিস্ময়ে ও কৌতূহলে একেবারে নিশ্চল হইয়া গেল, বলিয়া উঠিল, "ওমা! মাস্টার-মশাই যে!"

আর দৃষ্টি না পড়িয়া উপায় ছিল না, কেননা আমি প্রবল অস্বস্তিতে অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়াইয়া উঠিয়াছি।

মীরা ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া বস্ত্র সংযত করিয়া লইয়া খানিকটা মুখ নীচু করিয়াই রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে চক্ষু তুলিয়া সম্পূর্ণ পরিবর্তিত আকৃতিতে স্পষ্ট দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল। আমাকে যে চাকরিতে নিয়োগ করিয়াছিল সেই মীরা,—শান্ত, দৃপ্ত, আরও একটা কি যেন। সকলেই আমরা প্রস্তরবৎ স্থাণু হইয়া গিয়াছি। নিয়োগের সময় মাহিনার কথায় আমি যখন বলি—"আপনাদের যা সুবিধে হয় অনুগ্রহ করে দেওয়া"—সে সময় মীরার নাসিকার ডান দিকে যে-কুঞ্চনটা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেটা আবার ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে।

মিসেস্ রায়ের মুখেও একটা ভয়ের ছায়া ঘনাইয়া উঠিতেছিল;—এখনই একটা অঘটন ঘটাইয়া বসিবে মীরা, আমার এই চৌর্যবৃত্তির জন্য—এই অলক্ষ্যে সব কথা শোনার জন্য।···তীব্র উৎকণ্ঠার মধ্যেই হঠাৎ আবার মুখটা তাঁহার প্রসন্ন হাস্যে দীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিলেন, "তা ব'সো শৈলেন, এতক্ষণ ছিলে কোথায়? তোমার ছাত্রীরই পড়াবার কথা হচ্ছিল।"

আমি যত দিন এখানে ছিলাম তাহার মধ্যে মাত্র দুই দিন এই মহীয়সী নারীকে মিথ্যা বলিতে শুনিয়াছিলাম. তাহার মধ্যে এই এক।···আমায় বাঁচান দরকার ছিল, উনি সেই জন্য নিজের জিহ্বা কলুষিত করিলেন।

মীরা এক বার মায়ের পানে চাহিল—যাচাইয়ের দৃষ্টিতে, তাহার পর তাহার নাসিকার সেই কুঞ্চন ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।···মীরা মাকে বিশ্বাস করিয়াছে, তাঁহার মিথ্যায় প্রবঞ্চিত হইয়াছে। বিশ্বাস করিয়াছে যে আমি এই মাত্র ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছি, এখনও আসন গ্রহণ করি নাই। সুতরাং এক-আধটা শেষের কথা যদি কানেও গিয়া থাকে তো তাহার প্রাসঙ্গিক মানেটা নিশ্চয় ধরা পড়ে নাই আমার কাছে। কতকটা ভাবহীন দৃষ্টিতেই আমার পানে চাহিয়া চাহিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, "বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে?"

ওর মায়ের অনুরোধে নয়, অনুরোধের সুরে ঢালা ওর হুকুমে ধীরে ধীরে আবার উপবেশন করিলাম।

কিন্তু কোথায় কি একটা রহিয়া গেল যেন, কথাবার্তা আর জমিল না। আমার মনে হইল মায়ের কথা যদি বিশ্বাস করিয়াই থাকে, না বলিয়া নিঃসাড়ে প্রবেশ করার গ্রাম্যতাটা মীরা অন্তর দিয়া ক্ষমা করিতে পারিতেছে না।

একটু পরে একটা ছুতো করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

ক্রমশঃ

ইঙ্গিত

সম্বুদ্ধ

সকাল হইতে দলে দলে নাগরিক রাজসভার দিকে চলিয়াছে। চরণে ত্রস্ত গতি, মনে ব্যস্ত উৎকণ্ঠা—বুঝি স্থান পাইলাম না, বুঝি দেখিতে পাইলাম না।

অদ্য প্রকাশ্য রাজসভায় এক জন তরুণ সেনানীর বিচার হইবে। সেই বিচার দেখিবার জন্যই এত আগ্রহ, এত কৌতূহল।

সেনানীর সম্বন্ধে অভিযোগ গুরুতর। সে রাজকন্যাকে ভালবাসিয়াছে। সেনানী উচ্চবংশীয় নহে, সামান্য দরিদ্রের সন্তান মাত্র। স্বীয় বুদ্ধি ও প্রতিভার বলে সে সেনানীর পদ অধিকার করিয়াছে, কিন্তু তথাপি সে অনভিজাত। রাজ্যের নিয়মে, অভিজাতবংশীয় না হইলে রাজকন্যার প্রেম প্রার্থনা করিবার অধিকার তাহার থাকে না। যদি কেহ প্রার্থনা করে, সে দণ্ডনীয়—কারণ রাজবংশের সে অমর্যাদা করিয়াছে।

কেমন করিয়া ইহার সূত্রপাত হইল কেহ জানে না। রাজসভায় রাজকন্যা বসিতেন মাতার পার্শ্বে, যবনিকার অন্তরালে; সেনানী দাঁড়াইত মুক্ত অসি হস্তে, সিংহাসনের পার্শ্বে। কখন কোন্ অবসরে ইহাদের দৃষ্টি-বনিময় হইয়াছে, দৃষ্টি-বিনিময় হইতে ক্রমে প্রাণ-বিনিময় হইয়াছে, তাহার ইতিহাস কেহ বলিতে পারে না।

কেবল সেনানীই যদি রাজকন্যার প্রতি আকৃষ্ট হইত তাহার হয়তো প্রতিকার সহজ ছিল। কিন্তু বিপদ এই, রাজকন্যা স্বয়ংও তাহার প্রতি অনুরক্তা বলিয়া সন্দেহ হইতেছে।

সেনানীকে সভার সম্মুখে লইয়া আসা হইল। চতুর্দিকে প্রহরীবেষ্টিত, মণিবন্ধে শৃঙ্খল। সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেনানী এক বার চারি দিকে তাকাইল। সুগঠিত গ্রীবার ভঙ্গি তখনও মনোরম, চক্ষের দৃষ্টি তখনও প্রশান্ত।

সভায় সমবেত নাগরিকবৃন্দ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল। সভায় সেনানীকে প্রত্যহই দেখা যাইত, তবু যেন এতদিন ইহাকে ভাল করিয়া কেহ দেখে নাই। সিংহের মত দৃপ্ত শান্ত পদক্ষেপ, সুঠাম দেহ-সৌষ্ঠব—শক্তি ও সৌন্দর্যের অপূর্ব সমাবেশ হইয়াছে এই মানুষটির দেহে। এত সৌন্দর্য এত তেজ কোথায় লুকাইয়া ছিল এত দিন! দর্শকেরা অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল। মনে মনে কহিল, রাজকন্যার ভাগ্য ভাল, এমন মানুষের প্রেমের অধিকারিণী হইয়াছে।

বিচার আরম্ভ হইল। মহাদণ্ডপ্রতীহার বন্দীর সমক্ষে অভিযোগ-বাক্য উচ্চারণ করিলেন; কহিলেন, এই অপরাধের আমি সুবিচার প্রার্থনা করিতেছি।

রাজা কহিলেন, বন্দী, তোমার উত্তর?

বন্দী কহিল, আমার উত্তর কিছুই নাই মহারাজ।

—তুমি অপরাধ স্বীকার করিতেছ?

—না। অপরাধ আমি করি নাই।

—তুমি রাজকন্যার প্রতি অনুরক্ত?

—অনুরক্ত বলিতে সাহস হয় না। তাঁহার আমি পূজার্থী।

—তাহাই তোমার অপরাধ।

—না। যিনি কামনার যোগ্য তাঁহাকে কামনা করা অপরাধ হইতে পারে না।

—রাজকন্যাও কি তোমাকে কামনা করেন?

—সৌভাগ্যের আশা সকলেই করে। সৌভাগ্যে আস্থা স্থাপন মূর্খের কাজ। এই প্রশ্নের উত্তর দিবার দুঃসাহস আমার নাই।

রাজা কহিলেন, রাজকন্যা।

সখীর সঙ্গে রাজকন্যা সভাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সেনানীর দিকে এক বার মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন—সে দৃষ্টি অবর্ণনীয়। সেনানীর দৃষ্টি তাঁহার উপরে নিবদ্ধ।

দুই জনকে কল্পনায় একত্র বসাইয়া দেখিয়া সভাস্থ নাগরিকবৃন্দ চক্ষু মার্জনা করিল।

রাজা কহিলেন, কন্যা, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। এই যুবক তোমার প্রতি অনুরক্ত?

রাজকন্যা নীরব।

—তুমি এই যুবকের প্রতি অনুরক্তা?

রাজকন্যা সদ্যস্ফুট কমলের মত স্নিগ্ধ দুই চক্ষু এক বার সেনানীর মুখের উপরে, তাহার পর রাজার মুখের উপরে স্থাপন করিলেন। কহিলেন, এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিব না।

—কেন?

—ইহার উত্তর আমার নিকটে আশা করাই অন্যায়।

রাজা কহিলেন, উত্তম। দৈব-পরীক্ষা হইবে।

মহাদণ্ডপ্রতীহারকে কহিলেন, রঙ্গালয় সজ্জিত কর।

রাজ্যে প্রাচীনকাল হইতে একটি প্রথা ছিল। বিচার-কক্ষে অপরাধ সম্যক্ নির্ণীত না হইলে, বিচারের ভার দৈবের হস্তে অর্পণ করা হইত। রাজপ্রাসাদের একান্তে অবস্থিত রঙ্গালয়ে এই বিচার অনুষ্ঠিত হইত। ভূমিতলে রঙ্গালয়, ঊর্দ্ধে দর্শকদিগের আসন। রঙ্গভূমির দুই পার্শ্বে দুইটি কক্ষ, তাহাদের দ্বার রুদ্ধ। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া, নিজের ইচ্ছামত ইহার একটি দ্বার খুলিতে হইত। একটি কক্ষে থাকিত রাজ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হিংস্র ব্যাঘ্রটি। অন্য কক্ষে থাকিত, অভিযুক্তের সমশ্রেণীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপসী ও গুণবতী কন্যাটি। কোন্ কক্ষে কাহাকে রাখা হইল, তাহা কেহ জানিত না। অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যাঘ্রের কক্ষ খুলিয়া ফেলিলে উপবাসপীড়িত ব্যাঘ্র তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিত—প্রমাণ হইত, সে সত্যই অপরাধী এবং ইহাই তাহার দৈবপ্রেরিত দণ্ডবিধান। কন্যার কক্ষ খুলিলে প্রমাণ হইত দৈবের বিচারে সে নিরপরাধ। সেই কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিয়া রাজকীয় উপঢৌকন সহ সসম্মানে গৃহে প্রেরণ করা হইত—পুরোহিত রঙ্গালয়েই প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেন। রাজ্য সুশিক্ষিত, সুসংস্কৃত; রাজাও সংস্কৃতি-গর্বে গর্বিত; তথাপি তাঁহার ধমনীতে পূর্বপুরুষের বর্বর-রক্ত তখনও শীতল হয় নাই। পূর্বপুরুষের এই বর্বর বিচার তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

রঙ্গালয় সজ্জিত হইয়াছে। আসনে আসনে দলে দলে নাগরিক-নাগরিকা উৎকণ্ঠ-চিত্তে অপেক্ষা করিতেছে—রঙ্গালয়ে তিল ধরিবার স্থান নাই।

আসন-শ্রেণীর কেন্দ্রস্থলে, সাধারণ আসন হইতে একটু উচ্চে, রাজকীয় আসন রহিয়াছে। রাজা আসিয়াছেন, রাণী এবং রাজকুমারেরা আসিয়াছেন, রাজকন্যাও আসিয়াছেন।

এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখিতে রাজকন্যা কেন আসিলেন? আসিয়াছেন, হয়তো তাহার কারণ, তাঁহারও দেহে উষ্ণ বর্বর-রক্ত বিদ্যমান। না হইলে এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিতে তিনি আসিতে পারিতেন না। কিংবা হয়তো তাহার কারণ, জীবনের শেষমুহূর্তে তাঁহার প্রিয়তমকে তিনি এক-বার শেষ দেখা দেখিয়া লইতে চাহেন।

বিচারের সময় হইল।

রঙ্গভূমি দৃঢ় প্রাচীর-বেষ্টিত; সেই প্রাচীরে সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র দ্বার খুলিয়া সেনানীকে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল।

সেনানীর অঙ্গে বর্ম নাই। কোমল অথচ দৃঢ়-বদ্ধ মাংসপেশী অনাবৃত বক্ষে স্কন্ধে বাহুমূলে তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছে। ঘনকুঞ্চিত কেশরাশি স্কন্ধদেশ আচ্ছন্ন করিয়াছে।

সেনানীর মুখে শঙ্কার চিহ্ন নাই, দৃষ্টিতে উৎকণ্ঠা নাই। ঊর্দ্ধে দর্শকমণ্ডলীর দিকে চাহিয়া সে ধীর পদক্ষেপে এক বার রঙ্গভূমির চতুর্দিক পরিভ্রমণ করিল; যেন সকলের নিকটে নীরব ভাষায় বিদায় প্রার্থনা করিল, যেন আশীর্বাদ প্রার্থনা করিল। রঙ্গভূমি-পরিভ্রমণের শেষে রাজকীয় আসনের সম্মুখে আসিয়া সে দাঁড়াইল। সেইখানে দাঁড়াইয়া সে রাজাকে অভিবাদন করিল; সঙ্গে সঙ্গে

তাহার দৃষ্টি রাজাকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার পশ্চাতে অবস্থিতা রাজকন্যার উপরে পতিত হইল।

পলকের জন্য দুই জনের চক্ষু এক হইল। সেই এক মুহূর্তের দৃষ্টিতে রাজকন্যা তাহার চক্ষের ভাষা পড়িয়া লইলেন, সেই এক মুহূর্তের মধ্যেই নীরব চক্ষের ভাষায় তাহার উত্তরও দিলেন। তার পর তিনি চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে অপরের অলক্ষ্যে রাজার আসনের পৃষ্ঠে রক্ষিত তাঁহার দক্ষিণ করপল্লবের তর্জনীটি দক্ষিণ দিকে ঈষৎ একটু হেলাইয়া দিলেন।

সে ইঙ্গিত সেনানী বুঝিল। সেই ইঙ্গিতের জন্যই সে অপেক্ষা করিতেছিল। ধীর অকুণ্ঠিত পদক্ষেপে সে দক্ষিণের কক্ষটির দিকে অগ্রসর হইল; ধীর অকুণ্ঠিত হস্তে তাহার দ্বার খুলিয়া ফেলিল। দ্বার খুলিতেই কক্ষের মধ্য হইতে—

কে বাহির হইয়া আসিল?

ব্যাঘ্র? না রূপসী তরুণী?

রাজকন্যা স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন। সেনানী দ্বারের নিকটে যাইতেই তিনি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর দুই হস্তে চক্ষু আবৃত করিয়া, ছুটিয়া রঙ্গালয় হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সকলের দৃষ্টি তখন সেনানীর প্রতি নিবদ্ধ। রাজকন্যার প্রস্থান কেহ লক্ষ্য করিল না। সেনানী কিন্তু করিল। একটি অতি ক্ষীণ হাসির রেখা তাহার অধরের কোণে ফুটিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল। সে-হাসি কেহ দেখিতে পাইল না। রাজকন্যাও দেখিতে পাইলেন না।

সে-হাসিতে কি ছিল? করুণা? কৌতুক? আশ্বাস? নিরাশা?

কেহ সে-হাসি দেখে নাই; দেখিলেও বলিতে পারিত না। এক রাজকন্যাই হয়তো পারিতেন। রাজকন্যা সে হাসি দেখিলেন না।

সেনানী রাজকন্যার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিল। অপরের যাহা চক্ষে পড়ে নাই, প্রেমিকের একাগ্র দৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়িয়াছিল। সেনানী দেখিয়াছিল, রাজকন্যার মুখ বড় শুষ্ক, বড় করুণ। মুখশ্রী পাণ্ডুবর্ণ; আত্মসংবরণের প্রাণপণ চেষ্টায় চিবুক ও ওষ্ঠাধর ঋজু, দৃঢ়সংবদ্ধ; চক্ষুর নিম্নে কালিমারেখা; দৃষ্টি নিষ্পলক, শুষ্ক—যেন মনের মধ্যে যে বহ্নিদাহন চলিয়াছে তাহারই শুষ্ক উত্তাপ চোখে মুখে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাঁহার চক্ষুর পাতা ভারী, বারংবার মার্জনের ফলে রক্তবর্ণ। রাজকন্যা রাত্রে ঘুমান নাই। রাজকন্যা রাত্রি জাগিয়া কাঁদিয়াছেন। তিনি বর্বরকন্যা, কিন্তু বর্বর হইলেও তিনি নারী।

সেনানীকে ইঙ্গিত তিনি করিলেন; ইঙ্গিত করিবেন বলিয়াই তিনি রঙ্গালয়ে আসিয়াছিলেন। প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে এতক্ষণ সংবরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু কর্তব্য সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে শক্তির বাঁধ ভাঙিয়া পড়িল। ইহার পরে কি হইবে তিনি জানিতেন; যাহা হইবে সে দৃশ্য চক্ষু চাহিয়া দেখিবার সাহস তাঁহার ছিল না। রাজকন্যা পলাইয়া গেলেন। কিন্তু রঙ্গালয় হইতেই পলায়ন করা চলে, আপনার মনকে পশ্চাতে ফেলিয়া পলায়ন করা তো সম্ভব নয়! সে-কক্ষ হইতে কে বাহির হইয়া আসিবে তাহা রাজকন্যা জানিতেন। চক্ষে দেখুন বা না দেখুন, ইহার পরে যে-দৃশ্যটি ঘটিবে, মনের চক্ষে তাহাকে তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলেন।

রাজকন্যা জানিতেন, সে-কক্ষে কাহাকে রাখা হইয়াছে। পূর্ব-রাত্রে তিনি স্বয়ং সে সন্ধান লইতে বাহির হইয়াছিলেন; স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া সে সন্ধান বাহির করিয়াছিলেন। ইঙ্গিত করিতে তাঁহার ভুল হয় নাই, তিনি স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানেই সে-ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

রাজকন্যা জানিতেন, যে-ব্যাঘ্রটিকে রঙ্গালয়ে আনা হইয়াছে, তাহার তুল্য ভীষণাকৃতি ও হিংস্র ব্যাঘ্র রাজ্যের কোন পশুশালায় আর নাই। মাত্র তিন দিন পূর্বে তাহাকে বন্দী করা হইয়াছিল—তাহার মুখে পড়িলে সে মানুষের আর দুই মুহূর্তও জীবিত থাকিবার আশা নাই।

রাজকন্যা জানিতেন, যে-কন্যাটিকে রঙ্গালয়ে আনা হইয়াছে, তাহার মত রূপসী ও গুণবতী কুমারী রাজ্যে আর দ্বিতীয় নাই—তাহাকে যে পত্নীরূপে লাভ করিবে সে ভাগ্যবান্।

রাজকন্যা জানিতেন, সেই কুমারীর সহিত অভিযুক্ত

সেনানীর পরিচয় আছে, হয়তো তাহার প্রতি আকর্ষণও আছে।

রাজকন্যা জানিতেন, এই তরুণ সেনানীকে তিনি সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়াছেন, তাঁহাকে হারাইয়া তাঁহার জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিবে।

সমস্ত জানিয়া, সমস্ত ভাবিয়াই রাজকন্যা মন স্থির করিয়াছিলেন; সমস্ত জানিয়া, সমস্ত ভাবিয়াই সেনানীকে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। সমস্ত রাত্রি রাজকন্যা ঘুমান নাই, সারা রাত্রি জাগিয়া রাজকন্যা ভাবিয়াছেন। আর কাঁদিয়াছেন।

রাজকন্যার ভুল হয় নাই। এক দিকে যাইবার ইঙ্গিত করিতে গিয়া নিমেষের উত্তেজনায় অন্য দিকে যাইবার ইঙ্গিত তিনি করেন নাই। পাছে সেই ভ্রম ঘটিয়া বসে, এই ভয়ে তিনি পূর্ব রাত্রে বার-বার করিয়া সেইরূপ অঙ্গুলি হেলাইয়া ইঙ্গিতটি অভ্যাস করিয়া লইয়াছিলেন।

সে-ইঙ্গিত অভ্যাস করিতে, তাহার পরে কি হইবে তাহা মনে করিতে, রাজকন্যার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে; অবাধ্য চক্ষু বার-বার অশ্রুতে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে; অবাধ্য বক্ষ বার-বার ক্রন্দনবেগে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। তবু সেই অশ্রুকে, সেই হৃদয়কে সবলে দমন করিয়া রাখিয়া সেই ইঙ্গিত রাজকন্যা করিয়াছেন—বার-বার করিয়া তাহাই অভ্যাস করিয়া লইয়াছেন।

সমস্ত রাত্রি রাজকন্যা ঘুমান নাই। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রাজকন্যা সেই ইঙ্গিত অভ্যাস করিয়াছেন। আর কাঁদিয়াছেন। তিনি বর্বরকন্যা, কিন্তু বর্বর হইলেও তিনি নারী।

সমস্ত জানিয়া, সমস্ত ভাবিয়া, রাজকন্যা সেনানীকে ইঙ্গিত করিলেন—কোন্ দিকে যাইতে? দ্বার খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে সেনানীর সাক্ষাৎ হইল--

কাহার সঙ্গে?

ব্যাঘ্রের? না রূপসী কন্যার?

রাজকন্যা ভাবিয়া চিন্তিয়া সংকল্প স্থির করিয়াছিলেন; ভাবিয়া চিন্তিয়াই সেনানীকে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। কি ভাবিয়াছিলেন তিনি?

হয়তো রাজকন্যা ভাবিয়াছেন: আমার প্রিয়তম ব্যাঘ্রের মুখে প্রাণ হারাইবে, ইহা আমি সহিতে পারিব না। থাক, আমার দুঃখ আমারই অন্তরে গুমরিয়া মরুক—সে বাঁচিয়া থাকুক। এই কন্যাটিকে আমি জানি। সে সুন্দরী, সে গুণবতী, সে সেনানীর পরিচিতা, প্রিয়পাত্রী। অতএব আমি যখন সেনানীকে পাইবই না, ইহাকেই লইয়া সে সুখী হউক। আমি দূর হইতে জানিয়া তৃপ্ত হইব; তাহার সুখেই আমার সুখ।

এরূপ ভাবিলে রাজকন্যা কন্যার কক্ষের দিকেই ইঙ্গিত করিতেন। তাঁহার পক্ষে ইহা অসম্ভব ছিল না, কারণ তিনি বর্বরকন্যা। বর্বরসুলভ, তথা নারীসুলভ সরল আত্মত্যাগ-প্রবৃত্তি তাঁহার রক্তে মিশিয়া ছিল।

কিংবা হয়তো রাজকন্যা ভাবিয়াছেন, এই সেনানীকে আমি ভালবাসি, আমার সে প্রিয়তম। আমি তাহাকে পাইব না। হয়তো পাইব না, কিন্তু তাই বলিয়া আমারই চক্ষের সম্মুখে আর এক জন আসিয়া তাহাকে অধিকার করিবে? এই কন্যাটিকে আমি জানি। সে সুন্দরী, সে গুণবতী, সে সেনানীর পরিচিতা, প্রিয়পাত্রী। তাহাকে বিবাহ করিয়া সেনানী সুখী হইবে। কিন্তু, আমি যখন তাহাকে পাইবই না, অন্য কাহাকেও লইয়া সে সুখী হইবে ইহা আমি সহিতে পারিব না। তাহার অপেক্ষা সে বরং ব্যাঘ্রের হাতেই প্রাণ হারাক, তাহাই আমার পক্ষে সুসহ।

এরূপ ভাবিলে তিনি ব্যাঘ্রের কক্ষের দিকেই সেনানীকে যাইতে ইঙ্গিত করিতেন। ইহাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত না, কারণ তিনি বর্বরকন্যা। বর্বর-সুলভ, তথা নারীসুলভ সহজ অভিমানও তাঁহার রক্তে মিশিয়া ছিল।

বস্তুত, রাজকন্যা কোন্ রূপ ভাবিয়াছিলেন? সেনানীকে কোন্ দিকে যাইতে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন?

এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারিব না। ইহার উত্তর দিবার শক্তি আমার নাই। দুর্জ্ঞেয় নারীর হৃদয়, তাহার রহস্য আমার জানা নাই।

ইহার উত্তর যদি সত্যই জানিতে চাহেন, পাঠক আপনি একবার ভাবিয়া দেখুন, আপনি যদি সেই সেনানী হইতেন, আপনার প্রেয়সী কোন্ রূপ চিন্তা করিলে, কোন্ দিকে ইঙ্গিত করিলে, কোমলা বা মানিনী—কোন্ রূপে আত্মপ্রকাশ করিলে, আপনি অধিকতর সুখী হইতেন?

পাঠিকা, আপনি ভাবিয়া দেখুন, আপনি যদি সেই রাজকন্যা হইতেন, কোন্ রূপ চিন্তা করিতে, কোন্ দিকে ইঙ্গিত করিতে, কোমলা বা মানিনী—কোন্ রূপে আত্ম-প্রকাশ করিতে, আপনার অধিকতর প্রবৃত্তি হইত?

তারপর তাহা হইতে বুঝিয়া লউন, রাজকন্যা কোন্ রূপ চিন্তা করিয়াছিলেন, কোন্ দিকে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, কোমলা বা মানিনী—কোন্ রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

আপনার যেরূপ মনে হইতেছে, এই প্রশ্নের তাহাই উত্তর।

[এই গল্পের আখ্যান-বস্তু ইংরেজী হইতে গৃহীত।]

কবি

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দস্তুরমত একটা বিস্ময়। নজির অবশ্য আছে বটে—দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ, কিন্তু সেটা ভগবৎ-লীলার ব্যাপার, হৃষীকেশের ইচ্ছায় সেটা সম্ভবও হইয়াছিল। সুতরাং কুখ্যাত অপরাধ-প্রবণ হাড়ীবংশোদ্ভূত নিতাইচরণের কবিরূপে আত্মপ্রকাশ রীতিমত বিস্ময়ের ব্যাপার। ভদ্র জনে বলিল—এ একটা বিস্ময়। হরিজনে বলিল—নেতাই তাক লাগিয়ে দিলে রে বাবা।

চণ্ডীতলার মেলায় কবিগানের পাল্লা হইবার কথা, লোকজন অপরাহ্ণ হইতেই জমিয়া জমিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বেশ একটি জনতায় পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু আলো জ্বালিয়া আসর পাতিয়া দেখা গেল অন্যতম পাল্লাদার কবি নোটনদাস ভাগিয়াছে। গতবার হইতেই নোটনদাসের টাকা পাওনা ছিল—মা চণ্ডীর আশীর্ব্বাদী ফুল তাহার মাথায় ঠেকাইয়া আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল যে, 'আগামী বার অর্থাৎ বর্ত্তমান বৎসরে দুই বৎসরের টাকা অগ্রিম দেওয়া হইবে।' নোটনদাস বহুদিন হইতেই এ মেলাতে গাওনা করে, সে কিছু বলিতে পারে নাই। কিন্তু এবার আসিয়া মোহন্তের সম্মুখে হাত পাতিতেই মোহন্ত টকটকে তাজা জবাফুলের নির্ম্মাল্য হাতে দিয়া বলিলেন—জিতা রহো বেটা! কিন্তু টাকার কথাই উল্লেখ করিলেন না। লোকজন অনেক বসিয়াছিল, আলোচনা হইতেছিল মেলার খরচের অভাবের কথা—মা-চণ্ডীর না কি হ্যাণ্ডনোট না কাটিলে আর উপায়ান্তর নাই। এমন মজলিসে নোটন আর টাকার কথাটা পাড়িতেই পারিল না। ক্ষুব্ধ মনেই বাসায় ফিরিয়া আসিল। বাসায় তখন নূতন একটা বায়নার প্রস্তাব লইয়া এক জন লোক আসিয়া বসিয়া আছে। দশ ক্রোশ দূরে একটা মেলায় এবার বড় সমারোহ, তাহারা নোটনদাসকে চায়। অন্ততঃ এখানকার মেলা সারিয়া একটা দিনের জন্যও।

নোটন বলিল—আমি কাল থেকেই গাওনা করব। দক্ষিণে কিন্তু পনর টাকা রাত্রি।

লোকটা পরমোৎসাহে বলিয়া উঠিল—তাই দোব।

—কিন্তু আগাম।

লোকটা দশ টাকার একখানা নোট বাহির করিয়া নোটনের হাতে দিয়া বলিল—এই নেন বায়না; সেখানে মাটিতে পা দিলেই বাকী টাকা কড়াক্রান্তি মিটিয়ে দেবে বাবুরা।

নোটখানা ট্যাঁকে গুঁজিয়া নোটন ঢুলীটাকে ও দোহার দুই জনকে বলিল—ওঠ্ রে!

সন্ধ্যার সময়েই স্থানীয় স্টেশনে একখানা ট্রেনও ছিল। অন্ধকারে অন্ধকারে মাঠে মাঠে আসিয়া মুখ ঢাকিয়া ট্রেনে উঠিয়া নোটন সরিয়া পড়িল।

নোটন ভাগিয়াছিল কিন্তু অপর পাল্লাদার মহাদেব ছিল। সে মনে মনে আপশোষ করিতেছিল।

সংবাদটা শুনিয়া বাবুভাইয়েরা একেবারে আগুন হইয়া উঠিলেন। নোটনকে গলায় গামছা দিয়া ধরিয়া আনিয়া জুতা মারিয়া পিঠের চামড়া তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা হইতে ক্ষতিপূরণের মামলা করা পর্য্যন্ত নানা উত্তেজিত কল্পনায় তাঁহারা তৃণদাহী বহ্নির মতই লেলিহান হইয়া উঠিলেন।

ঠিক এই সময়েই সাধারণ জনতার ভিতর হইতে কোন রসিকজন চীৎকার করিয়া উঠিল—বল—হরি—!

সমগ্র জনতা সকৌতুকে ধ্বনি দিয়া উঠিল—হরি বো—ল! অর্থাৎ মেলাটির শবযাত্রা ঘোষণা করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে তৃণদাহী বহ্নি যেন ঘরে লাগিয়া গেল; অত্র গ্রামেরই বাৎসরিক এক শত বাইশ টাকা তিন আনা দশ গণ্ডা দুই কড়া এক ক্রান্তি আয়ের জমিদার গঞ্জিকাসেবী ভূতনাথ ব্যাঘ্রবিক্রমে ঘুরিয়া সম্মুখে যে দরিদ্রটিকে পাইল তাহারই চুলের মুঠি ধরিয়া বলিল—চোপ রও শালা!

অন্য কয়েক জনে তাহাকে ক্ষান্ত করিয়া বলিল—মারা-ধরা নয়, কবির পাল্লাই করাতে হবে। ডাক মহাদেবকে।

অনেক পরামর্শ করিয়া শেষে স্থির হইল—মহাদেব ও মহাদেবের প্রধান দোহার এই দুই জনের মধ্যেই পাল্লা হউক। কিন্তু আর এক জন দোহার ও ঢুলীর প্রয়োজন। এই সময়েই নিতাইচরণের আবির্ভাব। সে জোড়হাত করিয়া পরম বিনয় সহকারে শুদ্ধ ভাষায় নিবেদন করিল—প্রভু, অধীনের একটা নিবেদন আছে আপনকাদের সি-চরণে।

অন্য কেহ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মহাদেব কবিওয়ালা বলিয়া উঠিল—এই যে, আমাদের নেতাইচরণ রয়েছে। তবে আর ভাবনা কি? ওই তো দোয়ারকি করতে পারবে!

বাবুদের মধ্যে এক জন কলিকাতায় চাকরি করে, ময়লা কাপড়-জামার গাদার মধ্যে ধোপ-দুরস্ত জামা-কাপড়ের মত ফিটফাট ব্যক্তিটি গ্রাম্য ভদ্রজনের মধ্যে মধ্যমণির মত শোভমান ছিল; বেশ ভারিক্কী চাল; খুব উঁচুদরের এক জন পায়াভারী পৃষ্ঠপোষকের মত করুণা-মিশ্রিত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সে বলিল—বল কি? এ্যাঁ? নেতাইচরণের আমাদের এত বড় গুণ? তা লেগে যা রে বাবা, লেগে যা।

ভূতনাথ হি-হি করিয়া হাসিয়া বলিল—সে—তাই কাক কেটেই আমোদ হোক। কাক—কাকই সই।

নিতাই মনে মনে আহত হইলেও মুখে কিছু বলিল না, দোহারকি করিতে লাগিয়া গেল।

নিজের দোহারের সহিত কবিওয়ালার পাল্লা সুতরাং প্রতিযোগিতাটা হইতেছিল আপোষমূলক -ভানের মত। শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠিল দুই ধরণের। বুদ্ধিমান দল বলিল—দূর দূর—সাঁট করে পাল্লা হচ্ছে। অন্য দল বলিল—মহাদেবের দোহারও বেশ ভাল কবিয়াল, আচ্ছা কবিয়াল, টকাটক জবাব দিচ্ছে! নিতাইচরণের প্রশংসাও হইতেছিল—নিতাইচরণের গলাখানি বড় ভাল, আর মধ্যে মধ্যে 'ফোড়ন'ও দিতেছে চমৎকার। বাবুরা বলিলেন—বলিহারি বেটা, বলিহারি।

গ্রামবাসী হরিজন শ্রোতারা বাহবা দিল—আচ্ছা—আচ্ছা!

নিতাই উৎসাহিত হইয়া উটের মত নাক প্রবেশের পথে মাথা গলাইয়া দিল—নিজেই স্বাধীন ভাবে গান করিতে আরম্ভ করিল। মহাদেবের দোহার আপত্তি করিল—এ্যাই—এ কি হচ্ছে? ও কি গাইছ তুমি? এ্যাই।

নিতাই সে কথা গ্রাহ্যই করিল না, সে বাঁ-হাতখানিতে গাল আবৃত করিয়া ডান হাতখানি থুথু নিবারণের জন্য মুখের সম্মুখে ধরিয়া সম্মুখের দিকে অল্প ঝুঁকিয়া তখন বাবুদের খুব কাছে দাঁড়াইয়া গাহিতেছিল—

হুজুর—ভদ্র পঞ্চজন রয়েছেন যখন, সুবিচার হবে নিশ্চয় তখন
জানি—জানি—জানি।

বাবুরা খুব বাহবা দিয়া উঠিলেন—বহুত আচ্ছা—বহুত আচ্ছা!

হরিজনেরা বলিল—ভাল—ভাল!

নিতাই ধাঁ করিয়া লাফ মারিয়া ঘুরিয়া ঢুলীটাকে ধমক দিল—এ্যাই কাটছে! সঙ্গে সঙ্গে তাল দেখাইয়া হাতে তালি দিতে দিতে বোল বলিতে আরম্ভ করিল;—ধিক্‌ড়্‌ দা-দা-ধেন্‌তা—ধিক্‌ড়্‌-দা-দা-ধেন্‌তা—গুড়্‌ গুড়্‌ তা-তা-তা-থিয়া; ধিক্‌ড়্‌;—হাঁ! বলিয়া সে গোড়ার ধুয়াটা গাহিল—

ক-য়ে—কালীকপালিনী, খ-য়ে—খপ্পরধারিণী,
গ-য়ে—গোমাতা সুরভি গণেশজননী
কণ্ঠে দাও মা বাণী॥

মহাদেবের দোহার অতঃপর পাল্লা ছাড়িয়া দোহার-কি আরম্ভ করিল। মহাদেব ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি করিয়া গান ধরিল—নিতাইকে সে যেন শূলবিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। মহাদেবের শূল-প্রতিরোধের শক্তি নিতাইয়ের ছিল না, কিন্তু তাহার বাহাদুরি এই যে, সে ধরাশায়ী হইল না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে সব সহ্য করিল।

পাল্লার শেষে সে বাবুদের প্রণাম করিয়া হাসিমুখে বলিল—হুজুর, অধীন মুখ্যু ছোট নোক—

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বাবুরা বলিলেন—না না—খুব গেয়েছিস তুই। বহুত আচ্ছা—বহুত আচ্ছা!

ভূতনাথ বলিল—মাণিক রে বেটা মাণিক!

চাকুরে বাবু বলিল—ইউ আর এ পোয়েট ; এঁ্যা !

নিতাই বুঝিতে পারিল না, বিনীত সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে বাবুর দিকে চাহিয়া রহিল। বাবু বলিল—তুই তো এক জন কবি রে !

নিতাই অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া নতশিরে বিদায় লইয়া এবার কবিয়াল মহাদেবকে প্রণাম করিয়া বলিল—মাজ্জনা করবেন ওস্তাদ ! আমি অধম।

নিতাইয়ের বিনয়ে মহাদেবও খুশী হইয়া তাহার অনেক প্রশংসা করিল এবং বলিল—আমার দলে তুমি দোহারকি কর।

নিতাইও খুব খুশী হইয়া উঠিল। সে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পিছন হইতে দশ-বিশ জনে একসঙ্গে তাহাকে ডাকিল—এই-এই নেতাই, নেতাই !

নিতাই ফিরিয়া চাহিল, যাহারা ডাকিতেছিল তাহারা বাবুদের দেখাইয়া বলিল—মোহন্ত ডাকছেন,—বাবুরা ডাকছেন।

মোহন্ত সন্ন্যাসী চণ্ডীর প্রসাদী একগাছি বিল্বপত্রের শুষ্ক মালা তাহার গলায় দিয়া বলিলেন—জিতা রহো বেটা।

চাকুরে বাবু নিতাইয়ের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—তোকে একটা মেডেল দেওয়া হবে, মায়ের দরবার হ'তে ! বুঝলি।

নিতাই দিশেহারা হইয়া গেল। কি করিবে— কি বলিবে সে কিছুই ঠাওর করিতে পারিল না। বাবু বলিল—ভারী খুশী হয়েছি আমরা। কিন্তু খবরদার আপন গুষ্টির মত চুরি-ডাকাতি করবি না। তুই বেটা কবি !

নিতাই এবার হাতজোড় করিয়া বলিল—আজ্ঞে হুজুর, চুরি আমি করি না, মিছে কথা আমি বলি না, নেশাও আমি করি না। এই মা-চণ্ডীর ছামুতে দাঁড়িয়ে বলছি। মিছে বলি তো বজ্জাঘাত হবে আমার মাথায়।

নিতাই মিথ্যা শপথ করে নাই। সে চুরি করে না, মিথ্যা বলে না। এই সংযম তাহার ভীষণ উগ্র। এই উগ্রতার জন্যই নিতাই আত্মীয়-স্বজন সকল জন হইতে বিচ্ছিন্ন। সরকারী পাকা রাস্তাটার ধারে ধারে বড় বড় শিমুলগাছ - শীতকালে তাহাতে অপর্য্যাপ্ত ফল ধরিয়া থাকে, ফল পাকিয়া ফাটিয়া চারি দিকে তুলা উড়িয়া যায়, নিতাইয়ের মা এই ফল পাড়িয়া আনিয়াছিল—গৃহস্থ-বাড়ীতে তুলা বিক্রয় করিবার জন্য ; নিতাই বলিয়াছিল,—বুড়ো বয়েসে চুরি করলি মা ?

মা আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছিল—চুরি করলাম কি রে ?

—ঐ শিমুলের পাবড়া গুলান। ও তো পরের দব্য।

—পরের দ্রব্য !

মা বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া ছেলের মুখের দিকে চাহিয়াছিল।

ছেলে বলিয়াছিল—সরকারী পথের ধারের গাছ, ও হ'ল সরকার বাহাদুরের। তার পর হাসিয়া রসিকতা করিয়া বলিয়াছিল, সরকার বাহাদুর তো তোমার পিতে ঠাকুর লয় মা !

মা তারস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, নেতাই আমার পেটের ছেলে, সে আমাকে চোর বললে ! আমার বাপ তুললে !

নিতাইয়ের মামা গৌর হাড়ী এ অঞ্চলের বিখ্যাত ডাকাত। সদ্য সে তখন পাঁচ বৎসর জেল খাটিয়া ফিরিয়াছে, দিদির কান্না শুনিয়া সে আসিয়া সমস্ত শুনিয়া—নিতাইয়ের গালে চড়ের উপর চড় কষিয়া দিয়াছিল ! তিরস্কার করিয়াছিল ভগ্নীকে, গোপালকে যে নেকাপড়া শিখতে দিয়েছিলে ! তখন বারণ করেছিলাম !

কেবল মামাই নয়, মাতামহও ছিল ডাকাত, প্রমাতামহ ছিল ঠ্যাঙাড়ে। নিতাইয়ের বাপ ছিল সিঁদেল চোর, পিতামহ ছিল ডাকাত—মাতামহের সঙ্গে একসঙ্গে ডাকাতি করিত, প্রপিতামহের ইতিহাস অজ্ঞাত ; পিতৃ-পরিচয়হীন পিতামহের বাপই একদা আসিয়া হাড়ীপাড়ায় আশ্রয় লইয়া হাড়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। সেই বংশে সত্যসন্ধ কবিজন নিতাইয়ের উদ্ভব। ইহা বিস্ময় ছাড়া আর কি ?

নিতাই শুধু সত্যসন্ধ কবিজনই নয়, সে নেশাও করে না ; কিন্তু চা যদি নেশা হয়--তবে নিতাই নেশা করে। আর ঝোঁক তাহার দুধের উপর। নিত্য নিয়মিত গ্রামান্তর হইতে একটি মেয়ে তাহাকে দুধের যোগান দিয়া যায়। নিতাই তাহাকে বলে ঠাকুর-ঝি।

* * *
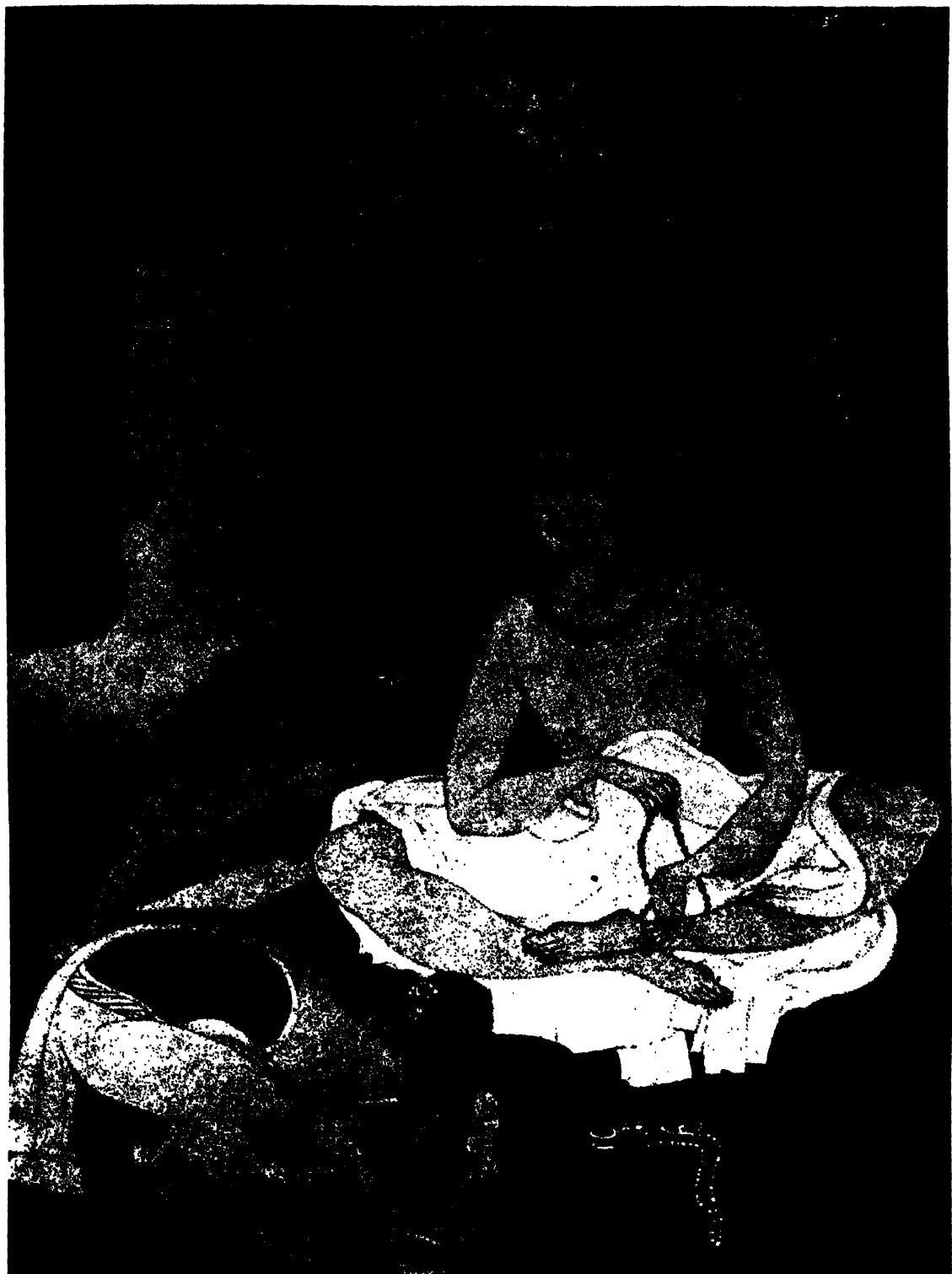
যবন হরিদাস

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা — শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার — [বিবিধ প্রসঙ্গে চিত্রপরিচয় দ্রষ্টব্য

কেমন করিয়া এমন হইল—সে ইতিহাস অজ্ঞাত, অলক্ষ্যে হারাইয়া গিয়াছে। কেবল একটি ঘটনা লোকের চোখে পড়িয়াছিল ;—নিতাই দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত পড়াশুনা করিয়াছিল—স্থানীয় নৈশবিদ্যালয়ে। কিন্তু চোর বেণীর গল্প তাহার মনে নাই।

মায়ের এই স-ক্রন্দন অভিযোগের আঘাত এবং মাতুলের নির্যাতনের অপমানে আহত হইয়া নিতাই বাড়ী ছাড়িয়া পলাইল। গ্রামেই স্টেশন কম্পাউণ্ডে কুলি-ব্যারাকের মধ্যে গিয়া বাসা গাড়িল। স্টেশনের পয়েন্টস-ম্যান রাজা মুচি তাহার বন্ধু লোক—সে-ই তাহাকে আশ্রয় দিল। রাজাও অদ্ভুত লোক—আঠারো বৎসর বয়সে সে বিগত মহাযুদ্ধে মেসোপটেমিয়া গিয়াছিল ; ফিরিয়া আসিয়া লাইট রেলওয়ের এই স্টেশনটিতে পয়েন্টসম্যানের কাজ করিতেছে। প্রাণ-খোলা দিল-দরিয়া লোক ; অনর্গল ভুল হিন্দী বলে, ঘড়ির কাঁটার মত ডিউটি করে, ডিউটির শেষে মদ খায়, গান গায়—প্রচুর চীৎকার করে, মধ্যে মধ্যে স্ত্রী-পুত্রকে ধরিয়া ঠেঙায়। নিতাইয়ের সঙ্গে রাজার আলাপ গান লইয়া, কবি গানের ছড়া লইয়া, নিতাইয়ের কবিজনোচিত রসিকতা লইয়া। আলাপের প্রথম দিনই নিতাই রাজার ছেলেকে বলিয়াছিলেন—'যোব রাজ'।—এখনও তাই বলে। রাজা হাসিয়া আকুল—বলিহারি ওস্তাদ! কেয়াবাৎ। নিতাই গালে হাত দিয়া—মুখের সম্মুখে অপর হাতটি রাখিয়া ঈষৎ ঝুঁকিয়া সঙ্গে সঙ্গে গান ধরিয়াছিল—

রাজার বেটা 'যোবরাজা' তেজার বেটা মহাতেজা—
খায় সে খাস্তা খাজা গজা—
বিদিত ভোমণ্ডলে।

রাজা সঙ্গে সঙ্গে ঢোলটি পাড়িয়া লইয়া ঝাঁকিয়া বসিয়াছিল—ছেলেটির হাতে তুলিয়া দিয়াছিল কাঁসি। তাহার পৈত্রিক পুরাতন ঢোলটি রাজার আজও আছে। কাঁসিটা তাহার নিজেরই, ছেলেবেলায় তাহার বাবা তাহাকে কিনিয়া দিয়াছিল, মহেশপুরের মেলায়।

নিতাই রাজাকে ডাকে রাজন্। রাজার বউকে বলে. রাণী।

এই রাজার আশ্রয়েই আসিয়া সে বাস আরম্ভ করিল ; রাজা তাহার গুণমুগ্ধ ভক্ত। দিনে সে স্টেশনে থাকিত—ভদ্রলোকজনের মোট গাড়ীতে তুলিয়া দিত, নামাইত, গ্রামে গ্রামান্তরেও মাথায় করিয়া দিয়া আসিত। রোজগার মন্দ হইত না, স্টেশনে নামাইতে চড়াইতে দু-পয়সা, গ্রামে পৌছিয়া দিয়া আসিলে চার পয়সা, গ্রামান্তরের রেট দূরত্ব হিসাবে এবং গরজ অনুযায়ী, দুই আনা চার আনা, বর্ষায় বা সন্ধ্যায় হইলে ছ-আনা বাঁধা। কিছু কমিশনি দিতে হয় স্টেশনের বাবুদের, কিন্তু দিয়াও যাহা থাকে—সেও দৈনিক চারি গণ্ডার কম নয়। অন্য কুলিদের এত হয় না ; তাহারা নিতাইয়ের হিংসা করে। কিন্তু নিতাইয়ের সহায় স্বয়ং রাজা।

স্টেশন-স্টলের ভেণ্ডার 'বেনে মামা' রহস্য করিয়া নিতাইকে বলে— রাজ-বয়স্য।

মামার দোকানের সজীব বিজ্ঞাপন বাতব্যাধিতে আড়ষ্ট বিপ্রপদ বলে— বয়স্য কিরে বেটা বয়স্য কি? রাজার সভাকবি!

নিতাই বিপ্রপদের পদধূলি লইয়া 'নৃপ' শব্দে মুখে দেয়, ভারী খুশী হইয়া উঠে।

বাতব্যাধিগ্রস্ত বিপ্রপদ সকালে উঠিয়াই কোন মতে আসিয়া স্টেশনে আড্ডা লয়, বেলা বারোটায় এক বার কোন মতে বাড়ী গিয়া খাইয়া খানিকটা ঘুমাইয়া আবার বেলা তিনটায় আসে—রাত্রি সাড়ে দশটায় শেষ ট্রেনখানি পার করিয়া তবে যায়। দেহ তার যত আড়ষ্ট—মুখ তার তদপেক্ষা অনেক বেশী সক্রিয়। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদে-আসলে বকিয়া সে পোষাইয়া লয়। রসিক ব্যক্তি, 'বসুধৈব কুটুম্বকম', বিপ্রপদের সঙ্গে নিতাইয়ের জমে ভাল। নিতাই পদধূলি লইলে বিপ্রপদ সংস্কৃতে স্বরচিত শ্লোকে আশীর্ব্বাদ করে—

"ভব কপি—মহাকপি—দগ্ধানল—সলাঙ্গুল—"

হাতজোড় করিয়া নিতাই বলে-প্রভু কপি মানে আমি জানি।

বিপ্রপদ ভুল স্বীকার করিয়া বলে—ও কপি নয়—কবি —কবি! আচ্ছা কবি তো তুই বটিস, কই বল দেখি—"শকুনি খেললে পাশা, রাজ্য পেলে দুর্যোধন, কিন্তু ভীমের বেটা ঘটোৎকচ কোন্ পাপে মরে?"

সঙ্গে সঙ্গে বাঁ-হাত গালে চাপিয়া, মুখের সম্মুখে ডান

হাতখানি রাখিয়া, ঈষৎ ঝুঁকিয়া নিতাই আরম্ভ করে—আ—। আ-া—। কবিগান আরম্ভ হইয়া যায়। রাজা পাশে দাঁড়াইয়া ভাবে—ঢোলকটা আনিবে নাকি? কিন্তু ঢোল আনা আর হইয়া উঠে না। ট্রেনের ঘণ্টা পড়ে। ট্রেন আসিয়া পড়িলে গান থামে। নিতাই দূরান্তরের যাত্রীদের সহিত মজুরীর দরদস্তুর করে—বলে—প্রভু—গগন পানে দিষ্টি করেন একবার;—গ্রীষ্মকাল হইলে বলে—দিনমণির কিরণটা একবার বিবেচনা করেন হুজুর। বর্ষায় বলে—বিষ্ণু বন্ন মেঘের একবার আড়ম্বরটা দেখেন কর্তা! শীতে বলে—শৈত্যের কথাটা একবার ভাবেন বাবু!

বিপ্রপদ মামার দোকানে বসিয়া নিতাইকে সমর্থন করে—আ জ্ঞ হাঁ। আপনাদের তো সব দোশালা আছে, ওর যে একশালাও নাই। ওর কষ্টের কথাটা বিবেচনা করুন একবার।

দু-পহরে যাইবার সময় নিতাই রাজাকে বলিয়া যায়—রাজন্ ঠাকুরঝি এলে দুধটা নিয়ে রেখ।

ও-সব পূর্ব্বকথা।

আজ গানের পর শুকনো বেলপাতার মালা গলায় দিয়া নিতাই ফিরিল—সেকালের দিগ্বিজয়ী কবিদের মত। সমস্ত পথটা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব তাহাকে ঘিরিয়া কলরব করিতেছিল—সে-সমস্ত কিছুই তাহার কানে যাইতেছিল না। রাজাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল—সভাকবির গৌরবতৃপ্ত রাজার মতই। সেই বকিতেছিল সকলের চেয়ে বেশী! হঠ যাও—হঠ যাও এতনা নগিচ কেঁও আতা হ্যায়? ভাগো! হঠ যাও! এমনই খবরদারীর মধ্যে রাজা তাহাকে বাসায় আনিয়া তুলিল—না হইলে নিতাইয়ের আজ পথ ভুল হইয়া যাইত।

বাসায় আসিয়া রাজা বলিল—কুছ তো খা লেও ওস্তাদ!

নিতাই সংক্ষেপে উত্তর দিল—উঁ-হু। বলিয়াই সে নিজের ঘরে ঢুকিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু ঘুম আসিল না। আজ কেবলই তাহার মনে পড়িল বিখ্যাত কবিয়াল তারণ মোড়লকে। উঃ তারণ মোড়লের কবিগান মনের মধ্যে জলজল করিতেছে! সে যেবার প্রথম শোনে ও দেখে, সেই কথাটাই সবচেয়ে বেশী মনে আছে। বাপ রে—বাপ রে—আসরে সে কি লোক—হাজারে হাজারে—আর সে কি গোলমাল! বুকে সারি সারি মেডেল, পাকা চুল—পাকা গোঁফ, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা লইয়া লম্বা মানুষটি আসিয়া আসরে ঢুকিতেই ব্যস—সব চুপ!

আসরের এক দিকে বেঞ্চ পাতিয়া গাঁয়ের বাবুরা বসিয়াছিল—তাহারা পর্য্যন্ত চুপ করিয়া গেল! আর সে কি গান! তার পর যখনই আশপাশে যেখানে তারণ কবির গান হইয়াছে, সেখানেই সে গিয়াছে। একবার ভিড়ের মধ্যে হাত বাড়াইয়া তারণ কবির পায়ের ধূলাও লইয়াছিল। মনে মনে তাহার বড় সাধ ছিল তারণ কবির দলে দোয়ারকি করিয়া সে কবিগান শিখিবে। কিন্তু তাহার কপালদোষেই মোড়ল মরিয়া গেল।

সে হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া আলো জ্বালিল; তার পর ছোট কাঠের চৌকির উপরে রক্ষিত একটি রঙীন কাপড়-বাঁধা দপ্তর খুলিয়া বসিল। দপ্তরের মধ্যে ছিল মোটা হরপে বটতলার ছাপা একখানি কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কৃষ্ণের শতনাম, শনির পাঁচালি, মনসার ভাসান, একখানা প্রথম ভাগ—একখানা দ্বিতীয় ভাগ, ধারাপাত, খানকয়েক খাতা, ভাঙা স্লেট একখানা, এক টুকরা ছোট লাল নীল পেন্সিল।

সকালে উঠিয়া রাজা তাহাকে ডাকিল—ওস্তাদ!

নিতাই তখন সবে ঘুমাইয়াছে—সে উত্তর দিল না।

যুদ্ধফেরত রাজা চা খায়, ওস্তাদ নহিলে চা খাইয়া সুখ হয় না, চা হইয়া গিয়াছে, ওদিকে সাড়ে-সাতটার ট্রেন আসিয়া পড়িল বলিয়া। রাজা আবার ডাকিল—ওস্তাদ! ওস্তাদ!

নিতাই জড়িতস্বরে উত্তর দিল—উঁ হু!

—চা লো গেয়া ভাইয়া!

—উঁ হু!

—আরে ট্রেন আতা হ্যায়!

—উঁ-হু!

রাজা নিরুপায় হইয়া চলিয়া গেল। আর ডাকিল

না। কাল রাত্রে ওস্তাদের বড়ই খাটুনী গিয়াছে, ঘুমাইতেছে বেচারা ঘুমাক!

বেলা নয়টা নাগাদ নিতাই আপনার চায়ের মগটি হাতে করিয়া শিথিল মন্থর পদক্ষেপে মামার দোকানে আসিয়া বসিল; মুখে মৃদু একটু হাসি।

বিপ্রপদ হৈ হৈ করিয়া তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিল—বলিহার বেটা বলিহার! জয় রামচন্দ্র! কাল নাকি সত্যিসত্যিই লঙ্কাকাণ্ড করে দিয়েছিস শুনলাম! ভ্যালারে বাপ কপিবর!

মুহূর্ত্তে নিতাই গম্ভীর হইয়া গেল, বিপ্রপদের রসিকতা আজ তাহাকে বিদ্ধ করিল। সে হাতজোড় করিয়াই বলিল—আজ্ঞে প্রভু, মুখ্যুসুখ্যু মানুষ—ছোট জাত—বাঁদর ভালুক যা বলেন তাই সত্যি। বলিয়া সে আপনার মগটি বাড়াইয়া বলিল—কই গো দোকানী মশায়—চা দেন দেখি।

দোকানী বেনেমামা চা ঢালিয়া দিয়া বলিল—না কাল নেতাই আমাদের আচ্ছা গান করেছে, ভাল গান করেছে।

নিতাই গম্ভীর ভাবে চা-পান আরম্ভ করিল। ওদিকে সাড়ে নয়টার ট্রেনটা আসিয়া পড়িল। নিতাই উঠিল না। রাজা প্লাটফর্ম হইতে হাঁকিতেছিল—ওস্তাদ, ওস্তাদ!

নিতাই সাড়া দিল না, উঠিয়া সে বাসার দিকে চলিল। রাজা ছুটিয়া আসিয়া বলিল—গাঁওকে একঠো মোট হায় ভেইয়া খালি, একঠো বেগ—আউর ছোটাসে একঠো বিস্তরা।

নিতাই বলিল—না।

রাজা প্রশ্ন করিল—কেঁও, তবিয়ৎ খারাব হ্যায়?

নিতাই বলিল—শরীরের জন্য নয়, কুলিগিরিই আর করব না।

রাজা অবাক হইয়া গেল।

* * *

বাসায় নিতাই রাজাকে ডাকিয়া বলিল—রাজন্, তুমিই বিবেচনা ক'রে দেখ।

রাজা প্রশ্ন করিল—কি?

একটি পাথর দিয়া মেঝের উপর দাগ কাটিতে কাটিতে নিতাই বলিল—এই তোমার কাল রাত্রির কথা স্মরণ কর। সুখ্যাতি ত তোমার একটা হয়ে গেল চারি দিকে—কবিয়াল বলে!

সোৎসাহে রাজা বলিয়া উঠিল—আলবৎ। জরুর।

—তবে? আর কি তোমার মস্তকে ক'রে ভার বহন করা উচিত হবে? ধরগা তোমার কবি হয়ে দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি মুনি হয়ে গেল।

রাজা রামায়ণের পালা গান শুনিয়াছে কিন্তু রত্নাকর বাল্মীকি সংবাদ তাহার মনে নাই, কিন্তু তাহাতেও কিছু আসিয়া গেল না, সে আসল কথাটি লইয়াই বিবেচনা করিতেছিল—কবি নিতাইচরণের কি মাথায় মোট-বহা উচিত হইবে। অনেক বিবেচনা করিয়া সে বলিল—উঁহু! লেকিন একঠো বাত ওস্তাদ—

রাজনের মুখের দিকে চাহিয়া নিতাই প্রশ্ন করিল—বল।

—লেকিন রোজকার ত চাহিয়ে ওস্তাদ! খানে ত হোগা ভেইয়া!

নিতাই বার-বার ঘাড় নাড়িয়া বলিল—সে আমি ভাবি না রাজন্। দু-বেলা না হয় এক বেলা খেয়েই থাকব আমি। তা ব'লে—ধর ভগবান আমাকে কবি করেছেন—এ্যাঁ!

এবার রাজা অনেক চিন্তা করিয়া খাঁটি বাংলায় বলিল—না ওস্তাদ, ছোট কাজ আর তোমার করা হবে না। উঁ-হু!

নিতাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—ওই তোমার বিপ্র ঠাকুর হে, আমাকে বলে কি না কপিবর—মানে তোমার হনুমান।

রাজা বলিল—জবাব কেঁও নেই দিয়া তোম?

—মুখের ডগায় এসেছিল—সামলে নিলাম। গরুর চেয়ে বাঁদর ভাল।

রাজা বলিল—জরুর।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাজা বলিল—আব তুম সন্সার পাতাও ওস্তাদ। সাদী ক'র।

তাচ্ছিল্যের সহিত ঠোঁট উল্টাইয়া দিয়া নিতাই বলিল—দূর।

—দূর কেঁও ভাই? উ হাম নেহি শুনেগা।

—তুমি ক্ষেপেছ রাজন্, বিয়ে ক'রে বিপদে পড়ব শেষে! আমাদের জাতের মেয়ে বিশ্বের মর্ম বোঝে? কেবল খ্যাচ খ্যাচ করবে।

—হাঁ, ই বাত ত ঠিক হ্যায়।

—তা ছাড়া—ধরগা তোমার; নিতাই কথা শেষ না করিয়াই ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

ভ্রূ নাচাইয়া রাজা প্রশ্ন করিল—উ কেয়া বাত ওস্তাদ?

—ধরগা তোমার—মনে-ধরা কনেই বা কোথায় হে? বেশ মৃদু মৃদু হাসিয়া নিতাই বলিল—আমরা হলাম গিয়ে কবি। আমাদের চোখ তো তোমার যাতে-তাতে ধরবে না হে!

রাজা অকস্মাৎ হা হা করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। রাজার উচ্চ হাসি—উৎকট এবং বিকট।

এই হাসির মধ্যে চকচকে পিতলের ঘটি মাথায় দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল একটি মেয়ে; নিতাই বলিল—এস ঠাকুরঝি এস।

মেয়েটি রাজার দিকে আঙুল দেখাইয়া সবিস্ময়ে বলিল—জামাই এত হাসছে কেনে? মেয়েটির কণ্ঠস্বর বড় মিঠা কিন্তু কথা কয় অত্যন্ত দ্রুত।

মেয়েটি গ্রামান্তরের মুচির মেয়ে, দূরসম্পর্কে রাজার শ্যালিকা, সেই সম্পর্ক ধরিয়া মেয়েটি রাজাকে বলে জামাই, নিতাই তাহাকে বলে 'ঠাকুরঝি'; এ গ্রামে সে নিত্য দুধ বেচিতে আসে। নিতাই নেশা করে না, কিন্তু দুধের ভক্ত; এক পোয়া দুধ তাহার নিত্য চাই। রাজার এখানে আসা অবধি এই ঠাকুরঝিই তাহাকে বরাবর দুধ দিয়া আসিতেছে।

নিতাই বলিল—শুধাও তাই জামাইকে।

মিঠা গলায় সরল বিস্ময়ে ঈষৎ কৌতুকে অত্যন্ত দ্রুত ভঙ্গিতে মেয়েটি প্রশ্ন করিল—হাসছ কেন গো জামাই? অই-অই! ই-কি হাসি গো? সঙ্গে সঙ্গে সেও হাসিতে আরম্ভ করিল।

রাজা এবার বলিল—ভাগ কালকুটি কাঁহাকা! উ বাত তুম কেয়া শুনেগা?

মেয়েটি যেন মার খাইয়া স্তব্ধ হইয়া গেল; কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া সে অত্যন্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া বলিল—সাও বাপু দুধ লাও। আমার দেরি হয়ে গেল। গেরস্তে বকবে!

রাজা এবার বাংলায় রসিকতা করিয়া বলিল—ওঃ ঠাকুরঝির আমার ডাক-গাড়ী ফেল হয়ে গেল! বাবারে! বাবারে!

নিতাই ব্যস্ত হইয়া দুধের আধারটি পাতিয়া দিয়া বলিল—না না, রাগ ক'র না ঠাকুরঝি। জামাইয়ের কথা ধ'র না।

মাপিয়া দুধ ঢালিয়া দিয়া মেয়েটি নীরবে চলিয়া গেল।

নিতাই বলিল—না রাজন্। এ পেকার বাক্য বলা তোমার ভাল হ'ল না।

—ধেৎ! বলিয়া রাজা আপনার অপরাধ ফুৎকারে উড়াইয়া দিল। নিতাই উনান ধরাইয়া আবার এক বার চা তৈয়ারী করিতে বসিল। দোকানী বণিক মাতুলের মাপা চায়ে তাহার নেশা হয় নাই। তা'ছাড়া কাল রাত্রির পরিশ্রমে ও জাগরণে শরীর এমন হইয়া আছে! উঃ মাথা যেন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে, কানের মধ্যে এখনও যেন ঢোল কাঁসির শব্দ ধ্বনিত হইতেছে! আর একটু চা না হইলে শরীরের বেশ জুৎ হইবে না। কেৎলীর বিকল্প ছোট একটি মাটির হাঁড়িতে জল চড়াইয়া দিয়া সে গুন্ গুন্ করিয়া একটা গান ভাঁজিতে আরম্ভ করিল—বেশ একটি নূতন গানের কলি মনে পড়িয়া গিয়াছে,—বাহবা-বাহবা, খাসা কলি হইয়াছে।

কাল যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে।

এক মগ চা শেষ করিয়া নিতাই আবার মগ ভর্ত্তি করিয়া লইল। দ্বিতীয় কলি আর মনোমত হইতেছে না। ওদিকে দেড়টার গাড়ীর ঘণ্টা হইয়া গিয়াছে, রাজন ষ্টেশনে। বাসার দুয়ারেই কৃষ্ণচূড়ার ছাতার মত গাছটির তলায় বসিয়া নিতাই চায়ের মগ-হাতে গানের কলি ভাবিতেছিল। দ্রুত গমনে পা ফেলিয়া ঠাকুরঝি ফিরিয়া চলিয়াছে। মেয়েটির কথাও যেমন দ্রুত, পা-ও চলে তাহার তেমনি ক্ষিপ্র। ঢ্যাঙা নয়—কিন্তু [illegible] গঠন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-গুলিতে বেশ একটি দীঘল ভঙ্গি আছে, দীঘল কিন্তু শীর্ণ নয়

বেশ দৃঢ় পুষ্ট দেহ অথচ কঠোরও নয়। নিতাই তাহাকে ডাকিল—ঠাকুরঝি অঠাকুর ঝি!

ঠাকুরঝি দাঁড়াইল।

—শোন-শোন।

মিঠা সরু আওয়াজে দ্রুত ভঙ্গির উত্তর ভাসিয়া আসিল—না। দেরী হয়ে যাবে।

—একটা কথা। শোন শোন। আমার দিব্যি।

যত জোরে ঠাকুরঝি চলে, তাহার চেয়েও দ্রুত ফিরিয়া নিতাইয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—কি?

নিতাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মিষ্টি হাসি হাসিয়া বলিল—রাগ করেছ?

এক কথাতেই মেয়েটি জল হইয়া গেল—মেয়েটির আকৃতি ও প্রকৃতিতে সঙ্গীত ও সঙ্গতের মত সুকুমার একটি সামঞ্জস্য আছে। কাল দীঘল তন্বী মেয়েটির মুখে চোখে গঠনপারিপাট্য নাই—তবু কচি পাতার মত এমন একটি কোমল শ্রী আছে যাহাতে মানুষের মন কোমল আবেশে ভরিয়া উঠে। ছোট চোখ দুটিতে ভীরু চকিত সরল দৃষ্টি মেলিয়া সে যখন চায় তখন মিষ্ট কথা না বলিয়া মানুষ পারে না, কথা বলিতেও মানুষের ইচ্ছা হয়।

ঐ সামান্য মিষ্ট কথাতেই ঠাকুরঝি পুলকিত হইয়া উঠিল, হাসিয়া সলজ্জভাবে বলিল—কাল মেলাতে তোমার গান শুনলাম বলে।

উদ্দীপ্ত হইয়া নিতাই বলিল—শুনেছ?

—হ্যাঁ। ছামুতেই বসেছিলাম গো। কত বার তোমার পানে চাইলাম, তুমি দেখতেই পেলে না!

অপরাধীর মত নিতাই বলিল—দেখতে পাই নাই ভাই আমি!

শঙ্কায় চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া মেয়েটি বলিল—সি ভাই ভাল হয়েছে। আমি কিন্তু হেসে ফেলতাম তা হ'লে!

নিতাই তাড়াতাড়ি একটি বাটি আনিয়া অবশিষ্ট চাটুকু ঢালিয়া ঠাকুরঝিকে দিয়া বলিল—চা খাও!

রাজার বাড়ীতে আপনার দিদির কাছে ঠাকুরঝি মধ্যে মধ্যে চা আস্বাদন করিয়াছে। চা বেশ লাগে তাহার! তবু সে সলজ্জভাবে বলিল—না না—তুমি খাও।

—না না। তা হ'লে ভাই বুঝব এখনও তুমি 'কোধ' ক'রে আছ!

বাটিটা টানিয়া লইয়া সকৌতুক বিস্ময়ে ঠাকুরঝি বলিল—'কোধ' কি গো? 'কোধ'? সে পিছন ফিরিয়া চা খাইতে বসিল। কখনও সে জামাই অথবা নিতাইয়ের দিকে সম্মুখ ফিরিয়া চা খায় না।

—রাগ—রাগ! নিতাই বিজ্ঞের মত হাসিতে লাগিল।

ঠাকুরঝি এবার গভীর বিস্ময়ে নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—আচ্ছা তুমি এত সব কি ক'রে শিখলে?

নিতাই গম্ভীর ভাবে বলিল—ভগবানের ছলনা ঠাকুরঝি! নইলে কবিয়াল করেও আমাকে হাড়িকুলে পাঠালেন কেনে বল?

অসীম শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সহিত ঠাকুরঝি কবির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিতাই বলিল—সবই ভগবানের লীলা ঠাকুরঝি! নইলে—আমাকে ঠাট্টা করে হনুমান ব'লে?

চকিত উত্তেজনায় ঠাকুরঝির ভ্রূদুটি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—প্রশ্ন করিল—কে?

—সে আর তুমি শুনে কি করবে? নাও চা খাও। জুড়িয়ে গেল।

—না! তুমি বল। জামাই বুঝি?

—না না। রাজন্ আমার বড় ভাল লোক ঠাকুরঝি। ওই বামুনরা। আমি ছোট জাত বলেই ঠাট্টা করলে!

—কই বামুনরা এমনি মুখে মুখে বেঁধে গান করুক দেখি! অঃ—ভারি বামুন! উত্তেজনায় ঠাকুরঝির মাথার অবগুণ্ঠন খসিয়া গেল। তাহার রুক্ষ কাল চুলের এলো খোঁপায় একটি জবা ফুল!

নিতাই বলিয়া উঠিল—বাঃ। ভারি মানিয়েছে কিন্তু ঠাকুরঝি!

ঠাকুরঝি লজ্জায় সচকিতা কিশোরী হরিণীর মত ত্বরিতে উঠিয়া ছুটিয়া পলাইল—চায়ের বাটিটা ধুইবার অজুহাতে। অদূরবর্ত্তী রেলওয়ে কাটিঙের জলে বাটিটা

খুঁইয়া আনিয়া সেটা নামাইয়া দিয়াই ঘটিটি হাতে ছুটিয়া সে চলিয়া গেল।

নিতাই বসিয়া বসিয়া আপন মনেই ঘাড় নাড়িতে আরম্ভ করিল। দ্বিতীয় কলিটাও তাহার আসিয়াছে।

কালো চুলে রাঙা কোসোম (কুসুম) হের হের
নয়ন কোণে!

অকস্মাৎ সে আজ অনুভব করিল—ঠাকুরঝিকে সে ভালবাসে!

কিন্তু পরক্ষণেই সে গম্ভীর হইয়া উঠিল ;—না না না— সে ভিন্ন জাতি—এক জনের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। মহাপাপ! সে মহাপাপ!

* * *

ঠাকুরঝি আসে ঠিক ঘড়ির কাঁটার মত।

ঠাকুরঝিকে সে ভালবাসে এ সত্য উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বেও নিতাই আপনার অজ্ঞাতসারেই দেখিত দূর প্রান্তরের বুকে রৌদ্রদীপ্ত সাদা একটি রেখা—রেখাটির উপরে ঝকমকে স্বর্ণাভ একটি বিন্দু। বিন্দুটি ঠাকুরঝির মাথায় রৌদ্রপ্রতিফলিত দুধের ঘটি। রেখাটি অত্যন্ত দ্রুত চলনশীল।

পরদিন কৃষ্ণচূড়া গাছটির তলায় নিতাই প্রান্তরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

সাদা ঋজু রেখাটি ক্রমে দীঘলদেহ কিশোরীতে পরিণত হইল, স্বর্ণাভ বিন্দুটি ঘটির আকার ধারণ করিল, ঠাকুরঝিকে চেনা গেল। নিতাই দেখিল—ঠাকুরঝির মুখে অপরিসীম বিমুগ্ধ বিস্ময়। ঠাকুরঝি আজ নিতাইকে দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছে, নিতাই আজ রীতিমত ভদ্রজন সাজিয়াছে।

সাবান দিয়া কাচা ধবধবে লালপাড় আট হাতি ধুতিখানি সে কোঁচা দিয়া পরিয়াছে, গায়ে একটি নূতন টুইলের হাতকাটা জামা! ওঃ আজ ওস্তাদকে চেনাই যায় না! দ্রুতগতি দ্রুততর করিয়া ঠাকুরঝি নিতাইয়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, আপাদমস্তক একবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া হেলিয়া দুলিয়া এক মুখ হাসিয়া বলিল—আচ্ছা সাজ হইছে বাপু! আজকে ঠিক কবিয়াল-কবিয়াল লাগছে! ভারী সোন্দর লাগছে!

নিতাই হাসিল। হাসিয়া বলিল—একটি কথা বলবার 'নেগে' দাঁড়িয়ে আছি। নিতাই ভাবিয়া চিন্তিয়া ভদ্র-ভাষায় কথা বলিতে 'ল' কারকে 'ন' কার বলিতে শুরু করিয়াছে।

সে লোহাকে 'নোয়া', লুচিকে 'নুচি', লঙ্কাকে 'নঙ্কা', লোককে 'নোক' বলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মেয়েটি তাহার দিকে চাহিল। নিতাই বলিল—আর ভাই দুধের পেয়োজন আমার হবে না।

—কেনে? ঠাকুরঝির কণ্ঠস্বর ম্লান হইয়া গেল।

নিতাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল—তার পর বলিল —একেই মিথ্যে কথা মহাপাপ—তার উপর তোমার নেকট। এখন ধর উপার্জ্জন আমার একেবারেই নাই। মানে—দরিদ্র ছোটনোকের কবি হওয়া কি ভাল—নোক হওয়া বড় বিপদ ঠাকুরঝি! এখন যদি মাথায় ক'রে আমি মোট বহন করি—তবে দশে কি বলবে বল দেখি।

ঠাকুরঝি ম্লান দৃষ্টি মেলিয়া কবিয়ালের দিকে চাহিয়া রহিল—তার পর বলিল—তোমাকে পয়সা লাগবে না ওস্তাদ!

—উঁ-হু, ওস্তাদ ব'লো না, ওস্তাদ ত অনেক হয়—রোজা লেঠেল, গুণীন সবাই ওস্তাদ। কবিয়াল ব'লো আমাকে।

ঠাকুরঝি হাসিল না, নিতাইয়ের কথা মানিয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গে সে সংশোধন করিয়া বলিল—তোমাকে দুধের দাম লাগবে না কবিয়াল।

নিতাই বিচিত্র দৃষ্টিতে তাহার ভক্ত তরুণীটির দিকে চাহিয়া বলিল—না। তোমার শাশুড়ী স্বামী তেরস্কার করবে—হয় ত পেহার করবে—

—না না না। দুটি গাই আমার নিজের কি না; চারটি আছে ওদের। আমার গাইয়ের দুধ আমি তোমাকে দেব।

নিতাই চুপ করিয়া উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

—লেবে না? কবিয়াল? ঠাকুরঝির কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল—দৃষ্টি ফিরাইয়া নিতাই দেখিল—ঠাকুরঝির চোখ দুটিতে জল টলমল করিতেছে।

নিতাই হাসিল। ঠাকুরঝি আর নিতাইয়ের কথার

অপেক্ষা করিল না, লঘু চঞ্চল পদক্ষেপে বাসার মধ্যে ঢুকিয়া বাটি বাহির করিয়া দুধ ঢালিয়া দিয়া আসিল। নিতাই তখন দুটি কৃষ্ণচূড়ার ফুল পাড়িয়া দাঁড়াইয়াছিল। কৃষ্ণচূড়ার ফুল সদ্য দুই-একটি করিয়া ফুটিতে সুরু করিয়াছে! ফুল দুটি বাড়াইয়া দিয়া নিতাই বলিল—লাও।

ঠাকুরঝি লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া বলিল—না!

—তা হবে না। তা হ'লে আমি দুধ নোব না।

ঠাকুরঝি ক্ষিপ্র হাতে ফুল দুটি লইয়া দ্রুতপদে গ্রামের দিকে চলিয়া গেল। স্টেশনে দেড়টার ট্রেনের টিকিটের ঘণ্টা পড়িল। নিতাই গতকালের গানটির কলি মিলাইয়া সুর ভাঁজিতে আরম্ভ করিল। এমনি নিত্য নিয়মিত। একখানা গানের পর আবার নূতন গান।

* * *

মাস তিনেক পর।

নিতাই কৃষ্ণচূড়া গাছটির তলায় দাঁড়াইয়া রৌদ্রে ঝলমল প্রান্তরের দিকে চাহিয়া ছিল। দ্রুত চলনশীল একটি সাদা রেখা—মাথায় একটি স্বর্ণাভ বিন্দু। বিন্দু বিচ্ছুরিত জ্যোতিরেখা মধ্যে মধ্যে চকিতের মত চোখে লাগে। কই? ওই কি? না ও ত নয়। তাহার পিছনে আর একটা—এ-ও নয়। নিতাইয়ের ভুল হয় নাই। রেখাগুলি নিকটে আসিয়া নারীমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া সম্মুখ দিয়া একে একে যতগুলি মেয়ে এ-গ্রামে দুধ বেচিতে আসে চলিয়া গেল, কিন্তু ঠাকুরঝি আসিল না।

নিতাই উৎকণ্ঠিত হইল, তবে কি ঠাকুরঝির অসুখ করিল? তাহা ছাড়া ওই দুধটুকুই এখন তাহার প্রধান খাদ্য। উহাতেই তাহার চা হয়—দুধে খুদ ফেলিয়া একটু পায়েস হয়—তাই খাইয়া সে দিন কাটাইয়া দেয়। ডাল-তরকারি অনেক হাঙ্গামা! কোন কোন দিন অবশ্য খিচুড়িও সে রাঁধে। কিন্তু বিনামূল্যের দুধের পায়েস অপেক্ষা খিচুড়িতে খরচ বেশী। তাহার সঞ্চয়-সম্বল এই কয়মাসেই শেষ হইয়া গিয়াছে। রাজা অবশ্য তাহার যথেষ্ট খোঁজখবর করে, সাহায্য করিতে পাইলে যেন কৃতার্থ হইয়া যায়, কিন্তু নিতাই তাহাকে অভাবের কথা বলে না। রাজার স্ত্রী বড় মুখরা মেয়ে। মধ্যে মহাদেব কবিয়াল গোটাদুয়েক পাল্লায় তাহাকে দোহার হিসাবে লইয়া গিয়াছিল—কিন্তু তাহার পর আর ডাকে নাই। মহাদেবের সঙ্গে একটু কথান্তরও হইয়া গিয়াছে। দোহারকি করিতে করিতে নিতাই কলিকয়েক জোগান দিয়াছিল।

ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে সে বলিয়াছিল—বেটা কোম্ভকার নন্দনের আস্পর্দ্ধা দেখ দেখি! বলে কি না—নীচু জাত তুই! কবিয়াল মহাদেব জাতিতে কুম্ভকার।

মিলিটারী রাজা সঙ্গে সঙ্গে রুখিয়া উঠিল, বলিল—হাঁ? কেঁও?

—কোম্ভকারও কবিয়াল আমিও কবিয়াল; দু চার কলি আমি গাইব না? এ কি পাঠশালার গণেশখুরি না কলুর ঘানি—যে ওর দাগে দাগে আমাকে যেতেই হবে? আঃ তাতেই বাবুর 'কোধ' হয়ে গেল।

রাজা বলিয়াছিল—আলবৎ! জরুর! নিশ্চয়!

—তা-পরে বলে—তুমি মেডেল পরতে পাবে না।

নিতাই চণ্ডীতলার মোহন্তের কাছে মেডেল আদায় করিয়া ছাড়িয়াছে। দশ আনায় এক ভরি চাঁদিতে খাদ মিশাইয়া—টাকার আকারের একটি মেডেল, মা চণ্ডীর কারবার—স্থানীয় সেকরা আট আনা পারিশ্রমিকেই তৈয়ারী করিয়া দিয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে রাজার উক্তি—হাম হোতা তো এক থাপ্পড় লাগা দেতা; হাঁ!

—আমি এইবার নিজেই দল গঠন করব রাজন্। কি বল?

—ই বাত ভাই বহুত আচ্ছা ওস্তাদ। ইসসে আচ্ছি বাত কুছ নেহি হো সক্তা হ্যায়। লাগাও তুম।

নিতাই এখন নিজেই দল করিবার চেষ্টা করিতেছে। সন্ধ্যায় রাজার বাড়ীতে কবিগানের মহড়া দেয়, রাজা ঢোলক বাজায়। দিনে রাজার ডিউটি; নিতাই চলিয়া যায় প্রান্তরের মধ্যে একটা পুরান আমবাগানের মধ্যে; সেখানে বহুকালের বৃদ্ধ আমগাছগুলিকে শ্রোতার আসনে বসাইয়া গালে হাত রাখিয়া মুখের সম্মুখে ডান হাতটি আড়াল দিয়া—ঈষৎ ঝুঁকিয়া নিখুঁত কবিয়ালের ভঙ্গিতে সে গানের পর গান করিয়া যায়। ঠিক বারোটা বাজিলেই ফিরিয়া কৃষ্ণচূড়া গাছটির তলায় দাঁড়ায়। ঠাকুরঝি আসে, দুধ দেয়—নিতাই চা তৈয়ারি করে। ঠাকুরঝি

গ্রাম হইতে ফিরিলে, দু'জনে চা লইয়া বসে গল্প হয়। দু-একটি ফুল—লাল ফুল তাই নিত্য যোগাড় করিয়া রাখে—ঠাকুরঝি সে-ফুল খোঁপায় পরে; অসঙ্কোচে নিতাইয়ের সম্মুখেই পরে—আর সে লজ্জিত হয় না। নিতাইয়ের অনেক গান ঠাকুরঝি শিখিয়া লইয়াছে। সে প্রান্তরের পথে একা চলিতে চলিতে মিহিসুরে প্রায় গায়—'কাল চুলে রাঙা কোসম—'

ঠাকুরঝি আজ আসিল না।

এক দিন—দুই দিন—তিন দিন।

চতুর্থ দিনে নিতাই উৎকণ্ঠিত হইয়া স্থির করিল—আজ না-আসিলে ঠাকুরঝির গ্রামে গিয়া খোঁজ করিয়া আসিবে। ঠাকুরঝি আসিল না, কিন্তু খোঁজ পাওয়া গেল। একটি আধাবয়সী মেয়ে আসিয়া রাজার বাড়ীতে রাজার স্ত্রীর সহিত তুমুল কলহ বাধাইয়া তুলিল। মেয়েটি ঠাকুরঝির ননদ। তাহার অভিযোগ—তাহাদের বধূ তিন মাসে দুধের দাম বাবদ সাড়ে চার টাকা গোলমাল করিয়াছে। অথচ গৃহস্থবাড়ীতে একটি পয়সাও পাওনা নাই। তাহারা বেশ বুঝিয়াছে—বধূ ঐ দুধ তাহার দিদিকে অর্থাৎ রাজার স্ত্রীকে দিয়াছে। রাজার স্ত্রী একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

রাজা শ্যালিকাটির সহিত বে-পরোয়া ঠাট্টা রসিকতা করিত বলিয়া রাজার স্ত্রী বোনের উপর খুশী ছিল না। নিতাই তো তাহার দু-চক্ষের বিষ! ঠাকুরঝির ননদকে সঙ্গে সঙ্গে আপন দুয়ারের ও পারের পথ দেখাইয়া ক্ষান্ত হইল না, কৃষ্ণচূড়ার তলায় নিতাইকে সুদ্ধ দেখাইয়া দিয়া বলিল—ঐ কবিয়ালের কাছে যাও। দুধ ঐ ওকেই দেয়। ব'সে ব'সে চা খায়, গল্প করে, গান করে, ঠাট্টা করে, তরজা করে। ঐ ওর সঙ্গে বোঝ গিয়ে।

নিতাই হতভম্বের মত দাঁড়াইয়াছিল। গোলমাল শুনিয়া রাজা আসিয়া পড়িয়াছিল। সে একেবারে চোখ পাকাইয়া বলিল—ভাগো হিঁয়াসে ভাগো! জেহেল দেঙ্গে হাম—টেরেস পাসকে লিয়ে। ভাগো!

ঠাকুরঝির ননদ আর কিছু বলিল না, নিতাইকেও কোন প্রশ্ন করিল না, আহতা বাঘিনীর মত হিংস্র ক্ষিপ্রতার সহিত প্রান্তরের পথে ক্রমশঃ একটি শাদা রেখায় পরিণত হইয়া একেবারে দৃষ্টি হইতে মিলাইয়া গেল।

নিতাই বলিল—না, না, করলে কি রাজন্?

রাজা আস্ফালন করিয়া উপরের দিকে হাতখানা ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—ঠিক কিয়া হায় হাম—আচ্ছা কিয়া হায়। ফিন আবেগা তো জরুর উস্কো জেহেল ভেজেঙ্গে হাম। হারামজাদী—

কথা তাহার শেষ হইল না, ওদিকে রাজার স্ত্রী, বোনও নিতাইয়ের সঙ্গে রাজাকেও দুর্দ্দান্ত ভাবে গালিগালাজ আরম্ভ করিয়াছে। রাজা কথা অসমাপ্ত রাখিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিল—উন্মত্ত জানোয়ারের মত। নিতাই শঙ্কিত হইয়া ডাকিল—রাজা—রাজা! আজ রাজন্ বলিতে তাহার ভুল হইয়া গেল।

কিন্তু রাজা—মিলিটারী রাজা; সে একগাছা কঞ্চি লইয়া স্ত্রীর পিঠখানা রক্তাক্ত করিয়া দিল। নিতাই মরিয়া গেল লজ্জায় দুঃখে। ছি! ছি! ছি! কেন সে কবিয়াল হইতে গেল! সহসা তাহার মনে হইল—দূরে গ্রামান্তরে ঠাকুরঝিকেও তো এমনি করিয়া নির্য্যাতন করিতেছে!

ওদিকে স্টেশন-স্টলে—বণিকমাতুল, বিপ্রপদ ঠাকুর তাহাকে ও ঠাকুরঝিকে লইয়া কদর্য্য রসিকতা সুরু করিয়া দিয়াছে। এখান হইতে বেশ শোনা যাইতেছে। নিতাই ঘরের মধ্যে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দেড়টার ট্রেন আসিতেছে। অদূরবর্ত্তী নদীর পুলের উপর গুম্ গুম্ শব্দ উঠিতেছে।

অনেক ভাবিয়া সে স্থির করিল—মেডেলটা সে বেচিয়া দিবে। চার-পাঁচ টাকা অবশ্যই হইবে। সেই টাকা সে ঠাকুরঝির স্বামীকে পাঠাইয়া দিবে। কিন্তু তাহাতেও মনটা যেন কেমন করিতেছে। দ্বিধার মধ্যেই সে চুপ করিয়া পড়িয়াছিল। একটা গানের দুইটা কলিও ইহার মধ্যে তাহার মনে আসিয়াছে,

কি পাপ করেছি বল তোমার চরণে?
দুধের উপর লাজের কালি হরি হে!—
লেপে দিলে বদনে!

গানের নেশাতে পড়িয়াই উঠি-উঠি করিয়াও মেডেলটা লইয়া তাহার ওঠা হইতেছিল না। আহা! গানটি বড় ভাল হইতেছে! কিন্তু গানটাও শেষ হইল না, রাজা আসিয়া ডাকিল—ওস্তাদ!

প্রচুর মদ খাইয়াছে রাজা। আসিয়া বসিয়াই সে বলিল—হারামজাদী ভাগ গিয়া।

—কি? কে?

—বহু—গোসা কর্‌কে বাপের ঘর চল্ গিয়া!

নিতাই বলিল—ছি ছি ছি! কি করলে বল দেখি?

—ঠিক কিয়া ওস্তাদ! উ গিয়া হ্যায়—হাম বাঁচা হ্যায়। ফিন সাদী করেঙ্গে হাম।

—না। স্ত্রী অদ্ধেক অঙ্গের সমান রাজন্—ও-কথা বলতে নাই!

রাজা হা-হা করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, উচ্চ উৎকট হাসি—ওস্তাদ—ই কেয়া বোলতা হ্যায়?

কোন মতেই নিতাই রাজাকে বুঝাইতে পারিল না। মত্ত রাজা সেই যে হাসি সুরু করিল—সে-হাসি তাহার থামিলই না। সে স্থির করিল পরদিন প্রাতঃকালে রাজা প্রকৃতিস্থ হইলে তাহাকে বুঝাইয়া স্ত্রীর নিকট তাহাকে পাঠাইয়া দিবে।

পরদিন প্রাতঃকালে সে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই রাজা দুঃখিত ভাবেই তাহাকে বলিল, খাঁটি বাংলায় বলিল—ওস্তাদ, ঠাকুরঝিকেও তাড়িয়ে দিয়েছে ভাই। স্বামী নাকি ছাড়পত্র করেছে। ঠাকুরঝি বাপের ঘর গিয়েছে।

নিতাই চমকিয়া উঠিল। ছি ছি ছি!

ওদিকে ট্রেনের সময় হইয়াছে, রাজা চলিয়া গেল। নিতাই নির্জ্জন আমবাগানে গিয়া উঠিল। আজ আর তাহার গান আসিল না। চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া সে ভাবিতেছিল। অকস্মাৎ তাহার মনে একটা কথা জাগিয়া উঠিল। সে তো কবিয়াল, জাতি-জাতির সহিত সম্বন্ধই বা তাহার কোথায়? সে যদি মুচি হয় তবে তো—! সে পুলকিত হইয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া গান ধরিল। পুরানো গান—সেই 'কালো চুলে রাঙা কোসোম হের হের নয়নকোণে'।

নাঃ মেডেলটি সে বেচিবে না, তাহার গলায় পরাইয়া দিবে। সে ফুলিগিরিই আবার করিবে। ক্ষতি কি? ফুলিগিরি করিলে তো কবিয়ালী কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না! ক্রমে কবিয়ালীতে পশার হইলে দশ-বিশটা মেডেল গাঁথিয়া একটা মালাই সে গড়াইয়া দিবে। আনন্দে চিন্তা তাহার অসংলগ্ন হইয়া পড়িল।

সে রাজাকে বলিল—না তোমাকে যেতেই হবে। বউকে নিয়ে এস আর ঠাকুরঝিকেও, বুঝলে। খুব ভাল দেখে বিয়ে দিতে হবে তার। ভাল লোক! মূর্খের হস্তে আর নয়! বলবে ঠাকুরঝিকে আমার নাম ক'রে, বুঝলে! সে হাসিল। হাসিয়া সে রাজাকে তাহার মনের কথার ইঙ্গিত দিল। হাসি দেখিয়া রাজাও হাসিল।

* * *

তিন দিন পর। আজ রাজা ফিরিবে সন্ধ্যার ট্রেনে।

কবিয়াল অনেক আয়োজন করিল। ঘর-দুয়ার অনেক করিয়া সাজাইল, ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া রাখিল, নিজের জীর্ণ কাপড়-জামায় সাবান দিয়া পরিষ্কার করিল, বণিক মাতুলের দোকানে ধারে কিছু মিষ্টিও কিনিয়া রাখিল। একটা নূতন গানও তাহার মনে আসিয়াছে।

সন্ধ্যা হইতেই স্টেশনে আসিয়া প্ল্যাটফর্মের উপরে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ঘণ্টাগুলা আজ বড় হইয়া উঠিয়াছে। সে নূতন গানটা ভাঁজিতেছিল।

গুম্-গুম্-গুম্। চকিত হইয়া নিতাই দেখিল—পুলের উপর ট্রেন। আঃ—ট্রেনটা যদি পুল ভাঙিয়া পড়িয়া যায়! সঙ্গে সঙ্গে বিকৃতমস্তিষ্কের মত আপন মনেই বলিল—না না না। ছি ছি!

ফোঁস ফোঁস শব্দে স্টীম ছাড়িয়া ট্রেনটা দাঁড়াইল।

কই রাজন্ কই?

—ওস্তাদ! ওস্তাদ!

নিতাই ছুটিয়া গেল। রাজা বলিল—লে আয়া হ্যায় তুমারা ঠাকুরঝিকো! বলিয়া উচ্চ উৎকট হাসি!

ঠাকুরঝি ট্রেন হইতে নামিল; চমৎকার সাজিয়া গুজিয়া আসিয়াছে! চমৎকার! কাল রঙে লাল শাড়ী—চমৎকার। ঠাকুরঝি মৃদু মৃদু হাসিতেছে। লজ্জায় নিতাই মাথা হেঁট করিল। কিন্তু রাজার বউ কোথায়?

স্টেশন মাস্টার গার্ডের কাছে কাগজপত্র সই করাইয়া ফিরিতেছিলেন, তিনি বলিলেন—কি রে রাজা? বউকে নিয়ে এলি?

—হাঁ হুজুর। নতুন বউ! নতুন বিয়ে করে নিয়ে এলাম। তার সঙ্গে ছাড়পত্ত হয়ে গেল। তারই বুন বটে এ!

মাস্টার হাসিয়া বলিলেন—বাঃ বেশ! এক দিন খাইয়ে দে।

—আলবৎ! জরুর! নিশ্চয়! আমাদের ওস্তাদের গান হবে।

নিতাই হাঁ করিয়া চাহিয়াছিল। ঠাকুরঝি সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল—জামাই ভারি ইয়ে! দিদি এল না তো আমাকে বলে তোকেই সাঙা করব। করতেই হবে! কিছুতেই ছাড়ে না। বলে—কবিয়াল বলেছে!

নিতাই ফতুয়ার পকেট হইতে মেডেলটি বাহির করিয়া রাজাকে দিয়া বলিল—বউকে দাও রাজন্!

বলিয়াই সে ট্রেনে চড়িয়া বসিল, বলিল—জংসন চললাম।

—ওই—কেনে?

নিতাই উত্তর দিল না, ট্রেন তখন ছাড়িয়া দিয়াছে। সে ওদিকে মুখ ফিরাইয়া নূতন গান ভাঁজিতে আরম্ভ করিয়াছে।

রাজা কিন্তু কবির হাসির ইঙ্গিত বুঝিতে পারে নাই।

ত্রিপত্রী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

আবার বৎসরশেষে মায়ের পূজার এল ডাক!
একসঙ্গে কত কথা মনে পড়ে আজ—কিন্তু থাক্;—
কি হবে কথায় মিছে? গিয়েছে যা, একেবারে যাক্।

মণ্ডপে নাহিক চণ্ডী;—কি বা কাজ অত বড় ঘরে?
মাঝে উঠিয়াছে ভিত, দু-ধারে মানুষ বাস করে;
পায়রা কড়ির ফাঁকে, উঠানে পরের গরু চরে!

তাও যদি বুঝিতাম—মিলিয়াছে মানুষের ঠাঁই
বাড়ন্ত এ গোষ্ঠীগৃহে, চণ্ডীর মণ্ডপে বাস তাই!
—তাও নহে, সারা গৃহে বড় বেশী লোকজন নাই।

দাওয়ায় শুকায় কাঁথা, ছেলেটা পড়িয়া একধারে;—
মাতৃহারা, স্তন্যহীন—কাঁদিতেছে ক্ষুধার্ত্ত চীৎকারে;
লক্ষ্মীর কৌটার কড়ি নিয়ে দিদি গিয়েছে বাজারে!

চারিধারে দেখি শুধু অভাবের নানা অভিযোগ,
গৃহে গৃহে হানাহানি, সূতিকা ও ম্যালেরিয়া রোগ,
আলস্য ও দলাদলি—হীনতার যত কর্ম্মভোগ!

এক-শ বছর আগে এ দশা ছিল না কিন্তু দেশে,
এ তফাৎ কেন তবে? কোথা হ'তে এই সর্ব্বনেশে
সৃষ্টিছাড়া মতিগতি? এ কি মৃত্যু আসে বন্ধুবেশে!

বিকায় না দেশী পণ্য বিদেশীয় রুচির উৎসবে;
লজ্জাহীন সজ্জা বাড়ে নিরন্নের বিলাস-বৈভবে;
ভূমির সম্পর্ক ছাড়ি' ভূস্বামীরা নাগরিক সবে!

পরাশ্রয়ী প্রাণী মোরা, পাঠাধ্যায়ী নূতন শিক্ষার,—
যে শিক্ষার বন্যাজলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সংস্কার-সংসার
ভেসে চলে কূল ছাড়ি'—লভিতে সভ্যতা-পারাবার!

—কি কথা বলিতেছিনু? মায়ের পূজার এল ডাক
আবার বৎসর পরে, ভাঙা ঘরে—কি করিব? থাক্
সে সব অতীত কথা—গিয়েছে যা, নিঃশেষে তা যাক্।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও বাংলা গদ্য

শ্রীমনোমোহন ঘোষ, এম. এ., পিএইচ. ডি.

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে এক জন অসামান্য ত্যাগবীর ও অধ্যাত্মরসিক ধর্ম্মনেতা এ-কথাই অনেকে জানেন কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব ছিল তা বেশী লোকের জানা নেই। অথচ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে বাংলা গদ্যের পরিপোষক হিসাবে তাঁর স্থান অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের খুব নিচে নয়। কিন্তু তাঁর এই কৃতিত্বের দিকে বঙ্গসাহিত্যের ঐতিহাসিকদের অনেকেই দৃষ্টিপাত করেন নি বা এ-বিষয়ে যথাযোগ্য ভাবে তাঁদের দৃষ্টি পড়ে নি। স্বনামখ্যাত রমেশচন্দ্র দত্ত দেবেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক কৃতিত্বকে স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর এই উভয়ের প্রত্যেকের সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থে দশ পৃষ্ঠার উপর আলোচনা থাকলেও মহর্ষির সম্বন্ধে তিনি মাত্র দুটি বাক্যই পর্য্যাপ্ত মনে করেছেন। তিনি লিখেছেন :—"অক্ষয়কুমার (সাহিত্য) ক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করার পর এক দল শক্তিশালী লেখকের হাতে তাঁর কাজের ধারা অব্যাহত রইল। ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত রইলেন; তাঁর প্রকাশিত ধর্ম্মসম্পর্কিত পুস্তকনিচয় থেকে বাংলা গদ্য অতিশয় উপকৃত হ'ল এবং মহিমা লাভ করল।"[১] কিন্তু রমেশচন্দ্রের এই মন্তব্য থেকে বাংলা গদ্যের ইতিহাসে দেবেন্দ্রনাথের যথার্থ স্থান কি, তা মোটেই বোঝা যায় না। মনে হয় তিনি কেবল অক্ষয়কুমার দত্তের অনুগামী লেখকদের মধ্যে এক জন। কিন্তু বাস্তব ঘটনা তা নয়; অক্ষয়কুমারের রচনার প্রগাঢ় বৈশিষ্ট্য থাকলেও তাঁর রীতিতে দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব কিয়ৎ পরিমাণে পড়েছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই কথার প্রমাণাদি আলোচিত হবে।

রামমোহন রায় বাংলা গদ্য রচনা প্রবর্ত্তনের বিশেষ সাহায্য করলেও নিছক সাহিত্যিক উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু রচনা করেন নি; আর তাঁর নিজের কালে এদিকে যে-সকল চেষ্টা হয়েছিল তা নানা কারণে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এই মহাপুরুষের মৃত্যুর (১৮৩৩) পর দশ বছর ধ'রে নানা ভাবে বাংলা গদ্যের চর্চ্চা চলতে থাকলেও তার মধ্যে যথার্থ সাহিত্যপদবাচ্য রচনার অস্তিত্ব ছিল না। যেহেতু তখনও লেখকমণ্ডলীর মানসলোকের সামনে সাহিত্যের কোন নতুন আদর্শ দেখা দেয় নি। কারণ কেবল সংস্কৃত-নবীশ বা তাঁদের প্রভাবগ্রস্ত লোকদের হাতেই ছিল নব-প্রবর্ত্তিত বাংলা গদ্যের উন্নতিবিধানের ভার, এবং তাঁদের মনে দৃঢ়ভাবে বিরাজিত ছিল বাংলা সাহিত্যের সেই মধ্যকালীন আদর্শ যা ভারতচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে চিরকালের মত মৃত্যুলোকে প্রয়াণ করেছিল। পুরাতনপন্থীদের প্রভাবই যে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির পথে অন্তরায়ের একমাত্র কারণ ছিল তা নয়; সাহিত্যক্ষেত্রে নব্যশিক্ষিতগণের অনুপস্থিতিও এ বাধার অন্যতম হেতু ছিল। ইংরেজী সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য ও প্রাচুর্য্য দেখে সেকালকার নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় এত দূর মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন যে, তার সঙ্গে তুলনায় নিতান্ত দীনহীন ও স্বল্পসম্বল বাংলা ভাষা তাঁদের চোখে নিতান্ত অবজ্ঞার পাত্র ছিল। তাঁরা এ ভাষায় খুব কমই লিখতেন, আর যা লিখতেন আন্তরিক শ্রদ্ধার অভাব বশতঃ এবং অন্যান্য কারণে তা খুব হৃদয়গ্রাহী হত না। বাংলা ভাষা সম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবজ্ঞার এ ছাড়াও একাধিক কারণ ছিল। কি বিষয়বস্তু, কি রচনারীতি, কি রুচি-প্রবৃত্তি কোন দিক দিয়েই বাংলা রচনা সেকালের নব্য শিক্ষিতদের গ্রহণযোগ্য ছিল না। যেহেতু তখনকার সংবাদপত্র, স্কুলবুক্ সোসাইটির পুস্তক, বা সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ এদের কোনটিরই বিষয়গৌরব তাঁদের নিকট লোভনীয় ছিল না। আর রচনারীতির দিক্ দিয়েও এগুলি ছিল নিকৃষ্ট—একান্ত সংস্কৃতগন্ধী ও অনেকাংশে দুর্ব্বোধ্য। রুচির দিক্ দিয়েও এ সকল নব্য সম্প্রদায়কে

[১] *Literature of Bengal*, Calcutta 1895. পৃ. ১১০

উৎসুক করবার মত ছিল না। রুচি সম্পর্কে প্রধান অপরাধ অবশ্য ছিল সংবাদপত্রাদির। এ সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক লিখছেন, " 'রসরাজ', 'যেমন কর্ম্ম তেমন ফল' ইত্যাদি অশ্লীলভাষী কাগজের কথা ছাড়িয়া দিলেও 'প্রভাকর' 'ভাস্করে'র ন্যায় ভদ্রসমাজের জন্য লিখিত পত্র সকলেও এমন সব ব্রীড়াজনক বিষয় বাহির হইত যাহা ভদ্রলোক ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে পারিত না।" (শিবনাথ শাস্ত্রী-কৃত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,' ৩য় সংস্করণ, পৃ. ১৯৯-২০০)। স্কুলবুক সোসাইটির প্রকাশিত পুস্তকগুলির রুচিগত ত্রুটি না থাকলেও সাধারণ পাঠক সে-সবের প্রতি স্বাভাবিক কারণে তেমন আকৃষ্ট হতেন না। এ ছাড়া সাহিত্য-পর্য্যায়ের যে-সব বই প্রকাশিত হ'ত তাদের মধ্যে অল্পবিস্তর অশ্লীলতা ও কুরুচির নিদর্শন প্রায়শঃ বর্ত্তমান থাকত।[২] এই সকল কারণে নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় বাংলা সাহিত্যের সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন ছিলেন।

পরবর্ত্তী কালের ইতিহাস থেকে দেখতে পাই যে, যাঁরা যথার্থ মূল্যবান্ নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তাঁরা, হয় নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত, নয় সেই শিক্ষার প্রভাবে প্রভাবিত। কাজেই নব্য শিক্ষিতগণের অবহেলার জন্যই যে উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে কোন যথার্থ নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা হয় নি এ-কথা হয়ত অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে এ হেন অনিশ্চিত অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হ'ল না। অল্পকাল মধ্যে এমন একখানি মাসিক পত্র দেখা দিল যার সম্বন্ধে নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় শ্রদ্ধা না দেখিয়ে পারলেন না। ১৮৩৯ অব্দে দেবেন্দ্রনাথ কতিপয় ব্রহ্মজ্ঞানপিপাসুকে একত্র ক'রে 'তত্ত্ববোধিনী' নামে এক সভা প্রতিষ্ঠা করলেন। তারই চার বছর পরে (১৮৪৩) প্রকাশিত হ'ল এই সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। সভার উদ্দেশ্য সাধনে আনুকূল্য করা ছাড়াও এই পত্রিকার কাজ ছিল, লোকের জ্ঞানবৃদ্ধি ও চরিত্র-সংশোধনে সহায়তা করতে পারে এমন বিষয়সকলের প্রকাশ।

তত্ত্ববোধিনীর প্রথম সংখ্যা পড়লেই যে-কথা বাংলা গদ্যের ঐতিহাসিকের মনে সর্ব্বপ্রথম জাগ্রত হয় তা হচ্ছে অব্যবহিত পূর্ব্বকালে প্রচলিত গদ্যের তুলনায় এর রচনার সরলতা ও সৌন্দর্য্য। এ পত্রিকা রামমোহনের রীতির অনুবর্ত্তন করলেও এর রীতি তার চেয়ে উন্নত এবং প্রাঞ্জল। বাঁশবেড়িয়াতে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন (১৮৪৩) উপলক্ষে দেবেন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা করেন তা 'তত্ত্ববোধিনী'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। নিচে বক্তৃতা দুটি থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করা গেল।

দেবেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় আছে :—

"যে বৃহৎ পৃথিবীর উপরে আমরা বাস করিতেছি ইহার আকৃতি কি ? সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি এই পৃথিবীর কত দূরে আছেন ? সূর্য্য অস্ত হইয়া কোথায় লুপ্ত হয়েন ? এবং পুনর্ব্বার সূর্য্য পূর্ব্বদিক্ হইতে কি প্রকারে নিয়মিত রূপে উদিত হয়েন ? চন্দ্রের প্রতি মাসে হ্রাসবৃদ্ধি কেন হয় ? প্রবল সমুদ্র আপনার নিয়মিত সীমাকে উলঙ্ঘন কেন করিতে না পারে ? শূন্য হইতে জলের উৎপত্তি কি প্রকারে হয় ? ঈশ্বরের এই প্রকারে আশ্চর্য্য সৃষ্টির নিয়ম এই সভাস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কাহার না জানিতে ইচ্ছা হয়, বিবিধ বিদ্যালয়ে এইক্ষণে বালকেরা এই সমস্ত জ্ঞানেরই অভ্যাস করিতেছে। কোন গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন তাহার বাক্যকেই প্রমাণ করিয়া সৃষ্টির রচনা জানিতেছে এমত নহে কিন্তু সেই গ্রন্থকর্ত্তার সিদ্ধান্তকে প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা মান্য করিতেছে। এইরূপে বালককালে অত্যন্ত নিপুণরূপে বিচিত্র সৃষ্টির রচনা বিষয়ে অনুশিষ্ট হইয়া জ্ঞানের উদ্রেকে ঈশ্বরের মহিমা কতক জানিতে শক্য হয়, তখন তাহারদিগের বোধ হয় যে এই অনন্ত সৃষ্টির স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা অবশ্য এক জন আছেন যিনি অনন্তস্বরূপ, কারণ অনন্ত সৃষ্টির স্রষ্টা অনন্তস্বরূপ ভিন্ন সম্ভব হইতে পারে না ; এবং সুতরাং তাঁহার আকার নাই, কারণ যাহার আকার স্বীকার করা যায় তাঁহাকে আর অনন্ত বলা যায় না ; এবং তিনি জ্ঞানস্বরূপ কারণ কোন জড় বস্তুর দ্বারা এ অচিন্তনীয় রচনার রচনা হইতে পারে না ; এবং এমত যে নিরাকার নির্ব্বিকার আনন্দস্বরূপ অন্তরস্থিত পরমেশ্বর তাঁহার প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা ও তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন ভিন্ন তাঁহার উপাসনা হইতে পারে না।" (পৃঃ ৫-৬)

২। এই অশ্লীলতার ধারা অনেক দিন সজীব ছিল। বিদ্যাসাগর-রচিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র প্রথম সংস্করণে (১৮৪৭) অশ্লীলতার অভাব ছিল না।

উল্লিখিত বক্তৃতাংশটির দুই-এক স্থানে কঠিন শব্দ প্রয়োগ এবং ব্যাকরণগত প্রাচীনত্বের কথা বাদ দিলে একে প্রায় অনায়াসে আধুনিক গদ্য ব'লে চালান যেতে পারে। কিন্তু এই বক্তৃতাই দেবেন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রথম রচনা নয়। এর আগেও তিনি এমনি বিশুদ্ধ এবং প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করেছিলেন। সেই বক্তৃতা হয়েছিল ১৮৪১ অব্দে তত্ত্ববোধিনী সভার সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে। এরও কিয়দংশ নিচে দেওয়া হ'ল :—

ঈশ্বরসাধনা নিমিত্তে এই তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিতা হইয়াছে। ঈশ্বরজ্ঞান না হইলে ঈশ্বরারাধনা হয় না, এবং একাকী নির্জ্জনে জ্ঞানালোচনার উপায় বিরহে জ্ঞানোপার্জ্জনও হয় না, অতএব এই সভা যে উপকারিণী ইহা বিশেষ বোধ হইতেছে। যদি ঈশ্বরারাধনা গুপ্ত এবং প্রকাশ্য উভয় স্থানেই উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে, যদিও যাহার ঈশ্বরভক্তি আছে, কি সজনে কি নির্জ্জনে, তাহার ঈশ্বরভক্তিরূপ দীপশিখা কখন নির্ব্বাণ হয় না, প্রকাশ্যে ভজনা করিলে আপনার ও অন্যের একেবারে উপকার হয়। নির্জ্জনে তাঁহার দৃষ্টান্ত কেহ গ্রহণ করিতে পারে না এবং তাঁহার নিকটে ঈশ্বরজ্ঞানোপযোগী বাক্য শুনিয়া কেহ তৃপ্ত হইতে পারে না। সভাতে সকলের সহিত ঈশ্বরারাধনা করিলে ঈশ্বর-ভক্তির দৃঢ়তা হয়, পরস্পর জ্ঞানালোচনায় জ্ঞানের প্রকাশ অধিক হয়, স্বধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগের এক স্থানে মিলন জন্য আত্মীয়তা এবং প্রণয়ের বৃদ্ধি হয়, আত্মীয়তা এবং প্রণয়ের বৃদ্ধি হইলে অজ্ঞানাবৃত ব্যক্তিদিগকে জ্ঞান দিবার অনেক উপায় করিতে পারি, অথচ এই প্রকাশ্য ভজনা নির্জ্জন ভজনার প্রতিবন্ধক নহে, বরং সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্তিদায়ক।(৩)

উল্লিখিত বক্তৃতাংশ দুটি পড়লে মনে হয় যে বিদ্যাসাগরেরও ছয় বছর আগে দেবেন্দ্রনাথের রচনা গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্ব্বরতার হাত থেকে আপনাকে নির্ম্মুক্ত করেছিল; বাংলা ভাষার পূর্ব্বপ্রচলিত সমাসাড়ম্বর থেকেও তা সেই সময় থেকেই মুক্ত; এবং দেবেন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা গদ্য বহুলাংশে সর্ব্বজনব্যবহার্য্য হয়ে উঠেছিল। এই ব্যাপারটি যে বাংলা গদ্যের ইতিহাস-লেখকদের চোখ এড়িয়ে গেছে তার কারণ এক দিকে দেবেন্দ্রনাথের রচনাবলীর সীমাবদ্ধ প্রচার এবং অপর পক্ষে অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের গ্রন্থনিচয়ের জনপ্রিয়তা। দেবেন্দ্রনাথের রচনাসমূহের আয়তন হয়ত বাংলা গদ্যের শেষোক্ত পরিপোষকদ্বয়ের গ্রন্থাবলীর (বিদ্যালয়পাঠ্য ছাড়া) আয়তনের চেয়ে নেহাৎ অল্প হবে না। মহর্ষির বাংলা রচনাবলীর একটা তালিকা নীচে দেওয়া যাচ্ছে :—

১। কঠোপনিষদের অনুবাদ (র: ১৮৪০)৪

২। ঋগ্‌বেদের অনুবাদ (আরম্ভ থেকে প্রথম মণ্ডলের ষোড়শ অনুবাকের তৃতীয় সূক্ত পর্য্যন্ত, ত.৫ ১৮৪৮—'৭১)

৩। ব্রাহ্মধর্ম্ম (সানুবাদ, ত. ১৮৪৯—'৫৩)
ও ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য (ত. ১৮৫৩—৫৭?)

৪। আত্মতত্ত্ব-বিদ্যা (ত. ১৮৫০—৫১)

৫। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস (১৮৬১?)

৬। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা (১৮৬২)

৭। ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত (১৮৬৪)

৮। ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান, ১ম প্রকরণ (১৮৬৫?)

৯। ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান, ২য় প্রকরণ (১৮৬৬)

১০। আত্মজীবনী (র. ১৮৯৪)

১১। পত্রাবলী

এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয় এমন অনেক রচনা হয়ত তত্ত্ববোধিনীর পাতায় ছড়ানো রয়েছে কিন্তু তাদের কিয়দংশ 'ষট্‌ত্রিংশৎ ব্যাখ্যান' (১৭৭৬ শক) এবং 'ব্রাহ্ম-সমাজের বক্তৃতা' (১৭৮২ শক) নামক দুখানি পুস্তকেও হয়ত সন্নিবিষ্ট থাকতে পারে। সে যাই হোক্, দেবেন্দ্রনাথের রচনার পরিমাণ যে নেহাৎ স্বল্প নয় তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু পরিমাণগত বাহুল্যই তাঁর রচনার সম্বন্ধে প্রধান কথা নয়। তাঁর লেখার সাহিত্যিক

৩। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবন-চরিতের প্রিয়নাথ শাস্ত্রী লিখিত পরিশিষ্ট সহ। কলিকাতা ১৩১৮। পরিশিষ্ট—পৃঃ ১৬৪।

৪। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী-সম্পাদিত 'মহর্ষির আত্ম-চরিত,' পৃঃ ১৪

৫। ত.—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রকাশের সময়;
র—রচনা সমাপ্তির কাল; কেবল সংখ্যা পুস্তক-প্রকাশের খ্রীষ্টাব্দ নির্দ্দেশ করবে।

গুণও উচ্চ শ্রেণীর। তাঁর চব্বিশ ও ছাব্বিশ বছর বয়সের লেখার যে নমুনা আগে উদ্ধৃত হয়েছে তার থেকেই তাঁর গদ্য রচনার উৎকর্ষ এবং বৈশিষ্ট্য কিয়দংশে বোঝা গিয়েছে কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী রচনা আরও উৎকৃষ্ট। তবে তাঁর রচনাশক্তির বিশেষ স্ফূর্ত্তি হয়েছে কেবল ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত তাঁর নানা বক্তৃতা ও ব্যাখ্যানে। যুগপৎ বিরাজমান ভাবের গাম্ভীর্য্য এবং ভাষার প্রাঞ্জলতার জন্যে তাঁর এই রচনাগুলি বহুকাল যাবৎ বাংলা গদ্য-সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ সম্পৎ ব'লে গণ্য হবে।

মন শান্ত ও সমাহিত হ'লেই তবে তাতে ঈশ্বরের মহিমা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, এই সত্যটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন :—

"হৃদয়কে পরিষ্কার কর—পরিষ্কার করিয়া ঈশ্বরের অমৃত-বারির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাক। সময়ের নিরূপণ নাই, কখন স্বর্গ হইতে সেই অমৃতবারি পতিত হয়—চাতকের ন্যায় প্রতীক্ষা করিয়া থাক; যখনি সেই জল বর্ষিত হয়, অমনি আগ্রহের সহিত তাহা গ্রহণ কর। * * অদ্যকার চন্দ্রমার মহিমা দেখ, তাহার অমৃত কিরণ সহস্রধারে বর্ষিত হইতেছে; অদ্য রজত বরণে পৃথিবী রঞ্জিত হইয়াছে, বৃক্ষেরা হরিৎ বর্ণ পরিত্যাগ করিয়া রৌপ্য বর্ণে শোভিত হইয়াছে। মাসে মাসে চন্দ্রের শুভ্ররশ্মি এই প্রকারে পতিত হয়, কিন্তু কখন তাহার মাধুর্য্য গ্রহণ করিয়া অনন্তের মহিমা অবলোকন করি? তোমারদিগকে জিজ্ঞাসা করি—তোমারদের মধ্যে যাঁহারা গঙ্গাতীরের শুভ্র চড়ার উপরে চন্দ্র-কিরণ ভোগ করিয়াছ, তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে গঙ্গাতীরে একাকী কি দুই চারি বন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গার স্নিগ্ধ মারুতে শরীর যখন শীতল হইল—সকল জগৎ স্তব্ধ পুলকে চন্দ্রের অমৃত কিরণ পান করিতেছে দেখিয়া মন যখন আর্দ্র হইল, এমন সময়ে কি কাহারও মনে অনন্তের মহিমা উদয় হয় নাই?"

(২২শে চৈত্র ১৭৮২ শক=১৮৬০ খৃঃ)

ধর্ম্মবক্তৃতা ও ব্যাখ্যানাদিতে দেবেন্দ্রনাথের রচনাশক্তির বিশেষ স্ফুরণ হ'লেও তাঁর 'আত্মজীবনী'র রচনা অনেকাংশে অপূর্ব্ব। এর সহজ সরল বাক্যবিন্যাস সোজাসুজি গিয়ে পাঠকের অন্তরকে স্পর্শ করে। এই পুস্তকের স্বল্পপরিসরের মধ্যে তিনি তাঁর ধ্যানপূত কর্ম্মময় জীবনের চব্বিশ বছরের (১৮শ—৪১শ) যে চমৎকার ছবি দিয়েছেন জিজ্ঞাসু পাঠকের নিকট তা প্রায় উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক। মানসিক এবং আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যের জন্যেই মহর্ষির জীবন-কাহিনী পাঠকদের চিত্ত আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু অনবদ্য রচনাপ্রণালীও এর আকর্ষণকে কম বাড়ায় নি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবর্ণনার তো কথাই নেই, তিনি নিজের আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্বাদির কথাও এমন সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করেছেন যে পাঠকের মনের সামনে তার মোটামুটি স্পষ্ট ছবি ভেসে ওঠে। তাঁর সময়কার য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের বস্তুতান্ত্রিকতা (materialism) তাঁর মনে যে আঘাত করেছিল সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন :—

"ভাবিলাম প্রকৃতির অধীনতাই কি মনুষ্যের সর্ব্বস্ব? তবে তো গিয়াছি। এই পিশাচীর পরাক্রম দুর্নিবার। অগ্নি স্পর্শ মাত্র সমস্ত ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। যানযোগে সমুদ্রে যাও, ঘূর্ণাবর্ত্ত তোমাকে রসাতলে দিবে, বায়ু বিষম বিপাকে ফেলিবে। এই পিশাচীর হস্তে কাহারও নিস্তার নাই। ইহার নিকট নত-শিরে থাকাই যদি চরম কথা হয়, তবে তো গিয়াছি। আমাদের আশা কৈ, ভরসা কৈ? আবার ভাবিলাম, যেমন ফটোগ্রাফের কাচপাত্রে সূর্য্যকিরণের দ্বারা বস্তু প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা মনের মধ্যে বাহ্য বস্তুর একটা আভাস হয়, ইহাই তো জ্ঞান। এই পথ ছাড়া জ্ঞানলাভের আর কি উপায় আছে? য়ুরোপের দর্শনশাস্ত্র আমার মনে এইরূপ আভাস আনিয়াছিল।

(আত্মজীবনী, ১৩১৮, পৃঃ ৯)

প্রকৃতির স্পর্শে সময়ে সময়ে মহর্ষি যে প্রেরণা লাভ করতেন তাও তিনি বেশ কবিত্বপূর্ণ অথচ সরল ভাষায় বর্ণন করেছেন :—

"আবার সেই শ্রাবণ ভাদ্র মাসের মেঘ বিদ্যুতের আড়ম্বর প্রাদুর্ভূত হইল এবং ঘন ঘন ধারা পর্ব্বতকে সমাকুল করিল। সেই অক্ষয় পুরুষেরই শাসনে পক্ষ, মাস, ঋতু, সম্বৎসর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহার শাসনকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। * * এক দিন আশ্বিন মাসে খদে নামিয়া একটা নদীর সেতুর উপর দাঁড়াইয়া তাহার স্রোতের অপ্রতিহত গতি ও উল্লাস-ময়ী ভঙ্গী দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া গেলাম। আহা! এখানে এই নদী কেমন নির্ম্মল ও শুভ্র! * * * * এ কেন তবে আপনার এই পবিত্র ভাব পরিত্যাগ করিবার জন্য নীচে ধাবমান হইতেছে? * * * * এই প্রকার ভাবিতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ আমি আমার অন্তর্যামী পুরুষের গম্ভীর বাণী শুনিলাম—"তুমি

এ উদ্ধত ভাব পরিত্যাগ করিয়া এই নদীর মত নিম্নগামী হও। তুমি যে সত্য লাভ করিলে, যে নির্ভর ও নিষ্ঠা শিক্ষা করিলে, যাও পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রচার কর।" (আত্মজীবনী, পৃঃ ১৫৭)

স্থানে স্থানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনায় তাঁর গদ্য-রচনা কাব্যের স্তরে উন্নীত হয়েছে। যেমন অমৃতসর-প্রবাসের কাহিনী প্রসঙ্গে তিনি লিখ্ছেন:—

"অরুণোদয়ে প্রভাতে আমি যখন সেই বাগানে বেড়াইতাম, যখন আফিমের শ্বেত, পীত, লোহিত ফুল সকল শিশির-জলের অশ্রুপাত করিত, যখন ঘাসের রজত-কাঞ্চন পুষ্পদল উদ্যান-ভূমিতে জরির মছনদ বিছাইয়া দিত, যখন স্বর্গ হইতে বায়ু আসিয়া বাগানে মধু বহন করিত, যখন দূর হইতে পাঞ্জাবীদের সুমধুর সঙ্গীতস্বর উদ্যানে সঞ্চরণ করিত, তখন তাহাকে আমার এক গন্ধর্ব্বপুরী বোধ হইত।" (আত্মজীবনী, পৃঃ ১২৫)

আগ্রাতে তাজমহল দেখে দেবেন্দ্রনাথ স্বল্প কথায় তার যে বর্ণনা দিয়েছেন তাও তাঁর রচনার কাব্যগুণের এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তিনি লিখছেন:—

"আগ্রায় আসিয়া 'তাজ' দেখিলাম। এ তাজ পৃথিবীর তাজ। আমি তাজের একটা মিনারের উপর উঠিয়া দেখি, পশ্চিম দিকে সমুদায় রাঙা করিয়া সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। নীচে নীল যমুনা। মধ্যে শুভ্র স্বচ্ছ তাজ সৌন্দর্য্যের ছটা লইয়া যেন চন্দ্রমণ্ডল হইতে পৃথিবীতে খসিয়া পড়িয়াছে।" (আত্মজীবনী, পৃঃ ১২০-১২১)

উপরে যে-সকল নমুনা উদ্ধৃত হ'ল সে সকল থেকে আশা করি দেবেন্দ্রনাথের গদ্যরচনার গুণোৎকর্ষ ভাল ক'রে বোঝা গিয়েছে কিন্তু এ সত্বেও বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে তাঁর কৃতিত্ব তেমন করে স্বীকৃত হয় নি এর কারণ, মনে হয়, তাঁর লেখার বিষয়বস্তু। ভাষা-বিশুদ্ধি ও উৎকৃষ্ট রচনারীতির দাম সাধারণ পাঠকের নিকট খুবই কম। প্রথমতঃ তাঁরা চান গল্প, তার পরে লৌকিক জ্ঞানের কথা। ধর্ম্মবিষয়ক বা আধ্যাত্মিক কথার বক্তা ও শ্রোতা দুইই দুর্লভ। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের সাহিত্যিক খ্যাতি যে মহর্ষির চেয়ে অনেক বেশী, এই তার প্রধান কারণ ব'লে মনে হয়। অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ করতে হলে রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদীর নাম করা যায়। তাঁর ভাগ্য মহর্ষির মত মন্দ না হ'লেও এক জন দ্বিতীয় শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের চেয়ে তাঁর নামডাক ঢের কম। সাধারণ পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে ক'জনেই বা তাঁকে জানেন, অথচ তিনি লৌকিক জ্ঞান নিয়ে বিস্তর সুন্দর, সারগর্ভ ও রীতিবিশুদ্ধ প্রবন্ধ লিখেছেন। শুধু স্বল্পজনপ্রিয় বিষয়ের জন্যে নয়, স্বাভাবিক আত্মগোপন ইচ্ছার জন্যেও মহর্ষির লেখা পাঠক-সাধারণের নিকট তেমন পরিচিত হয় নি। এ সম্বন্ধে তাঁর এক চরিতাখ্যায়ক বলেন:—

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাগুলি পড়িলেই বেশ দেখা যায় দেবেন্দ্রনাথ কেমন করিয়া সকল কাজে নিজের নাম গোপন করিয়া চলিতেন। * * তত্ত্ববোধিনী সভা তিনিই স্থাপন করিলেন, অথচ ১৭৬৯ শকের ফাল্গুনের তত্ত্ববোধিনীতে আছে "শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উপদিষ্ট কতিপয় ব্যক্তি ১৭৬১ শকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রদীপ্ত করিবার মানসে তত্ত্ববোধিনী নাম্নী এই সভা স্থাপন করিলেন।" * * সমস্ত তত্ত্ববোধিনী ঘাঁটিলে দেবেন্দ্রনাথের নাম কদাচিৎ পাওয়া যায়—"[৬]

এই শেষোক্ত কথাটির অর্থ হচ্ছে, তাঁর বক্তৃতা ও ব্যাখ্যানগুলির সম্পর্কে তত্ত্ববোধিনীতে তাঁর নামের প্রকাশ খুবই বিরল। এই সকলের সঙ্গে নাম সংযুক্ত না থাকায় তাঁর যশ যে নিতান্ত স্বল্প পরিমাণেও অক্ষয়কুমারের উপর বর্ত্তায় নি তা নয়। অথচ রাজনারায়ণ বসুর লেখা থেকে জানতে পারা যায় যে, পত্রিকায় প্রকাশের পূর্ব্বে দেবেন্দ্রনাথ বিশেষ শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক অক্ষয়কুমারের রচনা সংশোধন করে দিতেন।[৭] এ খুব সম্ভব তত্ত্ববোধিনীর গোড়ার দিকের কথা, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহর্ষি আত্মজীবনীর কুত্রাপি এ বিষয়ে উল্লেখ করেন নি। অক্ষয়কুমারের রচনায় কেবল অমিশ্রিত প্রশংসাবাদই তাতে আছে। সে যাই হোক, কেবল ধর্ম্মবিষয়ের আলোচনা এবং নামযশ সম্বন্ধে (যেমন অন্যান্য ঐহিক বিষয় সম্বন্ধে) ঔদাসীন্যহেতুই, মনে হয়, দেবেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক গুণপনা ঐতিহাসিকদের চোখে তেমন বড় হয়ে দেখা দেয় নি। কিন্তু বড় হয়ে দেখা না দিলেও বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উপর তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব হয়ত

(৬) অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এলাহাবাদ, ১৯১৬, পৃঃ ১৮৭-১৮৮।

(৭) পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৮৯।

নগণ্য নয়। তাঁর অনুরাগী এবং ভক্তমণ্ডলীর রচনাকে তিনি কি পরিমাণে প্রভাবিত করেছেন, উপস্থিত প্রবন্ধের স্বল্পপরিসরের মধ্যে তার বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর নয়। তবু এ-বিষয়ে মোটামুটি ঘটনাগুলির উল্লেখ না করলে এ-প্রবন্ধ অঙ্গহীন বিবেচিত হবে।

অক্ষয়কুমারের উপর দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। ১৮৪১ সালে প্রকাশিত অক্ষয়কুমার-রচিত ভূগোলের ভূমিকা থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে তাঁর রচনায় সংস্কৃতগন্ধ (Sanskritism) ও অনুপ্রাসপ্রিয়তা (খুব সম্ভব ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাবে) কত বেশী; আর জটিল মিশ্র বাক্যের বাহুল্যও উল্লিখিত রচনার আর এক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত অক্ষয়কুমার-রচিত রচনার তার মূল প্রকৃতি বদল না করলেও তার থেকে এই সকল দোষ বহুল পরিমাণে বিদায় গ্রহণ করেছে। তাঁর রচনার এই উন্নতি যে দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে ঘটেছিল তা মনে করার কোন বাধা নেই।

বিদ্যাসাগরের রচনা-পদ্ধতিও যে কিয়ৎ পরিমাণে দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে উৎকর্ষ লাভ করেছিল তা অনুমান করা হয়ত অন্যায় হবে না। কারণ ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'তে বিদ্যাসাগরের স্বাভাবিক রচনা-মাধুর্য্য এবং প্রাঞ্জলতা বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান থাকলেও তাতে স্থানে স্থানে ঈশ্বরগুপ্তসুলভ অনুপ্রাসপ্রিয়তা এবং অতিশয় সংস্কৃতগন্ধী বাগ্‌বিন্যাস ছিল। নিচে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল :—

'যক্ষকে রক্ষকতায় নিযুক্ত করিয়া' (৪),[৮] 'পরে সেই বারযোষিৎ যুক্তিপূর্ব্বক মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া ধূমপায়ী তপস্বীর আস্যদেশে প্রদান করিল' (৭), 'এ অনুকূল গলহস্ত অপ্রশস্ত নহে' (২২), 'বন্ধু অভ্যবহারের অব্যবহিত পরক্ষণেই অচেতন হইয়া নিদ্রাগত হইলেন' (২৭), 'কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অন্যথাভাবে অধর্ম্ম জানিয়া রাজার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন' (৯৭), 'পৌরেরা চৌরের উপদ্রবে ব্যাকুল হইয়া—' (১০১), 'তদীয় প্রতিশীর্ষ হইয়া গরুড়ের আগমন প্রতীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট রহিলেন' (১২৩)। এ সকল ছাড়াও বিদ্যাসাগরের রচনায় অন্য দোষ দুর্লভ ছিল না; যেমন এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'অন্তঃকরণে এইরূপ সংকল্প করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া রাজা রাজ্ঞীকে জিজ্ঞাসা করিলেন' (৪) দুটি 'ইয়া' প্রত্যন্ত শব্দের প্রয়োগে এই উদ্ধৃতাংশকে শ্রুতিকটু করেছে। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'তে বিদ্যাসাগর যাই লিখে থাকুন তাঁর মহাভারতের অনুবাদে[৯] বা তার পরে লিখিত অন্যান্য গ্রন্থে এই জাতীয় ত্রুটি একান্ত দুর্লভ। এ জন্যে অনুমান করা যেতে পারে যে দেবেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনা কিয়ৎপরিমাণে সংস্কার প্রাপ্ত হয়েছিল।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উপর দেবেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রভাব সম্বন্ধে বললেই এ-প্রবন্ধের বক্তব্য সমাপ্ত হবে। বাংলা সাহিত্যের উপর মহর্ষির প্রভাব বিশেষ ভাবে কাজ করেছিল কেশবচন্দ্রের ভিতর দিয়ে। ব্রহ্মানন্দ যে বাংলা দেশকে কেবল ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারের ব্যাপারে প্রচণ্ড উদ্দীপনা দিয়েছিলেন এবং গতানুগতিকতার সুদৃঢ় বন্ধন থেকে তাকে কিয়দংশে মুক্ত করেছিলেন তা নয়, বাংলা গদ্যের ওজস্বিতা এবং প্রাণস্পর্শিতা তাঁর হাতে যথেষ্ট পরিমাণে সংবর্দ্ধিত হয়েছিল। তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর অসাধারণ সারল্য ও প্রসাদগুণ; কেশবচন্দ্র যা বলেছেন বা লিখেছেন, পড়তে গেলে সে-সব সোজাসুজি গিয়ে পাঠকের প্রাণকে স্পর্শ করে। এর থেকেই সমসাময়িক শিক্ষিত সমাজের উপর তাঁর অসামান্য প্রভাবের খানিকটা আন্দাজ করা যেতে পারে। কেশবচন্দ্রের রচনার এই বৈশিষ্ট্য বহুলাংশে তাঁর বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের ফল হ'লেও এ-কথা অস্বীকার করা বোধ হয় শক্ত যে, দেবেন্দ্রনাথের লিপিভঙ্গী তাঁর রচনাকে কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল। দু-জনের রচনার সোদাহরণ তুলনা উপস্থিত প্রবন্ধের স্বল্পপরিসরে অসম্ভব, তাই তাতে বিরত থাকা গেল। সময়ান্তরে সে সম্পর্কে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। কিন্তু তার পূর্ব্বে একথা বোধ হয় বলা যেতে পারে যে সর্ব্বজনব্যবহার্য্য আধুনিক বাংলা গদ্য গড়ে ওঠার ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব নিতান্ত নগণ্য নয়।*

৮। এই সংখ্যাগুলি ১৮৪৭ সালে প্রথম মুদ্রিত 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'র পৃষ্ঠাঙ্কসূচক।

৯। এই অনুবাদ ১৮৪৮ সাল থেকে ধারাবাহিক ভাবে 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

* এ প্রবন্ধে মুদ্রিত দেবেন্দ্রনাথের রচনাবলীর তালিকা সম্পূর্ণ নয়।

উড়িষ্যার কয়েকটি অখ্যাত মন্দির

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

উড়িষ্যার দুইটি অংশ: পশ্চিমে জঙ্গলে আকীর্ণ পর্ব্বতময় স্থান ও তাহার পূর্ব্বপ্রান্তে সমুদ্রের নিকটে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি। আজকাল উড়িষ্যা যাইতে হইলে সমতলভূমি দিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে যাইতে হয়। পথে অনেকগুলি নদী পড়ে, সেই জন্য রেলে পুরী যাইবার সময়ে যাত্রীগণকে বহু নদীর সাঁকো পার হইতে হয়। তাহার মধ্যে সুবর্ণরেখা, বৈতরণী, ব্রাহ্মণী, মহানদী ও কাঠজুড়ি প্রধান। মেদিনীপুর হইতে একটি পাকা সড়কও শ্রীক্ষেত্রের অভিমুখে গিয়াছে, কিন্তু পথে সাঁকো না থাকায় চলাচলের পক্ষে অসুবিধা হয়। পূর্ব্বে শ্রীক্ষেত্রের যাত্রীগণ এই পথেই তীর্থযাত্রা করিতেন।

কিন্তু ইহা ছাড়া উড়িষ্যায় পৌছিবার আরও একটি পথ রহিয়াছে এবং অনেকে মনে করেন পূর্ব্বকালে সেই পথেই উত্তর-ভারতের সহিত উড়িষ্যার যোগাযোগ ছিল। এই পথটি মহানদীর উপত্যকার ভিতর দিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। ইহার ধারে এবং মহানদীর দুই পাশে বৌদ, সোনপুর, বড়ম্বা, নরসিংহপুর প্রভৃতি কতকগুলি প্রাচীন রাজ্য বর্ত্তমান এবং সেখানে পুরী, ভুবনেশ্বর বা কণারকের মতই অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। হয়ত ঐশ্বর্য্যে এবং সমৃদ্ধিতে সেগুলি ভুবনেশ্বর বা কণারকের সমতুল্য নহে, কিন্তু প্রাচীনত্বের গৌরবে অথবা শিল্পচাতুর্য্যে তাহাদের স্থান নিম্নে নহে। এই সকল স্থানে যাওয়া সময় এবং পরিশ্রমসাপেক্ষ বলিয়াই হয়ত অনেকে যান না, কিন্তু সেখানে পৌছিলে শুধু যে শিল্পকলাই আমাদিগকে আনন্দ দেয় তাহা নহে, অনেক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আমাদিগকে অভিভূত করে।

১৯৩৮ সালের শীতকালে আমি মহানদীর উভয় পার্শ্বে কয়েকটি প্রাচীন মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। কটক হইতে পশ্চিমাভিমুখে তালচের নামক একটি স্থান পর্য্যন্ত রেলের লাইন গিয়াছে। সেই লাইনে মেঢ়ামণ্ডলী স্টেশন হইতে সোজা রাস্তায় পশ্চিমে সম্বলপুর পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। এখন এই পথে মোটর-বাস চলে, অতএব যাতায়াতের কোনও
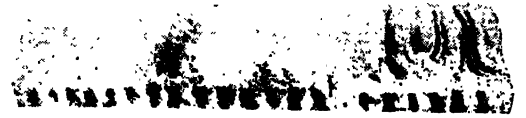
কালীয়দমন
সিংহনাথ মন্দিরগাত্রে খোদিত

অসুবিধা নাই। মহানদী উল্লিখিত রেলপথ এবং মোটর রাস্তার অনেকখানি দক্ষিণে অবস্থিত। সে-সকল স্থানে আমাকে সাইকেলে যাতায়াত করিতে হইয়াছিল। অন্যথা গরুর গাড়ীতেও যাওয়া চলে, তবে তাহাতে সময় বেশী লাগে।

আমি প্রথমে কটকে রেলে চড়িয়া তালচের লাইনে

রামনাথ মন্দিরের প্রাঙ্গণে শিল্পিগণ কাজ করিতেছে

আঠগড় স্টেশনে অবতরণ করি। সেখান হইতে বড়ম্বা শহর ও পরে বড়ম্বার সীমানায় অবস্থিত মহানদীর মধ্যে একটি দ্বীপে গমন করি। দ্বীপটির নাম সিংহনাথ। ইহার অপর পারেই বৈদ্যেশ্বর নামে একটি পুরাতন তীর্থস্থান আছে। বৈদ্যেশ্বরের পশ্চিমে কণ্টিলো। প্রবাদ যে শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথমূর্ত্তি পূর্ব্বে কণ্টিলোতে পূজিত হইত, উত্তরকালে তাহা শ্রীক্ষেত্রে নীত হয়। সিংহনাথ, বৈদ্যেশ্বর, খন্দপড়া প্রভৃতি স্থানে একটি বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম। যদিও দেবমূর্ত্তি শৈব, তবু এখানকার পূজারী-গণ ব্রাহ্মণ নহে, অনার্য্যবংশসম্ভূত। সেবকগণের স্থানীয় নাম মালিজাতি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে পুরীর জগন্নাথদেব সর্ব্বপ্রথমে অরণ্যবাসী শবর জাতি কর্ত্তৃক পূজিত হইতেন এবং এখনও বসু নামক সেই আদি শবরের দৌহিত্র-বংশ পুরীর মন্দিরে কতকগুলি সেবাকার্য্যের অধিকারী হইয়া রহিয়াছে।

সিংহনাথের মন্দির ক্ষুদ্র হইলেও চমৎকার কারুকার্য্যে মণ্ডিত। ইহার গঠনের মধ্যেও বৈশিষ্ট্য আছে। ভুবনেশ্বরে পরশুরামেশ্বর প্রভৃতি পুরাতন মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে গর্ভগৃহের উপরে এক দেওয়াল হইতে অপর দেওয়াল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ পাথরের পাট আছে। কিন্তু সিংহনাথে সেরূপ নাই। দুই দিকের দেওয়ালের ব্যবধান লহড়ার (corbel) সাহায্যে ক্রমে সঙ্কীর্ণ করিয়া অনেক উপরে ক্ষুদ্র দুইখানি পাথরের সাহায্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব সিংহনাথের অন্তর অনেকটা বাংলা দেশের ইটে তৈয়ারি দেউলের মত।

সিংহনাথের কারুকার্য্য সুন্দর। শৈব মূর্ত্তি নানাবিধ রহিয়াছে, তাহার মধ্যে অর্দ্ধনারীশ্বর, গজাসুর-সংহার, অজৈক-পাদ এবং একটি জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সিংহনাথে বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর ক্ষুদ্র মন্দিরে বৌদ্ধ মূর্ত্তি দেখিলাম না; কিন্তু নদীর অপর পারে বৈদ্যেশ্বর গ্রামে দুইটি সুন্দর বৌদ্ধ মূর্ত্তি দেখিয়াছি। সেখানে এক মন্দিরে কাঠের তৈয়ারি চমৎকার মণ্ডপের আচ্ছাদন

মন্দিরের গর্ভগৃহ হইতে জলনিষ্কাশনের পথে কুম্ভধারী নাগমূর্ত্তি, মোখলিঙ্গম্

আছে। দুই বৎসর আগেই তাহা অতিশয় জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এখন পর্য্যন্ত তাহা টিঁকিয়া আছে কি না জানি না।

মেঢ়ামণ্ডলী স্টেশন হইতে সম্বলপুরের পথে রামপুর নামে এক গণ্ডগ্রাম পড়ে। ইহা রেঢ়াখোল রাজ্যের রাজধানী। রেঢ়াখোলে অতিশয় ঘন শালের বন আছে। সেই পথে প্রায় ১৬।১৭ মাইল দক্ষিণে মহানদীর অপর পারে বৌদ নগর অবস্থিত। বৌদ এক সময়ে নিশ্চয়ই সমৃদ্ধিশালী বৌদ্ধ তীর্থকেন্দ্র ছিল, কেননা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সেখানে ভূমির মধ্যে প্রোথিত বিস্তীর্ণ গৃহের প্রাচীরশ্রেণী এবং তাহার মধ্যে বৃহদাকার বুদ্ধমূর্ত্তি খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছে। বৌদের রামনাথ মন্দির ক্ষুদ্র হইলেও ভুবনেশ্বরের মুক্তেশ্বর দেউলের মতই চমৎকার কারুকার্য্যে মণ্ডিত। ইহার গঠনে এবং আসনে (plan) বৈশিষ্ট্য আছে দেখিলাম। আসন অষ্টকোণ, শিবলিঙ্গের গৌরীপট্টকেও তদনুযায়ী অষ্টকোণ আকার দান করা হইয়াছে।

বৌদ রাজ্যের নৃপতি বিশেষ গুণগ্রাহী সজ্জন। তিনি সম্প্রতি উড়িয়া শিল্পিগণের সাহায্যে এক খানি নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইতেছেন। শিল্পিগণের মধ্যে কেহ সোনপুর, কেহ আঠগড়, কেহ বা অন্য কোনও রাজ্য হইতে আসিয়াছেন। মন্দির নির্ম্মাণের পূর্ব্বে শুনিলাম রাজা শিল্পিগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন তাঁহাদের আনুমানিক কত সময় লাগিবে এবং খরচই বা মোটামুটি কত পড়িবে। শিল্পিগণ নাকি বলিয়াছিলেন, "হুজুর, আমরা কাজ করিয়া যাইব, আপনি আমাদিগকে মালমশলা দিবেন এবং দৈনিক আট আনা হইতে এক টাকা পারিশ্রমিক দিবেন। তাহাতে যাহা খরচ হয় হইবে। আমরা এঞ্জিনিয়ারদের মত এষ্টিমেটের ব্যাপার বুঝি না।" রাজা হাসিয়া তাহাদের সর্ত্তে রাজি হইয়া যান এবং শিল্পিগণও বিনা তদারকে মনের আনন্দে কঠিন পরিশ্রম করিতেছেন দেখিলাম।

সোনপুর রাজ্যে তেল নদীর কূলে অবস্থিত বৈদ্যনাথ মন্দির

তত্ত্বানুসন্ধানে অথবা ব্যবহারিক প্রয়োগের ব্যাপারে জগতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা পিছাইয়া থাকিবে না, ইহা সুনিশ্চিত।

বৌদের কিছু দূরে, রাজ্যের সীমানার নিকটে গন্ধরাড়ির যুগল মন্দির অবস্থিত। স্থানটি অতি মনোরম, পাশেই মহানদী প্রবাহিত হইয়াছে এবং উত্তরদিগন্তে নীল পর্ব্বতমালা দৃষ্টিগোচর হয়।

গন্ধরাড়ি হইতে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে তেল নামক একটি ক্ষুদ্র নদী পার হইতে হয়। পার হইয়াই সোনপুর রাজ্যের রাজধানী সোনপুর শহর। ইহাও অতি প্রাচীন নগর। ঐতিহাসিকগণের মতে সোনপুর দক্ষিণকোশল রাজ্যের সহিত অতি প্রাচীন কালে একীভূত ছিল। সোনপুর রাজ্যের মধ্যে তেল নদীর কূলে দুইটি খুব সুন্দর মন্দির আছে। ইহার মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মন্দির দুইটির নাম বৈদ্যনাথ এবং কোশলেশ্বর। বৈদ্যনাথ উড়িষ্যার অন্যান্য মন্দিরের মত হইলেও ইহার গঠনসৌষ্ঠব লক্ষ্য করিবার মত। কিন্তু কোশলেশ্বর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রীতিতে গঠিত। ইহার

বৈদ্যনাথ মন্দিরের শিখর

বস্তুতঃ শিল্প বা গবেষণার কাজে যদি খাইবার পরিবার মোটামুটি সংস্থান থাকে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ঠিক খরচটুকু পাওয়া যায় তাহা হইলেই যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তাহার অনেকখানি অতিরিক্ত অর্থ মাহিনা স্বরূপ দেওয়া হয় বলিয়াই বোধ হয় আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার অবস্থা ভাল নয়। গবেষকগণের টাকাকড়ি গবেষণার জন্য যতখানি ব্যয়িত হয় তাহার অতিরিক্ত বৈষয়িক ব্যাপারেই দুর্ভাগ্যক্রমে নিয়োজিত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি আমরা বৌদের শিল্পিগণের মত বিজ্ঞানের সাধনায় ধর্ম্মজ্ঞানে রত হই তবে ভারতবর্ষ বিজ্ঞানের

নাগ ও নাগিনী—বৈদ্যনাথ মন্দির, সোনপুর

পাশে খোলা বারান্দার মত স্থান মধ্যভারত, রাজপুতানার এবং দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ভাগের মন্দির-গুলির স্মৃতি বহন করিয়া আনে। তদ্ভিন্ন এখানে একটি নিবিড় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ নরনারীর মূর্ত্তি দেখিয়াছি তাহা বৌদ্ধতান্ত্রিক মূর্ত্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মূর্ত্তিটির ফটো নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাই ভবিষ্যতে আর এক বার ঐ স্থানে গমন করিবার বাসনা আছে।

সোনপুরের মধ্যে চরধা নামক স্থানে কপিলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরও দর্শনীয় স্থান। বিনকা হইতে হাঁটিয়া বা সাইক্লে চরধায় পৌছান যায়। চরধার মন্দির সাধারণ রেখ-দেউলের মত, তবে মণ্ডপ কোশলেশ্বরের মত।
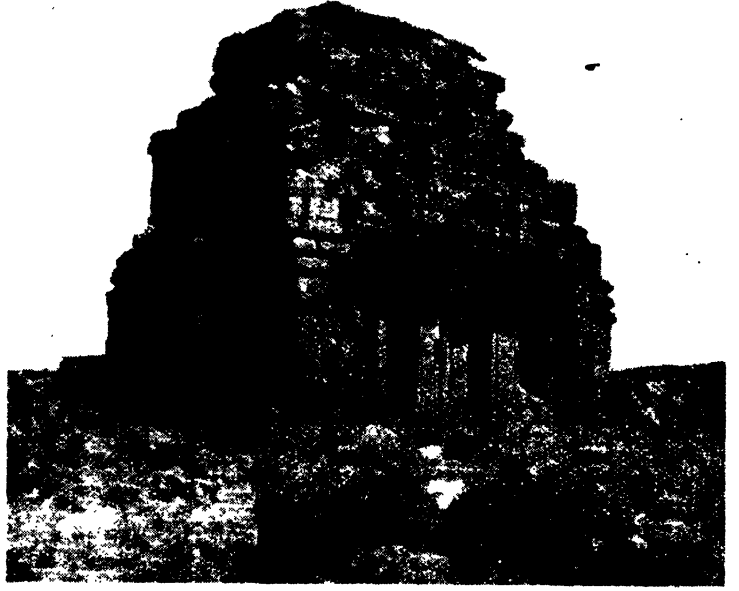
পাটনা রাজ্যে রাণীপুর-ঝরিয়াল গ্রামে আয়ত-আসনবিশিষ্ট খাখরা মন্দির

উড়িষ্যার পশ্চিম-প্রান্ত যে মধ্যভারতের শিল্পধারার দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল তাহার আরও প্রমাণ পার্শ্ববর্ত্তী বোলানগির-পাটনা রাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। পাটনার পুরাতন রাজধানী পাটনাগড়ে কোশলেশ্বর নামে আরও একটি মন্দির আছে। ইহার গঠন এবং মূর্ত্তির শৈলী সোনপুরের কোশলেশ্বরের মতই। পাটনারাজ্যের মধ্যে রাণীপুর-ঝরিয়াল একটি বিচিত্র স্থান। হঠাৎ খোলা মাঠের মধ্যে ছোট একখানি পাহাড়ের উপরে প্রায় বিশ-পঁচিশটি নানা জাতীয় পুরাতন মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানটি আজকাল পরিত্যক্ত বলিলেই হয়, কেবল নিকটে কন্ধ নামক অনার্য্য জাতি বাস করে।
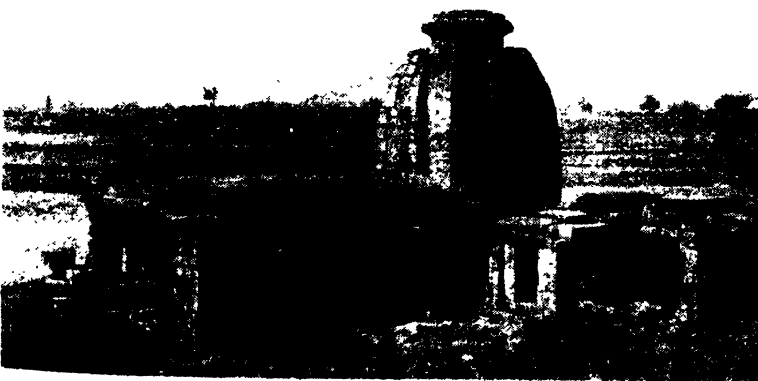
রাণীপুর-ঝরিয়ালের পাশে কৌসলি গ্রামে ইটের একটি মন্দিরের আসন সোনপুর রামনাথের মত অষ্টকোণ। এতদ্ভিন্ন রাণীপুর-ঝরিয়ালে সর্ব্বসমেত তিন-চারি রকমের মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। জব্বলপুরে ভেড়াঘাটে চৌষট্টি যোগিনীর যেমন বৃত্তাকার মন্দির আছে এখানে ঠিক তাহারই অনুরূপ একটি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া খাখরা নামক যে আয়ত-আসনবিশিষ্ট

রাণীপুর-ঝরিয়ালে অবস্থিত সোমেশ্বর মহাদেবের মন্দির

নদীর আঘাতে ক্ষয়প্রাপ্ত শিলা—রামপুর গ্রাম, রেঢ়াখোল

রাণীপুর-ঝরিয়াল হইতে আমি টিটিলাগড় নামক এক স্থানে যাই। উহা রায়পুর ভিজিয়ানগরম্ রেল-লাইনের উপরে অবস্থিত। টিটিলাগড়ের নিকটে ঘোড়ার, শিহিনি প্রভৃতি গ্রামে কয়েকটি ক্ষুদ্র রেখ-দেউল আছে। কারুকার্য্য ভাল নয়, তবে কতকগুলি মূর্ত্তি এখানে বর্ত্তমান, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য থাকিতে পারে। ঘোড়ারে পর্ব্বতগাত্রে খোদিত অত্যন্ত অস্পষ্ট সপ্তমাতৃকা এবং তৎসহ বীরভদ্র ও গণপতির মূর্ত্তি দেখিলাম।

পাটনা রাজ্যের মধ্যে আর একটি স্থান উল্লেখযোগ্য। বোলানগির হইতে সম্বলপুর যাইবার পথে ওঙ নদীর কূলে সালেভাটা নামক স্থানে এক মন্দির আছে। মন্দিরটি জীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তাহার গঠন চমৎকার। ইহার এক পাশ ভাঙিয়া যাওয়ায় মন্দিরটি ঈষৎ হেলিয়া পড়িয়াছে। হয়ত আর কিছুকাল পরে মন্দির ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে।

মন্দিরের বিষয়ে আমরা শিল্পশাস্ত্রে পাঠ করিয়া থাকি, সেই শৈলীর একটি বেশ বড় মন্দির এখানে বর্ত্তমান। অনুরূপ ছোট মন্দিরও একটি আছে। খাখরা দাক্ষিণাত্য হইতে আমদানী করা শৈলী। ভুবনেশ্বর, যাজপুর, সিংহনাথ প্রভৃতি স্থান ছাড়াও সুদূর হিমালয়ের মধ্যে যুক্তপ্রদেশের যজ্ঞেশ্বর নামক স্থানে এই শৈলীর একটি মন্দির রচিত হইয়াছিল। উত্তর-ভারতের সহিত দাক্ষিণাত্যের শিল্পসম্পর্ক যে কত নিবিড় ও কত দীর্ঘকাল-ব্যাপী, ইহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

রাণীপুর-ঝরিয়ালে ইটের তৈয়ারি একটি দেউলও আছে, তাহার গঠন মানভূম ও পশ্চিম বাংলার দেউলের মত হইলেও সেখানে গর্ভগৃহের উপরে গর্ভমুদ বর্ত্তমান, বাংলায় সেরূপ নাই। চিল্কা হ্রদের কয়েক মাইল পশ্চিমে বাণপুরের পাশে কোটপুরে গ্রামে ঐরূপ আর একটি ইটে তৈয়ারি গর্ভমুদযুক্ত দেউল দেখিয়াছিলাম। উড়িষ্যায় পশ্চিম বাংলার মত ইটের দেউল এই দুটি মাত্র দেখিয়াছি। রাণীপুর-ঝরিয়ালে কতকাংশে পরশুরামেশ্বরের মত রূপ-বিশিষ্ট একটি মন্দির আছে, তাহার শিলালিপি হইতে জানা যায় মন্দিরের নাম সোমেশ্বর।

উপরিউক্ত মন্দিরগুলি ছাড়া ছোট রেখ-দেউলের সংখ্যা রাণীপুর-ঝরিয়ালে প্রায় বিশটির কাছাকাছি হইবে। অধিকাংশ অযত্নে ভাঙিয়া পড়িয়াছে এবং যত্ন না লইলে আরও ভাঙিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

উড়িষ্যায় কয়েক বৎসর ভ্রমণ করিয়াও আমি সব দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিতে পারি নাই এবং শুধু মন্দিরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই দেখিয়াছি যে উড়িষ্যার পূর্ব্বোত্তর ভাগে বাংলা দেশের সহিত শিল্পে আদানপ্রদান চলিত। দাক্ষিণাত্যের সহিত তো ছিলই, উড়িষ্যার সর্ব্বাংশে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পশ্চিমে কোশলেশ্বর ও চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরে মধ্যভারতের সহিত সম্পর্ক সূচিত হয়। আরও গভীর গবেষণার দ্বারা আমরা ভবিষ্যতে শিল্প-ব্যাপারে আদানপ্রদানের সমগ্র ইতিহাস হয়ত উদ্ধার করিতে পারিব। তাহার জন্য শুধু এক জন নহে, বহু গবেষকের আজীবন সাধনার প্রয়োজন আছে। পাথরের মন্দিরে, শিল্পের ভাষায়, ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে আমরা যে নিবিড় যোগসূত্রের পরিচয় পাই, তাহাতে শুধু আশ্চর্য্য হইবার কথা নহে, আমরা পরম আনন্দও লাভ করিয়া থাকি। শিল্পী এবং ধর্ম্মপ্রাণ তীর্থযাত্রীর চোখে সমগ্র ভারত এক অখণ্ড দেশ ছিল, কোন প্রদেশের লোকই অপর প্রদেশে অস্বাভাবিক কোন প্রভেদ লক্ষ্য করিত না, বরং ঐক্যের নানাবিধ উপাদান খুঁজিয়া পাইত।

আসামে লাইন-প্রথা

শ্রীললিতমোহন কর, এম. এল. এ. (আসাম)

লাইন-প্রথা—আসাম প্রদেশের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার একটা বিশেষ এবং অদ্ভুত সমস্যা। আসাম-গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কোন কোন জেলায়,—দরং, নওগাঁ, কামরূপ ও গোয়ালপাড়া জেলার খাসমহলে এই লাইন-প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া প্রবাসীদের বসবাস নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। লাইন,—স্থায়ী অধিবাসী এবং প্রবাসীদের এলাকার মধ্যকার সীমারেখা। প্রবাসীদের মধ্যে যাহারা আসামে আসিয়া জমি বন্দোবস্ত করিয়া বর্ত্তমানে বসতকার হইয়া গিয়াছে, তাহারাও লাইন ডিঙ্গাইয়া অপর পারে কোন জমি খরিদ করিতে, দান বা হস্তান্তর কি অন্য কোন উপলক্ষে মালিক হইতে বা দখলাধিকার স্থাপন করিতে পারে না বা করিবার তাহাদের কোন প্রকার আইনসম্মত অধিকার নাই। ইহাই লাইন-প্রথার সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

আসামে লাইন-প্রথা প্রবর্ত্তনের কারণ,—দুর্ব্বার বেগে বাহিরের লোক আসিয়া আসামকে প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছে। ১৯৩১ সালের আসামের সেন্সাস রিপোর্টে ইহাকে কেবল মাত্র বহুসংখ্যক পিপীলিকার ব্যাপক আলোড়নের সহিত (mass-movement of a large body of ants) তুলনা করা হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক দিন গাড়ী ভর্ত্তি হইয়া, জাহাজ বোঝাই হইয়া, দলে দলে শতে শতে বাহিরের লোক,—যাহাদের বেশীর ভাগই মুসলমান, আসামে প্রবেশ করিতেছে, এবং বাসিন্দা হইতেছে। ইহাদের প্রবল প্লাবনে আসাম ভাসিয়া যাইবার উপক্রম এবং নানা প্রকার উপদ্রবে, অত্যাচারে আসামবাসী অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছেন।

আসামে বর্ত্তমানে যে-সব প্রবাসী বসতি স্থাপন করিতেছে তাহাদের মধ্যে ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসীর সংখ্যাই খুব বেশী। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার লোকসংখ্যা ৪৮½ লক্ষ মাত্র; এক ময়মনসিংহ জেলার লোকসংখ্যা ৪৫ লক্ষ। ইতিমধ্যে আসামের লোকসংখ্যা ২২·৪ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে। নওগাঁ জেলার বাড়তির হার ৪১·৩, কামরূপ জেলার হার ২৭·৯, গোয়ালপাড়া জেলার হার ১৫·৮, দরং জেলার হার ২২·৬ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মুসলমান অধিবাসীদের হার শতকরা ৬২ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে। নিম্নের তালিকা হইতে দশ বৎসরের বাড়তির হারের সঠিক সংখ্যা জানা যাইবে।

জেলার নাম		জনসংখ্যা
	১৯২১	১৯৩১
নওগাঁ	৩৯৭৯২১	৫৬২৫৮১
কামরূপ	৭৬২৬৭১	৯৭৬৭৪৬
দরং	৪৭৭৯৩৫	৫৮৪৮১৭
গোয়ালপাড়া	৭৬২৫২৩	৮৮২৭৪৮

এই তালিকা হইতে দেখা যায়, মাত্র দশ বৎসরে এই চারি জেলার লোকসংখ্যা ৬০৫৮৪২ জন বাড়িয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী দশ বৎসরে ইহাদের বাড়তির সংখ্যা আরও বহু বেশী হইবে। বর্ত্তমান সেন্সাস সমাপ্ত হইলে ইহার সঠিক বিবরণ পাওয়া যাইবে।

১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে আসামে আগন্তুকদের বাড়তির বিষয় উপলক্ষ করিয়া সেন্সাস কমিশনার একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য্য এই,—

"জমির জন্য লালায়িত ময়মনসিংহ জেলা হইতে আগত বহুসংখ্যক মুসলমান আগন্তুকের আক্রমণই এই প্রদেশে গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ঘটনা। ইহা আসামের ভবিষ্যৎ স্থায়ীভাবে পরিবর্ত্তিত করার,—১৯২০ সালের বর্ম্মী আক্রমণকারী অপেক্ষা অধিকতর নিশ্চিতরূপে আসামের সংস্কৃতি ও সভ্যতা আমূল ধ্বংস করার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।"

আসামে এই প্রকার অস্বাভাবিক ভাবে বাহিরের

লোকের আগমন এবং বসতি স্থাপনের প্রধান কারণ,—আসামের স্বভাব-সম্পদের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ এবং প্রয়োজনের তাড়না। আসামে আবাদযোগ্য প্রচুর জমি অযত্নে পড়িয়া আছে। আসামের জমি সুজলা, সুফলা এবং অতিশয় উর্ব্বর। আসামে সর্ব্বপ্রকারের ফসল ফলানের উপযোগী আবহাওয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। আসাম নদীমাতৃক দেশ। ব্রহ্মপুত্র নদের উভয় তীরে হাজার হাজার বিঘা পলি জমি পড়িয়া আছে। আসামের অরণ্য-সম্পদও অতুলনীয়, তাহাতে নানা প্রকার কুটীর-শিল্পের উপাদান পড়িয়া আছে। এই স্বভাব-সম্পদ কাজে লাগাইবার প্রবৃত্তি, যোগ্যতা বা কর্ম্মশক্তি আসামের অধিবাসীদের নাই, যদিও তাহারা দরিদ্র এবং অভাবগ্রস্ত। পক্ষান্তরে প্রবাসীরা উত্তম কৃষক, পরিশ্রমী এবং কর্ম্মঠ। আসামের অপর ভাগে,—সুরমা উপত্যকা, বাঙালী-অধ্যুষিত অঞ্চল; সেখানে বেকার-সমস্যা অতিশয় প্রবল। আসাম-গবর্ণমেণ্ট এই সমস্যা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত একান্ত উদাসীন ভাব অবলম্বন করিয়া আছেন। আসামের সীমান্তে ময়মনসিংহ জেলা অবস্থিত, তাহা জনবহুল এবং অভাবগ্রস্ত। ময়মনসিংহ জেলাবাসী লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষিত ব্যক্তির কাছে আসামের স্বভাব-সম্পদ একান্ত আকর্ষণের বস্তু, বিশেষ ভাবে তাহারা পেটের ক্ষুধায়ই দেশত্যাগী হইয়া আসামে বসতি স্থাপন করিতেছে।

আসামের এই সমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যা বলিয়াই এতকাল পরিচিত ছিল। সম্প্রতি মোসলেম লীগের,—বিশেষভাবে অ-আসামী কর্ম্মীরাই "লাইন-প্রথা উঠাইয়া দাও" এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করিতেছেন। লীগ ওয়ার্কিং কমীটিতে এবং আসামের প্রাদেশিক লীগ কন্‌ফারেন্সে লাইন-প্রথা উঠাইয়া দিবার মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আসামে এই লাইন-প্রথা কেবল মুসলমানের প্রতিই প্রযোজ্য নহে; আগন্তুক হিন্দু ও মুসলমান সকলের প্রতিই, এমন কি এত কাল সুরমা উপত্যকাবাসীদের প্রতিও প্রযোজ্য ছিল। ইহা অর্থনৈতিক সমস্যা হইলেও লীগ-কর্ম্মকর্ত্তাদের আন্দোলনের পর হইতে ক্রমশঃ সাম্প্রদায়িক রূপ প্রাপ্ত হইতেছে। আসামে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাবাসী মুসলমান, যাহারা অমুসলমানদের মতই লাইন-প্রথাকে সমর্থন করে, তাহাদের মনোভাবকে প্রভাবান্বিত করিবার জন্য সম্ভবতঃ এইরূপ করার প্রয়োজন হইতে পারে। অন্য দিকে ইহাকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার পর হইতে বিনা-অস্ত্রে আসাম-বিজয় বা আসামকে মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে পরিণত করা এই আন্দোলনের কর্ম্মকর্ত্তাদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ত্তমান কালে ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকাবাসী অমুসলমানরা ইহাকে একান্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। লাইন-প্রথা কমিটির রিপোর্টে আসাম ব্যবস্থা-পরিষদের এক জন বিশিষ্ট কংগ্রেসী সভ্য মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য—"আসাম প্রদেশকে মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে পরিণত করার কূট অভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্য লইয়া (মোসলেম লীগ) পূর্ব্ববঙ্গের আগন্তুক দ্বারা আসামকে প্লাবিত করিতে চাহিতেছেন।"

লাইন-প্রথাকে বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক রূপে চিত্রিত করিলেও ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকার অধিবাসী মুসলমানদের একটা বড় অংশ এখনও এই সমস্যা সম্বন্ধে আসামের অমুসলমান অধিবাসীদের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন মত পোষণ করেন। আসামের মুসলমানরা সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং ভাষার দিক্ দিয়া প্রবাসী মুসলমানদের সহিত এক নহেন। সুরমা-উপত্যকাবাসী মুসলমানদের সহিত এই বিষয়ে তাহাদের নিকটতম সম্পর্ক এবং সামঞ্জস্য বিদ্যমান রহিয়াছে। এই জন্যই বিশেষভাবে লীগের বাঙালী কর্ম্মীরা, সুরমা-উপত্যকাবাসী মুসলমান এই আন্দোলনের বিশেষ উৎসাহী কর্ম্মী।

১৯৩৭ সালে আসাম-গবর্ণমেণ্ট লাইন-প্রথা সম্বন্ধে একটি অনুসন্ধান-কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির রিপোর্ট দুই ভাগে বিভক্ত,—সরকারী এবং বেসরকারী। উভয় ভাগে মোট ১৮ জন মুসলমানের অভিমত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১২টি অভিমত লাইন-প্রথা রক্ষার পক্ষে; মাত্র ৬টি বিপক্ষে। এই ৬টির মধ্যে এক জনের মত দুই রূপে দুই বার দেওয়া আছে। নওগাঁ আঞ্জুমান ইসলামীয়ার সেক্রেটরী লাইন-প্রথা সমর্থন করিয়া যে অভিমত দিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য,—"লাইন-প্রথার প্রবর্ত্তন এবং তাহার স্থায়িত্বই তাহার প্রয়োজনীয়তাকে
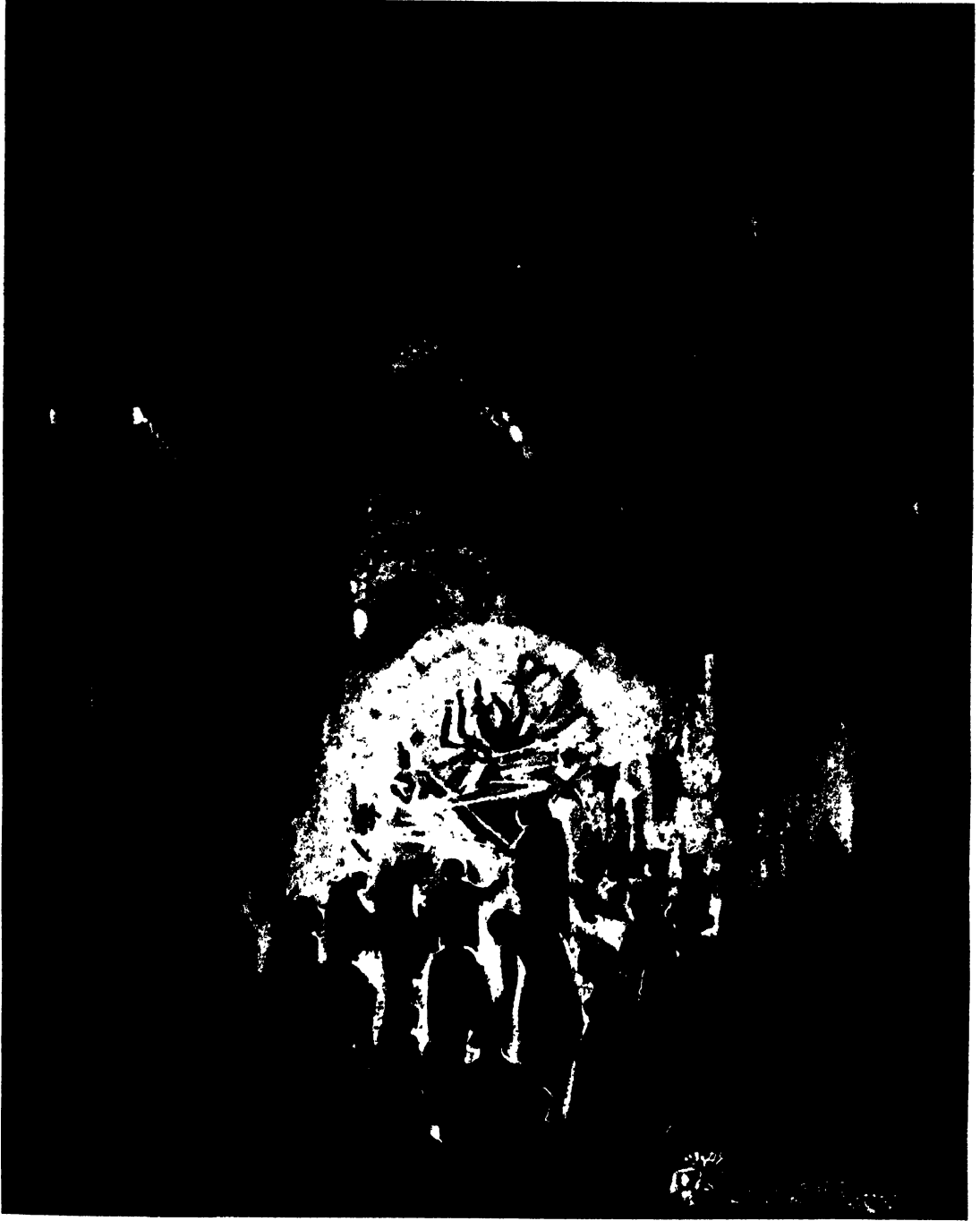
বিজয়া

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

নির্ভরযোগ্য ভাবে প্রমাণিত করে। স্থায়ী অধিবাসীরা তাহাদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা হইতে যখন প্রবাসীদের দ্বারা বঞ্চিত হইতেছিল তখন ইহা প্রবর্ত্তিত হয়। যখন স্থায়ী অধিবাসীরা প্রবাসীদের দ্বারা যৎপরোনাস্তি অত্যাচারে দলিত হইতে লাগিল, তখনই গবর্ণমেণ্ট লাইন-প্রথার সাহায্যে তাহাদিগকে বিপন্মুক্ত করেন। এই প্রকার রক্ষাকবচ স্থায়ী অধিবাসীদের তাগিদেই প্রবর্ত্তিত হয়। অত্যাচারের ভীতি আজও আছে কি না কিংবা তিরোহিত হইয়াছে তাহা বলিবার অধিকারী অত্যাচারী নহে, অত্যাচরিত যাহারা তাহারাই। যে-সব স্থানে লাইন আছে এবং যাহা সাধারণ ভাবে মিশ্র লাইন বলিয়া পরিচিত, সেই সব স্থানের ঘন বসতিপূর্ণ আসাম-পল্লীগুলির চিহ্ন চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র এখন বাঁকা নমুনার ময়মনসিংহবাসীদের গৃহগুলি দ্বারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহা এমন ভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে, যিনি কয়েক বৎসর সেখানে যান নাই, এখন তিনি সেখানে গেলে রিপ ভ্যান উইঙ্কল-এর অবস্থায় পতিত হইবেন। আগন্তুকদের নানা প্রকার নিষ্ঠুর অত্যাচারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য স্থায়ী অধিবাসীরা তাহাদের জমি বাড়ী ত্যাগ করিতে এবং অন্য কোথাও সরিয়া গিয়া নিজের নিরাপত্তার জন্য স্থান করিয়া লয়।" বড়পেটার আঞ্জুমানের সেক্রেটরীও লাইন-প্রথা সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষা করার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়া আগন্তুকদের অপরাধ-প্রবণতা এবং দৌরাত্ম্যের বিষয়ে জোর দিয়াছেন। আসাম ভেলীর মোসলেম পার্টির সেক্রেটরী আগন্তুকদের বসবাস নিয়ন্ত্রণ করার জন্য লাইন-প্রথার প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

আসাম-উপত্যকার স্থায়ী মুসলমান অধিবাসীদের উপর আগন্তুক বাঙালী মুসলমানরা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন তাহার একটি অতিসম্ভাবিত ভবিষ্যৎ অবস্থা বলিলেই বুঝা যাইবে। আসাম ব্যবস্থা-পরিষদে ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকার জন্য নির্দ্দিষ্ট ১৩টি মুসলমান সদস্য পদের মধ্যে মাত্র একটি ব্যতীত অবশিষ্ট ১২টি পদ ভবিষ্যতে প্রবাসী বাঙালী মুসলমানরা কেবল সংখ্যাধিক্যের বলে লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে। ইহা আসামের রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাবান একাধিক বিশিষ্ট প্রবাসী মুসলমান রাজনৈতিকের সুচিন্তিত অভিমত। বর্ত্তমানেও আসাম পরিষদে ৪ জন প্রবাসী বাঙালী মুসলমান সদস্য আছেন। আসাম ব্যবস্থা-পরিষদের ডেপুটি স্পীকার মৌলবী আমীরউদ্দিন আহম্মদ এক জন ভূতপূর্ব্ব ময়মনসিংহবাসী প্রবাসী বাঙালী মুসলমান। আসামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে একাধিক প্রভাবশালী বিশিষ্ট মুসলমান-নেতা গত নির্ব্বাচনে প্রবাসীদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছিলেন।

প্রবাসী বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে বর্ত্তমানে ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য, উকিল, মোক্তার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি বিশিষ্ট ও শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব নাই। এতদ্‌সত্ত্বেও প্রবাসীদের একটা বড় অংশ অশিক্ষিত এবং অপরাধপ্রবণ। সরকারী রিপোর্টে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ইহাদের দৌরাত্ম্যে এবং অত্যাচারে আসামবাসীরা ব্যতিব্যস্ত ও শাসকমণ্ডলী চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। ১৯৩৩ সালে পুলিস এড্‌মিনিস্ট্রেশন্ রিপোর্টের ৩৬ দফায় যে মন্তব্য করা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য,—"দুষ্কৃতকারী লোকের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়ায় গত দশকের প্রথম ভাগে যে-সকল এলাকা প্রায় অরাজক অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল, ঐ সকল এলাকায় (প্রধানতঃ নওগাঁ জেলা এবং গোয়ালপাড়া জেলার খাস মহলে) মুসলমান-আগন্তুক-সমস্যা যে একটি গুরুতর সমস্যা এবং শীঘ্রই ইহার মীমাংসা আবশ্যক ইহা গত কয়েক বৎসর যাবৎ বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল...। ঐ সকল আগন্তুকদের মধ্যে অনেকেরই দুইটি বাড়ী আছে; একটি বাড়ী এই প্রদেশে এবং অন্যটি বঙ্গদেশে তাহাদের নিজ জন্মস্থানে। ইহারা আবশ্যক সংবাদ-সংগ্রহক্রমে তাহাদের মূল বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া আরও দুষ্কৃতকারী লোক লইয়া আসে এবং এখানে দুষ্কর্ম করিয়া চোরাই মালসহ আবার মূল বাড়ীতে ফিরিয়া যায়। এই জন্য ইহাদের দুষ্কর্ম ধরা অত্যন্ত কঠিন হয়। ইহাদের দ্বারা হাঙ্গামা, খুন, নারীধর্ষণ, নারীহরণ প্রভৃতি আরও গুরুতর দুষ্কর্ম সাধিত হইয়া থাকে।" নওগাঁ জেলার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার রিপোর্টের এক স্থানে মন্তব্য করিয়াছেন, "বন্দোবস্ত-গ্রহণকারীরা প্রথম অবস্থায় এখানে স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া আসে না এবং নারীহরণ প্রায়ই

সংঘটিত হইয়া থাকে।" ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল অব পুলিস মিঃ কামইং-এর রিপোর্টে প্রকাশ, "নারীঘটিত মামলা ১৯২২ সালে ১৩৪ হইতে ১৯৩৬ সালে ক্রমবৃদ্ধি হইয়া ৩২৯টিতে দাঁড়াইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, জাল, খুন, ভ্রূণহত্যা, ডাকাতি, সিঁদচুরি, অপহরণ এবং গৃহপালিত পশু চুরির সংখ্যা প্রবাসী-প্লাবিত চারিটি জেলায় ১৯২২ সালে ২৬৬৮ হইতে ১৯৩৬ সালে ২৮৪০টিতে দাঁড়াইয়াছে।" আসামের এই সব অঞ্চলে প্রবাসীরা বসতি স্থাপন করিবার পূর্ব্বে এই সব অপরাধের সংখ্যা একান্ত নগণ্য ছিল। আসামের কমিশনার মিঃ কেণ্টলি, আই. সি. এস.-র রিপোর্টের এক স্থানে প্রকাশ, "ঐ সকল আগন্তুক জমির জন্য বুভুক্ষিত; তাহারা দেখে আসামীরা তাহাদের ভয়ে এতই ভীত যে তাহারা অনধিকারপ্রবেশ এবং গালাগালি দিয়া আসামীদিগকে জমি বিক্রী করিতে বাধ্য করিয়া অনায়াসে জমি হস্তগত করিতে পারে।" উক্ত কমিশনারের রিপোর্টের আর এক স্থানে আছে, "নওগাঁ জেলার কর্ত্তৃপক্ষ সকলেই একমত যে, লাইন-প্রথা উঠাইয়া দিলে আসামীদের গ্রামের উপর জোর আক্রমণ চলিবে।" নওগাঁ জেলার পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন, "অনুরূপ ব্যবস্থা না করিয়া লাইন-প্রথা উঠাইয়া দিলে এইরূপ উচ্ছ্বাস ও গোলযোগ উপস্থিত হইবে যে, বর্ত্তমান পুলিস-বাহিনীর পক্ষে শৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে।" অপরাধীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলায় নওগাঁ জেলায় ৪টি, কামরূপ জেলায় ২টি, দরং জেলায় ২টি, এবং গোয়ালপাড়া জেলায় ৪টি থানা বাড়াইতে হইয়াছে। ইতি-মধ্যে থানার সংখ্যা আরও বাড়িয়াছে।

বাংলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় হক্ সাহেব জিন্না সাহেবের 'মুক্তি দিবস' উপলক্ষে আসামের লাইন-প্রথাকে কংগ্রেসী প্রদেশে মোসলেম্ নির্যাতনের একটি দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছিলেন। লাইন-প্রথা পঁচিশ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল যাবৎ আসামে প্রচলিত আছে। তাহার দায়িত্ব কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের উপর আরোপ করা একান্ত ভ্রমাত্মক। আসামের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী মাননীয় সর্ সৈয়দ মোহাম্মদ সাদউল্লা তৎকালীন আসাম-গবর্ণমেণ্টের কর্ণধার থাকা কালে বর্ত্তমান অপেক্ষা কঠোরতর ভাবে এই লাইন-প্রথা প্রচলিত ছিল। লাইন-প্রথা সম্বন্ধে সর্ মোহাম্মদের বর্ত্তমান ব্যক্তিগত অভিমত কি বলিবার উপায় নাই। সর্ মোহাম্মদ সংযতবাক্, কোন প্রকার বাগাড়ম্বর করা বা বেফাঁস কথা বলা তাঁহার অভ্যাস নহে; আসামের প্রধান মন্ত্রী হইয়াও অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত আসামের এই অতিবড় সমস্যা সম্বন্ধে তিনি মৌনের মধ্যে গোপন থাকিয়া যাইতেছেন।

লাইন-প্রথা সম্বন্ধে প্রবাসীরা চান, তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থায় অবসান, সাধারণ এবং স্বাভাবিক নাগরিক জীবন, ক্ষমতা ও সুযোগসুবিধা পাইবার অধিকার। এই দাবী পূরণ করিতে হইলে লাইন-প্রথার অবসান ঘটান একান্ত অনিবার্য্য। আসামের স্থায়ী অধিবাসীরা চান, লাইন-প্রথা বজায় রাখিতে। প্রবাসীরা উৎপীড়ক এবং অনভিপ্রেত প্রতিবেশী। ইহাদের দ্বারা তাহাদের ধন-মান-প্রাণ বিপন্ন হইয়া উঠে। সাধ্যানুসারে তাঁহারা ইহাদের কাছ ঘেঁষিতে রাজী নহেন। ইহাদের দাবী মিটাইতে হইলে লাইন-প্রথা বজায় রাখিতে হয়। বর্ত্তমান আসাম-গবর্ণমেণ্টের নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য এই উভয় দলকে প্রবোধ দিয়া রাখা একান্ত প্রয়োজন।

প্রয়োজনের তাগিদে লাইন-প্রথা সম্বন্ধে আসাম-গবর্ণমেণ্ট একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। বিগত ২৬শে জুনের সংখ্যা আসাম গেজেটে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট একটি ডেভেলপমেণ্ট স্কীম গ্রহণ করিয়া যেখানে বে-বন্দোবস্তীয় খাস-মহালের জমি আছে, তাহা শতকরা ৩০ ভাগ বর্ত্তমান অধিবাসীদের ভবিষ্যৎ প্রসারের জন্য রিজার্ভ রাখিয়া অবশিষ্ট জমি ছোট ছোট ব্লক করিয়া জমিহীন হিন্দু, মুসলমান, পার্ব্বত্যঅঞ্চলবাসী, অনুন্নত এবং প্রবাসীদের মধ্যে প্রয়োজনানুসারে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। জমিহীন বলিতে যাহার নামে বা পরিবারের কাহারও নামে পাঁচ বিঘার কম জমি আছে কেবল তাহাদেরই বুঝাইবে। ১৯৩৮ সালে ১লা জানুয়ারির পরে আগত আর কোন নূতন প্রবাসীকে খাস-মহালের জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে না। পার্ব্বত্য-অঞ্চলবাসী এবং অনুন্নত সম্প্রদায়কে নির্বিঘ্নতার প্রতিশ্রুতি

দেওয়া হইয়াছে। লাইন-প্রথা তুলিয়া দেওয়া সম্বন্ধে সকল সম্প্রদায় একমত নহেন বলিয়া তাহা আপাততঃ বজায় রাখা হইয়াছে।

আসাম-গবর্ণমেণ্টের আধুনিকতম প্রস্তাব গ্রহণ দ্বারা আসামের সমস্যার সুমীমাংসা হইয়াছে বলা যাইতে পারে না। ইহাতে প্রবাসীদের দাবী অনুযায়ী জমি বন্দোবস্ত দেওয়া কালে বৈষম্যনীতি রদ করা হইয়াছে। স্থায়ী অধিবাসীদের চাহিদামত বৈষম্যনীতিপূর্ণ লাইন-প্রথা বজায় রাখা হইয়াছে। ইহাতে পার্ব্বত্য-অঞ্চলবাসী ও অনুন্নতদের নিবিঘ্নতার প্রতিশ্রুতি একাধিক বার দেওয়া হইয়াছে, যদিও তাহার মধ্যে কোন নূতনত্ব নাই, অথচ তাহাদের নিকটবর্ত্তী এলাকায় খাসমহালের অবশিষ্ট জমি প্রবাসীরা বন্দোবস্ত পাইতে কোন বাধা রহে নাই। নূতন আগন্তুকরা অতঃপর খাসমহালের জমি বন্দোবস্ত পাইবে না, কিন্তু স্থায়ী অধিবাসী হইতে খরিদ বা হস্তান্তর কি অন্য প্রকারে জমির দখলাধিকারী হইলে, যেভাবে সাধারণতঃ বর্ত্তমানে তাহারা আসামে আসিয়া বসতি স্থাপন করিতেছে তৎসম্বন্ধে কি হইবে, গবর্ণমেণ্ট-সিদ্ধান্ত এই বিষয়ে নীরব। এক দিকে শ্যামের প্রেম, অন্য দিকে কুলের টান, এই দোটানার মধ্যে পড়িয়া আসাম-গবর্ণমেণ্ট হাবুডুবু খাইতেছেন। দুই দিক বজায় রাখিতে গিয়া আলোর আড়ালে যদৃচ্ছা চলিবার স্বাধীনতা নিজ হাতে লইয়াছেন। তাঁহাদের বর্ত্তমান প্রবাসী-নিয়ন্ত্রণ নীতি অধিকতর অস্পষ্ট এবং সংশয়পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে মাত্র।

প্রার্থনা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

নিত্য আমি তোমার পায়ে
করি হে প্রভু প্রার্থনা,
জীবন মোর ব্যর্থ নাহি কোরো,
নয়ন-হারী কাঁটার ফুলে
করি যে মোরে বঞ্চনা
দৃষ্টি মোর খুলিয়া তুমি ধরো।
সুখের বলে যা কিছু চাহি,
দুখের সেথা অবধি নাহি;
দুঃখ ব'লে দুখেরে নাহি বুঝি,
অন্ধশত মিলিয়া বসি
অন্ধকার গহনে পশি
রবির আলো পাওয়ার লাগি
নয়ন রহি বুজি;
জীবন মোর পাওয়ার আশে
মরণ মোর খুঁজি।
সহজ তব প্রেমের রসে
জাগায়ে মোরে তোলো,
যেথায় তব আলোক ঝরে
নয়ন সেথা খোলো।

ভোরের বেলা ফুলের মত
উঠি গো যেন হাসি,
না-পাওয়া গানে বিভোর হয়ে
না-পাওয়া আশা বক্ষে লয়ে
হৃদয় যেন পূর্ণ করে
পদ্মদলরাশি,
সহজ-চারী পবন এসে
যায় গো যেন পরশে হেসে
পরাণে যেন বাজিয়া ওঠে
কানন-বেণু বাঁশী।
হতাশ মন বিবশ দেহ
তুলিতে নাহি পারি,
বক্ষ যেন চাপিয়া আছে
পাষাণ সম ভারী;
তাহারে তুমি স্বচ্ছ করে'
আলোকে তুলে ধরো,
প্রস্ফুটিত মুক্তদলে
গন্ধে তারে ভরো।

রাজনারায়ণ বসু

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

আজ আমি আপনাদের এই পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি, আপনাদেরও অভিনন্দিত করছি। আপনাদিগকে অভিনন্দিত করি, কারণ আপনারা এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে তিনটি সঙ্ঘ একত্র হ'তে পেরেছেন। আমাদের জাতীয় জীবনে দলাদলির বিষ যেভাবে সংক্রামিত হয়েছে ও হচ্ছে, তাতে ক'রে 'একলা চল রে' বলা ছাড়া উপায় নেই—মিলনের সুর, মিলনের গানকে দূরে রেখে বিচ্ছেদ বা বর্জনের ভাবকেই প্রধান ক'রে ধরতে হয়; জীবনে যেন আর কোনও কথা নেই। এমন যে সাহিত্যিকের জীবন, সাহিত্যচর্চা—সেখানেও নানা প্রকার দলগত ভেদের সৃষ্টি হয়ে আমাদের জাতীয় জীবনকে পঙ্কিল ক'রে তুলেছে। এই অবস্থায় আপনারা আজ তিনটি প্রতিষ্ঠান—বিদ্যাসাগর স্মৃতিসমিতি, মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষদ্, ও অত্রত্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ একত্র হয়ে স্বর্গীয় রাজনারায়ণের স্মৃতি পুনরুদ্দীপিত করতে চান, তাঁর নামে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে চান। আমাদের জাতীয় জীবন ও সাহিত্যজীবন, উভয় দিক্ হ'তেই এই লক্ষণ শুভ।

রাজনারায়ণ বাবুর নিকট আমাদের সমগ্র জাতি ঋণী; বিশেষ ক'রে বঙ্গদেশ, আরও বিশেষ ক'রে মেদিনীপুরবাসী। মেদিনীপুরে তিনি এসেছিলেন ইং ১৮৫১ সালে, আর একান্ত ভাবে ও অক্লান্ত যত্নে মেদিনীপুরের সেবা করেছিলেন ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত। শরীর নিতান্ত অচল হয়ে পড়ল ব'লেই তিনি মেদিনীপুর ছাড়তে বাধ্য হন। এই পনের-ষোল বৎসর তিনি মেদিনীপুরের সেবায় নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে রেখেছিলেন। প্রলোভন এসেছিল, আমাদের সকলেরই দৃষ্টি পড়ে থাকে রাজধানীর দিকে—কলকাতা না গেলে কি নাম-যশ, কি অর্থ, কি স্বাচ্ছন্দ্য, কি বৃহত্তর ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ-সুবিধা—কোনটিই সম্ভব হয় না। সাধারণতঃ মফঃস্বলবাসীরা শহরেদের কাছে একটু সঙ্কুচিত হয়ে থাকেন, প্রাদেশিক বা পাড়াগেঁয়ে হয়ে পড়ার ভয় আমাদের অনেকেরই আছে। এ-কথা যদি আজকের দিনে সত্য হয়, তবে তখনকার দিনে আরও সত্য ছিল। রাজনারায়ণ বাবু তখনকার দিনে ইন্‌কমটেক্সের এসেসর হ'তে পারতেন, তাঁর সমসাময়িক কলেজী বন্ধুরা অনেকেই তা হয়েছিলেন। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের ত কথাই নাই—তখনকার দিনে হাকিমী পদের মানমর্যাদা এখনকার তুলনায় নিশ্চয় অনেক বেশী ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করবার জন্যও তাঁর ডাক পড়েছিল. তবু তিনি যান নি, কারণ তিনি জীবনে ধ'রে নিয়েছিলেন কয়েকটি লক্ষ্য, যার সঙ্গে সংসারে প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের কোনও যোগ ছিল না—তাই সাধারণ লোকের সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাঁর মতের মিল হ'ত না। তাঁর ভাষায় বলি. "প্রিয় মেদিনীপুরের উন্নতি সাধন কার্য ছাড়িয়া যাইতে হইবে" এই চিন্তা ছিল তাঁর পক্ষে অসহ্য।

তাই মেদিনীপুরের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগ, হৃদয়ের যোগ, সাধনার যোগ, যে জন্য লোকে তাঁকে জানত মেদিনীপুরের রাজনারায়ণ বলে, তাঁর মাতৃভূমি বোড়াল বা ২৪ পরগণার কথা লোকে মনে করত না। অক্ষয়কুমার দত্ত মশায় তাঁকে একবার লিখেছিলেন—"আপনি মেদিনীপুর উজ্জ্বল করিয়া আছেন।" তাঁর সঙ্গে মেদিনীপুরের যে কি সম্পর্ক ছিল, তা এই কথায় স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, সুরাপান নিবারণী সভা, শিক্ষকতায় নবজীবনের প্রেরণা দান, সমাজে সবল ধর্মভাবের প্রবর্তন,—বহুমুখী প্রচেষ্টা, আন্তরিকতা ও প্রীতি দ্বারা তিনি যে স্থান অধিকার করেছিলেন, আজ প্রায় এক শতাব্দী হ'তে চলল তার স্মৃতি কিন্তু মেদিনীপুরের লোকদের মধ্যে এখনও উজ্জ্বল, আর তাঁর পঁচাত্তর-বৎসর-ব্যাপী জীবনে এই পনের-ষোল বৎসরের বিবরণী অমূল্য।

আজকার সভায় রাজনারায়ণ বাবুর জীবন-বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক ভাবে বলবার কোনও প্রয়োজন আছে ব'লে

মনে করি না। তিনি নিজেই তাঁর জীবনকথা বলে গেছেন। অবশ্য সে-কথা অসম্পূর্ণ, এবং তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই বলবার আছে। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিও বদলাচ্ছে, পরিপ্রেক্ষিত অনুসারে আমাদের বিচারেরও পরিবর্তন হচ্ছে। তাঁর মত লোকের সম্বন্ধে এ যুগে আমাদের ধারণাও বদলাবারই কথা। সেই দিক্ থেকে তাঁর জীবনী ও কার্যকলাপের কিছু আলোচনা করব।

তাঁর জীবন ছিল যাকে ইংরেজিতে বলা যায় planned life (পরিকল্পনা-অনুসারী জীবন)। তিনি জীবনে কি করতে চেয়েছিলেন, আর কি করতে পেরেছিলেন, তার সম্বন্ধে হিসাব ক'রে গেছেন।

বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের প্রথমেই, অর্থাৎ ইংরেজি ১৮২৬ সালে, তাঁর জন্ম। ১৮৪০-এ তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন, ১৮৪৬ সালে ব্রাহ্ম হন, ১৮৫১ সালে মেদিনীপুরে কর্ম গ্রহণ করেন, ১৮৬৬ পর্যন্ত ছিল মেদিনীপুরে কর্মস্থল তার পরে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর চিন্তা, বক্তৃতা, লেখা, আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে দেশ তাঁর সেবা পেয়েছিল। ১৮৯৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর তিন পোয়া কালই তিনি বেঁচে ছিলেন।

কলেজের ছাত্র যখন ছিলেন, তখন তাঁর মনে সাধ ছিল যে এক জন সুপণ্ডিত ও সুলেখক হবেন; "Science of National and Individual Happiness" ("জাতীয় ও ব্যক্তিগত সুখবিজ্ঞান") লিখবেন, একটি প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখবেন; সেই সঙ্গে লিখবেন "Universal History" (পৃথিবীর ইতিহাস), আর সংগ্রহ করবেন উৎকল দ্রাবিড় কর্ণাট মহারাষ্ট্র পরিভ্রমণ ক'রে চার বেদ ও প্রচলিত পুরাণ গ্রন্থ—এই ছিল তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা। এর কোনটিই তিনি করে যেতে পারেন নি, তবে এই তালিকা থেকে আমরা তাঁর রুচির আভাস পাই—হিন্দু কলেজের এক জন উৎকৃষ্ট ছাত্রের বিজ্ঞান ও ইতিহাস, ভারতীয় সংস্কৃতি ও ব্যষ্টি-সমষ্টি-দর্শনে অনুরাগের পরিচয় পাই, আর দেখতে পাই যে তিনি ছাত্রজীবনেও চেয়েছেন ফর্দ ক'রে অর্থাৎ স্পষ্ট ক'রে জীবনকে দেখতে। পরে আত্মচরিতে তিনি যখন জীবনের হিসেব-নিকেশ করেছেন সেখানে লিখেছেন—

"আমার জীবনে সম্পাদিত কাজের ফর্দ"র মধ্যে—ব্রাহ্মসমাজে প্রেমের ভাব প্রবেশ করানো, ধর্মবিজ্ঞানের সৃষ্টি, জাতীয় ভাবের উদ্বোধন, সমাজসংস্কার, হিন্দুমেলা-সংগঠন, কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলন, বিদ্বজ্জন-সমাগমের ব্যবস্থা। এ সমস্ত বিষয় আলোচনা করার পূর্বে এই কথাটির ওপরই আমি জোর দিতে চাই যে, তিনি জীবনকে একটা হিসেবের মধ্যে ফেলে গড়তে চেয়েছিলেন।

সর্বপ্রথম ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথাটা বলি। তাঁর আত্মচরিতে তিনি দাবি ক'রে বসেছেন যে,

"আমার বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজে প্রীতিভাব প্রথম সঞ্চারিত হয়, এই গৌরব বোধ হয় আমি দাওয়া করিতে পারি। আমি এইরূপ প্রীতিভাবের বক্তৃতা যে লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহার একটি কারণ আমার পারসী শিক্ষা। যে সময় ঐ সকল বক্তৃতা করা হইতেছিল সেই সময়ে আমার কোন মহামান্য ধার্মিক বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন, 'এই সকল বক্তৃতা ঈশ্বরের সঙ্গে অমৃত হইল' "

কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান, সমাজে এক নবযুগের সূচনা করে দেয়। রাজনারায়ণ বাবুর কথায় জানতে পারি,—"কেশববাবু আমার ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণবিষয়ক বক্তৃতা পাঠ করিয়াই ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেন।" তৃতীয়তঃ,—"সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়"—বাংলা ভাষায় এই বাক্যটি বসু-মহাশয়ের নামের সঙ্গে চিরকাল জড়িত থাকবে, কারণ তাঁকে সম্বোধন করেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এ-কথা বলেছিলেন। ভাইদের বিধবার সঙ্গে বিবাহ দেওয়ায় তাঁর মাতৃদেবী পর্যন্ত যখন তাঁকে প্রায় ত্যাগ করেন, তখন মহর্ষি তাঁকে এই কথা কয়টি লিখেছিলেন—

'এই ব্যাপারে যে গরল উপস্থিত হইবে তাহা তোমার কোমল মনকে অস্থির করিয়া ফেলিবে; কিন্তু সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়।"

চতুর্থতঃ, ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটি উৎকৃষ্ট উপাসনার উপদেশ রাজনারায়ণ বাবুর লেখা বলে দাবি করা যায়। তিনি বলেছিলেন, যখন তিনি প্রথম প্রথম বাংলা লেখেন, বাংলা সাহিত্যের সম্বন্ধে তখন তাঁর কোনও জ্ঞান ছিল না; রচনারও কোনও গুণ ছিল না, বাংলা তো তিনি তখন লিখতে জানতেন না, অন্য সাহিত্য জ্ঞানের জন্যই বাংলা

লিখতে পেরেছিলেন। কিন্তু রাজনারায়ণ বাবুর লেখায় তাঁর প্রাণশক্তির প্রাচুর্য এতখানি প্রকাশ পেত যে, শুধু ঐ গুণে তিনি তখনকার উপদেষ্টাদের মধ্যে প্রধান-আচার্যের পরেই স্থান পেতেন। ব্রাহ্মসমাজের দিক্ থেকে সাধুচিন্তা প্রচার করবার ও সমাজের ধর্মবুদ্ধি জাগ্রত রাখবার জন্য, রাজনারায়ণবাবুর মত পুরানো আচার্যদের উপদেশ সংগ্রহ ক'রে রাখবার সময় এসেছে কি না সে-কথা সমাজের নেতারা অবশ্য ভেবে দেখবেন। পঞ্চমতঃ, রাজনারায়ণ বাবুর জীবনে ও চরিত্রে সে-যুগের ব্রাহ্মসমাজের চিত্র কেমন স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়! যখন তিনি শারীরিক অসুস্থতার জন্য জীবনের বাকি কয়টা দিন দেওঘরে কাটাতে বাধ্য হন, তখন মহর্ষি ও তাঁর মধ্যে যে-সব পত্রের আদান-প্রদান চলেছিল, সেগুলি পড়তে গিয়ে সে-যুগের ছবি আমাদের সামনে আপনিই ভেসে ওঠে! ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮ অব্দের ১৩ই বৈশাখ তারিখের পত্রে বসু-মহাশয় মহর্ষিকে নিজ জীবনের অবশ্য-স্মরণীয় পাঁচটি মহাবাক্যের কথা জানাচ্ছেন, আর তার উত্তরে মহর্ষি লিখছেন,—

"আজ প্রাতঃকালে আমি বাগানের একটি চম্পক পুষ্পের আঘ্রাণ লইতেছিলাম ও হাফেজের এই শ্লোক গান করিতেছিলাম যে, হে প্রাতঃকালের সুগন্ধ সমীরণ আমার সেই প্রিয়বন্ধুর আবাসস্থল কোথায়? এমন সময় তোমার পত্র আমার হস্তগত হইল। আমি তাহাতে আমারই কথার সার পাইলাম।"

উভয়ের মধ্যে এমনি ক'রে চলত ভাবের আদান-প্রদান। এক জায়গায় দেখতে পাই, রাজনারায়ণ বাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ লঘুগম্ভীর ভাষায় guide, philosopher, friend ব'লে মহর্ষিকে বর্ণনা করেছেন। উভয়ের সম্বন্ধ গুরুশিষ্যের মত হ'লেও সমপ্রাণতা ছিল যথেষ্ট, আর সমপ্রাণতা থেকেই আসে সখ্যভাব। ধর্মপ্রাণতা তাঁকে গম্ভীর ক'রে তোলে নি, তাঁর প্রকৃতি ছিল খোলা, হাস্যমুখী। যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁরা একবাক্যে বলেছেন যে এত প্রাণখোলা হাসি আর খুব কমই দেখা গেছে। যেখানে যেখানে আমরা তাঁর পরিচয় পাই, সেখানেই দেখি তিনি চার দিকের মেঘ কাটিয়ে দিচ্ছেন, হাসির দ্বারা, কার্যের দ্বারা, সরস আলাপ-আলোচনার দ্বারা; উপনিষদের আনন্দলোক সর্বদা যেন তাঁকে ঘিরে রাখত। তিনি নিজে লিখেছেন, তাঁর প্রকৃত ধর্মজীবনের আরম্ভ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের ও উপদেশ প্রদানের অনেক পরে। কিন্তু আন্তরিকতা ও অকপটতা তাঁর শিরায় শিরায় মজ্জায় মজ্জায় ছিল। সত্য যদি ধর্মের সোপান হয়, তবে তিনি সেই সোপানে সর্বদা অধিরূঢ় ছিলেন; প্রীতি যদি ধর্ম হয়, তবে তিনি ধার্মিক ছিলেন; মনকে সংস্কারমুক্ত করতে চেষ্টা করা, যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা জীবনকে দেখা ও বুঝা, যদি ধর্মসাধনা হয়, তবে তিনি সাধক ছিলেন। হিন্দুত্ব তাঁর অতি প্রিয় ছিল বটে, কিন্তু বহু লোককে খুশী করার বা দলবৃদ্ধি করার জন্য তিনি সেরূপ ভাব পোষণ করেন নি। তাঁর অন্তরে ভক্তি ছিল সদাজাগ্রত। গল্প শুনেছি, তিনি যখন দেওঘরে নিতান্ত অসুস্থ, তখন তাঁর প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে এক জন উপস্থিত হয়ে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তাতে তিনি দুঃখিত হয়ে বলেন, "ভগবান্ কি আমায় কষ্টে রাখতে পারেন! তিনি যে এত দিন আমায় কত সুখে রেখে-ছিলেন সে সমস্ত কথা ভুলে গেলে কি চলে? নিশ্চয়ই সম্পদের সময় তাঁর কত দয়া পেয়েছি, সে-কথা ভুলে গিয়ে যত বিড়ম্বনা ভোগ করি।" এই ছিল বসু-মহাশয়ের ভাবনা, এই ছিল তাঁর ধর্মদৃষ্টি।

তখনকার দিনে লোকে বসু-মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করত। তিনি কলেজে পড়বার সময় কত বই লিখবেন ভেবেছিলেন, সে-কথা পূর্বে বলেছি। যা তিনি লিখেছেন তার পরিমাণ হয়তো বেশী নয়, কিন্তু তার বৈচিত্র্য বড় কমও নয়। মৌলিক রচনাতে তাঁর প্রাণের পরিচয় হয়তো আরও পাওয়া যেত। এক কালে তিনি বাংলা কবিতা লেখাও অভ্যাস করেছিলেন,—সমালোচনা করতে গেলে প্রয়োগ-বিজ্ঞানের সঙ্গে কিছু পরিচয় থাকা চাই। মধুসূদন তাঁর বাংলা কবিতা পড়ে মন্তব্য করেছেন—Good; if you go on practising you will succeed. ইংরেজিতেও তিনি কবিতা লিখতে পারতেন, তাঁর জামাতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষকে উদ্দেশ ক'রে যে চারিটি সনেট লিখেছিলেন তা আত্মচরিতে উদ্ধৃত করেছেন। ইংরেজি ভাল ক'রে জানা ছিল, বাংলা ভাষার সঙ্গে নাড়ীর যোগ ছিল, জোসেফ এডিসনের স্যর্ রোজার ডি কভার্লির লিখিত "আমার আত্মীয়

সভা* পড়ে দেখুন। প্রাচীন মিশর দেশ সম্বন্ধে, আর্য সভ্যতার সম্বন্ধে, চিকিৎসা সম্বন্ধে নানা প্রকার রচনা দিয়ে তিনি বাংলা ভাষার পুষ্টি ও সেবা করে গেছেন; ঈশ্বর গুপ্ত তাঁকে লক্ষ্য ক'রে একটু কটাক্ষ ক'রেই বলেছেন, "বেকন পড়িয়া করে বেদের সিদ্ধান্ত।" তবু কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে তিনি সাহিত্যচর্চা বেশী করতে পারেন নি। ধর্মচর্চা, শিক্ষকতা, সমাজসংস্কার, যা কি না তিনি ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করতেন,—তাঁকে সাহিত্য-চর্চায় বেশী সময় দেয় নি। তাহলেও তিনি বাংলা সাহিত্যের বিশেষ উপকার ক'রে গেছেন মধুসূদনকে সমালোচনা দ্বারা উৎসাহিত ও সতর্ক ক'রে। কোনও ইংরেজ কবি, ধনী লোকদের কাব্যরচনায় ব্যর্থ:চেষ্টার কথা-প্রসঙ্গে বলেছেন, তারা কেন কাব্য লিখে যশ অর্জন করতে চায়, তারা তো এমনি যশস্বী; তারা যদি সাহিত্যে অমরতা লাভ করতে চায়, তবে অন্যান্য ভাল কবি যাঁরা—যাঁরা সৎ কবি—তাঁদের সাহায্য করুক। বসু-মহাশয় যদি বাংলা সাহিত্যের আর কোনও চর্চা না করতেন, তাহলেও মধুসূদনের সারস্বত জীবনের সঙ্গে তাঁর যে নিগূঢ় সম্বন্ধ ঘটেছিল, তার দরুনই তিনি বঙ্গসাহিত্যে উচ্চস্থান অধিকার করে থাকবেন। অবশ্য বাংলা সাহিত্যের সমালোচক ও ঐতিহাসিক ব'লে পরিচিত হবার দাবি তাঁর আরও আছে। আমাদের আজকাল যে সমস্যা প্রকট, বাংলায় পাশ্চাত্য প্রভাব—সে-বিষয়েও তিনি আমাদের পূর্বাচার্য। "সেকাল আর একাল"-এ তাঁর এ-বিষয়ে সূচনা করা আছে। আবার সর্বপ্রথম ইংরেজি-শিক্ষিতদের দিক্ থেকে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিচার করেছেন, এবং সে-বিচার আধুনিক যুগ পর্যন্ত টেনে এনেছেন। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রস্তাবের সঙ্গে বসু-মহাশয়ের আলোচনা একত্র ক'রে তবে আমরা সাহিত্যের গতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারি।

বাল্যবন্ধুর রচনা "শর্মিষ্ঠা" পড়ে বসু-মহাশয় মেদিনীপুর থেকেই লিখেছিলেন, বইখানি

"In many places full of sterling poetry, and displays considerable knowledge of human nature";

আরও এক বৎসর পরে ব্যক্তিগত ঋণস্বীকার করে বলছেন—

"For some years past, I remained almost insensible to the charms of the Muse; but you have, in a certain degree, revived my old enthusiasm for poetry."

এ-কবিতা পড়া বা সমালোচনা করা তাঁর পক্ষেও নব-জাগরণ। বলছেন তিনি,

"I at times also involuntarily chant out favourite lines from your poems, which whenever I read I feel fresh pleasure."

সুতরাং মধুসূদনের কাব্য সম্বন্ধে লেখা তাঁর পক্ষেও প্রয়োজন ছিল। এক জনের পক্ষে আইন ব্যবসা চালান ও কাব্যরচনা এক সঙ্গে সম্ভব দেখে, তিনি উপহাসের মধ্য দিয়ে সবিস্ময়ে বলছেন—

My dear Madhu, your country does not know what an inestimable jewel you are.

মধুসূদনের দিক থেকেও এই উচ্ছ্বাস ছিল। মেঘনাদবধ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন তিনি লিখছেন,

O! That you were with me, my dear fellow! Wouldn't we sit together and read? Wouldn't we?

বাল্যসখিত্বের জন্য উভয়ের প্রীতি আরও বেড়ে উঠেছিল। উভয়ের রুচি, উভয়ের উৎসাহ, একজাতীয়, কে কোন্ কথা বলছেন, না ব'লে দিলে বুঝা কঠিন। তিলোত্তমা-সম্ভব সম্বন্ধে কে বলেছিলেন,

If Indra had spoken Bengalee, he would have spoken in the style of the Poem?

উভয়ের মধ্যে কে বলেছিলেন,

I would sooner reform the Poetry of my country than wear the imperial diadem of all the Russias?

রাজনারায়ণ বাবুর সমালোচনা দেখে যতীন্দ্রমোহন খুশী হয়ে বলেছিলেন, তখন তো সবই ইংরেজির তৌলে বিচার হ'ত—

If we had a few more readers of poetry like this gentleman, we could boast of something greater than what men in Milton's time were capable of doing,- that not only doth a genius live and breathe in our own time, but that he is fully appreciated by the "upper ten thousand" of his contemporaries.

এই হ'ল সমালোচকের কাজ।

রাজনারায়ণ বাবু মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সমালোচক। মধুসূদন একসময় কৃতজ্ঞভাবে বসু-মহাশয়কে লিখছেন—

You deserve my warmest thanks for encouraging me, for, you are decidedly, one of the "Representative Men" of the day, and your opinion may be fairly looked upon as an earnest of the future.... The appreciation of such scholars as yourself and about half a dozen

more in the city is a sure guarantee of the future fate of the poem......

অন্যত্র লিখেছেন,

Your opinion is better than the loud huzzas of a million of these fellows.

মেঘনাদবধ শেষ ক'রে বসু-মহাশয়কে পাঠাবার সময় মধুসূদন লিখছেন,—

There is no man whose opinion I value more than that of a certain Midnapur pedagogue.

রাজনারায়ণ বাবু তিলোত্তমাসম্ভবে যে-সব ত্রুটি দেখিয়েছিলেন, মধুসূদন তার জন্য সন্ত্রস্ত হয়ে বলেছেন—

Let that pass. You no doubt excuse many things in a fellow's first poem.

পদ্মাবতী পাঠিয়ে তিনি বন্ধুকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করছেন,—কেমন লাগল? I am very anxious to hear what you think of it.

এই প্রসঙ্গে পুরানো বন্ধুকে মর্যাদা দিয়ে তিনি আরও বলছেন—

An old friend whom I have at last learnt how to value.

তত্ত্ববোধিনীতে তিলোত্তমাসম্ভব সমালোচনা করার জন্য অনুরোধ ক'রে বলছেন—

That would be giving it a golly (jolly?) lift indeed.

সিংহলবিজয় কাব্য লিখবার যে পরামর্শ বসু-মহাশয় দিয়েছিলেন, মধুসূদন তা একেবারে ফেলে দেন নি, বলেছেন, I wish to preserve it for future use—ভবিষ্যতে ব্যবহার করবার জন্য রেখে দিয়েছি। কবি রঙ্গলালের কথায় মধুসূদন জানাচ্ছেন,

He is very proud of your approbation.

আর নিজের বেলায় তো কথাই নেই,—

My position, as a tremendous literary rebel, demands the consolation and the encouraging sympathy of friendship.

বন্ধুর সমালোচনার উপর তাঁর নির্ভর কম ছিল না; বলছেন, যদি দেখ যে মেঘনাদবধে কোনও গুণ নেই, তাহলে পুড়িয়ে ফেলব—তাতে আমার একটুও কষ্ট হবে না। মেঘনাদবধের প্রথম সর্গ ছাপাবার আগে রাজনারায়ণ বাবুর কাছে পাঠিয়ে মধুসূদন ভয়ে ভয়ে বলছেন,—

I need scarcely say that I shall look out with feverish anxiety to hear from you, and yet I should be sorry to hasten you. You must weigh every thought, every image, every expression, every line......

শুধু তাই নয়, রাজনারায়ণ বাবু তিলোত্তমাসম্ভবের যে সব ত্রুটিবিচ্যুতি দেখিয়েছিলেন, মধুসূদন যে সে-সমস্ত অভিযোগ মন দিয়ে পড়েছিলেন ও মেঘনাদবধ রচনায় সেই দিক্ দিয়ে সাবধান হয়েছিলেন, সে-কথাও এই পত্রে জানিয়েছিলেন।

দুই-একটা কথা অবশ্য এই প্রসঙ্গে জানতে ইচ্ছা করে। দুইজ-াই কাবারসিক, দুইজনাই বন্ধু, কিন্তু মধুসূদন বিলাত থেকে ফিরলে কাব্যচর্চা আর জমল কই? কেন জমল না? দুই জনেই তো বাংলা ভাষাকে এত দরদের সঙ্গে দেখেন, কিন্তু চিঠিপত্র ইংরেজিতে কেন? যা হোক্, আমরা রাজনারায়ণ বাবুকে মধুসূদনের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে যুক্ত দেখি, তাতে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রশংসা ও জ্ঞাতত্ব "প্রথম সমালোচক"ও দাবি করতে পারেন, তিনিই তো বলেছিলেন—যে-কথার আমরা আজও প্রতিধ্বনি করি—"মেঘনাদবধ বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্য।"

শুধু এই দিক্ দিয়ে দেখলেও জাতির স্মৃতিমন্দিরে থাকবার পক্ষে রাজনারায়ণ বাবুর দাবি প্রবল।

সাহিত্য ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে রাজনারায়ণ বাবুর চিন্তা এই সময়ে কাজ করছিল। ১৭৯৪ শকের ৩১শে ভাদ্র তারিখে তিনি এক বিখ্যাত বক্তৃতা করেন; সভাপতি ছিলেন মহর্ষি স্বয়ং। বক্তৃতাটিকে 'বিখ্যাত' বলেছি, কারণ "ন্যাশনাল পেপার" ও বিলাতের "টাইমস্" পত্রে এর প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে খুব আলোচনা হয়েছিল। এই বক্তৃতায় বসু-মহাশয় কতকগুলি কথা সূত্রাকারে সন্নিবেশিত ক'রে লোকের সামনে ধরেন। যেমন,ই ব্রহ্ম হিন্দুধর্মের মধ্যবিন্দু, ব্রহ্মোপাসনাই হিন্দুধর্ম। হিন্দুধর্ম কি, জানতে গেলে কি কি শাস্ত্র পড়া উচিত, তার উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন, হিন্দুধর্মে পৌত্তলিকতার যথেষ্ট নিন্দা পাওয়া যায়। সুতরাং হিন্দুধর্ম পৌত্তলিকতা-প্রধান নয়, ব্রহ্মোপাসনা-প্রধান। অদ্বৈতবাদও এর আত্মা নয়; শাস্ত্রবচন ও সাধারণের বিশ্বাস থেকে দেখা যায় যে দ্বৈতবাদীও হিন্দু, অদ্বৈতবাদীও হিন্দু। কঠোর তপস্যা কি সংসারত্যাগ হিন্দুর অবশ্যকরণীয় কর্ম নয়। 'হিন্দু-ধর্মে ত্যাগের কথা নেই,' 'পিতৃমাতৃভাবে সাধনা নেই',
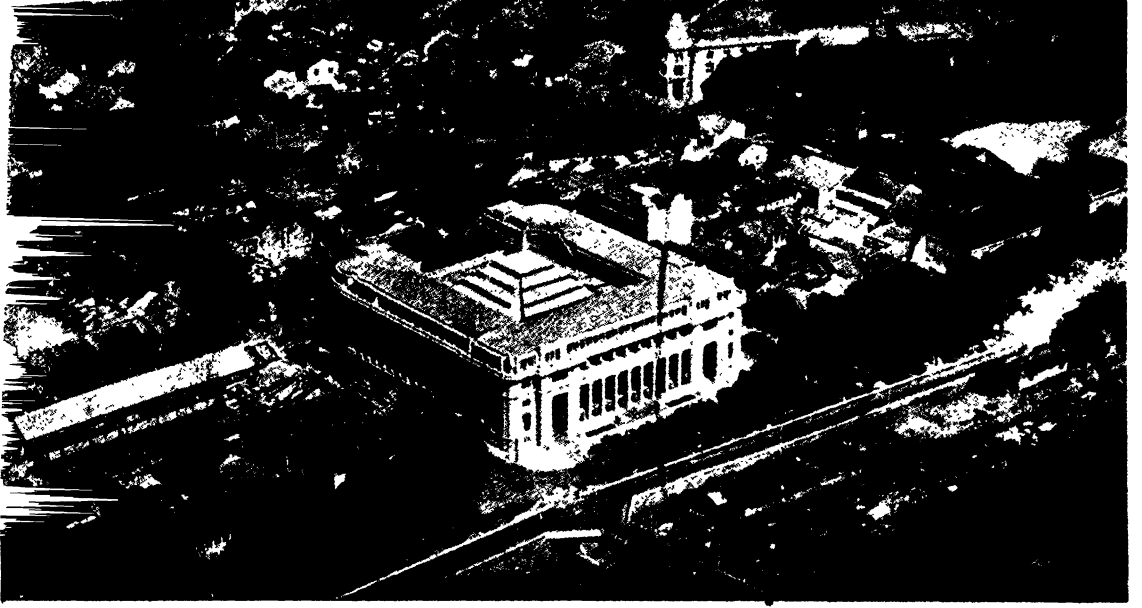
সাইগন ইন্দোচীন ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠান। এইটি সাইগনের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাচীন অঞ্চল

হুয়ে, আন্নাম। রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন অবগাহন-দীর্ঘিকা

সাইগন, নদীবন্দর। বন্দরের দুই পাশে চীনা বসতি।

কম্বোজের একটি গ্রামে ভুট্টা ছাড়াইয়া শস্য আহরণ চলিতেছে।

হুয়ে, আন্নাম। নিষিদ্ধ পুরী কিয়েনট্রুং প্রাসাদ—সাধারণের প্রবেশ নিষেধ
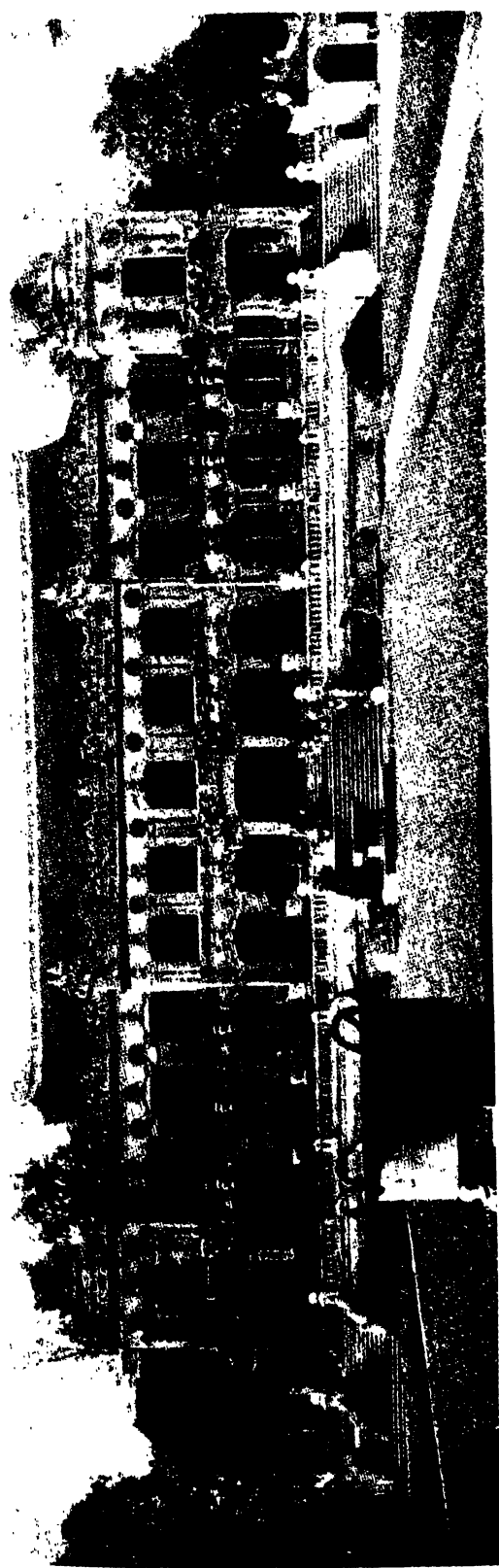
ন্হাট্রাং। নদীর বাঁধ—দূরে মাম মন্দিরের ভগ্নাবশেষ

আঙ্কোর-ভাটের মন্দিরের মধ্যাংশ

সাইগনের উদ্যানে সম্ভ্রান্ত কাম্বোজীয় মহিলা

'শত্রুর হিতসাধন নেই,'—এই সমস্ত অমূলক অপবাদ খণ্ডন ক'রে তিনি দেখিয়েছেন, সাধারণ হিন্দুধর্ম অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা কি কি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। তারপর দেখিয়েছেন, হিন্দুধর্মের উচ্চস্তর—জ্ঞানকাণ্ড—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা, আরও শ্রেষ্ঠ, এ ব্রহ্মোপাসনার নাম হিন্দুধর্মে সমর্থাধিকারীর ধর্ম। পুরাণ, তন্ত্র, বেদ, উপনিষৎ—নানা শাস্ত্র হ'তে শ্লোক সংগ্রহ ক'রে তিনি বইখানির প্রতিপাদ্য বিষয়ের গৌরব বাড়িয়েছেন। সভাপতির গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত ক'রে তিনি এই বক্তৃতায় বলেন, "ভারতবাসীদিগের ধর্ম বিষয়ে স্বাভাবিক অনুরাগ। এখানকার সকলে ধর্মকে যেমন পবিত্রভাবে দেখিতে পায়, সে পরিমাণে আর কোন দেশের লোকই পায় না।"

এই বক্তৃতার সময় তিনি যে তেজ ও আবেগের সঙ্গে কথাগুলি বলেছিলেন, আজও আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে তা প্রবেশ করবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"হিন্দু নাম কি মনোহর! এ নাম কি কখন আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি? এই নাম ঐন্দ্রজালিক প্রভাব ধারণ করে। এই নামদ্বারা সমস্ত হিন্দুগণ ভ্রাতৃসূত্রে সম্বদ্ধ হইবে। এই নাম দ্বারা বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, রাজপুত, মারহাট্টা, মান্দ্রাজী, সমস্ত হিন্দু ধর্মে একহৃদয় হইবে। তাহাদিগের সকলের এক প্রকার উন্নত কামনা হইবে, সকল প্রকার স্বাধীনতা লাভ জন্য তাহাদের সমবেত চেষ্টা হইবে। অতএব যে পর্যন্ত আর্য শোণিতের শেষ বিন্দু আমাদিগের শিরায় প্রবাহিত হইবে, আমরা এ নাম পরিত্যাগ করিব না। আমরা হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু নাম পরিত্যাগ করিয়া কি ক্রীতদাসের ন্যায় অন্য জাতির অনুসরণ করিব? ... হিন্দুজাতির ভিতরে এখনও এমন সার আছে যে তাহার বলে তাহারা আপনাদিগের উন্নতি আপনারাই সাধন করিবে।... আমরা তো রাজ্যবিষয়ে স্বাধীনতাভ্রষ্ট হইয়াছি, আবার কি সামাজিক রীতিনীতি বিষয়েও স্বাধীনতা হারাইতে হইবে?"

মিলটন 'ইংরেজ জাতি ভবিষ্যতে বড় হবে' এই স্বপ্ন দেখেছিলেন, রাজনারায়ণ বাবুও ঠিক হিন্দুজাতির পুনরভ্যুদয় সম্বন্ধে তেমনই স্বপ্ন দেখেছিলেন, এবং 'হোক ভারতের জয়' এই গান দিয়ে সেদিন বক্তৃতা শেষ করেন। তাঁর কথায় সেদিন উদ্দীপনা ছিল, প্রেরণা ছিল।

হিন্দু-জাগরণ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বাবু যে-সব কথা বলেছিলেন, আজ তা আমাদের অতি নিকটে এসে পড়েছে। পরবর্তী কালে তিনি 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' ছাপিয়ে প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকা আমি সকলকে পড়ে দেখতে অনুরোধ করি, পড়লে সকলেই স্বীকার করবেন যে বসু-মহাশয় ছিলেন প্রফেট্ বা ভবিষ্যদ্বক্তা। মহাহিন্দু সমিতি নামে তিনি এক মহাসমিতি স্থাপনের প্রস্তাব করেছেন এই পুস্তিকায়। হিন্দুদের ধর্ম সম্বন্ধে স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করা, জাতীয় ভাব উদ্দীপন করা, এবং সাধারণতঃ হিন্দুদের উন্নতিসাধন করা, এই হ'ল গিয়ে সমিতির উদ্দেশ্য। হিন্দুকে হিন্দুত্ব কিসের উপর নির্ভর করে, তা তিনি বিচার করেছেন—আর তাঁর বিচারের সূত্র ছিল এই,—**"আমরা যতই লইব ততই বাঁচিব, আর যতই ছাঁটিব ততই মরিব।"** 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতম্'—এই হবে সে হিন্দুসমিতির মন্ত্র—প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক নগরে শাখাসমিতি চাই। তার কার্যকলাপ কি ভাবে চলবে, সে সম্বন্ধে তিনি এক অনুষ্ঠানপত্র প্রস্তুত করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানপত্রই ছিল 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা'। এই অনুষ্ঠানপত্রের দুইটি প্রস্তাব আপনাদের সামনে পড়ব; আমি আশা করি, সে দুটি প্রস্তাব শুনলে রাজনারায়ণ বাবুকে 'প্রফেট'দের মধ্যে গণ্য করতে আপনাদের কিছুমাত্র আপত্তি থাকবে না।

প্রথম,

"মহাহিন্দুসমিতি আপনাদিগের অধীনে নানাস্থানে সংস্কৃত বিদ্যালয় ও সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য একটি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবেন।"

তাহলে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা (অবশ্য পরিবর্তন ক'রে) তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন।

দ্বিতীয়,

"মহাসভার কার্য হিন্দিভাষায় সম্পাদিত হইবে; ইহা ভরসা করা যায় যে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর যে সকল লোক হিন্দি ভাষা জানে না তাহারা মহাসভায় যোগ দিবার জন্য হিন্দি ভাষা শিক্ষা করিবে।"

অর্থাৎ হিন্দি যে ভারতবর্ষের হিন্দুদের মধ্যে অন্ততঃ সাধারণ ভাষা, পরস্পর আদান-প্রদানের ভাষা হবে, সে বিষয়ে তাঁর কোনও সংশয় ছিল না। অন্যত্র অনুষ্ঠান-

পত্রেরই এক জায়গায় তিনি এই মত আরও পরিষ্কার করে বলেছেন যে—

"মহাহিন্দুসমিতির সভ্যেরা যাহাতে ভারতবর্ষের সকল স্থানের সভ্যগণ হিন্দি ভাষা ও দেবনাগর অক্ষর অবলম্বন করিয়া পরস্পর পত্র লিখেন ও আলাপ করেন, সর্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করবেন। এইরূপ আলাপের জন্য বিদেশীয় অর্থাৎ ইংরাজি ভাষার সাহায্যে লওয়া স্বদেশপ্রেমী হিন্দুদিগের পক্ষে লজ্জার বিষয়। বঙ্গদেশে ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে যেখানকার প্রচলিত ভাষা হিন্দী নহে, তথাকার সভ্যদিগের উক্ত কার্য সাধন জন্য হিন্দি শিক্ষা কর্তব্য। যে পর্যন্ত না তাঁহারা হিন্দী শিখেন ইংরাজি ভাষা অগত্যা উক্ত আলাপের উপায় হইবে।"

আজকাল যাঁরা হিন্দু সংগঠন বা হিন্দু মহাসভার কার্যে আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদিগকে আমি অনুরোধ করি, রাজনারায়ণ বাবুর এই দিকটা তাঁরা একবার আলোচনা ক'রে দেখুন। আমি নিশ্চয় বলতে পারি যে তাঁরা স্বীকার করবেন, রাজনারায়ণ বাবু এ বিষয়ে ছিলেন "প্রফেট", এবং তাঁর ভাব তখনকার দিনে কতখানি এগিয়ে ছিল। আমি তাঁকে representative, প্রতিনিধি বলতে পারি, তবে তিনি বরাবরই ছিলেন advance guardএর, অগ্রবর্তী যোদ্ধাদের মধ্যে। তিনি ৪০।৪৫ বৎসর এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন; তাঁর হিন্দুত্ব static, স্থাণু ছিল না—ছিল dynamic—গতিশীল—সক্রিয়। সে হিন্দুত্ব ছিল জাতীয়তার ভাবে পরিপূর্ণ।

এদিক দিয়েও তিনি অনেকখানি এগিয়ে ছিলেন। তাঁর জাতীয়তার মূল ছিল বাঙালীত্বে; তিনি বলেছেন,

"আমার ধাতু বরাবর গাঢ় বাঙালীতর; আমার কলেজী শিক্ষায় ইহার উপর পাশ্চাত্য সভ্যতা জোর করিয়া আরোপ করিয়াছিল মাত্র, কলমের ন্যায় উহা আমার প্রকৃতির উপর গাঢ়রূপে বসে নাই।"

কিন্তু এই বাঙালীত্ব তাঁকে সংকীর্ণহৃদয় করে নি। আমি ইতিপূর্বে দেখিয়েছি যে তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আলাপ-আলোচনার জন্য হিন্দি ভাষা ও নাগরী লিপি সমর্থন করে গেছেন। তবু "সেকাল আর একাল" আলোচনায় 'বাঙালীর জয় হোক' এই প্রার্থনা ক'রেই তিনি শেষ করেছেন। "সেকাল আর একাল"-এর বিজ্ঞাপনের কথা মনে করে দেখুন।

"ইংরাজী শিক্ষার ইষ্ট বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে, তাহা হইতে যে সকল অনিষ্ট উৎপত্তি হইতেছে, এতদ্বিষয়ে কেহ প্রবন্ধ লেখেন নাই, আমি সে বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি, পূর্বে আমার এইরূপ মানস ছিল।"

তাঁর জাতীয়তা এইভাবে শুধু cultural বা সংস্কৃতিগত যে ছিল তা নয়; তার চেয়ে ব্যাপক ছিল। ১৮৬৫ সালে Prospectus of a Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal নাম দিয়ে বসু-মহাশয় একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে দিয়ে তার বাংলা অনুবাদও করান। এই পুস্তিকা পড়েই নবগোপাল মিত্র উদ্যোগী হয়ে হিন্দু মেলা ও জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন। পুস্তিকায় যে 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা'র কথা কল্পনা করা হয়েছে, সেই সভায় ব্যায়াম, সংগীতশিক্ষা, বাংলা ভাষার ভিতর দিয়ে শিক্ষা, বাংলা শিক্ষা, দেশী পোষাক, দেশী খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতির সম্বন্ধে ব্যবস্থা থাকবে। ধর্ম ও রাজনীতির চর্চার ভার তিনি ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষীয় সভা বা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশুনের উপর দিতে চেয়েছিলেন, যখন এই পুস্তিকা লেখা হয়, কংগ্রেস তখনও দেশে শিকড় গাড়তে পারে নি। বন্দেমাতরম্ গানের মর্যাদা তিনি বুঝেছিলেন, তাকে জাতীয় সংগীতের প্রথমে বসিয়েছিলেন, সেই সময়ে আর কেউ বন্দেমাতরমের মূল্য বুঝতে পেরেছিলেন কি না সন্দেহ। আমরা ন্যাশনাল নবগোপাল বলে যদি গৌরব করে থাকি, তবে রাজনারায়ণ বাবুকে আরও ন্যাশনাল বলতে হয়; তাঁর ভাব নিয়েই নবগোপাল বাবু কর্মে লেগে যান। জাতীয় সভা বা ন্যাশন্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হ'লে তার সামনে রাজনারায়ণ বাবু অন্ততঃ দুইটি প্রধান বক্তৃতা করেন—'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' আর 'সেকাল আর একাল'। এই দুইটি বক্তৃতার জন্য লোকে জাতীয় সভার কথা মনে করবে।

রাজনারায়ণ বাবু দেশকে চিনতেন; তরুণ যৌবনে ভ্রমণ

ক'রে দেশের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। একবার বিখ্যাত রামগোপাল ঘোষের সঙ্গে স্টীমারে, আবার মহর্ষির সঙ্গে ১৮৪৬, ১৮৪৭, ১৮৪৯ সালে পুজোর সময় নৌকোয় ক'রে দেশের অনেক জায়গায় গিয়েছিলেন এবং অনেক কিছু দেখেছিলেন। সুতরাং দেশের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল আমাদের চেয়ে বেশী। তাঁর কথা ছিল, "আমরা যদি জাতীয় ভাব হারাই, তাহা হইলে অগ্রগণ্যপদ লাভ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই।" মুসলমানদের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র অপ্রীতি ছিল না। যখন মেদিনীপুরের লোকেরা ১৮৬৬ সালের পর বুঝতে পারলেন যে তিনি আর মেদিনীপুরে থাকতে পারবেন না, তাঁর শারীরিক অপটুতাই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল, তখন তাঁরা বসু-মহাশয়কে এক পত্রে তাঁদের কৃতজ্ঞ মনোভাব জানিয়েছিলেন। এই পত্রের স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে এক জন মুসলমান ভদ্রলোকও ছিলেন। মুসলমানদের সম্বন্ধে তিনি আর এক জায়গায় বলেছেন,

"যখন আমরা এক দেশবাসী ও এক রাজার অধীন, তখন তাঁহাদিগের সহিত অন্য ঐক্য না হউক, রাজনৈতিক ঐক্য অবশ্য হইতে পারে।...এই সূচনাপত্রের প্রণেতা হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্যের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী।"

কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর প্রস্তাবিত মহাহিন্দুসমিতির কি সম্বন্ধ থাকবে সে বিষয়ে তিনি বলে গেছেন—

"জাতিসাধারণ মহাসমিতি (National Congress) যাহা বৎসর বৎসর কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে হইতেছে, সেই মহাসমিতিতে মহা হিন্দুসমিতির মহানাগরিকশাখাসকল প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন। সেই সকল প্রতিনিধি তথায় আমাদিগের মুসলমান ভ্রাতাদিগের সহিত একত্র কার্য করিবেন।"

রাজনারায়ণ বাবুর দৃষ্টি ছিল উদার, তিনি সর্বদা ভেবে এসেছেন সামঞ্জস্যের কথা, সব দিকে মন দেওয়ার কথা। মহর্ষির প্রিয় শিষ্য ও অনুগত সঙ্গী,—তাঁকে বাদ দিয়ে সেকালের ব্রাহ্মসমাজের কথা ভাবা যায় না; মধুসূদনের বন্ধু ও সমালোচক, তাঁকে বাদ দিয়ে আধুনিক যুগের বঙ্গসাহিত্যের কথা মনে করতে পারি না; সুরাপান নিবারিণী সভার সংস্থাপক ও বিধবাবিবাহাদি সমাজ সংস্কারে অগ্রণী, সেই সংস্কার যুগের তিনি এক জন বিশিষ্ট কর্মী; জাতীয় ভাবে বিশ্বাসী, হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক ছিলেন তিনি, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, এঁরাও তাঁর সংস্পর্শে কি আসেন নি? তাঁর মৃত্যুতে তাঁর দৌহিত্র শ্রীঅরবিন্দের সনেটের প্রথম কয়েকটি চরণ মনে পড়ে—

Not in annihilation lost, nor given
To darkness art thou fled from us and light,
O strong and sentient spirit; no mere heaven
Of ancient joys, no silence eremite
Received thee; but the Omnipresent Thought
Of which thou wast a part, and earthly hour,
Took back its gift.

রাজনারায়ণ বাবুকে আরও ভাল ক'রে জানতে ইচ্ছা হয়। এখনও এমন অনেক লোক পাওয়া যায় যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, একত্র আলাপ-আলোচনা করেছেন। তাঁদের স্মৃতিকথা সংগ্রহ ক'রে ও তাঁর চিঠিপত্র ও বিভিন্ন রচনার সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচিত হ'লে বাংলা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি হবে।

[মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসু স্মৃতিসভায় সভাপতির অভিভাষণ]

পৃথিবীর স্তব

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

মাতার সমান পূজ্য আর কেহ নাই। তাঁহারই গর্ভে আমাদের জন্ম, তাঁহারই কোলে আমরা মানুষ। মাতার দেহ দিয়াই আমাদের দেহ, মাতার প্রাণরসেই আমাদের পোষণ, মায়ের স্নেহেই আমাদের চরম সার্থকতা। এই মাতৃঋণ আমাদের কখনও শোধ হইবার নহে।

প্রায় চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে যখন বৈদিক ঋষিরা দেবতা ও স্বর্গের স্তবগানেই নিবদ্ধ তখন আথর্বণ ঋষি এক অপূর্ব্ব সত্য ঘোষণা করিলেন। তিনি বলিলেন, "কেন কল্পিত স্বর্গ ও দেবতাদের স্তব গান করিয়া বৃথা মরিতেছ? তোমার নিকটে তোমারই পায়ের নীচে এই যে পৃথিবী, ইনিই তো যথার্থ মাতা। এই মাতা তো মিথ্যা বা কৃত্রিম নন। ইনি পরম সত্য পরম আশ্রয়। ইহাঁকে উপেক্ষা করিয়া স্বর্গের জন্য যে ব্যাকুলতা তাহার কোনই অর্থ নাই।"

"আমাদের মাতা অপেক্ষাও পৃথিবী অধিকতর মাতা! পৃথিবী আমাদের মাতৃতমা। মায়ের ঋণই তো শোধ হয় না, পৃথিবীর কাছে আমরা যে আরও ঋণী। পৃথিবী-মাতার কোলেই আমাদের জন্ম। যত বড়ই হই না কেন এই মায়ের কোলের বাহিরে যাওয়ার উপায় নাই। পৃথিবী-মাতার স্তন্যরস যে অন্ন, তাহাই আমাদের শেষ দিন পর্য্যন্ত সাথী। পৃথিবী-মাতার স্নেহের অন্ত নাই, ইহাঁর ঋণ অপরিশোধনীয়।"

এই সব কারণেই আথর্বণ ঋষিরা স্বর্গের পরিবর্ত্তে পৃথিবীর মহিমা গান করিলেন, (অথর্ব ১২,১) দেবতার পরিবর্ত্তে মানুষের মহত্ত্বের স্তব গান (অথর্ব, ১০,২; ১১,৮) করিলেন। মানবের কামনা আকাজ্ক্ষা প্রেমপ্রীতি তাঁহারা একটুও উপেক্ষণীয় মনে করিলেন না।

হাজার হাজার বৎসর পূর্বে তাঁহাদের উচ্চারিত এই সব পৃথিবীর স্তব আজও পুরাতন হইল না। এই স্তব কখনও পুরাতন ও জীর্ণ হইবার নহে। মানব-ইতিহাসে দেখা যায় এই পৃথিবী-মাতার সঙ্গে যাঁহাদের যত গভীর যোগ ততই তাঁহাদের শ্রীবৃদ্ধি। মায়ের স্তন্যরসবঞ্চিত শিশু যেমন কোনমতেই পুষ্ট হয় না তেমনি যে-সব জাতির পৃথিবীর সঙ্গে যোগ শিথিল হইয়া আসে সে সব জাতি ক্রমেই সকল সম্পদ হইতে ভ্রষ্ট হইতে থাকে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের আখ্যানের মধ্যে দেখা যায় সকল জ্ঞানের আধারও এই পৃথিবী। এই পৃথিবী-মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরুও আর কেহ নাই। এই গুরুর কাছেই দীক্ষা পাইয়া ঐতরেয় ঋষি বিশ্বচরাচরের গভীরতম রহস্যে ও সকল জ্ঞানে নিষ্ণাত হইয়াছিলেন।

মানুষেরা দেবতার ও স্বর্গেরই পূজা করেন, সেই জন্য যাগ-যজ্ঞ ও উৎসবের আর অন্ত নাই; আথর্বণ ঋষির মত আমরা পৃথিবী-মাতার পূজা করিব। পৃথিবী-মাতার ঋণ কখনও শোধ হইবে না। তবু তাঁহার স্নেহের জয়গান আমরা করিব। মায়ের স্নেহের জয়গানই আমাদের মহামহোৎসব। এই মহাযজ্ঞে আমরা আমাদের মায়ের সঙ্গে যোগের সেই সব প্রাচীন ও গভীর বাণীই ধ্বনিত করিয়া তুলিব। অতি পুরাতন অথচ নিত্য নবীন সেই সব মন্ত্রই আজ আমাদের কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠুক।

"হে মাতা পৃথিবি, তোমারই কোলে জন্মিয়া মানুষ তোমাতেই বিচরণ করে। সর্ব্ববিধ প্রাণীকে তুমিই কর ধারণ ও পালন।"

> ত্বজ্জাতা ত্বয়ি চরন্তি মর্ত্ত্যাস্
>
> ত্বং বিভর্ষি দ্বিপদস্ত্বং চতুষ্পদঃ।

"এই যে পঞ্চ মানব (নানা জাতীয় লোক) যাহাদের জন্য উদীয়মান সূর্য্য জ্যোতির দ্বারা অমৃত দান করে, তাহারা হে পৃথিবি তোমারই সন্তান।"

তরেমে পৃথিবি পঞ্চ মানবাঃ যেভ্যো জ্যোতিরমৃতং মর্ত্যেভ্য
উদ্যন্‌ৎ সূর্য্যো রশ্মিভি রাতনোতি।

"এই পৃথিবীও পূর্ব্বে এক সময় অর্ণবের উপর চঞ্চল সলিলরূপে লীলায়িত ছিলেন, মনীষীরা নানা মায়ায় (উপায়ে) তাঁহাকেই অনুসরণ করিয়াছেন, সত্যে সমাবৃত তাঁহারই অমৃত-হৃদয় বিরাজিত পরম ব্যোমে।"

যার্ণবেধি সলিলমগ্র আসীদ্
যাং মায়াভিরন্বচরন্ মণীষিণঃ।
যস্যা হৃদয়ং পরমে ব্যোমন্
ৎ সত্যেনাবৃতমমৃতং পৃথিব্যাঃ।

"মহান্ তোমার বেগ মহান্ তোমার এজথু ও বেপথু, আবার তুমিই (এখন) মহা আবাসস্থান ও মহতী হইয়াছ।"

মহৎ সধস্থং মহতী বভূবিথ
মহান্ বেগ এজথুর্বেপথুষ্টে।

"অশ্ব যেমন করিয়া ঝাড়িয়া ফেলে তাহার গায়ের ধুলা তেমন করিয়া এই পৃথিবী কালে কালে কত জনগণকেই ফেলিয়াছে ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া!"

অশ্ব ইব রজো দুধুবে বি তান্ জনান্
য আক্ষিয়ন্ পৃথিবীং যাদজায়ত॥

সেই প্রবল এজথু ও বেপথু পৃথিবীর আজও সমাপ্ত হয় নাই, তবু এখন পৃথিবী ধর্মে ও কল্যাণ-বিধিতে নিয়ন্ত্রিত।

"ধর্মের দ্বারা ধৃত বলিয়াই আজ পৃথিবী ধ্রুবা। তাই আমরা এই কল্যাণময়ী আনন্দময়ী পৃথিবীকে নিত্য সর্বভাবে সর্বত্র অনুবয়ণ করিতে পারি।"

ধ্রুবাং ভূমিং পৃথিবীং ধর্মণা ধৃতাম্।
শিবাং স্যোনাম্ অনুচরেম বিশ্বহা।

"সত্য বিরাট, ঋত উগ্র দীক্ষা, তপ ব্রহ্ম ও যজ্ঞ সবাই এই পৃথিবীকে আছে ধারণ করিয়া। সেই পৃথিবীই ভূত ও ভবিষ্যতের নিয়ন্ত্রী, তিনি আমাদের লোককে বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত করুন।"

সত্যং বৃহদৃতমুগ্রং দীক্ষা তপো
ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তি।
সা নো ভূতস্য ভব্যস্য পত্ন্য
উরু লোকং পৃথিবী নঃ কৃণোতু।

"সেই তুমি, হে পৃথিবি, আমাকে হিরণ্যের মত কর দীপ্যমান্, আমাকে যেন কেহ বিদ্বেষ না করে।"

সা নো ভূমে প্ররোচয় হিরণ্যস্যেব সংদৃশি
মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন।

"আমাকে তুমি পশ্চাতে ঠেলিয়া রাখিও না, ঊর্দ্ধদিকে ঠেলিয়া তুলিও না, নীচুতেও ঠেলিয়া ফেলিও না।"

মা নঃ পশ্চান্ মা পুরস্তান্
নুদিষ্ঠা মোত্তরাদধরাদুত॥

"হে সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী মাতা, তুমিই সকলকে পালন কর, তোমার কোলেই সকলের আশ্রয়, তোমার ঐ সোনার বরণ বুকের মাঝেই এই সংসারের সুখের বাসা।"

বিশ্বংভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা
হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশনী

"যাহা কিছু এই সংসারে গতিমান ও প্রাণবান সকলকেই সর্বভাবে ধারণ ও পোষণ করেন সেই মাতা।"

যা বিভর্তি বহুধা প্রাণদ্ এজৎ।

আপন সন্তানগণের জন্যই তিনি, "নানাশক্তিযুক্ত নানা-বিধ শস্য তিনি করেন ধারণ ও পোষণ।"

নানাবীর্য্যা ওষধীর্যা বিভর্তি।

হে মাতা পৃথিবি, তুমি ইচ্ছা করিলে বিনা ক্লেশেই তোমার সন্তানকে অন্ন-পানের দ্বারা পুষ্ট করিতে পারিতে। কিন্তু তাহাতে তোমার সন্তানের পক্ষেই অগৌরব হইবে বুঝিয়া তুমি তাহাদিগকে ঘরের কোণে আবদ্ধ না রাখিয়া নানা দেশে নানাবিধ কৃচ্ছ্রতার মধ্যে দিয়াছ বিস্তৃত করিয়া।

আপন সন্তানগণকে কঠোর তপস্যায় দীক্ষিত করিয়া ধন্য ও সার্থক করিবার জন্যই তুমি তাহাদিগকে যেন নিজ নিজ জীবিকার জন্য নানা দুঃখের মধ্যে নানা দেশে দিয়াছ বিস্তীর্ণ করিয়া! হে কামদুঘা, ঐশ্বর্য্যের ত তোমার অভাব নাই। শুধু আপন সন্তানগণের কল্যাণের জন্যই তোমার প্রেমে এই কঠিন বিধান। ইহাতেই বুঝা যায় তোমার প্রেমে কি মহত্ত্ব কি গভীরতা!

"কামদুঘা হইলেও তুমি আপন সন্তানগণকে প্রশস্ত করিবার জন্যই বীজের মত নানা দিকে দিয়াছ ছড়াইয়া।"

ত্বম্ অসি আবপনী জনানাং
কামদুঘা প্রপ্রথানা।

"দেশে দেশে মানুষের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম। যেখানে যেমনটি করিলে ভাল হয় সেখানে ঠিক তেমন

ভাবে সমান স্নেহে সকলকেই তুমি আপন কোলে লইয়া করিতেছ পালন।"

জনং বিভ্রতী বহুধা বিবাচসং
নানা ধর্মাণং পৃথিবীং যথৌকসম্।

এক দিকে কঠোর তপস্যায় তুমি তোমার সন্তানদের চাও দীক্ষিত করিতে, অন্য দিকে প্রত্যেককে তুমি দিতে চাও যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা। ইহাতেই বুঝা যায় তোমার প্রেমের গভীরতার ও মহত্ত্বের তুলনা নাই।

"প্রতি জনের জন্য তোমার ভিন্ন পথ, কত যে তোমার পথ তাহারও নাই শেষ।"

যে তে পন্থানো বহবো জনায়নাঃ।

তাই, "তোমার বিস্তৃত ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষ আমাকে উদার প্রশস্ত করিতেছে।"

দ্যৌশ্চ ম ইদং পৃথিবী চান্তরীক্ষং চ মে ব্যচঃ।

এক দিকে পৃথিবী মাতার উদারতার আর অন্ত নাই, যেখানে তিনি স্বাধীনতা দেন সেখানে তিনি পরিপূর্ণ ভাবেই দেন। আবার অন্য দিকে তিনি নিয়মের কঠিন বন্ধনে বদ্ধ। কঠোর নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়াই তিনি ধ্রুবা। তাই এই পৃথিবী সকল কল্যাণ ও আনন্দের আধার, তাই সকলের পক্ষে তিনি অভয় প্রতিষ্ঠা।

এমন মায়ের পুত্র হওয়ার মধ্যে শুধু তো গৌরব নহে ইহার দায়িত্বও রহিয়াছে অপরিসীম। ইহা যেন না ভুলিয়া যান তাই ঋষি বার বার জপ করিতেছেন,

"ভূমি আমার মাতা, উদার প্রশস্ত পৃথিবীর আমি পুত্র।"

মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ।

অরুণ-রৌদ্র-বসনা মায়ের রূপখানি বাহিরে দীপ্ত অগ্নিময়, কিন্তু মায়ের হৃদয়খানি কি শ্যামল প্রাণ-শোভায় ভরপুর! তাই পৃথিবী আমাদিগকে এক দিকে দেন দীপ্তি অন্য দিকে দেন পরিপূর্ণ যোগ্যতা।

"অগ্নিবসনা পৃথিবী, শ্যামবর্ণ তাঁহার কোলখানি। তিনি আমাকে দীপ্তিমান্ ও সংশিত (সম্পূর্ণ উপযুক্ত, ধন্য) করুন।"

অগ্নিবাসাঃ পৃথিব্যসিতজ্ঞুস্
ত্বিষীমন্তং সংশিতং মা কৃণোতু।

"এই পৃথিবীর বুকের উপরে পরিচরণশীল ধারা সমান ভাবে অহোরাত্র অপ্রমাদে চলিয়াছে ঝরিয়া।"

যস্যামাপঃ পরিচরাঃ সমানী
রহোরাত্রে অপ্রমাদং ক্ষরন্তি।

"তোমার সকল গিরি, তোমার হিমবান্ সব পর্বত, তোমার সব অরণ্য, হে পৃথিবী (আমার পক্ষে) আনন্দময় হউক।"

গিরয়স্তে পর্বতা হিমবন্তো-
রণ্যং তে পৃথিবি স্যোনমস্তু।

"যে গন্ধ তোমার মধ্যে সমুদ্ভূত, তোমার ওষধি তোমার জল যে গন্ধকে ধারণ করে, তোমার যে গন্ধ পদ্মের মধ্যে সমাবিষ্ট, তাহার দ্বারা তুমি আমাকে সুরভিত কর।"

যস্তে গন্ধঃ পৃথিবি সংবভূব
যং বিভ্রত্যোষধয়ো যমাপঃ।
যস্তে গন্ধঃ পুষ্করমাবিবেশ
তেন মাং সুরভিং কৃণু।

আমি আজ যাহা বলিতেছি তাহা মধুময় বলিতেছি, যাহা দেখিতেছি তাহাই আজ আমাকে ভাল বাসিতেছে।

যদ্ বদামি মধুমৎ তদ্ বদামি
যদ্ ঈক্ষে তদ্ বনন্তি মা।

"হে পৃথিবি, তোমার স্নেহবদ্ধ সূর্য্যের সঙ্গে তোমাকে যতকাল যুক্ত দেখি, ততকাল যেন বৎসরের পর বৎসর আমার দৃষ্টি কখনও শ্রান্ত ম্লান বা নীরস না হয়।"

যাবৎ তেভি বিপশ্যামি ভূমে সূর্য্যেণ মেদিনা।
তাবন্ মে চক্ষুর্মা মেষ্টোত্তরামুত্তরাং সমাম্।

"তোমার অন্তরস্থিত মধুময় প্রীতি আমার জন্য দুগ্ধের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠুক।"

সা নো মধু প্রিয়ং দুহাম্।

"পুত্রের জন্য মায়ের দুগ্ধধারার মত পৃথিবীর স্নেহধারা আমার জন্য প্রবাহিত হউক।"

সা নো ভূমি র্বিসৃজতাং মাতা পুত্রায় মে পয়ঃ।

"বাণীর মধ্যে যে মধু, হে পৃথিবি, চিরদিন তাহা তুমি আমাকে দিও।"

বাচো মধু পৃথিবি ধেহি মহ্যম্।

"এই পৃথিবীতে যেখানে যত গ্রাম আছে বা অরণ্য

আছে, বা সভা সংগ্রাম বা সমিতি আছে, সর্বত্র আমি তোমারই স্তবগান করিব।"

যে গ্রামা যদরণ্যং যা সভা অধিভূম্যাম্।
যে সংগ্রামাঃ সমিতয়স্তেষু চারু বদেম তে।

আমার একমাত্র প্রার্থনা,

"হে মাতা পৃথিবি, তোমার সর্বসহা কোলে যেন বসিতে পাই।" ইহাই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

ক্ষমাং ভূমিং স্বাভি নিষীদেম ভূমে।

"তোমার পবিত্র ধূলাতে মাটিতে আমি নিজেকে পবিত্র শুদ্ধ করিয়া তুলিব।" ইহা অপেক্ষা আর প্রার্থনীয় কি আছে?

পবিত্রেণ পৃথিবি মোৎপুনামি॥

"শিলায় মাটিতে পাথরে ধূলায় রচিত বটে এই পৃথিবীর দেহ কিন্তু হিরণ্ময় তাহার হৃদয়খানি, সেই হিরণ্যবক্ষ পৃথিবীকে নমস্কার করি।"

শিলা ভূমিরশ্মা পাংসুঃ সা ভূমিঃ সংধৃতা ধৃতা
তস্যৈ হিরণ্যবক্ষসে পৃথিব্যা অকরং নমঃ॥

"হে মাতা পৃথিবী আমাকে তোমার কল্যাণে অধিষ্ঠিত কর। তুমি কবি, দিবালোকের সঙ্গে আমাকে এক সুরে বাঁধিয়া সুসঙ্গত করিয়া শ্রী ও কল্যাণে আমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর।"

ভূমে মাতর্নিধেহি মা ভদ্রয়া সুপ্রতিষ্ঠিতম্
সংবিদানা দিবা কবে শ্রিয়াং মা ধেহি ভূত্যাম্॥

[শ্রীনিকেতনে ভূমিকর্ষণ উৎসবে পঠিত। মন্ত্রগুলি অথর্ববেদ হইতে গৃহীত।

জীবনের ভাঙা রথ

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছোটে ভাড়াগাড়ি—কর্ম্মের ভাঙা রথ,
ধূলিজালে আঁখি আঁধা!
শহরতলীর চির-চেনা রাজপথ
কালনাগপাশে বাঁধা।

খোঁড়া ঘোড়া ছোটে টগ্‌বগে ভাঙা তালে,
চাকার ঘড়ঘড়ানি;
নড়বড়ে হাড়ে ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর ঢালে
রুক্ষদিনের গ্লানি।

স্ফীত বর্জ্জিত আবর্জ্জনার স্তূপ,—
চলে একান্ন ভোজ!
ক্ষুধাজর্জ্জর হিংস্রচকিত রূপ,
প্রাণকণা করে খোঁজ।

পাঁজরের ফাঁকে বিষনিঃশ্বাস জমা
আক্ষেপে চেপে রাখে,
সর্পিল কালো বিষাক্ত নর্দ্দমা
ফুঁসে ওঠে পাকে পাকে!

খাঁ খাঁ রোদ্দুর, উপজীব্যের তাড়া,
ভাড়াটিয়া গাড়ী ছোটে!
জীর্ণ পথের রুঢ় হাড়ে তারি সাড়া
তবু তাড়া নেই মোটে।

নর্দ্দমা-ঘেরা জীবনের ভাঙা পথ—
চির-নাগপাশে বাঁধা;
বিষ-নিঃশ্বাস, কর্ম্মপঙ্গু রথ,
মর্ম্মের আঁখি আঁধা।

বর্ষামঙ্গল

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এসো এসো ওগো শ্যামছায়াঘন দিন
আনো আনো তব মল্লার মন্দ্রিত বীণ।
বীণা বাজুক রমকি ঝমকি,
বিজুলির অঙ্গুলি নাচুক চমকি,
নবনীপকুঞ্জ নিভৃতে
কিশলয় মর্মর গীতে
মঞ্জীর বাজুক রিন্ রিন্ রিন্॥

নৃত্যতরঙ্গিত তটিনী
বর্ষণ-নন্দিত নটিনী,
চলো চলো কূল উচ্ছলিয়া
কল কল কল কল্লোলিয়া
তীরে তীরে বাজুক অন্ধকারে
ঝিল্লির ঝংকার ঝিন্ ঝিন্ ঝিন্॥

১৮ ভাদ্র, ১৩৪৭
শান্তিনিকেতন

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   স্বরলিপি—শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

[ধনা -র্সনা ধপা -া]
এ০ ০০ সো০ ০ ॥

দা পা II { মা -া পা -া | -া -া গা মা I পা -ধা না না |
এ সো এ ০ সো ০ ০ ০ ও গো শ্যা ০ ম ছা

নধ র্সা র্সা না I ধপা -া ধা পা | মা -া পা -া } I -া -া র্সা র্সা |
য়া ০ ঘ ন দি ন্ এ সো এ ০ সো ০ ০ :০ আ নো

না -র্রা র্রর্সা -া I -া -া পা পা | পা -ধা না না I না -া র্সা না |
আ ০ নো ০ ০ ০ ত ব ম ল্ লা র মন্ ০ দ্রি ত

ধা -না -পা -া I পা -ধা -না -র্সা | -র্ধনা -া না র্সনা II
বী ০ ণ ০ ই ০ ০ ০ ণ্ ০ এ সো০

র্সা না II নর্সা -র্মা র্মা র্মর্জ্ঞা | র্মর্জ্ঞা র্জ্ঞর্রা র্রা -া I র্রা র্রা র্রা -া |
বী ণা বা ০ জু ক০ র ম০ কি ০ ঝ ম কি ০

-র্রা -র্জ্ঞা -র্সা -া I র্সা র্রা র্জ্ঞা র্রা | র্সা -া র্রা র্সা I না -া র্সা র্রা |
০ ০ ০ ০ বি জু লি র অ ঙ্ গু লি না ০ চু ক

সর্া ধনা সর্ -া I সর্া না সর্া -া | না না সর্া -া I -া -া -া -া |
চ ম কি ০ চ ম কি ০ চ ম কি ০ ০ ০ ০ ০

মা পা পা পা I পা -ধা না না | ধনা সর্না ধপা -া I -া -া -া -া |
ন ব নী প কু ন্ জ নি ভৃ০ ০০ তে০ ০ ০ ০ ০ ০

পা পদা দা দা I দা -া দপা পা | মপা -দপা মগা -া I -া -া -া -া |
কি শ০ ল য় ম র্ ম০ র গী০ ০০ তে০ ০ ০ ০ ০ ০

ধা সর্া সর্া সর্া I সর্া -া সর্া সর্া | সর্া -া সর্া -া I না -র্রা র্সা -া |
ম ন্ জী র বা ০ জু ক রি ন্ রি ন্ রি ০ ন্ ০

সর্রা -া সর্া সর্না II
রি ন এ সো০

-া -া II { মপা -া মগা মা | পা -দা ণদা ণদা I
০ ০ নৃ ০ ত্যে ত র ঙ্ গি০ ত০

ণদা দা পা -া | -া -া -া -া I (ধসর্া -সর্া সর্া সর্া | সর্া -া সর্া সর্া I
ত০ টি নী ০ ০ ০ ০ ০ ব র্ ষ ন ন ন্ দি ত

ধসর্া সর্া সর্া না | পা -ধা না সর্না I ধনা না ধপা -া | -া -া -া -াধ) } I
ন টি নী আ ন ন্ দি ত০ ন টি নী ০ ০ ০ ০ ০

[সর্া সর্মর্া মর্া মর্জ্জর্া]
চ লো০ চ লো০

{ সর্া সর্জ্জর্া জ্জর্া জ্জর্া | জ্জর্া জ্জর্া র্রা -া I র্রা র্রা র্রা জ্জর্া | -া -া -া -া I
চ লো০ চ লো কূ ল উ চ্ ছ লি য়া ০ ০ ০ ০ ০

-র্রা র্রা র্রা র্রা | সর্া সর্া সর্া -র্র I না না নসর্া -া | (-সর্া -র্রা -না -া) } I
ক ল ক ল ক ল ক ল্ লো লি য়া ০ ০ ০ ০ ০

-া -া -া -া I
০ ০ ০ ০

সর্া সর্রর্া র্রা র্রসর্া | সর্া -র্রা সর্া সর্া I সর্া -র্রা সর্া সর্া | সর্া -র্র -না -া I
তী রে০ তী রে০ বা ০ জু ক অ ন্ ধ কা রে ০ ০ ০

না -সর্া সর্া সর্া | সর্া সর্া রসর্া সর্না I না -না না -না | না -া পা -ধা I
ঝি ল্ লি র ঝ ঙ্ কা০ র ঝি ন্ ঝি ন্ ঝি ন্ ই ০

-না -া -া -া | -া -া না সর্না II II
ন্ ০ ০ ০ ০ ০ এ সো০

দ্বাদশ-দ্বীপে সেকাল ও একাল

শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক

আজ একুশ বছর পরে ভূমধ্যসাগরের বুকে আবার নৌ-বাহিনীর সমর-অভিযান ও রণতরীর উদ্ধত গর্জ্জন জেগে উঠেছে। আবহমানকাল হ'তে এই সাগরের নীলাভ জলের প্রতি তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এসেছে তিনটি

রোডস্ : "কাসা দেল্লা দান্তে" বা দান্তে-ভবনের অভ্যন্তরে গথিক্ স্থাপত্যের নিদর্শন

মহাদেশের ভাবধারা ও বাণিজ্যসম্ভার। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এদের প্রথম আত্মিক পরিচয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-কলার প্রথম বিনিময় ঘটেছে এই খেয়ালি সাগরটির বিভিন্ন উপকূলে। তিন মহাদেশের বালুকা-সৈকতে জড়িয়ে আছে এই বিনিময়ের স্মৃতি, এই পরিচয়ের স্পর্শ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এখানে কত জাতি অতিথির অভিনন্দন পেয়েছে তাদের দিগ্বিজয়ের পথে, কত বিজিত সেনানী তাদের অন্তিমশয্যা লাভ করেছে এই সাগরের সুশীতল সিক্ত ক্রোড়ে। গ্রীক-রোমান, আরব-তাতার, মিশর-বাবিলন—এদের বিভিন্ন সংস্কৃতির ঘাত-প্রতিঘাত সমৃদ্ধ করেছে ভূমধ্যসাগরের বিচিত্র ইতিহাস। খ্রীষ্টান ইহুদী, খ্রীষ্টান মুসলমান—এদের মধ্যে ধর্ম্ম-যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের কাহিনী আজও ভূমধ্যসাগরের বিস্তৃত জলপথগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়। হাইফা থেকে ভেনিস পর্য্যন্ত, সৈয়দ বন্দর থেকে জিব্রাল্টার পর্য্যন্ত, এই সাগরের তীর ঘেঁষে যতগুলি শহর বন্দর গড়ে উঠেছে সর্ব্বত্রই দেখতে পাই এই বিচিত্র ভূমধ্যসাগরের সভ্যতার একটি বিশিষ্ট ছাপ। স্থাপত্যে, সঙ্গীতে, বাণিজ্য-কুশলতায়, সামরিক দক্ষতায় এবং সামাজিক সংগঠনে সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয় একাধিক সভ্যতার মিশ্রিত প্রভাব। যুগ যুগ ধরে শিক্ষা ও সাধনার যে ব্যাপক আদান-প্রদান চলেছে তাতে কারও ক্ষতি হয় নি, বরং সকলেই সমৃদ্ধ হয়েছে।

সুয়েজের খাল কাটার পরে যখন লোহিত সাগরের জল ক্রমে ভূমধ্যসাগরের জলে পড়ল (১৮৬১ খ্রীঃ) তখন দুনিয়ার বাণিজ্য ও উপনিবেশের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা হ'ল। কিন্তু ভূমধ্যসাগর থেকে নির্গত হবার দুটি মাত্র সঙ্কীর্ণ পথেই বসল বিশিষ্ট কোন দেশের সামরিক ঘাঁটি। সেদিন থেকেই কলহের সূত্রপাত হয়েছিল। আজ পর্য্যন্ত সে-বিবাদের মীমাংসা হয় নি। ইংরেজ বলছে তার প্রাণধারণের জন্য ভূমধ্যসাগরের উপর তার প্রভুত্ব এবং একচ্ছত্র আধিপত্য একান্ত প্রয়োজনীয়। ইতালিও বলেছে তাই। রোমক আমলে ভূমধ্যসাগর যে একটি ইতালিয়ান হ্রদ-বিশেষ ছিল সেই স্মৃতি আবার জেগে উঠেছে আধুনিক ইতালির রাষ্ট্র-পদ্ধতিতে। ভূমধ্যসাগর নিয়ে এই দুটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যে কলহ উপস্থিত হয়েছিল তার মীমাংসার যে চেষ্টা হয় নি এমন

রোড্‌সের পূর্ব্ব উপকূলে' কালিত্তেয়া" নামক স্থানের উষ্ণ-প্রস্রবণের ফোয়ারা। এখানে স্বাস্থ্যান্বেষীরা ধাতুজ জল পান করিয়া থাকেন।
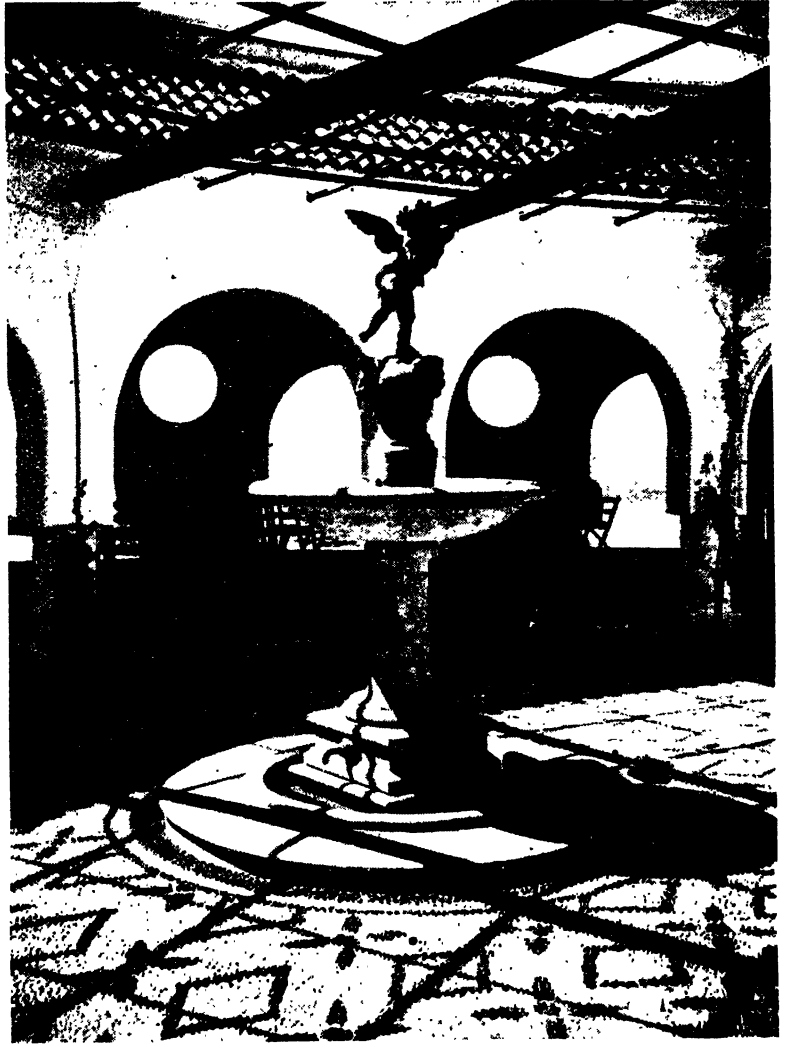
নয়। ভদ্রলোকের চুক্তি (Gentleman's Agreement), ইতর লোকের চুক্তি, ইত্যাদি অনেক রকমের চেষ্টাই হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোনটাই ধোপে টেকে নি। গত জুন মাসে তাই ইতালি যখন লড়াইয়ে যোগদান করল, ভূমধ্যসাগরের আনাচে-কানাচে আবার ছড়িয়ে পড়ল আসন্ন ধ্বংসলীলার আতঙ্ক। নৌ-বাণিজ্য স্থগিত হয়ে এল, বন্দরগুলির দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ক্রমশঃ শিথিল হয়ে এল; শুধু সাগরগর্ভে সাব্‌মেরিণের উৎপাতে মৎস্যরাজ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। সৈয়দ বন্দর, কাইরো, আলেক্‌জান্দ্রিয়া, হাইফা, সাইপ্রেস—পূর্ব্ব অঞ্চলের এই সব ঘাঁটিগুলিতে বসল ব্রিটিশ নৌবহরের সতর্ক পাহারা। এই অঞ্চলে ইতালির সমরায়োজন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে দোদেকানেজ্‌ (Dodecanese) দ্বীপমালাকে কেন্দ্র ক'রে। গ্রীস এবং তুরস্কের মধ্যবর্ত্তী যে জলভাগটুকুর নাম ঈজিয়ন্‌ সাগর (Aegean Sea), দোদেকানেজের দ্বাদশ-দ্বীপ এখানেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। দ্বীপের সংখ্যা বারটি বলেই এর নাম দোদেকানেজ্‌। অদূর ভবিষ্যতে পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরের নৌযুদ্ধগুলি এই দ্বাদশ-দ্বীপের প্রাঙ্গণটি মুখরিত ক'রে তুলবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এই দ্বাদশ-দ্বীপের বৃহত্তম এবং সর্ব্বপ্রধান দ্বীপ

রোড্‌স্ঃ তুর্কী আমলের একটি নগর তোরণ

রোড্‌স্ (Rhodes)। তুরস্কের উপকূল থেকে প্রায় বিশ মাইল দক্ষিণে এর প্রধান শহর ও বন্দরটি অবস্থিত। ইতালিয়ানদের অধীনে ব'লে তাদের ভাষায় এর আধুনিক নাম হয়েছে রোদি (Rodi)। রোদি দ্বাদশ-দ্বীপের রাজধানী, এবং এখানে এক জন গবর্ণর থাকেন। পাঁচ বছর আগে এই দ্বাদশ-দ্বীপে আতিথ্য গ্রহণ করার সুযোগ হয়েছিল; মাসাধিক কাল এই অঞ্চলে পর্য্যটন ক'রে বেড়িয়েছি। শান্তির যুগের সেই দিনগুলির কথা আজ স্বভাবতঃই মনে পড়ে। আধুনিক কালে কোন বাঙালী পর্য্যটক দ্বাদশ-দ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছেন কিনা আমার জানা নেই; অন্ততঃ সে-সম্বন্ধে কোন ভ্রমণ-বৃত্তান্ত কোথাও দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। এই অঞ্চলটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ বাঙালী পাঠকের কাছে উপস্থিত করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

১৯৩৫ সালের আগস্ট মাস। গ্রীষ্মের উত্তাপে দক্ষিণ-ইউরোপের শহর-বন্দরগুলি যেন ঝিমিয়ে পড়েছে; অধিকাংশ জনতা ছড়িয়ে পড়েছে হয় পাহাড়ে, নয়ত সাগর-সৈকতে অবসর-বিনোদনের আশায়। কেউবা স্বাস্থ্যান্বেষণে গিয়েছে বিদেশ-ভ্রমণে। এমনই একটি গ্রীষ্ম-দিনের অপরাহ্ণে ব্রিন্দিসি বন্দর থেকে "কালিতেয়া" নামের একটি জাহাজে রোদি অভিমুখে যাত্রা করলাম। দীর্ঘ দিনান্তে যখন সূর্য্যাস্ত হ'ল, ইতালির উপকূল তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে।
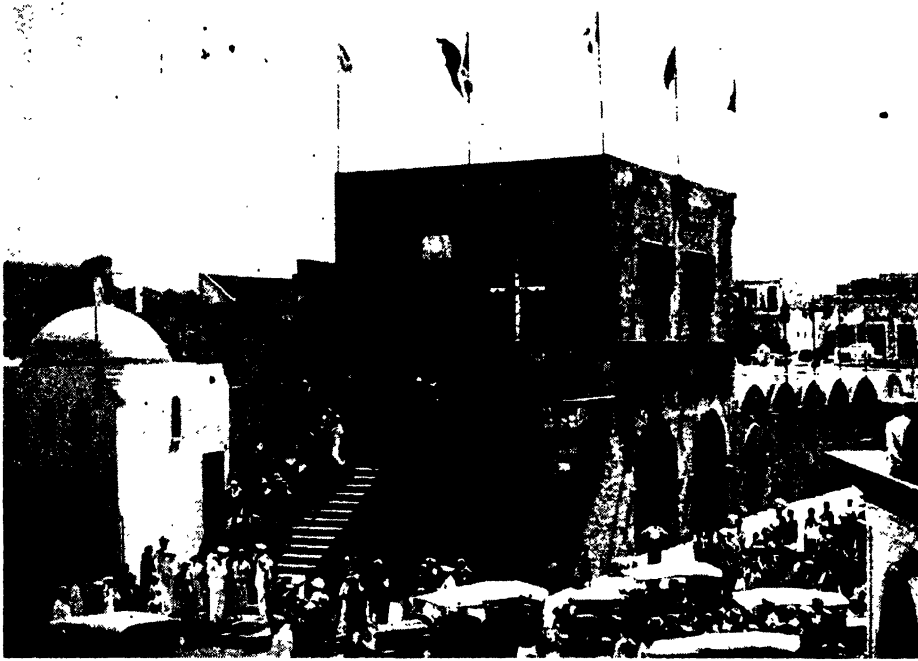
দান্তে-ভবন। মধ্যযুগে এটি একটি প্রাসাদ ছিল। অধুনা গভর্ণমেণ্ট দান্তে-সভাকে এটি দান করেছে। উদ্বোধন-উৎসব উপলক্ষে জনতা

জাহাজটি ছোট হ'লেও আধুনিক সাজসরঞ্জামে পরিপূর্ণ ছিল। যাত্রীর সংখ্যা স্থানের অনুপাতে অত্যধিক। ডেকে কোথাও এক বিন্দু জায়গা নেই। নৈশ ভোজনের সময়ে পাঁচ-ছজন ক'রে প্রত্যেক টেবিলে বসতে হ'ল। সহ-যাত্রীদের অনেকের সঙ্গেই ক্রমশঃ আলাপ-পরিচয় জমিয়ে নিলাম। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল ইতালিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। তারা যাচ্ছিল রোদিতে; সেখানে বৃহত্তর ইতালির সভ্যতার ধারা অধ্যয়নের জন্য সচোতা নাৎসিঅনালে দান্তে আলিগ্যেরি, অর্থাৎ জাতীয় দান্তে-সভার উদ্যোগে একটি গ্রীষ্মাবকাশের শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। দেড় মাস সেখানে অধ্যয়ন করার পরে পরীক্ষা হবে, এবং পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে তারা ডিপ্লোমা পাবে দান্তে-সভার।

এদের সঙ্গে আলাপ ক'রে অনেক তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল। আমিও যাচ্ছিলাম রোদিতে অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে, অবশ্য গ্রীষ্মাবকাশের সুযোগ নিয়ে আর কয়েকটি দেশ দেখার আগ্রহও কম ছিল না।

পরের দিন গ্রীসের তীর দেখতে পাওয়া গেল। মাঝে মাঝে দু-একটা ছোটখাট দ্বীপের গা ঘেঁষে জাহাজ চলতে লাগল। বৃহত্তর গ্রীসের অন্তর্গত এই দ্বীপগুলি ধূসর রঙের অপূর্ব্ব পাহাড় মাত্র; তাতে সবুজের ছোঁয়াচ মাত্র নেই। এই লোকালয়হীন, প্রস্তরময় দ্বীপগুলির গৈরিক ঔদাসীন্যের দিকে তাকাতে তাকাতে মনে হ'ল গ্রীক-ইতিহাসের অতীত কালের বীরত্বের কাহিনীগুলি হয়ত এদের আশে-পাশে কোথাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। করিন্থের খাল অতিক্রম ক'রে জাহাজ এথেন্সের দিকে দ্রুত অগ্রসর হ'তে লাগল। করিন্থের খাল পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছে। দু-দিকে উঁচু পাহাড়, তার মাঝে অপ্রশস্ত খালের উপর দিয়ে জাহাজকে পথটি অতিক্রম করতে হয়। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে জাহাজটি খালের মধ্যে
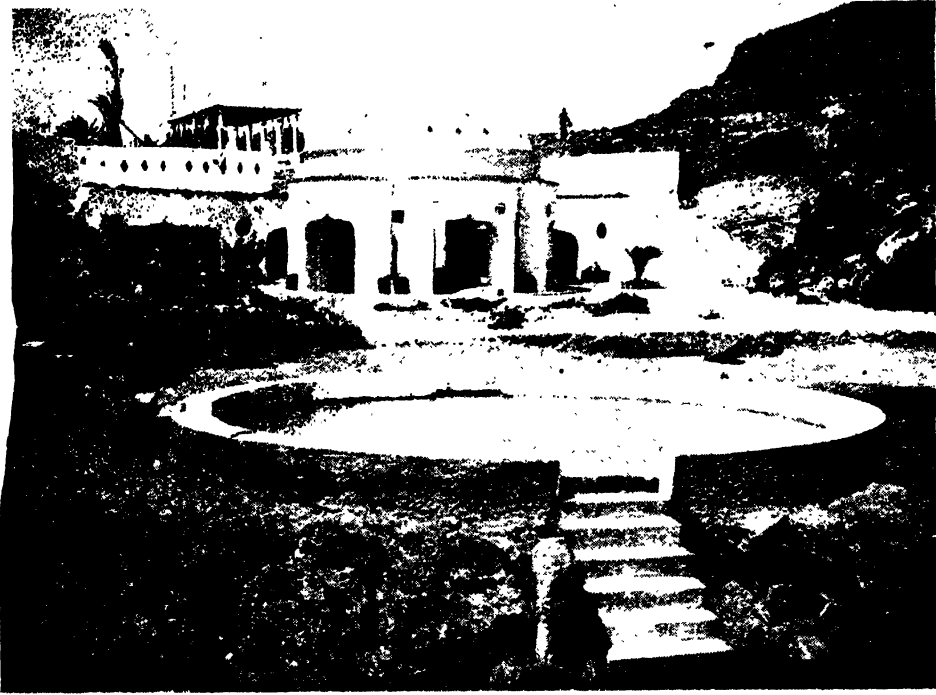
কালিতেয়ার উষ্ণ-প্রস্রবণের সাধারণ দৃশ্য

অদৃশ্য হয়ে গেছে। পৃথিবীর অন্য কোথাও বোধ হয় পাহাড় কেটে ঠিক এই ধরণের খাল তৈরি হয় নি। এথেন্সের বন্দরটির নাম পিরেয়ুস্ (Pireus)। চার ঘণ্টা সময় পাওয়া গেল। দল বেঁধে নেমে পড়লাম এথেন্স দেখবার জন্যে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এথেন্স দেখে প্রথমটা বেশ হতাশ হয়েছিলাম। রাস্তাঘাট রীতিমত নোংরা, এবং আধুনিক শহর যেটা তাতে না আছে কোন শ্রী, না কোন রুচির অভিব্যক্তি। গ্রীক-সভ্যতার যে গৌরবের সঙ্গে এথেন্সের নাম জড়িত, তার কোন অবশিষ্টই যেন আর জীবিত নেই ; সব মরে পচে যেন বিকৃত আকার ধারণ করেছে। সমুদ্র-উপকূলে যেখানে ছেলের দল সন্তরণ-সুখ অনুভব করছিল সেখানে রীতিমত পচা জলের গন্ধ পেলাম। পিচের রাস্তার মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড গর্ত ; ট্যাক্সিগুলি সেখানে গুরুতর আঘাত খেতে খেতে চলল অ্যাক্রপলিসের পথে। খানিকটা গিয়ে গাড়ী থামল ; আমরা একটি পাহাড়ের চূড়ায় অ্যাক্রপলিস দেখতে পেলাম। বাকী পথটা পদব্রজে উঠতে হ'ল। প্রাচীন গ্রীসের এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এসে যখন দাঁড়ালাম, তখন প্রথম পরিচয়ের নৈরাশ্য দূর হয়ে গেল। হাজার-হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু কালের দাবিকে উপেক্ষা ক'রে প্রাচীন গ্রীসের স্থাপত্য এখনও মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে তার কীর্ত্তিময় ইতিহাসের সাক্ষ্য দিতে। অ্যাক্রপলিস্ থেকে সমস্ত এথেন্সের দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। ওখান থেকে আমরা ন্যাশনাল মিউজিয়মে এলাম। অতি অল্প সময়ের মধ্যে যতটুকু দেখে নিলাম, তাতে এথেন্স-ভ্রমণ সার্থক হয়েছে ব'লে মনে হ'ল। এখানকার সাধারণ লোকেরা ইংরেজী বলে না ; আধুনিক গ্রীকের পরে ফরাসীর চলনটাই বেশী। আধুনিক গ্রীক-রাজধানীর লোকজন, রাস্তাঘাট এবং চাল-চলন দেখে মনে হ'ল এ-দেশটি ইউরোপের সমৃদ্ধির উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করতে পারে নি। জাহাজে যখন ফিরে এলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, পিরেয়ুস বন্দরে আলো জ্বলে উঠেছে। ... অনেকক্ষণ
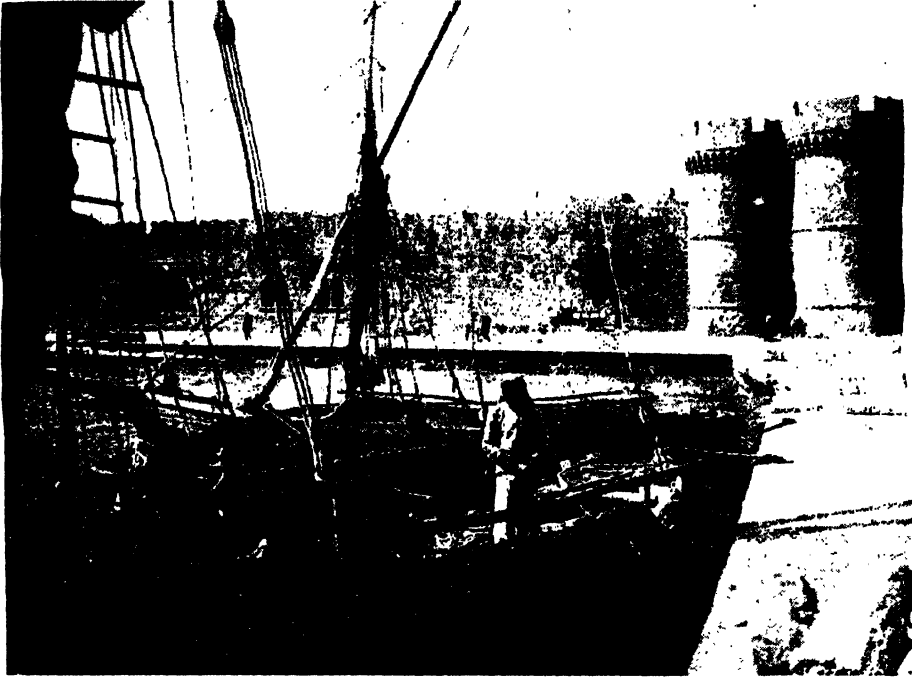
রোড্সের আধুনিক বন্দরের একটি দৃশ্য। যে নৌকাগুলি দেখা যাচ্ছে তাহা জেলেদের নৌকা। এতে করে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যাতায়াত করা যায়

জাহাজ ছেড়েছে, আকাশে শুক্লা-সপ্তমীর চাঁদ সাগরকে তার সলজ্জ সম্ভাষণ জানাচ্ছিল, দূরে দিগন্তের খানিকটা অংশ রাজধানীর আলোর আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। এই দৃশ্যটির মধ্যে একটি মাদকতার আভাস ছিল যা কল্পনা-বিলাসী মনকে সহজেই স্পর্শ করে। অন্যান্য চিন্তার অবকাশে বায়রণের "Where burning Sapho loved and sung," বোদলেয়ারের "Lesbos, ou les baisers sont comme les cascades" এই ধরণের কয়েকটা কবিতার লাইন মনে এসেছিল।

ভোরবেলা যখন ডেকে এসে বসলাম তখন প্রকৃতির দৃশ্য অনেকটা বদলে গেছে। সাগরের জল ঈষৎ নীলাভ থেকে গভীর নীলে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। মাঝে মাঝে দু-একটা দ্বীপ দেখতে পেলাম যাতে সবুজের প্রলেপ রয়েছে। গ্রীস্ ছাড়িয়ে ঈজিয়ন্ সাগরে এসে পড়েছি। এই সাগরের রঙের যে বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করলাম, রোদ্‌স্ পৌঁছান পর্য্যন্ত তার কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। বরঞ্চ রোদ্‌সে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছি যে সূর্য্যাস্তের ঠিক আগে ঈজিয়ন্ সাগরের জল ঘন-কৃষ্ণাভ নীলবর্ণ ধারণ করত। কত দিন মনে হয়েছে যে হয়ত দোয়াতে ক'রে তুলে নিলে এই জলে লেখা চলতে পারে। অন্য কোন সাগরে এত গভীর নীলবর্ণের জল কখনও চোখে পড়ে নি। হয়ত ঐ অঞ্চলের আকাশের রঙের গভীরতার সঙ্গে এর কোন যোগাযোগ থাকতে পারে।

রোদ্‌সে এসে যখন জাহাজ থামল তখন মধ্যাহ্ন অতীত হয়ে গেছে। দান্তে-সভার কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে কেউ কেউ ছাত্রছাত্রীদের অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন। সহযাত্রীদের কাছে বিদায় নিয়ে একটা হোটেলে গিয়ে উঠলাম। হোটেলের মালিক এক জন ইতালিয়ান, কিন্তু কর্ম্মচারীর দল গ্রীক। গ্রীকরা নিজেদের মধ্যে তাদের

একটি গির্জ্জার প্রবেশ-দ্বার। দ্বারের উপরে রোমান্‌-যুগের ভগ্নাবশেষ স্থাপিত হয়েছে

ভাষায় কথা বলে কিন্তু অতিথিদের সঙ্গে বলে ইতালিয়ানে। যেখানে এই হোটেলটি অবস্থিত সেটা রোদির নতুন শহর, ইতালিয়ান শহর—পিচ-ঢালা বড় রাস্তার উপরে। রাস্তার দু-ধারে অসংখ্য গোলাপ-ফুলের সারি। প্রত্যেক রাস্তার দু-পাশেই কোন-না-কোন ফুলগাছের বেড়া দেখতে পেলাম। দোতলার বারান্দা থেকে রোদির উত্তরে আনাতোলিয়ার উপকূল দেখতে পাওয়া যায়। সমুদ্র থেকে সোজা পাহাড় উঠে গেছে। আনাতোলিয়ার ঐ পর্ব্বত-শ্রেণীর বিচিত্র শোভা দেখতে ভাল লাগত। ঘণ্টায় ঘণ্টায় পাহাড়টির রং বদলাত। কখনও ধূসর একটি কুয়াশার জাল এর শিখর-দেশকে আবৃত ক'রে রাখত, কখনও বা সবুজ রঙের একটি আভা নেমে আসত এর শিখর থেকে উপত্যকার দিকে, আর সূর্য্যাস্তের সময় কখনও কখনও একে রামধনুর ক্রীড়াক্ষেত্র ব'লে মনে হয়েছে।

রোদি শহরটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত সুন্দর। মনে করুন একটি পাহাড় ক্রমশঃ ঢালু হয়ে নামতে নামতে ঠিক সাগরে এসে মিশে গেছে। সাগর-সৈকত থেকে এমনিই একটি পাহাড়ের ঢালু স্থানগুলি জুড়ে রয়েছে রোদি শহরটি। এর তিন দিকে সমুদ্র, আর অন্য দিকে পাহাড়টি ক্রমশঃ উঁচু হয়ে উঠে গেছে। পূব উপকূলে রোদির পুরনো ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শহর, আর উত্তর ও পশ্চিম উপকূলে নূতন শহরের গোড়াপত্তন হয়েছে। পাহাড়ের ঢালু গায়ে সবুজ গাছের সারি, শুধু মাঝে মাঝে বাড়ীগুলির লাল টালির ছাদ সবুজতার একঘেয়েমি ভঙ্গ করছে। রোদির আকাশ-রেখার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে শতাধিক বায়ু-চালিত মিলের শীর্ষভাগগুলি সর্ব্বক্ষণ হাওয়ায় ঘুরতে থাকে। এই দ্বীপে বারো মাস চব্বিশ ঘণ্টা একটি হাওয়া বইতে থাকে, শীতের দিনে তার বেগ খুব বৃদ্ধি পায়। এই হাওয়া সাধারণতঃ কখনও বন্ধ হয় না, হ'লে পানীয় জলের এবং কৃষিকার্য্যের বিশেষ অসুবিধা হয়ে থাকে, কারণ হাওয়া-চালিত মিলগুলির দ্বারা টিউবের সাহায্যে ভূগর্ভ থেকে জল তোলা হয়। এই জল কখনও গৃহকার্য্যে এবং কখনও কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। উইণ্ড-মিলের আধিক্যবশতঃ কখনও কখনও রোদির পশ্চিম উপকূলকে হল্যাণ্ডের দৃশ্যের কথা মনে করিয়ে দিত।

ছোটবেলা ভূগোলে পড়েছিলাম পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের মধ্যে রোডস্‌ ও সাইপ্রাসের পিতলের মূর্ত্তি একটি। আসলে এই মূর্ত্তিটির সঙ্গে সাইপ্রাসের কোন সম্পর্ক নেই। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় তিন শত বছর পূর্ব্বে রোদির আদিম অধিবাসিগণ ডিমিট্রিয়সের আক্রমণ প্রতিরোধ করার পরে সূর্য্যদেবের উদ্দেশে এই প্রকাণ্ড ব্রোঞ্জের মূর্ত্তিটি স্থাপন করেছিল। এটি প্রায় ৯০ ফুট উঁচু ছিল। মাত্র পঞ্চাশ বছর পরে একটি ভূমিকম্পে মূর্ত্তিটি ভাঙিয়া পড়ে এবং প্রায় এক হাজার বছর এটি সমুদ্রগর্ভে অবস্থান করে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সারাসেন-বিজেতাগণ এটিকে সমুদ্রগর্ভ থেকে উদ্ধার ক'রে সিরিয়ায় নিয়ে যায়। কথিত আছে যে, ৯০টি উট ইহার ভগ্নাবশেষ এডেসায় বহন ক'রে নিয়ে গিয়েছিল। রোড্‌সে তার চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট ছিল না। আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বলেন যে, এই মূর্ত্তির তলা দিয়ে জাহাজ যাতায়াত করবার উপাখ্যানটি বিশ্বাসযোগ্য নয়।

রোডসের পশ্চিম-উপকূলের দৃশ্য

রোড্‌স্ শহরের দৃশ্য

রোড্‌সের গীর্জ্জা

উষ্ণ-প্রস্রবণের দৃশ্য
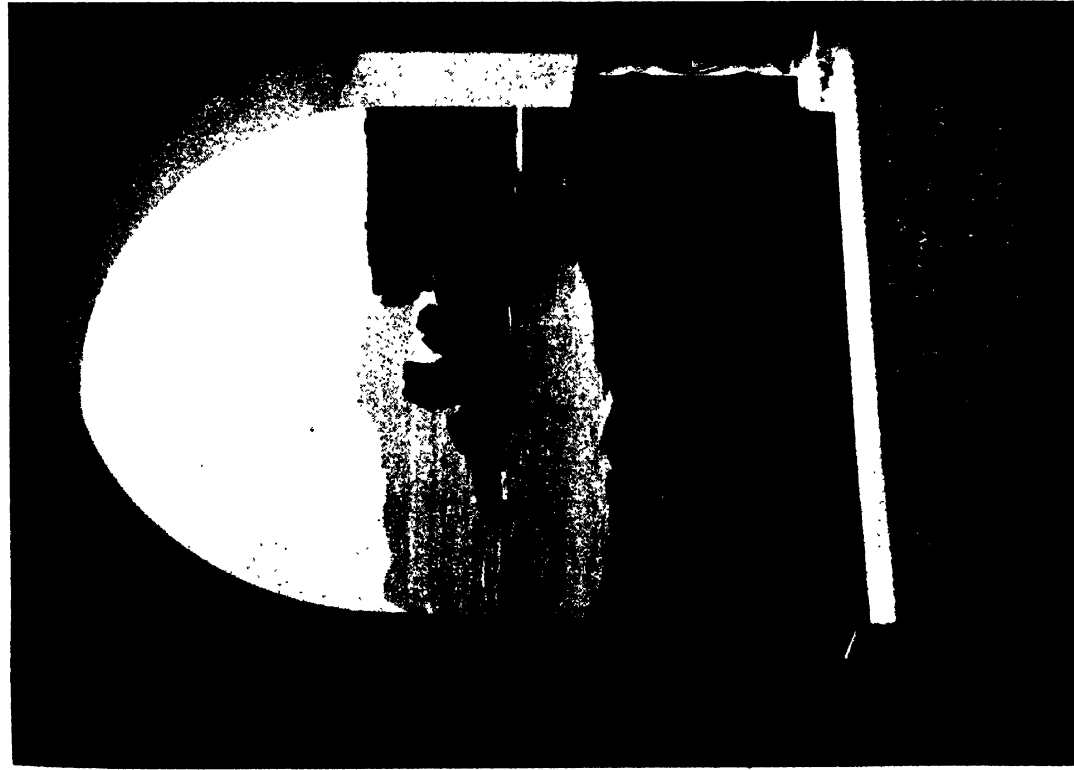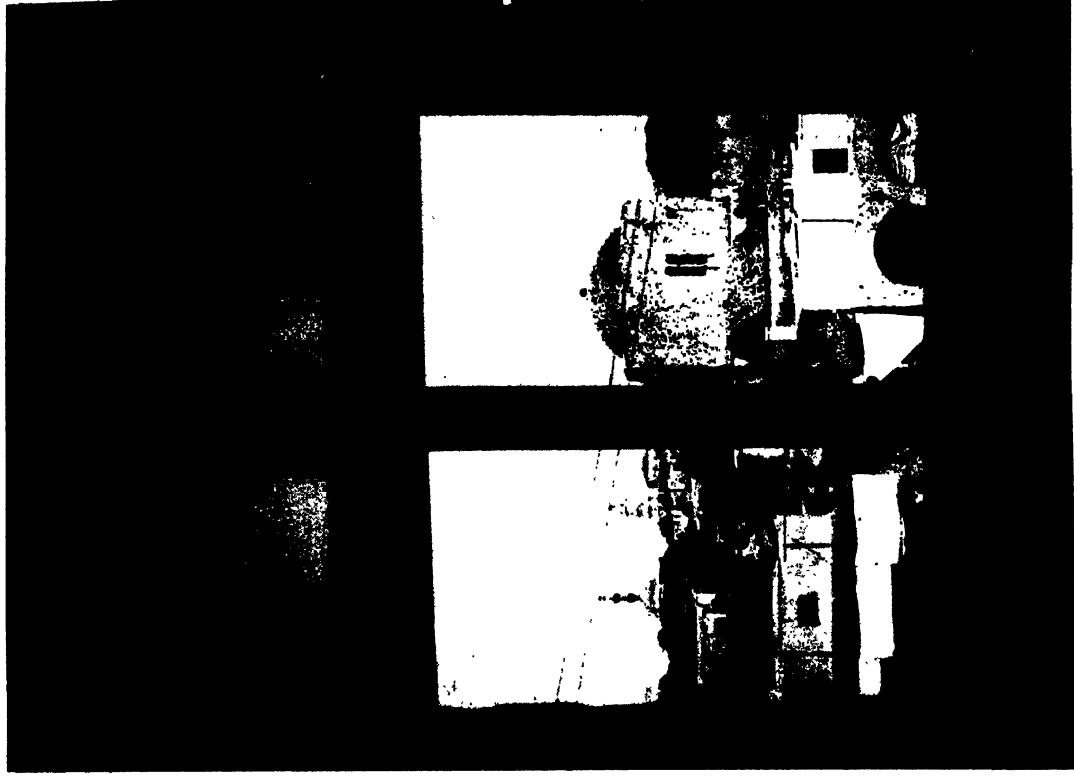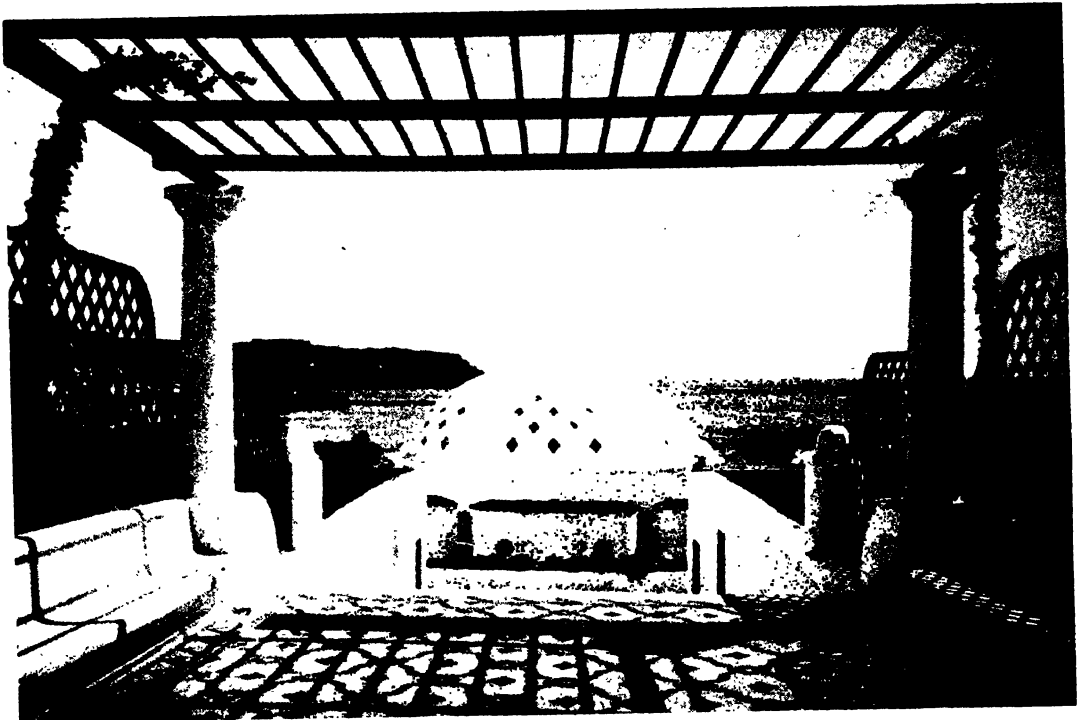
রোদির পুরনো শহরের অলিতে-গলিতে বেড়াতে বেড়াতে এর বিচিত্র ইতিহাসের কথা মনে হয়। অনেকে বলেন রোদির আদিম অধিবাসিগণ ছিলেন মাইসেনিয়ান্ কিংবা ফিনিশিয়ান্ সভ্যতার অন্তর্গত কোন জাতি। খ্রীষ্টের জন্মের হাজার বছর আগে ডোরিয়ানরা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। গ্রীক-কবি হোমার যে তিনটি শহরের নাম করেছেন, যথা, লিণ্ডুস্, ইয়াটিহ্নস্ এবং কামিরুস্, তাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। লিণ্ডুসে একটি সমৃদ্ধ আধুনিক শহর গড়ে উঠেছে, তার নাম লিন্দ। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় এবং প্রথম শতাব্দীতে রোদি রোমান্ সাম্রাজ্যের একটি জেলায় পরিণত হয়, এবং রোমান্ পুরুষদের একটি শিক্ষাকেন্দ্র এখানে স্থাপিত হয়। কথিত আছে, অগাষ্টাস্, টিবেরিয়াস্, সিসেরো এবং জুলিয়স্ সিজার ইত্যাদি রোমান্ সম্রাটগণ রোদিতে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। রোমান্ সাম্রাজ্যের অধীনে এই দ্বীপ-রাজ্যটির খুব উন্নতি হয়েছিল —ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিল্প-কলায়, স্থাপত্যে এবং সামাজিক জীবনে রোদি খুব উন্নত প্রদেশগুলির সমকক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রোমান্ সাম্রাজ্য ভেঙে যাবার পরে রোদি বাইজেনটাইন্-শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। তার পর ভেনিস্, জেনোয়া ইত্যাদি রিপাব্লিকদের অধীনস্থ হয়। ক্রুসেডের সময়ে রোড্স্ খ্রীষ্টান ধর্ম্মের এবং খ্রীষ্টান যোদ্ধাদের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। Knights Hospitallers of St. John of Jerusalem প্রথমে এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে, জেনোয়ার প্রসিদ্ধ নাবিক ভিগ্নোলো ভিগ্নোলীর সাহায্যে। পরবর্ত্তী কালে এরা রোড্সের নাইট এবং মাল্টার নাইট নামে অভিহিত হয়েছিল। এদের রাজত্বের অসংখ্য চিহ্ন এখনও রোদির পুরনো শহরের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে আছে। ষোড়শ শতাব্দীতে তুর্কীগণ রোড্স অধিকার করে এবং সম্রাট্ সোলেমানের আদেশে এই দ্বীপটি থেকে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের সমস্ত প্রভাব লুপ্ত ক'রে দেবার চেষ্টা হয়। বলা বাহুল্য গির্জ্জাগুলি মসজিদে পরিণত হয় এবং তা ছাড়া শহরের বিভিন্ন স্থানে অনেক নূতন মস্জিদ গড়ে ওঠে। এর মধ্যে মুরাদ রাইস্ মসজিদটি এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তুর্কী রাজত্বের অধীনে রোদির ক্রমশঃ অধঃপতন হয়, এবং আধুনিক কালের প্রগতির সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারে না। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপলি-যুদ্ধের সময়ে ইতালি রোড্স্ অধিকার করে এবং ১৯২৩ সনে লোজান্ সন্ধির পরে তুর্কীদের কাছ থেকে দ্বাদশ-দ্বীপের শাসনভার গ্রহণ করে। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত দ্বাদশ-দ্বীপ অর্থাৎ দোদেকানেজ্ ইতালির অধীনে আছে। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার আওতায় এসে রোদির চেহারা বদলে গেছে। অতীতকে অস্বীকার না ক'রে বর্ত্তমান সৃষ্টির উল্লাসে এগিয়ে যাচ্ছে। নূতন শহর ইতালির সৃষ্টি। এখানে নূতন বন্দর, এরোড্রোম, গবর্ণমেণ্টের আপিস, গির্জ্জা, হাসপাতাল, হোটেল, রাস্তা-ঘাট, যান-বাহন, ক্লাব, গল্‌ফ-কোর্স ইত্যাদি সবই তৈরি হয়েছে। রোদির অতীত বাণিজ্যের গৌরব ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা হচ্ছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই সঙ্গমস্থলে দুটি বিভিন্নমুখী সংস্কৃতির মিলন সম্ভব হবে কি না জানি না, কিন্তু ইতালির সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পদ্ধতিতে সে রকম একটা প্রয়াসের আভাস পেয়েছিলাম। দান্তে-সভার ক্লাস করতে তাই ছাত্র-ছাত্রীরা এসেছিল শুধু ইউরোপ থেকে নয়; অনেকে এসেছিল সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, ঈজিপ্ট, তুরস্ক এবং আরব দেশ থেকে। দান্তে-সভার ক্লাসে ব'সে মনে হয়েছে কোন আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় মানব-সভ্যতার গল্প শুনছি। অতীত যুগের পরিখার ধারে ছোট্ট প্রাসাদ দুর্গটির নূতন নামকরণ হয়েছে "কাসা দেল্লা দান্তে" (দান্তে-ভবন)। এখানেই দান্তে-সভার বক্তৃতাগুলি হয়ে থাকে। আমি যে বছরের কথা বলছি (১৯৩৫) অধ্যাপক পারিবেনি পড়াতেন ভূমধ্যসাগরের ও রোমান সভ্যতার ইতিহাস, অধ্যাপক মারাম্বিনি পড়াতেন ললিতকলার ইতিহাস। এ ছাড়া কয়েকটি ভাষার চর্চা হ'ত বিশিষ্ট অধ্যাপকদের নির্দ্দেশ অনুসারে।

আধুনিক রোদির বাসিন্দাদের মধ্যে তিনটি জাতির এবং তিনটি সভ্যতার প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়—গ্রীক্, লাতিন এবং তুর্কী। এখানকার জন-সাধারণের মধ্যে তিনটি ভাষার প্রচলন রয়েছে; যথা, ইতালিয়ান, গ্রীক্ (আধুনিক) ও তুর্কী। ইতালিয়ানরা

বেশীর ভাগ রাজকার্য্য এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করে, গ্রীকরা কেরাণীগিরি এবং দোকানদারী করে, আর তুর্কীরা সাধারণতঃ চাষের ও শিল্পের কাজ করে। পুরনো শহরটা চারিদিকে একটি উঁচু দুর্গ-প্রাকার দিয়ে ঘেরা। ক্রুসেডের আমলে এই প্রাচীরের প্রথম গোড়াপত্তন হয়েছিল, তার পর তুর্কীরা এর সংস্কার করেছিল। এখানকার তুর্কী পল্লীতে এখনও ছেলেদের ফেজ আর মেয়েদের অবগুণ্ঠন দেখতে পেয়েছি। কামাল আতাতুর্কের আদেশবাণী রোদির গৃহ-কোণে এসে এখনও পৌছয় নি। সন্ধ্যার পরে তুর্কী পল্লীতে বেড়াতে বেড়াতে উত্তর-পশ্চিম ভারতের ইস্‌লাম-প্রভাবাপন্ন শহরগুলির কথা মনে পড়ত—অনেক পরিচিত রূপের রোশনাই, শিক্-কাবাবের গন্ধ, দরবেশের মেহেদী-রঞ্জিত দাড়ি, তামাকুর মৃদু সুবাস, মহাজ্জিনের আওয়াজ, গুলবাগের রঙের বাহার, এশিয়ার সান্নিধ্য স্মরণ করিয়ে দিত। রোদির আশেপাশের কয়েকটি জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। "কালিতেয়া" অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে অবস্থিত। এখানকার ধাতব-প্রস্রবণগুলি অতিশয় প্রসিদ্ধ। প্রতি বৎসর দেশবিদেশ থেকে এই প্রস্রবণের জল পান করতে বহু লোকের সমাগম হয়ে থাকে। "ক্রেমাস্ত"-তে রোদির গ্রামবাসীদের লোকনৃত্য দেখতে গিয়েছিলাম। অনুষ্ঠানটি খুব উপভোগ্য হয়েছিল। "লিন্দ"-তে এখনও রোমান যুগের ধ্বংসাবশেষগুলি বিদ্যমান রয়েছে। ইতালিয়ানদের চেষ্টায় এখানেও একটি বর্দ্ধিষ্ণু শহর গড়ে উঠছে। পাইন-আবৃত একটি উঁচু পাহাড়ের উপরে "ফিলেরেম" দেখতে গিয়েছিলাম। তরুণদের সামরিক শিক্ষার একটি কেন্দ্র এখানে স্থাপিত হয়েছে। রোদি ছাড়া পাৎমস্ থেকে কাস্তেল্-রস্ স পর্য্যন্ত দ্বাদশ-দ্বীপের অনেকগুলি দ্বীপেই বেড়াতে গিয়েছিলাম। অবশ্য রোদির মত ঐতিহাসিক সমৃদ্ধি কিংবা স্থাপত্যের অহঙ্কার এরা কেউ করতে পারে না, কিন্তু সর্ব্বত্রই আধুনিক রোদির প্রভাব দেখতে পাওয়া গেল। কোথাও কোথাও নৌ-বাহিনীর ঘাঁটি বসেছে, কোথাও আবার বিমান-বাহিনীর। এসব স্থানগুলি দূর থেকেই দেখতে হয়েছে এবং ফটো তোলার হুকুম ছিল না।

রোদির সবচেয়ে ভাল লেগেছিল যে-স্থানটি সেখান থেকেই আঘাত পেলাম। সমুদ্র-সৈকতে জল-ক্রীড়ার আবেষ্টনটি ছিল অত্যন্ত সুখপ্রদ। কখনও কখনও চার পাঁচ ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্নান ক'রে সাঁতার কেটে কাটিয়েছি। একবার সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় যোগদান করাতে ভারতবর্ষের মান রক্ষা হয়েছিল কিন্তু বিদেশী জলবায়ু প্রতিশোধ নিয়েছিল। হপ্তাখানেক রোদির হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছিলাম। দিনের বেলা অলস-জীবনের সঙ্গীরূপে পেয়েছিলাম উইণ্ড-মিলের আবর্ত্তমান শীর্ষগুলিকে। আঙিনা থেকে ফুলের গন্ধ ভেসে আসত। সতীর্থদের মধ্যে কখনও কেউ আলাপ করতে আসত। আমার ঘরের জানলা দিয়ে জাহাজগুলির যাওয়া-আসা দেখতে পেতাম। গভীর রাত্রে প্রায়ই একটি বাঁশীর করুণ সুর ভেসে আসত আশেপাশের কোন গৃহস্থ-বাড়ী থেকে। এই বাঁশীটির সুরে ছিল এশিয়ার প্রাণ, এর সঙ্গীতে ছিল এশিয়ার মাধুর্য্য ও নৈপুণ্য। নিদ্রাহীন রাত্রে এই সুর শুনতে শুনতে জন্মভূমির কথা মনে পড়ে যেত। যেদিন হাসপাতাল পরিত্যাগ ক'রে এসে ফেরার জাহাজ ধরি, ওখানকার বর্ষীয়সী ইতালিয়ান নার্সটি একটু স্নেহের সুরে বললেন, "তুমি ছেলেমানুষ, তোমার সমস্ত জীবন সামনে পড়ে রয়েছে, তোমার এতটা অসতর্ক হওয়া উচিত নয়। তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে ভবিষ্যতে সাবধান হয়ে চলবে।" প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কিন্তু রাখতে পারি নি।

বেশ কয়েকটা বছর অতীত হয়ে গেছে, কিন্তু সেই বিদেশিনী ভগ্নীর সতর্কবাণী আর সেই উদাস বাঁশীর সুর আজও ভুলতে পারি নি।

রাখিবন্ধন

শ্রীমনোজ বসু

আপনারা শঙ্কর রায়ের কথা শুনেছেন নিশ্চয়। আমাদের গাঁয়ে বাড়ী, নীলকান্ত রায়ের ছেলে; বাপের নাম সে পুরোপুরি রেখেছে। বছর দুই হ'ল ডিটেনশন-ক্যাম্প থেকে ছাড়া পেয়েছে, সেই থেকে গাঁয়ে থাকে, কুশখালির মোড়লপাড়ায় ইদানীং একেবারে একেশ্বর সম্রাট্ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্বদেশী আমলে শঙ্কর খুব ছেলেমানুষ, পাঠশালায় পড়ত। নীলকান্ত মোটের উপর ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ হ'লেও এই সময়টা ক্ষেপে উঠলেন; নিশান উড়িয়ে দল বেঁধে এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে সভা করতে যেতেন, বক্তৃতা করতেন। বাড়ীর কাজকর্ম্ম সব দেখত যদু, জাতে নমঃশূদ্র, আসল কর্ত্তা যেন সে-ই।

এক দিন খুব সকালে নীলকান্ত শঙ্করকে ডেকে তুললেন। যদু ও বাড়ীর আরও অনেকে আগে থেকে দাঁড়িয়ে আছে। হলদে রঙের এক-এক টুকরা সুতো নিয়ে তিনি সকলের হাতে বেঁধে দিলেন। বললেন—আমার হাতেও তোমরা কেউ বেঁধে দাও—যদু, তুমিই দাও। কলমের খোঁচায় ওরা দেশের মাটি ভাগ করেছে, তা ব'লে মানুষ আমরা কি পৃথক হয়ে যাব?

সারা সকালটা ধ'রে কোলাকুলি চলল। যদু কিন্তু মোটের উপর খুশী নয়। সে বলে—দেখ বাবু, এই সব তো করে বেড়াচ্ছ, উদিকে আদায়পত্তোর জুৎমতো হচ্ছে না, বিষয়-আশয় চুলোয় যাবে। এই সব হাঙ্গামের দরকারটা কি শুনি?

নীলকান্ত বলেন—দরকার নেই? আচ্ছা বাপু, তোর ছাঁচতলায় বেড়া দিয়ে কেউ যদি দুটো ভাগ ক'রে বলে এ-দিক্‌টায় তুই থাকবি ও-দিক্‌টায় তোর মাগী থাকবে,—চুপ করে থাকতে পারিস। আমরা ঝগড়াঝাঁটি করি, ভাব করি, নিজেরা করব—তুমি বাপু কে হে, বাইরে থেকে মাতব্বরি করছ!

এর অনেক দিন পরে আর কিছু বড় হয়ে শঙ্কর বাপের বক্তৃতাও শুনেছে। তার এক-একটা কথা আজও যেন গান হয়ে কানে বাজে। মানুষের বিজয়-ঘোষণা… আঘাত-অপমানের মধ্যে মাথা উঁচু ক'রে বেড়ানোর সঙ্কল্প …এমনি ধরণের সব কথা।

তার পর মল্লিকা এল। ষোল-সতর বছরের অজানা অচেনা মেয়ে—সর্ব্বাঙ্গভরা রূপ আর একমুখ হাসি…সে হাসি কারণে-অকারণে ঝরনার জলের মত ঝরে পড়ে। নূতন মেয়ে পেয়ে কর্ত্তারও বাইরের ঘোরাঘুরি অনেকটা কমে এল।

এক বার রাখিবন্ধনের দিন সকাল সকাল স্নান ক'রে মল্লিকা, শঙ্কর—সকলে এসে দাঁড়িয়েছে।

—কই বাবা, রাখি বাঁধবে না?

নীলকান্ত হেসে বললেন—মনে মনে সব বাঁধন পড়েছে কি না—টুকরো দেশ তাই জোড়া লেগে গেছে, বাইরের রাখির আর দরকার নেই। একটু চুপ ক'রে থেকে বলতে লাগলেন—ম্যাকলিন সাহেব বলেছিল, ফুলের মত নরম দেহ, কিন্তু ভিতরটা যেন ইস্পাত—এই সব ছোকরা এ-দেশে এল কি ক'রে রায়? আমি জবাব দিলাম, সাহেব, রয়াল বেঙ্গল টাইগারের দেশ এটা—জগতে এদের জুড়ি নেই।

আনন্দে গৌরবে বুড়ার গৌর মুখখানি জল-জল করতে লাগল।

তার পর কর্ত্তা গত হয়েছেন। শঙ্কর কলিকাতায় থেকে আইন পড়ে, শনিবারে শনিবারে বাড়ী আসে; কৈফিয়ৎ হিসাবে বলে—যদু ভাই, একা-একা তুই ক'দিক সামলাবি? আমার তো একটা বুদ্ধি-বিবেচনা আছে! কাঠখোট্টা যদু এ-সব কথায় ভোলে না, ঘাড় নেড়ে সোজা জবাব দেয়—না ভাইধন, আমার সুখে কাজ নেই—এ রকম

ইস্কুল-পলাপলি ক'রো না আর; মানুষ হয়ে এসে একেবারে আমায় ছুটি দিও। তবু আসা বন্ধ হয় না, তবে শঙ্কর যথাসম্ভব তাকে পাশ কাটিয়ে বেড়ায়।

এক বার সোমবারের দিন সকালবেলা ঠিক বেরবার মুখে মেঘ করল, ঝড়-জল হওয়া অসম্ভব ছিল না। স্টেশন প্রায় মাইল চারেক পথ—ও রকম অবস্থায় কাপড়-চোপড় বই সমস্ত ভিজে গেলে কলেজে যাওয়া চুলোয় থাক—বড় রকম একটা অসুখ-বিসুখও হ'তে পারত। কিন্তু যদু এসব বুঝবে না। দুপুরে খাওয়ার সময়টা মুখোমুখি পড়ে গেল। যদু বলে—এবারে পুরোপুরি ইস্তফা দিয়ে এলে, ভাইধন? তা ভাল…নিজের কাজকর্ম নিজে দেখ গে, আমি সরে পড়ি।

শঙ্কর অপরাধীর ভাবে বলে—এই অবস্থায় যাই কি ক'রে, বুঝে দেখ্—

যদু বলে—ও, চিড়িয়াখানার খাঁচা ভেঙে বাঘ বেরিয়েছে বুঝি…শহরে আর যাবার জো নেই—

শঙ্করের রাগ হয়ে যায়, বলে—হাঁ, বেরিয়েছে… বেরিয়ে তার দুটো এসে এই গাঁয়ে ঢুকেছে। তুই সেই সকাল থেকে তক্কে তক্কে আছিস, আর ওদিকে ঘরের মধ্যে আর এক নম্বর তিনি ওৎ পেতে আছেন।

যদুর মুখ হাসিতে ভরে গেল।—তবেই দেখ ভাইধন, আমার একরত্তি ঐ বউঠাকরুনের—খালি বিদ্যে নয়, বুদ্ধিও কত! বুকের উপর থাবা দিয়ে সগর্ব্বে বলে—আমি… এই আমি খুঁজে পেতে এনেছিলাম, ঠাকুর আমার মান রেখেছেন।

—তোর আর তোর বউঠাকরুণের জ্বালায় আমি দেশান্তরী হয়ে যাব, মোটে বাড়ী আসব না।

যদু ভয় পায় না, মহানন্দে বলে—এই ত, বাপের বেটা হও, ভাইধন। কর্ত্তাই বা ক-দিন বাড়ী থাকতেন। কাঁহা কাঁহা মুল্লুক থেকে মানুষ কথা শুনবার জন্য ধরে নিয়ে যেত। হুঁ-হুঁ—বাড়ী থাকলে কিন্তু সেরেস্তায় বসতে হবে… হাটবাজার করতে হবে—

এই সময়টা এক কাণ্ড হয়ে গেল। যদুর ম্যালেরিয়া ধরেছিল, দিন দশেক ভুগে সবে ভাত খেয়েছে, ফসল কাটার সময়, নিতান্ত না দেখলে নয়—মাঠের দিকে যাচ্ছিল সেই সব তদারক করতে। থানার উপর দিয়ে রাস্তা। দেখে, গোকুল মোড়ল আর তার ভাইপো শুকনো মুখে ব'সে আছে, সামনে চেয়ারের উপর দারোগাবাবু; একটা কথা কাটাকাটি চলছিল যেন। গোকুল সম্পর্কে তার পিসতুত ভায়রাভাই—ভাব-সাবও আছে। যদু বারাণ্ডায় উঠে ফিসফিস ক'রে জিজ্ঞাসা করে—সক্কালবেলা পীঠস্থানে…কি হয়েছে রে?

গোকুল বলে—কাল রাত্রে আমার সর্ব্বস্ব চুরি গেছে। দক্ষিণের ঘরে সিঁদ কেটেছে, আবার রান্নাঘরেরও হাত-দেড়েক বেড়া খসিয়ে ফেলেছে—পিতল-কাঁসা ঘরে এক টুকরো নেই। আজকে কলার পাতায় ভাত খেতে হবে।

দারোগা ঘাড় নেড়ে বললেন—যা-ই বল মোড়লের পো, হিসেব ক'রে দেখলাম পাঁচটা টাকার কম কিছুতে হয় না। এখন না পার, বরঞ্চ দুপুরের ইদিকে জমা দিয়ে যেও—নির্ভাবনায় যাও, নাগাদ সন্ধ্যা আমরা গিয়ে হাজির হব—

গোকুলের চোখ ফেটে জল বেরবার মত হ'ল।—হুজুর, বিশ্বাস করছেন না—কি আর বলব। ঘরে একটা তামার পয়সা অবধি রেখে যায় নি। যদুর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল—এই এজাহার দিতে এসে বড্ড মুশকিলে পড়লাম। দারোগাবাবুর নিজে না গেলে কিছুতে হবে না, অথচ কোথায় তার পালকি-ভাড়া, কোথায় কনেষ্টবলের বার-বরদারি…এত টাকা এখন পাই কোথায়?

নীলকান্ত রায়ের সঙ্গে ঝগড়া করত যদু, তবু তাঁরই ভাতে মানুষ; তার মুখ কালো হয়ে উঠল। উগ্রকণ্ঠে বলে—কেন, গরু-বাছুর নেই?

দারোগার দিকে তাকিয়ে বলল—সে ত ঠিক কথা। তারা এত নিয়ে গেল, আর হুজুরের বেলায় ফক্কিকার? উনি না গেলে হবে কি ক'রে? গরু বন্ধক দিয়ে রাহা খরচের জোগাড় কর গে—

দারোগা আগুন হয়ে উঠলেন।—তুমি কে হে ফাজলামি করতে এসেছ? বেরোও—এই মহাদেব সিং, নিকাল দেও উসকো—

যদু উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলে—আমরাই

যাচ্ছি, সোজা সদরে চলে যাব, সে-পথ চিনি। বল ভাই বন্দেমাতরম্—

দারোগা হাঁকলেন—সদরে আমরা পাঠাব। তোদের চিনে যেতে হবে না। পাকড়ো—

দুপুরের পর গোকুল এসে চুপি চুপি মল্লিকাকে ব'লে গেল, যদুকে নিদারুণ মার মেরেছে…মেরে এখন অতুল ডাক্তারের উঠানে দেবদারু গাছে বেঁধে রেখেছে।

অতুল ডাক্তারের বাড়ী থানার লাগোয়া। ডাক্তারের সঙ্গে দারোগার গলায় গলায় ভাব এবং লোকে রটনা করে, ভালবাসাটা নিতান্ত নিষ্কামও নয়। মল্লিকা প্রথমটা হতভম্ব হয়ে যায়। পাড়ার দু-চার জনের চেষ্টায় সাক্ষাতের বন্দোবস্ত হ'ল। মল্লিকা চাদরে সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে থানায় চলল, সঙ্গে যদুর এক মেয়ে আর এক জ্ঞাতি-ভাসুরের ছেলে। আসামীকে তখন গারদঘরে রাখা হয়েছে। পিছনে উত্তরের রোয়াকে মল্লিকারা বসল।

হাতকড়ি-লাগান যদুর চেহারা দেখে মল্লিকার চোখে জল আসে।—এ কি ক'রে বসলে মোড়ল-দাদু?

স্বর্গীয় কর্ত্তার কথাগুলিই যদু মুখস্থের মত ব'লে যায়।—কেন, অন্যায়টা কিসের? বন্দেমাতরম্ বলেছি, মাকে ডেকেছি—ছেলের মুখ চেপে ধরে মাকে ডাকতে দেবে না, এমন ক্ষমতা কার?

দফাদার করালীচরণ এই গ্রামের বাসিন্দা, শঙ্করদের সদর-পুকুরের ধারে বাড়ী। তাকে ডাকিয়ে এনে মল্লিকা বলে—মোড়ল-দাদুকে এবার ছেড়ে দাও। সবে জ্বর থেকে উঠেছে, দুর্ব্বল শরীর—তার উপর দুপুরে কিছু খায় নি—

করালী বলে—দেমাক করে খায় নি। চিড়ে দেওয়া হ'ল, তা ছড়িয়ে ফেলল। বুঝে দেখ ত মা, থানার 'পরে হল্লা করে—ওর সাহসটা কি! বড়বাবু ওকে সদরে চালান দেবেন; দিন কতক জেলের ঘানি ঘুরিয়ে আসুক, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

মল্লিকা আশ্চর্য্য হয়ে বলে—বন্দেমাতরমের জন্য জেল?

করালী হেসে ওঠে।—কি জানি, কি জন্যে। তুমি মা ঘরে যাও, ওকে ছাড়া হবে না।

যদুও বলে—ঘরে যাও বউঠাকরুণ। এরা সহজে ছাড়বার লোক? দুপুরে কতকগুলো সাক্ষী এনে কি-সব তালিম দিচ্ছিল—একটু একটু কানে গেল। আমি নাকি ভয়ানক সব কাজ করেছি। তুমি ভাইধনকে চিঠি লিখে দিও। মাস পাঁচ-ছয় পরেই আসছি—ভাবনা নেই।

মল্লিকা চোখ মুছে বলে—সদর ত দশ-বারো ক্রোশ পথ; মোড়ল-দাদু এই রোগা শরীরে যাবে কিসে?

করালী হাসতে লাগল, বলে—আসামীর জন্যে কি আর পক্ষীরাজের বন্দোবস্ত হবে? এই জোছনা উঠলে রওনা হবে, সঙ্গে চার-পাঁচ জন কনেষ্টবল থাকবে, পৌঁছতে দুপুরও লাগবে না। দারোগাবাবু সকালে পাল্‌কিতে রওনা হবেন, বন্দোবস্ত সব হয়ে গেছে।

মল্লিকা দৃঢ়কণ্ঠে বলে—আমার মোড়ল-দাদুও পাল্‌কিতে যাবে।

করালী দাঁত বের করে হাসে। বলে—যোল বেহারার?

—তা দূরের পথ—বেহারা একটু বেশী চাই বইকি!

তার মুখের দিকে তাকিয়ে করালী হাসির জের টানতে সাহস পায় না। বলে—আচ্ছা মা, দারোগাবাবুকে বলি গে—

—হাঁ, বল গে। রোগা মানুষকে বারো ক্রোশ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেলে হাড় ক'খানাও আস্ত থাকবে না। সে হবে না। তুমি বল, পাল্‌কির খরচা আমরাই দেব—

রাত্রিবেলা থানা থেকে খবর এল, পাল্‌কির সম্বন্ধে দারোগাবাবুর আপত্তি নেই, সকালেই রওনা হবে। তবে বারোটা বেহারার দরুণ চব্বিশ টাকা এবং পাল্‌কি ভাড়া আট আনা একুনে সাড়ে চব্বিশ টাকা এক্ষুনি পাঠিয়ে দেওয়া চাই।

পাড়াগাঁয়ে যখন-তখন অত টাকা মেলে না। মল্লিকা হাতের একগাছা বালা খুলে যদুর মেয়ের হাতে দিল। বলে—পোদ্দারের দোকানে ছুটে যা, মানী—বন্ধক দিয়ে, বিক্রি করে, যে ভাবে হোক—টাকা নিয়ে আয়।

বালা-হাতে মানী ইতস্তত করে। মল্লিকা তাড়া দিয়ে ওঠে—হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি, মানুষের চেয়ে কি গয়না বড়?

তা অবশ্য নয়, এবং বালা নিয়ে মানীও চলে গেল। তবু মল্লিকা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সুস্থির হ'তে পারে না। এই

বালা তার শাশুড়ী হাতে পরতেন, সেকেলে জিনিস। শাশুড়ীকে সে চোখে দেখে নি···তিনি চিতায় উঠলে কর্ত্তা খুলে রেখে ছিলেন, মল্লিকা এলে তাকে পরিয়ে দেন। আবার সে যেদিন চিতায় উঠবে, হয়ত আর এক জনে সজল চোখে খুলে রেখে দিত। কিন্তু সে ত হ'ল না—

শঙ্কর খবর পেয়ে তিন দিনের দিন এসে পৌঁছল।

স্বামীর দিকে চেয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে মল্লিকা বলে—দেখ, তুমি রাগ করবে···ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ করে বসলাম—

—কি ?

মল্লিকা বাঁ-হাতখানা উঁচু করে দেখাল।

শঙ্কর হাসিমুখে বলে—গয়নার শোক লেগেছে ?

অশ্রুজড়িত স্বরে মল্লিকা বলে—এ যে আমার হীরে-মানিক—কোহিনুরের চেয়ে বেশী। তুমি ত জান। আচ্ছা, অন্যায় হয় নি আমার ?

—নিশ্চয়, এক-শ বার—

মল্লিকা এতটুকু হয়ে যায়, বলে—বাবা বেঁচে থাকলে কত দুঃখ করতেন তিনি—

—দুঃখ করতেন, তবে রাগ করতেন না মল্লিকা, এ ছাড়া আর যে উপায় ছিল না। পিতৃগর্ব্বে শঙ্করের মুখ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। বলতে লাগল—তিনি যা মানুষ—হয়ত বলতেন বউমা, এ তুমি কি করেছ—মানুষের হাতে হলদে রাখি পরিয়ে পরিয়ে বেড়াতাম, তুমি যে একটা হাতের বালা খুলে একসঙ্গে হাজার মানুষের মনের উপর রাখি পরিয়ে দিলে।

মল্লিকা লজ্জিত হয় একটু। বলে—এই দেখ, তোমার কানেও গেছে তা হ'লে। সত্যি, এই অঞ্চল জুড়ে আমি মা হয়ে বসেছি—

—তাই ত বলছি, ঘোরতর অন্যায়। আমি বেচারা কিছু খবর রাখি নে, কলকাতায় বসে পেনাল-কোড মুখস্থ ক'রে মরি। এখন পথ চলতে লোকে আঙুল দেখিয়ে বলে, ঐ মল্লিকা-মায়ের স্বামী যাচ্ছে। এতে ইজ্জত থাকে ?

মল্লিকা ছেলেমানুষের মত হাততালি দিয়ে ওঠে।—বেশ হয়েছে—খাসা হয়েছে···এতকাল তোমরা মাথায় চড়ে থাকতে, এখন থেকে আমার নামে তোমার পরিচয়।

স্নিগ্ধ হাসি হেসে শঙ্কর বলে—ইজ্জত আমি বজায় রাখবই।

—কি করবে ?

—একলা তোমায় দেমাক করতে দেব বুঝি ! আমিও পাশে পাশে থাকব। শঙ্কর আদর ক'রে তাকে কাছে টেনে নিল; গভীর স্বরে বলতে লাগল—বাবার ঐ ছবির সামনে যেমন ছোট্ট এতটুকু তুমি আমার বুকের মধ্যে রয়েছ, তেমনি থাকবে রোজ—চিরকাল—বুড়ো হয়ে মরে যাওয়া অবধি। লোকে বলবে—নীলকান্ত রায়ের ছেলে ঐ শঙ্কর, রায়-বাড়ীর বউ ঐ মল্লিকা···কেমন ? বাবার কাজ দু-জনেই করব আমরা।

মল্লিকা তদ্গত চোখে ছবিটির দিকে চেয়ে থাকে, তার পর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উপুড় হয়ে শঙ্করের পায়ে প্রণাম করে।

শঙ্কর থানায় চলে গেল। দারোগাকে বলে—আপনি নতুন এসেছেন, জানেন না। যদু-মোড়ল আমার বাড়ী থাকে, ওর বাপও আমাদের কাজ করত—

দারোগা আপ্যায়ন ক'রে বসালেন। বলেন—এসে পড়েছেন, বেশ হয়েছে মশাই। আমাদেরই বা গণ্ডগোলের গরজ কি ? তবে এ-ও বলি, ছাইভস্ম কেস—এতদূর কি গড়াত ? কথায় বলে, স্ত্রী-বুদ্ধি···তাঁরা পালকি-বেহারার টাকা জোগাতে পারলেন, আর কনেষ্টবল-গুলোর দরুন কিছু ধরে দিলে তখনই যে খতম হয়ে যেত। ওর আধা খরচও লাগত না মশাই—

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করে—ব্যাপারটা কি ?

দারোগা বলেন—পিঁপড়েগুলোর পাখনা উঠছে, দেখেন কি ? থানায় এসে চেঁচিয়ে গেল—সরকারী আপিস, সরকার এ-সব সায়েস্তা করতে জানে, করবেও। কিন্তু ছোটলোকের এই রকম বাড় বাড়লে ভদ্রলোকেরা টিঁকবে কি ক'রে, ভাবুন ত ! আরে মশায়, নিচু হয়ে নাই দিলি

থাকবে ত ভগবানকে ব'লে কয়ে আমার আপনার মত বামুন হয়ে জন্মাল না কেন?

শঙ্কর বলে—আপনার কাছে ভাগবত ভাষ্য শুনতে আসি নি, দারোগাবাবু। নীলকান্ত রায়ের নাম শুনেছেন, খাওয়া-ছোঁওয়ার বাছবিচার নেই বলে পাঁচ বচ্ছর একঘরে হয়ে ছিলেন। আমি তাঁর ছেলে—যদু চাকর নয়, আমার বড়ভাই—

—তা না হ'লে এই রকম কাঁধে চড়ে বসে! আপনারা দেশটা ডোবাবেন।

রূঢ় কণ্ঠে শঙ্কর বলল—আজ্ঞে না, আপনারাই। শুধু দেশ নয়, যে-সরকারের নিমক খাচ্ছেন তাকেও। সোজা কথায় বলি, পান-টান খাওয়ার সিকি পয়সা প্রত্যাশা করবেন না—মিথ্যে মামলা তুলে নিন।

দারোগা চটে উঠলেন।—মিথ্যে কি রকম? ডাক্তারবাবুর গাছ থেকে চুরি ক'রে নারকেল পাড়ে নি?

—না। তার কারণ, অতুল ডাক্তারের নারকেল গাছই নেই।

—আছে না আছে, সে বিচার কোর্ট করবে।

—তা করবে। আপাতত আমিও কিছু করে যাই। দারোগার গলায় ছিল কম্ফর্টার জড়ানো, রাগের মাথায় শঙ্কর কম্ফর্টার ধরে এক হেঁচকা টান দিয়ে ছেড়ে দিল।

তার পর হুলস্থূল কাণ্ড। যদু ছাড়া পেল, কিন্তু স্বদেশী ব্যাপারে বাপের সুনাম এবং তার সঙ্গে এই ঘটনা যোগ হয়ে নানা দফায় শঙ্করের মোট দেড় বছর জেল হয়ে গেল। সে-আমলের খবরের কাগজেও এ-সব কথা উঠেছিল, একটা কাগজে ত এক মল্লিকার নামেই দেড় কলম লেখা বেরুল—মল্লিকা-কুসুমের মত যিনি স্নিগ্ধ সৌরভে গৃহকোণ আমোদিত করিতেন, অভাগ্য সন্তানবর্গের কল্যাণকল্পে তিনি আজ স্বদেশ-গগনে সবিতৃস্বরূপ সমুদিত হইয়াছেন, এইবার নবপ্রভাতের অভ্যুদয় হইতে চলিল...ইত্যাদি। মোটের উপর সমস্ত মিলে ব্যাপার এমন গড়াল, যে-বেহারারা যদুর পাল্‌কি বয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তারা এক দিন এসে পাই-পয়সা অবধি ভাড়া ফিরিয়ে দিয়ে গেল। সকলের যুক্তি-পরামর্শে বালা বিক্রির টাকায় রায়-বাড়ীর মণ্ডপে একটা নৈশ-বিদ্যালয় খোলা হ'ল। চাষারা সন্ধ্যার পর বই-সেলেট নিয়ে আসে। মল্লিকাও এই সব নিয়ে যেন পাগল হয়ে উঠল; ছোট ছেলেমেয়েদের সে নিজে পড়ায়।

জেল থেকে বেরবার দিন ছেলেরা ফুলের মালা নিয়ে ফটক আটকে ব'সে আছে, ভিড় ঠেলে মল্লিকা আর যদু এগোবার ভরসা পায় না। শঙ্করকে তারা দুটো দিনও বাড়ীতে স্থির থাকতে দেয় না, এখানে সমিতি ওখানে বৈঠক—নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ নেই।...আবার পুলিসে ধরে, যথারীতি মামলা-মোকদ্দমার পর জেল হয়। ...শেষাশেষি আর কোর্টেরই দরকার হয় না, সোজা ডিটেনশন-ক্যাম্পে চালান হয়ে যায়।

বাড়ীর চিঠি আসে মাঝে মাঝে; মল্লিকা নিজের কথা কিছু লেখে না—তা ছাড়া সকল খবরই দেয়। মানীর বিয়ে হয়ে গেছে, জামাইটি লেখাপড়াও জানে একটু-আধটু, সেই এখন যদুর বাড়ীতে এসে আছে, চাষ-বাস দেখে। যদুকে খুব টানাটানি করছে, তাকে আর এখানে থাকতে দেবে না...

সেদিন মল্লিকার সত্যই চোখ ফেটে জল এসেছিল।—আচ্ছা, তোর বাপকে যে নিয়ে যাবি মানী, এই পুরীর মধ্যে একা-একা আমি থাকব কি ক'রে?

মানী বলে—বাবা বুড়ো হয়ে গেছেন, আর কত খাটবেন বল!

—তোর বাবাকে বুঝি বড্ড খাটাই?

মানী সমস্ত জানে, তার একটু লজ্জা হয়। বলে—না খুড়ীমা, তেমন কথা কে বলছে। আসলে হ'ল, বাবা এখানে থাকলে নানান কথা ওঠে, সমাজে মাথা নিচু হয়ে যায়। তাই তোমাদের জামাই বলছে, সকলকে ছেড়ে তিনটে মানুষ একলা থাকা যায় না ত!

জামাইও সঙ্গে ছিল। তার সুর মোলায়েম নয়, বলে—কোথায় মানুষ? আমরা ত তোমাদের কাছে কুকুরের সামিল। আমাদের ঘরে ঢুকতে দাও?

ম্লান হাসি হেসে মল্লিকা বলে—দিই কিনা, ওকে এক বার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ দিকি, অমূল্য।

মানী সামলে নেবার ভাবে তাড়াতাড়ি বলল—তোমরা দাও, কিন্তু সবাই দেয় না কিনা সেই কথা বলছে খুড়ীমা।

—দিন-কাল বদলে যাচ্ছে রে, যারা দেয় না তারাও দেবে।

অমূল্য আগুন হয়ে ওঠে।—দয়া? দয়া চাই নে, আমরা আলাদা থাকব। কোম্পানী বন্দোবস্ত করে দিয়েছে, দালান-কোঠা চাকরি-বাকরি বখরা হয়ে যাবে… খাসা হয়েছে—

—কিন্তু ভালবাসা ত হবে না, তফাৎটাই শুধু বাড়বে। একটা নিঃশ্বাস ফেলে মল্লিকা বলে—এদের অনেক দোষ আছে মানি, তবু এদেরই মধ্যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ছেলে মানুষের অপমান প্রাণ দিয়ে বুঝেছে। এই বাড়ীরই একটা লোক সব ছেড়ে-ছুড়ে আজও ভেসে বেড়াচ্ছে …হ্যাঁ রে মানী, আজকাল তোর খুড়োমশায়কে একেবারে ভুলে গেছিস, না?

মানী লজ্জিত হয়ে সরে যায়। অমূল্য তখন চলল শ্বশুরের কাছে। মণ্ডপের সামনেটায় একটা নিড়ানি নিয়ে যদু ঘাস তুলছিল। সেখানে আর এক দফা বচসা হল। অনেকক্ষণ পরে রান্নাবান্না হয়ে গেলে মল্লিকা গিয়ে দেখল, যদু ঘাসের উপর মাথায় হাত দিয়ে ব'সে ভাবছে।

মল্লিকা বলে—আর কেন মোড়ল-দাদু…আমরা উঁচু জাত—ওদের ঘেন্না করি; কেউ আর ইস্কুলে পড়তে আসবে না, ঘাস তুলে পথঘাট যতই সাফ করে রাখো না কেন—

যদু বলে—তাইত বউঠাকরুণ, নতুন কথা শুনি… তোমরা আর আমরা একেবারে পর, কোন সম্পর্ক নেই—

—থাকবে কি ক'রে। কোম্পানী দাগ কেটে মার্কা মেরে দিয়েছে যে। এদিক-ওদিক হবার জো আছে?

মল্লিকা দুপুরবেলা শঙ্করকে লিখতে বসল—অবস্থা ভাল নয়, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। স্বদেশী আমলের কথা শুনেছি, কিন্তু এমন দুর্দ্দিন আর কখনো আসে নি। আবার এদিকে ক্ষেত-খামার খাঁ-খাঁ করছে, ভয়ানক অজন্মা। লোকে এবার খেতে পাবে না…

কি-ই বা বয়স মল্লিকার, তবু চুলে পাক ধরেছে, কুঞ্চন-রেখা পড়েছে সুকোমল মুখের 'উপর। সেই ছিপছিপে হাসিমুখ মেয়েটি, চোখে মুখে চঞ্চলতা…এখন কথা বলে কম, হাঁটে কত আস্তে।

যদুকে শেষ পর্য্যন্ত এক রকম জোর-জবরদস্তি করেই নিয়ে গেল। মল্লিকা একা থাকে। এক-এক দিন যদু সন্ধ্যার পর গা ঢাকা দিয়ে আসে, বেশীক্ষণ থাকতে ভরসা পায় না, খবরাখবর নিয়ে সরে পড়ে। এক দিন মাস ছয়েক পরে সে ঘরের মধ্যে এসে চেপে বসল। বলে—ইঃ আমার কুটুম্বেরা। ভাত দেবার কেউ নয়, কিল মারবার গোঁসাই। বুঝলে বউঠাকরুণ, দুপুরে আজ লবডঙ্কা হয়েছে।

মল্লিকা শিউরে ওঠে।—সে কি?

তিক্ত কণ্ঠে যদু বলে—জুটবে কোথা থেকে? তের বিঘের বড় বন্দটা পতিত রয়েছে। তার কি চেষ্টা আছে, নবাবপুত্তুর তেড়ি কেটে লম্বা লম্বা বুলি আউড়ে বেড়াবে, সন্ধ্যের পর অশ্বিনীনাথের আড্ডায়…। গলা নামিয়ে চুপি চুপি বলে—আবার শুনি, রাত্তিরে এদিক-ওদিক বেরচ্ছে —পয়সার খাঁকতি, নেশার টান…শেষকালে জেলেটেলে না যায়, তাহলে মানীর কষ্টের পার থাকবে না।

মল্লিকা বলে—এই আমার মত?

যদু উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে—হঃ, তোমার মত! তুমি তো ভাগ্যধরী বউঠাকরুণ, ঐ হারামজাদার কথার মধ্যে তুমি আমার ভাইধনকে টেনে আনলে?

ভাতের থালা সামনে আসতে যদু গ্রাসের পর গ্রাস মুখে পোরে। কেবল যে দুপুরে খায় নি, সে-রকম মনে হয় না—হয়ত আরও কত বেলা…কত দিন তার ঠিক কি! মল্লিকার মনটা বড় খারাপ হয়ে রইল, রাত্রে খুব জ্বর এল, জ্বর এই রকম প্রায়ই হয়; ভাবনায় ভাবনায় কিছুতে ঘুম আসে না। আলো জ্বেলে তখন চিঠি লেখে—এতখানি বয়সের মধ্যে যা কোন দিন লেখে নি, তাই সে লিখল—কবে আসবে? আমি আর থাকতে পারি নে —তুমি চলে এস—

মল্লিকার চিঠির জন্য অবশ্য নয়, তবে এরই কিছুদিন পরে শঙ্কর হঠাৎ ছাড়া পেয়ে গেল। প্রথম যে ট্রেন পাওয়া গেল, তাতেই সে উঠে বসল।

সন্ধ্যার পর বড় কনকনে শীত—বাতাসের যেন দাঁত হয়েছে, গ্রামের কুকুরটা অবধি এরই মধ্যে খেজুর-রস জাল-

দেওয়া উনানের ধারে গুটিসুটি মেরে শুয়েছে। এমনি সময়ে শঙ্কর স্বল্পালোকিত স্টেশনে নেমে এদিক-ওদিক চাইতে লাগল।

—কোথায় যাবেন বাবু?

শঙ্কর গ্রামের নাম করে। বিছানার মোট ও স্যুটকেসটা দেখিয়ে বলে—বোঝা ভারী হবে না।

—উঁহু, শোলার আটি। চার আনা লাগবে—ষোলটি পয়সা, আধলা কম নয়।

টিকিটবাবু আলো হাতে সেই দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন।

—নতুন লোক দেখেছে, ঠগ বেটারা অমনি ছুরি শানাচ্ছে। বলি, ষোলটা পয়সা কখনও দেখেছিস এক জায়গায়?…আপনি ব্যস্ত হবেন না, এগিয়ে দেখুন—কত জনে হা-পিত্যেশ ক'রে আছে। চার পয়সা কি বড়জোর ছ-পয়সা—

লোকটা বলে—পাক্কা দু-কোশ পথ, খাল পেরুতে হবে,—ছ-পয়সা?

—তাই তো সবাই যাচ্ছে।

—তবে আমিও যাব।

বোঝা মাথায় নিয়ে সে দ্রুতপদে চলল।

পাকা রাস্তা ছেড়ে তারা সুঁড়ি-পথে নামল। খুব জ্যোৎস্না ফুটেছে, মাঠ গাছপালা ঝুপসি ঝুপসি জঙ্গলগুলো অনেক দিন পরে শঙ্করের চোখে অপরূপ ঠেকছে।

—তোমার নামটা কি ভাই?

—তা-ও ছ-পয়সার মধ্যে?

শঙ্কর চুপ করল। তার পর ভাবে, ঐ তো রোগা চেহারার মানুষ—দুটো বোঝা বয়ে খুব কষ্ট হয়েছে, মেজাজ তাই বিগড়ে গেছে। সহানুভূতির স্বরে বলে—এই ইয়ে…স্যুটকেসটা বরং আমার হাতে দাও দিকি—

বিরক্ত মুখে লোকটা বলে—তাহলে পয়সাও তিনটে কম দেবে তো?

পথ ছেড়ে এবার সে আমবাগানে ঢুকে পড়ল।

—ওদিকে কেন রে?

লোকটি বলে—এইখানে দাঁড়াও বাবু, জল খেয়ে আসি একটু—

—এত শীতে জল?

সে রুখে উঠল।—জলও খাওয়া যাবে না? বাগানের উদিকে খাল, কতক্ষণ লাগবে!

শঙ্করের মনে পড়ল, একটা খালের মত আছে বটে! চৈত্র মাসে একদম শুকিয়ে যায়, বর্ষায় হিঞ্চে-কলমী নিয়ে জেগে ওঠে, জলের চেয়ে শেওলাই তাতে বেশী। ছেলেবেলায় এইখানে সে দু-চার বার পুঁটিমাছ ধরতে এসেছে।

শঙ্কর দাঁড়াল। আবার ভাবে, দাঁড়িয়েই বা কি হবে! লোকটার ধরণ-ধারণ তেমন সুবিধে লাগছে না। বাগানের মধ্যে খানিকটা গিয়ে একটা উঁচু জমি—সেখান থেকে বেশ দেখতে পাওয়া গেল। শঙ্কর চেঁচিয়ে ডাকে—জল খাবি, তা খালের মাঝখানে কি করিস?

—আজ্ঞে, ঘাটের জল ঘোলা—

—কোমর জল হয়ে গেছে, এখনও এগুচ্ছিস।

জবাব না দিয়ে লোকটা ক্ষিপ্রবেগে শেওলা ছিঁড়ে পথ করতে লাগল। শঙ্কর বন-জঙ্গল ভেঙে সোজা খালের কিনারে ছুটল। ততক্ষণ সে ওপারে উঠে দৌড় দিয়েছে।

শঙ্কর হেসে ওঠে।—পারবি নে বাপু, সাত বছর আটকা ছিলাম, তা বলে পায়ে বাত ধরেছে ভাবিস নে। আচ্ছা—যত জোরে পারিস ছোট্—আমিও ছুটছি।

নূতন ক'রে আর শেওলা ছিঁড়তে হ'ল না, চক্ষের পলকে সে খাল পার হয়ে গেল, প্রায় রশি দুই গিয়ে লোকটাকে জাপটে ধরল।

স্যুটকেস ফেলে দিয়ে লোকটা কোমর থেকে বের করল এক ছুরি। ধস্তাধস্তি চলল খানিকটা। শঙ্কর বলে - ও ছুরিতে মাছ কোঁটা যায়, মানুষ কাটা যায় না—বুঝলি? হাত ধরে মোচড়ে দিতে ছুরি পড়ে গেল, লোকটা আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল।

গ্রামের ধারে এসে পড়েছিল। চেঁচামেচিতে লোক জুটে যায়।

—কি হয়েছে? কি হয়েছে?

লোকটা অসঙ্কোচে বলে—মেরে ফেলেছে ভাই রে, হাতখানা মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে। তেষ্টায় জল খেতে দেয় না, যেই বলেছি, গোপাল-দার ঐ বাড়ী হয়ে একটুখানি ঘুরে যাই—

বোঝা গেল, তার বাড়ী এই গ্রামেই। ছোকরাদের মধ্যে তিন-চার জন বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এল। বলে—ঐ রকম…ভদ্দোরলোক হয়েছে কি না, আমাদের জানোয়ার ভাবে। পড়ে পড়ে তুই মার খেলি, জবাবটা কি আমাদের জন্য মুলতুবি রেখেছিস?

ব্যাপার তুমুল হ'ত নিঃসন্দেহ। কিন্তু ওরই মধ্যে আধবুড়ো এক জনকে শঙ্করের চেনা-চেনা ঠেকল। বলে—চৈতন মোড়ল না? ওঃ—কুশখালি এসে পড়েছি যে, বুঝতে পারি নি।

চৈতন মোড়ল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়, গোঁফ-দাড়িতে ভরা মুখ, চিনবার জো নেই।

—আমি রায়-কর্ত্তার ছেলে গো, শঙ্কর—

চৈতন বলে—সব্বোনাশ? এদ্দিন পরে এলে? সেই লোকটার দিকে তাকিয়ে হেসে বলে—মেরে থাকে মেরেছে, বেশ করেছে; ইনি মারলে দোষ হয় না, সম্পর্কে তোর খুড়শ্বশুর—

শঙ্কর অবাক হয়ে আছে দেখে পরিচয় করিয়ে দেয়—এ হ'ল তোমাদের যদু-মোড়লের জামাই। ওরে অমূল্য, পেন্নাম কর—

অমূল্য গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই সময়ে এসে পড়লেন জমিদারী কাছারির নায়েব, সঙ্গে চার জন বরকন্দাজ। তিনিও এই ট্রেনে নেমেছেন, বরাবর রাস্তা ধরে যাচ্ছিলেন, হৈ-চৈ শুনে কি ব্যাপার জানতে এসেছেন।

—কি হে? একেবারে থেমে গেলে সব? এই যে অমূল্যচন্দোরও রয়েছেন দেখছি—

যারা বেশী বীরত্ব দেখাচ্ছিল তাদের আর পাত্তা নেই, কোন্ দিকে সরে পড়েছে, যেন কর্পূরের মত উবে গেছে। নজরে পড়ে গিয়ে অমূল্য ঘাড় নিচু ক'রে রইল।

শঙ্করের দিকে চেয়ে নায়েব বললেন—জামা যে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। খুলুন দেখি—এঃ মশায়—

পিঠের এক জায়গায় লম্বালম্বি চিরে গেছে। এদিকে এতক্ষণ কারও নজর পড়ে নি। এক জন বরকন্দাজ ছুরিখানা কুড়িয়ে নিল।

নায়েব বোমার মত ফেটে পড়লেন।—ব্রহ্মরক্ত পাত করেছিস, ভিটেয় ঘুঘু চরাব। শ্রাদ্ধের বন্দোবস্ত ত হচ্ছেই ভাল করে, কাল গিয়ে ফৌজদারি চড়াব। কালাপানি ঘুরিয়ে আনব তবে আমার নাম মন্মথ পাকড়াশি, হ্যাঁ—

শঙ্করের হাত ধরে টানতে টানতে বলেন—চলে আসুন, মশায়। আমি আছি, উড়বার জো নেই কারও। দায়-ঝক্কি সমস্ত আমার। চৈতন মোড়ল, বাবুর জিনিস দুটো তোমার জিম্মায় রইল, পৌঁছে দিও। কাছারি গিয়ে ডাক্তার ডেকে আগে ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হোক্—

রাস্তায় এসে মন্মথ মনের উল্লাস চাপতে পারেন না, হাসতে হাসতে বলেন—একটুখানি নোনছা ছাল উঠে গেছে মশাই, ডাক্তার লাগবে, না হাতী। তবে সাক্ষী হিসেবে ডাক্তার একটা চাই বটে···ডবল ফি ধরে দিলেই হয়ে যাবে, বন্দোবস্ত আছে।

চুপচাপ কয়েক পা গিয়ে আবার সুরু করলেন—ঐ অমূল্য বেটা হ'ল পালের গোদা। আরে বাপু, মাতব্বর হবি—ভাল কথা, গুছিয়ে চলতে পারলে দু-দশ টাকা আছেও—কিন্তু ঘর থেকে আগাম বের করতে হয় যে। তোর হ'ল ভাঁড়ে মা-ভবানী—মুটেগিরি করবি, আবার নেতাগিরিও করবি—শুধু বামুন-কায়েতদের মুণ্ডপাত ক'রে বেড়ালে কি শেষ রক্ষে হবে?

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করে—এদিকে বুঝি ঐ সমস্ত খুব আন্দোলন হচ্ছে?

নায়েব বললেন—হবে না? না দেবার কথা বড় মিষ্টি কি না! সব শেয়ালের এক রা হয়ে দাঁড়াচ্ছে—

শঙ্কর বললে—বামুন-কায়েত ওসব কিচ্ছু নয় নায়েব-মশায়। ওদের রাগ আসলে চড়া খাজনা আর জোর-জুলুমের উপর। সেইটেই এখন জাত-বেজাতের কথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

নায়েব প্রতিবাদ করে উঠলেন।—সেই আহ্লাদে থাকুন মশায়। এক বার আনাচ-কানাচ থেকে শুনে আসবেন দিকি ওদের কথা।

—এত সব তারা ত তলিয়ে বোঝে না!

—বুঝুক না বুঝুক, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই আমরা কি ছেড়ে কথা কইব? আর তা-ও বলি, ধন্য আছেন। নইলে দেখুন না কেন—দেওয়ানিতে আঠার মাসে বছর, আজ এক মাস ছুটোছুটি ক'রে সমন বের করতে পারছি নে, কোত্থেকে পথের মানুষ আপনি এসে এই কাণ্ড। এর নাম ফৌজদারি মামলা—একেবারে কাঁচা-খেগো দেবতা। সকালবেলা টুক করে থানায় একখানি এজাহার ঝেড়ে সেকেণ্ড ট্রেনে সদরে সোজা উকিলের বাড়ী।···কি মশাই, আবার এত রাতে বাড়ী যাবেন কি করতে? কাছারিতে দুটো শাক-ভাত খেয়ে ভোরবেলা বরঞ্চ এই পথে অমনি—

শঙ্কর সোজাই চলল। ব্যস্ত হয়ে নায়েব ডাকলেন—তা হ'লে সকালবেলা আসছেন ত? না, আবার লোক পাঠাতে হবে?

—আমি মামলা করব না।

—তার মানে?

শঙ্কর ফিরে দাঁড়াল।—ভেবে দেখলাম নায়েব-মশায় দোষ আমারই। পেটে ভাত নেই—শীতের রাত্রে চার মাইল মোট বয়ে আসছে, মজুরি ছ-পয়সা। এতে মেজাজ খারাপ হ'লে দোষ দেব কার? আমি যদি বলতাম, চার আনাই পাবি বাপু, সেইটে ন্যায্য···আর তার উপর যদি এ-সব হ'ত—

নায়েব শেষ করতে দেন না, গর্জ্জন করে ওঠেন—তা বুঝেছি, আপনারা ঘরের ঢেঁকি সব কুমীর হয়ে উঠেছেন, নইলে এই সব হাঙ্গামা—

—হাঙ্গামা-হুজ্জুত না হ'লেই বা আপনাদের দু-পয়সা আসে কিসে? হাতবাক্স কোলে ক'রে নেহাৎ একেবারে দুর্গানাম লিখতে কি কাছারি এসে বসেছেন? বলুন, সত্যি কি না।

একটু হেসে হন্‌হন্ করে সে বাড়ীমুখো চলল।

চাঁদের আলোয় শঙ্কর উঠানে বাদামতলায় দাঁড়াল।

—দুয়োর খোল ও যদু—

এই উঠানে কত সন্ধ্যায় কত ছুটাছুটি করেছে, মা তখন বেঁচে। বাদামতলার এইখানটায় বিয়ের পর

মল্লিকার পাল্‌কি এনে নামিয়েছিল। আজ যেন নূতন অতিথি, সবাই অবিশ্বাস করছে। এতকাল পরে ফিরে এসে দেখে, চেনা মানুষরা বদলে গেছে, নূতন পৃথিবী।

—যদুভাই, শুনতে পাচ্ছ না? আমি—আমি—

মল্লিকার জ্বর। লেপের নীচে এক রকম বেহুঁশ হয়ে ছিল, ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। শঙ্কর ঘরে ঢুকে চমকে ওঠে। ঠাণ্ডার ভয়ে দরজা-জানালা বন্ধ···মিটমিটে প্রদীপ···বালি-খসা ভাঙাচোরা দেয়ালের ফাঁক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আরশুলা উড়ছে···বিশীর্ণ ভয়াবহ মুখ মল্লিকার। জ্যোৎস্না-পরিপ্লাবিত দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে সে যেন কালো গহ্বরের মধ্যে ঢুকেছে। শঙ্কর হাত বাড়িয়ে দিল মল্লিকার দিকে, জীবন এসে মৃত্যুকে আদর ক'রে ডাকল।

—কেমন আছ?

—ভাল, খুব ভাল। এই ক-দিন একটু জ্বর হয়েছে।

—ক-দিন, না ক-বছর বল।

—গেক গে। ম্যালেরিয়া জ্বর—ঐ রকম ভোগায়। মল্লিকা উঠতে গিয়ে মাথা ঘুরে ব'সে পড়ে। বলে—মোড়ল-দাদু একা একা কি যে করছে! আগে একটা খবর দিলে না—বেশ লোক!

শঙ্কর বলে—বড্ড মনে-প্রাণে চেয়েছিলে কি না, হঠাৎ ছেড়ে দিল। চিঠিখানা পেয়ে অবধি এমন হয়েছিল মল্লিকা, খবর দেবার দেরি সইল না—ছুটে এসেছি।

—এত দয়া—এমন শত্রুতা আর কার আছে বলো। বলতে বলতে মল্লিকা প্রগল্‌ভ হাসি হাসল।

যদু দেখা দিল; কুলোয় করে চিঁড়ে-পাটালি আর জামবাটি-ভরা দুধ এনেছে। সে থমকে দাঁড়ায়।

—রক্তের দাগ কেন?

মল্লিকা বলে—দেখি, দেখি···এদিকে ফেরো তো—

শঙ্কর হেসে উড়িয়ে দেয়—দেখবার কি আছে···কাঁটায় ছড়ে গেছে, গরম জামায় চুপসে গিয়ে ঐ রকম দেখাচ্ছে।

—আহা-হা, তাহলে আগে একটু আইডিন—

—উঁহু, সকলের আগে এইটি। যদুর হাত থেকে এক রকম কেড়ে নিয়েই শঙ্কর খেতে বসল। তার পর অন্য প্রসঙ্গ তোলে।—আচ্ছা আমি যখন ডাকছি, গলা শুনে কি ভাবলে বল তো।

মল্লিকা বলে—অনভ্যাস হয়ে গেছে, ঠিক ধরতে পারি নি। ভয় হ'ল চোর-টোর বুঝি!

শঙ্কর হেসে ওঠে।—চোর এসে হাঁকাহাঁকি করে গেরস্ত জাগাচ্ছে···বুদ্ধি আছে দেখছি। একটু চুপ ক'রে থেকে বলে—চোর না হই, দাগী তো বটে! বাড়ী এলাম, কিন্তু কত দিন যে থাকব—

মল্লিকা গম্ভীর হয়ে যায়।—যদি বলি, যেতে দেব না আর—বাড়ী থেকে বেরতেই দেব না।

—এমন তো বল নি কোন দিন—

মল্লিকা বলে—তখন ছেলেমানুষ ছিলাম, একটা কথাও কি গুছিয়ে বলতে পারতাম ছাই!···সত্যি, আমি ঠিক করেছি, তোমাকে আর বাইরে-বাইরে থাকতে দেওয়া হবে না।

—তবে ঘরেই থাকব।

খাওয়া শেষ হয়েছিল। শঙ্কর হাত ধুয়ে হাসতে হাসতে খাটের উপর এসে বসল।

মল্লিকা ঠিক বিশ্বাস করে না।—সত্যি বলছ? তাহ'লে তোমার দেশের কাজ?

—কিন্তু তুমিও তো এক জন দেশের মানুষ।

মল্লিকা বলে—তা সত্যি। ধর তুমি ত জীবনটা এক রকম এই পথেই দিলে। আরও মানুষ রয়েছে, তারা যাক না।

—ঠিক কথা। কিন্তু যায় না যে!

—হয়ত ভাবে, মিছে আত্মবলি দেওয়া। এ-জাতের কি কিছু হবে? ক-দিন থাক, দেখবে অবস্থা। দেশের ছেলেমেয়ে এতকাল এত দুঃখ স্বীকার ক'রে কত কি করতে চেয়েছিল, সব চুরমার হয়ে গেছে।

মল্লিকার গলা ভারি হয়ে এল, সে আর-এক দিকে মুখ ফেরাল। শঙ্করও সহসা জবাব দিতে পারে না। তার পর বলে—পথের বাধা ত আসবেই মল্লিকা, বাধা শক্ত হচ্ছে, তাতেই ত মনে হয় সূর্য্য উঠল বলে। যোগী-ঋষিরা সাধনা করে, শেষ রাত্তিরে ডাকিনীর উপদ্রব বেশী হয়। গল্প শোন নি!

মল্লিকার দিকে ব্যথাভরা দৃষ্টিতে সে চেয়ে থাকে। আবার বলতে লাগল—মল্লিকা, তোমার শাঁখা সম্বল, রোগা দেহ; আমিও বুড়ো হয়ে গেলাম। সংসারের উপান্তে এসে দাঁড়িয়েছি—শ্মশানের উপর এবার ঘর বাঁধা হ'ল না। কিন্তু ফুল ফুটবে···এ অবশ্যম্ভাবী, আমাদের এত কষ্ট বিফলে যাবে না।

সকাল না হ'তে দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা পড়তে লাগল। যদু খিল খুলে দেখে, মানী, অমূল্য, চৈতন মোড়ল এবং আরও দু-তিন জন এসেছে। এরাই তাকে মারবে ব'লে শাসিয়ে বেড়ায়, কুশখালির দিকে যাবার উপায় নেই, জামাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে পর্য্যন্ত পর হয়ে গেছে। কিন্তু অবাক কাণ্ড—সেই জামাই পরম ভক্তিমান হয়ে সকলের আগেভাগে ঢিপ করে প্রণাম করল, পা আর ছাড়তেই চায় না।

চৈতন বলে—লজ্জায় আসতে চায় না। আমি বলি, ভয় রায়-কর্ত্তার ছেলেকে নিয়ে ত নয়, এর মধ্যে পাকড়াশি ঢুকে পড়েছে। আস্ত কলিঠাকুর—ডাহা মিথ্যের উপর চুনকাম করে। এবারে এমন জুত পেয়ে গেছে, শুধু অমূল্য কি—পাড়াটা সুদ্ধ চ'ষে ফেলবে।

যদু উদ্বিগ্ন হয়ে বলে—কি হয়েছে? অমূল্য কি করেছে?

—খুড়োমশায় বলেন নি কিছু? মানী কেঁদেই ফেলল।

—বুঝলে চৈতন-দা, এ-ও ঐ পাকড়াশির বুদ্ধি। বাবার কানে গেলে আবার একটা খাতির-উপরোধের ব্যাপার হবে, একদম তাই চেপে গিয়েছেন। বেরিয়ে গেছেন নাকি?

যদু বলে—চেঁচাস নে, ঘুমুচ্ছে ঐ ঘরে। বউঠাকরুণের রাতে ঘুম হয় না, এখন বোধ হয় একটু চোখ বুজেছে।

চৈতন নিঃশ্বাস ফেলে বলে—তবু রক্ষে। রওনা হবার আগে আসা গেছে। আর তোকেও বলি অমূল্য, পই-পই ক'রে বারণ করেছি—গায়ে গতরে খাট্‌, অধম্ম কাজগুলো ছেড়ে দে···বিশেষ নায়েব যখন আদা-জল খেয়ে লেগেছে—

কথায় কথায় যদু সব শুনল। হঠাৎ একসঙ্গে সকলে চুপ করে যায়, নিঃশব্দে শঙ্কর এসে দাঁড়িয়েছে। রুষ্ট কণ্ঠে যদু বলে—এমন মিথ্যুক হয়েছ ভাইধন, ছুরির খোঁচা খেয়ে স্বচ্ছন্দে বললে, কাঁটায় ছড়ে গেছে।

শঙ্কর বলে—কাঁটা নয়, কি মানুষ? কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে ফেলবার বন্দোবস্ত হয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত উভয়কেই আস্তাকুঁড়ে যেতে হবে—বুঝলে?

নিজের রসিকতায় সে হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

যদু আরও জ্বলে ওঠে।—হেসো না, আমার গায়ে জল-বিছুটি মারছে। হারামজাদা শেষকালে খুনে হয়ে দাঁড়াল! যা ইচ্ছে করুক গে পাকড়াশি, তুমিও থানায় চলে যাও ভাইধন, জামাই ব'লে খাতির করব না।

—জামাই না হ'লেও আমার দেশের মানুষ ত, খাতির আমাকে করতেই হবে। বলতে বলতে শঙ্করের কণ্ঠস্বর অপরূপ হয়ে ওঠে, দুই চোখে যেন আগুন জ্বলে। বলে—বড়ভাইয়ের মত আমায় মানুষ করলি যদু-ভাই, বাবার কাছে এইটুকু বয়স থেকে মানুষ—তুই আজ ঐ কথা বললি? তোর বউঠাকরুণ ঐ আঁধার ঘরে একা একা ধুঁকছে, আমারও কয়েদখানায় জীবনটা কেটে গেল··· এ-সব শুধু কি নিজেদের জন্য—বামুন-কায়েতদের জন্য—এই মোড়লদের জন্য নয়? যাদের চিনি নে, কোনদিন দেখব না···তারাও বড় হবে, মানুষ হবে—জীবন দিয়ে দিয়ে আমরা এই চাই নি? বল্‌ যদুভাই, বল্‌—আমি মিথ্যা বলছি কিনা।

বুড়া যদু আজকের নয়—বলতে গিয়ে যেন হাহাকার করে ওঠে।—কে ভাবে এ-সব ভাইধন? এক-দল কেবল আর-এক দলকে উস্কিয়ে দিচ্ছে বইত না! কোথাকার ভটচাজ্জিরা নতুন পাঁতি দিয়েছে—এখন থেকে তুমি আমার কেউ নও, আমি তোমার কেউ হলাম না। আজ যদি কর্ত্তা থাকতেন—

—আমরা ত আছি, মোড়ল-দাদু। চোখ চেয়ে সবাই শিউরে উঠল। মল্লিকা উঠে এসেছে, পা টলছে, কালি-মাখা কোটরগত দুটি চোখে যেন আলো ফুটেছে সামনের বেঞ্চির কোণে ধপ করে সে ব'সে পড়ল বলতে লাগল—সেবারে মাটি ভাগ করেছিল, এবার মানুষ ভাগ করেছে। সেবার সহ্য করি নি, এবারেও করব না। বসো তোমরা মিষ্টিমুখ ক'রে যেতে হবে। নিমু-ময়রার দোকানে একটি বার যেতে পারবে মোড়ল-দাদু?

খানিক পরে আবার মল্লিকা বেরিয়ে এল, হাতে হলদে সুতো। বলে—আমার শ্বশুর এ-সব তুলে রেখে গিয়েছিলেন। এস তোমরা, রাখি পরতে হবে। তুমি এস···তুমি···তুমি···

কেবল অমূল্য মুখ ভারি ক'রে থাকে। বলে—আমার হাতখানা মুচড়ে একেবারে ভেঙে দিয়েছে, এই হাতে পরব রাখি?

শঙ্কর বলে—শুধু হাতখানাই হাতের মাথায় পেলাম যে! মনের নাগাল পাই নে, নইলে বিষভরা মনটাই মুচড়ে ভেঙে দিতাম।

প্রাণখোলা হাসিতে ঘর ফেটে যাওয়ার উপক্রম।

জ্ঞান ও প্রেম

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমের যেখানে ঘটেছে সমন্বয়, সেখানে কল্যাণলক্ষ্মী পেতেছে তাঁর আসন। প্রেম যেখানে জ্ঞান থেকে অথবা জ্ঞান যেখানে প্রেম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, সেখানে ঘনিয়ে এসেছে অমঙ্গলের ছায়া। যেখানে শুধু ভালবাসা, সেখানে মঙ্গলের ফসল ফলানো সম্ভব নয়। ছেলের কালাজ্বর হয়েছে—মার প্রাণ সদাই উচাটন—ছেলেকে কেমন ক'রে নীরোগ করা যায়। সন্তানকে রোগমুক্ত করবার আগ্রহাতিশয্যে মা তাকে জলপড়া খাওয়ায়, তার শীর্ণ হাতখানিকে মাদুলিতে, তাবিজে, তাগায় ভারাক্রান্ত ক'রে তোলে, ছেলের মঙ্গলের জন্য তারকেশ্বরের মন্দিরে ধর্না দেয়—কিন্তু কোন কিছুতেই ফল হয় না—ছেলে এক দিন মাকে কাঁদিয়ে চিরনিদ্রার কোলে ঘুমিয়ে পড়ে। এখানে ছেলের জন্য মায়ের অন্তরে স্নেহের কোন দৈন্য ছিল না—কিন্তু মগজে ছিল জ্ঞানের দৈন্য—ছেলেকে নীরোগ করবার বিজ্ঞানসম্মত উপায়টি ছিল না তার জানা, আর এই অজ্ঞতার জন্যই ছেলেকে সে বাঁচিয়ে তুলতে সমর্থ হ'ল না। কালাজ্বর থেকে মুক্ত হবার পথ তাগা-তাবিজ নয়। তার পথ স্বতন্ত্র।

যেখানে মগজে জ্ঞানের প্রাচুর্য্য—কিন্তু অন্তরে নেই প্রেম, সেখানেও মঙ্গলের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। জ্ঞান প্রেম থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লে কতখানি মারাত্মক হ'তে পারে, ইয়োরোপের বর্ত্তমান মহাসমর দিনে দিনে প্রমাণিত করছে। এরোপ্লেন, সাবমেরিণ প্রভৃতি আধুনিক যুদ্ধের উপকরণগুলি বিজ্ঞানেরই দান। মানুষের মগজের কসরৎ থেকে তাদের আবিষ্কার। কিন্তু জ্ঞানের পিছনে প্রেম তো নেই, তাই বিজ্ঞান আজ রূপান্তরিত হয়েছে অমঙ্গলের বাহনে। এরোপ্লেন আজ দেখা দিয়েছে মৃত্যুর দূত হয়ে। জ্ঞান যদি প্রেমের সঙ্গে আপনাকে যুক্ত রাখতে পারত, মানুষ উড়োজাহাজকে কখনও ধ্বংসের কাজে লাগাত না। তাকে ব্যবহার করত দেশের সঙ্গে দেশের ব্যবধানকে লুপ্ত ক'রে দিয়ে একটা অখণ্ড মানব-সমাজকে গ'ড়ে তোলবার কাজে। এই সব কথা ভেবেই বার্ট্রাণ্ড রাসেল লিখলেন, The good life is one inspired by love and guided by knowledge. সেই জীবনই হ'ল মঙ্গলময় যার পিছনে রয়েছে প্রেমের প্রেরণা এবং যার সারথি হ'ল জ্ঞান।

যেখানে জ্ঞান নেই, শুধু ভালবাসা রয়েছে, সেখানে ভয় করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। অন্ধ ভালবাসা মারাত্মক। গুরুকে না বুঝে যেখানে অন্ধভাবে তাঁর অনুসরণ করি সেখানে নিজেকে যেমন যন্ত্রের পর্য্যায়ে নামিয়ে আনি, তেমনই গুরুর সাধনারও সর্ব্বনাশ ঘটাই। আমরা গুরুর লক্ষ্যকে ভুলে গিয়ে তাঁর নামে একটা সম্প্রদায় গড়ে তুলি আর সেই সম্প্রদায়ের কারাগারের মধ্যে গুরুর বাণীকে হত্যা করি। গুরুরা স্বাধীন মন নিয়েই সমস্ত সমস্যার আলোচনা ক'রে যান। কোন রকমের গোঁড়ামিই তাঁদের কাছে প্রশ্রয় পায় না। সত্য তাঁদের কাছে যে মূর্ত্তিতেই প্রতিভাত হোক না কেন, তাকে অনুসরণ করবার মত সাহস তাঁরা রাখেন। পাছে লোকে কিছু বলে—এই ভয়ে কখনও তাকে অস্বীকার করেন না। পূর্ব্বের উক্তির সঙ্গে পরের উক্তির কোন সামঞ্জস্য আছে কিনা—তা নিয়েও মাথা ঘামানো তাঁদের কাছে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। আশ্রমে রোগ-যন্ত্রণায় কাতর গো-বৎসটিকে মেরে ফেলবার যখন প্রয়োজন বোধ করলেন—গান্ধীজী হিন্দু হয়ে তাকে মারতে কোন কুণ্ঠাবোধ করলেন না। যখন মনে করেছেন কাউন্সিল-বর্জ্জন শ্রেয়—কাউন্সিল-বর্জ্জনেরই নির্দ্দেশ দিয়েছেন। যখন মনে করেছেন কাউন্সিলে ঢোকাই উচিত, ঢুকতেই বলেছেন। জীবনের বহু বৎসরের তপস্যার ক্ষেত্র সত্যাগ্রহাশ্রমকে যখন ভেঙে ফেলবার প্রয়োজন মনে করলেন, গান্ধী-সেবা-সঙ্ঘেরই মত তাকে ভেঙে দিলেন। অথচ তার প্রত্যেকটি তরুলতার সঙ্গে

কত কালের কত স্মৃতিই না জড়িয়ে ছিল! সত্যিকারের গুরু যাঁরা তাঁরা যুগে যুগে সত্যকে এমনই করেই অনুসরণ করেছেন—বিষ্ণু হয়ে যাকে মজ্জার রক্ত দিয়ে দিনে দিনে রূপ দিয়েছেন অকস্মাৎ এক দিন মহাদেব হয়ে আপন সৃষ্টিকে নিষ্ঠুর ভাবে রসাতলে তলিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করেন নি। যাকে আমরা অন্তরের স্বপ্ন দিয়ে রচনা করি তা আমাদের অত্যন্ত প্রিয় বটে, কিন্তু সত্য—সে যে মাথার মুকুট। তার দাবী সকল দাবীর উপরে।

My aim is not to be consistent with my previous statements on a given question, but to be consistent with truth as it may present itself to me at a given moment.

"কোন সমস্যা সম্পর্কে পূর্ব্বে যে মত প্রকাশ করেছি তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কথা বলা আমার জীবনের লক্ষ্য নয়। আমার জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে সত্য—আমার সামনে যখন যে রূপ নিয়ে আসে তাকে সেইরূপে গ্রহণ করা।"

এই কথাই হ'ল গান্ধীজীর কথা আর এই ধরণের কথাই যুগে যুগে উৎসারিত হয়েছে যাঁরা মানবের গুরু তাঁদের কণ্ঠ থেকে। গুরুরা কালের বুকে তাঁদের বাণী রেখে চলে গেছেন—চেলারা সেই বাণীর প্রাণকে বর্জ্জন ক'রে খোলসকে আঁকড়ে ধরেছে—গুরুর বাণীর কদর্থ করেছে—গুরুর নামে একটা সঙ্কীর্ণ মতবাদ খাড়া ক'রে তার পায়ে সোৎসাহে ফুল বিল্বপত্র দিয়েছে এবং নূতন একটা সম্প্রদায় সৃষ্টি ক'রে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের পথকে অযথা কণ্টকাকীর্ণ ক'রে তুলেছে। স্বাধীন মন নিয়ে জীবনের নানাবিধ সমস্যার কথা ভাবতে পারে নি—মতবাদের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত মন নিয়ে ভেবেছে আর তার ফলে সত্যের দেখা পায় নি--কেবল দলাদলির পরিমাণই বাড়িয়ে দিয়েছে। এক এক জন গুরুর নামে গজিয়ে উঠেছে এক একটি সম্প্রদায়, আর এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অপর সম্প্রদায়ের সম্পর্ক হয়েছে অনেকটা দা-কুড়ুলের সম্পর্ক। মানুষের ইতিহাসের অনেকগুলি পাতাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নিষ্ঠুর কাহিনী কলঙ্কিত ক'রে রেখেছে। মানুষ সভ্যতার ধাপে ধাপে যত উপরে উঠেছে ততই সম্প্রদায়ের মূল্য তার কাছে কমে গেছে—স্বদেশের স্বার্থ জগতের স্বার্থের সঙ্গে এক হ'য়ে দেখা দিয়েছে, ভৌগোলিক সীমারেখাগুলি বিলুপ্ত হ'য়ে গিয়ে বসুধা তার কাছে আত্মীয় হয়ে উঠেছে। সে দেখতে পেয়েছে জগতে দুটো জিনিষ সত্য—ব্যক্তি আর বিরাট্ মানবসমষ্টি। এই দুয়ের মাঝখানে আর যা-কিছু আমরা গড়ে তুলেছি, তাদের অস্তিত্ব ধোঁয়াটে। আমি ভারতবাসী, আমি ইংরেজ, আমি ফরাসী, আমি জার্ম্মান—এই যে এক-একটা বিশেষ জাতির মধ্যে আমরা নিজেকে সীমাবদ্ধ ক'রে দেখি, বাস্তবিকই কি এই রকম স্বাতন্ত্র্য-বোধের কোন অর্থ আছে? এক জন ইংরেজ—যার সত্যের প্রতি, সৌন্দর্য্যের প্রতি অথবা জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ আছে, সে কি সমভাবাপন্ন এক জন ভারতবাসীকে ঢের বেশী আত্মীয় ব'লে মনে করে না তার নিজের দেশের জনবুল্-মার্কা কোনও লোকের চেয়ে? এক জন এণ্ডরুজের কাছে ভারতের রবীন্দ্রনাথ অথবা গান্ধী, কি বিলাতের চার্চ্চিল অথবা লয়েড জর্জ্জের চেয়ে অনেক বেশী নিকটের মানুষ হয়ে দেখা দেন নি? এক জন রলাঁ্যার কাছে ক্লিমেঁশো অথবা লাভালের চেয়ে বিবেকানন্দ অথবা রামকৃষ্ণ পরমহংস অনেক বেশী আপনার লোক ব'লে কি মনে হয় নি? সম্প্রদায়ের উপরে, জাতির উপরে এত বেশী আমরা যে জোর দিয়ে থাকি—এই জোর দেওয়ার মধ্যে আছে চিত্তের একটা বর্ব্বর-সুলভ সংকীর্ণতা। দলকে, জাতিকে অত্যন্ত বড় ক'রে দেখতে গিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তার যোগ আমরা হারিয়ে ফেলি। শ্রদ্ধা যেখানে অন্ধ, সেখানে গুরুর নামে যে-সব সম্প্রদায় গজিয়ে ওঠে সেগুলি শেষ পর্য্যন্ত লাভের চেয়ে ক্ষতিরই কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্যই গান্ধীজী মালিকান্দায় গান্ধী-সেবা-সংঘ ভেঙে দিলেন; এই জন্যই ওয়াল্ট হুইটম্যান লিখে গেলেন,

> **I call to the world to distrust the accounts of my friends, but listen to my enemies, as I myself do,**
> **I charge you forever reject those who would expound me, for I cannot expound myself,**
> **I charge that there be no theory or school founded out of me,**
> **I charge you to leave all free, as I have left all free.**

যে শ্রদ্ধার মধ্যে জ্ঞানের অভাব তার আতিশয্য যেমন কল্যাণময় জীবনের প্রতিকূল—যে জ্ঞানের মধ্যে শ্রদ্ধা নেই তার মধ্যেও তেমনি বিপদের যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান।

The self-centred egotist does not attain to wisdom; for however vivid his experiences, he is confined to his

own narrow field. Wisdom comes only to the man of sympathy and compassion to whom the joys and sorrows of other men are well-nigh as real and vivid as his own.

ম্যাগডুগাল এখানে হৃদয়ের উপরই জোর দিয়েছেন বেশী ক'রে; মগজকে প্রাধান্য দান করেন নি; কারণ হৃদয় দিয়ে যেখানে আমরা অনুভব করি, সেখানেই জানা আমাদের সত্য হয়ে ওঠে। অহমিকার প্রাধান্য যাদের জীবনে তারা কখনও বহু মানুষের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না—দূরে দাঁড়িয়ে অহঙ্কারের উচ্চশিখর থেকে নিজেদের মনগড়া চশমা দিয়ে জীবনের বিপুল শোভাযাত্রাকে পর্য্যবেক্ষণ করে। এই জন্য তাদের অভিজ্ঞতা কখনও সম্পূর্ণতা লাভ করে না—দৃষ্টির মধ্যে আবিলতা থেকে যায়। শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্—একথা এই জন্য সত্য যে হৃদয়ের অনুভূতি নিয়ে, দরদ নিয়েই আমরা অন্যের জীবনকে বুঝতে পারি। অপরের সঙ্গে ঐক্যের অনুভূতি যেখানে নেই, সেখানে অন্যকে বুঝতে পারা সম্ভব নয়।

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে—কল্যাণময় জীবনযাপনের পক্ষে জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমের সমন্বয় অপরিহার্য্য। এই জ্ঞানের উপরে গান্ধীজী সম্প্রতি খুব বেশী জোর দিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। মালিকান্দায় তাঁর বক্তৃতাগুলি শুনে আমার এই কথাই মনে হয়েছিল। গান্ধীজীকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা যদি গান্ধীবাদের নামে চিত্তের সঙ্কীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিই, সত্য থেকে দূরে চলে যাই, তবে গান্ধীবাদ ধ্বংস হওয়াই যে উচিত এই কথাটাই বারংবার তিনি আমাদিগকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। গান্ধীজী দাঁড়িয়েছেন সত্যকে মর্য্যাদা দেওয়ার জন্য। সত্যকে যারা একটা বিশেষ মতবাদের মধ্যে চিরকালের জন্য সীমাবদ্ধ ক'রে রাখতে চায়, তারাই ত সত্যের সকলের চেয়ে বড় শত্রু। গান্ধীজীর পতাকা যারা বহন করতে চায় তারা অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে তাঁর পন্থাকে অনুসরণ করুক—এমনটি তিনি কখনও চান না। বিশ্বাস হৃদয়ের জিনিষ। শুধু হৃদয়কে আশ্রয় ক'রে আমরা ত কল্যাণের মন্দির-দ্বারে পৌঁছতে পারব না। বিশ্বাসের সঙ্গে চাই জ্ঞানের যোগ। আজকের দিনে বর্ব্বরতা নানাবিধ মারণঅস্ত্রকে সহায় ক'রে দিগদিগন্তে যখন চালিয়েছে তার নিষ্ঠুর অভিযান তখন অহিংসাকে কল্যাণের অপরিহার্য্য পথ ব'লে কেন আমাদের গ্রহণ করতে হবে, এই কলকারখানার এবং পুঁজিপতিদের আধিপত্যের দিনে চরকা চালানোর সার্থকতা কোন্ কোন্ দিক দিয়ে—এই সব সমস্যার উপরে যতক্ষণ বুদ্ধির আলোকপাত করতে না পারছি ততক্ষণ আমাদের অহিংসা এবং চরকা বিশেষ সুফল ফলাতে সমর্থ হবে না। আমরা চরকা চালাতে থাকব—কলে যেমন ক'রে চরকা চালায়। আমরা অহিংসার কথা বলতে থাকব, যেমন ক'রে টিয়া পাখী 'রাধা' 'রাধা' 'কেষ্ট রাধা' বলে। যারা গান্ধীজীকে আজকের দিনে অনুসরণ করছে তারা যে বুদ্ধির দিক্ দিয়ে পিছনে প'ড়ে নেই—জীবন দিয়ে প্রমাণ করবার প্রকাণ্ড দায়িত্ব রয়েছে গান্ধীবাদীদের উপরে। বুদ্ধির দিক্ দিয়ে গান্ধীবাদের সার্থকতা যদি আমরা প্রতিপন্ন করতে না পারি, যুগের হৃদয়কে আমরা স্পর্শ করতে পারব না, আমাদের নিজেদের কাজের মধ্যেও আমরা জোর পাব না। আমরা ত গান্ধীজীকে আমাদের ঠাকুরঘরের ঠাকুরের মত বেদীতে বসিয়ে তাঁকে একান্তভাবে আমাদেরই ক'রে রাখতে চাই নে—তাঁর নামে একটা নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করারও আমরা বিরোধী। তাঁর বাণীর আগুনকে দিগদিগন্তে বহন ক'রে নিয়ে যেতে চাই—কারণ সেই বাণীকে অনুসরণ করার মধ্যেই রয়েছে নূতন জগত সৃষ্টির সম্ভাবনা, সেই বাণীর মধ্যে রয়েছে কোটি কোটি নরনারীর রিক্ত এবং ক্লান্ত জীবনকে রূপান্তরিত করবার পরশমণি। মুমূর্ষু মানব-সভ্যতাকে বাঁচানোর একমাত্র পথ গান্ধীজীর প্রদর্শিত অহিংসার পথ, কল-দৈত্যের শাণিত শৃঙ্খাঘাতে বিদীর্ণ রুগ্ন মানব-সমাজকে আনন্দের মধ্যে, সৌন্দর্য্যের মধ্যে, কল্যাণের মধ্যে ফিরিয়ে আনবার পথ কুটীর-শিল্পগুলির পুনরুদ্ধারের পথ—নিরস্ত্র শৃঙ্খলিত দেশকে স্বাধীনতার নব প্রভাতের মধ্যে মুক্ত করবার পথ সত্যাগ্রহের পথ—এই বিশ্বাসকে যুক্তির এবং অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই ক'রে বরণ করবার যোগ্য ব'লে মনে করেছি ব'লেই গান্ধীজীকে আমরা অনুসরণ করছি। গান্ধীজীর জন্য গান্ধীজীর অনুসরণ করবার কোনো মানে হয় না। তিনি আমাদের

কাছ থেকে সে রকমের অন্ধভক্তের আনুগত্য পেয়ে একটুও খুশী হবেন না। তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার আতিশয্য যদি বর্ব্বর জগতকে সভ্যতার পথে এগিয়ে দিতে না পারে, ভারতের কোটী কোটী বুভুক্ষু অর্দ্ধনগ্ন মানব-মানবীর জীবনে আনন্দ না আনে—সে শ্রদ্ধা নিয়ে তিনি করবেন কি? খ্যাতিতে তো তাঁর লোভ নেই—লোকের কাছ থেকে বাহবার প্রাচুর্য্য তাঁর চিত্তকে শুধু পীড়িতই করে। তিনি চান একটা নূতন জগৎ যেখানে হিংসা নেই, শোষণ নেই, যেখানে প্রতিটি মানুষের জীবন আনন্দে ভ'রে গিয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন তাঁর বাণীর মধ্যেই এই নূতন জগৎ সৃষ্টির উপায় রয়েছে। যারা এই বাণীর বাহন হবে তাদের কাছ থেকে তিনি আশা করেন—বুদ্ধি দিয়ে তারা তাঁর বাণীকে বুঝবে। তাঁর অনুচরগণের কাছ থেকে এইটি আশা ক'রেই তিনি লিখেছেন—

A mere belief in Ahimsa or the Charkha will not do. It should be intelligent and creative. If intellect plays a large part in the field of violence, I hold that it plays a larger part in the field of non-violence.

পরিস্থিতি

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

পূজার ছুটি এল কাছে, আশ্বিনের আজ দোস্‌রা,—
ওদের সাথে 'টুরে' যেতে বলছে পরিতোষরা।
মা লিখেছেন, "বাড়ী এস",—তাই লিখেছেন বাবা যে;
বোন লিখেছে, "দাদা, তোমার ছেলেটা কী হাবা যে!—
'ও বাবা গো' ডাক শিখেছে, যাকে-তাকে চাই ডাকা!
বৌদি রাগেন, বলেন, 'এবার বুদ্ধি যে আর নাই ঢাকা!'
তোমার কিন্তু আসতে হবেই কাজের দোহাই মান্‌ব না;
জানি না, কি কারণ,—জেনো বৌদি একটু আনমনা।"
আর লিখেছেন শ্বশ্রূমাতা, "আর যত যাও যেখানেই
মনে রেখো, বিয়ের পরে কত দিন সে, দেখা নেই।
পঞ্চমী দিন আনতে যাবে দাদুভাইকে তার মামা
সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো, তৈরি যে তার হার জামা!"
বৌ লিখেছেন অনেক কিছু, লেখা চিঠির শেষটায়—
"তবু ভালো, লিখেছ যে আছ ছুটির চেষ্টায়!
আসবে জেনে আনন্দ হয় ভয়ও মনের নয় পিছু
ওগো তুমি আসছ তো? ছাই, আবার যদি হয় কিছু!"
কী ভাবনা তার সেই তা জানে, ভাবনা ধরায় বাচ্ছাটাই;
সরলে কোথাও অফিস থেকে হয় কিছু বা বাছ-ছাঁটাই!
এই তো সেদিন শিশু এল, মানুষ করা চাই তাকে,
কী দিয়ে কী করব শেষে কাজটা যদি না-ই থাকে!
কিন্তু তবু মন বসে না, বছর-ভোর সে খাটুনি,—
দু-দিন হ'লেও ফস্কানো চাই, ডিসিপ্লিনের আঁটুনি!
যেতেই হবে, কোথায় যাব?—বাড়ি?—কিংবা বেড়াতে?
কী করা যায় জরুরি এ পরিস্থিতি এড়াতে?

উদয়শঙ্কর ও তাঁহার সহযোগীগণ কর্ত্তৃক ভীল নৃত্য
উদয়শঙ্করের অধিনায়কত্বে সম্প্রতি আলমোড়ায় একটি নৃত্যশিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীউদয়শঙ্কর
আলমোড়া নৃত্য-কেন্দ্রের অধিনায়ক
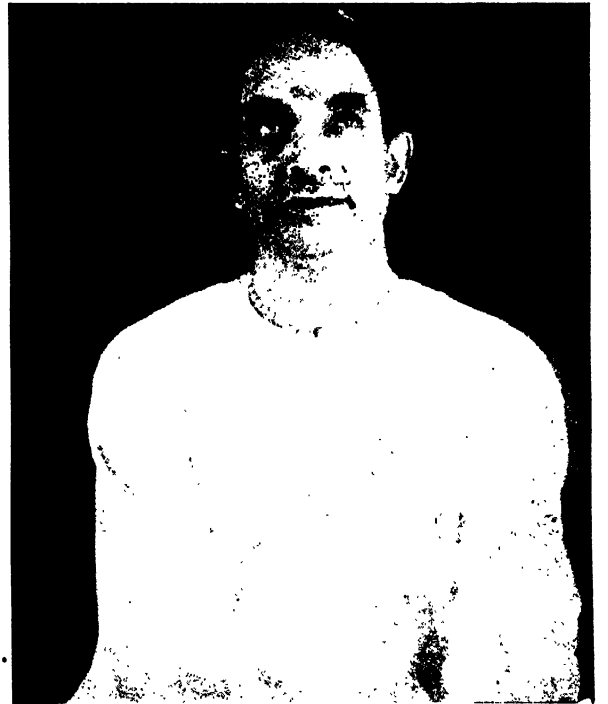
শ্রীশঙ্করণ নাম্বুদ্রি
আলমোড়া নৃত্য-কেন্দ্রে কথাকলিনৃত্যশিক্ষক

মহীশূরের মন্দির

মহীশূরের শিবসমুদ্রম্ জলপ্রপাত

মহীশূরের নূতন মহারাজা গত ৮ই সেপ্টেম্বর মহীশূরাধিপতিপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন

রাজহাঁসের জীবনযাত্রাপ্রণালী

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কথিত আছে, শ্বেতপদ্মের ক্ষণস্থায়িত্ববশতঃ শান্তি ও শুচিতার প্রতীকস্বরূপ বিধাতা তুষারশুভ্র রাজহংস সৃষ্টির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। বাস্তবিকই নিষ্কলঙ্ক শুভ্র পালকমণ্ডিত সৌম্যদর্শন রাজহংসকে শান্তি ও শুচিতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি বলিয়াই মনে হয়। গঠন-অপেক্ষাও ইহাদের সুললিত গ্রীবাভঙ্গী অধিকতর মনোমুগ্ধকর। বিচিত্র গ্রীবাভঙ্গী সহকারে রাজহাঁসেরা যখন দল বাঁধিয়া জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায় তখন জলাশয় যে কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাণী মাত্রেরই গলার

রাজহংস ও রাজহংসী পরস্পর আদর-আপ্যায়ন করিতেছে

বৈচিত্র্য এবং বর্ণগৌরবে বিভিন্নজাতীয় পাখী আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু রাজহাঁসের তুষারধবল শুভ্রতা এবং গঠন-পারিপাট্যের অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্যে মনের মধ্যে যেন একটা অনির্ব্বচনীয় স্নিগ্ধ ভাবের উদয় হয়। শুভ্রপালকমণ্ডিত দৈহিক সৌন্দর্য্য মোটামুটি একটা স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য আছে। তাহা অপেক্ষা খাটো কিংবা লম্বা হইলেই কেমন যেন একটা বেমানান মনে হয়। এই জন্যই জিরাফের লম্বা গলা এবং বনমানুষের খাটো গলা আমাদের দৃষ্টিতে বিসদৃশ ঠেকে। পাখীদের মধ্যেও সারস, হেরণ, উটপাখী, ফ্লেমিংগো প্রভৃতির

রাজহংস ও রাজহংসী মুখোমুখি হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে

শরীরের তুলনায় অসম্ভব লম্বা গলা দেখিতে পাওয়া যায়। রাজহাঁসের গলাও শরীরের তুলনায় অসম্ভব লম্বা। কিন্তু একমাত্র রাজহাঁসের গলা ব্যতীত অন্য কোন পাখীর লম্বা গলাই শরীরের শোভাবর্দ্ধনে বিশেষ সহায়তা করে নাই। এমন কি অন্যান্য লম্বগ্রীব পাখীদের স্বাভাবিক একটা নিজস্ব গ্রীবাভঙ্গী থাকিলেও রাজহাঁসের মত এমন সুললিত ভঙ্গীতে তাহারা গলা বাঁকাইবার কৌশল আয়ত্ত করিতে পারে নাই। ইহার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে এটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কোন কোন দেশের সুন্দরীরাও না কি ইহাদের সুললিত গ্রীবাভঙ্গী ঈর্ষ্যার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। এ-কথা অবশ্য বৃহদাকৃতি শ্বেতবর্ণের রাজহাঁস সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্নজাতীয় রাজহাঁস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কয়েকজাতীয় রাজহাঁসের শরীর শুভ্র পালকে আচ্ছাদিত। এতদ্ব্যতীত কাহারও বর্ণ খয়েরী, কাহারও বর্ণ ধূসর। ঠোঁট ও পায়ের রং কাহারও লাল, কাহারও কালো এবং কাহারও কাহারও আবার হলদে। কতকগুলির গলা লম্বা, আবার কতকগুলির গলা অপেক্ষাকৃত খাটো। কেহ কর্কশকণ্ঠে কেহ বা বাঁশীর সুরে শব্দ করে এবং কেহ কেহ আবার মোটেই শব্দ করে না। এই নিঃশব্দ রাজহাঁসেরাই সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী বলিয়া সাধারণতঃ লোকে যত্ন করিয়া পুষিয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট বিচরণক্ষেত্রে দলবদ্ধ ভাবে প্রায় সর্ব্বজাতীয় বন্য রাজহাঁসই দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহদাকৃতি লম্বগ্রীব রাজহাঁসেরা আটটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে নির্ব্বাক পোলিশ, বিউয়িক, হুপার এবং কস্‌করোবা রাজহংসই সৌন্দর্য্যের দিক্ হইতে সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য। দুগ্ধ-ধবল পোলিশ রাজহংসেরা সাঁতার কাটিবার সময় ডানা দুটি পিঠের উপর খানিকটা উঁচু করিয়া রাখে—ইহাতে তাহাদের দৈহিক সৌন্দর্য্য যেন শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এই জাতীয় পুরুষ-পাখীর ঠোঁটের গোড়ায় উপরের দিকে বেশ বড় রকমের একটি কালো মাংসপিণ্ড থাকে। এই চিহ্ন দেখিয়াই ইহাদের স্ত্রী-পুরুষ চিনিতে পারা যায়।

রাজহংস-দম্পতি

উয়িক ও হুপার রাজহংসেরা তি উচ্চকণ্ঠে কর্কশ শব্দ করিয়া কে। শ্বেতবর্ণের রাজহাঁসের ধ্যে কস্‌করোবা হাঁসেরাই পেক্ষাকৃত খর্ব্বকায়। ইহারাই গ্রীব ও হ্রস্বগ্রীব উভয় জাতীয় জহাঁসের ক্রম-উন্নতি বা ক্রম-বনতির সম্বন্ধনির্ণায়ক সংযোজক শৃঙ্খলস্বরূপ। ইহাদের ডানার প্রধান পালকগুলির অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ। পা ও ঠোঁটের বর্ণ লাল।

বৃহদাকৃতির রাজহাঁসের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার কৃষ্ণবর্ণ রাজহাঁসই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বস্তু। ইহারা বোধ হয় সিগ্‌নাস্ ওলোর নামক বৃহদাকৃতি শ্বেতবর্ণের রাজহাঁস অপেক্ষাও আকারে বড় হয়। অস্ট্রেলিয়া অদ্ভুত দেশ। এই অদ্ভুত দেশের অদ্ভুত প্রাণী কাঙ্গারু ও কৃষ্ণবর্ণ রাজহাঁসের কথা লোকে গল্প বলিয়াই মনে করিত। কিন্তু পরে দেখা গেল অন্ততঃ দুই জাতীয় বৃহৎ আকৃতির কৃষ্ণবর্ণের রাজহাঁস সেদেশে বিচরণ করিয়া থাকে। এক জাতীয় হাঁসের শরীর ধবধবে সাদা; কিন্তু গলাটা সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণের পালকে আবৃত। ইহাদের ঠোঁটের গোড়ায় হাল্কা লাল রঙের বড় একটি মাংসপিণ্ড থাকে। শ্বেতবর্ণের শরীরের উপর কৃষ্ণবর্ণের লম্বা গলা, তার উপর লালবর্ণের মাংসপিণ্ড খুবই সুন্দর দেখায়। ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে নারবরো নামে এক জন নাবিক কর্ত্তৃক ম্যাগেলান প্রণালীতে এই রাজহাঁস সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। অস্ট্রেলিয়ার আর এক জাতীয় বৃহদাকার রাজহাঁসের গলা ও সর্ব্বশরীর উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণের পালকে আচ্ছাদিত। ইহারা গলা প্রায় সর্ব্বক্ষণই উঁচু করিয়া রাখে—দেখিতে কতকটা উটপাখীর গলার মত এবং গ্রীবাভঙ্গীও শ্বেতবর্ণের রাজহাঁসের মত অত সুললিত নহে। আলিপুরের বাগানে এই জাতীয় কৃষ্ণবর্ণের রাজহাঁস রাখা হইয়াছে। উইলেম ডি ভ্ল্যামিং নামে এক জন ওলন্দাজ নাবিক ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় এই হাঁস আবিষ্কার করেন। যে-নদীতে হাঁসটি সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল সে-নদীটি আজও 'সোয়ান-নদী' নামে পরিচিত।
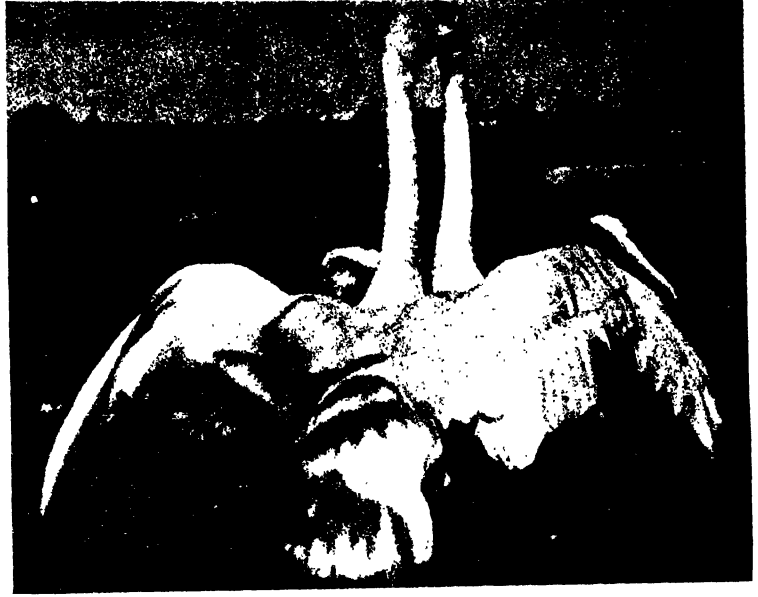
হ্রস্বগ্রীব রাজহংসের প্রায় পঁচিশটি বিভিন্ন জাতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে শ্বেতবর্ণের হাঁসের সংখ্যা খুবই কম। ইহাদের শরীর সাধারণতঃ শ্বেত ও ধূসর বর্ণের মিশ্রিত পালকে আবৃত। হ্রস্বগ্রীব রাজহংসের মধ্যে 'ওয়েভি' ও 'চেন রোসি' নামক দুই জাতীয় শ্বেতবর্ণের হাঁস দেখিতে পাওয়া যায়। হ্রস্বগ্রীব রাজহাঁসের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ও ট্যাস্‌মানিয়ার ম্যাগপাই হাঁস, ক্লোয়েফাগা ও কেল্‌প হাঁস, ব্রাণ্টা, গ্রে-লেগ, চীনা-হাঁস ও কটন-টিল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ম্যাগপাই হাঁসের চঞ্চু বড় রাজহংসের চঞ্চুর মত, ইহাদের পায়ের রং হলদে। পায়ের আঙুলগুলি সম্পূর্ণ জোড়া নয়। পিছনের আঙুল বড়। গলা ও শরীরের পিছনের পালক কালো; অবশিষ্ট পালক সাদা। কেল্‌প হাঁসের স্ত্রী-পাখীদের শরীরের রং ধূসর বাদামী। উভয় পার্শ্বে কালো রেখা আছে। ইহাদের পুরুষ-পাখীরা প্রায় সম্পূর্ণ সাদা। ব্রাণ্টা হাঁসেরা ডিম পাড়িবার সময় এমন গুপ্ত স্থানে বাসা নির্ম্মাণ করে যে বহু

অষ্ট্রেলিয়ার কালো রাজহাঁস

চেষ্টার ফলেও অনেক কাল পর্য্যন্ত কেহই তাহাদের বাসার সন্ধান করিতে পারে নাই। সেই কারণে ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে লোকে নানা প্রকার আজগুবি ধারণা পোষণ করিত। বহু অনুসন্ধানের ফলে মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহাদের বাসস্থানের সন্ধান পাওয়ায় ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হইয়াছে। সাধারণতঃ রাজহাঁসেরা জলের নীচে গলা ডুবাইয়া খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে, কিন্তু কটন-টিল নামক হাঁস জলের নীচে ডুবিয়া খাদ্য সংগ্রহ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হ্রস্বগ্রীব রাজহাঁসের ঠোঁটের গঠন দেখিয়া মনে হয় যেন তাহা শাকসজী ফলমূল ভক্ষণেরই উপযোগী এবং জলচর হইলেও অধিকাংশ সময়ই ইহারা স্থলভাগেই বিচরণ করিয়া থাকে। ফলমূল, ঘাস-পাতা, পোকামাকড় খাইয়াই প্রধানতঃ ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহা হইতেও বুঝা যায়, জলচরবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ ইহারা স্থলচারী হইয়া উঠিতেছে। কোন কোন হ্রস্বগ্রীব রাজহাঁসের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও সঙ্গী অথবা সঙ্গিনীর মৃত্যু ঘটিলে অথবা কোন কারণে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে তাহারা নূতন সঙ্গী অথবা সঙ্গিনী নির্ব্বাচন করে না।

রাজহাঁসেরা যাযাবর-জাতীয় পাখী; চিরকাল এক স্থানে বাস করে না। শীত ঋতুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ইহারা উষ্ণতর প্রদেশে চলিয়া যায়। দেশত্যাগ করিবার সময় ইহারা দলবদ্ধ ভাবে ত্রিভুজের দুই বাহুর মত কোণ করিয়া আকাশে উড়িতে থাকে। অবতরণ করিবার সময় ইহাদের কর্কশ কণ্ঠের সমবেত চীৎকার ধ্বনিতে আশে-পাশের লোকের কান ঝালাপালা হইয়া যায়। বসন্তকাল ইহাদের ডিম পাড়িবার সময়। এই সময় তাহারা সঙ্গী নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। হয়ত একটি রাজহংসী কোন জলাশয়ে সাঁতার কাটিয়া বেড়াইতেছে এমন সময়ে দূরতর স্থান হইতে কোন পুরুষ-রাজহংস উড়িয়া আসিয়া সে স্থানে অবতরণ করিল। উভয়ে উভয়ের নিকট অপরিচিত, কাজেই আগন্তুক রাজহংস প্রথমতঃ এক-আধ দিন বেশ সম্মানজনক ব্যবধান রক্ষা করিয়াই চলে। একই স্থানের বাসিন্দা হিসাবেই হউক অথবা পুরুষ-পাখীটির আগ্রহাতিশয্যেই হউক, ক্রমশঃ এ ব্যবধান ঘুচিয়া যায়। রাজহংসী প্রথমে কিন্তু এ-সব বন্ধুত্বের ব্যাপারে আমলই দেয় না। সে যেন কত নির্লিপ্ত এমনই একটা ভাব প্রকাশ করে। অবশেষে একান্ত বিরক্ত হইয়াই যেন আক্রমণাত্মক ভাবে ফিরিয়া দাঁড়ায়। আক্রমণ-প্রতিরোধকল্পেই রাজহংস যেন তাহার ডানা মেলিয়া ধরে। ইহাতেই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তাহার দৈহিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া রাজহংসী তখন উগ্রতা পরিহার করে এবং উভয়ে মুখো-মুখি হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকে। বোধ হয় এই ভাবেই উভয়ের মধ্যে একটা চুক্তি সম্পাদিত হয়। তখন গলাগলি করিয়া বা ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকাইয়া উভয়ে উভয়কে আদর-আপ্যায়ন করিতে থাকে। রাজহংসী খড়কুটা সংগ্রহ করিয়া ঝোপের আড়ালে বাসা নির্ম্মাণ করে এবং একসঙ্গে পাঁচ-ছয়টিরও বেশী ডিম পাড়িয়া থাকে। এ সময়ে কেহ বাসার নিকটে গেলে তাহাকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করে। ইহাদের ডানায় ভীষণ শক্তি।

ডানার আঘাতে মানুষের হাতের হাড় ভাঙিয়া গিয়াছে—এরূপ ঘটনার কথাও শোনা যায়। কোন কারণে উত্যক্ত হইলে ইহারা সম্মুখের দিকে গলা প্রসারিত করিয়া থাকে, তাকে আক্রমণ করিতে ইতস্ততঃ করে না—হয় ঠোকরাইয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয় নয়ত ডানার আঘাতে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে।

আহার-সংগ্রহ, আত্মরক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে মনুষ্যেতর প্রাণীদিগকে সময় সময় যে সকল কৌশল অবলম্বন করিতে দেখা যায়—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা সংস্কারমূলক। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য সত্যিকার বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রাজহাঁসদের মধ্যেও এরূপ বুদ্ধিবৃত্তির দৃষ্টান্ত বিরল নহে। মিয়ারের বিশপ-প্যালেসের সরোবরে কতকগুলি রাজহাঁস থাকিত। খাওয়ার সময় হইলেই একটা দড়ি টানিয়া ঘণ্টা বাজাইবার কৌশল তাহাদিগকে শিখানো হইয়াছিল। মায়েদের দেখাদেখি তাহাদের বাচ্চাগুলি পর্য্যন্ত এই কৌশল আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। আহারের সময় হইলেই বাচ্চাগুলিও দড়ি টানিয়া ঘণ্টা বাজাইত।

কলিকাতার উপকণ্ঠে এক বাড়ীতে কতকগুলি রাজহাঁস ছিল। বাড়ীর সংলগ্ন প্রশস্ত প্রাঙ্গণে হাঁসগুলি চরিয়া বেড়াইত। এক দিন আমি সেই বাড়ীর প্রাঙ্গণে ঢুকিবামাত্রই তিন-চারটা হাঁস গলা বাড়াইয়া আমাকে আক্রমণ করিতে ছুটিয়া আসিল। আমিও ছুটিয়া গিয়া বারান্দায় উঠিলাম। তথাপি কিন্তু তারা সে স্থান হইতে নড়িল না। চাকরটা বলিল—কয়েক দিন যাবৎ কুকুরটা উহাদের উপর উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। সেই ভয় হইতেই বাড়ীতে নূতন লোক আসিতে দেখিলেই তাকে তাড়া করিয়া যায়। খানিকক্ষণ বাদেই দেখিলাম—কোথা হইতে কুকুরটা ছুটিয়া আসিয়া হাঁসগুলির পিছু ধাওয়া করিল। খেলাচ্ছলেই সে উহাদিগকে তাড়া করিতেছিল। কিন্তু হাঁসেরা সে-কথা বিশ্বাস করিবে কেমন করিয়া? কাজেই তাহারা প্রাণের ভয়ে মাঠের মধ্যে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। উহাদের মধ্যে একটা হাঁসের এক খানা পা ছিল একটু খোঁড়া। সে অন্যান্য হাঁসগুলির সহিত সমান বেগে ছুটিতে পারিতেছিল না। কুকুরটাও উহাদের সঙ্গে না পারিয়া সেই খোঁড়া হাঁসটাকেই লইয়া পড়িল। বেগতিক দেখিয়া হাঁসটা তখন একটা দেয়ালের কোণে ছুটিয়া গিয়া 'যুদ্ধং দেহি' ভঙ্গীতে ডানা প্রসারিত করিয়া রুখিয়া দাঁড়াইল। দুই দিকে দেয়াল—রাজহাঁসটা কোণে আশ্রয় লইয়াছে। এক মাত্র সম্মুখের দিক্ ছাড়া পাশের দিক্ বা পিছনের দিক্ হইতে তাহাকে আক্রমণের উপায় নাই দেখিয়া কুকুরটা জিভ বাহির করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর আপন মনে এক দিকে চলিয়া গেল। তার পর আরও দুই-তিন দিন এ দৃশ্য দেখিয়াছি। কুকুরটাকে ছুটাছুটি করিতে দেখিবামাত্রই সেই খোঁড়া হাঁসটা দেয়ালের কোণে আশ্রয় লইয়া ডানা মেলিয়া আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকিত। ঘটনাটি তুচ্ছ হইলেও ইহা যে তাহাদের যথেষ্ট বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক সে-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনই কারণ নাই।

পদার্থবিদ্যায় ভারতবাসীর দান

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রাচীন যুগে জ্যোতির্বিদ্যায়, রসায়নবিদ্যায়, পদার্থবিদ্যায় ভারতবাসী জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিল। কিন্তু পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণায় কোন্ মনীষী কোন্ দিকে কতদূর অবধি মানবের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। আমরা বর্তমান যুগের কথা আলোচনা করিব। এই যুগে পথপ্রদর্শক হইলেন জগদীশচন্দ্র বসু।

ঈথর-তরঙ্গ

অঙ্ক কষিয়া গণনা করা হয়, ভবিষ্যতে প্রত্যক্ষ দর্শনে গণনার ফলাফল প্রতিপন্ন হয়, জ্যোতির্বিদ্যায় ইহার প্রধান উদাহরণ হইল নেপচুন আবিষ্কার। পদার্থবিদ্যার ইতিহাসেও এইরূপ ব্যাপার অনেকবার ঘটিতে দেখা গিয়াছে। একটির উল্লেখ করা যাইতেছে। ম্যাক্সওএল অঙ্ক কষিয়া দেখিলেন যে আলোক ও তাপের প্রসারের জন্য যে ঈথর কল্পিত হইয়াছে, সেই ঈথরেরই মধ্য দিয়া তড়িৎ-চুম্বকজনিত ঊর্মিমালা প্রবাহিত হইবে।

ইহার পর অনেক বৎসর চলিয়া গেল। ১৮৮৭ সালে হার্জ এ সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। পূর্ব হইতে জানা ছিল যে একটি লিডেনজার হইতে যখন তড়িৎ-মোক্ষণ হয় তখন তড়িৎ বরাবরই এক দিক হইতে অপর দিকে যায় না, তড়িতের যাতায়াত চলিতে থাকে এবং সেকেণ্ডের মধ্যে বহু লক্ষ বার উহা যাওয়া-আসা করে। লিডেনজার হইতে আগত দুইটি তারের মধ্যে একটু ফাঁক রাখিয়া ঐ লিডেনজারকে তড়িৎযুক্ত করা হইল, তড়িৎ-ক্ষরণ হইতে লাগিল। কিছু দূরে অবিকল একই ব্যবস্থা করা হইল—একই রকমের লিডেনজার, তাহার দুই প্রান্ত হইতে যে তার আসিয়াছে তাহার মধ্যে ঠিক একই ব্যবধান, শুধু এই দ্বিতীয় লিডেনজারটিকে তড়িৎযুক্ত করা হইল না। প্রথমটিতে যেই তড়িৎ-মোক্ষণ হয় অমনই দেখা যায় দূরে অবস্থিত এবং তড়িৎবিহীন লিডেনজারের সহিত যুক্ত তারের দুই প্রান্ত মধ্যে ক্ষীণ বিদ্যুৎ ক্ষরণ হইতেছে।

মনে করা যাক, একটি ঘরের দুই দিকে দুইখানি বেহালা আছে, বেহালা দুইটি এক সুরে বাঁধা। দেখা যায়, একটিতে যেই ঝংকার উঠান যায়, অমনি বেহালাটির তার কাঁপিতে থাকে, কিন্তু বেসুরো বাঁধা থাকিলে তার কাঁপে না। লিডেনজারে সেইরূপই ঘটিতেছিল। বেহালায় যখন ঝংকার দেওয়া হইল তখন বাতাসে তরঙ্গ উঠিল, এই তরঙ্গ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, বাতাসের মধ্য দিয়া নির্দিষ্ট গতিতে চলিল, চলিয়া দ্বিতীয় বেহালার তারের উপর পড়িল; এখন এই তার প্রথম বেহালার তারের সহিত এক সুরে বাঁধা থাকায় ইহাও এক সুরে কাঁপিতে লাগিল। এখানে প্রথম লিডেনজারে যে তড়িৎ-মোক্ষণ হইল তজ্জন্য তরঙ্গ উঠিল; কিন্তু কিসের এ তরঙ্গ? বাতাসের নয়, ঈথরের তরঙ্গ, ম্যাক্সওএল অঙ্ক কষিয়া যে তরঙ্গের কথা ভাবিয়াছিলেন। প্রথম লিডেনজার হইতে উত্থিত হইয়া এই তরঙ্গ আলোকের বেগে ছুটিল, দ্বিতীয় লিডেনজারের উপর পড়িল এবং উহা এক সুরে বাঁধা থাকায় এখানেও তড়িৎ মোক্ষণ হইতে লাগিল। দ্বিতীয় লিডেনজারের গঠন অন্যরূপ হইলে, দুইটি বেতালা হইলে, আর তড়িৎ-মোক্ষণ হইবে না।

এই বার হার্জ প্রথম লিডেনজারের পরিবর্তে একটি আবেশকুণ্ডলী লইলেন এবং ধরিবার স্থানেও লিডেনজার না লইয়া একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের বাঁকান তার রাখিলেন, তারের দুই প্রান্তের মধ্যে ক্ষুদ্র ব্যবধান। এদিকে আবেশ-কুণ্ডলীর মধ্যে যেই তড়িৎ-মোক্ষণ হয় অমনই অপর দিকের তারের প্রান্তে ক্ষীণ তড়িৎ-ক্ষরণ হইতে থাকে; তারের দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট রকমের হওয়া চাই, এদিক-ওদিক হইলে আর তড়িৎ-ক্ষরণ হয় না। ইহার পর হার্জ আবেশ-কুণ্ডলীর এক প্রান্ত একটি উচ্চ ধাতব দণ্ডের সহিত যুক্ত

করিলেন, দণ্ডের মাথায় একটি ধাতব চাদর; অপর দিকেও এই ধরণের ব্যবস্থা রাখা হইল। এখন দেখা গেল তড়িৎ-ক্ষরণ পূর্বের মত অত ক্ষীণ নয়। জগতে এই প্রথম বেতার-যন্ত্র নির্মিত হইল।

হার্জ ঈথরে যে তরঙ্গ তুলিলেন এবং যে ঈথর-তরঙ্গ আমাদিগের চক্ষে আলোকের অনুভূতি জাগায় উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? হার্মোনিয়ম হইতে আমরা 'সা' স্বরও শুনিলাম, 'রে'-ও শুনিলাম, উভয় অনুভূতিই বাতাস-তরঙ্গজনিত। প্রথমটার কম্পন-সংখ্যা কম, দ্বিতীয়টার বেশী। তেমনই হার্জের উদ্ভাবিত এই তরঙ্গও সাধারণ আলোক, উভয়ের গোত্র এক, উভয়ই ঈথর-তরঙ্গ, তবে বর্ণ বিভিন্ন; প্রথমটির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেশী, দ্বিতীয়টির কম। কিন্তু উভয়ে যে একগোত্রীয় তাহা প্রমাণিত হইবে কিরূপে? আলোকের কতকগুলি ধর্ম আছে। প্রথম, আলোক সোজা পথে চলে এবং সোজা পথে চলে বলিয়া অনচ্ছ পদার্থের ছায়া ফেলে। দ্বিতীয়, আলোক প্রতিফলিত হয়। তৃতীয়, আলোকের প্রতিসরণ আছে; অর্থাৎ একটি স্বচ্ছ পদার্থে প্রবেশ করিয়া আলোক বাঁকিয়া যায়। চতুর্থ, আলোক-তরঙ্গের কোন শৃঙ্খলা নাই, উহারা এলোমেলোভাবে সব দিকে কম্পিত হইয়া চলে, কিন্তু কতকগুলি কেলাসিত পদার্থ আছে যাহার মধ্য দিয়া আলোক যাইলে এই বহুমুখ কম্পন একমুখ হইয়া দাঁড়ায়। হার্জ যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সৃষ্টি করিলেন উহা যদি দৃশ্য আলোকের এক গোত্রীয় হয় তবে দৃশ্য আলোক ও অদৃশ্য আলোকের ধর্ম অনুরূপ হইবে। দৃশ্য আলোকের কয়েকটি ধর্মের কথা দেখা গেল; এই সকল ধর্ম অদৃশ্য আলোকে বিদ্যমান কি না হার্জ পরীক্ষায় মীমাংসা করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু হার্জের পরীক্ষায় অনেক বাধা দেখা গেল। হার্জীয় তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব বড় এই এক প্রধান অসুবিধার কথা, দ্বিতীয় অসুবিধা এই যে যে-যন্ত্র তরঙ্গ ধরিবে তাহা সূক্ষ্ম ধরণের নয়, একটু দূরে রাখিলে তরঙ্গ ধরা যায় না।

জগদীশচন্দ্র বসু

জগদীশচন্দ্র বসু হার্জের প্রবর্তিত যন্ত্রের দুই ভাবে উন্নতিসাধন করিলেন। হার্জের বৈদ্যুতিক উর্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কয়েক গজ, আর জগদীশচন্দ্র কর্তৃক নির্মিত যন্ত্র হইতে যে বৈদ্যুতিক উর্মি বাহির হইয়া আসিল তাহার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুবই অল্প, এক ইঞ্চির ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। তরঙ্গ ধরিবার জন্য জগদীশচন্দ্র এক নূতন ধরণের উপায় অবলম্বন করিলেন; এক খণ্ড সীসাঞ্জন বা গ্যালিনা (galena) এবং উহাকে স্পর্শ করিয়াছে একটি সরু তার, এই হইল ধরিবার যন্ত্র। এইখানে বলা যাইতে পারে যে বর্তমান সময়ে ক্রিস্টাল যুক্ত বেতার টেলিফোনে তরঙ্গ ধরিবার জন্য গ্যালিনাই ব্যবহৃত হইতেছে। এই-বার জগদীশচন্দ্র বিভিন্ন পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। যে লণ্ঠনের বৈদ্যুতিক তরঙ্গের উদ্ভব হইতেছিল তাহার মুখে একটি নল লাগাইয়া সেই নলের সম্মুখে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ধরিবার তাঁহার নূতন গ্রাহকযন্ত্র লাগাইলেন;

জগদীশচন্দ্র বসু। রয়াল ইনষ্টিটিউশনে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে তাঁহার আবিষ্কার বর্ণনা করিতেছেন।

উহার সহিত যুক্ত তড়িৎনির্দেশক যন্ত্রের কাঁটা নড়িয়া উঠিল। গ্রাহকযন্ত্র এক পাশে ধরা হইল, উহাতে কোন উত্তেজনার চিহ্ন দেখা গেল না। অতএব অদৃশ্য আলোক যে সরল পথে গমন করে তাহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইল। তাহার পর আলোক যেমন দর্পণে প্রতিফলিত হয় এবং প্রতিফলিত রশ্মি কয়েকটি নিয়ম পালন করে, জগদীশচন্দ্র দেখাইলেন যে অদৃশ্য আলোক ঠিক সেইরূপই করিয়া থাকে। কাচের মধ্য দিয়া যাইতে দৃশ্য আলোক বাঁকে, অদৃশ্য আলোকও বাঁকিল। কিন্তু এ-সব পরীক্ষা হইতে তিনি একটি ব্যাপার লক্ষ্য করিলেন। দৃশ্য আলোকের পক্ষে কাচ স্বচ্ছ, জল স্বচ্ছ, ইট-পাটকেল অনচ্ছ, আঁলকাতরা ত অনচ্ছ বটেই। এই অদৃশ্য আলোক জলের মধ্য দিয়া যায় না, কিন্তু ইট-পাটকেল, আলকাতরার মধ্য দিয়া অবাধে চলিয়া যায়। দৃশ্য আলোক কাচের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাঁকিয়া যায়, হীরকের মধ্যে ইহা আরও বেশী বাঁকে এবং এই কারণেই আলোক ছড়াইয়া দিবার ক্ষমতা কাচ অপেক্ষা হীরকের বেশী। হীরকের দ্যুতির ইহাই কারণ। জগদীশচন্দ্র দেখিলেন যে দৃশ্য আলোক সম্বন্ধে হীরকের যে ক্ষমতা অদৃশ্য আলোক সম্বন্ধে চীনামাটির ক্ষমতা তদপেক্ষা বেশী।

ইহার পরের পরীক্ষা অতিশয় বিস্ময়কর। সাধারণ আলোক সর্বমুখ তবে টুর্মালিন প্রভৃতি কেলাসিত পদার্থের ভিতর দিয়া যাইলে উহা এক মুখ হইয়া বাহির হইয়া আসে। এই আলোকের সম্মুখে যদি আর একখানি টুর্মালিন পূর্বের মত ধরা যায় তবে ইহার মধ্য দিয়াও ঐ আলোক যাইবে; কিন্তু টুর্মালিনটি যদি ৯০ ডিগ্রী ঘুরাইয়া ধরা যায় তাহা হইলে কিন্তু ইহার মধ্য দিয়া আলোক যাইবে না। দৃশ্য আলোক ও অদৃশ্য আলোক যদি এক জাতীয় হয় তবে অদৃশ্য আলোকেও অনুরূপ ঘটনা দেখা যাইবে। জগদীশচন্দ্র তাঁহার যন্ত্রে ইহাও দেখাইলেন। দৃশ্য আলোক সম্বন্ধে টুর্মালিন যাহা করে তিনি দেখাইলেন যে অদৃশ্য আলোক সম্বন্ধে বেশী কিছু নয়, বহু পৃষ্ঠাযুক্ত একখানি পুস্তক ঠিক তাহাই করিয়া থাকে। দৃশ্য আলোক ও হার্জীয় রশ্মি যে একজাতীয় জগদীশচন্দ্র নিসংশয়রূপে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

যে গ্রাহকযন্ত্র জগদীশচন্দ্র নির্মাণ করিলেন তাহাতে বিদ্যুৎতরঙ্গ পড়িলে একটি বিদ্যুৎস্রোত প্রবাহিত হয়, তড়িৎনির্দেশক যন্ত্রের কাঁটা ঘুরিয়া যায়। কিন্তু এই বিদ্যুৎপ্রবাহ তো আরও কিছু করিতে পারে—বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজাইতে পারে, বারুদের স্তূপে আগুন ধরাইতে পারে এবং ইট-পাটকেলের মধ্য দিয়া যখন এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যায় তখন মধ্যের দেওয়াল ভেদ করিয়া তো পার্শ্ববর্তী ঘরে ঐ বিদ্যুৎতরঙ্গ ধাবিত হইতে পারে; আর জগদীশচন্দ্র কর্তৃক নির্মিত যন্ত্র তো খুব কার্যকর, অত দূরে থাকিয়াও তো উহা সাড়া দিতে সক্ষম। ১৮৯৪ সালে নবেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি এক পরীক্ষার আয়োজন করিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ঘরে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উদ্ভূত হইল, মধ্যের দরজা বন্ধ, সে-দরজা রক্ষা করিতেছেন সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের জগদীশচন্দ্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ফাদার লাফোঁ; ঘর ভেদ করিয়া পার্শ্ববর্তী ঘরে ঐ বিদ্যুৎতরঙ্গ পৌছিয়া একটি পিস্তল ছুড়িল। পৃথিবীতে বিনা তারে বার্তা প্রেরণ সূচিত হইল।

শিশিরকুমার মিত্র

বিশেষজ্ঞেরা প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন যে ইংলণ্ড হইতে যে হার্জীয় রশ্মি যাত্রা করিল তাহার পক্ষে বাঁকিয়া গিয়া আমেরিকায় পৌছান অসম্ভব। কিন্তু যখন দেখা গেল উহা আমেরিকায় পৌছিল তখন বিজ্ঞানীরা ইহার কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রহিলেন। অনেক বৎসর পরে যথাযথ কারণ মিলিল।

১৯০২ সালে কেনেলি ও হেভিসাইড বলিলেন যে আকাশের উপরিকার স্তর একটি পরিবাহক ফলকের মত কাজ করে সেই হেতু ঈথর-তরঙ্গ যেখানে পৌছিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া যায়। হেভিসাইড বলিলেন যে সূর্য-কিরণে বাতাসের অণু হইতে ইলেকট্রনের বিচ্যুতি ঘটে, স্তরটি 'আয়নিত' হয়, তাহারই ফলে উহা পরিবাহক হয়। এই স্তরকে হেভিসাইড-স্তর বলা হইতে লাগিল। এখনও অবধি ব্যাপারটা অনুমানের বিষয় ছিল। ১৯২৫ সালে এপেলটন এইরূপ স্তরের অস্তিত্বের প্রমাণ দিলেন।

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র

স্বল্পক্ষণ স্থায়ী এক গুচ্ছ তরঙ্গ পাঠাইয়া তিনি দেখিলেন যে হেভিসাইড-স্তরে প্রতিফলিত হইয়া উহা ফিরিয়া আসিল। বহু পরীক্ষা চলিতে লাগিল, পরীক্ষার উন্নততর প্রণালী উদ্ভাবিত হইল। এই প্রসঙ্গে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল যে ঈথরের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যদি ছোট হয়, ৩ মিটারের কম হয়, তবে উহা ঐ স্তর হইতে প্রতিফলিত হয় না, সেখানে আটক পড়ে। এই রূপ রশ্মি আলোকের মত সোজা চলে এবং ঘুরিয়া গিয়া দূরস্থিত স্থানে পৌঁছিতে পারে না।

১৯৩০ সালে শিশিরকুমার মিত্র ও তাঁহার সহকর্মিগণ বাংলা-দেশে এই হেভিসাইড-স্তর কত উচ্চে অবস্থিত সে-সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। তখন অবধি জানা গিয়াছিল যে এইরূপ দুইটি স্তর বিদ্যমান, একটি ৯০ কিলোমিটার এবং অপরটি ২০০ কিলোমিটার উর্দ্ধে; ইহাদিগকে যথাক্রমে E ও F স্তর বলা হইত। ১৯২৮ সালে এপেলটন সন্দেহ করেন যে E স্তরের নীচে, ভূপৃষ্ঠ পৃথিবী হইতে ৬০ কিলোমিটার উর্দ্ধে হয়তো আর একটি স্তর আছে; কিন্তু ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি কোন প্রমাণ পান নাই। ১৯৩৫ সালে শিশিরকুমার মিত্র জানাইলেন যে ৫৫ কিলোমিটার উর্দ্ধে স্থিত একটি স্তর হইতে তিনি প্রতিফলন লক্ষ্য করিয়াছেন। এপেলটন ইহাকে D স্তর নামে অভিহিত করিবার প্রস্তাব করেন। ১৯৩৬ সালে শিশিরকুমার মিত্র ও তাঁহার সহকর্মিগণ ইহারও নিম্নে ৫ হইতে ৫৫ কিলোমিটার অবধি উচ্চে অবস্থিত বিভিন্ন স্তর হইতে তরঙ্গের প্রতিফলন লক্ষ্য করিলেন। অচিরেই আমেরিকা ও ইংলণ্ডে বিভিন্ন পরীক্ষা হইতে ইঁহাদের উক্তি সমর্থিত হইল।

পরমাণুর গঠন

বিভিন্ন পরীক্ষা হইতে একটি পরমাণুর গঠন এই রূপ নির্ণীত হইয়াছে।

একটি পরমাণুর দুইটি অংশ—কেন্দ্রক ও বাহির; পরমাণুর ভর (mass) প্রায় সবটাই কেন্দ্রে খুব অল্পপরিসর স্থানে সংহত। সমস্ত পরমাণুটি পজিটিভ ও নেগেটিভ তড়িতের সমষ্টি; নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত ইলেকট্রনেরা চারি দিকে ছড়াইয়া আছে, আর সমস্ত পজিটিভ তড়িৎ কেন্দ্রস্থিত ভরে আবদ্ধ।

মৌলিক পদার্থগুলিকে যদি আণবিক ওজন অনুসারে সাজান যায় তো দেখা যায় যে পর পর মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে আণবিক ওজনের পার্থক্যের কোন স্থিরতা নাই,—হাইড্রোজেন ১·০০৮, হিলিয়ম ৪, লিথিয়ম ৬·৯৪, বেরিলিয়ম ৯.১ এই রকম বরাবর গিয়া ইউরেনিয়মে শেষ হইয়াছে, ইউরেনিয়মের আণবিক ওজন ২৩৮·২। মোসলে মৌলিক পদার্থগুলিকে আণবিক ওজন অনুসারে সাজাইলেন, সাজাইয়া তাহাদিগকে ক্রমিক সংখ্যা দিলেন। হাইড্রোজেনের সংখ্যা হইল ১, হিলিয়ম ২, লিথিয়ম ৩. বেরিলিয়ম ৪, বরাবর যাইয়া সোনার সংখ্যা দাঁড়াইল ৭৯, পারদ ৮০, এবং অনাবিষ্কৃতদের জন্য স্থান ছাড়িয়া রাখিয়া ইউরেনিয়মের সংখ্যা পড়িল ৯২। স্থির করা হইল যে একটি পরমাণুর আণবিক সংখ্যা যত হয়, বাহিরের ইলেকট্রনের সংখ্যা তত; আর বাহিরে বিক্ষিপ্ত ইলেকট্রন-সমূহে যতটা নেগেটিভ তড়িৎ আছে কেন্দ্রস্থ পজিটিভ তড়িৎ ঠিক ততটা পরিমাণের। আর একটি সিদ্ধান্ত করিতে হইল যে

একটি পরমাণুর রাসায়নিক ধর্ম, উহার বর্ণালী নির্ভর করে বাহিরের ইলেকট্রন-সংখ্যা, অর্থাৎ উহার আণবিক-সংখ্যার উপর।

একটি পরমাণুর বাহিরের চিত্রটি ভাল করিয়া দেখা যাক। হাইড্রোজেন-পরমাণুর কেন্দ্রে একটি প্রোটন আছে আর বাহিরে একটি ইলেকট্রন আছে। প্রোটন কতটা স্থান জুড়িয়া আছে এবং কেন্দ্র হইতে কত দূরে ঐ ইলেকট্রন অবস্থিত রাদারফোর্ড আল্‌ফা রশ্মি লইয়া বিবিধ পরীক্ষা করিয়া তাহার একটা আভাস দিলেন। বহুদিন পূর্ব হইতে বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারা সমগ্র পরমাণুটির ব্যাসের একটা হিসাব পাওয়া গিয়াছিল; এখন দেখা গেল কেন্দ্রে যে-বস্তুটি রহিয়াছে উহার ব্যাস সমগ্র পরমাণুর ব্যাসের লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র, মধ্যে বিরাট শূন্যতা। এখন ইলেকট্রনটি কি বাহিরে স্থির হইয়া আছে? প্রোটন পজিটিভ তড়িৎযুক্ত, ইলেকট্রন নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত; পজিটিভ ও নেগেটিভ তড়িতের মধ্যে আকর্ষণ আছে; ইলেকট্রনটি চুপ করিয়া থাকিতে পারে না, প্রোটনের টানে উহার উপর গিয়া পড়িবে। এইরূপ যদি হইত তবে পৃথিবীতে পদার্থের অস্তিত্ব থাকিত না।

মানবের দৃষ্টির অগোচর এই প্রোটন ইলেকট্রনের সহিত সূর্য-পৃথিবীর তুলনা করা যাইতে পারে। অতি বৃহতের সহিত অতি ক্ষুদ্রের তুলনা, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে আকর্ষণ একই ভাবে কাজ করিতেছে। সূর্যের চারিদিকে যেমন পৃথিবী ঘুরিতে দেখা যায় তেমনই কল্পনা করা হইল যে প্রোটনের চারিদিকে ইলেকট্রন ঘুরিতেছে। ইহাদিগের ঘুরিবার নির্দিষ্ট কক্ষ আছে। বাহির হইতে যদি শক্তি পায় যেমন তাপ, তড়িৎ, তবে ইলেকট্রন নিকটের কক্ষ হইতে দূরের কক্ষে চলিয়া যায়, পরমাণু ছাড়িয়াও চলিয়া যাইতে পারে। আবার তাহারা লাফাইয়া নিকটবর্তী কক্ষে ফিরিয়া আসে এবং সেই সময় পরমাণু হইতে তেজ নির্গত হয়।

মেঘনাদ সাহা

একটি পরমাণু হইতে বাহিরের ইলেকট্রন যখন তাড়াইয়া দেওয়া হয় তখন উহার বর্ণালী একটি গোটা পরমাণুর বর্ণালীর সমান থাকে না, ভিন্ন রকমের হয়। কত উষ্ণতায়, কিরূপ চাপে একটি পরমাণু হইতে উহার

শ্রীমেঘনাদ সাহা

বাহিরের ইলেকট্রনকে তাড়ান যাইতে পারে মেঘনাদ সাহা তাহা অঙ্ক কষিয়া বাহির করিলেন। সূর্যের বিভিন্ন অংশের বর্ণালীতে কতকগুলি মৌলিক পদার্থজনিত রেখা দেখা যায় অন্য মৌলিক পদার্থের রেখা দেখা যায় না। ইহার সঠিক কারণ এত দিন বুঝা যাইতেছিল না। সাহার গণনা অনুসারে সমস্ত ব্যাপারের যথাযথ কারণ মিলিল। ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রের বর্ণালীতে কি কি রেখা লোপ পাইয়াছে দেখিয়া সাহা তাঁহার হিসাব দিয়া ঐ সকল নক্ষত্রের উষ্ণতা নিরূপণ করিলেন। এই ভাবে সাহা নক্ষত্রসমূহকে তাহাদের উষ্ণতা অনুসারে ছয়টি বিভিন্ন দলে ভাগ করিলেন। পূর্বে জ্যোতির্বিদেরা নক্ষত্রসমূহকে তাহাদের ঔজ্জ্বল্য অনুসারে যে ছয়টি দলে ভাগ

করিয়াছিলেন সে-বিভাগ ও সাহার বিভাগ একেবারে মিলিয়া গেল। আর একটা কথা আসিল। সূর্য অপেক্ষা সূর্য-কলঙ্কের উষ্ণতা কম। সাহা হিসাবে দেখাইলেন যে সূর্য-কলঙ্কের কম উষ্ণতায় কয়েকটি মৌলিক পদার্থের বাহিরের ইলেকট্রনেরা পলায় নাই, অতএব সূর্য-কলঙ্কের বর্ণালীতে উহাদের বর্ণরেখা পাওয়া যাইবে। সাহার এ সিদ্ধান্তের যাচাই হইল। মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরের শ্রেষ্ঠ দূরবীক্ষণের সাহায্যে জ্যোতির্বিদ রাসেল সূর্য-কলঙ্কের বর্ণালীতে এ-সব রেখা দেখিতে পাইলেন। একটি পরমাণুর বাহিরের অংশের যে-চিত্র কল্পনায় অঙ্কিত করা হইয়াছিল সাহা তাহা হইতে জ্যোতির্বিদ্যার একটি নূতন দিক্ খুলিয়া দিলেন।

দেবেন্দ্রমোহন বসু

একটি পরমাণুর দুইটি অংশ কল্পিত হইয়াছিল—কেন্দ্রক ও বাহির। বাহিরে ইলেকট্রনেরা নির্দিষ্ট কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ব্যাপারও কল্পনায় আনিতে হইল। পৃথিবী সূর্যের চারি দিকে ঘুরিতেছে এবং পাক খাইয়া ঘুরিতেছে; পৃথিবীর সূর্যের যেমন এই দুই রকম গতি আছে তেমনই বিবিধ পরীক্ষা হইতে সিদ্ধান্ত করিতে হইল যে ইলেকট্রনেরও আবর্তন আছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা আসিল। একটি তড়িৎযুক্ত পদার্থের যদি গতি থাকে তবে উহাতে চৌম্বক ধর্ম দেখা যায়। ১৯২৫ সালে হুণ্ড বিবিধ পদার্থের বিভিন্ন কক্ষে অবস্থিত ইলেকট্রনদের গতি হিসাব করিয়া তাহাদের চৌম্বক শক্তির মাপ করিলেন। কিন্তু দেখা গেল হুণ্ডের এই হিসাব হইতে লৌহ এবং ঐ মণ্ডলীর পদার্থের চৌম্বক শক্তি নির্ণীত হয় না। হিসাবে ইলেকট্রনদের দুই রকম গতিই ধরা হইয়াছিল। ১৯২৭ সালে দেবেন্দ্রমোহন বসু দেখাইলেন যে কোন মৌলিক পদার্থের বাহিরের কক্ষে যে ইলেকট্রনরা ঘুরিতেছে তজ্জন্য চৌম্বক ধর্ম আসে না, তাহাদের যে আবর্তন হইতেছে, তাহারা যে পাক খাইয়া ঘুরিতেছে তাহারই ফলে তাহাদের চৌম্বক ধর্ম। ইহাতে পূর্বের সকল ব্যাপার মীমাংসিত হইল। পরে স্টোনার এই রূপ হইবার কারণ নির্দেশ করিলেন এবং

শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু

এখন এই কল্পনা 'বসু-স্টোনার-সিদ্ধান্ত' নামে পরিচিত। বিভিন্ন চৌম্বক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন রঙের কারণও দেবেন্দ্রমোহন বসু যথাযথ ভাবে নির্দেশ করিলেন।

কোয়ানটম্-বাদ

বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখা যায় যে এক-একটি মতবাদের প্রতিষ্ঠার এক-একটি যুগ আসে; বিজ্ঞানী এই মতবাদকে লইয়া খুব হইচই করেন, চারি দিকে উহার জয়জয়কার হয়; তাহার পর এমন সব ঘটনা দেখা যায় যাহার ফলে বিজ্ঞানী তাহার এই সাধের অট্টালিকাকে নিজ হাতেই চূর্ণ করেন। আলোক কি ভাবে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়? এ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ দুই শত বর্ষ-কাল ধরিয়া তরঙ্গবাদ আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিল তাহার পর এমন সব ঘটনা দেখা দিতে লাগিল যাহাতে বিজ্ঞানী বলিল—'তাই তো'।

তাপ, দৃশ্য, আলোক, অতি-বেগনী আলোক, এক্স্-রশ্মি গামা-রশ্মি সবই তরঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে, তরঙ্গের একটা অবিচ্ছিন্নতা, একটা ধারাবাহিকতা আছে এই কথাই একটা এতদিন বলা হইয়াছিল। উত্তপ্ত কৃষ্ণবর্ণ হইতে যে-সব কিরণ নির্গত হয় তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে করিতে বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে প্ল্যাঙ্ক দেখিলেন যে অনেকগুলি ঘটনা তরঙ্গবাদ দ্বারা মীমাংসিত হয় না। প্ল্যাঙ্ক বলিলেন যে তেজ বিচ্ছিন্নভাবে, খণ্ডে খণ্ডে বাহির হইয়া যায়,

অবিচ্ছিন্নতা নাই, ধারাবাহিকতা নাই ; গতি এক-একটি গুচ্ছে এক-এক ঝলকে বাহির হইয়া আসে। এই মতবাদ গ্রহণ করিয়া আইনস্টাইন বলিলেন যে শুধু রশ্মিনির্গম ব্যাপার নয়, রশ্মি যখন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পরিচালিত হয় তখনও উহা বিচ্ছিন্নভাবে গমন করে। এই 'কোয়ানটম্-বাদ' গ্রহণ করিয়া বোর একটি হাইড্রোজেন-পরমাণুর কেন্দ্রকের চারদিকে ইলেকট্রনদের ভ্রমণ করিবার বিভিন্ন কক্ষের ব্যাস নির্ণয় করিলেন। এক কক্ষ হইতে অপর কক্ষে লাফাইয়া যাইতে কতটা শক্তির প্রয়োজন তিনি কষিয়া বাহির করিলেন। রশ্মির এক-একটি গুচ্ছের নাম দেওয়া হইল 'ফোটন'।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

প্ল্যাঙ্কের গণনা কতক তড়িৎচুম্বক সম্বন্ধীয় প্রাচীন সিদ্ধান্তের উপর, কতক নূতন কোয়ানটম্-বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যেন্দ্রনাথ বসু সমষ্টিগত এক নূতন হিসাব-

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

পদ্ধতি স্থির করিলেন যাহাতে সম্পূর্ণ ভাবে কোয়ানটম্-বাদ গৃহীত হইল। ইহা দ্বারা প্ল্যাঙ্কের পূর্ব-গণনার ফলাফল রক্ষিত হইল, অনেক নূতন কথা আসিল। পরে আইনস্টাইন সত্যেন্দ্রনাথ বসুর এই গণনা-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া খুব নিম্নশৈত্যে গ্যাসের ক্রিয়া সম্পর্কীয় অনেক ব্যাপার মীমাংসা করিলেন। এই পদ্ধতি বিজ্ঞানীর নিকট বসু-আইনস্টাইন পদ্ধতি নামে পরিগণিত হইল। পরে ফার্মি ও ডিরাক সমষ্টিগত গণনা ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন করিয়া এক পরিবর্তিত পদ্ধতি গঠন করেন। এখন দেখা যায় যে ফোটনের ক্রিয়া সব সময়ই বসু-আইনস্টাইন নিরূপিত নিয়মে ঘটে এবং ইলেকট্রনের কার্যকলাপ হয় বসু-আইনস্টাইন না-হয় ফার্মি-ডিরাকের পদ্ধতির দ্বারা মীমাংসিত হয়।

বোরের মতবাদ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ইহা প্রাচীন বলবিদ্যা ও নূতন কোয়ান্টম্-বাদের এক জগা-খিচুড়ি। এই সব কারণে কিছু দিনের মধ্যে আবার এক মতবাদ মাথা খাড়া দিয়া উঠিল, কোয়ানটম্-বাদের উপর ভিত্তি করিয়া এক নূতন বলবিদ্যা গঠিত হইল। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সমষ্টিগত গণনা ইহার সূচনা ; এই নূতন বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত করিলেন—ডি-ব্রগলি, হাইসেনবার্গ, স্রডিংগার ও ডিরাক।

রশ্মি-বিক্ষেপণ

মনে করা যাক কোন পদার্থের উপর আলোকরশ্মি পড়িল ; কিছু প্রতিফলিত হইল, হয়তো কিছু পদার্থ ভেদ করিয়া গেল, কিয়দংশ ঐ পদার্থ শোষণ করিল এবং কিছু চারিদিকে ছড়াইয়া গেল। রশ্মির ছড়াইয়া যাওয়া ব্যাপারটায় দেখা যায় যে নিপতিত রশ্মির যে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এই ছড়ান রশ্মিরও সেই একই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হয় নাই বটে, তবে বিভিন্ন রঙের আলোক বিভিন্ন পরিমাণে ছড়ায়। লাল আলো অপেক্ষা বেগুনীর দিকে আলোক বেশী পরিমাণে ছড়াইয়া পড়ে। আকাশ যে কেন নীল তাহার সঠিক কারণ এই প্রসঙ্গে পাওয়া গিয়াছে। এবার রশ্মি-তড়িৎ ব্যাপারটা একবার দেখা যাক। পদার্থের উপর রশ্মি পড়িলে উহা হইতে ইলেকট্রন নিঃসৃত হয় এবং একগুচ্ছ আলোক তাহার সমস্ত শক্তি ইলেকট্রনকে দিয়া দেয়। এইবার আর একটি পরীক্ষায় আসা যাইতেছে যাহার ফলাফল অভিনব। এক্স্-রশ্মি লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে এ. এচ্. কমটন একটি ব্যাপার লক্ষ্য করিলেন। পদার্থের উপর এক্স্-

রশ্মি পড়িল, আগেকার দুইটি ব্যাপারের কোনটাই পুরাপুরি হইল না, মাঝামাঝি একটা ঘটিল। নিপতিত রশ্মির শক্তি কতকটা রশ্মি ছড়ান কার্যে এবং অবশিষ্ট ইলেকট্রন-বহিষ্করণে ব্যয়িত হইল। শক্তির এইরূপ ভাগাভাগি হওয়ায় রশ্মিরূপে যে-অংশ ছড়াইয়া পড়িল নিপতিত রশ্মি অপেক্ষা তাহার শক্তি কমিল, তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বাড়িল; কোন্ দিকে ছড়াইল তাহার উপরও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরিমাণ নির্ভর করিল; এবং যে ইলেকট্রন বাহির হইল কেবল রশ্মি-তরঙ্গ ক্রিয়া হইলে তাহার যে বেগ হইত তদপেক্ষা কম বেগ হইল। তরঙ্গবাদ দ্বারা ইহার মীমাংসা হইল না, কোয়ানটম্-বাদ ইহার কারণ নিরূপণ করিল।

চন্দ্রশেখর বেনকট রামন

চন্দ্রশেখর বেনকট রামন আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করিলেন। কম্‌টন একস্-রশ্মি লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন, রামন দৃশ্য আলোক লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। মনে করা যাক কোন তরল পদার্থের উপর, যেমন ক্লোরোফরম, এক রকম তরঙ্গের আলোক পড়িল। এই আলোক চারিদিকে ছড়াইল। একটি নির্দিষ্ট দিক ধরা যাক, যে দিক হইতে আলোক আসিতেছিল তাহার লম্ব দিক। ছড়ান আলোকের কতকও এদিকে আসিল; ইহার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নিপতিত আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সমান। রামন দেখিলেন যে বর্ণালীতে সমান তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য-জনিত যে রেখা হইবার কথা তাহা তো আছেই, অধিকন্তু উহার দুই দিকে আরও অনেকগুলি রেখা রহিয়াছে, বেশী দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ-জনিত রেখা সংখ্যায় বেশী। তরঙ্গ-বাদ দ্বারা কেবল সমদৈর্ঘ্যের তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়, কিন্তু অপরগুলির কি কারণ হইতে পারে? প্রথম ধরা যাক যেগুলির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেশী। ব্যাপারটা এইরূপ কল্পিত হইল। বাহির হইতে ফোটন আসিল, শক্তির কতক পরিমাণ অণুকে কম্পিত করিল, অবশিষ্ট শক্তি কম শক্তিধর ফোটন হিসাবে বাহির হইয়া আসিল। কম শক্তিধর ফোটনের অর্থ ঐ রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দীর্ঘতর। এ অবধি বুঝা গেল; কিন্তু ছোট দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের রেখা কেন

শ্রীচন্দ্রশেখর বেনকট রামন

মিলিল? ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অর্থ ত অধিক শক্তিধর ফোটন; অল্প শক্তির ফোটন কিরূপে বেশী শক্তির ফোটনে পরিণত হইল? এইরূপ পরিকল্পনা করা হইল। পূর্ব হইতে ঐ অণু কিছু শক্তি আহরণ করিয়াছিল, এমন অবস্থায় বাহির হইতে ফোটন তাহার শক্তি লইয়া আসিল। কোন কোন ক্ষেত্রে দুই শক্তি মিলিত হইল এবং অণু যখন তাহার পূর্বকার সহজ অবস্থায় ফিরিল তখন মিলিত শক্তির জন্য যে ফোটন বাহির হইল তাহার শক্তির বৃদ্ধি পাইল—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কমিল, রেখা বর্ণালীর অপর দিকে দেখা দিল। অণুর গঠন, অণুর মধ্যে পরমাণুর বন্ধন, অণুর স্পন্দন, রাসায়নিক প্রক্রিয়া, পদার্থের ভৌতিক পরিবর্তন প্রভৃতি অনেক ব্যাপারে রামনের আবিষ্ক্রিয়া আলোক সম্পাত করিল।

রশ্মির ছড়াইয়া যাওয়া, রশ্মি-তড়িৎ ঘটনা, কমটন-ক্রিয়া এবং রামন-ক্রিয়ার দুইটি ব্যাপার সবগুলি এক সঙ্গে এই ভাবে কল্পনা করা যাইতে পারে। স্টেশনে প্ল্যাটফরম

টিকিট বিক্রয়ের যেমন স্বয়ংক্রিয় কল থাকে, এক দিকে একটি আনি ফেলিয়া দাও অপর দিক হইতে একটি টিকিট বাহির হইবে, সেই রকম পাঁচটি কলের কথা মনে করা যাক, সঙ্গে সঙ্গে ভাবা যাক যে যেমন আনি, দু-আনি আছে, সেইরূপ ইহা ব্যতীত আধ-আনি, দেড়-আনি মুদ্রাও আছে। প্রথম যন্ত্রে একটি দেড়-আনি ফেলা হইল, অপর দিক্ হইতে দেড়-আনি বাহির হইল। ইহার সহিত আলোকের সাধারণ ভাবে ছড়াইয়া পড়া ব্যাপার তুলনা করা যাইতে পারে; যে-শক্তির ফোটন প্রবেশ করিল সেই শক্তির ফোটন বাহির হইল। দ্বিতীয় যন্ত্রে দেড়-আনি ফেলা হইল, একটি দেড়-আনির টিকিট বাহির হইল। মুদ্রার সহিত আমরা ফোটনের তুলনা করিতেছিলাম এখন টিকিটের সহিত ইলেকট্রনের তুলনা করিলে ব্যাপারটা এই দাঁড়াইল যে ফোটন গিয়া পড়িল, ইলেকট্রন বাহির হইল, উভয়ের গতি সমান। ইহা হইল রশ্মি-তড়িৎ ব্যাপার। তৃতীয় যন্ত্রে দেড়-আনি ফেলা হইল, একটি এক আনা দামের টিকিট এবং একটি আধ-আনি বাহির হইল। ফোটন আসিল, নির্গত হইল কম শক্তির ফোটন এবং অবশিষ্ট শক্তির ইলেকট্রন। ইহা কমটন-ক্রিয়া। চতুর্থ যন্ত্রে দেড়-আনি ফেলা হইল, বাহির হইল এক-আনি ও আধ-আনি (সময় সময় আধ আনিটা ভিতরে জমা হইয়া থাকে)। ইহা রামন-ক্রিয়ার এক দিক্। প্রথম যন্ত্রে আগে একটি আধ-আনি জমা ছিল, এখন একটি এক-আনি দেওয়া হইল, বাহির হইল একটি দেড়-আনি। ইহা রামন-ক্রিয়ার অন্য দিক। কমটন-ক্রিয়া ও রামন-ক্রিয়া উভয়েতেই ফোটনের সহিত সংঘাতে পদার্থ হইতে ভিন্ন শক্তির ফোটন নির্গত হয়। উভয় ক্রিয়াই কোয়ানটম্ বাদ দ্বারা মীমাংসিত হইল।

কে. এস. কৃষ্ণান

স্ফটিক এবং বিবিধ কেলাসিত পদার্থের মধ্যে অণুগুলি কি ভাবে সজ্জিত আছে? ১৮১৩ সালে ব্রাগ এক যন্ত্র নির্মাণ করিলেন; এই যন্ত্রে একস্-রশ্মি একটি দানার মধ্য দিয়া গেল। বাঁকিল, বাঁকিয়া ফটোগ্রাফি কাচের উপর

শ্রীকে. এস কৃষ্ণান

আপনাকে অঙ্কিত করিল। দানার অভ্যন্তরস্থ অণুগুলি চারিদিকে সজ্জিত থাকায় ঐ সজ্জার চিত্র ফটোগ্রাফি কাচে আপনাকে প্রকাশিত করিল। বিভিন্ন রকমের দানার ভিতর দিয়া একস্-রশ্মি পাঠাইয়া চিত্র লওয়া হইতে লাগিল; দানার ভিতরকার সজ্জা মানব জানিতে পারিল। মানব চক্ষুর অগোচর এ সজ্জা; কিন্তু অদৃশ্য আলোকের সাহায্যে উহা দৃশ্যমান হইয়া উঠিল। কে. এস. কৃষ্ণান কেলাসিত পদার্থের বিভিন্ন দিকে চৌম্বক প্রবণতা কিরূপ তাহা নিরূপণার্থ সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণ করিলেন। এই যন্ত্র সাহায্যে কৃষ্ণান বিভিন্ন কেলাসিত পদার্থে পূর্বপ্রকাশিত সজ্জা লক্ষ্য করিলেন এবং শুধু তাহা নয়—এ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আহরণ করিলেন।

বিবিধ

মাত্র অল্প কয়েক জনের মৌলিক গবেষণার মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয়গুলির সামান্য পরিচয় দেওয়া হইল। বর্তমান কালে বহু ভারতীয় বৈজ্ঞানিক তাঁহাদের গবেষণা দ্বারা মানবের জ্ঞানের ভাণ্ডার পুষ্ট করিতেছেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

অর্ধেক রাজত্ব, কিন্তু রাজকন্যা নহে

লণ্ডনে যে ইংরেজ ভারতসচিব থাকেন, তিনি ভারতবর্ষের বড় কর্তা। বর্তমান ভারতসচিব তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, কংগ্রেস ভারতবর্ষের লোকদের সব চেয়ে বড়, সব চেয়ে সুশৃঙ্খল ও সব চেয়ে শক্তিশালী সভা। ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ভারতবর্ষের লোকদের কাছে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, কংগ্রেস তাহা গ্রহণ করেন নাই, আবার গবর্মেণ্টও কংগ্রেসের আগেকার প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। কংগ্রেস সর্বশেষ যে প্রস্তাব ধার্য করিয়াছেন, তাহার কথা পরে বলিব।

ইংলণ্ডের লোকেরা খুব সাহস, খুব স্বদেশপ্রেম ও খুব রণদক্ষতার সহিত লড়িতেছে। অর্থব্যয় যাহা করিতেছে, কাগজে তাহার পরিমাণ ছাপা দেখিতেছি বটে; কিন্তু কল্পনায় তাহা আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না—তাহা এত বেশী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বশাসক উপনিবেশ কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতিও ইংলণ্ডের সাহায্য করিতেছে। কিন্তু যুদ্ধ যে কত দিন চলিবে, কিরূপ ব্যাপক হইবে, ভারতবর্ষে পর্যন্ত আসিয়া পৌছিবে কি না বলা যায় না;—পৌছিবে ধরিয়া লওয়াই ভাল। এই কারণে, ব্রিটেনের ধনসম্পত্তি যতই হউক না কেন, ভারতবর্ষের সাহায্য সে চায়। চায় যে তাহার প্রমাণ, নানা রকমে নানা নামে ভারতবর্ষের লোকদের নিকট হইতে যুদ্ধের নিমিত্ত টাকা দান বা ঋণ রূপে পাইবার চেষ্টা।

ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে শক্তিশালী সভা কংগ্রেস গবর্মেণ্টের পক্ষে হইলে ভারতবর্ষের সাহায্য পাইবার খুব সুবিধা হইত। কিন্তু এ পর্যন্ত গবর্মেণ্ট তাহা পান নাই। অতএব, অন্য কোন একটা দলকে নিজের পক্ষে আনা গবর্মেণ্টের একান্ত আবশ্যক হইয়াছে বুঝিয়া মুসলিম লীগের নেতা মিঃ জিন্না খুব চড়া দর হাঁকিয়াছেন।

গবর্মেণ্টের একটি প্রস্তাব এই যে, বড়লাটের যে শাসন-পরিষদ (Executive Council) আছে, তাহার সদস্যদের সংখ্যা বাড়ান হইবে এবং দেশের সকল রাজনৈতিক দল হইতে সদস্য লওয়া হইবে। কংগ্রেসীরা সদস্য হইতে রাজী নহেন। সুতরাং মিঃ জিন্না ঠিক্ করিয়াছেন এখন মুসলিম লীগই সরকারের অগতির গতি। অতএব তিনি গবর্মেণ্টকে বলিয়াছেন, অতিরিক্ত যত সদস্য লওয়া হইবে, তাহার অর্ধেক মুসলিম লীগ নিজের সভ্যদের মধ্য হইতে বাছিয়া দিবে; গবর্মেণ্টের যে-যে বিভাগগুলি রাষ্ট্রের ঘাঁটি স্বরূপ অর্থাৎ Key portfolios, যেমন সামরিক বিভাগ, শিল্প-বাণিজ্য বিভাগ, যানবাহন বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ, ইত্যাদি, সেইগুলির ভারপ্রাপ্ত সদস্য হইবেন মুসলিম লীগের লোকেরা; অন্য কোন দল হইতে (যেমন হিন্দু মহাসভার দল, উদারনৈতিক দল ইত্যাদি) অন্যান্য যে-যে সদস্য লওয়া হইবে তাঁহাদের নাম মিঃ জিন্নাকে আগে হইতে জানাইতে হইবে, যাহাতে তিনি বিবেচনা করিবার সুযোগ পান যে তাহাদের সঙ্গে একত্র কাজ করা মুসলিম লীগের লোকদের পক্ষে সম্ভবপর ও সুবিধাজনক হইবে কিনা। ইহার সোজা মানে এই যে, মুসলিম লীগ কেবল যে মুসলমান সদস্যই বাছিয়া দিবেন তাহা নহে, অন্যান্য দলের কে কে সদস্য হইবেন তাহাও মুসলিম লীগের মরজির উপর নির্ভর করিবে।

মনে রাখিতে হইবে, যে, ভারতবর্ষে মুসলমানেরা সমগ্র-লোকসমষ্টির ঠিক্ সিকি অংশও নহে এবং মুসলিম লীগ মুসলমানদের সকলের বা অন্ততঃ অধিকাংশের প্রতিনিধিও নহে; অহ্‌র দল, জামিয়ৎ-উল-উলেমা, মোমিন দল, শিয়া সম্প্রদায় প্রভৃতি মুসলিম লীগকে আপনাদের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করেন না।

অথচ মিঃ জিন্না এই মুসলিম লীগের জন্য দাবী করিয়াছেন অর্ধেক রাজত্ব!

প্রাচীন কালের গল্পে ও কিংবদন্তীতে, কতকটা ইতিহাসেও বটে, এবং উপকথায় এরূপ দেখা যায় যে, কোন দেশের রাজা পরাজিত হইলে বিজয়ী রাজাকে,

রাজপুত্রকে কিম্বা সেনাপতিকে অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা উপহার দিয়া সন্ধি করিলেন ও শান্তি ক্রয় করিলেন; কিংবা কোন রাজপুত্র বা কোন চিকিৎসক রাজকন্যাকে কঠিন ব্যাধি হইতে মুক্ত করায় অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার পতিত্ব লাভ করিলেন; কিংবা কোন পণ্ডিত কোন সমস্যা পূরণ করিয়া বা তর্কযুদ্ধে রাজসভাস্থ সকল বিদ্বানকে পরাস্ত করিয়া ঐরূপ পুরস্কার পাইলেন।

কিন্তু মিঃ জিন্না ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে পরাজিত করেন নাই; অন্য যে-যে কারণে বা উপায়ে পুরাকালে বা উপকথা-রাজ্যে অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা লাভের কিম্বদন্তী আছে, এক্ষেত্রে সেরূপ কিছুও ঘটে নাই। অথচ মিঃ জিন্না অর্ধেক রাজত্ব চাহিয়া বসিয়াছেন! তবে ইহা অবশ্য-স্বীকার্য যে, তিনি মুসলিম লীগের জন্য রাজকন্যা চান নাই, অর্ধেক রাজত্ব চাহিয়াই মনের উপর লাগামটা খুব টানিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু তাহারও কারণ আছে।

ভারতবর্ষ দেশটা ইংরেজদের নিজের দেশ নহে। সুতরাং তাঁহাদের এই জমিদারীর কতকটার নায়েবী কাহাকেও দেওয়াতে তাঁহাদের আপত্তি হইবে না—নায়েব যে-ই হউক মাথার উপর প্রভু ত তাঁহারাই থাকিবেন। বোধ করি এই জন্য অর্ধেক রাজত্ব চাহিতে মিঃ জিন্না দ্বিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু রাজকন্যা! পরাধীন কালা আদমীকে রাজকন্যা দানে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সম্মতি হইতেই পারে না ভাবিয়া তিনি সে দাবী করেন নাই অনুমান করি। তদ্ভিন্ন, লীগের নেতা উপনেতাও যে অনেকগুলি—অত রাজকন্যা কোথায় পাওয়া যাইবে? সুন্দ-উপসুন্দের শুম্ভ-নিশুম্ভের পুনরাবির্ভাব হইতে কতক্ষণ?

জিন্না সাহেব বড়লাটের নিকট আগে কি চাহিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের কলমে লেখা তাহার কোন বিবৃতি খবরের কাগজে বাহির হয় নাই। অন্য কর্তৃক খবরের কাগজে লিখিত ও জিন্না সাহেব বা তাঁহার দলের কাহারও দ্বারা অ-প্রতিবাদিত বৃত্তান্ত দেখিয়া উপরে লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করা গিয়াছে। সম্প্রতি তাঁহার সহিত বড়লাটের যে কথাবার্তা হইয়াছে তাহা এ পর্যন্ত (২৬শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) কাগজে সঠিক বাহির হয় নাই। তাহা আমাদের জ্ঞাতব্যের বিষয় নহে।

—

"ব্রিটেন দুর্বল হইয়া পড়িলে ভারতের কি লাভ হইবে?"

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের গবর্ণর একটি দরবারে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন, "যদি ব্রিটেন দুর্বল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহা হইতে ভারতবর্ষের কি উপকার হইবে?" এরূপ প্রশ্নের উদ্দেশ্য, যুদ্ধে ভারতবর্ষের সাহায্য লাভ এবং সাহায্যলাভ দ্বারা ব্রিটেনের দুর্বল হইয়া পড়া নিবারণ। এরূপ প্রশ্ন দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে মনে হয় না। কারণ, এরূপ প্রশ্নের মধ্যে প্রশ্নকর্তার এইরূপ একটা ধারণা যেন উহ্য আছে মনে হয়, যে ভারতীয়েরা চায় ব্রিটেন দুর্বল হউক এবং তাহা চাহিবার কারণ তাহাদের এই বিশ্বাস যে, ব্রিটেন দুর্বল হইলে ভারতবর্ষ উপকৃত হইবে। কিন্তু ভারতীয় কোনও রাজনৈতিক দল এরূপ অভিলাষ করে বলিয়া অবগত নহি যে, ব্রিটেন দুর্বল হউক যেহেতু ব্রিটেন দুর্বল হইলে ভারতবর্ষ উপকৃত হইবে।

ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যে-যে জাতি যুদ্ধ করিতেছে, তাহারা ব্রিটেনকে পরাস্ত করিয়া ভারতবর্ষকে তাহার পরাধীন অবস্থা হইতে মুক্তি দিবে, এরূপ কোন উদ্দেশ্য তাহাদের নাই; আছে বলিয়া তাহারা কখনও ভানও করে নাই। তাহাদের এরূপ কোন প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকিলে হয়ত, সকল ভারতীয় না হউক, তাহাদের কিয়দংশ ব্রিটেনের দুর্বলতা ও পরাজয় কামনা করিত। কিন্তু তাহাদের সে উদ্দেশ্য নাই, সুতরাং ঐ কারণে কোন ভারতীয় ব্রিটেনের দুর্বলতা ও পরাজয় কামনা করিতে পারে না।

সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করা যদি ভারতীয় নেতাদের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে ব্রিটেনের দুর্বলতা বাঞ্ছনীয় হইত; কারণ, প্রবল শত্রুর চেয়ে দুর্বল শত্রুকে পরাস্ত করা সহজ। কিন্তু ভারতবর্ষের নেতাদের নির্ধারিত স্বাধীনতালাভের পন্থা সশস্ত্র বিদ্রোহ নহে। কংগ্রেসের পন্থা অহিংস, ও অস্ত্র অহিংস অসহযোগ বা সত্যাগ্রহ; এবং অন্যান্য অ-গুপ্ত দলের পন্থা রাষ্ট্রবিধিসঙ্গত আন্দোলন (Constitutional agitation), ও তাহার অঙ্গ খবরের কাগজে লেখা, সভায় বক্তৃতা করা ও প্রস্তাব নির্ধারণ করা,

কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন ও আবেদক দল প্রেরণ, ইত্যাদি। সন্ত্রাসনবাদী গুপ্তদল এখন নাই, ব্যক্তি কেহ কেহ থাকিলে তাহাদের কথা ধর্ত্তব্য নহে।

ব্রিটেনের সর্বনাশ হইলে ভারতবর্ষের পৌষ মাস হইবে, ভারতীয়দের এরূপ ধারণা না-থাকিবার কারণ মোটামুটি উপরে দেখাইলাম। এখন, বোম্বাইয়ের গবর্ণর ও তাঁহার সমচিন্তকদিগকে কিছু প্রশ্ন করিব। তাহা বোধ হয় করা যাইতে পারে। কেন-না ইংরেজীতে প্রবাদ আছে, বিড়ালও রাজার উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে পারে ("Even a cat may look at a king")।

—

"ব্রিটেন প্রবলতর হইলে ভারতবর্ষের উপকার হইবে কি ?"

আমাদের প্রথম পাল্টা প্রশ্ন, "যদি ব্রিটেন যুদ্ধে জয়ী হইয়া এখনকার চেয়েও শক্তিশালী হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের উপকার হইবে কি ?" গোড়াতেই বলিয়া রাখি, ব্রিটেনের জয়ে ভারতবর্ষ উপকৃত হউক বা না হউক, আমরা ব্রিটেনের জয় বাঞ্ছা করি ; কারণ ব্রিটিশ 'সভ্যতা' নাৎসী 'বর্বরতা' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ব্রিটেন জয়ী হইলে, যে-সব দেশ এখনও স্বাধীন আছে নাৎসীরা তাহাদিগকে পদানত করিবার চেষ্টা করিতে বা পদানত করিতে পারিবে না।

তাহার পর আমাদের আলোচ্য প্রশ্নটি করিবার কারণ বলি।

গত পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের আরম্ভে ব্রিটেন যত শক্তিশালী ছিল, উহা শেষ হইবার পর তাহা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয় এবং বহু লক্ষ বর্গমাইলব্যাপী ভূখণ্ড নূতন করিয়া তাহার সাম্রাজ্যের সামিল হয়। ইহাতে তাহার শক্তি সমৃদ্ধি বাড়ে। তাহার ফলে ভারতবর্ষের কি উপকার হইয়াছিল ও হইয়াছে, তাহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বলিতে পারিবেন। আমরা কেবল দুই-একটা পরবর্তী ঘটনার উল্লেখ করিব। তাহা ব্রিটেনের অধিকতর শক্তিশালী হইবার সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ফল, এরূপ বলিতে পারি না ; কিন্তু সেগুলি পরবর্তী ঘটনা ইহাই বলিতেছি। একটা কাক একটা তালগাছে বসিল ও তৎক্ষণাৎ একটা তাল ফল গাছ হইতে পড়িয়া গেল। এই ঘটনা হইতে কেহ যদি বলে যে, কাকটার গাছে বসাই ফলটা পড়ার কারণ, তাহা হইলে সেইরূপ তর্কের আলোচনায় উল্লেখ নিমিত্ত সংস্কৃতে "কাকতালীয় ন্যায়" কথাগুলি ব্যবহৃত হয়। লাটিনে ও ইংরেজীতে এইরূপ আছে, "*Post hoc, ergo propter hoc*", "After it, therefore on account of it" ("ইহার পরে, অতএব এই কারণে")। কিন্তু ইহা সুতর্ক নহে। আমরা এরূপ কোন ভ্রান্ত যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিতে চাই না।

গত জগদ্ব্যাপী যুদ্ধে ব্রিটেন জয়ী হইবার পর রৌলট আইন হইয়াছিল ও জালিয়ানওআলাবাগের কাণ্ড ঘটিয়াছিল ; এবং মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রাষ্ট্রবিধি-সংস্কার হইয়াছিল যাহার শেষ পরিণতি হইয়াছে সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন যাহার প্রাদেশিক অংশ তিন বৎসর হইল চালু হইয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা মনে করেন কিনা জানি না এই সমস্তই ভারতবর্ষের পক্ষে কল্যাণকর হইয়াছে। তাহা তাঁহারা মনে করিতে পারেন। আমরা করি না। গত জগদ্ব্যাপী যুদ্ধের ফলে প্রবলতর হইয়া ব্রিটেন কেবল মাত্র ভারতবর্ষেরই কল্যাণসাধনের নিমিত্ত আর কি কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার তালিকা তাঁহারা দিলেই আমাদের প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া হইবে।

—

ভারতের দুর্বলতা-সবলতা হইতে ব্রিটেনের লাভ-অলাভ

আর গোটা দুই প্রশ্ন এইরূপ হইতে পারে :—

ভারতবর্ষকে দুর্বল রাখিয়া ব্রিটেনের কি লাভ হইয়াছে ও হইতেছে ?

ভারতবর্ষকে সবল হইতে দিলে ব্রিটেনের কি ক্ষতি হইতে পারে ?

ব্রিটেনের বিবেচনায় ভারতবর্ষ যে সামরিক বলে যথেষ্ট বলীয়ান নহে, তাহা এখন সৈন্যসংখ্যা এবং কারখানায় যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতি বৃদ্ধির সরকারী চেষ্টা হইতেই বুঝা যায়। অবশ্য এই যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা ব্রিটেন নিজের স্বার্থের জন্য করিতেছে। বলা যাইতে পারে যে, এ-সকল

চেষ্টা ভারতরক্ষার নিমিত্ত। কিন্তু আমরা আগে অনেক বার বলিয়াছি, ভারতরক্ষার সরকারী মানে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ জমিদারি রূপে রক্ষা। যাহা হউক, তাহাও এক প্রকার ভারতরক্ষা বটে; কারণ, ভারতবর্ষ নূতন মনিবের হস্তগত হইলে সে নবোদ্যমে লুটপাট মারধর অল্লাধিক করিবেই; তাহা অবাঞ্ছনীয়।

ভারতবর্ষের সামরিক শক্তি ও আয়োজন আগে হইতেই যথেষ্ট করিয়া রাখিলে তাড়াতাড়ি কোন কাজ করায় যে-সব দোষ ও খুঁৎ হইয়া থাকে, তাহা হইত না; এবং যুদ্ধের গোড়াতেই গবর্মেণ্ট যত ভারতীয় সৈন্য অন্যত্র পাঠাইয়াছেন, তাহা অপেক্ষা বেশী সৈন্য পাঠাইতে পারিতেন। তাহা করিলে, হয়ত সোমালিল্যাণ্ড ইটালিয়ানদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া ব্রিটেনকে হটিয়া আসিতে হইত না, হয়ত কেনিয়ার প্রান্তস্থিত বুনা হইতে হটিয়া আসিতে হইত না, হয়ত সোলম হইতে হটিয়া আসিতে হইত না। অতএব, ভারতবর্ষকে দুর্বল রাখায় ব্রিটেনের কিছু ক্ষতিই হইয়াছে বলিতে হইবে।

অবশ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা মনে করিতে, এমন কি কেহ কেহ বলিতেও পারেন, ভারতবর্ষকে যথেষ্ট বলিষ্ঠ হইতে দিলে উহা ব্রিটেনের অধীন থাকিত না, সুতরাং ভারতবর্ষকে অধীন রাখা দ্বারা ব্রিটেনের যে অশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা হইয়াছে, রাজকার্যের বেতনাদি দ্বারা ইংরেজদের প্রচুর অর্থ লাভের যে উপায় হইয়াছে, এবং ভারতবর্ষের জনবল ও অর্থবল প্রয়োগ দ্বারা অন্যত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের যে সুবিধা হইয়াছে, তাহা হইত না।

কিন্তু ইহারও উত্তর আছে। ভারতবর্ষকে সবল, স্বাধীন ও ধনী হইতে দিলে আপাততঃ কোন কোন দিকে ব্রিটেনের লাভ কমিত বটে, কিন্তু অন্যান্য দিকে লাভ বাড়িত; কারণ, দরিদ্র জাতির সহিত বাণিজ্য করা অপেক্ষা ধনী জাতির সহিত বাণিজ্য করা অধিক লাভজনক, কেন-না দরিদ্র জাতি অপেক্ষা ধনী জাতি অধিক জিনিষ ও অধিক রকম জিনিষ কেনে এবং কোন জাতিই স্বদেশে তাহার আবশ্যক সব রকম জিনিষ উৎপন্ন ও প্রস্তুত করিতে পারে না।

ভারতীয়েরা অকৃতজ্ঞ নহে। গত জগদ্ব্যাপী যুদ্ধে ভবিষ্যৎ উপকারের আশায় ভারতবর্ষ প্রভূত জনবল ও ধনবল দ্বারা ব্রিটেনকে সাহায্য করিয়াছিল। সে আশা সফল না-হওয়া সত্ত্বেও এই যুদ্ধেও অনেকে ব্রিটেনকে সাহায্য করিতেছে ও করিবে। ব্রিটেন ভারতবর্ষকে সবল ও স্বাধীন হইতে দিলে ভারতবর্ষের ব্রিটেনের বন্ধু হইবার ও থাকিবার সম্ভাবনাই অধিক।

ব্রিটেনের লাভ-অলাভের কথা কিঞ্চিৎ বলিলাম। কিন্তু ভারতবর্ষকে স্বাধীন ও সবল হইতে দেওয়া উচিত কিনা, ইহার বিচার করিতে গেলে ব্রিটেনের কেবল লাভ-অলাভের কথা ভাবিলে চলিবে না। স্বাধীন থাকিবার ও হইবার-থাকিবার অধিকার প্রত্যেক দেশের ও জাতির আছে। তাহা অন্য কোন জাতির লাভলোকসানের কারণ হইবে কি না, তাহা মোটেই বিবেচ্য নহে। তা ছাড়া ব্রিটিশরা (হিক্স-বীচ প্রভৃতি কেহ কেহ ভিন্ন) বরাবর বলিয়া আসিতেছে, ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য তাহারা ভারত শাসন করে। কিন্তু স্বাধীনতা ভিন্ন কোন জাতির কল্যাণ হইতে পারে না—যদিও কখন কখন অল্প কালের জন্য অন্যের শাসন মানা আবশ্যক হইতে পারে। অতএব, ব্রিটিশরা যে ভারতের কল্যাণকামী তাহাদের এই ঘোষণা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্তও তাহাদের ভারতবর্ষকে স্বাধীন হইতে দেওয়া উচিত।

আমরা জানি, সাম্রাজ্যবাদীরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। তথাপি, যাহা লেখা উচিত লিখিলাম।

—

"ব্রিটেন কেবল নিজের নহে অন্যের স্বাধীনতার জন্যও যুদ্ধ করিতেছে"

বোম্বাইয়ের বড়লাট তাঁহার পূর্বোল্লিখিত বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "ব্রিটেন কেবল নিজের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছে না, অন্যদের স্বাধীনতার জন্যও যুদ্ধ করিতেছে।" এই কথার মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে, তাহা আমরা স্বীকার করি। ব্রিটেন যুদ্ধে জয়ী হইলে কেবল যে তাহার নিজের স্বাধীনতা রক্ষিত হইবে তাহা নহে, এখন যে-সকল দেশ স্বাধীন আছে, জার্মেনী দ্বারা তাহারা আক্রান্ত হইবে না ও তাহাদিগকে জার্মেনীর অধীন হইতে হইবে

না। অতএব, ইহা ঠিক কথা যে, ব্রিটেন এই সকল দেশের স্বাধীনতার জন্যও গৌণভাবে যুদ্ধ করিতেছে।

আর কতকগুলি দেশের স্বাধীনতার জন্যও ব্রিটেন পরোক্ষ ভাবে যুদ্ধ করিতেছে। সেগুলি সেই সব দেশ বা দেশাংশ যেগুলিকে গত এক বা দুই বৎসরের মধ্যে জার্মেনী গ্রাস করিয়াছে। ব্রিটেন জয়ী এবং জার্মেনী পরাজিত হইলে এই সকল দেশ ও দেশাংশ জার্মেনীর দ্বারা অধিকৃত না-থাকিয়া স্বাধীন হইতে পারিবে।

ব্রিটেন মুখ্যতঃ নিজের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধ করিলেও গৌণ ও পরোক্ষ ভাবে যে-অর্থে অন্যদের স্বাধীনতার জন্যও যুদ্ধ করিতেছে, তাহা বলিলাম। অর্থাৎ সংক্ষেপে ইহাই বলিলাম, যে, এখন যে-সকল দেশ স্বাধীন আছে এবং যাহারা অল্পকাল পূর্বেও স্বাধীন ছিল কিন্তু সম্প্রতি জার্মেনীর অধীন হইয়াছে, ব্রিটেনের স্বাধীনতা-সমর গৌণভাবে তাহাদের জন্যও বটে।

কিন্তু ইহা সত্য নহে যে, ব্রিটেন অন্য সকল দেশেরই স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছে। তাহা করিতেছে প্রমাণ করিতে হইলে সর্বাগ্রেই ত ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত স্বাধীনতা-হীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন হইতে দিতে হয়; কিন্তু নানা আছিলায় ও অজুহাতে ব্রিটেন তাহা অনির্দিষ্ট সুদূর ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিতেই ব্যস্ত। সেই জন্য, ব্রিটিশ বক্তারা অন্য যেখানে ইচ্ছা বলুন তাঁহারা মানব জাতির স্বাধীনতার রক্ষক ও উদ্ধারক, কিন্তু ভারতবর্ষে সে কথা না বলাই ভাল। "Credat Judæus Apella"।

মানবস্বাধীনতাযোদ্ধৃতাগর্ব্বী ব্রিটিশ বক্তাদের আর একটা কথাও মনে রাখা আবশ্যক। তাঁহারা নিজেরা আক্রান্ত হইতে পারেন, ও পরে হইয়াছেন, বলিয়াই এই যুদ্ধে নামিয়াছেন এবং গৌণভাবে অন্য কোন কোন জাতির জন্যও লড়িতেছেন। কিন্তু যখন শুধু আবিসীনিয়া আক্রান্ত হইয়াছিল, যখন স্পেনকে অন্তর্যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল, যখন চেকোস্লোভাকিয়াকে জার্মেনী গ্রাস করিল—এবং যখন ব্রিটেনের আক্রান্ত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, তখন ব্রিটেন কাহারও স্বাধীনতার জন্য লড়েন নাই।

—

জলের আরসী

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় "ভক্ত কৃষ্ণনদাসজী" সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে এই সাধু ভক্তের 'জলের আরসীতে মুখ দেখিয়া তিলক কাটিবার' একটি আখ্যায়িকা আছে। (প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৪৭, পৃ. ১৭.) জলের আরসীর সাহায্যে প্রসাধন সম্পাদনের একটি সত্য বৃত্তান্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর "আত্মচরিত" (তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪২৮) হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা তাঁহার সহধর্মিণী প্রসন্নময়ী দেবীর সম্বন্ধে।

এক বার আমাদের বড় দারিদ্র্যের অবস্থা উপস্থিত হয়। সেই সময়ে প্রসন্নময়ীর আরসীখানি ভাঙিয়া যায়। তখন তাঁহার একখানি নূতন আরসী কিনিবার পয়সা ছিল না। তিনি জলের জালাতে মুখ দেখিয়া চুল বাঁধিতে আরম্ভ করেন। এ সকল কথা আমি জানিতাম না। এক দিন আমার বন্ধু দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের পত্নী ব্রহ্মময়ী অপরাহ্নে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন যে প্রসন্নময়ী জলের জালার নিকট দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি হেমের মা, জলের জালার কাছে দাঁড়িয়ে কেন?" প্রসন্নময়ী হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আরসীখানা ভেঙ্গে গেছে, তাই জলের জালাতে মুখ দেখে চুল বাঁধছি।"

ব্রহ্মময়ী। ও মা, এমন ত কখনও শুনি নি।

প্রসন্নময়ী অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন, "দেখ্‌লেন, আমি কেমন একটা নূতন জিনিষ দেখালাম।" দুই জনেই হাসিতেছেন, এমন সময় আমি উপস্থিত; তখন আমি সমুদয় কথা জানিতে পারিলাম। এ কথাটাও আমার এই সঙ্গে বলা আবশ্যক যে, আমার বন্ধুপত্নী হাসিলেন বটে, কিন্তু ব্যাপারটায় তাঁর প্রাণে একটা আঘাত লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রকাণ্ড একখানি সুন্দর আরসী কিনিয়া আনিয়া উপহার দিলেন।

—

পশ্চিম-বঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচনের আবশ্যকতা

আমরা প্রবাসীর গত (আশ্বিন) সংখ্যার ৮২৩ পৃষ্ঠায় পশ্চিম-বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণুতা নিবারণের নিমিত্ত জলসেচনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছিলাম। সম্প্রতি বাঁকুড়ায় যে "সমবায় সম্মেলন" হইয়াছিল তাহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে যাহ

বলিয়াছিলেন তাহা অত্যাবশ্যকবোধে, দৈর্ঘ্য সত্ত্বেও, উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা শুধু বাঁকুড়া জেলার নহে, অন্য অনেক জেলার লোকদেরও কাজে লাগিবে।

কৃষিকার্যের প্রসঙ্গে বাঁকুড়া ও পশ্চিম বাংলার অন্যান্য স্থানে যে বিশেষ অভাব আছে তার উল্লেখ প্রয়োজন। তা হচ্ছে জল-সেচন। এই অঞ্চলের জমি অসমতল ও অনুর্বর। সেই জন্য প্রাচীন কাল থেকেই সেচন-ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। মহাভারত আদি গ্রন্থে সেচন-ব্যবস্থা রাজার কর্তব্য ব'লে নির্দিষ্ট হয়েছে।

এই জেলায় সেচনের জন্য যে-সকল বাঁধ, দীঘি প্রভৃতি দেখা যায়, তা ভূস্বামিগণ প্রস্তুত করেছিলেন ও সংস্কার করতেন বলে মনে হয়। এখন বহুকাল অমনোযোগের ও ঔদাসীন্যের ফলে এই সব জলাশয় ভরাট হয়ে গেছে, বাঁধও ভেঙে গেছে, কেউ মেরামত করে নি। অতএব যদি বৃষ্টিপাত না হয় বা বৃষ্টি সময়-মত না হয়, তবে শস্যহানি অনিবার্য হয়ে ওঠে। জলসেচনের ব্যবস্থা না থাকলে এই জেলায় চাষ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

এই কারণে, অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ আজ বাঁকুড়াবাসীর নিত্য সহচর। সরকারী কাজ উপলক্ষে বাংলার নানা জেলার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, কিন্তু দারিদ্র্যের এমন নগ্ন ও ভীষণ মূর্তি আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। কিন্তু চিরদিন এমন ছিল না। এই সকল বাঁধ ও পুকুর যখন ঠিক ছিল, তখন যে কেবল প্রচুর ধান জন্মাত তা নয়, আখ, গম, তুলা প্রভৃতি মূল্যবান ফসলের আবাদ হ'ত, মাছও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত, স্নান ও পানের জন্য জলের অভাব ছিল না।

কেমন করে, কার দোষে অবস্থার এই পরিবর্তন ঘটল, তার আলোচনায় ফল নেই। আজ আমাদের চিন্তা করতে হবে, কী উপায়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের উদ্যম ও দূরদর্শিতার নীরব সাক্ষী এই সকল জলাশয় আবার আগের মতন জলে ভ'রে উঠবে, দেশ ধন-ধান্যে পূর্ণ হবে, কৃষকের শুষ্ক মুখে আবার আনন্দের হাসির রেখা ফুটবে।

কিন্তু এই সব জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার ও মেরামত করবার দায়িত্ব গ্রহণ করবে কে? একটি দুটি নয়, এই জেলায় ছোট বড় প্রায় ত্রিশ হাজার বাঁধ-পুকুর আছে। যাঁরা এই সব জলাশয়ের মালিক তাঁদের বেশী স্বার্থ নেই, তাঁরা কেন ঘরের কড়ি দিয়ে পরের উপকার করতে যাবেন? যাদের স্বার্থ আছে জলের অভাবে যাদের মাঠে সোনার ফসল শুকিয়ে যায়, যাদের ঘরে অন্নের অভাবে হাহাকার ওঠে, তাদের নাই অর্থসম্বল, নাই উদ্যম, নাই একতা।

এই সমস্যার দিকে আমাদের যখন দৃষ্টি পড়ল, তখন দেখা গেল যে সমবায়ের দ্বারা এর মীমাংসা হতে পারে। সেই পদ্ধতিতে কাজ করে ভাল ফসলও পাওয়া গেল। বাংলা-গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্যপদ্ধতির সমর্থন করলেন। বাংলার তদানীন্তন লাট, লর্ড লীটন, বাঁকুড়া ও বীরভূম দুই জেলায় সেচন-সমিতির কাজ নিজে পরিদর্শন করলেন, এবং যাতে এই ধরণের সমিতি সর্বত্র গঠিত হয়, তার জন্য দশ জন অস্থায়ী ইনস্পেক্টারের পদ মঞ্জুর করা হ'ল।

যত দিন ত্রৈমাসিক সিভিল লিষ্টে ইনস্পেক্টারদের নাম ছাপা হ'ত, তত দিন ছাপার হরফে তাদের নাম দেখা যেত। কিন্তু পশ্চিম বাংলার লোকে চর্মচক্ষে তাদের বেশী দিন দেখতে পায় নি। জলবিহীন দেশে সেচনের ব্যবস্থা করবার জন্য নিযুক্ত এই সব কর্মচারী, জলপ্লাবিত পূর্ববঙ্গের কোন্ প্রান্তে নৌকাতে তাঁরা বাস করতে লাগলেন, তার সংবাদ সমবায় বিভাগের কর্তৃপক্ষই বলতে পারেন।

ফলকথা এই যে, অনেক দিন ধরে পশ্চিম বঙ্গে জলসেচনের ব্যবস্থার জন্য বিশেষভাবে কেউ নিযুক্ত ছিল না এবং সেই কারণেই সেচন-সমিতি-গঠনের কাজ আশানুরূপ অগ্রসর হয় নি এবং যে সকল সমিতি গঠিত হয়েছে, তার অধিকাংশই দেখা-শোনার অভাবে নষ্ট হতে বসেছে।

অতএব, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এবং সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রার মহাশয়ের কাছে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁরা নিজে এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে এমন ব্যবস্থা করবেন যাতে বিশেষভাবে এর জন্যই উপযুক্তসংখ্যক কর্মচারী নিযুক্ত হয়।

সমবায় প্রণালীতে বাঁধ ও পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করতে গিয়ে একটি অপ্রত্যাশিত প্রতিবন্ধক সামনে এসে পড়ল। এই ধরণের সমিতি ভারতবর্ষের অন্যত্র কোথাও নেই, অন্য দেশে আছে কি না, জানি নে। এর বিশেষত্ব হচ্ছে যে, একটি নির্দিষ্ট জলাশয় থেকে যাদের জমিতে সেচন হয়, তারা সবাই যদি সমিতিতে যোগ না দেয়, তবেই গোলমাল বাধে। নানা কারণে, সবক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না, এবং কয়েক জন লোকের ঔদাসীন্য বা বিরুদ্ধাচরণের জন্য অনেক ভাল ভাল জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধারের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় নি এবং যে-সকল সমিতি গঠিত হয়েছে, তাতে গ্রাম্য দলাদলি এবং হিংসাদ্বেষের সমন্বয় করতে অনেক সময় ও পরিশ্রম ব্যয় হয়েছে। উপযুক্তসংখ্যক লোক নিযুক্ত থাকলেও, এই সকল কারণে সংগঠন কার্য প্রতিহত হবে।

গতবার, ১৯৩৫-৩৬ সালে, যখন পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলায় অন্নকষ্ট উপস্থিত হয় তখন দুর্দশা মোচনের ভার বাংলার বর্ত্তমান চীফ সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ও. এন. মার্টিন মহাশয়ের হাতে ন্যস্ত হয়েছিল। তিনি এই অঞ্চলের বাঁধ-পুকুর পঙ্কোদ্ধারের জন্য যে খসড়া প্রস্তুত করেন, সেই বিল আইন-সভায় পাস হয়েছে।

কিন্তু সেই আইন প্রবর্ত্তন করবার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করেছেন, আমরা জানি না। এ বিষয়ে মন্ত্রী-মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এই নূতন আইনের মর্ম্ম কী, কি ভাবে এর প্রয়োগ করা হবে, সে সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে একটি বিবৃতির প্রয়োজন আছে। এই ব্যবস্থা দুই রকমে হ'তে পারে। যে সকল বাঁধ-পুকুর পঙ্কোদ্ধার করা প্রয়োজন, সর্ব্বত্রই যদি এই আইন অনুসারে কাজ করা স্থির হয়, তবে জেলার কালেক্টারকে এর জন্য দায়ী করতে হবে। তাঁর হাতে নানা কাজ, এই নূতন কর্ত্তব্য হবে বোঝার উপর শাকের আঁটি। গুরুতর রাজকার্যে ব্যাপৃত হয়ে, কালেক্টার এর প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারবেন বলে আমি মনে করি না।

কিন্তু সমবায় সমিতির কর্ম্মচারিগণ বিশেষভাবে দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতির কাজেই নিযুক্ত। তাঁরা দেখবেন যে, কেবল টাকা কর্জ্জ নিয়ে পশ্চিম বাংলার কৃষকদের লাভ নেই। তাদের জমিতে যদি ভাল ফসল না হয়, তবে তারাও মারা যাবে আর সেই সঙ্গে ব্যাঙ্কের টাকাও মারা যাবে। সুতরাং সমবায়কর্ম্মিগণ কখনই সেচ-ব্যবস্থার প্রতি উদাসীন হবেন না। পঙ্কোদ্ধারের জন্য তাঁরা সেচন-সমিতি গঠন করবেন, এবং যে সকল স্থলে দলাদলি বা অন্য কারণে সকলকে একত্র করে সমিতিভুক্ত করা সম্ভব হবে না, সেই সকল স্থলেই এই আইনের বিধান প্রয়োগ করবার জন্য কালেক্টারের কাছে আবেদন করবেন। পুকুরের মালিক বা জমির চাষীরা যদি বুঝতে পারেন যে নূতন আইনে তাঁদের আপত্তি টিকবে না, কালেক্টর আইনের বলে জলাশয় পঙ্কোদ্ধার ও মেরামতের ব্যবস্থা করতে পারেন এবং স্বার্থবিশিষ্ট সকল লোককেই খরচের টাকা দিতে বাধ্য করা যায়, তখন অনেক ক্ষেত্রেই মিটমাট করা সহজ হবে। এই সকল বিষয় আলোচনা ক'রে গবর্ণমেণ্টের কার্যপদ্ধতি স্থির করা প্রয়োজন।

নূতন আইন অনুসারে পঙ্কোদ্ধারের ভার যার হাতেই থাকুক, তার জন্য টাকার প্রয়োজন হবে। দুর্ভিক্ষ হ'লেই গবর্ণমেণ্টের অনেক টাকা খয়রাত করতে হয়। কিন্তু এই আইন কার্যকরী করতে যে টাকা লাগবে, তা খয়রাত করার দরকার হবে না, সে টাকা সুদ সমেত সরকারী খাজনাখানায় ফিরে আসবে। সমবায় সমিতির মারফত এই ব্যবস্থা করার সুবিধা হচ্ছে যে এই টাকা আদায়ের দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টকে নিতে হবে না, এমন কি কোনও টাকা লোকসান হ'লে, সে লোকসান সমবায় সমিতিই বহন করবে।

কিন্তু বর্ত্তমানে প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক থেকে আমরা পাচ্ছি স্বল্প-মেয়াদী টাকা। এক বৎসরের কড়ারে টাকা কর্জ্জ ক'রে অনেক বৎসরের কিস্তিতে দাদন করা চলে না। অতএব, যে পরিমাণ কাজ হবে, সেই পরিমাণ টাকা যেন দীর্ঘমেয়াদী কর্জ্জহিসাবে পাওয়া যায়, আশা করি তার ব্যবস্থা করা হবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মারফত কর্জ্জ দিলে, সেই ব্যাঙ্কের কিছু মুনাফা চাই। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের সুদের হার এমন ভাবে নির্দ্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন, যাতে চাষীদের উপর সুদের চাপ অতিরিক্ত না হয়। আজকাল পোষ্টাফিস ও অন্য দিকে নামমাত্র সুদে অনেক টাকা আমানত হচ্ছে। সুতরাং এই সকল জন-হিতকর রাজকর্ত্তব্যের জন্য টাকার অভাব হবে না আশা করা যায়, বিশেষতঃ যদি টাকা-আদায়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সমবায় সমিতি গ্রহণ করে।

রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে নূতন ইংরেজী গ্রন্থ

ডক্টর যতীন্দ্রকুমার মজুমদার অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণা করিয়া রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে যে গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতেছেন, তাহার বৃহৎ যে দুই খণ্ড পূর্ব্বে বাহির হইয়াছে, সে দুইটির বিষয় এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা অবগত আছেন। তাহার তৃতীয় খণ্ডটির ছাপাও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এবং উহা শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। রামমোহন যে-সকল বিষয়ে আন্দোলন করিয়াছিলেন, নথীপত্রসহ সেইগুলির প্রকৃত ইতিহাস এই তৃতীয় খণ্ডে নিবদ্ধ হইয়াছে। তিনি ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিচার, শাসনপ্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে সংস্কার সাধনার্থ আন্দোলন দ্বারা ভারতবর্ষে প্রগতির সূত্রপাত করেন; এই পুস্তকে তাহাই বিশেষ করিয়া দেখান হইয়াছে। শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও এ-বিষয়ে সঠিক জ্ঞান এত দিন কমই ছিল। ডক্টর মজুমদারের পুস্তকখানি পড়িয়া জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা রাম-

মোহন এই সকল বিষয়ে কি করিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারিবেন। গ্রন্থখানি প্রবাসীর মত পৃষ্ঠার আনুমানিক ৬৫০ পৃষ্ঠা পরিমিত হইবে। প্রথম দুই খণ্ড যেরূপ আদৃত হইয়াছে, এই খণ্ডও সেই রূপ আদৃত হইবে, আমাদের ধারণা এইরূপ। এই পুস্তকগুলি যেমন রামমোহনকে বুঝিবার চিনিবার নিমিত্ত অত্যাবশ্যক, সেই রূপ তাহার সমকালিক ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার পক্ষেও অত্যাবশ্যক, এবং উভয় কারণে মূল্যবান্।

—

বাঙালীর বাঙালীকে চিঠি লিখিবার ভাষা

জনৈক লেখক ৭ই আশ্বিনের "রাষ্ট্রবাণী"তে লিখিয়াছেন, "সেই ফিরঙ্গ প্রভাবের দিনেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদি স্নাতক ইংরাজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর নিকটে বাংলা ছাড়া ইংরাজিতে ভুলেও কখন চিঠি লিখতেন না।" ইহা সত্য নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে লেখা দুই খানি ইংরেজি চিঠি আমরা কয়েক বৎসর পূর্বে দেখিয়াছিলাম। সেই দুই খানি এবং তাঁহার লেখা আরও সতের খানি ইংরেজি চিঠি সম্প্রতি তাঁহার রচনাবলীর শতবার্ষিক সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথম তের খানি শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লিখিত এবং ২৬ বৎসর পূর্বে "Bengal : Past and Present"এ মুদ্রিত হইয়াছিল। অন্যগুলি জগদীশনাথ রায়, নবীনচন্দ্র সেন ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে লিখিত।

সেকালে ইংরেজি-জানা অনেকেই আত্মীয়-স্বজনকে পর্যন্ত ইংরেজিতে চিঠি লিখিতেন। আমরা যত দূর জানি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন বাঙালীকে ইংরেজিতে চিঠি লিখিতেন না; বাঙালীর কাছ থেকে ইংরেজি চিঠি পাওয়াও তাঁহার ভাল লাগিত না;—এমন কি তাঁহার বড় জামাতা তাঁহাকে ইংরেজিতে চিঠি লেখায় তাহা না পড়িয়াই ফেরত দিয়াছিলেন। মহর্ষির পুত্রদের মধ্যে বাঙালীকে বাংলায় চিঠি লেখা চলিয়া আসিতেছে—যদিও সকল স্থলে নহে। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় মাইকেল মধুসূদন দত্তকে ইংরেজিতে চিঠি লিখিতেন বটে, কিন্তু অন্য অনেক বাঙালীকে বাংলায় লিখিতেন। তাঁহার চিঠি পাইবার সৌভাগ্য আমাদের মধ্যে মধ্যে হইত—সমুদয়ই বাংলায় লেখা।

—

বঙ্গীয় পুলিস বিভাগে বাঙালী হিন্দু

"আর্থিক জগৎ" লিখিয়াছেন :—

বাঙ্গালা দেশে পুলিস বিভাগের অধীনে যে সমস্ত কনেষ্টবল রহিয়াছে, তাহার অধিকাংশই অবাঙ্গালী বলিয়া উহাদের স্থলে বাঙ্গালী কনেষ্টবল নিয়োগের জন্ম দেশে অনেক দিন ধরিয়া একটা আন্দোলন চলিতেছে এবং এই আন্দোলনে বাঙ্গালী হিন্দুদের পরিচালিত সংবাদপত্রই বড় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এই আন্দোলনের ফলে কিনা জানি না, কিছু দিন যাবত বাঙ্গালা সরকার পুলিস বিভাগে বাঙ্গালী কনেষ্টবল নিয়োগের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা অবগত হইলাম যে, সম্প্রতি বাঙ্গালা সরকার যে দুই শত বাঙ্গালী কনেষ্টবল নিয়োগ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ১৫০ জনই মুসলমান এবং বাকী ৫০ জন মাত্র হিন্দু। সরকারী চাকুরীর অন্য যে কোন বিভাগে বাঙ্গালী হিন্দু তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকার বিলুপ্ত হইলে তাহা উপেক্ষা করিতে পারে; কিন্তু পুলিস বিভাগে হিন্দুর অধিকার এইভাবে ক্ষুণ্ণ হইলে তাহা উপেক্ষা করা আত্মহত্যার সামিল হইবে। বাঙ্গালা দেশে বর্তমানে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার সময়ে পঞ্জাব, সিন্ধু প্রভৃতি প্রদেশে মুসলমান পুলিস নিজ সম্প্রদায়ের দাঙ্গাকারীকে সাহায্য করিয়াছে এবং বিপন্ন হিন্দুগণকে রক্ষা করে নাই বলিয়া অনেক অভিযোগ শুনা গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় পুলিস বিভাগে বাঙ্গালী হিন্দু তাহার ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত হইলে তাহা বরদাস্ত করা কিছুতেই উচিত হইবে না। হিন্দু-পরিচালিত সংবাদপত্রের নির্ব্বুদ্ধিতাপ্রসূত প্রচার কার্য্যের ফলে হিন্দু জাতির সমক্ষে যে এক নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সময় থাকিতে সাবধান হইবার জন্য আমরা হিন্দু জননায়কগণকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

—

গণতন্ত্রের সমানাধিকার

গণতন্ত্রে সকলের অধিকার সমান, এইরূপ একটা ভাসা ভাসা ধারণা সাধারণতঃ অনেকেরই আছে। তাহার

বিকৃতিও অনেকের মনে স্থান পাইয়াছে। গণতন্ত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এক আধ পৃষ্ঠায় করা যায় না। এখানে একটা বিকৃত ধারণার কথাই বলিব।

গণতান্ত্রিক প্রণালী অনুসারে শাসিত দেশে সকলের পৌর অধিকার সমান, ইহার একটা অর্থ এইরূপ যে, যদি ভোট দিবার কোন যোগ্যতা আইন অনুসারে সে দেশে নির্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে সে নির্দেশ ধর্মসম্প্রদায়নির্বিশেষে, বৃত্তিনির্বিশেষে, জাতিনির্বিশেষে সকলের পক্ষে একই হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি ভোটদাতার বয়স অন্যূন ২০ নির্দিষ্ট থাকে এবং ইহা নির্দিষ্ট থাকে যে বৎসরে তাহার অন্যূন তিন টাকা ট্যাক্স দেওয়া আবশ্যক, কিম্বা তাহার প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়া চাই, তাহা হইলে ধর্মজাতিবৃত্তি-নির্বিশেষে সকলের পক্ষেই নিয়ম উহাই হইবে। সরকারী চাকরী সম্বন্ধেও গণতন্ত্রের নিয়ম এই যে, যে রকম যোগ্যতা থাকিলে কোন সম্প্রদায়ের লোক কোন চাকরী পাইতে পারিবে, অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোকও অন্ততঃ সেইরূপ যোগ্যতা থাকিলে সেই চাকরী পাইবে, তাহার কম যোগ্যতা থাকিলে পাইবে না।

গণতান্ত্রিক অধিকারের এইরূপ সাম্য এক একটি মানুষের অধিকারের সাম্য, সমষ্টিগত সাম্য নহে। ইহা খুলিয়া বলা আবশ্যক।

ভারতবর্ষের কথা ধরা যাক। এদেশে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি নানা ধর্মসম্প্রদায় আছে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় কার্য যদি গণতান্ত্রিক রীতিতে সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে এই সব সম্প্রদায়ের এক একটি মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ও পৌর অধিকার সমান হইবে; হিন্দু জৈন বৌদ্ধ মুসলমান প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী লোকদের ব্যক্তিগত অধিকার সমান হইবে। কিন্তু গণতান্ত্রিক সাম্যের অর্থ এ নয় যে, হিন্দুসমষ্টি আইন-সভায় যতগুলি প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবে, মুসলমানসমষ্টিও ততগুলি পাঠাইতে পারিবে, হিন্দুসমষ্টি যতগুলি সরকারী চাকরী পাইবে, মুসলমানসমষ্টিও ততগুলি পাইবে, ইত্যাদি। বস্তুতঃ রাষ্ট্রবিধি ধর্মসম্প্রদায়ভেদ মানিবেই না। রাষ্ট্রের কাছে হিন্দু যেমন এক জন নাগরিক, মুসলমানও সেইরূপ এক জন নাগরিক, হিন্দু যেমন মহাজাতির (নেশ্যনের) একটি মানুষ, মুসলমানও সেইরূপ নেশ্যনের একটি মানুষ। গণ-তান্ত্রিক সাম্যের এইরূপ অর্থের পরিবর্তে যদি এই অর্থ করা যায়, সমগ্র হিন্দুসমাজ যত প্রতিনিধি চাকরী প্রভৃতি পাইবে, সমগ্র মুসলমান-সমাজও ঠিক্ তত পাইবে, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে, সমগ্র বৌদ্ধ সমাজ, সমগ্র জৈন সমাজ, সমগ্র পারসী সমাজ, সমগ্র শিখ সমাজ, সমগ্র ইহুদী সমাজ, সমগ্র খ্রীষ্টিয়ান সমাজ,...কেন প্রত্যেকে অন্য প্রত্যেক সমাজের সমান পাইবে না? তদ্ভিন্ন, এই এক একটি ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে আবার উপসম্প্রদায় ও শ্রেণী আছে; যেমন ধরুন মুসলমান-দের মধ্যে শিয়া ও সুন্নী, মোমিন ও সৈয়দ প্রভৃতি। ইহারা প্রত্যেকেই যদি বলে আমরা এক একটি আলাদা সমষ্টি, আমাদের প্রত্যেক সমষ্টির সমান প্রতিনিধি সমান চাকরী দিতে হইবে, তাহা হইলে ভাগ-বাঁটোআরাটা হইবে কি প্রকারে? মুসলমানেরা যদি বলে আমরা শিখ বা খ্রীষ্টিয়ানদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী, অতএব আমাদের দাবী মানিতেই হইবে, সংখ্যায় কম শিখ ও খ্রীষ্টিয়ানদের দাবী মানা অনাবশ্যক, তাহা হইলে হিন্দুরাও বলিতে পারে, "আমরা সংখ্যায় সকলের চেয়ে বেশি, আমরা কেন সংখ্যান্যূন অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমান হইতে যাইব?" এ-রকম ঝগড়া করিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, বস্তুতঃ কোন প্রকার শাসনপ্রণালীর কার্যই সুনির্বাহিত হইতে পারে না।

পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্য দেশেই একাধিক ধর্মসম্প্রদায় বা অন্ততঃ একাধিক ধর্ম-উপসম্প্রদায় আছে। খ্রীষ্টিয়ান বলিয়া অভিহিত দেশসকলে রোমান কাথলিক আছে প্রটেস্টাণ্ট আছে; মুসলমান বলিয়া অভিহিত দেশসকলে সুন্নী শিয়া প্রভৃতি উপসম্প্রদায় আছে। কোন কোন মুসলমান দেশে খ্রীষ্টিয়ান ইহুদী প্রভৃতি আছে। আফগানিস্থানে হিন্দু ও শিখ আছে। এই সকল দেশের এই সব অ-মুসলমান সম্প্রদায় প্রত্যেকে সমষ্টিগত ভাবে মুসলমান-সমষ্টির সমানসংখ্যক সরকারী চাকরী, আইন-সভায় সমান সংখ্যক প্রতিনিধি-পদ চাহে না; চাহিলে তাহাদিগকে বাতুল বলা হইত। চীন দেশের মুসলমানেরা ত অন্য চীন-দের সমানসংখ্যক সরকারী চাকরী, আইন-সভায় অন্য চীনদের সমানসংখ্যক প্রতিনিধি চায় না।

গণতান্ত্রিক সভ্য দেশসমূহে দলগুলি রাজনৈতিক নামে কিম্বা বৃত্তিমূলক নামে অভিহিত, ধর্মসম্প্রদায়ের নামে অভিহিত নহে। দু-একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ব্রিটেনে দলগুলির নাম আগে ছিল টোরি, হুইগ ইত্যাদি। পরে চলিত হয় লিবার্যাল (উদারনৈতিক), কন্‌জারভেটিভ (রক্ষণশীল), র‍্যাডিক্যাল (আমূলপরিবর্তনকামী), লেবার (শ্রমিক)। এই সব দলে নানা ধর্মের লোক আছে। সে দেশের পার্লেমেণ্টে ও পার্লেমেণ্টের বাহিরে রোমান কাথলিক, প্রটেস্টাণ্ট, ইহুদী প্রভৃতি দল নাই; অধিবাসীদের মধ্যে এবং রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে প্রটেস্টাণ্টদের সংখ্যাই বেশি, কিন্তু রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে তাহা লইয়া দলাদলি তর্ক-বিতর্ক হয় না, হয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মত লইয়া। ইহুদী ডিজরেলি ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী, ইহুদী লর্ড রেডিং ভারতের বড়লাট, ইহুদী মণ্টেগু ভারতসচিব এবং রোমান কাথলিক রিপন ভারতের বড়লাট হইয়াছিলেন। পৃথিবীর অন্যতম প্রধান গণতান্ত্রিক দেশ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও দলগুলির নাম রাজনৈতিক-মতসূচক কিম্বা বৃত্তিসূচক; যেমন রিপাব্লিকান, ডিমোক্র্যাট, লেবার-ফার্মার, ইত্যাদি। এই সব দলে নানা ধর্মের লোক আছে। সে দেশে খ্রীষ্টিয়ানদের প্রটেস্টাণ্ট রোমান কাথলিক প্রভৃতি উপসম্প্রদায় আছে, মর্মন আছে, ইহুদী আছে, চৈনিক বৌদ্ধ ও কংফুচ শিষ্য আছে, জাপানী বৌদ্ধ ও শিণ্টোপন্থী আছে, আদিম লাল আমেরিকান আছে, শিখ হিন্দু ইত্যাদি আছে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি এই সমুদয় নামে অভিহিত বা পরিচিত নহে।

বস্তুতঃ যে-সকল দেশ শিক্ষায় জ্ঞানে অর্থশালিতায় ও শক্তিতে অগ্রসর, তাহারা এই বিশ্বাসই ঘোষণা করে যে, ধর্মমত যাহার যাহাই হউক, তথাকার নেশ্যনের অন্তর্গত সকল মানুষের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও কর্তব্য এক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থও এক। তাহাদের প্রগতির ও উন্নতির ইহা একটি প্রধান কারণ যে তাহারা ঐরূপ বিশ্বাস পোষণ করে এবং ধর্মমতকে রাজনীতির সঙ্গে জড়াইয়া ঝগড়া করে না।

যে-সকল দেশে একাধিক ধর্মের লোক বাস করে, তাহাদের প্রত্যেকটিতেই কোন-না-কোন ধর্মের লোক বেশী। ভারতবর্ষে হিন্দুদের সংখ্যা বেশী। মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী লোক আপনাদের সংখ্যা বাড়াইতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, এখনও করিতেছেন না এবং তাঁহাদের চেষ্টায় কেহ বাধা দেন নাই। তাহা সত্ত্বেও হিন্দুরা সংখ্যায় বেশী বলিয়া মুসলমানসমষ্টি হিন্দুসমষ্টির সমানসংখ্যক চাকরী ও সমানসংখ্যক প্রতিনিধির দাবী করিয়া যে ঝগড়া বাধাইয়াছে তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক। যে-সব প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা কম, তাহারা এরূপ সমষ্টিগত সাম্যের দাবী করে না, ব্যক্তিগত যোগ্যতার জয়ের যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায্য দাবী করে। ভারতবর্ষ যখন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইবে, তখন কখনও একটা রাজনৈতিক দল কখনও বা অন্য কোন রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য হইবে, এবং প্রত্যেক দলেই নানা ধর্মের লোক থাকিবে। হইতে পারে যে, যখনই যে-দলের প্রাধান্য হইবে তাহারই অধিকাংশ সভ্যের ধর্মমত হইবে হিন্দুধর্মমত, কারণ হিন্দুদের সংখ্যা সমগ্র ভারতে খুব বেশী। কিন্তু তাহা না-হইতেও পারে—কখন কখন এমন হইতে পারে যে, অধিকাংশ সভ্যসমষ্টি গঠিত হইতে মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান শিখ প্রভৃতিকে লইয়া—বিশেষতঃ বাংলা, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে। কিন্তু যখনই যে-দলের প্রাধান্য হউক, প্রাধান্য ধর্মমতের জন্য হইবে না, হইবে রাজনৈতিক মতের জন্য। ব্রিটেনে প্রটেস্টাণ্টদের সংখ্যা বেশী। সেই জন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেই প্রটেস্টাণ্টদের প্রাধান্য থাকিতে পারে; কিন্তু সে প্রাধান্য তাহারা প্রটেস্টাণ্ট বলিয়া নহে, তাহাদের রাজনৈতিক মত সেই প্রাধান্যের কারণ।

—

আগামী সেন্সস

১৯৩১ সালের লোকসংখ্যা-গণনায় যে বিস্তর ভুল হইয়াছে এবং কতকগুলা ভুল অত্যন্ত হাস্যকর, তাহা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত যেরূপ পরিশ্রম, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সূক্ষ্ম বিচারশক্তি ও নিষ্ঠার সহিত প্রবাসীতে ও মডার্ণ রিভিয়ুতে দেখাইয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ। তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন যে, ভুলগুলার ঝোঁক মুসলমান-দিগের সংখ্যা বেশী করিয়া প্রদর্শনের দিকে। ইহা

আকস্মিক না হইবারই কথা। ভারতে অনুসৃত ব্রিটিশ রাজনীতির একটা লক্ষ্য হিন্দুদিগকে হীনবল করা, সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত মুসলমানদেরও উদ্দেশ্য সেই রূপ; এবং ব্রিটিশ কূটরাজনীতি নিজ স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যে এই মত প্রচার ও সেই অনুসারে কাজ করিয়া আসিতেছে যে, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের স্বার্থ আলাদা আলাদা; সেই জন্য, সরকারী চাকরী প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি প্রধান কয়েকটি সম্প্রদায়ের লোকদের সংখ্যা অনুসারে বাটিয়া দেওয়া আবশ্যক। হিন্দুদের সংখ্যা যথাসম্ভব কম দেখাইতে পারিলে তাহাদের দাবী কমাইবার সুবিধা হয়, মুসলমানদের সংখ্যা প্রকৃত যত তাহা অপেক্ষা বেশী দেখাইতে পারিলে তাহাদের দাবীও তদনুযায়ী বেশী স্বীকার করিবার সুবিধা হয়। তদ্ভিন্ন, সংখ্যালঘু বলিয়া তাহাদের পাওনা অপেক্ষা কিছু বেশী (weightage) তাহাদিগকে দিবার অন্যায় নীতি ত আছেই। তাহার দ্বারাও হিন্দুদিগকে হীনবল করা চলিবে।

এইরূপ মনোভাব ও যুক্তি ব্রিটিশ রাজপুরুষদের ও তাহাদের অনুচর মুসলমান কর্মীদের মধ্যে থাকায় সেন্সসে ভুল হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় হয় নাই বটে, কিন্তু সেন্সসটা নির্ভরের অযোগ্য হইয়াছে। ১৯৪১ সালের সেন্সসে যাহাতে ভুল না-থাকে এবং যাহাতে তাহা নির্ভরের অযোগ্য না-হয়, তন্নিমিত্ত প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে, এবার এক একটি পাড়া গ্রাম প্রভৃতিতে এক একজন গণনাকারী নিযুক্ত না-করিয়া জোড়া-জোড়া গণনাকারী নিযুক্ত করা হউক, প্রত্যেক জোড়ায় একজন হিন্দু, একজন মুসলমান, কিম্বা একজন হিন্দু একজন খ্রীষ্টিয়ান,...এইরূপ নিযুক্ত করা হউক। তাহাতে কিছু খরচ বাড়িত বটে, কিন্তু গণনা অপেক্ষাকৃত অধিক নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হইত। কিন্তু কর্তৃপক্ষ শুধু এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, কলিকাতায় এবং সমগ্র বঙ্গের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, মুসলমানদের সংখ্যা গণনা কেবল মুসলমান গণনাকারীর দ্বারা হইবে, কিন্তু হিন্দুদের গণনা হিন্দুদের দ্বারাই হইবে এরূপ ব্যবস্থা করেন নাই। ইহাতে কেহ যদি বলে, যে, কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাই এই যে, মুসলমানদের সংখ্যা গণনায় কোন কোন বা সমুদয় গণনাকারীর সংখ্যা বাড়াইয়া দেখাইবার ঝোঁক থাকিলে তাহা দমন না করা হউক, তাহা হইলে তাহার উত্তরে কর্তৃপক্ষ কি বলিবেন জানি না।

শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত গত ১৯৩১ সালের সেন্সসে যে-সব ভুল আছে তাহার উল্লেখ করিয়া সেরূপ ভুল যাহাতে আগামী সেন্সসে না হয় তাহার উপায় অবলম্বন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার নিমিত্ত স্থানীয় সেন্সস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ডাচ্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহার ফল কি হইয়াছে বা হইবে বলিতে পারি না। কিন্তু রায় চৌধুরী মহাশয় ও দত্ত মহাশয় যাহা করিয়াছেন তজ্জন্য সর্বসাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

আগেকার সেন্সসসমূহে প্রথমে সব গ্রাম নগর প্রভৃতির লোকসংখ্যা কিছু দিন ধরিয়া বাড়ী বাড়ী গিয়া লিখিয়া লওয়া হইত, এবং তাহার পর শেষ একটি দিনে যুগপৎ সর্বত্র একই সময়ে লোকসংখ্যা গণনা করিয়া আগেকার গণনা ঠিক্ হইয়াছে কিনা দেখা হইত এবং কোন গরমিল থাকিলে তাহা সংশোধন করা হইত। কিন্তু এবার এই শেষ এক দিনের যুগপৎ গণনাটা করা হইবে না। সেই কারণেও আশঙ্কা হয় ১৯৪১ সালের সেন্সসে কিছু খুঁৎ থাকিয়া যাইবে।

—

লণ্ডনবাসীদের সাহায্যার্থ ফণ্ড

লণ্ডনের উপর জার্ম্যানদের আকাশপথে প্রচণ্ড আক্রমণে অনেকে হত ও আহত হইতেছে এবং ঘরবাড়ী সম্পত্তিও বিস্তর নষ্ট হইতেছে। এ অবস্থায় লণ্ডনবাসীরা দিনের পর দিন বিনিদ্র রজনী যাপন করিলে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইত না। তাহারা যেরূপ স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য ও সাহস দেখাইতেছে তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয় ও প্রশংসনীয়। বিপন্ন লোকদের এরূপ গুণ না থাকিলেও তাহারা সর্ব-প্রকারের সাহায্যের যোগ্য; কিন্তু এরূপ গুণ থাকিলে তাহাদিগকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা বাড়িবারই কথা। এই নিমিত্ত কলিকাতার মেয়র সভা করিয়া যে লণ্ডনের সাহায্যার্থ টাকা তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সমর্থনীয়।

—

মেদিনীপুর জেলাস্থিত কাঁথি প্রভৃতির সাহায্য

মেদিনীপুর জেলায় কাঁথি প্রভৃতি মহকুমার অগণিত লোক বন্যায় সর্ব্বস্বান্ত ও সাতিশয় বিপন্ন হইয়াছে। খবরের কাগজে ও সর্বসাধারণের সভায় তাহাদের দুর্দশার কথা বিস্তারিত ভাবে দেশের লোকদিগকে জানান হইয়াছে; কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁকে কোষাধ্যক্ষ করিয়া সাহায্য-সমিতিও গঠিত হইয়াছে। কিন্তু সাতিশয় পরিতাপের বিষয়, এ বিষয়ে খবরের কাগজে আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাইতেছে না। আমাদের প্রত্যেক পাঠকের নিকট অনুরোধ তাঁহারা যিনি যাহা পারেন কুমার দেবেন্দ্র-লাল খাঁকে অতি সত্বর তাঁহার কলিকাতাস্থ ৩ নং মিণ্টো পার্ক রোডস্থিত ভবনে প্রেরণ করুন।

আমরা আগে আগে দেখিতাম যুবকেরা, বিশেষ করিয়া ছাত্রেরা, বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ অর্থ-সংগ্রহাদিতে বিশেষ উৎসাহ সহকারে পরিশ্রম করিতেন।

এবার তাহা দেখিতে পাইতেছি না। মেয়র, শেরিফ প্রভৃতি ধনী ব্যক্তি লাটবেলাটের তারিফ যাহাতে পাওয়া যায়, এইরূপ ব্যাপারেই সাধারণতঃ অগ্রসর হন। মেদিনীপুরের দরিদ্র কৃষিজীবীদের বেদনায় তাঁহাদের ব্যথিত না হইবারই কথা। কিন্তু অন্য সকলে—ধনীরাও, পূর্বে কাঁথির মত বিপদের সময় সাহায্য করিতেন। মেদিনীপুরের লোকেরা শুধু বিপন্ন বলিয়াই সাহায্য পাইবার যোগ্য। অধিকন্তু তাহারা দেশের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টায় অনতিক্রান্ত সাহস, স্বার্থত্যাগ ও দুঃখবরণের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিল। সেই জন্য তাহাদিগকে সাহায্য করা আরও উচিত। গুজরাটের বারদোলির স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মেদিনীপুর জেলার উক্ত প্রচেষ্টার ইতিহাস লিখিত হইলে তাহাও কম বিস্ময়কর হইত না।

—

হিন্দু মহাসভা কি চান

নিখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার কার্যনির্বাহক কমীটি বড়লাটের ও ভারতসচিবের বিবৃতি দুটিকে অত্যন্ত অসন্তোষকর ও নৈরাশ্যজনক বলিয়াছেন, যেহেতু হিন্দু মহাসভা কর্তৃক তাহার চরম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত স্বাধীনতার তাহাতে কোন উল্লেখ নাই এবং ভারতবর্ষকে অবিলম্বে ডোমীনিয়নত্ব দানের যে উল্লেখ তাহাতে আছে তাহা অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত। যুদ্ধের পর এক বৎসর অপেক্ষা অনধিক বিলম্বে ওএস্টমিন্সটার আইন অনুযায়ী ডোমীনিয়নত্ব হিন্দু মহাসভা দাবী করেন।

বড়লাট ও ভারতসচিবের বিবৃতিতে যে বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ভারতীয় এমন কোন গবর্মেণ্টের হাতে দেশশাসনের ভার হস্তান্তর করিবেন না যাহা ভারতীয় জাতীয় জীবনের বৃহৎ ও শক্তিশালী কোন কোন অংশের মনোমত নহে, ইহার অর্থ মহাসভার মতে বিশদ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। কারণ, এই উক্তির এরূপ অর্থ হইতে পারে যে, দেশী রাজ্যের রাজারা, কিম্বা মুসলিম লীগ, কিম্বা তদ্রূপ স্বার্থশালী অন্য লোকেরা যদি অধিকাংশ ভারতীয়ের বাঞ্ছিত রাষ্ট্রীয় প্রগতির বিরোধী হয়, তাহা হইলে সেই প্রগতি স্থগিত রাখা হইবে, কিম্বা অধিকাংশের অধিকার এই স্বার্থান্বেষী সংখ্যাল্পদিগকে প্রদান করা হইবে; তাহা গণতান্ত্রিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত হইবে এবং তদ্দ্বারা সংখ্যালঘুদিগকে প্রকারান্তরে সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে উত্তেজিত করা হইবে।

মহাসভার কার্যনির্বাহক সমিতি মনে করেন যে, আপাততঃ কিছু কালের নিমিত্ত কেন্দ্রীয় শাসনপরিষদকে বৃহত্তর করিবার এবং একটি যুদ্ধ-পরামর্শদাতা কৌন্সিল স্থাপন করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা ফলপ্রদ হইতে পারে কেবল যদি ইহা একটি রীতিতে পরিণত হয় যে, বড়লাট ঐ পরিষদ ও কৌন্সিলের দায়িত্বশীল প্রধান হইবেন এবং তাহাদিগকে বাস্তবিক প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হয়।

মহাসভা এরূপ কোন ব্যবস্থায় রাজী নহেন যাহাতে হিন্দুদের অধিকার ও প্রাধান্য নষ্ট বা খর্ব হয়। মহাসভা গবর্মেণ্টের এরূপ কোন যুক্তিসঙ্গত ও আত্মসম্মানসঙ্গত প্রস্তাব গ্রহণ করিতে রাজী আছেন যাহা হিন্দু-প্রগতি ও হিন্দু-উন্নতির পোষক, যাহা প্রতিক্রিয়াশীল দলসমূহ দ্বারা হিন্দু স্বার্থ আক্রমণ ব্যাহত করিতে পারিবে, এবং যাহা হিন্দুর কিছু কল্যাণ আরও অগ্রসর করিবার পথে বাধা জন্মাইবে না।

বড়লাটের শাসন-পরিষদ বাড়াইবার যে প্রস্তাব হইয়াছে, সে-বিষয়ে মহাসভা-কমীটি বলিয়াছেন যে, যদি মুসলীম লীগের মনোনীত দুই ব্যক্তিকে তাহার সদস্য করা হয়, তাহা হইলে মহাসভার মনোনীত ছয় জনকে তাহার সদস্য করিতে হইবে। যুদ্ধ-পরামর্শদাতা কৌন্সিলে যদি মুসলিম লীগের মনোনীত পাঁচ জন লোককে সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে মহাসভা-কমীটি তাহাতে মহাসভার মনোনীত পনর জন সদস্য চান। সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার ভিত্তিতে যত দিন ভারতবর্ষের শাসনকার্য চলিবে, তত দিন মহাসভার এই দাবীকে অযৌক্তিক বলা চলিবে না। কেন-না, মুসলমানেরা ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যার এক-চতুর্থাংশের কম এবং হিন্দুরা মোটামুটি তিন-চতুর্থাংশ।

মুসলিম লীগের সমর্থক কোন কোন কাগজ বলিয়াছে, হিন্দু-মহাসভার ঐরূপ দাবী করা অসঙ্গত, কারণ হিন্দুদের মধ্যে মহাসভার দলভুক্ত লোক বেশী নাই, হিন্দু-মহাসভা সমগ্র হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি নহে। এরূপ আপত্তি মুসলিম লীগ বা তাহার কোন মুখপত্রের মুখে শোভা পায় না; কেন-না, মুসলমান সমাজে অন্য যে-সব দল বা সমিতি আছে—যেমন অহ্‌রর দল, জামিয়াৎ-উল্-উলেমা, শিয়া উপসম্প্রদায়, মোমিনগণ—তাহাদের সভ্যসংখ্যা ও কংগ্রেসের মুসলমান সভ্যসংখ্যা মুসলিম লীগের সভ্যসংখ্যা অপেক্ষা অধিক, এবং মুসলিম লীগ সমগ্র মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি নহে; অথচ লীগ আপনাকে সমগ্র মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি বলিয়া ঘোষণা করিয়া অযৌক্তিক ও অসঙ্গত দাবী করিয়া থাকে।

মুসলিম লীগ যে পরিবর্ধিত শাসন-পরিষদের অতিরিক্ত সদস্যদের অর্ধেক মনোনীত করিতে চাহিয়াছে, মহাসভা-কমীটির মতে তাহা অযৌক্তিক, অসঙ্গত ও গণতান্ত্রিকতা-বিরোধী। ইহা সত্য কথা।

—

"পাকিস্তান দাবীকে এখনই বাদ দেওয়া যায় না"

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্যনির্বাহক কমীটির যে অধিবেশন বোম্বাইয়ে হইয়া গিয়াছে, তাহাতে গৃহীত প্রস্তাবগুলির তাৎপর্য মোটামুটি উপরে দিয়াছি। যুদ্ধ-পরামর্শদাতা কৌন্সিলের ও পরিবর্ধিত শাসন-পরিষদের সদস্য মহাসভা কাহাদিগকে মনোনীত করিবেন, সেই বিষয়টির যখন আলোচনা হইতেছিল, তখন ডাক্তার মুঞ্জে প্রকাশ করেন, যে, বড়লাটের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারের সময় তিনি পাকিস্তান প্রস্তাবের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডত্ব ও সংহতি রক্ষা করিবার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করা গবর্ন্মেণ্টের কর্ত্তব্য; বড়লাট বলেন যে, মহাসভা বিষয়টি যে দিক্ হইতে দেখিতেছেন, তাহা যথাযোগ্য ভাবে বিবেচিত হইবে বটে, কিন্তু পাকিস্তান দাবীকে এখনই বিবেচনার বিষয়ীভূত হইবার অযোগ্য বলা যাইতে পারে না, কারণ যুদ্ধের পরে সকল দলের প্রতিনিধিদের যে কন্‌ফারেন্স হইবে তাহার বিবেচনার নিমিত্ত তাহার সমক্ষে সকল সমষ্টিকে নিজ নিজ পরিকল্পনা উপস্থিত করিতে দেওয়া হইবে।

BOMBAY, Sept. 23.

"It is learnt that Dr. Moonje revealed at the meeting the points he had raised during his interview with the Viceroy with regard to the Pakistan Scheme of the Muslim League. Dr. Moonje had urged that the Government should affirm their determination to maintain the territorial unity and solidarity of India.

"It was revealed that, while the Viceroy would give due consideration to the Mahasabha point of view, the Pakistan demand could not be ruled out at this stage, as it would be open to all groups to place their respective schemes for consideration of the Conference of Representatives to be held after the War."—*I. P. I.*

পাকিস্তান প্রস্তাব সম্বন্ধে আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি যে, ইহার পশ্চাতে ও মধ্যে ব্রিটিশ কারচুপি ও সমর্থন আছে।

দুঃখের বিষয়, কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা সম্বন্ধে যাহা করিয়াছিলেন, অথবা করেন নাই, পাকিস্তান প্রস্তাব সম্বন্ধেও তাহাই করিতেছেন, অথবা করিতেছেন না। এদিকে মুসলীম লীগ খুব উদ্যোগিতার সহিত এই পরিকল্পনাটা প্রচার করিতেছে।

যে-সকল হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পারসী, ইহুদী প্রভৃতি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডত্ব একান্ত আবশ্যক মনে করেন, তাঁহাদিগকে অধিকতর উদ্যোগিতার সহিত তাহার ঐকান্তিক প্রয়োজন প্রচার করিতে হইবে। আমরা এ-বিষয়ে মডার্ণ রিভিয়ুতে যথাসাধ্য প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া আসিতেছি।

সাহিত্যের উন্নতিসাধন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কাজ

ইহা একটি সুবিদিত তথ্য যে, এক একটি দেশের ভাষা ও সাহিত্য সেই সেই দেশের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রচেষ্টার ফলে পুষ্টি ও উন্নতি লাভ করিয়াছে।

আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন আমাদের এক মুসলমান সহপাঠীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমাকে বলেন, "কোরান যে আল্লার বাণী, ইহার ভাষার উৎকর্ষ তাহার একটি প্রমাণ।" আমরা আরবী জানি না, সুতরাং কোরানের ভাষা সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিতে পারি না। কিন্তু আমাদের সহপাঠীর ভ্রাতার কথা হইতে ইহা বুঝিয়াছিলাম যে, কোরানের ভাষা আরবী সাহিত্যে আদর্শ বলিয়া মৌলবীরা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

যাঁহারা ইংরেজি সাহিত্য অধ্যয়ন করেন ও তাহার গদ্যের ও পদ্যের উৎকৃষ্ট নমুনাগুলির বিচারের সহিত পরিচিত, তাঁহারা জানেন, বাইবেলের যে ইংরেজি অনুবাদ প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত তাহা (অর্থাৎ Authorized Version) ইংরেজিতে সর্ববাদিসম্মতিক্রমে গদ্যের একটি উৎকৃষ্ট আদর্শ বিবেচিত হইয়া থাকে। যাঁহারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না এবং বাইবেলকে অভ্রান্ত মনে করেন না, তাঁহারাও বাইবেলের এই ইংরেজি অনুবাদটির সাহিত্যিক উৎকর্ষ স্বীকার করেন।

এইরূপ, জার্ম্যান ভাষাভিজ্ঞদের এইরূপ একটি মতের বিষয় অবগত আছি যে, বাইবেলের লুথারের সময়কার জার্ম্যান অনুবাদ জার্ম্যান গদ্যের একটি আদর্শ স্থাপন করে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে খুব প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ধর্ম্মপূজার আকারে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব লক্ষিত হয় বলিয়া কথিত হয়। মধ্য-যুগে বৈষ্ণব পদাবলীর রচয়িতারা গীতিকবিতার যে আদর্শ স্থাপন করেন, বৈষ্ণব অবৈষ্ণব সকল বাঙালীই তাহার উৎকর্ষ এবং পরবর্ত্তী সাহিত্যের উপর প্রভাব স্বীকার করেন। এইরূপ, শাক্ত কবি রামপ্রসাদ প্রভৃতির রচনাবলীর সাহিত্যিক গুণ শাক্ত অশাক্ত সকল বিবেচক ব্যক্তিদের দ্বারা স্বীকৃত হয়। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিদেশী ও দেশী প্রচারকদিগের চেষ্টায় যে বাংলা সাহিত্য পুষ্টি লাভ করিয়াছিল, তাহা অ-খ্রীষ্টিয়ানরাও স্বীকার করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও আচার্য্যদিগের দ্বারা, একাধিক ব্রাহ্মসাহিত্যিকের দ্বারা এবং ব্রাহ্ম প্রচেষ্টা কর্ত্তৃক সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত ব্যক্তিদিগের দ্বারা বাংলা ভাষা এবং গদ্য ও পদ্য সাহিত্য যে পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহাও নিরপেক্ষ লেখকেরা মানেন পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য ও অনুশিষ্যদিগের, বিশেষতঃ

স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা গদ্যের উপর প্রভাবও এইরূপ স্বীকৃত হইয়া থাকে।

—

বিধবাবিবাহ প্রবর্তক বিল

আমরা এই বিষয়ে আশ্বিনের "প্রবাসী"র ৮২৪ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার পর আরও কিছু লেখা আবশ্যক। বিধবাদের বিবাহ কেন হওয়া উচিত, তাহা ঐ সংখ্যাতে সংক্ষেপে বলিয়াছি। এই ঔচিত্য আরও পরিষ্কার করিয়া দেখান হইয়াছে, ময়মনসিংহ জেলার জঙ্গলবাড়ীর হিন্দুসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন চক্রবর্তী মহাশয়ের লিখিত "বাঙ্গালার ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু" নামক পুস্তিকাটিতে। ইহার মূল্য দুই আনা মাত্র। সকল হিন্দুর ইহা পড়া উচিত। ইহার তৃতীয় পৃষ্ঠায় তিনি ভারত-সরকারের লোকগণনার রিপোর্ট হইতে হিন্দুর জনসংখ্যা সম্বন্ধে মন্তব্যের এই অনুবাদটি দিয়াছেন :—

"মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে শিশুসংখ্যা হিন্দুদের অপেক্ষা বেশি; কেন-না হিন্দুর সামাজিক নিয়ম জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুকূল নহে। অধিকাংশ হিন্দু-জাতিতে ("caste"এ) বালিকাগণ যুবাবস্থার বহু পূর্বেই বিবাহিতা হয় এবং স্বামীর ও স্ত্রীর বয়সের খুব বেশি পার্থক্য থাকিয়া যায়। তাহাদের অনেকেই পূর্ণ যৌবন ও উৎপাদনশক্তি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে বিধবা হইয়া যায়। তাহাদের পুনর্বিবাহের অনুমতি দেওয়া হয় না।"

লেখক দেখাইয়াছেন, ৪৫ বৎসর পর্যন্ত বয়সের হিন্দু বিধবার সংখ্যা ১৩,০১,৬৩৩। পূরা তালিকাটি এইরূপ :

বয়স।	বিধবার সংখ্যা
০—৫	৩০১৫
৫—১০	১১,৮০৮
১০—১৫	২৫০৮৩
১৫—২০	৯০১০৫
২০—২৫	১৪০৭৫২
২৫—৩০	২১৯২৭৪
৩০—৩৫	২৪৭৩৭২
৩৫—৪০	২৮১৫০৬
৪০—৪৫	২৮২৭৩৮
	১৩০১৬৩৩

৪৫এর উর্দ্ধবয়স্কা বিধবার সংখ্যা ১০৮৫০২৪।

লেখক "ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুনারী" নাম দিয়া যাহা লিখিয়াছেন, নীচে তাহা উদ্ধৃত হইল।

"জীব-জগতে দেখা যায় যে, যে জীবের মধ্যে নারীর সংখ্যা পুরুষের অপেক্ষা অধিক সেই জীবেরই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে; জীবনসংগ্রামে সেই জীবই জয়ী হয়। কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে নারী-সংখ্যা-ন্যূনতা বৃদ্ধি পাইতেছে। একমাত্র ভূমিজ ও বৈষ্ণব সমাজ ব্যতীত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি সকল শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে নারীর আপেক্ষিক সংখ্যা কম এবং নারীর সংখ্যা অবিরাম কমিতেছে। যদি এইভাবে নারীর সংখ্যা ক্রমাগত কমিতে থাকে, তবে পরিণামে বাঙ্গালী হিন্দুর লয়প্রাপ্তি অনিবার্য্য। কোন কোন জাতির মধ্যে নারীর সংখ্যা এত কমিয়াছে যে, এখন পাঞ্জাবী ও সিন্ধির ন্যায় বিবাহের জন্য তাহাদের অন্য প্রদেশের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালায় হিন্দু নারীর সংখ্যা কিরূপ দ্রুত হ্রাস পাইতেছে নিম্নলিখিত সংখ্যা দ্বারা তাহা বুঝা যাইবে। প্রতি হাজার হিন্দু পুরুষে হিন্দু নারীর সংখ্যা কোন সালে কত ছিল তাহার হিসাব।

	পুরুষ	নারী
১৮৭২ সাল	১০০০	১০০২
১৮৮১ "	১০০০	৯৯৯
১৮৯১ "	১০০০	৯৬৯
১৯০১ "	১০০০	৯৫১
১৯১১ "	১০০০	৯৩১
১৯২১ "	১০০০	৯১৬
১৯৩১ "	১০০০	৯০৮

বিধবাদেরও বিবাহ খুব প্রচলিত করিতে পারিলে নারীসংখ্যার এই ন্যূনতার কিছু প্রতিকার হইতে পারে। তদ্ভিন্ন, বিধবাদিগকে যে অস্বাভাবিক অবস্থায় থাকিতে হয় এবং যে-যে কারণে তজ্জন্য তাহাদের অপমৃত্যু ও অকালমৃত্যু ঘটে, তাহাদের বিবাহ দিয়া তাহার প্রতিকার করিলে, নারীসংখ্যার ন্যূনতাও ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া নারী-সংখ্যা ও পুরুষের সংখ্যা সমতা প্রাপ্ত হইতে পারে। অতি-ক্ষয়িষ্ণু কতকগুলি জাতির বিবরণে লেখক লিখিয়াছেন—

"ঝল্ল-মল্ল-ক্ষত্রিয়, কোচ, তিয়র, হাড়ি, হাজং, লুপ্ত মাহিষ্য (পাটনী), হাড়ি, ডোম, ভুমুন্দর (ভুঁইমালী), মুচী, রবিদাস (চামার), জালিয়া, কাওরা, লোহার প্রভৃতি অনুন্নত জাতি-গুলির জন-সংখ্যা অসম্ভব পরিমাণে হ্রাস পাইতেছে। ১৯২১ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত এই দুইটি লোক-গণনায় ইহাদের জন-সংখ্যা তুলনা করিলে পরিষ্কার দেখা যায় যে, ইহাদের বংশলোপ আসন্ন।"

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে এই বংশলোপের আশঙ্কা বহু পরিমাণে নিবারিত হয়।

লেখক দেখাইয়াছেন, বঙ্গের মোট ১,০৫,৭২,৪৮৪ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে কেবল ৫০,৮৩,৯৩৬ জন দাম্পত্যজীবন ভোগ করে।

হিন্দুসমাজে এই যুগে সংহিতাকারেরা থাকিলে ও তাঁহাদের ব্যবস্থা শিরোধার্য্য হইলে তাঁহারা বিধবাবিবাহ চালাইতেন এবং বিপত্নীকদের বিবাহ করিতে হইলে কেবল বিধবাদিগকেই বিবাহ করিতে হইবে, এরূপ বিধান দিতেন। হিন্দু নৃপতি ও হিন্দু সংহিতাকার থাকিলে হিন্দুর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি স্বাভাবিক রাখিবার নিমিত্ত এইরূপ ব্যবস্থাও প্রচলিত হইত যে, সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্ক

পুরুষেরা অবিবাহিত থাকিলে তাহাদিগকে ট্যাক্স দিতে হইবে।

—

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার শতবার্ষিকী

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ধর্ম ও সমাজসংস্কার ক্ষেত্রে এবং সুনীতির আদর্শ প্রচার কার্যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের প্রধান সহকর্মী ছিলেন। তিনি দেশে ও বিদেশে ভারতীয় আধ্যাত্মিক বাণী প্রচার করেন। যীশু খ্রীষ্টকে তিনি প্রাচ্য যোগী ভক্ত রূপে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজের নিকট উপস্থিত করেন। তাঁহার শতবার্ষিকীর আয়োজন করিয়া উদ্যোক্তারা তাঁহার সম্বন্ধে কর্তব্য সাধনের সূচনা করিয়াছেন। এই উৎসবে ছাত্রদের বিশেষ করিয়া যোগদান কর্তব্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্সটিটিউট তাহারই চেষ্টার ফল।

—

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালী মহিলা অধ্যাপিকা

ঢাকা, ২৪শে সেপ্টেম্বর

এরূপ জানা গিয়াছে যে, ডাঃ মৈত্রেয়ী দাস এম. এ. এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের লেকচারার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক মিঃ হেমেন্দ্রকিশোর দত্তের কন্যা। তাঁহার স্বামী মিঃ উমেশচন্দ্র দাস একাউন্টেন্সীতে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বর্তমানে ইংলণ্ডে আছেন। —ইউ. পি.

—

প্রয়াগে শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের জন্মদিন-উৎসব

গত ১২ই সেপ্টেম্বরের এলাহাবাদের দৈনিক "লীডার" কাগজে দেখিলাম, তথাকার ললিতকলা ও সংস্কৃতির রোরিক কেন্দ্র (Roerich Centre of Art and Culture) চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের ৫০তম জন্মদিনোৎসব অনুষ্ঠান করেন। এলাহাবাদ মিউজিয়মের একটি কক্ষ অসিতবাবুর আঁকা ছবি রাখিবার নিমিত্ত আগে হইতেই নির্দিষ্ট আছে। এই জন্মোৎসব উপলক্ষে এই কক্ষে তাঁহার আরও আটটি চিত্র রক্ষিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ঐ সময় তাঁহার ছাত্র শ্রীযুক্ত শ্রীরাম কর্তৃক নির্মিত তাঁহার একটি আবক্ষ খড়ির ফলক (Plaster plaque) ঐ কক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

কুলটিতে সাংঘাতিক দাঙ্গা

আসানসোলের নিকটবর্তী কুলটিতে বৃহৎ কারখানা আছে। সেখানে হিন্দুরা একটি শোভাযাত্রা পুলিসের অনুমতি লইয়া পুলিস কর্তৃক নির্দিষ্ট পথ দিয়া লইয়া যাইবার সময় মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলে দাঙ্গা হয়। শোভাযাত্রার পথ হইতে অনেক দূরে একটি মসজিদ ছিল, হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিবার ইহাই অজুহাত। মসজিদের ঠিক্ সম্মুখ দিয়া শোভাযাত্রা লইয়া যাইবার আইনসঙ্গত অধিকার সকলেরই আছে। মসজিদের সম্মুখ দিয়া শোভাযাত্রা গেলে ইসলামের কোনও অবমাননা হয় না, ইহা বিদ্বান ও ধার্মিক বহু মুসলমান স্বীকার করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ইহাও সত্য যে, যে-দেশে নানা ধর্মাবলম্বীর বাস, সেখানে প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের লোকদের পূর্ণমাত্রায় নিজেদের সমুদয় অযৌক্তিক যৌক্তিক সংস্কার অপর সকলকেও মানিতেই হইবে, এরূপ জেদ কাহারও করা উচিত নয়।

মুসলমান জনতার আক্রমণের ফলে যে দাঙ্গা হয়, তাহা প্রশমিত করিবার নিমিত্ত পুলিস গুলি চালায়। তাহাতে ছয় জন হিন্দু মারা পড়িয়াছে ও অনেকে জখম হইয়াছে। পুলিস কাহার হুকুমে গুলি চালাইয়াছিল, জানা যায় নাই।

হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে ব্যারিস্টর শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে গিয়া যাহা জানিয়াছেন তাহার রিপোর্ট হইতে আমরা সামান্য কিছু উপরে সংকলন করিয়া দিলাম। হত হিন্দুদের পরিবারবর্গের নিমিত্ত এবং আহত ব্যক্তিদের নিমিত্ত অতি শীঘ্র সাহায্য আবশ্যক। তন্নিমিত্ত শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটি আবেদন প্রকাশ করিয়াছেন এবং স্বয়ং পাঁচ শত টাকা দিয়াছেন।

হিন্দু জনসাধারণ ও হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন তদন্তের দাবী করা হইয়াছে।

হিন্দুদের মন্দির ও খ্রীষ্টিয়ানদের গির্জা ঐ ঐ সম্প্রদায়ের অতিপ্রিয় ও সম্মাননীয়। মন্দির ও গির্জার সম্মুখ দিয়া, পূজা উপাসনাদির সময়েও, শোভাযাত্রা-আদি গিয়া থাকে। তাহাতে তাহারা আপত্তি করে না ও দাঙ্গাও করে না। মসজিদও মুসলমানদের অতিপ্রিয় ও সম্মানার্হ। সকল ধর্মভবনই সমুদয় ধর্মসম্প্রদায়ের লোকদের শ্রদ্ধার বস্তু হওয়া উচিত। কিন্তু বহু ধর্মসম্প্রদায়ের অধ্যুষিত কোন দেশে কোন আইনকানুন চালাইতে হইলে তাহা সকলের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য ও প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

কংগ্রেস কমিটিদ্বয়ের সর্বাধুনিক প্রস্তাব

কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির গত বোম্বাই অধিবেশনে যে প্রস্তাব ধার্য হয় এবং যাহা বোম্বাইয়ে সমগ্রভারতীয় কংগ্রেস কমীটির দ্বারা অনুমোদিত ও গৃহীত হইয়াছে, তাহার দ্বারা কংগ্রেস কমীটিদ্বয়ের দিল্লী-পুনা প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

শেষোক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছিল যে, কংগ্রেস পূর্ণ-স্বরাজলাভার্থ যে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম করিবেন, তাহা সম্পূর্ণ অহিংস হইবে, কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার এবং দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষার নিমিত্ত বলপ্রয়োগ আবশ্যক হইতে পারে। গান্ধীজী সকল ব্যাপারেই সম্পূর্ণ অহিংস থাকার পক্ষপাতী। সুতরাং তিনি কংগ্রেস-কমীটিদ্বয়ের দিল্লী-পুনা প্রস্তাবের অনুমোদন করিতে পারেন নাই। ইহাতে তাঁহার সহিত কংগ্রেস-কমীটিদ্বয়ের ছাড়াছাড়ি হয়। কংগ্রেস দিল্লী-পুনা প্রস্তাব দ্বারা গবন্মেণ্টের সহিত যে-যে সর্তে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, গবন্মেণ্ট তাহাতে রাজী হন নাই। সুতরাং কংগ্রেসকে নূতন প্রস্তাব ধার্য করিতে হইয়াছে। বোম্বাইয়ে তাহা করা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের এই সর্বাধুনিক প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, কংগ্রেস যে কেবল স্বরাজ-সংগ্রামেই অহিংস থাকিবেন তাহা নহে, স্বশাসক স্বাধীন ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার কার্যেও এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ ব্যাহত করিবার কার্যেও **যথাসম্ভব** অহিংস থাকিবেন। দিল্লী-পুনা প্রস্তাবে এবং বোম্বাই প্রস্তাবের মধ্যে পুরা সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য নাই। তাহার কারণ এই যে, এখন হয়ত আইন অমান্য করা আবশ্যক হইতে পারে এবং সেরূপ প্রচেষ্টা চালাইতে হইলে গান্ধীজীর নেতৃত্ব একান্ত আবশ্যক, কিন্তু সকল ব্যাপারে সম্পূর্ণ অহিংসতার সর্ত ভিন্ন তিনি নেতা হইবেন না। এখন তিনি নেতা হইয়াছেন, কিন্তু "পাইকারী আইনলঙ্ঘন" ("Mass Civil Disobedience") এখন তিনি হইতে দিবেন না।

আলোচ্য প্রস্তাবটিতে কংগ্রেস বলিতেছেন যে, মানব জাতির পুনর্বার বর্বর অবস্থায় অবনত হওয়া নিবারণ করিতে হইলে যুদ্ধ বন্ধ করা দরকার, তাহা করিতে হইলে পৃথিবীতে ন্যায্য রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করা এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ আবশ্যক। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়া এই কার্যে আত্মনিয়োগ করিবে। এই জন্য তাহার স্বাধীন হওয়া চাই।

এই আদর্শ ও লক্ষ্য নিশ্চয়ই খুব উচ্চ।

প্রস্তাবটি সম্পর্কে গান্ধীজী যে গোটা দুই বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন, কংগ্রেস সাধারণভাবে যুদ্ধ মাত্রেরই এবং বিশেষভাবে বর্তমান যুদ্ধের অহিংস-ভাবে বিরোধিতা বক্তৃতা ও লেখা দ্বারা করিবার স্বাধীনতা চায়, গবন্মেণ্টও যুদ্ধটা চালাইবার সব চেষ্টা ও আয়োজন করুন কিন্তু তাহার নিমিত্ত সৈন্যসংগ্রহ, অর্থসংগ্রহ, মাল-সংগ্রহ ব্যাপারে বল প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। ইহাতে যদি গবন্মেণ্ট রাজী হন, তাহা হইলে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবে না। কিন্তু যদি বড়লাট বলেন, সাধারণতঃ যুদ্ধের এবং বিশেষতঃ বর্তমান যুদ্ধের সমালোচনামূলক অহিংস বিরোধিতাও করিতে দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে গান্ধীজী ও কংগ্রেস সে নিষেধ মানিবেন না, এইরূপ অনুমিত হইতেছে। এই প্রকারে সত্যাগ্রহ বা অহিংস আইনলঙ্ঘন আরম্ভ হইতে পারে।

কংগ্রেসপক্ষের প্রস্তাবে বড়লাট রাজী হইবেন কি না, সম্ভবতঃ গান্ধীজী প্রধানতঃ তাঁহাকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিবেন। আজ ১১ই আশ্বিন উভয়ের সাক্ষাৎকারের কথা।

বঙ্গে নারীনিগ্রহ কমে নাই

১৯৩৯ সালের বঙ্গের পুলিস রিপোর্ট অনুসারে পুলিসের কাছে ১১৪১টা নারীনিগ্রহের সংবাদ আসে। অত্যাচরিতা-দের মধ্যে ৬২৭ জন স্ত্রীলোক মুসলমান, ৫০১ জন স্ত্রীলোক হিন্দু। ৭৩৬টা 'কেসে' দুর্বৃত্তরা মুসলমান, ৩৯৪টাতে হিন্দু, ৪টাতে হিন্দু মুসলমান দুই-ই, ২টাতে ফিরিঙ্গী ও দেশী খ্রীষ্টিয়ান, ৫টায় অজ্ঞাত।

বঙ্গে নারীনিগ্রহ সব বাঙালীর ও গবন্মেণ্টের মহা-কলঙ্ক ও লজ্জার বিষয়।

ইন্দো-চীনে যুদ্ধ

ইন্দো-চীনে কখন যুদ্ধ কখনও বা জাপানে ফ্রান্সে চুক্তির খবর আসিতেছে।

—

চীন-জাপান যুদ্ধ

তিন বৎসর যুদ্ধ করিয়া জাপান চীনের শতকরা ২৮ অংশ অধিকার করিয়াছে। বাকী অধিকার করিতে চাহিলে আরও নয় বৎসর লাগিবে।

—

মহাযুদ্ধটার বিস্তৃতি

মহাযুদ্ধটা আফ্রিকাতে খুব লাগিয়াছে। ইউরোপে জিব্রাণ্টার আক্রান্ত হইয়াছে। ব্রিটেন আকাশপথে জার্মেনীতে পাল্টা আক্রমণ খুব জোরে চালাইতেছে।

—

ভারতসচিবের আফসোস

ভারতসচিবের আফসোসব্যঞ্জক নিম্নলিখিত টেলিগ্রামটি দৈনিক কাগজসমূহে বাহির হইয়াছে :—

LONDON, Sept. 25.

Regret that the leaders of the Indian National Congress had rejected the Viceroy's offer was expressed by Mr. Amery, Secretary of State for India, in a speech in London.

Mr. Amery said: "I fully recognise the sincerity of Mr. Gandhi's pacifist convictions. The practical question is: how is he to reconcile his demand on his own behalf and on the behalf of the Congress for freedom to voice this conviction with his own statement, which I sincerely welcome, that he does not wish to embarrass the Government in its conduct of the war."

Referring to the coming interview between Lord Linlithgow and Mr. Gandhi, Mr. Amery expressed the hope that the outcome might be an agreement consistent both with Mr. Gandhi's conscientious objections to war in general and with the Viceroy's no less conscientious conviction and duty to allow nothing to stand in the way of India's whole-hearted effort to play her part in a struggle which concerned her present welfare and security and the ideals which her people held dear.—*Reuter.*

তাৎপর্য। ভারতসচিবের লণ্ডনের একটি বক্তৃতায় এই আফসোস প্রকাশিত হইয়াছে যে, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ভারতবর্ষের বড়লাটের শাসনপরিষদ বর্ধন ও যুদ্ধপরামর্শদাতা কৌন্সিল গঠনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ভারতসচিব বলেন: "মিঃ গান্ধীর শান্তিবাদ-মূলক দৃঢ় বিশ্বাসের অকপটতা ও আন্তরিকতা আমি সম্পূর্ণ স্বীকার করি। কেজো প্রশ্ন এই যে, তিনি তাঁহার ও কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এই দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশের ও প্রচারের স্বাধীনতার যে দাবী করিয়াছেন তাহার সহিত তাঁহার যে বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন যে তিনি গবর্মেণ্টকে যুদ্ধচালনা বিষয়ে বিব্রত করিতে চান না ও যে বিবৃতি আমি সুসাময়িক ও সুভাষিত বলিয়া সানন্দে স্বীকার করি, সেই বিবৃতির সামঞ্জস্য কি প্রকারে করিবেন।"

গান্ধীজীর সহিত বড়লাটের আগামী সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করিয়া ভারতসচিব এই আশা প্রকাশ করেন যে, তাহার ফল এই হইতে পারে যে, সাধারণভাবে যুদ্ধমাত্রেরই বিরুদ্ধে গান্ধীজীর বিবেকপ্রসূত আপত্তির সহিত সঙ্গত এবং বড়লাটেরও সমভাবে বিবেকপ্রসূত বিশ্বাস ও কর্তব্যবোধ যে ভারতবর্ষের সর্বান্তঃকরণে এই যুদ্ধ চালাইবার চেষ্টায় কোন বাধা জন্মিতে দেওয়া হইবে না—এই বিশ্বাস ও কর্তব্যবোধেরও সহিত সঙ্গত একটা সিদ্ধান্ত হইবে। বড়লাটের বিশ্বাস এই যে, ভারতবর্ষের এই চেষ্টার সহিত-তাহার বর্তমান কল্যাণ ও নিরাপত্তা এবং তাহার প্রিয় আদর্শ-গুলির রক্ষা নির্ভর করে।

ভারতসচিবের বক্তৃতার এই চুম্বক প্রকাশিত হইবার পরদিন আজ ১১ই আশ্বিন বক্তৃতাটি আদ্যোপান্ত ভারত-বর্ষের দৈনিকগুলিতে বাহির হইয়াছে। তাহার বিস্তারিত আলোচনার সময় নাই, এবং তাহার আবশ্যকও নাই; কেন-না, তাহাতে নূতন যুক্তি কিছুই নাই।

মহাত্মা গান্ধী ও বড়লাটের সাক্ষাৎকারের ফল কি হইবে, অনতিবিলম্বে জানা যাইবে।

ভারতসচিব আগে পার্লেমেণ্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে আর কথাবার্তা চালাইবেন না। সেই উত্তরে কিঞ্চিৎ উষ্মা ও দর্প প্রকাশ পাইয়াছিল। গান্ধীজীর দৃঢ়তায় এবার ভারতসচিবের সুরটা কিছু নরম দেখা যাইতেছে। যুদ্ধটার প্রচণ্ডতা, এবং ব্যাপ্তিবৃদ্ধিও, তাহার কারণ হইতে পারে।

—

নাৎসী বর্বরতা

নাৎসী বর্বরতার বহু দৃষ্টান্তের বিষয় পড়া গিয়াছে: কতকগুলি ইংরেজ শিশুকে নিরাপদ রাখিবার নিমিত্ত একখানি জাহাজে কানাডা পাঠান হইতেছিল, কিন্তু জার্মেনী সেই জাহাজটি ডুবাইয়া দেওয়ায় কয়েক শত শিশু মারা পড়িয়াছে—এই সংবাদ নাৎসী বর্বরতার আর একটা প্রমাণ।

—

সিন্ধুদেশে অরাজকতা

সিন্ধুদেশের অরাজকতা সম্বন্ধে তথাকার হিন্দুরা বড়লাটকে তাহাদের বক্তব্য জানাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বড়লাট তাহাদের প্রতিনিধিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন—এই সংবাদের উপর আমাদের মন্তব্য আশ্বিনের প্রবাসীতে ছাপা হইয়াছে।

সিন্ধুদেশের অত্যাচরিত ও বিপন্ন হিন্দুদের সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে কেবল মাত্র একটি তহসিল সম্বন্ধেই লেখা হইয়াছে যে, ১৭টি গ্রামের সমুদয় পরিবার অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। বাকী গ্রামগুলির অনেকগুলিতে কেবল একটি হিন্দু পরিবার অবশিষ্ট আছে। অবশিষ্ট গ্রামগুলির শতকরা পঞ্চাশটির উপর পরিবার অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। অন্য বহু তহসিলেও অবস্থা এই প্রকার।

মহাত্মা গান্ধীর প্রবন্ধে দেখা যায় হিন্দুদের এইরূপ বিপন্ন অবস্থা এবং গৃহত্যাগ বশতঃ মুসলমানদেরও আর্থিক অসুবিধা ঘটিয়াছে। আমাদের মনে হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ এখন কংগ্রেসের টনক নড়া উচিত। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, সিন্ধুদেশের অবস্থার উন্নতির নিমিত্ত কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগ সকলেরই চেষ্টা করা কর্তব্য। তাহাতে সন্দেহ কি?

কিন্তু ঐ দেশে এখনও হিন্দুহত্যা চলিতেছে। অদ্যকার (১১ই আশ্বিনের) দৈনিক কাগজেও নিম্নমুদ্রিত খবর বাহির হইয়াছে এবং অদ্যকার কাগজেই ভারতসচিবের বক্তৃতায় ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট সংখ্যালঘুদের কল্যাণের জন্য দায়ী বলিয়া অন্য কোন গবন্মেণ্টকে নিজের ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে পারেন না, মান্ধাতার আমলের সেই যুক্তিও বাহির হইয়াছে!

করাচী, ২০শে সেপ্টেম্বর

খবর পাওয়া গিয়াছে যে, আজ ঘাড়িয়াসিন রোডে দিয়া দুইজন হিন্দু একখানি টোঙ্গা করিয়া যাইবার সময় কুঠারধারী তিন ব্যক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হয়। ফলে একজন হিন্দু মারা গিয়াছে, অপর গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে।

তিনজনের উপর গুলীচালনা

সিন্ধু সরকারের বরাবরে সক্করের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট-প্রেরিত তারে আর একটি ঘটনার কথা জানা যায়। ঐ তারে লেখা হইয়াছে—"মীরপুরের আততায়ীদের অনুসন্ধান চলিতেছে। গতরাত্রে তিনজন লোক সারহাট ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া ষ্টেশন হইতে কিছু দূরে অগ্রসর হইবার পরই তাহাদের উপর গুলীচালনা করা হয়। উহারা অল্প আহত হইয়াছে। ঐ অঞ্চলে স্পেশাল পুলিস মোতায়েন করা হইয়াছে। অবস্থা আয়ত্ত। এ-পি।

—

ভারত-সরকার ও বাংলা-সরকারের সেন্সস সম্বন্ধীয় ভিন্ন ব্যবস্থা

ভারত-সরকার আগামী সেন্সসে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন উপসম্প্রদায়, শাখা প্রশাখা, জাতি, উপজাতি প্রভৃতির গণনা করাইবেন না, রিপোর্টে সে সকলের হিসাব ও উল্লেখ থাকিবে না, এইরূপ স্থির করিয়াছেন। সব ধর্মসম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন অংশের গণনা, হিসাব ও বৃত্তান্তের বৈজ্ঞানিক সুব্যবহার আছে, অন্যবিধ অপব্যবহারও আছে। যাহা হউক, ভারত-সরকার যখন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াইছেন, তখন তদনুসারেই সর্বত্র কাজ হওয়া উচিত। কিন্তু ইউনাইটেড প্রেস অবগত হইয়াছেন, বাংলা-সরকার বঙ্গের হিন্দুদের বহু শাখা প্রশাখা ও নানা জাতি উপজাতি সম্বন্ধে নিজের ব্যয়ে একটা রিপোর্ট প্রস্তুত ও প্রকাশ করাইবেন, কিন্তু মুসলমানদের সম্বন্ধে তাহা করাইবেন না—যদিও তাহাদের মধ্যেও, নামে না-হইলেও, কার্যতঃ অস্পৃশ্যতা আছে, জাতিভেদ আছে এবং শিয়া সুন্নী প্রভৃতি উপসম্প্রদায় ত আছেই। এই সংবাদ সত্য হইলে, বাংলা-সরকারের উদ্দেশ্য বোধ হয় ইহাই দেখান যে, মুসলমানরা সম্পূর্ণ অবিভক্ত ও অখণ্ড সম্প্রদায় এবং হিন্দুরা নানা ভাগে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন।

—

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অবস্থা

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে (হিন্দু) মানুষচুরি, নরহত্যা, লুট ইত্যাদি প্রায়ই ঘটিতেছে। ভারতবর্ষে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই যে ব্রিটিশ সরকার এদেশে আছেন, ইহা তাহার অন্যতম প্রমাণ।

—

ডক্টর প্রফুল্লকুমার বসুর অপসারণ

ডক্টর প্রফুল্লকুমার বসু দুই বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম্, এ, এবং ইহার অন্যতম ডক্টর অব ফিলসফি। তিনি ইন্দোরে মহারাজার কলেজে প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন—তাঁহা অপেক্ষা যোগ্য প্রিন্সিপ্যাল কেহ সেখানে ছিলেন না। তিনি আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের কাজও অনতিক্রান্ত যোগ্যতার সহিত করিয়াছেন। তাঁহার যোগ্যতার গুণে আগ্রা-অযোধ্যায়, মধ্যভারতে ও নিকটস্থ অন্যান্য অঞ্চলে বাঙালীর মর্যাদা ("status") উন্নত হইয়াছে। অথচ তাঁহাকে ইন্দোর কলেজ হইতে সরিয়া পড়িতে হইয়াছে। তাঁহার অপসারণ বার্দ্ধক্যবশতঃ, এরূপ বলিবার যো নাই—তাঁহার বয়স মোটে ৫০। তিনি দেহ মনে বেশ শক্ত সমর্থ আছেন। কর্তৃপক্ষের তাঁহার সাহিত এরূপ ব্যবহার সাতিশয় নিন্দনীয়।
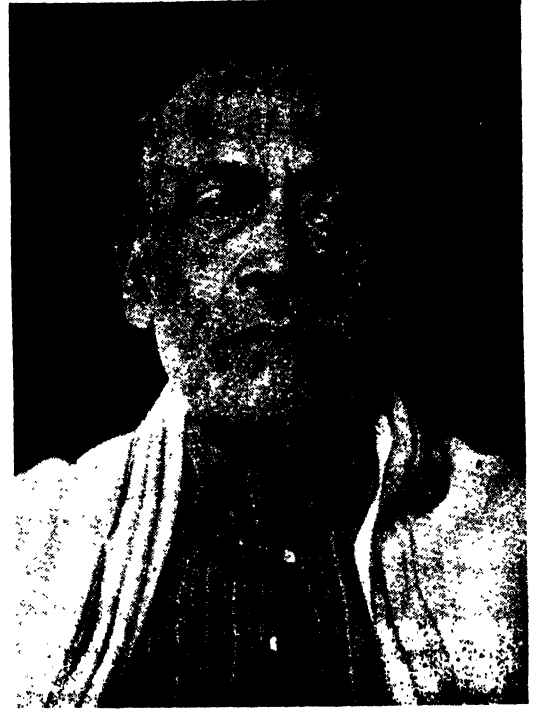
সর্ নীলরতন সরকারকে বিজ্ঞানাচার্য উপাধি দিবার সঙ্কল্প

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডাক্তার সর্ নীলরতন সরকারকে সম্মানসূচক ডি. এসসি. উপাধি দিবেন স্থির করিয়াছেন। তাঁহাকে এই উপাধি পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে দিলেও যোগ্য ব্যক্তিকেই দেওয়া হইত।

—

সূর্য্যকুমার সোম

সূর্যকুমার সোম

ময়মনসিংহের জননায়ক সূর্য্যকুমার সোম সম্প্রতি ৭১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বহু বৎসর যাবৎ ময়মনসিংহ জেলার বহুবিধ রাষ্ট্রিক উদ্যোগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি প্রভূত অর্থকরী আইন-ব্যবসা পরিত্যাগ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতিরূপে তিনি কারাবরণ করিয়াছিলেন। অমায়িক ও সরল প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার তাঁহার স্বভাবের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এবং ময়মনসিংহ জেলার [illegible] রাষ্ট্রকর্মী এই [illegible] তাঁহার অনুরাগী ছিলেন। আমাদের রাষ্ট্রীয় দুঃখদুর্দ্দশার কথা তিনি সহজ সরল ভাষায় প্রচার করিতে পারিতেন বলিয়া তাঁহার বক্তৃতাদি জনসাধারণের বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইত। কংগ্রেস জাতীয় দলের পক্ষ হইতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি অ্যাসেম্ব্লিতে ঢাকা বিভাগের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

—

ছেলেবেলা

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "জীবনস্মৃতি"তে তাঁহার বাল্যকালের কথা কিছু বলিয়াছেন, কিন্তু পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্তির পক্ষে যথেষ্ট বলেন নাই। "জীবনস্মৃতি" তাঁহার যে বয়সে আসিয়া থামিয়াছে, তাহাতেও পাঠকদের কৌতূহল অতৃপ্ত থাকিয়া যায়। এই গ্রন্থ রচনার পরে তাঁহার কোন কোন মুদ্রিত বক্তৃতায়, চিঠিপত্রে এবং অমুলিখিত কথোপকথনে তাঁহার জীবনের ঐ উভয় দিকের কিছু কিছু কথা ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে। তাঁহার

বাল্যকাল সম্বন্ধে "ছেলেবেলা" বহিখানি লিখিয়া তিনি যে কেবল ছোট ছেলেমেয়েদেরই আনন্দসম্ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা নহে, যে-সকল বৃদ্ধের মন একেবারে বুড়া ও পাকা হইয়া যায় নাই তাহাদিগকেও আনন্দের অধিকারী করিয়াছেন। তাঁহার ছেলেবেলার কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে যত অল্প বয়সের কথা তাঁহার মনে আছে তখন হইতে এবং শেষ হইয়াছে লণ্ডনে অধ্যাপক হেনরি মর্লে'র ছাত্ররূপে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের বৃত্তান্ত দিয়া। ভাষা মনোজ্ঞ ও বিষয়ের উপযোগী হইয়াছে বলাই বাহুল্য। বহিখানি শুধু সুখপাঠ্য নহে, শুধু কবির ব্যক্তিত্ব বুঝিবার পক্ষে আবশ্যক নহে, ইহা হইতে ৭০।৭৫, ৬০।৬৫ বৎসরের আগেকার কলিকাতার, বাংলার ও সমাজের উপর আলোকপাত হওয়ায় তখনকার সামাজিক ইতিহাসের উপকরণও ইহার মধ্যে রাখিয়াছে।

কবি কিছু দিন পূর্বে তাঁহার জোড়াসাঁকোর ভবনে এই বহির কিয়দংশ পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। কাহিনীর মনোহারিত্বের সহিত তাঁহার পাঠনৈপুণ্যের সংযোগে তখন অনেক শ্রোতার মনে হইয়াছিল, ইহা কি বাস্তব কিছুর বৃত্তান্ত, না উপন্যাসের গোড়াপত্তন?

—

চিত্রপরিচয়

কথিত আছে, যবন হরিদাসকে সাধনা হইতে বিরত করিবার উদ্দেশ্যে গৌড়ের বাদশাহ তাঁহার নিকট এক জন রূপোপজীবিনীকে প্রেরণ করেন। সে হরিদাসের সমীপ-বর্ত্তিনী হইলে হরিদাস তাহাকে তাঁহার ইষ্টদেবতার নামজপ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলেন। রমণী দেখিল, দিনের পর দিন যায়, হরিদাস নামজপে মত্ত, জপ শেষ হয় না, রমণীও তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়ে না। এই আত্মবিস্মৃত সাধনা দেখিয়া রমণীর মন পবিত্র হইল, হরিদাসকে প্রণতি জানাইয়া সে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রবাসী-কার্য্যালয় ২০শে আশ্বিন, ৬ই অক্টোবর হইতে ৩রা কার্ত্তিক, ২০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা কার্য্যালয় খুলিবার পর করা হইবে।

—

ঢাকুরিয়া বিনোদিনী বালিকা-বিদ্যালয়ে প্রবাসী-সম্পাদক। "দেশ-বিদেশের কথা" দ্রষ্টব্য।

প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ্ লুই ফিনোর নামে স্থাপিত পুরাতত্ত্বাগার, হানোয়া

আধুনিক ইন্দোচীন

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

কোনও দেশের অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক বিবরণ দিতে হইলে সে-দেশের জনসাধারণ এবং সে-দেশের ভৌগোলিক অবস্থান এই দুই বিষয়েরই চর্চ্চা সমান ভাবে করিতে হয়। এক হইতে অন্যকে বাদ দিয়া কোন প্রকারে সম্পূর্ণ বিবৃতি দেওয়া সম্ভব নয়। ইন্দোচীনের বিবরণেও এই দুই বিষয়ের পারিপার্শ্বিক বৃত্তান্ত দেওয়া প্রয়োজন।

এই ২,৪০,০০,০০০ লোকের আবাসভূমি সম্বন্ধে প্রথমেই বলা দরকার যে সেখানে প্রায় প্রত্যেক ব্যাপারেই, কি শাসনে, কি ব্যবসায়ে, কি শিক্ষায় কি রক্ষণাবেক্ষণে, সমস্ত ক্ষমতা ৪০,০০০ শ্বেতাঙ্গের করায়ত্ত। এই মুষ্টিমেয় ফরাসীর দল প্রায় সকলেই কর্ত্তার স্থলে প্রতিষ্ঠিত এবং এই দলের অধিকাংশই অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক, প্রায় কেহই ৪৫ বৎসরের অধিক বয়সের নয়। কিছু কাল যাবৎ এদেশের প্রাচীন ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বদল হইয়াছে এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে আগেকার সময়ের প্রৌঢ় বা অকালবার্দ্ধক্যপ্রাপ্ত রুক্ষ-প্রকৃতি ও শুষ্ক-আকৃতি মদ্যপ-অহিফেনসেবী ফরাসী "বড় সাহেবে"র দলও বিদায় পাইয়াছে।

এই বিরাট ইন্দোচীন যুক্তদেশে তিনটি জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ, যথা, আনামী, খমের বা কাম্বোজীয়, এবং থাই বা লাও-জাতীয়। এই তিনটি জাতি ছাড়া অন্য কয়েকটি জাতিও আছে, যথা, উচ্চ টঙ্কিন অঞ্চলের পাহাড়ী মাঁস, মিয়ো ও লোলো; মধ্যদেশের অধিত্যকাবাসী মোয়া, খা বা ফনোং; এবং প্রাচীন সাম জাতি যাহাদের অসংখ্য মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আনাম প্রদেশের প্রায় প্রত্যেক পাহাড়ের উপরে এই জাতির পূর্ব্বগৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। ইহা ভিন্ন দেশে বিদেশীর অভাব নাই যাহাদের মধ্যে চীনা, মালয়, দেশীয় ও ভারতীয়দিগের সংখ্যাই অধিক। ইহাদের মধ্যে তিনটি জাতি এখন বিশেষ সমস্যার কারণ। যথা, আনামজাতি, মোয়াজাতি ও লাও-জাতি এবং দেশের আর্থিক ব্যাপারেও এই সমস্যার ছায়া পড়িয়াছে।
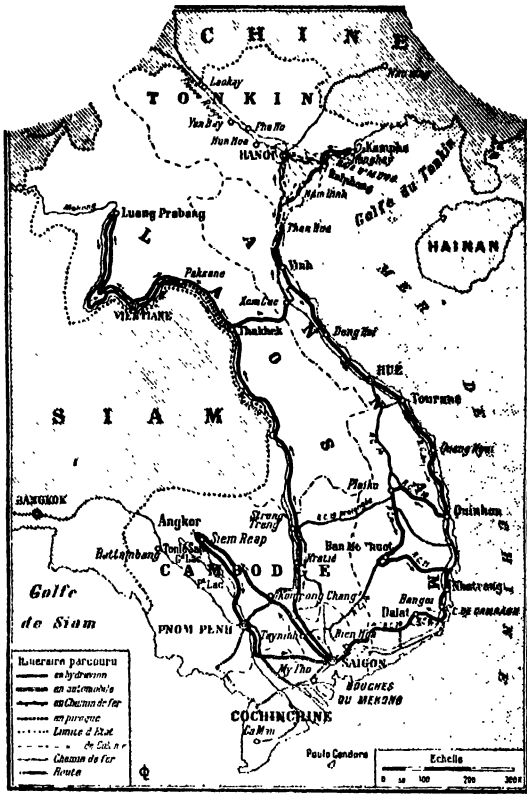
ইন্দোচীনের মানচিত্র

টঙ্কিনের লোহিত নদেব মোহানা (ব-দ্বীপ) আর্দ্র কৃষিপ্রধান দেশ। পথের দুই পাশে যতদূর দৃষ্টি যায় সারি সারি সবুজ ধানের ক্ষেত, রৌদ্রালোকের শাদা ঝলকে উজ্জ্বল জল, জলে ধান্যের পাণ্ডুর ছায়া, তাহার সীমায় আলের দৃঢ় রেখা ইহাই চতুর্দ্দিকে। চারি দিকে সম্মুখে পিছনে, বামে দক্ষিণে পথের উপর অসংখ্য পীতবর্ণ লোকের সারি, পুরুষের মাথায় ধুচুনির মত টুপী, স্ত্রীলোকের মাথায় বিরাট পাগড়ীর মত খোঁপা এবং সকলেরই কাঁধে বাঁশে-ঝুলান ভারা। পথঘাটের দুই পাশে বাঁশের বেড়ার পিছনে কুটীরের সারি, তাহার মাঝে মাঝে ধানের মরাই, শস্যের গোলা, হাটের ঝাঁপ-দেওয়া দোকান। হানোয়া শহর হইতে বিশ মাইল পথ চলিলেও অবিশ্রান্ত লোকের কাতার এবং বসতির ও শস্যক্ষেত্রের ঘনসমষ্টি দেখা যায়। টঙ্কিনের নদী-মোহনার অঞ্চল পৃথিবীর ঘননিবিষ্ট জনপদশ্রেণীর অন্যতম। চীন দেশের জনপদগুলির মধ্যে যেখানে লোকের বসতি ঘনতম সেখানে বর্গমাইল প্রতি ১৭০০ লোকের বাস। জাপানে ঘনতম স্থলে ২৯০০ প্রতি বর্গমাইল। এখানে ১৪০০ প্রতি বর্গমাইল গড়ে ধরা যায়, যদিও কোন কোন অঞ্চলে ৪৫০০।৫০০০ প্রতি বর্গমাইলও আছে। প্রতি চল্লিশ বৎসরে লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হইলে এই ৬৫ লক্ষ লোকের বাসস্থলের কি অবস্থা ও ব্যবস্থা হইবে?

ইহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থার কথা এখন হইতেই ভাবা হইতেছে। দুই প্রকার ব্যবস্থা হইতে পারে:— প্রথম, ইহাদের অন্য কোনও অপেক্ষাকৃত জনবিরল অঞ্চলে (যথা কম্বোজের ও লাও দেশের সমতল ভূমিতে অথবা মোয়াদিগের অধিত্যকা প্রদেশে) লইয়া যাওয়া; দ্বিতীয়, জলজকৃষির নূতন কোন প্রথা প্রবর্ত্তন দ্বারা ফসলের পরিমাণের বিশেষ বৃদ্ধি বা নূতন কৃষিক্ষেত্রের সৃষ্টি। আনামবাসিগণ প্রথম ব্যবস্থার বিরোধী, কেন-না তাহাদের কেহই বাপ-পিতামহের দেশ ছাড়িয়া যাইতে

ভিশি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পদচ্যুত ইন্দোচনে তেজস্বী গবর্ণর জেনারেল কাক্রু

চাহে না এবং যদি অবস্থার চক্রে যাইতেই হয় তবে কোনও প্রকারে ফিরিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলেই তাহারা ফিরিয়া আসে। উপরন্তু মোয়া প্রদেশের (ফরাসী) শাসনকর্ত্তারা সেখানে কঠোর পরিশ্রমী

টংকিঙের টিনের খনিতে টিন উত্তোলন

আনামীদিগকে লইতে চাহেন না, কেন-না সেই অঞ্চলের অধিবাসিগণের ক্ষমতা নাই যে তাহারা প্রতিযোগিতায় আনামীদিগকে ঠেকাইতে পারে। সুতরাং সম্প্রতি জলের সাহায্যে কৃষির উৎকর্ষের চেষ্টাই চলিতেছে। বেথুয়ং ও সংচু-র বিরাট বাঁধেই দেশের কৃষিক্ষেত্রের প্রায় এক-সপ্তমাংশের জলসেচ চলে। কৃষিক্ষেত্রের পরিমাণও পঞ্চাশ বৎসরে প্রায় চতুর্গুণ হইয়াছে। কোচিন-চীনে প্রাচীন কাল হইতেই জলসেচ ও বাণিজ্যপথ হিসাবে খালের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। এখন প্রায় ১২৫০ মাইল খাল লোকের ব্যবহার্য্য। সমস্ত ইন্দোচীনে বর্ষার প্লাবন হইতে জনপদ রক্ষার জন্য বিরাট বাঁধের ব্যবস্থা আছে। সেগুলিতে দেশরক্ষা ও জলসরবরাহ দুই কাজই হয়। এই বাঁধগুলির নির্ম্মাণ ও রক্ষা জলদেবতার সহিত মানুষের যুদ্ধের ইতিহাসের এক অঙ্ক বলিলেই চলে।*

মোয়াদিগের বাসভূমি, অর্থাৎ চীনের সীমান্তেকোচিন আনাম গিরিমালা অধিত্যকা অঞ্চল সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এখানকার লোকের জীবনযাত্রা এখনও শিকার ও মাছধরার উপরেই নির্ভর করে। কৃষির জন্য আদিম কালের ব্যবস্থা, অর্থাৎ জঙ্গলে আগুন লাগাইয়া তাহারই ছাইয়ের মধ্যে বীজ ছিটাইয়া দেওয়া এখনও প্রচলিত। তাম্রবর্ণ উজ্জ্বল দীর্ঘ নেত্র সবলকায় মোয়া জাতিরা এখনও আদিম কালের ন্যায় উপজাতি ও শাখাজাতি হিসাবে বাস করে। আজ এখানে, কাল অন্য স্থানে এইভাবে অর্দ্ধ যাযাবরের প্রথায় জীবনযাপনই তাহাদের প্রথা। সময়ের কোনই মূল্য নাই, আধুনিক জীবনযাত্রার অসংখ্য সমস্যারও কোনও বালাই নাই। তবে এইরূপে কালের স্রোতে ভাসিয়া চলার ফলে এই জাতি ক্রমেই নির্জীব ও ক্ষীণ, সংখ্যায় অল্প ও নৈরাশ্য-প্রবণ হইতেছিল, দেশও ক্রমে জনবিরল হইয়া জঙ্গলে পরিণত হইতেছিল। দেশে কৃষি ও আবাদের স্থানের অভাব নাই, সুতরাং সেই সুযোগে চা ও কফির বাগান করিয়া ও

* এদেশের কর্ত্তাদের উচিত টঙ্কিনে গিয়া শিক্ষা লাভ করা।

উত্তর-আনামের জলসেচন-ব্যবস্থার দৃশ্য

আনাম হইতে কুলি আনাইয়া শ্বেতাঙ্গ কর্ত্তারা লাভের পথ দেখিতে থাকেন। কিছুকাল পূর্ব্বে সাবাটিয়ে নামক ফরাসী শাসন-কর্ত্তা, এইরূপ চলিলে মোয়া জাতির উচ্ছেদ হইবে বুঝিয়া, ইহার প্রতিরোধের চেষ্টা দেখেন। তিনি মোয়া জাতির রীতিনীতি, ভাষা, পরিচ্ছদ প্রভৃতি দেখিয়া শুনিয়া সে সকলের সংস্কৃতি ও রক্ষার চেষ্টা করেন। ভাষায় রোমক অক্ষরের লিখনপ্রণালী, দেশে চিকিৎসা, শিক্ষা, পুর্ত্তবিভাগ প্রভৃতির প্রবর্ত্তন ইনিই করেন। ১৯২৭ সালে ইহার মৃত্যু হয়, সে ঘটনা কুহেলিকাচ্ছন্ন। ইহার পরের শাসনকর্ত্তার দল ঐ পথই ধরিয়া চলিতেছেন, সুতরাং মোয়া জাতির উন্নতির আশা আছে।

ইহার পর মেকং নদীর উপত্যকা বাসি লাও জাতির কথা। এই জাতি শ্যামদেশের ভাষাভাষী। আচার-ব্যবহারেও দুই দেশের সাদৃশ্য আছে এবং সম্প্রতি শ্যামদেশ (আধুনিক থাইদেশ) ও ইন্দোচীনে এই স্থানের সীমান্ত পরিবর্ত্তনের জন্য কথাবার্ত্তা চলিতেছে। সুতরাং এখানকার জনসমস্যা অতি জটিল।

বিগত মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক বিভাগ ইন্দোচীনের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করেন। তাহার পূর্ব্বে এদেশে প্রগতির ছায়া বিশেষ পড়ে নাই। পথ-ঘাট, কল-কারখানা বিশেষ কিছু ছিল না। ১৯১৪ সালে কাঁচা রাস্তা ছিল ৭৫০০ মাইল, ১৯৩৮ সালে তাহা কমিয়া দাঁড়ায় ৫০০০ মাইল, অন্য দিকে পাকা রাস্তা ৩২০০ মাইল হইতে ৮০০০ মাইলে পৌছাইয়াছে এবং এ্যাস্‌ফাল্ট দেওয়া পথ শূন্য হইতে ৩৪০০ মাইল দাঁড়াইয়াছে। রেলপথ প্রধানতঃ দুইটি, যথা, ট্রান্স-ইন্দোচীন, (উত্তরে হানোয়া হইতে দক্ষিণে সাইগন) যাহা এখন চীন-সীমান্ত হইতে দক্ষিণে মাইথো পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অন্যটি ফ্‌নোম্‌ পেন্‌হ্‌ হইতে শ্যামসীমান্ত পার হইয়া ব্যাঙ্ককে শ্যামদেশীয় রেলপথের সহিত যুক্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন প্রসিদ্ধ যুন্নান রেলপথ, (হায়ফং-হানোয়া-যুন্নান) যাহার মারফৎ অল্পদিন পূর্ব্বেও চিয়াং-কাইশেকের চীনরাষ্ট্র যুদ্ধের যাবতীয় উপকরণ পাইতেছিল ও সাইগন হইতে দালাত পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য রেলপথ আছে। সর্ব্বসুদ্ধ ১৯১৪ সালে ১২৫০ মাইল

হানোয়রা সেতু
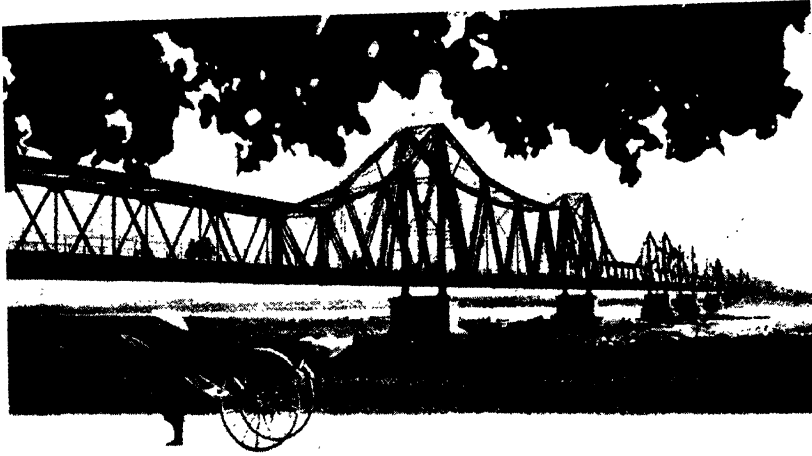
হানোয়ার হাসপাতাল

রেলপথ ছিল, এখন তাহা ২০০০ মাইল। ইহা ভিন্ন অম্-কুক্ হইতে বান্-না-ফাও পর্য্যন্ত মালবাহী তার পথ (টেলেফেরিক) ২৪ মাইল বিস্তৃত আছে, যাহাতে দৈনিক প্রায় ২০০ টন মাল পাঠান হইতে পারে।

ট্রান্স-ইন্দোচীনের রেলপথের ভাড়ার সহিত ভারতবর্ষের "অতি উৎকৃষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত" রেলের ভাড়ার তুলনা করা উচিত। সেখানকার চতুর্থ শ্রেণীর (আমাদের দেশের তৃতীয় শ্রেণী প্রকৃতপক্ষে চতুর্থ

সাইগন বন্দর

কেন-না মাঝে ইণ্টার ক্লাস আছে) ভাড়া মাইল প্রতি দুই পাইয়েরও কম এবং প্রতি টন মালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাড়া—প্রতি মাইল পাঁচ পয়সা। বলা বাহুল্য, সাধারণ মালে ভাড়া ইহা অপেক্ষা অনেক সস্তা।

বন্দর হিসাবে ইন্দোচীনে বিশেষ কিছু নাই। দক্ষিণে সাইগন, যেখানে প্রতি বৎসর ৫০০০ হইতে ৬০০০ জাহাজ আসে এবং ২৩,০০,০০০ হইতে ২৭,০০,০০০ টন বাণিজ্য-সামগ্রীর আদান-প্রদান হয়। উত্তরে হাইফং চীনদেশের নিকট বলিয়া কিছু খ্যাতি পায়। এখানে আধুনিক বন্দরের যাবতীয় ব্যবস্থার বিশেষ কিছু নাই। ১৯৩৯ সালে মাত্র ৭০৬টি জাহাজ এখানে যাওয়া-আসা করে এবং ১১,০০,০০০ টন মাল সরবরাহ হয়। উপরোক্ত দুইটি বন্দরই নদীর উপর, সাইগন মেকং নদের এবং হাইফং লোহিত নদের মোহানার কাছে। একেবারে সাগরের উপর দুইটি বন্দর স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে, প্রথমটি কাম-রান্‌হ উপসাগরে, দ্বিতীয়টি অলোম্‌গ উপসাগরে। প্রথমটিতে এখন যুদ্ধ-বহরের স্থান এবং দ্বিতীয়টি হইতে কয়লা সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। গত বৎসর ১৫,০০,০০০ টনের কয়লার কারবার এখানে হইয়াছে। ইহা ভিন্ন এরোপ্লেন ও হাইড্রোপ্লেনের ব্যবস্থা আছে। একমাত্র "এয়ার ফ্রান্স" বিমানপোতের বহর গত বৎসর ৪২৪৪ জন যাত্রী ও ৯৩ টন ডাক বহন করিয়াছে। সত্য সত্যই এদেশে যাতায়াতের ব্যবস্থায় অল্প কয় বৎসরের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের কারণ ঐ দেশের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর, জেনারেল কাত্রু, যাঁহাকে ভিসির পুত্তলিকা-গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি জার্ম্মান-বিদ্বেষী বলিয়া পদচ্যুত করিয়াছে।

এদেশের কর, শুল্ক ইত্যাদিতে ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদের গভীর ছায়া পড়িয়াছে। রেজিষ্ট্রেশন, আয়কর, ষ্টাম্প ইত্যাদিতে রাষ্ট্রের আয়ের এক-চতুর্থাংশ আসে, বাকী প্রায় সবই আমদানী-রপ্তানীর শুল্ক এবং রাষ্ট্র-করায়ত্ত দ্রব্যাদির (লবণ, তামাক, মদ, আফিং ইত্যাদির) লাভ হইতে আসে। আমদানীর দিকে শুল্কাদি এরূপে ধার্য্য করা হইয়াছে যাহাতে যতটা সম্ভব ফ্রান্স হইতেই অধিকাংশ বাণিজ্যবস্তু আসে। অন্য দেশের আমদানী অতি অল্প।

১৯১৯ সালে যুদ্ধের পর এদেশে নূতনভাবে রাষ্ট্রগঠনের চেষ্টা হয়। কৃষি ও আরণ্যসম্পদ এবং বিশেষ ভাবে ধান্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণের জন্য হানোয়া ও সাইগনে বিশেষ বিদ্যালয় ও পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়। এই দুই স্থানের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলে দেশের কৃষির বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। দেশের আয়ের প্রধানতম আকর এখনও ধানের ক্ষেত, কিন্তু ধান্য এখন আর পূর্ব্বেকার মত অপ্রতিদ্বন্দ্বী

দক্ষিণ-আনামের কাম রান্‌হ উপসাগরে ফরাসী জাহাজ

কোচিন-চীনের বিয়েন হোয়া অঞ্চলের শিল্প-বিদ্যালয়ের ছাত্রের শিল্প-নিদর্শন

নাই, যদিও দেশের শস্যক্ষেত্রের মধ্যে ১,১০,০০,০০০ একর ধানের জমি। ইন্দোচীনের রপ্তানির মালের মধ্যে মূল্য হিসাবে ১৯১৮ সালে চাউল ছিল তিন-চতুর্থাংশ। ১৯২৫ হইতে ১৯২৯ পর্য্যন্ত রপ্তানি চাউল সমগ্র রপ্তানির মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশ, এখন ইহা দুই-পঞ্চমাংশ মাত্র, যদিও পরিমাণে ইহা ১২,০০,০০০ টন হইতে ১৭,০০,০০০ টনে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশে চাউল উৎপন্ন হয় প্রায় ৬০,০০,০০০ টন। অন্য ফসলের মধ্যে ভুট্টা অনেক বাড়িয়াছে, ১৯২৪ সালে ভুট্টার দানা রপ্তানি হয় ৩৮,০০০ টন ১৯৩৮ সালে ৫,৫৬,০০০ টন। রবারের চাষ উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। গত বৎসর ৬০০০০ টন রবার রপ্তানি হয় এবং ২,৫০,০০০ একর জমিতে রবারের বাগান ছিল। ইহা ভিন্ন চা, কফি ও আকের চাষও চলিতেছে, গত বৎসর এদেশে ৩৬০০ টন কফি, ৬৩২০ টন চা এবং ৪৩,০০০ টন চিনি উৎপন্ন হয়। ইহা ভিন্ন গোলমরিচ, চীনাবাদাম, সয়াবিন, আব্রাজাঁ তৈল, রেড়ি, তামাক, শিমুল তুলা, পাট, বিঞ্জইন গঁদ, গালা ইত্যাদি অনেক কৃষি ও অরণ্যজাত পদার্থ এদেশে জন্মায় ও রপ্তানি হয়। কেবল মাত্র তুলা ও রেশম ধীরে ধীরে অবনতির পথে চলিয়াছে।

এদেশে খনিজের অনুসন্ধান ও আহরণ আরম্ভ হয় ১৮৯১ সালে, কিন্তু ১৯২০ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছুই কাজ হয় নাই। ১৯২০ সালের পর এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া

হয়। গত বৎসর ইন্দোচীনে ২৬,০০,০০০ টন কয়লা, ৫৮০০ টন দস্তা, ১৫০০ টন টিন, ৩০০ টন টঙ্গষ্টেন, ২০০ টন লৌহযুক্ত ম্যাঙ্গানিজ, ৫০,০০০ টন ফস্‌ফেট প্রস্তর এবং ১০০ কিলোগ্রাম স্বর্ণ উৎপন্ন হয়।

কলকারখানার হিসাবে দেশের এখনও বিশেষ কিছু উন্নতি হয় নাই। প্রধান শহরগুলিতে বিজলীর আলো-পাখা পৌঁছাইয়াছে, কিন্তু বিরাট জলপ্রপাতগুলি এখনও বিদ্যুৎ উৎপাদনে লাগে নাই। কয়েকটি তামাকের কারখানা, দুই-একটি সিমেন্টের কল, দেশলাইয়ের কল, তুলার কল এবং মদ-চোলাইয়ের কারখানা আছে। সম্প্রতি কাগজের কল স্থাপিত হইয়াছে এবং রেলগাড়ী-মেরামতি কারখানা বাড়ান হইয়াছে।

এক কথায় এদেশের ব্যবস্থা কৃষি ও খনিজাত কাঁচা মাল সরবরাহের। অধীন দেশে কলকারখানার আধিক্য হইলে সাম্রাজ্যবাদীদিগের অসুবিধা হয়। সুতরাং ইন্দোচীন সাম্রাজ্যবাদের স্বর্গ হিসাবে তৈয়ারী করা হইয়াছে এবং ইহাতেই বিপদের সৃষ্টি। জাপানের মত বুভুক্ষু দেশের পক্ষে এই প্রকার দেশ লাভ করা অতি সৌভাগ্যের বিষয়। এদেশের রপ্তানির মাল প্রায় সব-গুলিতেই জাপানের বিশেষ প্রয়োজন এবং ২,৪০,০০,০০০ অশিক্ষিত ক্রেতা লাভও জাপানের কলকারখানার মালিকদিগের পক্ষে বিশেষ সুবিধা। সুতরাং জাপানের ভয় ইন্দোচীনে অতিরিক্ত মাত্রায় ছিল। এখন ত শিয়রে সাক্ষাৎ যম।

জাপান ছাড়া ইন্দোচীনের শত্রুতা করিতে পারে শ্যামদেশ ও চীন। তাহার মধ্যে চীন এখন অসহায় ও ক্লিষ্ট। শ্যামদেশ এখন "থাই" দেশ নাম লইয়া থাই-ভাষা-ভাষী জনসমষ্টিকে এক করিবার চেষ্টায় আছে এবং সুবিধা বুঝিয়া এই সময়ে ইন্দোচীনের সীমান্ত পরিবর্ত্তন করাইবার জন্য দাবি করিয়াছে।

উপরের বৃত্তান্তে বুঝা যায় যে, ইন্দোচীন নামে সমগ্র ভাবে যে-রাষ্ট্রটি বুঝায় তাহার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের
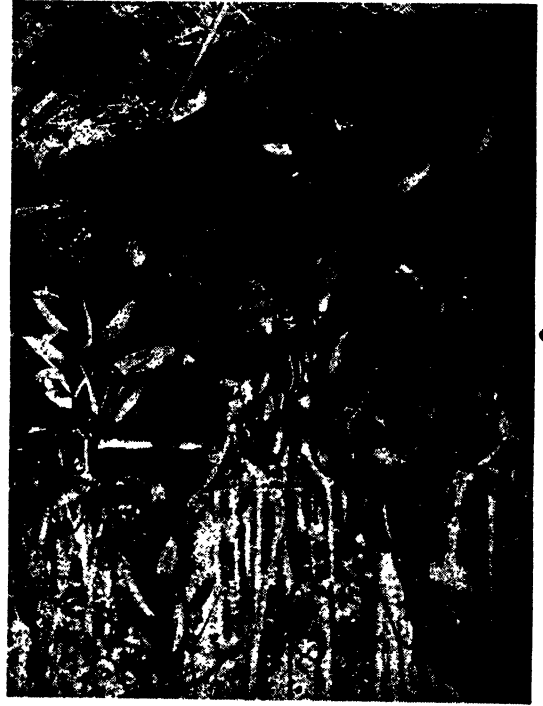
খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহৃত সুগন্ধি ভ্যানিলার বাগান।
কোচিনচীনের বিয়েন হোয়া অঞ্চল।

সকল রোগই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এক দিকে,—যথা, স্বল্পপরিসর উর্ব্বর প্রদেশে প্রচণ্ড জনসংখ্যার চাপ, সে-স্থান কঠোর পরিশ্রমী দরিদ্র কুলি-মজুরের অফুরন্ত উৎস। অন্য দিকে লোহিত নদের মোহনায় জনবিরল অথচ উর্ব্বর অঞ্চল, সেখানে বিদেশী ধনিক তাহার অর্থের সাত গুণ লাভ সহজেই পাইতে পারে, কেন না জমির মূল্য সামান্য, মজুরের পারিশ্রমিকের হার অত্যল্প। বলা বাহুল্য, আদিমনিবাসিগণের রক্ষার অজুহাত দরিদ্র চাষীকে নূতন জমি দেওয়ার বেলাতেই খাটে, বিদেশী ধনীর চা, কফি বা রবারের বাগানে কুলি-নিয়োগের সময় সে সকল স্তোতবাক্য প্রযুক্ত হয় না। খনি, রেলপথ, জলপথ, আকাশপথ সবই বিদেশীর করতলগত, সুতরাং দেশের লোকের পক্ষে ততটা উন্নতিই সম্ভব যতটা বিদেশীর পক্ষে লাভজনক। দেশের বিভিন্ন প্রদেশের লোকজনকে অতি সন্তর্পণে পৃথক রাখার ব্যবস্থাও আছে, সুতরাং বিদেশীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত অভিযানেরও কোনও সম্ভাবনা নাই

ইন্দোচীনে রবারের চাষ। রবার গাছের আঠা ছাঁকা হইতেছে।

অর্থাৎ ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদিগের গুরু রোমের "Divide et impera" (পৃথক কর এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত কর) নীতির ইহা এক সুন্দর উদাহরণ। দুঃখের বিষয় (সাম্রাজ্যবাদীদিগের পক্ষে) এই প্রাচীন রোমক নীতি এক দিকে—বাহিরে প্রবল শত্রু না থাকিলে—যেমন শাসনাধীন প্রজাকে দলন ও শোষণের উৎকৃষ্ট পন্থা,

তেমনই বাহিরের শত্রু প্রবল হইলে সে সাম্রাজ্য জয়ের পক্ষে শত্রুর অসীম সুবিধা ও সুযোগের ব্যাপার। স্বাধীন দেশ জয়কালে সে দেশের সমস্ত লোকের প্রচেষ্টা ও উদ্যমকে ভাঙিয়া তবে জয়ী হওয়া যায়, সাম্রাজ্যবাদীর অধিকৃত দেশ সম্পর্কে মুষ্টিমেয় শাসনকর্ত্তার দলকে পরাজিত করিলেই কার্য্যসিদ্ধি, বেড়া ভাঙিয়া ফলের বাগান লুট করার মত প্রথম চোটে ঢুকিতে পারিলেই হয়। ফরাসী মার্কা "সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা"র ফলে আজ ইন্দোচীনের অবস্থা এই প্রকার।

অনেকে আশা করিয়াছেন যে ইন্দোচীনে জাপান প্রবেশ করিলে যুদ্ধ-বিগ্রহ হইবে। হয়ত জেনারেল কাত্রু গবর্ণর থাকিলে হইতও, কেন-না তিনি অতিশয় তেজস্বী ও উদ্যমশীল বলিয়া খ্যাত এবং দেশের আট্‌ঘাট সকলই তাঁহার পরিচিত, সুতরাং যত দিন যুদ্ধের রসদ থাকিত তত দিন তিনি লড়িবার চেষ্টা করিতেন। এখন যিনি শাসনকর্ত্তা তিনি প্রথমতঃ, নৌ-বহরের উচ্চ কর্ম্মচারী, "জলের কুমীরে"র ন্যায় ডাঙার যুদ্ধে বিশেষ পটু নহেন, দ্বিতীয়তঃ, দেশের লোকজন সকলের নিকটেই তিনি বিশেষ অপরিচিত; সুতরাং যুদ্ধের ইচ্ছা থাকিলেও তাহার ব্যবস্থা করিতে অপারগ। দেশের লোকের না-আছে অস্ত্র না-আছে যুদ্ধে অভ্যাস (সাম্রাজ্যবাদ সফল হওয়ার ফল), কাজেই তাহারা যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লড়িবে না ইহা স্বাভাবিক।

লড়িবার ইচ্ছা থাকিলেও অস্ত্রশস্ত্র কোথায়? সাম্রাজ্যবাদের নিয়ম অনুসারে দেশে অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা নাই বলিলেই চলে। একটি এরোপ্লেন নির্ম্মাণ ও মেরামতের কারখানা টঙ্কিনে তৈয়ারী হইতেছিল, এখন তাহার ব্যবহার জাপানীরাই করিবে। এই কারখানায় ফরাসী কারিগর ও এঞ্জিনীয়রের তত্ত্বাবধানে বোধ হয় ৩০০০ ইন্দোচীনা কুলি বৎসরে ১৫০ খানি এরোপ্লেন নির্ম্মাণ এবং প্রয়োজনমত মেরামত করিতেছিল। সম্প্রতি বর্ত্তমান টঙ্কিন অঞ্চলেই বন্দুকের গুলির কারখানা, সেখানে দৈনিক ৫০,০০০ কার্ত্তুজ তৈয়ারী হইতে পারিত। ইন্দোচীনে বিদ্রোহ দমনের পক্ষে ইহা যথেষ্ট উপকরণ যোগাইতে পারিত, কেন-না নিরস্ত্র বিদ্রোহীকে দমন

করিতে দুই-চারি লক্ষ গুলীই যথেষ্ট, কিন্তু বিদেশী সশস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে এক দিনের যুদ্ধ চালাইবার উপকরণ এই কারখানায় সারা বৎসরেও হইত না। কামান বন্দুক মেসিনগান, গোলা বিস্ফোরক বোমা ইত্যাদি তৈয়ারী করার কোন ব্যবস্থাই এদেশে ছিল না, এখনও নাই। ইহাদের ভরসা ছিল সিঙ্গাপুর রুশ-জার্ম্মান বিরোধ ও ফ্রান্সের "ম্যাজিনো লাইন" নামক অচলায়তন। অলমতি বিস্তারেন।

[পল এমিল কাডিলহাক কর্ত্তৃক ফরাসী ভাষায় লিখিত বিবরণ হইতে মূল তথ্যগুলি সংগৃহীত]

ওরিয়েণ্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

এই সুপ্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানের ১৯৩৯ সালের রিপোর্ট আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কার্য্যবিবরণে দেখা যায় যে ওরিয়েণ্টাল তাহার প্রাচীন গৌরব বজায় রাখিয়া উত্তরোত্তর অগ্রগামী হইতেছে। ওরিয়েণ্টাল এতই সুপরিচিত যে তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলিয়া কেবলমাত্র তাহার হিসাব কৈফিয়ৎ দেখাইলেই যথেষ্ট হয়।

আলোচ্য বৎসরে :—

নূতন বীমা ৬০২২২টি যাহার পরিমাণ (টাকায়) •
১১,২৫,২২০৮১,

সর্ব্বশুদ্ধ চলতি বীমা ৪,০৩৩২৩টি যাহার পরিমাণ
৭৯৫৩৭৮৮০৮৲ টাকা

বীমার দাবীর পরিমাণ ১,৪৯,০৩০০০-১৩-৬
আলোচ্য বৎসরের আয় ৪,৭২,৭৬,৭৫০-২-৪—
যাহার মধ্যে বীমার প্রিমিয়াম ছিল ৩,৬৫,৪১৬৯২-১০-১০
অর্থাৎ গত বৎসর অপেক্ষা ১৫,৭৪,৪৯২-৮-১০ অধিক
আলোচ্য বৎসরের ব্যয় ২,৫৯,২৬,৫৯৩-১৫-২

অর্থাৎ ব্যয় অপেক্ষা আয়ের আধিক্যের পরিমাণ :—
২,১৩,৫০,১৫৬-৩-২

কোম্পানীর তহবীলে মোট মজুত ২৫,৩৬,১৫,৪৮০-২-১০

এই হিসাব হইতেই বুঝা যায় বীমা-জগতে ওরিয়েণ্টালের স্থিতি কিরূপ সুদৃঢ় এবং প্রগতিশীল।

দেশ-বিদেশের কথা

দাশ ব্যাঙ্কের বড়বাজার শাখা

শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশের ব্যবসাবুদ্ধি ও উদ্যোগিতার ফলস্বরূপ তাঁহার বড় বড় কল নির্ম্মাণের কারখানা, চটকল প্রভৃতি ছিল। তাহার পর তিনি দাস ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে তাহার বড়বাজার শাখা খোলা হয়। অল্পদিনের মধ্যেই তাহার কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়ের দক্ষতায় তাহা

শ্রীআলামোহন দাশ

শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায়

"আর্থিক জগৎ", "ভারত", "Indian Banking Journal" প্রভৃতি কাগজের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। বস্তুতঃ নন্দলাল বাবু তাঁহার অভিজ্ঞতা, কার্যদক্ষতা, পরিশ্রম ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার জন্য যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাহা তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য।

কৃতী শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লিখিতেছেন,

কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত ঢাকুরিয়াপল্লীতে লোকসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার ব্যবস্থা এক মহা সমস্যা হইয়া পড়ে। এখানকার ছাত্রীসংখ্যা খুব বেশী। তাহাদের শিক্ষার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বহু টাকা ব্যয় করিয়া একটি ইংরাজী বিদ্যালয় গঠন করিয়া দিয়াছেন এবং নিজেই তাহার সমস্ত খরচ নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ঢাকুরিয়ার "বিনোদিনী বিদ্যালয়" শচীন্দ্রনাথের মাতৃদেবীর স্মৃতি বহন করিতেছে এবং একটি আদর্শ বালিকা-বিদ্যালয়ে পরিণত হইতেছে। প্রবাসীর সম্পাদক এই বিদ্যালয় দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

শচীন্দ্রনাথের জীবনকাহিনী বড় বিচিত্র। নিঃসম্বল অবস্থায় এক জন দৃঢ়সঙ্কল্প কর্ম্মঠ বঙ্গযুবক অত্যন্ত দীন অবস্থা হইতে নিজ পরিশ্রম, সততা ও অধ্যবসায়বলে কিরূপে উন্নতির শিখরে সমারূঢ় হইতে পারেন, শচীন্দ্রনাথ তাহার অন্যতম দৃষ্টান্তস্থল। কলেজে পড়িবার খরচ নির্ব্বাহের জন্য ইনি কেবল গৃহশিক্ষকের কাজই করিতেন না পরন্তু আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও বৌবাজারের মোড়ে এক জন বন্ধুর সাহচর্যে একটি পানের দোকান খুলিয়া দেন। সামান্য ভাড়ায় ছোট একখানা ঘর ভাড়া করিয়া, নিজের আহার্য নিজেই রান্না করিয়া আট-দশ মাইল পথ পদব্রজে গমন করিয়া তাঁহাকে উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে হয়।

তাঁহার পরবর্তী জীবনের সংগ্রামের বৃত্তান্ত বিস্তৃত ভাবে বলিবার স্থান নাই। এক্ষণে তিনি কৃতিত্বের সহিত এবং সমুদয় কর্মীর কল্যাণের সুব্যবস্থার সহিত বেঙ্গল শেয়ার ডীলার্স সিণ্ডিকেট, এরিয়ান প্রভিডেণ্ট ইনসিওরেন্স কোম্পানী প্রভৃতি কারবারগুলি চালাইতেছেন।

বাংলায় ভ্রমণ—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীযুক্ত অমিয় বসু কর্তৃক সম্পাদিত এবং পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার-বিভাগ হইতে প্রকাশিত। মূল্য প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে দেড় টাকা মাত্র।

এই দুই খণ্ড বহিতে মোটামুটি প্রবাসীর সমান পৃষ্ঠার ৩৩১+২০০=৫৩১ পৃষ্ঠা আছে, এবং বিস্তর ছবি আছে। কাগজ পুরু ও উৎকৃষ্ট এবং ছাপা পরিপাটী। দুই খণ্ডই মোটা পাটায় বাঁধান। সুতরাং দাম খুব সস্তা বলিতে হইবে। ইহা নিশ্চয়ই হুহু করিয়া বিক্রী হইবে। কারণ, ইহা বহু তথ্যপূর্ণ, চিত্তাকর্ষক এবং ভ্রমণকারীদের সহায়ক। ইহা পড়িলে বাংলা দেশ দেখিতে পাঠকের ইচ্ছা হইবে। ইহাতে প্রথম সংস্করণে শুধু পূর্ববঙ্গ রেলপথে গিয়া বঙ্গের যে অংশ দেখা যায়, তাহারই বর্ণনা ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে সমগ্র বাংলার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। "পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশগুলির যে যে অংশে বহু বঙ্গভাষাভাষীর বাস আছে এবং বাংলার সহিত যাহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে, বাঙালী ভ্রমণকারীর সুবিধার জন্য এই পুস্তকে তাহাদেরও স্থান দেওয়া হইয়াছে। রেলপথের নিকটবর্ত্তী স্থান ব্যতীত রেলষ্টেশন হইতে মোটর বাস্, ষ্টীমার বা নৌকাযোগে যে-সকল প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন স্থানে যাওয়া যায় তাহাদের বিবরণও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে।" ইহাতে ইতিহাস ও কিংবদন্তী উভয়েরই স্থান দেওয়া এবং কিংবদন্তীকে সমধিক প্রাধান্য দেওয়া ঠিকই হইয়াছে।

অনেক প্রামাণিক বাংলা ও ইংরেজী পুস্তকের সাহায্য লইয়া এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। সম্পাদক লিখিয়াছেন, "এই পুস্তক পাঠে যদি বাঙালীর নিজের ঘরের খবর লইবার কিছু আগ্রহ ও উৎসাহ হয়, তাহা হইলে এই উদ্যম সার্থক হইবে।" আমাদের বিশ্বাস, উদ্যম সার্থক হইবে।

ইহা সমুদয় রেলওয়ে বুকষ্টলে প্রাপ্তব্য। ড.

ছেলেবেলা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শোভন কাগজের মলাট দেড়টাকা, দেশী রেশমে বাঁধাই দুই টাকা।

এই নবরচিত ও সদ্যপ্রকাশিত আত্মজীবনস্মৃতির প্রসঙ্গে "জীবনস্মৃতি"র কথা স্বভাবতই মনে পড়ে। "সরোবরের সঙ্গে ঝরণার যে তফাৎ", "জীবনস্মৃতি"র সহিত "ছেলেবেলা"রও সেই প্রভেদ—ভূমিকায় কবি এইরূপ লিখিয়াছেন; "সে হোলো কাহিনী এ হোলো কাকলী।" আরও একটি তুলনা দিয়া দুইটি বইয়ের প্রভেদের কথা বলা চলে; "জীবনস্মৃতি"কে ওস্তাদ শিল্পীর আঁকা রেখাচিত্রের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে; সুষম ও প্রাণবান্ রেখার দ্বারা সে-ছবি বর্ণবাহুল্যের প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া আমাদের মনকে স্তব্ধ করিয়া রাখে। "ছেলেবেলা"র ছবিগুলি বর্ণছটায় বর্ণাঢ্যতার বৈচিত্র্যে আমাদিগকে মুগ্ধ করে।

"জীবনস্মৃতি"তে কবি আপনার একান্ত আনন্দ-বেদনার বহু স্মৃতিকে একরূপ নেপথ্যেই রাখিয়া দিয়াছেন; "ছেলেবেলা"র "সহজ, যথাসম্ভব ছেলেদেরই ভাবনার উপযুক্ত" ভাষায়, "চারি দিকে অশ্রুজলের স্ফটিক দিয়া বাঁধাইয়া" রাখা বহু ছবি ক্ষণে ক্ষণে তিনি মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের দেখিতে দিয়াছেন; সে অশ্রুজল অন্তঃসলিলা, কিন্তু লঘুহাস্যের বালুকায় তাহা একেবারে চাপাও পড়িয়া যায় নাই—এক-এক স্থানে, বোধ হয় রচয়িতার অজ্ঞাতসারেই, বর্ণনা কাব্যের পর্য্যায়ে আসিয়া পড়ে—

"আমাদের ঐ বটগাছটাতে কোনো কোনো বছরে হঠাৎ বিদেশী পাখি এসে বাসা বাঁধে। তাদের ডানার নাচ চিনে নিতেই দেখি তারা চলে গেছে। তারা অজানা সুর নিয়ে আসে দূরের বন থেকে। তেমনি জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড়ো ক'রে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে, শেষকালে একদিন ডেকে পাওয়া যায় না। চলে যেতে যেতে বেঁচে থাকার চাদরটার উপরে ফুলকাটা কাজের পাড় বসিয়ে দেয়, বরাবরের মতো দিনরাত্রির দাম দিয়ে যায় বাড়িয়ে।"

বার্ষিক শিশুসাথী—পঞ্চদশ বর্ষ, ১৩৪৭—শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, ও ৩৮ জনসন রোড, ঢাকা। পৃ. ২১৪। মূল্য দেড় টাকা।

এই বৎসরের 'বার্ষিক শিশুসাথী' অন্যান্য বৎসরের ন্যায় সুমুদ্রিত ও চিত্তাকর্ষক রচনায় সুসমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীসুখলতা রাও, শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী, শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি লেখকগণের ৭০টি বিভিন্ন বিষয়ের গল্প কবিতা প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়াছে। বিষয়-বৈচিত্র্যে বইখানি ছেলেমেয়েদের আদরণীয় হইবে।

লেখকদের ছবিতে বইখানির আকর্ষণ বাড়িয়াছে মনে হয় না।

স.

রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ—শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণধন সিংহ, ১১ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা।

পারসীক কবি হাফিজের নাম সাহিত্যজগতে সুপরিচিত হইলেও ফরাসী ভাষা সাধারণ বাঙালী পাঠকের অনধিগম্য। বাংলা ভাষায় হাফিজের এই পদ্যানুবাদ মূল কবিতার সৌন্দর্য্য ও মর্ম্মার্থ গ্রহণে পাঠককে সাহায্য করিবে।

সাহিত্যক্ষেত্রে কবি মধুসূদন সম্ভবতঃ নবাগত। ছন্দের দিক হইতে তাঁহার কান এখনও সম্পূর্ণ ঠিক হয় নাই এবং ভাষার সমতাও সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় নাই। এই ত্রুটি সংশোধিত হইলে কবির ভবিষ্যৎ আশাপূর্ণ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ভগ্নাংশ—জগৎ দাশ ও সন্তোষকুমার ঘোষ। প্রকাশক—বিমল গুপ্ত, ৪ মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ১১০। মূল্য ১।০।

আলোচ্য পুস্তকখানি ছোট গল্পের বই। দুই জন লেখকের লেখা মোট সাতটি গল্প আছে। লেখকদ্বয় নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থার চাপে নিষ্পিষ্ট নরনারীদের দেখিতে চাহিয়াছেন। লেখকদ্বয়ের ভাষা সতেজ ও সাবলীল। যে সমাজ ও জীবন লইয়া ইঁহারা লিখিয়াছেন, পড়িয়া মনে হয় সে-জীবনের সঙ্গে ইঁহাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে। জগৎ দাশের 'পতিতা ও পতিদেবতা' গল্পটি এই বইয়ের শ্রেষ্ঠ গল্প।

বাগিচার কুলি—শ্রীলাবণ্যকুমার চৌধুরী। প্রকাশক—ডি. এম. লাইব্রেরি, ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১।০।

লেখক ইতিপূর্ব্বে 'অন্ধের বাঁশী' নামক উপন্যাস লিখিয়া পাঠক-সমাজে খ্যাতি ও সমাদর লাভ করিয়াছেন। এখানি তাঁহার দ্বিতীয় উপন্যাস—এখানিতেও তাঁহার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ আছে। ইহাতে চা-বাগানের কুলিমজুরের জীবনকাহিনী অতি নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। ঘটনা সৃষ্টি করিবার ও পাঠকের কৌতূহলকে ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা কথাশিল্পীর খুব বড় পুঁজি—লেখকের সে ক্ষমতা আছে। চরিত্রচিত্রণ হিসাবে ফুলমণির চরিত্র একেবারে জীবন্ত।

সবার সাথে—শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক—বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ২২২। মূল্য ২৲।

লেখক বাংলা কথা-সাহিত্যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার এ বইখানি ছোট গল্পের বই। সব গল্পগুলিই বস্তুতান্ত্রিক। এ-ধরণের গল্পে রস জমাইতে যে মুন্সিয়ানার প্রয়োজন হয়, লেখকের তাহা যথেষ্ট পরিমাণেই আছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিলালিপি—শ্রীমণীশ ঘটক। কলিকাতা, ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, কবিতা-ভবন হইতে প্রকাশিত। দাম দুই টাকা।

কবিতার বই। 'শিলালিপি'র নামচিত্র শিল্পী নন্দলাল বসুর আঁকা। বইখানি সৌষ্ঠবময়। উনচল্লিশটি কবিতা আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি ছন্দযুক্ত এবং কতকগুলি গদ্য-কবিতা। ছন্দমুক্ত হইলেও গদ্য-কবিতাগুলি বেপরোয়া নহে, এবং ছন্দযুক্ত হইলেও পদ্য-কবিতাগুলি গতানুগতিক নহে। কবিতাগুলিতে শিলালিপির স্তব্ধতা স্থিরত্ব নাই, প্রবাহিত জীবনের আবেগ ও ঝঙ্কার আছে।

স্মরণ অতীত সময়ের অভিশাপে
পাষাণ-শয়নে নিথর প্রহর যাপে
প্রস্তরীভূতা ঝঙ্কার ঝঞ্জনা।

'অহল্যা' কবিতাটিকে বেদনা-মুখর করিয়াছে। প্রতীক্ষাতুরা 'শবরী' বলিতেছে,

নির্দ্দেশহীন নিরুদ্দেশের লাগি
আর কতকাল রহিবে শবরী জাগি?

শুকতারা', 'অনূঢ়া', 'দুর্য্যোগ', 'একটি কথা', 'একমাত্র', 'চিলেকোঠা' প্রভৃতি কবিতাগুলির মধ্যে নূতনত্ব আছে। ছন্দযুক্ত কবিতাগুলি মনকে আনন্দ দান করে।

তন্বী তোমার তনুর পরশ লাগি
তন্দ্রাভঙ্গে উঠিল অতনু জাগি।

অথবা

দেহের সুরা করেছি পান, খুঁজিয়া বিদেহীরে
অলীক ক্ষোভে, অতৃপ্তিতে, যাই নি আমি ফিরে।

অথবা

দেহের শ্মশানে মোহেরে আহুতি দিয়া
প্রেম বিনিময়ে প্রাণ আহরিনু প্রিয়া?

অথবা

আজি কি তাহারে পড়ে মনে,
সতীদেহ স্কন্ধ'পর বুকে অনির্ব্বাণ ঝড়, জন্ম-যাযাবর সেই জনে?

ইহাদের সরসতা উপভোগ্য। 'শিলালিপি' কাব্যপ্রিয় পাঠকের প্রিয় হইবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

লেখা—শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ, এম্-এ, পিএইচ-ডি প্রণীত। প্রবন্ধ-গ্রন্থ। পৃষ্ঠসংখ্যা ২৩৭। গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—৯, সত্যেন দত্ত রোড এবং রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ বাঙ্গালী পাঠক সমাজে সুপরিচিত। ইঁহার নিজ নামে এবং 'ভাস্কর' এই ছদ্মনামে প্রকাশিত ইঁহার প্রবন্ধ ও অন্য রচনা মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠে দেখিলেই আমরা সকলে আগ্রহ সহকারে পড়িয়া থাকি। 'বীরবল,' 'পরশুরাম' ও 'বনফুল'-এর লেখার মত 'ভাস্কর' এই ছদ্মনাম দেওয়া লেখা পাইলে আমরা তাহাতে যে নূতন কিছু পাইব—চিন্তার দিক্ হইতে এবং নিরাবিল হাস্যরসের দিক্ হইতে,—সে বিষয়ে আমাদের সকলেরই একটা সানন্দ ও সাগ্রহ আশা থাকে, এবং সাধারণত সে আশার পূরণও হইয়া থাকে। প্রস্তুত পুস্তকে জ্যোতির্ম্ময় বাবুর ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত ও নানা পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত বত্রিশটি প্রবন্ধ একত্র করিয়া বাঙ্গালী সাহিত্যরসিকগণের সমক্ষে ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাজের প্রবন্ধ ও খেয়ালের বা হাসির প্রবন্ধ, এই দুই শ্রেণী ধরিয়া লেখক এগুলিকে যথাক্রমে "বৈষয়িকী" ও "কাল্পনিকী" এই দুই ভাগে বিন্যস্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগ দেখিয়া এরূপ মনে করা ভুল হইবে যে "বৈষয়িকী" পর্য্যায়ের প্রবন্ধগুলি নিছক গুরুগম্ভীর কাজের কথায় ভরা, এবং "কাল্পনিকী"র রচনাগুলিতে কেবল হাসাইবার অথবা কল্পনার ঘুড়ি উড়াইবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নাই। অন্যান্য কোন কোন প্রথম শ্রেণীর লেখকের মত গ্রন্থকার an idle singer of an empty day নহেন—তিনি ভাবুক এবং চিন্তাশীল, এবং তাঁহার চারি দিকে যে প্রবহমান জীবন বিদ্যমান তাহার সম্বন্ধে তাঁহার কৌতূহল ও অনুকম্পা অসীম। নিজেকে সেই জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া কেবল সাহিত্যবিলাসী হইবার মনোভাব তাঁহার নয়। সেই জন্য সেই জীবনের সঙ্গে, সুখদুঃখ হাসি-কান্নায় পরিপূর্ণ নিজের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে পূরা সহানুভূতি অনুভব করিয়া, তিনি ইহার মধ্যে যে সমস্ত অসামঞ্জস্য, যে সমস্ত অনুপপত্তি দেখিতে পাইতেছেন, যে দুঃখের দৃশ্য তাঁহাকে পীড়িত করিতেছে, সেগুলিকে তিনি লঘু তুলিকাপাতে অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রবন্ধগুলিতে বাঙ্গালীর শিক্ষা, বাঙ্গালীর ভাষা, বাঙ্গালীর সমাজ, বাঙ্গালীর জীবনে প্রাচীন ও নবীনের সংঘাত, বাঙ্গালীর ঘরের দুঃখদারিদ্র্য ও তাহার মধ্যে বাঙ্গালী মেয়ে ও পুরুষের স্বার্থত্যাগ ও আত্মবলিদান—এই সব বিষয়ের অবতারণা এক অভিনব ভঙ্গীতে পাওয়া যাইবে। জ্যোতির্ম্ময় বাবুর "বাংলেংরাজী ব্যাকরণ", "কলিকাতার মোহ", "অনৃত-সংহিতা", "স্ত্রী", "বঙ্কিমের মৃত্যু", "সামনের মাসে", "মডার্ণ ফুলশয্যা", "ছাদ", প্রভৃতি কতকগুলি সুপরিচিত রচনা এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে। সদালাপের মূল্যবান্ ভাণ্ডারস্বরূপ এই পুস্তক পাঠ করিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালী পাঠক আনন্দলাভ করিবেন, এবং সহৃদয় পাঠক হয়তো নিজের মনের কথার প্রতিধ্বনি পাইয়া জ্যোতির্ম্ময়বাবুর লেখনী-ধারণের সার্থকতা উপলব্ধি করবেন।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীরমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
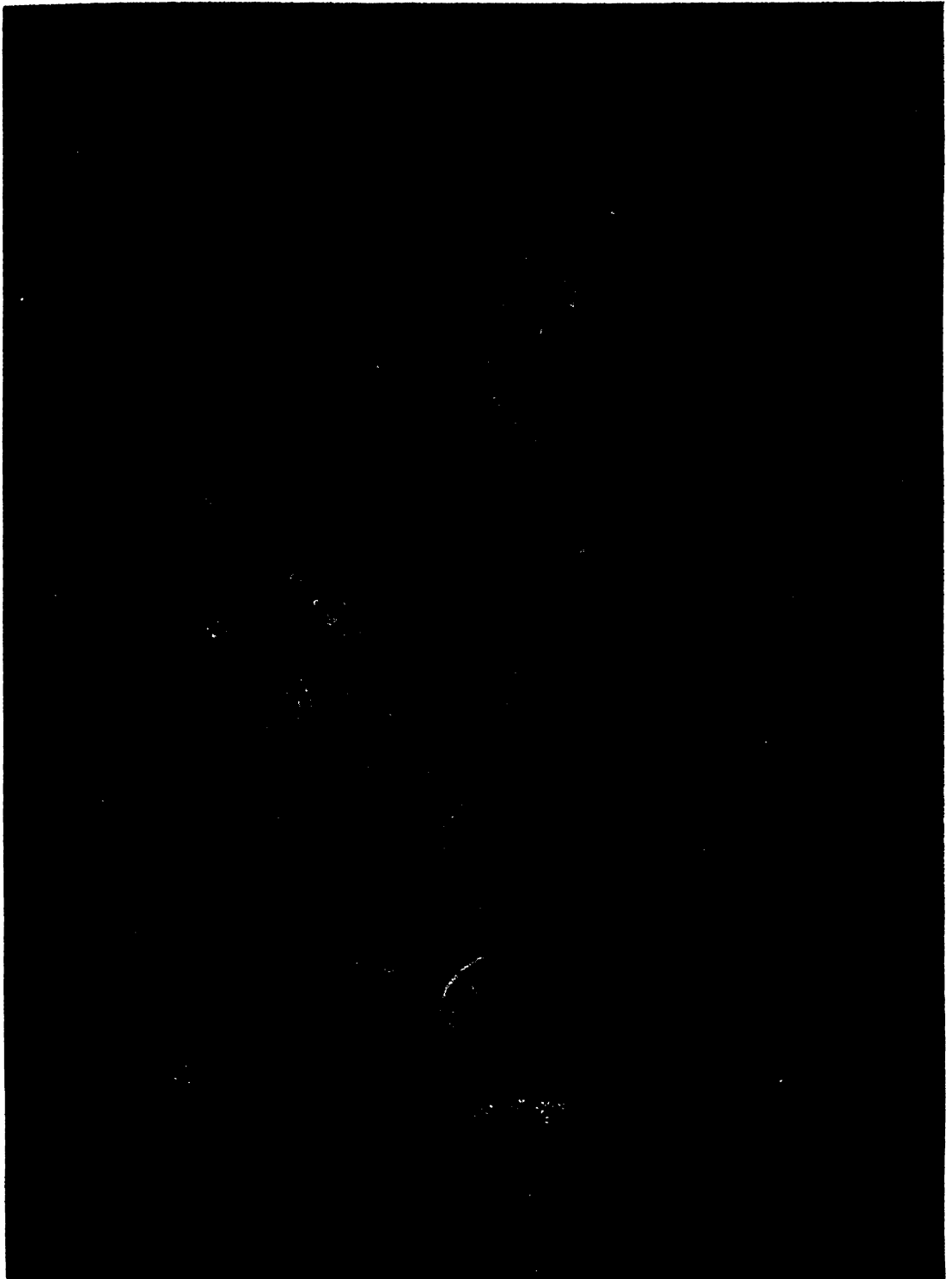
বুদ্ধ ও পূজারিণী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

সারদাচরণ উকীল
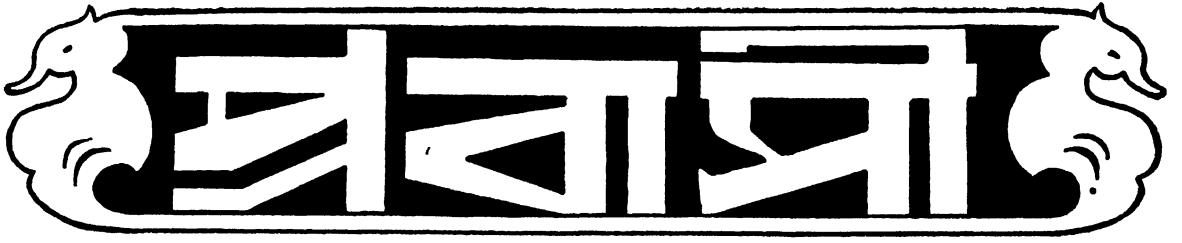
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪০শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭

২য় সংখ্যা

জপের মালা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একা বসে আছি হেথায়
যাতায়াতের পথের তীরে
যারা বিহানবেলায় গানের খেয়া
আনল বেয়ে প্রাণের ঘাটে
আলোছায়ার নিত্যনাটে
সাঁঝের বেলায় ছায়ায় তারা
মিলায় ধীরে।

আজকে তারা এল আমার
স্বপ্নলোকের দুয়ার ঘিরে
সুরহারা সব ব্যথা যত
একতারা তার খুঁজে ফিরে।
প্রহর পরে প্রহর যে যায়
বসে বসে কেবল গণি
নীরব জপের মালার ধ্বনি
অন্ধকারের শিরে শিরে॥

জোড়াসাঁকো
৩০ অক্টোবর, ১৯৪০

[রোগমুক্তির পর লিখিত সর্বপ্রথম কবিতা]

ঋণশোধ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অজস্র দিনের আলো
জানি একদিন
দু-চক্ষুরে দিয়েছিলে ঋণ।
ফিরায়ে নেবার দাবি জানায়েছ আজ
তুমি মহারাজ।
শোধ করে দিতে হবে জানি
তবু কেন সন্ধ্যাদীপে
ফেল ছায়াখানি।
রচিলে যে আলো দিয়ে
তব বিশ্বতল
আমি সেথা অতিথি কেবল।
হেথা হোথা যদি পড়ে থাকে
কোনো ক্ষুদ্র ফাঁকে
নাই হোলো পুরা
সেটুকু টুকুরা
রেখে যেয়ো ফেলে
অবহেলে
যেথা তব রথ
শেষ চিহ্ন রেখে যায়
অন্তিম ধুলায়
সেথায় রচিতে দাও আমার জগৎ।
অল্প কিছু আলো থাক।
অল্প কিছু ছায়া
আর কিছু মায়া।
ছায়াপথে লুপ্ত আলোকের পিছু
হয়ত কুড়ায়ে পাবে কিছু।
কণামাত্র লেশ
তোমার ঋণের অবশেষ

জোড়াসাঁকো
৩ নভেম্বর, ১৯৪০

ধর্মের অপমান

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

প্রায় চারি শত বৎসরের কথা। তখন মথুরায় গোকুলে শ্রীমদ্‌ বল্লভাচার্য তাঁহার বৈষ্ণব সাধনা প্রচারে প্রবৃত্ত ছিলেন। বল্লভাচার্যের পুত্র গোস্বামী বিঠ্‌ঠলনাথও সমর্থ সাধক ছিলেন। বিঠ্‌ঠলনাথজীর পুত্র শ্রীগোকুলনাথজী তাঁহাদের সম্প্রদায়ের ভক্তগণের বিষয়ে চৌরাশি বৈষ্ণব-বার্তা ও ২৫২ বৈষ্ণববার্তা গ্রন্থ লিখিয়া (১৫৬৮ খ্রীঃ) তখনকার দিনের সুন্দর একটি চিত্র আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। গোস্বামী বিঠ্‌ঠলনাথজীর সময়ে মথুরায় যেমন বৈষ্ণব ভাবের জাগরণ হইয়াছিল তেমনই সাধারণ লোকের মধ্যে বৈষ্ণব ভাবের বিরুদ্ধ-আন্দোলনও বেশ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সব বিরুদ্ধদলের খবরও গোকুলনাথজীর গ্রন্থেই মেলে। মথুরায় চৌবে অর্থাৎ চতুর্বেদীয় পাণ্ডা পুরোহিতের দল। তাঁহারা এই সব নূতন দলের অভ্যুদয় ও প্রভাবকে খুব ভাল নজরে দেখিতে পারেন নাই। না পারিবারই কথা। এই রকম গুটিকয়েক বৈষ্ণব বিরোধী চৌবে যুবকদিগের দলপতি ছিলেন ছীত চৌবে।

ছীতজীর দলের লোকদের সকলেরই মনে মনে এই প্রশ্নটি ছিল যে, "বল্লভ ও বিঠ্‌ঠলের মধ্যে কিছু একটা মোহিনী শক্তি আছে না কি? তাঁহাদের কাছে যে যায় সে-ই তো দেখি বনিয়া যায় বৈষ্ণব, আর তো তাঁহাদের কাছ হইতে ফিরিয়া আসে না! ইহার হেতুটা কি? আচ্ছা, আমরাই একবার নিজেরা দেখিয়া আসি না কেন?"

বল্লভাচার্যজীর প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের নাম শ্রীনাথজী। গোবর্ধন পর্বতের উপর শ্রীনাথজীর মন্দির। সেখানে যে যায় সে-ই অন্তত টাকা ও নারিকেল ভেট লইয়া যায়। ছীতজীরা বল্লভবিরোধী হইলেও নারায়ণ বিগ্রহকে একেবারে না মানিয়া তো পারেন না। সামাজিক দৃষ্টি ও লোকলজ্জাও তো আছে। তাই যাইবার সময় শ্রীনাথজীর জন্য অগত্যা একটি অচল টাকা ও একটি পচা নারিকেল ভেট লইয়া গেলেন।

এইরূপ ভেট দিয়াও ছীতজী সেখানে অত্যন্ত স্নেহের সহিত গৃহীত হইলেন। তাহার পর বিঠ্‌ঠলনাথজীর যে মহত্ত্ব দেখিলেন তাহাতে ছীতজীর হৃদয় পরিবর্তিত হইয়া গেল, তিনি একেবারে নবজীবন লাভ করিলেন। ছীতজী মনে করিয়াছিলেন দেখা করিয়াই চলিয়া যাইবেন কিন্তু এখানে আসিয়া তাঁহার আর ফিরিয়া যাইবার মন রহিল না।

তাঁহার সঙ্গীরা ভিতরে যান নাই, তাঁহারা বাহিরেই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা ছীতজীর জন্য বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা লোক-মারফৎ ছীতজীকে খবর দিলেন, "তোমার বন্ধুরা বাহিরে তোমার জন্য যে বসিয়া আছে, সে-কথা কি ভুলিয়াই গিয়াছ?"

লোকের মুখে বন্ধুদের এই বার্তা শুনিয়া ছীতজী বাহিরে আসিলেন এবং বন্ধুদের বলিলেন, "ভাই, ইঁহাদের প্রেমে মোহিনীশক্তি আছে। যদি তোমরা সম্মোহিত হইতে না চাও তবে এখনই এখান হইতে দূরে পলাও। আমি তো ভাই একেবারে সম্মোহিত হইয়াছি! আমি এইখানে চিরদিনের মত বাঁধা পড়িয়াছি!"

এমন কথা শুনিয়া ঐ সব বন্ধুরা আর তিলমাত্র সেখানে অপেক্ষা না করিয়া পলাইলেন। ছীতজী এই যে শ্রীনাথ-জীর আশ্রয় নিলেন আর সেখান হইতে এ পথে বাহিরে আসিবার বাসনা তিনি একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। জীবনে-মরণে শ্রীনাথের চরণে আপনা বিকাইয়া ছীতজী গোবর্ধনেই পড়িয়া রহিলেন।

ছীতজীর পরিবার ছিল মথুরার মধ্যে বিশেষ সম্মানের পাত্র। ইঁহারা বিখ্যাত বীরবলের কুলপুরোহিত ছিলেন। বীরবল আবার বল্লভী দলকে পছন্দ করিতেন না। ছীতজী যখন সেই দলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন তখন তাঁহার সঙ্গে

বীরবলের চিরদিনের মত ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। বীরবল তর্ক করিলে ছীতজীও বীরবলকে নিঃসঙ্কোচে আপনার মনের ভাব জানাইয়া দিলেন।

ছীতজীর এই স্বাধীন বেপরওয়া ভাব দেখিয়া বীরবল কিছু ক্ষুন্ন হইলেন। এক দিন বীরবল কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার সঙ্গে ছীতজীর এই সব মনোমালিন্যের কথা সম্রাট্ আকবরকে বলিয়াছিলেন। সম্রাট্ বলিলেন, "দেখ বীরবল, যাহার অন্তরে কোনো লোভ বা ভয় নাই সে কেন তাহার অন্তরের সত্য ভাব তোমাকে জানাইতে ডরাইবে? সে তো তোমার কাছে কিছু প্রত্যাশা করে না!" আকবরের কথায় বীরবল খুশী হইলেন না। কিন্তু কি আর করিবেন, অগত্যা চুপ করিয়া রহিলেন।

গোকুল-অষ্টমীর সময় মথুরাতে ও গোবর্ধন পর্বতে বিশেষ উৎসব হয়। বীরবল একবার বাদশাহের কাছে ছুটি লইয়া সেই উৎসবে মথুরাতে আসিলেন। বাদশাও উৎসবদর্শনার্থী হইয়া ছদ্মবেশে মথুরায় আসিলেন। বাদশা গোবর্ধন পর্বতে গেলেন। গোসাঁই বিঠ্ঠলনাথজী ছাড়া আর কেহ তাঁহাকে সেখানে চিনিতে পারেন নাই। এই উৎসবে ছীতজী মন্দিরে বসিয়া কীর্তন করিতেছিলেন। সেদিনকার উৎসবে ভক্তগণের সঙ্গে ঠাকুরও আসিয়া যে ভক্তদের খেলায় যোগ দিলেন, এই লীলা দেখিলেন ছীতজী আর দেখিলেন সম্রাট্ আকবর। বীরবলের মন অনুকূল না হওয়ায় তিনি ইহার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার কৃপা না হইলে কে কবে তাঁহার লীলানন্দ দেখিবার অধিকারী হইতে পারে?

শ্রীনাথজীর শরণ লইবার আগে ছীতজীর সাংসারিক অবস্থা ভালই ছিল। কিন্তু তিনি তো সবই ছাড়িয়া দিয়া আসিলেন। তাহাতে ছীতজীর বড়ই আর্থিক দুঃখদুর্গতি উপস্থিত হইল। আপন আর্থিক কৃচ্ছ্রতার কথা তিনি কখনও কাহাকেও জানান নাই। তবু বিঠ্ঠলনাথজী মনে মনে তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন এবং কিসে তাহার প্রতীকার করা যায় তাহার চিন্তা করিতেন।

এই সময়ে পঞ্চনদ প্রদেশ হইতে বিঠ্ঠলজীর কয়েক জন ধনী ভক্ত শুরু ও শ্রীনাথজীর দর্শনে মথুরায় আসিলেন। বিঠ্ঠলজী এক দিন তাঁহাদিগকে বলিলেন, "দেখ, ভগবান্ তোমাদের যথেষ্ট ঐশ্বর্য তো দিয়াছেন; তোমরা আমাদের অকিঞ্চন ভক্ত ছীতজীর একটু খোঁজখবর লইও।"

কথাটা ক্রমে ছীতজীর কানে আসিয়া পৌঁছিল। ছীতজী এই কথাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বিঠ্ঠলনাথজীকে বলিলেন, "গুরুজী, আপনি বলেন কি? আমি কি কোনো সুবিধা আদায় করিবার জন্য এই বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি? ধর্ম কি সম্পদ ও সুবিধার মূল্যে বিক্রয় করিবার বস্তু? স্বার্থ ও লোভ হইতে মুক্ত বলিয়াই তো ধর্ম বস্তুটি সর্বজনমান্য। ধর্ম নিঃস্বার্থ বিশুদ্ধ বলিয়াই তো আমাদিগকে ইহলোকে ও পরলোকে যথার্থ আশ্রয় দিতে সমর্থ। এই ধর্মকেও যদি স্বার্থ-সিদ্ধির উপায় করিয়া লওয়া যায় তবে তাহার চেয়ে দুর্গতি আর কিই বা হইতে পারে? প্রেম বস্তুটি নিঃস্বার্থ বলিয়াই সতীর এত গৌরব। সেই প্রেমকেই যদি পণ্য বস্তু করা যায় তবে তাহাতে আর বেশ্যাতে প্রভেদ কি? ধর্ম ও সম্প্রদায়ের নামে যে মানুষ কোনো বিশেষ সুখসুবিধা আদায় করিতে চায় সে অতি হীন-অভাজন। যে এমনভাবে ধর্ম বিক্রয় করিতে পারে সে যে বেশ্যারও অধম। তাহার অপেক্ষা ধর্মদ্রোহী আর কি কেহ আছে? আপনি ভাগবত মানুষ, আপনি আমার গুরু, আপনি কি আমার বিষয়ে এমন কথা বলিতে পারেন?"

বিঠ্ঠলনাথজী এই কথাতে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। তিনি সরল ধার্মিক জন ছিলেন বলিয়াই লজ্জিত হইলেন। তিনি যদি এখনকার দিনের বিদ্যাবুদ্ধি পাইয়া বিচক্ষণ হইতেন তবে এই কথায় তাঁহার বিন্দুমাত্র লজ্জা হইত না। আমরা তো কথায় কথায় ধর্ম ও সম্প্রদায়ের নামে সুবিধার পর সুবিধা আদায় করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া বেড়াই। এই বিষয়ে আমাদের তর্ক ও যুক্তিই কি কম? আমাদের বুদ্ধি তো কুশাগ্র হইতে তীক্ষ্ণ! অভাব যা তাহা হইল যথার্থ ধর্মবোধের। আজ সত্যই যদি আমাদের অন্তরে সাচ্চা ধর্মবোধ থাকিত তবে আমরা নিজেদের এই দুর্গতি দেখিয়া নিজেরাই লজ্জায় মরিয়া যাইতাম। আমরা কথায় কথায় ক্ষুব্ধ হই এই ভাবিয়া যে অন্যে বুঝি আমাদের ধর্মের অপমান করিতেছে! কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে ধর্মকে বাহির হইতে কিছুতেই তত আঘাত ও অপমান করা যায় না যত আঘাত করা যায় নিজেদের হীন ও অযোগ্য আচরণের দ্বারা। ভিতর হইতে ধর্মকে যেরূপ অপমান করা যায় বাহির হইতে সেইরূপ করা অসম্ভব।

একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে ছীতজী তখনকার দিনের প্রধান আটজন ভক্ত কবিগণের অর্থাৎ "অষ্টছাপের" মধ্যে একজন প্রধান কবি। এত গভীর ও মধুর সাহিত্য-ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াও এইরূপ দুঃখ-দারিদ্র্য বরণ করিয়া লওয়া অল্প সামর্থ্যের পরিচয় নহে।

বয়ঃসন্ধি

শ্রীতারাপদ রাহা

শ্রীমান্ সুকোমল বড় হইয়াছেন।

আর কেহ সে-কথা স্বীকার করিবেন কি না জানি না, কিন্তু মাণিক ওরফে শ্রীমান্ সুকোমলকান্তি রায়ের কিছু দিন হইতে কি করিয়া বিশ্বাস হইয়াছে—তিনি বড় হইয়াছেন।

সুলতা ত ব্যাপার দেখিয়া হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পায় না। পূজার ছুটির আগে এক দিন মাণিক স্কুল হইতে অনেক দেরী করিয়া আসিল। কি সব আবৃত্তি গান-বাজনা নাকি হইবে তাহারই মহলা হইতেছিল। যথাসময়ে মাণিক না আসাতে সুলতার সে কি উদ্বেগ!… সারা গা তার ঘামিয়া উঠিল। স্বামী বিমলকান্তির সেদিন কলেজ হইতে ফিরিতে দেরী হইবে। বাড়ীর চাকর অমূল্য পূজার কাপড় লইয়া বাগবাজারে গিয়াছে। সুলতা ছটফট করিতে লাগিল, এক বার ঘর এক বার বাহির;—কখনও বা জানালায় আসিয়া দাঁড়ায়।… ও কে যায়—শচীন না!… বাবা শচীন, শোন।—না শচীন শুনিল না, সে অনেকটা দূরে। সুলতা আরও জোরে ডাকিবে না কি?

না, ডাকিতে আর হইল না: ঐ যে মাণিক আসিতেছে। মাণিক না হইলে চলিবার এমন ভঙ্গী কার? হাত দুটি দুলাইয়া, স্যাণ্ডেল দুটি পায়ের আগে আগে চালান দিয়া, জামার বোতাম খুলিয়া এমন অদ্ভুত ভঙ্গীতে আর কার দুলাল আসে? সুলতার মুখখানা খুশীতে ভরিয়া উঠিল, বুকটা তাহার তখনও কাঁপিতেছে। মাণিক এবার কাছে আসিয়া গিয়াছে। আহা, মুখখানা একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। সুলতা ফটকের কাছে আগাইয়া গেল।

—আমার সোনা কই, এই যে আমার সোনা, এত দেরী করতে হয়, বাপ! …পথের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ আমার ঠিক্‌রে গেল। এস একটু আদর করি—

সুলতা মাণিককে জড়াইয়া ধরিয়া চুমু খাইতে গেল। মাণিক সন্ত্রস্ত হইয়া এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল—ছাড়ো, ছাড়ো দেখবে ওরা! তার পর মায়ের বাহুপাশ হইতে জোর করিয়া মুক্ত হইয়া ছুটিয়া ঘরে পলাইল।

শহরতলীতে বাড়ী। বাড়ীর সুমুখ দিয়া একটি ছোট গলি, আশেপাশে দু-চারিখানি ঘর। দেখিলে অবশ্য দু-এক জন দেখিতেও পারে, কিন্তু দেখিলেই বা কি! তাহার ছেলেকে সে আদর করিবে, তাহাতে লজ্জা কি!… তাহার ছেলে, নিজের পেটের ছেলে, একমাত্র ছেলে!

সুলতার বুকে যেন একটা ধাক্কা লাগিল। ঘরে আসিয়া সে বলিল—হাঁ রে বাবলু, আমি আদর করতে গেলে তোর লজ্জা লাগে?

মণিক জামা ছাড়িতেছিল—জামার মাঝেই মুখখানা রাখিয়া বলিল—জানি নে যাও—

—জানিস নে কি রে—ঠিক ক'রে বল।

—সবার সামনে তুমি অমনি করবে কেন?

—আমি যে তোর মা!

—মা হ'লেই বুঝি সবার সামনে—অমনি—

—ওঃ তোমার অপমান হয় বুঝি?

—অপমান হয় বুঝি!…অপমানের কথা কে বলছে? …আর, মা, তোমায় একটা কথা বলে রাখছি, সবার সামনে তুমি অমনি বাবলু মাণিক—ও-সব বলো না… ছেলেরা সব ঠাট্টা করে। মানুষ দেখলে তোমার যেন আরও জিদ বেড়ে যায়, বাব্‌লু মাণিক বলার ধুম পড়ে যায়!… কেন—ছেলেদের সামনে সুকোমল বলতে পার না?

সুলতা মাণিকের কথা শুনিয়া বিহ্বল হইয়া তাকাইয়া থাকে, মুখে তার কথা সরে না।

* * *

রাত্রে মাণিক ঘুমাইলে সুলতা স্বামীর কাছে মাণিকের কাণ্ডকারখানা বলে আর হাসে—ব্যাপার দেখ—

মাণিক দিগম্বর হইয়া বাপের বিছানায় অকাতরে ঘুমাইতেছে। বিমলকান্তি তাকাইয়া দেখিয়া বলেন, হুঁ। ...ও আবার আজকাল লাইট্ অফ্ না করলে শুতে চায় না!

সুলতা বিদ্যুৎগতিতে উঠিয়া গিয়া ঘুমন্ত মাণিকের ললাটে চুমু খাইয়া বলে, বাবলু আমার,—আমার বাবলু বড় হয়েছে!

* * *

দুর্গাপূজার আগে ষষ্ঠীর দিন মাণিকের জন্মতিথি-উৎসব হইয়া গেল। নূতন কাপড় পরিয়া নিমন্ত্রিত বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মাণিক পরমান্ন খাইল। কাপড় পরাইয়া দিবার কিছুক্ষণ পরেই কাপড়ের খোঁট খুলিয়া যায়। সুলতা বলে—খুব হয়েছে, এখন কাপড় খুলে প্যাণ্ট পর।

মাণিক বলে, না, চিরকালই প্যাণ্ট পরতে পারব না আমি,—কাপড় পরা আমায় ভাল করে শিখিয়ে দাও, না হয় বেল্ট দিয়ে এঁটে দাও।

সুলতা অগত্যা প্যাণ্টের বেল্ট দিয়া কাপড় ভাল করিয়া আঁটিয়া দেয়। মাণিক তাহার উপর সিল্কের পাঞ্জাবী পরিয়া বাবু সাজিয়া বেড়াইতে বাহির হয়।

সন্ধ্যাকালে যখন মাণিক বেড়াইয়া ফিরে তখনও বাহির হইতে কিছু বুঝা যায় না, কিন্তু পাঞ্জাবী খুলিলেই সুলতা হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে:

—ওমা!—কি কাণ্ড করেছিস, এই নাকি তোর কাপড় পরা! মাগো!—আজ তোর তের বছর পূর্ণ হ'ল, চৌদ্দয় পড়লি তুই!

মাণিক লজ্জা পাইয়া বলে—দাও না মা, শীগ্‌গির প্যাণ্টটা এনে।

সুলতা প্যাণ্ট আনিয়া মাণিকের হাতে তুলিয়া দিয়া বলে—যাও ঘরে গিয়ে শীগ্‌গির পরে ফেল, লোকে দেখলে বলবে কি!—কেবল আমি আদর করতে গেলে—তখন উনি বড় হন!

রাত্রে খাইতে বসিয়া মাণিক বলে—মা, এবার কিন্তু আমি একা একা সব জায়গায় ঠাকুর দেখে বেড়াব, অমূল্যকে সঙ্গে দিতে পারবে না, তা আগে থাকতে ব'লে রাখছি।

—সব জায়গায় মানে—কোথায় কোথায়?

—বাগবাজার, কুমারটুলী, আহিরীটোলা, মাড়েদের বাড়ী, বড় পার্ক, আরও যেখানে যেখানে ভাল ঠাকুর আছে!

—এত সব তুই নাম জানলি কি ক'রে?

—নাম জানলি কি ক'রে!—আমি তোমার সেই ছোটটিই আছি—না?

—না বাপু, আমি অতদূর তোমায় যেতে দিতে পারব না, গেছ শুনলে আমি ভয়ে মূর্চ্ছাই যাব।

মুখ ভেঙাইয়া মাণিক বলে—ভয়ে মূর্চ্ছাই যাব!—চিরকালই তোমার আঁচলের নীচে থাকব—না?—না যেতে দাও, লুকিয়ে যাব, দেখি কি করতে পারো!

অবাক্‌বিস্ময়ে সুলতা কিছুক্ষণ ছেলের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে, তার পরে বলে,—যাবি,—ওঁর সঙ্গে যাস। উনি সব দেখিয়ে শুনিয়ে আনবেন।

—সে আমি পারব না। দেখে আমার কাজ নেই। নিজের ইচ্ছামত জায়গায় নিয়ে গিয়ে একটু দেখিয়েই বলবেন, চল।

—ওঃ!

সহসা ভাতের থালার সমনেই মাণিক উন্মত্তের ন্যায় হাত-পা ছুড়িতে আরম্ভ করে।

বিমলকান্তি পাশেই খাইতে বসিয়াছিলেন, তিনি ভর্ৎসনা করিয়া বলেন—খোকা, এ-সব কি হচ্ছে, দিন দিন যত অসভ্য হচ্ছ!

বেশী বিরক্ত করিলে বিমলকান্তি খাওয়া ফেলিয়া উঠিয়া যাইবেন সুলতা তাহা জানে, তাহাই মাণিককে উদ্দেশ করিয়া বলেন—আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে, খুব হয়েছে,—যেও তুমি—যেও।

মাণিক তখন শান্ত হইয়া খাইতে থাকে, তার পর বলে—চিরকাল বাবা সঙ্গে সঙ্গে থাকলে লোকে বলে কি!

সুলতা হাসিয়া ফেলে: লোক মানে তোমারই সব বন্ধুবান্ধব বুঝি?

—কেন, তারা বুঝি মানুষ না?

—হাঁ, তোমারই মত মাতব্বর তারা।

সুলতা স্বামীকে পান দিতে শোবার ঘরে আসিয়াছিল, মাণিক হাতমুখ ধুইয়া আসিয়া মায়ের কোলের কাছে মুখ

আনিয়া চুপি চুপি বলে—মা, কাল সকালে ছয় আনার পয়সা দিতে হবে কিন্তু।

—কেন রে পাগলা?

—বাঃ, 'অল্-ডে' কিনতে হবে না

একটু আগেই যে সুলতা তার একা একা ঘুরিবার অনুমতি দিয়া ফেলিয়াছে—সে-কথা সে ভুলিয়াই গিয়াছিল, 'অল্-ডে'র কথা শুনিয়া প্রথমে চমকিয়া উঠিল। তার পর কথাটা মনে পড়িতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—আচ্ছা দেব।

* * *

পরদিন সকালে চায়ের পর মায়ের নিকট হইতে ছয় আনা পয়সা আদায় করিয়া মাণিক হন্তদন্ত হইয়া ছুটিল। যাইবার সময় গম্ভীর হইয়া সুলতা বলিয়া দিল—একটু সাবধান হয়ে কিন্তু চলাফেরা ক'রো, বাবা। আর যেখানেই যাও এগারোটার আগে বাড়ী ফিরো কিন্তু।

—আচ্ছা, আচ্ছা,—মাণিক পিছন না ফিরিয়াই বলিল।

মাণিক চলিয়া গেলে সুলতার বুকের মাঝে কেমন করিতে লাগিল, তাহার কান্না পাইতে লাগিল: পূজা-বাড়ীতে বাঁশী বাজিতেছে, কেমন যেন কান্না পায়, মাণিক—মাণিক তাহার সে মাণিক আর নাই।···কয়েক বৎসর আগেকার কথা মনে হইল: সাজিয়াগুজিয়া মাণিক মায়ের হাত ধরিয়া পূজা দেখিতে যাইত। এক বার পূজা দেখিয়া আসিয়া মায়ের কোলে বসিয়া তার মুখ ধরিয়া মাণিক বলিয়াছিল—মা, তোমায় দেখতে ঠিক দুগ্‌গাঠাকুরুণের মত, নয় মা? সুলতা মাণিককে আদর করিয়া চুমু খাইয়া বলিয়াছিল—আর তুমি আমার ঠিক কার্ত্তিক, নয়?

লজ্জা পাইয়া মাণিক বলিয়াছিল, ধ্যেৎ।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া সুলতার আজ কত কথাই মনে হয়! আবার কত ভয়: গাড়ী, ঘোড়া, ভীড়, ইহার মাঝে মাণিক কি করিয়া বসে ঠিক কি? বাস আর লরীগুলি হইয়াছে যেন —। ট্রামই বা কম কি, সেবার সেই গাঙ্গুলী-বাড়ীর ছেলেটা! মনে পড়িতেই সুলতা শিহরিয়া উঠিল: মাগো! মা ভবানী, তুমিই ভরসা!

সুলতার বুকের ভিতরে কি যেন অনবরত ঢিব ঢিব করিতে থাকে।

সুলতা রান্না করিতে যায় বটে, কিন্তু রান্নায় তার মন বসে না, এক বার ঘর এক বার বাহির করিয়া তার সময় কাটে, শোবার ঘরে আসিয়া সে বার বার ঘড়ি দেখিয়া যায়: এখন মাত্র ন'-টা, আরও দুই ঘণ্টা—।

প্রায় সাড়ে ন'টার সময় সুলতা ছেলের কথা ভাবিতে ভাবিতেই অন্যমনস্ক হইয়া রাঁধিতেছিল—এমন সময় উঠানে শব্দ হইল—

—মা!

সুলতা চমকাইয়া উঠিল—কে রে, বাবলু!···বাঁচালি, বাবা,···এর মাঝেই ফিরে এলি যে, মায়ের জন্যে মন কেমন করল বুঝি?

রান্নাঘরের বারান্দায় ধপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া বিষণ্ণ-সুরে মাণিক বলিল—'অল্-ডে' পেলাম না, মা।

সুলতা মনে মনে খুশী হইয়া বাহিরে সহানুভূতির সুরে বলিল—কেন রে, ডিপোতে পেলি না?

—না মা, এখানে আর দিচ্ছে না ওরা,—দিচ্ছে সেই মেন্ আপিসে। সেখানে যেতে আবার চার-পাঁচ আনা ভাড়া। সেখানেও পাওয়া যাবে না, জলি, কনক—ওরা সব গেছল কিনা, সেখানে কি ভীড়! বাপ রে, ঢুকবার জোটি নেই, ছ-আনার টিকেট সব গুণ্ডারা এক টাকায় বিক্রী করছে। আজকের টিকেট ত মিলবেই না, কাল-পরশুর টিকেটও সব বিক্রী হয়ে গেছে।

তার পর একটু থামিয়া মাণিক বলে—ইস্ একটু থেকে আমার ঠাকুর দেখা হ'ল না, কাল যদি বুদ্ধি ক'রে গোপালদার বাবার কাছে টিকেট কিনতে দিতাম!··· একেই বলে ভাগ্য!

পুত্রের নৈরাশ্যে সুলতার বেদনাও লাগে।

—তা দুখ্‌খু করতে নেই বাবা, এখানে সান্যাল-বাড়ী দেখে এস, রায়-বাড়ী, পঞ্চানন-তলা···আর বছর ওঁকে দিয়ে আগে থাকতে তোমার অল্-ডে কিনিয়ে রাখব। এখন সকাল সকাল নেয়ে দুটি খেয়ে বিশ্রাম কর, তার পর বিকেলবেলা বেশ সেজেগুজে ঠাকুর দেখতে যেও 'খন, কেমন?···হাঁরে, বাবলু, সন্ধ্যাবেলা তুই আমাকে এক বার

দর্শন করিয়ে আনতে পারবি নে, তুই ত বড় হয়েছিস এখন!—সুলতা মুচকিয়া হাসিল।

মাণিক সে-কথার জবাব না দিয়া বলিয়া উঠিল—হাঁ, এখন আমি নেয়ে খেয়ে বিশ্রাম করি—আবদার দেখ না, —আমি এই চললুম—

বলিয়া ঐ যে বাহির হইয়া গেল, আর ফিরিল একটায়।

সুলতা ভাবিল—এবার নাওয়া-খাওয়া সারিয়া ছেলে বিশ্রাম করিবে: মুখখানা একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে।

কিন্তু মাণিকের এখন কি আর বিশ্রাম করিবার সময় আছে? মাথায় দু-মগ জল ঢালিয়া দুটি ভাত মুখে দিয়া ঐ যে সেঁ ছুটিল, আর ফিরিল প্রায় সন্ধ্যাকালে। সুলতা ঠাণ্ডা চা গরম করিয়া ছেলেকে দিল। তাহার পর নূতন জামা কাপড় পরিয়া শ্রীমান্ সুকোমলকান্তি আরতি, নৃত্য-গীত, আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতি দেখিতে বাহির হইলেন আর ফিরিলেন প্রায় রাত্রি এগারোটা।

পূজার কয়দিনই ঠিক এক ভাবে চলিল, নবমীর দিন চা খাইতে বাড়ী আসার পর্য্যন্ত ফুরসুৎ হয় নাই।

সুলতা এক দিন অমূল্যকে সঙ্গে করিয়া গিয়া প্রতিমা দর্শন করিয়া আসিল।

বিজয়া দশমীর দিন সুলতা বলিল—বাবলু, তুই আমাকে সন্ধ্যাকালে একটু মোড়ের ওখানে নিয়ে যেতে পারবি না—ভাসানের ঠাকুর দেখে আসব—উনি বাড়ীতে থাকবেন।

সঙ্গে সঙ্গে মাণিক লাফাইতে সুরু করিল—সে আমি পারব না, কিছুতেই পারব না,—তোমার সঙ্গে অমন ঢিমে তালে আমি মোড়ে গিয়েই ফিরে আসতে পারব না।

সুলতা একটু ক্ষুণ্ণ হইল।

—কোথায় যাবে তুমি?

—ভাসানের লরীতে করে গঙ্গার ঘাটে ভাসান দেখতে যাব।

সুলতা শিহরিয়া উঠিল। বড়গঙ্গার ঘাটে স্বামীর সঙ্গে সে এক বার ভাসান দেখিতে গিয়াছিল। সেখানকার ভীড়, ছেলেদের দস্যিপনা, আর মোটর-লরীর ছুটোছুটি সে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছে। সেখানে সে মাণিককে কিছুতেই যাইতে দিবে না।

—না বাবা, তুমি আমাকে সঙ্গে ক'রে নাও আর না নাও, আমি তোমাকে লরীতে কিছুতেই যেতে দেব না।

—শচীন, অশোক—ওরা সব যাচ্ছে যে!

—তা আর যে খুশী যাক, তুমি যেতে পাবে না। বেশী বাড়াবাড়ি করলে বাড়ী থেকে বেরোতেই দেব না আমি।

স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া সুলতা বলিল—ওগো, তুমি একটু ব'লে দাও না, আমার কথা যদি না শোনে!

বিমলকান্তি হাঁকিলেন—খোকা!

—আজ্ঞে!

—প্রতিমার লরী না বেরোলে—তুমি বাড়ী থেকে ছুটি পাবে না, আর রাসবিহারী অ্যাভিনিউ দিয়ে হেঁটে যতগুলি পার প্রতিমা দেখ তুমি, এ রাস্তা পেরতে পাবে না।

—আচ্ছা।

মুখে বলিল বটে, আচ্ছা, কিন্তু ভ্রু-ললাট কুঞ্চিত করিয়া মাণিক কেমন এক গোঁ ধরিয়া বসিয়া রহিল।

সুলতা স্বামীর দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিল—রকম দেখছ?

—তা থাক।

* * *

সন্ধ্যাকালে সুলতা মাণিককে নিজের হাতে জামা-কাপড় পরাইয়া দিয়া বলিল—যাও এবার ঘুরে এস।

মুখখানা ভার থাকিলেও মুখে মাণিক কিছু আপত্তি করিল না, বরং লক্ষ্মী ছেলের মত জিজ্ঞাসা করিল—কখন ফিরতে হবে ব'লে দাও।

—ওঃ বাবা, এত লক্ষ্মী হয়েছ!

গম্ভীর হইয়া মাণিক বলিল—বলো।

—নটা, সাড়ে নটা?

—বেশ, নটায়ই আসব আমি—বলিয়া মাণিক ধীর পদক্ষেপে রওনা হইল; তাহার সঙ্গীরা সব আগেই রওনা হইয়া গিয়াছে।

* * *

সুলতা ঘরে বসিয়া স্বামীর সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছে। অমূল্যও ভাসান দেখিতে গিয়াছে, কথা আছে সেও নটার

মধ্যে ফিরিয়া আসিবে। আসিলে, মাণিক ও তাহাকে ঘরে রাখিয়া সুলতা স্বামীর সহিত একটু বাহির হইবে; ট্রামে করিয়া হাজরার মোড় অবধি গিয়াও যদি দু-একখানা ঠাকুর দেখা যায়: মা ত এক বৎসরের মত চলিলেন!

বিমলকান্তি ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন—ন'টা বাজতে পাঁচ মিনিট।

সুলতা হাসিয়া বলিল—তুমি ক্ষেপেছ, সাড়ে ন'টা দশটার আগে আসছে সে!

পরক্ষণেই বাহিরে কি একটা শব্দ হইতে সুলতা দরজা খুলিয়াই বলিয়া উঠিল—আরে, খোকা, কখন এসেছিস তুই? ডাকিস নি কেন? ওমা মাটিতে শুয়ে কেন,—ওঠ।

মাণিক একটিও কথা বলিল না, মৃদু আর্ত্তনাদ করিল শুধু।

—এই খোকা, কি হয়েছে বল, অমন করছিস কেন?

মাণিক অস্বচ্ছ কণ্ঠে বলিল—চেঁচিও না বলছি, একটিও কথা ব'লো না।

ব্যাপার কি জানিবার জন্য বিমলকান্তি বাহিরে আসিলেন। মাণিকের গায়ে হাত রাখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হয়েছে রে মাণিক?

—মাথা ঘুরছে, পানের সঙ্গে কি যেন খাইয়ে দিয়েছে।

বিমল সুলতাকে বলিলেন—জল আন, মাথা ধুইয়ে দিতে হবে।

সুলতা ভয়ে যেন জবুথবু হইয়া গিয়াছে। জল আনিতে গিয়া তার অর্দ্ধেকটা প্রায় ফেলিয়াই দিল—কিছু হবে না ত গো,—কোন ভয় নেই ত!...ডাক্তার ডাকবে?

বিমল মাণিকের মাথায় জল ঢালিতে ঢালিতে বলেন—না, না, কোনও ভয় নেই, মাথায় বাতাস কর তুমি।

সুলতা তাড়াতাড়ি একটা বালিশ আনিয়া দিয়া বলে—বাবলু, তুমি এর 'পর মাথা রাখ, আমি বাতাস করি।

মাণিক ইসারায় জানাইয়া দিল, বালিশে সে মাথা রাখিবে না, বারান্দার কিনারায় রাখিবে—এখনই হয়ত সে বমি করিবে। সুলতা মাণিকের মাথাটা নিজের কোলে তুলিয়া লইল।

প্রায় ঘণ্টা দুই শুশ্রূষার পর মাণিক ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিল। তখন ব্যাপারটা জানা গেল।

মাণিক হাঁটিয়া হাঁটিয়া রাসবিহারী অ্যাভিনিউ আর রসা রোডের মোড়ে গিয়াছিল। সেখানে জল-পিপাসা পাইলে সে একটা দোকানে পান খাইতে যায়। দোকানী জিজ্ঞাসা করে—শাদা?

—হাঁ, শাদা।

দোকানী পানের সঙ্গে কালচে রঙের কি যেন মিশাইয়া দিল।

পান খাইবার সঙ্গে সঙ্গে সে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যায়। পাশের দোকানের সামনে একখানা বেঞ্চ ছিল তাহাতেই শুইতে যায়, কিন্তু উহারা শুইতে দেয় না। দেখিতে দেখিতে অল্প ভীড় জমিয়া গেল। সকলে ব্যাপার শুনিয়া দোকানীকে বকিল। দোকানীই তাহাকে ট্রামে চড়াইয়া দিয়াছে। ফেরতা ট্রামে বেশী যাত্রী ছিল না, উঠিয়াই মাণিক বেঞ্চে শুইয়া পড়ে।—কোন রকমে গড়িয়াহাটার মোড়ে নামিয়া সে বমি করিয়া ফেলে, আর সে দাঁড়াইতে পারে না। কত মেয়ে-পুরুষ তার পাশ দিয়া চলিয়া গেল, কেহ তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইল না। অবশেষে গুণ্ডাগোছের একটা লোক আসিয়া তাহাকে তুলিয়া বলে—খোকা, তুমি সীগ্রেট খেয়েছ?

—না।

—তবে কি খেয়েছ?

—পান।

—ওঃ তবে পানের ভিতর কিমাম ছিল।—এস, কোথায় যাবে তুমি?

মাণিক ঠিকানা বলে। সেই লোকটা মাণিককে দুই হাতে আড়-কোলা করিয়া ধরিয়া ট্রাম লাইন পার করিয়া এক কলের কাছে লইয়া মাথা ধোয়াইয়া দেয়, তার পর হাত ধরিয়া বাড়ীর কাছে পৌঁছাইয়া দিয়া গিয়াছে।

সুলতা বলিল—আহা, লোকটার ঠিকানা জেনে নিলি না কেন?

—আমার তখন অত কথা বলার সাধ্য ছিল নাকি?

মাথা তখনও একেবারে ঠিক হয় নাই, মাণিক কিছুই

খাইতে চায় না। সুলতা বলে—কিছু না খেলে ঘুম হবে না, বাপ!

অগত্যা মাণিক কিছু খায়, কিন্তু বিমল আর সুলতার ভাসান দেখা এবার আর হইল না।

* * *

পরদিন সকালে বারান্দায় ডেক-চেয়ারে বসিয়া বিমলকান্তি চা খাইতেছিলেন। টিপয়ের উপর আরও দুইটি পেয়ালা, পাশে দুইটি বেতের মোড়া। সুলতা মাণিকের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

—কই রে, খোকা, এলি!

চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে মাণিক মায়ের বিছানা হইতে উঠিয়া আসিল।

—আজ কার বিছানায় শুয়েছিলি?

মৃদু হাসিয়া মাণিক বলিল—ধ্যেৎ,—চা দাও।

বিমলকান্তির বাঁ-হাতে খবরের কাগজ, সুলতা ও বিমলকান্তি দু-জনার মুখই হাসি-হাসি। চা খাইতে খাইতে মাণিকের কেমন সন্দেহ হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল—মা, তোমরা হাসছ কেন?

—কিছ্‌ছু না, তুই এখন চা খেয়ে নে।

চা খাওয়া হইলে সুলতা স্বামীকে দেখাইয়া বলিলেন—ওঁকে প্রণাম করেছিস বিজয়ার?

সলজ্জ হাসি হাসিয়া মাণিক বাবাকে নত হইয়া প্রণাম করিল, বিমলকান্তি তাহাকে মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—Be a good boy, a brilliant boy!

সুলতাকে প্রণাম করিতে গেলেই সুলতা মাণিককে বুকের মাঝে জড়াইয়া ধরিলেন—তবে রে, বাবলু, তুমি বড় হয়েছ? বড় হ'তে গিয়ে কাল কি ভয়টাই দেখিয়েছ,... আর যাবি অমনি একা একা বাহাদুরি করতে?

মায়ের বাহুপাশে বন্দী হইয়া বাবলু ছট্‌ফট করিতে লাগিল, লজ্জা পাইয়া সন্ত্রস্ত হইয়া সে এদিক-ওদিক তাকাইয়া দেখে, কেহ দেখিল কি না?

তাহার পর প্রথম সুযোগেই নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া কৃতিত্বের হাসি হাসিয়া সে বলে, মা, এবার কত জায়গায় ঠাকুর দেখেছি—জানো?

—বড় পার্ক, ত্রিকোণ পার্কে গেছলি বুঝি?

—হাঁ, বড় পার্ক, ত্রিকোণ পার্ক!—গেছলাম বাগবাজার, কুমারটুলী, আহিরীটোলা—কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে মাড়েদের বাড়ী—কি সুন্দর সুন্দর ঠাকুর সব—দেখলে তোমার তাক লেগে যাবে!

মুহূর্ত্তে সুলতার মুখ শুকাইয়া গেল।

—কই আমাকে বলিস নি ত?

—বললে তুমি বিজয়ার দিন আবার বেরোতে দিতে—না?

—ও: সেই জন্যে বল নি?

মাণিক সে-কথার কোন জবাব না দিয়া নিজের উৎসাহে বলিয়া চলিল—নবমীর দিন কেমন একখানা অল্‌-ডে পেয়ে গেলুম—

—অল্‌-ডে এবার পাওয়া যাবে না, তুই যে সেদিন বললি?

—শোনই না গো—পেলুম বিভূতি-দার কাছ থেকে—বেলা তিনটের সময়—তিন আনায়। রাত্রি নটার সময় এসে তা আমি আবার ছ-পয়সায় বিক্রী ক'রে দিয়েছি।

বিমলকান্তি খবরের কাগজ পড়া বন্ধ করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে পুত্রের বহির্জ্জগতে প্রথম অভিযানের কথা শুনিতে লাগিলেন। মাণিক কোনও দিকে দৃকপাত না করিয়া পরম উৎসাহের সহিত বলিয়া চলিল—কত বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, মা,...এক জন ত আমাকে বসতে দিয়ে নিজে দাঁড়িয়েই রইল,...আমাদের হেড-মাস্টারের ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি কত খুশী: ও তুমি আমার দাদার ছাত্র?...একটি ছেলের সঙ্গে দু-ঘণ্টার মধ্যে কি রকম ভাব হয়ে গেল, হাওড়ার ছেলে; প্রথমে আপনা-আপনি, কিছুক্ষণ পরেই তুমি,—তার পরে হাত ধরাধরি ক'রে সব জায়গায় ঠাকুর দেখে বেড়িয়েছি;—যাবার সময় ছেলেটি বলে, হাওড়ায় চলো,—সেখানকার ঠাকুর সবচেয়ে বড় আর ভাল—হাওড়া জায়গা কত বড়!

আমি বলি, ভাগ্‌, কলকাতার ঠাকুরের কাছে হাওড়ার ঠাকুর! জি. পাল, এইচ. পাল, কে. পালের ঠাকুরের কাছে হাওড়ার ঠাকুর!

বাগবাজারের ঠাকুর আর মণ্ডপ পুড়ে গেছে—তা

দেখে এলুম, আরও পিছিয়ে মণ্ডপ তৈরি ক'রে নতুন ঠাকুর পূজো করছে।...আহিরীটোলায় আবার দুটো সার্ব্বজনীন, এরা বলে আমাদেরটা আসল, ওরা বলে আমাদেরটা! ...কুমারটুলীতে সে কি ভীড়; বাপ রে!... দড়ি দিয়ে সব যাতায়াতের ব্যবস্থা করছে, আধ মিনিটের বেশী দাঁড়িয়ে দেখতে দেয় না—বলে, এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও—

সুলতার চোখের সামনে যেন বায়োস্কোপ হইয়া যাইতে লাগিল, কত বাস, কত ট্রাম, কত ভীড় তাহার মধ্য দিয়া হাওড়ার ছেলেটির হাত ধরিয়া তাহার বাবলু প্রতিমা দেখিয়া বেড়াইতেছে—

আরও কত কি বলিয়া মাণিক তাহার কাহিনী শেষ করিল। বিহ্বল সুলতার দিকে চাহিয়া বিমলকান্তি পরিহাস করিয়া কহিলেন—ভাবছ কি গো, ছেলে তোমার এবার লায়েক হ'তে চলল!

সুলতা কিন্তু সত্যই বড় ভাবিতেছে; ছেলে তার বড় হইবে হউক, কিন্তু এ কি দুর্ভাবনা! এ যে প্রায় মহাসমরে ছেলে পাঠাইবার মত দুর্ব্বিষহ।

সূর্য্যের রং

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সূর্য্যের রঙে চৈত্রের দিন আলো
সূর্য্যের রঙে নিভেছে কঠিন রাত,
তোমার বীণার স্বর্ণ সুরেতে
হয়েছে সুপ্রভাত!

চৈত্র-দিনের স্বর্ণ-পাত্রখানি
টলমল হ'ল স্বর্ণ-মদির সুরে,
সূর্য্যের রঙে নিভেছে কঠিন রাত
সূর্য্যের রঙে কোনো ইতিহাস নেই,
সূর্য্যের রঙে হয়েছে সুপ্রভাত
আজকের দিনে কালকের ছায়া নেই।

পিছনে আমার কত কালো ইতিহাস
অনাগত দিন ফণা উদ্যত করে,
হেলেনের মত তোমার হাসিতে
সূর্য্যের রং ঝরে।

উদ্যত-ফণা অনাগত দিনগুলি
সূর্য্যের রঙে আজ তারা মরে গেছে,
পিছনের যত কৃষ্ণ কঠিন রাত
আজ তারা গলে গেছে।

বাঙ্গালার বর্ণ ও ধ্বনি

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, এম. এ.

এগারটি স্বর এবং ছত্রিশটি ব্যঞ্জন বর্ণ লইয়া বাঙ্গালা বর্ণমালা গঠিত। স্বর এগারটি হইতেছে,—

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ।

স্বরবর্ণের দলে ৠ এবং ঌকে স্থান দিলে স্বরের সংখ্যা আবার একাদশের স্থানে ত্রয়োদশ হইয়া যায়। বর্ণমালায় ৠ এবং ঌ থাকিবে কি না এ-প্রশ্ন সহজেই উঠিতে পারে।

বাঙ্গালা ভাষায় ঌর ব্যবহার একেবারেই নাই, দীর্ঘ ঋর প্রয়োগও নাই বলিলেই চলে। বাঙ্গালা তো দূরের কথা সংস্কৃতেই বা ঌ ও দীর্ঘ ঋকার যুক্ত শব্দ কয়টি আছে?

স্মার্তগণ ত্রিবিধ ঋণের উল্লেখ করিয়াছেন। বৈয়াকরণগণ সব ঋণ শোধ করিয়াছেন, কিন্তু 'পিতৄণ' হইতে আজিও মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। 'পিতৄণ' গেলে সহর্ণের্ঘঃ সূত্রের একটি উদাহরণ কম পড়িয়া যায়। পাণিনি হইতে লোহারাম পর্যন্ত সকলকেই ঐ উদাহরণটির উপরে ভর করিতে হইয়াছে। সুনীতিবাবুর মত ভাষাতাত্ত্বিকও উপায়ান্তর পান নাই। চলন্তিকা-কার রাজশেখরবাবুও চলন্তিকার পরিশিষ্ট অংশে সন্ধি পরিচ্ছেদে ঐ উদাহরণ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। দুই-এক জন সাহসিক বৈয়াকরণ 'ভ্রাতৄদ্ধি' পর্যন্ত গিয়াছেন। তবে অধিকাংশ বাঙ্গালা-ব্যাকরণ-প্রণেতা অতটা পর্যন্ত ভরসা করিতে পারেন নাই।

পাণিনি ব্যোপদেব প্রভৃতির কথা থাক, কিন্তু লোহারাম, নকুলেশ্বর প্রমুখ বাঙ্গালা ভাষার বৈয়াকরণগণ যখন 'পিতৄণ' অস্বীকার করিতে পারেন নাই, তখন বাঙ্গালায় যে দীর্ঘ ৠ আছে তাহা মানিয়া লইতেই হইবে। বস্তুতঃ তাহা আমরা মানিয়া লইয়াছিও। এবং মানিয়াছি বলিয়াই ছাপাখানায় দুইটি অকেজো টাইপ অনর্থক রাখিয়াছি। দুইটি বলিতেছি এই জন্য যে, ৠ স্বীকার করিলে ৄকে অস্বীকার করিবার জো থাকে না। কথাটা বোধ হয় ঠিক হইল না। বরং বলা উচিত, ৄকে মানিয়াছি বলিয়াই ৠকে মান্য করিতে হইতেছে।

দীর্ঘ ৠ মানি আর যাহাই করি, ইহা যে স্বরসন্ধির একটি বিশেষ সূত্র মুখস্থ করিবার সময় ভিন্ন আর কখনও কোন কাজে আসে না এ-বিষয়ে প্রত্যেকেই একমত। সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে কয়টা দীর্ঘ ৠ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে? যদি না-ই পাওয়া যায়, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষার বর্ণমালায় উহা রাখিবার প্রয়োজন কি?

ঌকার সহজে দণ্ডায়মান হইতে পারেন না বলিয়া বর্ণবোধক পুস্তকে তাঁহাকে ডিগবাজি খাওয়ানো হইয়াছে। বস্তুতঃ ঌকে বাঙ্গালা বর্ণমালায় স্থান দিবার কোন হেতু দেখি না। দীর্ঘ ৠর পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিটি দেখান যাইতে পারে,—

পিতৄণ শব্দ সংস্কৃত বটে তবু উহা যদি বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে উহাকে বাঙ্গালা শব্দাবলীর মধ্যে স্থান দিতে হইবে। আর বাঙ্গালা শব্দের বানানের জন্য যে বর্ণের প্রয়োজন আছে তাহাকে বর্ণমালা হইতে বিতাড়িত করা সঙ্গত নয়।

এই যুক্তির বিরুদ্ধে এই উত্তর দেওয়া যায়,—

কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালা সাধু ভাষায় এইরূপ তৎসম শব্দের প্রয়োগ সুপ্রচুর। কিন্তু যে কোন সংস্কৃত শব্দকে যে-সে যখন-তখন বাঙ্গালা ভাষায় প্রয়োগ করিতে পারে না। শক্তিশালী লেখকগণ অবশ্য মধ্যে মধ্যে নূতন কথা অন্য ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়া অথবা নিজেরা গঠন করিয়া ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। সংবাদপত্র প্রভৃতির দ্বারাও সময়ে সময়ে নূতন কথা ভাষায় প্রবেশ করে। অবস্থা অনুকূল হইলে সেরূপ শব্দ ভাষায় প্রচলিত হইয়া যায়। যে-শব্দ একবার চলিয়া যায় তাহাকে ভাষার অঙ্গীভূত বলিয়া স্বীকার না করিয়া উপায় থাকে না।

পিতৄণ যদি বাঙ্গালায় চলিয়া যাইত, তাহা হইলে উহাকে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত বহু তৎসম শব্দের অন্যতম বলিয়া ধরিয়া লইতাম। কিন্তু পিতৄণ সে-ভাবে চলে নাই।

যে শব্দ বাঙ্গালায় ব্যবহার করা হয় না তাহাকে বাঙ্গালা শব্দ বলিয়া ধরিয়া লইব কেন? বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ-রচয়িতারাই বা সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রকে বাঙ্গালা ব্যাকরণে প্রয়োগ করিবেন কেন? তৎসম শব্দের প্রসঙ্গে সংস্কৃত নিয়ম প্রযোজ্য তাহা মানি। কিন্তু এ-কথা কি ঠিক নয় যে, সংস্কৃতের প্রত্যেকটি নিয়মই বাঙ্গালার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই। সংস্কৃতে লুপ্ত অকার (ঽ) আছে কিন্তু বাঙ্গালায় 'ততোধিক' লিখিলে কেহ দোষ দেয় কি?

বস্তুতঃ দীর্ঘ ৠ-যুক্ত কোন পদ ব্যাকরণ ভিন্ন অন্য কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া তো মনে পড়ে না। কোন বাঙ্গালী পিতৄণ লিখিতে রাজী হইবেন না। লিখিতে হইলে দীর্ঘ ৠকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পিতৃ-ঋণ বা পিতৃঋণ লিখিবেন। আর কথ্য ভাষায় কেহ পিতৄণ শব্দ উচ্চারণ করিলে স্বয়ং তারাশঙ্কর তর্করত্নের পক্ষেও হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইত।

আর যদি তর্কের খাতিরে বাঙ্গালায় পিতৄণ শব্দের অস্তিত্ব স্বীকারই করি, তাহা হইলেও ঐ একটি শব্দের জন্য একটি ৄ এবং একটি ৠ টাইপ রাখার প্রয়োজন নাই। দুইটি ঋ যদি পাশাপাশি থাকে এবং উহাদের মধ্যে যদি ফাঁক না থাকে তাহা হইলে দীর্ঘ ৠর চিহ্ন ব্যতীতও ঐ দুইটিকে মিলিত ভাবে একটি দীর্ঘ ৠ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু কার্যতঃ এরূপ ধরিবার কোন কারণ নাই। পিতৃঋণ-এ সন্ধি হয় নাই। এবং সন্ধি না হইলেও সমাসের দ্বারা উহাদের যোগ হইয়াছে। আর সমাসের যোগ যে সন্ধি অপেক্ষা নিবিড়তর সে সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত থাকিতে পারে না। এ অবস্থায় বাঙ্গালা বর্ণমালা হইতে ৠ ও ঌ এই দুইটি অনাবশ্যক বর্ণকে বাদ দিলে ক্ষতি কি? যদি বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে স্বরের সংখ্যা এগারটিই দাঁড়ায়।

এই এগারটি স্বরের মধ্যে প্রথমে অ আ দিয়াই আলোচনা আরম্ভ করা যাক।

বাঙ্গালার বর্ণমালা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে উহার একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি সর্বাগ্রে দৃষ্টি পড়ে। বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলি বর্ণের নামেই আমরা কোন না কোন বিশেষণ যোগ করিয়া থাকি। সংস্কৃত বর্ণমালা ব্যবহারকারী জাতিসমূহের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র বাঙ্গালীই বর্ণপরিচয়ের জন্য শুদ্ধমাত্র বর্ণের নামের উপর নির্ভর না করিয়া এক একটি বিশেষণের আশ্রয় লয়।

বাঙ্গালী শিশু পাঠশালায় যখন পড়া আরম্ভ করে, তখন শুধু অ আ বলে না; বলে স্বরে অ, স্বরে আ। শুধু ই ঈ বলে না; বলে হ্রস্ব ই, দীর্ঘ ঈ। ঐরূপ উ ঊ না বলিয়া বলে হ্রস্ব উ, দীর্ঘ ঊ।

ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, বাঙ্গালার বর্ণমালায় যে বর্ণগুলি আছে তাহাদের প্রত্যেকটিকে বুঝাইবার জন্য পৃথক পৃথক ধ্বনি নাই। তাই কয়েক স্থলে একই ধ্বনি দ্বারা একাধিক বর্ণ সূচিত হয়। কাজেই এক-একটি বিশেষণ যোগ করিয়া বর্ণসমূহের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। ইষু এবং ঈশা এই দুই শব্দের আদ্য স্বর এক নয় কিন্তু উহাদের উচ্চারণ অভিন্ন। উচ্চারণ দ্বারা এখানে বর্ণের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। অতএব এস্থলে যদি বলিয়া না দেওয়া হয় যে ইষুর 'ই' হ্রস্ব এবং ঈশার 'ঈ' দীর্ঘ, তাহা হইলে বানানে ভুল হইবার সম্ভাবনা। বস্তুতঃ বর্ণের মূল ধ্বনির সহিত বঙ্গীয় ধ্বনির অনেক দিক্ দিয়াই পার্থক্য ঘটিয়াছে। সেই কারণেই বাঙ্গালীর বানানে এত অশুদ্ধি দেখা যায়। বাঙ্গালী সংস্কৃতের ধ্বনি বজায় রাখিতে পারে নাই, কিন্তু সংস্কৃতের বর্ণগুলিকে যত্ন সহকারে রক্ষা করিয়াছে। আমাদের কাছে দীনেশ ও দিনেশ উভয়ে সমান। গিরীশ এবং গিরিশ— ইহাদের মধ্যে যে ভেদ আছে, তাহা আমাদের চোখেই ধরা পড়ে, কিন্তু কান এড়াইয়া যায়। একই কারণে আমরা সুতপুত্র কর্ণ লিখিয়া বসি, সূরে (সূর্য) এবং সুরে (দেবতা) গণ্ডগোল করি, মুহূর্ত লিখিতে মূহুর্ত লিখি, কৌতূহলে হ্রস্ব উ এবং কৌতুকে দীর্ঘ ঊ দিয়া কৌতুকের সৃষ্টি করি।

বাঙ্গালার বর্ণমালায় এগারটি স্বরবর্ণের ছয়টি বিশেষণ-যুক্ত তাহা পূর্বে দেখানো হইয়াছে। বর্ণমালার প্রথম স্বরটি হইতেই আরম্ভ করা যাউক।

পল্লীর পাঠশালার সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন অ এই স্বরটিকে স্বরে অ নামে অভিহিত করা হয়। ইহার এইরূপ নামকরণ হইল কেন? তাহার কারণ এই যে বাংলায় অ এবং য় (য়্+অ) ইহাদের উচ্চারণ প্রায় সমান। পুরাতন বাঙ্গালা পুঁথিতে অ বা য়, আ বা য়া একই শব্দে নির্বিচারে ব্যবহৃত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে উদ্ধৃত করা হইল।

জাঅ, জায় (যাও অর্থে)। মাঅ, মায় (মাতা অর্থে)। হঅ, হয় (হও অর্থে)। আর, য়ার। আন, য়ানাহী (অন্যে)।

চর্য্যাপদ হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

জাঅ, জায় (যায় অর্থে)। নিঅহি, নিয়ড্ডী (নিকটে)। পলুটিয়া (পাল্‌টাইয়া)। রঅণ, রয়ণ (রত্ন)। বিঅপ্প বিয়প্প (বিকল্প)। বিষয় বিষঅ। হিঅ (হৃদয়) হিঅহি, হিয়এ (হৃদয়ে)।

পূর্বে বলিয়াছি, অ এবং য় এই দুই বর্ণের উচ্চারণ প্রায় সমান। লেখার সময় অ এবং য় এর ব্যবহারে কোন প্রকার নিয়মশৃঙ্খলা ছিল না। 'আর' বলিবার সময় লোকে নিশ্চয় yara উচ্চারণ করিত না, তবু 'য়ার' বানান বিরল নহে। বানান সম্বন্ধে পুরাতন বাংলায় যথেষ্ট শিথিলতা ছিল, আধুনিক বাংলাতেও যে তাহা বিশেষ কমিয়াছে তাহা মনে হয় না। পুরাতন ভাষামাত্রেই বানানে অল্পবিস্তর যথেচ্ছাচার দেখা যায়। ইহার খুব সঙ্গত কারণও আছে। মানুষের মুখের ধ্বনি যত দ্রুত পরিবর্তিত হয়, হাতের কাজ তত দ্রুত বদলাইতে চায় না। বর্ণমালার প্রত্যেকটি বর্ণ এক একটি ধ্বনির চিহ্ন মাত্র। এই সমস্ত ধ্বনির অনেকগুলি বদলাইয়া যায় বা লোপ পাইয়া থাকে কিন্তু তবু তাহাদের চিহ্নগুলি যায় না। আবার যে সকল নূতন ধ্বনির উদ্ভব হয় তাহাদের পরিচয়যোগ্য চিহ্ন তৈয়ার হয় না। বানানের শিথিলতার ইহাই সর্বপ্রধান কারণ।

এই কারণে পুরাতন ভাষার বানানের উপর নির্ভর করিয়া ধ্বনিতত্ত্ব নিরূপণ করা দুরূহ। পুরাতন বাঙ্গালায় যেমন আর স্থানে য়ার পাওয়া যায় তেমনই অক্ষ স্থানে যক্ষ, উত্তম স্থানে য়ুত্তম, এবার স্থানে যেবার প্রভৃতিও দৃষ্ট হয়।

আসল কথাটি এই যে, য বর্ণটিকে অনেক সময় স্বরবর্ণের বাহনরূপে ধরা হইত। নাগরীতে অ (অ) স্বয়ং একটি স্বরবর্ণ হইয়াও ও (ও) এবং ঔ (ঔ) এই দুই স্বরের বাহনরূপে ব্যবহৃত হয়। নাগরী ও অ-য়ে ওকার, নাগরী ঔ অ-য়ে ঔকার। বাংলায় এইরূপ একটা স্বরবর্ণকে অন্য স্বরের বাহন করা হয় নাই বটে, কিন্তু য্ এই ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বারা বাহকতার কাজ করাইয়া লওয়া হইয়াছে।

শুধু আ-কার, ই-কার, ঈ-কার ইত্যাদি যোগ করিলে ততটা গোলযোগ হইবার কথা ছিল না। কিন্তু অ-কার যুক্ত য এর সহিত যুক্ত হওয়ার জন্যই সমস্যাটা জটিল হইয়াছে।

অ ব্যতীত অন্যান্য সকল স্বরেরই ব্যঞ্জনাশ্রয়ী একটা চিহ্ন আছে; নাই কেবল অ-য়েরই। যামি, য়ুত্তম, যেবার শব্দে া (আকার), ু (উকার), ে একার থাকাতে য-এর অস্তিত্ব একরকম উপেক্ষা করাই হইয়াছে। ঐ সকল স্থলে য-এর কোন কাজই নাই, উহা কেবল া, ু, ে এই স্বরচিহ্নগুলিকে বহন করিতেছে মাত্র।

কিন্তু যক্ষ (অক্ষ), যখণ্ড (অখণ্ড) প্রভৃতি শব্দে য বর্ণটাই চোখে পড়ে। বস্তুতঃ য-এর অন্তর্গত অ বর্ণটারই যে ওখানে প্রাধান্য, এবং অ-কার ব্যতীত য্-এর যে ওখানে কিছুমাত্র স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তাহা আর তলাইয়া দেখা হয় না। য়কে যে অ-এর পরিবর্তরূপে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে ইহাও তাহার অন্যতম কারণ।

শিথিলতার মাত্রা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল। লেখকেরা একই শব্দে য এবং অ যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ একই ধ্বনির জন্য দুইটি পৃথক্ বর্ণ বিনাবিতর্কে ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

ইহা হইতে একটা জিনিস স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ঐ সময়ে—অর্থাৎ যে সময়ে য এবং অ নির্বিচারে ব্যবহৃত হইতেছে, সেই সময়ে—য এবং অ এক অ নামেই পরিচিত হইতেছিল। সংস্কৃত পণ্ডিতগণ সংস্কৃত উচ্চারণ অনুসারে এককালে ইঅ বলিতেন বটে, কিন্তু অপভ্রংশ অবস্থার

পূর্ব হইতেই যকে বর্গীয় জ-এর ন্যায় উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে-কথা পরে বলা হইবে। অপভ্রংশ অবস্থায়—যখন য যশ্রুতিরূপে ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন—যকে একটি স্বতন্ত্রবর্ণ রূপে ভাষায় স্থান দেওয়া হইল। পূর্বে য (উচ্চারণ জ) তো ছিলই, কিন্তু ঐ অবস্থায় একই য প্রাচীন সংস্কৃত উচ্চারণ (ইঅ) লইয়া পুনঃ প্রবেশ করিল। কার্যতঃ উহারা পৃথক্ বর্ণ (কারণ উহাদের ধ্বনি সম্পূর্ণ পৃথক্) হইলেও আকৃতিতে কোন প্রকার পার্থক্য ছিল না। এমন কি পুরাতন বাঙ্গালাতেও [.] বিন্দুযুক্ত 'য়' দেখা যায় না। বিন্দুর বয়স খুব বেশী নয়।

যাহাই হউক, ঐ য-শ্রুতির য এবং পূর্ববর্তী য (যাহার উচ্চারণ জ) একই সময়ে ভাষায় ব্যবহৃত হইতে থাকিল। তখন y ধ্বনিসূচক যকে ইঅ নামে অভিহিত করা হইতে লাগিল। কিন্তু এই 'ইঅ' ধ্বনি খুব সুস্পষ্ট ছিল না। এই ইঅ-র ই অংশ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে হইতে শুধু অ ধ্বনিটাই রহিয়া গেল। তখন বর্ণমালা পড়িতে গিয়া দুইটা অ কানে বাজিতে লাগিল। প্রথম—স্বরমালার অ, দ্বিতীয়—ব্যঞ্জনমালার য়। ধ্বনি প্রায় এক হওয়ায় দুইটি বর্ণের দুইটি পৃথক নাম দেওয়া আবশ্যক হইল। নাম তো একই ছিল, তাহা আর পরিবর্তন করা হইল না। শুধু বিশেষণ যোগ করিয়া উহাদের পার্থক্য বুঝান হইল।

ব্যঞ্জনের য় (যাহা অ নামেই অভিহিত হইতেছিল) এর নাম হইল অন্তঃস্থ অ। এবং স্বরান্তর্বর্তী অ এর নাম হইল স্বরীয় অ বা স্বরে অ।

এখন য় এর নাম অন্তঃস্থ 'অ' না হইয়া স্বরে অ র অনুরূপ ব্যঞ্জনের অ বা ব্যঞ্জনে অ হওয়াই তো উচিত ছিল। একথা তো মানিতেই হইবে যে স্বরমালার একটি বিশেষ বর্ণের ধ্বনির সহিত সাম্য থাকিবার ফলেই য় এর নামের পার্শ্বে একটি বিশেষণ বসিয়াছে। তাহা যদি হয় তবে স্বরের সহিত পার্থক্য প্রদর্শনই তো ঐ বিশেষণ প্রয়োগের মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে ব্যঞ্জনের অ না বলিয়া অন্তঃস্থ অ বলা হইল কেন?

ইহার উত্তরে প্রথমেই একটি কথা বলা আবশ্যক। স্বরে অ নামটা প্রথমে দেওয়া হয় নাই। অন্তঃস্থ অ এই নামটিই আগে দেওয়া হইয়াছে। স্বরে অ নাম তাহার পরে দেওয়া। কাজেই স্বরে অ-র অনুরূপ ব্যঞ্জনের অ হওয়া উচিত ছিল একথা বলা চলে না।

এই মন্তব্য যদি প্রমাণিত হয় তাহা হইলে ইহা হইতে আর একটি কথাও মানিতে হয়। স্বরমালার একটি বিশেষ বর্ণের ধ্বনির সহিত সাম্য থাকিবার ফলেই য় এর নামের পার্শ্বে অন্তঃস্থ এই বিশেষণ বসিয়াছে এবং উহার নামকরণ হইয়াছে অন্তঃস্থ অ—এই মতটি সত্য নয়। এখন সেই আলোচনা করা যাউক।

সংস্কৃতের য প্রাকৃতে জ-ধ্বনি গ্রহণ করিল। অধিকাংশ প্রাকৃতে য এর বদলে জ এর ব্যবহার হইতে লাগিল। কিন্তু মাগধী প্রাকৃতে য ব্যবহৃত হইতে থাকিল। এমন কি জ এর স্থানেও স্থলবিশেষে য বসিতে লাগিল। মাগধী প্রাকৃতের য-এর ইঅ বা অ উচ্চারণ ছিল না, তাহার প্রমাণ আছে। এই ধ্বনি ছিল কতকটা শ্বাসাশ্রয়ী—অনেকটা ইংরেজি zএর মত। সুতরাং ধ্বনি যেমনই হউক না কেন, বর্ণমালায় য বরাবরই ছিল দেখা যাইতেছে। এবং এই শ্বাসাশ্রয়ী ধ্বনি যে পরে খাঁটি জ ধ্বনি পাইয়াছে, এখনকার উচ্চারণ হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়।

এদিকে শব্দান্তর্গত জ এর ব্যবহারও লোপ পাইল না। অর্থাৎ মাগধীতে য এবং জ দুই বর্ণই প্রায় একরূপ ধ্বনি লইয়া ব্যবহৃত হইতে থাকিল। প্রাচীন বাঙ্গালায় মাগধীর এই বৈশিষ্ট্য বজায় আছে। চর্যাপদে অনেক জ আছে, আবার (জ-উচ্চারিত) য ও কয়েকটি আছে। যেমন,—

যাই—সংস্কৃত যাতি হইতে। অর্থ যায়।

যাবন্তু—যাবৎ।

যোজই—যোগান দেয়।

যোইআ—যোগী।

যোগী—যোগী।

যেন—যেন।

চর্যাপদে মাত্র এই ছয়টি শব্দ য-আদি। ইহার মধ্যে আবার যোগী এবং যেন এই দুইটি শব্দ তৎসম। তাহা হইলে য-আদি শব্দের সংখ্যা মোটে পাঁচটি দাঁড়ায়। অথচ এই পাঁচটির মধ্যে আবার যাই শব্দের জাই রূপ

আছে। তৎসম শব্দ দুইটিরও জকারাদি রূপান্তর আছে। চর্যাপদে জ-আদি শব্দের সংখ্যা এক শত চৌত্রিশ। ইহার মধ্যে আবার প্রায় পঁয়ষট্টিটি শব্দের জ য হইতে আগত। যেমন,—জুবই (যুবতী) জে (যৎ) জোইনি (যোগিনী) জোবন (যৌবন) জাহ্ন (যাও) সং √যা হইতে) জউনা (যমুনা) ইত্যাদি।

চর্যাপদে দেখিতেছি 'য'এর (জ উচ্চারিত) ব্যবহার খুব কম। যএর স্থান অধিকার করিয়াছে জ। কিন্তু জএর স্থানে কোথাও য বসিতেছে না।

মাগধীতে যএর প্রতিপত্তি এত কমিল কেন তাহা চিন্তা করিবার বিষয়।

মাগধীতে আদ্য জ স্থানে য বসিত, একথা বররুচি বলিয়াছেন। হেমচন্দ্রও ঐ ধরণের মত প্রকাশ করিয়াছেন। এবং মার্কণ্ডেয় ঐ মত কতকটা সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। *

এতৎ সত্ত্বেও বাঙ্গালা ভাষার—মাগধীর সহিত যাহার মাতাপুত্রী সম্বন্ধ নির্দেশ করা চলে—সেই বাঙ্গালা ভাষার আদিতম নিদর্শনে আদ্য যএর এত দৈন্য কেন?

আসল কথা মাগধীতে যে যএর ব্যবহার ছিল তাহার উচ্চারণে প্রাচীন সংস্কৃত ইঅ ধ্বনি ছিল না, বরং কতকটা জএর কাছাকাছি ধ্বনিই ছিল। এমন কি প্রাকৃতের সময়ে সংস্কৃত পাঠকালেও য উত্তর-ভারতে জ রূপে উচ্চারিত হইতেছিল। সুনীতিবাবু 'যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা' হইতে তাহার একটি প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পাদাদৌচ পদাদৌচ সংযোগাবগ্রহেষু চ।†

আবার বররুচিই মাগধী সম্পর্কে বলিয়াছেন,—'চ বর্গস্য স্পষ্টতা তথোচ্চারণঃ।' এই সকল প্রমাণ হইতেই প্রাচীন বাঙ্গালায় আদ্য যএর দৈন্যের কারণ নির্ণয় করা সহজ হইবে।

মাগধীতে আদ্য জএর উচ্চারণে যে বিশিষ্টতা ছিল তাহাকেই স্বতন্ত্রভাবে দেখাইবার জন্য বৈয়াকরণগণ 'য' বর্ণ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। য বর্ণ যে সেই বিশিষ্ট ধ্বনির উপযুক্ত পরিচায়ক তাহা বলা যায় না। আসলে ঐ 'য'টা তখন প্রাকৃত ভাষার বর্ণমালায় অকেজো হইয়া বসিয়াছিল, তাই উহার ঘাড়ে ঐ ধ্বনির ভারটা চাপাইয়া দেওয়া হইল মাত্র। কিন্তু আদ্য জএর (যাহার স্থানে য বসান হইল) ধ্বনির সহিত স্বরান্তর্বর্তী জএর ধ্বনির যে পার্থক্য ছিল সে পার্থক্য ধীরে ধীরে লোপ পাইল। উচ্চারণ যতই সমান হইতে লাগিল ততই আদ্য যএর স্থানে আবার জ বসিতে লাগিল। কিন্তু য এর ব্যবহার সম্পূর্ণ লুপ্ত হইল না।

এদিকে তৎসম শব্দে য এর ব্যবহার তো ছিলই। সংস্কৃতের য-যুক্ত শব্দ প্রাকৃতে প্রবেশ কালে য লইয়াই প্রবেশ করিত। পরে সহজ ভাবেই এক দিন তাহা জএ পরিণত হইয়া যাইত।

মোট কথা এই যে, প্রাকৃতে এক জ ধ্বনি বুঝাইতে জ এবং য এই দুইটি বর্ণই ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এই কথা মাগধী প্রাকৃত সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া খাটে। অবশ্য এ কথাও সত্য যে, জ ধ্বনি বুঝাইতে য এর ব্যবহার অপভ্রংশের দিকে ক্রমশঃ কমিতে থাকে। বাংলা ভাষায় প্রাচীনতম নিদর্শনে জ-উচ্চারিত য বর্ণের প্রয়োগের অল্পতা ঐ অবস্থারই পরিণতি সূচনা করে।

যখন উচ্চারণে ঐক্য থাকা সত্ত্বেও দুইটি বর্ণের ব্যবহার প্রচলিত হইল তখন দুইটি বর্ণের দুইটি নাম দেওয়া আবশ্যক হইল।

বর্গান্তর্গত বলিয়া জ এর নাম হইল বর্গীয় জ। সংস্কৃতে য এর স্থান স্পর্শ ও উষ্ম বর্ণের অন্তঃস্থ বলিয়া উহাকে অন্তঃস্থ য নাম দেওয়া হইল, অবশ্য মুখে বলিবার সময় উচ্চারণ করা হইল অন্তঃস্থ জ। বস্তুতঃ য কে অন্তঃস্থ য বলা হইলেও উচ্চারণে অন্তঃস্থতার কোন চিহ্নই বিদ্যমান রহিল না।

একই উচ্চারণ লইয়া দুইটি বর্ণের ব্যবহার চলে প্রাকৃত যুগ হইতে। কিন্তু ইহাদের গায়ে বর্গীয় এবং অন্তঃস্থ এই বিশেষণদ্বয়ের যোগ কবে হইতে আরম্ভ হইল তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

এদিকে আবার এক বিপদ হইল। প্রাকৃতে স্পর্শবর্ণের

* S. K. Chatterji—Origin and Development of the Bengali Languageএর ২৪৪-২৪৮ পৃ. দ্রষ্টব্য।

† ODBL. ৪৭৭ পৃ. দ্রষ্টব্য।

রাসলীলা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

লোপাধিক্যের ফলে অনেক স্বরবর্ণ পাশাপাশি বসিয়া উচ্চারণে অসুবিধা ঘটাইতে লাগিল। এই অসুবিধা যখন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল তখন য-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি রূপে য (অন্তঃস্থ) ব ভাষায় পুনঃপ্রবিষ্ট হইল। অন্তঃস্থ ব এর কথা পরে বলা যাইবে। এখন অন্তঃস্থ যই আমাদের আলোচনার বিষয়।

অন্তঃস্থ য্‌ উচ্চারণে y রূপে যখন শ্রুত হইতে আরম্ভ হয় ঐ উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য লিখিত হয় তাহার অনেক পরে। কথার ভাষায় নূতন ধ্বনি যত সহজে প্রবেশ করে লেখার ভাষায় তাহার চিহ্ন তত সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বাংলায় স্টেশন, মাস্টার, স্টীমার প্রভৃতি শব্দের বয়স অন্ততঃ এক শতাব্দী হইবে। কিন্তু উহাদের আসল ধ্বনি প্রকাশ করিবার জন্য নূতন চিহ্নের ব্যবহার সবে আরম্ভ হইয়াছে। তাহাও এখনও সকলে গ্রহণ করেন নাই। আমরা এতদিন ষ্টিমার লিখিয়াও দিব্য স্টিমার উচ্চারণ করিয়া আসিয়াছি।

আধুনিক আর্য ভাষাসমূহ স্বতন্ত্র ভাষারূপে যখন দেখা দেয় তখন য-শ্রুতির ব্যবহার শুরু হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রাকৃতে সাধারণতঃ য-শ্রুতি দেখা যায় না। প্রাকৃতের পর এবং আধুনিক ভাষাসমূহের জন্মলাভের পূর্বে কোন সময় লেখায় য-শ্রুতির ব্যবহার আরম্ভ হইয়া থাকিবে।

ওদিকে য ধ্বনি লইয়া এক অন্তঃস্থ য তো পূর্ব হইতেই বর্ণমালায় ছিল। এখন যশ্রুতির য (যাহার উচ্চারণ y এর অনুরূপ) আসায় একই বর্গের দুই উচ্চারণ দাঁড়াইল। অর্থাৎ একই য এর ধ্বনি হইল (১) j এবং (২) y। বর্গীয় জ এর সহিত বিভেদ বুঝাইবার জন্য য এর এক নাম তো ছিল অন্তঃস্থ জ আবার অন্তঃস্থ জ র সহিত পার্থক্য দেখাইবার জন্য উহার আর এক নাম হইল অন্তঃস্থ অ (ইঅ)। অন্তঃস্থ অ (য) এবং অন্তঃস্থ জ (য)— বর্ণমালায় ইহারা অভিন্ন। তাই উহাদের নামবিশেষণেও অভিন্নতা রাখা হইয়াছে। ঐ অন্তঃস্থ বিশেষণ যুক্ত জ এবং অ উহার অধুনা প্রচলিত দুইটি ধ্বনির পরিচয় দিতেছে।

এই কারণেই স্বরমালার প্রথম বর্ণের নাম স্বরে অ হইলেও ব্যঞ্জনমালার এই বর্ণটির নাম ব্যঞ্জনের অ না হইয়া অন্তঃস্থ অ হইয়াছে।

মোট কথা তাহা হইলে এই দাঁড়াইতেছে। মাগধী প্রাকৃতে য এবং জ এই দুইটি বর্ণেরই প্রচলন ছিল। কিন্তু রূপের পার্থক্য থাকিলেও ইহাদের ধ্বনিগত সাম্য ছিল। মাগধীর এই বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালেতেও বর্তাইয়াছে। প্রাকৃত অবস্থা হইতে খাঁটি বাঙ্গালায় আসিতে আসিতে এই দুই বর্ণের ধ্বনিতে আর কিছুমাত্র পার্থক্য রহিল না। যখন উচ্চারণে কিছুমাত্র পার্থক্য রহিল না তখনই উভয়ের নামে বিশেষণ যোগ করিয়া উহাদের চিহ্নিত করা আবশ্যক হইল। অপভ্রংশের শেষ অবস্থা হইতে বাঙ্গালার সূচনাকালের মধ্যে কোন এক সময় এই দুই বর্ণ এইভাবে বিশেষিত হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

জ যখন বর্গীয় জ এবং য যখন অন্তঃস্থ জ নামে পরিচিত হইয়া গিয়াছে তখন য-শ্রুতির য লেখার মধ্যে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যশ্রুতির য (যাহার উচ্চারণ y) এবং পূর্ববর্তী য (যাহার উচ্চারণ j) দুয়েরই আকৃতি একরূপ। বস্তুতঃ উহারা একই বর্ণ, কিন্তু ধ্বনি ভিন্ন। তাই নামের অনেকখানি অর্থাৎ অন্তঃস্থ এই বিশেষণ অংশ রাখিয়া কেবল ধ্বনি পরিচায়ক অংশটুকু বদলাইয়া দেওয়া হইল। একটি য এর নাম ছিল অন্তঃস্থ জ অন্য য এর নাম হইল অন্তঃস্থ ইঅ তাহা হইতে অন্তঃস্থ অ।

এদিকে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ হঠাৎ অন্তঃস্থ অ নাম লওয়ায় স্বরের অ কে স্বরে অ নামে চিহ্নিত করিয়া ব্যঞ্জনের অ-র সহিত তাহার পার্থক্য নির্দেশ করা হইল।

আ-র নূতন নামকরণ হইল স্বরে আ। স্বরের অ-র সাদৃশ্যে স্বরে আ হওয়াই সম্ভব। পরে হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ এবং পূর্বে স্বরে-অ আছে। এ অবস্থায় আ নিঃসঙ্গ থাকিলে বর্ণমালা পাঠকালে ছন্দ বজায় থাকে না। সেটাও স্বরে-আ নামকরণের একটা কারণ হইতে পারে।

কম্বল ও পান্নু

শ্রীপরিমল গোস্বামী

পান্নু দত্ত এবং অভয় দে কলেজের থার্ড ইয়ার হইতে ফোর্থ ইয়ার পর্য্যন্ত সহপাঠী এবং কলেজের বাহিরে প্রথম বর্ষের প্রথম দিকেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কলেজে পড়িবার সময় ইহারা দুই জনে অবশ্যপাঠ্যের সীমানার বাহিরে অনাবশ্যক পাঠ্যের ভিতর দিয়া উভয়ে উভয়কে আকর্ষণ করিয়াছিল। এমন দেখা যাইত, ক্লাসে দর্শনের অধ্যাপক এথিক্সের মর্মকথা প্রাণপণে বুঝাইতেছেন, ছাত্রেরা মনোযোগ দিয়া অথবা মনোযোগের ভান করিয়া সেই বক্তৃতার দিকে লক্ষ্য করিতেছে, কিন্তু পান্নু পিছনের একটি আসনে বসিয়া আমেরিকা হইতে সদ্যপ্রকাশিত তদ্দেশীয় একখানি শিল্প-সংক্রান্ত বই গভীর মনোযোগের সহিত পড়িতেছে। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, অভয়ও ঠিক সেই সময় পিছনের আর একটি আসনে বসিয়া জাপান হইতে প্রকাশিত আর একখানি শিল্প-সংক্রান্ত বইতে মনোনিবেশ করিয়াছে।

পরস্পর অপরিচিত হইলেও ক্রমশ শিল্পের অদৃশ্য আকর্ষণে উভয়ে উভয়ের নিকটে আসিয়া পড়িল এবং অল্প দিনের মধ্যেই অত্যন্ত পরিচিত হইয়া উঠিল। আলাপ ঘনিষ্ঠ হইলে দেখা গেল অভয় বিত্তশালী, কিন্তু পান্নুর বিত্ত নাই আছে শুধু চিত্ত। এবং শুধু এই কারণেই সে এত চিত্তাকর্ষক যে তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে বসিলে সহজে তাহা ছাড়িয়া উঠা যায় না, তদুপরি বুদ্ধিও তাহার ক্ষুরধার।

সুতরাং আকর্ষণ দুই জনের মধ্যেই প্রবলভাবে কাজ করিল, এবং এই 'মধ্যাকর্ষণে'র ফলে উভয়েই মধ্য-পথে কলেজ ছাড়িয়া সোজা টালিগঞ্জের দিকে একটি প্রকাণ্ড শেড্ ভাড়া লইয়া তাহার মধ্যে গিয়া উঠিল।

পান্নুর পরামর্শে এবং অভয়ের টাকায় সেই শেডের মধ্যে কম্বল তৈয়ারীর প্ল্যান চলিতে লাগিল।

পাঠক, কম্বলের কথায় ঘামিয়া উঠিবেন না। শুধু ইতিহাসটা শুনুন।

এই কম্বল প্রথমে আসে পান্নু দত্তের মাথায়। কম্বল সম্বন্ধে তাহার এই দুর্বলতা কোথা হইতে আসিল তাহা সে নিজেও ভাল করিয়া জানে না। কিন্তু কিছু দিন হইতেই তাহার কেমন একটা ধারণা হইয়াছে যে মুক্ত ক্ষেত্রে বাঙালীকে কম্বল প্রস্তুত করিতে হইবে, শুধু জেলে গিয়া প্রস্তুত করিলেই চলিবে না। কারণ জেলের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে কম্বলের উৎপাদন-পরিমাণ অত্যন্ত কম, কাজেই বাঙালী চিরদিনই এই কম্বলের জন্য অন্য প্রদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকে। কোনও দিন যদি বাংলা প্রদেশ স্বতন্ত্র দেশে পরিণত হয় তাহা হইলে একমাত্র কম্বলের জন্যই হয়তো তাহার স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে হইবে।

অভয় দে কিন্তু কম্বল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সে শুধু জানে দোকানে দোকানে যাহা "র‍্যাগ" নামে পরিচিত এবং যাহার সাইনবোর্ড দেখিলে শিক্ষিত বাঙালীর মাথায় অযথা রাগ চড়িয়া যায় তাহাই কম্বল এবং তাহার মূল্য তিন-চারি টাকা হইতে ত্রিশ-চল্লিশ টাকা। ইহা কি বাঙালী প্রস্তুত করিতে পারিবে? পান্নু বলিল, নিশ্চয় পারিবে। আমরাই পারিব। অভয় দে এক লক্ষ টাকা বাহির করিয়া দিল, এবং দিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিল।

পান্নু দত্তের সঙ্গে অবশ্য তাহার একটা বোঝাপড়া হইল। অভয় দে জানিত পান্নু ছাড়া তাহার এ কারবার চলিতে পারে না। সে শুধু টাকাই দিতে পারে কিন্তু ব্যবসাতে সূক্ষ্ম বুদ্ধির যে খেলা দেখাইতে হয় তাহা তাহার মধ্যে নাই। কাজেই অভয় দে পান্নুকে বলিল, আমাদের এই ব্যবসায়িক সংযোগ যাতে স্থায়ী হয়, মাঝখানে কোন

রকম গোলমাল না হয় সেদিকটাও ভাবা দরকার।

পানু বলিল, তোমার প্রাণ এবং আমার মান রইল এর মধ্যে, আমি ছেড়ে গেলে তোমার কি ক্ষতি হবে তা কি আমি বুঝি না? কিন্তু এইটেই তো সব নয়, তোমাকে ছাড়লে আমার কি হবে সেইটেই বেশি ক'রে ভাবছি।

অভয় দে বুঝিল পানু ঠিকই বলিয়াছে, কিন্তু তবু একটা লেখাপড়া থাকা ভাল। পানুর টাকার অংশ না থাকিলেও দুই জনের কাজের অংশের সর্ত একটা নির্দ্দিষ্ট হওয়া দরকার এবং সেটা পাকাপাকিভাবে দলিলভুক্ত থাকা চাই।

অভয় দে চট্ করিয়া সেই মুহূর্ত্তে কথাটা বলিতে পারিল না, আর এক দিন বলিল।

পানু অবাক হইল। সে বলিল, কারবারটা সম্পূর্ণ তোমার, আমি একটি উপলক্ষ মাত্র, কাজেই লেখাপড়ার মধ্যে দিয়ে আমার একটা অধিকার এতে স্থাপন করা আমার পক্ষে লজ্জাকর। তুমি কি আমাকে ফাঁকি দেবে? আমি কি এমন কল্পনা স্বপ্নেও করতে পারি? কাজেই ওসব কথা আর তুলো না। তোমাকে আমি চিনি, তোমার মুখের কথাই আমার পক্ষে দলিলের চেয়ে বেশি।

অভয় দে বলিল, তা হ'লে এস আমরা সেকালের মত মুখের কথায় শপথ ক'রেই শুভ কাজ আরম্ভ করি।

পানু খুব উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, ভদ্রলোকের পক্ষে মুখের কথার চেয়ে দামী জিনিস সংসারে আর কি আছে? আমরা শপথ করছি এই কম্বল-কলের আমরা দুজন অংশীদার। আমরা যদি লাভ করি তা হ'লে আমরা দুজনে সমান লাভবান হব, আমরা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হই তা হ'লে সে ক্ষতি আমাদের দুজনেরই হবে। তখন আমি একটি পয়সা না নিয়ে এই কারবার চালাতে থাকব।—এক কথায় আজ থেকে আমরা একসঙ্গে ভাসছি, ডুবি ত একসঙ্গেই ডুবব।

অভয় দে নির্ভয় হইল। পানুর উপর বিশ্বাস তাহার আরও বাড়িয়া গেল, শ্রদ্ধাও বাড়িল অনেক।

পানু কিছু দিন হইতে অভয় দেকে অভয়-দা বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল, আজ অভয় দের সত্যই মনে হইল পানু তাহার ছোট ভাই।

পানুর কম্বল-উৎপাদনের উৎসাহ অসম্ভব রকম বাড়িয়া গেল। সেই উৎসাহের সঙ্গে কম্বলের তুলনাই হয় না। উৎসাহের সঙ্গে প্রচার বাড়িল দশ গুণ। পানু কম্বলের বার্ত্তা বাংলা দেশের গৃহে গৃহে প্রচার করিল। সে বলিল, বাঙালীকে বাঁচতে হ'লে কম্বল চাই।

কেহ কেহ অবশ্য বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিল, শুধু কম্বল নয় ঐ সঙ্গে লোটাও। কিন্তু পানু সে-কথায় কান দেয় নাই। পানুর শত্রু হইতে মিত্রের সংখ্যাই ক্রমশ বাড়িয়া চলিল এবং তাহারা সবাই বলিতে লাগিল, কানু ছাড়া যেমন গীত নাই, পানু ছাড়া তেমনই কম্বল নাই।

পানু শুধু যে কম্বল সম্বন্ধেই প্রচার করিতে লাগিল তাহা নহে, অভয়-দা সম্বন্ধেও প্রচার চালাইতে লাগিল। পানুর ভাষায় বর্ত্তমান বঙ্গে অভয়-দা'র মত দেশপ্রেমিক ত্যাগী লোক দ্বিতীয় নাই। যে দেশের ইতিহাসে কম্বল নাই সেই দেশে অভয়-দা কম্বলের কল স্থাপন করিয়া বাঙালীকে হীনতার হাত হইতে বাঁচাইয়া দিলেন। বাংলা দেশের শিল্পের ইতিহাসে অভয়-দা অবিস্মরণীয় উপকরণ যোগাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

পথে ঘাটে অভয়-দা'র নাম প্রচারিত হইল, বাংলা দেশের প্রত্যেকটি লোক অভয়-দা'র নাম জানিল। যে-কোন লোক যে-কোন স্থানে যদি জিজ্ঞাসা করে বর্ত্তমান বাংলার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে? তাহার উত্তরে সবাই বলে অভয়-দা।

অভয় দে অল্পকালের মধ্যেই স্থায়ী ভাবে 'অভয়-দা'তে পরিণত হইল। এবং সে অভয় চক্রবর্ত্তী না অভয় সরকার না অভয় সেন, তাহা ভাল করিয়া জানিবার পূর্ব্বেই তাহাকে অভয়-দা হিসাবে জানিয়াই সকলে পরম তৃপ্ত হইল।

অভয় পথে বাহির হইলে লোকে সবিস্ময়ে বাংলা দেশের এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটির দিকে চাহিয়া থাকে, আর অভয় আনন্দে, গর্ব্বে ফুলিয়া উঠে। পানুই তাহাকে বাংলা দেশে এই প্রতিষ্ঠা লাভে সাহায্য করিয়াছে এ-কথা মনে আসিতেই পানুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার মন ভরিয়া যায়।

পানুর শুদ্ধ বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল, ব্যবসায়ক্ষেত্রে

তাহা প্রয়োগ করিয়া দেখা গেল সেদিকেও তাহা সমান তীক্ষ্ণ।

পান্নু অভয়-দা'কে বুঝাইল, ব্যবসার বহু পূর্ব হইতেই প্রচার করা আবশ্যক। এমন কি ব্যবসার পরিকল্পনা-সময় হইতেই প্রচার আরম্ভ করিতে হয়। অনুর্বর দেশে উপযুক্ত সার দিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত না-করিলে কোন ফসলই ফলে না। প্রচার এই সার। এবং এই ধারণার বশবর্তী হইয়া চলিতে চলিতে পান্নু বুঝিতে পারিল এবং অভয় ও বুঝিল প্রচার সার বটে, কিন্তু উপযুক্ত বুদ্ধি না খাটাইতে পারিলে শেষে প্রচারই সার হইয়া দাঁড়ায়, আর কোন কাজ হয় না। এজন্য পান্নু দেশের বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকের মতামত সংগ্রহ করিল। কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লীগ সবাই পান্নুকে উৎসাহপত্র পাঠাইল।

কম্বল সম্বন্ধে কংগ্রেস বলিল—জীবকে হত্যা না করিয়াও কম্বলের জন্য প্রয়োজনীয় লোম সংগ্রহ করা যায় বলিয়া কম্বল অহিংসার একটি প্রতীক। কম্বলের সুতা চরকায় কাটা যায় বলিয়া এবং কম্বল তাঁতে বোনা যায় বলিয়া ইহাতে আমাদের সম্পূর্ণ সমর্থন আছে। কম্বল খদ্দর হইতে উৎকৃষ্ট।

কম্বল সম্বন্ধে হিন্দু মহাসভার মত—গোরুর লোম হইতে প্রস্তুত নহে বলিয়া আমরা বরাবরই কম্বলের ভক্ত। উপরন্তু ইহা হিন্দু সন্ন্যাসীর অবলম্বন বলিয়া দেশে কম্বল-প্রচারে আমাদের পূর্ণ সমর্থন আছে। তবে দেখিতে হইবে লোম যদি বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয় তাহা হইলে মেরিনো ভেড়া পর্য্যন্ত রাজি আছি। আঙ্গোরা ছাগ বা উট হইলে আমাদের আপত্তি আছে। কেন আছে তাহা বোধ করি স্পষ্ট করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

কম্বল সম্বন্ধে মুসলিম লীগ বলিল—কম্বল আমরা সকলেই ব্যবহার করি। তবে বাংলা দেশে কম্বলের কল স্থাপিত হইলে ইহার জন্য প্রয়োজনীয় লোম কোথা হইতে আসিবে তাহার উপরে আমাদের সহানুভূতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যদি আপনারা একমাত্র 'মোহেয়ার' দিয়া কম্বল প্রস্তুত করেন তাহা হইলে আপনাদের কম্বল আমরা গ্রীষ্মকালেও ব্যবহার করিতে রাজি আছি।

মিল স্থাপনের কাজ দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। লোমও জোগাড় হইতেছে। কিন্তু কল চালাইবার জন্য অভিজ্ঞ লোক পাওয়া যাইতেছে না। পান্নু তাহাতে কিছুমাত্র দমে নাই। সে স্কটল্যাণ্ডের একটি মিলের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করিতেছে, এবং প্রথম অবস্থায় সেইখান হইতেই অভিজ্ঞ লোক আসিবে প্রায় ঠিক হইয়া গিয়াছে।

পান্নু কিন্তু এ-সব কথাই দেশের মধ্যে প্রচার করিতেছে। এবং দেশের লোককে লোম সম্বন্ধে নানা রূপ বক্তৃতা দিয়া বিস্মিত করিতেছে।

কে জানিত যে হেরোডোটাস্‌-এর বিবরণীতে প্রাচীন কালে ব্যাবিলনবাসীদের উলের পোষাক ব্যবহারের কথা উল্লেখ আছে?

কে জানিত, প্রাচীন গ্রীসের লোকেরা উল দিয়া কম্বল প্রস্তুত করিতে পারিত?

কে জানিত, রোম্যানগণ উলের যাবতীয় কাজে অভিজ্ঞ ছিল?

কে জানিত, রোম্যানদের সময়ে ইংলণ্ডের উইনচেস্টার নামক শহরে একটি উলের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল?

তা ছাড়া মধ্যযুগে ফ্ল্যাণ্ডার্সে যে উলের জিনিস প্রস্তুত হইত এবং সেখান হইতে তাঁতী আনাইয়া ইংলণ্ডে উলের তাঁত চালান হইত—এ-সব সংবাদই বা কে জানিত?

পান্নু উন্মাদের মত বাংলা দেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া রোম-বিষয়ক এই সব মূল্যবান ইতিহাস রোমহর্ষক ভাষায় প্রচার করিতেছে। সে এমন কথাও এক দিন বলিয়াছে যে ইটালির রাজধানীর নাম সম্বন্ধে তাহার মনে একটি ঘোরতর ঐতিহাসিক সন্দেহ জাগিয়াছে।

ইহা যাহারা সকলেই পান্নুর কম্বল-মাহাত্ম্য বিষয়ে সবিশেষ অবগত হইয়া এক দিকে যেমন অভয়কে আর এক দিকে তেমনই পান্নুকে যথাক্রমে রেলগাড়ি ও এঞ্জিনের সহিত তুলনা করিতে লাগিল।

এক দিন একটি ছোটখাটো সভায় পান্নু তাহার বক্তৃতা দিতেছিল। তাহার বক্তব্য এই যে, বাঙালীর কম্বল বাঙালীকেই যে কিনিতে হইবে তাহা নহে। কম্বল

বাংলা দেশে প্রস্তুত হইবে বটে, কিন্তু তাহার প্রচার হইবে ভারতবর্ষের সর্বত্র। এইটি হইল ইহার ব্যবহারিক দিক্‌। ইহা ছাড়া কম্বলের একটি সংস্কৃতির দিক্‌ আছে। ইহা দ্বারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকের মধ্যে ঐক্য স্থাপন সহজে হইতে পারে। কম্বল সকলকেই ব্যবহার করিতে হয়—ত্যাগী ও ভোগী নির্বিশেষে কম্বল সকলেরই আশ্রয়। কম্বল গৃহস্থেরও চাই, সন্ন্যাসীরও চাই।

পান্নু কথা আরম্ভ করিলে সহজে শেষ করিতে চাহে না। তাহার ভাষায় এমন একটা উন্মাদনা আছে যাহাতে সে নিজেই সে সময়ে উন্মাদ হইয়া ওঠে। ইহাই তাহার কথা বলার নিজস্ব ভঙ্গী। তামাক কিংবা আলকাতরার ব্যবসা হইলেও পান্নু ঠিক এই ভাবেই নিজেকে এবং অপরকে মাতাইয়া তুলিতে পারিত।

সভায় বক্তৃতা চলিতেছিল। এক জন মাড়োয়ারী এই সভায় উপস্থিত ছিল। সে পান্নুর বক্তৃতা শুনিয়া একটু বেশি মুগ্ধ হইল, এবং পান্নুকে ডাকিয়া নিজের বাড়িতে লইয়া গিয়া একটি পরামর্শে মত্ত হইল। তার পর হইতে অন্ততঃ সাত দিন পর্য্যন্তও পান্নুকে কেহ বক্তৃতা দিতে দেখিল না। পান্নুকেও কেহ দেখিল না। বাংলা দেশের আবহাওয়ায় যেন একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়া গেল।

পান্নু এতদিন শুধু বক্তৃতা দিয়াই কারখানাটি সচল করিয়া রাখিয়াছিল, সেই পান্নু হঠাৎ একেবারে ডুব মারিল! অভয় তাহাকে কোথায়ও খুঁজিয়া না পাইয়া চোখে সরিষার ফুল দেখিতে লাগিল। পান্নুর অভাবে তাহার প্রত্যেকটি মুহূর্ত বিস্বাদ হইয়া গেল—মনে নানা রূপ আশঙ্কা জাগিল এবং তাহার কারখানাটিও মূল্যহীন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মাত্র এক-এক সময় মনে আশা জাগে। তাহার মনে হয়, পান্নু নিশ্চয় ইচ্ছা করিয়া এরূপ করিতেছে না। পান্নু প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, একসঙ্গে ভাসিব কিংবা একসঙ্গে ডুবিব—সেই পান্নু কৃতঘ্ন হইয়া সরিয়া পড়িবে ইহা একেবারে অসম্ভব।

কিন্তু কারখানার ভিতরে গেলেই অভয়ের মন দমিয়া যায়। যদি পান্নু আর ফিরিয়া না আসে!...

প্রতিদিন প্রকাণ্ড একগাদা ভেড়ার লোমের মধ্যে বসিয়া অভয় কারখানার বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে থাকে। কিন্তু চিন্তা করিতে গিয়া সমস্তই গোলমাল হইয়া যায়। এই ভাবে কিছু কাল কাটিল।

তার পর দিন-দশেক পরে উন্মাদের মত চেহারা লইয়া এক দিন পান্নু অভয়-দার কাছে আসিল। অভয় তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

কিন্তু পান্নু আজ তাহাকে আনন্দ দিতে আসে নাই। সে জন্য সে গভীর দুঃখিত, কিন্তু উপায় নাই।

পান্নু বলিল, আমরা অনেক আশা ক'রেই অনেক কিছু করি কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমাদের আশা পূর্ণ হয় না।

অভয়ের চোখমুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হইয়া গেল।

পান্নু বলিতে লাগিল, বাঙালীর দ্বারা কম্বলের মিল চালানো অসম্ভব, এই কথাটাই আজ উপলব্ধি করেছি।

অভয় ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

পান্নু বলিয়া চলিল, আজ একা ব'সে চিন্তা করতে গিয়ে দেখি আমরা ভুল করেছি। কোন কিছু করতে গেলে শুধু উৎসাহ আমাদের চিরদিন ধ'রে রাখতে পারে না। যদি কোনও কিছুর বীজ আমাদের অন্তর্নিহিত না থাকে তা হ'লে গাছ জন্মাবে কিসে? আমি চিন্তা ক'রে বুঝতে পেরেছি বাঙালীর কোষ্ঠীতে কম্বলের চিহ্ন নেই। আর এইটেই তো স্বাভাবিক। বাংলা দেশ গ্রীষ্মপ্রধান।

অভয়-দা ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, তা হ'লে এত টাকা সব নষ্ট হবে?

পান্নু বলিল, সংসারে কিছুই নষ্ট হয় না। যাকে আমরা নষ্ট হওয়া বলি তা অন্য মূর্তিতে রূপান্তরিত হয় মাত্র।

অভয় বলিল, জানি, সেটা কয়েক মাস আগেই কলেজে পড়েছি। কিন্তু তাতে সান্ত্বনা কোথায়?

পান্নু স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিল, সান্ত্বনা এই যে এক লাখ টাকা খরচ ক'রে আমাদের এত বড় অভিজ্ঞতা লাভ হ'ল। সংসার আমাদের কাছ থেকে টাকা আদায় না ক'রে কিছুই দিতে চায় না—কোন শিক্ষাই না। এমন কি, অসাবধানে পকেটে টাকা নিয়ে পথ চলা অন্যায় এ শিক্ষাও পকেট কাটা না যাওয়া পর্যন্ত আমরা লাভ করি না। টাকা তোমার

কিছু গেল—কিছু কেন, তোমার হয় ত যা কিছু ছিল সবই গেল—কিন্তু সংসারে যারা টাকাটাকেই বড় ক'রে দেখে তাদের মত হতভাগা আর কে আছে? আমরা পুরুষ, আমরা নিজেকে কোন কিছুর সঙ্গেই জড়াই না—আমরা সদা মুক্ত।—এইটে বিশ্বাস কর এবং এই বিশ্বাস নিয়ে এই সংসারের হাটে বেচাকেনা কর—তার পর যেদিন ওপার থেকে ডাক আসবে সেদিন কাকে কি পরিমাণ দিয়ে যাবে এসব নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না—মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে শ্মশানে যাবার লোক না ডেকে উইলের সাক্ষী ডাকতে হবে না। বেরিয়ে পড় পথে—পথই আমাদের একমাত্র আশ্রয়—এ-পথে চলতে একখানি মাত্র কম্বলের দরকার এবং তার জন্যে মিল চালাবার কোনই প্রয়োজন নেই!

পান্নুর আবেগ ক্রমশ বাড়িয়া চলিল এবং বক্তৃতার স্রোতে তাহার অভয়-দা ভাসিয়া চলিল, তাহার হাত পা শিথিল হইয়া আসিল, নিজেকে নিজে আর আয়ত্তে রাখিতে পারিল না। প্রায় আধঘণ্টা এই ভাবে কাটিবার পর অভয় সম্পূর্ণ মুক্ত পুরুষে পরিণত হইল এবং টাকার মূল্য যে এত কম তাহা সে এই প্রথম অনুভব করিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

হঠাৎ গুরুতর আঘাত পাইলে লোকের বোধশক্তি কিছুক্ষণের জন্য লুপ্ত হয়—কিন্তু এই অবস্থা তাহার বেশিক্ষণ থাকে না, ক্রমশই আহত স্থানটি বেদনায় টন্‌টন্ করিতে থাকে। অভয়ের মনের অবস্থাও ঠিক তাহাই হইল। মিল বন্ধ করিতে হইবে এ আঘাত তাহার পক্ষে গুরুতর হইয়াছিল বলিয়াই সে আঘাতের গুরুত্ব প্রথমে বুঝিতে পারে নাই। তদুপরি পান্নুর বক্তৃতার প্রলেপে বোধশক্তি তাহার আরও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল—কিন্তু পান্নু চলিয়া যাইবার পর হইতে সে ধীরে ধীরে নিজের অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে আরম্ভ করিল।

উপরন্তু অভয় সংবাদ পাইল পান্নু তাহাকে ভয়ানক ঠকাইয়াছে। সে নাকি এক মড়োয়ারীর সঙ্গে যোগ দিয়া পৃথক একটি কম্বলের মিল খুলিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। আরও শুনিতে পাইল পান্নু সেখানে আর অংশীদার নয়, লভ্যের অনিশ্চিত অংশের আশায় আর তাহাকে অনির্দিষ্ট-কাল অপেক্ষা করিতে হইবে না, পান্নু পাঁচ শত টাকা বেতনে সেখানে ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছে!

পান্নুর বিশ্বাসঘাতকায় অভয় একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। হঠাৎ তাহার মনে হইল পান্নু এক জন অভিনেতা। এই কথাটি মনে হইবার পর হইতে সে পান্নুর আগাগোড়া ব্যবহার স্মরণ করিয়া দেখিল এবং ক্রমেই বুঝিতে পারিল পান্নু আগাগোড়া তাহার সহিত অভিনয় করিয়াছে। ঘরে এবং বাহিরে সর্বত্র সে অভিনয় করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে।

অভয় এক জন অভিনেতার বাক্‌চাতুরীতে এমন করিয়া ভুলিল! মস্তিষ্ক অনেকটা স্থির হইলে মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল পান্নু এ কয়েক মাসে কম করিয়াও তাহার পঞ্চাশ হাজার টাকা মারিয়াছে এবং নগদ টাকা প্রায় ফুরাইয়া আসিবার মুখে সে সরিয়া পড়িয়াছে!

এখন একা সে এই সব কল লইয়া কি করিবে? অভিজ্ঞ লোক আসিলেই কি সে মিল চালাইতে পারিবে? অভয়ের নিজের উপর আর আদৌ বিশ্বাস নাই। সে নিজের বুদ্ধিতে ব্যবসা করিলে এত কিছু করিতে সাহস পাইত না, ছোটখাট কিছু করিত। কারণ এত বড় জটিল কল চালাইবার মত উৎসাহ বা প্রবৃত্তি বা বুদ্ধি তাহার কোন দিনই ছিল না। তাই একদিকে তাহার প্রিয় ভাই সরিয়া পড়াতে সে যেমন আঘাত পাইল—আর এক দিকে তেমনি এত বড় একটি মিল তাহার ঘাড়ে চাপিয়া থাকাতেও তাহার সোয়াস্তি হইল না।

কম্বলের কল হয়ত কম্বলের চেয়ে ভয়ানক। কম্বল ছাড়িলেও কম্বলের কল তাহাকে এখন ছাড়িতেছে না। সুতরাং দুর্ভাগ্য দুইটি। কিন্তু যুগপৎ দুইটি দুর্ভাগ্যই তাহাকে দুই দিক্ হইতে ক্রমাগত আঘাত করিতে থাকিলে সে হয়ত উন্মাদ হইয়া যাইত। ভগবান্ এই ভয়াবহ পরিণাম হইতে আপাতত তাহাকে রক্ষা করিলেন। এই সময় একটি অজ্ঞাত লোকের সঙ্গে তাহার পরিচয় হইল এবং সেই লোকটি তাহার মিল কিনিতে পারে এরূপ ইঙ্গিত করিল।

হাতে স্বর্গ নামিয়া আসিলেও হয়ত অভয় এত আনন্দিত হইত না। যে-কোন মূল্যে এই দায় হইতে

তাহাকে উদ্ধার পাইতেই হইবে। তাই অভয় তাহাকে ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করিয়া মিলটাকে একরূপ দান করিয়াই দিল। মূল্য যাহা পাইল তাহা সে তাহার নিজের নিকটেও প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইল।

কিন্তু এই মুক্তির আনন্দ তাহার একটি সপ্তাহও ভোগ করা হইল না। অভয় চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই শুনিতে পাইল যে-লোকটি মিল কিনিয়াছে সে পান্নুর লোক এবং যে টাকায় কিনিয়াছে সে সেই মাড়োয়ারীর টাকা! কিন্তু তাহার আর কিছুই করিবার উপায় নাই। পান্নুর কৃতঘ্নতা তাহাকে এক দিনে পশুর ধাপে নামাইয়া আনিল। সে ঠিক করিল পান্নুকে ধরিয়া মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত একেবারে তুলা ধুনিয়া দিবে। দৈহিক শক্তির সঙ্গে তাহার মানসিক শক্তির যেটুকু অসামঞ্জস্য ছিল, মনে হিংসা জাগিয়া ওঠাতে সেই অসামঞ্জস্য দূর হইল। তাহার নৈতিক জোর অস্বাভাবিক বাড়িয়া গেল—এবং তাহার মনে হইতে লাগিল যেন এখন সে কম্বলের কল একাই চালাইতে পারে।

পান্নু ঘুঘু, পান্নু চোর, পান্নু ধাপ্পাবাজ, পান্নু কুলাঙ্গার, পান্নু ইতর, পান্নু ডাকাত, পান্নু খুনে, পান্নু অভিনেতা—অভয়ের মনশ্চক্ষুর সম্মুখ দিয়া পান্নুর এই ধারাবাহিক চিত্রগুলি সিনেমা-চিত্রের মত সেকেণ্ডে চব্বিশখানা করিয়া ছুটিয়া চলিল।

অভয় তাহার গাড়ির তেল পুড়াইয়া পথে ঘাটে সর্ব্বত্র পান্নুর বিরুদ্ধে নানারূপ কুৎসা রটাইয়া ফিরিতে লাগিল। ইহা ছাড়া তাহার বর্ত্তমানে আর কোনও কাজ নাই। এই সময়ে অভয়ের কয়েকটি বিবাহ সম্বন্ধ আসিয়াছিল কিন্তু যাহারা এ-সব কথা বলিতে আসিয়াছিল অভয় তাহাদিগকে শুধু গায়ে হাত তুলিতে বাকী রাখিয়াছে। একটি কনের পিতাকে সে তাড়া করিয়া রাস্তায় পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়াছে। পান্নু ছাড়া আর কাহারও কথা ভাবিবার তাহার সময় নাই।

এই অভিনেতা-পান্নুকে জব্দ করিতে হইবে। তাহাকে আঘাত করিতে হইবে অন্তরে নয়—বাহিরে। এবং একআধ জায়গায় নয়, সর্ব্বাঙ্গে।

অভয় যাহাকে পায় তাহারই কাছে পান্নুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। বলে, এমন অভিনেতা দেখেছ? বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতার বাহান্ন পুরুষকে অভিনয় শেখাতে পারে। যাকে তোমরা অভিনেতা ব'লে গর্ব কর, সে এর পায়ের কাছে ব'সে সারা জীবন অভিনয় শিখলেও এর এক কণা আয়ত্ত করতে পারবে না।

অভয় তাহাকে পথে পথে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। পান্নু কোথায় থাকে—তাহা সে জানে না, পূর্বে যেখানে থাকিত এখন সেখানে সে থাকে না। কিন্তু যেখানেই থাক, কারখানায় তাহাকে আসিতেই হইবে। সেই জন্য কারখানার পথে মাঝে মাঝে গাড়ি লইয়া সে ঘুরিয়া যায়।—এক দিন না এক দিন তাহার দেখা নিশ্চয় পাওয়া যাইবে—এবং দেখা পাওয়া গেলে তাহাকে আর সে ছাড়িবে না। কিন্তু পান্নু যে কয়েক দিন হইল শহর ছাড়িয়া মিলের কাজে বাহিরে চলিয়া গিয়াছে তাহা সে জানিত না। তাই মিলের পথে তাহার দেখা মিলিতেছে না।

অভয়ের বিশ্রাম নাই। তাহার জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য, সমস্ত আদর্শ, সমস্ত ভবিষ্যৎ এবং সমস্ত আয়োজন একটি মাত্র কাজের ভিতরেই সার্থকতা লাভ করিবে, একটি মাত্র কাজই তাহার সমস্ত ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবে। পান্নুর হাত ভাঙিতে হইবে, পা ভাঙিতে হইবে, তাহার পর কম্বল জড়াইয়া তাহার উপর লাঠি চালাইয়া সমস্ত অঙ্গ থেঁতো করিতে হইবে, তার পর তাহা ছুরি দিয়া কাটিয়া কাটিয়া তাহার মধ্যে নুন পুরিয়া দিতে হইবে, সর্ব্বশেষে তাহার শির লক্ষ্য করিয়া শেষ আঘাত। সেই একটি আঘাতে পান্নুর অভিনয়-জীবনের শেষ।—এমন সাংঘাতিক অভিনয়ও মানুষ করিতে পারে!

রঙ্গমঞ্চে যে-লোকটি শয়তানের ভূমিকা অভিনয় করে তাহাকেও আমরা প্রশংসা করি কিন্তু যাহার অভিনয় রঙ্গমঞ্চের বাহিরে, সে মানুষের চিরশত্রু। পান্নুকে মরিতেই হইবে।

অভয়ের মনোভাব এবং যুক্তি স্বাভাবিকত্বের সীমা কিছুদিন হইতেই ছাড়াইয়া গিয়াছে।

সে দিনও দৈনিক কর্ত্তব্যের তাগিদে অভয় পান্নুকে খুঁজিবার জন্য টালিগঞ্জের পথে গাড়ি লইয়া ঘুরিতেছিল

এমন সময় পরিচিত কণ্ঠে 'অভয়-দা' ডাক শুনিয়া অভয় চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখে পান্নু তাহাকে ডাকিতেছে।

পান্নু ললাটদেশ বিস্ময়ে কুঞ্চিত করিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল এ কি অভয়-দা, তোমার চেহারা এত খারাপ হয়ে গেছে, ছি ছি ছি, তুমি কি হয়েছ বল দেখি?—তোমার দিকে যে একেবারে চাওয়া যায় না! কোথায় চলেছ?

বলিতে বলিতে নিজেই গাড়ির দরজা খুলিয়া তাহার পাশে গিয়া বসিল।

পান্নুকে দেখিবামাত্র অভয়ের মন হইতে মন্ত্রবলে আধ মিনিট পূর্ব হইতে গত মাসখানেকের সমস্ত স্মৃতি লুপ্ত হইল।

অভয় বলিল, পান্নু কোথায় চলেছ?

পান্নু বলিল, এক বার ডালহৌসি স্কোয়ারে যাব, তা তোমাকে পেয়ে ভালই হ'ল, চল।

অভয় ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে গাড়ি ছুটাইয়া দিল।

পান্নু ক্রমাগত অভয়-দার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করিতে করিতে চলিল, এবং একটা টনিকের নামও বলিয়া দিল। তাহার পর বাঙালী-চরিত্রের বিরুদ্ধে পান্নু চিত্তাকর্ষক ভাষায় এমন সব অভিযোগ করিতে লাগিল যে অভয় নিজের বাঙালীত্বের জন্য লজ্জায় যেন মাটিতে মিশাইয়া গেল। টালিগঞ্জের ব্রিজ হইতে ডালহৌসি স্কোয়ার পর্যন্ত এরকম দীর্ঘ একটানা লজ্জা সে জীবনে পায় নাই।

অভয় পান্নুকে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছাইয়া দিল— পান্নু তাহাকে একটু ধন্যবাদও দিল না। বরঞ্চ বলিল, অভয় দা তোমাকে আর কি বলি, যদি দাদা না হয়ে ছোট ভাই হ'তে তা হ'লে এই স্বাস্থ্য দেখে তোমার গালে দুটো চড় বসিয়ে তোমাকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তুলতাম।

অভয়ের মুখে সলজ্জ শুষ্ক হাসি।

পান্নু এক মুহূর্তে ভিড়ের মধ্যে মিলাইয়া গেল। অভয় শূন্যমনে বাড়ী ফিরিয়া হঠাৎ যেন ভূমিকম্পের এক প্রচণ্ড ধাক্কা খাইয়া ঘুরিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল।

...অভিনেতা আবার অভিনয় ক'রে গেল!...কিন্তু ইহার বেশী আর কিছু সে তখন চিন্তা করিতে পারিল না।

বর্ষণমুখর রাত্রি

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

হু-হু করি ক্ষিপ্র বায়ু তৃণদল উড়ায়ে চকিতে
কোথা গেল বহি'। আকুঞ্চিত শীর্ণ নদী-নীর।
পশ্চিম দিগন্ত হ'তে ঘনকৃষ্ণ জলদ ঘনায়,
ঝলসে বিদ্যুৎ।

অন্ধ, দিশাহারা
সঙ্গিহীন পথ চলিয়াছি।

বর্ষণমুখর রাত্রি, সুতীব্র পবন,
তরঙ্গে তরঙ্গে কাঁদে নদী,
জলস্থল তিমির-মগন।

কোথা গৃহ? ছিল কভু? তাও ভুলিয়াছি
ডু'বেছে আমার দিন, অমাযামিনীর
চিরযাত্রী আমি।
আমার জীবন ঘিরি লক্ষ্যহারা নিশা,
তরঙ্গ অধীর
আর, উদ্দাম পবন।
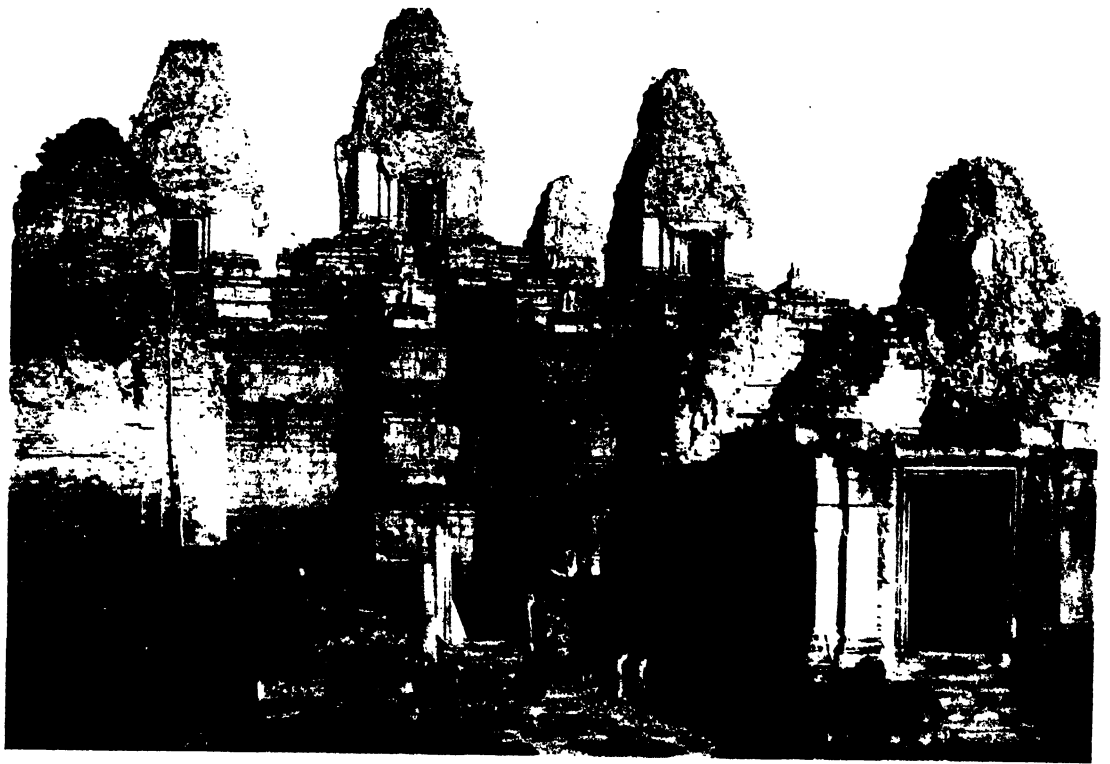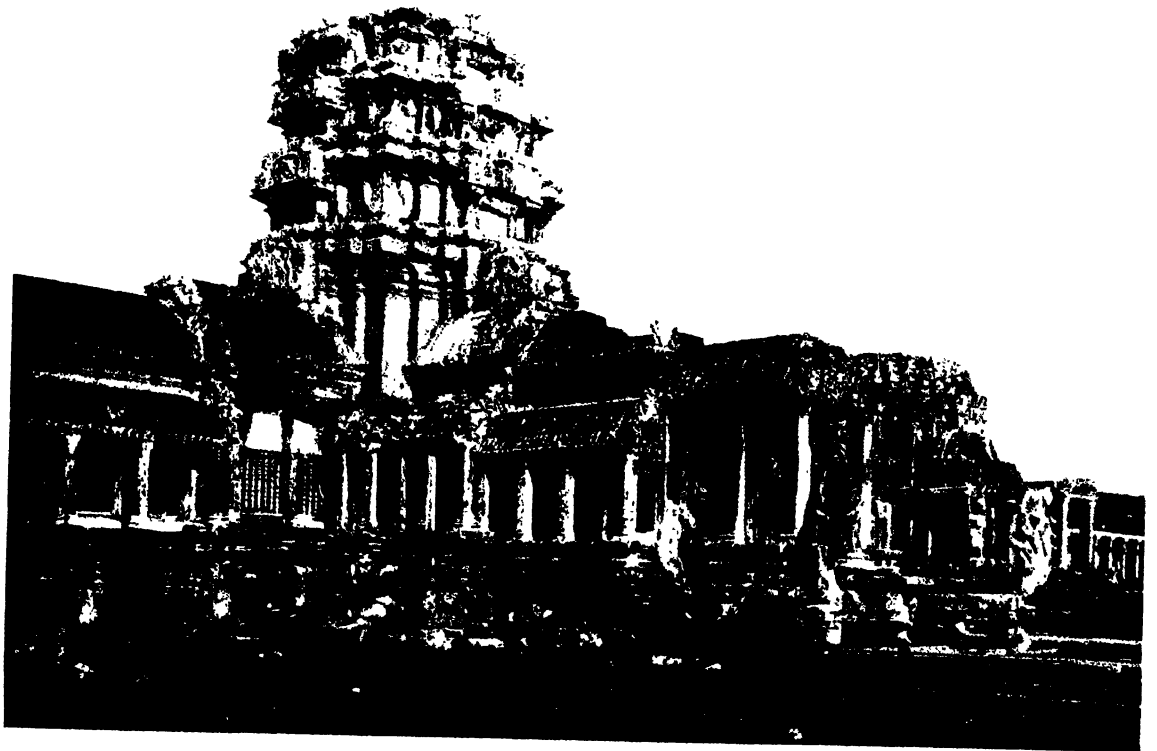
আঙ্কোর ভাট

"কাম্বোজের পুরাতত্ত্ব" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃ. ২৪৩

প্রে রূপ

পূর্ব্বমুখ

আঙ্কোর ভাট

আঙ্কোর ভাট খোদিত শিলাচিত্র. উর্দ্ধে স্বর্গ, নিম্নে নরকের দৃশ্য

নীলাঙ্গুরীয়

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৬

দশ দিন হইল আসিয়াছি; রবিতে রবিতে আট দিন গিয়াছে, কাল সোম আজ মঙ্গল। মন্দ লাগিতেছে না। আমরা, যাহারা অপেক্ষাকৃত নীচু স্তরে থাকি, বড়মানুষ হওয়াটাকে সাধারণতঃ একটা অপরাধ বলিয়া ধরিয়া লই, সেই জন্য ওদের সম্বন্ধে কতকগুলা মনগড়া ধারণা করিয়া বসিয়া থাকি। ভ্রান্ত ধারণাগুলা একে একে বিদায় লইয়া এই পরিবারের সঙ্গে আমায় ক্রমেই ঘনিষ্ঠ করিয়া দিতেছে। দেখিতেছি যেমন 'বিলাত দেশটা মাটির', তেমনই আবার বড়মানুষরাও মানুষ,—মানুষের অতিরিক্ত কিছু নয়, তেমনই আবার মানুষের চেয়ে কমও কিছু নয়। ধারণা ছিল শুধু দুঃখের দাহনেই খাদ নষ্ট করিয়া খাঁটি মানুষের সৃষ্টি করে; এখন দেখিতেছি সুখের মধ্যে, প্রাচুর্যের মধ্যেও মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভব। সত্যই ত, মানুষ আওতাতেও যখন বাড়িবার শক্তি রাখে, তখন আলো-বাতাসের স্বচ্ছন্দতায় কেন বাড়িবে না?

কিছু ভুল বিচার লইয়া এ-বাড়িতে পা দিয়াছিলাম, এখন ভাবি মানুষের আলো-বাতাস, কিংবা আওতা তাহার মনে; বাহিরের অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে তাহার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই।

অনিলের কথা মনে পড়িয়া গেল। অনিল বলে— "ভাই, আসলে সুখ-দুঃখ, অর্থ-দারিদ্র্যের মধ্যে কোন তফাৎ নেই, কাজেই খাঁটি মনের উপর কোনটারই দাগ পড়ে না। মানুষ জাতটাই মামলাবাজের জাত, ঘর-ভাঙাবার জাত—অন্নপূর্ণা আর শিবকে চায় আলাদা করতে। এক জনকে কাবে ফেলে হাত পাতায়, এক জনকে দিয়ে সেই হাতের আঁজলার উপর সোনার হাতা ওলটায়; ভাবে এবার বুঝি ভাঙল মন দু-জনের, পাকলো মামলা। দু-জনে কিন্তু সুখ-দুঃখের যুগ্মরূপে চিরদিনই সেই একই চালার মধ্যে কাটিয়ে আসছেন, কাটাবেনও।"

একটু দার্শনিক উচ্ছ্বাস আসিয়া গেল কি? আসলে কথাগুলা মনে আসিয়া পড়িল মীরার মা, অপর্ণা দেবীর কথা তুলিতে গিয়া।—সুখের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশের প্রসঙ্গে।

উনি মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের এক পুরাতন রাজবাড়ীর মেয়ে। জ্যাঠা-বাপ-খুড়ারা এখন কুমার-বাহাদুর, ছোট কুমার, মেজ কুমারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন বটে, কিন্তু ঠাকুরদাদা পর্যন্ত, কুহেলী-আবৃত অতীত হইতে সবাই রাজা-বাহাদুর, রাজা-সাহেব, রাজা খেতাব ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। অথচ মনে হয় এ-বাড়ীর আর সবাই এ-কথাটি জানিলেও অপর্ণা দেবী নিজে যেন জানেন না।

বাড়ীর মধ্যে ওঁর স্থানটি একটু অদ্ভুত গোছের। অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে উনি যেন একটি বৈরাগ্য-আশ্রম রচনা করিয়া বাস করিতেছেন। অপর্ণা দেবীর জ্ঞানের গভীরতার একটু আভাস এক জায়গায় দিয়াছি। পরে জানা গেল ওঁর একটা কলেজ-জীবনও ছিল। সেই জীবনের কৃতিত্বও এত বেশী যে ওঁর অভিভাবকেরা ওঁকে বিলাত পাঠাবার লোভও সংবরণ করিতে পারেন নাই, যদিও সে-যুগে ওটা প্রায় কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল। অভিভাবকদের মধ্যে পিতৃপক্ষ শ্বশুরপক্ষ উভয় পক্ষই ছিলেন, কেন না তখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এত উগ্র আলোকের নেশার যে একেবারেই কারণ ছিল না এমন নয়,—উভয় পক্ষেই কয়েক জন করিয়া আই-সি-এস্, ব্যারিস্টার ছিল, অর্থাৎ বিলাত জিনিসটা অনেকটা ঘরোয়া ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল।...স্বামী বিলাতে; ইনার টেম্পলে ব্যারিস্টারী খানা খাইতেছেন; কথা হইল স্বামী আরও কিছু দিন থাকিয়া যাইবেন, স্ত্রী

গিয়া কেম্ব্রিজে ভর্তি হইবেন। অদ্ভুত প্রতিভাশালিনী কন্যা,—ওঁকে লইয়া অসাধারণ রকম কিছু একটা করিতে উভয় পক্ষই যেন মাতিয়া উঠিলেন।

সব ঠিকঠাক, অপর্ণা দেবী পা বাড়াইয়া আবার পা টানিয়া লইলেন।

তাহার পর হইতে ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তন আসিতে লাগিল। যথাসময়ে স্বামী গুরুপ্রসাদ সাহেবী দাম্পত্যজীবনের স্বপ্ন এবং তালিম লইয়া ব্যারিস্টার মূর্তিতে ফিরিলেন। স্ত্রীকে বিলাতে না পান, একটা সান্ত্বনা ছিল বিলাতকে স্ত্রীর নিকট হাজির করিতেছেন। দেখিলেন স্ত্রী কালীঘাটের কালী হইতে রবিবর্মার কমলা পর্যন্ত উগ্র শান্ত হরেক রকম দেবদেবীদের আশ্রয়ে। পত্রাদিতে কোনরকম আঁচ পান নাই, একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। প্রায় বৎসর দুয়েক ধরিয়া অনেক চেষ্টা হইল, কিন্তু তাঁহাকে সঙ্গীচ্যুত করা গেল না। এই সময়ের অপর দিকের ইতিহাস মীরার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জন্ম—সে প্রায় পঁচিশ বৎসরের কথা। প্রায় ছয় বৎসর পরে মীরার জন্ম; আরও নয়-দশ বৎসর পরে জন্ম তরুর।

এই দশ দিনে জানা গেল—মীরার দাদা নীতীশকে লইয়া এই বাড়ীতে একটা ট্র্যাজেডির সুর আছে এবং এটাও বুঝিয়াছি এ-সুর অপর্ণা দেবীর জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে সব চেয়ে বেশী। জীবনের সঙ্গে অপর্ণা দেবীর একটা সুস্থ ভোগের সম্বন্ধ আর নাই; উনি যেন সংসারে আছেন অথচ নাই-ও। দোতলার এক প্রান্তে নিজের ঘরটিতেই থাকেন বেশী ক্ষণ, যত দূর জানিতে পারিয়াছি সাথী ওঁর অধিক সময়েই বই। কক্ষত্যাগের নিয়মিত সময় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দুইটি,—এক, সকালে, স্বামী যখন আহারে বসেন; আর এক রাত্রে, স্বামী, মীরা, তরু—সকলে যখন আহারে বসে। উনি যে সংসারে আছেন এই সময়টা এক বার করিয়া মনে পড়ে সবার। আমিও মীরাদের সঙ্গেই আহার করি, গল্পে নামাইবার চেষ্টা করি অপর্ণা দেবীকে। এক-এক দিন উচ্ছ্বসিত স্রোতে নামিয়া পড়েন, অনেক আলোচনা হয়, হাল্কা এবং গুরুও—যেমন প্রথম দিন হইয়াছিল। এক-এক দিন অপর্ণা দেবী থাকেন অন্যমনস্ক, স্বল্পবাক্; ঘরটাতে একটা থমথমে ভাব জাগিয়া থাকে, মীরাদের কি হয় জানি না, আমার ত আহার্যগুলাও যেন গলা দিয়া নামিতে চায় না।

আহারের সময় ব্যতীত এই দশ দিনে মাত্র তিন বার অপর্ণা দেবীকে তাঁহার কক্ষের বাহিরে দেখিয়াছি; দুই দিন অপরাহ্ণে, বাগানের মধ্যে। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি সেই বাগানটায় এই কয়দিনেই একটা অদ্ভুত পরিবর্তন আসিয়াছে। কাঁচির শাসন অবশ্য পূর্বরূপই, তবে নূতন বসন্তের সাড়া পাইয়া যেখানে যা ফুল ছিল এই শেষের দিকের সাত-আট দিনে যেন হুড়াহুড়ি করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। নানান রঙের কাপড়চোপড় পরা এক পাল শিশু যেন কোথায় আবদ্ধ ছিল, হঠাৎ মুক্তি পাইয়াছে। নূতন বসন্তের আতপ্ত অপরাহ্ণে রঙে-গন্ধে বোঝাই এই বাগানটা আমায় অমোঘ আকর্ষণে টানে। দুই দিন অপর্ণা দেবীও নামিয়া আসিয়াছিলেন। এক দিন আলোচনা হইল ফুল সম্বন্ধে, কিছু উচ্ছ্বসিত আলোচনা। প্রত্যেকটি ফুলের নাম জানেন, অনেক-গুলার ইতিহাস জানেন। এর আগে জানিতামই না যে ফুলের আবার একটা ইতিহাস আছে এবং সেটা রাজারাজড়ার ইতিহাসের মত শিখিবার জিনিস।... গল্প করিতে করিতে বেড়াইতেছিলাম, পরিচয় দিয়া যাইতেছেন, হঠাৎ একটা বিচিত্র বর্ণের মরশুমী ফুলের বেডের সামনে দাঁড়াইয়া পড়িয়া ঘুরিয়া বলিলেন—"শৈলেন, এত ভাল লাগে আমার শীতের মাঝখান থেকে বসন্তের গোড়া পর্যন্ত এই সময়টা, সমস্ত বছর যেন প্রতীক্ষা ক'রে থাকি। জান তো এ-ফুলগুলো ওদের দেশের মাঝ-বসন্তের ফুল, আমাদের দেশে ফুটতে আরম্ভ করে বেশ একটু শীত পড়লে। ওরা এই সব দিয়ে আমাদের শীতের চেহারা বদলে দিয়েছে। এ ফুলগুলো চিরস্থায়ী হ'ল এদেশে, আরও ছড়িয়ে পড়বে। আমাদের পরাজয়ের গ্লানির মধ্যে এইগুলো থাকবে সান্ত্বনা হয়ে..."

শুধু কথাগুলা নয়, বলিবার সময় ওঁর চেহারাও হইয়া উঠিয়াছিল অপরূপ। কতক যেন আবেশভরে বলিয়া যাইতেছেন—আয়ত চক্ষু দুইটি স্থির দৃষ্টিতে উপরে

নীচে এক-এক জায়গায়, বা আমার মুখের উপর এক এক বার নিবদ্ধ হইয়া যাইতেছে, যেন স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতেছে। একটু যে বেশী ভাবালু হইয়া পড়িয়াছেন, আমি যে খুব বেশী পরিচিত নই এখনও, সে-সব দিকে লক্ষ্য নাই। উনি যেন চেষ্টা করিয়া কিছু বলিতেছেন না—ওঁর অন্তর্লোকে যে-সব ভাবনা উঠিতেছে তাহাই যেন আপনা হইতেই উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে মাত্র। সেদিন ওঁর ইংরাজী বলার মধ্যেও এই জিনিসটি লক্ষ্য করিয়াছিলাম ;—যা অন্তরে জাগে তা প্রকাশ করার মধ্যে সংকোচ বা কৃপণতা থাকে না।

এমন অনাবিল কবি-প্রকৃতি আমার নজরে আর পড়ে নাই।

কয়েক দিন পরে আর-এক বার ওঁকে বাগানে দেখি। দুপুর গড়াইয়া গিয়াছে। আমি একটা ঘনপল্লবিত কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় একটি বেঞ্চে বসিয়া বই পড়িতেছিলাম, হঠাৎ ওঁর শাড়ীর চওড়া পাড়ের উপর নজর পড়িয়া যাওয়ায় উঠিয়া দাঁড়াইলাম। অপর্ণা দেবী সস্মিত বদনে আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "ব'স তুমি।"

তাহার পর আগাইয়া গেলেন। বুঝিলাম আজ আরও পুষ্পাবিষ্ট।...প্রায় ঘণ্টাখানেক ছোট বাগানটিতে নীরবে ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া গেলেন।

এই দুই দিন।

৭

আরও এক দিন তাঁহাকে বাহিরে দেখিয়াছিলাম। দিনটা কখনও ভুলিব না।

আমার রুটিনের মধ্যে একটা কাজ বৈকালে তরুকে লইয়া মোটরে করিয়া বেড়াইতে যাওয়া; পূর্বে যে-সময়টা কলেজ হইতে ফিরিবার পথে তিনবার-ইউনিভার্সিটি-ফেরৎ সেই ধাড়ি ছেলেটাকে পড়াইতে হইত।

মোটর আসিয়া গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়াইয়াছে। তরুর কি কারণে উপরে একটু বিলম্ব হইতেছে, আমি বেয়ারাটাকে তাগাদায় পাঠাইয়া বারান্দায় অপেক্ষা

মোটরের ক্লীনারটা গেট খুলিতে গিয়াছিল; হঠাৎ কানে আসিল সেখানে কাহার সহিত চেঁচামেচি লাগাইয়া দিয়াছে। গাড়ীবারান্দার বাহির দিকটায় তারের জাল বসাইয়া একঝাড় মর্ণিং গ্লোরীর লতা তোলা হইয়াছে; ও দিকটা দেখা যায় না। বারান্দা হইতে নামিয়া আসিয়া দেখিলাম ক্লীনারটা একটা ভুটিয়ানী বুড়ীর সহিত বচসা করিতেছে। ভুটিয়ানীটা বোধ হয় বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, গেটটা খোলা পাইয়া ভিতরে আসিবে, ক্লীনারটা আসিতে দিবে না। লোকটা অত্যন্ত ভীরু। ভীরু লোকেদের বিশেষত্ব এই যে তাহারা দুর্বল দেখিলে অত্যন্ত সাহসী হইয়া ওঠে, বোধ হয় এই করিয়া নিজেদের চরিত্রের ব্যালান্স বা ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চলে।...বুড়ীকে দেখিয়া হাত-পা ছুঁড়িয়া খুব তম্বি করিতেছে। ভুটিয়ানীটার মুখে আর কোন কথা নাই, অত্যন্ত দীন মিনতির সঙ্গে গ্রীবা হেলাইয়া এক-এক বার কপালে হাত দিয়া সেলাম করিতেছে, এক-এক বার ধীরে ধীরে হাতটা বুকে চাপিয়া বলিতেছে—"বেটা···বেটা!" অত্যন্ত কাহিল, বাঁ-হাতে গেটের একটা ছড় চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

আমায় দেখিয়া ক্লীনার গলা উঁচাইয়া রসিকতা করিয়া বলিল, "কি আমার নবদুর্গার মত চারিদিক আলো ক'রে মাঠাকরুণ এসে দাঁড়িয়েছেন, ওঁর বেটা হ'তে হবে! ··· ভাগো জলদি, নেই ত মোটরমে ধ্যাৎলায়ে দেগা!···"

ভুটিয়ানীটা যেন আর পারিল না; হাত তাহার আলগা হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে—"বেটা!—বেটা!—বেটা!" বলিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দুই হাতে বুক চাপিয়া সুরকির উপর বসিয়া পড়িল। ক্লীনারটা আর এক ঝোঁক পৌরুষের সঙ্গে তাহাকে বোধ হয় টানিয়া তুলিতে যাইতেছিল, উপরতলায় অপর্ণা দেবীর ঘর হইতে উৎসুক প্রশ্ন হইল—"কি বলছে ও মদন?—কি বলছে? বেটার কি হয়েছে ওর?"

দেখি অপর্ণা দেবী জানালা খুলিয়া দুইটা গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, মুখে একটা নিদারুণ উৎকণ্ঠার ভাব, মুখটা ঈষৎ হাঁ হইয়া গিয়াছে, অমন শান্ত চক্ষু দুইটাতে

রাজ্যের উদ্বেগ! কিছু বুঝিলাম না; এমন কি হইয়াছে যাহার জন্য তিনি এত বিচলিত একেবারে?

মদন বলিল, "দেখুন না মা, 'ব্যাটা ব্যাটা' ক'রে ভুজুং দিয়ে ভেতরে আসবার মতলব; গায়ের গন্ধে ভূত পালায়, ব্যাটা হও ওনার!"

আবার টানিয়া তুলিতে যাইতেছিল, অপর্ণা দেবী কর্কশ কণ্ঠে এক রকম চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ছেড়ে দাও ওকে! চলে এস তুমি, তোমার ব্যাটা হ'তে হবে না, ভাবনা নেই তোমার!...এলে চলে?..."

হঠাৎ জানালার কাছ থেকে সরিয়া গেলেন এবং বেশ বোঝা গেল অত্যন্ত চঞ্চল এবং অধৈর্য গতিতে নামিয়া আসিতেছেন। বাহিরে যাহারা ছিল সবার মুখে একটা স্তম্ভিত ভাব, সবাই সবার মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতেছে। অপর্ণা দেবী চাকরবাকরকে একটা উঁচু কথা বলেন না, আর এ একেবারে রূঢ় হইয়া পড়া! ক্লীনার মদন মাথাটা হেঁট করিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া মোটরটার কাছে দাঁড়াইল।

অপর্ণা দেবী কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া একেবারে ভুটিয়ানীর সামনে গিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইলেন এবং এক হাতে তাহার বক্ষলগ্ন একটা হাত ধরিয়া অপর হাতে তাহার মুখটা তুলিয়া উদ্বিগ্ন ভাবে প্রশ্ন করিলেন, "কেয়া হুয়া হ্যায় বেটাকা?"

ভুটিয়ানীটা একবার মুখের পানে চাহিল, স্ত্রীলোক দেখিয়া আরও উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ভাঙিয়া পড়িল, বুকটা চাপিয়া বলিল, "বেটা—বেটা!..."

আমরা গিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছি। জায়গাটা নূতন আর বিরলবসতি হইলেও, নিতান্ত রাস্তার ধারের ঘটনা,—গেটের বাহিরে জনকয়েক লোক জড় হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত খাপছাড়া দেখাইতেছে ব্যাপারটা,—অতিশয় নোংরা, ময়লা আর ছেঁড়া, পুরু, ভুটানী লুঙ্গিপরা সেই ভুটিয়ানী আর তার পাশেই এই অভিজাত মহিলা,—আশ্চর্যভাবে অধীর, কতকটা যেন পাগলের মত।...তরুর মুখটা শুকাইয়া গিয়াছে, চাকরদের সবাই ভীত, আমার মাথায় কোন ধারণাই আসিতেছে না—ব্যাপারটা কি। মীরা থাকিলেও না-হয় একটা কোন ব্যবস্থা হইত, সে প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে বাহির হইয়া গিয়াছে।

অপর্ণা দেবী আমার মুখের দিকে একটু ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "ভয়ানক মুশ্‌কিলে পড়া গেল তো শৈলেন,—ও আমার কথা বুঝতে পারছে না, অথচ এটা বুঝতে পারছি ওর ছেলে নিয়ে উৎকট রকম কিছু একটা হয়েছে—আমি বুঝতে পারছি কি না..."

একবার প্রায় উপস্থিত সকলের মুখের দিকে বিমূঢ় ভাবে চাহিয়া লইয়া আমায় প্রশ্ন করিলেন, "কি করা যায় বল দিকিন?"

বুড়ী বুক চাপিয়া অঝোরে কাঁদিতেছে, তাহার জীর্ণ গালের রেখা বাহিয়া অশ্রু নামিয়াছে। বুক চাপিয়া একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে মাথা দুলাইতেছে, আর ঐ এক বুলি—"বেটা!—বেটা!"

আমাদের পাশের বাড়ীটা একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের—এ-বাড়ীর সঙ্গে অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠতা আছে। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল, বলিলাম, "পাশে এ-বাড়ীতে ভুটানী আয়াটায়া নেই কি? আজকাল সায়েবেরা প্রায় নেপালী কিংবা ভুটানীই রাখে।"

অপর্ণা দেবীর মুখটা দীপ্ত হইয়া উঠিল, বোধ হয় মুহূর্ত মাত্র সময় যাহাতে নষ্ট না হয় সেই জন্য আমায় কিছু না বলিয়া একেবারে তরুকে বলিলেন, "ঠিক, যাও তো তরু, মিসেস রিচার্ডসনকে বল—'Auntie, will you please spare your ayah for a couple of minutes?—Mummy wants her badly'...run, there's a dear." (খুড়ীমা, তোমার আয়াকে মিনিট দুয়েকের জন্যে ছেড়ে দিতে পারবে কি? মা'র বিশেষ দরকার... দৌড়াও, লক্ষ্মীটি)।

বুঝিলাম, উগ্র উত্তেজনায় অপর্ণা দেবীর সংযত জীবন ভেদ করিয়া তাঁহার কলেজ-যুগের কয়েকটা মুহূর্ত আসিয়া পড়িয়াছে! মেয়ের সঙ্গে তাঁহাকে এর আগে এমনি কখনও ইংরেজী বলিতে শুনি নাই, পরেও শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না; এ-বিষয়ে তাঁহার স্বদেশীয়ানা অত্যন্ত কড়া।

আন্দাজ আমার ঠিক ছিল; একটা ঐ জাতেরই আয়া আসিয়া অপর্ণা দেবীকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। অপর্ণা দেবী তাহাকে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বলিলেন, "একে জিজ্ঞাসা কর তো এর ছেলে সম্বন্ধে কি বলতে চায়—কি হয়েছে তার?"

চীনা ভাষার মত একটা ভাষায় ওদের মধ্যে খানিকটা কি প্রশ্নোত্তর হইল। বৃদ্ধার কান্না আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। আয়া ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বুঝাইয়া দিল—বুড়ীর ছেলে আজ বৎসরাবধি নিরুদ্দেশ। গত বৎসর শীতে তাহারা কয়জন মিলিয়া কুকুর, ছাগল, চামরী-গরুর ল্যাজ, হরিণ আর ছাগলের চামড়া প্রভৃতি লইয়া হিন্দুস্থানে ব্যবসা করিতে নামিয়াছিল। এক দল গত বৎসরই শীতের শেষে ফিরিয়া যায়। তাহার ছেলে তাহাদের মধ্যে ছিল না। গ্রামের একটি লোকের মারফৎ মায়ের জন্য সাতটি টাকা ও একটা ফুলকাটা জলজলে গোলাপী রঙের ইটালিয়ান র‍্যাপার কিনিয়া পাঠাইয়া দেয় আর খবর দেয় যে তাহারা মাস-দুয়েকের মধ্যে ফিরিবে। পাশের গ্রামের আর একটি দম্পতি নামিয়াছিল। দু-মাস নয়, মাস-পাঁচেক পরে তাহারা ফিরিল, বৃদ্ধার সহিত দেখা করিয়া পাঁচটা টাকা আর চব্বিশ-ফলার একটা ছুরি দিয়া বলিল—ছেলে পাঠাইয়া দিয়াছে, তাহাদের হাজার বলা সত্ত্বেও কোনও মতে ফিরিল না। অন্য পথে এক দল ভুটিয়া নামিয়াছিল, তাহাদের দলে ভিড়িয়া যায়, খুব সম্ভবত সেই দলের একটি তরুণীর আকর্ষণে—বলে মায়ের বড় কষ্ট, হিন্দুস্থানে কিছু রোজগার করিয়া সে একেবারে ফিরিবে।

বৃদ্ধা বুকের উপর হইতে নকল প্রবালের তিন-চার ছড়া মালা সরাইয়া বুকের ভিতর হইতে সযত্নে পাট-করা একটা গোলাপী রঙের ফুলকাটা র‍্যাপার আর একটা নানা ফলার ছুরি বাহির করিয়া সাশ্রুলোচনে মাথা দোলাইয়া আয়াকে কি বলিল। আয়া অপর্ণা দেবীকে বলিল—"বলছে, ও বুদ্ধের মালা ছুঁয়ে শপথ করছে, ব্যাটার বউকে কিচ্ছু বলবে না, একটুও কষ্ট দেবে না, এই র‍্যাপার আর ছুরি তাকেই যৌতুক দিয়ে দেবে, তাই কখনও নিজের কাছ-ছাড়া করে না।"

দৃশ্যটা বড়ই করুণ, অনেকের চক্ষেই জল আসিল, শুধু অপর্ণা দেবীর চক্ষু দুইটা যেন অধিকতর উত্তেজনায় আরও শুষ্ক ও দীপ্ত হইয়া উঠিল। এক বার আমার দিকে এক বার আয়ার দিকে চাহিয়া বিহ্বলভাবে বলিলেন, "এত লোকের মাঝখানে...আর সে কোন্ শহরে আছে তাই বা কে জানে?"

হঠাৎ আয়ার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, এত জায়গা থাকতে কলকাতায় এল কেন খুঁজতে ও?"

কি উত্তর দেয় শুনিবার জন্য আগ্রহে চোখ দুইটা যেন তাঁহার ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল।

টের পাওয়া গেল—পাহাড় হইতে নামিয়া বৃদ্ধা খবর পাইল কলিকাতা সবচেয়ে জনবহুল জায়গা, অনেক ভুটিয়াও প্রতিবৎসর এখানে আসে; তাই সেই বারটি টাকা সংগতি করিয়া পরশু এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের গ্রাম তেরটি ঘরের বসতি, অনেক ছেলেবেলায় একবার ভুটানের রাজধানী পানাখা দেখিয়াছিল, মহানগরী সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না,—এখানে আসিয়া একেবারে অথৈ জলে পড়িয়া গিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত একটি ভুটিয়ার মুখ দেখে নাই, কেহ কথা বোঝে না, হাতে পয়সা নাই, আজ সকাল থেকে কিছু খায় নাই। সবচেয়ে নিরাশার কথা—বুদ্ধ তাহাকে দয়া করিয়া নিজের কাছে ডাক দিয়াছেন, মুক্তি খুবই কাছে, কিন্তু ছেলেকে এক বার শেষ দেখার সম্ভাবনাটা একেবারেই সুদূর হইয়া পড়িয়াছে।

অপর্ণা দেবী আরও আশ্চর্য কাণ্ড করিয়া বসিলেন,—যেমন আশ্চর্য, তেমনই অশোভন; দাঁড়াইয়া শুনিতে-ছিলেন, হঠাৎ বসিয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, "মিলেগা বেটা—মিলেগা; চলো উঠো, বুঢ়ী মাঈ, উঠো।"

এই অপ্রত্যাশিত সমবেদনায় বৃদ্ধা যেন একেবারে মুষড়াইয়া গেল। মাঝে মাঝে যে "বেটা—বেটা" করিতে-ছিল সেটাও বাহির হয় না মুখ দিয়া; শুধু চাপা কান্নার আওয়াজ—জীর্ণ শরীরটা যেন শতধা ভাঙিয়া পড়িবে। বুঝিতে পারিলাম—অপর্ণা দেবীরও কান্না নামিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে শমিত হৃদয়াবেগ লইয়া অপর্ণা দেবী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধার একটা হাত ধরিয়া বলিলেন, "উঠো।"

বৃদ্ধা ডান-হাতে লোহার গরাদ ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিল। অপর্ণা দেবী তাহার বাঁ-হাতটা নিজের বাঁ-হাতে ধরিয়া, ডান-হাতে তাহার পিঠটা জড়াইয়া, ধীরে ধীরে সুরকির রাস্তা অতিক্রম করিয়া, সিঁড়ি বাহিয়া নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। যেন একই শোকে আচ্ছন্ন দুইটি সখী—সব জিনিসেই অমিল,—জাতির, বয়সের, সজ্জার, শুচিতার ;—মিল শুধু এইটুকুতে যে দু-জনের বুকে একই ব্যথা,—হৃদয়ের একই তন্ত্রীতে ঘা পড়িয়াছে।

ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলাম সেই রাত্রে।

তরু পড়িতেছে, আমি কিছু অন্যমনস্ক,—আজ বিকাল হইতে মনের সামনে একটা ছবি মাঝে মাঝে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। সুদূর হিমালয়ের এক জনবিরল পল্লীতে, এক খানি গৃহে প্রবাসী পুত্রের পথ চাহিয়া এক বৃদ্ধা,—দিন যায়, মাস যায়, বৎসর ঘুরিয়া গেল···পরিত্যক্ত ঘরের শিকল তুলিয়া দিয়া দুর্বল কম্পিত চরণে বৃদ্ধা পাহাড়ের বিসর্পিত পথ বাহিয়া নামিতেছে,—ঘরের স্মৃতির সঙ্গে পাহাড়ের স্তূপ পিছনে পড়িয়া রহিল ··সামনে প্রসারিত হিন্দুস্থানের দিগন্ত বিস্তৃত সমতল···কোথায় পুত্র? যোজনপ্রসারী দৃষ্টির মধ্যে তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না···মরীচিকার মত কলিকাতার উর্মিল আকাশ-রেখা—সেই মরীচিকার মধ্যে বিকৃত তৃষ্ণা—"বেটা! বেটা!··" তাহার পর বিকালের সেই সমস্ত দৃশ্যটা যাহার অর্থ এখনও ঠিকমত মাথায় আসিতেছে না···"বেটা—বেটা?" আর সেই বেদনাতুর অবোধ সান্ত্বনা—"উঠো, বেটা মিলেগা—উঠো···"

তরু পড়ার মধ্যেই এক সময় প্রশ্ন করিল, "মাস্টার মশাই, জানেন?"

প্রতিপ্রশ্ন করিলাম, "কি?"

"মা কারুর ছেলের কথা হ'লে একেবারে কি রকম হয়ে যান, দাদার কথা মনে পড়ে যায়। ···আর একটা জিনিস মিলিয়ে দেখবেন এখন, বলে দিচ্ছি আপনাকে।"

প্রশ্ন করিলাম, "কি মিলিয়ে দেখব তরু?"

"মা ঠিক এবারে অসুখে পড়ে যাবেন। কালই উঠে দেখবেন আপনি। ওঁর সামনে কারুর ছেলে নিয়ে কোন কষ্টের কথা তোলা একেবারে মানা।"

আমার মুখের উপর আয়ত চক্ষু দুইটা রাখিয়া ঘাড়টা দুলাইয়া বলিল, "হুঁ মাস্টারমশাই, একেবারে ডাক্তারের মানা! দাদার কাণ্ডটা···"

সামলাইয়া লইয়া আড়চোখে আমার পানে একবার চকিতে চাহিয়া তরু অধিকতর মনোযোগের সহিত আবার পড়িতে লাগিল। একটু অস্বস্তির ভাব,—এখনই যেন খুব গূঢ় কি একটা পারিবারিক রহস্য প্রকাশ করিয়া ফেলিত আর কি।

আমার মনে পড়িয়া গেল—প্রথম যেদিন অপর্ণা দেবীর সহিত পরিচয় হয়, প্রসঙ্গক্রমে উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "তুমি জান না তাই বলছ শৈলেন, আমার নিজের ছেলে ঐ রকম আত্মবিলুপ্ত।" মীরা তরু আসিয়া পড়ায় কথাটা আর পরিষ্কার হয় নাই।

রহস্যটা পীড়া দিতেছিল ; কিন্তু তখন আর তরুকে এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করা সমীচীন মনে করিলাম না।

৮

পরিবারটি ছোট,—মীরার বাবা, মা, মীরা, তরু ; নেপথ্যে মীরার দাদা।

সে-অনুপাতে চাকর-বাকর বেশী। বেয়ারার কথা বলিয়াছি। নাম রাজীবলোচন হইতে সংক্ষিপ্ত হইয়া রাজু। অনেকটা সর্দারগোছের। বাসন মাজিতে হয় না, আর ঘর ঝাঁট দিতে হয় না বলিয়া কতকটা আভিজাত্য-গর্বিত। থাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কাঁধে একটা পরিষ্কার ঝাড়ন ফেলা ; যখন অন্য চাকরদের উপর ফফরদালালি না করে, তখন সব ঘরের আসবাবপত্রগুলা ঝাড়িয়া-মুছিয়া বেড়ায়। কতকটা ওর কাজের অভাবের জন্য এবং কতকটা ওর অধীনের চেয়ার-টেবিল আরশির অস্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতার জন্য অন্য চাকরেরা ওকে সম্ভ্রম করে। আরও একটা ক্ষমতা আছে লোকটার,—খুব দরের খবরের টুকরা-টাকরা সংগ্রহ করিয়া চারাইয়া

দেওয়া। এক দিন আমার ঘরের আসবাবপত্রগুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে হঠাৎ মুখ তুলিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "শুনেছেন বোধ হয় মাস্টারমশা?"

আমি মুখের দিকে চাহিতে বলিল, "আমেরিকা আর এদের একটি পয়সা ধার দেবে না।"

আমি প্রথমটা একটু বিস্মিত হইলাম; তাহার পর সত্যই ও কিছু বুঝে কিনা, জানে কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য প্রশ্ন করিলাম, "কাদের?"

জানে না, কিন্তু ঠকিল না লোকটা; একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, "কিছুই খোঁজ রাখেন না দেখছি!"

তাহার পর, পাছে আবার খোঁজ লইবার জন্য টাটকা-টাটকি ওরই দ্বারস্থ হই সেই ভয়ে হাতের চেয়ারটাতে তাড়াতাড়ি ঝাড়ন বুলাইয়া বাহির হইয়া গেল।

কথাটা কিন্তু এইখানেই শেষ হইতে দেয় নাই।—রাত্রে পড়িতে আসিয়াই তরু মুখটা বিষণ্ণ করিয়া বলিল, "আপনার এখান থেকে অন্নজল এবার উঠল মাস্টার-মশাই।"

এ রকম অপ্রত্যাশিত গুরুতর সংবাদে বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল, যতটা সম্ভব শান্ত ও নির্লিপ্ত ভাব ফুটাইয়া প্রশ্ন করিলাম, "সত্যি নাকি?—তা, হঠাৎ কি হ'ল?"

তরু মুখটাকে বিকৃত করিয়া বলিল, "বা রে! প'ড়ে কি হবে আপনার কাছে? আমেরিকা যে অতবড় একটা বড় মাড়োয়ারী মহাজন তার নাম পর্যন্ত জানেন না আপনি!...গোয়েঙ্কা, মুরারকা, আমেরিকা—শোনেন নি এদের নাম?"

আমার মুখের পরিবর্তিত ভাব লক্ষ্য করিয়া সেও আর হাসি থামাইতে পারিল না। মুক্তকণ্ঠে হাসিতে হাসিতে বলিল, "রাজু বেয়ারা ঐ রকম, মাস্টারমশাই; কিছু জানে না অথচ গালভরা খবর সব জোগাড় ক'রে তাক লাগিয়ে দেবে!"

লোকটার চরিত্রে এই নূতন আলোকসম্পাতে আমার প্রথম দিনের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল—রাজু আমায় বলিয়াছিল ব্যারিস্টার সাহেব একটা সিডিশুন কেসে কুমিল্লায় গিয়াছেন। আমি একটু বিস্মিতও হইয়াছিলাম। তরুকে বলিলাম। তরু হাসিয়া জানাইল—রাজু বেয়ারার কাছে সিডিশুনের যা অর্থ পার্টিশুনেরও সেই অর্থ, অর্থাৎ কোন অর্থই নাই; ও শুধু ব্যারিস্টারির সঙ্গে খাপ খায় এই রকম এক রাশ শব্দ সুযোগমত সংগ্রহ করিয়া গভীর অধ্যবসায়ের সহিত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছে। যা-তা বলিয়া লোকেদের ভুল খবর দেওয়ার জন্য প্রায়ই ধমক খায় মিস্টার রায়ের কাছে, চাকরি থেকে বরখাস্ত করিয়া দিবেন বলিয়া ভয়ও দেখান। বরখাস্ত যে করা হয় না, সেইটেই রাজু নিজের মর্যাদার পরিপোষক করিয়া চাকর-দাসীদের মধ্যে আস্ফালন করে, বলে, "দিন না ছাড়িয়ে, বারো টাকায় ইংরিজী-জানা বেয়ারা ফলছে গাছে?"

তরু বলিল, "বাবা হাল ছেড়ে দিয়েছেন মাস্টার-মশাই, রাজু বেয়ারা বলেন না, বলেন রেজো বেয়াড়া।"

নামের এই কদর্থ অপভ্রংশে তরু আবার খুব এক চোট হাসিল।

রাজু বেয়ারার পরেই নাম করিতে হয় বিলাসের; বরং আগে নাম করিলেই বেশী শোভন হইত, কেন-না এ-বাড়িতে রাজুর যদি এমন কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে যাহাকে সে ভয় করে তো সে বিলাস। প্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেও বরং বিলাসকে ছোট করা হয়। রাজু বেয়ারা আর সব চাকর-বাকরদের নিজের চেয়ে ছোট মনে করিয়া তৃপ্ত, বিলাসের পূর্ণবিশ্বাস রাজু একটা তৃণখণ্ড মাত্র, প্রয়োজন হইলে তাহাকে ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া যায় অথবা বাক্যের স্রোতে নিরুদ্দেশ করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া চলে। তবে বিলাস এটুকু করাকেও পণ্ডশ্রম বা শক্তির অপব্যয় বলিয়া মনে করে, তাই নীরব অবহেলার দ্বারাই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে চাপিয়া রাখিয়াছে। তরুর মুখে শুনিয়াছি রাজু বেয়ারা যখন চাকর-বাকরদের মধ্যে কোন বড় কথা ফাঁদিয়া জমাইবার চেষ্টা করে, এক বার খোঁজ করিয়া লয় বিলাস কাছেপিঠে কোথাও আছে কিনা। যদি কোন প্রকারে আসিয়াই পড়ে গল্পের মাঝখানে, ওপরের কোন ফরমাস লইয়া, তো রাজু থামিয়া যায়; আবার বিলাস শ্রুতির বাহিরে চলিয়া গেলে নাক সিঁটকাইয়া বলে—"ছুতো ক'রে শুনতে এসেছিল! আমার বয়েটি গেছে এসব কথা ওকে

শোনাতে; শখ হয়েছে তোদের বলছি, কোনও বাদশা-জাদীর বায়না নিয়ে তো কথকতা শোনাচ্ছে না রাজু…"

বিলাসের এই শক্তির মূলে একটি আত্মচেতনা বর্তমান, সে অপর্ণা দেবীর বাপের বাড়ির ঝি, রাজবাড়ির পরিচারিকা। অপর্ণা দেবী নিজে মাটির মানুষ, বিলাসের বিশ্বাস রাজবাড়ির মর্যাদা যাহাতে তাঁহার হাতে এখানে কোন রকমে ক্ষুন্ন না হয় সেই জন্যই বিশেষ করিয়া তাহাকে অপর্ণা দেবীর সঙ্গে এখানে পাঠান হইয়াছে; যদি সত্যই হয় বিশ্বাসটা তো লোক-বাছাইয়ে রাজবাড়ি যে ভুল করে নাই একথা বেশ স্বচ্ছন্দেই বলা চলে। আজ প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে বিলাস রাজবাড়ি হইতে যে বায়ুমণ্ডল সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, এখনও সেটা বজায় রাখিয়াছে। এই জন্য সে এই আধুনিক রুচিসম্মত বাড়িতে কতকটা বেমানান,—তাহার চওড়া কস্তাপেড়ে শাড়ী, গা-ভরা সোনা-রূপার মোটা মোটা গহনা, গালে অষ্টপ্রহর পান-দোক্তা, নাকে নথ আর চালের গুরুত্ব এই হালকা ফ্যাশানের বাড়িতে অনেকটা বিসদৃশ। মনে পড়ে প্রথম বিলাস যখন আমায় অপর্ণা দেবীর আদেশে ডাকিতে আসে, আমি তাহাকে নবপ্রথা অনুযায়ী কপালে জোড়কর ঠেকাইয়া নমস্কার করি; ভগবানকে ধন্যবাদ দিই যে ভাগ্যে পুরাতন প্রথাটা বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে নয় তো নিশ্চয় পায়ের ধূলা লইয়া বসিতাম বিলাসের। যত দিন ছিলাম মনে বরাবরই একটা ধুকপুকুনি লাগিয়া থাকিত—বিলাস কথাটা ফাঁস করিয়া দেয় নাই তো?

বিলাসের সঙ্গে ওর কর্ত্রীর এক দিক্ দিয়া একটা মস্ত বড় মিল আছে, ওকে দেখা যায় বড় কম,—আরও কম যেন; অপর্ণা দেবীর ঘরেও ওকে খুবই কম দেখিয়াছি। তবুও মাঝে মাঝে ওর এক-আধ বার দেখা পাওয়া যাইবে।

আর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। এই গম্ভীরা পরিচারিকাকে দু-এক বার মিষ্টার রায়ের সঙ্গে স্মিতবদনে চটুল চপলতার সঙ্গে পরিহাস করিতে দেখিয়াছি;—তাহাদের বাড়ির জামাই হিসাবে। আধুনিক রুচির মাপকাঠিতে এই যে গুরু অপরাধ এটিও রাজবাড়িরই পুরনো চাল,—বিলাস বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। দেখিয়াছি মিষ্টার রায় বেশ উপভোগ করিয়া প্রসন্নবদনেই উত্তর-প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। ব্যাপারটা গোপনীয় নয়, অপর্ণা দেবীর সামনেই হইয়াছে। যত দূর মনে পড়িতেছে, একবার অন্তত তাঁহাকেও বিলাসের পক্ষ অবলম্বন করিতে দেখিয়াছি।…সমস্ত ব্যাপারটির মধ্যে একটি অনির্বচনীয় মাধুর্য ছিল—চমৎকার একটি নির্মল সরসতা।

রাজু-বিলাসের পরে, শুধু একজন ছাড়া, আর সবাই এক রকম সাধারণ বলিলেই চলে,—শোফার, যেমন হয় আর সব শোফার, পাচক-ঠাকুর—যে কোন পাচক-ঠাকুরেরই মত। মিষ্টার রায়ের জন্য, বিশেষ করিয়া পার্টি প্রভৃতি উপলক্ষের জন্য একজন বাবুর্চি আছে—সেও অন্য সব বাবুর্চির মত অল্পভাষী এবং তাহার রন্ধনের আভিজাত্য এবং উৎকর্ষের জন্য পৃথিবীকে কিছু নীচু নজরে দেখে।…মাজাঘষা ধোওয়া-মোছার জন্য, একটি সস্ত্রীক পশ্চিমা চাকর আছে; অত্যন্ত খাটে এবং যখন কাজ থাকে না, আউট-হাউসে নিজেদের বাসায় বসিয়া পরস্পর কলহ করে। বাকি থাকে মালী; তাহার একটু ইতিহাস আছে। আমার এ-কাহিনী ভালবাসারই কাহিনী; মালীর জীবনে ভালবাসার বা নারী-মোহের যে রূপ দেখিয়াছি তাহার একটু পরিচয় দিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

ইমান্নুল মালীকে আমি প্রথমে দেখি বাগানেই। বিকাল বেলা, অলস ভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানা বর্ণের ফুলের বেডগুলি দেখিয়া বেড়াইতেছিলাম, ইমান্নুল বাগানের ওধার চারটি ভায়োলেট ফুলের সঙ্গে ফার্ণের শীষ লাগাইয়া একটা বটন-হোল তৈয়ারি করিয়া আনিয়া আমার হাতে দিল, ঝুঁকিয়া কপালে হাত দিয়া বলিল, "সেলাম মাস্টার বাবু।

বলিলাম, "সেলাম, তুমি এই বাগানের মালী?"

ইমান্নুল হাতের ডালকাটা কাঁচিটাতে একটা শব্দ করিয়া হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে হেঁ বাবু।"

আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এর পরে কি বলা যায়? বলিলাম, "বাগানটা রেখেছ চমৎকার, তোমার নাম কি?"

(ক্রমশঃ)

"ইমান্নুল।"

একটু বিস্মিত হইয়া চাহিলাম, মুসলমান বড়-একটা মালী হইতে দেখা যায় না। বলিলাম, "তা বেশ। ...ইমান্নুল হক্?"

আরও বিস্মিত হইতে হইল। ইমান্নুল হাসিয়া বিনীত গর্বের সহিত বলিল, "আজ্ঞে না বাবু, আমরা কেরেস্তান্--রাজার যা ধম্ম আর আপনার গিয়ে লাট সাহেবের যা ধম্ম তাই আর কি।"

ক্রীশ্চান বলিতে আমাদের মনে সাধারণতঃ যে ধারণা জাগে এ তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মসীতুল্য গায়ের রং, মুখের হাড়গুলা কিছু উঁচু, গলায় একটা কাঠের মালা, ডান হাতে রূপার একটা অনন্ত, মাথার তৈলমসৃণ চুলে একটা কাঠের চিরুনি গোঁজা। ... বলিলাম, "ও তাহ'লে তোমার নাম ইম্যান্নুয়েল?—বাঃ, বেশ; আমি মনে করলাম—ইমান্নুল হক্ বুঝি।"

ইমান্নুল হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে না, মুসলমান নয়; রাজার যা ধম্ম সেই।"

প্রশ্ন করিলাম, "বাড়ি কোথায়?"

"বাড়ী রাঁচি বাবু। ..আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ও! কি জাত?"

"ওঁরাও জাত আমরা।" ইমান্নুল বিকশিতদন্ত হইয়া আমার পানে চাহিয়া রহিল।

মনে পড়িল ওদিককার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে ক্রীশ্চানের ছুট বড় বেশী বটে। 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি কাগজে ইহাদের সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়িয়াছি অনেক। সেই সব জাতেরই এক জনকে সামনে পাইয়া কৌতূহল জাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তা ইমান্নুল, ক্রীশ্চান কে হয়েছিল? তোমার বাপ, না ঠাকুর্দা?"

ইমান্নুল বলিল—"না বাবু আমি ধরম আপনি বদলিয়েছি।"

সামনেই এক জন ধর্মান্তরগ্রাহীকে পাইয়া কৌতূহলটা আরও তীব্র হইয়া উঠিল,—কি বুঝিল ইমান্নুল যে নিজের ধর্ম ত্যাগ করিয়া বসিল? তাহার নিজের ধর্মের তুলনায় ক্রীশ্চান ধর্মের মহত্ত্ব? পাদরির প্ররোচনা? রাজার সঙ্গে, রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে গোত্র-সাম্যের লোভ? না কি?

প্রশ্ন করিলাম, "কি ভেবে ছাড়লে ধর্ম তুমি ইমান্নুল?"

ইমান্নুল সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিতে পারিল না, একটু মুখটা নীচু করিয়া লজ্জিত হাসির সহিত বলিল, "যীশু আমাদের ত্রাণ করবার জন্যে জান দিয়েছিলেন বাবু, তাই..."

বেশ বোঝা গেল, কিন্তু ইমান্নুলের এটা প্রাণের কথা নয়, কোথায় যেন একটা কি আছে। আরও কৌতূহল হইল, বলিলাম, "তাহ'লে তো আমাকে, মিষ্টার রায়কে, রাজু বেয়ারাকে, জগদীশ শোফারকে—সবাইকেই ধর্ম পাল্টাতে হয় ইমান্নুল। বল বাজে কথা বলছি আমি?"

অবশ্য বাজে কথাই বলিলাম; কিন্তু যাহা অভীপ্সিত ছিল সেটুকু হইল। তর্কের গলদ কোথায় ধরিতে না পারিয়া, অথবা পারিলেও সেটা গুছাইয়া ধরিয়া দিতে না পারায়—ইমান্নুল একটু থতমত খাইয়া চুপ করিয়া গেল। তাহার পর মাথাটা আবার নীচু করিয়া রগের কাছটা চুলকাইতে লাগিল।

আমি সুযোগ বুঝিয়া বলিলাম, "ঠিক বলি নি আমি? মানে তোমায় দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল কি না যে এমন এক জন চৌকস লোক..."

ইমান্নুল একবার হাসিয়া আমার পানে চাহিল, তখনই আবার মাথাটা নামাইয়া লইয়া বলিল, "ঠিক খেয়াল করেছেন আপনি বাবু। আপনাকে না ব'লে কাকেই বা বলি?...এখন কথা হচ্ছে আপনাকে একটা চিঠি লিখে দিতে হবে বাবু আমায়।"

গভীর রহস্যের আভাস পাইয়া আমি উৎসাহের সহিত বলিলাম, "তা লিখে দেব না? বাঃ, এক-শ বার লিখে দেব। ব্যাপারটা খুলে বল দিকিন আগে।"

ইমান্নুল কুণ্ঠিতভাবে ঘাড়টা চুলকাইতে চুলকাইতে আরম্ভ করিল, "আজ্ঞে—মানে..."

বলিলাম, "হ্যাঁ, বল, আরে আমায় বলবে তাতে আবার..."

"পাদরি সায়েবকে লিখতে হবে বাবু,—রেভারেণ্ড স্যামুয়েল চাইল্ড সায়েবকে।"

"এ তো খুব সহজ কথা, কি লিখব বল।"

ইমান্নুল আবার খানিকক্ষণ নিরুত্তর রহিল, তাহার পর আরও কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "পাদরি সায়েবকে লিখতে হবে—টাকাও কিছু জমেছে, কিছু জোগাড়ও হবে, এবার তুমি নাথুর মারফৎ যা কথা দিয়েছিলে তার একটা..."

এমন সময় বারান্দা হইতে রাজু বেয়ারা হাঁক দিল—"ইমান্নুল, তোকে বড়দিদিমণি ডাকছেন, শীগ্‌গির আয়।...হারামজাদা বুঝি আপনাকে বাটন-হোল ঘুষ দিয়ে চিঠি লেখাবার জন্যে ধরেছে মাষ্টারমশা? ..এলি?—জলদি আয়।"

প্রথম দিন এই পর্যন্তই টের পাই। ইমান্নুলের কথা আবার যথাস্থানে তোলা যাইবে।

বাঙালীর সংকট

শ্রীআশুতোষ বাগচি

নীট্‌শে যাকে বলেছেন সুপারম্যান্ ভারতের ভাগ্যক্রমে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে তেমন এক মহামানবের আবির্ভাব হয়, যাঁর লোকোত্তর মনীষা ভারতবাসীর মানসিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক মুক্তি সাধনে সার্থকভাবে নিযুক্ত হয়। আরও ভাগ্যের কথা যে তাঁর সমকালে এবং পরে শতাব্দকাল ধ'রে জাতির মুক্তিসাধনার নানা দিকে বহু শক্তিমান পুরুষের চিন্তা ও কর্ম অবিরাম চলতে থাকে। তাতে দেশের চিত্ত দীর্ঘদিনের তন্দ্রালস্য ও গতানুগতিকতার গ্লানিমুক্ত হয়ে এমন একটা চেতনা লাভ করে যা শিক্ষায় সাহিত্যে শিল্পে সংগীতে ধর্মে কর্মে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে—সমস্ত দেশ এক অপূর্ব ঐক্য-বোধের দিকে এগতে থাকে। ক্রমে, উনবিংশ শতকের নবম দশকে স্পষ্টভাবে দেখা দেয় রাষ্ট্রীয় চেতনা—যার সংহতি-রূপ কংগ্রেস।

এই কংগ্রেস জোরে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন আরম্ভ করতেই রাজশক্তি সেই জাগ্রত ঐক্যবোধকে খণ্ডিত, রাষ্ট্রিক মুক্তিপ্রয়াসকে প্রতিহত করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু কংগ্রেস সকল বাধা-বিঘ্ন ঠেলে দিন দিন দেশের হৃদয় অধিকার করতে থাকে। তখন যে বাঙালী জাতির ভিতর থেকে কংগ্রেস তার প্রাণরস আহরণ করছিল সেই বাঙালী জাতির উপচীয়মান ঐক্য ও সংহতিকে নষ্ট করবার জন্য বাংলা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। কিন্তু ফল হয় তার বিপরীত। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয় দেশে, সর্বসাধারণ তাতে দেয় সাড়া।

কিন্তু বিদেশী রাজশক্তির ছত্র-ছায়ায় নিরুপদ্রবে বাস ক'রে নির্বীর্য ও আয়েসী হয়ে পড়েছে যে পরাধীন জাতি, স্বাধীনতার স্বপ্নও কখনও দেখে না যারা, নিজ পরিবারের স্বার্থের সীমার বাইরে দৃষ্টিপাত করবার, জাতির কল্যাণ-চিন্তা মনে স্থান দেবার ক্ষমতাও খুইয়েছে যারা, তাদের ভিতর বিভেদ সৃষ্টি করা কুটিল রাষ্ট্রনীতি-বিদের পক্ষে যে সহজসাধ্য তার সাক্ষ্য দিচ্ছে গত পঁয়ত্রিশ বৎসরের ভারতের, বিশেষ ক'রে বাংলার ইতিবৃত্ত।

বাংলা দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলন চলেছে প্রবল বেগে তেমন সময়ে (১৯০৬ খ্রীঃ ১লা অক্টোবর) মহামান্য আগাখাঁকে মুখপাত্র ক'রে জন কয়েক মাতব্বর মুসলমান, বড়লাট মিণ্টোর নিকট উপস্থিত হয়ে এক দরখাস্ত পেশ করেন। (এই ডেপুটেশনের ভিতরকার রহস্য প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে মর্লের জীবনস্মৃতিতে আর লেডি মিণ্টোর ডায়েরীতে।) তার পরের কথাই এখন সব চেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে ভারতবর্ষে।

স্বদেশী আন্দোলনের রাষ্ট্রিক অংশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ-রূপে দেশের দারিদ্র্য লাঘবের জন্য নেতারা সকলকে দেশী নুন দেশী কাপড় ব্যবহার করতে বলেন। তখন এক দল লোক বাংলার মুসলমানদের মধ্যে তার বিরুদ্ধে শুরু করে প্রচারকর্ম। কত-না বিদ্বেষ জেগে ওঠে তা থেকে—যার পরিণামে দেখা দেয় কদর্য সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও দাঙ্গা। রাজশক্তি সেই সুযোগে আন্দোলন দমন করতে চেষ্টা করে রুদ্ররূপে। আত্মশক্তির চর্চা ক'রে আত্ম-নির্ভরশীল হয়ে দেশের আর্থিক সমস্যার কথঞ্চিৎ প্রতিকারের চেষ্টা করে বাঙালী স্বদেশী যুগে; তাকে কাবু করা হয় কোন-কোন বাঙালী মুসলমানের সহায়তায়। অজ্ঞ মুসলমান জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে তাদের বোকা পেয়ে হিন্দু-নেতারা বড়ই ঠকাচ্ছিল তাদের, কিন্তু তাদের হিতৈষী স্বধর্মী মুসলমান-নেতারা বাঁচিয়ে দিয়েছেন তাদেরকে মৎলববাজ হিন্দু-নেতাদের খপ্পর থেকে উদ্ধার ক'রে। বাংলার রাষ্ট্রিক ও আর্থিক আকাশ ঢেকে ফেলে সেই সময় রাজ-রোষের মেঘে।

কিন্তু ঘনায়মান কালো মেঘের ভিতর দিয়ে একটা আলো দেখা দেয়। এই সময় বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়ক ছিলেন এমন এক জন মানুষ যাঁর একাধারে

জ্ঞানের গভীরতা ও বিস্তার, বুদ্ধির প্রখরতা ও দীপ্তি, কর্মে অনালস্য ও অনুরাগ, স্বভাবের তেজস্বিতা ও চরিত্রের দার্ঢ্য, ইচ্ছাশক্তির প্রবলতা এবং কল্পনার বিস্তার ও বৈচিত্র্য ছিল অতুলনীয়—যাঁর দৃষ্টি ছিল দূর ভাবীকালে পরিব্যাপ্ত। বাংলা দেশে শিক্ষার গতিকে রোধ করবার উদ্দেশ্যে কার্জন যে ব্যবস্থা ক'রে যান তাকে শুধু ব্যর্থ করেই বিরত হন নি সরস্বতীর এই বরপুত্র—শিক্ষার সেই ক্ষীণধারাকে বন্যার মত ব্যাপ্ত ক'রে দেন সারা দেশে, যার প্রাণ-প্রবাহে স্নাত হয়ে বলিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে বাংলার যুব-শক্তি। নানা কারণে শিক্ষায় পিছিয়ে পড়েছিল বাংলার মেয়েরা। তাদের মধ্যেও যাতে অবাধে ও সহজে প্রবেশ করতে পারে শিক্ষার স্রোত তার জন্য আইন-কানুন রচনা ক'রে দেন তিনি। পরাধীন দেশের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের সংকীর্ণ আয়তনের মধ্যে অনতি-দীর্ঘ জীবনে এক জন মানুষের পক্ষে যতটা করা সম্ভব তা ক'রতে ত্রুটি করেন নি তিনি। দরিদ্র দেশবাসী এই শক্তিমান পুরুষের দাক্ষিণ্যে গ্রামে-গ্রামে স্কুল খুলেছে অনেক শক্তি ব্যয় ক'রে, অনেক স্বার্থ ত্যাগ ক'রে, অনেক ক্ষতি স্বীকার ক'রে। এই প্রতিভাবান পুরুষ নানা দিক্ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে তার রূপ দিয়ে যান—যার অভাব ছিল এত কাল পর্যন্ত।

ব্যুরোক্রেসি কিন্তু দেশের মধ্যে শিক্ষার এই দ্রুত বিস্তার দেখে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট রইলেন না। এর গতি রোধ করা যায়, এর শক্তি খর্ব করা যায়, একে পঙ্গু করা যায় কি উপায়ে তার নানা ফন্দি আঁটতে লাগলেন। তাঁদের উদ্ভাবিত অনেক অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হ'তে থাকল। কিন্তু ছোট ইংরেজ বার-বার একটা কথা ভুলে যায়। আমাদের হাতে-পায়ে প্রথম বেড়ি পরাতে যখন আমাদের প্রভুদের বাম হাত ছিল ব্যস্ত তখন থেকেই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁদের দক্ষিণ হাত ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সেই বেড়ি ভাঙতে নিযুক্ত আছে। তাঁদের সেই দক্ষিণ হাত ইংরেজী সাহিত্য, আর আধুনিক বিজ্ঞান—প্রবলবেগে যার চর্চা চলেছে পাশ্চাত্যে। চাবি বন্ধ ক'রে রেখে আসতে পারে নি ইংরেজ সুয়েজ খালের ওপারে তার সাহিত্যকে যার ভিতর দিয়ে ধ্বনিত হচ্ছে সাগর-গর্জনের মত বড় ইংরেজের স্বাধীনতাপ্রিয়তার জয়ধ্বনি—এবং আধুনিক বিজ্ঞানকে—যা নবযুগের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সুতরাং ব্যর্থ হয়েছে ব্যুরোক্রেসির সকল শর-সন্ধান।

ভারতের দুর্ভাগ্য যে বাদ্শাহ আলমগীর তাঁর প্রপিতামহ আকবরের অনুসৃত রাজনীতি—যা জাতীয় ঐক্যকে করে দৃঢ়তর এবং রাষ্ট্রকে করে বলিষ্ঠতর—তাকে করেন ত্যাগ। এই অসামান্য ধীমান্ সম্রাট ভারতে ইসলাম ধর্ম ও প্রভাব বিস্তারের এবং হিন্দু প্রজা নিগ্রহের যে সর্বনেশে নীতি গ্রহণ ক'রে অর্ধ শতাব্দী কাল রাজদণ্ড পরিচালন করেন তার ফলে ভারতে আকবরের মহাজাতি গঠনের প্রয়াস হাওয়ায় যায় মিলিয়ে, তাঁর যত্নে গড়া রাষ্ট্রসৌধ ধূলায় পড়ে লুটিয়ে। আধুনিক ভারতের জন-কয়েক মুসলমান নেতা পাঠান-মোগল ইতিহাসের এই অমূল্য শিক্ষাটি না-নিয়ে তুচ্ছ বৈয়ক্তিক ও ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে দিলেন দেশের সর্বজনীন স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির উর্ধে স্থান।

সেই আগা খাঁ-ডেপুটেশনের পর থেকে হিন্দু-মুসলমানের ব্যবধান বাড়তে থাকল। অবশেষে সাম্প্রদায়িক সুবিধাবাদী মুষ্টিমেয় মুসলমান-নেতাকে খুশি করবার জন্য কংগ্রেস কুক্ষণে লক্ষ্ণৌয়ে করলেন প্যাক্ট। মানুষের মনস্তত্ত্বের একটা দিক দেখলেন না তাঁরা। মানুষের লোভের আগুন ইন্ধন পেলে যে 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব' প্রবল ভাবে বেড়েই ওঠে এটা খেয়াল করলেন না তাঁরা। আর, খুশি করতে গিয়ে অন্যায়কে খানিকটা স্বীকার ক'রে নিলেন। এই রন্ধ্র দিয়ে কংগ্রেস রাজনীতিতে তোষণ-নীতির (policy of appeasement) শনি প্রবেশ করল। কংগ্রেস-নেতারা অবশ্য আশা করেছিলেন যে তাঁদের আন্তরিক উদারতায় তৃপ্ত হয়ে যে-সব তথাকথিত মুসলমান-নেতা কংগ্রেসের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে বাধা দিচ্ছিলেন নানা রকমে, এইবার তাঁরা প্রসন্ন মনে যোগ দেবেন কংগ্রেসের সঙ্গে। কিন্তু ভবী তাতে ভুলল না। বরং হ'ল 'উল্টা সমঝ্লি রাম'। আগে যে-সব মুসলমান কংগ্রেসে ছিলেন তাঁদেরও কেউ কেউ তাকে ছাড়লেন। কারণ, খুশি করবার আসল

ক্ষমতা ছিল ব্যুরোক্রেসির হাতে, আর কংগ্রেসের হাত ছিল তখন খালি। তখন থেকে 'গাছেরও খাব তলারও কুড়োব' নীতি অনুসরণ ক'রে আসছেন মুসলমান নেতৃবর্গ। কোন কষ্ট কোন ক্ষতি স্বীকার না ক'রেই যদি দক্ষিণ হস্তের উত্তম ব্যবস্থা হয় আর গাত্রত্বকের চিকনাই বাড়ে তবে সে-পথ ছাড়ে এমন আহম্মক কে আছে ছুনিয়ায়? সুতরাং প্যান্-ইস্‌লামের আস্ফালন চলতে থাকে আরও জোরে। কংগ্রেস যতই ছাড়তে লাগলেন এঁদের দাবির বহর ততই চলল বেড়ে। এর মধ্যে তামাশা এই যে দাবির এঁদের অন্ত নেই বটে কিন্তু দায়িত্ব নেই এঁদের এক ফোঁটাও—যাকে বলে all rights and no responsibility!

ইতিমধ্যে গান্ধীজীর কৃপায় কংগ্রেসের ঘাড়ে চেপে বসল খিলাফৎ। অসহযোগ-খিলাফৎ আন্দোলনের মত্ততার সময়ে দু-দিনের জন্য মনে হ'ল দেশের মুক্তির জন্য বুঝি বা হিন্দু-মুসলমান সমান ব্যাকুল হয়েছে। দু-এক জন নির্ভীক অতন্দ্র ব্যক্তি সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন। আমরা পনর-আনার দল তাঁদের অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং কটূক্তি করলুম সে জন্য। ফলাফল যা হ'ল তার উল্লেখ এখানে বাহুল্য। প্যান্-ইস্‌লামের মনের গোপনে যে-কথাটা চাপা ছিল প্রভুপক্ষের উত্তরোত্তর প্রশ্রয় পেয়ে সেইটে খুব স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে পাকিস্তান-প্রস্তাবে। তাঁরা সোজাসুজি ব'লে দিয়েছেন—'তোমরা এক নেশ্যন, আমরা আর এক নেশ্যন—দোস্‌রা নেশ্যন; তোমাদের সঙ্গে আমাদের একত্রে থাকা চলবে না।' (পূর্বাপর কার্য-করণ সম্বন্ধ বিচার ক'রে এই ঘোষণাটাও কম্যাণ্ড পারফরম্যান্স কিনা সে-বিষয়ে অনেকের মনে সংশয় জেগেছে)।

বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমান ছুটি পৃথক জাতি নয়। সাধারণ সহজ দৃষ্টিতে—এবং নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে—তারা এক জাতি। তাদের ভাষা এক এবং ভাষাশ্রয়ী সংস্কৃতিও মোটের উপর এক। ধর্মের শাশ্বত মূল সত্যগুলি সব দেশ-কালের মানুষের পক্ষে সমান হ'লেও তার বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানে এবং ঐতিহ্যে বহু বৈচিত্র্য ও অনৈক্য আছে—যার থেকে ক্রুসেড, জেহাদ, সাম্প্রদায়িক উৎপীড়ন অত্যাচার ঘটেছে। এই সেদিনও খাস ইংলণ্ডে ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যাণ্ট বিরোধের অন্ত ছিল না। শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সে-সব অন্তর্হিত হয়েছে সকল উন্নত দেশ থেকে। আমাদের দুর্ভাগ্য দেশের কোটি কোটি লোকের অশিক্ষার সুযোগে স্বার্থপরায়ণ কৌশলী ব্যক্তিদের গোপন এবং পরোক্ষ ইঙ্গিত ও উত্তেজনায় মাঝে-মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এখনও বাধে বটে; কিন্তু কিছু দিন বাদেই লোকে সে-কথা ভুলে গিয়ে আবার যথেষ্ট সখ্যভাবে পাশাপাশি বাস করে। বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মবিশ্বাসে ও ধর্মানুষ্ঠানে অনেক অনৈক্য আছে এবং থাকতে পারে। কিন্তু সে-জন্য তারা সব বিষয়েই পৃথক হয়ে বাঁচবে কি করে? আর্থিক ব্যাপারে উভয়কেই পরস্পরের উপরে নির্ভর করতেই হবে। বিপদে সম্পদে এক জন আর-এক জনকে এড়িয়ে চলতে পারছে না পারবে না। পাশাপাশি বসবাস ব'লে দু-জনেরই মুখ দু-জনকে দেখতে হবে, কথা বলতে হবে। যে-বাঙালী হিন্দু-মুসলমান অবিচ্ছেদ্য রূপে প্রায় সব রকমেই এক তাকে পৃথক ক'রে দেবার ব্যর্থ প্রয়াস ও বিড়ম্বনা কেন? সাম্রাজ্যবাদীর ভেদনীতি প্রয়োগের ফলে বাঙালী জাতির এই দুই প্রধান অংশের মধ্যে বিদ্বেষ জন্মিয়ে একটা অবিশ্বাস ও বিরোধ জাগিয়ে রাখতে পারায় ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের স্বার্থ-সিদ্ধি হ'তে পারে; কিন্তু জাতির কল্যাণের দিক্ থেকে দেখলে তাতে 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ' করা হচ্ছে বললে কম বলা হয়; কারণ এ-যাত্রা শুধু হিন্দুর একলার যাত্রা নয়, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান সকলের মিলিত যাত্রা। কিন্তু যে সময় কোন-কোন বাঙালী মুসলমান নিজেদেরকে এদেশের লোক নয় ব'লে প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে লজ্জা বা সংকোচ বোধ করছেন না তখন বাঙালী হিন্দু-মুসলমানকে এক জাতি বলাকে তাঁরা পরাভূত দুর্বলের কান্না মনে করতে পারেন! মনে তাঁরা যা খুশি করতে পারেন তাতে সত্য যা তার অপলাপ হবে না।

প্রায় চার বৎসর হ'ল বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের হাতে বাংলার শাসন-ক্ষমতা এসেছে। তার সাহায্যে তাঁরা

বাংলার হিন্দুকে কেবল কোণঠাসা করতেই ব্যস্ত নন, তাকে জাতে ও ভাতে মারতে কৃতসংকল্প ব'লেই প্রতীয়মান হচ্ছে। ব্রিটিশ রাষ্ট্র-ধুরন্ধরদের অনুগ্রহে বাংলার ব্যবস্থা-পরিষদ মন্ত্রীদের মুঠোর মধ্যে। তার সাহায্যে তাঁরা এমন সব অস্ত্র বানিয়ে ও শাণিয়ে নিচ্ছেন যা দিয়ে বাঙালী হিন্দুকে সাংঘাতিক আঘাত করা চলবে। ইতিমধ্যেই তার কিছু-কিছু নমুনা পাওয়া গেছে। পঞ্চাশ বছরের প্রাণপাত পরিশ্রমে বৃদ্ধ সুরেন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-সন্ধ্যায় তাঁর জন্ম-নগরী কলিকাতাকে যে পূর্ণ পৌর-অধিকারে প্রতিষ্ঠিত ক'রে যান তার 'একে একে নিবিছে দেউটি'। আশুতোষের নব নালন্দা কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে মারাত্মক আঘাতের আয়োজন পূর্ণপ্রায়। একটা ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে এর মিল দেখা যায়, যখন ত্রয়োদশ শতকে বিখ্যাত নালন্দার ধ্বংস সাধন হয় বিজয়ী তুর্কী সেনাপতি মুহম্মদ-ই-বক্তিয়ারের হাতে। সেটাকে ধ্বংস করা হয় হাতে মেরে—যার জন্য দায়ী কতকগুলি ভাগ্যান্বেষী মূর্খ বিদেশী সৈনিক। আর এটাকে মারবার জোগাড় হচ্ছে অন্য রকমে—যার জন্য দায়ী শিক্ষিত ও শিক্ষাভিমানী ব্যক্তি যাঁদের সকলেরই বহুপুরুষেরই জন্ম-ভূমি বাংলা দেশ, আর যাঁদের অনেকেরই শিক্ষা হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে—ইংরেজীতে যাকে বলা যায় তাঁদের *Alma Mater*! অবশ্য এমন বোকা কেউ নেই আজ দেশে যে বুঝতে পারছে না যে এ-বাণ নিক্ষিপ্ত হচ্ছে কার হাত থেকে শিখণ্ডীকে সামনে রেখে।

সব দেশেই শিক্ষার ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণের ভার থাকে জ্ঞান-তপস্বী ও শিক্ষাব্রতী বিশেষজ্ঞদের উপর। আমাদের গবুচন্দ্রদের ব্যবস্থায় এই সবচেয়ে গুরু বিষয়ের সকল ভার ন্যস্ত হবে সাম্প্রদায়িক মাপকাঠিতে যোগ্য বিবেচিত ব্যক্তিদের উপর—জ্ঞানচর্চা নিয়ে, শিক্ষা নিয়ে কোন মাথা-ব্যথা ছিল না যাঁদের এতকাল। শত বৎসর পূর্বে বাংলার হিন্দু এগিয়ে আসে ইংরেজী সাহিত্যের ভিতর দিয়ে পশ্চিমের জ্ঞানের প্রদীপ থেকে তাদের মনের পলতেয় আলো জ্বেলে নিতে, এবং দেশের মধ্যে ইস্কুল-কলেজ স্থাপন ক'রে চেষ্টা করে সেই আলো সকলের মনে জ্বেলে দিতে। সেটা কি বাঙালী হিন্দুর অপরাধ? সেকালে সামাজিক ব্যাপারে অনেক গোঁড়ামি থাকলেও শিক্ষা-প্রচারে উৎসাহ ও উদারতার অবধি ছিল না বাঙালী হিন্দুর। সকল জাতির সকল শ্রেণীর সকল ধর্মের বালক-যুবকদের জন্য তাঁদের ইস্কুল-কলেজের দরজা ছিল খোলা। ত্রিশ বছর আগেও স্বর্গত আশুতোষের পরিচালনাধীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের যাবতীয় প্রধান আধুনিক ভাষার এবং সংস্কৃতিমূলক সকল প্রাচীন ভাষার যথোচিত আসন দিয়েছেন। এই একটা জায়গায় যেন সকলে সহজে মিলতে পারে, কোন ব্যবধান বা বাধা না থাকে জ্ঞানের পুণ্য অঙ্গনে, তার ব্যবস্থা করেন তিনি। বাঙালী হিন্দু আর যেখানে হোক শিক্ষা-বিস্তারে, বিদ্যা-বিতরণে এমন কোন ভুল বা কার্পণ্য করে নি যে জন্য সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থাটাকেই এমন নির্বোধের মত নিষ্ঠুরভাবে নষ্ট করতে হবে।

আর সব কুকর্মের অপকারিতা কালক্রমে ক্ষীণ হ'য়ে যেতে পারে, আর সে-সবের প্রতিকারও দুঃসাধ্য নয়। কিন্তু শিক্ষা সম্পর্কে এঁরা যে আত্মঘাতী নীতির অনুসরণে উদ্যত হয়েছেন এই অপকর্মের ফল ফলতে বেশী বিলম্ব হবে না। বাংলার হিন্দুর উপর আক্রোশবশতঃ তাকে জাতে মারবার যে-আয়োজন করছেন বাংলার মন্ত্রীমণ্ডল তার প্রতিক্রিয়া থেকে নিষ্কৃতি নেই বাঙালী মুসলমানেরও। একই দেহের এক অঙ্গকে আঘাত করলে সমস্ত দেহটাই পীড়িত হয়। আজকে জ্ঞাতি-নিগ্রহের নিষ্ঠুর উল্লাসে মন্ত্রীরা ভুলে যাচ্ছেন যে প্রাকৃতিক জগতের মত নৈতিক জগতেরও কোন নিয়ম লঙ্ঘন করলে তার অনিবার্য ফল পেতে হয় সকলকেই—'হোক না সে মহারাজ বিশ্ব-মহীতলে'। ইতিহাস-বিধাতার অমোঘ দণ্ড সকলের উপর সমান উদ্যত আছে। বাংলার বর্তমান অদূরদর্শী মন্ত্রীমণ্ডলের কাজের হিসাব-নিকাশ যথাকালে হবে মহাকালের দরবারে - যেমন সকলেরই হয়েছে এবং হচ্ছে। যাঁর মন চিরদিন সকল সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে, যাঁর নির্মল ধ্যানদৃষ্টিতে নিখিল-মানবের মহামিলনের ভাবী দৃশ্য উদ্ভাসিত, সেই মহামনীষী রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে সম্প্রতি যে-বাণী বিঘোষিত হয়েছে তার প্রতি বাংলার মন্ত্রী-মহাশয়দের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। তিনি বলেছেন—

"Now, when the hand of cruel times lies heavy on the noblest endeavours of the soul, we shall do well to remember that it is the dwarfish mind that hurls itself against the eminence it cannot reach."

আর বলেছেন—

"In striking down the free life of others one strikes at the root of his own freedom."

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে কোমর বেঁধে নেমেছেন যে সকল মুসলমান নেতা তাঁদের আর একটা কথা স্মরণ করতে বলি। সেটি এই যে, বাংলাদেশ ভারতের বাইরে নয়, আর ভারতের তিন-চতুর্থাংশ অধিবাসী হিন্দু। বাঙালী হিন্দু যদি চার দিকের চাপে পিষেও যায় তথাপি ভারতে হিন্দু টিকে থাকবে এবং বাংলার তথা ভারতের মুসলমানকে আজ হোক কাল হোক হিন্দু-ভারতের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতেই হবে। সাত-শ বছরের পাঠান-মোগল রাজত্বে, বিশেষত ঔরঙ্গজেবের মত দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাটের দীর্ঘ শাসনে যা পারে নি আজকের দিনে জনকয়েক মুসলমান নেতা—যাঁদের মতিভ্রম সম্বন্ধে সন্দেহ নেই কারও মনে—সেই চেষ্টায় সফল হবেন এটা বিশ্বাস করতে বললে মানুষের সহজ বুদ্ধির অপমান করা হয়। ভবিষ্যত ভারতের রাষ্ট্ররূপ কেমন হবে এখন কেউ তা জোর ক'রে বলতে পারে না। তবে এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে তাতে নিছক মুসলমান বা নিছক হিন্দু ব'লে কিছুর প্রাধান্য থাকবে না। অষ্টাদশ শতকের পর মানবজাতি অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। ঊনবিংশ শতকের আগেকার আর এখনকার মানুষের মানসিক অবস্থায় অভাবনীয় প্রভেদ ঘটেছে। বর্তমান বিংশ শতকেই এমন সব বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক সত্যের যন্ত্রপাতির যান-বাহনের আবিষ্কার হয়েছে যাতে মানুষের আর্থিক সামাজিক ও নৈতিক জীবনে বিপর্যয় উপস্থিত করেছে। মানুষ কাল যেখানে ছিল আজ সেখানে নেই, আজ যেখানে আছে কাল যে সেখানে থাকবে তার বিন্দুমাত্র স্থিরতা নেই। এই নিয়ত এবং দ্রুত পরিবর্তনের বাইরে থাকবে কেবল এই অচলায়তনের অধিবাসী হিন্দু মুসলমান? বিগত মহাসমরের পূর্ববর্তী তুরস্কে আর আতাতুর্কের তুরস্কে কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কে ভাবতে পেরেছিল সুলতান-শাসনাধীন তুরস্কের তুর্করা—যে তুরস্ককে sick man of Europe বলে ব্যঙ্গ করত সকলে—তাদের মধ্যযুগের মর্চেপড়া আইন-কানুন, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, বেশ-ভূষা, বোরখা-হারেম ছেঁড়া ময়লা কাপড়ের মত ছেড়ে ফেলে একেবারে নবযুগের মধ্যে নতুন জন্মলাভ ক'রে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবে জগৎসভায়? বিপ্লবের আগেকার রাশিয়ার ছবিও ত প্রায় আমাদেরই মত। আজ সেখানে 'নানা জাতি নানা ভাষা নানা পরিধানের' বৈচিত্র্যের মধ্যে এক মহাশক্তিশালী রাষ্ট্রের উদ্ভব এবং অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে যার কর্তৃপক্ষের তুষ্টির জন্য আমাদের মহাপরাক্রান্ত কর্তাদেরও অনেক তোয়াজ করতে দেখা যাচ্ছে। বর্তমান শতাব্দের শুরু থেকে আজ তক ইউরোপ-এশিয়ার উপর দিয়ে বার-বার যে প্রলয়-ঝড় বয়ে চলেছে তার ঝাপটা আমাদেরও মনের দরজা-জানালায় প্রচণ্ড বেগেই আঘাত করেছে। সুতরাং, অচলায়তনবাসী আমাদের মনেও কল্পনাতীত পরিবর্তন এসেছে এবং আসছে গোচরে অগোচরে—যেহেতু আমরা জড়পদার্থ নই, মানুষ।

রিপু এবং কমপ্লেক্স বিশেষের তাড়নায় যাঁরা স্বদেশ ও স্বজাতির প্রগতিপথের এবং মুক্তির অন্তরায় হচ্ছেন, শুভবুদ্ধির আবির্ভাব হোক তাঁদের অন্তরে এই প্রার্থনা মাত্র করতে পারি আমরা। যদি তা না হয় তবে বিলম্বিত হবে সিদ্ধিলাভ কিন্তু ঠেকাতে পারবেন না তাঁরা কালধর্মের প্রবাহকে সাম্প্রদায়িকতার বাঁধ বেঁধে। কিন্তু, আমাদের কি কিছুই কর্তব্য নেই এই সংকটকালে? কিছুকাল যাবৎ ভাবের ঘরে চুরি ক'রে আসছে বাঙালী হিন্দু। সেই অপরাধের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে তাদের অসহায় সন্ততিদের উপর। কঠোর প্রায়শ্চিত্তেই সেই দারুণ অপরাধের স্খালন হ'তে পারে। বিদ্যা অর্থ খ্যাতি প্রতিষ্ঠা প্রাধান্য প্রভৃতি সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের কামনার বস্তুগুলিও সততা শ্রমশীলতা ও সংযমের দ্বারাই অর্জন করতে হয়। একটা জাতির অভ্যুদয় ও মুক্তিসাধনে এই সকল এবং আরও কত গুণরাজির কত অধিক আবশ্যক তার ইয়ত্তা আছে কি? অথচ বিগত বিশ-পঁচিশ বছরে বাঙালী হিন্দুর চরিত্রে এই সব সদ্গুণ উত্তরোত্তর হ্রাস পায় নি কি—যার যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল এর আগেকার বাঙালী-চরিত্রে? স্বর্গত গোখলে মহোদয় একদা বলেছিলেন, 'বাংলা যে-কথা ভাবে আজ, বাকী ভারত সেই কথা ভাবে কাল।' আর আজকের বাঙালী? সে-কালের আর এ-কালের বাংলার প্রতিনিধিরূপী ব্যক্তিদের কোন তুলনা চলে কি?

স্বামী বিবেকানন্দের অমূল্য উক্তিটি আজ আমাদের নিয়ত মনে রাখা আবশ্যক হয়েছে—

"চালাকীর দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়। তৎ কুরু পৌরুষম্—পৌরুষ প্রকাশ কর।"

বটগাছ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

নিত্য অভ্যাসমত যোগমায়া দেবীর ঘুমটা সকালেই ভাঙিয়া যায়। আব্‌ছা অন্ধকারে প্রকাণ্ড দ্বিতল বাড়ীটার চেহারা তাঁহার কাছে অত্যন্ত মনোরম, স্বপ্নে-দেখা কোন প্রিয় ভূমির রূপলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। কিন্তু ঘুম ভাঙিবার এইটিই একমাত্র হেতু নহে। মেনকা তাহার সুকোমল মাথাটি মিনিট দুই ধরিয়া তাঁহার পায়ের উপর ঘর্ষণ করিবার পর তিনি পঞ্চকন্যাস্মরেন্নিত্যং করিতে করিতে উঠিয়া বসেন। ঠাকুরদেবতার নাম সারা হইতে আরও মিনিট পনেরো লাগে। ইত্যবসরে মেনকা পায়ের দিক্ হইতে সরিয়া আসিয়া কখনও তাঁহার কোলের কাছে, কখনও বা পৃষ্ঠদেশে আপন সুকোমল স্পর্শ দ্বারা তাঁহাকে স্নেহাপ্লুত করিয়া কয়েক বার আদরের ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া থাকে। তিনি নাম লইবার অবসরে আপন মনে হাসিতে থাকেন ও মৃদু অনুযোগের স্বরে বলেন, রাত পোয়ালেই আবাগীর খিদে। সব—আগে বাসি দুয়োরে জল দিই, উঠোনে ঝাঁট পড়ুক—

মেনকা ওরফে মেনি এত সব লক্ষণ-তত্ত্বের ধার ধারে না। বিধবা যোগমায়ার পৃষ্ঠদেশে আপনার লেজের অগ্রভাগ স্পর্শ করাইয়া আদরভরা কণ্ঠে ডাকিয়া উঠে, মিউ।

যোগমায়া তাহাকে পিছন দিক্ হইতে টানিয়া আনিয়া আপনার কোলের উপর শোয়াইয়া গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহসিক্তস্বরে বলেন, আবাগীর সব বোধ আছে, খালি কথা কইতে পারে না। মেনকা উত্তর না দিয়া ঘড়র ঘড়র শব্দে আরাম ও আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকে।

রাত্রির দুধ হইতে খানিকটা দুধ যোগমায়া মেনকার জন্য রাখিয়া দেন। লক্ষণের কাজগুলি সারিয়া একটা আধভাঙা পাথরের বাটিতে সেই দুধটুকু ঢালিয়া বারান্দার একধারে বাটিটা নামাইয়া রাখিয়া ডাকেন, আয়, মেনি, আয়।

লেজ তুলিয়া মেনকা ত ছুটিয়া আসেই, সঙ্গে সঙ্গে ও-বাড়ী হইতে শব্দ আসে,—হাম্‌মা।

—যাই, মা, যাই। ব্যস্তভাবে যোগমায়া গোয়ালঘরের পানে ছুটিয়া যান।

—একটু দেরি আর কারও সয় না! একখানাই ত হাত, কদিক্ সামলাই বল?

গোয়ালঘরে ঢুকিয়া বলেন, ওমা, এ যে একশা করে রেখেছ! আহা, বাছা রে! সারারাত এই সোঁতা মাটিতে কাটিয়েছ? কত যে ছাই ছড়িয়ে দিলাম কাল, তোমার জ্বালায় কি আর রক্ষে আছে! যেমন কর্ম্ম, তেমনি ভোগ!

ইতিপূর্ব্বে উনান হইতে ছাইগুলি তুলিয়া একটি পিঁড়ির উপর রাখিয়াছিলেন। ডুমুর গাছে গরু বাঁধিবার পূর্ব্বে সেই ছাই গাছতলায় ভাল করিয়া ছড়াইয়া দিলেন। ডুমুর তলায় রক্ষিত নাদাটা ভাল করিয়া ধুইয়া সামান্য জল দিয়া খোল বিচালী মাখিয়া 'শানি' তৈয়ারী করিলেন ও গরুটিকে গোয়াল হইতে বাহির করিয়া ডুমুর তলায় বাঁধিতে বাঁধিতে বলিলেন, ভাল ক'রে খাবি মা, না খেলে ত দুধ হবে না। কাল থেকে আবার খুদ-সেদ্ধ দিতে হবে।

বাছুর গোয়াল হইতে ডাকিল, হাম—বা।

—আহা তোমায় এখুনি ছাড়ছি কি না! সেই গোয়ালা আসতে বেলা যায় নাম বারোটা। এত ক'রে পই পই ক'রে বলি কোঁয়ালে বাছুর, একটু সকাল সকাল দুয়ে দিস মা—পিত্তি পড়ে মরবে যে! তা কে শোনে কার কথা! আমারও হয়েছে যেমন অধর্ম্মের ভোগ।

বাহির-বাড়ীর বারান্দা হইতে আর এক প্রকারের আদরের ডাক শোনা যায়। যোগমায়া দেবী গরুর ব্যবস্থা সারিয়া রান্নাঘরে আসিয়া ঢোকেন ও তাওয়া-চাপা-দেওয়া একখানি রুটি হাতে করিয়া বাহির-বাড়ীর দিকে চলিতে

চলিতে স্বগত উক্তি করেন, মাগো মা, কারও কি একটু তস্ সয় না—সব টাইম বাঁধা! একটু এদিক-ওদিক হয়েছে কি কান্না!

মাঝের দুয়ার খুলিতে খুলিতে বলেন, কি লা খেঁদি, কাল বিকেলে খেয়ে—আবার তিন-প্রাতঃকালে খিদে! তোদের জ্বালায় আমার ধম্ম কম্ম সব চুলোয় গেল।

খেঁদি উত্তর দিল, ভোউ।

রুটি টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া দিতে দিতে যোগমায়া বলিলেন, গায়ে ত খড়ি উড়ছে—দুর্গন্ধ বেরচ্ছে! আজ তিন দিন নাওয়া হয় নি বুঝি? আর পারিও না, বয়স তো বাড়ছে দিন দিন!

টুকরা রুটি চর্ব্বণ করিতে করিতে খেঁদি শুধু লেজ নাড়িয়া সে-উক্তি সমর্থন করিল।

ও-পাড়ার নিস্তারিণী আসিয়া ডাকিলেন, কই গো বিমলের মা, গঙ্গা নাইতে যাবে না?

আর বোন, এই দেখ না, এদের জ্বালায় আমার নাবার খাবার সময় কি আছে? বলিতে বলিতে এ-বাড়ীতে আসিলেন।

নিস্তারিণী সহাস্যে বলিলেন, তা বটে! ওদের নিয়ে তুমি বেশ আছ, দিদি! তা আজ একটা যোগ আছে, চল না?

—আজ আর হবে না, বোন। চার দিকে নৈরেকার হয়ে আছে। খেঁদুকে নাওয়াতে হবে, ও-বাড়ীতে এক গলা বন হয়েছে—মোক্ত করতে হবে—

—কুকুর নাওয়ান, বন পরিষ্কার কালই না হয় ক'রো।

—না, বোন, শরীরের যা অবস্থা—কোন দিন ভাল থাকি-না-থাকি! আজই ক'রে রাখি। এবার যেদিন যোগটোগ হবে আমায় বরঞ্চ ব'লো, নেয়ে আসব। বয়স ত আর কম হ'ল না।

—কতই আর তোমার বয়স, আমাদের নিশু যেবার হয়—সেবার তোমার বিমলের পৈতে হ'ল। তখন বিমল তোমার যেটের এগারোয় পড়েছে—নয়?

—ঠিক এগার নয়, দশ। গভ্‌ভে এগার ধ'রে পৈতে হয় কি না। তা তোমার নিশুর বয়স যেটের দু-কুড়ি চার না পাঁচ হ'ল?

—হাঁ দিদি, তা হ'লো বইকি। নিশু সেদিন বলছিল, বিমলদার নাকি পেন্‌সিল নেবার সময় হয়েছে?

—তবেই বোঝ বোন, সত্তর পেরিয়ে কবে ভীমরতিতে পড়েছি। এখন যদি গতর না বয় তো গতরের অপরাধ কি?

—তা ত বটেই। তা পেন্‌সিল নিয়ে বিমল দেশে আসবে ত?

—আসবে না ত যাবে কোথায়। এলে বাঁচি বোন। যার ঘর দোর সে বুঝে পেড়ে নিক, আমি ছুটি পাই।

—নাতিনাতনী নিয়ে ঘরসংসার করবে না?

—চিরকালই ত বিষয় বিষয় করে কাটালাম, মা। সে এলে ঘর-সংসার তাকে বুঝিয়ে দিয়ে বাবা বিশ্বনাথের শ্রীচরণে গিয়ে পড়ব।

—তবে আমাকেও সঙ্গে নিয়ো দিদি। নাতিনাতনী নিয়ে ঘর করার সুখ কত! হাড় ভাজা-ভাজা হয়ে যাচ্ছে, দিদি!

—আমার বিমল কিন্তু ও-রকম নয়, মা বলতে অজ্ঞান।

—আমার নিশুও কি অমনি ছিল! হা-ঘরের মেয়ে এনেই না আমার এই খোয়ার, দিদি! যাই আবার বেলা হ'ল। রোদ চড়লে দু-কোশ ভাঙ্গতে জিব বেরিয়ে যাবে।

– আসিস এক বার দুপুর বেলা।

—আসব। বলিয়া পিতলের ঘড়াটি বাঁ কাঁকে চাপিয়া নিস্তারিণী চলিয়া গেলেন।

যোগমায়া জলের বালতি টানিয়া লইয়া তাহাতে ন্যাতা ডুবাইলেন ও কোমরে আঁচলটা জড়াইয়া ঘরের মেঝে প্রভৃতি পরিষ্কার করিতে লাগিলেন।

ঘরদুয়ার ত দুই-একটি নহে। উপর নীচে ছয়-সাত খানি ঘর, তার কোলে চওড়া বারান্দা। এতগুলি ঘর প্রত্যহ ন্যাতা দিয়া অবশ্য তিনি মুছিতে পারেন না। নিত্য-ব্যবহার্য্য ঘর দুখানি প্রত্যহ পরিষ্কার করিতে হয়—সেই সঙ্গে বারান্দাটাও; অন্য ঘর কোনটি সপ্তাহে এক বার, কোনটি বা দুই বার। বয়স যখন কম ছিল তখনকার কথা আলাদা। তখন ঐ নিস্তারই কত বার বাড়ীতে ঢুকিয়া বলিয়াছে, আহা ঘরদুয়োরে যেন লক্ষ্মী-ছিরি ফুটে

বেরোচ্ছে। এমন তকতকে উঠোন, ইচ্ছে করে দু-দণ্ড গড়িয়ে নেই। আর আমাদের বাড়ী—ম্যাগো!

বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে আর সেদিন নাই। তবু যোগমায়ার শরীরে আলস্যের অভাব।

বলেন, যখন বিয়ে হয়ে এ-বাড়ীতে এলাম, দুখানা চূণবালি-খসা শোবার ঘর ছাড়া কিছুই ত ছিল না, বোন। কর্ত্তাকে তাড়া দিয়ে দিয়ে আমিই এ-সব করালাম। এই লোহার আড়া দেওয়া চওড়া চওড়া ঘর, চওড়া বারান্দা, ঢাকা সিঁড়ি, ঠাকুর-ঘর, রান্নাঘর, ইঁদারা, গোয়াল—সব। পাঁচিল দিয়ে বৈঠকখানা বাড়ীটা আলাদা করিয়ে নিলাম। আমাদের সময়ে যা কেটেছে—কেটেছে। এখনকার বউঝিরা কি ঘরদুয়োরের কষ্ট সইতে পারে। বিমলের বউ সেবার এসে বললে, মা, বাথরুম নেই কেন? নাইবার ঘর—বুঝলে বোন? ওদের সব একেলে লজ্জা, আমাদের মত তো নয়। ইঁদারা তলায় টিন দিয়ে করিয়ে দিলাম একটা।

নিজের হাতের সৃষ্টি কিনা, কড়ি-বরগায় এতটুকু ঝুল জমিবার উপায় নাই; বাঁশের আগাটিতে বারণ বাঁধিয়া যোগমায়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি লইয়া এ-ঘর ও-ঘর করেন। কোথাও যদি এতটুকু চুণবালি খসিয়াছে, অমনই ছোট কর্ণিকখানি লইয়া চুণবালি মাখিয়া সেটুকুর সংস্কার সাধন করেন। নূতন ঘর-দুয়ার হইবার সময় একখানি ছোট কর্ণিক যোগমায়া কিনিয়াছিলেন। সামান্য খুচরা কাজে ছুট বলিতে মিস্ত্রি ডাকা তিনি পছন্দ করেন না।

ঘর ধোয়া ও মোছা শেষ হইলে তিনি কড়িকাঠের পানে চাহিলেন। না, আজ আর ঝুল ঝাড়িবার আবশ্যকতা নাই। স্নান করিবার পূর্ব্বে ও-বাড়ীর আগাছাগুলি কিছু উপড়াইতে হইবে আর নালাটা পরিষ্কার করিতে হইবে। বাড়ীর উঠানে সরিখাস আমগাছটা না থাকিলে নলে এত ঝরা পাতা পড়িয়া দুদিন অন্তর তাঁহার এ খাটুনিটা আর হইত না। কত লোকেই ত বলে, উঠানের গাছে তোমার ঘর-বারান্দা অন্ধকার হয়েছে, বিমলের মা—ওটা কাটিয়ে ফেল।

তিনি হাসিয়া বলেন, কটা মাসই বা, চোত-বোশেখে একবার আমাদের উঠোনে এসে দাঁড়িও, যেতে মন চাইবে না—এমন ঠাণ্ডা। আর ভাল গাছ, কর্ত্তারা পুঁতেছেন, আমি কি প্রাণ ধ'রে কাটতে পারি।

ছেলেও কয়েক বার বাড়ী আসিয়া গাছ কাটিবার কথা বলায় তিনি হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, আমি ম'লে তোরা যা হয় করিস। যত ইচ্ছে আলো-হাওয়া খাস।

কিন্তু নালা পরিষ্কার করার একটু হাঙ্গামা আছে। পুকুরে ডুব না দিয়া শুদ্ধ হইবার জো কি! এক উপায় আছে, আর সেই উপায়ের দ্বারাই দেহ শুদ্ধ করিবার সুযোগ তিনি পান। গয়লাবউ যখন গাই দুহিতে আসিবে, সেই সময় তাহাকে দিয়া ঘড়া কতক জল মাথায় ঢালাইয়া লইতে পারিলে—শুদ্ধ হইবার ভাবনা কি! তিনি তাই করেন। যেদিন নালা পরিষ্কার করিবার পালা আসে, সেদিন গঙ্গাজল মাথায় দিয়া গামছা পরিয়া শুদ্ধাচারে একটি বালতিতে কয়েক ঘড়া জল তুলিয়া রাখেন। তার পর গয়লাবউ আসিলে সেই জল গায়ে মাথায় ঢালাইয়া লইয়া শুদ্ধ হন। অবশ্য গয়লাবউকেও এ-কাজটি শুদ্ধাচারে করিতে হয়। অর্থাৎ পূর্ব্ব দিনের নির্দ্দেশমত সে বেচারি গঙ্গাস্নান করিয়া তবে গাই দুহিতে আসে।

তার পর পূজা, জপ ইত্যাদি। আতপ চালের ভাত চাপাইয়া বেশীক্ষণ জপে বসিয়া থাকিবার জো কি! কোন রকমে বার দশেক ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া, সূর্য্য-প্রণাম ও গুরু-প্রণাম সারিয়া স্তব পাঠ করিতে করিতে তিনি ফেন গালিতে থাকেন। একটা ঝালের ঝোল, একটু ভাতে ভাত, কোন দিন বা এক-আধখানা ভাজা, শেষ পাতে একটু দুধ। খাওয়া শেষ হইলে তিনি আশ্রিতদের জন্য পাতের প্রসাদ রাখেন। বড় জামবাটির আধ বাটি দুধমাখা ভাত কুকুরের জন্য, ছোট বাটিতে কিছু ভাত বিড়ালের জন্য, আর ভুক্তাবশিষ্ট পাতের তরিতরকারিমাখা ভাতগুলি গরুর জন্য। থালাখানি রোয়াকে রাখিবার সময় উচ্ছিষ্ট লোভী যে-সব কাক, কবুতর বা শালিখ পাখী আসিয়া জড়ো হয়, যোগমায়া তাহাদেরও ভাগ করিয়া কিছু দেন। নিস্তারিণী আসিলে বলেন, একা-একা খেয়ে তৃপ্তি হয় না, বোন। কি যে রাঁধি ছাইপাঁশ, খাওয়া ত নয়—গর্ত্ত বোজানো।

দুপুরে এ-বাড়ী ও-বাড়ী হইতে গিন্নীর দল কখনও বা মেয়ে, বউয়ের দল—কাকীমা, জেঠিমা, দিদিমা, ঠাকু-মা ইত্যাদি সম্বোধন দ্বারা তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়া—খানিক বা বসিয়া গল্প করিয়া গৃহান্তরে চলিয়া যায়। যোগমায়া দেবী তাহাদের উপদেশ দেন; কাহারও আনন্দে আহ্লাদ করেন, কাহারও দুঃখে সমবেদনা জানান। কাহাকেও বা দিদিমাসুলভ রসিকতার দ্বারা তৃপ্ত করেন। স্বপক্ষ বিপক্ষ প্রত্যেকেই তাঁহার কাছে মনের কথা জানাইয়া শান্তি পায়, কারণ অপ্রিয় সত্য কথা বলার অভ্যাস তাঁহার নাই।

বৈকালে আবার ঘরদোর ঝাঁটের পালা, গরুকে 'শানি' মাখাইয়া দিবার হাঙ্গামা ইত্যাদির মধ্যে সন্ধ্যা আসিয়া যায়। তখন দুয়ারে গঙ্গাজল ছিটাইয়া শাঁক বাজাইয়া, ধূপধুনার ধোঁয়া দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া সন্ধ্যাকে আহ্বান করিতে হয়। যে-ঘরে লক্ষ্মীপূজা হয় তাহার বেদিমূলে ও উঠানের তুলসী-বৃক্ষমূলে অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি মাথা লুটাইয়া প্রণাম করেন। প্রণাম করেন আর প্রার্থনা করেন। কি সে প্রার্থনার মন্ত্র—সে এক জানেন তাঁহার অন্তর্যামী।

সন্ধ্যা দেওয়া শেষ হইলে যোগমায়া দেবী ঠাকুর-ঘরের পেরেকে টাঙানো জপের মালাগাছটি লইয়া শোবার ঘরের বারান্দার সম্মুখে কম্বলের আসনখানি বিছাইয়া বসেন। মেনকা কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার পাশে চক্ষু বুজিয়া ঘড়র ঘড়র করিতে থাকে। উঠানের ওপাশের মেজে হইতে উইচিংড়া ও ঘুরঘুরে পোকার তীব্র আওয়াজ ভাসিয়া আসে, সরিখাস গাছটার ডালে পাখীর ডানা-ঝটপটানির শব্দ বার কয়েক শোনা যায়, প্রাচীরের ও-পিঠে অদূরের জঙ্গল হইতে শিবাপাল সমস্বরে সান্ধ্য প্রহর ঘোষণা করে। ও-বাড়ীর দালানে খেঁদির ভেউ ভেউ ধমকের মতই শোনায়। চারিদিক্ অন্ধকার করিয়া রাত্রি নামিয়া আসে।

* * *

দুপুর বেলায় ও-পাড়ার কমলমণি বেড়াইতে আসিলে তাহাকে দিয়াই যোগমায়া বিমলের চিঠিখানা পড়াইয়া লইলেন। বিমল লিখিয়াছে:

"শত কোটি প্রণামান্তে নিবেদন

মা, আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ-বাড়ীর সমস্ত কুশল জানিবেন। ভাদ্র মাস আসিতেছে। এবার বৃষ্টি কম, ডাক্তারেরা বলিতেছেন, পাড়াগাঁয়ে থাকা মোটেই নিরাপদ নহে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নাকি অত্যন্ত বেশী হইবে। আমাদের সকলেরই একান্ত ইচ্ছা, আপনি বাড়ী বন্ধ করিয়া অন্তত তিন-চারি মাস কলিকাতায় আসিয়া থাকেন। না আসিলে মনঃকষ্ট পাইব। আপনার প্রেরিত গাওয়া ঘি চমৎকার। এমন ঘির কল্পনা শহরে করাও যায় না। বড়ি ও কাঁঠাল-বিচি পাইয়াছি; ছেলেরা কাঁঠাল-বিচি ভাজা অত্যন্ত আহ্লাদ করিয়া খায় আর ঠাকুরমা কবে এখানে আসিবেন জিজ্ঞাসা করে। কবে আসিবেন পত্র পাঠ জানাইবেন।"

চিঠিখানা রাখিয়া কমল বলিল, তা যাও না কাকীমা—দাদা যখন এত ক'রে লিখেছেন। ভাদ্দর মাসে কালী-ঠাকুরও দেখা হবে—নাতিনাতনীও দেখবে। এই নিবন্ধ্যা পুরীতে একলাটি কি ভালই লাগে!

যোগমায়া হাসিলেন, এক বার সেখানে গিয়ে উঠলে কি আর এখানে ফিরে আসতে পারব? আমার শাশুড়ী কি বলতেন জানিস,

আপনার ঘরখানি আঁধারে আলো
ঠুস ক'রে পড়ে মরি সেও যেন ভালো।

ভিটে কি ত্যাগ করতে আছে?

—কিন্তু তাঁরা না এলে একলা বুড়োমানুষ কতকাল ভিটে আগলে থাকবে তুমি?

—আসবে বইকি, মা। পেন্‌সিল হ'লে বাড়ী ঘর-দুয়োরে আসবে না ত থাকবে কোথায়?

—কেন, পেন্‌সন নিয়েও ত কত লোক শহরে বাস করছে।

—পোড়াকপাল তাদের। তারা নিম্মায়া-পিশাচ। তা যাই বল্ কমলি, শহরে যত সুখেই থাক, এমন ফল-পাকুড় দুধ-ঘি আর পেতে হয় না। ঐ ত লিখেছে খোকা।

—ঘরের তৈরী গাওয়া ঘি, হবে না?

যোগমায়া বলিলেন, লোকে বলে, বুড়োমানুষ—থাক

ত একা, কেন গরু পুষে অত হাঙ্গামা। বোঝ দিকি মা, আমি কি দুধ খাবার জন্যে গরু পুষিছি। গরু যে বাড়ীর লক্ষ্মীছিরি। বলে, হ্যাগা, উঠোনে আম-কাঁঠাল গাছ কেন? কেন যে, আম-কাঁঠাল হ'লে বুঝবি। নয় কি না?

কমল জানে, যোগমায়া সংসারের গল্প আরম্ভ করিলে সহজে থামিতে চাহেন না। কাজের ছুতা ধরিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল।

নিস্তারিণী আসিলে যোগমায়া চিঠির কাহিনী তাহাকে শুনাইলেন। ঘি ও কাঁঠাল-বিচি ছেলেদের কেমন লাগিয়াছে সে-কথা অনেকবার আবৃত্তি করিয়া অবশেষে বলিলেন, যাবি নাকি নিস্তার ভাদ্দরকালী দেখতে! যাস ত না-হয় মার নাম ক'রে ছেলেমেয়েগুলোকে এক বার দেখে আসি।

—বেশ ত দিদি, চল না। উৎসাহে নিস্তারিণীর চোখ-মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

—কিন্তু বোন, বিশ্বেশ্বরী আর খেঁদুর একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

—হরির মাকে বল না?

—পোড়াকপাল! পোষকালী দেখতে গিয়ে কি খোয়ার ওদের করেছিল—মনে নেই? আস্ত বিচিলির আঁটি নাদার কাছে ফেলে দিত, গতরখাগীর 'শানি' মাখতে যেন গতরে কুলুত না। এসে দেখি ভাগাড় মূর্ত্তি! খেঁদুকে এক বেলা উপোস দিয়েই রাখত, আর মেনিটাকে এক মুঠোও দিত না। আমি আসতে যত গরুর চোখ দিয়ে জল পড়ে, তত খেঁদু বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে—তত কি মেনি ল্যাজ আপ্‌সে ম্যাও-ম্যাও করে মরে। মাত্তর দুটি দিন, তাতেই ওদের শতেক দশা করে ছেড়েছিল, বোন!

—তবে ভুবনের মাকে বল, বুড়োমানুষ, গরুও আছে ঘরে—বেরালও আছে—যত্নআত্তি করবে।

—তার যে শুনিছি বোন হাতটান আছে।

—জিনিষপত্তর ভাঁড়ারে চাবি বন্ধ ক'রে—দুদিনের খোরাক দিয়ে যেয়ো। এক চুরি করে ত আঁটি কতক বিচিলি—তা সে আর এমন কি?

—সেই ভাল। কাল আবার ভাল ক'রে চার দিক্ দেখতে হবে—কোথায় বট-অশথ ডুমুর গাছ গজিয়েছে—পাঁচিলের মাথায় কি কোঠার গায়ে? বর্ষাকালে অভাব ত নেই শত্তুরের।

—তা বটে! নিস্তারিণী সায় দিলেন।

—সেবার সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পা মচকে পড়ে মরি—মনে আছে তোর? আমিও যাব না ছেলেও ছাড়বে না। ধরাধরি করে নিয়ে তুললে ইষ্টিমারে। তার পর একটি মাস কলকাতায়। পা ভাল ক'রে সারতে-না-সারতে পালিয়ে এলাম। এসে বোন, বাড়ী দেখে আমার যেন কান্না পেল! বর্ষাকাল, এক গলা জঙ্গল উঠোনে, এখানে ওখানে বটগাছ—ডুমুর গাছ গজিয়েছে। খোঁড়া পা নিয়ে সেই সব পরিষ্কার করি। সে আজ ছ'বছরের কথা। রান্নাঘরের ভিতের গোড়ায় সেই যে বটগাছ বেরিয়েছিল—প্রত্যেক বার বর্ষার সময় সাতটা ক'রে ডাল গজায় তাতে! কেটে দিই, আবার গজায়।

—ও শত্তুরের দশাই অমনি। এক বার গজালে আর মরতে চায় না।

—তাহলে বোন, কাল থেকেই ত যাবার উদ্যুগ করতে হয়। গোয়ালাবউকে বলে দিয়ো ত দুগুটি (কাঁচি দু-পোয়া) ভাল ঘি যেন কড়া পাকে উনিয়ে দেয়। ময়রাকে সের দুই কাঁচাগোল্লার কথাও ব'লো। চাটি মুগের ডাল ভেজে নিতে হবে, ও-বাড়ীর ছাইগাদায় একটা ওল হয়েছে ভাবছি তুলব, যে দেবতার গতিক—এক কাঠা (আড়াই সের) ডালের বড়ি কি শুকিয়ে উঠবে?

—শুধু এই নেবে?

—আর গুচ্ছেক নিয়ে সাতটা পুঁটুলি ভারী। মুটের ভাড়া দিতে দিতে নাজেহাল। ও-বাড়ীতে কুমড়ো-ডাঁটা, পুঁই-ডাঁটা হয়েছে ডালকতক নেব, একমুঠো কাঁচা লঙ্কা, একটা গভ্‌ব-মোচা, নেবু এক পেতেটাক আর ছাঁচিকুমড়োর গাছে কটা জালি পড়েছে—দেখি যদি দু-চার দিনের মধ্যে বাড়ে। আর কি-ই বা আছে এই বর্ষাকালে!

—কেন মিষ্টি ডাঁটা?

—তা হ'লে বড্ড ভারী হবে না? তা ডাঁটা না

হয় থাক, গোটাকতক কাঁচা বেল নেব। মোরব্বা ক'রে খাবে ছেলেরা, কি বলিস ?

—সেই ভাল।

* * *

ফিরিবার পথে ট্রেনের কামরায় কথা হইতেছিল—শুনলি ত নিস্তার ছেলে বউয়ের কথা। বলে, কাছে এমন আদিগঙ্গা—রোজ চান ক'রবে, মা কালীকে পিত্যহ দেখবে—শুনলি ত ?

নিস্তারিণী বিষণ্ণ মুখে বলিলেন, আমার যদি অমন সোনা ছেলে-বউ হ'ত, ত কোন্‌কালে দেশ ফেলে ওদের কাছে গিয়ে থাকতাম।

যোগমায়া দেবী সবিস্ময়ে বলিলেন, বলিস কি নিস্তার ? দেশের ঘরবাড়ী সব যে মাটিয়ে যেত !

—গেলই বা। যাদের জন্যে ঘর-দুয়োর, দরদ থাকে তারাই দেখবে, আমি মরি কেন হাকুলিবিকুলি ক'রে।

নিশ্বাস ফেলিয়া যোগমায়া দেবী বলিলেন, নিজের পয়সা আর গতর দিয়ে যদি তৈরী হয়, নিস্তার, ত অমন কথা মুখ দিয়ে বার করতে হয় না। ও যে ছেলে মানুষ করারও বাড়া !

—তা যাই বল দিদি, তোমার বয়স বাড়ছে, মিত্যুর কথা কিছুই বলা যায় না—তোমার উচিত ওদের কাছে থেকে ছেলে-বোয়ের সেবাযত্ন ভোগ করা।

যোগমায়া দেবী সে-কথায় কান না দিয়া বলিলেন, ভুবনের মা লোক ভাল, কি বলিস ? গিয়ে বাড়ীঘর দুয়োরের অযত্ন কিছু দেখব না, কেমন ?

নিস্তারিণী প্রবোধ দিয়া বলিলেন, দুটো দিনে আর কি অযত্ন হবে, দিদি, ভালই দেখবে।

যোগমায়া সহসা বলিলেন, আচ্ছা নিস্তার, বাড়ীর ওপর ওদের টান কি রকম বুঝলি ?

পাছে নিস্তারিণী অন্যরূপ উত্তর দেন, সেই জন্য তাড়াতাড়ি বলিলেন, টান না থাকলে আদ্দিন কোন্‌কালে শহরে কোঠাঘর তুলত, কি বলিস ? মুখে কিছু বললে না বটে, জানি ত খোকাকে। কলেজের ছুটিতে যখন বাড়ী আসত, কলকাতায় যেতে ওর মন যেন আর চাইত না। তার পর সেবার ছেলেমেয়েগুলো বাড়ী এসে কি আহ্লাদ। আমগাছে চড়ে, কুমড়োর ডগা ছেঁড়ে, লাঠির খোঁচা দিয়ে এঁচোড় পাড়ে ; কি হুড়োহুড়ি বোন ! আমার বাড়ীর আধখানা মাটি যেন চষে ফেলল। চলে গেলে ছোট কর্ণিক দিয়ে চুণবালিখসা সারাতে পারি নি বোন, মিস্ত্রি ডাকতে হ'য়েছিল। বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

নিস্তারিণী হাসিয়া বলিলেন, তোমার দেয়ালের চুণ-বালি খসলে কাউকে ত রক্ষে রাখ না, দিদি !

—তাই বলে ওদের বকব ? ওরা ক্ষেতি অপ্‌চো কিছু বোঝে ? যখন বুঝবে—আপনিই সারাবে। বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

ট্রেন চলিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে চলিল যোগমায়ার অনর্গল গল্প, সংসারকে কেন্দ্র করিয়া যে-গল্পের আরম্ভেরও ইতিহাস থাকে না, সমাপ্তিরও ব্যাকুলতা জাগে না।

* * *

একটি বৎসর পরে কালীঘাট হইতে আর একখানি পত্র আসিল। বোসেদের সেজ মেয়ে ইলা আট বৎসর পরে বাপের বাড়ী আসিয়া যোগমায়াকে প্রণাম করিতে আসিয়াছে। স্বামীসৌভাগ্যবতী মেয়ে। পুত্রকন্যা এবং ধনজনে সমৃদ্ধ সংসার বলিয়া বহুকাল বাপের বাড়ীতে আসা হয় নাই। সম্প্রতি পিতৃহারা সর্ব্বকনিষ্ঠ ভাইটির বিবাহোপলক্ষ্যে মায়ের অনুরোধ ঠেলিতে না পারিয়া আসিয়াছে।

সে-ই চিঠিখানা পড়িতেছিল। যোগমায়া বারান্দার থাম ঠেস দিয়া উৎকর্ণ হইয়া বসিয়াছিলেন, উঠানে এক মুঠা রাঙানটে মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া নিস্তারিণীও—খোলায় তেল চাপাইয়া আসা সত্ত্বেও—চিঠির পাঠ শুনিতেছিলেন। যথারীতি প্রণাম নিবেদন ও কুশল প্রশ্নের পর বিমল লিখিয়াছে :

আপনার শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে গত মে মাস হইতে আমি চাকুরি হইতে অবসর লইয়াছি। এখনও ছুটি চলিতেছে—চার মাস পরে পুরা অবসর লইব। আপনি শুনিয়া হয়তো সুখী হইবেন যে, ইতিপূর্ব্বে লেক রোডে যে জমির টুকরা সুবিধামত কিনিয়াছিলাম, তাহাতে ইমারত তুলিবার মনস্থ করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। চার মাস ছুটির মধ্যে বাড়ী সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে। গৃহপ্রবেশের দিন সর্ব্বপ্রথম সেই বাড়ীতে

আপনার পায়ের ধুলা পড়িবে—এই আশায় মন আমার উৎফুল্ল হইয়া উঠে।…আপনি হয়ত বলিবেন, দেশে বাড়ী থাকিতে আবার বাড়ী করিতেছ কেন? করিতেছি কারণ, একখানা বাড়ী থাকিলে কি আর একখানা বাড়ী করিতে নাই! বিশেষত কলিকাতায় বাড়ী করা যখন লাভজনক। পেন্সন লইলে আয় কমিবে, ও-বাড়ী ভাড়া দিয়া কিছু আয়ও ত দাঁড়াইতে পারে! তা ছাড়া, এখন দেশের বাড়ীতে গেলে আপনার নাতিনাতিনী-দের উচ্চশিক্ষার অনেক ক্ষতি হইতে পারে। এই বাড়ীতে থাকিয়া উহারা লেখাপড়া করিতে পারিবে। সব দিক বিবেচনা করিয়া বাড়ী তৈয়ারী করাই স্থির করিয়াছি।

ইলা হাসিমুখে বলিল, হ'ল দিদিমা? ক'লকাতায় বাড়ী না হ'লে মানায়। আমাকে সন্দেশ খাওয়াবেন কিন্তু।

রাঙানটে হাতে চাপিয়া নিস্তারিণীও হাসিলেন, ভগমান ভালই করুন, দিদি। যেমন তোমার মন তেমনি বিমলের লক্ষ্মীছিরি উথলে উঠুক।

যোগমায়া দেবী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, তাই বল, বোন, তোমাদের আশীর্ব্বাদে বাছার আমার—ঝর ঝর করিয়া তাঁহার দু-চোখ বহিয়া অনেকগুলি অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে গোয়ালে সাঁজাল দিতে গিয়া যোগমায়া দেবী বিশেশ্বরীর পিঠে হাত বুলাইয়া খানিক কাঁদিলেন; তুলসীতলায় ও লক্ষ্মীবেদীতলে সান্ধ্যপ্রণাম সারিতে গিয়া ঐ অবাধ্য অশ্রুই প্রতিদিনকার প্রার্থনার মন্ত্র সব একাকার করিয়া দিল; রাত্রিতে মেনিকে কোলের কাছে চাপিয়া ধরিয়া খেলনা-হারা নয় বৎসরের বালিকার মতই ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং সারারাত্রি না ঘুমাইয়া এ-বাড়ীর প্রথম রূপ হইতে বর্ত্তমান রূপ, কর্ত্তাদের আমলের ঘটনাবলী ও সে-কালের কত কথাই না স্মরণ করিতে লাগিলেন।

নিত্যপ্রথামত পরদিন দ্বিপ্রহরে নিস্তারিণী বেড়াইতে আসিয়া যোগমায়ার পানে চাহিয়া অবাক হইয়া বলিলেন, দিদি, তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে?

—একটু কেমন বে-ভাব হয়েছে, বোন।

—তা বিমলকে একখানা চিঠি লিখে দাও না হয়।

—আজ খোকাকে চিঠি লিখে দিলাম।

—সেখানে কবে যাবে? সাগ্রহে নিস্তারিণী প্রশ্ন করিলেন।

—সেখানে? ম্লান হাসিয়া যোগমায়া বলিলেন, তুই তো এক দিন বলেছিলি, কাশী যাবি। যাবি আমার সঙ্গে?

—তুমি যাবে নাকি? নিস্তারিণী আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন।

—যাব। দেখে আয় দিকি—ওই ঘরে—আর কি কি নিতে হবে। বলিয়া সামনের ঘরটায় অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিস্তারিণী বলিলেন, কিছুই ত বিশেষ নাও নি। একটা মাত্র পুঁটুলি আর খানকতক কাপড় চাদর।

—ওতেই হবে। আর সব পয়সা দিয়ে কিনে নিতে কতক্ষণ। ওতেই হবে—কি বলিস? বলিয়া হাসিলেন।

সে-হাসি নিস্তারিণীর মনঃপূত হইল না। নিরুৎসাহ কণ্ঠে বলিলেন, তা এত তাড়াতাড়ি কেন? ছেলের গৃহপ্রবেশ দেখে যাবে না, আশীর্ব্বাদ করবে না?

—তাদের ত দিনরাতই আশীর্ব্বাদ করছি, বোন। গৃহপ্রবেশ দেখা কি এমন বড় কথা! এ ত প্রথম গৃহ-প্রবেশ নয়।

—তা হোক, না হ'লে সে দুঃখু করবে।

যোগমায়া বলিলেন, না, সে আমার তেমন অবুঝ ছেলে নয়। যাস ত বল্? কাল ভাল দিন আছে। গঙ্গাচ্ছান ক'রে দুর্গা দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়ি দুই বুনে।

—কাল! খানিক কি ভাবিয়া নিস্তারিণী নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই যেন বলিলেন, আচ্ছা কালই তবে। যাই বাড়ী গিয়ে গোছগাছ করি। বলিয়া নিস্তারিণী উঠিলেন।

কথাটা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল। বহুলোক যোগমায়াকে শেষ বারের জন্য দেখিতে আসিল। তাহারা বুঝিল, এতদিনে বিষয়মোহমুগ্ধা বৃদ্ধার অন্তরে ধর্ম্মের আলোকপাত হইয়াছে।

* * *

বাস্তভিটায় নিস্তারিণীর আজ শেষ রাত্রিযাপন। কি জানি কেন, সন্ধ্যা হইতেই আকাশে মেঘ জমিয়াছিল, রাত্রিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। গাছের ডালে ঝড়ের দোলা লাগিয়া জল ঝরার শব্দে সারারাত্রি যেন কাহাদের সশব্দ নিশ্বাসপতনের কথা মনে করাইয়া দিল। কুকুরটা দালানের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিবার সঙ্গে সঙ্গে এক-এক বার কেমন যেন বুকফাটা শব্দে গোঙাইয়া উঠিতে লাগিল; গোয়ালের ভিতর হইতে গরুটাও মাঝে মাঝে হাম্বাধ্বনি দ্বারা আসন্ন বিয়োগ-ব্যথার সূচনা করিতেছে; কোলের কাছে ঘড়র ঘড়র শব্দে মেনি কেবল নিশ্চিন্তমনে অঘোরে ঘুমাইতেছে। কিন্তু এ-সব ত বাহিরের শব্দ; যোগমায়ার অন্তরের বহুবর্ষের মরিচা-ধরা তালাটি এই বহিঃপ্রলয়ের সুযোগে সহসা খুলিয়া গিয়াছে। সেখানে বালিকা বধূ যোগমায়া পটপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বল্পবাক্ লাজনম্রা কিশোরীতে, প্রেমময়ী যৌবনচটুলা বাঙ্ময়ী বধূতে, প্রশান্ত অপরাহ্ণে প্রীতিময়ী প্রৌঢ়া গৃহিণীতে এবং এই নিশীথরাত্রির শ্রান্তকায়া, বার্দ্ধক্য ও স্নেহভারনিপীড়িতা জননীতে ক্রমাগত রূপান্তরিতা হইতেছেন। সংসারের কত ঢেউ তাঁহার মনের প্রান্তে আছড়াইয়া পড়িয়াছে; কত সংঘাত দেহের দৃঢ়তাকে শিথিল করিয়া আনিয়াছে; কত বেদনা শিরা ও বলিরেখাকে সুপ্রকটিত করিয়া তুলিয়াছে। অসংখ্য ঢেউ, দুর্জ্জয় তার আঘাত; তট ভাঙিবার, তট গড়িবার কি বিপুল তার প্রতি মুহূর্ত্তের প্রয়াস। তবু মানুষ বাঁচিয়া থাকে, যোগমায়াও বাঁচিয়া আছেন।

শেষরাত্রিতে যোগমায়া দেবী ঘুমাইয়া পড়িলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, সকাল হইয়াছে। বিমলের আর একখানি পত্র আসিয়াছে। কমল পড়িতেছে,

"ছেলেদের লেখাপড়া শেষ হইয়াছে। এবার মনে করিতেছি, কলিকাতার বাড়ীটা ভাড়া দিয়া আপনার শ্রীচরণের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিব।"

সবটা পড়া হইল না, ঘুম ভাঙিয়া গেল। সারা রাত্রি ঝড়বৃষ্টির পর কত যুগের পুরাতন সূর্য্য যেন নবকলেবরে দেখা দিয়াছেন। সেই কোমল নবরৌদ্রপাতে বাড়ীটা যেন স্বপ্নে-দেখা প্রিয়ভূমির ঐশ্বর্য্য লইয়া ঝলমল করিতেছে।

* * *

একটু বেলা হইলে নিস্তারিণী পিতলের ঘড়াটি কাঁকে করিয়া দেখা দিলেন, কই গো দিদি, হ'ল তোমার?

যোগমায়া রন্ধনগৃহের ভিতের কাছে শাবল দিয়া কি যেন খুঁড়িতেছেন দেখা গেল।

নিস্তারিণী আগাইয়া আসিলেন, ও কি হচ্ছে, দিদি?

যোগমায়া দেবী নিস্তারিণীর পানে চাহিয়া হাসিমুখে বলিলেন, সেই বটগাছটা, বোন। কাল রাত্তিরে বাদলা নেমেছে, আবার হয়ত সাত-শ'টা ডালপালা বার ক'রে ভিত জখম করবে। বুড়োবয়সে কি কম অধম্মের ভোগ আমার! আজ আর গঙ্গাচ্চান হবে না, বোন, তুমি যাও। গাছ তুলতে, কুকুর নাওয়াতে, বন পরিষ্কার করতে সেই যার বেলা তিনপ'র। আর-এক দিন বরং যোগ-টোগ দেখে...। বলিয়া দেহের সবটুকু বল সঞ্চয় করিয়া ভিতের গায়ে শাবলের আঘাত করিতে লাগিলেন। সে আঘাতে দক্ষিণ বাহুমূলের লোল চর্ম্ম বাতাস-লাগা ভারি পর্দ্দাটার মতই এধার ওধার দুলিতে লাগিল।

প্রত্যূষা

শ্রীগৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়

যাত্রী, নোঙর তোলো।
রাত্রির ঘুম যে ভাঙে, যাত্রী—
তুমি কি এখনো রইবে অচেতন ?
জাগো, যাত্রী জাগো।

অনেক দিনের-পথ-চাওয়া পথের প্রান্ত এসেছে, যাত্রী।
পিছনেতে ফেলে এসো গুণটানার দিন, ক্লান্ত দিন
ফেলে এসো।
দীর্ণ মাস্তুলে তোলো জীর্ণ গেরুয়া পাল।
ঘুমন্ত হাওয়ারা যে জাগে,
উড়ে যায় ঝাঁকে ঝাঁকে—
কোন্ ঊর্ধ্ব থেকে ওরা দেখেছে সংকেত
সাগর-সংগমে প্রথম-উদয়-অরুণিমা।
ওদের সঙ্গ নাও।
দূরের সাগর আজ কাছে এল, যাত্রী :
শোনো তার গুরু গুরু গরজন,
অধীর নদীতে শোনো শেষ রাত্রের ভাটার ভাটিয়ালি।
জাগো, যাত্রী, জাগো—
সুর মেলাও,
সেই অকূলে জমাও তোমারো শেষ পাড়ি।
যাত্রী, নোঙর তোলো।

চরের মায়ায় আর ঘুমিয়ো না, যাত্রী।
ডাঙায় এই তো শেষের রাত্রি তোমার।
দম্‌কা হাওয়ায় নিবেছে ডাঙার প্রদীপ—
কেই বা সেখানে যাপ্‌ল জাগর রাত,
তোমার তরে কেই বা ঝাঁপ্‌ল দীপশিখা
কম্পমান নীলাম্বরীর আঁচলে
প্রতীক্ষার নিভৃত বাতায়নে ?
তবে কেন পিছনেতে চাও, যাত্রী ?—
নদীর বাঁকে বাঁকে নব নব বিস্ময়—
ভালো লেগেছে, ভালোবেসেছ—
সেই তো ভালো।
সেই-সেই বাঁকে ওদের পাঠিয়ে দাও, যাত্রী,
পাঠিয়ে দাও উড্ডীন স্বপনরঞ্জন পাখায়—
ফিরিয়ে দাও।
ঘর-বাঁধা তোমার হ'ল না, যাত্রী,
পথে পথেই কাট্‌ল দিন—
জনবিহীন বালুচরে,
বিবাগী বটচ্ছায়ায়,
নামহারা বন্দরে বন্দরে।
সেই তো ভালো, যাত্রী, এই তো ভালো।
যাত্রী, নোঙর তোলো।

চরাচর এখনো জাগে নি, যাত্রী—
কুয়াশার দল সারি সারি ঘুমন্ত
প্রান্তরের পারে প্রান্তরে।
রঙের মশাল জ্বলে নি পূবের আকাশে
পাখীদের সাড়া নেই।
আকাশে শেষ তারাটি কাঁপ্‌ছে,
ঝাপ্‌সা স্রোতে কাঁপ্‌ছে মাস্তুলের মায়া—
চাঁদ নিবে এল।
আর দেরী নয়, যাত্রী।
যাত্রী, নোঙর তোলো॥

লোহিত সাগর-তীরে

শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক

ইতিহাসের অস্পষ্ট অতীত যুগে লোহিত সাগর মানব-সভ্যতা বিস্তারের পথ সুগম ক'রে দিয়েছিল। প্রাচীন কালে এশিয়ার ভাবধারা এবং সংস্কৃতি লোহিত সাগরের জলপথ অতিক্রম ক'রে আফ্রিকায় প্রবেশলাভ করেছিল। মিশরের সভ্যতা এবং বাণিজ্য লোহিত সাগরের তীর ঘেঁসে এশিয়ার এবং আফ্রিকার বিভিন্ন জনপদে ছড়িয়ে পড়েছিল। ক্রমে ক্রমে খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং ইসলামের জয়যাত্রা এই লোহিত সাগরের বক্ষেই ভেসে বেড়িয়েছিল নূতন নূতন দিগ্বিজয়ের অভিযানে। লোহিত সাগরের উভয় উপকূলে মরুভূমির তপ্ত হাওয়ায় আর রুক্ষ আবেষ্টনের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম্মমতের সংঘর্ষও কম হয় নি। এই সাগরটির উপকূলবাসী বিভিন্ন জাতি এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের করুণ কাহিনী আলোচনা করলেই বোঝা যাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতি কোথাও কোথাও এগিয়ে গিয়েছিল কি কারণে, আর অন্যত্র পিছিয়ে পড়েছিলই বা কেন। প্রকৃতি সেখানে নিষ্ঠুর, মানুষকে সাধারণ জীবনযাত্রার জন্য যেখানে কঠিনতম পরিশ্রম করতে হয়, শান্তিনিষ্ঠ সুশৃঙ্খল উন্নতির ধর্ম্ম সেখানে প্রবল হ'তে পারে না। বরঞ্চ প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় যে প্রকৃতির কার্পণ্যকে মানুষ আরও বীভৎস ক'রে তোলে তার নৈতিক আচরণের উচ্ছৃঙ্খলতা দিয়ে, সকল রকমের উন্নত সামাজিক ব্যবস্থাকে অস্বীকার ক'রে। তাই সাহারার প্রান্ত দেশে কিংবা আরবের মরুভূমির আশেপাশে যেসব মানবসম্প্রদায়গুলি বসবাস ক'রে আসছে তাদের জীবনযাত্রায় এই প্রাকৃতিক কার্পণ্য এবং নিষ্ঠুরতার ছায়া অতিমাত্রায় প্রতিভাত হয়েছে। এই সম্প্রদায়গুলির বীরত্বের মধ্যে সাহস আছে কিন্তু করুণা নেই, তাদের ভোগের আকাঙ্ক্ষায় লালসা আছে কিন্তু সুরুচি কিংবা তৃপ্তির আনন্দ নেই, তাদের সমাজ-ব্যবস্থায় শাসন আছে কিন্তু স্বাধীনতা নেই। ধর্ম্মবিশ্বাস তাদের করেছে অসহিষ্ণু, বাণিজ্যের সম্ভাবনা তাদের করেছে লোভী, দৈহিক শক্তি তাদের করেছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি উদাসীন। আফ্রিকার কোনও কোনও অনুর্ব্বর প্রদেশে তাই আজও দেখতে পাওয়া যায় আদিম মানবের প্রতিনিধিগণ সভ্যজগতকে উপেক্ষা ক'রে তাদের জীবনযাত্রা অতিবাহিত করছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশে প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক আবেষ্টনের প্রভাব সব চেয়ে বেশী।

মধ্যযুগে লোহিত সাগরের প্রাধান্য বেড়ে উঠেছিল ইসলামধর্ম্ম-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে। মুসলমানদের পরমতীর্থ মক্কা-মদিনা যাত্রার অন্যতম উপায় ছিল লোহিত সাগরের সুগম এবং নিরাপদ জলপথে। আফ্রিকা ও আরবের মুসলমান-রাজ্যগুলির মধ্যে বাণিজ্যও চলত এই সাগরটিকে কেন্দ্র ক'রে। এই যুগে মোসলেম-সংস্কৃতিই লোহিত সাগরের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছিল। কিন্তু ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে যখন সুয়েজের খাল কাটা হ'ল তখন ভূমধ্য-সাগরের বিস্তৃত এবং বহুমুখী প্রভাব দেখা দিল লোহিত সাগরের আনাচে-কানাচে। সুয়েজ খাল কাটার অনেক আগে থেকেই কয়েকটি বিশিষ্ট ইউরোপীয় শক্তির সাম্রাজ্য এবং উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন উপকূলে এবং দ্বীপপুঞ্জে। ইউরোপের সঙ্গে এশিয়ার এই নূতন জলপথ আন্তর্জ্জাতিক বিনিময়ে একটি নূতন যুগের সূচনা করল। লোহিত সাগরের বুকের ওপর দিয়ে ভেসে এল বিভিন্ন মহাদেশের বিপুল বাণিজ্য-সম্ভার, প্রচুর ভাবধারা আর ঔপনিবেশিক অভিযান; ঘটল সাদা-কালোর, রাজা-প্রজার মধ্যে নিকটতর পরিচয়। মরুভূমির শুষ্ক হাওয়া কিন্তু বণিক এবং শাসক সম্প্রদায়কে খুব মোলায়েম অভ্যর্থনা জানাল না। তাছাড়া লোহিত সাগরের জলপথের উপরে আধিপত্য বিস্তার করার জন্য একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি তাদের নিপুণ কূটনীতির জাল

মাসোয়া বন্দর
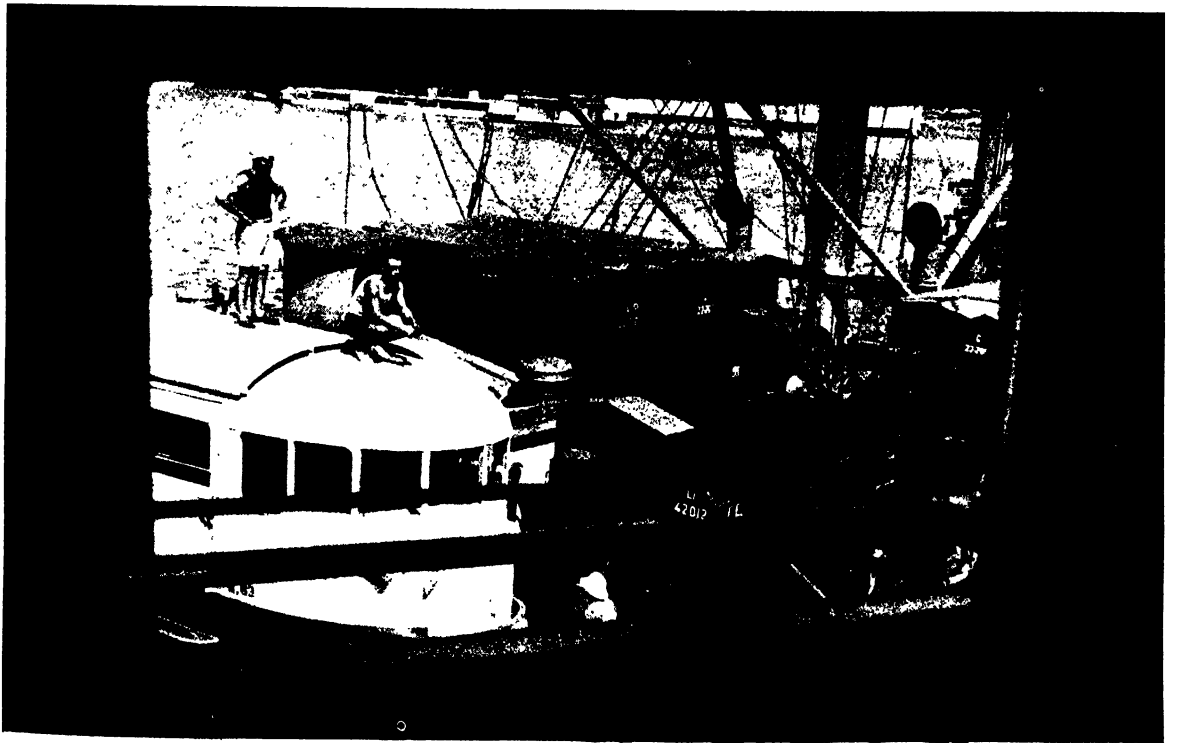
মাসোয়া বন্দরে ইতালীয় জাহাজ থেকে মাল নামান হচ্ছে

এরিত্রিয়ার কৃষিকার্য্যে আজকাল বিরাট মোটর-ট্রাক্‌টারের ব্যবহার হচ্ছে
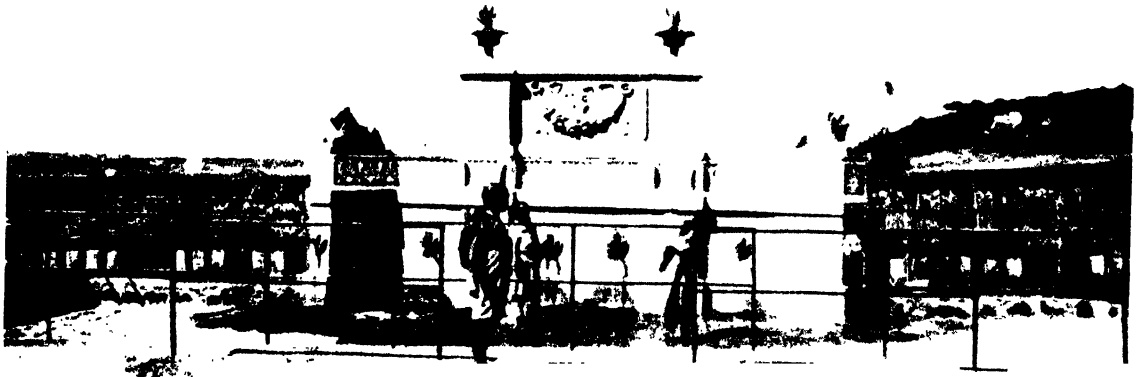
আদি উগ্রী শহরে জনসাধারণের পানীয় জলের আধুনিক কূপ

আসমারাতে খ্রীষ্টিয়ান বাসিন্দাদের গীর্জ্জা

ছড়াতে লাগল। ইংরেজ ও ফরাসী সুয়েজ খালের আধিপত্য গ্রহণ করল, লোহিত সাগর থেকে ভারত মহাসাগরের প্রবেশপথে ইংরেজ এডেন বন্দর অধিকার করল। আর লোহিত সাগরের পশ্চিম-উপকূলে ইতালীর উপনিবেশ বসল এরিত্রিয়ায়, মাসোয়া বন্দরে। পূর্ব্ব-আফ্রিকায় সোমালীদের দেশে পাশাপাশি ইংরেজ, ফরাসী ও ইতালীয়দের উপনিবেশ স্থাপিত হ'ল। আফ্রিকার বাসিন্দাদিগকে সভ্য করবার চেষ্টা চলতে লাগল, আর অন্য দিকে লোহিত সাগরের পূর্ব্ব-উপকূলে মুসলমান-রাজ্যগুলির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠল সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় শক্তিগুলি। লোহিত সাগরের আধুনিক ইতিহাস এই ধরণের কতকগুলি রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এবং ঔপনিবেশিক পদ্ধতিকে কেন্দ্র ক'রেই এগিয়ে চলেছে।

আস্মারা, পুলিস-আপিস

সাম্রাজ্য-বিস্তারের একটা প্রধান কায়দা এই যে কোথাও একটি ক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করার পরে তাকে রক্ষা করার জন্য অন্যান্য রাজ্য কিংবা প্রদেশ জয় করার প্রয়োজন দেখা দেয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিটি কোথাও একটু জায়গা দখল ক'রে নেবার পরে তার আত্মরক্ষার প্রশ্ন দেখা দেয়। অতঃপর সীমানা নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, এবং ক্রমশঃ তাহা যুদ্ধে পরিণত হয়। সাম্রাজ্য-বিস্তারের ইতিহাসে এই পদ্ধতিটি বিশেষভাবে কার্য্যকরী হয়েছে। ইতালীর ইথিওপিয়া জয়ের পশ্চাতেও রয়েছে এমনই একটি আত্মরক্ষার কাহিনী। পঞ্চাশ বছরেরও অধিক কাল আগে ইতালী লোহিত সাগরের পশ্চিম উপকূলে পূর্ব্ব-আফ্রিকার এরিত্রিয়ায় একটি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, কিন্তু কোন প্রকারেই তার বিস্তার লাভ ঘটে নি। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্চেসকো ক্রিস্‌পির আমলে যখন ইতালীয় সেনা ইথিওপিয়ার সীমানা আক্রমণ করে তখনও আত্মরক্ষাই এই যুদ্ধের কারণ বলে ঘোষিত হয়। কিন্তু সেদিন আদুয়ার মরুপ্রান্তরে ইতালীয় বাহিনী ইথিওপিয়ার প্রতি-আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে এবং অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আফ্রিকার একটি কালো জাতির হাতে এই পরাজয়ের এবং অপমানের স্মৃতি ইতালীর সাম্রাজ্যবাদী অন্তরে প্রতিহিংসার বহ্নি প্রজ্জলিত ক'রে রাখে। চল্লিশ বছর পরে ইতালী আদুয়ার প্রতিশোধ নেয় এবং ইথিওপিয়াকে শাসন করে। এই চল্লিশ বছর ধরে প্রতিনিয়ত এরিত্রিয়ার আর ইথিওপিয়ার সীমান্তে বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই ছিল। ইথিওপিয়ার প্রজারা যখন-তখন ইতালীয় উপনিবেশে গিয়ে লুটতরাজ করত, সরকারী কর্ম্মচারীদের উপর অত্যাচার ক'রে নাকি তাদের ব্যতিব্যস্ত ক'রে রাখত। তার পর উয়াল-উয়াকে যে দুর্ঘটনা হয়, তাকে উপলক্ষ ক'রে শক্তি-পরীক্ষার আয়োজন সম্পূর্ণ হ'ল। যে-যুদ্ধ অন্ততঃ ছ-বছর ধরে চলবার কথা ছিল তা আট মাসেই শেষ হয়ে গেল। লোহিত সাগরের তীরে এই ক্ষুদ্র অভিযানটিকে কেন্দ্র ক'রে ইউরোপের রাজনীতিতে যে বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হ'ল তার কুফল আজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংস-লীলার মধ্যে।

ইতালী চেয়েছিল ইথিওপিয়ার সঙ্গে এরিত্রিয়ার সীমানাটাকে পাকাপাকি ভাবে কায়েম ক'রে নিতে, আর এরিত্রিয়া এবং সোমালীল্যাণ্ডের মধ্যে যাতায়াতের উপযোগী কোন ভূমিখণ্ডকে দখল করতে; কারণ এরিত্রিয়া
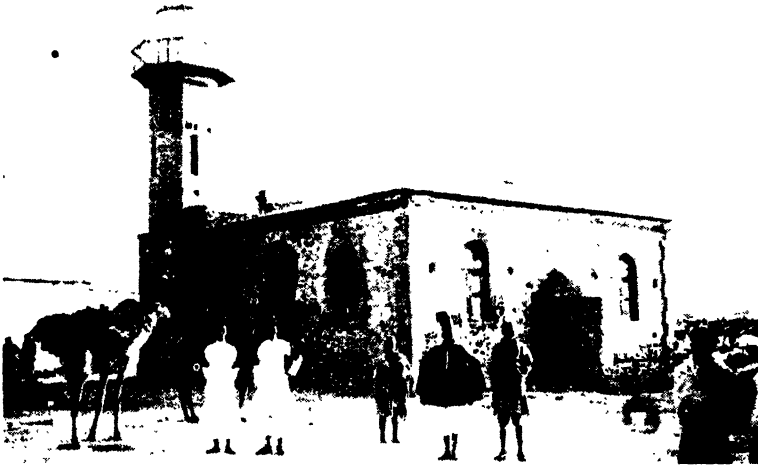
আদ্দি-কাদের মসজিদ

উপনিবেশটি না ছিল স্বাবলম্বী না সমৃদ্ধিশালী। এর লোকসংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষের কাছাকাছি, অর্থাৎ বাংলা দেশের কোন একটি বড় জেলার সমান। এর উত্তরে মিশর, পূর্ব্বে লোহিত সাগর, দক্ষিণে দানকালিয়া এবং পশ্চিমে ইথিওপিয়া। বাসিন্দাদের মধ্যে হাবশী, তিগ্রে, বেল্‌জা ইত্যাদি সম্প্রদায়ই প্রধান। লোকসংখ্যার প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী; অবশিষ্টদের মধ্যে খ্রীষ্টিয়ান এবং ইহুদীর সংখ্যাই বেশী। খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে আবার ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান্ট, সনাতনী এবং কপ্ত, এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নরনারী দেখতে পাওয়া যায়। ইথিওপিয়ার যুদ্ধের পরে অবশ্য এরিত্রিয়া ইতালীর পূর্ব্ব-আফ্রিকার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়ে পড়েছে, কিন্তু তার আগে এখানে লোকসংখ্যার প্রয়োজনের উপযোগী পরিমাণের কোন শস্য উৎপন্ন হত না। এরিত্রিয়ায় সাধারণতঃ দু-রকমের আবহাওয়া দেখতে পাওয়া যায়; সমুদ্রোপকূলে সমতল ভূমিতে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম এবং পার্ব্বত্য অঞ্চলে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের আবহাওয়া। কৃষি সাধারণতঃ পার্ব্বত্য অঞ্চলেই হয়ে থাকে, আর সমতল প্রদেশে শিল্প-বাণিজ্যের রেওয়াজই বেশী। এরিত্রিয়ার প্রধান শহর আস্‌মারা পার্ব্বত্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর প্রধান বন্দর মাসোয়া সমতলভূমিতে। এখানে কিছু কিছু সোনার এবং লোহার খনি আছে, আর নির্ম্মাণ-শিল্পের উপযোগী মালমসলা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এ থেকেই বুঝতে পারা যাবে যে এরিত্রিয়া ইতালীর পক্ষে লাভজনক ত ছিলই না, বরং এই কলোনীটিকে স্বাবলম্বী করার জন্য এখানকার কৃষিকার্য্যে এবং শিল্প-বাণিজ্যে প্রচুর পরিমাণে ইতালীর পুঁজি খাটাতে হয়েছে। তুলার চাষ, লবণের কারখানা, মাছ-মাংসের রপ্তানি-বাণিজ্য ইত্যাদি গ'ড়ে উঠেছে ইতালীয় শাসকদের উদ্যোগে। এখানকার গৃহপালিত পশুর সংখ্যা এবং তার আর্থিক সম্ভাবনা প্রচুর। তাই এই শিল্পটির উন্নতিকল্পে এরিত্রিয়ার অধিবাসীদের যত্নবান হতে হয়েছে। কিন্তু মোটের উপর এরিত্রিয়া কলোনীটির দুরবস্থা কিছুতেই বিদূরিত হয় নি। মার্শ্যাল বাদয়লিও (Badoglio) তাঁর *The War in Abyssinia* (London, 1937) গ্রন্থে লিখেছেন:

"The Colony of Eritrea, small and poor, with scanty resources and limited possibilities, had led a wretched, poverty-stricken existence, even in the military sense, since 1896." (Page 4).

এরিত্রিয়ার জীবনে একটি নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হ'ল ১৯৩৫ সালে, ইথিওপিয়ার যুদ্ধের আয়োজন যখন সুরু হ'ল। সুয়েজ খাল অতিক্রম ক'রে ভেসে আসতে লাগল ইতালীয় সৈন্য, গোলাবারুদ, যুদ্ধের নানারূপ সাজসরঞ্জাম, এবং প্রচুর খাদ্যসামগ্রী ও নির্ম্মাণকার্য্যের উপযোগী মালমসলা। মাসোয়ার বন্দর একটি নূতন প্রাণের স্পন্দনে উল্লসিত হয়ে উঠল। এক দিকে বসল ইতালীয় নৌ-বহরের ঘাঁটি, অন্য দিকে তৈরী হল আধুনিক কায়দার অসংখ্য গুদামঘর। অত্যধিক গরমে খাদ্যসামগ্রী কিংবা অন্যান্য কাঁচা মাল নষ্ট না হ'তে পারে সেজন্য তাপ-নিয়ন্ত্রিত গুদাম-ঘরও কায়েম হ'ল। ইথিওপিয়ার যুদ্ধের সময়ে মাসোয়া বন্দরের আমদানি-বাণিজ্য কতটা বেড়ে গিয়েছিল নিম্নলিখিত

তালিকা থেকে তার খানিকটা আন্দাজ করা যাবে :—

	আমদানি (টন)	রপ্তানি (টন)
১৯৩৪	৯৫,১৪৭	১৭৬,৯৮৯
১৯৩৫	৯৪৪,১০৩	১৩৭,৮২৫
১৯৩৬	১,১৫৫,৭৩৩	১৯২,৫২০

এরিত্রিয়ার রাস্তাঘাট ছিল অত্যন্ত অপ্রশস্ত, এবং আধুনিক যুদ্ধের পক্ষে অনুপযুক্ত। ইতালীয় মজুর এবং সৈনিকেরা লেগে গেল রাস্তা তৈরী করার কাজে, এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে এরিত্রিয়ার প্রধান প্রধান শহর বন্দরের মধ্যে যাতায়াতের উপযোগী সুন্দর প্রশস্ত রাস্তা তৈরী হ'ল। এই রাস্তাগুলি ধরেই ইতালীয় সমরবাহিনী ইথিওপিয়ার রণপ্রাঙ্গণে ক্ষিপ্রগতিতে প্রবেশ করেছিল। আজও এরিত্রিয়া আর ইথিওপিয়ার মধ্যে রেলপথের যোগাযোগ স্থাপিত হয় নি; কাজেই আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে এই জনপদটির সংস্পর্শ কায়েম হয়েছে এই নূতন রাস্তাগুলির সূত্রে। কোথাও দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে, কোথাও জনমানবহীন লোকালয়হীন অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে, কোথাও মরুভূমির শুষ্ক প্রান্তরে এই রাস্তাগুলি আঁকা-বাঁকা ভাবে চলেছে পূর্ব্ব-আফ্রিকার অজ্ঞাত এবং ভয়সঙ্কুল জনপদে। কোথাও কোথাও এই রাস্তাগুলিকে আমাদের রাঁচি এবং হাজারীবাগ অঞ্চলের রাস্তাগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়। আধুনিক স্থলযুদ্ধের কর্ম্মকৌশল যেসব পদ্ধতির অনুসরণ করেছে তাতে এই ধরণের রাস্তাগুলির প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। অনতিবিলম্বে উত্তর এবং পূর্ব্ব-আফ্রিকায় যে অনিবার্য্য যুদ্ধ ঘনিয়ে আসছে তাতে এই প্রশস্ত পাথর-পিচ-ঢালা রাস্তাগুলি রণকৌশলকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করবে। তাই কিছুকাল থেকে উত্তর-আফ্রিকায়, মিশরে, প্যালেস্টাইনে, ইরাকে রাস্তা তৈরী করার একটি মরশুম প'ড়ে গিয়েছে। এখানে একথা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে ইথিওপিয়ার যুদ্ধের এত শীঘ্র মীমাংসা হবার অন্যতম প্রধান কারণ ইতালীয় মজুর-সেনার অত্যন্ত দ্রুত-গতিতে রাস্তা-নির্ম্মাণ।

আশ্চর্য্যের বিষয় পঞ্চাশ বছর যাবৎ উপনিবেশ স্থাপন করার পরেও এরিত্রিয়ায় ইতালীয় নরনারীর লোকসংখ্যা এক প্রকার অকিঞ্চিৎকর ছিল বললেও হয়। ইথিওপিয়ার যুদ্ধের আগে পাঁচ লক্ষ বাসিন্দার মধ্যে মাত্র সাড়ে চার হাজার ইতালীয় নরনারী এরিত্রিয়ায় বসবাস করত। অতি অল্পসংখ্যক বিদেশীই এখানে কৃষি, শিল্প কিংবা বাণিজ্যের কাজ করত। মাসোয়ার বন্দর তখনও এত উন্নত হয় নি, কাজেই আজকাল আমদানি রপ্তানির কারবারে যে শত শত বিদেশী লোক খাটছে তারা তখনও এখানে আসে নি। ইতালীয় বাসিন্দা যারা ছিল তাদের মধ্যে অধিকাংশই রাজকর্ম্মচারী এবং সৈনিক বিভাগের ওস্তাদ। দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি খুব ধীরে ধীরে হয়েছে; রাস্তাঘাট, শহর-বন্দর, হাট-বাজার ক্রমশঃ ক্রমশঃ গ'ড়ে উঠেছে। কিন্তু ইথিওপিয়ার যুদ্ধের পূর্ব্বে চল্লিশ বছর ধ'রে যে উন্নতি হয়েছে, ঐ যুদ্ধের পরে চার বছরে উন্নতি তার চেয়ে কম হয় নি। এর কারণ সহজেই অনুমেয়। ইথিওপিয়ার সঙ্গে ইতালীর বাণিজ্য আজকাল বেশীর ভাগ এরিত্রিয়ার পথেই প্রবাহিত হয়;
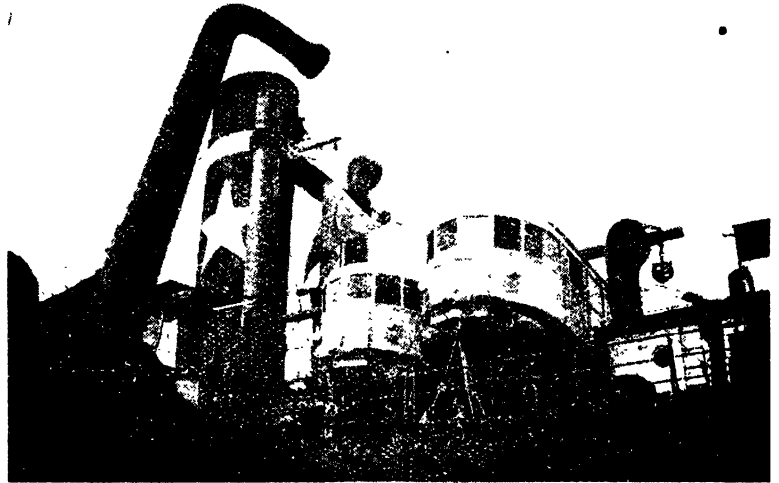
মাসোয়া বন্দরের একটি দৃশ্য। ইলেকট্রিক ট্রেনের অংশ আমদানি

কানুন দিয়ে রক্তের শুদ্ধতা বজায় রাং সম্ভব হবে না।

ইতালীয়রা এরিত্রিয়ার যুবক সেনানীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে। এদের নাম "আস্‌কারি"। তাদের উন্নত বলিষ্ঠ দেহ, চালচলনের ক্ষিপ্রতা, স্বাভাবিক বুদ্ধি এবং নির্ভীকতা যে কোন সমাজেই আদৃত হবে। মিশ্‌ মিশে কালো রঙের চামড়ার ওপরে একখানি শাদা চাদরের দেহাবরণ তাদের অঙ্গসৌষ্ঠবের মধ্যে একটি সারল্য এবং গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দেয়। ইথিওপিয়ার যুদ্ধে এরা যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে তা স্বীকার করতে গিয়ে ইতালীয় সেনানায়ক মার্শ্যাল বাদয়লিও বলেছেন :

"Our invincible native troops—zaptie, infantry, artillery, cavalry, engineers and other services—once again gave proof of their heroism, their loyalty and sincere attachment to our cause. Swift on the march, dashing in attack, they have acquired, thanks to our careful training, tenacity in defence as well." (*The War in Abyssinia*. P. 175).

এরিত্রিয়ার আধুনিক পাম্পিং ষ্টেশন

শুধু বাণিজ্য নয়, উপনিবেশটিকে দৃঢ় ভিত্তিতে গ'ড়ে তোলবার জন্য যত রকমের সামরিক আয়োজন দরকার অধিকাংশই এই পথে যাতায়াত করে আর কিছুটা যায় জিবুতির পথে। কিন্তু যে অল্পসংখ্যক ইতালীয় প্রজা এখানে বসবাস করত তারা এই দেশটিকে একটি দ্বিতীয় জন্মভূমির মতন করেই দেখতে শিখেছিল। সাদা-কালোর প্রভেদগুলি তখনও এদের মাথায় খুব গভীর ভাবে প্রবেশ করে নি। অনেক ইতালীয় প্রজা আফ্রিকা-বাসী হাবসী কিংবা তিগ্রে রমণীর পাণিগ্রহণ ক'রে এখানে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করত। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায় ছিল। ইতালীয়রা সাধারণতঃ খ্রীষ্টিয়ানদের সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন করত। আধুনিক কালে সাদা-কালোর এই অবাধ মেলামেশায় বাধা পড়েছে। সাম্রাজ্যবাদী ইতালী আজকাল অনেকগুলি নূতন আইন-কানুন করেছে যাতে ইতালীয় এবং পূর্ব্ব আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে বিবাহাদি না হ'তে পারে। কিন্তু উপনিবেশ স্থাপন করতে হ'লে একটি গার্হস্থ্য সমাজেরও প্রয়োজন আছে; তাই হাজার হাজার ইতালীয় চাষী এবং মজুর-পরিবার জন্মভূমি পরিত্যাগ ক'রে আফ্রিকার কঠিন মরুদেশে এসে আজকাল বাসা বেঁধেছে। ইতালীয়দের স্বাভাবিক মেজাজের দিক্‌ থেকে দেখতে গেলে মনে হয় যে আইন-

আধুনিক সামরিক শিক্ষা পেলে আফ্রিকাবাসী অনুন্নত সম্প্রদায়গুলিও যখন এত বীরত্ব এবং রণকৌশলের দক্ষতা অর্জ্জন করতে পারে তখন ভারতবাসীদের মধ্যে কোন কোন জাতির ওপর কখনও কখনও একটি অসামরিক অপবাদ আরোপিত হয় দেখে বিস্মিত হতে হয়।

একাধিক বার ইউরোপ যাতায়াতের অবসরে লোহিত সাগরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইতালীয় জাহাজে ভ্রমণ করার ফলে মাসোয়া বন্দরটিকে ভাল ক'রে দেখবার সুযোগ হয়েছে। এক বার আমরা কয়েক জন ভারতীয় মিলে বন্দরে নেমে বেশ খানিকটা বেড়িয়ে নিয়েছিলাম। গ্রীষ্মকালে এখানে এত গরম থাকে যে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়। শীতকালে ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে পর্য্যন্ত লোহিত সাগরের হাওয়ায় একটু হিমের স্পর্শও পাওয়া যায় না। দিনের বেলা জাহাজের সুইমিং পুলে সময় কাটানো ছাড়া উপায় নেই; চতুর্দ্দিক থেকে মরুভূমির হাওয়া এসে লোহিত

সাগরকে সর্ব্বক্ষণ উত্তপ্ত ক'রে রাখে। রাত্রিতে ডেকের উপর বসে বিশ্রাম করা সত্যিই খুব আরামপ্রদ। তারায় ভরা গভীর নীল আকাশে মেঘের লেশমাত্র নেই, শুষ্ক হাওয়ার উত্তাপটা আসে একটু কমে, আর নীচে সাগর-জলের ছপ্ ছপ্ ক'রে নৃত্য করার শব্দ অবসরপরায়ণ চিত্তে কল্পনার আবেশ ছড়িয়ে দেয়। দূরে কোথাও লাইট-হাউসের বাতি নক্ষত্রালোকে উল্কাপাতের নৈসর্গিক আবেষ্টনটির তাল ভঙ্গ করে।

আস্মারা, সরকারী দপ্তরখানা

১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ইউরোপ-যাত্রার পথে মাসোয়া বন্দরে জাহাজ থেমেছিল। তখন ইথিওপিয়ার যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং মাসোয়া বন্দরে অনেকগুলি ছোট-বড় যুদ্ধের জাহাজ দাঁড়িয়েছিল। এবারে ব্রিটিশ পাসপোর্ট-ওয়ালা যাত্রীদের বন্দরে নামবার হুকুম ছিল না। এরিত্রিয়ার গবর্ণর যাচ্ছেন ইতালীতে বড়দিন উপলক্ষে, তাই নিয়ে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ হচ্ছিল। যাত্রীদের এবং মালপত্র ওঠা-নামার শেষে জাহাজ যখন সুয়েজের দিকে যাত্রা করল তখন সূর্য্যাস্তের বেশী দেরি নেই। সমস্ত আকাশটা একেবারে লাল হয়ে গেছে, আর তারই প্রতিবিম্ব লোহিত সাগরের শান্ত দর্পণে প্রতিভাত হওয়াতে মনে হচ্ছিল যেন আমরা কোন রক্তের সমুদ্রের উপর দিয়ে ভেসে চলেছি। সূর্য্যাস্তের এরূপ বর্ণচ্ছটা আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। লোহিত সাগরের নামের যদি কোন সার্থকতা থাকে তবে এই সূর্য্যাস্তের বর্ণ-সম্পদের জন্যেই হয়ত হবে। দুখানা ইতালীয় ডেস্‌ট্রয়ার আমাদের জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা দূর এল, তার পর আবার মাসোয়ার দিকে ফিরে গেল। আমরা তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। সহযাত্রীদের মধ্যে ভারতবর্ষ থেকে প্রত্যাগত এক জন ইতালীয় চিত্র-শিল্পীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। নাম তার কলোনেল্লো। ইনি দিল্লীতে বড়লাটের গৃহে অনেক চিত্র এবং ফ্রেস্‌কো এঁকে দিয়েছেন। তারই সব অভিজ্ঞতার কথা শুনছিলাম। আমাদের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল মাসোয়া থেকে ইতালী-যাত্রী এক জন ইতালীয় এঞ্জিনিয়ার। সূর্য্য তখন অস্ত গেছে, কিন্তু তার রক্ত-আভা তখনও দিগন্তের কোল উদ্ভাসিত ক'রে রেখেছে। দূরে আফ্রিকার উপকূলের ধূসর পর্ব্বতশ্রেণীর সীমারেখা একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায় নি। এঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক সেই দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে ছিলেন। খানিকক্ষণ পরে যখন কলোনেল্লো আমাকে এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তখন জানলাম তিনি বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে দেশে যাচ্ছেন। আফ্রিকায় থেকেছেন এক বছর মাত্র, অথচ এত অল্পদিনে এই কৃষ্ণ মহাদেশের উপরে তার এতখানি মায়া কি ক'রে জন্মাল তা বুঝলাম না। তাঁর সঙ্গে আলাপের সূত্রে তিনি বললেন যে আফ্রিকার ইতালীয় উপনিবেশে তেমন আকর্ষণের বস্তু কিছু নেই, কিন্তু তবুও যেন কেন তাঁর একটা মায়া বসে গেছে। আমি বললাম যে আমাদের ভারতবর্ষের প্রতিও অনেক শ্বেতাঙ্গের যে রকম মায়া ধ'রে যায়, আপনারটা হয়ত তাই। তিনি বললেন যে তাঁর যতদূর ধারণা ব্যাপারটা ঠিক এক নয়। পূর্ব্ব-আফ্রিকায় ইতালীয় উপনিবেশ গ'ড়ে উঠেছে ইতালীয় চাষী এবং মজুরের মেহনতে। ভারতবর্ষে যত দূর জানা যায় শ্বেতাঙ্গ চাষী কি মজুর কখনও উপনিবেশ স্থাপন করতে আসে নি। ফলে হয়েছে এই যে ভারতবর্ষের সমাজ বিভক্ত হয়েছে দুটি সম্প্রদায়ে যাদের স্বাভাবিক মেলা-মেশার পথে অনেক বাধা। সেই তরুণ এঞ্জিনিয়ারটির ধারণা যে, শত আইন-কানুন সত্ত্বেও ইতালীয় চাষী এবং
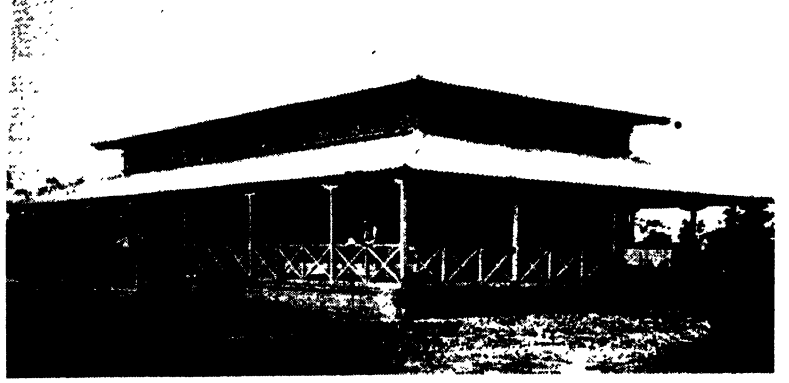
মজুরদের হাবসী, তিগ্রে, এবং বেল্‌জ্‌া সম্প্রদায়ের চাষী এবং মজুরদের সঙ্গে মেলামেশা করার পথে কোন বাধা শেষ পর্য্যন্ত টিকবে না। এই ভদ্রলোকের কাছেই শুনলাম আফ্রিকার নারীদের একনিষ্ঠার কথা। তিনি বললেন যে যে-সব ইতালীয় পুরুষ এখানে এসে আফ্রিকার মেয়েকে বিয়ে করেছে তারা নাকি আর ইউরোপে ফিরে যেতে চায় না। এ-সব কথা শুনবার পরে আফ্রিকার প্রতি তাঁর আসক্তিকে বুঝতে কষ্ট হ'ল না।

মাসোয়ার একটি আধুনিক গুদাম-ঘর
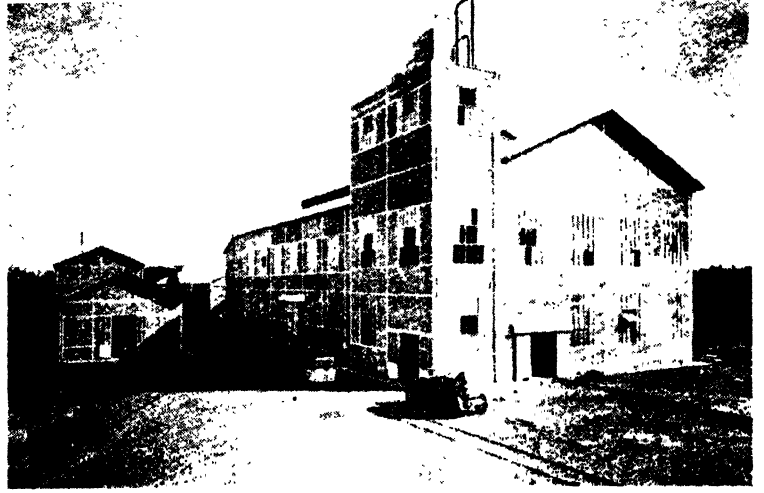
আরও অনেক কথাবার্ত্তা হ'ল। ডিনারের ঘণ্টা তখন লোহিত সাগরের বুকে সন্ধ্যার ছায়া নেমে পড়তেই আমরা পরস্পরের কাছে যখন বিদায় নিলাম এসেছে।

দেয়ালি

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

ভালবেসে হাতে তুলে দিয়েছিলে কাজ
চুকায়ে যেতেছি তার সবটুকু আজ
মুহূর্ত্তের তরে তারে করি নাই হেলা
পথে বসে করি নাই বিপথের খেলা।
কি হারাল কি খোয়াল কি হ'ল সঞ্চয়,
পৃথিবীর পথে তার রবে পরিচয়।
পৃথিবী ছবিটি তার যতনে আঁকিবে
গগনে গগনে শুভ সংবাদ বহিবে
বায়ু তারে ছড়াইবে দেশ হ'তে দেশে
পুষ্পিত ফলিত হবে ফুলে ফলে শেষে।
নিরন্তর বহি চলি চিরন্তন সুর
মাটির অন্তর ভেদি উঠাবে অঙ্কুর।
ছুঁয়ে যাব সুন্দরের নন্দন-দেয়ালি
সুন্দরে অন্তরে ধরি প্রেম-দীপ জালি ॥

পুরাতন চিঠি

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Elgersburg Thurwald
M. Hote Warte.

দিনকরকরকমলেষু—

এবার চলিনু তবে
সময় হয়েচে নিকট, এখন
জাহাজে চড়িতে হবে।
উচ্ছল জল করে ছল ছল
তরণী-পতাকা চল-চঞ্চল
কাঁপিছে অধীর রবে।

রবিদাদা

—

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

দিনু, তোরা কোথায় জানিনে, শৈলশিখরে না সমুদ্রতীরে, না রাজধানীতে না শান্তিনিকেতনে। আমি আছি ঘুর্ণিপাকের পিঠে চড়ে। এখানে ওখানে, এপারে ওপারে, এর বাড়ীতে, ওর বাড়ীতে, এ-সভায় ও-সভায়, এখানে চায়ে ওখানে ডিনারে, এখানে জাহাজে ওখানে রেলগাড়িতে। মনের কম্পাসের কাঁটা নিত্যই রয়েছে উত্তরায়ণের সেই কোণার্কের দিকটাতে। নীলমণির আশ্রয়ে কবে আমার কেদারায় গিয়ে অধিষ্ঠিত হব, এই কথা চিন্তা করচি। ইতি বিজয়া দশমী ১৩৩৪

রবিদাদা

—

কল্যাণীয়েষু,

এখানে [জাপানে] এসে অবধি তোদের কোন চিঠিপত্র পাইনি। কেমন আছিস, কোথায় আছিস, সমস্ত আন্দাজে অন্ধকারে ঝাপ্সা। আমরা যে-দেশে এসেছি, এ একেবারেই গানের দেশ নয়, এ ছবির দেশ। এরা এদের সমস্ত সুখ দুঃখ বেদনা আশা আকাঙ্ক্ষা একমাত্র ছবি দিয়েই ব্যক্ত করে। এদের গান শুনেছি কিন্তু তাকে গান বলা চলে না—সুর সহযোগে আওয়াজ করা মাত্র। এদের নাচ খুবই সুন্দর কিন্তু গান যতদূর কাঁচা হতে হয়। কাজেই আমারও গানের স্ফূর্ত্তি একেবারেই নেই। গানের সমস্ত স্মৃতি পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হয়ে যেত যদি-না প্রায় মুকুলটা চীৎকার শব্দে যখন তখন যেখানে সেখানে অত্যন্ত নির্লজ্জ এবং নির্দ্দয়-ভাবে আমার গান আওড়াত। এমনি দুর্ভিক্ষের দশা যে মুকুলকেও থামিয়ে দিতে ইচ্ছে করে না। যাই হোক, এখন ওকেও ফেলে যেতে হচ্ছে। ও এখানে থেকে ছবি আঁকার চর্চ্চা করবে। আমেরিকায় গানবাজনার অভাব হবে না। কিন্তু আমাদের সেই শান্তিনিকেতনের মত গানে জবজবে আকাশ কোথায় পাব? তোর ঘরের সেই গানের আসর ছবির মত মনে পড়ে—আর মনে পড়ে তোর জানলার গরাদের বাইরে থেকে কালো কালো জলজলে সেই চোখগুলো। এবারকার বর্ষার পালা শান্তিনিকেতনের মাঠের উপর থেকে আপন পাওনা চুকিয়ে নিয়ে চলে গেছে—আকাশ থেকে বাদল মেঘের তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে শ্রাবণের দলবল বিদায় নিয়েচে, এখন শরতের শিউলি ফোটার সময় হয়ে এল। কিন্তু আশ্রমের এই সব ঋতু-অতিথিরা কি তাদের কবি-বৈতালিকের কথা স্মরণ করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে চলে যাবে না? বৎসরে বৎসরে তারা যে বিচিত্র অভ্যর্থনা পেয়ে এসেচে এবারে তার আয়োজনের ত্রুটির নালিশ ওখানকার মাঠে মাঠে রয়ে গেল। তাই থেকে থেকে মনটার ভিতর ঝটপট্ করে ওঠে—কিন্তু—চলি গো চলি গো, যাই গো চলে।

তোদের বিদ্যালয়ের জন্যে একটা জাপানী ঘণ্টা পাঠাচ্ছি। আহার, উপাসনা প্রভৃতি সাধনার আহ্বানের বেলায় এটা ব্যবহার করলে চল্‌বে। এই ঘণ্টা আমার একজন জাপানী বন্ধু বিদ্যালয়কে দান করেচেন। রেলগাড়ী চল্‌চে, আমিও চলন্ত তাই লেখাটা অনেকটা তোর ছাঁদের হয়ে এল।

তোদের রবিদাদা

বঙ্গলক্ষ্মী]

মনোবিকাশের ছন্দ

বিশ্বভারতীর ছাত্রদিগকে অধ্যাপনাকালে কথিত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যা কিছু সজীব, যার মধ্যে প্রাণের বেগ রয়েছে তার আত্ম-প্রকাশের গতি নিয়ন্ত্রিত হয় ছন্দে; যা মৃত তার মধ্যে ছন্দের লীলা নেই। শিশুদের শিক্ষাদান ব্যাপারে নিজেদের অক্ষমতা বশত, আমরা তাদের দেহের বৃদ্ধি, তার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত মনের গতির মধ্যে যে সজীব ছন্দের অর্থাৎ দেহ-

মন বিকাশের যে বিভিন্ন ধরণের স্বাভাবিক নিয়মস্বাতন্ত্র্য রয়েছে, তাদের মধ্যে বুদ্ধিবিকাশের এবং মননশক্তির হ্রাস-বৃদ্ধির যেসব কারণ রয়েছে সেগুলকে দেখতে পাই না, বুঝতে পারি না। ফলে আমাদের হাতে তাদের হতে হয় লাঞ্ছিত এবং তাদের সর্বদিকের উন্নতির পথে আমরা সহায়ক না হয়ে হই অন্তরায়।

শান্তিনিকেতনে শিশুদের শিক্ষাদান-কর্তব্যে যখন অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে আমিও আংশিকভাবে যুক্ত ছিলেম তখন আমি এই ছন্দ-নিয়মের সত্যকে মনে রেখে ছেলেদের সব দিক দিয়ে যতটা সম্ভব পর্যবেক্ষণ করবার চেষ্টা করেছি। তখন আমার স্নেহভাজন সন্তোষচন্দ্র মজুমদার এই বিদ্যালয়ে ছিলেন। তিনি আমেরিকা ইত্যাদি দেশের শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত ছিলেন। তাঁর যোগ্যতার কথা ভেবেই তাঁকে বিশেষ ক'রে শিশুদের শিক্ষা দেবার ভার দিয়েছিলাম। এদেশের দুর্ভাগ্য, যাঁরা বিদ্যাদানে পটু, যাঁরা সত্যিকার বিদ্বান্, যাঁরা বিদ্যাদানের কৌশলকে বিশেষভাবে আয়ত্ত করেছেন, তাঁরা সকল ক্ষেত্রে না হোক অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশু কিংবা বালকদের শিক্ষাদানকার্যকে নিজেদের ভারী পদমর্যাদার বিরোধী বিষয় বলে গণ্য করেন। ছোট ছেলেদের পড়ানো যেন তাঁদের মর্যাদার বাইরের বিষয়। শিশু এবং বালকদের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব চর্চা করা তাঁদের চিত্ত-বৃত্তির মধ্যে নেই। এঁদের কাছে বালক এবং শিশুদের এত বড় অসম্মান বাস্তবিকই দুঃখের বিষয়।

সেই জন্যই সন্তোষ যখন বিলাত থেকে ফিরে এলেন তাঁকে শিশুশিক্ষার ভার দিলাম। এ ভার তাঁকে দেবার অন্যতম কারণ ছিল, তিনি আমার কথার যথার্থ সত্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বোঝবার চেষ্টা করতেন, গ্রহণ করবার চেষ্টা করতেন। 'সব কিছু জানি সব কিছু বুঝি, নতুন আর কিছু বোঝবার শোনবার প্রয়োজন নেই' এই শ্রেণীর মারাত্মক দুর্বুদ্ধি তাঁর ছিল না। সেই জন্য নিঃসংকোচে তাঁর কাছে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্‌দের অভিজ্ঞতার কথা, শিক্ষাদান-বিষয়, কোথায় কে কি রকমের পরীক্ষার সাধনায় রত আছেন এবং আমি নিজেই বা এ বিষয় কী অনুভব করি, কী বিচার আমার, কী আমি ভাবছি, সব কথাই বলতুম। বিশ্বাস ছিল তিনি সে-সব কথাকে তাঁর শক্তিসামর্থ্যানুযায়ী কাজে লাগাবার চেষ্টা করবেন।

আমার বেশ মনে পড়ে আজকের দিনে বিদেশে ইউরোপে বিশিষ্ট মনোবিদেরা এবং শিক্ষাবিদেরা যে সকল দিক্ দিয়ে শিশু-শিক্ষার পরীক্ষা করছেন, যে-সব প্রণালীকে অবলম্বন করেছেন শিশুদের মানুষ ক'রে তোলবার জন্য, অনেক দিন আগেই এ-সব বিষয় আমি সন্তোষের কাছে এবং তৎকালীন অন্যান্য শিক্ষকদের কাছে ইঙ্গিত করেছিলাম। কিন্তু হ'ল না যা এখানে, তাই সফল হচ্ছে অন্য জায়গায়। অথচ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়টি একাধারে বিদ্যালয় এবং বহুজনের দ্বারা গঠিত একটি পরিবারময় গৃহ। এখানে শিক্ষানৈতিক যে পরীক্ষা সহজে সম্ভব, অন্য কোথাও তা সম্ভব কি না জানি না। তবু আমার আশানুরূপ বিশেষ কিছু হয়েছে কিংবা হচ্ছে ব'লে আমি জানি না। যা হয়েছে সেটার মূল্য এদেশের পক্ষে অনেক; কিন্তু এর চেয়ে আরও অনেক বেশী হ'তে পারত।

কিন্তু আজ যা হ'ল না, কালকেও তা হ'তে পারবে না এ কথা সত্য নয়। সুতরাং এ বিষয়ে নিরুৎসাহ না হওয়াই উচিত। সন্তোষকে আমি বলেছিলাম ক্লাসে যে সব ছেলেরা আসে, তাদের প্রত্যেকের একটা স্বতন্ত্র রেকর্ড রেখো—কার স্বাস্থ্য কেমন, কে ওজনে কমছে, কে বাড়ছে, কার স্বাভাবিক দেহবিকাশে বুদ্ধি-বিকাশে কী কী কারণে বিঘ্ন ঘটছে, কে সর্ববিষয়ে উন্নতি করতে করতে হঠাৎ কেন থমকে যায়—কেন হঠাৎ তার মধ্যে সাময়িক জড়ত্ব, শৈথিল্য আসে, তাদের ওই সব অবাঞ্ছনীয় ভাবের স্থায়িত্ব কত দিন, কে ভালো পড়াশোনা করতে করতে হঠাৎ কেন পিছিয়ে পড়ে, কেই বা বরাবর নিরুদ্যম থেকে হঠাৎ কোন্ বয়স থেকে কোন্ মাস থেকে উৎসাহশীল এবং বুদ্ধিমান হ'তে শুরু করে; কোন্ ছেলে ক্লাসের কোন্ পর্বে বেশ চনমনে থাকে অথবা অলস অন্যমনস্ক থাকে ইত্যাদি। এসব বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখলে বুঝতে পারা যায় কার মনের এবং জীবনের বিকাশ কি ছন্দে চলে, কার গতির মধ্যেকোথায় বাঁক বা সে বাঁকের ধারা কী, কোথায় চলনে তার যতি। এসব বিষয় ধৈর্যের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা দরকার এবং এই ভাবে পর্যবেক্ষণ অবশ্য তাঁরাই করতে পারেন যাঁরা এসব বিষয়ের গুরুত্বকে মেনে নিয়ে, শিক্ষাকে নিজের জীবনে সত্য ভাবে গ্রহণ করেন। অশিক্ষিত যাঁদের মন তাঁদের দ্বারা এ কাজ হওয়া সম্ভব নয়।

জীবন এবং মনের বিকাশের বিষয় মানুষের দৈহিক স্বাস্থ্যকে বাদ দিয়ে নয়। দুটোই চলে পাশাপাশি তাল মিলিয়ে। কী বিশেষ কারণে এবং নিয়মে, কেউ দেহে দ্রুত বাড়তে বাড়তে হঠাৎ থামে, অথবা বেঁটে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক সময় বাড়তে থাকে দ্রুত গতিতে, এসব বিষয় জানবার প্রয়োজন আছে। এই জানার ভিতর দিয়েই সত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। মানুষের দেহে মনে, কাজে কর্মে, ভাব এবং গতির, জড়ত্বের এবং সজীবতার ক্রিয়া-পদ্ধতির লক্ষণসমূহকে যত বিশেষ ভাবে দেখা যাবে, ততই মানব-জীবন-বিকাশের ছন্দ-বৈচিত্র্যের সঙ্গে ঘটবে আমাদের পরিচয়। এই ছন্দের নিয়মের বৈলক্ষণ্য গাছপালা লতাপাতা ফুলের মধ্যে কোথাও কোথাও দেখা যায়। বাইরে থেকে মনে হয় অহেতুক, কিন্তু তারও অন্তর্নিহিত হেতু থাকতে পারে। কিন্তু ব্যতিক্রম দিয়ে সাধারণ রীতির প্রতি উদাসীন হবার কারণ নেই।

এই প্রসঙ্গে তোমাদের এই কথা জানা দরকার যে, ছন্দে জীবনের এবং সজীবতার সত্যের প্রকাশ, ছন্দে ধরা পড়ে জীবনের জাগ্রত রূপ, ছন্দ দেয় প্রাণের পরিচয়। এই জন্য সর্ব দেশেই, কেউ কারও সঙ্গে পরামর্শ না ক'রেই কবিরা সব ছন্দের ভিতর দিয়ে বলেছেন তাদের উপলব্ধির বিষয়কে। আমার বিশ্বাস এই জন্যই প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ মধুর। প্রত্যেকটি গাছের প্রত্যেকটি লতার বাণী প্রকাশ করছে

আপনাকে ডালপালা ও পুষ্পের ছন্দে। ছন্দোময় তাদের বাণী, কেননা তারা সজীব। কাব্যের সজীবত্বকে তার প্রাণের মাধুর্যকে প্রকাশ করে ছন্দ। ছন্দের এই তাৎপর্য-বিষয়টি কবি-কল্পনার বিষয় নয়। চোখ দিয়ে এটা দেখবার, কান দিয়ে শোনবার এবং মন দিয়ে বোঝবার বিষয়।

প্রকৃতির রাজ্যে যেমন এক-একটি ঋতুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এক-একটি তরুলতার আত্মপ্রকাশের বেগের বা নিরুদ্যমতার পরিচয় পাওয়া যায়, আমার বিশ্বাস যদি সতর্কতার সঙ্গে বিষয়টির পর্যবেক্ষণ করা হয়, তা'হলে দেখতে পাওয়া যাবে, এক-একটি ঋতুর প্রভাব বিভিন্ন মানুষের মন ও দেহের ক্রিয়াকেও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চালনা করে। এরকম হওয়াটাই সংগত, না হওয়াটাই আশ্চর্যের বিষয়।

দেশ]

তুমি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঐ ছাপাখানাটার ভূত,
আমার ভাগ্যবশে তুমি তারি দূত।
দশটা বাজল তবু আসো নাই—
দেহটা জড়িয়ে আছে আরামের বাসনাই,
মাঝে থেকে আমি খেটে মরি যে,
পণ্য জুটেছে, খেয়াতরী যে
ঘাটে নাই। কাব্যের দধিটা
বেশ করে জমে গেছে, নদীটা
এইবার পার করে প্রেসে লও,
খাতার পাতায় তারে ঠেসে লও।
কথাটা তো একটুও সোজা নয়,
ষ্টেশন-কুলির এ তো বোঝা নয়,
বচনের ভার ঘাড়ে ধরেছি;
চিরদিন তাই নিয়ে মরেছি;
বয়স হয়েছে আশী তবুও
সে ভার কি কমবে না কভুও।

আমার হতেছে মনে বিশ্বাস
সকালে ভুলাল তব নিশ্বাস
রান্নাঘরের ভাজাভুজিতে,
সেখানে খোরাক ছিলে খুঁজিতে,
উতলা আছিল তব মনটা
শুনতে পাওনি তাই ঘণ্টা।
শুঁটকি মাছের যারা রাঁধুনিক
হয়তো সে দলে তুমি আধুনিক।
তব নাসিকার গুণ কী যে তা,
বাসি দুর্গন্ধের বিজেতা।
সেটা প্রোলিটেরিটের লক্ষণ,
বুর্জোয়া গর্বের মোক্ষণ।
রৌদ্র যেতেছে চড়ে আকাশে
কাঁচা ঘুম ভেঙে মুখ ফ্যাকাশে।
ঘন ঘন হাই তুলে গা-মোড়া,
ঘস্ ঘস্ চুলকোনো চামোড়া।
আকামানো মুখ ভরা খোঁচাতে,
বাসি ধুতি, পিঠ ঢাকা কোঁচাতে।
চোখ দুটো রাঙা যেন টোমাটো
আলুথালু চুলে নেই পোমাটো।
বাসি মুখে চা খাচ্ছ বাটিতে,
গড়িয়ে পড়ছে ঘাম মাটিতে।
কাঁকড়ার চচ্চড়ি রাত্রে,
এঁটো তারি পড়ে আছে পাত্রে।
সিনেমার তালিকার কাগজে
কে সয়াল ছবি, ব'লে রাগো যে।
যত দেরী হতেছিল ততই যে
এই ছবি মনে এল স্বতই যে।
ভোরে ওঠা ভদ্র সে নীতিটা
অতিশয় খুঁতখুঁতে রীতিটা,
সাফসোফ বুর্জোয়া অঙ্গেই
ধবধবে চাদরের সঙ্গেই
মিল তার জানি অতি মাত্র,
তুমি তো নও সে সৎ-পাত্র।
আজকাল বীড়িটানা শহুরে
যে চাল ধরেছে আটপহুরে,
মাসিকেতে একদিন কে জানে
অধুনাতনের মন-ভেজানে
মানেহীন কোনো এক কাব্য
নাম করি দিবে অশ্রাব্য।

৪ অগষ্ট, ১৯৪০, শান্তিনিকেতন

নিরুক্ত]

কালিম্পঙের চিঠি

শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কর্তব্যের সংসারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছি। রক্তে জোয়ার আসবে বলে মনে হচ্চে যেন। শারদা পদার্পণ করেছেন পাহাড়ের শিখরে, পায়ের তলায় মেঘপুঞ্জ কেশর ফুলিয়ে স্তব্ধ আছে। মাথার কিরীটে সোনার রৌদ্র বিচ্ছুরিত। কেদারায় বসে আছি সমস্ত দিন, মনের দিক্‌প্রান্তে ক্ষণে ক্ষণে শুনি বীণা-পাণির বীণার গুঞ্জরণ। তারি একটুখানি নমুনা পাঠাই :—

পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দের মিলে।
বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি
হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি।
মাঝখানে আমি আছি,
চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দে করতালি।

আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ
জানে তা কি এ কালিম্পঙ ?
ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে পর্বতশিখর
অন্তহীন যুগযুগান্তর।
আমার একটি দিন বরমাল্য পরাইল তারে
এ শুভ সংবাদ জানাবারে
অন্তরীক্ষে দূর হতে দূরে
অনাহত স্বরে
প্রভাতে সোনার ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং,
শুনিছে কি এ কালিম্পঙ ?
২৫।৯।৪০

পরিচয়]

শেষ সঞ্চয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিনান্তবেলায় শেষের ফসল দিলেম তরী 'পরে
এপারে কৃষি হোলো সারা
যাব ওপারের ঘাটে।
হংসবলাকা উড়ে যায়
দূরের তীরে তারার আলোয়
তারি ডানার ধ্বনি বাজে মোর অন্তরে,
ভাঁটার নদী ধায় সাগরপানে কলতানে
ভাবনা মোর ভেসে যায় তারি টানে।
যা কিছু নিয়ে চলি শেষ সঞ্চয়
সুখ নয় সে দুঃখ সে নয়, নয় সে কামনা
শুনি শুধু মাঝির গান আর দাঁড়ের ধ্বনি তাহার স্বরে।

দেশ]

কালান্তর

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমার ঘরের সিঁড়ি বেয়ে
যতই আমি নাবছি
আমার মনে আছে কিনা
ভয়ে ভয়ে ভাবছি।
কথা পাড়তে গিয়ে দেখি
হাই তুললে দুটো,
বললে উস্‌খুস্‌ ক'রে
"কোথায় গেল মুটো।"
ডেকে তাকে ব'লে দিলে
"ড্রাইভারকে বলিস
আজকে সন্ধ্যা ন'টার সময়
যাব মেট্রোপলিস।"
কুকুরছানার ল্যাজটা ধরে
করলে নাড়াচাড়া,
বললে আমায়, "ক্ষমা করো
যাবার আছে তাড়া।"
তখন স্পষ্ট বোঝা গেল
নেই মনে আর নেই।
আরেকটা দিন এসেছিল
একটা শুভক্ষণেই ;
মুখের পানে চাইতে তখন,
চোখে রইত মিষ্টি,
কুকুরছানার ল্যাজের দিক
পড়ত না কো দৃষ্টি।
সেই সেদিনের সহজ রংটা
কোথায় গেল ভাসি,'
লাগল নতুন দিনের ঠোঁটে
রুজ-মাখানো হাসি।
বুটসুদ্ধ পা দুখানা
তুলে দিলে সোফায়
ঘাড় বেঁকিয়ে ঠেসেঠুসে
ঘা লাগালে খোঁপায়।
আজকে তুমি শুকনো ডাঙায়
হালফ্যাশানের কূলে,
ঘাটে নেমে চমকে উঠি
এই কথাটাই ভুলে।
এবার বিদায় নেওয়াই ভালো
সময় হোলো যাবার,
ভুলেছ যে ভুলব যখন
আসব ফিরে আবার।

১৩ শ্রাবণ, ১৩৪৭, শান্তিনিকেতন

যুগান্তর]

ভক্ত নারী দয়াবাঈ

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

মথুরা-বৃন্দাবনের কাছাকাছি ভূভাগকে জ্ঞানী ও ভক্তগণ বড় ধন্য স্থান মনে করেন। এই প্রদেশটি বড় বড় জ্ঞানী ও প্রেমিকের জন্ম ও সাধনার লীলাতে পরমসার্থকতাপ্রাপ্ত। বৃন্দাবনের ক্রোশ পঁচিশ-ত্রিশ পশ্চিমে আলওয়ার রাজ্যের মধ্যে ডেহরা গ্রামে দুসর বণিক-কূলে ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে ভক্ত চরণদাসের জন্ম। চরণদাসের পূর্ব্বনাম ছিল রণজিৎ। রণজিতের পিতাও ছিলেন কঠোর তপস্বী। প্রায়ই বনে গিয়া তপস্যা করিতেন। একবার তপস্যার্থ তিনি যে বনে গেলেন, আর ফিরিলেন না। দাদামহাশয়ের কাছে দিল্লীতেই রণজিৎ মানুষ। দুসর বণিক-বংশে জন্মিলেও তাঁহার

[দ]াদামহাশয় তাঁহাকে বাদশাহী কাজের উপযোগী শিক্ষাই দিতেছিলেন। কিন্তু রণজিৎ মহাপুরুষ গুরুর সংস্পর্শ পাইয়া উনিশ [ব]ৎসর বয়সেই সাধনার ক্ষেত্রে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। [ব]ালককাল হইতেই রণজিতের ঝোঁক সেই দিকেই ছিল। সদ্‌গুরু [প]াইয়া তাঁহার জীবনব্যাপী আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল। রণজিৎকে [গ]ুরু নূতন নাম দিলেন চরণদাস। চরণদাস নাম হইতেই তাঁহার [স]ম্প্রদায়কে বলে চরণদাসী পন্থা।

তখনকার দিনে প্রেমের ও "মধুর" সাধনার নাম করিয়া ধর্ম্ম[জ]গতে নানা দুর্নীতি ও অনাচার প্রচলিত হইয়াছিল। চরণদাস [ব]ার বৎসর কঠোর সাধনার পর যখন ধর্ম্ম-উপদেশ দিতে আরম্ভ [ক]রিলেন তখন সেই সব দুর্নীতি দূর করিবার জন্ম বদ্ধপরিকর [হ]ইলেন। এই জন্ম চরণদাসের উপদেশের মধ্যে চরিত্রের বিশুদ্ধির [উ]পর এতটা জোর দিবার চেষ্টা দেখা যায়। চরিত্রগত বিধিনিষেধগুলির দিকে তিনিই যে এতটা ঝোঁক দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন সে কেবল তখনকার দিনে চারিদিকের দুর্গতি দেখিয়া [এ]ই দুর্গতি হইতে তিনি আপন মণ্ডলীকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিয়াছিলেন।

এমন অনেক সাধনা দেখা যায় যেখানে নারীদের প্রতি ধারণা অতি নীচ। নারীচরিত্র বিষয়ে নানাবিধ জঘন্ত উক্তি যেখানে [স]কলেরই মুখে মুখে, অথচ দেখা যায় সেই সব জায়গায়ই নারীদের [স]ঙ্গে মাখামাখি বেশী। চরণদাস কিন্তু এই ধরণের মানুষ ছিলেন না, তিনি যথাসম্ভব এই সব মলিন আবহাওয়া হইতে দূরেই থাকিতেন।

চরণদাসের আপন গ্রামের ও আপন কুলের কন্তা দয়া ও সহজো বাঈ ছিলেন চরণদাসেরই আত্মীয়া। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন ইঁহারা তাঁহার ভগ্নী। তবে ইঁহারা ভগ্নী না হইলেও ভগ্নীর মতই স্নেহের পাত্র ছিলেন। চরণদাস ইঁহাদিগকে যে দীক্ষা দিতে বাধ্য হইয়াছেন সে কেবল ইঁহাদের ভক্তি ও ঐকান্তিকতার জন্ম।

দয়াবাঈ ও সহজো বাঈ তাঁহাদের সাধনার কথা তাঁহাদের নিজের বাণীতে রাখিয়া গিয়াছেন। গুরুর প্রতি তাঁহাদের যে কি শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল তাহা বুঝা যায় তাঁহাদের বাণীতে। ১৭৬১ সালে অর্থাৎ প্রায় ১৮০ বৎসর পূর্ব্বে দয়াবাঈ তাঁহার দয়াবোধ গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা তাঁহার পরিণত বয়সের লেখা। অনেকে মনে করেন "বিনয়-মালিকাও" দয়ারই রচনা। তাহাতে "দয়াদাস" নামে কবিতা দেখা যায়। কাহারও কাহারও মতে দয়াদাস অন্ত একজন ভক্তের নাম। গুরুর প্রতি তাঁহার ভক্তি তাঁহার প্রত্যেকটি বাণীতে উচ্ছ্সিত হইয়া উঠিতেছে। এখানে দুই-একটি বাণী দেখান যাউক। এই সব বাণীগুলির কোন্‌টি বা পরব্রহ্ম ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া বলা, কোন্‌টি বা গুরুদেবের প্রতি উক্ত তাহা বুঝা কঠিন।

জৈ জৈ পরমানন্দ প্রভু পরমপুরুষ অভিরাম।
অন্তরজামী কৃপানিধি দয়া করত পরনাম।

"জয় জয় পরমানন্দ প্রভু অভিরাম পরমপুরুষ, জয় জয় কৃপানিধি অন্তর্যামী পুরুষ, দয়া তোমাকে প্রণাম করে।"

ব্রহ্মরূপ সাগর সুধা গহিরো অতি গম্ভীর।
আনন্দ লহর সদা উঠৈ নহীঁ ধরত মন ধীর।

"ব্রহ্মরূপ অতি গভীর গম্ভীর অমৃতসাগরে সদাই আনন্দ-লহর তরঙ্গিত, মন যে আর মানে না ধৈর্য্য।"

চরণদাস গুরুদেব জু ব্রহ্মরূপ সুখ ধাম।
তাপ-হরণ সব সুখ-করন দয়া করত পরণাম।

"গুরুদেব শ্রীমৎ চরণদাসজী ব্রহ্মরূপ সুখধাম। তিনি সর্ব্বতাপ-হরণ, সকল সুখদাতা, তাঁহাকে দয়া করে প্রণাম।"

সতগুরু সম কেউ হৈ নহীঁ যা জগ মেঁ দাতার।
দেত দান উপদেশ সোঁ করৈ জীব ভবপার।

"জগতে সদ্‌গুরুর সমান দাতা আর তো কেহই নাই। উপদেশের দ্বারা তিনি যাহা দান করেন তাহাই জীবকে করায় ভবপার।"

গুরুর মাহাত্ম্যের কথা বলিয়া দয়ার আর শ্রান্তি নাই। দয়া সংসারে বহু দুঃখ পাইয়াছিলেন। যে-গুরুর কৃপায় সেই দুঃখের সাগর তিনি পার হইলেন, তাঁহার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা নিত্য জাগ্রত থাকা নিতান্তই স্বাভাবিক।

"করুণার সাগর গুরু, কৃপা-নিধান গুরু, গুরুই হইলেন ব্রহ্মের ভাগবত বিগ্রহ।"

করুণা সাগর কৃপা নিধানা।
গুরু হৈঁ ব্রহ্মরূপ ভাবানা।

"এই গুরুই সকল হৃদয়-গ্রন্থি দেন ভালরূপে চূর্ণ করিয়া, তাঁহার উপদেশে লাভ-ক্ষতি সকলই হইয়া যায় সমান।"

হানি লাভ দোউ সম করি জানৈ।
হৃদৈ গ্রন্থ নীকী বিধি ভানৈ।

"শ্রীগুরুই উপদেশ দিয়া সকল ভ্রম করেন দূর, হে দয়া, গুরুর কৃপাতেই মেলে সুখসাগরে বাস।"

দৈ উপদেস করে ভ্রমনাশা।
দয়া দেত্ত সুখ-সাগর-বাসা॥

"হে দয়া, হরিনাম লও, জগতে এই নামই সার। হরি ভজিতে ভজিতে এখন আমি হরিই হইয়া গিয়াছি, অপার রহস্যের সন্ধান এখন আমি জানিয়াছি।"

দয়াদাস হরিনাম লে যা জগমেঁ যে সার।
হরি ভজতে হরি হী ভয়ে পায়ো ভেদ অপার॥

উদ্বোধন]

ডায়েটম

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিগত মহাযুদ্ধের কয়েক বছর পরের ঘটনা। উইল্‌মিংটনের অ্যালকোহল-উৎপাদনকারী কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ এক বিষম সমস্যায় পড়িয়া বিব্রত হইয়া উঠিলেন। মাৎগুড় অ্যালকোহল-উৎপাদনের প্রধান উপকরণ। মাৎগুড় গাঁজিয়া গেলে তাহা হইতে অ্যালকোহল চোলাই করা হয়। বড় বড় ট্যাঙ্কার জাহাজযোগে কিউবার চিনির কারখানা হইতে উদ্বৃত্ত প্রচুর পরিমাণ মাৎগুড় উইল্‌মিংটনে প্রেরিত হইত। কোন কারণে কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহ হয় যে, কিউবার রপ্তানিকারকদের যোগাযোগে জাহাজের কর্ম্মচারীরা গুড়ের সঙ্গে সমুদ্রের জল মিশাইয়া মালের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া অসদুপায়ে কোম্পানীর প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করিতেছে। অনুমানে বুঝা গেল, কিউবার উপকূল হইতে জাহাজ ছাড়িবার পর কিছুদূর অগ্রসর হইলে হোস-পাইপের সাহায্যে সমুদ্রের জল গুড়ের ট্যাঙ্কারের মধ্যে পাম্প করিয়া দেওয়া হয়। তরঙ্গাঘাতে ট্যাঙ্কার অনবরত আন্দোলিত হইবার ফলে জল গুড়ের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যায়। কাজেই মাল খালাস করিবার সময় মালের কোনই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। এই চুরি ধরিবার জন্য কোম্পানী মালবাহী জাহাজে ডিটেকটিভ নিযুক্ত করিয়াও কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কারণ যখন তাহারা এক দিকে নজর রাখেন হয়ত তখন অন্য দিকে অতি সঙ্গোপনে এই ব্যাপার চলিতে থাকে; অথবা তাহারা যখন নিদ্রিত থাকেন তখন নিঃশব্দে এই কাজ সমাধা হইয়া যায়। বোঝাই করিবার সময় একবার এবং খালাস করিবার সময় আরেকবার এইজাতীয় তরল মাল ওজন করিয়া লওয়া যেমনই ব্যয়সাধ্য তেমনই অসুবিধাজনক ব্যাপার। বিশেষতঃ তরলতা বা গাঢ়ত্ব দেখিয়াও মাৎগুড়ের ভালমন্দ বিচার করা চলে না; কারণ একই গুড় ঋতুভেদে বিভিন্ন আবহাওয়ায় তরল বা গাঢ় অবস্থায় থাকিতে পারে। কাজেই অনন্যোপায় হইয়া কোম্পানী রাসায়নিকদের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন – সমুদ্রজলে বিভিন্ন অনুপাতে যেরূপ বিবিধ পদার্থ মিশ্রিত রহিয়াছে গুড়ের মধ্যে তো আর সে-সব পদার্থ থাকিতে পারে না!
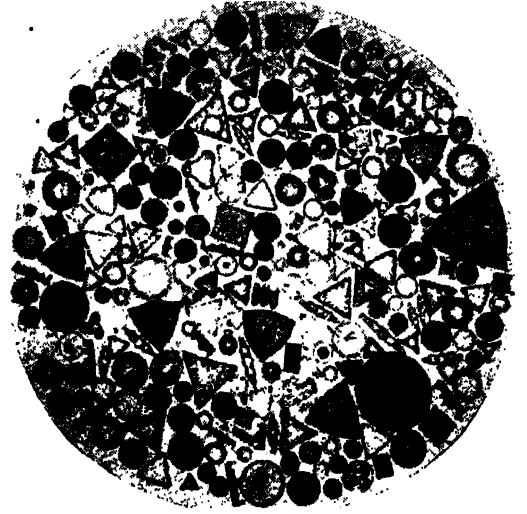
বিভিন্ন আকৃতির ডায়েটম। প্রায় ৫০ গুণ বড় করিয়া দেখান হইয়াছে।

সুতরাং গুড়ের মধ্যে সমুদ্রজল মিশ্রিত হইলে রাসায়নিক পরীক্ষায় অবশ্যই তাহা ধরা পড়িবে। কিন্তু ফল হইল তাহার বিপরীত। বহু অর্থব্যয় এবং বহুদিনের চেষ্টায় রাসায়নিকেরা দেখিতে পাইলেন—সমুদ্রজলে যেমন আইওডিন, ব্রোমিন, বোরন, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি বিবিধ পদার্থ মিশ্রিত রহিয়াছে, গুড়ের মধ্যেও ঠিক সেই সেই পদার্থের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তাছাড়া আরও দেখা গেল—অত অধিক পরিমাণ গুড়ের সহিত তাহার এক-চতুর্থ বা এক-পঞ্চমাংশ জল মিশ্রিত করিলে ঐ সব জিনিষের আনুপাতিক পরিমাণের বিশেষ কোন হ্রাসবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় না। কাজেই রাসায়নিকদের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল।

যথেষ্ট সময় এবং অর্থ ব্যয় করিয়াও কোন প্রতীকারের ব্যবস্থা না হওয়ায় কোম্পানী বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। এমন সময় এক জন এক নূতন উপায় অবলম্বনের পরামর্শ দিলেন। উপায়টি তেমন বিশেষ কিছু নয়; সহজে
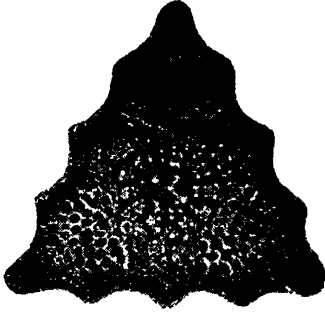
বাইডালফিয়া ক্রেনুলেটা নামক ত্রিকোণাকার ডায়েটম।
প্রায় ৩৫০ গুণ বড় করিয়া দেখান হইয়াছে।

চিনিতে পারা যায় সমুদ্রজলে এরূপ কতকগুলি জৈব পদার্থের সন্ধান করা। সমুদ্রজলে উপরে নীচে সর্ব্বত্র ডায়েটম নামে এইরূপ অগণিত জৈব পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। যে কোন স্থান হইতে কিছু জল তুলিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখিলেই তাহাতে বিচিত্র আকারের ডায়েটমের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের আকৃতি অতি ক্ষুদ্র হইলেও শক্ত কাচের আবরণে আবৃত বলিয়া মৃতই হউক আর জীবিতই হউক যে-কোন অবস্থাতেই চিনিতে পারা যায়। গুড়ের মধ্যে তো আর এই জৈব পদার্থের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না! সামান্য একফোঁটা গুড় ও জল—অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে পরীক্ষা করিলেই প্রকৃত ঘটনার হদিস মিলিতে পারে। সমুদ্রের জলের সঙ্গে এই পদার্থগুলি গুড়ের সহিত সমান ভাবে মিশিয়া থাকিবে। গুড়ের গাঢ়ত্বের দরুণ ইহারা নীচে থিতাইয়া পড়িতে পারিবে না। তা ছাড়া দুষ্কৃতকারীরা এই পরীক্ষার ব্যাপার জানিতে পারিলেও পাম্পের মুখে সূক্ষ্ম ছাঁকুনি বসাইয়া এই জৈব পদার্থের প্রবেশ রোধ করিতে সমর্থ হইবে না। কারণ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইহারা ছাঁকুনির ছিদ্রপথে জমিয়া গিয়া জলপ্রবেশ-পথ বন্ধ করিয়া দিবে। কোম্পানী এই পরিকল্পনানুযায়ী যে যে স্থান দিয়া মালবাহী জাহাজ যাতায়াত করে তাহার কয়েক শিশি জল ও বিভিন্ন জাহাজে আমদানী গুড় হইতে সামান্য নমুনা অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন—সমুদ্রজলে যে-সকল ডায়েটম রহিয়াছে গুড়ের মধ্যেও ঠিক সেই ডায়েটমই দেখা যাইতেছে। তখন আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না যে, গুড়ের সহিত সমুদ্রজল মিশ্রিত করা হইয়াছে। এই ভাবে ধরা পড়িয়া কয়েক জন পোতাধ্যক্ষের লাইসেন্স বাতিল হইবার ফলে এই ধরণের চুরির উৎপাত একদম বন্ধ হইয়া যায়। বিরাট ষড়যন্ত্রের ফলে একটা সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানী পথে বসিতে চলিয়াছিল;—বিপুল অর্থব্যয় ও রাসায়নিক পরীক্ষাও যাহার কোন সন্ধান করিতে পারে নাই—অতি সামান্য অদৃশ্য ডায়েটম তাহার সুরাহা করিয়া দিল।

ডায়েটম নামক পদার্থটা কি, এ-সম্বন্ধে একটা কৌতূহল জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষজ্ঞেরা কেহ কেহ বলেন—ডায়েটম ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একপ্রকার উদ্ভিজ্জকোষ বিশেষ। কিন্তু এ-বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। কেহ কেহ ইহাদিগকে আণুবীক্ষণিক প্রাণীর পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করেন। আবার কাহারও কাহারও মতে, ডায়েটম উদ্ভিদ ও প্রাণীর মাঝামাঝি একপ্রকার জৈব পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহারা জৈব পদার্থ বটে কিন্তু না উদ্ভিদ না প্রাণী। সাধারণতঃ ডায়েটম জলের মধ্যে নিশ্চল ভাবেই অবস্থান করে; কিন্তু কোন কোন
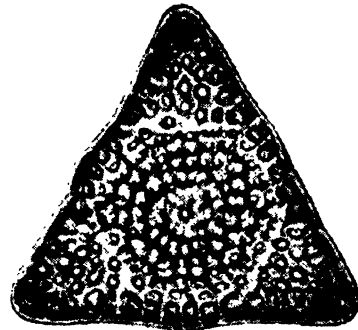
বাইডালফিয়া সেলুলোসাম নামক ডায়েটম

ডায়েটমের মৃদু-সঞ্চরণ-ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও সঞ্চরণ-ক্ষমতাই প্রাণীজগতের একমাত্র সুস্পষ্ট লক্ষণ নহে এবং অধিকাংশ প্রাণী সঞ্চরণ-ক্ষমতার অধিকারী হইলেও উদ্ভিদ্-জগতে যে এই দৃষ্টান্তের একান্ত অভাব এমন কথা বলা চলে না, তথাপি কোন

কোন ডায়েটমের বিস্ময়কর সঞ্চরণ-ক্ষমতা দেখিলে ইহা-দিগকে প্রাণী ছাড়া আর কিছু মনে করাই দুষ্কর হইয়া
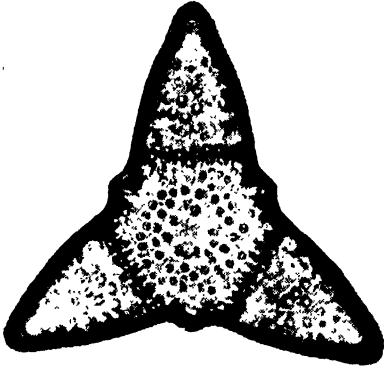
বাইডালফিয়া আর্টেঞ্জেলস্কিয়ানা নামক ডায়েটম

পড়ে। কলিকাতা ও তাহার আশেপাশে বিভিন্ন অঞ্চলের নালা, ডোবা ও পুকুর হইতে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে আমি কয়েক জাতের ডায়েটম সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ইহাদের মধ্যে দুই-একটির মৃদু-সঞ্চরণ-ক্ষমতা থাকিলেও অধিকাংশই নিশ্চল। কিন্তু গাছপালায় আবৃত অন্ধকার একটা ডোবার মধ্যে জলজ লতাপাতার গায়ে একদিন একটা অদ্ভুত পদার্থ দেখিতে পাইয়াছিলাম, অবশ্য মাইক্রসকোপের সাহায্যে। পদার্থটা দেখিতে এক বাণ্ডিল কাঠির মত। পরে জানিয়াছিলাম, এই অপূর্ব্ব আণুবীক্ষণিক পদার্থটি ব্যাচিলারিয়া প্যারাডক্সা নামক এক জাতীয় ডায়েটম। এই ডায়েটমের দ্রুত-সঞ্চরণশীলতা ও অপূর্ব্ব গতিভঙ্গী দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলাম। দেড়-শ হইতে দু-শ গুণ বড় দেখায় এরূপ যে-কোন মাইক্রস্কোপের সাহায্যে ইহাদিগকে পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্ধকারে অথবা ক্ষীণ আলোকে ইহারা নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে। তখন দেখিলে মনে হয় যেন কতগুলি সরু সরু কাঠি বাণ্ডিলের মত বাঁধা অবস্থায় পাতার গায়ে আটকাইয়া রহিয়াছে। আলোকের ঔজ্জ্বল্য একটু বৃদ্ধি করিলেই বাণ্ডিল হইতে পর-পর একটি-একটি করিয়া কাঠি এক দিকে প্রসারিত হইতে থাকে। একটা কাঠি কিছু দূর প্রসারিত হইলেই তাহার পরেরটা, পার্শ্ববর্ত্তী আর একটা কাঠির গায়ে পাশাপাশি ভাবে সংলগ্ন থাকিয়াই, কতকটা যেন পিছলাইয়া আরও খানিক দূর প্রসারিত হয়। এরূপে ক্রমে ক্রমে বাণ্ডিলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রত্যেকটি কাঠিই প্রসারিত হইয়া খুব বড় একটা লম্বা কাঠিতে পরিণত হয়। অতি অল্প সময়ের জন্য এ ভাবে লম্বা থাকিয়া পুনর্ব্বার বাণ্ডিলের অবস্থায় ফিরিয়া আসে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার বিপরীত দিক হইতে প্রসারিত হইতে থাকে। ক্রমাগত এইরূপ সঙ্কোচন-প্রসারণের ফলে সমগ্র পদার্থটাই বেশ দ্রুতগতিতে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া যায়। আলোকরশ্মির তীব্রতা বৃদ্ধি করিলে এই সঙ্কোচন-প্রসারণ-প্রক্রিয়া অপরূপ ভঙ্গীতে অধিকতর দ্রুত গতিতে চলিতে থাকে। তখন একই সময়ে দুই দিক হইতেই লম্বা হইতে থাকে এবং মধ্যস্থলও ঢেউএর আকারে উভয় দিকে সঙ্কুচিত এবং প্রসারিত হইতে হইতে দ্রুতগতিতে রশ্মিপথ হইতে সরিয়া পড়ে। রক্তবর্ণের আলোকসম্পাতে গতিভঙ্গীর জটিলতা হ্রাস পায়; অধিকন্তু সঙ্কুচিত ও প্রসারিত অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। বিভিন্ন আলোক প্রয়োগে এই জৈব পদার্থটির আরও অনেক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলাম। পূর্ব্বোক্ত কাঠির প্রত্যেক কাঠিই এক-একটি ডায়েটম। এই জাতীয় ডায়েটম পরস্পর সংলগ্ন হইয়া এইরূপ দলবদ্ধ-ভাবেই জীবন যাপন করিয়া থাকে। পরস্পর সংলগ্ন ভাবে থাকিবার ফলেই ইহাদের পক্ষে সঞ্চরণ-ক্ষমতা অর্জ্জন করা সম্ভব হইয়াছে। প্রত্যেকটি বাণ্ডিলে একাধিক ডায়েটম না থাকিলে ইহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। দুইটি হইতে আরম্ভ করিয়া তেত্রিশটি ডায়েটমে গঠিত ইহাদের বিভিন্ন বাণ্ডিল দেখিতে পাইয়াছি। যে-সকল বাণ্ডিলে দুইটি মাত্র ডায়েটম থাকে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুইটিকে আলাদা করিয়া দিলে উভয়েই অচল হইয়া পড়ে। এই সকল কারণেই ইহাদিগকে প্রাণীপর্য্যায়ভুক্ত মনে করা স্বাভাবিক।

পৃথিবীতে যে কতরকম অদ্ভুত আকৃতির ডায়েটম দেখিতে পাওয়া যায় তাহার হিসাব দেওয়া দুষ্কর। কোনটা দেখিতে ছুঁচের মত, কোনটা মাকুর মত, কোনটা নলের মত; কেহ তারকার মত আকৃতিবিশিষ্ট, কেহ ত্রিকোণাকার, কেহ চতুষ্কোণ, কেহ বা গোলাকার কৌটার

মত। এ পর্য্যন্ত দশ হাজারেরও উপর বিভিন্ন জাতীয় ডায়েটমের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ জলের উপর, কেহ বা জলের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় থাকে। অনেকেই জলের তলদেশে অবস্থান করে। অধিকাংশ ডায়েটমেরই শরীরের ব্যাস এক ইঞ্চির
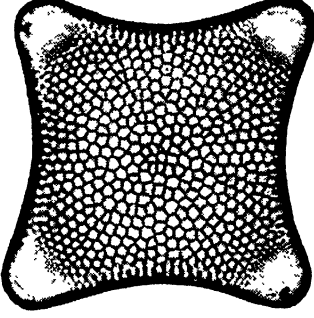
ট্রাইগোনিয়াম আর্কটিকাম নামক ডায়েটম। প্রায় ৪০০ গুণের উপর বড় করিয়া দেখান হইয়াছে।

আড়াই-শ ভাগের এক ভাগের বেশী হয় না; কিন্তু মাত্র কয়েক জাতের ডায়েটমের ব্যাস এক ইঞ্চির প্রায় ত্রিশ ভাগের এক ভাগ হইয়া থাকে। জলে দ্রবীভূত অতি সামান্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সিলিকা বা বালুকণা কোন অজ্ঞাত কৌশলে সংগ্রহ করিয়া ডায়েটম তাহার বহিরাবরণ তৈয়ারী করে। এই বহিরাবরণ কতকটা বাক্সের মত, ভিতরে ফাঁপা। বাক্সের খোলের উপর ডালা পরাইয়া দিলে যেমন চতুর্দ্দিক বন্ধ হইয়া যায়, ডায়েটমের বিচিত্র নমুনার বহিরাবরণগুলিও ঠিক সেইরূপ। বিচিত্র আকৃতি ও বিচিত্র কারুকার্য্যবিশিষ্ট খোলের উপর ঠিক একই রকম আকৃতি ও কারুকার্য্য বিশিষ্ট ডালাটি আঁটা। জোড়া মুখের চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া ফিতার আকার পর্দ্দা জড়ানো থাকে। চতুর্দ্দিক আবদ্ধ এরূপ একটা শক্ত আবরণের মধ্যে প্রাণবস্তু বাঁচে কেমন করিয়া? যদিও বা বাঁচে তথাপি বৃদ্ধি বা প্রজননকার্য্য চলে কিরূপে? প্রকৃতি তাহার বহিরাবরণটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া জীবনযাত্রানির্ব্বাহের উপযোগী যাবতীয় কার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এরূপ অপরিবর্ত্তনীয় আবদ্ধ দেহাবরণ আর কোন জৈবদেহে দেখা যায় না। প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবকোষ পেক্‌টিন, সেলুলোজ, প্রোটিন প্রভৃতি এমন কতকগুলি নমনীয় জৈব উপাদানে গঠিত যে, অভ্যন্তরস্থ প্রাণবস্তু বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের আবরণ বাহিরের যে কোন দিকে প্রসারিত করিয়া দিতে পারে। কিন্তু ডায়েটমের বহিরাবরণ অতিশয় কঠিন ও অনমনীয় বলিয়া অভ্যন্তরস্থ প্রাণবস্তুর উপরের দিক ছাড়া আর কোন দিকে বর্দ্ধিত হইবার উপায় নাই। অভ্যন্তরস্থ প্রাণবস্তু বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাক্সের ঢাকনার মত আবরণটি ঠেলিয়া বাহির হইতে থাকে। বাড়িতে বাড়িতে যখন পরিণত অবস্থায় উপনীত হয় তখন প্রাণপঙ্ক দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং এই দুই ভাগের মধ্যস্থলে পিঠে পিঠে ঠেসান দিয়া দুইটি নূতন আবরণী গড়িয়া ওঠে। অতঃপর পুরাতন আবরণীর অর্দ্ধাংশ ও নূতন আবরণীর অর্দ্ধাংশ লইয়া দুইটি নূতন ডায়েটম আলাদা হইয়া যায়। খোলের অভ্যন্তরেই এইরূপে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া প্রজনন-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় বলিয়া নূতন ডায়েটম দুইটি পুরাতনের অনুরূপ হইলেও আকারে কিঞ্চিৎ ছোট হইতে বাধ্য হয়। এইরূপ প্রজনন-প্রক্রিয়ার বিপদ এই যে, ক্রমশঃ ছোট হইতে হইতে কোন এক সময়ে ইহাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু সেরূপ বিপদের সম্ভাবনা এড়াইবার জন্য অন্য রকমের প্রজনন-প্রক্রিয়ার ব্যবস্থাও ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে। কোন
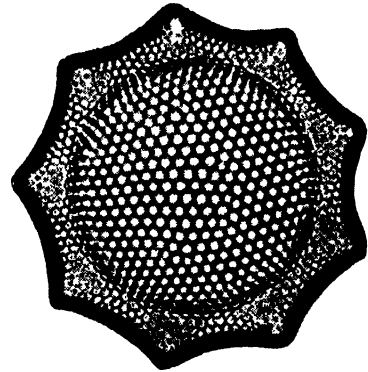
বাইডালফিয়া ইম্পেরিয়ালিজ নামক ডায়েটম। প্রায় ১৫০ গুণ বড় করিয়া দেখান হইয়াছে।

কোন ডায়েটম, প্রাণ-পদার্থ বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পুরাতন আবরণী সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে এবং

দ্বিধা বিভক্ত হইয়া অপেক্ষাকৃত বৃহদাকৃতির নূতন আবরণী গড়িয়া তোলে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার দুইটি ডায়েটম এক সঙ্গে মিলিত হয় এবং সম্মিলিত প্রাণপঙ্ক বর্দ্ধিত হইয়া পুরাতন আবরণ পরিত্যাগ করে। অতঃপর দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া বৃহদায়তনের নূতন দুইটি ডায়েটম জন্ম গ্রহণ করে।
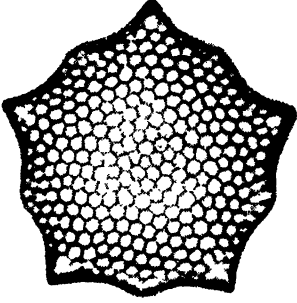
বাইডালফিয়া ক্যাম্পেচিয়ানা নামক ডায়েটম

অধিকাংশ ডায়েটমের আবরণের জোড়া মুখ দুইটি সরল রেখায় থাকে না। করাতের দাঁতের মত পর্য্যায়-ক্রমে উঁচুনীচু ভাবে থাকায় জোড়া মুখ খুব দৃঢ়ভাবে আঁটিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ দৃঢ়বদ্ধ খোলের মধ্যে থাকিয়া ইহারা খাদ্য সংগ্রহ বা নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য চালায় কিরূপে? ইহাদের ক্ষুদ্র আবরণীর গায়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রপথেই তাহারা জলে দ্রবীভূত ভক্ষ্যবস্তু আহরণ এবং নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। বিভিন্নজাতীয় ডায়েটমে এই ছিদ্রগুলিও বিভিন্ন প্যাটার্নে সজ্জিত। পেকটিন-জাতীয় পদার্থের পর্দ্দায় ছিদ্র মুখ আবৃত থাকে। ইহাদের মধ্য দিয়া বাহিরের দ্রবীভূত পদার্থ ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে; কিন্তু ভিতরের পদার্থ বাহিরে যাইতে পারে না।

শত শত বৎসর ধরিয়া সাগর-মহাসাগর-হ্রদের জলের নীচে থিতাইয়া পড়িয়া এই সকল ডায়েটমের অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঙ্কাল বহুদূরব্যাপী পুরু স্তর রচনা করিতেছে। এক কালে যেখানে সমুদ্র বা ঐরূপ কোন সুবিস্তীর্ণ জলাশয়ের অস্তিত্ব ছিল প্রাকৃতিক দুর্ব্বিপাকে হয়ত তাহা শুষ্ক ভূমিতে পরিণত হইয়াছে, এরূপ স্থলে প্রায়শঃই ডায়েটম-কঙ্কালগঠিত বিরাট মৃত্তিকাস্তরের সন্ধান পাওয়া যায়। বহিরাবরণের অভ্যন্তরস্থ জীববস্তু কবে মরিয়া পচিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে; কিন্তু কঠিন সিলিকা-নির্ম্মিত কঙ্কালগুলি এখনও অবিকৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ইহাই ডায়েটম-ঘটিত মৃত্তিকা, অতি মিহি ও হাল্কা উজ্জ্বল তুষারশুভ্র পদার্থ। রোদের সময় এই মৃত্তিকাস্তরের দিকে চাহিতেই চোখ ঝলসিয়া যায়। এজন্য কুলি-মজুরেরা রঙীন কাচের চশমা পরিয়া এই মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়া থাকে। ডায়েটম-ঘটিত মৃত্তিকার ব্যবহার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, সামান্য লবণদানী প্রস্তুতের মসলা হইতে আরম্ভ করিয়া গুরুতর বিস্ফোরণ-নিরোধক পদার্থ-রূপে ইহার প্রয়োজনীয়তা যে কত ভাবে অনুভূত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

জলীয় বাষ্প শোষণ করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে বলিয়া ইহার সাহায্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় বহুবিধ পাত্রাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। মূল্যবান ধাতুপাত্রাদি পরিষ্কার করিতে ডায়েটম-ঘটিত মৃত্তিকা অপরিহার্য্য। এসিড প্রভৃতি ক্ষয়কারী পদার্থ স্থানান্তরিত করিবার সময় পাত্রের চতুর্দ্দিকে ডায়েটম চূর্ণ বিছাইয়া দেওয়া হয়। এসিড চুয়াইয়া বা উপচাইয়া পড়িলে ডায়েটম তাহা সম্পূর্ণরূপে শোষিয়া লয়, তরল গ্যাসোলিন জ্বালাইয়া অগ্নুৎপাদন করিতে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, এই দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য তরল গ্যাসোলিন ডায়েটম-ঘটিত মৃত্তিকায় শোষিত করাইয়া কঠিন ইষ্টকখণ্ডের ন্যায় অতি সহজে ব্যবহার করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত ষ্টোভের মত একপ্রকার উনুনের সাহায্যে অনায়াসে ইহাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে পারা যায় অথচ কোন রকম বিপদের আশঙ্কা তাহাতে নাই। চিনি পরিশ্রুত করিবার ছাঁকুনিরূপে সাফল্যের সহিত ডায়েটম ব্যবহৃত হইতেছে। রং ও তরল আলকাতরায় ডায়েটম মিশাইয়া তাহার সাহায্যে অনেক অভিনব কার্য্য সংসাধিত হয়। প্রতিশব্দ-নিরোধক গৃহ প্রস্তুতের জন্য প্রচুর পরিমাণে ডায়েটম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিশ্ববিশ্রুত নোবেল-পুরস্কার-প্রদাতা আলফ্রেড নোবেল নাইট্রো-গ্লিসারিন নামক ভীষণ প্রকৃতির বিস্ফোরক পদার্থ আবিষ্কার করিয়া তাহা নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহারের জন্য ডায়েটম-ঘটিত

['দ্বীপময় গ্রীস' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃ. ২১১]

পার্লামেণ্ট ভবন, এথেন্স

প্রাচীন গ্রীসের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আধুনিক পদ্ধতিতে নির্ম্মিত প্রাথমিক-বিদ্যালয়, এথেন্স

গ্রীক শিল্পকলার বিখ্যাত নিদর্শন, ভিনাসের মর্ম্মরমূর্ত্তি
লুভ্‌র্‌ কলাশালা, প্যারিস

ট্রয়ের পুরোহিত লাওকোন দুই পুত্রকে সর্পের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছে
ভাটিকান চিত্রশালা, রোম

মৃত্তিকার সাহায্যেই কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কয়লার খনি, করাত কল, ময়দার কল, শস্যপেষাই কারখানায় অনেক সময় আকস্মিক বিস্ফোরণের ফলে অনেক দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। ইহাকে ধূলিকণার বিস্ফোরণ বলা হয়। সহজদাহ্য পদার্থের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গুঁড়ায় যখন আবদ্ধ স্থান ভর্ত্তি হইয়া উঠে তখন আশেপাশে যে কোন স্থানে সামান্য একটু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হইলেই মুহূর্ত্তের মধ্যে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটিয়া যায়। এই সকল কলকারখানার দেওয়ালের গায়ে ডায়েটম-ঘটিত মৃত্তিকা ছড়াইয়া রাখিলে বিস্ফোরণ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না, কারণ ইহারাও ধূলিকণার সহিত মিশিয়া থাকে বলিয়া কোন এক স্থানে উত্তাপ বৃদ্ধি পাইবামাত্রই তাহা নিজ দেহে শোষিয়া লয়, কাজেই উত্তাপ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে পারে না বলিয়াই বিস্ফোরণ ঘটিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত আরও কতভাবে যে ডায়েটমের ব্যবহার হইতেছে তাহার হিসাব দেওয়া দুষ্কর।

এই যান্ত্রিক উৎকর্ষের দিনে মানুষ মাকড়সার সূত্রের মত সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে, কোয়ার্টজের মত কঠিন পদার্থের মধ্যে সেই সূক্ষ্ম সূত্র বুনিতে সক্ষম হইয়াছে, হীরকের মত কঠিন বস্তুর মধ্যে অদৃশ্য প্রায় সূক্ষ্ম ছিদ্র করিতে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, কৃত্রিম উপায়ে মৌমাছির মধুচক্র গঠনে সফলতা অর্জ্জন করিয়াছে, কঠিন পদার্থকে ডায়েটম অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর চূর্ণে পরিণত করিয়াছে কিন্তু একটি কাজ সে করিতে পারে নাই—পারিবেও না বোধ হয় সেটি হইতেছে—ডায়েটমের মত সূক্ষ্ম অথচ ফাঁপা কণিকা।

ধরিত্রীর প্রেম

শ্রীকমলরাণী মিত্র

এই ধরণীর প্রতি ধূলিকণা আমারে বেসেছে ভালো
তাই মোর বুকে জমিয়া উঠেছে অফুরাণ ভালবাসা ;
প্রতিদিন দুটি নয়নের আগে জ্বালায়ে প্রেমের আলো
মুখর করেছে আমার মুখের যত গান, যত ভাষা !
নিখিল গগনে অসীম নীলিমা বিছায়ে মেলিয়া রাখি,
আঁখিতে বুলালো চাঁদের স্বপন, দূরের স্বপন-মায়া
গান গেয়ে গেয়ে গগন-সীমায় অনিমিখ চেয়ে থাকি ;—
বেলা ব'য়ে যায়, ক্রমশ ঘনায় গোধূলি সন্ধ্যাছায়া।
ধূলায় মাটিতে, কুসুমে ও তৃণে, শ্যাম-পল্লবদলে
তারায় তারায় লক্ষ যুগের যতেক কাহিনী লিখা,
সে সকলি শুধু আমারে গোপনে ভালবাসিবারই ছলে,
আমারি লাগিয়া চির-অম্লান প্রেমের আরত্রিকা ॥

ফিরে ফিরে তাই জনমে জনমে আবার ফিরিয়া আসি,
বেঁচে থেকে ভাবি যেন আর কভু ছেড়ে যেতে নাহি হয়
দুখে সুখে এই জীবন ভরিয়া কত কাঁদি কত হাসি
তবুও মরণ মাগিতে পারি না—জীবনেরই গাহি জয়।
পথে প্রান্তরে গিরিকান্তারে সুবিপুল সমারোহে
আমার লাগিয়া থরে থরে রাখা আনন্দ-আয়োজন ;
রজনীগন্ধা, বকুল-গন্ধ কত যে এনেছে বহে
মধুর মদিরা মাধুরী-বিলাস রোমাঞ্চ-শিহরণ !
আকাশে বাতাসে গন্ধে ও গানে নিত্য বাঁচিতে চাই
গলায় দুলায়ে বাসর-রাতের মাধবী ফুলের মালা ;
শুধু হেসে হেসে শুধু ভালবেসে নাচিয়া গাহিয়া যাই
দু-হাতে ছড়ায়ে গীত-পারিজাত সুরভি-গন্ধ ঢালা ॥

ভাবী ভারতের জয়িষ্ণু ধর্ম

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম. এ.

ধর্ম সার্বভৌমিক বস্তু। সর্ব মানবের জন্য ও সকল যুগের জন্য ধর্ম এক ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু সেই এক ও অপরিবর্তনীয় বস্তুও মানবসমাজের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় নব নব ভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

ঈশ্বর কখনও কখনও কোন দেশকে, কোন জনমণ্ডলীকে, তাঁহার পবিত্র আশীর্বাদরূপে এক-একটি বিশেষ মহান্ দুঃখ প্রদান করেন, এক-একটি বিশেষ মহৎ সংগ্রামে নিক্ষেপ করেন। প্রাণবান্ সমাজের মানুষ নানা ভাবে তাহার প্রত্যুত্তর দেয়, তাহাতে respond করে। বর্তমান দুঃখ-সংগ্রামের স্পর্শে ও ভবিষ্যৎ কর্তব্যের আহ্বানে ভারতবাসীর মন ধর্ম বিষয়ে কি ভাবে সাড়া দিলে তাহা শ্রেষ্ঠ হয়, ভারতবাসীর মনের ধর্মচেতনা কি আকার ধারণ করলে তাহা ঐ নব সংগ্রামের ও নব অবস্থার উপযোগী হয়, এবং ক্রমে ক্রমে তাহা জয়িষ্ণু আকার ধারণ ক'রে ভারতে ব্যাপ্ত হ'তে পারে, সে-বিষয়ে চিন্তা করা একান্ত আবশ্যক।

জগতের প্রতি শ্রদ্ধা

প্রাচীন কালে ধর্ম মানুষের মনকে প্রধানতঃ পূজা-অর্চনার প্রণালী অথবা তত্ত্বরাজ্যের ও ভাবরাজ্যের উচ্চ-শিখরে বিহার করবার প্রণালী শিক্ষা দিতেন। যেন পরলোকের জন্য প্রস্তুত ক'রে দেওয়াই ধর্মের একমাত্র অথবা প্রধান কাজ ছিল। এই ভাব ক্রমশঃ হ্রাস হ'য়ে আসছে। ভাবী ভারতের জয়িষ্ণু ধর্ম সংসারকে যে শুধু অবজ্ঞা করবেন না, তাই নয়, সংসারকে সম্মান করবেন। সংসারই আমাদের কার্যক্ষেত্র; এই ক্ষেত্রেই আমাদের মহত্ত্বের বা ক্ষুদ্রতার পরীক্ষা হয়। এই সংসারকে শ্রদ্ধা ক'রে এখানে খাটতে হবে। ভাবী যুগে যোগ-ধ্যানের, তত্ত্বজ্ঞানের, ভক্তি-প্রেমের, বৈরাগ্যসাধনের প্রধান পরীক্ষা এই হবে যে, এ সকলের সাধনা মানুষকে ইহলোকে কল্যাণ কর্মে সফল ক'রে তুলতে পারছে কি না। অন্তর্লোকের সম্পদ পরীক্ষিত হবে ও ব্যবহৃত হবে বহির্জগতে; ভাব-সম্পদের পরীক্ষা হবে মধুর চরিত্রে ও মানবপ্রীতিতে।

কৃতজ্ঞতা ও প্রফুল্লতা

এই কারণে ভাবী ভারতের জয়িষ্ণু ধর্মকে কৃতজ্ঞতা ও প্রফুল্লতার উপরে, আনন্দ ও উৎসাহের উপরে জোর দিতে হবে। প্রাচীন কালের সেই দুঃখবাদকে এবং সংসার সম্বন্ধে নির্লিপ্ততাকে জয়িষ্ণু ধর্ম আর ধর্মের অঙ্গ ব'লে মনে করবে না; অসুস্থ মনের লক্ষণ ব'লেই মনে করবে। এই জগতেই আমরা জীবিত থাকি, বাস করি, উঠি-পড়ি, হাসি-কাঁদি। এই জগতেই মানুষকে ভালবাসি ও মানুষকে ভালবেসে ঈশ্বরকে ভালবাসবার পথে প্রথম পা ফেলতে শিখি। এই জগৎ, এবং এই জগতে সুখে দুঃখে যাপিত আমাদের জীবন, উভয়েরই জন্য আমরা কৃতজ্ঞ ও প্রফুল্ল থাকব। হাসিমুখ ও প্রফুল্লতা আমাদের স্বভাব হবে। এই জগতে জীবিত থাকা, অথচ একে ভাল না বলা, ভাল না বাসা, খুশীমনে জীবিত না থাকা,—এ লক্ষণটি আর কোন দিন ধর্মের লক্ষণ রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে ব'লে আমার মনে হয় না। বরং ভাবী যুগের ধর্মে মরণোন্মুখ সাধু পুরুষও এই পৃথিবীকে ভালবাসা জানিয়ে, এই পৃথিবীর রূপরসগন্ধ-স্পর্শশব্দের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, পৃথিবী থেকে বিদায় লবেন।

মনুষ্যত্ব

ভাবী ভারতে জয়িষ্ণু হ'তে হ'লে ধর্মের একটি লক্ষণ হবে মানুষে মনুষ্যত্ব সঞ্চার করা এবং মানুষের মনুষ্যত্বের সকল বাধা দূর করা। "নিজের পথ নিজেই দেখে লব, নিজের কর্তব্য নিজেই ঈশ্বরের আলোকে নির্ণয় করব", এ প্রবৃত্তির অণুমাত্র হ্রাস হ'লেও মানুষের মনুষ্যত্ব খর্ব হ'তে থাকে।

মনুষ্যত্বের প্রধান মন্ত্র, স্বাধীন বিবেক। কিন্তু বর্তমান যুগে যেন নানা কারণে এ-মন্ত্রটি ক্ষীণ হ'য়ে আসছে। একটি কারণ এই যে, বর্তমান যুগে দলবদ্ধ কাজের বড় প্রাধান্য হয়েছে। এর ফল এই দাঁড়াচ্ছে যে দলের বা দলের নেতার নির্দেশ অবিচারে মান্য করতে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা ভোটের দ্বারা দল গঠনের সময়ে এই প্রণালীর প্রয়োজন থাকতে পারে বটে; প্রয়োজন থাকলেও তাহা সমর্থনযোগ্য কি না, সে বিচারে প্রবৃত্ত হব না। কিন্তু মানবের অন্তর-ক্ষেত্রে ও ধর্মক্ষেত্রে এই প্রণালী বিষবৎ পরিত্যাজ্য। এ প্রকার কাজ বিবেককে নিষ্প্রভ ক'রে মনুষ্যত্বকে খর্ব করে।

দ্বিতীয়তঃ, কোন মানুষের মধ্যে কোন দিক্ দিয়ে অসাধারণত্ব প্রকাশ পেলে সে-মানুষকে অতি-মানব, অথবা অভ্রান্ত মানব অথবা অবতার ক'রে নেবার একটি প্রবৃত্তি দেশে প্রকাশ পাচ্ছে। এমন কি, তাঁর ছবি বা মূর্তিকে ঈশ্বর বোধে পূজা করবার প্রবৃত্তিও দেখা দিয়েছে। এই শ্রেণীর সমুদয় আতিশয্যের মূলে থাকে, ব্যক্তিগত বিবেকের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব, এবং তার ফলে মনুষ্যত্বের অভাব। ভারতে নবযুগের জয়িষ্ণু ধর্মের বুলি হবে, "নিজের স্বাধীন বিবেককে সম্মান কর, নিজের মনুষ্যত্বকে সম্মান কর।"

এই মনুষ্যত্ব ও এই স্বাধীন বিবেকপরায়ণতা হ্রাস হয়ে গেলে শুধু যে ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষতি হয়, তাই নয়; দলের সম্প্রদায়ের ও জাতির জীবনেরও গুরুতর ক্ষতি হয়। আমাদের দেশের অবস্থা কিরূপ? মানুষের মনের মধ্যে এখনও এত নিগড়, আহারে ব্যবহারে এখনও বাহ্য আচারের এত দাসত্ব, নিজের ধর্মকর্মের ভার অন্যকে দিবার রীতি এখনও এত প্রবল যে, এ জাতিকে বয়স্ক মানুষের জাতি না ব'লে খোকার জাতি বলতে ইচ্ছা হয়। এই খোকার জাতিটাকে মানুষের জাতি ক'রে গ'ড়ে তুলতে হ'লে ভাবী ভারতে ধর্মকে একটি প্রবল মনুষ্যত্ব-সঞ্চারকারী শক্তি হয়ে দণ্ডায়মান হ'তে হবে।

যে-ধর্ম মানুষকে বলবে, "তোমার নেতা, তোমার পরিচালক, তোমার অন্তরে আছেন, বাহিরে নাই"; যে-ধর্ম অন্তরবাসী সেই দেবতার বাণীকে মানবমনে সর্বপ্রধান ক'রে তুলবে; যে-ধর্ম মানুষকে পরাক্রান্তের কাছে ভয়ে লুণ্ঠিত মস্তক পুনরায় উন্নত ক'রে তুলতে শিখাবে; যে-ধর্ম মানুষকে অধিকাংশের ভয় হ'তে মুক্ত ক'রে দিয়ে প্রয়োজন হ'লে একা দাঁড়াবার বীর্য প্রদান করবে, ভাবী ভারতে পুনরায় এইরূপ মনুষ্যত্ব-সঞ্চারকারী ধর্ম প্রচার করা চাই।

এইরূপ ধর্ম বর্তমান কালে এ দেশে একবার প্রচারিত হয়েছিল। তখন দেশে 'বিবেক' কথাটি রাজনীতিতেও সম্মানিত ছিল; তখন তাহার ফলে ৩০ কোটির মধ্যে অন্ততঃ কয়েক সহস্র মানুষের মত মানুষ ভারতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার পর সে দিন চ'লে গিয়েছে। যে-যুগসন্ধিতে আমরা দণ্ডায়মান, তাহাতে পাশ্চাত্য সভ্যজগতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লুপ্ত করবার একটি প্রয়াস চলছে। ভারতেও স্বাধীনতা-সংগ্রামে, কল্যাণ-কর্মে, এমন কি ধর্মসমাজে পর্যন্ত, যেন আবার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ও মনুষ্যোচিত বিবেকপরায়ণতার স্থান লুপ্ত হ'তে যাচ্ছে। যে-ধর্ম ভারতকে নূতন জয়িষ্ণু জীবন দান করবে, তাকে পুনরায় বিবেকপরায়ণতার ও মনুষ্যত্বের ভিত্তিতে দণ্ডায়মান হ'তে হবে।

জলের স্রোত কোন্ দিকে প্রবাহিত হয়, ভাসমান তৃণখণ্ড তাহা ব'লে দেয়। ভাসমান একটি কুটোর মত, স্রোত কোন্ দিকে বয় তা দেখিয়ে দেওয়াই ধর্মের কাজ নয়; কিন্তু দরকার হ'লে স্রোতে বাঁধ দেওয়া, স্রোতকে ফিরানো ধর্মের কাজ।

পূর্বে নানা প্রসঙ্গে আমি বলেছি, বর্তমান জগতে মানবের শ্রদ্ধাশক্তির অপব্যবহারই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মানুষের মনুষ্যত্বকে খর্ব ক'রে দিচ্ছে, নৈতিক ঐকান্তিকতাকে ম্লান ক'রে দিচ্ছে। পূর্বে বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, চৈতন্যদেব প্রভৃতির, অথবা পরোপকার-পরায়ণ মহামনা পুরুষ ও নারীদের জীবনী চিত্র ও প্রসঙ্গই সাহিত্যকে অলংকৃত করত, আলাপকে উন্নত করত। এখন তাঁদের স্থান অধিকার করছে অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ। যে সম্মান ধর্মজীবনের প্রাপ্য, লোকহিতের প্রাপ্য, ঋষি-দৃষ্টির প্রাপ্য ছিল, তা যখন অভিনয় শিল্প কিংবা ব্যবসায়ে সফলতার পায়ে ঢেলে দেওয়া হয়, তখন সুস্থ মানবমনের

কর্তব্য হয় তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচার করা। আগামী যুগে সতেজে এই বিদ্রোহ প্রচার না করলে দেশে বীর্যবান্ মনুষ্যত্ব নূতন ক'রে জন্মাবে না; যা আছে তাও ক্রমশঃ ম্লান হয়ে যাবে। এ বিষয়ে অধিকাংশের অপ্রিয় হবার সাহস ধর্মকে পুনরায় অর্জন করতে হবে।

দুঃখ ও সংগ্রামে দৃঢ়তা

মনুষ্যত্ব সঞ্চার বিষয়ে আর একটি কথা এই যে, ভাবী ভারতের জয়িষ্ণু ধর্মের পক্ষে আর শুধু করুণ হ'লে চলবে না; তাকে প্রয়োজনানুরূপ কঠোরও হ'তে হবে। যে-বাড়ীর অভিভাবকগণের অভিপ্রেত থাকে যে ছেলেদের সৈনিক রূপে শিক্ষিত করবেন, সে-বাড়ীতে সে ছেলে-গুলিকে তাদের দিদিমার কাছে অধিক দিন রাখা হয় না; একটু প'ড়ে গেলেই, একটু আঘাত লাগলেই, যিনি 'আহা' বলবেন, গায়ে হাত বুলিয়ে দিবেন, এমন কোমল প্রকৃতির গুরুজনের কাছে অধিক দিন রাখা হয় না। শীঘ্রই তাদের কঠোরতর শিক্ষকের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়।

মানুষের সুখ-দুঃখের জীবনের উপরে ধর্মের একটি করুণ দৃষ্টি আছে। তাহাই আমাদের চির-পরিচিত। বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্যদেব, ইঁহারা মানবজীবনের বিবিধ দুঃখে পরম ব্যথায় ব্যথিত হয়ে, সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়ে, ধর্মকে মানবের নিকটে শান্তির আকারে সান্ত্বনার আকারে উপস্থিত করেছিলেন। ধর্মের শান্তি, ধর্মের সান্ত্বনা, রোগে শোকে সংসার-সন্তাপে করুণাময়ী পরমজননীর স্নেহকোলে আশ্রয়,—এ সকল ধর্মরাজ্যের অমৃতময় অনুভূতি। এ সকলের দ্বারা যুগে যুগে অগণ্য দুঃখী তাপী কত বল কত আশা লাভ করেছে। ধর্মের এই করুণ মূর্তির সম্মুখে আমাদের মস্তক সহজেই নত হয়।

কিন্তু আজ যে আমাদের এ ভারতে অন্যরূপ দিন উপস্থিত! এখন যে আমাদিগকে অশেষ লাঞ্ছনা অন্তর্বিচ্ছেদ দণ্ড কারাবাস প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যেতে হবে। ঈশ্বর তাঁর আশীর্বাদ রূপে এক-এক সময়ে এক-এক দেশের ও এক-এক জাতির জীবনে অনেক দণ্ড ও লাঞ্ছনা আনয়ন করেন। আমরা বর্ত্তমান ভারতের অপমান বিচ্ছিন্নতা ও অধোগতির জন্য অনেক দুঃখ করি বটে; কিন্তু এ দুঃখলাঞ্ছনা আমাদের আরও অনেক প্রাপ্য রয়েছে। সে প্রাপ্য দুঃখ লাঞ্ছনাকে ভগবানের দণ্ডপ্রসাদ ব'লে গ্রহণ করতে হবে। আমরা এক বার স্মরণ ক'রে দেখি, যুগযুগান্তরে আমরা নিম্নশ্রেণীর মানুষদের কত পদদলিত করেছি; একই ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত বিভিন্ন শাখার মধ্যে সামান্য প্রণালীভেদ নিয়ে কত লড়াই করেছি; বহুবিবাহের দ্বারা এবং বাধ্যতামূলক চিরবৈধব্যের দ্বারা নারীর কত অবমাননা করেছি; পুরাতন 'নাচ' হ'তে আরম্ভ ক'রে বর্তমান কুৎসিত আমোদ পর্যন্ত, নানা প্রণালীতে জাতীয় প্রকৃতিকে কত দূষিত করেছি। এ সকলের একটিরও প্রায়শ্চিত্ত এখনও শেষ হয় নাই। আমাদের সম্মুখে এখনও অনেক দুঃখ অনেক সংগ্রাম অবশিষ্ট রয়েছে। তাহা আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য।

এ সকল সংগ্রাম মনুষ্যোচিত ভাবে বহনের জন্য দেশবাসীর মনকে প্রস্তুত ক'রে, সংকল্পকে দৃঢ় ক'রে, শরীর-মনের সকল শক্তিকে উদ্যত ক'রে দিবে কে? উত্তেজনার আকারে নয়, কিন্তু শান্ত অথচ দৃঢ় তপস্যার আকারে জাতীয় জীবনে এই সকল সংস্কার সাধন করবে কে? এই দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামে জাতীয় চরিত্রে সৈনিকের অনুরূপ একটি ভাবজাগিয়ে রাখবে কে?—ভাবী ভারতে জয়িষ্ণু হ'তে হ'লে ধর্মকেই ইহা করতে হবে।

দুঃখের সম্বন্ধে ধর্মের একমাত্র ভাব, করুণা সহানুভূতি ও সান্ত্বনা নয়। দুঃখলাঞ্ছনা ও দণ্ড সম্বন্ধে ধর্মের প্রাচীন করুণ শিক্ষার সঙ্গে এ যুগে যুক্ত ক'রে নিতে হবে, সৈনিকের ন্যায় আনন্দে দুঃখবরণের আদর্শটি। এ যুগেও যদি ধর্ম প্রাচীন আদর্শের অনুসরণে আমার দৃষ্টান্তে বর্ণিত দিদিমার মত আমাদের দুঃখ-বেদনা-দণ্ডের উপরে কেবল কোমল হাত বুলাতে চান, তবে আমাদের বলতে হবে, "না! এ ধর্মে আমাদের কুলাবে না। আমরা চাই ধর্ম আমাদিগকে সৈনিকের কঠোরতা শিক্ষা দিন।" আমরা কবির ভাষায় ঈশ্বরকে বলতে চাই,—

> অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো, সেই ত তোমার আলো।
> সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো, সেই ত তোমার ভালো
> পথের ধূলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ, সেই ত তোমার গেহ।
> সমরঘাতে অমর করে রুদ্র নিঠুর স্নেহ, সেই ত তোমার স্নেহ।

ঐক্য

ভারতে ভিন্ন ভিন্ন রক্তের, ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার, ভিন্ন ভিন্ন ভাষার, ভিন্ন ভিন্ন সমাজরীতির সমাবেশ হয়েছে। এই বৈচিত্র্য বস্তুতঃ দুর্বলতার কারণ নয়; ইহা বলেরই উপাদান হ'তে পারে। কিন্তু ইহা স্পষ্ট যে এই বিচিত্রতাময় ভারতে জাতীয় জীবন গ'ড়ে দিতে হ'লে ইহার ভাবী জয়িষ্ণু ধর্মকে একটি প্রবল মিলনাগ্রহসম্পন্ন ও মিশ্রণশক্তিসম্পন্ন ধর্মরূপে আত্মপ্রকাশ করতে হবে। প্রচলিত যে-ধর্মে এই মিলনাগ্রহ ও মিশ্রণশক্তি যে পরিমাণে সতেজ, সে-ধর্ম সেই পরিমাণে ভাবী ভারতে মানুষের কাজে আসবে এবং মানুষের চিত্তকে জয় করবে। যে-ধর্মে যে-পরিমাণে স্বদলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ভাবটি প্রবল, সে-ধর্ম সেই পরিমাণে ভাবী ভারতের পথের কণ্টকস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে, এবং মানুষের অশ্রদ্ধার বস্তু হ'য়ে পড়বে। এ যুগে যদি কেহ এই স্বপ্ন দেখেন যে ভারতে হিন্দু-প্রধান অথবা মুসলমান-প্রধান ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র স্থাপিত হয়ে স্থায়ী হ'তে পারে, তবে তাঁকে বলতে ইচ্ছা হয়, নদীর জল সাগরে গমন করবে, ইহা যেরূপ অনিবার্য ও নিশ্চিত, ভাবী ভারতে এক-জাতীয়তার আদর্শটি জয়যুক্ত হবে, ইহাও তেমনই অনিবার্য ও নিশ্চিত। নদীর জলকে বাধা দিয়ে তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া যায়, দেরী করিয়ে দেওয়া যায়; কিন্তু সাগরে গমন নিবারণ করা যায় না। তেমনই ভারতে এক-জাতীয়তার স্রোতটিকে বাধা দিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেওয়া যায়, দেরী করানো যায়; কিন্তু সেই স্রোতকে বন্ধ করবার সাধ্য কারও নাই। ভাবী ভারতে প্রত্যেক ধর্ম সেই পরিমাণে জয়িষ্ণু হবেন, যে পরিমাণে এ সত্যকে সম্মান দান ক'রে চলবেন।

ভক্তিসাধনার পথে ঐক্য

কিছু কাল হ'তে প্রায় প্রত্যেক প্রচলিত ধর্মেই নবীনদের দ্বারা প্রণোদিত নানা নব ধর্মান্দোলন দেখা দিয়েছে। ভাবী ভারতে এই নব ধর্মান্দোলনসমূহ কি প্রণালীতে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবে ভারতের এক-জাতীয়তার সহায়তা করতে পারেন, স্বর্গগত আচার্য ও প্রথিতনামা সাহিত্যিক শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা আমি তাহা প্রকাশ করতে ভালবাসি। একটি ভাল ব্যঞ্জন রান্না হ'লে আগুনের জ্বালে তার আলু বেগুন পটোল প্রভৃতি প্রত্যেকটি উপাদানের রস প্রত্যেকটিতে প্রবেশ করে। প্রত্যেকের রসে প্রত্যেকেরই স্বাদ বাড়ে। ভাবী ভারতে প্রত্যেক নব্য ধর্মান্দোলনকে সেইরূপ একটি কাজ করতে হবে।

ধর্মের রান্নাঘর কোথায়? তাহার মতে নয়, তাহার পূজার প্রণালীতে নয়, তাহার রীতিনীতিতে নয়; কিন্তু তাহার সাধু-ভক্তদের জীবনে। ধর্মের রস, ধর্মের স্বাদ সাধু-ভক্তদের জীবনেই থাকে, তাঁদের হৃদয়নিঃসৃত ভক্তি-ধারাতেই থাকে। ভারতের সমুদয় সম্প্রদায় হ'তে উত্থিত নব্য ধর্মান্দোলনসকল শুধু স্বসম্প্রদায়ের সাধু-ভক্তদের নয়, কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের সাধু-ভক্তদের চরিত্রের রস, ভক্তিপ্রেমের রস, একত্র মিশ্রিত করুন, ও ভারতে তাহা পরিবেশন করুন। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার সেই দৃষ্টান্তটির ব্যাখ্যাসূত্রে বলেছিলেন, ভাল রান্না করা ব্যঞ্জনের আলুকে চেখে দেখ, দেখবে, তাতে পটোলের ও বেগুনের স্বাদ মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে। তেমনই নবযুগে ভারতের প্রত্যেক নব্য ধর্মান্দোলন ভারতে প্রচলিত সকল ধর্মসম্প্রদায়ের সাধু-ভক্তদের সাধনামৃত আপনাতে একত্র করুন; যেন ঐ নব্য ধর্মান্দোলন-সকলের ফলে ভাবী ভারতে ভাল হিন্দুতে স্বীয় ধর্মরস ব্যতীত ইসলামের ও খ্রীষ্টীয় সাধনার রস পাওয়া যায়, ভাল মুসলিমে স্বীয় ধর্মরস ব্যতীত উপনিষদের ও বাইবেলের রস পাওয়া যায়, ভাল খ্রীষ্টানে স্বীয় ধর্মরস ব্যতীত চৈতন্যদেবের ও মহম্মদের সাধনার রস পাওয়া যায়। যদি নব্য ধর্মসম্প্রদায়সকল ধর্মের উত্তাপে মানুষগুলির হৃদয় শ্রদ্ধাভক্তিতে বিগলিত ক'রে দিতে পারেন, ও সেই বিগলিত শ্রদ্ধা ভক্তির দ্বারা সকল ধর্মের সাধু-ভক্তগণের হৃদয়ামৃতকে আপনার ক'রে নিতে পারেন, তবে তাহাই হবে ভাবী ভারতের ঐক্যের প্রধান উপকরণ।

উপরে বলা হয়েছে, ভারতের মানব-বৈচিত্র্য প্রকৃত পক্ষে ভারতের দুর্বলতার কারণ নয়। যদি এইরূপ মিলনাগ্রহ-

সম্পন্ন ও মিশ্রণশক্তিসম্পন্ন কয়েকটি প্রবল ধর্মান্দোলন দেশে প্রবাহিত থাকে, তবে বৈচিত্র্যই আমাদের বলের কারণ হবে। ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে পৃথিবীর মিশ্র জাতিরাই সর্বাপেক্ষা দৃঢ় জাতি। যদি ভারতে একটি প্রবল মিশ্রণশক্তি থাকে, তবে ভাবী যুগে ইতিহাসের এই সত্যটি ভারতেও আবার প্রমাণিত হবে।

বিজ্ঞানের সাক্ষ্যও এইরূপ। ভূগর্ভস্থ অগ্নির প্রবল আলোড়নে ফেল্‌স্পার, কোয়ার্টস্‌, অভ্র (folspar, quartz, mica) প্রভৃতি বিভিন্ন খনিজ পদার্থের কণা একত্র মিশ্রিত হ'য়ে যায়; পরে তাহা ভূস্তরের চাপে অতি দৃঢ় অথচ অতি মসৃণ গ্রানাইট (granite) প্রস্তর রূপে প্রকাশিত হয়। তেমনি ভারতের নব্য ধর্মান্দোলন সমূহে যদি প্রবল মিলনাগ্রহ ও মিশ্রণশক্তি থাকে, তবে প্রধানতঃ ভক্তির উত্তাপ ও আলোড়নের ফলে, ক্রমশঃ হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ এক হ'য়ে যেতে থাকবে। তারা প্রথমতঃ ভাবে আদর্শে বন্ধুতায় এক হবে; ক্রমে বিবাহ-সূত্রে রক্তেও মিশ্রিত হ'য়ে যাবে। এবং এইরূপে আগামী কোন যুগে পূর্বাপেক্ষা অনেক দৃঢ়, গ্রানাইট প্রস্তরের ন্যায় ঘাতসহ নূতন এক জাতিতে পরিণত হবে।

ইহা এখন আমাদের মানস-স্বপ্ন মাত্র হ'তে পারে; কিন্তু আগামী যুগে জয়িষ্ণু ধর্ম যদি আমরা চাই, তবে চরম গন্তব্য স্থান মনের সম্মুখে স্পষ্ট ক'রে রাখাই প্রয়োজন। তাহা স্পষ্ট না থাকলে পথিমধ্যে পথভ্রান্ত হবার আশঙ্কা অনেক।

এই ভবিষ্যতের আশার ছবির জন্য বর্তমান যুগের প্রস্তুতি কিরূপ? শুধু নিশ্চেষ্ট উদারতা যথেষ্ট নয়। এ জন্যই আমি বার বার 'মিলনাগ্রহসম্পন্ন' ও 'মিশ্রণশক্তিসম্পন্ন' এই দুটি বিশেষণের ব্যবহার করছি।

ভাবী যুগের প্রতি যাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ, তাঁদের জিজ্ঞাসা করি, এই আদর্শ কি মনকে মাতায় না? সংসারের প্রতি শ্রদ্ধায় উন্নত, কৃতজ্ঞতায় প্রফুল্লতায় উজ্জ্বল, মনুষ্যত্বে বীর্যময়, ভক্তিতে মধুময়, ঐক্যবন্ধনে দৃঢ়, ভাবী যুগের জয়িষ্ণু ধর্মের এই ছবি, এক ঈশ্বরের পতাকাতলে মিলিত এক ভারতের এই ছবি,—ইহা কি আমাদের মনকে মুগ্ধ করে না? উদ্যমকে জাগরিত করে না? এই জয়িষ্ণু ধর্মকে মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিবার সমান আর কোন গঠনমূলক কার্য ভারতের জন্য আমরা করতে পারি? ঈশ্বর ভারতবাসীকে এই আশীর্বাদ করুন, যেন জীবনে ও চরিত্রে এই তেজোময় বীর্যময় মধুময় ঐক্যময় জয়িষ্ণু ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে, আমরা সম্মুখের সুদিনের জন্য অপেক্ষা করতে পারি।

প্রেম-প্রভাত

শ্রীসুভদ্রা রায়

জীবন-কুঞ্জে জাগিল কুসুম
নয়নে নয়ন রাখি,
মেলিয়া গোপন মাধুরী-বিভোর
প্রথম প্রেমের আঁখি।
নিবিড় হরষে গাহি কেকারব
মিলন-বিরহ-গান,
যৌবন মায়া বিলোল দৃষ্টি
করিল যে মহীয়ান্‌।

আকুল তৃষ্ণা প্রণয়-বেদনা
রয়ে রয়ে উঠে ফুলে,
দোদুল্যমান তরঙ্গ দল
ভেঙে পড়ে কূলে কূলে
প্রেমঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিল
নব উল্লাসরাশি
চল-বিদ্যুৎ কহিছে একেলা
এ নহে নর্ম্ম-হাসি।

বন্দী

শ্রীসাধনা কর

চৈত্রের সকাল। খাওয়া চলছিল লফ্‌সি। জেল-কম্পাউণ্ডের ভিতরে সারি সারি গাছ—শাল, দেবদারু, বাদাম, গাছের উপর রকমারি পাখীর ভীড়, ডাকাডাকি, মাতামাতি। উড়ো-হাওয়া ঝরকে ঝরকে পাতা ঝরাতে সুরু করল। কাঠবিড়ালী সুড়্ সুড়্ ক'রে নামে ওঠে। নীচে বন্দীর দল, সামনে কানা-উঁচু পেতলের থালা কলাই-করা। কোনটা ভাঙা, বাঁকা, তোবড়ানো কোনটা, কোনটার বা কলাই উঠে গেছে।

ভূপেন গোঁসাই খেতে খেতে পাশের দিকে চেয়ে বললে, "হাত গুটিয়ে যে!—চালাও!"

ডাণ্ডা-বেড়ি-পরা চক্কোত্তি উবু হয়ে খাচ্ছিল, অবাক হয়ে মুখ তোলে—"বসে আছ অমন জিনিস ফেলে? নির্লোভ বটে! নাও সুরু করো। রাজদ্বারের সম্মানিত অতিথি, রাজভোগের অপমান ক'রো না অমল!"

নূতন-আগত রাজবন্দী অমল কিছুতেই খাবার মুখে দিতে পারে না। ভাত, ডাল ও ফেন মিশিয়ে পাতলা একটি জিনিস—লফ্‌সি; সঙ্গে সামান্য তরকারিও আছে। কালো রং, রকমারি জিনিসের ঘ্যাট্। খাওয়া বিষয়ে এমনিতেই তার অনেক বাছ-বিচার। এখানে পাঁচ-সাত দিন প্রায় সে উপোসী।

যে-কয়েদীটা পরিবেশন করছিল সে হিন্দুস্থানী। বাংলা কিছু বোঝে, রসিকতা করলে, "শ্বশুরবাড়ী মোশাই, শ্বশুরবাড়ী। খায়েন্ খায়েন্, খিয়ে লিন্!" সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়ে মুখের থুথু, পানের কুচি। অত্যন্ত নোংরা ওর কয়েদী পোষাক, বোটকা গন্ধ; অমল নাক সিঁট্‌কে মুখ ফেরালে।

চক্কোত্তি হেসে সায় দেয়, "হুঁ, একেবারে সাক্ষাৎ শ্রীহস্তের পরিবেশন। বল কি অমল, আপনা থেকে জিবে জল এসে যায় যে! না, কি মান করেছ? আংটি, রিস্টওয়াচ, সাইকেল, না সোনার চেন, কি চাই বল! বল!"

হাসির ধুম পড়ে যায়। কয়েদীটাও বড় বড় দাঁত বার ক'রে হাসে।

ওদিকে বহুক্ষণ একটা গোলমাল চলছিল, বেড়ে ওঠে। কৌতূহলী দু-এক জন বন্দী উঠে দাঁড়ায়। এক-মানুষ-উঁচু দেয়ালের ওপাশে পৃথক্ কম্পাউণ্ড, সাধারণ কয়েদীদের খাবার বৈঠক। এত দূর থেকে সব আবছা অস্পষ্ট, শুধু এক জায়গায় উত্তেজনা আর ভীড়।

তরকারি নিয়ে বকতে বকতে আসে আরেক জন কয়েদী। প্রহরী-পুলিস জিজ্ঞেস করলে, "ভাতু সিং, খবর!"

কয়েদীটা মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁজের সঙ্গে বললে, "ডাকাতি করবার সময় মনে ছিল না, এখানে এসে আবদার। শালা ডাকু, আজ আছে কিছু পাওনা!"

"কে দশ নম্বর? কি করলে আজ!"

কয়েদী মুখভঙ্গি করে বললে, "তরকারিতে আরসোলার ঠ্যাং,—টিকটিকির মাথা আর শালার মুণ্ডু। জামাই এসেছেন উনি, কি না, ভাল খাবার চাই!"

চমকে ওঠে অমল, "আরসোলা!—তরকারিতে?"

হাসে গোঁসাই, "আরসোলা তো ভাল, কি যে নেই বলা দুষ্কর। ঘাস, পাতা, সাপ, ব্যাং—সব…।"

"কুকুর, কুকুরেরও অধম আমরা"—গর্জ্জে ওঠে নরেন দে, সুন্দর লম্বা—দেহ শীর্ণ, চোখে মুখে অপরিসীম ক্লান্তির ছাপ—আজ যেন কি উত্তেজনায় উদ্ভাসিত। ক্রোধে তার কথা বন্ধ হয়ে যায়।

চক্কোত্তি ফিরে চাইল। ও আজ দু-মাস এসেছে এখানে, অসম্ভব গম্ভীর। কথা নেই, হাসি নেই, নেই কোন স্ফুর্ত্তি। মাথা গুঁজে কি ভাবে, সাধলেও কথা কয় না। আজ তার যেন ঈষৎ ভাবান্তর—চক্রবর্ত্তী বিস্মিত হ'ল।

অমল উত্তেজিত স্বরে বললে, "কি ক'রে খাও এ সব ভূপেন-দা?"

"কি করে কেন" চক্কোত্তি গোঁসাইয়ের হয়ে ভান করে, "হাত দিয়ে তুলে, মুখ দিয়ে খাই! বাচ্ছা, এখনও কচি, বুঝতে পার না সবটা।" গভীর সহানুভূতির চিহ্ন তার মুখে খেলে গেল—"কত দিন না খেয়ে বাঁচবে অমল! সবে দিন সাত, আরও কত দিন কত বছর কাটাতে হবে এখানে, বল তো? না খেলে নিজেরই ক্ষতি; ওদের প্রাণে এতটুকু আঁচড় কাটবে না। তার চেয়ে গালের ভিতর ভাত ফেলে চোখ বুজে ভাব বাড়ির কথা, মায়ের রান্না, বোনের পরিবেশন, বাস্ আরসোলা, টিকটিকি সব তল হয়ে যাবে আপনিই।"

চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর হালচাল সম্পূর্ণ সাহেবী ধরণের। হাজরা পার্কের কাছে হালফ্যাশানের প্রকাণ্ড বাড়ী। বাবা-মার আদুরে ছেলে সে।

খাবার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম। কাজে যাবার সময় হঠাৎ ডাক দিল প্রহরী-পুলিস—"দেখুন এদিকে!"

দোতলার বারান্দায় মোটা পাত-লোহার পুরু গরাদে। ঝুঁকে পড়ে সবাই। বাইরেটা হিজিবিজি, ছায়া-ছায়া। দূরে সেণ্ট্রাল টাওয়ার—জেলের হেড কোয়াটার। দেয়ালের গায়ে ছাল-ছাড়ানো পাঁঠার মত ঝুলে রয়েছে দশ নম্বর কয়েদী। হাত-পা বাঁধা, খালি গা, প্রায় ন্যাংটা।

সার্জ্জেণ্ট, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, এসেছে জেলরবাবু, ডাক্তার। সিপাহী ক-হাত তফাতে দাঁড়িয়ে প্রস্তুত। কানে আসে, "পঁচিশ-ঘা।"

সঙ্গে সঙ্গে সিপাহী পা গুনতে থাকে—এক দুই তিন চার—সপাং। লিক্‌লিকে ব্যাটন রোদে ঝলক খায়। সাপের জিবের মত হিস্ করে লাঠির মাথার বেত। নড়ে ওঠে দেহটা। সিপাহী কায়দা ক'রে ঘোরে। কয়েদীটা হাতের কামড় ছেড়ে দিয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে। সুরু হয় গালাগালি, "শালা শূয়ারকো বাচ্ছা, পাজি, বদমায়েস ।" মুখের কথা মুখেই থাকে, তাড়াতাড়ি সমস্ত শরীরের জোর দিয়ে দাঁতে কামড়ে ধরে নিজের হাত; সমস্ত প্রাণশক্তি সমস্ত অনুভূতি ঐখানেই যেন সংহত। পিছনে আবার পড়ে ঘা, একের পর এক, পড়েই চলে।—এক দুই তিন চার—সপাং, এক দুই তিন চার—সপাং। সঙ্গে সঙ্গে চলে কয়েদীর অফুরন্ত অশ্রাব্য অশ্লীল গালি, বিকট দাঁত খিঁচুনি।

গরাদে ধ'রে দাঁড়িয়ে সবাই, অমল অচল অনড়। গোঁসাই ঠেলা দেয়, "অমল।" অমল ফিরে চেয়েই মুখ নামায়। চোখ ছল্‌ছল্ করে। গোঁসাই সস্নেহ তিরস্কারে পিঠে চাপড় মেরে বলে, "পুরুষ তুমি! ছি! কার ভাই তুমি, মনে রেখো। কত দেখবে এ রকম, দৈনিক ব্যাপার! প্রথমে একটু লাগেই ভাই, ক্রমশঃ সয়ে যাবে।"

প্রহরীটা ভাল, এদের সঙ্গে ভাব আছে, বললে, "বড্ড কচি বয়েস যে! কেন বাপু এ বয়সে এ দলে যোগ দিয়ে কষ্ট পাচ্ছ? বাড়ীতে সুখে থাকতে। আর সত্যি খাবার দেওয়াতে উপরওয়ালার বিশেষ হাত নেই। জানেন?—এই জেলের কর্ম্মচারিগুলো বড় পাজি—আবার কাউকে ব'লো না বাবু—ওরাই তো সরায়। তার পর ওজনে ঠিক রাখবার জন্যে দেয় যত ছাইভস্ম মিশিয়ে। তবু তো এখন আন্দোলন ক'রে ক'রে অনেক ভাল খাবার পাচ্ছ—আগের কথা যা শুনি।..."

ওদিকে মার তখন শেষ হয়েছিল। সিপাই হাতের ব্যাটনটা খুলে ফেললে। হাতটা ব্যথা হয়ে উঠেছে, রগড়ে নিয়ে ঠিক করে।

কয়েদী নিঝ্‌ঝুম, নিস্তেজ, দেহটা প্রায় চেপ্‌টে গেছে, ফেনা-ওঠা মুখে অস্পষ্ট গোঙানি, আর আরক্ত দু-চোখে ফেটে-পড়া তারা দুটো থেকে থেকে উঠছে ধিক্‌ধিকিয়ে। ওদিকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্রুদ্ধস্বরে আবার হাঁকে, "চালাও দশ ঘা।"

সিপাহীটা নিঃশব্দে মুখ তুলে চায়:—"চালাও!" নিরুপায় সে! নিয়ম-মাফিক আবার চলে পা-গোনা, সুরু হয় বেত।

প্রহরী এদের বুঝিয়ে বলে, "গালাগাল শুনে সাহেব চটে গেছে!"

"হুঁম্"—গোঁসাইয়ের গম্ভীর স্বর গম্ গম্ করে উঠল, "অপমান লেগেছে, স্টুপিড্!"
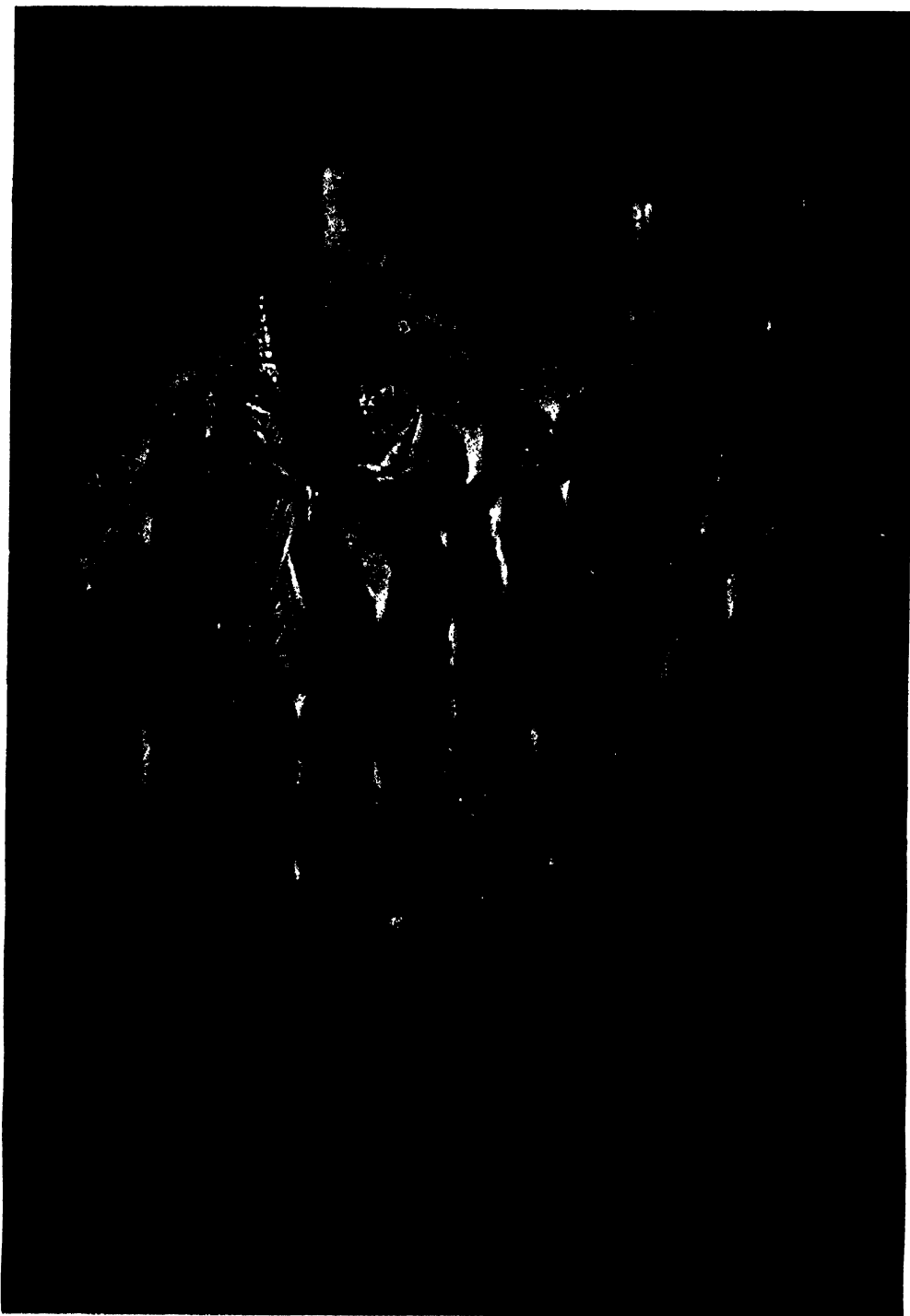
শুভদৃষ্টি
শ্রীপরিতোষ সেন

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বিস্ময়ে অমলের মুখে কথা সরে না—গালাগালের জন্যে আরও দশ ঘা ?

চক্কোত্তি ম্লান হাসে—"আমরা যে কয়েদী। ওরা মারবে, আমরা মার খাব—এই হচ্ছে নিয়ম। আচ্ছা গোঁসাই এর কি বদল হবে না কোন দিন—এই সবলের নিষ্ঠুর পীড়ন দুর্ব্বলের উপরে। যত প্রতিবাদ, যত আন্দোলন সবই কি চিরদিন ব্যর্থ যাবে ?"

ও-ধার থেকে মাথা ঝাড়া দিয়ে ওঠে নরেন দে। বড় বড় চোখ—জ্বলে বাঘের মত। কি যেন বলতে গিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে সে; রুদ্ধ আবেগে কাঁপতে থাকে ভিতরে ভিতরে।

কাজের ঘরে যাবার পথে গোঁসাই চক্কোত্তিকে জিজ্ঞেস করে, "লক্ষ্য করেছ, পঞ্চা-দা, নরেন-দে'কে ?"

চক্কোত্তি চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ে—"বুঝতে পারছি নে কিছু। কেন ও আজ এত উত্তেজিত। ভয় হচ্ছে।"

* *

নীচের তলায় প্রকাণ্ড লম্বা কাজের ঘর। সকাল-বিকাল ঘণ্টা-দুয়েক কাজ—চালের কাঁকর বাছা, ছোবড়ার দড়ি পাকানো, চট সেলাই। বন্দী-জীবনের কঠিন বন্ধনের মধ্যে কিছুক্ষণ একত্র মেলামেশা। সবাই মিলে হৈ-চৈ করে, গল্পগুজব করে, হাসি-পরিহাসে সারাদিনের গুমোট-করা বিষণ্ণতা কাটিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা। জানালার গরাদের ফাঁকে ফাঁকে আঁকা-বাঁকা রোদ। ঘুলঘুলিতে ভীড় করে চড়ুই আর পায়রার ঝাঁক, একটু একটু ক'রে তারা মেঝের উপর এসে পড়ে; কয়েদীরা কাঁকর বাছতে বাছতে চাল ছড়িয়ে দেয় মুঠো মুঠো, ঘাড় বাঁকিয়ে ভয়ে নির্ভয়ে নেচে নেচে পাখিগুলো ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে খেয়ে বেড়ায়। ভারি মজা। বন্দীদের স্ফূর্ত্তি তারই সঙ্গে যায় মিশে।

আশু হাই তুলে উঠে দাঁড়িয়েছিল, বাইরে চেয়ে বললে, "গোঁসাই, কে যায় দেখ।"

খোঁচা মারে আর এক জন—"পারু ব্যানার্জি বুঝি ?" চোখে চোখে ইসারা খেলে যায়, মুখে মুখে চাপা হাসি। সবায়ের সঙ্গে কৌতূহলে অমলও উঠে দেখে। কিছু দূরে বাঁধান রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে একটি ছিপছিপে মেয়ে, পিছনে বলিষ্ঠ কষ্টিপাথরের মত কাল সাঁওতাল-মেয়ে প্রহরিণী। গোঁসাই ঝুঁকে পড়ে জানলায়। মেয়েটি এদিকে তাকিয়ে হাসে, হাত নাড়ে। পিছন থেকে ধমক আসে। তবু পারু ছাড়ে না, কি একটা বললে।

আশু গোঁসাইয়ের পিঠ চাপড়ে দেয়—"লাকি চ্যাপ্।"

চক্কোত্তি ডাণ্ডা-বেড়ি-পরা, দাঁড়াতে পারে না সটান হয়ে; দড়ি পাকাচ্ছিল, আর বসে ছিল নরেন দে।

এত দিন তার কাজের ঘরে আসা নিষিদ্ধ ছিল, কদিন হ'ল হুকুম পেয়েছে। অটুট তার নীরবতা, কোন এক দৃঢ় সংকল্পে কঠিন। কোন দিকে দৃষ্টি নেই।

আশুর কথা শুনে চক্কোত্তি হেসে ফেলে—"হিংসে হচ্ছে আশু ? শুনেছ ওখানে বীণাকে নিয়ে কি ব্যাপার ঘটে গেছে ? গোঁসাই, খবরটা ত সঠিক জানতে হচ্ছে।" সবাই উদ্‌গ্রীব। গোঁসাই এ-দলের সেক্রেটারী। গোপন চিঠি-পত্রের লেনদেন, বাইরের খবর নেওয়া, মেয়ে ওয়ার্ডের সঙ্গে যোগ রাখা—কাজ তারই। ওদিকে পারু ব্যানার্জ্জি।

গোঁসাই বললে, "শুনলুম ত কাল দুপুরে নাকি সুপারিন্‌টেনডেণ্টকে ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করেছিল বীণা। বদমায়েস্, মেয়েরা যখন দুপুরে স্নান করে, রোজ সেই সময় গিয়ে উপস্থিত। খুব আক্কেল হয়েছে। আরও জানলুম লীলার উপর নাকি খুব পীড়াপীড়ি চলছে, কি একটা খবর বার করবার চেষ্টা। সে মেয়েও বাবা সোজা নয়, প্রাণ যাবে তবু রা বেরবে না। কিন্তু বড্ড শাস্তি পাচ্ছে বেচারা; আবার নাকি বুকের ব্যথাটা দেখা দিয়েছে।"

বাইরে ঘণ্টা বাজল। প্রহরী এসে দাঁড়াল—"চলিয়ে বাবুজী, চলিয়ে।"

এক জন বন্দী মুখ বাঁকিয়ে বলে, "আবার সেই ঘরে বন্ধ। বইটা যে পড়ব, তাও বন্ধ ক'রে দিয়েছে। স্টুপিড-গুলো বোঝে না কি ক'রে যে এই চার-পাঁচ ঘণ্টা কাটাব। চল বাপু, চল, কোন্ চুলোয় ঢুকোবে ঢোকাও, নিশ্চিন্দি।"

চার-পাঁচ জন প্রহরী ঘরে ঢুকেছিল। এক জন একটু বুড়ো-গোছের, গভীর নিশ্বাস চেপে বললে, "হাঁ বাবু, খুব নিশ্চিন্দি। তোমরা ত তবু শুয়ে বসে ঘুমিয়ে আরাম

পাও, আর এই যে ঠায় বন্দুক ঘাড়ে পাহারা দিই আমরা, না ঘুম না শোওয়া। ছুটি চাইলে ছুটি নেই। ছেলেটা জ্বরে বেঘোর। ঘরে একা মেয়েমানুষ, কি করতে পারে বল।…চারটা মেয়ের পরে ঐ সম্বল। ইচ্ছে করে কাজ ছেড়ে দিই। পোড়া পেট। বুড়ো বয়সে আবার কোথায়ই বা যাই…। চল বাবু, চল।"

* * *

দীর্ঘ দুপুর। চৈত্রী রোদ্দুরে ঝাঁ ঝাঁ করে চারি দিক। হু-হু শব্দে থেকে থেকে বয় হাওয়া। শুয়ে শুয়ে অমলের বিরক্তি ধরে। বদ্ধ ঘর। গরমে চোখ মুখ জ্বালা করছে। সাত দিন না-কামান বিশ্রী মুখটা। নোংরা ময়লা পোষাক, গায়ে মাটি শুকিয়ে খড়খড়ে। নিজের দিকে চেয়ে চেয়ে নিজেরই ঘৃণা হয়। আবার একবার স্নান করবার আশায় যায় স্নানের জায়গায়। কাক-স্নান। লম্বা চৌবাচ্চায় এতটুকু জল। পরিষ্করণের জন্য তলায় কিছু চূণ ঢালা। এতেই এতগুলি লোকের স্নান। অমল কোন রকমে গাটা ধুয়ে ফেললে। পেট চোঁ চোঁ করছে। ভাল ক'রে না খাওয়ায় খিদে আর মেটে না। এত দূর জায়গায় আপনার লোক কেউ যে খাবার পাঠাবে, সে আশা বৃথা। বাড়ীর অবস্থা মনে প'ড়ে মনটা হয় বিষণ্ণ, দাদা দ্বীপান্তরে; নিজে সেও ক-বছরের জন্যে এখানে রইল আটকা, কে জানে! ডেটিনিউ! মা, ভাই, বোন বাড়ীতে কি দুঃখেই না দিন কাটাচ্ছে। এখন যদি হঠাৎ বাড়ীতে গিয়ে ওঠা যেত! হয় না কি এমন? সমস্ত প্রাণটা ছটফট করে। নির্দোষ সে; কলেজের ছুটিতে গিয়েছিল বাড়ী। দাদা বোমার মামলায় ধরা পড়ল। অমলের জানা ছিল কিছু কিছু। দলের লোকের যাওয়া-আসা, পরিচয়, চেনা-শুনা। খবর পেল বাড়ীতে খানাতল্লাসি হবে। তাড়া-তাড়ি অমল ডেস্ক খুলে কয়েকখানা দরকারী চিঠিপত্র লুকোতে গিয়েছিল, পড়ল ধরা। সি. আই. ডি. পুলিসের প্ররোচনায় লোকের মিথ্যা সাক্ষ্যে সে দোষী বনল। এখন পরীক্ষা দেওয়া খতম, ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্র হয়ে গেল অন্ধকার। ভাবতে ভাবতে অমলের মাথা গরম হয়ে ওঠে। ছুটে যেতে ইচ্ছে করে দেয়াল ভেঙে, উন্মুক্ত নীল আকাশের তলায় বাইরে।

করিডরে প্রহরীর দল, গুনগুনিয়ে গান গায় খৈনি টেপে, হাই তোলে, ওঠে বসে, করে পায়চারি। পালার সময় পেরিয়ে গেলেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। নিঃশব্দ দুপুর। দুপুর রাত্রের মত ছম্‌ছমে।

হঠাৎ কোথায় একটা গোলমাল দেখা দিল। এক মুহূর্ত্তে সজাগ হয়ে ওঠে সমস্ত কারাগার। প্রহরী অমনি বন্দুক ঘাড়ে প্রস্তুত। পাগলাঘুণ্টি বাজতে থাকে ঢং ঢং, ঢং ঢং, ঢং ঢং। হৈ-চৈ, ছুটোছুটি, উদ্বিগ্ন সোরগোল। এই ওয়ার্ডের দিকেই যেন তার লক্ষ্য। কোথায় কি হ'ল? হঠাৎ ছ্যাঁৎ ক'রে ওঠে অমলের প্রাণটা। পুলিস, সিপাহী, সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট জেলর—একসঙ্গে ভারী ভারী সব ত্রস্ত বুটের দ্রুত আওয়াজ, ঝন্ ঝন্ ক'রে গেটের তালা খুলে ঢোকবার শব্দ। কোন্ বাথরুমের জানলার শিক-কাটা বেরিয়েছে। ধুম খোঁজ আর বেপরোয়া মার-পিট, ঘণ্টা-খানেক সমস্ত ওয়ার্ড তোলপাড়। অমলও মারের হাত থেকে বাদ গেল না। ঘোড়ামুখো সাহেবটার সাদা সাদা চোখ দুটো বেড়ালের মত তীক্ষ্ণ। এমন গালাগাল বুঝি মানুষ মানুষকে করতে পারে না। না-হক্ অমলকে ব্যাটনের তীক্ষ্ণ খোঁচা দিয়ে বললে, "এসেছ কবে? ছিলে কোন্ জেলে?" জেলের পরিচয় দিতে মুখ বিকৃত ক'রে বললে, "ওঃ, তুমি সেই বদমায়েস ডাকাতটার ভাই?" তার পরে সেপাইদের দিকে ফিরে হুকুম জারি হ'ল—"বিশেষ নজর রাখবে।"

গা জ্বালা করে অমলের। না সয়ে কিন্তু উপায় নেই। কতক্ষণ পরে একটা প্রচণ্ড হৈ-চৈ, চারদিক থেকে চড়-চাপড়, ঘুসি, ও ব্যাটনের বাড়ির শব্দ। তারপরে সবাই নীচে যায় নেমে।

বিকেল বেলা কাজের ঘরেও সেদিন কড়া শাসন। সাধারণ সেপাইদের মুখখিঁচুনি, মনিবিয়ানার হুকুম সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। এমনিতেও সবাই চুপ। নরেন দে-কে নিয়ে গেছে। তার প্যাণ্টের ভিতর থেকে নাকি বেরিয়েছে লোহা কাটবার সরু ব্লেড।

ব্যথিত ক্ষুব্ধ স্বরে অমল বলল চক্কোত্তিকে, "এ কাজ কেন করতে গেলেন উনি।" চক্কোত্তি থেমে থেমে বললে, "আমি আগেই কিন্তু সন্দেহ করেছিলুম;

দশ-বার বছর আটক থেকে ওর মাথা গেছে খারাপ হয়ে।”

আর এক জন জিজ্ঞাসা করলে, “কি শাস্তি হবে?” উত্তর দেয় গোঁসাই ম্লানমুখে, “জেলে পুরবে আর কি।” খানিক বাদে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, “জমিদারের ছেলে, ডেপুটির জামাই হবে এক দিন, আশা ছিল। সব ঘুলিয়ে দিল সর্বনেশে ছোঁওয়ায়।”

চক্কোত্তি রাগে গজরায়—“নচ্ছার বেটা ডেপুটি, সেই ত ওকে জেলে পুরলে। কি ট্র্যাজিডি! মেয়েটার বিয়ে ঠিক হয়েছে কোন্ এক বিলেত-ফেরত বড় ডাক্তারের সঙ্গে।

“আইভি-র বিয়ে?”

“হুঁ”—চক্কোত্তি বললে, “আমার বোন তার সঙ্গে এম-এ পড়ে। চিঠিতে জানলুম। তারা হ'ল বড়লোক; শিক্ষিতা মেয়ে আধুনিকা, নরেনের মত লোকের কথা কতক্ষণ মনে রাখবে?”

ফণী উবু হয়ে পেট চেপে ধ'রে বসে পড়ে—“উঃ, আবার উঠল ব্যথাটা!”

আশু বললে, “আমাকেও ভাই যা অম্বলে ধরেছে!”

এক জন বললে, “তা হবে না?” না হওয়াটাই বরং আশ্চর্য্যের! যা খাবার! তা আবার দিনেই তিন বার, রাত্রিটা একেবারে বাদ।”

“অনিদ্রার কথাটা ছাড়লে কেন ভায়া?...” শুরু করে আর এক জন “সমস্ত রাত্রিটা নিছক জেগে কাটে। কি বিরক্তিকর! নরেন-দার দোষ নেই বাপু। এক যুগ বন্ধ! আমার ত এখনই ইচ্ছে করছে অমনি ক'রে শিক কেটে বেরিয়ে যাই।”

চক্কোত্তি হাসল—“আসছে ডিকশন্। শিক কাটা বের করবে'খন।”

“সত্যি? কবে?” সমস্বরে কয়েক জন প্রশ্ন করে।

“আজ রাত্রেই। আই-বি, ম্যাজিস্ট্রেট ডিকশন আরও ক'জন হোমরাচোমরা। সন্দেহ রয়ে গেছে কারও কারও উপরে। খুঁচিয়ে মারবে!”

অমল বললে “খুব মারে বুঝি?”

“মার?” আশ্চর্য্য হয়ে আশু মুখ তোলে—“বাছ-বিচার নেই, এক ধার থেকে সে কি পিটুনি। মনে আছে পঙ্কা-দা?”

গোঁসাই মুচকে হাসে—“আমার দেবদাসের কথা ভোলা কি যায়?” কপালের মস্ত কাটা দাগটায় দিকে চেয়ে চক্কোত্তি হেসেই খুন—“বেশ বলেছ গোঁসাই। সেদিন গেছে বঁড়শির ছিপের বাড়ি, আজ তোমার রাতের অভিসার। পা জড়িয়ে লাথিটা আদায় করে নিও।”

তিন জনেই হাসে, অন্য বন্দীরা উৎসুক, উদ্গ্রীব।

আশু শুরু করলে, “আমরা তিন জনে তখন হিজলি জেলে, বছর-তিনেক আগের কথা। একটা সিপাই ছিল ভারি বেয়াড়া। অসহ্য বেয়াদবি তার দমাবার ইচ্ছাতে আঁটলুম এক মতলব। এক দিন দুপুরবেলা সবাই মিলে পাছড়ে ধ'রে সিঁড়ি পর্য্যন্ত টেনে এনে এক ধাক্কা। আর যায় কোথায়! বলের মত উলটে-পালটে একেবারে নীচে। মার ঠিক খেতুম না। ভাত নিয়ে আরও দু-জন সেপাই উঠে আসছিল উপরে, দেখে ফেললে আমাদের। তার পরে? তার পরে এল ডিকশন। স্তূপাকার হয়ে বসেছিলাম সবাই, কিছু রেহাই পাব ব'লে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ফাঁক ক'রে বেদম পিটুনি। উমানন্দ ব'লে একটা বাচ্ছা তো তখনই অজ্ঞান। গোঁসাইয়ের কপালে তারই ঐ দাগ।

সবাই হাসে শুষ্ক হাসি,—“ভূপেন-দা, আজ আবার কি হয় দেখো।”

চক্কোত্তি গান ধরল—

“এত দিন যে বসেছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুনে,
দেখা পেলেম ফাল্গুনে।”

* * *

বেলা থাকতেই আজ ঘরে বন্ধ। বাইরে তখনও পড়ন্ত রোদ সতেজ উজ্জ্বল। দূরে মাঠের পরে মাঠ, উঁচু-নীচু ঢেউ খেলিয়ে এর গায়ে ও ঢলে পড়েছে। চৈতালি ফসল কাটা শেষ, শুধু পোড়া খড়, ধূ ধূ লাল মাটি। দুই-একটা তালগাছ ছন্নছাড়ার মত অসহায়, উঁচু মাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে। সাঁওতাল ছেলেরা গরু-ভেড়া ছেড়ে দিয়ে খেলায় মত্ত। এখনও গাঁয়ে ফেরবার তাড়া নেই। জেলের দেউড়িতে দুটো জোয়ান সেপাই। শেষ

বেলাকার ঐ পড়ন্ত রোদ তাদের গায়ে কপালে; বন্দুক ঘাড়ে পাগড়িবাঁধা তারা ঠায় দাঁড়িয়েই থাকে।

এই সুন্দর বিকেলবেলা, আস্তে আস্তে ঘিরে আসবে সন্ধ্যা। অমলের ঘরে বন্ধ হ'তে ইচ্ছা হয় না। রাত্রের কথা ভেবে মনে একটু শঙ্কার ছায়া পড়ে। অন্তদের মুখের দিকে তাকাল।

* * *

সদর্প বুটের আওয়াজ। কেঁপে ওঠে দালানটা। গভীর ঘুম ভেঙে গেল। ঘুমের ঘোর কাটে না। ডিকশন এল, না, সিপাহী বদলাল, অমল তাই ভাবে। অনিশ্চিত আশঙ্কায় তার বুক ঢিপ ঢিপ করে। সব চুপ। টং টং টং। কোন্ ঘরে ঘড়ি বাজছে। রাত দশটা, নিশ্বাস ছেড়ে সে উঠে বসে। পৃথিবী জ্যোৎস্নায় মগ্ন। দিগ-দিগন্ত স্বপ্নে প্লাবিত, উদ্বেলিত, পরিষ্কার, স্বচ্ছ, সুন্দর। শাল ফুলের মদির গন্ধ, বাতাসে তার মৃদু আমেজ। কোথায় সাঁওতাল-পল্লীতে মাদল বাজছে, গানের কলিও ভেসে আসে।

অমলের কিশোর প্রাণ স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে পড়ে। হঠাৎ কেন মনে হয় পারুল ব্যানার্জ্জি আর গোঁসাইয়ের কথা, মনে পড়ে নিজের জীবনের বিভিন্ন স্মৃতি। সেও ছিল চৈত্র মাসের দিন; ফুলু মাসীর সঙ্গে গিয়েছে পিকনিকে। আই. এ. দেওয়া হয়ে গেছে। স্ফূর্ত্তি অনাবিল, নিশ্চিন্ত। রাঁচি পাহাড়ের নীচে ঘনসন্নিবিষ্ট আমবনে ডেরা ফেলা গেল। সঙ্গী ও সঙ্গিনীর দল অল্প নয়। বিকালবেলা গল্প চলছে; ফুলু মাসী ডাকলেন এই অম্‌লা।

অমল ফিরে চাইল। আর মুখ তুললে ও-পাশের একটি কালো মেয়ে। তারও নাম অমলা।—ফুলু মাসীর ভাসুর-ঝি। মাসী বললেন, "আম পেড়ে দিবি? ঐ দেখ্ ও-গাছটায় কত কচি আম।"

অমলা বুঝলে তাকে নয়। সঙ্গিনীরা হেসে উঠল। ফুলু মাসী হেসে বললেন, "ও, তোকে ডাকি নি অমলা; অমলকে ছোটবেলায় ডাকতুম অম্‌লা ব'লে; ডাকটা মুখে এসে গেল।"

লজ্জিতা অমলার লজ্জা ভাঙাবার জন্যে অমল বললে, "বাঃ, আপনার নাম অমলা, আমার নাম অমল, বেশ, আমরা দু-জনে বন্ধু।"

সবাই হাসে, অমলা লজ্জা পেলে আরও। স্বভাবতই সে লাজুক। আর ও নূতন এসেছে শহরে, পাড়াগাঁ থেকে। সকলের পিছনে পিছনেই নিজেকে ঢাকা দিতে চায়।

অমল লাফ দিয়ে গাছে চ'ড়ে বসল। নীচে দারুণ ভিড়। অমল কচি কচি আম ফেলে, আর সবাই কাড়া-কড়ি ক'রে কোঁচড় ভরে। শুধু অমলা একটু আড়ালে এদিকে চেয়ে আছে। তার তরুণ বয়সের সজীব দুটি চোখে কৌতুক উপচানো। সকলের আম-কাড়াকাড়ির মজা দেখছে। কিছু পরে অমল যখন নেমে এল, সবাই তাকে ঘিরে ছেঁকে ফেলল। সবাইকে বিলিয়ে কোঁচড়ের আম প্রায় ফুরিয়েই গিয়েছিল। নিজের জন্যে রাখা পকেটের দুটি ভাল আম নিয়ে সে দিতে গেল অমলাকে। কিছুতেই নেবে না অমলা। রাঙিয়ে ওঠে কপাল, টোল খায় গাল। অমল এক রকম জোর ক'রেই তাকে নেওয়ায়। অন্য মেয়েদের বাঁকা চাহনিতে সেদিন অমলের বড় রাগ ধরেছিল ওদের 'পরে। আজ সে-সব মনে করতে বড় ভাল লাগে। চোখে ভাসে অমলার সেই কৌতুক-উজ্জ্বল লজ্জিত কালো চোখ। এত দিনে হয় তো—

"হু-জু র।"—অমলের ভাবনার জাল ছিঁড়ে পড়ে। চমকে ওঠে! কি বিকট স্বর প্রহরীটার। হয়ত ঢুলছিল। কানে ডাক যেতে অস্বাভাবিক জোরে উত্তর দিয়েছে।

ও ঘর থেকে আশু বলে, "বেটা, ষাঁড়ের মত কেমন চেঁচাচ্ছে দেখ!"

সেণ্ট্রাল টাওয়ার থেকে পর পর ক্ষীণ ডাক শোনা যায় দূরে দূরে—"বারো নম্বরকা সিপাই—হাজির হো!"

"হু-জু-র।"

আরও দূরে হাজত-ঘরে গোনা চলছে। থেমে থেমে চীৎকার ওঠে "ঠিক হ্যায়-য়!"

ঘুম আর আসে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে যায়। চোখমুখ জ্বালা করে। মাথা ওঠে গরম হয়ে। কত আর শুয়ে বসে ভাবা যায়। মোটা চট, কম্বলের বিছানা;

ইঁটের বালিশ। ঘুমিয়ে সুখ নেই, ঘাড় ব্যথা হয়, গালে কম্বলের লোম খস্‌খস করে। অস্বস্তিপূর্ণ দীর্ঘ রাত্রি।

বারোটা একটা। রাত গভীর থেকে গভীরতর হয়। ক্লান্তি ও অবসাদে অমলের ঝিমুনি আসে। কি জানি স্বপ্নে কি দেখছিল। মা, বোন, পার্ক ব্যানার্জ্জি, অমলা। হিজিবিজি, আজে-বাজে সব মাথামুণ্ডু যত!

দুড়ুম, দুম্‌!

ছুটে যায় তন্দ্রা। ও-ঘর থেকে চক্কোত্তি বিরক্ত স্বরে হাঁকে—কি জ্বালা! সারারাত এম্‌নি ক'রে এরা দেখছি ঘুমোতেই দেবে না। ওঃ, ফাঁকা আওয়াজ!"

আবার কিছুক্ষণ চুপ। অমল উঠে চোখে মুখে জল দিয়ে, আবার ঘুমের চেষ্টা দেখে। বাইরে খস্‌খসে আওয়াজ। অমল আপন মনেই ব'লে ওঠে—"সেরেছে এবার!"

প্রহরী বদলেছে। এ প্রহরীটা ল্যাংড়া। বুট পায়ে টেনে টেনে হাঁটে। ইচ্ছে করেই বেটা যেন আরও জোরে জোরে শব্দ ক'রে চলে।

চক্কোত্তি গর্জ্জে বললে, "ঘুঁসিয়ে শুয়োরটার আরেকটা পা ল্যাংড়া ক'রে দেব। ভাল ক'রে চল্‌ রাস্কেল।"

প্রহরীটা যেন শুনতেই পায় না। ও-ঘর থেকে আরেক জন বলে ওঠে। সবাই জেগে। থেকে থেকে চীৎকার, থেকে থেকে বুটের আওয়াজ, প্রহরীর তদারক। ঘুম আসবে কোথা দিয়ে।

বাইরে ফিস্‌ ফিস্‌ কথা শোনা গেল। দুটো সিপাইতে কথা কইছে। ল্যাংড়াটা বললে, "না ভাই, হ'ল না। ছুটি এখন দেবে না। বল তো সেই কবে আষাঢ় মাসে বাড়ী গিছলুম বিয়ে করতে। আর ছুটি নেই। চিঠি আসছে কেবলই, যাবার জন্যে। কি করি বল, ইচ্ছে করে—দিই চাকরি ছেড়ে!"

আরেক জন সান্ত্বনা দেয়, "চাকরিতে ছুটি নেই। চাকরি ছেড়ে খাবি কি। তার চেয়ে এক কাজ কর, নিয়ে আয় বৌকে। আমি তো তাই করব ভাবছি!"

সেপাইটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে।

অন্ধকার ঘর। আলো নেই যে বই পড়া যাবে। আর বই-ই বা কোথায়! অমল উঠে পায়চারি শুরু করে। রাত তিনটে। কতক্ষণ নিঝুম থেকে আবার ডাক আসে, "আট নম্বরকা সিপাই—হাজির হো!"

"হু-জু-র!"

অমলের হাসি পায়। সিপাইটা তো ঘাগি কম নয়! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার মত ঘুমোয়। কানটা আছে ঠিক সজাগ। ঘুমের মধ্যেই সাড়া দেয়। ভুল হয় না তো। সাড়া দিয়ে সে একটা হাই তোলে, বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে বকে আপন মনেই—"আঃ বেটা কি সারাক্ষণই চেঁচাচ্ছে, ঘুমোবার জো নেই একটু।"

খানিক গজ্‌ গজ্‌ ক'রে তার গলা নেমে যায়। দেয়ালের গায়ে মাথাটা ঢুলে পড়ে।

"ঠিক আ-ছে—এ-এ!"

অমলের ঘুম আসে না। নিজের দুঃসহ বন্দী জীবনের উপরে যেন ঘৃণা ধরে। আর পারা যায় না।

সিপাইটা হয়ত ঢুলে পড়ে গিয়েছিল। বিরক্তিপূর্ণ একটা শব্দ করলে। জেলরবাবু এদিকে আসছে। সিঁড়িতে বুটের শব্দ। প্রহরীর ঘুম ছুটে যায়। সবাই সজাগ, সন্ত্রস্ত!

অমলের হঠাৎ যেন এদের উপর মায়া হয়। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এদের এমনি ভাবেই কাটে। কি না, চাকরি! শুক্লা রাত্রি, বাসন্তী হাওয়া, বাইরের আনন্দ ভোগ করতে পায় না ভাল ক'রে। কোথায় এ, কোথায় বা এর যুবতী স্ত্রী। সমস্ত রাত্রি বন্দুক-ঘাড়ে পাহারা! অমলের মনে হয়, তারা, তারাই কি শুধু বন্দী!

ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালীর খাদ্য

কবিকঙ্কণচণ্ডী ও বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ.

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে তৎকালীন বাঙালী-জীবনের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবন, বাঙালী রমণীর পাতিব্রত্য ও চিত্তকোমলতা, বাঙালী বণিকের বাণিজ্যে অধ্যবসায় ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে বাঙালীর খাদ্যেরও একটা পরিচয় ঐ গ্রন্থেই পাওয়া যায়। এই পরিচয়ও একান্ত সংক্ষিপ্ত নয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত সেকালের বাঙালীর খাদ্যসামগ্রীর আলোচনা করা যাইতেছে।

শিবের ঈপ্সিত দ্বাদশ ব্যঞ্জন

"হরগৌরীর কলহারম্ভ" প্রসঙ্গে কবি শঙ্করের মুখ দিয়া দ্বাদশ ব্যঞ্জনের তালিকা ব্যক্ত করিয়াছেন। শঙ্কর ভিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিয়া গৌরীকে রন্ধনের ফরমায়েস করিলেন। নিজেই দ্বাদশ ব্যঞ্জনের বর্ণনা করিয়া বলিলেন—"আজি গণেশের মাতা রাঁধ মোর মত।" "ব্যঞ্জন"গুলি এই—

সিম, নিম ও বেগুনের "তিত"; কুমড়া ও বেগুনের "সুকতা"; কড়া ভাজা সরিষার শাক; সরিষার তৈলে বাথুয়া শাক ভাজা, ঘৃতে ভাজা ও "দুগ্ধ-গুড়ে" ভিজান ফুলবড়ি; পলতার কচি ডগার চড়চড়ি; "ছোলার সূপ" অর্থাৎ বোধ হয়, ডাল; কাঁঠাল বিচি, নটে শাকে, আদারস দিয়া ঝাল দিয়া ঘৃত ও জিরা "সম্ভার" দিয়া ঘণ্ট; "টাবা-জল" অর্থাৎ লেবু বিশেষের রস সহ "মুসরি সূপ"; করঞ্জার ফল" গুড়সহ অর্থাৎ করমচার অম্বল; কাঁঠাল বিচি-বঞ্জল এবং কুমড়ার বড়ি যুক্ত মানকচুর ব্যঞ্জন (ইহাতে নারিকেল কোরা এবং চই'র ঝাল দিতে হইবে); আমড়া দিয়া পালং শাক।

এই দ্বাদশ ব্যঞ্জনের সঙ্গে অতিরিক্ত আছে—

"গোটাকাসন্দীতে জাম্বীরের রস।"

সর্ব্বশেষে, "মধুরেণ সমাপয়েৎ" নীতি অনুসারে শঙ্কর চাহিলেন—

"ভোজনের শেষে খাই হাণ্ডী দুই ক্ষীর।"

উপরে যে খাদ্যের তালিকা দেখা গেল, সম্পূর্ণ নিরামিষ হইলেও উহাতে যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে এবং ভাইটামিনের সংখ্যাও কম নহে। তিন রকম "তিক্ত" হইতে আরম্ভ করিয়া "দুই হাঁড়ি" ক্ষীর পর্য্যন্ত খাদ্য-সম্ভার যদি সেকালের খাদ্যের একটি বাস্তব চিত্র বলিয়া ধরা যায় তবে সেকালের বাঙালীর হজম-শক্তি একালের "বাবু"দের চেয়ে অনেকগুণ বেশী ছিল, বলিতে হইবে।

ধর্ম্মকেতু-পত্নী নিদয়ার মুখে বহুবিধ খাদ্যের কথা

নিদয়ার "অরুচি" হইয়াছে; নানা রকম খাদ্যদ্রব্যের কথা মনে হইতেছে। কি কি খাদ্যদ্রব্য ইচ্ছা হইতেছে তাহার একটি তালিকা তিনি দিতেছেন:—

পান্তা ভাত ও বাসি ব্যঞ্জন; কড়া (শুক্‌নো করিয়া) তেলে ভাজা বাথুয়া শাক; কচি লাউশাক ও ছোলার শাকের ডগা; "কুসুম-বড়ী" সহ মাছ-চড়চড়ি; পুঁটি ও চিংড়িমাছ ভাজা; মহিষ-দুধের দই সহ খই, চিনি ও পাকা চাপাকলা; সোনার থালায় শালি ধানের অন্ন "কাঞ্জিকা" সহ; কাঞ্জির সহিত "চাকাচাকা" মূলো ও বেগুন; আমড়া "নোয়াড়ী" এবং পাকা চাল্‌তা; আম্‌সী, কাসন্দী, কুল ও করম্‌চা ফল; পোড় ও ডুমুর দিয়া চিংড়ি মাছ।

এই ফর্দ্দের মধ্যে মাত্র একপ্রকার মিষ্টদ্রব্যের কথা আছে। কিন্তু ফর্দ্দ এখনও সমাপ্ত হয় নাই। শেষের দিকে কয়েকটি "মিঠা"র উল্লেখ আছে:—

ক। "ক্ষীর নারিকেল তিলের পিঠা।"

খ। "দুগ্ধে গুড়ে তিলে মিশিয়ে লাড়ু।"

গ। "দধির সহিত খুদের জাউ।"

ঘ। "চিঁড়া চাপাকলা দুধের সর।"

নিদয়া ব্যাধের স্ত্রী, দরিদ্র ঘরণী। তাঁহার ফর্দ্দের মধ্যে মহার্ঘ কোন বস্তুর উল্লেখ নাই।

গ্রন্থের এই অংশের পাঠভেদ হেতু নিদয়া-প্রদত্ত আর একটি ভোজ্য-তালিকা দেখা যায়। সেটি এই—

ধান বাছিয়া লইয়া খইএর সঙ্গে "মহিষের দই"; কুল ও "করঞ্জা" (করমচা ফল); মিঠা ঘোল ও পাকা চালিতার ঝোল (অর্থাৎ অম্বল); বোয়াল মাছ কুটিয়া উহার সঙ্গে শিম, হেলেঞ্চা, পলতা ও গিমা শাক—ইহাতে আবার কড়া জ্বালে সরিষার তৈলে সাঁতলাইয়া কিছু পলতার শাক দিতে হইবে; আবার রস সহ "কটু" অর্থাৎ সরিষার তৈলে সাঁতলান চিংড়ি মাছ; "গণ্ডাদশ" কাঁটালের বিচি, কিছু "ফুলবড়ি", পুঁই ডগা ও কচুর মিশ্র তরকারি; "গোটা" কাসুন্দি মিশান শোল মৎস্যের পোনা; আম দিয়া মসুরির "সুপ"; লেবুর রস সহ পোড়া মাছ এবং কই মাছে "ঝশ" (?)—ইহাতে মরিচের ঝাল দিতে হইবে; "হরিদ্রা-রঞ্জিত কাঞ্জী" (?); পাকা তাল; মুলা, বেগুন, শীম ও নীমের সঙ্গে দুধ দিয়া মিশ্র পদার্থ।

এই তালিকার সকল ভোজ্য পদার্থ আমাদের কাছে সুস্বাদু মনে হয় না; কিন্তু নিদয়া তিনটির সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। যথা—

(ক) কুলকরঞ্জা প্রাণসম বাসী।
(খ) প্রাণ পাই পাইলে আমসী।
(গ) প্রাণ পাই পাইলে পাকাতাল।

সাধারণ গরীব বাঙালী গৃহস্থদের খাদ্যতালিকার বেশ সুস্পষ্ট ধারণা উপরিলিখিত বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যাইতেছে।

কালকেতুর ভোজন

কবির অতিরঞ্জিত বর্ণনায় কালকেতুর ভোজ্যদ্রব্যের পরিমাণ অসম্ভবের কোঠায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু, যে খাদ্যপদার্থগুলির নাম আছে সেগুলি আমরা লক্ষ্য করিতে পারি—

আমানী; খুদের জাউ; লাউ-মিশান "মুশরী-সুপ"; আলু ও ওলপোড়া, বন-পুঁই, কলম্বী (কলমী) ও "কাঁচড়া" শাক; হরিণের মাংসের ঝোল; নকুল অর্থাৎ বেজী পোড়া; কচু ("শারী কচু"), করমচা ও আমড়ার "ঘণ্ট"; দধি।

এই পদগুলির মধ্যে এক বেজী-পোড়া বাদে কোনটিই "অখাদ্য" নয়। দগ্ধ নকুল কি সত্যই সেকালে প্রচলিত খাদ্য ছিল? না, কবি বীভৎস রস সৃষ্টির জন্য উহা উল্লেখ করিয়াছেন? বনবাসী কোন কোন জাতির ঐরূপ খাদ্য থাকা অসম্ভব নয়। কালকেতুর আচরণ কিন্তু একেবারে বন্যজাতীয় নহে। কবি বলেন যে কালকেতু ভোজনের পর সভ্য রীতি অনুযায়ী আচমন এবং মুখশুদ্ধি করিয়াছিলেন। যথা—

"আচমন করি হরিতকি মুখে দিলা।"

"ফুল্লরা ও কালকেতুর কথোপকথন" আখ্যায়িকায় দরিদ্র ব্যাধের অতি সামান্য খাদ্য-আয়োজনের বর্ণনা আমাদের করুণা উদ্রেক করে। কালকেতু ফুল্লরাকে নিম্নলিখিত বস্তুগুলি রাঁধিতে বলিতেছেন:—

"কাচড়া খুদের ভাত", নালিতা শাক (পরিমাণ—হাঁড়ি দুই তিন), গোধিকা পোড়া। ইহার সহিত লবণ (চারি কড়া মূল্যের)।

এই হইল দরিদ্র ব্যাধের খাদ্য। ফুল্লরা খুদ ধার করিতে গিয়া সখীর কাছে "লাড়ু কলা" ও "খইমুড়ি" পাইয়াছিলেন। গরীবেরা সেকালে পরস্পরকে কিরূপ বস্তু উপহার দিত তাহাও এই স্থলে দেখা যায়। ফুল্লরার, সখী "বিমলার মাতা"কে "বেঙাচি" অর্থাৎ বৈঁচিফল এবং "শেয়াড়ীর ফল" (?) উপঢৌকন দেওয়ার উল্লেখ আছে।

দুর্বলার বেসাতি

এই আখ্যায়িকায় ধনীগৃহস্থের উপযোগী খাদ্যসামগ্রীর একটি চিত্র পাওয়া যায়। "সাধুর" অর্থাৎ ধনী বণিকের দাসী রন্ধনের দ্রব্যসম্ভার কিনিতে বাজারে গিয়া নিম্নলিখিত বস্তুগুলি কিনিয়া আনিল—

লাউ; কচি কুমড়া; "পলাকড়া" ও পাকা আম; ছানা; চিনি; পান; "জীয়ন্ত শশ" (জীবন্ত শশক অর্থাৎ খরগোস?); বুড়ো (বড়) কচ্ছপ (কেঠো); খরসুলা (খলিশা মাছ); কই; মহিষা-দই; কামরাঙ্গা; তালশাঁস; হিঙ্গু (হিং), জিরা, "রসবাস" (অর্থাৎ এলাচি, লবঙ্গ, দারচিনি ইত্যাদি); চৈ, মেথি, জোয়ান, মৌরী, মুগ, মাষ (মাসকলাই), বরবটি, সরলপুঁটি (সরপুঁটি), ঘৃত ("সের দরে ঘৃত ষড়াপুরি"), চিতল মাছ, বোয়াল, শোল, পোনা, চিংড়ি, খাসী (দাম আট কাহন কড়ি), তৈল (সরিষার অথবা অন্য রকম, লেখা নাই। তবে, দাম দশ বুড়িতে এক সের)। নারিকেল, কুল, করমচা, পানীফল, কাঁঠাল (সংখ্যা দুই কুড়ি), "ফুলগাতা" (কি পদার্থ, বুঝা অসম্ভব)। করুণা, কমলা, টাবা (তিন প্রকারের লেবু?), ফুলবড়ি, তেজপাতা, ক্ষীর, আদা, মান (মানকচু), ওল, দুগ্ধ, "কাঁকুড়ি" (অবোধ্য, টীকাকারও এখানে নীরব), মর্তমান কলা, গুবাক (সুপারি—এই সঙ্গে আর একবার পানের উল্লেখ আছে), কর্পূর, শঙ্খচুর্ণ (পাথুরে চুণ তখন অজ্ঞাত), শাক (কি শাক, উক্ত নাই), বেগুন, সার-কচু (?), খাস-আলু (বোধ হয় যাহাকে "মেটে আলু" বলে - বর্তমান "গোলআলু" অথবা "বিলাতী আলু" সেকালে অজ্ঞাত ছিল), খণ্ড লবণ, আটা (পিঠে করিবার জন্য), "খণ্ড" অর্থাৎ শুষ্ক খণ্ডাকার গুড়, এবং হরিদ্রা।

দুর্ব্বলা এই সব জিনিস কিনিয়া "ভারী" অর্থাৎ বাহকদিগের দ্বারা বাড়ী আনাইল। তার পর স্নান করিয়া নিজে "দধি খণ্ড কলা" জলপান করিল এবং "ভারী"দিগকে চিঁড়া-দই দিল।

দুর্ব্বলা বড়ঘরের ঝি অর্থাৎ দাসী। তাহার বাজারে যাওয়ারও ঘটা আছে:—

দুর্ব্বলা হাটেরে যায়, পশ্চাতে কিঙ্কর ধায়,
কাহন পঞ্চাশ জয়্যা কড়ি।
কপালে চন্দন চুয়া, হাতে পান, মুখে গুয়া,
পরিধান তসরের সাড়ী।

কিন্তু দোকানদারেরা দুর্ব্বলাকে ভয় করিত—

দুর্ব্বলা হাটেরে যায়, দুআধারা লোক চায়,
হের আইসে সাধু ঘরের ধাই।
বুঝিয়া এমন কাজ, যার আছে ভয় লাজ,
ভাল বস্তু রাখিল লুকাই।

যাহা হউক, দুর্ব্বলার "বেসাতি" একটি বড় "ক্রিয়া-কর্ম্মের" উপযোগী, এবং পদপ্রাচুর্য্যে "পূজার বাজারের" সদৃশ।

খুল্লনার রন্ধন

দুর্ব্বলা কর্ত্তৃক বিপুল "বেসাতি" সম্পাদনের পর খুল্লনার উপর রন্ধনের ভার পড়িল। এই রন্ধনের বিবরণ নিম্ন-প্রকার—

১। নানাবিধ ভাজা

(ক) "বার্ত্তাকু কুমড়া ভাজা"

(খ) ঘিয়ে ভাজা "পলাকড়ি"। পলাকড়ি পটোল; অন্য কিছুও হইতে পারে।

(গ) নটে শাক "ফুলবড়ি" সহ

(ঘ) "চিঙ্গড়ি কাঁঠালবীচি দিয়া"

(ঙ) "ঘৃতে নালীতার শাক"

(চ) বাথ্য অর্থাৎ বাথুয়া শাক, কড়া তেলে ভাজা।

(ছ) "কই ভাজে গণ্ডাদশ"
"মরিচাদি দিয়া আদারসে।"

(জ) "ভাজে চিথলের কোল"

২। সুক্তা

"মাজা" অর্থাৎ সম্ভবতঃ থোড়, এবং কাঁচকলায় ঘন "বেসারি" (সম্ভবতঃ, বেসন) ও "পিঠালি" দিয়া, হিং, জিরা ও মেথি ঘৃতে সাঁতলাইয়া—"সুক্তার রন্ধন পরিপাটি।"

৩। মুগের ডাল (?)

কবির ভাষায়, "মুগসূপে ইক্ষুরস।" ইক্ষুরসের এই ব্যবহার অধুনা বোধ হয় অজ্ঞাত।

৪। মুসরীমিশ্রিত মাংসের সূপ

দেখা যাইতেছে, আজকাল আমরা যে "সূপ"কে পাশ্চাত্য অনুকরণ মনে করি তাহা চারি শত বৎসর পূর্ব্বেও এদেশে বিদিত ছিল—অবশ্য প্রকারভেদ হইতে পারে। উল্লিখিত স্বদেশী সূপটি এই প্রকারের—

"মুসরী মিশ্রিত মাস, সূপ রান্ধে হিঙ্গবাস,
দিয়া জিরা বাসে সুবাসিত।"

অর্থাৎ মুসরী মিশ্রিত মাংসের সূপ, উহাতে হিং দেওয়া হইল। এবং জিরা দিয়া সুবাসিত করা হইল।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে—এই "মাস" কি মাংস? না, মাষ (মাষকলাই)? এই রন্ধনপ্রসঙ্গের পূর্ব্বে, দুর্ব্বলার ক্রীত দ্রব্য-সামগ্রীর মধ্যে 'মাষ (মুগমাষ) ছিল (মূর্দ্ধণ্য "ষ")। এই জন্য, অনুমান করা যায় যে, সূপের "মাস" মাংস। অবশ্য, এ অনুমান যে অব্যর্থ তাহা বলি না।

৫। মাছের ঝোল

"রোহিত মৎস্যের ঝোল,
মানকড়ি মরিচে ভূষিত।"

দ্বিতীয় ছত্রের অর্থ দুর্ব্বোধ্য, টীকাকারও নিস্তব্ধ।

৬। মাংস

"মাংস রান্ধিল অবশেষে।"

ইহা আমাদের বাঙালীর ঘরের রান্না মাংসের "কারি" (curry) বা ঝোল, বলিয়া মনে হয়।

৭। মিষ্টদ্রব্য

কয়েকটী দ্রব্য রন্ধন করা হইয়াছিল:—

(ক) গুড়ে ভিজান বড়ি ("খণ্ডে ফেলে বটিকা ভাজিয়া")

(খ) দুধে লাউ এবং "খণ্ড" (শর্করা) দিয়া খুব জ্বাল দিয়া প্রস্তুত মিষ্টদ্রব্য।

"দুগ্ধে লাউ" প্রাচীন কালে বাংলা দেশে একটি প্রিয় খাদ্য ছিল। প্রাচীন সাহিত্যে বহু স্থলে ইহার উল্লেখ আছে। বর্ত্তমানে কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। খুল্লনা ঐ দ্রব্যকে মৌরী দ্বারা সাঁতলাইয়া লইয়া ছিলেন।

"দুগ্ধে লাউ দিয়া খণ্ড, জ্বাল দিল দুই দণ্ড,
সাঁতলিল মহুরীর বাসে।"

(গ) ইহার উপর ছিল—

কলাবড়া, "মুগসারি" (মুগের পিঠে), "খিরভাজা" ও "খিরপুরী"।

অন্ন অর্থাৎ ভাত রাঁধা হইয়াছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। সেকালে লুচির (অথবা রুটির) প্রচলন ছিল না।

খুল্লনার রন্ধনের পূর্ব্বোক্ত বর্ণনার সঙ্গে একটি অতিরিক্ত পাঠও আছে :—

বোদালি হেলঞ্চাশাক
কাঠি দিয়া কৈল পাক
ঘন বেসার সন্তোলন তৈলে।

(বেসার=বেসবার অর্থাৎ হরিদ্রা, সর্ষপ ইত্যাদির মিশ্রণ। সন্তোলন=সাঁতালান)।

কিছু ভাজে রাই খড়া
চিঙ্গুড়ের তোলে বড়া
খরসোলা পুজিদশ তোলে।

(রাইখড়া মৎস্যবিশেষ ; চিঙ্গুর=চিংড়ি ; খরসোলা=খল্‌শে)।

করিয়া কণ্টকহীন
আম্রে শকুলমীন ... (শকুল=শৌল)
খর লোণ দিয়া ঘন কাঠি। (খরলোণ=কড়ানুন)
রান্ধিল পাঁকাল ঝষ (?)
দিয়া তেঁতুলের রস
ক্ষীর রান্ধে জ্বাল করি ভাটি (অল্প অল্প জ্বাল দিয়া)

এই প্রসঙ্গে, উল্লেখ করা যাইতে পারে যে সেকালের ধনীরা স্থবর্ণের ভোজনপাত্র ব্যবহার করিতেন।

"খুল্লনা কাঞ্চন থালে যোগায় ওদন।",

এবং

"স্থবর্ণের বাটীতে দুবলা দেই ঘি।"

সাধুর ভোজন।

খুল্লনার রন্ধনের পর সাধু ধনপতির ভোজনের বর্ণনা আছে। এই উপলক্ষ্যে, কবি বলিতেছেন যে খুল্লনা পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়াছিলেন—

"পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন হইল রন্ধনে।"

উপরিলিখিত বিবরণে ঠিক পঞ্চাশটি "ব্যঞ্জন" পাওয়া যায় কি না, আমরা গুনিয়া দেখি নাই। যাহা হউক, সাধু যখন ভোজনে বসিলেন তখন প্রথমতঃ তাঁহাকে "কাঞ্চন থালে" ওদন অর্থাৎ ভাত দেওয়া হইল এবং "স্থবর্ণের বাটী"তে ঘি। তার পর যে পদগুলি পরিবেশন করা হইল তাহার পুরাপুরি তালিকা পাওয়া যায় না; কেবল এইটুকু আছে—

প্রথমে স্থকুতা ঝোল দিল ঘণ্ট সুপ।
মীন-মাংস ভোজন আপনে বাসে ভুপ।

পুঁথির পাঠান্তরে আছে—

প্রথমে স্থকুতা ঝোল দিল ঘণ্ট শাক।
প্রশংসা করয়ে সাধু ব্যঞ্জনের পাক।
ভ‍্জামান ঝোল ঘণ্ট মাংসের ব্যঞ্জন।
ভোজন করয়ে সাধু আনন্দিত মন।
ঘৃতে জরজর খায় মীন মাংস বড়ি।
বাদ করি কৈ-ভাজা খায় দেড় বুড়ি।
আম্র খাইল পিঠা জল ঘটীঘটী।
দধি খায় ফেনি তথি করে মটমটী।...(ফেনি=বড় বাতাসা)
দধি পিঠা খাইল সাধু মধুর পায়স।

খুল্লনার রন্ধন ও কুটুম্ব ভোজন

এই প্রসঙ্গেও কবি "পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের" উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু পঞ্চাশটি পদের নাম করেন নাই। এ স্থলেও, কুটুম্বেরা "কনক থালে" ওদন পাইলেন এবং "স্থবর্ণের বাটী'তে ঘৃত। অতঃপর, বর্ণনা কতকটা পূর্ব্বের মত—

প্রথমে স্থকুতা ঝোল দিল ঘণ্ট শাক।
প্রশংসা করয়ে সভে ব্যঞ্জনের পাক।
ভাজা দিল ঝোল আদি মাংসের ব্যঞ্জন।
গন্ধে আমোদিত কৈল রন্ধন-ভবন।
দধি দুগ্ধ দিল রামা মধুর পায়স।

* * * * *

পাঠান্তরে, খুল্লনার রন্ধনের এইরূপ পরিচয় আছে—

শাক সুপ রান্ধিয়া ভাজিয়া ওলার বড়ি।
ঘৃত দিয়া ভাজিল উত্তম পলাকড়ি।
কটু তৈলে কই মৎস্য ভাজে পণ দশ।

মুঠে নিঙোরিয়া তাহে দিল আদার রস।
খণ্ড মুগের সুপ উত্তারে ডাবরে।
আচ্ছাদন থালাখান দিলেন উপরে।

যাহা হউক, সকলে ভোজন সমাপন করিলেন এবং

"কর্পূর তাম্বুল কৈল মুখের শোধন।"

শ্রীক্ষেত্রে বিক্রীত খাদ্যদ্রব্য

বর্ত্তমান কালে যাঁহারা শ্রীক্ষেত্র অর্থাৎ পুরীধামে গিয়াছেন, তাঁহারা সেখানকার বিক্রীত খাদ্যদ্রব্যসমূহের সঙ্গে পরিচিত আছেন। কিন্তু চারি শত বৎসর পূর্ব্বে সেখানে কি কি প্রকারের খাদ্য ক্রয়ার্থ পাওয়া যাইত, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ চণ্ডীতে পাওয়া যায়। কবির ভাষায়—

ধন্য ক্ষেত্র জগন্নাথ, বাজারে বিকায় ভাত,
কোই থাই না শুনি হেন বোল।
ত্রিসন্ধ্যা বিকায় হাটে, সুপ ঘণ্ট পুরি ঘটে
আলু বড়া শুকতার ঝোল।
ক্ষীর খণ্ড ছেনা নাড়ু, ছেনা পানা পুয়া গাড়ু,
মানের বেসারি আদা ঝাল।
নাকরা ব্যঞ্জন-রাজা, ঘৃতে পলাকড়ি ভাজা
মধুরস ব্যঞ্জন রসাল।

পাঠান্তরেও এই কয়েকটি পদের কথা আছে :—

ক্ষীরখণ্ড, ক্ষীরপুলি, পদ্মচিনি, অমৃতমণ্ডা, ছোলাবড়ি, কলাবড়া, "ছানাপানা", "নাকরা", "মানের বেসারি" ইত্যাদি এবং "আর্দ্রকে বার্ত্তাকু-পোড়া।"

খুল্লনার নানাবিধ খাদ্যে সাধ

মাতৃত্ব আসন্ন হওয়ায় খুল্লনার সাধারণ খাদ্যে অরুচি এবং নানাবিধ নূতন নূতন খাদ্যের ইচ্ছা হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে, কবির বর্ণনায় বহুবিধ গ্রাম্য খাদ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। খুল্লনা বলিতেছেন—

যদি পাই সাজঘোলে……(সাজঘোল=টাট্‌কা ঘোল)
বদরি শকুল-ঝোলে……(শকুল=শোলমাছ)
তবে গ্রাস চারি খাত্যে পারি।
পুড়িয়া রোহিত ঝস
দিয়া তেঁতুলের রস
হিঙ জিরা বাসে সুবাসিত।
ভাজা চিথোলের কোল
মাগুর মৎস্যের ঝোল
মান করি মরীচ ভূষিত।…(মান=মানকচু)?
লতা নালিতার শাক
কাঁজি দিয়া কর পাক
সতিনী সাঁতলিবে জোয়ানি ফোড়ায়্যা।…(জোয়ান ফোঁড়ন দিয়া)
সম্ভল লবণ তথি…(তথি অর্থাৎ উহাতে; সম্ভল=সঁতলাও)
দিয়া হিঙ জিরা মেথি
বনি বল্যা যদি থাকে দয়া।……(যদি বোন বলে দয়া থাকে)

গ্রন্থের সম্পাদকগণ এই স্থলে যে অতিরিক্ত পাঠ সংযোগ করিয়াছেন, তাহাতে আরও বহুবিধ প্রকারের খাদ্যদ্রব্যের নাম পাওয়া যায়। যথা—

"পোড়ামাছে জামীরের রস;" ধান বাছিয়া ফেলিয়া খই এবং উহার সঙ্গে "মহিষা দই;" "আমড়া সংযোগে রান্না শাক", পুপ অর্থাৎ পিঠে, আম দিয়া মুসুরীর সুপ, আমূশী (ইহাতে নাকি "প্রাণ" পাওয়া যায়), "পোড়া কাসুন্দি"সহ শোল মাছের পোনা (সম্ভবতঃ কাসুন্দি দিয়া পোড়া শোল—ইহাকে "সোনা"র তুল্য বলা হইয়াছে), "হরিদ্রা রঞ্জিত কাঞ্জি", "বনশাক" (?)

এই তালিকার পরে আরও একটি দীর্ঘ তালিকা আছে। খুল্লনার উক্তি—

কহি নিজ সাধ শুন লো দাসী।
পান্ত ওদন ব্যঞ্জন বাসি।
বাথুয়া ঠনঠনি তেলেতে পাক।……(শুষ্ক করিয়া তেলে ভাজা বাথুয়া শাক)
ডগি ডগি তোল ছোলার শাক।……(ডগি=কচি ডগা)
মীন চড়চড়ি কুসুমবড়ি।……(বড়ি দিয়া মাছ চড়চড়ি)
সরল সফরি ভাজা চিঙ্গড়ি।……(সরপুঁটি ও চিংড়ি ভাজা)
যদি ভাল পাই মহিষা দই।
কেলি চিনি তাহে মিশায়ে খই।
পাকা চাঁপা কলা করিয়া জড়।
খেতে মনে সাধ করেছি বড়।
কনক থালেতে ওদন শালি।……(শালি ধান্যের ভাত)
কাঁজির সহিত করিয়া মেলি।
হেন কাঁজি ভুঞ্জি মনেতে তায়।
চাকা চাকা মূলা বাগুন তায়।
আমড়া নোয়াড়ী পাকা চালিতা।
আমসি কাসন্দি কুল করঞ্জা।
খোড় উড়ুম্বর ইচলি মাছে।……(উড়ুম্বর—ডুমুর ও ইচলি=চিংড়ি)
খাইলে মুখের অরুচি ঘুচে।

* * * *

মনে করি সাধ খাইতে মিঠা।
খীর নারিকেল ছাঞির পিঠা।

* * *

দুগ্ধে তিলের গুড়ি মিশায়ে লাউ।
দধির সহিত খুদের জাউ।
চিড়া পাকা কলা দুধের সর।
কহি দুয়া এই শুন গো আর।
ঝুনা নারিকেল চিনির গুঁড়া।
করি আপনার সাধের চুড়া।

খুল্লনার এই তালিকার সহিত ব্যাধপত্নী নিদয়ার তালিকার অনেকাংশে মিল আছে। খুল্লনা ধনী সদাগরের পত্নী হইয়াও রুচিতে ও আকাঙ্ক্ষায় বিলাসিতা এবং বাহুল্য বর্জ্জিতা।

খুল্লনার জন্য নানাবিধ শাক সংগ্রহ ও রন্ধন।

তৎকালে বোধহয় মহিলাগণের "সাধ" অর্থাৎ ইচ্ছামত ভোজনের ব্যবস্থা করিবার উপলক্ষে নানাবিধ শাক সংগ্রহের প্রথা ছিল (যেমন আজকালও পল্লীগ্রামে "চৌদ্দ-শাক" রাঁধা হয়)।

দুয়া নাম্নী দাসী শাক সংগ্রহে বাহির হইল।

কি কি শাক সংগ্রহ হইল?

নট্যা রাঙ্গা তোলে শাক পালঙ্ক নালিতা।
তিক্ত পলতার শাক কলতা পলতা।
সাঁজতা বনতা বনপুঁই ভদ্রপলা।
হিঞ্চলী কলমী শাক জাঙ্গি ডাঁড়িপলা।
নটিয়া বেথুয়া তোলে ফিরে ক্ষেতে ক্ষেতে।
মহুরী শুলফা ধন্যা ক্ষীরপাই বেতে।
বাড়ি বাড়ি ফিরে দুয়া দিয়া বাহুনাড়া।
ডগি ডগি তোলে যত সরিষার খাড়া।

এই প্রকারে শাকসংগ্রহ শেষ হইলে, রন্ধন আরম্ভ হইল। লহনা নিম্নলিখিত পদগুলি রাঁধিলেন—

ঘৃতে জবজব কৈল নালিতার শাক।
কটু তৈলে বেথুয়া করিল দৃঢ় পাক।
খণ্ডে মুগের সূপ উত্তারে ডাবরে।
আচ্ছাদন থালা থালি তাহার উপরে।
কটু তৈলে ভাজে রামা চিতলের কোল।
রোহিতে কুমুড়া বড়ি আলু দিয়া ঝোল।
বদরী শকুল মীন রসাল মুসুরী
পণছই ভাজে রামা সরল সফরী।
কতকগুলো তোলে রামা চিঙ্গড়ীর বড়া।
কটি কটি গোটাকতক ভাজিল কুমুড়া।

লহনার "পঞ্চাশব্যঞ্জন অন্ন" রন্ধনের পরিচয় এইখানে শেষ হইল।

বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল

খ্রীষ্টীয় পঞ্চাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষাংশে রচিত "মনসামঙ্গলে"ও তৎকালে প্রচলিত খাদ্য-সামগ্রীর পরিচয় পাওয়া যায়। মনসামঙ্গল কাব্য কবিকঙ্কণ চণ্ডীর পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও, এ-বিষয়ে উভয় লেখকের মধ্যে মোটামুটি সাদৃশ্য আছে। বিজয়গুপ্তের বর্ণনা অপেক্ষাকৃত সরল। তাঁহার বর্ণনায় পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকটি বিশিষ্ট খাদ্যপ্রকরণের পরিচয়ও পাওয়া যায়। বিজয়গুপ্ত রন্ধনের দুইটি বিবরণ দিয়াছেন। একটি, সোনেকা ছয় পুত্রের জন্য রন্ধন করিতেছেন, তাহার বর্ণনা; অপরটি, সোনেকার সাধ-ভক্ষণের রান্না। নিম্নে দুইটিই উদ্ধৃত করিতেছি—

প্রথম বর্ণনা

অনেক দিন পরে রান্ধে মনের হরিষ।
ষোল ব্যঞ্জন রান্ধিল নিরামিষ।
প্রথমে পূজিল অগ্নি দিয়া ঘৃত ধূপ।
নারিকেল কোরা দিয়া রান্ধে মুসুরীর সূপ।
পাটায় ছেঁচিয়া নেয় পোলতার পাতা।
বেগুন দিয়া রান্ধে ধনিয়া পোলতা।
জ্বরপিত্ত আদি নাশ করার কারণ।
কাঁচা কলা দিয়া রান্ধে সুগন্ধা পাঁচন।
জমানী পুড়িয়া ঘৃতে করিল ঘন পাক।
সাজঘৃত দিয়া রান্ধে গিমা তিতা শাক।
কোমল বাথুয়া শাক করিয়া কেচা কেচা।
লাড়িয়া চাড়িয়া রান্ধে দিয়া আদা ছেঁচা।
নারিকেল দিয়া রান্ধে কুমারের শাক।
ঝাঁজ কটু তৈল রান্ধে কুমারের চাক।
বেতাগ বেগুন কাটি থুইল বাটী বাটী।
ঝিঙ্গা পোলাকড়ি ভাজে আর কাঁঠাল আটি।

* * * *

ঝাঁজ কটু তৈল দিয়া রান্ধে বেগুণ পোড়া।
বাটী বাটী ভরিয়া ব্যঞ্জন থুইল ঠাঁই ঠাই
কলার খোর রাখিতে বাটিয়া দিল রাই।
অত্যন্ত ধবল যেন সাজ দুধের দৈ।
সরিষা বাটা দিয়া রান্ধে পানীকচুর বৈ।
রন্ধন করিতে লাগে বড় পরিপাটী।

মরিচের ঝাল দিয়া রান্ধে বটবটী।
মুগের ঝোল রান্ধে আর মাস কলাইর বড়ি।
দুগ্ধ লাউ রান্ধে আর নারিকেল কুমারী।
সুক্তাপাতা দিয়া রান্ধে কলাইর ডাইল।
পাকা কলা লেবু রসে রান্ধিল অম্বল।
রান্ধি নিরামিষ ব্যঞ্জন হৈল হরষিত।
মৎস্যের ব্যঞ্জন রান্ধে হৈয়া সচকিত।
মৎস্য মাংস কাটিয়া থুইল ভাগ ভাগ।
রোহিত মৎস্য দিয়া রান্ধে কলতার আগ।
মাগুর মৎস্য দিয়া রান্ধে গিমা গাছ গাছ।
ঝাঁজ কটু তৈলে রান্ধে খরসুল মাছ।
ভিতরে মরিচ গুড়া বাহিরে জড়ায়ে সুতা।
তৈলপাক করি রান্ধে চিঙ্গড়ীর মাথা।
ভাজিল রোহিত আর চিতলের কোল।
কৈ মৎস্য দিয়া রান্ধে মরিচের ঝোল।
ডুম ডুম করিয়া ছেঁচিয়া দিল কৈ।
ছাল খসাইয়া রান্ধে বাইন মৎস্যের খৈ।
রন্ধনের কাজ থ কুক ভোজনের কথা।
বারমাসি বেগুণেতে শোল মৎস্যের মাথা।
দুই তিন আনাজ করিয়া ভাগ ভাগ।
খোর দিয়া ইচার মুণ্ড মূলা দিয়া শাক।
জিরা মরিচ রান্ধনী বাটিয়া করে নিল।
মসল্লা বাটিতে হাতে তুলে নিল শিল।
মাংসেতে দিবার জন্য ভাজে নারিকেল।
ছাল খসাইয়া রান্ধে বুড়াখাসির তেল।
ছাগ মাংস কলার মূলে অতি অনুপম।
ডুম ডুম করি রান্ধে গাড়রের চাম।
একে একে যত ব্যঞ্জন রান্ধিল সকল।
শোল মৎস্য দিয়া রান্ধে আমের অম্বল।
মিষ্টান্ন অনেক রান্ধে নানাবিধ রস।
দুই তিন প্রকারের পিষ্টক পায়স।
দুগ্ধে পিঠা ভালমত রান্ধে ততক্ষণ।
রন্ধন করিয়া হইল হরষিত মন।

দ্বিতীয় বর্ণনা

ইহার অনেক স্থলে প্রথমটিরই পুনরাবৃত্তি। নূতন পদগুলির নাম এই—

নারিকেল কোরা দিয়া রান্ধে মুগের সুপ।

*　　*　　*

কড়ীর বেতাগে রান্ধে কলাইর ডাল।

*　　*　　*

নারিকেল কোরা দিয়া রান্ধে বটবটি।

*　　*　　*

রোহিত মৎস্য দিয়া রান্ধে কোলটের আগ।
খান খান করিয়া কাটিয়া লইল চই।
সাজ কটু তৈলে রান্ধে বহিল মৎস্যের খই।
চেঙ্গ মৎস্য দিয়া রান্ধে মিঠা আমের বোল।
কলার মূল দিয়া রান্ধে পিপলিয়া শোল।

*　　*　　*

উপল মৎস্য আনিয়া তাহার কাঁটা করে দূর।
গোলমরিচে রান্ধে উপলের পুর।
আনিয়া ইলিস মৎস্য করিল ফালা ফালা।
তাহা দিয়া রান্ধে ব্যঞ্জন দক্ষিণ সাগর কলা।
শোল মৎস্য কাটিয়া করিল খান খান।
তাহা দিয়া রান্ধে ব্যঞ্জন আলু আর মান।
মাগুর মৎস্য আনিয়া কাটিয়া ফেলে ঝুড়ী।
তাহা দিয়া রান্ধে ব্যঞ্জন আদা মাগুরী।
শাইল তণ্ডুল অন্ন রাঁধিল বিশেষ।
দুই তিন প্রকারে রান্ধে পিষ্টক পায়েস।

*　　*　　*

রাঁধিতে রাঁধিতে সোনার না পুরিল আশ।
পাকা তেঁতুল করে খলিশার বংশ নাশ।

উপসংহার

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। কিন্তু যাঁহারা প্রাচীন কালের বাঙালী-সমাজের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু, তাঁহাদের কাছে এ-সব বিষয় একেবারে অকিঞ্চিৎকর বিবেচিত হইবে না। বাঙালীর আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি পরিবর্তিত হইতেছে। বাঙালীর আহার-ব্যবহারের গুরুতর পরিবর্ত্তন তাহার জীবনীশক্তি হ্রাসের অন্যতম কারণ কি না, বিবেচনার বিষয়। শহরের লোকেরা এই প্রবন্ধে বর্ণিত সেকালের শাকসব্জী-প্রধান খাদ্যসামগ্রীর কথা শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চন করিতে পারেন। কিন্তু, এই শাকসব্জী, মুগ-মুসুরী, নারিকেলের নাড়ু দুধ, ক্ষীর, মাছ, দই খাইয়া সেকালের বাঙালী অপেক্ষাকৃত অধিক জীবনীশক্তি ধারণ করিতেন, ইহা অনেকে স্বীকার করেন। বেরিবেরির ধাক্কায় আজকাল অনেকে শাকসব্জীর মূল্য বুঝিতেছেন বটে; তথাপি শহরে, প্রধানতঃ রাজধানীতে, একদিকে সিঙারা, কচুরি, পানতুয়া, রসগোল্লা, "আবার খাব", "জলতরঙ্গ" প্রভৃতি, অন্য দিকে, চপ্‌, কাটলেট্‌, ডেভিল, ইত্যাদি এবং তাহার উপর, চানাচুর, ঘুগ্‌নি, সাহেবী ধরণে প্রস্তুত "আলু ভাজা" (fried potato) ইত্যাদি কৃত্রিম খাদ্যের অত্যধিক প্রাধান্য বর্ত্তমান। ফলে, প্রভূত অর্থব্যয়ের বিনিময়ে ভগ্নস্বাস্থ্য প্রাপ্তি।

বাংলার পল্লীতে, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে সেকালের ভোজন-দ্রব্যের প্রচলন এখনও অনেকটা বিদ্যমান। স্বল্পব্যয়ে সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্যের পরিচয় আমরা সেকালের খাদ্যতালিকায় পাইতেছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালীর খাদ্যে মুসলমানী প্রভাব পরিস্ফুট। কিন্তু পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে উহা লক্ষ্য হয় না। পোলাও, কাবাব, কোপ্তা, কোর্ম্মা ইত্যাদির নাম ষোড়শ শতাব্দীর খাদ্যে দেখিতে পাই না।

সন্ন্যাস ও গীতার ধর্ম্ম—শ্রীজীবানন্দ গোস্বামী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীপরেশচন্দ্র গোস্বামী, ৩।১, দীন রক্ষিত লেন, কলিকাতা। ১৬২ পৃ., মূল্য বারো আনা।

বহু অযোগ্য ব্যক্তি যে সন্ন্যাস গ্রহণ করে এবং গেরুয়ার যে অপব্যবহার হয়, এ বিষয়ে গ্রন্থকারের সঙ্গে সকলেই একমত হইবেন, আশা করা যায়। আর গীতা নিষ্কাম ভাবে করণীয় কর্ম্ম করিয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছেন এবং সমাজ রক্ষার জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছেন, সম্পূর্ণ কর্ম্মত্যাগ অনুমোদন করেন নাই—ইহাও বোধ হয় বিতর্কের বাহিরে। লেখকের কল্পিত দৃষ্টান্ত 'সুন্দর দাস' জাতীয় সন্ন্যাসী (৪৯ পৃ.) যে ভোগমগ্ন ভণ্ড, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। আর ইহারা যে সমাজের কলঙ্ক এবং ধর্ম্মের ও নীতির শত্রু, এ-কথাও বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। গীতার আদর্শ ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে এই সব অপকীর্ত্তির উদ্‌ঘাটন করিয়া লেখক সমাজের উপকারই করিয়াছেন। জায়গায় জায়গায় আলোচনায় একটু আধটু অসঙ্গতি এবং শৃঙ্খলার অভাব লক্ষিত হইলেও মোটের উপর বইখানি সময়োচিত এবং উপাদেয় হইয়াছে। ধর্ম্মান্ধ এবং ধর্ম্মমুগ্ধ ব্যক্তিরা পাঠে উপকৃত হইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বাংলার ব্যাঙ্কিং—ডক্টর হরিশ্চন্দ্র সিংহ, এম্. এস্‌সি, পিএচ্ ডি-প্রণীত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পুস্তকখানির ভূমিকায় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—"যিনি অর্থশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রচার করিবেন, তিনি দেশের পরম উপকার করিবেন।" ডক্টর সিংহের বইখানির পাঠক মাত্রেই এই উক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিবেন।

কিন্তু শুধু বাংলা ভাষায় লিখিত হইয়াছে বলিয়াই নহে, বইখানির ভিতর ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় যে ভাবে সুযুক্তি দ্বারা ও সুললিত ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে সেভাবে সাধারণ পাঠকের উপযোগী কি ইংরাজী কি বাংলা কোন ভাষাতেই উপযুক্ত পুস্তক নাই বলিয়াও গ্রন্থকারকে বিশেষ ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। নিতান্ত ঘরোয়া উদাহরণ খুঁজিতে গিয়া দুই-এক স্থানে অপ্রীতিকর বিষয়ের অবতারণা করা হইলেও বইখানির লিখনপ্রণালী যেমন মধুর, উহার আলোচ্য বিষয়ের সমাবেশ তেমনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।

ছাত্র ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী সকলেই এই বইখানি পড়িলে প্রভূত জ্ঞান লাভ করিবেন।

উপসংহারে গ্রন্থকার বাংলার ব্যাঙ্কগুলির উন্নতি ও বাঙালীর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির সমৃদ্ধি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার অভিমতের প্রায় প্রত্যেকটিই আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র, দ্বিতীয় ভাগ—অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার প্রণীত, ৩৮৪ পৃষ্ঠা, দাম ৪৲।

বইখানি আগাগোড়া পড়িয়া সমালোচনা লেখা দুঃসাধ্য, সুতরাং মোটামুটি কয়েকটি অধ্যায় ও ভূমিকা পড়িয়াই সমালোচনা করিতে হইতেছে। বইখানিতে বহু প্রকার বিষয়ের সমাবেশ রহিয়াছে। বিভিন্ন পাঠক রুচি হিসাবে নানান্ মাল মশলা পাইতে পারেন। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, বিগত দশ বৎসরের ভিতর এই সমুদয় রচনা ছুটকাভাবে অনেকেই দেখিয়াছেন। "একালের দুনিয়া ধনদৌলত সম্পদ বৃদ্ধি, টাকাকড়ি আর্থিক উন্নতি ইত্যাদি সম্বন্ধে কিরূপ চিন্তা করিয়া থাকে, কোন্ কোন্ ঢঙের 'মত' প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত" তাহারই পরিচয় এই বইখানিতে দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। তবে লেখক স্বীকার করিয়াছেন যে কোন কোন স্থানে "ধান ভানতে শিবের গীত" গাওয়া হইয়াছে। ধনদৌলত ও আর্থিক উন্নতি বিষয়ক নানা প্রকার সমস্যা আর ধন-বিজ্ঞান-গবেষণার বিচিত্র কর্ম্মক্ষেত্রের সঙ্গে আমাদের এম্ এ, বি এল, পাস করা লোকজনের যোগাযোগ ঘটাইয়া দেওয়াই লেখকের আসল উদ্দেশ্য। ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা থাকিলে বইখানির ভিতর হইতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আহরণ করা যাইতে পারে।

বাংলায় ধনবিজ্ঞান, প্রথম ভাগ (১৯২৫—১৯৩১) শ্রীবিনয়কুমার সরকার কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ৪।৹ টাকা।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের সভ্য ও গবেষকগণের ১৯২৫ হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত সময়ের রচনাসমূহ লইয়া এই পুস্তকখানি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেকগুলি তথ্যবহুল প্রবন্ধ বইখানিতে আছে।

শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল

রতনদীঘির জমিদার-বধূ—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়। গুরুচরণ পাবলিশিং হাউস, ২৯।১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, পৃ. সংখ্যা ২১২। মূল্য ২৲

দুইটি ব্যর্থ জীবনকে কেন্দ্র করিয়া উপন্যাসখানি রচিত। অনাথ বালক মাণিক নিঃসন্তান জমিদার-পত্নী মহামায়ার মাতৃত্বকে উদ্রিক্ত করিয়া তাঁহার সন্তানের স্থান পূর্ণ করিয়া বসিল। স্নেহ-ভালবাসায় এই পাতান মা-ছেলের সম্বন্ধটি যখন স্বাভাবিক সম্বন্ধের মতই সার্থক হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময় হইতেই ট্রাজেডীর সূত্রপাত। মায়ের সাধ হইল সংসার পাতিবার, ছেলের উচ্চাশা জাগিল দেশসেবা করিবার। গ্রামেরই কন্যা রেণুর উপর মহামায়া দেবীর নজর ছিল, কথাটা মাণিক-রেণুর অজানা ছিল না। ছেলের কাছে নিরাশ হইয়া মহামায়া দারুণ অভিমানে এবং কতকটা বিতৃষ্ণাতেও একটা কাণ্ড করিয়া বসিলেন,—নিজের দূর-সম্পর্কিত এক ননদের নাতি, অপদার্থ যুবা মদনের সঙ্গে রেণুর বিবাহ দিয়া তাহাকে গৃহলক্ষ্মী করিয়া আনিলেন। কিন্তু সহ্য করিতে পারিলেন না, এর পরেই তাঁহাকে শয্যা গ্রহণ করিতে হইল, এবং কিছু দিনের মধ্যেই সংসার হইতে বিদায় লইতে হইল।

এর পরে মাণিক-রেণুর জীবন, মাঝখানে মদন। এই জীবনের কারুণ্য লেখক বেশ দক্ষতার সহিত ফুটাইয়াছেন। 'রতনদীঘির জমিদার-বধূ' রেণু নিজের মনের আগুনে জ্বলিয়াছে, কিন্তু হিন্দু নারীর আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। মাণিক নিজেকে এমন ভাবে সামলাইতে পারে

নাই। তাহাকে এক দিন নিজের ভুলের কথা স্বীকার করিয়া প্রণয় নিবেদন করিতে হইল। কিন্তু যাহাকে সে কুসুমের মত পেলব ভাবিয়াছিল, দেখিল সে এখানে বজ্রের চেয়েও কঠোর। এইখানেই শেষ। লেখক মাণিকের জীবনকে এইখান হইতে অন্য গতি দিয়াছেন। দুইটি প্রাণীই তাহাদের বেদনার বহ্নি বুকে চাপিয়া নিষ্কলুষ ভাবে নিজের নিজের পথ বাহিয়া চলিয়াছে।

লেখা বেশ তরতরে, ঘটনা-সমাবেশও বরাবর একটা ঔৎসুক্য বজায় রাখিয়া যায়। চরিত্রগুলি সব আলাদা আলাদা,—প্রত্যেকেরই নিজস্বতা আছে। তবে বইটিতে সেন্টিমেণ্ট অর্থাৎ ভাবালুতার একটু বাড়াবাড়ি আছে, এক এক জায়গায় একটু খেলো হইয়া পড়িয়াছে যেন। ফলে আদর্শের সঙ্গে স্বাভাবিকতার মিল এক এক জায়গায় ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ—শ্রীসুশোভনচন্দ্র সরকার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৭৫।

শ্রীযুত সুশোভনচন্দ্র সরকার আন্তর্জাতিক সমস্যা আলোচনায়, বিশেষ করিয়া সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে বিবিধ প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠক-সমাজে সুপরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার লেখা পুস্তক সকলেই আগ্রহের সহিত পাঠ করিবে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতেও তাঁহার যশ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বিগত মহাসমরের (১৯১৪-১৯১৮) পরবর্ত্তী ইউরোপে যে-সব নীতি রাষ্ট্রগঠনে ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কনির্ণয়ে সাহায্য করিয়াছে, বর্ত্তমান পুস্তকে তাহাই তিনি সাধারণ পাঠকের উপযোগী করিয়া লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। মহাযুদ্ধের অবসান হইতে ১৯৩৮ সালে সমরোন্মুখ ইউরোপ পর্য্যন্ত ভের্সাই সন্ধিপত্র ও ব্যবস্থা, বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘ, রুষবিপ্লব ও সোভিয়েট-ইউনিয়ন্‌, মুসোলিনী ও ফাশিসম্‌, হিট্‌লার ও নাৎসি প্রকোপ, ট্রট্‌স্কি ও ষ্টালিন্‌ প্রভৃতি নানা বিষয়ই প্রসঙ্গতঃ ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থশেষের একটি পরিশিষ্টে গ্রন্থকার প্রচলিত আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক সম্পৃক্ত বহু ইংরেজী শব্দের বাংলা পরিভাষা দিয়াছেন। যাঁহারা আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি বিষয়ে লেখেন তাঁহাদের এগুলি বিশেষ কাজে আসিবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

রাষ্ট্রবিধান—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার এম. এ., বি. টি.। ডি, এম্‌, লাইব্রেরী, কলিকাতা। পৃ. ১০২; মূল্য ।৴৹ আনা।

সরল ভাষায় স্কুলের বালকবালিকাগণের জন্য দেশবিদেশের শাসননীতির কথা বর্ণিত আছে। সামান্য দুই-একটি তথ্যগত ভুল থাকিলেও বইখানি ভাল।

মুসলমানের তেত্রিশ কোটি দেবতা—স্কুলসমূহের ভূতপূর্ব্ব জিলা ইন্‌স্পেক্টর আলহজ্জ মৌলভী মোহম্মদ তৈমুর কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ১০০ পৃ.।

ইহাতে বাংলার মুসলমান সমাজে ধর্ম্ম ও আচারে লেখকের মতে যে যে গ্লানি বর্ত্তমানে আছে ও উপস্থিত হইয়াছে তাহার নিরাকরণ সম্বন্ধে কোরাণ হইতে উদ্ধৃত সুরাসহ সুচিন্তিত আলোচনা। ইহা মুসলমান সমাজের উপকারে আসিবে বলিয়া বিশ্বাস করি। বইখানির ভাষা সরল ও সুখপাঠ্য।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

দীওয়ান-ই-হাফিজ—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অনূদিত। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ভিক্টোরিয়া পার্ক, ঢাকা। মূল্য ২৲ টাকা।

এই অনুবাদ-গ্রন্থে ২৭ পাতা ব্যাপী একটি ভূমিকায় হাফিজের পরিচয় আছে; মূল গ্রন্থের পত্রাঙ্ক ১২১, কবিতার সংখ্যা ৬০; বাঁ-দিকে মূল ফার্সী, ডান দিকে বঙ্গানুবাদ।

ওমর খৈয়ামের কবিতার একাধিক অনুবাদ বাংলায় হইয়াছে, অন্তত একখানির চিত্র-সংস্করণ বাজারে চলিত আছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত হাফিজের বিস্তৃত অনুবাদ বাংলায় হয় নাই; দুই-চারিটা কবিতার অনুবাদ এখানে ওখানে হইয়াছে। কিন্তু এক সময়ে বাংলা দেশে ওমরের অপেক্ষা হাফিজ অধিক জনপ্রিয় ছিলেন।

হাফিজের বিস্তৃত অনুবাদ করিয়া অনুবাদক বাংলা সাহিত্যের বিশেষ উপকার করিলেন। অনুবাদ পড়িয়া কাব্যপাঠের আনন্দ পাইলাম। অনুবাদকের পক্ষে ইহা কৃতিত্বের চিহ্ন। বাংলা কাব্যরসিক পাঠকসমাজ গ্রন্থখানি পড়িলে আনন্দ পাইবেন ও উপকৃত হইবেন। বইখানা চিত্রিত প্রচ্ছদপটে সুদৃশ্য বাঁধাই করা; গৃহে রাখিলে গৃহ-সজ্জার কাজেও লাগিবে।

বঙ্কিম-স্মৃতি—সম্পাদক শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র দাশ। ঢাকা বঙ্কিম-শতবার্ষিকী-সমিতির পক্ষ হইতে আলবার্ট লাইব্রেরি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা।

ইহা একখানি সঞ্চয়ন গ্রন্থ—ইহাতে বাঙালী হিন্দু মুসলমান গ্রন্থকারের ১৯টি প্রবন্ধ আছে। ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা ও একখানি পত্র-প্রতিলিপি আছে। শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থপ্রকাশকাল, শতবার্ষিকী উৎসবের বিবরণ ও পরিশিষ্টে বঙ্কিম সম্বন্ধে পুরাতন লেখকদের মন্তব্যের অংশ উদ্ধৃত আছে।

বইখানাতে ভাল-মন্দ-মাঝারি মিলিয়া পড়িবার ও জানিবার অনেক কিছু আছে।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

দেবেশ—শ্রীপ্রিয়লাল দাস। বরেন্দ্র লাইব্রেরী। ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। মূল্য ১।০।

"দেবেশ" একখানি উপন্যাস। বইটি লিখিতে লেখক শক্তি সাহস উভয়েরই পরিচয় দিয়াছেন। নীচ জাতির মধ্যে শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে গিয়া দেবেশ তাহাদেরই এক কন্যার সংস্পর্শে আসিল। জন-সেবার আনন্দের মধ্যেই এক দিন নিদারুণ

দুঃখের আঘাত পাইয়া যখন বুঝিল তাহার পরিচয় প্রণয়ের আসক্তির কোটায় উঠিয়া গিয়াছে, দেবেশ সে-আসক্তিকে অস্বীকার করিল না; বিবাহের দ্বারা তাহাকে নিজের জীবনে বরণ করিয়া লইল। এই পরিণতিটুকু ঘটাইতে লেখক দুঃখ-নিরাশার যে আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে। বইয়ের ভাষা অনাড়ম্বর, অযথা বাগ্‌বিস্তারের চাপে গল্পের গতিবেগ কোথাও ব্যাহত হয় নাই।

কিন্তু একেবারে শেষের দিকে পিতার ক্ষমাটুকু একটু বিসদৃশ হইয়াছে যেন। অতবড় একটা বিচ্যুতি ও-ধরণের পরিবারে সহসা ক্ষমা পাইবার নয়; নেহাৎ যদি সম্ভব ছিল তো তাহার ক্রমপরিণতি দেখান উচিত ছিল। এইখানটিতে মনে হয় লেখক যেন হঠাৎ "ওঁ শান্তি"-র ঝোঁকে পড়িয়া গিয়াছেন।

বইয়ের ছাপায় স্থানে স্থানে ক্রটি আছে। একটি লোককেই কখন "রজনী" কখন "ধরণী" নামে অভিহিত করার মত ক্রটিও হইয়া গিয়াছে।

অমিতাভের উচ্ছৃঙ্খলতা—শ্রীলীলাময় দে। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। মূল্য ১৲।

সাতটি ছোট গল্প লইয়া বইখানি। গল্পগুলি পরিকল্পনা এবং চরিত্রের দিক দিয়া বিশেষত্ববর্জ্জিত। মাঝে মাঝে সোজা কথা বেশি ঘোরাল করিয়া বলিবার ঝোঁকে ভাষা এই রকম হইয়া উঠিয়াছে—"যেন ব্যর্থতার মাঝে নিষ্ফল হ'তে দিও না।" (পৃ. ২১)। আশার কথা এই যে চারি দিকের সামান্য সামান্য ঘটনাগুলিকে সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়া দেখিবার ক্ষমতা আছে লেখকের, কিন্তু এগুলিকে সাহিত্যের কোটায় তুলিবার শক্তি এখনও তাঁহাকে অর্জ্জন করিতে হইবে।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয় শব্দকোষ—শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও শান্তিনিকেতন হইতে বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রতি খণ্ডের মূল্য আট আনা।

এই বৃহৎ অভিধানখানির ৭০তম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার শেষ শব্দ "ব্যাসিদ্ধ" এবং শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক ২২২৮। ইহার পৃষ্ঠা প্রবাসীর পৃষ্ঠা অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে কিছু বড়।

ড.

ঋতু-সংহার—শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীভবানী দেবী অনূদিত এবং কলিকাতা ১৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট হইতে কমলা কাব্য প্রকাশালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সাধারণ এবং রাজসংস্করণ যথাক্রমে ১৷০ ও ১৷০ টাকা।

কালিদাস কবিশ্রেষ্ঠ। বিগত দশ-বার বৎসরের মধ্যে তাঁহার বিবিধ কাব্যের বহু অনুবাদ বাংলায় প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্বেও তাঁহার কতকগুলি কাব্য অনূদিত হইয়াছে। কালিদাসের সাহিত্য-কুঞ্জ বিচিত্র পুষ্পলতাশোভিত, তিনি কাব্যে নানা বর্ণের নানা গন্ধের ফুল ফুটাইয়াছেন। ঋতু-সংহারও সেই অপূর্ব্ব কাব্য-কাননের একটি কুসুম। অধ্যাপক শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী ভূমিকায় অনুবাদক ও অনুবাদকাব্যখানির পরিচয় দিয়াছেন। কালিদাসের কথা বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, "বিচ্ছেদ ও মিলন্ যেমন পরস্পরের পূর্ণতা-সম্পাদক, মেঘদূত ও ঋতু-সংহারও তেমনই পরস্পরের অবশ্যম্ভাবী পরিশিষ্ট।" অনুবাদকদ্বয়ের ছন্দে নৈপুণ্য, অনুবাদে সৌষ্ঠব, এবং কালিদাস-কাব্যে অধিকার আছে। ভাষার প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ না করিয়া অনুবাদে কালিদাসের শব্দসম্ভার যথাসম্ভব অবিকৃত রাখিতে পারিলে বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ হইবে, এ-কথা সকল অনুবাদকের মনে রাখা কর্ত্তব্য। ঋতুবর্ণনাচ্ছলে একাধারে প্রকৃতি ও মানবমনের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রদর্শন কালিদাসের পক্ষেই সম্ভব। গ্রন্থের প্রচ্ছদে এবং ভিতরে কয়েকখানি ছবি আছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

খোয়াই—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র। মডার্ণ পাব্লিশিং সিণ্ডিকেট, ১১৯ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

গদ্যছন্দে রচিত সাতান্নটি ছোটবড় কবিতার সংগ্রহ। অনেকগুলি কবিতাই স্মৃতিশেখর উপাধ্যায় ছদ্মনামে ইতিপূর্ব্বে বাংলার নানা মাসিক পত্রিকায় দেখিয়াছিলাম এবং পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম। 'হাউই' কবিতাটির স্মৃতির আবেদনে স্মৃতিশেখরকে কোন দিনই সম্পূর্ণ ভুলিতে পারি নাই।

গ্রন্থের 'উৎসর্গ-পত্রে' কবি ছন্দে জানাইয়াছেন: জীবনের পূর্ব্ব ভাগে আলসেমির মহাপাতকের পর অবশেষে এই প্রবীণ বয়সে

> "অনুতাপাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে
> বসলুম আমার পাথুরে ডাঙায় খোয়া ভাঙতে"

ফলে 'ঘামের' (কল্পনার) উষ্ণ প্রস্রবণের তোড়ে বইল এই 'খোয়াই' নদী। উপলহত এই প্রবাহিণীর ছন্দচপল কলধ্বনি প্রতিপদেই জানাইয়া দেয় যে কবি যখন তাঁহার কুঁড়েমির মৌতাতে চোখ বুজিয়া ছিলেন তখন বাহিরের লোকেরা তাঁহাকে 'অন্ধ' মনে করিলেও অন্তর্লোকে তিনি সংসারের বিচিত্র শোভাযাত্রার অনুসরণ করিতেছিলেন।

> "অনেক দিন আছি চোখ বুঁজে,
> তাই আস্তে আস্তে ফুট্‌ছে অন্তশ্চক্ষু।
> * * *
> তাই চোখ বুঁজে দেখি রূপ
> শুনি গান, পাই সৌরভ,
> স্ফুরিত স্পর্শ-বৈদ্যুতি
> আমার অন্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।"

সুরেন্দ্রনাথ বয়সে প্রবীণ, শিল্পী হিসাবেও পরিণত। সুললিত সুষমায় মণ্ডিত তাঁহার কাব্য; যথাযথ শব্দপ্রয়োগের যাদু তাঁহার করায়ত্ত। তবু তাঁহার গদ্যছন্দ আজও স্থানে স্থানে পদ্যের

আমেজে আবিল বলিয়া মনে হয়। এই ত্রুটিটুকু মনে না রাখিলে বলিতে পারি, কবিতার পর কবিতায় মৃদু বিস্ময়ের কচিৎ-বিকীর্ণ-উপলপথে তাঁহার কল্পনার খোয়াই নদী কাব্যামোদী পাঠকের চিত্ততটকে রসসিক্ত করিবে।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভারতে স্বরাজ—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী, বি-এল প্রণীত ও প্রকাশিত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা। মূল্য এক টাকা।

হিন্দু রাজত্বে ও মুসলমান রাজত্বে ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ও সমাজের অবস্থা তাহার ক্রমিক পরিবর্ত্তন ও অবনতি এবং ইংরেজ রাজত্বে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও প্রসার, ইংরেজ জাতির আদর্শ, সুশাসন ও সাহচর্য্য কিরূপে কালক্রমে ভারতবাসীর স্বরাজের স্বপ্ন সাফল্যমণ্ডিত করিবে—লেখক তাহা এই পুস্তকে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, লেখক যুক্তিতর্কের পরিবর্ত্তে নিছক মত-প্রকাশের স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছেন। ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যতাও অনেক ক্ষেত্রে রক্ষিত হয় নাই।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

রামপ্রসাদের মা—স্বামী ভূমানন্দ। প্রকাশক শ্রীশিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পি. ৬৪, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় লেখক সাধক কবি রামপ্রসাদের শাক্তসংগীতগুলির মধ্যে সাধনার চারিটি স্তরের সন্ধান দিয়াছেন এবং ইহাদের অন্তর্নিহিত শাস্ত্রীয় তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সংগীতগুলি এক সময়ের রচনা নহে—সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে সাধনার বিভিন্ন অবস্থায় কবি বিভিন্ন ভাবের সংগীত রচনা করিয়াছিলেন—আপাতদৃষ্টিতে তাহাদের মধ্যে যে বিরোধের ভাব পারদৃষ্ট হয় এই দিক্ দিয়া দেখিলে তাহার সমাধান সহজ হইয়া পড়ে। পুস্তিকাখানি রামপ্রসাদের সঙ্গীতের গূঢ়রহস্যভেদে সহায়তা করিবে এবং অভক্তের নিকটও এই সংগীতকে রমণীয় করিয়া তুলিবে। বিক্ষিপ্ত শাক্তসংগীতের মধ্য দিয়াই প্রাচীন কালে তান্ত্রিক সাধনার মূলরহস্য সাধারণের নিকট সরল ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। ব্যাপকভাবে শাক্তসংগীত-সাহিত্যের এবংবিধ আলোচনা হইলে ইহার মূল্য ও গৌরব নির্দ্ধারিত হইবে—অধুনা অবহু-প্রচলিত তন্ত্রসাহিত্যের গভীর তত্ত্বসমূহ বুঝিবার সুবিধা হইবে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

গল্পে বারভূঁইয়া—শ্রীসতীশচন্দ্র শাস্ত্রী বি. এ. প্রণীত এবং কলিকাতা ২০৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে বি. সিংহ এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

বাংলার বারভূঁইয়া বীরত্বের জন্য, রাজোচিত বহু গুণের জন্য ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ। তাঁহাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান ভূমাধিকারী উভয়েই বাংলার ইতিহাসকে উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের কাহিনী বাঙালী মাত্রেরই আদরের জিনিষ। বাংলার স্বাধীনতার জন্য তাঁহারা আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বীরত্বের কথা কিশোরদিগের পাঠের উপযুক্ত গ্রন্থকার এই পুস্তকখানি রচনা করিয়া যথার্থই দেশপ্রীতির পরিচয় দিয়াছেন এবং কিশোরদিগের কল্যাণসাধনে অগ্রসর হইয়াছেন। অদ্ভুত ও কাল্পনিক এ্যাডভ্যান্চারের পুস্তক অপেক্ষা এই জাতীয় পুস্তকই যে বালকবালিকাদিগের অধিকতর উপযোগী তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। গ্রন্থকার সরল ভাষায় বেশ হৃদয়গ্রাহী করিয়া গল্পে বারভূঁইয়ার বীরত্ব কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। মাঝে মাঝে কবিতাংশ উদ্ধৃত করিয়া রচনাকে আরও সরস করিয়াছেন।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

রবীন্দ্র-রচনাবলী—অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য কাগজ ও বাঁধাই ভেদে ৪।০, ৫।০, ৬।।০, ও ১০৲।

রবীন্দ্রনাথ কৈশোরে ও যৌবনে যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গবাণীকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন, পরিণতবয়সে সেগুলির প্রতি আর তাঁহার দাক্ষিণ্যদৃষ্টি ছিল না, সমৃদ্ধতর সাহিত্যসাধনার সুতীব্র দৃষ্টিতে প্রারম্ভ-যুগের এই রচনাগুলিতে তিনি অপূর্ণতাই দেখিয়াছিলেন, তাই এগুলি সম্প্রতি আর পুনর্মুদ্রিত হইত না। কিন্তু পাঠকগোষ্ঠীর সকলে তাঁহার সহিত এ-বিষয়ে একমত নহেন বলিয়া তাঁহাদের আগ্রহ নিবারণের একমাত্র উপায় ছিল বহুগুণ মূল্যে প্রথম সংস্করণের দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহ করা, এ উপায়ে অগণিত প্রার্থীর ঔৎসুক্য নিবৃত্ত করা সম্ভব হইত না। বর্তমানে বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ যে সমগ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশ করিয়াছেন তাহারই অংশস্বরূপ একটি খণ্ডরূপে এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়া অগণিত পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই গ্রন্থগুলি অনেক দিন চলিত ছিল না; এই খণ্ডের নাম দেওয়া হইয়াছে 'অচলিত সংগ্রহ'। প্রথম-যুগের যে-সকল গ্রন্থ এখন অপ্রচলিত, সেগুলি রবীন্দ্র-রচনাবলীর এই বিভাগে ক্রমশঃ সংকলিত হইবে।

এই গ্রন্থগুলির পুনঃপ্রকাশ উপলক্ষ্যে বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের সম্পাদক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় লিখিয়াছেন,

"ইতিহাসের খাতিরেই যে এই বর্জিত রচনাগুলি পুনঃপ্রকাশে ব্রতী হইয়াছি তাহা নয়—যদিও তাহা করিলেও অন্যায় হইত বলিয়া মনে করি না; এই রচনাগুলি যে শুধু রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইতিহাসের দিক দিয়াই প্রয়োজনীয়, যে বয়সে এগুলি তিনি লিখিয়াছেন সে বয়সের পক্ষে বিস্ময়কর, এমন নহে; এগুলির রচনাকালে বাংলা-সাহিত্য উৎকর্ষের যে পর্যায়ে ছিল তাহার পক্ষে এগুলির অধিকাংশই পরম বিস্ময়, এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র এক দিন রবীন্দ্রনাথকে জয়মাল্য পরাইতে কুণ্ঠিত হন নাই।..."

এই খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের 'কবি-কাহিনী', 'বন-ফুল', 'ভগ্নহৃদয়', 'রুদ্রচণ্ড', 'কাল-মৃগয়া', 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ও 'শৈশব সঙ্গীত' এবং পরিশিষ্টে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ-পরিচয় বিভাগে গ্রন্থ-সংক্রান্ত অনেক মূল্যবান তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সংস্করণটির প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অতি পুরাতন দুইখানি পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি, এবং রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও যৌবনের কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য প্রতিকৃতিতে এই খণ্ডের সজ্জা শোভন হইয়াছে।

স.

কাম্বোজের পুরাতত্ত্ব ও প্রাচীন ললিতকলা

আঁরি মার্শাল

ইন্দোচীন প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ডাইরেক্টর

বর্ত্তমান ফরাসী ইন্দোচীনের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগের যে অঞ্চল এখন কাম্বোজ নামে খ্যাত তাহার পুরাকালের নাম ছিল খ্‌মের রাজ্য। চীন দেশের পুরাণ এবং কাম্বোজের শিলালিপিতে এই দেশের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে খ্রীষ্টীয় নবম হইতে চতুর্দ্দশ শতক ব্যাপী এক অতি গৌরবময় সভ্যতার সঠিক ও উজ্জ্বল চিত্র প্রকাশিত হয়। আঙ্কোরের মন্দিরগাত্রে খোদিত শিলাচিত্র এই সকল বিবরণ সমর্থন করে, উপরন্তু ঐ ভাস্কর্য্য-আলেখ্যে প্রাচীন খ্‌মের-রাজগণের সময়ের সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সকল ধার্ম্মিক নরপতি সুদূরবিস্তৃত রাজ্যের সর্ব্বত্র অনেক মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন, সেগুলি এখন আধুনিক শ্যামদেশ (থাইদেশ), কাম্বোজ, কোচিন-চীন এবং দক্ষিণ-লাওস দেশে বর্ত্তমান।

এই সকল মন্দিরের বিবরণ দিতে হইলে প্রায় এক সহস্র প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা দিতে হয়, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি আয়তন, স্থাপত্যকৌশল এবং

বায়োঁ। নরমুখযুক্ত অট্টচূড়া
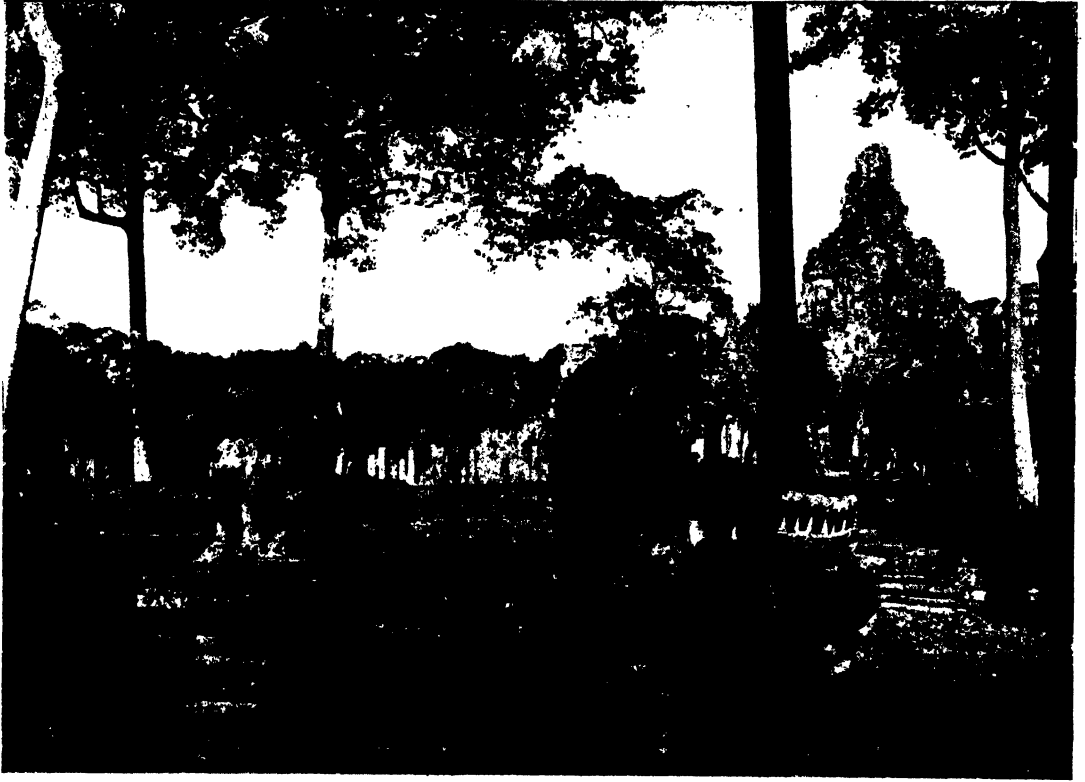
বায়োঁ। পূর্ব্ব দিকের চত্বর হইতে দৃশ্য

কারুকার্য্যের সৌন্দর্য্যে জগতের প্রাচীন ও মধ্য যুগের যে কোনও মহত্তম প্রতিষ্ঠানের সমকক্ষ বলিয়া পরিচিত হইতে পারে।

এই সকল প্রতিষ্ঠানই স্থাপত্যের বিশেষত্বযুক্ত এবং সেই মৌলিকত্বে ইহা স্পষ্টই বুঝায় * যে যদিও খ্‌মেরদিগের কলাশিল্পের উদ্ভব ভারতীয় সভ্যতার জ্যোতিতেই হইয়াছিল এবং খ্‌মেরগণ ভারত হইতেই সংস্কৃতির কয়েকটি ধারা লাভ করিয়াছিল কিন্তু উহারা অল্পকালের মধ্যেই ভারতীয় মানশাস্ত্রের নানারূপ পরিবর্ত্তন করিয়া এক অভিনব স্থাপত্যবিদ্যার বিকাশ করে। এই সকল মন্দিরগাত্র যে আলেখ্যরাজিতে শোভিত তাহার রূপ, অলঙ্কার ও পরিমাণের প্রাচুর্য্যের তুলনা পৃথিবীর অন্য কোনও স্থলে অল্পই পাওয়া যায়। মনে হয় যেন খ্‌মের ভাস্করগণ মধ্যযুগের ইয়োরোপীয় শিল্পীর কল্পনা ও চিত্রকৌশল, গ্রীকদিগের রেখাপাতের সুষমা ও প্রাচ্য শিল্পীর রূপবাহুল্য একাধারে পাইয়াছিল।† এই সকল গুণের মিশ্রণে এমনই অপরূপ শোভার বিকাশ হইয়াছে যে দর্শকমাত্রই আশ্চর্য দেখিয়া বলেন, "আমি এইরূপ দৃশ্য ইতিপূর্ব্বে কোথায়ও দেখি নাই।"

কাম্বোজের ইতিহাস খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু উহার পূর্ব্বগত শতকগুলিতেই ভারত হইতে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সভ্যতাবাহী এক স্রোত এই দেশ পর্য্যন্ত বহিয়া চলিতেছিল। বৌদ্ধ শ্রমণ, ব্রাহ্মণ পুরোহিত, বণিক ও পরিব্রাজকের দল ভারত হইতে এদেশে আসিয়া হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারায় এদেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন। ঐ দুই ভারতীয় ধর্ম্মের প্রভাবে এদেশে বহু মন্দির স্থাপিত হয় যাহা এখন কাম্বোজে

* পাশ্চাত্য গবেষকদের মতে।—অনুবাদক।

† অজন্তা, এলোরা, সাঁচী ও পার্সিপোলিস—এই সকল কলাকৌশল ও সৌন্দর্য্যের নিকটতর নিদর্শন।—অনুবাদক।

প্রাহ্ প্রাং চত্বর

সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি আঙ্কোরের বিরাট হ্রদের উত্তরভাগে স্থিত, যেখানে খ্‌মের-রাজকুলের এক প্রধান রাজধানী ছিল।

ইন্দোচীনের প্রাচীন অধিবাসিগণ মালয়-পলিনেসীয় শ্রেণীর একবংশোদ্ভূত ছিল। তাহারা এক অতি প্রাচীন সভ্যতা হইতে নানা বিশ্বাস, ইতিবৃত্ত—হয়ত কিছু কলাশিল্পও—উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিল। ঐ অতি প্রাচীন সভ্যতা এখন "ওসিয়ানিক" (মহাসাগরজাত) বলিয়া খ্যাত, কেন-না আমাদের ধারণা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে উহার উদ্ভব হয়, কিন্তু এখনও ঐ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অতি অল্পই। উহার প্রভাব মধ্য-আমেরিকা এবং দক্ষিণ- ও পূর্ব্ব- এশিয়ায় ব্যাপ্ত হয় এবং সেই জন্যই ঐ সকল দেশের কলাশিল্পে কতকগুলি সাধারণ উপকরণ লক্ষিত হয়। এই সকল প্রভাবের মিশ্রণই—যাহার সহিত ভারতের পথে প্রাপ্ত মিশর, অসুর ও পারস্যের কলা-উপকরণও যুক্ত হইয়াছিল*—খ্‌মের কলাশিল্পে এক মৌলিকত্ব স্থাপিত করে যাহার প্রভায় উহা জগতে উচ্চস্থান লাভ করে।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে কাম্বোজ দেশের চতুর্দ্দিকে ইটের তৈয়ারী উঁচু অট্টচূড়া (টাওয়ার) স্থাপনা করা হয়। এই-গুলি কখনও পৃথক্ পৃথক্ থাকিত, কখনও কয়েকটি একত্রে স্থাপিত হইত। ঐগুলির স্থাপত্য দক্ষিণ-ভারতের স্থাপত্য-রীতির কতকটা অনুযায়ী। কিন্তু নবম শতকে, খ্‌মের-রাজকুলের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন স্থাপত্যশিল্প দেখা দিল।

কলাশিল্পের (এই দেশের) এই নূতন রীতি যাহা "কুলীন" বা ক্লাসিক" নামে পরিচিত (পূর্ব্বেকার কলারীতি "আদিম" নামে খ্যাত) নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ লক্ষণযুক্ত। প্রথমতঃ, ইহাতে প্রতিষ্ঠানগুলির আয়তন

* মিশর ও অসুর দেশের কলার প্রভাব ভারতে বিশেষরূপে আসিয়াছিল কি না সন্দেহ—অনুবাদক।
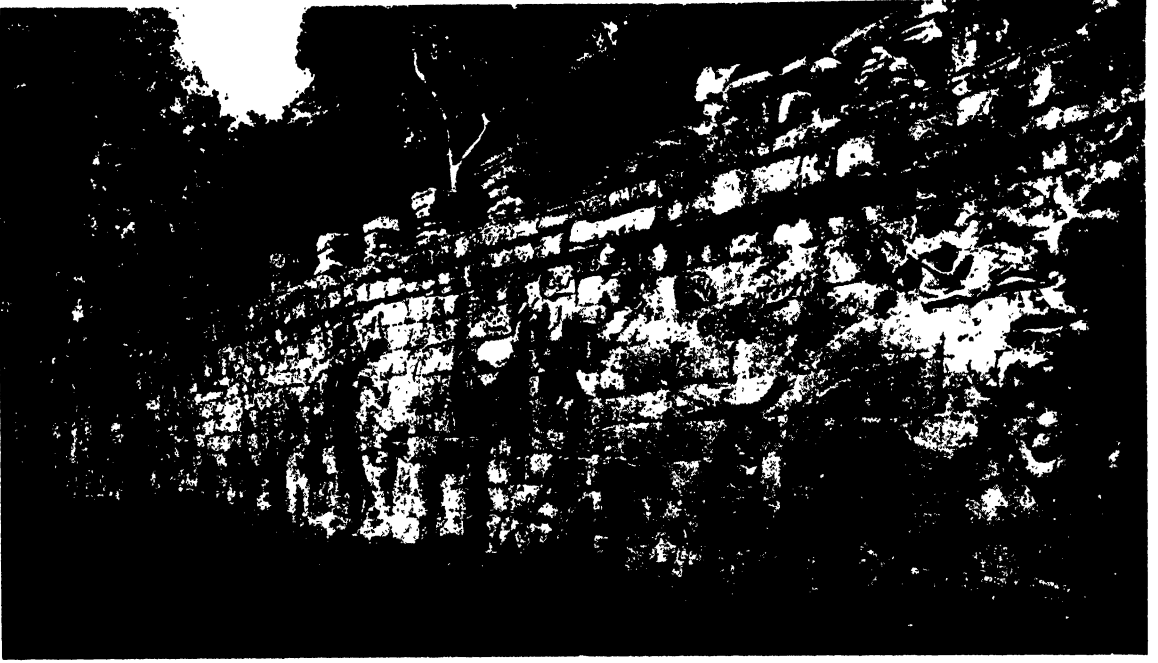
আঙ্কোর-থম হস্তিযূথ-চত্বর

(দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ) বৃদ্ধি হয় এবং ইটের পরিবর্ত্তে ইহাতে বালুকা-প্রস্তরের ব্যবহার আরম্ভ হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রধান গর্ভগৃহের সহিত বহু অঙ্গের যোগ এবং অনেকগুলি গ্যালারী দ্বারা পৃথকস্থিত উচ্চ অট্টচূড়াগুলির পরস্পরের সহিত সংযোগ স্থাপিত হয়। খ্‌মেরদিগের কলাশিল্পের প্রগতির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয় আঙ্কোর ভাটের যুগে (খ্রীঃ দ্বাদশ শতক) এবং ঐ সময়ই উহার উজ্জ্বলতম প্রকাশ দেখা যায়।

ইহার পর দেশ যুদ্ধবিগ্রহে বিধ্বস্ত হয়, আনাম-অঞ্চলের ছামগণ এবং উত্তর-অঞ্চলের শ্যামদেশীয়গণ ক্রমাগত আক্রমণ করার ফলে খ্‌মেরগণ ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং শেষে পরাজিত হইয়া, খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতকে আঙ্কোর ছাড়িয়া পূর্ব্বদিকে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হয়। ইহাই খ্‌মের-রাজ্যের অবসান। ইহার পর খ্‌মেরদিগের গৌরবের জ্যোতি ম্লান হইয়া মিলাইয়া যায় এবং তাহাদের মন্দির ও প্রাসাদগুলি লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হইবার পর পরিত্যক্ত ও জনমানবশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকে।

বন্যবৃক্ষলতার আবরণ মন্দিরগুলি ছাইয়া তাহাদের লোক-চক্ষুর আড়াল করিয়া ফেলে এবং এই অবস্থায় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী পর্য্যটক আঁরি মুহো ঐ মন্দিরগুলি পুনরাবিষ্কার করেন। তিনিই প্রথমে জগতের নিকট এই বিরাট্ স্মৃতি-সৌধগুলির কথা প্রকাশ করেন, তাহার পূর্ব্বে ঐগুলি মানব-স্মৃতির বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। সে সময় ঐ অঞ্চল শ্যাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে উহা ফরাসী সাম্রাজ্যের অধিকারে আসায় প্রাচীন খ্‌মের-রাজ্যের নানা অঞ্চল পুনর্ব্বার—অবশ্য ফ্রান্সের অধীনে—একত্র হয়।

১৯০৮ সালে লেকোল ফ্রাঁসেজ দ্য এক্সত্রেম ওরেয়াঁত নামক বিখ্যাত ফরাসী পুরাতত্ত্বপরিষদের বিশেষ চেষ্টায় আঙ্কোরের মন্দির ও সৌধগুলির রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা আরম্ভ হয় এবং ইহার ফলে ধ্বংসোন্মুখ মন্দিরগুলির সংস্কার ও রক্ষণের ব্যবস্থা সুচারুরূপে হয়। তখন-কার সেই বৃক্ষলতাগুল্ম-আচ্ছাদিত মন্দির, অট্টচূড়া ও সৌধমালার দৃশ্য আজ কল্পনার চক্ষে দেখাও দুরূহ। এক দিকে যদিও ঐ শ্যামল আবেষ্টনী ঐ প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিজাতীয় সৌন্দর্য্য দান করিয়াছিল কিন্তু অন্য দিকে উদ্ভিদের শিকড়ের আকর্ষণে ও নির্য্যাসে তাহার শিলা

প্রাহ্ খান
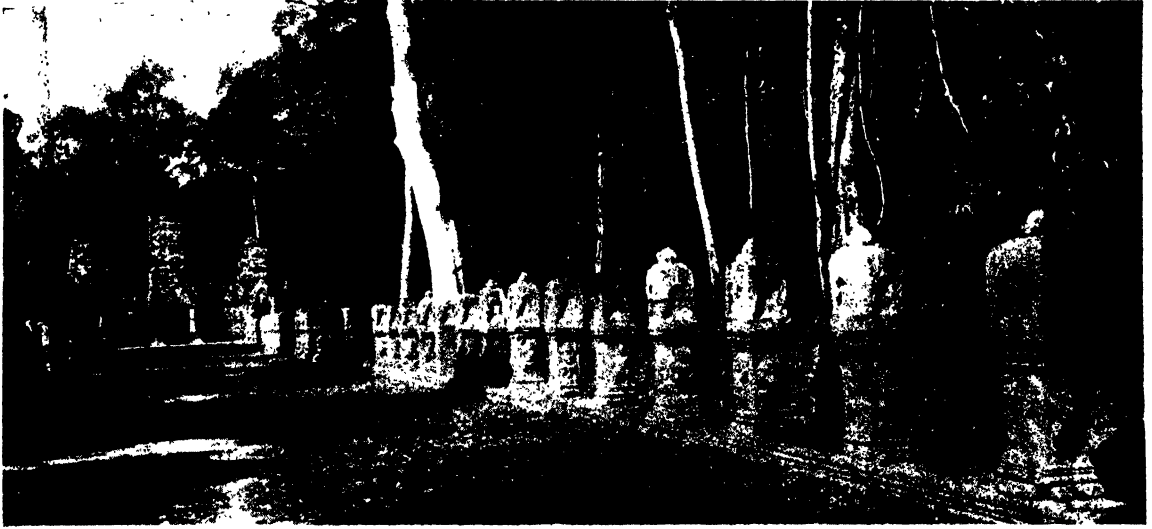
পূর্ব্ব দিকের মন্দির-পথ

হইতে শিলা বিচ্যুত করিয়া ও প্রস্তরগুলিকে জীর্ণ করিয়া সমস্তটি এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিতেছিল।

জঙ্গল কাটিয়া সংস্কার করিবার সময় বহু শিলাচিত্র (বা-রেলিফ) মূর্ত্তি, স্মারক ও অন্য লিপি এবং কতকগুলি অলঙ্কৃত ব্রোঞ্জখণ্ড পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞগণ লিপিগুলির (অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষায়) পাঠোদ্ধার করিয়া প্রতিষ্ঠানগুলির স্থাপনের সঠিক কাল নির্ণয় করিতে পারেন। ইতিপূর্ব্বে বহুকাল যাবৎ ঐ স্মারক-সৌধগুলি অতি প্রাচীন বলিয়া খ্যাত ছিল। ইতিহাস নামে যে সকল কিম্বদন্তী এদেশে প্রচলিত ছিল তাহাতে ঐরূপ বিবরণই পাওয়া যাইত। উপরোক্ত লিপিগুলির পাঠোদ্ধারে দেখা গেল যে খ্মের-সভ্যতার গৌরবময় যুগ খ্রীষ্টীয় নবম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

* * *

আঙ্কোর নগরীর ভিতরে এবং তাহার আশপাশে অপেক্ষাকৃত অল্পপরিসর ভূমিখণ্ডে খ্মের-কলা-শিল্পপ্রসূত প্রতিষ্ঠানগুলির বহু শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে আমি কেবল তাহার প্রধানতম কয়েকটির বিষয় বলিব।

সিয়েম রিয়প নগরের দর্শকের পক্ষে আঙ্কোরভাটের আয়তনই প্রধানতম দৃশ্য। জলপূর্ণ প্রশস্ত মন্দির-পরিখায় মন্দির দ্বারগুলির দীর্ঘ অলিন্দ প্রকোষ্ঠ ও মধ্যভাগের অট্টচূড়া ইত্যাদির প্রতিচ্ছায়া, মন্দিরের ছাদের স্তর এবং প্রস্তরমণ্ডিত প্রশস্ত পথ, এই অপরূপ দৃশ্যাবলী দর্শকের মনে অতি গভীর ভাবে মুদ্রিত হয়। মন্দিরের বাহিরের চত্বরের দেওয়ালের পাশের পরিখা এক-এক দিকে হাজার গজের অধিক দীর্ঘ এবং প্রস্থে দুই শত গজেরও অধিক। মন্দিরের প্রধান দ্বারের সম্মুখে এই পরিখার উপর দিয়া একটি বিরাট্ প্রস্তরময় সেতুপথ গিয়াছে, যাহার দুই পাশ পূর্ব্বকালে সপ্তমুখী নাগশ্রেণীমণ্ডিত স্তম্ভমালায় সুসজ্জিত ছিল। চতুর্দ্দিকের দেওয়াল পার হইয়া ভিতরে যাইবার পথ একটি মণ্ডপের ভিতর দিয়া, যাহার চতুষ্পার্শ্বে দীর্ঘ প্রকোষ্ঠ (গ্যালারী) এবং মধ্যে তিনটি দ্বারপথ। ছায়াময় বৃক্ষশোভিত প্রশস্ত পথ, শ্যামল তৃণমণ্ডিত চত্বর এবং জলপূর্ণ দীঘি, এই সকলের শোভায় আঙ্কোরভাট যথার্থই ইউরোপের শ্রেষ্ঠ রাজপ্রাসাদ ভার্সাইয়ের সহিত তুলনা হইতে পারে। মন্দিরের মধ্যভাগের স্মৃতিসৌধ, যাহার উচ্চ অট্টচূড়াগুলিকে দূর হইতেই ত্রিতলব্যাপী দীর্ঘ প্রকোষ্ঠগুলির উপর বিরাজ করিতে দেখা যায়, যতই নিকট হইতে দেখা যায় ততই সৌম্য রূপ ধারণ করে। মন্দিরের দৃশ্যাবলী যেরূপ ক্রমশঃ প্রকাশের অনুপাতে দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয় তাহাতে মন্দিরনির্ম্মাতা

প্রাহ্ কো মন্দিরের ভিতরের স্থাপত্য-অলঙ্কার

পাঁচ শত গজের অধিক ব্যাপী শিলাচিত্রমালায় সজ্জিত। এই খোদিত চিত্রাবলীতে দেবদেবী, পুরাণ-প্রথিত বীরগণ ও মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা খ্মের-নৃপতির জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। উৎসবে, ব্যসনে, রাজপ্রাসাদের নানা দৃশ্যে এবং হিন্দুদিগের কাব্যবর্ণিত নানা প্রসিদ্ধ বীরকীর্ত্তি সাধনে ব্যস্ত এই পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নায়কদিগের কত শত দৃশ্যই দেখা যায়। দক্ষিণ দিকের প্রকোষ্ঠে মন্দিরনির্ম্মাতা খ্মের-রাজার যুদ্ধযাত্রার চিত্রাবলীর পর নরকে পাপীর শাস্তি ও স্বর্গে পুণ্যাত্মাগণের আনন্দের নানা আলেখ্য আছে। ভূমিতল হইতে দুই শত ফুট উর্দ্ধে আরোহণ করিলে পরে উচ্চতম তলে পৌছান যায় যেখানকার মধ্যস্থিত মঞ্চের গর্ভগৃহে মন্দিরের

স্থপতিগণের দৃশ্যবিন্যাসের জ্ঞান কত গভীর ছিল, ঘন-সন্নিবেশের ধারণা কিরূপ সমীচীন ছিল এবং রেখাপাত ও অলঙ্কার-যোগের কল্পনা কিরূপ তীক্ষ্ণ ছিল, তাহা আশ্চর্য্যভাবে প্রকাশিত হয়। মন্দিরের প্রকোষ্ঠগুলির ভিতরে প্রবেশ করিলে এক দৃশ্য দেখা যায় যাহা একাধারে অভিনব ও মর্ম্মস্পর্শী। দীর্ঘ প্রকোষ্ঠের প্রাচীরগাত্র

পবিত্রতম অংশ বিরাজ করিতেছে। এখানকার চতুর্দ্দিকের প্রাচীরগাত্র খোদিত চিত্রে ও ভাস্কর্য্য-অলঙ্কারে মণ্ডিত, যাহার মধ্যে অলঙ্কারমালায় আচ্ছাদিত নগ্নবক্ষা হাস্যমুখী দেবললনাগণকে দেখিলে মনে হয় যেন তাঁহারা দর্শককে স্মিতমুখে পুষ্পদানে ইচ্ছুক।

মন্দিরের গগনচুম্বী অট্টচূড়ামালা, অলিন্দ ও

প্রকোষ্ঠের অলঙ্কৃত স্তর বহন করিয়া নীল আকাশে যেরূপ সুদৃঢ় ঘন রেখাপাত করিয়া উন্নত হইয়া আছে তাহা সত্য সত্যই সুগম্ভীর মহিমাপূর্ণ।

বলা যাইতে পারে আঙ্কোরভাটে যে স্থাপত্য-কল্পনা বাস্তব রূপ ধারণ করিয়াছে তাহার বিশুদ্ধতা এতই কুলীন (ক্লাসিক) ও আভিজাত্য এতই উচ্চবর্গের যে জগতে তাহার সমকক্ষ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

আঙ্কোরের শেষ রাজধানীর মধ্যভাগে স্থিত দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত বায়োঁ মন্দির সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। প্রথম দর্শনে মনে হয় যে উহা কোন বিরাট্ শিলাখণ্ড যাহা প্রাকৃতিক শক্তিতে খোদিত ও কর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু নিকটে গেলে দেখা যায় যে, উহার মধ্যভাগের সৌধসমষ্টিতে বিভিন্ন উচ্চতার কয়েকটি অট্টচূড়া রহিয়াছে তাহা বিরাট্ নরমুখের প্রতিকৃতিতে শোভিত। আঙ্কোর-থম নগরীর প্রাকারের তোরণগুলি এই মন্দিরের সমসাময়িক এবং সেগুলিকেও স্থপতিগণ ঐরূপ নরমুখ-যোগে অলঙ্কৃত করিয়াছে।

বায়োঁ মন্দিরে প্রবেশ করিলেই প্রথমেই এক গোলক-ধাঁধার জালে পড়িতে হয়। কয়েকটি দীর্ঘ অলিন্দ-প্রকোষ্ঠ (গ্যালারী) নানা কোণ হইতে আসিয়া কয়েক স্থলে মিলিত হইয়া পারাপার হইয়াছে। মিলনস্থলগুলিতে খিলানের ছড়াছড়ি এবং চারি দিকের দেওয়াল অসংখ্য খোদিত শিলাচিত্রের শোভায় পরিপূর্ণ। কোথাও পুষ্পের ভার লইয়া দেববালা, কোথাও পদ্মে নৃত্যশীলা অপ্সরা, কোথাও বা ক্ষুদ্র মূর্ত্তিমালা ও সাধারণ ভাস্কর্য্য-অলঙ্কার। কিন্তু উপরের মঞ্চে (প্ল্যাটফর্ম্মে) উঠিয়া মন্দির-মধ্যভাগের প্রায় ১৫০ ফুট উন্নত অট্টচূড়ামালার পাদমূলে পৌছান মাত্র মনে হয় যেন এক স্বপ্নরাজ্যের মায়াকুঞ্জে আসিয়াছি। মঞ্চের চতুর্দ্দিক অতি অদ্ভুত সমুন্নত অট্টচূড়ামালায় ঘেরা, তাহাদের প্রত্যেকটির অতি বৃহৎ নরমুখ যেন স্মিতহাস্যে দর্শকের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করে। সে যেন স্বপ্নরাজ্যের দানবপুরী পাষাণে বাস্তব রূপ গ্রহণ করিয়াছে—সে যেন লোকজগতের স্থাপত্যের অতীত!

ইহার তুলনা জগতের অন্য কোনও স্মারক-সৌধের সহিত চলে না। মন্দিরের বাহিরের অংশের দীর্ঘ অলিন্দ-প্রকোষ্ঠগুলির খিলান ছাদ কবে ধ্বংস পাইয়া লুপ্ত হইয়াছে, প্রাচীরে খোদিত শিলাচিত্রের সারির লুপ্ত-প্রায় শেষাংশ এখনও দেখা যায়, যাহাতে সেই অতীত যুগের খ্মেরদিগের জীবনযাত্রার কতুশত দৃশ্য অঙ্কিত ছিল। নদীর ধারের হাট-বাজার, নদীর বক্ষে জেলেদের নৌকা, প্রাসাদের অন্তঃপুরে রাজ-পরিবারের আমোদ-প্রমোদ সভা-সম্মিলন সবই ছিল সেইখানে। এই শিলাচিত্রের এক প্রশস্ত অংশে আছে সেনাবাহিনীর যুদ্ধযাত্রার ছবি—যেরূপ আঙ্কোর-ভাটে পাওয়া যায়। যুদ্ধবিগ্রহের ছবি যাহা আছে তাহা দেখিলে শিলালিপির ঐতিহাসিক কাহিনী যেন চক্ষের সম্মুখে জাগিয়া উঠে।

স্থাপনের সময় মন্দির বুদ্ধদেবকে নিবেদন করা হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে দেশে ধর্ম্মান্তরের প্রবাহ আসায় ইহা শৈবধর্ম্মাবলম্বিগণের অধিকারে আসে। বোধ হয় মন্দিরের অট্টচূড়ার মুখগুলি বৌদ্ধ দেবগণের, সম্ভবতঃ বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের, এবং সাধারণ অনুমানে সেগুলি যে ব্রহ্মা বা শিবের মুখমণ্ডল বলিয়া পরিচিত তাহা বোধ হয় ভুল। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরই ছিলেন প্রাচীন নগরের অধিষ্ঠাতা দেবতা। শৈবধর্ম্মবিশ্বাস বৌদ্ধধর্ম্মকে স্থানচ্যুত করার সঙ্গে সঙ্গেই মন্দিরের প্রত্যেক অঙ্গ হইতে বৌদ্ধমতের সকল মূর্ত্তি ও চিত্র তুলিয়া ফেলা হয়।

বায়োঁর অতি নিকটে এবং নগরীর প্রধান চতুষ্ক-প্রাঙ্গণের পাশে রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান। তখনকার দিনে একমাত্র দেবতার জন্যই পাষাণ-পুরী নির্ম্মিত হইত, স্বয়ং রাজা ইট বা কাঠের প্রাসাদে থাকিতেন। শত-শত বৎসরের কালের প্রকোপে রাজপুরীর আর কিছুই নাই, আছে মাত্র চতুর্দ্দিকের প্রাকার এবং একটি ৩২৫ গজ দীর্ঘ পাষাণ-চত্বর (terrace) যাহার গাত্রে এক সুদীর্ঘ ও অতি অপরূপ শিলাচিত্রে হস্তিযূথ লইয়া শিকারের দৃশ্য অঙ্কিত আছে। প্রাকারের ভিতরে ল্যাটেরাইট প্রস্তর নির্ম্মিত পিরামিডের উপর একটি ছোট মন্দির আছে যাহার নাম ফিমিয়েনকস্। কথিত আছে যে, পূর্ব্ব-কালে এখানে এক স্বর্ণময় মণ্ডপ ছিল যাহার ভিতরে

খ্‌মের-রাজগণ প্রতি রাত্রে রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর দর্শন পাইতেন। দেবী নাগিনী রূপে দেখা দিতেন এবং কিম্বদন্তীতে ইহাও আছে যে খ্‌মের-রাজবংশ নাগকুলোদ্ভব।

এই "গৌরব-চত্বরের" পাশে—যাহার অন্য নাম "হস্তিযূথ চত্বর"—নৃপতি লেপ্রুর চত্বর দেখা যায়। আঠার বৎসর পূর্ব্বে এই চত্বরের ভিতরে পাকা গাঁথুনিতে ঢাকা একটি দেওয়াল আবিষ্কৃত হয়। বাহিরের আচ্ছাদন খুলিয়া ফেলিলে দেখা গেল ঐ দেওয়ালে অতি সুন্দর শিলাচিত্রে নাগিনী, রাজকন্যা, নাগ ও রাক্ষস পর্য্যায়ক্রমে পরে পরে অঙ্কিত রহিয়াছে। এই চত্বরেই এক প্রসিদ্ধ মূর্ত্তি পাওয়া যায় যাহার নামে সমস্ত চত্বরটি এখন খ্যাত। এই মূর্ত্তি "নৃপতি লেপ্রু" নামে পরিচিত যদিও এই নামকরণের কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই, আছে কেবল সেইরূপ সাধারণের বিশ্বাস যাহাতে অনেক স্মারক-চিহ্নের অহেতুক নামকরণ হইয়া থাকে।

আঙ্কোর-থমের নগরপ্রাকারের ভিতরে আরও অনেক ছোটবড় মন্দির-মণ্ডপ, চত্বর, জলাশয় ইত্যাদি আছে, তাহার মধ্যে বায়োঁ এবং ফিমিয়েনকসের মাঝামাঝি বাফুয়ন মন্দির ও তাহার ছোট ছোট সুন্দর শিলাচিত্র উল্লেখ-যোগ্য।

নগর হইতে দূরে পূর্ব্ব দিকে টাকিও নামক মন্দির আছে। হিন্দুধর্ম্মমতে দেবদেবীর বাসস্থান পর্ব্বতশিখরে সেই জন্য অনেক খ্‌মের মন্দির প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম গিরি-শিখরে স্থাপিত হইত। টাকিওর পঞ্চ অট্টচূড়া এইরূপ স্তরে স্তরে নির্ম্মিত উচ্চ মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া চারি-পার্শ্বের বনানীর বহু উপরে নীল আকাশে মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। এই মন্দিরের কারুকার্য্য অন্য মন্দিরের তুলনায় রুক্ষ এবং দেওয়ালের উপরের অংশ চিত্রশূন্য।

টা প্রোহ্‌ম মন্দির এখনও জীর্ণধ্বংসাবশেষের অবস্থায় আছে। এই বিহার প্রশস্ত ক্ষেত্রের উপর বিরাজমান। ইহার উদ্যান-সীমানার প্রাচীর এক এক দিকে সহস্র গজের অধিক। মন্দিরের চত্বর ও প্রাঙ্গণ-গুলিতে বৃক্ষগুল্মের আচ্ছাদন এখনও রহিয়াছে এবং তাহাদের শ্যামল শোভা মন্দিরের মণ্ডপ ও নানা স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য অলঙ্কারের সহিত মিলিয়া এক অতি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

নিকটস্থিত বাণ্টেয়ে কৃদেই মন্দির দেখিলে সহজেই বুঝা যায় টা প্রোহ্‌ম মন্দিরের সংস্কার ও সংরক্ষণ করিলে উহার আকৃতি কিরূপ হইবে। দুইটিই এক সময়ের এবং একই ধরণের মন্দির এবং সংস্কার ও সংরক্ষণের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায় বাণ্টেয়ে কৃদেই মন্দিরের সংস্থান, পরিমাপ ও নির্ম্মাণরীতি ইত্যাদি সহজেই ধরা যায়।

প্রাহ্‌ খান নামক বিরাট মন্দিরও ঐ যুগের কীর্ত্তি। এই মন্দিরের বহিঃপ্রাকারের তোরণের সম্মুখে স্থাপত্যবিদ্যার এক অত্যাশ্চর্য্য নিদর্শন আছে। এই তোরণের সম্মুখে ও ভিতর দিয়া প্রশস্ত প্রস্তর-ফলক নির্ম্মিত রাজপথ পরিখা পার হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে। রাজপথের দুই পাশের সীমানা স্তম্ভের সারি দিয়া বাঁধান আছে। এই স্তম্ভলহরী নিপুণ ভাস্করের কৌশলে সপ্তমুখ নাগধারী বিশালকায় দেব ও দানব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। বাসুকি নাগ দিয়া সুরাসুরের সমুদ্র-মন্থনের প্রতিরূপ এই স্তম্ভলহরীতে ফলিত হইয়াছে। স্তম্ভের শেষে উদ্যত-ফণা সপ্তমুখ বাসুকি যেন মন্দিরের শত্রুকে আক্রমণোদ্যত বলিয়া মনে হয়। অন্য দেশে অন্য অনেকেই রাজপথের দুই ধার মূর্ত্তিশ্রেণী দিয়া শোভিত করিয়াছেন কিন্তু এক পরিকল্পনায় ও একই পৌরাণিক আখ্যানের বিষয়বস্তু দিয়া এরূপ ভীম পরিমাপের স্থাপত্য-অলঙ্কারের সৃষ্টি করিতে কেহই সমর্থ হইতে পারেন নাই। আঙ্কোর-থম নগরীর পঞ্চতোরণের সম্মুখেও এই একই পরিকল্পনার স্তম্ভলহরী ছিল। নগরীর বিজয়-তোরণের সম্মুখের খণ্ড খণ্ড মূর্ত্তি যথাস্থানে জুড়িলে ইহাই দাঁড়াইবে।

নেয়ক পেয়ন নামের ছোট মন্দিরটি অন্য ধরণের। একটি বৃহৎ দীঘি কেন্দ্রে রাখিয়া চারি ধারে অনেকগুলি ছোট জলাশয় কাটা হয়। বড় দীঘিটির কেন্দ্রে পদ্মের আকারে স্তরে স্তরে নির্ম্মিত প্রস্তর মঞ্চের উপর একটি ছোট মন্দির আছে। পূর্ব্বকালে এই পুষ্করিণীগুলির জল বোধ হয় রোগশান্তির জন্য ব্যবহৃত হইত। দুঃখের বিষয় এখন বৎসরের অধিকাংশ সময় এগুলিতে জল থাকে না এবং যে সুন্দর বনস্পতি এতদিন মন্দিরকে

ছায়াদান করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল সম্প্রতি সেটিও বজ্রপাতে ফাটিয়া পড়িয়াছে।

প্রে রূপ নামে আর একটি মন্দিরের সংরক্ষণকার্য্য সম্প্রতি শেষ হইয়াছে, ইহার সমস্তই ইটের তৈয়ারী। ইহাও স্তরে স্তরে গঠিত পিরামিড-আকার মঞ্চ-ভিত্তির উপর পাঁচটি উন্নত অট্টচূড়া স্থাপন করিয়া প্রতিষ্ঠিত। ইটের রক্তাভ বর্ণ এই মন্দিরসমষ্টিকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

আঙ্কোর অঞ্চলের অন্যান্য প্রধান মন্দির মধ্যে ফ্নোম বাখেঙ্গ উল্লেখযোগ্য। একটি টিলার শিখরের মধ্যস্থলে স্থাপিত পিরামিড ভিত্তির উপর দেওয়ালটি রহিয়াছে। ইহা আঙ্কোরভাট ও আঙ্কোর থমের মাঝামাঝি অঞ্চলে, প্রথম আঙ্কোর নগরীর কেন্দ্রস্থলে; ইহারই চতুষ্পার্শ্বে মহারাজ যশোবর্ম্মণ খ্রীষ্টীয় নবম শতকে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন।

আঙ্কোরের মন্দিরগুলির কয়েক যোজন দূরে অন্য কয়েকটি স্মৃতিমন্দির আছে। বান্টেয়ে সাম্রে মন্দিরের সংরক্ষণের আরম্ভেই একটি সুন্দর ভাস্কর্য্য-অলঙ্কারপূর্ণ চত্বর পাওয়া যায় যাহার উপর দিয়া মন্দিরের প্রধান প্রবেশ-পথ চলিয়া গিয়াছে। আঙ্কোরের পথে, অল্প দূরে রলুয়স সৌধমালার মধ্যে প্রাহ্ কো নামে ইটের অট্টচূড়া-রাজি আছে যাহার মৃন্ময় কারুকার্য্যের এক অংশ রক্ষা করা গিয়াছে। ইহা নবম শতাব্দীতে নির্ম্মিত।

সর্ব্বশেষে আঙ্কোর হইতে বাইশ মাইল দূরে স্থিত এক দেবস্থলের বিষয় বলিব। ইহার নাম বান্টেয়ে শ্রেই, এবং ভাস্করের দৃষ্টিতে ইহা সকল মন্দিরের মধ্যে অনুপম সুন্দর। এই ছোট মন্দিরটির আয়তনের স্বল্পত্ব বিশেষ দ্রষ্টব্য। ইহার উচ্চতম অট্টচূড়া মাত্র ৩৩ ফুট উন্নত এবং ভিত্তি-মঞ্চ মাত্র চার ফুটের অল্পাধিক উচ্চ।

মন্দির-পথের দুই পাশে শিলাস্তম্ভ, তাহার পর মন্দিরের প্রবেশ-পথে তোরণমণ্ডপ, যাহার একটি কারু-কার্য্য খচিত ছাদের স্কন্ধের সম্পূর্ণ সংস্কার হইয়াছে, তাহার পর মন্দির। দুই প্রস্থ প্রাকার-ঘেরা নিবিড় কারুকার্য্য-ময় মন্দিরগুলি এখন উন্নতশির হইয়া অনুপম শোভা বিস্তার করিতেছে। মন্দিরগুলি যে-পুষ্করিণীর মধ্যে স্থাপিত, দুঃখের বিষয় সেটি শুকাইয়া গিয়াছে। এই মন্দিরগুলির ছাদের কয়েকটি স্কন্ধে (পেডিমেণ্ট) যে খোদিত শিলাচিত্রণ দেখা যায়, সেগুলি খ্মের-ললিতকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিতে পারা যায়। তাহাদের আলেখ্য-বিন্যাস এবং শিল্পকৌশল দুই-ই অতি উচ্চ অঙ্গের।

আঙ্কোরের স্মৃতিসৌধসংস্কার-বিভাগে যে নূতন পদ্ধতি এখন চলিতেছে তাহাতে উদ্ভিদাদি দ্বারা ভূপাতিত মন্দিরের পুরাতন প্রস্তরগুলিকে পরিষ্কার করিয়া পুনর্ব্বার যথাস্থানে দৃঢ়ভাবে যোজনা করিয়া মন্দিরের প্রধান প্রধান অংশের পুনর্গঠন করা হয়। এই মন্দির-সমষ্টির সমস্তই ঐভাবে সংস্কার করায় দর্শক এখন সেই দৃশ্যই দেখিতেছেন যাহা খ্মের-রাজকুলের গৌরবময় যুগে শত-সহস্র তীর্থদর্শনকামী দেখিয়া গিয়াছে। মন্দিরের প্রাচীন যুগের অবস্থার এরূপ সুচারুভাবে লুপ্তোদ্ধার খ্মের-স্মৃতিসৌধ-ধ্বংসাবশেষগুলির মধ্যে অতি অল্প স্থলেই হইয়াছে। মন্দিরের ভিত্তি-শিলায় অঙ্কিত লিপির পাঠোদ্ধারে সঠিক্ জানা গিয়াছে যে ইহা খ্রীঃ ৯৬৭ সালে স্থাপিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে খ্মের-শিল্পকলার উদ্ভব ও প্রগতির যুগ, মধ্যযুগের ফ্রান্সের সংস্কৃতিপ্রবাহের সম-সাময়িক এবং এই দুইটির মধ্যে একাধিক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ইউরোপের রোমাণ্টিক, বাইজাণ্টীয় ও রোমক শিল্পকলার মধ্যে সংযোগ সুস্পষ্ট ও এই স্রোত রেনেসাঁসের কাল পর্য্যন্ত সমানে চলিয়াছিল, অন্য দিকে খ্মেরদিগের কলাশিল্পের উদ্ভব ও লোপ দুই-ই যেন আকস্মিক ব্যাপার। আমি আগেই বলিয়াছি, ইহার উদ্ভব হিন্দু-সভ্যতার প্রভাবেই হইয়াছিল এবং এদেশের ধর্ম্ম, পৌরাণিক আখ্যায়িকা ও সাহিত্য প্রভৃতি সমস্তই ভারতের সভ্যতার আলোকে অনুপ্রাণিত।* কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা উচিত যে এদেশের শিল্পকলার অনেকগুলি উপকরণ দেখা যায় যেগুলি খ্মেরদিগের নিজস্ব ছিল বলিয়াই মনে হয়। তাহার প্রধান একটির কথা বলি: রেখাপাতের পরিমাণ, অনুপাত ও সামঞ্জস্য, ভূমধ্যসাগরিক শিল্পকলার ক্লাসিক যুগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

* প্রবন্ধের শেষে অনুবাদকের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

খ্মের-শিল্পকলার আকস্মিক অধঃপতন, যাহার কারণ যুদ্ধবিগ্রহ ও শত্রুর আক্রমণ বলিয়া স্থির করা হইয়াছে, যতটা চরম বলিয়া কয়েক জন লেখক বলিয়াছেন তাহা নয়। আধুনিক কাম্বোজীয়ের কাজকর্ম্মের অনিচ্ছা যথেষ্টই, কিন্তু তাহার শিল্পকলায় রুচি ও প্রবৃত্তি দুই-ই আছে। দেশজাত শিল্পকলা বিদ্যালয় (লেকোল দেজার্ এন্দিজেন) ফ্নোম পেন্হ্ নগরে বিশ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হওয়ায় পূর্ব্বকালের শিল্পকলার চর্চ্চায় ও পুনর্জাগরণের বিশেষ সহায়তা হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে আজিকার কাম্বোজীয়গণ সত্য সত্যই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার সেই শিল্পীদিগের বংশধর যাহাদের নির্ম্মিত কারুকার্য্য-খচিত অনুপম মন্দিরগুলি আজ আমরা এরূপ শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের চক্ষে দেখি। ফটোগ্রাফ বা লেখনীর ক্ষমতা নাই সেই সকল কীর্ত্তিচিহ্নের রূপগৌরব বা মনোরম শোভার উপযুক্ত পরিচয় দেয়। যথাযথভাবে খ্মের জাতির শিল্প-প্রতিভার রস উপভোগ করিতে হইলে সেই অতুল কীর্ত্তিগুলিকে তাহাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে দেখিতে হয়, যেখানে নিবিড় অরণ্যের কাঠামের মধ্যে সেই সৌধরাজির স্থাপত্যরূপের প্রভার সহিত প্রকৃতি-দেবীর কবিত্বধারার স্নিগ্ধরস যুক্ত হইয়াছে।

অনুবাদকের বক্তব্য

খ্মেরদিগের সভ্যতার উদয়াস্ত সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদিগের মত মানিয়া চলা উচিত। বিশেষতঃ ঐ দেশের ও ঐ যুগের শিল্পকলা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এদেশে খুব বেশী নাই। তবে যে বিশেষজ্ঞ এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তিনি ফরাসী, সুতরাং ফ্রান্স ও ইয়োরোপের সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকে শিক্ষিত ও দীক্ষিত। সেই জন্যই সব বিষয়ই প্রথমে ইয়োরোপীয় এবং তৎপরে মিশরী ও পারসীক সভ্যতার মাপকাঠিতে ওজন করা ও ঐ সকল সভ্যতার কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। ভারত-বর্ষের সকলই নগণ্য এবং বৌদ্ধ বা হিন্দু সভ্যতার নিজস্ব এমন কিছুই ছিল না যাহা মহামূল্য বা যাহা হইতে অন্য দেশ ঋণ লইয়া ধনী হইয়াছে, এরূপ ধারণা প্রচারে পাশ্চাত্য, বিশেষতঃ ইংরাজ বিশেষজ্ঞগণ বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। প্রবন্ধ-লেখক মহাজ্ঞানী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইলেও হয়ত এ কথা বলা চলে যে খ্মের-সভ্যতার গৌরব-যুগের সহিত ভারতের সংস্কৃতি-প্রবাহের কতটা নিগূঢ় প্রাণসম্পর্ক ছিল সে বিষয়ে বিশেষ চর্চ্চা করা তিনি প্রয়োজন মনে করেন নাই।

যে-যুগে খ্মের-শিল্পকলা "সহসা" উদীয়মান হয়, তখনকার জগতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতের গৌরব প্রায় অতুলনীয়। এ-দেশ হইতে সভ্যতার যে স্রোত সুবর্ণদ্বীপ, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ ও চম্পায় (কাম্বোজ) বহিয়াছিল তাহা অতি সতেজ ও প্রবল ছিল, এ-কথা পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞগণও স্বীকার করেন। সেই সরস প্লাবনের সিঞ্চনে ঐ সকল দেশে অতি অল্প সময়ে যে সভ্যতার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া অনুপম শিল্পকলায় পুষ্পিত হইবে ইহা আর আশ্চর্য্য কি? যে-যুগে খ্মের-শিল্পকলার জ্যোতি সহসা নিবিয়া যায়, তখন ভারতবর্ষ বর্ব্বর আক্রমণে প্রপীড়িত এবং মহাদেশব্যাপী অরাজকতার জরায় জীর্ণ, সুতরাং যে প্রবাহ সুদূর কাম্বোজের শিল্পক্ষেত্র এবং রাষ্ট্রচালনের ক্ষেত্র চার শত বৎসর ধরিয়া সজীব ও সতেজ করিয়া রাখিয়াছিল তাহার উৎস-মুখই রুদ্ধ হইয়া যায়। এরূপ ঘটনায় খ্মের-দিগের রাজ্য ধ্বংস হইবে ইহা আশ্চর্য্য কি? আশ্চর্য্য শুধু এই যে, পাশ্চাত্য সুধীবর্গ প্রাচ্যদেশের যাবতীয় সভ্যতার পুরাতত্ত্ব-বিচারে, দেশ ও কালে অতিনিকট ভারতের প্রতি দৃক্পাতমাত্র না করিয়া আরও কয়েক সহস্র যোজন দূরের ও খ্মের-যুগের তুলনায় শত শত বৎসরের অতীত কালের অন্তর্গত সভ্যতার কথা ভাবিয়া এরূপ "সহসা" উদয় ও অস্তের কারণ খুঁজিয়া বেড়ান। ভারতের রাষ্ট্রশক্তি একচ্ছত্র ও প্রবল থাকিলে খ্মের-সভ্যতার ধ্বংস হইত কিনা ইহা বিচার করা পুরাতত্ত্ববিদের পক্ষে বাতুলতা, কিন্তু ভারতের হিন্দু-সভ্যতার পতনের সহিত কাম্বোজ দেশের পতনের সম্পর্ক কতটা আছে, সে-বিষয়ে শেষ কথা কি বলা হইয়াছে; না সে-বিষয়ে চিন্তা করাই নিষিদ্ধ?

খ্মেরদিগের শিল্পকলার অবশিষ্ট প্রকৃতিদেবী অরণ্যের আচ্ছাদনে রক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতের, বিশেষতঃ উত্তর-ভারতের আর্য্যাবর্ত্তের, হিন্দুদিগের কীর্ত্তিমন্দিরগুলি লুব্ধ বর্ব্বর বিজেতার হিংসার হাত হইতে প্রায় কিছুই রক্ষা পায় নাই। পাইয়াছে কেবল তাহাই যাহা লোকালয় হইতে দূরে ছিল বা যাহা এতই বিরাট্ ছিল যে তাহার সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন মূর্খ শাসকের যুগযুগব্যাপী অত্যাচারেও সম্ভব হয় নাই। সুতরাং ভারতের অতীতযুগের স্থাপত্যনিদর্শনের অবশিষ্টের সহিত তাহার উপনিবেশের স্থাপত্যের পার্থক্য—পরিমাপে ও পরিসরে—হইতে বাধ্য। ইহাও সত্য যে অন্যদেশজাত সভ্যতার মত ভারতের সভ্যতা বিদেশে প্রবাহিত হইয়া রূপান্তরিত হইতেও বাধ্য, (পারসিক, গ্রীক ও রোমক শিল্পকলার সম্পর্ক দেখিলেই একথা বুঝা যায়) কেননা যে-কোন জীবন্ত শিল্পকলা সুযোগ পাইলেই নূতন উপকরণ ও নূতন কলাপ্রকরণ যোগ করিবেই, যতক্ষণ ও যতদূর পর্য্যন্ত তাহা সম্পূর্ণ শাস্ত্র- ও আচার- বিরোধী না হয়।

খ্মের-সভ্যতার গৌরব তাহার নিজস্ব রূপেই অক্ষয় ও বিখ্যাত থাকিবে, কিন্তু যেরূপ রোমক-শিল্পকলায় গ্রীসের দান অপর্য্যাপ্ত ছিল, সেইরূপ খ্মের-সভ্যতায় ভারতের দান কতটা ছিল তাহা নির্দ্ধারণের চেষ্টায় দোষ কি?

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

বিবিধ প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ আরোগ্যের পথে

রবীন্দ্রনাথের পীড়ার আত্যন্তিক আশঙ্কাজনক অবস্থা কাটিয়া গিয়াছে এবং তিনি আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতেছেন, এই সুসংবাদে আমরা, অগণিত অন্য বহুজনের সহিত, নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। বিধাতার করুণায় যে কবির আয়ু বাড়িল, তাহার জন্য আমরা বিশ্বপতির চরণে সভক্তি কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি নিবেদন করিতেছি। কবি যত দিন আমাদের মধ্যে থাকিবেন, তাঁহার জীবন মানবের কল্যাণ ও আনন্দ বিধানে উৎসর্গীকৃত হইবে।

—

ভারতসচিবের "ভারত-শূন্য" বক্তৃতা

কয়েক দিন পূর্বে ভারতসচিব বিলাতের গস্পোর্ট নামক স্থানে, বর্তমান যুদ্ধে ব্রিটেনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি, একটি বক্তৃতায় তাহা নির্দেশ করেন। তিনি বলেন :—

"We wish to see established in Europe the elementary human rights of justice and freedom for individuals, the right of minorities to be respected by majorities and of small nations to live in peace side by side with greater ones; to see co-operation take the place of anarchy. Meanwhile our first task is to save ourselves by our exertions and Europe by our example."

তাৎপর্য্য। "আমরা ইয়োরোপে প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যায্য ব্যবহার প্রাপ্তির ও স্বাধীনতার প্রাথমিক মানবীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই; সংখ্যালঘুদের অধিকার সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা মানিত, এবং বৃহত্তর জাতিদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র জাতিদের শান্তিতে বাস করিবার অধিকার মানিত দেখিতে চাই; এবং সহযোগিতাকে অরাজকতার স্থান অধিকার করিতে দেখিতে চাই। আপাততঃ আমাদের প্রথম কৃত্য আমাদের নিজের চেষ্টা দ্বারা আপনাদিগকে এবং আমাদের দৃষ্টান্ত দ্বারা ইয়োরোপকে রক্ষা করা।"

এই বক্তৃতা অনুসারে ব্রিটেনের কর্তব্য ব্রিটেনের এবং ইয়োরোপ মহাদেশের চতুঃসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমেরিকার নিকট হইতে ব্রিটেন প্রভূত সাহায্য পাইতেছেন এবং আরও প্রত্যাশা করেন। আমেরিকার প্রতি কৃতজ্ঞ ব্রিটেনের কোন কর্তব্যের উল্লেখ যে এই বক্তৃতায় নাই, তাহার কারণ এই হইতে পারে যে, ব্রিটেন ইয়োরোপে যে-যে কাম্য বস্তুর ও অবস্থার প্রতিষ্ঠা দেখিতে চান, আমেরিকায় তাহা আছে, এবং তাহার অভাব থাকিলে বা ঘটিলে আমেরিকা নিজের চেষ্টায় তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে; কেন-না, আমেরিকা স্বাধীন। তদ্ভিন্ন, মিঃ চার্চিল আমেরিকার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে পঞ্চমুখ, সুতরাং আর কোন ব্রিটন আমেরিকার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিলেও চলে। ব্রিটেনের স্বশাসক ডোমীনিয়নগুলির অনুল্লেখেরও কারণ প্রথমোক্ত কারণের মত কিছু হইতে পারে। অধিকন্তু, ডোমীনিয়নগুলি ব্রিটিশ কমনওএল্‌থের অংশ এবং তাহাদের রাজনৈতিক মর্যাদা ব্রিটেনের সমান স্তরের। "আমরা" শব্দের মধ্যে ভারত-সচিব তাহাদিগকেও ধরিয়া থাকিলে তাহাদের কিছু বলিবার নাই।

কিন্তু ব্রিটিশ মন্ত্রীদের মধ্যে তিনি যে-ভারতবর্ষের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত, তাহার উল্লেখ কেন নাই? ভারতবর্ষের লোকেরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে ন্যায্য ব্যবহার স্বাধীনতা প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত। ইয়োরোপে যাহা যাহা কাম্য, ভারতবর্ষে সেই সকলের প্রতিষ্ঠা কি ব্রিটেনের কর্তব্য নহে? ব্রিটিশ শাসনকর্তারা ও রাজনীতিকেরা বার-বার বলিতেছেন, যুদ্ধে সকল রকমে ব্রিটেনের সাহায্য করা উচিত। শুধু "বলিতেছেন" বলিলে কম বলা হয়। ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট ভারতবর্ষের সব রকম সাহায্য দাবী ও আদায় করিতেছেন, সাহায্যপ্রাপ্তি যাহাতে কম না হয়, তাহার নিমিত্ত "ভারত-রক্ষা আইন" প্রণীত হইয়াছে। অথচ ভারতবর্ষের প্রতি কর্তব্যের উল্লেখের বেলায় ভারত-সচিব এই বক্তৃতায় নীরব।

তিনি বলিয়াছেন, **নিজেদের চেষ্টা দ্বারা** আত্মরক্ষা আপাতত ব্রিটিশ জাতির প্রথম কৃত্য। নিজেদের চেষ্টা (exertions) দ্বারাই যদি তাঁহারা ইহা করিতে

চান, তাহা হইলে ভারতবর্ষকে চেষ্টা ("war efforts") কেন করিতে বলেন? অবশ্য ইহার উত্তর এরূপ হইতে পারে যে, প্রভু ভৃত্যদের দ্বারা যাহা করান তাহা তাঁহারই চেষ্টার সামিল, ভৃত্যদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গণনীয় নহে। ব্রিটিশ জাতি এবং ভারতীয়দের মধ্যে যে কার্যতঃ প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ আছে, তাহা অস্বীকার্য নহে।

—

অন্য ব্রিটিশ রাজনীতিকদের "ভারত-শূন্য" বক্তৃতা

শুধু ভারত-সচিবই যে "ভারত-শূন্য" বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা নহে; অন্য অনেক ব্রিটিশ রাজনীতিকও করিয়াছেন। তাহার কেবল দুটি দৃষ্টান্ত দিব।

প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল ৯ই নবেম্বর লণ্ডনে লর্ড মেয়রের ভোজসভায় যে বক্তৃতা করেন, তাহার যে রিপোর্ট রয়টার পাঠাইয়াছেন, তাহাতে কোথাও ভারতবর্ষের উল্লেখ নাই। বক্তৃতাটির যে-যে জায়গায় ভারতবর্ষের উল্লেখ থাকিতে পারিত, সেইরূপ কয়েকটি বাক্যসমষ্টির তাৎপর্য নীচে দিতেছি। তাহা দিবার পূর্বে মিঃ চার্চিলের দু-একটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি এবং তাহার সত্যতা স্বীকার করিতেছি।

"আমাদের উপর দিয়া যে ঘোরতর বিপদের ঝঞ্ঝা বহিয়া চলিয়াছে তাহাতে জগতের ধৈর্য এবং স্বাধীনতাপ্রিয় প্রত্যেক জাতিই লণ্ডন নগরী বা লণ্ডনের নাগরিকদের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধান্বিত না হইয়া থাকিতে পারে না। আমাদের পূর্বপুরুষদের আমলে কখনও এরূপ হইতে দেখা যায় নাই।"

এখন অন্য বাক্যসমষ্টিগুলির তাৎপর্য দি

"দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ ইউরোপের জাতিসমূহ বা এখনও আমাদের সহকর্মী হিসাবে অপর যে সকল দেশ কাজ করিতেছেন, তাহাদের প্রতি দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা আমরা অণুমাত্রও বর্জন বা পরিহার করি নাই; বরং এই বিশ্বসংগ্রামে আমরা যখন অপর সকল কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া একক সংগ্রামলিপ্ত রহিলাম তখনও আমরা অধিকতর দৃঢ়তার সহিত, অধিকতর সুবিবেচনার সহিত যে সকল দেশের জন্য বা যে সকল দেশের সহিত আমরা রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, তাহাদের সর্ববিধ স্বার্থরক্ষা করিয়াছি। অষ্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, নরওয়ে, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম—ইহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ফ্রান্স এবং সর্বশেষ গ্রীসের জন্যও আমরা প্রাণপণে লড়িব এবং আমাদের চূড়ান্ত জয় ইহাদের সকলের স্বাধীনতা আনিবে।"

ভারতবর্ষও ত ব্রিটেনের সহকর্মী, তাহাকেও ত ব্রিটেনের সহিত রণাঙ্গনে অবতীর্ণ করা হইয়াছে। সে ত ব্রিটেনকে পরিত্যাগ করে নাই। তাহার নাম করা হয় নাই কেন? ব্রিটেনের চূড়ান্ত জয় কি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনিবে? যদি আনে, সে বিষয়ে মিঃ চার্চিল নীরব কেন?

"আমেরিকার সাধারণতন্ত্রী দলের পক্ষ হইতে মিঃ উইলকি আমাদিগকে সাহায্য করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহাতে আমি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়া মিঃ চার্চিল বলেন, এই বিশিষ্ট মার্কিণ রাজনীতিক কখনই ব্রিটেনকে সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ হন নাই। বর্তমানে আমেরিকা ব্রিটেনকে আমেরিকার সম্প্রতি উৎপাদিত বিপুল সমরোপকরণের অংশ দানের আশ্বাস দিয়াছেন—যুক্তরাষ্ট্রের অসংখ্য কলকারখানায় বর্তমানে বিপুল পরিমাণে সমরোপকরণ নির্মিত হইতেছে।"

"আমরা আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছি। বিজ্ঞান ও সংগঠনশক্তির সাহায্যে ও ব্রিটিশ কারিগরদের সহায়তায় এ বিষয়েও আমরা সাফল্য অর্জন করিব—এ বিষয়েও আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই দিক দিয়া বাহিরের সাহায্য আমাদের নিকট বিশেষ মূল্যবান। আমেরিকা আমাদিগকে যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে এবং এতাবৎ যে মূল্যবান সাহায্য আমেরিকার নিকট হইতে আমরা পাইয়াছি, তাহার জন্য আমেরিকাকে আমি সম্বর্দ্ধিত করিতেছি।"

ভারতবর্ষও ব্রিটেনকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে। তাহাও "বাহিরের সাহায্য"। কিন্তু মিঃ চার্চিল তাহার উল্লেখ করেন নাই, তাহার জন্য ভারতবর্ষকে "সম্বর্দ্ধিত" করেন নাই। ভারতবর্ষের লোকেরা দরিদ্র। তাহাদের আর্থিক দান ধনী আমেরিকার সমতুল্য হইতে পারে না। কিন্তু আমেরিকা যাহা এ পর্যন্ত দেয় নাই, ভারতবর্ষ তাহা দিয়াছে—দিয়াছে যুদ্ধে প্রাণ দিতে প্রস্তুত মানুষ।

"অত্যাচারীর করাল গ্রাস হইতে জাতি-সমূহের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ব্রিটেন বদ্ধপর। স্বায়ত্তশাসনের পথে গণ-উন্নয়ন ব্রিটেনের লক্ষ্য—জগতের জনগণের মধ্যে সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠা ব্রিটেনের উদ্দেশ্য—ব্রিটেন বিশ্বাস করে উহাই জগতে শান্তি এবং সমৃদ্ধি আনয়নে সমর্থ হইবে।"

যে-জগতের কথা মিঃ চার্চিল বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ যে তাহার অন্তর্গত, এরূপ অনুমান করিবার কি কি হেতু আছে?

পৃথিবীর আধুনিক যুগের ইতিহাসে যত জাতি অন্ত

জাতিকে গ্রাস করিয়াছে, মিঃ চার্চিল "অত্যাচারী" শব্দটি তাহাদের সকলের প্রতি প্রয়োগ করেন নাই; কেবল জার্মেনীর প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন। জার্মেনী দ্বারা ভারতবর্ষ কবলিত হয় নাই; এই জন্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ব্রিটেনের লক্ষ্য নহে। জার্মেনী ভারতবর্ষকে গ্রাস করিলে বা স্বাধীন ভারতকে গ্রাস করিতে চাহিলে ব্রিটেন কি করিত, তাহা অনুমান করা অনাবশ্যক।

কেবল আর একজন ব্রিটিশ রাজনীতিকের অল্প দিন আগেকার কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিব। ইনি মিঃ আর্নেস্ট বেভিন।

তিনি বলেন :—

"Britain and her Allies are determined to produce a just order in Europe and recreate it on the basis of freedom, free association and equality."

তাৎপর্য। ব্রিটেন ও তাঁহার মিত্ররাষ্ট্রসমূহ ইয়োরোপে সুশৃঙ্খল ন্যায়সঙ্গত অবস্থা উৎপন্ন করিতে এবং তাহাকে স্বাধীনতা, স্বাধীন সাহচর্য ও সাম্যের ভিত্তির উপর পুনর্গঠিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ব্রিটেন ও তাঁহার মিত্ররাষ্ট্রপুঞ্জ এই সাধু কাজটি কেবল ইয়োরোপে করিবেন। এশিয়ায় করিতে গেলে ভারতবর্ষ ব্রহ্মদেশ প্রভৃতিকে স্বাধীন হইতে দিতে হয়। আফ্রিকায় করিতে গেলে, ব্রিটেনের অধীন তথাকার কৃষ্ণকায় বিস্তর জাতিকে তাহাদের দেশ ও তাহাদের স্বাধীনতা ফিরাইয়া দিতে হয়।

—

বাঙালী জাতির আধুনিক অতীত কৃতিত্ব

বত্রিশ বৎসর আগে ১৯০৮ সালে বিলাতের তখনকার প্রসিদ্ধ দৈনিক কাগজ "ডেলী নিউস" ভারতবর্ষীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিবৃতি দিবার নিমিত্ত নিজের এক জন বিশেষ ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে এদেশে প্রেরণ করেন। তাঁহার বিবৃতির এক অংশে বাঙালী জাতি সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা তখন মায়াবতী হইতে প্রকাশিত "প্রবুদ্ধ ভারতে"র ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের মে সংখ্যায়, ৯৬ পৃষ্ঠায়, উদ্ধৃত হইয়াছিল। "প্রবুদ্ধ ভারত" লিখিয়াছিলেন :—

The Special Commissioner deputed by the *Daily News* sends to that paper his estimate of the Bengali character and the situation in India today. In the course of it he writes :

"The Bengali is the maker of new India. The Indian who has suffered most from the historic travesty is the native of Bengal. Our view of him is shamefully imperfect. Bengalis are in some respects the most intellectual of the Indian peoples, so they are the most assimilative. They have learnt our ways and grown into our system. British India without the Bengali is inconceivable. He is ubiquitous and indispensable."

Speaking of the "Greatness of Bengal" and its part in the New Movement, he says :

"It is in accordance with the fitness of things that such a tendency should have had its beginnings in Bengal, so often the birthplace of great movements and the home of great personalities, although in certain respects behind the South and West of India. An unwritten chapter in the history of modern India is the record of what has been done for the people by men of Indian race, and in that record a commanding share has fallen to Bengal. This fact makes all the more curious the rooted belief of Anglo-India that the Bengali people is hopelessly degenerate. The century just passed will furnish us with abundant illustrations. In Ram Mohun Roy and Keshub Chandra Sen we have examples of daring religious reformers; in the Pandit Vidyasagar, an educationist of genius; in Vivekananda, famous on both sides of the Atlantic by his lectures, a singularly powerful embodiment of the renascent Indian ideal; while in our own day, Rabindranath Tagore has revealed the riches of Bengali as a literary language. The brilliant experimental work of Dr. P. C. Ray and Dr. J. C. Bose has been acclaimed in every laboratory in Europe; and a long line of eminent citizens have left their mark on the public life of the country. All this does not look like exhaustion."

তাৎপর্য। ডেলী নিউস হইতে ভারপ্রাপ্ত স্পেশ্যাল কমিশ্যনার সেই কাগজকে বাঙালী-চরিত্র ও চরিত সম্বন্ধে এবং ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে নিজ নির্ধারণ পাঠাইয়াছেন। তাহার মধ্যে তিনি বলিয়াছেন :—

"বাঙালী নবীন ভারতের নির্মাতা। ইতিহাসের হাস্যোদ্দীপক বিকৃতিতে যে-ভারতীয়ের প্রতি সর্বাধিক অবিচার হইয়াছে সে বাঙালী। তাহার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা লজ্জাকর রূপে অসম্পূর্ণ। কোন কোন দিকে ভারতীয় জাতিসমূহের মধ্যে বাঙালীরাই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিশালী; সেই জন্য তাহারা বাহিরের জিনিষকে নিজের ব্যক্তিত্বের অঙ্গীভূত করিতে সর্বাপেক্ষা অধিক সমর্থ। তাহারা আমাদের ধরণধারণ শিখিয়াছে এবং আমাদের রাষ্ট্রপদ্ধতির অনুরূপ ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে (বা আপনাদিগকে গড়িয়া তুলিয়াছে)। বাঙালীবর্জিত ব্রিটিশ ভারত অচিন্তনীয়। বাঙালী সব ঘটে বিদ্যমান এবং তাহাকে না হইলে চলে না।"

'বঙ্গের মহত্ত্ব' এবং 'নব প্রচেষ্টা'য় তাহার অংশ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া ডেলী নিউসের প্রতিনিধি বলিয়াছেন :—

"বঙ্গেই যে এইরূপ প্রবণতার* আরম্ভ হইয়াছে, তাহা যথা-যোগ্যই হইয়াছে,—কারণ যদিও বাংলা দেশ কোন কোন বিষয়ে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের পশ্চাদ্বর্তী তথাপি অনেক সময়ই বহু মহৎ প্রচেষ্টার জন্মভূমি ও বহু মহৎ ব্যক্তির বাসভূমি হইয়াছে বঙ্গদেশ। (* এই বাক্যটির পূর্ববর্তী বাক্যটি প্রবুদ্ধ ভারতে

উদ্ধৃত না হওয়ায়, লেখক কীদৃশ প্রবণতার কথা বলিয়াছেন, তাহা বুঝা যাইতেছে না। প্রবাসীর সম্পাদক)। ভারতবর্ষের লোকদের নিমিত্ত ভারতীয় জাতির মানুষেরা কি করিয়াছেন তাহার বৃত্তান্ত আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি অলিখিত অধ্যায়, এবং সেই কৃতিত্বের প্রধানতম একটি অংশ বঙ্গদেশের বাঙ্গালীরা নৈরাশ্যপূর্ণরূপে অধোগতিপ্রাপ্ত, ভারতবর্ষপ্রবাসী ইংরেজদের এই বদ্ধমূল ধারণা উক্ত তথ্যের আলোকে আরও অদ্ভুত প্রতীয়মান হয়। যে (উনবিংশ) শতাব্দী সম্প্রতি শেষ হইয়াছে, তাহা হইতে প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। রামমোহন রায় ও কেশব চন্দ্র সেনে আমরা অতি সাহসী ধর্মসংস্কারকের দৃষ্টান্ত পাই; পণ্ডিত বিদ্যাসাগরে পাই প্রতিভাশালী শিক্ষাবিধায়কের; বাগ্মিতার জন্য অ্যাণ্টলাণ্টিক মহাসাগরের উভয় দিকে প্রসিদ্ধ বিবেকানন্দে নবীভূত ভারতীয় আদর্শ বিশেষ শক্তিমান মূর্তি ধারণ করে; এবং আমাদের সমকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গের সাহিত্যিক ভাষার ঐশ্বর্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। ইয়োরোপের প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে ডাঃ পি, সি, রায় ও ডাঃ জে, সি, বোসের সমুজ্জল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকার্য সম্বর্ধিত হইয়াছে; এবং বহু বিশিষ্ট নাগরিক দেশের সার্বজনিক জীবনে আপনাদের কৃতিত্বের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। এই সকল হইতে প্রতীয়মান হয় না যে, বঙ্গের শক্তি নিঃশেষ হইয়াছে।"

আমাদের বাঙালীদের অহঙ্কার বাড়াইবার নিমিত্ত এক জন বিচক্ষণ বিদেশী পর্যবেক্ষকের এই কথাগুলি উদ্ধৃত হয় নাই। বাংলা দেশ ও বাঙালী কি ছিল এবং এখন কি হইয়াছে ও হইতে বসিয়াছে, সে বিষয়ে আমাদের মধ্যে চিন্তার উদ্রেক হইলে কিঞ্চিৎ সন্তোষের বিষয় হইবে।

আমরা এখনও শিল্পবাণিজ্যে পশ্চিম-ভারতবর্ষ ও অন্য কোন কোন অঞ্চল অপেক্ষা অনগ্রসর আছি, আগে আরও বেশী ছিলাম; এখনও বাংলা দেশ স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত অপেক্ষা অনগ্রসর আছে, আগে আরও বেশী ছিল। এইরূপ অন্যান্য দিকেও আমাদের অনগ্রসরতা উপলব্ধি করিয়া উন্নতির চেষ্টা করা উচিত। আগে আমরা সাহিত্যে, ললিতকলায়, বিজ্ঞানে, প্রত্নতত্ত্বে, ইতিহাসে, দর্শনে, ধর্মসংস্কারে ও সমাজ-সংস্কারে, রাজনীতিতে,...অগ্রণী ছিলাম। অগ্রণী বরাবর না-থাকিতে পারি, কারণ অন্য সকলেরও অগ্রসর হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু কোন দিকে পিছাইয়া পড়া অবাঞ্ছনীয় ও অনুচিত। পিছাইয়া পড়িতেছি কিনা, তাহাই বিশেষ সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিতে হইবে এবং পিছাইয়া পড়া সত্য হইলে তাহা নিবারণ করিতে হইবে।

—

আদালত-প্রাঙ্গণ হইতে নারীহরণ

গত ১৭ই আশ্বিনের "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় নিম্ন-মুদ্রিত চিঠিটি বাহির হইয়াছে।

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

বাগেরহাট, ২৭শে সেপ্টেম্বর

বাগেরহাট আদালত-প্রাঙ্গণ হইতে এক দল মুসলমান একটি হিন্দু নারীকে তাহার স্বামীর হেপাজত হইতে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,—খুলনা জেলার মোরেলগঞ্জ থানার অধীন বোর্শিবেওয়া গ্রামের চরণ মণ্ডল তাহার নাবালিকা কন্যা বিরঙ্গকে বরিশাল জিলার পিরোজপুর থানার অধীন রাণীপুর গ্রামের বিপিনবিহারী বৈরাগীর সহিত বিবাহ দেয়। কিছু দিন পরে উক্ত বিপিন তাহার স্ত্রীকে লইয়া শ্বশুরবাড়ী আসে। তথা হইতে গত ২৮।৫।৩৯ তারিখে ঐ গ্রামের হাসেম সেখ প্রমুখ আসামীগণ উক্ত নাবালিকা বধূটিকে ফুসলাইয়া লইয়া যায়। বিপিন বাগেরহাট ফৌজদারী আদালতে ৩০।৫।৩৯ তারিখে আসামীগণের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ ধারামতে মোকদ্দমা আনয়ন করে। বিচারে গত ১১।৯।৩৯ তারিখে আসামীগণের ৪ মাস করিয়া জেল হয়। উক্ত রায় হাইকোর্ট পর্য্যন্ত বহাল থাকে। বিচারকালে তল্লাসী পরোয়ানা বাহির হওয়া সত্ত্বেও অপহৃতা নারীকে উদ্ধার করা যায় নাই। পরে ফরিয়াদী আবার আবেদন করায় পরোয়ানা বাহির হইলে পুলিশ অন্যতম আসামী আকুবালীর বাড়ী হইতে মেয়েটিকে উদ্ধার করে।

গত ৩০।৪।৪০ তারিখে বিরঙ্গ স্থানীয় মহকুমা হাকিম মিঃ এ. লতিফ সাহেবের কোর্টে ৩৬৬।৩৭৬ ধারামতে মোকদ্দমা আনয়ন করে। মহকুমা হাকিম গত ৬।৫।৪০ তারিখে উক্ত মোকদ্দমা ডিসমিস করেন। পরে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে খুলনা ডিষ্ট্রিক্ট জজের নিকট মোশন করা হয়। জজসাহেব উক্ত মহকুমা ব্যতীত অন্য ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারা উক্ত মোকদ্দমার তদন্ত ও বিচার করিবার আদেশ দেন। তদনুসারে উক্ত মোকদ্দমা স্থানীয় অন্যতম ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ এম এফ রহমন সাহেবের নিকট প্রেরিত হয়। গত ১১।৭।৪০ তারিখে ফরিয়াদী নারীর জবানবন্দী গ্রহণ করার পর উক্ত হাকিম তাহার মোক্তার ও স্বামীর বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও তাহাকে অন্য কোনও হিন্দু মোক্তার বা বিশিষ্ট হিন্দু ভদ্র-লোকের জামিনে না দিয়া স্থানীয় মোক্তার নবাবজান সর্দ্দারের হেফাজতে দেন। মেয়েটি স্থানীয় এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া ১৫ বৎসরের অনধিক বয়স্কা বলিয়া সাব্যস্ত হয়। এই মামলায় হাসেম সেখ ও ইমানদি সেখ নামক আসামীদ্বয়ের তলব হয়।

বিপিন বৈরাগী তাহার নাবালিকা স্ত্রীকে তাহার হেফাজতে পাইবার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বিরঙ্গকে তাহার স্বামীর হেফাজতে দিবার আদেশ দেন। কিন্তু উক্ত হাকিম সাহেব জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ

অমান্য করিয়া প্রায় ৫ সপ্তাহকাল ধরিয়া ঘুরাইতে থাকেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ আদেশ প্রাপ্তির পর অবশেষে উক্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট গত ২৩।৯।৪০ তারিখে মেয়েটিকে তাহার স্বামীর জামিনে দিবার জন্য উপরোক্ত মোক্তার নওয়াবজান সর্দ্দারকে হুকুম দেন। তদনুসারে জামিনদার মোক্তার সাহেব মেয়েটিকে কোর্টে হাজির করেন। কোর্টের বাহিরে দলবদ্ধ বহু মুসলমান ঘোড়ার গাড়ীসহ উৎসুক নেত্রে বিচরণ করিতে থাকে। তাহাদের গতিবিধি দেখিয়া মনে হইতেছিল, বিশেষ কোন হাঙ্গামার সৃষ্টি হইতে পারে। জনতা দেখিয়া ফরিয়াদী পক্ষের আশঙ্কা হওয়ায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট ফরিয়াদী পক্ষের মোক্তারবাবু ফরিয়াদীর স্ত্রীকে পুলিসের সাহায্যে বাসায় পৌঁছাইয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ফরিয়াদীকে তাহার স্ত্রীকে লইয়া যাইবার জন্য হুকুম দেন এবং তিনি বলেন যে, তিনি বাদীর গন্তব্য স্থান পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার জন্য কোনও রকম পুলিসের সাহায্য করিতে পারিবেন না, মাত্র কোর্টের বারান্দার সম্মুখস্থ ঘোড়ার গাড়ী পর্য্যন্ত পুলিস সাহায্য করিবে।

প্রকাশ যে, বিপিন তাহার স্ত্রীকে লইয়া কোর্টের বারান্দায় আসিলে দলবদ্ধ আসামীগণ অন্যান্য মুসলমানগণের সহায়তায় বিপিন ও তাহার সাহায্যকারী ব্যক্তিগণকে আক্রমণ ও গুরুতররূপ জখম করিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের চক্ষের সম্মুখে মেয়েটিকে বলপূর্ব্বক তাহার স্বামীর নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া তাহাদের আনীত ঘোড়ার গাড়ীতে উঠাইয়া বিজয়গর্ব্বে "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি করিতে করিতে চলিয়া যায়। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কোর্টের বারান্দায় আসিয়া সংক্ষুব্ধ বিচলিত জনতা দর্শন করা সত্ত্বেও তাহা শান্ত করিবার বা প্রতিকারের কোন চেষ্টা করেন নাই।

প্রকাশ, বিপিন তাহার ক্ষতবিক্ষত দেহ লইয়া তৎক্ষণাৎ স্থানীয় বাগেরহাট থানায় যাইয়া এজাহার দিতে চায়। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত দারোগা সাহেব এজাহার লন নাই। বিপিন তথায় কোনরূপ প্রতিকার না পাইয়া ফিরিয়া আসে।

শুনিয়াছি, দৈনিক বসুমতীতেও এই ঘটনাটার বিস্তারিত বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছে।

এই ঘটনাটার বৃত্তান্তের সম্পূর্ণ বা আংশিক কোন সরকারী প্রতিবাদ আমরা দেখি নাই। সুতরাং ইহা সত্য মনে করিয়া ইহার সম্বন্ধে এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি। ১০-১১-১৯৪০।

উপরে উদ্ধৃত চিঠিটি যখন খবরের কাগজে বাহির হয় এবং আমরা পড়ি, তখন বালিকাটির অভিযোগ বিচারাধীন ছিল। বিচার শেষ হইয়াছে কি না, না হইয়া থাকিলে কেন শেষ হয় নাই, হইয়া থাকিলে বিচারক কি রায় দিয়াছেন, এ পর্যন্ত (২৩শে কার্ত্তিক পর্যন্ত) তাহা কোন কাগজে দেখি নাই। অভাগিনী বালিকাটি এখন কোথায় কি অবস্থায় আছে, তাহাও কোন কাগজে দেখি নাই।

কেহ যদি এই দুটি বিষয়ের সংবাদ জানেন, তিনি তাহা দৈনিক কাগজে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

বালিকাটির ও তাহার স্বামীর দুর্ভাগ্যের বৃত্তান্ত খবরের কাগজে পড়িবার পর দেশে ও বিদেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং সাতিশয় ভীষণ ঘটনা অনেক ঘটিয়াছে এবং এখনও নিত্য ঘটিতেছে। কিন্তু আমরা বাগেরহাটের ঘটনাটার বিষয় প্রতিদিন যত বার ভাবিয়াছি, অন্য কোন ঘটনা সম্বন্ধে প্রতিদিন তত বার ভাবি নাই। অন্য কোন আধুনিক ঘটনা আমাদিগকে এত ব্যথিত ও চিন্তাকুল করে নাই।

আদালতে ও আদালত-প্রাঙ্গণে সমবেত সরকারী ও বেসরকারী মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে যাহারা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহারা সকলেই মনুষ্যজাতীয়, কিন্তু তাহাদের সকলের দ্বারা বালিকাটির ও তাহার স্বামীর সাহায্য হয় নাই। কেন হয় নাই? দলবদ্ধ আসামী-গণ ও তাহাদের সহায়ক অন্যান্য মুসলমানগণের কথা ছাড়িয়া দিলাম। অন্যদের মধ্যে বালিকার স্বামীর সাহায্য-কারী কিছু লোকও যে ছিল, ইহা পড়িয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াছি। কিন্তু বাকী সরকারী ও বেসরকারী লোকেরা বিপিনের সাহায্য কেন করেন নাই? আদালত-প্রাঙ্গণে "বিক্ষুব্ধ জনতা" ছিল দেখিতেছি। কিন্তু এই জনতা শুধু বিক্ষুব্ধ হইল, বালিকার উদ্ধার-সাধন করিতে অগ্রসর কেন হইল না? জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে প্রত্যেক বিপন্ন মানুষের প্রতি অন্য সব মানুষের সহানুভূতি আদর্শস্থানীয় ও বাঞ্ছনীয়, এবং অনেক স্থলে তাহার সক্রিয় বাহ্য প্রমাণও পাওয়া যায়। এই ঘটনায় এবং অন্যান্য এইরূপ ঘটনায় তাহার সম্যক্ পরিচয় না-পাওয়ার নানা কারণ থাকিতে পারে। আলোচ্য ঘটনাস্থলে সমবেত সমুদয় বা অধিকাংশ মুসলমান এক পক্ষ অবলম্বন করায় বালিকা ও তাহার স্বামী মুসলমানদের সাহায্যের পরিবর্ত্তে তাহাদের শত্রুতাই পাইয়াছিল। এইরূপ অন্যান্য ঘটনাতেও অবস্থা এই রূপ হয়। কিন্তু সমবেত সমুদয় হিন্দু কেন বালিকাকে রক্ষা

করিবার চেষ্টা করে নাই? হয়ত নারীহরণকারীদের আক্রমণের ভয়ে কেহ কেহ নিবৃত্ত ছিল। কিন্তু সকলেই সেই কারণে নিবৃত্ত ছিল, ইহা হইতে পারে না; কারণ ঘটনাটির বর্ণনায় দেখিতেছি বালিকার স্বামী ব্যতীত অন্য সাহায্যকারীও ছিল। এরূপ ঘটনা মধ্যে মধ্যে ঘটে, যে, কোন গুণ্ডা ছোরা মারিয়া বা গুলি ছুঁড়িয়া কাহাকেও আহত বা খুন করিয়া অস্ত্র প্রদর্শন বা চালনা করিতে করিতে পলাইবার চেষ্টা করিয়াছে এবং দর্শকদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাণভয় তুচ্ছ করিয়া ধাওয়া করিয়া তাহাকে ধরিয়াছে। বাঙালী হিন্দুর এইরূপ করিবার দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং কেহ বাঙালী হইলেই তাহাকে প্রাণভয়ে ভীত হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। বাংলা দেশে অনেক দাঙ্গা হয়, যাহার উভয় পক্ষ হিন্দু কিম্বা এক পক্ষ হিন্দু। এই সব দাঙ্গায় বহু হিন্দু প্রাণভয় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে। কেহ বা নিজের ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিবার নিমিত্ত লড়ে, কেহ অন্য কারণে—কারণ ও উদ্দেশ্যের বিচার এখানে করিতেছি না। এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে, বাঙালী মাত্রেই সর্বদা প্রাণভয়ে ভীত নহে।

স্বদেশের নিমিত্ত স্বাধীনতা লাভ করিবার চেষ্টায় বহু বাঙালী প্রাণ দিয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধিকতর সংখ্যক বাঙালী সেই উদ্দেশ্যে জীবনকে বিপন্ন করিয়া নির্ভীক আচরণ করিয়াছে। তাহাদের কাজ আইনসঙ্গত বা বেআইনী হইয়াছিল, তাহা এখানে বিচার্য নহে। আমরা পাঠকবর্গকে কেবল ইহাই স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, সব বাঙালী প্রাণভয়ে ভীত নহে।

কতকগুলি বাঙালীর মধ্যে যে নির্ভীকতা দেখা গিয়াছে, সব বাঙালীর পক্ষে—অন্ততঃ অধিকাংশ বাঙালীর পক্ষে সেই নির্ভীকতা নিজ নিজ চরিত্রে বিকশিত করা অসম্ভব নহে, সাধনা দ্বারা তাহা নিশ্চয়ই সাধ্য। সকলেরই তাহা করা একান্ত আবশ্যক।

দূর বা অদূর ভবিষ্যতের কথা ছাড়িয়া দিয়া, বর্তমানেই আমরা সমর্থ ও সাহসী বাঙালীদিগকে নারীরক্ষার কার্যে অবিলম্বে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিতেছি।

অনেক দেশে মানুষের সহানুভূতি নিজ নিজ স্তর ও শ্রেণীর সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ইংলণ্ডেও আগে সাধারণ সময়ে লর্ডের দরদ লর্ডের জন্য যতটা হইত, শ্রমিকের জন্য ততটা হইত না; আমেরিকাতেও ক্রোরপতির দরদ ক্রোরপতির জন্য যতটা হইত, দিন-মজুর বা হাঘরের জন্য ততটা হইত না। কিন্তু ইংরেজরা, আমেরিকানরা স্বাজাতিকতাবোধ ও অন্যান্য উপায়ে এই সঙ্কীর্ণতা প্রায় অতিক্রম করিয়াছে। হিন্দু বাঙালীদের মধ্যে যাহাদের সহানুভূতির সংকীর্ণতা অত্যন্ত অধিক তাহাদিগকে ইহা দূর করিতে হইবে—পুরা মাত্রায় দূর করিতে হইবে। যাহার স্ত্রীকে দুর্বৃত্ত লোকেরা ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে, সে ব্যক্তি গরীব ও "নিম্ন" জাতীয়, অতএব তাহার স্ত্রীকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব আমাদের ব্রাহ্মণাদি বর্ণের লোকদের বা সঙ্গতিপন্ন লোকদের নাই, এইরূপ চিন্তা ও ভাবকে সম্পূর্ণ নির্মূল করিতে হইবে।

কংগ্রেস স্বরাজ চান, হিন্দু মহাসভার লোকেরাও স্বরাজ চান। কংগ্রেস অস্পৃশ্যতা উন্মূলিত করিতে চান, হিন্দু মহাসভাও তাহার বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করিয়াছেন। কারণ, উভয়েরই স্বরাজ সকল স্তরের শ্রেণীর ও জাতির নিমিত্ত—কেবল কতকগুলি উপরের দিকের লোকের জন্য নহে।

এই স্বরাজ কাহার নিমিত্ত চাওয়া হয়? সমাজবদ্ধ মানুষদের জন্যই চাওয়া হয়, গাছপালা পশু-পক্ষীর আবাসস্থল মৃত্তিকারূপী দেশের জন্য নহে। মানুষের সমাজ তথাকথিত স্বরাজ পাইলেও টিকিতে পারে না, যদি গৃহ-পরিবারে ও সমাজে লক্ষ্মীরূপিণী নারী সুরক্ষিতা না হন; অন্য দিকে, নারী সুরক্ষিতা হইলে পরাধীনতার অবস্থাতেও এবং স্বেচ্ছাকারী রাজার অধীনেও সমাজ টিকিয়া থাকিতে পারে।

অতএব, স্বরাজ অর্জনের চেষ্টার ঐকান্তিক আবশ্যকতা ও শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া বলিতেছি, নারী রক্ষা তাহা অপেক্ষা কম আবশ্যক ও কম প্রশংসনীয় কাজ নহে। বস্তুতঃ নারী রক্ষা স্বরাজ-অর্জন-চেষ্টা অপেক্ষাও গোড়ার কাজ। যদি সমাজই না রহিল, তবে স্বরাজ কাহার নিমিত্ত? যদি নারীই নির্ভাবনায় গৃহের অধিষ্ঠাত্রী রূপে না রহিলেন, তবে সমাজ কেমন করিয়া টিকিবে?

অতএব যে সকল রাজনীতিকেরা স্বরাজ লাভের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর, তাঁহাদিগকে নারী রক্ষা কার্যে বদ্ধপরিকর হইতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

কেহ কেহ মনে করে, দেশ স্বাধীন হইলেই নারীহরণ-সমস্যার সমাধান আপনা-আপনিই হইয়া যাইবে। ইহা সাংঘাতিক ভ্রম। স্বাধীনতার একটা মানে ইংরেজের প্রভুত্ব লোপ। কিন্তু নারীহরণ ত ইংরেজ করিতেছে না, দেশের লোকেই করিতেছে। সুতরাং ইংরেজ সরিয়া দাঁড়াইলেই বা সরিয়া গেলেই নারীহরণ বন্ধ কেমন করিয়া হইবে? কী বিদেশী রাজের আমলে, কী স্ব-রাজের আমলে, পূর্ণ-মনুষ্যত্বের দ্বারাই নারীহরণ নিবারিত হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর যে-সব কাজ ও বক্তৃতা আমরা প্রশংসনীয় মনে করি, নারীরক্ষা সমিতির উদ্যোগে আলবার্ট-হলে আহূত সভার সভাপতিত্ব করা ও তথায় স্পষ্টবাদিতা-পূর্ণ বক্তৃতা করা তাহার মধ্যে অন্যতম। তাঁহার সম-মতাবলম্বী কিংবা ভিন্নমতাবলম্বী কংগ্রেসীরা এরূপ সভার সভাপতিত্ব করেন না এবং এরূপ বক্তৃতাও করেন না। ঐ বক্তৃতায় সুভাষ বাবু এই সত্য উক্তি করিয়াছিলেন যে, নারী-রক্ষার কার্য সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট নহে; প্রথম প্রথম তাঁহার ধারণা ছিল যে, উহা সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট, কিন্তু মান্দালে জেলে বদ্ধ থাকা কালে তিনি নিয়মিতরূপে "সঞ্জীবনী" পড়িয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, নারীরক্ষা অসাম্প্রদায়িক কাজ। তিনি আরও এই অপ্রিয় সত্য বলেন যে, আমাদের দেশে যত পাশবিকতা আছে, তাঁহার জ্ঞানে অন্য কোন দেশে তত নাই।

বাগেরহাটের আদালতের নিকট হইতে বিচার পাইবার নিমিত্ত যে জেলা-জজ ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম ও তাগিদ আবশ্যক হইয়াছিল, তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, এইরূপ মোকদ্দমা সম্বন্ধে উদাসীন বা অযথেষ্ট যোগ্যতাবিশিষ্ট হাকিমদের উপর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর ও মন্ত্রীদলের যথোচিত দৃষ্টি ও শাসন নাই। বালিকার স্বামী থাকিতে ও অন্য বহু হিন্দু থাকিতে হাকিম বালিকাটিকে মুসলমান মোক্তারের হেফাজতে কেন রাখিলেন? হাকিম যে বালিকাটিকে স্বামী-গৃহে পৌঁছিতে সমর্থ করিবার নিমিত্ত তাহার স্বামী-গৃহ পর্যন্ত সঙ্গে কনেস্টবল দেন নাই, দুর্বৃত্তেরা বালিকাটিকে ছিনাইয়া লইয়া গেল জানিয়াও তাহা নিবারণের চেষ্টা করিলেন না, তাহার কারণও বোধ হয় হাকিমদের ঐরূপ কাজের উপর উপরওয়ালাদের খর দৃষ্টির অভাব। বালিকার স্বামী থানায় নালিশ করায় দারোগা তাহার অভিযোগ লিখিয়া লইল না, এরূপ বহু অভিযোগ বহু স্থলে খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। কিন্তু তাহার যথোচিত প্রতিকার হয় নাই। ইহা বর্তমান শাসন-প্রণালীর ও শাসকদের একটা বড় ত্রুটি।

বাগেরহাটের ঘটনাটার বৃত্তান্ত পড়িয়া আমাদের মনে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, শাসক-হাকিমের ও পুলিসের কর্তব্য কি কেবল কোন অপরাধ হইয়া যাইবার পর নালিশ আসিলে তবে ধরপাকড় করা ও বিচার করা? না, অপরাধ হইতে না-দেওয়াও তাঁহাদের কর্তব্য? মনে করুন, কোন হাকিম ও পুলিস কর্মচারী দেখিলেন, বে-আইনী কাজ করিবার নিমিত্ত, খুন পর্যন্তও করিবার নিমিত্ত, লোক জড় হইয়াছে, অথবা দেখিলেন যে খুন হইতে যাইতেছে। তাহা হইলে তাঁহারা দাঙ্গা ও খুন নিবারণের চেষ্টা করিতে বাধ্য কিনা? খুন হইয়া যাইবার পর বা কেহ জখম হইবার পর অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা পুলিসের কাজ এবং তাহার বিচার করা হাকিমের কাজ, আইন কি শুধু ইহাই বলে? খুন-জখম নিবারণের চেষ্টা করিতে আইন বলে না? অন্য অপরাধও নিবারণ করিতে কি আইন বলে না?

আলোচ্য সংবাদের একটা অংশ এই যে, বালিকাটির স্বামীকে ও তাহার সহায়কদিগকে আক্রমণ করিয়া কতকগুলি লোক আদালত-প্রাঙ্গণ হইতে বালিকাটিকে ধরিয়া লইয়া গেল; হাকিম ইহা অনবগত ছিলেন না, ইহা যে বেআইনী কাজ তাহাও তিনি জানিতেন। কিন্তু এই বেআইনী কাজ নিবারণ করিবার কোন সরকারী চেষ্টা হইল না।

আমাদের বক্তব্য এই যে, হাকিমদের ও পুলিসের অগোচরে যত বেআইনী কাজ হয় সমুদয় নিবারণ করা তাঁহাদের অসাধ্য হইলেও, যে-সব আইনবিরুদ্ধ কাজের আয়োজন তাঁহাদের গোচর হয় ও যে-সব ঐরূপ কাজ

তাঁহাদের প্রায় চোখের সামনেই হয়, সেগুলা হইতে না-দেওয়া তাঁহাদের একান্ত কর্তব্য। সেই কর্তব্য না করিলে তাহার সরকারী প্রতিকার হওয়া আবশ্যক। ঔদাসীন্য, অবহেলা, বা অসামর্থ্যের জন্য যথোচিত শাস্তি হওয়া আবশ্যক।

আলোচ্য ঘটনাটার বৃত্তান্তে দেখা যাইতেছে, কতকগুলা লোক বাহুবলে বেআইনী কাজ করিল, সরকারী কোন উপায়ে তাহা নিবারিত হইল না। এইরূপ সমুদয় স্থলে বেসরকারী লোকদের দ্বারা বাহুবলে নারীরক্ষা হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাহা বেআইনী নহে, নীতিবিরুদ্ধ নহে, ধর্মবিরুদ্ধ নহে; বরং তাহা দ্বারা আইনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ ও মর্যাদা রক্ষিত হয়। বাংলা দেশে, এবং যে-সব দেশ বা প্রদেশের অবস্থা বঙ্গের মত, সেখানে বেআইনী কাজ সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা নিবারিত না হইলে, বেসরকারী লোকদিগকে বাহুবল দ্বারা আইনের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। স্বরাজলাভের নিমিত্ত অসহযোগ ও আইনলঙ্ঘন করিবার লোক—পুরুষ ও নারী উভয়ই—বঙ্গে হাজার হাজার পাওয়া গিয়াছিল, আবশ্যক হইলে আবার পাওয়া যাইবে। নারীরক্ষা সম্পূর্ণ বৈধ কাজ, ধর্মসঙ্গত ও আইনসঙ্গত কাজ; ইহা না করিলে অধর্ম হয়, আইনের মর্যাদা রক্ষিত হয় না। ইহার জন্য হাজার হাজার লোক পাওয়া উচিত।

যদি কখনও এরূপ আইন হইতে দেখা যায় নারীরক্ষা যাহার ফলে বেআইনী হইয়া পড়ে, কিংবা যদি বর্তমান আইনসমূহের অপপ্রয়োগে নারীরক্ষা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে সেরূপ আইনলঙ্ঘন করা, আইনের সেরূপ অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধতা করা প্রত্যেক সৎ ও সমর্থ পুরুষ ও নারীর একান্ত কর্তব্য হইবে। আশা করি, সেরূপ সময় কখনও আসিবে না।

নারীহরণ নিবারণের নিমিত্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন-নিবেদনের আমরা বিরোধী নহি; তাহার আবশ্যকতা স্বীকার করি। কিন্তু নারী অপহৃতা হইবার পর নালিশ ও আবেদন-নিবেদন অপেক্ষা নারীকে অপহৃত হইতে না-দেওয়া এবং বৈধ বাহুবলাদি সব উপায়ে তাঁহাকে রক্ষা করাই শ্রেয়ঃ।

—

নারীহরণ ও মুসলমান সমাজ

নারীহরণ নিবারণার্থ হিন্দুদের সমিতি আছে, অসাম্প্রদায়িক সমিতিও আছে, কিন্তু আমরা যত দূর জানি মুসলমানদের এরূপ কোন সমিতি নাই। কিন্তু এই তথ্য হইতে আমরা এরূপ কোন সিদ্ধান্ত করিতেছি না যে, মুসলমান মহাপুরুষ ও মনীষীরা নারীর মর্যাদা সম্বন্ধে উদাসীন, কিংবা তাঁহাদের উক্তিতে ও মুসলমান শাস্ত্রে নারী সম্বন্ধে কোন মহতী বাণী নাই। কারণ, ইহার বিপরীত যে সত্য, তাহা পরে দেখাইতেছি।

মুসলমান শাস্ত্র, মহাপুরুষ ও মনীষীরা যাহাই বলুন, বর্তমান মুসলমান সমাজে সম্ভবতঃ হিন্দুনারীহরণ সম্বন্ধে কতকগুলা এরূপ ধারণা আছে যাহা আমরা ভ্রান্ত মনে করি। সেগুলা কি, স্পষ্ট নির্দেশ করা অনাবশ্যক। সেই ধারণাগুলার একটা ফল এই দেখা যায়, যে, বহুস্থলে গৃহস্থ মুসলমান নারীরা অপহৃতা হিন্দুনারীকে লুকাইয়া রাখিতে সাহায্য করিয়াছেন; দল বাঁধিয়া বলপূর্বক হিন্দুনারী অপহরণ ও পুনরপহরণ আর একটা ফল।

নারীহরণ যে অতি গর্হিত কাজ, হিন্দুনারীহরণও যে খুব গর্হিত, মুসলমান সমাজে এরূপ প্রবল জনমত না-থাকায় মুসলমান সমাজেই একটা অবাঞ্ছনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। তাহা ভদ্র মুসলমান ও পুরুষেরা লক্ষ্য করিয়াছেন কি না, জানি না। তাহা এই যে, মুসলমান-নারীহরণ, মুসলমান নারীদের উপর অত্যাচার, বাড়িয়া চলিয়াছে। কিছু দিন পূর্বে খাজা সর্ নাজিমুদ্দিন আইনসভায় এ বিষয়ে যে-সব সংখ্যার উল্লেখ করেন, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

কোথাও যদি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই লোক থাকে ও সেখানে যদি আগুন লাগে, তাহা হইলে আগুন বাছিয়া বাছিয়া হিন্দুর বা মুসলমানের ঘর পুড়ায় না, যার ঘর সামনে পড়ে সেটাকেই অপক্ষপাতিত্ব সহকারে প্রাকৃতিক নিয়মে পুড়ায়।

সেইরূপ, কোন কারণে পাশব প্রবৃত্তির আগুন জ্বলিলে ও প্রশ্রয় পাইলে তাহা হিন্দু মুসলমান বিচার করে না, উভয় সম্প্রদায়ের নারীরই সর্বনাশ করে;—হয়ত বা যাহারা নিকটতর, অধিকতর সংখ্যায় তাহাদেরই সর্বনাশ

করে। এবম্বিধ কারণে দেখা যায়, অপহৃতা ও নির্যাতিতা নারীদের মধ্যে মুসলমান নারীর সংখ্যা সেইরূপ বেশী যেমন নারীনিগ্রহকারীদের মধ্যে মুসলমান পুরুষের সংখ্যা অধিক।

কোন প্রকার লালসাই যে নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্র হইতে তাহার একটা দৃষ্টান্ত পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। কয়েক দশক পূর্বে য়ুরোপীয় শক্তিশালী দেশসমূহের লোকদের মনে এইরূপ একটা ভাব ভিতরে ভিতরে কাজ করিত যে, যদি পররাজ্য গ্রাস করিতে হয়, বিদেশী জাতির সম্পত্তি অপহরণ করিতে হয়, তাহা হইলে এইরূপ সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যলিপ্সার প্রশস্ত ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা এই দুই মহাদেশ। কিন্তু পরে এমন সময় আসিয়াছে যে, এই য়ুরোপীয় লালসা এখন আর কেবল এশিয়া ও আফ্রিকায় চরিতার্থতার ক্ষেত্র না খুঁজিয়া আপন মহাদেশ ইয়োরোপেই বিশেষ করিয়া খুঁজিতেছে। রাশিয়া যে-সকল দেশ সম্প্রতি নিজের অঙ্গীভূত করিয়াছে, তাহা ইয়োরোপে স্থিত; জার্ম্যানী ইয়োরোপের কয়েকটি দেশ গ্রাস করিয়াছে; ইটালী ফ্রান্সের কোন কোন অংশ গ্রাস করিতে চাহিয়াছে এবং গ্রীসের বিরুদ্ধে লড়িতেছে। ইটালী এশিয়া ও আফ্রিকাতেও পরদেশ অধিকারার্থ যুদ্ধ করিতেছে।

নারীহরণ সম্বন্ধে বঙ্গের পুরুষজাতীয় মুসলমানদের অনেকের মনের ভাব যাহা অনুমান করিতে পারা যায়, উপরে লিখিত অনেক বাক্য হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। মুসলমান মহিলারা এ বিষয়ে কি মনে করেন, জানি না। তাঁহারা এ বিষয়ে কখনও কিছু লিখিয়াছেন কিনা, জানি না। তাঁহারা যদি কেহ 'প্রবাসী' পড়েন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, এ বিষয়ে তাঁহাদের মত জানিতে অনেকের কৌতূহল ও আগ্রহ আছে।

—

নারীর প্রতি আচরণ সম্বন্ধে মুসলমান জনমত

ইহা মোটের উপর সত্য, যে, হিন্দু নারীদের মধ্যে যেমন অনেকে নির্যাতিতা হন, মুসলমান নারীদের মধ্যেও তেমনি অনেকে নির্যাতিতা হন। এবং ইহাও গবন্মেণ্ট কর্তৃক সংগৃহীত সংখ্যা হইতে বুঝা যায়, যে, মুসলমান নারীদের নির্যাতন হিন্দু বদমায়েস দ্বারা যত হয়, মুসলমান বদমায়েস দ্বারা তদপেক্ষা অনেক বেশী হয়। মুসলমান পুরুষদের দ্বারা মুসলমান নারীদের নির্যাতনের মোকদ্দমা হিন্দু ষড়যন্ত্রের ফলে হয়, মুসলমানরা এরূপ সন্দেহ করেন কিনা, জানি না। কিন্তু সেরূপ সন্দেহের কোন কারণ আমরা অবগত নহি।

এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া ভদ্রশ্রেণীর শিক্ষিত মুসলমানরা বুঝিতে পারিবেন—সম্ভবতঃ তাঁহারা আগে হইতেই বিশ্বাস করেন, যে, নারীর প্রতি আচরণ সম্বন্ধে সভ্যজনোচিত লোকমত তাঁহাদের মধ্যে স্পষ্টতর ও প্রবলতর হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে আন্দোলন করিতে হইলে তাঁহারা তাঁহাদের শাস্ত্রের যথেষ্ট সমর্থন পাইবেন।

কয়েক বৎসর পূর্বে আমরা ভূপালের পরলোকগতা বেগম সাহিবার একখানি উর্দু বহির ইংরেজী অনুবাদ পাইয়াছিলাম। তাহাতে মুসলমানধর্মপ্রবর্তক মুহম্মদের এই মর্মের একটি বাণীর ইংরেজী অনুবাদ ছিল বলিয়া মনে পড়িতেছে:

"Paradise lies at the feet of the mother."

"স্বর্গ জননীর পদতলে অবস্থিত।"

ইহাও শুনিয়াছি, যে, মুসলমানদের শাস্ত্রে ব্যভিচারীকে লোষ্ট্রনিক্ষেপ দ্বারা বধ করিবার বিধান আছে।

ঘটনাক্রমে ১৩৪৩ সালের ২৭শে শ্রাবণ, "স্বস্তিকা" নাম দিয়া মুদ্রিত একটি হিন্দু বালিকার বিবাহ উপলক্ষ্যে প্রেরিত আশীর্বাদগুলি পাইয়াছিলাম। তাহার শেষে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মহাশয়ের নিম্নমুদ্রিত কথাগুলি আছে।

'মুহম্মদ'

"মান্ আক্‌রম যওজতহু আক্‌রমহু-ল্লাহ্"

যে স্ত্রীকে সম্মান করে, ঈশ্বর তাহাকে সম্মানিত করেন।

"আলা ইন্ন লকুম্ 'আলা নিসাইকুম্ হক্'ান্ ওয়ালিনিসাইকুম্ 'আলয়কুন্ হক্'ান্।"

সাবধান! স্ত্রীর উপর তোমাদের স্বত্ব আছে এবং তোমাদের উপর স্ত্রীর স্বত্ব আছে।

"আদ্দুনয়া মাতা'উন ওয়া খয়্র মতা'ই-দ্ দুনয়া আল্ মর্‌আতু-স্ স্বালিহ'তু।"

পৃথিবী সম্পদ্, এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ ধার্মিকা নারী।

ঢাকা আশীর্বাদক

৩রা আষাঢ়, ১৩৪৩ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

এই প্রকার বহু বাক্য হইতে এই সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত, যে, নারীহরণ কার্যে সাফল্য লাভ করিয়া "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি উত্থিত করা মুসলমানশাস্ত্রবিরুদ্ধ।

—

বঙ্গে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা

কোন দেশে নারীর সংখ্যা ক্রমাগত কমিতে থাকিলে তথাকার অধিবাসী জাতির লোকসংখ্যা হ্রাস এবং পরিণামে লয়প্রাপ্তি অনিবার্য। এই জন্য বঙ্গে পুরুষদের তুলনায় নারীদের সংখ্যার অবিরাম হ্রাস সাতিশয় উদ্বেগজনক। এই হ্রাস কিরূপ, তাহা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত ভারতবর্ষের মহিলাদের ন্যাশন্যল কৌন্সিলের বুলেটিনের ১৯৩৬ সালের এপ্রিল সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে দেখাইয়াছিলেন। তাহা হইতে কতকগুলি তথ্য সংকলন করিয়া দিতেছি।

এ পর্যন্ত সরকারী সেন্সস অর্থাৎ লোকসংখ্যাগণনা সাত বার হইয়াছে। এই সাত বারে বঙ্গের সব ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিহাজার পুরুষে মোট স্ত্রীলোক কত ছিল, এবং হিন্দুদের মধ্যে কত ও মুসলমানদের মধ্যে কত ছিল, তাহার তালিকাটি নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

সেন্সসের বৎসর	সকল সম্প্রদায়	হিন্দু	মুসলমান
১৮৭২	৯৯২	১০০৩	৯৮৭
১৮৮১	৯৯৪	৯৯৯	৯৮৮
১৮৯১	৯৭৩	৯৬৯	৯৭৭
১৯০১	৯৬০	৯৫১	৯৬৮
১৯১১	৯৪৫	৯৩১	৯৪৯
১৯২১	৯৩২	৯১৬	৯৪৫
১৯৩১	৯২৪	৯০৮	৯৩০
হ্রাস	—৬৮	—৯৫	—৫৭

হাজার-করা এই হ্রাস বঙ্গের কোন একটা বা কয়েকটা অঞ্চলে আবদ্ধ নহে। সকল ডিবিজনেই যে হ্রাস হইয়াছে, তাহা যতীন্দ্রবাবু আর একটি তালিকায় দেখাইয়াছেন।

এরূপ মনে হইতে পারে, যে, বঙ্গে ক্রমশঃ কলকারখানা ও বাণিজ্য বাড়িতেছে এবং তদুপলক্ষ্যে বঙ্গের বাহির হইতে প্রধানতঃ পুরুষরাই আসিতেছে; এই জন্য বঙ্গে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা হাজার-করা ক্রমাগত কম দেখা যাইতেছে। নারীসংখ্যার হ্রাস কিয়ৎ পরিমাণে এই কারণে হইতেছে বটে। কিন্তু তাহা ঘটিতেছে কলিকাতা ও কলকারখানাবহুল বাণিজ্যপ্রধান অন্য কয়েকটি নগরে। যদি আমরা বঙ্গের মোট লোকসংখ্যা হইতে নগরগুলির লোকসংখ্যা বাদ দিই, তাহা হইলে গ্রামময় বঙ্গের লোকসংখ্যা পাওয়া যাইবে। সমগ্র বঙ্গে ও গ্রামময় বঙ্গে প্রতিহাজার পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা নীচের তালিকায় দেখান হইতেছে।

সেন্সসের বৎসর	সমগ্র বঙ্গে	গ্রামময় বঙ্গে
১৮৭২	৯৯২	১০০৭
১৮৮১	৯৯৪	১০০৬
১৮৯১	৯৭৩	৯৯০
১৯০১	৯৬০	৯৮২
১৯১১	৯৪৫	৯৭১
১৯২১	৯৩২	৯৬১
১৯৩১	৯২৪	৯৫৫
মোট হ্রাস	—৬৮	—৫২

অতএব ইহা নিঃসন্দেহ, যে, বঙ্গে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকদের সংখ্যার হ্রাস হইতেছে।

রোগে মৃত্যু পুরুষদের চেয়ে নারীদের কম হয়। কিন্তু নারীমৃত্যুর এই আপেক্ষিক ন্যূনতা সত্ত্বেও, বঙ্গে নারী-সংখ্যার হ্রাসের আপেক্ষিক আধিক্যের একটি কারণ সন্তানপ্রসবকালে এদেশে নারীদের মৃত্যু খুব বেশী হয়। আর একটি কারণ, এদেশে পুরুষ অপেক্ষা নারীরা আত্মহত্যা বেশী করে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষেরা আত্মহত্যা করে বেশী, কারণ তথাকার পুরুষদের জীবন স্ত্রীলোকদের জীবনের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক সংগ্রামময়, বিপৎসঙ্কুল ও ঝঞ্ঝাটপূর্ণ। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদেরই বেশী আত্মহত্যা করিবার কারণ, এদেশে নারী ও পুরুষ উভয়েরই জীবন দুঃখময় হইলেও নারীদের জীবন অপেক্ষাকৃত অধিক দুঃখময়। তাঁহাদের নানাবিধ দুঃখ কমাইলে তাঁহাদের মধ্যে আত্মহত্যাও কমিবে। নারীদের প্রসবকালীন মৃত্যুসংখ্যা কমাইবার প্রধান উপায়, তাঁহাদিগের অল্পবয়সে জননীত্ব নিবারণ, ঘন ঘন জননীত্ব নিবারণ, সূতিকাগারসমূহের উন্নতি সাধন, প্রসবকালীন রীতিনীতি প্রথা খাদ্য ও আচারের আবশ্যকমত সুপরিবর্তন, এবং সর্বত্র শিক্ষিতা ধাত্রী পাইবার আবশ্যকমত উপায় অবলম্বন।

যতীন্দ্রবাবুর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধটির বিষয় "নারীগণ ও

জাতীয় স্বাস্থ্য" ("Women and the Nation's Health")। বোধ হয় সেই জন্য তিনি পুরুষদের চেয়ে নারীদের সংখ্যা কম হইবার একটি কারণের উল্লেখ করেন নাই। আমরা ১৯৩৪ সালের বঙ্গীয় সরকারী স্বাস্থ্য রিপোর্টে দেখিয়াছিলাম, ঐ বৎসর বঙ্গে পুরুষজাতীয় শিশু জন্মিয়াছিল ৭৫৯৭২২ এবং স্ত্রীজাতীয় শিশু জন্মিয়াছিল ৭০৪৭৯৮। অন্যান্য বৎসরও বোধ করি স্ত্রীজাতীয় শিশু জন্মে কম। ইহার প্রাকৃতিক কারণ জানি না। কিন্তু **ইহা কি হইতে পারে না যে, বঙ্গে সাধারণতঃ নারীর আদর অপেক্ষা অনাদর ও নিগ্রহ বেশী হয় বলিয়া বিধাতা বা প্রকৃতি এদেশে নারী কম পাঠাইতেছেন?**

বৎসরের পর বৎসর হিন্দুনারী হরণ চলিয়া আসিতেছে। তাহাতে হিন্দুনারীর সংখ্যা কত কমিতেছে, কেহ তাহা গণনা করিতে পারেন নাই। কিন্তু হিন্দুনারী হরণ যে হিন্দু-নারী হ্রাসের একটি কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব, হিন্দুনারী হ্রাসের অন্যান্য কারণ যেমন দূর করিতে হইবে, হিন্দুনারীহরণও সেইরূপ বন্ধ করিতে হইবে। তাহার অন্যতম উপায় বৈধ বলপ্রয়োগ যখনই আবশ্যক হইবে, তখনই অবলম্বন করিতে হইবে এবং তাহার দ্বারা ধর্মের ও আইনের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইবে।

বিবাহ-যোগ্য বয়সের বহু লক্ষ সন্তানহীনা হিন্দু বিধবার বিবাহ হয় না। তাহাদের সকলেরই বিবাহ হওয়া উচিত। অনেকের বিবাহের ইচ্ছাও আছে। সেই ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়ায় অনির্দিষ্টসংখ্যক হিন্দু বিধবা আর হিন্দু সমাজভুক্ত থাকে না। এই ভাবে হিন্দুনারীর সংখ্যা হ্রাস বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন দ্বারা নিবারিত হওয়া আবশ্যক।

বাংলা-সরকার শক্তিশালী, ভারত-সরকার তদপেক্ষা শক্তিমান, বিলাতের গবন্মেণ্ট, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে শক্তিমত্তম। কিন্তু ইহাদের শক্তি বাগেরহাটের বালিকাটির ও সেই অবস্থায় পতিত অন্যান্য বালিকাদের রক্ষায় যথোচিত প্রযুক্ত হয় নাই। দেশে মুসলিম লীগ আছে, হিন্দুমহাসভা আছে, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ আছে কংগ্রেস। কিন্তু বাগেরহাটের বিপন্না বালিকাটির ও তদ্বিধ অন্যান্য বালিকাদের পক্ষে তাহারা থাকিয়াও না-থাকার মত। নারীরক্ষার্থ সরকারী কর্তৃপক্ষের এবং বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সাহায্য অবশ্যই চাহিতে হইবে—তাহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু অন্য বৈধ উপায়ও অবলম্বন করিতে হইবে।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "উমা ঘোষ" পুস্তকসংগ্রহ

আমরা আহ্লাদের সহিত নিম্নমুদ্রিত আবেদন ও জ্ঞাপনীটি প্রকাশ করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বঙ্গরমণীদের লেখা প্রায় পাঁচ শত পুস্তক পৃথক ভাবে "উমা ঘোষ সংগ্রহে" রাখা হইয়াছে। তিন বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার কন্যা উমারাণীর স্মৃতির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় পাঁচ শত বঙ্গরমণীলিখিত পুস্তক প্রদান করিয়াছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষও বইগুলি "উমা ঘোষ সংগ্রহ" রূপে পৃথক ভাবে সযত্নে রাখিয়া দেন। এক সঙ্গে মহিলাদের প্রণীত এত অধিক পুস্তকের এক স্থানে কোথাও সংগ্রহ নাই।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার কন্যার পঞ্চম বর্ষের স্মৃতি উপলক্ষে সম্প্রতি ২৬খানি পুস্তক 'উমা ঘোষ সংগ্রহে' দান করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৭০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত কবি প্রসন্নময়ী দেবীর পুস্তকও আছে। এই সংগ্রহে অনেক লেখিকা তাঁহাদের রচিত পুস্তক প্রদান করিয়াছেন।

মহিলা লেখিকারা যদি তাঁহাদের এক এক খানি বই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট এই 'উমারাণী ঘোষ' সংগ্রহের জন্য প্রদান করেন তাহা হইলে এই সংগ্রহটি পুষ্ট হয় এবং এই বিশ্বস্ত স্থানে মহিলাদের বহি থাকিলে গ্রন্থপঞ্জী করিবার সুবিধা হইবে।

ঘোষ মহাশয়ের পিতৃস্নেহের প্রকাশ প্রশংসনীয় ও অনুকরণযোগ্য। সংগ্রহটির মুদ্রিত তালিকা প্রকাশিত হইলে, তাহাতে যে-সব বহি নাই, লেখিকারা, তাঁহাদের আত্মীয়েরা কিংবা প্রকাশকেরা সেগুলি বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে পারিবেন।

—

শিশিরকুমার ঘোষ জন্মশতবার্ষিকী

অমৃত বাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক, বহু বৈষ্ণব ও অন্য গ্রন্থের প্রণেতা শিশিরকুমার ঘোষের সম্পাদকীয় বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতা এবং তাঁহার বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীর উৎকর্ষ তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে একাধিক স্থানে কীর্তিত হইয়াছে। কিন্তু পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতের কয়েক স্থানে তাঁহার যে উল্লেখ আছে, তাহা অনেকেরই জানা নাই। সেই জায়গাগুলি হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, সমুদয় উদ্ধৃত করিলাম না।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা, পটুয়াটোলা লেনে যশোরের লোকদের এক বাসা ছিল। শিশিরবাবু মধ্যে মধ্যে সেখানে আসিতেন। তিনি আসিলেই আনন্দবাদী দলের* সমাগম হইত। তাঁহারা আমাকে ডাকিতেন। সে সময়ে প্রধানত: সঙ্গীত ও সঙ্কীর্তন হইত। টাকীনিবাসী শ্রদ্ধেয় বন্ধু হরলাল রায় সেই কীর্ত্তনে গড়াগড়ি দিতেন। শিশিরবাবু চমৎকার কীর্ত্তন করিতে পারিতেন। তাঁহার কীর্ত্তনে আমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিত। সেখানে নূতন ধরণের সঙ্গীত হইত। কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলে তাহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে। একটি সঙ্গীতে ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলা হইত,

তোমার রাগে রাঙ্গা নয়ন তলে বহে দেখি প্রেমধার।

আর একটি সঙ্গীত যাহা তাঁহাদের মুখে সর্ব্বদা শুনিতাম, তাহা এই,—

মা যার আনন্দময়ী তার কিবা নিরানন্দ ?
তবে কেন রোগে শোকে পাপে তাপে বৃথা কান্দ ?
মাঝখানে জননী ব'সে, সন্তানগণ তার চারি পাশে,
ভাসাইয়াছেন প্রেমময়ী প্রেমনীরে।
এক বার বাহুতুলে মা মা ব'লে নৃত্য কর সন্তানবৃন্দ।

এই গান করিয়া সকলে নৃত্য করিতেন। [গানটি শিশির-বাবুর রচিত।]

এক দিকে যেমন অনুতাপ ও ক্রন্দন শুনিতাম, অপর দিকে ইঁহাদের কাছে গিয়া আনন্দ ও নৃত্য দেখিতাম। তখন ইহা বেশ ভাল লাগিত। শিশির বাবুদের ভাইয়ে ভাইয়ে ভাব দেখিয়া মন মুগ্ধ হইয়া যাইত। ইহার পরেই তাঁহারা কলিকাতা হিদেরাম বাঁড়ুয্যের গলিতে আসিয়া বাসা করিয়া থাকেন। সে সময়ে তাঁহাদিগকে সর্বদা দেখিতাম। শিশির বাবুর অমায়িকতা দেখিয়া আমার মন মুগ্ধ হইয়া যাইত। এক দিনের কথা স্মরণ আছে, তিনি সেদিন আমাকে আহার করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আহারের সময় উপস্থিত হইলে বলিলেন, "কি পরের মত' বাহিরে ব'সে খাবে। চল, রান্নাঘরে গিয়ে মাকে বলি, হাঁড়ি হ'তে গরম গরম ভাত তরকারি মার হাতে না খেলে সুখ হয় না।" এই বলিয়া দুজনে গিয়া রান্নাঘরে আহারে বসিলাম। যত দূর স্মরণ হয়, তাঁর জননী গরম গরম ভাত তরকারি দিতে লাগিলেন ও আমরা আহার করিতে লাগিলাম।

আর একটি জায়গা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

আনন্দমোহন বাবু বিলাত হইতে আসার পর হইতে আমরা একত্র হইলেই এই কথা উঠিত যে, বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য কোন রাজনৈতিক সভা নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ধনীদের সভা, তাহার সভ্য হওয়া মধ্যবিত্ত মানুষদের কর্ম্ম নয়; অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে তাহাদের উপযুক্ত একটি রাজনৈতিক সভা হওয়া আবশ্যক। আমাদের তিন জনের (সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রীর) কথাবার্ত্তার পর স্থির হইল যে, অপরাপর দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করা কর্ত্ত‌ব্য। অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় আনন্দমোহন বাবুর বন্ধু এবং আমারও প্রিয় বন্ধু ছিলেন। প্রথমে তাঁহাকে পরামর্শের মধ্যে লওয়া হইল।

* এই দলের পরিচয় এই আত্মচরিতে আছে।
—প্রবাসী সম্পাদক।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার জন্মশতবার্ষিকী

কেবল বাংলা দেশে নহে, কেবল বাঙালীদের দ্বারা নহে, বঙ্গের বাহিরেও, যেমন লাহোরে ও মাদ্রাজে, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জন্মশতবার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে সভাপতি হইয়াছেন স্থানীয় লোকে এবং যোগ দিয়াছেন স্থানীয় জনগণ। যাহা উচিত তাহাই হইয়াছে। কারণ, প্রতাপচন্দ্র আপন আধ্যাত্মিক প্রতিভা ও অন্তদৃষ্টি, সাধু চরিত্র, বাগ্মিতা ও সাহিত্যিক শক্তি বাঙালীদের, ভারতীয়দের, জগদ্বাসীর সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্যক্ষেত্র ভারতবর্ষের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তিনি পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইয়া ইয়োরোপ, আমেরিকা ও জাপানে বহুস্থানে বক্তৃতাদি করেন, এবং অনেক প্রসিদ্ধ লোকের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করেন। তাঁহার এই ভ্রমণবৃত্তান্তের একটি মনোজ্ঞ বহি আছে, এই বৎসর তাহার নূতন সংস্করণ হইয়াছে। তাঁহার অন্যান্য উৎকৃষ্ট পুস্তকের মধ্যে "প্রাচ্য ঈশা" (The Oriental Christ)" প্রসিদ্ধ। যীশু খ্রীষ্টকে পাশ্চাত্য খ্রীষ্টিয়ানেরা অনেকে যেরূপ মনে করে, প্রতাপচন্দ্র তাহা না করিয়া তাঁহাকে প্রাচ্য সাধুসন্তদের মত করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহাই যীশুর সত্য রূপ।

প্রতাপচন্দ্রের জীবনচরিত, ব্যক্তিত্ব ও গ্রন্থাবলীর সহিত আমাদের যুবজনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা উচিত। তিনি যুবজনের নিমিত্ত "ইন্সটিটিউট ফর দি হাইয়ার ট্রেনিং অব্ ইয়ং মেন" নাম দিয়া যে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন, তাহাই এক্ষণে ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট নামে বিদিত।

—

ইয়োরোপ আফ্রিকা ও এশিয়ায় যুদ্ধ

ইয়োরোপে বর্তমান যুদ্ধ বাধিবার আগে হইতে চীনে জাপানে যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছিল। ইহাতে উভয় পক্ষে যত মানুষ হত ও আহত হইয়াছে, অতীতে বা বর্তমানে পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোন যুদ্ধে তত হইয়াছে বলিয়া অবগত নহি। আক্রান্ত দেশের ঘরবাড়ী ও অন্যবিধ সম্পত্তিনাশও এই যুদ্ধে যত হইয়াছে, তাহাও পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে অনতিক্রান্ত বলিয়া মনে হয়।

কিছু দিন হইতে জাপানীদের পরাজয়ের ও হটিয়া যাইবার সংবাদ আসিতেছে। জাপানীরা যে চীন হইতে অনেক সৈন্য সরাইয়া লইতেছে, পরাজয়ই তাহার একমাত্র কারণ না হইতে পারে;—গুজব রটিয়াছে যে, তাহারা হল্যাণ্ডের অধিকৃত জাভা প্রভৃতি দ্বীপ দখল করিতে চায় এবং সেখানে সৈন্য পাঠাইবে। তাহারা ইন্দোচীনে অনেকটা প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে। থাই-ভূমিতে (শ্যামদেশে) তাহাদের প্রভুত্ব স্থাপিত না হইয়া থাকিলেও উহা তাহাদের খুবই প্রভাবাধীন। তাহারা চীনে তাহাদের অভিলাষ অনুযায়ী অধিকার বিস্তার করিতে পারিল না বা পারিবে না বলিয়া যে এশিয়া মহাদেশে ও তাহার বহু দ্বীপে সাম্রাজ্য স্থাপনের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছে, এমন নয়।

আমরা চীনদের স্বদেশপ্রেম, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সাহস, অধ্যবসায়, বুদ্ধিমত্তা ও রণদক্ষতা প্রশংসমান চিত্তে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। তাহাদের জয় কামনা করি।

য়ুরোপীয় যুদ্ধ ইয়োরোপেও আরও ব্যাপক হইয়াছে ইটালীর গ্রীস আক্রমণে। জাপান যেমন চীনের নিকট সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য অনেক অংশে ঋণী, ইটালীও সেইরূপ সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য গ্রীসের নিকট অনেক অংশে ঋণী। কিন্তু সংগ্রামে ও কূটরাষ্ট্রনীতিতে কৃতজ্ঞতার স্থান নাই। জাপান চীনকে পদানত করিতে চায়—এ-পর্য্যন্ত পারে নাই; ইটালীও গ্রীসকে পদানত করিতে পারিবে না মনে হইতেছে। গ্রীস তাহার ইতিহাসবিশ্রুত পুরাকালের শৌর্য্যের সহিত লড়িতেছে ও ইটালীকে পরাস্ত করিতেছে। ইহা দেখিয়া ইটালীর বন্ধু জার্মেনী তাহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত গ্রীস আক্রমণ করিতে পারে বটে, কিন্তু ব্রিটেন গ্রীসের সহায় আছে। গ্রীসকে সাহায্য করায় ব্রিটেনের কোন স্বার্থ না থাকিলে সে গ্রীসকে সাহায্য করিত না, যেমন আবিসীনিয়াকে করে নাই, কিন্তু গ্রীস ব্রিটেনের কোন শত্রুর হস্তগত হইলে ভূমধ্যসাগর দিয়া ব্রিটেনের ভারতবর্ষে আসিবার পথ বন্ধ হইবে; সেই জন্য গ্রীসকে তাহার সাহায্য করিতেই হইবে।

ব্রিটেন অনেক সপ্তাহ হইতে আকাশপথে জার্মেনীর আক্রমণ শুধু প্রতিহত করিয়াই ক্ষান্ত না থাকিয়া আকাশপথে জার্মেনীর এবং জার্মান-অধিকৃত ফ্রান্সের অনেক স্থান আক্রমণ করিতেছে। রয়টারের সংবাদ যেরূপ আসিতেছে, তাহাতে মনে হয়, এরোপ্লেনের সংখ্যায় এখনও জার্মেনীর শ্রেষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও আকাশযুদ্ধে ব্রিটেনের সাফল্য অধিক হইতেছে। এরোপ্লেনের সংখ্যা যখন ব্রিটেনের অধিক হইবে, তখন সম্ভবতঃ জার্মেনীকে আরও বিপন্ন হইতে হইবে।

ব্রিটিশ বোমারুরা ইটালীর নানা স্থানও আক্রমণ করিতেছে।

স্থলযুদ্ধ অপেক্ষা আকাশযুদ্ধে মানুষ মরে কম, ইহা মন্দের ভাল।

চীন-জাপান যুদ্ধে দেখা গিয়াছে ও এখনও দেখা যাইতেছে যে, জাপানীরা হাজার হাজার অযোদ্ধা পুরুষ এবং স্ত্রীলোক বালকবালিকা ও শিশুদিগকে হত্যা করিয়াছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী প্রাসাদ দোকান ধর্মমন্দির সাধারণ ঘরবাড়ী প্রভৃতি নষ্ট করিয়াছে। এগুলি যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত হয় না। অযোদ্ধা নানা বয়সের মানুষ মারা এবং ঐ সকল সম্পত্তি নষ্ট করার উদ্দেশ্য বিভীষিকা উৎপাদন এবং পরোক্ষভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীর যুদ্ধে অর্থ ব্যয় করিবার ক্ষমতা নষ্ট করা বা হ্রাস করা।

জার্মেনীও ব্রিটেন-আক্রমণে বিভীষিকা উৎপাদন ও অসামরিক সম্পত্তি বিনষ্ট করার পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। গির্জা পর্য্যন্ত নিষ্কৃতি পাইতেছে না।

প্রাচীন কালে, অন্ততঃ ভারতবর্ষে, যুদ্ধ সম্বন্ধে এই রীতি ছিল যে, সংগ্রাম যোদ্ধাদের মধ্যে, সৈনিকদের মধ্যে, হইবে; কৃষক প্রভৃতি অসামরিক লোকেরা আক্রান্ত হইবে না; শস্তক্ষেত্রাদি নষ্ট করা হইবে না; ইত্যাদি। এখন সেরূপ নিয়ম মানা হয় না। য়ুরোপীয় সর্বজাতিক আইন (International Law) বলিয়া যাহা অভিহিত হয়, যুদ্ধানরত কোন পক্ষের তাহা না মানিলে যদি সুবিধা হয়, তাহা হইলে সে পক্ষ তাহা মানে না, ভঙ্গ করে।

চীনের লোকেরা বৌদ্ধ ধর্ম মানে, জাপানের লোকেরাও বৌদ্ধ ধর্ম মানে। কিন্তু কেহ কাহাকেও রেহাই দিতেছে না। ইয়োরোপের যে সকল জাতির মধ্যে যুদ্ধ হইতেছে, তাহারা সবাই নামে খ্রীষ্টিয়ান, এবং সকলেরই পাদরীরা তাহাদের গির্জায় বলে যীশুখ্রীষ্ট জগতে শান্তির বার্তা প্রচার করিতে ও শান্তি স্থাপন করিতে আসিয়াছিলেন। অথচ যুধ্যমান কোন জাতি তাহাদের প্রতিপক্ষকে মারিয়া ফেলাই যে পরম ধর্ম, আচরণ দ্বারা জগতের লোককে তাহাই জানাইতেছে। ভারতবর্ষের মুসলমানরা অনেকে এইরূপ বিশ্বাসের ভান করিতেছে যে, প্রত্যেক মুসলমান দেশ অন্য মুসলমান দেশের বন্ধু, ভারতীয় মুসলমানদেরও বন্ধু। কিন্তু ভারতবর্ষেই যে মোগল ও পাঠানে বহু যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা উভয়েই মুসলমান ছিল। গত মহাযুদ্ধের সময় মুসলমান আরব ও মুসলমান তুর্কে যুদ্ধ হইয়াছিল। অথবা বেশী দিন আগেকার ও বেশী দূর দেশের ঘটনার কথা বলিবার কি প্রয়োজন?—সে দিন যে শিয়া সুন্নির খুনাখুনি লক্ষ্ণৌতে হইয়া গেল তাহারা ত সবাই মুসলমান। কোন জাতিই, কোন মানবসমষ্টিই, সমষ্টিগতভাবে তাহাদের ধর্ম মানিয়া চলে না। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান মুসলমান কেহই বাদ যায় না। সমষ্টিগত ভাবে কোন জাতিই সভ্য বা ধার্মিক হয় নাই—যদিও ব্যক্তিগত ভাবে সভ্য ও ধার্মিক মানুষ সব জাতি ও দেশে কিছু আছে।

আফ্রিকার যুদ্ধে ইটালী কিছু সুবিধা করিতে পারিতেছে না, এইরূপ সংবাদ আসিতেছে।

ইটালী এডেনে, আরব দেশে ও প্যালেস্টাইনে বোমা ফেলিয়াছে।

পৃথিবীর মহাদেশগুলির মধ্যে যুদ্ধটা এখনও উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছে নাই। কিন্তু জার্মেনীর মাইনের বা টর্পেডোর আঘাতে আমেরিকান জাহাজ কিছু ডুবিয়াছে।

অস্ট্রেলিয়া নিউজীল্যাণ্ড প্রভৃতিকেও একটা মহাদেশ বলা যাইতে পারে। যুদ্ধ এখনও সেখানে পৌঁছে নাই বটে, কিন্তু তাহার নিকটে জাহাজ ডুবিয়াছে। জার্মেনীর শনির দৃষ্টি সে দিকেও আছে।

—

বার্লিনে মোলোটফ

মোলোটফ কেন বার্লিন গেলেন, সেখানে কি কথা হইল, স্টালিন ও হিটলারের মধ্যে কোন চুক্তি হইল কি না, ইত্যাদি বিষয়ে অনেক খবর ও জল্পনা দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে ও হইবে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা ভবিষ্যৎ কোন ঘটনা হইতে বা ঘটনার অভাব হইতেই বাস্তবিক বুঝা যাইবে।

হিটলার অনেক আগে হইতেই টোপ ফেলিয়া রাখিয়াছে। স্টালিন হিটলারের ইয়োরোপ-এশিয়া ভাগের প্রস্তাবে রাজী হইলে স্টালিনের ভাগে পড়িবে ইরান আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষ—টোপটা এই। স্টালিন টোপটা গিলিলে, ব্রিটেন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নিজের সাম্রাজ্য-বাদপ্রণোদিত নীতির পরিবর্তন করিবে কিনা, করিলে কিরূপ পরিবর্তন করিবে, তাহা এখন অনুমান করিতে পারা যায় না।

বস্তুতঃ, স্টালিন হিটলারের টোপ গিলিবে, বা গিলিবে না, এরূপ না বলিয়া, হিটলার স্টালিনের টোপ গিলিবে কি না, এইরূপ বলাই হয়ত অধিকতর সঙ্গত। স্টালিন যে কূট রাজনীতিতে হিটলারের চেয়ে দড়, তাহা রাশিয়ার প্রায় বিনা-যুদ্ধে পোল্যাণ্ডের বৃহৎ অংশ দখল এবং লাটভিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশ যুদ্ধ ব্যতিরেকে দখল হইতে অনুমিত হয়।

শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসু ও কংগ্রেস

কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কলাম আজাদ শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসুকে কংগ্রেসের নিয়মানুবর্তিতাভঙ্গ দোষের জন্য কিছু শাস্তি দিয়াছেন। মৌলানা সাহেবের চিঠির উত্তর যদি শরৎ বাবু চিঠিটি পাইবার পরই দিয়া ফেলিতে পারিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত। কাগজে বাহির হইয়াছিল যে, তিনি ডেরাদুনে থাকায় এবং সেখানে তাঁহার নিকট আবশ্যক কাগজপত্র না-থাকায়, তিনি এ বিষয়ে পূর্ণ বিবৃতি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া দিবেন। তিনি সপ্তাহ বা সপ্তাহাধিক কাল কলিকাতায় আসিয়াছেন, এখনও (২৮শে কার্তিক) তাঁহার বিবৃতি কাগজে দেখি নাই। তিনি নানা কার্যে ব্যস্ত থাকেন বটে, কিন্তু পূর্ণ-বিবৃতি দেওয়াটাকে "জাতীয়" একটা বড় কর্তব্য মনে করিয়া তাহা প্রকাশিত করিলে ভাল হইত।

ইতিমধ্যে তাঁহার দলভুক্ত বহু রথী এবং অন্য কোন কোন রথী আসরে নামিয়া অনেক লম্বা লম্বা বিবৃতি ঝাড়িয়াছেন। কিঞ্চিৎ বিলম্বে বৈধ কংগ্রেস পক্ষের লোকেরাও বিবৃতি ঝাড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। শরৎ বাবুর পক্ষে যথাসময়ে তাঁহার বিবৃতি প্রকাশ সম্ভবপর হইলে, উভয় পক্ষের বিবৃতিযুদ্ধে যে শক্তি ও সময় নিয়োজিত হইয়াছে তাহা বাঁচিয়া যাইত, এবং উভয় পক্ষের কাগজগুলির অনেক স্তম্ভ জায়গায় আবশ্যক ও পাঠযোগ্য সংবাদ প্রবন্ধাদি মুদ্রিত হইতে পারিত; এবং বঙ্গের রাজনৈতিক হাওয়া দলাদলির যে যে বিষে জর্জরিত আগে হইতেই ছিল, তাহার দ্বারা অধিকতর জর্জরিত হইত না।

আমরা অবসর অভাবে অনেক অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ে লিখিত রচনাও পড়িতে পারি না। সেই হেতু আমরা শুধু মৌলানা সাহেবের চিঠিটি পড়িয়া শরৎ বাবুর পূর্ণ বিবৃতিটি পড়িবার প্রতীক্ষায় ছিলাম। কিন্তু তাহা এখনও বাহির না-হওয়ায় মৌলানা সাহেবের চিঠিটি পড়িয়া আমাদের যে ধারণা হইয়াছে তাহাই লিখিতেছি। আমরা মনে করি, মৌলানা সাহেব যাহা করিয়াছেন, তাহাতে কোন নিয়ম ভঙ্গ করা হয় নাই। তাঁহার পক্ষে আরও অধিক কাল অপেক্ষা না-করা সমীচীন হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না। কারণ, রাজনৈতিক দলগুলির রণ-কৌশল আমাদের জানা নাই। শরৎবাবুর কৃত কার্যের ন্যায্যতাপ্রতিপাদক কোন অপ্রকাশিত কারণ বা অবস্থা থাকিলে তিনি তাহা বলিতে পারিবেন, আমরা তাহা জানি না।

শরৎবাবুর দলের কেহ কেহ এবং অ-কংগ্রেসী কেহ কেহও গোটা দুই বাজে রব তুলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, শরৎবাবুকে শাসন করায় বাংলা দেশকে ও বাঙালী জাতিকে অপমান করা হইয়াছে। আমরা এ বিষয়ে তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক মনে করি না। আমাদের বিচারিত বিশ্বাস, শরৎবাবু সম্বন্ধে যাহা করা হইয়াছে, তাহাতে বাংলা দেশকে ও বাঙালী জাতিকে বিন্দু মাত্রও অপমানিত করা হয় নাই।

বস্তুতঃ মামলাটা মোটেই বাংলা দেশ বা বাঙালী জাতি এবং অন্য কোন পক্ষের মধ্যে নহে, শরৎবাবুর ও কংগ্রেসের মধ্যে। শরৎবাবু যাহা করার জন্য দণ্ডিত হইয়াছেন, তাহা করিবার আগে বাঙালী জাতির সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার সম্মতি লন নাই। বাঙালী জাতি এ বিষয়ে তাঁহাকে নিজের মুখপাত্র প্রতিনিধি নিযুক্ত করে নাই। অতএব এই ব্যাপারের মধ্যে বাংলা দেশ ও বাঙালীকে টানিয়া আনা অনুচিত।

আর একটা বাজে রব এই যে, শরৎবাবু য়্যাসেম্বলীতে না থাকিলে, মাধ্যমিক শিক্ষা বিল ও কলিকাতা মিউনিসিপাল বিল, মুসলমানদের বাঞ্ছিত এই দুটা সাম্প্রদায়িক বিল খুব সহজে পাস হইয়া যাইতে পারে; তাহা যাহাতে হয় এই উদ্দেশ্যে মৌলানা সাহেব তাঁহাকে য়্যাসেম্বলী হইতে সরাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এটাও সম্পূর্ণ বাজে কথা। শরৎবাবু খুব দক্ষ লোক। কিন্তু আইন-সভায় বিল পাস হইতেছে ও হইবে ভোটের জোরে, সুযুক্তির জোরে নহে। সুতরাং শরৎবাবুর যোগ্যতা নিঃসন্দেহ যতটা আছে, তার দশ গুণ যোগ্যতা তাঁহার থাকিলেও, তৎসত্ত্বেও বিল দুটা পাস হইবে যদি এ বিষয়ে মুসলমান মন্ত্রীরা ও গবর্ণর সাহেব প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া থাকেন। আইনসভায় শরৎবাবুর থাকা না-থাকার উপর ফলাফল নির্ভর করিবে না। তদ্ভিন্ন, ইহাও মনে রাখা দরকার যে, ঐ বিল দুটার প্রথম ও সর্বপ্রধান বিরোধী শরৎবাবু ও তাঁহার দলের লোকেরা নহেন, অন্য লোকেরা। বিল দুটার বিরোধিতা অপসারণ রূপ সাম্প্রদায়িক দুরভিসন্ধি যদি কাহারও থাকে, তাহা হইলে ঐ দুটার প্রধান বিরোধীদিগকে বিরোধিতার সুযোগ ও ক্ষেত্র হইতে বঞ্চিত ও অপসারিত করার চেষ্টাই তাহার পক্ষে অধিক আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে শাসন করায় বাংলা দেশকে অপমান করা হয় নাই বটে; কিন্তু "বাংলা দেশকে অপমান করা হইয়াছে" এই রব তুলিলে যে অনেক বাঙালী তাহা সহজেই বিশ্বাস করেন, তাহার কারণ আছে। ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত (Communal Decision) বাংলা দেশকে—বিশেষতঃ হিন্দু বাঙালীকে—যেরূপ হীনবল করিয়াছে তাহা জানিয়াও কংগ্রেস "না-গ্রহণ না-বর্জন" রূপ শব্দসমষ্টির আড়ালে উহা গ্রহণই করিয়াছেন; বিহার-প্রদেশভুক্ত বঙ্গের অংশগুলি বাংলাকে ফিরাইয়া দিবার

প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াও কংগ্রেস ঐ প্রস্তাব কার্যে পরিণত করাইবার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করেন নাই; ইত্যাদি। এই সব কারণে কংগ্রেস অগণিত বাঙালীর সন্দেহভাজন।

—

বঙ্গের বন্ধুর অপ্রাচুর্য, অ-বন্ধুর প্রাচুর্য

কারণ যাহা-যাহাই হউক, বর্তমান সময়ে বাংলা দেশের—বিশেষ করিয়া বাঙালী হিন্দুর—বন্ধু বড় বেশী নাই; অ-বন্ধুই (শত্রু কাহাকেও বলিতে চাই না) প্রচুর। যদিও আমাদিগকে ভগবৎকৃপার ও স্বাবলম্বনের উপর নির্ভর করিয়াই মনুষ্যত্ব অর্জন ও রক্ষা করিতে হইবে, তথাপি বন্ধু ও সহায় যত পাওয়া যায়, ততই মঙ্গল। এ অবস্থায়, ছিঁচকাঁদুনের মত "আমাদিগকে অপমান করিল" বলিয়া নাকে কাঁদা কিম্বা যাত্রার দলের ভীমের মত বক্তৃতা ঝাড়া কোনক্রমেই সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। নাকে কাঁদিয়া বা ঝগড়া করিয়া অপরের সম্মান আদায় করা যায় না।

ভারতবর্ষের কোন প্রদেশই একা একা বাঞ্ছিত অবস্থায় পৌঁছিতে ও থাকিতে পারে না। বাংলা দেশ পারে, যদি কেহ মনে করেন, তাহা তাঁহার ভুল। আবার, যদি অন্যান্য কোন কোন প্রদেশের লোকে মনে করেন যে বাংলাকে বাদ দিয়া তাঁহারা বড় হইবেন, তাহাও ভুল।

বাংলা দেশের ও বাঙালীর সত্য অপমান কাহাকেও হজম করিতে বলি না। কিন্তু অন্যদের এমন অনেক ব্যবহার আছে, যাহা গায়ে না-মাখাই, উপেক্ষা করাই, শ্রেয়ঃ। নাকে কাঁদা কোন অবস্থাতেই বাঞ্ছনীয় নহে।

—

সাংবাদিকদের জিৎই বটে!

সরকারী এইরূপ একটা হুকুম বাহির হইয়াছিল যে, যুদ্ধায়োজনে যাহাতে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে বাধা জন্মে, যাহা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে যুদ্ধবিরোধিতা, কোন সংবাদপত্র এরূপ কিছু লিখিতে পারিবে না। সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে কোন সংবাদ বা সত্যাগ্রহী কাহারও কোন বক্তৃতা বা তাহার অংশ ছাপিতে চাহিলে তাহা আগে দিল্লীস্থিত প্রধান সংবাদপত্রপরামর্শদাতাকে দেখাইতে ও তাঁহার অনুমতি লইতে হইবে, এইরূপ হুকুমও হইয়াছিল।

ইহা সম্মানজনক নহে, দিল্লী ভিন্ন অন্য স্থানের কাগজ-ওআলাদের পক্ষে সুসাধ্যও নহে। মহাত্মা গান্ধীর 'হরিজন' বন্ধ করার মোটামুটি ইহাই কারণ। অন্য অনেক কাগজ-ওআলার ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহারা কাগজ বন্ধ করিতে পারেন না;—কারণ তাঁহাদের কাগজগুলি ব্যবসা, 'হরিজন' ব্যবসা নহে; ব্যবসা হঠাৎ গুটান যায় না।

দু-একটি কাগজ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ছাপা বন্ধ করিয়াছেন। তাহাতে গবন্মেণ্টের কোনই অসুবিধা হয় নাই।

যাহা হউক, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান এংলোইণ্ডিয়ান ও ভারতীয় অনেক সম্পাদক ও অন্য সাংবাদিক দিল্লীতে এক কন্‌ফারেন্স করিলেন—উদ্দেশ্য, গবন্মেণ্টের ভারতরক্ষা-আইনানুগ হুকুমগুলা সম্বন্ধে কোন কিছু করা। গবন্মেণ্ট যে-হুকুম জারি করিয়াছিলেন, তাহা সাংবাদিকদের সহিত পরামর্শ করিয়া করেন নাই, নিজের বুদ্ধি অনুসারে করিয়াছিলেন। কোন প্রধান বা গণনার যোগ্য কাগজ গবন্মেণ্টকে যুদ্ধায়োজন করিতে নিষেধ করে নাই বা তাহাতে বাধা দেয় নাই। দু-একটা কাগজ তাহা করিয়া থাকিলে তাহাদের শাস্তি হইয়া গিয়াছে।

গবন্মেণ্ট যে-যে হুকুম সম্প্রতি জারী করিয়াছিলেন তাহা অনাবশ্যক। এবং, বলিয়াছি, গবন্মেণ্ট তাহা সম্পাদকদিগকে জিজ্ঞাসা না-করিয়াই করিয়াছিলেন।

এ অবস্থায়, গবন্মেণ্ট যেমন তাঁহাদের সহিত পরামর্শ না করিয়া হুকুম জারী করিয়াছিলেন, সেইরূপ সম্পাদকেরাও গবন্মেণ্টের কাছে দরবার না করিয়া, স্বয়ং কিছু করিলে তাহা অনুচিত হইত না, হয়ত বা তাহাতেই তাঁহাদের আত্মসম্মান অধিক বজায় থাকিত। কিন্তু তাঁহারা তাহা না করিয়া গবন্মেণ্টের কাছে দরবার করিয়াছেন এবং যে-অপরাধ তাঁহারা করেন নাই, করিবার সঙ্কল্পও করেন নাই, তাহা "করিব না" বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিবার আত্মাবমাননা করিয়াছেন। নিষ্পত্তিটার স্বরূপ এতদ্বিষয়ক সরকারী জ্ঞাপনীর নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলা হইতে বুঝা যাইবে।

"As the result of friendly conversations in Delhi with representatives of leading newspapers, who have given them an assurance that they have no intention of impeding the country's war effort and that any deliberate or systematic attempt by newspapers to do so wou.d be viewed with disapproval by the press as a whole, Government now feel that the matter may well be left to the discretion of Editors in consultation with Press Advisers in cases of doubt."

তাৎপর্য। দিল্লীতে প্রধান প্রধান খবরের কাগজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বন্ধুভাবে কথাবার্তা হয়। তাঁহারা এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, দেশের যুদ্ধোদ্যম ব্যাহত করিবার অভিপ্রায় তাঁহাদের নাই এবং কোন বা কোন কোন সাংবাদপত্রের দ্বারা যুদ্ধোদ্যমে ব্যাঘাত জন্মাইবার অভিপ্রায়ে বা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ব্যাঘাত জন্মান হইলে সমুদয় সংবাদপত্র তাহা নিন্দার চক্ষে দেখিবে। পূর্বোক্ত কথাবার্তার ফলে গবন্মেণ্ট এখন অনুভব করিতেছেন যে, সন্দেহ-স্থলে প্রেস-পরামর্শদাতাদের সহিত পরামর্শসাপেক্ষ সম্পাদকীয় বিবেচনার উপর এখন ব্যাপারটা ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে।

ইহার মধ্যে জিৎটা কোথায়? এক প্রকার মুচলেকা

লইয়া সম্পাদকদের বিবেচনার উপর ব্যাপারটা ছাড়িয়া (!) দেওয়া হইল। কিন্তু প্রেস-পরামর্শদাতাদের সঙ্গে "পরামর্শ"ও করিতে হইবে! শুধু তাই নয়। কোন কোন কাগজের সম্পাদক বা প্রতিনিধিদিগকে লইয়া একটি পরামর্শদাতা কমীটি হইবে বা হইয়াছে, তাহাও "পরামর্শ" দিবেন। আগেকার চেয়ে "পরামর্শ"বাহুল্য হওয়ায় সংবাদপত্রসমূহের স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাইল!

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন (Penal Code) রহিল, প্রেস আইন রহিল, ভারতরক্ষা আইন রহিল, যে-কর্ম কর্তারা করেন নাই, করিবার অভিপ্রায় রাখেন নাই, তাহা না-করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে হইল, সরকারী প্রেস-"পরামর্শ"দাতাদের উপর বেসরকারী সংবাদপত্রপ্রতিনিধিকমীটিরূপ "পরামর্শ"দাতা বাড়িল। এই প্রকারে কর্তারা কপালে জয়তিলক পরিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

মাসিক-পত্র-সম্পাদক মাসিক ডিঙ্গিতে আদার ব্যাপার করে, দৈনিক জাহাজের খবরে তার কী বা দরকার? তাহা হইলেও, ইংরেজীতে যখন বলে বিড়ালও রাজদর্শনে অধিকারী, তখন আমরা বলি, নেতৃস্থানীয় সংবাদপত্রসমূহের ("leading newspapers"এর) প্রতিনিধিরা যদি এই প্রস্তাব ধার্য করিতেন যে, তাঁহারা যুদ্ধের কোন খবরই ছাপিবেন না এবং যুদ্ধ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় কোন মন্তব্যই করিবেন না, তাহা হইলে তাঁহারা রাজপুরুষদের অপ্রকাশ্য ও অপ্রকাশিত শ্রদ্ধা এবং সম্মানকর নিষ্পত্তি পাইতে পারিতেন। কারণ, খবরের কাগজগুলিতে ব্রিটেনের মোটের উপর ক্রমান্বয়ে জিতের সংবাদ বাহির হওয়ায় ব্রিটেনের যে-সুবিধা হইতেছে, যুদ্ধসংবাদের অপ্রকাশ দ্বারা সেই সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইতে গবর্মেণ্ট চাহিতেন না। অবশ্য এরূপ প্রস্তাব ধার্য করিয়া তদনুসারে কাজ করিলে কিছু দিন তাঁহাদের কাগজগুলির, যুদ্ধসংবাদ ছাপিয়া যে-কাটতি বাড়িয়াছে, তাহা কমিবার সম্ভাবনা ছিল; তাহাতে ব্যবসার কিয়ৎকালস্থায়ী ক্ষতি হইতে পারিত। সেই ক্ষতির সম্ভাবনাটা কর্তাদিগকে ভীত করিয়া থাকিবে।

—

কেন্দ্রীয় আইন-সভায় সুভাষবাবুর নির্বাচন

কেন্দ্রীয় আইন-সভায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর ঢাকার প্রতিনিধি নির্বাচন তাঁহার যোগ্যতা হিসাবে ঠিক হইয়াছে। তিনি যদি সভায় উপস্থিত হইতে পারেন, তাহা হইলে সভাগৃহে এমন অনেক কথা বলিতে পারিবেন যাহা তাহার বাহিরে এখন বলা আইনবিরুদ্ধ বলিয়া সরকারী মত প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি সভায় উপস্থিত হইবার সুযোগ পাইবেন কিনা সন্দেহস্থল। যদি পান, তাহা হইলেও তাঁহার রাজনৈতিক মত কাগজপত্রে যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে তাঁহার মত মতাবলম্বী মানুষ কেন যে আইসভায় প্রতিনিধি-পদপ্রার্থী হইয়াছিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। তাহা আমাদের কাছে রহস্যময়ই হইয়া আছে।

—

পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন

পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের তিরোভাবে বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষ এক জন বিদ্বান আচারনিষ্ঠ প্রাচীনপন্থী শাস্ত্রবিৎ ব্যক্তির কর্মিষ্ঠতা হইতে বঞ্চিত হইল। তিনি শতাধিক সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন; সংস্কৃতেও তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। পাণ্ডিত্যের সহিত এরূপ শ্রমশীলতা ও অধ্যবসায়ের একত্র সমাবেশ দুর্লভ।

—

মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় বন্যা-সাহায্য সমিতি

বন্যায় মেদিনীপুর জেলার বহুসংখ্যক গ্রাম বিধ্বস্ত ও অগণিত লোক বিপন্ন হইয়াছে। তাহা বঙ্গের সংবাদপত্র-পাঠকেরা অবগত আছেন। বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতি গঠিত হইয়াছে। সমিতি অনেক জায়গায় সাহায্য করিতেছেন; কিছু টাকা ও চাল তাঁহারা পাইয়াছেন, কিন্তু এখনও যথেষ্ট পান নাই। প্রবাসীর সম্পাদককে এই সমিতির সভাপতি করা হইয়াছে। ইহার কার্যালয়, ঊ ৭৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

কলিকাতার কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে সমিতির কার্যালয় খোলা হইয়াছে। কিন্তু প্রবাসী কার্যালয়ে টাকাকড়ি দেওয়া বা পাঠান যাঁহাদের পক্ষে সুবিধাজনক, তাঁহারা সেখানে দিতে বা পাঠাইতে পারেন। তাহার রসীদ দেওয়া হইবে।

সমিতি শ্রীযুক্তা রমলা সেনের সংগৃহীত ১০০৲ টাকা পাইয়া বিশেষ কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। তিনি আরও টাকা সংগ্রহ করিতেছেন। অন্য সহৃদয়া মহিলারা এইরূপ করিলে বিপন্ন লোকদের বড় উপকার হয়।

—

বীরভূমে অন্নকষ্ট

সংবাদপত্রে এই সত্য সংবাদ বাহির হইয়াছে, যে বীরভূম, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও মুরশিদাবাদ জেলার অনেক স্থানে অজন্মা হেতু খুব অন্নকষ্ট হইয়াছে। বীরভূমের যে-যে অঞ্চলে বিশ্বভারতী পল্লীসংগঠনের কাজ করেন, সেখানে দুর্গতদিগকে সাহায্য দিবার চেষ্টাও করিতেছেন। কর্ম-সচিব শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত

আবেদন প্রকাশ করিয়াছেন। শান্তিনিকেতনের ঠিকানায় তাঁহাকে সাহায্য পাঠাইলে নিরন্ন লোকদের উপকার হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পল্লীসংগঠনের কাজও হইবে।

—

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ১৮-শ অধিবেশন

আগামী ডিসেম্বর মাসের ২৮শে ও ২৯শে জামশেদপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অষ্টাদশ অধিবেশনের বন্দোবস্ত হওয়ায় সুখী হইয়াছি। ইহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত মহাশয় সাধারণ ভাবে প্রত্যেক বাঙালীকে এই অধিবেশনে যোগ দিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। প্রত্যেককে চিঠি পাঠান অসম্ভব।

এবার সম্মেলনের পরিচালক-সমিতি জামশেদপুর ও কাশী দুই স্থান হইতে অধিবেশনের আহ্বান পাইয়াছিলেন। জামশেদপুরে এবার অধিবেশন হইবে, আগামী বৎসর কাশীতে হইতে পারিবে।

অন্য অনেকের মত আমাদেরও এই দুঃখ আছে যে, পঞ্জাবের ও বোম্বাই প্রদেশের বাঙালীরা সম্মেলনকে একবারও আহ্বান করিয়া তথায় অধিবেশনের বন্দোবস্ত করেন নাই। এরূপ বন্দোবস্ত করা অসাধ্য ত নহেই, দুঃসাধ্যও নহে। আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁহারা বন্দোবস্ত করুন। কোথাও কাহারও যদি দোষত্রুটি থাকে বা অনুমিত হইয়া থাকে (আছে বলিতেছি না), তাহা ক্ষমার যোগ্য—সে দোষত্রুটি আমাদের সকলের।

—

অন্ধদের দুঃখলাঘব শিবির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা

কলিকাতায় অন্ধজনের যে দুঃখলাঘব-শিবির (Blind Relief Camp) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও যাহা কলিকাতার লর্ড বিশপ ও ভারতের মেট্রোপলিটান উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, তাহা সাতিশয় প্রয়োজনীয় ও অত্যন্ত হিতকর প্রতিষ্ঠান। আমরা ইহার স্থায়িত্ব ও সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করিতেছি।

এই উদ্যোগে ব্যবহারের নিমিত্ত রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রসাদে পাইয়া নীচে মুদ্রিত করিতেছি।

আলোকের পথে প্রভু দাও দ্বার খুলে
আলোকপিয়াসী যারা আছে আঁখি তুলে।
প্রদোষের ছায়াতলে
হারায়েছে দিশা
সমুখে আসিছে ঘিরে
নিরাশার নিশা।
নিখিল ভুবনে তব যারা আত্মহারা
আঁধারের আবরণে খোঁজে ধ্রুবতারা
তাহাদের দৃষ্টি আনো রূপের জগতে
আলোকের পথে।

জোড়াসাঁকো। ২. ১১. ৪০

—

হিন্দুসংগঠন

হিন্দু মহাসভা ও তাহার শাখা প্রশাখা এবং তদ্বিধ অন্যান্য হিন্দু সভায় হিন্দুসংগঠনের প্রস্তাব ও আলোচনা হইয়া থাকে। কৃষ্ণনগরে ৩০শে কার্তিক ও ১লা অগ্রহায়ণ যে হিন্দুসম্মেলন হইবে, সম্ভবতঃ তাহাতেও ইহা উত্থাপিত হইবে। হিন্দুসংগঠনের একান্ত প্রয়োজন আছে। সকল হিন্দুর মধ্যে সংহতি স্থাপিত করিতে হইলে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ উৎপাদন, রক্ষা ও বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। কতকগুলি হিন্দু যদি বংশগত ও জন্মগত কারণেই অপর কতকগুলি হিন্দুকে অবজ্ঞা করে, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ থাকিতে পারে না। আকর্ষণ উৎপাদন, রক্ষা ও বৃদ্ধি করিতে হইলে কোন জা'ত (caste) বা শ্রেণীর লোকের বংশগত ও জন্মগত সামাজিক অমর্য্যাদা থাকা উচিত নহে। কোন মানুষের যত দিন সংক্রামক রোগ থাকে তত দিন সে অস্পৃশ্য থাকিতে পারে। কিন্তু অন্য কোন প্রকার অস্পৃশ্যতা ন্যায়বিরুদ্ধ ও সংগঠনের পরিপন্থী। প্রাচীনপন্থী "উচ্চ"বর্ণের হিন্দুরা অস্পৃশ্যতা-সমর্থক "শাস্ত্রীয়" এবং তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যুক্তির অবতারণা করিতে পারেন। তাহার মূল্যের বিচার এক্ষেত্রে অনাবশ্যক। অস্পৃশ্য হইবার অসুবিধা, অপমান ও লাঞ্ছনা তাঁহারা ভোগ করেন নাই। যুক্তি যাহাই হউক, **অস্পৃশ্যতার লেশমাত্র থাকিতে হিন্দুসংগঠন সম্পূর্ণ অসম্ভব।** সমাজসংস্কারকেরা অধিকন্তু মনে করেন, অনাচরণীয়তা এবং "উচ্চ" ও "নীচ" জাতির ভেদ থাকিতেও সংগঠন অসম্ভব। আমাদের নিজের মত এইরূপ।

অন্য দিকে রক্ষণশীল ও প্রাচীনপন্থীরা মনে করেন, অনাচরণীয়তা ও জাতিভেদ গেলে ত হিন্দুত্বের সবই গেল।

রক্ষণশীল ও সংস্কারক এই উভয় সমষ্টির মধ্যে গুরুতর মতভেদ রহিয়াছে। আচরণেও প্রভেদ রহিয়াছে। অথচ, হিন্দুদের অবস্থা এরূপ হইয়াছে, যে, **সব রকমের** হিন্দুকে লইয়া একটি সংহত সমষ্টি গঠন করা একান্ত আবশ্যক। তাহার উপায় কি?

হিন্দু মহাসভা ও তদ্বিধ অন্য সভাসমিতিকে যদি অবিমিশ্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয় এবং

তাহার সভ্য হইবার সমান অধিকার সব হিন্দুরই আছে নিয়ম করা হয়, তাহা হইলে চলে কি ?

কিন্তু তাহা করিলেও সব হিন্দুকে সামাজিক মর্যাদা দিবার প্রয়োজন থাকিবে ;—ন্যায়ের অনুরোধে থাকিবে, মানবিকতার অনুরোধে থাকিবে, এবং প্রচারপরায়ণ অ-হিন্দু সম্প্রদায়গুলির নানাবিধ চেষ্টা সম্ভূত হিন্দু সমাজের ভাঙ্গন ও সভ্যসংখ্যাহ্রাস নিবারণের নিমিত্ত থাকিবে।

হিন্দু সমাজের ভাঙ্গন এবং হিন্দুর হ্রাস নিবারণ করিতে হইলে বিবাহযোগ্যা বিধবা ও অন্য বিধবাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। তাহা বিবাহযোগ্যাদের বিবাহের বন্দোবস্ত এবং বিধবাদের দায়াধিকারের সুব্যবস্থা না করিলে সম্ভবপর হইবে না। কুমারীদের—বিশেষতঃ প্রাপ্তবয়স্কা কুমারীদের—অসন্তোষ নিবারণ না করিলেও হিন্দু সমাজের ভাঙ্গন বন্ধ করা যাইবে না।

—

সার্বজনীন বিগ্রহপূজা ও জাতিভেদ

হিন্দুসমাজে যে জাতিভেদ প্রচলিত আছে, তদনুযায়ী চিরাগত লৌকিক একটি সংস্কার এই যে, ব্রাহ্মণ সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি। ব্রাহ্মণের কতকগুলি একচেটিয়া অধিকারও এই লৌকিক সংস্কার অনুসারে স্বীকৃত হইত ; তন্মধ্যে দেবদেবীর বিগ্রহের পূজার্চনা, ভোগরন্ধন, প্রসাদ-বিতরণ ইত্যাদি একটি প্রধান অধিকার। সকল জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, ইহা কিছু কাল হইতে কোন কোন জাতি অস্বীকার করিতেছেন ;—ইঁহারা হিন্দু সমাজেরই অন্তর্গত আছেন (ব্রাহ্ম বা আর্যসমাজী হইয়া যান নাই)। দেব-দেবীর বিগ্রহে পূজার্চনাদির যে অধিকার ব্রাহ্মণের একচেটিয়া ছিল, কয়েক বৎসর হইতে ক্রমবর্ধমান সার্ব-জনীন দুর্গাপূজা কালীপূজাদির দ্বারা সেই অধিকারে অন্য জাতিরাও ভাগ বসাইতেছেন। রক্ষণশীল হিন্দুরা নিশ্চয়ই এই সব পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছেন। এই পরিবর্তনগুলি হিন্দুসমাজের ভিতর হইতে হইতেছে। রক্ষণশীল হিন্দু নেতারা ইহা বন্ধ করিতেছেন না বা করিতে পারিতেছেন না। ভিন্ন ভিন্ন হিন্দুজাতির বরকন্যার মধ্যে বিবাহও ধীরে ধীরে প্রচলিত হইতেছে। এই প্রকারে বিবাহিত দম্পতিসমূহ হিন্দুসমাজেই থাকিতেছেন।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, জাতিভেদ হিন্দু-সমাজের ভিতর হইতেই ভাঙিয়া পড়িতেছে।

হিন্দু মহাসভার সুরাট অধিবেশনের সভাপতি প্রবাসী-সম্পাদকের অভিভাষণের এক জায়গায় বলা হইয়াছিল যে, জাতিভেদহীন হিন্দুসমাজের অস্তিত্ব ও চিন্তনীয়তা অসম্ভব নহে। ডাঃ মুঞ্জে প্রভৃতি নেতারা এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। অভিভাষণের ঐ অংশের বিরুদ্ধে তাঁহারা কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। আমরা হিন্দুসমাজে যে-যে পরিবর্তনের কথা উপরে বলিয়াছি, তাহা জাতিভেদবিহীন ভবিষ্যৎ সমাজের আদর্শের দিকে হিন্দুদের গতি সূচিত করিতেছে কি না, ভাবিবার বিষয়।

—

কুলটির গুলি নিক্ষেপের তদন্ত হইল না ?

সরকারী অনুমতি লইয়া অনুমতিপত্রে নির্দিষ্ট সময়ে ও পথে গম্যমান হিন্দু শোভাযাত্রার উপর পুলিস গুলি চালানতে অনেক হিন্দু নিহত ও তার চেয়ে অনেক বেশী আহত হয়। ইহার স্বাধীন তদন্তের দাবী হিন্দুরা গবর্ন্মেণ্টের নিকট একাধিক বার করিয়াছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত তদন্ত হইল না। ইহা হইতে যে উপদেশ পাওয়া যায়, তাহা হিন্দুরা মর্মগত করিয়া উপায় চিন্তা করুন।

—

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

ভারতবর্ষে যত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়, তাহার প্রায় সব-গুলাতেই মুসলমানেরা এক পক্ষে থাকেন। তাঁহাদের এই ধারণা আছে যে, তাঁহাদের ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ—বিশেষ করিয়া হিন্দু ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই ধারণা পোষণ করিবার অধিকার তাঁহাদের আছে। কিন্তু তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, অন্য প্রত্যেক ধর্মের লোকদেরও নিজ নিজ ধর্মকে সর্ব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাস করিবার অধিকার আছে। সুতরাং তাঁহারা যেমন হিন্দুর নানা ধর্মানুষ্ঠানে কিম্বা বিশেষ বিশেষ সময়ে বা স্থানে তৎসমূহের অনুষ্ঠানে আপত্তি করেন ও বাধা দেন, হিন্দুদেরও সেইরূপ তাঁহাদের ধর্মা-নুষ্ঠান সম্বন্ধে আপত্তি করিবার ও বাধা দিবার অধিকার আছে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমতের ও সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতা অশ্রেষ্ঠতার সহিত রাষ্ট্রের কোন সম্পর্ক নাই, রাষ্ট্র তাহার বিচারক নহে। আদর্শ রাষ্ট্র এ বিষয়ে সমদর্শী ও পক্ষপাত-শূন্য। এরূপ রাষ্ট্র হয় প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই অপরের ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধীয় প্রত্যেক আপত্তি গ্রাহ্য করিবেন, নয় কাহারও আপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া সকলকেই, অপরের সহিত বিরোধ না করিয়া, নিজ নিজ ধর্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে দিবেন। প্রথমোক্ত রীতি অনুসৃত হইলে সকল সম্প্রদায়ের সকল ধর্মানুষ্ঠানই বন্ধ করিতে হইবে, সুতরাং সেই রীতি অনুসৃত হইতে পারে না। শেষোক্ত নিয়মানুসারে কাজ করা যাইতে পারে ও করা উচিত। কিন্তু তাহা করিতে হইলে, রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য ও দৃঢ় হইতে হইবে। একটা দৃষ্টান্ত লউন। যদি হিন্দুদের পঞ্জিকা অনুসারে

প্রতিমা বিসর্জন করিবার কোন সময় নির্ধারিত হয়, এবং তাহা মুসলমানদের কোন নমাজেরও সময় হয়, তাহা হইলে প্রতিমা বিসর্জ্জনের নিমিত্ত যেমন নমাজ স্থগিত হইতে পারে না, সেইরূপ নমাজের নিমিত্তও প্রতিমা বিসর্জন স্থগিত হইতে পারে না। যদি মহরমের মিছিলের পথের ধারে (নিকটে বা দূরে) হিন্দুদের কোন মন্দির থাকে, তাহা হইলে যেমন মহরমের মিছিল বন্ধ করা হইবে না বা তাহাকে অন্য পথে যাইতে বলা হইবে না, সেইরূপ হিন্দুদের কোন মিছিলের পথের ধারে (নিকটে বা দূরে) মসজিদ থাকিলে হিন্দু মিছিল বন্ধ করা বা তাহাকে অন্য পথে যাইতে বলাও হইবে না। মুসলমানের আজান কিম্বা মুসলমানদের মহরমের ঢাক বাজান যেমন বন্ধ করা হইবে না, সেইরূপ হিন্দুদের কোন ভজন বা যাত্রা বা ঘণ্টাধ্বনি শঙ্খ-ধ্বনিও বন্ধ করা হইবে না। কিন্তু কেহ ইচ্ছা করিয়া ভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবে না। পরস্পরের সুবিধার নিমিত্ত প্রত্যেককে কিছু অসুবিধা সহ্য করিতে হইবে—যেমন মুসলমানেরা মেঘগর্জন, বজ্রধ্বনি, মোটর গাড়ী বাস্ লরীর শব্দ, রেল-গাড়ীর নানা উচ্চধ্বনি ও এরোপ্লেনের আওয়াজ অগত্যা সহ্য করেন।

সকলকে অপক্ষপাত দৃঢ়তার সহিত এইরূপ ন্যায্য রীতি মানাইবার মত গবর্মেণ্ট ভারতবর্ষে কখন প্রতিষ্ঠিত হইবে, কেহ বলিতে পারে না।

—

সৈন্যসংগ্রহে পক্ষপাতিত্ব

সরকারী বক্তৃতাদি সম্প্রতি লোকের মনে এই ধারণা জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছিল যে, যে এক লক্ষ অতিরিক্ত সিপাহী লওয়া হইতেছে, তাহা সকল প্রদেশের সকল শ্রেণীর যোগ্য লোক হইতে বাছিয়া লওয়া হইতেছে। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। গত ৭ই নবেম্বর কেন্দ্রীয় আইন-সভায় সামরিক বিভাগের সেক্রেটরী একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন:

১৯৩৯ সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪০ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান শ্রেণীসমূহ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করা হইয়াছে পাঠান ৪৬৭১, পঞ্জাবী মুসলমান ২৪১৪৮, শিখ ১১৬০৫, ডোগরা ৪৪৬৪, গুর্খা ৩২৯০, গাঢ়োআলী ২৫৯৮, কুমায়ুনী ১৫৭৪, রাজপুত ৩১৯৭, জাট ৫৩০৭, আহীর ১৬৪৩, মরাঠা ৫১৬৪, খ্রীষ্টিয়ান ২৪০১, গুজর ৮৫৩, বিবিধ হিন্দু ১৫২৮২, বিবিধ মুসলমান ৭১৯৮ এবং কুর্গী ২৯।

ইংরেজদের লেখা ভারতবর্ষের সামরিক ইতিহাস একথা বলে না যে, পঞ্জাবী মুসলমানেরা শিখ, গুর্খা, রাজপুত, মরাঠা প্রভৃতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা বহু বহুগুণে শ্রেষ্ঠ সিপাহী, কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী সিপাহী লওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে। মোট হিন্দু লওয়া হইয়াছে ৪৪২০১ এবং মোট মুসলমান লওয়া হইয়াছে ৩৬০১৭। কিন্তু ভারতবর্ষে মুসলমানেরা হিন্দুদের এক-তৃতীয়াংশেরও কম। অনুপাতে হিন্দুদিগকে ও শিখদিগকে এত কম ও মুসলমানদিগকে এত বেশী লইবার কারণ রাজনৈতিক, সামরিক নহে।

ফর্দটাতে মান্দ্রাজী নাই, বাঙালী নাই, ভোজপুরী ব্রাহ্মণ নাই, ভূমিহার ব্রাহ্মণ নাই, গুজরাটী নাই,…; তাহারা কেহই প্রধান শ্রেণী নহে।

—

টিকিয়া থাকিবার উপায় সৈনিক ও শ্রমিক

পৃথিবীতে পুরা অহিংসাপন্থীর সংখ্যা খুব কম। শেষ পর্যন্ত তাঁহাদেরই আদর্শের জিত হইবে আশা করি। কিন্তু আপাততঃ যুদ্ধ দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে না পারিলে মানুষের মত হইয়া টিকিয়া থাকা যায় না। আধুনিক যুদ্ধে জল স্থল আকাশে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সৈনিক চাই বটে, কিন্তু খুব উৎকৃষ্ট নানাবিধ জলস্থল ও আকাশ যান ও যন্ত্র এবং উৎকৃষ্ট প্রচুর বোমা, শেল্, কামান, বন্দুক, গোলা-গুলি ইত্যাদিও চাই। এইগুলি প্রস্তুত করিবার কারখানা, কারিগর ও শ্রমিক চাই। বাঙালীদিগকে দীর্ঘকাল যুদ্ধ শিখিবার সুযোগ না-দেওয়ায় তাহাদের মধ্যে সৈনিক নাই বলিলেও চলে, অধিকন্তু সৈনিক হইবার ইচ্ছাও অল্প বাঙালীর মধ্যেই দেখা যায়।

'প্রবাসী'র বর্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার দেখাইয়াছেন, আজকালকার যুদ্ধে কারখানা-শ্রমিকদের কাজ কত দরকারী ও মূল্যবান। কিন্তু বঙ্গের মোট লোকসংখ্যার তুলনায় বাঙালী কারখানা-শ্রমিক অন্য অনেক প্রদেশের চেয়ে কম।

সুতরাং টিকিয়া থাকিতে হইলে যে দুই শ্রেণীর লোক চাই, সেই দুই শ্রেণীই বঙ্গে কম। ইহার প্রতিকার আবশ্যক।

—

জলসেচন পূর্তকার্যে ১৫৪ কোটি ব্যয়

কেন্দ্রীয় জলসেচন বোর্ডের মীটিঙে বড়লাট বলিয়াছেন ভারতবর্ষে এ পর্যন্ত জলসেচন পূর্তকার্যে মোট ১৫৪ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। তাহার মধ্যে বঙ্গে ৪ কোটিও হয় নাই—যদিও বাংলা সকল প্রদেশের চেয়ে বেশী রাজস্ব বরাবর দিতেছে!

—

সিন্ধুদেশে হিন্দুহত্যা-প্রচেষ্টা

সিন্ধুদেশে হিন্দুহত্যা বন্ধ করা সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি ও জল্পনা চলিতেছে। কাজ বোধ করি এখনও আরম্ভ হয় নাই। তথাকার ইউরোপীয় সমিতির টনক এত দিনে

নড়িয়াছে—বোধ করি হিন্দুহত্যা-প্রচেষ্টার দরুন ব্যবসাতে ক্ষতি হইতেছে বলিয়া। সিন্ধুর এক ইংরেজ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট বলিয়াছেন, হত্যা-প্রচেষ্টার গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারীদিগকে ধরিতে হইবে।

—

মণিপুরী সংস্কৃতি-পরিষদ

গত পূজার ছুটিতে অধ্যাপক কালিদাস নাগ যখন মণিপুর গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার উদ্যোগে তথায় একটি মণিপুরী সংস্কৃতি-পরিষদ স্থাপিত হইয়াছে। তথাকার দরবারের সভ্য মহারাজকুমার প্রিয়ব্রত সিংহ, বি-এ, ইহার সভাপতিত্ব করিতে রাজী হইয়াছেন। মণিপুরী নৃত্য, তথাকার হাতের তাঁতের নানাবিধ কাপড়, বাঁশ ও বেতের অনেক রকম জিনিষ প্রসিদ্ধ। মণিপুরের লোকেরা বাংলা কীর্তন গান করেন এবং বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর তাঁহাদের মধ্যে চলন আছে।

—

সুপুরে পল্লীসংগঠন-কার্য

পল্লীসংগঠনের **কথা** আজকাল অনেকেই বলেন—বাংলা-সরকার পর্যন্ত। বিশ্বভারতী **কাজ** আরম্ভ বহুপূর্ব হইতে করিয়াছেন। কোন ক্ষয়িষ্ণু গ্রামকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনর্গঠিত করিতে হইলে তাহার অবনতির কারণ ও স্বরূপ নির্ণয় আবশ্যক। প্রতিকার-চেষ্টা তাহার পর হইতে পারে। প্রারম্ভিক কাজ ও তাহার পরবর্তী কাজ কেমন করিয়া করিতে হয়, বীরভূমের সুপুর গ্রাম সম্বন্ধে বিশ্বভারতীর সম্প্রতি প্রকাশিত বুলেটিনটি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। পল্লীসংগঠনার্থী সকলেরই ইহা রাখা ও পড়া উচিত। দাম দু-আনা মাত্র।

—

বরপণ নিবারণার্থ বিল

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বরপণ নিবারণার্থ একটি বিল রচনা করিয়াছেন। তাহাতে ৫১ টাকা বা তত্তুল্য মূল্যের সামগ্রীর বেশী যৌতুক দেওয়া ও লওয়া দণ্ডনীয় করিয়াছেন, কিন্তু **স্বেচ্ছায়** কন্যাকে প্রদত্ত গহনাপত্রকে যৌতুকের সামিল করেন নাই। এই **স্বেচ্ছার** ভিতরই ফাঁকির ফাঁক রহিয়াছে। ফাঁকির কোন উপায় থাকা উচিত নয়। বিবাহটা কেনাবেচার ব্যাপার নয়, জীবনের মহত্তম অনুষ্ঠান, এই ধারণা না জন্মিলে শুধু আইনের দ্বারা বরপণ কুপ্রথার উচ্ছেদ হইবে না; কিন্তু কিছু প্রতিকার হইতে পারে যদি আইনটায় ফাঁকি দিবার ফাঁক কিছু না থাকে।

যাহারা কন্যার বিবাহে কন্যাশুল্ক লয়, বাঁকুড়ায় তাহাদিগকে "পাঠী-বেচা" বলে। টাকা দিয়া বর ক্রয়কে সেইরূপ "পাঁঠা কেনা", এবং যাহারা বরপণ গ্রহণ করে তাহাদিগকে "পাঁঠা-বেচা" বলা যাইতে পারে।

১৫০০ ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহী

মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের নিমিত্ত ১৫০০ জনের এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-নেতারাও আছেন।

এই বার অহিংস রণাঙ্গন গরম হইবে।

—

ভারতীয় ভাষাসমূহের সরকারী বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

ভারতীয় ভাষাসমূহের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনা করিবার নিমিত্ত ভারত-সরকার এক কমীটি খাড়া করিয়াছেন। তাহাতে যে কোন বাঙালী নাই, তাহা দু-মাস আগে মডার্ণ রিভিয়ু ও প্রবাসীতে লিখিয়াছি।

গত অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে হায়দরাবাদে এই কমীটির এক বৈঠক বাসবার কথা ছিল। তাহার কোন রিপোর্ট এখনও দেখিতে পাই নাই। কিন্তু কমীটির জন্য প্রস্তুত ডক্টর অমরনাথ ঝার একটি নোট দেখিয়াছি। তাহা ১২ই নবেম্বর লীডার কাগজে ছাপা হইয়াছে। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, "সমুদয় ভারতীয় ভাষায় সমুদয় বৈজ্ঞানিক লেখায় ইংরেজী পরিভাষা ব্যবহার করা পরামর্শসিদ্ধ।" এ-বিষয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বলিবার নাই কি? তাঁহারা ত বাংলা পরিভাষা রচনা করিয়াছেন। ভারত-সরকার ঝা মহাশয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে বলিতে হইবে, রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া রাজেন্দ্রলাল মিত্র, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি যাহা করিয়াছেন, সবই মূর্খতা ও পণ্ডশ্রম।

—

যুদ্ধের জন্য নূতন ট্যাক্স স্থাপন

যুদ্ধব্যয়নির্বাহার্থ নূতন ট্যাক্স বসাইবার নিমিত্ত আয়োজন ও তর্ক-বিতর্ক কেন্দ্রীয় আইন-সভায় চলিতেছে। ভারতবর্ষ যুদ্ধে যোগ দিবে কি দিবে না, তাহার প্রতিনিধিদিগকে সে-বিষয়ে মত প্রকাশেরও সুযোগ না দিয়া, যুদ্ধব্যয়ের টাকা সংগ্রহের নিমিত্ত ট্যাক্সে সম্মতি দিতে তাঁহাদিগকে বলা অসঙ্গত। ইহাতে আপত্তি করিবার অধিকার তাঁহাদের আছে। অবশ্য "গণতন্ত্র" ও "স্বাধীনতা" জগতে প্রতিষ্ঠা করিবার সংগ্রামে নিরত ব্রিটিশ জাতি সে আপত্তি শুনিবে না। ট্যাক্স স্থাপন ও আদায় না-করিয়া গবর্মেণ্ট ছাড়িবেন না। অন্ততঃ তাহার অপব্যয় না-হইলেও সেটা মন্দের ভাল।

রবীন্দ্রসকাশে চীন শুভেচ্ছা-দূত

ভারতের প্রতি শুভেচ্ছাজ্ঞাপক চীন দৌত্যের নেতা মনীষী তাই চী-তাও সেদিন রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে ও তাঁহাকে চীনরাষ্ট্রপতি চিয়াংকাই-শেকের চিঠি দিতে গিয়াছিলেন। চিঠিতে চিয়াংকাই-শেক কবির পীড়ার সংবাদে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া তাঁহার আরোগ্য প্রার্থনা করিয়াছেন এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষার উপায় সম্বন্ধে কবির উপদেশ চাহিয়াছেন। কবি ভারতবর্ষ ও চীনের প্রাচীন যোগ পুনঃস্থাপন করিয়া তাহার রক্ষার উপায়ও করিয়াছেন। তিনি এই উপদেশ দিবার যোগ্যতম ব্যক্তি।

—

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষা

সুপণ্ডিত ভাইস-চ্যান্সেলার অমরনাথ ঝা মহাশয়ের অনুকূলতায় এবারেও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা শিখাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অবৈতনিক অধ্যাপনার প্রশংসনীয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

—

পাঠ্যপুস্তকে পয়গম্বরদের ছবি দেওয়া নিষিদ্ধ

বঙ্গের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর সাহেব এক হুকুম জারী করিয়াছেন যে, কোরানে উল্লিখিত আদম, হবা, নোহ, মূসা, আব্রাহম, ঈশা প্রভৃতি পয়গম্বরদের ছবি কোন স্কুলকলেজপাঠ্য পুস্তকে দেওয়া নিষিদ্ধ হইল। মুহম্মদের ছবি দেওয়া ত কার্যতঃ নিষিদ্ধ ছিলই। নিষেধ সত্ত্বেও কোন বহিতে সেরূপ ছবি থাকিলে তাহা পাঠ্যপুস্তক-তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

যীশুখ্রীষ্ট এবং বাইবেলের পুরাতন অংশে উল্লিখিত ভাববাদীরা খ্রীষ্টিয়ানদেরও বিশেষ সম্মানিত। তাঁহারা ইঁহাদের ছবি আঁকা ও প্রকাশ করা নিষিদ্ধ মনে করা দূরে থাকুক, ইঁহাদের শত শত অত্যুৎকৃষ্ট চিত্র ও মূর্তি খ্রীষ্টীয় শিল্পীরা অঙ্কিত ও নির্মিত করিয়া খ্রীষ্টিয়ানদিগকে এবং অন্য অনেককেও আনন্দ ও অনুপ্রাণনা দিয়াছেন। এই সকল ও অন্য ছবি পুস্তকে দিতে তাঁহাদিগকে নিষেধ করা তাঁহাদের ধর্মাধিকারে অন্যায় হস্তক্ষেপ। আশ্চর্যের বিষয় খ্রীষ্টিয়ান জাতির রাজত্বে এক জন খ্রীষ্টিয়ান ডিরেক্টরের দ্বারা এরূপ হুকুম জারী হইল।

ভাগ্যে হিন্দু জৈন ও বৌদ্ধ দেবতা ও মহামানবদের নাম কোরানে নাই!

—

নারীদের অধিকার

জাতীয় পরিকল্পনা কমীটি নারীদের যে-সকল ভিত্তীভূত অধিকার বিবৃত করিয়াছেন, তাহা সভ্যসমাজসম্মত। অধিকারগুলি তাঁহারা বাস্তবিক পাইলে নারী পুরুষ বালক বালিকা শিশু সকলের মঙ্গল হইবে।

—

শ্রীহট্ট গোয়ালপাড়া বাংলাকে দিবার প্রস্তাব

আসাম প্রদেশে বাঙালীদের সম্বন্ধে সরকারী ব্যবস্থা ও ব্যবহার যেরূপ, তাহা পরিবর্তিত হইয়া অসমিয়াভাষী ও বাংলাভাষীর সম্পূর্ণ অধিকারসাম্য স্থাপিত হইলে তাহার কোন জেলাকে পুনরায় বাংলার সামিল না-করিলেও চলে অন্যথা সামিল হওয়াই ভাল।

—

মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের প্রতিবাদ-সভা

নবেম্বরের শেষে কলিকাতায় মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের যে বৃহৎ প্রতিবাদসভা হইবে, তাহাতে সকলেরই যোগদান একান্ত বাঞ্ছনীয়।

—

রুমানিয়ায় ভূমিকম্প

রুমানিয়া রাষ্ট্রবিপ্লবে সম্প্রতি ভুগিয়াছে। তাহার উপর আবার ভীষণ ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইল এবং অনেক হাজার লোকের মৃত্যু হইল। তাহার জন্য আমরা বেদনা বোধ করিতেছি।

—

রবীন্দ্রনাথের "চিত্রলিপি"

রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিয়া যে অগণিত চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার মধ্য হইতে কয়েকটি নির্বাচন করিয়া বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় সম্প্রতি একটি চিত্র-সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে আঠারোখানি ছবি আছে। গ্রন্থারম্ভে কবির ভূমিকা ও গ্রন্থের শেষে কবির স্বহস্তাক্ষরে মুদ্রিত বাংলা ও ইংরেজি ১৮টি কাব্যকণিকা, ছবিগুলি সম্বন্ধে কবির মন্তব্য স্বরূপ সংযুক্ত হইয়াছে। এই লেখাগুলির দু-একটি উদ্ধৃত হইল।

"প্রতি দিবসের যত ক্ষতি যত লাভ
পশ্চাতে ফেলি প্রকাশে সহসা পরম আবির্ভাব।
ভাসিয়া চলে সে কোথায় কেহ না জানে।
আঁধার হইতে সহসা আলোর পানে॥"

"পসরাতে কী আছে তা নাই বা জানিলাম
চিরকালের তুমি বিদেশিনী,
ধ্যানের পটে ধরা দিলে শুনালে না নাম,
চিনি তবু নাই বা তোমায় চিনি।"

এই "চিত্রলিপি" সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ শিল্পরসিক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ আগামী ডিসেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিউতে প্রকাশিত হইবে; প্রবাসীতেও বিশেষজ্ঞলিখিত একটি প্রবন্ধ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

কিশোরীমোহন সাঁতরা

শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সাঁতরার অকালমৃত্যুতে বিশ্বভারতীর প্রভূত ক্ষতি হইল। তিনি দীর্ঘকাল উহার সহকারী কর্মসচিব ছিলেন এবং বিশেষ করিয়া গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে কাজ করিতেন। দেশের অন্যান্য হিতকর বহু কার্যের সহিতও তাঁহার যোগ ছিল। তাঁহার সৌজন্যের জন্য তিনি বন্ধু ও পরিচিতবর্গের অনুরাগভাজন ছিলেন।

—

গৌরগোপাল ঘোষ

১৯৪০ সাল বিশ্বভারতীর পক্ষে দুর্বৎসর বলিয়া গণ্য হইবে। দীনবন্ধু এণ্ডরুজ, কালীমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ও অমিতা সেনের মৃত্যুর পর এই বৎসর কিশোরীমোহন সাঁতরার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পর তাঁহারই মত অকালমৃত্যু হইয়াছে গৌরগোপাল ঘোষের, ৪৭ বৎসর বয়সে। তিনি বিশ্বভারতীর সহকারী কর্মসচিব ছিলেন এবং পল্লীসংগঠন বিভাগে পল্লীশিল্প উপবিভাগের ভার তাঁহার উপর ছিল। পূর্বে বিশ্বভারতীতে শিক্ষকতা এবং অন্য কাজও তিনি করিয়াছিলেন। তিনি বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন এবং জিউজিৎসুর নানা প্যাঁচ তিনি ভাল করিয়া জানিতেন।

—

প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসী-সম্পাদকের বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী ছিলেন। আমরা প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে একই গোরুর গাড়ীতে বাঁকুড়া হইতে রাণীগঞ্জে আসিয়া ট্রেন ধরিয়া হাবড়ায় আসি, একই মেসে থাকিয়া একই কলেজে ভর্ত্তি হই। এম্. এ. পাস করিবার পর প্রমথনাথ সরকারী শিক্ষাবিভাগে চাকরী গ্রহণ করেন। পেন্সন লইবার সময় তিনি বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টর ছিলেন। পেন্সন ভোগ করিবার সময় তিনি বাঁকুড়া মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানের ও অন্যান্য অবৈতনিক কাজ করিয়াছিলেন। তিনি চরিত্রবান্, সুরসিক, অমায়িক ও পরোপকারী ছিলেন। আমরা বাল্যবন্ধু, যৌবনবন্ধু ও বার্দ্ধক্য বন্ধু ছিলাম বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কত কথাই মনে পড়িতেছে।... তিনি সুলেখক ছিলেন। কিন্তু যৌবনকালে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে "নবীনা জননী" নামক উপন্যাস লেখার পর আর কোন বহি লেখেন নাই। এই পুস্তকখানির তিনটি সংস্করণ হইয়াছে। তাঁহার এক পরলোকগত পুত্র অমরনাথ উৎসাহী ও ত্যাগী কংগ্রেসকর্মী ছিলেন। আর একটি পুত্রও উৎসাহী কংগ্রেসকর্মী। তাঁহার অন্তর্নিহিত দেশভক্তি এই ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

—

নেভিল চেম্বারলেন

ভূতপূর্ব ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন প্রধান মন্ত্রীর পদ ত্যাগের পর সাধারণ অন্যতম মন্ত্রী হইয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় সকল মন্ত্রীরই দায়িত্ব খুব বেশী; তাঁহাদিগকে পরিশ্রমও খুব করিতে হয়। মিঃ চেম্বারলেনের স্বাস্থ্যে এই দায়িত্বের উদ্বেগ ও পরিশ্রম সহ্য না হওয়ায়

তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। তদনন্তর অস্ত্রোপচারের পরও বোধ হয় বেশ সুস্থ হন নাই। সম্প্রতি পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

তিনি শান্তিকামী ছিলেন। কূটরাজনৈতিক কৌশলে তিনি হিটলারের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার কখনও কর্তব্যনিষ্ঠা, সাহস ও স্বদেশভক্তির অভাব হয় নাই।

—

জবাহরলালের কারাদণ্ড

গোরখপুর জেলায় প্রদত্ত কয়েকটি বক্তৃতার জন্য জবাহরলাল নেহরুর চারি বৎসর কারাবাস দণ্ড হইয়াছে। দণ্ডটা ভারতবর্ষের ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের আইন অনুযায়ী হইয়াছে, বেআইনী হয় নাই; দণ্ডের কঠোরতাও উক্ত-আইনবিরুদ্ধ হয় নাই। কিন্তু দুর্বৃত্ত লোকদের সম্বন্ধে যে-ব্যবস্থা হয়, মানবহিতব্রত লোকদের সম্বন্ধে সে-ব্যবস্থা হওয়া উচিত নহে, ধর্মনীতির এই নিয়ম অনুসারে তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। দণ্ডের পরিমাণে অসঙ্গতিও আছে;—এইরূপ বক্তৃতার জন্য বিনোবা ভাবের কয়েক মাস কারাদণ্ড হইয়াছে, জবাহর-লালের হইল তাহার বার গুণ। বোধ হয় ইহার কারণ, পণ্ডিতজীর ব্যক্তিত্ব, প্রসিদ্ধি এবং কর্মিসমাজে তাঁহার প্রাধান্য। যে বড়, তার শাস্তিটাও বোধ করি বড় রকমের হওয়া চাই।

তবে দণ্ডদানের প্রধান দুটা উদ্দেশ্য তাঁহার শাস্তি দ্বারা সিদ্ধ হইবে না। তিনি দণ্ডিত হইয়াছেন বলিয়া তিনি বা তাঁর সমমতাবলম্বী কেহ যে তাঁহার কৃত কার্যের মত কার্য হইতে ভবিষ্যতে নিবৃত্ত থাকিবেন, তাহার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই; এবং এই দণ্ডের ফলে তিনি বা তাঁহার সম-মতাবলম্বীরা যে আপনাদের মত ও চরিত্র "সংশোধন" বা পরিবর্তন করিবেন, তাহারও সম্ভাবনা নাই। দণ্ডটাতে কেবল এই হইবে, যে, চারি বৎসর তিনি বক্তৃতা দ্বারা নিজের মত প্রচার করিতে পারিবেন না (অবশ্য যদি চারি বৎসরের আগেই তিনি খালাস না পান)। কিন্তু ইংরেজীতে যেমন কথা আছে যে, জীবিত সীজরের চেয়ে মৃত সীজরের প্রভাব অধিক হইয়াছিল, সেইরূপ কারাগারের বাহিরের মুক্ত জবাহরলালের চেয়ে তাহার ভিতরে আবদ্ধ জবাহরলালের দ্বারা তাঁহার মত অধিক প্রচারিত হইবে।

মাতা দেবকীর পুণ্য জঠর হইতে অষ্টম বারে যিনি বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহার অবদানপরম্পরা জগতে সুবিদিত। দেশভক্তদের সংস্পর্শে পূত কারাগার হইতে জবাহরলাল অষ্টম বার বাহির হইবার পর কি ঘটিবে, কে বলিতে পারে?

—

সনৎকুমার রায়চৌধুরীর দুটি চিঠি

বঙ্গে ব্রিটিশ শাসনের বর্তমান আমলে বঙ্গের ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কিরূপ বিকৃতি ও অন্যবিধ অনিষ্ট হইতেছে, গবর্মেণ্টের অবগতির নিমিত্ত সে-বিষয়ে তিনি একটি চিঠি লিখিয়াছেন। এই আমলে নারীহরণ ও হিন্দুর ধর্মানুষ্ঠানে বিঘ্ন-বাধা উৎপাদন কি প্রকার হইতেছে, সে-বিষয়েও তিনি একটি চিঠি লিখিয়াছেন। উভয় পত্রই যথাস্থানে প্রেরিত হইয়াছে এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিতও হইয়াছে। উভয়ই সরকারের ও সর্বসাধারণের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

পুণা সার্বজনিক সভা সেকালের একটি প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান ছিল। ইহা হইতে অনেক দীর্ঘ আবেদন গবর্মেণ্টের নিকট যাইত। সেকালে সরকারী কর্মচারীরা রাজনৈতিক বিষয়েও মতামত প্রকাশে এখনকার চেয়ে বেশী স্বাধীন ছিলেন। পুণা সার্বজনিক সভার অনেক আবেদন সরকারী বিচারপতি প্রসিদ্ধ মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে রচনা করিয়া দিতেন। তাঁহাকে বলা হয়, এই সব আবেদনে ফল কচিৎ হয় ও সামান্যই হয়; আপনি এগুলি রচনার জন্য এত পরিশ্রম কেন করেন। তিনি উত্তর দেন, লোকশিক্ষার নিমিত্ত, লোকমত গঠন করিবার নিমিত্ত করি; তা ছাড়া, আবেদনে এমন অনেক কথা লেখা যায়, যাহা সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতে বা প্রকাশ্য সভার বক্তৃতায় বলিতে বাধা ঘটিতে পারে।

—

আধুনিক গ্রীসের শিল্প-নিদর্শন "প্রয়াস"

দ্বীপময় গ্রীস

শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক

ইউরোপীয় মহাসমরের রথচক্র গ্রীসের প্রান্তদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইতালীয় সেনা যেদিন আলবানিয়ার সীমান্ত হইতে গ্রীক রাজ্যে প্রবেশ করিল সমস্ত সভ্যজগতে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। আরও একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা রক্ষা হইল না। বলকান জনপদে, ভূমধ্যসাগরের এপার-ওপারে, তুরস্ক-প্যালেস্টাইন-মিশরে একটি গোপন আতঙ্ক ছড়াইয়া পড়িল। আধুনিক ইতালীর সামরিক শক্তির তুলনায় গ্রীসের আয়োজন অকিঞ্চিৎকর হইলেও ইংরেজের বন্ধুত্বের ভরসায় এবং সাহায্যে গ্রীকসেনা আত্মরক্ষা করিতেছে। হিটলার মুসোলিনীর সামরিক অভিযান মধ্যপ্রাচ্যে অগ্রসর হওয়ার পথে গ্রীসই ছিল প্রধান অন্তরায়। সেই জন্যই বোধ হয় গ্রীসকে শাসন করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। গ্রীসের যুদ্ধই অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত ভূমধ্যসাগরে এবং মধ্যপ্রাচ্যে একটি বৃহত্তর এবং ব্যাপক যুদ্ধের সূচনা। সমগ্র দুনিয়ার দৃষ্টি তাই আজ গ্রীসের রণাঙ্গনের প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছে।

গ্রীক স্বাধীনতার এই নিষ্ঠুর অগ্নিপরীক্ষার মুহূর্ত্তে, আধুনিক গ্রীক রাষ্ট্রের জীবনমরণের এই সন্ধিক্ষণে গ্রীক ইতিহাসের গৌরবময় অতীত যুগের কথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

ইউরোপীয় ইতিহাসের উষাকালে দ্বীপময় গ্রীসের উপকূলগুলিকে কেন্দ্র করিয়া যে একটি উন্নত সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, আধুনিক কালের পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতি তাহারই বংশধর। খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রায় সহস্র বৎসর কাল এই দ্বীপবাসী কর্ম্মঠ এবং স্বাধীন জাতির কীর্ত্তিতে মুখর হইয়া রহিয়াছে। এই যুগের গ্রীকদের চিন্তা এবং কর্ম্ম, পরবর্ত্তী কালের বিজ্ঞান, দর্শন এবং শিল্পের প্রাণ জোগাইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাচীন

গ্রীক দেবতা হার্মিস
প্রাচীন গ্রীসের শিল্প-নিদর্শন

গ্রীক যুগের কীর্ত্তিকে আধুনিক সভ্যতা আজও অতিক্রম করিতে পারে নাই। আধুনিক কালের কাব্য, দর্শন, নাট্যশিল্প, চিত্র ও ভাস্কর্য্যের আদর্শ, আয়ুর্ব্বেদ ও গণিত-শাস্ত্র, শিক্ষা ও ধর্ম্মবিজ্ঞান—সমস্তই গ্রীক চিন্তা এবং কর্ম্মকুশলতা দ্বারা উদ্বুদ্ধ। বর্ত্তমান কালের গণিতশাস্ত্রের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন পিথেগোরাস, নীতিশাস্ত্রের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন সক্রেটিস এবং প্রাণিতত্ত্বের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন এরিস্টটল্‌। বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিজ্ঞানে বস্তুর উপাদান সম্বন্ধে যে গবেষণা চলিতেছে খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে এক জন গ্রীক পণ্ডিত অনুরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন (Thales of Miletus, c. 585)। কোপেরনিকাসের আবিষ্কারের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এক জন গ্রীক পণ্ডিত অনুমান করিয়াছিলেন যে পৃথিবী গোলাকার এবং সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘোরে। পৌরাণিক যুগের গ্রীকরা সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিল; তাহাদের জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চ্চার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল ন্যায়শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিচার-পদ্ধতির উপরে। ভাবুকতা অপেক্ষা যুক্তির উপরেই তাহাদের আস্থা ছিল বেশী। এমন কি খ্রীষ্টধর্ম্ম যে ক্রমে ক্রমে সমগ্র ইউরোপ জয় করিল তাহারও প্রধান কারণ ছিল এই যে, সমস্ত প্রাচ্যধর্ম্মগুলির মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মই ছিল গ্রীক চরিত্র এবং চিন্তাধারার সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। গ্রীক অলিম্পাসের সঙ্গে ক্যাথলিকদের স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের সাদৃশ্য ছিল প্রচুর। স্রষ্টা এবং সৃষ্ট জগতের মধ্যে দৌত্য করিতেন গ্রীক দেবতা অ্যাপোলো; ক্যাথলিকদের যীশুও একটি অনুরূপ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন না কি? খ্রীষ্টধর্ম্ম রোমে পৌঁছিয়াছিল গ্রীসের মধ্যবর্ত্তিতায়; তার পর রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা ইউরোপের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার যে বিশিষ্ট রূপ আমরা দেখিতে পাই তাহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী ছিল গ্রীক দ্বীপমালার ভৌগোলিক আবেষ্টনটি। গ্রীসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে একটি করুণ বৈরাগ্য সোপান ছিল। সাগরের নীল জলের উপরে গৈরিক রঙের পর্ব্বতময় দ্বীপমালার দৃশ্য মানুষের মন ভুলায়, কিন্তু তাহাদের অনুর্ব্বর ভূমি মানুষের অনায়াস জীবনযাত্রার পথে বিঘ্নের সৃষ্টি করে। প্রচণ্ড শীত এবং প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যবর্ত্তী বসন্তকালটুকু ছিল ক্ষণস্থায়ী, গ্রীক নরনারীর বিশ্রামের অবকাশটুকু ছিল ক্ষীণ ও বিরল। তাই তাহারা কৃষি-কার্য্য ছাড়িয়া বাণিজ্যের চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। পুরাকালের গ্রীসের প্রধান প্রধান শহরগুলি তাই গড়িয়া উঠিয়াছিল সমুদ্র উপকূলে। গ্রীকরা ক্রমশঃ ঈজিয়ান সাগরের এবং ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন উপকূলে তাহাদের উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু কখনও একটি কেন্দ্রীয় সভ্যতা গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করে নাই। ছোট ছোট দ্বীপ লইয়া, ছোট ছোট শহর লইয়া এক-একটি স্বাধীন

এথেন্স

রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। গ্রীক দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বত্রই এই ছোট ছোট স্বরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। অতীত যুগের গ্রীক সভ্যতার একটি বিশেষত্ব ছিল এই যে, সাগরের জল ও দুর্ভেদ্য পর্ব্বত দ্বারা বিভক্ত রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আটান্নটি বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্বন্ধে এরিস্টটল্ যে গবেষণা করিয়াছিলেন তাহার উৎকর্ষ কখনও বিলুপ্ত হইবার নহে। আধুনিক কালের সকল প্রকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জল্পনা-কল্পনা সেই অতীত যুগের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। যে গণতান্ত্রিক আদর্শবাদ বর্ত্তমান যুগে বিশ্বব্যাপী সামাজিক উন্নতি এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিয়াছে তাহার প্রথম গোড়াপত্তন হইয়াছিল অতীত কালের গ্রীসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বরাষ্ট্রগুলিতে। যে নির্ব্বাচনপ্রথায় আজ পৃথিবীর সমস্ত উন্নত প্রদেশে পরস্পর-বিরোধী মতবাদ এবং দলাদলির মীমাংসা হয়, সেই ভোট-প্রথার আবিষ্কার হইয়াছিল এথেন্স নগরীতে।

হোমারের মহাকাব্য হইতে আরম্ভ করিয়া প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিকদের গ্রন্থাবলীর মধ্য দিয়া প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার যে মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই তাহা এক দিকে যেমন বহুমুখী অন্যদিকে তেমনই হৃদয়গ্রাহী। হেরডোটাস, থুসিডাইডিস্, প্লুটার্ক, ডিওডোরাস্, জেনোফোন, ইসোক্রাটিস্ ও ডিমস্থেনিসের ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীতে প্রাচীন গ্রীক প্রতিভার যে পরিচয় আমরা পাই তাহার সম্পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়। দর্শনে, বিজ্ঞানে, রাজনীতিতে, সমাজশাসনে, শিল্পকলায়—সমস্ত বিষয়েই গ্রীকদের আদর্শ এবং অভিজ্ঞতা অতিশয় উচ্চাঙ্গের ছিল। গ্রীক ভাস্করের অমর নিদর্শনগুলি আজও দেখিতে পাওয়া যায় ইউরোপের প্রসিদ্ধ মিউজিয়মগুলিতে—এথেন্স, রোম, প্যারিস, বার্লিন, নেপ্‌লস্, ফ্লোরেন্স, লণ্ডন,
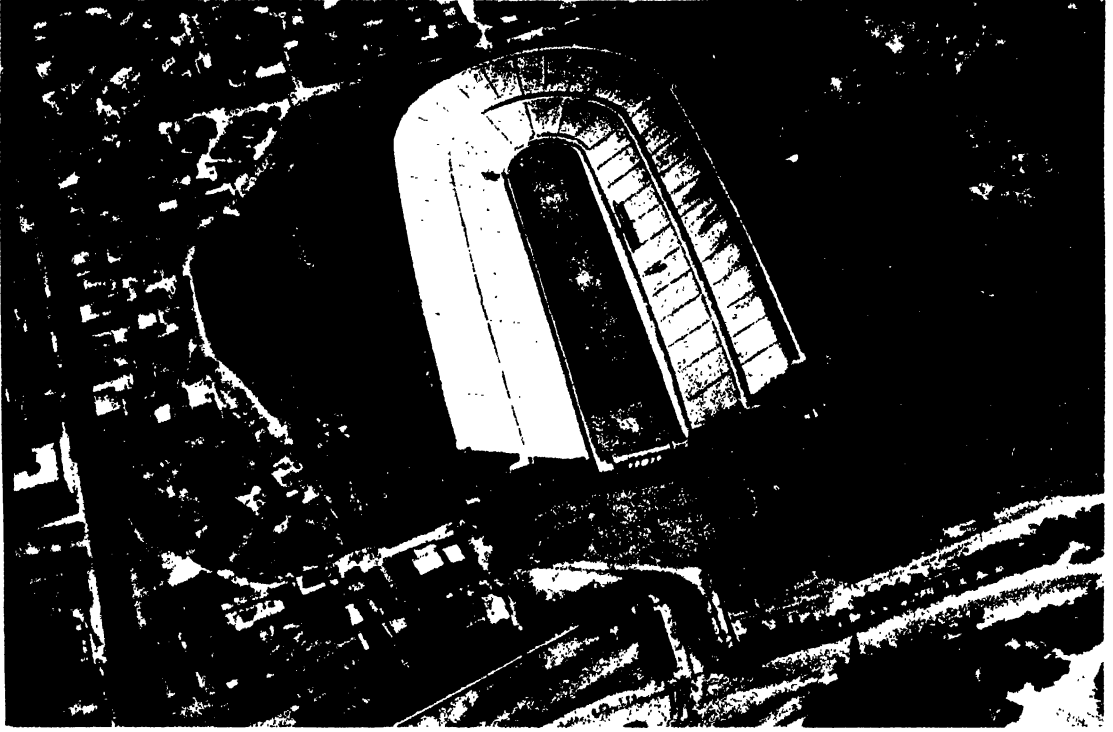
এথেন্স ক্রীড়াপ্রেক্ষণস্থান বা ষ্টেডিয়াম

মিউনিক, ইস্তাম্বুল, আলেকজান্দ্রিয়া, কোপেনহেগেন, নিউ ইয়র্ক, লেনিনগ্রাড, সর্ব্বত্রই গ্রীক শিল্পপ্রতিভার উপযুক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। প্রাচীন গ্রীসের ললিত-কলা একটি সুসমঞ্জস ছন্দোময় এবং প্রকৃতিনিষ্ঠ সৌন্দর্য্য-চর্চ্চার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রীক শিল্পীরা নরনারীর সৌষ্ঠবময় দেহ রচনায় পারদর্শী ছিলেন; তাঁহারা ক্রীড়ারত যুবক-যুবতীদের বলিষ্ঠ সুন্দর মূর্ত্তি পাথরের গায়ে খুদিয়া মানব-দেহের অপরূপতার জয়ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের সঙ্গে গ্রীকরা একটি সুন্দর এবং বলিষ্ঠ আদর্শবাদকে যে নিপুণতার সহিত যে একটি সুষমাময় রূপ দিতে পারিত তাহা অন্য কোন জাতি কখনও পারিয়াছে কিনা সন্দেহ।

সমসাময়িক জগতে গ্রীক সভ্যতার এইরূপ আপেক্ষিক উৎকর্ষ সত্ত্বেও গ্রীসের সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের সামাজিক ব্যবস্থাকে অন্যত্র জোর করিয়া চালাইতে চায় নাই। তাই দেখিতে পাই যে সেকেন্দার শাহের দিগ্বিজয়ের রথ সিন্ধু নদের তীরে আসিয়া পৌছিলেও গ্রীক ভাষায় কোনও বিজিত রাজ্যের প্রজাকে কথা বলিতে হইত না। এমন কি, গ্রীসের নিকটবর্ত্তী সিরিয়ায় গ্রীক ভাষার প্রচলন থাকা সত্ত্বেও সেখানকার অধিবাসিগণকে নিজেদের ভাষা ভুলিতে হয় নাই। এই হিসাবে রোমান সাম্রাজ্যের দাবী ছিল একটু জবরদস্ত। রোমান সাম্রাজ্যবাদীরা যেখানে উপনিবেশ স্থাপন করিতে যাইতেন সেখানে একটি দ্বিতীয় রোমের সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতেন। প্রাচীন হেলেনিক সভ্যতা অপেক্ষা, বিজিত দেশ কি জাতিকে জেতার শিক্ষায় এবং ধর্ম্মে রূপান্তরিত করিবার শক্তি রোমান সভ্যতার ছিল বেশী। সেই জন্যই রোমান সাম্রাজ্য হেলেনিক সংস্কৃতি হইতে যে-সব উন্নত ভাবধারা গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদিগকে সমস্ত ইউরোপে বিস্তার করিতে পারিয়াছিল। গ্রীক সংস্কৃতি যে পশ্চিম-ইউরোপের সর্ব্বত্রই শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে

প্রভাবান্বিত করিয়াছে তাহাও রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তারের মধ্য দিয়া। রোমানদের শাসনশক্তি বেশী ছিল সত্য, কিন্তু গ্রীকদের শাসন-পদ্ধতিতে যে উদারতার স্পর্শ ছিল রোমানদের তাহা ছিল না। তাই দেখিতে পাওয়া যায় যে মাসিডন-অধিকৃত কোন কোন রাজ্যের মুদ্রায় সেকেন্দার শাহ এবং বিজিত রাজ্যের রাজা উভয়ের মূর্ত্তিই বিদ্যমান থাকিত।

দুঃখের বিষয় আধুনিক গ্রীসে প্রাচীন গ্রীসের স্মৃতি ছাড়া আজ আর কিছুই অবশিষ্ট নাই বলিলেও চলে। প্রাচীন রোম এবং প্রাচীন মিশর-বাবিলনের মতই প্রাচীন গ্রীস পৃথিবীর বুক হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; অবশ্য গ্রীক সংস্কৃতির প্রভাব আজও সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলে বিদ্যমান। আধুনিক গ্রীসের লোকসংখ্যার মধ্যে তুর্কী, আলবানীয় ও স্লাভিক জাতির অংশই বেশী। পারস্যের সঙ্গে গ্রীসের যুদ্ধগুলিকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল পরবর্ত্তী-কালে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সেই সংঘর্ষ ও বিরোধ গ্রীসের জাতীয় জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ক্রুসেডের সময়ে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের এই সংঘর্ষ ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্ম্মের মধ্যে বিরোধের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। তারপর তুরস্কের শাসনে আসিয়াও গ্রীস প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সংগ্রামে খ্রীষ্টধর্ম্মের অগ্রদূতের কাজ করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গ্রীসের রণক্ষেত্রে যদি তুর্কীর পরাজয় না হইত তবে হয়ত সম্পূর্ণ বলকান জনপদ এবং রুশিয়া আজ ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইত। গ্রীসের স্বাধীনতা-আন্দোলন এবং গ্রীক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এই সম্ভাবনাটিকে হয়ত চিরকালের জন্য ব্যাহত করিয়াছে। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তুর্কী আধিপত্য গ্রীসে বর্ত্তমান ছিল। এই সময়ে গ্রীক রাজ্যটি ছয়টি "সঞ্জকে" অর্থাৎ সামরিক বিভাগে বিভক্ত ছিল। ১৮২১ সাল হইতেই গ্রীসে বিদ্রোহের সূচনা হয় এবং ক্রমে ক্রমে এই বিদ্রোহ স্বাধীনতা-আন্দোলনে পরিণত হয়। দশ-এগার বৎসর ধরিয়া গ্রীক প্রজাগণ নিজেদের বীরত্বে এবং বিদেশীর উৎসাহে ও সাহায্যে যে আন্দোলন এবং তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহ চালায় তাহাকেই আধুনিক গ্রীসের গোড়াপত্তন বলা যাইতে পারে। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে কন্‌ভেন্‌শ্যান্ অফ্ লণ্ডন অনুসারে স্বাধীন গ্রীক-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং রুশিয়া গ্রীসের নব স্বাধীনতার পৃষ্ঠপোষক ঘোষিত হয়। ১৮০৪ সালে

মাসিডন-অঞ্চলের বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত কৃষক-যুবতী

রুশিয়া সার্বিয়াতে যে কারণে বিপ্লববাদীদের সাহায্য করিয়াছিল ১৮২১ সালে ঠিক সেই কারণেই গ্রীসের বিপ্লবকে সাহায্য করিয়াছিল। রুশিয়ার উদ্দেশ্য ছিল ইস্তাম্বুলে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। তাহা ছাড়া, সেই যুগে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শবাদ ইউরোপের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং পরাধীন জাতিগুলিকে

জাতীয়তার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। বোহেমিয়ার ও ইতালির স্বাধীনতা-আন্দোলনের ন্যায় গ্রীসের স্বাধীনতা-আন্দোলনও একটি জাতীয়তাধর্ম্মী সাহিত্যের মধ্য দিয়া জনসাধারণের মধ্যে বিপ্লবের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিল। ফিলমুসই (Philomousoi) নামে এথেন্সে যে সাহিত্যিক-

ঈজিয়ন দ্বীপের বেশভূষাসজ্জিত কৃষক-তরুণী

সমিতি গঠিত হইয়াছিল তাহা আসলে ছিল জাতীয়তাবাদী এবং বিদ্রোহী। কোরায়িস (Korais) তাঁহার ভাষাতত্ত্বের গবেষণার ভিতর দিয়া আধুনিক গ্রীক ভাষার গোড়াপত্তন করিলেন। জাতীয়তার আদর্শবাদ কোরায়িসের চলতি ভাষার সাহায্যে বহুল প্রচার লাভ করিল। রিগাসের (Rhigas of Valentino) জাতীয় সঙ্গীত জনসাধারণের প্রাণে এক নূতন উদ্যম, নবীন উৎসাহের সৃষ্টি করিল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে Philike Hetairea নামে যে সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা ছিল অতিমাত্রায় বিপ্লবী। মস্কৌ, বুকারেষ্ট, ত্রিয়েস্তে এবং অন্যান্য কর্ম্মস্থলে এই সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সমিতির সভ্যরা অর্থসাহায্য সংগ্রহ করিত, আসন্ন বিদ্রোহের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া তাহার জন্য প্রস্তুত হইবার জন্য দেশবাসীদের মধ্যে প্রচারকার্য্য চালাইত। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইস্তাম্বুলে পেট্রিআর্ক গ্রেগরিয়সের ফাঁসির খবর যখন ইউরোপের সকল দেশে পৌঁছিল, তখনই উপস্থিত হইল গ্রীক আন্দোলনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ। ইসলামের অত্যাচারের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টিয়ান ইউরোপের প্রতিবাদ গ্রীক বিপ্লবের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। তাহা ছাড়া ইউরোপের উদারনৈতিক প্রাণ মেটারনিখের কঠিন শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সুযোগ পাইল গ্রীক আন্দোলনের মধ্যে। গ্রীসের স্বাধীনতা-আন্দোলন তাই সেদিন একটি বৃহত্তর রঙ্গমঞ্চের উপর প্রতিষ্ঠিত হইল; গ্রীকদের সংগ্রাম আসলে বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম, ইসলামের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টধর্ম্মের সংগ্রামে পরিণত হইল। গ্রীকরা তুর্কীদের পরাজিত করিয়াছিল, কিন্তু মিশরের মহম্মদ পাশা যখন তুর্কীর পক্ষে যোগদান করেন তখন ইংরেজ এবং ফরাসী নৌ-বহর গ্রীসকে সাহায্য করিবার জন্য উপস্থিত হয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে গ্রীক স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া সমবেত হয়। আজ যে-ইতালী গ্রীকদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়াছে সেই ইতালী হইতেও বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক গ্রীক-যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। কবি কার্দুচ্চি ইতালীয় ভলন্টিয়ারদের সম্বন্ধে একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। শুধু সৈন্য দিয়া নয়, প্রচুর অর্থ দিয়াও ইউরোপীয়ান শক্তিবর্গ গ্রীসের সহায়তা করিয়াছিল।

পুরাকালে এথেন্স এবং স্পার্টার মধ্যে যে বিরোধ এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব আমরা দেখিতে পাই, গ্রীক

জাতীয় জীবনে সেই দ্বন্দ্বটি আবহমান কাল ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে। এমন কি স্বাধীনতা-আন্দোলনের অবসরেও তিন-তিন বার গ্রীকদের আত্মকলহ ব্যাপকভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। স্বাধীনতার পরেও আজ পর্য্যন্ত এই এক শত বৎসর যাবৎ গ্রীক সমাজ এবং জাতীয়তা অন্তর্দ্বন্দ্বে এবং আত্মকলহে জর্জ্জরিত হইয়া রহিয়াছে; দেশের এই চরম বিপদের দিনে ভরসা করা যায় সে-সকল অতীতের বিষয় হইয়াছে। রাজনৈতিক জীবনে বাংলা দেশের প্রতিদ্বন্দ্বী যদি ইউরোপে কোন দেশ থাকিয়া থাকে তবে তাহা গ্রীস। গ্রীকরা স্বভাবতঃ একটু আত্মকেন্দ্রিক এবং বিপ্লবী। গ্রীক স্বাধীনতার যুদ্ধে যত বিদেশী স্বেচ্ছাসেবক আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইংরেজ কবি লর্ড বায়রণ। মিস্‌সলঙ্গির যুদ্ধক্ষেত্রে গ্রীসের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। গ্রীসের স্বাধীনতা-যুদ্ধের সঙ্গে লর্ড কক্রেন এবং জেনারেল চর্চের নাম চির-কালের জন্য জড়িত থাকিবে। ১৮২৭ সনে নাভারিনোর বন্দরে যে নৌ-যুদ্ধ হয় তুরস্কের শক্তি তাহাতে বিশেষভাবে ব্যাহত হয় এবং পরবর্ত্তী যুদ্ধগুলিতে গ্রীক সেনা এবং নৌ-বাহিনী সহজেই তুর্কীদের পরাজিত করে।

গ্রীক রাষ্ট্র যখন প্রতিষ্ঠা হইল তখনও তাহাকে আধুনিক অর্থে স্বাধীন বলা যাইতে পারে না, কারণ তখনও ইংরেজ, ফরাসী ও রুশ আধিপত্যই সেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহারাই গ্রীসের নূতন রাজবংশ নির্ব্বাচন করিল। বাভারিয়ার অটো ক্রমশঃ এত স্বৈরাচারী হইতে লাগিলেন যে গ্রীক প্রজারা অসহিষ্ণু হইয়া পড়িল, এবং ১৮৪৩ সনে একটি সামরিক বিদ্রোহের পরে রাজাকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো গ্রহণ করিতে হইল। নির্ব্বাচন, মন্ত্রিসভা প্রভৃতি ব্যবস্থা গৃহীত হইল বটে, কিন্তু অটো বেশী দিন গ্রীসের সিংহাসনে থাকিতে পারিলেন না। ১৮৬২ সনে ন্যাশন্যাল অ্যাসেম্ব্লীতে অটোর পদ-পরিত্যাগ দাবী করা হইল; এবং তাহার পরবর্ত্তী বৎসর গ্রীস গণতন্ত্র তাহার নূতন রাজা পাইল প্রিন্স উইলিয়ম জর্জ্জকে। ইনিই প্রথম জর্জ্জ নামে গ্রীসের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। বর্ত্তমান গ্রীসের রাজা দ্বিতীয় জর্জ্জ ইঁহারই পৌত্র। প্রথম জর্জ্জকেও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টই নির্ব্বাচিত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই সময় হইতে বলকান যুদ্ধের (১৯১২-১৩) পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গ্রীসে গণতন্ত্রের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ লাগিয়া ছিল। ক্রীটের বিদ্রোহ, ট্রিকুপেস্ (Charilos Trikoupes) এবং ডেলিয়ানেস্-এ (Theodore Delyannes) মধ্যে নেতৃত্ব লইয়া কলহ, এথ্‌নিকে হেটাইরেয়া (Ethnike Hetairea) নামক বিপ্লবী সমিতির কার্য্যকলাপ, ম্যাসিডনিয়াকে গ্রীক রাষ্ট্রের অন্তর্গত করিবার নিষ্ফল চেষ্টা, পুনরায় গ্রীস ও তুরস্কের যুদ্ধ, আর্থিক দুরবস্থা, প্রথম জর্জ্জের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ইত্যাদি নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া স্বাধীন গ্রীক রাজ্য প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল অতিবাহিত করিয়াছে।* বলকান যুদ্ধের পূর্ব্বরঙ্গে গ্রীসের রাষ্ট্রনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ক্রিটের বিদ্রোহী নেতা ভেনিজেলসের আবির্ভাব আধুনিক গ্রীসের জাতীয় জীবনে একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল। ভেনিজেলসের নেতৃত্বে ১৯১২ সনের অক্টোবর মাসে গ্রীস তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। গ্রীক সেনা সালোনিকা দখল করে এবং গ্রীক নৌ-বহর দার্দ্দানেলেসের এর পথ রুদ্ধ করে। বলকান-যুদ্ধের পরে গ্রীস তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজ্যের অনেকটা জমি ফিরিয়া পায়। এপিরাস্, মাসিডন, ক্রিট্ এবং ঈজিয়ান দ্বীপপুঞ্জে গ্রীসের যে রাজ্য বৃদ্ধি হয় তাহাতে গ্রীসের লোকসংখ্যা প্রায় আঠার লক্ষ বাড়িয়া যায়। ইতিমধ্যে ভেনিজেলসের গতিবিধি এবং কার্য্যকলাপ রাজা কনস্টান্টাইনের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে, এবং ভেনিজেলস্ একাধিক বার গ্রীসের প্রধানমন্ত্রিত্বের পদ হইতে বঞ্চিত হন। ভেনিজেলস্ মাসিডনে গিয়া তাহার ষড়যন্ত্র পাকাইতে থাকেন এবং ১৯১৭ সনের জুন মাসে তুরস্ক এবং বুলগারিয়ার বিরুদ্ধে গ্রীস যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধাবসানে ভেনিজেলস্ গ্রীসের দাবী মিত্র-শক্তির সম্মুখে উপস্থিত করে এবং গ্রীক সীমান্তের বাহিরে সমস্ত গ্রীক-জাতীয় এবং গ্রীক-ভাষী সম্প্রদায়কে গ্রীক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য মিত্রশক্তি প্রতিশ্রুতি দেয়। মাসিডন ও থ্রেস্ লইয়া অবশ্য কোন অসুবিধা হইল না, কিন্তু এশিয়া-মাইনরের উপকূলে গ্রীক বাসিন্দাদের গ্রীসে

স্থানান্তরিত করা একটি কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। প্রায় চৌদ্দ লক্ষ নরনারীর এশিয়া-মাইনর হইতে গ্রীসে আসিবার খরচ জোগান গ্রীক রাষ্ট্রের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। তাই বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ হইতে গ্রীসকে এক কোটি পাউণ্ড ঋণ দেওয়া হয়। জেনীভার Refugee Settlement Commission মাত্র দেড় বৎসর সময়ের মধ্যে বিদেশ হইতে প্রত্যাগত লক্ষ লক্ষ পরিবারের যেরূপ ভাবে গ্রীসের চতুঃসীমানার অভ্যন্তরে বসবাস করিবার ব্যবস্থা করিল তাহা সত্যই প্রশংসার বিষয়।

বিগত মহাযুদ্ধের পরেও গ্রীসের অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান হইল না। গণতন্ত্রের আদর্শবাদ আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। গ্রীক সেনা যখন যুদ্ধাবসানে মুক্তি পাইল তখন প্লাস্টেরাসের নেতৃত্বে ১৯২২ সনে কিয়সে বিদ্রোহ বাধিল। রাজা কন্‌স্টান্‌টাইন্‌ পলায়ন করিলেন এবং এক বৎসর পরে পালেরমো-তে প্রাণত্যাগ করিলেন। দ্বিতীয় জর্জ্জ রাজা হইলেন। কিন্তু তাঁহার মন্ত্রীদের মধ্যে ছয় জনকে রিপাব্লিকান্‌ দল গুলি করিল। গ্রীসে পুনরায় ব্যাপক অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা দেখিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাদের প্রতিনিধিকে এথেন্স হইতে স্থানান্তরিত করিলেন। এই বারেও ভেনিজেলস্‌ পুনরায় গ্রীসের রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়া গ্রীসকে রক্ষা করিল। ১৯২৪ সনে হেলেনিক রিপাব্লিক স্থাপিত হইল। আধুনিক গ্রীসের রাষ্ট্রীয় কাঠামো এই রিপাব্লিকান্‌ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আধুনিক গ্রীসের লোকসংখ্যা চৌষট্টি লক্ষ। ১৯০৭ সালে ইহা ছিল ছাব্বিশ লক্ষ মাত্র এবং ১৯২০ সালে ছিল পঞ্চান্ন লক্ষ। গ্রীক রাজ্যের সীমানার বাহিরে এখনও অনেক গ্রীক প্রজা বাস করে, প্রধানতঃ ইস্তাম্বুলে, মিশরে, সাইপ্রাসে, দোদেকানেজ দ্বীপপুঞ্জে এবং আমেরিকায়। লোকসংখ্যার প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত আছে। দেশের ভূমিখণ্ডের শতকরা মাত্র ২২ ভাগে কৃষিকার্য্য চলিতে পারে, অবশিষ্ট বেশীর ভাগ অনুর্ব্বর এবং পাহাড়ে ঢাকা। গ্রীসে যতটা শস্য উৎপন্ন হয় তাহাতে লোকসংখ্যার খাদ্য-সঙ্কুলান হয় না। জলপাই ও আঙ্গুরের চাষ প্রসিদ্ধ। গ্রীসের উৎপন্ন তামাক পৃথিবীর বিভিন্ন বাজারে আদৃত হইয়া থাকে। তুলা এবং চাউলের চাষ খুব সামান্য। লোহা, ম্যাগনেসিয়াম এবং লিগনাইটের খনি আছে। অবশ্য গ্রীসে পাথরের প্রাচুর্য্য খুবই স্বাভাবিক। গ্রীসে শিল্পোন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় পুঁজিপাটা এবং কয়লার খনির অভাব। গ্রীসের প্রধান প্রধান শিল্পের মধ্যে জলপাইয়ের তেল, সুরা, ময়দা এবং পিষ্টকের নাম করা যাইতে পারে। ছোট ছোট শিল্পের মধ্যে রেশম, পশম, পাট, কার্পেট ইত্যাদিই উল্লেখযোগ্য।

আজিকার এই চরম দুর্য্যোগের দিনে গ্রীক সেনা এবং গ্রীক জাতি তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বীরত্বের সহিত লড়িতেছে। গ্রীক রাজ্যের আর্থিক দুরবস্থা এবং সামরিক দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও তাহারা যে সাহস ও বীরত্ব দেখাইতেছে তাহাতে স্বাধীনতাকামী সকল দেশের এবং জাতির মনেই সহানুভূতি এবং প্রশংসার উদ্রেক করিবে। স্বাধীনতা-আন্দোলনের যুগের গান গাহিতে গাহিতে গ্রীক নরনারী আজ আবার সমর-প্রাঙ্গণে যাত্রা করিতেছে। গ্রীসের চির-সুহৃৎ ইংরেজ তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছে। কিন্তু গ্রীসের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করিতেছে রুশিয়ার অভি-সন্ধির উপর। ইস্তাম্বুল এবং দার্দানেলেসের উপর রুশিয়ার নজর আছে; জার্ম্মেনীর সমর-বাহিনী গ্রীস এবং তুরস্কের উপর দিয়া অনায়াসেই মধ্যপ্রাচ্যের রণক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তাহা যদি না হয় এবং তুরস্ক ও রুশিয়া যদি গ্রীসকে সাহায্য করিতে পারে তবে হয়ত গ্রীক রাষ্ট্রের এক শত বৎসরের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইবে না। আধুনিক গ্রীসের জয়-পরাজয় যাহাই হউক না কেন, যে অমর গ্রীস হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকাশকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে তাহার স্মৃতি কখনও মুছিয়া যাইবার নহে।

১২ই নবেম্বর, ১৯৪০

ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়নের ঐক্য

শ্রীগোপাল হালদার

ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশন হইয়া গেল (বোম্বাই, ২৮শে ও ২৯শে সেপ্টেম্বর)। ভারতবর্ষের সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর মুখপাত্র এই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস; কাজেই এই কংগ্রেসের গুরুত্ব যথেষ্ট। তদুপরি ইহার এবারকার অধিবেশনের গুরুত্ব বাড়িয়া গিয়াছে কয়েকটি বিশেষ কারণে। প্রধানতঃ তাহা এই—(১) যুদ্ধ বিষয়ে ভারতীয় শ্রমিকদের সিদ্ধান্ত; (২) ভারতীয় শ্রমিক-আন্দোলনের ঐক্য। নানা আবার ভাবে দুইটি বিষয়ই পরস্পর জড়াইয়া গিয়াছিল।

দুই বৎসর পরে বোম্বাইয়ে এই অধিবেশন হইল—অধিবেশন যথাসময়ে হইতে পারে নাই। এই দুই বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাস অভাবনীয় পরিবর্তনের দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। দুই বৎসর পূর্বেও সকলেই জানিতাম—যুদ্ধ আসিতেছে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। এখন জানি—যুদ্ধ আসিয়া গিয়াছে; কিন্তু সেই যুদ্ধের স্বরূপ লইয়া দেশ-বিদেশে সকলে যে একমত হইতে পারিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যে-রূপ দুই বৎসর পূর্বে আমাদের সম্মুখে ভাসিত, ইহার সহিত তাহার মিল না দেখিয়া কেহ কেহ এমনও ভাবিয়া বসিয়া আছেন যে, পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী ও নূতন সাম্রাজ্যবাদীদের এই যুদ্ধকে "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই" বলা চলে না। এই মতের বিরোধ সাম্রাজ্য-অন্তর্ভুক্ত ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছে, ভারতীয় মজুর-আন্দোলনের মধ্যেও তেমনই বিরোধের সৃষ্টি করিবে, এইরূপ আশঙ্কা করা

গিয়াছিল। বোম্বাই অধিবেশনের প্রাক্কালে শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায় একাধিক বিবৃতিতে ভারতীয় মজুর-শ্রেণীকে এই যুদ্ধে ফাশিজমের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছিলেন। এই দিকে তাঁহার পক্ষে বে-সরকারী ও আধা-সরকারী নানাবিধ মধ্যপন্থীদের সহায়তা লাভের সম্ভাবনা ছিল। দুই বৎসর পূর্ব্বেকার নাগপুরের অধিবেশনে শ্রমিক আন্দোলনের দুই শাখা—জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন (এইটি মধ্যপন্থীদের প্রতিষ্ঠান) এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (নানা মতের বামপন্থীদের প্রতিষ্ঠান) একযোগে সম্মিলিত হয়। বোম্বাইয়ের অধিবেশনই তাহাদের প্রথম একত্র অধিবেশন—তাই, এখানে ফেডারেশনের মধ্যপন্থী মতবাদের যথেষ্ট প্রভাব থাকিবার কথা। এমন কি মনে হইয়াছিল, প্রভাবশালী ও প্রতিষ্ঠাপন্ন নানা ব্যক্তি ও যূথের মিলনে, বামপন্থী ও ফেডারেশন-ভুক্তদের চেষ্টায়, হয়ত ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবার যুদ্ধে ব্রিটেনের সহযোগিতা করিবার প্রস্তাবই গ্রহণ করিয়া বসিবে। বলা বাহুল্য, এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইলে অন্যান্য শ্রমিক-সঙ্ঘের পক্ষে হয়ত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ত্যাগ করিবার প্রশ্ন উঠিয়া পড়িত। অর্থাৎ, দুই বৎসর পূর্ব্বে খণ্ডিত শ্রমিক-আন্দোলনকে একত্র করিবার যে চেষ্টা শুরু হইয়াছিল, তাহাও আবার এখন এই কারণেই বিনষ্ট হইত।

বোম্বাই অধিবেশনের গুরুত্ব ছিল প্রথমত এই যুদ্ধের জন্য। কারণ, দুই বৎসর পূর্ব্বেও মজুর-শ্রেণী যে যুদ্ধে কি করিবে সে-বিষয়ে কাহারও সংশয় ছিল না। সকলেই জানিত, মজুর-শ্রেণীর যুদ্ধের সহিত সম্পর্ক থাকিতে পারে না। কিন্তু এখন যুদ্ধ বাধিবার পর তাহা লইয়া মতভেদ দেখা দিয়াছে—যেমন গত ১৯১৪-১৯১৮ সালের প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বাধিবার পরেও ইউরোপের যুধ্যমান দেশগুলির শ্রমিক-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উহার স্বপক্ষে বিপক্ষে মতবাদের উদ্ভব হইয়াছিল। তখনকার সে-দ্বন্দ্ব অবশ্য ভারতীয় মজুরদের স্পর্শ করে নাই। কারণ, তখন পর্যন্ত ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসই জন্মগ্রহণ করে নাই, ভারতে সঙ্ঘবদ্ধ মজুর-শ্রেণীর কোন মুখপাত্রই ছিল না। দ্বিতীয় কারণ ছিল এই, সেই যুদ্ধও এমন করিয়া সর্বতোভাবে মজুরের মুখাপেক্ষী হয়

নাই। তখনও অস্ত্র-কারখানার ও অন্যান্য কারখানার মজুরেরা কাজ না করিলে যুদ্ধ নিঃসন্দেহ অচল হইত। আসলে শ্রমিকেরা কাজ না করিলে যে-কোন সভ্যদেশের জীবনযাত্রাই ত অচল হয়—অতএব, যুদ্ধের প্রশ্ন এই ক্ষেত্রে না তুলিলেও চলে। তথাপি কথাটি তুলিতে হয়, কারণ এইবারকার যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে আর সৈনিকের যুদ্ধ নাই, তাহা "সামগ্রিক যুদ্ধ"। ইহার সমরক্ষেত্র জল-স্থল-আকাশ বটে; কিন্তু আসল সমরকেন্দ্র কলকারখানা। যাহার যুদ্ধ-কারখানা (war industries) কার্যকরী এবার সেই জয়ী হয়। উহার অভাবেই পোল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশগুলি চক্ষের পলকে জার্মানীর কবলিত হইয়া পড়িল। এই দিকে পিছনে পড়িয়া থাকাতেই ব্রিটেনকে যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় একটু বিব্রত হইতে হইয়াছে। আর এই দিকে অবহিত থাকাতেই সোভিয়েট ফাশিস্ত শত্রুর নিকট হইতে সম্মান লাভ করিতেছে। এক কথায়, বর্তমান যুদ্ধের উদ্দেশ্য যেমন শিল্প-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি, বর্তমান যুদ্ধের অবলম্বনও তেমনি শিল্প-বাণিজ্যের শক্তি—চাই যুদ্ধ-কারখানা ও তাহার প্রয়োজনীয় কাঁচামালের বাণিজ্য। অতএব, যুদ্ধ করে আজ আসলে অপেক্ষাকৃত অল্প সৈনিক; কিন্তু যুদ্ধ চালায় আজ অধিকসংখ্যক শ্রমিক। শ্রমিকে সৈনিকে এই দিকে তফাৎ কমিয়া গিয়াছে। বিলাতের শ্রমিকেরা আজ যুদ্ধের যে আসল নিয়ন্তা, তাহা শ্রমিক-মন্ত্রী মিঃ অ্যাটলির পদমর্যাদা হইতে স্পষ্ট এবং মিঃ বিভানের মারফৎ আদায়-করা মজুরীর হার ও অন্যান্য সুবিধা হইতে পরিষ্কার। তথাপি প্রশ্ন উঠিতে পারে,—ভারতবর্ষে যুদ্ধ-কারখানা নাই; অতএব, যুদ্ধকালে ভারতীয় শ্রমশক্তিরও তেমন গুরুত্ব নাই। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ইহার উল্টা প্রমাণই আমরা প্রথমাবধি দেখিতেছি। যুদ্ধ বাধিতে-না-বাধিতে চটকলের এলাকায়, জাহাজঘাঁটিতে, রেলওয়ের কারখানায়, বিজলী ও গ্যাসের কেন্দ্রে, এবং সর্বোপরি লোহা ও ইস্পাতের শিল্পকেন্দ্রে যে-সব ব্যবস্থা গৃহীত হয়, এক বৎসরের মধ্যে শ্রমিক-কর্মীদের ভারত-রক্ষা নিয়মের গুণে যে দশা ঘটিল,—তাহাতে বেশ বুঝা যায়, ভারতীয় শ্রমশক্তি যুদ্ধের হিসাবে মোটেই অবজ্ঞেয় নয়। তাহা ছাড়া, যুদ্ধের পট-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটি একেবারে সুস্পষ্ট হইতেছে যে, এবারকার যুদ্ধে ব্রিটেনের পৃথিবীজোড়া সাম্রাজ্য কয়েকটি ভূভাগে বিভক্ত করিয়া লইতে হইবে। এক-একটি দেশ হইবে তেমনি এক-এক ভূখণ্ডের কেন্দ্র। এইরূপে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রাচ্য-খণ্ডের প্রাণকেন্দ্র বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। অষ্ট্রিয়া, নিউজিল্যাণ্ড হইতে মিশর-প্যালেস্টাইন পর্যন্ত বিস্তৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই প্রাচ্যখণ্ডের যুদ্ধোপকরণ জোগাইবে
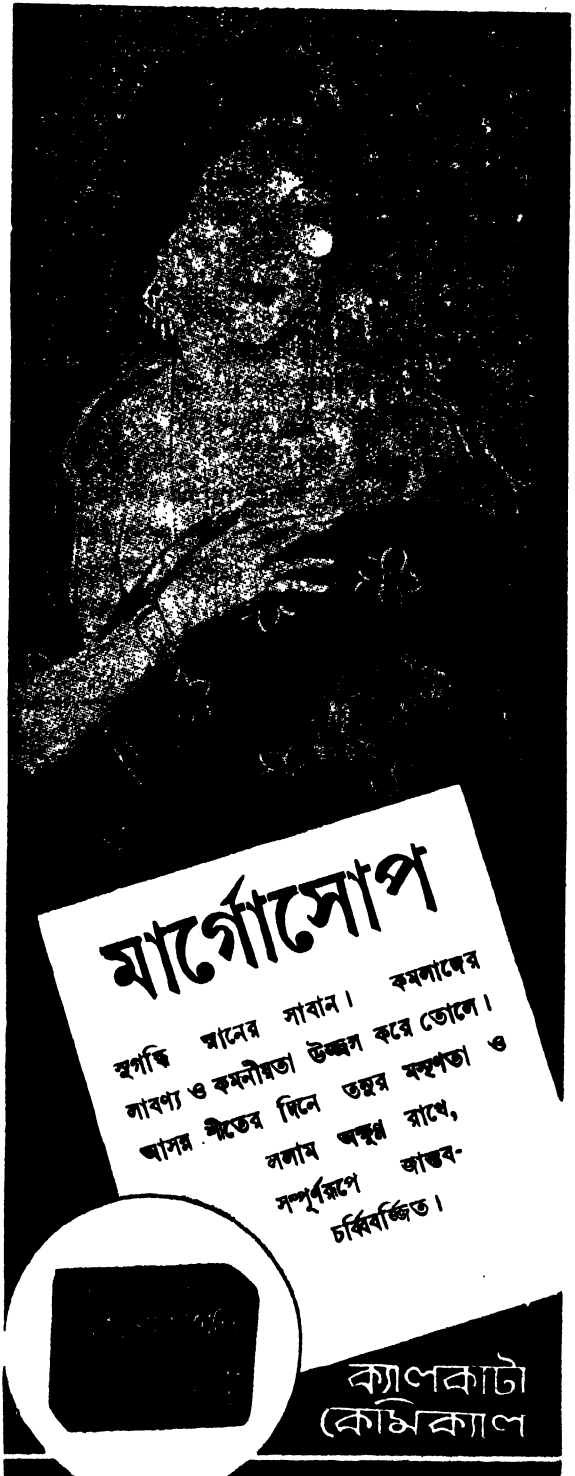
ভারতবর্ষ। বলা বাহুল্য, তাহার অর্থ,—এই বিপুল যুদ্ধের বিপুল যুদ্ধোপকরণের জোগানদার হইবে ভারতবর্ষ। শুধু ইহার "কাঁচা মাল" পাইলেও সাম্রাজ্যের চলিবে না; যুদ্ধের শিল্পজাতও এখানকার কল-কারখানায় তৈয়ারী করিতে হইবে। "রোজার কমিশন" সেই ব্যবস্থাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। অতএব, অচিরকাল মধ্যে ভারতীয় শ্রমশক্তি ও শ্রমিক-শ্রেণীই হইবে ব্রিটিশ প্রাচ্য-সাম্রাজ্যের যুদ্ধের অন্যতম প্রধান উপকরণ। এমন কি, বিলাতী 'ইকনমিস্ট' পত্রের মুখে শুনিয়া আশ্চর্য হইতে হয়, ভারতবর্ষে মোট বিশ হাজারের মত যুদ্ধদ্রব্য মিলিতেছে, তাহার কলকারখানায় এখনই নাকি আমাদের আত্মরক্ষার উপযোগী শতকরা আশী ভাগ বস্তু তৈয়ারী হইতেছে—বন্দুক, কলের কামান, গোলা-বারুদ, বড় কামান, হাউইৎসার, প্রভৃতি এখনই নির্মিত হইতেছে, ট্যাঙ্কও নির্মিত হইবে,—মোটর-কারখানা ও বিমান-কারখানাও হয়ত প্রতিষ্ঠিত হইবে। মোটের উপর, ভারতীয় শ্রমিক-শ্রেণী এই সমাগত যুদ্ধের একটি বড় আশ্রয়, ইহাতে ভুল নাই। এই কারণে, এই শ্রমিক-সমাজের যেটি মুখপাত্র যুদ্ধ সম্বন্ধে তাহার মতামতের বিশেষ গুরুত্ব আছে। বোম্বাই অধিবেশনে সেই মত স্থির হইবার কথা, তাই বোম্বাইতে যুদ্ধপক্ষীয় ও যুদ্ধবিরোধী শ্রমিকদের দ্বন্দ্ব বাধিবার সম্ভাবনা ছিল।

বোম্বাই অধিবেশনের সার্থকতার বড় প্রমাণ এই যে, বিরোধ ঘনাইয়া উঠিতে পারে নাই; অথচ শ্রমিকদের মতাদর্শও বিসর্জন করা হয় নাই। অধিবেশনের পূর্বেই বোম্বাইয়ের বিভিন্নমতাবলম্বী শ্রমিক কর্মীরা একত্র হন। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সম্পাদক মিঃ এন্. এম্. যোশী ছিলেন ইহার উদ্যোক্তা। মিঃ যোশী নিজে মধ্যপন্থী (centrist),—অবশ্য সার্ভেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সদস্যপদ তিনি হারাইয়াছেন উগ্রপন্থী বলিয়া—শ্রমিক-আন্দোলনে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও ঐকান্তিকতায় কেহ সন্দেহ করেন না। অন্য দিকে, বোম্বাইও শ্রমিক-আন্দোলনের কেন্দ্র—সকল মতবাদই সেখানে ঠাঁই পায়। যুদ্ধের স্বপক্ষে সেখানে ফেডারেশানের মিঃ যমুনাদাস মেহ্‌তা ও রায়পন্থী মিঃ কর্নিক প্রভৃতি ছিলেন। আবার যুদ্ধের বিপক্ষে কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট ও সাম্যবাদীরাও ছিলেন। ছিলেন না সম্ভবত ফরওয়ার্ড ব্লক বা ঐরূপ মতাবলম্বী কেহ। কিন্তু বাংলার কেহ কেহ ও নাগপুরের মিঃ রুইকর ছাড়া অন্যত্র শ্রমিক কর্মীরা কেহ ফরওয়ার্ড ব্লকের সহিত বিশেষ সম্পর্কিত নহেন। বোম্বাইর এই বিভিন্নমতাবলম্বীরা পূর্বেই স্থির
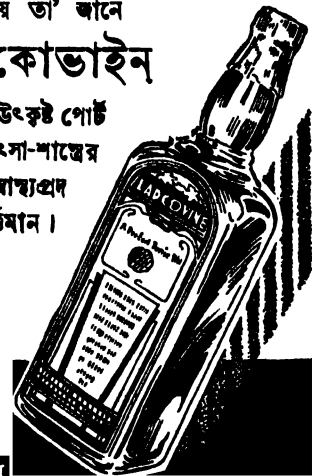
করেন যে, যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁহাদের মতের বিরোধ আছে। তাই স্ব স্ব মত তাঁহারা অধিবেশনে প্রকাশ করিবেন, যদিও শ্রমিক-ঐক্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করেন। সেই প্রস্তাবের মূলকথা অনেকটা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সুরে বাঁধা :

"বর্তমান যুদ্ধ যদি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের যুদ্ধই হয় তাহা হইলে আগে ভারতবর্ষকে তাহা দেওয়া উচিত। যে যুদ্ধে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে না তাহাতে ভারতবর্ষের লাভ নাই, ভারতবর্ষের শ্রমিক-শ্রেণীর তো লাভ নাইই।"

এই প্রস্তাবের পরে একটি "দ্রষ্টব্য" ছিল—তাহা কাগজে প্রকাশিত হইবার কথা নয়, শুধু সদস্যদের জানিয়া রাখিবার বিষয়। 'দ্রষ্টব্য'টির অর্থ এই : "যুদ্ধ-প্রস্তাব বিষয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু আশা করা যায় সকলেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। তবে এই ব্যাপারে ট্রেড ইউনিয়নগুলির নিজের মতানুযায়ী চলিবার স্বাধীনতা রহিল।" অর্থাৎ এই দ্রষ্টব্যের ফলে মূল সিদ্ধান্তই কার্যত নাকচ হইয়া যায়। এদিকে, বোম্বাইয়ের বাহিরের শ্রমিক-দলেরা এই সব বিষয়ে কিছুই জানিত না, আবার বোম্বাইয়েরও সাম্যবাদীরা দ্রষ্টব্যটি স্পষ্ট অনুমোদন করিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না। অতএব জেনারেল কাউন্সিলে এই সিদ্ধান্ত ও দ্রষ্টব্য লইয়া গুরুতর তর্ক ও আলোচনা চলে। বাংলার জাহাজীদের (Indian Seamen's Union) নেতা মিষ্টার আফ্‌তাব আলী 'সিদ্ধান্তে'র বিরোধী ; বোম্বাইয়ের সাম্যবাদীরা 'দ্রষ্টব্যে'র বিরোধী; নাগপুরের মিষ্টার রুইকর জানিতে চাহিলেন, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াও কি আবার কেহ যুদ্ধে চাঁদা সংগ্রহ ও রংরুট সংগ্রহ করিতে পারিবেন? উত্তর মিলিল না। উত্তর দেওয়া আসলে অসম্ভব ; মিষ্টার যোশী ও কমরেড নিম্বকর প্রমুখদের কথায় তাহা বুঝা যায়। ট্রেড ইউনিয়নে কংগ্রেসের সংগঠন বড় দুর্বল, ঐক্য এখনো অনায়ত্ত ; কাহাকেও কিছু মানাইবার মত তাহার শক্তি কোথায়? এ-অবস্থায় মতবাদে যথাসম্ভব পরিচ্ছন্নতা থাকিলেও সংগঠনে শিথিলতা থাকিবে ; আর তাই এইরূপ অসঙ্গতি দেখা যাইবে। আসলে, অসঙ্গতি সিদ্ধান্তে ও দ্রষ্টব্যে নহে ; অসঙ্গতি ট্রেড ইউনিয়নের উচ্চ মতাদর্শের সঙ্গে দুর্বল সংগঠনের। সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে অবশ্য কেহই আর নিজেদের সংশোধনী প্রস্তাব লইয়া জিদ্ করিলেন না। কিন্তু যে ভাবে মিঃ আফ্‌তাব আলী ও বোম্বাইয়ের শ্রমিক প্রভৃতিকে মজুর-প্রতিনিধিরা বাধা দিতে থাকেন তাহাতে বুঝিতে বাকী রহিল না যে, সাধারণ শ্রমিকের মনোভাব কিরূপ।

যুদ্ধপক্ষীয় ও যুদ্ধবিপক্ষীয় দলে তথাপি যে বিরোধ ও ভাঙাভাঙি ঘটিল না, তাহার কারণ, সকলেই চাহিয়াছে ভারতীয় শ্রমিকের ঐক্য। বোম্বাই অধিবেশনের অন্যতম প্রধান কাজ এইটি। নিঃ ভাঃ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস জন্মে ১৯২০ সালে। তাহার পূর্বে নানা শাখায় শ্রমিক-আন্দোলন দেখা দিয়াছিল, কিন্তু সে-সব শাখা একত্র হইল এই যুদ্ধ-পরবর্তী যুগে, অসহযোগের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের দিনে। দশ বৎসর পরে ১৯২৯ সালে আর এক রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। উগ্রপন্থীরা তখন রাজকীয় (হুইট্‌লি) শ্রমিক কমিশন ও জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রমিক-বিভাগকে বয়কট করিতে চাহেন। মধ্যপন্থীরা তাই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ছাড়িয়া ক্রমে ক্রমে এক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠন করেন। এদিকে একটু পরে পুরাতন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসও আবার ভাগ হইল ; সাম্যবাদীরা রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠন করিলেন। মোটের উপর, শ্রমিক-আন্দোলন এইরূপে একেবারে টুক্‌রা-টুক্‌রা হইয়া যাইতে থাকে। ইহার ফলেই আবার ঐক্যের প্রয়োজন অনুভূত হইল। ১৯৩৮ সালে নাগপুরে তাই ফেডারেশান ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস একযোগে চলিতে চেষ্টা করিবে, স্থির করে। নাগপুরে নির্বাচিত সেই জেনারেল কাউন্সিলের অর্ধেক সভ্য হয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের, অর্ধেক ফেডারেশনের। সভাপতি ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ; সম্পাদক মিঃ বাখ্‌লে ফেডারেশনের। এইবার বোম্বাইতে ফেডারেশন কয়েকটি সর্তে কংগ্রেসের সঙ্গে মিশিয়া গেল। কংগ্রেসও তাহাদের

সে সর্ত কয়টি মানিয়া লইল :—যথা, তিন-চতুর্থাংশের মত না থাকিলে কখনো রাজনৈতিক প্রস্তাব (যেমন, যুদ্ধবিষয়ক), বা সর্বব্যাপক (general) ধর্মঘট বা বিদেশীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগের প্রস্তাব গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে না।"

ফেডারেশনকে এই ভাবে স্বীকৃত করাইবার জন্য কৃতিত্ব প্রাপ্য মিঃ জোশী, গিরি ও কালাপ্পার; আর কংগ্রেস যে রাজী হইল তাহার কারণ উগ্রপন্থীরা ইতিমধ্যে বুঝিয়াছেন যে, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানকে তাঁহাদের একচেটিয়া করিবার চেষ্টা করিলে ভুল হইবে। উহাতে তাঁহারাই একা পড়িয়া যাইবেন, শ্রমিক-সাধারণের সহিত যোগাযোগ হারাইবেন। অবশ্য, এই ঐক্যের ফলে তাঁহাদের রাজনৈতিক মতবাদ যে এই কংগ্রেসে আর স্পষ্টত তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না, তাহাও উগ্র নেতারা বুঝেন। তথাপি তাঁহারা মনে করেন, ভারতীয় শ্রমিক-আন্দোলনের আসল স্বার্থ এখন শ্রমিক ঐক্য। শ্রমিকের রাজনৈতিক মতকে গঠিত করিতে হইলেও এই ঐক্যসূত্র ছিন্ন করিলে চলে না, ইহাই তাঁহাদের অতীতের অভিজ্ঞতা। তাহা ছাড়া, যোশী প্রমুখ "ট্রেড ইউনিয়নিষ্টদের" হাতে নবজাত এই শ্রমিক-সংস্থা যে মোটের উপর উন্নতি লাভ করিবে, এই বিশ্বাস তাঁহাদের আছে।

অতএব বোম্বাইতে ভারতীয় শ্রমিক এক হইল। কিন্তু সে ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এখনও মাত্র লাখ তিনেক মজুরের কংগ্রেস—তাহার মধ্যে আহমেদাবাদের (গান্ধীবাদী) ট্রেড ইউনিয়ন নাই; টাটার লোহা-ইস্পাতের শ্রমিকেরা নাই; বাংলার সুরহাবর্দ্দি-চালিত ইউনিয়নগুলি ত নাইই; কয়লার খনির মোট এক হাজারের বেশী শ্রমিকও নাই। তথাপি, ঐক্যের সূচনা হইয়াছে, ইহাই আশার কথা। আশ্চর্য ব্যাপার কিন্তু এই নূতন জেনারেল কাউন্সিলে যাঁহারা সর্বাপেক্ষা বড় দল তাঁহারা ফেডারেশনের দল নন,—তাঁহারা নাকি কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল। কিন্তু এই দল কি মধ্যপন্থী না উগ্রপন্থী? আবার, সাম্যবাদীদের দল সংখ্যায় অল্প; অথচ, তাহাদের প্রভাব যে অল্প নয়, বোম্বাইয়ের আবহাওয়ায়ও তাহা টের পাওয়া যায়। কিন্তু, তাঁহারা ট্রেড ইউনিয়নের উচ্চ পর্যায়ে স্থান করিতে পারেন নাই কেন? তাঁহাদের নায়কগণ সম্ভবত কারাগারে। এবারকার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পরিচালক-গোষ্ঠীতে সভাপতি মিঃ কালাপ্পা ও সম্পাদক মিঃ যোশী দুই জনই ফেডারেশনের, কিন্তু সম্ভবত দুইজনই মধ্যপন্থী (centrist)।

বাংলার প্রভাব এই ট্রে. ই. কংগ্রেসে কম হইবার কথা নয়—ওয়ার্কিং কমিটিতে চার জন বাঙালী রহিয়াছেন—দুই জন প্রতি-সভাপতি, দুই জন অন্য সদস্য।

বাঙালী প্রতিনিধিরাও ছিলেন সংখ্যায় বেশী (অবশ্য বোম্বাইয়ের কথা স্বতন্ত্র), মোট ২৫ জন। কিন্তু বাংলার লেবর পার্টির প্রায় কেহই বোম্বাই যান নাই। তাহা ছাড়া বাংলার শ্রমিক-আন্দোলনের কতকগুলি দুর্বলতা বোম্বাইতে অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠে—যথা, বাংলার ট্রেড ইউনিয়নগুলি তাহাদের দেয় চাঁদা দিতে পারে না; অথচ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলি তাহাদের চাঁদা মোটামুটি দেয়। দ্বিতীয়তঃ, বাংলার শ্রমিক-আন্দোলন যে ব্যক্তিভিত্তিক তাহাও বেশ বুঝা যায়। বোম্বাই গির্নী কামগর ইউনিয়নে রায়পন্থী, সাম্যবাদী (ডাঙ্গে প্রমুখ) ও স্বতন্ত্র (নিম্বকর প্রমুখ) কর্মীরা একযোগে কাজ করেন। বাংলার কোন শ্রমিক-শাখায় কি এইরূপ কাজ সম্ভব? এই দিক হইতে বাংলায় ট্রেড ইউনিয়নের মূল তত্ত্বটিই যেন উপেক্ষিত হয়; বোম্বাইতে তাহা ইহা অপেক্ষা বেশী প্রসার লাভ করিয়াছে। আসলে বোম্বাইয়ের বাতাসে যে সত্যটি টের পাওয়া যায় তাহা এই—পশ্চিম-উপকূলের মজুর বেশী সচেতন; এমন কি, জীবনযাত্রায়ও বেশী অগ্রসর। ইহার মূল কারণ এই যে, পশ্চিম-উপকূলে দেশীয় ধনিকতন্ত্র আজ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; পূর্ব-উপকূলে চলিয়াছে আধা-জমিদারী, আধা-ধনিকের যুগ। পশ্চিম-উপকূলে তাই ধনিকে শ্রমিকে তফাৎও সুস্পষ্ট; পূর্ব-উপকূলে মধ্যবিত্তদের মধ্যস্থতায় তাহা জটিলীকৃত। পশ্চিম-উপকূলে দেখা যায় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে ধনিক কেন্দ্রিত, আর ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে শ্রমিক কেন্দ্রিত। পূর্ব-উপকূলে এখানে-ওখানে সর্বত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বাঙালী মধ্যবিত্তদের কলহ, কোলাহল, জটিলতা, আবিলতা। অথচ, লোক হিসাবে তুলনা করিলে হয়ত দেখিব, পূর্ব-উপকূলে রাজনৈতিক চেতনা অনেক তীক্ষ্ণ, অনেক স্বচ্ছ, অনেক প্রবল।

কিন্তু যুগটা ব্যক্তিগত কৃতিত্বের নয়, সঙ্ঘবদ্ধ কৃতিত্বের—শ্রমিক-সামন্ত সাজিবার নয়, শ্রমিক নেতৃত্ব সৃষ্টি করিবার—সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক শক্তি উদ্বুদ্ধ করিবার।

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীসজনীচন্দ্র রায়চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বনস্পতি

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
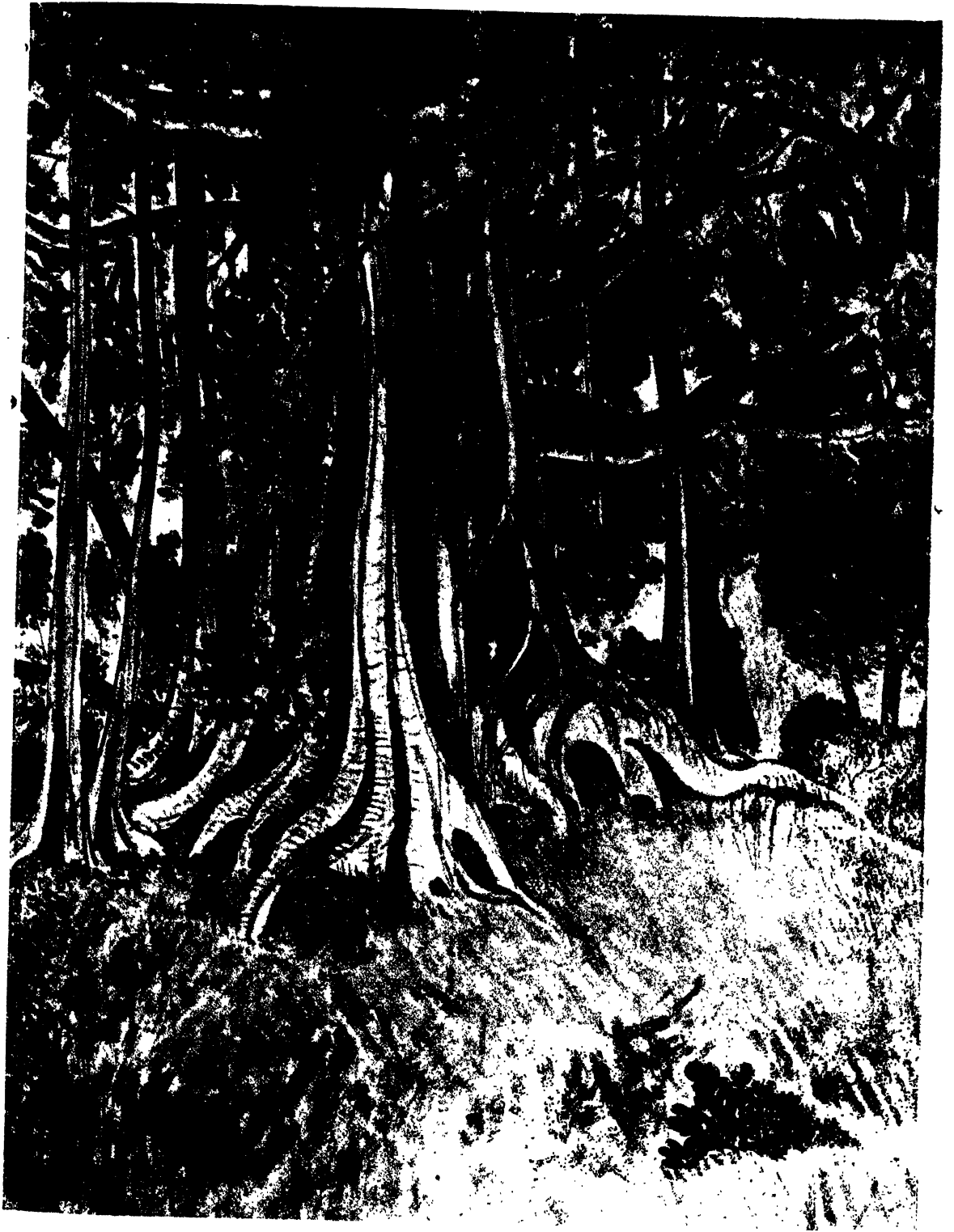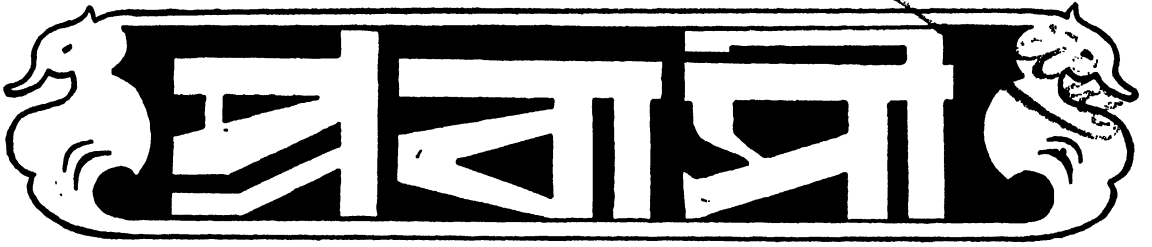
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪০শ ভাগ, ২য় খণ্ড — পৌষ, ১৩৪৭ — ৩য় সংখ্যা

গহন রজনী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গহন রজনীমাঝে
রোগীর আবিল দৃষ্টিতলে
যখন সহসা দেখি
তোমার জাগ্রত আবির্ভাব
মনে হয় যেন
আকাশে অগণ্য গ্রহতারা
অন্তহীন কালে—
আমারি প্রাণের দায় করিছে স্বীকার।
তার পরে জানি যবে
তুমি চলে যাবে,
আতঙ্ক জাগায় অকস্মাৎ
উদাসীন জগতের ভীষণ স্তব্ধতা।

জোড়াসাঁকো
১২।১১।৪০
রাত্রি দুইটা

ভোরের চড়ুই পাখী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওগো আমার ভোরের চড়ুইপাখী,
একটুখানি আঁধার থাকতে বাকি
ঘুমঘোরের অল্প অবশেষে
শাসির 'পরে ঠোকর মারো এসে,
দেখ কোনো খবর আছে নাকি।
তাহার পরে কেবল মিছিমিছি
যেমন খুশি নাচের সঙ্গে
বিষম কিচিমিচি,
নির্ভীক ঐ পুচ্ছ
সকল বাধা শাসন করে তুচ্ছ।
যখন প্রাতে দোয়েলরা দেয় শিষ
কবির কাছে পায় তারা বকশিষ,
সারা প্রহর একটানা এক পঞ্চম স্বর সাধি
লুকিয়ে কোকিল করে কী ওস্তাদি,
সকল পাখী ঠেলে
কালিদাসের বাহবা সেই পেলে।
তুমি কেয়ার কর না তার কিছু,
মানো নাকো স্বরগ্রামের কোনো উঁচুনিচু।
কালিদাসের ঘরের মধ্যে ঢুকে
ছন্দভাঙা চেঁচামেচি
বাধাও কী কৌতুকে।
নবরত্নসভায় কবি যখন করে গান
তুমি তারি থামের মাথায় কী কর সন্ধান।
কবিপ্রিয়ার তুমি প্রতিবেশী,
সারা মুখর প্রহর ধরে তোমার মেশামেশি।
বসন্তেরি বায়না-করা—
নয় তো তোমার নাট্য
যেমন-তেমন নাচন তোমার,
নাইকো পারিপাট্য।

অরণ্যেরি গাহন সভায় যাও না সেলাম ঠুকি,
আলোর সঙ্গে গ্রাম্য ভাষায় আলাপ মুখোমুখি ;
কী যে তাহার মানে
নাইকো অভিধানে,
স্পন্দিত ওই বক্ষটুকু তাহার অর্থ জানে।
ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে কী কর মসকরা,
অকারণে সমস্ত দিন কিসের এত ত্বরা।
মাটির পরে টান,
ধুলায় কর স্নান,
এমনি তোমার অযত্নেরি সজ্জা,
মলিনতা লাগে না তায় দেয় না তারে লজ্জা।
বাসা বাঁধো রাজার ঘরের ছাদের কোণে
লুকোচুরি নাইক তোমার মনে।

অনিদ্রাতে যখন আমার কাটে দুঃখের রাত
আশা করি দ্বারে তোমার প্রথম চঞ্চুঘাত।
অভীক তোমার চটুল তোমার
সহজ প্রাণের বাণী
দাও আমারে আনি
সকল জীবের দিনের আলো
আমারে লয় ডাকি
ওগো আমার ভোরের চড়ুইপাখী।

জোড়াসাঁকো
১১।১১।৪০
প্রাতে

বিবর্ত্তনে যুগ-সন্ধি

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

প্রকৃতির মধ্যে বিবর্ত্তন অর্থাৎ ক্রমপরিণাম চলেছে, এ-সত্যটি আজকাল প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। বিবর্ত্তন বা ক্রম-পরিণাম জিনিসটা কি? অল্প এবং মোটা কথায় ব্যাপারটি হ'ল এই:—বর্ত্তমানে স্থষ্টির যে চেহারা তা চিরকাল এ-রকম ছিল না; শুধু পৃথিবীর কথাই যদি ধরি তবে যত অতীতে যাই দেখি পৃথিবীর রূপ, পৃথিবীর অধিবাসীদের আকার প্রকার সমাবেশ বদলে বদলে চলেছে; এখন দেখছি বটে পৃথিবীটা মানুষে ভরা—অর্থাৎ কোটি কোটি মানুষ রয়েছে—কিন্তু এক দিন ছিল, কয়েক লক্ষ বৎসর মাত্র পূর্ব্বে হয়ত—যখন মানুষ ব'লে কোন জীবের অস্তিত্ব ছিল না—ছিল বড় জোর বনমানুষ আর যত জন্তুজানোয়ার। আরও অতীতে যদি যাই তবে দেখি জন্তুজানোয়ারের মধ্যেও হাতীঘোড়া সিংহব্যাঘ্র কিছু নেই, আকাশে ডানা-ওয়ালা জীব কিছু কিছু দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু ডাঙায় সব বিপুল অতিকায় সরীসৃপ। তারও আগে ডাঙার ভাগই মেলে কম, ডাঙার জীব অতি বিরল—ছিল সব জলজ জীব, মৎস্য কূর্ম্ম বা তাদের পূর্ব্বপুরুষ। আরও বেশী কিছু অতীতে জীবের আর সাক্ষ্য পাই না, পৃথিবীটা কেবল গাছপালা-লতাগুল্মে পরিপূর্ণ। তারও আগে গাছপালা অর্থাৎ সবুজ সজীব ব'লে কিছু নেই—কেবলই চোখে পড়ে জড়পদার্থের, স্থূল-ভৌতিক বস্তুর সমারোহ ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া।

এই কালের প্রবাহে স্তরের পর স্তর, শ্রেণীর পর শ্রেণীর যে একটা ক্রমিক আবির্ভাব হয়েছে তার মধ্যে তিনটি সীমানা বা সন্ধিস্থল খুবই স্পষ্ট—এক মানুষ ও পশুর মধ্যে, দ্বিতীয় পশু বা জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে, তৃতীয় উদ্ভিদ ও জড়পদার্থের মধ্যে। বিবর্ত্তনতত্ত্ব প্রথম বলছে, জড়ের পরে উদ্ভিদ দেখা দিয়েছে, উদ্ভিদের পরে জীবের উদ্ভব হয়েছে, নিম্নতন জীবের বা প্রাণীর পরে মানুষ আবির্ভূত হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন সন্দেহ আর বোধ হয় উঠতে পারে না—কিন্তু বিবর্ত্তনতত্ত্ব আরও বলতে চেয়েছে যে জড়ের "পরে" কেবল নয়, জড় "হ'তে"ই প্রাণ বা উদ্ভিদ জন্ম নিয়েছে, উদ্ভিদের পরে নয় উদ্ভিজ্জ-সত্তা থেকেই জীব প্রকট হয়েছে, আবার ইতর জীব বা জন্তুজানোয়ারের শুধু পরে নয় তাদেরই এক পূর্ব্ব-পুরুষের জঠর হ'তে প্রথম মানুষ ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এই শেষ সিদ্ধান্তটিতে সকলে সব সময়ে সম্পূর্ণ সম্মতি দিয়ে উঠতে পারে না—এর হেতু আছে। বিবর্ত্তনের ধারাটি সাধারণ-ভাবে পুরোপুরি গ্রহণ করলে দাঁড়ায় এই যে জড় পরিবর্ত্তিত হ'তে হ'তে এক সময়ে প্রাণে পরিণত হয়েছে—অক্সিজেন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন, কারবন প্রভৃতি জড় উপকরণ উপাদনের ভিতর হ'তে তখন দেখা দিল শৈবালজাতীয় আদিম উদ্ভিদ; উদ্ভিদ (অবশ্য এখনকার পূর্ণপরিণত বট-অশ্বত্থ কিছু নয়, উদ্ভিদের একটা আদিপুরুষ, তার কয়েক যুগব্যাপী ভ্রূণরূপ) পরিবর্ত্তিত হ'তে হ'তে প্রাণীতে পরিণত হ'ল, সেই রকম আবার প্রাণী বা পশুও পরিবর্ত্তিত হ'তে হ'তে মানুষে পরিণত হল। সুতরাং এখন প্রশ্ন, পরিবর্ত্তনের এইরকম নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা বাস্তবিকই দেখা যায় কি না,—মোটামুটিভাবে হয়ত দেখা যায় কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে নজর দিলে দেখা যায় না, বৈজ্ঞানিকেরা এই কথা বলছেন: পরিবর্ত্তনের ধারায়, স্তরে স্তরে, সত্যাই ফাঁক রয়ে গেছে। প্রথম প্রথম বলা হ'ত এই যে-সব সন্ধির বা সংযোগের নিদর্শন পাওয়া যায় না, তা কালের প্রকোপে নষ্ট হয়ে গিয়েছে কিম্বা হয়ত বা যথেষ্ট অনুসন্ধানের পর ভবিষ্যতে এক দিন মিলবে—এ শেষোক্ত আশা এ পর্য্যন্ত যথেষ্ট ফলবতী হয় নি, আর প্রথমোক্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য, ঠিক সন্ধিস্থলগুলিই নষ্ট হয়ে গেল কোন্ বিধানের বশে? বহু অন্বেষণ-বিশ্লেষণ-পরীক্ষণের পর "মিসিং লিঙ্ক"এর কাছাকাছি অনেক কিছু আবিষ্কার হল বটে, কিন্তু ঠিক ঠিক জিনিসটি আর পাওয়া যায় না।

সমস্যা এই, জড় ও উদ্ভিদের মধ্যে এমন কিছু পদার্থ আছে কি যা সম্পূর্ণ জড়ও নয় সম্পূর্ণ উদ্ভিদও নয়,

কিছু জড় কিছু উদ্ভিদ? তা ত ঠিক দেখি না। জড়ে প্রাণ যখন দেখা দিয়েছে তখন উভয়ের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছে। উভয়ের মধ্যে ক্রমিক পৈঠা কিছু নাই। সেই রকম আবার উদ্ভিদও ক্রমে যখন প্রাণীর স্তরে উঠে দাঁড়িয়েছে তখন উদ্ভিদ ও প্রাণীর ধর্ম্ম যুগপৎ মিলেমিশে আছে এমন সত্তা পাওয়া যায় কি? এখানেও সেই একই উত্তর। প্রাণীর আর মানুষের মধ্যবর্ত্তী কোন জীব সম্বন্ধেও অন্য উত্তর নেই মনে হয়।

সব চেয়ে পুরানো মানুষের যে নমুনা পাওয়া গিয়েছে, আর সব চেয়ে পরে যে বন-মানুষ দেখি, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য অনেক আছে বটে—শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে কিন্তু তবুও মানুষ মানুষ, আর বন-মানুষ বনমানুষ, পার্থক্যটা রয়ে গেছে। যে বা-নর থেকে নরের উদ্ভব হয়েছে, তার যে বুদ্ধিশক্তি নেই তা নয়, এমন কি বুদ্ধির চাতুর্য্যে মানুষকে দু-এক ক্ষেত্রে সে হারিয়েও দিতে পারে—তবুও তার নেই একটি জিনিস, তাই সে পশু আর সে জিনিস আছে ব'লেই মানুষ মানুষ (সে-জিনিসটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, তা হ'ল আত্মসম্বিৎ—নিজেকে নিজে দেখা)। বৈজ্ঞানিকেরা তাই বাধ্য হয়ে মানুষকে মূলতঃই একটা পৃথক শ্রেণীর অন্তর্গত করেছেন (homo sapiens—সজ্ঞান মানুষ)—তার নিকটস্থ যে-শ্রেণী তার নমুনা "নেয়াণ্ডারটাল" মানুষ, সে বন-মানুষেরই সামিল।

এখানে আরও একটি কৌতূহলের ব্যাপার আছে। কোন্ বিশেষ বন-মানুষ হতে যে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে, বৈজ্ঞানিকেরা তা আবিষ্কার করতে পারেন নি। তাঁরা বলেন একই বংশের ধারায় পিতাপুত্রানুক্রমের মত এক-টানা সোজা রেখায় বিবর্ত্তন চলে না। নূতন একটি প্রাণীর জন্ম হল একটি নির্ব্বাচন-প্রক্রিয়া; মূল একটি শ্রেণীর বীজ হ'তে অনেকগুলি রূপভেদ দেখা দেয়, তাদের ভিতর থেকে একটি হয় নূতনের জন্মদাতা। কিন্তু আরও আশ্চর্য্যের কথা হল এই যে সময়ে সময়ে এমনও হয় যে, যে-রূপভেদটি সব চেয়ে দূরের, যার সঙ্গে সাদৃশ্য সবচেয়ে কম ঠিক তা হ'তেই নূতনের জন্ম। অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে মানুষের বেলায় ঠিক এই রকম ঘটেছে। সুতরাং এখানে পশু ও মানুষের সন্ধিস্থলে ফাঁকটা খুব বড়রকমেরই রয়ে গেছে—প্রকৃতি এখানে সত্যসত্যই উল্লম্ফন দিয়েছেন।

তার পর অর্থাৎ তার আগে পশু বা জীব ও উদ্ভিদের সন্ধিস্থলটি ধরা যাক। পশুস্তরের সবচেয়ে নিম্নতন প্রাণী, জীবের প্রথম প্রকাশ হ'ল জীবাণু বা রোগবীজাণু জাতীয় সত্তা—উদ্ভিজ্জাণুর সঙ্গে তার পার্থক্য আছেই। এক আদি জীব যা উদ্ভিদের খুব কাছাকাছি তা হ'ল স্পঞ্জ। বহুদিন স্পঞ্জকে উদ্ভিদজাতীয় বলেই ধরা হয়েছিল; কিন্তু আরও অভিনিবেশের সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণের পর দেখা গিয়েছে যে, স্পঞ্জ প্রাণীই, উদ্ভিদ নয়, তার ডিম আছে, তার শিশুরূপ আছে (larva)-এ সব প্রাণীরই বৈশিষ্ট্য।* স্পঞ্জেরই মত বোধ হয়, মনে হয় একই জাতির বুঝি, আমাদের ব্যাঙের ছাতা (কালিদাসের "শিলীন্ধ্র") অথচ তা হ'ল উদ্ভিদ। উদ্ভিদের শেষ আর প্রাণীর অগ্র, এ উভয়ে অনেকখানি সাদৃশ্যের, ঐক্যের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও রয়েছে একটা বিচ্ছেদ।

আরও নীচে নেমে গেলে, নিরীক্ষণ করি যদি জড় ও প্রাণের সংযোগস্থল, তবে সেখানে এই বৈষম্য ও বৈরূপ্য বেশ পরিস্ফুট। প্রাণের প্রথম রূপ হ'ল জৈবসার (protoplasm); আর জড়, স্থূলভূত ঐ দিকে পরিবর্ত্তিত হ'তে হ'তে শেষে যে রূপ গ্রহণ করে তা হ'ল লেহ (colloid) ও শ্বেতসার (albumenoid)। কিন্তু লেহ বা শ্বেতসার কখন কবে কি রকমে যে জৈবসারে রূপান্তরিত হয় তার ইতিহাস পাওয়া যায় না।

তাই বর্ত্তমানের সিদ্ধান্ত এই, প্রকৃতি সাধারণতঃ হেঁটে হেঁটে খুব সম্ভব চলেন, কিন্তু মাঝে মাঝে আবার লম্ফ-প্রদানও করেন। ছোটখাট উল্লম্ফন প্রায়ই ঘটেছে—তার ফলে হয় শ্রেণীর বা জাতির মধ্যে নূতন রকমের বিশেষ বিশেষ বৈচিত্র্যের উদ্ভব। এমন কি এ ধরণের মতবাদও দেখা দিয়েছে যে প্রকৃতির গতি টানা-রেখায় আদৌ চলে না, পদে পদে উল্লম্ফন অর্থাৎ প্লুতগতিই হ'ল

* এ বিষয়ে আরও বিশদ বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। মতানৈক্যও আছে। তবে আমার প্রমাণ হলেন J. A. Thomson: *Biology for Everyman.*

তার স্বাভাবিক স্বধর্ম্ম। তবে এ সকলের মধ্যে তিন (বা চারিটি) উল্লম্ফন খুব বড় রকমের হয়েছে, যার ফল কেবল জাতির পরিবর্ত্তন নয়, একটা জগতেরই রূপান্তর, তা হ'ল বিবর্ত্তনের এক পৈঠা হ'তে আর-এক পৈঠায় উত্তরণ। এই রকমে জড়ের মূল গড়ন ও গতি সম্বন্ধে আজকাল যে কণা-সমাহার-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সঙ্গে প্রাণশক্তির মূল গড়ন ও গতি স্বাজাত্য অর্জ্জন করেছে। যা হোক, বিবর্ত্তনের আকস্মিক পরিবর্ত্তন ও বিপর্য্যয় এনেছে প্রথম জড় যখন প্রাণবস্তুতে পরিণত হয়েছে, তার পর দ্বিতীয় বিপর্য্যয় ঘটেছে যখন প্রাণবস্তু আবার মানসবস্তুতে পরিণত হয়েছে, তৃতীয় বিপর্য্যয় ঘটেছে মন যখন বুদ্ধিতে পরিণত হয়েছে—প্রথমে ধাতুপ্রস্তর, তার পর গাছপালা, তার পর জন্তু, সর্ব্বশেষে মানুষ।

এই ব্যাপারটি যে ঘটেছে তাতে বোধ হয় আর সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু সমস্যা রয়ে গেছে কি উপায়ে, কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করে তা ঘটেছে? বিবর্ত্তনের, অন্ততঃ জৈব বিবর্ত্তনের, হেতু বা প্রেরণা হিসাবে একটি তত্ত্ব বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করা হয়, তাকে নাম দেওয়া হয়েছে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন। কথাটির অর্থ এই। সৃষ্টির মধ্যে একটা লড়াই চলেছে—প্রত্যেক সত্তাকে লড়াই করতে হয় প্রত্যেক সত্তার সঙ্গে, বিশেষভাবে তার স্বজাতীয় সত্তার সঙ্গে। আর তার পারিপার্শ্বিকের—অর্থাৎ শীতগ্রীষ্ম জলবায়ু আহার-বিহার প্রভৃতির—প্রয়োজন ও দাবি মিটাবার উপযোগী দেহগত ও অবস্থাগত ব্যবস্থা যে পাত্রের যত সুষ্ঠু হয়েছে আর এ সব বিষয়ে নিজের জন্য যথাযোগ্য ও যথেষ্ট অধিকার লাভ করতে হ'লে পরের সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী প্রতিযোগে যে যত প্রকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র (নখদন্তছল ছলচাতুরী ইত্যাদি) অর্জ্জন করেছে সে এবং তার বংশের যে সন্তান-সন্ততি এই আনুকূল্য বজায় রাখতে বা বাড়িয়ে তুলতে পেরেছে তারাই জীবনসংগ্রামে জয়ী হয়ে বর্ত্তে থাকে। কিন্তু বিবর্ত্তনের পদ্ধতি সম্বন্ধে এই যে সিদ্ধান্ত তা বিবর্ত্তনের সবটুকু রহস্য, তার মর্ম্মগত সত্যটি ব্যক্ত করে কি না সন্দেহ। প্রথমতঃ জীবনে সংগ্রাম আছে কিন্তু তাই ব'লে সংগ্রাম ছাড়া আর যে কিছু নাই তা বলা চলে না। সম্মিলন সাহচর্য্য জিনিসটি সমান মাত্রায় দেখা যায়। নিম্নতর জীবসৃষ্টির স্তরেও বৈজ্ঞানিকেরাই আজকাল এই সত্যটির অপরূপ অদ্ভুত উদাহরণ সব আবিষ্কার করেছেন। তার পর "যোগ্যতমে"রই উদ্বর্ত্তন হয় কেবল? সাধারণ দৃষ্টিতে কত অযোগ্যেরই উদ্বর্ত্তন হয়েছে দেখি না কি? বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তনবাদের যোগ্যতা অর্থ ত শারীরিক যোগ্যতা, জীবনধারণের যোগ্যতা। বলা হয় বিবর্ত্তনের শেষ ধাপ হ'ল মানুষ। মানুষ তবে কি নিজেকে যোগ্যতম বলে প্রমাণ করতে পেরেছে, শুধু এই কারণে যে সে হ'ল আদর্শ লড়াইয়ে, যাবতীয় নখী-দন্তী-"ছলী"কে ছলেবলে-কৌশলে হারিয়ে হটিয়ে দিয়ে একচ্ছত্র রাজত্ব স্থাপন করেছে?

অনেক মনীষীর মত তাই এই যে, মানুষের তথাকথিত যোগ্যতা তার আত্মপ্রসাদলাভের জন্য একটা ধারণা বা কল্পনামাত্র। অনেক ইতর প্রাণীর মধ্যে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য হিসাবে, অন্য প্রতিযোগীদের সঙ্গে সংগ্রামের দিক্ দিয়ে যতখানি যোগ্যতা আছে মানুষের ততখানি আছে কি না সন্দেহ। অনেক কীট, অনেক উদ্ভিদ—পৃথিবীতে সজীব সত্তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সুদূর অতীতে যারা দেখা দিয়েছে তারা (অর্থাৎ তাদের বংশধর)—প্রায় অপরিণত অপরিবর্ত্তিত আদিম রূপেই আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তে গিয়েছে—মানুষের সঙ্গে সঙ্গে তারাও তবে যোগ্যতম? ব্যাপারটি আসলে তবে তা নয়। বিবর্ত্তনের চিত্র থেকে বড় জোর এই কথা বলা যেতে পারে যে সৃষ্টির মধ্যে চলেছে একটা ক্রমিক ঊর্দ্ধায়ন—যোগ্যতার হিসাবে নয়—তা হল নবতর ঊর্দ্ধতর মহত্তর তত্ত্বকে ধরে ধরে পার্থিব আয়তনের নবতর ঊর্দ্ধতর মহত্তর সংগঠন। এ যেন একটা সোপানাবলী বা আরোহণী—উপরে উঠে চলেছি, কিন্তু নীচের পদের উপর দাঁড়িয়ে, ভর ক'রে। নবতর উচ্চতর একটা ক্রম বা পদবী দেখা দিল, প্রতিষ্ঠিত হ'ল কিন্তু নিজের মধ্যে সে নীচের ক্রমগুলি বা পদবী গ্রহণ করলে, তুলে ধরলে পরিবর্ত্তিত ধরণে, তাদের বিসর্জ্জন দিলে না। জড় থেকে প্রাণ দেখা দিল—এই প্রাণতত্ত্বকে ধরে প্রাণী নামে এক নূতন সংগঠন হ'ল, কিন্তু সেখানে জড় প্রতিষ্ঠা হিসাবে আছে, জড়ের মধ্যে প্রাণ অনুস্যূত, জড় সেখানে পেয়েছে একটা নূতন ধর্ম্ম ও ক্রিয়া। সেই

রকম মন (বা মনবুদ্ধি) যখন ফুটে উঠল, তার মধ্যে প্রাণ ও জড় উন্নীত হ'ল, লাভ করল আবার নূতনতর ধর্ম্ম ও ক্রিয়া—এই সমবায় গড়ল মানুষ নামক জীবকে।

বিবর্ত্তনের যথাযথ উদ্দেশ্য তবে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন নয়—তা হ'ল চেতনার ক্রমবিকাশ, চেতনার উচ্চ হ'তে উচ্চতর সংগঠন। জড় হ'তে মানুষ পর্য্যন্ত যে একটি ক্রমান্বয় চলে এসেছে তার ভিতরকার সূত্র হ'ল এই চেতনা—জড়ে চেতনা সুপ্ত, প্রাণের প্রথম পদে, উদ্ভিদে, চেতনা স্বস্থ, প্রাণের দ্বিতীয় পদে—মনের স্পর্শ যে প্রাণ পেয়েছে সেখানে, প্রাণীর মধ্যে, চেতনা অর্দ্ধজাগ্রত, মনবুদ্ধির মানুষের চেতনা পূর্ণ জাগ্রত। বুদ্ধি, মন, প্রাণ, জড় এই রূপচতুষ্টয়ে চেতনার চতুর্ব্বিধ অবস্থা—জলের যে রকম কঠিন, তরল ও ধূমল (এবং শেষে বৈদ্যুতিক) অবস্থা সেই রকম।

বিবর্ত্তনের বিভিন্ন স্তরসন্ধিতে যে একটা ফাঁক বা সংযোগের অভাব আমরা উল্লেখ করেছি তার অর্থ বা ব্যাখ্যা এবার আমরা পাব। বরফ যখন জলে পরিণত হয় তখন উভয়ের মধ্যে একটা সেতু নেই, বরফ নরম হ'তে হ'তে ক্রমে জলে রূপান্তরিত হয়েছে ব্যাপারটি এ-রকমের নয়—শক্ত যে জিনিষ ছিল হঠাৎই সে তরল হয়ে পড়ল। আবার জল যখন বাষ্পে পরিণত হয় সেখানেও দেখি একটা আকস্মিক পরিবর্ত্তন—জল গরম হ'তে হ'তে এমন এক জায়গায় বা অবস্থায় গিয়ে পৌছে (সেটা তবুও জলীয়) যে তখন সে হঠাৎ বাষ্পীয় আকার ধারণ ক'রে বসে, দুইয়ের মধ্যে কোন উভয়পদী অবস্থা নাই। ঠিক সেই রকম জড় ও উদ্ভিদের মধ্যে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে, প্রাণী ও মানুষের মধ্যে এক একটা ছেদ, ফাঁক, আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

আদিতে জড়। জড়ের অন্তরে একটা তাপন ও পাচন ক্রিয়া চলছিল, তার তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতা এমন একটা বিশেষ মাত্রায় গিয়ে পৌছল যে তার ভিতর থেকে তখন নিঃসৃত হয়ে এল প্রাণস্পন্দন। প্রাণশক্তি বা জীবনীশক্তি জড়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন লীন সুপ্ত ছিল; একটা মন্থনের ও উর্দ্ধায়নের ফলে সে প্রকট হ'ল। তলা থেকে, নীচে থেকে গুপ্ত চেতনার চাপে জড়ের কোষ ফেটে, মুক্ত করে দিল প্রাণকে। চেতনা তার জড়ময় রূপ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে প্রথমে প্রাণময় রূপ গ্রহণ করলে। জড়ের মধ্যে নিভৃত চেতনার চাপে প্রাণশক্তি চারদিকে উৎসারিত বিচ্ছুরিত হ'তে লাগল শত সহস্র রূপ নিয়ে—স্থূলে তার ফল উদ্ভিদ জগৎ। উদ্ভিদের মধ্যে প্রাণময় জড় সক্রিয় হয়েছে আপনাকে নব নব আকারে নব নব ধারায় সৃষ্টি করতে, গঠন করতে—পশ্চাতে অন্তঃস্থ চেতনার চাপ প্রসারের দিকেও যেমন উপরের দিকেও তেমনি প্রযুক্ত হয়েছে; এই উর্দ্ধমুখী চাপের ফলে প্রাণময় জড় থেকে আবার চেতনার এক নূতন মূর্ত্তি দেখা দিল - প্রাণকোষ ফেটে বের হয়ে এল সংজ্ঞা, সংবেদনা—হ'ল প্রাণীর আবির্ভাব; এই সংজ্ঞা, সংবেদনা বা আদি-মনকে ঘিরে প্রাণ ও জড় লাভ করল নূতন এক গড়ন। এই আদি-মনের আবার চলতে লাগল সংমার্জ্জন ও সংবৃদ্ধি—পিছনকার চেতনার চাপ নিরন্তর রয়েছে, সে থেমে থাকে না, থামতেও দেয় না—আদি-মন থেকে নিঃসৃত হ'ল বুদ্ধি, আত্মসম্বিৎ, তকে ঘিরে মন প্রাণ দেহ পেল যে নব রূপায়ন তারই নাম মানুষ।

আরও প্রশ্ন আছে, আরও রহস্য আছে। বলা হ'ল চেতনা সুপ্ত গুপ্ত লুপ্তপ্রায় হয়ে আছে সত্তার অতলে, সেখান থেকে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে জেগে উঠে আসতে থাকে, তার পর আত্মোন্মীলন আত্মপ্রকাশ স্তরে স্তরে স্ফুটতর হয়ে ওঠে। প্রশ্ন, এ চেতনাটি কোথা হ'তে এল—উপরে উঠে চলবার প্রেরণা কেমন ক'রে পেল? রহস্য হ'ল এই যে, চেতনা সর্ব্বদাই একটা উর্দ্ধের জিনিষ, তার স্বরূপ রয়েছে একটা পরম পদে; এই পরম পদ, এই উর্দ্ধতন স্তর হতে চেতনা ক্রমে নেমে এসেছে, আপনাকে ঢেকে ঢেকে চলেছে, শেষে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে ফেলেছে যেখানে তারই নাম জড়। তা হ'লে ব্যাপার এই, বিবর্ত্তন যে যে ক্রম ধরে উঠে চলেছে, ঠিক সেই সেই ক্রম ধরেই একটা নিবর্ত্তন বা অবতরণ তার আগে রয়েছে। চেতনার স্বাভাবিক অবস্থা, তার স্বরূপ হল পূর্ণতম চেতনা, যাকে বলা যেতে পারে অতি-চেতনা (কারণ, মানুষের সাধারণ চেতনা অতিক্রম করে সে রয়েছে)। এ চেতনা নিম্নাভিমুখী হয়েছে—একটা বিচিত্র বহুমুখী সৃষ্টির জন্য—

ঋগ্বেদের "নীচীনাঃ স্থ্যঃ" বা গীতা ও উপনিষদের "অবাক্‌শাখং"। এই নিম্নগামী পথে চেতনা আপনাকে খণ্ডিত স্বল্প আচ্ছন্ন ক'রে চলেছে—অতিচেতনা এক সময়ে মানসতত্ত্বে পরিবর্ত্তিত হয়েছে, তখন সৃষ্টি হয়েছে মনোময় জগৎ; মনোময় তত্ত্ব থেকে চেতনা যখন আরও আত্মবিস্মৃত রজোতামস হয়েছে তখন সে প্রাণতত্ত্বে পরিণত হয়েছে ও প্রাণময় জগৎ সৃষ্টি করেছে, তার পর চেতনা যেখানে নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলেছে, পূর্ণ তামস হয়েছে সেখানে জড়ের—জড়তত্ত্বের ও জড়গতের উদ্ভব। এই গেল চেতনার "নিবর্ত্তনে"র ক্রমসঙ্কোচনের ধারা—তারপর বিবর্ত্তনের ক্রমবিকাশের ধারা। চেতনা এই রকমে উচ্চ হতে নীচে এসে পড়েছে বলেই ত আবার তাকে নীচে হ'তে উপরে উঠতে হচ্ছে।

উপরে হ'তে চেতনা যে নীচে নেমে এসেছে সে ধারা হ'ল প্রচ্ছন্ন, সেটি রয়েছে যেন পিছনের দিকে, একই অন্তর্লোকে—জড় জগৎ যখন প্রকাশ পেল এবং জড় জগৎ যখন বিবর্ত্তিত হয়ে চলল তখন তার লক্ষ্য ও প্রয়াস হ'ল পিছনে প্রচ্ছন্ন যে তত্ত্ব রয়েছে তাকে ক্রমে বাহিরে জাগ্রত প্রকট করা—প্রথমে জড়ের মধ্যে, জড়কে প্রতিষ্ঠা করে, তার পর সেই জড়কেই মূল বনিয়াদ করে একটির পর আর একটি তত্ত্ব বাহিরে প্রকট করে, সেই জড়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত সজ্জিত করা। অন্য কথায়, নিবর্ত্তনে পৃথক পৃথক তত্ত্বের অবরোহ সৃষ্টি হয়েছিল; বিবর্ত্তনের পদ্ধতি হ'ল সেই সেই তত্ত্বে—বিপরীত দিক্ হ'তে, পুনরায় আরোহণ ত বটেই অধিকন্তু যতটিতে আরোহণ করা যায় সবগুলিতেই যুগপৎ অধিষ্ঠিত থাকা এবং উর্দ্ধতমের ধর্ম্মে নিম্নতরদের নিয়ন্ত্রিত রূপান্তরিত করা।

নিবর্ত্তনের ধারায় যে-সব স্তর বা তত্ত্ব সৃষ্ট হয়েছিল বিবর্ত্তনের ধারায় তাদের ক্রিয়া এখন আমরা বুঝতে পারব। নীচের চেতনার চাপে জড় উর্দ্ধমুখী হয়ে উঠছে প্রাণের দিকে (অন্য কোন দিকে যে নয়) তার কারণ প্রাণ-তত্ত্ব আগে হ'তেই জড়ের উপরে রয়েছে, এবং জড়ের মধ্যে নেমে প্রকট হ'তে সচেষ্ট। সেই রকম প্রাণ যখন বের হয়ে নেমে এল, জড়কে অধিকার করল, তার গতি হ'ল মনের দিকে উঠতে, কারণ প্রাণের উপরে মন আগে হ'তেই রয়েছে, সে মনও নেমে আসতে প্রকট হ'তে চায়। সুতরাং বিবর্ত্তনগত রূপান্তরের প্রণালীটি হ'ল এই যে এক দিকে নীচে থেকে চাপের, উর্দ্ধপ্রবেগের ফলে জিনিষ বদলে বদলে চলেছে আর অন্য দিকে সম্পূর্ণ রূপান্তর, একটা বিপর্য্যয় ঘটেছে তখন যখন উপর থেকে একটা তত্ত্ব নেমে সেই উর্দ্ধায়িত বস্তুকে আশ্রয় করেছে। লক্ষ্য করবার বিষয় নীচের চাপে জিনিস যে বদলায় তা ঘটে ধীরে ধীরে, ধারাবাহিকভাবে কিন্তু যে মুহূর্ত্তে উপর হ'তে কিছু নেমে আসে তখনই ধারাবাহিকতা কেটে যায়, আসে যাকে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন "প্রকৃতির উল্লম্ফন।"

বিবর্ত্তনের যুগসন্ধিতে যে ফাঁক দেখা যায় তা অনিবার্য্য ও স্বাভাবিক। কারণ বিবর্ত্তনের ক্রমপরিবর্ত্তনের মধ্যে রয়েছে একটা অবতরণ—এই জন্যই হয় হঠাৎ পরিবর্ত্তন। প্রকৃতির যে অর্জ্জিত রূপ-ধর্ম্ম তার অদলবদল নানা রকমে চলে তার অন্তরের প্রবেগের ফলে কিন্তু প্রকৃতি নূতন পর্য্যায়ের রূপ, নূতন পর্য্যায়ের ধর্ম্ম তখনই অর্জ্জন করে যখন তার মধ্যে অবতীর্ণ হয় উর্দ্ধতর—নূতন রূপের ও নূতন ধর্ম্মের একটা লোক।

অবশ্য আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখা যায় যে নীচের দিক্ হ'তে যেমন অবিরল এক চেষ্টা চলেছে উর্দ্ধমুখী পরিবর্ত্তনের জন্য, তেমনই উপরের দিক্ হ'তেও প্রতিনিয়ত নেমে আসছে একটা চাপ, একটা আভাস, একটা প্রভাব। ঋগ্বেদীয় ঋষি এই গুহ্য সত্যের দিকে লক্ষ্য করেই বলেছেন বোধ হয় যে নীচ ধরে আছে উপরকে আবার উপর ধরে আছে নীচকে—"অবঃ পরেণ পর এনাবরেণ।" তবে উপরের একটা বস্তু-তত্ত্ব যখন স্বরূপে নেমে আসে, অবতীর্ণ হয়, তখনই ঘটে বিবর্ত্তনে একটা যুগান্তর ও ক্রমান্তর।

অধ্যাত্মদ্রষ্টারা বলেছেন যে বর্ত্তমানে জগৎ, পৃথিবী আবার একটা যুগসন্ধিতে উপস্থিত হয়েছে। মনোময় পুরুষ মানুষে পূর্ণতা লাভ করেছে, মনের শিখরে মানুষ উঠে দাঁড়িয়েছে, তার আগ্রহ আস্পৃহা উর্দ্ধতর বৃহত্তর কিছুর দিকে প্রসারিত—তাই এখন সময় হয়েছে, মনের উপরে রয়েছে যে অতিমানসতত্ত্ব, তারই অবতরণ হবে এবার মানুষেরই রূপান্তরের ফলে—বা অন্য উপায়ে—এবং পৃথিবীতে দেখা দেবে মানুষের অপেক্ষা পূর্ণতর এক জীব—অতিমানস বা চিন্ময় জীব।
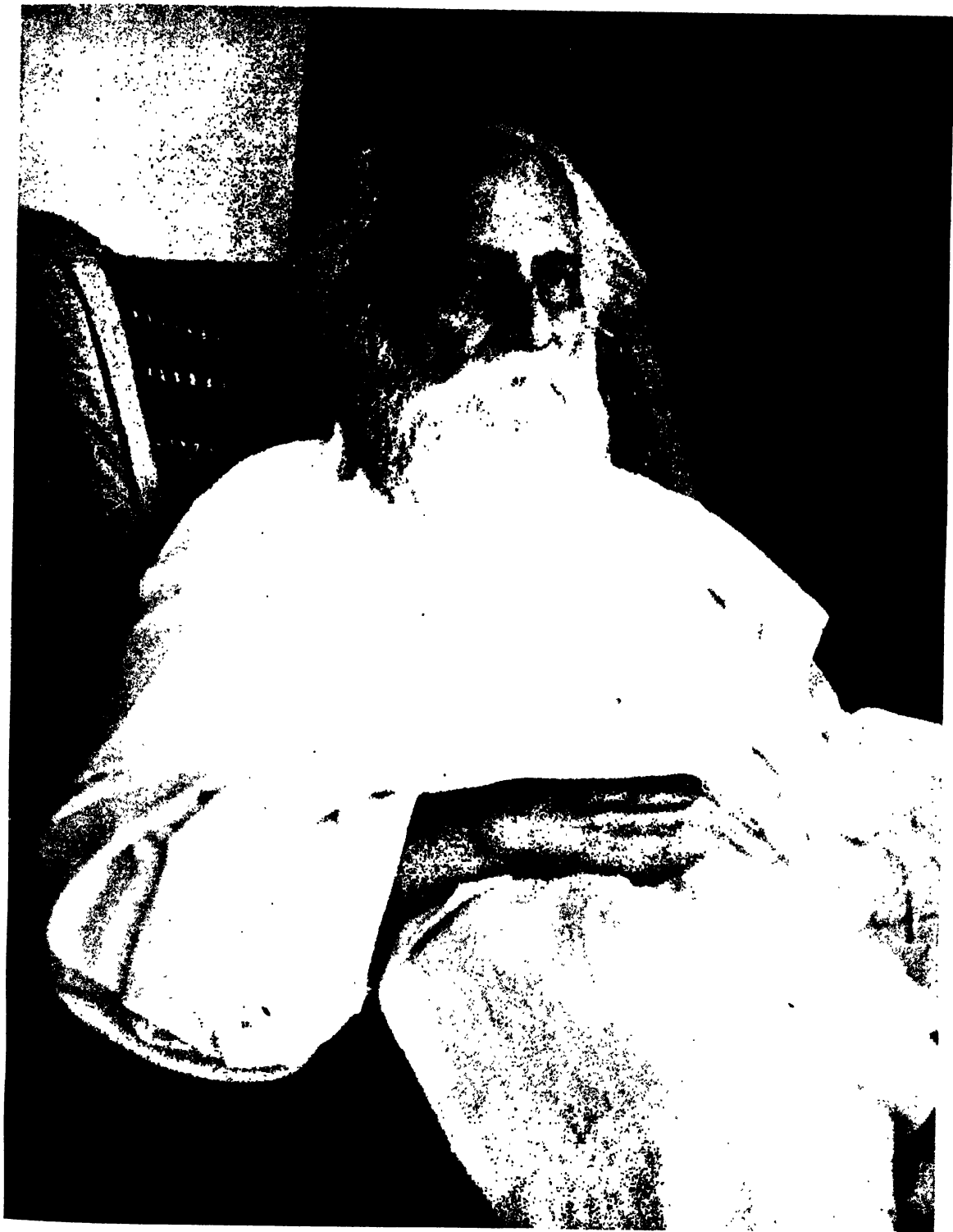
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১ অগ্রহায়ণ ১৩৪৭ তারিখে ডক্টর সত্যনারায়ণ সিংহ কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে

নীলাঙ্গুরীয়

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

তরুর ঠাস-বোনা রুটিনের মধ্যে আমার জায়গা ঠিক হইয়া গেছে। কাজ বেশ নিয়মিত ভাবে চলিতেছে। ওদিকে কলেজে নাম লিখাইয়া লইয়াছি। প্রচুর অবসর রহিয়াছে; পড়াশুনা যদিও ঠিকমত আরম্ভ করি নাই, তবু আয়োজন চলিতেছে।

প্রচুর অবসর, কেন না পাঁচটার পূর্বে তরুর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ থাকে না। সকালে তাহার সেই লক্ষ্মী-পাঠশালা, দুপুরে লরেটো, তাহার পর ঘণ্টাখানেক বৈষ্ণব-সংগীত। কীর্তনের মাষ্টার চলিয়া গেলে তরুর ভার আমার উপর পড়ে। প্রথমেই ওকে মোটরে করিয়া বেড়াইতে লইয়া যাইতে হয়। কোন দিন ইডেন গার্ডেনস্, কোন দিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কোন দিন অন্য কোথাও। এর মধ্যে দুই দিন কলিকাতার বাহিরেও হইয়া আসিয়াছি—এক দিন দমদমার দিকে, এক দিন বটানিক্যাল গার্ডেন্স্। এই মোটর-অভিযানে তরুর প্রয়োজনের চেয়ে আমার নিজের সখের দিকটাই বেশি করিয়া দেখিতেছি আমি,—এ সত্যটুকু গোপন করিয়া কি হইবে? আমি একটু ভ্রমণবিলাসী, মাঝের চারটে বৎসর আমার জীবনের এই শ্রেষ্ঠ ব্যসনটিকে যেন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। মুক্তি পাইয়া, মুক্তির সঙ্গে সুযোগ পাইয়া সে যেন অন্ধ আবেগে ডানা মেলিয়া দিয়াছে।

আর একটা কথা—এর মধ্যে এক দিন মীরা সঙ্গে ছিল, বরাবরই নির্বাক, বোধ হয় বার-তিনেক তরুর সঙ্গে এক-আধটা কথা কহিয়া থাকিবে, আর একবার শোফারকে একটা হুকুম; আমার সঙ্গে একটাও কথা হয় নাই। কিন্তু ও যে পাশে ছিল, সেই বা কি এক অপূর্ব অনুভূতি! তাহার পর রোজই বেড়াইতে যাইবার সময় একবার ফিরিয়া বাড়িটার দিকে চাহিতাম—একটা আশা যদি উপর থেকে কেহ বলে, "তরুদিদি একটু থেমে যেও, বড় দিদিমণি বোধ হয় যাবেন ওদিকে।"...মোটরের পা-দানিতে পা তুলিতে দেরি হইয়া যাইত।

বেড়াইয়া আসিয়া একটু এদিক ওদিক করিয়া তরু আসে পড়িতে। পড়িবার নির্ধারিত সময় দুই ঘণ্টা। পড়ার মাঝে মাঝে গল্পগুজব সাঁদ করাইয়া তরু যে সময়টুকু আত্মসাৎ করে সেটার হিসাব করিলে তরু বোধ হয় বইয়ে দেয় ঠিক ঘণ্টাখানেক সময়। কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিমতী মেয়ে,—ওইতেই ওর পড়া হইয়া যায়, তা ভিন্ন লরেটোর পড়াইবার পদ্ধতিও এমন চমৎকার যে পাঠ গ্রহণ করিবার সময়ই বোধ হয় ওর অর্ধেক পড়া হইয়া গিয়া থাকে। লক্ষ্মী-পাঠশালায় পড়ার বিশেষ হাঙ্গাম নাই,—স্তব, পূজাপদ্ধতি, সব ওইখানেই সারে; খান দুই-তিন হালকা বাংলা বই আছে, দেরি হয় না।

তরু দু-এক দিন নিজের পদ্ধতিতে প্রশ্ন করিল, "মাষ্টার মশাই, শুনেছেন?"

জিজ্ঞাসা করি—"কি?"

"দিদি এইবার এক দিন আসবেন বলেছেন—দেখতে যে আপনি কেমন পড়াচ্ছেন।"

বলি—"বেশ ভাল কথাই ত।"

লক্ষ্য করিয়াছি কথাটা বলিয়াই তরু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চায়। "ভাল কথাই ত" বলা সত্ত্বেও আমার মুখটা যে একটু মলিন হইয়া ওঠে সেটা ওর দৃষ্টি এড়ায় না। একদিন বলিয়াও ফেলিল ভিতরের কথাটা। হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া গেল এবং পরদার বাহিরে একটু মুখটা বাড়াইয়া দেখিয়া লইয়া ফিরিয়া আসিল; তাহার পর কুণ্ঠিত চাপা গলায় প্রশ্ন করিল, "একটা কথা বলছি মাষ্টার-মশাই, কিন্তু বলুন কারুখ্যে বলবেন না কক্ষনও..."

ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "কথাটা যদি এমনই গোপনীয় ত বলে কাজ নেই তরু,—বলতে হয় না অত গোপনীয় কথা।"

বাধা পাইয়া তরুর মুখের দীপ্তিটা যেন নিবিয়া গেল। অপ্রতিভ ভাবে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "না, সে কখন বলবও না আমি।"

পড়িতে লাগিল। কিন্তু বেশ বুঝিতেছি তরু অভিনিবিষ্ট হইতে পারিতেছে না পড়ায়, কথাটা ওর পেটে গজগজ করিতেছে। চিরন্তনী নারীরই ত একটি টুকরা তরু—পেটে কথার ভার বহন করিবে কি করিয়া বেচারি?

মনে মনে হাসিয়া ওর অবস্থাটা উপভোগ করিতেছি, তরু হঠাৎ পড়া বন্ধ করিয়া মুখটা তুলিয়া হালকা তাচ্ছিল্যের সহিত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, কি আর এমন লুকনো কথা মাষ্টারমশাই? লুকনো হ'লে কখন বলত দিদি—বলুন না?"—এবং পাছে আবার কোন বাধা উপস্থিত হয় সেই ভয়ে এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গেল, "দিদি বলে—'পড়া দেখতে আসব বললে মাষ্টার-মশাইয়ের মুখটা কি রকম হয় লক্ষ্য ক'রে বলিস ত তরু।'...আমি গিয়ে বলি। দিদি তাতে বলে—'করুন রাগ তোর মাষ্টার-মশাই, আমি যাব এক দিন। ...সাবধান থেক তরু, যদি দেখি ফাঁকি দিচ্ছ!' ...দিই ফাঁকি আমি মাষ্টার-মশাই?"

"না, পড় দিকিন।"

পর্যবেক্ষণ!...মনে একটা গ্লানি জমিয়া ওঠে। মীরার এই দম্ভ, এই মুরুব্বিয়ানাটা বরাবর হজম করিয়া যাইতে হইবে? ...ব্যারিস্টার রায় নাই, মন্দ লাগিতেছে না; কিন্তু এই রকম সময়ে কামনা করি তিনি আসিয়া পড়ুন অবিলম্বে,—যদিও তিনি শত বিভীষিকায় ভীষণ, তবুও! নিজের মনেই ব্যঙ্গ করিয়া বলি, "এ সম্রাজ্ঞী রিজিয়ার আস্ফালন আর সহ্য হয় না।"

এমন সময় মীরা এক দিন আসিয়াই পড়িল। অপর্ণা দেবীর ঘরে যেদিন ইচ্ছা না থাকিলেও প্রচ্ছন্নভাবে ওদের আদর-আবদারের খেলা দেখি, তার ঠিক চার দিন পরে। বোধ হয় এ ঘটনাটুকুর সঙ্গে আমার সম্বন্ধও ছিল, কেন না আমার "মনিব" মীরা সেদিন আমার কাছে একটু খেলো হইয়া পড়িয়াছিল। যদিও অপর্ণা দেবী মিথ্যা বলিয়াও অনেকটা সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই ক্ষতিটুকু না পূরণ করিয়া লইলে আমি বশে থাকিব কি করিয়া?

মনে মনে ব্যঙ্গ করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রবেশ করিলও ঠিক সম্রাজ্ঞী রিজিয়ার মতই। প্রথমে রাজু বেয়ারা পর্দার ভিতরে মুখটা বাড়াইয়া বলিল, "বড়দিদিম'ণ আসছেন মাষ্টারমশা।" অর্থাৎ কায়দামাফিক অ্যানাউন্স করিল আর কি; তাহার পর পর্দাটা তুলিয়া ধরিল; মীরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল।

মীরা সাজিয়া আসিয়াছে। একটা খুব হাল্কা চাঁপা-ফুলের রঙের শাড়ী পরিয়াছে, গায়ে ঐ রঙেরই একটা পাতলা পুরো-হাতা ব্লাউস মণিবন্ধের কাছে ঝালরের মত করিয়া কাটা, তাহার মধ্যে দিয়া মীরার পুষ্পকোরকের মত হাত দুইটি বাহির হইয়া আছে,—দু-গাছি রুলি ঝিকমিক করিতেছে। পায়ে, মাঝখানটিতে একটি করিয়া ফুলতোলা মখমলের স্যাণ্ডেল, কপালে একটি খয়েরের টিপ, মাথায় পরিষ্কার করিয়া গুছান এলো খোঁপা, আর সেই অনবদ্য বাঁকা সিঁথি।

মীরা কালো—শ্যামাঙ্গীই বলি। পীতে-হরিতে তাহাকে দেখিতে হইয়াছে ফুলে-ভরা একটি নবীন চম্পকতরুর মত।

বোধ হয় এই সাজার জন্যই একটু কুণ্ঠিত হইয়া বসিয়া রহিল মীরা—অল্প একটু—নিজেকে দ্রষ্টব্য করিয়া তুলিলে যেমন হয়। অবিলম্বেই আবার সে-ভাবটুকু সামলাইয়া লইয়া বেশ সহজ গলায়, সহজ গাম্ভীর্যের স্বরে বলিল, "আপনার ছাত্রীর পড়া দেখতে এলাম।"

উত্তর দিবার সময় গলা দিয়া যেন একটা কঠিন বস্তুকে নামাইয়া দিতে হইল। বলিলাম, "বেশ করেছেন ভালই ত।"

মীরা বলিল, "তরু একটু বিশেষ চঞ্চল; সেই জন্যেই দেখেশুনে আপনাকে রাখলাম।"

আমার সংশয়িত মনের ভুল হইতে পারে; কিন্তু "রাখলাম" কথাটাতে মীরা যেন বিশেষ একটি ঝোঁক দিল। হয়ত আমারই ভুল, মীরা অত রূঢ় হয় নাই, কিন্তু আমি উত্তর যা দিলাম তা এই ধারণারই বশবর্তী হইয়া। একটু ইতস্তত করিলাম, তাহার পর বলিলাম, "আপনার অনুগ্রহ।"

কথাটার মধ্যে মনের তিক্ততাটা বোধ হয় প্রকাশ পাইয়া থাকিবে, যদিও স্পষ্টভাবে রূঢ় হইবার আমারও ইচ্ছা ছিল না। মীরা একবার তাহার সেই তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া লইয়া আবার বেশ সহজ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "না, না, অনুগ্রহ কিসের? আমরা উপযুক্ত লোক খুঁজছিলাম, আপনি উপযুক্ত লোক—এতে অনুগ্রহ কি আছে আর? আপনাকে রাখা এ ত নিছক স্বার্থ।"

মীরা কথাটা নরম সুরেই বলিল—একটু যেন অনুশোচনা আছে তাহাতে। আমাকে রাখা বিষয়ে যে দম্ভটুকু প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে সেটুকু যেন সামলাইয়া লইতে চায়। আমিও নরম হইয়া গেলাম। সত্য কথা বলিতে কি—এই নরম হইবার সুযোগটুকু পাইয়া আমি যেন বাঁচিয়া গেলাম। মীরা—কি উদ্দেশ্যে ঠিক জানি না—ইচ্ছা করিয়া আমায় ক্ষুণ্ণ করিতেছে; কিন্তু ওর উপর ক্ষুণ্ণ হওয়া যে কত শক্ত আমার পক্ষে তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। আঘাতে-আকর্ষণে মীরা এরই মধ্যে এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগাইতেছে। তরুর মুখে, ও আমার কাজ পরিদর্শন করিতে আসিবে শুনিলে মুখটা বোধ হয় অন্ধকার হইয়া যায়; কিন্তু ওরই মধ্যে কেমন করিয়া মনের কোথায় একটা রঙীন বাসনা জাগিয়া থাকে। মীরা যে মূর্তিতেই আসিতে চায়, আসুক, শুধু আসুক ও। আহত পৌরুষের অভিমানে মুখ ভার করিয়া আমি প্রবল আশায় ওর পথ চাহিয়া থাকি। ওকে যতটা চাই না তাহার শতগুণ চাইও আবার। মীরাকে দেখার আগে এ অদ্ভুত ধরণের অনুভূতির কখনও সন্ধান পাই নাই নিজের মধ্যে।...তাই বলিতেছিলাম নরম হইবার সুযোগ পাইয়া আমি যেন বর্তাইয়া গেলাম।

আমার উত্তরের মধ্যে যে একটা ব্যঙ্গের ইসারা ছিল সেটুকু নিঃশেষে মুছিয়া লইবার জন্য সত্যই কৃতজ্ঞতার স্বরে বলিলাম, "অনুগ্রহ যে নয় এ-কথা কি ক'রে বলি?—আমি উপযুক্ত কি না সে-কথা ত যাচাই করেন নি; এসে দাঁড়িয়েছি, আপনি নিয়োগ করেছেন। আমার যে একটা অভাব ছিল, আমার যে আশ্রয়ের একটা প্রয়োজন ছিল—আমার চেহারার মধ্যে সে কথাটা নিশ্চয় কোথাও ধরা পড়েছিল, আপনার দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। তাই আপনি যাচাই করা দূরে থাকুক, ভাল ক'রে পরিচয়ও নেন নি আমার; ডেকে নিলেন। অনুগ্রহ নয় ত কি বলব একে?"

এ উচ্ছ্বাসটা দেখাইয়া ভাল করি নাই। অবশ্য সে-কথাটা অনেক পরে জানিতে পারি, তাহার কারণটাও। মীরা কি এক রকম ভাবে, স্থির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া এই স্তুতি শুনিল,—তাহার মুখটা কঠিন হইয়া আসিতে লাগিল, এবং একেবারে শেষের দিকে, ধীরে ধীরে তাহার নাসিকার সেই কুঞ্চনটা জাগিয়া উঠিল। কথাটা একেবারে ঘুরাইয়া লইয়া, কতকটা অসংলগ্নভাবেই বলিল, "পড়ছে কি রকম আপনার ছাত্রী আগে তাই বলুন।"

সঙ্গে সঙ্গেই ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আমি আপনার স্তব শুনতে আসি নি মাস্টার-মশাই। এমন কি অসাধারণ কাজ করেছি যে..."

হাসি দিয়া মর্মান্তিক কথাটা বোধ হয় নরম করিবার চেষ্টা করিয়া থাকিবে মীরা, তবুও আমার গায়ে এমুড়ো-ওমুড়ো একটা কষাঘাতের মত বাজিল সেটা। মনে হইল সমস্ত শরীরটা একটা অসহ্য জ্বালার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একেবারে অসাড় হইয়া গেল, নিজের দীনতার গ্লানি যেন ক্রমাগতই ফেনাইয়া ফেনাইয়া উপচাইয়া পড়িতে লাগিল। ক্ষণমাত্র মীরার চোখের পানে চাহিয়া চক্ষু নামাইয়া লইলাম।

তরুও যেন কি রকম হইয়া গিয়াছে; একবার নিতান্ত কুণ্ঠিত, অপ্রতিভভাবে আমার মুখের উপর করুণ দুইটি চক্ষু তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তাহ'লে কোন্‌খানটা পড়ব মাস্টার-মশাই?" আমি উত্তর দেওয়ার আগেই আবার মীরাকে প্রশ্ন করিল, "কোন্ পড়াটা শোনাব তোমায় দিদি?"

কোন উত্তর না পাইয়া মাথা নীচু করিয়া মনোযোগের সহিত ওর ইংরাজী রীডারটার পাতা উলটাইতে লাগিল।

ঘরটাতে বায়ু যেন হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে; অসহ্য গুমট একটা। তিন জনে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া আছি। একটু পরে মীরাই আবার গুমটটা ভাঙিল,

বরং ভাঙিবার চেষ্টা করিল বলাই ঠিক। কথাটাতে চপল হাস্যের ভাব ফুটাইবার প্রয়াস করিয়া বলিল, "যেটা খুশি পড় না; আমি দুটোতেই পণ্ডিত,—যেমন তোমার লক্ষ্মী-পাঠশালার শিবস্তোত্র বুঝি, তেমনই তোমার লরেটোর কচকচানি বুঝি; তুমি যেটা বলবে আমায় একই রকম ভাবে ঠকাতে পারবে।...নয় কি মাস্টার-মশাই?...কিন্তু আজ আমি এখন উঠি; আবার সরমাদি'কে কথা দেওয়া আছে—আটটার সময় আসব।" বলিয়া হাতঘড়িটা উল্টাইয়া দেখিয়া উঠিয়া পড়িল।

আবার একটু নিস্তব্ধতা আসিয়া পড়িল। কোন মতেই আঘাতের স্মৃতিটা যেন কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছি না।...একটু পরে তরু আমার ডান হাতটা হঠাৎ জড়াইয়া ধরিয়া আবদারের সুরে বলিল, "একটা কথা বলব মাস্টার-মশাই?"

ক্লিষ্ট কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব শান্ত করিয়া উত্তর করিলাম, "বল।"

"না, আপনি রাগ করবেন; আমার উপরও, দিদির উপরও।"

হাসিয়া বলিলাম, "না, করব না, বল।"...এবং এই সুযোগে, তখনই যে-ব্যাপারটা হইল সেটাকে চাপা দেওয়ার জন্য আরও প্রাণখোলাভাবে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, "তোমার দিদির উপর রাগ কেন করতে যাব?...দেখ ত!"

তরুর মুখটাও পরিষ্কার হইয়া গেল, উৎসাহের সহিত বলিল, "ভয়ংকর ভালবাসে দিদি আপনার লেখাগুলো মাস্টার-মশাই।...মানসী, কল্লোল, আরও অন্য অন্য মাসিক পত্র থেকে খুঁজে খুঁজে পড়ে...হ্যাঁ, দেখেছি আমি।"

কৌতূহল হইল; কিন্তু তাহার চেয়ে মুগ্ধ হইলাম বেশী। নারীর মন—ওরা পুরুষের অন্তস্তল পর্যন্ত এক-দৃষ্টিতেই দেখিয়া লইতে পারে, হোক না তরুর মতই ছোট। আর জোড়াতাড়া দিতেও ওদের হাত এইটুকু থেকেই দক্ষ। তরু তার দিদি আর আমার মধ্যে ভাব করাইয়া লইবার জন্য সদ্য সদ্যই ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছে, দলিল-দস্তাবেজ হাজির করিতেছে আমার প্রতি ওর দিদির প্রীতির; অর্থাৎ এই মাত্র যা হইল, ওটা কিছু নয়, মীরা আসলে আমার লেখা ভালবাসে—যাহার মানে হয় আমায় ভালবাসে।

হাসিয়া প্রশ্ন করিলাম, "সত্যি নাকি?"

তরু চোখ দুইটা বড় করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, মাস্টার-মশাই!—দুটো পদ্য আপনার লিখেও নিয়েছে।"

"কিন্তু পেলে কোথা থেকে?"

শান্তি স্থাপনের ঝোঁকে তরু এ-দিকটা ভাবে নাই; ভয়ে ওর হাতটা একটু আলগা হইয়া গেল। তখনই আবার ভাল করিয়া আমার হাতটা জড়াইয়া পাঁজরার কাছে মাথা গুঁজিয়া ধরিল।

বলিলাম, "কি ক'রে পেলে বল তোমার দিদি?"

তরু অপরাধীর মত স্খলিত কণ্ঠে বলিল, "আমি নিয়ে গেছলাম।"

তাহার পর অনুযোগের সুরে বলিল, "দিদিই কিন্তু বলেছিল মাস্টার-মশাই।"

আরও একটু মৌন থাকিয়া অনুশোচনার স্বরে বলিল, "আমি কুমারী মা-মেরীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব'খন মাস্টার-মশাই, না ব'লে নিয়ে যাবার জন্যে আপনার খাতা।...দিদিকে কিন্তু বলবেন না।"

আবার সেই বোধহীনা বালিকা,—ওদের কনভেন্টের অভ্যস্ত বুলি আওড়াইতেছে।

* * *

সেই রাত্রে, যত দূর মনে পড়ে, আমার জীবনে প্রথম এক অনাস্বাদিতপূর্ব মধুর অশান্তির আস্বাদ পাইলাম।

মীরা প্রথম দিনে আমার সামনে এক দৃপ্ত রূপ লইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয় বার তাহাকে দেখি প্রচ্ছন্নতার অন্তরাল হইতে তাহার মায়ের কাছে সন্তানের হালকা রূপে। কোন্‌টা স্বাভাবিক মীরা জানে না,—হয়ত দুইটা রূপই স্বাভাবিক—নিজের নিজের জায়গায়। কিন্তু মীরা চায় না যে আমি জানি ওর একটা হালকা দিকও আছে। আজ যে-মীরা আসিয়াছিল সম্রাজ্ঞীর স্পর্ধিত বেশে—তাহার উদ্দেশ্যই ছিল দ্বিতীয় দিনের ছাপটা আমার মন হইতে ভালভাবে মুছিয়া দেওয়া। এ এক ধরণের আক্রোশ মীরার মনে;—সহজ ভাবে সে-ছাপটা সরাইতে

না পারিয়া, সহজ ভাবে আক্রোশটা মিটাইতে না পারিয়া মীরা অস্বাভাবিক ভাবেই একটু দাম্ভিকতা করিয়া গেছে আমার কাছে।…কিন্তু তাহার পর? মীরার সজ্জার আড়ম্বর ছিল কেন? ঐ ছাপ মেটানোর জন্য, না আরও কিছু?—এই প্রশ্নই সে-রাত্রে কত স্বপ্নজাল বিস্তার করিয়াছিল।…মীরা বাহিরে যাইবার জন্ম সাজে নাই, আমাদের ঘর হইতে গিয়া সে যায় নাই কোথাও। যদি ধরা যায় সাজিয়াছিল বাহিরের জন্যই, কিন্তু গেল না কেন তবে? আমায় আঘাত করিতে আসিয়া সে নিজেই আহত হইয়া গেছে—নিজের অস্ত্রেই?…যদি তাই হয়? স্বপ্নের জাল যেন আরও সূক্ষ্ম হইয়া, আরও জটিল হইয়া ওঠে।…আর সর্বোপরি তরুর সংবাদ—মীরা আমার লেখার পক্ষপাতি,—আমার দুইটি পদ্য—আমার অন্তরের দুইটি রঙীন বাণী মীরার সঞ্চয়ের খাতায় অমরত্ব লাভ করিয়াছে…তরু সেদিন বলিয়াছিল মীরা কবিদের ভালবাসে,—মীরা সমর্থন করিয়াছিল এই বলিয়া যে কবিদের সে ভু-চক্ষে দেখিতে পারে না…

এই মীরাই আবার আজ আমায় আঘাত দিয়াছে—সূক্ষ্ম কিন্তু অমোঘ।

জীবনে এক নূতন আলো;—অপরূপ তৃপ্তি, তাহারই পাশে কিন্তু গাঢ় ছায়া, সুতীব্র বেদনা।

১০

দিন-চারেক পরে মিস্টার রায় আসিলেন; আমি আসার ঠিক সতের দিনের দিন।

আমি আমার ঘরে বসিয়াছিলাম। ইমানুল রাজু বেয়ারার অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া আমার ঘরে আসিয়া বসিয়াছে। হাতে একখানি পোস্টকার্ড, তাহাকে চিঠি লিখিয়া দিতে হইবে। ইমানুলের পরিচয় আরও একটু পাইলাম আজ। রাঁচির দুই স্টেশন এদিকে জোন্‌হা, সেইখানে নামিয়াই ইমানুলের বাড়ী যাইতে হয়, দুইটা পাহাড় ডিঙাইয়া। স্টেশন হইতে মাইল-দেড়েক দূরে জোন্‌হার জলপ্রপাত, ওদিককার একটা দ্রষ্টব্য বিষয়। রাঁচি হইতে মোটরে বা রেলযোগে প্রায়ই লোকে দল বাঁধিয়া প্রপাত দেখিতে আসে, গাইড বা কুলি হিসাবে স্থানীয় লোকেরা এই থেকে কিছু কিছু উপার্জন করে, বিশেষ করিয়া যখন জোন্‌হা দর্শনের মরসুম, অর্থাৎ পূজার সময় হইতে শীতের খানিকটা পর্যন্ত। কতকটা এই সাময়িক উপার্জন, আর কতকটা সামান্য একটু চাষ-আবাদ—এই লইয়া ইমানুলের চলিয়া যাইতেছিল। বাড়ীতে বড় ভাই, ভাজ আর তাদের দুইটি ছোট ছোট ছেলে। বড় ভাই ক্ষেত-আবাদের দিকটায় নজর রাখে।

জোন্‌হার কাছে কি উপলক্ষে একটা বড় মেলা বসে, লোক হয় বিস্তর, কিছু পাদ্রীরও আমদানি হয়। এক দিন রেভারেণ্ড চাইল্ড গাড়ী হইতে নামিল, সঙ্গে এক জন ওদেশী সহযোগী ও একটা পুস্তকের গাঁঠরি—মেলায় বিলি করিবার জন্য। মেলায় গাঁঠরিটা পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ইমানুলকেই কুলি নিযুক্ত করিল সাহেব। সেই দিন পাদ্রীসাহেবের বক্তৃতায় যীশুর করুণার কথা ইমানুল ভাল করিয়া শুনিল। স্টেশনে ফেরত আসিবার সময় সাহেব যীশুর কথা আরও বলিল, খ্রীষ্টধর্ম্মের গৌরব আর সমদর্শিতার কথা বলিল এবং ইমানুলের ঝোঁক দেখিয়া তাহাকে একটা টাকা দিয়া বলিল—সে যেন শীঘ্রই এক দিন তাহাদের মিশনে আসে, সমস্ত ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে।

মিশনে আসিয়া ইমানুল আর যা দেখিল তা দেখিল, একটি দেখার মোহ তাহাকে একেবার পাইয়া বসিল। নূতন ধর্মের চোখ-ঝলসান আলোয় ইমানুলের নজর সব চেয়ে বেশী করিয়া পড়িল মিস্ ফ্লোরেন্স চাইল্ডের উপর। মেয়েটি রেভারেণ্ড চাইল্ডের ভ্রাতুষ্পুত্রী, বাপ-মা নাই।… ইমানুল যখন কাহিনীটা বিবৃত করিতেছিল, আমার অত্যন্ত অদ্ভুত ঠেকিতেছিল,—অত উঁচুতে দৃষ্টিক্ষেপ কি করিয়া করিতে পারিল ইমানুল! মাথায় ছিট আছে একটু নিশ্চয়, তবুও একেবারে পাগল না হইলে সম্ভব হয় কি করিয়া?

কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলাম অদ্ভুত হইলেও আশ্চর্য কি এমন? চোখে-লাগা চোখের ব্যাপার,—তাহার সঙ্গে নিজের গায়ের রং আর মুখের কাঠামোর কি সম্বন্ধ আছে? যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে তেমনই করিয়া আকর্ষণ করে; নিজের পানে চাহিয়া দেখিবার কি ফুরসৎ দেয়? ইমানুলের বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তখন আবার সাম্যের মোহ—সাম্যের অর্থই ত আকাশে মাটিতে মিতালি। এক

দিকে থাকিবে কদর্য ওঁরাও যুবক, আর অপর দিকে থাকিবে দেবকন্যার মত তরুণী ফ্লোরেন্স,—তবেই ত সাম্যের কথা উঠিবে।

আরও আছে। শুধু গায়ের চামড়া আর মুখের কাঠামোই কি সব? ভালবাসার মূল যেখানে, সেখানে ত সেই একই রাঙা রক্তের তরঙ্গ তুলিতেছে।

ভেদাভেদ-জ্ঞানের সঙ্গে দ্বিধা আশঙ্কাও গেছে;— ইমান্থুল কথাটা বোধ হয় স্বয়ং ফাদার চাইল্ডকে বলিত; বর্বরেরা চিন্তা আর বাক্যের মধ্যে অবসর রাখিতে জানে না। তবে ইতিমধ্যে ফাদার চাইল্ডের সহযোগী ন্যাথেনিয়াল কথাটা টের পাইল। লোকটা খুব ধূর্ত এবং অভিজ্ঞ, যাহাকে বলা যায় পাকা খেলোয়াড়। জানে যে যাহারা খ্রীষ্টান হয় তাহারা সব সময় ত্রাণকর্তা যীশুর আহ্বানে সাড়া দিয়া আসে না,—বরং অধিকাংশ সময়েই নয়। অবশ্য ইমান্থুলের এ-ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি, একেবারে চাঁদে হাত বাড়ান। কিন্তু সে বাড়িতে দিল না। খলিফা লোক, যেমন বাড়িতে দিল না তেমনই আবার নিরুৎসাহও করিল না; বলিল, "এটা এমন কিছু বেশী কথা নয়। তুমি পাবে, তবে সময় নেবে একটু। আগে কিছু উপার্জন কর, কিছু সঞ্চয় কর, তার পর আমি যথাসময়ে ফাদার চাইল্ডের কাছে কথাটা ভাঙব। ইতিমধ্যে আমি তার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।"

ইমান্থুল দীক্ষিত হইবার কয়েক দিন পরে, চাইল্ড সাহেবকে বলিয়া-কহিয়া কলিকাতায় তাঁহার এক ব্যবসাদার বন্ধুর নিকটে ইমান্থুলের মালীগিরির চাকরি জোগাড় করিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি সরাইয়া দিল। বলিল, "এবার গিয়ে তুমি মাসে মাসে টাকা জোগাড় করতে থাক ইমান্থুল, আমি এদিকে পথ পরিষ্কার করতে থাকি। তুমি শুধু আমায় মাঝে মাঝে চিঠি দিতে থেক এবং দয়াময় যীশুর কাছে খুব প্রার্থনা করতে থেক।...পাবে বইকি মিস্ ফ্লোরেন্সকে, তবে সময় নেবে।"

ন্যাথেনিয়াল জানিত সভ্য জীবনকে একটু ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইলেই এই বন্য ওরাঁওয়ের মোহ ভাঙিবে, তাহার পূর্বে নয়।

ইমান্থুল কলিকাতায় আসিল এবং চাকরি ও প্রার্থনা সুরু করিয়া দিল। এমনই রোজ প্রার্থনা করিত নিজের ঘরে, তাহার পর প্রথম রবিবার আসিতেই পাদ্রীর দেওয়া অতিরিক্ত বড় কোটপ্যাণ্ট পরিয়া সাহেব-পরিবারের সঙ্গে গির্জায় যাইবার জন্য তাহাদের সঙ্গ লয়। ফলে সেই দিন তাহার দুইটি জিনিস ঘুচিয়া যায়—চাকরি আর সাম্যের মোহ। তাহার পর এখানে চাকরি করিতেছে। এখানেও প্রায় বছর-চারেক হইল।

আমি বলিলাম, "ইমান্থুল, তবুও রাজা-লাটসাহেবের ধরম সম্বন্ধে তোমার মোহটা গেল না?"

ইমান্থুল দাঁত বাহির করিয়া হাসিল, বলিল, "সাহেব আমির, বাবু, ওদের কথা যেতে দিন, ত্রাণকর্তা যীশু বলেছেন একটা ছুঁচের ছেঁদার অন্দর দিয়ে একটা উট গলে যেতে পারে, কিন্তু একজন আমির লোক স্বর্গে যেতে পারে না। কিন্তু ফাদার চাইল্ড অন্য রকম লোক আছেন, তিনি ত্রাণকর্তা যীশুর মতন, কাউকে নীচু দেখেন না। আপনি দিন লিখে বাবু নাথুকে। লিখুন, 'ভাই ন্যাথেনিয়াল পুরীনকে ইমান্থুল বোয়ানের হাজার হাজার সেলাম পোঁছে'—ইংরিজীতেই লিখবেন বাবু, নাথু ইংরিজী জানে—পরে, এর আগের চিঠিতে সব বাৎ নাথু ভাইকে জানিয়েছি, কিন্তু এখনতক্ কোন জবাব না পাওয়ায় মর্ম্মান্তিক দুশ্চিন্তায় আছি..."

আমি একটু বিস্ময়ের সহিত চাহিতেই ইমান্থুল কুণ্ঠিত ভাবে হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, 'মর্ম্মান্তিক দুশ্চিন্তা' লবজটা নিশ্চয়ই লিখে দেবেন মাষ্টারবাবু ইংরিজীতে,— ক্লীনার মদন শিখিয়ে দিয়েছে, খুব জোর আছে লবজটাতে। মদন আপন ইস্তিরিকে হরেক চিঠিতে লেখে—মর্ম্মান্তিক দুশ্চিন্তায় আছি—খুব জলদি জবাব এসে পড়ে। লিখে দিন—'মর্ম্মান্তিক দুশ্চিন্তায় আছি'। ইংরিজীতে আরও ওজনদার হবে লবজটা—হেঁ বাবু..."

এমন সময় গেটের বাহিরে মোটরে হর্ণ বাজিয়া উঠিল। মর্মান্তিক দুশ্চিন্তা আর পোস্টকার্ড ভুলিয়া ইমান্থুল গেট খুলিতে ছুটিয়া গেল।

একটু পরেই মীরার সঙ্গে মিস্টার রায় গাড়ী থেকে নামিলেন।

আমি বাহির হইয়া গাড়ীবারান্দার উপর দাঁড়াইয়া

ছিলাম, অভিবাদন করিতে যাঁবা সংক্ষেপে পরিচয় দিল—"তরুর নতুন টিউটার—শৈলেনবাবু।"

মিস্টার রায়—"That's all right" বলিয়া আমার দিকে চাহিয়া একটু শিরশ্চালন করিলেন, তাহার পর পিতাপুত্রীতে উপরে চলিয়া গেলেন।

আমার মনটা অত্যন্ত ছোট হইয়া গেল। ভীত, ক্ষুণ্ণ-মনে হাজার রকম অশুভ কল্পনা করিতে করিতে আমি ঘরের মধ্যে গিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম।

কারণ ছিল। মিস্টার রায় যেন কল্পনার মধ্যে হইতে মূর্তি লইয়া নামিয়া আসিয়াছেন,—আমার বিভীষিকার ধ্যানমূর্তি। সেই বাঁকা টিকলো নাক, সেই ঈষৎ কোটর-গত তীক্ষ্ণ চক্ষু, সেই কপাল, সেই মোটা ঘন ভ্রূ, বর্তুল চিবুক। মনটা আমার একটা অহেতুক অস্বাচ্ছন্দ্যে যেন নিজের মধ্যেই গুটাইয়া আসিতে লাগিল। কল্পিত চেহারার সঙ্গে এ মিলটা আমার একেবারেই ভাল লাগিল না, কেন না এ-রকম মিল কখনও হয় না। কেবলই মনে হইতে লাগিল—এর পিছনে একটা দৈব অভিসন্ধি আছে। আমার জীবনে আর একবার মাত্র এইরূপ রহস্যময় মিলের অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি এখনও আমার মনটাকে চঞ্চল করিয়া তোলে। খুব ছেলেবেলায় একবার আমাদের বাংলা স্কুলে থার্ড মাস্টারের পদ খালি হয়। হঠাৎ এক দিন স্বপ্ন দেখিলাম নূতন থার্ড মাস্টার এক জন আসিয়া-ছেন;—মাথায় টাক, মোটা গোঁফ, সুচল দাড়ি; সবল চেহারা। আসিয়াই প্রথমে হেডমাস্টারকে চেয়ারসুদ্ধ তুলিয়া আছাড় দিলেন—ছেলেদের না ঠেঙাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার জন্য। সেকেণ্ড মাস্টার আগন্তুককে নমস্কার করিবার জন্য সহাস্য মুখে হাত তুলিতে যাইতে-ছিলেন, আকস্মিক বিপদ দেখিয়া ছুটিয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িলেন। নূতন মাস্টার তাঁহাকে তাড়া করিয়া রাস্তা পর্যন্ত দিয়া আসিলেন, তাহার পর সেই অভিভাবক-হীন স্কুলে ঢুকিয়া আমাদের মার! সে যে কী মার, স্বপ্ন হইলেও এখনও গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে। যখন ভাঙিল স্বপ্ন, দেখি ঘামিয়া নাহিয়া গেছি।

পরের দিন সত্যই থার্ড মাস্টার আসিলেন,—সেই টাক, সেই গোঁফ, সেই সুচল দাড়ি, সেই চেহারা। প্রথম দিনই আমাদের ক্লাসের বলাইয়ের ঘাড়ে মার পড়িল। তেমন বিশেষ দোষ ছিল না; কিন্তু থার্ড মাস্টার বলিলেন, "আজ ভাল দিন দেখে কাজে জয়েন করেছি, বৌনিটা সেরে রাখলাম। তোমাদেরও সুবিধে হ'ল,—হেডমাস্টারের মত আমার কাছে যে মামার বাড়ীর আবদার খাটবে না, এটা জেনে রাখলে।"

তাহার পর-দিন থেকেই মার আরম্ভ হইল। সে যে কী উৎকট, অমানুষিক প্রহার!—পাঁচ দিনের মধ্যে সাতটা ছেলে বিছানা লইল। অবশ্য হেডমাস্টার বা সেকেণ্ড মাস্টারকে মারেন নাই—স্বপ্নে একটু বাড়াবাড়িই হয়—তবে আমাদের পড়াইয়া অর্থাৎ প্রহার করিয়া যে-সময়টা বাঁচিত সেটা মাস্টারদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়াই কাটাইতেন। এগারটি দিন ছিলেন, তাহার পর স্কুলের কমিটির বিশেষ অধিবেশন করিয়া তাঁহাকে সরান হইল। যাইবার দিন একটু অনুতপ্ত গোছের হইয়াছিলেন, হেডমাস্টার প্রভৃতিকে বলিলেন, "আমাদের পরস্পরের ভাল ক'রে পরিচয়ই হ'ল না; ফুরসুৎ পেলাম কই?"

তাহার পর কল্পনা আর বাস্তবে আশ্চর্য মিল এই দেখিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি মন বড়ই বিমর্ষ হইয়া রহিল এবং সমস্ত দিন আমি মিস্টার রায়ের দৃষ্টি এড়াইয়া কাটাইলাম। বলা বাহুল্য, এই স্নিগ্ধ পরিবারের সঙ্গে পক্ষাধিক কাল কাটাইয়া আমার যে একটা অহেতুক এবং অস্বাভাবিক ব্যারিস্টার-ভীতি ছিল সেটা অনেকটা অপসারিত হইয়া আসিয়াছিল, বুঝিতে পারিতেছিলাম একটু বড় মহলে কখন যাতায়াত না থাকার দরুনই বড়দের সম্বন্ধে আমার একটা অপরিচয়ের আতঙ্ক থাকিয়া গিয়াছিল, এক ধরণের inferiority complex বা হীন-মন্যতা,—ব্যারিস্টার-ভীতি তাহারই একটা উগ্র রূপ। বেশ কাটাইয়া উঠিতেছিলাম দুর্বলতাটুকু, সব ভণ্ডুল করিয়া দিল চেহারায় কল্পনায় বাস্তব ব্যারিস্টারের এই কল্পনাতীত মিল। অবশ্য ভয় আর কিছু নয়। মিস্টার রায় যে খুব একটা অভদ্র রকম কিছু করিবেন এমন নয়, তবে ব্যারিস্টারি পদ্ধতিতে খুব কড়া জেরায় ফেলিয়া আমায় ভদ্রভাবে অপদস্থ করিতে পারেন; আমার চাকরির মধ্যেই তাঁহার জেরার প্রচুর মালমসলা রহিয়াছে।

এত বেশী মাহিনার টুইশনি যে লইয়া বসিয়া আছি, কি বিশেষ যোগ্যতা আমার? তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া এক অনভিজ্ঞা বালিকাকে কি এমন বুঝাইয়াছি যে, সে নির্বিচারে নিয়োগ করিয়া ফেলিল? গৃহকর্তা বাড়ী নাই দেখিয়াও আমি কয়েকটা দিন অপেক্ষা করিলাম না কেন?...

কতকটা আড়ালে আড়ালেই কাটাইলাম এবং বৈকালে তরুকে লইয়া যখন বেড়াইতে গেলাম, খুব সন্তর্পণে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া প্রশ্ন করিলাম—মিস্টার রায় আমার সম্বন্ধে কোন প্রশ্নাদি করিয়াছেন কিনা। তরু বলিল—"কিচ্ছু না।"...এ উত্তরে নিশ্চিন্ত হইবারই কথা, কিন্তু আমি আরও চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। তখন মনে হইল লোকটা কিছু একটা মতলব আঁটিয়া স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। একটা নূতন লোক বাড়ীতে আসিয়াছে, তাহাকে দেখিলও, অথচ তাহার সম্বন্ধে না রাম না গঙ্গা—কিছুই বলে না, এ ত ভাল লক্ষণ নয়!

আহারের সময় আবার সাক্ষাৎ হইল। রাজু বেয়ারা আসিয়া বলিল, "ওঁরা ডাইনিং রুমে এসেছেন, সায়েব আপনাকে ডাকছেন। সায়েব ভয়ংকর খাপ্পা হয়েছেন মাস্টার-মশা!"

প্রশ্ন করিলাম, "কেন রে?"

"গবরমেণ্ট বলছে—ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরি দিল্লীতে নিয়ে যাবে।"

আশ্বস্ত হইলাম—রাজুর সেই পাকামি! তাহার পিছনে পিছনে গিয়া ডাইনিং রুমে প্রবেশ করিলাম এবং মিস্টার রায়কে নমস্কার করিয়া নিজের চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইলাম।

মিস্টার রায় সত্যই কি একটা লইয়া উত্তেজিত ভাবে কথা কহিতেছিলেন, আমি দাঁড়াইতেই আমার পানে চাহিয়া স্মিত হাস্যের সহিত বলিলেন, "আই সী (I see) ...তুমিই তরু-মার টিউটার হয়েছ? দাঁড়াও একটু, দেখি।"

অপর্ণা দেবী বলিলেন, "বাঃ, তোমরা সবাই খেতে বসেছ, আর ও-বেচারি চেয়ার কোলে ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে?...তুমি ব'সো শৈলেন।"

মিস্টার রায় অপ্রতিভ ভাবে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "O sorry, I didn't mean that—তোমায় দাঁড়িয়ে থাকতে বলব কেন? ব'সো, ব'সো...মিলিয়ে দেখছিলাম মীরা-মা তোমার যেমনটি বর্ণনা ক'রে লিখেছিল আমায়, ঠিক সেই রকমটি তুমি—exactly; মীরা লিখেছিল..."

মীরা যেন প্রসঙ্গটাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টায় বলিল, "বাবা, পদ্মার কথা ছেড়ে দিলে কেন? মাস্টার-মশাইও নিশ্চয় শোনবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে আছেন।" যাহাতে আমি ব্যস্ত হইয়া উঠি সেজন্য আমার পানে কতকটা প্রত্যাশা ও মিনতির দৃষ্টিতে চাহিল।

বলা বাহুল্য মীরা কি লিখিয়াছিল সেইটুকু শুনিবার জন্যই আমি উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়াছি, তবু আগ্রহের অভিনয় করিয়া প্রশ্ন করিলাম, "পদ্মার কথা হচ্ছিল নাকি? তা'হলে ত..."

মিস্টার রায় বলিলেন, "পদ্মার কথা বলব বইকি, না বললে আমার আহার পরিপাক হবে না; She is sublime (পদ্মা মহিমময়ী)...হ্যাঁ, কি বলছিলাম? ঠিক কথা—মীরা-মা লিখেছিল—"You are too grave for your age, তা সত্যিই তুমি বয়সের অনুপাতে বেশী ভারিক্কে —if I am any judge of physiognomy (আকৃতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যদি আমার বিন্দুমাত্র জ্ঞান থাকে)...মীরা-মাঈ, কত বয়স লিখেছিলে মাস্টার-মশাইয়ের?"

অবাধ্যভাবেই আমার দৃষ্টি একবার টেবিলের চারি দিকে ঘুরিয়া গেল,—সকলে যেন কাঠ মারিয়া গেছে। শুধু তরু তাহার শৈশবসুলভ অনভিজ্ঞতায় কিছু কৌতুকের আভাস পাইয়া একবার এর, একবার ওর মুখের পানে চাহিয়া অল্প অল্প হাসিতেছে।

সামলাইল মীরাই, উপস্থিত-বুদ্ধি তাহারই বেশী; সামলাইলও, আবার সুযোগ পাইয়া আমার গাম্ভীর্যকে ব্যঙ্গও করিল। ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন লিখে থাকব বোধ হয়, ঠিক মনে পড়ছে না।"

মিস্টার রায় হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "O no, you naughty girl; he is hardly twenty-four—বাইশ-তেইশের বেশী হ'তেই পারে না।...

Yes, let me see···না, তুমি আমায় বয়সের কথা লেখই নি মীরা,—না লেখ নি—রয়েছে চিঠি আমার কাছে। লিখেছ, লোক ভাল, লিখেছ, সাহিত্যিক—মানে, তরুকে ওদিকে ট্রেনিং দিতে পারবেন—অর্থাৎ তোমার সিলেক্শন যাতে আমি রদ না ক'রে দিই সেই জন্যেই বোধ হয় আর সব কথাই লিখেছ ওঁর সম্বন্ধে, কিন্তু বয়সের কথা ··"

চক্ষু বিস্তারিত করিয়া হাসিতে হাসিতে মীরার নমিত মুখের দিকে চাহিয়া তিনি মাঝপথেই থামিয়া গেলেন। অপর্ণা দেবী এই সময় ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "লেখে নি নিশ্চয় বয়সের কথা।"

মাথা নীচু করিয়া থাকিলেও বেশ বুঝিলাম, কথাটুকু বলার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী স্বামীর দিকে চাহিয়া কিছু ইঙ্গিত করিয়াছেন। মিস্টার রায় সঙ্গে সঙ্গে চিঠির প্রশংসাটা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া নির্বাকভাবে আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রায় মিনিট-পাঁচেক শুধু সবার কাঁটা-চামচ-প্লেটের ঠোকাঠুকির শব্দ শোনা যাইতে লাগিল,—মাঝে মাঝে শুধু এক-এক বার মিস্টার রায়ের—"I see···হুঁ, বুঝেছি।" এক বার, বোধ হয় উপরে উপরেই অপর্ণা দেবীর পানে চাহিয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ তুমি—Yes, you are right, ভুল হয়েছে..."

সামলাইতে যাইয়া যে আরও বেসামাল করিয়া ফেলিতেছেন সেদিকে হুঁস নাই।

খানিকক্ষণ পরে কথাবার্তা আবার স্বাভাবিক ধারায় প্রবর্তিত হইল। কুমিল্লার কথা, আট ঘণ্টা পদ্মার উপর স্টীমার-যাত্রার কথা, তরুর লেখাপড়ার কথা, মল্লিকদের বাড়ীর পার্টির কথা। মীরা আর অপর্ণা দেবী সাবধানে প্রসঙ্গটা ঠিক পথে চালিত করিয়া রাখিলেন। তবু মিস্টার রায় তরুর পড়ার প্রসঙ্গে শেষের দিকটায় আবার একটু বেফাঁস করিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "আমার আইডিয়া ছিল বেশ একজন বয়স্থ দেখে টিউটার ঠিক করা; তোমায় সে-কথা বলেছিলাম কি কখনও মীরা-মাঈ?"

মীরা আবার রাঙিয়া উঠিয়া বলিল, "কই, না তো বাবা।"

অপর্ণা দেবী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "হয়েছে খাওয়া, এইবার তাহ'লে ওঠ তোমরা; তুমি আবার রাত জেগে আছ।"

উঠিয়া হাত মুছিতে মুছিতে মিস্টার রায় কতকটা চিন্তিতভাবে আপন মনেই বলিলেন, "তাহ'লে বলি নি। আর, ভালই হয়েছে—যারা ছোট, অল্প বয়স, তাদের চোখের সামনে সর্বদা আমাদের মত বুড়ো এক জন থাকা ভাল কি না সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ—তা'তে তারাও বুড়িয়ে যেতে পারে..."

কথা শেষ হইবার আগেই, যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা সে-ই প্রথমে পর্দা ঠেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

[ক্রমশঃ

মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ—নাবালক লইয়া

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

যাহাদের বয়স ২১এর কম রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদের নাবালক বলিয়া গণ্য করা হয়। ২১এর কমবয়স্ক কাহারও, কি মিউনিসিপ্যালিটিতে কি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে কি লাট-কাউন্সিলে অন্য যোগ্যতা থাকিলেও ভোটাধিকার থাকে না। বাংলা দেশে মুসলমানদের মধ্যে এইরূপ নাবালকের অনুপাত ও সংখ্যা বেশী। কেবলমাত্র সাবালক ধরিলে, বাংলা দেশে মুসলমানরা সমগ্র লোক-সংখ্যার শতকরা ৫৪'৪ হওয়া সত্ত্বেও, সংখ্যালঘিষ্ঠ হইয়া পড়েন। কথাটা শুনিলে খট্‌কা লাগে বটে; কিন্তু কথাটা সত্য।

ইংরেজী ১৯৩১ সালে যখন সেন্সাস লওয়া হয়, তখন কাহাকে কাহাকে ভোটাধিকার দেওয়া হইবে, আর বাংলা দেশে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বাংলার লাট-কাউন্সিলে কাহার জন্য কয়টি আসন সংরক্ষিত হইবে ইত্যাদি বিষয় লইয়া বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা চলিতেছিল। মুসলমানেরা দাবী করিতেছিল যে, তাঁহারা যখন সমগ্র বাংলা দেশের লোকসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৫৩'৫ জন (১৯২১ সালের সেন্সাস মতে) বাংলার লাট-কাউন্সিলেও তাঁহাদের জন্য সংখ্যানুপাতে বা অন্ততঃপক্ষে অর্দ্ধেকের উপর আসন ছাড়িয়া দেওয়া হউক। অপর পক্ষে হিন্দুরা বলিতেছিল যে নাবালক ও সাবালক লইয়া মুসলমানদের অনুপাত সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৫৩'৫ ভাগ বটে; কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে কেবলমাত্র সাবালকদের লইয়া কারবার। সাবালকদের মধ্যে মুসলমানদের অনুপাত অর্দ্ধেকেরও কম। তাছাড়া হিন্দুরা খাজনা ট্যাক্স দেয় বেশী—বাংলার প্রাদেশিক রাজস্বের শতকরা ৮০ ভাগ হিন্দুরা দেয়; জনহিতকর কার্য্যে তাঁহারা শুধু অগ্রণী নহেন—ইহা তাঁহাদের একরকম একচেটিয়া; শিক্ষায় দীক্ষায় তাঁহারা মুসলমানদের চেয়ে বহু অগ্রসর ইত্যাদি ইত্যাদি।

মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকার ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় বর্ত্তমান লেখক গাণিতিক হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে ২১ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক লোকদের মধ্যে মুসলমান ও অ-মুসলমানের সংখ্যা এক হিসাবে হইতেছে এইরূপ :

অ-মুসলমান—১১৪,৮৫,৯১৩

মুসলমান—১১২,৫৪,৪২৮;

আর এক হিসাবে সাবালক হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা হইতেছে :

হিন্দু—১১১,৯৬,৫৫৮

মুসলমান—১০৬,৫৪,১১৬

এক হিসাবে অ-মুসলমান সাবালকরা মুসলমান সাবালক অপেক্ষা সওয়া দুই লক্ষ বেশী; অপর হিসাবে কেবলমাত্র হিন্দু সাবালকরা মুসলমান সাবালক অপেক্ষা সাড়ে পাঁচ লক্ষ বেশী। প্রথম হিসাবে মুসলমানদের অনুপাত হয় শতকরা ৪৯'৩ জন; আর দ্বিতীয় হিসাবে তাঁহাদের অনুপাত দাঁড়ায় শতকরা ৪৭'৮এ। আর পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকারের হিসাবের গড় ধরিলে মুসলমান সাবালকদের অনুপাত দাঁড়ায় শতকরা ৪৮'৫ জন করিয়া।

সেন্সাস রিপোর্টে ৫ বৎসর অন্তর করিয়া বয়স বিভাগ করিয়া লোকসংখ্যা দেখান থাকে। যেমন ০-৫ বৎসরের ৪৬,৫৫,৬৭২ জন মুসলমান; ও ৩১,১২,০২০ জন হিন্দু ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ০-৫, ৫-১০, ১০-১৫, ১৫-২০ বৎসরের লোকসংখ্যা যোগ করিলেই বা ঐ যোগফলে ২০-২৫ বৎসরের লোকসংখ্যার ৫ ভাগের ১ ভাগ যোগ দিলেই নাবালকের সংখ্যা পাওয়া যায় না। কারণ আমাদের দেশে লোকে নিজ নিজ বয়স বলিবার সময় সঠিক বয়স বলে না—মোটামুটি বয়স বলে। আমার বয়স ৪৩; কিন্তু বলিবার সময় বলিলাম হয় ৪০, না-হয় ৪৫। এতদ্ব্যতীত সামাজিক কারণে অবিবাহিতা কন্যার

বয়স কম করিয়া বলা হয়। আর বৃদ্ধরা নিজেদের বয়স বাড়াইয়া বলেন—বোধ হয় বেশী বয়স বলিলে বেশী সম্মান তাঁহাদের প্রাপ্য হইবে। এই দোষ হিন্দুদেরও আছে; মুসলমানদেরও আছে। কিন্তু বয়স বেশী করিয়া বলিবার মাত্রাটা মুসলমানদের মধ্যে খুব বেশী। এ বিষয়ে সরকারী অ্যাক্‌চুয়ারির রিপোর্টে আছে,

"Generally the rates of misstatement [of age] are greater amongst Muhammedans than amongst Hindus" [Report on the Age-Distribution and Rates of Mortality deduced from the Indian Census Returns by Mr. H. G. W. Meikle, Actuary to the Government of India, page 18

অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে বয়স সম্বন্ধে অত্যুক্তি হিন্দুদের অপেক্ষা বেশী। এই সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমরা ২১ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক হিন্দু ও মুসলমানের লোকসংখ্যা নির্দ্ধারণ জন্য কিছু গাণিতিক হিসাব করিয়া ঐ হিসাবের ফলাফল পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে দেখাই। ঐ প্রবন্ধের গণনা সম্বন্ধে এ যাবৎ কেহ কোনও আপত্তি করেন নাই বা ভ্রম দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই—সুতরাং আমাদের গণনা যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে ও সঠিক্ হইয়াছিল ইহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি।

এইবার ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে গোটাকতক ব্যক্তিগত কথা বলিব। প্রবন্ধটি ১৩৩৭ সালের ৺পূজার ছুটিতে লেখা হইবার পর উহা আমরা বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার তৎকালীন অন্যতম সহকারী সম্পাদক ৺অনিলকুমার রায়চৌধুরীকে দেখিতে দিই এবং তাঁহাকে অনুরোধ করি তিনি যেন ইহার গণনার পদ্ধতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতামত লয়েন। তিনি উক্ত প্রবন্ধের কয়েকটি কপি করাইয়া বিমান-ডাকযোগে বিলাতে ডাঃ মুঞ্জেকে পাঠান ও অনুরোধ করেন যেন ইহা গোলটেবিল বৈঠকের ইংরেজ প্রতিনিধি-দিগকে, বিশেষ করিয়া যাঁহারা বঙ্গীয় হিন্দুর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন তাঁহাদিগকে, দেওয়া হয়। ইহা ইংরেজী ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসের ঘটনা। প্রবন্ধটি বিলাতে পাঠাইবার পর তিনি আমাকে এই কথা বলিলে, আমরা শুধু প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সহিত অল্পবিস্তর পরিচিত থাকায় তাঁহাকেও ইহার এক কপি পাঠাই এবং মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দিই ও যাহাতে জানুয়ারী মাসেই উহা বাহির হয় তজ্জন্য অনুরোধ করি। কিন্তু ঐ জানুয়ারী মাসেই আমার অপর একটি প্রবন্ধ "Communalism in the Bengal Administration"—ছাপা হওয়ায়, উহা ঐ মাসে বাহির না হইয়া ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয়। পরে ৺অনিলকুমার রায়চৌধুরীর পরামর্শে ইংরেজী ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি ঐ প্রবন্ধের কয়েক প্রুফ অগ্রিম লইয়া ভারত-সচিব ও মিঃ র‍্যামসে ম্যাক-ডোনাল্ড সাহেবকে বিলাতে বিমান ডাকযোগে পাঠান হয়—কিন্তু আমাদের বিশ্বাস উহা যথাসময়ে তাঁহারা পান নাই।

আমাদের প্রেরিত প্রবন্ধ পাঠের ফলেই হউক বা অপর কোন প্রকারে স্বাধীন চিন্তার ফলেই হউক, বাংলার মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যে নাবালক লইয়া এ-কথা বিলাতে অনেকেই জানিতে পারেন।

ইংরেজী ১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে বিলাতের হাউস অব কমন্স সভায় গোলটেবিল বৈঠক সম্বন্ধে আলোচনাকালে প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যামসে ম্যাক-ডোনাল্ড সাহেব যখন পঞ্জাব ও বাংলার মুসলমানদের কথা বলিতেছিলেন, তখন মিঃ আইজাক ফুট সাহেব বাধা দিয়া বলিয়া উঠেন, "And there are more children" অর্থাৎ তাঁহাদের (মুসলমান-দের) মধ্যে শিশুর সংখ্যা বেশী। প্রধান মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করেন, "Yes, but we do not enfranchise children"—সত্য; কিন্তু আমরা শিশুদের ভোটাধিকার দিই না। [Debates on Indian Affairs—House of Commous (21 George V—cmd. 10179 (1931) ১৩২এর কলমে দেখুন।]

ইহার কিছু দিন পরে আমরা বিলাতের ন্যাশনাল রিভিউ নামক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি প্রবন্ধ পাঠাই—ঐ প্রবন্ধে অন্যান্য কথার মধ্যে সাবালকদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যাল্পতার কথা থাকে। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক Maxse সাহেব আমাদের লিখেন যে উহা তিনি বিলাতের মর্ণিং পোষ্ট নামক কাগজে ছাপাইবার জন্য

দিয়াছেন, এবং আশা করেন লেখক যে-উদ্দেশ্যে উহা বিলাতে ছাপাইতে চাহেন তাহা সফল হইবে। উক্ত প্রবন্ধের সারাংশ পরে মর্ণিং পোষ্টে ছাপা হইয়াছিল।

ইংরেজী ১৯২১ সালে মুসলমানেরা বাংলার জনসংখ্যার শতকরা ৫৩'৫ ভাগ লইয়াছিলেন; আর সাবালক বা ২১ বৎসরের উৰ্দ্ধবয়স্কদিগের মধ্যে শত করা ৪৮'৫ জন ছিলেন। কিন্তু ইংরেজী ১৯৩১ সালে তাঁহারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জনসংখ্যার শতকরা ৫৪'৪ ভাগে দাঁড়ান। এখনও কি তাঁহারা সাবালক বা ২১ বৎসর উৰ্দ্ধবয়স্কদিগের মধ্যে অর্দ্ধেকেরও কম আছেন?

এ বিষয়ে ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে কি আছে দেখা যাউক। ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টের প্রথম খণ্ডের ৪র্থ অধ্যায়ে ১১৫ পৃষ্ঠায় একটি ছবি ও ১১৪ পৃষ্ঠায় একটি কোষ্ঠা দিয়া সেন্সাস সুপারিনটেনডেন্ট বলিতেছেন,

"Muslims at all ages form the majority of the population, but as attention is successively restricted to that portion only of the population which is above any given age their preponderance over Hindus is reduced Amongst those of and over middle age, *i.e.* aged 40 and over, there is always, as successive yuinquennial groups are excluded, an actual preponderance in numbers of Hindus. This change in the proportion, however, is entirely due to the female portion of the population. At every stage amongst males of and over any given age there are more Muslims than Hindus."

অর্থাৎ মুসলমানেরা সকল বয়সের লোকসংখ্যার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু যত পর পর বেশী বয়সের জনসংখ্যার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা যায়, দেখিতে পাওয়া যায় হিন্দুদের উপর তাঁহাদের এই প্রাধান্য কমিয়া আসিতেছে। মধ্যবয়সের বা তদূৰ্দ্ধবয়সের লোকদের মধ্যে, অর্থাৎ যাঁহারা ৪০ বা তদূৰ্দ্ধ বয়সের তাঁহাদের মধ্যে যতই পর পর পাঁচ পাঁচ বৎসরের লোকসংখ্যা বাদ দেওয়া যায়, ততই সংখ্যায় হিন্দুদের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাধান্যের এই পরিবর্ত্তন কিন্তু শুধু স্ত্রীলোকের দরুন। পুরুষদের মধ্যে প্রত্যেক ধাপে ও প্রত্যেক বয়সেই হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বেশী। (বাংলার সেন্সাস্ রিপোর্ট, ১৯৩১ সাল ১ম খণ্ড, ১১৬ পৃ.)

বাস্! সাবালকদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যাল্পতার কথা বা হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা একেবারেই তলাইয়া গেল। হিন্দুদের দাবী 'সাত বাঁও জলের নীচে' গেল।

১৯৩১ সালের সেন্সাস সুপারিনটেনডেন্ট সাহেবের উপরি উদ্ধৃত উক্তি কি প্রকৃতই সত্য? তিনি যে এই সিদ্ধান্ত করিলেন—ইহা কি যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত, না রাজনৈতিক কারণে ফরমাস মত অপসিদ্ধান্ত? আমরা সেন্সাস সুপারিনটেনডেন্ট সাহেবের সিদ্ধান্তের সত্যতা গাণিতিক হিসাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার চেষ্টা করি, কিন্তু পারি নাই। কেন পারি নাই বলিতেছি। লোকে যে যাহার বয়স বলিয়াছিল, সেই বয়সের ও লোকসংখ্যার অঙ্কগুলি সেন্সাস কর্ত্তৃপক্ষগণ কিয়ৎপরিমাণে "সুসিদ্ধ" করিয়াছেন—অর্থাৎ গোঁজামিল দিয়াছেন। আসল অঙ্কগুলি প্রকাশিত করেন নাই—আর কি ভাবে "সুসিদ্ধ" বা গোঁজামিল দিয়াছেন তাহাও ভাল করিয়া প্রকাশ করেন নাই। অতি ছোট ছোট অক্ষরে রিপোর্টের ১২১ পৃষ্ঠায় যে কোষ্ঠাটি দিয়াছেন তাহার উপরে নোট দিয়াছেন,

"The figures published in Imperial Table vii have been already corrected for minor misstatements of age."

কিন্তু কি ভাবে সংশোধিত তাহা প্রকাশ করেন নাই।

সেন্সাস-কর্ত্তৃপক্ষগণের বড় বড় অক্ষরে **Muslims at all ages form majority** ইত্যাদি উক্তি, আর অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে **The figures in imperial table vii have been already corrected for minor misstatements of age** উক্তি দেখিয়া আমাদের পয়সা পয়সা "প্রথম ভাগে"র কথা মনে পড়িয়া গেল। "প্রথম ভাগে"র মলাটের উপর বড় বড় অক্ষরে "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের" এই কথা কয়টির পরে অতীব ক্ষুদ্র অক্ষরে—খালি চক্ষে দেখা যায় না এত ছোট অক্ষরে—"প্রদর্শিত পন্থানুসারে শ্রীহরিহর ব্রহ্ম বিরচিত" ছাপার কথা মনে হইল।

এইবার আমরা সেন্সাস কর্ত্তৃপক্ষগণের "সুসিদ্ধ" করিবার বা গোঁজামিল দিবার ফল যৎসামান্য কিছু দেখাইব। ১৯২১ সালের সেন্সাসে বিভিন্ন বয়সের

মুসলমান পুরুষের সংখ্যা আমরা নিম্নের মত পাই।

বয়স		মুসলমান পুরুষের সংখ্যা
০-৫	...	১৭, ২৫, ১২৬
৫-১০	...	২২, ২৩, ৩১৫
১০-১৫	...	১৭, ১৬, ১২৭
১৫-২০	..	১১, ৪৩, ৯৯৬
২০-২৫	...	৯, ৬৬, ৭৭৪

বাহুল্যভয়ে বাকী অঙ্কগুলি উদ্ধৃত করিলাম না।

(১৯২১ সালের বাংলার সেন্সাস, ২য় খণ্ড, ৩৬ পৃ.)

যাহারা ইংরেজী ১৯২১ সালে ০-৫ বৎসরের কোঠায় ছিল দশ বৎসর পরে ইংরেজী ১৯৩১ সালে তাহারা ১০-১৫ বৎসরের কোঠায় গেল। এইরূপে ৫-১০ বৎসর ১৫-২০-এর কোঠায়, ১০-১৫ বৎসর ২০-২৫-এর কোঠায়, ১৫-২০ বৎসর ২৫-৩০-এর কোঠায়, ২০-২৫ বৎসরের ৩০-৩৫-এর কোঠায় গেল।

১৯৩১ সালের সেন্সাস হইতে ঐ ঐ বয়সের কোঠার মুসলমান পুরুষদের সংখ্যা আমরা নিম্নে দিলাম।

বয়স		মুসলমান পুরুষের সংখ্যা
১০-১৫	...	১৮, ১৬, ৫৪৯
১৫-২০	...	১২, ৩৪, ৪৪৫
২০ ২৫	...	১২, ৯৮, ০২৫
২৫-৩০	...	১২, ৪৭, ৪৬১
৩০-৩৫	...	১১, ৪৬, ৬৩০

(১৯৩১ সালের বাংলার সেন্সাস, ২য় খণ্ড, ৩৬ পৃ.)

আর আমরা তর্কের খাতিরে স্বীকার করিয়া লইলাম যে ১৯২১ হইতে ১৯৩১ পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরে ০-৩৫ বৎসরের কোন মুসলমান পুরুষ মারা যান নাই—যদিও এইটি অসম্ভব।

তথাপি আমরা কি দেখিতে পাইতেছি? ১৯২১ সালের ০-৫ বৎসরের ১৭ লক্ষ ২৫ হাজার লোক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (!!!) হইয়া ১০-১৫ বৎসরের ১৮ লক্ষ ১৬ হাজারে পরিণত হইয়াছে। ২১ বৎসর বয়সের কাছাকাছি বলিয়া ১৯২১ সালের ১৫-২০ বৎসরের ১১ লক্ষ, ৪৩ হাজার লোক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (!!!) হইয়া ২৫-৩০ বৎসরের ১২ লক্ষ ৪৭ হাজারে পরিণত হইল। ১৯২১ সালের ২০-২৫ বৎসরের ৯ লক্ষ ৬৬ হাজার লোক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (!!!) হইয়া ৩০-৩৫ বৎসরের ১১ লক্ষ ৪৬ হাজারে পরিণত হইল—একেবারে শতকরা ১৯ জন করিয়া বৃদ্ধি।

পক্ষান্তরে ১৯২১ সালের ৫-১০ বৎসরের ২২ লক্ষ, ২৩ হাজার কমিয়া ১৫-২০ বৎসরের ১২ লক্ষ, ৩৪ হাজারে প্রায় অর্দ্ধেকে পরিণত হইল। মুসলমানদের মধ্যে গত দশ বৎসরে যে এরূপ শিশুমৃত্যু হইয়াছে তাহা সরকারী স্বাস্থ্য-বিবরণীতে বা অন্য কোথাও প্রকাশ নাই। ১৯২১ সালের ১০-১৫ বৎসরের ১৭ লক্ষ ১৬ হাজার কমিয়া ১২ লক্ষ ৯৮ হাজারে দাঁড়াইল।

এইরূপ মারাত্মক কমি-বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ হইতেছে যে কর্ত্তৃপক্ষ মুসলমানগণের মধ্যে বর্ত্তমানে সাবালকের সংখ্যা বেশী দেখাইবার অভিপ্রায়ে কতকগুলি প্রকৃত নাবালককে নাবালকের কোঠায় না ফেলিয়া সাবালকের কোঠায় ফেলিয়াছেন। ফলে সাবালকদের অতি বৃদ্ধি; আর নাবালকদের অত্যন্ত হ্রাস ঘটিয়াছে।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, ১৯৩১ সালে মুসলমানদের সংখ্যা অন্যায় করিয়া বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে অত মুসলমান বাংলা দেশে নাই। কথাটা আংশিক সত্য বলিয়া আমাদের মনে হয়। কিন্তু ১৯৩১ সালের সেন্সাসের অঙ্কগুলি সঠিক বলিয়া ধরিয়া লইয়া আমরা আমাদের বক্তব্য বলিব।

১৯২১ সালে মুসলমানদের মধ্যে নাবালকের যে অনুপাত ছিল ১৯৩১ সালে তাহা থাকিলে, মুসলমানরা বাংলার জনসংখ্যার শতকরা ৫৩·৫ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ৫৪·৪ হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র বাংলার সাবালকদের মধ্যে তাঁহাদের অনুপাত শতকরা ৪৯·৩ হয়। এখনও মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাবালক লইয়া।

১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টের প্রকাশিত অঙ্কগুলি প্রকৃত ও সত্য ধরিয়া লইয়াও আমরা দেখাইব যে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাবালক লইয়া। ১৯৩১ সালে মুসলমানদের মধ্যে নাবালকের সংখ্যা বা অনুপাত ১৯২১ সাল অপেক্ষা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩১ সালের বাংলার সেন্সাস রিপোর্টের ১৫০ পৃষ্ঠা হইতে আমরা হিন্দু ও মুসলমানের যে বয়স বিভাগ অনুসারে যে অনুপাত পাই তাহা নিম্নে দেখান গেল।

প্রতি ১০,০০০এ বয়স বিভাগ

মুসলমান

বয়স	পুরুষ ১৯৩১	পুরুষ ১৯২১	স্ত্রী ১৯৩১	স্ত্রী ১৯২১
০-৫	১,৫৯৮	১,৩১৬	১,৭৫৬	১,৪৭৯
৫-১০	১,৪৭১	১,৬৯৭	১,৮০২	১,৭৪০
১০-১৫	১,২৬৪	১,৩০৯	১,২২২	১,০৭১
১৫-২০	৮৫৯	৮৭৩	১,০৮৬	১,০৩৯
মোট ০-২০	৫,১৯২	৫,০৯৫	৫,৪৬৬	৫,৩২৯

হিন্দু

বয়স	পুরুষ ১৯৩১	পুরুষ ১৯২১	স্ত্রী ১৯৩১	স্ত্রী ১৯২১
০-৫	১,৩২৬	১,০৭৫	১,৪৮৪	১,২৩৪
৫-১০	১,২৪২	১,৩৬০	১,২০৪	১,৪৩৬
১০-১৫	১,১১৪	১,১৭৪	১,০৭৬	৯৭৩
১৫-২০	৮৯৭	৯২৭	১,০২২	১,০৩৬
মোট ০-২০	৪,৫৭৯	৪,৫৩৬	৪,৭৮৬	৪,৬৭৯

পাঠকগণের সুবিধার জন্য আমরা যদি উপরিউদ্ধৃত অঙ্কগুলি নিম্নের মত করিয়া সাজাই, তবে আমরা দেখিতে পাই,

প্রতি ১০,০০০

বয়স ০—২০	পুরুষ ১৯৩১	পুরুষ ১৯২১	স্ত্রী ১৯৩১	স্ত্রী ১৯২১
মুসলমান	৫,১৯২	৫,০৯৫	৫,৪৬৬	৫,৩২৯
হিন্দু	৪,৫৭৯	৪,৫৩৬	৪,৭৮৬	৪,৬৭৯
মুসলমানদের মধ্যে নাবালকের (০—২০ বয়সের) আধিক্য	৬১৩	৫৫৯	৬৮০	৬৫০
১০ বৎসরে এই আধিক্যের বৃদ্ধি	+৫৪		+৩০	

পূর্ব্বে যে বলিয়াছি সাবালকদের মধ্যে মুসলমানদের অনুপাত শতকরা ৪৯·৩ জন করিয়া, প্রকৃত অনুপাত তদপেক্ষা আরও কম। ১৯২১ সাল অপেক্ষা ১৯৩১ সালে মুসলমানদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে নাবালকের আধিক্য হিন্দুর তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর এই বৃদ্ধির পরিমাণ প্রতি ১০,০০০ হাজারে $\frac{৫৪+৩০}{২}=৪২$ বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি; অর্থাৎ শতকরা হিসাবে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ০·৪২। সুতরাং ১৯৩১ সালে সাবালকদের মধ্যে মুসলমানদের প্রকৃত অনুপাত ৪৯·৩—০·৪২=৪৮·৯ হইতেছে। এই গণনাতেও একটি ভুল রহিয়া গেল—আর সেই ভুলটি মুসলমানদের সুবিধাজনক। আমরা ২০ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক লোকদের সাবালক ধরিয়া লইয়াছি; ২১ বৎসর বয়স্ক লোকেদের বাদ দিই নাই। কেবলমাত্র ২১ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক লোকদের সাবালক ধরিলে মুসলমানদের মধ্যে সাবালক বা ভোটাধিকারের যোগ্য লোকের অনুপাত আরও কমিয়া যাইবে।

সর্ব্বশেষে ছোট একটি কথা বলিতে চাই। সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্তব্যে ৪০ বৎসরের উপর হিন্দুদের যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে তাহা কেবলমাত্র স্ত্রীলোকদের দরুন বলিয়া হিন্দুদের উপর পরোক্ষে কটাক্ষপাত করিয়াছেন। এই কটাক্ষপাত করা সঙ্গত হয় নাই। কারণ মুসলমানদের মধ্যে যে-কোন কারণেই হউক না কেন, হিন্দুদের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী। প্রতি ১,০০০ হাজার পুরুষে গত ৩০ বৎসর ধরিয়া হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে স্ত্রীলোকের অনুপাত কিরূপ ছিল তাহা নিম্নে দেখান হইল।

সেন্সাস বৎসর	হিন্দু	মুসলমান	মুসলমানের মধ্যে বেশী নারীর অনুপাত
১৯০১	৯৫১	৯৬৮	১৭
১৯১১	৯৩১	৯৪৯	১৮
১৯২১	৯১৬	৯৪৫	২৯
১৯৩১	৯০৮	৯৩৬	২৮

বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যদি কোন জাতি স্ত্রীলোকের অঙ্কল ধরিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে চাহেন তো সে বাহাদুরি হিন্দুর প্রাপ্য নহে।

অন্তরালে

শ্রীমনোজ গুপ্ত, এম. এ., বি. এল.

"সর্ব্বনাশ হবে, সর্ব্বনাশ হবে, সর্ব্বনাশ হবে—ধর্ম্মে সইবে না—আমি যদি…" শুনতে শুনতে ঘুম ভেঙে গেল। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এ-পাড়ায় সবে কাল এসেছি; প্রথম দিনের সকালেই যখন এই নমুনা তখন কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা বলা যায় না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর এ-বাড়ীটা ঠিক করেছিলাম; অত কম টাকায় একটা আলাদা বাড়ী পাওয়া যায় না। অথচ ফ্ল্যাটে থাকতে একেবারেই অভ্যস্ত নই। বাড়ী কলকাতার আদিম ইতিহাসের সাক্ষ্য দিলেও আমাদের পক্ষে বেশ ভালই; পাড়াটাও বেশ নিরিবিলি বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু প্রথম সকালেই যে-পরিচয় পেলাম তাতে বেশ সন্তুষ্ট হ'তে পারলাম না।

ওদিকে তখন মুদারা ছেড়ে তারায় উঠেছে। কানে গেল, "এ-সব বদ্মায়সি; আমায় জব্দ করবার মতলব। মনে করেছে একা বিধবা মানুষ…" আর শুয়ে থাকা চলল না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে এ-সব কথা শুনতে মোটেই ভাল লাগছিল না। ঠিক কোন্ বাড়ী থেকে যে কথাগুলো আসছিল তা বুঝতে পারি নি—চার ফুট চওড়া গলির দু-ধারে বাড়ী, গায়ে গায়ে; এক বাড়ীর কথা অন্য বাড়ীর শুনতে মোটেই কষ্ট করতে হয় না, 'শুনব না' ভাবলেও উপায় নেই। বিধবা মানুষের গলার আওয়াজ তখনও শোনা যাচ্ছে, তবে এখন আর তারায় নয়, একেবারে নাকি-সুরের কান্নায় এসে পৌঁছেছে। আশ্চর্য্য, দ্বিতীয় প্রাণীর সাড়া পেলাম না। একা-একা যে ঝগড়া করা যায় তা জানতাম না, ভাবলাম মহিলাটির মাথা খারাপ! সময়-অসময়ে যদি এই রকম করে চেঁচাতে আরম্ভ করে তা হ'লেই তো গিয়েছি আর কি! সারাদিন বাড়ীতে থাকতে হয়, প্রায় এক বছর এই রকম আছি তাও সহ্য হয়েছে, কিন্তু এ সহ্য হবে বলে মনে হয় না।

চা নিয়ে মা ঘরে ঢুকলেন। আমায় উঠতে দেখে বললেন, "উঠেছিস! আর না উঠেই বা উপায় কি? যে রকম চেঁচাচ্ছে।"

জিজ্ঞেস করলাম; "ও পাগলটি কোন্ বাড়ীতে থাকে?"

বিরক্ত হয়ে মা বললেন, "পাগল কেন হ'তে যাবে? জ্ঞান বেশ টন্‌টনে। সামনের বাড়ীর বাড়ীউলী। তিন কুলে কেউ নেই।"

"তবে ঝগড়া করছে কার সঙ্গে?"

"ভাড়াটেদের সঙ্গে। ও তো নিজে থাকে একটা ঘর নিয়ে, বাদবাকি সব ঘরগুলো ভাড়া দিয়েছে। কতগুলো সংসার যে ও-বাড়ীতে আছে! এই তো ঝগড়া করছে, আবার এখনি ডাকবে যেন কত আপনার লোক।"

মেয়েদের আশ্চর্য্য ক্ষমতা। কাল সন্ধ্যাবেলা এসেছেন এর মধ্যে এত খবর সংগ্রহ করেছেন। কি ক'রে যে সম্ভব হ'ল তা ভাবতেও পারি না। এই জন্যই বোধ হয় পাশ্চাত্য দেশে মেয়েদের দিয়ে গুপ্তচরের কাজ করায়। আর কিছু জানা গেল না—মা'র বসবার সময় ছিল না। চা খেয়ে নিয়ে আমিও উঠছিলাম ওয়াই. এম. সি. এ যাব ব'লে—বিনা পয়সায় সব ক'টা খবরের কাগজ আর কোথাও পড়তে পাওয়া যায় না, আর কাগজগুলো না দেখলে চাকরি খালির খবরও পাওয়া যায় না। আমাদের বাড়ী থেকে বেরতে গেলে বিধবা মানুষের বাড়ীর দিকে নজর পড়বেই। এরই মধ্যে বাড়ীটার সম্বন্ধে বেশ একটু সচেতন হয়ে উঠেছি, আশপাশের আর সব বাড়ীর সঙ্গে এ-বাড়ীটার যেন কোন পার্থক্য আছে। সদর দরজাটা খোলা ছিল, বাড়ীর ভিতরের অনেকটা পর্য্যন্ত দেখা যায়, চেষ্টা ক'রে দেখবার দরকার হয় না। রকের উপর ব'সে একজন আধা-বয়সী স্ত্রীলোক চা করছিলেন। যেতে যেতে শুনতে পেলাম, "বৌদি, ও বৌদি, চা যে জুড়িয়ে

গেল।" গলাটা সেই বিধবা মানুষের। নেপথ্য থেকে জবাব এল, "চা খাব কি বল? আজ যে একাদশী।" বিধবা মানুষটির কথাগুলো কানে এল, "মনে থাকে না—আমি পারি না, চা না খেলে আমার ঘুমই ছাড়ে না তা কাজকর্ম্ম করব কি ক'রে? মাছ ছাড়বার কথাই শাস্তরে আছে, চা ছাড়বার কথা তো আর নেই। জ্যান্তে আমায় ভারি সুখী করেছিলেন তাই তাঁর জন্যে···" শেষ কথাগুলো কানে এল না, গলির মোড়ে এসে গিয়েছিলাম। এই লোকই যে ক-মিনিট আগে পাড়া মাথায় করেছিলেন তা বিশ্বাস করে কার সাধ্য!

ক-দিনের মধ্যে সেই রহস্যময় বাড়ীটার সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা গেল, জানতে বাধ্য হ'লাম বললেও মিথ্যে কথা বলা হয় না। বাড়ীটায় যে ঠিক কত জন লোক আছে তা জানতে হ'লে বোধ হয় আদমসুমারির দরকার হ'ত। প্রতিদিন ঘুম ভাঙত তাদের কিচিরমিচির আওয়াজে আর তাই শুনতে শুনতে ঘুমুতে যেতে হ'ত। সেই বিধবা মানুষটির গলা একসঙ্গে পাঁচ মিনিট শুনি নি এমন কোন দিন হয় নি, আর বেশীর ভাগ তা সুরু হ'ত সপ্তমে। ভাবতাম মহিলাটির গলা কি দিয়ে তৈরি! চেঁচাবার জন্যে তাঁর বিষয়ের অভাব কোনদিনও হ'ত না। প্রথম প্রথম ভাল বুঝতে পারতাম না তাঁর রণচণ্ডী মূর্ত্তির কারণ কি; অল্প ক'দিনের মধ্যেই কারণগুলো প্রায় সবই জানা হয়ে গেল।

মা'র কাছে শুনেছিলাম তাঁর ত্রিকুলে কেউ নেই, কিন্তু তাঁর কথা শুনে তা বিশ্বাস করা অসম্ভব। ভোর-বেলা বৌদিকে চা খেতে নিমন্ত্রণ থেকে আরম্ভ হ'ত, তার পর কে কারখানায় কাজ করে তার উঠতে বেলা হয়ে গেছে, কার ছোট ছেলেটা সকাল থেকে খেতে পায় নি চেঁচাচ্ছে, কার মেয়ের বয়সের গাছপাথর না থাকা সত্ত্বেও লজ্জাসরমের লেশ মাত্র নেই, কার রাঁধতে তেল খরচ হয় সবচেয়ে বেশী—এ সবের কোনটাই বাদ পড়ত না। ভদ্রমহিলার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতার তারিফ না ক'রে পারা যায় না। পাড়ার কে কি করছে না-করছে সব তাঁর জানা আছে। এক-এক সময় এমন সব কথা কানে আসত যা শুনলে কানে আঙুল না দিয়ে থাকা যায় না, কিন্তু উপায় নেই, শুনতেই হবে, কানে তো আর সত্যি সীসে ঢেলে বসে থাকা যায় না।

প্রথম ক'দিন তাঁর হঠাৎ চীৎকার শুনে ভয় পেয়ে যেতাম, ভয়ানক কিছু না হলে লোক ও-রকম ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে না; ক্রমশঃ বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেল। বেশীর ভাগ চেঁচানর কারণ হচ্ছে একটি ছোট্ট ছেলে পানু—বৌদির নাতি। সময়-অসময় ছেলেটা বিধবা মানুষের ঘরে গিয়ে হাজির হ'ত আর তিনি চীৎকার করতে বাধ্য হতেন। সময়-সময় ভাবতাম ছেলেটির বাপ-মাই বা কি রকম? যাকে নিয়ে দিবারাত্র এত হাঙ্গাম, তাকে একটু আটকে রাখে না কেন? আটকে যে কেন রাখে না তা আবিষ্কার করতেও সময় লাগল না। পানু তার মা'র সঙ্গে তার মামার বাড়ী গিয়েছিল—অবশ্য খবরটা সেই বিধবা মানুষটির মারফতেই পেয়েছিলাম। তাদের ফিরে আসার মধ্যে যে ক'বার শুনেছিলাম, "এ তোমার অন্যায় বৌদি, পানুকে তুমি কেন পাঠালে? তাদের ঘরে দাঁড়াবার জায়গা নেই, সেখানে কি ছেলেকে পাঠায়?"—তা বলা যায় না! আশ্চর্য্য হতাম এই ভেবে যে বাড়ীর আর সব লোক কি ক'রে এসব সহ্য করে? পয়সা দিয়ে থাকে যখন, তাঁর এত আত্মীয়তা করবারই বা কি দরকার, আর এত জুলুম করবারই বা কি দরকার? কারণটা বিধবা মানুষটিই সময় মত জানিয়ে দিলেন।

পিয়ন এসেছিল মনি-অর্ডার নিয়ে। ত্রিকুলে যার কেউ নেই তার কোথা থেকে মনি অর্ডার আসে ভাবছিলাম। শুনলাম বিধবা মানুষটি বলছেন, "তা বাবা এ-মাসে এত দেরী কেন? দেরী করলে কি আমার চলে? ঐ ক'টা টাকার উপর নির্ভর ক'রে থাকতে হয়। নামেই এতগুলো ভাড়াটে; টাকা দেবার বেলায় কারও হাত বেরোয় না! কি করব? ভাবি, আছে থাক্, দেবেই অখন। তুমি বাবা আর একটু তাড়াতাড়ি ক'রে নিয়ে এস।"

পিয়ন বললে, "আমি কি করব মা? আপিস থেকে টাকা পাঠালে তো দেব! আমাদের দেরী করবার উপায় নেই, টাকা আমরা ফেলে রাখি না।"

"তা কি হয় বাবা? সে কি যে-সে আপিস? তারা

টাকা দেরী ক'রে পাঠাবে কেন? কত তাদের দয়ার শরীর! তিনি তো একেবারে ভাসিয়ে গিয়েছিলেন; ভাগ্যে অমন আপিসে কাজ করতেন তাই তো আজও খেতে পাচ্ছি—মাসটি শেষ হয় আর তারা পেন্‌সিন্‌টি পাঠিয়ে দেয়…" পিয়ন ততক্ষণ বোধ হয় পোষ্ট আপিসে ফিরে গেছে, তাই তাকে শুনতে হয় না, কিন্তু আমাদের শুনতে হয়। এইটুকু সহ্য করলেই যদি নিয়মিত ভাড়া দেওয়ার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় তাহলে কলকাতা শহরে লক্ষ লক্ষ লোক তাতে রাজি আছে, চাই কি আমিও রাজি হ'তে পারি কিন্তু তখনও আমার অনেক কিছু জানতে বাকি ছিল।

নীরদ ঐ বাড়ীর ভাড়াটেদের মধ্যে এক জন। ছেলেটি নাকি কোন্ থিয়েটারে কাজ করে—থিয়েটার করে না, দর্শকদের জায়গা দেখিয়ে দেয়। মাইনে খুবই অল্প পায়, পোষ্য অনেকগুলি, মা, ভাই একটি, দুটি বোন, নিজের স্ত্রী! ছেলেটির সঙ্গে প্রায়ই দেখা হ'ত গলিতে আসতে-যেতে। ঠিক বিয়ে করার বয়েস তার হয়েছে বলা যায় না—কে যে তার উপর দয়া ক'রে তার বিয়ে দিয়েছিলেন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করত কিন্তু পেরে উঠতাম না। কোথায় যে বাধত তা জানি না—অবস্থা দু-জনেরই প্রায় এক রকম, বরং তার ভাল বলতে হবে, সে যা হোক কিছু রোজগার করে, আমি তাও করি না—তবু তার সঙ্গে মিশতে বাধত—বোধ হয় এক দিন তার চেয়ে অনেক উঁচুতে ওঠবার স্বপ্ন দেখতাম ব'লে।

নীরদের দুটি বোনেরই বিয়ের বয়েস হয়েছে, মানে এক জনের বিয়ের বয়েস সামাজিক নিয়মে অনেক দিন পেরিয়ে গিয়েছে, আর এক জনের বয়েস যাই যাই করেও যেতে পারছে না—বোধ হয় গরীবের উপর করুণায়। তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হলেও বিধবা মানুষটির মারফৎ পরিচয় হয়ে গিয়েছিল, দু-এক বার যে দেখি নি তাও নয়। বড়টির নাম করুণা, ছোটটি নির্ম্মলা। করুণার সঙ্গে বিধবা মানুষটির রাশিচক্রের যে কি যোগ ছিল জানি না, তিনি তাকে মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। সকাল বেলা কলে যাওয়া থেকে তার সঙ্গে সুরু হ'ত আর রাত্রে খোলা বারান্দায় শোয়া পর্য্যন্ত তা চলত। তার সব তাতেই দোষ! ঐ একটি লোকই বাড়ীর মধ্যে বিধবা মানুষটির একাধিপত্যে একটু বাধা দিত, মাঝে মাঝে তাঁর কথার জবাব দিয়ে। সেই জন্যেই বোধ হয় তাকে তাঁর বাক্য-বাণ সব চেয়ে বেশী সহ্য করতে হ'ত। তার যে বিয়ের বয়েস অনেক দিন কেটে গিয়েছে এবং বিয়ের আশা তার একেবারেই নেই এটা সব সময় তাকে মনে ক'রে দেওয়া তাঁর একটা নৈতিক কর্ত্তব্য ব'লে বিধবা মানুষটি মনে করতেন। করুণার জবাবটা মাঝে মাঝে কানে আসত, "তা মাসিমা মেসোমশায়ের মত এক জনের হাতে পড়ার চেয়ে এ কি ভাল নয়?"

অমনি সপ্তমে সুরু হ'ত, "তাঁর মত লোকের হাতে পড়া ক'জনের ভাগ্যে হয়? সে কি একটা যে-সে লোক ছিল? জানিস, আপিসের বেয়ারা এসে বাড়ীতে কত খাতা-কাগজ-পেনসিল দিয়ে যেত?"

করুণা কিছুমাত্র উত্তেজিত না হ'য়ে বলে, "তোমারই কাছে শুনেছি মেসোমশায় যত দিন বেঁচেছিলেন তোমায় শান্তিতে নিশ্বাস ফেলতে দেন নি।" চালে খড়ে আগুন ধরে যায়। অতিপরিচিত গলায় শুনতে পাই, "কোন্ হারামজাদি বলে? অনেক ভাগ্য করলে তার মত লোকের হাতে পড়ে। তোরা কি সে ভাগ্য ক'রে…" ইত্যাদি।

করুণার আর কোন কথা শুনতে পাওয়া যেত না; তার মা বলতেন, "কি যে করি মেয়েটাকে নিয়ে? এক জ্বালা হয়েছে।" তার পর আসতেন বিধবা মানুষটির কাছে, তাঁকে শান্ত করতে—অবশ্য অনেকটা সময় লাগিত।

কি জানি কেন প্রথম দিন থেকেই বিধবা মানুষটির উপর একটা বিরক্তি এসে গিয়েছিল; সেদিন সেটা আরও বেড়ে গেল আমার নিজের সম্পর্কে একটা কথা শুনে। তিনি জানতেন আমি বাড়ী নেই, সেটা আমার ফেরবার সময়ও নয়। কি কারণে ওয়াই. এম্. সি. এ বন্ধ ছিল তাই তাড়াতাড়ি ফিরছিলাম, শুনলাম বিধবা মানুষটি কাকে বললেন, "আইবুড় ধেড়ে মেয়ে আর ঘরে বসে থাকা ছেলে দুইই এক। এই ধর না কেন সামনের বাড়ীর ঐ ছেলেটা! দিনরাত ঘরে বসে আছে, ভালও লাগে! আমি মা হতাম তো এক বার বুঝিয়ে দিতাম! কি ক'রেই যে বুড়ো বাপের জমানো পয়সায় ব'সে ব'সে খায়।" ইচ্ছে

করছিল গোটাকতক কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিই কিন্তু পারলাম না; হাজার হোক মেয়েমানুষ তো! আর একটা কারণও বোধ হয় ছিল—কথাগুলোর সত্যতা অস্বীকার করবার ক্ষমতা আমারও ছিল না, কিন্তু সহ্যের সীমা সেই দিনই ছাড়িয়ে গেল। ব্যাপারটা করুণাকে নিয়েই।

দুপুর বেলা বিস্তি খেলা হচ্ছিল—প্রায়ই হয়, তবে আজ এক জন নূতন লোকের আগমন হয়েছে বুঝতে সময় লাগল না। লোকটির নাম শুনলাম রজত। এর আগে এখানে কোন দিন তার নাম শুনেছি বলে মনে হ'ল না। কথাবার্ত্তায় বুঝলাম রজতবাবু এখানে প্রায়ই এসে থাকেন তবে সম্প্রতি কিছু দিন আসেন নি। বিধবা মানুষটি যেভাবে তাঁর অভ্যর্থনা করলেন তাতে মনে হ'ল তিনি তাঁর নিকটতম আত্মীয়—ভদ্রমহিলা আধুনিক নয়, তা না হ'লে ভাবতাম তাঁর বিশেষ বন্ধু।

খেলা চলছিল; এক দিকে ছিলেন বিধবা মানুষটি আর রজত অন্য দিকে নীরদ আর বিধবা মানুষটির বৌদি। হঠাৎ বিধবা মানুষটির বিকট হাসি শুনতে পেলাম। সে-রকম হাসি খুব বেশী শুনেছি বলে মনে হয় না; আগের যুগের লোকের কাছে বৈঠকি হাসি বলে একটা কথা শুনেছিলাম, এ বোধ হয় তাই। তাঁর হাসি থামবার আগেই নীরদ উঠে পড়ল; সেদিন তাদের থিয়েটারে ম্যাটিনি ছিল তাই সে আর দেরি করতে পারলে না। বিধবা মানুষটি করুণাকে ডাকতে সুরু করলেন কিন্তু অনেকক্ষণ ডাকবার পরেও তার জবাব পেলেন না। রজতকে শুনিয়ে বললেন, "মান করেছেন! আমি তো বড় ধার ধারি। সকালে না-হক্ আমায় কতকগুলো কথা শোনালে আবার তার উপর মান! যা মরগে যা।" খেলাটা বন্ধ হয়ে গেল।

একটু পরেই শুনতে পেলাম নীরদ থিয়েটার থেকে এক জন লোক পাঠিয়েছে; থিয়েটারে মোটেই ভিড় হয় নি, বাড়ীসুদ্ধ সবাইকে সে আজ থিয়েটার দেখাতে পারে। বিধবা মানুষটি প্রথমেই রজতকে জিগ্যেস করলেন, "তুমি যাবে নাকি?"

বেশ তাচ্ছিল্যের সুরে রজত বললে, "আমার কোন থিয়েটার আরম্ভ হওয়ার সাত দিন পরে দেখতে বাকি থাকে না, তাছাড়া আমি ও-রকম পাসে থিয়েটার দেখতে যাই না। কত থিয়েটার-বায়স্কোপ আমার বাড়ীতে গাড়ী-গাড়ী পাস পৌছে দিয়ে যায়।

বিধবা মানুষটি বললেন, "আমিও যাব না, আমার শরীরটা বিশেষ ভাল নেই। তোরা সবাই যা।"

বিধবা মানুষটির বৌদি বললেন, "মুশকিল হয় তো বৌমার যাওয়ার; পানুকে নিয়ে থিয়েটার যাওয়া—ছেলেটা যে শয়তান, কাউকে শুনতে দেবে না।"

বিধবা মানুষটি বললেন, "না না, ওকে এখানে রেখে যাও; আমি রইলাম, তাছাড়া করুণা নির্ম্মলা রইল···

করুণার মা বললেন, "ওদেরও নিয়ে যাব ভাবছিলাম; বড় একটা হয়ে ওঠে না, তা···"

"না না, ধেড়ে ধেড়ে মেয়ে নিয়ে আবার থিয়েটারে যাবে কি? লোকে কথায় বলে নাটক, নভেল! সোমত্ত বয়েস, তার উপর বিয়ে হয় নি, থিয়েটারে নিয়ে যাবে কি? অকথা-কুকথা কত কি বলে···"

এর পর কথা বলার ক্ষমতা করুণার মার ছিল না। অন্য সময় হ'লে করুণা কি বলত বলা যায় না কিন্তু রজতের সামনে সে কিছুই বললে না। যারা থিয়েটার যাবার তারা চলে গেল; তখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। যে তক্তাপোষটার ওপর বিস্তি খেলা হচ্ছিল রজত তারই এক দিকে হেলান দিয়ে শুয়েছিল; তার সামনেই ছিলেন বিধবা মানুষটি, একটু দূরে পানু আপনার মনে খেলা করছিল। বিধবা মানুষটির কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না—এই প্রথম কথা বলার সময় তাঁর গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম না। আশ্চর্য্য লাগছিল।

পানুর কান্না শুনতে পেলাম; কেউ তাকে থামাল না, সে কাঁদতেই লাগল। রজত বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "ও দিদি, ছেলেটা যে চেঁচাচ্ছে।"

দূর থেকে বিধবা মানুষটি জবাব দিলেন, "যাচ্ছি ভাই, কাপড়টা কেচে নি, সন্ধ্যে হয়ে গেল। গায় জলটা দিয়েছি আর মুখপোড়া ছেলে চেঁচাতে সুরু করেছে।"

রজত বাবুর গলা শুনলাম, "বাড়ীতে তো আরও লোক

রয়েছে।" পান্নুর কান্না ক্রমেই বাড়ছিল, শুনতে বিশ্রী লাগছিল। হঠাৎ সে চুপ করল, ভাবলাম বিধবা মানুষটির এতক্ষণে সময় হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় শুনলাম, "তোমার লজ্জা করে না? সেদিনের কথা মনে নেই?"

আর একজনের গলা শুনলাম, "এখানে কেন আসি তা তুমি জান, তোমায় রাণীর মত..."

এবার করুণার গলা বেশ স্পষ্ট শুনতে পেলাম, "হাত ছাড়; বেরিয়ে যাও, নইলে লোক ডাকব।"

হঠাৎ কেন আমার ঘরের আলোটা জাললাম জানি না—বোধ হয় আমার উপস্থিতির কথাটা তাদের জানিয়ে দিতে। একজন লোকের তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার শব্দ পেলাম—তিনি যে রজতবাবু তা বুঝতে মোটেই দেরী হ'ল না। রজতের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই বিধবা মানুষটির গলার সপ্তম সুর শুনলাম, "রাক্ষুসি, তুই আবার রজতের কাছে গিয়েছিলি? এখনও তোর শিক্ষা হয় নি? একবার তোর বেহায়াপনার জন্যে ও এ-বাড়ী ছেড়েছিল আবার তাকে তাড়ালি? ওঃ, কি শয়তান! এক মিনিট সরে গেছি অমনি কালনাগিনী এসেছে। এর চেয়ে..."

করুণা দাঁতে দাঁত চেপে বললে, "খবরদার বলছি, অনেক সহ্য করেছি, এবার আর..."

মা এসে ঘরে ঢুকলেন। তাদের কথা বেশ মন দিয়ে শুনছি দেখে বললেন, "একটু বাইরে ঘুরে আয়, ও-সব কেলেঙ্কারির কথা..."

বেশ চেঁচিয়েই বললাম, "আমি সব জানি মা, সব জেনে শুনে চুপ ক'রে চলে যাওয়া অন্যায়, ভয়ানক পাপ। মেয়েটির কোন দোষ নেই, লোকটা ওর হাত চেপে ধরেছিল, ও লোক ডাকার ভয় দেখাতে পালায়। এ-রকম ক'রে ওর নামে দোষ..." মা বললেন, "কি করবি, কথা বলতে গেলে ছোটলোকের মত যা-তা বলতে সুরু করবে—নিজের মান বাঁচাতে পারবি না।" মা প্রায় জোর ক'রেই বাড়ীর বাইরে পাঠিয়ে দিলেন।

সমস্ত রাস্তাটা করুণার কথা ভাবতে ভাবতে গেলাম। মেয়েটিকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে ঐ বাঘিনীর হাত থেকে; তার আপনার লোক কেউ বাড়ী নেই, থাকলেও যে বড় বেশী কাজ হ'ত তা বলা যায় না। ঠিক করলাম এ-পাড়ায় আর নয়, কাল যেখানে হোক একটা বাড়ী ঠিক করব—বাবা-মা আপত্তি করবেন না নিশ্চয়।

অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরলাম। ভাবছিলাম ধূমায়িত বহ্নি তখনও দেখতে পাব, না-পেয়ে আশ্চর্য্য হ'লাম। ব্যাপার কি? বাড়ী ফিরে মাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারছিলাম না; শেষে বললাম, "বাবা, কাল বাড়ীটা ছেড়ে দেব ভাবছি।"

বাবা বললেন, "কালই? বাড়ী কোথা পাবি?"

বললাম, "যেমন ক'রে হোক যোগাড় করব।"

মা বললেন, "সেই ভাল; এখানে আর থাকতে পারব না।" তখনও আসল কারণটা জানতে পারি নি, ভাবছিলাম ঐ সব কুৎসিত কথার জন্যে মা বলছেন। জানতে সময় লাগল না।

বিধবা মানুষটির গলা শুনলাম, "আমায় আসে উপদেশ দিতে! মাগীর সাহসও কম নয়। একটা গোটা বাড়ী নিয়ে রয়েছে তাই ধরাকে সরা দেখছে। আরে তুই তো ভাড়াটে, আমার নিজের বাড়ী।" মার মুখের দিকে তাকালাম; মা চুপ ক'রে রইলেন। নেপথ্যে আবার শুনলাম, "কি করবি কি? মারবি? গুণ্ডা ছেলে আছে তাই ভয় দেখাচ্ছিস? রজত হাত ধরেছিল, উনি নিজে দেখেছেন! রজত সেই ছেলে! ও-রকম মেয়ে তার জুতো ঝাড়ার জন্যেও সে রাখে না।" বুঝলাম মা ছেলের জানাটাকে নিজের জানা বলে মিথ্যের ভাগী হয়েছেন একটি অসহায় মেয়ের জন্যে। বাইরের দরজার দিকে যেতে মা বললেন, "কোথা যাচ্ছিস? মাথা খাস..."

বললাম, "পুলিসে খবর দিতে—এত রাত্রে চেঁচামেচি ভদ্রলোকের পাড়ায়..." মা এসে হাত ধরলেন।

ওদিকে তখনও গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে তবে একটু একটু ক'রে কমে আসছে—আশা করা যায় এক সময় থামবে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম ঐ এক জন বিধবা স্ত্রীলোকের ভয়ে পালাচ্ছি—এর চেয়ে কাপুরুষতা আর কি হ'তে পারে? কিন্তু থাকিই বা কি ক'রে? একদিন যে আমার

সম্বন্ধে আরও কড়া রকম কিছু বলবে না তা কি ক'রে বলা যায়? এই সব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুম ভাঙল অনেক রাত্রে। খোলা জানলাটা দিয়ে সামনের বাড়ীর সবটার প্রায় দেখা যায়। বাড়ীটার অবস্থা দেখে আশ্চর্য্য হলাম—শুধু রাত্রের ক'ঘণ্টা বাড়ীটা একটু নিস্তব্ধ হয়, আজ দেখলাম প্রায় সব ঘরেই আলো জলছে, সবাই ব্যস্ত। ভাবলাম মেয়েটা শেষ পর্য্যন্ত কি···ভুল করেছিলাম।

পান্নুর বাবার গলা শুনলাম, "মাসিমা ও আর বাঁচবে না।"

ধমক দিয়ে বিধবা মানুষটি বললেন, "কি ছেলেমানুষি করছ? বড় ডাক্তার ডাক; আমি জানি ফুঁড়ে ওষুধ দিলে ও অসুখ সেরে যায়।"

"বড় ডাক্তার? মাসিমা আমার কাছে যে একটা টাকাও পুরো নেই।"

"আমি আছি কি করতে? তুমি ডাক্তার ডাক, যত টাকা লাগে।"

"টাকা এত রাত্রে কোথায় পাবে মাসিমা?"

"সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। বেনেদের বাড়ী গেলেই টাকা দেবে, তারা আমার এ হারছড়া বেশ চেনে। কে বড় ডাক্তার কাছে আছ জান? না জান তো সামনের বাড়ীর ওদের জিজ্ঞেস কর; সেদিন ওদের বাড়ী বড় ডাক্তারদের কথা হচ্ছিল।"

কে এসে কড়া নাড়লে; জানলা দিয়ে দেখলাম পান্নুর বাবা। দরজা খুলে দিয়ে বললাম, "আপনি বাড়ী যান, আমি ডাক্তার ডেকে আনছি।"

দেখলাম বিধবা মানুষটি একটা মোটা শাদা চাদর গায়ে দিয়ে বাড়ী থেকে বেরুলেন।

পান্নুর বাবা বললে, "একা যেও না মাসিমা।"

যেতে যেতে মহিলাটি বললেন, "যা, যা, বাজে বকিস নে, আমার কাকে ভয়? বিধবা মানুষ···"

কৃপা

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তোমার কৃপার পরশমণির
লাগল ছোঁয়া যার জীবনে—
চকিতে তার মনের মরু
উঠল হেসে ফুলের বনে।
ঘুমিয়ে ছিল ঝরণা-ধারা—
হঠাৎ জেগে পাগল-পারা
উধাও হয়ে ছুটল বেগে
বাজিয়ে নূপুর ক্ষণে ক্ষণে॥

পুঞ্জীভূত ঘন আঁধার
এক নিমেষেই গেল দূরে—
স্তব্ধ পুরী মুখর ক'রে
বাজল বাঁশি ভোরের সুরে
যাবার যাহা গেল সরে—
জ্যোতির মুকুট মাথায় পরে'
নতুন মানুষ বেরিয়ে এল—
আনন্দ তার দু-নয়নে।

নিরক্ষরের পথে শিক্ষালাভ

বেলতলা বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রচেষ্টা

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

আমরা অনেকে জানি যে আমাদের দেশের শ্রমজাত পণ্যদ্রব্যাদির দারুণ দুর্দ্দশা বর্ত্তমান কালে আমাদের অর্থনীতিকে পীড়িত ও পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে ভারতের শ্রমজাত শিল্পদ্রব্য দেশ-বিদেশে প্রেরিত ও বিক্রীত হইত, এবং প্রভূত অর্থ বিদেশ হইতে আসায় দেশের ধনভাণ্ডার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পরিপূর্ণ হইত। প্রাচীন ভারতের এই বহির্বাণিজ্যের ইতিহাস নানা প্রত্যক্ষ-প্রমাণে আজও উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্ব-যুগে ভারতের বস্ত্রশিল্পীর হাতে বোনা উৎকৃষ্ট কার্পাস-বস্ত্র ব্যাবিলন, মিশর এবং রোমে ব্যবহৃত হইত তাহার প্রমাণ ঐতিহাসিকরা সংগ্রহ করিয়াছেন। কেবল বস্ত্র নয়, নানা শ্রমজাত ভারতীয় শিল্পদ্রব্য ভারতের বাহিরে সাদরে গৃহীত হইত এবং উচ্চহারে বিক্রীত হইত। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে রোমের ঐতিহাসিক প্লিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, রোমের প্রভূত অর্থ ভারতীয় দ্রব্যাদির (তাহার মধ্যে ছিল সূক্ষ্ম সুতার পরিধেয় বস্ত্র, যাহা রোমের সুন্দরীদের ছিল বিশেষ প্রিয়-বস্ত্র) মূল্য রূপে রোমের ধনভাণ্ডার শূন্য করিয়া, প্রতি বৎসর ভারতে চলিয়া যাইতেছে। ভারতের এই বৈদেশিক বাণিজ্য এককালে অতি বিস্তৃত ছিল, এবং দেশের ধনভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করিয়া ভারতের অর্থনীতিকে সবল করিয়া রাখিয়াছিল। মধ্যযুগে এবং মুসলমানী আমলেও এই ভারত-শিল্পের বহির্দ্দেশে রপ্তানির ইতিহাস গৌরবের ইতিহাস। ভারতের বণিক, সার্থবাহ ও শ্রেষ্ঠীরা ভারতের শিল্পদ্রব্য জাহাজে করিয়া বিদেশে লইয়া গিয়া, বিক্রয় করিয়া, প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিত, তাহার পুনঃপুনঃ উল্লেখ জাতকে, প্রাচীন পালি-সাহিত্যে, ভারতের নানা প্রাচীন নাটকে, 'কথাসরিৎসাগরে,' এবং অন্যান্য প্রাচীন ও মধ্য যুগের সাহিত্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম যুগ পর্য্যন্ত, ভারতের সুবিখ্যাত 'শাল' ইংলণ্ডে এবং ফ্রান্সে যথেষ্ট বিক্রয় হইত, এবং "পেস্‌লী শলে"র রূপে এবং নামে বিদেশে অনুকৃত হইয়াছিল। সুবিখ্যাত ফরাসী মূর্ত্তি-চিত্রকর অ্যাঙ্গ্রের নানা মূর্ত্তি-চিত্রে ফরাসী সুন্দরীরা ভারতের শালে বিভূষিত হইয়া চিত্রিত হইয়াছেন।

ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের এই যে বিদেশে প্রসার লাভ, ও বিদেশী বাজারে ইহা স্থান লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ—এই সব শ্রমজাত দ্রব্য বর্ণসমাবেশে, রূপকল্পনায়, নক্সার পরিকল্পনায়, কারিগরী ও নির্ম্মাণ-কৌশলে, এবং সৌন্দর্য্যগুণে ও রূপমাধুর্য্যে ছিল অভিনব ও অতুলনীয়। তাহাদের পরিকল্পনার ও রচনাকৌশলের পশ্চাতে ছিল ভারত-শিল্পীদের অদ্ভুত সৌন্দর্য্যবোধ ও আশ্চর্য্য উদ্ভাবনী-শক্তি। মুসলমানী আমলেও বাদশাহ ও ওমরাহগণের সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতায়, ভারতের রূপবুদ্ধি, ভারতীয় শিল্পীদের সৌন্দর্য্যবুদ্ধি ও অদ্ভুত কলাকৌশল নানা চারুশিল্পে ও কারুশিল্পে জীবিত, ও ব্যবহারিক জীবনের নানা ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট পরিণতি লাভ করিয়াছিল। কারুশিল্পকে দেশে ও বিদেশে স্থান ও প্রতিষ্ঠা দিতে হইলে, সমাজে শিল্পীর রচিত দ্রব্যাদির উৎকৃষ্ট সমজদার ও পৃষ্ঠপোষক থাকা একান্ত আবশ্যক। নানা কারণে, আমাদের দেশের চারুশিল্প ও কারুশিল্প দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। ইহার একটা কারণ উপযুক্ত পরিমাণে গুণগ্রাহী সমজদারের অভাব। উৎকৃষ্ট শিল্পের (চারুশিল্প, বা কারুশিল্পই হউক), গুণ গ্রহণ করিবার শিক্ষা ও শক্তির অভাব হইয়াছে এদেশে,—এই কথাটা বুঝিবার সময় আসিয়াছে। আমাদের একপেশে, একঘেয়ে কেতাবী-শিক্ষা

আমাদের রূপবুদ্ধিকে পঙ্গু ও রূপবৃত্তিকে শক্তিহীন করিয়াছে—এই কথাটা অনেক সুশিক্ষিত ও সুবিদ্বান্ মানুষও বুঝিবার শক্তি হারাইয়াছেন। ভারতবাসী জ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে আপনার বুদ্ধিশক্তির নানা পরিচয় দিতেছেন,—কেবল জাতীয় জীবনের একটা দিক এখনও পক্ষাঘাতে পঙ্গু হইয়া রহিয়াছে;—চোখ থাকিতেও যে ভারতবাসীরা চোখ হারাইয়া বসিয়া রহিয়াছেন,—এই ব্যাধিটা অনেক চক্ষুষ্মান্ মানুষও প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছেন না, এবং আমাদের লেখাপড়ার পণ্ডিত মহাশয়রা এই কথাটা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন না, কিংবা ইচ্ছাপূর্ব্বক বুঝিতে চাহিতেছেন না। আমাদের দেশে হাতে গড়া কিংবা যন্ত্রে গড়া পণ্যদ্রব্যাদি যদি তাহার প্রাচীন গৌরব আবার ফিরিয়া পায়, আমাদের শিল্পজাত পণ্যাদি যদি বিলাতী বা জাপানী শ্রেষ্ঠ পণ্যাদির সমকক্ষ রূপ ও পরিকল্পনা (form and design) যদি আবার গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে, আমাদের অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে একটা নূতন শক্তি অর্জ্জন করিবে, এ-কথা অর্থ-নৈতিক পণ্ডিতেরা অকপটে স্বীকার করেন। আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই যে কেবল কেতাবী-বিদ্যার জোরে, কেবল বিজ্ঞানের বহর বাড়াইয়া, আমাদের অর্থসমস্যার সম্যক্ সমাধান করা অসম্ভব। সমাজে ও রাষ্ট্রে, পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিকের সহিত শিল্পী, রূপ-সাধক, ও কারিগরকে সম্মানের স্থান দিতে হইবে, তাঁহাদের কাজের উৎকর্ষ ও পরিণতির ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে, এবং তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ রচনার আদর, পুরস্কার ও মূল্য দিতে হইবে। যে-সমাজে শিল্পীর আদর নাই, সে-সমাজ কুশিক্ষার সমাজ। কারণ, শিল্পী ও তাহার শিল্প-রচনা আমাদের চরিত্র রক্ষা করে, ভব্যতা, যথাযোগ্যতা ও যথাকর্ত্তব্যতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ নির্দ্দেশ করে, এবং সমাজে অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া, উচ্চচিন্তার দিকে মানুষের মুখ ফিরাইয়া দেয়। এ-কথা নিশ্চয়ই ভুল, যে, কোনও জাতির শ্রেষ্ঠ চিন্তা, পরিকল্পনা, শ্রেষ্ঠ সাধনা, কেবল অক্ষরে লেখা, অভিধানের ভাষায় গাঁথা কেতাবের চারি কোণের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। মানুষের শ্রেষ্ঠ চিন্তার অনেক ফল নিরক্ষর ভাষায়—পটে, পুতুলে, নানা জাতির চারু- ও কারু- শিল্পে নিবদ্ধ আছে। সুতরাং কেজো কথা অথবা অর্থসমস্যার কথা বাদ দিলেও, উচ্চশিক্ষার আদর্শের দিক্ দিয়া, রূপবৃত্তির ও রূপবুদ্ধির সাধনা ও পরিণতি করা, উচ্চ সভ্যতার অভিমানী মানুষের একান্ত কর্ত্তব্য। রূপবিদ্যাকে বাদ দিয়া যে মানুষ উচ্চশিক্ষার দাবী করিবেন, আমরা তাঁহাদের দাবী মুক্তকণ্ঠে এবং উচ্চকণ্ঠে অস্বীকার করিব। কেতাবী পাণ্ডিত্যের এক-পায়ের খঞ্জ শিক্ষা আমাদের উচ্চশিক্ষার পরপারে কখনই লইয়া যাইতে পারে না। কিন্তু, ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যক্রমে, শিক্ষার একচক্ষু হরিণ, কেবল অক্ষরে লেখা কেতাবের পাতায় বিচরণ করিয়া শ্রেষ্ঠ তৃণাহার বৃথাই অনুসন্ধান করিতেছে। এই একচোখো শিক্ষা ভারতের বাহিরে কোনও সভ্য সমাজে যথেষ্ট বলিয়া গৃহীত বা স্বীকৃত হয় নাই। রূপবিদ্যার শিক্ষা এবং শিল্পকলার সম্যক অনুশীলন প্রত্যেক সভ্য সমাজে, প্রত্যেক সভ্য দেশে সম্মানের স্থান অধিকার করিয়াছে।

এই রূপবিদ্যাকে শিক্ষাতন্ত্রে তাহার উপযুক্ত স্থান দিতে হইলে, গোড়া হইতে সুরু করিতে হইবে। রূপবিদ্যার আলোচনা, সাধারণ লেখাপড়ার শিক্ষা শেষ হইবার পর দিলেও চলিতে পারে,—এইরূপ বিশ্বাস যে একেবারে ভ্রান্ত, শিক্ষাতত্ত্বের মনস্তাত্ত্বিকরা আমাদের সে ভুল ধরিয়া দিয়াছেন। জর্ম্মানী, অষ্ট্রীয়া ও আমেরিকার অনেক বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিৎ শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নানা গবেষণা করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে মানুষের রূপবুদ্ধি ও সৌন্দর্য্যবুদ্ধি শিশুকাল হইতে ব্যবহার করিবার ও পরিণতি লাভ করিবার সুযোগ না দিলে—এই স্বাভাবিক বৃত্তি আহার ও সাধনার অভাবে অকালে পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং, এই বৃত্তিকে জাগ্রত, শিক্ষিত, পুষ্ট ও পরিণত করিতে হইলে,—শিশুকাল হইতে তাহার উপযুক্ত খাদ্য দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেতাবী বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে যদি শিশু ও বিদ্যার্থীদের রূপবুদ্ধি শিক্ষিত ও পরিণত করিবার যথোচিত ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে ভগবৎ-দত্ত এই শ্রেষ্ঠ দান, এই রূপবুদ্ধি

কেতাবী-বিদ্যার বিরাট খট্টাঙ্গ পুরাণে চাপা পড়িয়া মারা যায়। তাহার পর আর তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করা যায় না। এই হইল, আধুনিক শিক্ষা-বৈজ্ঞানিকদের গবেষণালব্ধ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এই ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ হইলেন ভিয়েনার প্রফেসর সিজেক্। তাঁহার প্রদর্শিত পথে, আমেরিকার প্রাথমিক শিশু-বিদ্যালয়ে রূপবৃত্তির সাধনা ও শিক্ষার বিস্তৃত আয়োজনের ব্যবস্থা হইয়াছে। শিশুর সমস্ত বৃত্তির সর্ব্বতোভাবে প্রসার ও উৎকর্ষ লাভ করাই হইল আধুনিক সভ্য জাতির শিক্ষার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। আমাদের দেশের শিক্ষাতন্ত্র নানা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে নানা ভাবে পীড়িত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া আছে। তথাপি সরকারী শিক্ষাবিভাগের পরিকল্পনায় 'Wall Picture for Schools' 'Picture Hours' প্রভৃতির শুষ্ক উল্লেখ মধ্যে মধ্যে শুনা যায়। কিন্তু এ-পথে এ-পর্য্যন্ত কোনও চেষ্টাই ভারতের কোনও স্কুলে বা কলেজে প্রবর্ত্তিত হয় নাই।*

আমাদের একপেশে শিক্ষাপদ্ধতির গতানুগতিক পাঠ্যতালিকায় সম্প্রতি একটি নূতন আয়োজন হইয়াছে; তাহার জন্য বেলতলা গার্লস্ স্কুলের একনিষ্ঠ সেবক ও কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও ঐ স্কুলের অধ্যক্ষ ডাঃ শকুন্তলা শাস্ত্রী ও সুযোগ্য সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীমতী বীণা সেনগুপ্তা আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

উপরে উল্লিখিত শিক্ষাকর্ম্মীদের উদ্যম ও উদ্যোগে ঐ স্কুলে প্রতি সপ্তাহে এক ঘণ্টা করিয়া "ছবির ঘণ্টা" (Picture Hour) প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। স্কুলের নানা ক্লাসে নানা বয়সের নানা ছাত্রী পড়ে। সকল ক্লাসের ছাত্রীদের বয়স অনুসারে তিনটি বিভাগ করিয়া, তিনটি বিভিন্ন ক্লাসে একত্র করিয়া, সপ্তাহে এক ঘণ্টা করিয়া ছবি দেখান হইতেছে। এই উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

প্রথমতঃ, এই শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য—ছাত্রীদের রূপ-রস-বোধ জাগ্রত ও উন্নত করা। ইহার প্রথম, প্রকৃষ্ট, ও অল্পব্যয়সাধ্য সহজ উপাদান হইল—মেয়েদের সামনে কতিপয় নির্ব্বাচিত ও বিশিষ্ট স্তর ও পর্য্যায়ে বিভক্ত (selected and graded), জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্প-গুরুদের হাতে লেখা চিত্রাবলীর শ্রেষ্ঠ রঙীন প্রতিলিপি উপস্থিত করা এবং চিত্রগুলির বিশিষ্ট গুণের প্রতি কৌশলে ছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। চিত্রগুলির বিষয়বস্তু বা রচয়িতার নাম, ধাম ও অন্যান্য অবান্তর কথা বাদ দিয়া, চিত্রের রসবস্তুর উপরই বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করাই হইল প্রকৃষ্ট উপায় ও পথ। কোনও রকমে শিশুদের মন এই চিত্রগুলির উপর নিবদ্ধ করিতে পারিলেই শিক্ষকের প্রথম কর্ত্তব্য সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ 'রসের চক্র' চিত্রটি ও শিশুচিত্তের মধ্যে একটা স্পর্শের সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিতে পারিলেই চিত্র আপনার কার্য্য আপনি করিয়া লইবে। চিত্র তখন নিজের নিরক্ষর ভাষায় তাহার শ্রেষ্ঠ বক্তব্য শিশুর চিত্তে আনন্দের মধ্যবর্ত্তিতায় পরিবেষণ করিবে। কোনও শিক্ষক বা পরিচায়কের বোঝাপড়ার বা টীকাটিপ্পনীর আবশ্যক হইবে না। অবশ্য কখনও কখনও দু-চার জন বালিকা, চিত্র সম্বন্ধে বাহিরের অবান্তর খবর জানিতে চাহে, এই অপ্রাসঙ্গিক কৌতূহল ছবির রস-বস্তুর রস গ্রহণের কোনও সহায়তা করে না, বরঞ্চ, মনকে চিত্রের বাহিরে অন্য পথে পথভ্রষ্ট করে। এ ক্ষেত্রে, ঐ প্রশ্নের যৎসামান্য উত্তর দিয়া বিদ্যার্থিনীদের মন ছবির চতুষ্কোণের মধ্যে আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে। ছাত্রীদের মন ছবির মধ্যে (অন্ততঃ ৪৫ মিনিটের জন্যও) ডুবাইয়া রাখিবার নানা উপায় ও কৌশল আছে। বেলতলা গার্লস্ স্কুলে ছবির ক্লাসে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে।

এক-একখানি ছবি (Picture Post Card) বালিকাদের হাতে দিয়া, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ছবির একটি ছন্দোবদ্ধ সহজ ছড়ায় লিখিত বিবরণ পাঠ করা হয়। ঐ

* বিলাতে পৌর-সভার শিক্ষা-বিভাগে (London County Council Instruction in Art Department) সাধারণ পৌরবাসীকে রূপবিদ্যা শিক্ষা দিবার যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে :—

"In the Council's Literary Evening Institutes Special courses of lectures on the Appreciation of Art and Architecture are held. Their main object is to promote in the layman a comprehension of the World's Masterpieces and thereby to raise the standard of general culture" E. M. Rich, Education Officer, London County Council.

ছড়ায় ছবির বিশিষ্ট রসবস্তু একটু কৌতুকের সুরে উল্লিখিত থাকে। ছবিটি চোখের সামনে রাখিলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ছড়াটি শুনিলে, বা আবৃত্তি করিলে, ছবির সঙ্গে একটা সহজ মিতালি বা সখ্যের বন্ধন দর্শকদের মনের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং এই সুযোগে ছবি তাহার মধুর রস-বস্তু, আনন্দের সেতুর উপর দিয়া, শিশুদের চিত্ত অধিকার করিয়া বসে।

প্রথমেই, কেতাবী ক্লাসের অবসানে, "ছবির ঘণ্টা"র আরম্ভের বৈচিত্র্য ও ব্যবধান হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য নিম্ন লিখিত ছড়াটি বালিকাদের আবৃত্তি করান হয়।

ছবির ঘণ্টা

পড়ার ঘণ্টা শেষ হোলো, ভাই, ছবির ঘণ্টা এলো।
পড়ার খাতা বন্ধ করে', ছবির খাতা খোলো॥
চোখের দেখার সময় এলো, ছবির কথা বলো।
বইয়ের পাতা বন্ধ করে', চোখের পাতা খোলো॥

উপরের তিনটি ক্লাসে নিম্নলিখিত ছড়াটি আবৃত্তি করান হয়।

ছবির কথা

কথার মধ্যে সেরা কথা, কবির কথা কবিতা।
দেখার মধ্যে সেরা দেখা, রূপ-রেখার ছবিতা॥
পুঁথির পাতায় পাবো না যা', ছবির পাতায় পাবো।
রংরেখার ভেলায় চড়ে', জ্ঞানসাগর পারে যাবো॥

এই শিক্ষাপদ্ধতিতে, প্রত্যেক ক্লাসে, এক ঘণ্টার মধ্যে ১০ থেকে ১৫ খানি নির্ব্বাচিত ছবি অবলম্বন করিয়া নিরক্ষরের পথে জ্ঞানের নূতন দ্বার খুলিবার চেষ্টা হইয়াছে। এইরূপে প্রত্যেক শনিবার ২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত "ছবির ঘণ্টা"য় বালিকাদের স্বাভাবিক রূপবৃত্তির সাধনার কিছু সুযোগ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নীচের তিন ক্লাসের জন্য, ছবি দেখান হইয়াছে—ওস্তাদ কলমের আঁকা প্রসিদ্ধ পশু-চিত্র। এই নীচের ক্লাসে পশুর চিত্র অন্য চিত্র অপেক্ষা বেশী কৌতুকপ্রদ। য়ুরোপের প্রসিদ্ধ প্রাচীন ওস্তাদের কলমে আঁকা উৎকৃষ্ট পশু-চিত্র এবং কয়েকটি চীন-শিল্পীদের হাতে লেখা পশুর বিচিত্র চিত্র শিশুচিত্তের সরস অভিনন্দন অতি সহজে অর্জ্জন করিয়াছে। চীন-শিল্পীর হাতে-গড়া বরফের দেশের ভালুকের ("পোলার বেয়ার") এক খানি ছোট পোষ্টকার্ড খুব আনন্দ দিয়াছিল। ছবিটির পরিচায়ক ছড়াটি নীচে উদ্ধৃত হইল।

ভালুকের বৈঠক

এ তো কুকুর নয়, বেড়াল নয়, ইঁদুর নয়, বাঁদর নয়,
এ যে দেখি ভালুকের বৈঠক।
মাঝেরটি বুঝে-সুঝে, আছে বটে মুখ বুজে,
দুপাশে দুই বোম্বেটে খালি করে বক্ বক্।
এ যে দেখি তিন জন ভালুকের বৈঠক।
দুপাশের দুটি ভাই, চীৎকার করে', ভাই,
নিজেদের দুঃখের কাহিনী বলছে।
মাঝেরটি চুপ করে', হাত দুটি জড়ো করে',
ইহাদের দুঃখের কাহিনী শুনছে।
বলে: "তিন দিন খাই নাই, কি করে' চলে ভাই?
শরীর আই-ঢাই, গা যেন দুলছে।"
ভাই বলে: "গ্রীষ্ম এলো, বরফ তো গলে গেলো,
এইবার খাবারের দোকান যে খুলছে॥"

একজন মেধাবী যুবক-বাঙালীর হাতের লেখা মৌলিক কয়েকটি পশু-চিত্র এই ছবির ক্লাসে দেখান হইয়াছিল। অবশ্য, ওস্তাদ-কলমের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ছবির বিশিষ্ট গুণ সব সময়ে আধুনিক চিত্রাবলীতে পাওয়া যায় না। কিন্তু শিল্পী সুধাংশু রায়চৌধুরীর হাতের কয়েকখানি পশু-চিত্র নীচের ক্লাসে খুব আদর পাইয়াছিল। এই ছবিগুলির জন্য রচিত দুইটি ছড়ার নমুনা নীচে উদ্ধৃত হইল।

বকের মাছ-শিকার

ঐ পদ্মবনের মাঝখানে, শুকনো ডালের নীচে দিয়ে,
যেখানে মাঝিরা সব দাঁড় টানে, ঐ পদ্মবনের মাঝখানে।
যেখানে মাছগুলো সব ছুটে লুকোয়, এই পদ্মবনের মাঝখানে।
দুই শিকারী বক গুঁড়ি মেরে, বসল গিয়ে সেইখানে।
সাঁঝের মুখে, জলের বুকে, মাছের আনাগোনা যেখানে।
ঐ পদ্মবনের মাঝখানে।
তাদের সাদা সাদা পালক, আর ছোট ছোট চোখ।
তাদের ঠোঁট কি লম্বা, আর কালো, তারা মাছ ধরতে জানে
বড় ভালো।
তাদের পিঠে পড়ে সাঁঝের আলো, পিঠ সাদা আর ঠোঁট কালো।
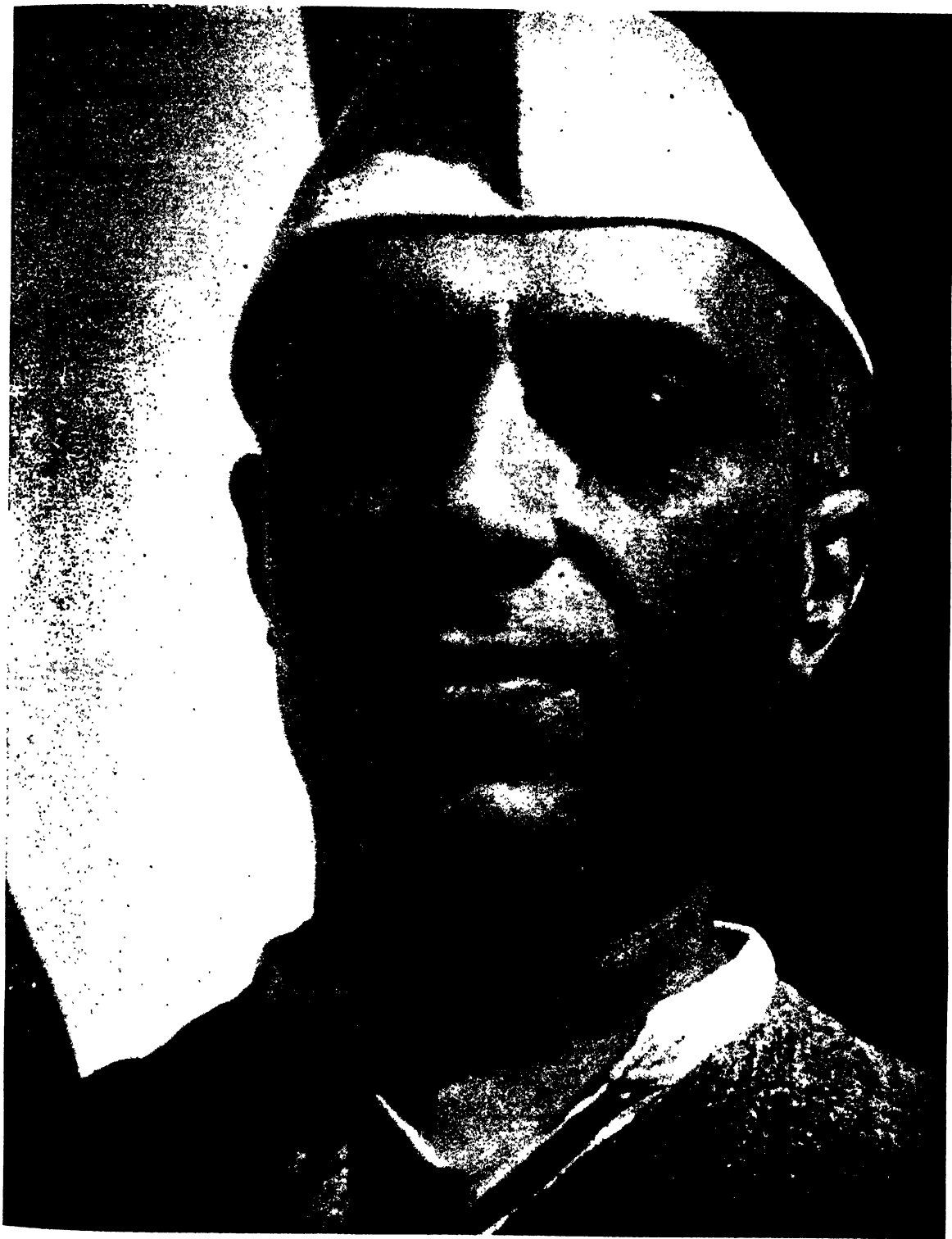
পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু

শ্রীশম্ভু সাহা কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে

মাছ শিকার করবে বলে' বসে আছে দুজনে,
ঐ পদ্ম বনের মাঝ-খানে, ভাই, পদ্মবনের মাঝখানে।

দীঘির পাড়ে সারস

সকালে আজ জাল বুনেছে, ছোট গাছের ছোট পাতা।
আকাশ ছেয়ে চেয়ে আছে, ছোট গাছের ছোট পাতা।
সরু ডালের আঙুল দিয়ে, নীচে নেমে জল ছুঁয়েছে
যেথা জংলী পাতার ঝালর দেওয়া, সবুজ ঘাসের আসন পাতা।
নীচে জংলী গাছের জংলী পাতা, উপরে, ছোট গাছের ঐ
ছোট পাতা।
(গাছের) পাতার জালের আড়াল পেয়ে, সাদা লম্বা সারস
আছে চেয়ে,

দীঘির জলের এপার ওপার, দেখা যায় না চোখ মেলিয়ে
সারসীকে ডেকে বলে "দীঘির জলে পাড়ি দিবি?
দূর থেকে ডাকছে ও-পার, এপার ছেড়ে ও-পার যাবি?"

শিক্ষাপদ্ধতির এই নূতন উদ্যোগে যাঁহারা শিক্ষকের ভূমিকা লইয়া সাহায্য করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুজনেই খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী—শ্রীযুক্ত চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ রায় চৌধুরী। শেষোক্ত শিক্ষক নিম্নশ্রেণীর ভার লইয়া এই পদ্ধতির রূপবিদ্যার শিক্ষার আয়াস সম্পূর্ণ রূপে সার্থক ও সফল করিয়া তুলিয়াছেন।

আশা করা যায় অন্যান্য বিদ্যালয়েও রূপবিদ্যার শিক্ষাদানের যথোচিত ব্যবস্থা হইবে।

চিঠি

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

সবারে যদি ডেকে বলিতে পারি—
"আয় রে তোরা দেখে যা আজ পেয়েছি লেখা তারি।"
ভোরে যেমনি উঠেছি জেগে
কোথা থেকে কি আবেশ লেগে
শিহরি ওঠে পুলকাবেগে প্রতি অণুটি দেহে;
চোখের আগে সে লেখাখানি ধরিল সে কি স্নেহে!

মুকুতাপাঁতি শুভ্র লেখা আঁকে শিশির-অণু,—
শিহরে ধরা নিয়ে তাহার তৃণ-শ্যামল তনু।
পাখিগুলি কি গাহিছে গাছে!
ওদেরো তবে বোধ কি আছে?
জলে মাটিতে ছন্দ নাচে ঢেউয়ের দোলা তুলি;
শূন্য যেন পূর্ণ ক'রে নাচে আখরগুলি।

আর যা-কথা লিখেছে সে যে রয়েছে প্রাণে প্রাণে;
একটি কথা বুঝিবে সে-ই পড়িতে যে-বা জানে।
আজ যে রবি আকাশপারে
জানিয়ে দিল তাই সবারে,
স্বর্ণালোকে উজল হয়ে সে-কথা পড়ে ধরা—
"প্রতিদিনের পৃথিবীতেই অমৃত আছে ভরা।"

কার সে-লেখা সে যে কেমন শুধাবে জানি সবে
আমি তা জানি আমার মতো আপন অনুভবে।
কি খুলে বলি,—বলার কি ও?
বিদেশে কারো নাই কি প্রিয়?
পাও নি তার চিঠি অমিয় কোনো সকালবেলা,
কেবলি যার না পেয়ে চিঠি ভেবেছ করে হেলা?

ইচ্ছা করে বলি তাহারে, ওগো কবির কবি,—
লিখে তুমি-সে কি সুখ পেলে! তুচ্ছ যেন সবি!
লেখা এসেছে, রেখেছ টুকে
লিখেছ বা এ সকৌতুকে,
কিন্তু লেখা পাওয়ার সুখে গাইলে কি গো তুমি
"মধুময় এ পৃথিবীখানি, মধুময় এ ধূলি?"

আলোচনা

"দেবী" ও "মিস্"

শ্রীবনমালা মিত্র

আশ্বিনের "প্রবাসী"র পুস্তক-পরিচয়ে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ের 'লঘুগুরু' পুস্তকের নামতত্ত্ব প্রবন্ধের সমালোচন-প্রসঙ্গে এক জায়গায় লেখা আছে দেখলাম যে, "সমস্ত নারীর নামের সঙ্গে 'দেবী' পদ ব্যবহার করিলে 'মিস্' বা 'মিসিস্' বলার শ্রুতিকটুত্ব হইতে আমরা উদ্ধার পাইব, তাঁহার (রাজশেখরবাবুর) এই প্রস্তাব আজকাল অতি সহজ ভাবেই ভদ্র-সমাজে গৃহীত হইয়া যাইতেছে।" মেয়েদের নামের পদবী সম্বন্ধে রাজশেখরবাবুর মতের মূল্য আছে মনে ক'রে জানাতে লিখছি যে, 'নামতত্ত্ব' তাঁর অনেক দিনের লেখা; সম্প্রতি তাঁর মত বদলেছে। 'লঘুগুরু' যে-সময় প্রকাশিত হয় সে-সময় 'দেবী' পদবী সম্বন্ধে আমার আপত্তি জানিয়ে লিখেছিলাম যে, 'দেবী' পদবী ব্যবহার করতে ভারী লজ্জা বোধ হয়। তাতে তিনি লিখেছিলেন, "পুরুষমানুষের মতন 'মিত্র'ই ভাল। সিনেমাওয়ালীরা 'দেবী' উপাধি দখল ক'রে তার জাত মেরে দিয়েছে।" তাঁর নাতনীর বিয়ের সময় নিমন্ত্রণপত্রাদিতে তাঁর নাতনীর নামের পর 'দেবী' বা 'পালিত' (পিতৃ-পদবী) কিছুই ব্যবহৃত হয় নি। সংবাদপত্রের সংবাদেও শুধু 'শ্রীমতী আশা' দেখেছিলাম।

বিক্রমপুর

শ্রীবিনোদবিহারী রায় বেদরত্ন

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ৪০০ পৃষ্ঠার বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ঢাকা জেলার বর্ত্তমান (ভূমিশূন্ত) বিক্রমপুরই বর্ম্মচন্দ্র সেন বংশের রাজধানী ছিল।

গত ভাদ্র মাসের 'প্রবাসী'তে বিক্রমপুর সম্বন্ধে আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে আমি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি রাজা লক্ষণ সেনের পলায়ন (১২০০ খ্রীষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত বর্ম্মচন্দ্র সেন বংশের রাজধানী নদীয়া জেলার বিক্রমপুরেই ছিল। লক্ষ্মণ সেন সমতটে গিয়া ধাত্রীগ্রামে রাজধানী করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেন ফল্গুগ্রামে রাজধানী করিয়াছিলেন। তখন সমতটে বিক্রমপুর নামে রাজধানী থাকিবার কোন প্রমাণ নাই। তাঁহাদের পরে হয়ত ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সমতটের (ভূমিশূন্ত) বিক্রমপুর নাম হইয়া থাকিবে।

এ-বিষয়ের মীমাংসা হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমাদের দেশে সে-চেষ্টা মোটেই হয় না। যিনি যাহা লিখেন, মনে করেন যে তাহাই ঠিক, কেহ প্রতিবাদ করিলেই অসন্তুষ্ট হন। এই জন্যই একই বিষয়ে কাহারও মতের সহিত কাহারও মতের মিল নাই। ইহাতে ইতিহাসের সর্ব্বনাশই হয়। এই জন্যই আজ পর্য্যন্ত বুদ্ধের নির্ব্বাণের দিন ঠিক হয় নাই। চন্দ্রগুপ্তের অভিষেকের দিন, অশোকের অভিষেকের দিন ঠিক হয় নাই। এক-এক জন এক-এক রূপ লিখেন। এরূপ ভাবে দেশের ইতিহাসকে নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নহে। আশা করি যোগেন্দ্রবাবু আমার প্রতিবাদ খণ্ডন করিবেন। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলাম, তিনি তাঁহার বিক্রমপুরের ইতিহাস ভাল করিয়া পড়িতে লিখিয়াছেন। এরূপ উত্তর সন্তোষজনক নহে।

"মা, তুমি আমাকে ভালবাস?"

শ্রীঅবনীনাথ রায়

শম্ভু সম্পদের দ্বিতীয় কন্যার যখন বসন্ত হইল তখন তাহার অজ্ঞাতেই তাহার মনের মধ্যে হু হু করিয়া উঠিল। কেমন একটা অজানা আশঙ্কায় এবং অস্বস্তিতে মন ভরিয়া গেল। ডাক্তার গায়ের গুটি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—এ ত মনে হচ্ছে আসল বসন্ত, শম্ভুবাবু, জলবসন্ত এ নয়। প্রথমে মনে হয়েছিল বুঝি হাম কিন্তু আজ দেখে বুঝতে পাচ্ছি এ বসন্ত।

শম্ভু ভীরু প্রকৃতির লোক। তাহার শরীরের মধ্যে একবার কাঁপিয়া উঠিল। মুখে ডাক্তারের কথায় সায় দিয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

মাত্র চারি বৎসরের ছোট্ট মেয়েটি—ভাল নাম আজও দেওয়া হয় নাই। বাচ্চু বলিয়াই ডাকে। কিন্তু মেয়েটি অত্যন্ত মায়াবী, গৌরবর্ণ সুশ্রী চেহারা কমনীয় দেহকান্তি দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। রূপের চেয়েও যেন মেয়েটির গুণ বেশী—ঠিক ময়না পাখীর মত কথা বলে।

দুপুর রাত্রে জ্বর বাড়িতে লাগিল। সরোজিনী টেম্পারেচার লইয়া বলিল—জ্বর ১০৫ ডিগ্রির উপর উঠেছে।

শম্ভু মেয়ের সম্বন্ধে মন্দটা না ভাবিতে পারিলেই বাঁচে মাথা ঝাঁকানি দিয়া বলিল,—তোমার থার্মোমিটার কোন সস্তা জাপানী মাল—ওতে গায়ের জ্বর ঠিকমত উঠছে না; ১০৫ ডিগ্রি, কই গায়ে হাত দিয়ে ত এত জ্বর বোধ হচ্ছে না।

মেয়ে ভুল বকিতে লাগিল—ঐ বামুন বুড়ো আমাকে দেখছে, আমাকে ডাকছে।

সরোজিনী মেয়েকে বুকের মধ্যে আরও সাপটিয়া ধরিল, বলিল—কই, এখানে ত আর কেউ নেই মা—উনি রয়েছেন, আর আমি তোমাকে কোলে নিয়ে বসে রয়েছি।

মেয়ে প্রতিবাদের সুরে বলিল,—না, ঐ যে বামুনবুড়ো আমাকে দেখছে, আমি দেখতে পাচ্ছি।

পাঁচ দিনের দিন সর্ব্বাঙ্গে গুটি ভরিয়া গেল। সরোজিনী অশ্রুসজল কণ্ঠে বলিল—উঃ, মা শীতলা একেবারে সর্ব্বাঙ্গে ঢেলে দিয়েছেন, কোথাও তিল ধারণের ঠাঁই রাখেন নি।

শম্ভু সান্ত্বনার সুরে বলিল—ডাক্তার বলেছেন বেরিয়ে যাওয়াই ভাল, বেরিয়ে গেলে আর কোন ভয় থাকে না।

কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে বাহির হইয়া যাইবার পর জ্বর কমিয়া গেল, মেয়েটাও যেন একটু সুস্থ বোধ করিতে লাগিল। শম্ভু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

বন্ধু আশু বলিয়াছিল বারো এবং তেরো দিনের বসন্ত রোগীর সঙ্কটের সময়—ঐ দুটা দিন কাটিয়া গেলে আর কোন ভয় নাই।

শম্ভু মনে মনে হিসাব করিয়া ভাবিতেছিল, এগারো দিন ত কাটিয়া গেল, আর দুটো দিন কি কোন রকমে কাটিবে না?

শম্ভুর মনের মধ্যে মেয়ের জীবন ভিক্ষা করিয়া নিরন্তর প্রার্থনার স্রোত চলিতেছিল—সর্ব্বব্যাপী জগদীশ্বর, শ্রীশ্রীকালী, শ্রীশ্রীশীতলা, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব—কাহারও নিকট মাথা খুঁড়িতে সে বাকি রাখে নাই।

এগারো দিনের রাত্রি। হঠাৎ রাত বারোটার পর সর্ব্বাঙ্গ চুলকাইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার একটা উন্মত্ততা মেয়েটিকে পাইয়া বসিল। সে উন্মত্ততার কি দুঃসহ আবেগ—শম্ভু এবং সরোজিনী দুই জনে মিলিয়া ছোট্ট মেয়েটির দুইখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া রাখিতে পারে না—ধস্তাধস্তি করিয়া যেন একটা শক্তিপরীক্ষার প্রতিযোগিতা চলিল এবং পরিশেষে মেয়েটি ক্লান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িল।

শম্ভু বলিল—আমি ডাক্তারের কাছে চললুম—এই ভাবে চললে সকাল অবধি ওকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।

সরোজিনী ম্লানকণ্ঠে বলিল—কিন্তু এই রাত্রে এই মেয়ে নিয়ে আমি একলা কি ক'রে থাকব ?

শম্ভু ব্যস্ত হইয়া বলিল—আমি সাইকেলে যাব আর আসব—এই নিয়ে সকাল অবধি চুপ ক'রে ব'সে থাকা যায় না।

ডাক্তার নিজেই অসুস্থ—আসিতে পারিলেন না। বলিলেন—ওই ওষুধটা তিন ঘণ্টার বদলে আধ ঘণ্টা অন্তর দিন—ওতে উপকার করবে।

গভীর দুশ্চিন্তার মধ্যে বিনিদ্র রজনী কাটিল। সকালে মেয়েটি উঠিয়া বসিল—সর্ব্বাঙ্গে মহামারী আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, যন্ত্রণার একশেষ হইতেছে কিন্তু তবু সে দরজার কাছে বসিয়া সংসারের কর্ম্মস্রোত দেখিবে—চাকর রামসিং ঘর ঝাঁট দিতেছে, মহারাজিন্ রান্না করিতেছে—এই সবই তাহার দেখিতে ভাল লাগে। সে চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া থাকিবে না।

বারো দিনের দিন বন্ধু মহেন্দ্র বলিল—দেখ শম্ভু, তুমি ত এ-সব বিশ্বাস কর না, তবু তোমাকে বলি এই সব রোগে মানুষ ওষুধ করে না, মা শীতলার নামে ফেলে রেখে দেয়। তাঁর কৃপাতেই ক্রমে ক্রমে ভাল হয়ে যায়। এদেশে এক জাত আছে তাদের নাম মালী। তারা এ-বিষয়ে খুব ওস্তাদ—শুশ্রূষাও খুব ভাল করতে পারে। বল ত তাদের এক জনকে ডাকিয়ে দেখাই।

শম্ভু মহেন্দ্রের হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—তোমরা সকলে যা ভাল বোঝ তাই কর, ভাই।

মালী আসিল। প্রথমে হাত জুড়িয়া ভক্তিভরে রোগীকে নমস্কার করিল। তাহার পর মেয়েটিকে উঠাইয়া বসাইল। বিমর্ষ মুখে বলিল—বাবু, এ ত একদম বিগড় গিয়া।

শম্ভু বলিল—এখন যাতে যা হয় তাই কর মালী।

মেয়েটিকে সামনে বসাইয়া মালী বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিল।

সরোজিনী কাঁদিয়া কহিল—ওগো, মায়ের কাছে ঘাট স্বীকার কর, মেয়ের জীবন ভিক্ষা ক'রে নাও।

শম্ভু অশ্রুপূর্ণনেত্রে ঢিপ ঢিপ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিল এবং মনে মনে মায়ের কৃপার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহার দেখাদেখি ঘরের সকলেই রোগীর সম্মুখে প্রণত হইল।

মালী খানিকটা কাঁচা মাখন মন্ত্রপূত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিতে বলিয়া গেল। শম্ভু রাত্রে আর এক বার মালীকে আসিবার জন্য বলিল, মালী সে-কথা খুব কানে তুলিল বলিয়া মনে হইল না।

* * *

তেরো দিনের প্রত্যূষে শম্ভু এবং সরোজিনীর মনে আর কোন আশা ছিল না। শম্ভু অনুমান করিতে পারিতেছিল যে শেষ মুহূর্ত্ত এই রকম করিয়াই এক সময় আসিয়া পড়িবে। কেবল তাহার মনে এই প্রশ্ন জাগিতেছিল যে এত করিয়া ঠাকুরদেবতার কাছে প্রার্থনা করিলাম, পরমহংসদেবের কাছে প্রার্থনা করিলাম কিন্তু তাঁহারা আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না ? আগে ত বহুবার তাঁহাদের কাছে বিপদ জানাইয়া ফল পাইয়াছি !

ঔষধের জোরে তবুও সময় কাটিয়া যাইতে লাগিল।

দুপুরে মেয়েটি এক বার উঠিয়া বসিল এবং যেন কিছুই হয় নাই এমনি ভাবে তাহার পুতুলগুলি লইয়া একবার খেলা করিল। তাহার পরই আবার আসিল যন্ত্রণার অদম্য উন্মত্ত আবেগ—হাত পা ধরিয়া রাখা যায় না, খাট হইতে মেঝেয় নামিয়া পড়িতে চায়।

সরোজিনী মেয়েকে কোলে লইয়া সজল কণ্ঠে প্রার্থনা করিতে লাগিল, মেয়েকে বলিল—মা, ঠাকুরের কাছে বল, ঠাকুর, আমাকে বাঁচিয়ে রাখ, মায়ের কোল জুড়ে আমাকে রেখে দাও।

মেয়েটির কথা জড়াইয়া আসিতেছিল—তবু প্রাণপণ শক্তিতে মায়ের কথার অনুবৃত্তি করিয়া বলিল, ঠা-কু-র, আ-মা-কে বাঁ-চি-য়ে রা-খ, মা-য়ে-র কো-ল জু-ড়ে আ-মা-কে রে-খে দা-ও।

শম্ভু ছেলেমানুষের মত কাঁদিয়া ভাসাইতেছিল, আর অশ্রুবিকৃত স্বরে 'মা, মা, আমার বাচ্চু, মা' বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

পাড়াপ্রতিবেশীরা শম্ভুকে ছি ছি করিতে লাগিল, বলিল—আপনি না পুরুষমানুষ? কিন্তু আপনি দেখছি মেয়েমানুষেরও অধম।

হঠাৎ মেয়ে বাবাকে ডাকিয়া বলিল—বাবা, তুমি তরকারিওয়ালীকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে কেন?

শম্ভু বলিল—কৈ, মা, আমি ত কোন তরকারি-ওয়ালীকে তাড়িয়ে দিই নি।

মেয়ে প্রতিবাদের সুরে বলিল—না দিয়েছিলে, আমি যে দেখলুম।

শম্ভু বলিল—আচ্ছা মা, আর কখনও দেব না।

মেয়ে বলিল—আচ্ছা। আবার বলিল—বাবা, আমি তোমার কোলে উঠব।

শম্ভু বলিল—মা, তুমি আগে সেরে ওঠ, তার পর তোমাকে ভাল ক'রে কোলে নেব। শম্ভু যদিচ সেবা-শুশ্রূষা করিতেছিল কিন্তু খানিকটা দূরত্ব রাখিয়া এবং স্পর্শ বাঁচাইয়া চলিতেছিল।

মেয়েটি তার দাদাকে ডাকিয়া বলিল—দাদা, আমার কাছে এস।

দাদা দরজার বাহির হইতে জবাব দিল—বাচ্চু, তুমি আগে সেরে ওঠ, তার পর তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যাব।

এই রকম ছোড়দা, দিদি সকলকেই এক-এক বার ডাকিল এবং সকলের কাছ হইতেই এক প্রত্যুত্তর পাইল। কেহই কাছে আসিয়া তাহাকে কোলে লইল না, সকলেই দূর হইতে সান্ত্বনা দিল।

মেয়েটি যেন নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিল তার অত বড় বিপদ এবং যন্ত্রণার মধ্যে এক মা ব্যতীত আর কেহই তার কাছে আসিবে না।

মায়ের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মা, তুমি আমাকে ভালবাস?

সরোজিনীর বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। এ অলক্ষুণে প্রশ্ন কেন? বহু দিন আগে একটি পাঁচ বছরের ছেলে অসুখে ভুগিতে ভুগিতে ঐ প্রশ্ন করিয়াছিল—সে ত চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তার প্রশ্নটি মনের মধ্যে গাঁথিয়া আছে।

সরোজিনী মেয়েকে বুকের মধ্যে আরও নিবিড়ভাবে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—বাসি বইকি মা, খু-ব ভালবাসি।

মেয়ে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার পর বলিল—আমি আবার আসব।

সরোজিনী তাড়াতাড়ি বলিল—মা, তোমাকে কি কেউ কষ্ট দিচ্ছে?

মেয়ে বলিল—হাঁ, কষ্ট দিচ্ছে—আমি যাব না, কিন্তু নিয়ে যাচ্ছে।

তার পর জড়াইয়া জড়াইয়া আরও কি বলিল কিন্তু চেষ্টা করিয়াও সে জড়িত স্বরের অর্থগ্রহ করা গেল না।

চোখের দৃষ্টি ক্রমশ ঘোলা হইয়া আসিতেছিল কিন্তু তবু পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে, বালিশের উপর মুখ উঁচু করিয়া বার বার সকলের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল,—শক্তি নিঃশেষ হইয়াছে কিন্তু তবু যেন শেষ শক্তি সঞ্চয় করিয়া তার প্রিয় ভাই-বোনকে, বাপ-মাকে, সাধের এই ধরণীকে দেখিয়া লইতে চায়। রক্তবর্ণ চক্ষুতে সে কি অসহায় সকরুণ দৃষ্টি!

ডাক্তার আসিয়া বলিলেন—আপনারা শুধু শুধু ভয় পাচ্ছেন। আমি ত ভয়ের কিছু দেখছি নে।

শম্ভুর মনে আবার আশার সঞ্চার হইল। ভাবিল, আমি হয়ত বৃথাই ভয় পাইতেছিলাম—হয়ত এ-অসুখে এই রকমই হয়। নিজের মনকে তাড়া দিয়া বলিল—ওরে অবিশ্বাসী, ওরে সন্দেহাত্মা, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলি, ঠাকুর যে তোর প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন, তোর এতই সন্দেহ যে সেটা এক বার নজরে পড়িল না।

ঔষধ দিবার পর মেয়েটি সত্যই সুস্থ বোধ করিল এবং একটু যেন ঘুমের ভাব আসিল।

বন্ধুরা বলিল—আজ কয় রাত্রি থেকে একেবারে ঘুম নেই। ও একটু সুস্থ হ'য়ে ঘুমুক, এখন ডেকেও ওষুধ খাওয়াবেন না।

মেয়েটি উপুড় হইয়া শুইয়া শুইয়া ঘুমাইতে লাগিল।

রাত্রি দশটা বাজিয়া যাইবার পর শম্ভুর কেমন যেন সন্দেহ হইল। স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল—ও কত ঘুমুচ্ছে? তুমি এক বার নেড়েচেড়ে ভাল ক'রে দেখ ত। সত্যিই ঘুমুচ্ছে ত?

সরোজিনী পায়ের দিক নাড়িয়া দেখে পা আড়ষ্ট—'ওগো, মেয়েও আমার নেই গো' বলিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

পাড়াপ্রতিবেশী সকলে ছুটিয়া আসিল, দেখিয়া শুনিয়া বলিল—ঘুমের মধ্যে হার্ট ফেল করেছে।

* * *

শম্ভু স্ত্রীকে বলিল—মা আমার অভিমান ক'রে চলে গেল। আমার কোলে উঠতে চেয়েছিল—আমি কোলে নিই নি, তাই মা আমার রাগ ক'রে চলে গেছে।

সরোজিনী বলিল—আমি তোমাকে তখনি বলেছিলাম যে তোমার মনে অনুতাপ থাকবে, তুমি এক বার কোলে নিয়ে ব'স।

শম্ভু স্বীকার করিল, সে পারে নাই। মনে মনে বলিল—আমারা স্নেহ-ভালবাসা প্রভৃতির কত গর্ব্ব করি কিন্তু এদের সত্যিকার মূল্য এক কাণাকড়িও নয়। এর চেয়েও বড় সত্য নিজের জীবন, নিজের স্বার্থ। নয়ত নিজের প্রাণের ভয়ে কোন্ পিতা মৃত্যুপথযাত্রিণী কন্যাকে তার শেষ সাধ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে?

ইহার কয়েক দিন পরে এক দিন সন্ধ্যায় আকাশ ভরিয়া মেঘ করিল। টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। সরোজিনী কপালে করাঘাত করিয়া বলিল—এই বৃষ্টিটা কিছু দিন আগে হ'লে মায়ের আমার প্রাণটা যেত না। অতিরিক্ত গরমেই ত এই সব অসুখ-বিসুখ হয়। মায়ের আমার বড় গরম লেগেছিল—তাই প্রায়ই দেখতুম সকালে উঠে কলতলায় গিয়ে কলের নীচে মাথা দিয়ে ব'সে আছে। তখন কত বকাবকি করেছি কিন্তু তখন কি জানি মায়ের আমার এই রকমের অসুখ করবে।

গভীর রাত্রে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। সরোজিনী নিদ্রামগ্ন। শম্ভু তাহাকে ডাকিয়া জাগাইল, বলিল—দেখ, বাচ্চু এসেছে, দরজা ঠেলছে—দরজাটা খুলে দাও।

সরোজিনী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শম্ভুর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—তুমি কি পাগল হ'লে? ও ত বৃষ্টির ছাটের শব্দ, আর ঝোড়ো বাতাস দরজায় লাগছে...

শম্ভু আমতা আমতা করিয়া বলিল—কিন্তু সে যে বলেছিল আবার আসবে?

ঝাঁসী-দুর্গ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিরাট্ পাষাণ-নগর-প্রাচীর
দূর দুরান্ত ঘিরে
শ্রেণী-নিবদ্ধ পাষাণ-মুকুট শিরে।
গিরি বেদী 'পরে বীরভঙ্গিম
রণদেবতার মত।
অভ্রশীর্ষ প্রাকার-বর্ম্ম
দুর্গ সমুন্নত।

হেথায় হোথায় দানব-মূরতি
পুর-প্রবেশের দ্বার
শত্রুনিবারী কঠিন কীলক তা'র।
অতীত যুগের ছায়ালোক হ'তে
ছুটে আসে সেনাদল,
ধ্বনি' ওঠে তোপ, ঝলি' ওঠে অসি,
কানে পশে কোলাহল।

বিগত যুগের শৌর্য্যমহিমা
ঝলিছে মানস পটে
জীবনসিন্ধু উচ্ছলে হৃদিতটে।
অশ্বারোহিণী রাণী লক্ষ্মীর
দৃপ্ত মূরতি জাগে
দশ দিক্ হ'তে বীর সেনাদল
তাঁহারি নিদেশ মাগে।

স্তব্ধ সে কাল মূর্চ্ছিত ছিল
পাষাণ-পুরীর তলে,
জাগিয়াছে আজি, নয়নে বহ্নি জ্বলে।
কামানে কৃপাণে গজে তুরঙ্গে,
বীরদল-পদভরে
শৈলনগরী উন্মথি' ওঠে
রণ-রথ-ঘর্ঘরে।
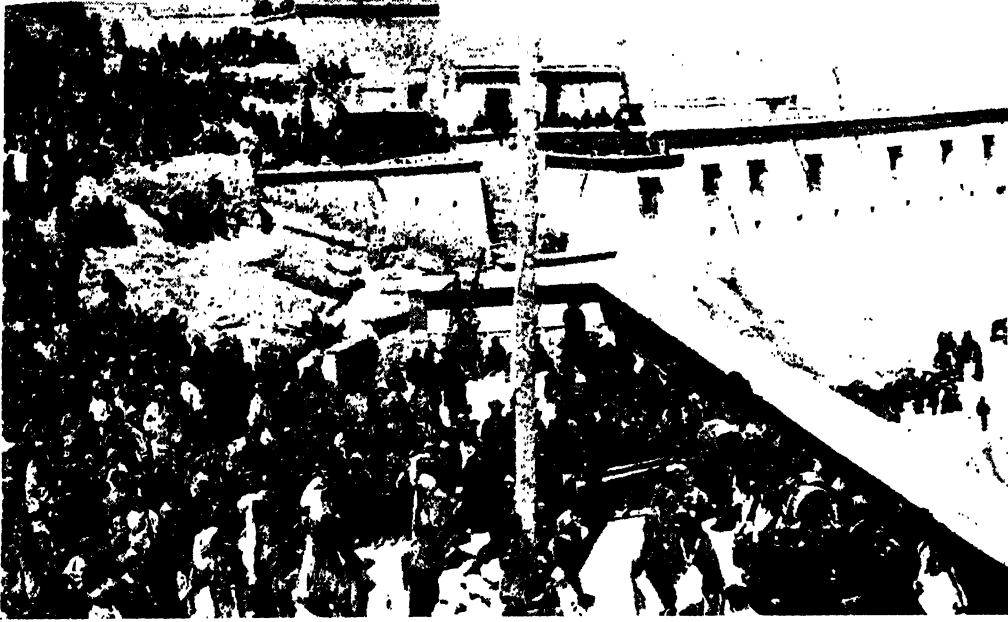
ডেপুঙ মঠের অভ্যন্তর উৎসবের দৃশ্য
ফটোগ্রাফ শ্রীশিবনারায়ণ সেনের সৌজন্যে

তিব্বতের একটি বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

সংস্কৃতে কু ল প তি শব্দের একটা বিশেষ অর্থ আছে; যিনি অন্নদানাদি দ্বারা লালন-পালন করিয়া দশ হাজার ছাত্রকে অধ্যাপন করেন, তাঁহাকে কু ল প তি বলা হয়।[১] দশ হাজার ছাত্রকে এক জায়গায় রাখিয়া বিনা পয়সায় পড়াইবার কথা অতিরঞ্জিত মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহা যে, সত্য তাহা নালন্দার বিবরণে পাওয়া যায়। সেখানে দশ হাজার ছাত্রের পড়িবার ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ মঠ, বিহার, বা বিশ্ববিদ্যালয় এখনো তিব্বতে আছে। ইহা ভারতেরই অনুকরণে হইয়াছিল। মনে রাখিতে হইবে, তিব্বতের ধর্ম ও সংস্কৃতির বহু অংশ ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত।

তিব্বতে ভারতের অনুকরণে বহু মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সকলের মধ্যে নিম্নলিখিত চারিটিকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতে পারা যায়—

(১) ডেপুঙ[২] ('ব্রস' স্পুঙস), অর্থাৎ 'ধান্যকূটক'[৩]।

(২) সেরা (সে'র[৪]) অর্থাৎ 'বন্য (গোলাপ)।'

(৩) টাশি লহুন পো (বক্র'শিস'লহুন'পো) অর্থাৎ 'মঙ্গলকূট'।

১। মুনীনাং দশসাহস্রং যোঽন্নদানাদিপালনাৎ।
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিঃ স বৈ কুলপতিঃ স্মৃতঃ॥

২। কেহ-কেহ উচ্চারণ করেন ডপুঙ।

৩। তিব্বতী ডেপুঙ শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ নানা লেখকের লেখায় নানারূপ দেখা যায়, যেমন, ধ ন ক ছে ক, ধ ন ক ট ক, ধা ন্য ক ট ক, ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য Watters: On Yuan Chuang, Vol. II pp. 214-216. মনে হয়, এই সমস্ত নামের কতকগুলির মূলে রহিয়াছে সংস্কৃত শব্দটির চীনা ভাষায় লিপ্যন্তরীকৃত J'ê-na-ka-che-ka শব্দের পুনর্বার ইংরাজীতে লিপ্যন্তরীকরণ। আলোচ্য তিব্বতী শব্দটির প্রতিশব্দ এ স্থানে, ধা ন্য কূ ট ক ছাড়া আর কিছু হয় না। তিব্বতী 'ব্রস শব্দের অর্থ এখানে 'ধান্য' এবং স্পুঙস শব্দের অর্থ 'কূট', শেষোক্ত শব্দটির শেষে -ক যোগ করায় কূ ট ক হইয়াছে। ধ ন ক ট ক কিংবা ধা ন্য ক ট ক এখানে কিছুতেই হইতে পারে না।

৪। কখনো কখনো লিখিত হয় সের'ব অর্থাৎ 'শিলা', 'করকা।'

(৪) গাদেন[৫] (দগ' ' ল্দন) অর্থাৎ 'তুষিত'। ইহাদের মধ্যে জম য়ঙ ছো জে ('জম 'দব্যঙস'ছোস'র্জে) অর্থাৎ 'মঞ্জুঘোষ ধর্মস্বামী' প্রথমটিকে (খৃঃ ১৪১৫), চম্‌ ছেন ছো জে (ব্যমস 'ছেন'ছোস ' র্জে) অর্থাৎ 'মহামৈত্রেয় ধর্মস্বামী' দ্বিতীয়টিকে (খৃঃ ১৪১৮) গেদুন ডুপ প ('দগে' গদুন গ্রুব'প) অর্থাৎ 'সংঘসিদ্ধি' তৃতীয়টিকে (প্রায় উক্ত সময়েই), এবং জে চোঙ খ প লো জঙ দগ প (র্জে ' চোন খ ' প ' ব্লো ' বজঙ গ্রগস ' প) অর্থাৎ 'স্বামী সুমতিকীর্তি' চতুর্থটিকে (খৃ. ১৪০৮) স্থাপন করেন।

এই সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে ডেপুঙ। গাদেনে ৩,৩০০, টাশি ল্হুন পোতে ৪,৮০০, ও সেরায় ৫,৫০০ ব্যক্তির স্থান আছে; কিন্তু ডেপুঙে আছে ১০,০০০ জনের স্থান। সেখানে এখনো ৭,৭০০০ ছাত্র বাস করে।

দক্ষিণ-ভারতে অন্ধ্রদেশে[৬] ধা ন্য কু ট ক নামে এক প্রকাণ্ড বিহার ছিল। ইহাকেই আদর্শ করিয়া নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া তিব্বতের এই বিহারেরও নাম ধা ন্য কু ট ক বা তিব্বতীতে ডেপুঙ হয়।

কালক্রমে তিব্বতে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে, এবং চারি দিকের বিভিন্ন প্রদেশের ভিক্ষুগণ এখানে আগমন করিতে থাকেন। নিয়মপালনে, শীলরক্ষায় ও জীবনের বিশুদ্ধতায় ডেপুঙের ভিক্ষুগণ বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এখানে আটটি কলেজ আছে; আধ্যাত্মিক বিদ্যা, ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, তর্ক প্রভৃতি শিক্ষার জন্য সাতটি এবং লৌকিক সাহিত্য শিক্ষার জন্য একটি। এখানে আয়ুর্বেদও পড়াইবার ব্যবস্থা করা হয়। শেষোক্ত কলেজটিতে সাধারণ লোকেরা পড়িবার সুবিধা পায়।[৭]

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে একটি তরুণ লামা (= ব্ল. ম, অর্থাৎ 'গুরু') মঙ্গোলিয়া হইতে চীন হইয়া কলিকাতায় এবং সেখান হইতে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীতে আগমন করেন। ইনি গে শে থুব তেন শেরব লা নামে

মুনিশাসন প্রাজ্ঞ

পরিচিত ছিলেন। ইহার আসল নাম থুব তেন শেরব (থুব ' বস্তন ' শেস ' রব) অর্থাৎ 'মুনিশাসন প্রাজ্ঞ।' গেশে (দগে বশেস) হইতেছে, তাঁহার উপাধি, ইহার অর্থ 'কল্যাণ মিত্র'। আর লা (লগস) শব্দের অর্থ আমাদের 'মহাশয়'। সাধারণত গেশে লা বলিয়াই ইহাকে উল্লেখ করা হইত। এই উপাধিটি তিনি ডেপুঙ বিহার বা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে লাভ করেন। ইনি খুবই সজ্জন, এবং নিজের গুণে শান্তিনিকেতনে পরিচিত ব্যক্তিগণের খুব প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বস্তুতই প্রগাঢ় পণ্ডিত এবং তিব্বতীতে অনূদিত বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ক গ্যু র (বক' ' 'গ্যুর) ও ত ঞ্জু র (বস্তন ' 'গ্যুর) এই উভয়েই তাঁহার গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। যে গ্রন্থসমূহের মধ্যে বুদ্ধদেবের আদেশ-উপদেশ বা সূত্রসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার নাম ক গ্যু র, আর যে সমস্ত গ্রন্থে পরবর্তী আচার্যগণের রচিত শাস্ত্রসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে তাহার নাম ত ঞ্জু র। অ ভি স ম য়া ল ঙ্কা র কা রি কা র মত দুরূহ গ্রন্থসমূহ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ইহাদের যে কোন স্থান

৫। কখনো কখনো উচ্চারিত হয় গান্দেন।

৬। দ্রষ্টব্য Watters: On Yuang Chwang, Vol. II, p. 216.

৭। In course of time the monastery became the principal seat of learning, and learned and wise men flocked to it from the different parts of the country. In discipline, moral culture and purity of life, the Monks of Depung excelled the monks of all other similar institutions in Tibet. It soon claimed a University with seven colleges for the study of different branches of sacred literature including metaphysics, logic, medicine, and one for profane literature for the benefit of the lay people."—Sarat Chandra Das: JASB, 1905, N.S. Vol. I, p. 115.

ডেপুঙ মঠ
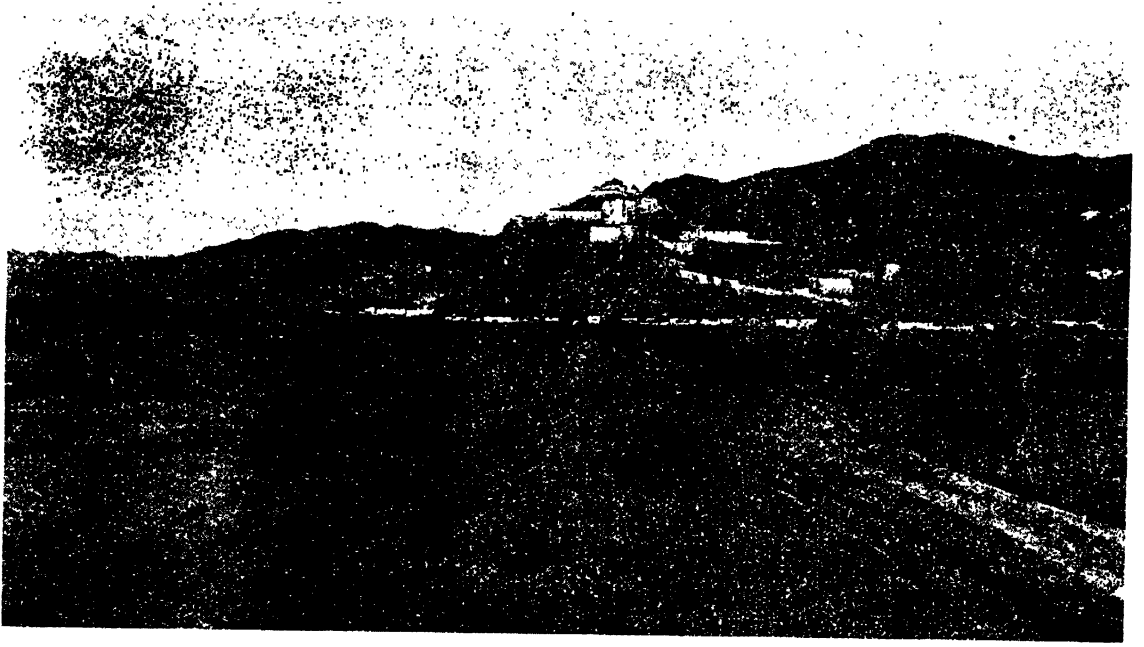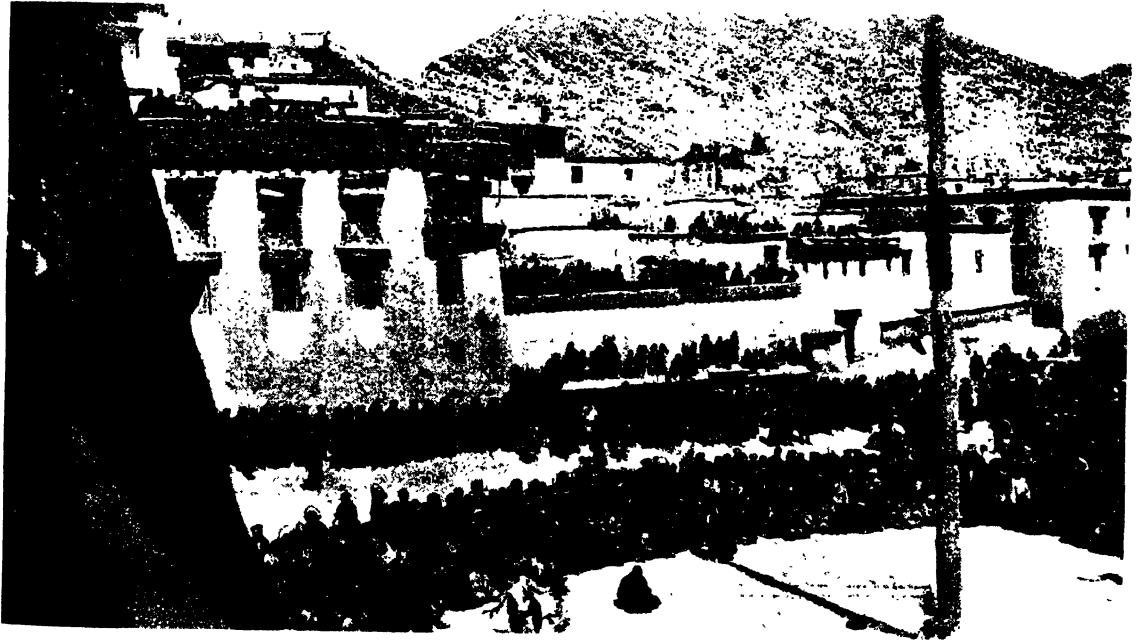
ডেপুঙ মঠের অভ্যন্তরে উৎসবের দৃশ্য

ফোটোগ্রাফ দুইটি শ্রীশিবনারায়ণ সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত
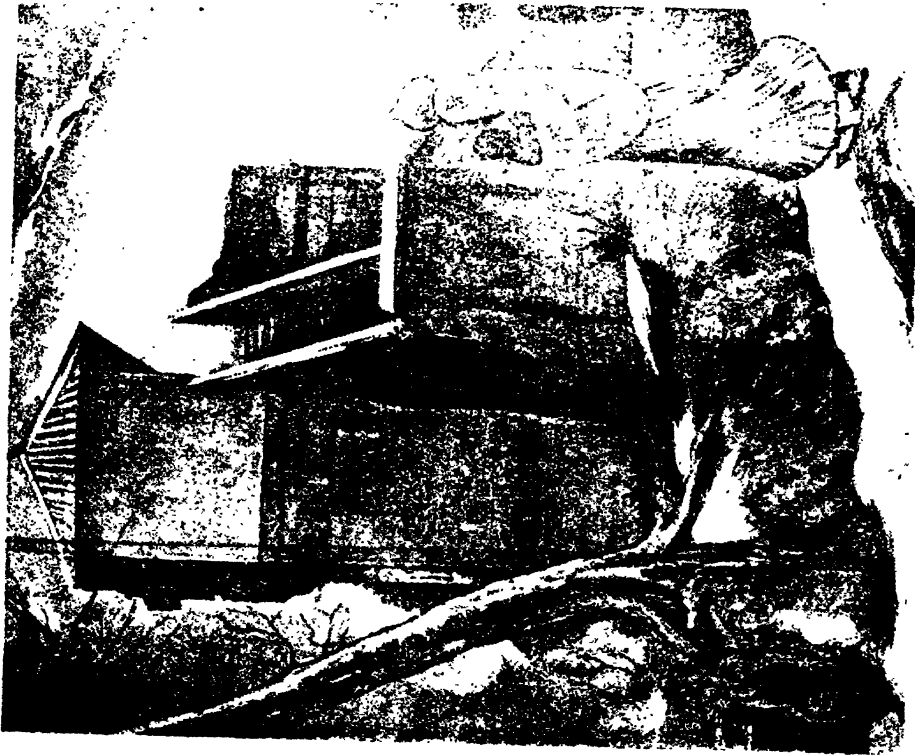
মসজিদের পথে
শ্রীয. ক. শুক্ল কৃত অ্যাকোয়াটিন্ট, aquantint

রোমের দৃশ্য
শ্রীয. ক. শুক্ল কৃত এচিং, etching

ডেপুঙ বিহারের এক অংশ
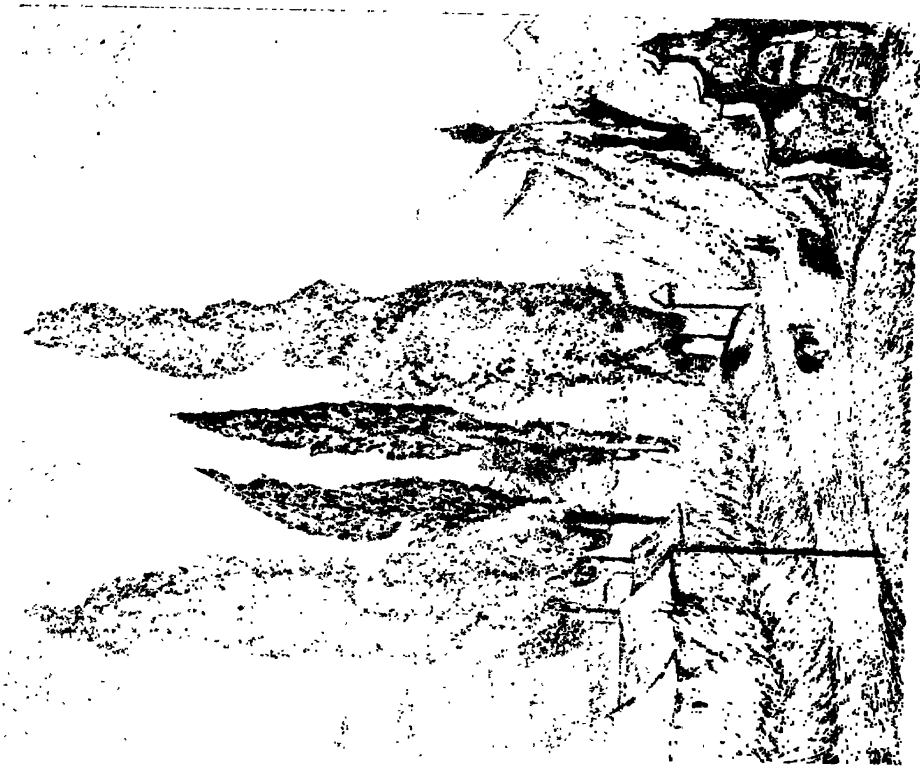
হইতে তিনি আবৃত্তি ও তাহা ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ ছিলেন। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় তাঁহার একখানি চিত্র দেওয়া হইল।

মঙ্গোলিয়া হইতে তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিব্বতে আগমন করেন, এবং ডেপুঙ বিহারে প্রবিষ্ট হন। ভারতীয়দের সংস্কৃত চর্চার জন্য যেমন কাশী, বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার জন্য মঙ্গোলীয়দের তেমনি তিব্বত। শাস্ত্রীয় বা ধার্মিক প্রশ্নের মীমাংসায় মঙ্গোলীয় লামা অপেক্ষা তিব্বতীয় লামাদের প্রামাণিকতা বেশী। লাসা (ল্হ. স অর্থাৎ 'দেবভূমি') হইতে ডেপুঙ দুই ক্রোশের মধ্যে। তিনি ছাত্ররূপে এখানে কুড়ি বৎসর বাস করেন এবং সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গে শে এই উপাধি লাভ করেন। ইনি বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনে প্রবিষ্ট হন। বিদ্যাভবনে প্রধানত গবেষণার কাজ করা হয়। ইহার এখানে প্রবেশ করিবার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পালি ভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্র কীরূপ কী আছে তিব্বতে কেহ তাহা জানেন না। তাই তাঁহার ইচ্ছা হইল, যে তিব্বতীয় সাহায্যে তাহা তিনি সেখানে প্রচার করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি এই লেখকের সহিত মূল পালি ত্রিপিটকের প্রধান প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। এই কার্যে স্বয়ং তিনি লো চ বা অর্থাৎ সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদকের, আর বর্তমান লেখক প ণ্ডি৮ অর্থাৎ ভারতীয় পণ্ডিতের কাজ করিয়াছিলেন।
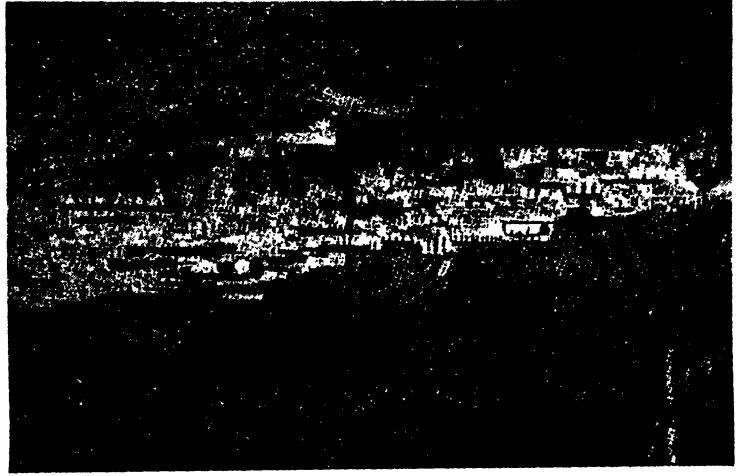
পূর্ব্বোক্ত গে শে মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একখানি নিজের ও একখানি ডেপুঙ বিহারের ছবি দিয়াছিলেন। তাঁহার ছবিখানি পূর্বে দেওয়া হইয়াছে, বিহারের ছবিখানি এই পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল। ইহাতে বিহারের কেবল অর্ধেক অংশ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা কত প্রকাণ্ড তাহা উহাতেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। ইহার ঘরগুলির দিকে তাকাইলে ইহাকে একটি ছোট নগরের মত মনে হয়। ইহা একটি পর্বতের নীচের দিকে গায়ে অবস্থিত। ইহার চারিটি ভাগ আছে। মধ্যস্থানে একটি একটি বৃহৎ শালা আছে। ইহার নাম ছুগ খঙ ছেন পো, অর্থাৎ মহাসনশালা। স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, এই শালার ২৪০টি কাঠের স্তম্ভ আছে, এবং ইহার ক্ষেত্রফল ৩৪,৫৬০ বর্গফুট। এই শালায় শিক্ষক ও ছাত্রেরা সকলে বিশেষ-বিশেষ সময়ে ধর্মানুষ্ঠানের জন্য একত্র সমবেত হন। পূর্বেই বলিয়াছি এই বিহারে ১০,০০০ জনের স্থান আছে, এবং গে শে মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন তাঁহার সময়ে ৭,৭০০০ জন ওখানে ছিলেন।

তাঁহার নিকটে শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে যেরূপ জানিয়াছিলাম তাহাতে জানা যায় যে, উহা ঠিক আমাদের সংস্কৃত-পাঠশালা বা টোলের মত। টোলেরই ছাত্রদের

৮। মূল সংস্কৃত বহু সহস্র গ্রন্থের অনুবাদ চীনা, তিব্বত ও মোঙ্গলীয় ভাষায় আছে। ইহাদের অধিকাংশেরই মূল সংস্কৃত এখনো পাওয়া যায় নাই। সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ সাধারণত দুই জনে মিলিয়া করিবার রীতি ছিল, এক জন তিব্বতীয় ও এক জন ভারতীয়। তিব্বতীয়কে বলা হইত লো চ বা আর ভারতীয়কে সাধারণত বলা হইত প ণ। প ণ হইতেছে প ণ্ডি ত শব্দের পূর্ব অংশ।

মত সেখানেও ছাত্রেরা পরস্পর আলোচনা ও তর্ক করিতে খুব পটু। পাঠাভ্যাসের জন্য ইহাঁরা সময়ে-সময়ে পাহাড়ের মধ্যে নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া থাকেন।

বিহারে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য এক-একটি ভিন্ন-ভিন্ন কুঠরি আছে। গে শে মহাশয় কোন্ কুঠরিতে ছিলেন ছবির মধ্যে তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। এখানে বিভিন্ন দেশের ছাত্রেরা আসিয়া থাকেন, এবং প্রত্যেক দেশের ছাত্রের জন্য বিভিন্ন বিভাগ নির্দিষ্ট করা আছে।

ভর্তি হওয়া সম্বন্ধে কতক বিধি-নিষেধ আছে। প্রবেশার্থীরা বৌদ্ধ হইবেন। তাঁহাদিগকে হয় ভিক্ষু অথবা শ্রামণের (novice) হইতে হইবে। বৌদ্ধ হইলেও জেলে, মাঝি, কামার, কসাই প্রভৃতি অতি নীচ শ্রেণীর কেহ প্রবেশ করিতে পারে না।

ভোজন, বাসস্থান, বা শিক্ষার জন্য কাহাকেও কিছু দিতে হয় না। সমস্ত খরচই রাজসরকার হইতে দেওয়া হইয়া থাকে।

তিব্বতে ৬ হইতে ১২ পর্যন্ত বয়সের ছোট-ছোট ছেলেকে ভিক্ষুদের নিজেদের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়, তাঁহারা ইহাদিগকে শিক্ষা দেন। দুই-তিন বৎসর শিক্ষা পাইলে প্রধান লামাদের কাছে ইহাদিগকে আনা হয়, এবং তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখেন। ইহার পর ইহাদিগকে শ্রামণের করিয়া বিহারে রাখা হইয়া থাকে।

সেখানে চারিটি ডিপ্লোমা বা উপাধি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। ইহার জন্য চার বৎসর, সাত বৎসর, বার বৎসর, বা কুড়ি বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়। এই পরীক্ষা গৃহীত হয় লাসার সুপ্রসিদ্ধ ছো খঙ (ছোস্‌খঙ) অর্থাৎ 'ধর্ম-মন্দির' নামে গৃহে। পরীক্ষা গ্রহণ করেন এক পরীক্ষক-সমিতি। ইহাতে পূর্বোল্লিখিত চারিটি বিহারের প্রতিনিধি থাকেন।

"রামমোহন ও বাংলা গদ্য"

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

প্রবাসীর আশ্বিন সংখ্যায় অধ্যাপক শ্রীমনোমোহন ঘোষ লিখিত 'রামমোহন ও বাংলা গদ্য" শীর্ষক সুলিখিত প্রবন্ধের পরিপূরক হিসাবে কিছু বলিতে চাহি। তিনি রামমোহনের বাংলা রচনার মূল প্রেরণাটি ঠিকই ধরিয়াছেন এবং সেই প্রেরণা তাৎকালিক অন্য গদ্য-লেখকদিগের না থাকাতে সেগুলিতে যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক গুণ দেখা দেয় নাই এবং রামমোহনের আন্তরিক প্রেরণাই যে তাঁহার প্রকাশভঙ্গীতে সাহিত্যিক রস-সঞ্চার করিয়াছে ইহাও যথার্থ; কিন্তু ইহা ছাড়াও অন্য একটি কারণে রামমোহনের স্থান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে; সেই কথাটি মনোমোহনবাবু তাঁহার সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সম্ভবতঃ বলিতে পারেন নাই। উহা হইল এই যে, তাৎকালিক অন্য লেখকদিগের মনে কোনও প্রবল প্রেরণা না থাকায় তাঁহাদের কাহাকেও কেন্দ্র করিয়া কোনও সাহিত্য গড়িয়া উঠে নাই, কিন্তু রামমোহন নানা আন্দোলনের স্রষ্টা হওয়াতে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন দল গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের প্রাণে আন্দোলনের তরঙ্গ উঠাতে তাঁহারা রচনার মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন এবং সে জন্য রামমোহনকে কেন্দ্র করিয়া সাহিত্যসেবকের দল গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহা রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি কাহাকেও কেন্দ্র করিয়া হয় নাই। রামমোহনের শিষ্য ও আত্মীয় সভার উৎসাহী সদস্য ব্রজমোহন মজুমদার মহাশয় রামমোহনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া "ব্রাহ্ম পৌত্তলিক-সম্বাদ" রচনা করেন[1] ও ঐ আত্মীয় সভার সম্পাদক বৈকুণ্ঠনাথ বন্দোপাধ্যায় গীতার অনুবাদ এবং তেলিনী পাড়ার শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন।

রামমোহনের সর্ব্বপ্রধান শিষ্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের দান বাংলা সাহিত্যে তাৎকালিক যে-কোনও লেখকের অপেক্ষা কম নহে। সাহিত্যসাধক চরিতমালা প্রভৃতি গ্রন্থে ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা সিরিজে যে-সমস্ত লেখকের রচনা বাহির হইয়াছে তাহার সহিত রামচন্দ্রের বাংলা গদ্যের ষ্টাইল বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে বিদ্যাবাগীশের গদ্য ভাষার প্রাঞ্জলতা ও গতি-স্বাচ্ছন্দ্য সেই সমস্ত তথাকথিত মহারথীদের অপেক্ষা কম নহে। রামচন্দ্র যে শুধু কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাই নহে, বাংলা ভাষায় তাঁহার রচিত অভিধান তাৎকালিক একটি উৎকৃষ্ট অভিধান ছিল, তাহার প্রমাণ এই যে উহার প্রশংসা প্রথম বৎসরের স্কুলবুক সোসাইটির রিপোর্টে আছে। উহা ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং উহাই বাঙালী-রচিত প্রথম বাংলা অভিধান। শুধু তাহাই নহে, বাংলা ভাষার চর্চ্চার প্রসারকল্পে তাঁহারই চেষ্টায় হিন্দু কালেজের সহিত সংশ্লিষ্ট বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপিত হয় এবং রামচন্দ্রই প্রথম বাঙালী যিনি বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার প্রস্তাব সর্ব্বপ্রথমে করেন। সংস্কৃত, ফার্শী বা ইংরাজিকে শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার অনেকে করিলেও বাংলা ভাষার সাহায্যে শিক্ষাপ্রদান করিবার স্বাধীন চেষ্টা তৎপূর্ব্বে হয় নাই।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী তারিখে উক্ত পাঠশালার পাঠারম্ভকালে তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকা উচিত। তিনি এই বক্তৃতায় ইংরাজী বা সংস্কৃত কেন শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত নহে, তাহা যুক্তিসহকারে বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "মাতৃক্রোড়রূপ সুখশয্যাতে উপদেশ ব্যতিরেকে শ্রবণানুসারে যে ভাষা অভ্যাস করিয়াছে সেই ভাষা দ্বারা উৎকৃষ্ট বীজ হয়...এমত প্রত্যাশা করি যে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসবেত্তারা স্ব স্ব গ্রন্থে উক্ত বৃত্তান্ত সম্বলিত মদীয় নাম সংকলন করিবেন।" রামচন্দ্রের নাম সত্যই স্মরণীয় থাকা উচিত ছিল, কিন্তু কেন জানি না, তাঁহাকে দেশ ভুলিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন যে মাতৃভাষায় যদি সমস্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সম্ভব হয় তবে শত বৎসরের মধ্যেই "ভারতবর্ষস্থ ব্যক্তি-দিগের লৌকিক ও পারমার্থিক স্বাধীনতা স্বয়ং দেদীপ্যমান হইবেক।"[2]

---

(১) ব্রজমোহন মজুমদার—ইহাঁর পুস্তকের উল্লেখ কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক রিপোর্ট (১৮১৯-২০) দ্বিতীয় পরিশিষ্টে আছে। পরে আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে "পৌত্তলিক প্রবোধ" এই নামে পুনর্মুদ্রিত হয়। স্কুলবুক সোসাইটির রিপোর্টে Brumho Pootlik Sambad এই নাম দেখিয়া শ্রীব্রজেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুস্তকখানির "ব্রহ্মপুত্তলিক সম্বাদ" বলিয়া লিখিয়াছেন। (সংবাদপত্রে সেকালের কথা—প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ পৃ. ৪৮৪)। কিন্তু নামটি ব্রাহ্ম পৌত্তলিক সম্বাদ হইবে বলিয়াই অনুমিত হয়; কারণ পুস্তকটির নামের ইংরেজী স্কুলবুক সোসাইটির রিপোর্টে করা হইয়াছে, "Conference between a True Believer and an Idolator." ব্রহ্মের ইংরেজী True Believer হইতে পারে না, ব্রাহ্ম সম্বন্ধেই উহা প্রযোজ্য। পুত্তলিকের ইংরেজী Idol এবং পৌত্তলিকের ইংরেজী Idolator। ব্রজমোহন স্কুলবুক সোসাইটির জন্য ফাগুসনের জ্যোতিষ গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন।

(২) বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের এই বক্তৃতার ফটো-প্রতিলিপি

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে জ্যোতিষ সম্বন্ধে তাঁহার "জ্যোতিষসার সংগ্রহ" পুস্তক ও ১৭৫০-৫১ শকাব্দে তাঁহার ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত উপাসনা বিষয়ে ব্যাখ্যানগুলি প্রকাশিত হয়।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পাঠশালার পাঠারম্ভে বক্তৃতা ও ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে নীতিদর্শন প্রকাশিত হয়।

ইঁহারা ব্যতীত নীলরত্ন হালদার,৩ রাধামোহন সেন৪ প্রভৃতি লেখকবর্গের উপর রামমোহনের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। রামমোহন নিজে অর্থ দিয়া দরিদ্র লেখকগণের রচিত সংগ্রন্থ প্রকাশ করিতে সাহায্য করিতেন, তাহারও প্রমাণ আছে।৫

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার অংশীদার হরচন্দ্র রায়ের সহিত যে রামমোহনের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। গঙ্গাকিশোরের ছাপাখানাতেই ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে রামমোহনের কঠোপনিষদ ছাপা হয়, তাহার পর ক্রমে ক্রমে বেদান্ত বিষয়ক গ্রন্থগুলি ও বৈকুণ্ঠনাথের গীতা ছাপা হয় এবং অংশীদার হরচন্দ্র রায় আত্মীয় সভার সভ্য ছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে "বাঙ্গাল গেজেটি" প্রকাশের অল্প পরেই সংবাদপত্র প্রকাশে রামমোহনের যে আগ্রহ দেখা যায়, যাহার ফলে সম্বাদকৌমুদী, বঙ্গদূত, মিরাৎউল আখবার, হরকারা, বেঙ্গল হেরাল্ড প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে গঙ্গাকিশোরের বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের অন্তরালে রামমোহনের প্রভাব থাকা বিচিত্র নহে। "সমাচার দর্পণ" প্রকাশকাল হিসাবে "বাঙ্গাল গেজেটির" দশ-পনেরো দিন পূর্ব্বে বাহির হইয়া থাকিলেও 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের পরিকল্পনার পূর্ব্বেই যে বাঙ্গাল গেজেটি প্রকাশ করিবার পরিকল্পনা স্থির হয় এবং তদনুসারে বিজ্ঞাপনও বাহির হয়, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। গঙ্গাকিশোর পূর্ব্বে শ্রীরামপুর প্রেসে কাজ করিতেন; তাঁহার মত শিক্ষাদীক্ষার কোনও লোক বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রথম প্রচার করিবার সংকল্প করিলেন, ইহা অতি বিচিত্র বলিয়া মনে হয়। কিন্তু রামমোহনের মত অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষের পক্ষে উহা আশ্চর্য্য নহে, বিশেষতঃ যখন ইহার অল্পদিন পরেই নানা সংবাদপত্র প্রচারের সহিত রামমোহনের যোগ দেখা যাইতেছে। আর একটি কারণেও রামমোহনের সহিত বাঙ্গাল গেজেটির প্রত্যক্ষ যোগ অনুমিত হয়। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত রামমোহন রায়ের জীবনচরিতে দেখা যায় ১৮১৯ জুলাই সংখ্যা ইণ্ডিয়া গেজেটে একটি সংবাদ আছে যে রামমোহনের সহমরণ সম্পর্কিত পুস্তকটি বাঙ্গালা সংবাদপত্রে পুনর্মুদ্রিত হওয়াতে উহার প্রচারের সুবিধা হইয়াছে। তখন বাংলা সংবাদপত্র মাত্র দুইটি ছিল, সমাচার দর্পণ ও বাঙ্গাল গেজেটি। পুস্তকটি দর্পণে প্রকাশিত হয় নাই। গেজেটির ফাইল পাওয়া যায় না। যদি ইণ্ডিয়া গেজেটের কথা সত্য হয় তবে উহা গেজেটিতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহা রামমোহনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ প্রমাণ করে।

"বাঙ্গাল গেজেটি" প্রকাশ বিষয়ে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে যতগুলি বিজ্ঞাপনের সন্ধান পাওয়া যায় সবগুলিই হরচন্দ্র রায়ের স্বাক্ষরে প্রকাশিত এবং এই হরচন্দ্র "আত্মীয় সভা"র ঘনিষ্ঠ সভ্য। এই কাগজে "plain, concise and correct Bengalee"-তে সংবাদ দিবার কথা বিজ্ঞাপনে প্রচার করা হয়। তখন রামমোহনের ভাষাই এইরূপ ভাষার আদর্শরূপে পরিচিত ছিল এবং হরচন্দ্র নিশ্চয়ই সে ভাষার আদর্শ তাঁহার গুরু রামমোহনের নিকট পাইয়াছিলেন।৬

এক দিকে যেমন রামমোহনের অনুচরগণ রামমোহনের আদর্শে সাহিত্য সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, অপর দিকেও রামমোহনের আদর্শ বিরোধীগণও সেই আদর্শের প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য বিরুদ্ধ মত সমন্বিত পুস্তকাদি রচনা করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে রামমোহনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপই মৃত্যুঞ্জয়ের 'বেদান্তচন্দ্রিকা', কাশীনাথ তর্কবাগীশের 'বিধায়কনিষেধক সংবাদ'

ব্রিটিশ মিউজিয়াম হইতে আনাইয়া তাহার অংশবিশেষ ৪৫ বর্ষের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র দ্বিতীয় ভাগের ১০৬-১০৮ পৃষ্ঠায় শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন।

(৩) বহু পুস্তক-প্রণেতা নীলরত্ন হালদার মহাশয় রামমোহনের "বঙ্গদূত" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

(৪) রাধামোহন সেনের পুত্র ভোলানাথ সেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের কর্ম্মচারী এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের "রিফরমার" নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

(৫) কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার নামক একজন কবির "গৌরীবিলাস ও কঙ্কালীর অভিশাপ" নামক কাব্যখানি "শ্রীরামমোহন ধনী"র অর্থে প্রকাশিত, তাহা পুস্তকের ভূমিকাতে উল্লিখিত আছে। "অর্থ বিনা সে সকল না হয় পূর্ণিত। শ্রীরামমোহন ধনী করিলেন হিত। ছাপিলা পুস্তক করি নিজ অর্থব্যয়। শ্রম সার্থক হয় গুণীগণে লয়।"

এই রামমোহন ধনী যে রাজা রামমোহন রায় তাহার প্রমাণ পুস্তকের শেষে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রামমোহন রায়ের নাম আছে। (সংবাদপত্রে সেকালের কথা—প্রথম ভাগ, পৃ. ৪৬৫)।

(৬) সংবাদপত্র স্থাপন ও প্রচারে রামমোহনের অতুলনীয় দানের কথা মণ্টোগোমারী মার্টিন তাঁহার "History of British Colonies" নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ২৫৪ পৃষ্ঠায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"But to no individual is the Indian Press under greater obligations than to the lamented Rammohun Roy and the munificent Dwarkanath Tagore."

রামমোহন-শিষ্য দ্বারকানাথ যে মুক্ত হস্তে "সম্বাদ কৌমুদী," "বঙ্গদূত", "বেঙ্গল হেরল্ড," "ইণ্ডিয়া গেজেট" প্রভৃতি পত্রিকাগুলিকেই সাহায্য দান করিয়াছিলেন, তাহাই নহে; শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ "সমাচার দর্পণ" প্রকাশের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করাতে সর্ব্বপ্রথম সাহায্য-ভাণ্ডারে অর্থ প্রদান করেন দ্বারকানাথ। এই তথ্যটি ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাউণ্টস হইতে উদ্ধার করিয়াছেন রামমোহন-সংক্রান্ত তথ্য-সম্পর্কে গবেষণায় রত মার্কিণ মহিলা কুমারী অ্যাড্রিয়ান মূর। তাঁহার যন্ত্রস্থ "Rammohun's Influence on American Thought" নামক পুস্তক হইতে আমি এই সংবাদটি গ্রহণ করিয়াছি।

কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পাষণ্ডপীড়ন' ও বেনামী 'চারি প্রশ্ন' ও গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্যের জ্ঞানাঞ্জন প্রভৃতি প্রকাশিত হইল এবং সম্বাদকৌমুদীর মতামতের বিপক্ষতা করিবার জন্য সমাচার চন্দ্রিকার সৃষ্টি হইল। এইরূপে দেখা যায় রামমোহনের প্রচারিত আদর্শের ঘাতপ্রতিঘাত ও সংঘাতে বাংলা ভাষা যে ভাবে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে, অন্য কোনও এক জনের দ্বারা তাহা হয় নাই। সেজন্য দেখা যায় যে রামমোহনের অনতিপরবর্ত্তী যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিম-চন্দ্রের যুগ পর্য্যন্ত সকল বিশিষ্ট সাহিত্যরথীই রামমোহনকে বাংলা গদ্যের জনক বলিয়া আসিয়াছেন। মনস্বী কাশীপ্রসাদ ঘোষ, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও বাংলা সাহিত্যের আদি ঐতিহাসিক রামগতি ন্যায়রত্ন, সুপণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত রামমোহনকে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

বঙ্কিম-সম্পাদিত প্রথম বর্ষের বঙ্গদর্শনের ষষ্ঠ সংখ্যা হইতে অষ্টম সংখ্যা পর্য্যন্ত তিন সংখ্যায় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে'র সুদীর্ঘ সমালোচনা আছে। এই সমালোচনা কাহার রচিত তাহার উল্লেখ নাই, কাজে কাজেই উহা সম্পাদকীয় বলিয়াই ধরিয়া লওয়া রীতি। এতদ্ভিন্ন লেখার ভঙ্গী, লিখিত প্রবন্ধে বাঙ্গলা ভাষার সম্পর্কে পাণ্ডিত্য-পূর্ণ আলোচনা প্রভৃতি দ্বারা উহা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা বলিয়াই সুস্পষ্ট বোধ হয়। যদি উহা বঙ্কিমের নাও হইয়া থাকে, তথাপি উহার মতামতের সহিত বঙ্কিমের মতের ঐক্য যে আছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ মতভেদ থাকিলে তিনি বিনা-স্বাক্ষরে উহা নিজ সম্পাদকীয় দায়িত্বে নিশ্চয়ই প্রকাশ করিতেন না। এই সমালোচনায় স্পষ্টই উল্লিখিত আছে যে "১৭৫২ অব্দে অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ শেষ হয়; ১৭৫৭ অব্দে পলাশীর বিপর্য্যয়; তার পর পঞ্চাশ বৎসর ভাষাতে উন্নতি অবনতি প্রায় কিছুই হয় নাই। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সকল বিরাজ করিয়াছেন, কিন্তু ভাষা মুখ-বদ্ধ জলাশয়ের ন্যায় স্থিরভাবে ছিল। উপপ্লব কর্ত্তা মহাত্মা রামমোহন রায় আসিয়া তাহার মুখ খুলিয়া দিলেন"। (বঙ্গদর্শন অগ্রহায়ণ ১২৭৯, "বাঙ্গলা ভাষা" প্রথম বর্ষ অষ্টম সংখ্যা)

যাঁহারা বলেন যে, রামমোহনকে বাংলা গদ্যের স্রষ্টারূপে যাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা "সাম্প্রদায়িক" কারণে করিয়াছেন, তাঁহারা কত ভ্রান্ত, উল্লিখিত রামমোহন-সমর্থক নামগুলি হইতেই তাহা প্রমাণ হয়। সেকালে এক রাজনারায়ণ বসু ভিন্ন রমেশচন্দ্র দত্ত, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি কেহই সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্ম ছিলেন না। কাশীপ্রসাদ বাংলা জানিতেন না বলিয়া প্রবাসী-সম্পাদককে যাঁহারা ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন, তাঁহারা হয় জানেন না কিম্বা ইচ্ছা করিয়াই চাপিয়া গিয়াছেন যে, কাশীপ্রসাদ "বিজ্ঞান সেবধি" নামক বাংলা সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন এবং শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ তাঁহাদের বাংলা পুস্তকগুলি কাশী-প্রসাদকে দিয়াই সংশোধিত করাইয়া লইয়াছিলেন।

কবিতা

শ্রীসতীশ রায়

এ শুধু ফোটানো ফুল, তার বেশী নয়,
নাহি সখা এর মাঝে ফলের কামনা;
সুমেরুর ক্ষণপ্রভা, প্রভাতের সোনা,
পূর্ণিমার চাঁদ দেখে শিশুর বিস্ময়।
প্রজাপতি পাখা 'পরে বিচিত্র আল্পনা!
ফুল যদি দেখে ভোলে ক্ষমা কোরো ভুল;
এ আলোকলতা ভূমে মেলে না কো মূল
সোনালি তন্তুতে শূন্যে স্বপ্নজাল বোনা!

তবু এরে ঘিরিয়াছে আকাশ বাতাস
বস্তুবিশ্ব-বৃন্ত 'পরে ভাবের কুসুম,
রসাতল হ'তে টানি আনে রসোচ্ছ্বাস,
বীতরস অরণির এ অগ্নি নির্ধূম।
এ মায়া-দর্পণে হের সর্ব্ব সমাধান;
এই বিশ্ব-রহস্যের প্রাকৃত পুরাণ!

রক্তসন্ধ্যা

শ্রীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ঈ. বি. আর. লাইনের ক্ষুদ্র একটি স্টেশন। একটিমাত্র ঘর এবং সেই ঘরের মধ্যেই সেই স্টেশনটির যথাসর্ব্বস্ব। দ্বারের উপরে ত্রিকোণাকৃতি কাষ্ঠফলকের এক দিকে লেখা—"স্টেশনমাস্টারের অফিস, প্রবেশ নিষেধ" আর অপর দিকে লেখা—"টেলিগ্রাফ অফিস, প্রবেশ নিষেধ।"

বিজ্ঞাপন থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, ঐ ক্ষুদ্র একটি ঘরে সকল প্রকার কার্য্যই সমাধান হয়। এক কোণে টিকিটের একটি আলমারি, এবং তারই কাছে চিরপরিচিত জানলার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের ছাড়পত্র দেওয়া হয়। আর এক পাশে স্টেশন-মাস্টার তাঁর পৃথক্ চেয়ার-টেবিল নিয়ে যথাসম্ভব নিজের পদমর্য্যাদা রক্ষা করেন। পূর্ব্বদিকের দেয়ালের কাছে দুটি যন্ত্র। সে দুটি পূর্ব্ব ও পশ্চিমের স্টেশন দুটির সঙ্গে সংযুক্ত। এতে যথাবিধি লাইন ক্লিয়ার পাওয়া ও দেওয়া হয়। ইহার সম্মুখে দাঁড়িয়ে স্টেশনমাস্টার বাবু শত শত যাত্রীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন। উত্তর দিকের দেয়ালের কাছে দুটি টেলিগ্রাফের কল অহরহ অবোধ্য ভাষায় কি যেন বলে চলেছে। কখনও বুকিং বাবু এসে চোখে মুখে বিরক্তির রেখা ফুটিয়ে শব্দগুলোকে থামাবার চেষ্টা ক'রে কোলাহল বৃদ্ধি করছেন—টরে টক্কা—টক্কা টক্কা টরে টরে টরে—।

এই প্রকার অদ্ভুত শব্দ। সে কি থামে? বুকিং বাবুর অঙ্গুলিস্পর্শে প্রাণহীন কল যেন দ্বিগুণ উৎসাহে কথা ব'লে ওঠে। তিনি মাঝে মাঝে বিরক্তির চরম সীমায় পৌছে দু-চার বার জোরে ঠুকে দেন কলের মাথাটি কঠিন বুকের সঙ্গে, এবং উঠে পড়েন। তাঁর চেহারায় বেশ বোঝা যায় যে, তিনি রেগে গেছেন। অবুঝ কল তাঁর রাগ বুঝতে পারে না, পূর্ব্বের ন্যায় বলে চলে—টক্কা টক্কা—টরে টক্কা!

"তোমার মাথা! এক দিন দেব তোমাকে ফাক্কা ফাক্কা ক'রে, জ্বালিয়ে খেলে!" বুকিং বাবু বারান্দায় এসে বিড়ি ধরিয়ে আরামে একটি দীর্ঘ টান দিয়ে মুখভরা ধোঁয়া ছাড়েন।

"কি হ'ল হে সতীশ! চটে গিয়েছ মনে হচ্ছে।" নিজের আসনে বসে স্টেশনমাস্টার বাবু কি যেন লিখতে লিখতে বলেন, মুখ তুলে প্রশ্ন করবার প্রয়োজন হয় না, কারণ এটা দৈনন্দিন কাহিনী, এবং সতীশ কি উত্তর দেবে তাও তাঁর জানা।

"আর বলবেন না দাদা জ্বালিয়ে খেলে, এর কি আর শেষ নেই, দিনরাত হ্যাঃ!" সতীশ বিড়িতে দ্বিতীয় টান দেয়।

ঘটাং ঘটাং—টং টং—অকস্মাৎ ঘণ্টা বেজে ওঠে। স্টেশনমাস্টার বাবু নিজের আসন ছেড়ে পূর্ব্বদিকে দেয়ালের কাছে অবস্থিত একটি যন্ত্রের কাছে যান। কি একটা যন্ত্র দু-এক বার টিপে দেন এবং টেলিফোনের রিসিভারটার উপর কান চেপে ধরে মুখে বলেন অন্য একটা যন্ত্রে—'হ্যালো—হ্যাঁ, ফিপ্‌টিন আপ? রাইট টাইম? আচ্ছা, হ্যাঁ!" রিসিভারটা নামিয়ে ঝুলিয়ে দেন স্বস্থানে, যন্ত্রের গায়ে একটা হাতল ঘুরিয়ে দেন জোরে। ঘটাং—বিশ্রী শব্দ ক'রে একটি ছোট্ট লোহার বল আত্মপ্রকাশ করে, তিনি সেটা তুলে নিয়ে সাগ্রহে দেখেন, বারান্দায় বেরিয়ে এসে ডাকেন "রামটহল—এ রামটহল, দেখ বেটা মরেছে, আরে রামট-হ-ল—" রামটহল নিকটেই কোথাও ছিল, দৌড়ে আসে বড়-বাবুর সম্মুখে, চোখে মুখে ব্যস্ততা ও ক্ষিপ্রতার পরিচয় দেয়।

"কোথায় ছিলি বেটা! গাড়ী আসার সময়, কোথায় গিয়ে ব'সে থাকিস বল্ ত? এক দিন একটা বিপদ ঘটাবি দেখছি—কোম্পানীর কাজ, ইয়ারকি আর কি?" বড়বাবু অনেক কিছু বলে যান কোম্পানীর কাজ ও তার সবিশেষ

দায়িত্ব সম্পর্কে। রামটহল একটি অক্ষরেরও উত্তর দেয় না, কারণ সে বড়বাবুকে আজ পাঁচ বছর দেখছে ও এ-সম্পর্কে প্রতিদিন অহোরাত্র শুনে যাচ্ছে। সুচতুর রামটহল জানে যে বড়বাবুর কথার উত্তর দিলে তিনি আগ্নেয়গিরির মত অকস্মাৎ জ্বলে ওঠেন। "যা—ফিপটিন আপ আসছে, লাইন ক্লিয়ার দে, চোখ দুটো একটু খুলে সিগন্যাল নামাবি, বুঝলি? কোম্পানীর কাজ। হাজার হাজার লোকের প্রাণ, বাপু, তোর হাতে—হ্যাঁ—। বড়বাবু প্রত্যেকটি ট্রেনের আগমনের পূর্ব্বে এই কথাটি বিশেষ ক'রে স্মরণ করিয়ে দেন রামটহলকে। সেও বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে কথাগুলো শোনে। এক দিন সে কথাগুলোকে উপেক্ষা ক'রে চলে গিয়েছিল, সেদিন বড়বাবু আগুন ছুটিয়ে দেন চীৎকার ক'রে, এবং তখন থেকেই নিজে কেবিনে উঠে সিগন্যালের পাখা নামিয়ে দিতেন। প্রায় পনর দিন তিনি রামটহলের এই ভীষণ দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যটুকু নিজে ক'রে হাজার হাজার যাত্রীর প্রাণের আশঙ্কা দূর করতেন। কয়েক জন তাঁর পরিচিত লোক ও সতীশ তাঁকে বলে, "দাদা, আপনি এ-কাজ নিজে করেন কেন? রামটহলকে বলুন না কেন।"

"আরে, ভায়া. তোমরা বোঝ না, হাজার হাজার লোকের প্রাণ ঐটুকু লোহার হ্যাণ্ডেলের উপর। সেদিন তাই তো ও-বেটাকে বুঝিয়ে বললাম। তা নবাবপুত্তুর গ্রাহ্যই করলেন না, এই দেখ না সেদিন মাজদিয়াতে কি সর্ব্বনাশটাই হ'ল, আহা কত প্রাণ অকালে গেল বল তো? ভাব দেখি সেই গভীর রাত্রে কি আর্ত্তনাদটাই উঠেছিল!" বলতে বলতে দাদার চোখ-দুটি বাস্তবিকই অশ্রুপূর্ণ হয়ে ওঠে। দৃষ্টি হয়ে আসে কুয়াশাচ্ছন্ন। "তোমরা কি ভাব যে ড্রাইভার সিগন্যাল অমান্য ক'রে চলে এসেছিল? আরে দূর! আসলে এই মূর্ত্তিমান রামটহলের মতই কোন গুণধর সেই লাইনেরই লাইন ক্লিয়ার দিয়েছিল যে-লাইনে দাঁড়িয়েছিল নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস। ভাব দেখি এক বার! সামান্য অসাবধানতার জন্য কি সর্ব্বনাশটাই না হ'ল!"

যা হোক, সতীশ বুঝিয়ে পুনরায় রামটহলের কাজটুকু রামটহলকে দিল, কিন্তু সেদিন থেকে তার কর্ত্তব্য হ'ল বড়বাবুর উপদেশটুকু প্রতিবার স-মনোযোগে শোনা এবং তার পর কেবিনে উঠে সিগন্যালের পাখা নামানো।

ফিপটিন আপ আসার সময় হয়, বুকিং বাবুর বাতায়নের সম্মুখে সামান্য ভিড় হয়ে ওঠে। যাত্রীরা চীৎকার করে—"বুকিং বাবু এদিকে আসুন, গাড়ীর ঘণ্টা দিয়েছে, পাখা নেমেছে, ও বাবু!" বুকিং বাবু তখন নির্ব্বিকার চিত্তে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছেন।

ট্রেনের ধোঁয়া বহুদূর থেকে দৃষ্টিগোচর হ'লে বুকিং বাবু মন্থরগতিতে এসে নিজের স্থানে এসে দাঁড়ান। প্রথমে উপস্থিত জনতাকে বেশ কিছু বকুনি দেন—"বেটারা যেন ঘোড়ায় চড়ে আসে, কাল থেকে যদি এত বিরক্ত করিস তো এক জনকেও টিকিট দেব না, বুঝবি মজা তখন—হ্যাঁ!" যেন উপস্থিত জনতার সকলেই কাল আসবে টিকিট নেবার জন্য এবং টিকিট না-দেওয়াটা যেন তাঁর ইচ্ছাধীন! "কোথাকার টিকিট? দে পয়সা!"

এক জন যাত্রী একটি টাকা এগিয়ে দিয়ে নিকটবর্ত্তী কোন স্টেশনের টিকিট চায়। সতীশ টাকাটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলেন, "নেবেন ত চার আনার টিকিট, এগিয়ে দিলেন একটি টাকা। বড় টাকাওয়ালা হয়েছেন, কেন এতক্ষণ টাকাটা ভাঙিয়ে রাখতে পার নি, হবে না, যাও। কই হে তোমার পয়সা দাও।"

"বাবু, কোথায় ভাঙাব টাকা? আজকে দয়া ক'রে দিন, অন্য দিন পয়সা ভাঙিয়ে আনব, গাড়ী এসে গেছে বাবু, এই গাড়ীতে না গেলে মকদ্দমাটা খারিজ হয়ে যাবে বাবু,—"

"তোমার মকদ্দমা চুলোয় যাক, জমিদারি লাটে উঠুক, "খটাং খটাং।" টিকিট অবশ্য সকলেই পায়। তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটই সকলে নেয়। মধ্যম শ্রেণীর টিকিট বড়বাবুর পাঁচ বছরের মধ্যে একখানাও বিক্রয় হয় নি, কই মনে তো পড়ে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট বিক্রয় হয় তখন, যখন স্থানীয় জমিদার-বাড়ীর কোন বাবু বা বউ যাতায়াত করেন। তখন তাঁরা অবশ্য ভিতরে এসে বসেন, বড়বাবু নিজে টিকিট দেন। মাঝে মাঝে মহকুমা-হাকিম আসেন, সেদিন স্টেশনের অন্য আবহাওয়া হয়। বড়বাবু প্যান্ট প'রে আসেন ও হাকিমের আরদালিকেও

সেলাম করেন। সতীশ নব্য ছোকরা, বিশেষ ব্যস্ত হন না, তবুও দাদার পূর্ব্বদিনের উপদেশের অত্যাচারে কিছু ত্রস্ত হয়ে পড়েন। সেদিন দু-এক জন হতভাগ্য তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী বিনা-টিকিটে গাড়ীতে চড়তে বাধ্য হয় এবং যথাসময়ে অতিরিক্ত পয়সা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে। অনেকে ট্রেন ফেলও করে।

হাকিম চলে যাবার পর বড়বাবু তাদের ওপর অগ্ন্যুৎপাৎ ক'রে বলেন, "গোমুখ্যু কিনা! হাকিম গেলেন, আর ওরা কিনা প্রাণপণে চীৎকার করছে! কেমন, এখন গেলি না বাবার গাড়ীতে চড়ে! হাকিমের সামনে নিজেও মরবে, আর আমাকেও মারবে! ওরে রামটহল, এবার তামাকটা দে বাবা! উঃ—" বড়বাবু ফার্স্ট-এড-এর বড় বাক্সটার গহ্বর থেকে ধুতি বের করে পরেন ও প্যাণ্টটা ছেড়ে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলেন। মনে হয় যেন তাঁর বুকের উপর থেকে ভারি একটা পাথর নেমে গেল। পূর্ব্বদিনে হাকিম নেমেছেন এবং বলে গিয়েছিলেন যে আজ বারটার ট্রেনে ফিরবেন, সুতরাং কাল থেকেই তিনি সর্ব্বদা প্যাণ্ট চড়িয়ে আছেন। রাত্রেও স্টেশনে শুয়েছিলেন সেই প্যাণ্ট পরেই, এবং প্রভাত থেকে বেলা বারটা পর্য্যন্ত তিনি একবারও তামাক খাবার অবসর কিংবা সাহস পান নি, যথারীতিতে তিনি এর মধ্যে প্রায় বারো বার তামাক খেতেন।

রামটহল সেই বাক্স থেকেই হুঁকো-কল্‌কে বের করে, বড়বাবুর প্যাণ্টটি ভাঁজ ক'রে ছোট্ট সুটকেসে ভ'রে পুনরায় সেই বাক্সতেই রেখে দেয়। ওটা ও টুপিটা সেখানেই থাকে। বলা যায় না তো কখন হাকিম কিংবা কোন অফিসরের আগমনের হুকুম হয়। যথাসময়ে ফিপটিন আপ আকাশ-বাতাস কম্পিত ক'রে স্টেশনে এসে দাঁড়ায়। সারা স্টেশন কোলাহলে মুখরিত হয়। দু-একটি লোক পান-বিড়ি হেঁকে যায় দু-চার বার। কুলি দু-চার জন আছে, কিন্তু তারা বিশেষ উৎসাহ দেখায় না, কারণ প্রয়োজন খুব কম দিনই হয়। তারা কোম্পানীর কাজ করে। জমিদারবাবুরা এলে তাঁদের সঙ্গে চাকর আসে সে কাজের জন্য। হাকিম এলে বড়বাবুর দুর্দ্দান্ত দাপটে সকাল থেকেই তারা হাজির থাকে, রং-ওঠা নীল উর্দ্দি প'রে হাকিমকে সাহায্য করে, যদিও বেশী জিনিস বড়বাবু নিজেই নামিয়ে দেন, সেদিন তারা পয়সা পায় না।

ফিপটিন আপ আসে। বড়বাবু তাড়াতাড়ি গেঞ্জির উপরে কোটটি প'রে লাইন ক্লিয়ার হাতে নিয়ে ছোটেন গার্ডের গাড়ীর দিকে, দু-চার বার সেলাম করেন, সাহেব গার্ড হ'লে তাঁর নিজস্ব ইংরাজিতে ভাব প্রকাশ করেন। পরে ছুটে যান এঞ্জিনের দিকে, লাইন ক্লিয়ার স্বহস্তে ড্রাইভারের হাতে দেন। এ-কর্ত্তব্যটুকু বড়বাবু আজ সুদীর্ঘ পনর বৎসরেও হস্তান্তর করেন নি। ওখান থেকে চীৎকার করেন—"ঘণ্টা—আ—আ—" "টং-টং—"

গাড়ী ছেড়ে যায়। বড়বাবু ফিরে আসেন নিজের ঘরে। কোটটি খুলে ফেলে পুনরায় রিসিভার তোলেন, পশ্চাতের স্টেশনকে বলেন, "হ্যালো—ফিপটিন আপ পাসড থ্রু রাইট টাইম—"

স্টেশন পুনরায় মৃতপ্রায় হয়।

এই ট্রেনটি বেলা বারটায় যায়, তার পর ট্রেন আসে বেলা তিনটেয়। সুতরাং রামটহলকে রেখে সতীশ ও বড়বাবু দু-জনেই যান খেতে। বড়বাবু ফিরে আসেন এবং রামটহলকে ছুটি দেন খাবার। রামটহল বড়বাবুর চির-পরিচিত শয্যাটি পুরাতন ক্যাম্প খাটটির উপর পেতে বড়-বাবুর সামান্য দিবানিদ্রার আয়োজন করে, তামাক সেজে নলটি শয্যার উপর রেখে বিদায় নেয়।

সতীশ দ্বিপ্রহরে আসেন না, ঘরে তাঁর নূতন বউ।

বড়বাবু মৃদু হেসে বহুদিন পূর্ব্বে সতীশকে এ-অনুমতি চিরস্থায়ী ক'রে দিয়েছেন। তিনটের ট্রেন চলে যাবার পর সতীশ দু-কাপ চা ছোট্ট একটি চা-দানিতে ঢেলে নিয়ে স্টেশনে উপস্থিত হন—টেবিলের দেরাজ থেকে পেয়ালা বের ক'রে প্রথমে দাদাকে দেন।

এইটুকু সেই ঘরের ও তার আবহাওয়ার ইতিহাস। তার সম্মুখে ক্ষুদ্র ও দরিদ্র প্ল্যাটফর্ম, চার-পাঁচটি লাইন অতিক্রম ক'রে অদূরে একটি টিনের মাল-গুদাম, পাট ও তামাকের সময় সেটি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, ইতস্ততঃ দুচার-খানি মালগাড়ী যেন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে থাকে। স্টেশনের এক পাশে একটি বিশ্রামাগার আছে, কোন উচ্চপদস্থ কোম্পানীর কর্ম্মচারী ওদারকে এলে সেটি খুলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়, নতুবা সেটি বার মাস থাকে বন্ধ এবং তার সম্মুখে দশ-বারটি কুকুর বিশ্রাম করে ও সময়ে
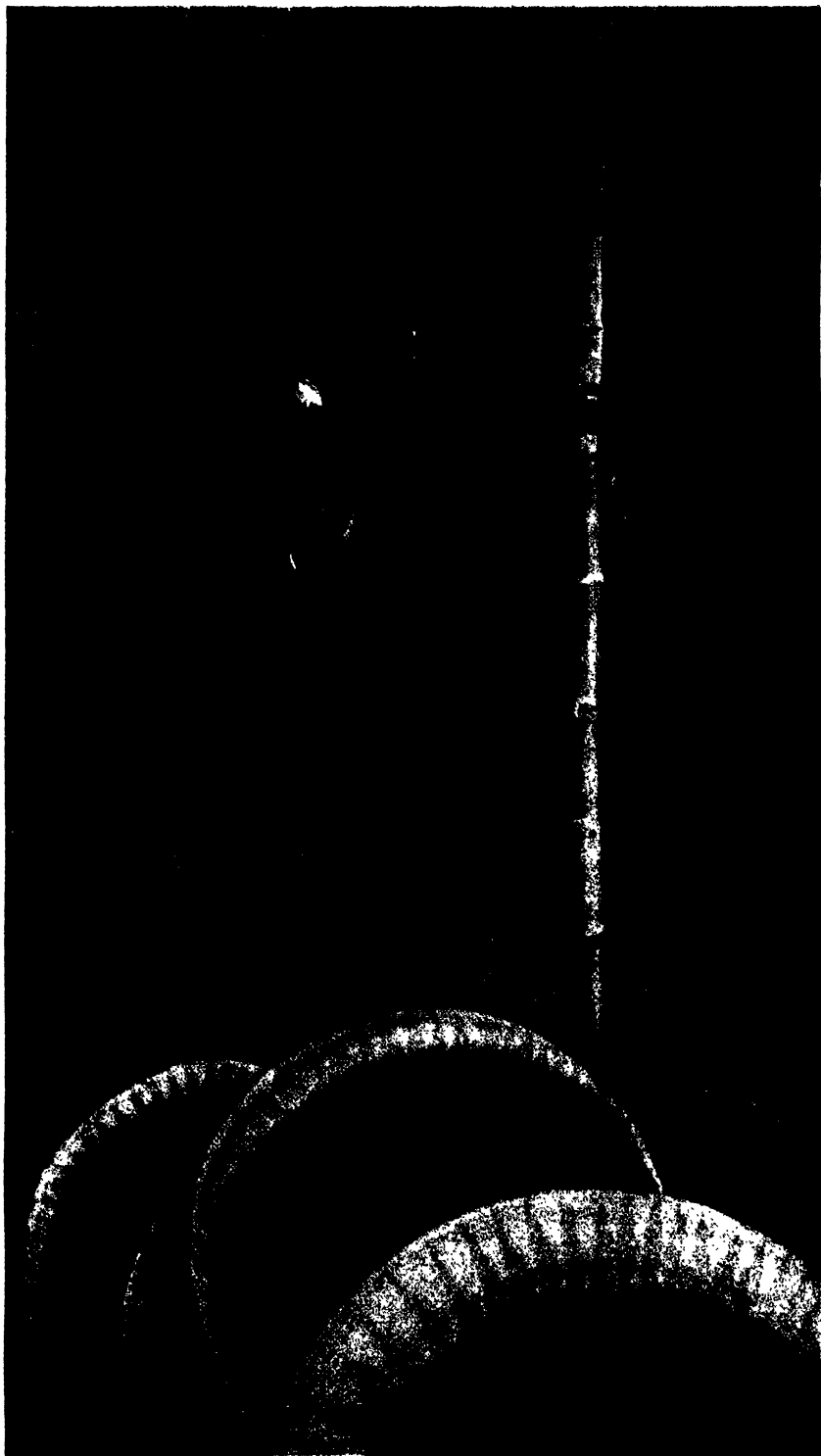
প্রতীক্ষমানা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা শ্রীইন্দুভূষণ গুপ্ত

সময়ে বিশ্রী চীৎকার ক'রে ঝগড়া করে, যদিও প্রতিমাসে বিশ্রামাগারের জন্ম পৃথক্ ব্যয় কোম্পানী নিঃশব্দে বহন করে। হাকিমের ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর আগমনের দিন কতকগুলি অনাথ কুকুর কিছুক্ষণের জন্ম আশ্রয়হীন হয় ও ঘরটিও সূর্য্যালোক দেখে কিছুক্ষণের জন্য!

স্টেশনের নাম হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ জেলার অন্তর্গত, এবং কাটিহার জংশন তিনটি স্টেশন দূরে মাত্র।

স্টেশন আমাদের প্রধান প্রতিপাদ্য নয়, দাদা ওরফে বড়বাবু অর্থাৎ শ্রীশিবরাম দে সরকারের কাহিনী বলতে ওটুকু ভূমিকা দিতে বাধ্য হ'লাম।

সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত মাত্র পাঁচখানা গাড়ী ক্ষুদ্র স্টেশনটির বুকের ওপর দিয়ে যাতায়াত করে, তিনখানা কলকাতা অভিমুখে যায় এবং দুখানা কাটিহার অভিমুখে আসে, রাত্রে মাঝে-মাঝে দু-একখানা মালগাড়ী যাতায়াত করে। বড়বাবু স্টেশনেই শুয়ে থাকেন চিরপরিচিত সেই ক্যাম্প-খাটটির উপর গড়গড়ার নলটি হাতে ক'রে, ঘুম এসে গেলে নলটি হাত থেকে অজ্ঞাতে পড়ে যায়, ঘণ্টার সঙ্গে দুর্গা দুর্গা ব'লে উঠে দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য সমাপ্ত করেন। মালগাড়ী চলে যাবার পর পুনরায় গড়গড়া টানতে টানতে ঘুমিয়ে পড়েন, সকালে সাতটার গাড়ীর পূর্ব্বে সতীশ চা এনে যথাবিধি তাঁর ঘুম ভাঙায়। স্বগৃহে শয়ন বড়বাবুর ভাগ্যে আজ প্রায় দশ বৎসর ঘটে না অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে, তখন দাদার একমাত্র সন্তান চিরকুমারের বয়স মাত্র নয় বৎসর। এখন নাকি স্টেশনে না শুলে দাদার ঘুমই আসে না, অন্ততপক্ষে আজ পাঁচ বছর সতীশ সেই ব্যবস্থাই দেখছে। গ্রীষ্মকালে তাঁর ক্যাম্প-খাট বারান্দায় আসে, শীতে যায় ঘরের মধ্যে।

রামটহল প্রিয় ভৃত্য।

শিবরামবাবু আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই দাদা, স্থানীয় জমিদার-বংশের বড়বাবু থেকে দরিদ্রতম প্রজার দাদা ও প্রিয়পাত্র, বয়স প্রায় পঞ্চাশ, কেশবিরল মস্তক, নাতিদীর্ঘ নাতিস্থূল দেহ, সদাহাস্য মুখ—সার্ব্বজনীন দাদা আমাদের সকলেরই চিত্তই জয় করেছেন। ক্রোধে অবশ্য তিনি অগ্ন্যুৎপাত করেন জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে, কিন্তু সে অগ্ন্যুৎপাত ক্ষণস্থায়ী এবং মর্ম্মভেদী নয়, সুতরাং সকলেই সেটাকে সহজ করে নিয়েছে; দশ বৎসর পূর্ব্বে স্ত্রীবিয়োগের পর বাঙালীর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে তিনি আর দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন নি, পুত্র চিরকুমারের মুখের দিকে চেয়ে—সেই পুত্র আজ উনিশ বৎসরের যুবক, কলকাতায় থার্ড ইয়ারে পড়ে, ছুটিতে কাছে এলে দাদা আত্মহারা হন এবং দৈনন্দিন প্রথা পরিবর্ত্তন ক'রে বাড়ীতে শয়ন করেন; ইচ্ছা আছে পুত্রকে শিক্ষিত ক'রে ভাল চাকরিতে দেবেন অবশ্য রেলের চাকরিতে আর নয়। কারণ, আজ প্রায় পঁচিশ বৎসর শিবরামবাবু কোম্পানীকে সেবা করছেন কিন্তু এমন সেবা ক'রেও দাদা আজ পর্য্যন্ত ভাল এবং বড় স্টেশনের বড়বাবু হ'তে পারেন নি, সুতরাং কোম্পানীর প্রতি তাঁর অভিমানের যথেষ্ট হেতু আছে।

সতীশ যুবক, প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে সে বিয়ে করেছে এবং নব-পরিণীতা বধূও সঙ্গেই থাকে। দাদা সতীশের বাড়ীতে আহার করেন, অবশ্য সেজন্য সতীশকে মাসিক সাহায্যও করেন—অর্থাৎ সতীশের গৃহেই শিবরামবাবুর জীবনযাত্রার সকল ব্যবস্থা। সতীশের স্ত্রী মনোরমা লক্ষ্মী মেয়ে, শিবরাম তারও দাদা এবং তার স্বামীরও দাদা, পরিবর্ত্তে মনোরমা পায় শিবরামের অপর্য্যাপ্ত স্নেহ—প্রায়ই এটা-ওটা, পূজাপার্ব্বণে উপহার। শিবরামবাবু গৃহব্যবস্থার কোন অভাবই অনুভব করতে পারেন না মনোরমার শ্রদ্ধা-ভক্তিতে, সতীশের আন্তরিকতায়। চিরকুমার ছুটিতে এলেও এ-ব্যবস্থা কোন পরিবর্ত্তন হয় না, মনোরমা তার প্রিয় বৌদি।

অদ্ভুত আত্মীয়তা!

"দাদা, এবার চির-ঠাকুরপোর বিয়ে দিন, আপনার দেখার লোক আসবে, আমার একটা সাথী জুটবে, একা-একা হাঁপিয়ে উঠি এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে—" মনোরমা প্রায়ই বলে দাদাকে। সে শহরের মেয়ে, স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়েছে, ইংরাজিতে দু-একটা রচনাও লিখেছে, এ জীবন হাঁপিয়ে ওঠারই জীবন তার।

"শুনলে হে ভায়া? মনু এবার আমাকে তাড়াতে চায়, গলগ্রহ আর সইতে পারছে না"—দাদা হেসে বলেন।

"কি যে বলেন! আমি বুঝি তাই বললাম, যান আর

আপনার সঙ্গে কথাই বলব না”— মনোরমা কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করে।

“দেখ পাগলির রাগ হ'ল! আর আমিও এমনই বললাম,—এই বি. এ-টা পাস করলেই চিরর বিয়ে দেব, দেখিস তোর সঙ্গে কেমন ঝগড়া করে”— দাদা হেসে ওঠেন, আবহাওয়াও তরল হয়ে ওঠে। এমনি প্রায়ই হয়।

মনোরমা সত্যই ভাল মেয়ে, আদর্শ বধূ। চিরকুমার এলে তার দিনগুলো লঘুগতিতে কেটে যায়।

সতীশের বিবাহের পর দাদার জীবন এই ভাবেই কাটছে, তার পূর্ব্বে দু-জনের আহারের ব্যবস্থা একই সঙ্গে ছিল, পাচক ও রামটহল ভরসা, পাচক এখনও আছে, রামটহল তো সংসারের একজন সভ্য। মনোরমা পাচক তুলে দিতে চেয়েছিল, শিবরাম বাধা দেন, বলেন অল্প বয়সে আগুনের উত্তাপ সহ্য হবে না, মনোরমার দেহবর্ণ মলিন হবে, সুতরাং তিনিই পাচকের বেতনটা দেন।

এমনি ভাবেই আমাদের চিরপরিচিত দাদা প্রায় পাঁচ বৎসর এই হরিশ্চন্দ্রপুরে জীবন কাটালেন সকলের আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা সংগ্রহ ক'রে। সতীশের বিবাহের পর তাঁর সংসার যেন পুনরায় পূর্ণ হ'য়ে ওঠে, সতীশ ও রামটহল দাদার স্নেহের অমর্য্যাদা করে নি কোন দিন।

এই বৎসর শিবরামবাবুর জীবনে ও হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশনে স্মরণীয় পরিবর্ত্তন হ'ল।

এপ্রিল মাসের নূতন টাইম-টেবিলে যে পরিবর্ত্তন হ'ল সে-পরিবর্ত্তন সকল ব্যবস্থাকেই সবিশেষ আঘাত করল। রাত্রি দুটা তেত্রিশ মিনিটে আপ ও ডাউন দুখানা ট্রেন নগণ্য হরিশ্চন্দ্রপুরে সাক্ষাৎ ক'রে বিপরীত মুখে যাবে, তন্মধ্যে যেখানা কাটিহারের দিকে যাবে সেখানার নাম হচ্ছে কাটিহার এক্সপ্রেস এবং সেখানা স্টেশনে উপস্থিত ডাউন ট্রেনখানাকে উপেক্ষা ক'রে হরিশ্চন্দ্রপুরে না থেমে তীব্রবেগে ছুটে যাবে কাটিহারের দিকে। হরিশ্চন্দ্র-পুরের ইতিহাসে এই প্রথম, সুতরাং পরিবর্ত্তন হ'ল অনেক।

রামটহলের সাহায্যকারী আর এক জন এল, নাম সীতারাম। দুটি উজ্জ্বল পেট্রোম্যাক্স এল ট্রেনের সময় স্টেশনকে উজ্জ্বলতর রূপে আলোকিত করবার জন্য। বিশ্রামাগারটি প্রতিদিন পরিচ্ছন্ন হ'তে লাগল। কুকুর-গুলি আশ্রয়হীন হ'ল। রামটহল নতুন উর্দ্দি পেলে। শিবরামবাবু সকলের কাছে বললেন যে এইবার হয়ত তাঁকে কোন বড় স্টেশনের কর্ত্তা করবেন কোম্পানী, এখানে তারই পরীক্ষা করা হচ্ছে। হরিশ্চন্দ্রপুরের লোক খুশী হ'ল দুখানা বেশী ট্রেন পেয়ে। দাদার অগ্ন্যুৎপাত হ'ল বর্দ্ধিত ও মুহুর্মুহু, এবং সতীশের মুখে পড়ল বিষাদের ঘন প্রতিচ্ছবি!

“ভয় নেই ভায়া, তোমার মুখ কালো করবার কিছু নেই, ও সময়টা আমিই ম্যানেজ ক'রে নেব, তোমার নতুন বউ, রাতটা আর বৃথাই কাটাতে বলব না এই নীরস লোহা-লক্কড়ের মধ্যে”— দাদা মৃদু হেসে বলেন— “এবার খুশী হয়েছ ত? আরে ভায়া আমাদেরও অমন এক দিন ছিল।” হয়ত অস্তগামী সূর্য্যের রামধনুর মত দাদার মানস-চক্ষুর সম্মুখে যৌবনের রামধনুর রক্তিমচ্ছটা আত্মপ্রকাশ করে। কথাটা মনোরমাকেও বলেন। সেদিন থেকে দাদার আদর বর্দ্ধিত হয় তার কাছে, সতীশের মুখচ্ছবি মনোরমার সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেই প্রথাই স্থায়ী হয়।

আমাদের দাদার কর্ত্তব্যজ্ঞান দশ গুণ বর্দ্ধিত হ'ল, নিজে গিয়ে পয়েণ্ট দেখে এসে, সম্মুখে দাঁড়িয়ে থেকে দূরের সিগন্যাল নামানোর ব্যবস্থা করেন। পুনরায় গিয়ে দেখে আসেন পয়েণ্ট ঠিক হয়েছে কিনা—প্রতিদিন তাঁর এই মহাকর্ত্তব্য সমাপ্ত করতে হয়। “সোজা কথা নয় ত, এক্সপ্রেস ছুটে চলে যাবে এবং আর একখানা ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকবে—এই ত পরীক্ষা! একটা কত বড় দায়িত্ব”—দাদা বলেন।

স্টেশনের নিদ্রিত আবহাওয়া কম্পিত ক'রে এক্সপ্রেস লৌহদানবের ন্যায় ছুটে চলে যায়, নিশ্চিন্ত হয়ে দাদা এসে ফোনে বলেন—“এক্সপ্রেস পাশড্ থ্রু রাইট টাইম।” দাদাই সর্ব্বেসর্ব্বা।

সতীশ তখন নববধূর বুকের কাছে স্বপ্ন দেখে।

শিবরামবাবু একাই সব ঠিক ক'রে ক্লান্ত হয়ে ধুম-

পান করতে করতে রাত্রি ভোর ক'রে দেন। তাঁর দিন কাটে এই ভাবে।

অদৃশ্য ভাগ্যলিপির প্রতিবাদ করার কারও ক্ষমতা নেই। মানুষ নিজের ইচ্ছামত জীবনের পথ প্রস্তুত করবার চেষ্টা করে এবং বিভিন্ন ও বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় প্রতি-ফলিত করে, কিন্তু অলক্ষ্যে ব'সে এক জন সে-আয়োজন দেখে হাসেন, ইঙ্গিত করেন অন্যরূপ!

সে-বার গরমের দীর্ঘ ছুটিতে চিরকুমার পিতার নিকট এল। মনোরমার সুমধুর ব্যবহারে, সতীশের অগ্রজ-সুলভ প্রীতিতে আর পিতার গভীর স্নেহে দিন কাটিয়ে সে একদিন যাত্রা করল কলকাতা অভিমুখে। এই দু-মাস আমাদের দাদা শিবরাম দে সরকারের দিন কেটেছে রঙীন চিন্তায়, পুত্রের যৌবনশ্রীতে উদ্ভাসিত মুখের দিকে তাকিয়ে। এমন কি গভীর রাত্রের এক্সপ্রেসকে যাত্রা করিয়ে দাদা নিজের বাড়ীতে গিয়ে শুতেন, কোন কোন দিন পুত্রের ঘুম ভাঙিয়ে অবশিষ্ট রাত্রিটুকু গল্প করেই অতিবাহিত করতেন। বহুদিন পরে দাদার গৃহে পুনরায় সন্ধ্যার আলো জ্বলেছিল। মনোরমার অত্যাচারে দাদা কথা দিয়েছেন যে, এবার পরীক্ষার পরই তার একটি সাথী তিনি এনে দেবেন।

যথাসময়ে দাদা পুত্রকে ট্রেনে চড়িয়ে দিলেন, মনোরমাও স্টেশনে এসেছিল বিদায় দিতে।

"এবার কিন্তু তুমি আগে চিঠি দেবে বৌদি।"

"না তুমি, সে-বার আমি দিয়েছিলাম।" ব্যবস্থাটা ঠিক হবার পূর্ব্বেই ট্রেন দিল ছেড়ে, মনোরমার উত্তরের পূর্ব্বেই চক্ষু সজল হয়ে উঠল। দাদা চোখের জল গোপন করতে গিয়ে অশ্রুধারাকে মুক্ত ক'রে ফেললেন!

বহুদূর পর্য্যন্ত চিরকুমার মুখ বের ক'রে থাকল। ক্রমে ট্রেন অদৃশ্য হ'ল, দাদার চোখের সম্মুখে তো বহু পূর্ব্বেই ট্রেনখানা ঝাপসা হয়ে গেল।

পর-দিন সংবাদ এল যে চুয়াডাঙার কাছে ট্রেন লাইনচ্যুত হয়েছে এবং বহু লোক হতাহত হয়েছে। কোম্পানী সবিশেষ সেবা ও যত্নের ব্যবস্থা করেছেন যত সত্বর সম্ভব।

শিবরামবাবুর কাছে এও সংবাদ এল যে, তাঁর পুত্র চিরকুমার সেই আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে। কোম্পানী তাঁর যথাসম্ভব ক্ষতিপূরণ করবেন।

সংবাদ শুনবার দু-দিন পরে শিবরামবাবুর জ্ঞান ফিরে আসে। মনোরমা মাতার ন্যায় তাঁকে বুকে ক'রে সেবা করে।

সাত দিন কেটে গেছে। শিবরামবাবু এ কয় দিন কোম্পানীর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে যোগদান করতে পারেন নি।

রাত্রি দুটো, শিবরামবাবু ঘরে ঘুমিয়ে আছেন। সে-ঘরে একটি আলো জ্বলছে স্তিমিত হয়ে। পাশের ঘরে মনোরমা ঘুমিয়ে। সতীশ স্টেশনে নিজের কর্ত্তব্য ও দাদার কর্ত্তব্যটুকু সমাধান করছে।

অকস্মাৎ শিবরামবাবুর ঘুম গেল ভেঙে। মনে হ'ল যেন অপর স্টেশন থেকে তাঁকে যথারীতি ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকল। ঘুম ভাঙার পর তাঁর বুকে লাগল আঘাত। তাই ত! ট্রেন আসবার সময় হয়েছে। হয়ত বা অপর স্টেশন অনেকক্ষণ তাঁকে ডাকছে আর তিনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে আছেন? বিশেষ এই সময়টায়। একখানা এক্সপ্রেস ট্রেন বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলে যাবে অপর একখানা দণ্ডায়মান ট্রেনের পাশ দিয়ে। এতগুলো নিদ্রিত নিশ্চিন্ত যাত্রীর দায়িত্ব! কোম্পানীর গুরুভার কার্য্য!

ঘরে একটি ঘড়ি অবিরাম টিক্ টিক্ ক'রে চলেছে। দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে সুপটু দাদা দেখলেন সে-ঘড়িতে দুটো বেজে পাঁচ মিনিট। সুতরাং আর মাত্র আটাশ মিনিট দেরি! সর্ব্বনাশ! সতীশ কোন দিন এক্সপ্রেস পাস্ করায় নি। হয়ত বা ঘুমিয়েই পড়েছে, রামটহল ত দ্বিতীয় কুম্ভকর্ণ! তা হ'লে কি হবে? উঃ, ভাবতেই শিবরাম বাবুর দেহের রক্তস্রোতে ঝিম্ ঝিম্ ক'রে উঠল, মস্তিষ্ক করল প্রচণ্ড আঘাত তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। দাদা উঠে জামাটা প'রে নিয়ে পথে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন। চতুর্দ্দিকে সুষুপ্তি। দূরে ও নিকটে কতকগুলো কুকুর চীৎকার ক'রে উঠল।

দাদা স্টেশনে উপস্থিত হ'য়ে নিজের ঘরে এসে দেখেন সতীশ টিকিট দিচ্ছে। সেদিন কয়েক জন যাত্রী এসেছিল, গভীর রাত্রের যাত্রী।

সতীশ তাদের উপর খুব রাগ করছে ও বলছে—"এত রাত্রেও সব মরতে চলেছ। কেন, এত দিন যে এ গাড়ী

ছিল না, তখন?" সতীশ বিশ্রী মুখভঙ্গী ক'রেও টিকিট দেয়।

দাদাকে দেখে সতীশ চমকে উঠল।

"এ কী, দাদা? নিশ্চয়ই পালিয়ে এসেছেন। মনু জানে যে আপনি চলে এসেছেন?"

"না ভাই, সে পাগলী জানলে কি আর আসতে দিত রে? একা একা হাঁপিয়ে উঠলাম। তুমি টিকিটগুলো দাও, আমি আর সব ক'রে দিচ্ছি। ওদের অত ব'কো না, কে ফেরে কে না ফেরে!" দাদার কণ্ঠ যেন কেউ চেপে ধরে ভাষা রুদ্ধ ক'রে দিয়েছে!

"না না, আপনি কিছু করবেন না, এখানে বসুন। আমি সব ক'রে দিচ্ছি।"

"না ভাই, গাড়ীটা আমিই পাস করিয়ে দি। তার পর দু-জনে গিয়েই শোব।"

কাটিহার থেকে গাড়ী এসে দাঁড়াল। রামটহল ও সীতারাম বড়বাবুকে অকস্মাৎ অসময়ে দেখে বিস্মিত ও চিন্তিত হ'ল।

"রামটহল, এক্সপ্রেস আসবে, পয়েণ্ট ঠিক কর্। সীতারাম তুমি ডাউন দাও"—সতীশ আদেশ করলেন।

"তবেই হয়েছে! ঐ উজবুক পয়েণ্ট ঠিক করবে? মানে এক দিন তুমি ভরাডুবি করবে দেখছি। দাও আমাকে চাবি। রামটহল, তুমি ও সীতারাম কেবিনে ওঠ। আমার নীল আলো দেখলে পাখা ডাউন করবে। সতীশ, তুমি ফোন মেসেজটা সঙ্গে সঙ্গে দিও, দাও চাবি।"

দাদা চাবি ও আলো নিয়ে দূরে গেলেন পয়েণ্টের কাছে। রামটহল ও সীতারাম কেবিনে উঠল। সতীশ দাঁড়াল প্ল্যাটফরমে। মনে দুঃখ, চোখে বিস্ময় ও অশ্রু, ভাবল লোকটা কাজ ছাড়া থাকতে পারে না!

দাদা পয়েণ্টের কাছে এসে দাঁড়ালেন। দ্বিতীয় লাইন দিয়ে এক্সপ্রেস ছুটে যাবে এই ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে দাদা দাঁড়িয়ে ছিলেন তার চতুর্দ্দিকে শুধু অন্ধকার, শুধু যেন চাপা বীভৎস বিভীষিকা, মাঝে মাঝে জোনাকি-আলোর কুহেলিকাপূর্ণ ইঙ্গিত। দূরে স্টেশনে আলো জ্বলছে। সেখানে চাঞ্চল্যের সাড়া নেই। কয়েকটি মাত্র যাত্রী উপস্থিত গাড়ীতে উঠল। ক্ষণিকের জন্য স্টেশনের স্থির আবহাওয়া আলোড়িত হ'ল মাত্র, তার পরই সব চুপ। একখানা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, মুক্ত বাতায়ন দিয়ে প্রতি কক্ষের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। যাত্রীরা নিশ্চিন্ত নিদ্রিত। ট্রেনখানা একটা আলোর মালার মত দাঁড়িয়ে। এঞ্জিনটি সম্মুখে ভয়ঙ্কর সাপের ন্যায় গর্জ্জন করছে। একটি লোক আলো নিয়ে তাকে তৈলদানে সেবা ও সন্তুষ্ট করল, যেন রাক্ষসপূজা!

অকস্মাৎ দূরে কতকগুলো শৃগাল বিশ্রী চীৎকার ক'রে উঠল। সারা পৃথিবী চমকে উঠল সে চীৎকারে, শিবরাম-বাবুও।

"বাব!"

"কে?" শিবরাম পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলেন—"চির?—কে এ?" পুনরায় পরিচিত কণ্ঠে পিতৃসম্ভাষণ!

সম্মুখের অন্ধকারে ফুটে উঠল, একখানা মুখ। হ্যাঁ, সেই মুখ! মুখখানা অতীব করুণ, বীভৎসরূপে বিকৃত। কিন্তু শিবরামবাবু স্পষ্ট চিনতে পারলেন।

"ওঃ—বাঁচাও—বাঁচাও!" মুখখানা আরও বিকৃত হ'ল। শিবরামের দেহে যেন বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা, দেহের প্রতি রক্তবিন্দু অকস্মাৎ যেন রাত্রের অন্ধকারে, জনকোলাহলের বাইরে, এত দিন পরে বিদ্রোহ ক'রে উঠল।

"বাবা!"

পুনরায় সেই মুখ! কানে এল নিশীথ রাত্রে বিভীষিকা-ময় মাঠের বুকে শত শত মুমূর্ষুর গগনভেদী আর্ত্তনাদ—"বাঁচাও বাঁচাও!"

সম্মুখে পুত্রের মুখচ্ছবি স্পষ্টতর হ'ল!

কোম্পানী! কোম্পানীর দায়িত্বপূর্ণ কাজ! শিবরাম-বাবু পয়েণ্ট ঠিক না ক'রেই স্টেশনের কেবিনকে নীল আলো দেখিয়ে দিলেন। দেখলেন সিগন্যালের পাখা নত হ'য়ে এক্সপ্রেসের পথ সুগম ব'লে ঘোষণা করল।

কয়েক মুহূর্ত্তেই মূর্ত্তিমান দৈত্যের মত এক্সপ্রেস এসে পড়ল, আর কিঞ্চিৎ মাথাটা দুলিয়ে সেই লাইনই ধরল যে-লাইনে আর একখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে!

অদূরে দাঁড়িয়ে আমাদের দাদা বিশ্রীভাবে হেসে উঠলেন, হাঃ, হাঃ, হাঃ—

তাঁর হাসি অতলে তলিয়ে গেল দিগন্তপ্রকম্পিত চীৎকার ও আর্ত্তনাদে।

অপবাদ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজিকার অরণ্যসভারে
অপবাদ দাও বারে বারে ;
বলো যবে দৃঢ়কণ্ঠে অহংকৃত আপ্তবাক্যবৎ
প্রকৃতির অভিপ্রায়, নব ভবিষ্যৎ
করিবে বিরল রসে শুষ্ক তার গান
বনলক্ষ্মী করিবে না অভিমান।
এ-কথা সবাই জানে
যে সংগীত-রসপানে
প্রভাতে প্রভাতে
আনন্দে আলোক-সভা মাতে
সে যে হেয়
সে যে অশ্রদ্ধেয়
প্রমাণ করিতে তাহা আরো বহু দীর্ঘকাল যাবে
এই একভাবে।
বনের পাখিরা ততদিন
সংশয়বিহীন
চিরন্তন বসন্তের স্তবে
আকাশ করিবে পূর্ণ
আপনার আনন্দিত রবে॥

উদয়ন
৩০ নবেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে

তিন প্রশ্ন

শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী

রবীন্দ্রনাথ দাঁড়ালেন ন্যুইয়র্কের
ষাটতলা বাড়ির ছায়ায়—
কে উঁচু ?—উচ্চতা
চূর্ণ চূর্ণ হ'ল দৈত্যরাজ্যে, কোটি জ্বলন্ত ডলার-অর্কের
আলো-নেভা কালো ছাইয়ে জমল তুচ্ছতা,
গান জেগে রইল মহাকালের মায়ায়।
—চৈতন্যের শুভ্র স্তম্ভ কবির উদ্ভাবনায়।

এণ্ড্রুজ ছিলেন নম্রকণ্ঠ শান্ত, নীল চোখে কোমল বিদ্যুৎ-তেজ
জলিয়নঅলা পঞ্জাবে নামলেন একা—
কার জোর বেশি ?
বর্ম্মিত হন্তাঁর দেশী তিনি সর্ব্বদেশী,
ভাবনায় নিয়ত কল্যাণ-রেখা
হাতে অজিতের শক্তি ; ফিজি, কেনীয়া, দুঃখীর বিশ্বে ধ্যানী ইংরেজ
দিয়ে গেছেন ভালোবাসা ; বাংলার আলোয় শেষ দেখা।

আর গান্ধীজির কাঁধে দেখ কোটি কৃষকের লাঙলের চাপ
চাষ করচেন ভারতের শুকনো মাটি বৃষ্টি-রোদে,
অবিচল মানসমূর্ত্তি, সংহারী যুগের তাপ
কঠিন কর্ম্মে ফিরিয়ে দিচ্চেন অক্রোধে,
এমন সময় উপরে ঘুরে ঘুরে এরোপ্লেন যদি বোমা ফেলে, বেয়োনেট
নিয়ে ছোটে মহামারী এবং সাম্প্রদায়িক ছোরা বুলেট—
তার সামনে ঐ শীর্ণ দেহের খোলা বুক
হারবে, না, জিৎবে ?
মিটবে
আগুনে নেশা। যুগে যুগে জাগবে কার প্রসন্ন মুখ ?

পাতঞ্জল যোগদর্শন—পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত অভিনব সংস্করণ। সূত্র, ব্যাসভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ, ভাষানুবাদ, ভাষাটীকা, সাংখ্যতত্ত্বালোক, সাংখীয় প্রকরণমালা ও যোগভাষ্যটীকা ভাস্বতী সহিত। সাংখ্যযোগাচার্য্য শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ আরণ্য প্রণীত। শ্রীমদ্ ধর্ম্মমেঘ আরণ্য ও রায় শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ বাহাদুর, এম-এ, পি-এইচ ডি সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই গ্রন্থে সর্ব্বত্রই গ্রন্থকর্ত্তার সূক্ষ্মদৃষ্টি, বিচারপটুতা, অভিজ্ঞতা, নিপুণতা এবং চিন্তাশীলতা অসামান্যরূপে পরিস্ফুট। ইহাতে জানিবার শিখিবার ও চিন্তা করিবার বহু বিষয়ই স্থান পাইয়াছে। বঙ্গভাষায় এরূপ স্বাধীন চিন্তাসহকারে সাংখ্যশাস্ত্রের আলোচনা আর দেখা যায় না। ইহা বঙ্গভাষার সম্পদ যথেষ্ট বৃদ্ধি করিল ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যায়। যোগভাষ্যের টীকাটিও সংস্কৃত ভাষার রত্নভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি করিল, ইহাও বলিতে হইবে। গ্রন্থখানি চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই পাঠ্য। গ্রন্থের সংস্কৃত অংশের ভাষা অতি সরল ও সুন্দর হইয়াছে।

এইবার ইহার কতকগুলি দোষ আমরা যেরূপ বুঝিয়াছি তাহাই প্রদর্শন করিব। দেখা গেল গ্রন্থখানি নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর দৃষ্টিতে লিখিত হয় নাই। আজকাল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের সংমিশ্রণে যে একটা অবৈদিক ভাবের প্রবাহ বহিতেছে, গ্রন্থকার তাহা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এজন্য এ গ্রন্থের বহু স্থলই বেদবিশ্বাসী হিন্দুর অপাঠ্য বলিয়া মনে হইতেছে। বঙ্গানুবাদাদির ভাষায় মাধুর্য্য ও আকর্ষণীশক্তি একেবারেই নাই বলিতে ইচ্ছা হয়। বহুমান্য পূজনীয় আচার্য্যবর্গের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের যথেষ্টই অভাব পরিলক্ষিত হইল। অদ্বৈতবাদের উপর একটা বিকট বিদ্বেষ ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এতৎসম্পর্কিত বিচারগুলি দেখিলে গ্রন্থকার সাংখ্য ও বেদান্ত শাস্ত্রের রহস্য জ্ঞান সম্বন্ধেই আমাদের সংশয় প্রবলাকার ধারণ করে। ব্যাসভাষ্যের বহু জটিল স্থলগুলি পরিষ্কারও করা হয় নাই। যেমন ৫৬-৫৮ পৃষ্ঠায় ঈশ্বরের সদাঈশ্বরত্ব বিষয়ক ভাষ্যাংশ। গ্রন্থকারের ন্যায় এক জন বিচক্ষণ ব্যক্তি কেন যে সে বিষয়ে উদাসীন হইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

জাগৃহি—রেজাউল করীম, এম-এ, বি-এল। আর্য্য পাবলিশিং কোং, কলিকাতা, মূল্য ১।০।

মৌলবী রেজাউল করীম সাহেবের নাম বাংলা দেশে সুপরিচিত। নানা ঘটনার মধ্য দিয়া আজ বাংলা দেশে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটি বিষম বিরোধ বাড়িয়া উঠিতেছে। এইরূপ স্থলে মুসলমান শিক্ষিত-সমাজের দায়িত্ব বিশেষ গুরুতর। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বৃহৎ দায়িত্ব পালনের অপেক্ষা হাতের কাছে আশু লাভের সম্ভাবনা থাকিলে, মানুষ তাহার লোভ সামলাইতে পারে না। বাংলা দেশের শিক্ষিত মুসলমানগণও তাই আজ চাহেন চাকরিবাকরি ইত্যাদিতে কোনরূপে উচ্চ স্থান দখল করিতে। সেখানে নানা ভাবে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয় হিন্দু শিক্ষিতদের সঙ্গে। অতএব, এই হিন্দু প্রতিযোগীদের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তাঁহারা কতকটা হয়ত ভুল ধারণায়, কতকটা জানিয়া বুঝিয়াও এক অস্ত্র ব্যবহার করিতেছেন—মুসলমান ধর্ম্ম, মুসলমান সংস্কৃতি এই দেশের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি অপেক্ষা স্বতন্ত্র; মুসলমান সমাজের স্বার্থ হিন্দু সমাজের স্বার্থ অপেক্ষা বিভিন্ন। এই কথায় যে-পরিমাণ সত্য আছে, তাহা অপেক্ষা বহুগুণে বেশী আছে মিথ্যা। কিন্তু আওড়াইতে আওড়াইতে তবু হয়ত এই কথাগুলি আজ অনেক শিক্ষিত যুক্তিশীল মুসলমানের নিকটও মিথ্যা ঠেকে না; আর সাধারণ মুসলমানকে ইহা বুঝাইয়া দিতেও তাহাদের বাধে না। এই নিদারুণ বিকৃত মনোভাবের ও বিকৃত অবস্থার বিরুদ্ধে যে দুই-এক জন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মুসলমান দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদের সাহস ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অতুলনীয়। রেজাউল করীম সাহেব তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁহার অক্লান্ত লেখনী স্ব-সমাজের সত্যকার কল্যাণে ও স্বদেশের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলে নিয়োজিত।

এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে তিনি মুসলমান সমাজকে সেই সত্য ও স্থিরপথে আহ্বান করিতেছেন। তিনি চাহেন, মুসলমান স্থিরদৃষ্টি লাভ করুন—সাহিত্য গ্রহণ করিতে শিখুন, সংখ্যার মোহে আম্বেদকরকে দলে না টানিয়া নিজেদের দোষ দূর করুন, ধর্ম্মের নামে ফাঁকি না দিয়া দেখুন সমাজের মধ্যে কোন আর্থিক পার্থক্যের বশে এত অসামঞ্জস্য পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিতেছে; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা আন্দোলন করিয়া উহাকে বিদেশীয় সরকারের কবলে তুলিয়া না দিয়া স্থির বুদ্ধির দ্বারা ও স্বদেশীয় মনোভাবের দ্বারা চালিত হউন; মাদ্রাসা ও মক্তবের শিক্ষার ভারে আর নিজেদের ভারাক্রান্ত করিয়া না রাখুন।

এই যুক্তিনিষ্ঠা ও ঔদার্য্যে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের পথ দেখা যাইতেছে। হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজের জনগণেরই নিকট আমরা এই গ্রন্থের প্রচার কামনা করি।

শ্রী গোপাল হালদার

মৃগয়া—"বনফুল"। রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

মৃগয়া উপন্যাস। হিরণপুর গ্রামের জমিদারবাবুদের মৃগয়া-অভিযান অবলম্বনে রচিত। মৃগয়া-ক্ষেত্রে পঞ্চশরের অবাধ মৃগয়া উপাখ্যানে রসসৃষ্টির আনুকূল্য করিয়াছে। উপন্যাস হইলেও ইহার রচনায় অভিনবত্ব আছে; গ্রন্থখানি গ্রামে, পথে ও প্রান্তরে—এই তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ গদ্যকবিতায়, 'পথে' কাহিনীর আকারে এবং 'প্রান্তরে' নাটকের ভাষায় রচিত। 'গ্রামে' অংশে শিকারের উদ্‌যোগ-পর্ব; তাড়াহুড়া ও ব্যস্ততার মধ্যে অভিযাত্রীরা প্রস্তুত হইতেছেন; গদ্যকবিতার ভাষা এই ব্যস্ততাকে গতিশীল করিয়াছে। পথে প্রত্যেকেরই কথা বলিবার অবসর অল্প, কাজেই পথের কাহিনী বর্ণনার ভার লেখক নিজেই লইয়াছেন। সবশেষে প্রান্তরে সকলকে মিলিত করিয়া প্রত্যেকের মুখে কথা দিয়া তিনি নিজে চুপ করিয়া আছেন।

তিন অংশের মধ্যে রচনানৈপুণ্যে প্রথম অংশই সব চেয়ে সুন্দর হইয়াছে। এই অংশে অল্প কথায় যে-ভাবে লেখক প্রত্যেকটি চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। জমিদারের তিন ভাই, বড়বাবুর মেয়ে উষা, বিলাতফেরত ব্যারিষ্টার জামাই—তাহারই ইচ্ছায় এই শিকারের আয়োজন, উষার কলেজী বন্ধু মীনা তাহাদের বাড়িতে বেড়াইতে আসিয়াছে, আর আসিয়াছে উষার দূরসম্পর্কে আত্মীয় এবং

হৃদয়-সম্পর্কে বন্ধু হীরেন ;– তাছাড়া জমিদার-বাড়ির বৃদ্ধা বিধবা গৃহিণী, তিন ভাইয়ের তিন বউ, বড়বাবুর মোসাহেব লাহিড়ী, ডিস্‌পেপশিয়াগ্রস্ত রোগা নিতাই, খাজনাপ্রপীড়িত তিনু চাটুজ্জে, কল্পনাপ্রবণ হরিশ খুড়ো, তালুকদার মশাই, বাদল ডাক্তার, সরকারী ঠাকুরদা ও তাঁহার সেকেলে গৃহিণী, খুড়ো হরু মণ্ডল, সবজান্তা বীরেন ও তার বেকার বন্ধুর দল, ঝাংরু সর্দার, মোহিনী গোহুম্না, মুহুরী নীলাম্বর দত্ত—সবশুদ্ধ মিলিয়া শ'খানেকের কাছাকাছি। ইঁহাদের সকলকে লইয়া একখানি বিরাট উপন্যাস রচিত হইতে পারিত। কিন্তু লেখক সেদিকে যান নাই। ইঁহাদের গতানুগতিক জীবনে মৃগয়াকে উপলক্ষ্য করিয়া যে ক্ষণিক উত্তেজনা ও আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে জীবনের সেই হঠাৎ-উদ্ভাসিত রূপটিকে লইয়াই তিনি মৃগয়া গড়িয়াছেন। একটি আকস্মিক ঘটনার বিদ্যুৎ-বিকাশে বহু জীবনকে দেখিবার এই ভঙ্গীটি বনফুলের নিজস্ব। চরিত্রচিত্রণে তাঁহার ভাষার যাদুমন্ত্র আলোচ্য গ্রন্থখানিকেও সমৃদ্ধ ও সুখপাঠ্য করিয়াছে।

নিয়তি—শ্রীচারুবালা সরস্বতী। প্রকাশক শ্রীকালীকিংকর মিত্র।° ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ৫৮৯, মূল্য ২।° টাকা।

আকস্মিক প্লেগ রোগে পিতামাতা ও পরিবারের সকলকে হারাইয়া ধনীর অনূঢ়া ও শিক্ষিতা কন্যা নীলা প্রথমে পিতৃবন্ধু ও পরে দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের গৃহে আশ্রিত হইয়া কি ভাবে নিয়তি কর্তৃক বিড়ম্বিত হইতে হইতে অবশেষে জীবনের সাফল্য লাভ করিল তাহারই করুণ-মধুর উপাখ্যান। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে নীলার আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনী মন্দ হয় নাই। অতিরিক্ত মাত্রায় দীর্ঘ হইলেও গল্পরস আছে।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য

ভারতের মুসলমান হিন্দু মা'র সন্তান—শ্রীদিগিন্দ্র-নারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত এবং গৌরাঙ্গ মিশন, মালদহ হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃ. ১৫৪, মূল্য বারো আনা।

গ্রন্থকারের প্রতিপাদ্য বিষয় গ্রন্থের নামকরণেই প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না যে, বর্ত্তমানে ভারতে যে আট কোটি মুসলমান আছেন তাঁহাদের অনেকেরই জননী হিন্দু নারী ছিলেন। আর, এখনও যে হিন্দুনারী মুসলমানের জননী হইতেছেন না, এমন নয়। কখনও কচিৎ বা ভদ্র, সামাজিক উপায়ে তাঁহারা মুসলমানের পত্নী এবং মুসলমান-জননী হইয়া থাকেন, আর, কখনও বা অসামাজিক এবং অশিষ্ট উপায়ে তাঁহারা ঐরূপ হইতে বাধ্য হন। ইতিহাসের এই অধ্যায়টা হিন্দুসমাজের পক্ষে খুব গৌরবের কিনা, ভাবিবার বিষয়।

কিন্তু এই কথাটার উপর জোর দিলেই হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য বাস্তবে পরিণত হইয়া যাইবে না। তাহার কারণ, হিন্দুনারীর গর্ভজাত মুসলমান কখনও নিজেকে হিন্দুসমাজের নিকট ঋণী মনে করে নাই ;— তাহার জননী হইবার আগে তাহার মা'র হিন্দুত্ব ত আর ছিল না!

তথাপি গ্রন্থকারের বক্তব্য বিষয় অসত্য নয়।

নানা প্রকার প্রমাণের সাহায্যে গ্রন্থকার তাঁহার বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহার উদ্দেশ্যও সাধু।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

চামড়ায় কারুশিল্প—শ্রীযতীন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী ; ৫৮-৩, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

কম করিয়া ধরিলেও বাংলাদেশে চামড়ার কাজের প্রচলন হইয়াছে প্রায় বছর দশ-বারো পূর্ব্বে। কিন্তু এই হাতের কাজটির শিক্ষা সম্বন্ধে বাংলায় লেখা বিজ্ঞানসম্মত কোন পূর্ণাঙ্গ পুস্তক আজ পর্য্যন্ত চোখে পড়ে নাই। সে-হিসাবে লেখকের এই চেষ্টার প্রশংসা করিতে হয়।

চামড়ার কারুশিল্পে লেখক শিক্ষালাভ করিয়াছেন শান্তিনিকেতনে, এই শিল্পের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে, সন্দেহ নাই। পুস্তক রচনাকালে সেই শিক্ষা-কেন্দ্রের যোগ্য শিক্ষকদের নিকট ভাল করিয়া উপদেশ লইলে সম্ভবত পুস্তকখানি আরও সুন্দর এবং পরিপাটি হইত।

উপকরণ ও যন্ত্র পরিচয়ের সহিত প্রকরণের অংশ মিশাইয়া দীর্ঘ ছন্দে এক ফর্দ্দ তৈয়ারি করা সমীচীন হয় নাই। পরিচ্ছেদ-বিভাগ এ-সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত পন্থা।

'চামড়া কার্য্যোপযোগী করণ' 'মডেলিং' 'লেস তৈয়ারী করা' 'লেসিং' প্রভৃতি চামড়ার কাজের প্রধান অংশগুলি বুঝাইবার জন্য প্রক্রিয়ামূলক ভাল রেখাচিত্রের একান্ত প্রয়োজন, নতুবা তরুণ শিক্ষানবিশদের নিকট নিছক ভাষার বর্ণনা অন্ধকার থাকিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে টার্ণার প্রভৃতি যে কোন বিলাতী লেখকের পুস্তক দেখিলে লেখকের ধারণা পরিষ্কার হইত। শুধু নিজের কৃত কাজের ফটোর প্রতিলিপি না ছাপাইয়া কিছু প্রক্রিয়া-চিত্রের রেখা-প্রতিলিপি দিলে বইটি সত্যই ছাত্রদের পক্ষে অধিক ব্যবহারোপযোগী হইতে পারিত।

'বাটিক' অংশটি প্রমাদ-দুষ্ট। 'বাটিকের কাজ আর কিছুই নহে কেবল চামড়ার উপর এলোমেলোভাবে সরু সরু রেখাপাত'— বাটিক শিল্পের এই পরিচয় প্রদান শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীর যোগ্য হয় নাই। তাঁহার ইহাও জানা উচিত ছিল যে 'বাটিক' বলি জাভা দ্বীপের শিল্প, জাপানের আদবেই নহে।

পুস্তকের শেষে শিক্ষাপদ্ধতি ও তৎসম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়াতে ইহা স্কুলশিক্ষার উপযোগী হইয়াছে। আটাত্তরটি চিত্র ও পঁয়ষট্টিটি ডিজাইন সম্বলিত এই চামড়ার কারুশিল্প-গ্রন্থখানি বাংলার ছাত্রমহলে সমাদর লাভ করিবে আশা করি।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মুক্তির সন্ধানে ভারত—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। এস. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১২ নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা ; পৃ. ৸৵° + ৪৮৪ + ৪

আলোচ্য গ্রন্থে উনবিংশ শতাব্দী প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনীতিক আন্দোলন এবং কর্ম্মচেষ্টার একটি ধারা-বাহিক ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে। নির্ভুল তথ্যসঙ্কলনের জন্য গ্রন্থকার যে বিশেষ শ্রমস্বীকার করিয়াছেন ইহা পুস্তকের যে-কোনও অধ্যায় পাঠ করিলে জানা যায়। কংগ্রেসের উৎপত্তির পূর্ব্বেও যে বাংলা দেশে রাজনীতিক আন্দোলনের চেষ্টা হইয়াছিল এবং দু-একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল, ইহা অনেকের নিকটেই নূতন সংবাদ বলিয়া বিবেচিত হইবে। বইখানিতে স্বদেশী আন্দোলনের বহুমুখী কর্ম্মধারার বিস্তৃত ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পুস্তকের শেষাংশে ঘটনা-পরম্পরার খুঁটিনাটি বর্ণনা কিছু বেশী হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। রাজনীতিক পরিবর্ত্তনের মূল ধারাগুলির ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে যতটুকু তথ্য প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

পুস্তকখানি ভবিষ্যৎ কালে ঐতিহাসিকগণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে ; বর্ত্তমান কালের পাঠকগণও ইহা হইতে দেশের রাজনীতিক আবহাওয়ার তথ্যবহুল চিত্র লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

মিশর ও প্রাচ্যের পথে—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, আবুল মুজফ্ফর আহমদ বি. সি. এল. (অক্সফোর্ড) বার-এট-ল প্রণীত এবং গ্রন্থকার কর্তৃক ৭নং পার্ক লেন, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। মূল্য প্রতি ভাগ দুই টাকা।

গ্রন্থকার মিশর ও প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া ও নব্যতুরস্ক পরিভ্রমণ করিয়া ঐ সকল স্থানের শিক্ষাদীক্ষা রাজনীতি প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন, তিনি তাহাই এই ভ্রমণকাহিনী দুই ভাগে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সে-সকল দেশে জাতীয়তার উদ্বোধনে যে যুগান্তকর পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে, উন্নতির যুগে যে নূতন ধারা ও নূতন ভাব প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ধর্ম্ম বিষয়ে যে উদারতার ফলে সমগ্র দেশ এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে, লেখক সেই সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয়ের আলোচনা করিতে এই ভ্রমণকাহিনী লিখিয়াছেন। প্রথম ভাগে গ্রন্থকার আধুনিক মিশরের শিক্ষার ধারার ক্রমিক ইতিহাস দিয়া উহার সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষিশিক্ষা ও বাণিজ্যশিক্ষায়, টেকনিক্যাল ও ব্যবসায়মূলক শিক্ষায়, শাসনপ্রণালীগঠনে, নারী-আন্দোলনে এবং যুবকদিগের নৈতিক চরিত্র গঠনে মিশর যে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করিয়াছে তাহা চিত্তাকর্ষক ভাষায় বর্ণনা করিয়া লেখক দেশ-বাসীকে উপহার দিয়াছেন। মিশরের পর প্যালেষ্টাইন ভ্রমণ করিয়া তিনি যে-সকল তথ্য অবগত হইয়াছেন, তাহা সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন; পবিত্র তীর্থ জেরুজালেমের ভৌগোলিক বিবরণ, উদ্ভিজ্জ ও জলবায়ু, প্রাচীন ইতিবৃত্ত, শাসনপ্রণালী, শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতি তিনি এমন চিত্তাকর্ষক ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে ইহাকে আদৌ নীরস ভ্রমণকাহিনী বলা যায় না।

দ্বিতীয় ভাগে গ্রন্থকার সিরিয়া ও নব্যতুরস্ক সম্বন্ধে যে সকল তথ্য অবগত হইয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ে নিজের মতামতও প্রকাশ করিয়াছেন। বাইরুথ ও দামাস্কাসের প্রাকৃতিক পরিচয়, শিক্ষা, সমাজ, বিচার, শাসন প্রভৃতির বিবরণ দিয়া গ্রন্থকার সিরিয়া-কাহিনী শেষ করিয়াছেন। পরে ইস্তাম্বুল ও আঙ্কারা ভ্রমণ করিয়া তিনি নব্যতুরস্কের যে পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই চমকপ্রদ। নব্যতুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা কামাল আতাতুর্কের প্রভাবে শিক্ষা, শাসন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, কৃষ্টি ও সমাজসংস্কারে তুরস্কে যে অপূর্ব্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা গ্রন্থকার বেশ মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা স্থানে স্থানে উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক। ভাষা সরল এবং বর্ণনার ভঙ্গীও সুন্দর। উভয় ভাগেই কয়েকখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হওয়ায় পুস্তকখানি আরও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

ইয়োরোপা—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস। সেন ব্রাদার্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃ. ১৪৯, মূল্য এক টাকা।

লেখকের সঙ্গে যদি আমার পরিচয় না হ'ত তবে 'ইয়োরোপা' প'ড়ে মনে করতুম যে গ্রন্থকার বহুদিন সাহিত্যচর্চা করেছেন, আর বর্তমান বইখানি তাঁর পরিণত বয়সের পরিপক্ব রচনা। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলাপে জানলুম যে এইটিই তাঁর প্রথম উদ্যম, এবং প্রবীণ হ'তে তাঁর এখনও বিস্তর দেরি আছে। অতএব অনুমান করছি—তিনি শুকদেবের মতন পূর্বসংস্কার নিয়ে জন্মেছেন, অথবা শিশুকাল থেকেই মনে মনে হাত পাকিয়েছেন।

'ইয়োরোপা'য় প্রথমেই নজরে পড়ে—ভাষার ঝরঝরে প্রকাশ-ভঙ্গী, যাতে কোনও রকম কৃত্রিমতা মুদ্রাদোষ বা উৎকট মৌলিকতার চেষ্টা নেই। এ ভাষা খাঁটি বাংলা, ইংরেজী ইডিয়মের ভেজালে জাত হারায় নি। অথচ এতে অসাধারণতার লক্ষণ সুস্পষ্ট। লেখক আবশ্যক স্থলে নূতন শব্দ গঠন করেছেন, নূতন ভাবে বাক্যবিন্যাস করেছেন, কিন্তু সে-সমস্তই বাংলা ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে অবিরোধে খাপ খেয়ে গেছে।

বইখানি মামুলী ভ্রমণবৃত্তান্ত নয়। ইয়োরোপের গির্জা মঠ দুর্গ সেতু প্রাসাদ চিত্রশালাদির বর্ণনা এর মুখ্য বিষয় নয়। ইয়োরোপ কত উঁচুতে আর আমরা কত নীচে প'ড়ে আছি এ রকম বিলাপও এতে নেই। লেখক প্রতিদিন কি করেছেন, কেদার-বদরী-যাত্রীর মতন কোন্ কোন্ চটিতে বিশ্রাম করেছেন আর কত বার খিচুড়ি খেয়েছেন—এ রকম বিশ্বস্ত খবরও এতে নেই। লেখকের কৃতিত্ব এই—তিনি ইয়োরোপের যে বৈচিত্র্য দেখে নিজে মুগ্ধ হয়েছেন তার রস লেখার প্রভাবে পাঠকের মনেও সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। ইয়োরোপীয় প্রকৃতির যে রূপ লেখক বাহ্য ও অন্তর দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছেন তা শুধু নিসর্গশোভা নয়, ঐতিহ্য মানবপ্রকৃতি জাতীয় সাধনা সবই তার অন্তর্ভুক্ত। তীর্থযাত্রী স্পেশাল ট্রেনের মতন তিনি পাঠকের টিকি ধরে বিশ দিনে বিলাত ঘুরিয়ে আনেন নি। এই পুস্তকে যে চিত্রপরম্পরা দেখতে পাই তা সংক্ষিপ্ত ও নির্বাচিত, কিন্তু জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী। ইয়োরোপ দর্শনের সৌভাগ্য আমার হয় নি, কিন্তু 'ইয়োরোপা' প'ড়ে মনে হয়েছে মনশ্চক্ষুতে তা দেখছি।

রাজশেখর বসু

জ্ঞানেশ্বরী—অনুবাদক শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী এম-এ বিদ্যাভূষণ, সাহিত্যরত্ন ও শ্রীশঙ্কর গণেশ শার্ঙ্গপাণি। প্রকাশক শ্রীজীবনকিশোর গোস্বামী, ২৪৬ নং নবাবপুর, ঢাকা। মূল্য ১৲

সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র সাধক জ্ঞানদেব বিরচিত শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার বিস্তৃত ব্যাখ্যা জ্ঞানেশ্বরী মহারাষ্ট্র-সাহিত্যের এক বিশিষ্ট সম্পদ্। 'ভাষার নৈপুণ্য, ভাবের গাম্ভীর্য্য, দিব্য অলঙ্কারবিন্যাস, দৃষ্টান্ত-কুশলতা, বর্ণনাচাতুর্য্য, দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি, মনস্তত্ত্ববিদের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, বৈজ্ঞানিকের সত্যানুসন্ধান ও ভাবুক রসিকের রসাস্বাদনপ্রাচুর্য্যে জ্ঞানেশ্বরীর তুলনা জ্ঞানেশ্বরীই।' বাংলা ভাষায় এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া অনুবাদকদ্বয় গীতারসরসিক বাঙালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থে প্রথম ছয় অধ্যায়ে অনুবাদ আছে। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি এইরূপে বাংলায় অনূদিত হইলে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও গৌরব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

দেশের দারিদ্র্য

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

সমগ্র বঙ্গদেশ দেখিলে দারিদ্র্যের চারি কারণ। যথা,—

(১) বৃত্তি-হানি

(২) প্রজা-বৃদ্ধি

(৩) অসত্য-বৃদ্ধি

(৪) সুখেচ্ছা-বৃদ্ধি

পশ্চিম বঙ্গে আরও চারিটি কারণ বর্তমান। যথা,—

(৫) মেলেরিয়া

(৬) ভূমির উর্বরতার হানি

(৭) অনাবৃষ্টি

(৮) অতিবৃষ্টি

এই আট কারণ কাহারও অবিদিত নাই। তথাপি দেশহিতকামীর সর্বদা স্মরণ কর্তব্য। উদাহরণ-বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

(১) বৃত্তি-হানি

বৃত্তি, বর্তন, জীবিকা। প্রাচীন নীতিশাস্ত্রে বার্তা ও কলা, এই দুই ভাগে বৃত্তি বিভক্ত হইয়াছিল। বার্তা প্রকৃতি-জন্য, কলা মানুষ-জন্য। কৃষিকর্ম শ্রেষ্ঠ বার্তা। তদ্দ্বারা বহু লোকের জীবিকা হয়। এই বার্তা পূর্বে ছিল, এখনও আছে। বাণিজ্য আর এক বার্তা। বাণিজ্য এখনও আছে। কিন্তু ধনী বণিকের নিকটে দেশের স্বল্পবিত্ত বণিক পরাজিত। কলিকাতায় ধনবান্ বিদেশী বণিকের একাধিপত্য। তাহাদের পরে ভারতের পশ্চিম দেশীয় বণিকের অধিকার। ছোট ছোট নগরেও ইঁহারা লাভবান্ হইতেছেন। সেই অনুপাতে বাঙ্গালীর বৃত্তিহানি হইয়াছে। গ্রামের আর এক বার্তা, বৃদ্ধিমূলক ঋণদান ছিল। এখনও কিছু কিছু আছে। কিন্তু নূতন আইনের জোরে বার্তাটি মৃতপ্রায় হইয়াছে। অনেক নূতন নূতন বেঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে বটে, অর্থের চলাচল দ্বারা দেশের উপকারও হইতেছে। কিন্তু তাহারা স্বল্পধন গৃহস্থের চিরপ্রচলিত একটি বার্তার হানি করিয়াছে। বেঙ্কে টাকা জমা রাখিতে সকলের সাহস হয় না, এবং যে সে লোক বেঙ্ক হইতে ঋণ পায় না।

আরও অনেক বার্তা ছিল। এখানে দুইটির উল্লেখ করি। বঙ্গ দেশের পূর্ব ভাগে, পশ্চিম ভাগে ও দক্ষিণ ভাগে লবণসমুদ্র। সমুদ্র-জল হইতে লবণ পৃথক করিতে বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। মলঙ্গা নামে এক জাতি লবণ করিত। লক্ষ লক্ষ লোক এই বার্তা দ্বারা বাঁচিয়া থাকিত, শুল্ক দিয়াও সংসার প্রতিপালন করিত। সে কথা এখন নিশার স্বপন হইয়াছে। আমরা কলিকাতায় 'মলঙ্গা লেন' এই নাম শুনিতেছি, আর ছয় পয়সায় এক সের লবণ কিনিতেছি। বহু দূর দেশে যুদ্ধ হইতেছে, বঙ্গদেশে নয়, ভারতবর্ষেও নয়। করকচ লবণ পাইলেও গবাদি বাঁচিত।

এক স্থানের পণ্যদ্রব্য অন্য স্থানে বহন করিয়া লইতে লক্ষ লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল। কোথাও গাড়ী, কোথাও নৌকা,—এই দুই যানের বাহকেরা দেশটিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। এখন বিপুল ধনশালী রেল কোম্পানী ও ষ্টীমার কোম্পানী তাহাদের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে। গ্রাহকের বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে, এবং দূর দেশে অক্লেশে যাতায়াতে দেশ-জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়াছে। এ সব সত্য। কিন্তু যাহারা বৃত্তিহীন হইয়াছে, তাহারা কি করিবে?

বস্ত্র ব্যতীত লজ্জা ও শীত নিবারণ হয় না। কলার মধ্যে বস্ত্র-বয়ন যেমন অত্যাবশ্যক তেমন বিপুল বৃত্তি ছিল। কিন্তু লক্ষ লক্ষ তাঁতী প্রাণত্যাগ করিয়াছে। যাহারা আছে তাহারাও মরিতে বসিয়াছে। হস্ত কলের প্রতিযোগী হইতে পারে না। ধনী বণিকের নিকট দুই পাঁচ শত তাঁতীর সমবায়ও দাঁড়াইতে পারে না। সৌখিন ধুতি শাড়ীর গ্রাহক অল্প। কলই কলের সহিত লড়াই করিতে পারে। কল দুঃখীর প্রতি দৃষ্টি করে না,

আত্মারাম চিন্তা করে না, মানুষকে কল করিয়া ছাড়ে। আমরা কলের চাকায় বদ্ধ হইয়া ঘুরিতেছি। রেলে চড়িতেছি, মোটরে হাওয়া খাইতেছি, ক্ষুদ্র নগরেও বিদ্যুৎ জ্বালিতেছি, রেডিওতে দেশ-বিদেশের গান-বাজনা শুনিতেছি। এই যুগে চরকায় সুতা কাটিতে বলা শোভা পায় না। যাহা একবার লোপ পায় তাহাকে পুনরায় জীবিত করা দুঃসাধ্য।

কর্মকারেরও তাঁতীর দশা উপস্থিত। গ্রামে দুইটা ফাল, পাঁচখানা কাস্তে গড়িয়া তাহার দিনপাত হয় না। ধনী বণিক কোদাল, গাঁতি, ছুরি, কাঁচি, খুর, গজাল, জলুই, কব্জা, চাবি প্রভৃতি যাবতীয় লৌহকর্ম গ্রামের মেলায় ও হাটে পাঠাইতেছে। হাজার হাজার কর্মকার-বংশ নির্মূল হইয়াছে। এমন গ্রাম আছে যাহার দুই ক্রোশের মধ্যে কামার নাই। গ্রামে কামার, কুমার, ধোপা, নাপিত, মুচি 'বলি' (চলিত কথায়, ভোল) পায়। বলির পরিমাণের নাম বিড়া। ধানের আটি দ্বারা বিড়া নির্দ্দিষ্ট হয়। পূর্বকালে যে যত বিড়া পাইত অনেক গ্রামে এখনও তাহাই আছে। কিন্তু বর্তমান কালে তাহাতে কুলায় না। অজন্মার বৎসরে ইহারা কেহ বলি পায় না। সে বৎসর গৃহস্থ মরে, আর তাহার সহায়েরাও মরে।

তেলের কল বসিয়া তৈলিকের বৃত্তি গিয়াছে। ধানের কল অগণ্য দুঃখী নারীকে বার্তাহীন করিয়াছে। এখন আর বাঙ্গালী সৈন্য আবশ্যক হয় না। শৌর্য-প্রকাশের দিন নাই। এই কারণে বহুলোককে পূর্বকালের বৃত্তি ত্যাগ করিতে হইয়াছে। গ্রামে অসংখ্য লোকের কাজ নাই। তাহারা আলস্যে ও নিরানন্দে দিন কাটাইতেছে।

(২) প্রজা-বৃদ্ধি

উপায়ান্তর না পাইয়া বৃত্তিহীন জাতি সকলে ভূমির প্রতি সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিতেছে। যাহারা দশ-পনর বিঘা জমি চষিতে পাইতেছে, তাহারা কায়ক্লেশে বাঁচিয়া আছে। অন্যে দাসত্ব করিতেছে, চাকরির জন্য ছুটাছুটি করিতেছে। কিন্তু ভূমির পরিমাণ বাড়ে নাই, ফলে দারিদ্র্য বাড়িয়াছে।

তদুপরি বৎসর বৎসর প্রজা বাড়িতেছে। পূর্বে যে জমি দুই কোটি, তিন কোটি বাঙ্গালী ভোগ করিত, এখন প্রায় পাঁচ কোটি লোকেরও সেই ভূমি। বঙ্গদেশে কৃষিযোগ্য ভূমি সকলকে বাঁটিয়া দিলে জনপ্রতি দুই বিঘা, আড়াই বিঘার বেশী পড়ে না। এই আড়াই বিঘা জমির দুই বিঘায় মাত্র একটি ফসল, ধান হয়। ধান ফুরাইলে বিস্তীর্ণ মাঠ শূন্য প্রান্তর। দুই বিঘা জমির ধানে একটি লোকের সম্বৎসরের অন্ন-বস্ত্র নির্বাহ হয় না।

মনে পড়িতেছে বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে হের হিটলার দুঃখ করিয়াছিলেন তাঁহার দেশে জার্মানদের বাঁচিয়া থাকিবার ভূমি নাই। ঠিক মনে পড়িতেছে না, বোধ হয় তিনি বলিয়াছিলেন, প্রতি সহস্রে ছয় বর্গ কিলোমিটার মাত্র। অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলের উৎপন্ন দ্রব্যে ৪৩৩ জনকে নির্ভর করিতে হইতেছে। জার্মানী কৃষিপ্রধান দেশ বটে। কিন্তু জার্মান জাতি কেবল কৃষিজীবী নয়। সেদেশে বিজ্ঞান ও যন্ত্র নির্মাণের পরাকাষ্ঠা, ব্যবসায়ে অতুলনীয় সম্পদ, কৃষিকর্মের অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছে। এ সব সত্ত্বেও হের হিটলারের দুঃখের সীমা ছিল না। আর আমরা বঙ্গদেশে প্রতি বর্গমাইলে ছয় শত লোক ঠাসা-ঠাসি করিতেছি। অরণ্য, নদী, খাল, বিল ও পতিত জমি বাদ দিলে আট শতে দাঁড়াইবে। বিনা করে প্রজাদিকে সমানভাবে জমি বিলি করিয়া দিলেও প্রজা-বৃদ্ধিহেতু দারিদ্র্যের বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।*

(৩) অসত্য-বৃদ্ধি

নির্ধনের নানা দোষ। সে ধর্মরক্ষা করিতে পারে না, অসৎ হইয়া পড়ে। খলতা, কপটতা, মাৎসর্য দারিদ্র্যের অবশ্যম্ভাবী ফল। শত বৎসর পূর্বে আদালতে যত মকদ্দমা হইত, বোধ হয় এখন তাহার দশগুণ হইয়াছে।

---

* গত সেন্‌সসে বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা প্রায় ৪ কোটি ৭৬ লক্ষ। কৃষিবিভাগের হিসাবে বঙ্গভূমি প্রায় ৮০ হাজার বর্গ মাইল। কৃষিযোগ্য ভূমি ৫৭ হাজার বর্গমাইল।

এখন কাহারও কথায় বিশ্বাস নাই। লিখিত পাঅতি (প্রাপ্তি) থাকিলেও, রেজিষ্টরি করিয়া লইলেও ঋণ পরিশোধের আশঙ্কা যায় না। দারিদ্র্য হইতে অসত্য-বৃদ্ধি, 'অসত্য-বৃদ্ধি হইতে দারিদ্র্য-বৃদ্ধি, এই কার্য-কারণের চক্র-পরিবর্তনে দুর্দিনের বৃদ্ধি হইয়াছে। "সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা"। কিন্তু সংহতির অনুকূল ক্ষেত্র নাই। গ্রামের লোক মিলিত হইয়া কায়িক পরিশ্রম দ্বারা অনেক কাজ করিতে পারে। এ-কথা কেহ বুঝে না, তাহা নয়। তথাপি সমবায়ে প্রবৃত্ত হয় না কেন? চুরি করে না, মিথ্যা কথা কহে না, এমন লোকের সংহতি 'কার্য-সাধিকা বটে। সাধু নাই এমন নয়। কিন্তু এক চোরে সংহতি ছিন্ন করিয়া ফেলে। এ বিষয়ে উচ্চশিক্ষিত, অল্প-শিক্ষিত, ও অশিক্ষিতের তারতম্য নাই। পূর্বকালেও চুরি ছিল, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক হইয়া চুরির প্রবৃত্তি প্রবল ছিল না। পূর্বকালেও 'আমিষভক্ষণ' ছিল, বাঙ্গালার 'ধুতি খাওয়া' বলিত, কিন্তু উপরি পাওনা ন্যায্য পাওনা হইয়া দাঁড়ায় নাই। পরস্পর বিশ্বাস না থাকিলে ব্যবসায়, বাণিজ্য ও দেশহিতকর কার্যে সমবায় চলে না।

(৪) সুখেচ্ছা-বৃদ্ধি

মানুষ স্বভাবতঃ অলস ও সুখাভিলাষী। ইন্দ্রিয়-সুখ মানুষকে চিরদিনই প্রলুব্ধ করে। আমরা এখন মোটা ভাত, মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট নই। বিভবশালী লোকের অনুকরণে রেলে ও মোটরে চড়িতে চাই, পায়ে হাঁটিতে চাহি না। দুই ক্রোশ অনায়াসে হাঁটিয়া যাইতে পারি, ত্বরারও হেতু নাই, দুই আনা পয়সা দিয়া মোটরে চড়িয়া বসি। এই দরিদ্র ও গ্রাম-প্রায় বাঁকুড়া নগরে প্রায় ৫ হাজার সাইকেল অহরহঃ ছুটিতেছে। বোধ হয় ৫০ জনেরও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আড়াই লক্ষ টাকা বিদেশী কর্মকারের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতায় মোটরের সারি দেখিলে মনে হয় দেশে ধনের সীমা নাই। কিন্তু তখনই মনে পড়ে বিদেশে কত কোটি টাকা চলিয়া যাইতেছে। কলিকাতায় পাড়ায় পাড়ায় সিনেমা আর লোকারণ্য। যদি সিনেমার চিত্রপটে নারীর হাবভাব প্রকাশিত না হইত, তাহা হইলে বোধ হয় এত ভিড় হইত না। নগরে নগরে সিনেমা চলিতেছে, আর দূরদূরান্তর গ্রামের নরনারী দেখিতে ছুটিতেছে। নগরে আসিয়া কত নূতন নূতন বসন-ভূষণ, এনামেল পাত্র, আরও কত কি কিনিয়া লইয়া যাইতেছে। শত পথে পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রামে গ্রামে ব্যাপ্ত হইতেছে আর শত ছিদ্রে কষ্টে উপার্জিত অর্থ বণিকের গৃহে সংগৃহীত হইতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা বহুমূল্য। আমরা উচ্চমূল্যে বিদ্যা ও ন্যায়বিচার কিনিতেছি।

মাগন থাকিলে যোগান হয়, ইহা বাণিজ্যের নীতি। কিন্তু ইন্দ্রিয়সেবার যোগান থাকিলে তদনুপাতে মাগন হয়। চোখের সমুখে মোটর ছুটিতেছে, চড়িবার ইচ্ছা আপনি হয়। পাড়ায় সিনেমা। কত কি চিত্র দেখাইতেছে, চিত্রে গান গাহিতেছে, কথা কহিতেছে। দেখিবার কৌতূহল কার না হয়। ফলে কিন্তু দুঃখীর অর্থ-ব্যয় হইতেছে।

প্রাচীন নীতিবিদেরা লোকস্থিতির বিষয়-সমূহকে ত্রিবর্গে ভাগ করিয়াছিলেন, ধর্ম অর্থ কাম। চাণক্য বলিয়াছেন, ধর্ম সুখের মূল, ধর্মের মূল অর্থ, আর যাহা ধর্ম ও অর্থ পীড়ন না করে, তাহা কাম। "ধর্মেন ধার্যতে লোকঃ।" যদ্দ্বারা লোকস্থিতি হয়,তাহা ধর্ম। নীতিজ্ঞেরা ধর্ম অর্থ কাম, তিনকে সমভাবে সেবন করিতে বলিয়াছেন। অজরামরবৎ অর্থ অর্জন করিবে। কারণ অর্থ ব্যতীত ধর্ম ও কাম হয় না। অর্থ না থাকিলে প্রাণই থাকে না। কিন্তু অর্থ ন্যায়ানুগত হইবে।

(৫) মেলেরিয়া

পশ্চিম বঙ্গের অবস্থা আরও শোচনীয়। ষাটি সত্তর বৎসর ধরিয়া মেলেরিয়া রাক্ষসী লোকের রক্ত শোষণ করিতেছে। বলহীন, উৎসাহহীন, উদ্যমহীন, ধনহীন, বুদ্ধিহীন প্রজা মৃত কি জীবিত বুঝিতে পারা যায় না। তাহারা ভাবিতে পারে না, খাটিতে পারে না। পশ্চিম বঙ্গের যেখানে মেলেরিয়া নাই সেখানকার লোকে, দুঃখী দরিদ্র লোকে দ্বিগুণ কাজ করিতে পারে। পশ্চিম দেশীয় অর্থনীতি মানুষের অর্থ-উপার্জন দিয়া তাহার প্রাণের মূল্য কষে। বলে যে লোক যত দিন শয্যাগত থাকে

তাহার প্রাণের মূল্য তত কমিয়া যায়। সে জড়ভাপন্ন হইয়া বসিয়া থাকিলেও সেই ফল। আর যে কাজ না পাইয়া বসিয়া থাকে তাহার প্রাণের মূল্য কিছুই নাই। মেলেরিয়া দারিদ্র্য-বৃদ্ধির যেমন হেতু, দারিদ্র্যও মেলেরিয়া-প্রকোপের তেমন হেতু। লোকে বলকর ও পুষ্টিকর আহার পাইলে মেলেরিয়া প্রবল হইতে পারিত না।

(৬) ভূমির উর্বরতা-হানি

চাষই যাহাদের একমাত্র জীবিকা, আর যাহাদের ভূমি বন্যামগ্ন হয় না, তাহাদের আর এক সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। বসুন্ধরা শস্যহীনা হইতেছেন। বর্ষার জলে মৃত্তিকা ধুইয়া জমি নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। লোকে বলে পূর্বের মত ফসল আর হয় না। পূর্বে যে জমিতে শুধু গোবর-সার দিলেই প্রচুর ধান ফলিত, এখন তাহাতে খইল না দিলে ধান ফলে না। কিন্তু ইহাতে জমির আয় কমিয়া যাইতেছে।

(৭) অনাবৃষ্টি

বীরভূম হইতে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের উত্তরাংশকে অনিশ্চিত বৃষ্টির দেশ বলা যাইতে পারে। দুই বৎসর অনাবৃষ্টি, তৃতীয় বৎসর সুবৃষ্টি, এইরূপ নিয়ম ধরা যাইতে পারে। এ বৎসর বীরভূম ও বাঁকুড়ায় অন্নকষ্ট হইয়াছে। তদুপরি উচ্চভূমিতে জল দাঁড়ায় না, অন্তঃস্রোতে নিম্নগত জল জোড়ে, ঝোড়ে চলিয়া যায়। এই কারণে সুবৃষ্টির বৎসরেও পূর্ণ ফসল জন্মে না। ভূমি ক্রমশঃ রসহীন হইয়া পড়িয়াছে। লোকে বলে ৬০।৭০ বৎসর পূর্বে যে কুআতে যত হাত দোড়ি লাগিত এখন তত হাতে জল পাওয়া যায় না, দোড়ি বাড়াইতে হইয়াছে।

(৮) অতিবৃষ্টি

মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশ জলা দেশ। বর্ষাকালে নদীগুলি জল বহিয়া গাঙ্গে ফেলিতে পারে না, বানে দেশটি প্লাবিত হয়। এই সে বৎসর ঘাটাল ডুবিয়া গিয়াছিল, এ বৎসর কাঁথি ডুবিয়াছে। ধানই যাহার একমাত্র সম্বল, অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টিতে তাহার হানি হইলে দারিদ্র্যের অবসান হইতে পারে না।

ডাক্তার মেলেরিয়া, যক্ষ্মা, কুষ্ঠরোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারে মগ্ন আছেন। কিন্তু যেখানে দেহ জর্জর, পথ্যের অভাব, সেখানে ঔষধে কি করিবে? একদিন আশ্বিন মাসে প্রাতঃকালে বাঁকুড়ার রাজপথে দাঁড়াইয়া আছি, দেখি দলে দলে সাঁওতাল নারী হাতে ঝুড়ী লইয়া দ্রুতপদে পূর্বাভিমুখে যাইতেছে। সুধাইলাম, "তোঁরা এত সকালে কোথায় যাচ্ছিস, হাতে ঝুড়ী কেন?" "বনে যাচ্ছি।" তাহাদের সময় নাই, আর কিছুই বলিল না। বনে কেন, এত আকুলচিত্তে কেন, অনুসন্ধানে জানিলাম, বনে এক প্রকার বিষাক্ত আলু জন্মে, সেই আলু কুড়াইতে যাইতেছে, যে আগে যাইবে সে পাইবে। এই আলুর চাকা কাটিয়া জলে ধুইয়া ধুইয়া বিষমুক্ত করিয়া সিঝাইয়া খাইবে। আর এক দিন দেখি ঝুড়ীতে বন্য-কচুর পাতা লইয়া যাইতেছে। শুখাইয়া রাখিবে, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ব্যঞ্জন হইবে। এইরূপ কত লোক যে অসার শাগ দ্বারা উদর পূরণ করিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। অন্নবিদেরা বলেন, দৈনিক আহারে এক ছটাক 'প্রোটিন' (যেমন শুষ্ক ছেনা) ও ২৫০০ 'কালোরি' (তাপমান-বিশেষ) থাকা চাই। কিন্তু প্রোটিন দূরে থাক ১০০০ কালোরিও হয় না। আমি পূর্ববঙ্গের অবস্থা সবিশেষ জানি না। কিন্তু পূর্ববঙ্গবাসী এখানকার অবস্থা দেখিয়া বলিয়াছেন, এত দারিদ্র্য পূর্ববঙ্গে নাই। কলিকাতা ও অন্যান্য বড় নগর দেখিয়া গ্রামের দারিদ্র্যের পরিমাণ পাওয়া যায় না।

ফেরিওয়ালা

শ্রীবিশ্বজিৎ সেন

সকাল সবে পা বাড়িয়েছে দিগন্তের পারে…সূর্য্যের বিরাট প্রদীপের পল্‌তেটিতে ধরতে সুরু করেছে আগুন। ঘুম ভেঙে অনেকক্ষণই চুপ ক'রে শুয়েছিলাম রবিবারের দোহাই দিয়ে। কতই ভাবছিলাম,—আকাশ-পাতাল… এলোমেলো; বারান্দার সামনে একখণ্ড আকাশ… নীলিমায় মোড়া…ঝাপসা ভাঙা ভাঙা মেঘরাশি ছড়ান।

"কাগজ হ্যায়"—কাগজওয়ালা কাগজ নিয়ে এসেছে, পরক্ষণেই মেঝেতে কাগজ পড়ার টপ্ ক'রে একটা শব্দ… যেন বিদ্যুৎ আর মেঘের ডাক। তার পর সে ডাকতে ডাকতে চলে যায়,—"আনন্দবাজার……ইস্‌টেস্‌ম্যান্… হিন্দুস্থান-স্ট্যাণ্ডার্ড…জবর খবর…আনন্দবাজার.."

কিছুক্ষণ ভাবি এই কাগজওয়ালা সম্বন্ধে, টিনের একটা ঘর…মিটমিটে গ্যাসের আলো আর টিপটিপে বৃষ্টিতে রাত্রিশেষের তার রূপ…যেন গীতাবসানে তার ভাঙা সুরের রেশ…কাগজওয়ালা, নাম একটা কিছু হবে—অপূর্ব্ব, নাঃ; বিনোদ, নাঃ; শম্ভু, হ্যাঁ, শম্ভুই,…সে বিছানা ছেড়ে উঠল, ঘুমের আবেশ ঝেড়ে ফেলে হাতমুখ ধুয়ে নিল… প্রকাণ্ড ওয়াটার-প্রুফটা গায়ে চড়িয়ে টুপিটা কানের পাশ দিয়ে সারা মুখ প্রায় ঢেকে নিল, আর নিল কাগজ ঢাকার ছোট্ট সবুজ তেরপলটা, ঘরের কোণ থেকে সাইকেলটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে কাগজের কার্য্যালয়ের উদ্দেশে… সারবন্দী কাগজওয়ালার দল যেখানে ব'সে গেছে, সেও সেখানে ব'সে যায়, এক তাড়া কাগজ টেনে নিয়ে যায় গ্রাহকদের বাড়ী বাড়ী…"আজকে জবর খবর ফিন-ল্যাণ্ডের কি হ'ল…একটা জাহাজ ডুবল…"

কাগজ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে হয়ে যায় বেলা…পা ওঠে টন্‌টনিয়ে…শেষ কাগজ ক'টা যে বাড়ীতে দেয়, সেখানে শুনতে হয় অনেক কিছু…কাগজ দিতে আজ দেরি হ'ল কেন…আমরা কাগজ কিনেছি, এ কাগজ নিয়ে যাও ফিরিয়ে…প্রথম ক'টা দিন তো বেশ দিলে, এখন এ রকম সুরু করলে কেন…ইত্যাদি ইত্যাদি। পড়ে-থাকা কাগজগুলো মোড়ের একটা কাগজের আড্ডায় বিক্রি করে; শিখের দোকানে খুরিতে ক'রে একটু চা খেয়ে হিসেব করে—কত আজ বিলনো হ'ল…এই তো এদের জীবন,…সুরহীন, ছন্দোহীন, একাকার ঝঙ্কার…

কতকক্ষণ ভাবি, তার পর মুখহাত ধুয়ে নীচে এসে কাগজটা খুলি, রাস্তা দিয়ে হেঁকে যায়—"আর্য্য বেকারী", "আম চাই, ভাল ল্যাঙড়ে আম।"

মা বলেন, "ভানু, আমওয়ালাকে এক বার ডাক না, লক্ষ্মীটি।" রাস্তায় ছুটতে হয়,—"এই আম?" তার পর দরাদরি—খুব ভাল আম…আজই এসেছে…ডালা খুলেই আনা…কি রকম বড়, বাঃ, বাঃ… আমওয়ালা নিজেই উচ্ছ্বসিত…ও দাগ কিছু নয়, মা, চুপড়ির দাগ…দাম? তা আপনারা যা বলবেন…ঠিক বাত দশটা…পনরো!… সেলাম, সেলাম, বউনিকা বখৎ বলেই না দশটা দিচ্ছি… পারব না…আর কেউ এত সস্তা, এত মিঠা দিক দেখি… চীজ তো দেখতে হবে…সে বকতে বকতে ওঠে। বৌদি ও মা যুগপৎ মন্তব্য করেন, "ডাকাত যেন এরা!"

চীনা কাপড়ওয়ালা ওই মোড় থেকে ডাকে, "কা-আ-পু-উ-ও-ওব্, কাপ্‌ড়া-আ-আ।" ও-পাশের বারান্দা থেকে ভাইপো অপু চীৎকার করে…"চীনাম্যান্, চাঙ্ চুঙ্" চীনার হুঙ্কার আর অপুর খলখল হাসি…

"চাই ঢাকাই শাড়ী, চাই শান্তিপুরী শাড়ী"—কাপড়-ওয়ালা ডেকে যায়। ফেরিওয়ালা-গত-প্রাণ বৌদি সেদিকে লোলুপ দৃষ্টি হেনে বলেন, "আজ বেশ ভাল কাপড় দেখছি কিন্তু, মা।

মা হেসে বলেন, "আজ থাক্।" ফেরিওয়ালার প্রতি বৌদির পক্ষপাতিত্ব, ইঁদুরের প্রতি বিড়ালের পক্ষপাতিত্বের কোনও অংশে কম নয়। কিছুক্ষণ পর আসে আর এক পূব-দেশী মুসলমান আমওয়ালা। "নে স্লান্, মা ঠান্, সব-

কটাই নে স্থান্, ছাওয়ালটা মোর বাসায় ধুকুতে লাগ্‌সে জ্বরে। তারে কেইল্যা আর ঘুরতে নারি।" পাশেই বসেছিলেন আমার এক তরুণ আত্মীয়, মডার্ণ-ডে লিটারেচারের একান্ত ভক্ত, হালফ্যাশানের কেতাদুরস্ত। বললাম, "শুনলেন ?"

"ফুঃ" গভীর অবজ্ঞার সঙ্গে রহস্য ক'রে বললেন তিনি, "জানেন ? কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর পর যে অমাবস্যা আসে, তার দুপর রাত্রে কোনও শেয়াল মরলে সে পরজন্মে ফেরিওলা হয়ে জন্মায় !" যদিও আমি জানি, ফেরিওয়ালারা শেয়ালের চেয়েও ধূর্ত্ত, তবুও এও জানি,—কথাটা নিছক ফেরিওয়ালার মুখ দিয়ে না বেরিয়ে, 'উপন্যাসের কোনও চরিত্রের স্বগত উক্তি যদি হ'ত, তবে তার দুঃখে ভদ্রলোক একেবারে কেঁদেই ফেলতেন, বলতেন, "এমনটি আর হয় না।" আমারও এঁদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে ইচ্ছা হয়, "এমনটি আর হয় না।" চোখের জলের কত অপব্যয়ই না আমরা করি !

"দো দো আনা, চার আনা" গাড়ীটা ঠেলতে ঠেলতে যায়। অপু বলে, "কই কাকা, আমায় তুমি রবারের বল দেবে বলেছিলে," ব'লেই সে আমার উত্তর আধিক্য মনে করে, ডাকল, "এই।" লোকটা ফিরে তাকাতেই বললাম ইসারায়, "না, না।" সে চলে যায় দেখে অপু ফুঁপিয়ে ওঠে, "চলে যায় যে।" আমি বলি, "ওরা ও-রকমই।"

দুপুরবেলা বসেছিলাম পড়বার ঘরে···চারি দিকে বুক-শেলফে ভিড় করে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, ইবসেন, বার্ণাড-শ, মেটারলিঙ্ক আর ইয়েট্‌সের দল তাঁদের অমর কাব্যলোকে। সামনের টেবিলে হাল্কা নীল রঙের রাইটিং প্যাড আর কলমদানীতে অ্যাজল ক'রে রাখা শেফার্স ঝর্ণা-কলম। মনের মধ্যে অনেকগুলো ভাল ভাল কথা জড় হয়েছিল,··· চুনির পাহাড়···সোনালী সন্ধ্যা···রক্তিম গোধূলি···উদাস স্বপ্নপারের রাত্রি···পক্ষিরাজ···সোনার কাঠি···শ্যামল তেপান্তর। ভাষায় সেগুলোকে রং দিতে গিয়ে চেয়ে-ছিলাম আকাশের পানে। দুটো চিল ক্রমাগত পরিক্রমা করছিল ওই গম্বুজওয়ালা বাড়ীটার চারিধার, কখনও চক্রাকারে, কখনও আড়াআড়ি। হঠাৎ পিছনের জামায় টান পড়ল, "কাকা।" জিজ্ঞাসা করলাম, "কি রে ?" "বেহালা।" অপু উত্তর করল; তার পর পরম ঔদাসীন্যের সঙ্গে ও যা বলে গেল, তার অর্থ—নীচে দরজা দিয়ে একজন বেহালাওয়ালা যাচ্ছে, এবং পরহিতায় একটি বেহালা কেনা অবিলম্বেই প্রয়োজন। অতএব আর বিলম্ব করা চলে না। রক্তিম গোধূলির সবটুকু রং মুছে গেল নিঃশেষে, স্বপ্নপারের রাত্রি লুকালো নিশীথ-নিদ্রার আড়ালে···মিষ্টি কথাগুলো কোন্ রন্ধ্রপথে মন থেকে অন্তর্দ্ধান করল, যেমন নাকি ফোলানো বেলুনের গায়ে পিন ফুটালে সবটুকু হাওয়া হুস্ ক'রে বেরিয়ে যায়। আইসক্রীমওলা যায় পথ দিয়ে, তাকে ডাকি; কিছু বলবার আগেই সে বলে চলে, "কয়টা দেব ?···কি নেবেন ? মিল্ক-ম্যাঙ্গো, অরেঞ্জ···" দুটো কিনি। মনে হয়, পথ চলতে চলতে রৌদ্রে যখন জিব আসে শুকিয়ে, কিংবা বাড়ীতে ব'সে ব'সে যখন হাঁপিয়ে উঠি, তখন কি ক'রে ফেরিওয়ালার আবির্ভাব হয় তার আক কি লেবু কি বরফ নিয়ে, তা এখনও আমার জ্ঞানের অগোচর ! বাজে কাগজ ফেলার ঝুড়ির সঙ্গে বরং ওদের কতকটা তুলনা চলতে পারে। পকেটে যখন কয়েকটা তামার পয়সা থাকে, তখন দু-একটা ক'রে ফেরিওয়ালার কাছে খরচ করতে পারি···কিছু হিসাব করলে দেখা যাবে সেগুলো একসঙ্গে একটা রজতমুদ্রার সমান। ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটেও আমরা কত মূল্যবান্ কাগজই না ফেলে দিই।

"বাসন চাই গো" ব'লে পুরনো কাপড় মাথায় একটি মেয়ে ডেকে যায়। পাশের তারা রোডের সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে 'বর্ত্তনওয়ালা'র কাঁসা ঝনঝনিয়ে আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে।

বিকেলে বার হচ্ছি বন্ধু টুটুর বাড়ী যাব বলে। হঠাৎ বৌদি ঘরে ঢুকে বললেন, "দুটো টাকা দিতে পার ঠাকুরপো ?" "হঠাৎ টাকা ?" বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করি। ভদ্রমহিলা একটি জামা কিনবেন,—অতি সুন্দর জামা, দামও নাকি আশাতীত সস্তা। দেখতে চাইলাম সেই অপূর্ব্ব জামাটিকে। সত্যই অবাক্ হলাম—কাক, চিল, ভেড়া, মানুষ, গাড়ী, পাহাড়, চাঁদ, গাছ প্রভৃতি তাবৎ সৃষ্টির যাবৎ বস্তু সবই এই ক্ষুদ্র জামাটির

মধ্যে বর্ত্তমান। জামাটি পরলে বোধ হয় বক্ষে বসুধা-ধারণের পুণ্যসঞ্চয় হবে। দাম শুনে বিস্ময়ের মাত্রা আরও কয়েক ডিগ্রি বেড়ে গেল ··নেহাতই চার-ছয় আনা মার্কা জাপানী ছিটের জামা, যার জাত নেই পোষাকের বাজারে···তারই দাম দু-টাকা বার আনা! কি আর করি, জামাটিকে বহু কষ্টে নিলাম দু-টাকা চার আনায়। সারাটা পথ ভাবতে ভাবতে চললাম টাকাটার কথা··· ন্যায্য মূল্য কোনও মতেই পাঁচ সিকার বেশী হওয়া উচিত নয়—আমারই টাকা আমারই সামনে নিয়ে গেল চুরি ক'রে! অথচ কাউকেই এ কথা বলা যায় না—অনুদ্দিষ্ট চোরের বদলে আমাকেই উপদেশ দিয়ে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলবেন। হায় বিধাতা!

টুটুর বাড়ী ঢুকতেই দেখি সারা রাস্তা জুড়ে একটা লোক ছড়িয়ে নিয়ে বসেছে—তার লেস্, ফিতে, রিবন, টিপ, ডল, ইত্যাদি যাবতীয় সরঞ্জাম। চারি দিকে তার মেয়েদের ভিড়, কারও লক্ষ্য সেপটি-পিনে, কেউ চায় টিপ ···ছোট খোকার দৃষ্টি পুতুল। টুটুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি লেকের দিকে। কৃষ্ণ সেজে কয়েক জন লোক দেখি দাঁতের মাজন বিক্রি করছে। চীনাবাদাম, ওদেরই সগোত্র বস্তু নিয়ে এক জন ফেরিওয়ালাকে দেখি পথে··· তাকে ঘিরে শিশুর ভিড়। তার পসরার লোভনীয় বস্তুগুলি পড়ছে শিশুদের হাতে···প্রাপ্তদান বালকদলের মুখে উৎসাহের হাসি। সন্ধ্যার অস্তসূর্য্যরশ্মিচ্ছটা পড়েছে ওদের সারা গায়ে ছড়িয়ে···মনে একটা ভাব জাগল···ওর মুখখানা যেন চেনা চেনা···কোথায় দেখেছি পূজার পটে আঁকা গৌরাঙ্গের মুখ···না—ক্রুসবিদ্ধ যিশুর মুখের প্রেমময়তার আদল! ভাবলাম দেবপুরুষের সঙ্গে উপমিত হয়ে ওর জীবনটা বোধ হয় সার্থক হ'ল, কিংবা কে জানে, হয়ত সেই অতি-মানবরাই হয়ত ধন্য হলেন, সামান্য ফেরিওয়ালার মধ্যে মূর্ত্তি গ্রহণ করে। আমি বললাম, "টুটু, ফেরিওলার দৌরাত্ম্যে আর বাস করা চলে না। দিন আরম্ভ হবার সঙ্গে, 'আনন্দ-বাজার' আর রাত বারোটার সময়ও 'কুলপী-ই বরো-ও-প্।' স্বর এদের নিশির ডাকের চেয়েও ভয়ঙ্কর, শ্যামের বাঁশীর চেয়েও তীব্র।" শুনি "অবাক্-জলপান"-ওয়ালা বলছে···"বাবুদের জন্যে আনা,···কাশী হ'তে মটর আনা···দিল্লী হ'তে পেঁয়াজ আনা···"

"হকার· নিতান্তই হকার," টুটু বলে, "পথে ঘাটে এরা,···বিশেষত্ব নেই কিছুই। এদের নিয়ে চলে না কাব্যসৃষ্টি, রামধনুর বর্ণলিপি নেই এদের জীবনে ···যেন পথ চলতে ঘাসের ফুল, কি শ্যাওলা ছাতা, কিংবা বুনো আসশ্যাওড়ার ঝোপ···পথিকের দৃষ্টি এড়িয়ে থাকে বুকের মধ্যে মধুসঞ্চয় নিয়ে। জীবন ওদের বেশ আনন্দময় ভ্রাম্যমাণ জিপ্‌সী প্যাটার্ণের। জীবনে ওদের ছন্দ আছে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে তা মেলে না···বুনো ঘোড়ার মত ওদের ছন্দ কেবলই রাশ ছিঁড়ে চলতে চায়, আর ভাঙার মধ্যে ওরা তা সৃষ্টি করে। সে ওদের নিজস্ব ঘূর্ণি-হাওয়ার ছন্দ, তরঙ্গসঙ্কুল আটলাণ্টিক-এর নাচের ছন্দ···অধীর···মত্ত···ফেনিল···।

"আজকে দোলের দিনে ওরা হয়ত বাসা বেঁধেছে নবদ্বীপে, কিন্তু রথের দিনে হয়ত দেখা যাবে ওদের শ্রীরাম-পুরের মেলায়···আজ এদের কাছে আছে খেলনা, রং আর পিচকারী, সেদিনও এদেরই কাছে থাকবে সুচ, সেফ্‌টি পিন, কাঁচপোকার টিপ, কাঁচের চুড়ি, বাসন, আরও কত কি! এমনই ক'রেই চলে ওদের ভাঙাগড়ার খেলা।"

আমি হঠাৎ বলে উঠি, "আচ্ছা, এদের মধ্যে কার জীবন সবচেয়ে কষ্টের তোমার মনে হয়?"

টুটু বলে, "কাগজ-ওলা?"

আমি বলি, "না বোধ হয়, ওই 'দেশীছিট কাপ্‌ড়ে'-ওলার; বেলা দশটা, সাড়ে দশটায় হয় ওদের পথচলার সুরু। এ পাড়া থেকে ও পাড়া, এ রাস্তা থেকে ও রাস্তা, দুপুর রোদে কিংবা ঝড়-জলে কাপড়গুলো ঢাকা দিয়ে চলেছে হেঁটে। ওই ভারী বোঝাটা একবার এ-কাঁধ থেকে ও-কাঁধ, হয়ত কোনও রোয়াকে বোঝাটা রেখে জিরোয়। দিনান্তে পথশ্রমে ক্লান্ত ওদের হয়ত হয় পথচলার শেষ।"

টুটু বলে, "তা বলতে গেলে, সকলের জীবনই কষ্টের। মোটের উপর ফেরিওলা-জীবনের অনেকখানি আজও পর্দার আড়ালে রয়ে গেছে। বর্ত্তমান সাহিত্যের যাঁরা রথী তাঁরা এখনও তাঁদের অভিযান সুরু করতে পারেন নি ওদের জীবন-পথে। তাই ওদের নিয়ে চিন্তা করা চলে, কল্পনা করা চলে, কারণ এখনও ক্রিটিকের সমালোচনা আর দরদী পাঠকের অশ্রুতে ওদের জীবন-পাত্র ভরে ওঠে নি। কিন্তু এমন এক দিন আসবে, যেদিন সাহিত্যিকের দল নামিয়ে আনবে ওদের অজ্ঞাতলোক থেকে সাহিত্যের আসরে। পাতায়-পাতায় ওদের দিনগুলি হর্ষ ও ব্যথার রঙীন স্বপ্নে বাষ্পীভূত হয়ে উঠবে, ওদের নিয়ে রচিত হবে কত কাহিনী···"

আমাকে রসভঙ্গ ক'রে বলতে হ'ল, "থাম টুটু, সেই অনাগত দিনের কথা স্মরণ ক'রেই তোমার প্রথম গান রচনা ক'রে যাবে নাকি? আলো অনেকক্ষণ জ্বলে গেছে, বাড়ী যাবার কথা ভুলেই গেলে?"

"তাইত, চল, চল।"

পথে যেতে যেতে শুনি,—"আলু নারকোলের ঘুগনি··"

গুজরাটের দোহাদ তালুকে প্রসিদ্ধ [illegible]জন-হিতৈষী শ্রীযুক্ত ঠক্কর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভীল-সেবামণ্ডল ও আশ্রমের দৃশ্য

ভীল রমণীগণ
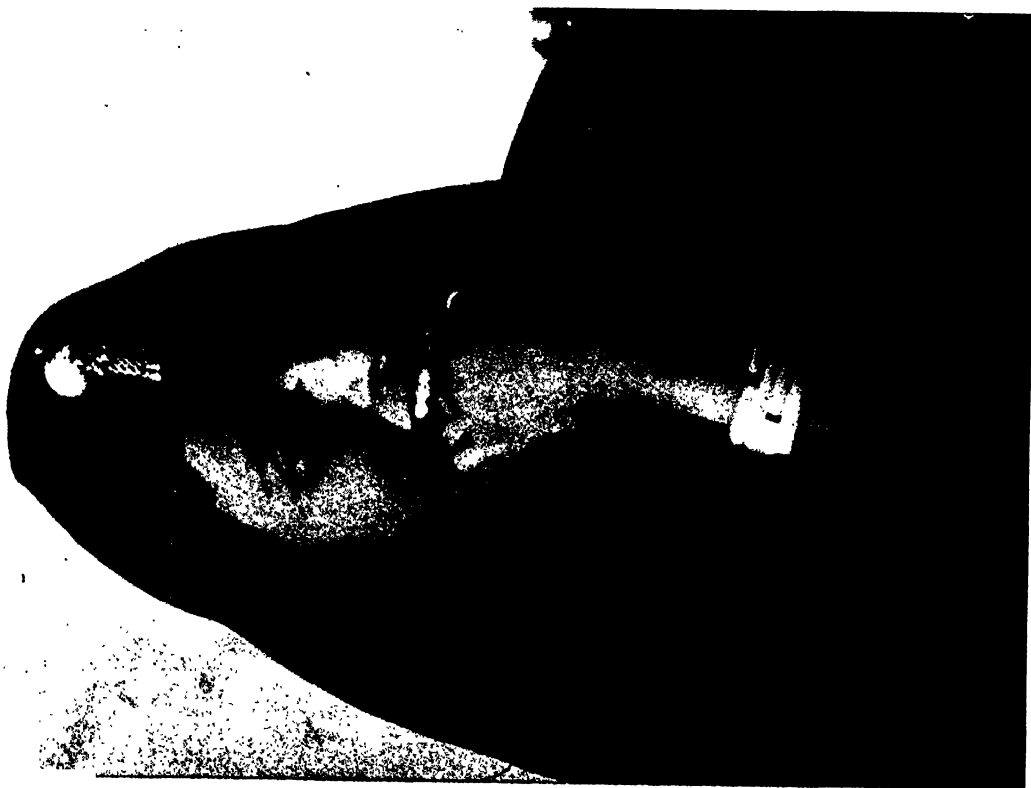
বঙ্গের বাহিরে বাঙালী বেদাচার্য্য

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

প্রাচীনকালের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তখনকার দিনেও বাংলা দেশের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে বেদ-প্রচার ছিল। তাই সেই যুগে বাংলার বাহিরেও বাঙালী আচার্য্যদের বেদচর্চ্চার জন্য সমাদর ও সম্মান কম ছিল না। এই সব কারণে মনে হয় আদিশূর রাজার পঞ্চ বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়নের কি কোনো প্রয়োজন ছিল? বাংলার বৈদিকেরা তো বলেন তাঁহারা রাজা শ্যামল বর্ম্মার আনীত। কেহ কেহ বলেন পাল রাজাদের সময় বাংলায় বেদচর্চ্চা নানা ভাবে উৎপীড়িত হইয়াছিল তাই দলে দলে বাঙালী বেদজ্ঞ পণ্ডিত দেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাম্রশাসন শিলালেখ প্রভৃতি প্রমাণ দৃষ্টে মনে হয় বৌদ্ধ পাল-রাজারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের প্রভূত ভাবে সমাদর করিতেন। বৈদিক আচার্য্যদের তাঁহারা যথেষ্ট ভূমি প্রভৃতি দান করিয়াছেন। বৈদিক বিদ্যার উন্নতির জন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের বসতি স্থান "আনন্দযুক্ত" নামক অগ্রহারেরও উল্লেখ পাল-রাজা দ্বিতীয় গোপালদেবের জাজিলপাড়া তাম্রশাসনে পাই (২২শ পংক্তি) (ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৪৪ পৃঃ ২৬৭)।

রাষ্ট্রকূট রাজা পঞ্চম গোবিন্দ অর্থাৎ সুবর্ণবর্ষ ৯৩৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রাবণ পূর্ণিমা শুক্রবারে একটি তাম্রশাসনের দ্বারা মহারাষ্ট্র দেশে কেশব দীক্ষিত নামক এক জন বাজিকাণ্ব শাখাধ্যায়ী পণ্ডিতকে লোহগ্রাম নামে একটি গ্রাম দান করেন। পুণার দক্ষিণে সাতারা জেলায় সাংলীতে এক ব্রাহ্মণের কাছে এই শাসনখানি পাওয়া যাওয়াতে ইহার নাম হইয়াছে সাংলীশাসন। ইহাতে গ্রহীতার পরিচয়ে দেখি—

> পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর বিনির্গত কৌশিক গোত্র বাজিকাণ্ব সব্রহ্মচারি-দামোদরভট্টসুতায় কেশবদীক্ষিতায় (পংক্তি ৪৬-৪৮)
>
> (Indian Antiq., Sept. 1883 p. 251)

কাজেই বুঝা যায় পুণ্ড্রবর্দ্ধনের বেদাচার্য্যরা বেদবিদ্যায় বিখ্যাত মহারাষ্ট্র কর্ণাট প্রভৃতি দেশেও কিরূপ সমাদর লাভ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ প্রদেশে কোলাগাল্লুরে একটি তাম্রশাসন পাওয়া যায়? তাহাতে দেখা যায় রাষ্ট্রকূটরাজ খোত্তিগে "গৌড়-চূড়ামণিগুণী" "তড়া-গ্রামোদ্ভব" বরেন্দ্র-দেশোজ্জ্বলকারী (বরেন্দ্র্যদ্যোতকারিণা) বিদ্বান্ গৌড়চূড়ামণি গুণী গদাধর নামক গৌড়দেশীয় ব্রাহ্মণকে ৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শাসনের দ্বারা ভূ-সম্পত্তি দান করিতেছেন।

(. Indica, XXI, p. 264)

উড়িষ্যায় বৈদিক ব্রাহ্মণদের পূর্ব্বপুরুষরা দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ হইতে গিয়া সেই দেশে বসবাস করেন (E. R. E, , 566) তাঁহাদেরই কেহ কেহ পরে উৎকল ত্যাগ করিয়া পুনরায় বাংলা দেশে বসবাস করেন। এই ভাবেই শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্ব্বপুরুষ শ্রীহট্ট জেলায় গিয়া বাস করেন। ইঁহাদের মধ্যে উপেন্দ্র মিশ্রের সাত পুত্র, কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্বেশ্বর, জগন্নাথ, জনার্দ্দন, ত্রৈলোক্যনাথ। গঙ্গার তীরে বাস করিবার জন্য জগন্নাথ নদীয়ায় আসেন। তাঁহার পুত্রই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। মহাপ্রভুর বড় ভাই বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া শঙ্করাচার্য্য নাম গ্রহণ করেন ও বোম্বাই প্রদেশে পাণ্ডরপুরে দেহত্যাগ করেন; মহাপ্রভু যে আবার জগন্নাথধামে বাস করেন তাহাতে তাঁহার পুরাতন উৎকলভূমির প্রতি আকর্ষণই সূচিত হয়।

উৎকল-প্রবাসী বাঙালী পণ্ডিতদের কথায় রাঢ় দেশের সিদ্ধল গ্রামবাসী ভট্ট ভবদেবের নাম পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেব মন্দিরলগ্ন একখানি শিলা-লেখে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। জেনারাল ইুয়ার্ট শিলাখানি কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটিতে আনিয়াছিলেন। পরে তাহা সেই মন্দিরে ফিরাইয়া দিতে হয়। এখন তাহা মন্দিরে গাঁথা হইয়া আছে। ভবদেব ছিলেন

ব্রহ্মদ্বৈতদর্শনে মহাপণ্ডিত। সিদ্ধান্ত-তন্ত্র গণিতশাস্ত্রে ফল-সংহিতায় ও হোরাশাস্ত্র রচনায় তিনি ছিলেন বরাহতুল্য। অর্থশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ অস্ত্রবেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে নিপুণ ভবদেব মীমাংসা শাস্ত্রের ও স্মৃতির যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন আজও উৎকলে তাহা প্রামাণ্য। ভট্ট কুমারিলের একটি গ্রন্থ তাঁহার রচিত। বালবলভীভুজঙ্গ ভবদেবই ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেব মন্দির রচনা করান ও সেখানকার বিখ্যাত সরোবর খনন করান।*

এই ভবদেব রচিত পূর্ব্বমীমাংসার একখানি গ্রন্থ সম্প্রতি কাশীর গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত-বর মঙ্গলদেব শাস্ত্রী সম্পাদন করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানা সরস্বতীভবন গ্রন্থমালার অন্তর্গত। গ্রন্থখানির নাম "তৌতাতিতমততিলকম্"। গ্রন্থখানার প্রথম অধ্যায় পর্য্যন্ত মুদ্রিত আমাদের হস্তগত হইয়াছে। অধ্যায়-শেষে গ্রন্থপরিচয়ে দেখা যায়—"বালবলভীভুজঙ্গাপরনাম্নো মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীভবদেবস্য কৃতৌ তৌতাতিমততিলকে নামধেয়পাদঃ সমাপ্তঃ।"

এই গ্রন্থখানির টীকা করিয়াছেন দক্ষিণ-ভারতের চিন্ন-স্বামী শাস্ত্রী ও পট্টাভিরাম শাস্ত্রী।

তুতাতিত হইল ভট্টকুমারিলেরই এক নাম। কাজেই "তৌতাতিত" নামের দ্বারা কুমারিল-মতেরই পোষকতা এই গ্রন্থে করা হইয়াছে তাহা বুঝা যায়। গ্রন্থখানির ভাষা, বিচার ও সিদ্ধান্ত স্থাপনের প্রণালী অতিশয় চমৎকার।

তখনকার দিনে বহু বাঙালী পণ্ডিত কাশীতে বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য মহনীয়-কীর্ত্তি শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতীর নাম। তিনি ছিলেন ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনসিয়া-গ্রামবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণ। তাঁহার গ্রন্থগুলিতে যেমন গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনই তাঁহার ভাষা ও বিচারপ্রণালী অপূর্ব্ব। তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যাও বিস্তর। তাঁহার রচিত অদ্বৈতসিদ্ধি, অদ্বৈতরত্নরক্ষণ, সিদ্ধান্তবিন্দু, গূঢ়ার্থদীপিকা, সংক্ষেপশারীরকব্যাখ্যা, বেদান্তকল্পলতিকা প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার গভীর বেদ-উপনিষদের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

মহাভারতের বিখ্যাত টীকাকার অর্জ্জুন মিশ্র বাংলার বাহিরে সুপরিচিত। তিনি বারেন্দ্র চম্পাহেটী গ্রামবাসী। সংহিতা উপনিষদের শাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল।

বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদ বাংলা দেশ ছাড়িয়া কাশীতে গিয়া বাস করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইনি অদ্বৈতমকরন্দের টীকা রচনা করেন। তাহাতে উপনিষদাদি শ্রুতিশাস্ত্রে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাসুদেব সার্ব্বভৌমও অদ্বৈতমকরন্দের টীকা রচনা করেন। রঘুনাথ শিরোমণি লেখেন শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ড-খাদ্যের টীকা। ইঁহাদের লেখাতে প্রগাঢ় শ্রৌতজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

গৌড় পূর্ণানন্দ কবিচক্রবর্ত্তীর তত্ত্বমুক্তাবলী ও মায়াবাদশতদূষণীতেও গভীর শ্রৌতজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থাংশে ১৪শ শতাব্দীর সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে উদ্ধৃত হইয়াছে।

তাঁহারই সমসাময়িক গৌড় ব্রহ্মানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধি ও সিদ্ধান্তবিন্দুর উপর চমৎকার টীকা লেখেন। তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থ অদ্বৈতসিদ্ধান্ত-বিদ্যোতন। তিনিও বেদবিদ্যায় গভীর পণ্ডিত ছিলেন।

অদ্বৈতসিদ্ধি রচয়িতা শ্রীধরের বাসস্থান ছিল বর্দ্ধমান জেলার ভূরসুঠ গ্রামে।

আসীদ্ দক্ষিণ রাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্ম্মণাম্।
ভূরিসৃষ্টি রিতিগ্রামো* ভূরি শ্রেষ্ঠিজনাশ্রয়ঃ।

---

* উড়িষ্যার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৃন্দাবননাথ শর্ম্মা কিছুদিন পূর্ব্বে দেওগড় হইতে আমাকে এক পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে এই বিষয়ে বাঙালী পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত তিনি স্বীকার করেন না। ভবদেব নিজ দেশে সরোবর খনন করান এবং সেই কথার উল্লেখ-যুক্ত শিলাখানি ঘটনাক্রমে ভুবনেশ্বর মন্দিরে যুক্ত হয়। উড়িষ্যাতে ভবদেবের স্মার্ত্তবিধানের প্রভাবও তিনি মানেন না। তাঁহার মতে বাঙালী পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে উড়িষ্যার প্রতি অবিচার করিয়াছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে এই ভবদেব এবং জীব দেবাচার্য্যের ভক্তিভাগবত মহাকাব্যে উল্লিখিত ভবদেব এক ব্যক্তি নহেন।

* এই ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রামের কৃষ্ণ মিশ্র একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রবোধচন্দ্রোদয় রচনা করেন—

গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়া পুরী।
ভূরিশ্রেষ্ঠক নাম ধাম পরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা।
(প্রবোধচন্দ্রোদয়, ২য় অঙ্ক, ৭)

(প্রশস্ত পাদভাষ্যেশ্রীধরকৃত ন্যায় কন্দলী টীকার সমাপ্তি বচনে)

বাংলা দেশে ও মান্দ্রাজে নানা গ্রন্থালয়ে বঙ্গাক্ষরে লেখা বহু উপনিষৎ ও টীকাপুঁথি সংগৃহীত আছে। বেদান্ততত্ত্ব-মঞ্জরী নামে বঙ্গাক্ষরে লেখা পুঁথি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মেদিনীপুর জেলায় পাইয়াছেন।

রাজা মহীপাল দেবের বাণগড় লিপিতে দেখা যায় যে তখন মীমাংসাশাস্ত্রের আলোচনা বাংলা দেশে রীতিমত ছিল—

"মীমাংসা ব্যাকরণ তর্কবিদ্যাবিদে" ইত্যাদি।

অনেকের মতে শালিকনাথ বাঙালী। তবে সপ্তম শতাব্দীতেই মীমাংসা-দর্শনের প্রচার বাংলায় ছিল।

লক্ষ্মণ সেনের সভাষদ্ হলায়ুধ মীমাংসাসর্ব্বস্ব লেখেন।

এই সব বাঙালী পণ্ডিতেরা বাংলা দেশের বাহিরেও পূজিত এবং সম্মানিত হইতেন। বাংলা দেশের বাহিরেও ইঁহাদের সব সিদ্ধান্ত সমাদৃত হইত।

১৩৪৪ সালের আশ্বিন মাসের ভারতবর্ষ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ দেখাইয়াছেন যে মুক্তাবস্ত নামে বেদবিদ্যার জন্য প্রখ্যাত গ্রাম ছিল বরেন্দ্র দেশে।

মধ্য-ভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত পিপলিয়া নগর নামক স্থানে প্রাপ্ত পরমাররাজ অর্জ্জুনবর্ম্মদেবের ১২১১ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত তাম্রশাসনে মুক্তাবস্তুর ব্রাহ্মণদের উল্লেখ আছে।

(J. A. S. B., V. p., 378)

ভূপালে প্রাপ্ত অর্জ্জুনবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনে দেখা যায় মুক্তাবস্তুবিনির্গত ব্রাহ্মণস্তে দান করিবার জন্যই ১২১৩ খ্রীষ্টাব্দে শাসনখানি রাজা সম্পাদন করাইয়াছেন।

(Journal of the American Oriental Society, VII, p 32)

এই মুক্তাবস্তুই বুন্দেলখণ্ডের চরখরি রাজ্যে প্রাপ্ত চন্দেলরাজ পরমর্দ্দিদেবের ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত তাম্রশাসনে মুতাউথ বা সুতাউথ নামে অভিহিত হইয়াছে।

সুতাউথ ভট্টাগ্রহার বিনির্গতেভ্যঃ......ছান্দোগ্য শাখাধ্যায়িভ্যঃ......ইত্যাদি (Ep. India, XX., পৃঃ ১৩০)

উড়িষ্যার মহারাজ বিনীততুঙ্গদেবপ্রদত্ত তালচের তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

পুণ্ডবরম বিনির্গত...অথাবস্ত বিনির্গত...ইতাদি

(Archeological survey of Mayurbhanj appendix, p 156)

এই পুণ্ডবরমই পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও অথাবস্তই মুক্তাবস্তুর বিকৃত রূপ।

উড়িষ্যা তালচেরে প্রাপ্ত গয়াড়তুঙ্গদেবের তাম্রশাসনে লিখিত আছে।

বরেন্দ্র মণ্ডলে মুখাউধ ভট্টগ্রাম বিনির্গত
যজুর্বেদাচরণকণ্বশাখাধ্যায়িনে ইত্যাদি। ঐ ১৫৩ পৃঃ।

এখানে মুখাউধ ঐ মুক্তাবস্তু।

মধ্যপ্রদেশে নিমার জেলায় নর্ম্মদাগর্ভে মান্ধাতাদ্বীপে-স্থিত সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের নিকটে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে দেবপালদেবের সম্পাদিত একটি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। শাসনটি ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত। Epigraphica Indicaর নবম খণ্ডে (১০৩ পৃ.) কীলহর্ণ সাহেব ইহার পরিচয় দেন।

এই শাসনখানিতে দেখা যায় রাজা যে ভূমিদান করিতেছেন তাহার আয়ের ৩২½টি বণ্টক বা ভাগ হইবে। তাহার মধ্যে এক জন ২ ভাগ, দুই জন প্রত্যেকে ১½ ভাগ, তিন জন প্রত্যেকে অর্দ্ধ ভাগ, ছাব্বিশ জন প্রত্যেকে ১ ভাগ পাইবেন। তাহার মধ্যে মুতাবথুস্থান বিনির্গত... আশ্বলায়ন শাখাধ্যায়ী...নারায়ণ শর্ম্মা এক ভাগ (৩৪-৩৬ পংক্তি), মুতাবথুস্থানবিনির্গত মাধ্যন্দিনশাখাধ্যায়ী গদাধর শর্ম্মা অর্দ্ধ ভাগ, ও উদঙ্গ শর্ম্মা অর্দ্ধ ভাগ পাইবেন (৪৭-৫০ পংক্তি)।

এই মুতাবথুকে কীলহর্ণ সাহেব অর্জ্জুন বর্ম্মার তিনটি শাসনে উল্লিখিত মুক্তাবস্তুস্থান বলিয়াই মনে করেন।

এই তাম্রশাসনটির রচয়িতা রাজগুরু মদন। পিপড়িয়ায় প্রাপ্ত অর্জ্জুন বর্ম্মদেবের পূর্ব্বোক্ত তাম্রশাসন ও ভূপালে প্রাপ্ত অর্জ্জুন বর্ম্মদেবের তাম্রশাসনও তাঁহারই রচনা। তিনিই অর্জ্জুনদেবের গুরু। এই রাজগুরু মদন ছিলেন গৌড়দেশবাসী।

"গৌড়ান্বয় গঙ্গাপুলিনরাজহংস" মদনের একটু পরিচয় লওয়া যাউক।

মালবের পরমার-বংশীয় রাজাদের পুরাতন রাজধানী ছিল ধারানগরে। এই ধারানগরে কমালমৌলা মসজিদের মেহরাবের উত্তর দিকে একখানি কৃষ্ণবর্ণ শিলা প্রাচীরে লগ্ন ছিল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সেই শিলাখানি দেওয়াল হইতে খসিয়া পড়িলে দেখা যায় তাহার ভিতরের দিকে রাজা অর্জ্জুন বর্ম্মার ৮২ পংক্তি দীর্ঘ প্রশস্তি লেখা। লেখা দেখা যায় এমন ভাবে শিলাখানি এখন মসজিদে লাগান হইয়াছে।

এই শিলাপ্রশস্তিতে সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষা প্রযুক্ত হইয়াছে। ৭৬টি শ্লোক ইহাতে আছে তাঁহা ছাড়া গদ্য লেখা। বিজয়শ্রী বা পারিজাতমঞ্জরী নামে একখানা অপরিচিতপূর্ব্ব চতুরঙ্ক নাটকের প্রথম দুইটি অঙ্ক ইহাতে লিখিত। এই নাটকের লেখক রাজগুরু মদন। মদনের পূর্ব্ব নিবাস গৌড় বঙ্গদেশে। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন গঙ্গাধর। ধারানগরের বসন্তোৎসবে এই নাটকখানি প্রথম অভিনীত হয়। দুইখানি শিলাতে নাটকটি পূর্ণভাবে লিখিত হইয়াছিল। একখানি ঘটনাক্রমে অধিগত হওয়ায় নাটকের দুই অঙ্ক পাওয়া গেল। আর একখানি শিলাতে যে বাকী দুই অঙ্ক লিখিত আছে সেই শিলাখানির কি গতি হইল কে জানে?

এই প্রশস্তিটির প্রথমেই পাই মহারাজ অর্জ্জুন বর্ম্মদেবের নাম। তাঁহার প্রদত্ত ১২১১, ১২১৩, ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দের যে-সব তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহারও রচয়িতা এই রাজগুরু মদন।

মহারাজা অর্জ্জুন বর্ম্মদেব যে পরাক্রান্ত বীর ছিলেন, তাহার পরিচয় নানা ভাবেই পাওয়া গিয়াছে। তিনি সাহিত্যেও সুপণ্ডিত ছিলেন। বিখ্যাত অমরুশতকের একটি টীকা অর্জ্জুন বর্ম্মদেবের লেখা। তাহাতেও তিনি নিজ গুরু মদনের কথা বলিয়াছেন। মদনের উপাধি তাহাতে দেখা যায় বালসরস্বতী। মদনের বহু রচনার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রসিক সঞ্জীবনী মতে তাঁহার কাব্য রচনাও বিস্তর। গুরুর প্রসাদে ও সহায়তাতেই এতটা সম্ভবপর হইয়াছিল। প্রশস্তির তৃতীয় পংক্তিতে দেখা যায় সারদা দেবীর মন্দিরে সকল দিগন্তর হইতে উপাগত অনেক "ত্রৈবিদ্য সহৃদয়কলাকোবিদ রসিকসুকবিসঙ্কুল" সমাগম হইয়াছিল। সেখানে গৌড়বংশীয় গঙ্গাপুলিন-রাজহংস গঙ্গাধরবংশীয় রাজগুরু মদনের অভিনব কৃতি এই নাটিকা অভিনীত হয়।

"গৌড়াম্বরগংগাপুলিনরাজহংসস্য গংগাধরায়ণের্ম্মদনস্য রাজগুরোঃ কৃতিরভিনবা"—ইত্যাদি (পংক্তি, ৩, ৪)

ডক্টর ভাণ্ডারকরের ১৮৮৩-৮৪ সালের রিপোর্টে দেখা যায় এই বালসরস্বতী মদনের গুরু ছিলেন জৈনাচার্য্য আশাধর। আচার্য্য আশাধর অর্জ্জুনদেব, দেবপাল ও জয়সিংহের সমকালীন।

আচার্য্য ফুল্‌টন্‌ এই প্রশস্তিটি পাঠোদ্ধার করিয়া এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকায় অষ্টম খণ্ডে (পৃ. ৯৬) প্রকাশ করেন।

পুরাতনপ্রবন্ধসংগ্রহ গ্রন্থে বস্তুপালসভায় দুই জন প্রতিদ্বন্দ্বী কবির নাম পাই। এক জন মদন, অন্য জন হরিহর। উভয়ের রচিত কয়েকটি শ্লোকের নমুনাও সেখানে দেওয়া আছে।

(সিংঘী জৈন গ্রন্থমালা দ্বিতীয় গ্রন্থ, নং ২৫৮, ২৫৯, পৃ.৭৭)

রাজশেখরসূরিকৃত প্রবন্ধকোষে (১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে) হরিহরের সম্বন্ধে বেশ বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে আছে গৌড়দেশবাসী হরিহর শ্রীহর্ষ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কাজেই দেখা যায় শ্রীহর্ষও গৌড়দেশীয়। গুজরাট-যাত্রাপ্রসঙ্গে রাণা বীরধবল, মন্ত্রী শ্রীবস্তুপাল ও পণ্ডিত কবি সোমেশ্বরের সঙ্গে তাঁহার আলাপ-পরিচয়ের কথা সবিস্তারে বর্ণিত আছে। হরিহর সেখানে আপন পূর্ব্বপুরুষ শ্রীহর্ষ-রচিত কাব্য শুনাইয়া বস্তুপাল প্রভৃতিকে চমৎকৃত করিয়া দেন।

(সিংঘী গ্রন্থমালা, ষষ্ঠ গ্রন্থ, ৬৭-৭১, পৃ. ৫৮-৬১)

বারাণসীতে গোবিন্দচন্দ্র রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র ছিলেন জয়ন্তচন্দ্র, তাঁহার পুত্র মেঘচন্দ্র, সেখানে হীর নামে এক বিপ্র ছিলেন। শ্রীহর্ষ তাঁহার পুত্র। তর্ক-অলঙ্কার-গীত-গণিত-জ্যোতিষ-মন্ত্র-ব্যাকরণাদি সকল বিদ্যা শ্রীহর্ষ আয়ত্ত করেন। তাঁহার বিস্তৃত পরিচয় সিংঘী জৈন গ্রন্থমালার ষষ্ঠ গ্রন্থ প্রবন্ধকোষে হর্ষকবি প্রবন্ধে (১১ নং) দেওয়া আছে (পৃ. ৫৪-৫৮)।

বারাণসীর রাজসভায় পণ্ডিতগণের কাছে শ্রীহর্ষের

পিতা হীর অপমানিত হন। পুত্র শ্রীহর্ষ তাঁহার কবিত্বে ও পাণ্ডিত্যে পরে তাহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। তাঁহার নৈষধ রচনা সমাপ্ত হইলে বারাণসীর রাজকবিগণ তাহা অসামান্য বলিয়া স্বীকার করেন। রাজা কহিলেন, "আপনি কাশ্মীর দেশে গিয়া সেখানকার রাজা ও কবিগণের সম্মতি সংগ্রহ করুন।"

শ্রীহর্ষ কাশ্মীরে গেলেন। সেখানে ভারতী তাঁর প্রতি প্রসন্ন হইলেন কিন্তু স্থানীয় পণ্ডিতেরা বিরুদ্ধ থাকায় রাজসভায় তিনি প্রবেশলাভ করিলেন না। ক্রমে তাঁর সম্বল ফুরাইয়া আসিল। কিছুতেই আর যখন তাঁহার ব্যয়নির্ব্বাহ হইতেছে না তখন এক দিন এক দেবালয়ে বসিয়া তিনি জপ করিতেছেন এমন সময় দুই দাসী নিকটস্থ কূপে জল ভরিতে আসিল। কে আগে জল ভরিবে এই লইয়া দারুণ কলহ উপস্থিত হইল। ক্রমে মারামারি; ঘট ও মাথা দুই-ই ভাঙ্গিল। রাজার কাছে বিচার, সাক্ষী কৈ? তাহারা বলিল, "নিকটে দেবালয়ে এক ব্রাহ্মণ জপে রত ছিলেন, তিনি হয়তো কিছু বলিতে পারেন।"

শ্রীহর্ষকে রাজসভায় আসিতে হইল। তিনি সংস্কৃতে বলিলেন, "মহারাজ, আমি তো এখানকার ভাষা জানি না। তবে দাসীরা নিজ ভাষায় যে যে কথা বলিয়াছে তাহা আমি শুদ্ধ স্মৃতির বলে পুনরায় বলিয়া যাইতে পারি।" এই কথা বলিয়া আদ্যোপান্ত তাহাদের সকল কথা তিনি সেই দেশীয় ভাষায় শুদ্ধভাবে বলিয়া গেলেন। দাসীদের বিচার শেষ করিয়া রাজা শ্রীহর্ষকে বলিলেন, "মহাশয়, অদ্ভুত আপনার শক্তি! কে আপনি?" শ্রীহর্ষ আপন পরিচয় দিয়া তাঁহার দুঃখের কথা জানাইলেন। তখন রাজা পণ্ডিতগণকে তাঁহাদের ক্ষুদ্রতার জন্য তিরস্কার করিলেন। (প্রবন্ধকোষ—হর্ষবর্দ্ধন প্রবন্ধ)

এই গল্পের অনুরূপ একটি কথা পরবর্ত্তীকালে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সম্বন্ধেও প্রচলিত আছে।

প্রবন্ধচিন্তামণি গ্রন্থেও এক অর্জ্জুনদেবের নাম পাওয়া যায়। (সিংঘী জৈন গ্রন্থমালা, রামচন্দ্র প্রবন্ধ, পৃ. ৯৭)।

মদনের কথা-প্রসঙ্গে অবান্তর অনেক কথাই আলোচিত হইল। মদনের বেদবিদ্যাই এইখানে প্রধান আলোচ্য ছিল। তবু বলা উচিত, বেদচর্চ্চা ছাড়া সাধারণ সংস্কৃত চর্চ্চার জন্যও মদনের খ্যাতি ছিল। সংস্কৃত সাহিত্য চর্চ্চায় বাঙালী কায়স্থদেরও বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। যোধপুর রাজ্যের মধ্যে কিংসরিয়া গ্রামের কাছে এক গিরিশিখরে কেবায় মাতার একটি মন্দিরে (দহিয়া) দধিচিক রাজা চচ্চের নামে একটি উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে। লিপিটি ৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দের। সেই লিপিটির রচয়িতা গোড়কায়স্থ সৎকবি শ্রীকল্যের পুত্র মহাদেব।

গৌড়কায়স্থ বংশেভূচ্ছ্রীকল্যো নাম সৎকবিঃ।
সুনুস্তস্য মহাদেবঃ প্রশস্তিং [ব্যদধাদিমাম্]। (২৬)

(Epigraphica Indica XII, p. 61)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ডক্টর ডি. আর. ভাণ্ডারকর এবং রমাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মত, বাংলা দেশের কায়স্থ ও গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণদের মধ্যে মূলতঃ যোগ আছে। সেন্সস রিপোর্টে (1931, I, ch. 12, 471-472 pp.) এই কথা স্বীকৃত। বাংলায় নাগরদের নানা অবশেষ এখনও আছে। নাগরদের মধ্যে বাঙালী কায়স্থদের সব উপাধি এখনও চলিতেছে। শ্রীহট্টে এখনও নাগর উপাধিধারী জাতি আছে। শ্রীহট্টবাসী ঈশান নাগরের নামও এই স্থলে চিন্তনীয়।

ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণাদি সমাজের প্রধানতঃ দুই ভাগ। উত্তর ও দক্ষিণ দেশের সমাজভেদে এই দুই ভাগ। দক্ষিণে যে পাচটি শাখা তাহাকে বলে পঞ্চ দ্রবিড়। উত্তরের পাঁচ শাখাকে বলে পঞ্চ গৌড়। পঞ্জাব, উজ্জয়িনী, কাশী, কোশল প্রভৃতি সব প্রখ্যাত স্থান থাকিতে গৌড়ের নামেই কেন উত্তর-ভারতের তাবৎ সমাজ চিহ্নিত হইল ইহাই ভাবিবার বিষয়।

এক সময় গৌড়দেশ বলিতে বাংলার পশ্চিম ভাগ ও অযোধ্যার এক ভাগকে বুঝাইত। মৎস্যপুরাণ-মতে দেখা যায় শ্রাবস্তীনগরও গৌড় দেশেই নির্ম্মিত।

শ্রাবস্তশ্চ মহাতেজা বৎসক স্তৎসুতোঽভবৎ
নির্ম্মিতা যেন শ্রাবস্তী গোড়দেশে দ্বিজোত্তমাঃ।১২,৩০

গৌড় নাম হইতেই নাকি গোণ্ডা জেলার নামকরণ হইয়াছে। রাজপুতনায় ব্রাহ্মণ রাজপুত কায়স্থ এমন কি চামারও গৌড়শাখাশ্রয়ী আছেন। মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর ওঝা বলেন তাঁহারা বোধ হয় অযোধ্যা হইতে আগত, বাংলা দেশ হইতে নহে। (রাজপুতানেকা ইতিহাস, পৃঃ ২৪৩)। কিন্তু বাংলা দেশ হইতে কেন নহে সে কারণ তিনি দেখান নাই। আজমেরে বহু গৌড়ের বাস ছিল। যোধপুরের এক অংশে গৌড়াটি বা গৌড়বাটি বহু গৌড়ের স্থান ছিল। সেই জনপদ-নাম এখনও আছে (ঐ পৃঃ ২৪৪-২৪৫)।

অলবিরুণী তো থানেশ্বরকেও গৌড়ের অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়াছেন। তাই মনে হয় এক সময় বাংলা হইতে শ্রাবস্তী পর্য্যন্ত গৌড় ছিল, পরে তাঁহাদের প্রভাব আরও বহুদূর পশ্চিমে বিস্তৃত হয়।

ওঝাজীর মতে চৌহান পৃথ্বীরাজের সময় গৌড়েরা রাজপুতনায় যান। যোধপুর রাজ্যের এক অংশের সেই জন্য নাম গৌড়বাড় যেমন কাঠীদের স্থান কাঠিয়াবাড়। এখন সেখানে রাজগড় ছাড়া আর কোনো স্থান গৌড়দের অধিকারে নাই। জুনিয়া, সাবর, দেবলিয়া, শ্রীনগর প্রভৃতি স্থান আজমের প্রদেশে গৌড়দেরই ছিল। এখন মাত্র শ্রীনগর গৌড়দের অধিকারে আছে,

বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময় আসেরের দুর্গপতি গোপালদাস গৌড় একজন বিশিষ্ট যোদ্ধা ছিলেন। ইঁহার পুত্র বিঠ্‌ঠলদাস গৌড়সম্রাট সাহজহানের সময় মনসবদার ছিলেন। তাঁহার পুত্র ছিলেন যোদ্ধা অনিরুদ্ধ গৌড়। ইহার ভাই অর্জ্জুন গৌড়ের হাতে রাঠোরের অমর সিংহ নিহত হন।

আজমেরের গৌড় বীর বৎসরাজ যেমন মহাবীর তেমনই মহাদাতা ছিলেন। এই জন্য কথা আছে,

> জেতাঁ অড়ব-পসাব নিত ধিনো গোড় বছরাজ।
> গঢ় অজমের স্থমেরুসুঁ উঁচো দীসে আজ।

"যিনি নিত্য অর্ব্বুদ মুদ্রা মূল্যের দান (পসাব) বিতরণ করিতে পারিতেন ধন্য সেই গৌড় বৎসরাজকে। তাঁহার ঔদার্য্যে আজ তাঁহার আজমের গড় সুমেরু হইতেও উন্নত মনে হয়।

বাক্‌পতি মুঞ্জের নরওয়াল তাম্রশাসন নামক প্রবন্ধে শ্রীযুত কে. এন. দীক্ষিত মহাশয় বলেন, পরমার রাজত্বকালে বহু বাঙালী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ মালবদেশে বাস করিতেছিলেন। দক্ষিণ রাঢ়ের বিল্বগবাস গ্রামের দোনক শর্ম্মা তাঁহাদের মধ্যে একজন। তখন বরেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত বগুড়ায়ও বেদ বিদ্যার বিলক্ষণ প্রচার ছিল। তাঁহারা অনেকেই সামবেদীয় ছান্দোগ্য শাখাশ্রয়ী।

মাদ্রাজ প্রদেশে অন্ধ্রভূভাগের অন্তর্গত গন্তুর (Guntur) জেলার পুরাকীর্ত্তি অনুসন্ধানে এক জন মহাপণ্ডিত বাঙালী গুরুর নাম পাওয়া যায়। তিনি আচার্য্য-প্রবর শ্রীবিশ্বেশ্বর শিবাচার্য্য। কাকতীয়, মালব, কলচুরী, ও চোল প্রভৃতি বংশীয় রাজারা তাঁহার মন্ত্রশিষ্য।

১১৮৩ শকাব্দায় অর্থাৎ ১২৬২ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত মালকাপুর স্তম্ভলিপি অনুসারে দেখা যায় কাকতীয় রাজা গণপতি ও তাঁহার কন্যা রুদ্রাম্বা (রুদ্রদেব মহারাজ) তাঁহার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শিবাচার্য্য তাঁহার স্বদেশ দক্ষিণ রাঢ় হইতে ত্রিশ জন সামবেদী ব্রাহ্মণকে সেই দেশে লইয়া গিয়া বসতি করান। তাহা ছাড়াও তিনি অনেক বঙ্গদেশীয় আচার্য্য ও অধ্যাপককে সেই দেশে লইয়া যান।

(Malkapuram Stone Pillar Inscription of Rudramba, Journal of Andhra Historical Research Society Vol. IV; R. Sewel, List of Inscription of Southern India).

কাকতীয় রাজা গণপতি শৈব আচার্য্য বিশ্বেশ্বর শিবকে দান করেন "মন্দর" গ্রাম। তাঁহার কন্যা রুদ্রাম্বা দান করেন "বেলংগপুংডী" গ্রাম। উভয় গ্রামই কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণতীরস্থিত। বিশ্বেশ্বর শিব এই সব গ্রামের দ্বারা "বিশ্বেশ্বর গোলকি" (গোমুলকী) নামে অগ্রহার স্থাপনা করেন। বিশ্বেশ্বর শিবের আদি নিবাস ছিল গৌড় রাঢ়ের অন্তর্গত পূর্ব্বগ্রামে।

> শ্রীবিশ্বেশ্বরসম্ভমমুজ্জৎচচ্ছ্রীগৌড়চূড়ামণিঃ।
>
> শাসন পংক্তি, ৪১, ৪২

আচার্য্য বিশ্বেশ্বর ছিলেন—

> গৌড়দক্ষিণরাঢীয়পূর্ব্বগ্রামসমুদ্ভবাঃ। ঐ পংক্তি ৬২, ৬৩

(Journal of the Andhra Historical Research Society, Vol. IV and Kakatiya Sancika p. 148).

এইখানে বেদবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকিলেও

একটি কথা উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। বিশ্বেশ্বর শিবাচার্য্য ঐ গ্রামগুলির আয়কে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া এক-একটি ভাগ এক-এক প্রকার সৎকার্য্যের জন্য দান করিতেন। এক ভাগের আয়ে দীনদুঃখীর জন্য অন্নসত্রের, এক ভাগের আয়ে আরোগ্যশালার, ও আর এক ভাগের আয়ে প্রসূতিশালার ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইত। সেই যুগে আর কোথাও কেহ প্রসূতিশালার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না। ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত মঠের আয় হইতে হাসপাতাল ও প্রসূতিশালা (maternity home) স্থাপন করিয়া তখনকার যুগে এই বাঙালী পণ্ডিত একটি অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

তেলেগু কাব্য "সোমদেব বাজিয়ম্" গ্রন্থে এবং "প্রতাপ চরিতম্" আখ্যান (Journal of the Telugu Academy, Vol IX) এক জন শিবদেবয্য পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন রাজা গণপতি দেবের পরামর্শ-গুরু। বিশ্বেশ্বর শিব ও এই শিবদেবয্য অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। (Journal of the Andhra Historical Research Society, p 152-153.

প্রায় সাড়ে নয় শত বৎসর পূর্ব্বে তাঞ্জোরের বিখ্যাত রাজরাজেশ্বর মন্দির নির্ম্মিত হয়। মন্দিরনির্ম্মাতা 'রাজ-রাজের পুত্র রাজেন্দ্র দেবের রাজত্বকালে যে দানের কথা পাওয়া যায় তাহাতে গৌড়দেশের শৈবাচার্য্যগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। শর্বশিবের পরিবারের গৌড়ীয় গুরুগণ রাজার দানের যোগ্য গুরু বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন (South Indian Inscription, I, p. 59 ; II, p. 61)।

গঞ্জামে প্রাপ্ত রাজা আনন্দ বর্ম্মদেবের (৭০০ খ্রীঃ) এক লেখানুসারে দেখা যায় কামরূপীয় একজন ব্রাহ্মণকে রাজা ভূমি দান করিতেছেন।

(Jogendra Chandra Ghosh, Journal of the Assam Research Society, Vol. III, no. 4).

বাংলা দেশের বাহিরে বাঙালী বেদজ্ঞদের এই যে সম্মান তাহার কারণ হইল বাংলা দেশের মধ্যে তখন বেদ-বিদ্যার বিলক্ষণ চর্চ্চা ছিল। সময়ান্তরে বাংলা দেশের মধ্যে বেদচর্চ্চার কথাও আলোচনা করা যাইবে।

রোগশয্যায় রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

রোগের নিদারুণ যন্ত্রণায় রোগী কাতরতা প্রকাশ করে এইটেই স্বাভাবিক নিয়ম, অধিকাংশ মানুষই রোগের যন্ত্রণায় এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম পালন করে, কেউ কম, কেউ বা বেশী। কিন্তু এবার রোগকাতর রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আমরা যা লক্ষ্য করলুম, তা সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত ব্যাপার। যন্ত্রণাকে অবিচলিত ভাবে সহ্য করার অসাধারণত্ব দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। যাঁরা তাঁর সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকেন তাঁদের চিত্তবিনোদন করেন তিনি নানারকম হাস্য-পরিহাস দিয়ে, নিজের যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করবারও উপায়ও হয়তো তাই। বিমর্ষতার চর্চ্চা করা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, সেই জন্য অন্যেরও আনন্দভাববিবর্জ্জিত গম্ভীর মুখের সান্নিধ্যও রবীন্দ্রনাথের কাছে অসহ্য। এক দিকে যেমন তিনি বল্‌গাবিহীন বাচালতার প্রতি বিরূপ, অন্য দিকে তেমনি, যাঁরা হাসি মিশিয়ে বক্তব্য বিষয়কে সরস ক'রে তাঁর কাছে নিবেদন করতে পারেন, তাদের প্রতি তিনি প্রসন্ন। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত সুস্থ, কিন্তু এখনও রোগমুক্ত নন। এজন্য চিকিৎসকবর্গ তাঁর প্রতি অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা-নিয়মানুশাসিত হয়ে যখন যে কর্ত্তব্য সমাধা করা প্রয়োজন, ক'রে থাকেন। অনন্যোপায় হয়ে রবীন্দ্রনাথকে ইন্‌জেক্‌শন-রূপ ব্যাপারের অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে, সুস্থ থাকলে এ-ধরণের চিকিৎসাকে আমল দেবার পাত্রই তিনি

নন। চিকিৎসকের কর্ত্তব্যে তাঁর অস্থিরতা বাঁধা পড়ে এসে কবিতার ছন্দে, তৈরি হয় সময়-কাটানো ছড়া :

ডাক্তারে মিলে নামাইল মোরে
পাহাড় হইতে হিঁচুড়িয়া
মুখ রহিলাম খিঁচুড়িয়া ;
মনে মনে ভাবি কলিকাতা পানে
যেতে হবে মোরে কি চড়িয়া।
সবে মিলে দুই পহরে
নিয়ে গেল মোরে শহরে
তার পর হতে চিকিৎসা মোর
দেহ আছড়িয়া পিছড়িয়া।

সকালবেলা রবীন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখি, শুশ্রূষায় রত দৌহিত্রী শ্রীমতী নন্দিতাকে মুখে মুখে তিনি এই কবিতাটি বলছেন। রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা ভাল ক'রে জানেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, তাঁর দেহকে লোকহস্ত থেকে বাঁচিয়ে রাখবার দিকে তাঁর কি পরিমাণ সতর্কতা ছিল। আর আজকে তাঁর শরীর নিয়ে "আছড়িয়া পিছড়িয়া"র কারবার শুরু হয়েছে। পরের হাতে সেবা গ্রহণ করায় রবীন্দ্রনাথের বিমুখতা ছিল বিশেষ, আর আজ সেই সেবা তাঁকে নিতে হচ্ছে নির্ব্বিচারে না হোক, বিচার ক'রেও, ইচ্ছেয় অনিচ্ছেয় অনেকের হাতে। রবীন্দ্রনাথের মনের সঙ্গে যাঁদের বিন্দুমাত্র পরিচয় আছে, তাঁরা নিশ্চয়ই এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথের মনের চাপা ব্যথার পরিচয় পাবেন।

তারিখটা নবেম্বরের শেষ হলেও, শীতের আবির্ভাব ঘটে নি, গরম দিনের জোর বেশ মিশে আছে আজকের দিনে। শুশ্রূষাকর্ম্মে রত শ্রীমতী রাণী চন্দকে বিকেল-বেলা কবি এই উপলক্ষ্যে লিখে নিতে বললেন :

আকাশের বুকে হাঁপানি ধরায়
বিকেলবেলার গরম
এ যে একেবারে চরম।
এক ফোঁটা জল বাহিরে নাহিকো
দেহ জুড়ে বহে ঘরম।
তারিখ মিলায়ে তবুও বিধির
মেজাজ হ'ল না নরম।
ডিসেম্বরের দ্বারে এসে তবু
লাগে না তাহার শরম,
একি গো পাঁজির ভরম।

এ-বছর অনাবৃষ্টির মার চলেছে বীরভূমের বুকে। ইতিমধ্যেই মাটির উপরের সব রস গেছে শুকিয়ে, চারি ধারে উড়ছে রাঙা ধুলো, গাছপালাগুলো গরমের তপ্ত নিঃশ্বাসের ছোঁয়ায় মুহ্যমান। এ-সব দৃশ্য দেখে এবং নিজের চিত্তের সৃষ্টিরাজ্যেও নব নব ছন্দোময় কবিতার এবং রসসৃষ্টির ব্যাপারে অনুর্ব্বরতার কথা ভেবে, অপরাহ্ণে আমাকে লিখে নিতে বললেন :

জানি নে হা বিধি মালঞ্চ মোর
কোন্ পাপে হ'ল দোষী
কত দিন ধরি করিছে বসিয়া
নির্জ্জলা একাদশী।
কেমনে রাখিবে লাজ—
খসে পড়ে তার সাজ—
দেখিতে দেখিতে গামছার মতো
হ'ল তার বেনারসি।
সরোবর-তীরে এসে
হায় হায় করে শেষে
মুখ দেখিবার আয়নায় তার
কাচ পড়ে গেছে খসি।

এই কবিতাটির কবিত্বসম্পদ এবং ভাবৈশ্বর্য্যের মূল্য ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতার পরিচায়ক। কিন্তু এ-কথা এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সেই সময় শুশ্রূষাকার্য্যে রত শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে নানা টুকরো আলাপের সামান্য অবকাশে কবি এই কবিতাটি মুখে মুখে ব'লে গেলেন। পরকে দিয়ে নিজের কবিতা লেখানোও ইতিপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ অভ্যাস করেন নি। কে জানে, নিজের লেখনী-আয়নায় নিজের ভাব-রূপের পূর্ণ মূর্ত্তি না দেখতে পেয়েই হয়ত তিনি বললেন :

মুখ দেখিবার আয়নায় তার
কাচ পড়ে গেছে খসি।

খাইবার-গিরিসঙ্কটে ঘোড়া-গরুর পথ

পেশোয়ার ও লাহোর

শ্রীশান্তা দেবী

বাংলা দেশ থেকে কাশ্মীর যাবার পথে দ্রষ্টব্য স্থান অনেক আছে। যদি আগে থেকে হিসাব করে দিনক্ষণের মাপ-জোখ করে যাওয়া যায় তাহলে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব থেকে পশ্চিম পর্য্যন্ত যত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান আছে তার অধিকাংশই দেখা সম্ভব হয়। ছেলেবেলা থেকে ইতিহাসে যে-সমস্ত নাম মুখস্থ করেছি সেগুলি স্বচক্ষে দেখে কেবল যে পুরাতন পাঠ ঝালান হয় তা নয়, ঘরকুনো মানুষের বাস্তবিকই আনন্দ হয় কাগজের পাতার বাইরে এদের প্রকৃত রূপ দেখে। অনেক বয়সেও মানুষের মনের কোণে ইতিহাসকে গল্প মনে ক'রে ভুলে যাবার একটা প্রবৃত্তি থাকে, চোখে তার পটভূমিকা দেখলে সে প্রবৃত্তিটা সম্পূর্ণ ঘুচে যায়।

আমরা ২৭শে মে, ১৯৩৯, বিকালের ট্রেনে হাওড়া ছাড়লাম। ভীষণ গরম, পথশ্রম ও ধূলার এত বর্ণনা কিছু দিন ধরে শুনছিলাম যে গাড়ীতে উঠলেই মাথায় অগ্নিবৃষ্টি হবে, এই রকম একটা আশঙ্কা নিয়ে বেরলাম। কিন্তু প্রথমেই বৃষ্টির জলধারা আমাদের অভিনন্দিত করল। গরমের ভয়টা কমল।

রাত্রে খেয়েদেয়ে ঘুমোচ্ছি, এমন সময় আসানসোল স্টেশনে এক জন সিন্ধি কি পঞ্জাবী ব্যক্তি প্রায় দরজা-জানালা ভেঙে কামরায় ঢুকে পড়ল। লোকটার খুব সাহেবী ধরণ-ধারণ, গাড়ীতে ব'সে মদ খাওয়া থেকে আরম্ভ ক'রে কোনও অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই। যাই হোক, আর বেশী লোক উঠল না এই রক্ষা। দিনের বেলা ট্রেন মোগলসরাই হয়ে কাশীর পথে চলল। আসবার আগে টাইম-টেবল দেখি নি। হঠাৎ গঙ্গার ধারে কাশীর বড় বড় ঘাট আর বেণীমাধবের ধ্বজা দেখে অবাক হয়ে গেলাম, স্বপ্ন দেখছি নাকি। সেই কোন্ শৈশবে কাশী একবার দেখেছিলাম, কিন্তু তার ঘাটগুলি ভোলা যায় না! মনে করেছিলাম এলাহাবাদ দিল্লী হয়ে যাব, কিন্তু এ আবার কোন্ পথে এলাম? বই খুলে দেখলাম এপথে ইতিপূর্ব্বে আসি নি।

ব্রিটিশ-সীমান্তের পাহাড়ের উপর দূরে আফগান-সীমান্তের আফিস ইত্যাদি
বামে শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ ও শ্রীমতী মীরা চৌধুরী। দক্ষিণে লেখিকা

গ্রীষ্মের তাপে আর বৃষ্টির অভাবে সমস্ত দেশটা শুকিয়ে গিয়েছে। ধুলোয় পথঘাট ভরে গেছে, রেলগাড়ীর ভিতর কোথাও এক চুল স্থান ধূলিহীন নেই, নাক চোখের ফুটো পর্য্যন্ত ধুলো বোঝাই। শুকনো সাদা মাঠের মধ্যে মাঝে মাঝে গাছে ঘেরা ছোট ছোট গ্রাম। মাঝে মাঝে কুয়া ও আম্রকুঞ্জ, কোথাও ঘাসের চিহ্ন নেই। গাছতলায় শুকনো পাতা পাহাড়ের মত স্তূপ হয়ে আছে। গরম খুবই বটে, তবে মারাত্মক নয়। মাথায় জলপটি কি বরফের থলি দেবার দরকার হয় না। সঙ্গে একটা ফ্লাস্ক ভর্ত্তি বরফ-জল ছিল, সেটা না থাকলে হয়ত কষ্ট হ'ত।

বেড়া দেবার উপযুক্ত ডালপালার একান্ত অভাব ব'লে মাঠের মধ্যের ছোট বড় ক্ষেতগুলি পাতলা পাতলা মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা।

বেলা আড়াইটার সময় লক্ষ্ণৌ পৌঁছলাম। নেমে দেখা হ'ল না। গাড়ী থেকে লক্ষ্ণৌএর চওড়া চওড়া রাস্তা ও বড় বড় কম্পাউণ্ডওয়ালা বাংলোগুলি দেখলাম। স্টেশনে আর্ট সোসাইটির অনেক জিনিস কাচের ভিতর সাজান, ফিরিওয়ালারা কিছু কিছু বিক্রীও করছে। রাত্রে মোরাদাবাদে খুব বাসন বিক্রীর ঘটা দেখলাম। সব বড় শহরের স্টেশনে যদি সে দেশের শিল্পের নমুনা এই রকম সাজান থাকে তা হ'লে স্টেশনের শ্রীবৃদ্ধিও হয়, দেশের শিল্পের বিদেশীর কাছে কদরও বাড়ে। বিশেষতঃ বিভিন্ন প্রদেশের লোক পরস্পরের সৃষ্ট শিল্পসম্ভারের সর্ব্বদাই সমাদর করতে পারে। কিন্তু আমাদের বাংলা দেশে বর্দ্ধমানের মিহিদানা ছাড়া কোনও স্টেশনে বোধ হয় সেখানকার মানুষের তৈরি দেশজ জিনিস উল্লেখযোগ্য রকম কিছু পাওয়া যায় না। খালি পান, বিড়ি, সিগ্রেট, ডাব আর 'চা গরেম'। আমাদের দেশে ঢাকাই, মুর্শিদাবাদী, বিষ্ণুপুরী, কৃষ্ণনগরী অনেক রকম কাপড়-চোপড় স্টেশনে ফিরি করা যায়।

২১শে সকাল বেলাই আমরা লাহোর পৌঁছলাম। একবার মনে করেছিলাম গাড়ী বদলাবার আগে একটু
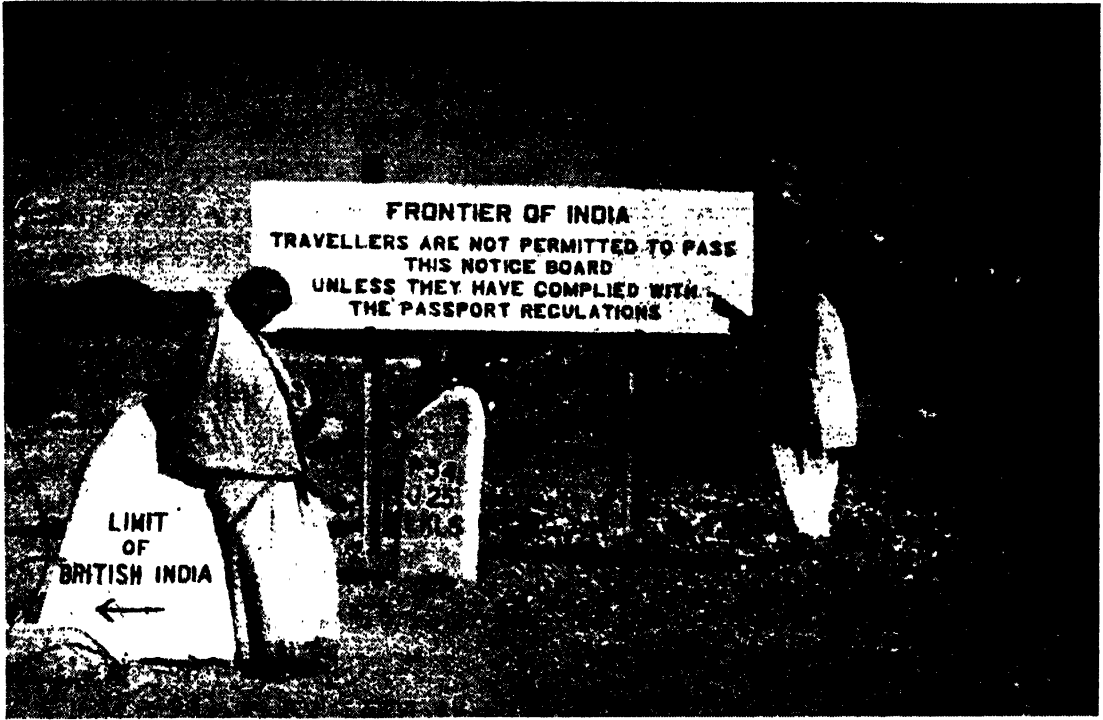
ব্রিটিশ-সীমান্তে লেখিকা (বামে)

লাহোর ঘুরে দেখব। কিন্তু সেখানে তখন মেথরের ধর্ম্মঘট চলছে ব'লে কাগজে রোজ পড়ছিলাম, কাজেই বেশী উৎসাহ হ'ল না। স্টেশনে বসেই যতটা দেখা যায় দেখতে লাগলাম, চার ধারে সব লাল ইটের বাড়ী, চুণকাম প্রায় চোখে পড়ে না। বাড়ীর ছাদে ছাদে আস্ত এবং ভাঙা খাটিয়া পড়ে আছে। খোলার চাল কি খড়ের চাল আশে পাশে কোথাও দেখতে পেলাম না। আগের দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পশ্চিমী মেয়েদের ঘাঘরা পরার ঘটা দেখে এসেছি। আজ সকালে লাহোরে নেমে দেখি সব পায়জামা আর পাঞ্জাবী কুর্ত্তা পরা। এদেশে বোধ হয় এই পায়জামাকে সুথন বলে। অধিকাংশের পোষাক আগাগোড়াই সাদা, দু-চার জন মেয়ে রঙীন রেশমের পায়জামা কুর্ত্তাও পরেছে। জরি রেশম রং যতই চড়ান যাক না কেন এই পোষাকের স্ত্রীজনোচিত শ্রী নেই। একটি নূতন বৌ হাইহিলের জুতোর উপর পায়জামা প্রভৃতি চড়িয়ে ওড়নায় দীর্ঘ ঘোমটা টেনে চলেছে; কিন্তু পোষাকটাই এমন কেঠো যে নব-বধূর সলজ্জ মন্থর গতি কিছুই ফুটছে না।

পঞ্জাবের পুরুষরা মোটামুটি বাংলা দেশের পুরুষদের চেয়ে লম্বা চওড়া ও ফর্সা এটা সকলেই জানে। মুখশ্রীও এদের বেশ পুরুষোচিত। তবে মানুষ বড় নোংরা, সর্ব্বত্র সবাই এত থুথু ফেলছে যে কোথাও একটা জিনিস নামাতে কি পা ফেলতে ইতস্তত করতে হয়। সুন্দর চেহারার সঙ্গে নোংরামির এমনই অমিল আছে যে এতে জিনিসটা চোখে আরও উৎকট হয়ে লাগে।

লাহোর অমৃতসর জলন্ধর প্রভৃতির আশে পাশে বড় বড় খাল কাটার এত ঘটা যে যুক্তপ্রদেশের চেয়ে এ দেশটা অনেক বেশী সরস ও সবুজ দেখায়। মাঠ প্রায় সবই ক্ষেত, লক্ষ্ণৌএর দিকের মত খালি সাদা মাঠ নয়। এদেশে কুয়াও খুব। চাকার গায়ে সারি সারি ভাঁড় ঝুলিয়ে বলদের সাহায্যে (কপিকলে) জল তোলার রীতি প্রায়

সীমান্ত-প্রদেশবাসীদের মাটির
গোষ্ঠিগৃহ

সর্ব্বত্র। এ ছাড়া সাধারণ বাঁধান ইঁদারা আছে, টেনে জল তোলবার জন্য। আমাদের নদীমাতৃক ও বৃষ্টিস্নাত বাংলা দেশের চেয়ে পঞ্জাবে এখন বেশী জল ও বেশী সরসতা দেখা যায় বর্ষাকালের আগে। পঞ্জাবও পঞ্চনদীর তীরে বটে, কিন্তু সরসতা আধুনিক খাল কাটার জন্যই প্রধানতঃ। এদিকে পশ্চিম-বাংলা কোন চেষ্টার অভাবে প্রায় মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে। এমনই বাংলার দুর্ভাগ্য।

পঞ্জাবের ওদিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই চ্যাপ্টা মাটির ছাদওয়ালা মাটির বাড়ী বেশী চোখে পড়ে। এদেশে বৃষ্টি কম আর সব মানুষই ঘরের বাইরে শোয় ব'লে এই রকম ছাদের সুবিধা বেশী। পথের দু-ধারে পেয়ারা, তুঁত, মলবেরি প্রভৃতির বাগান ছাড়া আরও অনেক বাগান দেখলাম যার গাছগুলি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। পরে কিছু চেরি ও পপলার ব'লে চিনেছিলাম। মোটের উপর ফলের বাগান খুব বেশী, বাংলায় এ রকম কিছু নেই।

আমরা যে গাড়ীতে যাচ্ছিলাম সেটা ফ্রণ্টিয়ার মেল। যে-কামরায় উঠেছিলাম তাতে এক দল কাশ্মীরী আগে থেকেই ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এক জন অনেকটা জওয়াহরলাল নেহরুর মত দেখতে। সঙ্গে যে মহিলাটি ছিলেন তিনি ইউরোপীয়দের চেয়ে ফর্সা ও দীর্ঘাকৃতি, দেখতেও মন্দ নন, তবে আয়তনে মোটা মোটা বাঙালী গিন্নীদের দ্বিগুণ। জিনিসপত্র বাক্স তোয়ালে গামছা আর ফলে সমস্ত গাড়ীটা বোঝাই। তার উপর লাহোরে বড় স্টেশন পেয়ে বাবুরা নাপিত ডেকে দাড়ি কামাতে এবং ছেলেরা বুকস্টল থেকে বই কিনে বেঞ্চ বোঝাই করতে সুরু করে দিলেন। তারই মধ্যে একটা বেঞ্চে আমরা একটু স্থান করে নিলাম। বসতে-না-বসতে আর এক ব্যক্তি এসে সেখানে ব্যাগ রেখে খানিকটা জায়গা দখল করে নিল।

কয়েকটা স্টেশন পরে কাশ্মীরী দল নেমে গেলেন, তাঁরা জম্মু হয়ে শ্রীনগর যাবেন। পঞ্জাবে সেদিন অন্তত যুক্তপ্রদেশের চেয়ে ঠাণ্ডা ছিল এবং নদী ও খালের কৃপায় রেলপথের ধারে ধুলো কম।

কিছু দূর পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রায় একই রকম, অবশ্য এদিকে গাছপালা ঢের বেশী। তার পর লালামুসার পর থেকে প্রকৃতির চেহারা বদলে গিয়েছে। এইখান থেকে পাহাড় সুরু, মাটির রংও অনেক জায়গায় কালো। লাল ইটে গাঁথা আমাদের পরিচিত ধরণের ঘরবাড়ী প্রায় শেষ হয়ে মাটির বাড়ী অথবা পাথরের উপর মাটি লেপা বাড়ী সুরু হয়েছে। লোকগুলোর চেহারা ভাল, পোষাক আরোই সুন্দর। সকলেই প্রায় জরির টুপির উপর সাদা উষ্ণীষ পরেছে। দু-চার জনের পাগড়ী রঙীন। সাজসজ্জা ও চেহারা দেখলে মনে হয় সবাই এক এক জন রাজপুত্র।

ব্রিটিশ-রাজ্যের সীমান্তের দিকে চলেছি। এখানকার লোকেরা যে ঠাণ্ডা প্রকৃতির নয় তা স্টেশনের ব্যবস্থা দেখেই বোঝা যায়। স্টেশনে গাড়ী এসে দাঁড়াবামাত্র বন্দুক কাঁধে প্রহরীরা পায়চারি ক'রে পাহারা দিতে সুরু করল। এখানে সূর্য্যদেবও অগ্নিমূর্ত্তি বলে পরিচিত। কাজেই গাড়ীতে সারাক্ষণই বরফ বিক্রী হয়। তেমন কিছু গরম না থাকলেও সাহেবরা সমস্তক্ষণ বরফ কিনে পাখার তলায় রাখছে, বরফের হাওয়া খাবে ব'লে।

এদিকের এই পর্ব্বতসঙ্কুল দেশে পথ অনেক খরচ ক'রে তৈরি। মোটর ও রেলগাড়ী দুইয়ের পথই পাহাড় কেটে কেটে তৈরি। অনেকগুলি ঘুটঘুটে অন্ধকার সুড়ঙ্গ পার হলাম। সংখ্যায় কত এখন মনে নেই। এক একটি এমন

দীর্ঘ ও বায়ুরন্ধ্রহীন যে শেষকালে মনে হয় এই বার শেষ না হলেই দম বন্ধ হয়ে যাবে। রেল-লাইন বোধ হয় সর্ব্বদা পাহারাওয়ালার নজরে থাকে। লাইনের ধারে ধারে ছোট ছোট ঘর অথবা গুহা আছে, সেখানেই পাহারাওয়ালাদের বাস।

পথের ধারের এই পাহাড়গুলি দেখতে ভারী সুন্দর। মাটির পাহাড়ের উপর বোধ হয় বৃষ্টির জল মাথা দিয়ে চার ধারে গড়িয়ে গড়িয়ে প'ড়ে গাগুলি এমন ভাবে ধুয়ে দিয়েছে যে মনে হয় পাহাড় কেটে কেউ রেলিং-ঘেরা মন্দির বানিয়েছে। মাটির প্রাচুর্য্য বেশী বলে এই রকম মন্দিরের গড়ন সহজেই হয়েছে। পাহাড় থেকে ক্রমাগত জল নামে ব'লে পথগুলি রক্ষা করবার জন্য রেল-লাইনের তলা দিয়ে আগাগোড়া ক্রমাগত সারি সারি বাঁধানো নালা কাটা। ঢালু দিকে জল এখনও জমে রয়েছে দেখা যায়। মাঝে মাঝে কত ছোট ছোট নদী পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে বয়ে চলেছে।

রাওলপিণ্ডির কিছু আগে ও পরে পাহাড় আবার পাতলা হয়েছে, সমতল ভূমি দেখা যায়। এখানে আমাদের এক বন্ধুর বন্ধু এলেন আমাদের খোঁজখবর নিয়ে সব ব্যবস্থা ক'রে দিতে। তিনি কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ, খুব সুন্দর চেহারা এবং আশ্চর্য্য ভদ্র।

রাওলপিণ্ডি থেকে দীর্ঘ পথ পাহাড়, মাঝে ছোট ছোট উপত্যকায় শস্যক্ষেত্র, মাটির চৌকো চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা বাড়ী ও চৌকো গ্রাম, উঠানে শস্য ঝাড়া, পাহাড়ের গায়ে ও ফাঁকে ফাঁকে উটচরা ও পার্ব্বত্য জল-ধারা গড়িয়ে চলা দেখতে দেখতে চললাম। দেশটা বেশ নূতন রকম দেখতে। পাহাড়ের মাঝে মাঝে উপত্যকার কোন গ্রামটা নীচে, কোনটা পাহাড়ের উপরে, ঘর ছাদ সব মাটির। এত নীচু নীচু ঘর যে দূরের গ্রাম-গুলি পাহাড়েরই অংশ ব'লে মনে হয়। পাহারাওয়ালাদের ঘর যেন জানোয়ারের গুহা, মাটির ভিতর একটি গর্ত্ত মাত্র। গুহার ভিতর মানুষের আবাসের চিহ্ন এদিকে প্রায়ই দেখা যায়।

লাহোরের পর রাবি (ইরাবতী) এবং ওয়াজিরা-বাদের পর চেনাব অর্থাৎ চন্দ্রভাগা নদী পার হলাম।
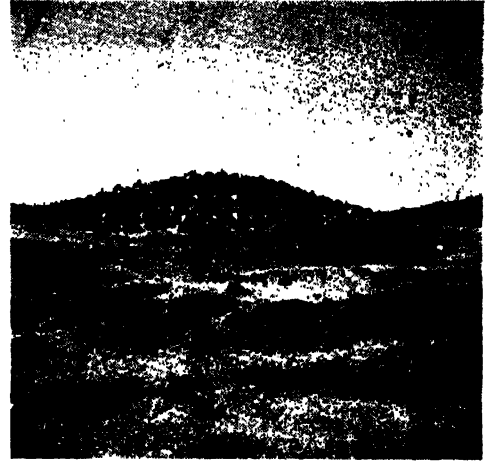
সীমান্তবাসীদের গোরস্থান

তার পর এল ঝিলম (বিতস্তা)। ঝিলম প্রকাণ্ড সুবিস্তীর্ণ নদী। নদীর ঠিক উপরেই একটি স্টেশনের নামও ঝিলম। সেখানে ডাঙ্গার উপর হাজার হাজার কাঠের গুঁড়ি সাজানো, কাশ্মীর থেকে জলপথে এখানে সব ভাসিয়ে আনা হয়েছে। একটু দূরেই কাঠচেরার রীতিমত মস্ত একটা কারখানা।

ক্রমে আটকের কাছে সিন্ধুনদ পার হলাম। বৈদিক স্তোত্রেও এই সিন্ধুনদ, বিতস্তা, অসিক্নি, ইরাবতী, শতদ্রু ও বিপাশা এই পঞ্চ নদের নাম দেখতে পাওয়া যায়। সিকন্দরশাহ এই আটকের কাছে পার হয়েছিলেন কিনা জানি না। কারুর কারুর মতে এইখানেই পার হয়েছিলেন। কিন্তু নদীর দুই তীর এখানে এত সুন্দর যে স্বভাবতই মানুষের ইচ্ছা হয় এপার থেকে পার হয়ে গিয়ে ও-পারের রহস্যভেদ করতে। নদীর ও-পারে প্রকাণ্ড একটা সেকেলে ধরণের কেল্লা মানুষের দৃষ্টি আরও আকর্ষণ করে। এপারে স্নানের ঘাটে অনেক মানুষ স্নান করছে। রেলপথটা নদীগর্ভ থেকে অনেক উঁচু বলে নদী কত বাঁক ঘুরে কত দূর থেকে আসছে তা প্রকাণ্ড সুন্দর রিলীফ ম্যাপের মত দেখা যায়। দেশটা এখানে এমন নূতন ধরণের যে দেখে সাধ মেটে না। কিন্তু দ্রুতগামী রেলগাড়ীতে ব'সে কত-টুকুই বা দেখা যায়? আরও কিছু পথ পরে কাবুল নদী।

খাইবার-গিরিসঙ্কট

বৈদিক নাম ছিল কুভা। এ নদী রেল-লাইনের ধার দিয়েই অনেক দূর চলেছে। লাইনের ধারেই সুন্দর ঝাউগাছে ঘেরা রাজপথ, তার ফাঁকে ফাঁকে দীর্ঘ পথ, নদী দেখা যাচ্ছে ছবির মত। এদিককার গাছপালা আমাদের পরিচিত ভারতবর্ষের গাছপালার থেকে অনেকটা অন্য রকম। অনেক গাছ বাগানের মত করে লাগানো। হয়ত কোনও ফলের চাষ। পরে কাশ্মীরে এই রকম ফলের চাষ দেখেছি।

এদেশে গ্রীষ্মকালে যত দীর্ঘক্ষণ সূর্য্যের আলো থাকে তেমন ইতিপূর্ব্বে কোথাও দেখি নি। সন্ধ্যা সাতটায় রোদ এত জোরালো যে সেদিকে তাকানো যায় না। পেশোয়ার কর্কটক্রান্তি-রেখার অনেক উত্তরে, সুতরাং এখানে গ্রীষ্মকালে দিন রাত্রের তুলনায় অনেক দীর্ঘ। আমরা বাংলা দেশের মানুষ এত দীর্ঘ দিন দেখতে অভ্যস্ত নই। আটটাতেও দিনের আলো স্পষ্ট! আমরা সেই সময় পেশোয়ার পৌছলাম। প্রথমে শহরের স্টেশন, তার পর ক্যাণ্টনমেণ্ট। শহরের পরই গাড়ী থেকে দেখা যায় সৈন্যদের ব্যারাক, খেলার মাঠ, গুলি ছোড়ার জায়গা, ড্রিল করার মাঠ, ঘোড়দৌড়ের মাঠ ইত্যাদি।

পেশোয়ার আজ আমাদের অচেনা অজানা, কিন্তু পাঁচ হাজার বৎসর আগেও এর সঙ্গে আমাদের যোগ ছিল। ধৃতরাষ্ট্র-মহিষী গান্ধারী ছিলেন এই পেশোয়ারের কন্যা। ব্রাহ্মণবীর পরশুরাম ছিলেন এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা এবং বৈয়াকরণ পাণিনি ছিলেন এই দেশের মানুষ।

আমরা আতিথ্যপরায়ণ শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে উঠেছিলাম। তিনি স্টেশন থেকে তাঁর ফোর্ট রোডের বাসা-বাড়ীতে আমাদের নিয়ে গেলেন। এদেশে গাছ প্রচুর, কাজেই সুন্দর বাগানে ঘেরা তাঁর বাড়ী। পেশোয়ারী প্রথায় মাটি দিয়েই তৈরি, কিন্তু বাংলার মত ধরণ, দেখলে পাকা বাড়ী মনে হয়। তিনি তখন সীমান্তপ্রদেশের কণ্ট্রোলার অব একাউণ্টস।

এখান থেকে ৩৫ মাইল দূরে ব্রিটিশ-রাজ্যের সীমানা, খাইবার পাসের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। প্রফুল্লবাবুর চেষ্টায় আমরা খুব সহজেই পাসপোর্ট পেলাম। আমাদের কাণ্ডারী হলেন তাঁর গৃহিণী শ্রীমতী মীরা চৌধুরী। যে-দেশে সারাক্ষণই মানুষ লুট হয়, সে দেশে থেকেও তাঁর সাহসের অভাব নেই। বহু পুরাকালে এই খাইবার পাস ছিল দুই সারি উচ্চ পাহাড়ের মাঝখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারার পাশ দিয়ে প্রাকৃতিক পথ। এখন সেখানে পাহাড় কেটে কেটে রেলপথ ও মোটরের পথ হয়েছে। তলায় একটি জলধারা উপলখণ্ডের ভিতর দিয়ে বরাবর চলেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এই উপলবহুল জলধারার গতি ধরে ধরে কত জাতির মানুষ ভারতবর্ষের উর্ব্বর সুবিস্তীর্ণ স্বর্ণভূমির সন্ধানে এসেছে।

পথের দুই ধারে এই দেশীয় উপজাতিদের (tribe-দের) ছোট ছোট গ্রামের মতন এলাকা মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। এগুলিকে গ্রাম বললে ঠিক বলা হয় না, এ যেন এক-একটা প্রকাণ্ড একান্নবর্ত্তী গোষ্ঠীর পাঁচিল-ঘেরা এলাকা। ঠিক চৌকোণা করে চারি দিকে উঁচু মাটির পাঁচিল দিয়েছে। ভিতরে যাবার একটি মাত্র দরজা, বোধ হয় তার পর মাঝখানে একটু উঠান আছে, আর দেয়ালের গায়ে গায়ে চার পাশে আগাগোড়াই মাটির ঘর, তার ছাদও মাটির। ঘরের উপর দিকে ছোট ছোট ফুটো, কারুর সঙ্গে ঝগড়া হ'লে ভিতরের লোক এইখান দিয়ে গুলি চালায়। এই রকম বাড়ীর অনেকগুলিতে চার দিকে চারটা মিনারের মত (watch-tower) আছে; সেখানে চ'ড়ে শত্রুদের

গতিবিধি দেখা যায়। এই সব লোকেরা বেশীর ভাগই আফ্রিদি, এরা আর্য্যবংশীয় ব'লে পরিচিত।

পথে দেখলাম অনেক মেয়ে একলাই কাঠের বোঝা-টোঝা মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে; ছোট ছোট সুন্দরী মেয়েরাও এই দুর্গম নির্জ্জন গিরিবর্ত্মে বেশ একলা চলেছে। শুনলাম পুরুষদের মধ্যে যতই ঝগড়া থাক, ওরা নাকি স্বজাতীয় অন্য গোষ্ঠীর মেয়েদের কেউ কিছু বলে না।

এখানকার ছোট ছেলেগুলো ভারি সুন্দর ও মিষ্টি দেখতে। লাল লাল ফোলা গাল আর ফরসা রং। নাক চোখ একটুও থ্যাবড়া নয়, বড় বড় নীল চোখ আর কাটা-ছাঁটা সুন্দর মুখ। ছোট মেয়েরা লাল ছিটের পায়জামা আর লাল পাঞ্জাবীর উপর ওড়না প'রে বেড়ায়, বড়রা বেশীর ভাগ জামা-কাপড় সবই কালো পরে। কেউ কেউ লাল পায়জামা আর কালো পাঞ্জাবী পরেছে। মেয়েদের বন্দুক নেই, কিন্তু পুরুষদের সকলেরই কাঁধে বন্দুক।

খাইবার-পাসে ঢোকবার মুখে একটা প্রাচীন মাটির কেল্লা পার হ'তে হয়। তার নাম জামরুদ ফোর্ট। এ বৎসরের নূতন আইনে এই জামরুদ ফোর্টের ওপারে যাত্রী ও পথিকদের যাওয়া বারণ। আমরা গত বছরের কথা বলছি।

এখানে পাসপোর্ট দেখাতে হয়। এখন খাইবার-পাসে প্রধানতঃ তিনটি পথ। একটি প্রাচীন ক্যারাভ্যানের পথ, সেই পথে সেকালের মত আজও উট, গাধা ও ঘোড়ার সারি পিঠে ফল শস্য ও অন্যান্য বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে কাবুল থেকে পেশোয়ারে সপ্তাহে দুই বার আসা-যাওয়া করে। এই পথটি মোটর-পথ থেকে অনেক উপরে। দ্বিতীয় পথটি আধুনিক মোটর-পথ; এ পথে ভারি ভারি মোটরবাস ও মোটর-লরি সর্ব্বদা যাতায়াত করে। জামরুদ ফোর্টেই এই পথের সুরক্ষিত দরজা। তৃতীয় পথ পেশোয়ার থেকে লান্ডিকোটাল পর্য্যন্ত রেলপথ, সৈন্যসামন্ত এক স্থান থেকে আর এক স্থানে চালান দেবার পক্ষে এই রেলপথ প্রচুর কাজে লাগে। শুনেছি এই ট্রেনও সপ্তাহে দু-বার যায়।

যাত্রী-বোঝাই 'বাস' এক রাজ্য হ'তে আর এক রাজ্যের সীমানা পার হবার সময় ১২৲ টাকা মাশুল দেয় এবং খালি
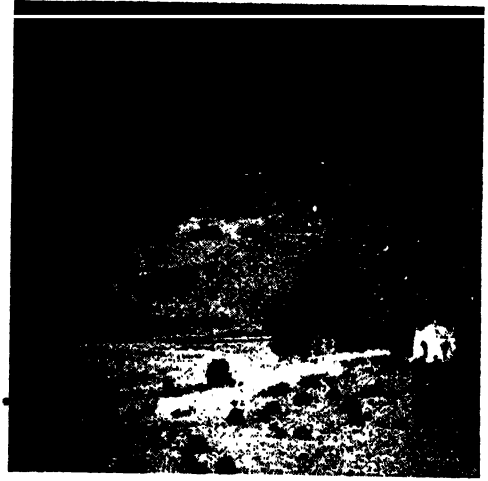
খাইবার-গিরিসঙ্কটের গহ্বরে আলি মসজিদ্

থাকলে দেয় ৪৲ টাকা। যে-সব মানুষ হেঁটে যায় তাদেরও নাকি মাথাপিছু এক টাকা দিতে হয়। এ সব শোনা কথা, সঠিক কিনা জানি না।

এই পথে যেতে যেতে অনেক জায়গায় পাহাড়-কাটা পরিত্যক্ত গুহা দেখা যায়, কোন কোনটাতে এখনও মনুষ্য-বসতির চিহ্ন আছে। প্রকৃতি যেখানে এমন সুবিশাল প্রাচীর গেঁথে রেখেছেন সেখানে তার ভিতর একটু গর্ত্ত কেটে মানুষের আশ্রয় গ'ড়ে নেওয়া খুবই সহজ।

খাইবার-পাসের ভিতর দিয়ে যাবার সময় দুই পাশের পাহাড়গুলিকে বড় নেড়া দেখায়। নেড়া মাথায় চৈতন-চুট্‌কির মত ছোট ছোট গুল্মের গুচ্ছ মাঝে মাঝে সাজানো, বড় গাছ কি মাঝারি গাছও চোখে পড়ে না। পথের মাঝে মাঝেই কাঠের দোকান রয়েছে। বোধ হয় এই সব কাঠ বহু দূর থেকে আনা। মেয়েরাও মাঝে মাঝে পাহাড় বেয়ে উঠছে মাথায় শুকনো কাঠের বোঝা নিয়ে; কোথা থেকে যে এ সব কাঠ কুড়িয়ে আনছে বোঝা যায় না। যেখানে যেখানে ইংরেজ সৈন্যদের ছাউনি, সেখানে দুই-চারিটা বড় গাছ দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলি সম্ভবতঃ তারাই লাগিয়েছে। পাহাড়ের অচল কঠিন স্তূপের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ যখন শ্রান্ত হয়ে যায়, তখন এই গাছগুলির ডালে ডালে ও পাতায় পাতায় আলো ও

খাইবার-গিরিসঙ্কটে বৌদ্ধ স্তূপ

বাতাসের নৃত্য মানুষের চোখগুলো আবার তাজা করে তোলে।

জামরুদ ফোর্ট পার হবার পর আর একটি ফোর্ট পার হলাম, সেটি আধুনিক, তার নাম সাগাই ফোর্ট। অনেক দূর পর্য্যন্ত খাইবার-পাসের ভিতরের এই অংশটিকে বলে আলি মসজিদ gorge (গিরিসঙ্কট)। এই গিরি-সঙ্কটের ভিতর সত্যই একটি ছোট মসজিদ আছে। তার চেহারা অত্যন্তই সাদাসিধা।

কিছু দূর গেলে একটি ক্যারাভ্যান-সরাই চোখে পড়ল। চৌকো সমতল একটি উঠানের চার পাশে পাহাড়ের গা ঘেঁষে প্রাচীর ও ছোট ছোট ঘর। ঘরগুলির ছাদে এলোমেলো হয়ে কতকগুলি খাটিয়া ধূলা জঞ্জালের মধ্যে পড়ে আছে। উট ঘোড়া ও গাধার পিঠে কাবুলী মেওয়া ইত্যাদি বোঝাই ক'রে যারা এই পথে যাওয়া-আসা করে তাদেরই বিশ্রামের জন্য এ সরাই। আমরা ফেরবার সময় দেখলাম অনেক উপরের পথ দিয়ে এক সারি ঘোড়া কাবুল থেকে পেশোয়ারের দিকে চলেছে।

খাইবার-পাসের ভিতরেও পাহাড়ের গায়ে চৌকা করে দেয়াল দিয়ে ঘেরা একান্নবর্ত্তী পরিবারের গোষ্ঠি-গৃহ মাঝে মাঝে দেখা যায়। এগুলিরও চার পাশে চারটি মিনারেট, এবং দেয়ালে বন্দুক ছুঁড়বার জন্য সারি সারি গর্ত্ত।

কঠিন পাহাড়ের বুকে মাঝে মাঝে পাথর-চাপা-দেওয়া গোরস্থান। প্রত্যেকটি সমাধির উপর একটি ক'রে বর্শার ফলার মত পাথর উর্দ্ধমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মৃতের স্মৃতিকে সকরুণ করবার জন্য কিংবা মৃত্যুর নির্দ্দয়তাকে ভোলবার জন্য কাশ্মীরবাসীদের মত এরা সমাধির উপর সারি সারি ফুলের গাছ বসিয়ে যায় না।

পথের ধারে এক জায়গায় পাহাড়ের চূড়ার উপর একটি পরিত্যক্ত বৌদ্ধ স্তূপ এই গিরিবর্ত্মের ভিতর বুদ্ধের মহিমা প্রচার করছে। শুনেছি Swat valley-র (স্বাত উপত্যকার) পথে কোথাও কোথাও পাহাড়ের গায়ে খোদিত বৌদ্ধমূর্ত্তি আছে। পেশোয়ার মিউজিয়মে রক্ষিত অনেক মূর্ত্তি এই ধরণের জায়গা থেকে সংগৃহীত।

খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট্ অশোক তাঁর শিলালিপি শাহাবাজগড়ি পর্ব্বতে উৎকীর্ণ করেন। সে সময়ে স্থানীয় লোকেরা ব্রাহ্মীলিপি পড়তে পারত না বলে এগুলি খরোষ্টি লিপিতে লেখেন। লিপির নামটির সার্থকতা এই পথে এলে অনুভব করা যায়, কারণ জীবজন্তুর মধ্যে খর ও উষ্ট্রেরই প্রাধান্য এখানে বেশী।

তখ্‌তীবাহী, শহরী বহলোল প্রভৃতি স্থানে প্রচুর বুদ্ধ-মূর্ত্তি ও স্তূপ এই দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সাক্ষ্য দেয়।

আমরা খাইবার-পাসের ব্রিটিশ সীমানা পর্য্যন্ত যাবার অনুমতি পেয়েছিলাম। সাধারণ দর্শকেরা সীমান্তের কিছু আগেই ফিরতে বাধ্য হন; কিন্তু আমাদের একেবারে শেষ সীমা পর্য্যন্ত যেতে দেওয়া হয়েছিল। এর কাছেই প্রকাণ্ড একটি উন্নতশীর্ষ গিরিশৃঙ্গ কালো পাথরের প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। বর্ষায় এর উপর দিয়ে অধুনালুপ্ত জলপ্রপাতের ধারার চিহ্ন রয়ে গিয়েছে; সাদা সাদা জলের রেখা দেখে বোঝা যায়।

সীমানার পর পথ দিয়ে আর এক পাও যাওয়া বারণ, কিন্তু পাহাড়ের উপর দিয়ে কিছু দূর হেঁটে যেতে দিল, কারণ সেই পাহাড়টি ব্রিটিশ সম্পত্তি। এখানে দাঁড়িয়ে দূর থেকে আফগান-সীমান্তের মাশুল আপিস ডাকঘর ইত্যাদি দেখলাম।

খাইবার-পাস থেকে ফিরে বিকালে ছয়টার সময় আমরা পেশোয়ারের বাজার দেখতে বেরোলাম এক জন

পেশোয়ারী সর্দারের গাড়ীতে। তখন ঠিক ছুপুর বেলার মত রোদ। বাজারটি বেশ দেখবার মত, আমাদের বাংলা দেশে এমন বাজার বোধ হয় কেউ দেখে নি। যেমন সরু রাস্তা, তেমনি গায়ে গায়ে ঠাসা বাড়ী, তেমনি অসংখ্য লোকের ভীড় আর তেমনি ধুলো আর মাছি। পথের মাঝে মাঝে বড় দরওয়াজা, তার ভিতর চক-মিলানো উঠোন, উঠোনের চার পাশ ঘিরে দোকান আর বাজার। কোন কোনটার পাশ দিয়ে সরু গলি বেরিয়ে গিয়েছে, কিন্তু তাতে গাড়ী ঢোকে না।

বাজারের রাস্তায় স্ত্রীলোক প্রায় চোখেই পড়ে না। ছুই-এক জন বোরখা-পরা এবং ছুই-এক জন মুখ-খোলা বৃদ্ধা দেখলাম আর সব পুরুষের ভীড়। পেশোয়ারে মুসলমানদের ত পর্দ্দা আছেই, হিন্দু মেয়েরাও খুব পর্দ্দা-নশীন, সম্ভ্রান্ত মহিলাদের ছবিও পুরুষদের দেখানো বারণ। পার্ব্বত্য আফ্রিদিদের কিন্তু ওসব বালাই নেই, বেশ একা একা মেয়েরা ঘুরে বেড়ায়।

বাজারে টাঙ্গাতে হঠাৎ একটি বৌ দেখলাম। তার পোষাকটি বেশ অভিনব; নীল পাজামার উপর আগা-গোড়া টাকার ছুগুণ মাপের রূপার ফুল ঠেসে বসানো, জামায় বুকের উপরও সেই রকম। মেয়েটি যেন রূপার বর্ম্ম পরেছে; বর্ম্মটি দেখতে বেশ সুন্দর, কিন্তু বোধ হয় মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গে বিঁধছিল। তার ফর্সা মুখটি দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে ঢাকা, মাথা নীচু ক'রে খোলা টাঙ্গায় ব'সে আছে।

বাজারে অনেক জায়গায় বোধ হয় সরবতের দোকানে বড় বড় মাখনের স্তূপের মত কি সাজানো রয়েছে; শুনলাম সেগুলি পাহাড়ের চূড়া থেকে সংগৃহীত তুষার-পিণ্ড। পেশোয়ার থেকে বরফে ঢাকা যে পাহাড় দেখা যায় তার নাম শুনলাম মিচ্‌নি খানা, হিন্দুকুশ পর্ব্বতের একটি চূড়া। এইখান থেকে বাজারে তুষারপিণ্ড আনে কিনা জানি না। তৈরি বরফের মত স্বচ্ছ এগুলি নয়, একেবারে ছুধের মত সাদা ধপধপে।

এদেশে কেনবার জিনিষ কাবুলী জুতো, কম্বল আর কার্পেট, তাছাড়া বোখারার রেশম ইত্যাদি। তামার বাসনে বাজার বোঝাই, বড় বড় ঘড়া হাঁড়ি থেকে গেলাস থালা বাটি সবই তামার। এদেশের সতরঞ্চি একটু নূতন

খাইবার-গিরিসঙ্কটে প্রস্তরফলকে ব্রিটিশ রেজিমেণ্টদের নাম

ধরণের। বাজারে সব চেয়ে বেশী চোখে পড়ে ফল। এত রকম ফল ও এত দোকানে ফল আর কখনও দেখি নি!

রাস্তা দিয়ে বিরাটকায় মহিষ গাড়ী টেনে নিয়ে যাচ্ছে এবং মাঝে মাঝে অন্য গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লাগাচ্ছে, কারণ পথ অত্যন্ত সরু। যোধপুরের কথা মনে পড়ে গেল; সেখানে দেখেছিলাম বাজারের সরু পার্ব্বত্য পথের বাঁকে বাঁকে উটে একায় ঘোড়সওয়ারে সারাক্ষণ ধাক্কাধাক্কি হচ্ছে। কোন্ বাঁকের আড়াল থেকে কে যে গলা বাড়িয়ে আসছে জানা যায় না। রাস্তার জন্য সেখানে লোকে ভাল গাড়ীতে চড়তে পায় না।

পেশোয়ারের বাজারের কাছেই মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহের আমলের একটি কাছারি বাড়ীতে ঢুকলাম। বাড়ীটি মাটির, তার উপর কাঠের কড়ি দিয়ে মাটির ছাদ। কাঠের সিঁড়ি চার-পাঁচ তলা উঠে গিয়েছে। ছাদের উপর থেকে সমস্ত পেশোয়ার দেখা যায়। চারি দিক দিয়ে পর্ব্বতমালা গোল হয়ে প্রাচীরের মত এই শহরটিকে ঘিরে ধরেছে, এটি যেন একটি ছুর্গ। এর কোন্ দিকে সোয়াট ভ্যালি (স্বাত উপত্যকা), কোন্ দিকে লাণ্ডিকোটাল, বান্নু, কান্দাহার, কোয়েটা আমাদের সঙ্গী ভদ্রলোক আঙুল বাড়িয়ে সব দেখাচ্ছিলেন। দূরে হিন্দুকুশের তুষারাবৃত চূড়া দেখা যাচ্ছিল।

পেশোয়ারে একটি মিউজিয়মও আছে। ছোট হলেও তাতে দ্রষ্টব্য অনেক। আমরা অতি অল্প সময়েও অনেক জিনিস দেখেছিলাম। গ্রীকরা এই গান্ধারের পথেই ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন, কাজেই এই গান্ধার দেশে গ্রীক-শিল্পের নমুনা অনেক এবং গান্ধারশিল্পে তার ছায়াও স্পষ্ট। মিউজিয়মে ভিনাস ও এপোলোর ধরণের মূর্তি অনেক, তাদের মুখ, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, গ্রীবাভঙ্গী সবই গ্রীক। এই অঞ্চলেই পাওয়া এট্‌লাসের মূর্তি ভারতবর্ষের মিউজিয়মে দেখে বিস্মিত হ'তে হয়।

অনেকগুলি বড় বড় বুদ্ধমূর্তি ঘরে ঢুকলেই চোখে পড়ে। গ্রীকরাজাদের যুগের ও কণিষ্কের যুগের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাগুলি ঐতিহাসিকদের কাজের পক্ষে মূল্যবান্‌। কারণ রাজা কণিষ্কের রাজধানী ছিল পুরুষপুরে অর্থাৎ পেশোয়ারে। খরোষ্ঠি শিলালিপিগুলিও খুব মূল্যবান্‌। কতকগুলি বড় বড় কাঠের মূর্তি মানুষের দৃষ্টি খুব আকর্ষণ করে। এগুলির গড়ন দেখলে একেবারে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মনে হয়। বাস্তবিক বহু প্রাচীন কিনা খোঁজ করি নি। কয়েকটি এক-মানুষ-উঁচু মূর্তি অশ্বারোহী, কয়েকটি শুধু খাড়া দাঁড়িয়ে। এগুলি কবরের উপর স্থাপিত থাকৃত লেখা রয়েছে। পেশোয়ারে এবং খাইবার-গিরিসঙ্কটের ভিতর অনেক গোরস্থান আছে। সেখানে প্রত্যেকটি গোরের উপর একটি ক'রে বাঁকা পাথর তলোয়ারের মত খাড়া হয়ে আছে, আর কোনও চিহ্ন নেই। দুই-চারিটির উপর একটা ক'রে চ্যাপ্টা ঢিপি আছে, অধিকাংশের উপর তাও নেই, কেবল পাথরের খাঁড়াটি। ঐ ঘোড়-সওয়ার কাঠের মূর্তিগুলি কোথাকার কবরের জানি না।

মিউজিয়মে প্রাচীন হাঁড়িকুড়ি, বাটখারা, অস্ত্রশস্ত্র ঢাল-তলোয়ার, বর্ম্ম ইত্যাদি যা আছে তার ভিতর কিছু কিছু খনন ক'রে পাওয়া।

এখন যেটা সম্পূর্ণরূপে মুসলমান দেশ সেখানে তিনটি প্রসিদ্ধ আর্য্য-সভ্যতার ধারা মিলিত হয়েছিল; হিন্দু ইরাণী ও গ্রীক এই তিনটি জাতির রক্ত এবং সভ্যতার সংমিশ্রণ যে এখানে হয়েছে তা মানুষের চেহারা এবং প্রাচীন শিল্প-নিদর্শন দেখে স্পষ্টই বোঝা যায়। শুনেছি এই ইন্দো-গ্রীক ও ইন্দো-ইরাণী শিল্পকলার বহু নিদর্শন সুদূর আফগানিস্থান ও বামিয়ান প্রভৃতি স্থানে ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা খননকার্য্য ও গবেষণার অধিকার পান বিতাড়িত রাজা আমানুল্লার অনুগ্রহে।

আমরা সেই রাত্রেই পেশোয়ার ছেড়ে রাওলপিণ্ডির ট্রেন ধরলাম। পরদিনই সকাল ৭॥০টায় আমাদের শ্রীনগর যাবার কথা।

শ্রীনগর থেকে ফেরবার পথে ঘণ্টা-কয়েক লাহোরে ছিলাম। অত অল্প সময়ে লাহোর কিছু মন্দ দেখা হয় নি। আমাদের বন্ধু অধ্যাপক সরোজেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় অল্প সময়ে যথাসম্ভব ঘুরিয়ে এনেছিলেন আমাদের; তাঁহার পত্নী শ্রীমতী শোভনা রায়ের আতিথ্যে আনন্দেই দিন কেটেছিল।

লাহোর শহরটি মস্ত। তবে পঞ্জাবের অন্যান্য বড় শহরের মত এটিও বোধ হয় খুব ছড়ান। এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় যেতে কয়েক মাইল পার হয়ে যেতে হয়। শহরের পুরানো দিকে আমরা বেশী যাই নি, নূতন দিকে স্কুল-কলেজ প্রভৃতির প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা বড় বড় সুন্দর বাড়ী। সরকারী রাস্তা খুব চওড়া, কলিকাতার কোনও রাস্তা এত চওড়া নয়; মাঝে মোটর ও অন্যান্য ভাল গাড়ীর পথ, দুই পাশে গরু মহিষ ও গো-যান প্রভৃতির কাঁচা মাটির পথ। পথের ধারে গাছ। চোখে দেখতে রাস্তাগুলি বেশ লাগে, কিন্তু নাসিকার পক্ষে এদেশের এমন বাদশাহী সড়কও বড় পীড়াদায়ক। সেদিন যত মাইল পথ আমরা ঘুরেছি সবই পচা পাকের তীব্র গন্ধে আমোদিত।

লাহোর এক সময় মোগল বাদশাহদের মস্ত একটি আড্ডা ছিল। ভারতবর্ষ জয় করবার পথে মুসলমান রাজারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ অতিক্রম করেই লাহোরের ঘাঁটি আগলে বসতেন। কাজেই তাঁদের আমলের অনেক জিনিস লাহোরে এখনও দেখতে পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীর বাদশাহ ও তাঁহার ইতিহাস-প্রসিদ্ধা সুন্দরী সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের সমাধি এই লাহোরেই। লাহোরেই জাহাঙ্গীরের প্রথম যৌবনের প্রেয়সী আনারকলির সমাধি।

এই আনারকলির নামে লাহোরে প্রকাণ্ড একটি পাড়া ও বাজার। যে তরুণীর নিষ্ঠুর মৃত্যুদণ্ডকে স্মরণ ক'রে এই বিরাট্ বাজার, বাজারের এক জন মানুষও আজ তাকে স্মরণ করে কি না সন্দেহ। আনারকলি ছিল একটি সুন্দরী বন্দিনী বালিকা। আকবর শাহের দরবারে তাকে নর্ত্তকী করা হয়। সে ডালিমফুলের মতই সুন্দর পেলব ও ছোট্ট ছিল। এই বালিকাকে যুবরাজ সেলিমের ভাল লেগে যায়। বালিকাও সম্ভবতঃ রাজকুমারকে ভালবেসে ফেলেছিল। আকবর শাহ তা জানতে পেরে দরবারে নৃত্যরতা আনারকলিকে রাজকুমারের দিকে সপ্রেম দৃষ্টিতে চেয়ে হাসতে দেখে তাকে জীবন্ত সমাধি দিবার আদেশ দেন। গল্প আছে, বাদশাহ হবার পর জাহাঙ্গীর এই সমাধিকে উদ্যান প্রভৃতি দিয়ে সুসজ্জিত করেন।

ভাগ্যচক্রের গতিতে জাহাঙ্গীর ও তাঁহার ভুবন-বিখ্যাত মহিষী নূরজাহানেরও মৃত্যু ও সমাধি এই লাহোর নগরেই হয়। জাহাঙ্গীরের সমাধিতে শাজাহানের স্থাপত্যের মত বিস্ময়কর কিছু নেই বটে, কিন্তু তবু মোগল বাদশাহদের সমাধির উপযুক্ত বিরাট্ চত্বর আঙ্গিনা চারি ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফটক, জ্যামিতির মাপে নিখুঁত করে সাজানো উদ্যান ইত্যাদি দেখলে এবং এক মোড় থেকে আর এক মোড় পর্য্যন্ত হাঁটতে শ্রান্ত হ'তে হয় বলে স্বভাবতই মানুষের মনে একটা সম্ভ্রমের সঞ্চার হয়।

কিন্তু ভারতেশ্বরী নূরজাহানের অযত্নে পরিত্যক্ত সমাধি-মন্দিরের দিকে চাইলে মন উদাস হয়ে যায়! ভারতের অধীশ্বরীর কিনা এই বিশ্রামস্থল! ছোট একটি চৌকো বাড়ীতে কয়েকটি ছোট ছোট খিলানের দরজা, মাথার উপর গম্বুজ নেই, আশেপাশে প্রাচীর ফটক মিনার কিছুই নেই, যেন কোনও গৃহস্থের পোড়ো বাড়ী! শোনা যায় পুরাকালে এর অনেক স্থান মর্ম্মরমণ্ডিত ছিল। কিন্তু শিখ-আমলের সময় এই সব মূল্যবান্ পাথরগুলি তারা খুলে নিয়ে গিয়েছে। লোকে বলে রণজিৎ সিংহের শুভ্র মর্ম্মরমণ্ডিত সমাধির অধিকাংশ প্রস্তরই রাজমহিষী নূরজাহানের সমাধি হ'তে সংগৃহীত। আধুনিক ভারত-সরকার যদি এই সমাধি-মন্দিরটিকে আর একটু সুন্দর ক'রে রাখেন তা হ'লে সে অর্থটা সম্পূর্ণ অপব্যয় হয় না।

নূরজাহান ও জাহাঙ্গীরের সমাধির নিকটে তাঁদের আত্মীয় আসফ খাঁর সমাধি-মন্দির। নূরজাহানের সমাধি অপেক্ষা এই সমাধি-মন্দিরটিও অনেক বড় এবং সুদৃশ্য। তবে দুটির কোনটিরই বিশেষ কিছু যত্ন নেই। প্রহরী, উদ্যানপালক অল্পস্বল্প যা আছে তা জাহাঙ্গীরের সমাধি-মন্দিরের জন্যই। এখানে কিছু কিছু দর্শক সর্ব্বদাই আসে বলেই বোধ হয় ফটকের সামনে ফল ইত্যাদির দোকান সাজানো।

লাহোরের মিউজিয়ম বেশ দেখবার মতন জিনিস। মিউজিয়মের ভিতর বাহির সবই সুন্দর। গহনার বাক্স যেমন গহনার মত সুন্দর হ'লে তবেই পরস্পরের শোভা বৃদ্ধি হয়, তেমনই মিউজিয়মের বাড়ী সুন্দর হ'লে ভিতর ও বাহির দুইয়েরই সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়।

লাহোরের মিউজিয়মে ঢুকতেই প্রথমে চোখে পড়ে কতকগুলি বড় বড় কাঠের দরজা ও অলিন্দ। এগুলি সবই খোদাইয়ের সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে শোভিত। ভারতবর্ষের অন্য যে কয়টি মিউজিয়ম দেখেছি তাতে এ রকম জিনিস দেখি নি।

এদেশের সূচিশিল্পের নমুনাও এখানে অনেক আছে। সেগুলি সযত্নে এমনভাবে রক্ষিত যে প্রত্যেকটিই দর্শকের চক্ষে পড়ে। শালের নমুনাও যথেষ্ট আছে।

মিউজিয়মে সচরাচর প্রাচীন চিত্রই বেশী থাকে, কিন্তু লাহোর মিউজিয়মে আধুনিক শিল্পীদেরও বহু চিত্র আছে। ভারতীয় চিত্রকলার নবজাগরণ যাঁদের চেষ্টায় হয়েছে সেই অবনীন্দ্র, গগনেন্দ্র ও নন্দলাল প্রভৃতির অনেকগুলি বিখ্যাত চিত্র এখানে আছে।

গান্ধারশিল্পের কিছু কিছু নিদর্শন আমরা পেশোয়ারে দেখেছি, কিন্তু তার যে-সব শ্রেষ্ঠ নিদর্শন চিত্রল, সোয়াট প্রভৃতিতে পাওয়া গিয়েছিল তার অধিকাংশই আছে লাহোর মিউজিয়মে। বিরাট্ বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি বৌদ্ধ সম্রাট্ কণিষ্কের যুগের গান্ধারশিল্পের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

কণিষ্কের পরবর্ত্তী যুগের আরও যে-সকল মূর্ত্তি এঁরা

সংগ্রহ করেছেন সেগুলিও শিল্প-নিদর্শন হিসাবে উচ্চ শ্রেণীর জিনিস। এগুলিকে এঁরা যুগের পর যুগ হিসাবে ও শিল্পনীতি অনুসারে এমন সুন্দর ভাবে সাজিয়েছেন যে দেখলে সহজেই দর্শক বৌদ্ধশিল্পের বিকাশের ধারণা করতে পারেন। এ ছাড়া জাতক প্রভৃতি প্রস্তর-চিত্র (relief)-গুলি বইয়ের পাতার মত সাজানো আছে, যেন দেখে মানুষ বই পড়ার মত গল্পগুলি বুঝতে পারে। এখানে (সম্ভবতঃ) বৌদ্ধ মাতৃমূর্ত্তি হারীতির অনেকগুলি মূর্ত্তি আছে।

মোটের উপর এই মিউজিয়মটি ভিতরে বাহিরে সৌন্দর্য্য ও শৃঙ্খলার এমন একটি ছাপ মানুষের মনে দেয় যে এঁকে সহজে ভোলা যায় না।

শিখ গুরু ও নেতাদের এখানে অনেক প্রতিকৃতি আছে। শিখ-সম্প্রদায়ের এত ছবি অন্য কোথাও দেখা যায় না। তাঁদের কর্ত্তব্য এগুলির একটি এলবাম সাধারণের জন্য প্রকাশ করা।

এই সময়ে লাহোরে রণজিৎ সিংহের শতবার্ষিকী উৎসব চলছিল। মন্দিরে ভজনগান ও তীর্থযাত্রীদের ভীড় আমরা দেখে এলাম। এই সময় স্বভাবতই শিখ-নেতাদের কথা মনে হয়। তাই মিউজিয়মে ছবিগুলি বিশেষ করে চোখে লেগেছিল। জাপানে দেখেছি সব মিউজিয়ম ও মন্দিরে ছবির পোষ্টকার্ড পাওয়া যায়। আমাদের দেশের ভাল ছবির প্রতিলিপি পোষ্টকার্ড, ক্যাটালগ কি বিবরণী কিছুই নেই এটা বড় দুঃখের বিষয়। এদিকে মিউজিয়মের কর্ত্তাদের মন দেওয়া দরকার।

[এই প্রবন্ধে মুদ্রিত ফটোগ্রাফগুলি শ্রীযুক্তা মীরা চৌধুরী কর্ত্তৃক গৃহীত]

কীটপতঙ্গের লুকোচুরি

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শিয়াল, সজারু, অপোসম প্রভৃতি জানোয়ারেরা শত্রু-হস্তে লাঞ্ছিত হইলে আত্মরক্ষার্থ যেমন মৃতের মত ভান করিয়া পড়িয়া থাকে এবং সুযোগ বুঝিলেই ছুটিয়া পলায়ন করে, নিম্নশ্রেণীর কীটপতঙ্গের মধ্যে অহরহই এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ধরিবামাত্রই ফড়িং প্রবল বেগে ডানা নাড়িয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টার পর, শত্রুর হস্ত হইতে কোনক্রমে নিস্তার লাভের উপায় না দেখিলে মৃতের মত ভান করিয়া অসাড় ভাবে পড়িয়া থাকে। মনে হইবে যেন মরিয়া দেহটা শক্ত হইয়া গিয়াছে। তখন সেটাকে ধরিয়া রাখিবার কথা কাহারও মনে উদয় হয় না। ছাড়া পাইবার পর কিছুক্ষণ মৃতের মত পড়িয়া থাকিয়া হঠাৎ চক্ষের নিমেষে উড়িয়া পলায়ন করে। ফড়িংকে মাকড়সার জালে পড়িতে দেখিয়াছেন কি? না দেখিয়া থাকিলে একটা ফড়িং ধরিয়া মাকড়সার জালের উপর ছুড়িয়া দিন। ছুড়িয়া দিলেই ফড়িংটা জালের আঠায় আটকাইয়া যাইবে। আর সঙ্গে সঙ্গেই পলায়ন করিবার জন্য প্রাণপণে ঝাপটাঝাপটি সুরু করিয়া দিবে। ফড়িংটা যদি আকারে বেশ বড় হয় তবে দেখিবেন—মাকড়সাটা ভয়ে জালের এক প্রান্তে গিয়া লুকাইয়া রহিল। প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া ফড়িংটা যখন বুঝিতে পারে আর মুক্ত হইবার উপায় নাই তখন সে শিকারীর কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য অন্য রকম উপায় অবলম্বন করে। সে মড়ার মত চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। দশ-পনর মিনিট কাটিয়া যায়—কোনরকম নড়াচড়া নাই। এদিকে মাকড়সা জাল হইতে বহুদূরে আত্মগোপন করিয়া ওৎ পাতিয়া রহিয়াছে। নড়াচড়া বন্ধ হইবার অনেকক্ষণ পর যখন বুঝিতে পারে শিকার নিশ্চয়ই নিস্তেজ

হইয়া পড়িয়াছে তখন ধীরে ধীরে জালের সুতা বাহিয়া ফড়িংটার কাছে উপস্থিত হয়। কিন্তু শিকার যে মোটেই নড়ে না! মাকড়সাদের এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায়—ইহারা মৃত দেহ আহার করে না। মৃত কীটপতঙ্গ জালে ফেলিয়া দিলে হয় জাল ঝাড়িয়া নয় তো জাল কাটিয়া অবসরমত সেটাকে ফেলিয়া দেয়। বিভিন্ন জাতের অধিকাংশ মাকড়সারই সাধারণতঃ এই রীতি। অবশ্য অনেক দিন উপবাসী থাকিলে কদাচিৎ কোন কোন ক্ষেত্রে এ রীতির বিরুদ্ধাচরণ যে না দেখা যায় এমন নহে। যাহা হউক, মৃত মনে করিয়া মাকড়সাটা অসাড় ফড়িংটার কাছে বসিয়া সময় সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়। কিন্তু ফড়িংটা স্বভাবের তাড়নায়ই হউক বা অনেকক্ষণ একভাবে থাকায় অস্বস্তির দরুনই হউক একটু গা ঝাড়া দিতেই মাকড়সা ছুটিয়া গিয়া তাহার ঘাড় কামড়াইয়া ধরে এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরের পশ্চাদ্ভাগ হইতে ফিতার মত সুতা বাহির করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ফেলে। ফড়িংটা যদি আরও কিছুক্ষণ ঐ ভাবে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিত তবে মাকড়সা তাহাকে সত্য সত্যই মৃত মনে করিয়া জাল কাটিয়া ফেলিয়া দিত। শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে মাকড়সারাও কিন্তু মৃতের মত ভান করিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়া থাকে। ছুটাছুটি করিয়াও শত্রুর হস্ত হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে তাহাকে বিভ্রান্ত করিবার উদ্দেশ্যে হাত-পা গুটাইয়া ক্ষুদ্র এক ডেলা ঝুল বা ঐরূপ কোন অকিঞ্চিৎকর পদার্থের মত নিস্পন্দভাবে পড়িয়া থাকে। শত উত্যক্ত করিলেও এই অবস্থায় পলায়নের চেষ্টা করে না। কতকটা যেন কচ্ছপের মত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মাকড়সা বলিয়া কোনক্রমেই চিনিতে পারা যায় না। চোখের সামনে থাকিলেও তাহাকে তখন খুঁজিয়া বাহির করা দুষ্কর হইয়া পড়ে।

কমা-প্রজাপতি নামে অদ্ভুত আকৃতির প্রজাপতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের অনুকরণ-শক্তিও অদ্ভুত। ইহাদের ডানাগুলি যেন স্বভাবতই ছিন্নবিচ্ছিন্ন। ডানা মুড়িয়া পত্র-পল্লবের উপর বসিলে গাছের ছিন্নপত্র ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। কোন্ জাতীয় শত্রুর ভয়ে ইহারা এরূপ লুকোচুরি খেলিয়া থাকে তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

গাছের ডালে কাঠপোকার বাচ্চা গুটি বাঁধিয়াছে। এই গাছের ফলগুলি দেখিতে এই পোকার গুটির মত—শত্রু সহজে বুঝিতে পারে না এগুলি গাছের ফল, কি পোকার গুটি।

আমাদের দেশে কয়েক জাতের সুতলি পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা মথজাতীয় প্রজাপতির বাচ্চা। গাছের পাতা খাইয়াই ইহারা জীবন ধারণ করে। সুতলি পোকার শরীরের মধ্যদেশে পায়ের অস্তিত্ব নাই। দেহের সম্মুখভাগে এবং পশ্চাদ্ভাগে পাগুলি অবস্থিত। এই জন্যই ইহারা জোঁকের মত চলাফেরা করে। যে-গাছে সুতলি পোকা বিচরণ করে তাহার রং এবং সুতলি পোকার শরীরের রং দেখিতে প্রায় একই রকমের। কাজেই বর্ণ-সামঞ্জস্যে বিভ্রান্ত হইয়া শত্রুরা অনেক সময়েই প্রতারিত হইয়া থাকে। চড়ুই প্রভৃতি পাখীরা ইহাদের পরম শত্রু। এই শত্রুদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য ইহারা আর এক প্রকার অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। সরু সরু ডালের গায়ে পশ্চাদ্ভাগের পা আটকাইয়া শরীরটাকে কাঠির মত বাহিরের দিকে প্রসারিত করিয়া দেয় এবং এই অবস্থায় সারা দিন নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। দেখিয়া মনে হয় যেন ডালের গায়ে একটি পত্রশূন্য বোঁটা
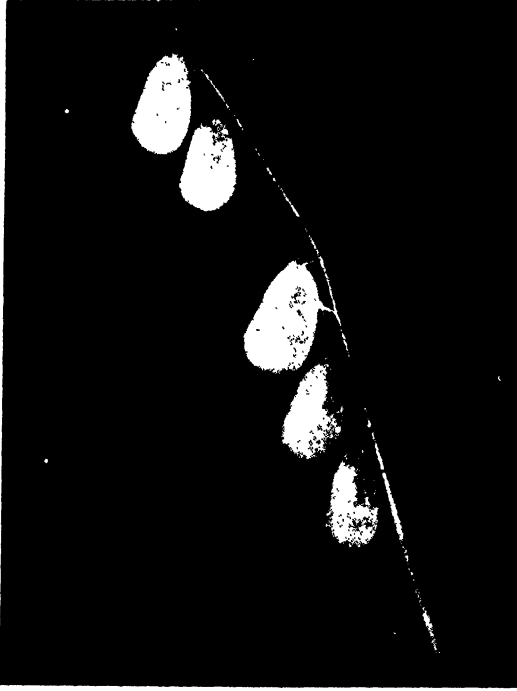
শত্রুর নজর এড়াইবার জন্য ফ্লাটা নামক পতঙ্গের বাচ্চা সরু ডালের গায়ে গুটি বাঁধিয়া থাকে—দেখিলে পাতা বা ফল মনে হয়।

লাগিয়া রহিয়াছে। পাখীদের ভয়ে সারাদিন এ ভাবে থাকিয়া রাত্রিবেলায় আহারান্বেষণে বহির্গত হয়। শত্রুর নিকট এই চাতুরী ধরা পড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ ডালের গায়ে সুতা আঁটিয়া মাকড়সার মত নীচে ঝুলিয়া পড়ে। ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে সুতার প্রান্তে কাঠির মত সুতলি পোকা ঝুলিতেছে - একটু লক্ষ্য করিলে অনেকেই এ দৃশ্য দেখিতে পাইবেন। এক জাতের সুতলি পোকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা যে-গাছের পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে, দিনের বেলায় সেই গাছের ডাল আঁকড়াইয়া নীচের দিকে ঝুলিয়া থাকে। মনে হয় যেন সরু সরু লাঠির মত কতকগুলি ফল ঝুলিতেছে। এক একটা পল্লবের নিকটবর্ত্তী ডাল হইতে এইরূপ অসংখ্য পোকা ঝুলিতে দেখা যায়।

শরীরের পশ্চাদ্ভাগে শুঁড়ওয়ালা সবুজ রঙের এক জাতীয় মথ-প্রজাপতির বাচ্চা পাখীদের অতি উপাদেয় খাদ্য। ইহারাও গাছের পাতা খাইয়া শরীর পোষণ করে। দিনের আলো বাড়িয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহারা খাওয়া বন্ধ করে এবং একটা পাতা যত দূর খাওয়া হইয়া গিয়াছে তাহারই সন্নিকটে মাথা উঁচু করিয়া একপ্রকার অদ্ভুত ভঙ্গীতে বসিয়া থাকে। দেখিয়া স্বভাবতই মনে হয় যেন বোঁটার গায়ে একটি কুঁড়ি গজাইয়া উঠিয়াছে। শত্রুর দৃষ্টি এড়াইবার ইহাই তাহাদের প্রধান ফন্দী।

কীটপতঙ্গেরা সাধারণতঃ ডিম পাড়িয়াই খালাস, বাচ্চাদের কোন খোঁজখবর লয় না। দুর্ব্বল ও অসহায় হইলেও, নিজেরাই তাহাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। এই আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় তাহারা যে কত রকম অদ্ভুত কৌশল ও অনুকরণশক্তির পরিচয় দিয়া থাকে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমাদের দেশীয় রক্ততিলক-প্রজাপতির বাচ্চারা পুত্তলি-অবস্থায় নিরাপদে কাটাইবার জন্য এমন এক অদ্ভুত আকৃতি পরিগ্রহ করে যে তাহাদিগকে দেখিলেই যেন একটা বিতৃষ্ণার ভাব উদয় হয়, তাহার কাছে ঘেঁসিতেই প্রবৃত্তি হয় না। কাঠ-পোকারা (কতকটা ক্ষুদ্রকায় গুবরে পোকার মত দেখিতে) গাছের গায়ে ডিম পাড়িয়া তাহার আর কোন খোঁজখবর নেয় না। ডিম হইতে বাচ্চা ফুটিয়া গাছের গায়েই অবস্থান করে। পাখীরা ইহাদের ভীষণ শত্রু। গুটি বাঁধিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিবার সময় সহজেই শত্রুর কবলে পড়িতে পারে—এই ভয়ে সেই গাছের ফলের অনুকরণে গুটি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে নিশ্চিন্ত ভাবে অবস্থান করে। ইহাদের শত্রুরা, এমন কি মানুষেরাও, সহজে বুঝিতে পারে না যে, সেগুলি গাছের ফল কি পোকার গুটি। ফ্লাটা নামক এক জাতের পতঙ্গের বাচ্চা শত্রুর নজর এড়াইবার জন্য পত্রশূন্য সরু ডালের গায়ে পর পর গুটি নির্ম্মাণ করিয়া শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে। দেখিয়া ডালের পাতা বা বোঁটায় ঝুলানো ফল বলিয়া মনে হয়। নিম্নশ্রেণীর কীটপতঙ্গের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহারা তাহাদের দেহের রং ও শরীরের অদ্ভুত আকৃতির সাহায্যে অপরকে বিভ্রান্ত করিয়া আহার সংগ্রহ ও আত্মরক্ষা এই উভয়বিধ ব্যবস্থাই করিয়া

লইয়াছে। আমাদের দেশের নালা-ডোবা-পুকুরে জলজ লতাপাতার মধ্যে কাঠির মত ধূসর রঙের একপ্রকার পোকা বোধ হয় সকলেরই নজরে পড়িয়াছে। ইহারা জলজ ঘাসের মধ্যে নীচের দিকে মুখ করিয়া হাত-পা ছড়াইয়া ডালপালা-সংযুক্ত একটি তৃণখণ্ডের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চল ভাবে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। গায়ের রং এবং চেহারা দেখিয়া অন্যের তো দূরের কথা মানুষেরাই বুঝিতে পারে না যে সেটা একটা প্রাণী কিংবা মৃত ঘাস। ছোট ছোট মাছ ও জলপোকারা ঘুরিতে ঘুরিতে নিশ্চিন্ত মনে তাহার নিকটস্থ হইবামাত্রই চক্ষের নিমেষে কোন একটাকে ধরিয়া ফেলে। ইহারা উভচর প্রাণী, তবে দিনের আলোতে ডাঙায় থাকিতে চাহে না। ডাঙায় ছাড়িয়া দিলেই শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে মনে করিয়া হাত-পা লম্বালম্বি ভাবে গুটাইয়া ঠিক মৃতের মত পড়িয়া থাকে। কিছুক্ষণ পরেই উঠিয়া মাকড়সার মত লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া জলের দিকে অগ্রসর হয়। আমাদের দেশে গাছপালার উপরেও কয়েক জাতীয় কাঠি-পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সম্পূর্ণ রূপে স্থলচর। কিন্তু ইহাদের শিকার ধরিবার ও আত্মরক্ষা করিবার কৌশল সম্পূর্ণ জল-কাঠির ন্যায়।

আমাদের দেশের খাল-বিল-ডোবা প্রভৃতি জলাশয়ের ধারে ছোট ছোট ঝোপের মধ্যে একরকম কাঠি-মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা শয়ানভাবে জাল পাতিয়া শত্রুর দৃষ্টি এড়াইবার জন্য অথবা শিকারকে ধোঁকা দিবার জন্য পাগুলিকে উভয় দিকে একত্র ভাবে প্রসারিত করিয়া ঠিক একটি কাঠির মত জালের সূতা অথবা পাতার গায়ে লাগিয়া থাকে। জানা না থাকিলে কিছুতেই বুঝিবার উপায় নাই যে, সেটা একটা কাঠি কিংবা মাকড়সা। শিকার জালে পড়িবামাত্র হাত-পা ছড়াইয়া ছুটিয়া গিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। শিকারকে আয়ত্ত করিয়া আবার ঠিক পূর্ব্বের মত-পা প্রসারিত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ধীরে ধীরে তাহাকে উদরস্থ করিতে থাকে।

আমাদের দেশে গাঁদা, ডালিয়া, সূর্য্যমুখী প্রভৃতি ফুলের পাপড়ির মধ্যে সাদা, হলুদ বা সবুজাভ এক প্রকার সুদৃশ্য মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের চালচলন কতকটা কাঁকড়ার মত বলিয়া ইহাদিগকে কাঁকড়া-মাকড়সা
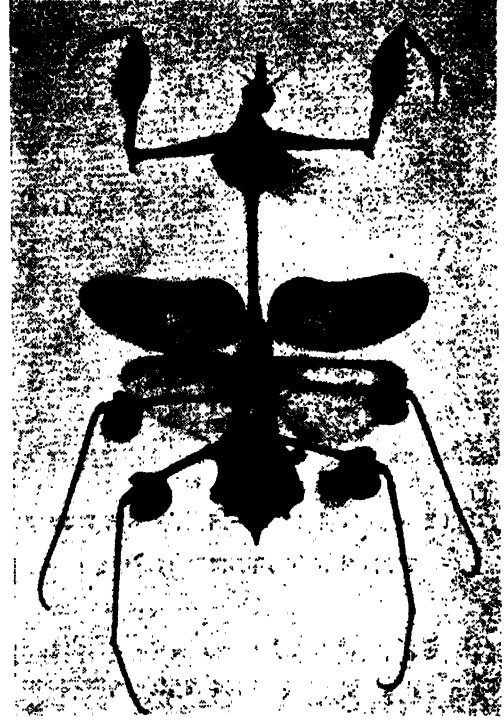
দক্ষিণ-ভারতের গঙ্গাফড়িং। অর্কিড ফুল মনে করিয়া কীটপতঙ্গ কাছে আসিলেই ধরিয়া ফেলে।

বলা হয়। ফুলের রং অনুযায়ী ইহাদের দেহের রঙেরও পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট পাখী ও কুমোরে-পোকারা ইহাদের পরম শত্রু। সর্ব্বদাই এক স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে বলিয়া এবং ফুলের রঙের সঙ্গে দেহের রং মিলিয়া যাওয়ায় শত্রুরা ইহাদিগকে সহজে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না। তাছাড়া এরূপ লুকোচুরির ফলে নিরীহ পোকামাকড়েরা মধুর লোভে নির্ভাবনায় ফুলের উপর উপবেশন করিবামাত্রই ইহাদের কবলে পতিত হয়। ইহাদের জীবনযাত্রাপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিবার সময় আমি বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা শিকারের আশায় একই স্থানে নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিয়াছে। কীটপতঙ্গ ফুলের উপর বসিবামাত্রই চক্ষের নিমেষে তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে। শিকার অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী হইলে ধরা পড়িয়াও সময় সময় উড়িয়া পলায়। শিকার পলায়ন করিবার সময় হয়ত সম্মুখের পা দুখানা উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় ঠিক সেই
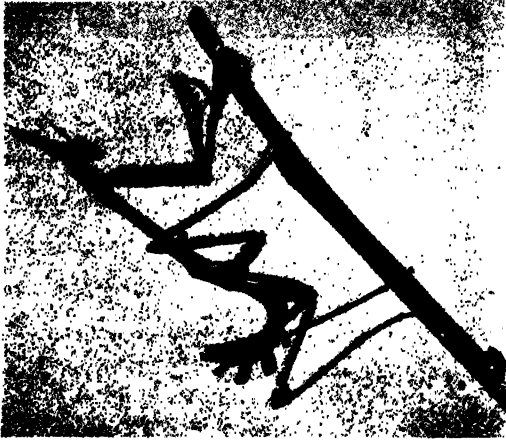
বিচিত্র আকৃতির গঙ্গাফড়িং—শিকারের আশায় শুকনো ডালের গায়ে নিশ্চলভাবে বসিয়া আছে।

ভাবেই উর্দ্ধপদ হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিবে। একটু নড়িয়া বসিয়া পা দুখানাকে স্বস্থানে গুটাইয়া রাখিবে না।

পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতের হাজার হাজার মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি জাতের অনুকরণশক্তির কথা শুনিলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া থাকিতে হয়। এ পর্য্যন্ত কলিকাতা ও তাহার আশে-পাশে বিভিন্ন স্থান হইতে আমি প্রায় ছাব্বিশ রকমের বিভিন্ন আকৃতির অনুকরণকারী পিঁপড়ে-মাকড়সা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমার মনে হয় যত রকমের পিপীলিকা আমরা দেখিতে পাই তাহাদের প্রায় প্রত্যেকেরই অনুকরণকারী পিঁপড়ে-মাকড়সার অস্তিত্ব রহিয়াছে। আমাদের দেশীয় দুর্দ্ধর্ষ নালসো বা লাল-পিঁপড়েকে অন্ততঃ তিন জাতের বিভিন্ন মাকড়সা অনুকরণ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে দুই জাতের মাকড়সা লাল পিঁপড়ে খাইয়া জীবন ধারণ করে। পিঁপড়ে ধরিবার জন্যই ঐ দুই জাতের অনুকরণকারী মাকড়সা এই কৌশলের আশ্রয় লইয়াছে। ডেঁয়ো পিঁপড়ের অনুকরণ-কারী চার জাতের মাকড়সাকে কলিকাতা ও তাহার আশেপাশে বিচরণ করিতে দেখা যায়। শত্রুর কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্যই ইহাদের অনেকে এই অনুকরণবৃত্তির আশ্রয় লইয়াছে। কেবল এক জাতের মাকড়সা এই অনুকরণ-ক্ষমতাকে দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে কাজে লাগাইয়াছে। ইহারা প্রধানতঃ ডেঁয়ো পিঁপড়ে খাইয়াই জীবন ধারণ করে। ডেঁয়ো-পিঁপড়েরা নিজেদের সঙ্গী বলিয়া ভুল করিয়া ইহাদের কাছে আসিলেই তাহারা তিন-চার জনে মিলিয়া তাহাকে কাবু করিয়া ফেলে।

লঙ্কাদ্বীপে পাতার ন্যায় ডানাওয়ালা এক প্রকার গঙ্গা-ফড়িং দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ডানা দেখিতে ঠিক চওড়া একটা পাতার মত শিরতোলা। শিকার অন্বেষণে ইহারা পাতার উপরই বিচরণ করে এবং প্রায়ই শিকারের প্রতীক্ষায় এক স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কীটপতঙ্গেরা ইহাকে পাতা মনে করিয়া নিকটস্থ হইলেই আর রক্ষা নাই। সাঁড়াশীর মত সম্মুখস্থ একজোড়া দাঁড়ার সাহায্যে তাহাকে চাপিয়া ধরে। পাখীরা ইহাদের স্বাভাবিক শত্রু। কিন্তু প্রায়ই তাহারা ইহাদিগকে পাতা মনে করিয়া প্রতারিত হইয়া থাকে। দক্ষিণ-ভারতের গঙ্গিলাস নামক গঙ্গাফড়িঙের আকৃতি অতি অদ্ভুত। দেখিতে ঠিক এক-একটি অর্কিড ফুলের মত। যেমন রং তেমনই গঠন, পাতার গায়ে পিছনের পা আটকাইয়া মুখ নীচু করিয়া ঝুলিয়া থাকে। ফুল মনে করিয়া ছোট ছোট কীটপতঙ্গেরা নিকটে আসিবামাত্রই ধরিয়া উদর পূর্ত্তি করে। ফুল মনে করিয়া পাখীরাও ইহাদিগকে আক্রমণ করে না।
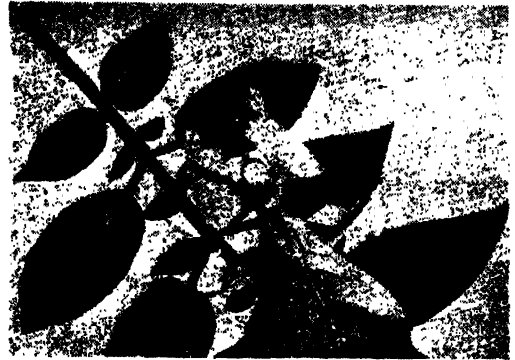
পাতা-গঙ্গাফড়িং শিকার ধরিবার আশায় পাতার সঙ্গে মিশিয়া আছে।

শুষ্ক ডাল অথবা লতাপাতার গায়ে আর একপ্রকার অদ্ভুত গঙ্গাফড়িং দেখিতে পাওয়া যায়। শিকারান্বেষণে যখন ইহারা সরু সরু ডালের গাত্রসংলগ্ন হইয়া অবস্থান করে তখন ইহাদিগকে শুষ্ক তৃণখণ্ড ছাড়া আর কিছুই মনে করা যায় না। ইহাদের এই অদ্ভুত আকৃতিতে প্রতারিত হইয়া ছোট ছোট কীটপতঙ্গেরা উপবেশন করিবার নিমিত্ত নিকটে উপস্থিত হইলেই অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়া জীবনলীলা শেষ করে।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর কৃতি

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেব, এম. এ.

"বাঙ্গালী নব্য ভারতের স্রষ্টা।...সে সর্ব্বস্থানেই আছে, সে অপরিহার্য্য।...ভারতীয়েরা তাহাদের জনসাধারণের জন্ত যাহা করিয়াছে তাহা আধুনিক ভারতেতিহাসের এক অ-লিখিত অধ্যায়। এবং এই স্মরণীয় অধ্যায়ের প্রধান অংশ বাংলার ভাগেই পড়িয়াছে।"*

শুধু ব্রিটিশ ভারতে নহে, বহু দেশী রাজ্যেও বাঙ্গালীর কৃতিত্ব আছে।

সেই বাঙ্গালী কেবল আজ নিজ বাসভূমেই 'পরবাসী' নহে, কিন্তু যে-সকল প্রদেশে সে সম্মানের সহিত বন্ধুভাবে শতাধিক বৎসরাবধি বসবাস করিয়াছে, আজ সেখান হইতে তাহাকে "খেদাইতে" পারিলে সে-প্রদেশবাসীরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। তাহারা এখন মনে করে আমাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে আসিয়াছে ইহারা। ইহা নিজেদের হীনতাবোধের ('inferiority complex'-এর) প্রতিক্রিয়া নহে কি? কিন্তু "British India without the Bengali is impossible," "বাঙ্গালীকে বাদ দিয়া ব্রিটিশ ভারত অসম্ভব।" ব্রিটিশ ভারত কেন, দেশী ভারতও বাঙ্গালী না হইলে যে চলে না। তাহারা ভুলিয়া যায়, এই অভিশপ্ত জাতিই ভাগ্যান্বেষণ করিতে আসিয়া বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, বর্ম্মা, রাজপুতানা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মহীশূর ও সুদূর হিমালয়ের উচ্চশিখরেও শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম্ম ও সভ্যতার আলোক বিস্তার করিয়াছে; কত কুসংস্কার দূর করিয়াছে, কত অহিতকর প্রথার উচ্ছেদ সাধনে সহায়তা করিয়াছে, কত আতুরের সেবা করিয়াছে, কত দুর্ভিক্ষপীড়িতের মুখে অন্ন দিয়াছে।*

পাল ও সেন বংশের বহু নৃপতি যখন অনেক দেশ জয় করিয়াছিলেন, তখন বহু বাঙ্গালী হিমালয় প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সিমলা ও কাশ্মীরের মধ্যবর্ত্তী সুকেত, কেঁওথাল, কাংড়া, কিশনাবর প্রভৃতির রাজবংশ এবং তথাকার সাধারণ অধিবাসী অনেকেই সেই সকল বাঙ্গালীর বংশধর। শেরিং সাহেব তাঁহার "Hindu Tribes and Castes"এ ইহা বলিয়াছেন ও তাহারাও এ-কথা স্বীকার করে।

বাঙ্গালীরা এক কালে ভারতের অনেক প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ভারতে ঔপনিবেশকতায় সেই সর্ব্বপ্রধান।

পঞ্জাবের গৌড় ব্রাহ্মণরা বাঙ্গলা দেশ হইতে গিয়াছিল। দিল্লী, বরেলী, বিজনোর ইত্যাদির "গৌড়-তগা" ব্রাহ্মণেরা এককালে বাঙ্গালী ছিলেন। বর্ত্তমান তামিল জাতি তাম্রলিপ্তির সমুদ্রকূলবাসী বাঙ্গালীদের বংশধর বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। তামিলদিগের ভাষায় বহু বাঙ্গলা শব্দ পাওয়া যায়। কাশী ও মির্জাপুরে কিছু গৌড় কায়স্থ পাওয়া যায়। তাহারাও এক কালে বাঙ্গলার অধিবাসী ছিল।

* The Bengalee is the maker of new India... British India without the Bengali is impossible. He is ubiquitous and indispensable... An unwritten chapter in the history of Modern India is the record of what has been done for the people by men of Indian race, and in that record a commanding share has fallen to Bengal"—Extract from a Report of the Special Commissioner deputed by the "London Daily News" in 1908.

* শিক্ষিত পাঞ্জাবীগণের সমাজে বহু কুৎসিত আচার প্রচলিত ছিল। স্বর্গত অবিনাশ মজুমদার মহাশয়ের অবিরাম চেষ্টায় উহার অনেক সংশোধন হইয়াছে। তাঁহার "Purity Servant" পত্রিকা পাঞ্জাবে সুনীতি প্রবর্ত্তনের যন্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল। অবিনাশ বাবুরই চেষ্টায় ১৯০৭ সালে এলাহাবাদের অনশন পীড়িতদের জন্য করাচীর একেশ্বরবাদী সম্মেলন ৩০০০৲ টাকা দান করেন। অনাথদের ভরণপোষণ, অনশনক্লিষ্টদের অন্নদান তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। ঐরূপ উদাহরণ আরও কত আছে, তাহা পাঠকরা সংগ্রহ করিয়া দিবেন।

এক কালে বঙ্গের শিল্পজাত দ্রব্য বহু দেশের শিল্পকে পরাস্ত করিয়াছিল। এই সকল দ্রব্য লইয়া বাঙ্গালী সওদাগরগণ গ্রীস, রোম, মিশর, পারস্য ও তুরস্ক দেশে যাতায়াত করিত।

মাদ্রাজের নামবুদ্রী ব্রাহ্মণদের বহু আচারব্যবহার বাঙ্গালীদের মত। আমার বন্ধু হায় ব্বাদের অমৃতলাল শীল বলেন, তাহারা বিজয়ের সিংহল-যাত্রার সময় তাঁহার সহিত বাঙ্গলা দেশ হইতে আসিয়াছিল।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, বাঙ্গালীরা নেপালে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। পরবর্তীয়া ভাষা অনেকটা বাঙ্গলার মত।

বাঙ্গালীরা তিব্বত, বর্ম্মা, সিংহল, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বোরনীও, বালী, শ্যাম, চীন, জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল; ঐ সকল স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল; হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল। এ-সকল পুরাতন কথা। ইহার কাহিনী ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হইতেছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙালীর নানা কৃতির ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই। ক্রমশঃ লোকে উহা ভুলিয়া যাইতেছে।

অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা নিজের বাসভূমি ছাড়িয়া দেশ-বিদেশে যায় কেবল টাকা রোজগার করিবার জন্য। বিহারের কুলীরা বাংলা দেশ হইতে মনি-অর্ডার দ্বারা প্রত্যেক বৎসর চার কোটি (?) টাকা তাহাদের "মুলুকে" পাঠায়। সঙ্গে কত লইয়া যায় তাহার কোন হিসাব নাই। মাড়বারী, মাদ্রাজী, গুজরাতী, কাঠিয়াবাড়ী, পাঞ্জাবী বাঙ্গলায় আসিয়া কেবল অর্থের রাশি সঞ্চয় করে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে বাঙ্গলা দেশকে কি দিয়া যায়?*

বিহারের অন্যতম পূর্ব্বতন নেতা রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর তাঁহার এক অভিভাষণে বলিয়াছিলেন—

"বাঙ্গালী যথায় বসতি করিয়াছে সেই স্থানেই অধিবাসীদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছে। প্রত্যেক বিশিষ্ট জেলায় তাহারা স্কুল খুলিয়াছে, স্ত্রী-শিক্ষার পথ প্রদর্শন করিয়াছে। প্রথম বালিকা-বিদ্যালয় তাহারাই স্থাপন করিয়াছে, স্বায়ত্ত শাসন প্রসারের ও জন-স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সংগ্রাম করিয়াছে। তাহারাই প্রথম সংবাদপত্র প্রচার করিয়াছে। রাষ্ট্র ও পৌর জীবনের তাহারই জন্মদাতা। আইন ব্যবসায় বাঙ্গালীরাই নেতৃত্ব করিয়াছে; এবং উচ্চ আদর্শ দ্বারা উহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। যাহা কিছু বিহারের নৈতিক, মানসিক বা বৈষয়িক উন্নতির অনুকূল, বাঙ্গালীরাই তাহাতে বিশেষ অংশ লইয়াছে।"

উপরে যাহা বলা হইয়াছে অনেক প্রদেশেই উহা সমান ভাবে খাটে। পঞ্জাব তাহার যাবতীয় উন্নতির জন্য বাঙ্গলার নিকটই ঋণী। একজন শিক্ষিত পঞ্জাবী বলিয়াছিলেন—

"When the country was involved in utter darkness Raja Rammohan Roy brought light to this country."

"এই আলোক পঞ্চনদ প্রদেশকে এতদূর উদ্ভাসিত করিল, যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর হইতে পঞ্জাবে পুনরায় জীবন্ত ভাব লক্ষিত হইল। যে আর্য্যধর্ম্ম পঞ্জাবের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে উহা ব্রাহ্মসমাজের আদর্শেই স্থাপিত হইয়াছিল।"

গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের* চেষ্টায় পঞ্জাবের নানা স্থানে ইংরাজী স্কুল, দেশীয় ভাষার পাঠশালা, পুস্তকালয়, বক্তৃতা-গৃহ, চিকিৎসালয়, অনাথাশ্রম এবং বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্যামাচরণ বসু† (রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসু ও মেজর বামনদাস বসুর পিতা) মহাশয়ের দ্যোতনায় ও নবীনচন্দ্র রায়, সর্ প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ মিত্র

* এখন অবশ্য হাসপাতালে কিছু দেয়, কিম্বা বঙ্গদেশে দুই-চারিটা ধর্ম্মশালা স্থাপন করে। যে-পরিমাণে লইয়া যায়, তাহার তুলনায় দান নগণ্য।

* গোলোকনাথ ১৭ বৎসর বয়সে কলিকাতার পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া পঞ্জাবে উপস্থিত হন। তথায় ১৯ বৎসর বয়সে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কপূরতলার রাজকুমার সর্ হরনাম সিংহ অহলুবালিয়া তাঁহার জামাতা ছিলেন। কুমার সর্ মহারাজকুমার সিংহ, বড়লাটের শাসনপরিষদের ভূতপূর্ব্ব মেম্বার, কুমার দলীপ সিংহ, পঞ্জাব হাইকোর্টের জজ, তাঁহার দৌহিত্র। বাঙ্গালীর শোণিত ইহাদের শিরায় প্রবাহিত।

† পঞ্জাবের যাবতীয় জনহিতকর অনুষ্ঠানে তাঁহার সহযোগিতা ছিল। তাঁহাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে ঐ প্রদেশের ডেভিড হেয়ার বলা হইত।

প্রমুখ সমাজের শীর্ষস্থানীয় প্রবাসী বাঙ্গালীদের সহযোগিতায় ১৮৮৫-৮৬ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস্-চ্যান্সেলার ছিলেন সর্ বিপিনকৃষ্ণ বসু। তিনিই উহাকে সুপ্রণালীবদ্ধ করেন। মধ্যপ্রদেশের বহু উন্নতির মূলে ছিলেন তিনি। বহু জনহিতকর কার্য্যের প্রেরণা দিয়াছিলেন তিনিই।

বোম্বাই-প্রবাসের সময় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার পত্নীর প্রভাবে ও আদর্শে ঐ প্রদেশের উচ্চস্তরের বহু নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়।

মহীশূরের উন্নত শাসনপ্রণালী প্রস্তুত করিতে ও উহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে ও মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে সর্ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও দেওয়ান বাহাদুর জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী মহীশূর গবর্ণমেণ্টকে অশেষপ্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন।

অযোধ্যা প্রদেশে (তখন অযোধ্যা স্বতন্ত্র ছিল, আগ্রা প্রদেশের সহিত মিলিত হয় নাই) রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়েরই বিশেষ চেষ্টায় ক্যানিং কলেজ ও অযোধ তালুকদার্স এসোসিয়েশ্যন স্থাপিত হয়।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস্চ্যান্সেলার ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। তিনিই উহাকে সুপ্রণালীবদ্ধ করেন।

যুক্তপ্রদেশে প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সারদাপ্রসাদ সান্যাল মিওর কলেজ স্থাপনের মূলে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চিন্তা প্রথমে এই শেষোক্ত ভদ্রমহোদয়ের চিত্তে উপস্থিত হয় ও তিনি তৎকালীন লাটসাহেব সর্ আলফ্রেড লায়েলকেকে উহার পন্থা বলিয়া দেন।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (বর্ত্তমান যুক্ত প্রদেশের) গবর্ণমেণ্ট যখন আগ্রা কলেজ তুলিয়া দিতে মনস্থ করেন, সে সময় আগ্রার সবজজ্ অবিনাশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (ডাঃ সতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের পিতা) মহাশয়ের ঘোরতর আন্দোলনের ফলে উহার তত্ত্বাবধান এক বোর্ড অব ট্রষ্টীর হস্তে ন্যস্ত হয়। কলেজ মৃত্যুর মুখ হইতে মুক্তি পায়। আগ্রায় এখন এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র বসু তিন বৎসরের জন্য উহার ভাইস্-চ্যান্সেলার মনোনীত হন। ইনি এই পদ দ্বিতীয় বার শোভিত করেন। তাঁহা অপেক্ষা যোগ্য ভাইস্-চ্যান্সেলার তাঁহার আগে কেহ হন নাই। এ বৎসর রেভরেণ্ড জে. সি. চাটুজ্যে উহার স্থলে ভাইস্-চ্যান্সেলার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

উপরোক্ত সকল প্রদেশে বাঙ্গালীরাই প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রথম উন্মেষ বাঙ্গালীদের দ্বারাই হয়। প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া সমগ্র ভারতকে ভালবাসিতে, উহার স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতে আমরাই শিক্ষা দিয়াছিলাম। আমরাই "বন্দেমাতরমে"র রচয়িতা। পৃথিবীর কোন জাতীয় সঙ্গীত উহার সমকক্ষ নহে, ভাবে কিংবা ভাষায়। কংগ্রেস প্রথমতঃ বাঙ্গালীদেরই দ্বারা স্থাপিত ও পরিপোষিত, যদিও হিউম ও কটনের মনে উহার প্রথম পরিকল্পনা উদিত হয়। এখন অবস্থা উল্টা দাঁড়াইয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মকে পুর্ণর্জীবিত করিবার জন্য ভারতের অনেক প্রদেশে বাঙ্গালীরা বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। বিধর্ম্মী দ্বারা বিধ্বস্ত মথুরা বৃন্দাবনের পুনর্গঠন ও মন্দিরাদি স্থাপন বাঙ্গালীদের দ্বারাই হইয়াছিল। শ্রীশ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মের বার্ত্তা বাঙ্গালীরাই এই সকল দেশে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

যে আর্য্যসমাজের প্রভাব আজ পঞ্জাবের ধর্ম্মপরিবর্ত্তনের স্রোত রুদ্ধ করিয়াছে, যাহার শিক্ষায় উহার এরূপ সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি হইয়াছে, সেই "আর্য্যধর্ম্ম" রাজা রামমোহন রায়ের সংস্কার-আন্দোলন হইতেই প্রেরণা পায়। উহার প্রবর্ত্তক স্বামী দয়ানন্দকে নবীনচন্দ্র রায় ও সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য পঞ্জাবে আনয়ন করেন ও লাহোর ব্রাহ্মসমাজই তাঁহার প্রধান সহায় হয়।

আসামী, উড়িয়া, হিন্দী বাংলা ভাষার নিকট অশেষ প্রকারে ঋণী; আমরাই উহাদের নূতন করিয়া সঞ্জীবিত করিয়াছি। কিন্তু ঐ ভাষাভাষীরা এখন উহা স্বীকার করিতেও লজ্জা বোধ করে।*

---

* এক বিহারী সাহিত্য-সভায় সম্প্রতি বলা হইয়াছে, বিহারী সাহিত্য বাংলা সাহিত্যকে অনেক কিছু দান করিয়াছে।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় লিখন ও রচনা পদ্ধতি (composition) শিক্ষার জন্য যে-সকল পুস্তক নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দেখিলাম মৈথিলীতে "কপাল-কুণ্ডলা," মালয়ালমে "বিষবৃক্ষ"; উড়িয়াতে "কোনারক"। এগুলা নিশ্চয় ঐ নামের বাংলা পুস্তকের অনুবাদ। বাঙ্গালীরা কি তবে এই সকল ভাষার রচনা-কৌশলও শিক্ষা দিবে?

প্রবাসে বাসকালীন বাঙ্গালীরা কত জনহিতকর কার্য্য করিয়াছে—কত স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, অনাথালয়, আতুরাশ্রম, কুষ্ঠাশ্রম, অন্নসত্র, মাতৃমন্দির (Maternity Hospital), পরিত্যক্ত-শিশু-আশ্রম (Foundling Hospital), কূপ, পুষ্করিণী, ঘাট, মন্দির, ইত্যাদি স্থাপিত করিয়াছে, মনে করিলে হৃদয় আনন্দে ও আত্ম-গৌরবে উচ্ছলিত হইয়া উঠে।

উত্তর-ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য চিকিৎসাপ্রণালী আমরাই লোকপ্রিয় করিয়াছি। কারণ, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে এ-সকল প্রদেশে সরকারী-বেসরকারী ডাক্তার বাঙ্গালীরাই ছিলেন।

আমরাই এ-সকল প্রদেশে আয়ুর্ব্বেদকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছি। অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত হাতুড়েদের হাত হইতে উহাকে উদ্ধার করিয়াছি। আমরাই আয়ুর্ব্বেদের লুপ্তপ্রায় পুস্তকাবলীকে পুনর্মুদ্রিত করিয়া বিস্মৃতির গর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়াছি। ভারতবর্ষে হোমিওপ্যাথির প্রচার আমরাই করিয়াছি।

যখন হিন্দুস্থানীরা উর্দ্দুর প্রেমে মশগুল, হিন্দীকে যুক্তপ্রদেশে আদালতের ভাষারূপে প্রচলিত করিবার

বিহারের নিজস্ব কোন পুরাতন সাহিত্য আছে কিনা জানা নাই। যদি মিথিলার কথা বলা হইয়া থাকে, তবে বিহারীদের মৈথিলী সাহিত্যের উপর যতটা দাবী আমাদেরও ততটাই। কারণ, উত্তর-ভারতের ভাষাগুলা একটা অন্যের সহিত এরূপ বেমালুম ভাবে মিশিয়া গিয়াছে, যে, তাহাদের সীমারেখা কোথায় টানিতে হইবে বলা কঠিন। আমরা যদি বিদ্যাপতিকে আমাদের কবি বলিয়া দাবী করি, সেটা অন্যায় হয় না। বিদ্যাপতির বাসভূমি বাংলার দ্বারে, "দ্বারবঙ্গে"। একালের মানচিত্র দেখিলে বুঝা যায় না, কিন্তু সেকালে "দ্বারভাঙ্গা" বঙ্গের দ্বারদেশেই ছিল। এখনকার 'সব লাল হো জায়েগা" বিহারী নীতিতে কি হইয়াছে জানি না, কিন্তু ২৫ বৎসর পূর্ব্বে মিথিলার অক্ষরগুলা ত প্রায় অর্দ্ধেক বাংলার মত ছিল। আমি এরূপ একটা পোষ্টকার্ড দেখিয়াছিলাম। আমার এক মৈথিলী ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম মৈথিলী অক্ষর অর্দ্ধেক বাংলা। ভাষাও তদ্রূপ। আমি ১৯১০ সালে বৈদ্যনাথধামে এক বিহারী পাণ্ডাকে তাহার শিশুপুত্রদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাংলার "প্রথম ভাগ" হইতে অক্ষর-পরিচয় করাইতে দেখিয়াছি। তখন হিন্দী তাহাদের ভাষা ছিল না। বিহারের আদালতের কাগজপত্র "কয়থী"তে লিখিত হয়। কয়থী "দেবনাগরী" নহে, উহার বিকৃত রূপ; যেমন "মুড়িয়া" ইত্যাদি 'শঙ্কর' অক্ষর। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার বিদ্যাপতির মুখবন্ধে বলেন, "এক কালে মিথিলা ও গৌড় লিপি অভিন্ন ছিল। এখন উভয়ে কিছু প্রভেদ হইয়াছে।..."বিদ্যাপতি গৌড় ভাষা কিছু ব্যবহার করিতেন।" "...মৈথিলী ভাষা কতক বাঙ্গলা ভাষার অনুরূপ।" প্রায় ৫০০ বৎসরের অধিক আমরা বিদ্যাপতিকে আমাদের কবি বলিয়া সম্মানিত করিয়াছি। নিজ বাসভূমে তাঁহাকে লোকে একপ্রকার ভুলিয়াই ছিল। আমরাই তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃতি হইতে রক্ষা করিয়াছি। আমরাই তাঁহার কবিতা সংগ্রহ করিয়া ৬০ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত করিয়াছি।

পণ্ডিত মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী তাঁহার "হিন্দী ভাষা কী উৎপত্তি" নামক পুস্তকে বলেন, "বিহারী ভাষা যদ্যপি হিন্দী সে বহুত কুছ মিলতী জুলতী হয়, তথাপি য়হ উসকী শাখা নহী। য়হ বঙ্গলা সে অধিক সম্বন্ধ রখতী হয়; হিন্দী সে কম।" চট্টগ্রামী কথিত ভাষা আমাদের পক্ষে বুঝা কঠিন, কিন্তু বিদ্যাপতির ভাষা শিক্ষিত অশিক্ষিত বাঙ্গালী সকলেই বুঝিতে পারে। যদি চট্টগ্রামের ভাষা বাঙ্গলা ভাষার একটা শাখা, তবে বিদ্যাপতির ভাষাই বা কেন আমাদের ভাষার একটি শাখা নহে ও তিনি আমাদের কবি কেন নহেন? আমেরিকার লংফেলো, স্কটল্যাণ্ডের বার্ন্‌স্ ও পঞ্জাবের কিপলিংকে ইংরাজ কবি বলে কেন? ভাষা হিসাবেই না? কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে মৈথিলী স্বতন্ত্র ভাষারূপে পরিগণিত হয়। মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চ্যান্সেলার) প্রমুখ বিশিষ্ট মৈথিলীরা তাঁহাদের ভাষাকে হিন্দী বা ভোজপুরী হইতে পৃথক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত। এই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ দ্বারভাঙ্গার মহারাজ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি মৈথিলী অধ্যাপকের পদ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অনেক টাকা দিয়াছেন।

আর যদি বিহারী সাহিত্য-সভার সভ্যেরা বিহারী ভাষার অর্থ "ভোজপুরী" মনে করিয়া থাকেন, তবে উহা ত অপভাষা, উপভাষা বা Patois। তাহার সাহিত্য নাই। যাহার সাহিত্য কিছুই নাই, সে অন্যকে, বাঙ্গলা সাহিত্যকে কি দিবে? বিহারে এখন যে দুই-চারিটি কবি আছেন তাঁহাদের কবিতার ভাষা হিন্দী, কিন্তু নূতন 'ফরমানে' উহা শীঘ্র "হিন্দুস্থানী" হইয়া যাইবে। সম্প্রতি সংবাদপত্রে দেখিলাম, বিহারীরাই এই 'হিন্দুস্থানী'র বিপক্ষে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে।

প্রচেষ্টা সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালীরাই করিয়াছে। সে আজ ৭০ বৎসরের কথা।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দীতে প্রথম ক্ষুদ্র গল্প (short stories) লেখার সম্মান এক বাঙ্গালী মহিলারই প্রাপ্য।

পঞ্জাবী স্ত্রীলোকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রথম হিন্দী পত্রিকা এক বাঙ্গালী রমণীই বাহির করেন।

বাঙ্গালীদের (কলিকাতা) বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের সকল প্রধান ভাষাকেই শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন করিয়াছে। এরূপ উচ্চ আদর্শ অন্য কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাই।*

কাশ্মীরের সকল প্রকার উন্নতির মূলে বাঙালীই ছিলেন। নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, ঋষিবর মুখোপাধ্যায়, ডাঃ আশুতোষ মিত্র, উহাকে নূতন রূপ দিয়াছেন। ঋষিবরবাবু উহার রেশম বিভাগের অধ্যক্ষ (Director of Sericulture) ছিলেন। কাশ্মীরের রেশম উৎপাদনের এত উন্নতি ও তাহার গুটি হইতে রেশম লাটাইয়ে জড়াইবার কারখানা (filature) যে পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, উহা তাঁহারই প্রচেষ্টার ফল। আশুতোষবাবুকে কাশ্মীরের "পুনর্জন্মদাতা" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, "নেপালের সহিত বাঙ্গালার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ, অনেক সময় মনে হয়, নেপাল আগে বোধ হয় বাঙ্গালীরই উপনিবেশ ছিল।"

* যুক্তপ্রদেশে বাঙ্গালী বালকবালিকারা ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির উত্তর তাহাদের মাতৃভাষায় দিতে পারিবে না, হিন্দী বা উর্দ্দু বা হিন্দুস্থানীতে দিতে হইবে এই নিয়ম হইয়াছে। ইংরাজীতে দিতে হইলে কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি লইতে হইবে। সেটা আবার তাঁহাদের মর্জ্জির উপর নির্ভর করে। অথচ এংলো-ইণ্ডিয়ানদের বেলায় সে বাঁধাবাঁধি নাই। যদি বলা হয়, বাংলার খাতা কে দেখিবে? সেটা কোন ওজর নহে। বাংলা ভাষার খাতা দেখিবার লোক পাওয়া যায়, আর অন্য বিষয়গুলার বাঙ্গালী পরীক্ষক পাওয়া যাইবে না? পরীক্ষার ফী বাঙালী ছেলে-মেয়েরাও দেয়, যদি তাহাতে না কুলায় ২১৫ টাকা আরও অধিক ফী লইলেই হয়। অনেক বাঙালী শিক্ষক বা শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন যাঁহারা বিনা পারিশ্রমিকে এ সকল খাতা দেখিয়া দিতে পারেন। বাঙালী পরীক্ষার্থী পরীক্ষার্থিনীদের ইংরেজীতে উত্তর দিবার একটা স্থায়ী আদেশ দিলেই হয়। প্রত্যেক বার অনুমতি লইবার লেঠা কেন? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কি উদার ব্যবস্থা, আর এ প্রদেশের শিক্ষা বিভাগ কি সংকীর্ণমনা।

আমার কতকগুলি নেপালী ছাত্রকে নিজেদের মধ্যে "পরবতীয়া"য় কথা কহিতে শুনিলে অনেক সময় বোধ হইত উহারা বাংলায় কথা কহিতেছে। বাঙ্গালী ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার, শিক্ষক নেপালের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। আধুনিক নেপাল তাঁহাদের গঠিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

১৯৪০-এর আগস্টের মডার্ণ রিভিয়ুতে শ্রীযুত পি. রাজেশ্বর রাও লিখিয়াছেন যে, যদিও অন্ধ্রদেশ বাংলা দেশের সমীপবর্ত্তী নহে এবং বাঙ্গালীরা এদেশে আসিয়া বাস স্থাপনও করে নাই, তথাপি বাংলার প্রভাব এখানে যথেষ্ট বিদ্যমান; ব্রাহ্মসমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, বঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন এ-সকলই অন্ধ্রদেশকে নূতন জীবন দান করিয়াছে; শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙ্গলার প্রভাব সুস্পষ্ট; আজকার দিনেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষিণ-ভারত হইতে যত ছাত্র শিক্ষা পাইবার জন্য আসে, তন্মধ্যে অন্ধ্রদের সংখ্যাই অধিক; সর্ রাধাকৃষ্ণনের গৌরব-গরিমা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই কারণে; অধ্যাপক রামচন্দ্র রাও-এর অর্থশাস্ত্রের খ্যাতির মূলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল; তেলুগু ভাষায় বহু বাংলা উপন্যাসের অনুবাদ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ছন্দহীন কবিতার (free verse) অনুকরণও আজ বহু অন্ধ্র নবীন কবিরা করিতেছেন।

এ স্থলে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, মহেন্দ্রলাল সরকারের সায়েন্স এসোসিয়েশন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় না থাকিলে অধ্যাপক রামনের কখনই রয়্যাল সোসাইটির ফেলোশিপ ও নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির সৌভাগ্য হইত না।

বাঙ্গালীর এ-সকল সৎকার্য্যের ইতিহাস ক্রমশঃ প্রায় বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে। উহাদের একটা বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক অন্যান্য প্রদেশের লোকদের ও আমাদের পরবর্ত্তীদের বিজ্ঞপ্তির জন্য। তাহারা যেন আমাদের ভুল না বুঝে। বাঙ্গালীর প্রবাসজীবন অন্যান্য প্রদেশবাসীর হিংসা, দ্বেষ বা অবজ্ঞার বস্তু না হইয়া বরং তাঁহাদের শ্রদ্ধা, ভক্তি,

ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করুক ও বাঙ্গালী উহা বাংলার ইতিহাসের একটা গৌরবজনক অধ্যায় বলিয়া মনে করুক, ইহাই আমাদের সকলের ইচ্ছা।

এ-কার্য্য এক বা দুই জনের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। যদি প্রত্যেক বাঙ্গালী (প্রবাসী বা বঙ্গবাসী) সহায়তা করেন ও যে কোন প্রদেশের গ্রাম বা নগর বা বিভাগের সহিত তাঁহারা সুপরিচিত তথাকার বাঙ্গালীদের সৎকার্য্যের কাহিনী সংক্ষেপে লিখিয়া পাঠান, তবে সংস্কৃতি, সভ্যতা, শিক্ষা, আহার-বিহার, রাজনীতি, সমাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর কৃতিত্বের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিত হইতে পারে।

এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নাবলী প্রকাশিত হইল। "প্রবাসী"র পাঠক-পাঠিকাদের, তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবদের ও বঙ্গদেশের সুসন্তানদের—যাঁহারা জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল দেখিতে চাহেন—নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই স্মৃতি-মন্দিরের এক-একখানা ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া উহা নির্ম্মাণে সহায়তা করুন।

যিনি যে-বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন বা জ্ঞাত আছেন,উহার **সঠিক** সংক্ষিপ্ত বিবরণ অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রবাসী-সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। খামের শীর্ষে "বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর কৃতি" এই কথাগুলি লিখিয়া দিলে পত্রগুলি প্রবাসী আপিসের পত্রস্তূপ হইতে বাছিয়া লইতে সুবিধা হইবে। লেখকরা যে-সকল প্রশ্নের উত্তর দিবেন তাহার নম্বর দিতে ভুলিবেন না। প্রত্যেক পত্রের শিরোদেশে প্রদেশের নাম নিশ্চয় দিবেন, যথা—আসাম, উড়িষ্যা, বিহার ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, এই লেখাগুলি **সমস্তই** প্রবাসীতে ছাপিবার কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে না। লেখা-গুলি একখানি গ্রন্থের উপকরণরূপে রক্ষিত হইবে।

যিনি যাহা পাঠাইবেন, অনুগ্রহ করিয়া রেজিস্টরি করিয়া পাঠাইবেন। স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া বা ডাকযোগে স্বতন্ত্র প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে না।

ফোটোগ্রাফ পাঠাইলে, তাহাও সাদরে গৃহীত হইবে; কিন্তু তাহা ফেরত দিতে পারা যাইবে না।

"বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর কৃতি" সম্বন্ধে বর্ত্তমান লেখকের আরও প্রবন্ধ পরে প্রকাশিত হইবে।

প্রশ্নাবলী

১। আপনাদের প্রদেশে, জেলায় বা নগরে বাঙালীরা সে-দেশের লোকেদের শিক্ষার জন্য কি করিয়াছেন?

২। যে বাঙালী শিক্ষকেরা তাঁহাদের জীবন সে-প্রদেশের যুবকদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম ও অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

৩। আপনাদের প্রদেশের বাঙালীরা শিক্ষা, নীতি, ধর্ম্ম বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে কি পুস্তকাবলী জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য প্রণয়ন ও প্রকাশিত করিয়াছেন।

৪। আপনাদের প্রদেশে বাঙালী দ্বারা প্রকাশিত বা সম্পাদিত সংবাদপত্র—দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ইত্যাদির নামধাম।

৫। আপনাদের প্রদেশের প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য বাঙালীর প্রচেষ্টা।

৬। জন-স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন ও সামাজিক দুর্নীতি দূরীভূত করিবার নিমিত্ত বাঙালীরা কি চেষ্টা করিয়াছেন।

৭। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা (এলোপ্যাথিক, হোমিও-প্যাথিক ও আয়ুর্ব্বেদিক) বিস্তারে বাঙালীর উদ্যম।

৮। চিকিৎসালয়, অনাথ আশ্রম, কুষ্ঠাশ্রম, আতুরাশ্রম, নারীরক্ষা-আশ্রম প্রভৃতি কত ও কোন্ স্থানে স্থাপন করিয়াছেন?

৯। জনসাধারণের সুবিধার জন্য কত পথঘাট প্রস্তুত করিয়াছেন ও কূপ পুষ্করিণী ইত্যাদি খনন করিয়াছেন?

১০। কত পুস্তকালয়, সভাসমিতি সে-দেশের জন-সাধারণের উপকারার্থ স্থাপিত করিয়াছেন?

১১। সাধারণের উপকারার্থে কত হাট-বাজার বাগান ইত্যাদি দান করিয়াছেন?

১২। স্থাপত্য গৃহ-নির্ম্মাণ ইত্যাদিতে কি পরিবর্ত্তন আনিয়াছেন?

১৩। সে-প্রদেশীয়দের আহার বিহার, পোষাক ও পরিচ্ছদে কি উন্নতি সাধন করিয়াছেন?

১৪। চারুশিল্পে (painting & sculpture) স্বর্ণ রৌপ্য কাংস্য ও বস্ত্রশিল্পে বাঙালীদের প্রভাব কি পরিমাণে বিদ্যমান?

১৫। ব্যবসায়, বাণিজ্য ও কৃষি ইত্যাদির জন্য তাঁহারা কি করিয়াছেন?

১৬। সঙ্গীত নৃত্যকলা ইত্যাদিকে ভদ্রসমাজে প্রচলিত ও শ্রদ্ধেয় করিতে তাঁহাদের প্রচেষ্টা কতটা?

১৭। সামাজিক নৈতিক ও রাজনৈতিক জাগরণের জন্য বাঙালীরা কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন।

১৮। শাসনকার্য্যে ও বিচারাসনে ন্যায়ের উচ্চ আদর্শ রক্ষায় বাঙালীরা কিরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন?

১৯। রঙ্গালয়ে এবং ছায়াচিত্র-জগতে (সিনেমায়) বাঙালীরা ভারতকে কি দিয়াছেন?

২০। বিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ইত্যাদির গবেষণায়, বাঙালীর অংশ।

২১। ভারতের সর্ব্বপ্রদেশের সাহিত্যের উন্নতির জন্য বাঙালীরা বা বাঙালীর সাহিত্য কতটা সাহায্য করিয়াছে।

"প্রবাসী"র প্রথম কার্যাধ্যক্ষ আশুতোষ চক্রবর্ত্তী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, মজঃফরপুর

প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় যখন এলাহাবাদে থাকিতেন তখন একটি ব্রাহ্ম যুবক তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিল। তাঁহার নাম আশুতোষ চক্রবর্ত্তী। তিনি সম্প্রতি ভাগলপুরে বন্ধুপুত্র ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ("বনফুল") মহাশয়ের বাড়ীতে পক্ষাঘাত রোগে ৭৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি আমার অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। ইঁহার মুখে প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয়ের ও তাঁহার পুত্র-কন্যাদির কত গল্প শুনিয়াছি।

খুলনা জেলার এক নিভৃত পল্লীতে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গৃহে ইঁহার জন্ম। কিন্তু অল্প বয়সেই ব্রাহ্ম-সমাজের উদার ধর্ম্মমতে আকৃষ্ট হইয়া পিতা-পিতৃব্যদের বিরাগভাজন হন। ফলে গৃহত্যাগী হইয়া নানা স্থানে ব্রাহ্মসমাজের সেবাব্রতে নিযুক্ত হয়েন। ঢাকায় এই কার্য্যে থাকার সময় মধ্যভারতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ঢাকার ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকেই ঐ স্থানের দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত লোকদের সেবাকার্য্যে পাঠান। সেখানে বহু দিন বহু অসুবিধা ও কষ্টের মধ্যে থাকিয়া কৃতিত্বের সহিত এই সেবাকার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া আসেন।

কিছু দিন 'প্রবাসী' কাগজের আফিসেও তিনি কার্য্য করিয়াছিলেন।* 'প্রবাসী' তখন এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইত। এলাহাবাদে ব্রাহ্মদের একটা জুতার ব্যবসায় ছিল। আশুবাবু সেখানেও কার্য্য করিতেন। তার পর কিছু কাল রাজমহলে একটি বন্ধুর জমিদারীতে কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনের জন্য নিযুক্ত হইয়া বহু বৎসর এই স্থানের অধিবাসী দুঃস্থদিগের সেবা ও সাহায্য করিয়া সকলেরই শ্রদ্ধাপ্রীতি অর্জ্জন করিতে থাকেন। কোনও কারণে ঐ কৃষিকার্য্য লাভজনক না হওয়ায় আশুবাবু মজঃফরপুরের অন্তর্গত নরৌলী নামক গ্রামে এক জমিদারীর ম্যানেজার হইয়া আসেন। এই জমিদারীর মালিক চট্টগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ খাস্তগীর মহাশয়ের

আশুতোষ চক্রবর্ত্তী

পুত্রদ্বয়। ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসর এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া কৃষিকার্য্য ও জমিদারীর যে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এখানকার সকলেই তাঁহার সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও কর্ম্মকুশলতার অকৃত্রিম প্রশংসা করিতেছেন। কিন্তু আশুবাবুর মহাপ্রাণতা শুধু বৈষয়িক কর্ম্মকুশলতার গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না; দুঃস্থের সেবা, দরিদ্রকে অর্থদ্বারা, নিজের পরিশ্রমদ্বারা সাহায্য করা তাঁর দৈনিক জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। কত সহস্র দরিদ্র যে তাঁহার সাহায্যে উপকৃত হইয়াছে তাহার

---

* এলাহাবাদে তখন ক্যানিং রোডে মিত্র কোম্পানীর একটি বৃহৎ দরজির দোকানে আশুবাবুর ও আমার বন্ধু স্বর্গগত রামচরণ গুপ্ত ম্যানেজারি করিতেন। তিনিই আশুবাবুকে প্রবাসীর কাজ করিবার নিমিত্ত আনিয়া দেন। রামচরণবাবু এলাহাবাদের বর্ত্তমান জি চাইল্ড এণ্ড কোং নামক দরজির দোকানের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। প্রবাসীর সম্পাদক

ইয়ত্তা নাই। ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়ান যে একটি প্রবাদ আছে, আশুবাবুকে তাই করিতে দেখিয়াছি।

বিহারের বিগত ভূমিকম্পের দিন তিনি মজঃফরপুর শহরে উপস্থিত ছিলেন। সেই দিন দেখিয়াছি এই সত্তর বৎসরের বৃদ্ধকে বলবান যুবকের মত পরিশ্রম করিতে। যে বাড়ীতে থাকিতেন সে-বাড়ীর দুইটি শিশুকে বাঁচাইবার জন্য নিজের পৃষ্ঠে কত যে ছাতের ভগ্ন ইষ্টকখণ্ড বহন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝান যায় না। যখন শিশু দুইটিকে উদ্ধার করিয়া বাহিরে আসিলেন তখন ভাঙা বাড়ীর সুরকীর ধুলায় তাঁর গৌরবর্ণ ও পক্ক কেশ রঞ্জিত। সাফল্যের উল্লাসে তাঁহার মুখমণ্ডলে যে আনন্দ ও উৎসাহের দীপ্তি দেখিয়াছি তাহা আর ভুলিব না। তার পর সেই দুর্দ্দিনে কত শত লোকের কুটীর নির্ম্মাণ ও আহারের সামগ্রীর সংস্থান করাইয়া দিয়া প্রতি ব্যক্তির বাড়ীতে তৎকালীন নানা প্রকারের অসুবিধা দূর করিবার জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে তাঁহাকে দেখিয়াছি তাহা চিরকাল স্মরণ থাকিবে।

এই ব্রাহ্মণতনয়ের তেজস্বিতা ও স্পষ্টবাদিতা সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিত। এই তেজস্বিতার অন্তরালে তাঁহার হৃদয়ের স্নেহপ্রবণতা গোপনে বন্ধুমহলে আত্মপ্রকাশ করিত। তাঁহার 'পাতান' সম্পর্কের বহু বালক-বালিকা যুবক-বৃদ্ধ আজ আমাদের এই শহরে তাঁহার জন্য শোকার্ত্ত।

গোলাপ ফুলের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরক্তি দেখিয়াছি। নরৌলী গ্রামে তাঁহার গোলাপের বাগান দেখিবার বস্তু ছিল। শীতকালে শহরের কত সম্ভ্রান্ত নরনারী কেবল গোলাপ দেখিতেই সেখানে যাইতেন। যাইয়া যে কেবল গোলাপ দেখিয়া খুশী হইতেন তাহা নয়, ঐ গোলাপ ফুলগুলি যাঁহার যত্নে বাগান উজ্জ্বল করিয়া রাখিত তাঁহার সরল আতিথ্য গ্রহণ করিয়াও পুলকিত হইয়া আসিতেন। শত্রুহীন, পরদুঃখকাতর, চিরকুমার এই বৃদ্ধের হাস্যকৌতুক উপভোগের বস্তু ছিল। আমাদের দেশে বহু লোক খুব বড় বড় কাজ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন সত্য, কিন্তু এই মহাপ্রাণ নীরবকর্ম্মী নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে প্রতিদিনের কার্য্যে যে মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহার জন্য সংবাদপত্র ও সভামণ্ডপ প্রশংসাবাক্যে মুখরিত হইবে না, জানি; কিন্তু আমরা তাঁহার বন্ধুগণ মনে করি যে বাংলার প্রতি পল্লীতে যদি এমনই একটি লোকও থাকিত, তাহা হইলে বাঙালীর মানুষ হইবার প্রচেষ্টা অনেকটা সহায়তা লাভ করিত।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারতসচিবের পুরাতন বুলি

ব্রিটেনের পূর্বতন ও বর্তমান অন্য অনেক রাজপুরুষের ন্যায় বর্তমান ভারতসচিব ভারতবর্ষের বেলায় শুধু কথার দ্বারায়ই কাল্পনিক চিঁড়া ভিজাইতে চান, এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, তাঁহার কথায় ভিজান কাল্পনিক চিঁড়ার ভোজে ভারতীয়েরা পরিতৃপ্ত হইয়া রাজনৈতিক সুষুপ্তি ভোগ করিতে থাকিবে, এবং তাঁহারা ভারতবর্ষের প্রকৃত চিঁড়া-দই বরাবর ভোগ করিতে থাকিবেন।

গত ১লা ডিসেম্বর তিনি ব্রিটেনের নিউ মার্কেট নামক স্থানে একটা বক্তৃতা করেন। তাহার কেবল দুটা কথা সম্বন্ধে কিছু বলিব।

দিল্লীতে ঈস্টার্ন গ্রূপ (ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রাচ্যাংশ) কন্‌ফারেন্স নামক একটা আলোচনা সভা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পূর্বাংশের স্বশাসক অংশগুলির কয়েক জন প্রতিনিধির সঙ্গে ভারত-গবর্ন্মেণ্টের বাছাই-করা কয়েক জন লোক একত্র বসিয়া এই আলোচনা করেন যে, বর্তমান যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষে কেমন করিয়া প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত হইতে পারে। এই যে আলোচনা-সভাটার বৈঠক হইয়াছে, ইহা হইতে ভারতসচিব লোকদিগকে (কোন্ লোকদিগকে জানি না) বুঝাইতে চান যে, ভারতবর্ষ স্বশাসক হইবার পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে! অর্থাৎ কি না, "ভারত-গবর্ন্মেণ্টের মনোনীত কয়েক জন লোক যখন স্বশাসক কতকগুলি দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক টেবিলে ব'সতে পেয়েছে, তখন ভারতবর্ষ আর রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে অপাংক্তেয় নেই, সেও স্বশাসক হ'ল ব'লে, তার স্বশাসক হ'তে বেশি দেরি নেই"।

কিন্তু ইহা অপেক্ষা বড় ব্যাপারে ভারতবর্ষের গবর্ন্মেণ্ট-মনোনীত 'প্রতিনিধি' আগে আগে যোগ দিয়াছে;—ইম্পীরিয়্যাল কন্‌ফারেন্সে ছিল, আবার যে ভার্সাই-সন্ধি দ্বারা জার্মেনীকে চিরতরে পঙ্গু করিয়া রাখিবার দুরাশা করা হইয়াছিল ও যাহা বর্তমান যুদ্ধের অন্যতম কারণ, সেই ভার্সাই-সন্ধিপত্রে স্বাধীন ব্রিটেন ও স্বশাসক ডোমীনিয়নগুলির প্রতিনিধির সঙ্গে ভারতবর্ষের তথাকথিত 'প্রতিনিধি'ও দস্তখত করিয়াছিল। সে ত অনেক বৎসর আগেকার কথা, কিন্তু ভারতবর্ষ তখন যে তিমিরে ছিল এখনও সেই তিমিরে—এখনও ভারতবর্ষ পরপদানত।

যদি দিল্লীর এই কন্‌ফারেন্সের উদ্দেশ্য হইত ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার নিমিত্ত জলে স্থলে আকাশে অস্ত্র-শস্ত্র-যান-যন্ত্র যা কিছু দরকার সবই, স্বাধীন ব্রিটেন ও স্বশাসক ডোমীনিয়নগুলির লোকদের মত ভারতবর্ষের লোকদিগকেও স্বদেশে প্রস্তুত করিতে সমর্থ করা, এবং যদি সেই উদ্দেশ্যের অনুরূপ ব্যবস্থা হইত, তাহা হইলে বিশ্বাস করা যাইত যে, এই দেশকে স্বশাসনের পথে আগাইয়া দেওয়া হইতেছে। কিন্তু কন্‌ফারেন্সটার উদ্দেশ্য তা নয়। উদ্দেশ্য মোটামুটি দুটা। প্রথম, স্বাধীন ব্রিটেন ও স্বশাসক ডোমীনিয়নগুলি যাহা প্রস্তুত করিবে তাহার কাঁচা মাল ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন; দ্বিতীয়, প্রধান প্রধান যুদ্ধোপকরণ-কারখানার সহায়ক কারখানা (Works for subsidiary industries) স্থাপন। অর্থাৎ ভারতবর্ষকে আত্মনির্ভরক্ষম করা এই কন্‌ফারেন্সের উদ্দেশ্য নহে; উদ্দেশ্য, ভারতবর্ষকে এখনকার চেয়ে অধিক পরিমাণে ব্রিটেনের ও স্বশাসক ডোমীনিয়নগুলির 'উত্তরসাধক' করা।

ভারতবর্ষের লোকেরা পরাধীন বলিয়া যে তাহাদিগকে বোকা-বুঝানও অনায়াসসাধ্য, ভারতসচিবের এমন মনে করা ভুল।

ভারতসচিবের দ্বিতীয় যে উক্তির সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই, তাহা সংক্ষেপে এই :—

"ব্রিটেন ভারতবর্ষকে পূর্ণ মাত্রায় স্বশাসন-অধিকার দিবে অঙ্গীকার করিয়াছে। এই অধিকার পাওয়া

ব্রিটেনের উপর ততটা নির্ভর করিতেছে না, যতটা করিতেছে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের ঠিক্ প্রকৃতি সম্বন্ধে ভারতীয়দের আপনাদের মধ্যেই ঐকমত্যের উপর.।"

এটা একটা, অধুনা বহুবার আওড়ান, ব্রিটিশ ছেঁদো কথা।

অনেক বৎসর হইতে—ন্যূনকল্পে গত ৩৪ বৎসর হইতে—ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট মুসলমানদিগকে নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়করূপে বরাবর পাইবার নিমিত্ত নানা বিষয়ে তাহাদিগকে সুবিধা দিয়া তাহাদের মুনটাকে এমন বিগড়াইয়া দিয়াছে যে, তাহারা যে-সব সর্ত্তে হিন্দুদের ও অন্য স্বাজাতিকদের সহিত একমত হইতে পারে, সেই সব সর্তের মানেই ভারতবর্ষের চির-পরাধীনতা। সম্প্রতি আবার কিছু দিন হইতে পাকিস্তানের ধুয়া উঠিয়াছে। তাহার অর্থ ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করা ও ভারতবর্ষে স্থায়ী অন্তর্যুদ্ধ উৎপন্ন করা এবং তদ্দ্বারা ইহাকে চিরদুর্বল ও অনায়াসপরাজেয় রাখা। এই পাকিস্তান-প্রস্তাবকে, অগ্রহণীয় বলিয়া, স্পষ্টভাষায় অগ্রাহ্য করা দূরে থাক, বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ডাঃ মুঞ্জের কাছে বলিয়াছেন যে, প্রস্তাবটাকে এখনই উড়াইয়া দেওয়া যায় না, এবং অল্প দিন আগে ভারতসচিব কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন ভাষায় ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, পাকিস্তান-প্রস্তাবটা ভারতীয় সমস্যা সমাধানের একটা উপায় হইতেও পারে!

এ-বিষয়ে আগে আগে অনেক কথাই বলিয়াছি। কত আর পুনরুক্তি করিব? মোদ্দা কথা এই, যখনই ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা আমাদিগকে বলেন, "আমরা তোমাদিগকে স্বরাজ দিতে ত প্রস্তুতই আছি, তোমরা একমত হলেই হয়", তখনই আমরা বুঝি যে, তাঁহাদের কথার শেষ এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অর্ধেকটা তাঁহাদের মনের ভিতর, অনুক্ত অবস্থায়, রহিয়া গেল। সেই অর্ধেকটা এই, "কিন্তু তোমরা যাতে একমত হ'তে না পার তার ভাল ব্যবস্থা আমরা ক'রে রেখেছি, এখনও কচ্ছি, এবং ভবিষ্যতে আবশ্যক মত আরো ক'রব।"

—

কেন্দ্রীয় আইনসভায় রাজস্ব-বিল অগ্রাহ্য, আবার গ্রাহ্য

যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষের ব্যয় বাড়িয়াছে এবং পরে আরও বাড়িতে পারে। সেই বাড়তির মঞ্জুরি কেন্দ্রীয় আইন-সভার নিকট হইতে লইবার রীতি ভারতশাসন-আইনে নির্দিষ্ট আছে। এই যে মঞ্জুরি লওয়ার রীতি, ইহা একটা অন্তঃসারশূন্য অভিনয় মাত্র। কারণ, আইন-সভার য়্যাসেমব্লি-কক্ষে মঞ্জুরি প্রথমে না পাইলে, বড়লাট এই সার্টিফিকেট দিয়া রাজস্ব-বিলটাকে আবার সেই কক্ষে পাঠান যে, বিলের টাকার মঞ্জুরি দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ও দেশের শাসনকার্য নির্বাহের জন্য একান্ত আবশ্যক। তাহা সত্ত্বেও যদি য়্যাসেমব্লি মঞ্জুরি না দেন, তাহা হইলে বড়লাট তাহা উক্ত সার্টিফিকেট সহ আইন-সভার কৌন্সিল অব স্টেট নামক অন্য কক্ষে পাঠান। সেখানে স্বাধীনচেতা কতিপয় সভ্য আছেন, কিন্তু অধিকাংশই ধামাধরা। সুতরাং তাহার মঞ্জুরি পাওয়া নিশ্চিত।

সম্প্রতি এই অভিনয় ঠিক্ উক্ত প্রকারে হইয়া গিয়াছে।

য়্যাসেমব্লির অধিকাংশ সভ্য যে বিলটা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন এবং ট্যাক্সবৃদ্ধিতে মত দেন নাই, তাহা যুক্তিসঙ্গত। কারণ, ভারতবর্ষ বর্তমান যুদ্ধে যোগ দিবে কি না, সে-বিষয়ে ভারতবর্ষের নির্বাচিত প্রতিনিধিদিগের মত লওয়া হয় নাই, অথচ যুদ্ধের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করিতে ও তজ্জন্য ট্যাক্স বাড়াইতে তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল। সরকার-পক্ষ ঠিক্ যেন বলিতেছেন, "আমাদের যা খুশি আমরা তাই করিব, কিন্তু তার খরচটা তোমাদিগকে দিতে হইবে।" ইহা নিতান্ত অসঙ্গত ও অযৌক্তিক।

এই অসঙ্গতি ও অযৌক্তিকতা ভারতশাসন-আইনের মধ্যেই রহিয়াছে। আইনটাকে সুসঙ্গত ও যৌক্তিক করিতে হইলে দুই রকমের মধ্যে কোন এক রকম ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। এক রকম এই:—শাসকদের যখনই যা খুশি, আইন-সভাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তখনই তা তাঁহারা করিতে পারিবেন, এবং তাহার ব্যয়নির্বাহের জন্য ট্যাক্স বাড়ান বা নূতন ট্যাক্স বসান আবশ্যক হইলে, আইন-সভাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া

তাহা করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় রকম এই:—যে-যে কাজের জন্ত ব্যয়ের মঞ্জুরি আইনসভার নিকট চাওয়া আবশুক বলিয়া নির্দিষ্ট হইবে, সেই সেই কাজে প্রবৃত্ত হইবার আগে শাসকদিগকে তদ্বিষয়ে আইনসভার সম্মতি লইতে হইবে।

কিন্তু ভারতশাসন-আইনে উক্ত দুই রকম ব্যবস্থার কোনটিই ঠিক্ করা হয় নাই। প্রথম রকমের প্রথমার্ধটি লওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ শাসকেরা যা খুশি তাই করিবেন; এবং দ্বিতীয় রকমের শেষার্ধটি লওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ ব্যয়ের মঞ্জুরি লইতে হইবে। কাজেকাজেই ভারত-শাসন-আইনটা অসঙ্গত ও অযৌক্তিক হইয়াছে।

কিন্তু তাহাও বাস্তবিক বাহ্যতঃ। কারণ, যুদ্ধ বা শান্তি শাসকেরা যা খুশি তা ঘোষণা করিতে পারিবেন, ইহা ঠিক্ আছে; আবার মঞ্জুরি লওয়াটা অভিনয়মাত্র হওয়ায়, কৌন্সিল অব্ স্টেটের মঞ্জুরি সুনিশ্চিত থাকায়, শাসকেরা ইচ্ছামত ব্যয় করিবার নিমিত্ত যা খুশি ট্যাক্স বাড়াইতে ও বসাইতেও পারিবেন, ইহাও ঠিক্ আছে।

অতএব, ভারতশাসন-আইনের বাহ্য অসঙ্গতি ও অযৌক্তিকতা যাহাই থাকুক, ইহা বাস্তবিক খুব সঙ্গত ও যৌক্তিক!

—

ভারতশাসন-আইনের বাহ্য অসঙ্গতির কারণ

ভারতশাসন-আইনের বাহ্য অসঙ্গতির আনুমানিক ও প্রায়নিশ্চিত কারণ বলিতেছি।

উপরে বর্ণিত দু-রকম ব্যবস্থার প্রথমটি যদি খোলাখুলি-ভাবে করা হইত, তাহা হইলে ব্রিটেন জগতের সমক্ষে এই ভান করিতে পারিত না যে, সে ভারতবর্ষকে অন্ততঃ কিছু স্বশাসন দিয়াছে, সে ভারতশাসনে স্বেচ্ছাচারী বলিয়া স্পষ্ট ধরা পড়িত। দ্বিতীয় রকম ব্যবস্থা করিতে হইলে, ব্রিটেনকে নিজের হাতের ক্ষমতা অন্ততঃ অনেকটা ভারতকে ছাড়িয়া দিতে হইত; কিন্তু তাহা করিতে সে নারাজ। এই কারণে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ব্রিটেন বাস্তবিক স্বেচ্ছা-কারিণী কিন্তু বাহ্যতঃ স্বশাসনদাত্রীবেশিনী।

—

বঙ্গীয় হিন্দু সম্মেলনের একটি প্রস্তাব

কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের যে অধিবেশন গত মাসে হইয়া গিয়াছে, তাহাতে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে কোনটিই অনাবশুক নহে। কিন্তু সবগুলির আলোচনা কিংবা শুধু উল্লেখও, এখানে করা যাইবে না। কেবল একটি অত্যাবশুক প্রস্তাব হিন্দু মহাসভার সাপ্তাহিক মুখপত্র "হিন্দুস্থান" হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিব। প্রস্তাবটি এই:—

হিন্দু সংগঠন

১৯। এই প্রাদেশিক সম্মেলনী মনে করেন যে, হিন্দু সংগঠন অর্থাৎ হিন্দুসমাজের বিভিন্ন শাখা ও জাতির মধ্যে একাত্ম-বোধ জাগ্রত করা সমাজের বর্তমান অবস্থায় বিশেষতঃ এই প্রদেশের হিন্দুগণের পক্ষে জীবনমরণের সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে এবং শাখা হিন্দুসভাসমূহের সমগ্র শক্তি এই কার্য্যে নিয়োজিত করা অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। এই সম্মেলন হিন্দু সংগঠন কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য প্রস্তাব করিতেছে যে,

(ক) প্রাম্ত প্রামে ধর্ম্মসভা অথবা সাধারণ দেবায়তন প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপকভাবে চেষ্টা করা হউক।

(খ) সনাতন হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসী হিন্দুগণের মধ্যে সর্ব্বত্র সার্ব্বজনীন পূজা ও উৎসব প্রচলনের ব্যবস্থা করা হউক। এই সব পূজার, বিশেষতঃ দুর্গাপূজা, কালীপূজা, দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী ও শিবরাত্রি উৎসব প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্যপালনীয় বলিয়া ঘোষণা করা হউক। এই সব পূজার অনুষ্ঠানে সর্ব্বজাতীয় হিন্দুর সর্ব্ব বিষয়ে সমান অধিকার দেওয়া হউক।

(গ) সর্ব্বত্র সম্মিলিত উপাসনা, স্তোত্র ও স্তব পাঠ, কথকতা, কীর্ত্তন, বেদ, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, গ্রন্থসাহেব, ত্রিপিটক ও অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠানের জন্য যথাশক্তি প্রযত্ন করা হউক।

(ঘ) সর্ব্বত্র হিন্দু সমাজের মহাপুরুষগণ, ধর্ম্মগুরুগণ ও বীরপুরুষগণের বাৎসরিক উৎসব সমবেতভাবে প্রচলনের ব্যবস্থা করিয়া হিন্দুর আত্মগৌরব-বোধ জাগ্রত করা হউক।

(ঙ) হিন্দু মাত্রেই যাহাতে নিজদিগকে জাতিবাচক সংজ্ঞায় আত্মপরিচয় না দিয়া কেবল হিন্দু নামে পরিচয় দেন তজ্জন্য প্রচারকার্য্য চালান হউক।

(চ) হিন্দুজাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে যাহাতে বিবাহের প্রচলন হয় তজ্জন্য প্রযত্ন করা হউক।

(ছ) যেসব অসবর্ণ বিবাহ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবে সেই সব বিবাহে পাত্রপাত্রী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের উপর কোন প্রকার সামাজিক উৎপীড়ন না হয় তাহার ব্যবস্থা করা হউক।

(জ) বিবাহে সম্মত বিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহের প্রচলন করা হউক।

(ঝ) সাধারণ মন্দির ও দেবস্থানে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সমস্ত হিন্দুকে প্রবেশ, দর্শন ও পূজার অধিকার দেওয়া হউক।

(ঞ) বাল্যবিবাহ প্রথা নিরোধ করা হউক।

(ট) পণপ্রথা উচ্ছেদের জন্য ব্যক্তি- ও সমষ্টিগত-ভাবে চেষ্টা করা হউক।

(ঠ) বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি উপলক্ষে বিবিধ অবান্তর বিষয়ের খরচ যত দূর সম্ভব কমান হউক।

(ড) আত্মরক্ষার্থ গ্রামে গ্রামে মল্লশালা স্থাপন করা, লাঠি ও ছোরা খেলা প্রবর্ত্তন করা ও ব্যায়াম-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিবার জন্য এই সম্মেলন হিন্দু সভাসমূহকে অনুরোধ করিতেছে।

(ঢ) হিন্দু সমাজ হইতে যাহাতে পানদোষ ও মাদকদ্রব্য ব্যবহার দূরীভূত করা হয় তাহার চেষ্টা করা হউক।

আমরা গত মাসের "প্রবাসী"তে, ২৭০-২৭১ পৃষ্ঠায়, "হিন্দুসংগঠন" এবং "সার্বজনীন বিগ্রহপূজা ও জাতিভেদ" সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, উপরে উদ্ধৃত প্রস্তাবটি পড়িবার পর আমাদের সেই কথাগুলি পড়িতে পাঠক-দিগকে অনুরোধ করিতেছি।

সার্বজনীন পূজা ও উৎসবগুলিতে "সর্বজাতীয় হিন্দুর সর্ববিষয়ে সমান অধিকার" দেওয়ার অর্থ এই যে, দেবদেবী বিগ্রহকে স্পর্শ করা ও ভূষিত করা, অর্চনা করা, মন্ত্রপাঠাদি করা, ভোগ রন্ধন ও পরিবেষণ করা, অঞ্জলি দেওয়া প্রভৃতি কার্য আর ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া থাকিবে না। কোথাও কোথাও কোন কোন সার্বজনীন পূজায় সকল বিষয়ে সব জা'তের (caste-এর) লোককে সমান অধিকার ইতিমধ্যে দেওয়া হইয়াছেও।

এই প্রকারে ব্রাহ্মণদের এমন একটি নিজস্ব অধিকার লুপ্ত হইতে বসিয়াছে যাহার প্রভাবে তাঁহারা সকল জা'তের (caste-এর) মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিয়া আসিতেছেন। জাতিভেদের একটি ঘাঁটি ব্রাহ্মণদের হাতছাড়া হইতে বসিয়াছে।

হিন্দু সমাজে জাতিভেদ রক্ষিত হইয়া আসিতেছে প্রধানতঃ অন্ত দুটি উপায়ে। কতকগুলি জা'তকে অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয় গণ্য করিয়া তাহাদের স্পৃষ্ট বা প্রদত্ত অন্ন-জল গ্রহণ না-করা, এবং যে-সব জা'ত আচরণীয় তাহাদেরও মধ্যে পারস্পরিক অন্নজল গ্রহণ নিষিদ্ধ করা ও রাখা একটি উপায়। শিক্ষিত বাঙালী সমাজে এরূপ নিষেধ অমান্য করা অনেক বৎসর হইতেই বাড়িয়া চলিতেছে। রেল ও ষ্টীমারে ভ্রমণ কালে শিক্ষিত ইংরেজী না-জানা লোকেরা এবং অশিক্ষিত লোকেরাও—অনেকে কতক অজ্ঞাতসারে, কতকটা জ্ঞাতসারে এবং কখন কখন বাধ্য হইয়া—এই নিষেধ মানেন না।

জাতিভেদ রক্ষার আর এক উপায় ভিন্ন ভিন্ন উপজা'ত (sub-caste) ও জা'তের (caste-এর) মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করা ও রাখা। ভিন্ন ভিন্ন উপজা'তের মধ্যে বিবাহ হিন্দু-সমাজে অল্পস্বল্প কিছু আগে হইতেই ক্রমশঃ চলিতেছিল, এবং পরে ভিন্ন ভিন্ন জা'তের মধ্যে বিবাহও ২।১টি করিয়া হইয়া আসিতেছে। খুলনায় যে বঙ্গীয় হিন্দুসম্মেলন হইয়াছিল, তাহাতে এইরূপ বিবাহ সমর্থিত হয়; কৃষ্ণনগরের অধিবেশনেও তাহা সমর্থিত হইয়াছে।

এই যে সমর্থন ইহাকে শুধু পার্মিসিব (permissive) বলিলে চলিবে না, অর্থাৎ ইহা বলিলে চলিবে না যে হিন্দু মহাসভা নিষেধ তুলিয়া লইলেন, বাধা ভাঙিয়া দিলেন—যাহার ইচ্ছা 'অসবর্ণ' বিবাহ কর, যাহার ইচ্ছা করিও না। কারণ, প্রস্তাবের ভাষায় ইহা অপেক্ষা বেশী কিছু বুঝায়। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, "হিন্দু জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে যাহাতে বিবাহের প্রচলন হয় **তজ্জন্য প্রযত্ন করা হউক**।" অবশ্য 'অসবর্ণ' বিবাহ করিতে কাহাকেও বাধ্য করার কথা উঠিতেছে না—ব্রাহ্মসমাজেও কাহাকেও 'অসবর্ণ' বিবাহ করিতে বাধ্য করা হয় না। কিন্তু **প্রযত্ন করার** মানে শুধু অনুমতি দেওয়া নহে, শুধু 'সবর্ণ' বিবাহ করিতে **বাধ্যতার বিধি উঠাইয়া** দেওয়া নহে; ইহার মানে 'অসবর্ণ' বিবাহ চালাইবার চেষ্টা করা। এই চেষ্টা হিন্দু-মহাসভা কি প্রকারে করিতেছেন বা করিবেন, অবগত নহি। সেরূপ চেষ্টার কি ব্যবস্থা হইয়াছে, মহাসভার কর্তৃপক্ষ সর্বসাধারণকে জানাইলে ভাল হয়।

—

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের প্রতিবাদ-সভা

সভাপতি—আচার্য্য স্যার পি সি রায়, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি—স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়।

তারিখ—২১শে, ২২শে ও ২৩শে ডিসেম্বর

স্থান—হাজরা পার্ক

ইতিমধ্যে প্রায় পাঁচ শত স্কুল কর্তৃপক্ষ সম্মেলনে তাঁহাদের

মতামত জানাইবার জন্ত প্রতিনিধি প্রেরণ করার সঙ্কল্প জানাইয়াছেন। সম্মেলনের উদ্দেশ্ত সমর্থন করিয়া প্রত্যহ কলিকাতা ২০৯ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে অভ্যর্থনা-সমিতির অফিসে বহু পত্র আসিতেছে। দুই শতাধিক নরনারী অভ্যর্থনা-সমিতিতে যোগ দিয়াছেন ; ইহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেণীর লোক আছেন, কিন্তু তন্মধ্যে অধিকাংশই হইতেছেন বাংলার শিক্ষাব্রতী। যে কেহ দুই টাকা চাঁদা দিয়া অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য এবং আট আনা চাঁদা দিয়া প্রতিনিধি হইতে পারেন। দর্শকের টিকিটের মূল্য এক টাকা ও চারি আনা ধার্য্য করা হইয়াছে। মনিঅর্ডারযোগে অথবা ব্যক্তিগতভাবে সর্ব্বপ্রকার চাঁদা ২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—এই ঠিকানায় সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে। হাজরা পার্ক চূড়ান্তভাবে সম্মেলনের স্থান বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে ; সন্নিহিত আশুতোষ কলেজে মফঃস্বল হইতে আগত প্রতিনিধিগণের বাসের ব্যবস্থা করা হইবে।

এই সম্মেলন উপলক্ষে আশুতোষ কলেজ হলে একটি শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হইতেছে ; উহাতে কিভাবে সকল দিক দিয়া এই প্রদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার হইয়াছে তাহা দেখান হইবে।

সম্মেলনে যোগদান এবং বক্তৃতা দান করার জন্ত বাংলার বাহিরের বহু শিক্ষাবিদকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। ইহা অতিরিক্ত আকর্ষণ হিসাবে বহুসংখ্যক দর্শক ও প্রতিনিধির উপস্থিতির কারণ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণকে সাহায্য করার জন্ত একটি সংখ্যাবহুল স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই স্বেচ্ছাসেবকের জন্ত আবেদন করায় উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে অবিলম্বে ছুটির দিন ব্যতীত অন্যান্য দিনে বেলা ১২টা হইতে ৪টার মধ্যে আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক সুকুমার ভট্টাচার্য্যের সহিত অথবা বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক হরিচরণ ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

সম্মেলন সম্বন্ধে যে কোনও সংবাদ ২০৯ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—এই ঠিকানায় সম্পাদক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে।

এই প্রতিবাদ-সভার যেরূপ আয়োজন হইতেছে, তাহাতে প্রতিনিধি ও দর্শকদের ভিড় ইহাতে যে খুবই হইবে তাহা নিশ্চিত। বিলটার অনিষ্টকারিতাও সকল দিক্ দিয়া ভাল করিয়াই দেখান হইবে। তাহা দেখাইবার নিমিত্ত যথেষ্টসংখ্যক যোগ্য বক্তা প্রস্তুত আছেন। সভাতে যে-সকল প্রস্তাব গৃহীত হইবে, তাহার মুসাবিদা যে উৎকৃষ্ট হইবে সে বিষয়েও সন্দেহ নাই।

বিলটার সর্বপ্রধান দোষগুলা আমরা "প্রবাসী"তে ও "মডার্ণ রিভিয়ু"তে আগেই দেখাইয়াছি। পুনরুক্তি করিব না। বিলটা আইনে পরিণত হইলে এবং নেতরা তাহার অনিষ্ট নিবারণের কোন উপায় অবলম্বন করিতে না পারিলে, বঙ্গে শিক্ষার বিস্তৃতির পরিবর্তে সঙ্কোচ হইবে—বিদ্যালয়ের ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাস পাইবে, এবং শিক্ষার উন্নতির পরিবর্তে বিষম বিকৃতি ঘটিবে ; গুণানুসারে যোগ্যতম শিক্ষক নিয়োগের পরিবর্তে ন্যূনতম যোগ্যতাবিশিষ্ট লোক নিযুক্ত হইবে, সুতরাং বহুসহস্র যোগ্য লোকের চাকরী যাইবে এবং বহু সহস্র যোগ্য লোক চাকরী পাইবেন না ; এরূপ বাংলা বিদ্যালয়-পাঠ্য, পুস্তকসমূহ লিখিত ও প্রচলিত হইবে যাহার ভাষা ও বিষয়বস্তু উভয়ই অপকৃষ্ট হইবে ; পাঠ্যপুস্তকরচয়িতা বিস্তর যোগ্য লেখক ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন ; যে-বয়সে বালক-বালিকার মন গঠিত হয় সেই বয়সে অপকৃষ্ট পুস্তক পাঠে, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত ও চরিত্র গঠিত না হইয়া, বিপরীত ফল ফলিবে ; এবং এইরূপ পুস্তক পাঠের ফলে বঙ্গে ভবিষ্যতে উৎকৃষ্ট সাহিত্যিকবৃন্দের আবির্ভাব ব্যাহত হইবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এবং বঙ্গীয় সংস্কৃতির এই প্রকারে নানা দিক্ দিয়া দুর্নিবার ক্ষতি হইবে।

এই সকল ক্ষতি নিবারণের নিমিত্ত, বিলটা আইনে পরিণত হইলে আমরা কি করিব, তাহা নির্ধারণ করা আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য। অবশ্য উহা যাহাতে আইনে পরিণত না হয়, তাহার জন্ত সকল প্রকার চেষ্টা করাই প্রথম কর্তব্য।

—

ভারতীয় ভাষাসমূহ সম্বন্ধে একটা সরকারী (অপ ?) চেষ্টা

গত আগস্ট মাসের শেষ দিকে প্রকাশিত মডার্ণ রিভিয়ুর সেপ্টেম্বর সংখ্যায়, ভারত-গবর্মেণ্টের এডুকেশন বিভাগ হইতে সমুদয় ভারতীয় ভাষার সাধারণ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনার নিমিত্ত যে চেষ্টা হইতেছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছিলাম। গত ভাদ্র মাসের শেষের দিকে প্রকাশিত 'প্রবাসী'র আশ্বিন সংখ্যাতেও এ-বিষয়ে

কিছু লিখিয়াছিলাম। পুনর্বার অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে এবং ডিসেম্বরের মডার্ণ রিভিয়ুতে এ বিষয়ে লিখিয়াছি।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনার চেষ্টা ব্যক্তিগত ভাবে এক শতাব্দীরও অধিক কাল বাংলা দেশে হইয়া আসিতেছে। তাহার ফলে আমরা বাল্যকালে প্রায় সত্তর বৎসর আগে পদার্থ-বিজ্ঞান উদ্ভিদ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে যে-সকল বাংলা বহি বাংলা বিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলাম, তাহাতে অনেক পারিভাষিক শব্দের সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম।

প্রতিষ্ঠান হিসাবে বঙ্গে পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলনে ও রচনায় প্রথমে হাত দেন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এই কাজ বহু পরিমাণে করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ভারত-গবর্মেণ্টের শিক্ষাবিভাগ যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন সে বিষয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উদাসীন আছেন—অন্ততঃ বাহিরের লোক আমরা এ-বিষয়ে তাঁহাদের কর্ম্মিষ্ঠতার কোন সংবাদ অবগত নহি। অথচ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয় বা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্তৃপক্ষীয় কেহই সাক্ষাৎভাবে ভারত গবর্মেণ্টের শিক্ষাবিভাগের চেষ্টার কোন খবর রাখেন না, ইহা কেমন করিয়া বলিব? বলিলে তাহা ধৃষ্টতা বিবেচিত হইতে পারে। অবশ্য ইহা হইতে পারে যে, তাঁহারা সব বিষয়েই এরূপ ওয়াকিফহাল যে, এসব সংবাদ সংগ্রহের নিমিত্ত তাঁহাদের পক্ষে মডার্ণ রিভিয়ু ও প্রবাসী পড়া অনাবশ্যক।

যাহাই হউক, ব্যাপারটা এই যে (এবং তাহা আমরা সেপ্টেম্বরের মডার্ণ রিভিয়ুতে লিখিয়াছিও)—ভারতবর্ষে শিক্ষাবিষয়ে সরকারী সেণ্ট্রাল পরমর্শদাতা বোর্ড ("Central Advisory Board of Education in India") ভারত-বর্ষীয় ভাষাসমূহের সাধারণ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমস্যাটি পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত যে একটি কমীটি নিয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে বাংলা দেশের সরকারী বা বে-সরকারী কোন সভ্যই নাই; মহারাষ্ট্রের, অন্ধ্রের, তামিল দেশের এবং গুজরাটেরও নাই।

কমীটির সভাপতি হায়দরাবাদের প্রধান রাজপুরুষ সর্ আকবর হাইদরী। তিনি ভারতবর্ষের প্রধান সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিক কেন বিবেচিত হইলেন, তদ্বিষয়ে গবেষণা চলিতে পারে।

সম্প্রতি আরও চমৎকার খবর আসিয়াছে। নিখিল-ভারতীয় হিন্দুমহাসভার প্রধান ব্যবস্থাকারক (Chief Organizer) শ্রীযুক্ত চন্দ্রগুপ্ত বেদালঙ্কার খবরের কাগজে লিখিয়াছেন, "কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনার নিমিত্ত সর্ হাইদার আকবরির সভাপতিত্বে যে পরামর্শদাতা কমীটি নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার ছয় জন সভ্য মুসলমান, চারি জন হিন্দু এবং দুই জন য়ুরোপীয়। কমীটির চারি জন মুসলমান সভ্য হায়দরাবাদের উর্দু ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক, এক জন মুসলমান সভ্য আলিগড় মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক, আর এক জন মুসলমান সভ্য উর্দুর প্রগতিসাধক দিল্লীস্থিত আঞ্জুমন-ই-তরক্কী-এ-উর্দুর সেক্রেটরী।"

এই সংবাদ সত্য হইলে দেখা যাইতেছে, গবর্মেণ্ট ভাষা-সাহিত্য-বিজ্ঞান বিষয়েও সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট কূটনীতি চালাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন, এবং রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে তাহা যে ভাবে চালাইয়াছেন, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাহা অপেক্ষাও উৎকট আকারে চালাইতে চান।

ভারতবর্ষের মুসলমানেরা সাহিত্যের বা বিজ্ঞানের কোনই ধার ধারেন না, ইহা বলিলে অসঙ্গত ও মিথ্যা কথা বলা হইবে। কিন্তু সত্য কথা ইহাই যে, ভারতীয় ভাষা-সমূহের ও ভারতীয় সাহিত্য-সমূহের বিকাশ ও উন্নতি প্রধানতঃ হিন্দুদের চেষ্টায় হইয়াছে, এবং ভারতে বিজ্ঞানচর্চাও প্রধানতঃ হিন্দুরা করিয়াছে। তদ্ভিন্ন, হিন্দুরা সংখ্যায় এবং শিক্ষায় মুসলমানদের অনেক অগ্রবর্ত্তী। অথচ কমীটিতে সভ্য হইলেন ছয় জন মুসলমান ও চারি জন হিন্দু! দুটি মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি মুসলমান সাহিত্যিক সভার প্রতিনিধি কমীটিতে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, গুরুকুল কাঙ্গড়ী, ও নাগরী প্রচারিণী সভার কোন লোক উহাতে নাই। ভারতবর্ষের প্রাচীন তিনটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের কেহ তাহাতে আছে কিনা জানি না। আরবী ফারসী হইতে পরিভাষা রচনা বা চয়ন করিবার ওকালতী করিবার লোক কমীটিতে যথেষ্ট আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের সমুদয় আর্য ভাষার জননী এবং দ্রাবিড় ভাষাসমূহের পুষ্টিসাধিকা সংস্কৃতভাষার পক্ষে ন্যায্য কথা বলিবার লোক কোথায়?

সাংস্কৃতিক বিপদ শুধু বাংলার নয়

আমরা ভাবিতেছিলাম, মক্তব-মাদ্রাসার 'বাংলা' পাঠ্যপুস্তকসমূহের উপদ্রবে, বঙ্গীয় পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন কমীটির কারসাজিতে এবং মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের অন্তর্নিহিত অভিযানে বঙ্গের সংস্কৃতি বিপন্ন হইলেও, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি নিরাপদ থাকিবে। কিন্তু সে অনুমান, সে ধারণা, হয়ত ভ্রান্ত। ভারতবর্ষের সব ভাষাকেই হয়ত আরবী-ফারসীর প্রভাবে অভিভূত করিবার চেষ্টা হইতেছে। সমগ্র ভারতবর্ষকে ভাষিক পাকিস্তানে পরিণত করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

অথবা এ অনুমানও হয়ত ভ্রান্ত কিন্তু অন্য যে অনুমান করা যাইতে পারে, তাহাও ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশেষত্ব রক্ষার অনুকূল নহে। শিক্ষাবিষয়ক সরকারী কেন্দ্রীয় পরামর্শদাতা বোর্ড ইংরেজী পরিভাষার অনুসরণের পক্ষপাতী, এবং কমীটির অন্যতম সভ্য পণ্ডিত অমরনাথ ঝা তাহাতে সায় দিয়াছেন। অক্সিজেনকে অক্সিজেন বলিতে ও লিখিতে আমাদের আপত্তি নাই—চেয়ার টেবিলকে ত চেয়ার টেবিল বলিয়াই থাকি। উচ্চ-বিজ্ঞান চর্চায় য়ুরোপীয় ভাষাসমূহে যে-সকল শব্দ ব্যবহৃত হয়, সে সকল জানা ও ভারতীয় ভাষায় ব্যবহার করা চলিতে পারে। কিন্তু পণ্ডিত অমরনাথ ঝা যে তাঁহার এতদ্বিষয়ক নোটে লিখিয়াছেন, "it is advisable to adopt English terminology in all scientific writings in all Indian languages", "সমুদয় ভারতবর্ষীয় ভাষায় সমুদয় বৈজ্ঞানিক লেখায় ইংরেজী পরিভাষা গ্রহণ পরামর্শসিদ্ধ", তাহা আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা যে শুধু বৈজ্ঞানিক রচনাতেই ব্যবহৃত হয় তাহা নহে। বিজ্ঞানের প্রভাব যেমন জীবনের সকল বিভাগে বাড়িতেছে, সেইরূপ বৈজ্ঞানিক পরিভাষাও অল্পে অল্পে সাহিত্যের মধ্যেও স্থান পাইতেছে। যে-সকল ইংরেজী বা অন্য য়ুরোপীয় শব্দ, এবং আরবী-ফারসী শব্দও, আমাদের সব ভাষার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, সেগুলিকে বর্জন ও বহিষ্কার করিতে বলিতেছি না—যদিও তুর্করা তাহাদের ভাষা হইতে সমস্ত আরবী শব্দ বহিষ্কৃত করিয়াছে, কিন্তু সংস্কৃতের মত রত্নখনি আমাদের থাকিতে আমরা একেবারে পাইকারি ভাবে ইয়োরোপের ভাষিক দাসত্ব কেন গ্রহণ করিয়া আমাদের ভাষা-সমূহের সার্থক্য সাধন করিব?

চীন দেশে ও জাপানে বিজ্ঞানের চর্চা বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং ক্রমশঃ অধিকতর বিস্তৃত হইতেছে। চৈনিক ও জাপানী ভাষায় তথাকার বৈজ্ঞানিক সাহিত্যিকগণ হুবহু সমগ্র য়ুরোপীয় পরিভাষা গ্রহণ করিয়াছেন কি না, সন্ধান লওয়া আবশ্যক।

রামমোহন রায়ের সহিত অনেক ইংরেজের তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। তাঁহার এক জন ইংরেজ প্রতিপক্ষ একবার তর্কবিতর্ক উপলক্ষে বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের লোকেরা "বুদ্ধির রশ্মির নিমিত্ত" (for the "Ray of Intelligence") ইংরেজদের নিকট ঋণী। উত্তরে রামমোহন বলেন :—

> If by the "Ray of Intelligence" for which the Christian says we are indebted to the English, he means the introduction of useful mechanical arts, I am ready to express my assent and also my gratitude; but with respect to *Science Literature*, or *Religion*, I do not acknowledge that we are placed under any obligation, for by a reference to history it may be proved that the World was indebted to our ancestors for the first dawn of knowledge, which sprang up in the East, and thanks to the Goddess of Wisdom, we have still a philosophical and copious language of our own which distinguishes us from other nations who cannot express scientific or abstract ideas without borrowing the language of foreigners."

রামমোহন রায় যখন এই উত্তর দিয়াছিলেন, তখন ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ভারতবর্ষে ইংরেজী বা দেশী কোনও ভাষায় বিজ্ঞান শিখাইতে আরম্ভ করেন নাই। উপরের উক্তির তাঁহার অন্যান্য কথার অনুবাদ এখানে দিবার আবশ্যক নাই। তিনি শেষে যাহা বলিতেছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে, "আমাদের নিজের বহুশব্দসম্ভারপূর্ণ এরূপ একটি ভাষা (অর্থাৎ সংস্কৃত) আছে যাহা আমাদিগকে অন্য সেই সকল জাতি হইতে এখনও বৈশিষ্ট্য দিয়াছে যাহারা বৈজ্ঞানিক কিংবা বস্তুবিচ্ছিন্ন ভাব বিদেশীদের ভাষা হইতে ঋণ না করিয়া প্রকাশ করিতে পারে না।" এস্থলে রামমোহন এই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, ইংরেজরা তাহাদের বৈজ্ঞানিক পরিভাষার নিমিত্ত গ্রীক ও রোমানদের ভাষার নিকট ঋণী; কিন্তু আমরা

সংস্কৃতের সাহায্যে সমুদয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, সত্য ও তথ্য প্রকাশ করিতে সমর্থ।

বর্ত্তমান সময়ে রামমোহনের যুগ অপেক্ষা বাংলা হিন্দী প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ও পুষ্টি অনেক অধিক হইয়াছে। এখন যদি আমরা সমুদয় বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ ইংরেজী হইতে গ্রহণ করি, তাহা হইলে রামমোহন যে-বৈশিষ্ট্যের গৌরব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সে-বৈশিষ্ট্য থাকিবে না।

কতকগুলি বাঙালী রাজনীতিক বাংলার অপমানের মিথ্যা রব তুলিয়াছিলেন, কিন্তু ভাষা সাহিত্য বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সত্যসত্যই যে বাংলা দেশকে ও বাঙালীকে উপেক্ষা করা হইয়াছে, সে স্থলে তাঁহারা নীরব ছিলেন।

—

অ-রাজনৈতিক বিষয়েও সরকারী সাম্প্রদায়িক কূটনীতি

ব্রিটেনের সাম্রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার সাহায্য লওয়া তাহার কূটরাজনীতির এমন একটা অপরিহার্য অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে, যে, বৈজ্ঞানিক ব্যাপারেও ব্রিটেন, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিতেছে ও বাড়াইতেছে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনা যদি গবর্মেণ্ট একটি অবিমিশ্র বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক বিষয় মনে করিতেন, তাহা হইলে ইহার নিমিত্ত গঠিত বোর্ড ও কমীটিতে কেবলমাত্র বা প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিকেরাই স্থান পাইতেন। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধতম বা প্রসিদ্ধ এক জন বৈজ্ঞানিক, এক জন সাহিত্যিকও এই সমিতিগুলির সভ্য মনোনীত হন নাই। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য যে, কেবলমাত্র বা প্রধানতঃ বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার অভিপ্রায় হইতে এই চেষ্টার উৎপত্তি হয় নাই, ইহার গোড়ায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বিদ্যমান। সংখ্যালঘু এবং বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক বিষয়ে হিন্দুদের চেয়ে কম অগ্রসর মুসলমান সম্প্রদায় হইতে এবং সরকারী বা আধা-সরকারী লোকদের ও য়ুরোপীয়দের মধ্য হইতে ইহার বোর্ড ও কমীটির অধিকাংশ সভ্য মনোনয়নও প্রমাণ করিতেছে যে, ইহা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হইতে উদ্ভূত।

কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র যে-ভাষায় লিখিত, তাহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপ বুঝাইতে সেই ভাষার শব্দ ব্যবহার স্বাভাবিক। এই কারণে, ভারতবর্ষের মুসলমানদের কোন মাতৃভাষা আরবী হইতে উৎপন্ন না হইলেও তাঁহাদের ধর্ম্মঘটিত নানা বিষয় আরবী শব্দ দ্বারা অভিহিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতবর্ষের কোন ভাষারই জননী আরবী না হইলেও বৈজ্ঞানিক শব্দ রচনায় আরবীর সাহায্য লইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই—বিশেষতঃ ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রধান ভাষার জননী সংস্কৃত ভাষা হইতে সমুদয় শব্দই রচিত হইতে পারে এবং এপর্য্যন্ত উর্দু ভিন্ন আর এই সব ভাষাতে তাহা হইয়াছেও।

ইহুদীদের ধর্ম্মশাস্ত্র এবং খ্রীষ্টিয়ানদের ধর্ম্মশাস্ত্রের পুরাতন খণ্ড হিব্রু ভাষায় লিখিত। কিন্তু সেই কারণ দেখাইয়া, যে-সব দেশের ভাষা হিব্রু বা হিব্রুর সহিত সংপৃক্ত নহে, তথাকার ইহুদী বা খ্রীষ্টিয়ানেরা নূতন বৈজ্ঞানিক শব্দ রচনা বা সংগ্রহ করিবার সময় হিব্রুর সাহায্য গ্রহণ করেন না। এই সুদৃষ্টান্ত হইতে এরূপ আশা করা অস্বাভাবিক হইবে না যে, ভারতবর্ষের মুসলমানেরাও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের ভাষাকেই প্রাধান্য দিবার জেদ করিবেন না।

—

"বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ কর"

কৃষ্ণনগরে গত মাসে যে বঙ্গীয় হিন্দু সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এক দিন ডাক্তার মুঞ্জে স্থানীয় এক মূর্তিনির্ম্মাতার নির্মিত স্বামী বিবেকানন্দের একটি উৎকৃষ্ট আবক্ষ মৃন্ময় মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। সেই উপলক্ষ্যে অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি বাংলা দেশকে স্বামী বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে অনুরোধ করেন এবং বলেন যে, বাংলা দেশ তাহা করিলে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশ বঙ্গের অনুসরণ করিবে।

ভারতবর্ষের কোন একটি প্রদেশ নেতৃত্ব করুক এবং অন্য সকলে তাহার অনুবর্তী হউক, ইহা আমরা চাই না; সকলেই ঠিক্ পথ ধরিয়া অগ্রসর ও উন্নত হউক, আমরা ইহাই চাই। অবশ্য সাময়িকভাবে কখন কখন কোন কোন

বিষয়ে কোন কোন প্রদেশ পথপ্রদর্শক হইতে পারে, এবং তাহা হইয়াছেও।

স্বামী বিবেকানন্দ ঠিক্ কি পথ ধরিয়া চলিতেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সিস্টার নিবেদিতার তাঁহার সহিত হিমালয় প্রদেশে ভ্রমণের কাহিনীর এক স্থানে আছে। তাহা নীচে উদ্ধৃত করিতেছি। উক্ত পুস্তকের "নৈনীতাল ও আলমোরায়" শীর্ষক অধ্যায়ে নিবেদিতা লিখিতেছেন—

"It was here, too, that we heard a long talk on Ram Mohun Roy, in which he pointed out three things as the dominant notes of this teacher's message, his acceptance of the Vedanta, his preaching of patriotism, and the love that embraced the Mussalman equally with the Hindu. In all these things, he claimed himself to have taken up the task that the breadth and foresight of Ram Mohun Roy had mapped out."—*Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda* (Authorized Edition, 1913. Edited by the Swami Saradananda, Udbodhan Office, Calcutta). Chapter II, page 19.

তাৎপর্য্য। "এইখানেই আমরা রামমোহন রায় সম্বন্ধে তাঁহার (স্বামী বিবেকানন্দের) একটি দীর্ঘ কথন শুনিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি এই উপদেষ্টার বাণীর তিনটি প্রধান সুর নির্দেশ করেন,—তাঁহার বেদান্তকে স্বীকৃতি, তাঁহার স্বদেশহিতৈষণা প্রচার, এবং সেই প্রীতি যাহা মুসলমানকে হিন্দুর সহিত সমভাবে আলিঙ্গন করে। এই সমস্ত বিষয়েই, তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) দাবী করেন যে, রামমোহন রায়ের মানসিক প্রশস্ততা ও ঔদার্য্য এবং ভবিষ্যদ্দর্শিতা যে কাজের নক্সা আঁকিয়া গিয়াছে, তিনি তাহাই নিজের কাজ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।"

—

যুদ্ধে ব্রিটেনকে সাহায্য দেওয়ার কথা

আমরা আগে আমাদের বাংলা ও ইংরেজী উভয় মাসিকে বলিয়াছি, পূর্ণমাত্রায় অহিংসাবাদী ভিন্ন অন্য সকলের যুদ্ধে ব্রিটেনকে যিনি যে প্রকারে পারেন সাহায্য করা উচিত। এখনও তাই বলি। তাহার কারণ এ নয় যে, ব্রিটেন জিতিলে ভারতবর্ষের কোন লাভের বা সুবিধার আশা আছে;—বস্তুতঃ তাহা নাই। ইহাও নয় যে, ব্রিটেন হারিলে ভারতবর্ষ রসাতলে যাইবে; কারণ, যে-বিধাতা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপনের পূর্ব্বে ইংরেজের সাহায্য ব্যতিরেকে নানা দুঃখ-দুর্গতির মধ্যে অনেক হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষকে টিকাইয়া রাখিয়াছেন, বিংশ শতাব্দীতেও তিনিই বিধাতাই আছেন, ব্রিটিশ জাতিকে বিধাতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজ বিধাতৃত্ব ছাড়িয়া দেন নাই; তিনি সকল অবস্থাতেই পৃথিবীর অন্য সব দেশের মত ভারতবর্ষেরও অস্তিত্ব রক্ষার একটা ব্যবস্থা করিতে পারিবেন ও করিবেন।

আমেরিকার মনীষী এমার্সন বলিয়াছেন, মানব জাতির কোন চূড়ান্ত বিপদ ("final disaster") ঘটিতে পারে না।

তাহা হইলে আমরা কেন ব্রিটেনকে সাহায্য করিবার পক্ষপাতী এবং কি ভাবে সাহায্য করার পক্ষপাতী?

আমরা নিঃস্বার্থ-ভাবে, স্বেচ্ছায়, সাহায্য করার পক্ষপাতী।

ইংরেজী বহি ও কাগজপত্রে যাহা পড়িয়াছি তাহাতে আমাদের এই ধারণা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের প্রতি ব্রিটিশ জাতির ব্যবহার যেমনই হউক, হিটলারের অনুচর জার্ম্যান জাতির বর্ব্বরতা অপেক্ষা ব্রিটিশ সভ্যতা (তাহা যেমনই হউক) শ্রেষ্ঠ। এই কারণে তাহাদের জয় বাঞ্ছনীয়। তাহাদিগকে সাহায্য করিবার পক্ষপাতী হইবার দ্বিতীয় কারণ তাহাদের বিপন্ন অবস্থা। বিপন্নের সাহায্য করা মানব-ধর্ম্ম। কিন্তু অনুগ্রহের আশায় বা নিগ্রহের ভয়ে সাহায্য করা অনুমোদনযোগ্য নহে।

ব্রিটেনকে সাহায্য করিবার আর একটি কারণ, ব্রিটেন নিজের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছে। আমাদের প্রতি তাহার ব্যবহার যেরূপই হউক, নিজের স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা প্রশংসনীয়। চীন ও গ্রীস এইরূপ চেষ্টা করিতেছে। তাহারাও সাহায্য পাইবার যোগ্য।

কিন্তু আমরা দরিদ্র, এবং স্বয়ং বিপন্ন। অপরকে সাহায্য দিবার ক্ষমতা আমাদের সামান্যই আছে।

—

বীরভূমে অন্নকষ্ট ও জলকষ্ট

বীরভূম জেলার অন্নকষ্ট ও জলকষ্টের সংবাদ খবরের কাগজে বিস্তারিত বাহির হইয়াছে। বিশ্বভারতীর পল্লীসংগঠন বিভাগ কয়েকটি স্থানে কেন্দ্র খুলিয়া সাহায্য বিতরণ করিতেছেন। নিরন্ন লোকদিগকে চাউল বিতরণের ব্যবস্থা ভিন্ন আরও কয়েক প্রকারে বিপন্ন লোকদিগকে সাহায্য করা হইতেছে বা হইবে।

স্ত্রীলোকেরা ধান ভানিয়া ও সুতা কাটিয়া উপার্জন করিতে পারেন ; স্ত্রীলোকেরা ও পুরুষেরা সুতা কাটিয়া ও ঢেরায় শণের দড়ি তৈরি করিয়া রোজগার করিতে পারেন ; এবং পুরুষেরা পুকুরের পঙ্কোদ্ধার ও কুয়া কাটার কাজ করিয়া এবং স্ত্রীলোকেরা ঐ কাজে মাটি বহার কাজ করিয়া মজুরি পাইতে পারেন।

—

বীরভূমে গবাদি পশুর দুর্দশা

বীরভূমে মানুষের যেরূপ দুরবস্থা হইয়াছে, জলের অভাবে ও খাদ্যের অভাবে গবাদি পশুরও সেইরূপ দুর্দশা হইয়াছে। এই কারণে অনেক গৃহস্থ আপনাদের গোরুবাছুর বিক্রী করিয়া দিতেছে। জেলার কর্তৃপক্ষও এইরূপ পরামর্শ দিতেছেন। ইহা ঠিক হইতেছে না। বিক্রীত গাভী, বলদ, বৃষ ও বাছুর অধিকাংশ স্থলে কসাইদের হাতে পড়িবে এবং তাহারা পশুগুলিকে বধ করিয়া মাংস বিক্রয় করিবে। ইহা জৈন ও হিন্দুদের পক্ষে প্রীতিকর নহে। অথচ যাহারা গবাদি পশু বিক্রী করিতেছে, তাহারা অধিকাংশ স্থলে হিন্দু। কিন্তু তাহারা অগত্যা এইরূপ করিতেছে।

পশুগুলি বিক্রী করা যে ঠিক হইতেছে না, তাহা ধর্ম-মতের বিচার না করিয়াও বলা যাইতে পারে। দুঃসময় কাটিয়া গেলে বীরভূমের চাষীদিগকে আবার চাষ করিতে হইবে, এবং দুধের প্রয়োজন এখনও আছে, পরেও হইবে। যে-সব গাভী ও চাষের বলদ এখন বিক্রীত ও নিহত হইতেছে, তাহাদের স্থান পূরণ করিবার নিমিত্ত গাভী ও বলদ তখন কোথায় পাওয়া যাইবে ? অতএব, সে-গুলিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে পুকুরের পঙ্কোদ্ধার ও কূপ খননের দ্বারা জলের বন্দোবস্ত অতিশীঘ্র করা গবর্মেণ্টের কর্তব্য। পশুর খাদ্যও অন্য জেলা হইতে আনাইয়া অনশনক্লিষ্ট পশুদের প্রাণরক্ষা করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে পশুর খাদ্যের রেলভাড়া কমান উচিত এবং আবশ্যকসংখ্যক গোশালা বীরভূম জেলার স্থানে স্থানে সরকারী ব্যয়ে স্থাপন করিয়া চালান উচিত। পঞ্জাবের কোন কোন জেলায় দুর্ভিক্ষ হওয়ায় গবাদি রক্ষার নিমিত্ত তথাকার গবর্মেণ্ট যাহা করিয়াছিলেন, সরকারী "ইণ্ডিয়ান ফার্মিং" নামক পত্রিকার নবেম্বর সংখ্যা হইতে তাহার তাৎপর্য্য নীচে দিতেছি। পঞ্জাবেও বঙ্গের মত মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সেখানেও প্রধান মন্ত্রী ও অন্য কোন কোন মন্ত্রী মুসলমান। তাঁহারা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গে করিতে কোন বাধা হওয়া উচিত নয়।

১৯৩৮ সালে স্বল্পবর্ষণের ফলে শুধু যে মানুষের খাদ্যশস্য ক্রয়ের জন্য অর্থাভাব ঘটে তাহা নয়, বলদগোরুর খাদ্য ক্রয়েরও অসুবিধা ঘটে। রোটক ও হিসার জেলার বিখ্যাত গোজাতি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটে ; নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানেও পশুখাদ্যের সমস্যা আরও ঘনীভূত হয়। পঞ্জাব-সরকার ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পশুখাদ্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার জন্য এক জন পরামর্শদাতা নিয়োগ করিয়া সমস্যার সমাধান করেন। প্রদেশের অন্তর্গত ও বহির্ভূত অনেক রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে পশুখাদ্য আনয়ন করিবার রেলমাশুল কমাইয়া দেওয়া হয়। ১৯৩৯ সালের শীতকালে মাসিক প্রায় ৭০০,০০০ মণ পশুখাদ্য এই ভাবে রেলপথে অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে আমদানি হয়। এইরূপ রেলভাড়া কমানোর ফলে ১৯৩৮-৩৯ সালে সরকারের প্রায় ১২।০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, এবং ১৯৪০ সালের জানুয়ারি পর্য্যন্ত ১২ লক্ষ টাকা এইভাবে ব্যয় হইবে, এইরূপ নির্দ্ধারিত হয়। এই ব্যবস্থার ফলেই অধিকাংশ পশুর প্রাণরক্ষা হয়।

পশুরক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া একটি নূতন পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়। এই সকল কেন্দ্রে ৬০০০ গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। ৫৲।১০৲ হারে অর্থানুকূল্য করিয়া বৃষ প্রতিপালন করিবারও ব্যবস্থা হয়। অভাবগ্রস্ত লোকেরা দুগ্ধবতী গাভীর খাদ্য যাহাতে সংগ্রহ করিতে পারে, প্রথম দিকে তাহারও ব্যবস্থা হইয়াছিল।

—

প্রবাসী সম্মেলনের নাম পরিবর্তন প্রস্তাব

প্রস্তাবিত হইয়াছে যে, প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনকে অতঃপর "ভারতীয় বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন" নাম দেওয়া হউক। এই পরিবর্ত্তনে আমাদের আপত্তি নাই।

—

"সাধু বাংলা ভাষার ধ্বংস"

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের পরীক্ষা-সচিব (এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বিভাগের অধ্যক্ষ) ডক্টর প্রসন্নকুমার আচার্য্য মহাশয়ের কতকগুলি প্রস্তাব "প্রবাসী-সম্মেলনী"র কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার প্রস্তাবগুলি বিশেষ বিবেচনার যোগ্য। সেগুলির আলোচনা এখন না-করিয়া সেগুলির হেতুবাদের তৃতীয় হেতুটির উল্লেখ এখানে করিতেছি।

"৩। যেহেতু অনিবার্য রাজনৈতিক কারণবশতঃ এক দিকে বাংলা দেশের স্কুল-কলেজে সাধু বাংলা ভাষার ধ্বংস আরম্ভ হইয়াছে এবং অন্য দিকে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথাদির অনন্যকরণীয়

ভাষার অনুকরণপ্রিয় নবীন লেখকলেখিকারা বাঙ্গলা ভাষার আভিজাত্যের হানি করিতেছেন ;"

যে-সব নবীন লেখকলেখিকাদের দ্বারা (সকলের দ্বারা নহে) বাংলা ভাষার অনিষ্ট হইতেছে, তাঁহাদের কৃত অনিষ্টের প্রতিকারচেষ্টা কে করিতে পারেন না-পারেন, সে-বিষয়ে কিছু না বলিয়া আমরা বলি, যে-রাজনৈতিক কারণবশতঃ 'সাধু বাংলা ভাষার ধ্বংস আরম্ভ হইয়াছে', বঙ্গের বাহিরের বাঙালীরা সেই কারণের প্রভাবের বাহিরে ; সেই জন্য তাঁহাদের অন্তর্গত বাংলা সাহিত্যিক ও বাংলা সাহিত্যসেবীদিগকে আমরা বাংলা ভাষাকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যথাশক্তি চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

এ বিষয়ে আমরা আগে, বোধ হয় দু-একটা বক্তৃতায় কিছু বলিয়াছি এবং গত ৩১শে অক্টোবর জামশেদপুরে কিছু বলিয়াছি।

—

মুসলমানদের সম্বন্ধে সরকারী ভেদনীতি

১০ই ডিসেম্বরের বেহার হেরাল্ডে দেখিলাম, বিহারের এক জন সরকারী ইংরেজ স্থপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার চম্পারন বিভাগের এঞ্জিনীয়ারিং আফিসের হিসাবরক্ষকের পদ খালি হওয়ায় বিজ্ঞাপন দিয়াছেন এবং ঐ পদের প্রার্থীরা মুসলমান হইলে তাহাদের দরখাস্তে লিখিতে বলিয়াছেন, তাহারা শেখ, সৈয়দ, সুন্নি বা মোমিন। কেহ শেখ, সৈয়দ, সুন্নি বা মোমিন হইলে হিসাবরক্ষায় তাহার দক্ষতা কম বা বেশি হয়, ইহা ত এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। সুতরাং কে কি, দরখাস্তে তাহা লিখিতে বলিবার প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য কি ?

বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলল হক সাহেব ও তাঁহার মুসলমান সহযোগী মন্ত্রীরা ত বলিয়া দিয়াছেন, বঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে কোন সামাজিক শ্রেণীভেদ নাই, তাহারা সব সমান, কিন্তু বিহারে শ্রেণীভেদ আছে দেখিতেছি, এবং তাহার রক্ষার নিমিত্ত পরোক্ষ সরকারী চেষ্টাও আছে। হক্-মন্ত্রিমণ্ডল বিহার হইতে মুসলমান আমদানিও করিয়া থাকেন।

—

আগামী সেন্সস

১৯৩১ সালের লোকসংখ্যা-গণনায় যে অনেক গলদ ছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। যতগুলা ভুল দেখান হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোন একটাও যে ভুল নয়, এ পর্যন্ত কেহ তাহা দেখাইতে পারে নাই। গলদগুলার মধ্যে কোন কোনটার মূলে যে বদ মতলব ছিল, এরূপ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই রকম দুরভিসন্ধি লোপ পায় নাই, আগামী সেন্সসের বেলাতেও তাহা প্রবল ও কার্যকর থাকিবে—বোধ হয় প্রবলতর হইবে। অবশ্য, সকলকে সাবধান হইতে বলা হইতেছে। কিন্তু মিথ্যা কথা বলার যদি প্রতিযোগিতা হয়, তাহা হইলে তাহাতে কাহারও জয় আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়।

কে কোন্ ধর্মাবলম্বী বা কোন্ জা'তের লোক, তাহা লেখা বা না-লেখার প্রশ্ন লইয়া খবরের কাগজে অনেক লেখালেখি হইয়াছে। তাহা অনাবশ্যক নহে। কিন্তু দেশে সম্পূর্ণ বেকার লোক কত আছে এবং বৎসরের অধিক মাস বা ছয় মাস কতলোক বেকার থাকে, তাহারও শুমারি হওয়া আবশ্যক।

—

বিহারের গণশিক্ষা প্রচেষ্টার ফল

বিহারে প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা বহু পরিমাণে ফলপ্রদ হইয়াছে। গত ৭ই ডিসেম্বর

গণশিক্ষা কমীটির সম্পাদক বাৎসরিক রিপোর্ট পাঠ করেন। রিপোর্টে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ১৯৩৯-৪০ সালে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে যে ১৮৮৭৮টি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়, সেখানে ১১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৩২৫ জন প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী শিক্ষা গ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৪ লক্ষ ১৩ হাজার ৪৮২ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আদিম অধিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকের সংখ্যা যথাক্রমে ১ লক্ষ ৬১ হাজার ৬৬২ এবং ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ১৭। মহিলাদের শিক্ষার জন্য ৪২৭টি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয় এবং এই সমস্ত কেন্দ্রে ২১ হাজার ৩৩৩ জন শিক্ষার্থিনীর মধ্যে ৯ হাজার ২ শত ২ জন পরীক্ষোত্তীর্ণা হইয়াছে।

জেলের কয়েদীদের মধ্যে শিক্ষাপ্রচার কার্য্যও বেশ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে সেণ্ট্রাল জেলসমূহের কয়েদীদের মধ্যে ৫৯৪ জন কয়েদী উচ্চ প্রাথমিক ও নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হয়। গয়া জেলে শিক্ষাদানের যে ক্লাস খোলা হয় তাহাতে ৪২১১ জন কয়েদী যোগদান করে। তন্মধ্যে ২৩৬৩ জন কয়েদী লিখনপঠনক্ষম হইয়াছে। বিহার-সরকার ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চের পর গ্রাম্য চৌকিদার কার্য্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও গ্রহণ করা হইবে না বলিয়া যে নির্দ্দেশ জারী করেন, তদনুসারে উক্ত সময়ের মধ্যে ৯ হাজার চৌকিদার শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। —এ, পি

বাংলা দেশে এ বিষয়ে কি করা হইতেছে ? প্রতিধ্বনি বলে, "কি করা হইতেছে ?"

—

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

এবার জামশেদপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের যে অধিবেশন হইবে, তাহাতে মূল অধিবেশন ভিন্ন কেবল তিনটি শাখার অধিবেশন হইবে—সাহিত্য, বৃহত্তর বঙ্গ, ও বিজ্ঞান। এইরূপ কথা হইয়াছে যে, সাহিত্য শাখায় এবার প্রধান আলোচ্য বিষয় হইবে বাংলা ভাষার আদর্শ নির্দ্ধারণ ("standardization")। আলোচনার প্রকৃতি গতি ও পরিণাম কি প্রকার হইবে, তাহা আগে হইতে অনুমান করা যায় না। হয়ত সাহিত্যে কথিত-বাংলার ব্যবহার সম্বন্ধে কথা উঠিবে। আমাদের বেশী ভাষা জানা নাই। দু-একটা যাহা জানি, তাহার প্রত্যেকটাতেই তাহার পুস্তকলিখিত রূপ এবং কথিত রূপের মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। এই প্রভেদটা বাংলায় কিছু বেশী। এবং সেই কারণে, অ-বাঙালীরা বলেন, বাংলা শিক্ষা করা কঠিন। অথচ বাংলার ব্যাকরণ অন্য কোন কোন ভারতীয় প্রধান ভাষার, যেমন হিন্দীর, ব্যাকরণ অপেক্ষা কম জটিল।

বাংলা ভাষার পুস্তকলিখিত রূপ ও কথিত রূপের মধ্যে প্রভেদ কমান বাঞ্ছনীয়।

কথিত-বাংলার নানা শব্দের বানানটাও প্রধান সাহিত্যিকেরা স্থির করিয়া দিলে ভাল হয়। 'করিতেছি'র কথিত রূপের বানান করছি, ক'রছি, কচ্ছি, কোচ্ছি, ইত্যাদি হইয়া থাকে। 'কলিকাতা'কে কথিত বাংলায় সাধারণতঃ কল্‌কাতা লেখা হয়, কিন্তু কোলকাতা, কোলক্যাতা লিখিতেও দেখিয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তকলিখিত বাংলার নানা শব্দের বানান সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা বহু পরিমাণে গৃহীতও হইয়াছে। কথিত-বাংলা শব্দগুলি সম্বন্ধেও তাঁহারা কিছু করুন না ?

ভাষা, অবশ্য, পুকুরের জল বা ডোবার জলের মত স্থিতিশীল নয়, নদীর মত গতিশীল। ইহার রূপ বদলাইয়া চলিতেছে ও চলিবে। বরাবরের জন্য তাহা কেহ আঁটিয়া দিতে পারে না।

জামশেদপুর বিজ্ঞানের প্রয়োগে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনের বৃহৎ কারখানার স্থান। নিকটবর্ত্তী টাটানগরের কারখানাও নগণ্য নহে। এরূপ স্থানে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে বিজ্ঞান শাখায় যদি প্রধানতঃ বিজ্ঞানের সেই সকল প্রয়োগের কথাই আলোচিত হয় যাহার দ্বারা বাঙালীরা, অল্প বা অধিক পরিমাণে, কুটীরে বা বৃহৎ কারখানায়, নানা পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করিয়া লাভবান হইতে পারে, তাহা হইলে তাহা স্থানকালোচিত হইবে। বাঙালী বহু বৎসর ধরিয়া যে-সকল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত, তাহা কি বঙ্গে কি বঙ্গের বাহিরে আর সহজে করিতে পারিতেছে না; এখন নূতন পথ দেখিতে হইবে।

এ সকল গেল "কেজো" কথা।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের একটি প্রধান—যদিও অলিখিত—উদ্দেশ্য, বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয়। ইহার যথেষ্ট সুযোগ ও অবসর থাকা চাই। নানা রকমের নূতন জাতিভেদ—যথা সরকারী ও বে-সরকারী মনুষ্য, কংগ্রেসী ও অ-কংগ্রেসী রাজনীতিক, বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী, 'প্রগতি' সাহিত্যিক ও প্রাক্-'প্রগতি' সাহিত্যিক, "পারিষদ" সাহিত্যিক ও অ-"পারিষদ" সাহিত্যিক, সাহিত্যিক ও অ-সাহিত্যিক, ইত্যাদি—দেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। এই সব জাতিভেদ সত্ত্বেও সকল বাঙালীর মিলনস্থান প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন।

জামশেদপুর বাস্তবিক বাংলা দেশেরই অংশ। কিন্তু যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইহাকে বঙ্গের বাহিরে ফেলা হইয়াছে এখন তাহার আলোচনা করিব না। ইহাকে

অন্ততঃ বৃহত্তর বঙ্গের অঙ্গে পরিণত করিতে হইবে—ন্যূনকল্পে দুই দিনের জন্য।

—

পূর্ব্বতন ও আধুনিক বাঙালীর কৃতি

উনচল্লিশ বৎসর আট মাস পূর্বে যখন "প্রবাসী" প্রকাশিত হয়, তাহার আগে, বঙ্গের বাহিরে বাঙালীরা যে নিঃশব্দে বিনা আড়ম্বরে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ও অনেক দেশী রাজ্যে নানা সৎকার্য করিয়াছে, তাহা অল্প লোকেরই জানা ছিল। "প্রবাসী" প্রকাশিত হইবার পর প্রধানতঃ স্বর্গগত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের পরিশ্রমে এই মাসিক পত্রে প্রবাসী বাঙালীদের কীর্তি-কাহিনী প্রকাশিত হইতে থাকে।

তাহা প্রধানতঃ ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হইবার পরের বৃত্তান্ত। বস্তুতঃ, অ-বাঙালীদের, এবং বিস্তর বাঙালীদেরও, ধারণা এইরূপ যে, বাঙালীরা ইংরেজী শিখিবার সুযোগ আগে পাইয়া বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে চাকরিবাকরীর সুবিধা করিয়া লইয়াছিল এবং কিছু কৃতিত্ব ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ইহা যে মিথ্যা তাহা নহে; কিন্তু ইহা আংশিক সত্য মাত্র। ইংরেজ রাজত্ব আরম্ভ হইবার এবং বাঙালীরা ইংরেজী শিখিবার আগেও ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালীদের সক্রিয়তা ও কৃতিত্ব সামান্য ছিল না। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় "প্রবাসী"র বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত "বঙ্গের বাহিরে বাঙালী বেদাচার্য" প্রবন্ধে তাহার কিছু পরিচয় দিয়াছেন। এইরূপ প্রবন্ধ "প্রবাসী"তে তিনি আরও লিখিবেন।

বঙ্গের বাহিরে ইংরেজ আমলে বাঙালীরা যাহা করিয়াছে, তাহার সব প্রধান কথাও এ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত হয় নাই। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় যাহা "প্রবাসী"তে ও পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা ব্যতীত তিনি এ-বিষয়ে আরও অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। আশা করি সেগুলি প্রকাশিত হইবে। কিন্তু প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত তাঁহার সংগ্রহে যাহার উল্লেখ নাই, এরূপ বিস্তর স্মরণীয় কাজ বাঙালীরা বঙ্গের বাহিরে করিয়াছে। সেই সকলের সংগ্রহ যাহাতে হইতে পারে, সে বিষয়ে বঙ্গের ও বঙ্গের বাঙালীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত এলাহাবাদের বর্ষীয়ান প্রবীণ অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দেব মহাশয় "প্রবাসী"র বর্তমান সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। "প্রবাসী"র জন্য লিখিত তাঁহার এতদ্বিষয়ক আরও প্রবন্ধ প্রস্তুত আছে এবং যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে।

ইংরেজ আমলে ও তাহার আগে বাঙালীদের কৃতিত্ব বর্ণনা করিয়া স্বজাতির আত্মম্ভরিতা উৎপাদন বা বৃদ্ধি আমাদের উদ্দেশ্য নহে, আত্মবিশ্বাস উৎপাদন ও বৃদ্ধিই আমাদের উদ্দেশ্য। আত্মবিশ্বাসের প্রভাবে বাঙালী দৃঢ় অধ্যবসায়ী অথচ নম্র কর্মী হইবে, ইহাই আমাদের আশা।

—

তপসিলি জাতির সংখ্যা বাড়িবার আশঙ্কা

ভারত-গবন্মেণ্ট আগামী সেন্সসে কোন ধর্মাবলম্বীদের ভিন্ন ভিন্ন উপসম্প্রদায় (sect), শ্রেণী, জা'ত (caste) ইত্যাদির লোকসংখ্যা গণনা করাইবেন না বলিয়াছেন; কিন্তু ইহাও বলিয়াছেন যে, যদি কোন প্রাদেশিক গবন্মেণ্ট তাহা নিজ ব্যয়ে করাইতে চান, তাহা করাইতে পারেন। তদনুসারে বাংলা-গবন্মেণ্ট হিন্দুদের সব জা'তের (caste-এর) লোকসংখ্যা গণনা করাইবেন, কিন্তু মুসলমানদের সামাজিক কোন শ্রেণীভেদ স্তরভেদ নাই ইহা দেখাইবার নিমিত্ত তাহাদের সকলকে কেবল মুসলমান বলিয়া লেখাইবেন—যদিও ভারতবর্ষের মোমিনরা তার-স্বরে বার বার বলিয়াছে উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানেরা সরকারপ্রদত্ত সব সুবিধা আত্মসাৎ করিয়াছে, তাহাদিগকে কোন ভাগ দেয় নাই। হিন্দুদের সমুদয় জা'তের লোক-সংখ্যা গণনা করাইবার উদ্দেশ্যটা খুব সাধু। বঙ্গীয় মন্ত্রীপুঙ্গবেরা দেখিতে চান, বর্তমান তপসিলভুক্ত হিন্দু জাতিরা ছাড়া আরও কোন কোন জা'ত (caste) তপসিলি হইতে চাহিলে তাহা হইবার যোগ্য কিনা। অর্থাৎ তাঁহারা তপসিলি হইতে আরও অনেক জা'তের লোককে প্রলুব্ধ করিতে চান। আরও কোন কোন জা'তের ২।৪ জন লোক চাকরী পাইবে, ২।৪ জন ছাত্র বৃত্তি পাইবে, এই আশায় সেই সেই জা'তের বহু সহস্র ও বহু

লক্ষ লোক আপনাদিগকে "নীচ জাত" বা "ছোট লোক" বলিয়া মানিয়া লইতে রাজী হইবে, মন্ত্রীরা এইরূপ উচ্চ আশা পোষণ করেন।

সত্য কথা কিন্তু এই যে, কোন জা'তই নীচ জা'ত নয়, কোন জা'তের লোকই ছোট লোক নয়।

১২৭৮ সালের ৩১শে শ্রাবণের "সুলভ সমাচারে" কেশবচন্দ্র সেন, "দেশের বড় লোক কাহারা ?" এই প্রশ্ন করিয়া তাহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন :—

"বলিতে গেলে বনেদি বড় ঘর এদেশে অল্প। কিন্তু বাস্তবিক বড় মানুষ কাহারা ? আমাদের দেশে এদেশের 'ছোট' লোকেরা। তাহারা না থাকিলে কাহার বা ভাত জুটিত, কে বা গাড়ী চড়িয়া ঘোড়দৌড় দেখিতে যাইত, আর কেই বা তাকিয়া ঠেসান দিয়া গুড়গুড়ি টানিত। দেখ, সামান্য লোকেরা আমাদের সর্ব্বস্ব দিতেছে। তাদের ধনে আমরা বড়মানুষি করিতেছি। কিন্তু কয় জন তাহাদিগের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব মনে করে ? তাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দিন রাত্রি কষ্ট করিয়া আমাদিগকে অন্ন দিতেছে, কিন্তু কয় জন তাহাদিগের অবস্থা একবারও মনে করে ?"

এই প্রকৃত বড়মানুষদিগকে আরও অধিক সংখ্যায় তপসিলি বানাইয়া হিন্দুসমাজকে ও সমগ্র জাতিকে হীনবল করিবার চেষ্টা হইতেছে।

—

বাংলা দেশের নানা সমস্যা

বাংলা দেশের নানা দিকে এরূপ দুর্দশা হইয়াছে যে, বাঙালীদের মন অন্য কোন দিকে বিক্ষিপ্ত না হইয়া সমস্যাগুলির সমাধানে নিয়োজিত হওয়াই আবশ্যক।

কে ভারতবর্ষের বা বঙ্গের একছত্র নেতা হইবেন, বাংলা দেশে কাহারও ঐকরাজ্য বা কোন দুই জনের দ্বৈরাজ্য স্থাপিত হইবে কিনা, কে কাহাকে আক্রমণ বা পাল্টা আক্রমণ করিবে—সমস্যাগুলি ইত্যাকার কিছু নহে।

সমস্যাগুলি সর্বসাধারণের অন্ন বস্ত্র বাসগৃহের ও স্বাস্থ্যের সমস্যা এবং শিক্ষার সমস্যা। সেগুলির সমাধান বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীতে যতটা সম্ভব, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃত ও পূর্ণ সমাধান তত দিন হইবে না যত দিন বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর উচ্ছেদ ও তাহার স্থানে গণতান্ত্রিক স্বশাসনের ব্যবস্থা না হয়। সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা রদ না হইলে এই ব্যবস্থা হইতে পারিবে না; অথবা এই ব্যবস্থা না হইলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা রদ হইবে না। সুতরাং আমাদের চেষ্টা এই দুই দিকেই যুগপৎ করিতে হইবে।

—

সুভাষবাবুর কারানিষ্ক্রমণ

বাংলা-সরকার সুভাষবাবুকে জেল হইতে বাড়ী আসিতে দিয়া সুবুদ্ধির কাজ করিয়াছেন। তিনি প্রায়োপবেশন করিবার আগেই যদি তাঁহাকে বাড়ী আসিতে দেওয়া হইত, তাহা হইলে আরও সুবুদ্ধির কাজ হইত। "They builded better than they knew." দেশে ঝগড়া ও দলাদলি যত বাড়ে, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের ও হক্-মন্ত্রিমণ্ডলের ততই সুবিধা।

সুভাষ বাবু কায়মনোবাক্যে সুস্থ হউন, আমরা এই কামনা করিতেছি।

—

এক এক জনের সত্যাগ্রহ

যে-সকল মহিলা ও পুরুষ কংগ্রেসের সভ্য তাঁহাদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী যাঁহাদিগকে মনোনীত করিতেছেন, তাঁহারা একা একা যুদ্ধবিরোধী সত্যাগ্রহ করিতেছেন। ইহা সকল প্রদেশেই হইতেছে।

ইহার ফল কি হইবে, বলিতে পারি না। কিন্তু আমরা ইহার কোন প্রতিকূল সমালোচনাও করিতে চাই না। দেশের হিতের নিমিত্ত, দেশের লোকদিগের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত, প্রত্যেকেরই নিজ নিজ জ্ঞানবিশ্বাস অনুসারে, অন্যের অনিষ্ট না করিয়া, কিছু করা কর্ত্তব্য। সত্যাগ্রহীরা তাহা করিতেছেন। তাঁহারা দলবদ্ধ সত্যাগ্রহ করিয়া গবর্ন্মেণ্টকে বিব্রত করিতেছেন না।—ভারতের বা ব্রিটেনের কোন ক্ষতি করিতেছেন না।

যাঁহারা এই প্রকার বা অন্য কোন প্রকার সত্যাগ্রহের পক্ষপাতী নহেন, প্রত্যুত তাহার বিরোধী, তাঁহারা পূর্ণ রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের নিমিত্ত স্বীয় স্বীয় অনুমোদিত উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। সত্যাগ্রহীরা বা তাঁহাদের নেতা গান্ধীজী তাহাতে বাধা দিবার কোন ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই।

ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা ভারতীয়দের মধ্যে যে ঐকমত্য দেখিতে চান বলেন, তাহা, তাঁহাদেরই কৃপায়, দুঃসাধ্য—অসম্ভব বলিলেও চলে। আমাদের দেশী নেতারা কেহ কেহ সকল দলের সম্মিলিত অভিযান (যাহাকে তাঁহারা য়ুনাইটেড ফ্রন্ট বলেন) চান। কিন্তু বর্তমানে তাহাও সুসাধ্য নহে। কিন্তু একটা কাজ সকল দলের লোকই করিতে পারেন—কেহ কাহারও সমালোচনা না করিয়া নিজ নিজ পথে চলিতে পারেন। কোন কোন দল অন্য কোন কোন দলের এরূপ সমালোচনা করেন, যাহাতে মনে হয়, তাঁহারা খুব ভাল ছেলে, অন্যেরা ভাল ছেলে নহে, অতএব গবন্মেণ্টের কৃপাদৃষ্টি যেন তাঁহাদের উপর পড়ে, অন্যদের উপর নহে তাঁহাদের মতলবটা এইরূপ। এই প্রকার পারস্পরিক সমালোচনার দ্বারা আমাদের শক্তি বাড়ে না বা কোন সুবিধা হয় না, সুবিধা হয় বিদেশী গবন্মেণ্টের।

—

জয় না-হওয়া পর্যন্ত যুঝিবার প্রতিজ্ঞা

কয়েক দিন পূর্বে ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে ব্রিটিশ নৃপতির বক্তৃতার একটি সংশোধক প্রস্তাব স্বাধীন শ্রমিক দল (Independent Labour Party) উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতার ভিত্তিতে শান্তিস্থাপন-প্রয়াসের উদ্দেশে করা হইয়াছিল। ইহার পক্ষে চারি জন পার্লেমেণ্ট-সভ্য ভোট দেন, বিরুদ্ধে ৩৪১ জন। ইহা হইতে বুঝা যায়, ব্রিটেন জয়ী না-হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন সাহেব শান্তিরক্ষার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, ব্রিটেনকে হীনতা স্বীকার পর্যন্ত করান হইয়াছিল। কিন্তু ব্রিটেনের বর্তমান মনোভাব এইরূপ যে, যখন এত হীনতা স্বীকার করা সত্ত্বেও শান্তি রক্ষিত হইল না, যুদ্ধ আরম্ভ হইলই, তখন আর থামা নয়—হয় এস্পার কি ওস্পার।

হিট্‌লারও সেদিনকার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, যুদ্ধে পরাজিত হইলে জার্মেনীর অস্তিত্ব থাকিবে না। তাহার মানে, জার্ম্যানদিগকে প্রাণপণ সর্বস্বপণ করিয়া শেষ পর্যন্ত লড়িতে বলা।

—

আদালত-প্রাঙ্গণ হইতে অপহৃতা বালিকাটি কোথায়?

গত মাসের "প্রবাসী"তে বাগেরহাটের আদালত-প্রাঙ্গণ হইতে অপহৃতা যে বালিকাটির কথা লিখিয়াছিলাম, তাহার কি হইল?

দৈনিক কাগজগুলিতে বড় বড় অনেক খবর বাহির হইতেছে। কিন্তু মেয়েটির খবর নাই। আদালতের সম্মুখে নারীহরণ অতি তুচ্ছ ব্যাপার কিনা!

—

নিখিলব্রহ্ম বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

খ্রীষ্টিয়ানদিগের আগামী বড়দিনের ছুটিতে রেঙ্গুনে নিখিল-ব্রহ্ম বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় এই অধিবেশনের সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। তিনি যেমন হিন্দু নানা শাস্ত্রের সেইরূপ বৌদ্ধ শাস্ত্রসমূহের বিস্তারিত ও গভীর জ্ঞানের জন্য প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধ দেশে হয়ত তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলিবার অনুরোধ হইবে।

ব্রহ্মদেশবাসী বাঙালীদের মাতৃভাষা ও সাহিত্যে অনুরাগ অতীব প্রশংসনীয়। তাঁহারা নানা বাধা সত্ত্বেও প্রতিবৎসর তাঁহাদের সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন চালাইয়া আসিতেছেন।

—

বাঁকুড়া নারীসম্মেলনের দুটি প্রস্তাব

অন্যত্র বাঁকুড়া নারীসম্মেলনের গত অধিবেশনের যে প্রতিবেদন মুদ্রিত হইল, তাহাতে যে দুটি প্রস্তাবের বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য।

কতকগুলি নারীকেও যে আইনে নির্দিষ্ট কোন-না-কোন অপরাধের জন্য কারাগারে পাঠাইতে হয়, ইহা দুঃখের বিষয়। কিন্তু সেখানে থাকিতে যাহাতে তাহাদের চারিত্রিক উন্নতির পরিবর্তে অবনতি না-হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। পুরুষ-বন্দীদের অবনতি হয় বলিয়া, বন্দিনীদের অবনতি বরদাস্ত করিতে হইবে, এমন কোন বাধ্যতা নাই। বন্দিনীদের যাহাতে অবনতি

না হয়, তাহার নিমিত্ত তাহাদের জন্য আলাদা কারাগারের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

যে-সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত নারীদের কল্যাণ জড়িত, তাহার কমীটিসমূহে নারীদের প্রতিনিধি লইতে হইবে, অপর প্রস্তাবটির তাৎপর্য্য এই। এই প্রস্তাবটি অনুসারেও কাজ হওয়া উচিত।

—

রামকৃষ্ণ মিশন শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান

কলিকাতার ল্যান্সডাউন রোডে রামকৃষ্ণ মিশনের যে শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান আছে, তাহার ১৯৩৯ সালের রিপোর্টটি দেখিয়া প্রীত হইলাম। এই প্রতিষ্ঠানটির দ্বারা বহু-সংখ্যক প্রসূতির ও তাঁহাদের শিশুদের কল্যাণ সাধিত হইতেছে। ইহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

—

কুষ্ঠরোগীদের জন্য আশ্রম

যাহাদের কুষ্ঠ রোগ হয়, তাহাদের চেহারা এমন বিকৃত ও কুৎসিত হইয়া যায় এবং ক্ষত প্রভৃতিও এমন হয়, যে, তাহাদের সংস্রব স্বভাবতই বর্জনীয় মনে হয়। তদ্ভিন্ন এই রোগের সংক্রামকত্বও আছে। এইরূপ নানা কারণে প্রাচীন কাল হইতে সকল দেশে কুষ্ঠরোগীরা ঘৃণিত হইয়া এবং অন্য মানুষদের দয়ামায়া হইতে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে। এইরূপ একটা অমূলক সংস্কারও আছে যে, কুষ্ঠরোগী মাত্রেই পূর্বজন্মের বা বর্তমান জীবনের কোন মহাপাতকবশতঃ এই ভীষণরোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ অন্য যে-কোন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যেমন পাপী না হইয়া নির্দোষ, এমন কি পুণ্যাত্মাও, হইতেও পারে, কুষ্ঠরোগীরাও সেইরূপ।

কুষ্ঠরোগীদের সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসার নিমিত্ত আশ্রম স্থাপন খ্রীষ্টীয় মিশনারীরাই প্রথমে করেন। এখনও অন্যেরা কয়েকটি স্থানে তাহাদের জন্য আশ্রম স্থাপন করিয়া থাকিলেও, খ্রীষ্টীয় সেবাব্রতীরা এ বিষয়ে অগ্রণী আছেন।

ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে কুষ্ঠীদের জন্য মিশন ৬৬ বৎসর কাজ করিতেছেন। তাহার ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪০ সালের আগস্ট পর্য্যন্ত এক বৎসরের রিপোর্ট পাইয়াছি। এই ইংরেজী রিপোর্টটি পুরুলিয়ার A. Donald Miller সাহেবের নিকট হইতে আনাইয়া সকল ইংরেজী-জানা লোকের দেখা উচিত। তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, অনেক বালকবালিকা আরোগ্য লাভ করিয়াছে। অধিকবয়স্ক কেহ কেহও আরোগ্য লাভ করে।

১৯৩৯ সালে আশ্রমগুলির মোট ব্যয় হইয়াছিল ৮,৪২,৩২৮ টাকা। ইহার মধ্যে গবর্মেণ্ট ও মিউনিসিপালিটি আদি অন্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ৩,৯০,৫০৬ টাকা। বাকী দান। দাতাদের মধ্যে ভারতবর্ষীয় লোক অনেক আছেন। যথেষ্ট আশ্রমের অভাবে এবং বর্তমান আশ্রমগুলিতে স্থানাভাবে অনেক রোগীকে ফিরাইয়া দিতে হয়। আরও আশ্রম নির্মাণার্থ সকলে টাকা দিলে অতি মহৎ কাজ করা হইবে।

—

ইয়োরোপ আফ্রিকা ও এশিয়ায় যুদ্ধ

যুদ্ধ প্রচণ্ডতম ভাবে চলিতেছে ইয়োরোপে, কিন্তু আফ্রিকা ও এশিয়াতেও কম নহে। বিস্তারিত সংবাদ দৈনিক কাগজগুলিতে বাহির হইতেছে।

ইয়োরোপের যুদ্ধে জার্মেনীর ব্রিটেনের উপর আক্রমণ চলিতেছে, আবার ব্রিটেনও জার্মেনীকে আক্রমণ করিতেছে। আক্রমণ প্রধানতঃ আকাশপথে বোমাবর্ষণ দ্বারা হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে জাহাজ ডুবানও চলিতেছে।

ইংরেজদের এরোপ্লেন দ্বারা ইটালীর কোন কোন স্থান আক্রান্ত হইবার সংবাদও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়।

ইটালী গ্রীসকে আক্রমণ করিয়া এ পর্য্যন্ত নাস্তানাবুদই হইয়া আসিতেছে। এরূপ যে হইবে, আগে হইতে অনুমান করিতে পারা যায় নাই। কারণ, কয়েক বৎসর হইতে মুসোলিনির আস্ফালন ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির খবর পাওয়া যাইতেছিল, গ্রীসের যুদ্ধায়োজনের কিছুই জানা যায় নাই। ইটালীকে এরূপ নাকাল হইতে দেখিয়াও তাহার বন্ধু জার্মেনী কেন যে তাহার সাহায্য করিতেছে না বা করিতে পারিতেছে না, তাহার ঠিক্ কারণ এখনও জানা যায় নাই। অনুমান কিছু কিছু হইতেছে বটে।
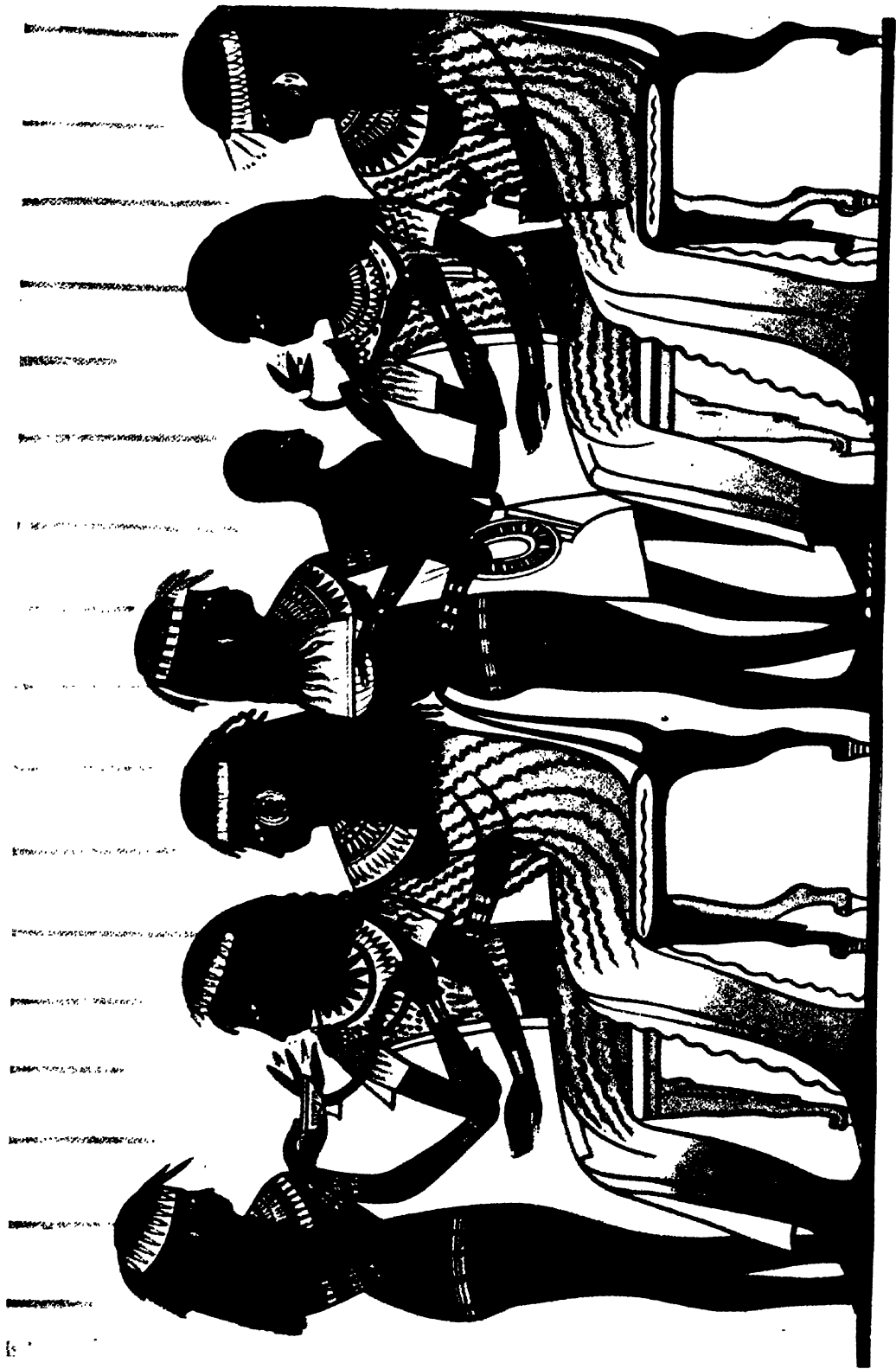
মিশরের চিত্রকলা-নিদর্শন

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

আফ্রিকায় ইটালী মোটের উপর সুবিধা করিতে পারিতেছে না। প্রথম প্রথম ইংরেজরা তাহাদের অধিকৃত সোমালিল্যাণ্ড ছাড়িয়া আসিতে এবং কেনিয়ার সীমান্তেও কিছু হটিতে বাধ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পর ইটালীয়ানরা খুব হারিতেছে।

এশিয়ায় ইটালী আরবদেশের ও প্যালেস্টাইনের কোথাও কোথাও এবং এডেনে বোমা ফেলিয়াছিল, কিন্তু কোথাও কোন জায়গায় আড্ডা গাড়িতে পারে নাই।

এশিয়ার প্রধান যুদ্ধ জাপানে ও চীনে। জাপানীরা নূতন করিয়া চীনের কোন অংশ অধিকার করিতে পারে নাই। পূর্বে যাহা দখল করিয়াছিল, তাহার কোন কোন অংশ আবার চীনরা দখল করিয়াছে। জাপানীরা আপনাদের অধিকৃত অংশটাকে "চীন সাধারণতন্ত্র" নাম দিয়া তাহার একজন চৈনিক সাক্ষীগোপাল রাষ্ট্রপতি খাড়া করিয়াছে। জাপানের তাঁবেদার এই "চীন সাধারণতন্ত্র" স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলিয়া এখনও কোন স্বাধীন দেশ কর্তৃক স্বীকৃত হয় নাই। মোটের উপর চীনে জাপানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়, চীনের ভবিষ্যৎই উজ্জ্বল। ভারতবর্ষের লোকেরা চীনের জয় ও বিপন্মুক্তি কামনা করে।

জাপান ইন্দোচীনে নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, কিছু যুদ্ধও করিয়াছে। কিন্তু ইন্দোচীন জাপানের দখলে আসে নাই।

ইন্দোচীন ও থাইল্যাণ্ডের (শ্যামদেশের) মধ্যে কিছু সংঘর্ষের খবর আসিয়াছিল।

জাপান হল্যাণ্ডের সাম্রাজ্যভুক্ত জাভা প্রভৃতি দ্বীপের উপর লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।

আমেরিকা যদি ব্রিটেনের পক্ষে যুদ্ধে নামে, তাহা হইলে জাপান আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে।

রাশিয়াকে হিটলার নিজের দলে টানিতে পারে নাই, কিন্তু ব্রিটেনও পারে নাই। রাশিয়া হিটলারের পক্ষ অবলম্বন না করিলেই বোধ হয় ব্রিটেন তাহা যথেষ্ট সাহায্য, এবং সৌভাগ্য, মনে করিবে। রাশিয়া চীন বা জাপান কাহারও দলে যায় নাই, কিন্তু যুদ্ধোপকরণ চীনকে বিক্রী করে বটে।

—

ডিক্টেটারির চাহিদা

কিছু দিন থেকে বাংলা দেশে কতকগুলি ছাত্র ও অন্য যুবকদের মধ্যে ডিক্টেটারির একটা চাহিদা জন্মিয়াছে মনে হয়। তাহার আভাস মীটিং ভাঙাতে ও আনুষঙ্গিক মাথা ভাঙিবার ও হাত-পা ভাঙিবার চেষ্টাতে পাওয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি কৃষ্ণনগরে যে হিন্দু সম্মেলন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ত প্রস্তাবই হইয়াছিল যে, শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ডিক্টেটর করা হউক। সেই প্রস্তাবের আলোচনা বেশী দূর অগ্রসর হইবার পূর্বেই শ্যামাপ্রসাদ বাবু অসম্মতি জানাইতে তাহা ভোটে দেওয়া হয় নাই।

গত ৬ই ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে অল-বেঙ্গল স্টুডেণ্ট্‌স্ ইকনমিক সোসাইটির উদ্যোগে সর্ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হয় :—

"The constitution of free India should start with dictatorship rather than with democracy."

"স্বাধীন ভারতের কন্সটিটিউশ্যনের সূত্রপাত গণতন্ত্র হইতে না হইয়া বরং ডিক্টেটারি হইতে হওয়া উচিত।"

অর্থাৎ কি না স্বাধীন ভারতবর্ষ পরিণামে যে মূল রাষ্ট্রবিধি পাইবে, তাহার আরম্ভ হউক ডিক্টেটারিতে।

ভারতবর্ষের সব মানুষ **এক জন মানুষের অধীন** হইবে এবং তাহাকেই বলা হইবে **স্ব-অধীন-তা**!

যাহা হউক, এই প্রস্তাবটা অধিকাংশ ভোটে গৃহীত হয়। সভাপতি উপসংহারে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া, পার্লেমেণ্টারি রীতি অনুসারে, প্রস্তাবটার বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন।

আমরা ডিক্টেটারির বিরোধী। ডিক্টেটার যদি নিজের দেশের লোক হয়, তাহা হইলেই তাহার অধীনতা যে অধীনতা নহে, প্রত্যুত স্বাধীনতা, এরূপ মনে করা হাস্যকর। ডিক্টেটারের অধীন জার্মেনীর ও ইটালীর লোকদের কতটা স্বাধীনতা আছে ?

ডিক্টেটারের অধীন হইতে চাওয়ার মানে, আমাদের প্রত্যেকের যে বুদ্ধি, যে বিচারশক্তি, যে বিবেচনাশক্তি, যে বিবেক, যে ভালমন্দর জ্ঞান আছে, তাহার ব্যবহার আমরা করিব না, কিম্বা করিবার সামর্থ্য

আমাদের নাই, অন্য এক জন লোক যাহা হুকুম করিবে, তাহাই আমরা মানিব, তাহার হাতে যন্ত্রের মত চালিত হইব। তাহা হইলে আমরা বুদ্ধিবিবেকশালী মানুষ হইয়াছি কেন? যন্ত্র হইলেই ত হইত ভাল?

প্রস্তাবটির দ্বারা চাওয়া হইয়াছে যে, প্রথমে ভারতবর্ষে ডিক্টেটারি স্থাপিত হউক, তাহার পর ভারতবর্ষ স্বাধীন রাষ্ট্রের মূলবিধি (constitution) পাইবে। সেই রকম গবন্মেণ্টই ভাল ও বাঞ্ছনীয় যাহা সকল মানুষকে মনুষ্যোচিত জীবন যাপন করিতে বাধা না দিয়া সমর্থ করে, যাহা সকলের মানসিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশের সহায় হয়। ডিক্টেটারি এ রকম গবন্মেণ্ট নয়।

ডিক্টেটারের ও গণতান্ত্রিক নেতার মধ্যে প্রভেদ এই যে, কোন গণতান্ত্রিক নেতাকে তাঁহার পদ হইতে সরাইতে চাহিলে সাধারণ নির্বাচনে তাঁহাকে ভোটে পরাস্ত করিয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। কিন্তু ডিক্টেটারকে সরাইতে হইলে বলপ্রয়োগসাপেক্ষ বৈপ্লবিক উপায় অবলম্বন করিতে হয়। অবশ্য, এমন হইতে পারে যে, কাহাকেও ভোটের দ্বারা ডিক্টেটার করা হইল। কিন্তু তিনি যখন ডিক্টেটার হইয়া বসিলেন তাহার পর তাঁহার হুকুমই সকলকে মানিতে হইবে। তিনি ভোটাভুটি হইতে দিতে, এবং ভোটের ফল মানিতে বাধ্য নহেন। তাঁহাকে কোন কিছু মানাইতে হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে এমন বলপ্রয়োগ করিতে হইবে যাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে তিনি অসমর্থ।

আমরা স্বাধীনতা চাই কিসের জন্য? শুধু দৈহিক জীবনের পূর্ণতার জন্য ত নহে, শুধু যথেষ্ট খাইতে পরিতে পাইবার ভাল বাড়িতে থাকিবার জন্য ত নহে; বরং হৃদয়-মনের আত্মার পূর্ণবিকাশ যাহাতে হইবে এরূপ জীবনের জন্যও বটে। ডিক্টেটার যে আমাদিগকে এই সর্বাঙ্গীন পূর্ণ জীবন লাভ করিতে দিবে, এমন কি দৈহিক পুষ্টির উপকরণও যথেষ্ট পাইতে দিবে, তাহার কি নিশ্চয়তা আছে? ডিক্টেটারের অধীন জার্মেনীতে মানুষকে যে সব সময় যথেষ্ট খাইতে দেওয়া হইয়াছে বা এখনও হইতেছে, এমন নয়। ইংরেজ গবন্মেণ্টের বিরুদ্ধে আমাদের একটা নালিশ এই যে, আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী মতামত কাগজে বহিতে সভায় প্রকাশ করিতে পাই না। রাশিয়ার, জার্মেনীর ও ইটালীর ডিক্টেটারেরা ত সেই সেই দেশের মানুষ। তাহাদের অধীন রাশিয়া, জার্মেনী ও ইটালীতে কি বাক্‌স্বাধীনতা ও প্রেসের স্বাধীনতা আছে? আমাদের দেশে কোন দেশী ডিক্টেটার হইলে তিনি যে সকলকে বাক্‌স্বাধীনতা এবং মুদ্রণস্বাধীনতা দিবেন, তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? প্রতিপক্ষদের মীটিং ভাঙিয়া দেওয়া এবং তাহাদের খবরের কাগজ অচল বা বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা কি আমাদের দেশে দেখি নাই?

ডিক্টেটারি চাওয়া নিজেদের পঙ্গুতা ও মানসিক অসামর্থ্য জাহির করা মাত্র।

—

ব্রিটেনের যুদ্ধব্যয়

১০ই ডিসেম্বরের রয়টারের তারের খবরে দেখা গেল যে, সে দিন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে ব্রিটেন প্রতিদিন ১,৬০,০০,০০০ পাউণ্ড খরচ করিয়াছে। এক পাউণ্ড বর্তমান মুদ্রা বিনিময়ের হারে ১৩⅓ টাকার সমান। ভারতবর্ষের দৈনিক যুদ্ধব্যয় ২০ লক্ষ টাকা, কেন্দ্রীয় আইনসভার গত এক অধিবেশনে রাজস্ব-সচিব বলিয়াছিলেন। তাহাও ভারতবর্ষ বহনে অসমর্থ। কিন্তু ভারতবর্ষের চেয়ে লোকসংখ্যায় ও আয়তনে অনেক-গুণ ছোট ব্রিটেন প্রত্যহ ২১ কোটি টাকার উপর খরচ করিতেছে! কি প্রকারে? ভারতের ধন তাহার ঐশ্বর্যের ভিত্তি বলিয়া।

ব্রিটেনের লোকসংখ্যা পাঁচ কোটি, ভারতের পঁয়ত্রিশ কোটি; ব্রিটেনের আয়তন ৮৯০৪১ বর্গমাইল, ভারতের ১৮০৮৬৭৯ বর্গমাইল। ব্রিটেনের দৈনিক যুদ্ধব্যয় ২১⅓ কোটি টাকা, ভারতের কুড়ি লক্ষ টাকা। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার সপ্তমাংশ লোকের বসতি যে দ্বীপে এবং যাহার আয়তন ভারতবর্ষের কুড়ি ভাগের এক ভাগ, সেই দ্বীপটি যুদ্ধে প্রতিদিন ভারতবর্ষ অপেক্ষা ১০৬⅔ গুণ অধিক টাকা ব্যয় করিতে সমর্থ। ব্রিটেন ভারতবর্ষ অপেক্ষা কত অধিক ধনী, ইহা হইতে বুঝা যাইবে।

ব্রিটেন অধিক ধনী বলিয়াই যে এত বেশী খরচ করিতেছে ও করিতে পারিতেছে, তাহা নহে। সে বুঝিয়াছে, এই যুদ্ধে জয়ের উপর তাহার স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্র-অস্তিত্ব নির্ভর করে। এই জন্য সে প্রাণপণ ও সর্বস্ব পণ করিয়াছে।

—

ভারতসচিবের গত বৃহস্পতিবারের স্তোকবাক্য

এই মাসের বিবিধ প্রসঙ্গ শেষ করিবার সময় ভারত-সচিবের ১২ই ডিসেম্বরের লম্বা বক্তৃতার রিপোর্ট পড়িলাম। উহাতে তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের কীর্তি বর্ণনা করিয়া কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা এবং দেশী নৃপতিদিগকে পরস্পরের সহিত রফা করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে শান্তশিষ্ট বালকের মত থাকিতে ও বড়-লাটের তিন মাস আগেকার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বলেন। ইহারই নাম "ভারত আগে" ("India first")। ব্রিটেন ভারতের পক্ষে কল্যাণকর রফা হইতে দিলে ত তাহা হইব! সে-পথ যে তাঁহার কৃপায় বন্ধ!

—

জার্মানির ভূমি-পরিমাণ ও লোকসংখ্যা

বর্তমান যুদ্ধের পূর্বে জার্মানির ভূমি ১,৮১,৭০০ বর্গ-মাইল ও লোকসংখ্যা ৬ কোটি ৬০ লক্ষ ছিল। অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে ৩৬৩ জন। সম্প্রতি ১০ই ডিসেম্বর হের হিটলার বলিয়াছেন, প্রতি বর্গ কিলোমিটরে ১৪০ জন। ২·৫৯ বর্গ কিলোমিটরে ১ বর্গমাইল। অতএব প্রতি বর্গ-মাইলে ৩৬৩ জন বটে। কিন্তু এই ভূমির মধ্যে অরণ্য, পর্ব্বত, হ্রদ, নদী প্রভৃতি আছে। বোধ হয় এই সকল কৃষির অযোগ্য ভূমি বাদ দিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, এক সহস্র জার্মানকে ৬ বর্গ কিলোমিটর ভূমির উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। এই হিসাবে প্রতি বর্গমাইলে ৪৩২ জন হইবে। 'দেশের দারিদ্র্য' নামক প্রবন্ধে এই কথা লিখিত হইয়াছে।

—

"রবীন্দ্র-রচনাবলী"

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় রবীন্দ্রনাথের যে সমগ্র রচনাবলী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছেন তাহার পঞ্চম খণ্ড সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডে কবিতা-অংশে 'চৈতালি', নাটক-অংশে 'কাহিনী' ("গান্ধারীর আবেদন", "লক্ষ্মীর পরীক্ষা", "নরকবাস", "সতী" প্রভৃতি), উপন্যাস-অংশে "নৌকাডুবি" এবং প্রবন্ধ অংশে 'বিচিত্র প্রবন্ধ' ও 'প্রাচীন সাহিত্য' মুদ্রিত হইয়াছে। এই খণ্ডে নিম্নলিখিত ছবি আছে: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের প্যাস্টেল চিত্র, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সুহৃদ ত্রিপুরেশ্বর রাধা-কিশোর দেবমাণিক্য, পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ, ও কবির বোট "পদ্মা" ('চৈতালি' ও 'ছিন্নপত্রে'র অধিকাংশ এই বোটে লিখিত হয়)। অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডেরও কোনো কোনো গ্রন্থের সূচনা কবি লিখিয়া দিয়াছেন। 'চৈতালি'র সূচনায় কবি লিখিতেছেন:

"...পতিসরের নাগর নদী নিতান্তই গ্রাম্য। অল্প তার পরিসর, মন্থর তার স্রোত। তার এক তীরে দরিদ্র লোকালয়, গোয়ালঘর, ধানের মরাই, বিচালির স্তূপ, অন্য তীরে বিস্তীর্ণ ফসল কাটা শস্যক্ষেত ধু ধু করছে। কোনো এক গ্রীষ্মকাল এইখানে আমি বোট বেঁধে কাটিয়েছি। দুঃসহ গরম। মন দিয়ে বই পড়বার মতো অবস্থা নয়। বোটের জানলা বন্ধ করে খড়খড়ি খুলে সেই ফাঁকে দেখছি বাইরের দিকে চেয়ে। মনটা আছে ক্যামেরার চোখ নিয়ে, ছোটো ছোটো ছবির ছায়া ছাপ দিচ্ছে অন্তরে। অল্প পরিধির মধ্যে দেখছি বলেই এত স্পষ্ট করে দেখছি। সেই স্পষ্ট দেখার স্মৃতিকে ভরে রাখছিলুম নিরলংকৃত ভাষায়। অলংকার প্রয়োগের চেষ্টা জাগে মনে যখন প্রত্যক্ষবোধের স্পষ্টতা সম্বন্ধে সংশয় থাকে। যেটা দেখছি মন যখন বলে এটাই যথেষ্ট তখন তার উপরে রং লাগাবার ইচ্ছাই থাকে না। চৈতালির ভাষা এত সহজ হয়েছে এই জন্যেই।..."

'চৈতালি'র প্রথম সংস্করণে গ্রন্থ-সূচনায় "তুমি যদি বক্ষোমাঝে থাক নিরবধি" এই কবিতাটি কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত ছিল। 'চৈতালি'র আধুনিক সংস্করণগুলিতে এটি আর ছাপা হইত না। 'চৈতালি'র প্রথম সংস্করণ হইতে কবির তৎকালীন হস্তাক্ষরের প্রতিলিপিতে কবিতাটি রচনা-বলীতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত কিন্তু পরে বর্জিত "অভিমান" কবিতাটিও রচনাবলী-সংস্করণ

'চৈতালি'তে পুনর্মুদ্রিত আছে। সব বইগুলিরই পুরাতন নানা সংস্করণের সহিত মিলাইয়া পাঠ নির্ণয় ও পাঠসংশোধন করা হইয়াছে।

—

চীনে ও জাপানে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

আমরা প্রবাসীর বর্তমান সংখ্যার ৩৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছি চীনে ও জাপানে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা কি প্রকারে রচিত হইতেছে তাহা জানা আবশ্যক। শান্তিনিকেতনে এক জন বিখ্যাত চৈনিক বিদ্বান্ আসায় তাঁহার নিকট হইতে সংবাদ জানিয়া লইবার নিমিত্ত পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি জানাইয়াছেন,

"চীন দেশের বিদ্বান্‌টির নাম Mr. T. F. Chow, তিনি আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন চীন দেশে ও জাপানে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সেই সেই দেশের ভাষায় তৈরি করা হইয়াছে। যদিও দুই-চারিটা শব্দ য়ুরোপীয় ভাষাতে, যাহা পূর্ব্বেই চীনা জাপানী ভাষায় চলিত হইয়াছিল, তাহা রহিয়া গিয়াছে। কোনো কোনো শব্দ অনুবাদিত ও য়ুরোপীয় দুই রূপেই চলে—যথা লজিক (Logic)।

"চীন দেশে পরিভাষা শব্দ তৈরির জন্য একটি কমিটি আছে তাহার প্রধান Dr. K. C. Chen। ইনি রসায়ন-শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত। এই কাজে পূর্ব্বে ছিলেন Dr. S. C. Hsin. তিনি biologist অর্থাৎ জীবতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত। এখন তাঁহাকে উত্তর-পশ্চিম চীন দেশের কৃষিবিদ্যালয়ের ভার লইয়া যাইতে হইয়াছে, তাই Dr. Chen এই কমিটির অধ্যক্ষতা করিতেছেন। এই কমিটি পরিভাষা শব্দ তৈরি করেন এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে গ্রন্থমালা রচনা করান ও রচিত গ্রন্থাবলী বিচার করিয়া দেখেন।

"জাপানেও ঠিক এই প্রণালীতেই কাজ হয়। তবে সেখানে য়ুরোপীয় ভাষা হইতে গৃহীত শব্দ দুই-চারিটা বেশি চলে—কারণ চীন দেশের পূর্ব্বেই ওদেশে য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের চর্চ্চা সুরু হইয়াছিল।

"ভারতে পরিভাষা বিষয়ে ইতিপূর্ব্বেই অনেক কাজ করিয়াছেন নাগরী প্রচারিণী সভা। কাশী হিন্দুস্থানী একাডেমী, এলাহাবাদ, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও মহারাষ্ট্র পণ্ডিতমণ্ডলী এই বিষয়ে যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তো সবই উর্দ্দুতে অনুবাদ করিয়াই চালাইতেছেন।

"বাংলা দেশেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে কাজ হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা সবগুলি আমার হাতের কাছে নাই। যাহা আছে তাহাতেই দেখিতেছি ১৩০১ সালে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বিষয়ে কাজ করিয়াছেন (দ্রঃ পৃঃ ৮১, ১৪৮ এবং ১৩০৫ সালের পত্রিকায় ২২৭ পৃঃ)। ঐ পত্রিকায় ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন (১৩০৬ সাল, পৃঃ ৯১, ৯৬-১০২)। শ্রীযুত যোগেশ রায় মহাশয় ভৌগোলিক পরিভাষা বিষয়ে ১৩০৭ সালে (১৭০ পৃঃ) লিখিয়াছেন। অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতিও অনেক কাজ করিয়াছেন। দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা-বিদ্যায় তো বহু প্রাচীন ভাল ভাল শব্দ আছে। নূতনও বিস্তর রচিত হইয়াছে। আরও বহু শব্দ সহজেই রচিত হইতে পারে।"

রবীন্দ্রনাথের "চিত্রলিপি"*

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

এই বইখানি নানা দিক্ দিয়া একক, এবং বৈশিষ্ট্যময়। ইহাতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত আঠারোখানি চিত্রের প্রতিলিপি আছে (এগুলির মধ্যে দশখানি বহুবর্ণময়), এবং চিত্রের ভাব ও উদ্দেশ্য লইয়া কবিবরের রচিত আঠারোটী ক্ষুদ্র বাঙ্গালা কবিতা এবং কবিতাগুলির ইংরেজী ভাবানুবাদ কবির স্বাক্ষরিত হস্তলিপির প্রতিলিপিতে প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কবির রচিত একটী ইংরেজী ভূমিকা, ও শিল্পাধিষ্ঠাত্রী "চিত্রলেখা দেবী"-র উদ্দেশ্যে রচিত আর একটী বাঙ্গালা কবিতা ও তাহার ইংরেজী অনুবাদও আছে।

এই বইয়ে সহজ-লভ্য আকারে কবির চিত্র-বিষয়ক কৃতির কতকগুলি নিদর্শন মিলিবে। রবীন্দ্রনাথ সর্ববাদিসম্মতিক্রমে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে অন্যতম। সঙ্গীত বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্ব কাহারও কাহারও পক্ষে—বিশেষতঃ যাঁহারা ভারতের প্রাচীন সঙ্গীতের ব্যবসায়ী বা অনুরাগী তাঁহাদের কাহারও কাহারও পক্ষে—অনুমোদনীয় বলিয়া মনে না হইলেও, আধুনিক বাঙ্গালায় ও ভারতবর্ষে তিনি যে সঙ্গীতকে তাহার একটী অভিনব এবং বহুজনের মতে যুগোপযোগী রূপ দিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নাট্যেও—নাটক রচনায়, অভিনয়ে এবং প্রয়োগে—তাঁহার প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কলা বা সুকুমার শিল্প—ইংরেজীতে যাহাকে Art বা Fine Art বলে—তাহার চারিটী মুখ্য অঙ্গ: কাব্য, সঙ্গীত, নাট্য এবং রূপ-শিল্প। রূপ-শিল্পের প্রকাশ হইয়া থাকে নেত্র-গ্রাহ্য রেখায়, বর্ণে এবং বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও ঘনত্বের সমাবেশের মধ্যে; বাস্তুগঠন, ভাস্কর্য ও চিত্র উহার প্রকাশের তিন প্রধান উপায়। নাট্য—অভিনয় নৃত্য ইত্যাদিকে একাধারে চলমান চিত্র বা ভাস্কর্য এবং সঙ্গীতের সংযোগ বলা যাইতে পারে। এই চারি প্রকার কলার মধ্যে আপেক্ষিক স্থান কোনটীর সর্বোচ্চে, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। তবে রূপকর্ম, নাট্য, কাব্য এবং সঙ্গীত, এই তিনটীর মধ্যে, সঙ্গীত-ই দ্যোতনা-শক্তিতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী—বিশেষতঃ যন্ত্র-সঙ্গীত, কারণ ইহা ভাষার অতীত, বাক্যের অতীত, এবং নেত্র-গ্রাহ্য রূপের অতীত। কিন্তু কাব্য, নাট্য ও রূপকর্ম বহুল পরিমাণে সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্র-

চিত্রাঙ্কণরত রবীন্দ্রনাথ
শ্রীশম্ভু সাহা গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে

নাথের মত অনুভূতিশীল কবি এবং নিষ্ঠাবান্ গুণীর নিকট কাব্য, নাট্য এবং সঙ্গীত, তিনটীই সার্থক-ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার অনুভবী প্রতিভা, রূপ-শিল্পের প্রতিও যে আকৃষ্ট হইবে, ইহা স্বাভাবিক। শিল্পকলার তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সমঝদার; অবনীন্দ্র-নাথ নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীদের লোকোত্তর প্রতিভার একজন দরদী পরিপোষক তিনি, এবং বিদেশী শিল্পের মহত্ত্বও তিনি উপলব্ধি

* চিত্রলিপি—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত ও ও রচিত। বিশ্বভারতী পুস্তকালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। সেপ্টেম্বর ১৯৪০ সালে প্রকাশিত। আকার, ১১"×৯"। মূল্য ৪।০; রাজসংস্করণ, কবি-কর্তৃক স্বাক্ষরিত, কুড়িখানি মাত্র, মূল্য দশ টাকা।
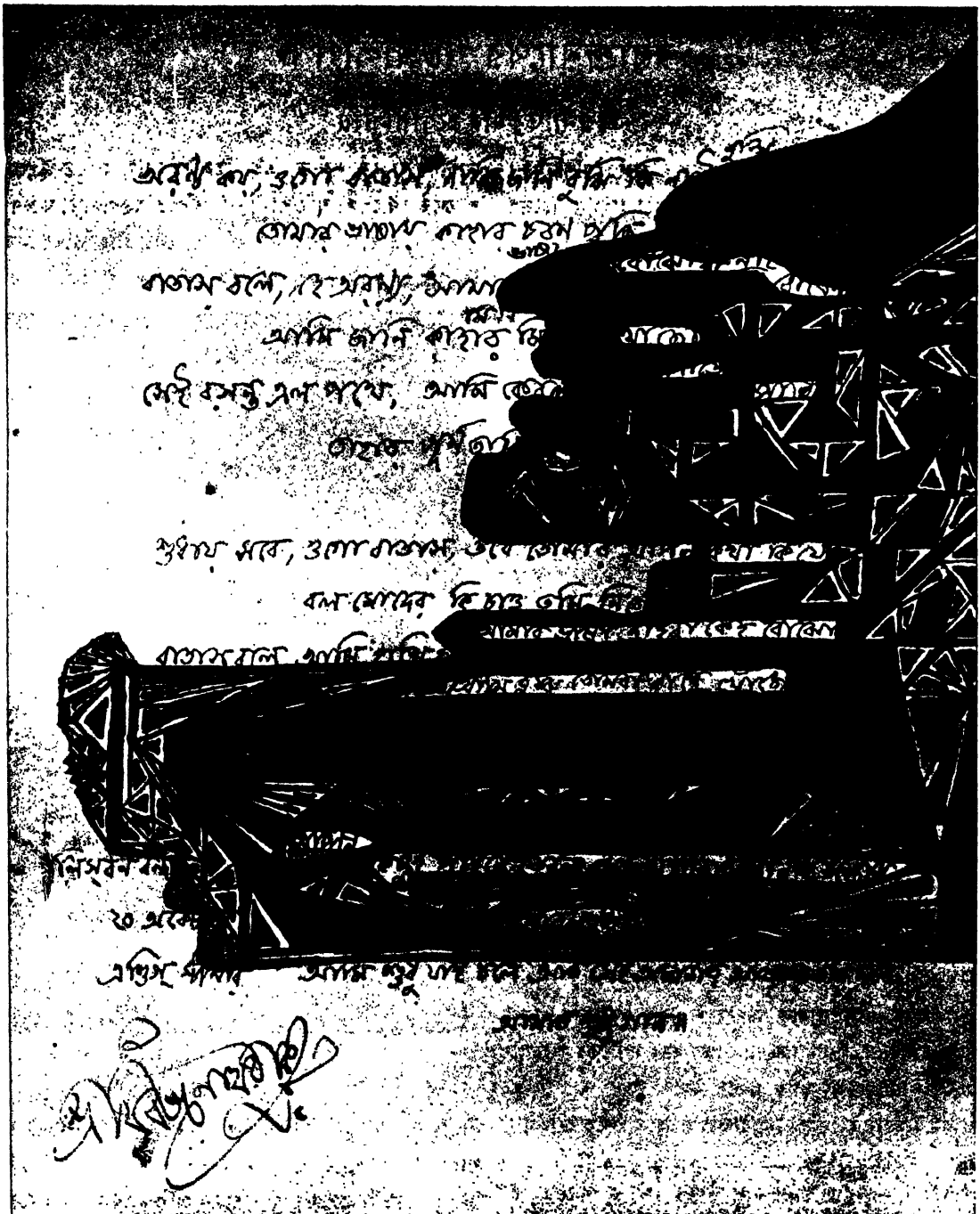
কবির চিত্রের সূচনা : কবিতার বিচিত্রিত পাণ্ডুলিপি
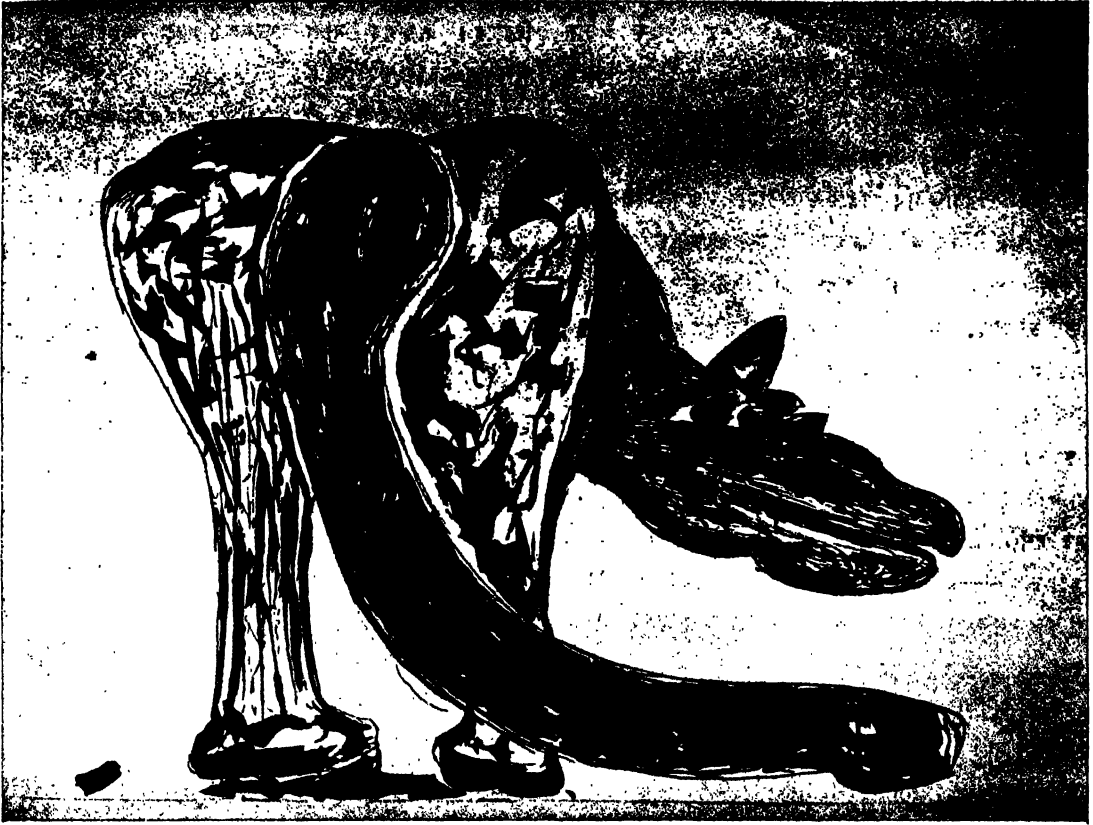
কবি-কর্তৃক অঙ্কিত প্রাণী-কল্পনার চিত্র

করেন। বহু বৎসর পূর্বে অস্‌লো নগরে নরওয়ের বিখ্যাত ভাস্কর গুস্তাভ্‌ ভিগেলাণ্ড্‌-এর বিরাট্‌ ভাস্কর্য-বিষয়ক কৃতিত্ব দর্শন করিয়া তিনি বিশেষ-ভাবে তাহার সৌন্দর্য ও শক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়াছিলেন; সেই দর্শনের অনুধ্যানের আনন্দে যাহাতে অন্ততঃ একটী দিনের জন্য কোনও বাধা না পড়ে, সেই জন্য তিনি সারাদিন ধরিয়া অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া জনসাধারণের মধ্যে দেখা দেন নাই, একথা নরওয়ের একটী বন্ধু আমায় বলিয়াছিলেন।

কলানুরাগী বিদগ্ধজন রূপ-শিল্পকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। কলা বা সঙ্গীতে কৃতিত্ব কিন্তু বিশেষ-শিক্ষা-সাপেক্ষ; শিক্ষা দ্বারা এবিষয়ে মানসিক প্রবণতাকে পুষ্ট এবং প্রকাশ-ক্ষম করিয়া তুলিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভা, শিক্ষা ও সাহচর্যের ফলে সঙ্গীতে সহজেই আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। রূপ-শিল্পে তাঁহার যে প্রকাশ কয়েক বৎসর হইল দেখা দিয়াছে, তাহার মধ্যে রূপকর্মের অনুধ্যান আছে, সাহচর্য আছে, রূপকর্মের সহিত "সাহিত্য" আছে; কিন্তু রীতিমত পরিপাটী বা নিয়ম অনুসারী শিক্ষা বা সাধনার সহায়তা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার শিল্পময় প্রকাশের মধ্যে ঘটে নাই। রবীন্দ্রনাথের শিল্পচেষ্টার পক্ষে ইহাই সর্বপ্রধান লক্ষণীয়, যে ইহা স্বত-উৎসারিত, সাবলীল,—এবং ইহার মধ্যে অপরিহার্যতা-গুণ বিদ্যমান। কবির বিভিন্ন প্রকারের অনুভূতির প্রকাশ যেমন আপনা হইতেই তাঁহার গানে, কাব্যে, নাটকে, কথায় হইয়া থাকে,—গোপন বার্তা যেমন তাঁহাকে প্রকট করিয়া দিতেই হইবে, তেমনি একটা অবশ্যম্ভাবিতার সহিত তাঁহার অনুভূতির প্রকাশ নূতন ভাবে রূপ-রেখায় ও বর্ণে আমাদের চোখের সামনে প্রকটিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে অবশ্য শিক্ষার বা শিক্ষানবিশীর অভাব আছে—তাহা শিল্প-শিক্ষককে, এবং যিনি শিল্পের প্রাণ

অপেক্ষা তাহার আকারকেই বড় বলিয়া মনে করেন তাঁহাকে, খুশী করিবে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই শিল্প-চেষ্টাকে শ্রীযুক্ত আনন্দ কুমারস্বামীর মত শিল্প-রসিক childlike, not childish —অর্থাৎ শিশুচেষ্টিতের মত সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত অতএব সুন্দর, বয়োবৃদ্ধ কর্ত্তৃক শিশুর অসুন্দর অনুকরণ নহে, বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁহার রূপ-শিল্পের এই অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাঁহার তুলিকার লিখনে যে ভাষাহীন গীতি বা উক্তি রচিত হইয়াছে, সাধারণ চিত্রের ভাষার ব্যাকরণ দিয়া তাহার যাচাই করিতে গেলে চলিবে না। কথা হইতেছে, এগুলির দ্বারা অনুভব-শীল ব্যক্তির চিত্তে কোনও ভাব-পরম্পরা উদিত হয় কি না। হয় তো রচনা-কালে যে ভাবের ভাবুক হইয়া কবি তুলিকার চালনা করিয়াছেন, দ্রষ্টার মনে এই প্রকার চিত্রের দর্শনে ঠিক সেই ভাবটী জাগিবে না; কিন্তু তাহাতে আসিয়া যায় না—কারণ তথ্যের বাহিরেকার সমস্ত ব্যাপারেই আমাদের মন-গড়া ভাব-ই আমাদের পক্ষে কার্যকর হইয়া থাকে।

কবির আঁকা সব ছবিগুলিই যে শ্রেষ্ঠ বা সুন্দর তাহা কেহ বলিবে না। ছবিগুলির মধ্যে সেগুলির উদ্ভবের ইতিহাস নিবদ্ধ রহিয়াছে। কেমন করিয়া বাঙ্গালায় ও ইংরেজীতে লেখা গান কবিতা বা গদ্যরচনার মধ্যে লিখন-কালে কোনও অংশ কাটাকুটি করিয়া বাদ দিবার আবশ্যকতা হওয়ায়, কবির অলস লেখনীর মুখে এই সমস্ত কাটাকুটির রেখা নানা প্রকারের নক্শার এবং কিস্তূতকিমাকার জীবের রূপ গ্রহণ করিত। নিজ কল্পনার বল্গাকে শ্লথ করিয়া দেওয়ার ফলে, এই ভাবে কবির কলমের অব্যাহত গতির ফলে তাঁহার চিত্র-প্রতিভা নিজেকে দেখা দিতে আরম্ভ করে। কালো কালির লেখায় ক্রমে লাল কালির মিলন হইল. তাহার পরে বিভিন্ন রঙ্গের কালি আসিল, প্রথমটায় কলমের দ্বারায় ও পরে তুলির সাহায্যে তাঁহার চিত্র-রচনার ক্রম-বিকাশ চলিল।

কবির হাতে এইভাবে নানা ঢঙ্গের রঙ্গীন ও একরঙ্গা বহু চিত্র রচিত হইয়াছে। কতকগুলি নিছক্ কল্পনা-প্রসূত— নক্শা, অথবা আদিম যুগের বিরাট্‌কায় অদ্ভুত অদ্ভুত অধুনালুপ্ত জন্তুর অনুকরণে অঙ্কিত পশু পক্ষীর মূর্তি। বিভিন্ন রঙ্গের সমাবেশে রচিত প্রাকৃতিক দৃশ্য, ফুল-পাতা এবং অনেকটা স্বাভাবিক-ভাবে আঁকা নরনারীর চিত্রও তাঁহার হাতে দেখা দিয়াছে। এগুলির মধ্যে অনেকগুলিতে একটা রোমান্টিক আব-হাওয়া বিশেষ স্পষ্ট।

শিল্পের দিক হইতে এই ছবিগুলির সার্থকতা অথবা, এগুলির নিরর্থকতা বিচার করিবার যোগ্যতা আমার নাই। তবে আমি এইটুকু বলিতে পারি, কবির আঁকা অনেকগুলি ছবিই আমার কাছে উপভোগ্য। রঙ্গের সমাবেশের দরুন, অনেকগুলির মূল্য আমার কাছে শব্দহীন গানের সুরের গুঞ্জনের মত মনে হয়। আমার কাছে কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগে, কবির হাতে আঁকা কতকগুলি মুখ। আমার মনে হয় এইখানে কবি মুখের আকার ও ভঙ্গীর দ্বারা অদ্ভুত-ভাবে ছবিতে মানুষের ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এখানে তাঁহার কৃতিত্ব একেবারেই শিশু-চেষ্টিতের মত নহে, এখানে যেন অকস্মাৎ প্রৌঢ় শিল্পের, ওস্তাদ শিল্পীর হাতের ঝঙ্কার দেখা দিয়াছে! দৃষ্টান্ত স্বরূপ "চিত্রলিপি"-র ২, ১১, ১৩ সংখ্যক চিত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কবির চিত্রের প্রদর্শনীতে এরূপ মুখের ছবি আরও অনেক দেখিয়াছি। কবি অসীমের আহ্বান তাঁহার কবিতা গান ও সুরে আমাদের শুনাইয়া দিয়াছেন, তেমনি মানব-চরিত্রের মধ্যে সীমার পরিচয়ও আমাদের দিয়াছেন; এই মুখচিত্রগুলি নূতন ভাবে, এবং নিরতিশয় শক্তি সহানুভূতি ও সার্থকতার সঙ্গে মানব-চরিত্রের সম্বন্ধে কবির সুগভীর আত্মীয়তাবোধের এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ দিতেছে। এই প্রকার মুখের ছবিগুলির জন্যই আমি রবীন্দ্রনাথকে উচ্চকোটির রূপ-শিল্পীর আসন দিতে ইতস্তত করিব না। অন্য চিত্রগুলি, রেখা ও রঙ্গের jeu d'esprit বা প্রতিভার লীলা; কিন্তু এগুলি যথার্থ creative art—প্রতিভার সার্থক শিল্প-রচনা।

রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেক ছবিটীর আশয় অবলম্বন করিয়া, কতকটা ব্যাখ্যাত্মক ভাবে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঙ্গালা কবিতা ও সেগুলির ইংরেজী ভাবানুবাদ দিয়াছেন। সব সময়ে সেগুলি যে দ্রষ্টা এবং পাঠকের মনোভাবেরও প্রকাশক হইবে, তাহা মনে হয় না। কিন্তু তাহাতে ছবি ও কবিতা, উভয়ের মূল্য কমে না। একাধারে কবি ও চিত্রকার জগতে তাদৃশ সুলভ নহে। শিল্প-রসিক ব্যক্তি এই বই হইতে কবির প্রতিভার একটা নূতন দিক্ দেখিয়া প্রীতবিস্মিত হইবেন।

ভারতীয় কারু-শ্রমিকের শিক্ষা

শ্রীগোপাল হালদার

বর্ত্তমান যুদ্ধে সৈনিকে ও শ্রমিকে তফাৎ যে কমিয়া আসিতেছে, 'প্রবাসী'-সম্পাদক মহাশয় গত অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী'তে তাহার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে যুদ্ধ বাধে জাতিতে জাতিতে শিল্প-সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা লইয়া; আবার সেই যুদ্ধ চলেও যুদ্ধরত জাতিদের যুদ্ধ-শিল্পের সহায়তায়, তাহার ফলাফলও হয়ত নির্ভর করিবে তাহাদের যুদ্ধ-শিল্পের শক্তির উপর। কিন্তু বর্ত্তমান কালের শিল্প বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞদের সাধনায় পরিপুষ্ট হয়। তাহাতেই উহার শক্তি অসম্ভব রূপে বাড়িয়া চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে এক জন সাধারণ শ্রমিকও কল-কারখানায় অসাধারণ শক্তি ও চাতুর্যের কাজ সম্পাদন করে; যেমন, বিদ্যুতের বোতাম টিপিয়া দিয়া সে হয়ত অনায়াসে তিনখানি তাঁতে তিন জোড়া মিহি কাজের কাপড় বা চট বুনিয়া ফেলে। অথচ, পূর্বেকার যুগে তেমন একখণ্ড মিহি কাজের বস্ত্রও হয়ত বিশেষ নিপুণ তন্তুশিল্পী ছাড়া অন্য কেহ বয়ন করিতেই পারিত না। আর এত দ্রুত এই পরিমাণে এমন কাপড় বা চট বুনিবার মত শক্তি সেই তন্তুশিল্পীর পক্ষেও ছিল কল্পনার অতীত। এইরূপে দেখি, যন্ত্র-যুগের একটি বড় লক্ষণই এই যে, ইহার ফলে তথাকথিত কারু-কুশল শ্রমিকের প্রয়োজন ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে। কারণ যন্ত্রই কারু-কুশল হইয়া উঠিতেছে।

কারু-শ্রমিকের যুগ

কিন্তু ইহার একটি বিপরীত দিকও আছে। এই কারু-কুশল যন্ত্র আপনা হইতে গড়িয়া উঠে না, আপনা হইতে চলেও না। কলের তাঁত যাঁহারা আজও নির্মাণ করেন, উন্নত করেন, তাঁহারা অসাধারণ কুশলী, অসাধারণ বৈজ্ঞানিক। যাঁহারা উহার পরীক্ষক, যাঁহারা তদারক করেন যাঁহারা মেরামত করেন, তাঁহারাও নানা দিকে কুশলী, বিশেষজ্ঞ। ইঁহাদের এই কারু-কুশলতা পশ্চাতে থাকে বলিয়াই যন্ত্র এত কারু-কুশল; আর সাধারণ শ্রমিক আগেকার যুগের শ্রমিকের অপেক্ষাও অনেক বেশী শক্তি ও নৈপুণ্যের অধিকারী হইয়াছে। বর্তমান সভ্যতার মেরুদণ্ড অবশ্য শ্রমিক; কিন্তু তাহারও আসল মেদমজ্জা, আসল স্নায়ুকেন্দ্র, এই কারু-কুশল শ্রমিকের দল—যাহাদের বলিতে পারি নানা স্তরের 'কারু-শ্রমিক' বা টেক্‌নিশিয়ান। কুশলী মজুর হইতে আরম্ভ করিয়া নানা ক্ষেত্রের মিস্ত্রী, ফোরমান্, ওবারশিয়ার, একেবারে কারখানার ম্যানেজার পর্যন্ত সবাই এই কারু-কুশলী বা টেক্‌নিশিয়ান পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান শিল্পে ইহাদের না হইলে একদিনও চলে না—শিল্প-উৎপাদন প্রণালী দিনের পর দিন এতই জটিল হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু বিশেষ শিক্ষা, বাস্তবক্ষেত্রে কলকারখানায় বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ না পাইলে তেমন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকও এইরূপ কারু-কুশল হইতে পারেন না। অতএব, শিল্পোন্নয়নের বা উৎপাদন-বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইলে চাই উন্নত যন্ত্র, উন্নত সংহতি-শক্তি প্রভৃতি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চাই এই সুশিক্ষিত ও সুনিপুণ কারু-কুশলী দলকে। আর এই যুদ্ধকে যখন বলিতে পারি শিল্প-যুদ্ধ অথবা যুদ্ধ-শিল্পের যুদ্ধ, তখন এক দিক হইতে আবার বলিতে পারি ইহা কারু-কুশলীর বা যুদ্ধ-টেক্‌নিশিয়ানের যুদ্ধ। এমন কি আজ-কালকার দিনে সৈনিকই বড় কেহ নাই। যুদ্ধ-বিমান তো একটা ল্যাবরেটরি; বিমান-ধ্বংসী কামান, বড় কামান, প্রভৃতি যত যুদ্ধাস্ত্র আছে তাহাও ব্যবহার করিতে যথেষ্ট কারু-কুশলতার প্রয়োজন হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে আর শিল্পক্ষেত্রে এমনিভাবে তফাৎ কমিয়া আসিতেছে।

যুদ্ধক্ষেত্রেই যদি কারু-কুশলীদের এত প্রয়োজন তাহা হইলে যুদ্ধের শিল্পাগারে, কলকারখানায় যে তাহাদের

কি পরিমাণে প্রয়োজন তাহা না বলিলেও চলে। এই প্রয়োজন আরও নিমেষে নিমেষে বাড়ে, নূতন রূপ লাভ করে যুদ্ধের তাগিদে। যেমন দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ—আমাদের চটকলে এখন কাজ খুব কম; কিন্তু যন্ত্রগুলিকে তাই বলিয়া ফেলিয়া না রাখিয়া যুদ্ধের গোলা উৎপাদনের একটি কাজে আংশিকভাবে (machining of shells) লাগানো হইতেছে। এইরূপে অমাদের রেল-কারখানায় হইতেছে গোলা তৈয়ারী। এই ব্যাপারটি সহজে সম্ভব হয় নাই—যেখানে চট তৈয়ারী হইত কিংবা রেলের চাকা প্রভৃতি নির্মাণ হইত সেখানে গোলা তৈয়ারী করিতে হইলে যন্ত্রেরও বেশ পরিবর্তন সাধন করিতে হয়, আর চট-কলের বা রেল-কারখানার কারু-কুশলীদেরও একটু নূতন করিয়া এইরূপ শিক্ষা সঞ্চয় করিতে হয়। যুদ্ধের প্রয়োজনে আজ ভারতবর্ষের শিল্পগুলিকে যেমন যুদ্ধাস্ত্র বা যুদ্ধোপকরণ নির্মাণের কর্মে প্রয়োগ করিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস দেখা দিয়াছে, তেমনই আজ অভাব অনুভূত হইয়াছে ভারতবর্ষে কারু-কুশলীদের। কল-কারখানা বাড়ানো দরকার, নূতন কল-কারখানা চাই, নূতন ধরণের কাজ চাই;—কিন্তু কোথায় ভারতবর্ষে অত কুশলী মজুর, অত মিস্ত্রী, অত ফোরম্যান্, অত ওবারশিয়ার, অত বিচক্ষণ কারুবিদ্ বৈজ্ঞানিক?

ভারত-সরকারের পরিকল্পনা

এই সমস্যায় পড়িয়া ভারত সরকার স্থির করেন, তাঁহারা এই যুদ্ধ-শিল্পের জন্য যে-কোন কারু-কুশলীকে যে কারখানায় দরকার কাজে লাগাইবেন। কিন্তু ইহাতেও সমস্যার সমাধান হয় না। অন্তত আরও ১৫ হাজার ভারতীয় কারু-কুশলী আজ চাই। ভারত-সরকার বিলাতের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলেন—১০০ কারু-শিক্ষক (trainer) বিলাত হইতে ভারতে আনিয়া ক্রমশঃ এই দেশে কারু-কুশলী সৃষ্টি করিয়া তুলিবেন। কিন্তু এই উপায়েও পনের হাজার কারু-কুশলী পাইতে অনেক বিলম্ব হইত; অথচ সময় নাই। তাই, এখন স্থির হইয়াছে বিলাতী শিক্ষকরা ত আসিবেনই, এদেশ হইতেও উপযুক্ত মজুর ও শিক্ষিত লোকদের এক-এক বারে ৫০ জন করিয়া বিলাতে পাঠাইয়া বিলাতের বিভিন্ন কারখানায় কাজ শিখাইয়া মাস ছয়েকে তাঁহাদের কারু-কুশলী করিয়া তোলা হইবে। এইভাবে ভারতবর্ষের শত শত কারু-কুশলী একই সময়ে তৈয়ারী হইতে থাকিবে। কারখানা হইতে বাছাই করিয়া এই উদ্দেশ্যে শ্রমিক শিক্ষার্থী গৃহীত হইবে আবার কিছু কিছু গৃহীত হইবে নানা কারু-শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হইতে ছাত্র শিক্ষার্থী। বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষার্থীরাও সুযোগ পাইবে—যেমন; বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজের ভাগে পড়িয়াছে এখন শতকরা ১৮ জন করিয়া শিক্ষার্থী প্রেরণের সুযোগ। এই শিক্ষার্থীদের আসল মনোনয়নের ভার সরকারী যুদ্ধ-সরবরাহ বিভাগের ন্যাশেন্যাল সার্বিস লেবর ট্রিব্যুন্যাল নামক পরিষদের উপর। কিন্তু বড় বড় কারখানার কর্তৃপক্ষ ও প্রাদেশিক শিল্প-নিয়ামকদের পরামর্শ তাঁহারা গ্রহণ করিয়া শিক্ষার্থী মনোনয়ন করিবেন। বিলাতে বাসকালে এই সব শিক্ষার্থীরা বিলাতী শ্রমিকদের মতই মজুরী, প্রভৃতি পাইবেন, কোনোরূপ বৈষম্য করা হইবে না।

পরিকল্পনার এই বৈষম্যহীনতার দিকটিকে বিশদ করিয়া বিলাতের শ্রম-মন্ত্রী মিষ্টার বেভান কার্ডিফ শহরে নবেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে জানান যে, ভারতীয় জাহাজী-শ্রমিকদের আর 'লস্কর' বলা চলিবে না; তাহাদের মজুরী ত অনেক ক্ষেত্রে দেড়া বা দ্বিগুণ হইয়াছেই, অধিকন্তু তাহাদের জন্য এখন বিলাতের বন্দরে শহরে চিকিৎসাদির জন্য হাসপাতাল প্রভৃতিরও ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু মিষ্টার বেভানের মূল বক্তব্য এই যে, পৃথিবীর শ্রমিক-সমাজে এবার ভারতীয় শ্রমিক যাহাতে সমান আসন অধিকার করিতে পারে তাহার আয়োজন তিনি করিয়া ফেলিতেছেন। ভারতীয় শিক্ষার্থী কারু-শ্রমিক যাঁহারা বিলাতে আসিতেছেন তাঁহারা বিলাতী শ্রমিকের মতই মজুরী পাইবেন, সমান অধিকার ভোগ করিবেন, এমন কি, দুই-চার দিন বিলাত-বাসের পরেই বিলাতী শ্রমিকদের পরিবারের মধ্যেও বাস করিতে পারিবেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সহিতও তাঁহাদের

পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইবে। ফলে, দেশে ফিরিয়া ভারতীয় শ্রমিকের জীবনযাত্রার উন্নতি ও ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রসারও এই শিক্ষার্থী কারু-শিল্পীরা সাধন করিবেন।

এই ভাবে ভারত সরকারের এই পরিকল্পনা একদিকে ভারতবর্ষে শিল্পোন্নয়নের একটি বাধা দূর করিবে কারু-শ্রমিক সৃষ্টি করিয়া, অন্যদিকে শ্রমিকোন্নয়ন সাধন করিবে আন্দোলনের কুশলী কর্ম্ম গঠন করিয়া। একই কালে ইহাতে ভারতীয় শিল্পপতির ও ভারতীয় শ্রমজীবীর উল্লসিত হইবার কথা।

ভারতীয় শিল্পপতির দশা

ভারতীয় শিল্পপতিরা এই সুসমাচার পাঠ করিয়া কতটা উৎসাহিত বোধ করিতেছেন? এবারকার যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই তাঁহারা অনেক স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। গত যুদ্ধের অবকাশে প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠিত হইতে থাকে। কারণ, বিলাতের কারখানা তখন গোলা বারুদ তৈয়ারী করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে; বাণিজ্যের পথেও জার্ম্মানী বাধা দিতে থাকে। যুদ্ধের শেষে ভারতবর্ষের সেই কল-কারখানা বাড়িয়া চলে। অবশ্য, বাট্টার গোলমালে এবং বিলাতী শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহা যথেষ্ট প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। ভারতীয় পুঁজি অনেক সময়ে ক্ষতিগ্রস্তও হয়। এদিকে যুদ্ধশেষে সুযোগ বুঝিয়া ব্রিটিশ ও বিদেশীয় শিল্প-পতি ও পুঁজিপতিরা আবার ভারতবর্ষে অধিকার স্থাপন করিতে সচেষ্ট হয়। প্রথমত দেখা গেল, কাঁচামাল ভারতে উৎপন্ন হয়—যেমন, পাট, তুলা, ইত্যাদি। জাহাজ ভর্ত্তি করিয়া তাহা বিলাতে আনিয়া তাহাতে শিল্পজাত তৈয়ারী করিয়া আবার ভারতবর্ষেই বিক্রয় করিতে গেলে রেল ও জাহাজের মাশুলই পড়ে অনেক। অথচ ভারতবর্ষে কারখানা স্থাপন করিলে সেই অসুবিধা থাকে না। দ্বিতীয়ত দেখা গেল, ভারতীয় শ্রমিকের মজুরী অনেক কম। অতএব, ভারত-

বর্ষে কারখানা স্থাপন করিলে বা ভারতীয় কারখানাগুলি ধীরে ধীরে কিনিয়া হস্তগত করিলে এই দিক দিয়াও মুনাফা হইবে অনেক বেশী। এই সব কারণে যুদ্ধ শেষে ভারতবর্ষে শিল্পযুগের প্রারম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই শিল্পের বার আনা পুঁজি ও বার আনা কর্তৃত্ব বিলাতের হাতেই রহিয়াছে (এই বিষয়ে ১৯৪০-শের ডিসেম্বরের 'মডার্ণ রিভিয়ু'-এ প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অশোক মেহ্‌তার 'ব্রিটিশ ইন্‌টারেস্‌ট্‌স ইন ইণ্ডিয়া' নামক চমৎকার প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য)। তথাপি, ভারতীয় শিল্পপতির ভাগ্যে ছিটেফোটা জুটিয়াছে। তাঁহারা তাহা বাড়াইয়া তুলিবার জন্য-চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই (এই শিল্পপতিরা প্রধানত পশ্চিম উপকূলের, দুই-এক জন দিল্লী-রাজপুতনার। বাঙালী প্রায় নাই বলিলেই চলে)। বোম্বাই সিন্ধিয়া ষ্টিম নেবিগেশুন কোম্পানী ইহার অগ্রণী। এইখানে বালচাঁদ হীরাচাঁদ, বা পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, কিংবা স্তর চুণীলাল মেহ্‌তা প্রমুখদের নাম স্মরণীয়। তাঁহারা জাহাজ চালানো, মোটর-কারখানা স্থাপন প্রভৃতির জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। এবার যুদ্ধ বাধিতে তাঁহাদের স্বপ্নের দৌড় বাড়িয়া গেল—জাহাজ চালনা, মোটর কারখানা গঠন ছাড়াইয়া সেই স্বপ্ন জাহাজ নির্ম্মাণ, এঞ্জিন নির্ম্মাণ, গুরু-রাসায়নিক তৈয়ারীর আশা হইতে একেবারে বিমান-কারখানায় গিয়া ঠেকিল। প্রথমেই, অবশ্য তাহারা একটু দমিয়া গেলেন "অতিরিক্ত মুনাফা কর" আইনে। যুদ্ধের বাড়তি লাভের যদি অর্দ্ধেকই খোয়াইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের হাতে পুঁজিই তো বেশী জমিতে পারিবে না—তাঁহারা শিল্প স্থাপন ও শিল্পপ্রসার করিবেন কিরূপে? কিন্তু এইটি যুদ্ধের খরচের জন্য সরকারের প্রয়োজন; অতএব, উহাতে আপত্তি করিলেও সরকার কর্ণপাত করিবে না, তাহা দেশীয় পুঁজিপতিরা বেশ বুঝিলেন। অতএব, চেষ্টা হইল ইহা মানিয়া লইয়াই এই সুযোগে ভারতবর্ষকে "স্বদেশী" করিয়া ফেলিবার।

কিন্তু ভারতবর্ষের পুঁজিপতিদের সেই আশা ক্রমশই
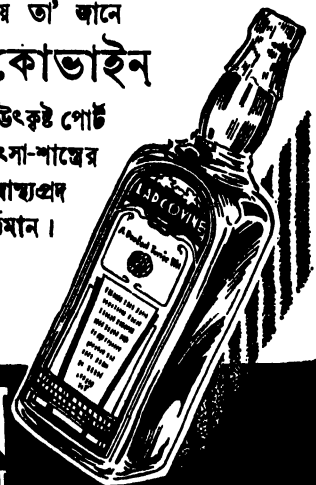
শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছে। যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষের মাল দরকার; এমন কি, ভারতবর্ষের কলকারখানায়ও তাহা প্রস্তুত করা দরকার। কারণ, গরজ বড় বালাই। কিন্তু ভারতের সেই কল-কারখানাও যে ভারতীয়ই হইবে,—বিদেশীর হইবে না,—ভারতীয়দের পুঁজিতে, ভারতীয়দের পরিচালনায় স্থাপিত ও চালিত হইবে তাহার নিশ্চয়তা কি? নিশ্চয়তা খুবই কম। তাহা ছাড়া কোন্ কোন্ দিকেই বা ভারতবর্ষ এই নূতন কল-কারখানা গড়িবার সুযোগ লাভ করিবে? তাহাতেও দেখা যায় উল্লাসের কারণ নাই। বালচাঁদ হীরাচাঁদ তারস্বরে জানাইতেছেন, "আমাদের জাহাজ চালনার সুযোগ বাড়িবে না; জাহাজ নির্ম্মাণের আশাও নাই। চারি দিকে যখন বিলাতী জাহাজ ডুবিতেছে তখন নূতন জাহাজের অর্ডার যাইতেছে আমেরিকায় ও অন্যত্র; বিলাতী জাহাজ-মালিকরা ভারতবর্ষকে এই দুর্দ্দিনে ও এই সুযোগ দিতে অস্বীকৃত।" এদিকে দিল্লীতে ব্রিটিশ পূর্ব্ব-সাম্রাজ্যের মন্ত্রণা আরম্ভ না হইতেই সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক প্রতিনিধিরা জানাইয়াছেন, "বিমান-নির্ম্মাণ ত আমরা সুরু করিয়া দিয়াছি, তোমাদের ভারতবর্ষে আর ও সম্বন্ধে চেষ্টা করিয়া কি লাভ?" গুরু-রাসায়নিকের কারখানা স্থাপনের পূর্ব্বেই দেশীয় শিল্পপতিরা সভয়ে ভাবিতেছেন, বিলাতের বিশ্বগ্রাসী "ইম্পীরিয়াল কেমিক্যালস্" তাহাদের টিকিতে দিবে ত? দিল্লীর আইন সভার তর্ক-বিতর্কে সরকার পক্ষ প্রায় নিরুত্তরে স্বীকার করিয়া লইয়াছে,—ভারতবর্ষের রেল ইঞ্জিনের অর্ডার আমেরিকায় গিয়াছে; মোটর কারখানা স্থাপনের কথাও একটি আমেরিকান কোম্পানির সঙ্গে হইতেছিল। এক কথায়, ভারতের মোটর, জাহাজ, ইঞ্জিন, সবই আকাশে ঝুলিতেছে।

ভারতের কারু-কুশলা

ইহার আর যে কারণই প্রদর্শিত হউক এই কথা বলা হয় নাই যে, ভারতবর্ষে উপযুক্ত কারু-কুশলী নাই। এই কথা ত সত্য যে, ভারতবাসীর যে-সব জিনিষের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগও ঘটে না সে-সব জিনিসের কারু-কুশলী ও কারু-শ্রমিক আমাদের নাও থাকিতে পারে;

যেমন বিমান-ধ্বংসী কামান, বিমান-নির্ম্মাণের খুঁটিনাটি, কি ট্যাঙ্ক কিম্বা যুদ্ধজাহাজের জিনিসপত্র। কিন্তু ভারতের শিল্পোন্নয়নের পক্ষে প্রধান বাধা সাম্রাজ্য শিল্প-নীতি। এবং সে বাধা আর যাহাই হউক অন্তত কারু-কুশলীর অভাব নয়। ভারতবর্ষ প্রকাণ্ড দেশ, দেহে মনে ইহার অধিবাসীদের মধ্যে এমন লোক প্রচুর রহিয়াছেন যাঁহারা যে-কোনো প্রয়োজন মিটাইতে পারেন—একটু চেষ্টা করিলে, সাধারণ শ্রমিক, কারু-শ্রমিক, এমন কি, উঁচুদরের কারু-কুশলী সবই এখন পাওয়া, সবই গড়িয়া তোলা যায়। এই সত্যটি ১৯২৯শের রাজকীয় শ্রমিক কমিশনের নিকটে তৎকালীন বড় বড় বিশেষ কারখানার পরিচালকেরা বেশ স্পষ্টই বলিয়াছিলেন। যেমন, ইছাপুরের রাইফেল কারখানার সুপারেণ্টেণ্ডেণ্ট বলিয়াছিলেন, বিলাতী পাশ্চাত্য শ্রমিকদের অপেক্ষা এখানকার শ্রমিকদের কাজে আয় বেশী। তখনকার হীরাপুরের (বর্ত্তমানে উহার সহিত বার্ণপুর কুল্টীও এক সঙ্গে চলিতেছে) লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা ছিল নূতন। উহার ম্যানেজার বলিয়াছিলেন যে, বিলাতী বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে তাহাদের নিম্নস্থ দেশীয় কারু-কুশলীরা বেশ কাজ শিখিয়া ফেলিতেছেন। টাটায়, কাঁচড়াপাড়ায়, খড়গপুরে, জামালপুরেও এমনি কথাই শোনা গিয়াছে। তবে একটি কথা লক্ষণীয়:—এই সব সরকারী বা সাহেবী মনোভাবাপন্ন দেশী কারখানায় (যেমন, টাটা, বার্ণপুর প্রভৃতিতে) সত্য-সত্যই উঁচুদরের দেশীয় কারু-কুশলী গড়িবার চেষ্টা বিশেষ নাই—উচ্চস্তরে উহারা সাহেব পোষণ করেন, দেশীয়দের জন্য মধ্য স্তরই মনে করেন যথেষ্ট। চেষ্টা করিলে এই সব কারখানার কর্ত্তারাও যে দেশীয় কারু-কুশলীদের এই দেশে বা বিদেশে শিখাইয়া উচ্চ কারু-কুশলীতে পরিণত করিতে পারিতেন, তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই। আমাদের জানা-শুনার মধ্যে আমরা দেখি, বেঙ্গল কেমিক্যাল দেশী মজুর-মিস্ত্রী ও কারু-কুশলীর দ্বারাই এমন সব সূক্ষ্ম ও নিপুণ যন্ত্র তৈয়ারী করান যাহার তুলনা বিলাতেও বেশী মিলে না। অথচ, তাহাদের দামও কম; কারণ মজুরী কম। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সূক্ষ্মতম যন্ত্রগুলি সবই এই দেশের কারু-শ্রমিকের কাজ। বাটা ও কতক পরিমাণে টাটা ছাড়া, এই দেশের দেশী-বিদেশী শিল্পপতির মধ্যে, দেশীয় কারু-শ্রমিকদের শিক্ষার্থী হিসাবে বিদেশে পাঠাইবার, এই প্রকাণ্ড দেশের বিচিত্র জন-সম্পদের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য কে কি চেষ্টা করেন, তাহা জানিতে কৌতূহল হয়।

ভারতীয় শিল্পের দিক হইতে তাই উহার প্রতিষ্ঠার বা প্রসারের বাধা কারু-কুশলীর অভাব নয়—বাধা সাম্রাজ্য নীতির। তথাপি বর্ত্তমানের এই সরকারী পরিকল্পনাকে সমর্থনই করা উচিত। কিন্তু আরও কিঞ্চিৎ দুশ্চিন্তার কারণ আছে। যে উপায়ে এই শিক্ষার্থী বাছাইয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা বুঝিয়া দেখিবার মত। উপরে বসিয়া আছেন ন্যাশেন্যাল সার্ব্বিস লেবর ট্রিব্যুনাল—ইহার সম্বন্ধে আমাদের যতটুকু জ্ঞান তাহাতে ইহাকে ন্যাশেনাল বলিতে সাহস হয় না। ইহারা যে-সব কারখানায় শ্রমিকের নাম চাহিবেন, হয় সেই সব কারখানা সরকারী না হয় সাহেবী-ভাবাপন্ন। অতএব যে-সব নাম ট্রিব্যুনালের দরবারে পেশ হইবে তাহা হয় সাহেবের না-হয় ফিরিঙ্গীর—যাহারা সাহেবী রীতিনীতিতে অভ্যস্ত,—যেন বিলাতের সাহেবী শ্রমিকদের পরিবারে সহজে ঠাঁই পায়। আর, ইস্কুল-কলেজ হইতে যে-সব নাম আসিবে তাহাও ঐ কারণে ঐরূপ ফিরিঙ্গী বা ফিরিঙ্গী-ভাবাপন্ন ভারতীয়েরই হইবে। ফলে, এই ভাবে ভারতবর্ষে যে ভাবে একটা 'সৈনিক-জাত' নামে বিশেষ শ্রেণী সৃষ্টি করা হইয়াছে হয়ত ফিরিঙ্গী-পাঠান-শিখ মিলাইয়া তেমনই একটা 'কারু-কুশলীর জাত'ও সৃষ্টি করিয়া ফেলা হইবে। ইহার অর্থ দেশের পক্ষে বা ভারতীয় শ্রমিকের পক্ষে অতি সুস্পষ্ট।

ভারতীয় শ্রমিকের আশা

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তাহা হইলে মিষ্টার বেভিন ভারতীয় শ্রমিকদের যে আশার স্বপ্ন দেখাইলেন, তাহার সত্য রূপটি কি হইতে পারে? লস্করেরা একটু সমাদর পাইল; দুই-চার শত ভারতীয় শ্রমিক বিলাতের সাহেব শ্রমিকদের পরিবারে দিন কাটাইয়া আসিল; ইহাতে

ভারতীয় শ্রমিকের কি লাভ? ভারতীয় শ্রমিক-আন্দোলন সত্যই উপকৃত হইবে কি?

এই কথা অবশ্য সত্য যে ভারতীয় শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি অনেক সময়েই হইয়াছে বিলাতের তাড়নায়। প্রথম যুগে এই দিকে তাগিদ ছিল বিলাতী ধনিকের, আজকাল তাগিদ আসিতেছে বিলাতী শ্রমিকেরও নিকট হইতে। কোনো ক্ষেত্রেই এই তাগিদ নিঃস্বার্থ নয়। কারণ, ভারতবর্ষে কল-কারখানার পত্তন ছিল বিলাতের শিল্পপতিদের পক্ষে আপত্তিকর। তথাপি যখন এখানে কল-কারখানা আরম্ভ হইল তখন দেখা গেল এখানকার অন্নহীন অসংখ্য জনসাধারণকে কারখানায় সামান্য মজুরীতে খাটায়; তাই, বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিলাতী মালিকেরা হারিয়া যায়। প্রত্যেক দেশের শিল্প-যুগের এই পত্তনকাল তাহার শ্রমিকের পক্ষে এইরূপ ভয়াবহ—বিলাতে গত শতাব্দের ইতিহাস তাহার নির্মম সাক্ষ্য বহন করিতেছে। যাহাই হউক, বিলাতের কলওয়ালা ভারতীয় শ্রমিকের মজুরী ও অবস্থার উন্নতির জন্য স্বদেশীয় শাসন-কর্তাদের চাপ দিতে থাকে, তাহার ফলে ভারতীয় শ্রমিকের সত্যই খানিকটা সুবিধা হয়। অবশ্য ভারতের নবজাত পুঁজিপতিদের ইহাতে অসুবিধা হয়, আর তাহাই ছিল বিলাতী পুঁজিপতির উদ্দেশ্য। এই প্রথম যুগের কথা। ইহার পরে ত বিলাতী ধনিক ভারতবর্ষেই কারখানা স্থাপন করিতে ও ভারতের শিল্প অধিকার করিতে আরম্ভ করিল। ডাণ্ডি ছাড়িয়া চটকল আসিল গঙ্গার তীরে, ল্যাঙ্কেশায়ার ছাড়িয়া কাপড়ের কল আসিল বোম্বাইতে। ফলে বিলাতী ধনিকের অপেক্ষা বেশী ক্ষতি হইল বিলাতী শ্রমিকের—যেমন ল্যাঙ্কেশায়ার বা ডাণ্ডীর বহু দিনের চেষ্টায় বিলাতের শ্রমিক আজ তাহার নিজের মজুরী প্রভৃতির সুব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। পৃথিবীব্যাপী বিলাতের সাম্রাজ্য; তাহার মুনাফা বিলাতে আসে; নানা সরকারী কর রূপে দেশের উন্নতিতে উহা ব্যয়িত হয়; তাই বিলাতের শ্রমিকেরাও খানিকটা ইহার অংশ

পায়। অতএব পৃথিবীর শ্রমিক-সমাজে বিলাতের শ্রমিকেরা সর্বাপেক্ষা উচ্চ আয়ের অধিকারী। ভারতের সস্তা মজুরীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কিন্তু তাহাদের বেকার হইতে হয়। তাই, তাহাদের গরজ এখন ভারতে যাহাতে মজুরীর হার বাড়ে, মজুরের জীবনযাত্রা উন্নত হয়, যাহাতে মজুর-আন্দোলন শক্তিশালী হয়, এবং ভারতীয় ধনিক সস্তায় তাহাদের শোষণ করিতে না পারে। নিজেদের উচ্চ জীবন-যাত্রার দায়েই ভারতের শ্রমিকদের জীবন-যাত্রাকে তাহারা উন্নত করিতে চায়। বেভিন সাহেবের বক্তৃতার পিছনেও এই উদ্দেশ্য, এই লক্ষ্য রহিয়াছে।

তবুও উদ্দেশ্য মোটের উপর ভারতীয় শ্রমিকদের পক্ষে হিতকারী। কিন্তু এই হিতকাঙ্ক্ষা কত দূর পর্যন্ত যাইতে পারে? বিলাতী মজুর যে তাহাদের সাম্রাজ্যের নানা শোষিত অঞ্চলের মুনাফার একটি অংশ নিজেরাও ভোগ করে, অর্থাৎ সাম্রাজ্যের মুনাফার তাহারাও অংশীদার, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহার জন্যই তাহাদের জীবন যাত্রা এত উচ্চ। কিন্তু ভারতীয় শ্রমিকের শোষণ শেষ হইলে সেই সাম্রাজ্যবাদের মুনাফা শেষ হইবে, সাম্রাজ্যবাদ শেষ হইবে; বিলাতী ধনিক ও শ্রমিক সকলেরই বর্তমানের এই উচ্চ জীবন-যাত্রা বিনষ্ট হইবে। ততদূর পর্যন্ত যাইতে নিশ্চয়ই বিলাতী শ্রমিক অস্বীকৃত হইবে। অতএব এই হিতকাঙ্ক্ষার যাথার্থ্য বুঝিতে হইলে দেখা দরকার বেভিনের চেষ্টার ফল কি।

প্রথমত দেখি, ভারতবর্ষে যাহারা শ্রমিক তাহারা আসলে কলের মজুর নয়, প্রধানত তাহারা ক্ষেতের কৃষক। ভারতবর্ষের এই অগণিত জনগণের উদরে অন্ন নাই বলিয়াই ত অত সহজে তাহাদের নামমাত্র মজুরী দিয়া কলের কাজে লাগান যায়; মজুরী বেশী চাহিলে কাজে জবাব দিয়া নূতন মজুর গ্রহণ করা যায়; আর 'সর্দার'ও 'সাহুকারের' এবং কলওয়ালার কবলে তাহারা অত সহজে গিয়া পড়ে। অতএব, প্রয়োজন ভারতবর্ষের জনগণের কাজ দেওয়া, জীবিকার ব্যবস্থা করা। দুই-চারি শত কারু-কুশলী বিলাতী শ্রমিক-আন্দোলনের কৌশল শিখিয়া আসিলেই এইরূপ ক্ষেত্রে যে ভারতের শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি হইবে, তাহা একটা অদ্ভুত স্বপ্ন। শ্রমিকের অবস্থা দেশের সাধারণ লোকের অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত, আবার এই দেশের সাধারণ লোকের অবস্থা ইহার শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে জড়িত। অতএব, এই দিক হইতে দেশে কলকারখানার প্রসার ঘটাই প্রথম দরকার, যাহাতে কারখানায় মজুর এত সুলভ না হয়; মজুরীর হারও তাহার ফলে বাড়িবে, মজুরের অবস্থারও উন্নতি হইবে।

দ্বিতীয়ত, বেভিন সাহেব যদি ভারতের শ্রমিকের উন্নতি চান তাহা হইলে তিনি এখানকার যুদ্ধ-শিল্পের শ্রমিকদের অন্তত বিলাতের ঐসব শিল্পের শ্রমিকদের অনুপাতে মজুরী ও সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করুন। শুধু বিলাতে কেন, এখানেও যাহাতে এই সব কারু-কুশলী বিলাতী হারে এই কারখানায় মজুরী পান, তাহার চেষ্টা করুন। বলা যাইতে পারে, বিলাতের সঙ্গে এদেশের তফাৎ অনেক। সেখানে মজুরের শীতকালে কয়লা দরকার, মাংস খাওয়া দরকার। কিন্তু এখানেও এই উষ্ণ দেশে শ্রমিকের অনুরূপ সুব্যবস্থা দরকার—যেমন সুচিকিৎসার। তাহা ছাড়া, শিক্ষা, বাসস্থান, ছুটির ব্যাপার, মেয়েদের প্রসবকালীন ব্যবস্থা, বৃদ্ধবয়সের বা অসুখের সময়ের, বীমা প্রভৃতির বিষয়ে সকল দেশের শ্রমিকেরই প্রয়োজন একরূপ। ভারতীয় শ্রমিকদের সেইরূপ সুবিধাই দেওয়া হউক। জীবনযাত্রায় তাহাদের একসমান, অর্থাৎ আসল মজুরীতে (real wages) সমাবস্থ করিতে বাধা কি? অন্তত ভারতবর্ষের যুদ্ধ-শিল্পের শ্রমিকদের 'মাগ্‌গি ভাতা' দেওয়ার ব্যবস্থাটুকুই আপাতত করা হউক; পরে তাহা হইলে অন্য কলকারখানায়ও তাহা প্রসারিত করা যাইবে।

তৃতীয় কথা—কিরূপ শ্রেণীর মধ্যে হইতে ভারতবর্ষের শিক্ষার্থী কারু-শ্রমিক মনোনীত হইবে, সে-বিষয়ে আমাদের সংশয় আছে। এই 'বিলাতফেরতা' কারু-শ্রমিকের দল দেশে ফিরিয়া যদি বা শ্রমিক আন্দোলনে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে এই দেশেও 'লেবর-লর্ড' বা "শ্রমিক-লাটের" আবির্ভাব হইবে, আমরা টমাস বা বেভিনের মত শ্রমিক নেতা পাইব। যদি কারু-কুশলীরা ফিরিঙ্গী বা ঐরূপ শ্রেণীর লোক হয় তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে এইরূপ 'নেতা' হইয়া উঠাই সম্ভব। এই সম্পর্কেই আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, পৃথিবীতে যে-সব দেশে ফাশিজ্‌ম্ আজ জয়ী হইয়াছে সেখানকার ফাশিস্ত দলগুলির মেরুদণ্ড ছিল এইরূপ কারু-শ্রমিক, এইরূপ কারু-কুশলী, এইরূপ শ্রমিকের সর্দারের দল। ইতালী ও জার্মানীর এই দৃষ্টান্ত মনে রাখিলে মিষ্টার বেভিনের প্রস্তাবটির এই দিকটির প্রতি চোখ বুজিয়া থাকা চলে না।

আসলে বিলাতী ধনিক ও বিলাতী শ্রমিকের সদিচ্ছার আসল পরীক্ষা এবার যুদ্ধের মধ্য দিয়াই হইতেছে—আমাদের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক দাবীর প্রতি তাহাদের মনোভাবে। দুই-চার শত শিক্ষার্থী কারু-কুশলীর দ্বারা তাহা অপ্রমাণিত করা যায় না। তবে মোটের উপর কারু-শ্রমিক ভারতের চাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

লুম্মিনী-দর্শন

অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ

যাত্রা

আমি আমার কুড়ি জন ছাত্র ও আমার এক আমেরিকান সহযোগী সমভিব্যাহারে ভগবান্ বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্মিনী দর্শনে বাহির হই। অপরাহ্নে বি. এন. ডবলিউ. রেলের এলাহাবাদ স্টেশনে ডাকগাড়ীতে উঠি এবং পরদিন প্রত্যুষে গোরক্ষপুরে নামি। সেখান হইতে শাখা রেলে নওতানোয়া যাত্রা করি। নওতানোয়া ব্রিটিশ-রাজ্যের শেষ ও নেপাল-রাজ্যের আরম্ভ। এখান হইতে লুম্মিনী ১২ মাইলের পথ। গ্রীষ্মকালে যানবাহনের মধ্যে পাওয়া যায় 'বাস', গরুর গাড়ী ও ঘোড়া। তখন ছিল নবেম্বর মাস, নদীসকল জলে পূর্ণ, কাজেই বাস বা গরুর গাড়ী কোনটাই চলে না। উপায় ছিল অশ্বারোহণে বা পদব্রজে যাত্রা। আমরা শেষটাই পছন্দ করিলাম।

লুম্মিনীর পথে

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আমরা নওতানোয়া হইতে যাত্রা করি। পথ দীর্ঘ ও কষ্টকর, কেননা সেই দিনই ফিরিবার কথা। একের পর এক অসংখ্য নদী আমাদের পার হইতে হইল। কোনটা গভীর দুস্তর, কোনটা স্বল্পতোয়া বালুময়। নওতানোয়া ও লুম্মিনীর মাঝে পড়ে মাঝগাঁও গ্রাম। ঠাকুর ব্রিজমোহন সিংহ এই গ্রামের জমিদার। বয়সে প্রবীণ হইলেও তাঁহার দেহের গঠন এত সুন্দর যে তাঁহাকে বৃদ্ধ বলা চলে না। তাঁহাকে দেখিলেই সম্ভ্রমের উদয় হয়। অতিথিপরায়ণ বলিয়া তাঁহার বেশ সুনাম আছে। আমরা কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার গৃহে বিশ্রাম লইয়াছিলাম। তৎকালে নানা রূপ আদর-আপ্যায়নের মধ্যে তিনি নেপালী 'লাওয়া' মিশ্রিত এক প্রকার সুস্বাদু চা পান করিতে দেন। গরম চা-টি এত সময়োপযোগী যে উহা আমাদের দেহ ও মনে অচিরে এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতা ও স্ফূর্তি আনিয়া দিয়াছিল। ফিরিবার পথে নৈশ ভোজনের জন্য তিনি আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার অমায়িক ও মধুর ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ হইয়া সানন্দে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম এবং সূর্য্যাস্তে লুম্মিনী হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি ভূরিভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছে। নানা রকমের সুস্বাদু ও গরম আহার্য্য প্রস্তুত। ক্ষুধাও পাইয়াছিল—মনে পড়ে আহার্য্যগুলির যথেষ্ট সদ্ব্যবহার আমরা করিয়াছিলাম।

ঠাকুর ব্রিজমোহনের গৃহে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিবার পর আমরা লুম্মিনীর পথে অগ্রসর হইলাম। পথে পড়িল কতকগুলি নদী ও ছোট ছোট গ্রাম। নেপাল তরাইয়ের ও যুক্তপ্রদেশের গ্রামগুলির মধ্যে খুব বেশী সাদৃশ্য দেখা যায়—আয়তনে ছোট ও জনবিরল। তবে এই পার্থক্য চোখে পড়িল, যখন আমরা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতাম তখন স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকারা তাহাদের গৃহের সম্মুখস্থ সঙ্কীর্ণ গলিতে সারি সারি দাঁড়াইয়া কৌতূহলপূর্ণ চক্ষে আমাদিগকে নির্ব্বাক অভ্যর্থনা করিত; আর গ্রামের কুকুরগুলা করিত সবাক অভ্যর্থনা তাদের ঘন ঘন চীৎকার দ্বারা। সম্ভবতঃ এই দ্বিবিধ বিপরীত অভ্যর্থনার মূলে আমাদের অদৃষ্টপূর্ব্ব পোষাক ও হাবভাব। কুকুর ও ছেলের দল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিত গ্রামের সীমানা পর্য্যন্ত। এইরূপে প্রায় পাঁচ-ছয় ঘণ্টা ক্রমাগত চলিবার পর দিবা দ্বিপ্রহরে আমরা পবিত্র লুম্মিনী তীর্থক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম।

লুম্মিনীর ধ্বংসাবশেষ

লুম্মিনী গ্রামের আয়তন প্রায় তিন বর্গমাইল। তাহার অর্দ্ধেকটা ধ্বংসস্তূপপূর্ণ। সেই ধ্বংসস্তূপের চারি দিকে শস্যক্ষেত্র ও ছোট ছোট কুটীর। অদূরে একটি বড় ডাক-বাংলা আছে। ডাকবাংলাটি পরিসর ও প্রয়োজনীয় আসবাবে পূর্ণ। সেখানে কিছুকাল বিশ্রাম করিবার পর আমরা নওতানোয়া হইতে আসিবার সময় যে আহার্য্য সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম তাহাতে মধ্যাহ্নভোজন সমাধা

করিলাম। ডাকবাংলার ওভারসীয়ার শ্রীচমনলাল পারসী আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া ভগ্নস্তূপের মধ্যে যাহা কিছু দর্শনীয় বস্তু ছিল, সবই নিজে অগ্রগামী হইয়া যত্ন সহকারে দেখাইয়াছিলেন। আমাদের আশা ছিল খননকার্য্যের অধ্যক্ষ পণ্ডিত নাগরজীর সহিত আমাদের দেখা হইবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। শুনিলাম দশ দিন পূর্ব্বে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। কাঠমুণ্ডতে একটি সরকারী গৃহ নির্ম্মিত হইতেছিল। তাহার পরিদর্শন কালে খাড়াই পাহাড় হইতে পা ফসকাইয়া তিনি হঠাৎ পড়িয়া যান এবং তাহাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার এই শোচনীয় মৃত্যুতে আমি প্রাণে বড়ই আঘাত পাইলাম। অসময়ে তাঁহার এই আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যুতে নেপালের পুরাতত্ত্ব সমূহক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পুরাতত্ত্বে তাঁহার জ্ঞান ও স্পৃহা অসীম ছিল। তাহার উপর ছিল তাঁহার অসাধারণ কর্ম্মদক্ষতা; তদ্দ্বারা অতি অল্প সময়ে তিনি লুম্বিনীর অনেক লুপ্তবস্তু উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নেপালের প্রধান সেনাপতি সর্ কাইসর সামশের জঙ্গ বাহাদুর, কে-সি-আই, লর্ড কার্জ্জনের মত পুরাতত্ত্বে অত্যন্ত অনুরাগী এবং সেই জন্যই নেপাল-সরকার ধ্বংসস্তূপগুলির খননকার্য্যে অধুনা মনোযোগী হইয়াছেন। আমরা প্রায় তিন ঘণ্টা ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে অতিবাহিত করিয়াছিলাম। স্থানটি ভাঙা প্রস্তরখণ্ড, ইষ্টক ও অসংখ্য স্তূপে পরিপূর্ণ। কম বেশী চারি ফুট খনন করিবার পর স্তূপগুলি বাহির হইয়াছিল। কতকগুলি স্তূপের চারি পার্শ্বে ছোট ছোট গুহা বা কক্ষ আছে। খুব সম্ভবতঃ যে-সকল সাধু-সন্ন্যাসী ভগবদারাধনার জন্য নির্জ্জন স্থান ভালবাসিতেন, তাঁহাদের জন্যই উক্ত স্থানগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। সাধুদের বসবাসের জন্য ঠিক ঐরূপ স্তূপ এলিফ্যাণ্টা গুহাতেও দেখিয়াছিলাম। অসংখ্য অতীতের নিদর্শন (relics) একটি ছোট মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। নরম পাথরে নির্ম্মিত একটি ছোট বুদ্ধমূর্ত্তি মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে পাওয়া যায়। সেই মূর্ত্তিটি উক্ত মিউজিয়মে অতি যত্নসহকারে রাখা হইয়াছে। মূর্ত্তিটির গড়ন ও কারুকার্য্য অতি সুন্দর।

লুম্বিনীর স্তম্ভ

খননকালে অসংখ্য ইষ্টক পাওয়া যায়; সেই ইষ্টকগুলি একটি টিনের ঘরে থাক দিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। ইষ্টকগুলি দেখিতে খুব বড় এবং বিভিন্ন পাঁচ প্রকার আয়তনের। যথা—

(ইঞ্চিতে)
২১×২১×৫
১৫×১৫×২½
১৪×৮×২
১২×৮×২

ইষ্টকগুলির উপর কিছু লেখা নাই। তবে তাহাদিগের আয়তন দেখিয়া বুঝা যায় যে সেগুলি মৌর্য্যবংশীয় রাজাদের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। লুম্বিনীর অশোকস্তম্ভ (যাহার সম্বন্ধে পরে বিশেষভাবে বলিব) এবং এই বৃহৎ পরিমাণের ইষ্টকগুলি হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে অশোকের রাজত্বকালে স্থানটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং আগত বহু সাধু-সন্ন্যাসী, ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর বসবাসের জন্য স্তূপের চারিপার্শ্বে অনেক গুহা বা কক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

অশোকস্তম্ভ

লুম্বিনীর অশোকস্তম্ভটি পুরাতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকের কাছে একটি অমূল্য সম্পদ। স্তম্ভটির শীর্ষভাগ ভাঙিয়া গিয়াছে। ভগ্নস্তম্ভের উপরিভাগ হইতে একটি চিড় খানিক দূর নামিয়া আসিয়াছে। মনে হয় উহা

নরম পাথরে তৈরি বুদ্ধমূর্ত্তি

বজ্রাঘাতের চিহ্ন। নানা স্থানে যে সকল অশোকের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে এই লুম্বিনী বা রুম্মনদেই স্তম্ভলিপি খুব ভাল অবস্থায় আছে। ইহাও একটা সৌভাগ্যের কথা যে, সেই বজ্রাঘাতের চিড়টি অশোক-লিপি যে স্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে ঠিক তাহার উপর পর্য্যন্ত আসিয়া থামিয়া গিয়াছে। অশোকস্তম্ভটি অত্যন্ত যত্নসহকারে সংরক্ষিত, তাহার নিম্নভাগ পাথর দিয়া বাঁধানো এবং চারি দিক লৌহ তারে ঘেরা। লিপিগুলি পোস্তার উপর দাঁড়াইয়া বেশ পড়া যায়।

মূল শিলালিপি

১। দেবাণ-পিয়েন পিয়দসিন লাজিন বসতি বসভিসিতেন

২। অতন আগচ মহিইতে হিদ বুদ্ধে যাত সক্য-মুনিতি

৩। সিল বিগতভি চা কালপিহ সিলা থভে চ উসপাপিতে

৪। হিদ ভগবম্ যাতে তে লুম্মিনীগামে উবলিকে কটে

৫। অঠ ভাগিয়ে চ।

অনুবাদ

দেবানামপ্রিয় প্রিয়দর্শন রাজা অশোকের রাজ্যাভিষেকের বিশ বৎসর পর তিনি স্বয়ং এই তীর্থে আসিয়াছিলেন কারণ এই স্থানে শাক্যমুনি বুদ্ধের জন্ম হইয়াছিল। এই একটি প্রস্তর-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার চারি দিকে পাথরের প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া দিয়াছিলেন এবং এই স্থানে ভগবান্ বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া লুম্বিনী গ্রামবাসীদের দেয় রাজস্ব কমাইয়া উৎপন্ন শস্যের কেবল মাত্র এক-অষ্টমাংশ রাজসরকারের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল।

উক্ত শিলালিপিতে দুইটি ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, উক্ত স্থান যে ভগবান্ বুদ্ধের জন্ম-স্থান উহা তাহাই পুরাতত্ত্বের দিক্ হইতে সামান্য সাক্ষ্য প্রদান করে। বৌদ্ধ সাহিত্য অনুসারে বোধিসত্ত্ব শেষবার কপিলাবস্তুর শাক্যরাজা শুদ্ধোদনের মহিষী মায়াদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, রাণী মায়াদেবী নিজেকে আসন্নপ্রসবা বুঝিয়া পিতৃগৃহে যাইতে ইচ্ছুক হইলেন। যথাকালে রাণী পাল্কি-করিয়া বহু দাস-

খননকার্য্যে প্রাপ্ত বৃহদাকার ইষ্টক

দাসী সঙ্গে লইয়া পিতৃ-রাজ্য দেবদহ যাত্রা করিলেন। পথ নৃত্য-গীতে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। রাণী লুম্বিনী গ্রামে পৌছিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করেন। সেখানে রাজা শুদ্ধোদনের এক প্রমোদ-উদ্যান ছিল। সেই সময় সহসা তাঁহার প্রসববেদনা উপস্থিত হয় এবং এক রমণীয় শালবৃক্ষের শাখা অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় পুত্র প্রসব করেন। কথিত আছে, সন্তানপ্রসবজনক কোন কষ্ট তিনি পান নাই। এই প্রকারে লুম্বিনী পৃথিবীর ইতিহাসের এক প্রধান ঘটনার সহিত বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে এবং বৌদ্ধদিগের যে চারিটি প্রধান তীর্থস্থান জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তন্মধ্যে লুম্বিনী একটি। দ্বিতীয়তঃ, এই শিলালিপি কৌটিল্যের একটি উক্তির সমর্থন করে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র মতে সেই সময় দিতে হইত উৎপন্ন-দ্রব্যের একের চতুর্থাংশ বা একের পঞ্চমাংশ—চতুর্থ-পঞ্চ বিভাগ। সুতরাং উক্ত শিলালিপি হইতে সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, অশোক লুম্বিনী গ্রামের নির্দ্দিষ্ট রাজস্বের অর্দ্ধ ভাগ মকুব করিয়াছিলেন।

রুম্মনদেই কী মন্দির

লুম্বিনী গ্রামে একটি মন্দির আছে। উহার ধ্বংসাবশেষ প্রান্তরের মধ্যভাগে একটা ঢিবির উপর অবস্থিত। মন্দির মধ্যস্থিত পাষাণ-খোদিত মূর্ত্তিগুলি বুদ্ধের জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দেয়। তিনটী মূর্ত্তি সেখানে আছে—মায়া-দেবীর, শিশু বুদ্ধের ও একটি পরিচারিকার। কে, কোন্ সময়ে এই মন্দিরটি প্রথম নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। তবে খোদিত মূর্ত্তিগুলি খুব পুরাতন বলিয়া-বোধ হয়। মন্দিরটিও যে বহু প্রাচীনকালে প্রথম নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার কিছু প্রমাণ পাইলাম। যে প্রাচীন ভিত্তির উপর বর্ত্তমান মন্দিরটি দাঁড়াইয়া আছে তাহার অনেকাংশ ভাঙিয়া-চুরিয়া গিয়াছে এবং তাহার ইষ্টকগুলির গড়ন ও রং মন্দিরের প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দেয়। আমি এই প্রকারের ইট বুদ্ধগয়ার বোধিমন্দিরের ও কুশীনারার মহাপরিনির্ব্বাণ মন্দিরের প্রাচীন ভিত্তিতে দেখিয়াছি। কানিংহম প্রমুখে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে ঐ দুই মন্দিরই সর্ব্বপ্রথম রাজা অশোকের সময়ে নির্ম্মিত হয়—পরে বহু বার পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। লুম্বিনী মন্দিরের মূল ভিত্তি হইতে মনে হয় প্রথম বার ইহা বহু প্রাচীনকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মহাযান ও বজ্রাযান বুদ্ধ মতের বহু দেবদেবীর মত লুম্বিনী মন্দির-মধ্যস্থিত মূর্ত্তিগুলিকে লোকেরা হিন্দু-দেবতা বলিয়া পূজা করে। সেখানকার লোকেরা উহাকে রুম্মনদেই কী মন্দির বলে। উহা এখন হিন্দুদিগেরও একটি পবিত্রতীর্থ। রুম্মনদেই বা রুম্মনদেবী লুম্বনদেবীর অপভ্রংশ। 'ল' অক্ষর 'র' এ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নেপাল তারাই ও যুক্তপ্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা চলতি ভাষায় সাধারণতঃ 'ল' স্থানে 'র' উচ্চারণ করে।

রবীন্দ্রনাথ ও তাই-চী-তাও সংবাদ

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

বিগত ১০ই ডিসেম্বর সকালে শান্তিনিকেতন আশ্রমের বিশিষ্ট অতিথি চীন দেশের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতি মাননীয় তাই-চি-তাও (His Excellency Tai-Chi-Tao) রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার কক্ষেই সাক্ষাৎ করেন; অসুস্থতা হেতু রবীন্দ্রনাথ অগত্যা এই বিশিষ্ট অতিথিকে নিজ শয়নকক্ষেই অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। পরস্পর নমস্কার-বিনিময়ের পর রবীন্দ্রনাথ ইংরেজীতে মান্যবর অতিথিকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "আপনার শুভাগমনে আমরা আন্তরিক আনন্দ লাভ করিয়াছি, ইহাতে শান্তিনিকেতনের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া শুধু নয়, আপনার উপস্থিতি আমার চিত্তে পুনরায় চীনের দীর্ঘ দিবসের সৌজন্যধারার আনন্দময় স্পর্শের অনুভূতি আনিয়া দিয়াছে। চীন দেশের অতীত গৌরবের কথা আজ মনে পড়িতেছে। আমি একান্তমনে আশা করি, অতি সত্বর চীন দেশ তাহার বর্ত্তমান বিপদ ও উপদ্রবের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, পুনরায় বিশ্বসভায় স্বীয় গৌরবময় স্থান অধিকার করিবে।" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি চীনা ভাষায় অনুবাদ করিয়া মান্যবর তাওর সহযোগী (ইনিও চীন-সরকারের এক জন বিশিষ্ট অধ্যক্ষ ও চীনের দেশ-রক্ষাপরিষদের সদস্য) তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে চীনা ভাষায় মাননীয় তাও কবিকে সম্বোধন করিয়া প্রত্যুত্তর দেন (ইহা তাঁহার সহযোগী ইংরেজীতে কবিকে বলেন), "কবিবর, আপনার আন্তরিক সম্বর্দ্ধনায় আমি বিশেষ ভাবে মুগ্ধ হইয়াছি। আমি বাহির হইতে অতিথির ন্যায় এখানে আসি নাই, অন্তরের রাজ্যে আমি এই দেশেরও অধিবাসী। চিরাগত কাল হইতেই চীন ও ভারত সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মযোগের সৌভ্রাত্রবন্ধনে আবদ্ধ। শাক্যমুনি ও কনফুসিয়াস সমসাময়িক ছিলেন, ইহা বিশেষ ঐতিহাসিক দ্যোতনাপূর্ণ। বহু অতীতকাল হইতে এই দুই দেশের বিদ্বদ্বর্গ ও সত্যানুসন্ধানীদের পরস্পর ভাবা-বিনিময়, ও নানা বিপদ উপেক্ষা করিয়া পরস্পরের দেশে তীর্থযাত্রা চলিয়া আসিতেছে। কেবল গত সাত শত বৎসরের ইতিহাসে দেখি, ঘনরাত্রির অন্ধকার যেন এই মৈত্রীসম্বন্ধের উপরে যবনিকা পাত করিয়াছিল, সেই অন্ধকারে পরস্পরের পরিচয়ও যেন আমরা বিস্মৃত হইয়াছিলাম। যে-সময় এই দুই মহাদেশ নিজেদের যথার্থ সত্তাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছিল সেই মুহূর্ত্তে চীন দেশে আপনার আবির্ভাব দেবতার আশীর্ব্বাদস্বরূপ। ১৯২৪ সালে আপনি যে কেবল ভারতবর্ষের বাণীই চীনে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাহা নয়, আপনি আমাদিগের মধ্যে সেই জ্ঞান সঞ্চারেরও চেষ্টা করিয়াছিলেন যাহাতে আমরা পাশ্চাত্য বস্তুতান্ত্রিকতার মায়াপাশ ছেদন করিয়া নিজেদের আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পথ চিনিয়াছি; সেই সময় হইতেই আমাদের সংস্কৃতির নবযুগের সূচনা হইয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ—"আমার ধারণা যদি ভ্রান্ত না হয়, তবে লাওৎসেও বুদ্ধ এবং কনফুসিয়াসের সমসাময়িক।"

তাও—"কতকাংশে তাই; কিন্তু তিনি বুদ্ধ এবং কনফুসিয়াসের চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন।"

রবীন্দ্রনাথ—"তাঁহার অনেক বাণী দুরূহ হইলেও, তাঁহার কয়েকটি বাণী আমি যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে সেগুলি আমাকে উপনিষদের বাণী স্মরণ করাইয়া দেয়।"

তাও—"আর একটি বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। যে-সময় ভারতবর্ষ এবং চীন স্বীয় শ্রেষ্ঠ আসনে অধিরূঢ় ছিল সেই সময়েই এই দুই দেশের মধ্যে সৌহৃদ্যের চর্চ্চা হইয়াছিল, দুর্দ্দিনের অন্ধকার নামিয়া আসিতে দুই জাতির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধও বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। পুনরায় এই দুই দেশে নবজাগরণের প্রভাত সূচিত হইতেই উভয়ে উভয়ের সহিত পূর্ব্বসম্বন্ধকে উদ্ধার

করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে; এই সংকল্প উভয় দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণের সূচনা করিতেছে।"

রবীন্দ্রনাথ—"হয়তো আপনি জানেন, ভারতে বর্ত্তমানে আমরা পথহারা হইয়াছি। আপনাদের নিকট হইতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পাইবার জন্য আমরা প্রতীক্ষা করিয়া আছি; আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় আছি যেদিন আপন বীর্য্যের বলে সকল বাধা উত্তীর্ণ হইয়া চীন স্বাধীনতার পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত হইবে; আপনাদের সেই প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষকে তাহার পথ দেখাইয়া দিবে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, চীনে জাতিসংগঠন-কার্য্যের যে সূচনা আমি দেখিয়া আসিতেছি তাহা যেন সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হয়, নবজাগ্রত চীনের সেই মূর্ত্তি যেন আমি দেখিয়া যাইতে পারি।"

তাও—"চীন দেশে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর হইতে আমরা নানা বাধাবিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া চলিতেছি কিন্তু এই সংগ্রামে আমরা নিশ্চয়ই জয়ী হইব। সান-ইয়াট-সেন আমাদের যে পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, দৃঢ়-বিশ্বাসে সেই পথের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্যস্থলে পৌছিব।"

রবীন্দ্রনাথ—"আপনাদের বীর অধিনেতা চিয়াং কাই-শেকের নায়কত্বে চীনের পুনর্গঠনে আপনারা যে দৃঢ় সংকল্প লইয়া ব্রতী হইয়াছেন, পুনরায় চীনে যাইয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিবার অভিলাষ আমার মনে জাগ্রত আছে।"

তাও—"আমরা একান্তমনে এই আশা করিয়া থাকিব, চীন দেশে পুনরায় আপনার শুভাগমন সম্ভব হইবে, চীন-বাসীগণ পুনরায় আপনার দর্শনলাভ করিয়া অনুপ্রাণিত ও কৃতার্থ হইবে। চীনের বর্ত্তমান দুর্দ্দিন অতিক্রান্ত হইলে চীন-সরকারের ও সমগ্র চীন দেশের প্রতিনিধিরূপে আমি বিমানযোগে আপনাকে চীনে লইয়া যাইব, আমার এই আশা যেন পূর্ণ হয়।"

রবীন্দ্রনাথ—"সেই শুভদিবসের জন্য আমি আনন্দের সহিত প্রতীক্ষা করিব।"

অতঃপর কবিকে শ্রদ্ধানিবেদন করিয়া মান্যবর তাও এবং তাঁহার সঙ্গীগণ বিদায় গ্রহণ করেন।

এই আলাপের পূর্ব্বদিন বৈকালেও মান্যবর তাও কবির সহিত অল্পক্ষণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। শান্তি-নিকেতনে আম্রকুঞ্জে বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে মান্যবর তাওয়ের সংবর্দ্ধনার যে আয়োজন হইয়াছে তাহাতে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যোগ দিতে পারিবেন না বলিয়া কবি দুঃখ প্রকাশ করেন ও বিশ্বভারতীর কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবির পক্ষে মান্য অতিথির সংবর্দ্ধনাপত্র পাঠ করিবেন, ইহাও জানাইলেন। চীন দেশে ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথ যে দুটি পরিচ্ছদ উপহার পাইয়াছিলেন তাহা মাননীয় তাওকে দেখাইয়া কবি বলেন যে, ঐ পরিচ্ছদ দুটি তাঁহার বিশেষ প্রিয় বস্তু। চীনদেশে তিনি যেন এক আধ্যাত্মিক নবজন্ম লাভ করিয়াছিলেন, এই নববাস সেই নবজন্মেরই প্রতীকরূপে তাঁহার নিকট আজিও সমাদৃত।

দেশ-বিদেশের কথা

বাঁকুড়া-নারী সম্মিলনীর সাধারণ অধিবেশন

নারী বন্দিনীদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র কারাগারের এবং নানা প্রতিষ্ঠানে নারী-প্রতিনিধি লইবার দাবী জ্ঞাপন।

গত ১৭ই নভেম্বর রবিবার স্থানীয় সিনেমা হলে বাঁকুড়া নারী-সম্মিলনীর উদ্যোগে শ্রীসুধা মজুমদার মহাশয়ের নেত্রীত্বে একটি বিরাট মহিলা-সভার অধিবেশন হয়। সভায় প্রায় ৬০০ শত মহিলা উপস্থিত ছিলেন। এখানকার তদানীন্তন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা উষা হালদার মহাশয়ার অক্লান্ত পরিশ্রমে গত বৎসর বাঁকুড়ার বিচ্ছিন্ন নারীসমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া বাঁকুড়া মহিলা সমিতি স্থাপিত হয়। বর্ত্তমান জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা সুধা মজুমদার মহাশয়া সম্মিলনীটিকে অধিকতর শক্তিশালী ও সর্ব্বতোমুখী কল্যাণক্ষম করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে এবং বাংলার তথা ভারতের অন্যান্য নারী-সম্মিলনীর সহিত যোগ-সূত্র স্থাপনা করার উদ্দেশ্যে নিখিল-ভারত-নারী-সম্মিলনীর পশ্চিম-বঙ্গীয়-শাখারূপে পুনর্গঠন করেন। স্থানীয় বালিকাগণ কর্ত্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইবার পর শ্রীযুক্তা লীলা ঘোষ সম্মিলনীর বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। অতঃপর সভানেত্রী মহোদয়া প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁহার সুচিন্তিত ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর অভিভাষণে সম্মিলনীর উদ্দেশ্যাদি ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি সভায় সকলকে জ্ঞাপন করেন। স্থানীয় মাতৃমঙ্গল ও শিশু-প্রতিষ্ঠানটি ও প্রাথমিক অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয়টির উন্নতিকল্পে সমিতি আরও দৃষ্টি দিবেন ও জাতীয় উন্নতিকল্পে স্ত্রীশিক্ষা একান্ত অপরিহার্য্য বলিয়া প্রতি মাসে স্থানীয় কলেজের অধ্যাপকগণের ও অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তির সাহায্যে বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা হইবে, তাহাও তিনি জানান। অতঃপর সভায় দুইটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রস্তাবনা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রথম প্রস্তাবনাটি শ্রীযুক্তা ভ্রমর ঘোষ এম-এ কর্ত্তৃক উত্থাপিত হয়। তিনি বলেন "বাঁকুড়ার সমবেত মহিলার পক্ষ হইতে আমি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে সমগ্র বাংলার দীর্ঘকাল দণ্ডিত স্ত্রী-কয়েদীদিগের নিমিত্ত বালক-জেলখানা (Borstal) প্রণালীতে একটি স্বতন্ত্র কারাগার নির্ম্মাণ করিতে ও তাহাদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতি

বিধানার্থে প্রাথমিক শিক্ষা, নিত্য অল্পবিস্তর ধর্ম্মোপদেশ দানের ব্যবস্থা ও স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের নিমিত্ত কার্য্যকরী শিক্ষা-দানের (যথা মাদুর তৈয়ার, বাঁশ ও বেতের কাজ, তাঁত বুনন, কার্পেট ও সতরঞ্চি বুনন ইত্যাদি) সুযোগ ও ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করি। সংখ্যানুপাতে স্ত্রী-কয়েদীদিগের সংখ্যা পুরুষ-কয়েদী অপেক্ষা কম হওয়ার দরুন যদি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট এত খরচ করা অসম্ভব ও নিরর্থক বলিয়া মনে করেন, তবে আমরা সমগ্র ভারতের দীর্ঘকালদণ্ডিত স্ত্রী-কয়েদীদিগের নিমিত্ত উপস্থিত অন্ততঃ একটি কি দুইটি মাত্র স্বতন্ত্র জেলখানা নির্ম্মাণ করিবার কথা ভাবিতে অনুরোধ করি ও আবশ্যক হইলে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকেও এ সম্বন্ধে সচেতন করিতে বলি। গত বৎসর শ্রীযুক্তা সুধা মজুমদার মহাশয়ার প্রস্তাবনায় ফরিদপুর-মহিলা-সমিতির অধিবেশন হইতেও বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে এবম্প্রকার অনুরোধ করা হইয়াছিল। তখন জেলবিভাগের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী মিঃ হল্যাণ্ড এ বিষয়ে যথোচিত দৃষ্টি দিবেন বলিয়া জানাইয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত আমরা আর কোন কিছু শুনি নাই। আমি বঙ্গীয় পরিষদের সভ্য মহিলা ভগ্নীদিগের দৃষ্টিও এ বিষয়ে আকর্ষণ করি ও যাহাতে তাঁহারা অনতিবিলম্বে ইহা কার্য্যকরী হইতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা অবলম্বন করুন।"

শ্রীউমা গুহ, বি-এ কর্ত্তৃক অতঃপর আর একটি অত্যাবশ্যক প্রস্তাবনা আনীত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রাহ্য হয়:—

"এই সম্মিলনী দুঃখের সহিত পরিলক্ষ্য করিতেছে যে দেশে শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের সহিত নারীদের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে বিজড়িত থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশগুলিতেই যথোপযুক্ত নারী-প্রতিনিধি গ্রহণ করা হয় না এমন কি মহিলা-উন্নতি-কল্পে যে প্রতিষ্ঠানগুলিও দেশে আছে তাহাতে নারীদের কোন প্রতিনিধি নিবার ব্যবস্থা নাই। আমরা দেশের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি ও বিশেষভাবে বাঁকুড়ার নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মপরিষদে যাহাতে এই সম্মিলনীর মনোনীত প্রতিনিধি গ্রহণ করা হয় তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি—(১) বাঁকুড়া সম্মিলনী-প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল স্কুলের maternity ward (২) সরকারী লেডী ডাফরিন হাসপাতাল, (৩) ওয়েসলিয়ান কলেজ (৪) উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (৫) মিশনারী গার্লস স্কুল (৬) মিউনি-সিপ্যালিটির এডুকেশন কমিটি (৭) ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের এডুকেশন কমিটি।

অতঃপর মিসেস রহমান কর্ত্তৃক ধন্যবাদ দানের পর 'জাতীয় সঙ্গীত' স্থানীয় উচ্চ-বালিকা-বিদ্যালয়ের বালিকাগণ কর্ত্তৃক গীত হইবার পর সভার কর্ম্ম শেষ হয়। সর্ব্বশেষে ডাক্তার দ্বিজেন্দ্র-নাথ মৈত্র মহাশয় ১৫০টি ছায়াচিত্র অবলম্বনে নারীজাতির নৈতিক, মানসিক ও শারীরিক উন্নতি-বিধায়ক চমৎকার একটি বক্তৃতা দান করেন।

রাঁচিতে হিন্দু ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব সাহিত্য-সম্মিলনীর নবম বার্ষিক অধিবেশন

হিন্দু ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব সাহিত্য-সম্মিলনীর নবম বার্ষিক অধিবেশন গত ১৫ই হইতে ১৭ই কার্ত্তিক সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতার কয়েক জন গুণী পণ্ডিত ও অধ্যাপক এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় সকলকে সাদরসম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া সভাপতি মহাশয়ের 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সম্মিলনীর কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত সুধাকান্তি রায় কর্ত্তৃক বার্ষিক বিবরণ পঠিত হইলে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন, সংস্কারেচ্ছু হইয়া ফরমায়েস করিয়া কোনও সাহিত্য গঠিত হয় না। কবি, কথাসাহিত্যিক ও চিত্রকর প্রভৃতি শিল্পিগণের জীবনের মধ্যে একটা ধ্যানময় নিঃসঙ্গতা আছে, যাহার মধ্যেই তাঁহাদের সাধনা, তাঁহাদের সৃষ্টি গঠিত হইয়া উঠে, যদিও তাহা সকল মানবের কাজেই লাগে এবং তাহাদের আনন্দ দেয়।

সম্মিলনীর অধিবেশনে নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়:

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'প্রাচীন ভারতের প্রতিমাপূজা'; কৃষ্ণনগর কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাংলা শব্দের উচ্চারণ"; শ্রীযুক্ত নীরদকুমার রায়, প্রসিদ্ধ পারসিক সুফী কবি নূরউদ্দিন অবদর্‌রহমান জামী প্রণীত "য়ুসুফ ও জুলেখা" নামক ঐতিহাসিক প্রেম-কাব্য; শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার চৌধুরী, "চলচ্চিত্রে সাহিত্যের স্থান"; শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ সেন, "শিশুদিগের প্রাথমিক শিক্ষা"; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু গীতারত্ন, "সংসারীর গীতার সাধনা"; শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র, কবি জসিমুদ্দিন প্রণীত "নক্সী কাঁথার মাঠ"; শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর ঘোষ, "কৃষি ও আমাদের আর্থিক উন্নতি"; অধ্যাপক ডাঃ দুঃখহরণ চক্রবর্ত্তী, "বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞান"।

ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় "সমসমাজবাদে ভারতীয় সভ্যতার দান" সম্বন্ধে, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু "ভাগবতধর্ম্ম ও বেদান্ত দর্শন" সম্বন্ধে, এবং ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন "আধুনিক বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির উপায়" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরিশেষে শ্রীযুক্ত সুধাকান্তি রায় স্বরচিত একটি গল্প পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত সুধাকান্তি রায়, শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ সেন, শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কালীশরণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র রায় প্রভৃতির যত্নে এবং স্বেচ্ছাসেবকগণের কর্ম্মতৎপরতায় সম্মিলনীর এই অধিবেশনটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

১২০৷২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীরমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গ্রামের ঘাটে

শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

প্র   সী প্রেস, কলিকাত
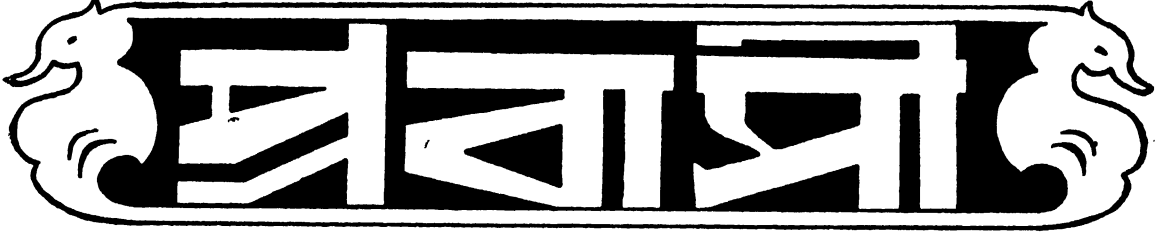
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪০শ ভাগ, ২য় খণ্ড | মাঘ, ১৩৪৭ | ৪র্থ সংখ্যা

অন্তঃশীলা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জটিল সংসার,
মোচন করিতে গ্রন্থি জড়াইয়া পড়ি বার-বার।
গম্য নহে সোজা
দুর্গম পথের যাত্রা স্কন্ধে বহি দুশ্চিন্তার বোঝা।
পথে পথে যথাতথা
শত শত কৃত্রিম বক্রতা।
অনুক্ষণ
হতাশ্বাস হয়ে শেষে হার মানে মন।
জীবনের ভাঙা ছন্দে ভ্রষ্ট হয় মিল,
বাঁচিবার উৎসাহ ধূলিতলে লুটায় শিথিল।

ওগো আশাহারা,
এই শুষ্কতার পরে আনো নিখিলের বন্যাধারা।
বিরাট আকাশে
বনে বনে ধরণীর ঘাসে ঘাসে
সুগভীর অবকাশ পূর্ণ হয়ে আছে
গাছে গাছে
অন্তহীন শান্তি-উৎস-স্রোতে।

অন্তঃশীল যে রহস্য আঁধারে আলোতে
তারে সদ্য করুক আহ্বান
আদিম প্রাণের যজ্ঞে মর্মের সহজ সামগান।
আত্মার মহিমা যাহা তুচ্ছতায় দিয়েছে জর্জরি
ম্লান অবসাদে, তারে দাও দূর করি,
লুপ্ত হয়ে যাক শূন্যতলে
দ্যুলোকের ভূলোকের সম্মিলিত মন্ত্রণার বলে॥

২৮ মে, ১৯৪০

প্রচ্ছন্ন পশু

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংগ্রাম-মদিরাপানে আপনা বিস্মৃত
দিকে দিকে হত্যা যারা প্রসারিত করে
মরণলোকের তারা যন্ত্রমাত্র শুধু,
তারা তো দয়ার পাত্র মনুষ্যত্বহারা।
সজ্ঞানে নিষ্ঠুর যারা উন্মত্ত-হিংসায়
মানবের মমতন্তু ছিন্ন ছিন্ন করে
তারাও মানুষ ব'লে গণ্য হয়ে আছে,
কোনো নাম নাহি জানি বহন যা করে
ঘৃণা ও আতঙ্কে মেশা প্রবল ধিক্কার,
হায় রে নির্লজ্জ ভাষা হায় রে মানুষ।
ইতিহাস-বিধাতারে ডেকে ডেকে বলি
প্রচ্ছন্ন পশুর শাস্তি আর কত দূরে
নির্বাপিত চিতাগ্নিতে স্তব্ধ ভগ্নস্তূপে

উদয়ন
২৪ ডিসেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে

অবিচার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নারীর দুঃখের দশা অপমানে জড়ানো
এই দেখি দিকে দিকে ঘরে ঘরে ছড়ানো ;
জানো কি এ অন্যায় সমাজের হিসাবে
নিমেষে নিমেষে কত হলাহল মিশাবে।
পুরুষ জেনেছে এটা বিধিনির্দিষ্ট
তাদের জীবন-ভোজে নারী উচ্ছিষ্ট।
রোগ-তাপে সেবা পায় লয় তাহা অলসে ;
সুধা কেন ঢালে বিধি ছিদ্র এ কলসে।
সম সম্মান হেথা নাহি মানে পুরুষে
নিজ প্রভু-পদ-মদে তুলে রয় ভুরু সে ;
অর্ধেক কাপুরুষ অর্ধেক রমণী
তাতেই তো নাড়ীছাড়া এ-দেশের ধমনী।
বুঝিতে পারে না ওরা এ বিধানে ক্ষতি কার,
জানি না কী বিপ্লবে হবে এর প্রতিকার।
একদা পুরুষ যদি পাপের বিরুদ্ধে
দাঁড়ায়ে নারীর পাশে নাহি নামে যুদ্ধে
অর্ধেক কালীমাখা সমাজের বুকটা
খাবে তবে বারে বারে শনির চাবুকটা।
এত কথা বৃথা বলা, যে পেয়েছে ক্ষমতা
নিঃসহায়ের প্রতি নাই তার মমতা,
আপনার পৌরুষ করি দিয়া লাঞ্ছিত
অবিচার করাটাই হয় তার বাঞ্ছিত।

শান্তিনিকেতন
৪ পৌষ, ১৩৪৭

আশীর্বাদপ্রার্থীর প্রতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

কোন্ বাণী মোর জাগল যাহা
রাখবে স্মরণে,
পলে পলে দলিত সে
কালের চরণে।
তাদের নিয়ে সারাবেলা
চলচে রাখা, চলচে ফেলা,
খেলার শেষে বাঁচবে যা তাই
বাঁচবে মরণে॥

৭ই পৌষ, ১৩৪২

২

অবসান হোলো রাতি।
নিবাইয়া ফেলো কালিমা-মলিন
ঘরের কোণের বাতি।
নিখিলের আলো পূর্ব আকাশে
জ্বলিল পুণ্যদিনে
একপথে যারা চলিবে, তাহারা
সকলেরে নিক্ চিনে॥

৭ই পৌষ, ১৩৪৩

৩

শরৎবেলার বিত্তবিহীন মেঘ
হারায়েছে তার ধারাবর্ষণবেগ,
ক্লান্তি-আলসে যাত্রার পথে দিগন্ত আছে চুমি,
অঞ্জলি তব বৃথা তুলিয়াছ হে তরুণী বনভূমি।
সময় এসেছে নির্জন গিরিশিরে
কালিমা ঘুচায়ে শুভ্র তুষারে মিশে যাবে ধীরে ধীরে
অস্তসাগর পশ্চিম পারে সন্ধ্যা নামিবে যবে
সপ্ত ঋষির নীরব বীণার রাগিণীতে লীন হবে।

৭ই পৌষ, ১৩৪৪

৪

বাঁশরী আনে আকাশবাণী,
ধরণী আনমনে
কখনো শোনে কখনো নাহি শোনে।
দিনের যবে অস্ত হবে
গানের হবে শেষ
তখন বুঝি পড়িবে মনে
সুরের কিছু রেশ।

৭ই পৌষ, ১৩৪৫

৫

এক দিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে
রাজার দোহাই দিয়ে
এ-যুগে তারাই জন্ম নিয়েছে আজি,
মন্দিরে তারা এসেছে ভক্ত সাজি।
গর্জনে মিশে স্তবমন্ত্রের স্বর,
মানবপুত্র তীব্র ব্যথায় ডাকেন, হে ঈশ্বর,
এ পানপাত্র নিদারুণ বিষে ভরা
দূরে ফেলে দাও, দূরে ফেলে দাও ত্বরা।

৭ই পৌষ, ১৩৪৬

৬

বরষে বরষে শিউলি তলায়
ব'স অঞ্জলি পাতি,
ঝরা ফুল দিয়ে মালাখানি লহ গাঁথি;
এ-কথাটি মনে জানো
দিনে দিনে তার ফুলগুলি হবে ম্লান—
মালার রূপটি বুঝি
মনের মধ্যে রবে কোনোখানে
যদি দেখ তারে খুঁজি।
সিন্দুকে রহে বন্ধ
হঠাৎ খুলিলে আভাসেতে পাও
পুরানো কালের গন্ধ॥

৭ই পৌষ, ১৩৪৭

[শান্তিনিকেতনের পূর্বতন ছাত্র শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক বর্ষে বর্ষে ৭ই পৌষে শান্তিনিকেতনের বার্ষিক উৎসবের সময় কবির নিকট হইতে সংগৃহীত আশীর্বাণীর সঞ্চয়। ইহার কোন-কোনটি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইলেও ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য সবগুলি একত্র প্রকাশিত হইল —প্রবাসী সম্পাদক]

মানুষের সাধনা

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন
২২ জুন

শ্রীমান অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কল্যাণবরেষু

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন

আপনার ১৯শে জুন তারিখের পত্র প্রাপ্ত হইলাম। আপনার জিজ্ঞাসিত বিষয়টির সম্বন্ধে আমার বুদ্ধিতে আমি যতদূর বুঝি তাহা এই :—

(১)

পশুপক্ষীদিগের জ্ঞান-শিক্ষার প্রয়োজন নাই ; তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারই তাহাদের গুরু।

(২)

মনুষ্যের অন্নবস্ত্রাদির অভাব মোচনের জন্য কৃষি-বিদ্যা বস্ত্রবয়ন-বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা করা আবশ্যক; এবং আধ্যাত্মিক অভাব মোচনের জন্য আত্মা বিষয়ক এবং পরমাত্মা বিষয়ক বিদ্যা শিক্ষা করা আবশ্যক।

(৩)

শিক্ষা দুই রূপ, শুনিয়া শেখা এবং দেখিয়া শেখা। অন্নের ভিতরে নানাপ্রকার পুষ্টিকর পদার্থ আছে এটা আমাদের শুনিয়া শেখা; অন্নের ভিতরে কত প্রকার কি কি পুষ্টিকর পদার্থ আছে, রসায়নবিৎ পণ্ডিতের তাহা দেখিয়া শেখা। শুনিয়া শেখা বিদ্যাকে বলা যায়—পরোক্ষ জ্ঞান; দেখিয়া শেখা বিদ্যাকে বলা যায় অপরোক্ষ জ্ঞান।

(৪)

অপরোক্ষ জ্ঞান যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ব্বপুরুষগণের এবং বর্ত্তমান কালের সাধুসজ্জনের নিকট হইতে শুনিয়া শেখা পরোক্ষ জ্ঞানের পথ অবলম্বন করা শ্রেয়।

(৫)

আপনি চা'ন অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান। তাহার একমাত্র উপায় আত্মজ্ঞান।

(৬)

সকলেই আমরা ন্যূনাধিক পরিমাণে আত্মাকে জানি। আদবেই যদি আমরা আত্মাকে না জানিতাম, তবে আত্মার অভাব মোচনের জন্য আমাদের মাথা-ব্যথা হইত না; তাহা হইলে আপনিও আমাকে ১৯শে তারিখের পত্র লিখিতেন না। আমিও এ-পত্র লিখিতাম না। আত্মা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটের বস্তু অথচ আত্মাকে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা কম জানি এইটিই আমাদের দুঃখ—একেবারেই যে জানি না তাহা নহে।

(৭)

সমুচিত আত্মজ্ঞান ভিন্ন অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বিতীয় উপায় নাই। আমরা যদি আমাদের নিকটতম এই আত্মাকে চৈতন্যময় আত্মারূপে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিতে পারি, তবে সেই সঙ্গে আপনাতে এবং সর্ব্বজগতে চৈতন্যময় পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিতে পারি। আপন আত্মাকে আমরা ছায়া-ছায়ারূপে বা ঝাপ্‌সা-ঝাপ্‌সা রূপে দেখি বলিয়া পরমাত্মাকেও একপ্রকার অন্ধশক্তি রূপে দেখি।

মোটামুটি এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হইলাম—চিঠিপত্রে সব কথা সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করিয়া বলা অতিশয় কঠিন। তা ছাড়া এক্ষণে আমি একটা দুরূহ বিষয়ের ভার হাতে লওয়াতে তদ্ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে উচিতমতো মনঃসমর্পণ করিতে অক্ষম। এ-সকল বিষয়ে মুখামুখি কথোপকথন যেমন বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েরই পক্ষে প্রীতিজনক, চিঠিপত্রের চালাচালিতে সেরূপ সুফলের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

নীলাঙ্গুরীয়

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১১

রায়-পরিবারের সঙ্গে দিন দিন বেশ ভাল করিয়া মিশ খাইয়া যাইতেছি। আর সবাই চমৎকার, এক আশঙ্কা ছিল ব্যারিস্টার রায়ের সম্বন্ধে, দেখিতেছি তাঁর মত অমায়িক লোক অল্পই দেখা যায়। বরং বলা চলে তিনি এক দিক দিয়া আমায় নিরাশ করিয়াছেন, কেন না যে-জিনিসটা সম্বন্ধে একটা উৎকট রকম ধারণা গড়িয়া রাখিয়াছি, যদি দেখা যায় যে সেটা উৎকট হওয়ার ধার দিয়াও গেল না, তো মনে এক ধরণের নৈরাশ্য আসে। মনটা যেন উৎকটকে গ্রহণ করিবার জন্য নিজেকে তৈয়ার করিয়া রাখে, তাহার পর দেখে তাহার কষ্ট করিয়া অত তোড়জোড় করাই বৃথা হইয়াছে।...আমার তো মস্ত বড় একটা উপকার করিয়াছেন, একটা পেশা সম্বন্ধেই আমার ভ্রান্ত ধারণা একেবারে দূর করিয়া দিয়াছেন। আমার আদর্শ ব্যারিস্টারের চেহারাঅলা লোকই যখন এই রকম, তখন আর কোন দ্বিধা সন্দেহই নাই আমার ও-সম্প্রদায় সম্বন্ধে। এখন, এমন একটা অদ্ভুত ধারণা এককালে ছিল বলিয়া নিজের পানেই বিদ্রূপের দৃষ্টিতে চাহি মাঝে মাঝে।

তরুর পড়াশুনা চলিতেছে। ওকে এই:ভাবে যে কি করা হইবে কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। অন্তত এই দোটানার মধ্যে ওর শিশু-মন যে বিভ্রান্ত এবং কখন কখন সেই বিভ্রমের জন্যই শ্রান্ত হইয়া পড়ে, এটা বেশ বোঝা যায়। এক দিন লরেটো থেকে আসিয়াই সোজা আমার ঘরে আসিয়া বইয়ের স্যাচেলটা আমার বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া একেবারে আমার কোলে মুখ গুঁজিয়া লুটাইয়া পড়িল। প্রশ্ন করায় ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল, "আমি আর যাব না লরেটোয় মাষ্টারমশাই, কখনও যাব না আমি।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন বল তো, কি হ'ল ?"

"না, ওদের মেয়েরা গালাগাল দেয় আমাদের শিবঠাকুরকে, বলে 'He is a mad snake-charmer' (পাগল সাপুড়ে)। আমি বলেছি তাদের—'I will ask him to curse you' (আমি তাঁকে বলব তোমাদের শাপ দিতে)। শাপ দিয়ে দেবেন'খন সবাইকে ভস্ম ক'রে। কিন্তু আমি যাব না ওদের স্কুলে, মাষ্টারমশাই।

তাহার পর-দিন লক্ষ্মী পাঠশালা হইতে দশটার সময় আসিল বেশ প্রফুল্লভাবে। মোটর থেকেই আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া যেন কতকটা বিজয়োল্লাসে প্রশ্ন করিল, "মাষ্টারমশাই, ইম্যাকুলেট কন্‌সেপশ্যন কি সম্ভব ?"

আমি লিখিতেছিলাম, শুম্ভিত ভাবে ঘুরিয়া ওর মুখের দিকে চাহিয়া একটু কড়াভাবেই প্রশ্ন করিলাম, "কে শেখালে তোমায় এ-কথা তরু ?"

আমার ভাবগতিক দেখিয়া তরু একেবারে হতভম্ব হইয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল; তাহার পর একেবারে মগ্নস্বরে আমতা-আমতা করিয়া বলিল, "না কেউ বলে নি আমায়...ওদের জিজ্ঞেস করতে বলে দিয়েছে...।"

কথাটা বুঝিলাম, লক্ষ্মী পাঠশালায় গিয়া শিবনিন্দার কথা প্রচার করায় এই ফলটি দাঁড়াইয়াছে। বোধ হয় কোন অগ্রণী বয়ঃস্থা ছাত্রী প্রশ্নের আকারে এই পাল্টা জবাব প্রেরণ করিতেছে; ব্যাপার দাঁড়াইতেছে কবির লড়াইয়ের মত। তরুর আবার যাহাতে বেশী কৌতূহল উদ্রেক না হয় সেই উদ্দেশ্যে বলিলাম, "ও-কথা বললে ওদের ঠাকুরকেও পাগল বলা হয় তরু, তাই তোমায় কেউ শিখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেটা কি তোমার বলা উচিত ? ধর্ম্ম নিয়ে কারুর মনে কষ্ট দিতে আছে ?"

তরু লক্ষ্মীমেয়ের মতই উত্তর করিল, "না মাষ্টার-মশাই; তা ভিন্ন মহাদেব তো শুধু আমাদের ঠাকুর, ক্রাইস্ট কিন্তু ওদের, আমাদের—সব্বারই ত্রাণকর্ত্তা।

মহাদেব ত্রিশূল নিয়ে অন্যদের মারেন, ক্রাইস্ট তো নিজেই ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন।”

এও এক জগাখিচুড়ি হইয়া যাইতেছে, নরেটোর শেখান বুলি লক্ষ্মী পাঠশালার বর্ম ভেদ করিয়া শিশুহৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে।

কথাটা সেদিন মিষ্টার রায়কে বলিলাম। আহারের পর উনি গিয়া একটি ঘরে একটু একান্তে বসেন। ওঁর সখের আলোচনা জ্যোতির্বিজ্ঞান,—সেই সময় কখন কখন গভীর রাত্রি পর্যন্ত এই লইয়া ব্যাপৃত থাকেন। ওই সময়টিতে ওঁর একটু পানের অভ্যাস আছে; দুই-এক পেগের পর ওঁর অমায়িক মনটা আরও উদার হইয়া পড়ে। এর মধ্যে আমায় দুই-এক দিন ডাকিয়া কিছু এদিক-ওদিক আলোচনাও করিয়াছেন। আজ আমার কথাটা শুনিয়া অনেক কথাই বলিলেন, বেশীর ভাগই ওঁদের দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে। স্বীকার করিলেন ওঁর ওই উগ্র পাশ্চাত্য ভাবের দ্বারা উনি অপর্ণা দেবীর জীবন ব্যর্থ করিয়াছেন, পুত্রের দিক্ দিয়া তো বটেই, বোধ হয় মীরার দিক্ দিয়াও। এখন তরুকে লইয়া আসলে একটা পরীক্ষা চলিতেছে। মিষ্টার রায়ের মত, তাঁহার সন্তানেরা তাহাদের মায়ের দিকে না গিয়া তাহাদের বাপের দিকেই গিয়াছে, অর্থাৎ বাপের মারফৎ পাশ্চাত্য ভাবটা তাহাদের মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে একেবারে। এই যদি তাহাদের প্রকৃতি তো সে-প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া সুফলপ্রদ হইবে না। তাই নমনীয় অবস্থাতেই তরুর উপর দিয়া প্রাচ্য পাশ্চাত্য দুইটি ধারার পরীক্ষা চলিতেছে। তরু শেষ পর্যন্ত বোধ হয় মায়ের দিকে যাইবে। মিষ্টার রায় বলিলেন—"I am hoping Sailen, I may give at least one of our children to their poor mother." (শৈলেন, আমার আশা আমাদের অন্তত একটি সন্তান ওদের মার হাতে দিতে পারব)।

মিষ্টার রায় পেগটা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে একটু চুমুক দিলেন, তাহার পর রাখিয়া দিয়া বলিলেন, “শৈলেন, অথচ এই পাশ্চাত্য ভাবের জন্য দায়ী ওদের মা-ই, অপর্ণা। আমি নীরব প্রশ্নের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। মিষ্টার রায় মাথাটা নাড়িয়া একটু জোরের সহিতই বলিলেন, “Yes, Aparna. Except for her saree you could not know her from a European girl in those days.” (শাড়ী না থাকলে সে-যুগে ইউরোপীয় মেয়ের সঙ্গে ওর কোন পার্থক্যই ধরা যেত না)। কলেজের প্রথম ছাত্রী,—ডিবেটে বল, টেনিসে বল, স্টাইলে বল, ও ইংরেজ ছাত্রীদেরও পেছনে ফেলে যেত। আমি যখন বিলাতে, পুরোপুরি ওরই উপযোগী হবার জন্যে পাশ্চাত্য ধরণধারণে কত যত্নে কত ব্যয়ে হাত পাকালাম, তার পর যখন আমি তোয়ের, the miracle came (বিস্ময়কর ব্যাপারটা ঘটল)।... ওর প্রতিভা দেখে ওকেও বিলাতে পাঠাবার কথাবার্তা বহুদিন থেকে চলছিল—সে যুগে একটা দুঃসাহসের ব্যাপার। কথা ঠিকঠাক, নেক্‌স্ট স্টীমারেই অপর্ণা বিলাত আসছে, কেম্ব্রিজে ভর্তি হবে, ভারতীয় মেয়ের প্রতিভা দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দোব, হঠাৎ ‘কেব্‌ল’ পেলাম—অপর্ণা আসছে না। পাছে শক্ পাই, আসল কথাটা কেউ আর আমায় খুলে জানালে না। বিলাত থেকে আমি একেবারে full-fledged সাহেব হয়ে ফিরলাম and then I had the rudest shock in my life (জীবনের সব চেয়ে মোক্ষম আঘাত পেলাম)। Where was the Aparna of my dreams? (আমার স্বপ্নের সে অপর্ণা কোথায়?) দেখলাম শাড়ী-সিঁদুর শাঁখা-আলতায় এক ভট্‌চাজগিন্নী সামনে উপস্থিত।”

মিষ্টার রায় রসিকতাটুকু হাসিতে হাসিতে করিলেন বটে, কিন্তু লক্ষ্য করিলাম কত বৎসর পূর্বের কথা হইলেও হাসিটুকুতে সেদিনের সেই নৈরাশ্যটুকু লাগিয়া আছে। পেগে আর এক চুমুক দিলেন, তাহার পর পাত্রটা টেবিলে নামাইয়া রাখিয়া কৌচে হেলিয়া পড়িয়া ছাদের দিকে খানিকটা একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন—যেন কালের ব্যবধান ভেদ করিয়া কত দূরে গিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাঁহার। একটু পরে ধীরে ধীরে দৃষ্টি নামাইয়া কতকটা যেন আত্মগত ভাবেই বলিলেন, “পরিবর্তনটা টের পেলেও যে আমি অপর্ণাকে ছাড়তে পারতাম এমন নয়—I was over head and ears in

love with her (আমিও প্রেমে একেবারে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিলাম)।

একটু থামিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "She is a wonderful girl, is Aparna; believe me Sailen." (বিশ্বাস কর, আশ্চর্য মেয়ে অপর্ণা)

মিষ্টার রায় স্মৃতির আলোড়নে ভাবাতুর হইয়া পড়িয়াছেন। আমারও কিছু একটা বলা দরকার এখানে, প্রাণের অন্তরতম কথাটাই আপনি বাহির হইয়া আসিল, বলিলাম, "আমি ওঁকে অপরিসীম শ্রদ্ধা করি।"

মিষ্টার রায় সেই রকম আবিষ্ট ভাবেই আমার পানে চাহিয়া বলিলেন, "And she deserves" (তার যোগ্যও সে)। তাহার পর অকস্মাৎ আলোচনার মোড় ফিরাইয়া প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন, "Bye the by, মীরাকে তোমার কি রকম বোধ হচ্ছে?"

আমি একেবারে নির্বাক হইয়া গেলাম। মিষ্টার রায় সাধারণ কৌতূহলেই বোধ হয় কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমার মনে যে কোথায় ঘা দিল তাহার খোঁজ রাখেন নাই, তবু আমি বেশ নিষ্কম্প কণ্ঠে উত্তর দিতে পারিলাম না, একটু আমতা-আমতা করিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে...মীরা দেবী...মানে, আমি এই মাস-দুয়েকের কাছাকাছি সামান্য যতটুকু দেখছি, তাতে তো খুব ভাল, মানে..."

এই কয়টি কথা বলিতেই কপালে ঘাম জমিয়া উঠিল, মিষ্টার রায় চুরুটের ধূম্রজালের মধ্য দিয়া আমার পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন—সেই আমার চিরকেলে বিভীষিকার ব্যারিষ্টার, খাঁড়ার মত নাক কি একটা রহস্য ভেদ করিবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে, ঠোঁট দুইটা পাইপের উপর চাপা, তাহাতে চিবুকটা আরও ধারাল হইয়া উঠিয়াছে যেন। ...আমি আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না, হঠাৎ থামিয়া গিয়া দৃষ্টি নত করিলাম। অনেকক্ষণ চুপচাপ গেল; সে এক অসহ্য অবস্থা, আমি অপরাধের গুরুভার লইয়া চক্ষু নত করিয়া বসিয়া আছি, অনুভব করিতেছি—আমার ললাটে আসিয়া পড়িতেছে বিচারকের রুদ্র দৃষ্টি।...আমি রায়-পরিবারের আতিথেয়তার অবমাননা করিয়াছি, মীরার আমি পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছি, আজ ধরা পড়িয়া গিয়াছি। ... ধরাইয়া দিয়াছি আমি নিজেকে নিজেই, মিষ্টার রায় বোধ হয় নিতান্ত সাধারণ কৌতূহলেই প্রশ্নটা করিয়াছিলেন—মীরাদের প্রশংসাটা চলিতেই ছিল, আমার বিবেক আমার কণ্ঠে জড়তা আনিয়া দিয়া তাঁহার কাছে কথাটা ফাঁস করিয়া দিল যে আমি তাঁহার কন্যার সম্বন্ধে মনে মনে অনুরাগ পোষণ করি।...আমি চক্ষু নত করিয়া অনুভব করিতেছি, আমার স্বেদসিক্ত ললাটে মিষ্টার রায়ের উদ্যত দৃষ্টির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ... দেখিতেছি না, কিন্তু তাহার জ্বালা অনুভব করিতেছি।

অসংযত ভাবেই চোখের পল্লব একবার উপর দিকে উঠিল। কী স্বস্তি! মিষ্টার রায় আমার দিকে মোটেই চাহিয়া নাই, কৌচের পিঠের উপর মাথাটা উল্টাইয়া দিয়া চক্ষু মুদিয়া, চিন্তিত ভাবে ধীরে ধীরে পাইপটা টানিতেছেন।

আরও একটু গেল।

তাহার পর সেই ভাবেই পাইপ-মুখে প্রশ্ন করিলেন, "So you have joined your M. A. class already? (তা হলে এম-এ সুরু ক'রে দিয়েছ?)

উত্তর করিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"হুঁ..."

আরও খানিকক্ষণ নীরবে কাটিল, তাহার পর মিষ্টার রায় সোজা হইয়া বসিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, "Suppose you go abroad and fetch a European degree" (যদি ইউরোপে গিয়ে সেখান থেকে একটা ডিগ্রী নিয়ে এস তো কেমন হয়?)

অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন; "মীরাকে কেমন বোধ হচ্ছে"—তাহার চেয়ে শত গুণে অপ্রত্যাশিত। আমি কয়েকটা অদ্ভুত, অস্পষ্ট অনুভূতির মিশ্রণে একেবারে নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিলাম; 'হাঁ-না' কোন রকমই উত্তর মুখে জোগাইল না।

আরও একটু পরে মিষ্টার রায় ধীরে ধীরে বলিলেন, "যাও শোও গে, রাত হয়েছে, আমি স্টেট্‌সম্যানে

তোমার ফ্রেণ্ড মিষ্টার করের অ্যাস্ট্রনমি সম্বন্ধে সেই লেখাটা ততক্ষণ পড়ি।...গুড নাইট...হ্যাঁ, তরুর কথা শুনলাম, আর একদিন দু-জনে বসে ভাল ক'রে আলোচনা করতে হবে।...গুড নাইট।"

* * *

দুঃখের জীবনে বিনিদ্র রজনী অনেকই কাটাইতে হইয়াছে, কিন্তু সেদিনের সেই যে তন্দ্রাহীন রাত্রি যা দীর্ঘ হইয়াও সুখের তীক্ষ্ণতায় আমার কাছে অল্পায়ু হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার কথা এ-জীবনে কখনও ভুলিব না। শিশু যেমন অতি সামান্য খেলনা লইয়াই কল্পনায় নিজের আনন্দ সৃষ্টি করিয়া চলে, মিষ্টার রায়ের তিনটি অতি সামান্য কথা লইয়া আমি আমার জীবন-মরণ সৃষ্টি করিয়াছি সেই রাত্রে—মীরাকে কি রকম বোধ হচ্ছে?...এম-এ তাহলে সুরু ক'রে দিয়েছ?... আচ্ছা, ইউরোপে গিয়ে একটা ডিগ্রী নিয়ে এলে কেমন হয়

নিতান্ত খাপছাড়া তিনটি কথা, কিন্তু প্রশ্নে-উত্তরে, আশায়-আবেগে এই তিনটি লইয়াই যে কত গড়াপেটা হইল সেদিন এখনও ভাবিলে বিস্মিত হই। কত অসংলগ্ন অসম্ভব কল্পনা; সবকেই সূত্রের মত বাঁধিয়া রাখিল, সবের মধ্যেই সামঞ্জস্য আনিল শুধু একটি প্রশ্ন— "মীরাকে তোমার কেমন বোধ হচ্ছে?"

হয়ত নিতান্ত নিরুদ্দেশ ভাবেই মিষ্টার রায় প্রশ্ন তিনটি করিয়াছিলেন, হয়ত যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহার সবটুকুই মিথ্যা, তবু সেই রাত্রিটি একটি চরম সত্যরূপে আমার জীবনে শাশ্বত হইয়া আছে।

১২

মাস-তিনেক কাটিয়া গেল। মীরা আমার জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছে। আমিও কি ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছি ওর জীবনে? ও আমার লেখা খোঁজে, মাষ্টারির অভিনয় করে তরুকে লইয়া—যখন বোঝে আমি টের পাইয়াছি, হঠাৎ ভারিক্কে হইয়া ওঠে, মনিবের গুরুতর সম্বন্ধটা মেরামত করিতে লাগিয়া যায়। এ আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্য দিয়া কি হইতেছে সব সময় ঠিক ধরিতে পারি না সন্দেহ হয়। একদিন মিষ্টার রায় বাড়ীতে একটা পার্টি দিলেন। আমার সময়ে এই প্রথম পার্টি। কারণটা ঠিক মনে পড়িতেছে না, খুব সম্ভব বিশেষ কোন উপলক্ষ্য ছিল না। আমি আসিবার এই তিনটা মাসের মধ্যে মীরা চার-পাঁচটি ছোট বড় পার্টিতে যোগদান করিয়া আসিল দেখিলাম, তাহার মধ্যে তরুর সঙ্গে একটিতে আমিও ছিলাম; সেই সব নিমন্ত্রণের পাল্টা নিমন্ত্রণ হিসাবে মীরা বোধ হয় পিতাকে রাজী করাইয়া এই বন্দোবস্তটা করিতেছে। খুব ব্যস্ত;—সাজানর প্ল্যান, মেনুর (খাদ্য-তালিকার) নির্ণয়, যন্ত্র-সঙ্গীতের জন্য ভবানীপুর হইতে অরকেস্ট্রা ঠিক করা, যাহাদের নিমন্ত্রণ করিতে হইবে তাহাদের তালিকা প্রস্তুত, কার্ড ছাপান, বিলির বন্দোবস্ত—সমস্ত লইয়া কয়েক দিন তাহার যেন নিঃশ্বাস ফেলিবার ফুরসৎ নাই। উৎসাহের দীপ্তি, কর্ম-চঞ্চলতার কতকটা আলুথালু ভাব, এবং তারই মাঝে মাঝে আধটু ক্লান্তির অবসাদে তাহার এক যেন নূতন রূপ ফুটিয়াছে। মাঝে মাঝে আমার পরামর্শ চায়। আমি এ সমাজের অল্পই বুঝি, বিশেষ করিয়া পার্টির বিষয় তো আরও কম। বলিলে মীরা বলে, "ও-সব শুনছি না, আপনি গা-ঝাড়া দিতে চান, শৈলেনবাবু। বাবার ফুরসৎ কম, একবার সেই রাত্রে খাবার সময় দেখা হবে, মাকে তো দেখছেনই, দাঁড়ান আপনি স'রে, আমি দাঁড়িয়ে অপমান হই···।"

মীরা কথাগুলা একটু অভিমানের সুরে বলে। এ কয় দিন থেকে সেই কতকটা দৃপ্ত মীরা যেন লুপ্ত, মীরা কর্মের মধ্যে কতকটা যেন এলাইয়া গেছে, তাহার চিরন্তনী অসহায় নারী-প্রকৃতিটা স্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আমি অবশ্য তাহারই সাহায্যে তাহাকে পরামর্শ দিই, সে যা বলে, কিম্বা কোন সময় বলিয়াছে সেই সব কথাই খানিকটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আমার মন্তব্য জানাই, তাহাতেই সে প্রীত। মীরা এই কয়টি দিনে কর্মব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে ভুলিয়া তাহার অজ্ঞাতসারেই আমার খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। ও বুঝিতেছে না, ফুরসৎ নাই ওর বুঝিবার, এমন কি পরিবর্ধমান অন্তরঙ্গতার মাঝে কখন্ "মাষ্টার-মশাই" ছাড়িয়া যে "শৈলেনবাবু" বলিতে আরম্ভ করিয়া

দিয়াছে তাহারও হিসাব নাই বোধ হয় ওর; কিন্তু আমার হিসাব আছে, আমি সমস্ত অন্তর দিয়া বুঝিতেছি; এই লুকোচুরিটুকু যে কত মিষ্ট লাগিতেছে! ··· মীরা আমায় পাইতেছে না, কিন্তু মীরাকে আমি পাইতেছি।

বলিল, "আপনি নেমন্তন্নটা নতুন করে লিখে দিন না —বাংলায় আজকাল যেমন নতুন কত ধরণে লেখে দেখতে পাই···"

লেখা হইলে মুখের পানে প্রশংসার দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "চমৎকার হয়েছে, আমি মাথা খুঁড়লেও পারতাম না। আপনাকে কী যে বকশিশ দেব তাই ভাবছি।"

আজ মীরা কি সত্যই এত কাছে?—যেন বিশ্বাস হয় না। আমি আমার যতটুকু সীমা ও অধিকার তাহার মধ্যেই একটা শোভন উত্তর খুঁজিতেছিলাম, মীরা হাসিয়া একটু চিন্তিত ভাবে ভ্রূযুগল কুঁচকাইয়া থাকিয়া বলিল— "হয়েছে,—ওর জন্যে কার্ড পছন্দ, ছাপান,—সব আপনার হাতে, আমি একেবারে আর ওদিকে চাইব না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "অসহযোগিতাও একটা বকশিশ নাকি?"

মীরাও তর্কের উৎসাহ অভিনয় করিয়া বলিল, "বাঃ, নিজের একটা সম্পূর্ণ ভার দিয়ে দেওয়া বকশিশের মধ্যে পড়ে না? ধরুন যদি···"

শেষ করিবার পূর্বেই অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। আমি ওর কথার সরল অথচ অনভীপ্সিত মানেটা যেন ধরিতে পারি নাই, কিম্বা ওর লজ্জাটাও যেন চোখে পড়ে নাই এই ভাবে প্রশ্ন করিলাম, "তা বেশ, আমার কিন্তু প্লেন কার্ড পছন্দ, মেলা ফুলকাটা-টুলকাটা ভাল লাগে না। আপনার সঙ্গে রুচির মিল না হ'তে পারে তাই আগে থাকতে ব'লে রাখছি।"

মীরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার আমার পানে চাহিল— ভান করিতেছি, না সত্যই কিছু বুঝি নাই? তাহার পর সহজ ভাবেই বলিল, "প্লেন তো নিশ্চয়ই, আমারও তাই পছন্দ।"

তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

কি ভাবিল মীরা আমায়? স্থূলবুদ্ধি? অরসিক? জড়? না, বুঝিতে পারিল আমি তাহার কথাটার যাহা মানে হইতে পারে তাহা পুরাপুরিই বুঝিয়াছি, না বুঝিবার ভান করিয়া তাহার লজ্জাটা সামলাইয়া লইয়াছি মাত্র?

যাহাই ভাবুক, কাজটা কিন্তু ঠিকই করিয়াছি। মীরা লজ্জিত হইবে আর আমি ওর জ্ঞাতসারে সেই লজ্জা উপভোগ করিব সেদিন এত শীঘ্র আসে না।

পার্টিতে অনেকগুলি নূতন মানুষ দেখিলাম, মীরা সাধারণত যাহাদের সঙ্গে মেলামেশা করে, মেয়েপুরুষ উভয় জাতিরই। মীরা প্রথম ঝোঁকটায় সকলকে অভ্যর্থনা করিতে, বসাইতে ব্যস্ত ছিল, কতকটা নিশ্চিন্ত হইলে আমায় ছাড়া-ছাড়া ভাবে কয়েক জনের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। তাহার মধ্যে একজন রেবা;—মীরার বিশেষ বন্ধু। মীরা যখন কয়টা দিন সরঞ্জামে মাতিয়া ছিল, রেবাকে তাহার সঙ্গে দেখিয়াছি। মেয়েটি মীরার চেয়ে এক-আধ বছরের ছোট হইতে পারে, খুব সুন্দরী, খুব শৌখিন এবং অত্যন্ত লাজুক। এর আগেও এবং পরিচয়ের পরও রেবাকে দেখিয়া আমার এই কথাই মনে হইয়াছে যে ও নিজের সৌন্দর্যকে এত ভালবাসে যে না সাজাইয়া গোছাইয়া যেন পারে না; আর এই সাজানর জন্যই ওর অপরিসীম লজ্জা। এই মেয়েটিতে এই একটা নূতন জিনিস দেখিলাম, কেন না সুন্দরীরা একটু লজ্জিত বেশী হয় একথা সত্য হইলেও, শৌখিনদের ভাগে লজ্জা একটু কম থাকে,—কেন-না শখ জিনিসটাই হইতেছে পরের চক্ষে নিজেকে বিশিষ্ট করিয়া দেখা।

রেবাকে অবশ্য এ-কাহিনীর মধ্যে আর পাওয়া যাইবে না, কারণ আমি আসিবার কিছু দিন পরেই হঠাৎ বিবাহ হইয়া রেবা লাহোরে চলিয়া গেল। সৌন্দর্য, শখ আর লজ্জার অদ্ভুত সমাবেশে ও আমার মনে একটা কৌতূহল জাগাইয়াছিল বলিয়া ওর কথা একটু না তুলিয়া পারিলাম না।

আর একটি যুবতী সম্বন্ধে আমার কিছু দিন হইতে কৌতূহল জাগিয়াছিল, তাহার কারণ আগন্তুকদের মধ্যে তাহাকেই সবচেয়ে বেশী দেখিয়াছি এ-বাড়ীতে, আর তরুর মুখেও তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছি। অপর্ণা

দেবী আজ সাক্ষাৎভাবে পরিচয় করাইয়া দিলেন। জীবনে তাহাকে কখনও ভোলা চলিবে না। শুধু তাহাই নয়, যত দিন বাঁচিয়া থাকিব তাহার স্মৃতির পাদপীঠে অনির্বাণ শ্রদ্ধার বাতি জ্বালিয়া রাখিব।

অপর্ণা দেবী গোড়া হইতেই উপস্থিত ছিলেন না; কাল রাত্রি হইতে তাঁহার শরীরটা হঠাৎ একটু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। পার্টিটা আর পিছাইয়া দেওয়া সম্ভব হইল না; তবে তিনি একটু বিলম্ব করিয়া নামিলেন, যখন প্রথম অভ্যর্থনার বেগটা কতকটা প্রশমিত হইয়া সবাই একটু স্থির হইয়াছে। তাঁহার সেই গরদের চওড়া লাল-পেড়ে শাড়ী, সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর, মুখে প্রসন্ন হাসি ঈষৎ ক্লান্তির সহিত মিশিয়া একটা অপার্থিব কারুণ্যের ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছে। অভ্যাগতদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ফিরিলেন একটু। উনি নামিয়াছেন পর্যন্ত আমার নজরটা বেশীর ভাগ ওঁর দিকেই রহিয়াছে। আমার মন আর দৃষ্টি ওঁকে বরাবরই খোঁজে, কম পায় বলিয়া আরও বেশী করিয়া খোঁজে।

এক সময় মীরা এক যুব-দম্পতির সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া বলিল—"শৈলেনবাবু, আপনার লেখার খোরাক নিয়ে এলাম, পরিচয় করুন,—তপেশবাবু আর অণিতা—মিস্টার তপেশ বোস আর অণিতা চট্টোপাধ্যায়—অবশ্য এখন বোস—বুঝতেই পাচ্ছেন জ্যান্ত রোম্যান্স।"

আমি ওঁদের নমস্কার করিয়া হাসিয়া বলিলাম, "রোম্যান্সের দিক থেকে ওঁদের অভিনন্দিত করছি।"

তপেশ হাসিয়া কি একটা উত্তর দিতে যাইবে, এমন সময় অপর্ণা দেবী একটু যেন চঞ্চলভাবেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুখে একটা উদ্বেগের ভাব, চাপিবার প্রয়াস থাকিলেও বেশ প্রকট। প্রশ্ন করিলেন, "সরমাকে দেখছি না তো মীরা, আসে নি?"

মীরা যেন এতক্ষণ একটা দরকারী জিনিস ভুলিয়াছিল, একটু চকিত হইয়া চারি দিকে চাহিয়া বলিল, "কই দেখছি না তো!"

"আসে নি নিশ্চয়, কেন এল না বল তো? কার্ড পাঠাতে ভোল নি তো?"

"তাঁকে আমি নিজের হাতে কার্ড দিয়েছি। আসতেনও তো বরাবর কেমন হচ্ছে-না-হচ্ছে খোঁজ নিতে।"

"তবে!"

একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ফোনে একবার দেখ মীরা, লক্ষ্মীটি।"

মীরা পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা মোটর আসিয়া গেটে প্রবেশ করিল। "ঐ যে সরমাদের গাড়ী" বলিয়া মীরা ত্রস্তপদে অগ্রসর হইল।

সরমাকে আমি এই বাড়ীতে পূর্বে কয়েক বার দেখিয়াছি এবং এর-তার মুখে, বিশেষ করিয়া তরুর কাছে তাহার অল্পবিস্তর পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু কোন প্রাসঙ্গিকতা না থাকায় তাহার সম্বন্ধে কিছু বলি নাই; দু-একটা কথা বলিতে চাই।

সরমাকে দেখিলে আমার একটা কথা মনে পড়িয়া যায়,—স্থির-বিদ্যুৎ। এ এক আশ্চর্য সৌন্দর্য যাহার পানে একবার চাহিলে আপাদমস্তক ভাল করিয়া না-দেখিয়া চোখ ফিরাইবার উপায় থাকে না। আমি ঠিক এই ধরণের সৌন্দর্য জীবনে আর এক বার মাত্র দেখিয়াছি—একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ের মধ্যে। বোটানিক্যাল গার্ডেন্সের একটা লেকের ধারে সে, এক জন আয়া আর একটা ছোট মেয়ে বসিয়াছিল, বোধ হয় তাহার ভগ্নী।... আমার খেয়াল হইল যখন ছোট মেয়েটা বলিল—"Look, Kate, the Babu is staring at you" (কেট্, দেখ, বাবুটি তোমার পানে হাঁ ক'রে চেয়ে রয়েছে)। আমি অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম, কিন্তু লক্ষ্য করিলাম কেট্ অপ্রস্তুত বা বিস্মিত কিছুই হইল না। তাহার মানে, কেট্ এতে অভ্যস্ত—লোকে তাহার দিকে এক বার চাহিলে যে চাহিয়া থাকিবেই—কেটের এটা গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে।

অবশ্য আমি নিতান্ত আত্মবিস্মৃত হইয়া সরমার দিকে চাহিয়া থাকি নাই। বাহাদুরি লইতেছি না; সৌন্দর্য যে আপনাকে এবং আর সবাইকে আকৃষ্ট করে আমাকে তাহার চেয়ে কিছু কম করে না; তবে আমি সেই—"Look Kate, the Babu is staring at you"-এর পর থেকে অতিরিক্ত সাবধানে থাকি, সৌন্দর্যকেও বিশ্বাস করি না; চোখকেও নয়। তবুও আলাদা ছিলাম,

অভদ্রতার ততটা ভয় ছিল না, সরমার আশ্চর্য সৌন্দর্য দেখিলাম খানিকটা।

সরমার মাথায় এলো খোঁপা, চুলটা ঈষৎ কুঞ্চিত বলিয়া চিক্ চিক্ করিতেছে, বাঁকা কি সিধা কোন সিঁথিই নাই, চুলটা শুধু টানিয়া আঁচড়ান। মুখটা বেশ পুরন্ত। মুখের ভাবটা একটু ছেলেমানুষ-ছেলেমানুষ গোছের। রংটা খুব গৌর এবং একটু হলদেটে—অর্থাৎ রঙে রক্তাভা থাকিলে যে একটা উগ্রতা থাকে সেটা নাই। বিদ্যুৎও স্থির হইয়া গেলে এই রঙেই দাঁড়াইবে।

সরমার পরনে খুব হালকা কমলালেবুর রঙের একটা শাড়ী, সেই রঙেরই পুরা-হাতা ব্লাউস, কানে দুইটি ঝুমকা দুল, হাতে দুগাছি রুলি আর চার গাছি করিয়া আসমানি রঙের রেশমী চুড়ি।

সরমা অসামান্যা সুন্দরী, কিন্তু তাহার সৌন্দর্যের মধ্যে আরও যা অসামান্য তা তাহার শান্তি, যাহা প্রায় বিষাদের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে।...বিদ্যুৎ শুধু স্থির নয়, তাহার দাহও হারাইয়াছে।

অর্পণা দেবীও একটু আগাইয়া গিয়াছিলেন। মীরা হাসিতে হাসিতে সরমাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া বলিল, "এসেছে তোমার সরমা, মা; এই নাও।...মা হেদিয়ে উঠেছিলেন সরমাদি। ওঁর ভয় আমি তোমাকে কার্ড দিতেই ভুলে বসে আছি।"

সরমা লজ্জিত ভাবে একবার অর্পণা দেবীর পানে চাহিয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিল। অর্পণা দেবী তাহার মস্তকে হাত দিয়া হাতটা ধীরে ধীরে পিঠে নামাইয়া লইলেন; হাসিয়া বলিলেন, "আমার সরমাই তো, তোর হিংসে হয় নাকি?"

সরমা হাসিয়া অর্পণা দেবীর মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "এ কি রকম হ'ল কাকীমা? এদিকে বলছেন, 'আমার সরমাই তো', আবার ওদিকে ধ'রে রেখেছেন যে কার্ড না পেলে আসতাম না। আমার জোর রইল তাহ'লে কোথায়?"

আবার তিন জনেই এক সঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন। অর্পণা দেবী একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "বাঃ, কার্ড না দিলে আসবে না এ-কথা কেন বলব? বলছিলাম মীরার পদে পদে যা ভুল,—তোমার কার্ড বোধ হয় পাঠানই হয় নি। তোমার গুণের কথা চাপা দিচ্ছিলাম না, ওর দোষের কথা, ওর ভুলের কথা বলছিলাম।"

মীরা গম্ভীর হইয়া গেল, প্রশ্ন করিল, "সেইটেই কি ভুল হ'ত মা?"

অর্পণা দেবী তাহার পানে চাহিয়া বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "বা রে। কার্ড না দেওয়াটা ভুল হ'ত? কী যে বলে মীরা!"

মীরা আরও তর্কের ভঙ্গীতে বলিল, "বা—রে, হ'ত?—যে সরমা তোমার এত আপনার যে মীরারও হিংসে হচ্ছে বলছ, তাকে কার্ড পাঠানই কি ভুল হয় নি?"

সঙ্গে সঙ্গে গাম্ভীর্য ঠেলিয়া তাহার হাসি উছলিয়া উঠিল।

ওর গাম্ভীর্যের পিছনে এই কৌতুক লুকান ছিল দেখিয়া সরমা ও অর্পণা দেবীও হাসিয়া উঠিলেন। অর্পণা দেবী দুই জনের নিকটই পরাজয় স্বীকার করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা হয়েছে, ওদিকে চল একটু; তোমরা দু-জনেই সমান।"

মীরা একটু আবদারে হুকুমের সুরে বলিল, "বল—দু-জনেই তোমার সমান আপনার, অর্থাৎ সরমাদি আমার চেয়ে বেশী আপনার নয়।"

অর্পণা দেবী হাসিয়া বলিলেন, "দু-জনেই সমান দুষ্ট, এবং আপনার।...এস সরমা।"

ঘুরিতেই অল্প দূরেই আমায় দেখিলেন। আমি তখন অন্য দিকে চোখ-কান যে নাই আমার সেইটা প্রমাণ করিবার জন্য খুব মনোযোগের সহিত কেট্‌লি হইতে চা ঢালিতেছি। অর্পণা দেবী কাছে আসিয়া বলিলেন, "তুমি বড় একলা পড়ে গেছ তো শৈলেন। নতুন মানুষ..."

মীরা বলিল, "আমাদের সঙ্গে ঘুরে ফিরে একটু জানাশোনা করে নিন্ না মা।" একটু হাসিয়া বলিল, "কিন্তু যা একলষেঁড়ে মানুষ!"

অর্পণা দেবী একটু হাসিলেন, বলিলেন, "তা বেশ তো। কিন্তু দাঁড়াও আগে তোমাদের পরিচয়টা করিয়ে

দিই।...এটি আমাদের তরুর নতুন মাষ্টার। এ সরমা, এ হচ্ছে..."

অর্পণা দেবী হঠাৎ থামিয়া গেলেন; কি যেন একটা প্রবল কুণ্ঠা আসিয়া গেল মাঝখানেই। সরমাও একটু রাঙিয়া উঠিল।

অর্পণা দেবী কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন, "এমন চমৎকার মেয়ে দেখা যায় না, শৈলেন।"

সরমা আবার একটু রাঙিয়া উঠিল, তাহার পর আমায় নমস্কার করিয়া হাসিয়া বলিল, "এমন চমৎকার কাকীমা দেখা যায় না শৈলেনবাবু, মিছিমিছি এত প্রশংসা করতে পারেন!"

আবার সবাই হাসিয়া উঠিলাম।

আমি উত্তর করিলাম, "যোগ্যের প্রশংসায় মস্ত বড় একটা আনন্দ আছে কি না, সরমা দেবী।"

সরমা সেই ভাবেই বলিল, "শুনলেন—বললাম মিছিমিছি প্রশংসা করেন।"

আমি বললাম, "ঐটেই তো যোগ্যতার চিহ্ন।—আপনি যোগ্য বলেই তো মনে করেন, আপনাকে যে প্রশংসাগুলো করা হয় সেগুলো আপনার প্রাপ্য নয়; যে অযোগ্য সে মনে করবে তার মত প্রশংসার পাত্র জগতে বিরল, কিন্তু লোকে তার প্রাপ্য চুকিয়ে দিলে না।... যা শূন্যগর্ভ তাই তো ভরে ওঠবার জন্যে হাহাকার করতে থাকে।"

যাহাকে ভালবাসা যায় সে কাছে থাকিলে একটা তৃতীয় নয়ন খোলে মানুষের। মীরার প্রথম কথায় আমরা সকলেই যখন হাসিলাম, আমার যেন মনে হইল মীরার হাসিটা ওরই মধ্যে একটু নিষ্প্রভ, অন্তত মীরার কথা যে অল্প হইয়া গেছে এটা তো বেশই স্পষ্ট।...অবাধ্য ভাবেই যেন চক্ষু গিয়া মীরার উপর পড়িল, সেই মুহূর্তেই আবার সরাইয়া লইলাম। মীরার বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ; তাহার তৃতীয় নয়ন আমার চেয়েও শতগুণে জাগ্রত;—ঐটুকুতেই সে বুঝিল সে ধরা পড়িয়া গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গেই সতর্ক হইয়া গেল।

[ক্রমশঃ

রাতজাগা পাখী

শ্রীকানাই সামন্ত

কবি নই, রাতজাগা পাখী
নিষুপ্ত ভুবনে জেগে থাকি।
একা আমি।
নির্নিমেষ দৃষ্টি অনুগামী
পরিক্রমাপর সপ্তর্ষির।
নীরব নিস্তব্ধ যামিনীর
হৃদয়ে কখনো ডানা মেলি
পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে চাঁদের চামেলি
যখন কৌমুদী-দলে
ঢাকে জলে স্থলে।...
কভু কারে ডাকি।...
আমি এক রাতজাগা পাখী।

নব্য বাংলার সাধনা

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

একটা পচা নোংরা জগতে আমরা বাস করছি। এখানে সব-কিছুই সমাদর পাচ্ছে—আদর নেই শুধু মানুষের জীবনের। বড়ো বড়ো কল-কারখানা আকাশে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে—কিন্তু দিনান্তে যারা বেরিয়ে আসে তাদের জঠর থেকে তাদের সঙ্গে মানুষের চেয়ে প্রেতের সাদৃশ্যই বেশী। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গগনচুম্বী মন্দির—বিচিত্র তাদের কারুকার্য্য—জগৎজোড়া তাদের খ্যাতি—কর্ণবিদারী ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে দেবতার পূজা চলেছে ষোড়শোপচারে—মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে অস্পৃশ্য নরনারীর দল—দেবালয়ে প্রবেশ করবার অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত! রাষ্ট্রের স্পর্দ্ধা বাড়তে বাড়তে শেষ পর্য্যন্ত আকাশকে ছোঁয়ার উপক্রম করেছে—কিন্তু রাষ্ট্রের মানুষগুলো পরিণত হয়েছে যমের আহার্য্যে। একজন হিটলার, একজন মুসোলিনী হুকুম দেয় আর মৃত্যুর দিগন্তব্যাপী তাণ্ডব নৃত্য সুরু হয়ে যায়। দাউ দাউ ক'রে জ্বলে ওঠে যুদ্ধের দাবানল আর সেই দাবানলে বিনষ্ট হয় হাজার হাজার মানুষের জীবন। যারা বাঁচে তাদের অনেকে বিকলাঙ্গের অভিশপ্ত জীবন বহন করে। সৈনিকদলে যাদের নাম নেই মৃত্যু তাদেরও অব্যাহতি দেয় না। রাতের আকাশে নিশাচর পক্ষীর মতো আসে উড়োজাহাজের দল, সুরু হয় বোমাবৃষ্টি, ধূলিসাৎ হয়ে যায় অট্টালিকার পর অট্টালিকা, নারীর এবং শিশুর মৃতদেহে আচ্ছন্ন হয় নগরীর রাজপথ। জাতির বিরুদ্ধে জাতির মনে সঞ্চিত হয়ে ওঠে ঘৃণা আর বিদ্বেষ। যুদ্ধ একদা থামে কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে ঘৃণা আর বিদ্বেষ থেকেই যায়। হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিহিংসা ফুটন্ত জলের মত টগবগ করতে থাকে। শান্তি একটা প্রহসন হয়ে দাঁড়ায়। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে দলিত, মথিত ক'রে ছুটে চলেছে রাষ্ট্রের অভ্রভেদী রথ। কত হৃদয়ের কত আশা, কত স্বপ্ন যে চাকার তলায় গুঁড়িয়ে ধূলিসাৎ হয়ে গেল—রাষ্ট্রের সেদিকে দৃষ্টি দেবার সময় কই? প্রতিষ্ঠানের পর প্রতিষ্ঠান। সমাজ-জীবনের এক-এক রকমের প্রয়োজন এক-এক রকমের প্রতিষ্ঠানকে তৈরি করেছে। কিন্তু জীবনের দাবীকে ছাড়িয়ে গেছে প্রতিষ্ঠানের দাবী—শাঁসের চেয়ে খোলা হয়ে পড়েছে অধিকতর মূল্যবান। জীবনের দাবীকে অস্বীকার করলে আইন যে কত নিষ্ঠুর হ'তে পারে তারই ছবি ভিক্টর হুগো এঁকেছেন তাঁর অমর উপন্যাস লে মিজারেবলে। দারিদ্র্যের তাড়নায় বাধ্য হয়ে জাঁ ভলজাঁ রুটি চুরি করেছে। কঠিন দণ্ডে সে দণ্ডিত হ'ল। অপরাধীর লাঞ্ছিত জীবনের ভার বহন ক'রে চলেছে সে। পুলিস কিছুতেই তার পিছু ছাড়ে না। পাদ্রীর কৃপায় পলাতক আসামীর জীবন রূপান্তরিত হয়ে গেল—জাঁ ভলজাঁ হয়ে দাঁড়াল একজন আদর্শ নাগরিক। কিন্তু আইন তাকে কিছুতেই অব্যাহতি দেবে না—তার চোখে সে মানুষ নয়—একজন পলাতক আসামী মাত্র—সে যে রুটি চুরি করেছিল। জাভেয়ারের চোখে জাঁ ভলজাঁ শুধু একজন চোর। জাভেয়ার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পুলিস-কর্ম্মচারী। কর্ত্তব্য ছাড়া আর কিছু সে বোঝে না—পুলিসের কর্ত্তব্য চোর ধরা, অতএব জাঁ ভলজাঁকে সে তো কিছুতেই মুক্তি দিতে পারে না! মানুষ হিসাবে আসামী যে কত বড়ো, তার পরিচয় সে পেয়েছে; তার হৃদয়ের বিশালতা জাভেয়ারের প্রাণকে নাড়া দিয়েছে; সে হঠাৎ অন্তরে একটা ধাক্কা পেল। জাঁ ভলজাঁকে গ্রেপ্তার করা কি কর্ত্তব্য হিসাবে সত্য সত্যই অপরিহার্য্য? আইনের কবল থেকে মুক্ত হবার কি কোনো অধিকার নেই তার? কিন্তু তাকে ছেড়ে দিলে যে বে-আইনী কাজ করা হয়। জাভেয়ার বে-আইনী কাজ করবে কেমন ক'রে? অন্তরের এই দ্বন্দ্বের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে জাভেয়ার আত্মহত্যা করেছে। আইনের মর্য্যাদার চেয়ে মানুষের

জীবনের মর্য্যাদা যে অনেক বেশী, অন্ধকারের মধ্যে আইনের চক্র আবর্ত্তিত হচ্ছে আর সেই চক্রে মানুষের জীবন যে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাচ্ছে—এই কথাটাই ভিক্টর হুগো ব্যক্ত করেছেন তাঁর অমর লেখনীকে অবলম্বন ক'রে।

নয়া জগতের পত্তন করেছেন যাঁরা দিগ্‌দিগন্তে নূতন আদর্শের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিয়ে তাঁরা মানুষকেই দিয়েছেন সকলের চেয়ে বেশী মর্য্যাদা। তাঁরা শাস্ত্রকে, সমাজকে, রাষ্ট্রকে তাদের ন্যায্য মর্য্যাদা দান করতে ত্রুটি করেন নি—কিন্তু বজ্রকণ্ঠে এই কথাই দিকে দিকে ঘোষণা করেছেন, তোমার আমার জন্যই রাষ্ট্র—রাষ্ট্রের জন্য আমরা নই; তোমার আমার জন্যই সমাজ—সমাজের জন্য আমরা নই; তোমাকে, আমাকে, মানুষকে যা অবজ্ঞা করে তার দাম কানাকড়িও নয়। ইবসেনের নোরা যেখানে বলেছে, Before all else I am a reasonable human being—সেখানে সামাজিক অনুশাসনের চেয়ে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে মানুষের জীবন। ইবসেনের শিষ্য বার্ণার্ড শ'য়ের লেখাতেও মানুষেরই বন্দনা-গান। শ'য়ের কণ্ঠে সাম্যবাদের ডমরুধ্বনি, কারণ ধনী আর দরিদ্রের আয়ের বৈষম্য কোটি কোটি মানুষের জীবনকে দৈন্যের মধ্যে পঙ্গু ক'রে রেখেছে। যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অগণিত মানুষের আত্মপ্রকাশের পথ দারিদ্র্যের জগদ্দল পাথরে অবরুদ্ধ হয়ে আছে—তার অবসানের জন্যই মার্ক্স, লেনিন, রাস্কিন, কার্পেণ্টার, ক্রোপটকিন থেকে আরম্ভ ক'রে রাসেল, লাস্কি, শ', গান্ধী, জওহরলাল—সকলেরই কণ্ঠে বেজে উঠেছে বিপ্লবের অগ্নিবাণী।

The sum of all known reverence I add up in you
 who-ever you are,
The President is there in the White House for you,
 it is not you who are here for him,
The Secretaries act in their bureaus for you, not you
 here for them,
The Congress convenes every Twelfth-month for you,
Laws, courts, the forming of States, the Charters of
 Cities, the going and coming of commerce and
 mails, are all for you.

ওয়াল্ট হুইটম্যানের এই কয়েকটি লাইনের মধ্যে গণতন্ত্রের জয়গান। এই গণতন্ত্রেরই জয়ধ্বজা উড়ছে নবজগতের তোরণদ্বারের শিখরদেশে। নবযুগের যাঁরা মহামানব তাঁরা আমাদের কানে শোনালেন, "মানুষকে শোষণ কোরো না—কারণ মানুষের জীবন মূল্যবান। যারা মানুষকে শোষণ করে তাদের স্থান রক্তশোষা মাছ আর মশকের পর্য্যায়ে। নূতন যুগের মানুষ মানুষকে শোষণ করবে না। তারা মানুষের সেবা করবে, ন্যায়ের পূজারী হবে।" রাস্কিন লিখলেন, "অন্য মানুষের রক্তে পুষ্ট যে আনন্দের জীবন তা মশা আর রক্ত-শোষা মাছের পক্ষে ভালো, মানুষের পক্ষে নয়; নিষ্কর্ম্মার জীবন যাপন করে যারা তাদের দিনগুলি কখনোও নিষ্কলঙ্ক হ'তে পারে না। দিবসের প্রথমে সব চেয়ে বড়ো প্রার্থনা হচ্ছে—একটি মুহূর্ত্তও যেন আলস্যে নষ্ট না করি; ভোজনের পূর্ব্বে ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা জানানোর শ্রেষ্ঠ মন্ত্র হচ্ছে, ন্যায়ের পথে আমাদের আহার্য্য আমরা অর্জ্জন করেছি—এই চেতনা।"

রাস্কিনের সমসাময়িক শিক্ষিত-সমাজের কর্ণকুহরে যে কথাটি তিনি প্রবেশ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন এক কথায় সেটি হচ্ছে, you are a parcel of thieves। তবুও যে তারা রাস্কিনের জন্য ফাঁসির কোনো ব্যবস্থা করে নি তার কারণ তারা এ-কথা ভাবতে পারে নি যে লোকটা যা বলছে সে তার মর্ম্মের কথা।

আমাদের দেশের বঙ্কিমচন্দ্রকেও তাঁর সমসাময়িক শিক্ষিত-সমাজ যে জেলে পাঠানোর উদ্যোগ করেনি তার কারণও, বোধ হয়, তাঁর কথার গুরুত্ব তারা তেমন ক'রে উপলব্ধি করতে পারে নি। মানুষ মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করছে—এই দৃশ্য রাস্কিনের জীবনে ঘটাল রূপান্তর। আর্টের সমালোচক রাস্কিন সমাজকে ন্যায়ের ভিত্তিতে নূতন ক'রে গড়ে তুলবার জন্য অর্থনীতির এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে নব আদর্শের জয়ধ্বজা উড়িয়ে দেখা দিলেন বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারার প্রচারকরূপে। যাঁরা তাঁর The Crown of Wild Olive অথবা Unto This Last পড়েছেন তাঁরাই জানেন রাস্কিনের লেখার মধ্যে বিপ্লবের বহ্নিশিখা। বার্ণাড শ' লিখেছেন, Generally the Ruskinite is the most thoroughgoing of the opponents of our existing state of society। অর্থাৎ রাস্কিনের শিষ্য যাঁরা তাঁরাই হচ্ছেন আমাদের

বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু। আমরা জানি গান্ধীজী রাস্কিনের একজন অনুরাগী ভক্ত। গুজরাটীতে তিনি তাঁর লেখার অনুবাদও করেন।

মানুষের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুর আচরণ বঙ্কিমেরও সাহিত্য-জীবনে এনেছে রূপান্তর। সমাজকে ন্যায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সর্ব্বপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধে তাঁরও লেখনী অগ্নি উদ্গীরণ করেছে। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আছে :

"জীবের শত্রু জীব, মনুষ্যের শত্রু মানুষ, বাঙালী কৃষকের শত্রু বাঙালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তু-গণকে ভক্ষণ করে। রোহিতাদি বৃহৎ মৎস সফরীদিগকে ভক্ষণ করে। জমীদার নামক বড়মানুষ কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে।"

দিগন্তব্যাপী এই শোষণের মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য ঔপন্যাসিক বঙ্কিমকে রূপান্তরিত করল বিপ্লবী বঙ্কিমে। তাঁর অগ্নিবর্ষী লেখনী থেকে বেরিয়ে এল আনন্দমঠ, কৃষ্ণ-চরিত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম, রাজসিংহ। জন্মভূমিকে নূতন মহিমায় দেখবার জন্য নূতন আদর্শ প্রচারে তিনি ব্রতী হলেন আর এই নূতন আদর্শ হ'ল স্বাধীনতার আদর্শ আর সাম্যের আদর্শ। তাঁর ধ্যানের ভারতবর্ষের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে কৃষক। স্বাধীন ভারত-বর্ষ যদি সাত লক্ষ গ্রামের কোটি কোটি কৃষকের কুটীরে অন্নের প্রাচুর্য্য না আনে, তাকে অভিনন্দন জানাতে তিনি একেবারেই প্রস্তুত নন। রেলপথের বিস্তার, টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোনের প্রচলন, রেডিয়োর এবং সিনেমার আবির্ভাব, নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন, বড়ো বড়ো অট্টালিকায় নানাবিধ উপকরণের প্রাচুর্য্য, প্রশস্ত রাজপথে যানবাহনের চলাচল এবং জনতার প্রবাহ, স্থানে স্থানে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের অস্তিত্ব— আধুনিক সভ্যতার এই সব বিচিত্র উপাদানের প্রাচুর্য্যকে আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ যখন দেশের মঙ্গল ব'লে ভুল বুঝছিল তখন বঙ্কিমচন্দ্র এসে তাঁর মোহগ্রস্ত স্বদেশকে আহ্বান ক'রে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন,

"এই মঙ্গলের ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল? হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে খালি পায়ে এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটি অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট বলদে ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের মঙ্গল হইয়াছে?"

তার পর নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বজ্রগর্জ্জনে উচ্চারণ করলেন এমন একটি বাণী যা চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে রইল তরুণ ভারতবর্ষের মর্ম্মের প্রতিটি শিরার সঙ্গে। বঙ্কিম বললেন,

আমি বলি, অণুমাত্র না, কণামাত্রও না। তাহা যদি না হইল, তাহা হইলে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না। দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি? কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয় জন? আর এই কৃষিজীবী কয় জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয় জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। * * * সেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোনো মঙ্গল নাই।

বঙ্কিমের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হ'ল গণতন্ত্রের জয়-ধ্বনি। সভ্যতার বাহিরের উপকরণ-বাহুল্যের উপরে আমরা জোর দিয়েছিলাম বেশী ক'রে—আমাদের মতো মুষ্টিমেয় শিক্ষিত যারা তাদের স্বার্থকে দেশের মঙ্গলের সঙ্গে এক ক'রে দেখছিলাম। দেশের কোটি কোটি সর্ব্বহারা কৃষকের মধ্যে আমাদের চেতনাকে পরিব্যাপ্ত ক'রে দেবার মতো চিত্তের বিশালতা আমাদের ছিল না। তাদের কল্যাণকে আমরা গণনার মধ্যে আনি নি, তাদের জীবনকে আমরা দান করতে শিখি নি কোনো মর্য্যাদা। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিমার মধ্যে আনলেন আমূল পরিবর্ত্তন। তিনি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরলেন হাসিম শেখের এবং রামা কৈবর্ত্তের অস্থিচর্ম্মসার মূর্ত্তি, তাদের মঙ্গলকে দেশের মঙ্গল ব'লে দিকে দিকে ঘোষণা করলেন। সভ্যতার সহস্র সরঞ্জামকে দূরে সরিয়ে রেখে ভারতের লক্ষ লক্ষ নর-কঙ্কালের ধূলিধূসরিত পায়ে বঙ্কিম রাখলেন তাঁর প্রাণের প্রণতি।

কেশবচন্দ্রের লেখাতেও মানুষের জয়গান। কেশবের সুলভসমাচারে ও ধর্ম্মতত্ত্বে তাঁর সমাজতান্ত্রিক(socialistic) মত প্রকাশ পেয়েছিল। ১২৭৮ সালের ৩১শে শ্রাবণের সুলভসমাচারে তিনি লিখেছিলেন :

"আমাদের পাঠকগণ, যাহারা তোমাদের মধ্যে রেওত বা কারিগর আছ, সকলে একত্র হইয়া এক বার গা তুলো। তোমাদের যাতে ভাল হয়, তোমরা যাহাতে দৌরাত্ম্য, নিষ্ঠুরতা, প্রজাপীড়ন বলপূর্ব্বক থামাইতে পার, ইহাতে একান্ত যত্ন কর।··· তোমরা আর নিদ্রা যাইও না। সময় হইয়াছে, উঠ। দেখ তোমাদের হইয়া বলে এমন লোক নাই। রাজপুরুষেরা তোমাদের কথা শুনিতে পান না, বড় মানুষেরা তোমাদিগকে গ্রাহ্য করে না। এরূপ অপমান কি তোমরা চিরকাল সহ্য করিবে? তোমরা কি মানুষ নও? পরমেশ্বর কি জ্ঞান বুদ্ধি দিয়া তোমাদিগকে সৃষ্টি করেন নাই? তবে কেন অজ্ঞান-নিদ্রায় পড়িয়া আছ? তোমরাই এ দেশের বড় লোক, তোমরা না থাকিলে দেশ ছারখার হইবে, তাহা কি জান না?"

১৭৯৪ শকের ১৬ই মাঘের ধর্ম্মতত্ত্বে তিনি বলছেন,

"এদেশের দুই পাঁচটি ধনী মানী এবং জ্ঞানীর উপর দেশের মঙ্গল নির্ভর করে না, কিন্তু সামান্য লোকদিগের উপর। দোকানদার না থাকিলে কি সহর এক দিন চলিতে পারে? চাষা না থাকিলে কি কেহ এক দিন বাঁচিতে পারে? এ সকল গরিব দুঃখী চাষা দোকানদার যত দিন গরিব দুঃখী থাকিবে, যত দিন তাহাদের দুরবস্থা দূর না হয়, তত দিন এদেশের মঙ্গল নাই।"

তারপর এলেন বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। তাঁর কণ্ঠে বঙ্কিমেরই প্রতিধ্বনি। মূর্খ যারা, অজ্ঞ যারা, চণ্ডাল আর মেথর ব'লে যাদের আমরা ঘৃণাভরে দূরে রেখে দিয়েছি অনাদরের ধুলায়, বিবেকানন্দের প্রণতি পৌঁছেছে তাদেরই ধূলিমলিন নগ্নপায়ে। যারা ক্ষুধায় কাতর, অজ্ঞতায় পঙ্গু, ভীরুতায় ক্লীব, সহস্রের পদতলে নিত্য নিষ্পেষিত—তাদের সেবায় আত্মনিয়োগের বাণীই বিবেকানন্দের বাণী। তিনি সবাইকে ডাক দিয়ে বললেন,

"হে ভাবী সংস্কারকগণ, হে ভাবী স্বদেশ-হিতৈষিগণ! তোমরা হৃদয়বান হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধর পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ যে কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে এবং কোটি কোটি ব্যক্তি শত শত শতাব্দী ধরিয়া অর্দ্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারতগগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এই সকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে?

এখানেও সেই রামা কৈবর্ত্তের এবং হাসিম শেখের মঙ্গলের কথা। যারা অনাদৃত, যারা অস্পৃশ্য, যারা মানুষের অধিকার থেকে সকল দিক দিয়ে বঞ্চিত, যারা দারিদ্র্যে পঙ্গু তাদেরই কল্যাণ-কামনাকে অন্তরের আকাশে ধ্রুবতারা ক'রে জ্বালিয়ে রাখবার মন্ত্র বিবেকানন্দের মন্ত্র। মানুষকে দিলেন তিনি সকলের চেয়ে উচ্চ আসন। দরিদ্রকে নারায়ণ জ্ঞানে পূজা করবার যে দীক্ষা—সেই দীক্ষায় নূতন ভারতকে দীক্ষিত করলেন বিবেকানন্দ।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বঙ্কিমের এবং বিবেকানন্দের বাণীর সুর। যারা অস্পৃশ্য, অপমানিত, বুভুক্ষু, যারা বঞ্চিত হয়েছে মানুষের অধিকার থেকে তাহাদিগকে মানুষের মর্য্যাদা দেবার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে কবির কণ্ঠে। লক্ষ লক্ষ মানুষের দুঃখভার লাঘব করবার চেষ্টায় উদাসীন থেকে কর্ম্মের দাবীতে কর্ণপাত না ক'রে যারা রুদ্ধদ্বার দেবালয়ের কোণে ভগবানের অনুগ্রহ লাভের জন্য আরাধনা করছে—ভগবান যে তাদের কাছ থেকে অনেক দূরে—এই কথাই বললেন রবীন্দ্রনাথ।

"তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ,—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারোমাস।"

বিবেকানন্দ যেমন তরুণ ভারতবর্ষকে আহ্বান করেছেন কর্ম্মসাগরে ঝাঁপ দিয়ে জনসাধারণের সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে রবীন্দ্রনাথও ঠিক তাই করেছেন।

"রাখো রে ধ্যান, থাক্ রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলাবালি,
কর্ম্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে,
ঘর্ম্ম পড়ুক ঝরে।"

He was energy personified, and action was his message to men—এই কথা রল্যাঁ লিখেছেন বিবেকানন্দ সম্পর্কে। শান্তিনিকেতনের এবং শ্রীনিকেতনের স্রষ্টা কর্ম্মবীর যে রবীন্দ্রনাথ, যাঁর তপস্যার আসন বোলপুরের অবারিত প্রান্তরে, তাঁর সম্পর্কেও কি এই মন্তব্য প্রযোজ্য হ'তে পারে না?

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা—
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা—"

তরুণ ভারতের কর্ণে এই জনসেবার উদ্দীপ্ত আহ্বান রবীন্দ্রনাথের আহ্বান। 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান'—এই বিখ্যাত কবিতাটিতে ধ্বনিত হয়েছে অস্পৃশ্যতাকে বিলুপ্ত ক'রে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলিত হবার তূর্য্যধ্বনি। কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ সবাই সগোত্র। সকলের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছে একই সুর—"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"—এই সুর। প্রত্যেকটি মানুষকে পূর্ণতার মধ্যে মুক্ত করবার সাধনাই কেশবের সাধনা, বঙ্কিমের সাধনা, বিবেকানন্দের সাধনা, রবীন্দ্রনাথের সাধনা, নব্য বাংলার অর্দ্ধশতাব্দীর সাধনা। গান্ধীজী এই সাধনারই উত্তরসাধক। যেখানে তিনি বলেছেন—

I am not interested in an order which leaves out the meanest—the blind, the halt and the maimed. My Swaraj is even for the least in the land."

সেখানে তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে সেই বাণী যা কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ বারম্বার উচ্চারণ করেছেন নব্য ভারতের কর্ণে।

"সকলের অধম যে—তাকে ঠাঁই দেয় না যে সমাজ-ব্যবস্থা, যে সমাজ-ব্যবস্থায় অন্ধ, খঞ্জ এবং বিকলাঙ্গের দল পরিত্যক্ত, তার প্রতি কোনোই লোভ নেই আমার। দেশের মধ্যে দীনের থেকে যে দীন—আমার স্বরাজে তারও আসন আছে।"

গান্ধীজীর যে বাণী উপরে উদ্ধৃত হয়েছে, এই হচ্ছে তার বাংলা অনুবাদ আর এই অনুবাদের মধ্যে আমরা শুনতে পাই রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি:

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে,
সবার পিছে, সবার নীচে,
সবহারাদের মাঝে।"

"I know that in every fibre of my being I am also one of them. Without them I am nothing. I do not want to exist.

গান্ধীজীর এই যে বাণী এর অনুবাদ করলে দাঁড়ায়,
"আমি জানি যে আমার প্রত্যেকটি শিরায় আমি জন-সাধারণেরই একজন। তাদের বাদ দিলে আমি মিথ্যা হয়ে যাই। তাদের অস্বীকার ক'রে আমি বাঁচতে চাই নে।"

এর মধ্যে আমরা প্রতিধ্বনি শুনতে পাই বিবেকানন্দের সেই বাণীর যেখানে তিনি পঞ্চাশ বছরের জন্য আর-সব দেবতাকে সরিয়ে রেখে সহস্র সহস্র দরিদ্রনারায়ণ-রূপে যে জীবন্ত দেবতা বিচরণ করছেন আমাদের চারিপাশে—তাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে বলেছেন আমাদের মর্ম্মের বেদীতে। বিবেকানন্দের এই বাণীর উপরে মন্তব্য করতে গিয়ে রলাঁ্যা লিখেছেন স্বামীজীর জীবনচরিতে,

"If the generation that followed, saw, three years after Vivekananda's death, the revolt of Bengal, the prelude to the great movement of Tilak and Gandhi, if India to-day has definitely taken part in the collective action of organised masses, it is due to the initial shock, to the mighty "Lazarus, come forth!" of the Message from Madras."

"বিবেকানন্দের পরে যারা এল তারা দেখল তাঁর মৃত্যুর তিন বৎসর পরে বিপ্লব এল বাংলায়। বাংলার এই বিপ্লব তিলকের এবং গান্ধীর বিরাট আন্দোলনের পূর্ব্বাভাষ। বাংলায় বিপ্লব যে সম্ভব হ'ল, আজ যে ভারতবর্ষ সংঘবদ্ধ জনসাধারণকে নিয়ে একযোগে কাজ করতে সমর্থ হয়েছে, এর মূলে স্বামীজীর মাদ্রাজের সেই বাণী, 'ঘুমন্ত ভারতবর্ষ, জাগো।'

আত্মবিস্মৃত হতভাগ্য বাঙালী আজ জানুক—ভারতবর্ষকে সে কি দান করেছে—তার রামমোহন কেশবচন্দ্র, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ নব্য ভারতের কানে কোন্ কথা শুনিয়েছেন। আজ যদি তার জীবনের গাঙে সত্যসত্যই ভাটা এসে থাকে, নিরাশ হবার কোনো কারণ নেই। এত বড়ো বড়ো দিকপাল মহারথীদের সৃষ্টি ক'রে বাংলা আজ অবসাদে আচ্ছন্ন। তার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির তেজ সুদীর্ঘকাল ধরে নব নব ক্ষেত্রে আপনাকে প্রকাশ ক'রে আজ ক্লান্তিতে অভিভূত হয়ে পড়েছে। তাই তার চোখে আজ ঘুমের জড়িমা। এই ঘুমের শেষে নবগৌরবে সে আবার জাগ্‌বে। সেই জাগরণের স্বর্ণ-উষায় পুনরায় সুরু হবে তার জীবনের সকল ক্ষেত্রে নব নব ফসল ফলাবার পালা। সেই জ্যোতির্ম্ময় প্রভাত কত দূরে? কত দূরে?

ভারতবর্ষে রসায়ন-শিল্প

শ্রীসুনীলবিহারী সেনগুপ্ত, ডি. এসসি.

১৯১৪ সনে যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ নানা রকম পণ্যদ্রব্যের জন্য বিদেশের উপর কতখানি নির্ভরশীল ছিল তাহা বুঝা গিয়াছিল। সব রকম প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ, রং প্রভৃতির আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কাপড়ের দাম এত বৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে গরীব লোকেরা পুরাতন শতছিন্ন ন্যাকড়া পরিয়া কোন রকমে লজ্জা নিবারণ করিত। ইউরোপে পুনরায় যুদ্ধ লাগিয়াছে। এ-যুদ্ধ কত দিন স্থায়ী হয় তাহার কোন স্থিরতা নাই। যুদ্ধে ব্যস্ত জাতিরা তিন-চারি বৎসরের জন্য প্রস্তুত হইয়া এই যুদ্ধে নামিয়াছেন। বিদেশজাত পণ্যদ্রব্যের আমদানী বন্ধ হওয়ায় এবং মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতবর্ষে সমস্ত জিনিসের দাম ইতিমধ্যে বাড়িয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত কি সঙ্কটময় অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয় তাহা কেহ বলিতে পারে না।

ভারতবর্ষ হইতে ১৬০ কোটি টাকার মাল বিদেশে রপ্তানি হয়। ইহার মধ্যে শতকরা ৯৯ ভাগই হইতেছে কাঁচা মাল। বিদেশ হইতে আমদানী হয় প্রায় ১৩০ কোটি টাকার মাল; তাহার মধ্যে বেশীর ভাগই হইতেছে রসায়ন-শিল্পজাত পদার্থ। ভারতবর্ষ হইতে যে কাঁচামাল বিদেশে চলিয়া যায় সেইগুলি নানারকম নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যে ও বিলাসিতার উপকরণে পরিণত হইয়া আমাদের দেশেই উচ্চমূল্যে বিক্রী হইতেছে। প্রতি বৎসর বহু টাকা বিদেশে চলিয়া যাওয়ায় আমরা দিন দিনই দরিদ্র হইয়া পড়িতেছি। এই শোষণ বন্ধ করিতে হইলে আমাদের বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি করিতে হইবে। শিল্পোন্নতি ছাড়া বর্ত্তমান বেকার-সমস্যার সমাধানের কোন পথ নাই।

ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশের তুলনায় কত দরিদ্র তাহা এই তালিকাটি দেখিলেই বুঝা যাইবে।

	ইংলণ্ড	জাপান	ভারতবর্ষ
জন প্রতি গড়পড়তা বৈদ্যুতিক শক্তি খরচ হয়	৪৫০	৩৪০	৮
কয়লা (টন) খরচ জনপ্রতি	৪.৯৩	·৭	·০৬
লোহা (টন) খরচ জনপ্রতি	·২৮	—	·০০৭

দেশী শিল্পের প্রথম সূত্রপাত হয় ১৯০৬ সনে—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়। তখন দেশপ্রীতির প্রেরণায় ছোটবড় নানারকম শিল্পপ্রতিষ্ঠান চারিদিকে গড়িয়া উঠে। তখন কাপড়ের কল, কালি, কলম, নিব, জাম, জেলী, জুতা, ট্রাঙ্ক, সুটকেশ, সাবান, তেল ইত্যাদি নানা রকম স্বদেশী জিনিস বাজারে দেখা গিয়াছিল। ইহার মধ্যে বেশীর ভাগ শিল্পপ্রতিষ্ঠান নষ্ট হইয়া গিয়াছে কিন্তু কতকগুলি আজও টিকিয়া আছে এবং দিন দিন উন্নতি করিতেছে। বর্ত্তমানে কাপড়, চিনি ও পশমের ব্যবসা যেরূপ আশাতীত সাফল্যের সহিত চলিতেছে তাহাতে মনে হয় যথেষ্ট সুযোগ পাইলে অন্যান্য শিল্পের উন্নতিও সম্ভব।

১৯৩১ সনের আদমসুমারী হইতে জানা যায় যে ভারতবর্ষের মোট লোকসংখ্যা ৩৩ কোটি ৮০ লক্ষ। এই বিশাল জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ·৪৮ ভাগ (১৬ লক্ষ লোক) নানারকম কলকারখানায় ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কাজ করিতেছে। ইহার মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই কাপড় ও পাটের কলে, কয়লার খনিতে এবং রেলওয়ে ও ট্রাম বিভাগে কাজ করে। ঠিক রাসায়নিক দ্রব্য বলিতে যাহা বুঝি যেমন সালফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড, ইত্যাদি তাহা প্রস্তুত

করিবার মত প্রতিষ্ঠান খুব কম। অথচ এগুলির চাহিদা আমাদের প্রচুর। নিম্নে একটি তালিকা দেওয়া গেল, ইহা হইতে কতটা রাসায়নিক দ্রব্য ভারতে প্রস্তুত হয় এবং কতটা আমরা বিদেশ হইতে আমদানী করি তাহার একটা আভাস পাওয়া যাইবে। তালিকাটি ১৯৩৭ সনের পরিসংখ্যানহইতে গৃহীত।

রাসায়নিক দ্রব্য	ভারতবর্ষে বার্ষিক উৎপাদন (টন)	বার্ষিক আমদানী (টন)
সালফিউরিক এসিড	২৮,০০০	২৯০
নাইটি ক এসিড	৪৮০	৩০০
হাইড্রোক্লোরিক এসিড	৩৪০	৮০
এলুমিনিয়াম সাল্‌ফেট্‌ ও ফটকিরি	৮,৯৪০	৪,১৫০
সোডিয়াম সাল্‌ফেট্‌	১,০৫০	২,৫৩০
সোডিয়াম্‌ সাল্‌ফাইড্‌	০	৪,১১০
ম্যাগ্নোসিয়ম্‌ সাল্‌ফেট	৩,০৬০	৭২০
তুঁতে	০	২,৮৪০
আয়রন সাল্‌ফেট	৪৮০	৮০
এমোনিয়াম সাল্‌ফেট	১২,০০০	৪৮,১০০
ম্যাগ্নেসিয়ম ক্লোরাইড	?	৯০০
জিঙ্ক ক্লোরাইড	০	২,৮৫০
এমোনিয়াম ক্লোরাইড	০	২, ৫০০
সোডা ছাই	০	১, ২২, ১০০
সোডিয়াম বাইকার্বোনেট	০	১১, ২৫০
কষ্টিক সোডা	১,৪৪০	৩৯, ৪০০
সোডিয়াম সিলিকেট	১,৭০০	২, ৬৩০
পটাসিয়ম নাইট্রেট	৭,০০০	
তরল ক্লোরিন	০	৩৪৫
ব্লিচিং পাউডার	২,৭৬০	১৭, ১৫০
ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড	০	১, ২৭৫
ক্যালসিয়ম কার্ব্বাইড	০	৪, ৩০০
এম্মোনিয়া	০	৯২
সোডিয়াম বাইক্রোমেট	০	৪২০
পটাসিয়ম বাইক্রোমেট	০	১, ৫০০
বোরাক্স	০	২, ৬৮০

শিল্পজগতে সালফিউরিক এসিড একটি অতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ। ইহা না হইলে অন্য কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে না। অন্যান্য এসিড এবং ধাতব লবণ তৈরী করিতে সালফিউরিক এসিডের দরকার হয়। বিদেশ হইতে ইহার আমদানী অন্য রাসায়নিক পদার্থের তুলনায় অনেক কম। ইহার কারণ দুইটি। প্রথমতঃ ইহা তৈরি করিতে খরচ অনেক কম—দ্বিতীয়তঃ ক্ষয়কর (corrosive) বলিয়া বিদেশ হইতে আনিতে অনেক খরচ হয়। সাধারণতঃ ভারতবর্ষে গন্ধক হইতে এই এসিড তৈরী হয়। ভারতবর্ষে গন্ধক থাকিতে পারে এমন কোন খনিজ দ্রব্য না থাকাতে, প্রায় সবটা গন্ধক বিদেশ হইতে আমদানী হয়। যুদ্ধের সময় বিদেশ হইতে গন্ধক আমদানী করা চলিবে না ; ফলে সালফিউরিক এসিড তৈরী করাও সম্ভব হইবে না এবং ভারতবর্ষে যত রসায়নশিল্প আছে তাহা বন্ধ হইবার উপক্রম হইবে। গন্ধকের জন্য আমাদের যথেষ্ট অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। ভারতের খনিজ সম্পদ কম নয়।

রসায়নশাস্ত্রে একটা কথা আছে, 'যে দেশ যত বেশী সালফিউরিক এসিড্ তৈরী করে, সে-দেশ শিল্প-বাণিজ্যে তত বেশী উন্নত।' সমগ্র পৃথিবীতে যে-পরিমাণ সালফিউরিক এসিড তৈরী হয় তাহার শতকরা মাত্র ·০০২৮ ভাগ ভারতবর্ষে তৈরী হয় অথচ ভারতবর্ষের জনসংখ্যা সমস্ত পৃথিবীর তুলনায় শতকরা ১৭ জন। ইহাতেই আমরা বুঝিতে পারি ভারতবর্ষে রসায়ন-শিল্পের প্রয়োজনীয়তা কতখানি।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষির জন্য বহু কৃত্রিম রাসায়নিক সার বিদেশ হইতে আমদানী হয়। ভারতের কৃষকেরা গরীব বলিয়া এবং অল্প অল্প জমি লইয়া কাজ করিতে হয় বলিয়া কৃত্রিম সার ব্যবহার করিতে পারে না। বেশীর ভাগ কৃত্রিম সার চা-বাগানে এবং ইক্ষুচাষে ব্যয় হয়। অনেকের ধারণা ভারতবর্ষে কৃত্রিম সারের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। তাঁহারা শুনিয়া হয়ত আশ্চর্য্য হইবেন যে ব্রহ্মদেশ ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে চাউল ও গম এখনও আমদানী হয়। কৃষির প্রসারকল্পে কৃত্রিম সারের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। নিম্নে একটি তালিকা দেওয়া হইল। ইহা হইতে কতটা সার আমরা

বিদেশ হইতে আমদানী করি তাহার একটা আভাস পাওয়া যাইবে।

সার	পরিমাণ (টন)	মূল্য (টাকা)
সোরা	৬,০০৫	২, ৯২, ৩৩৮
এমোনিয়াম সালফেট	৪৮, ১৩৬	৪৮, ২৪, ৪১৯
পটেসিয়াম ক্লোরাইড	২, ২২২	২, ২২, ২৯৪
অন্যান্য পটেসিয়ম লবণ	১, ১৩৭	১, ৩০, ৩৩০
সুপার ফসফেট	৭, ৭৬২	৫, ৬৮, ৭৪
অন্যান্য ফসফেট	৩, ১৮৯	৩, ৫২, ৪৭১
এমোনিয়াম ফসফেট	৩, ০৮১	৪, ৬৩, ৯৬৬

কৃত্রিম সারের জন্য পটেসিয়াম লবণ সস্তায় ও বহুল পরিমাণে যাহাতে তৈরী করা যায় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। হাড়ের রপ্তানি বন্ধ করিয়া ফস্‌ফেট সার তৈরী করিতে হইবে। কয়লা পুড়াইয়া কোকে (coke) পরিণত করিতে হইলে যে এমোনিয়া পাওয়া যায় তাহার সবটা এমোনিয়াম সালফেটে পরিণত করিতে হইবে। ১৯৩৭ সনের হিসাবে জানা যায় যে প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ টন কয়লা খনি হইতে উঠান হইয়াছে। যদি সবটা কয়লা হইতে এমোনিয়াম সালফেট তৈরী করা হইত তবে অন্ততঃ ২,০০,০০০ টন এমোনিয়াম সালফেট পাওয়া যাইত। বেশীর ভাগ কয়লা খরচ হয় রেলওয়ে ও লৌহশিল্পে। কলকারখানা চালাইতেও যথেষ্ট খরচ হয়। যেখানে ২ লক্ষ টন এমোনিয়াম সালফেট পাওয়া উচিত ছিল সেখানে মাত্র ১২,০০০ টন এমোনিয়াম সালফেট পাওয়া যাইতেছে এবং ৪৮,০০০ টন বিদেশ হইতে আমদানী করি। এই সব অপচয় নিবারণ করিবার জন্য গবেষণা করা প্রয়োজন।

প্রত্যেক জাতিই নিজ নিজ ইন্ধনের (fuel) যোগাড়ে সচেষ্ট। ভারতে একটি মাত্র তৈলখনি আছে আসামের ডিব্রুগড়ে। কয়লাও ভারতের পক্ষে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ নাই। দক্ষিণ-ভারতে আজ পর্য্যন্ত একটি কয়লার খনি আবিষ্কৃত হয় নাই। নরম কয়লা (soft coal) যাহাতে কেহ না পোড়ায় তাহার একটা বন্দোবস্ত হওয়া উচিত। কয়লা হইতে যে আলকাতরা, এমোনিয়া গ্যাস ও গন্ধক পাওয়া যায় তাহা যাহাতে সবটা রক্ষা করা যায় সেদিকে সচেষ্ট হওয়া উচিত। আলকাতরা যে কি মূল্যবান জিনিষ তাহা রসায়নশাস্ত্রের প্রত্যেকটি ছাত্র জানে।

দুঃখের বিষয় শুধু উৎপাদনে নয়, নানা রকম আধুনিক প্রক্রিয়া প্রবর্ত্তনে ভারতবর্ষ অনেক পশ্চাৎপদ। টাটার লৌহ-শিল্প শুধু আধুনিক প্রক্রিয়ানুসারে সালফিউরিক এসিড তৈরী করিয়া থাকে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সেই পুরাতন প্রক্রিয়াই (Lead chamber process) অবলম্বিত হয়। এদিকে আমাদের অনেক কিছু ভাবিবার ও করিবার আছে।

এসিডের পর আমাদের ক্ষার শিল্পের (Alkali Industry) প্রয়োজন। ক্ষারের জন্য আমাদের সর্ব্বতোভাবে বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। একমাত্র টিটাগড়ে কাগজের কারখানায় যাহা কিছু ক্ষারজাতীয় পদার্থ তৈরী হয় কিন্তু তাহা সবটা নিজেদের কাজেই দরকার হয়। কাপড় ও সাবানের কারখানায় এবং পেট্রোলিয়ম পরিশুদ্ধ করিতে যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষার আমাদের প্রয়োজন।

যেসব শিল্পে রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন সে-সব শিল্প সম্বন্ধে এখন আলোচিত হইবে। নিম্নে একটা তালিকা দেওয়া হইল; ইহাতে কতটা পণ্য আমাদের দেশে প্রস্তুত হয় এবং কতটা বিদেশ হইতে আমদানী হয় তাহার একটা আন্দাজ পাওয়া যাইবে।

আমদানী

পণ্য	ওজন (টন)	মূল্য (টাকা)	ভারতবর্ষে আট মাসের উৎপাদন (টন)
কাগজ	১,৮৭,০১২	৪,০০,৩১,৭৩৯	৪০,১২০
কাঁচ ও কাঁচের জিনিস	—	১,৫০,২৬,২০২	?
চিনি	১৬,৭৩৪	২০,৭৮,১৩৬	১,৭৯,৫২৮
রবার		২,০৯,০১,২২৪	?
কৃত্রিম রেশম		৫,৬৬,১১,০৯১	
সাবান	২,১৭৭	২৪,৯৪,৮৩৩	?
স্নো, পাউডার ইত্যাদি	.	৬৯,৭৮,৬১২	?
ঔষধ		২,২৯,৬৭,৭০৭	
লোহা		৮,৩২,২১,৫৪৪	২৬,৭৬,৬২২
তামা এলুমিনিয়াম প্রভৃতি		৫,১৩,৯৬,৯৪৯	?
সার (কৃত্রিম)	৭৩,২৩৮		
আলকাতরা হইতে প্রাপ্ত রাসায়নিক পদার্থ—		৭১,০০৬১৯	
(ক) রং —	৯,৯১০	৩,৬৬,২৯,৩১৭	•
(খ) ন্যাপথ্যালিন—	৫৬৬	২,০৮,৭৭৪	
(গ) অন্যান্য—	১,০৬২	৬,৪৭,১২৬	

ইহা ছাড়া আরও অনেক পণ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে; কিন্তু ইহা হইতেই আমরা ভারতবর্ষে রসায়ন-শিল্পের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারি।

যথাসম্ভব শুল্ক ধার্য্য হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশে যে-পরিমাণ কাগজ উৎপন্ন হয় তাহাতে আমাদের চাহিদার মাত্র এক-পঞ্চমাংশ মিটে। কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রধান বাধা যথোপযুক্ত আঁশওয়ালা কাঠের অভাব। ভারতবর্ষে কাগজ তৈরী করিবার কাঁচা মাল হইতেছে খড় ও বাঁশ। ভারতবর্ষের নৈসর্গিক অবস্থা এত অনুকূল থাকা সত্ত্বেও কাগজ তৈরী করিবার জন্য উপযুক্ত কাঠ পাওয়া যায় না ভাবিতে আশ্চর্য্য বোধ হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এত দিন কাগজের জন্য কানাডার খাপেক্ষী ছিল। নানা রকম গবেষণা ও অনুসন্ধান করিয়া বর্ত্তমানে পাইন জাতীয় এক রকম বৃক্ষ হইতে কাগজ তৈরী করিবার উপযুক্ত শাঁস (pulp) পাইতেছেন। আমাদের কাগজের চাহিদা দিন দিনই বাড়িতেছে, কাজেই এদিকে সকলের দৃষ্টি পড়া প্রয়োজন।

কাঁচের জন্য যে-সব মালমশলা দরকার হয় একমাত্র সোডা-ছাই (Soda ash) ছাড়া সবই আমাদের দেশে পাওয়া যায়; অথচ কাঁচ-শিল্পের বিশেষ কোন উন্নতি হইতেছে না। যুদ্ধের জন্য বিদেশ হইতে সোডা ছাইর আমদানী বন্ধ হওয়াতে বর্ত্তমানে অনেক কাঁচের কারখানা অচল হইবার উপক্রম হইয়াছে।

বিদেশ হইতে আমরা দুই কোটি টাকার রবারের জিনিস আমদানী করি অথচ রবারের উৎপত্তি-স্থান হইতেছে ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণ-ভারতবর্ষ।

কৃত্রিম রেশমের চাহিদা দিন দিনই বাড়িতেছে। ভারতবর্ষের মত গরীব দেশে বিদেশজাত কৃত্রিম রেশমের বিক্রী বাৎসরিক ৫ কোটি টাকা। অথচ এক গজ কৃত্রিম রেশমও আমাদের দেশে তৈরী হয় না। মূলধনীদের (capitalists) দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

অনেকের ধারণা ঔষধের জন্য বিদেশ অনেক টাকা লইয়া যায়। ঔষধের মোট আমদানী বার্ষিক ২ কোটি টাকা—জনপ্রতি মাত্র চারি পয়সা ঔষধের জন্য ব্যয় হয়। এজন্য কেহ মনে ক·'বেন না যে ভারতবর্ষের সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল। ভারতবর্ষের দারিদ্র্য ইহা হইতে বুঝা যায়। রোগশোকগ্রস্ত ভারতবাসীর চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট টাকা নাই। আমাদের দেশে ঔষধের নানা রকম গাছ আছে। দুঃখের বিষয় এ-গুলিও বিদেশে চালান হয় এবং নানা রকম ঔষধে পরিণত হইয়া আমাদের দেশেই উচ্চমূল্যে বিক্রী হয়।

লৌহশিল্প ও তাম্রশিল্প ছাড়া অন্য কোন রকম ধাতব শিল্প ভারতবর্ষে নাই বলিলেই চলে। রকমারি ইস্পাত (special steel) আমাদের দেশে তৈরী হয় না। ভারতবর্ষে যে-পরিমাণ লোহা উৎপন্ন হয় তাহার প্রায় ৪০ গুণ বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া থাকি। ভারতবর্ষে খনিজ দ্রব্যের অভাব নাই অথচ অন্য কোন ধাতব শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইতেছে না। মধ্য-প্রদেশে এত বক্সাইট (Bauxite) থাকা সত্ত্বেও এলুমিনিয়াম তৈরী করিবার কোন কারখানা এখনও বসে নাই। ১৯৩৭ সনে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার এলুমিনিয়ামের জিনিষ ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। দামে সস্তা, ওজনে হাল্কা এবং জলে বাতাসে টিকে বলিয়া এলুমিনিয়ামের ব্যবহার ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে—কাজেই ঐ শিল্পের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

বিস্কুট, কেক, জাম, জেলি, দুধ প্রভৃতির জন্য আমরা বিদেশকে প্রায় ৩ কোটি টাকা দিয়া থাকি। নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে কোন্ জিনিস কত পরিমাণ আমদানী করিয়া থাকি।

	:৯৩৫-৩৬ (হান্ড্রেটওয়েট)	মূল্য (লক্ষ টাকা)
বিস্কুট ও কেক	৫,৪৭,০০	৩৬
জাম ও জেলী	২০,০০০	৭
লজেঞ্চুস, টফি প্রভৃতি	+	১৮
মাখন	৭,৭০০	৭
ঘন ও রক্ষিত দুধ	২,০৯,২০০	৫৪
টিনের ও বোতলের খাবার	×	৬৫
টিনে ভরা মাছ	৬৪,১০০	১৪
শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য দুধ	১০,৪০০	১৩½
গরু ও শূকরের মাংস	১৬,০০০	১২¾
চাটনী (নানারকম)	১০,৮০০	৭
টিনে ও বোতলে ভরা ফল	৪৩,৩০০	১১

এদিকেও আমাদের যথেষ্ট কাজ করিবার রহিয়াছে।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ইহার চেয়ে বেশী আলোচনা করা সম্ভব নয়। যে-সব শিল্পের কথা আলোচিত হইল ইহা ছাড়া আরও অনেক ছোটখাট শিল্প আমাদের দেশে গড়িয়া উঠিতে পারে—যেমন ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং (Electro plating), রঞ্জনশিল্প, কালি, ধাতু-পরিষ্কারক (metal polish) ইত্যাদি।

আমাদের দেশে এত সুযোগ ও সুবিধা থাকিতে কেন রসায়ন-শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে না এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন। বেশীর ভাগ লোকই মূলধনীদের দোষ দিয়া থাকেন। তাঁহাদের অপরাধ যে, তাঁহাদের দৃষ্টি সব সময়ে লাভের অঙ্কের দিকে থাকে। শুধু মূলধনীদের দোষ দিলেই চলিবে না। ভারতবর্ষীয় বৈজ্ঞানিকেরা এ-বিষয়ে কতখানি চেষ্টা করিয়াছেন তাহাও আলোচনা করা প্রয়োজন। গত পঁচিশ বৎসরের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ধারার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহা সহজেই বুঝা যায় যে শিল্পের যথার্থ কাজে লাগে এই রকম গবেষণার সংখ্যা অতি কম। ভারতবর্ষীয় বৈজ্ঞানিকদের একটা ধারণা আছে যে ফলিত-বিজ্ঞানের গবেষণায় মৌলিকতা কম, সুতরাং গবেষণা হিসাবে সেগুলি নিকৃষ্ট। এই মনোভাবের ফলে ফলিত-রসায়নের কাজ দ্রুত অগ্রসর হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় বেশীর ভাগ গবেষকদের শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞানের অত্যন্ত অভাব। শিল্পের সাহায্যকল্পে তাঁহারা যে-সব গবেষণা করেন তাহা প্রায় বেশীর ভাগই কোন কাজে লাগে না। ইউরোপ ও আমেরিকায় যে-সব মনীষীরা অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করিয়া আছেন তাঁহাদের অনেকেরই নানারকম শিল্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে। কাজেই তাঁহারা বিজ্ঞানের নানারকম উচ্চ গবেষণায় নিযুক্ত থাকিলেও কতকগুলি কাজ তাঁহারা করেন যাহাতে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ভাবে ফলিত-রসায়ন শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা আদৌ কোন কাজে লাগে না। আমাদের পুঁথিগত বিদ্যা হাতেকলমে কাজে লাগাইবার বন্দোবস্ত প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের করা উচিত। ইহার জন্য অর্থব্যয় করিতে মোটেই কার্পণ্য করা উচিত নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত-রসায়নের অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযোগীন্দ্রকুমার চৌধুরী পাটের আঁশ (fibre) সম্বন্ধে বহু মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন। রাঁচিতে লাক্ষা সম্বন্ধে ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেরাদুনের বন-গবেষণালয়ে মিঃ কামেসম্‌ ও ডাঃ কৃষ্ণার গবেষণা যথেষ্ট কাজে লাগিতেছে। ডাঃ শ্রীনীলরতন ধর দেখাইয়াছেন যে চিনি তৈরী হইবার পর গুড়ের মত যে পরিত্যক্ত জিনিষটা (molasses) থাকে সেটা জমির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে। যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে তাহা কাজে লাগাইয়াছেন। অধ্যাপক ভাটনগর পেট্রোলিয়ামের উন্নতিকল্পে যে গবেষণা করিয়াছিলেন তাহাও কার্য্যকরী হইয়াছে। সুযোগ ও সুবিধা পাইলে আমাদের দেশের রাসায়নিকেরা বহু মূল্যবান গবেষণা করিতে পারেন কিন্তু দুঃখের বিষয় শিল্পে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা এখনও বহু ভারতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান বুঝিতে পারিতেছে না। ইউরোপ ও আমেরিকায় শুধু শিল্প-গবেষণার জন্য বহু অর্থ ব্যয়িত হয়। টাটা লৌহশিল্পের মত বিরাট প্রতিষ্ঠানে গবেষণায় নিরত কোন রাসায়নিক নাই। মূলধনীদের দৃষ্টি এদিকে পড়া উচিত।

[এই প্রবন্ধ লিখিতে ১৯৩৯ সনের নভেম্বর মাসের সায়েন্স ও কালচার পত্রে প্রকাশিত ডক্টর শ্রীহীরালাল রায়ের প্রবন্ধের যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।—লেখক]

মিশর

শরের খর্জ্জুরকুঞ্জ

মিশরের মসজিদ

মিশরের পিরামিড ও তালকুঞ্জ

কায়রোর রাজপথ
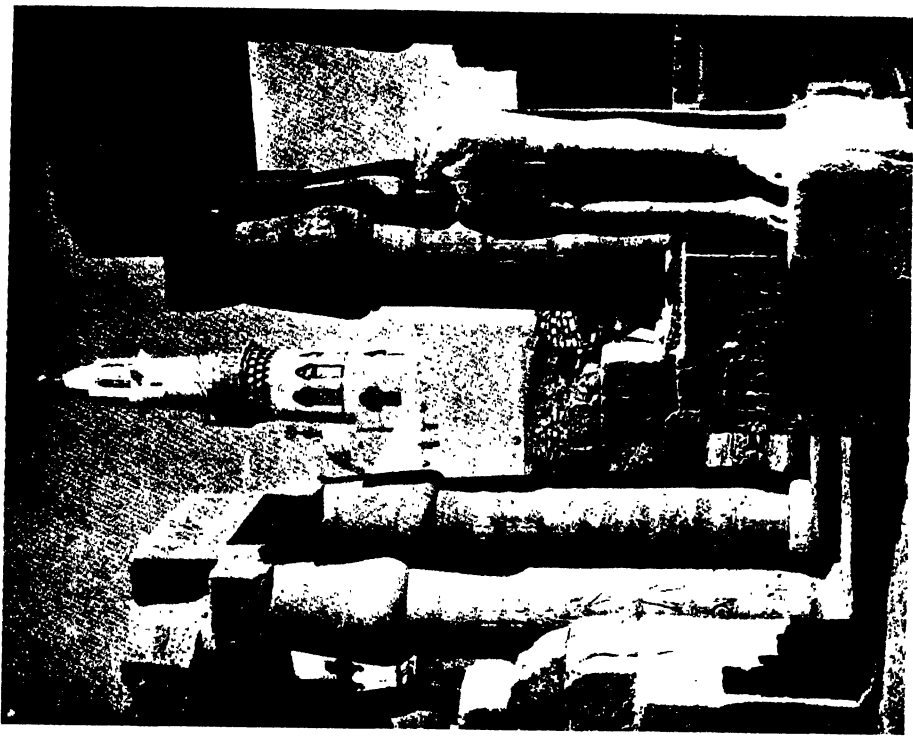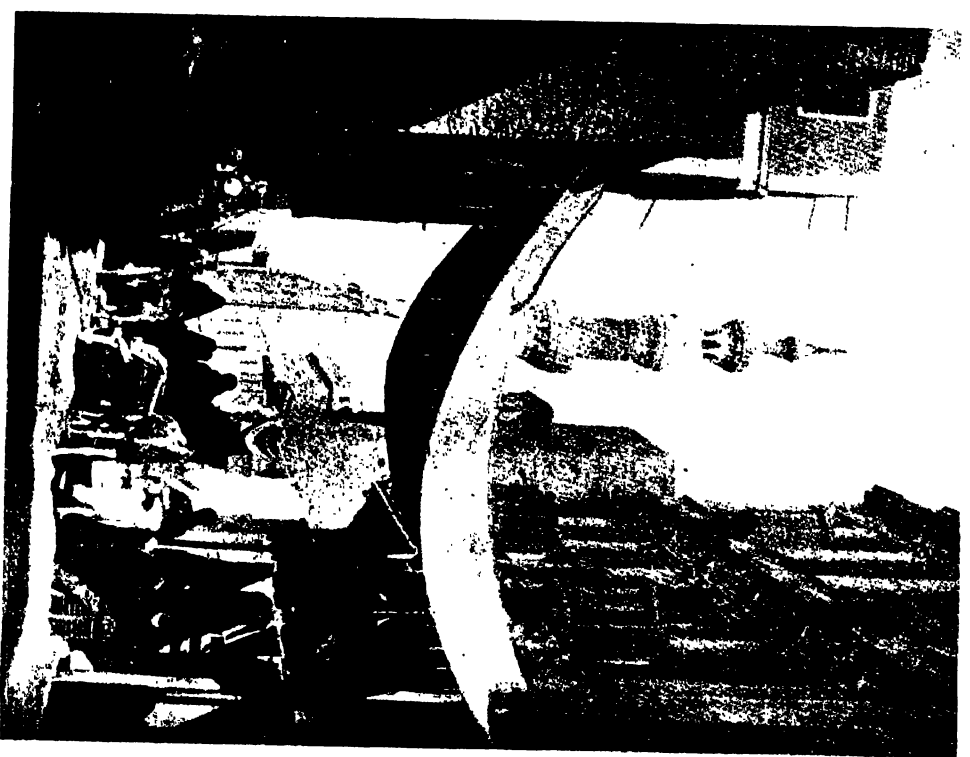
বিদ্যাসাগর ও বাংলা গদ্য

শ্রীমনোমোহন ঘোষ, এম. এ., পিএইচ. ডি.

বাংলা গদ্যের সংস্কারক হিসাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যশ সুবিপুল এবং প্রায় সর্ব্বজনস্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে যাঁরা এ গদ্যের উন্নতিবিধান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের মত খ্যাতিলাভ আর কারুর ভাগ্যে ঘটে নি। এ বিষয়ে আধুনিক কবিগুরু তাঁর যে প্রশস্তি রচনা করেছেন বিদ্যাসাগরের অনুরাগীদের নিকট তা সুবিদিত।[১] কিন্তু এ প্রশংসাবাদের মাধুর্য্য বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনার উৎকর্ষ নির্ণয় করবার কিছু কিছু সাহায্য করলেও তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য গদ্য লেখকের কৃতিত্ব সম্বন্ধে একটা অনুচিত ঔদাসীন্য সৃষ্টি করে। ১৮৪৭ সাল থেকে ১৮৭৩ পর্য্যন্ত যে সাতাশ বছরের মধ্যে বিদ্যাসাগর নানা উপাদেয় গ্রন্থ রচনা ক'রে বাংলা গদ্যে এক নূতন শ্রী আনছিলেন সে সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, প্যারীচাঁদ, বঙ্কিমচন্দ্র এবং কেশবচন্দ্রের হাতেও আমাদের গদ্য রীতি নানাভাবে সংস্কার প্রাপ্ত হয়েছিল। বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে এই পাঁচ জনের দান এত নগণ্য নয় যে বিদ্যাসাগরের অভ্রভেদী খ্যাতির অন্তরালে তাঁদের আংশিক প্রচ্ছাদনকেও অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করা যেতে পারে। তাই উপস্থিত প্রবন্ধে নূতন করে বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনার গুণাগুণ পরীক্ষা করার প্রয়াস করা হবে।

১৮৪৭ সালে প্রকাশিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'কেই বিদ্যাসাগরের প্রথম সাহিত্যিক দান ব'লে ধরে নিতে হবে।[২] হিন্দী 'বৈতাল পচ্চীসী' অবলম্বনে রচিত এ পুস্তক কাঁচা হাতের রচনা[৩] এবং গোড়ার দিকে তেমন সমাদর পায় নি[৪]; কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যেতে পারে যে বিদ্যাসাগরী রীতি এ গ্রন্থে প্রায় পুরোপুরি ভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের নিজস্ব রীতি কি? কোথায় তাঁর রচনার বিশেষত্ব? দেবেন্দ্রনাথের গদ্যসম্পর্কে আলোচনায় দেখা গিয়েছে যে বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যে হাত দেওয়ার চার বছর আগে থেকে তিনি এক নূতন ভঙ্গীতে গদ্য রচনা সুরু করেছিলেন[৫]। তবে বিদ্যাসাগর গদ্য লেখায় হাত দিয়ে কোন্ দিকে নূতনত্ব আনলেন? এ প্রশ্নের আলোচনার জন্য 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র প্রথম সংস্করণ (১৮৪৭) থেকে কিয়দংশ নিচে উদ্ধার করা যাচ্ছে—

(প্রথম উপখ্যান্) বেতাল কহিল মহারাজ শ্রবণ কর। বারাণসী নগরীতে প্রতাপমুকুট নামে এক প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। তাঁহার বজ্রমুকুট নামে নন্দন ও মহাদেবী নাম্নী মহিষী ছিল। এক দিবস রাজকুমার প্রাড্‌বিবাক্‌ পুত্রকে সমভিব্যাহারী করিয়া মৃগয়ায় গমন করিলেন। ক্রমে২ নানাবনে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে কোন নিবিড় অরণ্যানী প্রবেশপূর্ব্বক তন্মধ্যবর্ত্তি পরম রমণীয় এক সুশোভিত সরোবর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। এবং দেখিলেন ঐ সরসীর তীরে হংস বক চক্রবাক সারস প্রভৃতি নানাবিধ জলচর পক্ষিগণ কলরব করিতেছে। প্রফুল্লকমলসমূহের সৌরভে চারি দিক আমোদিত হইতেছে। মধুকরেরা মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া গুন২ ধ্বনি করত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। তীরস্থিত তরুগণ অভিনব পল্লবফলকুসুমসমূহে সুশোভিত আছে। তাহাদিগের ছায়া অতি স্নিগ্ধ ও সুশীতল বিশেষতঃ শীতল সুগন্ধ গন্ধ-

---

(১) চারিত্রপূজা (১৩৩৭), পৃ. ২৪।

(২) বিদ্যাসাগরের প্রথম রচনা 'বাসুদেব চরিতে'র ভাষা সম্বন্ধে কোন আলোচনা নিরাপদ নয়, কারণ এ পুস্তকখানি কখনো প্রকাশিত হয় নি। এ পুস্তকের মুদ্রিত ভগ্নাংশ থেকে এর উপাদেয়তা স্বীকার করলে ভুল হতে পারে। তাই সে বিষয়ে নিবৃত্ত থাকা গেল।

(৩) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও বাংলা গদ্য, প্রবাসী, ১৩৪৭ কার্ত্তিক, পৃ. ৫৬ দ্রষ্টব্য।

(৪) বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর, ৩য় সং পৃ. ১৭৩

(৫) প্রবাসী, ১৩৪৭, কার্ত্তিক পৃ. ৫৩ দ্রষ্টব্য

বহের মন্দ২ সঞ্চার দ্বারা পরম রমণীয় হইয়াছে। তথায় শ্রান্ত ও আতপতাপিত ব্যক্তি প্রবেশমাত্রেই গতক্লম হয়।

বলা বাহুল্য, উদ্ধৃতাংশের রচনা বর্ণিত কাহিনীকে কাব্যের পর্য্যায়ে উন্নীত করেছে। এমন সুশ্রব্য, সরস, ছন্দোময় অথচ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ রচনা বাংলা সাহিত্যে এর আগে দেখা যায় নি। বিদ্যাসাগরী গদ্যের বিশেষত্ব এইখানে। তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী গদ্যলেখকেরা যে গদ্যকে বহুলাংশে সর্ব্বকার্য্যে ব্যবহারোপযোগী করে ছিলেন তিনি তাতে শোভাসঞ্চারের প্রচেষ্টা করলেন। দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের চেষ্টায় বাংলা ধর্ম্মতত্ত্ব ও বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচারের বাহন হওয়ার যোগ্যতা লাভ করছিল; তাঁদের রচনার স্থানে স্থানে শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া গেলেও নিছক সাহিত্যরসসৃষ্টির অবসর তাঁদের ছিল না। কিন্তু নবোত্থিত গদ্যসাহিত্যের এ শোচনীয় দৈন্যকে কিয়ৎপরিমাণে দূর করল বিদ্যাসাগরের প্রতিভা। যে ভাষা তথ্যমাত্র প্রচারের সাধন ছিল তা অংশত কলা-লক্ষ্মীর আরাধনের উপযোগী হয়ে উঠল। নবজাগ্রত বাঙালী জাতির সৌন্দর্য্যবোধ তথা সংস্কৃতিবিকাশের এক নূতন রাস্তা খুলে গেল।

বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যের শোভা সম্পাদনে কিঞ্চিৎ কৃতকার্য্যতা লাভ করলেন তার মূলে এক দিকে ছিল সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে তাঁর আশৈশব ও সুনিবিড় পরিচয়, আর অপরদিকে ছিল তাঁর সহজাত শিল্পবোধ এবং সম্মুখে বর্ত্তমান গদ্যের আদর্শ। তারি ফলে সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহার্য্য অলঙ্কারকে তিনি বাংলা গদ্যে অনেকটা সুন্দর ভাবে সন্নিবিষ্ট করতে পেরেছিলেন। প্রপিতামহীর বিচিত্র বস্ত্রাভরণসম্ভার থেকে নির্ব্বাচিত প্রসাধনসামগ্রী বালিকা প্রপৌত্রীর গায়ে কিঞ্চিৎপরিমাণ মানানসই ভাবে পরানো হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের আগে ফোর্ট উইলিয়ম সংশ্লিষ্ট পণ্ডিতগোষ্ঠীর কেউ কেউ (যেমন মৃত্যুঞ্জয়) সংস্কৃতোচিত অলঙ্কারকে বাংলায় চালাতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সামনে গদ্যের কোন সুস্পষ্ট আদর্শ এবং অন্তরে শিল্পীসুলভ মাত্রাজ্ঞান না থাকায় তাঁদের চেষ্টা সেদিক দিয়ে তেমন ফলপ্রসূ হয় নি। সংস্কৃত ভাষার নিজস্ব অলঙ্কারকে বাংলার উপযোগী করার চেষ্টা থেকেই বিদ্যাসাগরের রীতি মুখ্যত তার অনিবার্য্য রূপটি পেয়েছে। এই রূপটির এক লক্ষণ হচ্ছে খাঁটি বাংলা (প্রাকৃতমূলক বা তদ্ভব) এবং বিদেশী ভাষা থেকে পরিগৃহীত শব্দের আপেক্ষিক অল্পতা, অন্য লক্ষণ হচ্ছে স্থানবিশেষে সমাসবদ্ধ পদের সুপ্রচুর ব্যবহার; কতিপয় স্থানে সংস্কৃতসুলভ পদ এবং বাগ্‌বিন্যাসও তার সঙ্গে দেখা দিয়েছে।

'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র পরে বিদ্যাসাগরের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৪৮) ও 'জীবন চরিত' (১৮৪৯) প্রকাশিত হ'ল। এ দুখানি অনুবাদ বা অনুবাদমূলক গ্রন্থ। বিষয়ানুরোধে এদের ভাষা অনলঙ্কৃত। তা হ'লেও এ পুস্তকদ্বয়ের গদ্য নিতান্ত হালকা বা শ্রীহীন নয়। এ গ্রন্থদ্বয়ের পরেই 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র দ্বিতীয় সংস্করণ (১৮৫০) প্রকাশিত হল এবং এ সময় থেকে বিদ্যাসাগরের রচনারীতি যে কেমন সমাদর লাভ করল তা বুঝা যায় তাঁর পন্থাবলম্বী শক্তিমান লেখকবর্গের ত্বরিত আবির্ভাবে। ১৮৫৩ সালে তারাশঙ্কর তর্করত্ন রচিত 'কাদম্বরী' (সুললিত মর্ম্মানুবাদ) প্রকাশিত হ'ল। এ অনুবাদে বিদ্যাসাগরের প্রভাব বুঝতে কারুরই অসুবিধা হয় না। তারি পরের বছর (১৮৫৪) রচিত 'শকুন্তলা' বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনার যশকে উজ্জ্বলতর করে তুলল। এ পুস্তক থেকে তাঁর লোকপ্রিয় গদ্যের একটি নমুনা নিচে উদ্ধার করা হ'ল—

তানলয়বিশুদ্ধস্বরসংযোগবতী গীতি শ্রবণ করিয়া রাজা অকস্মাৎ যৎপরোনাস্তি উন্মনাঃ হইলেন; কিন্তু কি নিমিত্ত উন্মনাঃ হইতেছেন তাহার কিছুই অনুধাবন করিতে না পারিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন এই মনোহর গীত শ্রবণ করিয়া আমার মন এমন আকুল হইতেছে। প্রিয়জনবিরহ ব্যতিরেকে মনের এরূপ আকুলতা হয় না; কিন্তু আমার প্রিয়জনবিরহ উপস্থিত দেখিতেছি না। অথবা মনুষ্য সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইয়াও, রমণীয় বস্তু দর্শন কিংবা সুমধুর গীতি শ্রবণ করিয়া যে আকুলহৃদয় হয়, বোধ করি, অনতিপরিস্ফুট রূপে জন্মান্তরীণ স্থিরসৌহৃদ্য তাহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়।৬

৬। প্রথম সংস্করণ পৃ. ৬৬, ৬৭

উদ্ধৃতাংশের ভাষার সঙ্গে আজকালকার গদ্যসাহিত্যের ভাষার পুরোপুরি মিল না থাকলেও বাঙালী পাঠক যে দীর্ঘকাল যাবৎ এ রচনার রস অন্তত আংশিক ভাবেও গ্রহণ করতে পারবেন সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। রচনার প্রাঞ্জলতা ও গাম্ভীর্য্যের সহিত এরূপ রস বাংলা সাহিত্যে খুব সুলভ নয়। বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা বাংলা গদ্যসাহিত্যের এক স্থায়ী সম্পদ। এ পুস্তক রচনার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক লেখক তাঁর প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করলেন। তাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা যাচ্ছে। ১৮৫৭ সালে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথাভ্রমণ' নামে যে উপন্যাস লিখলেন তাতে বিদ্যাসাগরের গদ্যের প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট দেখা গেল। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'টেলিমেকস'ও (১৮৫৮) বিদ্যাসাগরী ছাঁচে ঢালা, আর রামগতি ন্যায়রত্নও 'রোমাবতী' (১৮৬২) রচনায় বিদ্যাসাগরের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। কিন্তু রামগতির আগেই বিদ্যাসাগর 'সীতার বনবাস' (১৮৬০) প্রকাশ করেছিলেন। এখানিও তাঁর অন্যতম উপাদেয় রচনা এবং আদি যুগের বাংলা গদ্যের এক উচ্চশ্রেণীর সৃষ্টি। এই পুস্তকের মধ্যে স্থানে স্থানে তিনি বেশ সুললিত ভাবে সুদীর্ঘ সমাসের ব্যবহার করেছেন। নিচে এর দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হচ্ছে।

রাম কহিলেন, প্রিয়ে! এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিণী-তীরবর্ত্তী তপোবন; গৃহস্থগণ বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক, সেই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রামসুখ সেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন! লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্য! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণগিরি; এই গিরির শিখরদেশ আকাশ-পথে সততসঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধবনপাদপ সমূহে আচ্ছন্নথাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।[৭]

শকুন্তলা ও সীতার বনবাস বিদ্যাসাগরের রীতিকে লোকপ্রিয় করে তুলছে বটে কিন্তু বিধবাবিবাহ এবং বহুবিবাহ সম্পর্কে লিখিত পুস্তকনিচয়ও তাঁর গদ্যকে লোকসাধারণে, বিশেষ ক'রে সংস্কৃতের পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচারিত করবার কম সাহায্য করে নি। অবশ্য তাঁর ইস্কুলপাঠ্য গ্রন্থনিচয়ও (যথা বাংলার ইতিহাস, জীবনচরিত, বোধোদয় (১৮৫১), বর্ণপরিচয় (১৮৫৫), কথামালা (১৮৫৬), চরিতাবলী (১৮৫৬) আদি তাঁর গদ্যকে লোকসাধারণের, বিশেষ করে নবীন শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধার্হ করার যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এস্থলে উল্লেখ করা উচিত যে গদ্য-সাহিত্য নির্ম্মাণে তাঁর সহযোগী অক্ষয়কুমারের 'চারুপাঠ' তিন ভাগও শিক্ষার্থীমণ্ডলীতে তৎকালে প্রচারিত হচ্ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে হয়ত বিদ্যাসাগরের খ্যাতি ছিল তাঁর চেয়ে অনেক বেশী। ১৮৫৫ থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে, কি সমাজ-সংস্কার, কি দয়া-বিতরণ, কি সাহিত্য-রচনা সব দিক দিয়ে বিদ্যাসাগর খ্যাতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে অধিরূঢ় ছিলেন। কিন্তু এরূপ জাজ্জ্বল্যমান সমসাময়িক খ্যাতি সত্ত্বেও তাঁর রচনা-রীতি সম্বন্ধে প্রশংসা ও অনুরাগের অজস্র ধারা দীর্ঘকাল স্থায়ী হল না। তাঁর অনুরাগীদের অনেকেই সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত, আর এ পাণ্ডিত্যের জন্যেই বিদ্যাসাগরী গদ্যের সম্যক্ রসগ্রহণ ছিল তাঁদের পক্ষে সহজসাধ্য। কিন্তু বাংলা দেশের তখন এমন এক শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল জ্ঞানার্জ্জনের জন্যে যাঁরা সংস্কৃতের চেয়ে ইংরেজীর উপরই বেশী মাত্রায় নির্ভর করতেন এবং ইংরেজীর মত একটি জীবন্ত ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে বাংলা রচনায় সংস্কৃতের অতিমাত্র প্রভাবকে তাঁরা অনাবশ্যক কৃত্রিমতা বলে গণ্য করলেন। এ দলের পুরোভাগে ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) ও রাধানাথ শিকদার। তাঁদের প্রচারিত 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪ সালে স্থাপিত) বিদ্যাসাগরের ভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহরূপে দেখা দিল। এ পত্রিকায় ক্রমশঃ মুদ্রিত এবং ১৮৫৭ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 'আলালের ঘরের দুলাল' বিদ্যাসাগরী রীতির প্রতি প্রকাশ্য সমর-আহ্বান। এ সংগ্রামে 'আলালী' ভাষা অবশ্য অক্ষত শরীরে জয়লাভ করতে পারে নি কিন্তু উপাখ্যানাদি রচনায় বিদ্যাসাগরী ভাষার অবিসংবাদিত প্রভাবও আর রইল না। ১৮৬৫ সালে 'দুর্গেশনন্দিনী'তে

৭। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত সংস্করণ, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ ১৯০৯, পৃ. ১০

যে-ভাষা ব্যবহার ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে সাহিত্য-ক্ষেত্রস্থ লৌকিক প্রশংসার দুর্গ থেকে ক্রমশঃ স্থানচ্যুত করলেন সে-ভাষা আলালী ভাষার সঙ্গে বিদ্যাসাগরী ভাষার (যথোপযুক্ত মাত্রায়) সংমিশ্রণের ফলে তৈরী।[৮] বিশুদ্ধ বিদ্যাসাগরী রীতিকে যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রশংসার চোখে দেখেন নি তার কারণ মুখ্যত তিনটি :—(১) অলঙ্কারাদি ব্যবহারের কৃত্রিমতা, (২) পুনরুক্তি দোষ ও (৩) শব্দাড়ম্বর।[৯] কবিকল্পনার যে-সকল সৃষ্টি সংস্কৃত কাব্যে শত শত বৎসর ধরে বহুবার ব্যবহারের পর পর্য্যুষিত (stale) হয়ে গেছে সে সকলকে আবার বাংলায় দেখতে পেলে প্রেক্ষাবান্ পাঠকের ধৈর্য্য রক্ষা করা কষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন 'ভ্রান্তি-বিলাসে'র কোন নায়িকা তার স্বামীকে লক্ষ্য করে বলছেন—

আমি জীবিত থাকিতে তুমি কখনও অন্যের হইতে পারিবে না। তুমি দিবাকর, আমি কমলিনী, তুমি শশধর আমি কুমুদিনী; তুমি জলধর, আমি সৌদামিনী। তুমি পরিত্যাগ করিতে চাহিলেও আমি তোমায় ছাড়িব না। অতএব, আর কেন, গৃহে চল; কেন অনর্থক লোক হাসাইবে, বল।১০

অথবা 'সীতার বনবাসে' লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করে বলছেন—

আপনকার মুখারবিন্দ, সায়ংকালের কমল অপেক্ষাও ম্লান ও প্রভাতসময়ের শশধর অপেক্ষাও নিষ্প্রভ লক্ষিত হইতেছে।১১

বিদ্যাসাগরের রচনায় যে সকল স্থলে পুনরুক্তি দোষের উদাহরণ প্রচুর পরিমাণে মেলে তার মধ্যে সীতার বন-বাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদ একটি। এর প্রথম চার অনুচ্ছেদে (paragraph) 'অশ্রু' কথাটি পাঁচ বার এবং 'নিতান্ত' ও 'কাতর' শব্দ চার বার এবং 'দুর্ব্বহ', 'বাষ্প-বারি', 'সবিশেষ', 'অতি বিষম' এই শব্দগুলি দুবার করে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। আর প্রথম অনুচ্ছেদে 'ইলেন' প্রত্যয়ান্ত আটটি ক্রিয়াপদ বর্ত্তমান এবং তাদের মধ্যে তিনটি উপর্য্যুপরি বাক্যে ব্যবহৃত।

বিদ্যাসাগরের শব্দাড়ম্বরের এক দিক হচ্ছে সুপরিচিত সংস্কৃত ও খাঁটি বাংলা শব্দের যথাসম্ভব পরিহার। যেমন 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক ১ম প্রস্তাবে', কোনও পুস্তক হইতে প্রমাণাদি 'বাহির-করা' অর্থে তিনি 'বহিষ্কৃত-করা' এই ক্রিয়া পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করেছেন।[১২]

বিদ্যাসাগরের শব্দাড়ম্বরের অন্য দিক হচ্ছে তাঁর সমাস-প্রিয়তা। সমাসাড়ম্বর স্থানে স্থানে বিদ্যাসাগরের রচনাকে দুর্ব্বোধ ও সৌন্দর্য্যহীন করেছে। যেমন, 'জীবনচরিত (১৮৪৯) নামক পুস্তকে বিদ্যাসাগর নিউটনেব প্রসঙ্গে লিখছেন—

একদা, তিনি একটা পুরাতন বাক্স লইয়া জলের ঘড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ ঘড়ীর শঙ্কু, বাক্সমধ্য হইতে অবিরত বিনির্গত জলবিন্দুপাত দ্বারা নিমগ্ন কাষ্ঠখণ্ড প্রতিঘাতে পরিচালিত হইত; বেলাবোধনার্থ তাহাতে একটি প্রকৃত শঙ্কুপট্ট ব্যবস্থাপিত ছিল।১৩

নিউটন কর্ত্তৃক মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের আবিষ্কার বর্ণনা করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর লিখেছেন—

একদিবস তিনি উপবন মধ্যে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দৈবযোগে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী আম্রবৃক্ষ হইতে এক ফল পতিত হইল। তদ্দর্শনে তিনি তৎক্ষণাৎ বস্তুমাত্রের পতননিয়ামক-সাধারণকারণবিবরিনী পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।১৪

বলা বাহুল্য উদ্ধৃত অংশদ্বয়ে ব্যবহৃত কঠিন সংস্কৃত শব্দ ও দীর্ঘ সমাস কেবল যে এদের দুর্ব্বোধ করেছে তা নয়, এতে বিদ্যাসাগরী গদ্যের স্বাভাবিক ছন্দকেও বাধা দিয়েছে। একেবারে নবশিক্ষার্থীদের জন্যে রচিত বোধোদয়েরও দুচার স্থানে সমাস এবং শক্ত সংস্কৃত কথা ব্যবহার ক'রে বিদ্যাসাগর ভাষার দুরূহত্ব সঞ্চার করেছেন।[১৫] এ-সব কারণেই তাঁর

(৮) তুলনীয়, ডাঃ সুশীলকুমার দে—*Hist. of Bengali Literature in the 19th Century*, পৃ. ২৯১

৯। বঙ্কিম কৃত—*Essays and Letters* (Centenary Ed.) পৃ. ২৭, ২৯

১০। পঞ্চম সংস্করণ ১৮৭০) পৃ. ৩৯

১১। পূর্ব্বোল্লিখিত সংস্করণ, পৃ. ২৯

১২। উল্লিখিত পুস্তকের ৪র্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য

১৩। প্রথম সংস্করণ পৃ. ৪০

১৪। প্রথম সংস্করণ পৃ. ৪৩

১৫। বিহারীলাল সরকারকৃত পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তক পৃ. ২২২-২২৩

গদ্যকে তৎকালীন নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট অপ্রিয় করে তুলেছিল ব'লে মনে হয়। এ নব্যদল বিদ্যাসাগরী রীতির কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালালেন তা শেষ পর্যন্ত স্বয়ং বিদ্যাসাগরকেও হয়ত কিয়ৎপরিমাণে প্রভাবিত করেছিল। সীতার বনবাসাদির শেষের দিকের সংস্করণগুলিতে তিনি অনেক সমাসবদ্ধ পদকে ভেঙে দিয়েছেন[১৬] এবং পূর্ব্ব সংস্করণে ব্যবহৃত সংস্কৃতোদ্ভূত 'কহ' ধাতুর প্রয়োগ প্রায় একেবারে তুলে দিয়ে কেবল খাঁটি বাংলা (প্রাকৃত বা তদ্ভব) 'বল' ধাতুরই প্রয়োগ করেছেন। 'আখ্যানমঞ্জরী' (১৮৬৩, ১৮৬৮) 'ভ্রান্তি বিলাস' (১৮৬৯) নামক তাঁর পরবর্ত্তী গ্রন্থেও এ-জাতীয় ব্যবহার বর্ত্তমান।[১৭] এ-সকল পরিবর্ত্তনের ফলে তাঁর ভাষা তখন একটু সরল হয়েছে বটে কিন্তু তবু খাঁটি বাংলা শব্দের আপেক্ষিক অপ্রাচুর্য্যবশতঃ উল্লিখিত গ্রন্থনিচয়ের রচনা তার বিদ্যাসাগরী ভঙ্গী তেমন ক'রে হারায় নি। বিদ্যাসাগরের বেনামী রচনাগুলিও অনেকটা এ শেষোক্ত শ্রেণীর রীতিতে রচিত; তবে এ বইগুলিতে বাংলা (প্রাকৃতোদ্ভূত, এবং বিদেশী থেকে গৃহীত তদ্ভব) শব্দের পরিমাণ একটু বেশি। কিন্তু শব্দসঞ্চয়ের কথা বাদ দিলেও এ রচনাগুলির অন্য আকর্ষণ আছে। এগুলিতে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহবিরোধী কতিপয় সমসাময়িক মহাপণ্ডিতকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও কটূক্তির কশাঘাত করেছেন। তারি ফলে খানিকটা হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে।

উক্ত বিরোধী দলের মধ্যে ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন নামে এক বিখ্যাত ভট্টাচার্য্য বিদ্যাসাগরের প্রতি বিস্তর কটূক্তি বর্ষণ করেছিলেন। তারই জবাবে 'ব্রজবিলাস' লিখিত হয় (১৮৮৪)। এ পুস্তিকার একস্থলে আছে—

এ যাত্রায় খুড়র কাছে দুই চারিটি প্রশ্ন করিব। * * যদি উপেক্ষা করিয়া অথবা ভয় পাইয়া অথবা আর কোনও নিগূঢ় কারণের বশবর্ত্তী হইয়া খুড় মহাশয় উত্তরদানে বিমুখ হন 'হুও' 'হুও' বলিয়া হাততালি দিয়া ইয়ারবর্গ লইয়া কিয়ৎক্ষণ আনন্দে নৃত্য করিব, পরে রীতিমত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া মড় মড় করিয়া খুড়র ঘাড় ভাঙিয়া ফেলিব।

যদি বলেন, খুড়র ঘাড় ভাঙিলে, খুড় মরিয়া যাইবেন। তাহার উত্তর এই খুড়র ঘাড় বড় মজবুদ, সহজে ভাঙে কার সাধ্য। আর যদি ভাঙিয়াই যায় তাহাতে আমি নাচার। আমি মনকে বুঝাইব খুড়র কপালে লেখা ছিল উপযুক্ত ভাইপোর হস্তে সদগতি হইবেক, তাহাই ঘটিয়াছে বিধিনির্ব্বন্ধ অতিক্রম করে কার সাধ্য। * * * যদি বল খুড়র ঘাড় ভাঙিলে তোমার পাপ জন্মিবে। তাহার উত্তর এই, পাপের জন্য আমার তত দুর্ভাবনা নাই। * * * খুড়র ঘাড় ভাঙিলে হয় গোহত্যার নয় ব্রহ্মহত্যার পাতক হইবেক। শুনিয়াছি এ উভয়েরই যথোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে। যদি স্পষ্ট বিধান না থাকে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়েরা চিরজীবী হউন, মনের মত তৈলবট সামনে ধরিলে, তাঁহারা প্রফুল্লচিত্তে হয় বচন গড়িয়া নয় মজুদ-বচনের ঘাড় ভাঙিয়া অম্লান বদনে নিখিরকিচ ব্যবস্থা লিখিয়া দিবেন তাহা হইলেই সাধু সমাজে আর কোনও ওজর আপত্তি থাকিবে না।[১৮]

বিদ্যাসাগরের বেনামী রচনাগুলি এ শ্রেণীর হাস্যরসে পরিপূর্ণ। তবে এ হাস্যরসকে খুব উচ্চশ্রেণীতে ফেলা যায় না। কিন্তু উক্ত রচনাগুলির কয়েক স্থানে এর চেয়েও নিকৃষ্ট উপায়ে হাস্যসৃষ্টি করা হয়েছে। মোটের উপর দেখতে গেলে বিদ্যাসাগরের সৃষ্ট হাস্যরস সংস্কৃত 'প্রহসন' জাতীয় রচনার হাস্যরসের সঙ্গে তুলনীয়। এ উভয়ই স্থূলরুচিপ্রসূত এবং স্থানে স্থানে অশ্লীলতাদুষ্ট। অবশ্য বিদ্যাসাগরের বয়ঃকনিষ্ঠ সমসাময়িক পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কিন্তু উল্লিখিত বেনামী রচনাগুলির হাস্যরস সম্বন্ধে বলেছেন—"এই রসিকতা * * * গ্রাম্যতা দোষে দূষিত নহে; ইহা ভদ্রলোকের সুসভ্য সমাজের যোগ্য; এবং পিতাপুত্রের একত্র উপভোগ্য। এরূপ উচ্চ অঙ্গের রসিকতা বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই আছে।"[১৯]

১৬। এ প্রসঙ্গে চারুবাবুর সম্পাদিত পূর্ব্বোল্লিখিত 'সীতার বনবাস' দ্রষ্টব্য। এর পাদটীকায় এক বা একাধিক পূর্ব্ব সংস্করণের পাঠান্তর দেওয়া আছে। তবে সেই সংস্করণ বা সংস্করণগুলির পরিচয় নাই। প্রত্যেক সংস্করণের পরিচয় ও পাঠান্তর সহ বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলীর এক বিদ্বজ্জনব্যবহার্য্য সংস্করণ হওয়া প্রয়োজন।

১৭। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, (১৩৪১) পৃ. ৪৪।

(১৮) ব্রজবিলাস (১২৯১ বাং) পৃ. ১৬-১৯

(১৯) পুরাতন প্রসঙ্গ ১ম খণ্ড (১৩২০) পৃ. ২১৩—২১৪

সুপণ্ডিত কৃষ্ণকমল যে-রুচির আবহাওয়ায় পরিবর্দ্ধিত হয়েছিলেন সে-রুচি অনেক দিন আগে বাংলা দেশের ভদ্রসমাজ থেকে বহুলাংশে বিদায় গ্রহণ করেছে। বিদ্যাসাগরের রচনায় মারাত্মক গ্রাম্যতাদোষ প্রচুর না থাকলেও এমন দু-একটি স্থান আছে যা শিষ্টাচারসম্পন্ন আধুনিক পিতাপুত্রে একত্র পড়তে কুণ্ঠাবোধ করবে। কিন্তু এজন্যে আমরা বিদ্যাসাগরকে নিরতিশয় কঠোর ভাবে বিচার করতে পারি না। কারণ, যে-অবস্থায় পড়ে তিনি আঘাত ফিরিয়ে দেবার জন্যে প্রতিপক্ষকে বাঙ্ময় কশাঘাত করেছেন তা ভাবলে আমরা এই পুরুষসিংহের প্রতি কারুণ্য অনুভব করি। বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তনে উদ্যোগী হওয়ার অব্যবহিত পরেই তাঁর প্রতি যে ঘোরতর উপহাস, কটূক্তি এবং নিন্দাকর্দ্দম নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তা তিনি বেশ নির্ব্বিকার চিত্তে সহ্য করেছেন। বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে লিখিত দ্বিতীয় পুস্তকের ভূমিকাই এ সম্বন্ধে প্রমাণ। এ-স্থলে তিনি যে উদারতা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন তা সম্ভবতঃ রামমোহন ছাড়া তাঁর কোন পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের রচনায় দুর্লভ। এখানে বিদ্যাসাগর লিখেছেন—

অধিক আক্ষেপের বিষয় এই যে, উত্তরদাতা মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই উপহাসরসিক ও কটূক্তিপ্রিয়। এদেশে উপহাস ও কটূক্তি যে ধর্ম্মশাস্ত্রবিচারের এক প্রধান অঙ্গ, ইহার পূর্ব্বে আমি অবগত ছিলাম না।...অনেকের এবংবিধ উত্তরদানপ্রণালী দর্শনে আমার অন্তঃকরণে প্রথমতঃ অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিয়া ছিল। কিন্তু একটি উত্তর পাঠ করিয়া আমার সকল ক্ষোভ এককালে দূরীভূত হইয়াছে।...এক বর ঐ উত্তর লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই বর বয়সে বৃদ্ধ ও সর্ব্বত্র প্রধান বিজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াও উত্তর পুস্তকে মধ্যে মধ্যে উপহাস রসিকতা ও কটূক্তি প্রিয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি ধর্ম্মশাস্ত্র বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াও বাদীর প্রতি উপহাসবাক্য ও কটূক্তি প্রয়োগ করা এদেশে বিজ্ঞের লক্ষণ।।[২০]

উল্লিখিত রচনাংশে প্রকাশিত লোকদুর্লভ ধৈর্য্য বিদ্যাসাগর দীর্ঘকাল রাখতে পারেন নি। বিধবা-বিবাহের বৈধতা রাজবিধি দ্বারা স্বীকৃত হওয়ার পরে তাঁর উপর কটূক্তি ও অন্য অত্যাচার একান্ত ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। যে-ধৈর্য্যকে আঠার বছরেও (১৮৫৫—১৮৭২) তিনি হারান নি তখন সে ধৈর্য্য তাঁকে ত্যাগ করল। তিনি প্রতিপক্ষদের যথাশক্তি ও যথাভিরুচি গালাগালি দিয়ে একাধিক বেনামী পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। কিন্তু এ-সকল বেনামী রচনায় বিদ্যাসাগর যা লিখেছেন তাঁর গদ্যের বিচারে সে-সকলকে না ধরলেও বিশেষ ক্ষতি নেই। তাঁর প্রধান রচনানিচয়ে—বিশেষ করে শকুন্তলা, সীতার বনবাস, মহাভারতের উপক্রমণিকার অনুবাদ (রচনাকাল ১৮৪৮—১৮৬০), বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাবদ্বয় (১৮৫৫), বহুবিবাহ বিষয়ক বিচারদ্বয়ে (১৮৭১—১৮৭৩) তিনি যে গদ্য ব্যবহার করেছেন বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে তার সাহায্য অতুলনীয়। বিদ্যাসাগরের অনুবাদের আদর্শেই কালীপ্রসন্ন সিংহ সমগ্র মহাভারতের বঙ্গানুবাদ ক'রে ভারতীয় সাধনার এই বিরাট কল্পবৃক্ষ বাঙালীর গৃহদ্বারে রোপণ করেছেন। 'সোমপ্রকাশ', 'বঙ্গবাসী' আদি জনপ্রিয় সাপ্তাহিক কাগজও এ গদ্যে লিখিত হয়ে বহু বাঙালীর জ্ঞানবৃদ্ধির সাহায্য করেছে। নানা প্রকাশক দ্বারা প্রচারিত সংস্কৃত পুরাণাদির অনুবাদেও এ বিদ্যাসাগরী ভাষারই পুনঃপুনঃ ব্যবহার দেখা যায়। এ অনুবাদগুলিতে জাতীয় সংস্কৃতির প্রসারবৃদ্ধির কম সাহায্য করে নি। কিন্তু আগেই বলেছি, এদিক দিয়ে সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করলেও, যে গল্প-উপন্যাসের ভাষা নিয়ে বিদ্যাসাগর খ্যাতি লাভ করেছিলেন তার প্রভাব অপেক্ষাকৃত স্বল্পকালস্থায়ী হয়েছিল। তা সত্ত্বেও বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর আসন অতিশয় সমুন্নত। তাঁর আবির্ভাব না হ'লে এত তাড়াতাড়ি বঙ্কিম ও তদনুগামী ঔপন্যাসিকবর্গকে পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ; কারণ বঙ্কিম গোড়ার দিকের উপন্যাসগুলিতে যে-ভাষা ব্যবহার করেছেন তাতে বিদ্যাসাগরী ভাষার প্রভাব নিতান্ত সমধিক।

(২০) বিধবা বিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক—বিজ্ঞাপন।

চলচ্চিত্রে সাহিত্যের স্থান

শ্রীনলিনীকুমার চৌধুরী

বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্যের ন্যায় আমাদের দেশেও চলচ্চিত্র এমন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে যে জীবনের ক্ষেত্র হইতে ইহাকে অস্বীকার করিয়া চলিবার উপায় নাই। এই চলচ্চিত্রের সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা উচিত বলিয়াই সাহিত্যের আসরে হয়ত এই বিষয় লইয়া আলোচনার অবকাশ আছে।

আমি এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া বাঙালীদের দ্বারা পরিচালিত চলচ্চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই চলচ্চিত্রের বিষয়গুলিকে বিভিন্ন পর্য্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে।

শিশুসাহিত্য ও শিশুশিক্ষা

এই বিভাগে এমন সব আখ্যান ও শিক্ষামূলক বিষয় সন্নিবিষ্ট হওয়া প্রয়োজন যাহা দ্বারা শিশুদের শিক্ষা ও মনোবৃত্তি উপযুক্তভাবে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পায়। শিক্ষণীয় বিষয় যাহাতে আনন্দের ভিতর দিয়া শিশুর মনের মধ্যে কার্য্যকরী হইতে পারে চলচ্চিত্র ইহাতে প্রভূত সাহায্য করিতে পারে। পাশ্চাত্য দেশে গবেষণায় স্থির হইয়াছে যে চলচ্চিত্রের সাহায্যে লোকের ধারণা ও স্মৃতিশক্তি দেড়গুণ বৃদ্ধি পায়।

শিশুদের পাঠ্যবিষয়ক, দেশ, জাতি ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বহু তথ্য চলচ্চিত্রের ভিতর দিয়া পরিবেশিত হইতে পারে। অবশ্য এই সব বিষয়ের স্থান চলচ্চিত্রে দিতে হইলে চল'চ্চত্র-পরিবেশকদের শিশুমনস্তত্ত্ব ও শিশুশিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ হইতে হইবে। দুঃখের বিষয়, যে পাশ্চাত্য দেশকে অনুকরণ করিয়া আমাদের দেশে চলচ্চিত্র-শিল্প অগ্রসর হইতেছে, সেইসব দেশের লোকেরা এই চল'চ্চত্রের দ্বারা শিশুশিক্ষার বহুবিধ ব্যবস্থা করিলেও সেই দিক দিয়া আমাদের দেশে প্রায় কিছুই করা হয় নাই বলিয়া মনে হয়।

আগে শিশুরা রূপকথা ও আখ্যানের ভিতর দিয়া মা-ঠাকুরমার নিকট হইতে অনেক কিছু শিখিতে পারিত, সেই সব রূপকথা ও আখ্যান বর্ত্তমানে লুপ্তপ্রায়। আজকাল অনেক শিশু মা-ঠাকুরমার সঙ্গে গিয়াই বিকৃতসমস্যা-মূলক, সিনেমার ছবি দেখিয়া আসে। ইহা তাহাদের মনে কি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তাহা মনস্তত্ত্ববিদদের ভাবিবার বিষয়।

আমাদের দেশের শিশুসাহিত্য-রচয়িতাদেরও দায়িত্ব এই বিষয়ে রহিয়াছে। চিত্রপরিচালকগণ যখন শিশুদের উপযোগী চিত্র প্রস্তুতে উদাসীন (অথচ শিশুরা সিনেমা দেখিবেই), তখন সাহিত্যিকগণের কঠোর সমালোচনা দ্বারা তাঁহাদিগকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা আবশ্যক।

লোকশিক্ষা ও লোকসাহিত্য

পূর্ব্বে আমাদের দেশে যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী, কবি-গান প্রভৃতির ভিতর দিয়া লোকশিক্ষা প্রচারিত হইত। বর্ত্তমানে কালের প্রবাহে এই সব জিনিস লুপ্তপ্রায়। আজ-কাল যেখানে-সেখানে সিনেমা ও শখের থিয়েটার অনেক মামুলী বিষয় সাধারণকে পরিবেশন করিতেছে। চলচ্চিত্রে ধর্ম্মমূলক আখ্যান একেবারেই প্রস্তুত হইতেছে না আমি এ-কথা বলিতেছি না, কিন্তু যাহা হইয়াছে তাহাদ্বারা এই-গুলি আমাদের প্রাচীন আমলে লোকশিক্ষার যে-সব ব্যবস্থা ছিল, তাহার স্থান অধিকার করিতে পারিতেছে কি না ইহাই বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। আমার মনে হয় এই জাতীয় অধিকাংশ চিত্রই সেই গৌরব অর্জ্জন করিতে পারে নাই। কারণ ব্যবসা জিনিসটাকে বড় করিয়া দেখিবার দরুন সস্তায় ও সহজে লোকের নিকট বাহবা লইবার জন্য ও চটুল আমোদের দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিবার জন্য এই জাতীয় চিত্রেও এমন সব

শারীরিক হাবভাব ও লাস্যলীলার অবতারণা করা হয় ও প্রাধান্য দেওয়া হয় যাহাদ্বারা এই প্রকার চিত্র পরিবেশনের আসল উদ্দেশ্য (যদি মহৎ উদ্দেশ্য কিছু থাকে) ব্যর্থ হইয়া যায়। দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য এই সমস্ত চিত্র উপযুক্ত সাহিত্যিক ও পণ্ডিতগণের দ্বারা সূক্ষ্মভাবে সমালোচিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। পনর বৎসর পূর্ব্বেও রাশিয়া লোকশিক্ষায় পৃথিবীর অনেক দেশেরই পশ্চাতে ছিল, কিন্তু লোকশিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেশের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া আজ রাশিয়াকে শিক্ষায় দীক্ষায় বহু দেশ হইতে অগ্রণী করিয়া তোলা হইয়াছে।

স্বাস্থ্য, পল্লী-উন্নয়ন, কৃষিকার্য্য ও দেশের মোটামুটি ইতিহাস প্রভৃতি বহু বিষয় চলচ্চিত্রদ্বারা সাধারণকে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। পাশ্চাত্য দেশে ও প্রাচ্য দেশের জাপানে চলচ্চিত্রদ্বারা এই সব কার্য্য বহুল পরিমাণে সাধিত হইতেছে। আমরাই উদাসীন।

এই বিষয়ে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মনোযোগী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

উচ্চসাহিত্য ও উচ্চশিক্ষা

যাঁহারা স্কুলে ও কলেজে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের উপযোগী বহু শিক্ষণীয় বিষয়—যথা, ভূগোল, বিজ্ঞান, উদ্ভিদতত্ত্ব, জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রভৃতি বহু বিষয়ক জ্ঞান সিনেমার দ্বারা প্রচারিত হইতে পারে। আমাদের শিক্ষা-বিভাগগুলি এই বিষয়ে মনোযোগী হইলে অনেক কাজ হইতে পারে।

অভিজ্ঞতায় দেখা যাইতেছে যে আজকাল চলচ্চিত্রে উচ্চসাহিত্যের স্থান ক্রমশই সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। ইহা ভাবিবার বিষয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে কতকগুলি রোমাঞ্চকর ঘটনাবহুল মামুলী শ্রেণীর গল্পকেই প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে। অথচ লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদের রচনা সিনেমার উপযোগী করিয়া পরিবেশন করিবার তেমন চেষ্টা দেখা যায় না।

আজকাল যে-সকল তথাকথিত সিনেমা-সাহিত্যিকেরা গল্প ও নাটকাদি (বোধ হয় চিত্র-পরিচালকদের ফরমায়েসী) রচনা করেন, সেই সব সিনেমা-সাহিত্যিকদের অন্য দিকে কোনও প্রতিভা আছে কিনা জানি না কিন্তু সাহিত্য-প্রতিভা নাই। এই সকল রচনা ও অভিনয় দেশের পক্ষে যে অনিষ্টকর সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই সম্বন্ধে সুসাহিত্যিক "বনফুল" তাঁহার অধুনা-প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে যে-সব কথা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন,

"এই যে আমাদের দেশে আজকাল ঘরে ঘরে স্রোতে-ভাসা অনির্দ্দিষ্ট-গতি দায়িত্বজ্ঞানবর্জ্জিত মেরুদণ্ডহীন পরানুচিকীর্ষু যুবক-যুবতীর আবির্ভাব হইয়াছে (ইংরেজিতে যাহাদের 'স্নব' বলে) তাহার মূল কারণ হয়তো অন্য, কিন্তু বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যও যে তাহাতে ইন্ধন-সংযোগ করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। শুধু সাহিত্য নয়, সিনেমাও। যে সাহিত্য ও সিনেমার সহায়তায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার কথা তাহারই সহায়তায় আমরা উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছি। আজকাল সাহিত্য ও সিনেমার প্রধান উপকরণ প্রেম। প্রেম জিনিসটা মন্দ নয়, কিন্তু অশক্ত হীন প্রাণের প্রেম হাস্যকর। দলে দলে লেকে ডুবিলে বা কবিতা লিখিলেই অশক্তের প্রেম মহিমময় হয় না।

"বর্ত্তমানের সাহিত্য ও সিনেমার অজস্রতায় শক্তির মন্ত্র নাই—ইহা আমাদের নির্জ্জীব স্বপ্নবিলাসী মনের পরিচয়। অপরে জীবন ভোগ করিতেছে লোলুপ আমরা দূর হইতে বসিয়া দেখিতেছি এবং ঢোঁক গিলিতেছি। জীবনকে ভোগ করিবার মত শক্তি নাই। সত্যকার সাহিত্যের বাণী শক্তির বাণী, তাহা উদ্বুদ্ধ করিবে, উন্মত্ত করিবে, উৎসাহ দিবে। শক্তিমান হইলে তবেই সৎ সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব। সকলের সে শক্তি নাই।"

এই সম্পর্কে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় আমাদের একটি আশঙ্কার কথা শুনাইয়াছেন। তিনি তাঁহার একটি অভিভাষণে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন যে,

"আজকাল অবশ্য সিনেমা-অভিনেত্রী ও নৃত্যকলাবিলাসিনী-দের প্রতিপত্তিই অধিক—ময়ূরবাহন সাহিত্যের কুমার-সম্প্রদায় এক্ষণে 'উষার উদয়সম অকুণ্ঠিতা' এই সকল উর্ব্বশীকেই তাঁহাদের ইষ্টদেবীরূপে বরণ করিয়াছেন।"

অর্থাৎ সাহিত্য ও শিল্পকলাই যেখানে মুখ্য হওয়া উচিত সেইখানে উহা গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। ইহা বিশেষ আশঙ্কার কথা সন্দেহ নাই।

সিনেমার পরিচালক ও অধিকারীরা হয়ত মনে করেন

যে, যখন এই জাতীয় চিত্র প্রদর্শন করিয়াই তাঁহাদের ব্যবসা ভাল রকম চলিয়া যাইতেছে (অবশ্য ভাল রকম, চলিতেছে কিনা ইহা আমার পক্ষে বলা সহজ নহে), তখন আর উচ্চশ্রেণীর জিনিস পরিবেশন করিবার চেষ্টা করিয়া অনিশ্চয়তার ভিতরে যাইবার প্রয়োজন কি? কারণ মামুলী চরিত্রগুলি অভিনয় করা যত সহজ, উচ্চাঙ্গের চরিত্রগুলি অভিনয় করা তত সহজ নাও হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের একটা কথা মনে রাখা উচিত যে দেশের প্রতি তাঁহাদেরও নিশ্চয়ই একটা দায়িত্ব আছে; শুধু ব্যবসাই সব নয়। প্রকৃত শিক্ষিত লোকেরা এই সব ছবি দেখিয়া কোনও আনন্দের খোরাক পান কিনা সেই বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সন্দিহান।

উচ্চশ্রেণীর জিনিস পরিবেশন করিতে পারিলে লোক আরও বেশী আনন্দিত হইবে, লোকের রুচি উন্নত হইবে এবং তাহা হইলে ব্যবসাগত লাভ আরও বেশীই হইবে। এই সকল ছবির বিষয়বস্তু যাহাতে আরও উন্নত হয় এবং যাহাতে ইহাদের সাহিত্যিক মূল্য আরও বেশী থাকে সেই জন্য এই সব ছবির বিষয়বস্তু লইয়া উপযুক্ত সমালোচনা হওয়া উচিত। আজকাল সাধারণতঃ যে-সব সমালোচনা নজরে পড়ে, তাহার বেশীর ভাগগুলিতেই দেখা যায় যে, অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা কি রকম অভিনয় করিয়াছেন, কে সুমধুর কণ্ঠে গান গাহিয়াছেন, চিত্রগ্রহণ কেমন হইয়াছে এবং শব্দগ্রহণ পরিষ্কার হইয়াছে কি না—প্রায় এই লইয়াই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে (অবশ্য চলচ্চিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য এই সব বিষয়ের আলোচনাও প্রয়োজন সন্দেহ নাই)। কিন্তু বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা হয় না; বড়জোর মোটামুটিভাবে গল্পাংশটি দেওয়া হয় মাত্র। প্রায়ই বিষয়বস্তুর কোনও সমালোচনা হয় না। এই জাতীয় আলোচনাকে কেহ সমালোচনা না বলিয়া বিজ্ঞাপনের পর্য্যায়ে ফেলিলে অন্যায় হয় না বলিয়া মনে করি। এই সব ছবিগুলির সাহিত্যমূলক সমালোচনার জন্য উপযুক্ত সাহিত্যিকদের মনোযোগী হওয়া উচিত।

এই সম্পর্কে আর একটি আলোচনা নজরে পড়িল। আলোচনা করিয়াছেন কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি লিখিয়াছেন,

"সিনেমার টেক্‌নিক্ বলতে আমার মতে দুটি মাত্র টেক্‌নিক্। একটি যন্ত্র ব্যবহারের টেক্‌নিক্, আর একটি গল্প ব্যবহারের টেক্‌নিক্। আজকাল প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, যন্ত্র ব্যবহারের টেক্‌নিক্‌টা অনেকেই আয়ত্ত ক'রে ফেলেছেন। আয়ত্ত করতে পারেন নি শুধু গল্প ব্যবহারের টেক্‌নিক্‌টি।

"অথচ গল্প ছাড়া সিনেমা আর কিছুই যখন বলে না, তখন গল্পটিই আসল। এই গল্পটিকে প্রকাশ করবার জন্যই তার যন্ত্রপাতি যা-কিছু সব।

"সিনেমার নিজস্ব একটি ধর্ম আছে। সে ধর্মটি তার গতি ও ছন্দ।

"আবার গল্পেরও একটি ধর্ম আছে সে ধর্ম তার রূপ ও রস। এই দু'য়েরই ধর্ম বজায় রেখে দুইকে এক করাই সিনেমা-শিল্পীর বড় কাজ। অথচ প্রায়ই দেখি, এই দুইকে এক করার দুরূহ কর্ম করতে গিয়ে সিনেমার চিত্র-নাট্যকারেরা সর্ব প্রথমেই গল্পটিরই ধর্ম নষ্ট করে বসেন।...

"আর সেই জন্যই আমাদের দেশে দেখা যায়, যতগুলি গল্প সিনেমায় রূপান্তরিত হয়েছে, কোনটিই তার স্বধর্ম রক্ষা করতে পারে নি। এবং তার ফলে কোনও গল্পই রূপে রসে সঞ্জীবিত হয়ে দর্শক-সাধারণের মনে তার চিরস্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় নি।

"আমাদের সিনেমার চিত্র-পরিচালকদের পক্ষে এ বড় কম লজ্জার কথা নয়। গল্প তাঁরা বাইরে থেকে নির্বাচনই করুন, কিম্বা নিজেরাই রচনা করুন, কোনও ক্ষতি নেই, কিন্তু এইটুকু তাঁরা যেন সর্বদাই মনে রাখেন—গল্প রচনা একটা যা-তা খামখেয়ালী ব্যাপার নয়, একেও হৃদয় দিয়ে সৃষ্টি করতে হয়—এও বস্তুসৃষ্টির মতই একটা অমোঘ নিয়মের অধীন। জগতের প্রত্যেকটি অণুপরমাণুর মধ্যে প্রকাশের যে একটা দুরন্ত আবেগ আমরা প্রতিনিয়তই লক্ষ্য করছি, সেই একই আবেগ গল্প লেখকের মনোবৃত্তির মধ্যে অলক্ষ্যে কাজ করতে থাকে, তাই সেখানে এতটুকু ভুলচুক হ'লেই আগাগোড়া সব যায় গোলমাল হয়ে, কোনও কিছুর মধ্যেই কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আর খুঁজে পাওয়া যায় না, রূপ ও রস বিকাশের প্রণালী যায় রুদ্ধ হয়ে।

তাই আমরা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করছি—শুধু একই কারণে সিনেমার রসসৃষ্টির আবেদন দর্শক সাধারণের কাছে ধীরে ধীরে কমে আসছে। বাংলা দেশের যে-সব কৃতী সাহিত্যসেবী তাঁদের আজীবনের সাধনা ও বিধিদত্ত ক্ষমতা দিয়ে কথা-সাহিত্যকে যে মর্যাদা দান করেছেন, আজ সিনেমা-রচিত গল্প-

গুলি তাঁদের সে সাধনালব্ধ আদর্শকে যে যথেষ্টপরিমাণে ক্ষুণ্ণ করছে, সে-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।"

উপযুক্ত সাহিত্যিকদের সমালোচনাই হওয়া উচিত চলচ্চিত্রের সাহিত্যিক মূল্য নির্দ্ধারণের মাপকাঠি। সাহিত্যিকদের মনোযোগ এই দিকে আকৃষ্ট হওয়া বিশেষ আবশ্যক। প্রয়োজনবোধে তাঁহাদিগকে কঠোরও হইতে হইবে; নিরপেক্ষ যে হইতে হইবে এ-কথা বলাই বাহুল্য। মোটের উপর আবর্জ্জনা দূর হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

পরিশেষে নিবেদন, এ-কথা বলা আমার মোটেই উদ্দেশ্য নহে যে আজ পর্য্যন্ত যে-সমস্ত বাংলা চলচ্চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার একটিরও কোনও সাহিত্যিক মূল্য নাই। ভাল ভাল কিছু জিনিস যে একেবারেই হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহা অযথেষ্ট। এই সম্পর্কে যে-সব অভাব ও অভিযোগের প্রশ্ন আমার মনে উদিত হইয়াছে তাহারই কিঞ্চিৎ এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছি মাত্র।

দুঃখ-রাগিণী

শ্রীকালিদাস রায়

দুঃখ-বেদনার
রাগিণী গাহিবার
তরে এ জনমের
সমূহ অভিযান।

আকুল বীণাখানি
কাঁপিয়া উঠে জানি
করেতে কতবার
তুলিতে সেই তান।

এস হে অচ্যুত,
চরণ বিচ্যুত,
চলিতে বাধাযুত
লও হে কর ধরি।

তোমারি সন্তান
কত না শোকতান
তুলিবে মহীয়ান,
জীবন-বীণাপরি'।

এ বীণা আজ হ'তে
লও গো তব সাথে
হৃদয়-বেদনাতে
বাজাতে নারি তায়।

তুমি যে "সুর তোল,
বেদনা দুখ ভোল,
চরণে পথ চল,"
কহিছ কত হায়।

আমি তা কিসে পারি
পরাণে যাই হারি
যাতনা-বিষে মরি
কেমনে আঁখি রুধি ?

জ্বলনে জ্বলে যাই
তুমি কি দেখ তাই
ওগো ও নিঠুরাই
কেমনে সম্বুধি ?

কবে যে শোধনের,
আত্মবোধনের
রাগিণী মহীয়ান
উঠিবে বাজি শেষ,

তারি সে পরশের
মহান হরষের
তরেতে চেয়ে আছি
ওগো ও হৃদয়েশ।

তোমারি ছন্দের
কুসুম-গন্ধের
অরূপ রূপ আজি
লুটিতে চায় প্রাণ,

তোমারে সাজাব যে
আঁখির বারি সাজে
তাহারি রূপ রাজে
পরাণে মহীয়ান।

বৃত্তিনির্ণয় ও মনোবিদ্যা

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বর্ণাশ্রম ভারতের একটি প্রাচীন ধর্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে বর্ণাশ্রম বিভক্ত। প্রত্যেক বর্ণের জন্য একটি করিয়া পৃথক্ বৃত্তি নির্দিষ্ট ছিল। অনুমান হয়, চারি প্রকার বৃত্তির জন্যই চারিটি বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল। হয়ত, তখনকার সামাজিক অবস্থা সহজ ও সরল ছিল বলিয়া বৃত্তিসমষ্টিকে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা সম্ভব হইয়াছিল। প্রত্যেককে স্ব-স্ব বর্ণানুযায়ী বৃত্তি গ্রহণ করিতে হইত। আবার ব্যক্তিবিশেষের গুণাগুণ অনুসারে বর্ণোন্নতি বা অবনতির ব্যবস্থা ছিল। ইহা হইতে মনে হয়, বর্ণের গুণাগুণ বিচার করিয়াই নির্দিষ্ট বৃত্তি গ্রহণের বিধি সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। হিন্দুসমাজে আজও বর্ণাশ্রম প্রচলিত; কিন্তু বর্ণবিশেষের নির্দিষ্ট বৃত্তি গ্রহণের এখন আর সে সুযোগ নাই। নানা জাতির সংমিশ্রণের ফলে বর্ণাদির নির্দিষ্ট গুণাগুণের তারতম্য হেতু পূর্বের নির্ধারিত বিধি পালন এখন একেবারেই সুফলপ্রদ নহে। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে বৃত্তি গ্রহণ বিষয়ে নানাবিধ জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। বর্তমান ভারতে হিন্দু ব্যতীত অন্যান্য নানা ধর্মাবলম্বীর সমাবেশ হইয়াছে এবং সকল শ্রেণীর মধ্যেই বৃত্তি-সমস্যা পরিস্ফুট ভাবে দেখা যাইতেছে।

কোন্ ব্যক্তি কি প্রকারের বৃত্তি গ্রহণে উপযুক্ত বা কোন্ বৃত্তিতে কিরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তির প্রয়োজন এ-বিষয়ে জনসাধারণের কোনরূপ স্পষ্ট ধারণা না থাকায় পরিশ্রম ও সময় বৃথা নষ্ট হইতেছে। নিজের শক্তি বা গুণাদি কোন্ বৃত্তির উপযোগী তাহা বিচার না করিয়াই যিনি যেমন সুবিধা পাইতেছেন, তিনি তেমন বৃত্তিই গ্রহণ করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা ভাগ্যবান্ তাঁহারা হয়ত প্রথম-প্রয়াসলব্ধ বৃত্তিতেই আশাতীত সাফল্য লাভ করিলেন। অপেক্ষাকৃত মন্দ ভাগ্য যাঁহাদের, তাঁহারা হয়ত নানা বৃত্তি গ্রহণানন্তর অবশেষে এমন একটি বৃত্তি গ্রহণ করিলেন যাহাতে কোন প্রকারে দুঃখকষ্টে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। আবার এমনও অনেকে আছেন যাঁহারা জীবনে কোনরূপ বৃত্তি গ্রহণের সুযোগই পাইলেন না।

উপযুক্ত বৃত্তি স্থির করিতে না পারায় অযথা সময় ও শক্তির অপব্যবহারে সমাজের অপরিমিত ক্ষতি হইতেছে। এই অকল্যাণ নিবারণের জন্য পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে বহু বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠান তদ্দেশীয় ব্যক্তিবর্গের উপযুক্ত বৃত্তি নির্ধারণ বিষয়ে সাহায্য করিতেছেন। প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট মনোবিজ্ঞানিগণ গবেষণার দ্বারা বৃত্তিসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া কোন্ বৃত্তির সাফল্য লাভ করিতে কি প্রকারের গুণ থাকা প্রয়োজন তাহা নির্ণয় করিয়াছেন এবং নানা বিষয়ে দক্ষতা ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নিরূপণের জন্য বহু অভীক্ষা (tests) উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই সকল অভীক্ষা বিদ্যালয়ের পরীক্ষা হইতে ভিন্ন প্রকারের। বিদ্যালয়ের পরীক্ষা হইতে ছাত্রের পাঠ্যবিষয়ে উৎকর্ষ জানা যায় আর এইরূপ অভীক্ষাদ্বারা পরীক্ষার্থীর সহজাত বুদ্ধি, প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, বিশিষ্ট দক্ষতা ইত্যাদি বৃত্তি-নিরূপক গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। যে-বৃত্তির উপযোগী গুণাদির সহিত অভীক্ষায় প্রকাশিত পরীক্ষার্থীর গুণ ও প্রকৃতির ঐক্য দেখা যাইবে, সেই বৃত্তি গ্রহণই যে পরীক্ষার্থীর পক্ষে মঙ্গলজনক তাহা অবিসম্বাদিত। এই পদ্ধতি অনুসারে পাশ্চাত্য-দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যক্তিবিশেষের উপযুক্ত বৃত্তিবিষয়ে উপদেশ দিয়া স্থানীয় সমাজের নানা প্রকার হিতসাধন করিতেছেন। আমাদের দেশে ঐরূপ প্রতিষ্ঠানের অভাব অনুভূত হওয়ায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় আড়াই বৎসর পূর্বে মনোবিদ্যা-বিভাগের অন্তর্গত একটি ব্যবহারিক শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই শাখা পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত অভীক্ষাসমূহ হইতে কতকগুলি নির্বাচন করিয়া তাহা এই দেশোপযোগী করিয়া লইয়াছেন

এবং পরীক্ষার্থীর গুণাগুণ নির্ধারণের জন্য প্রয়োগ করিতেছেন।

বৃত্তি বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য ব্যবহারিক শাখা যে যে অভীক্ষা প্রয়োগ করেন তাহার তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হইল।

১। বুদ্ধি অভীক্ষা—বাচনিক (Intelligence test)—এই শ্রেণীর অভীক্ষায় পরীক্ষার্থীর বিমূর্ত (abstract) বুদ্ধির পরিমাপ করা যায়। বিমূর্ত বুদ্ধির পরিমাপ করিতে গেলে বিভিন্ন বিষয়ে স্মরণশক্তি, বিভিন্ন প্রকারের যুক্তিশক্তি ইত্যাদি প্রশ্নোত্তর সাহায্যে নির্ণয় করিতে হয়।

২। বুদ্ধি অভীক্ষা—কায়িক (Performance test)—এই শ্রেণীর অভীক্ষায় বিশেষ বিশেষ কার্মিক সমস্যার সমাধান-ক্ষমতা দ্বারা পরীক্ষার্থীর মূর্ত (concrete) বুদ্ধি পরিমাপ করা যায়। কতকগুলি কাষ্ঠফলককে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধান উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ ভাবে সাজাইতে হয়।

৩। বিশিষ্ট দক্ষতা অভীক্ষা—(ক) যান্ত্রিক (mechanical ability)—এই অভীক্ষায় প্রাপ্ত সাফল্যাঙ্ক (score) দ্বারা ছাত্রের যান্ত্রিক দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের কতকগুলি বিযুক্ত অংশ যথাস্থানে সাজাইয়া যন্ত্রটিকে পুনর্নির্মাণ করিতে হয়।

(খ) হস্তসাধ্য (manual ability)—কত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত ছাত্র যন্ত্রাংশ বা বস্তু নির্দিষ্ট ভাবে সাজাইতে পারে তাহা দেখা হয়। কতকগুলি বা লৌহ-যন্ত্রাংশ পরীক্ষার্থীকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সাজাইতে বলা হয়। যতগুলি কাষ্ঠফলক বা যন্ত্রাংশ ঐ সময়ের মধ্যে সে উপযুক্ত ভাবে সাজাইতে পারে, তাহাই তাহার হস্তসাধ্য দক্ষতার পরিমাপ।

(গ) পরিচালনা (manual dexterity)—সূচে সুতা পরাইবার অনুরূপ কতকগুলি বিশেষ কার্য পরীক্ষার্থীকে পুনঃপুনঃ করিতে হয়। ইহাতে পরিচালনা-নৈপুণ্য ধরা পড়ে।

(ঘ) নির্মাণ (constructional ability)—ছাত্রকে নানা আকারের কাষ্ঠফলক দেওয়া হয় ও তাহার ইচ্ছানুযায়ী সে গাড়ী, বাড়ী ইত্যাদি যে-কোন বস্তু নির্মাণ করে। নির্মিত বস্তুর পরিকল্পনা ও সম্পাদনার উপর তাহার নির্মাণ-নৈপুণ্যের পরিমাপ হয়।

(ঙ) অঙ্কন (drawing)—ছাত্রকে মন হইতে ও প্রদর্শিত আদর্শানুরূপ চিত্র অঙ্কিত করিতে হয়।

৪। বিদ্যা পরিমাপ অভীক্ষা (scholastic tests): (ক) ভাষাজ্ঞান (linguistic)—বিদ্যালয়ের ফলাফল দেখিয়া বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রের কিরূপ অধিকার জন্মিয়াছে, তাহার পরিমাপ করা হয়।

(খ) শ্রুতিলিখন (dictation)—ছাত্রকে পাঠ শুনিয়া লিখিতে বলা হয়।

(গ) পঠন (reading)—ছাত্রের প্রবন্ধ পাঠের রীতি দক্ষতা প্রভৃতি লক্ষ্য করা হয়।

(ঘ) পাটীগণিত (arithmetic)—ছাত্রকে বিশেষ বিশেষ প্রকারের অঙ্ক কষিতে দেওয়া হয়।

৫। মানসিক প্রকৃতি অভীক্ষা (temperamental tests)—(ক) অন্তর্বৃত্তি ও বহির্বৃত্তি (introversion-extroversion)—যে লোকের ভাবধারণা বা চিন্তাধারা সাধারণত নিজ অন্তরের দিকে নিবদ্ধ বা অন্তর্মুখ, তাহার মানসিক বৃত্তিকে অন্তর্বৃত্ত বলা হয়। অন্তর্বৃত্ত ব্যক্তি প্রায়শ লাজুক হয় এবং জনসমাজে সহজে মিশিতে পারে না। বহির্বৃত্ততা ইহার বিপরীত মনোবৃত্তি। বহির্বৃত্ত ব্যক্তি খুব সহজেই লোকসমাজে মিশিয়া বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে পারে। ৫০টি ভাব লইয়া এই অভীক্ষা গঠিত। অভীক্ষা-লিখিত ভাব ছাত্রের প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর মাত্র এই বিবেচনা করিয়া ছাত্র অন্তর্বৃত্তিসম্পন্ন কি বহির্বৃত্তি-সম্পন্ন ইহা নির্ধারণ করা হয়।

(খ) অধ্যাত্মীয় যুগ্মপ্রশ্ন (subjective paired questions)—এই অভীক্ষা দ্বারা ইহাই দেখা হয় যে ছাত্র তাহার নিজের সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা পোষণ করে। বিশেষ প্রকারের ধারণা পোষণ বিশেষ মানসিক প্রকৃতির লক্ষণ। ৩০টি যুগ্ম প্রশ্ন লইয়া এই অভীক্ষা গঠিত। প্রশ্নের এক অংশ অন্য অংশের বিপরীত। যেমন, "তুমি সাহসী কি ভীরু?" এই অভীক্ষায় অপরের মতামতের উপর নির্ভর না করিয়া ছাত্রের নিজের মতামত অনুসারে তাহাকে উত্তর দিতে উপদেশ দেওয়া হয়। এই উপায়ে

প্রাপ্ত উত্তর বিবেচনা করিলে ছাত্র নিজের সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা পোষণ করে তাহা ধরা পড়ে।

(গ) মানসিক বিশেষত্ব (mental constitution)—এই অভীক্ষা দ্বারা ছাত্রের কোন মানসিক বিকৃতি বা রোগপ্রবণতা থাকিলে তাহা ধরা পড়ে। ছাত্রকে নানা রূপ প্রশ্ন করা হয়, যথা—(১) ঘুমন্ত অবস্থায় কি কখনও চ'লে বেড়াও? (২) মাঝে মাঝে কোন বস্তুতে আগুন লাগিয়ে দেবার দুর্দমনীয় ইচ্ছা হয় কি? (৩) আত্মহত্যা করবার প্রবল ইচ্ছা কখনও হয়েছিল কি? ইত্যাদি। প্রশ্নের উত্তর হইতে ছাত্রের মনোবিকারের কোনরূপ সম্ভাবনা আছে কি না তাহা জানা যায়।

(ঘ) শব্দানুসঙ্গ (word association)—ছাত্রকে পরে পরে এক শতটি কথা শোনান হয়। যথা—ঘোড়া, বাড়ী, ছুরি, রক্ত প্রভৃতি। প্রত্যেক কথা শুনিবামাত্র ছাত্রের মনে প্রথম যে কথা বা ভাব উদয় হয়, ছাত্রকে তৎক্ষণাৎ তাহা বলিতে হয়। উত্তর দিতে কত দেরি হইল, ছাত্র কি উত্তর দিল ইত্যাদি লিখিয়া রাখা হয়। এই উপাত্য-গুলি (data) বিবেচনা করিয়া ছাত্রের নির্জ্ঞানে (unconscious) অবস্থিত মনোভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। নির্জ্ঞানস্থিত মনোভাব অনেক সময় আমাদিগকে বিশেষ বিশেষ বৃত্তি নির্বাচনে প্ররোচিত করে।

৬। মনোবৃত্তি পরীক্ষা (psychological tests): প্রতিক্রিয়া-কাল (reaction time)—ইঙ্গিত পাইবামাত্র ছাত্র কত শীঘ্র কার্য্য করিতে পারে তাহা যন্ত্রসাহায্যে পরিমাপ করা হয়।

৭। শারীরিক পরীক্ষা (physical examination)—চিকিৎসক দ্বারা ছাত্রের স্বাস্থ্য, দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি, শারীরিক পুষ্টি ও পরিশ্রমের ক্ষমতা ইত্যাদি দেখা হয়। কোন শারীরিক রোগের প্রবণতা আছে কি না তাহাও নির্ণয় করিয়া অভিভাবককে সেই বিষয়ে যত্ন লইবার জন্য অনুরোধ করা হয়।

৮। সাক্ষাতে আলাপ ও আলোচনা (interview)—ছাত্রের সঙ্গে অভীক্ষক আলাপ ও আলোচনা করিয়া তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা, বৃত্তির সুযোগ-সুবিধা, বিশেষ বৃত্তি অবলম্বনে সাফল্যের সম্ভাবনা আছে কি না, প্রভৃতি তথ্য সংগ্রহ করেন এবং ছাত্রের কথাবার্তা চালচলন দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণায় উপনীত হন।

অদ্যাবধি ব্যবহারিক শাখা বহু ছাত্রছাত্রীর অভীক্ষা গ্রহণ করিয়া উপযুক্ত বৃত্তি বিষয়ে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন এবং এখনও বহু বৃত্তিগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিকে সেই বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। বৃত্তি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে অভীক্ষা দ্বারা ছাত্রের গুণাগুণ ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা ছাড়াও ছাত্রের পারিবারিক, আর্থিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে নানা তথ্য জানা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে ব্যবহারিক শাখার এক জন প্রতিনিধি বিদ্যালয়ের ছাত্রের অভিভাবকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি সংগ্রহ করেন। পরীক্ষার্থী সম্বন্ধে এইরূপে প্রাপ্ত যাবতীয় তথ্য, তাহার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও গুণাদি সমস্তই বিবেচনা করিয়া ভবিষ্যতে তাহার পক্ষে কিরূপ বৃত্তি গ্রহণ করা সমীচীন বা সে কোন্ বৃত্তি গ্রহণে উপযুক্ত বা ভবিষ্যতে উপদিষ্ট বৃত্তি গ্রহণ করিতে হইলে তাহার কি প্রকারের শিক্ষালাভ করা উচিত, ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয় এবং উপদেশ-লিপি অভিভাবকের নিকট প্রেরিত হয়।

মনোবিদ্যা-বিভাগের ব্যবহারিক শাখা যে কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সাফল্য বহু পরিমাণে ছাত্রের অভিভাবক ও শিক্ষক মহাশয়গণের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। ব্যবহারিক শাখার এইরূপ বৃত্তিসমস্যা সমাধান চেষ্টা সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিবে, আশা করা যায়।

আরোগ্য

শান্তিনিকেতনে গত ৭ই পৌষ উৎসবের ভাষণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি আশ্রমে উপস্থিত আছি অথচ ৭ই পৌষের উৎসবের আসন গ্রহণ করতে পারিনি এরকম ঘটনা আজ এই প্রথম ঘটল। আমার বার্ধক্য এবং আমার রোগের দুর্বলতা আমাকে সমস্ত বহির্বিষয় থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। আজ আমার সেই দূরত্ব থেকে তোমাদের যদি কিছু বলি তো সংক্ষেপে বলব। কেননা বাহিরের কোনো কাজে অধিকক্ষণ মনোযোগ দিতে আমার নিষেধ আছে, কেবল যে ডাক্তারের তা নয়, আমার রোগজীর্ণতারও।

যৌবনের তেজ যখন প্রখর ছিল ভাবতুম বার্ধক্যটা একটা অভাবাত্মক দশা, অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে সমস্ত শক্তি হ্রাস হয়ে সেই দশা মৃত্যুর সূচনা করে। কিন্তু আজ আমি এর ভাবাত্মক দিক ক্রমশ উপলব্ধি করতে পারছি। সত্তার যে বহিরঙ্গ, যাকে আমরা অহং নাম দিতে পারি, তার থেকে শ্রদ্ধা ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছে। ঠিক মনে হচ্ছে যেমন পরিণত ফল তার বাহিরের খোসাতে আর আসক্ত হয়ে থাকে না, সেই খোসাটা ক্রমশ তার পক্ষে নিরর্থক হয়ে ওঠে। তখন তার প্রধান সম্পদ হয় ভিতরের শস্য। কাঁচা অবস্থায় সেই শস্যের পরিণতরূপ সে অনুভব করতে পারে না, এইজন্যে তাকে বিশ্বাস করে না। তখন সে আপনার বাহিরের পরিচয়েই বাহিরে পরিচিত হ'তে চেষ্টা করে, সেখানে কোনো আঘাত পেলে সে পরম ক্ষোভের বিষয় ব'লে মনে করে। বৃদ্ধ বয়সে তার বিপরীত দশা ঘটে। সে অন্তরের পূর্ণতার মধ্যে আপনাকে যত উপলব্ধি করতে পারে ততই একটা পরম আশ্বাস লাভ করে এবং ততই বাহিরের ক্ষতি অথবা অসম্মান তাকে আর ক্ষুব্ধ করতে পারে না। এ-কথা কেউ যেন না মনে করে, এটা একমাত্র বৃদ্ধ বয়সেরই অধিকারগত। বস্তুত অল্প বয়সে আমরা সংসারের বহিরঙ্গকেই সম্পূর্ণ মূল্য দিই ব'লেই সংসারে এত অশান্তি ঘটে এবং মিথ্যার সৃষ্টি হ'তে থাকে। কেননা এই বাহিরের দিকেই আমরা পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন এবং একমাত্র আপনার মধ্যেই আবদ্ধ।

আজ আমি রোগের দশা অতিক্রম করছি ব'লেই আরোগ্য কা'কে বলে সেটা বিশেষভাবে অনুভব করি, কিন্তু যথার্থ আরোগ্য সে জীবনের সকল অবস্থারই সম্পদ। সেই আরোগ্যে আমরা সমস্ত বিশ্বভুবনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যোগস্থাপন করতে পারি। জগতে আমাদের অস্তিত্ব আনন্দময় হয়ে ওঠে। তখন আমাদের দেহের অনুকূল অবস্থা। এই যে আরোগ্যতত্ত্ব এটা দেহের অন্তরবিভাগের সম্পদ, অলক্ষ্যে সকল দেহে ব্যাপ্ত হয়ে কাজ করে। অসুস্থ হ'লেই সেই অন্তর্গূঢ় সামঞ্জস্য ভেঙেচুরে গিয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পীড়িত করতে থাকে। তখন তার বিরোধের অবস্থা। সেই রকম আমাদের সত্তার যে অন্তরবিভাগে আধ্যাত্মিক সত্য পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে তার প্রভাব যখন অক্ষুণ্ণ হয়, তখন সর্বত্র তার শান্তি এবং সকলের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য। এই আন্তরিক সম্পূর্ণতাকে উপলব্ধি করবার সাধনায় কোনো বয়সের ভেদ নেই। তরুণ অবস্থায় নানাপ্রকার আসক্তির আবিলতায় এই উপলব্ধির ব্যাঘাত ঘটে, কিন্তু যাঁরা তাকে অতিক্রম ক'রে আপনার আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারেন তাঁরা সর্বত্র শান্তিলাভ করেন। কারণ তাঁরা মানবতার সত্যকে অনুভব করতে পারেন এবং তাঁদের ভয় থাকে না, তাঁরা মৃত্যুকে অতিক্রম করেন।

মানব-ইতিহাসে কোনো কোনো জাতির মধ্যে এই সত্যের উপলব্ধির ইতরবিশেষ দেখা যায়। য়ুরোপীয় সভ্যতা প্রথম থেকেই বাহিরে আপনার সার্থকতা অন্বেষণ করেছে এবং লোভকে কর্ণধার ক'রে দেশে দেশে বিশেষভাবে এসিয়ায় ও আফ্রিকায় দস্যুবৃত্তি দ্বারা ধনসঞ্চয় করেছে। যে-বিজ্ঞান যথার্থ আত্মসাধনার সহায় তাকে বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথ থেকে ভ্রষ্ট ক'রে জগতে মহামারি বিস্তার করেছে। এই দুর্গতির অন্ত কোথায় জানি নে। অপর পক্ষে কোনো কোনো জাতি অপেক্ষাকৃত সহজে তাদের স্বভাবকে অনুসরণ ক'রে বাহিরের চিত্তবিক্ষেপ থেকে শান্তিলাভ ক'রে এসেছে। তারা বিবাদ ক'রে লড়াই ক'রে মানুষের গৌরব সপ্রমাণ করতে চায় নি। বরঞ্চ লড়াই করাকে তারা বর্বরতা ব'লে জ্ঞান করেছে। চীন তার প্রধান দৃষ্টান্ত। বহু শতাব্দী ধ'রে আপনার সাহিত্য, অতুলনীয় শিল্প ও অতিগভীর তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে মনকে সম্পদশালী ক'রে রাখতে পেরেছে। মানুষের চরম

সত্য যে তার অন্তরে সঞ্চিত এই কথাটা যতই তারা জীবনের ব্যবহারে সপ্রমাণ করেছে ততই তারা মহতী প্রতিষ্ঠা পেয়ে এসেছে। আজ লোভের সঙ্গে বিজ্ঞানবাহন রিপুর সঙ্গে তার শোচনীয় বিরোধ ঘটল।

আমাদের বিশ্বাস, একদিন যখন এই বিরোধের অবসান হবে তখন চীন তার সেই চিরন্তন প্রাচীন শান্তিকে পুনরায় পৃথিবীতে স্থাপন করতে পারবে। কিন্তু যারা লোভকে কেন্দ্র করেছে তারা জয়লাভ করলেও আত্মপরাভবের বিপত্তি থেকে কোনোদিন রক্ষা পাবে কি না সন্দেহ করি। এই লোভের শেষ পরিণাম মহতী বিনষ্টি। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, পরস্পরের অর্জিত সম্পদের প্রতি লুব্ধ হস্তক্ষেপ, এই অভ্যাস অনার্য অভ্যাস এবং এই অভ্যাস মাদকতার মতো শরীরমনকে অভিভূত ক'রে রাখে। তার থেকে নিজেকে উদ্ধার করা পরম আঘাতেও অসাধ্য। ইতিহাসের এই নিষ্ঠুর শিক্ষা দেশকে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রত্যেককেই মনের ভিতর ধ্যান করতে হবে। কারণ পাশ্চাত্য সংক্রামকতা আমাদের জাতির মধ্যে প্রবেশ ক'রে ভারতবর্ষের পুরাতন আধ্যাত্মিক বীর্যকে প্রতিদিন পরাস্ত করছে। ঋষিবাক্যে যে পরম মন্ত্র একদিন আমরা পেয়েছিলেম সে হচ্ছে শান্তং শিবং অদ্বৈতং—এক সত্যের মধ্যে সত্যের এই তিন রূপ বিধৃত। শান্তি এবং কল্যাণ এবং সর্বমানবের মধ্যে ঐক্য,—এই বাণীর তাৎপর্য মানুষকে তার সত্য পরিচয়ে উত্তীর্ণ করতে পারে কারণ মানবের ধর্ম পরস্পর প্রীতির মিলন, ব্যবহারে কল্যাণ ও শান্তিকে অক্ষুণ্নভাবে স্বীকার করা। আমি এই কামনা করি আমাদের পিতামহের মর্মস্থান থেকে উচ্চারিত এই বাণী আমাদের প্রত্যেকের ধ্যানমন্ত্র হয়ে জগতে শান্তির দৌত্য করতে থাক্।

যে সমাজ আত্মার পরিবর্তে বহির্বিষয়কে একান্ত প্রাধান্য দেয়, সে আপন লোভের সঞ্চয় দিয়ে অন্যকে আঘাত করে এবং সেই লোভের সঞ্চয়ই তার ফিরে আঘাতের বিষয় হয়। এই আঘাত-প্রত্যাঘাতের কোনোদিন কোথাও অন্ত দেখা যায় না। শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে সে এই লোভের দুর্গকে দৃঢ়তর করতে থাকে, পরাস্ত হ'লে দৃঢ়তর প্রয়াসে তার অনুসরণ করতে থাকে। তখন পৃথিবীর যে-সকল জাতি বাহুবলে তার সমান নয় তাদের স্বাধীন কৃতার্থতার পথ অবরুদ্ধ করে ফেলে। এই লোভরিপু-প্রধান সভ্যতা পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকে হেয় ক'রে রাখবার পেষণযন্ত্র হয়ে থাকে, কারণ লোভ প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ্য করতে পারে না। এ রকম সভ্যতাকে সভ্যতা নাম দেওয়া যায় না, কেননা সভ্যতা সর্বমানবের সম্পদ। অধুনাকার মহাযুদ্ধের অধিনায়কদের অন্তত এক পক্ষ ব'লে থাকেন তাঁরা সমস্ত মানবের জন্য লড়াই করছেন। কিন্তু নিজেদের গণ্ডির বাহিরের মানুষকে মানুষ বলেই গণ্য করে না, উদ্ধত লোভরিপুর এই লক্ষণ। কেননা আত্মা যাদের মুখ্য লক্ষ্য নয় আত্মীয়তার বোধসীমা তাদের কাছে সংকীর্ণ। মানুষের সম্বন্ধে অদ্বৈতবুদ্ধি অর্থাৎ অখণ্ড মৈত্রী তাদের কাছে শ্রদ্ধা পায় না। মনে রাখতে হবে একদিন এই মৈত্রী প্রচার করবার জন্য সেদিনকার বুদ্ধভক্ত ভারত প্রাণান্ত স্বীকার ক'রেও দেশে বিদেশে অভিযান করেছিল, পরসম্পদকে আত্মসাৎ করবার জন্য নয়।

পাশ্চাত্য অলংকার-মতে মহাকাব্য যুদ্ধমূলক। মহাভারতের আখ্যানভাগেরও অধিকাংশ যুদ্ধবর্ণনার দ্বারা অধিকৃত—কিন্তু যুদ্ধেই তার পরিণাম নয়। নষ্ট ঐশ্বর্যকে রক্তসমুদ্র থেকে উদ্ধার ক'রে পাণ্ডবের হিংস্র উল্লাস চরমরূপে এতে বর্ণিত হয় নি। এতে দেখা যায় জিত সম্পদকে কুরুক্ষেত্রের চিতাভস্মের কাছে পরিত্যাগ ক'রে বিজয়ী পাণ্ডব বিপুল বৈরাগ্যের পথে শান্তিলোকের অভিমুখে প্রয়াণ করলেন—এ কাব্যের এই চরম নির্দেশ। এই নির্দেশ সকল কালে সকল মানবের প্রতি। যে ভোগ একান্ত স্বার্থগত, ত্যাগের দ্বারা তাকে ক্ষালন করতে হবে। যে ভোগে সর্বমানবের ভোজের আহ্বান আছে সভ্যতার স্বরূপ আছে তার মধ্যে। কিন্তু রিপু অতি প্রবল, সাধনা অতি দুরূহ। সেই কারণেই এই সাধনায় যতদূর সিদ্ধিলাভ করা যায়, মনুষ্যত্বের গৌরব ততদূর প্রসারিত হ'তে থাকে, ব্যাপ্ত হ'তে থাকে তার সভ্যতা।

যুগ প্রতিকূল, বর্বরতা বলিষ্ঠতার মর্যাদা গ্রহণ ক'রে আপন পতাকা আন্দোলন করে বেড়াচ্ছে রক্তপঙ্কিল মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। কিন্তু বিকারগ্রস্ত রোগীর সাংঘাতিক আক্ষেপকে যেন আমরা শক্তির পরিচয় ব'লে ভুল না করি। লোভ যে সম্পদ আহরণ ক'রে আনে তাকে মানুষ অনেকদিন পর্যন্ত ঐশ্বর্য ব'লে জ্ঞান করে এসেছে এবং অহংকৃত হয়েছে সঞ্চয়ের মরীচিকায়। লোভের ভাণ্ডারকে রক্ষা করবার জন্যে জগৎ জুড়ে' অস্ত্রসজ্জা যুদ্ধের আয়োজন চলল। সেই ঐশ্বর্য আজ ভেঙেচুরে তার ভগ্নাবশেষের তলায় মনুষ্যত্বকে নিষ্পিষ্ট করে দিচ্ছে।

আমার অধিক কিছু বলবার নেই, শক্তিও নেই। মানবসত্যের শেষ বাণী আমাদের দেশে উচ্চারিত হয়েছে, আমি আজ কেবল তারই প্রত্যুচ্চারণ করে বিদায় গ্রহণ করি।

—

সেই পুরাতন কালে ইতিহাস যবে
সংবাদে ছিল না মুখরিত
নিস্তব্ধ খ্যাতির যুগে—
আজিকার এই মতো প্রাণযাত্রাকল্লোলিত প্রাতে
যাঁরা যাত্রা করেছেন
মরণশঙ্কিল পথে
আত্মার অমৃত-অন্ন করিবারে দান
দূরবাসী অনাত্মীয় জনে,
দলে দলে যাঁরা
মরুবালুতলে অস্থি গিয়েছেন রেখে,
সমুদ্র যাঁদের চিহ্ন দিয়েছে মুছিয়া,
অনারব্ধ কর্মপথে
অকৃতার্থ হন নাই তাঁরা,
মিশিয়া আছেন সেই দেহাতীত মহাপ্রাণ-মাঝে
শক্তি জোগাইছে যাহা অগোচরে চিরমানবেরে,
তাঁহাদের করুণার স্পর্শ লভিতেছি
আজি এই প্রভাত-আলোকে,
তাঁহাদের করি নমস্কার।

উদয়ন, শান্তিনিকেতন
১২ ডিসেম্বর, ১৯৪০, প্রাতে

[শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী কর্তৃক লিখিত শ্রুতিলিপি, কবিকর্তৃক অনুমোদিত। গত ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে আচার্য শ্রীক্ষিতিমোহন সেন কর্তৃক পঠিত।]

নীলকণ্ঠ

শ্রীকল্পিতা দেবী

বিশ্বসমুদ্র মন্থন ক'রে
নাগেন্দ্রের উত্তপ্ত নিশ্বাস উঠছে,
প্রাণের সরল গতি তারি চাপে উৎক্ষিপ্ত।
পৃথিবীর পঞ্চভূত নির্মম মূর্তি নিয়েছে,
বিজ্ঞানীর হাতে নিষ্ঠুর রূপ তার
বেরিয়ে পড়েছে,
মনুষ্যত্বকে দলিত ক'রে—
বর্বরের অট্টহাসিতে কাঁপছে ধরণী।
কল্কি অবতারের চোখে ধ্বংসের স্বপ্ন
খসে-পড়া উল্কা বুঝি,
ঠিকরণ চোখের আগুন তার,
তর্জনী স্থির-ইঙ্গিতে বাঁধা চাপা ওষ্ঠে,
নির্দেশ করছে নিদারুণ সমাপ্তি।
ভবিষ্যৎ ভ্রূকুটি-কুটিল অবিচলিত,
প্রতীক্ষা ক'রে আছে দারুণ অন্তিমকে।
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ডেকেছে প্রলয়ের বান,
দিক্-বিদিকে মৃত্যুর করতালি
স্থায়িত্বকে উপহাস ক'রে।
বৃহৎ আকাশ-আবেষ্টনে
কোনো দাগ অবসাদ গ্লানি নেই।
অসীম মণ্ডলে রয়েছে প্রাণবায়ু
বিরাট্ বুকে ঘুমিয়ে—
প্রলয়ের মত্ততা নিয়ত প্রতিহত হচ্ছে
সেই স্তব্ধতায়—
সৃষ্টির বেগমত্ত গতি যুগে যুগে
ধুয়ে মুছে নিচ্ছে যত জঞ্জাল,
যেমন্ বাসুকি-কণ্ঠের গরল
শোষণ করে নিয়েছিল
একই গণ্ডূষে।

পল্লীপথে

শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

জীবনের রহস্যসন্ধানে

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সূর্য্যই এই জাগতিক শক্তির মূল উৎস। আলোকরূপে সূর্য্য তাহার তেজ বিকিরণ করে এবং পৃথিবী এই তেজের কিয়দংশ শোষণ করিয়া লয়। জ্ঞাত অজ্ঞাত শক্তির যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ এই সঞ্চিত তেজেরই বিভিন্ন বিকাশমাত্র। সূর্য্যের তেজ যদি আলোক-রশ্মিরূপে না আসিয়া কয়লা-রূপে আপতিত হইত তবে পৃথিবীর প্রত্যেক একর জমিতে প্রতি মাসে প্রায় দুই হাজার মণ কয়লা সঞ্চিত হইতে দেখা যাইত। বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন ২৪৩ টন কয়লা পোড়াইয়া যে-পরিমাণ শক্তি আহৃত হয়, গ্রীষ্মকালের তিন মাসে প্রত্যেক একর জমিতে সূর্য্য হইতে আলোকরূপে সেই পরিমাণ শক্তি আপতিত হইয়া থাকে। কিন্তু সূর্য্য হইতে আগত এই বিপুল তেজরাশি পৃথিবী সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে না। বিবিধ রাসায়নিক পদার্থকে খাদ্যবস্তুতে পরিবর্তিত করিবার জন্য উদ্ভিদ-জগৎ এই শক্তির শতকরা এক ভাগ মাত্র ব্যবহার করিয়া থাকে; বাকী প্রায় সমগ্র অংশই বাজে খরচে নষ্ট হইয়া যায়।

ফটোসিন্থেসিস্ প্রক্রিয়া পরীক্ষার নিমিত্ত খাদ্যনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থায় কেবলমাত্র পরিস্রুত জলের সাহায্যে চারাগাছগুলি উৎপাদন করা হইয়াছে। খাদ্যের উপাদান নিয়ন্ত্রণ করিয়া পাতার সবুজ কণিকার পরিমাণ ইচ্ছামত হ্রাস বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

কয়লা, গ্যাসোলিন প্রভৃতির অন্তর্নিহিত শক্তি সূর্য্য হইতেই প্রাপ্ত। কিন্তু তাহা হইতে কার্য্যোপযোগী শক্তি আহরণ করা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। কাজেই যদি সোজাসুজি সূর্য্যকিরণ হইতেই আমাদের কার্য্যোপযোগী শক্তি আহরণ করিতে পারিতাম তাহা নিশ্চয়ই সহজলভ্য ও স্বল্পব্যয়সাধ্য হইত। মানুষ আজও তাহা করিতে সমর্থ হয় নাই; কিন্তু চেষ্টার বিরাম নাই। পৃথিবীর পৃষ্ঠে পড়িয়া অপরিমিত সূর্য্যকিরণ অযথা নষ্ট হইতেছে—ইহা বহুকাল হইতেই বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং সূর্য্যকিরণকে সোজাসুজি কাজে লাগাইবার চেষ্টাও চলিতেছে। বহুকাল পূর্ব্বেই বহুসংখ্যক আতসী-কাচের সমবায়ে সূর্য্যকিরণকে সংহত করিয়া বাষ্প উৎপাদন ও তাহার সাহায্যে জলসেচন করিয়া সাহারা মরুভূমির স্থানবিশেষকে উর্ব্বরা ভূমিতে পরিণত করিবার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল। মাসাচুসেটস্ টেকনোলজি ইনষ্টিটিউটের গবেষণাকারিগণ সূর্য্যকিরণ হইতে সোজাসুজি কার্য্যোপ-যোগী শক্তি আহরণের নিমিত্ত গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। অনেক স্থলে আজকাল সূর্য্যকিরণের সাহায্যে সহস্র সহস্র জলাধার উত্তপ্ত করিয়া গরম জল সরবরাহ ও তৎসাহায্যে বাষ্প উৎপাদন করিয়া এঞ্জিন প্রভৃতি চালাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইগুলিকে অবশ্য প্রকৃত কার্য্যকরী ব্যবস্থা বলা যায় না; ভবিষ্যৎ গুরুতর কার্য্যের প্রথম সোপান মাত্র।

ভূমি হইতে জলসরবরাহ করিবার নিমিত্ত বৃক্ষকাণ্ডের অভ্যন্তরে লম্বালম্বি ভাবে অবস্থিত স্প্রিংয়ের মত জড়ানো সূক্ষ্ম সূত্রবৎ পদার্থ। এই স্প্রিং অবলম্বনে জল নীচে হইতে উপরে উঠিয়া থাকে।

যাহা হউক স্মরণাতীত কাল হইতে জীবন-সংগ্রামে নিষ্পেষিত হইয়াও প্রাণী-জগৎ যাহা আয়ত্ত করিতে পারে নাই, এমন কি বুদ্ধিবলে আধুনিক মানুষও আজ পর্য্যন্ত যাহার কিছুমাত্র হদিস পায় নাই, পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভিদ জগৎ সেইরূপ একটি অদ্ভুত কৌশল আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। কৌশলটি হইতেছে সাধারণ জল ও বায়ু হইতে দেহপুষ্টির উপযোগী খাদ্য-প্রস্তুত-প্রক্রিয়া। উদ্ভিদ-জগৎ সূর্য্যকিরণের সাহায্যে অজৈব রাসায়নিক পদার্থসমূহকে শোষণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই খাদ্যে রূপান্তরিত করিয়া দেহের পুষ্টিসাধন করে। উদ্ভিজ্জাত এই খাদ্যবস্তু উদরসাৎ করিয়াই প্রাণী-জগৎ তাহার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রাণী-জগৎ পরানুগ্রহপুষ্ট। উদ্ভিদের অস্তিত্ব না থাকিলে প্রাণী-জগতের অস্তিত্ব সম্ভব হইত না। উদ্ভিদ নিজেই নিজের খাদ্য প্রস্তুত করে, প্রাণীরা তাহা পারে না। উদ্ভিদ হইতে তাহারা সেই খাদ্য সংগ্রহ করে। নিরামিষাশী প্রাণীরা উদ্ভিজ্জরসে শরীর পুষ্ট করে, আমিষাশী প্রাণীরা তাহাদের দেহ উদরসাৎ করিয়া জীবনধারণ করে। ইহাই চিরন্তন রীতি। প্রাণীরা পরভোজীর মত উদ্ভিদ-দেহের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া আছে। কিন্তু উদ্ভিদেরা কি উপায়ে জল, মাটি, বায়ু প্রভৃতি অজৈব পদার্থগুলিকে খাদ্যবস্তুতে রূপান্তরিত করে? ইহা একটি গুরুতর রহস্য। এই রহস্য উদ্‌ঘাটনকল্পে বৈজ্ঞানিকেরা বহুকাল হইতেই অক্লান্তভাবে গবেষণা করিয়া আসিতেছেন। তাহার ফলে কতগুলি তথ্য অধিগত হইলেও প্রকৃত ঘটনাটা আজও অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হয় নাই। যত দূর জানা গিয়াছে তাহার মোটামুটি ব্যাপারটা এই: গাছ শিকড়ের সাহায্যে মাটি হইতে জল টানিয়া লয় এবং পাতার গায়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রমুখে বাতাস হইতে কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড নামক পদার্থ সংগ্রহ করে এবং সূর্য্যকিরণের সহায়তায় সঙ্গে সঙ্গেই এই পদার্থ দুইটিকে চিনি ও অন্যান্য কার্ব্বোহাইড্রেট জাতীয় পদার্থে রূপান্তরিত করে। বৃক্ষের এই খাদ্য-প্রস্তুত-প্রণালীকে 'ফটোসিন্থেসিস' বলা হয়। 'ফটোসিন্থেসিস' অর্থে আলোর সাহায্যে খাদ্যসংগঠন-প্রক্রিয়া বুঝায়। ইহা যে এক প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া এ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই; কিন্তু কি ভাবে এই প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় তাহার কোন সঠিক সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে, দুই হাত লম্বা এবং দুই হাত চওড়া স্থানের মধ্যে যতগুলি পাতা বিছাইয়া রাখা যায়, ততগুলি পাতা কেবলমাত্র জল ও কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড সহযোগে সারাদিনে এক আউন্সের তিন ভাগের এক ভাগ চিনি উৎপাদন খুবই কম করে। কার্ব্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ১০,০০০ ভাগ বাতাসের বাতাসের মধ্যে মধ্যে ৩ ভাগ মাত্র কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড পাওয়া যায়। এই সামান্যপরিমাণ পদার্থ সংগ্রহ করিয়া কি উপায়ে এত দ্রুতগতিতে তাহা হইতে এত অধিকপরিমাণ চিনি উৎপাদন করে, তাহাও এক বিস্ময়কর ব্যাপার। কোন রাসায়নিক তাঁহার পরীক্ষাগারে আজ পর্য্যন্ত উদ্ভিদ-অবলম্বিত প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। যাহা পারিয়াছেন তাহা হইতে প্রকৃত সমস্যার সমাধান হয় নাই। মোটের উপর কি উপায়ে যে উদ্ভিদেরা জলবায়ু হইতে এত সহজে খাদ্যবস্তু উৎপাদন করে তাহা সত্যই

একটা হতবুদ্ধিকর সমস্যা। বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে এই সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছেন।

চার্লস এফ. কেটারিং এই সমস্যাটাকে এই ভাবে দেখিতেছেন যে, ঘাসের বর্ণ সবুজ হয় কেন? এই প্রশ্ন সম্বন্ধে একটু বুঝাইয়া বলা প্রয়োজন। পরীক্ষার ফলে বহু পূর্ব্বেই মোটামুটি ভাবে এ-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গিয়াছে। বৃক্ষপত্রের সবুজ কণিকা বা ক্লোরোফিল সূর্য্যালোকের বর্ণসপ্তকের সমুদয় বর্ণ শোষণ করিতে পারে না। বৃক্ষপত্রকে অ্যালকোহলে ডুবাইয়া গরম করিলে সবুজ কণিকাগুলি বাহির হইয়া আসে। অ্যালকোহলে মিশ্রিত এই সবুজ পদার্থকে বর্ণবিশ্লেষণী যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, সবুজ কণিকাগুলি বর্ণছত্রের লাল এবং নীল রশ্মি সম্পূর্ণভাবে শোষণ করিয়া লইয়াছে এবং কেবলমাত্র সবুজ রশ্মিকেই ছাড়িয়া দিতেছে, এই কারণেই কণিকাগুলি আমাদের চোখে সবুজ বর্ণে প্রতিভাত হয়। ইহাতে কিন্তু আসল প্রশ্নের মীমাংসা হয় না, জটিলতা বাড়িয়া যায়। প্রশ্ন ওঠে, বৃক্ষপত্র কেবল মাত্র সবুজ রশ্মিকেই ছাড়িয়া দেয় কেন? সবুজ রশ্মি হইতে শক্তিসংগ্রহে কেন এবং কি অসুবিধার সৃষ্টি হয় যাহাতে এই খাদ্যসংগঠন-প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটিতে পারে?

আবার কোন কোন বিশেষজ্ঞ সমস্যাটাকে এইভাবে দেখিতেছেন যে, বৃক্ষদেহের অভ্যন্তরস্থ কলকৌশলের কিরূপ কার্য্যপ্রণালী চলিতেছে তাহা জানিতে পারিলে আমরা জীবন-রহস্য উদ্ঘাটনে অনেকদূর অগ্রসর হইতে পারিব। কারণ জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার প্রধান অবলম্বন খাদ্য। অজৈব মৌলিক পদার্থ হইতে একমাত্র উদ্ভিদই খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে। প্রত্যক্ষেই হউক পরোক্ষেই হউক সমগ্র জীব-জগৎ উদ্ভিদের উপরই নির্ভরশীল। পৃথিবী হইতে জীবিত ও মৃত সমুদয় উদ্ভিদের চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গেলে জীব-জগতের অস্তিত্বও সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইবে।

কেহই অবশ্য এ-কথা মনে করেন না যে, উদ্ভিদ-অবলম্বিত প্রক্রিয়ার সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে আমাদের খাদ্য-

নির্দ্দিষ্ট তাপে বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে শৈবালজাতীয় উদ্ভিদকে স্বতোবিকিরণকারী কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড খাওয়াইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

বস্তু প্রস্তুত করিবার সমস্যা সমাধানের জন্যই 'ফটোসিন্থেসিস' প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত গুপ্তরহস্য অবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কারণ আবহমান কাল উদ্ভিদেরাই আমাদের জন্য এই কাজ অতি সফলতার সহিত চালাইয়া আসিতেছে। ইহার অন্তর্নিহিত তথ্য সঠিক ভাবে অবগত হইতে পারিলে বৈজ্ঞানিকেরা রাসায়নিক তত্ত্ব সম্পর্কিত বহুবিধ জটিল রহস্য উদ্ঘাটনে সমর্থ হইবেন। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা আরও পরিষ্কার হইবে। পৃথিবীর বর্ত্তমান সভ্যতা ও তাহার অগ্রগতি মূলতঃ পেট্রোলিয়াম নামক খনিজ তৈলের উপরই নির্ভর করে। অবিশ্রান্ত ব্যবহারের ফলে পৃথিবীর এই তৈলসম্পদ দ্রুতগতিতে হ্রাস পাইতেছে। সভ্যজাতিসমূহের ইহাতে দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। 'ফটোসিন্থেসিস'-রহস্য অবগত হইতে পারিলে পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি হাইড্রোকার্ব্বন জাতীয় পদার্থ ইচ্ছামত উৎপাদন করিবার ক্ষমতা মানুষের আয়ত্তাধীন হইবে। তাছাড়া কৃত্রিম উপায়ে অতি সুলভে খাদ্যপ্রাণ ভিটামিন জাতীয় পদার্থসমূহ উৎপাদন করাও অসম্ভব হইবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গাছের পত্রাভ্যন্তরে সূক্ষ্ম কণিকার

মত অসংখ্য সবুজ রঙের পদার্থ থাকে। এগুলি 'ক্লোরোফিল' নামে পরিচিত। এই সবুজ কণিকাগুলিই সূর্য্যরশ্মি সংগ্রহ করে। এগুলি লৌহ, ম্যাগ্নেসিয়াম ও অন্যান্য পদার্থের সমবায়ে গঠিত একপ্রকার অতি জটিল যৌগিক পদার্থ। আমাদের দেহাভ্যন্তরে রক্তের লোহিত কণিকাগুলি যে ভাবে অবস্থান করে ইহারাও কতকটা সেই ভাবেই বৃক্ষপত্রে অবস্থান করে। একটি পাতার এক ইঞ্চি দীর্ঘ ও এক ইঞ্চি প্রশস্ত স্থানে বিভিন্ন কোষের মধ্যে প্রায় দুই কোটিরও উপর সবুজ কণিকা দৃষ্ট হয়। পাতা হইতে পৃথক করিয়া এই সবুজ কণিকাগুলি কাচপাত্রে রাখিয়া পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে—ইহাদের 'ফটো-সিন্থেসিস' প্রক্রিয়া চালাইবার ক্ষমতা থাকে না। ইহার প্রধান কারণ হয়ত এই যে, উত্তপ্ত করিয়া বাহির করিবার ফলে কণিকাগুলির জীবনীশক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। শুদ্ধ রাসায়নিক ক্রিয়াই নহে, জীবনীশক্তির সহিত এই প্রক্রিয়ার একটা অচ্ছেদ্য যোগাযোগ রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

কার্ব্বন ডাইঅক্সাইডকে স্বতোবিকিরণ শক্তিসম্পন্ন করাইবার নিমিত্ত সাইক্লোট্রোন যন্ত্রে আণবিক সংঘর্ষ ঘটিবার লক্ষ্যস্থলে স্থাপন করা হইতেছে।

বৃক্ষপত্র জল ও কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড সহযোগে অতি দ্রুতগতিতে চিনি তৈয়ারী করে; এই চিনি আবার নানা উপায়ে পরিবর্ত্তিত হইয়া বৃক্ষদেহের বিভিন্ন অংশ সংগঠনে ব্যবহৃত হয়। জল ও কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড সহযোগে রাসায়নিক পরীক্ষাগারেও চিনি তৈয়ারী করা সম্ভব। কিন্তু এই দুইটি পদার্থ হইতে কৃত্রিম উপায়ে চিনি তৈয়ারী করিতে হইলে মধ্যবর্ত্তী পন্থা রূপে ইহাকে ফরম্যালডিহাইড্ নামক এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থে পরিবর্ত্তিত করিতে হয়। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত এই চিনির কিন্তু স্বভাবজাত চিনির মত পুষ্টিকর ক্ষমতা নাই। অধিকন্তু প্রস্তুত-প্রণালীও উদ্ভিদ-অবলম্বিত প্রক্রিয়ার মত সহজসাধ্য নহে। উদ্ভিদবেত্তারা অনেক দিন হইতেই এই ধারণা পোষণ করিতেছেন যে, রাসায়নিকেরা জল ও কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড হইতে যে-রীতিতে চিনি উৎপাদন করিতে পারেন উদ্ভিদপত্রেও চিনি প্রস্তুতের জন্য অনুরূপ প্রক্রিয়া চলিতেছে। তাহার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার রীতি দেখাইতেছি।

কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2)+জল (H_2O)+ ক্লোরোফিল+আলো ; এইগুলি মিলিয়া তৈয়ারী হয়:— ফরম্যালডিহাইড্ (CH_2O)+অক্সিজেন (O_2)।

ফরম্যালডিহাইডের ৬টি অণু মিলিত হইয়া নিম্নোক্ত পরিবর্ত্তন ঘটে। যথা—$6CH_2O$ (ফরম্যালডিহাইড)= $C_6H_{12}O_6$ (গ্লুকোজ)

এই গ্লুকোজ (শর্করা জাতীয় পদার্থ আবার জলীয় পদার্থ বিযুক্ত হইয়া ষ্টার্চ্চ বা শ্বেতসারে পরিণত হয়। যথা:— $n\,C_6H_{12}O_6$ (গ্লুকোজ)—nH_2O (জল)=$C_6H_{10}O_5$ (শ্বেতসার)। বর্ত্তমানে কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ রুবিন এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। তাঁহার গবেষণার ফলে এই প্রচলিত ধারণার সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের যান্ত্রিক জগতের বিস্ময়, পরমাণু চূর্ণ করিবার অপূর্ব্ব যন্ত্র সাইক্লোট্রোনের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। এই যন্ত্র-সাহায্যে কতগুলি পদার্থের

পরমাণুগুলিকে স্বতোবিকিরণশীল (radio-active) করিতে পারা যায়। এই উপায়ে প্রাপ্ত স্বতোবিকিরণশীল কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড বৃক্ষদেহে শোষণ করাইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে। আশা করা গিয়াছিল এই স্বতোবিকিরণশীল কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড সহযোগে বৃক্ষদেহে যে ফরম্যালডিহাইড উৎপন্ন হইবে তাহাও স্বতোবিকিরণশীল হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রত্যেক পরীক্ষায় তাহার বিপরীত ফলই পাওয়া গিয়াছে। তাহাতেই বুঝা যায় বৃক্ষদেহে চিনি তৈয়ারী করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত উপায়ের কোন বিপরীত প্রক্রিয়া চলিতেছে। অথবা ইহার সহিত অন্য কোনরূপ প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে।

বরোনের সহিত আণবিক সংঘর্ষ ঘটাইলে বরোন হইতে কার্ব্বন-পরমাণু বাহির হইয়া আসে। এই কার্ব্বন-পরমাণুগুলিকে স্বতোবিকিরণকারী কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড অণুতে পরিবর্ত্তিত করিয়া যব, গম, বালি, সূর্য্যমুখী প্রভৃতি গাছকে শোষণ করিয়া লইতে বাধ্য করা হয়। এই গাছগুলিকে পরে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় যে, স্বতোবিকিরণকারী কার্ব্বনের কিরূপ পরিণতি ঘটিয়াছে। রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে মৌলিক পদার্থের সকলগুলি পরমাণুরই গুরুত্ব সমান নহে। সমান গুরুত্ব সম্পন্ন পরমাণুগুলিকে পৃথক করিয়া লইবার উপায়ও আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাধারণ ভাবে কার্ব্বন-পরমাণুর স্বতোবিকিরণকারী শক্তি ৬ ঘণ্টার বেশী স্থায়ী হয় না। এই জন্য সমান গুরুত্বসম্পন্ন এক জাতীয় কার্ব্বন-কণিকা আলাদা করিয়া সাইক্লোট্রোন সাহায্যে দীর্ঘকালস্থায়ী স্বতোবিকিরণশীল শক্তিসম্পন্ন করা হয়। ইহার সাহায্যে অধিকতর ব্যাপকভাবে পরীক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে।

'ফটোসিন্থেসিস' ব্যাপারটা এরূপ দুরূহ ও জটিল যে মাত্র এক দিক দিয়া অগ্রসর হইলে ইহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া সম্ভব হইবে না। এই জন্য সমবেত ভাবে বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন দিক হইতে এ রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য গবেষণা করিতেছেন। স্বতোবিকিরণশীল কার্ব্বন-ডাইঅক্সাইডের পরীক্ষা ব্যতীত এক দল বৈজ্ঞানিক উদ্ভিদের বিবিধ রঞ্জক পদার্থ ও ক্লোরোফিলের উপাদান সম্পর্কিত গবেষণায় ব্যাপৃত হইয়াছেন।

অদৃশ্য রশ্মিনিরোধক সীসক-মুখোস ও দস্তানা পরিধান করিয়া বৈজ্ঞানিক কর্ম্মী বৃক্ষপত্রে শোষণ করাইবার নিমিত্ত সাইক্লোট্রোন যন্ত্র হইতে স্বতোবিকিরণকারী কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড বাহির করিয়া লইতেছেন।

কেহ কেহ আবার তাহাদের সংগঠনতত্ত্ব সম্পর্কিত পরীক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। কয়েক দল বৈজ্ঞানিক সবুজ এবং পিঙ্গল বর্ণের ব্যাক্টেরিয়া কেমন করিয়া আলোক-রশ্মিকে কাজে লাগাইয়া থাকে সে-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন।

'ফটোসিন্থেসিস' সম্বন্ধে এই দুইটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন জাতীয় যাবতীয় উদ্ভিদই অজৈব পদার্থ হইতে খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করিবার জন্য একই রীতি অনুসরণ করিয়া থাকে এবং যুগযুগান্তের বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেও এই রীতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন সংসাধন করে নাই। পৃথিবীর বৃহত্তম উদ্ভিদ হইতে ক্ষুদ্রতম শৈবাল, জলজ লতাপাতা কিংবা মরুভূমির পত্রহীন লতাগুল্ম প্রভৃতি সকলেই এই কৌশলের অধিকারী। অবশ্য সকল রকমের উদ্ভিদই সবুজ নহে; তথাপি তাহাদের মধ্যে অন্যান্য বর্ণের কণিকার সহিত সবুজ কণিকারও অস্তিত্ব রহিয়াছে। ব্যাঙের ছাতা জাতীয়

উদ্ভিদের কথা আলাদা। ইহাদের সবুজ কণিকা নাই, কাজেই নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করিতে পারে না। মৃত্তিকায় সঞ্চিত জৈব পদার্থ অথবা অন্যান্য মৃত উদ্ভিদের দেহ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। ইহারা পরভোজী মাত্র। উদ্ভিদ-দেহে এ পর্য্যন্ত দুই রকমের সবুজ কণিকা এবং বিভিন্ন হলুদ বর্ণের বারো রকমের কণিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বোধ হয় এই চৌদ্দ রকমের কণিকা সম্মিলিতভাবে খাদ্য তৈয়ারী প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যেকটি বিভিন্ন বর্ণ-কণিকার বিশিষ্ট কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কিছুই জানিতে পারা যায় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি উদ্ভিদেরা সূর্য্যরশ্মির দৃশ্য বর্ণছত্র হইতে লাল ও নীল বর্ণের রশ্মিগুলিই শোষণ করিয়া লয়। চলচ্ছক্তি সম্পন্ন সবুজ ও পিঙ্গলবর্ণের ব্যাক্টেরিয়া (এক প্রকার আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ) দৃশ্য বর্ণছত্রের লাল প্রান্তের কিয়দংশ এবং অদৃশ্য লোহিতাতীত রশ্মি হইতেই অধিক পরিমাণ তেজ আহরণ করিয়া থাকে। ইহারা কর্দ্দম অথবা কর্দ্দমাক্ত জলাভূমির নীচে বাস করে বলিয়াই হয়ত অদৃশ্য লোহিতাতীত রশ্মির উপরই বিশেষভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। কারণ দৃশ্য আলো কর্দ্দমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু অদৃশ্য আলো তাহা অনায়াসে ভেদ করিয়া যায়। উদ্ভিদেরা যে বাছিয়া বাছিয়া লাল, নীল এবং লোহিতাতীত রশ্মি ব্যবহার করে, নিশ্চয়ই ইহার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন পরীক্ষা হইতে বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করিতেছেন যে, উদ্ভিদ যে-উপায়ে খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করে বলিয়া এতকাল ধারণা প্রচলিত ছিল, তাহার সহিত অন্য কোন প্রক্রিয়া জড়িত থাকাই সম্ভব। উদ্ভিদ যে সকল খনিজ পদার্থ আহরণ করে হয়ত তাহার কিয়দংশ 'ক্যাটালিস্টের' মত কার্য্য করিয়া থাকে। অর্থাৎ ঐ সকল খনিজ পদার্থের কিয়দংশ নিজে সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া খাদ্য প্রস্তুতের উপাদানসমূহের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া থাকে। খুব সম্ভব বৃক্ষপত্র কর্ত্তৃক শোষিত পদার্থ হইতে অক্সিজেন বাহির করিয়া দিবার জন্য সূর্য্য রশ্মির প্রয়োজন হয়। অক্সিজেন বাহির হইয়া গেলে পত্রাভ্যন্তরে অন্ধকারে রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। যাহা হউক এই তথ্য সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারিলে জীবন-রহস্য উদ্ঘাটনে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইবে।

দুর্জ্ঞেয়

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

বসে আছি অসহায় একা আমি গহন কাননে,
ঊর্দ্ধনীল নভস্তলে বলাকার শ্রেণী অগণন
ফিরিছে নীড়াভিমুখী শ্রান্তকায়া ;—সন্ধ্যা যে এখন।
ভ্রমর আসিল ফিরে তন্দ্রাচ্ছন্ন নূপুর-নিক্বণে,
আঁধার নামিয়া এল ধরণীর বন-উপবনে,
ভ্রমিয়া উদাস কোথা ভ্রান্ত শুধু স্বপ্নভ্রষ্টা মন !
সহসা চেতনা ভাঙে লভি' কার স্পর্শ অতুলন,
মেঘ-শাড়ী-ফাঁকে তার মুখ-শশী চমকে নয়নে।

সে আসি কহে না কথা অঙ্গভঙ্গে জ্যোৎস্না ঝর ঝর,
দুটি আঁখিপ্রান্তে শুধু বিলসিত বিদ্যুৎ-বিথার,
ক্ষণপরে গুঞ্জরিল কি দুর্জ্ঞেয় ছন্দে অনিবার
সপ্তস্বরা বীণাখানি তার।—মরি, সঙ্গীত-লহর !
তারি সাথে মন মোর গান হয়ে কাঁপে থর থর,
পরিচয় নাহি জানি হেরি তার নিশি-অভিসার।

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

১

মানবিক সত্তা

আজ সন্ধ্যায় উদয়নের পূর্বের বারান্দায় এসে প্রায় দুই ঘণ্টা বসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সঙ্গে ছিলেন শ্রীমতী প্রতিমা দেবী, শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী। আজ শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের "আনন্দবাজার"। এই বাজারে ছেলেমেয়েরা এক-একটি দলে বিভক্ত হয়ে নানারকম দোকান করে। কোনো দোকানে বিক্রি হয় পান, পয়সা খিলি; কোনো দোকানে ফুল, ছোট্ট নামে মাত্র তোড়া দাম চার আনা কিম্বা কিছু বেশী; কোনো দোকানে চা, মিষ্টি, লুচি ইত্যাদি ভোজ্য; কোনো জায়গায় বা গান-বাজনার আখড়া; কোথাও স্কেচ করার আড্ডা,—অর্থাৎ এখানকার ছেলেমেয়েরা দর্শকদের মধ্যে যাকে পায় ধরে কাগজ-পেন্সিলে তার ছবি আঁকে, ছবির বিশেষত্ব এই যে-যাকে আঁকা যায় চেহারাটা ঠিক তার মতন এমন কি একেবারেই তার মতন হয় না। অথচ যার ছবি আঁকা হয় তাকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দিতে হয় মূল্য। বলা বাহুল্য এ বাজারে সব দোকানেই এবং সব জায়গাতেই কিছু দক্ষিণা দিতে হয়, কারণ এটা আনন্দবাজার। এই আনন্দবাজারে বিক্রীত মূল্য হ'তে সঠিক খরচের অংশটা কেটে নিয়ে বাকী লভ্যাংশ যা হয় ছেলেমেয়েরা সেটা স্থানীয় দরিদ্র-ভাণ্ডারে দান করে পরম আনন্দে। এ মেলায় শিশু এবং বালকবালিকাদের আনন্দ সকলের চেয়ে বেশী। তাদেরই জিনিসের কাটতি বেশী এবং চড়া দামে।

আজ এই আনন্দবাজারের গল্প হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে। তিনি তাঁর বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের আনন্দ-বাজারের নানারকম গল্প বেশ আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করছিলেন। গল্পের আসরে এসে উপস্থিত হলেন ডাক্তার অমিয় চক্রবর্ত্তী। তিনি এসে কবির পাশে চেয়ারে বসেই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি পালিয়েছেন এখানে, তা বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। আনন্দ-বাজারে ছেলেমেয়েরা ডাকাতি করছে, এড়াবার উপায় নেই।" এঁর কথা শেষ হ'তেই রবীন্দ্রনাথ বেশ একটু হেসে বললেন, "একবার ওরা আমাকে ধরে এক দোকানে চা খাওয়াবে বলে টেনে বসালে, ওরা বেশ জানত আমি কিছুই খাইনা, তাই নিশ্চিন্তমনে অনেক রকম খাদ্য সাজিয়ে দিলে সামনে। তার পর একেবারে পাঁচ টাকা আদায় ক'রে নিলে। এবার তো আমি যেতে পারব না। তা আমার বৌমার (প্রতিমা দেবী) কাছে আমার পাঁচ টাকা জমা আছে। আমার অভিভাবিকাকে (শ্রীমতী নন্দিতা দেবী, কবির নাতনী) বলব, সেই টাকা আনন্দবাজারে দোকানীদের দিয়ে আসবে। বেশ লাগে এদের এইদিনের আনন্দ।" এমন সময় কি কথাপ্রসঙ্গে আমি অমিয়বাবুকে বললাম, "কাগজে পড়েছেন হিটলারের কুবুদ্ধি, সাহায্য করবার নামে ইটালিতে ৫০,০০০ জার্মান সৈন্য পৌঁছে দিয়েছে, এইবার বুঝি বন্ধুত্বের ছুতোয় ইটালির দফা সারবে।" রবীন্দ্রনাথ আমাকে বাধা দিয়ে বললেন "থাম বাপু, হচ্ছিল আনন্দবাজারের আনন্দের কথা, ফস্ করে নিয়ে এলে এর মধ্যে ঘোর নিরানন্দের প্রসঙ্গ। আর পারি না রোজ রোজ এই সব হানাহানি খুনোখুনির খবর শুনতে, লড়াইতে মরছে মানুষ, বোমার ঘায়ে মরছে কত লোক, দুর্ভিক্ষে কত লোক বিপন্ন, এ-সব ব্যাপার মনের মধ্যে শুধু অশান্তি নয় যন্ত্রণার সৃষ্টি করে।

"মানুষকে মানুষ মারছে পশুর মত, কি ভয়ংকর নির্মমতা। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার দেখ, একদিকে এই অমানুষিক অত্যাচার কিন্তু এরই পাশাপাশি দেখ এক দল মানুষ এই সব দুঃখ কী তীব্রভাবে অনুভব করছে অন্তরে। (অমিয়বাবুকে লক্ষ্য করে) এই যে তোমার মনে বাজছে

আমার মনে বাজছে আরো কত লোকের মনে ব্যথা বাজছে—এর কারণ কি? আমার মনে এর একটা গূঢ় কারণের সন্ধান পাই। তোমরা এটাকে স্পেকুলেশ্যন্ বলতে চাও বল। আমার চিন্তায় এবং অনুভূতিতে টের পাই—একটা বিরাট মানব-সত্তা আছে অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎকে জুড়ে, যে-সত্তার মধ্যে ক্রমাগত চলেছে একটা ভালোর তপস্যা। আমার মধ্যে তোমার মধ্যে সেই বিরাট মানুষ-সত্তার তপস্যার যে একটি বেদনা আছে তার প্রতিক্রিয়া চলেছে। তার কারণ, সেই তপস্যার মধ্যে রয়েছে ভালোর পরম পরিণতি; সে-তপস্যার মধ্যে চলেছে মনুষ্যত্বের একটা পূর্ণতার আয়োজন, সে-আয়োজনের উদ্দেশ্য অশান্তির মধ্যে শান্তিকে শিবকে কল্যাণকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া।

"চিন্তা করে দেখ, সকলের মধ্যে একটা সাধারণ ভালোর জন্য একটা স্বাভাবিক তাগিদ আছে, সকলের মধ্যেই অকল্যাণের বিরুদ্ধে কম-বেশী প্রতিবাদ আছে। এই যে কল্যাণ এবং ভালোর তপস্যায় মানুষের রত হবার ইচ্ছে, নিজেকে আপাত সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত ক'রেও কেন এটা হয়? মানুষের মধ্যে যাঁরা সাধু যাঁরা মহৎ, যাঁরা বড়, তাঁরা সকলেই সেই এক ভালোর কথাই বলেছেন, বলেছেন একই কল্যাণাদর্শের কথা, এর থেকে কি প্রমাণিত হয়? এই কথাই কি প্রমাণিত হয় না যে, বিরাট মানবসত্তার মধ্যে সব কালকে জড়িয়ে অনন্তকাল ধরে যে ভালোর তপস্যা চলেছে, ঐসব মানুষের মধ্যেও একটি অবিচ্ছিন্ন ঐক্যসূত্রে চলেছে তারি ক্রিয়া। যাদের মধ্যে সে-ক্রিয়া সাফল্যলাভ করতে পারছে না, তারা নেমে যাচ্ছে নিচে, আর যাঁদের মধ্যে সে-ক্রিয়া যতটা সাফল্যলাভ করেছে তাঁরা ততটাই উপরে উঠেছেন মনুষ্যত্বে। খণ্ড খণ্ড ভাবে মানুষের শরীরকে ভাগ করে দেখলে কি মানুষের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়? অথচ সব খণ্ডকে জড়িয়ে রয়েছে অখণ্ড একটা মানুষ। তেমনি আমি তুমি সকল মানুষ জড়িয়ে আছি সেই বিরাট একটি মানব-সত্তার মধ্যে,—যে-সত্তা বারে বারে সমস্ত প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে যুগে যুগে চাচ্ছে সেই শান্ত, সেই পরমকল্যাণকে সকলের আত্মায় সচেতন করে দিতে। এই বিরাট সাধনায় তপস্যায় যুগের ভাগ নেই, অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে চলেছে এই তপস্যা। এই তপস্যাকে অন্তরে যে যত গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পারে সেই ততটা অকল্যাণের মোহকে তুচ্ছ স্বার্থকে জয় করতে পারে।

"বিরাট মানব-সত্তার মধ্যে শান্তির কল্যাণের যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা অতীতকাল থেকে চলে আসছে, একে তপস্যা কেন বলছি? তপস্যা বলছি কেননা সে তো শুধু ক্ষণিকের জিনিস নয়, শুধু বর্তমানের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে নয়,—তার গূঢ় উদ্দেশ্য সুদূর ভবিষ্যতের পারে একটা শান্তিকে কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করা। আর এই প্রতিষ্ঠার কাজে তপস্বী প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তের লাভ-লোকসানকে অবহেলা করে অস্বীকার ক'রেই তো ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে চলেন। এমনি সাধারণ ভাবেই দেখ, ভালো মানুষ একটা ভবিষ্যৎ শ্রেয়কে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্যে তার প্রতিদিনের কত প্রেয়কে অস্বীকার করতে চায় জীবনে। মানুষের এই অস্বীকৃতির মধ্যেই সে পরমকে এবং কল্যাণকে চেয়েছে অতীতকাল থেকে, ভবিষ্যৎকাল পর্য্যন্ত; তাই দেখতে পাই উপনিষদের বাণীর মধ্যে মানুষের অন্তরে সেই মহৎ আত্মার কল্যাণ-প্রয়াসকে উপলব্ধির কথা বলেছে বারে বারে। সেই জন্যেই দেখ, বেঁচে থাকবার মধ্যে একটা সার্থকতা আছে এত অশান্তির মধ্যেও, সেই জন্যেই এত দুঃখের মধ্যেও একটা সুখের আশা আছে, এই আশা এই সার্থকতা আমাদের জীবনে কখনই থাকত না যদি-না মানুষের জীবনে একটা বড় তপস্যার বেদনা থাকত। এই তপস্যার, এই শান্তিকামনার, শ্রেয়সাধনার বেগ আমাদের মধ্যে না থাকলে আমরা হয়ে যেতাম পশুর মতো, সম্পূর্ণ বাইরের প্রকৃতির করতলগত জীব—তা যে হয় নি তার কারণ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই সেই বিরাট মানব-সত্তার তপস্যার দাবী রয়েছে। সেই দাবী ক্রমাগত মানুষকে বলছে, যা শিব, যা শান্ত, যা সৎ তাকেই স্বীকার কর।

কবির কথা শেষ হ'তেই অমিয়বাবু বললেন, "আপনার 'জীবনদেবতা'র মধ্যে এবং অন্যান্য রচনাতেও এই ভাবধারার পরিচয় রয়েছে, শুধু তাই নয়, আপনার এই উপলব্ধির একটি বিশেষ ইভলুশ্যন চলে আসছে পরবর্তী

রচনাতেও।" রবীন্দ্রনাথ বললেন, "Religion of Man" ("মানুষের ধর্ম") বইতে আমি এই কথাই বলবার চেষ্টা করেছি।"

দিনটা ছিল ঠাণ্ডা, উত্তরে হাওয়ার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল পূবের হাওয়া, তাই বেশীক্ষণ দুর্বলদেহ রবীন্দ্রনাথকে বাইরে বসতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয় বলে প্রস্তাব করলুম তাঁকে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করতে। ঘরের মধ্যে সহজে তিনি প্রবেশ করতে নারাজ। রোগীর মতন একটি ঘরে চব্বিশ প্রহর থাকায় তাঁর মনে ঘরের প্রতি একটা একঘেয়ে ভাবের বিরূপতা এসেছে। তবু বলতে হ'ল,—চলুন। অনিচ্ছাসত্ত্বেই শয়ন-কক্ষে তাঁকে যেতে হ'ল, তখন সন্ধ্যে সাতটা।

২

মানবিক অভিব্যক্তি

অসুস্থতাহেতু মানব-সত্তা সম্বন্ধে অধিক কথা বলা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সেদিন আর সম্ভব হয় নি। তার এক দিন পরে অর্থাৎ ৭ই পৌষ সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ যখন কিছুক্ষণের জন্য উদয়নের দক্ষিণের বারান্দায় এসে বসেছিলেন তখন ডাক্তার অমিয় চক্রবর্তী তাঁর কাছে পুনরায় মানব-সত্তা সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন করে বললেন, "আপনি পরশু মানব-সত্তা সম্বন্ধে যা বলেছেন, সে-বিষয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তারও মিল আছে। য়ুরোপীয় চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এক দল বলছেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ব্যাপক মানবত্বের একটা ভূমিকা আছে, যাঁদের আমরা প্রতিভাশালী ব'লে জানি তাঁদের প্রতিভা একটা আকস্মিক কিম্বা অসম্ভব ব্যাপার নয়, তাঁরাও অর্থাৎ প্রতিভাশালীরাও সেই সর্ব্বমানুষের সত্তাধারার অন্তর্গত। কিন্তু সকল মানুষের পক্ষে এক-এক জন প্রতিভা-শালী না হওয়ার কারণ সম্বন্ধে তাঁদের বিচার অনুযায়ী এই কথা বলা হয় যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে প্রতিভা রয়েছে তার স্ফুরণের সুযোগ-সুবিধা তারা পায় না কেননা স্বভাবের এবং শরীরের মধ্যে তাদের কতকগুলি বাধা থেকে যায়। যাঁদের মধ্যে বাধার অভাব—সাধারণের তুলনায়—তাঁরাই জিনিয়স্ (প্রতিভাশালী) হয়েছেন এবং তাঁদের অপেক্ষাকৃত সুপরিস্ফুট মানবত্ব অন্যকে ক্রমাগত উদ্বুদ্ধ করছে সেই স্তরে উন্নীত হবার জন্যে।"

অমিয়বাবুর কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ যা বললেন তার মর্ম এই: "বিরাট মানব-সত্তার সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের সত্তার ঐক্য আছে। কিন্তু সে ঐক্যের ভিতর দিয়ে যে-মানুষ সেই বিরাট মানব-সত্তার পরম লক্ষ্যের কেন্দ্রাভিমুখে অগ্রসর না হ'তে পারে সে চলে যায় ঝরে যায়। এই চলে যাওয়া ঝরে যাওয়ার মধ্যে আছে একটা ব্যর্থতা, সে ব্যর্থতা গণ্যের মধ্যে নয়। দেখ না আমগাছে মুকুলের অজস্রতা ঘটে, কিন্তু সেই অগণ্য মুকুলের মধ্যে যারা ঠিক লক্ষ্যের পরিণতি লাভ করে তারাই হয় গণ্য, যারা ফলের পূর্ণতাকে প্রাপ্ত না হয়ে ঝরে যায় মরে যায় তাদের কথা কেউ ভাবে না আর তাদের সম্বন্ধে কেউ কিছু চিন্তাও করে না, এটা হয়ে আসছে। তেমনি বহু যুগ ধরে যে মনের সত্তা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানকে নিয়ে রয়েছে তারই পরম লক্ষ্যের দিকে যখন কোনো মানুষের মনুষ্যত্বের পরিণতি সার্থক হয়েছে তখন তিনি হয়েছেন মহৎ, তাঁর বিনাশ নেই, তিনি পৌঁচেছেন পরম সত্যে। সংসারে যাঁরা কিছু ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছেন কিম্বা এক-একটা বিষয়ে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁরা জীব-জগতের মধ্যে নিশ্চয়ই এক-একটি পর্যায়ের এক-এক পংক্তিতে কেউ এতটুকু বড় কেউ অতটুকু বড় হয়েছেন, সেটা মনের এবং সেই দিক দিয়ে ইন্‌টেলিজেন্সের একটা ক্রমবিকাশের ফল বলতে পার। কিন্তু তাঁরাও, আমি যে মানবাত্মার কথা বলছি সেই বিরাট আত্মার লক্ষ্যের অন্তর্গত নন। পশুরাজ্যেও কতগুলি জীবের মধ্যে দেখা যায় ইন্টেলিজেন্সের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, সেই হিসাবে তারা অন্য পশুর তুলনায় উন্নত, কিন্তু তাই ব'লে তারা পশুত্ব-পর্যায় থেকে বাইরে আসে না। অনেক মানুষের মধ্যে কতগুলি মানুষ অনন্যসাধারণ মন, বুদ্ধি এবং ট্যালেণ্ট নিয়ে দেখা দেন, কার্যক্ষেত্রে ব্যবহারে তাঁরা নিজেদের অসাধারণত্বের কিছু ইতিহাসও রেখে যান, সেটাও অক্ষয়ত্ব অমরত্ব পায় না, কালের বুকে তাঁদের স্মৃতি মুছে যায়। কেননা তাঁদের বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রতিভা সবই কেবলমাত্র জীবলোকের এক-একটা দিকের অনন্য-

সাধারণতার অন্তর্গত। কিন্তু মানুষের যেটা পরম সার্থকতা সেটা আত্মার অনুভূতিতে, সেই বিরাট মানবাত্মার সঙ্গে যে মানুষের একাত্মতার অনুভূতি এবং উপলব্ধি যত গভীর সে মানুষ ততটাই সত্য। কেননা মানুষ শুধু জীব নয়, সে শুধু মন পায় নি, সে একটা বড় আত্মার অংশীদার। কাজেই যে মানুষ আত্মার রাজ্যে সেই পরমাত্মার সঙ্গে আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতাকে না উপলব্ধি করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে, যেমন করে ব্যর্থ হয়ে যায় ফল-না-হওয়া কত ফুল, তাদের সুখ-দুঃখের পর্ব ক্ষণিকতার মধ্যে কিছুক্ষণ বেঁচে থেকেই কালের মধ্যে নিঃশেষে মিলিয়ে যায়, তা নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই।"

অমিয়বাবু বললেন, "বৌদ্ধশাস্ত্রমতে মানুষের মধ্যে স্তরবিভাগ দেখা যায়, এক স্তর থেকে অন্যতে উত্তীর্ণ হবার সম্ভাব্যতা রয়েছে। বোধিসত্ত্ব যাঁরা তাঁরা বুদ্ধ হবার পথে চলেছেন। যাঁদের মধ্যে আত্মিক চেতনা জাগে নি তাদের পথ আরো কত দীর্ঘ।"

রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, "তারা যে পথেই নামে নি, বেঁচে আছে মাত্র। প্রাণ মন এবং আত্মার সমগ্রতায় যাঁরা আত্মপ্রকাশ করেছেন তাঁরাই পরিপূর্ণ মানুষ, যারা কেবলমাত্র প্রাণধারণের পর্যায়ে রয়ে গেল তাদের হিসেব থাকে না। যাঁরা পরমাত্মার সঙ্গে একাত্মাকে অনুভব করেছেন, তাঁরা দুঃখশোকের মারকে জয় করেছেন, তাঁরা অনন্তকালের মধ্যে আছেন অমর হয়ে, অতীত তাঁদের মারতে পারে না, বর্তমানের দুঃখশোকের বিপর্যয় তাদের উপলব্ধিকে আহত করে না। তাঁরা ভবিষ্যতের লোকে রচনা করেন তাঁদের আসন, সে-আসন থেকে কেউ তাঁদের নামাতে পারে না। যাঁরা যথার্থ মহাত্মা তাঁদের সকলের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়, তাঁরা সাময়িক সুখ-দুঃখকে নির্ভয়ে আনন্দে জলাঞ্জলি দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে স্থির করেছেন তাঁদের সাধনা। একটা কল্যাণময় বৃহৎ আত্মার আহ্বান তাঁদের মনকে সাময়িকতার সুখ দুঃখের উর্ধে তুলে রাখে। সব মহাত্মাদেরই বাণী একই, কোন্ পথে চলা মানুষের পক্ষে বাঞ্ছনীয় তার নির্দেশও একই। হ'তে পারে তাঁদের ভাব ভাষা স্বতন্ত্র কিন্তু এক তাঁদের লক্ষ্য, এক তাঁদের উদ্দেশ্য, এক তাঁদের প্রকৃতি। এঁদের সকলের আত্মানুভূতির এই ঐক্যই বারে বারে প্রমাণ ক'রে দিয়েছে যে একটা বিরাট মানব-সত্তা আছে আর সেই সত্তার সঙ্গে আমাদের যে সত্যকার যোগ সেটা সমগ্রতার যোগ, সে-যোগ হচ্ছে আত্মার পূর্ণ প্রকাশের পথে। যে-মানুষ সেই সম্পূর্ণতাকে উপলব্ধি করতে পারে নি, সে পায় নি অমরত্ব, সে মরেছে এ নিয়ে দুঃখ করলেও কোনো উপায় নেই। এক সময় ছিল যখন চতুর্দিকে ছিল কেবল জল, সেই বিপুল একাকার জলের মধ্যে এক-এক জায়গায় কোথাও কম উঁচু কোথাও বেশি উঁচু, উঠল একটা নির্জল বস্তুপিণ্ড, ক্রমে হ'ল এই রকমের পৃথিবী। ঐ যে এক-একটা অংশ উঁচু হয়ে উঠল, সে তো উঠল বিপুল জলরাশির মধ্যে একক হয়ে, সব জল রইল পড়ে জলের অবস্থায়, তার জন্যে ওদের উঁচু হয়ে ওঠা বন্ধ হয় নি। এমনি করেই সেই পরমাত্মার যোগে যাঁরা উঠেছেন তাঁরাই অমর হয়ে গেছেন, যাঁরা হন নি, তাঁদের সেটা দুর্ভাগ্যের, তার বেশি আর কী বলব।"

কবির কথা শেষ হতে অমিয়বাবু বললেন, "আশ্চর্য এই যে সাধারণ মানুষ সব দেশেই তাঁদের শ্রেষ্ঠ ব'লে যুগে যুগে গণ্য করেছে, তাঁদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা-ভক্তি-পূজা নিবেদন করছে, যাঁরা মানব-আদর্শের পরিচয় দিয়েছেন। আপনার "রিলিজন্ অফ্ ম্যান্" বক্তৃতাগুলিতে আপনি দেখিয়েছেন যে সেই একাদর্শের প্রতি সকলের আত্মিক অনুভূতির যোগ রয়েছে; সেই জন্যেই যাঁরা বড়ো সব মানুষ তাঁদেরই নতি জানিয়েছে। নিজেদের জীবনের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছে তাঁদের দিকে এবং মহাজীবনের এক ভূমিকার দিকে লক্ষ্য রেখে। এইখানে মহাপুরুষের একটি বিশেষ সার্থকতা দেখা যায়, তাঁদের আত্ম-সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব বারে বারে নূতন মূল্য পায় অন্য মানুষের অশেষ সম্ভবপরতার কাছে।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "অসীম চৈতন্যই পরমাত্মার স্বরূপ; আমাদের খণ্ডচেতনা খানিক পায়, খানিক দেখে, সবখানি নয়। আমাদের চৈতন্য পরম চৈতন্যের অভিমুখে চলেছে; যাঁরা সত্তার এই পথে বৃহৎ ক'রে সত্যকে পেয়েছেন তাঁরাই মহাত্মা। জড় থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মন, মন

থেকে আত্মা—সৃষ্টি জুড়ে এই অভিব্যক্তি চলেছে। মানুষের বিচিত্র স্তরের সত্তায় যেখানে অভিব্যক্তি দেখা দিয়েছে, যেখানে সমগ্রভাবে সে মনুষ্যত্বের সাধনায় নেমেছে সেইখানে সে সত্য হয়ে উঠছে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই সত্যের বিকাশ দেখা যায়। এই জন্যে তারা দেশের জন্যে, সমাজের কল্যাণের জন্যে স্বার্থের বহির্গত প্রয়াসের মধ্যে আপনাকে উৎসর্গ করছে। উৎসর্গ করছে কার কাছে? আপন বৃহৎ সত্তার কাছে, যেখানে তার পূর্ণ মানবিকতার পরিচয়। ছোট-আমিকে ভুলে মানুষ বৃহৎ-আমির মধ্যে নিজেকে পেতে চাচ্ছে। গাছের মধ্য দিয়ে প্রাণের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্য দিয়ে এই সৃষ্টির সাধনা চলেছে। কিছুকে বাদ দিয়ে নয়, সত্যকে কোথাও অস্বীকার ক'রে নয়—সমগ্রের জ্যোতিতে দেহ-মন-আত্মার জাগ্রত ধর্মকে ফুটিয়ে তোলার এই সাধনা। এই হ'ল চৈতন্যের বিকাশ, পরম চৈতন্যের মধ্যে। মানুষের আশা রয়ে গেল যে এই বিকাশের দিকেই সকলে চলেছি।"

নারী

শ্রীশোভা দেবী

সন্ধ্যার মত দেহে রাঙাবাস, আঁখিতে ক্ষরিছে মধু,
অবলুণ্ঠিত মন্দির-তলে কে তুমি তরুণা বধূ?
প্রদীপ জ্বালিয়া তুলসীতলায় কল্যাণ মাগ কার?
আলিপনা আঁক নিপুণ কলায় আনি পূজা-উপচার
কাহার ঘরণী? কাহার জননী? কাহার ঝিয়ারী তুমি?
তোমার পুণ্যে ধন্য হয়েছে তোমারই জন্মভূমি॥

শারদ প্রভাতে ফুলসাজি হাতে তুমিই কি তোল ফুল?
পল্লীর পথে চল বাপীতটে ছড়াইয়া ভিজা চুল।
তোমারে ঘেরিয়া প্রথম উষার সোনালী কিরণ নাচে
বিশ্বভবনে কর্ম্মজীবনে তোমারই আশিস্ যাচে
তোমার বিরহে কাতর ত্রিদিবে দেবতারা করে শোক
সৃষ্টির লীলাকমলে তোমার বরণ-আরতি হোক॥

তুমি সতী সীতা চিরবন্দিতা নব নব রূপ ধরি,
যুগে যুগে দিলে কত পরীক্ষা শত আদর্শে গড়ি।
অনল হয়েছে চন্দন তব অঙ্গপরশ সেবি
এলে প্রণয়ের প্রীতি-অর্চ্চনে চিরঈপ্সিত দেবী।
নলিনী নিলয় ত্যেয়াগী এসেছে অমৃতভাণ্ড করে
তোমার অমল কোমল মূরতি জীবন সফল করে॥

মহাশক্তির অংশরূপিণী মহাকালী রূপে হেরি
ধ্বংসরূপিণী অয়ি ধূমাবতী বাজাও কালের ভেরী।
সিংহবাহিনী জগৎজননী সকল অশিব নাশি
তোমার হাসির অভয় প্রসাদে পৃথিবী উঠিল হাসি
ক্ষুধিত ধরার তুষ্টির লাগি তুমি বিতরিছ অন্ন
ভিক্ষুক শিবে অন্নপূর্ণা, তুমিই করেছ ধন্য॥

কালো কেশে তব নিশারহস্য জয়মালা গলে দোলে
সৃজন জাগিল মানসে তোমার জীবন খেলিছে কোলে।
ধরার শ্যামলী, তাপসী দুলালী, প্রকৃতির নব রাণী
প্রাসাদেতে শচী, কুটীরে লক্ষ্মী যুগে যুগে তোমা জানি।
তুমি চিন্ময়ী, তুমি মৃন্ময়ী, তুমি কায়া, তুমি ছায়া
নিখিল পূজিছে তোমার চরণ আরাধ্যা যোগমায়া॥

গোপাল মাষ্টার

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

রাঁধিবার সরঞ্জামের মধ্যে একটি বিলাতী প্লাস, একটি স্ক্রু-ড্রাইভার ও একটি জীর্ণ কুকার। ব্যারাকের ৪৯ নং ঘরের বাসিন্দা গোপাল মাষ্টার স্বপাকেই ভোজন করেন। অন্যান্য লোকে তাঁহাকে বলে—পাগলা মাষ্টারটা। 'টা' শব্দাংশটি তাহাদের শ্রদ্ধার তাপমান যন্ত্র। প্রতিবেশিগণের অশ্রদ্ধাকে উপেক্ষা করিয়া গোপালবাবু আপনার কর্ত্তব্য করিয়া যান, এ-সব কথায় কান দিবার সময় তাঁহার নাই।

ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকে চাল, ডাল, আলু, তৈলের শিশি, বাটি, কুঁজা প্রভৃতি এবং তৎসহ কতকগুলি পুরাতন কেস্ ও ভাঙা টাইপ। স্কুল হইতে ফিরিয়া তিনি আপন মনে টাইপের পর টাইপ সাজাইয়া কি যেন কম্পোজ করেন। প্রতিবেশীর সহিত বাক্যালাপের সময় বা প্রয়োজন কোনটাই তাঁহার হয় না। নিয়মিত দাড়ি না কামাইয়া মাঝে মাঝে নিজের অসুন্দর মুখখানাকে কুৎসিত করিয়া তুলেন।

কোনদিন রাত বারটায়, কোন দিন বা একটু সকালেই তাঁহার স্টোভ জ্বলিতে আরম্ভ করে—এই তাঁহার রন্ধনের স্বাভাবিক সময়। সকালে কদাচিৎ রাঁধিবার চেষ্টা হয়। যদি কেহ কখনও কোন প্রশ্ন করে, সহাস্যে সবিনয়ে তার উত্তর দিয়া তিনি উপকৃত বোধ করেন বলিয়াই মনে হয়।

করুণাই হউক আর কৌতুহলেই হউক তাঁহার এই রহস্যময় জীবনযাত্রাপ্রণালীর প্রতি আমি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। মাঝে মাঝে তাঁহার ওখানে যাইয়া নানা প্রশ্নে তাঁহার কাজের অসুবিধা করিয়াছি, কিন্তু সহাস্যে তিনি বলিয়াছেন, "বসুন বসুন, কথা বলতে বলতে কাজ করি।" এমনি করিয়া আমার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘনিষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় দেখি গোপালবাবু এক গাল দাড়ি লইয়া সামনের স্টোভের উপর স্থাপিত মৃদু লণ্ঠনের আলোয় কম্পোজ করিতেছেন। ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার ধূলি-অবলুপ্ত কম্বলটির এক কোণে বসিয়া প্রশ্ন করিলাম—কি করছেন মাষ্টার-মশায়?

সহাস্যে গোপালবাবু বলিলেন—দেখতেই পাচ্ছেন।

আমি বলিলাম—যেটুকু দেখছি সেই কি সব? কি কম্পোজ করছেন? কি জন্যে করছেন? নিজেই বা করছেন কেন?

—এইবার বিপাকে ফেললেন। এর অনেক ইতিহাস বলতে সময় লাগবে, শুনবার ধৈর্য্য আপনার হয়ত হবে না।

—নিজের ধৈর্য্য সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকলে প্রশ্ন করার ধৃষ্টতা থাকা সম্ভব নয়।

—আপনি বেশ বলেন কিন্তু, কথাগুলি বেশ ধারালো। এ ব্যাপার হচ্ছে যে, স্কুলে পড়াতে পড়াতে দেখলাম বাজারের নোটে ছেলেগুলোর সব মাথা খাচ্ছে। পরের লেখা মুখস্থ করতে করতে নিজের চিন্তা করবার শক্তিও হারিয়েছে, লেখার ক্ষমতাও হারিয়েছে। তাই ভেবে ভেবে বের করলুম যে এমন একটা বই বা নোট লিখব যাতে তাদের চিন্তাশক্তি ও লেখার ক্ষমতা বাড়বে। লিখেও ফেললাম, কিন্তু কোন প্রকাশক তা প্রকাশ করলে না। বললে—ও-সব করলে কি বই চলে, কথাটা হচ্ছে সহজে পাস করতে হবে। তাই—

—তাই কি?

—নিজেই প্রকাশ করব।

—নিজে কম্পোজ করতে গেলেন কেন?

গোপালবাবু ক্ষণিক হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া লইয়া বলিলেন—এই সোজা হিসাবটা বুঝলেন না মশাই! একবার ছাপাতে যা খরচ তার অনেক কমে এই পুরানো টাইপ,

কেস কিনলুম। অন্তের মেশিনে ছাপিয়ে নেব। আর টাইপ পরেও যথেষ্ট ব্যবহার করা যাবে, এই বইটা একবার চলে গেলে হয়। কে বলতে পারে এ 'গোপাল প্রেসে'র ভিত্তি কিনা।—গোপালবাবু নিজেকেই ব্যঙ্গ করিবার জন্য উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন।

—প্রকাশক ব্যতীত বই চালানো মুশকিল। আপনি এ কাজ ক'রে লাভবান হবেন ব'লে বিশ্বাস কম। তবে পুরুষস্য ভাগ্যং।

গোপালবাবু অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—কৃতকার্য্য হওয়াটাই এ জগতে স্বাভাবিক নয়। অকৃতকার্য্যতাই মানুষের ভাগ্যে হামেশা ঘটে। কিন্তু তাই ব'লে ত চুপ করে থাকা যায় না। মাষ্টারি করি, যা সামান্য পাই তার কিছু বাড়ীতে পাঠিয়ে নিজের উদরান্নের সংস্থান থাকে না। চেষ্টা করতে হবে নিশ্চয়ই, ধরুন এই বইটা যদি চলে তবে আরও অনেক লিখতে পারব। মাষ্টারি-জীবনের মধ্যেও বৈচিত্র্য আসবে, অর্থও আসবে।

বুঝিলাম অকৃতকার্য্যতাকে তিনি সত্যই ভয় করেন এবং সেই জন্য সে-সম্বন্ধে চিন্তাকেও মনের কোণে স্থান দিতে নারাজ। ভবিষ্যতের স্বপ্নের খোরাক জোগাইতে গোপালবাবুর রাঁধিবার সময় হয় না।

ক্ষণিক চিন্তা করিয়া গোপালবাবু আবার বলিলেন—মাষ্টারি তো সত্যিই করি না, শিক্ষার নামে অশিক্ষা বা কুশিক্ষা দান ক'রে ফাঁকি দিয়ে কিছু টাকা নিচ্ছি। সত্যিকার শিক্ষা যদি দিতে পারতাম তবে মাষ্টারকে মানুষে ঘেন্নাও করত না, মাষ্টারকে মাইনে দিতেও তার প্রাণ টন্‌টন্ করত না।

ব্যথিত হইয়াছিলাম তাই তাঁহার অবশ্যম্ভাবী অকৃতকার্য্যতার কথা জানাইতে সাহস করি নাই। যে ভবিষ্যৎকে চাহিয়া নিজের উপরেই নির্দ্দয় লাঞ্ছনা করিয়া যাইতেছে তাহাকে কেমন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করা যায়? তথাপি প্রশ্ন করিলাম—কত দূর ছাপা হ'ল?

—দু-ফর্ম্মা হয়েছে, তৃতীয় ফর্ম্মার আট পৃষ্ঠা কম্পোজ করেছি।

—তা হ'লে পূজার আগেই বই বেরিয়ে যাবে আশা করা যায়।

—অবশ্যই।

ভারাক্রান্ত মনে ফিরিয়া আসিলাম। সকাল-সন্ধ্যা কোন আনন্দ নাই, অনন্যমনে, স্বল্পাহারে, অনাহারে এই লোকটি যে দিনের পর দিন একটির পর একটি টাইপ সাজাইয়া যাইতেছে এই ধৈর্য্য, এই অধ্যবসায়, এই সাধনার শক্তি এ কোথা হইতে পাইয়াছে! বিশ্বজগতের বাহিরে একাকী এ কেমন করিয়া দিন কাটায়! এই সাধনার মূল্যই বা কি?

রাত্রি বারটায় সিনেমা হইতে ফিরিতেছিলাম। এমনি সময়ে গোপালবাবুর ষ্টোভ জ্বালিবার কথা। কিন্তু আজ তাঁহার ষ্টোভ নীরব। কেসের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া লণ্ঠনের আলোকে তিনি কম্পোজ করিতেছেন। দরজায় দাঁড়াইয়াছিলাম কিন্তু আগন্তুককে দেখিবার সময় তাঁহার নাই। বলিলাম—মাষ্টার-মশায় রান্না হয়েছে?

গোপালবাবু স্বভাবসিদ্ধ স্মিতহাস্যে জবাব দিলেন—একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, তাই রান্নাটা আজ আর সম্ভব হ'ল না।

—কি হ'ল?

—ষ্টোভের তেল ঢেলে নিয়ে লণ্ঠন জ্বালিয়েছিলাম—এখন লণ্ঠনটাও শূন্যোদর, কাজেই এত রাত্রে তেল এনে রান্না করা সম্ভব নয়।

—খাবেন না?

অত্যন্ত উপেক্ষার সুরে তিনি বললেন—মোড়ের মাথায় ডালপুরীর দোকানটা কি খোলা দেখলেন?

—হ্যাঁ খোলা আছে।

গোপালবাবু মহা পুলকে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—বাঃ তা হ'লে আজ খাওয়া হবে!

—যান আর দেরি করবেন না, আমি আপনার ঘরে বসছি। দেরি হ'লে দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।

গোপালবাবু চলিয়া গেলেন।

আমি বসিয়া বসিয়া তাঁহার কথাই ভাবিতেছিলাম—বিরক্ত হইয়াছিলাম সন্দেহ নাই। নিজের প্রতি এই ঔদাসীন্যকে মার্জ্জনা করা সম্ভব নয়। তিনি বিবাহিত, তাঁহার উপর কেবলমাত্র তাঁহারই নয় আরও অনেকের

দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। অহেতুক আশায় নিজেকে বঞ্চিত করা আত্মহত্যাই।

চারখানি পুরী হাতে করিয়া গোপালবাবু প্রবেশ করিলেন। সহর্ষে বলিলেন—নিতাইবাবু, পুরী এখনও গরম আছে। আশ্চর্য্য বরাত—

গোপালবাবু জল ভরিয়া লইয়া, তাঁহার এনামেলের থালায় পুরী কয়খানি সাজাইয়া লইলেন। তাঁহার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কৌতুহল ছিল, তাই প্রশ্ন করিলাম—বাড়ী থেকে চিঠি পেলেন? সব ভাল ত?

আধখানা পুরী এক গ্রাসে পুরিয়া দিয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন—আজই পেলাম।

ক্ষণিক পরে বলিলেন—মেয়েমানুষমাত্রেই কিছু অবুঝ।

—তার অর্থ?

তিনি স্মিতহাস্যে কহিলেন—স্ত্রী লিখেছেন, বর্ষাকালে দুধের দাম বেড়েছে, যা পাঠাচ্ছি তাতে চলে না আরও টাকা দরকার, নইলে ছোট খোকার দুধ হয় না।

—বর্ষাকালে দুধের দাম ত বাড়েই, টাকা কিছু পাঠিয়ে দিন।

—আপনিও দেখি তাদের মতই করলেন। পারলে ত টাকা পাঠাতুমই কিন্তু পাই কোথা—

আমি সহিষ্ণুতা হারাইয়াছিলাম, বলিলাম—এই ছাপাতে ত টাকার কিছু অপচয় হয়েছে, নইলে ত আরও কিছু পাঠাতে পারতেন। এ-টাকা হয়ত শেষ পর্য্যন্ত অপব্যয়ই হয়ে দাঁড়াবে।

গোপালবাবু স্থিরনেত্রে আমার মুখখানা ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন—তাঁহার চোখে এমন হিংস্র দৃষ্টি কোন দিন দেখি নাই। ক্ষণিক চিন্তা করিয়া বলিলেন—আপনার কথার জবাব আছে, কিন্তু—

—বলুন। আমি কিছু মনে করব না।

গোপালবাবু বলিলেন—এই যে দুটো পয়সার জন্যে এই পরিশ্রম করছি, দিনরাত্রি পোকা-বাছার মত টাইপ খুঁজছি, এ কার জন্যে? ভবিষ্যতে পয়সার মুখ দেখে তারা সুখী হবে বলেই না? আমি আগে মেসে খেতুম, এখন রেঁধে খাই খরচ কমাবার জন্যে, তবুও তাদের টাকার থেকে একটি পয়সাও কমাই নি—আমি কষ্ট করেছি এ-কথার কতটুকু তারা বোঝে? কোন চেষ্টা না ক'রে কোন পরিশ্রম না ক'রে কেবলমাত্র মাষ্টারির চল্লিশ টাকা আঁকড়ে পড়ে থাকলেই কি তারা বা আমি সুখী হব?

—সে-কথা সত্য হ'লেও তারা ত অন্যত্র টাকা পাবে না, আর আপনি যে শরীরের উপর এই অত্যাচার করছেন সেটাও ত উচিত নয়। এই বই-ছাপানো ত পরেও হ'তে পারত।

এই সামান্য সহানুভূতিতে গোপালবাবু অত্যধিক উল্লসিত হইয়া বলিলেন—আমার শরীরের উপর অত্যাচার? ক'দিন? বইটা বেরোলেই বেশ দিনকয়েক খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে পড়ব। এ-জগতে বড় বড় লোকের জীবনী পড়ে দেখুন, সকলকেই যথেষ্ট কষ্ট করতে হয়েছে—দেখুন না বিদ্যাসাগরের জীবনী। ভগবানের এমনি আইন, কষ্ট না দিয়ে সুখ তিনি কাউকে দেন না। বহুকষ্টে লেখাপড়া শিখেছিলাম, তার কি একটা সুবিচার নেই!

দীর্ঘশ্বাস নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিয়া বলিলাম—ভগবান্ করুন তাই হোক।

গোপালবাবুও তৃষ্ণার্ত্ত কণ্ঠে এক গ্লাস জল টানিয়া দিয়া প্রতিধ্বনি করিলেন—হবে বইকি? নিশ্চয় হবে।

পূজা আগতপ্রায়—সকলেরই বাজার করিবার প্রয়োজনে সময়াভাব হইয়াছে। সেই জন্য কয়েক দিন যাবৎ গোপালবাবুর সহিত দেখা হয় নাই।

তাঁহার পুস্তকের চতুর্থ ফর্ম্মা কম্পোজ হইয়াছে, কিন্তু কাগজ কিনিবার পয়সার অভাবে আজও তাহা ছাপা হয় নাই।

সন্ধ্যার পর বাজার হইতে ফিরিয়া গোপালবাবুর খোঁজ লইতে গেলাম। গোপালবাবু তেমনি ভাবে বসিয়াই টাইপ সাজাইতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—পুজোর বাজার করলেন?

—হাঁ, করলুম কিছু কিছু।

—দেখি কি রকম কাপড়চোপড় কিনলেন?

গোপালবাবু পুঁটুলি খুলিয়া দেখাইতে লাগিলেন—এই বড় খোকার জামাকাপড়, মেয়ের ফ্রক, স্ত্রীর কাপড় ব্লাউজ, ছোট ছেলের—

—আপনার কাপড় কেনেন নি ?

তাচ্ছিল্যের সহিত বলিলেন,—নাঃ থাকগে এখন। এখন হয় কিনে নেব। তার পরে টাকাও কিছু বেশী খরচ হ'ল।

—কেন ?

—ওই চারের ফর্ম্মাটা ছাপাতে কাগজ কিনলাম। তার পর স্ত্রীর কাপড় কিনতে গিয়ে দু-টাকা বেশী দিয়ে ভাল কাপড়ই কিনে ফেললাম। ভাবলুম—একটা টাকা আছে ও দিয়ে আর কি হবে, ছেলেদের খেলনাই কিনি—পূজোর দিনে একটু হাসি-তামাশা করুক—

—কিন্তু ছেলেপুলের সঙ্গে আপনি কাপড় না পরলে যে পূজা সর্ব্বাঙ্গীন হয় না।

—থাক্‌গে, বুড়োবয়সে আবার কাপড় !

আজ আনন্দিত হইয়াই ফিরিয়া আসিলাম। নিজের স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া তিনি স্ত্রীপুত্রের জন্যে সমস্ত খরচ করিয়াছেন। অপরিচিতা পল্লীবধূর প্রতি অকারণেই সমবেদনা ছিল, তাই স্নেহের এই প্রকাশে আনন্দিতই হইয়াছিলাম।

মানুষের মন কি বিচিত্র! গোপালবাবুর অন্তরের এই স্নেহভালবাসা যেমন সত্য, সেই পল্লীবধূর বর্ষার দিনে ছেলের দুধ না সংগ্রহ করিতে পারাও তেমনি সত্য। দেওয়া আর না-দেওয়া এই দুয়ের মধ্যেই তাঁহার স্নেহের অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট।

আপনার ঘরে ফিরিয়া দেখি গোপালবাবু-সংক্রান্ত আলোচনায় আসর বেশ সরগরম। এক জন বলিলেন—পাগলা মাষ্টারটা দেখি আজ একটা রবারের বেলুনে ফুঁ দিয়ে নিজে নিজেই মিটি মিটি হাস্‌ছে। বেলুন দেখেই মশগুল!

অপর ব্যক্তি বলিলেন—এই ত তার বন্ধু, ওকে এর তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা কর না।

আমি বলিলাম—ও-হাসি বেলুন দেখে নয়, বেলুনের মধ্যে তিনি তাঁর ছেলের সহাস্য মুখখানিই দেখেছিলেন।

কেহ বলিলেন—ওর অর্থ একমাত্র তুমিই বোঝ।

—রতনে রতন চেনে কিনা!

এই ব্যঙ্গোক্তিতে দুঃখিত না হইয়াই বলিলাম—নিজের অজ্ঞতার সম্বন্ধে সচেতন নয় ব'লেই মানুষ জগতে এত অত্যাচার করতে পারে।

সকলে প্রগল্‌ভের মত ক্ষণিক হাসিয়া লইয়া পুনরায় পাগল মাষ্টারটার সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

দুই-এক বৎসর পরের কথা—

গোপালবাবুর পুস্তক বাহির হইয়াছিল কিন্তু নিজের স্কুলে সামান্য দুই-এক জন ছাত্র ছাড়া সে পুস্তক কেহ কিনে নাই। তাঁহার ঘরে কতক বাঁধানো পুস্তক, কতক ভাঁজ-করা ফর্ম্মা, কতক ছাপা ফর্ম্মা আজও পড়িয়া আছে। কেস ও টাইপ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ধুলায় ও বয়সের গুণে কাগজে রং ধরিয়াছে।

বই-ছাপানো ব্যাপারে কিছু টাকা ধার করিয়াছিলেন, কয়েক বৎসর টিউসনি করিয়া তাহা শোধ করিয়াছেন।

কিন্তু কয়েক দিন যাবৎ শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে—গোপালবাবু মোটা মোটা রসায়ন-বিদ্যার কেতাব আনিয়া পড়া শুরু করিয়াছেন।

শঙ্কার কারণ, বই ছাপা অপেক্ষা রাসায়নিক গবেষণায় খরচা বেশী। গোপালবাবু যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরম্ভ করিবেন, এই পুস্তকপাঠ তাহারই পূর্ব্বাভাষ মাত্র। তাহাতেও ক্ষতি ছিল না কিন্তু পল্লীর কোণে সেই অসহায় বধূটির অবশ্যম্ভাবী দুঃখের কথা মনে করিয়াই শঙ্কিত এবং দুঃখিত হইয়াছিলাম।

গোপালবাবুর ঘরে সেদিন সন্ধ্যা হইতেই ষ্টোভ জ্বলিতেছিল—এতক্ষণ ষ্টোভ জ্বলিতে শুনিয়া সন্দেহও হইয়াছিল।

গোপালবাবুর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি যাহা অনুমান করিয়াছিলাম তাহাই। ফিল্‌টার পেপার, বীকার, ফানেল প্রভৃতি বহু বস্তুর আমদানী হইয়াছে। তিনি একটি টেষ্ট-টিউবে লিট্‌মাস সলুউসন লইয়া লণ্ঠনের নিকটে কি যেন নিবিষ্ট মনে দেখিতেছেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি করছেন মাষ্টার-মশায় ?

—ও, আসুন আসুন। একটা পরীক্ষা করছিলাম।

—বিজ্ঞানশাস্ত্র আমিও কিছু কিছু পড়েছিলাম, বলুন না সব ব্যাপারটা খুলে—

তিনি সোৎসাহে বলিলেন—বলব বইকি। দেখুন ত এইটার রং, একটু নীল না লাল, মানে এটা এসিডিক্ না অ্যালক্যালাইন আছে—

আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলাম—নীল লিটমাস দিয়েছিলেন ত?

—হ্যাঁ।

—তবে এটাকে ত নিউট্রাল ব'লে মনে হচ্ছে।

—বটে! তা হলে ঠিক্ হয়েছে। ভাল দেখতে পাচ্ছি না কি না?

তিনি সহর্ষে খানিক জল স্টোভের উপর চাপাইয়া দিয়া বলিলেন—ব্যস, নিউট্রাল যদি হয়ে থাকে তবে পরীক্ষায় নিশ্চয়ই ফল পাব।

—কিন্তু কি ফল সেটা ত বললেন না।

—বলছি।

স্টোভে বেশ খানিকটা পাম্প দিয়া আসিয়া তাঁহার ধূলি-অবলুপ্ত কম্বলটায় বসিয়া বলিলেন—শুনুন। মিল্ক শুগার হয় কিসের থেকে জানেন?

—না।

—ছানার জল থেকে। কত ছানার জল নষ্ট হচ্ছে এই কলকাতায়, কিন্তু এর থেকে রাশি রাশি মিল্ক শুগার পাওয়া যায়, অথচ ভারতে ও-দ্রব্যটি তৈরিই হয় না। এ-ব্যবসায়ে প্রচুর লাভও বটে। শুগার পেলে দেখবেন সমস্ত যন্ত্রপাতির খসড়া ক'রে ফেলব এবং—

—যন্ত্রপাতি তৈরি করবার টাকা পাবেন কোথায়?

গোপালবাবু আত্মপ্রসাদের সঙ্গে খানিক হাসিয়া লইয়া বলিলেন—সেবার বইয়ের ব্যবসাটায় গোড়ায় গলদ ছিল, এবার কি সেই ভুল হ'তে দেই। এবার অনিবার্য্য, অবশ্যম্ভাবী।

—অর্থাৎ।

—যদি শুগার বের ক'রতে পারি তবে এই ব্যবসায় একটা ব্যাঙ্ক নেবে, আমাকে ফ্যাকটরীর ভার দেবে এবং লাভেরও একটা অংশ দেবে। শুগার বের হবেই, কারণ এর প্রসেস্ খুবই সোজা, না হওয়ার কোন কারণ নেই।

—কি ক'রে হবে?

—এই ত ধরুন নিউট্রাল করা হ'ল, এখন এর জল মেরে খুব ঘন ক'রতে হবে অর্থাৎ ওভারস্যাচুরেটেড সলিউসন। তার পরে রেখে দিলেই নীচে চিনি দানা বাঁধবে—মানে ক্রিস্টালাইজ করবে। সেইটাকে গুঁড়িয়ে নিলেই মিল্ক শুগার হ'ল। দানা বাঁধতে আটচল্লিশ ঘণ্টা লাগবে।

অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করিলাম—রান্না হয়েছে?

গোপালবাবু উচ্চহাস্যে বলিলেন—রান্না হয় কি ক'রে? স্টোভে ত ওইটাই চাপিয়ে দিলাম, ওটা ঠিক গাঢ় হ'তে রাত বারটা হবে নিশ্চয়ই।

—তবে খাবার কি হবে?

—সে ব্যবস্থার ত্রুটি হয় নি। ডালপুরী এনে রেখেছি।

ইতস্ততঃ করিয়া প্রশ্ন করিলাম—ব্যাঙ্ক আপনার ব্যবসা গ্রহণ করবে কেন? তারা ত বড় বড় বৈজ্ঞানিককে নিয়েই এ ব্যবসায় আরম্ভ করতে পারতো—

—পথটা ত আমিই দেখাচ্ছি, পরীক্ষা ক'রে প্রসেস্ ও যন্ত্রপাতি সবই ত আমি করবো। সবই যখন আমি করবো, তখন বৈজ্ঞানিক নিয়ে তারা কি করবে? তারা ব্যবসা চায়, লাভ চায়, বৈজ্ঞানিক চায় না।

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম—যা হোক্ এবার তা হ'লে—

—হ্যাঁ, এবার একটা কিছু হবেই।

পরদিন সকালে গোপালবাবুর ডাকেই ঘুম ভাঙিল।

গোপালবাবু অস্বাভাবিক ব্যাকুলতার সহিত বলিতেছেন—আসুন ত নিতাইবাবু একটু দয়া ক'রে—

—কেন?

—আসুন না।

একটা কাচের পাত্রে কিছু লবণাভ তরল পদার্থ ছিল। তিনি সেই দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—দেখুন ত ওর মধ্যে সাবুর দানার মত কিছু দেখতে পান কি না। চশমা না পাল্টালে কিছু আর বুঝবার উপায় নেই।

পাত্রটা হাতে লইতে যাইতেছিলাম, তিনি তারস্বরে

বেদের মেয়ে

শ্রীতারক বসু
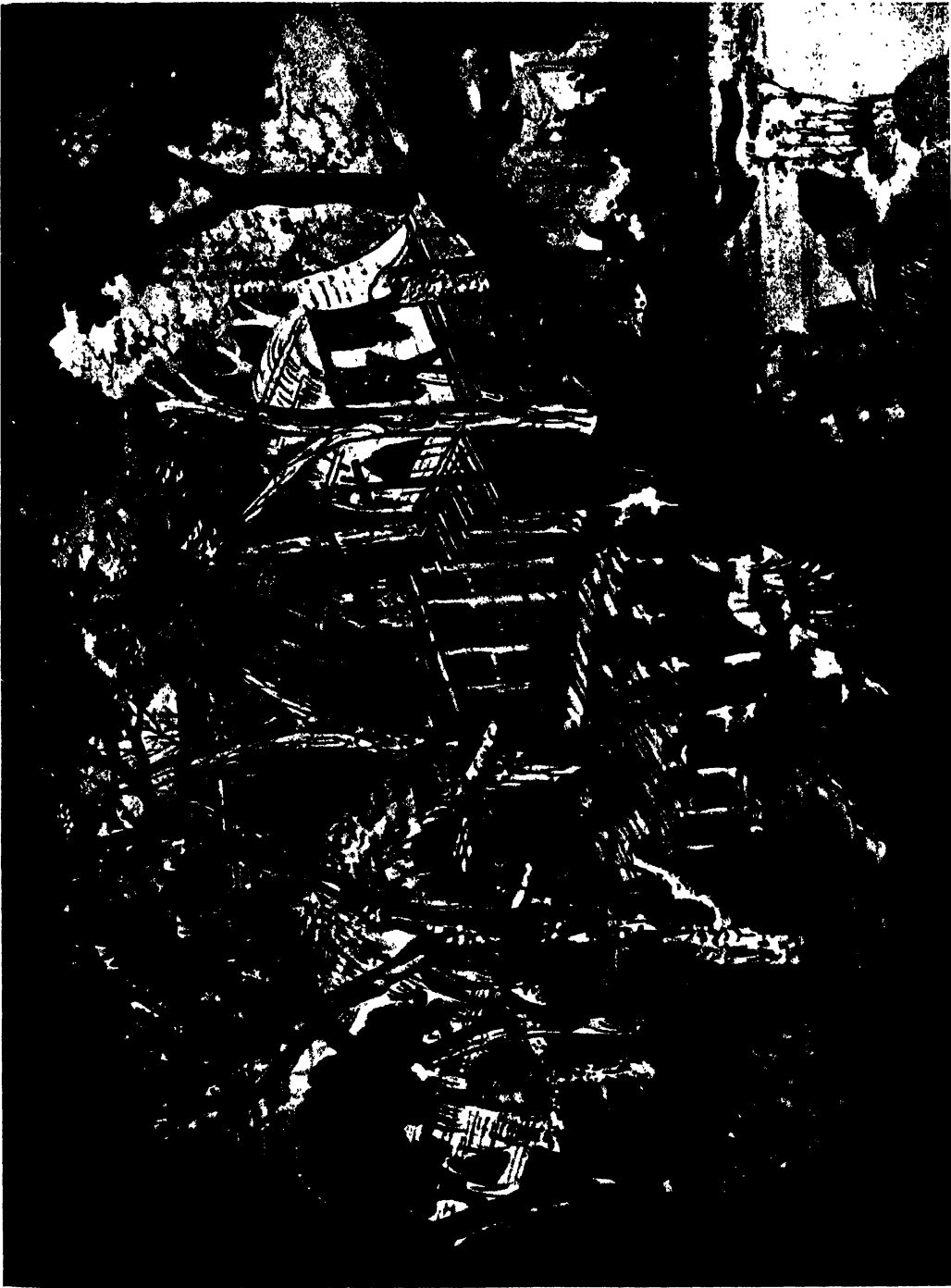
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বলিয়া উঠিলেন—করেন কি? করেন কি? নাড়বেন না। দূর থেকে দেখুন—

অভিনিবেশসহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলাম বটে, কিন্তু একটা সর পড়িয়া আছে। সাবুর দানার মত কোন বস্তু দেখা গেল না।

—দেখলেন?

—হ্যাঁ, কিন্তু দানা ত দেখা যায় না।

গোপালবাবু ব্যথিত চিত্তে বলিলেন—হবে, আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় কিনা!

আটচল্লিশ ঘণ্টাও চলিয়া গেল কিন্তু চিনির দানা বাঁধিবার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। উপরে একটা সর জমিয়া উঠিল—ধূলা ও ময়লারই হউক বা কোন রাসায়নিক দ্রব্যেরই হউক।

গোপালবাবু কয়েক দিন সেই তরল পদার্থ লইয়া নানাবিধ পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু কোন প্রকারেই চিনি দানা বাঁধিল না। অবশেষে তিনি পুনরায় পড়াশুনা আরম্ভ করিলেন।

কয়েক দিন পরে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিলেন—পচা ছানার জলে নাও হ'তে পারে, কারণ তাতে ল্যাকটোজ জন্মায়। এবার দুধ থেকে নিজে ছানা ক'রে তবে দেখতে হবে। আর সেবার নিউট্র্যাল করাটাও বোধ হয় ঠিক হয় নি। এবার রবিবারে দিনে দিনে ব্যাপারটা করতে হবে। ব্যাঙ্ক বলেছে যদ্দিন ফ্যাক্টরী তৈরি চলবে তত দিন মাসিক এক শত টাকা দক্ষিণা—

—বাড়ীর খবর ভাল?

—ভাল।

একটু পরে হাসিয়া বলিলেন—আপনার ভয় নেই, অন্যান্য মাসের মত এ-মাসেও নিয়মিত টাকা পাঠানো হয়েছে।

আমি বলিলাম—বেশ রবিবারে খাওয়ার পরে আরম্ভ করা যাবে পরীক্ষা, যত রাত্রি হয়। আমিও যথাসাধ্য সাহায্য করব।

—সাহায্য করবেন? বেশ! বেশ!

রবিবারে নিশীথ রাত্রি অবধি পরীক্ষা চলিল। সময়াভাবে গোপালবাবু আজও খাবার খাইয়া রাত্রি কাটাইবেন স্থির করিয়াছেন।

স্টোভের উপর দুই সের ছানার জল মরিয়া প্রায় এক পোয়া হইয়াছে। গোপালবাবু মাঝে মাঝে খানিকটা লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে প্রশ্ন করিতেছেন—দেখুন ত গুঁড়ো গুঁড়ো কিছু ভেসে বেড়াচ্ছে কি না?

আমি নির্ব্বোধের মত বলি—কই না।

রাত্রি প্রায় বারটায় জল বেশ ঘন আকার ধারণ করিল। গোপালবাবু বলিলেন—এইবার হয়েছে, কেমন?

—হ্যাঁ।

—রেখে দেওয়া যাক্। কাল সকালে দানা বেঁধে থাকবে।

—আমারও বিশ্বাস তাই।

—নিশ্চয়ই হবে, হবে না কেন? দু-জনে করেছি, কোন ভুলচুক ত হয় নি।

পরদিন প্রত্যূষে একটা গোলমালে ঘুম ভাঙিয়া গেল।

গোপালবাবু কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছেন, ভোর রাত্রে তাঁহাকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। হাসপাতালে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন।

হাসপাতালে পাঠানো, তাঁহার বাড়ীতে সংবাদ দেওয়া, সমস্ত কর্ত্তব্যই আমার স্কন্ধে আসিয়া পড়িল। যথারীতি সেগুলি সম্পন্ন করিয়া, বার বার এই প্রার্থনাই সেদিন করিয়াছিলাম, গোপালবাবুকে তাঁহার জন্য না হউক অন্ততঃ তাঁহার অসহায় পরিবারের জন্য যেন বাঁচাইয়া রাখেন।

পরদিন গোপালবাবুর স্ত্রী আসিয়া পড়িলেন, কিন্তু গোপালবাবু আর হাসপাতাল হইতে ফিরিলেন না। সৎকার, ও বিধবা স্ত্রীর থানের কাপড়ের ব্যবস্থা করিবার সমস্ত মর্ম্মন্তুদ কর্ত্তব্যই করিতে হইল—শেষ কর্ত্তব্য তাঁহাকে গোপালবাবুর জিনিসপত্র সহ গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসা।

জিনিসপত্র বাঁধা হইতেছিল। গোপালবাবুর স্ত্রী একটা কাচের পাত্র আনিয়া বলিলেন—এটা কি দেখুন ত? ফেলে দেব?

ব্যথিত বিস্ময়ে দেখিলাম, গোপালবাবুর মিল্ক শুগার সত্যই দানা বাঁধিয়াছে। কি জবাব দিব? উপেক্ষার সহিত বলিলাম—ফেলেই দিন—ও দিয়ে আর কি হবে!

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ১৮৩+৮। মূল্য ১।০ টাকা।

বাঙালী হিন্দুর জাতীয় দুর্দ্দিনে যাঁহারা দরদ দিয়া বাঙালী হিন্দুর কথা চিন্তা করিয়াছেন ও মনে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন, গ্রন্থকার তাঁহাদের অন্যতম। বাঙালী হিন্দু প্রাণবন্ত জাতি; কিন্তু তথাপি ক্ষয়িষ্ণু। কথাটা শুনিলে প্রথমে ইহা প্যারাডক্স, হেঁয়ালি বলিয়া মনে হয়—কিন্তু ইহা প্রকৃত সত্য। বড়লোকের ছেলে, যথেষ্ট সম্পত্তি ও আয় আছে, কিন্তু অমিতব্যয়িতার ফলে ক্রমেই ঋণগ্রস্ত ও দরিদ্র হইয়া যাওয়ার ন্যায় বাঙালী হিন্দু ক্ষয়িষ্ণু। তাহার ক্ষয়ের যথেষ্ট কারণ আছে।

লেখক অল্প কথায় সাধারণের বোধগম্য ভাষায় সহজে কি কি কারণে বাঙালী হিন্দু ক্ষয়িষ্ণু তাহা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছেন। হিন্দুর ধর্ম্মান্তর গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে তিনি লিখিয়াছেন, "উত্তরবঙ্গে ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারের পশ্চাতে বহু সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণ নিহিত আছে। রংপুরে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য সম্বন্ধে বুকানন সাহেব (১৮০৭) লিখিয়াছেন যে এখানকার মুসলমানেরা আরব, আফগান বা মুসলমান আগন্তুকদের বংশধর নহে, অধিকাংশই স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীদের বংশধর, রাজা ও ভূস্বামীদের গোঁড়ামি ও অত্যাচারের ফলে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়াছে। রাজা রামমোহনের সময়েও এই ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তন প্রবলভাবে চলিয়াছিল।"...অপর স্থলে তিনি লিখিয়াছেন,

"এ স্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আর্য্যসমাজের শুদ্ধি-আন্দোলনের বহু পূর্ব্বে বাংলা দেশের কয়েক জন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মনে এই শুদ্ধি-সমস্যার কথা উদিত হইয়াছিল। ধর্ম্মান্তর-গ্রহণের ফলে হিন্দুর সংখ্যা যে হ্রাস পাইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও হ্রাস হওয়ার আশঙ্কা আছে, ইহা তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সেই বিপত্তি নিবারণের জন্য শুদ্ধির ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার এক শত জন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কলিকাতার "পতিতোদ্ধার সভার অনুমত্যনুসারে" পতিতোদ্ধার "বিষয়ক ভূমিকা ও ব্যবস্থা পত্রিকা" প্রচার করেন। উহাতে সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ দেওয়া হয় যে, শুদ্ধি-ব্যবস্থা শাস্ত্রসম্মত এবং যাহারা হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা পুনরায় হিন্দু হইতে ইচ্ছা করিলে, তাহাদিগকে শুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করা যাইতে পারে। উক্ত পুস্তিকার শেষে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা আবেগপূর্ণ ভাষায় হিন্দুসমাজের নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন, "সুবিজ্ঞবর মহাশয়েরা উদিত বিষয় অতি মনোযোগপূর্ব্বক বিশেষ বিবেচনা করিয়া বর্ত্তমান সময়কে শেষসাবকাশ জানিয়া, হিন্দুজাতির চিহ্ন থাকিতে এমত বিহিত উপায় দ্বারায় করিতে আদেশ হয়, যদ্দ্বারা পৃথিবী এককালে হিন্দুশূন্যভূতা ও বেদবিহিত সনাতন ধর্ম্ম নিতান্ত লোপ না হয়; অর্থাৎ ভ্রান্ত ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাবলম্বনে পতিত হিন্দুদিগকে তাঁহাদিগের প্রার্থনা মতে আমাদিগের উক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবস্থানুযায়ী সংস্কার দ্বারা উদ্ধার ও স্বজাতির সহিত ব্যবহারকরণ সর্ব্বসাধারণ পক্ষে আজ্ঞা করেন।"

কিন্তু হায় ৮৭ বৎসর পূর্ব্বে বাংলার উদার দূরদর্শী ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা হিন্দুসমাজকে আত্মরক্ষার জন্য যে আহ্বান করিয়াছিলেন, বাংলার হিন্দু-সমাজ এখনও তাহাতে সাড়া দিতে পারিল না।"

ইহা ত গেল শুধু একটি বিষয়ের কথা। গ্রন্থকার হিন্দুজাতির ক্ষয়ের প্রায় সকল কারণগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। জাতিভেদের পরিণাম, পাতিত্য দোষ, অস্পৃশ্যতার অভিশাপ, বিবাহ-সমস্যার জটিলতা, বাংলার হিন্দুসমাজের লোকক্ষয়, আর্থিক বিপর্য্যয় হইতে আরম্ভ করিয়া রাষ্ট্র ও সমাজ, ছায়াচিত্র, লোকসাহিত্য, সমাজ ও সাহিত্য, বিধবা-বিবাহ নিষেধের পরিণাম প্রভৃতি প্রায় সব কথাই আলোচনা করিয়াছেন; এবং প্রতিকার কোন্ পথে তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের আলোচনার বিশেষত্ব এই যে, তিনি কোনও পূর্ব্বসংস্কার লইয়া আলোচনা আরম্ভ করেন নাই, যাহা সত্য বলিয়া মনে হইয়াছে তাহাই লিখিয়াছেন। এ-বিষয়ে তিনি বিখ্যাত সংখ্যাতত্ত্ববিদ্ কার্ল পিয়ার্সন-এর নিম্নোদ্ধৃত উক্তি অনুসরণ করিয়া জাতির ও সমাজের কল্যাণভাজন হইয়াছেন:—

"Of one thing, however, I feel sure that no judgment will lead to lasting social gain which is reached by appeal to the emotions, which is based on inadequate knowledge of facts or which collect data with the view of supporting any preconceived opinion."

যাহাতে হিন্দুজাতির কল্যাণকামী সকলের দৃষ্টি এই গ্রন্থখানির প্রতি আকৃষ্ট হয় তজ্জন্য নিখিল বঙ্গীয় সেন্সাস বোর্ড সকলকে বইখানি পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

বঙ্গীয় শব্দকোষ—পণ্ডিত শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং তাঁহার দ্বারা শান্তিনিকেতনস্থিত বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ডের মূল্য আট আনা। হাতে না লইলে ডাক-মাশুল আলাদা লাগে। প্রাপ্তিস্থান, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা।

এই বৃহৎ অভিধানখানির ৭১তম খণ্ড শেষ হইয়াছে। তাহার শেষ শব্দ 'ভাদ্দর' এবং শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক ২২৬৪। এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে, গ্রন্থখানি ৯০ খণ্ডে শেষ হইবে।

আমরা বহুবার লিখিয়াছি, ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ে, সমুদয় কলেজে ও উচ্চ বিদ্যালয়ে রাখা উচিত। সন্তোষের বিষয়, বাংলা-গবর্ন্মেণ্ট প্রকাশিত খণ্ডগুলি ২১ প্রস্থ লইয়াছেন, এবং শুনা যায়, ৪৯ প্রস্থ লইবেন।

বঙ্গীয় মহাকোষ—প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত পণ্ডিত অমূল্য-চরণ বিদ্যাভূষণ। যে সম্পাদকমণ্ডলী তাঁহার সহিত সহযোগিতা করিতেন, এখনও তাঁহারাই সম্পাদন করিতেছেন। ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইন্সটিটিউট কর্ত্তৃক কলিকাতাস্থিত ১৭০ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা। ডাকমাশুল আলাদা। ২য় খণ্ড, ১৭শ সংখ্যা।

এই সংখ্যার প্রধান প্রবন্ধ দুইটি—'অনুমান' ও 'অনুরাধপুর'। প্রথমটি দার্শনিক, দ্বিতীয়টি প্রত্নতাত্ত্বিক। দ্বিতীয়টি সচিত্র।

পঞ্চতীর্থ—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী, এম্ এ, বি এল্ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার সেন, এম্ এ, কান্দিরপাড়, কুমিল্লা। মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থকার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কয়েকটি স্মৃতিসভার সভাপতিরূপে যে পাঁচটি প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন, এই পুস্তকে সেইগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। পুস্তকটির নাম এই কারণে 'পঞ্চতীর্থ' রাখা হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি যথাক্রমে "১। রাজা রামমোহন রায়, ২। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, ৩। পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব, ৪। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" সম্বন্ধে লিখিত। লেখক এই পাঁচ জনকে যথাক্রমে "মনীষী", "ভক্ত-বিশ্বাসী", "ত্যাগী", "কর্ম্মী", "ঋষি", বলিয়াছেন। এই পাঁচটি শব্দের কেবল এক একটিই এক এক জনের প্রতি প্রযোজ্য, না এক এক জনের প্রতি একাধিক শব্দ প্রযোজ্য, তাহার আলোচনা করিতে চাই না।

প্রবন্ধগুলি 'সাধুভাষা'য় সুলিখিত। সকল স্থলে লেখকের সহিত একমত হইতে না পারিলেও পাঠকেরা ইহা পড়িয়া উপকৃত হইবেন।

ড.

রাজপুত ও উগ্রক্ষত্রিয়—শ্রীহরিচরণ বন্ধু সঙ্কলিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৬ নং ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জি ষ্ট্রীট হইতে শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র রায় কর্তৃক প্রকাশিত। পৃ. ১৪৬। মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থকার প্রাচীন যুগের ঋগ্বেদাদি আর্যশাস্ত্র, মাধ্যমিক যুগের শিলা, তাম্রলিপি এবং আধুনিক যুগের বিশেষজ্ঞদের গবেষণা ও ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ প্রামাণিক গ্রন্থাদি হইতে বহু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থে পরিবেশন করিয়াছেন। বাংলা দেশের উগ্রক্ষত্রিয় বা আগুরি শ্রেণীর হিন্দুগণ যথার্থ রাজপুত ক্ষত্রিয় কিনা, সে সম্বন্ধে কাঁহারও কাঁহারও মতদ্বৈধ থাকিতে পারে; কিন্তু গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত যেরূপ সুবিন্যস্ত প্রমাণ-প্রয়োগের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাতে উহা নিরপেক্ষ সুধীজনের নিকট আদৃত হইবার যোগ্য।

উ. চ.

আধুনিক যুদ্ধ—শ্রীভবেশচন্দ্র রায়, এম. এস্‌সি. ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিংহ প্রণীত। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। প্রকাশক শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়, ৪০-এ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা।

বইখানিতে প্রথমে অতি সংক্ষেপে আদিম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানকাল পর্যন্ত যুদ্ধ ও যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রের বিবর্ত্তন দেখানো হইয়াছে। তাহার পরে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের কারণ ও প্রধান প্রধান রাজনীতিকের পরিচয় দিয়া বর্ত্তমান যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধে এইখানিকে প্রথম বই বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে এই সম্বন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট বই প্রকাশিত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, বইখানি বেশ সময়োপযোগী। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের যুদ্ধ সেকালের তীরধনুক অথবা গাদাবন্দুকের যুদ্ধ নহে, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রেরও জটিলতা বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সব দুরূহ বিষয় অতি সহজ সরল ভাষায় সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করিয়া লেখকদ্বয় তাঁহাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

বহুসংখ্যক ছবি দিয়া পাঠ্যবিষয় বুঝিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ছবিগুলি সুমুদ্রিত।

আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে লেখকদ্বয় বিদেশী শব্দের বাংলা উচ্চারণ সম্বন্ধে সাবধান হইবেন।

বইখানির একটি বিশেষত্ব, ইহার নির্ঘণ্ট, সাধারণতঃ বাংলা বইতে যাহা থাকে না।

জহর ও অমৃত—শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম. এ.। ডি, এম্, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

অত্যাচারী জমিদারের দেবোপম পুত্র কি করিয়া দুশ্চরিত্রা কুলত্যাগিনী অভিনেত্রীর কবলে পড়িয়া অধঃপতনের শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাই এই উপন্যাসের গল্পাংশ। যে সকল উপকরণ দ্বারা উপন্যাস লিখিত হয় সবই ইহার মধ্যে যথেষ্ট মাত্রায় আছে। দুঃখের বিষয় রস কোথাও তেমন ভাবে জমাট বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই।

নিজেরে হারায়ে খুঁজি—শ্রীগীতা ঘোষ। প্রকাশক শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার, ৯. মাধব চ্যাটার্জ্জী লেন, কলিকাতা। মূল্য ১।৵।

এই উপন্যাসখানিতে গল্পাংশ অতি সামান্য, কিন্তু সেই সামান্য কথা লেখার গুণে মধুর হইয়া উঠিয়াছে। বইখানি গ্রন্থকর্ত্রীর প্রথম লেখা, কিন্তু কোথাও কাঁচা হাতের লক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

একটি অনাথা শিশুর অতি শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিবার কাহিনী লইয়া বইখানি লিখিত। যে-সমাজের কথা লেখিকা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বাঙালী জনসাধারণের পরিচিত নহে, তাহা সাহেবী-ঘেঁষা ইঙ্গবঙ্গ সমাজের কথা। যেটুকু অস্বাভাবিক বোধ হয় তাহা হয়ত পরিচয়ের অভাবে।

বইখানির ভাষা অতি সুন্দর। শৈশবের অস্পষ্ট স্মৃতির কথা পড়িতে গিয়া পাঠকের নিজের অতি সুদূর কুয়াশাচ্ছন্ন শৈশবের কথা মনে পড়িয়া যায়, কোনো মিল না থাকা সত্ত্বেও। লেখার গুণে খেলাঘরের "কৃষ্ট্-দুর্গা-উমা", "সোনাদের আমগাছ", দ্রুতধাবমান গাড়ীর পশ্চাতে ক্রম-বিলীয়মান ফুলের গাছে "লাল বড় বড় ফুল" সব সত্য হইয়া উঠে। যাহারা পিছনে রহিল, তাহাদের কথা মনে হইয়া চক্ষু ঝাপসা হইয়া আসে।

শ্রীআর্য্যকুমার সেন

নবদ্বীপ মহিমা—কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী কর্তৃক সংকলিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। পরিশোধিত, পরিবর্ধিত ও চিত্রসম্বলিত। শ্রীজিতেন্দ্রিয় দত্ত ও শ্রীফণিভূষণ দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত।

মূলগ্রন্থকারের পরলোকগমনের তেইশ বৎসর পরে প্রকাশিত নবদ্বীপ মহিমার এই দ্বিতীয় সংস্করণ বাঙালী পাঠকের নিকট আদর লাভ করিবে। বর্ত্তমান সংস্করণের সম্পাদকদ্বয় নানা নূতন তথ্যের সমাবেশের দ্বারা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণকে সমৃদ্ধ ও কালানুগ করিয়া তুলিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ফলে, 'বর্ত্তমান সংস্করণে গ্রন্থ প্রথম সংস্করণের প্রায় তিন গুণ হইয়াছে।' নবদ্বীপের প্রধান গৌরব নবদ্বীপের পণ্ডিত-সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। বঙ্গের অন্যান্য অংশের প্রধান প্রধান সংস্কৃত গ্রন্থকতাদিগের পরিচয়ও প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে উপনিবদ্ধ হইয়াছে। তাই ইতিহাসরসিক ও সংস্কৃত পণ্ডিত উভয় সম্প্রদায়ের নিকট এই গ্রন্থ সমান আদৃত হইবে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—শ্রীঅমূল্যপদ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত, ৩২।১ এ, গোবিন্দ ঘোষাল লেন, ভবানীপুর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২৷৹ টাকা।

জীব ও ঈশ্বরের লীলা কীর্ত্তনই ভারতের নব বেদ, ইহাই গীতাশাস্ত্র। যাহা শাশ্বত ও অমোঘ সত্য, তাহাই গীতাকারের কণ্ঠে উদ্গীত হইয়াছে। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে গীতার মূল শ্লোকগুলি পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন ও তৎসহ স্থানে স্থানে গদ্যে গীতার তাৎপর্য্য 'বিশদ ব্যাখ্যার' দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা অতি অল্প হইয়াছে যাহার দ্বারা গীতার ভাব ফুটিয়া উঠে নাই। দু-এক স্থানে ভুল চোখে পড়িল।

তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার মহাশয় স্বধর্ম্ম কি এবং পরধর্ম্মই বা কি, কিছুই বলেন নাই, অথচ এই দুটি জিনিস না বুঝিলে, এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি এই সকল বিষয় বিশেষ আলোচনা করিবেন।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

জ্ঞান-বিজ্ঞান—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সিংহ। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ৮২ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীদের 'সাধারণ জ্ঞান' বৃদ্ধির উদ্দেশ্য লইয়া বহিখানি লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ভ্রমবাহুল্যের ফলে ও রচনাকুশলতার অভাবে বহিখানি সে উদ্দেশ্যসাধনের সম্পূর্ণ উপযোগী হয় নাই।

স.

অনন্ত বর্দ্ধন—শ্রীবিধুভূষণ সেন গুপ্ত, এম, এ। মূল্য চারি আনা।

এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি টেনিসনের "এনক্ আর্ডেন্"-এর বঙ্গানুবাদ। অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল ও সুবোধ্য। সাধারণ পাঠক ইহা হইতে মূল কাব্যের গল্পাংশ আহরণ করিতে পারিবেন। কলেজের ছাত্রগণেরও ইহা কাজে লাগিতে পারে। গ্রন্থ-পরিচয়, গ্রন্থকারের নাম এবং গ্রন্থের মূল্য ইংরেজীতে না লিখিয়া বাংলায় লিখিলে ভালো হইত। অনুবাদক কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক, বাংলায় বই লিখিয়াছেন, মলাটে, উৎসর্গপত্রে এবং ভূমিকায় ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করিয়া কেন বইখানাকে এমন হতশ্রী করিয়া ফেলিলেন, বুঝিলাম না।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মধুমালা—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম. এ.। গ্রন্থনিকেতন, ১২৯ডি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

লেখকের ছন্দের হাত ভাল, ভাষাও সাবলীল। কবিতাগুলি সুপাঠ্য। কবির উপরে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অত্যধিক; ছন্দের দিক দিয়া সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবও বেশ স্পষ্ট। এই প্রভাব ছাড়াইতে পারিলে কবিতা আরও ভাল লাগিত।

বইটিতে তিনটি অংশ। প্রথম অংশে বিভিন্ন সুরের কয়েকটি কবিতা আছে। কবিতা কয়টি ভাল, কিন্তু এমন ভিন্ন বস্তু ও ভিন্ন রকমের কয়টি কবিতা একত্র করার ফলে পড়িতে একটু রসভঙ্গ ঘটে।

দ্বিতীয় অংশে অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ নামে বারোটি সনেটের একটি বারোমাসী; সনেট ক'টি পড়িতে মন্দ লাগে না।

তৃতীয় অংশে কালিদাসের ঋতুসংহার কাব্যের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ হৃদ্য হইয়াছে; কিন্তু ইহার মধ্যে 'বর্ষা' কবিতাটি অন্য ছন্দে লিখিলে ভাল হইত।

আসে রাজ-বেশে বরষা
জলভার বহি মেঘ-মাতঙ্গ হরষা
ঘনগর্জ্জনে বাজে মঙ্গল সঘনে
তড়িৎপতাকা উড়ায়ে আসিছে গগনে
বিলাসীর রস-ভরসা
আজি, ওই আসে ঘন বরষা—

পড়িতে পড়িতে রবীন্দ্রনাথের অনুকৃতি এত স্পষ্ট হইয়া চক্ষে পড়ে যে কবিতাটির রস গ্রহণেই বাধা জন্মে।

ইহার পরে আবার দুইটি কবিতা ছাপা হইয়াছে; সে দুইটি প্রথমে ছাপা হওয়া উচিত ছিল।

বইটি আগাগোড়া পড়িলে মনে হয় লেখক লেখার তারিখ অনুসারে কবিতাগুলি সাজাইয়াছেন; বিষয়-বস্তু অনুসারে সাজান নাই। সেই ভাবে সাজাইলে বইটির রসসমৃদ্ধি ঘটিত।

অলৌকিকা—গোপাল বটব্যাল। ভারত লাইব্রেরি, ৮ নং বেনিয়াপাড়া লেন, বরানগর, কলিকাতা। মূল্য ।৹ আনা।

গল্পের বই। আটটি গল্প আছে। রোমাণ্টিক্ গল্প। ভাষার আড়ষ্টতার জন্য রস একটু ব্যাহত হইয়াছে, না হইলে বইটা আরও ভাল হইত।

"সম্বুদ্ধ"

শরত-প্রতিভা—শ্রীসতীশচন্দ্র দাস। শ্রীগুরু লাইব্রেরী ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। পৃ. ১৮১, ৩টি ছবি। মূল্য দেড় টাকা।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে বাঙালী পাঠকসাধারণের কৌতূহল অপরিসীম। ১৯০২ হইতে ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত জীবনের দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর শরৎচন্দ্রের যে রেঙ্গুন-প্রবাস তাহা অজ্ঞাতবাসের ব্যঞ্জনাময় রহস্যে আবৃত। 'চরিত্রহীন' পড়িয়া নবীন বাংলা যখন চমৎকৃত, উহার লেখকের সাক্ষাৎ পরিচয় পাইবার সৌভাগ্য পাঠকদের তখনও হয় নাই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার এই যুগটির সহিতই আলোচ্য গ্রন্থের লেখক বিশেষভাবে পরিচিত। পঞ্চদশ অধ্যায় এবং নাতিদীর্ঘ 'উপসংহার' ও 'পরিশিষ্টে' সমাপ্ত এই গ্রন্থের 'প্রস্তাবনা'য় জানিতে পারা যায় যে রেঙ্গুনে অবস্থান কালে লেখকের সহিত শরৎচন্দ্রের বিশেষ 'জানাশুনা' ছিল, এমন কি দুই জনে 'একসঙ্গে' 'এক বাড়ীতেও' অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহারই সুযোগে বহু খুঁটিনাটি এবং কোথাও কোথাও বিশেষ প্রয়োজনীয় সংবাদ এই গ্রন্থে তিনি দিতে পারিয়াছেন। কিন্তু রচনানৈপুণ্যের অভাবে সমস্তই কেমন অগোছালো এবং এলোমেলো হইয়া এলাইয়া পড়িয়াছে। শরৎচন্দ্রের সমগ্র জীবনের এবং ('প্রস্তাবনার' অস্বীকৃতি সত্ত্বেও) স্থানে স্থানে সাহিত্য-আলোচনার মোহ ত্যাগ করিয়া গ্রন্থকার যদি শরৎ-জীবনের রেঙ্গুনপ্রবাস পর্ব্বমাত্র লইয়া আপনার সাক্ষাৎ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাগুলি নিজে বা অন্য কোন সুলেখকের সাহায্যে গুছাইয়া লিখিতেন তবে একটি চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ হইতে পারিত, কারণ সাধারণের অজ্ঞাত বহু তথ্য তাঁহার জানা রহিয়াছে।

গ্রন্থটির শরত-প্রতিভা নাম ভ্রমাত্মক কারণ 'শরৎজীবনের কতকগুলি বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে', 'তাঁহার সাহিত্যের আলোচনা করা হয় নাই।'

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আলোচনা

"সাপের শত্রু"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ, এম.এ., বি.টি

গত বৈশাখ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে শ্রীযুত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'সাপের শত্রু' শীর্ষক প্রবন্ধে নিম্নোদ্ধৃত কথা কয়েকটি লিখিয়াছেন :—

"...অনেকের ধারণা, নকুল সর্পবিষঘ্ন কোন বনজ ঔষধের সন্ধান জানে। সর্পদংশন মাত্রই ছুটিয়া গিয়া সেই ঔষধপত্র চিবাইয়া খায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিষক্রিয়া দূরীভূত হইবামাত্র পুনরায় আসিয়া সাপের সঙ্গে লড়াই সুরু করিয়া দেয়। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিজ্ঞতার ফলে এ ধারণা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।"

শরীরের বিষক্রিয়া দূর করিবার জন্য নকুল কোন বনজ ঔষধ চিবাইয়া থাকে এ ধারণা যে 'অমূলক' নয়, এ সম্বন্ধে এক জন প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা উল্লেখ করিতেছি। সিরাজগঞ্জের নিকট-বর্ত্তী এক পল্লীগ্রামের এক প্রান্তে মাঠের নিকট একটি প্রকাণ্ড পাকুড় গাছ আছে। রৌদ্রক্লান্ত চাষীরা গ্রীষ্মের দিনে প্রায়ই সেই গাছের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করে। অদূরে ঝোপ-সংলগ্ন কিছু স্থান ছোট ছোট গুল্ম ও নানা আগাছায় পূর্ণ। গত ফাল্গুনের এক অপরাহ্নে প্রায় সাড়ে তিন ফুট চার ফুট লম্বা একটি গোখুরা সাপ সেই আগাছার মধ্যে দুইটি বেজীর দৃষ্টিতে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। সাপ ও বেজী উভয়ের ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ শুনিয়া এবং বেজীগুলিকে সর্ব্বাঙ্গ ফুলাইয়া ইতস্ততঃ লাফালাফি করিতে দেখিয়া এক জন চাষী আগাইয়া গিয়া সাপ ও বেজী দুটিকে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখিতে পায়। ক্রমে তামাসা দেখিতে অনেক লোক জুটিয়া গেল। আমাদের একজন প্রবীণ আত্মীয় কার্য্যোপলক্ষে সেই পথে গ্রামান্তরে যাইতেছিলেন। জনতা দেখিয়া কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তিনিও সেস্থানে যান। ততক্ষণ সাপটি ফাঁকা জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছে। বেজী দুইটি তাহার চারিদিকে চক্রাকারে ঘুরিতেছে—চোখে তাহাদের জ্বলন্ত হিংস্রতা। সাপ কুণ্ডলী পাকাইয়া প্রায় দেড় ফুট উঁচুতে ফণা তুলিয়া বেজীগুলির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া এদিক-ওদিক হেলিতেছে আর হিস্ হিস্ শব্দ করিতেছে। সুযোগ বুঝিয়া সাপই প্রথমে আক্রমণ করিল ; হঠাৎ পিছন দিকে উল্টাইয়া গিয়া একটা বেজীর পিঠের উপর ছোবল বসাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গেই চক্ষের নিমেষে অন্য বেজীটা সাপের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার ঘাড় কামড়াইয়া ধরিল। সর্পদষ্ট বেজীটি বিদ্যুৎগতিতে তিন লাফে ঝোপের ভিতর অন্তর্হিত হইয়া গেল। সাপ প্রথমে লেজ দিয়া বেজীটার দেহ জড়াইয়া ধরিল কিন্তু জোরে চাপ দিবার সামর্থ্য বোধ হয় তাহার ছিল না। বেজীও কামড় ছাড়িল না ; মাঝে মাঝে গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া আক্রোশের সহিত সাপের মাথাটা মাটির উপর ঘর্ষণ করিতে লাগিল। মিনিট দশেক পরে পূর্ব্বের বেজীটি ফিরিয়া আসিল—তাহার মুখে একটি ছোট সতেজ লতার ডগা। ডগাটি সেখানে নামাইয়া রাখিয়া সে ত্রস্তে তাহার সঙ্গীর সাহায্যে অগ্রসর হইল এবং সাপটার মধ্যস্থল চিবাইয়া দুই খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল। যে বেজীটি সাপকে কামড়াইয়া ধরিয়াছিল সেটিও সাপের ঘাড় কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং উভয়েই বিজয়গর্ব্বে খণ্ডিত সর্পদেহ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে বেজীকর্ত্তৃক আনীত সেই লতার ডগাটা লাভ করিবার আশায় কয়েক জন ঢিল লইয়া বেজীগুলিকে তাড়া করিল। মনে করা গিয়াছিল যে, ঔষধটি ফেলিয়াই বেজী হয়ত পলাইবে কিন্তু তাহা হইল না। চক্ষের নিমেষে লতার টুকরা মুখে তুলিয়া লইয়া এবং সেই মুখেই সাপের মাথাটি লইয়া বেজীটা পলায়ন করিল। যেটি প্রকৃত হন্তা সেটি কিছুই লইতে পারিল না। অবশ্য লোকজন চলিয়া গেলে ফিরিয়া আসিয়া তাহারা তাহাদের শিকারের সদ্ব্যবহার করিয়া থাকিবে।

গোপালবাবু মনুষ্যেতর প্রাণিজগতের প্রতি কৌতূহলী দৃষ্টি সম্পন্ন। নানাপ্রকার পশুপক্ষীর বিচিত্র জীবনেতিহাস ও তাহাদের কলা-কৌশলের বর্ণনা সরস ও চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ আজ বুদ্ধির প্রভাবে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। তাহারই চতুর্দ্দিকে ইতর প্রাণী-জগতেও যে হিংসা-দ্বেষ, স্বার্থপরতা, স্নেহ, বাৎসল্য, বুদ্ধি প্রভৃতির খেলা চলিতেছে 'প্রবাসী'র মারফৎ তাহার কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী পরিবেশনের জন্য গোপালবাবু আমাদের ধন্যবাদার্হ। বেজীর বনজ ঔষধ জানা না-জানা সম্বন্ধে বিদেশী লেখকদিগের কথার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া আমাদের দেশেও তিনি তথ্যানুসন্ধান করিলে এ বিষয়ে আরও অনেক কিছু অবগত হইতে পারিবেন আশা করি। আলোচ্য ধারণার সত্যতা সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত যাহা জানি লিখিলাম।

'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধ কাহার রচনা ?

'বাঙ্গালা ভাষা' নামক একটি প্রবন্ধ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের পাঠ্য একটি সংকলনে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বলিয়া 'বঙ্গদর্শন' হইতে মুদ্রিত হইয়াছে, এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গ্রন্থাবলীতেও ঐ প্রবন্ধটি মুদ্রিত হইয়াছে দেখিয়া শ্রীযুক্ত চিত্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এ-বিষয়ে সমাধানের জন্য প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন।

[১২৮৫ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' "বাংলা ভাষা" প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। লেখার শেষে লেখকের নাম ছিল না। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ প্রবন্ধটি তাঁহার 'বিবিধ প্রবন্ধ' পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে পুনর্মুদ্রিত করেন।]

সাহিত্যিক ও সাহিত্য-সম্মেলন

শ্রীউপেন্দ্র রাহা

প্রতি বৎসরই কোন-না-কোন স্থানে বিপুল অর্থব্যয় ও আড়ম্বর সহকারে সাহিত্য-সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। সাহিত্য-সম্মেলনের অর্থ সাহিত্যিকদিগের সম্মেলন। এই সম্মেলন উপলক্ষে সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরের সহিত পরিচয় ও ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ পাইবেন এবং জাতীয় সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য ও পরিসর বৃদ্ধির জন্য পরস্পর মিলিতভাবে আলাপ-আলোচনা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন—প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যেই এই সকল সম্মেলন আহূত হইয়া থাকে। কারণ, সাধারণ মানুষের ন্যায় সাহিত্যিকদেরও একটা সমাজ আছে এবং তাঁহাদের সাহিত্য-সাধনা পৃথক পৃথক ভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও এইরূপ সামাজিক মিলনের সার্থকতা আছে।

অন্যান্য বৃহৎ ব্যাপারের ন্যায় সাহিত্য-সম্মেলনের অনুষ্ঠানও বহুব্যয়সাপেক্ষ। এই জন্য প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা কোন কালে সাহিত্যসেবী-রূপে লেখনী ধারণ করেন নাই, সাহিত্যক্ষেত্রে কোথায় কি হইতেছে, তাহা জানেন না বা জানিবার জন্য যাঁহাদের স্বভাবতঃ কোন ঔৎসুক্য নাই, সাধারণতঃ যাঁহাদের সাহিত্যের প্রতি কোনরূপ অনুরাগ আগ্রহ বা কোন প্রকার সাহিত্যিক প্রবণতা নাই, এবং সাহিত্যিকদের প্রতিও যাঁহাদের কোনরূপ শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় না, তাঁহারাও অর্থ, খ্যাতি বা পদমর্য্যাদা বলে সাহিত্য-সম্মেলনের কর্ম্মকর্ত্তারূপে নেতৃত্ব করিয়া থাকেন। এই সকল লক্ষ্মীর বরপুত্রের সাহায্য ব্যতীত বাণীপূজার অনুষ্ঠানও সম্ভবপর হয় না। কারণ ইঁহাদের নিজের অর্থদানের এবং পদগত প্রভাব-প্রতিপত্তির বলে অপরের নিকট হইতে অর্থ-সংগ্রহেরও সামর্থ্য আছে। সাহিত্যিকগণের অনেকেই দুঃস্থ, সমাজে তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও কম, এই জন্য তাঁহাদের দ্বারা অর্থদান কি অর্থসংগ্রহ—কোনটাই সম্পন্ন হয় না এবং এই কারণে সাহিত্য-সম্মেলনে কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব করিবারও অধিকার তাঁহাদের নাই। প্রাণের ঐকান্তিক আগ্রহ ও অকৃত্রিম উৎসাহে কেহ কেহ এই ব্যাপারে যোগদান করিলেও তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে প্রভাবশালী কর্ম্মকর্ত্তাদিগের নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়া নিজের উপরে ন্যস্ত কর্ম্মভার নীরবে বহন করিতে হয়, কারণ তাঁহাদের কথার বা মতেরও কোন মূল্য নাই। হয়ত অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি আদৌ সাহিত্যিক না হইলেও একজন প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুপরিচিত ব্যক্তি। সাহিত্য-সম্মেলনের কার্য্য তিনি একা সম্পন্ন করিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহার দলের লোকদের সাহায্যেই তাঁহাকে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। এই কারণে তাঁহার দলের লোকেরাই প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকেন এবং সকল বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করেন। কারণ, যাহাদের সহিত কর্ম্মকর্ত্তার দলগত বা ভাবগত সাম্য নাই, তাহাদিগকে লইয়া কার্য্য করিতে গেলে পদে পদে নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, ভাববৈষম্যের জন্য কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইতে চায় না। এই জন্যই দেখিতে পাই, সাহিত্য-সম্মেলনের বিভিন্ন কার্য্যেও কোন বিশেষ দলই সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া থাকে, অন্যেরা তাঁহাদের সাহচর্য্য করিলেও সেই সহকারিতার মধ্যে আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। সকল প্রকার ভেদ, বৈষম্য ও বিরোধ ভুলিয়া জাতীয় কল্যাণের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে ঐকান্তিকতার সহিত সম্মিলিত হওয়ার মনোভাব বাঙালীর মধ্যে নিতান্তই বিরল; দুঃখের বিষয় ইহা একটা কঠোর সত্য।

সম্মেলনের যাঁহারা প্রধান উদ্যোক্তা, তাঁহাদিগকে সকল বিষয়েই দলের লোকের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া, এই সকল লোকের উপর যে কর্ম্মভার অর্পিত হয়, তাহা সম্পাদনে তাহাদের কাহার কিরূপ যোগ্যতা আছে, তাহাও বিচারের অবকাশ বা আবশ্যক হয় না,

কারণ তাহাদের যোগ্যতা যেরূপই হউক না কেন, ইহাদের সাহায্যে কার্য্য পরিচালন করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ইহার একটি ফল এই হয় যে, সাহিত্যিকদিগের সম্মেলনের জন্য সাহিত্য-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইলেও অনেক সত্যকার সাহিত্যিকও সাহিত্য-সম্মেলনে অপাংক্তেয় ও উপেক্ষিত হইয়া থাকেন। অবশ্য যে-সকল সাহিত্যিক লেখক বা গ্রন্থকার রূপে দেশপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই সম্মেলনে আমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। কিন্তু এক শ্রেণীর সাহিত্যিক আছেন, যাঁহারা আজীবন একনিষ্ঠ-ভাবে সাহিত্যসেবায় ব্রতী আছেন এবং যাঁহাদের বহু লেখা অনেক দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকে, অথচ যাঁহারা লোকসমাজে চিরকাল অখ্যাত ও অজ্ঞাতই থাকিয়া যান। যাঁহারা গ্রন্থকাররূপে পরিচিত, হয়ত তাঁহাদের অনেকের অপেক্ষা ইঁহারা সাহিত্যিক হিসাবে শ্রেষ্ঠ এবং অধিকতর মর্য্যাদা লাভের যোগ্য। কিন্তু ইঁহারা ঘন বনরাজির অন্তরালবর্ত্তী পুষ্পরাশির ন্যায় আত্মগোপন করিয়া আছেন; ইঁহারা দুঃস্থ, সমাজে উপেক্ষিত। ইঁহারা লোকচক্ষুর অন্তরালে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত সাহিত্য-সাধনায় ব্যাপৃত আছেন, লোক-সমাজে ইঁহাদের পরিচয় অপ্রকাশিত। হয়ত ইঁহাদের অনেকেরই যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা কিম্বা প্রসিদ্ধিলাভের আধুনিক উপায়সমূহ অবলম্বনের প্রবৃত্তি নাই, ইঁহারা বিরামহীন কর্ম্মের কঠোরতার মধ্যে আপনাদিগকে অবলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। সাধারণতঃ দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের সহকারী সম্পাদকগণ ও সম্পাদক-সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত লেখকগণ এই পর্য্যায়ভুক্ত। ইঁহাদের লেখায়ই দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রগুলি বিপুলকলেবর হইয়া প্রকাশিত হয়, অনেক সময়ে ইঁহাদের লেখাই অপরের নামসংযুক্ত হইয়া বাহির হইয়া তাঁহাকে সুলেখকের গৌরব প্রদান করে। কোন কোন স্থলে এরূপও দেখা যায় যে, যাঁহার নাম পত্রিকা-সম্পাদকরূপে প্রচারিত, তাঁহাকে কখনও লেখনী-ধারণের ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না কিম্বা তাঁহাদের লেখনী-পরিচালনের যোগ্যতা নাই, কিম্বা থাকিলেও তাহা সম্পাদকীয় খ্যাতির অযোগ্য।

তথাপি ইঁহারা সম্পাদকের বিপুল গৌরব লাভ করিয়া থাকেন, আর প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা পত্রিকা সম্পাদন করিয়া থাকেন, সেই দীনহীন সাহিত্যিকগণ নীরবে ও অক্লান্তভাবে আপনাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া উপেক্ষিত ও অখ্যাত জীবনের লাঞ্ছনাভার বহন করিয়া থাকেন। সাহিত্যক্ষেত্রে এইরূপে অজ্ঞাতবাসের অভিশাপে অভিশপ্ত সত্যকার সাহিত্যিকগণ সাহিত্য-সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন না। আর এক শ্রেণীর সাহিত্যিক আছেন, যাঁহারা বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থাবলী সম্পাদনে আপনাদের প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তি নিয়োজিত করিয়া থাকেন। ঐ সকল গ্রন্থে তাঁহাদের নাম থাকে না, পরন্তু যাঁহারা সম্পাদক বা প্রকাশক এই সকল গ্রন্থ তাঁহাদেরই নাম বহন করে। অথচ যাঁহাদের পরিশ্রম, বিদ্যাবত্তা ও কর্ম্মদক্ষতার ফলে এই সকল বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে, তাঁহারা চিরকাল অজ্ঞাতই রহিয়া যান। মাসিক, দৈনিক কিম্বা সাপ্তাহিক পত্রে সময়ে সময়ে যাঁহাদের সুলিখিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে, অনেকেই তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন খবর রাখেন না। ইঁহাদের মধ্যেও অনেক সত্যকার সাহিত্যিক আছেন। মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা কিম্বা পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির পরিমাপে ইঁহাদের যোগ্যতা নির্ণীত হওয়া উচিত নহে। বিভিন্ন পত্রিকার পরিচিত লেখক-সম্প্রদায় আছেন, লেখক তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত না হইলে কিম্বা সম্পাদকের পরিচিত না হইলে অনেক স্থলে উৎকৃষ্ট লেখাও প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকে এবং প্রকাশের গৌরব লাভ করিতে পারে না। অনেক সুলেখক বিবিধ পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়া বারংবার প্রত্যাখ্যাত হইয়া বিরক্ত ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন, তাঁহাদের লিখিবার প্রবৃত্তিও ক্ষীণ হইয়া যায়। অথচ যথোচিত উৎসাহ পাইলে ইঁহাদের রচনাসম্ভারে অনেক সাময়িকপত্র সমৃদ্ধ হইতে পারিত।

উপরে যে কয় শ্রেণীর সাহিত্যিকের কথা বলা হইল, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন-সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাদের নাম সংগৃহীত হওয়া প্রয়োজন। ইতঃপূর্ব্বে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'জন্মভূমি' মাসিকপত্রে বাংলা ভাষার লেখকদিগের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং 'বঙ্গভাষার লেখক' নামে এই সকল বিবরণ গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত

হইয়াছে। এই গ্রন্থে প্রাচীন ও আধুনিক, খ্যাত ও অপেক্ষাকৃত অখ্যাত লেখকগণের পরিচয় যথাসম্ভব প্রদত্ত হইয়াছে। পরলোকগত শিবরতন মিত্রও বাংলা ভাষার মৃত লেখকদিগের বিবরণ-সমন্বিত এক গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে গ্রন্থ বা বিবরণী-পুস্তিকার যে প্রয়োজন আছে, বোধ হয় কেহই তাহা অস্বীকার করিবেন না।

এখন বাংলা দেশের অনেক জেলায়ই সাহিত্য-পরিষদের শাখা এবং প্রায় সকল জেলায়ই বিবিধ সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠান স্ব-স্ব জেলার খ্যাত ও অখ্যাত লেখকগণের পরিচয় ও বিবরণ সংগ্রহের চেষ্টা করিলে তাহা স্বল্পায়াসেই সংগৃহীত হইতে পারে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যালয়ে প্রতি জেলার লেখকগণের নাম ও ঠিকানাসহ একটি তালিকা থাকিলে সাহিত্য-সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষ অনায়াসেই সেই তালিকা হইতে সাহিত্যিকদিগের নাম অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্মেলনে আহ্বান করিতে পারেন।

দুঃখের বিষয়, যে-জেলায় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হয়, কর্ম্মকর্ত্তৃগণের শোচনীয় অজ্ঞতা ও অনবধানতার ফলে সেই জেলার প্রবীণ সাহিত্যিকগণও অনাহূত থাকিয়া যান। কিছুকাল পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত কোন কোন সাহিত্য-সম্মেলনে আমরা ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। সাহিত্যিকদের মধ্যে এ-বিষয়ে আলোচনার আবশ্যকতা আছে, মনে করি। অন্যান্য স্থলে যেরূপ, সাহিত্যক্ষেত্রেও যদি কেবল ধন ও পদমর্য্যাদা সম্মেলনে যোগদানের মাপকাঠি-রূপে ব্যবহৃত হয়, তবে তাহা কেবল দুঃখের বিষয় নহে, অমার্জ্জনীয়ও বটে। যাঁহারা স্থানীয় সাহিত্যিকদের পরিচয় পর্য্যন্ত অবগত নহেন, কিম্বা পদ-গৌরব ও ধনবত্তার মানদণ্ডে তাহাদিগের পরিমাণ করিয়া উপেক্ষাভরে বর্জ্জন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে সাহিত্য-সম্মেলনের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করা ধৃষ্টতা মাত্র। আমরা শত বৎসরের প্রাচীন যে-কোন গ্রন্থকার বা লেখকের পরিচয় সযত্নে সংগ্রহ করিয়া থাকি এবং লেখা যেরূপেই হউক না কেন, তাৎকালিক রচনার অন্যতম নিদর্শন রূপে তাহা সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকি, কিন্তু সমসাময়িক লেখক-গণের রচনা সংগ্রহ করা দূরে থাকুক, অনেকের পরিচয় জানিবার জন্য কোন চেষ্টা করি না। এ-বিষয়ে আমাদের ঔদাসীন্য অমার্জ্জনীয়। আমরা ভরসা করি, অতঃপর প্রত্যেক জেলার জীবিত ও মৃত লেখকদিগের পরিচয় ও রচনা সংগ্রহের জন্য স্থানীয় সাহিত্য-পরিষৎ, সাহিত্য-সভা কিম্বা স্থানীয় সাময়িকপত্রগুলি চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবেন।

বর্ত্তমান যুগে ধন, পদমর্য্যাদা ও বিদ্যাবত্তা এই তিনটির পরিমাণ অনুসারেই লোকে সমাজে মান-মর্য্যাদা লাভ করিয়া থাকে। যাঁহার মধ্যে এই তিনটি যত অধিক পরিমাণে থাকে, তিনিই সমাজে তত উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়া থাকেন। সাহিত্য-সম্মেলনেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। দুঃস্থ কিম্বা পদগৌরবহীন সাহিত্যিক-গণ সম্মেলনে উপস্থিত হইলেও অনেক স্থলে তাঁহারা নির্ম্মম ভাবে উপেক্ষিত হইয়া থাকেন। যাঁহারা তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান, তাঁহারাও তাঁহাদের প্রতি যথোচিত আতিথেয়তা বা সৌজন্য প্রদর্শন করিতে কার্পণ্য করেন। ধন ও পদমর্য্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা কোনরূপে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন বা প্রকাশ করিয়াছেন কিম্বা সংবাদ বা সাময়িকপত্রে দু-একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাঁহারাই সাহিত্যিকের মর্য্যাদা ও গৌরব এবং যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন লাভ করিয়া থাকেন। কবি লিখিয়াছেন, 'কত রত্ন বিলুণ্ঠিত পদতলে, কত কাচ শিরের বিভূষণ রে'। সাহিত্য-সম্মেলনের উদার সার্ব্বজনীন ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যব-হার-বৈষম্য আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গ-সমাজের এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছেন, "বাংলা দেশে মনুষ্যত্ব বেতনের ওজনে নির্ণীত হয়, কে কত বড় বাঁদর, তাহা লেজ মাপিয়া স্থির করিতে হয়, বন্দী তাহার চরণ-শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য দেখাইয়া বড়াই করে; এমন অধঃপতন আর কোন দেশে হয় নাই।" আশা করি অতঃপর সাহিত্য-সম্মেলনে সত্যকার সাহিত্যিকগণ যাহাতে উপেক্ষিত ও অনাদৃত না হন, সাহিত্য-সম্মেলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যাহাতে ব্যর্থ না হয় এবং ইহা কেবল একটি অভিজাত অনুষ্ঠানে যাহাতে পরিণত না হয়, সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষ তৎপ্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিবেন।

আবিসিনিয়ায় খ্রীষ্টীয় উৎসবে শোভাযাত্রা

আবিসিনিয়ায় খ্রীষ্টীয় উৎসবে শোভাযাত্রা

পুরোভাগে 'সেণ্ট জর্জ ও ড্রাগন' এবং 'খ্রীষ্টমাতা' চিত্র—আবিসিনিয়ার শিল্পনিদর্শন

সোমালিল্যাণ্ডের মাটির ঘর

সোমালিল্যাণ্ডের রাজপথ

সোমালিল্যাণ্ডের সরকারী দপ্তরখানা

ইথিওপিয়ার সাধনা

শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভূমিকা লিখিতে হইলে ইথিওপিয়াকে অগ্রাহ্য করা চলে না। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মধ্যে আজ যে সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে তাহা হয়ত অবশ্যম্ভাবী ছিল। কিন্তু মুসোলিনীর ইথিওপিয়া-অভিযানের পর হইতেই ইউরোপীয় রাজনীতিতে জর্মন প্রভাব বাড়িয়া চলিয়াছিল। ইথিওপিয়াকে উপলক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছিল এই কথা বলা হয়ত যুক্তিসঙ্গত হইবে না কারণ বর্ত্তমান যুদ্ধের আসল কারণ ইথিওপিয়া নয়। কিন্তু, অন্য দিকে ইহাও সত্য যে ইথিওপিয়াকে কেন্দ্র করিয়া জেনিভার নেতৃত্ব অপদস্থ না হইলে হয়ত হিটলারের স্পর্দ্ধা এত শীঘ্র আত্মপ্রকাশ করিতে সাহসী হইত না। তস্কর ইতালিকে শাস্তি দিবার আয়োজন যখন সম্পূর্ণ হইল, জেনিভা-লাঞ্ছিত জার্ম্মানী দেখিল তাহার সুযোগ উপস্থিত, দেখিল শত্রুপক্ষের দলবদ্ধ ঐক্য নষ্ট হইয়াছে, বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘের মর্ম্মর-প্রাসাদে ফাটল ধরিয়াছে। জার্ম্মানী একে একে ভের্সাই, লোকার্ণো এবং অন্যান্য সন্ধিগুলির সর্ত্ত ভাঙ্গিতে লাগিল। তাহারই চরম পরিণতি হয়ত বর্ত্তমানের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ইথিওপিয়ার স্বাধীনতা লাভের সুবর্ণ সুযোগ আবার উপস্থিত হইয়াছে। হাবসী-সম্রাট তাফারী পুনরায় ইঙ্গ-মিশরীয় সুদানের সীমান্ত-প্রদেশে তাঁহার আস্তানা লইয়াছেন। আফ্রিকার এবং গ্রীসের যুদ্ধে বিব্রত ইতালির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার এই উপযুক্ত সময়। ইউরোপের দাসত্ব-কলঙ্কিত আফ্রিকায় একমাত্র স্বরাষ্ট্র ইথিওপিয়া তাহার লুপ্ত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে, সমগ্র এশিয়া এই ভরসা করিতেছে।

সম্রাটের বিশেষ রক্ষীদল

ইতালির সঙ্গে ইথিওপিয়ার যুদ্ধ খুব বেশী দিনের কথা নয়। মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ইতালি আবিসিনীয়া দখল করিয়াছে। আমি তখন রোমে ছিলাম। ইতালীয় নরনারীর মত আমারও সেই সময়টা খানিকটা উত্তেজনার মধ্য দিয়া কাটিয়াছে। এক দিকে ফাশিস্ত ইতালির প্রথম সামরিক অভিজ্ঞতা, অন্য দিকে জেনিভার শাসন। ইতালির অন্যায় আচরণের জন্য জেনিভায় তখন তর্কবিতর্ক চলিতেছে। তাহাকে কি উপায়ে শাসন করা যায়, তাহার সাম্রাজ্যলাভের অভিযান ব্যর্থ করা যায়, সেই উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা চলিতেছে। ইতালিতে তখন দুইটি

বিভিন্ন রকমের আন্দোলন লক্ষ্য করিয়াছি, প্রথমতঃ ইতালির জাতীয় ঐক্য সাধনের নিমিত্ত সরকার এবং জনসাধারণের চেষ্টা, এবং দ্বিতীয়তঃ একটি ব্যাপক, ইংরেজ ও ফরাসী বিদ্বেষ। ইতালীয় জনসাধারণের মনে যে খানিকটা আতঙ্কের ভাব না ছিল এমন নয়, কিন্তু সরকারী প্রচারের সাহায্যে তাহা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। এমন সময়ে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল, অধুনা-প্রসিদ্ধ হোর-লাভাল চুক্তির পরিকল্পনা খবরের কাগজে প্রকাশিত হইল। ইতালিতে অনেকেই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল এইরূপ মনে হইল, এবং মুসোলিনী ঐ চুক্তির সর্ত্ত গ্রহণ করিতে রাজী হইবেন এইরূপ গুজব রোমের পথে-ঘাটে কাফে-রেঁস্তোরায় ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু মুসোলিনীর সিদ্ধান্তের পূর্ব্বেই ব্রিটেন এবং ফ্রান্স হোর-লাভাল চুক্তিকে অস্বীকার করিল, এবং উহা মন্ত্রীমহাশয়দের ব্যক্তিগত দায়িত্বে করা হইয়াছে ব্রিটিশ এবং ফরাসী গবর্ণমেণ্ট এই অভিযোগ করিল। হোর-লাভাল চুক্তি গ্রাহ্য হইল না, ইথিওপিয়ার যুদ্ধ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। মসিয় লাভাল তখন একটি কথা বলিয়াছিলেন যাহা আজ বিশেষ করিয়া মনে পড়ে। তিনি হোর-লাভাল চুক্তিকে সমর্থন করিবার জন্য বলিয়াছিলেন, "Paris is too big a price for Addis Abeba." হয়ত প্যারিসের সাময়িক দুর্দ্দশা চিরস্থায়ী হইবে না। নাৎসী-কবল হইতে নিজের স্বাধীনতা এবং বৈশিষ্ট্য উদ্ধার করিতে পারিবে। কিন্তু মসিয় লাভালের ভবিষ্যদ্বাণী যে অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। লাভাল বুঝিয়াছিলেন যে, জার্ম্মান-বিরোধী জেনিভার চক্রব্যূহ হইতে ইতালি খসিয়া পড়িলে, জার্ম্মানীকে রোধ করা শক্ত হইবে। ইথিওপিয়ার সঙ্গে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের ইহাই প্রধান রাজনৈতিক যোগাযোগ।
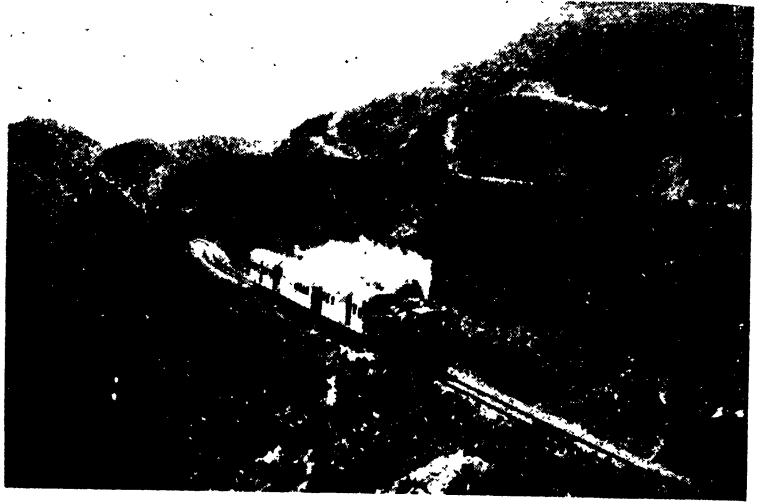
জিবুতি—আদ্দিসআবেবা রেলপথের এক অংশ

ইথিওপিয়ার বিরুদ্ধে যত রকমের প্রচারকার্য্য ইতালি চালাইয়াছে তন্মধ্যে প্রধান এই যে হাবসীরা বর্ব্বর, তাহাদের কোন সভ্যতা নাই। বাস্তবিক পক্ষে ইহা কতদূর সত্য তাহা ভাবিবার বিষয়। সভ্যতা অর্থে যদি শুধু ইউরোপীয় সভ্যতা বুঝায় তবে হাবসীরা অসভ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে, কারণ হাবসীদের জাতীয় জীবনে এবং সমাজে পাশ্চাত্য আধুনিকতা কিছুই নাই বা তখনও ছিল না। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়, শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃষিকার্য্যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চায় ইথিওপিয়াবাসীরা ইউরোপ কেন, এশিয়ারও অধিকাংশ দেশের পিছনে পড়িয়া আছে। কিন্তু সভ্যতা অর্থে যদি জীবনধারণের উপযোগী নিজস্ব একটি বিশিষ্ট সংস্কার এবং পদ্ধতি বুঝায় তবে ইথিওপিয়াবাসীরা অসভ্য নয়। তাহাদের সাহিত্য, শিল্পকলা এবং স্থাপত্যের মধ্য দিয়া যে বিশিষ্ট জাতীয় প্রাণটির পরিচয় আমরা পাই তাহা মিশরের সভ্যতার মত উন্নত না হইলেও, আরব-সভ্যতার মত সমৃদ্ধ না হইলেও, তাহাকে বর্ব্বর বলা চলে না। মিশর, খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং ইস্‌লামের প্রভাবই হাবসী সভ্যতার প্রধান উপকরণ।

ইথিওপিয়ার সভ্যতা তাহার সাহিত্য এবং শিল্পসাধনার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ইথিওপিয়ার সাহিত্য খুব প্রাচীন। অনেকে শুনিয়া হয়ত বিস্মিত হইবেন যে ইথিওপিয়ার সাহিত্য আমাদের বাংলা

সাহিত্যেরও বহু পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় তিন শত বৎসর পরে হাবসী সাহিত্যিকগণ বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেণ্ট তাঁহাদের প্রাচীন "জে-এজ" ভাষায় অনুবাদ করেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত হাবসী সাহিত্যের প্রাচীন যুগ বলা যাইতে পারে। এই সময়কার সকল প্রকার সাহিত্যিক প্রচেষ্টা প্রধানতঃ খ্রীষ্টধর্ম্ম সংক্রান্ত উপাখ্যান কিংবা মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইথিওপিয়ার প্রাচীন সাহিত্য গ্রীক সাহিত্যের অনুকরণ করিত, এবং গ্রীক সাহিত্যের অনুবাদ প্রচুর পরিমাণে এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পর হইতে হাবসী সাহিত্য আরব সাহিত্যের প্রভাবে রূপান্তরিত ও সমৃদ্ধ হইতে থাকে। আধুনিক সাহিত্যে "আমহারা" ভাষার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা মাত্র এক শত বৎসর পূর্ব্বের কথা। ইথিওপিয়ার ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে আধুনিক হাবসী ভাষা প্রাচীন 'জে-এজ", আরবী, আমহারা এবং তিগ্রে ভাষাগুলির কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। হাবসী নামটাই আসিয়াছে আরবী "আল্-হাবাস্" অথবা "আল্-হাবাসা" হইতে। আরবদেশীয়রা ঐ নামে ইথিওপিয়াকে বুঝিত। হাবসী সাহিত্যের মধ্য যুগে আরবীর প্রভাব খুব বেশী ছিল। প্রাচীন সাহিত্যে যেমন গ্রীক হইতে অনুবাদ খুব জনপ্রিয় ছিল, মধ্যযুগে তেমনি আরব-সাহিত্য হইতে প্রচুর অনুবাদ হইয়াছিল। ইথিওপিয়ার আধুনিক সাহিত্য সম্রাট্ তাফারীর উৎসাহে এবং অনুগ্রহে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন সাহিত্যে বাইবেল এবং ধর্ম্ম সংক্রান্ত অনেক রচনাবলীর টীকা-টিপ্পনি তাফারীর রাজত্বকালে প্রকাশিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় যাজকসম্প্রদায়গণ, ক্যাথলিক-প্রোটেস্টাণ্ট-নির্ব্বিশেষে একটি প্রচার-সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই প্রচারকার্য্য শুধু খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করার পক্ষপাতীই

আবিসিনিয়ার তালশ্রেণী

শুধু নহে, ইস্‌লাম-বিরোধীও বটে। ১৯০৩ সনে আদ্দিস্ আবেবায় প্রকাশিত "Mystery of the Trinity" এই ধরণের ইস্‌লাম-বিরোধী সাহিত্যের অন্তর্গত। ইথিওপিয়ার প্রধান পুরোহিতের আনুকূল্যে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। হেরুই হ্বলেদা সেলাসিয়ে নামক লেখক প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত প্রধান প্রধান ধর্ম্মসঙ্গীত-গুলির সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া আধুনিক কালে সম্রাট তাফারীর নির্দেশ অনুসারে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধেও অনেক পুস্তক প্রণয়ন হইয়াছে। তাফারীর উন্নতিনিষ্ঠ রাজত্বে বিভিন্ন রকমের আধুনিক আন্দোলনের প্রতিবিম্ব হাবসী-সাহিত্যে পড়িয়াছে। হেরুই-রচিত "বর্ত্তমান জগৎ"-এ (১৯৩৩ সনে প্রকাশিত) উদারপন্থী আদর্শবাদের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। জাতীয়তাবাদী তরুণ হাবসীদের একটি সঙ্ঘ আছে; দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার নাম "টেক্কুর কোট" অর্থাৎ "কাল-কুর্ত্তা"—ইতালীয় ফাশিস্ত সম্প্রদায়ের অনুকরণ হয়ত। কালকুর্ত্তাদের রচনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবাদী অহঙ্কার অতিমাত্রায় পরিপুষ্ট হইয়াছে।

ইথিওপিয়ার চিত্রকলায় এবং স্থাপত্যে দুইটি প্রভাব বিশেষভাব বিদ্যমান—প্রথম বাইজন্‌টাইন এবং

দ্বিতীয় মিশরীয়। চিত্রকলায় বাইজন্‌টাইন্ প্রভাব খুব বেশী। যীশু খ্রীষ্টের পরিবার ও জীবনীকে কেন্দ্র করিয়া হাবসী চিত্রকরগণ ছবি আঁকিতে ভালবাসিত। স্থাপত্য-শিল্পীরা অন্য দিকে মিশরের আদর্শকেই বিশেষ করিয়া আয়ত্ত করিয়াছিল। আকৃসুমের প্রসিদ্ধ স্তম্ভগুলি সমস্তই মিশরীয় স্থাপত্য-শিল্পের প্রতিবিম্ব না হইলেও তদ্দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবাপন্ন বলা যাইতে পারে। আকৃসুমের প্রসিদ্ধ বিজয়-স্তম্ভটি আজকাল রোমের "ভিয়া দেল্ ত্রিনফ" এ স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং ইতালির ইথিওপিয়া-বিজয়ের সাক্ষ্য দিতেছে।

ইথিওপিয়ার সাহিত্য এবং শিল্পের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে তাহার সভ্যতা প্রধানতঃ খ্রীষ্ট-ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। আরব-আক্রমণের পর হইতে ইস্‌লামের প্রভাব ইথিওপিয়ার জাতীয় জীবনে প্রবেশ করিয়াছে সত্য, কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। ইথিওপীয় সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং ইস্‌লাম এই দুইটি পরস্পর-প্রতিকূল প্রভাব তাহার জাতীয় জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

সামাজিক উৎকর্ষের দিক হইতে ইথিওপিয়া আধুনিক রাষ্ট্রগুলির অনেক পিছনে পড়িয়া আছে। এখনও দাসত্ব-প্রথা ইথিওপিয়ায় প্রচলিত। কৃষিতে, শিল্পে, বাণিজ্যে হাবসীদের দুরবস্থা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। হাবসী-দের যে বাণিজ্য এককালে সাগর অতিক্রম করিয়া এশিয়ার বিভিন্ন উপকূলে পৌঁছিত বলিয়া জানা যায়, তাহাদের এই অবনতির কারণ অনুমান করা দুঃসাধ্য। ইথিওপিয়ায় এখন পর্য্যন্ত কোন আদমসুমারী হয় নাই। তাহার লোক-সংখ্যা ষাট লক্ষ হইতে এক কোটি দুই লক্ষ পর্য্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যায় অনুমিত হইয়া থাকে। ইথিওপিয়ার খনিজ সম্পদের কোন বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান এখনও হয় নাই। সম্প্রতি ইতালীয়রা ক্রমশঃ ক্রমশঃ ভূতাত্ত্বিক গবেষণ চালাইতেছে। জানা গিয়াছে যে ইথিওপিয়ায় কয়লার খনি এবং সোনার খনি রহিয়াছে। ইহা ছাড়া ইথিও-পিয়ায় প্ল্যাটিনাম নামক ধাতুটি অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। সামরিক বিদ্যায়, যান্ত্রিক কর্ম্মকৌশলে ইথিওপিয়া এখনও আধুনিক পর্য্যায়ে আসিয়া উপনীত হইতে পারে নাই।

ইথিওপিয়ার জলবায়ু কোন উন্নত আর্থিক ব্যবস্থার অনুকূল নহে। সমতলভূমিতে অসহ্য গরম এবং অপর্য্যাপ্ত বৃষ্টি, কৃষি ও শিল্পের উন্নতিপথে প্রচুর বাধার সৃষ্টি করিয়া থাকে। পার্ব্বত্য অঞ্চলে অনুর্ব্বর ভূমিকে লইয়া চাষী এবং মজুরদের অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হয়, কিন্তু তাহার পুরস্কার খুব স্বল্পই। ধূলিধূসরিত মরুপ্রান্তরে হাবসী সর্দ্দারগণ অনেক সময় লুণ্ঠন করিয়া তাহাদের জীবনধারণ করে। গৃহ-নির্ম্মাণে হাবসীরা বিশেষ দক্ষ নয়। জনসাধারণের গ্রাম্য কুটীরগুলিকে হাবসীরা "টুকুল" বলিয়া থাকে। তাহার অভ্যন্তর ভারতবর্ষের চাষীদের ঘরবাড়ীর মতই, কিন্তু চালটি ত্রিকোণ। এই চালটি সাধারণতঃ খুব মজবুত এবং এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া যায়। একটু সমৃদ্ধ অঞ্চলে, বড় বড় হাটবাজারে আজ-কাল টিনের ঘরের রেওয়াজ দেখিতে পাওয়া যায়। আদ্দিস্ আবেবা শহরটিকে বাংলা দেশের যে-কোন জেলা-শহরের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে।

ইথিওপিয়া-প্রত্যাগত ইতালীয় সতীর্থদের কাছে শুনিয়াছি যে ঐ দেশের সমাজশাসন খুব উন্নত না হইলেও একটি বিষয়ে হাবসীদের নৈতিক চরিত্র অনুকরণীয়। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই হাবসী নারী পাতিব্রত্য এবং একনিষ্ঠার গর্ব্ব করিতে পারে, এবং এই একনিষ্ঠা কোন কুসংস্কারের অন্ধ অনুকরণ নয়, সজ্ঞান সচেতন নৈতিক চরিত্রের বিশিষ্ট উদাহরণ।

ফসল

শ্রীসুশীলরঞ্জন জানা

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল লক্ষ্মণের—মনে পড়ে গেল, কামারের বাড়ী যেতে হবে ভোর ভোর। চোখ ঘষতে ঘষতে বাইরে বেরিয়ে এল সে, দেখল—রাত তখনো ভোর হয় নি।

শীতের শেষরাত্রি। কুয়াশায় রাত্রির ঠাণ্ডা অন্ধকার আদিগন্ত শাদা ধোঁয়ার মতো ধব্ ধব্ করছে। সবুজ ঘাসের ওপরে অবিচ্ছিন্ন শিশিরবিন্দু ঝকমক্ করছে অন্ধকারে, আর পোকামাকড়ের অবিশ্রাম ঝিক্‌ঝিক্ শব্দ। লক্ষ্মণ শিস্ দিতে দিতে বাঁধের উপরে মাঠের ধারে এসে দাঁড়াল।

দিগন্তের ঘন বনসীমার মাথার উপরে শুকতারাটি তখনো জল্ জল্ করছে। মাঠের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল লক্ষ্মণ। ভালো লাগার একটি নিঃশব্দ আনন্দ তার সমস্ত মনে সঞ্চারিত হয়ে গেল। ধানগাছগুলি পাকা ফসলের ভারে নুয়ে পড়েছে মাটিতে। একটি ডাহুক এতক্ষণ নিঃশব্দে কোথায় ধানের শীষ টেনে টেনে খাচ্ছিল—লক্ষ্মণের পায়ের শব্দে সশব্দে সেটা মাঝ-মাঠের দিকে উড়ে গেল। তার ডানার ঝাপটে নিটোল ধানের পাকা শীষগুলি থর্ থর্ ক'রে উঠল। পরের দিন রাত্রির মধ্যে ধান কেটে শেষ করতেই হবে তাকে, হ্যাঁ—কালকেই। মনে মনে ঠিক ক'রে বসল সে—লঘু আনন্দে মন গেল ভরে: বিগত বছরের চেয়ে ভালো ধান এবার পাবে সে। মাঠের ধান দেখা যায় না কুয়াশায় আর রাত্রিতে—তবু নিটোল ধানের শীষগুলি সে যেন স্পষ্ট অনুভব করল দৃষ্টি দিয়ে, সমস্ত চেতনা দিয়ে। তার পর আবার শিস্ দিতে দিতে ঘরের দিকে ফিরল সে। বেশ শীত পড়েছে।

বিছানায় এসে বসল সে ভোরের অপেক্ষায়। আগাগোড়া কাপড় মুড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে হৈমন্তিকা। তাকে ঠেলা দিয়ে ডাকল সে—এই হিমি, এই—

হৈমন্তিকা ঘুমের ঘোরে নিরুত্তরে পাশ ফিরে শুল তার দিকে মুখ ক'রে।

তার পর রইল হৈমন্তিকা অস্পর্শ আর অব্যক্ত। কত ধান এবার পাবে সে—মনে মনে তারই একটা আনন্দ করবার চেষ্টা করতে লাগলো লক্ষ্মণ। বছরের খরচ—এটা ওটা-সেটা, খুঁটিনাটি অনেক খরচ। সংসারের বহু অভাব-অভিযোগের মাঝখানে হঠাৎ হৈমন্তিকা সুন্দর আর স্পষ্ট হয়ে উঠল। হৈমন্তিকার জন্যে একটা গন্ধতেল কিনতেই হবে এবার। বেচারী সেই যে কবে বলেছিল ক-দিন—তার পর বোধ হয় ক্ষুণ্ণ মনের হতাশায় বলে নি কোনোদিন আর—হয়ত বলতে সাহস পায় নি। লক্ষ্মণকে যেন একটু ভয় করে হৈমন্তিকা। ভারি শান্ত ভীতু মেয়ে—ভারি ভালো লাগে লক্ষ্মণের, তুলতুলে ছোটোখাটো মেয়েটি। লক্ষ্মণ আস্তে আস্তে হৈমন্তিকার একরাশি এলোমেলো চুলের ওপর আঙুল বুলোতে লাগলো। মনে ঘনঘোর স্বপ্ন তার—আসন্ন সুখের দিন। হৈমন্তিকার চুল থেকে হঠাৎ একটা সুগন্ধি তেলের অপরিচিত মিঠে গন্ধ যেন নাকে এসে লাগল তার। হৈমন্তিকার স্পর্শকোমল হঠাৎ ভালো লাগার উষ্ণতায় তার দেহের সমস্ত অস্থি আর গ্রন্থিগুলো যেন বিগলিত হয়ে উঠল।

লক্ষ্মণ ডাকল—এই ওঠ্ না—ভোর হ'ল।

হৈমন্তিকা নিরুত্তর। রাত তখনো ভোর হয় নি। তবে শুয়ে পড়লে পাছে আবার ঘুম ধরে যায়—এই জন্যে খাড়া বসে রইল সে। ভোর ভোর কামারবাড়ী যেতে হবে তাকে। আবার আস্তে আস্তে ভবিষ্যতের স্বপ্নে ভোর হয়ে গেল লক্ষ্মণ। নানান খরচ, নানান প্রয়োজন মাঠের পাকা ফসলের মুখ চেয়ে অপেক্ষা ক'রে আছে। নানান কথার মাঝখানে আবার মনে পড়ে গেল তার হৈমন্তিকার গন্ধতেলের কথা। তার পর সেইটাই শুধু ঘোরাফেরা করতে লাগল তার মনের

মধ্যে। শেষ পর্য্যন্ত সেটাকে চেপে রাখা অসহ্য হয়ে উঠল তার পক্ষে। বলে ফেললে—এবার তোর সেই গন্ধতেলটা এনে দেবো। মাঠের ধানটা উঠলেই—

লক্ষ্মণের কথার মাঝখানে হৈমন্তিকা শুধু বললে, হুঁ।

লক্ষ্মণের মনে হ'ল—তার কথা যেন অবিশ্বাস করল হৈমন্তিকা। অভাবের সংসার তার—নিরুপায় সে। তবু মুহূর্ত্তের উদ্দাম বিদ্রোহে সে শুধু বললে, আচ্ছা দেখিস। পরিমিত জীবনযাপনের সুনির্দ্দিষ্ট অনটন অত্যন্ত পরিচিত তার। আজ বাধাবন্ধনহীন আনন্দের সামান্য একটু দুরাশা তার নিজের বিরুদ্ধে, সমস্ত অবস্থার বিরুদ্ধে যেন বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে বসল। ঝোঁকের মাথায় ব'লে ফেলল সে—আর সেইরকম নীল ডুরে শাড়ী।

নীল ডুরে শাড়ীতে চমৎকার দেখায় হৈমন্তিকাকে—আর সে ভালবাসে ওইরকম শাড়ী পরতে। বিয়ের সময়ের সেই নীল ডুরে শাড়ীখানি শতছিন্ন হয়ে গিয়েছে একেবারে। কিন্তু সেটা এখনো আছে পুঁটুলিতে বাঁধা—মাঝে মাঝে খুলে দেখে সেটা হৈমন্তিকা। কত দাম হ'তে পারে সেইরকম একখানা শাড়ীর! আন্দাজ করবার চেষ্টা করল লক্ষ্মণ—তার পর ঠিক করলো: শাড়ী একখানাও কিনবে সে। উঠানে স্তূপীকৃত ধান—বাইরে নতুন খড়ের গাদা, সারস আর পায়রার ঝাঁক নেমেছে নতুন ধানের লোভে। হৈমন্তিকা নবান্নের আয়োজনে ব্যস্ত—নীল ডুরে শাড়ী তার পরনে। হৈমন্তিকা যেন চলে গেল তার সুমুখ দিয়ে—উঠনে স্তূপীকৃত নূতন ধানের পাশ দিয়ে—তার শাড়ীর নীল ডোরাগুলি স্পন্দমান বিস্তৃত নিতম্বের ওপরে কেঁপে কেঁপে নাচছে। ধানের গায়ে হলদে রং লেগেছে—অফুরন্ত স্বপ্ন লক্ষ্মণের।

হৈমন্তিকা নীরব। লক্ষ্মণ যেন নিজেকেই শুনিয়ে বললে, আচ্ছা—দেখতে পাবি এবার নবান্নের দিন।

হৈমন্তিকার দুটি হাত লক্ষ্মণের কোমর বেষ্টন ক'রে জড়িয়ে গেল। হৈমন্তিকা আড়মোড়া ভেঙে হেসে বললে—আমি কি অবিশ্বাস করছি। এখনও রাত আছে অনেক, শুয়ে পড়। শীত করছে না তোমার!

—রাত আছে এখনও—খানিকক্ষণ শুলেও চলে। লক্ষ্মণ শুয়ে পড়ল আবার।

গিরিশ কামারের লোহা পেটার একটানা ঠং ঠং শব্দ শুনতে শুনতে পথ দিয়ে একমনে হাঁটছে লক্ষ্মণ। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল: কে যেন ডাকছে কোত্থেকে তাকে। লক্ষ্মণ ঘুরে তাকিয়ে দেখল, মাঠের ধানবন ভেঙে পরেশ আসছে।

লক্ষ্মণ দাঁড়াল। পরেশ কাছে এল, বললে—কোথায় যাচ্ছিস?

—কামার-বাড়ী।

—চল্—আমিও যাব।

দু-জনে হাঁটতে লাগল পাশাপাশি।

পরেশ হেসে বললে—তোর ধান তো তোকে ডাকছে রে।

লক্ষ্মণ হেসে বললে—তোকে খবর দিলে বুঝি!

—হ্যাঁ দিলে। ওই দেখ না।

দু-জনেই ঘুরে দাঁড়াল মাঠের দিকে। মাঝখানের মাঠে খানিকটা জায়গা জুড়ে ধানগাছের গায়ে সবুজ রং লেগে রয়েছে তখনও। তারই মাঝখানে লক্ষ্মণের জমিটুকুতে ধানগাছের রং প্রায় মিশে গিয়েছে পাকা ধানের রঙের সঙ্গে। উত্তরা হাওয়ায় ধানগাছগুলি কাঁপছে।

পরেশ হেসে বললে—ডাকছে কিনা দেখ।

দু-জনে মুখোমুখি চেয়ে নিঃশব্দে হেসে আবার চলতে লাগল।

লক্ষ্মণ বললে—আর দেরি নয়—আজ রাত্রেই কেটে সব শেষ করব। দু-জন লোক ঠিক ক'রে রেখেছি। কেটে একেবারে শ্বশুরবাড়ী চালান দিয়ে দেব রাতারাতি।

পরেশের চোখে হঠাৎ পুঞ্জীভূত ভয় একটা কালো হয়ে উঠল। বললে—খবর্দ্দার ও-কাজ করিস নে লক্ষ্মণ—তোর জন্যে সব চাষীগুলো মারা পড়বে। আর দু-এক দিন সবুর কর—রাতারাতি সব একসঙ্গে কাটা শেষ হয়ে চালান হয়ে যাবে। কিছু ভাবতে হবে না তোকে।

লক্ষ্মণ অধৈর্য্য হয়ে বললে—দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে—ধানগাছ আর দাঁড়াতে পারছে না। দেখ না—

সব শুয়ে পড়ছে। রায়বাবুরা আর দেরি করছে কেন! একবার হুকুম দিলে তো হয়।

পরেশ চাপা গলায় বললে—আর দু-এক দিন সবুর কর—হবে।

—আর এর মধ্যে চৌধুরীরা এসে যদি হাঙ্গাম বাধায়!

চৌধুরীরা ভিতরের খবর কিছু জানে না। চৌধুরী-দের কৈলাস নায়েব জানে—ধান এবার চৌধুরীদের গোলাতেই উঠবে। ওদের সঙ্গে লাঠালাঠি ক'রে রায়-বাবুরা তো আর পারবে না। তিন-শ লোক লাগিয়ে একেবারে রাতারাতি মাঠের ধান সরিয়ে ফেলবে।

ও-সব বড়লোকের বিরোধ গোলমালের ব্যাপার জানতেও ইচ্ছে নেই লক্ষ্মণের—শুনতেও ভাল লাগে না তার। শুধু মাঠের ধানগুলি তার ঘরে উঠলে হ'ল। চৌধুরী এবং রায় মরুক মারামারি আর লাঠালাঠি ক'রে। সে তো বহু দিনের শত্রুতা—বহু দিন থেকেই চলে আসছে।

কামারশালের সুমুখে চাষীরা এসে ভিড় করেছে অনেকে—রোদে পিঠ দিয়ে বসেছে সব। গিরিশ এক-মনে হাতুড়ি পিটছে।

লক্ষ্মণ চুপি চুপি বললে—আমার কাস্তেগুলো কখন দেবে গিরিশ-দা?

কাজে ব্যস্ত গিরিশ। মুখ না তুলেই বললে—হবে হবে ভাই—সব একসঙ্গে হবে। তুই যা দিকিন—ওই ওদের সঙ্গে বসে কাস্তের বাঁট তৈরি ক'রে ফেল্।

গিরিশ একমনে হাতুড়ি পিটতে লাগল।

লক্ষ্মণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার হাতুড়ি-পেটা দেখতে লাগল। তার পর বললে—কবে হবে?

—কাল ভোর ভোর এসে সব নিয়ে যাস। অত তাড়াহুড়ো কিসের! সব একসঙ্গে হবে।

—কামারশালে ব'সে ব'সে লোহা পিটছ তুমি—মাঠের দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছ? লক্ষ্মণ হেসে বললে—ঘরে আসবার জন্যে লক্ষ্মীঠাকরুণ সেখানে ব'সে আছে জান!

—আর লক্ষ্মীঠাকরুণ বুঝি আমার ঘরে আসবে না। গিরিশ মুখ তুলে একটু হাসল। আবার হাতুড়ি পিটতে পিটতে বললে, অনেকগুলো খবর আছে আমার রে—মাঠের ধানটা উঠলে হয়। এই শীতের মধ্যে ছেলের বিয়ে দিতেই হবে। কেশরগাঁয়ের সেই মেয়েটিকে দেখে ছেলের আমার ভয়ানক মনে ধরে গিয়েছে—কদিন খুব ঘোরাঘুরি করছে ও'দিকে। সে তো মাঠের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে আছে—কবে ধান উঠবে ঘরে।—ব'লে গিরিশ হাসতে লাগল।

গিরিশ আবার বললে—এই দেখ না—কদিন কাজের চাপে যেতে পারে নি ওদিকে। আজ ভোর থেকেই সরে পড়েছে—পাছে কাজে আটকা পড়ে যায়।

লক্ষ্মণ হেসে বললে—দাও না ওর বিয়ে এবার।

—দেবো ভাই, ধান কাটা শেষ হ'লেই দেব। আত্মগত ভাবে তার পর গিরিশ বললে—বুড়ো হয়ে পড়লুম আর কত দিন হাতুড়ি পিটব!

লক্ষ্মণ অন্যমনস্ক হয়ে বললে—ধানটা ঘরে উঠলে হয়—নবান্নের আগে আমারও কিছু খরচ আছে গিরিশ-দা।

গিরিশ হাতুড়ি পিটতে পিটতে বললে—খরচ কি শুধু তোর একার ভাই—সকলেরই খরচ আছে। জামা-কাপড়, ঘর-দোর—

আগামী স্বল্প সঙ্কীর্ণ আনন্দের দিন কটি—ভবিষ্যতের সমস্ত হাসিমুখগুলি ঘোরাফেরা করছে সকলের মনে মনে, আর মাঠের ধানবনে।

ক্ষুণ্ণ লক্ষ্মণ কামারশাল ছেড়ে ঘরের দিকে ফিরল। ছায়াচ্ছন্ন ঘন বসতি ছেড়ে মাঠের পাশের পথটিতে এসে পড়ল সে। কামারশালের লোহা-পেটার শব্দ ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে এল। লক্ষ্মণ এগিয়ে চলেছে অন্যমনে। পথের একটা বাঁক ফিরতেই সে দেখতে পেল দূরে—মাঠের দিকে ঝুঁকে-পড়া একটা খেজুর গাছের তলে একটি ছোট্ট ছেলের সঙ্গে হৈমন্তিকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা কইছে—কাঁখে তার জলের কলসী। লক্ষ্মণ নিঃশব্দে তার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

হৈমন্তিকা তখন বোঝাচ্ছে ছেলেটিকে—আর কবে তোর বাপ জামা এনে দেবে। এক কাজ কর—খুব ক'রে কান্নাকাটি সুরু করবি। শীত শেষ হয়ে গেলে জামা নিয়ে কি হবে!

কচি ছেলেটি মুখ ভার ক'রে বললে—কাঁদলে মারে যে। বলেছে, ধানকাটা শেষ হয়ে গেলে দেবে।

হৈমন্তিকা ভেংচি কেটে বললে, দে-বে।—দেখ্, খুব ক'রে কাঁদবি।

পেছন থেকে লক্ষ্মণ হেসে উঠল—বললে, কেন ওকে আবার ক্ষেপিয়ে দিচ্ছিস! জ্বালাতন হয়ে মরবে বেচারী নিতাই—ও বেচারীও মার খাবে। তুই ভারী ইয়ে—

হৈমন্তিকা লক্ষ্মণের দিকে ঘুরে হেসে বললে—দেখো না—ওই অতটুকু কচি ছেলে, তাকে জামার লোভ দেখিয়ে বসিয়ে রেখেছে এখানে—ধানে গরু পড়লে তাড়াবে। ও তাই পারে নাকি!

—তাতে তোর কি!

হৈমন্তিকা চটে বললে, সত্যিই ওর বাপ ওকে জামা এনে দেবে ভেবেছ নাকি!—ছাই দেবে। কচি ছেলে—হাঁ ক'রে ব'সে আছে মাঠের দিকে চেয়ে—ধানকাটা শেষ হ'লে জামা পরবে। আমি আসবার সময় দেখি—খেজুর গাছে ঠেস দিয়ে মাথাটি গুঁজে ঘুমিয়ে পড়েছে বেচারী। আহা—

তারপর ওরা দু-জন এগিয়ে চলল। লক্ষ্মণ চুপ ক'রে হাঁটতে লাগল।

হৈমন্তিকা লক্ষ্মণের মুখের দিকে চেয়ে টিপি টিপি হেসে বললে—আজ একটা তোমার খুব ভাল খবর শুনলুম। বুলা বাপের বাড়ী আসবে—খবরের পর খবর পাঠাচ্ছে: ধানকাটা শেষ হ'ল কি না। নবান্নের সময়ে আনবে ব'লে কথা দিয়ে এসেছিল তার বাপ। ওঃ—কত দিন পরে দেখা হবে আবার। তোমার খবর নিয়েছে শুনলুম।

লক্ষ্মণ ব'লে উঠল—দেখ দিকিন গরুটা কাদের?

দূরে একটা গরু মুখ বাড়িয়ে মাঠের ধান খাওয়ার চেষ্টা করছে—গলার দড়িতে টান পড়েছে, সুবিধে করতে পারছে না। টানাটানিতে তার পর পট ক'রে ছিঁড়ে গেল দড়িটা।

হৈমন্তিকা ব্যস্ত হয়ে বললে—আমাদেরই গরু তো।

লক্ষ্মণ ছুটে গেল। গরুটা মাঠে নেমে গিয়েছে তখন। লক্ষ্মণ টেনে আনতে আনতে দু-একগাছা ধান-গাছ মুখে ছিঁড়ে এল গরুটার। লক্ষ্মণ তার পিঠে হাত বুলতে বুলতে বললে—খাবি, খাবি—তুইও খাবি পেট ভ'রে, আমরাও খাব। আর দু-দিন সবুর কর।

হৈমন্তিকা হাসতে হাসতে বললে—তার চেয়ে দু-জনেই মাঠে নেমে চলে যাও।

দুপুরে কাস্তের বাঁট তৈরি করতে বসল লক্ষ্মণ রোদে পিঠ দিয়ে, আর অনেক বার মনে পড়ল বুলার কথা। বুলা আসবে—অনেক দিন পরে আবার দেখা হবে তার সঙ্গে।

গ্রামান্তরের গুটিতিনেক রাস্তা এসে মিশেছে লক্ষ্মণের সুমুখে। একপাশ ঘেঁষে একটি বটগাছ ঠাণ্ডা কালো ছায়া ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে—বটগাছের কোলে অনেকখানি জায়গা সবুজ ঘাসে ভরে গিয়েছে, যেন বটগাছের স্নিগ্ধ ছায়ার প্রতিবিম্ব পড়েছে চিকণ ঘাসগুলিতে। গুটি দুই তিন ছোট ছোট ছেলে গরু নিয়ে এসেছে সেখানে। তারা গরু ছেড়ে দিয়ে লক্ষ্মণের কাস্তের বাঁট তৈরি দেখছে।

একটি ছেলে বললে—এবার বনভোজন হবে লক্ষ্মণ-কাকা?

লক্ষ্মণ বললে—হবে বৈকি।

—কোথায় হবে?

—সবাই যেখানে ঠিক করবে—সেইখানে হবে। হয়ত জলার পুকুরধারেই হবে।

মাঠের মাঝখানে অনেক দূরে সে পুকুর। সব ছেলে-গুলি একসঙ্গে মাঠের দিকে তাকাল: জলার সেই পুকুরের ধারে সারি সারি বাবলার গাছ—বাবলা-বন ভ'রে গিয়েছে হলদে ফুলের বন্যায়। মাছরাঙা আর নীলকণ্ঠ পাখী ডিম পাড়ে সেখানে—খড়হাঁস নির্ভয়ে সাঁতার কাটে।

প্রত্যেক বছরই ধানকাটার শেষে একটি ক'রে উৎসব হয়—কৃষক-পরিবারের সমস্ত ছেলেবুড়ো যোগ দেয় তাতে। স্বল্প আয়োজন আর অফুরন্ত আনন্দের হট্টগোলে নীল আকাশের নীচে একটি দিন।

লক্ষ্মণ আড়মোড়া ভেঙে বললে—দেখিস, মাঠে যেন গরু না গিয়ে পড়ে।

লক্ষ্মণের ঘুম আসছিল—রোদে পিঠ দিয়ে সে শুয়ে

পড়ল। অনেকক্ষণ ঘুমল সে। বেলা পড়ে এল এক সময়ে।

হৈমন্তিকা জলের কলসী নিয়ে ফিরছিল অল্পবয়সী গুটিকয়েক মেয়ের সঙ্গে। ঘুমন্ত লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে একটি মেয়ে বললে—হিমিদি, দেব জল ছিটিয়ে?

—দে। ব'লে হাসতে লাগল হৈমন্তিকা। বললে, ঘুমোবার আর জায়গা পেলে না ও, গাছতলায় এসেছে।

একটি মেয়ে বললে—আহা, হিমিদির কষ্ট হচ্ছে গো। ব'লে সে জল ছিটিয়ে দিলে।

লক্ষ্মণ চোখ ঘষতে ঘষতে উঠে বসল। মেয়েরা তখন হাসতে হাসতে এগিয়ে গিয়েছে। হৈমন্তিকা ঘুরে দেখল একবার। লক্ষ্মণ তাকিয়ে আছে। হৈমন্তিকা হাসল।

লক্ষ্মণ হাই তুলে কাস্তের বাঁটগুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াল। কামার-বাড়ী যেতে হবে তাকে।

রাত ঘণ্টা-দুই হয়েছে। গিরিশের ছেলে বনমালী ফিরল ঘরে।

গিরিশ বললে—কোথায় গিয়েছিলি রে।

—কোথাও না—এই—এমনি একটু—

বনমালী তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে ঢুকল। গিরিশের মুখে নিঃশব্দ আনন্দ-উজ্জ্বল হাসির ঢেউ ভেঙে পড়ল। মনে মনে বললে সে, শীতের মধ্যেই বিয়ে চুকিয়ে ফেলতে হবে বনমালীর। সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটি কেশরগাঁয়ের। কাল রাত্রির মধ্যেই মাঠ খালি হয়ে যাবে। কাস্তে সব তৈরি শেষ। তার পর একটি সুন্দর মেয়ে আসবে ঘরে ক-দিন পরে, বনমালী বসবে কামারশালে—তার পর···তার পর কচি ছেলেমেয়েগুলি—

সারাদিনের কর্ম্মক্লান্ত গিরিশ তার মুখ থেকে মুক্ত তামাকের কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার মত ঘুরতে লাগল ভবিষ্যতের স্বপ্নলোকে! বিশ্রাম—শান্তি—অবসর।

গিরিশের ঝাপ্‌সা চোখের সুমুখে অন্ধকারে কে একটি লোক এসে দাঁড়াল। লোকটি বললে—গিরিশ আছ?

—হ্যাঁ—কে! গিরিশ চমকে সচেতন হয়ে উঠল।

—ম্যানেজার বাবুর ডাক আছে। লোকটি নীরস কঠোর কণ্ঠে বললে।

চৌধুরীবাবুদের ম্যানেজারের ডাক। বিচলিত হয়ে পড়ল গিরিশ। রায়বাবুদের আশ্বাসবাণী মনে পড়ল একবার তার—তার পর অন্ধকারে হতাশ ভাবে সে লোকটির দিকে তাকাল। ভয়ে ভয়ে বললে—কেন?

—জানি নে। যেতে হবে।

কি করবে গিরিশ ভেবে পেলে না। শুধু কোথাও ছুটে পালাতে ইচ্ছে হ'ল তার। কিন্তু গিরিশ যেতে নারাজ হয় যদি, তা হ'লে জোরে ধরে নিয়ে যাওয়ার হুকুম নিয়ে এসেছে লোকটি। শুনে গিরিশ আরও ভয় পেয়ে গেল। হতাশ ভাবে তাকাতে লাগল সে চার দিকে। ভীরু চোখ মেলে দেখল সে; একটি লোক ছিল, আরও দুটি লোক নিঃশব্দে তার পাশে এসে দাঁড়াল।

নিরুপায় গিরিশ উঠে দাঁড়িয়ে ঢোক গিলে বললে—চল।

লোক ক'টি নিঃশব্দে অনুসরণ ক'রে চলল গিরিশকে। যেতে যেতে পাকা ফসল-ভরা অন্ধকার মাঠের দিকে তাকিয়ে গিরিশ শুধু ভাবতে লাগল: রায়বাবুদের রাতারাতি ধান কেটে ফেলার খবরটা কেমন ক'রে পেল চৌধুরীরা! আর নিষ্কৃতি নেই, এতগুলি চাষীর সারা বছরের ভাত, সমস্ত স্বপ্ন আর আনন্দ ঘুচে গেল—শেষ হয়ে গেল। কেমন ক'রে পেল খবর চৌধুরীরা! গিরিশ শুধু ভাবতে লাগল।

যেমন ক'রে হোক চৌধুরীরা জানতে পেরেছে। তারা জেনেছে, গিরিশের কামারশালে ভিন্ গ্রামের কাজের ঠেলা নয়, রায়েদেরই কাস্তে তৈরি করছে সে। স্বয়ং বরদা চৌধুরী এসেছে মহালে।

ম্যানেজার দেঁতো হাসি হেসে বললে—কি রে গিরিশ, ক-শ কাস্তে হ'ল? রায়েরা সব প্রজা হাত ক'রে ফেলেছে ভিতরে ভিতরে—না? নিমকহারাম, ছোটলোক।

গিরিশ নীরব।

বরদা চৌধুরী গম্ভীর কণ্ঠে বললে—ক-শ কাস্তে হয়েছে?

গিরিশ কম্পিত কণ্ঠে বললে—তিন-শ।

—হুঁ। চৌধুরী কঠোর দৃষ্টিতে গিরিশের দিকে তাকিয়ে বললে—এই সমস্ত ভেঙে বল্লম তৈরি করতে

হবে—বুঝলি? আজ রাত্রের মধ্যেই চাই। তার পর ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে বললে—লোকজন সব ঠিক তো তোমার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

চোখের ইঙ্গিতে গিরিশকে দেখিয়ে চৌধুরী বললে—ওকে যা বলবার ব'লে দাও।

ম্যানেজার গিরিশের দিকে তাকিয়ে বললে—তোর সঙ্গে লোক দিচ্ছি পাঁচ জন। সারারাত কাজ করবে তোর সঙ্গে তারা। ভোরে মাল নিয়ে চলে আসবে। বেইমানী করলে তাদের হাতুড়ির ঘা পড়বে তোর মাথায়। বাহাদুর, লে যাও।

কোমরে ছোরা-বাঁধা বাহাদুরের সঙ্গে গিরিশ কলের পুতুলের মত এগিয়ে গেল।

গিরিশের অন্ধকার কামারশালে আগুন আবার গন্ গন্ ক'রে জ্বলে উঠল। আগুনে ঝুঁকে-পড়া ক্লান্ত মুখ ক'টা লাল হ'য়ে উঠল পোড়ান লোহার মত। স্তব্ধ রাত্রির বুকে সারা রাত ধরে হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগল—ঠন্ ঠন্ ঠন্।

ভোরের আগেই শেষ হ'ল কাজ। বল্লমের তীক্ষ্ণ ছুচাল ফলাগুলো লুকিয়ে রাখা হ'ল ধানের ভিতরে। বস্তার মধ্যে চালান যাবে সকালে। গিরিশ স্থিরদৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে কপালের ঘামের বিন্দু ক'টি মুছে নিলে।

—মাঠের দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছ—ঘরে আসবার জন্যে লক্ষ্মীঠাকুরুণ সেখানে ব'সে আছে জান?—বিড় বিড় ক'রে বললে লক্ষ্মণ।—গিরিশ তবু ক্ষান্ত দেবে না। তার পর হৈমন্তিকার ঠেলা খেয়ে জেগে উঠে বসল লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ হাই তুলে বললে—স্বপ্ন দেখছিলুম। রাত বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছে—না রে!

—এই দুপুর রাতে তোমার রাত শেষ হয়ে এল!

—না না, কি বলছিস! দেখি একবার—

লক্ষ্মণ বাইরে এসে আকাশের দিকে তাকাল। গভীর নিঃশব্দ রাত্রির তারায় ভরা আকাশে শুকতারার উদয় তখনও হয় নি। লক্ষ্মণের পরিচিত বড় তারাটি সবে নারকেল গাছের মাথার উপরে ঝলমল করছে। ঠাণ্ডা উত্তুরে বাতাসে দূর মাঠের ধান-বনের ক্ষীণ মর্ম্মর শব্দ কানে এসে লাগল লক্ষ্মণের—আর বহু দূর থেকে ঠন্ ঠন্ লোহা-পেটার শব্দ। খুশীতে দুলে উঠল তার মন। আর একটি দিন আর একটি রাত। তার পর মাঠের ধান ঘরে উঠবে। শিস্ দিতে দিতে ঘরে ঢুকল লক্ষ্মণ। ঘরে এসে আলো জ্বালালে। তার পর বিছানার এক প্রান্তে গুটিসুটি মেরে ব'সে ভাঙা গলায় গুন্ গুন্ ক'রে গান ধরল:

কাল রাত্রে এমন সময় মাঠে—

হৈমন্তিকা বললে—তার মানে! এই দুপুর রাতে আলো জ্বেলে ব'সে ব'সে গান গাইবে নাকি!

—হুঁ হুঁ। শীতে গলা কেঁপে উঠল একটু লক্ষ্মণের। গুন্ গুন্ ক'রে বললে—গন্ধতেল আর নীল ডুরে শাড়ী—

হৈমন্তিকা ফুঁ দিয়ে আলো নিবিয়ে দিলে।

—দিলি নিবিয়ে। হাই তুলে লক্ষ্মণ বললে, বড্ড শীত—তবু একটু গরম ছিল ঘরটা।

—শুয়ে পড়—গরম হবে। অন্ধকারে হৈমন্তিকার একটি হাত এগিয়ে এল নিবিড় হয়ে। হৈমন্তিকা বললে, ধানকাটা তো শেষ হয়ে যাবে দু-এক দিনের মধ্যে। তার পর তোমার একটা গায়ের চাদর কিনে এনো।

খরচ অনেক প্রয়োজন। লক্ষ্মণের লঘু মন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল—বললে, এ বছর আর হবে না। কাটিয়ে দেব কোনরকমে।

—এই শীতে। নাই বা হ'ল আমার শাড়ী। কিনতে হবে না।

—আমার খুশী আমি কিনব। এক গাদা খরচ—অন্যমনস্ক লক্ষ্মণ বললে, চাদর কেনা হবে না এবার।

—হবে হবে। খরচের ভয়ে ম্রিয়মাণ লক্ষ্মণকে উৎসাহিত ক'রে বললে হৈমন্তিকা—কিছু ভাবতে হবে না তোমাকে—আমি ঠিক চালিয়ে নেব। চুপ কর।

কি ক'রে চালিয়ে নেবে হৈমন্তিকা! ভেবে পেল না লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণের নিস্পন্দ নিস্তব্ধতাকে হৈমন্তিকা উচ্ছল হাসিতে চঞ্চল ক'রে তুলতে চাইল। খিল্ খিল্ ক'রে হেসে বললে—কি হ'ল! বললুম না, ভাবতে হবে না।

ভাবতে হবে না লক্ষ্মণকে, তাকে ভাবতে দেবে না হৈমন্তিকা। দুশ্চিন্তাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের হিম নিরুৎসাহতা থেকে নিজের বাধাবন্ধনহীন উদ্দাম বর্ত্তমানের আনন্দে হৈমন্তিকা লক্ষ্মণকে হাল্‌কা পালকের মত উড়িয়ে নিয়ে গেল। হৈমন্তিকা একটি পুরুষকে শুধু ভালবাসে—সুগঠিত দরিদ্র একটি পুরুষকে; আর সে দেবে গন্ধতেল আর শাড়ী উপহার। লক্ষ্মণকে কিছু ভাবতে দেবে না সে। তার বিগলিত বর্ত্তমানের মাঝখানে সে যেন একটা ঘূর্ণি হাওয়া। চার দিকের সমস্ত কিছুকে নিজের উদ্দাম আবেগের মাঝখানে জড়িয়ে ছড়িয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

লক্ষ্মণের যখন ঘুম ভাঙল, দিব্যি তখন ভোর হয়ে গিয়েছে।

ক্ষুণ্ণ লক্ষ্মণ বললে—রাত থাকতে ডেকে দিলি নে একটু—

হৈমন্তিকা শুধু হাসল।

সারা রাত গিরিশ হাতুড়ি পিটেছে। কাস্তে সব তৈরি—হয়ত নিয়ে চলে গিয়েছে সকলে। লক্ষ্মণ তাড়া-হুড়ো ক'রে বেরিয়ে পড়ল।

পায়রা আর সারসের ঝাঁক নেমেছে মাঠে। লক্ষ্মণ হাত উঁচিয়ে ধরতেই ঝট্‌পট্‌ ডানার শব্দ ক'রে উড়ে গেল সব। লক্ষ্মণ হন্‌ হন্‌ করে হাঁটতে লাগল। শুকনো খড়ের গন্ধ এসে লাগছে নাকে তার। উত্তরে হাওয়ার ঝলকে ধানের শীষগুলি ঝর্‌ ঝর্‌ করছে বহু দূর থেকে বহু দূরে—কানে এসে লাগছে লক্ষ্মণের। চোখে তার হৈমন্তিকা, কাস্তে আর সোনার ধান।

গিরিশের কামারশালের সুমুখে একটু থমকে দাঁড়াল লক্ষ্মণ। দু-একটি পরিচিত মুখ দেখবার আশা করেছিল সে—কিন্তু কাউকেও দেখতে পেল না। নিস্তব্ধ গিরিশের ঘর, দরজা খোলা। উঠোনে নতুন ধান জড়ো করা রয়েছে এক জায়গায়। ধানের স্তূপের পাশ দিয়ে ডিঙিয়ে যাওয়ার সময় লক্ষ্মণ হঠাৎ "উঃ" ক'রে পা চেপে বসে পড়ল।

—বাপ রে! এখানে আবার কি রেখেছ গিরিশ-দা!

একটা বল্লমের ফলা টেনে বার করল লক্ষ্মণ। বললে, এটা ধানের মধ্যে কেন!

গিরিশ লক্ষ্মণের গলার সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এসেছে উঠোনে। তার ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে পায়ে চাপা হাত ঝেড়ে দিয়ে বললে, যাক্‌ গে। কাস্তে সব হয়ে গিয়েছে গিরিশ-দা! আমার গুলো—

লক্ষ্মণের পায়ে রক্তের ধারা। কাঁচা সোনার মত ধান-গুলি লাল হয়ে গেল রক্তে—খানিকটা মাটিও। গিরিশ শুধু নীরবে সেই দিকে তাকিয়ে রইল—একটি কথাও সে বললে না।

মায়া

শ্রীমণিমোহন মুখোপাধ্যায়

বেঁধো না আমার হস্তে কামনার পেলব কঙ্কণ;
উদার আকাশ-সম মেঘহীন আমার অন্তর
উজ্জ্বল আলোকে ঝলে। তার মাঝে ক'রো না অঙ্কন
ঘনমেঘবর্ণ দিয়া রূপান্বিতা প্রেমস্বপ্নচ্ছায়া;
মেঘের আড়ালে, হায়, ঢেকে যাবে সুনীল অম্বর
সুচির সত্যের স্থানে দেখা দিবে বহুরূপী মায়া।

আমি চাই নিস্তরঙ্গ সরসীর একরূপা জল;
সুনিত্য, সুনীল নভঃ, সেই ভাল, বৈচিত্র্যবিহীন।
হে শিল্পী, তোমার ছবি, সে যে মিথ্যা ছল,
তুমি এঁকে দাও মনে অপরূপ নানা বর্ণ দিয়া
প্রেমের মধুর চিত্র। ধীরে তাহা শূন্যে হয় লীন,
মুছে যায় চিত্রখানি, পড়ে থাকে নীল মোর হিয়া।

ছায়া

শ্রীপরিমল গুপ্তা

১

সুব্রত সেন রেলওয়ের ডাক্তার। বদলীর কাজ! সম্প্রতি সে লিলুয়া থেকে বদলী হয়ে সপরিবারে এসেছে কাশী। রেলের কোয়াটারটি মনোরম। সঙ্গে আছেন বৃদ্ধ পিতামাতা, স্ত্রী এবং চার বছরের পুত্র বুলবুল। পিতামাতা ছেলের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, কারণ তাঁদের সুব্রত ভিন্ন অন্য কোন সন্তান নাই। সুব্রতর স্ত্রী নীলিমা সপ্রতিভ হাস্যমুখী মেয়ে। বর্ণনা করবার মত রূপ যদিও তার নয়, তবুও মুখখানা তার সুষমামণ্ডিত। লেখাপড়া সে সাধারণ ভাবে শিক্ষা করেছিল। গরীব বিধবা মায়ের মেয়ে সে, তবুও তার বিবাহ হয় সুব্রতর সঙ্গে। সুব্রত পদস্থ ব্যক্তির পুত্র। ছয় বৎসর পূর্ব্বে আসানসোলে থাকার সময় সে নিজে দেখে নীলিমাকে পছন্দ করেছিল। পিতামাতা মনে মনে ক্ষুব্ধ হ'লেও, একমাত্র উপযুক্ত পুত্রের নিজ পছন্দ মত পাত্রী নির্ব্বাচনে আপত্তি প্রকাশ ক'রে মতানৈক্য ঘটান নি।

আরও কয়েক স্থানে বদলী হবার পর বর্ত্তমানে সুব্রত লিলুয়া থেকে এসেছে কাশী। সুব্রতর খোকাটি বেশ সুদর্শন। হৃষ্টপুষ্ট ছেলেটি ভারী চটপটে। ডাকনাম বুলবুল। বুলবুল নিজে অনেক অসম্ভব কথা কল্পনা ক'রে বলে। কিন্তু বয়স্কদের মুখে অসম্ভব কথা শুনলে সে চট ক'রে বলে—তুমি ভারী বোকা!

বুলবুলের নানাবিধ প্রশ্নোত্তরের জালায় ঠাকুরদাদা ঠাকুরমা ব্যতিব্যস্ত থাকেন। নীলিমাও বাদ যায় না। বুলবুলকে নিয়ে ক'টি প্রাণীর বেশ আনন্দে দিন কাটে।

বেনারস আসবার পর সুব্রত মাতাপিতা ও নীলিমাকে নিয়ে কয়েক দিন দর্শন ক'রে বেড়ায়—বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা ও অন্য সকল দেবমন্দির। তার পর এক দিন প্রস্তাব হয় মূল-গন্ধকুটী-বিহারে বেড়াতে যাবার। হিন্দু-মন্দির নয়, শুনে মা যাবার তেমন গরজ করেন না। পিতাও ক্লান্ত আছেন ব'লে অন্য এক দিন সেখানে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

২

সুব্রত নীলিমাকে সঙ্গে ক'রে এক দিন বেরিয়ে পড়ে—সারনাথের ধ্বংসস্তূপ দর্শনেচ্ছায়।

সারনাথের ধ্বংসস্তূপ দুই ভাগে বিভক্ত। এক অংশে চলছে দিনের পর দিন খননকার্য্য। সেই স্তূপাবলীর এক পাশে বুদ্ধমন্দির স্থাপিত। অন্য অংশে আছে প্রাচীন মুদ্রা, অলঙ্কার, তৈজসপত্রাদি, এবং নানারূপ বুদ্ধমূর্ত্তি ও অন্যান্য মূর্ত্তি। সারি সারি কক্ষের পর কক্ষে সেগুলি অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্যস্বরূপ সাজান আছে। মূল-গন্ধকুটী-বিহারের সীমায় এসে যানবাহন ছেড়ে দিয়ে পদযোগে সারনাথ যেতে হয়। ওরাও গাড়ী সেখানে ছেড়ে দিয়ে পদব্রজে অগ্রসর হয়। ধ্বংসাবশেষের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে অতি প্রাচীন বটবৃক্ষশ্রেণী সারিবদ্ধভাবে। এই সকল বৃক্ষশ্রেণী যে কত শত বৎসরের গৌরব-কাহিনীর সাক্ষ্য দিতে পারে—অন্তরে তা নির্ণয় করতে গেলে অন্ত পাওয়া দুষ্কর! সুব্রত আর নীলিমা ধীরে ধীরে এসে উপস্থিত হয় যে অংশে আছে বুদ্ধ-মন্দির স্থাপিত।

ওরা সোজা প্রবেশ করে মন্দিরের ভিতর। প্রবেশ মাত্র দৃষ্টি স্থির হয়—বিরাট্ সৌম্য অমিতাভ মূর্ত্তি দর্শনে। অগণিত দীপমালা বেষ্টিত বেদীর উপর ধ্যানী পদ্মাসীন বুদ্ধমূর্ত্তি। অপলক দৃষ্টি রেখে নীলিমা অগ্রসর হয় মূর্ত্তির সম্মুখে।

নতজানু হয়ে মস্তক তার আপনি লুটিয়ে পড়ে মূর্ত্তির চরণোদ্দেশে। মন্দিরের ভিতরটি বেশ প্রশস্ত। বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্ব হ'তে তাঁর সমাধিলাভ পর্য্যন্ত দেয়ালের গায় সারি সারি ছবি অঙ্কিত। মুগ্ধনয়নে নীলিমা ঘুরে ঘুরে দেখে।

মন্দিরের ভিতর মুণ্ডিত-মস্তক গেরুয়াধারী কত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আসা যাওয়া করছে। সকলেরই পা পাদুকা-বিহীন। কেহ কেহ বা এক পাশে ব'সে গ্রন্থ পাঠে রত। কত দেশীয় সন্ন্যাসী যে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে তা অনুমান করা নীলিমার পক্ষে কঠিন। মুগ্ধনেত্রে নীলিমা মন্দিরের দৃশ্যাবলী দেখতে থাকে। সুব্রতর তাড়ায় চটপট আর একবার বুদ্ধ-মূর্ত্তিকে প্রণাম ক'রে নেয়।

বেদীর নিম্নে একটি ছোট বাক্স রক্ষিত আছে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাহায্যার্থ নীলিমা ইচ্ছামত কিছু অর্থ ঐ বাক্সটায় ছেড়ে দেয়। তার পর সুব্রতর সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে মন্দিরের বাইরে এসে দাঁড়ায়।

৩

বেলা তখন অপরাহ্ণ। সুব্রত নীলিমাকে নিয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায় ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে। কত জায়গায় খনন-কার্য্য শেষ হয়ে গেছে! তার বিরাট্ শূন্য গহ্বর পড়ে আছে। কোনখানে খননকার্য্য সম্পূর্ণ শেষ হয় নি—কোন স্থানে খননকার্য্য আরম্ভ হয়েছে।

উঁচুনীচু জমি, সকল স্থানই অসমতল। অতিমাত্রায় নির্জ্জন স্থান। ঝোপ-ঝাড়ে জঙ্গলাকীর্ণ মূল-গন্ধকুটী-বিহার। জনমানবের সাড়া তো নাই-ই—প্রকৃতিও যেন এখানে ধ্যানস্থ। ধ্যানভঙ্গের আশঙ্কায় পশুপক্ষীও নিঃসাড়ে যাতায়াত করে। স্থান-বৈশিষ্ট্যে দর্শকের মন উদাস হয়ে উঠে। ঘুরে ঘুরে নীলিমা আর সুব্রত দেখে অতীত গৌরবের স্তূপাবলী। তাদের মত আরও কয়েকটি নর-নারীকে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

কোথাও অসমাপ্ত খননের মধ্যে সুন্দর অট্টালিকা দৃষ্টি-গোচর হয়। কোথাও আবার সামান্য মাত্র কর্ত্তিত জমির ভিতর পূর্ণ একখানা আবাসগৃহের অভাস পাওয়া যায়। কত যে চূর্ণ-বিচূর্ণ স্তম্ভ এবং গৃহাবলীর ভগ্ন অংশ উপরে তুলে রেখে দিয়েছে, তার ইয়ত্তা নাই। সুব্রত আর নীলিমা পাশাপশি ঘুরে বেড়ায়। মুখে কারও বাক্য নাই। মন ওদের চলে গেছে কোন্ সুদূর অতীত যুগে।

মনশ্চক্ষে নীলিমা দেখতে পায়—মূলগন্ধকুটী-বিহার—কত অগণিত নরনারীর বাস। দেখতে তারা অজন্তার ছবির মত। পোষাকও তাই। রূপ-রস শৌর্য্যে-ঐশ্বর্য্যে এদের তুলনা নাই। সুন্দর এদের ছন্দ, মার্জ্জিত রুচি ও ভাষা! দুঃখ নাই দৈন্য নাই। আনন্দ-কলরবে মূলগন্ধকুটী নগরী মুখরিত। কত বিপণি, কত দোকানী! স্বামী-পুত্র নিয়ে মাতা-বনিতার সুখের নীড়।

প্রদোষকালে কোন নারী প্রসাধনে রত। কেউ বা নৃত্য-ছন্দে লীলায়িত। কোন নারী স্বামী-পুত্রের প্রতীক্ষায় অপেক্ষমানা। কেউ কেউ হয়ত তার বাৎসল্যকে নিয়ে সোহাগে মত্ত!

গৃহে গৃহে এমনই সময়ে গর্জ্জন ক'রে উঠে প্রবল ধ্বনি। বিপুল দোলনসহকারে আবাস-গৃহাবলী ভূগর্ভের দিকে নামতে থাকে। নিরুপায় নরনারী ছুটে ত্রাসে দ্বারের প্রতি। কক্ষবেষ্টিত ও হস্তধৃত তাদের সন্তান! কিন্তু রুদ্ধ দ্বারে কঠিন ধাক্কা পেয়ে তারা ছুটে বেড়ায় প্রতি দরজার দ্বারে!

সন্ধ্যার অন্ধকারে পৃথিবী তাদের এবং মূলগন্ধ নগর গ্রাস ক'রে নেয়। তারা আলো চায়, বাতাস চায়, তাদের সন্তানদের বাঁচাতে চায় তারা ভূগর্ভ হ'তে চীৎকার করে—রক্ষা কর! রক্ষা কর! কিন্তু তাদের রক্ষা করবার মত কেউ ছিল না। তাদের কেউ রক্ষা করে নাই! ভগবান্‌ও নয়।

কান পেতে থাকলে বুঝি বা এখনও ভূগর্ভ থেকে তাদের আকুল আহ্বান কানে বাজে।

একটা মিলিত কণ্ঠের হাসির রোলে নীলিমার আবেশ টুটে যায়। তাকিয়ে দেখে, একদল নরনারী ভগ্নস্তূপের উপর ব'সে তাদের সখের ভোজন-পালা সমাধা করছে—আর হাসি-আলাপনে সারনাথ-ভ্রমণ উপভোগ করছে। নীলিমা সুব্রতর হাত ধরে বক্র দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে বলে—ছিঃ ছিঃ! ওদের কি প্রাণ নেই! ওরা কি মনে করে যে, এটা একটা সাধারণ পোড়ো বাড়ী? ওরা কি অনুভব করতে পারে না যে, এই স্থান অতীত গৌরবের কত বড় একটা মহা-শ্মশান! ব'লে সে এগোতে থাকে।

সুব্রত নীলিমাকে সারনাথের অপর অংশ দেখবার

কথা বলে। কিন্তু নীলিমা রাজী হয় না। সে বলে—এখানে ভোজের পালা—হয়ত ওখানে গিয়ে দেখবো আর কিছু! তার চাইতে চল আজ ফেরা যাক। অন্য সময়ে আসা যাবে।

সুব্রত আর কথা না ব'লে ধীরে ধীরে নীলিমার সঙ্গে অগ্রসর হয়।

৪

নীলিমাকে নেশায় পেয়ে বসে। সে প্রায়ই সারনাথ যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। কর্ম্ম অবসানের পর সুব্রত যেদিন সময় পায় নীলিমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে—তার অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্য।

এমনি ভাবে উত্তীর্ণ হয় চার-পাঁচ মাস। সুব্রত মাঝে মাঝে সারনাথ যেতে রাজী হয় না। নীলিমাকে বলে—তুমি কি পাগল হ'লে? ও জায়গা ছাড়া কি আর যাবার স্থান নেই?

নীলিমার চক্ষু অশ্রুতে টল টল করে। বলে—আর যেতে চাইব না! কিন্তু দু-দিন যেতেই সুব্রতর মনে হয়—আহা! বেচারী সারনাথ বেড়াতে ভালবাসে! যেদিন যেতে চায় নিয়ে গেলেই পারি। তার পর সুব্রত নিজেই উপযাচক হয়ে নীলিমাকে নিয়ে যায় সারনাথের পথে।

শীত-গ্রীষ্ম উত্তীর্ণ হয়ে আসে বর্ষাকাল। কাজেই ইচ্ছামত সারনাথ যাওয়া আর চলে না। নীলিমা দিন দিন কেমন যেন উদাস হয়ে উঠে।

বর্ষার বারিধারার প্রতি দৃষ্টি রেখে মন তার ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে একাকী ঘুরে বেড়ায়। শ্রাবণ মাসের বর্ষার দুর্যোগ যত গাঢ় হয় মন তার ততই উতলা হয়। তার কিছুই ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে মনকে সে শাসন করে, সংসারের কাজে মন নিবিষ্ট করতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার ভাল লাগে না! কিছুই তার ভাল লাগে না!

বুলবুলকে কাছে ডেকে আদর করতে গিয়ে হঠাৎ তার খেয়াল হয়, যেদিন ভূমিকম্পে মূল-গন্ধকুটী শহর পৃথিবীর গর্ভে আশ্রয় নিয়েছিল সেদিন তার মত কত মা সন্তানকে সোহাগ করতে ব্যাপৃত ছিল!

আর তার বুলবুলকে আদর করা হয় না। আবার সে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে বসে।

ভাদ্র মাসের শেষ দিকে বর্ষার বিরাম হয়। ক'দিন ধরে বৃষ্টি বন্ধ থাকাতে গুমোট গরমে শহরের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। প্রখর রৌদ্রের তেজে জল-কাদা শুকিয়ে রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন হয়। কিন্তু অসহ্য গ্রীষ্মের জ্বালায় মানুষ কামনা করে আবার বৃষ্টি হোক। বৃষ্টির শীতলতায় তারা একটু স্বস্তি পেতে চায়।

এমনি দিনে, সেদিন সুব্রত হাসপাতালের কর্ত্তব্য সম্পাদন ক'রে শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী ফেরে। ইচ্ছা যে নীলিমাকে সঙ্গে ক'রে একটু গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাবে। তার ইচ্ছা জ্ঞাপন করবার পূর্ব্বেই নীলিমা ছুটে এসে সুব্রতকে ধরে বসে যে, আজ তাকে সারনাথ নিয়ে যেতেই হবে। বহুদিন ধরে সেখানে যাওয়া হয় না। সুব্রত আর আপত্তি করতে পারে না। স্ত্রীর মুখের প্রতি ক্ষণকাল দৃষ্টিপাত ক'রে সে বলে—আচ্ছা!

৫

একটা টিবির উপর সুব্রত চুপ ক'রে ব'সে থাকে। সারনাথ-ভ্রমণে তার কাছে এখন আর নূতনত্ব কিছু নেই। এখানে বসে বসেই সে ব'লে দিতে পারে কোথায় কি আছে।

নীলিমা একলা ঘুরে বেড়ায়। বুদ্ধমন্দির প্রদক্ষিণ করে ঘুরতে ঘুরতে এক প্রান্তে এসে সে দাঁড়ায়। একটা সমাপ্ত পরিখার পাড়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে, এই নির্জ্জন ভগ্ন পরিত্যক্ত নগরীর কথা। চারি দিক নিস্তব্ধ! জন-মানবের সাড়া নেই। সেই পরিখার মধ্যে সুন্দর মন্দির-সদৃশ একখানি গৃহ দেখা যায়। নীলিমা পরিখার নীচে নেমে আসে, ইতস্তত ঘুরে ফিরে গৃহখানা সে দেখতে থাকে। অন্বেষণ করতে নীলিমা একটি দ্বার দেখতে পায়। সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ ক'রে সে একটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠের মধ্যে এসে দাঁড়ায়!

চারি দিকে বারান্দাবেষ্টিত সেই বৃহৎ কক্ষের মধ্যস্থলে বেদীর উপর ধূসর রঙের বুদ্ধমূর্ত্তি সমাধিস্থ। সে আরও দেখতে পায়, এক পাশে পিলসুজের উপর অর্দ্ধদগ্ধ প্রদীপ,

ব্যজন করবার চামর, বৃহৎ পিতলের ধূপদানে ধূপমিশ্রিত দগ্ধ ভস্ম। স্বপ্নাবিষ্টের মত নীলিমা চামরখানা তুলে নিয়ে ধ্যানী বুদ্ধকে ব্যজন করতে থাকে।

দিবা অবসানপ্রায়। আকাশেও মেঘাড়ম্বর! সে কারণে পরিখার কক্ষে অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠে। অন্ধকার কক্ষে ব্যজনরতা নীলিমার আত্মবিস্মৃতের মত হঠাৎ মনে পড়ে যায়—

বহু বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এই মন্দিরের সে ছিল সেবিকা! রাজপ্রাসাদের পাশে এই মন্দির গঠিত। প্রতিদিন দিনের শেষে সে পূজার উপকরণ সাজিয়ে তথাগতর ব্যজন-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকত। রাজকার্য্যের অবসানে গোধূলি সন্ধ্যায় আসতেন রাজা। সঙ্গে থাকতেন রাণী, রাজকন্যা এবং সখিবৃন্দ। মূল-গন্ধ নগরীর অনেক কথাই তার মনে পড়ে—এই মন্দিরে রাজার সঙ্গে শহরের কত গণ্য-মান্য ব্যক্তিকেই না সে দেখেছে।

শেষদিনের কথা তার মনে হয়—এমনি সন্ধ্যায় নিত্যকার মত সে পূজার উপকরণ সাজিয়ে রাজা-রাণীর প্রতীক্ষায়, মন্দির-দেবতার ব্যজনরতা।

অকস্মাৎ পৃথিবীর প্রলয়কারী গর্জ্জনে ছুটে সে বাইরে আসে। চারি দিকে বিক্ষিপ্ত প্রস্তররাশির সূক্ষ্ম ধূলার সঙ্গে গোধূলি সন্ধ্যায় আকাশ-বাতাস এক রঙে রঙীন হয়ে গেছে।

পায়ের নীচে ধরিত্রী ক্রুদ্ধা নাগিনীর মত ক্রমাগত ক্রূর ছন্দে দোদুল্যমানা। ভয়ে ত্রাসে সে দৌড়ে পালাতে যায়, কিন্তু পালাতে সে পারে না। ফিরে আসতে চায় এই মন্দিরের মধ্যে—কিন্তু তাতেও সে অক্ষম হয়!

ঘনঘটা মেঘাড়ম্বরে একবার তড়িৎপ্রবাহ খেলে যায়। কর্ণবিদারক গভীর শব্দে আবিষ্টের মত নীলিমা দৌড়ে সেই কক্ষের বাইরে পরিখার মধ্যে এসে দাঁড়ায়। হাতে তার সেই ব্যজনী—পালাবার পথ সে পায় না।

সুব্রত বহুক্ষণ ধরে ব'সে আছে নীলিমার প্রতীক্ষায়। কথা আছে, সে বেড়িয়ে ফিরে আসবে এই টিবির উপর উপবিষ্ট সুব্রতর কাছে।

সুব্রত বসে বসে ভাবে তার জীবনের ঘটনাবলী। এত দিন তো তারা বেশ ছিল! কিন্তু কাশী আসবার পর, সারনাথের এই বিধ্বস্ত নগরী দর্শনের পর থেকে—নীলিমার মনের পরিবর্ত্তনে তার সুখের নীড়ে একটা কালো ছায়া যেন ধীরে নেমে আসে! সুব্রত বুঝতে পারে নীলিমার মনের দিনের পর দিন কত দ্রুত পরিবর্ত্তন। যে-নীলিমা সর্ব্বদা আনন্দ-কাকলীতে মুখর ছিল, এই উদাস-করা সমাধি-নগরী দর্শনের পর তার সেই নীলিমার প্রাণ যেন ক্রমে একটা স্তূপে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। নীলিমার বার-বার এই প্রেতপুরীতে বেড়াতে আসবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু নীলিমার প্রতি সে কঠিন হ'তে পারে না। নীলিমার বিষণ্ণ মুখ সে সহ্য করতে পারে না!

আজকাল নীলিমা যেন স্বামী-পুত্রের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে বিস্মৃত হ'তে বসেছে।

এমনি চিন্তার মাঝে ঝোড়ো শীতল হাওয়া অনুভূত হওয়ায় সুব্রতর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়। চেয়ে দেখে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টি পড়তে আর বেশী বিলম্ব নাই। কিন্তু নীলিমা এখনও ফিরছে না কেন? সে কি আকাশের এই দুর্য্যোগের ঘটা দেখতে পাচ্ছে না?

সুব্রত ব্যস্তভাবে নীচে নেমে আসে। এ-প্রান্ত হ'তে ও-প্রান্ত—যত দূর দৃষ্টি চলে—সে চেয়ে দেখে। কিন্তু কোথায় নীলিমা! তার যে অস্তিত্বও চোখে পড়ে না।

ব্যাকুল কণ্ঠে সুব্রত উচ্চস্বরে ডাকে—নীলিমা! নীলিমা! কিন্তু নীলিমার পরিবর্ত্তে প্রতিধ্বনি মাত্র তাকে উপহাস করে।

মুহূর্ত্তকালের জন্য তড়িৎরেখা আকাশ চিরে মিলিয়ে যায়! প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সগর্জ্জনে মেঘধ্বনি হয়। সুব্রত দিশেহারার মত ছুটতে থাকে মন্দির-অভিমুখে। আশা এই—যদি নীলিমাকে মন্দিরমধ্যে পাওয়া যায়।

৬

উত্তীর্ণ সন্ধ্যায় মন্দির-অভ্যন্তর মহাবোধি-স্তুতিগানে মুখরিত। সমবেত শ্রমণমণ্ডলী তখন স্বগত-আরাধনায় ব্যাপৃত।

দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে স্তবধ্বনি শ্রবণে ক্ষণকালের জন্য

সুব্রত আত্মবিস্মৃত হয়। দৃষ্টিসঞ্চালনে চারি দিক চেয়ে দেখে, কিন্তু এখানেও নীলিমা নেই!

অধীর চিত্তে সুব্রত মন্দির-প্রাঙ্গণে নেমে আসে। চিন্তাকুল প্রাণে আবার উঠে গিয়ে দাঁড়ায় মন্দির-সম্মুখে।

স্মিতমুখে এক জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তার কাছে অগ্রসর হয়, এবং বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় তাকে জিজ্ঞাসা করে—সঙ্গিনী কোথায়? কারণ সুব্রত এবং নীলিমা প্রায়ই এখানে আসে ব'লে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের নিকট ওরা পরিচিত।

সুব্রত সকল ঘটনা তাকে বলে এবং এখনি, যে মুষলধারে বারিপাত আরম্ভ হবে সেজন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে। প্রথম সন্ন্যাসীর পশ্চাতে দু-একজন ক'রে আরও কয়েক জন সাধু এসে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে একজন বালক বৌদ্ধ ব'লে ওঠে যে, কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে সে এক জন বাঙালী মহিলাকে মন্দিরের পিছনে শূন্য প্রান্তরের দিকে যেতে দেখেছিল।

শ্রবণমাত্র সুব্রত ছুটতে থাকে সেই প্রান্তর-উদ্দেশে। সঙ্গে সঙ্গে গুরুগুরু ধ্বনি সহকারে বৃষ্টিবিন্দু বর্ষণ হ'তে থাকে। পরহিতকারী বৌদ্ধমণ্ডলী নিশ্চল থাকতে পারেন না। সাহায্যার্থ সুব্রতর পিছু পিছু তাঁরা ক'জনে অগ্রসর হন।

উচ্চকণ্ঠে সুব্রত আবার ডাকে নীলিমা! নীলিমা! দুর্যোগ-হাওয়ার গভীর স্বননে সে ডাক মিলিয়ে যায় দিগন্ত-প্রান্তরে।

বৃহৎ পরিখার পাশ দিয়ে সুব্রত ব্যাকুল ভাবে ছুটতে যায়—সেই মুহূর্ত্তে ক্ষণপ্রভা আকাশের গায়ে রেখা টেনে দেয়। ক্ষণকালের জন্য নীল দীপ্তিতে সমস্ত প্রান্তর আলোকিত হয়। ঝুঁকে প'ড়ে সুব্রত পরিখার ভিতর দৃষ্টি সঞ্চালন করে। পরে বিনীত সুরে সন্ন্যাসীদের নিকট একটা আলোর জন্য অনুরোধ করে।

সেই বালক-সন্ন্যাসী বায়ুবেগে ছুটে যায় মন্দির পানে। ততক্ষণে মুষলধারে বারিপাত আরম্ভ হয়।

তীব্র কষাঘাতের মত বারিধারা সকলের চোখে মুখে ছিটকে পড়তে থাকে। স্পষ্ট অনুভূত হয়, প্রবল জলধারা গড়িয়ে পড়ছে প্রতি গহ্বরে। কিশোর দয়ালুর আনীত টর্চ্চের আলোতে এবং তার সাহায্যে সুব্রত নীলিমার জ্ঞানহীন দেহ উপরে তুলে নিয়ে আসে এবং সকলের সহানুভূতিতে নীলিমার হিমশীতল দেহ মন্দির-বাটীর ভিতরে বহন ক'রে নিয়ে যায়।

ডাক্তার সুব্রতর পরিচর্য্যায় এবং মন্দিরবাসীদের সহায়তায় নীলিমা কিঞ্চিৎ সুস্থ হয় বটে, কিন্তু তার জ্ঞান তখনও ফিরে আসে না। নীলিমার হাতের সেই ব্যজনী-খানা কিশোর সাধু সযত্নে তাকের উপর তুলে রাখে।

পিতামাতা ও বুলবুলের জন্য সুব্রতর মন অধীর হয়ে উঠে। তাদের এই সুদীর্ঘ বিলম্বে না জানি তাঁরা কত আকুল হয়ে পড়েছেন। কিন্তু সুব্রত উপায়ও তো কিছু ভেবে পায় না!

বয়স্ক সন্ন্যাসিগণ পার্শ্বের কক্ষে গিয়ে বসে থাকেন। বালক-সন্ন্যাসীটি বসে থাকে সুব্রতর পাশে। সুব্রতর চিন্তাকুল মুখের ভাবে বালকটি কি অনুমান করে। সে সুব্রতকে বলে—এই দুর্যোগে তুমি স্ত্রী নিয়ে ঘরে যাবে কি ক'রে?

সুব্রত তাকে জানায় মা বাপ এবং পুত্রের কথা!

কিশোরটি উঠে যায় বয়স্কদের নিকট। কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসে সুব্রতর পাশে। তাকে বলে—তুমি গৃহে গিয়ে খবর দিতে পার এবং তোমার মা আর ছেলেটিকে নিয়ে আসতে পার।

রোগিণীর যে অবস্থা—একে তো এখন নিয়ে যাওয়া চলতে পারে না।

সুব্রত চিন্তা করে যে, পরামর্শ ঠিক। গেলে কিছু ঔষধপত্রও সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসা যেতে পারে যদিও প্রধান সন্ন্যাসী তাঁর ঔষধ-ঘর থেকে কিছু ওষুধ নীলিমাকে দিয়েছিলেন।

মহাবোধির ক্ষুদ্র সেবকটি নীলিমার কাছে ব'সে থাকে। সুব্রত অবিলম্বে রওনা হয়—যেখানে গাছের তলায় তার গাড়ী আছে।

দু-ঘণ্টা অতীতপ্রায়। সুব্রত তখনও ফেরেনি। সাধুবৃন্দ যে যাঁর শয্যায় শায়িত কিন্তু কেহই নিদ্রিত নন।

বাইরে ঘনঘটা দুর্যোগের বিরাম নেই। কিশোর তাপস এক ভাবে রোগিণীর পার্শ্বে উপবিষ্ট। বয়স্কদের

মধ্যে কেহ কেহ একবার ক'রে এসে নীলিমার কক্ষে ঘুরে যান।

সুব্রত না ফেরা পর্য্যন্ত তাঁদেরও দায়িত্ব কম নয়।

তন্দ্রায় বালকের চক্ষু মুদ্রিত হয়ে আসে। চমক ভেঙে চক্ষু মার্জ্জনা ক'রে আবার সে ঠিক হয়ে বসে। মন্দিরের ঘড়িতে রাত্রি বারটা ঘোষিত হয়। কিন্তু তখনও সুব্রতর দেখা নেই।

উদ্বিগ্নচিত্তে সন্ন্যাসিমণ্ডলী বার-বার কক্ষ হ'তে কক্ষান্তরে আসা-যাওয়া করতে থাকেন।

তন্দ্রাতুর কিশোর সাধু স্থির হয়ে ব'সে থাকে রোগিণীর পাশে। দুর্যোগ-রাত্রির নিস্তব্ধ কক্ষের চারি দিকে মাঝে মাঝে সে দৃষ্টি সঞ্চালন করে। স্তিমিত প্রদীপের আলোতে কক্ষের অন্ধকার সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নি। দেওয়াল এবং মূর্চ্ছিতার খাট—আবছা আলোর সমাবেশ।

সেই আলো-ছায়ার মধ্যে কিশোর দেখতে পায়—কা'রা যেন সারি সারি দেয়াল ঘেঁষে রোগিণীর শয্যার পানে এগিয়ে আসে! তারা ঝুঁকে হেঁট হয়ে মূর্চ্ছিতাকে দেখে! ফিস ফিস ক'রে কি যেন বলাবলি করে। আবার তারা সরে যায় তাকের উপর রক্ষিত ঐ ব্যজনীখানার পানে। মনে হয় চামরখানা ওরা তুলে দেখে! আবার যথাস্থানে রেখে দেয়। এক জন অপর জনকে আঙুল তুলে মূর্চ্ছিতাকে দেখায়!

অপলক দৃষ্টিতে বালক তাকিয়ে থাকে তাদের পানে। ভাবে, আশ্চর্য্য—ওরা কি তাকে গ্রাহ্য করে না! আবার তার মনে হয়, কা'রা যেন দরজার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। উঁকি মেরে কক্ষের ভিতর একবার দেখে। তার পর সকলে মিলে রোগিণীকে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে!

বিমূঢ় কিশোর উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করে—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি!

মুহূর্ত্তমধ্যে সকল প্রহেলিকা দূরীভূত হয়। বালক উঠে দাঁড়ায়।

ভাবে—আমি কি জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখছি!

তার স্তোত্র-আবৃত্তি শুনে এক জন বয়স্ক সন্ন্যাসী সেই কক্ষে উপস্থিত হন।

৭

বৃষ্টি মন্দীভূতপ্রায়। একাধিক লোকের পদশব্দ শোনা যায়! সুব্রতর পিছনে তার মা, মায়ের কোলে বুলবুল। অপর এক জন ডাক্তার, নার্স ও কুলীর হাতে ঔষধের বাক্স। সকলে একসঙ্গে কক্ষমধ্যে মাঝে এসে দাঁড়ায়।

সুব্রত ত্রুটি স্বীকার ক'রে মন্দিরবাসীদের জানায় যে, তার গাড়ী অচল হওয়ার দরুন তাদের আসতে এত বিলম্ব।

বহুক্ষণ মূর্চ্ছিত থাকার পর, সুচিকিৎসার গুণে নীলিমার জ্ঞান ফিরে আসে। বুলবুল হতভম্বের মত মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। শাশুড়ী পুত্রবধূর মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। নীলিমার প্রাণের ক্ষীণ আশার মাঝে বাকি রাত্রিটুকু অবসান হয়।

জ্ঞান ফিরে এলেও নীলিমার যেন আচ্ছন্নতা কাটে না। কখনও মনে হয়, সে কোন অদৃশ্য ব্যক্তির পানে তাকিয়ে আছে এবং তার সঙ্গে কথা বলছে। কখনও বেশ স্বাভাবিক ভাবে স্বামী-পুত্রের কথার উত্তর দেয়। সুব্রতর মনে শঙ্কা জাগে, নীলিমার মস্তিষ্ক বিকৃতি না ঘটে!

দুর্যোগের রাত্রি প্রভাত হয়। আকাশে মেঘের উৎসব থাকলেও বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তা-ঘাটের জল নেমে গেলেও সব কর্দ্দমাক্ত।

সকাল সাতটায় একখানা এম্বুলেন্স-কার মন্দির-বাটীর সংলগ্নে এসে দাঁড়ায়। রাত্রিতেই সুব্রত এ বন্দোবস্ত ক'রে এসেছিল। স্ট্রেচার ক'রে ধীরে ধীরে নীলিমাকে গাড়ীতে তোলা হয়।

মঠধারীদের নিকট করজোড়ে সুব্রত ক্ষমা চায় এবং বিদায় প্রার্থনা করে! চট ক'রে সুব্রত এক বার চলে যায়—শুদ্ধোদনসুত-মন্দিরে। সেখানে সাহায্যার্থ বাক্সে এক মুঠি অর্থ অর্পণ করে। বাইরে আসতে পূর্ব্ব-রাত্রির সেই ক্ষুদ্র সন্ন্যাসী তার সামনে এসে দাঁড়ায়। সুব্রত এক হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে। বালক তাকে একান্তে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে যায়।

কিশোর তাপস সুব্রতকে বলে—ডাক্তার তোমার স্ত্রীর

যদি মঙ্গল চাও—তবে তুমি এই বারাণসী ছেড়ে চলে যাও। তথাগতর কৃপায় এবার তার প্রাণ রক্ষা হয়েছে বটে, কিন্তু এখানে তুমি থাকলে, ঐ প্রেত-নগরীর দুর্নিবার আকর্ষণে ভবিষ্যতে কি হবে তা বলা শক্ত!

সুব্রত ভাবে কথাটা ঠিক। তার পর কিশোরকে আলিঙ্গন করে, সকলকে নিয়ে গৃহাভিমুখে রওনা হয়।

গৃহে ফিরে কখনও জ্ঞানে কখনও মোহাবিষ্টাবস্থায় নীলিমার কিছু দিন কাটে। সকলেই তার জন্য উৎকণ্ঠিত-চিত্তে দিন যাপন করে। তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ ক'রে তোলবার জন্য নানারূপ ভাবে চেষ্টা চলতে থাকে।

শরৎকালের শেষ দিকে সত্যই সে আরোগ্য হয়ে উঠে বসে।

আসন্ন শীতের অপরাহ্নে এক দিন নীলিমা জানলার ধারে ব'সে থাকে। অন্যমনস্কচিত্তে সে তাকিয়ে থাকে শান্ত নীল আকাশের পানে।

মন তার চলে যায় সেইখানে যেখানে ইতস্তত স্তূপা-বলীর মধ্যে বুদ্ধ-মন্দির—পরিখা-অভ্যন্তরে মন্দিরমধ্যে বুদ্ধদেব! অন্তরে তার ধ্বনিত হয়—মূল-গন্ধকুটী বিহার। চোখের দৃষ্টি তার ঝাপসা হয়ে আসে। রক্তিম সন্ধ্যার আলোকে তার চোখের সম্মুখে ফুটে উঠে—নীল আকাশের কোলে লোহিত বর্ণের পদ্মাসন বুদ্ধ-মূর্ত্তির ছায়া! সেই মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে সন্ধ্যা-তারকারা সাদা মেঘের চামর দ্বারা ব্যজনরত।

তড়িতাহতের মত নীলিমা কম্পিত দেহে সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

কোথা হ'তে বুলবুল ছুটে এসে দু-হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে—মা এ জায়গা ভাল নয়! চল আমরা চলে যাই। হেঁট হয়ে নীলিমা পুত্রকে কোলে তুলে নেয়। ভাবে—বুলবুল ঠিক বলেছে। পৃথিবীর বহু লোকই তো সারনাথ দর্শন ক'রে থাকে। কিন্তু তার মত কারও মন এমন ব্যাকুল হয় বলে তো শোনা যায় না! তবে কি সে উন্মাদ হবে? পুত্রকে নিবিড় ভাবে বক্ষে চেপে সে মনে মনে বলে—না না, বিশ্বনাথ! আমায় উন্মাদ করো না। আমার স্বামী-পুত্রের দুরবস্থা করো না! আমি পালিয়ে যাব! ঐ প্রেত-পুরীর সীমানা ছেড়ে বহুদূরে পালিয়ে যাব।

সুব্রত হাসপাতালে কর্ম্মে ব্যস্ত। ভৃত্য এসে তাকে জানায় যে নীলিমা তাকে এক বার ডেকে পাঠিয়েছে।

ত্রস্ত সুব্রত তাড়াতাড়ি ছুটে আসে নীলিমার নিকট। দু-হাতে সুব্রতর একখানি হাত চেপে ধ'রে নীলিমা তাকে বলে—আমাকে নিয়ে তুমি দূরে পালিয়ে চল। এই কাশী শহর ছেড়ে আমাকে নিয়ে বহু দূরে পালিয়ে চল। তা না হ'লে আমি পাগল হয়ে যাব।

ঐ ধ্বংস-নগরীর পাষাণস্তূপ আমাকে দিবারাত্র আহ্বান করছে! সুব্রত নীলিমাকে সান্ত্বনা দিয়ে ফিরে যায় হাসপাতালে। কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে তার মনে পড়ে কিশোর শ্রমণের কথা। কিশোর তাকে বলেছিল—প্রেত-নগরীর দুর্নিবার আকর্ষণে ভবিষ্যতে কি হবে তা বলা শক্ত!

রাত্রিবেলার কর্ম্ম-অবসানে ফিরে এসে সুব্রত সকলকে এবং নীলিমাকে জানায়—সে ছুটির দরখাস্ত করে এসেছে। তার পর কয়েক দিনের মধ্যেই সুব্রত সকলকে নিয়ে কাশী ছেড়ে এক দিন বেরিয়ে পড়ে—সারনাথ এবং নীলিমার দূরত্বরক্ষার উদ্দেশে!
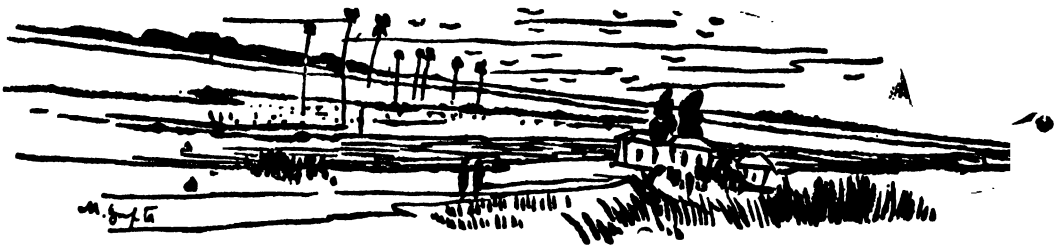
বিপর্য্যয়

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত

অবিশ্বাস করিবারও কথা নয়।

দৈনিক সংবাদপত্রের নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত সংবাদ, ছাপার অক্ষরে দৈনিক কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে।

ছোট্ট প্যারাগ্রাফটুকুতে আর একবার চোখ বুলাইয়া লইলাম।

"সৎকার্য্যে দান।—বাজুডাঙ্গার লোকনাথ মিত্র মহাশয় ৫৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি বাজুডাঙ্গা গ্রামে একটি হাঁসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য জেলাবোর্ডের নামে তিন লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। এই দানের জন্য মিত্র মহাশয়ের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।"

দৈনিক সংবাদপত্রের অতগুলি পৃষ্ঠার বৃহৎ কলেবরের মধ্যে—আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি, দেশের ও বিদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন ও সারা পৃথিবীর বহুবিধ চাঞ্চল্যকর সংবাদের মধ্যে বাজুডাঙ্গা গ্রামে কোন হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইল কি না, ইহা জানিবার জন্য ব্যাকুলতা বড় বেশী লোকের হয় না। কিন্তু তবুও আমার হাত হইতে সংবাদপত্রখানা পড়িয়া গেল। সমস্ত দেহটা যেন শির শির করিয়া উঠিল।

একটা জীবনধারার অজ্ঞাত গতির ইতিহাসের কয়েকটা ছিন্ন পৃষ্ঠা আজ যদি লোকচক্ষে প্রকাশ করি, আশা করি লোকনাথ মিত্রের স্বর্গীয় আত্মা আমাকে অভিশাপ দিবে না। মনের সম্মুখে অনেকগুলি ম্লান চিত্র আজ বড়ই জীবন্ত হইয়া উঠিতেছে।

সওদাগরি আপিসে চল্লিশ টাকা মাহিনার চাকরি করি, বহুবাজারের একটা গলির মধ্যে একটা সস্তা মেসে কোনরূপে বাস করি, শনিবার বৈকালের ট্রেনে দেশের বাড়ীতে যাইয়া সোমবার সকালে ফিরিয়া আসি। স্টেশন হইতে বাজুডাঙ্গা মাইল দুইয়ের মধ্যেই, কাজেই ভ্রমণ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যায়াম, এ-কথার সার্থকতা সগৌরবে প্রমাণ করি। ইহাই আমার তখনকার দিনের প্রাত্যহিক বা সাপ্তাহিক রুটিন। জীবনের কতগুলি বৎসর যে সেই কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে কাটাইয়াছি, আজ তাহার হিসাব করিতে গেলে অঙ্ক মেলে না, গোলমাল হইয়া যায়।

আমাদের গ্রামখানির মধ্যে অবস্থার সচ্ছলতা সম্বন্ধে কাহারও প্রতি ইঙ্গিত করিতে হইলে লোকনাথ মিত্রকেই লোকে দেখাইত। কিন্তু সেটা ছিল মস্ত ভুল। লোকনাথের পূর্ব্বপুরুষ যে বিত্ত সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন দূর অতীতে, তাহাই ক্ষয় পাইতে পাইতে প্রায় শেষ দশায় আসিয়া পৌছিয়াছিল লোকনাথের সময়ে। এটা বাহিরের লোকে বুঝিতে পারিত না, কিন্তু আমি বুঝিয়াছিলাম। কেন, তাহা বলিতেছি।

সংসারে লোকের মধ্যে ছিলেন লোকনাথের স্ত্রী ও একটিমাত্র মেয়ে। চিররুগ্না।

একটা রবিবারে সারা মধ্যাহ্নটা মাছ ধরিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বাড়ী ফিরিয়া চায়ের বাটিটায় চুমুক দিতেছি, এমন সময়ে বাহিরে কে ডাকিল, তারক আছ না কি?

বাহিরে আসিয়া দেখি লোকনাথবাবু। আমার বৈঠকখানা নামধারী ঘরখানার ভাঙা তক্তপোষের উপর যে ছেঁড়া সতরঞ্চখানা অবিন্যস্তভাবে পাতা ছিল, তাহাই টানিয়া, কোঁচার কাপড় দিয়া ধুলা ঝাড়িয়া তাঁহাকে বসিতে দিলাম।

লোকনাথবাবুর আগমন আমার বাড়ীতে একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

ঘরের আসবাবপত্র, জিনিষপত্রের মহার্ঘ্যতা, কলিকাতার অতিআধুনিক খবর প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিবার পরে আমাকে বলিলেন, কি জান তারক, তোমাকে বলতেও লজ্জা করে। আলিজান ব্যাটার কাছে দেড়শো টাকা পাব, নালিশ করবার ভয় দেখালেই পা জড়িয়ে ধরে, অথচ আজ দেব কাল দেব করে—আমি বলেছি যে এক

সঙ্গে ত দিতে পারবি নে, দশ পনের বিশ যা পারিস, তা বুঝেছ, বেটার কাল আসবার কথা ছিল, এখনও ত চুলের টিকিটি দেখবার যো নেই, অথচ কানাই মণ্ডলের মুদীখানার দোকানে আজই টাকা দেব ব'লে কথা দিয়েছি। সে বেটা কথার খেলাপ করলে ব'লে আমি ত আর কথার খেলাপ করতে পারি নে। আসবে অবিশ্যি কাল পরশুর মধ্যেই, যাই হোক, সে জন্যে তাই তোমার কাছে বেশী নয়, গোটা দশেক টাকা, আসছে শনিবারে বাড়ী আসছ ত, আর তা নয় ত যদি বল ত আমি বউমার কাছে দিয়ে যেতে পারি—এই সব চাষাভুষো নিয়ে কি ঝকমারি, ইচ্ছে করে কলকাতাতেই চলে যাই। পাওয়া যায় না তোমাদের আপিসে একটা চাকরি ?

মাসকাবারের চল্লিশটি টাকা বেতন পাইয়া 'বজেট' করিয়াছিলাম। তাহাতে সাতটি টাকা ধার করিবার প্রয়োজন ছিল, মাসের শেষের দিকে পুরাতন খবরের কাগজগুলি বিক্রয় করিলে আনা সাতেক হইবে। তাহাতে আপিসের চা-ওয়ালার বাকী দামটা মিটান সম্ভব হইবে, এই ভাবের একটা জটিল অঙ্ক হিসাবের খাতার পৃষ্ঠায় লেখা ছিল।

কিন্তু লোকনাথ বাবু স্বয়ং টাকা চাহিতে আমার মত লোকের নিকট আসিয়াছেন, এই কল্পনাতীত ব্যাপারটাও ছোট করিয়া দেখা যায় না। স্ত্রীর ভাণ্ডারে এগার টাকা কয়েক আনা ছিল, তাহা হইতে দশটা টাকা লইয়া লোকনাথবাবুকে দিলাম। তিনি বহু ধন্যবাদ দিয়া আলিজানের মুণ্ডপাত করিতে করিতে উঠিলেন এবং জানাইলেন যে আগামী শনিবারের পূর্ব্বেই আলিজান যদি টাকা দেয়, তাহা হইলে বধূমাতাকে—

বাধা দিয়া জানাইলাম যে এই সামান্য ব্যাপারের জন্য ব্যস্ত হইবার কোন প্রয়োজন নাই।

লোকের গোপনীয় ও ব্যক্তিগত কথা লইয়া পাঁচ কান করা ভদ্রতার কার্য্য নয় তাহা জানি। কিন্তু তবুও এ-কথাটা কেমন গোপন রাখিতে পারিলাম না। সন্ধ্যার সময় গ্রামের থিয়েটারের আখড়ায় প্রতি রবিবার মহলা বসিত, আমিও উপস্থিত থাকিতাম, সেদিনও গেলাম।

ঠিক কি প্রসঙ্গে লোকনাথবাবুর কথা উঠিয়াছিল, আজ তাহা ঠিক মনে পড়িতেছে না, কিন্তু কথায় কথায় লোকনাথবাবুর অসুবিধার কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম।

আমাদের দলে নারদ সাজিত বঙ্কু চাটুয্যে, সে বলিল, বল কি হে, অবশেষে তোমাকেও ?

এ-কথাটার মধ্যে যেন একটা প্রচ্ছন্ন অর্থ আছে বুঝিলাম। মিনিট খানেকের মধ্যেই আরও বেশী খানিকটা বুঝিবার সুযোগ হইল। বঙ্কু চাটুয্যে বলিল, গাঁয়ে এমন লোক নেই যার কাছে ও হাত পাতে নি, এমন দোকান নেই যেখানে ওর দেনা নেই, অথচ জমীজমা মায় বসতবাড়ী ও গাঁয়ের কুণ্ডুদের কাছে বাঁধা। কেবল তুমিই বাদ ছিলে এতদিন, এইবারে তোমাকেও—

মনে বড় দুঃখ হইল। দশ টাকা আর পাওয়া যাইবে না, এবং আমার বজেটে যে সাত টাকা ঘাটতি ছিল, সেটা এক মুহূর্ত্তেই সতেরোয় দাঁড়াইল, এবং মাসের প্রথমে চল্লিশ টাকা বেতন পাইয়া নিয়মিত খরচ যোগাইয়া সতের টাকা ঘাটতি মিটান যে কতদূর অসম্ভব ব্যাপার তাহা ভাবিয়া বড়ই ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলাম।

পরের সপ্তাহেও দেশে গিয়াছি। রবিবার নদীতে স্নান করিতে যাইতেছি, হঠাৎ দেখিলাম মোটা বটগাছটার ওপাশে যে কাশবন ও নিশিন্দার ঝোপ, একটা লোক হঠাৎ আমার দিকে পিছন ফিরিয়া সেই দিকে চলিল। লোক যাতায়াতের পক্ষে ও-স্থানটা সুগম নয়, কাজেই লোকটি কে তাহা দেখিবার জন্য একটু জোরে কয়েক পদ যাইয়াই একেবারে লোকনাথবাবুর সঙ্গে মুখোমুখি হইলাম।

লোকনাথবাবু হয়ত সেটা প্রত্যাশা করেন নাই। বলিলেন, তারক যে, কাল রাত্তিরে তোমার ওখানে যাব যাব করেও যাওয়া হ'ল না। তোমাকে কিন্তু বলে রাখছি তারক, আলিজানটাকে যদি আমি বেশ ক'রে শিক্ষা না দিই তবে আমার নাম বদলে দিও। হাইকোর্টের কোন ভাল উকীলের সঙ্গে আলাপ আছে তোমার ? আমাদের মহকুমা কোর্টের উকীল, আর ব'ল না তাদের কথা, কেবল পয়সা গুণতেই জানে—

পরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই হইবে, এই বলিয়া আমি নদীর দিকে অগ্রসর হইলাম। আমাকে দেখিয়া তিনি যে বড়ই অপ্রতিভ হইয়াছেন তাহা বুঝিতে দেরী হইল না।

সন্ধ্যার সময় গ্রামের থিয়েটার ক্লাবে গেলাম, কিন্তু ফিরিয়া আসিতে হইল। নাট্য-সম্পাদক গিয়াছেন কলিকাতায়, নারদ গিয়াছে মামার বাড়ী; কাজেই রিহার্স্যাল বন্ধ।

বাড়ী ফিরিয়া একখানি পুরাতন মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইতেছি, এমন সময় দ্বারে খুটখুট করিয়া আওয়াজ হইল। তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দেখি লোকনাথবাবু।

অভ্যর্থনা করিয়া তক্তপোষে বসাইলাম। লোকনাথবাবু বলিলেন, তারক, শুনবে আমার একটা কথা?

আবার কিছু টাকার প্রয়োজন হইয়াছে তাহা বুঝিলাম। লোকনাথবাবু বলিলেন, তোমার কাছে মাপ চাইছি ভাই। সকালে তোমাকে দেখে বড় চক্ষুলজ্জায় পড়েছিলাম। আমার সব মিথ্যে ভাই, সব মিথ্যে। আলিজানের কাছে আমি কিছুই পাব না। আমার ঘরবাড়ী বিষয়আসয় সব কুণ্ডুদের কাছে বাঁধা। ডিক্রী হয়ে গিয়েছে, কোন্ দিন জারি ক'রে আমাকে তাড়িয়ে দেবে। লোকের কাছে ধার চেয়েও আর পাই নে। লোকে ভাবে জোচ্চোর। অথচ কানাই মণ্ডলের মুদীখানার দোকান আমারই টাকায় হয়েছে। অমনিই তাকে দিয়েছিলাম পাঁচশো টাকা, হ্যাণ্ডনোটও নিই নি, দলিল নয়। তখন ছিল। এখন সেই কানাই আর আমাকে জিনিস দেয় না। কড়া কথা ব'লে অপমান করতেও কসুর করে না। গোপাল ময়রার খাবারের দোকানের ইতিহাস জান? থাক্ কাজ নেই আর শুনে। কিন্তু আজ আমি কপর্দ্দকহীন, ভিকিরি। কিন্তু তাতেও আমি দমি নি তারক। সংসারে আমার একটি মাত্র মেয়ে, মিণ্টু, আমার মিণ্টুরাণী, ভেবেছিলাম তার বিয়ে দিয়ে কোনও বিদেশে চলে যাব। মেয়েটা ভুগছে ম্যালেরিয়ায়, বোধ হয় কালাজ্বর, আজ ৩.৪ বছর হ'ল, প্রথমটা ডাক্তারী ওষুধ এনে খাইয়েছিলাম, বছরখানেক থেকে তাও বন্ধ। কিন্তু আজ—

লোকনাথবাবু হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। অনেক কষ্টে তাঁহাকে একটু প্রকৃতিস্থ করিলাম।

তিনি বলিলেন, শেষ রাত্তির থেকে হেঁচকি উঠছে, সে হেঁচকি এখনও থামলো না। থোড়ের জল, মুড়ির জল, অনেক তো দেওয়া হ'ল, সে যে কি কষ্ট আজ সারাটা দিন, মেয়েটা আমার বিনা চিকিৎসায় গেল। পয়সার অভাবে তাকে এক ফোঁটা ওষুধ দিতে পারলাম না। অথচ আমার সবই ছিল, আমার পয়সায় অনেকে অনেক কিছু করেছে, এখন তারাই বলে আমি জোচ্চোর, তারাই বলে লোকের কাছ থেকে টাকা ধার ক'রে আমি আর দিই না।

লোকনাথবাবুর চোখ দিয়া আবার জল গড়াইয়া পড়িল। মুছিয়া তিনি বলিলেন, সে জন্য দুঃখ করি না তারক, কিন্তু আমার মিণ্টু, সারাটা দিন আমারই চোখের সামনে কষ্ট পেতে পেতে মরবে, একটি ফোঁটা ওষুধ তাকে আমি দিতে পারলাম না, এ আপশোষ—

কথা শেষ করিতে তিনি পারিলেন না।

বলিলাম, এ কথা তো আগে আমাকে বলেন নি, গেল সপ্তাহেও বললে আমি কলকাতার কোন হসপিটালে ভর্ত্তি করবার ব্যবস্থা করতাম। যাই হোক, চলুন আপনার বাড়ী।

গ্রামে এক জন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিতেন, তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গেলাম।

তার পরের মর্ম্মভেদী দৃশ্যের উল্লেখ আর না করাই ভাল। শেষ রাত্রে মিণ্টু চলিয়া গেল।

পরের সপ্তাহে বাজুডাঙ্গায় গিয়া আর লোকনাথবাবুকে দেখিতে পাইলাম না। শুনিলাম মিণ্টুর মৃত্যুতে তাঁহার স্ত্রী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সে মূর্চ্ছা আর ভাঙে নাই। দুই দিন পরেই তিনিও মিণ্টুর অনুগমন করিয়াছেন। তার পর দিন হইতেই লোকনাথবাবু নিরুদ্দেশ।

* * *

প্রায় এগার বছর পরের কথা বলিতেছি।

আমাদের সওদাগরি আপিসের কাঁচা মাল খরিদের

একটা ডিপো ছিল, উত্তর-পশ্চিমের সীমান্তে একটা ছোট শহরে। সেইখানকার ইনচার্জ্জ হইয়া আসিয়াছি।

কলিকাতার বৌবাজারের মেসে দীর্ঘকাল যাপন করিবার পর এই অনাস্বাদিত পরিবর্ত্তন বড়ই ভাল লাগিল। ফাঁকা মাঠ ও শালবনে খুব বেড়াইতাম। আমার স্ত্রীর অম্বলের অসুখ অতি শীঘ্রই সারিয়া গেল। হাতের তাগা ভাঙিয়া গড়ানোর প্রয়োজন হইল।

সেবার কাঁচা মাল আমদানীর বড় মন্দা, অথচ হেড আপিস হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে—একটা বড় অর্ডার পাওয়া গিয়াছে, অতি সত্বর মাল ডেলিভারী দেওয়ার প্রয়োজন।

এই সমস্যার সমাধান কি-ভাবে করি তাহা লইয়া দুশ্চিন্তায় পড়িলাম, এমন সময়ে খবর পাওয়া গেল, আমার ওখান হইতে দশ মাইল দূরে, জঙ্গলের ধারে এক সাপ্লাই কোম্পানী আছে, তাহার মালিক এক বাঙালী বাবু, প্রচুর কাঁচামাল সেখানে মজুত আছে। কিন্তু বাবুজী বড় কঞ্জুস, পয়সাকড়ি সম্বন্ধে সকালে তাঁহার নাম উচ্চারণ নিষিদ্ধ।

প্রয়োজন যখন হইয়াছে, তখন আমার আপিস বেশী দামেও কিনিতে ইতস্তত করিবে না। সুতরাং একটা পাহাড়ী ঘোড়ায় চড়িয়া গেলাম দশ মাইল দূরে সেই সাপ্লাই কোম্পানীতে।

সেই বিজন জঙ্গলের এক প্রান্তে এক বৃহৎ কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। শুনিলাম প্রায় তিন-চার শত লোক এখানে কাজ করে। বিলাত আমেরিকার সঙ্গে ইহাদের কারবার। রেলওয়ের সাইডিং তাঁহাদের কারখানা পর্য্যন্ত গিয়াছে।

আমি কার্ড পাঠাইয়া মালিকের সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম।

এখানে এ অবস্থায়, এগার বছর পরে লোকনাথবাবুকে দেখিব তাহা আশা করি নাই। দীর্ঘ এগার বৎসরের ইতিহাস শুনিলাম। কেমন করিয়া ধীরে ধীরে এই বাণিজ্যশালা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা যেমনি কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনি বিস্ময়কর।

আমার আপিসের সঙ্গে তাঁহার ব্যবসায়িক যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ায় প্রায়ই আমি যাইতাম তাঁহার ওখানে। এক দিন তাঁহার অনুপস্থিতিতে এক ব্যক্তি আমার সঙ্গে আলাপ করিলেন, শুনিলাম তিনি ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার। তাঁর মুখে আরও বিস্তৃত ইতিহাস শোনা গেল।

কপর্দ্দকহীন অবস্থায় লোকনাথবাবু এখানে আসিয়াছিলেন। এই কারখানার যিনি সৃষ্টি করেন, তাঁহারই কন্যাকে বিবাহ করিয়া লোকনাথবাবু কারবারের অংশী হন। তার পর শ্বশুরও মারা গিয়াছেন, স্ত্রীও মারা গিয়াছেন, এখন একটিমাত্র কন্যা, সেই লোকনাথবাবুর সম্বল।

ম্যানেজার বাবু বলিতে লাগিলেন, কিন্তু মশাই, এ রকম হাড় কিপ্টে প্রায় দেখা যায় না। ব্যবসার জন্যে কিম্বা ফ্যাক্টরীর জন্যে পয়সা খরচ করতে পিছবে না, কিন্তু নিজের জন্যে একটি পয়সা খরচ, সে যেন ওঁর কাছে মহাপাপ। গায়ে ওই যে পাঁশুটে রঙের সোয়েটার দেখছেন, আমি তো মশাই দশ বছর ধরে ওই সোয়েটার দেখে আসছি। কাছে গেলে বুঝবেন তাতে কতগুলো সেলাই। অথচ মা-লক্ষ্মীর কৃপায়—

চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়া ভদ্রলোক আবার বলিলেন, একটি মাত্র মেয়ে, তাও স্বাস্থ্য ভাল নয়, আমার তো টি. বি. বলেই সন্দেহ হয়। কত দিন বলেছি যে পয়সা কি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবেন? মেয়েটাকে নাইনিতাল কিংবা ভাওয়ালী নিয়ে যান, না হয় পাঠিয়ে দিন। তা কানেই তোলেন না আমাদের কথা। আমরা কর্ম্মচারী আমরা আর কি বলব বলুন।

কিছু দিন পরে আবার গিয়াছি কাজের জন্য। শুনিলাম, লোকনাথবাবু দু-দিন যাবৎ ফ্যাক্টরীতে আসেন নাই, অনতিদূরেই তাঁর বাংলো, সেখানে আছেন।

গেলাম। একখানি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-গ্রন্থ লইয়া তিনি একখানা চেয়ারে বসিয়াছিলেন, আমাকে দেখিয়া বলিলেন, মেয়েটার বড্ড অসুখ, বুঝলে তারক। তবে সিরিয়াস কিছু নয়, ও রকম মাঝে মাঝে হয়। আরও দুই-এক বার হয়েছিল, হোমিওপ্যাথি জিনিষটা যদি ঠিক সিমটম মিলিয়ে দিতে পারা যায়, একেবারে অব্যর্থ। কিন্তু হয়েছে কি জানো, দুটো তিনটে সিমটম

ঠিক ধরতে পারছি নে, তাই বোধ হয় ওষুধে ভাল কাজ হচ্ছে না।

আমি বলিলাম, কি ছেলেখেলা করছেন, একটা ঘোড়া কিংবা মোটর পাঠিয়ে সিভিল সার্জ্জনকে নিয়ে এসে ভাল ক'রে একবার পরীক্ষা করান। মেয়েটি তো অনেক দিন থেকেই ভুগছে শুনেছি।

ওই হতভাগা নগেনটা বলেছে বুঝি? আমার মেয়ের অসুখ বেশী কিংবা কম তা আমি বুঝি না, বুঝবে নগেন? এরই জন্যে আটান্ন মাইল দূর থেকে সিভিল সার্জ্জন আনাতে হবে? কত ফি নেবে জান সিভিল সার্জ্জন এতদূর আসতে? আড়াইশোর কম নয়। খুকীর মায়ের অসুখের সময়েও ত ওদের কথা শুনে এনেছিলাম সিভিল সার্জ্জন। কি করলে সে, ধরে রাখতে পারলে তাকে? তবে? আড়াইশ টাকা দিয়ে তাঁকে নিয়ে আসব, আর তিনি মুচকে হেসে বলে যাবেন, কিছুই নয়, নেচারের উপর রাখুন। পয়সা তোমাদের আজকাল ভারি সস্তা হয়েছে দেখছি যে। এঁ্যা।

তর্ক করিয়া কোন ফল নাই তাহা বুঝিলাম।

চারদিন পরে খবর পাইলাম লোকনাথ বাবুর মেয়েটি মারা গিয়াছে। ম্যানেজার নগেন বাবু আমার এখানে আসিয়া খবরটা জানাইয়া লোকনাথ বাবুর অত্যধিক কার্পণ্যের প্রতি বহু দোষারোপ করিলেন।

এগারো বৎসর পূর্ব্বেকার একটা রাত্রির ম্লানচিত্র আমার মনের সম্মুখে প্রসারিত হইয়া গেল। সেদিন হাতে পয়সা ছিল না, তাই বিনা চিকিৎসায় সে মেয়েটি মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিল। আজ প্রভূত অর্থ থাকা সত্ত্বেও অর্থের উপর অতি মমতার জন্যই এ-মেয়েটিও বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুকে বরণ করিল।

দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ কোথায়, এ সমস্যার সমাধান কে করিবে?

আজ লোকনাথবাবু নিজে সেই মৃত্যুলোকে যাইবার পূর্ব্বে হয়ত বা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গেলেন। দাতব্য চিকিৎসালয় এবং হাসপাতাল, এ ছাড়া তাঁর সঞ্চিত অর্থের সদ্গতি আর কিসে হইতে পারিত?

দৈনিক সংবাদপত্রখানা আবার হাতে তুলিয়া লইলাম। চোখের কোণে জল আসিতেছিল, অক্ষরগুলা ক্রমে ঝাপসা বোধ হইতে লাগিল। লোকনাথবাবুর আত্মার সদ্গতি হোক।

প্রাণ সৃষ্টি

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

ব্রহ্ম দীপ্ত অগ্নিসম জীব তাহে স্ফুলিঙ্গের কণা—
বিকীর্ণ হইয়া পড়ে বিচ্ছুরিয়া আলোর ঝরণা
প্রাণের প্রবাহ ছুটে ব্যোম বহ্নি সলিল মরুতে—
ফুটে প্রাণ প্রেম পুষ্প ক্ষিতিবক্ষে বিদগ্ধ মরুতে।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সাবেক সাংবাদিক ও সাহিত্যিকগণের এবং আধুনিক সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদিগের মধ্যে সংযোগসেতু বা যোগসূত্র ছিলেন বলিতে পারা যায়। তাঁহার মৃত্যুতে সেই সেতু ভগ্ন, সেই সূত্র ছিন্ন হইল। তাঁহার মৃত্যুকে অকালমৃত্যু বলা যায় না; মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স আটাত্তর বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার বয়স আশীর কাছাকাছি হইয়া থাকিলেও, (তাঁহার অন্যতম পুত্র শ্রীমান্ অরুণেন্দ্রনাথ গুপ্ত আমাকে লিখিয়াছেন) "তাঁহার এনার্জি কিছুমাত্র হ্রাস হয় নি", "মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত তাঁর জ্ঞান ছিল'। সুতরাং এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি যদি আরও কিছু দিন বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি বাংলা ও ইংরেজীর পাঠকদিগকে আনন্দদায়ক ও হিতকর আরও কিছু রচনা উপহার দিতে পারিতেন।

তাঁহার পিতা মথুরনাথ গুপ্ত বিহারে সবজজ ছিলেন। তাঁহার বাল্যকাল ও কৈশোর বিহারে অতিবাহিত হইয়াছিল। কলিকাতায় গ্রে ষ্ট্রীটে তাঁহার পৈত্রিক বাড়ী ছিল। বর্ত্তমানে স্কটিশচার্চ কলেজ নামে পরিচিত এখানকার জেনার‍্যাল এসেমব্লীজ্ ইন্সটিটিউশ্যনে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সহাধ্যায়ী ছিলেন। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকায় স্বামী বিবেকানন্দ যখন ১৮৯৮-৯৯ সালে লাহোর যান, তখন নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে ছিলেন। নগেন্দ্রবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রী অর্জ্জন করেন নাই। কিন্তু তিনি ইংরেজী যেরূপ লিখিতে পারিতেন, আমাদের উচ্চতম ডিগ্রীধারীদের মধ্যেও অল্প লোকেই সেরূপ পারেন। ইংরেজী সাহিত্যের জ্ঞানও তাঁহার কম ছিল না। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, লাহোরে এক সময়ে একটি কলেজে তাঁহাকে এম, এ, ক্লাসে কিছু দিন ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতে হইয়াছিল।

আমি তাঁহার জীবনের কোন ঘটনারই ঠিক্ তারিখ হয়ত লিখিতে পারিব না, ঘটনাকালে তাঁহার ঠিক্ বয়সও লিখিতে পারিব না—তাহা তাঁহার কোন জীবনীলেখক লিখিবেন।

তিনি অল্প বয়সেই সাংবাদিকের কাজে প্রবৃত্ত হন। যখন তাঁহার বয়স বোধ হয় একুশ, সেই সময়ে তিনি সিন্ধু দেশে করাচীতে ফীনিক্স নাম দিয়া একটি সাপ্তাহিক কাগজ বাহির করেন। ইহার বেশ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইহা সম্পাদন করিবার সময় তাঁহাকে একবার কয়েক দিনের জন্য জেলে যাইতে হইয়াছিল। ফীনিক্সে প্রকাশিত এক জন পত্রপ্রেরকের নামহীন পত্র লইয়া একটা মোকদ্দমা হয়। নগেন্দ্রবাবু আদালতে ঐ লেখকের নাম বলিতে অস্বীকার করেন, কারণ তাহা সম্পাদকীয় শিষ্ট রীতির বিরুদ্ধ। বিচারক সেই কারণে আদালতের অবমাননা 'অপরাধে' তাঁহাকে শাস্তি দেন। আমার যত দূর মনে পড়ে, তিনি কয়েক দিন জেলে থাকিবার পর আদালতের এই হুকুম নাকচ বা রদ হইয়া যায়। কারাদণ্ড অল্প বা অধিক দিনের জন্যই হউক, যুবক নগেন্দ্রনাথ যে শাস্তির ভয়ে সম্পাদকীয় পদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই, তাহার দ্বারা তিনি ভারতীয়ের ও বাঙালীর মাথা উঁচু রাখিবার কারণ হইয়াছিলেন।

সিন্ধুদেশের প্রতি তাঁহার যৌবনকালের প্রীতি শেষ বয়স পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। কয়েক বৎসর আগে পর্য্যন্ত তিনি অবসর-জীবনে বৎসরে একবার করাচী যাইতেন। দয়ারাম গিডুমল, সাধু হীরানন্দ প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ সিন্ধী তাঁহার বন্ধু ছিলেন। তিনি অধুনা মাথায় টুপি (cap) ব্যবহার করিতেন, কিন্তু তাহার আগে তাঁহাকে সিন্ধী নানা রঙের সুন্দর পাগড়ী ব্যবহার রাখিতে দেখিয়াছি। তাঁহাকে তাহা বেশ মানাইত।

করাচী হইতে তিনি লাহোরের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র

ট্রিবিউনের সম্পাদক হইয়া আসেন। তাঁহার আগে শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক ছিলেন। তখন ইহা সপ্তাহে দুবার বাহির হইত। তিনি ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ট্রিবিউন ছাড়িয়া যাইবার সময় উহা সপ্তাহে তিন বার বাহির হইতে আরম্ভ হয়। তিনি যখন ট্রিবিউন সম্পাদন করিতেন তখন পঞ্জাবে (এবং ভারতবর্ষের অন্যত্রও) বেশী খবরের কাগজ ছিল না। তিনি ট্রিবিউনকে জনমত গঠনের ও প্রকাশের অতি শক্তিশালী একটি প্রতিষ্ঠান করিয়া তুলেন। হিউম সাহেব বলিয়াছিলেন, ট্রিবিউনের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ভারতে সর্বাপেক্ষা সুলিখিত। এই কাগজটিকে তিনি এরূপ প্রভাবশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, লাহোরের এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ সিবিল এণ্ড্ মিলিটারি গেজেট একদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, পঞ্জাব কি ছোটলাট সর্ ডেনিস্ ফিজ্‌প্যাট্রিকের দ্বারা শাসিত হইতেছে? না, ট্রিবিউনের সম্পাদকের দ্বারা? নগেন্দ্রবাবু রাজনৈতিক ও সামাজিক নানা বিষয় যেরূপ ভাল বুঝিতেন, তাঁহার লিখনভঙ্গীও সেইরূপ মনোজ্ঞ ছিল। খবরের কাগজের লিখিবার ধরণকে ইংরেজীতে কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্যের সহিত জর্নালীজ (Journalese) বলা হইয়া থাকে। নগেন্দ্রবাবুর ইংরেজী সে রকম ছিল না। তাহাতে সাহিত্যিক মাধুর্য্য,উৎকর্ষ ও শুচিতা লক্ষিত হইত। বাংলা ভাষাতেও তিনি সাংবাদিকের কাজ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সাংবাদিক বাংলাও 'কাগজ্যে' বাংলা ছিল না, সাহিত্যিক গুণ তাহাতেও থাকিত।

তিনি ট্রিবিউনের কাজ ছাড়িয়া বাংলা দেশে, কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এখানে তাঁহার গ্রে ষ্ট্রীটস্থিত পৈত্রিক গৃহ হইতে "সুপ্রভাত" নাম দিয়া একটি বাংলা সাপ্তাহিক বাহির করেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের কিছু লেখা বাহির হইয়াছিল, এইরূপ মনে পড়িতেছে। আমি তখন এলাহাবাদে কাজ করিতাম, নগেন্দ্রবাবুর কাগজটির সেখানকার সংবাদদাতা ছিলাম। তাঁহার কাগজে ছাপা আমার দু-একটা সংবাদ-চিঠি ("news-letter") পড়িয়া তিনি আমাকে ব্যক্তিগত চিঠিতে এই 'সার্টিফিকেট' দিয়াছিলেন যে, আমার জর্ন্যালিষ্টিক ইন্সটিংক্ট (journalistic instinct) আছে। তাহাতে আমি উৎসাহিত হইয়া-

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
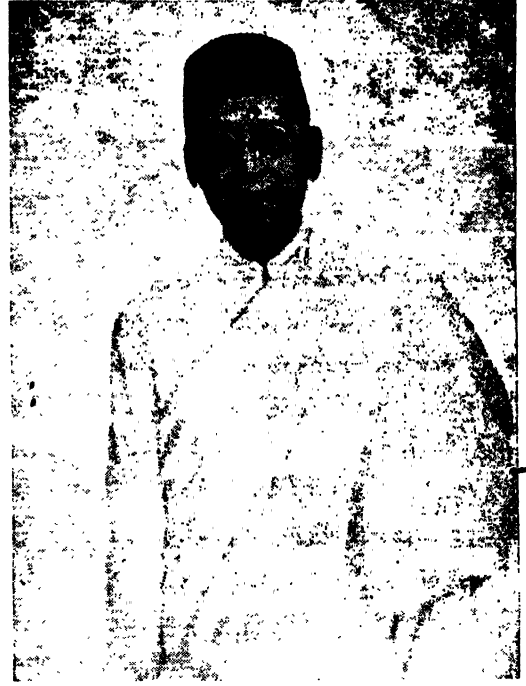
ছিলাম। কিছুকাল আমি হিন্দুস্থান রিভিয়ুতে নিজের নাম না দিয়া শিক্ষাবিষয়ক কতকগুলি নোট লিখিতাম। সেগুলি পড়িয়া মান্দ্রাজের "হিন্দু"র প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ সাংবাদিক জী সুব্রমনি আইয়ারও নোটগুলির অজ্ঞাতনামা লেখককে ঐরূপ সার্টিফিকেট কথাপ্রসঙ্গে দিয়াছিলেন। কিন্তু তখন আমি কোথাও দরখাস্ত করিতে না পারায় কোন দৈনিক কাগজের আফিসে চাকরি পাই নাই। এখন বয়স বেশী হইয়া যাওয়ায় দরখাস্ত করিলেও কোন সম্পাদকীয় আফিসে চাকরী পাইব না। তথাপি এই অবান্তর কথাগুলি কৃতজ্ঞতার সহিত লিখিতেছি এই জন্য যে, নগেন্দ্রবাবু বন্ধুভাবে আমাকে এবং মান্দ্রাজী প্রসিদ্ধ সম্পাদক অপরিচিত ও অজ্ঞাত এক যুবককে উৎসাহ দেওয়ায় আমি আমার কয়েকটা মাসিক কাগজে সম্পাদকরূপে রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে লিখিবার কাজে সাহস পাইয়াছিলাম।

নগেন্দ্রবাবু ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহযোগিতায়

কিছু কাল টুয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরী নামক একটি মাসিক কাগজ চালাইয়াছিলেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান পীপল্ নামক সাপ্তাহিক কাগজের সম্পাদক হন। ইহা পরে এলাহাবাদের বর্তমান দৈনিক কাগজ লীডারের সহিত মিলিত হইয়া যায়। উহার বর্তমান প্রধান সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিরুরাবুরী যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণি (এখন ডক্টর ও সর্) ও নগেন্দ্রবাবু ঐ দৈনিকের যুগ্ম সম্পাদক হন।

১৯০৯ সালে নগেন্দ্রনাথ আবার লাহোরের ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদক হইয়াছিলেন ও ১৯১২ সালে ঐ কাজ ছাড়িয়া দেন। সেই বৎসর তিনি তথাকার "পাঞ্জাবী" কাগজের সম্পাদক হন। কলিকাতার "বেঙ্গলী"র সহিতও তাঁহার কিছুকাল সম্পর্ক ছিল।

১৯১৩ সালে তিনি সম্পাদক রূপে সাংবাদিকের কাজ করা ছাড়িয়া দেন, কিন্তু বিশেষ কোনও কাগজের সহিত সংযুক্ত না থাকিয়া স্বাধীনভাবে জীবনের প্রায় শেষ সময় পর্যন্ত অনেক কাগজে লিখিতে থাকেন।

নগেন্দ্রবাবু যদিও সাংবাদিক বলিয়াই বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন, তথাপি তাঁহার সাধারণ সাহিত্যিক কৃতিত্বও কম ছিল না। বস্তুতঃ, তিনি যদি সাংবাদিকের কাজ না করিতেন এবং তাহাতে দক্ষতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ না করিতেন, তাহা হইলে সাহিত্যক্ষেত্রে ছোট গল্পের, উপন্যাসের ও নানাবিধ প্রবন্ধের লেখক বলিয়াই তিনি যশস্বী হইতেন, এবং সাহিত্যব্যবসাতে ব্যবসাবুদ্ধি থাকিলে তাহাতে যথেষ্ট ধনাগমও তাঁহার হইতে পারিত।

"বসুমতী" কার্যালয় হইতে দুই খণ্ডে প্রকাশিত নগেন্দ্র-গ্রন্থাবলীতে অনেক ছোট-গল্প ছাড়া "লীলা", "পর্বত-বাসিনী" ও "তমস্বিনী", এই তিনটি উপন্যাস, "নব নগর" নাটিকা এবং "শ্যামার কাহিনী" ও অন্যান্য নক্সা আছে।

"প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিয়ু"র সহিত তাঁহার যোগ বহুবৎসরব্যাপী। 'প্রবাসী'তে অনেক ছোট গল্প ও কিছু প্রবন্ধ ছাড়া তিনি "জয়ন্তী", "আরাতামা" ও "ব্রজনাথের বিবাহ" এই তিনটি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।

"মডার্ণ রিভিয়ু"তে তিনি বিস্তর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার "A Planet and A Star" ("একটি গ্রহ ও একটি নক্ষত্র") নামক দীর্ঘ উপন্যাস ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় আরম্ভ হইয়া ১৯৩৪ সালের এপ্রিল সংখ্যায় সমাপ্ত হয়।

তিনি রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার ইংরেজী তর্জমা করিয়াছিলেন। সেগুলি আমেরিকায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার অনুবাদগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের "উর্বশী"র তর্জমা আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছিল। ইহা ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ। এটিতে যেমন মূলের অর্থ, তদ্রূপ মূলের স্বরলহরী এবং ঝঙ্কারও যথাসম্ভব রক্ষিত হইয়াছে। ১৯২৭ সালের জুলাই মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে নগেন্দ্রবাবু "Rabindranath Tagore: The Man and The Poet" ("মানুষ ও কবি রবীন্দ্রনাথ") শীর্ষক যে প্রবন্ধ লেখেন, তাহারই অঙ্গস্বরূপ তাহাতে এই সুন্দর পদ্যানুবাদটি স্থান পাইয়াছিল।

আমরা নগেন্দ্রবাবুর ইংরেজী লেখার সাহিত্যিক উৎকর্ষের বিষয় ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। অ-বাঙালী-দিগের দ্বারাও ইহা স্বীকৃত। সম্প্রতি লক্ষ্ণৌতে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা সম্বন্ধে যে কনফারেন্স হইয়া গিয়াছে, তাহার সভাপতি, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, অধ্যাপক ডক্টর অমরনাথ ঝা ভারতবর্ষের মৃত ও জীবিত সাংবাদিকদিগের নাম করিতে গিয়া নগেন্দ্রবাবুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "Nagendranath Gupta who has retained a literary finish even in his most hasty compositions" ("নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত যিনি তাঁহার খুব তাড়াতাড়ি লেখা রচনাগুলিতেও সাহিত্যিক সুমার্জিততা রাখিতে পারিয়াছেন")।

আমাদের এই ঈর্ষ্যাদ্বেষপ্রপীড়িত বাংলা দেশে যে অনেক 'গেঁয়ো জুগীই ভিখ্ পায় না'—সাংবাদিক-মহলেও পায় না, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাহার একমাত্র দৃষ্টান্ত না হইলেও অন্যতম দৃষ্টান্ত। তাঁহার সম্বন্ধে মান্দ্রাজী-সম্পাদিত বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক "ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মা'র" সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছেন:—

"The late Mr. Nagendranath Gupta:—The death which took place last Saturday morning of Mr. Nagendranath Gupta, a prominent figure in Indian journalism in the early years of the century, a distinguished author in English and Bengalee, a man of varied

information and wide culture, has passed almost unnoticed in the Indian Press. Mr. Gupta was attracted from journalism to a business career thirty years ago and has for some ten or twelve years past been living a retired life in Bandra. His broad human interests made him a favourite with his neighbours without distinction of race or creed. . . . His death, it is no exaggeration to say, has left a void in the circles where he had been almost an institution for many years. Our deep sympathy goes out to the family."

এই সাপ্তাহিকটির বৃদ্ধ সম্পাদক নটরাজন্ মহাশয় ৫০ বৎসর সম্পাদকতা করিয়া সম্প্রতি অবসর লইয়াছেন। তাঁহার পুত্র এখন সম্পাদক। বান্দোরায় তাঁহাদের নিজের বাড়ী আছে। তাহারই খুব নিকটে একটি বাসায় নগেন্দ্রবাবু সপরিবারে থাকিতেন। উভয় গৃহেই আমি আতিথ্য সম্ভোগ করিয়াছি।

এলাহাবাদের অবাঙালী-সম্পাদিত প্রসিদ্ধ দৈনিক লীডারে সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিত হইয়াছে:—

We deeply regret the death announced in Sunday morning's *Leader,* of Mr. Nagendranath Gupta at the age of 78 at a nursing home in Bombay. Mr. Gupta was a distinguished journalist. He first came to be known to the public as editor of the *Phoenix* of Karachi. But he rose to fame later as editor of the *Tribune* of Lahore, whose proprietor, the late Sardar Dyal Singh Majithia, gave him his full confidence. The *Tribune* became so influential under Mr. Gupta's editorship that once the local Anglo-Indian paper, the *Civil and Military Gazette* asked whether the province was being governed by Sir Dennis Fitzpatrick or by the editor of the *Tribune!* . . . . In the autumn of 1905, he was brought over to Allahabad by Mr. Sachchidananda Sinha to edit the *Indian People.* He did so for four years, after which that paper was incorporated with the *Leader.* Of this paper he was the first editor with Mr. Chintamani, but he severed his connection with it after seven months. . . . Mr. Gupta had command of a fine literary style and wrote still better on literary topics than on political. He was also a story-writer, poet and artist. Altogether he was one of the most cultured of men and always lived a peaceful life.

লীডারে উল্লিখিত তাঁহার চারুশিল্প-প্রতিকা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সমরেন্দ্রনাথের তুলির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

সাংবাদিকের কাজ ও গ্রন্থ রচনা ব্যতীত অন্য কাজও নগেন্দ্রবাবু করিয়াছিলেন। তাহার একটির উল্লেখ ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মার হইতে উদ্ধৃত অংশে আছে। তিনি টাটা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কিছুকাল সেক্রেটরী ছিলেন। তাহার পূর্বে বাংলা দেশে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের সেক্রেটরীর কাজও তিনি করিয়াছিলেন। লাহোরে সম্পাদক থাকিতে তিনি সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট অনেকের দরখাস্ত লিখিয়া দিতেন। লাহোর ত্যাগ করিবার পরও অন্য একটি কাজের জন্য তাঁহার কখন কখন ডাক পড়িত। তথাকার কোন কোন নামজাদা লোকের অভিভাষণ তাঁহাকে লিখিয়া দিতে হইত!

সাংবাদিকের ও সাহিত্যিকের কাজ ছাড়া বিদ্যাবত্তা-সাপেক্ষ আরও কোন কোন কাজ তিনি করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যাপতির পদাবলীর যে মূল্যবান সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহার আগে সে রকম সংস্করণ ছিল না। তিনি মিথিলার ভাষা বিশেষ রূপে জানিতেন। জীবনের প্রথম-ভাগে বিহারের সহিত সংস্রব এই জ্ঞান লাভে তাঁহাকে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ-ভাবে সাহায্য করিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, তিনি মৌখিক বক্তৃতা করা অপেক্ষা স্বলিখিত বক্তৃতা পড়িতে ভাল বাসিতেন, এবং পড়িতে পারিতেনও ভাল। কবিতা আবৃত্তি করিবার ঝোঁকও তাঁহার ছিল। আমি যখন এলাহাবাদে থাকিতাম, তখন বাঙালী সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে প্রবন্ধপাঠ, বক্তৃতা, ছেলেমেয়েদের দ্বারা কবিতা আবৃত্তি, লাঠিখেলা, দৌড়ের প্রতিযোগিতা ইত্যাদি হইত। এরূপ কয় বৎসর হইয়াছিল, এখন মনে নাই। এক বৎসরের কথা মনে আছে, সেবার বিচারপতি প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি ছিলেন। সেই অধিবেশনের সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত কেহ লিখিলে এখনও হৃদয়গ্রাহী হইবে, কিন্তু এখানে তাহা প্রাসঙ্গিক হইবে না। কেবল সেবারকার একটি আবৃত্তির কথা বলি। এংলোবেঙ্গলী স্কুলের ছাত্র জীবনময় রায় রবীন্দ্রনাথের—

"পঞ্চ নদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে
জাগিয়া উঠেছে শিখ—
নির্মম নির্ভীক," ইত্যাদি

আবৃত্তি করিল। আবৃত্তি কেমন করিয়া করিতে হয়, দেখাইবার নিমিত্ত নগেন্দ্রবাবু তৎক্ষণাৎ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আবার তাহাই আবৃত্তি করিলেন।

পালোয়ানি কুস্তি প্রভৃতি তাঁহার আকর্ষণের জিনিস

ছিল। এক সময়ে তিনি ইহার চর্চাও করিতেন এবং ইহার নানা কৌশল ও প্যাঁচ জানিতেন। এই হেতু, গোলাম, কীকড় সিং, গামা প্রভৃতির সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল এবং তাঁহাদিগকে কখন কখন নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিতেন। ফুটবল ক্রিকেট প্রভৃতি তাঁহাকে এমন আকৃষ্ট করিত যে, কলিকাতায় থাকিতে একটা বড় ম্যাচও প্রায় তাঁহার বাদ পড়িত না। বৃদ্ধ বয়সে তিনি দ্রুত হাঁটা ভিন্ন অন্য কোন ব্যায়াম করিতে পারিতেন না।

ভারতবর্ষের ছয়টি প্রদেশের অভিজ্ঞতা নগেন্দ্রবাবুর ছিল—বিহার, বাংলা, আগ্রা, অযোধ্যা, পঞ্জাব, সিন্ধু, বোম্বাই। অন্য কোন বাঙালী সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের এরূপ বিস্তৃত অভিজ্ঞতা নাই। দুঃখের বিষয় প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন তাঁহাকে কখনও সভাপতি নির্বাচন করেন নাই, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদও কোন উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। তিনি কোন "আত্মচরিত" বা "জীবনস্মৃতি" লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন কিনা জানি না। তাহা থাকিলে ও প্রকাশিত হইলে মনোজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রদ হইবে। তাঁহার নিজের জীবনের অনেক কথা তাঁহার মুখে শুনিতে পাইতাম। অন্য অনেক বৃদ্ধের মত নিজের গত জীবনের কথা বলিবার অভ্যাস তাঁহার ছিল। নাতী-নাতিনীদের মন্তব্য অনেক সময় উপভোগ্য হয়, কখনও বা ঠিক উপভোগ্য না হইলেও শুনিয়া রাখা ভাল। একবার লাহোরে ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সমরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে আমরা গল্প করিতেছিলাম; তখন কি একটা কারণে তাঁহার এক অল্পবয়স্ক পৌত্র তাঁহাকে বলিল, "তুমি কেবলই নিজের কথা বল।" তিনি শুনিয়া হাসিলেন।

যে ছয়টি প্রদেশের কথা বলিলাম, সর্বত্র প্রধান প্রধান লোকদের সহিত তাঁহার পরিচয় ও সংস্পর্শ ছিল। যথা—দাদাভাই নওরোজী, রাণাডে, গোখলে, লাজপৎ রায়, মদনমোহন মালবীয়, মোতীলাল নেহরু, তেজবাহাদুর সাপ্রু, প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সর্ সুন্দরলাল, মেজর বামনদাস বসু, শ্রীশচন্দ্র বসু, সর্দার দয়াল সিং মাজীঠিয়া, সচ্চিদানন্দ সিংহ ইত্যাদি। প্রত্যেক প্রদেশেই তাঁহার অনেক বন্ধু ছিল। সিন্ধুদেশের কথা আগেই বলিয়াছি। বাংলা দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ অনেকের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রকাশ কার্য উপলক্ষ্যে সারদাচরণ মিত্রের সহিত তাঁহার সংস্পর্শ ঘটিয়াছিল।

পারসীদিগের মধ্যে তাঁহার অনেক বন্ধু ছিল। তাঁহাদের ধর্ম সম্বন্ধে তিনি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ধর্মবিষয়ে তাঁহার মত উদার ছিল। কেশবচন্দ্র সেন ও পরমহংস রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধ হইতে তাহা বুঝা যায়।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর বহু লোকের সহিত তাঁহার হৃদ্যতা হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহার হৃদয়মনে প্রাদেশিক সংকীর্ণতা ছিল না।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিনি কয়েকটি প্রদেশে সম্পাদকের কাজ সুখ্যাতির সহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মত এরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে না-হইলেও, আগে অনেক প্রদেশে বাঙালীরা সম্পাদকতা করিতেন। এখন বঙ্গের বাহিরে অ-বাঙালীর কাগজের সম্পাদক আছেন কেবল ট্রিবিউনের কালীনাথ রায়। তিনি যশস্বী। বঙ্গের বাহিরে সকল প্রদেশেই এখন যে সেই সেই প্রদেশের লোকদের সব কাগজে তথাকার লোকেরাই সম্পাদকতা করেন, তাহা নহে—ভিন্ন-প্রদেশাগত লোকেরাও করেন, কিন্তু তাঁহারা আগেকার মত বাঙালী নহেন। এইরূপ হইবার কারণ চিন্তনীয়।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দেওয়া বা বিশ্লেষণ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার ইংরেজী ও বাংলা রচনাবলী সম্পর্কে কেবল একটি কথার উল্লেখ এখানে করিব। বঙ্গীয় উপন্যাসের আখ্যান-ভাগে বর্ণিত ঘটনাবলী সাধারণতঃ বাংলা দেশের সীমায় আবদ্ধ থাকে, কোন কোন উপন্যাসে ঘটনাবলী ভারতবর্ষে বঙ্গের বাহিরেও ঘটে, তদপেক্ষা কম উপন্যাসে হয়ত ভারতবর্ষের বাহিরে অন্য দেশেও লেখকের কল্পনা গিয়া পৌঁছে। নগেন্দ্রনাথের ইংরেজী উপন্যাসে ("A Planet And A Star"-এ) তাঁহার কল্পনার লীলাভূমি পৃথিবী গ্রহ ও তাহাকে অতিক্রম করিয়া নক্ষত্রলোক।

রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে নগেন্দ্রবাবু মহাত্মা গান্ধীর মতাবলী

ও কর্মপন্থার অনুরাগী ছিলেন। আমাকে লিখিত একাধিক পত্রে তিনি এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, কেবল লেখা ও বলা দ্বারা তাহার সমর্থন করিয়া তিনি সন্তুষ্ট নহেন, কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে না পারায় তিনি ক্ষুব্ধ। ইহাতে মনে হয়, তাঁহার হৃদয় যাহা চাহিত, দেহ ও অবস্থা তাহার অনুকূল ছিল না।

তাঁহার পুত্র অরুণেন্দ্রনাথের পত্রে জানিলাম, তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন তাঁহার আয়ু শেষ হইয়াছে, কিন্তু বলিয়াছিলেন, "আমার কোন দুঃখ নাই।" তাঁহার গভীর দুঃখের কোন কোন কারণ অবগত ছিলাম। ভগবৎকৃপায় যে তৎসমুদয়ের উর্দ্ধে তিনি উঠিতে পারিয়াছিলেন, এই সংবাদ সান্ত্বনাপ্রদ।

ভারতের বৃহৎ শিল্প

শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ

রজার মিশনের ভারতে আগমনের এবং দিল্লীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রাচ্য অংশের সম্মেলনের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে একটা বড় রকমের প্রচারকার্য্য চলিয়াছিল যে, দিল্লী সম্মেলনের আলোচনার ফলে ভারতীয় শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে এবং এই প্রচারকার্য্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের শ্বেতাঙ্গ-পরিচালিত দুইটি পত্রিকা। কিন্তু ঐ সম্মেলনে ভারতবর্ষের শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতিনিধিগণকে গ্রহণ করিতে না দেখিয়া সম্মেলনের যে উদ্দেশ্য প্রচার করা হইয়াছিল ভারতবাসীর মনে তৎসম্বন্ধে সন্দেহ জাগে এবং ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে এই অভিমত প্রকাশিত হয় যে রজার মিশনের আগমনের ও প্রাচ্য সাম্রাজ্য সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ভারতীয় শিল্পের উন্নতি সাধন নহে; ভারতবর্ষে বিলাতী মূলধনে গঠিত ও শ্বেতাঙ্গ-পরিচালিত শিল্পগুলির বনিয়াদ কিরূপে দৃঢ়তর করা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবনের প্রতিই সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিগণ অধিকতর মনোযোগ দিবেন। সম্মেলনের বা উহার কমিটিগুলির কোন রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নাই এবং বহু বাদানুবাদের পরও দিল্লী সম্মেলনে ভারতীয় বণিকসঙ্ঘসমূহ হইতে কোন প্রতিনিধি গ্রহণ না করাতে উহার প্রতি ভারতবাসীর সন্দেহের ভাবও দূর হয় নাই।

দিল্লী সম্মেলনের ফলে ভারত-সরকারের শিল্পনীতিতে কোন পরিবর্ত্তন যে হয় নাই, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদে অতিরিক্ত ফাইনান্স বিলের আলোচনায় এবং সিন্ধিয়া কোম্পানীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বালচাঁদ হীরাচাঁদের ও সর্ এম. বিশ্বেশ্বরায়ার বক্তৃতা ও বিবৃতি হইতেই তাহা স্পষ্ট বোঝা গিয়াছে। ভারতীয় শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে মূল শিল্পগুলির প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক, এবং ঐ সঙ্গে কৃষি, বৃহৎ শিল্প, কুটীর-শিল্প, ব্যাঙ্কিং এবং পণ্য ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি প্রত্যেকটির সহিত পরস্পরের একটা অঙ্গাঙ্গী যোগ স্থাপনের চেষ্টা করা দরকার। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ভারতের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক, বণিক ও শিল্পপতিগণ এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া প্রাথমিক ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ করিয়াছেন। আটটি প্রদেশের মন্ত্রিত্ব যখন কংগ্রেসের করায়ত্ত ছিল তখন ভারত-সরকারও পরিকল্পনা-কমিটিকে সাহায্য করিয়াছেন; কিন্তু কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলির পদত্যাগের পর তাঁহারা পরিকল্পনা-কমিটির সহিত আর কোন সংস্রব রাখেন নাই। ইহা হইতেও বোঝা যায় যে ভারতীয় শিল্পের ও অর্থনৈতিক জীবনের যথার্থ উন্নতি ভারত-সরকার সহানুভূতির চক্ষে দেখেন নাই, কারণ ভারতীয় শিল্প উন্নত হইলে বিলাতী শিল্প সেই পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, বিলাতী শিল্পপতিগণের এই ধারণার প্রভাব তাঁহাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

জাহাজ চলাচল এবং জাহাজ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদ দেখাইয়াছেন যে ভারতীয় জাহাজকে পণ্য লইয়া উন্মুক্ত সমুদ্রপথে বিদেশে যাতায়াতের অনুমতি ভারত-সরকার কোন দিনই দেন নাই ; উপকূল-বাণিজ্যেই উহাদের ব্যবসা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই উপকূল-বাণিজ্যেও ভারতীয় জাহাজ বিলাতী জাহাজের সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারে না বলিয়া সংরক্ষণ দাবী করিয়াছিল, কিন্তু তাহা পায় নাই এবং ভবিষ্যতেও যাহাতে না পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থাও ভারত-শাসন আইনেই করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহার কারণ ভারত-সরকার দেশীয় জাহাজ কোম্পানীগুলিকে কখনও জাতীয় সম্পদ বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই, বিলাতী জাহাজের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপেই উহাদিগকে দেখিয়াছেন। ভারতবর্ষের বন্দরে যে-সব জাহাজ চলাচল করে, তাহাদের হিসাব রাখা হয় দুই স্থানে, লণ্ডনে ব্রিটিশ রেজিষ্টারে এবং ভারতবর্ষে ভারতীয় রেজিষ্টারে। ভারতীয় রেজিষ্টারেও আবার ভারতীয় জাহাজ ও বিলাতী জাহাজের মধ্যে একটা পার্থক্য বজায় রাখা হয়। ইহার ফলে দেশী ও বিলাতী জাহাজ ব্যবসায়ের প্রতি সরকারী ব্যবহারে যে কিরূপ তারতম্য ঘটে হজযাত্রী বহনে গত বৎসরের ঘটনা তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে এক অর্ডিনান্স জারী করিয়া ভারত-সরকার সিন্ধিয়া কোম্পানীর কয়েকটি জাহাজ সরকারী প্রয়োজনে গ্রহণ করেন, এবং যে কয়টি জাহাজ তাঁহারা চার্টার করেন তন্মধ্যে সিন্ধিয়ার হজযাত্রী বহনে জনপ্রিয় জাহাজ 'এল মদিনা' অন্যতম। ইহা ছাড়া ভারতীয় রেজিষ্টারভুক্ত কোম্পানীগুলির জাহাজ চলাচল ভারত-সরকার নিয়ন্ত্রণ করিবেন বলিয়া জানাইয়া দেন এবং সিন্ধিয়া কোম্পানীও তাহা মানিতে বাধ্য হন। এই আদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিবার উপায় তখন ছিল না, ভারত-সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয় হজযাত্রী বহনের ঘটনায়। হজযাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারত-সরকার জানান যে কোন কোম্পানীকেই হেজাজে প্রেরণের জন্য জাহাজের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিবার অধিকার তাঁহারা দিতে পারেন না; কোন কোম্পানীর জাহাজ এবং কয়টি জাহাজ যাত্রী লইয়া হেজাজ যাইবে তাহা তাঁহারাই স্থির করিয়া দিবেন। এই সিদ্ধান্তের পর সিন্ধিয়া কোম্পানীর সহিত একটা ভাসাভাসা আলাপ মাত্র করিয়া মোগল-লাইনের সহিতই তাঁহারা কাজের কথা আলোচনা করেন, এবং একমাত্র মোগল-লাইনকেই হেজাজে জাহাজ প্রেরণের অনুমতি প্রদান করেন। সিন্ধিয়া কোম্পানী হজযাত্রায় যাত্রী বহনের জন্য প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও তাহাকে এইভাবে বঞ্চিত করা হয়। শুধু ইহাই নহে, ভাড়ার দিক দিয়াও ভারত-সরকার যাহা করিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহাদের অপক্ষপাতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। গত বৎসর জাহাজ চালাইবার ব্যয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও ভারত-সরকার হজযাত্রীদের ভাড়া বৃদ্ধির অনুমতি দেন নাই, কারণ সিন্ধিয়া কোম্পানী হেজাজ যাত্রায় মোগল-লাইনের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। আর এবার একা মোগল-লাইন হজযাত্রী বহনের অনুমতি লাভ করিবার পরও তাঁহারা উহাকে শতকরা ১৩ টাকা ভাড়া বৃদ্ধির অনুমতি তো দিয়াছেনই, তাহা ছাড়াও যুদ্ধকালীন বীমা বাবদ এবং সমুদ্রে বিপদে পড়িয়া প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব হইলে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন। এই ক্ষতি-পূরণের পরিমাণও সামান্য নয়, প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ টাকা। একটা কথা মনে রাখিলেই মোগল-লাইনের প্রতি ভারত-সরকারের এত অনুগ্রহের কারণ বুঝিতে মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব হইবে না। মোগল-লাইন ভারতীয় কোম্পানী নহে, বিলাতী টার্ণার মরিসন কোম্পানী উহার ম্যানেজিং এজেন্ট। বিদেশী কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগিতায় দেশী কোম্পানী পারিয়া না উঠিলে দেশীয় শিল্পকে সুপ্রতিষ্ঠ করিবার জন্য পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্য দেশেই দেশীয় শিল্পকে সাহায্য করা হয়; বিলাতী জাহাজ-শিল্পও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এই নীতি অনুসরণের ফলেই গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিদেশী কোম্পানীকে বাঁচাইবার জন্য দেশীয় শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার দৃষ্টান্ত দেশীয় শিল্পের বিরুদ্ধে বিদেশী শিল্পকে সুবিধা ও সংরক্ষণ দানের উদাহরণ ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশে মিলিবে কি না সন্দেহ।

শুধু ইহাই নহে, ভারতীয় রেজিষ্টারভুক্ত কোম্পানী-

গুলির জাহাজের ভাড়া নির্দ্ধারণ করিবার জন্যও ভারত-সরকার অতিশয় ব্যগ্র। বিলাতী রেজিষ্টারভুক্ত জাহাজের ভাড়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নির্দ্ধারণ করেন না, এবং বিলাতী কোম্পানীর বহু জাহাজ ভারতীয় উপকূল-বাণিজ্যে লিপ্ত আছে। ভারতীয় জাহাজের ভাড়া ভারত-সরকার নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়ায় এবং বিলাতী জাহাজের নিজ নিজ ভাড়া নির্দ্ধারণের স্বাধীনতা থাকায় ভারতীয় জাহাজগুলি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। ইহা ছাড়া ভারতীয় রেজিষ্টারভুক্ত দুইটি বড় কোম্পানী সিন্ধিয়া এবং মোগল-লাইনের সহিত ব্যবহারেও যথেষ্ট পার্থক্য করা হয়। সিন্ধিয়ার জাহাজের ভাড়া নির্দ্ধারণের স্বাধানতা সিন্ধিয়া কোম্পানীর নাই, ভারত-সরকার এই ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মোগল-লাইনের ভাড়া নির্দ্ধারণের স্বাধীনতায় তাঁহারা হস্তক্ষেপ করেন নাই। ভাড়া নিয়ন্ত্রণের কৈফিয়ৎ স্বরূপ ভারত-সরকার ক্রেতা-সাধারণের স্বার্থের দোহাই দিয়া থাকেন, কিন্তু এই কৈফিয়ৎও সম্পূর্ণ অমূলক। ভারতীয় জাহাজ চলাচল এবং উহাদের মাল বহনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের ফলে বিলাতী কোম্পানীর জাহাজেরই চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহারা বহু ক্ষেত্রে ভাড়া দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। অথচ বিলাতী জাহাজের ভাড়া বৃদ্ধিতে ক্রেতা-সাধারণের যে ক্ষতি হইতেছে ভারত-সরকার তৎপ্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধে অত্যন্ত বেশীরূপে লিপ্ত হইয়াও জাহাজের ভাড়া নির্দ্ধারণের প্রয়োজন অনুভব করেন নাই, অথচ ভারত-সরকার তাহাই করিতেছেন এবং এমন ভাবে করিতেছেন যেন দেশী জাহাজের সহিত প্রতিযোগিতায় টার্ণার মরিসনের বা অন্য বিলাতী কোম্পানীর কোন ক্ষতি না হয়।

কেবল জাহাজ-চলাচল নিয়ন্ত্রণেই নয়, ভারতীয় শিল্পের দ্বারা বিলাতী কায়েমী স্বার্থে আঘাত পড়িলেই বিলাতী শিল্পপতিরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দ্বারস্থ হন এবং ভারত-সরকারও স্বেচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায়ই হউক বিলাতী কায়েমী স্বার্থবাদীদের মতামত মানিয়া চলিতেই বাধ্য হন। অতীতের ইতিহাস ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমান যুদ্ধের এই পনেরো মাসের মধ্যেই তাহার দৃষ্টান্ত মিলিবে। কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধি ষ্টেটসম্যানও স্বীকার করিয়াছেন যে এদেশে বিমানপোতের কারখানা নির্ম্মাণের বৃহত্তম প্রতিবন্ধক বিলাতের বিমানপোত নির্ম্মাণ দপ্তর। জাহাজ নির্ম্মাণ ব্যাপারেও পরিষ্কার দেখা গিয়াছে যে বিলাতের মন্ত্রীসভা হইতে আরম্ভ করিয়া কলিকাতা পোর্টট্রাষ্টের চেয়ারম্যান পর্য্যন্ত ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণ প্রচেষ্টার বিরোধী। বর্ত্তমান জগতে বিমানপোত, জাহাজ ও মোটরযান নির্ম্মাণের ব্যবস্থা প্রত্যেক দেশে থাকা দরকার এবং পৃথিবীর যে-সব বড় বড় দেশে এইগুলি ছিল না, সেই সকল স্থানে এই তিন প্রকার কারখানা নির্ম্মিত হইয়াছে ও হইতেছে। ব্রিটিশ ডোমিনিয়নসমূহে এই সব কারখানা নির্ম্মাণের জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে ঐ সব শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তাঁহাদের মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্ত শান্তনম্ এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু অতিরিক্ত ফাইনান্স বিলের আলোচনা কালে সরকারী শিল্পনীতি সম্পর্কে বহু তথ্য উদ্ঘাটিত করিয়া ভারতবর্ষে শিল্পপ্রতিষ্ঠার প্রতি সরকারের প্রকৃত মনোভাব কি তাহা দেখাইয়াছেন। ইঁহাদের বক্তৃতা ও প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত হইয়া সরকারী মুখপাত্রেরা যে-সব উক্তি ও স্বীকারোক্তি করিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় শিল্পপ্রচেষ্টায় তাঁহাদের সহানুভূতির অভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ ও সাহায্যের ফলে কানাডা শীঘ্রই মাসে ৩৬০টি বিমানপোত নির্ম্মাণ করিতে পারিবে, এবং অষ্ট্রেলিয়া ইতিমধ্যেই দৈনিক দুইটি করিয়া বিমানপোত নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া উভয় স্থানেই এই শিল্পটি সরকারী সাহায্যে ও উৎসাহে নূতন গঠিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের কথা আলাদা। যুদ্ধ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে শেঠ হীরাচাঁদ ভারত সরকারকে জানাইয়াছিলেন যে তাঁহারা বার্ষিক অন্ততঃ ৫০টি বিমানপোত ক্রয় করিতে সম্মত হইলে সরকারী অর্থসাহায্য ছাড়াই তিনি ভারতবর্ষে বিমানপোত নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপন করিবেন। গড়িমসি করিয়া ভারত-সরকার বৎসরাধিক কাল কাটাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু শেঠ হীরাচাঁদ নিরস্ত হন নাই। মহীশূর-গবর্ণমেণ্টের

সহযোগিতায় তিনি যখন বিমানপোত নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ সম্পূর্ণ করিয়া আনিয়াছেন, ভারত-সরকার সেই সময় জানাইলেন যে তাঁহারা ঐ কারখানা হইতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বিমানপোত ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন।

সরকারী সাহায্য প্রার্থনা করিয়া হয়রাণ হইয়া সিন্ধিয়ার প্রতিনিধিগণ নিজেরাই কলিকাতায় জাহাজের কারখানা নির্ম্মাণের সঙ্কল্প লইয়া জমি পছন্দ করিতে আসিয়াছিলেন এবং পোর্ট ট্রাষ্টের নিকট জমি ইজারা চাহিয়াছিলেন। পোর্ট ট্রাষ্ট এমন চড়া রকমের খাজনা হাঁকিয়া বসিলেন যে ঐ সর্ত্তে ইজারা লওয়া সম্ভব হইল না। ভারত-সরকারের বাণিজ্যসচিব সর্ রামস্বামী মুদালিয়র মধ্যস্থতা করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু ভারত-সরকারের শাসন-পরিষদের সদস্য হইয়াও তিনি পোর্ট ট্রাষ্টের শ্বেতাঙ্গ চেয়ারম্যান সর্ টমাস এলডারটনকে টলাইতে পারিলেন না। অবশেষে সিন্ধিয়া কোম্পানী ভিজাগাপট্টম বন্দরে জমি ইজারা লইয়াছেন। ভিজাগাপট্টমের এই জমি ইজারা লওয়া সম্পর্কেও ভারত-সরকারের কোন কৃতিত্ব নাই, আর্থিক বা অন্যরূপ সাহায্য দেওয়া তো দূরের কথা। জমিটা খালি পড়িয়াছিল, পয়সা দিয়া অদূর ভবিষ্যতে কাহারও উহা ইজারা লইবার সম্ভাবনা ছিল না। এত প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়াও ভিজাগাপট্টমে জাহাজের কারখানা নির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সিন্ধিয়া কোম্পানীর কন্‌সাল্‌টিং এঞ্জিনীয়ার বিলাতের সর্ আলেকজাণ্ডার জিব এণ্ড পার্টনার্সের এক জন অভিজ্ঞ প্রবীণ প্রতিনিধি স্বয়ং আসিয়া কারখানার স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন এবং উহা জাহাজ নির্ম্মাণের পক্ষে সর্ব্বপ্রকারে উপযুক্ত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। বিলাত হইতে কোন জাহাজের কারখানা তুলিয়া আনিয়া ভিজাগাপট্টমে বসাইতে পারিলে সুবিধা হইত, সিন্ধিয়া কোম্পানী সে-চেষ্টাও করিয়াছিলেন; কিন্তু বিলাতের বোর্ড অব ট্রেড এবং এডমিরালটির প্রতিবন্ধকতার জন্য তাহা হইতে পারে নাই। ব্রিটেন কানাডাকে ১৮টি বাণিজ্য জাহাজ নির্ম্মাণের অর্ডার দিয়াছে; অষ্ট্রেলিয়া সরকারী অর্থসাহায্যে জাহাজের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রিটেনের জন্য যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মাণ করিতেছে। ভিজাগাপট্টম কারখানায় বিলাত হইতে কয়টি জাহাজের অর্ডার আসে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ভারত-সরকারের কমার্স সেক্রেটারী সর্ এলান লয়েড রাষ্ট্রীয় পরিষদে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে অবশ্য ভারতবাসীর উৎসাহিত হইবার কোন কারণ নাই। তিনি বলিয়াছেন, "ভারতের সমর-সাহায্য-প্রচেষ্টার অঙ্গ-রূপে জাহাজশিল্প গঠন করিয়া বাণিজ্য-জাহাজ নির্ম্মাণে সাহায্য করিবার ইচ্ছা গবর্ণমেণ্টের নাই।" শুধু যে তাঁহাদের ইচ্ছা নাই তাহা নহে, নীরব উদাসীনতা দ্বারা এবং নানাবিধ বিধিনিষেধের সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা এই প্রচেষ্টাকে প্রথমাবধিই বাধা দিয়া আসিতেছেন। ভারতীয় মার্কেণ্টাইল মেরিন কমিশন ভারতবর্ষে জাহাজের কারখানা প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করিবার ১৬ বৎসর পর উহা কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে বটে, কিন্তু ভারত-সরকারের ইহাতে কোন কৃতিত্ব নাই। সরকারী বাধা অতিক্রম করিয়া সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় প্রচেষ্টাতেই ভারতের জাহাজ-শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে।

ইহার পর মোটরশিল্পের কথা। সর্ এম. বিশ্বেশ্বর-রায়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে ভারতবর্ষে মোটর-যান নির্ম্মাণের প্রস্তাব উঠিলেই ফিসক্যাল কমিশন রিপোর্টের প্রতি ভারত-সরকারের ভক্তি অত্যন্ত বেশী বাড়িয়া যায়। মোটরশিল্প প্রতিষ্ঠার পর উহা কোন্ কোন্ অসুবিধার সম্মুখীন হয় তাহা না দেখিয়া তাঁহারা নাকি উহাকে সাহায্য করিবার কথা কল্পনাই করিতে পারেন না। অথচ গত আগস্ট মাসে ভারত-সরকার অ-ভারতীয় কয়েকটি কোম্পানীকে বহুসংখ্যক মোটর গাড়ীর অর্ডার দিয়াছেন। কোন আমেরিকান কোম্পানীর সহিত মোটর গাড়ী সরবরাহ সম্পর্কে ২৫ বৎসরের মেয়াদে ভারত-সরকার চুক্তি করিয়াছেন কি না, এই মর্ম্মে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ডাঃ গ্যাডগিল প্রশ্ন করিলে ভারত-সরকার তাহার স্পষ্ট উত্তর দেন নাই, কিন্তু অস্বীকারও করিতে পারেন নাই। ভারত-সরকারের অর্থসচিব কেন্দ্রীয় পরিষদে এইটুকু বলিয়াছেন যে শীঘ্রই ২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬০ হাজার মোটর-যান ক্রয় করিবার প্রয়োজন হইবে। এই সমস্ত মোটর-যানের অর্ডার বিদেশে না দিয়া ভারত-সরকার

ইহার একটি অংশেরও অর্ডার দিবার প্রতিশ্রুতি প্রস্তাবিত মোটর-নির্ম্মাণ-কোম্পানীকে দিলে ভারতবর্ষেই বিরাট একটি মোটরের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত। ভারতবর্ষে মোটরের কারখানা স্থাপন করিলেই যে উহা কেবল পার্ট্‌স্‌ জোড়া দিয়া গাড়ী সাজাইবার কারখানাতেই পর্য্যবসিত হইবে এরূপ মনে করিবারও কোন কারণ নাই। ভারত-সরকার প্রধান খরিদ্দার থাকিলে অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতে একটি সম্পূর্ণ মোটর গাড়ীর কারখানা নির্ম্মিত হইতে পারে, শেঠ হীরাচাঁদ এবং সর্ এম. বিশ্বেশ্বরায়া উভয়েই ইহা বিশ্বাস করেন।

ভারতবর্ষে এই সব বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে যে মূলধন, কাঁচামাল এবং শ্রমিক দরকার তাহার সবই দেশে পাওয়া যায়। জাহাজ-কারখানার জন্য শেঠ হীরাচাঁদ সিন্ধিয়া কোম্পানীর অংশীদারদের নিকট চাহিবা-মাত্র ৭৫ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন; বিমানপোত-নির্ম্মাণ-কারখানার জন্য আবশ্যক টাকাও উঠিয়া গিয়াছে। দুই কোটি টাকা মূলধনে মোটর গাড়ীর কারখানাও রেজেষ্ট্রি করা হইয়াছে। বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত মূলধন ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না বলিয়া যে কথাটা অত্যন্ত অর্থপূর্ণভাবে রটানো হইয়া থাকে তাহার যে কোন ভিত্তি নাই টাটা কোম্পানীর মূলধন সংগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া ভিজাগাপট্টম জাহাজের কারখানা প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দেশে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রধান উপাদান ইস্পাতের অভাব নাই। সর্ অর্দ্দেশির দালাল দেখাইয়া দিয়াছেন যে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভারতে যত ইস্পাত দরকার তাহার সবই দেশে প্রস্তুত হইবে এবং ভারতে প্রস্তুত ইস্পাত পৃথিবীর যে-কোন দেশের ইস্পাতের সমকক্ষ। বর্ত্তমানে ভারতের মোট ইস্পাতের চাহিদার শতকরা ৮৪ ভাগ দেশেই প্রস্তুত হইতেছে। ভারতবর্ষে উপযুক্ত শ্রমিকের যে অভাব হয় না এবং অস্ত্রনির্ম্মাণের ন্যায় কঠিন কার্য্যেও যে তাহারা সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ও দক্ষতা দেখাইতে পারে তাহাও গত কয়েক মাসের মধ্যেই বেশ বোঝা গিয়াছে। শিল্পশিক্ষার উপযুক্ত পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল না বলিয়াই ভারতবর্ষে দক্ষ শ্রমিকের অভাব ঘটিয়াছে, শিল্পশিক্ষালাভে ভারতবাসীর অনিচ্ছা বা অযোগ্যতার জন্য নহে। তার পর বৃহৎ শিল্প পরিচালনার উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা দায়িত্ববোধ ও দক্ষতা ভারতবাসীর যে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে, অন্যান্য বৃহৎ ভারতীয় শিল্প ছাড়াও একমাত্র টাটা কোম্পানী পরিচালনা করিয়াই ভারতবাসী তাহার প্রমাণ দিয়াছে। টাটা কোম্পানী পৃথিবীর যে কোন দেশের বৃহত্তম শিল্পের সহিত তুলনার যোগ্য; উহার অন্তর্ভুক্ত শিল্পগুলিতে বর্ত্তমানে ৬২ কোটি টাকারও অধিক মূলধন খাটিতেছে এবং উহার পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার ভারতীয় ডিরেক্টর এবং ভারতীয় জেনারেল ম্যানেজারের হাতে। ভারতীয় শিল্প গড়িয়া তুলিবার উপযুক্ত ক্ষমতা ও সুযোগ ভারতবাসীর আছে কিন্তু তাহা সম্ভব হইতেছে না শুধু বিলাতী প্রভাবমুক্ত জাতীয় গবর্ণমেণ্টের অভাবে। বিলাতী কায়েমী স্বার্থবাদীদের ভ্রূকুটির ভয়ে বর্ত্তমান ভারত-সরকার ভারতীয় বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার সাহায্য করিতে বা উৎসাহ দিতে কুণ্ঠিত হইবেন অথবা বাধাপ্রাপ্ত হইবেন ইহাই স্বাভাবিক। ইহা বুঝিয়াই ভারতীয় শিল্পপতিগণ সরকারী সাহায্যের আশায় বসিয়া থাকেন নাই, নিজেদের চেষ্টায় ও দেশবাসীর সহযোগিতায় অগ্রসর হইয়া তাঁহারা ভারতের শিল্পোন্নতির চেষ্টা করিতেছেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের ১৯৪১ ৬ই জানুয়ারীর বক্তৃতা

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট গত ৬ই জানুয়ারী তথাকার ব্যবস্থাপক সভা কংগ্রেসে নিজ দেশের বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতি ঘোষণা করেন। তাঁহার বক্তৃতা হইতে এই ধারণা জন্মে যে, তিনি বুঝিয়াছেন ব্রিটেন পরাজিত হইলে জার্মেনীর আক্রমণ হইতে আমেরিকা অব্যাহতি পাইবে না। তাঁহার ধারণা যাহা, অন্য সকল আমেরিকানদের মনে সেই ধারণা জন্মাইবার চেষ্টা তিনি এই বক্তৃতায় করেন। তিনি ঘোষণা করেন, আমেরিকা ব্রিটেনকে যথেষ্ট জাহাজ, এরোপ্লেন, এবং কামান বন্দুক গোলাগুলি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করিবে; তাহার জন্য নগদ মূল্য চাহিবে না; যুদ্ধ শেষ হইবার পর ব্রিটেন পণ্যের বিনিময়ে পণ্য দিয়া ঋণ শোধ করিলেই আমেরিকা সন্তুষ্ট হইবে। আমেরিকা ব্রিটেনকে যাহা যাহা দিতে চাহিতেছে তাহা এখন যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে না। এই জন্য রুজভেল্ট উৎপাদন আরও দ্রুত হয় এই আকাঙ্ক্ষা করেন। তাহার ব্যবস্থা হইতেছে।

আমেরিকা যে ব্রিটেনকে আরও অধিক পরিমাণে সাহায্য করিতে চাহিতেছে, তাহার প্রধান ও সাম্প্রত কারণ আমেরিকার নিজের আক্রান্ত হইবার ও স্বাধীনতা হারাইবার ভয়। অবশ্য, এরূপ ভয় না থাকিলেও আমেরিকা কেবল পৃথিবীতে গণতান্ত্রিকতা রক্ষার নিমিত্তও ব্রিটেনকে সাহায্য করিত এবং করিয়া আসিতেছে। আমেরিকা যে-কারণেই ব্রিটেনকে সাহায্য করুক না কেন, তাহার জন্য আমরা তাহার প্রশংসা করি। ব্রিটেন তাহার সাম্রাজ্যভুক্ত ভারতবর্ষকে এবং ক্ষুদ্রতর অন্য কোন কোন দেশকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইতে দেয় নাই, স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে; তথাপি ব্রিটেন যে স্বয়ং স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ, ইহাও মন্দের ভাল; পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক দেশ যত বেশী থাকে ততই মঙ্গল। এই কারণে ব্রিটেনের স্বাধীন দেশ রূপে অস্তিত্ব আমরা চাই। আমাদের নিজেদের স্বাধীনতা অর্জনও আমাদিগকে অবশ্যই করিতে হইবে। ব্রিটেনের শাসনাধীন থাকিয়া তাহা করা খুবই কঠিন কাজ বটে; কিন্তু ব্রিটেন যদি পরাজিত ও জার্মেনীর অধীন হয়, তাহা হইলে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন সহজতর না হইয়া কঠিনতরই হইবে।

—

আমেরিকা ও ভারতবর্ষ

রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট তাঁহার এই বক্তৃতার এক স্থলে বলেন, আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি বড় ছোট সকল জাতির অধিকারসমূহের ও মর্যাদার প্রতি ভদ্রজনোচিত শ্রদ্ধার ভিত্তির উপর স্থাপিত, এবং শেষ পর্যন্ত ন্যায় ও সু-নীতির জয় হইবে। অন্য এক স্থলে তিনি বলেন, "ভবিষ্যতে আমাদিগকে মানব-স্বাধীনতার সার-বস্তু-স্বরূপ চারিটি উপাদানের প্রত্যাশা করিতে হইবে; যথা—সর্বত্র বাক্‌স্বাধীনতা ও মনোভাব প্রকাশের স্বাধীনতা, সর্বত্র প্রত্যেকের নিজ নিজ পন্থা অনুসারে ঈশ্বরের উপাসনার স্বাধীনতা ও অধিকার, অভাব হইতে মুক্তি এবং ভয় হইতে মুক্তি।"

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এ পর্যন্ত **রাষ্ট্র হিসাবে** ভারতীয়দের রাজনৈতিক কোন অধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত কিছুই করে নাই, ভারতবর্ষের মর্যাদা রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্যও কিছুই করে নাই। ভারতবর্ষের লোকদিগের সমষ্টিকে বৃহৎ জাতি বা ক্ষুদ্র জাতি যাহাই মনে করা হউক, রুজভেল্টের ঘোষিত আমেরিকান্ পররাষ্ট্রনীতি অনুসারে ভারতবর্ষের জন্য কিছু করা আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের উচিত ছিল। আমরা বলিতেছি না যে, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিয়া দিবার নিমিত্ত ব্রিটেনের সহিত আমেরিকার যুদ্ধ করা উচিত ছিল। কিন্তু আগেকার কথা ছাড়িয়া দিলেও, বিংশ শতাব্দীতেই

এমন সব ঘটনা ঘটিয়াছে, এমন উপলক্ষ্য হইয়াছে, যখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের কার্যে অসন্তোষ জানাইতে ও তাহার প্রতিবাদ করিতে পারিত;—যথা, জালিয়ানওয়ালাবাগের ও পেশাওয়ারের কাণ্ড। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কিছুই করে নাই।

সার্বজাতিক রাষ্ট্রনীতির (International Politicsএর) ক্ষেত্রে এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের কার্যের কোন প্রকার প্রতিকূল সমালোচনা করিলে, তাহাতে নানা গোলযোগের সৃষ্টি হইতে পারে, স্বীকার করি। কিন্তু যদি কোন রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে দাবী করা হয়, যে, তাহা ছোট বড় সব জাতির অধিকার ও মর্যাদাকে শ্রদ্ধা করে, অথচ পরাধীন ভারতবর্ষের সম্বন্ধে টুঁ শব্দও না করে, তাহা হইলে হয় তাহাকে বলিতে হইবে, যে, তাহার মতে জাতি হিসাবে ভারতবর্ষের ৩৫ কোটি লোকের কোনও অস্তিত্ব নাই, কিংবা সেই উচ্চ দাবী তাহাকে প্রত্যাহার করিতে হইবে।

ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আমরা উপরে আমেরিকা সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহা রাষ্ট্র হিসাবেই তাহার প্রতি প্রযোজ্য; কেন-না, ব্যক্তিগত ভাবে কোন কোন আমেরিকান ভারতবর্ষের জন্য প্রভূত শক্তি সময় ও অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ও বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ্য পরলোকগত আচার্য্য জাবেজ টমাস সাণ্ডার্ল্যাণ্ড।

রুজভেল্ট সাহেব মানবস্বাধীনতার যে চারিটি অপরিহার্য্য উপাদানের কথা বলিয়াছেন, সেগুলির প্রত্যাশা ভবিষ্যতে করিতে হইবে বলিয়াছেন। আমরা কিন্তু সে-গুলির অভাব কয়েক শতাব্দী হইতে অনুভব করিয়া আসিতেছি। আমাদের সেগুলি এখনই চাই।

—

যুদ্ধশেষে ব্রিটেন ভারত সম্বন্ধে কি করিবে

যুদ্ধ চলিবার সময়েই, ইচ্ছা থাকিলে, ব্রিটেন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার পথে অনেকটা অগ্রসর করিয়া দিতে পারে। যুদ্ধ শেষ হইবার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষকে স্বশাসক হইতে দেওয়া হইবে, পার্লেমেণ্টের পক্ষ হইতে পার্লেমেণ্টে এই ঘোষণা ত নিশ্চয়ই করা যায়।

আমেরিকার সহিত ব্রিটেনের নানাবিধ চুক্তি হইতে পারিতেছে; রাশিয়ার সহিত চুক্তির কথাবার্তা দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতেছে এবং রাশিয়া রাজি হইলে এখনই চুক্তি হইতে পারে; ব্রিটেন আমেরিকাকে নিজের সাম্রাজ্যের আমেরিকাস্থিত কোন কোন জায়গা ইজারা পর্যন্ত দিয়াছে। কিন্তু একমাত্র ভারতবর্ষেরই সহিত কোন চুক্তি সমানে সমানে এখন হইতে পারে না—এমন আজগুবি মিথ্যা কোন্ মূর্খ ভারতীয় রাজনীতিক বিশ্বাস করিবে?

প্রকৃত কথা এই যে, ব্রিটেন ভারতবর্ষের উপর তাহার ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে, এমন কি অনুভাব্য পরিমাণেও ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহে। বর্তমান যুদ্ধ ঘটিবার আগেও সে প্রস্তুত ছিল না। এখন ত প্রস্তুত না হইবার বা না থাকিবার আরও কারণ ঘটিয়াছে।

ব্রিটেন ছোট দেশ এবং জার্মেনীর নিকটস্থ দেশ। সেখানে, ব্রিটিশ আকাশযোদ্ধারা অনতিক্রান্ত সাহস ও দক্ষতা সহকারে বাধা দিলেও এবং পরে প্রতিশোধ লইলেও জার্মেনী সর্বত্র গিয়া বিস্তর ক্ষতি করিতেছে এবং যথেষ্ট যুদ্ধসম্ভার উৎপাদনেও বিঘ্ন ঘটাইতেছে। ভারতবর্ষ জার্মেনী হইতে দূরে বলিয়া এবং ব্রিটেনের অধীন থাকায় এখানে যথেষ্ট যুদ্ধোপকরণ উৎপাদিত ও ব্রিটেনে প্রেরিত হইতে পারিতেছে। ভারতবর্ষ দখলে না থাকিলে তাহা যথেচ্ছ হইতে পারিত না এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে তখনও হইতে পারিবে না। তদ্ভিন্ন, অন্যান্য কারণেও ভারতবর্ষকে নিজের অধীন রাখা ব্রিটেন নিশ্চয়ই একান্ত আবশ্যক মনে করে। কেন, তাহার কিছু আভাস দিতেছি।

খবরের কাগজের পাঠকেরা সবাই জানেন, ব্রিটেন যুদ্ধে প্রতিদিন অনেক কোটি টাকা খরচ করিতেছে। এত খরচ যে-ধনশালিতার জোরে সে করিতে পারিতেছে, তাহার বনিয়াদ ভারতবর্ষ। সে যত খরচ করিতেছে তাহার প্রভূত অংশ ধার-করা। আমেরিকা হইতে সে যে কোটি কোটি টাকার জাহাজ এরোপ্লেন যুদ্ধাস্ত্র প্রভৃতি লইতেছে, তাহাও ধারে।

এই সকল ঋণ শোধ করিতে হইলে তাহাকে স্বদেশে ও বিদেশে বড় বড় কারখানায় রাশি রাশি পণ্য উৎপন্ন করিতে হইবে, এবং নিজের জাহাজে করিয়া তাহা লইয়া

গিয়া নানা দেশে বিক্রী করিতে হইবে। সেই সকল পণ্য উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত কাঁচা মাল চাই। সেই সব কাঁচা মাল সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত এমন সব দেশ চাই যে-সব দেশের লোকেরা তাহা হইতে যথেষ্ট পণ্য উৎপন্ন করিতে পারে না বা করিবার যথেষ্ট সুবিধা ও সুযোগ পায় না।

অতএব, যুদ্ধশেষে ব্রিটেন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি করিবে সে-বিষয়ে আমাদের যাহা অনুমান তাহা বলিতেছি।

যুদ্ধশেষে ব্রিটেন স্বশাসনের পথে ভারতবর্ষকে বাস্তবিক অগ্রসর করিয়া দিবে না, ওএস্টমিন্সটার স্ট্যাটিউট অনুযায়ী ডোমীনিয়ন-মর্যাদা ত দিবেই না। যদি বলেন, বড় একটা কিছু করিবার যে প্রতিশ্রুতি ভারত-সচিব ও বড়লাট দিয়াছেন, তদনুসারে কাজ কি হইবে না? যদি না-হয়, তাহা হইলে কি প্রকারে সেই না-হওয়াটা ঘটিবে?

সকলেই বা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, যে, বড়-কর্তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা কতকগুলি সর্তসাপেক্ষ;— যেমন, ধরুন, তাঁহারা বলিয়াছেন, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে পরস্পরের সহিত বুঝাপড়া করিয়া একটা কিছু ঐকমত্য খাড়া করিতে হইবে, সাম্প্রদায়িক বিরোধের পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব স্থাপন করিতে হইবে;— অথচ যে-যে অবস্থার সমবায়ে এগুলি ঘটিতে পারে, ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট সেরূপ অবস্থা ঘটাইবার নিমিত্ত কিছু করিতেছেন না, করিবেনও না; প্রত্যুত ঐ ঐ অবস্থা যাহাতে ঘটিতে না-পারে, তদনুরূপ সরকারী আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থার অসদ্ভাব নাই।

সুতরাং যুদ্ধান্তে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ সত্যবাদিতার সহিত বলিতে পারিবেন, "আমরা যেরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষকে স্বশাসন-পথের পথিক হইতে সাহায্য করিব বলিয়াছিলাম, সেরূপ অবস্থা ত ঘটে নাই; সুতরাং আমরা নাচার।"

ইহা বলিয়াই তাঁহারা নিবৃত্ত হইবেন না। ভবিষ্যতে পূর্ণ স্বরাজ পাওয়া দূরে থাক, তাহার অনুকূলে প্রচেষ্টা চালাইবার পথে এমন সকল নূতন এবং 'আইনসঙ্গত' বাধা উদ্ভাবিত হইবে এবং কার্যতঃ প্রযুক্ত হইবে, যাহাতে ভারতবর্ষ অনির্দিষ্ট দীর্ঘ কালের মধ্যে মাথা তুলিতে না-পারে। কেন-না, অনির্দিষ্ট দীর্ঘ কালের জন্য ব্রিটেনের ধনশালিতা রক্ষা ও বৃদ্ধি আবশ্যক এবং ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত না-রাখিলে তাহা সম্ভবপর নহে।

এখন স্বরাজলাভ-প্রচেষ্টা চালাইবার পথে যত বাধা আছে যুদ্ধের পর তাহা আরও বাড়াইবার সামর্থ্য ব্রিটেনের বাড়িবে। কারণ, এখন ব্রিটেন ভারতবর্ষে দমননীতি চালাইতে একাগ্র হইতে পারিতেছে না—যুদ্ধে তাহাকে যথাসাধ্য সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হইতেছে। যুদ্ধের পর তাহার সে বাধা থাকিবে না। এই জন্য অহিংস যত উপায়ে এখন স্বরাজলাভ-চেষ্টা করা যায়, আমাদের সকলেরই তাহা করা উচিত। "অহিংস" বলিতেছি এই জন্য যে, অহিংসার আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতার কথা ছাড়িয়া দিলেও, অহিংস ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে সিদ্ধি-লাভের সম্ভাবনা বর্তমান অবস্থায় আমাদের নাই।

বহুবিধ রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের নিমিত্ত যে-সকল কাঁচা মাল আবশ্যক, তাহার অনেকগুলি সম্বন্ধে ইম্পীরিয়্যাল কেমিক্যাল কোম্পানীকে একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ইহা কয়েক বৎসর আগেকার কথা। ভারতে সাবান ও দিয়াশলাই প্রস্তুত করিবার বড় বড় কারখানা বিদেশীরা চালাইতেছে। বড় বড় ব্রিটিশ কোম্পানীর নামের শেষে "ইণ্ডিয়া লিমিটেড" জুড়িয়া দিয়া তাহাদের ভারতীয় শাখা স্থাপিত হইয়াছে। কাঁচা মালের এইরূপ একচেটিয়া অধিকার যুদ্ধের পর আরও অধিক পরিমাণে দেওয়া হইবে, বিদেশীদের এইরূপ বড় বড় কারখানা আরও স্থাপিত হইবে, বড় বড় ব্রিটিশ কোম্পানীর "ইণ্ডিয়া লিমিটেড" লেজুড়যুক্ত ভারতীয় শাখা আরও স্থাপিত হইবে। তাহাদের সকলের দ্বারা ভারতবর্ষের আকাশ জল স্থল ও ভূগর্ভের সম্পদ আহৃত ও নিজেদের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির নিমিত্ত ব্যবহৃত হইবে।

অতএব, ভারতীয়েরা শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে পণ্যোৎপাদনের ও তাহা বিক্রয়ের ক্ষেত্র সময় থাকিতে যত বেশী পারেন অধিকার করুন; নতুবা পরে পস্তাইবেন। বাঙালীদেরই এ-বিষয়ে সকলের চেয়ে অধিক অবহিত হওয়া আবশ্যক, কারণ তাঁহারা এই সকল বিষয়ে পিছাইয়া পড়িয়াছেন।

যুদ্ধের পর ভারতবর্ষের প্রতি ব্রিটেনের ব্যবহার যেরূপ

হইবার সম্ভাবনা তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়াও আমরা ব্রিটেনের জয়ই কামনা করিতেছি। তাহার কারণ দুটি। (১) আমাদের ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, অন্যের যাহাতে কল্যাণ অন্যের জন্য তাহাই প্রার্থনীয়। ব্রিটেনের স্বাধীনতা-রক্ষা তাহার কল্যাণের নিমিত্ত আবশ্যক। যুদ্ধে জয় ভিন্ন তাহার স্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পারে না। এই জন্য তাহার জয় চাই। (২) ব্রিটেন জিতিলে আমাদের অবস্থা যাহাই হউক, ব্রিটেন হারিলে আমাদের অবস্থা আপাততঃ তাহা অপেক্ষা বহুগুণে মন্দ হইবার সম্ভাবনা। এই কারণেও আমরা ব্রিটেনের জয় চাই।

—

ব্রিটেনে বিবাহ বৃদ্ধি

ব্রিটেনে সমুদয় বিবাহের সংখ্যা শেষ যে বৎসর গণিত হইয়াছে তাহা ১৯৩৮। ১৯৩৪ হইতে ১৯৩৮ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি পড়িয়া দেখা যায় ব্রিটেনে বিবাহের সংখ্যা ৩৮৭৪৭১ হইতে বাড়িয়া ১৯৩৮ সালে ৪০৭৫৭৩ হইয়াছে। ইহা সুলক্ষণ। নিউস্ রিভিয়ু নামক বিলাতী সাপ্তাহিক বলিতেছেন, এই সুফলের জন্য প্রশংসা বহুপরিমাণে আর. চার্লসওআর্থ কর্তৃক সম্পাদিত ম্যাট্রিমোনিয়্যাল পোষ্ট এণ্ড ফ্যাশনেবল ম্যারাজ এডভার্টাইজার নামক সংবাদ-পত্রের প্রাপ্য।

—

বঙ্গে বিবাহের হ্রাসবৃদ্ধি

আমাদের দেশে বিবাহের সংখ্যার হিসাব রাখিবার কোন ব্যবস্থা নাই। সুতরাং বিবাহ বাড়িতেছে কিম্বা কমিতেছে ঠিক বুঝিবার উপায় নাই। অনুমান হয়, কমিতেছে—বিশেষতঃ শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে। ইহা কুলক্ষণ। বরপণ ও কন্যাপণ প্রথা এবং বিবাহ নিজের জা'ত (caste) ও উপজা'তের (sub-caste-এর) মধ্যেই করিতে হইবে এই রীতি দীর্ঘকাল হইতে অনেকের বিবাহিত না-হইবার কারণ হইয়া আছে। বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকিলে বিবাহের সংখ্যা কিছু বাড়িতে পারিত। তাহা প্রচলিত না-থাকায় যথেষ্টসংখ্যক বিবাহ হয় না।

এই সকল চিরাগত বাধার উপর আর একটা নূতন বাধা হইয়াছে মানুষের দারিদ্র্যবৃদ্ধি। দারিদ্র্যের জন্য অনেক যুবক বিবাহ করিতে পারে না বা চায় না, বা উভয়ই। জীবনযাত্রাপ্রণালীর মান (standard) বৃদ্ধিও একটা অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। অনেক যুবক ও যুবতী মাসিক কয়েক শত টাকা আয় না হইলে বিবাহ করিতে চায় না। সাদাসিধা ভাবে গৃহস্থালী করিবার আদর্শ শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তাহা গৃহীত হইলে বিবাহের সংখ্যা বাড়িতে পারে। সাবেক একান্নবর্তী গৃহস্থালী পূর্ববৎ প্রচলিত থাকিলে তাহাও বিবাহসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হইতে পারিত। কিংবা যদি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপিত হয় এবং সকলেরই ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া সকলেরই কাজ জুটাইয়া দিয়া সকলকে পরিশ্রম করিতে বাধ্য করা হয়, তাহাও একটা প্রতিকার বটে। বিবাহের সংখ্যা হ্রাস সামাজিক অসুস্থতার লক্ষণ ও বহু অনিষ্টের আকর।

—

বঙ্গে জন্মের হার হ্রাস

বঙ্গের আইন-সভায় প্রশ্ন করা হয়, বঙ্গে জন্মের হার হ্রাসের কথা সরকার অবগত আছেন কিনা, এবং হ্রাসের কারণ কি? বঙ্গে অন্য অনেক প্রদেশের চেয়ে জন্মের হার কম ইহা নির্ধারিত তথ্য। কারণ সম্বন্ধে সরকারী উত্তর এই যে, ওলাউঠা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মহামারী অন্যতম কারণ; দারিদ্র্যও একটি কারণ। ম্যালেরিয়ায় সন্তানজনন-শক্তি হ্রাস পায়, শুনিয়াছি বটে। ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বঙ্গে শিশুর জন্ম কম হওয়ার একটি কারণ হইতে পারে। দারিদ্র্য কি পরিমাণে আর একটি কারণ, তাহা ঠিক বলা যায় না। দারিদ্র্যের জন্য মানুষ বিবাহ করিতে না পারিলে শিশু কম জন্মিবে ইহা ঠিক্। কিন্তু বিবাহিত লোকেরা কতটা গরীব হইলে তাহাদের সন্তান হয় না, সে-বিষয়ে কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সিদ্ধান্ত আছে কি না, জানি না। সাধারণতঃ দেখা যায়, অনেক ধনী পরিবারে সন্তান জন্মে কম, কোন কোন ধনী পরিবার নির্বংশও হয়, কিন্তু দরিদ্র পরিবার বহুসন্তানবান্।

আগেই বলিয়াছি, দারিদ্র্যের জন্য অনেকে বিবাহ করে না বা করিতে পারে না; অনেকের আবার গৃহস্থালী সম্বন্ধে 'নজর' ও 'রুচি' বেজায় বড় বলিয়াও তাহারা

বিবাহ করে না। শিশু কম জন্মিবার ইহাও একটা কারণ।

কয়েক বৎসর হইতে বাংলা খবরের কাগজে প্রতিদিন প্রকাশ্য ভাবে বিজ্ঞাপিত হওয়ায়, অনিচ্ছা অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে "জন্মনিরোধ" ও "গর্ভনিরোধে"র নানা ঔষধ আর একটা কারণ। আরও কয়েক রকম ঔষধ প্রতিদিন অবাধে বিজ্ঞাপিত হইতে দেখিতে পাই যেগুলা গর্ভপাতের কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন উপায়। ব্রিটেন ও আমেরিকার কোন ভদ্র কাগজে ঐ সকল ঔষধ বিজ্ঞাপিত হইতে দেখি নাই। নানা পাশ্চাত্য দেশে এ-বিষয়ে সুরুচির বাধা ভিন্ন আইনের বাধাও আছে। আমরা খুব আধ্যাত্মিক জাতি বলিয়া সুরুচির বাধা এদেশে নাই, এবং আমরা পরাধীন বলিয়া সরকার এ-বিষয়ে কোন আইন করা আবশ্যক মনে করেন নাই।

আমরা প্রাপ্তযৌবন ও সুস্থ যুবক-যুবতীর বিবাহ আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয় মনে করি, এবং যথেষ্ট শিশুর জন্ম ও বাঁচিয়া থাকাও আবশ্যক মনে করি। তাহার বিপরীত অবস্থা অবাঞ্ছনীয়।

—

বঙ্গে যথেষ্ট জলসেচনের ব্যবস্থার অভাব

আমরা অনেক বার লিখিয়াছি, ভারতবর্ষের অন্য অনেক প্রদেশের তুলনায় চাষের জমিতে জলসেচনের সরকারী ব্যবস্থা বঙ্গে অত্যন্ত অসন্তোষজনক। এই উদ্দেশ্যে সরকারী পূর্ত কার্যে কোন্ প্রদেশে কত কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহাও অনেক বার লিখিয়াছি। আবার কতকগুলি অঙ্ক পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

অন্য সব প্রদেশের চেয়ে বঙ্গের লোকসংখ্যা বেশি এবং বাংলা দেশ খুব ঘনবসতিও বটে। এ রকম ঘনবসতি প্রদেশকে অন্নকষ্ট হইতে রক্ষা করিবার দুটি উপায় আছে। একটি উপায়, যতটা সম্ভব বেশি জমি চাষের কাজে লাগান এবং চাষের জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি। এ পর্যন্ত যত জমি চাষের কাজে লাগান হইয়াছে, তাহাতে গোচারণের জমি কমিয়াছে। এই জন্য গবাদি পশুর খাদ্য উৎপাদনও, মানুষের খাদ্য উৎপাদনের মত, একটি সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। যে-সকল জমি চাষের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহার উৎপাদিকা-শক্তি বাড়াইতে হইলে জলসেচনের বন্দোবস্ত চাই—বিশেষতঃ পশ্চিম-বঙ্গে, এবং জমিতে সার দেওয়াও চাই। আরও বেশি জমি কৃষি-ক্ষেত্রে পরিণত করিতে হইলে, তাহাতেও সার দিতে ও জল সেচিতে হইবে।

ইহা হইতে জলসেচনের আবশ্যকতা বুঝা যাইবে।

বঙ্গের মত ঘনবসতি প্রদেশকে অন্নকষ্ট হইতে রক্ষা করিবার দ্বিতীয় উপায়, এখানে বড় বড় কারখানায় ও কারিগরদের ঘরে ঘরে নানা প্রকার পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করিয়া লোকদের নগদ আয় বৃদ্ধি এবং সেই আয়ের টাকায় বাহির হইতে আমদানী শস্য-আদি খাদ্য ক্রয়। কিন্তু এ-বিষয়ে বাংলা দেশ অন্য কোন কোন প্রদেশের পশ্চাতে পড়িয়া আছে। বাংলাকে এ-বিষয়ে অন্যান্য প্রদেশের সমকক্ষ করিবার চেষ্টা দেশহিতৈষীদিগকে করিতে হইবে।

আপাততঃ জলসেচনের কথাই বলি।

১৯৩৭-৩৮ সালের জলসেচন বিষয়ক রিপোর্ট সম্প্রতি ভারত-গবর্মেণ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়, ঐ বৎসরের শেষ পর্যন্ত ভারত-গবর্মেণ্ট সারা ভারতবর্ষে সেচ-কাজের জন্য ১৫০ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা মূলধন ব্যয় করিয়াছিলেন;—পঞ্জাবে ৩৫ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা, সিন্ধুতে ৩০ কোটি ১ লক্ষ টাকা, যুক্তপ্রদেশে ২৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা, মান্দ্রাজে ২০ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা এবং বোম্বাইয়ে ১০ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা; বঙ্গে কিন্তু কেবল ৫ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা।

সরকারী সেচন-ব্যবস্থার সুবিধা যে-প্রদেশের যে-পরিমাণ জমি পায়, তাহার হিসাবেও বাংলা দেশ সর্ব-নিম্নস্থানীয়। ১৯৩৭-৩৮ সালে সিন্ধুপ্রদেশের মোট আবাদি জমির শতকরা ৮৯·১২ ভাগ, পঞ্জাবের ৩৮·৮ ভাগ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ১৮·২৮ ভাগ, মান্দ্রাজের ২০·৪৯ ভাগ, যুক্তপ্রদেশের ১৪·৪৩ ভাগ এবং বঙ্গের ০·৮১ ভাগ সরকারী জলসেচন-ব্যবস্থার সুবিধা পাইয়াছিল।

ঐ বৎসর ঐ ব্যবস্থার সুবিধাপ্রাপ্ত জমি হইতে কোন্ প্রদেশে কত টাকার ফসল জন্মিয়াছিল, তাহার হিসাবেও বাংলা দেশ নিম্নস্থানীয়;—পঞ্জাবে জন্মিয়াছিল ৪০ কোটি ৩২ লক্ষ টাকার, যুক্তপ্রদেশে ২২ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার,

মান্দ্রাজে ২১ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকার, সিন্ধুতে ১০ কোটি ২৮ লক্ষ টাকার, কিন্তু বঙ্গে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকার।

সেচনের সুবিধাপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ ও তাহাতে উৎপন্ন ফসলের মূল্যের হিসাবে বাংলা দেশ বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা প্রভৃতিরও নীচে।

বাংলা দেশ হইতে ভারত-গবর্মেণ্ট বরাবর অন্য সকল প্রদেশ হইতে রাজস্বের অধিক অংশ ও অধিক টাকা লইয়া আসিতেছেন, কিন্তু বঙ্গের জন্য খরচ বরাবর কম করিতেছেন। অতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার!

—

বঙ্গে কৃষিতে মনোযোগের অভাব

বঙ্গে ধান যাহাতে আরও বেশি উৎপন্ন হয়, জমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধির দ্বারা তাহার চেষ্টা ত করা চাই-ই; কারণ চাল আমাদের প্রধান খাদ্য; অন্যান্য ফসলের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

বঙ্গের অনেক জায়গায় ভাল কাপাস হইতে পারে। বঙ্গে সুতা ও কাপড়ের কল বাড়িতেছে। সেগুলির তুলা বাংলা দেশ হইতেই যত পাওয়া যায়, ততই লাভ। আমরা অনেক কোটি টাকার কাপড় কিনি। তাহা নিজেদের উৎপন্ন করিতে পারা চাই।

চিনির উপর শুল্ক বসায় এবং বঙ্গে চিনির বিক্রী খুব বেশি বলিয়া আমরা অনেক কোটি টাকার চিনি বিহার ও যুক্তপ্রদেশ হইতে কিনি। যদি আমরা আকের চাষ বাড়াইয়া চিনি ও গুড় বেশি করিয়া উৎপাদন করিতে পারি, তাহা হইলে বঙ্গের টাকা বহু পরিমাণে বঙ্গে থাকে। খাদ্য হিসাবে গুড় চিনি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং গুড় তৈরি করিতে বড় বড় কারখানারও দরকার নাই। গুড় উৎপাদনের দিকে বেশি মন দেওয়া উচিত। অবশ্য, যাহাদের টাকা আছে, তাঁহাদের চিনির কল স্থাপন করাও কর্ত্তব্য। গুড় বা চিনি, যিনি যাহাই উৎপন্ন করুন, ভাল আকের চাষ করিতে হইবে। বঙ্গে আগে তাহা খুব হইত, এখনও হইতে পারে।

আটা ও ময়দার ব্যবহার বঙ্গে ক্রমেই বাড়িতেছে। আটার ব্যবহারই বাঞ্ছনীয়; তাহা অধিক পরিমাণে পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। আটা ও ময়দা কিংবা তাহার নিমিত্ত গম বাংলা দেশকে বাহির হইতে আনিতে হয়। কিন্তু ভাল গমের উপযুক্ত জমি বঙ্গেও আছে, এবং, তা ছাড়া, ভাল গম বঙ্গে যথেষ্ট উৎপাদন বৈজ্ঞানিক কৃষির অসাধ্যও নহে।

সরিষা ও অন্যান্য তৈলবীজও বঙ্গে যথেষ্ট উৎপন্ন হইতে পারে। বর্তমানে বাহির হইতে তৈলবীজ আমদানী করিবার রেলভাড়া অসুবিধাজনক, কিন্তু তৈল আনিবার রেলভাড়া সুবিধাজনক। ফলে বঙ্গের তৈল-নিষ্কাশকেরা প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইতেছেন। তৈলবীজের রেলভাড়া কমানু ইহার একটি প্রতিকার বটে, কিন্তু তার চেয়ে ভাল প্রতিকার বঙ্গেই যথেষ্ট তৈলবীজ উৎপাদন।

বাঙালীদের বেশি করিয়া ফল আহার করা উচিত। তাহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে ও পুষ্টি অধিক হয়। এই জন্য নানা রকম ফলের চাষ করিতে হইবে। নানা রকম শাক ও অন্যান্য তরকারীর চাষ এবং সঙ্গে সঙ্গে গোপালন সকল গ্রামের ও ২।৩টি ছাড়া বঙ্গের সব শহরের গৃহস্থদের দ্বারা হইতে পারে ও হওয়া উচিত।

বিত্তে ও স্বাস্থ্যে বাংলা দেশকে স্বাভাবিক অবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা একান্ত আবশ্যক। তাহা করিতে হইলে কোন উপায়ই তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়। কোন কোন উপায় সরকারী উদ্যোগ ব্যতিরেকে ব্যাপকভাবে অবলম্বন করা যায় না বটে, কিন্তু অনেক উপায়ই এক একটি স্থানের লোকেরা সংঘবদ্ধ হইলেই অবলম্বন করিতে পারেন, এবং কোন কোন উপায় প্রত্যেক গৃহস্থ ব্যক্তিগত ভাবে অবলম্বন করিতে পারেন।

—

গত ঈশাহি বৎসর ও মাস

ইংরেজরা খ্রীষ্টিয়ান বলিয়া এবং অন্য সকল পাশ্চাত্য জাতিও খ্রীষ্টিয়ান বলিয়া তাঁহারা ঈশার জীবনের সহিত সংপৃক্ত ঈশাহি অব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেই অঙ্কের পরে লাটিন Anno Domini শব্দ দুটি সংক্ষিপ্ত করিয়া "A. D." অক্ষর দুটি ব্যবহৃত হয়। তাহার পরিবর্তে ইংরেজীতে বলা হয় "In the year of Our Lord—", অর্থাৎ "আমাদের প্রভুর—বৎসরে।" এই অব্দের ১৯৪০ সাল এবং তাহার শেষ মাস ডিসেম্বর গত

পৌষ মাসে শেষ হয়। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে খ্রীষ্টিয়ানদের যে কৃষ্টমাস পর্ব বড়দিন বলিয়া অভিহিত হয়, তাহাও গত পৌষ মাসে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

ঈশার নামে যে সাল প্রচলিত, তাহার গত বৎসরটিকে তাঁহার নামে অভিহিত করিলে কার্যত তাঁহাকে বিদ্রূপ করাই হয়। কারণ, বহু খ্রীষ্টীয় জাতি তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া শান্তির পরিবর্তে যুদ্ধ ও যুদ্ধের আয়োজনেই ঐ বৎসর কাটাইয়াছে। এমন কি তাহাদের বড়দিনেও যুদ্ধ ও যুদ্ধের আয়োজন বন্ধ ছিল না। কেবল অখ্রীষ্টিয়ান মহাত্মা গান্ধী এই খ্রীষ্টীয় বড়দিন উপলক্ষ্যে সপ্তাহের অধিক কাল তাঁহার অহিংস সংগ্রাম বন্ধ রাখিয়াছিলেন।

নামতঃ-খ্রীষ্টিয়ান জাতিসমূহকে বিদ্রূপ করিবার নিমিত্ত আমরা এই সকল কথা লিখিতেছি না, ক্ষোভের সহিতই লিখিতেছি। যাহারা নামে তাঁহার শিষ্য, তাহারা কাজে তাঁহার কথা মানিলে পৃথিবীর চেহারা ও মানুষের ইতিহাস অন্যরূপ হইত। তাহারা তাঁহার কথা না মানিয়া শুধু যোদ্ধাদিগকে নিহত ও আহত করিতেছে না; যাহারা যুদ্ধে ব্যাপৃত নহে এরূপ পুরুষ নারী ও শিশুদিগেরও সেই দশা করিতেছে এবং অগণিত নারীর যেরূপ দুর্গতি ঘটাইতেছে তাহা অপেক্ষা তাহাদের মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়ঃ হইত।

নামতঃ-খ্রীষ্টিয়ানেরাই যে এই প্রকারে নিজ নামের অপমান করিতেছে তাহা নহে, জাপানের ও থাই দেশের (শ্যাম দেশের) নামতঃ-বৌদ্ধেরাও তাহা করিতেছে।

যুদ্ধবিগ্রহের বহু সংবাদ এবং তদ্বিষয়ক নানা কল্পনা-জল্পনা দৈনিক কাগজে বাহির হইতেছে। মাসিক পত্রে সেই সকলের পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন নাই। মন্তব্য প্রকাশ মাসিক কাগজের কাজ বটে। কিন্তু আমরা কোন মন্তব্য দ্বারা যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত বা স্থগিত করিতে বা তাহার প্রকৃতির বৈপরীত্য ঘটাইতে বিন্দুমাত্রও পারিব না। সুতরাং তাহা হইতেও নিবৃত্ত থাকিলাম।

ভারতবর্ষের কাহারও না কাহারও যাহাতে হিত হইতে পারে—বিশেষতঃ, অন্য কাহারও ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ দ্বারা তাহার অনিষ্ট বা ক্ষতি না করিয়া, যাহাতে বাঙালীদের হিত হইতে পারে, এরূপ বিষয়সমূহের আলোচনা করিতেই আমাদের ভাল লাগে।

—

"সাহিত্যিক ও সাহিত্যসম্মেলন"

প্রবাসীর বর্তমান সংখ্যায় "সাহিত্যিক ও সাহিত্য-সম্মেলন" শীর্ষক যে-প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কোন সাহিত্যসম্মেলনের উদ্দেশে লিখিত বা মুদ্রিত হয় নাই। উহা অনেক আগেকার লেখা। জামশেদপুরের সকল প্রকার সুব্যবস্থার সাক্ষ্য আমরা দিতে পারি। রেঙ্গুনের আগেকার সুব্যবস্থার আমরা এবং এবারকার সুব্যবস্থার অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন সাক্ষ্য দিতে সমর্থ।

—

নিখিল ব্রহ্ম বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

ব্রহ্মদেশনিবাসী বাঙালীরা সযত্নে আপনাদের মাতৃভাষার ও তাহার সাহিত্যের অনুশীলন করিয়া থাকেন এবং বঙ্গের সংস্কৃতির সহিত যোগরক্ষাও তাঁহারা করিয়া আসিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে নিখিল ব্রহ্ম বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গত মাসে তাহার চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন রেঙ্গুন শহরে হইয়া গিয়াছে। নানা অসুবিধা ও যুদ্ধ সত্ত্বেও যাঁহারা এই বার্ষিক অনুষ্ঠানটি বজায় রাখিয়াছেন, তাঁহারা প্রশংসাভাজন, এবং বঙ্গের অধিবাসী আমাদের বাঙালীদের কৃতজ্ঞতাভাজন। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় চব্বিশ ঘণ্টার নোটিসে জাহাজে উঠিয়া রেঙ্গুন পৌঁছিয়া এই অধিবেশনের সভাপতির কাজ যোগ্যতার সহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির, ও শাখা-সভাপতিদিগের অভিভাষণগুলি যথাযোগ্য ও সময়োচিত হইয়াছিল। শাখাসমূহে অনেকগুলি সুলিখিত প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

ব্রহ্মের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় উ বা য়িন্ এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় ছাত্ররূপে কলিকাতা-প্রবাস-কালের উল্লেখ করেন এবং অনুবাদের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার রস কিয়ৎ পরিমাণেও যে আস্বাদ করিতে পারিয়াছিলেন তাহা বলেন। ব্রহ্মের বাঙালীদিগকে তিনি ব্রহ্মদেশকে স্বদেশ মনে করিতে এবং তাহার ভাষা শিখিয়া তাহার সাহিত্যের রস আস্বাদ করিতে অনুরোধ করেন। তিনি যে বলিয়াছেন, কোন

নিখিল ব্রহ্ম প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের ৪র্থ অধিবেশনে গৃহীত আলোকচিত্র,—
মূল সভাপতি, শাখা-সভাপতিগণ ও প্রধান উদ্যোগিগণ
সম্পাদক বিনয়শরণ কাহালি কর্তৃক প্রেরিত

জাতিকে জানিতে হইলে তাহার ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক, ইহা সত্য কথা।

রেঙ্গুনে যে বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া থাকে, তাহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ব্রহ্মদেশীয় শাখার উদ্যোগে হয়। পরিষদের এই শাখা বর্তমান বৎসরের পৌষ মাস হইতে "সুবর্ণভূমি" নাম দিয়া একখানি মাসিক পত্র বাহির করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুদৃশ্য এই পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় অনেকগুলি রচনা আছে। অধিকাংশ প্রবন্ধ। তদ্ভিন্ন গল্প, কবিতা, গানও আছে। কয়েকটি সচিত্র। ইহা টিকিয়া থাকিলে বাংলার সাময়িক-পত্র-বিভাগের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করিবে। ব্রহ্মদেশের শিক্ষিত বাঙালী মহিলা ও পুরুষেরা ইহার গ্রাহক ও ক্রেতা হইলে এবং ইহার মারফতে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও ভাব বাঙালী সমাজকে উপহার দিলে তাঁহাদের শক্তির সদ্ব্যবহার হইবে এবং বাঙালী জাতির মানসিক সম্পদ্ বৃদ্ধির একটি উপায় হইবে।

ব্রহ্মদেশের সেন্সসে বাঙালীদিগকে বাঙালী ও চাটগাঁইয়া এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া দেখান হয়। ইহা অযৌক্তিক। সম্মেলন ইহার প্রতিবাদ করিয়া সকল বাঙালীকে বাঙালী বলিয়া দেখাইবার দাবী করিয়াছেন। ঠিকই করিয়াছেন। কেন না, চট্টগ্রামের লোকেরা বাঙালী ভিন্ন আর কিছু নহেন।

—

জামশেদপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

জামশেদপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন করিবার কথা প্রবাসীর সম্পাদককে শ্রীযুক্ত কালীপদ সিংহ ১৯৩৯ সালের জুন মাসে প্রথম লেখেন। তিনি তখন জামশেদপুরে ওকালতী করিতেন, এখন বার্নপুরে কাজ করেন। তিনি পরে সম্মেলনের পরিচালক-সমিতিকে চিঠি লিখিলে সমিতি প্রস্তাবে রাজী হন। অতঃপর কালীপদ বাবু জামশেদপুরের চলন্তিকা সাহিত্য পরিষদের সহিত পরামর্শ করেন। কিন্তু ১৯৩৯ সালে অধিবেশনের ব্যবস্থা

করা সম্ভবপর হয় নাই। ১৯৪০ সালে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত প্রমুখ স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণের উদ্যোগে যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহা অনেক দিক্ দিয়া স্মরণীয় হইয়া থাকিবে—বিশেষতঃ যদি ইহাতে গৃহীত প্রস্তাবগুলি অনুসারে কাজ করা হয়। তাহা হইলে ইহাকে খুবই সাফল্যমণ্ডিত বলা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইবে।

মূলসভাপতির, শাখা-সভাপতিগণের ও মহিলা-শাখার সভানেত্রীর অভিভাষণগুলি, অনেকগুলি প্রবন্ধ এবং বাংলা ভাষার আদর্শ নির্ধারণ বিষয়ক আলোচনা শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল।

—

জামশেদপুরে সভা ভাঙিবার চেষ্টা

বৃহত্তর বঙ্গ শাখার সভাপতি ডক্টর কালিদাস নাগ তাঁহার অতীত ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী ও বর্তমানবিচারী সারগর্ভ বক্তৃতা ওজস্বিনী ভাষায় করিবার পর তাঁহার বন্ধু ক্ষিপ্রভাষী সুরসিক সুবক্তা অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষকে কিছু বলিতে বলেন। দেবপ্রসাদ বাবুর বক্তৃতার শেষের দিকে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর এরূপ কিছু উল্লেখ ছিল যাহাকে প্রশংসাসূচক বলা চলে না। এই গুরুতর অপরাধে কয়েকটি ছোকরা চেঁচামেচি করিয়া সভা ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু জামশেদপুরে ও টাটানগরে লোহা ইস্পাতের কারখানা আছে, খড়ের গাদা নাই। খড়ে যত সহজে আগুন ধরে, লোহা ইস্পাতে তত সহজে লাগে না; এবং খড়কুটায় গড়া জিনিষ যত সহজে ধ্বংস করা যায়, লোহা ইস্পাতের তৈরি কিছু তত সহজে ভাঙা যায় না। সুতরাং দেখা গেল, ঐ ছোকরারা আক্ষরিক অর্থেই "counted without their hosts"—জামশেদপুরের লোহার মানুষগুলির মনে আগুন ধরান গেল না, ইস্পাত-প্রকৃতি মানুষগুলির সভাও ভাঙিল না।

কলিকাতার কোন কোন কাগজে দেখিয়াছিলাম, সে-দিন নাকি জামশেদপুরে রক্তারক্তি হয় আর কি! বিরামবিহীন-রক্ষাবিহীন-সংগ্রামপরায়ণ কেহ এরূপ বাস্তব সংগ্রামের স্বপ্নও দেখিয়া উল্লসিত হইতে পারেন বটে; কিন্তু বাস্তবিক এরূপ কিছু ঘটে নাই।

ব্যাপারটার তুচ্ছতা জানাইবার নিমিত্ত এতগুলা বাক্য অপব্যয় করিতে হইল।

—

রবীন্দ্রনাথ ও প্রবাসী বাঙালী সমাজ

রেঙ্গুন ও জামশেদপুর উভয় স্থানেই বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের আরোগ্যলাভে ভগবচ্চরণে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করা হইয়াছিল।

—

জামশেদপুরের সাহিত্য-সম্মেলনের কয়েকটি প্রস্তাব

জামশেদপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের গত অধিবেশনে যতগুলি প্রস্তাব ধার্য হইয়াছে, তাহার মধ্যে এখানে কয়েকটির উল্লেখ করিব। সামান্য কিছু আলোচনাও করিব। তাহার মধ্যে নিখিল ব্রহ্ম বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের কয়েকটি প্রস্তাবেরও উল্লেখ থাকিবে।

"বঙ্গসাহিত্য এবং ভাষার সেবায় যে-সকল প্রবাসী সাহিত্যিক ব্রতী আছেন, তাঁহাদের রচিত ও প্রকাশিত পুস্তক এবং সাময়িক পত্র সম্মেলনের সদস্যগণকে ব্যক্তিগতভাবে ও পাঠাগারাদির জন্য ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।"

এই অনুরোধ সকল শিক্ষিত বাঙালীকেই করা যাইতে পারে। বঙ্গনিবাসী বাঙালীরাও সকলে সব ভাল বাংলা পুস্তক ও সাময়িক পত্র পড়েন না বা কিনিয়া পড়েন না।

"'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' গ্রন্থের চতুর্থ ভাগের জন্য পরলোক-গত লেখক যথেষ্ট মালমশলা রাখিয়া গিয়াছেন; অতএব ঐ ভাগ প্রকাশের ভার পরিচালক-সমিতিকে প্রদান করা হউক এবং তাঁহাদিগকে লেখকের উত্তরাধিকারিগণের সহিত এতৎসংক্রান্ত সর্ত্ত সাব্যস্ত করিবার অধিকার দেওয়া হউক।"

ইহা খুব ভাল প্রস্তাব। অবিলম্বে কার্যে পরিণত হওয়া উচিত।

এখানে একটি শোকসংবাদ দুঃখের সহিত দিতে হইতেছে। স্বর্গগত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের পত্নী গত ২৬শে অক্টোবর দেহত্যাগ করিয়াছেন।

"প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের এই সপ্তদশ অধিবেশন ১৯৪১ সালের সেন্সাস কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী সেন্সসমূহে লোকের মাতৃভাষা লিপিবদ্ধ করা সম্পর্কে অনেক ভুল হইয়াছে বলিয়া ভারতের সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত বাঙ্গালীদের ও বঙ্গভাষা-ভাষীদের এবং অপরাপর শিক্ষিত সংখ্যালঘুদের সংখ্যা নির্ভুল-ভাবে গণনার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত।"

বঙ্গের হিন্দু বাঙালীদের সংখ্যা গত সেন্সসে কম ও মুসলমানদের সংখ্যা বেশী দেখান হইয়াছিল।

"এই সম্মেলনের অভিমত এই যে, আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি ও বোর্ডসমূহে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রমুখ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের এবং নাগরী প্রচারিণী সভা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রমুখ যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে অনেক কাজ করিয়াছে ও করিতেছে, তৎসমুদয়ের যথেষ্ট প্রতিনিধি থাকা উচিত।"

আমরা মডার্ণ রিভিয়ু ও প্রবাসীতে কয়েক বার এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছি। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বিষয়ে যে পরামর্শদাতা বোর্ড নিযুক্ত হইয়াছে, তাহার বার জন সভ্যের মধ্যে ৬ জন মুসলমান, ৪ জন হিন্দু ও ২ জন ইংরেজ। এ-বিষয়ে সাম্প্রদায়িক ভাগ করা এবং এরূপ হাস্যকর সাম্প্রদায়িক ভাগ করা কোন দিক দিয়াই সমর্থনীয় নহে। রেঙ্গুনে নিখিল ব্রহ্ম বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা কমীটিতে কোন বাঙালী না-লওয়ার নিন্দা করিয়া উপযুক্ত বাঙালী প্রতিনিধি লইতে বলিয়াছেন।

"'ধলভূম শিক্ষা সমিতি' গ্রামে গ্রামে বাঙ্গলা স্কুল স্থাপন করিয়া বাঙ্গলা শিক্ষা প্রসারের যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে এই সম্মেলন সন্তোষ ও আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন ও জনসাধারণকে উক্ত সমিতির প্রচেষ্টা সফল করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছেন।"

ইহার সমর্থন করিতেছি।

"এই সভা প্রস্তাব করিতেছেন যে, বাঙ্গলা সাহিত্যের অমূল্য শ্রীসম্পদ নিখিল ভারতের নিকট উদ্‌ঘাটিত করিবার জন্য এবং বাঙ্গলা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি দৃঢ়তর করিবার জন্য হিন্দী, উর্দ্দু, তামিল প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার মধ্য দিয়া বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিবার সহজ ও সুলভ পুস্তক প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন কর্ত্তৃক প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করা হউক। নিখিল ভারত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রসার সমিতি এই প্রকার কার্য্য করিতেছেন বলিয়া ঐ সমিতির প্রচেষ্টার সমর্থন করা হউক।"

এই প্রকার প্রস্তাব বহু পূর্বেও হইয়াছে। এখন শীঘ্র কাজে কিছু হওয়া চাই।

নিখিল ব্রহ্ম বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দুটি প্রস্তাব এখানে উল্লেখ্য। একটিতে বলা হয়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ব্রহ্মদেশীয় শাখা যেন অ-বাঙালীদিগকে বাংলা শেখান, এবং অন্যটিতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শিতার নিমিত্ত উপাধি দিবার ব্যবস্থা করিতে বলা হয়।

বাঙালীদের শুধু যে অন্যান্য প্রদেশবাসীদিগকে বাংলা শিখান উচিত তাহা নহে, তাঁহাদের ভাষাও শিক্ষা করা ও সর্বপ্রকারে তাঁহাদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করাও একান্ত কর্তব্য।

"বাঙ্গলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি কেবল ভারতে নহে, বিদেশেও প্রতিষ্ঠা লাভ করায় এবং বাঙ্গলার বাহিরে বেতার লাইসেন্সধারীদের মধ্যে অনেকে বাঙ্গালী বলিয়া এই সম্মেলন তাঁহাদের প্রতিনিধি হিসাবে এই অভিমত ব্যক্ত করিতেছেন যে, কলিকাতা ও ঢাকা বেতারকেন্দ্র হইতে যেরূপ বাঙ্গলা ব্যতীত অন্যান্য ভাষায় সংবাদ ও সঙ্গীত পরিবেষণ করা হয়, সেইরূপ বাঙ্গলার বাহিরে ভারতের সমস্ত প্রধান প্রধান বেতারকেন্দ্র হইতে প্রতি সপ্তাহে যথোপযুক্ত দীর্ঘ সময় বাঙ্গলায় সংবাদ ও সঙ্গীত পরিবেষণের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। সুতরাং বেতার কণ্ট্রোলারকে বাঙ্গলার বাহিরে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর ন্যায্য দাবী পূরণের উপায় উদ্ভাবন করিতে অনুরোধ করা হউক।"

এই দাবী খুবই ন্যায্য। সকল বাঙালীই ইহার সমর্থন করিবেন, এবং অ-বাঙালীদের ইহার বিরুদ্ধতা করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। বেতার যন্ত্রের আমদানী ও ক্রেতা খুব বাড়িতেছে। ক্রেতাদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা যথেষ্ট। বঙ্গের বাহিরে যে-সকল বাঙালীর এই যন্ত্র আছে, তাঁহারা ব্যক্তিগত ভাবে কণ্ট্রোলারকে উক্ত দাবী জানান।

সর্বশেষে আমরা যে প্রস্তাবটি মুদ্রিত করিতেছি, তাহা বঙ্গের বাঙালী ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালী উভয় সমষ্টিরই কল্যাণকল্পে গৃহীত হইয়াছে। তাহা এই :—

"এই সম্মেলনে বাঙালীর শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথ নির্দেশ করিবার জন্য 'বৃহত্তর-বঙ্গ-সংগঠন পরিষৎ' (Greater Bengal Planning Committee) নামে একটি সমিতি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত হউক। এই সমিতি তাঁহাদের পরিকল্পনা আগামী অধিবেশনে উত্থাপিত করিবার জন্য ও পরিচালক-সমিতিতে আলোচনার জন্য যত শীঘ্র সম্ভব পাঠাইয়া দিবেন। অন্য সহকর্মী লইবার ক্ষমতা এই সমিতির রহিল। কমীটির সভ্যগণের নাম—শ্রীগুরুসদয়

দত্ত, সভাপতি; শ্রীনগেন্দ্রনাথ রক্ষিত, সম্মেলক (Convener); শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়; ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ; শ্রীযুক্ত বলরাম সেন; ডক্টর কালিদাস নাগ; ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন, কানপুর; শ্রীদেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, এলাহাবাদ; শ্রীপ্রফুল্ল-কুমার সরকার, কলিকাতা।"

শুনিয়াছি, নগেন্দ্রবাবুর একটি পরিকল্পনা প্রায় প্রস্তুতই আছে। তাহা হইলে কমীটির প্রথম অধিবেশন হইতে বিলম্ব হইবে না। বিলম্ব না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

—

জামশেদপুর 'প্রবাস' না হইয়াও 'প্রবাস'

জামশেদপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে যে-সকল অভিভাষণ পঠিত ও বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার কোনটির প্রতিই আমাদের মনে কোন তাচ্ছিল্যের ভাব নাই। সকলগুলিরই মূল্য আছে। প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র উল্লেখ করিতে পারিলে আমরা সুখী হইতাম। কিন্তু সময় ও স্থানের অভাবে তাহা করিতে পারিতেছি না।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত মহাশয়ের অভিভাষণটির স্বতন্ত্র উল্লেখের কারণ, বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে বাঙালীদের অযথা লাঞ্ছনা এবং অনেক স্থলে আর্থিক অসুবিধা।

যাহা বাস্তবিক বঙ্গের বাহিরে, সেখানেও বাঙালীর কোন অন্যায় অসুবিধা হওয়া উচিত নহে, কারণ বাঙালীও ভারতবাসী এবং অন্যদের মত গবর্মেণ্টকে ট্যাক্স দেয়। কিন্তু যাহা বঙ্গেরই অংশ, তাহাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা বঙ্গের বাহিরে বলিয়া ফতোআ দিয়া সেখানে বাঙালীর অসুবিধা ঘটান একান্ত অসহ্য। এ-বিষয়ে রক্ষিত মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলেন:—

আজ এখানে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সকল প্রতিনিধিবর্গকে সমবেত দেখিয়া আমার বহুদিন পূর্বেকার একটা গানের একটা পদ বার বার মনে পড়িতেছে যে, "নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে।" যদিও সিংভূম ও মানভূম জেলা চিরদিনই বাংলা-দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস এবং কোন অজ্ঞাত রাজনৈতিক কারণে, শুধু লেখনীর একটী মাত্র রেখাপাতে আমাদিগকে বাংলা দেশ হইতে সহসা বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রবাসী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই আমরাও আজ নিজবাসভূমে প্রবাসী এবং সেই জন্যই বোধ হয় প্রবাসের দুঃখ আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা দুঃসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আমার বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশের প্রবাসী বাঙ্গালী অপেক্ষা নিজের ঘরে প্রবাসী বাঙ্গালী আমরা অনেক অধিক দুর্ভোগ সহ্য করিতেছি। বিহারে বাঙ্গালীর দুর্দশা আজ সর্বজনবিদিত। কংগ্রেস মন্ত্রিসভার শাসনকালে বিহারে বাঙ্গালীর উপর যে অপ্রত্যাশিত অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহা এই প্রদেশের শ্রদ্ধেয় বাঙ্গালী নেতা মাননীয় শ্রীযুক্ত পি, আর, দাস মহাশয়, মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নিকট সবিশেষ জ্ঞাত করাইয়াছিলেন। তাহার ফলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বিহারের দেশকর্মী নেতা পরম শ্রদ্ধেয় ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে উক্ত বিষয় তদন্ত করিতে অনুরোধ করেন, এবং অভিযোগগুলি সত্য হইলে তাহার ন্যায্য প্রতিকার করিবার জন্য তাঁহার উপর সকল ভার অর্পণ করেন। এই তদন্তের ফলে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের অনুকূলেই তাঁহার মতামত ব্যক্ত করেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদের অনুরোধ সত্ত্বেও কংগ্রেস-পরিচালিত বিহার গবর্ণমেণ্ট, বাঙ্গালীর প্রতিকূলে যে সমস্ত আইন-কানুন প্রচলিত ছিল, তাহার বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন করেন নাই। এই অবিচারের ফলে আজ আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা ও জীবিকা উপার্জনের পথ অতিমাত্র সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে, এমন কি দুঃস্থ ও পীড়িত বাঙ্গালীর হাঁসপাতাল-প্রবেশাধিকারও অন্যায়রূপে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে।

জামশেদজী টাটা ও তাঁহার বংশের কৃতিত্বে ভারতবর্ষের অনেকের অন্ন জুটিতেছে। তাঁহার সম্মানের কোন লাঘব চাই না, কিন্তু অন্য কারণে বলিতে হইতেছে যে, যে-দুটি জায়গার বাংলা নাম ছিল সাকচী ও কালীমাটী, তাহারা এখন জামশেদপুর ও টাটানগর নামের আচ্ছাদনে বাঙালীত্ব হারাইয়াছে।

—

জামশেদপুর বাঙালীত্বের প্রতীক

জামশেদপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে আমি সামান্য কিছু কথার মধ্যে, দুঃখের সহিত বলিয়াছিলাম, জামশেদপুরে বাঙালীর প্রতীক (symbol) দেখিলাম। অর্থাৎ আদর্শ ও তাহাতে উপনীত হইবার পথ বাহির করে বাঙালী, বুদ্ধি দেয় বাঙালী, কিন্তু ফল ভোগ করে অ-বাঙালী;—অন্যতম দৃষ্টান্ত জামশেদপুর।

স্বদেশী সামগ্রী উৎপাদন ও ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য। ইহা শ্রেয়োলাভের পথ। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রাক্‌কালে ও পরে বাঙালীরা ইহা বলিল, ইহার জন্য নানা নিগ্রহ বাঙালীর হইল, ভদ্রঘরের শিক্ষিত ছেলেরা দেশী কাপড়ের মোট মাথায় করিয়া ফেরি করিল। কিন্তু লাভ

কাহার হইল? টাকাটা কে পাইল? অবাঙালীরা। অন্যেরা যে লাভবান হইয়াছে, কোটি কোটি টাকা পাইয়াছে ও পাইতেছে বাঙালীরই প্রবর্তিত প্রচেষ্টার ফলে, তাহাতে দুঃখ নাই; কিন্তু বাঙালীদেরও ত লাভবান হওয়া উচিত ছিল। তাহা তাহারা হয় নাই। ইহার একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত জামশেদপুর। ব্যাপারটি মোটামুটি জানিতাম, কিন্তু নগেন্দ্রবাবু যেরূপ দলিল এবং তথ্যসংগ্রহ দ্বারা তাঁহার অভিভাষণে ইহা দেখাইয়াছেন, আমরা তাহা কখনও করি নাই—তাহার উপকরণ আমাদের নিকট ছিল না।

কথাটা সংক্ষেপে এই :—

টাটারা ভারতবর্ষে বৃহৎ লোহা ও ইস্পাতের কারখানা স্থাপন করিবার নিমিত্ত গবর্মেণ্টের নিকট হইতে অনুমতি ও অধিকার পাইয়াছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত খনি না পাওয়ায় গবর্মেণ্টকে সে অধিকার প্রায় ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। এমন সময়ে দেশী রাজ্য ময়ূরভঞ্জে স্বর্গত প্রমথনাথ বসু মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত সুবৃহৎ লৌহখনির সংবাদ পাইয়া এবং তাহা কয়লার খনিরও যথাসম্ভব নিকটে হইবে জানিয়া তাঁহারা সাকচীতে কারখানা স্থাপন করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু তাহা হইলেও যথেষ্ট মূলধন তাঁহারা বিলাতে বা এ দেশে পাইতেছিলেন না। এই অবস্থায়, যে-স্বদেশী প্রচেষ্টা বঙ্গে আরব্ধ হইয়া ও প্রবল আকার ধারণ করিয়া অল্পাধিক ভারতব্যাপী হয়, তাহার কল্যাণে তাঁহারা তিন সপ্তাহের মধ্যে আড়াই কোটি টাকা মূলধন প্রাপ্ত হন।

কারখানাটা হইল বঙ্গের সাকচীতে, তাহার খনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন একজন বাঙালী, কারখানার মূলধন জুটিল বাঙালীর স্বদেশী-আন্দোলনের জোরে এবং এখনও বেশী দরে ঐ কারখানার জিনিস বাঙালীরাই সকলের চেয়ে অধিক কেনে। কারখানার অনেক বিশেষজ্ঞের কাজ আগে বাঙালী করিত, এখনও করে।

এই কারখানা বাঙালীর হইতে পারিত, মূলধন বাঙালী দিতে পারিত, এখনও এমন বাঙালী-ঘর আছে যাহারা ক্রোরপতি, তাহারা টাকা না দিলেও অল্পবিত্ত বাঙালীদের সমবায়ে মূলধন উঠিতে পারিত। কিন্তু বাঙালীদের এণ্টারপ্রাইজ ছিল না, সংহতি ছিল না, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবিশ্বাস ছিল না। সেই জন্ম, যাহা বাঙালীর হইতে পারিত, তাহা শুধু যে বাঙালীর হয় নাই তাহা নহে, তাহা হইতে এখন বাঙালীকে তাড়াইয়া তাহাতে বিহারী নিয়োগের দস্তরমত চেষ্টাও হইয়া থাকে।

প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের আবিষ্কার ও চেষ্টার ফলে এবং বাঙালীদের প্রবর্তিত স্বদেশী প্রচেষ্টার প্রভাবে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা নগেন্দ্রবাবু লভেট ফ্রেজার সাহেবের "Iron & Steel in India" বহি হইতে উদ্ধৃত করিয়া অনুগ্রহ পূর্বক আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। সমস্ত উদ্ধারগুলি খুব ছোট অক্ষরে ছাপিতেও তিন পৃষ্ঠা লাগিত। তত স্থান নাই। অল্প কিছু উদ্ধৃত করিলাম, কিন্তু স্থানাভাবে অনুবাদ দিতে পারিলাম না।

. . . . in the ensuing despondency all the prospecting licenses held by Mr. Tata were subsequently surrendered, except the one relating to Lohara.

At this stage one of those chance incidents which make or mar all great enterprises stirred their energies afresh. . . .

One morning the Tata firm received a letter from Mr. P. N. Bose, whose name was already familiar to them by reason of his report upon the iron desposits in the Drug district. Mr. Bose explained that he had retired from his post in the Geological Survey, and was now in the employment of the Maharajah of Mourbhanj. . . . Mr. Bose, with the concurrence of the Maharajah, informed Messrs. Tata Sons and Co. that he had found very rich deposits of iron, and invited them to send representatives to inspect the ore-fields. His statements were on the whole below the mark. In the story of the industrial development of India, Mr. Bose is assured of permanent mention. His inquiries were the prelude to the discoveries of Mr. Weld in the Drug area, and he now pointed the way to still more promising results. His work is one more refutation of the current criticism of Bengalis on the supposed ground that they are not practical men. . . .

It was clear that he had found important ore-fields. They were also well aware that more iron was being traced in the adjacent British Districts of Manbhum, Singhbhum, and Dhalbhum. . . .

At this stage, which was reached in the spring and summer of 1906, the project flagged again. A preliminary prospectus was prepared and submitted to various financial interests in London, but unforeseen difficulties were encountered. . . .

Eventually there was one exciting period when about four-fifths of the required capital was actually promised; but the Syndicate fell through, and the enterprise again seemed doomed, and Sir Dorab returned to India.

For more than a year the negotiations were continued in England, but never with more than partial success. By the summer of 1907, however, new situation had been created in India. The "Swadeshi" movement, which on its more praiseworthy side meant the cultivation of the doctrine that the resources and the industries of India ought to be developed by the Indians themselves, had reached its height. All India was talking "Swadeshi" and was eager to invest in "Swadeshi" enterprises. Sir Dorab and Mr. Padshah, who had spent weary months in the City of London without avail, after their return, conceived in conjunction with Mr. Bilimoria the bold idea of appealing to the people of India for the capital needed. The decision was a risky one, and many predicted failure, but it was amply justified by the result. They issued a circular, which was practically an appeal to Indians. It was followed by the publication of a prospectus, which bears the

date August 27th, 1907. Mr. Axel Sahlin, in a lecture delivered to the Staffordshire Iron and Steel Institute in 1912, has described the instant response. He says:

"From early morning till late at night, the Tata Offices in Bombay were besieged by an eager crowd of native investors. Old and young, rich and poor, men and women they came, offering their mites and at the end of three weeks, the entire capital required for the construction requirements £1,630,000 was secured, every penny contributed by some 8,000 native Indians. And when, later, an issue of Debentures was decided upon to provide working capital, the entire issue, £400,000 was subscribed for by one Indian Magnate, the Maharaja Scindia of Gwalior."

নগেন্দ্রবাবু নিম্নমুদ্রিত সত্য বিবৃতি তাঁহার অভিভাষণে করিয়াছেন যে, প্রধানতঃ বাঙালীরা জামশেদপুরের কারখানাটি বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন :—

"বাঙ্গালীর নিকট এই শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ঋণ যে শুধু অতীতের ইতিহাসেই সীমাবদ্ধ এরূপ মনে করিলে ভুল হইবে। বর্তমানেও এই প্রতিষ্ঠান বাংলা দেশ হইতে যে সহায়তা লাভ করিতেছে তাহারও পরিমাণ খুব সামান্য নহে। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে লৌহ-সামগ্রী ক্রয় করিয়া থাকে। বাংলা দেশে শুধু করগেট টিনের চাহিদাই প্রায় বাৎসরিক দুই লক্ষ টন, ইহা ছাড়া অন্যান্য লৌহ-দ্রব্যাদির প্রয়োজনীয়তাও বাঙ্গালীরই বেশী। প্রতি বৎসর এই বিপুল অর্থসম্ভার বাংলা দেশ হইতে আসিয়া এই প্রতিষ্ঠানটির ধনভাণ্ডারকে পুষ্ট করিতেছে। এই কারখানার প্রস্তুত লৌহসামগ্রী ক্রয় করিয়া বাঙ্গালী নিরন্তর যে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতেছে, তাহাও এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমাদের সহানুভূতির একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এই শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি ভারত-গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রক্ষিত, অর্থাৎ এই কারখানার উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য একটু অধিক হওয়ার দরুন, ভারত-সরকার বিদেশী মালের উপর উচ্চ হারে শুল্ক বসাইয়া ইহাকে বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিতেছেন। অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে লৌহ ক্রয় করিতে হইলেও, বাঙ্গালী ভারতবর্ষের এই জাতীয় শিল্পটিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কোন দিনই আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত বা দুঃখিত হয় নাই।"

স্বদেশভক্ত-সঙ্কট বা স্বদেশপাণ্ডা-সঙ্কট

বৈদ্যসঙ্কট কথাটা বাংলা দেশে চলিত আছে। রোগে অনেক লোকের কোন চিকিৎসাই হয় না; আবার অনেকের বহু চিকিৎসক জুটে, কিন্তু নিদান ও ঔষধের ব্যবস্থায় তাঁহারা একমত হন না। ফলে, যদি-বা রোগী না-মরিত কিংবা কম কষ্ট পাইত, বৈদ্যসঙ্কটে তাহার দশা বিপরীত রকম হয়। বহু তীর্থস্থানে এইরূপ পাণ্ডা-সঙ্কট ঘটিয়া থাকে। অনেক পাণ্ডা যাত্রীকে টানাটানি করিতে থাকে, সবাই বলে তাহারা তাহার অঞ্জলি অর্ঘ্য আদি দেবতার নিকট পৌঁছাইয়া দিবে ও তাহাতে পরে তাহার স্বর্গলাভ হইবে; কিন্তু এই পাণ্ডা-সঙ্কটে তাহার সদ্য সদ্য স্বর্গলাভের উপক্রম হয়।

ভারতবর্ষে—বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে, বৈদ্যসঙ্কট ও পাণ্ডাসঙ্কটের ন্যায় স্বদেশপাণ্ডা-সঙ্কট হইয়াছে। দেশের লোকদের মধ্যে যাহারা দেশের ভাল চায়, তাহাদিগকে নানা পাণ্ডা টানাহেঁচড়া করিতেছে;—সবাই বলিতেছে তাহাদিগকে স্বরাজ-স্বর্গে বা অন্য কোন স্বর্গে পৌঁছাইয়া দিবে। কংগ্রেসের দুইটা (না আরও বেশী?) দল হইয়াছে; ফরোআর্ড ব্লক কংগ্রেসেরই একটা দল কিনা জানি না; হিন্দুসভা হিন্দুমহাসভা নামধেয় দুটা দল হিন্দুদের হইয়াছে, অধিকন্তু আছে ভারত-সেবাশ্রমসংঘ, হিন্দু মিশন ইত্যাদি; ভারতীয় জাতীয় উদারনৈতিক সংঘ কংগ্রেস অসহযোগী হইবার সময় হইতেই আছে; মানবেন্দ্রনাথ রায় একটা র‍্যাডিক্যাল (অর্থাৎ মৌলিক=মূলা হইতে উদ্ভূত) দল গড়িতে চেষ্টা করিতেছেন। ছাত্রেরাই বা কেন পশ্চাৎপদ হইবেন? তাঁহারাও চরম ও পরম উৎসাহে দলাদলি করিতেছেন। দেশহিতৈষীরা কোন্ দলে যাইবেন স্থির করিতে পারিতেছেন না। কথিত আছে, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় যখন মুমূর্ষু, তখন তাঁহার দেহে নানা ঠাকুরদেবতার নামের ছাপ দিবার পর কোন একটি সম্প্রদায়ের আরাধ্যের নামের ছাপও দেওয়া হইবে কিনা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়। তাহাতে তিনি সেই ছাপ দেহের পশ্চাদ্দেশে দিতে বলেন—যদি দেবতা ঠেলিয়া তাঁহাকে স্বর্গে ঢুকাইয়া দিতে পারেন এই আশায়! এই নজীর অনুসারে সমুদয় দলেরই ছাপ (label) লওয়া যাইতে পারিত এই আশায় যে, কোন-না-কোন দল ছাপিত ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই স্বরাজধামে পৌঁছাইয়া দিবে—যদি ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে অহি-নকুল সম্বন্ধ না হইত।

খ্রীষ্টীয় বড়দিনের ছুটিতে সভা-সমিতি

গত খ্রীষ্টীয় বড়দিনের ছুটিতে রাষ্ট্রনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, শৈক্ষিক, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক, অর্থনৈতিক, সংখ্যাতাত্ত্বিক,...এত রকম সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, যে সবগুলির খুব সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা দূরে থাক, উল্লেখ করিবারও চেষ্টা করিব না। শুধু কতকগুলি নামের তালিকা দেওয়া নিষ্ফল। এতগুলি সভা যে হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, ভারতীয়দের দৃষ্টি উন্নতি ও অগ্রগতির সকল উপায়ের উপর পড়িয়াছে। সমঞ্জসীভূত সর্বব্যাপী প্রচেষ্টা হইলেই সিদ্ধিলাভ হইবে।

এতগুলির মধ্যে যে আমরা জামশেদপুরের ও রেঙ্গুনের

সম্মেলন দুটি সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু লিখিয়াছি তাহার কারণ, আমরা বাঙালী এবং এইরূপ সম্মেলনে সকল রকম বাঙালী একত্র বসিয়া কোন কোন বিষয়ে বাঙালীদের হিতচিন্তা ও আলোচনা করিতে পারেন। যাঁহারা সরকারী চাকর্যে বা পেন্সানপ্রাপ্ত তাঁহারাও এইরূপ সম্মেলনে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা আমাদিগকে লাভবান করিতে পারেন। ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোকেরা মিলিত হইতে পারেন; যাঁহারা কোন রাজনৈতিক দলেরই লোক নহেন, এখানে তাঁহাদেরও স্থান আছে। সাহিত্যিক নানা দলেরও এগুলি মিলনক্ষেত্র।

আমরা সমগ্র জগতের হিতৈষী হইবার অভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করি, সকলের হিতেই আনন্দ লাভ করিবার আশা রাখি। কিন্তু আমাদের শক্তি অতি অল্প, অবসর কম, মাসে এই কাগজটিতে একবার মাত্র লিখি এবং লিখিবার স্থান সীমাবদ্ধ। সুতরাং যদি আমরা বিশেষ করিয়া প্রধানতঃ সেই সকল ঘটনা ও বিষয় সম্বন্ধেই লিখি যাহার সহিত বাঙালীদের হিত বিশেষ করিয়া ও সাক্ষাৎভাবে জড়িত, তাহা হৃদয়মনের সংকীর্ণতা বশতঃ নহে। অন্ততঃ আমাদের ধারণা এইরূপ।

—

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের প্রতিবাদ

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের প্রতিবাদে কলিকাতায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে সুবৃহৎ সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার বক্তৃতা ও প্রস্তাবগুলি বাংলার শাসকবর্গের বিশেষ মন দিয়া শ্রদ্ধার সহিত অধ্যয়ন করা উচিত। যে-প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী পাইয়াছে, তাহাকে সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করা বাতুলতা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যে-প্রচেষ্টার সমর্থক ও অন্যতম পরিচালক এবং যাহার অঙ্গীভূত সভার সভাপতি, তাহাকে সাম্প্রদায়িকতা-প্রসূত মনে করা বা মনে করিবার ভান করা বুদ্ধিভ্রংশের লক্ষণ।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের প্রতিবাদের পশ্চাতে এই কারণ অবশ্যই আছে যে, ঐ বিল দ্বারা হিন্দুদের এবং অন্য অমুসলমানদের শিক্ষার ও সংস্কৃতির প্রভূত ক্ষতি হইবে বলিয়া, বিল যে দুরভিসন্ধির ফল তাহাকে ব্যর্থ করা আবশ্যক। কোন সম্প্রদায় বা কোন সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কতকগুলি লোক যদি অপরাপর সম্প্রদায়ের ক্ষতি করিবার চেষ্টা করে, এবং যদি সেই সকল সম্প্রদায় সেই অপচেষ্টা ব্যাহত করিবার প্রয়াস পায়, তাহা হইলে সেই প্রয়াসকে সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট বলা শব্দের অপব্যবহার। অপরাপর সম্প্রদায়ের হিতাহিতের প্রতি উদাসীন হইয়া, এমন কি অপরাপর সম্প্রদায়ের ক্ষতি বা অনিষ্ট করিয়াও, নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ সিদ্ধি করিবার চেষ্টাই সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট চেষ্টা। "আমি যে সম্প্রদায়ের লোক, কেহ তাহার অনিষ্টচেষ্টা করিলেও আমি উদাসীন ও নিষ্ক্রিয় থাকিব, অনিষ্ট নিবারণের চেষ্টা করিব না; কেন-না এইরূপ নিষ্ক্রিয়তা দ্বারা আমি অসাম্প্রদায়িকতার সার্টিফিকেট পাইব", কাহারও মনের ভাব এইরূপ হইলে, সে প্রকার নির্বোধ ও ভীরু ব্যক্তির প্রশংসা করা যায় না।

হিন্দু ও অন্যান্য অ-মুসলমানেরা যে মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের প্রতিবাদ করিতেছেন, তাহা কেবল নিজেদেরই অনিষ্ট নিবারণের জন্য নহে, মুসলমানদেরও অনিষ্ট নিবারণের নিমিত্ত। কারণ, এই বিল পাস হইলে সম্প্রদায়-নির্বিশেষে বঙ্গের সমুদয় অধিবাসীর ক্ষতি হইবে। বাংলা দেশের শিক্ষাসংক্রান্ত প্রচেষ্টা প্রধানতঃ হিন্দুদের কীর্তি এবং খ্রীষ্টীয় মিশনারিরাও অংশতঃ এই প্রচেষ্টার যশোভাগী। শিক্ষাবিধায়ক হিন্দুরা ও খ্রীষ্টিয়ানরা কখনও কেবলমাত্র যথাক্রমে হিন্দু ও খ্রীষ্টিয়ান ছেলেমেয়েদের শিক্ষার নিমিত্ত যত্নবান্ ছিলেন না। তাঁহারা যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহার দ্বারা তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়-ব্যতিরেকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরাও উপকৃত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় মিশনারিদের শিক্ষাপ্রচেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য যদি অন্যান্য সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদিগকে খ্রীষ্টিয়ান করা নাও-হয়, তাহা হইলেও উহা যে অন্যতম উদ্দেশ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই উদ্দেশ্যে কাজ করিবার ন্যায্য অধিকার তাঁহাদের আছে। কিন্তু হিন্দুদের শিক্ষাপ্রচেষ্টার অন্তরালে অহিন্দুকে হিন্দু করিবার অভিপ্রায় কখনও ছিল না, এখনও নাই। অতি অল্পসংখ্যক হিন্দু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হিন্দুর ছেলেমেয়েকে স্বধর্ম-নিষ্ঠ করা। হিন্দুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অন্য সকল বিদ্যালয় অবিমিশ্র শিক্ষাদান-উদ্দেশ্যমূলক। সেগুলির দ্বারা সম্প্রদায়নির্বিশেষে ছাত্রেরা উপকৃত হইয়াছে। হিন্দু-প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ বিদ্যালয় এই প্রকার।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের পূর্বোক্ত বৃহত্তম সভায় যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে, তাহার সবগুলিরই আমরা সমর্থন করি। কোনটির বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই।

সমুদয় প্রস্তাবগুলি অনুসারে কাজের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত এবং শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত যে কমীটি গঠিত হইয়াছে, দরকার মত তাহাতে আরও সভ্য লওয়া যাইতে পারে। যে-সকল মহিলা শিক্ষাদানকার্যে ব্যাপৃত আছেন এবং যে-সকল মহিলা অন্য প্রকারে শিক্ষাবিস্তারে সাহায্য করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্য হইতেও এই কমীটিতে কয়েক জনকে লওয়া হইয়াছে বা হইবে।

বৃহত্তম সভাটিতে বিলটার প্রতিবাদ হইবার পর

আরও প্রতিবাদ-সভা নানা স্থানে হইয়াছে, পরেও হইবে ও হওয়া চাই। কিন্তু প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিলটা পাস হইয়া গেলেও বৃহত্তম সভায় যে কর্তব্য নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে খুব বেশী মন দিতে হইবে। মন্ত্রীদের ও তাহাদের সমর্থক দলের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া বসিয়া থাকিলে বঙ্গের শিক্ষা ও সংস্কৃতি নষ্ট হইবে।

বাংলা বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকাবলী

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলে ব্যবস্থা আছে যে, ম্যাট্রিকুলেশ্যন (প্রবেশিকা) পরীক্ষার পাঠ্য কোন পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করিতে পারিবে না। বিলে যে শিক্ষা-বোর্ড নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা আছে, সেই বোর্ড একটা পুস্তকপ্রকাশক কমীটি নিয়োগ করিবে, এবং সেই কমীটি দরকারী সব বহি লিখাইবে ও প্রকাশ করিবে। যদি বিলটা দুর্ভাগ্যক্রমে আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে এই বহিগুলা কি প্রকার হইবে, তাহা বর্তমানে পাঠ্যপুস্তকনির্বাচক কমীটির দ্বারা অনুমোদিত মধ্য-বাংলা ও মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় সকলে ও মক্তব মাদ্রাসায় ব্যবহৃত অনেক পুস্তক হইতে অনুমান করা যায়। তাহার কিছু কিছু নমুনা প্রবাসীর বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত অধ্যাপক রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গে যাঁহারা "উচ্চ" রাজনীতি, "উচ্চ" শিক্ষানীতি এবং অন্য নানাবিধ "উচ্চ" জিনিসের চর্চা করেন, তাঁহারা এই সকলের বড় একটা খবর রাখেন না। আমরা যাহারা জাহাজের খবর রাখি না—কেবলমাত্র আদার ব্যাপারী, আমরাও এ-সকলের পূরা খবর জানি না। বঙ্গের ভাষার ও বঙ্গের সংস্কৃতির কিরূপ অনিষ্ট হইতেছে এবং মাধ্যমিক শিক্ষা বিল আইনে পরিণত হইলে আরও কিরূপ অনর্থ ঘটিবে, তাহা কিন্তু এই সকল হইতে অনুমান করা যায়। অতএব সময় থাকিতে সাবধান। এখনও সময় আছে।

হিন্দু মহাসভার প্রধান প্রস্তাব

মাদুরায় হিন্দুমহাসভার যে অধিবেশন সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রধান প্রস্তাব খবরের কাগজের পাঠকেরা পড়িয়াছেন। হিন্দু মহাসভা যে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা চান, তাহা গোপন করেন না। তবে তাঁহারা যুদ্ধের অবসানে ওএস্টমিন্‌স্টার স্ট্যাটিউট অনুযায়ী ডোমীনিয়ন মর্যাদা পাইলেই সন্তুষ্ট হইবেন। তাঁহারা যুদ্ধ শেষ হইবার এক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের জন্য ডোমীনিয়নত্ব চান। প্রধান প্রস্তাবটিতে এই কথাও বলা হইয়াছে যে, আগামী ৩১শে মার্চের মধ্যে যদি ব্রিটেন পাকিস্থান প্রস্তাবের বিরোধিতা ও তাহার নামঞ্জুরি দ্ব্যর্থশূন্য ভাষায় ঘোষণা না করেন এবং যুদ্ধ শেষ হইবার এক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়নত্ব দিবার অঙ্গীকারও ঐ তারিখের মধ্যে না-করেন, তাহা হইলে হিন্দু মহাসভা সাক্ষাৎভাবে সক্রিয় কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করিবেন। এই উপায় কংগ্রেসের মত কোন আইন লঙ্ঘন হইবে, বা অন্য কিছু হইবে, তাহা এখনও বলা হয় নাই। কিন্তু উহা যে অহিংস হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। গান্ধীজী যে-অর্থে ও যে-ভাবে অহিংসা মানেন, তাহা কেহ মানুন বা না-মানুন, কোন বুদ্ধিমান ভারতীয়ই মনে করিতে পারেন না যে, সশস্ত্র কোন বিদ্রোহ দ্বারা এখন স্বরাজ অর্জন করিতে পারা যায়।

নীতির দিক হইতে কংগ্রেস বিশ বৎসরেরও অধিক কাল প্রয়োজন মত আইন লঙ্ঘন বৈধ বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছেন, এবং তদনুসারে কাজও করিয়াছেন ও করিতেছেন। এখন হিন্দু মহাসভারও মত সেইরূপ হইল। কাজ কিরূপ হয় পরে দেখা যাইবে।

হিন্দু মহাসভা প্রধান প্রস্তাবটি দ্বারা যে প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছেন, তাহা কাহার নিকট হইতে পাওয়া চাই বলেন নাই। আমরা বহুবার ইংরেজী ও বাংলায় বলিয়াছি এবং তাহার সমর্থক প্রামাণিক কথাও উদ্ধৃত করিয়াছি যে, পার্লেমেণ্ট স্বয়ং যে প্রতিশ্রুতি দেন নাই তাহা, অন্যে পরে কা কথা, খোদ ইংলণ্ডেশ্বর দিলেও পার্লেমেণ্ট দ্বারা অবশ্যপালনীয় নহে। অতএব, প্রতিশ্রুতিটি শুধু ভারতসচিব বা বড়লাটের মুখ হইতে বাহির হইলে চলিবে না; উহা পার্লেমেণ্টের কোন আইনের দ্বারা বা তাহার তুল্যমূল্য কিছুর দ্বারা প্রদত্ত হওয়া চাই।

সত্যাগ্রহ উলেমা কর্তৃক সমর্থিত

জামিয়াৎ-উল-উলেমা-ই-হিন্দ্ ভারতবর্ষের মুসলমান বিদ্বানদিগের সমিতি। সংখ্যাবহুল মোমিন্ শ্রেণীর এবং পঞ্জাবের প্রভাবশালী অগ্রসর রাজনৈতিক অহ্‌রারদিগের ন্যায় ইহার রাজনৈতিক মতামত মুসলিম লীগ হইতে ভিন্ন। কংগ্রেসের সভ্য হাজার হাজার মুসলমানের রাজনৈতিক মতও মুসলিম লীগ হইতে ভিন্ন। কিন্তু মুসলিম লীগ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক একত্ব ও ভারতীয় স্বাজাতিকতার (nationalism-এর) বিরোধী বলিয়া ব্রিটিশ রাজপুরুষ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম লীগকেই ভারতীয় সব মুসলমানের প্রতিনিধি সমিতি বা প্রধান প্রতিনিধি সমিতি মনে করেন, বা মনে করিবার ভান করেন। মুসলিম লীগ কংগ্রেসের বিষম বিরোধী।

কিন্তু জামিয়াৎ-উল-উলেমা-ই-হিন্দের কার্যনির্বাহক

কমীটি গত ৬ই জানুয়ারী মৌলানা হুসেন আহমদ মাদানির সভাপতিত্বে বার ঘণ্টা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনার পর যুদ্ধ সম্বন্ধে কংগ্রেসের ভাব এবং মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহের সমর্থন করেন। পঞ্জাবের অহ্‌রেরা অনেকে সত্যাগ্রহ আগেই করিয়াছেন।

—

উদারনৈতিক সংঘের দাবী

এবার কলিকাতায় ভারতবর্ষীয় জাতীয় উদারনৈতিক সংঘের অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি শ্রীযুক্ত বিঠল নারায়ণ চন্দাবরকরের বক্তৃতায় উদারনৈতিকদের রাষ্ট্রনীতি যোগ্যতার সহিত দ্যোতিত হইয়াছিল। পণ্ডিত প্রকাশনাথ সাপ্রু প্রভৃতির বক্তৃতাও বেশ হইয়াছিল।

হিন্দু মহাসভার ন্যায় এই সংঘও ডোমীনিয়নত্ব দাবী করেন এবং যুদ্ধ শেষ হইবার পর দুই বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়ন করা হইবে, এই প্রতিশ্রুতি চান; কিন্তু সেরূপ প্রতিশ্রুতি না দিলে তাঁহারা কোন সক্রিয় উপায় অবলম্বন করিবেন, এরূপ বলেন নাই।

—

উদারনৈতিকদের সত্যাগ্রহের বিরোধিতা

যুদ্ধ শেষ হইবার পর দুই বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়ন করা হইবে, এরূপ কোন প্রতিশ্রুতি না পাইলে উদারনৈতিকেরা স্বয়ং ত কোন সক্রিয় উপায় অবলম্বন করিবেনই না, অধিকন্তু তাঁহারা বর্তমানে কংগ্রেস-কর্তৃক সত্যাগ্রহ অবলম্বনের নিন্দাসূচক একটি প্রস্তাব ধার্যও করিয়াছেন। ডক্টর রঘুনাথ পুরুষোত্তম পরাঞ্জপ্যে এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন। প্রস্তাবটির ও তাহার সমর্থক তাঁহার বক্তৃতার প্রধান কথা এই যে, সত্যাগ্রহ বর্তমান পরিস্থিতিকে জটিলতর করিবে। কোন অবস্থাতেই অহিংস আইনলঙ্ঘন উচিত কিনা, তাহা প্রস্তাবটিতে কিংবা ডক্টর পরাঞ্জপ্যের বক্তৃতায় বলা হয় নাই। আমরা তাঁহাদের সহিত একমত নহি।

বর্তমান জটিল অবস্থা ও সঙ্কটের জন্য যে গবর্মেণ্ট দায়ী, উদারনৈতিকদের অধিবেশনে ব্যক্ত এই মত ঠিক্‌। উদারনৈতিকদিগকেও আমরা স্বাজাতিক (nationalist) মনে করি।

স্বাজাতিক যতগুলি ভারতবর্ষীয় সভাসমিতি ও প্রতিষ্ঠান আছে, তাহারা পরস্পরের সমালোচনা না করিয়া নিজের নিজের উদ্ভাবিত উপায়ে স্বরাজলাভের চেষ্টা করিলেই ভাল হয়।

বাঙালী উদারনৈতিক দল ও "সঞ্জীবনী"

বাংলা দেশে খাঁটি উদারনৈতিক মতের কাগজ একটি মাত্র ছিল। তাহা "সঞ্জীবনী"। তাহা বন্ধ হইয়া আছে। এক কাগজটি কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় মৃত্যুকাল পর্যন্ত অর্দ্ধ শতাব্দী নানা দুঃখ ও ক্ষতি সহ্য করিয়া চালাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরও "সঞ্জীবনী" তাঁহার রাজনৈতিক মত পরিত্যাগ করে নাই। এই কাগজটি যাহাতে আবার বাহির হয় ও উদারনৈতিক মত অনুসারে নিয়মিত রূপে পরিচালিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা লর্ড সিংহ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় প্রমুখ বঙ্গের নেতৃস্থানীয় উদারনৈতিকেরা করিলে ভাল হয়। বার্ষিক অধিবেশন যথেষ্ট নহে, একটি অন্ততঃ সাপ্তাহিক মুখপত্র চাই।

—

বিষ্ণুপুরের তসর ও গরদ

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর শহরে উৎকৃষ্ট তসরের ও গরদের সাড়ী ধুতি চাদর রুমাল এবং পুরুষ ও মহিলাদের সকল রকম জামার কাপড় প্রস্তুত হয়। তথাকার এক জন সুশিক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য ভদ্রলোক কলিকাতায় এই সমুদয় জিনিষের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি যত রকম কাপড় রাখেন তাহা আমরা দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। তিনি কলিকাতার সর্বত্র গিয়া কাপড় দেখাইতে প্রস্তুত আছেন। ন্যূনকল্পে দশ জন প্রবাসী বাঙালী আহ্বান করিলে তিনি বঙ্গের বাহিরে বৃহত্তর বঙ্গেরও অনেক স্থানে যাইতে পারেন। তাঁহার ঠিকানা, "ব্রতী", গড়িয়াহাটের মোড়, বালিগঞ্জ, কলিকাতা; টেলিফোন নম্বর পিকে ৯৭১। বাঙালীর টাকা বাঙালীরই থাকে, এবং বাঙালী তন্তুবায়েরা তাহাদের যথাযোগ্য পারিশ্রমিক ও লাভ পায়, তাঁহার উদ্দেশ্য এই প্রকার। আমরা এই উদ্দেশ্যের সমর্থন করি।

—

"বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর কৃতি"

গত পৌষের 'প্রবাসী'তে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দেব মহাশয়ের "বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর কৃতি" প্রবন্ধের শেষে কতকগুলি প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছিল এবং বঙ্গের বাহিরের পাঠকদিগকে নিজ নিজ প্রদেশে বাঙালীদের কৃতি সম্বন্ধে তথ্য ও বিবৃতি পাঠাইতে অনুরোধ জানান হইয়াছিল। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, এই অনুরোধ সফল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নাগপুরের দীননাথ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় মধ্যপ্রদেশ সম্বন্ধে এতদ্বিষয়ক একটি লেখা পাঠাইয়াছেন। তাঁহাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

ধর্মান্তর গ্রহণ দ্বারা বিবাহচ্ছেদ

অনেক বিবাহিতা স্ত্রীলোক ধর্মান্তর (সাধারণতঃ মুসলমান ধর্ম, কখনও কচিৎ খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম) গ্রহণ করিয়া স্বামীর সহিত বিবাহ ছিন্ন করে এবং গৃহীত নূতন ধর্মের পতি গ্রহণ করে। অনেক স্থলে তাহাদিগকে এই ধর্মান্তর গ্রহণ করান হইয়া থাকে। এ-পর্য্যন্ত লোকের ধারণা এবং আদালতের রায় এইরূপ ছিল যে, কোন বিবাহিতা স্ত্রীলোক ধর্মান্তর গ্রহণ করিলে ও তাহার স্বামীও সেই ধর্ম গ্রহণ না-করিলে, তাহাদের বিবাহ স্বতই ছিন্ন হইয়া যায়। মুসলমানের সংখ্যা বাড়াইবার বা বাড়িবার ইহা একটা উপায় হইয়া আসিয়াছে।

সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টে মাননীয় বিচারপতি মিঃ এজ্‌লী তাঁহার একটি সুযুক্তিপূর্ণ রায়ে অন্যবিধ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

যে-মোকদ্দমায় তিনি এই রায় দিয়াছেন, তাহা একটি য়ুরোপীয় স্ত্রীলোক মুসলমান হইয়া তাঁহার স্বামীর বিরুদ্ধে আনিয়াছিলেন। দম্পতি রুশীয়, ধর্মে উভয়েই ছিলেন খ্রীষ্টিয়ান। বার্লিনে তাঁহারা বিবাহ করেন। স্বামী এখনও খ্রীষ্টিয়ান এবং এডিনবরা নিবাসী। তিনি মোকদ্দমায় হাজির হন নাই। স্ত্রী ভারতবর্ষে মুসলমান হইয়া নূরজাহান বেগম নাম লইয়াছেন। তিনি স্বামীকেও মুসলমান হইবার নিমিত্ত টেলিগ্রাফ করেন। স্বামী রাজী হন নাই। মোকদ্দমায় স্ত্রীলোকটি হাইকোর্টের নিকট দুটি প্রার্থনা জানান:—(১) তাঁহার স্বামীকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও স্বামী তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করেন নাই বলিয়া বিবাহবিচ্ছেদ মঞ্জুর করা হউক; অথবা, (২) তিনি মুসলমান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার বিবাহবন্ধন স্বতই ছিন্ন হইয়া গিয়াছে বলিয়া ধার্য করা হউক। বিচারপতি এজ্‌লী সুযুক্তি প্রয়োগ সহকারে উভয় প্রার্থনাই নামঞ্জুর করিয়াছেন। তাঁহার সকল যুক্তি উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই। রায়ের কেবল একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি:—

"It is not the policy of the State in the twentieth century to act as a proselytizing agency or to promote the interests of one form of religion to the detriment of another."

"ধর্মান্তর গ্রহণ করাইবার যন্ত্রের কাজ করা বিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রের নীতি (policy) নহে।; অথবা কোন এক ধর্মের ক্ষতি করিয়া অন্য কোন ধর্মের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া দেওয়াও বিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রের নীতি নহে।"

আইনের কোন তর্কের মধ্যে না-গেলেও সাধারণ বুদ্ধিতেও ইহা ন্যায্য মনে হয় না যে, কোন ব্যক্তি তাহার পূর্ব ধর্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দু বা মুসলমান বা খ্রীষ্টিয়ান ·· হইয়া গেলেই তাহার স্বামী বা স্ত্রীকেও সেই ধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা দম্পতির পূর্ববিবাহ ছিন্ন হইয়া যাইবে। ধর্মান্তর গ্রহণপূর্বক পূর্ববিবাহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া নূতন বিবাহ করিবার ইহা একটা ফন্দী হইয়া দাঁড়াইয়াছে বা দাঁড়াইয়াছিল।

হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান,···কোন কোন লোকের সহিত অন্য ধর্মের স্ত্রীলোকের অবৈধ সম্পর্ক থাকে। কোন আইন সেই অবৈধ সম্পর্ক ছিন্ন করিতে ঐ সব হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান,···পুরুষকে বাধ্য করে না। কিন্তু যদি কোন হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান,···পুরুষের বৈধভাবে বিবাহিতা স্ত্রী থাকে, এবং সেই বৈধ স্ত্রী অন্য ধর্ম অবলম্বন করে, তাহা হইলে বৈধ বিবাহ ছিন্ন হইয়া যাইবেই, ইহা কখনও ন্যায্য বিধি হইতে পারে না। বিধি এরূপ হইলে ভিন্নধর্মাবলম্বী পুরুষ ও স্ত্রীলোকের অবৈধ সম্পর্ককে, ভিন্নধর্মাবলম্বী পুরুষ ও স্ত্রীলোকের বৈধ সম্পর্ক অপেক্ষা দৃঢ়তর, শ্রেষ্ঠতর, ও স্থায়িতর বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়।

—

শিক্ষালয়ে ধর্মবিষয়ক পক্ষপাতিত্ব

সম্প্রতি সরকারী হুকুম জারি হইয়াছে যে, সরকারী ও সরকারীসাহায্যপ্রাপ্ত যে-সকল কলেজে মুসলমান ছাত্র আছে, তাহাদিগকে বিকালের "জহর" নমাজ করিবার সময় দিবার নিমিত্ত কলেজগুলির কাজ প্রত্যহ আধ ঘণ্টা বন্ধ রাখিতে হইবে।

প্রত্যেক ধর্মের লোকদের নিজ নিজ ধর্ম অনুসারে চলিবার অধিকার অবশ্যই আছে, কিন্তু নিজের ধর্ম আচরণ করিতে গিয়া অন্য ধর্মের লোকদের যাহাতে অসুবিধা না হয়, তাহা দেখা প্রত্যেক ন্যায়বান লোকের কর্তব্য। বিচারপতি এজ্‌লী একটা বিবাহবিচ্ছেদের মোকদ্দমায় যে রায় দিয়াছেন, তাহার একটি উক্তি শিক্ষাক্ষেত্রেও খাটে; যথা—

"অন্য ধর্মের ক্ষতি বা অসুবিধা করিয়া কোন ধর্মের সুবিধা বা স্বার্থসিদ্ধি করা বিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রের নীতি (policy) নহে।"

মুসলমান ছাত্রদের ধর্মাচরণের নিমিত্ত অমুসলমান ছাত্রদিগকে প্রত্যহ আধ ঘণ্টা আলস্যে কাটাইতে বাধ্য করা (কেন না, তাহাদের ঐ আধ ঘণ্টার সদ্ব্যবহারের কোনই ব্যবস্থা করা হয় নাই) এবং ফলে ছুটির সময়ের পরেও আধ ঘণ্টা অধ্যাপকদিগকে অধ্যাপনা করিতে এবং ছাত্রদিগকে তাঁহাদের ব্যাখ্যান ও বক্তৃতা শুনিতে বাধ্য করা ন্যায়সঙ্গত নহে। অথচ প্রত্যহ ঐ অতিরিক্ত আধ ঘণ্টা ক্লাস না করিলে নির্দিষ্ট শিক্ষণীয় বিষয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হইবে না।

গবর্ন্মেণ্ট কলেজগুলি সকলের প্রদত্ত ট্যাক্স ও সকল ছাত্রের প্রদত্ত বেতন হইতে চলে, কেবল মুসলমানদের নহে। সরকারীসাহায্যপ্রাপ্ত কলেজগুলিও সকলের প্রদত্ত বেতন এবং সকলের প্রদত্ত ট্যাক্স হইতে প্রদত্ত সাহায্য দ্বারা পরিচালিত হয়, শুধু মুসলমানদের নহে। অতএব, মুসলমানদের সুবিধার নিমিত্ত অমুসলমানদের ক্ষতি বা অসুবিধা করা উচিত নহে।

ধর্মের জন্য স্বয়ং অসুবিধা, ক্ষতি, দুঃখ সহ্য করাই ধর্মের উপদেশ; নিজে ধার্মিক হইবার নিমিত্ত অপরের ক্ষতি বা অসুবিধা ঘটান ধর্মের নিয়ম নহে। মুসলমানদের ধর্মের নিয়ম তাহা বটে কি না, জানি না; সম্ভবতঃ তাহা নহে।

গবর্ন্মেণ্ট কলেজসমূহের ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজসমূহের প্রিন্সিপ্যালদের এবং সেই সকলের অমুসলমান ছাত্রদিগের অভিভাবকদের এ বিষয়ে বাংলা-গবর্ন্মেণ্টকে ও গবর্ণরকে পুনর্বিবেচনা করিতে বলা আবশ্যক। পুনর্বিবেচনা না হইলে বা পুনর্বিবেচনায় ন্যায্য সুফল না হইলে, সরকারী হুকুমটি ফেডারেল কোর্টে উপস্থিত করা উচিত। কংগ্রেস এ বিষয়ে কিছু করিবেন আশা করা যায় না। নিখিল-ভারতীয় বা বঙ্গীয় খ্রীষ্টিয়ান সমিতির ও হিন্দু মহাসভার এ বিষয়ে বিশেষ কর্তব্য রহিয়াছে।

সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে যে, এই সরকারী হুকুমটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত পরামর্শ না করিয়াই দেওয়া হইয়াছে। অতএব এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবর্ন্মেণ্টের মধ্যে বুঝাপড়া হওয়া আবশ্যক।

ব্যাপারটির সুমীমাংসা না হইলে ইহা মুসলমান ও অমুসলমান ছাত্র এবং অভিভাবকদের অসদ্ভাবের একটি স্থায়ী কারণ হইয়া থাকিবে।

এত দিন যে এ রকম নিয়ম প্রচলিত ছিল না, তাহাতে কত মুসলমান অমুসলমান হইয়া গিয়াছে, কিংবা মুসলমান সমাজের কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহার কোন হিসাব দেওয়া হয় নাই।

অনেক মুসলমান মোটরগাড়ী, বাস্, ট্রামগাড়ী, রেলওয়ে ট্রেন, ও ষ্টীমার চালাইবার কাজে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই এই যানগুলি চালাইতে চালাইতে প্রত্যহ বিকালে "জহর" নমাজের সময় আধ ঘণ্টা যানগুলি থামাইয়া রাখেন না, বা রাখিবার দাবী করেন না। এরোপ্লেনের পাইলটদের মধ্যেও মুসলমান আছেন। মাঝদরিয়ায় বরং জলযান থামান যায়, কিন্তু আকাশে "জহর" নমাজের জন্য আধ ঘণ্টা দূরে থাক্, সামান্য ২।১ মিনিটের জন্যও আকাশযান থামাইলে "পপাত চ মমার চ" হইতে হইবে। সুতরাং সে-ক্ষেত্রে মুসলমান পাইলটরা গোঁড়ামি অপেক্ষা সুবুদ্ধির অনুসরণই করিয়া থাকেন।

এই ব্যাপারটার মধ্যে অমুসলমানদের সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য ও উপেক্ষাপ্রসূত এবং তাহারা হীন এই অহঙ্কৃত ধারণা হইতে উদ্ভূত একটা বিবেচনা-অভাব আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কলেজের ছাত্রদের খুব বেশী অংশ হিন্দু। তাঁহারা কখন কখন তুচ্ছ কারণে কলেজ ছাড়িয়া দিবার ধমক দেন। কিন্তু আলোচ্য হুকুমটি এমন একটি গুরু কারণ যাহার জন্য, ঐ হুকুম প্রত্যাহৃত না হইলে, প্রত্যেক অমুসলমান ছাত্র গবর্ন্মেণ্ট কলেজ ও গবর্ন্মেণ্ট-সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ ছাড়িয়া দিয়া সম্পূর্ণ-বেসরকারী কলেজে ভর্ত্তি হইলে তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গত হইবে।

গবর্ন্মেণ্ট কলেজসমূহে ও সরকারীসাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ-সমূহে যে সরকারী টাকা খরচ হয়, তাহার খুব বেশী অংশ অমুসলমান করদাতাদের নিকট হইতে আসে —বঙ্গের রাজস্বের ন্যূনকল্পে শতকরা ৭০।৭৫ টাকা হিন্দুরা দিয়া থাকে। অধিকাংশ ছাত্র হিন্দু। তাহাদের বেতন হইতে ঐ সকল কলেজের ব্যয়ের প্রভূত অংশ পাওয়া যায়। অথচ, হিন্দুরা গবর্ন্মেণ্ট কর্তৃক নগণ্য বিবেচিত।

কলেজে যে সরকারী সাহায্য পাওয়া যায় তাহা ভিক্ষালব্ধ অর্থ নহে। উহা, আমরা যাহা ট্যাক্স দি, তাহারই সামান্য কিঞ্চিৎ অংশ। তথাপি, আমরা যদি কোন সরকারী-সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজের কর্তৃপক্ষ হইতাম, তাহা হইলে আলোচ্য হুকুম তামিল করা অপেক্ষা সাহায্যটা লওয়াই বন্ধ করিতাম এবং ভিক্ষার দ্বারা ও ব্যয়সংক্ষেপ দ্বারা ব্যয় সংকুলানের চেষ্টা করিতাম।

বলা বাহুল্য, আমরা মুসলমানদের নমাজের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত, কিন্তু তাঁহারা অন্যের ক্ষতি ও অসুবিধা না করিয়া তাঁহাদের উপাসনা করিবেন, ইহাই বাঞ্ছনীয় মনে করি।

প্রত্যহ যে আধ ঘণ্টা সময় মুসলমান ছাত্রেরা 'জহর' নমাজ পড়িবে, অমুসলমান ছাত্রেরা তখন সঙ্গীতচর্চা করিয়া সেই সময়টা সুখে কাটাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে মুসলমান ছাত্রদের নমাজে বাধা জন্মিবার আশঙ্কা আছে। যে ইমারতে নিয়মিত রূপ নমাজ হয়, তাহা মসজিদ হইয়া যায়, মুসলমানদের ধারণা এইরূপ, শুনিয়াছি। সুতরাং অমুসলমান ছাত্রেরা কলেজে নমাজের সময় গান-বাজনা করিলে মসজিদ-সমীপে-সঙ্গীত-সমস্যার (problem of music before mosqueএর) উদ্ভব হইতে পারে। তাহা অবাঞ্ছনীয়।

বস্তুতঃ আলোচ্য সরকারী হুকুমটি কতকগুলি কলেজকে মসজিদে (ও ভবিষ্যৎ শহীদগঞ্জে) পরিণত করিবার উপায় প্রতীয়মান হইয়া উঠিবে কিনা বলা যায় না।

মুসলমান ছাত্রেরা এত দিন কলেজে 'জহর' নমাজ পড়িত না। তাহাতে তাহাদের ঐ ধর্মাচরণের অধিকার তামাদি হইয়া যায় নাই। সুতরাং হিন্দু ছাত্রদের সন্ধ্যা-আহ্নিক গায়ত্রী-জপ হোম চণ্ডীপাঠআদি কলেজে করিবার এবং অন্যান্য ধর্মের ছাত্রদেরও নিজ নিজ ধর্মাচরণ কলেজে করিবার অধিকার তামাদি হয় নাই। সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে শিক্ষালয়গুলি ধর্মালয়েও (অথবা বস্তুত ধর্মকলহালয়েও) পরিণত হইতে পারিবে। ইহা কাহারও বাঞ্ছিত বটে কি?

—

কংগ্রেস-সভাপতির কারাদণ্ড

কংগ্রেস-সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মহাশয় সত্যাগ্রহ করেন নাই, পরে হয়ত করিতেন। কিন্তু তিনি সত্যাগ্রহ করিবার পূর্বেই তাঁহার একটি বক্তৃতাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে এলাহাবাদে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারান্তে তাঁহাকে আঠার মাসের জন্য জেলে পাঠান হইয়াছে। ভারতবর্ষে স্বরাজকামী এমন কোন বক্তা ও লেখক খুঁজিয়া বাহির করা সহজ নহে, যাঁহার ভারতবর্ষসম্বন্ধীয় ব্রিটিশ রাজনীতির সমালোচনা ভারতে ব্রিটিশ আইন অনুসারে দণ্ডনীয় না হইতে পারে। সুতরাং মৌলানা সাহেবের শাস্তিটা আইনসঙ্গত হইয়াছে কিনা তাহার আলোচনা অনাবশ্যক। কিন্তু ইহা বলিতেই হইবে যে, তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ও শাস্তি দিয়া গবন্মেণ্ট রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতার পরিচয় দেন নাই। গ্রেপ্তারের আগে লাহোরে আজাদ মহাশয় বলিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইলে আমি তলোআর ধরিতে দ্বিধা করিব না।" সুতরাং তাঁহার অহিংসাবাদ গান্ধীজীর অহিংসাবাদের মত নহে। কংগ্রেস কয়েক মাস পূর্বে যেরূপ সর্তে যুদ্ধে গবন্মেণ্টের সহযোগিতা করিতে রাজী ছিলেন, সরকার সেইরূপ কোন সর্ত পালন করিলে কংগ্রেসের সহযোগিতা এখনও পাওয়া যাইতে পারিত, মৌলানা সাহেবের ঐ উক্তি হইতে এরূপ অনুমান করা যুক্তিযুক্ত। সেই বক্তৃতার সুযোগ গ্রহণ না-করা গবন্মেণ্টের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক নহে।

সম্ভবতঃ ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট এখন কংগ্রেসের সহযোগিতা বড় একটা আবশ্যক মনে করিতেছেন না। এরূপ সহযোগিতা ভিন্নও ত ব্রিটেন ইটালীকে খুব পরাস্ত করিতে ও তাহার প্রায় এক লক্ষ সৈন্য বন্দী করিতে পারিয়াছেন। ব্রিটেন যত জিতিবে, তাহার আত্মবিশ্বাস ও দর্প এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জবরদস্ত হাকিমি তত বৃদ্ধি পাওয়া আশ্চর্যের বিষয় হইবে না। তাঁহার মেজাজ যেরূপই হউক, হিটলার ও মুসোলিনির জয় অপেক্ষা ব্রিটেনের জয় বাঞ্ছনীয়।

—

কলিকাতায় "আজাদ দিবস"

মৌলানা আবুল কালাম আজাদের কারাদণ্ড হওয়ায় ছাত্র ফেডারেশুনের অনুরোধক্রমে ও উদ্যোগে কলিকাতার অনেক স্কুলকলেজের ছাত্রেরা আজাদ দিবস পালন করিয়াছে। তাহারা রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রা করিয়া "আজাদের জয়" ঘোষণা করিয়াছিল। তাহা হইলে "কংগ্রেসের ক্ষয়" ও "আজাদের ক্ষয়" এখনও বন্ধ হয় নাই?

—

'বঙ্গনারী' নামে পরিচিতা অনিন্দিতা দেবী

বিদুষী সুলেখিকা শ্রীযুক্তা অনিন্দিতা দেবী সম্প্রতি আটান্ন বৎসর বয়সে পুরীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ রচনা স্বকল্পিত 'বঙ্গনারী' নামে

অনিন্দিতা দেবী

প্রকাশিত হইত। ভারতীয় নারীকুলের নানা সমস্যা ও দুঃখদুর্দশার আলোচনা এবং তাহার সমাধান ও প্রতিকার সম্বন্ধেই তাঁহার লেখনী প্রধানতঃ চালিত হইত। স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-জাতির দৈহিক ও মানসিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের যাঁহারা বিরোধিতা করেন, সমাজ-নীতি ও সাংসারিক ব্যবস্থার দিক দিয়া তাঁহাদের যে-সকল ভ্রমপূর্ণ কিন্তু আপাত-সত্যসন্নিভ যুক্তি আছে, তাঁহার রচনায় তিনি সেগুলা খণ্ডন

করিতেন। স্ত্রীজাতির উন্নয়নের অনেক সমর্থকের ন্যায় তিনি উগ্র ভাষায় তাঁহার বক্তব্য বলিতেন না, কিংবা শুধু সাম্যের দোহাই দিয়া ক্ষান্ত হইতেন না; অনুগ্র, সংযত, মিত ভাষায় তিনি ভারতরমণীর উন্নতির আলোচনায় একান্ত আধুনিক মনোভাব ও মননশীলতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই রচনাগুলি "আগমনী" নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। নারীদের কল্যাণকল্পে যাঁহারা চিন্তা ও আলোচনা করেন, তাঁহারা এই গ্রন্থখানিতে একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাইয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন।

অনাথ ও বিধবাদের কল্যাণার্থ পরিচালিত অনেক প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

—

"কেশরী" ও "মাহ্‌রাট্টা"র হীরক মহোৎসব

আমাদের দেশে খবরের কাগজ দীর্ঘজীবী হয় কম;—সবল ও সক্রিয় ভাবে দীর্ঘজীবী থাকে আরও কম কাগজ। ষাট বৎসর পূর্বে লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মরাঠী "কেশরী" ও ইংরেজী "মাহ্‌রাট্টা" শেষোক্ত শ্রেণীর কাগজ। দুটি কাগজই এখনও বাঁচিয়া থাকিয়া বলিষ্ঠ ভাবে আপনাদের কাজ করিতেছে। এই দুটির হীরক মহোৎসব (Diamond Jubilee) সম্প্রতি পুণায় অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ইহা আনন্দের সংবাদ। কাগজ দুটির আয় হইতে নানা জনহিতকর কার্যে ১,৬৪,০০০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে এবং তিন লক্ষ টাকার একটি ফণ্ড তদর্থে সঞ্চিত আছে, ইহাও তাহাদের অন্যতম কীর্তি।

—

"সাহিত্যে 'প্রগতি' সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ"

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের জামশেদপুর অধিবেশনের নিমিত্ত আমি "সাহিত্যে 'প্রগতি' সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সাহিত্য-শাখার সভাপতি মহাশয় উহা পাঠ করিতে আমাকে আহ্বান করেন। কিন্তু উহা পড়িতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগিত, উহা মুদ্রিত আকারে সভাস্থ সকলকে দেওয়া হইয়াছিল এবং সেদিনকার প্রধান আলোচ্য বিষয়ের সহিত উহার সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না—এই তিনটি কারণে আমি উহা পড়ি নাই। উহা পরে কোন কোন দৈনিকে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। বিষয়টি সম্বন্ধে আমার যাহা কিছু বক্তব্য, সব কথা উহাতে নাই;—উহা 'যৎকিঞ্চিৎ' মাত্র। আমার সকল মন্তব্যের সমর্থক দৃষ্টান্তও উহাতে দেওয়া হয় নাই। যেমন, এক স্থানে এই মর্মের কথা বলিয়াছি যে, শ্রেণীবিশেষের বা ব্যাপক ভাবে সমগ্র সমাজের দুর্দশার চিত্র আঁকা সার্থক হয় যদি তাহার ফলে দুর্দশামোচন ঘটে, কিন্তু ইহার সমর্থক কোন দৃষ্টান্ত দি নাই। দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বঙ্গে "নীলদর্পণ", আমেরিকায় "আঙ্কল্ টম্‌স্ ক্যাবিন," বিলাতে "অলিভার টুইস্ট" লিখিত হওয়ায় তাহার সুফল ফলিয়াছিল। যাঁহারা ঐ ঐ পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাঁহারা সাক্ষাৎভাবে সংস্কারক ও আন্দোলক ছিলেন কিনা, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। আমাদের দেশে যাঁহারা 'প্রগতি'-সাহিত্যিক বলিয়া পরিচিত হইতে চান, তাঁহাদের লেখার ঐরূপ কোন ফল ফলিয়াছে কিনা, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

—

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস

ভারতবর্ষের অবস্থা এখন যেরূপ, তাহাতে রাজনীতিতেই লোকের মন নিমগ্ন থাকা স্বাভাবিক বটে, কিন্তু অন্য নানা বিষয়েও মন দেওয়া চাই। বিজ্ঞান সেইরূপ একটি প্রধান বিষয়। গত মাসে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের যে অধিবেশন বারাণসীতে হইয়া গিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত দৈনিক কাগজগুলিতে কয়েক দিন ধরিয়া বাহির হইয়াছে। তাহাতে বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু সবিশেষ মনোযোগের ব্যবস্থাও চাই।

টাটা কোম্পানীর অন্যতম প্রধান কর্মচারী সর্ আর্দাশির দালাল বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি নির্বাচিত হন। বর্তমান যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষের রপ্তানী ও আমদানী বাণিজ্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, তিনি তাহার উল্লেখ করেন এবং এই মত প্রকাশ করেন যে,

> "ভারতবর্ষের শিল্পবাণিজ্যক অর্থনৈতিক অবস্থাকে অব্যাহত রাখিতে হইলে যে-সমস্ত দ্রব্য একান্ত প্রয়োজনীয়, এই দেশেই সেই সমস্ত দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে; কারণ তাহা হইলে বর্তমানে যেরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে ভবিষ্যতে আর সেইরূপ অবস্থা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না।"

তিনি "বোর্ড অব্ সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল রিসার্চ" নামক অধুনা-প্রতিষ্ঠিত সরকারী বোর্ডের নানা দিক দিয়া সমালোচনা করেন। রাশিয়া ও অন্য কোন কোন পাশ্চাত্য দেশে গবর্মেণ্ট বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য কত বেশী খরচ করেন এবং এদেশে সরকারী ব্যয় কত সামান্য, তাহাও তিনি বলেন।

—

কলিকাতা মিউনিসিপালিটী সংশোধক দ্বিতীয় বিলের প্রতিবাদ

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সংশোধক (বস্তুতঃ সংহারক) দ্বিতীয় বিলের প্রতিবাদ চলিতেছে এবং ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রতিবাদ-প্রচেষ্টার নেতা হইয়াছেন দেখিয়া উৎসাহ বোধ করিতেছি।

প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিলটা যদি আইনে পরিণত হয়, তখন বিরোধিতা ছাড়িয়া দিলে চলিবে না,—এটাকে ব্যাহত করিবার সকল রকম চেষ্টা করিয়া চলিতে হইবে।

বিক্রীর উপর ট্যাক্সের প্রতিবাদ

বিক্রীর উপর ট্যাক্সের প্রতিবাদও হইতেছে। ইহাও খুব ব্যাপকভাবে হওয়া চাই।

আগামী নির্বাচনের নিমিত্ত মন্ত্রীদের তোড়জোড়

আগামী নির্বাচনে মন্ত্রীরা যাহাতে নির্বাচিত হইতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে প্রাথমিক শিক্ষা, পল্লীসংগঠন, মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের চূণকাম, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহাদের কাগজিক মনোযোগের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তিন বৎসর পরে তাঁহাদের হঠাৎ জাগৃতি না-হইয়া প্রথম হইতে জাগরণ ঘটিলে এবং তাঁহারা যে শুধু মুসলমানদের পরিচারক নহেন, প্রত্যুত বঙ্গের সকল লোকেরই সেবা করিতে বাধ্য ও তাঁহাদের বেতনটা প্রধানতঃ হিন্দুদের দেওয়া রাজস্ব হইতে আসে, ইহা মনে রাখিলে ভাল হইত।

সেন্সসে হিন্দুদের গণনা

গত ১৯৩১ সালের মানুষগুন্তিতে নানা কারণে হিন্দুদের সংখ্যা গণনায় অনেক ভুল হয়, তাহাদের সংখ্যা কম দেখান হয়। এবার যাহাতে সেরূপ না-হয়, তাহার চেষ্টা প্রতিষ্ঠান হিসাবে হিন্দু মহাসভা, হিন্দু লীগ প্রভৃতি করিতেছিলেন। এখন অন্যেরাও, দেখাদেখি, এই কাজে নামিয়াছেন, ভালই। আমাদের বাংলা ও ইংরেজী মাসিক দুটির এদিকে দৃষ্টি কয়েক বৎসর আগে হইতেই এ পর্যন্ত আছে।

বিহার ও যুক্তপ্রদেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণ

বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেস গবর্ন্মেণ্ট প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের যে চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও চলিতেছে। তাহার ফলে হাজার হাজার লোক লিখনপঠনক্ষম হইয়াছে। বিহারে কয়েদীদিগের মধ্যেও এই চেষ্টা চলিতেছে। অতঃপর কোন নিরক্ষর লোককে চৌকিদার নিযুক্ত করা বা রাখা হইবে না, বিহারের গবর্ন্মেণ্ট এইরূপ ঘোষণা করায় ৯০০০ চৌকিদার লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে।

তিন বৎসরে প্রয়াগের সাক্ষরতা সাধন

প্রয়াগ মহিলা-বিদ্যাপীঠের কৃতী প্রতিষ্ঠাতা ও ভাইস্-চ্যান্সেলার বাবু সঙ্গমলাল আগরওআলা তিন বৎসরে এলাহাবাদের প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে লিখনপঠনক্ষম করিবার একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। অধ্যাপক, শিক্ষক, ছাত্র প্রভৃতি শিক্ষিত লোকেরা তাঁহার সহায় হইয়াছেন। তাঁহার সাফল্য সম্বন্ধে আমরা আশান্বিত।

বঙ্গের কোন একটি ছোট গ্রামেরও লোকেরা কি প্রতিজ্ঞা করিতে ও তাহা রক্ষা করিতে পারেন না যে, তিন বৎসরে তাঁহারা তাঁহাদের গ্রামটিকে সম্পূর্ণ নিরক্ষরতা-বর্জিত করিবেন?

"সংস্কৃত শিক্ষা"

রবীন্দ্রনাথ অগণিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ যেমন লিখিয়াছেন, তেমনই বালকবালিকাদের জন্য বিদ্যালয়-পাঠ্য মনোজ্ঞ গ্রন্থও অনেকগুলি রচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ চল্লিশ বৎসর পূর্বে শান্তিনিকেতনে যখন নূতন প্রণালীতে বিদ্যালয় স্থাপন করেন তখন তিনি তাঁহার অবলম্বিত শিক্ষণপন্থার উপযোগী এইরূপ কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন, পরেও চিত্তাকর্ষক এইরূপ বহি কয়েকখানি লিখিয়াছেন। বিশ্বভারতী যে "রবীন্দ্র-রচনাবলী" খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছেন, এই পাঠ্য গ্রন্থগুলিও তাহার অন্তর্গত হওয়া উচিত। এইরূপ পাঠ্য গ্রন্থে তাঁহার এমন অনেক রচনা আছে, যাহা বয়স্করাও পড়িয়া আনন্দ ও শিক্ষালাভ করিতে পারে। কতকগুলিতে তাঁহার অভিনব শিক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষানৈপুণ্যের পরিচয় আছে। আমরা জানিলাম, "রবীন্দ্র-রচনাবলী"র একটি খণ্ডে এই পাঠ্যগ্রন্থগুলি সন্নিবিষ্ট করিবার অভিপ্রায় বিশ্বভারতীর গ্রন্থনাধ্যক্ষ মহাশয়ের আছে।

বেঙ্গল লাইব্রেরির মুদ্রিত পুস্তকতালিকায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "সংস্কৃত শিক্ষা" প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের উল্লেখ আছে। এই বই দুই খণ্ড প্রবাসীর পাঠক-মহাশয়দের কাহারও নিকট থাকিলে তাহা বিশ্বভারতীর গ্রন্থণাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দেখিতে দিলে বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ বিশেষ কৃতজ্ঞ হইবেন। ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, কলিকাতা, এই ঠিকানায় বহিগুলি প্রেরণ করিলে তিনি পাইবেন।

জনৈক যুবকের প্রতি

গত ১লা জানুয়ারী প্রাতঃকালে জনৈক যুবক আমার বাসায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। যত দূর মনে পড়িতেছে তাঁহার পারিবারিক পদবী "ঘটক"; নাম বোধ হয় দেবেন্দ্রনাথ। তিনি পুনর্বার আমার সহিত দেখা করিলে বাধিত হইব। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

সাম্প্রদায়িক ভাষা ও সাম্প্রদায়িক ইতিহাস

অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম.এ.

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িক ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। সেই একই বিষয়ের এবং সঙ্গে সঙ্গে, এক শ্রেণীর বিদ্যালয়ে যে বিকৃত সাম্প্রদায়িক ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহারও আলোচনার আবশ্যকতা আবার উপস্থিত হইয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের প্রতিবাদকল্পে কলিকাতায় যে বিরাট সভা হইয়াছিল (২১, ২২, ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৪০), সেখানে দেখা গেল যে শিক্ষাব্রতীদিগের মধ্যে অনেকেরই এ-বিষয়ে জ্ঞান অল্প এবং ধারণা অস্পষ্ট। বাংলা ভাষা এবং ভারতের ইতিহাস শনৈঃ শনৈঃ যে সাম্প্রদায়িকতারূপ রাহুর কবলে গিয়া পড়িতেছে, শিক্ষিত বাঙ্গালীর অধিকাংশই সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত নহেন। অথচ প্রত্যেকেরই এ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হওয়া উচিত। এজন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধে, নূতনতম দৃষ্টান্তসহ, সাম্প্রদায়িক ভাষা ও সাম্প্রদায়িক ইতিহাসের একটা ধারণা দিবার জন্য ঐ বিষয়ের পুনরবতারণা করা যাইতেছে।

একটা কথা প্রথমেই বলিয়া রাখা আবশ্যক মনে করি। মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য একটা পৃথক্ বাংলা ভাষা এবং তাঁহাদের জন্য পৃথক্ ধরণের ইতিহাস হওয়া উচিত কিনা, এই বিষয়ে যুক্তিতর্কের অবতারণা করা একান্ত অনাবশ্যক। এস্থলে আমি কেবল বাস্তব পরিস্থিতির একটা চিত্র দিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিব।

সাম্প্রদায়িক ভাষা

একখানি বর্ণপরিচয়ের বই হইতে আরম্ভ করিব। শ্রীযুক্ত এ. এম. শারফুদ্দীন আহ্‌মদ প্রণীত "আমার মক্তব পাঠ," ১ম ভাগ, "মক্তব মাদ্রাসা ও মুসলিমপ্রাইমারী স্কুলের প্রথম শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত (কলিকাতা গেজেট ৭।১২।৩৯ ইং)।" এই পুস্তকে অ, আ, ক, খ হইতে যুক্তবর্ণ পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। বর্ণ শিক্ষা দেওয়ার জন্য—**অজ, আম,** প্রভৃতির সঙ্গে **নজর, ফজর, তলব, চাচা, জানাবা, খলিফা, হাদিস, মোনাজাত,** ইত্যাদি যে-সকল শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিব না। নিম্নে যে বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিতেছি, উহা দ্বারাই পুস্তকের শিক্ষিতব্য ভাষার ধারণা করিতে পারিবেন।

> ফজর হইল।
> শীতল পানি আন।
> এলেম শিখিলে আলেম হইবে।
> খোদা বড় মেহেরবান্।
> মিথ্যা বলা বড় গুনাহ্।
> আস্‌মানে চাঁদ উঠিয়াছে।
> মুরুব্বির বাক্য লঙ্ঘন করিও না।
> (মুরুব্বি=গুরুজন)
> পানির অপর নাম অম্বু।
> নাপাক জিনিষ স্পর্শ করিও না।
> ইত্যাদি।

একটী কুকুর এক মাংসের টুক্‌রা মুখে লইয়া সেতুর উপর দিয়া যাইতেছিল ইত্যাদি গল্প অনেকেই বাল্যকালে পড়িয়াছেন। এই পুস্তকে সেই গল্পটি আছে এবং উহার একটী বাক্য এই :—

> তাহার মুখ হইতে গোশ্‌তের টুক্‌রা পানিতে পড়িয়া গেল (পৃঃ ২০)।

"সৈয়দ আহমদ" নামক গল্পে :—

> সৈয়দের আম্মা ইহা জানিতে পারিয়া……ভয়ানক চটিয়া গেলেন।…
>
> জননীর কথা শুনিয়া বালক সৈয়দের ভয় হইল। তিনি "খালা—আম্মার" বাড়ীতে পলাইয়া গেলেন।

"চোরের শিক্ষা" গল্পে :—

> আমি বড়ই গরীব। তাই এই গোনাহের কাজ করিতে আসিয়াছি।……
>
> এরূপ মহৎ ব্যক্তি দুনিয়ায় কমই পয়দা হইয়াছেন।

এই পুস্তকের ৩৩ পৃষ্ঠায় একটী কবিতা আছে। কবিতার নীচে আছে—"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।" কবিতাটির

প্রথম ছত্র—"সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি।" কবিতাটির নাম দেওয়া হইয়াছে—**"মোনাজাত।"** পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ কবে যে "মোনাজাত" লিখিয়া ফেলিলেন, তাঁহা কেহ জানেন কি ?

উপরে যে পুস্তকখানির কথা বলা হইয়াছে, উহার নামেই প্রকাশ যে উহা মক্তবপাঠ্য। অবশ্য, যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা বেশী সেখানে উহা হিন্দু ছাত্রগণকেও পড়ান হয়, অথবা হইবে, এরূপ আশঙ্কা অমূলক নহে।

কিন্তু আর একখানি বর্ণপরিচয়ের কথা বলিতেছি, যাহা হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর ছাত্রের "মনোনীত" পাঠ্য। বইখানির এক পৃষ্ঠায় কতগুলি বই বিক্রয় হইয়াছে তাহার একটা হিসাব দেওয়া হইয়াছে। এই হিসাবে এই বইখানির প্রায় ৫০ হাজার খণ্ড বিক্রয় হইয়াছে, অনুমান করা যায়।

এই বইখানিতে মাঝে মাঝে মক্তবী ভাবের শব্দ ও বাক্য প্রবিষ্ট করান হইয়াছে। "অজগর আস্‌ছে তেড়ে" ইত্যাদি ছড়া অনেকেই শুনিয়াছেন। আলোচ্য বইখানিতে কতকগুলি নিজস্ব ছড়া আছে। তন্মধ্যে—"ঈদের নামাজ পড়ে", "কু-কু-কু মোরগ ডাকে", "জসীমের মাথায় ঝুড়ি", "তাজে বেশ মানায় মাথা", ইত্যাদি লক্ষ্য করিবার মত। ই'কার শিখিতে গিয়া হিন্দু বালকও পড়িবে—"করিম", "রহিম", "জলিল", ও'কারে—"ভোরে মোরগ ডাকে", "রহিম কোরাণ পড়ে", ল'ফলা শিখিয়া হিন্দু বালক বলিতে শিখিল—"হে আল্লা দয়া কর", "ক্ক" শিখিয়া—"লতিফের পিতা মক্কায় গিয়াছেন"—ইত্যাদি।

কৌতূহলী পাঠকের জন্য বলিয়া দিতেছি যে এই বই খানির নাম "আলোকমালা", ১ম ভাগ, লেখক কবি গোলাম মুস্তাফা।

যাহা হউক, খাঁটি মক্তবপাঠ্যের কথা আবার ধরা যাউক। শ্রীযুক্ত শারফুদ্দীন সাহেবের বইয়ের মত অতটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ* না হইলেও, অন্যান্য গ্রন্থকারের মক্তবপাঠ্য বর্ণ পরিচয় পুস্তকগুলি একেবারে "বৈশিষ্ট্য" বর্জ্জিত নহে। কারণ, তাহা হইলে, ওগুলি পাঠ্য হইতে পারে না। যথা, কাজী আকরম হোসেন প্রণীত "মক্তবের বর্ণশিক্ষা।" (Cal. Gazette 7-12-39) ইহাতে **কল, ভয়, রস,** প্রভৃতির সঙ্গে **হক, শরম, হজরত, রহমত,** ইত্যাদি এবং **কাঠ, দাদা,** প্রভৃতির সঙ্গে **খানা, নানা, আজান, হারাম, আসমান,** ইত্যাদি আছে।

"আজান দাও" "নামাজ পড়", "বাদাম বড় মজা" (মজা=সুস্বাদু ?), "জৈতুন একটী ফলের নাম" ও "মুরুব্বির কথা রাখিবে" প্রভৃতি বাক্যের সঙ্গে লেখক "কেউ বলে হরি কেউ বলে আল্লা" এই বাক্য লিখিয়া যে সৎসাহস দেখাইয়াছেন তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

"আম্মা" "হিম্মত" "কুর্সী" ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ বাহুল্যভয়ে ত্যাগ করিলাম।

এই প্রসঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী বাঙ্গালীগণের কথাও মনে পড়ে। যদি তাঁহারাও খ্রীষ্টীয় "ভাবধারা"র সঙ্গে কোমলমতি খ্রীষ্টীয় বালকবালিকাগণকে পরিচিত করাইবার জন্য অভিনব বর্ণপরিচয় লিখিতে আরম্ভ করেন, তবে তাহা কেমন হইবে ? মনে হয় কতকটা নিম্নলিখিত প্রকারের হইবে।

কর, খল, ইত্যাদির—তাঁহারা হয়ত, জন (John), পল (Paul), গড, এই সব শিখাইবেন। আ'কার ইকার ইত্যাদির দৃষ্টান্ত হইবে,—ইভা, বিশপ, যীশু, মেরী, হেভেন, হেল, কফিন, পিগ্; ফলা অর্থাৎ যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উদাহরণ হইবে—খৃষ্ট, প্রেয়ার (Prayer=মোনাজাত), চার্চ্চ, লাঞ্চ, রিচার্ড, গুড্‌ফ্রাইডে। বাক্য শিখাইতে হইলে, ধরুন—এস, আমরা মঞ্চে বসিয়া লাঞ্চ (lunch) খাই; গড খুব মার্সিফুল, বানানা এক প্রকার ফল, ইত্যাদি পড়ানো হইবে। বাঙ্গালী খ্রীষ্টানেরা যদি জিদ ধরেন, তবে এরূপ ব্যাপার অসম্ভব নহে।

বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে যাঁহারা কর্ত্তৃস্থানীয় (authorities) তাঁহারা ইহার বিচার করুন। আমি কেবল ব্যাপারটা দেখাইয়া দিতে চাই; মতামত প্রকাশ করিতে চাই না।

---

*"আমার মক্তবপাঠ" পুস্তকগুলি ইস্‌লামিয়া লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। প্রকাশকেরা বিজ্ঞাপন পুস্তিকায় বলিতেছেন—"সাহিত্যের ভিতর দিয়া কোমলমতি বালকবালিকাগণকে মুস্‌লিম ভাবধারার সহিত পরিচিত করাইবার জন্য গ্রন্থকার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।"

কিন্তু কেবল শিশু-শ্রেণীর পুস্তক দেখিয়া পাঠক সন্তুষ্ট না হইতে পারেন। সেইজন্য একখানি ৪র্থ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক হইতে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিতেছি। এই পুস্তকখানিও 'শ্রীযুক্ত' এ. এম. শারফুদ্দীন কর্ত্তৃক রচিত এবং ১৯৪০ সালের পাঠ্য। নিম্নে কতকগুলি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি :—

১। এক এক জায়গায় আবার দরিয়ার পানি অত্যন্ত গভীর। (পৃঃ ১৩)

অন্ধকার রাজ্যে বাসোপযোগী সমস্ত সুবিধাই আল্লাহ্‌তালা করিয়া দিয়াছেন। (পৃঃ ১৫)

২। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হইতেছিল যে, ইহা ত বালুকা দরিয়া নয়, ইহা যেন তরল অগ্নি দরিয়া।

মরুযাত্রীর দল ভয়ে ও বিস্ময়ে…খোদাতালার নাম করিল। (পৃঃ ৫৫)

অগাধ অনন্ত দরিয়ার বুকে যেমন দ্বীপ, তেমনি মরু-দরিয়ার বুকে এই সব মরূদ্যান। (পৃঃ ৫৭)

পানির আশায় তাহারা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে, কিন্তু কোথায় পানি? (পৃঃ ৫৬)

৩। বেদনায় তাঁহার চোখে পানি আসিল।…আপনি অযথা আমার নেক্‌বখত আব্বার প্রতি নির্দ্দয় অভিযোগ করিতেছেন। (পৃঃ ১৮—১৯)

৪। বাদশাহ তাঁহার মুল্লুকের সবাইকে তাঁহার বাড়ীতে দাওয়াত করিলেন। (পৃঃ ২৫)

৫। আগুন আর পানি একত্র হইলেই বাষ্পের সৃষ্টি হয়। (পৃঃ ৬০)

এই বাষ্প…স্তম্ভের মত হইয়া আসমানের দিকে ছুটিয়া যায়। (পৃঃ ৬২)

৬। তিনি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ৭৭ বৎসর বয়সে এন্তেকাল করেন। (পৃঃ ৬৫)

৭। বাবর তখন একমনে আল্লাহ্‌তালার নিকট মোনাজাত করিতে লাগিলেন। (পৃঃ ৭০)

দ্রষ্টব্য :—আবার ঐ গল্পেই আছে :—

"খোদাতা'লা বান্দার আকুল প্রার্থনা শুনিলেন।" (পৃঃ ৭১)

৮। একজন ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন—আমাদের যে সব পূর্ব্ব-পুরুষ এন্তেকাল করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পানি প্রেরণ করিতেছি (পৃঃ ৭৫)

আল্লাহ্‌তালার এবাদতের জন্য দুনিয়া ত্যাগ ও ফকিরী গ্রহণ অনাবশ্যক।

৯। এই বালকটি বড় হইয়া তাহার বীরত্বে ও হিম্মতে সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিবে। (পৃঃ ১০১)

একদিন শোনা গেল শিবাজীর বড় বেমার হইয়াছে। (পৃঃ ১০২)

এই পর্য্যন্ত গদ্য লেখার উদাহরণ দিলাম। এখন পদ্যের সম্বন্ধে কিছু শুনুন :—

কবি জসীমউদ্দীন রচিত "মুন্‌সা সাহেব" হইতে :—

সেই দরজা পার হইয়া মুসল্লিরা যায় চলে যায়,
জরীর জামা, জরীর জুতো, বেহেস্তি লেবাস পরে গায়

*　　*　　*

তখন খোদার আদেশ পেয়ে দোজখ হতে জননী তার,
ভেস্তে যাবে হাত ধরিয়ে পুণ্য পেয়ে ছোট্ট খোকার।

কবি নজরুল ইস্‌লাম রচিত "মোহ্‌ররম" কবিতা হইতে :—

নীল সিয়া আস্‌মান, লালে লাল দুনিয়া;
"আম্মা! লাল্ তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।

*　　*　　*

গড়াগড়ি দিয়া কাঁদে কচি মেয়ে ফাতিমা;
"আম্মা গো, পানি দাও, ফেটে গেল ছাতিমা।"

শ্রীযুক্ত শারফুদ্দীন আহমদের পুস্তকের ভাষা যে সর্ব্বত্রই পূর্ব্বোক্তরূপ তাহা নহে। বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরচ্চন্দ্রের মত ভাষাও আছে। আবার বিষয়বৈচিত্র্যেও পুস্তকখানি সমৃদ্ধ। "রাণা প্রতাপের দেশপ্রীতি", "প্রতাপাদিত্য", "শিবাজি", "রণজিৎ সিংহ", "কবীর ও নানক" প্রভৃতি গল্প এবং রবীন্দ্রনাথের "শরৎ", যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর "কর্ম্মের গৌরব", কুমুদরঞ্জন মল্লিকের "মুক্তিপিপাসা" অপরিবর্ত্তিত ভাষায় এবং গোলাম মুস্তাফার "বাংলা দেশ" এই সব পদ্য রচনাও পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। পুস্তকের সঙ্কলনকর্ত্তা নিজেও বেশ ভাল বাংলা লিখিতে পারেন, মনে হয়।

উপরে যে উদাহরণগুলি দিয়াছি, তন্মধ্যে ১ ও ২ সংখ্যক উদাহরণ সম্পর্কে কিছু বলিবার আছে। প্রথমটি হইল জয়ন্তকুমার ভাদুড়ীর রচনা, "পরিবর্ত্তিত" করিয়া উদ্ধৃত। দ্বিতীয়টি যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের রচনা, ঐ একই প্রকারে "পরিবর্ত্তিত", মূল লেখকগণের মত লইয়া

"পরিবর্ত্তন" করা হইয়াছে কিনা জানি না, হইলেও "পরিবর্ত্তিত" ভাষা নিশ্চয়ই মূল লেখকের নহে, এ অনুমান অসঙ্গত নহে। কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন—এইরূপ "পরিবর্ত্তন" কি সকল লেখকের বেলা ঘটান যায়? ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলকেই কি এমন "পরিবর্ত্তন" করা যাইতে পারে না যে তাঁহাদের চেনাই কঠিন হয়? উত্তর:—এরূপ করা যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের "মোনাজাত" কবিতাটিকেই ধরা যাউক, কেহ যদি উহাকে মক্তবের ছাঁচে "পরিবর্ত্তন" করিতে চায়, তবে কতকটা এইরূপ দাঁড়াইবে:—

ফজরে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি।
সারারোজ আমি যেন নেক্ হয়ে চলি॥
আদেশ করেন যাহা মুরুব্বিরগণে।
আমি যেন সেই কাজ করি ভাল মনে॥

বাকীটা পাঠক নিজে চেষ্টা করিবেন। আমার বক্তব্য এই যে এই কার্য্য সম্ভব। তবে, "কবিতার ভাল মন্দ কিছুই না জানি।"

কিন্তু মুসলমান পাঠ্যপুস্তক-সঙ্কলনকারীদের অথবা লেখকদের সকলেই এক রকম নহেন। ৭।১২।৩৯ তারিখের কলিকাতা গেজেটে মনোনীত "সবুজসাহিত্য" ২য় ভাগ, নামক একখানি পুস্তক দেখিলাম। ইহা মৌলবী মহফুজুর রহমান খান প্রণীত। এখানির সঙ্গে পূর্ব্ববর্ণিত "আমার মক্তব-পাঠ" পুস্তকের প্রকৃতিগত পার্থক্য বিদ্যমান। মোটামুটি বইখানি আগাগোড়া পড়িয়া পূর্ব্বে উদ্ধৃত বাক্যগুলির মত একটিও চোখে পড়িল না। এ পুস্তকেও "মহসিন ও চোর" গল্পটি আছে। এখানে চোর বলিতেছে:—"...বাধ্য হইয়া এই নিন্দিত পাপ কাজে হাত দিয়াছি।" "গোনাহ" শব্দ নাই। এমন কি বিদ্যাসাগরের গল্পও আছে। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যোগীন্দ্র সরকার, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি কবির কবিতা অ-"পরিবর্ত্তিত" আকারেই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। কবি জসীমউদ্দীন ও নজরুলও এখানে এই অ-"পরিবর্ত্তিত" ভাষায় কবিতা লিখিয়াছেন। আশা ও আনন্দের কথা, সন্দেহ নাই।

বলিয়া রাখা দরকার যে "সবুজসাহিত্য" বইখানি "ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের যাবতীয় প্রাইমারী স্কুল, জুনিয়ার মাদ্রাসা ও এম-ই স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রূপে অনুমোদিত।" সুতরাং ইহা, "আমার মক্তব-পাঠ" বইখানির মত একেবারে খাস মক্তবপাঠ্য পুস্তক নহে।

"সবুজসাহিত্যে"র মতই আর একখানি পুস্তকের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে, যদিও এখানি কেবল মক্তবেরই পাঠ্য। ইহার নাম—"মক্তব সাহিত্য"—২য় ভাগ। প্রণেতা, শিক্ষাবিভাগের ভূতপূর্ব্ব এসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর খান্ বাহাদুর আহ্‌ছান উল্লা এম. এ। পুস্তকের ৪৩টি পাঠের ২।৩টি বাদে সকলগুলির ভাষাই আমাদের পরিচিত পুরাতন প্রকৃতির বাংলা ভাষা। রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন দাশ, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির কবিতাও আছে—"পরিবর্ত্তিত" নহে। কাশীরাম দাসের মহাভারত হইতেও খানিকটা আছে। সৈয়দ এমদাদ আলীর "সেকেন্দ্রা" কবিতার ভাষা যে কোন হিন্দু কবির মতই। বিষয়-সম্ভারও অকিঞ্চিৎকর নহে। অন্য পাঠগুলির সঙ্গে সঙ্গে, "ভারতের প্রাচীন সভ্যতা", "বিশ্বামিত্র", "রামচন্দ্র", "কৌরব ও পাণ্ডবগণ", "অশোক," "হর্ষবর্দ্ধন" ইত্যাদি আছে। খানবাহাদুর এর জন্য ধন্যবাদার্হ। কেবল "মোনাজাত" (কবিতা), ও "ঈমান" গল্পে আরবী শব্দের প্রাচুর্য্য দেখা যায়।

আমরা অবশ্য জানি না যে ছাত্রদিগকে "মুসলিম ভাবধারার সহিত পরিচিত" করাইবার জন্য সৃষ্ট "আমার মক্তব-পাঠ" শ্রেণীর পুস্তকের বিক্রয় বেশী, না "সবুজ সাহিত্য' ও "মক্তব সাহিত্যে"র মত পুস্তকের চলন বেশী। বলা বাহুল্য, সব কয়খানি পুস্তকই ১৯৪০ সাল হইতে পাঠ্যরূপে মনোনীত।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে বাঙ্গালী মুসলমানেরা যদি পৃথক মাতৃভাষা রূপে উর্দ্দুকে গ্রহণ করিতে চাহেন, তবে কষ্টকর হইলেও তিনি তাহা সহ্য করিতে প্রস্তুত। কিন্তু তাঁহারা যদি বাংলা ভাষাকেই গ্রহণ করেন, তবে যেন উহা খাঁটি বাংলা হয়।* তাঁহার

* প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩৯।

পরামর্শ অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় নাই বোধ হইতেছে।

অধিকন্তু, মাধ্যমিক শিক্ষা বিল সম্পর্কে আন্দোলনের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ব্যবস্থাপক সভার ভোটসংখ্যার জোরে, এবং প্রস্তাবিত শিক্ষাবোর্ডের ভোটাধিক্যে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্র ছাড়াইয়া মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রেও, আরবীমিশ্রিত বিকৃত বাংলা ভাষা বাংলার সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইবে—এই অশুভ আশঙ্কা বাঙ্গালীকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে।

সাম্প্রদায়িক ইতিহাস

সম্প্রদায় হিসাবে, যেমন বাংলা ভাষাকে দুই ভাগ করার চেষ্টা হইতেছে, তেমনি ইতিহাসকেও দ্বিখণ্ডিত করার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। ভারতীয় ইতিহাস-মহাসভার (Indian History Congress) কলিকাতায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতিরূপে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলিয়াছিলেন যে, কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের মনস্তুষ্টির জন্য ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত অথবা লুক্কায়িত করা ইতিহাসলেখকের পক্ষে ঘোরতর অন্যায় কার্য্য। যাঁহারা বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তক লেখেন, তাঁহারা কেহ কেহ ঐতিহাসিক, অর্থাৎ ইতিহাস অধ্যয়ন, আলোচনা ও গবেষণা করা তাঁহাদের জীবনের ব্রত। কিন্তু সকল ইতিহাসপুস্তকলেখক ঐরূপ নহেন। শেষোক্ত শ্রেণীর লেখকদিগের প্রকৃত ঐতিহাসিক-দিগের অভিমত অনুসরণ করা উচিত। এবং এ-বিষয়ে কোন ঐতিহাসিক সত্য কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের মনঃপূত হইবে কিনা, এই বিবেচনার বশীভূত হইয়া ইতিহাস পুস্তক লেখা কোনক্রমেই উচিত নহে। দুঃখের বিষয়, এক শ্রেণীর লেখক এ-বিষয়ে নিজেদের কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস পুস্তক লিখিতে বসিয়া ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত অথবা খণ্ডিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কোন ঐতিহাসিক চরিত্র সম্বন্ধে অপ্রিয় সত্য কথা সহ্য করিবার মত মানসিক শক্তি যদি কোন ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের না থাকে, তবে আবশ্যক হইলে ঐ চরিত্র পাঠ্যপুস্তক হইতে একেবারে বাদ দেওয়া বরং ভাল, তথাপি উঁহার সম্বন্ধে সত্য কথাকে আংশিক ভাবে কিংবা বিকৃত করিয়া প্রকাশ করিয়া পাঠককে প্রতারণা করা উচিত নহে।

আমি এই প্রবন্ধে পাঁচখানি ইতিহাস-পুস্তক হইতে দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, কি প্রকারে বিদ্যালয়পাঠ্যপুস্তকে ঐতিহাসিক সত্যকে কোথাও বিকৃত, কোথাও খণ্ডিত, কোথাও বা লুক্কায়িত করার চেষ্টা হইয়াছে। এই কার্য্যের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ ভারতবর্ষের তুর্কী-আরব-পাঠান-মোগল যুগের শাসকগণকে যেন নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, প্রায় নিখুঁত মানুষরূপে চিত্রিত করা। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি নিবারণের উদ্দেশ্যে সব পুস্তকগুলি হইতে মাত্র দুই-একটি বিষয়ের উদাহরণ দিতেছি। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে ঐ পুস্তকগুলি এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন:—

১। মৌলবী আব্দুস্ সাত্তার প্রণীত **ভারতবর্ষের ইতিহাস** (মক্তবের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর এবং জুনিয়ার মাদ্রাসার পাঠ্য)—প্রকাশক হাজী আব্দুল মজীদ, ৮ নং হেমচন্দ্র ষ্ট্রীট, খিদিরপুর, কলিকাতা। কোন্ সালে মুদ্রিত, পুস্তকের কোথাও লেখা নাই এবং পাঠ্যপুস্তক সমিতির অনুমোদিত কি না, আমার হাতের পুস্তকখানিতে তাহাও লেখা নাই। তবে কোন বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইত, পুস্তকখানি দেখিয়া ইহা মনে হয়। এই পুস্তকে যে মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, একটু পরিবর্ত্তিত অথবা কিঞ্চিদ্গুপ্ত আকারে তাহা অন্য পুস্তকেও দেখা যায়।

আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন:—

"আওরাঙ্গ জেব অতিশয় নিষ্ঠাবান্ মুসলমান ছিলেন। ইসলামধর্ম্মের প্রতি সম্রাটের এইরূপ অনুরাগ দেখিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে সমস্ত রাজ্যব্যাপী হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে ও ইসলামধর্ম্মের বিরুদ্ধে নানারূপ কুৎসা রটাইতে আরম্ভ করে। অবশেষে ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে সংবাদ পৌঁছে যে থাটা, মুলতান, বেনারস প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণেরা প্রকাশ্যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিয়া মুসলমান বিদ্যার্থীদিগকে বিপথে লইয়া যাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। ইহাতে দেশময় অশান্তির সৃষ্টি হয়। তখন সম্রাট দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। শাসনকর্ত্তারা সম্রাটের আদেশ পালন করিতে যাইয়া বেনারসের কেশবমন্দির

(?) ধ্বংস করিলেন। কথিত আছে উহার উপর মসজিদ স্থাপন করা হয়।" ইত্যাদি (পৃ. ১৩০-৩১)

আওরঙ্গজেবের আদেশে সারাভারতব্যাপী যে বহু হিন্দুমন্দির ধ্বংসকার্য্য চলিয়াছিল, তাহা লেখকের বর্ণনায় মাত্র একটি মন্দিরে সীমাবদ্ধ হইল এবং এ কার্য্যও "ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের" দোষেই ঘটিয়াছিল!

জিজিয়া সম্বন্ধে লেখকের মত এই :—

"সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রজাসাধারণের উন্নতিকল্পে সর্ব্বশুদ্ধ ৮০ প্রকার টেক্স উঠাইয়া দিয়া কেবলমাত্র জিজিয়া ও জাকাত এই দুই প্রকার কর আদায় করিতেন। বিদ্রোহ দমনার্থে ও বৈদেশিকদিগের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য মুসলমান প্রজাগণকে স্বীয় প্রাণ দিয়া যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিতেন, কিন্তু অমুসলমান প্রজাগণকে তদ্রূপ বাধ্য করা হইত না। সুতরাং তাহাদের ধনজন রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ও সামরিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রত্যেক অমুসলমান সমর্থ ও বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষের প্রতি বার্ষিক এক দেবেন অর্থাৎ সাড়ে চারি আনা করিয়া শাসনকর লইতেন। ইহাই জিজিয়া কর।" (পৃ. ১৩১)

জিজিয়া কর যে এমন একটি সুন্দর, সুবিবেচনাপ্রসূত কর, এবং উহার পরিমাণও মাত্র বার্ষিক ।১০ আনা (কয়েক টাকা নহে), তাহা বোধ হয় আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক সর্ যদুনাথ সরকার জানিতেন না। জানিলে, এত পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়া সময় নষ্ট করিতেন না।

রাজপুত জাতি সম্রাট মহীউদ্দীন মোহম্মদ আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে কেন বিদ্রোহ করিয়াছিলেন (না, করিয়াছিল ?), লেখক তাহারও একটি উত্তম কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন :—

"রাজপুত রাজারা দেখিলেন আওরঙ্গজেবের শাসন বড় দৃঢ়। তাঁহার রাজত্বে যদৃচ্ছা সুখভোগ করা সম্ভবপর নহে। তাঁহারা আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন ও মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইলেন।" (পৃ. ১৩২)

লেখকের আর একটু মন্তব্যও শুনুন :—

"তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যে সকল সম্রাট ছিলেন তাঁহাদের সময়ের শাসনত্রুটির সংস্কার করিতে যাইয়া এবং মোগল সাম্রাজ্যকে ইসলামের আদর্শে গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টায় তিনি অনেকের অপ্রিয় হইয়াছিলেন।" (পৃ. ১৩৫)।

যে-সকল পাঠক মনে করিবেন যে জিজিয়া করের নূতন ব্যাখ্যা ও উহার প্রত্যক্ষ সমর্থন "অননুমোদিত" পুস্তকে থাকিতে পারে, কিন্তু "অনুমোদিত" পুস্তকে নাই তাঁহাদের অবগতির জন্য নিম্নে একখানি প্রচলিত পাঠ্য পুস্তকের নাম করিতেছি।

২। **সংক্ষিপ্ত ভারত ইতিহাস**—খান বাহাদুর কাজি আবদুর রসিদ বি-এ প্রণীত, এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস চ্যান্সেলার মিঃ এ. এফ. রহমান বি-এ (অক্সন্) কর্ত্তৃক পরীক্ষিত (revised)। পাঠ্যপুস্তক-সমিতি (Text-book Committee) কর্ত্তৃক বইখানি সমস্ত উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর জন্য মনোনীত। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে বইখানির ২০শ সংস্করণ হইয়া গিয়াছে।

এই পুস্তকেও জিজিয়া করকে ১ম সংখ্যক পুস্তকের যুক্তির মত যুক্তি দিয়া সমর্থন করা হইয়াছে। তবে, জিজিয়ার পরিমাণ চৌদ্দ পয়সা কি আঠার পয়সা, এরূপ কিছু লেখা হয় নাই। আরঙ্গজেবের চরিত্রে অবশ্য গুণ ভিন্ন কোন দোষ ছিল না, লেখক এইরূপ বর্ণনাই দিয়াছেন।

৩। **মক্তব ইতিকথা**—এ. এম্. সিরাজউল হক্ বি-এ প্রণীত। প্রকাশক মখ্‌দুমী লাইব্রেরী, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার। ২৪-৯-৩৬ তারিখের কলিকাতা গেজেট অনুসারে, এই পুস্তকখানি মক্তবের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পাঠ্য। অন্ততঃ, পুস্তকের নাম-পত্রে (title page) এইরূপ লেখা আছে। মক্তবের সরকারী পাঠ্য-বিষয়-তালিকা (Syllabus) অনুযায়ী পুস্তকে ভারতের প্রাচীন যুগের ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত, অর্থাৎ কেবল এই কয়টি বিষয় আছে :—আমাদের দেশ, প্রাচীন হিন্দুদিগের সমাজ ও রাজনীতি, কতিপয় হিন্দুরাজ্যের বিবরণ, বুদ্ধদেব, আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ, বৌদ্ধযুগে ভারতের সামাজিক অবস্থা। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে ঐ তালিকা হইতে হিন্দুযুগের বড় বড় কয়েকটি গৌরবময় বিষয় বাদ দেওয়া হইয়াছে, যথা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য, অশোক, বিক্রমাদিত্য, সমুদ্রগুপ্ত, হর্ষবর্দ্ধন। ইহাই হইল খাঁটি মক্তব-পাঠ্য তালিকা। অন্ততঃ ১৯২৯ সালে যে নূতন সিলেবাস

তৈয়ারী হয়, তাহা এইরূপ। ইহার পরে সিলেবাস বদল হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। যদি হইয়া থাকে আমার ভ্রম সানন্দে সংশোধন করিব।

যাহা হউক, আওরঙ্গজেবের সম্বন্ধে গ্রন্থকারের অভিমত এই :—

"আওরঙ্গজেব ইস্‌লাম ধর্ম্মকেই একমাত্র পবিত্র এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। ইহাতে হিন্দুগণ তাঁহাকে অপ্রীতির চক্ষে দেখিতেন।" (পৃ. ৮০)

"ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি ধর্ম্মের বিধানগুলি অতি সূক্ষ্মভাবে পালন করিতেন...প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন খাঁটি ফকীর ছিলেন...

"এতগুলি গুণ থাকা সত্ত্বেও আওরঙ্গজেবের সময় হইতেই মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত হয়। এই সময় রাজপুতগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠেন।" (পৃ. ৭৭)

কেন যে রাজপুতগণ বিদ্রোহী হইলেন, তাহা উল্লেখ নাই। গ্রন্থকার এখানে জিজিয়া করের কথা মোটেই তুলেন নাই। এক রকম ভালই করিয়াছেন।

কিন্তু "মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ" লিখিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন :—

"...সম্রাট আকবর বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় জাতির সহায়তা ও সহানুভূতির উপর স্থাপিত হইলেই মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়তর হইবে। তাই তিনি হিন্দু মুসলমানকে সমান চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার উদারনীতির ফলে হিন্দুগণ তাঁহার অনুগত হইয়াছিল। মারহাট্টা ও রাজপুতদিগের সহিত অনবরত যুদ্ধবিগ্রহে বহু অর্থ ও সৈন্যক্ষয় হয়। এইরূপে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই সাম্রাজ্য ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে কেহই তেমন ক্ষমতাশালী ছিলেন না।" (পৃ. ৮১)

উক্ত বিবরণে আওরঙ্গজেবের কোন্ কার্য্য যে সম্রাজ্যের পতনের কারণ হইয়াছিল, এরূপ বলা হয় নাই। আকবরের "উদারনীতির ফলে হিন্দুগণ তাঁহার অনুগত হইয়াছিল ;" কিন্তু আওরঙ্গজেবের কোন্ নীতির ফলে হিন্দুগণ কিরূপ ভাব অবলম্বন করিয়াছিল, লেখক তাহা প্রকাশ করা আবশ্যক অথবা সঙ্গত মনে করেন নাই। ইহা ঐতিহাসিক সত্যকে সংগোপন করার চেষ্টার মত মনে হয় না কি ?

৪। আমাদের চতুর্থ পুস্তক—**ছোটদের ইতিহাস,** কলিকাতা ইস্‌লামিয়া কলেজের অধ্যাপক কাজী আকরম হোসেন এম্. এ প্রণীত। সমগ্র বঙ্গদেশের প্রাইমারী স্কুল ও মক্তব সমূহের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পাঠ্য (কলিকাতা গেজেট ২৪-৯-৩৬)।

আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মন্তব্য :—

"...তাঁহার মত সাহসী, কষ্টসহিষ্ণু ও ধার্ম্মিক বাদশাহ্ জগতে খুবই কম দেখা গিয়াছে। এত সত্ত্বেও আওরঙ্গজেব সর্ব্বজনপ্রিয় হইতে পারেন নাই। তাঁহার কোন কোন কার্য্যে হিন্দু প্রজাগণ মনে ব্যথা পাইয়াছিল এবং রাজপুতগণ তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়াছিল।..." (পৃ. ১২৯)

এই লেখকও জিজিয়ার নাম করেন নাই এবং আওরঙ্গজেবের হিন্দুনির্যাতননীতিরও উল্লেখ করেন নাই। আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক পিতার প্রতি ব্যবহার :—

"এই সময় আওরঙ্গজেব তাঁহার সহিত যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিতেন এবং রাজকার্য্যে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।" (পৃ. ১২৭)

"তিনি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন...সন্ন্যাসীর মত কঠোর জীবন যাপন করিতেন।" (পৃঃ ১২৮)

৫। পঞ্চম পুস্তকখানি—**ছোটদের ইতিহাস,** লেখক গভর্ণমেণ্ট স্কুলের শিক্ষক জিয়াউদ্দিন আহ্‌মদ এম. এ., বি. টি.; ১৯৩৯ সালে ইহার পঞ্চম সংস্করণ বাহির হইয়াছে। প্রকাশক তাজমহল পাবলিশিং হাউস্, ঢাকা। পিতার প্রতি আওরঙ্গজেবের ব্যবহার সম্বন্ধে লেখক বলেন :—

"শাহ্‌জাহান ৮ বৎসর বন্দী অবস্থায় থাকিয়া অবশেষে প্রাণত্যাগ করেন। এই সময় আওরঙ্গজেব পিতাকে যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন ও রাজকার্য্যে তাঁহার সাহায্য লইতেন..." (পৃ. ৫৬)।

অন্যত্র :—

"আওরঙ্গজেব অত্যন্ত সাহসী ও পরিশ্রমী সম্রাট ছিলেন।... তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন।...রাজ্য বিষয়ক সমস্ত কাজ তিনি নিজেই নির্ব্বাহ করিতেন এবং প্রজাদের অভিযোগ শুনিয়া তাহার বিচার করিতেন।" (পৃ. ৬০)

আওরঙ্গজেবের এই পরিচয়কে কি ইতিহাসের দিক দিয়া পূর্ণ, আংশিক নহে, বলা যাইতে পারে ?

আর একটি কথা। এই বইগুলির প্রত্যেকখানিতেই আরঙ্গজেবের স্বহস্তে টুপি সেলাই এবং কোরাণ নকল করার কথাটি আছে। কিন্তু তাঁহার অচল অটল হিন্দুবিদ্বেষের কোন উল্লেখ নাই। ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁহারা একটুও আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা বলিতে বাধ্য হইবেন যে পূর্ব্বে উদ্ধৃত বর্ণনাগুলিতে আওরঙ্গজেবের

একটি পক্ষপাতমূলক চিত্র দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে।

আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া ইতিহাসে সাম্প্রদায়িকতার একটিমাত্র উদাহরণ দিলাম। আরও দেওয়া যায়। যথা:—

৫ সংখ্যক পুস্তকে শিবাজীর কথায় বলা হইয়াছে—

"শিবাজী চতুরতার সহিত আফ্‌জল খাঁর সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া সাক্ষাৎ করিতে যান। তখন শিবাজী কৌশলে আফ্‌জল খাঁকে বাঘনখ অস্ত্রের সাহায্যে নিহত করেন।"

(পৃ. ৬৩)

ইহা ঐতিহাসিক সত্য নহে, এ-কথা অনেকেই জানেন। "কৌশল" অবলম্বন করিয়াছিলেন আফজল খাঁ, সেই কৌশল প্রতিহত করিতে গিয়া শিবাজী তাঁহাকে নিহত করিতে বাধ্য হন।

৪র্থ সংখ্যক পুস্তকেও প্রত্যক্ষভাবে শিবাজীকে "কৌশলের" জন্য দায়ী না-করিয়া, পরোক্ষে সেই কথাই বলা হইয়াছে।

"উভয়ে তথায় সাক্ষাৎ হইলে শিবাজি বিজাপুরের সেনাপতিকে নিহত করিয়া ফেলিলেন।" (পৃ. ১৩০)

৩ সংখ্যক পুস্তকেও সেই প্রণালী অবলম্বিত:—

"শিবাজী সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন।* আফ্‌জল খাঁ স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু সাক্ষাৎকালে শিবাজী হঠাৎ আফ্‌জল খাঁকে হত্যা করিলেন।" (পৃ. ৮৪)

তবে, এই পুস্তকে, শিবাজীর একটি বিশেষ গুণ উল্লেখ আছে যাহা এই শ্রেণীর অনেক পাঠ্য পুস্তকে নাই—অর্থাৎ

"মসজিদ ও কোরাণের প্রতি তিনি সম্মান প্রদর্শন করিতেন।"

১ সংখ্যক পুস্তকে শিবাজীর কথায় আছে:—

"...আফজল খাঁ শিবাজীর কথায় বিশ্বাস করিয়া একাকী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই সাক্ষাতের সময় হঠাৎ শিবাজীর হাতে আফজল খাঁর মৃত্যু হয়।" (পৃ. ১৪০)

শিবাজীর চরিত্র-সমালোচনায় লেখক বলিতেছেন:—

"...তিনি স্বদেশ ও স্বধর্ম্মকে পরাধীনতা হইতে মুক্ত করিবার আশায় অসাধু উপায় অবলম্বন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।" (পৃ. ১৪২)

অন্যান্য রাজাদের কথা বাদ দিয়া কেবল শিবাজীর সম্বন্ধেই "অসাধু উপায়" উল্লেখ করার অর্থ স্পষ্ট।

* শিবাজী সন্ধির প্রস্তাব করেন, না, আফ্‌জল খাঁ? সর্ যদুনাথ সরকারের *Shivaji and his Times* পুস্তকে বোধ হয় আছে যে আফ্‌জলই সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠান।

আর একটি কথা বলিয়া ইতিহাসের বিষয় সমাপ্ত করিব। আমাদের পূর্ব্বপুরুষের গৌরবময় কার্য্যকলাপ পাঠ দ্বারা ছাত্রদের মনে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করা পুরাতন ইতিহাস পাঠের একটা উদ্দেশ্য। আর্য্যজাতির সম্বন্ধে বালকদের মনে এরূপ ধারণা আগেকার পাঠ্যপুস্তক দ্বারা হইত বলিয়া মনে পড়ে। কিন্তু আজকাল দু-একখানি ইতিহাস দেখা দিয়াছে যাহাতে আর্য্যদের সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে, তাহা পাঠ করিবার কোনই আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের ৩ সংখ্যক পুস্তকখানি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। ইহাতে আর্য্যদের সম্বন্ধে প্রায় দুই পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণনা আছে। বর্ণনার বক্তব্য মোটামুটি এই—আর্য্যদের মধ্যে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল, তাঁহারা কৃষিকার্য্য, সুতাকাটা, রন্ধন ইত্যাদি জানিতেন, কালক্রমে জাতিবিভাগ সৃষ্টি হইল এবং হিন্দুদের জীবনে চারিটি আশ্রম ছিল। বাস্। জানি না, মক্তবে আর্য্যদের সম্বন্ধে বেশী কিছু পড়া নিষেধ কি না।

আমি যে ইতিহাস-পুস্তকগুলির আলোচনা করিলাম উহাদের ১ ও ৩ সংখ্যক বই কেবল মক্তবপাঠ্য, অন্যগুলি মক্তব-মাদ্রাসা ও সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য। প্রথমোক্ত তিনখানি বই তো হিন্দু ছেলেরা কোন কোন বিদ্যালয়ে পড়িতেছেই; শিক্ষাবিভাগের অপূর্ব্ব বিধানে অপর দুইখানিও যে মুসলমান-সংখ্যাবহুল কোন কোন বিদ্যালয়ে হিন্দু ছাত্রদিগকে পড়ান হয়, অন্ততঃ হইতে পারে, এ-কথা বলা অযৌক্তিক নহে।

ইতিহাসে যে সাম্প্রদায়িকতা এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ, উহা যে ক্রমশঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে প্রবেশ করিবে না, তাহা কেহ বলিতে পারেন কি?

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একাধিক খ্যাতনামা ঐতিহাসিকও পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচন-সমিতির অনুগ্রহ পাইবেন এই আশায়, স্বলিখিত পুস্তকে স্থানে স্থানে সত্য সংগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আলাউদ্দীন খিল্‌জী, মুহম্মদ টোগলক, জাহাঙ্গীর প্রভৃতির সম্বন্ধে আর খোলাখুলি কথা কেহ বলিতে পারেন না। কারণ, পাঠ্যপুস্তক মনোনয়ন সমিতির ভয়।

পরিশেষে, সাম্প্রদায়িক ইতিহাস সম্বন্ধেও সেই কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সম্প্রদায়বিশেষ যদি ভারতবর্ষের ইতিহাসের কোন কোন অংশ তাঁহাদের "মোনাছিপ" মত বানাইয়া পড়িতে চাহেন, তাহা করুন। কিন্তু সংখ্যাধিক্যের জোরে আইন পাস করাইয়া তাহা অপরের উপর চাপাইবার চেষ্টা করিলে, ঘোরতর অন্যায় হইবে।

মিশর

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে সাহারা মরুভূমির যে-অংশ এশিয়ার দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া আছে তাহাই সুদূর-অতীত-প্রসিদ্ধ মিশর বা ঈজিপ্ট। উত্তরে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে "ইঙ্গ-মিশরী" সুদান, পশ্চিমে ইতালীয় ট্রিপলি ও সাহারা এবং পূর্ব্বে লোহিত সাগর ও ফালস্তিন বা পালেস্টাইন এই ৩,৮৬,০০০ বর্গমাইল বিস্তৃত দেশটির সীমানা। দেশের ২৯/৩০ ভাগ মরুভূমি, সেচখাল, পথঘাট, খেজুর বাগান ইত্যাদিতে ১৯০০ বর্গ মাইল ছাইয়া আছে, নীলনদের প্রবাহপথ, খালবিল ও মোহানায় ২৮৫০ বর্গ মাইল জুড়িয়া আছে, চাষের উপযুক্ত জমির পরিমাণ ১২,০০০ বর্গমাইল মাত্র। প্রকৃতপক্ষে সাহারার অন্যান্য মরুময় অঞ্চলগুলির সঙ্গে মিশরের কোনই প্রভেদ নাই, কেবল মাত্র নীলনদের অমৃত সিঞ্চনে মরুভূমির যে-অংশটুকু সঞ্জীবিত হইয়াছে তাহার উপরেই মিশর দেশের বিরাট ঐতিহাসিক লীলাখেলার অভিনয় হইয়াছে ও হইতেছে।

এদেশের খনিজ সম্পদ এককালে জগদ্বিখ্যাত ছিল। লোহিত সাগরের কূলের পাহাড়ী অঞ্চলের স্বর্ণ ও রত্নের খনি মিশর-নৃপতিদিগের রাজকোষ পূর্ণ করিত। এখন সেগুলিতে আর বিশেষ কিছু নাই। মিশরে এখন ম্যাঙ্গানিজ, কিছু খনিজ তৈল, ওয়াদি নাট্রন হ্রদের সোডা কার্ব্বনেট, মরু-অঞ্চলের নানা স্থলের সোরা, ফট্‌কিরি, ফস্ফেট-সারপ্রস্তর এবং সিনাই ও জেবেল জুবারার ফিরোজা ও মরকত মণি উৎপন্ন হয়। ইহা ভিন্ন লোহিত সাগরের উপকূলে লৌহখনি এবং বিভিন্ন অঞ্চলে অতি উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য উপযোগী প্রস্তর পাওয়া যায়। সুতরাং মিশরের খনিজ সম্পদ আধুনিক কালের হিসাবেও নগণ্য নহে।

মরুময় দেশে প্রাকৃতিক আরণ্য সম্পদ কিছুই নাই কেননা যেখানে উদ্ভিদ জন্মাইতে পারে সে-সকল স্থলেই প্রায় কৃষি বা উদ্যান গঠন করা হয়। তবে খেজুর গাছ প্রায় দেশের সর্ব্বত্রই দেখা যায় এবং ইহার প্রায় ৩০ প্রকার জাতি আছে। অন্য ফলের মধ্যে আঙ্গুর আঞ্জির, ডুমুর, বেদানা, খোবানি, পিচ, কমলা ও অন্য লেবু, কলা, তরমুজ, খরমুজ, তুঁত, জলপাই ইত্যাদি প্রচুর জন্মায়।

কৃষিজাত ফসলের মধ্যে মিশরের সর্ব্বপ্রধান সম্পদ কার্পাস। মিশরের কার্পাসের দীর্ঘ আঁশ ও দৃঢ়তা প্রসিদ্ধ এবং এই দুই গুণের জন্য ইহার মূল্য অন্য সকল শ্রেণীর কার্পাস অপেক্ষা অনেক অধিক। এই কার্পাস রপ্তানিই মিশরের জনসাধারণের জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান উপায় এবং ইহারই প্রসার বা সঙ্কোচের উপর দেশের আর্থিক অবস্থার সম্পূর্ণ নির্ভর। পুরাকালে রোমক-সাম্রাজ্য মিশরের গম ও অন্য শস্যের প্রচুর সরবরাহের উপর নির্ভর করিত। এখন মিশর কিছু পরিমাণে বিদেশের শস্য আমদানী করিয়া জীবনধারণ করে। আখের চাষ সম্প্রতি এ-দেশে প্রচলিত হইয়াছে এবং ফরাসী-চালিত কয়েকটি চিনির কারখানায় বাৎসরিক প্রায় এক লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হয়। গম, জোয়ার ও ভুট্টা এ-দেশে জন্মায় তবে সমস্ত দেশের চাহিদার অনুপাতে উহা পর্য্যাপ্ত নহে।

দেশের আবহাওয়া আমাদের রাজপুতানার মতই, তবে ভূমধ্যসাগরকূলে শীতকালে বেশ বৃষ্টি হয়। দেশের লোকজন তিন জাতির, যথা—(১) ফেলাহিন, ইহারা চাষী ও শহরবাসী, একই জাতের এবং প্রায় সকলেই মুসলমান, অল্প কিছু কপ্ত শ্রেণীর খ্রীষ্টান ; (২) বন্য জাতীয় যাযাবর আরব, ইহারা কোসির হইতে সুয়াকিন পর্য্যন্ত মরু-অঞ্চলে থাকে, (৩) নুবা নিউবিয় জাতির চাষী ; ইহারা আরব ও নিগ্রো সঙ্কর জাতি বলিয়া জ্ঞাত। মিশরে প্রায় ২ লক্ষ বিদেশী আছে যাহারা দেশের ধনসম্পদ গ্রাসে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। দেশের লোকসংখ্যার শতকরা ৯২ ভাগ মুসলমান, ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই সুন্নি সম্প্রদায়ের।

খ্রীষ্টান প্রায় শতকরা ৮ ভাগ। ইহুদীর সংখ্যা অর্দ্ধ লক্ষের কিছু বেশী।

মিশর এখন ক্রমেই ইউরোপীয় ছাঁচে শিক্ষিত হইতেছে। পোষাক-পরিচ্ছদ, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের, এখন অবস্থায় কুলাইলেই সম্পূর্ণ ইউরোপীয় হইয়া থাকে, পুরুষের পরিচ্ছদে কেবলমাত্র রক্তবর্ণ ফেজটুপি দেশের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। মিশরীরা ভদ্র ও অতিথিবৎসল বলিয়া বিখ্যাত এবং আদবকায়দায় অতিশয় সভ্যভব্য। ইহারা সাধারণতঃ সরল, মুক্তহস্ত, বিলাসপ্রবণ ও স্নেহশীল। দয়াদাক্ষিণ্য এবং জীবে দয়া ইহাদের সাধারণ গুণ।

* * *

মিশরের ইতিহাস মানব-সভ্যতার আদিযুগের এক অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়। ইয়োরোপীয় পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ মিশরের ইতিহাসের সম্যক্ পরিচয় পাওয়ার পূর্ব্বে গ্রীস দেশকে জগতের সভ্যতার আদিম উৎস বলিয়া প্রচার করিতেন। এখনও সভ্যতার বহু অঙ্গ মূলতঃ গ্রীক বলিয়াই তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন। মিশর, বাবিল, অসুর, সুমের ও পারস্য দেশের ইতিহাস-পুরাণের অধ্যায়গুলির পরিচয় পাইবার পর দেখা গেল যে গ্রীকদিগের সভ্যতার নয়-দশমাংশ ঐ সকল দেশ হইতে গৃহীত এবং তাহার মধ্যে মিশরের দান সর্ব্বাপেক্ষা বিশাল। প্রাচীন মিশরের সভ্যতার সম্পূর্ণ লোপ প্রাপ্তি হইয়াছে এবং আধুনিক মিশরী প্রাচীন মিশরের সঙ্গে যোগ রাখে নাই, সুতরাং মানব-সভ্যতার ইতিহাসে মিশরের প্রাধান্য স্বীকারে ইয়োরোপীয়দিগের "মানহানি"র সম্ভাবনা নাই। এই কারণে এখন ঐরূপ এক দল পাশ্চাত্য মহাপণ্ডিত মিশর দেশই জগতের যাবতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আকর বলিয়া প্রচার করিতেছেন। এই পাশ্চাত্য "প্রোপাগাণ্ডা"-দুষ্ট মহাপণ্ডিতগণের এবং তাঁহাদের উৎকট-তর শিষ্যগণের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না হইলে ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের প্রকৃত ও সত্য পরিচয় পাওয়া দুরূহ ব্যাপার থাকিবেই। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের অধ্যায়ে অধ্যায়ে সত্যের গোপন ও মিথ্যা তত্ত্বের আরোপণ ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে।

* * *

সভ্যতার অভ্যুদয় যেখানেই হউক ও যে ভাবেই হউক অতি প্রাচীন মিশর মানব-সভ্যতার এক গৌরবময় মহান্ প্রকাশের অধিকারী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। খ্রীঃ-পূঃ ৩২০০ বৎসরের নিকটস্থ কালে মিশরে প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় এবং ইহার অব্যবহিত পরেই মিশরে বিরাট স্মৃতিমন্দির পিরামিড ইত্যাদি নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়। ঐ বিশাল কীর্ত্তিচিহ্নগুলির প্রসার ও গঠন-কৌশল অতিআধুনিক সভ্য জগতের নিকটেও প্রায় অসাধ্য সাধন বলিয়া জ্ঞাত হয়, সুতরাং সুদূর অতীতের মিশর সভ্যতার কত উচ্চ স্তরে উঠিয়াছিল তাহা সহজেই ধারণা করা সম্ভব।

খ্রীঃ পূঃ ৩৩শ শতক হইতে খ্রীঃ পূঃ ১৯শ শতক পর্য্যন্ত মিশরে ঐ দেশজাত ১২টি বংশ সাম্রাজ্য গঠন ও শাসন করে। এই সময়ের মধ্যে মিশর জগতের সাম্রাজ্য ও সভ্যতাগুলির মধ্যে যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করে তাহার পরিচয় দান করা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার। অল্প কথায় বলা যায় যে প্রস্তরে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পে তৎকালীন মিশর যতটা অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার পরের ৪০০০ বৎসরের মানব সভ্যতায় মানুষের জ্ঞান ও কৌশল তাহা অপেক্ষা বিশেষ কিছু অগ্রসর হয় নাই, এমন কি কয়েকটি বিষয়ে—যথা অতি কঠিন প্রস্তরে সূক্ষ্ম আলেখ্য উৎকীরণে এখন তাহার তুলনায় পশ্চাতেই আছে। লৌহ ভিন্ন সেকালে জ্ঞাত অন্য ধাতুশিল্পে ও কারুকার্য্যে, বয়ন রঞ্জন ও চিত্রণেও ঐ পুরাকালের মিশরীগণের জ্ঞান ও দক্ষতা আধুনিক শিল্পজ্ঞগণকে আশ্চর্য্য করে।

১৯শ শতক হইতে ১৬শ শতক পর্য্যন্ত প্রায় তিন শতাব্দী ব্যাপী কালে মিশরে পাঁচটি বিদেশী (?) রাজকুল রাজত্ব করে। ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন জ্ঞান নাই। ১৬শ শতাব্দীতে "নূতন সাম্রাজ্যের" আরম্ভ হয় এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গেই মিশর-সাম্রাজ্যের বিজয় অভিযান বিদেশে চলিতে আরম্ভ করে। উত্তর-আফ্রিকায় মিশর অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইবার পর পশ্চিম-এশিয়ায় একের পর এক মিশর-সম্রাট্ যুদ্ধ-অভিযান চালনা করেন। তৃতীয় টুথমোসিস ইউফ্রেটিস নদী পার হইয়া মিত্তানিদিগের রাজ্য
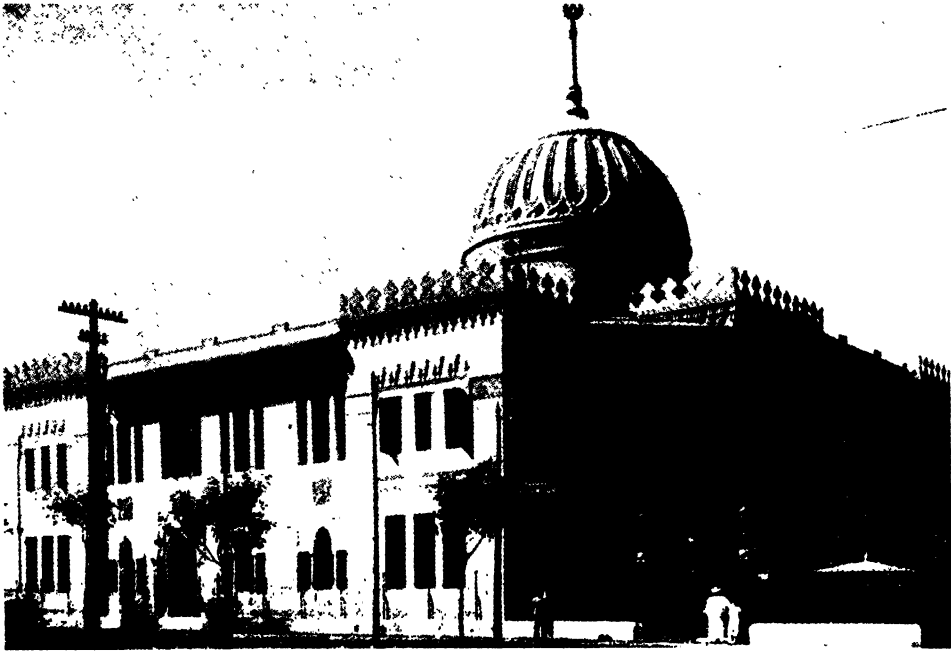
আধুনিক কাইরোর প্রাচ্যসঙ্গীতভবন

জয় করিয়া প্রায় আধুনিক পারস্যের সীমান্তে তাঁহার দিগ্বিজয়ের ধ্বজা লইয়া যান। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১১০০ বৎসর কাল পর্য্যন্ত মিশরের এই গৌরবময় যুগ চলে যদিও ইহার শেষ নয় জন (রামেসিস্ ৪র্থ হইতে ১২শ) নৃপতি ৮০ বৎসর কালের রাজত্বে দেশের অবনতির আরম্ভ ও চরমগতি হয়।

ইহার পর মিশরে প্রথমতঃ লিবীয় ও অন্য বিদেশী সেনানীদিগের শাসন ও প্রতাপ বাড়িতে থাকে। কিছুদিন লিবীয় ও ইথিয়োপীয় বিজেতা ও শাসনকর্ত্তাদিগের যুদ্ধবিগ্রহ চলিবার পর মিশরে অন্য এক দিক হইতে বিপদ আসে। অসুর-সাম্রাজ্য তখন তাহার প্রতাপের চরমে উঠিতেছে। যে-মিশর শত শত বৎসর ধরিয়া সিরিয়া প্যালেস্টাইন ও ইরাকের প্রাচীন জনপদগুলি বিজয় ও বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করিয়াছিল সেই মিশর অসুর নৃপতিদিগের বিজয়-অভিযানে কাঁপিতে থাকে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৬৭১ সালে অসুর-নৃপতি ইসারহাড্ডন মিশর-সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া মিশরে অসুর-প্রতাপের বিস্তার করেন। ৬৬১ খ্রীঃ পূঃ সালে নৃপতি অসুর-বানি-পাল মিশরে শেষ এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রচণ্ড অসুর-অভিযান করেন। ৬১০ খ্রীষ্ট পূর্ব্ব সালে অসুর-সাম্রাজ্যের পতনের পর মিশর পুনর্ব্বার স্বাধীন হয় কিন্তু এ স্বাধীনতা দীপ নির্ব্বানের শেষ স্ফুলিঙ্গের মত ছিল। স্বাধীন মিশরাধিপতি নেখো সিরিয়া প্যালেষ্টাইন ইত্যাদি সাম্রাজ্যের অংশ পুনরাধিকারের চেষ্টায় অভিযান করিয়া ইহুদী নরপতি যোসাইয়াকে পরাজিত ও নিহত করেন কিন্তু ওদিকে অসুর বিজেতা বাবিল নৃপতি নাবোপোলাসের মিশর কর্ত্তৃক সিরিয়া দখলের সংবাদ পাইয়া অসুর সাম্রাজ্যের এই অংশ উদ্ধার করিতে বাবিল যুবরাজ নেবুখাদ্রেজারকে প্রেরণ করেন। কারখেমিসের যুদ্ধে (খ্রীঃ পূঃ ৬০৫) মিশরী সৈন্য ভীষণ ভাবে পরাজিত হয় এবং ঐ সময়ে নাবোপোলাসের হঠাৎ মারা না গেলে তাঁহার পুত্র মিশর অধিকার করিতেও পারিতেন।

ইহার পর কিছুকাল মিশরে শান্তি ও বিশেষ সমৃদ্ধি ছিল। কিন্তু এ মিশর পূর্ব্বেকার প্রবলপরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী সম্রাটদিগের দেশ আর ছিল না। ইহা এখন কুটিল রাষ্ট্রনীতির কৌশলে নিজ অধিকার বজায় রাখিয়া চলিবার

মিশরের স্ফিংস

চেষ্টা করিতেছিল। ইহুদীকে বাবিলিয়গণের বিরুদ্ধে লড়াইয়া এবং বাবিলিয়গণকে পারসিকগণের বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়া এইরূপে ৭০।৮০ বৎসর চলে, কিন্তু পারসিকদিগের শক্তি তখন ক্রমশই প্রবল হইতেছিল এবং খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫২৫ সালে পারসিক অক্কমনিষ্য নৃপতি কম্বুজ মিশর জয় করেন এবং ইহার পরই প্রাচীন মিশরের গৌরবসূর্য্য অস্ত যায়।

পারসিকগণ প্রায় দুই শত বৎসর দেশ শাসন করিবার পর--যাহার মধ্যে মিশর দুই বার বিদ্রোহ করিয়া অল্প দিনের জন্য স্বাধীন হয়—গ্রীক-বিজেতা আলেক্‌সান্দার পারসিক সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া মিশর অধিকার ও নূতন রাজধানী আলেক্‌জান্দ্রিয়া স্থাপনা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মিশর তাঁহার পার্শ্বচর ও সেনাধ্যক্ষ লাগসপুত্র টলেমির অংশে পড়ে। টলেমি-বংশ প্রায় তিন শত বৎসর মিশর ভোগদখল করিবার পর খ্রীঃ পূঃ ৩০ সালে রোমাধিপতি অগস্টস্ মিশর অধিকার করেন। ইহার পর প্রায় ৬৫০ শত বৎসর ধরিয়া মিশর রোমক সাম্রাজ্যের অংশগত ছিল। গ্রীক টলেমিগণের শাসনকালে মিশর ধনধান্যে পূর্ণ সমৃদ্ধিশালী বিশাল জনপদে পরিণত হয়। রোমকদিগের সৈন্য বলে শাসন এবং দেশের

লোকের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করার ফলে দেশে অসন্তোষ, অরাজক এবং ধনক্ষয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। আরম্ভ করে এবং ৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে পারসীক নৃপতি খুসরু প্রায় বিনাযুদ্ধে মিশর দখল করেন। দশ বৎসর পরে হেরাক্লিয়াস
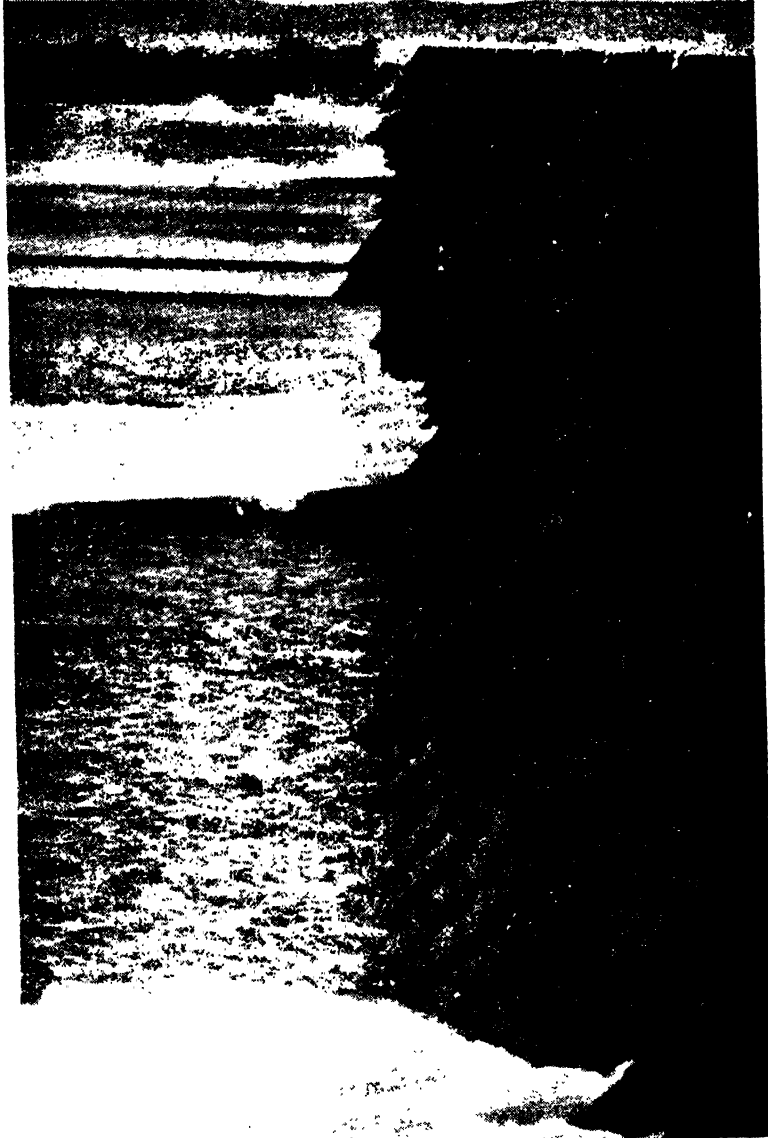
মিশরের একটি প্রসিদ্ধ বাঁধ—পৃথিবীর বৃহত্তম বাঁধগুলির অন্যতম

দেশে প্রজাশক্তি রোমক-নিয়মানুসারে নিরস্ত্র, বিভক্ত ও ক্ষীণ করা হয় যাহার ফলে বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে। মিশরের সীমান্তের বর্ব্বরগণ ক্রমাগত দেশ ও দেশবাসিগণকে আক্রমণ করিতে

পারসিকগণকে পরাস্ত ও বিতাড়িত করেন কিন্তু দেশে অরাজকতা বাড়িতে থাকে।

দেশবাসীর উপর উৎপীড়নের ফলে অসন্তোষ ও অরাজক হইলে প্রবলতম সৈন্যমূলক শাসন বিদেশী শত্রুর

আক্রমণে কিরূপ অসহায় হয় মিশরে রোমক-সাম্রাজ্য তাহার জাজ্বল্যমান উদাহরণ। ৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়-খলিফা প্রথম-ওমর তাঁহার সেনাপতি আম্‌র্‌-ইব্‌ন্‌-এল-অস্‌কে ৪০০০ সৈন্য লইয়া মিশর আক্রমণ করিতে পাঠান। ছয় মাস যুদ্ধের পর আম্‌র্‌ সিরিয়া হইয়া পূর্ব্ব-মিশরে প্রবেশ করিয়া নীলনদ অতিক্রম করেন। ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে আরও ১২০০০ সৈন্য তাঁহার সাহায্যে আসে। হেলিয়োপোলিসে রোমক সৈন্যদল তাঁহার দ্বারা পরাজিত হয়। ইতিমধ্যে তাঁহাকে খলিফার আদেশে বাবিলন জয়ের জন্য যাইতে হয়। এক বৎসর কাল অবসর পাইয়াও রোমকগণ দেশ রক্ষার কোনও ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দের শেষে আম্‌র্‌ পুনর্ব্বার মিশর আক্রমণ করেন এবং ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দের শেষে মিশর আরব খলিফার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়।

৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মিশর পূর্ব্বাঞ্চলের খলিফাদিগের সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। কিন্তু এই যুগের শেষের আব্বাসীদ খলিফাগণের আমলে মিশরের শাসনকর্ত্তাগণ নামেমাত্র খলিফাগণের অধীনে ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত টুলুনিদ বংশ এবং ৯৩৫ খ্রী: হইতে ৯৬৯ খ্রী: পর্য্যন্ত ইখ্‌শিদি বংশ মিশরীগণের উপর শাসন মাত্র নহে রাজত্বই করিয়া গিয়াছিলেন। ৯৬৯ খ্রী: জোহর নামক সেনাপতি ফাতিমাই খলিফা মো'ইজ দ্বারা প্রেরিত হইয়া মিশর অধিকার করেন। ১১৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জেহাদ-বিজেতা সালা এদ্দিন মিশর জয় করিয়া পুনরায় ইহা আব্বাসিদ খলিফাদিগের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করেন। সালা এদ্দিন নিজেই কিন্তু আয়ুবিদ নামে এক প্রায়ঃস্বাধীন রাজকুল স্থাপন করেন যাহারা ১২৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মিশরে রাজত্ব করে। ১২৫২ হইতে ১৩৮২ খ্রী: পর্য্যন্ত বাহরি এবং ১৩৮২ হইতে ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বুর্‌জি নামে দুই মামেলুক বংশীয় রাজকুল মিশরে রাজত্ব করে। এই সকল মামেলুক বংশের নৃপতি নামে আব্বাসিদ খলিফাদিগের অধীনে ছিল, আসলে খলিফাগণ এই মামেলুক সুলতানগণের ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র ছিলেন। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কি অটোমান সুলতান আরব খলিফা-দিগের সাম্রাজ্যের অবসান করিয়া মিশর অধিকার করেন।

মিশরে আরব রাজত্ব মাৎস্যন্যায়ের চরম বলিলেও চলে। চক্রান্ত, গুপ্তহত্যা, উৎকোচ দান ও গ্রহণ, বিদ্রোহ ও রাষ্ট্র বিপ্লব, স্ত্রীবুদ্ধির অন্তর্বিরোধের প্রলয়কার্য্য, ইহা প্রায় তিন শত বৎসর চলে। মুসলমান, ইহুদী, খ্রীষ্টান, আরব, তুর্ক, কাফ্রী, আর্ম্মানি, সকল শ্রেণীর চক্রান্ত ও বিপ্লবকারী অর্থ বা জনবলে এবং বিষ বা গুপ্তঘাতকের প্রয়োগে দেশে অরাজকের আগুন জ্বালাইয়াই রাখে। সুলতান সালা এদ্দিন এবং তাঁহার বংশধরগণ প্রবল প্রতাপে দেশ শাসন করেন এবং সুবিচারও করেন কিন্তু ভ্রাতৃবিরোধ ও অন্তঃপুরের চক্রান্ত সমানে চলিতে থাকে। সালা এদ্দিনের আয়ুবিদ বংশের শেষ নৃপতি তুরানশাহের মৃত্যু তাঁহার বিমাতা শাজার-অল-দুর্‌ এবং তাহার প্রিয়পাত্রেরা ঘটায়। সুলতানকে খুন করিয়া সিংহাসন দখলের চেষ্টায় পুনর্ব্বার দেশে অরাজক আনিয়া, আয়ুবিদ রাজকুল শেষ করিয়া প্রিয়পাত্র আইবেককে মসনদে বসাইয়া পরে তাহাকে খুন করিয়া এবং তাহার পার্শ্বচর দ্বারা নিজে খুন হইয়া এই সর্ব্বনাশী স্ত্রীলোকের চক্রান্ত শেষ হয়। পরের মামেলুক রাজকুলের ইতিহাসও ঐ প্রকারই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অন্তর্বিপ্লবেই কাটে।

আরব শাসনকর্ত্তাদের আমলে মিশরের বহু প্রসিদ্ধ মসজিদ ও অন্য ইস্‌লাম-অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। কিন্তু মিশরের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা দুর্দ্দশার শেষ সীমায় পৌছায়। অল-কাহিরা (কাইরো) নগর এবং জগৎ-বিখ্যাত অল-অজহর মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয় ফাতিমাই খলিফা মো'ইজ-প্রেরিত সেনাপতি জোহরের কীর্ত্তি। পরবর্ত্তী সুলতানগণও বহু মসজিদ-মাদ্রাসা স্থাপন করেন কিন্তু দেশের জনসাধারণের শান্তি ও সম্পদের জন্য কোনও প্রকার স্থায়ী ব্যবস্থা করিবার বুদ্ধি, ইচ্ছা বা উৎসাহ ইহাদের ছিল বলিয়া বিশেষ দেখা যায় না।

১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে মিশর ইস্তাম্বুলের অটোমান তুর্ক সুলতানগণের সাম্রাজ্যের অংশ হয় এবং এই সময় হইতেই মিশরের আধুনিক ইতিহাসের পত্তন। ১৫১৭ হইতে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইস্তাম্বুল হইতে প্রেরিত পাশা উপাধিধারী শাসনকর্ত্তারা মিশর শাসন করে। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে মিশরের প্রাচীন মামেলুকদিগের ক্ষমতার পুনঃ-

প্রতিষ্ঠা হয় এবং শেখ-অল-বালাদ উপাধিধারী মিশর শাসনকর্ত্তা তাহাদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইতে থাকে। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে নেপোলিয়ন মিশরে অভিযান করেন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীগণ মিশর ছাড়িলে তুর্ক সুলতান পুনরায় ইস্তাম্বুল হইতে পাশা পাঠাইয়া মিশর শাসনের ব্যবস্থা করেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রেরিত পাশা মেহেমেট আলিকে, ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে, মিশর-শাসনের অধিকার তাঁহার বংশে উত্তরাধিকারসূত্রে রাখিবার অনুমতি তুর্ক সুলতান দান করেন। মেহেমেট আলির বংশধর ইস্মায়েল পাশা খেদিভ উপাধি লাভ করেন। বর্ত্তমান নৃপতিও এই বংশেরই।

মেহেমেট আলির সময় হইতেই মিশর ইয়োরোপীয়-দিগের কূটরাজনীতির চক্রান্তের মধ্যে পড়ে এবং ইংরাজ ও ফরাসী ক্রমে তুর্ক সুলতানের ক্ষমতা লোপ করিয়া দেশ গ্রাসের সকল আয়োজনই করে। তাহার পরের যুগের বৃত্তান্ত এই প্রবন্ধের মধ্যে দেওয়া সম্ভব নহে। তবে এই মাত্র বলা যায় যে এখন এক বিশেষ অধ্যায়ের আরম্ভ হইয়াছে।

রেডিয়াম

বর্ত্তমানে এক গ্র্যাম রেডিয়ামের দাম প্রায় ৬৫,০০০৲; দাম বেশী মনে হইতে পারে, কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে দাম ছিল, গ্র্যামপ্রতি ২,০০,০০০৲, তাহার তুলনায় কিছুই নয়।

গ্রেট বিয়ার লেকে লা'বিন পয়েণ্ট। এইখানেই লা'বিন প্রথম রেডিয়ামের সন্ধান পান।

পিয়ের কুরি ও মাদাম কুরি রেডিয়াম আবিষ্কার করিয়াছিলেন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহারা রেডিয়ামের পেটেণ্টের দাবী করেন নাই, তাঁহারা বিজ্ঞানজগৎকে ইহা দান করিয়াছিলেন। কিন্তু রেডিয়ামের প্রস্তুতকারক হইয়া দাঁড়াইল এমন একটি দল, যাহা ইহাকে একচেটিয়া ব্যবসায়ে পরিণত করিল।

অথচ রেডিয়ামের সব চেয়ে বড় ব্যবহার ক্যান্সার রোগে, এবং পৃথিবীর সকল ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসার জন্য যে-পরিমাণ রেডিয়াম দরকার, তাহা নাই; যাহা আছে, তাহাও এত দুর্ম্মূল্য, যে ছোটখাট হাসপাতাল বা গবেষণাগারের পক্ষে তাহা কেনা সম্ভব নয়।

আজ যে রেডিয়াম-ব্যবসায়ের এতদূর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার মূলে কানাডার একটি ফরাসী পল্লীর এক চৌদ্দ বছর বয়সের বালক, গিল্‌বেয়ার লা'বিন। লা'বিন রেডিয়ামের দাম শুনিয়া উৎসাহিত হইয়া স্থির করিয়াছিল যে ইহার চেয়ে ভাল ব্যবসায় আর হইতে পারে না। গ্রামের লোকে তাহাকে পাগল বলিত, এবং বলা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কারণ রেডিয়াম সম্বন্ধে লা'বিনের বিন্দুমাত্রও জ্ঞান ছিল না, চৌদ্দ বৎসরের বালকের থাকা সম্ভবও নহে।

কিন্তু একটি মানুষের সমস্ত চিন্তা যখন একটিমাত্র আকাঙ্ক্ষায় কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে তখন সে যে কি অসাধ্যসাধন করিতে পারে, লা'বিনের জীবন তাহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। সে জানিত এ-ব্যবসায়ে টাকা লাগে। লা'বিন টাকা জমাইতে আরম্ভ করিল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কৃপণও তাহার টাকা জমানোর ইতিহাস শুনিলে লজ্জা পাইবে।

পনেরো বছর বয়সে লা'বিনের রেডিয়াম অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। এই এক বৎসরে সে এইটুকু শিখিয়াছিল যে পিচব্লেণ্ডি নামক চকচকে কাল রঙের এক খনিজ পদার্থ হইতে রেডিয়াম বাহির করা হয়। সে পিচব্লেণ্ডির খোঁজে লাগিয়া গেল, যদিও কোথায় পিচব্লেণ্ডি পাওয়া যায় সে-বিষয়ে কোনও ধারণাই তাহার

রেডিয়াম-বিশুদ্ধীকরণের একটি প্রক্রিয়া

শুদ্ধ রেডিয়াম সল্ট পাইবার পূর্ব্বে রেডিয়াম বেরিয়াম ক্লোরাইডকে ২০টি বিভিন্ন প্রক্রিয়াতে বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়।

রেডিয়াম বেরিয়ামের ক্রিষ্টাল বা দানা। মূল বিমিশ্র খনিজ অপেক্ষা ইহা অনেক বিশুদ্ধ হইলেও শুদ্ধ রেডিয়াম অপেক্ষা ইহা এখনও শতগুণে ভারী রহিয়াছে।

রেডিয়াম-বিশুদ্ধীকরণের শেষ প্রক্রিয়াগুলি অত্যন্ত বিপজ্জনক বলিয়া এগুলি বিশেষ একটি কক্ষে করা হয়।

এই ছোট টিউবটিতে ৬৫০০০ টাকা মূল্যের রেডিয়াম আছে। ৪৫০ টন বিমিশ্রখনিজ হইতে এতটুকু রেডিয়াম সংগৃহীত হইয়াছে।

ছিল না, কিন্তু অধ্যবসায়ের কথঞ্চিৎ পুরস্কার তাহার মিলিল, একটি রূপার খনির সন্ধান পাইয়া। ফলে সতের বছর বয়সের সময় সে এক রৌপ্যখনির মালিক হইয়া বসিল, এবং মোটা রকম টাকা জমাইয়া ফেলিল।

দুই বৎসর পরে খনির স্বত্ব বিক্রয় করিয়া আবার সে পিচব্লেণ্ডির সন্ধানে বাহির হইল, এবং এক স্বর্ণখনির উপরে টাকা ঢালিয়া বছরখানেকের মধ্যে সর্ব্বস্বান্ত হইল।

১৯১৬ সালে টরোণ্টোয় থাকিতে থাকিতে লা'বিন্ ২০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে পার্থে পিচব্লেণ্ডির খবর পাইল। এক শত ডলার মাত্র সম্বল করিয়া সে পার্থে গেল এবং শুনিল খবর ভুয়া। এইবার সম্ভবতঃ ভগবান তাহার মাথায় কিছু বুদ্ধির সঞ্চার করিলেন, কারণ ইহার পরে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত লা'বিন্ সোজাসুজি খনিজ পদার্থের কারবারে লাগিয়া রহিল, পিচব্লেণ্ডির জন্য মাথা না ঘামাইয়া। এই বৎসরের এপ্রিল মাসে চার্লি সেণ্টপল নামক এক বন্ধুকে লইয়া লা'বিন সুদূর উত্তর-কানাডায় খনিজ পদার্থের সন্ধানে যাত্রা করিল। সেখানে এত শীত যে মানুষজন থাকে না। শীতকালে তাপমান-যন্ত্র শূন্যেরও ৫০ ডিগ্রি নীচে থাকে। সেণ্টপলের চোখ বরফের অত্যাচারে সাময়িক ভাবে অন্ধ হইয়া গেল, একা লা'বিন প্রকৃতির দুরন্ত লীলার মধ্যে পড়িয়া অস্থির হইয়া উঠিল। তবু সে যেখানে-সেখানে খুঁজিয়া চলিল, যদি কিছু পাওয়া যায়। রেডিয়ামের কথা তাহার মনেও ছিল না, তাহা তখন এক পাগলাটে বালকের স্বপ্নের মত মন হইতে মিলাইয়া গিয়াছে। সহসা একখণ্ড চক্‌চকে কালো খনিজ পদার্থ তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল, উদ্বেল হৃদয়ে লা'বিন্ দেখিল, পিচব্লেণ্ডি। লা'বিনের শৈশবের স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইয়াছে!

কিন্তু বিনা পয়সায় ব্যবসায় চলে না। যাঁহাদের হাতে ব্যবসার মূলসূত্র, টাকা, তাহারা লা'বিনের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। পিচব্লেণ্ডি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে লাভটা হইয়াছে কোথায়? মেরুপ্রদেশের অত সন্নিকটে, যেখানে হইতে নিকটতম রেলরোড ১১০০ মাইল দূরে, থাকিলই বা সেখানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পিচব্লেণ্ডি খনি! তাহা ছাড়া ৪৫০ টন খনিজ পিচব্লেণ্ডি হইতে মাত্র এক গ্র্যাম রেডিয়াম প্রস্তুত হয়। সেই পাণ্ডববর্জিত দেশ হইতে সভ্যজগতের কারখানায় কে তাহাদের পিচব্লেণ্ডি পৌঁছাইয়া দিবে?
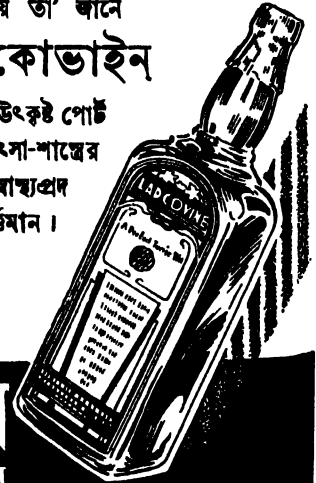
লা'বিন চায় সেই পাণ্ডববর্জ্জিত দেশেই রেডিয়ামের কারখানা স্থাপন করিতে। তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল যে পৃথিবীতে গুটিকয়েক মাত্র বৈজ্ঞানিক খনিজ পিচব্লেণ্ডি হইতে রেডিয়াম নিষ্কাশনের উপায় জানে, তাহারা সকলেই সেই একচেটিয়া রেডিয়াম ব্যবসায়ীদলের কাজে নিযুক্ত। লা'বিন তাহাদের অনুরোধ করিল অন্ততঃ এক জনকে ছাড়িয়া দিতে, এবং উত্তর পাইল "অসম্ভব।"

সারা দুনিয়ায় তখন বৎসরে ৩৫ গ্র্যাম করিয়া রেডিয়াম প্রস্তুত হয়, তাহার মধ্যে ত্রিশ গ্র্যাম আফ্রিকার বেলজিয়ান কঙ্গোতে। শুধু সেই গুটিকয়েক বৈজ্ঞানিক ছাড়া আর কেহ রেডিয়াম নিষ্কাশনের প্রণালী জানে না। বহু চেষ্টায় লা'বিন মঁসিয় পঁশো নামক এক ফরাসী বৈজ্ঞানিকের সন্ধান পাইলেন ইংল্যাণ্ডের কর্ণওয়াল নামক স্থানে। লা'বিনের অনুরোধে তিনি আসিলেন কানাডার মণ্টরিয়েল নামক স্থানে।

কিন্তু পঁশো যখন শুনিলেন যে পিচব্লেণ্ডির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে প্রায় উত্তর-মেরুর কাছাকাছি, তখন তিনি সাফ জবাব দিলেন। হয় তাঁহাকে সভ্যজগতে কারখানা খুলিয়া সেইখানে পিচব্লেণ্ডি পৌছাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করা হউক, না হয় তিনি অবিলম্বে কর্ণওয়ালে ফিরিয়া যাইবেন।

পঁশোর কথাই থাকিল। বহু চেষ্টায়, বহু আয়াসে রেল, নৌকা, এবং এরোপ্লেন সাহায্যে চার হাজার মাইল দূরে পোর্ট হোপ অণ্টারিওতে পিচব্লেণ্ডি পৌছাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করা হইল। খরচ যাহা হইল, তাহা না বলাই ভাল। কিন্তু ফল ফলিল। ১৯৩৩ সালে কানাডায় বছরে ৩ গ্রেণ রেডিয়াম উৎপন্ন হইত, এখন তাহা ত্রিশ গ্রেণের কাছাকাছি পৌছিয়াছে। ভবিষ্যতে আরও বাড়িবার যথেষ্ট আশা আছে। রেডিয়ামের দাম ২,০০,০০০৲ টাকা হইতে ৬৫,০০০৲ টাকায় নামিয়াছে, আরও নামিবে। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ ক্যানসার রোগী ও সহস্র সহস্র চিকিৎসকের প্রাণে আশার সঞ্চার হইয়াছে।

সেই সুদূর উত্তরে, গ্রেটবিয়ার লেকের উপরে লা'বিন পয়েণ্টে যাহারা পিচব্লেণ্ডি খুঁড়িয়া বাহির করে, তাহাদের মধ্যে নানা দেশের লোক আছে। প্রচণ্ড শীতের উপদ্রব সহ্য করিয়া উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া তাহারা পৃথিবীর রেডিয়ামের পরিমাণ বাড়াইয়া চলিয়াছে। সবার উপরে আছে গিলবেয়ার লা'বিন নামে একটি লোক, যাহার এতদিনের স্বপ্ন আজ সফল।

স.

দেশ-বিদেশের কথা

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব সায়ান্সের ডীন শ্রীঅমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার তিন জন কৃতী ছাত্র

উপবিষ্ট, দক্ষিণে : অধ্যাপক অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

বামে : ডক্টর পি. এল. ভাটনগর

দণ্ডায়মান, দক্ষিণে : শ্রীঅশোককুমার মুস্তফী, এম. এসসি. (গণিত)। বিশ্ববিদ্যালয়ের গত এম. এসসি. পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ের সকল পরীক্ষার্থীর মধ্যে ইনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

বামে : শ্রীশান্তিরাম মুখোপাধ্যায় এম. এ. (গণিত)। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গত এম. এ. পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ের সকল পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

শ্রীপূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসাধন গুপ্ত

নিখিল-ভারতীয় কয়েকটি বিতর্ক-সভায় ইঁহারা প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কৃত হইয়াছেন।

কোয়েম্বাটোর রবীন্দ্র-পরিষদে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত

শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুত লক্ষ্মণম্ মুদালিয়ার কোয়েম্বাটোরে তাঁহার নিজ বাসগৃহে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নামে একটি নৃত্য ও সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়াছেন। কবির কাব্য, ভাবধারা ও জীবনী আলোচনা করাও এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মসূচীর একটি অঙ্গ।

প্রতি বৎসর কোনও কৃতী ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানে একটি উদ্বোধনী বক্তৃতা দিয়া থাকেন। গত বৎসর ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান সার সি. পি. রামস্বামী আয়ার এই বক্তৃতা দেন। এই বৎসর অক্টোবরে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়কে এই উদ্বোধনী বক্তৃতা
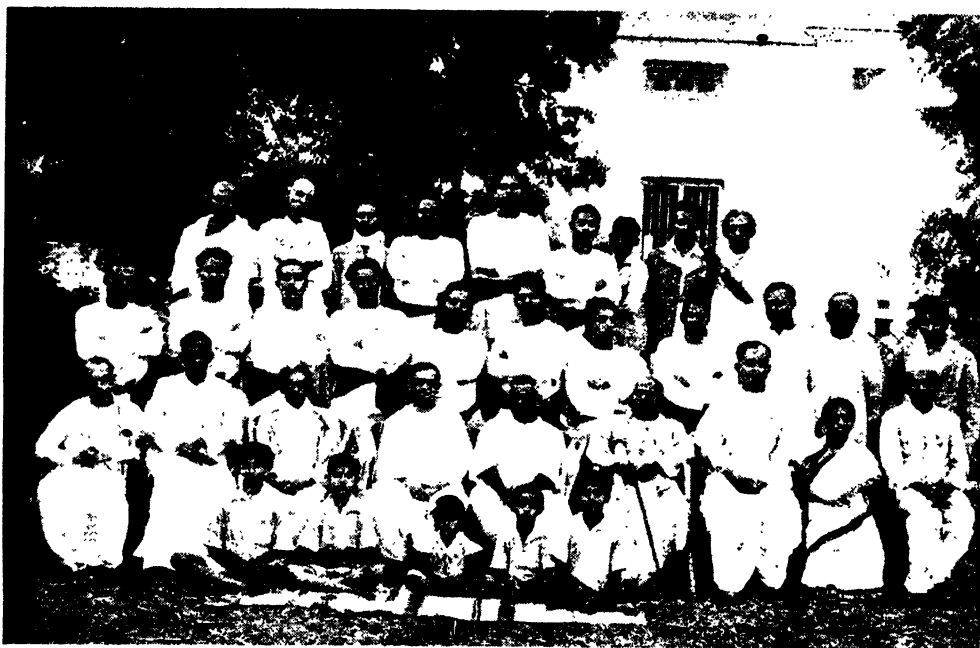
কোয়েম্বাটোর টেগোর একাডেমিতে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত ও তদীয় ব্রতচারী দল

দিবার জন্য আহ্বান করা হয়। তদুপলক্ষ্যে গৃহীত চিত্র এতৎসহ প্রকাশিত হইল।

শ্রীপরিতোষ সেন
সম্প্রতি ইন্দোর ডেলি কলেজে শিল্পকলার শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।

ডক্টর শশধর দত্ত
এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের গত সমাবর্তন উৎসবে ডি. ফিল. উপাধি পাইয়াছেন।

বাঙ্গালোরে বাঙ্গালীদের বার্ষিক অনুষ্ঠান 'দীপালী-সম্মিলনী'। সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র মধ্যস্থলে উপবিষ্ট

শ্রীযুক্ত শশধর দত্ত

শ্রীযুক্ত দত্ত এম এ পাশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক রিসার্চ স্কলার নিযুক্ত হন এবং অধ্যাপক রানাডের অধীনে শঙ্কর-দর্শন সম্বন্ধে গবেষণা করেন। পরে অধ্যাপক অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অধীনে গবেষণা করিয়া ডক্টরেট পাইয়াছেন। প্রবন্ধের বিষয় ছিল, "The Problem of Relation in Contemporary Philosophy"।

বাঙ্গালোরে দীপালী সম্মিলনী

প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও বাঙ্গালোরে "দীপালী-সম্মিলনী" স্থানীয় বাঙালীদিগের দ্বারা গত ৩০শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়। কোলার গোল্ডফীল্ডস্, বোম্বাই প্রভৃতি স্থান হইতেও শুভাকাঙ্ক্ষিগণ সম্মিলনীতে যোগদান করিয়া বাঙ্গালোরের বাঙালীদিগের এই বাৎসরিক অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করেন।

এই উপলক্ষ্যে ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত, বক্তৃতা ও নাট্যাভিনয়ের আয়োজন হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানে আচার্য্য রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিপ্রহরে খেলাধূলার প্রতিযোগিতায় বালক-বালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চাশোর্দ্ধবয়স্করাও যোগদান করিয়াছিলেন।

সান্ধ্যসম্মিলনীর প্রারম্ভে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র "আশীর্ব্বাণী" দান করেন এবং স্থানীয় বাঙালীদিগের স্বতন্ত্র একটি সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহ দেন। পরে সঙ্গীত, আবৃত্তি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

ইহার পর স্থানীয় সায়েন্স ইন্‌স্টিটিউটের বাঙালী ছাত্রবৃন্দ দ্বারা "পরশুরাম" রচিত "চিকিৎসা-সঙ্কট" অভিনীত হয়।

সুরশিল্পী ফৈয়াজ খাঁ ও তাঁহার ছাত্র শ্রীপ্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীপ্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায় গত চারি বৎসর সুবিখ্যাত ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর নিকট সঙ্গীতসাধনা করিয়া কৃতী হইয়াছেন।

শিক্ষা-সঙ্কট ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাল, এম.এ.

যে-কোন সভ্য দেশের উন্নতির প্রধান লক্ষণ নির্ণয় করা হয় দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা দেখিয়া। সেই জন্য সকল দেশেরই গবর্ণমেণ্টের একটি প্রধান কর্ত্তব্য শিক্ষাবিস্তার। যে-গবর্ণমেণ্ট সেই প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করিতে অস্বীকার করে বা অবহেলা করে সে-গবর্ণমেণ্টকে কিছুতেই জনসাধারণ মানিয়া লইতে চাহে না; পরাধীন দেশে অবশ্য জনসাধারণ ক্ষমতাহীন, তাই তাহারা কিছুই করিতে পারে না।

বাংলা দেশে বর্ত্তমানে যে-গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত তাহার মন্ত্রিমণ্ডল কিন্তু দেশে শিক্ষাবিস্তার পছন্দ করেন না। ইহা আমাদের কল্পিত বা সাজান কথা নয়। বাংলার সরকারী রিপোর্ট ইহার সাক্ষ্য দিবে।

বাংলার সরকারী রিপোর্টে (১৯৩৮-৩৯) দেখা যাইতেছে যে, এই দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বর্ত্তমানে সর্ব্বশুদ্ধ ৬৪,২৬৭টি বিদ্যায়তন আছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা ছিল ৬৭,৪৯৫; গত এক বৎসরের মধ্যে সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে ৩,২২৮টি। এক দিকে প্রাথমিক বা প্রাইমারী বিদ্যালয় হ্রাস পাইয়াছে ৪,২২২টি; অন্য দিকে কলেজের বৃদ্ধি হইয়াছে ১টি, মাধ্যমিক স্কুলের বৃদ্ধি হইয়াছে ১০১টি, মাদ্রাসার বৃদ্ধি হইয়াছে ৪১০টি এবং অনমুমোদিত বিদ্যালয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে ৪৭৮টি।

ইহার পূর্ব্ব বৎসরের রিপোর্টে (১৯৩৭-৩৮) দেখা যাইতেছে যে, ঐ বৎসরে মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে ১,৩৩০টি। তাহার মধ্যে প্রাইমারী স্কুলের হ্রাস হইয়াছে ১,৪৪৩টি, কিন্তু বৃদ্ধির দিকে দেখা যায় মাধ্যমিক স্কুল বাড়িয়াছে ৩৫টি, মাদ্রাসা বাড়িয়াছে ১২৫টি এবং অনমুমোদিত বিদ্যালয়েরও হ্রাস হইয়াছে ৪৭টি। গত কয়েক বৎসরে প্রাথমিক শিক্ষার কিরূপ সঙ্কোচ হইতেছে তাহা নিম্নের বিবরণে বুঝা যাইবে:

বৎসর	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	হ্রাস
১৯৩৪-৩৫	৬৪,৩০৯	
১৯৩৫-৩৬	৬২,১৫০	২,১৫৯
১৯৩৬-৩৭	৬১,১৫৭	১,০০৭
১৯৩৭-৩৮	৬০,০৭৪	১,০৮৩
১৯৩৮-৩৯	৫৫,৪৫২	৪,৬২২

অর্থাৎ গত পাঁচ বৎসরে স্কুলের সংখ্যা ৮৮৭১টি হ্রাস পাইয়াছে।

এইবার আমরা মাধ্যমিক শিক্ষার আলোচনা করিব। কারণ মাধ্যমিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে সরকারী কুক্ষিগত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্যই বঙ্গীয় মন্ত্রিমণ্ডলী ১৯৪০ সনের মাধ্যমিক শিক্ষা বিল আইন-পরিষদে উপস্থিত করিয়া নিযুক্ত কমিটিতে পাঠাইয়াছেন। গত পাঁচ বৎসরে মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা কিরূপ ছিল দেখা যাক।

বৎসর	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ছাত্রসংখ্যা
১৯৩৪-৩৫	৩,১৯৪	৪,৮০,৯৬৬
১৯৩৫-৩৬	৩,২৪৪	৫,০১,৫১৯
১৯৩৬-৩৭	৩,২৯৩	৫,২৪,২৪৬
১৯৩৭-৩৮	৩,৩২৬	৫,৫৪,৪১৬
১৯৩৮-৩৯	৩,৪৩১	৫,৭৫,২৯৮

দেখা যাইতেছে যে গত পাঁচ বৎসরে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়াছে ২৩৭টি এবং ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়াছে ৯৪,৩৩২। দেশে যদি বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে প্রত্যেক দেশহিতৈষী তাহাকে শুভলক্ষণ বলিয়া মনে করিবেন—কিন্তু বাংলা দেশের বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর ধারণা ইহার ঠিক বিপরীত। মাধ্যমিক শিক্ষা বিলটি পরিষদে উপস্থিত করিতে গিয়া শিক্ষামন্ত্রী (ইনি আবার প্রধান মন্ত্রীও বটেন) ঘোষণা করিলেন—

"Secondary Education is in Bengal at present uncontrolled. ... Expansion in an unplanned manner has been rapid. ... The development of Secondary Education cannot be allowed to drift indefinitely upon dangerous currents aimless and uncontrolled."

অর্থাৎ "বর্ত্তমানে বাংলা দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা অনিয়ন্ত্রিত ... শিক্ষার প্রসার দ্রুত গতিতে হইতেছে কিন্তু সুচিন্তিত প্রণালী অনুসারে নয় ... মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তৃতিকে কোনও মতেই বিপদসঙ্কুল আবর্ত্তে উদ্দেশ্যহীন, অনিয়ন্ত্রিতভাবে ভাসিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।"

সাধারণবুদ্ধিবিশিষ্ট লোকের কাছে সরল ভাষায় ইহার অর্থ দাঁড়ায় এই যে বৎসরে যে ৪৭।৪৮টি স্কুল গড়ে বাড়িয়াছে, ইহাতে দেশের অবস্থা অতীব বিপজ্জনক হইতেছে; সুতরাং এই শিক্ষার সঙ্কোচ সাধন করিতে হইবে।

কোন্ যুক্তির বলে যে বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী এই ধারণা করিলেন, তাহা দেশের লোক বুঝিতে অক্ষম।

আতঙ্কগ্রস্ত মন্ত্রিমণ্ডলী তাঁহাদের কল্পিত বিপজ্জনক আবর্ত্ত হইতে মাধ্যমিক শিক্ষাতরণীকে রক্ষা করিবার জন্য একটি শিক্ষাপরিষদ (Board) গঠন করিতে তৎপর হইয়াছেন। অর্থাৎ এই পরিষদ হইবে পাকা দাঁড়ী ও মাঝির দল এবং তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণে শিক্ষাতরণী আর বানচাল হইবে না। এই বোর্ড বা পরিষদের গঠন সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব, কিন্তু পূর্ব্বেই আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, নিয়ন্ত্রণ বলিতে মন্ত্রিমণ্ডলী কি বুঝেন ?

১৯৩৮-৩৯ সনের রিপোর্ট দেখা যায় বাংলা দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে শতকরা ৭টি ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়ে এবং শিক্ষার জন্য যত টাকা খরচ হয় বাংলা গবর্ণমেণ্ট তাহার মধ্যে মাত্র শতকরা অনধিক ১৫ টাকা মাত্র খরচ দেন। বাকী টাকা দেশের লোকেরাই সংগ্রহ করে। অথচ বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী এই অবস্থায় শিক্ষার সংস্কার করিতে চাহেন! তাজ্জব ব্যাপারেরও কি একটা সীমা নাই ?

বহুদিন হইতে বাংলা দেশের লোকদের শিক্ষার জন্য একটা আগ্রহ আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশ বুদ্ধিতে, বিদ্যায়, শিক্ষা বিস্তারে অগ্রগণ্য ছিল। বাংলাদেশের এই বৈশিষ্ট্য আজ বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহার কি প্রতিবাদ এবং প্রতিকার হইবে না ?

বর্ত্তমানে শিক্ষায়তনগুলি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা সরকারের শিক্ষাবিভাগ, ঢাকার মাধ্যমিক বোর্ড, জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি এবং প্রতি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি আছে। শিক্ষার ক্রম এবং ধারাবাহিক পদ্ধতি শিক্ষাবিভাগই নির্দ্ধারণ করেন, শুধু প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যপ্রণালী বিশ্ববিদ্যালয় নির্দ্ধারণ করেন। তথাপি মন্ত্রিমণ্ডলী তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন যে, বাংলা দেশের শিক্ষাপ্রণালীতে সুচিন্তিত ক্রম বা উদ্দেশ্য নাই। যদি না থাকে, তবে দোষ কাহার ? দেশবাসী বলিবে, সে দোষ শিক্ষাবিভাগের।

শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের কিন্তু ধারণা যে যত দোষ সংস্থাই বিশ্ববিদ্যালয়ের। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাবিস্তারের পক্ষপাতী। আসল কথা এই যে, সরকারী শিক্ষাবিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে রাজী নহেন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং তখন হইতে বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনভাবে দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করিয়া আসিতেছে। বাংলায় বর্ত্তমানে যে পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোত বর্ত্তমান, তাহার ইতিহাস যাঁহারা জানেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য লইয়া এই শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিকল্পনা প্রথমে চিন্তিত হয়, ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে এই শিক্ষার বীজ বপন করা হয়, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই শিক্ষাতরুটিকে সুদৃঢ়মূল করা হয়। এই শিক্ষাপ্রণালীর মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ ভারতে বিদেশী শাসনকে কায়েমী করিবার জন্য ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ এক দল কর্ম্মচারী তৈয়ার করা। বিদেশী ভাষার বাহনে এই শিক্ষাপ্রবর্ত্তনের দ্বারা ভারতীয় ভাষা ও ভারতীয় বুদ্ধিকে পঙ্গু করিবার উদ্দেশ্যই প্রচ্ছন্ন ছিল এবং সর্ব্বোপরি উদ্দেশ্য ছিল যে সরকারী চাকুরী দিয়া শিক্ষিতসমাজকে রাজভক্ত করিয়া রাখা।

বাংলা দেশে সর্ব্বপ্রথমে এই শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইলেও বাংলার শিক্ষিতসমাজে এমন কতকগুলি স্বাধীন চিন্তাশীল মানুষ আসিয়াছিলেন যাঁহাদের আদর্শ ও অনুপ্রেরণায় বাঙালী স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখিয়াছে, নিজের ভাষার উন্নতি করিয়াছে, ধর্ম্মসংস্কার করিয়াছে, সাহিত্য গড়িয়াছে, স্বাধীনতার আন্দোলন এবং সংগ্রাম করিয়াছে, এবং সর্ব্বোপরি দেশকে কুসংস্কারমুক্ত ও জাগ্রত করিবার জন্য শিক্ষাবিস্তার করিতে চাহিয়াছে। বাঙালী মনীষার এই স্বাধীন স্রোতকে রুদ্ধ করিয়া সঙ্কীর্ণ গতিতে পরিচালিত করিবার জন্য মাঝে মাঝে অনেক চেষ্টা হইয়াছে; কিন্তু বাঙালী প্রতিবারই তাহাকে ব্যর্থ করিয়াছে। কিন্তু এবারের যে আয়োজন, তাহা অত্যন্ত সর্ব্বনাশজনক,—কারণ এতদিন পর্য্যন্ত বাধা আসিয়াছে বাহির হইতে, এবারে আসিতেছে ভিতর হইতে।

বাংলাদেশ হিন্দুমুসলমানের দেশ। ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালী হিন্দুরা ইংরেজী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করে এবং রাজকার্য্য পরিচালনায় ইংরেজের সহায়তা করে। তাহার পর হইতে প্রধানতঃ হিন্দুদিগের চেষ্টায় এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। শিক্ষিতগণ-সংখ্যায় সেই জন্য হিন্দুর প্রাধান্য বেশী। তাহার পর যেদিন হিন্দুরা দেশাত্মবোধে প্রবুদ্ধ হইয়া স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিল, স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করিল, সেই দিন হইতে হিন্দু রাজশক্তির বিরাগভাজন হইল,—সেই দিন হইতে রাজশক্তি হিন্দুকে জব্দ করিবার জন্য মুসলমান সম্প্রদায়কে অনুগ্রহে তুষ্ট করিয়া হিন্দু-বিদ্বেষী করিতে সচেষ্ট হইল।

রাজনীতিতে সুপরিচিত এই ভেদনীতি আজ ভারতবর্ষকে দ্বিধাবিভক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে—হিন্দুস্থানকে চিরিয়া পাকিস্থান করিতে মন্ত্রণা দিতেছে—হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানকে উত্তেজিত করিবার ছল এবং প্রশ্রয় ক্রমাগতই খুঁজিতেছে। ফলে আজ ভারতের জাতীয়তা বিপন্ন—ভারতের আকাশবাতাস, জলস্থল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বাষ্পে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ভারতের মধ্যে অগ্রগামী বাঙালীকে আজ এই বিষে জর্জ্জরিত হইতে হইয়াছে।

বাংলার শান্তি, সংস্কৃতি, উন্নতি আজ বিপন্ন। বাংলাকে এই বিপদ হইতে কে উদ্ধার করিবে?

জাতিগঠনের ভিত্তি শিক্ষা। এই শিক্ষার সাহায্যে হিন্দুরা এক অখণ্ড জাতিগঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল;—তাহারা বিদ্বেষ আনে নাই, ভেদাভেদ চাহে নাই—জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলকেই আহ্বান করিয়াছিল শিক্ষাসত্রে দীক্ষা লইবার জন্য—কিন্তু আজ সে-সাধে বাদ পড়িয়াছে। শিক্ষার সঙ্কোচ সাধনে, শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতার সংহার-মানসে বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের বিশ্লেষণ

যে নূতন মাধ্যমিক শিক্ষা বিল তাঁহারা প্রণয়ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহা যদি আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে দেশের শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন হইবে।

(১) গত পঁচাশি বৎসর যাবৎ অনুমোদিত উচ্চবিদ্যালয়গুলির উপর প্রবেশিকা পরীক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে এবং যে ক্ষমতার কোনও অপব্যবহার আজ পর্য্যন্ত হয় নাই, সেই ক্ষমতাকে রাতারাতি অপহরণ করা হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য শিক্ষাবিস্তার—সেই উদ্দেশ্যে কুঠারাঘাত করার অর্থই শিক্ষার সঙ্কোচ—এই সঙ্কোচ কি দেশবাসী নীরবে সহ্য করিবে?

(২) যেদিন হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব দেশের শিক্ষিত নেতাদের হাতে গিয়াছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সংস্কারের হিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন সেই দিন হইতে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার জন্য চেষ্টার ক্রটি করে নাই। তাহারা যাহা পারে নাই এই বার দেশীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর চেষ্টায় তাহা সাধিত হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাম্রাজ্যবাদিগণের বিরাগভাজন হওয়ার পর হইতে সরকার হইতে উপযুক্ত সাহায্য পাওয়ার অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আসিয়াছে—সেই ক্ষতির কথঞ্চিৎ পূরণ করার চেষ্টা হইয়াছে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের দ্বারা। কিন্তু নূতন বিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ক্ষমতাটুকুও অপহরণ করার প্রস্তাব হইয়াছে—অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতিপূরণের কোনও বন্দোবস্ত করা হয় নাই! ইহা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বিদ্বেষমূলক নহে?

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ও অন্তর্ভুক্ত যতগুলি উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় আছে সেই সমস্ত বিদ্যালয়ের অনুমোদন বাতিল করা হইবে। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১,৩৫৫। এই বিদ্যালয়গুলিকে মিলে প্রস্তাবিত বোর্ডের অনুমোদন নূতন করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যদি ইহারা অনুমোদন লাভ না করে তবে ইহাদের ছাত্রগণ এমন কি প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবেও ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে পারিবে না—কারণ প্রস্তাবিত বিলে এইরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে বিশ্ববিদ্যালয় কোন প্রাইভেট পরীক্ষার্থীকেও পরীক্ষা দানে অনুমতি দিতে পারিবেন না।

এই ১,৩৫৫টি উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রায় এক সহস্র বিদ্যালয় সরকার হইতে কোনও সাহায্য পায় না। সেগুলি দেশের লোকের অর্থে স্থাপিত, দেশীয় শিক্ষকগণের স্বার্থত্যাগে গঠিত এবং জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত। এই সকল বিদ্যালয়ের স্বাধীনতা হরণ করার কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে তাহা দেশবাসী সহজেই অনুমান করিতে পারেন। দেশে যাহাতে শিক্ষাবিস্তার না হয় তাহাই একমাত্র উদ্দেশ্য।

(৪) এই বিল আইনে পরিণত হইলে শিক্ষিত বিদ্বানগণের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের স্বাধীনতা থাকিবে না—বিদ্যালয়-সমূহেরও পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচনের স্বাধীনতা থাকিবে না। প্রস্তাবিত বোর্ডের একটি কমিটির হস্তে এই ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত হইবে। সরকারী শিক্ষাবিভাগের বর্ত্তমান পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচনী কমিটির কার্য্যের সহিত যাঁহারা সুপরিচিত তাঁহারাই জানেন যে, এই কমিটির কার্য্য আদৌ সন্তোষজনক নহে। তাঁহারা পুস্তকের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিবেচনা না করিয়া আয়ের দিকেই লক্ষ্য রাখেন। সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় যে ১৯৩৮-৩৯ সনে এই কমিটির উদ্বৃত্ত আয় হইয়াছে ৬,১৯৯ টাকা।

এই ভাবে দেশের শিক্ষাকে মুষ্টিমেয় সরকারী প্রসাদপুষ্ট কয়েক ব্যক্তির খেলার বস্তু হইতে দেওয়া কি দেশবাসীর উচিত?

(৫) প্রস্তাবিত বিলটি যদি আইনে পরিণত হয় তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জাতিগঠনের আশা দুঃস্বপ্নে পরিণত হইবে।

ইহাতে বর্ণহিন্দুদের শিক্ষার জন্য কোনও ব্যবস্থা করা হয় নাই, অবর্ণ হিন্দুদের জন্য, মুসলমানদের জন্য এবং বালিকা-দিগের জন্য বিভিন্ন কমিটির সৃষ্টি হইবে। ফলে শিক্ষা-প্রণালী বহুধা বিভক্ত হইবে।

(৬) প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রধান অভিযোগ এই যে ইহাতে শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিষময় বীজ বপন করা হইবে। ইঁহারা যে শিক্ষাবোর্ড গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন ইহাতে সর্ব্ব বিভাগে, সর্ব্ব কমিটিতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা রাজনীতিক্ষেত্রে কিরূপ বিষময় ফল প্রসব করিয়াছে তাহা সর্ব্বজনবিদিত—সেই বিষ শিক্ষাক্ষেত্রে কিছুতেই প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নয়।

সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের কথা এই যে, এদেশে হিন্দুগণ শিক্ষায় অগ্রণী, শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দুগণের দান অতুলনীয়। সেই হিন্দুবিরোধিতায় পরিপূর্ণ হইয়া মুসলমান মন্ত্রিমণ্ডলী এই বিল প্রণয়ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, কয়েক জন তাঁবেদার হিন্দু মন্ত্রী এই বিষয়ে তাঁহাদের সাহায্য করিতেছেন।

যদি এই বিল আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে বাংলার হিন্দুকে বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার পথ অন্বেষণ করিতে হইবে। বিলের প্রচ্ছন্ন পরামর্শদাতা যে-সকল সাম্রাজ্য-বাদী ইংরেজ আছেন তাঁহাদের মনোরথ সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইবে। ইস্‌লামের দোহাই দিয়া প্রধানমন্ত্রী মাধ্যমিক শিক্ষা বিল আইনে পরিণত করিতে চাহিয়াছেন। অতি সম্প্রতি তিনি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, মুষ্টিমেয় বর্ণ-হিন্দু শুধু এই বিলের বিপক্ষে আছে। কিন্তু তাঁহার এ-কথা জানা আছে বর্ণহিন্দুর দানই বাংলার শিক্ষাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। তিনি বর্ণহিন্দুবিরোধিতার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া এই অসত্য উক্তি করিয়াছেন। কিন্তু এ-কথা ভুলিলে চলিবে কেন যে, বাংলা দেশে গত তিন শতাব্দীর ইতিহাস এই মুষ্টিমেয় বর্ণহিন্দুই রচনা করিয়াছে। আজ যদি এই মুষ্টিমেয় বর্ণহিন্দুকে নানা ভাবে পিষিয়া মারিবার চেষ্টা চলে, তবে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়াই আত্মরক্ষা করিতে হইবে।

(৭) মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের জন্য কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে স্যাড্‌লার কমিশন যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, তাহার দোহাই দিয়া এই বিল পাস করাইবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু স্যাড্‌লার কমিশনের রিপোর্টে যে-সকল ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছিল, পরিকল্পনার সেই সমস্ত অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাদ দিয়া শুধু একটি সাম্প্রদায়িক বোর্ড গঠন করিয়া শিক্ষার সঙ্কোচ করিলে কি শিক্ষার সংস্কার হইবে?

কমিশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছিল যে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার করিতে হইলে দেড় কোটি টাকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্ত্তমান বিলে মাত্র ২৫ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালের সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় যে, বাংলা সরকার এই বৎসরে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করিয়াছেন মাত্র ২৩,৩৯,৪৪০ টাকা অথচ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ খরচ করিয়াছেন ১,২৫,৫৯,২২২ টাকা। আর বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই যে বর্ণহিন্দুগণের অর্থে পরিচালিত, তাহা ধূর্ত্ত ও মূর্খ ছাড়া কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।

যে সরকারের অর্থ নাই, কিংবা অর্থ থাকিলেও শিক্ষার জন্য যথেষ্ট ব্যয় করিবার ইচ্ছা নাই, সে সরকারের নেতৃত্ব করার এত সাধ কেন?

(৮) বাংলা দেশ নদীমাতৃক। এ-দেশে খাল-বিল প্রচুর। পূর্ব্ববঙ্গ এবং দক্ষিণ-বঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থানের সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা জানেন, এই সকল অঞ্চলে যাতায়াতের অসুবিধা কিরূপ, বিশেষতঃ বর্ষাকালে। এখানে স্কুলের সংখ্যা যত বেশী হইবে, পল্লী-অঞ্চলের অধিবাসিগণের পক্ষে ততই সুবিধা হইবে। যদি স্কুলের সংখ্যা হ্রাস করা হয়, তবে পল্লীবাসিগণের সমূহ ক্ষতি হইবে। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের দরিদ্র মুসলমান অধিবাসিগণের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা তাহাতে বিপন্ন হইবে। অথচ মুসলমান মন্ত্রিগণ ইস্‌লামের নামে এই সকল সরল মুসলমানকে ভুল বুঝাইয়া নিজেদের প্রভুত্ব বজায় ও আত্মীয় পোষণ করিতে চাহিতেছেন। আজ সময় থাকিতে মুসলমান ভাইগণ এই প্রভুত্ববাদী মন্ত্রিমণ্ডলীর যথার্থ স্বরূপ দেখুন।

যে স্যাডলার কমিশনের দোহাই দিয়া মন্ত্রিমণ্ডলী দেশ-

বাসীকে বোকা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, সেই কমিশনের সুচিন্তিত মন্তব্য হইতেছে এই :—

"The country is in urgent need of more schools and more colleges, but the schools should teach better and the colleges should give a more thorough preparation for life. To restrict education would be unjust and short-sighted."

অর্থাৎ দেশের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইতেছে আরও বেশী বিদ্যালয় এবং আরও বেশী কলেজ। কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে স্কুলগুলিতে যেন উন্নততর ধরণের শিক্ষা দেওয়া হয় এবং কলেজগুলিতে যেন এমন শিক্ষা দেওয়া হয়, যাহাতে শিক্ষার্থী জীবন গঠন ও যাপনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়। শিক্ষার সংকোচসাধন অদূরদর্শিতা ও অবিচারের কার্য্য হইবে।

এই উন্নততর প্রণালীর শিক্ষাদানের জন্য গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট কিছুই করেন নাই। তাঁহারা নূতন ট্রেণিং স্কুল বা কলেজ স্থাপন করেন নাই। তাঁহারা অধিকসংখ্যক স্কুলকে সাহায্য করেন নাই। তাঁহারা শিক্ষকগণের আর্থিক অবস্থাকে উন্নত করিবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা দেশে অধিকসংখ্যক কৃষি-বিদ্যালয়, শিল্প-বিদ্যালয় বা ব্যবসায় শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপন করেন নাই। যাহাতে দেশের সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ হয়, এমন কোনও ব্যবস্থাই করেন নাই।

কিন্তু বাংলা গবর্ণমেণ্টের নিশ্চেষ্টতা সত্ত্বেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধিকসংখ্যক শিক্ষকের ট্রেণিংএর ব্যবস্থা করিয়াছেন। মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণের বন্দোবস্ত করিয়াছেন এবং কৃষিবিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন; শিক্ষার্থিগণের সামরিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। সুদূর পল্লী-অঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা করিয়াছেন। শিক্ষকগণের অবস্থার উন্নতির জন্য স্কুল কোড (School Code) বা বিদ্যালয়সংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন। বিনা অপরাধে কর্ম্মচ্যুত শিক্ষকগণের সুবিচার প্রাপ্তির জন্য Arbitration Board গঠন করিয়াছেন।

নূতন যে বিল প্রণয়ন করা হইতেছে তাহার কোথাও শিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে একটি কথা নাই; শুধু আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা হরণ করার কথা এবং শিক্ষাকে কায়েমীভাবে সংকোচ করার কথা।

আসল কথা মন্ত্রিমণ্ডলী জানেন যে অর্থ না থাকিলে কোনও উন্নতির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে না, তাই তাঁহারা উন্নতির কথা তোলেন নাই। কিন্তু ইস্লাম বিপন্ন, এই ধুয়া ধরিয়া মুসলমানগণকে বিপথচালিত করিয়া ভোটের জোরে দেশের ক্ষতিকর এই আইন করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

(৯) বিদ্যালয়গুলির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে স্যাডলার কমিশন বলিয়াছেন যে পুরাপুরিভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বিপজ্জনক হইবে। তাঁহারা বলিয়াছেন—

"There is an element of danger in any great extension of Governmental control over schools."

সেইজন্য তাঁহারা অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের দ্বারা একটি ছোট বোর্ড গঠন করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।

কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রস্তাবিত বোর্ডের সেরূপ স্বাধীনতা

থাকিবে না। একে ত ইহাতে সরকারী প্রতিনিধি ও কর্ম্মচারীই থাকিবে বেশী, তাহার উপরে ইহাকে সব সময়েই সরকারের অনুমোদনের জন্য কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকিতে হইবে এবং এই বোর্ডের হাতে থাকিবে না উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ। ব্যবস্থাটা যে হাস্যাস্পদ হইবে, তাহাতে কি সন্দেহ আছে?

গবর্মেণ্ট বোর্ডের যে-কোন কাজ ও ব্যবস্থা ইত্যাদি বাতিল করিতে পারিবেন, এবং ইচ্ছা করিলে বোর্ডের সভাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া সকল সদস্যকে পদচ্যুত করিয়া নূতন বোর্ড গঠন করিতে পারিবেন। সুতরাং বোর্ডকে সর্ব্বদা কৃতাঞ্জলি থাকিতে হইবে বলা 'অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

গবর্মেণ্ট সম্প্রদায়বিশেষের বিদ্যালয়সমূহ সম্বন্ধে এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ের সম্প্রদায়বিশেষের ছাত্রদের সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্ব করিবার পথ খোলা রাখিয়াছেন। বিলে এই ধারা আছে যে, প্রয়োজন হইলে বোর্ডের নিয়মগুলি তাহাদের প্রতি খটিবে না।

(১০) বঙ্গীয় মন্ত্রিমণ্ডল যে বোর্ড গঠন করিতে চাহিয়াছেন তাহাতে বিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক সমিতির কোন প্রতিনিধি থাকিবে না, শিক্ষকগণের কোনও প্রতিনিধি থাকিবে না। অথচ যে ইংরেজি ও আধা-ইংরেজিগণের সন্তানসন্ততিরা এদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করে না, তাহাদের প্রতিনিধি প্রেরণের যথেষ্ট ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহা প্রকারান্তরে ইংরেজি প্রভুগণের তুষ্টিবিধানের প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নহে।

ইংরেজ ও ইঙ্গ-ভারতীয় ছাত্রছাত্রীগণের জন্য বাংলা দেশে ৬৭টি স্কুল আছে; তাহাদের মধ্যে ২৪টি স্কুলে মাধ্যমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্টে দেখা যায় যে এই ৬৭টি স্কুলের মোট ছাত্রসংখ্যা ১২,৮০৫ এবং ইহাদের জন্য সরকারী তহবিল হইতে খরচ হইয়াছে ৯,৬০,৮৯৫ টাকা এবং মিউনিসিপাল তহবিল হইতে খরচ হইয়াছে ২৮,৬৪১ টাকা।

অথচ পৌণে ছয় লক্ষ দেশীয় ছাত্রের জন্য বাংলা সরকার খরচ করিয়াছেন এবং করিবেন মোট ২৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রতি ইঙ্গ-ভারতীয় ছাত্রের জন্য তাঁহারা খরচ করিবেন প্রায় আশী টাকা এবং প্রতি বাঙালী ছাত্রের জন্য খরচ করিবেন মাত্র চার টাকা বা সাড়ে চার টাকা।

জনসংখ্যার অনুপাতে শতকরা ২৬টি ইংরেজ-সন্তান এদেশে শিক্ষালাভ করে; তাহাদের শিক্ষাবিস্তারের জন্য মন্ত্রিমণ্ডলী ছাত্রপ্রতি আশী টাকা ব্যয় করিতে কাতর নহেন কিন্তু দেশীয় ছাত্র মোট অধিবাসীর শতকরা ৭টি বলিয়া তাহাদের শিক্ষার সঙ্কোচ করিবেন। ইহাই ইহাদের দেশপ্রীতির নমুনা।

(১১) ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে ইংরেজ ও আধা-ইংরেজগণের সন্ততিগণের শিক্ষার প্রসার ও উন্নতিকল্পে যে শিক্ষা বোর্ড আছে তাহার গঠনতন্ত্রে ১৩ জন লোক থাকে।

(১) শিক্ষামন্ত্রী বা তাঁহার প্রতিনিধি—১
(২) শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তা—১

(৩) বিদ্যালয়সমূহের প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের প্রতিনিধি—৩

(৪) ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের মনোনীত—৩

(৫) শিক্ষকগণের প্রতিনিধি—৩

(৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি—১

১২

ইহাদের সহিত বিদ্যালয়সমূহের ইন্‌স্পেক্টার বা পরিদর্শক এক জন থাকেন, কিন্তু তাঁহার ভোট থাকে না!

আর বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী যে বোর্ড গঠন করিতেছেন তাহাতে বিদ্যালয়সমূহের প্রতিনিধির স্থান নাই, শিক্ষকগণের প্রতিনিধির স্থান নাই অথচ যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষাবিভাগের থাকিবে এবং পরিদর্শকগণের ভোটাধিকার থাকিবে। প্রস্তাবিত বোর্ডটি বস্তুতপক্ষে পরিচালিত হইবে সরকারী শিক্ষাবিভাগের পরিদর্শকগুলির দ্বারা। বাকি সকলেই মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সুতরাং তাঁহারা "ঘুমন্ত অংশীদার" হইয়া থাকিবেন।

এইরূপ বোর্ডের হাতে শিক্ষায় কি কোনও উন্নতির আশা করা যায়?

(১২) ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যেখানে যেখানে শিক্ষা-বোর্ড স্থাপিত আছে, সে-সকল বোর্ডের কার্য্য-কলাপদৃষ্টে অনেক লোকের মনে ধারণা হইয়াছে যে বোর্ড-গুলির কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। সর্ জর্জ্জ অ্যাণ্ডারসন বলিয়াছেন—

"These boards have not achieved the success which is essential to a properly regulated system of secondary education."

"সুনিয়ন্ত্রিত মাধ্যমিক শিক্ষা প্রণালীর পক্ষে অপরিহার্য্য যে কৃতকার্য্যতা, তাহা এই বোর্ডসমূহ লাভ করে নাই।"

সর্ জিয়াউদ্দিন আহম্মদ সংযুক্ত প্রদেশের মাধ্যমিক বোর্ড সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন—

"The general standard of teaching and examination has gone down by the transfer of Intermediate examination from the universities to the Board. The Matriculation or High School examination has definitely suffered."

অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত হইতে বোর্ডের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার পর হইতে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের শিক্ষা ও পরীক্ষার মান অবনত হইয়াছে, আর প্রবেশিকা পরীক্ষার মান ও ফল যৎপরোনাস্তি শোচনীয় হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, সর্ জর্জ্জ অ্যাণ্ডারসন বা সর্ জিয়াউদ্দীন আহাম্মদ বর্ণহিন্দু নহেন।

গত ১৯ বৎসরের মধ্যে ঢাকা বোর্ড শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন বা সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারে নাই। এ-সকল নিদর্শন থাকিতেও বাংলার মন্ত্রিমণ্ডল কেন যে সকল দোষের আকর অদ্ভুত একটা বোর্ড গঠন করিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছেন, তাহা বুঝিতে দেরী হয় না। ইহার তিনটি উদ্দেশ্য হইতে পারে;—প্রথমতঃ, সাম্রাজ্যবাদী প্রভুগণের মনস্তুষ্টি বিধান করা; দ্বিতীয়তঃ, মুসলমান-সমাজকে বিভ্রান্ত করিয়া কয়েকজন আত্মীয়কে বড় চাকুরীতে বা উচ্চপদে প্রবেশ করাইয়া স্বীয় দলকে দৃঢ় ভিত্তিতে গঠন করা; তৃতীয়তঃ, বর্ণহিন্দুদিগের উপর নির্ম্মম অবিচার করিয়া চিরকালের মত তাহাদের পদানত করিয়া রাখা।

কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডলীর এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। মুসলমান সমাজে শিক্ষিত-সংখ্যা আজ কম আছে বলিয়া তাঁহারা চিরদিন বিমূঢ় থাকিবেন না।

গত ২১শে ও ২২শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় যে বিরাট্ সম্মেলন হইয়াছিল তাহাতে বাংলার সকল রাজনৈতিক দলের নেতারা, বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষীরা এবং বাংলার সমগ্র শিক্ষাসমাজের দশ সহস্র প্রতিনিধি সমবেত হইয়া এই মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বেও দেশের নানা স্থানে বহু প্রতিবাদ-সভার অনুষ্ঠান হইয়াছে। কিন্তু বিষয়টি এরূপ গুরুত্বপূর্ণ এবং বিলটি আইনে পরিণত হইবে যে শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে, তাহা স্মরণে রাখিয়া ইহার বিরুদ্ধে আরও প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক।

আশা করা যায় যে, অতঃপর বাংলার জেলায় জেলায় প্রতিবাদ-সম্মেলন আহূত হইবে এবং বাংলার মুসলমানগণ দলে দলে হিন্দুদিগের সহিত সমবেত হইয়া জাতীয়তার পরিপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবেন।

যদি মন্ত্রিমণ্ডল এই সকল প্রতিবাদে কর্ণপাত না করেন তাহা হইলে জাতির স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে নূতন কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষার ও শিক্ষামন্দিরের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য বাঙালীকে আত্মত্যাগে প্রস্তুত হইয়া অগ্নিমন্ত্রে নূতন করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে
শ্রীরমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

রাগিণী মধুমাধবী

রাজপুত চিত্র

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

চিত্রাধিকারী শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গীয়

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪০শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৪৭

৫ম সংখ্যা

ঐকতান

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী
মানুষের কত কীর্তি কত নদী গিরি সিন্ধু মরু
কত না অজানা জীব কত না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে—
যেথা পাই চিত্রময় বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক
রয়ে গেছে ফাঁক।
কল্পনায় অনুমানে ধরিত্রীর মহা একতান
কত না নিস্তব্ধ ক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ

দুর্গম তুষার-গিরি অসীম নিঃশব্দ নীলিমায়
অশ্রুত যে গান গায়
আমার অন্তরে বার-বার
পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ তার।
দক্ষিণ-মেরুর উর্ধ্বে যে অজ্ঞাত তারা
মহা জনশূন্যতায় দীর্ঘ রাত্রি করিতেছে সারা
সে আমার অর্ধরাত্রে অনিমেষ চোখে
অনিদ্রা করেছে স্পর্শ অপূর্ব আলোকে।
সুদূরের মহাপ্লাবী প্রচণ্ড নির্ঝর
মনের গহনে মোর পাঠায়েছে স্বর।
প্রকৃতির ঐকতান-স্রোতে
নানা কবি ঢালে গান নানাদিক হতে।
তাদের সবার সাথে আছে মোর এইমাত্র যোগ
সঙ্গ পাই সবাকার লাভ করি আনন্দের ভোগ,
গীত-ভারতীর আমি পাই তো প্রসাদ
নিখিলের সংগীতের স্বাদ।
সব চেয়ে দুর্গম যে-মানুষ আপন অন্তরালে
তার পূর্ণ পরিমাপ নাই বাহিরের দেশেকালে।
সে অন্তরময়
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে জেলে ফেলে জাল,
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চির নির্বাসনে
সমাজের উচ্চমঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও-পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে
ভিতরে প্রবেশ করি সে-শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হ'লে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।

তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে-জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে-কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে নিত্য আমি থাকি তার খোঁজে।
সেটা সত্য হোক
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজদুরি।
এসো কবি, অখ্যাত জনের,
নির্বাক মনের
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার
প্রাণহীন এ-দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।
অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি
তাই তুমি দাও তো উদ্বারি।
সাহিত্যের ঐকতান-সংগীত-সভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়
মূক যারা দুঃখে সুখে
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে।
ওগো গুণী
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনার খ্যাতি;
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার॥

উদয়ন, ২১।১।৪১, প্রাতে

১১ই মাঘ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক প্রতিকূল লোকমত প্রায়ই অত্যন্ত তীব্র হয়ে দেখা দেয়—ব্যক্তিগত কটুভাষণের সঙ্গে বিজড়িত হওয়াতে সেই তীব্রতার সামনে দাঁড়িয়ে আপন মত প্রকাশ করা সংকোচের বিষয় হয়ে ওঠে। আজ আমার পক্ষে সেই সংকোচের দিনের অবসান হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে আমি মৃত্যুর গহনে অবতরণ করেছিলুম, এখনও তার বন্ধুর তটভাগে স্খলিত পদে চলেছি। আজ আমার পক্ষে লোকমতের প্রভাব আর প্রবল নয়—এখন নিরবধিকাল আমার সম্মুখে বর্তমান।

১১ই মাঘের উৎসব যে-সত্যে প্রতিষ্ঠিত তাকে আমাদের দেশের জনসাধারণ স্বীকার করে নি। যা তারা স্বীকার করে না তাকে তারা কলঙ্কিত করে। যিনি পরম শ্রদ্ধেয় যেমন মহাত্মা রামমোহন রায় তাঁর সম্বন্ধে বিরোধের উত্তাপ আজো প্রশমিত হয় নি। এটা স্বাভাবিক সুতরাং অনিবার্য, অতএব তাই নিয়ে পরস্পরকে লাঞ্ছিত করা নিরর্থক। এ সকল দ্বন্দ্ব-কোলাহল ভুলে গিয়ে অদ্যকার উৎসবের মূলে যাঁর মহান চারিত্রশক্তি প্রতিষ্ঠিত শান্তমনে তাঁকে স্মরণ করে তাঁর উদ্দেশে আমাদের ভক্তি নিবেদন করব। মতভেদ সত্ত্বেও এই শ্রদ্ধার কারণকে সত্য বলে স্বীকার করবেন এ কথা আমাদের দেশের সকলের কাছেই প্রত্যাশা করতে পারি। কারণ এই সম্মানে স্বদেশের প্রতিই সম্মান।

পরজাতীয়কে যখন আমরা আচার ধর্ম নিয়ে বিচার করি তখন স্বভাবত অত্যুক্তি করে থাকি, বিশেষত যেখানে তাদের সঙ্গে এমন সম্বন্ধ যা দুঃখ দেয় এবং অপমান করে। কিন্তু তাদের ধর্ম ব্যক্তিগত জীবনে অনেক মহত্ত্ব প্রকাশ ক'রে থাকে তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের দেশেও সামাজিক শত বাধা ভেদ করে মহাপুরুষের উদ্ভব হয়েছে কিন্তু সংস্কারের আবিলতায় আমরা তাঁদের ক্ষুদ্র করেছি, তাঁদের সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি নি। জাতীয় চিত্তদৈন্যের এই বিকৃতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে প্রত্যহ আমাদের ইতিহাসে।

খ্রীষ্টধর্ম মানুষকে শ্রদ্ধা করেছে কেননা তাঁদের যিনি পূজনীয় তিনি মানবের রূপে মানবের ভাগ্য স্বীকার করেছিলেন। এই কারণে যাঁরা যথার্থ খ্রীষ্টান তাঁদের মানবপ্রীতি অকৃত্রিমভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে দেশে বিদেশে, আমরা তার পরিচয় পেয়েছি। যদি তাঁদের ধর্মমতে কোনো অসম্পূর্ণতা থাকে ব'লে আমরা মনে করি, তবু এ-কথা স্বীকার করতে হবে যে অন্তত এক জায়গায় এই ধর্ম মানবজাতির সঙ্গে আত্মনিবেদনের যোগে তাঁদের সম্বন্ধযুক্ত করতে পেরেছে, সেটা ধর্মবুদ্ধির শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাঁদের সাহিত্য এবং ব্যবহারে যেখানে মাহাত্ম্য দেখেছি মানবিকতা সেখানে সমুজ্জ্বল। সেখানে দৈন্য নেই, সেখানে স্বার্থের সংঘাতের ঊর্ধ্বে একটি উদার সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। আমাদের দেশে ধর্ম মানুষের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে; আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বাহন না হয়ে আধুনিক ভারতীয় ধর্মানুষ্ঠান দেশব্যাপী ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি করেছে।

আচার যেখানে সাম্প্রদায়িক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত নয় সেখানে তাই নিয়ে মানুষের পরস্পর অনৈক্য ঘটে না। যেমন চীনদেশে। চীন-সভ্যতায় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিরোধ নেই মতের পার্থক্য সত্ত্বেও। আচারে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধর্মের নামে সমাজকে তারা নিপীড়িত করে নি। যখন এক সময়ে খ্রীষ্টধর্ম ঈশ্বরের ক্রোধের দোহাই দিয়ে বাহুবলে নিজের প্রভুত্ববিস্তার চেষ্টা করেছিল তখনই সে ভিন্নমতাবলম্বীদের নির্যাতন করেছে, কেননা তখনও তাদের ধর্ম শুভবুদ্ধিকে অমান্য ক'রে সংস্কারকেই স্বীকার করেছিল। সর্বসাধারণের বিশ্বাসের কোনো বুদ্ধিসম্মত ভূমিকা তাতে দেখা দেয় নি শাস্ত্র-অনুশাসন ছাড়া। আজকের দিনে য়ুরোপীয় সভ্যতার বহু ত্রুটি সত্ত্বেও সমাজে ধর্মের অন্ধ আক্রমণ নেই, তাদের মধ্যে কেউ বৌদ্ধ বা মুসলমান হ'লে তাকে ধর্মের নাম নিয়ে অত্যাচার করা হয় না। আচার এবং ধর্মের মিশ্রণে তাদের সমাজ কলুষিত হয় নি—তাদের শক্তির একটি কারণ সেইখানে। আমাদের দেশে শক্তিক্ষয়ের প্রধান একটা হেতু ধর্মের নাম নিয়ে প্রাত্যহিক জীবনে বহু নিরর্থক সংস্কারের আধিপত্য। এতে ধর্মের ভ্রষ্টতা এবং আচারের অত্যাচার-পরায়ণ অন্যায় রূপ প্রকাশ পায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপে দক্ষিণ-মালাবারের একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। কোনো ব্রাহ্মণেতরজাতীয় ডাক্তারকে ব্রাহ্মণ গৃহস্থ আপন বাড়িতে নিয়েছিল চিকিৎসার জন্য, যে পথ দিয়ে গিয়েছিল সেটা কোনো পুষ্করিণীর তীরস্থ। তাতে মকদ্দমা উঠেছিল আদালত পর্যন্ত, যে, সমস্ত পুষ্করিণীর জল দূষিত হয়েছে অতএব তাকে শোধন করবার আইন জারি হোক অপরাধী গৃহস্থের উপর। এখানে দেখি দণ্ডদাতা আইন এবং আচারের সমবেত মূঢ় আক্রমণ, এর মধ্যে শাশ্বত ধর্মের পরিচয় নেই। অথচ ধর্মের নামে এই রকম অমানবিকতা আমাদের দেশে শ্রদ্ধা পেয়ে আসছে। মহাপুরুষ দৈবে আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ ক'রে এই অধার্মিক ধর্মবিশ্বাস এবং বুদ্ধিবিরোধী আচারের প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন। তথাপি দেশের জনসাধারণের মধ্যে নিরর্থক অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তিই ধর্মের মর্যাদা নিয়েছে এবং আজও ধর্মবোধহীন অমানবিকতার চাপে সমাজ মানুষকে অপমানিত করছে।

এই প্রকার মিথ্যা ধর্মবিশ্বাসের অভিঘাতে সমাজ শতখণ্ডে ভেঙে পড়ল—তার নাম নিয়ে বেশির ভাগ দেশবাসীকে অশ্রদ্ধাভাজন করা হ'ল, বলা হ'ল অশুচি এবং অপাংক্তেয়। আচারের বেড়া গেঁথে যে বহু-সংখ্যক মানুষকে দূরে সরিয়েছি তাদের দুর্বলতা এবং মূঢ়তা তাদের আত্মাবমাননা সমগ্র দেশের উপর চেপে তাকে অকৃতার্থ করে রেখেছে সুদীর্ঘকাল। অথচ আমাদের যা বিশুদ্ধ, যা আমাদের সনাতন আধ্যাত্মিক সম্পদ তাতে মানুষের এবং সর্বজীবের মূল্য ভূরিপরিমাণ স্বীকার করেছে। আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি—এত বড়ো কথা বোধ হয় কোনো শাস্ত্রে নেই। সকলের মধ্যে আত্মার এই সম্বন্ধস্বীকার এবং এই সমগ্রের দৃষ্টিকে আমরা হারিয়েছি। আনুষ্ঠানিক মোহে আচ্ছন্ন হয়ে ঘরে ঘরে আচারের এবং অনৈক্যের ব্যর্থতা বিস্তার করেছি। জাতীয় সত্তা শতধা বিখণ্ডিত হয়ে আজ আমাদের চরম দুরবস্থা উপস্থিত। এই দুর্গতিগ্রস্ত সমাজে একদিন একটি ব্রাহ্মণ সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন, রামমোহন রায়। সমাজের সমস্ত অন্ধতাকে তিনি প্রতি পদে অস্বীকার করেছেন, নির্ভয়ে দাঁড়িয়েছেন মূঢ় সংস্কারের বিরুদ্ধে। সেজন্যে তিনি নিন্দাভাজন হয়েছেন এবং সেই নিন্দার আক্রমণ এখনো শান্ত হয় নি। এই দুর্গতির দিনেই আজ আমাদের পুনর্বার তাঁর বাণী স্মরণ করবার সময় এল। তাঁর মহাজীবনের মূল সাধনা কোন্‌খানে নিহিত তা আমাদের বুঝতে হবে।

উপনিষদের একটি মন্ত্র আছে—সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম; বিশ্ববিধাতার একটা রূপ আছে যা কেবলমাত্র সত্য, অর্থাৎ আছে ছাড়া তার অন্য বাণী নেই। তার পরবর্তী কথা হচ্ছে জ্ঞানং—সে কেবলমাত্র হওয়া নয়। সত্যবোধের উপরে জ্ঞানের উপলব্ধিতে মনুষ্যত্বের বড়ো পদবী লাভ হ'ল। সেই জ্ঞানকে যেখানে অবজ্ঞা করা হয়েছে, বুদ্ধির মোহমুক্ত বহুধা শক্তিকে প্রয়োগ না ক'রে মানবত্বকে যেখানে অস্বীকার করেছি সেইখানে আমাদের অকৃতার্থতা। জ্ঞানের সোপান দিয়ে উপনীত হই পরমাত্মায়, কৃত্রিম কর্মের পথে নয়। তাঁর সামীপ্যে সর্বমানবের মিলন। ব্রহ্মকে উপনিষদ-কথিত বাণীতে উপলব্ধি করতে হ'লে বিশ্বসত্যকে স্বীকার ক'রে জ্ঞানের ভিতর দিয়ে আধ্যাত্মিক সত্যে পৌঁছতে হবে।

সংপ্রাপ্যৈনম্ ঋষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি ॥

সর্বব্যাপী আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সকলের মধ্যে জ্ঞানতৃপ্ত ঋষিরা প্রবেশ করেন। আমাদের শাস্ত্র-মতে এই হচ্ছে মানুষের চরম সার্থকতা। এই বাণী ফিরিয়ে আনলেন মহাত্মা রামমোহন রায়। আনুষ্ঠানিক কৃত্যের বন্ধনে বন্দী সমাজকে ধর্মভ্রষ্টতা হ'তে আত্মোপলব্ধির সাধনায় প্রবৃত্ত করলেন তিনি; ভারতকে শোনালেন ঐক্যমন্ত্র যাতে চরম মানবসত্যের উপলব্ধি দ্বারা মানুষের মধ্যে সত্য এবং জ্ঞানের যোগে কল্যাণময় সম্বন্ধ স্থাপিত হ'তে পারে। ধর্মের বিকার ভয়াবহ, বৈষয়িক ঈর্ষা-বিরোধে যে ক্ষতি করে তারও চেয়ে সাংঘাতিক ক্ষতি করেছে ধার্মিকতা। আশ্চর্য ধীশক্তি নিয়ে রামমোহন দাঁড়ালেন জাতীয় ধর্মবিশ্বাসের কুহেলিকার অতীতে; সত্যের অকুণ্ঠিত প্রকাশে নিয়োগ করলেন তাঁর অতুলনীয় চারিত্রশক্তি। এই অধ্যবসায়ে তিনি ছিলেন একক, তিনি ছিলেন নিন্দিত। তাঁর সাধনাকে আজকের এই উৎসবে অন্তরে গ্রহণ করে নিজেকে এবং নিজের দেশকে যেন ধন্য করি।

চিরস্মরণীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে
যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায় বারম্বার কেঁপে,
যারা অন্যমনা, তারা শোনো
আপনারে ভুলো না কখনো।
মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ
সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরি নিত্য পরিচয়।
তাহাদের খর্ব কর যদি
খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি।
তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয় ॥

শাশ্বত প্রতিষ্ঠা

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

জগৎ জুড়ে চারি দিকে আজ চলেছে ভীষণ মারামারি হানাহানি। দুঃখ-দুর্গতির আর অন্ত নেই। এখানে বসে সেই সব দুঃখ-দুর্গতির কথা কল্পনায়ও আনতে পারি না। এমন সময়ে জগতে ধর্ম্মের কথা কে শুনবে?

তবু সেই জন্যই আজ ধর্ম্মকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরতে হবে, ধর্ম্ম ছাড়া এই দুর্গতির মধ্যে মানুষের আশ্রয় আর কি হতে পারে?

প্রশ্ন হতে পারে বটে ধর্ম্মেই বা বাঁচাবে কেমন করে? তবে য়ুরোপের আজ এমন দশা কেন? সেখানে তবে কি এত দিন ধর্ম্ম ছিল না? বড় বড় মন্দির, বড় বড় প্রতিষ্ঠানে ঠাসা ছিল যেই দেশ, যেখানে কত কত মনীষী ও মহামনা লোকের বাস, সেই দেশের তবে কেন এমন দুর্গতি?

তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে ব্যক্তিগত ভাবে সেই দেশে জ্ঞানী ও ভক্তিমান্ ধার্ম্মিক মহৎ মানুষ থাকলেও সারা দেশে ধর্ম্মের নামে যে বিরাট্ ঐশ্বর্য্যময় আয়োজন ছিল তাহার মধ্যে ধর্ম্মের চেয়ে সংস্কার অনুশাসন ও সম্প্রদায়টাই ছিল বেশি। তাই সেখানে ধর্ম্মের নেতার দল যুদ্ধের জয়ের জন্য, বিপক্ষকে পরাজিত করবার জন্য, যুদ্ধোদ্যমকে আশীর্ব্বাদ করেছেন, যুদ্ধাস্ত্রকে আশিস বর্ষণ করেছেন।

সংস্কার ও সম্প্রদায় যেখানে ধর্ম্মকে অতিক্রম করে সেখানেই ধর্ম্মের নানা দুর্গতি ও বিকার দেখা দেয়। তখন সংস্কার অনুশাসন ও আচারের বাছ-বিচারই সত্য ও ধর্ম্মজীবনের স্থানটি জুড়ে বসে। ধর্ম্ম যেখানে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সেখানে এইরূপ ঘটা অসম্ভব নয়। অথচ ধর্ম্ম ও জীবনকে পরস্পরে বিযুক্ত করে রাখলেও কিছুতেই চলতে পারে না। তবে দেখতে হবে যে ধর্ম্মই যেন জীবনকে চালিত করে, ধর্ম্ম যেন সাংসারিক লাভ-লোকসান প্রভৃতি হিসাবের দ্বারা চালিত না হয়। আমাদের লাভ-লোকসানের হিসাব বা সাম্প্রদায়িক সংস্কার যদি ধর্ম্মকে চালিত করে তবে তার চেয়ে আর দুর্গতি কি হতে পারে।

কেউ কেউ বলেন আমাদের যে-সব মনোভাব নীচ ধরণের তার সঙ্গেও যদি ধর্ম্ম যুক্ত থাকে তবে তাতেও কতক পরিমাণে সংযম আসে। তাই তাঁরা বলেন, জীবহিংসা যদি করতেই হয় তবে না হয় তা করো ধর্ম্মের নামে। কিন্তু তাতে কি জীবহিংসা কখনও কমেছে? না যারা সাধারণত হিংসাবিমুখ তারাও বাধ্য হয়ে ধর্ম্মের নামে করেছে হিংসা। ডাকাতরা যে কালীপূজা করত তাতে তাদের ডাকাতি কি আরও ভীষণ হয় নি? ঠগীরা ধর্ম্মের নামে মানুষের প্রাণ হরণ করত। সেই জন্যই মানুষের এই প্রাণ হননের প্রবৃত্তি ধর্ম্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটুও কমল না, বরং ধর্ম্মের নামে এই জিঘাংসা আরও উগ্র হয়ে সারা ভারতকে এমন করে পেয়ে বসল যে কর্ণেল স্লীম্যানকে অতি কঠোর হস্তে তা দমন করতে হয়েছিল।

য়ুরোপে Inquisitionএ যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে সেরূপ নিষ্ঠুরতা তাদের সাধারণ সামাজিক জীবনে কখনও দেখা যায় নি। ধর্ম্মের জোরেই অনেক রকমের অমানুষিকতা ভীষণ প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল। চরিত্রগত স্বেচ্ছাচার যখন ধর্ম্মের সায় পায় তখন যে তা আরও কত ব্যাপক ও বীভৎস হয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তার প্রমাণ Bacchanalia, Saturnalia প্রভৃতি উৎসব। দেখা গেছে হোলি প্রভৃতি উৎসবে সহজ মানুষও এমন কুৎসিত গালাগালিতে মেতে ওঠে যে ভারতের অনেক স্থানে তখন মেয়েরা রাস্তায় বের হতে পারেন না।

কাজেই ধর্ম্মকেই জীবনের চালক করতে হবে, দিনগত-প্রয়োজনময় জীবনকে ধর্ম্মের চালক করলেই বিপদ।

অথচ সব দেশেই দেখা গিয়েছে যে এক দল লোক নানা ভাবে ধর্ম্মের নামে নিজেদের স্বার্থই সিদ্ধ করে নিয়েছেন। লোকে তাঁদের সেই সব আচরণকেই ধর্ম্ম বলে ভুল করেছে। তাই এক-এক সময় ধর্ম্মের এই রকম দুর্গতি দেখে মানুষ রাগ করে ধর্ম্মকেই বর্জ্জন করেছে। কিন্তু বৃথা রাগ করলে চলবে কেন? সেই দোষ কি ধর্ম্মের? ধর্ম্মকে নিজেরাই বিকৃত করে তার সেই বিকৃত রূপ দেখে যদি নিজেরাই রাগ করি তবে কি সেটা যুক্তিসঙ্গত হবে? মানুষের দেহও তো পচলে দুর্গন্ধ হয়, তাই বলে কে কবে জ্যান্ত মানুষের সঙ্গ বর্জ্জন করবার কথা বলতে পেরেছে?

ধর্ম্ম হ'ল জীবনের জীবন, এই রকম মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাকে ছাড়ব এও কি কখনো হয়? আমাদের দেশে একটি কথা আছে,

ভূমিতে পড়িলে লোক ভূমিই আশ্রয়।

ধর্ম্মের আদর্শ হ'তে ভ্রষ্ট হওয়ার থেকে যদি পতন ঘটেই থাকে তবে উঠতে হলেও ধর্ম্মকেই আশ্রয় করে উঠতে হবে, তা ছাড়া আর তো গতি নেই।

স্বার্থকামনা ও বাসনার দ্বারা মানুষ বদ্ধ। সেই বন্ধনের মধ্যে ধর্ম্মই দেয় মুক্তি। যখন দেখি ধর্ম্মই মানুষকে বাঁধছে তখন বুঝতে হবে ধর্ম্মের নাম করে সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতাই এই বাঁধনের হেতু। চতুর বিষয়ী লোকের দল ধর্ম্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা আমদানি করে লোকের সর্ব্বনাশ করছে। এমন অবস্থায়ও যথার্থ ধর্ম্ম ছাড়া আর কেউ সেই দুর্গতি হতে মানুষকে রক্ষা করতে পারে না। এই দুর্গতি হতে মানব সমাজকে যাঁরা রক্ষা করেছেন তাঁরাই সব মহাপুরুষ।

মহাপুরুষদের এজন্য এই জগতে কম দুঃখ সইতে হয় নি। মহাত্মা যিশুখ্রীষ্ট এই জন্য কণ্টকের মুকুট মাথায় ধারণ করে দুই চোরের মাঝখানে বধ্যভূমিতে প্রাণ দিলেন।

চতুর পাণ্ডা ও পুরোহিতের দল চিরকাল ঈশ্বরকে মন্দিরের মধ্যে বন্ধ করে সরল সাধারণ লোকের কাছে দিব্যি ব্যবসা জমিয়ে বসেছিল। খ্রীষ্ট যেই বললেন, "তাঁকে দেবতা করে মন্দিরে বন্ধ করে রাখা কেন? তিনি আমাদের পিতা, আমাদের ঘরের লোক।" "পিতা"—এই কথা বলতেই মন্দিরের সব বাঁধন গেল ঘুচে, ভগবান বের হয়ে এলেন মানবের গৃহে-পরিবারে। তাঁকে নিয়ে যাঁরা ব্যবসা চালাতেন তাঁরাই বা মহাত্মা খ্রীষ্টকে ছাড়বেন কেন? তাই খ্রীষ্টকে প্রাণ দিতে হ'ল।

শাস্ত্রে আচারে যাগে যজ্ঞে যখন এই দেশের মানুষের চিত্ত প্রপীড়িত তখন বুদ্ধদেব বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—ঐ সব জাল-জঞ্জাল ছাড়—প্রত্যেকে আপন আপন চিত্তকে দীপ্ত ক'রে সেই আলোতে নিজের নিজের পথ দেখ—"আত্মদীপো ভব" তখন তাঁকেও যে কি পরিমাণ দুঃখ সইতে হয়েছিল তা সহজেই বুঝি।

যখনই মহাপুরুষের বড় বড় বাণীতে এই দেশ সাড়া দিয়েছে তখনই তার জ্ঞান বিজ্ঞান ও আনন্দের সবগুলি দ্বার খুলে গেছে। আর যখন তার দৃষ্টি ক্ষুদ্র আচারে সংস্কারে কলুষিত হয়েছে তখন ভারতের দুঃখ-দুর্গতির আর সীমা নেই।

প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতের বিরাট্ আদর্শ যখন সত্য ও সাধনা হ'তে পরিভ্রষ্ট, যখন ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য আচারবিচারমাত্র-সম্বল সম্প্রদায়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন, তখন মনীষী রামমোহনের মহান্ হৃদয় সেই দুর্গতি দেখে ব্যথিত হ'ল। রামমোহন দেখলেন ভারতকে এক বিরাট্ আদর্শে একপ্রাণ করতে না পারলে আর তার কল্যাণ নেই। কোনো বিশেষ সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রে দেবতায় বা আচার-অনুষ্ঠানে এই ঐক্যের সম্ভাবনা কোনোমতেই সম্ভব নয়। কারণ এক সম্প্রদায়ের দেবতা অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা দারুণ বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখেন। একের লিঙ্গ, দেবতা, প্রতিমা, শাস্ত্র ও আচার অন্যের পক্ষে অপূজ্য অগ্রাহ্য ও অশ্রদ্ধেয়। আজও ভারতের সকল হিন্দুকে এক করতে গেলে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের দেবতা শাস্ত্র বা আচার আশ্রয় করলে চলে না। অথচ দেবতা বা শাস্ত্র-আচার মাত্রই যেমন কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের উপাদেয় তেমনি অন্যান্য সব সম্প্রদায়ের অপাদেয়। এই বিপদ হ'তে মুক্ত হবার কোনো উপায়ই দেখা যায় না। অথচ তাই বলে ভারতের বাইরের শাস্ত্র বা আচারকে আনাও তো চলবে না। তখনকার সেই যুগে অসাধারণ মনীষী রামমোহন বুঝলেন যে এই বিপদে একমাত্র গতি ভারতের অতি

পুরাতন ধর্ম্মের মূল উপনিষদকে আশ্রয় ক'রে শাশ্বত ধর্ম্ম ভিত্তির উপর দাঁড়ানো। তা ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

কিছু দিন পূর্ব্বে বাংলা দেশের শিক্ষাবিভাগ মুসলমানদের জন্য ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে হিন্দুদেরও বলেন তাঁরা যেন তাঁদের সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের ধর্ম্মশিক্ষার উপযোগী কোনো পাঠ্যপুস্তক রচনা ও তদুপযোগী কিছু সাধনেরও ব্যবস্থা করেন। হিন্দু ছেলেমেয়েদের ধর্ম্মশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে যে কমিটি হল তাতে নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব প্রাচীনপন্থী ও বর্ত্তমান কালের উদার ভাবের লোকও ছিলেন। কমিটির পর কমিটি বসল কিন্তু সর্ব্ব সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধেয় কোন একটা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হল না। এক সম্প্রদায়ের স্তবস্তুতি পূজাপদ্ধতি আনলেই অন্য সম্প্রদায় তৎক্ষণাৎ ছেড়ে চলে যাবেন, কিছুতেই এই বিপদের সমাধান করা গেল না। তখনই বোঝা গেল কি কারণে রামমোহন একেবারে এই সব সাম্প্রদায়িক শাখাগুলোকে পরিহার করে একেবারে এই দেশের ধর্ম্মের নিত্য ভিত্তিতে ও শাশ্বত সত্যে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। তার পর থেকেই দেখা গেল যে হিন্দুর সর্ব্ব সম্প্রদায়ের জন্য কোনো ব্যবস্থা খাড়া করতে গেলেই রামমোহনের ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্কলিত সব বাণীর বাইরে আর যাবার যো নেই।

পশ্চিম-জগৎ যখন তার শিক্ষাদীক্ষা ধর্ম্ম রাজনীতি নিয়ে এই দেশে এসে উপস্থিত হল তখন সুদূরদর্শী রামমোহন বুঝেছিলেন এখন ভারতের ধর্ম্মকে আর নানা শাখায় বহুধা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে চলবে না। ভারতের নানা সাধনা একটি মহান্ ঐক্যের মধ্যে সংহত না হলে আর উপায় নেই। কত বড় মনীষা থাকলে তখনকার দিনে এই কথাটি বোঝা যায় তা ভাবলে আজও বিস্মিত হ'তে হয়। অথচ তার জন্য রামমোহন ক্রমাগতই পেয়ে গেছেন নিন্দা লাঞ্ছনা ও অপমান, সেই দুর্গতির এখনও কি শেষ হয়েছে?

হয়তো প্রাচীনকালেও এই দেশে যুগে যুগে সকল ধর্ম্মগুরুরাই এই সমস্যা নিয়ে বিব্রত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই এমন অবস্থায় উপনিষৎ গীতা ও ব্রহ্মসূত্রকেই আশ্রয় স্বরূপ বলে ধরেছেন এবং এই তিনটি আশ্রয়কে নাম দিয়েছেন প্রস্থানত্রয়। তাই দেখতে পাই ভারতের প্রত্যেকটি ধর্ম্মগুরু আপন সম্প্রদায় স্থাপনের জন্য প্রস্থানত্রয়কে আশ্রয় না করে পারেন নি। রামমোহনও ভারতকে শাশ্বত ধর্ম্ম-ভিত্তির উপরে স্থাপন করতে গিয়ে এই প্রস্থানত্রয়েরই আশ্রয় নিলেন। রামমোহনকে যাঁরা অ-হিন্দু বলে গাল দিতে চান তাঁরা মনে রাখবেন—রামমোহন যে-পথে গিয়েছেন তাঁর পূর্ব্ব-পূর্ব্ববর্ত্তী সব ধর্ম্মগুরুরাও সেই পথেই গিয়েছেন।

তবে রামমোহনের বিশেষত্ব কোথায়? তাঁর বিশেষত্ব তাঁর শাশ্বত ধর্ম্মকে তিনি বর্ত্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগের সঙ্গে একান্ত সঙ্গত করে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর সময় সমস্ত প্রতীচ্য তার সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐশ্বর্য্য নিয়ে এ-দেশে হাজির হ'ল, তিনি তার সঙ্গে ভারতের সাধনাকে অপূর্ব্বভাবে মিলিয়ে দিলেন। ভারতের ধর্ম্মসাধনা অর্থাৎ ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মজ্ঞান, প্রধানত ছিল সন্ন্যাসীদের। তিনি সেই সাধনা প্রতিষ্ঠিত করলেন ভারতের গৃহস্থ-জীবনে। তা ছাড়া সমাজ রাজনীতি শিক্ষা প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে রামমোহনের যে-সব অতুলনীয় দান আছে তার কথা আমরা এখন উল্লেখ না-ই করলাম।

কেউ যদি বলেন, ভারতের প্রাচীন সাধনাতে যদি আমরা ফিরে যাই তবে আমরা কি করে উদ্যমী কর্ম্মশীল প্রতীচ্যের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে পারব? ভারত তো চিরদিন কর্ম্মবিমুখ। তার উত্তরে বলতে হবে এই যে আজকের দিনে কর্ম্মবিমুখ অলসতাকেই আমরা ভারতের আধ্যাত্মিকতা বলে মনে করছি আসলে তা হল ভারতের পরবর্ত্তী তামসিক যুগের কথা। ভারতের গৌরবোজ্জ্বল যুগে পদে পদে দেখা যায় জীবনের প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও কর্ম্মে ও সাধনায় উদ্যমের সহিত গভীর যোগ। তামসিকতার অবসাদে যদি আপনাকে আমরা ছেড়ে দিই তবে তাতে আমাদের পৌরুষের যে অপমান তার মত অধর্ম্ম আর আমাদের কিছু নেই। এইখানে ভারতের মনীষীদের ছবিতে কর্ম্মময় উদ্যমময় মানবের যে মাহাত্ম্য আমরা কীর্ত্তিত দেখি প্রতীচ্য দেশের পৌরুষ-সাধনার কাছে তার কুণ্ঠিত হবার কোনো হেতু নেই।

আমাদের দেশের ঋষিদের অমর বাণীর মধ্যে সেই বীর্য্যময় সাধনার মন্ত্র ছিল বলেই রামমোহন বেদ-উপনিষদের দিকে ঝুঁকলেন। মানবাত্মার জয় ঘোষণা, নিত্য এগিয়ে চলবার জন্য মহতী আকাঙ্ক্ষা, উদ্যমের মধ্যে মহা সার্থকতা, সবই দেখতে পাই সেই সব অমৃত-মন্ত্রের মধ্যে। উপনিষৎ-বাণীগুলির মধ্যে দেখা যায় আচার-অনুষ্ঠান সম্প্রদায় বিধিবিষেধ সকলের উপরে মানুষ ও তার মাহাত্ম্য।

উপনিষৎ বলেন, ইন্দ্রিয় হ'তে মন বড়, মন হ'তে আত্মা বড়, আত্মা হ'তেও পুরুষ বড়, পুরুষ হ'তে আর শ্রেষ্ঠ কিছু নেই, তাহাই চরম ও পরম।

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।
কঠোপনিষৎ, ১, ৩, ১১

এই পুরুষ আপনার জ্যোতিতে আপনি দীপ্ত, বুদ্ধের ভাষায় বলা যায় সে আত্মদীপ্ত।

তাই বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বললেন,

"অয়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি।"—বৃহদারণ্যক, ৪, ৩, ৯

উপনিষদের মহর্ষি আরও বললেন, এই পুরুষই বিজ্ঞানময়।

"এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ।"—বৃহদারণ্যক ২, ১, ১৬

বুদ্ধি, মর্ম্মশক্তি, উদ্যম, সঙ্কল্প, কর্ম্মসাধনা, সব কিছু নিয়ে প্রাচীন শব্দ "ক্রতু"। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন, এই মানবই ক্রতুময়।

এষ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ।—৩, ১৪, ১

ছান্দোগ্য আরও বলেন, এই মানুষই হল যজ্ঞ। মানুষকে বাদ দিলে যাগযজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের কোনই অর্থ নেই।

পুরুষো বাব যজ্ঞঃ—ছান্দোগ্য ৩, ১৬, ১

মুণ্ডক উপনিষৎ বলেন, কর্ম তপস্যা ব্রহ্ম পরমামৃত সবই এই পুরুষ। নানাবিধ মিথ্যার আবরণে মানুষ আছে চাপা পড়ে। যে সেই সব মিথ্যার রাশিতে আচ্ছন্ন অন্তরনিহিত রহস্যাবৃত পুরুষকে চিনতে পারে সে-ই অবিদ্যার সকল বন্ধনকে পারে মুক্ত করতে।

পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।
এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং
সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সৌম্য।—মুণ্ডক, ২, ১, ১০

প্রশ্নোপনিষৎ বলেন, সর্বভাবে পরিপূর্ণ সেই পুরুষের স্বরূপ বুঝতে হবে।

ষোড়শকলং পুরুষং বেত্থ।—প্রশ্ন উপ. ৬, ১

এই পরিপূর্ণ পুরুষকে না জানলে মৃত্যুকে অতিক্রম করে' অমৃত লাভের আর কোনো উপায় নেই, তাই প্রশ্ন উপনিষৎ বলেন, সেই বেদ্য পুরুষকে জান যেন মৃত্যু তোমাদের আর না ব্যথিত করতে পারে।

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।
প্রশ্ন উপ. ৬, ৬

আরও প্রাচীন সব বেদসংহিতাতে দেখি ধর্মের নামে যে উদ্যমহীনতা তাকে ঋষিরা কঠোর ভাবে আঘাত করছেন। তখনকার দিনেও আচারপরায়ণ পুরোহিতের দল যে কর্ম্মোদ্যম হ'তে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, তা বুঝতে পারি সেই আঘাতের ভাষায়—"নিরুদ্যম পুরোহিতদের মত নিদ্রালু হোয়ো না—"

মো ষু ব্রহ্মেব তন্দ্রয়ুর্ভব—সামবেদ সংহিতা, ২, ১, ১৮

তাই সব বেদে ঋষিদের প্রার্থনা—হে দেবতা, পিতা যেমন পুত্রগণকে কর্মোদ্যম শেখান তেমনি আমাদিগকে কর্মোদ্যমে ক্রতুতে তুমি শিক্ষিত কর।

ইন্দ্র ক্রতুন্নাভর পিতাপুত্রেভ্যো যথা
শিক্ষাণো অস্মিন্।—সামবেদ, ৬, ৩, ৬

সামবেদ আরও বলেন—কর্মপরায়ণরাই দেবতার প্রিয়, নিদ্রালু অবসাদগ্রস্তেরা নয়, অতন্দ্র উদ্যমীরাই আনন্দলোক অধিকার করতে পারেন।

ইচ্ছন্তি দেবা সুন্বন্তম্ন স্বপ্নায় স্পৃহয়ন্তি।
যন্তি প্রমাদমতন্দ্রাঃ।—১, ১, ৬

মানব-মাহাত্ম্যের ও মানবীয় দৃষ্টি ও কল্যাণ-উদ্যমের এই যে জয় ঘোষণা তাতেই বুঝা যায় ভারতের প্রাচীন মহর্ষিদের মনীষার মহত্ত্ব। সেই সব মহা সত্য যখন আমরা বিস্মৃত হয়েছিলাম তখন এই যুগের যে মহর্ষি আমাদের কাছে আবার নূতন করে তা এনে উপস্থিত করলেন সেই যুগগুরু রামমোহনকে যদি আমরা যোগ্য সম্মান না দিতে পারি তবে আমাদের চেয়ে আর অভাজন কে?

হয়তো কেউ বলতে পারেন আমাদের শাস্ত্র-শাসিত

বিনীত দেশে রামমোহন বৃথা একটা বিদ্রোহ এনে হাজির করলেন। কেউ বা আবার বলবেন স্বাধীন যে নব যুগ আসছে তার প্রারম্ভে তিনি বেদ উপনিষদের দোহাই দিয়ে আমাদের চিত্তকে বেঁধে ফেলে পুরাতন অর্থহীন ঋষিবাণীর অনুশাসনের কাছে দাসখৎ লিখে দিলেন। আসল কথা রামমোহনই দেখালেন সেই পরম সত্যে নিত্য সত্যে স্বাধীন ও পরাধীন ব'লে কোনো বিরোধ নেই। শাশ্বত সত্যময় ঋষিবাক্যের সঙ্গে স্বাধীন বিচারের কোনোই বিরোধ নেই। বরং সেই সব সাধক-বাণী ভিতরের বাইরের সব বৃথা দাসত্ব হ'তে আমাদের চিত্তকে মুক্ত করে দেয়। ঋষিরাই বললেন, "যদি ঋগ্বেদ জেনে থাক তবে বড় জোর দেবতাদের রহস্য জেনেছ, যদি যজুর্বেদ জেনে থাক তবে না হয় জোর যজ্ঞের রহস্যটাই আয়ত্ত করেছ। যদি সামবেদ জেনে থাক তবে না হয় আর সব কথাই জেনেছ কিন্তু তোমার অন্তরের মধ্যে যে বেদ আছে সেই অনন্ত জীবনবেদকে যদি জেনে থাক তবেই তুমি জানতে পেরেছ ব্রহ্মকে, এই বেদ না জানলে আর কোনো বেদের সাহায্যেই তুমি ব্রহ্মবিৎ হ'তে পার না।"

ঋচোহ যো বেদ স বেদ দেবান্
যজুংষি যো বেদ স বেদ যজ্ঞম্।
সামানি যো বেদ স বেদ সর্বং
যো মানসং বেদ স বেদ ব্রহ্ম।—ইতিহাসোপনিষৎ

Unpublished Upanishads
Adyar Library. p. 11

কাজেই রামমোহনই আমাদের দেশে নূতন ও পুরাতনের বিরোধ দিলেন ঘুচিয়ে, শাস্ত্র ও বিচারবুদ্ধির বিরোধ দিলেন দূর করে। আজ জগতের এই দুর্গতির দিনে বার বার সেই যুগগুরুর কাছেই শ্রদ্ধানত হয়ে বলি, "হে আচার্য্য, সময় এসেছে, জগতে যত ভাই-ভাই আজ পরস্পরকে না জেনেই কর্ণার্জ্জুনের মত বৃথা হানাহানি মারামারি করে মরছে। তোমার উচ্চারিত ভারতের অতি প্রাচীন ঐক্য মন্ত্র "পিতা নোঽসি" আজ আবার আমাদের কাছে দীপ্যমান হোক।

হে পরম দেবতা, তুমি আমাদের সকলেরই পিতা, সর্ব্বই আমরা তোমার সন্তান। "পিতা নোঽসি" এই কথা আমরা মুখে প্রতিদিন আওড়ালে বা ভজন করলেও সমস্ত জীবন দিয়ে জানি নে। "পিতা নো বোধি" তুমি সমস্ত জীবনকে এই সত্য দিয়ে বোধিত কর। তবেই তোমার প্রতি আমাদের সব নমস্কার সত্য হবে। নইলে আমাদের যত পূজা অর্চ্চনা ক্রিয়াকর্ম্ম সবই ব্যর্থ। "নমস্তেঽস্তু" পৃথিবীতে যে যেখানে যে ভাবে তোমাকে আজ নমস্কার করছে মৈত্রী ও প্রেমে সব আজ সত্য হোক। নইলে পৃথিবীতে হিংসা দ্বেষ হানাহানি মামামারির অন্ত কিছুতেই হবে না। "তুমিই আমাদের সকলের অন্তরস্থিত পরম বর্ম তোমার প্রেরিত কল্যাণ বুদ্ধি ও উদ্যমই আমাদের অন্তরস্থিত পরম রক্ষা-কবচ।"

ব্রহ্ম বর্ম মমান্তরম্
শর্ম বর্ম মমান্তরম্।—সামবেদ সংহিতা,
উত্তরার্চিক, ৯, ৩, ৮

শিবরাত্রি

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

এক দিন হঠাৎ বাতাসে কোথা হইতে এক টুকরা ছেঁড়া কাগজ সামনে আসিয়া পড়িল। কুড়াইয়া লইয়া দেখিলাম তাহাতে নীচে লেখা কয় পঙ্‌ক্তি লিখিত আছে :—

"হে শিব, যাঁহারা তোমাকে জানিয়াছেন তাঁহারা বলেন স্বয়ং শিব না হইলে কেহ শিবের অর্চনা করিতে পারে না। এ অবস্থা কবে হইবে কে জানে? তোমাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা হয়, কীরূপে দেখিব? কে দেখাইবে?

শুনা যায়, ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, এক ব্যাধ নাকি কোন এক কৃষ্ণ চতুর্দশীর রাত্রিতে এক গহন বনের মধ্যে তোমাকে দর্শন করিয়াছিল। ইহাতে মনে হয়, কৃষ্ণ চতুর্দশী রাত্রির এমন কিছু একটি গুণ আছে, যাহাতে, হে দেবদেব, হে দেবাতিদেব, হে মহাদেব, যদি কেহ তোমাকে বস্তুতই দেখিতে ইচ্ছা করে, তবে অন্তত তাহার একটা আভাস পাইতে পারে। কৃষ্ণ চতুর্দশী রাত্রি, চারিদিকে ঘন ঘোর অন্ধকার। কোথাও কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জগৎকে শোনাইয়া গিয়াছেন, সকলের পক্ষে যাহা রাত্রি সংযমী ব্যক্তি তাহাতে জাগিয়া থাকেন, তাহাই তাঁহার দিন। এই রাত্রিতে যদি কেহ জাগিতে পারে—ত্রিযামার শেষ যাম পর্যন্ত, আর একবার পূর্বাকাশের দিকে নেত্র সঞ্চার করে, তবে, নিশ্চয়ই বলিতে পারি, হে মহাদেব, তুমি যে কী মহান্, কী বিরাট, কী সুন্দর, তোমার যে কী মহিমা, সে তাহার কিছু-না-কিছু বুঝিতে সমর্থ হইবে। হে চন্দ্রশেখর, পূর্বাকাশের প্রান্তে কৃষ্ণ চতুর্দশীর সুচারু চন্দ্রলেখার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বুঝিতে বিলম্ব হইবে না, ভক্তেরা কেন তোমাকে এই নামটি প্রদান করিয়াছেন। হে ব্যোমকেশ, মহাদেব চন্দ্রশেখরের ঐ ব্যোম ভিন্ন আর কী কেশ হইতে পারে? ভক্ত মুগ্ধ হইয়া তাহা দেখে আর চিত্ত তাহার তোমার চরণে লুটাইয়া পড়িতে চাহে। যে দিক্ দিয়াই ভাবিয়া দেখি, হে ব্যোমকেশ, মনে হয়, তোমার ভক্তেরা "ব্যোম" "ব্যোম" না বলিবে তো আর কী বলিবে? দ্যুলোক তোমার মস্তক, অন্তরীক্ষলোকে সঞ্চরণশীল জলধর পটল তোমার সেই মস্তক হইতে অবলম্বিত জটাজুটমণ্ডল, হে জটাধর, হে কপর্দী, এই জন্যই তো ভক্তেরা তোমাকে এই নামে ডাকিয়া থাকেন। বিয়দ্‌গঙ্গা মন্দাকিনী বিষ্ণুপদ (আকাশ) হইতে প্রথমে তো তোমার এই জটাজুটেরই মধ্যে পতিত হইয়া কলকল শব্দে প্রবাহিত হয়, তুমি তাহাকে এইরূপে প্রথমে ধারণ কর এবং এই জন্যই তুমি গঙ্গাধর। সত্যই তো তোমার জটাজুট হইতে ভগবতী গঙ্গা ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে ত্রিলোচন, তুমি দেবাতিদেব মহাদেব, চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি ভিন্ন অপর চক্ষু তোমার কী হইতে পারে? লোকে প্রশ্ন করে তুমি কোথায় আছ, কিন্তু, হে সর্ব, তুমি কোথায় নও? চারি দিকে যাহা কিছু আছে সবই তোমার মূর্তি। এই পৃথিবী, এই জল, এই তেজ—আর ইহারই প্রকৃষ্ট প্রকাশ চন্দ্র ও সূর্য, এই বায়ু, এই আকাশ, এই জীব—এ সমস্তই তো তোমার মূর্তি। তুমি অষ্ট মূর্তিতে নিত্যই প্রকাশমান। তথাপি আজো তোমাকে দেখিতে পাইলাম না! কী অন্ধকার! হে স্মরহর, হে কামের দহনকারী, কাম নানা আকারে উৎপীড়ন করিয়া আমাকে তোমার নিকটে আসিতে দিতেছে না, এই সমস্ত অনর্থের মূল, মহাশত্রু, নিত্যশত্রুকে তুমি নিজের নয়ন-অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিয়া দাও। হে মহাদেব, আর আমার কিছু বলিবার নাই। তোমাকে নমস্কার—

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ।
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ।
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।"

নীলাঙ্গুরীয়

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১৩

শুধু সতর্ক হইল বলা ঠিক হইবে না; মীরার মূর্তিও গেল বদলাইয়া।

আমিও সতর্ক হইয়া গেলাম; কিন্তু শেষরক্ষা যে করিতে পারি নাই সেটা এই প্রসঙ্গের শেষ পর্যন্ত টের পাওয়া যাইবে।

পরিবর্তনের প্রথম তো এই দেখা গেল যে মীরা আরও সহজ ভাবে কথা কহিতে আরম্ভ করিল, বরং একটু বেশী করিয়াই। সরমার বাঁ-হাতটা দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "এবার চল সরমাদি একটু ওদিকে, শচী তোমায় খুঁজছিলও; মা এস।"

আমি সতর্ক ছিলামই।...আমি এখানে আসিয়াছি তরুকে পড়ানর কাজ লইয়া, আর একটা কাজ প্রকৃতির খেয়ালে আমার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে,—মীরাকে পড়া। আমি ওর অন্তস্তল পর্যন্ত ভালভাবে পড়িয়া ফেলিয়াছি। মীরা জেদী মেয়ে। আমার মুখে সরমার প্রশংসাটা ওর কটু লাগিয়াছে। বেশ বুঝিলাম আমায় না ডাকিবার জন্যই মীরা উঁহাদের দুই জনকে এত ঘটা করিয়া ডাকিতেছে; আঘাতটা কাটাইবার জন্য আমি তখনই চায়ের কেটলিটা তুলিয়া নিজের কাজে লাগিয়া গেলাম। মীরা মনে মনে বোধ হয় একটা কুটিল হাস্য করিয়া থাকিবে; নিজের পরাজয়টা বুঝিয়া তখনই অস্ত্র পরিবর্তন করিল, দুই পা গিয়াই গ্রীবা বাঁকাইয়া একটু বিস্মিতভাবে বলিল, "বাঃ, আপনিও আসুন শৈলেন বাবু!"

অপর্ণা দেবী বলিলেন, "ও-বেচারি চা-টা ঢালছে, খেয়ে নিয়েই না হয় আসবে; এইখানেই তো আছি আমরা।"

মীরা বলিল, "বাঃ, বাড়ীর লোক উনি, নিজের চা নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন? একটু দেখতে শুনতে হবে না সবাইদের?"

মিস্টার রায় অন্য একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে আসিয়া পড়িলেন, মীরার শেষ কথাটারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, একটু দেখ-শোন গে সবাই তোমরা, সার্ভিসটা ঠিক হচ্ছে কিনা।"

তাহার পর সরমার মাথায় হাত দিয়া তাহার মুখটা নিজের দিকে ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, "তুমি আরও রোগা হয়ে গেছ সরমা মাঈ—you are killing yourself by inches; no..." (তুমি তিল তিল ক'রে নিজেকে হত্যা করছ; ঠিক নয়...)

সরমা যেন অতিমাত্র সঙ্কুচিত হইয়া গেল। মিস্টার রায় বিশেষ করিয়া যেন তাহাকেই বলিলেন, "যাও, দেখ-শোন গে সব। এবারে এদের ষ্ট্রিং-কনসার্টটা বেশ ভাল হয়েছে, যে ছোকরা ব্যাঞ্জো ধরেছে তার হাতটি চমৎকার নয় কি?...হাল্লো!..."

অভিমতের সমর্থনের অপেক্ষা না করিয়াই কে এক-জনকে উদ্দেশ্য করিয়া চলিয়া গেলেন।

মীরা আবার আমায় ডাক দিল, "আসুন শৈলেন-বাবু।"

অপর্ণা দেবীও বলিলেন, "এস শৈলেন, ও ছাড়বার পাত্রী নয়।"

মেয়ে-পুরুষ-শিশুতে প্রায় এক শতেরও অধিক লোক। সমস্ত বাগানটাতে, গাড়ীবারান্দার সামনে গোল ঘাস-জমিটাতে ছোট-বড় টেবিল পাতা; কোথাও দুইটা, কোথাও ততোধিক চেয়ার দেওয়া। সুবিধা-মত বসিয়া আহারের সঙ্গে সবাই গল্পগুজব করিতেছে; জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। অবশ্য জিজ্ঞাসাবাদ বেশীর ভাগ করিল মীরাই, তাহার পর অপর্ণা দেবী, সরমা

নমস্কার করিয়া প্রয়োজনমত এক-আধটা প্রশ্ন করিল বা উত্তর দিল, আমি একেবারেই রহিলাম নীরব।

একবার রাস্তার পাশের দেওয়ালের দিকটায় নজর পড়িল, দেখি গেট থেকে আরও একটু সরিয়া ইমানুল, ক্লীনার মদন এবং অন্য গাড়ীরও কয়েক জন ড্রাইভার দাঁড়াইয়া আছে, তামাসা দেখিতেছে। একটু দূরে, গেটের ওদিকটায় একটা ঝাড়ুদার মেথর, তাহার ঠিক পিছন দিকে একটা ঝুড়ি, উচ্ছিষ্ট সঞ্চয়ের জন্য একটু লুব্ধ দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া আছে। ইমানুলকে চিনিতে একটু বেগ পাইতে হইল, সে একটা ঝলঝলে স্যুট পরিয়া একটু আড়াল দেখিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ইমানুল হঠাৎ কোটপ্যাণ্ট পরিল কেন? এই রকম একটা দিনে কি ওর বেশী করিয়া মনে পড়িয়া যায় যে ও লাট-সাহেবের সমধর্ম্মী?...সেই দিকে চাহিয়া চিন্তা করিতেছি; এমন সময়—"এই যে, আপনারা এখানে? নমস্কার"—বলিয়া একটি ভদ্রলোক আমাদের দলের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

অপর্ণা দেবী বলিলেন, "এই যে নিশীথ, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

নিশীথের নিখুঁৎ কায়দামাফিক ইভ্‌নিং-স্যুট-পরা, বাঁ-হাতে হরিণের শিঙের মুঠি-লাগান একটা চেরির ছড়ি, ডান হাতে একটা পাইপ। গায়ের রং শ্যামবর্ণ, বয়স সাতাশ-আঠাশ আন্দাজ হইবে।

নিশীথ পাইপে একটা টান দিল, তাহার পর বাঁ-হাতের ছড়িটার উপর একটু চাড় দিয়া সেটাকে ধনুকাকার করিয়া বলিল, "আমার আসতে একটু দেরীই হ'য়ে গেছল প্রথমত; কর্ণেল ব্রেটের ছেলে গ্ল্যাস্‌গো থেকে লাষ্ট মেলে ফিরেছে খবর পেলাম, একটু সন্ধান-টন্ধান নিতে গেছলাম। আমরা ক-জনে ওদিকে ঐ টেবিলটাতে ব'সে আছি; আপনাদের পাকড়াও ক'রে নিয়ে যাবার ভার পড়েছে আমার উপর। চলুন।"

বলিয়া নিজের রসিকতায় সাহেবী ধরণের হাস্য করিয়া পাইপে আর একটা টান দিল।

অপর্ণা দেবী বলিলেন, "আমার একটু ঘোরাফেরা দরকার; অন্ততঃ যতক্ষণ পারি। তুমি এঁদের নিয়ে যাও বরং।...ইনি হচ্ছেন তরুর টিউটর, নাম শৈলেন মুখোপাধ্যায়; আর এ আমাদের নিশীথ, শৈলেন; তুমি নিশ্চয় শুনে থাকবে এর সম্বন্ধে।"

অল্প অল্প শুনিয়াছি, দু-একবার দেখিয়াছিও, পরিচয় হয় নাই। একটা আবছায়া উত্তর দিলাম, "ও, ইনিই?"

নমস্কার করিলাম। নিশীথ আড়চোখে একবার দেখিয়া লইয়া, পাইপটা একটু কপালের কাছে তুলিয়া ধরিয়া একটা দায়ে-ঠেকাগোছের প্রতিনমস্কার করিল, তাহার পর কালক্ষেপ না করিয়া মীরার পানে চাহিয়া বলিল, "তাহ'লে আপনারা চলুন মিস্ রায়, সরমা দেবী আসুন।"

আমার প্রতি ভদ্রতা প্রকাশ করিতে যে অভদ্রতাটা জাহির করিল সেটা অন্তত অপর্ণা দেবীর দৃষ্টি এড়াইল না, তিনি বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে এস শৈলেন, আরও কয়েক জনের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।"

মীরা একটু আব্দারের সুরে বলিল, "না মা; ওঁকে আমাদের সঙ্গে আসতে দাও।"

নিশীথ সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "হ্যাঁ, সেই বেশ হবে, আসুন আপনিও।"

মীরা এটা যে কেন বলিল, তখন বুঝিবার কথা নয়, পরে বুঝিয়াছি।...আমি একটু বিমূঢ়ভাবে অপর্ণা দেবীর পানে চাহিলাম। অপর্ণা দেবী হাসিয়া আমাকেই প্রশ্ন করিলেন, "কি করবে?"

তাহার পর সমস্যাটা আমার পক্ষে আরও জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন দেখিয়া সেইরূপ ভাবেই হাসিয়া বলিলেন, "তাহ'লে যাও ওদের সঙ্গেই, আমি এক্ষুনি উপরে চ'লে গেলে তুমি আবার একলা পড়ে যাবে।... সরমাকে ছাড়বে না?"

মীরা সরমার হাতটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "না,... তোমার ঐ মিসেস্ সেন আসছেন।"

নিশীথ অযথাই মীরাকে সমর্থন করিয়া বলিল, "বাঃ, ওঁকে কি ক'রে ছাড়ব আমরা!"

অপর্ণা দেবী একবার মুগ্ধ নয়নে সরমার পানে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি এক্ষুনি যেন পালিও না সরমা, আর

যাবার আগে নিশ্চয় একবার আমার সঙ্গে উপরে ঘরে দেখা ক'রে যেও ; নিশ্চয়। আমি বোধ হয় আর বেশীক্ষণ নীচে থাকতে পারব না।"

মীরা যাইতে যাইতে গ্রীবা ফিরাইয়া বলিল, "পালানো সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থেক।"

নিশীথও ঘুরিয়া, দাঁতে পাইপ চাপিয়া প্রতিধ্বনি করিল, "পালানো শক্ত আমাদের কাছ থেকে, সেদিকে আপনার কোন চিন্তা নেই।"

বোধ হয় ভাবিল এ রসিকতাটুকু একেবারে চরমগোছের হইয়াছে ; ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে সাহেবী কায়দায় মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

১৪

আমি টানা পড়িলাম বটে কিন্তু আমার যেন পা উঠিতেছিল না। বাড়ীতে আমার সময়ে এই প্রথম পার্টি হইলেও তরুর সঙ্গে এর পূর্বে বার-দুয়েক বাইরে পার্টিতে গিয়াছি এবং দুইবারে যা অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাতে আরও দুইবার যাওয়ার যখন প্রয়োজন হইল তখন ছুতানাতা করিয়া কাটাইয়া দিয়াছি। তাহার কারণ এই পার্টিতে আমার এই অভিজাত-সম্প্রদায়ের সঙ্গে বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক অসামঞ্জস্যটা যতটা স্পষ্ট হইয়া উঠিত, অন্য কোন ব্যাপারেই ততটা হইত না। এ ধরণের পার্টিগুলা আসলে দেখিলাম স্বয়ম্বর-সভা, একেবারে মুখ্যত না হোক নিতান্ত গৌণতও নয়। মীরা, শচী, মিষ্টার মল্লিকের কন্যা দীপ্তি, রেবা আরও কত সব তাহাদের নাম জানি না,—ইহাদের কেন্দ্র করিয়া ভাগ্যান্বেষীরা কথাবার্তা, আধুনিকতম ফ্যাশান, মাঝে মাঝে বোধ হয় উপলক্ষে-অনুপলক্ষে উপহার-উপঢৌকন প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে অবিরাম নিজেদের অদৃষ্ট পরীক্ষা করিয়া যাইতেছে। মীরাকে যাহারা আগলাইয়া থাকে তাহাদের মধ্যে আছে নীরেশ লাহিড়ী, বি. এ. ক্যান্টাব, নবীন ব্যারিস্টার ; জার্মেনী-প্রত্যাগত মৃগাঙ্ক সোম, ইলেকট্রিকাল এঞ্জিনিয়ার ; শোভন রায়,—কি তাহা এখনও খোঁজ লইয়া উঠিতে পারি নাই ; আলোক সেন, কলেজের ছাত্র ; আর এই নিশীথ চৌধুরী। এই লোকটি রাজশাহী প্রান্তের কোন এক রাজার ভাগনে। বিদ্যাবুদ্ধি কতটা আছে বলা যায় না, তবে, যে-সমাজে চলাফেরা করে, কিম্বা মীরাকে লইয়া যাহাদের সঙ্গে রেষারেষি তাহাদের সঙ্গে মানানসই হইবার জন্য আমেরিকা হইতে কিছু টাকা দিয়া গোটাছয়েক অক্ষর আনাইয়া লইয়াছে এবং শীঘ্রই নাকি "হায়ার এঞ্জিনিয়ারিং" পড়িবার জন্য গ্লাসগো রওয়ানা হইবে। মোটের উপর বিদ্যা, প্রতিপত্তি, অর্থ, সাজানো কথা এবং অঙ্গের সাজগোজ লইয়া ঈর্ষা-অভিনয়ের মধ্যে এখানে যে বায়ুমণ্ডল সৃষ্ট হয়, এক ধুতি-চাদর-পরিহিত গৃহশিক্ষকের সেখানে স্থান নাই। আমি সেটা অনুভব করিয়াছি ; অনুভব করিয়াছি বলিয়াই দুইবার কাটান দিয়াছি, পার্টিতে যাই নাই। এবার একেবারে নিজেদের বাড়ীতে—উপায় ছিল না, তবু আশা ছিল বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়াই কাটাইয়া দিব, কিন্তু পাকেচক্রে ধরা পড়িয়া গেলাম।

আজ আবার বিশেষভাবে আমি এড়াইতে চাহিতেছিলাম, তাহার কারণ সরমাঘটিতব্যাপার টুকুর পর থেকেই মীরার হঠাৎ পরিবর্তন। মীরার চরিত্রের এই দিকটাকে আমি একটু ভয় করি। এই কয়দিন হইতে মীরা কর্ম-চাঞ্চল্যের অনবধানতায় অল্প অল্প করিয়া আমার খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল। ওর এই খুব কাছে আসাটাকে আমি যেমন প্রার্থনা করি, তেমনি আবার সন্দেহের চক্ষেও দেখি,—লক্ষ্য করিয়াছি মীরা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে যখন খুব কাছে আসিয়া পড়ে তাহার পর হইতে অতি সামান্য একটা ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া—কখন বা উপলক্ষ্য না থাকিলেও আবার দূরে সরিয়া যায়, এই সময় জাগে তাহার সেই নাসিকার কুঞ্চন। আমাদের দু-জনের দূরত্বটা—যাহা মীরাই মিটাইয়া আনে—আবার স্পষ্ট হইয়া উঠে।

নিশীথের পিছনে পিছনে চলিলাম। মীরা আলাপ-জিজ্ঞাসাবাদ করিতে করিতে যাইতেছে, নিশীথ কয়েক জনকে তাহার "হায়ার এঞ্জিনিয়ারিঙে"র জন্য গ্লাসগো-যাত্রার কথা বলিল ; আমরা বাগানের শেষের দিকটায় গিয়া পড়িলাম। তিনখানি টেবিল এক সঙ্গে করা, তাহার চারিদিকে খান-আষ্টেক চেয়ার। দেখিলাম

নীরেশ, মৃগাঙ্ক প্রভৃতি মীরা কেন্দ্রিকদের প্রায় সকলেই রহিয়াছে। আমরা পৌঁছিবার পূর্বেই সবাই দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল, অভ্যর্থনার একটা কাড়াকাড়ি পড়িল। নীরেশের বাম চোখে ফিতাবাঁধা একটা মোনোক্‌ল চশমা আঁটা, সেটা খুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে লুফিতে লুফিতে মীরার পানে চাহিয়া বলিল, "আমরা এখানে খানতিনেক টেবল একত্র ক'রে বেশ জমিয়ে বসব স্থির করলাম; কিন্তু কোনমতেই জমছে না দেখে তার কারণ খুঁজতে গিয়ে টের পেলাম এর প্রাণপ্রতিষ্ঠাই হয় নি। যা মৃত তা জমাট বাঁধতে পারে, কিন্তু জমে না। অবশ্য আপনি ঘুরতে ঘুরতে একবার-না-একবার আসতেনই দয়া ক'রে, কিন্তু সেই অনিশ্চিত 'একবারে'র জন্যে ধৈর্য ধরে ব'সে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল ব'লে আপনাকে কাজের মধ্যে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসবার জন্যে আমরা মিষ্টার চৌধুরীকে পাঠালাম। এখন কি ক'রে যে মার্জ্জনা চাইব বুঝতে পারছি না।"

বিলাতী কায়দায় "হিয়ার হিয়ার" বলিয়া একটা সমর্থন হইল, কিন্তু বেশ বোঝা গেল কথাটা যেন সবার কণ্ঠে একটু বেশ আটকাইয়া বাহির হইয়াছে, বিশেষ করিয়া নিশীথের,—তাহার আপশোষ বোধ হয় এই জন্য যে তাহার উপর খুঁজিয়া পাতিয়া আনিবার ভার দিয়া ইহারা দিব্য ততক্ষণ বসিয়া বসিয়া রুচিকর ভাষা গড়িয়াছে। তাহার মুখচোখের অবস্থা দেখিয়া সন্দেহ রহিল না যে সে ভব্য রকম একটা কিছু বলিবার জন্য ভিতরে ভিতরে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পরের কথার প্রতিধ্বনি করা ভিন্ন অন্য শক্তি না থাকায় পারিয়া উঠিতেছে না।

দুইটা চেয়ার কমতি ছিল বলিয়া আমরা দাঁড়াইয়াছিলাম, একজন ওয়েটার সংগ্রহ করিয়া আনিয়া পাতিয়া দিল।

চেয়ারে বসিতে বসিতে মীরা হাসিয়া বলিল, "এদিকে আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না আপনারা ধন্যবাদের কাজ ক'রে উলটে কেন মার্জনা চাইছেন।"

কথাটার অর্থ ধরিতে না পারিয়া সকলে জিজ্ঞাসু নেত্রে মীরার মুখের দিকে চাহিল। মীরা বলিল, "তা নয় তো কি বলুন?—ওদিকে থাকলে কিছুই যে কাজ করছি না সেটা হাতে হাতে ধরা পড়ে যেত; আপনাদের এই অনুগ্রহ ক'রে ডেকে নেওয়ায় বরং সবার মনে একটা ধারণা থেকে যাবে—বেচারীকে ওরা ডেকে নিলে তাই, নইলে মীরা যদি এদিকে থাকত, কাজ কাকে বলে একবার দেখিয়ে দিত।"

কথাটাতে, বিশেষ করিয়া চোখ পাকাইয়া ঈষৎ মাথা দুলাইয়া বলিবার ভঙ্গিতে সবাই হাসিয়া উঠিল।

ওয়েটার ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া চায়ের সরঞ্জাম লইয়া সামনে দাঁড়াইল, প্রশ্ন করিল, "চা আর লাগবে কারুর?"

নিশীথ একটা কথা বলিবার সুবিধা পাইয়া যেন বর্তাইয়া গেল, বলিল, "না, চা একবার হয়ে গেছে।" তাহার পর একটা জুৎসই কথা বলিতে পারিবার আনন্দে সবার মুখের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিল, "এই দুর্লভ সময়টুকুর মধ্যে চা-কে প্রবেশ করতে দিতে মন সরে না; তাহ'লে এত যে মার্জনা চাওয়া-চাওয়ির ব্যাপার, আমরা নিজেদেরই মার্জনা করতে পারব না।"

মীরা একটু বিব্রতভাবে নিশীথের দিকে চাহিয়া ফেলিয়া দৃষ্টি নত করিয়া প্রসঙ্গটা বদলাইবার জন্য কি একটা বলিতে যাইতেছিল, মৃগাঙ্ক বলিল, "আমার মত কিন্তু অন্য রকম, অবশ্য সেটা বলতে গেলে আগে মীরা দেবীর কাছ থেকে অভয় পাওয়া দরকার।"

মীরা লজ্জিতভাবে চক্ষু তুলিয়া বলিল, "আমার একটা অভয় দেওয়ারও ক্ষমতা আছে নাকি? কই, এ-সম্পদের কথা তো জানতাম না।"

মৃগাঙ্ক উত্তর করিল, "জানেন না বলেই তো পাবার আশা করি; ধরুন, ফুলের গন্ধ আছে জানলে সে কি আর পাপড়ি খুলে সেটা প্রাণ ধরে বিলোতে পারত?"

সকলে আবার একটু মলিন হাসির সঙ্গে অনুমোদন করিল। ধোঁয়ার আড়ালে নিশীথের হাসিটা যে কত মলিন সেটা ঠিক বোঝা গেল না।

মীরা আবার লজ্জিত ভাবে মাথা নীচু করিল, তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিল, "বেশ, তাহ'লে আপনার কথা মতই তো আমার না দেওয়ারই কথা অভয়,—ফুলকে

যদি জানিয়ে দেওয়া হয় তার গন্ধের কথা, কেনই বা বিলোতে যাবে?"

এ-সমস্যায় সকলেই চুপ করিয়া রহিল। উত্তর আমার ঠোঁটে আসিয়াছে; কিন্তু এ-পরিবেষ্টনীতে আমার মুখ খোলা উচিত কিনা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু প্রকাশের ইচ্ছাই জয়ী হইল; বলিলাম, "কৃপণ ব'লে বদনাম হওয়ারও আশঙ্কা আছে তো?"

সকলে একটু চকিত হইয়া আমার মুখের পানে চাহিল। উত্তরটা ওদের পক্ষেরই, কিন্তু নবাগতের হঠাৎ প্রবেশটা উহারা সন্দেহের চক্ষে দেখিল। তবুও সমর্থন না করিয়া উপায় ছিল না, কাষ্ঠহাসির সহিত সবাই জড়াজড়ি করিয়া বলিল, "ঠিক, ঠিক বলেছেন উনি, বাঃ, কৃপণ হবার একটা আশঙ্কা আছে তো?"

মীরা একেবারে বিজয়ের হাসি হাসিয়া উঠিল, বলিল, "চমৎকার! যে পরকে অভয় দেবে তার নিজেরই আশঙ্কা।"

সকলে আবার একচোট থ হইয়া গেল; কিন্তু ওরই মধ্যে খুশীও হইয়াছে, কেননা মীরা এই উত্তরটা আমায়ই দিয়াছে মুখ্যত। আমি প্রত্যুত্তর দিতে আরও খানিকটা সময় দিলাম, বুদ্ধির দৌড়ের পরীক্ষাও হইয়া যাক না একটু। নীরবতা কাটে না দেখিয়া অবশেষে বলিলাম, "বাঃ, আশঙ্কা নয়? তার কৃপণ হবার আশঙ্কা আছে বলেই তো তার কাছে হাত পাততে যাই, যাচকের তো দাতার কাছে জোরই এইখানে। এই আশঙ্কা আছে বলেই তো দাতা মহৎ।"

সকলে আবার স্খলিত কণ্ঠে যোগ দিল, "বাঃ, ঠিকই তো...জোরই তো ঐখানে...আপনাকে কৃপণ বলা হবে—নেই এ-ভয়টা আপনার?"

মৃগাঙ্ক এই জয়-পরাজয়ের ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার জন্যই যেন আলাদা করিয়া বলিল, "জোর বইকি, দিন অভয় এবার।"

মীরার স্তবের নেশা আসিয়া গিয়াছিল, স্তাবকের কাছে হারিয়াই তো আনন্দ; কী যে একটা মুগ্ধ ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে আমার পানে চকিতে চাহিল, যেন বরমাল্যটা আমাকেই তুলিয়া দিল সে। মীরা সাধারণ ভাবে খোশামোদ ঘৃণা করে; এখানে সে সব নারী হইতেই স্বতন্ত্র, সে বিশিষ্ট। মনে পড়ে প্রথম দিন যখন আমি টুইশ্যনির জন্য তাহার সহিত দেখা করি, কি একটা কথায় আমার মুখে খোশামোদের ভাব ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া তাহার নাসিকা ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সেই মীরাই আবার স্বয়ংবর-সভায় সব নারীর সঙ্গে এক হইয়া যায়, পুষ্পবৃষ্টি হইলে সঞ্চয়ের জন্য আঁচল বাড়াইয়া ধরে, এখানে সে সাধারণ।...একটু অনুযোগের সুরে হাসিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে এসে আপনি ঐদিকে হয়ে গেলেন? দিস্ ইজ্ নট্ ফেয়ার।"

তাহার পর মৃগাঙ্কর পানে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা বলুন আপনার মতটা কি।"

লজ্জিত ভাবে ঘাড় কাৎ করিয়া হাসিয়া বলিল, "না হয় দেওয়াই গেল অভয়।"

ব্যাপার ততক্ষণে অন্য রকম দাঁড়াইয়া গেছে;—আমার ওকালতিতে জিতিয়া স্বয়ংবর-সভার সকলের মনের অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে অভয় যখন পাওয়া গেল তখন কি জন্য যে অভয় চাওয়া সেটা বিলকুলই ভুলিয়া বসিয়াছে। ওয়েটারও চায়ের সরঞ্জাম লইয়া চলিয়া যাওয়ায় মনে পড়িবার সম্ভাবনা আরও কম। মৃগাঙ্ক ব্যাকুল ভাবে হাতড়াইতেছিল, আমি বলিলাম, "উনি দুর্লভ সময়টুকুর মধ্যে চায়ের প্রবেশ পছন্দ করছিলেন না, আপনি বললেন—আপনার মত এই যে..."

মৃগাঙ্ক ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "ও ইয়েস, থ্যাঙ্ক ইউ, ঠিক; আমি বলছিলাম, "চা একবার হয়ে গেছে বটে, কিন্তু লোভ ব'লে আমাদের একটা প্রবল রিপু আছে,—যদি মীরা দেবীর ক্লেশ না হয় তো চা যদি আর একবার ওঁর হাতের রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করে তো সেটাকে অনধিকার-প্রবেশ না ব'লে বরং..."

সকলে উল্লসিত ভাবে সমর্থন করিয়া কথাটা আর শেষ হইতে দিল না। ওদের পক্ষের জয়যাত্রা আবার আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া নিশীথ পর্য্যন্ত নিজের পরাজয়ের কথা ভুলিয়া অকুণ্ঠ ভাবেই যোগদান করিল। ওয়েটারটা ততক্ষণে ওদিকে চলিয়া গিয়াছে, উৎসাহিত ভাবে চেয়ার

ঠেলিয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "আমি পাকড়াও ক'রে আনছি। বাঃ, মীরা দেবী এলেন দয়া করে, চা না করিয়ে ওঁকে ছাড়া হবে নাকি?"

প্রতিধ্বনির জন্য ওর কণ্ঠ চুলকাইয়া উঠিয়াছে। এই আগেই দেওয়া নিজের অভিমতটা—চা'কে প্রবেশ করিতে না দেওয়ার কথাটা—আর কি মনে থাকিতে পারে?

১৫

আমার এ একটা দুরদৃষ্ট—অভিশাপ আছে জীবনে—মীরার যখন খুব কাছটিতে আসিয়া পড়িব, সঙ্গে সঙ্গে সরিয়া যাইতে হইবে। এবারে মীরার ততটা দোষ ছিল না, সরমার প্রশংসায় সে অবশ্য চটিয়াছিল, কিন্তু সে-কথা সে ভুলিয়া গিয়াছিল। সে স্তুতির মাদকতায় ভরপুর, তাহার চিত্তে দাক্ষিণ্যের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। কিন্তু অদৃষ্ট, ঘটনার চক্রান্তে ব্যাপারটা আবার অন্য রকম হইয়া দাঁড়াইল।

সুরু থেকেই একটা কথা আমার বড় বিসদৃশ ঠেকিতেছিল। মাঝে নিজেই তর্কের ঝোঁকে পড়িয়া একটু বিস্মৃত হইয়াছিলাম, আবার সেটার দিকে দৃষ্টি গেল। লক্ষ্য করিতেছি সরমাও যে আমাদের সঙ্গে আসিয়া বসিয়াছে, সেদিকে কাহারও বিশেষ হুঁস নাই। সব যেন মীরাকে ঘেরিয়া পড়িয়াছে। অবশ্য সরমাকেও সবাই সমুচিত ভাবে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়াছে, এক-আধটা প্রশ্নাদিও করিয়াছে মাঝে মাঝে, আর ব্যাপার যাহা হইতেছে তাহা হইতে সে যে একেবারে বাদ পড়িতেছে এমন নয়, হাসিবার সময় সেও হাসিয়াছে, এক-আধটা অভিমতও দিয়া থাকিবে,—শান্ত ভাবে, যেমন হাসা, যেমন কথা বলা তাহার স্বভাব; কিন্তু একটা ত্রুটি হইয়াই গিয়াছে তাহাদের তরফ হইতে। স্তব, প্রশংসা, বা ইংরেজীতে যাহাকে বলে কম্প্লিমেণ্ট, মীরার ঘাড়ে জড় করিতে সবাই এতই উন্মত্ত যে এই সভাতেই যে আরও একটি মহিলা বসিয়া আছেন সেদিকে খেয়ালই নাই কাহারও। ইহারা ইংরেজদের নকল করিতে যায়, কিন্তু সামঞ্জস্য রক্ষা করিবে এমন সাধারণ বুদ্ধিটুকু পর্যন্ত ঘটে রাখে না। বিশেষ করিয়া পাশেই একজন লেডীকে যথাস্থানে ছাড়িয়া দিয়া আর একজনকে সপ্তম স্বর্গে তুলিয়া দিবে, ওরা যে-সভ্যজগতের নকল করিতেছে তথাকার নিতান্ত অসভ্যরাও একথা ভাবিতে পারে না!...আমি সরমার পানে খুব সন্তর্পণে এক-আধবার চাহিয়া লইয়াছি, বুঝিয়াছি এর দাগ পড়ে নাই ওর মনে। ওর মনের কোথায় যেন একটা বেদনার উৎস আছে। যোগী যেমন নিজের মূর্দ্ধার অমৃতরসে জিহ্বাগ্র সংলগ্ন করিয়া ধ্যানস্থ থাকে, সরমারও যেন কতকটা সেই রকম ভাব, সেও যেন সেই দুঃখের অমৃতরসে জিহ্বা দিয়া আত্মস্থ। বাইরে ও হাসে কথা কয়; একটা প্রসন্নতার আবরণও আছে ওর সব জিনিসের উপর; কিন্তু তাহার সঙ্গে ওর ভিতরের যোগ নাই।

হইতে পারে সবাই ওর ঔদাসীন্য জানে বলিয়াই ওকে একান্তেই থাকিতে দেয়, কিন্তু তবুও ব্যাপারটা অত্যন্ত বিসদৃশ, প্রায় একটা দুষ্কৃতির কাছাকাছি; আমি তো হাঁপাইয়া উঠিতেছিলাম।

পাকড়াও করিয়া আনিবার নিশীথের একটা অনন্য-সাধারণ ক্ষমতা আছে স্বীকার করিতে হইবে, শুধু চায়ের সরঞ্জাম ঘাড়ে ওয়েটারকে পাকড়াও করিয়া আনিল না, আরও আনিল শোভনকে আর দীপ্তিকে। শোভনের বাহুটা ধরিয়া সামনে দাঁড় করাইয়া বলিল, "দীপ্তি আর শোভাকেও ধ'রে আনলাম, দু-জনকে দু-জায়গা থেকে।"

প্রকাণ্ড একটা বীর সে!

মীরা চা ঢালিতে সুরু করিয়া দিল। চমৎকার দেখাইতেছিল মীরাকে। উঠিয়া, সামনে ঝুঁকিয়া চা ঢালিতেছে, এক গুচ্ছ চূর্ণ কুন্তল কপাল হইতে স্খলিত হইয়া নতশীর্ষ লতার তন্তুর মত মুখের উপর দুল দুল করিতেছে, কানের ঝুমকা দুইটা সামনে গড়াইয়া আসিয়াছে, তাদের মুক্তার ঝুরিগুলা গালের উপর পড়িয়া ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে। সকলেরই কথা একটু বন্ধ, শুধু লুব্ধভাবে একের পর এক করিয়া মীরার সামনে পেয়ালা বাড়াইয়া দিতেছে; মীরা যেন ক্রমেই পরিবর্দ্ধমান লজ্জায় রাঙিয়া উঠিতেছে; কেহ যে কথা কহিতেছে না, সেই জন্যও নিশ্চয় অনুভব করিতেছে, ওকে সবাই দেখিতেছে বলিয়া কথা কহিতেছে না। মীরার যে-সমাজে স্থিতি-গতি সেখানে মেয়েরা

নিজেদের প্রত্যেক ভঙ্গিটির সম্বন্ধেই সচেতন ;—মীরা জানে তাহার ঈষন্নত দেহযষ্টি, তাহার কপালের আলগা কুন্তল-গুচ্ছ, তাহার কানের লুটান ঝুমকা চারিদিকে একটা শান্ত বিপর্যয় ঘটাইতেছে ; এ-সবের ওপর তাহার আরক্তিম লজ্জাটি সম্বন্ধেও সে সচেতন, তাহাতেই তাহার লজ্জা আরও বেশী। ... আমি যথাসাধ্য সংযত ছিলাম, তবু নিজের দৃষ্টি বলিয়াই অযথা তাহার সাধুতার বড়াই করিতে পারি না। দৃষ্টিরও দোষ ছিল না, আজ খোশামোদের অর্ঘ্য দেওয়ার পর মীরার কাছে দৃষ্টি আমার প্রশ্রয়ই পাইয়াছে।

দীপ্তি একটু দূরে, ওদিকটায় কে-একজনের সঙ্গে কি কথা কহিতে গিয়াছিল, আসিয়া উপস্থিত হইল। মীরার চেয়ে দীপ্তি বছর-চারেকের ছোট, একটু বেশী চটুল, মাথার দুই পাশে দুইটি বেণী, চলে শরীরটা একটু সামনে ঝুঁকাইয়া আর দুলাইয়া,--সর্বসমেত বেশ একটা নিজস্ব স্টাইল আছে। কথা বলিবার ভঙ্গি খুব জোরাল,—কতটা সত্য বলিল, কতটা মিথ্যা বলিল ভ্রূক্ষেপ করে না, শ্রোতাদের উপর দাগ বসিল কি না সেইটিই তাহার লক্ষ্য। আসিয়াই বিস্ময়ে সমস্ত শরীরটাকে যেন একটু টানিয়া তুলিয়া, মুখের উপর হাত দুইটা জড় করিয়া বলিল, "ওমা! তুমি এখানে মীরাদি? অথচ তখন থেকে তোমায় এত খুঁজছি যে রীতিমত সাধনা বললেও চলে। ...সরমাদিও দেখছি যে! বাঁচলাম, কে যেন বলছিল আপনার শরীর খারাপ, আসতে পারবেন না ; এত ভাবনা হয়েছিল, মনে হ'ল সব ফেলে যাই, একবার দেখে আসি।"

সরমা হাসিয়া বলিল, "না আসলেই হ'ত ভাল ; কিন্তু শরীরের দোহাই তো মীরার কাছে চলবে না, তাই...।"

নীরেশ আবার কি একটা লাগসই কথা ভাবিতেছিল, জোগাড় হওয়ায় সরমাকে শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল, "মীরা দেবীকে পেতে হ'লে তো সাধনারই দরকার মিস্ মল্লিক ; আমাদের সাধনাটা একটু বেশী ছিল, তাই...।"

বোধ হয় অজ্ঞানকৃত, অথবা নিছক মূঢ়তা, তবুও নীরেশের অভদ্রতাটা আমার সহ্য হইল না—এই সরমার কথাটা শেষ করিতে না দিয়া নিজের মন্তব্য আনিয়া ফেলা। নীরেশের কথাটাও শেষ হইবার পূর্বেই সেটা যেন চাপা দিয়াই সরমাকে প্রশ্ন করিলাম, "হ্যাঁ, তাই ব'লে কি বলতে যাচ্ছিলেন সরমা দেবী? ...বোধ হয় মীরা দেবীর ভয়েই এসেছেন, কিন্তু আমাদের কৃতজ্ঞতা সেজন্যে কিছু কম হবে না।"

মীরা আমার কাপে চা ঢালিতেছিল, হঠাৎ আমার দিকে চোখ তুলিল। খানিকটা চা টেবিলের ঢাকনার উপর পড়িয়া গেল। মীরা তখনই আবার সমস্ত ব্যাপারটা সামলাইয়া লইল। চা'টা পড়িয়া যাওয়ার অজুহাতে তাহার তীক্ষ্ন, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিটা সঙ্গে সঙ্গে শান্ত করিয়া লইয়া বলিল, "এক্স্কিউজ মি, মাফ করবেন।"

কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক কথাবার্তা হইল। কথাবার্তাটা একটু বেশী উদ্যোগী হইয়া চালাইল মীরাই। যখন বুঝিল সরমা-সম্পর্কীয় ব্যাপারটা তাবৎকালের জন্য আমার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে বা যাওয়া সম্ভব, নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই সাহিত্যের কথা তুলিল, ওদের লক্ষ্য করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, মাঝখানে আপনারা সাহিত্যচর্চার জন্যে একটা ছোটখাট প্রতিষ্ঠান তৈরি করবেন ব'লে বলেছিলেন মৃগাঙ্কবাবু, কি হ'ল তার?"

মৃগাঙ্ক বলিল, "তারও উৎস তো আপনারাই? দেখলাম দু-চার দিন কথার পর আপনার উৎসাহই নিবে এল..."

কেন যে নিবিয়া আসিয়াছিল তাহা এদের সাহিত্য-জ্ঞান আর প্রীতির যেটুকু নমুনা দেখিলাম তাহা হইতেই বুঝিতে পারিয়াছি। মীরা বলিল, "না, ঠিক নেবে নি, বাবা কুমিল্লায় চলে যেতে পড়ে গেলাম একলা, মা'র শরীর খারাপ, নানা ঝঞ্ঝাটে আর ওদিকে মন দিতে পারি নি। আপনাদের সংকল্প যদি আবার রিভাইভ্ করেন তো খুব এক জন উপযুক্ত লোক পেতে পারি আমরা। আমাদের শৈলেনবাবু এক জন উদীয়মান কবি এবং সাহিত্যিক, —আপনারা নাম শুনেছেন নিশ্চয় এঁর..."

যে যেমনটি ছিল একেবারে চিত্রার্পিতের মত স্থির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিল, কাহারও পেয়ালা ঠোঁটের কাছাকাছি আসিয়া থামিয়া গিয়াছে, কাহারও টেবিলের কাছাকাছি নামিয়া; কেহ একটা চুমুক

টানিয়াছে, না গিলিয়া গাল ফুলাইয়া চাহিয়া আছে; কেহ ঠোঁটে পেয়ালা ঠেকাইয়া বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া আমার পানে চাহিয়া আছে,—একটু একটু করিয়া পেয়ালার গা গড়াইয়া টেবিল-ক্লথের উপর চা পড়িতেছে, আশ্চর্যের অভিনয়ে বাধা পড়িবে বলিয়া সেদিকে আর লক্ষ্য করিতে পারিতেছে না।

একটু পরে যেন সম্বিৎ পাইয়া কয়েক জন একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "ইনিই আমাদের শৈলেনবাবু?"

নগণ্যতা থেকে একেবারে খ্যাতির শিখরে উঠিয়া গেলাম। বায়রণের তবু খ্যাতিহীনতা আর খ্যাতিত্বের মাঝখানে একটা রাত্রির ব্যবধান ছিল, আমার বোধ হয় একটা মুহূর্তও নয়। "উদীয়মান সাহিত্যিক"কে অভিনন্দিত করিবার জন্য একেবারে ঠেলাঠেলি পড়িয়া গেল যেন। আলোক বলিল, "বর্ণচোরা আম মশাই আপনি, হু কুড্ থিঙ্ক যে আপনিই আমাদের শৈলেনবাবু? ...নাউ, প্লীজ্..."

শেকহ্যাণ্ড করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিল। লজ্জিতভাবে শেকহ্যাণ্ড করিয়া হাতটা টানিয়া লইব, মৃগাঙ্ক হাত বাড়াইয়া বলিল, "আসুন, বাঃ, আমাদের হাতে সাহিত্য বেরোয় না ব'লে অস্পৃশ্য নাকি? হাঃ হা হা ..."

নীরেশ একটু দূরে ছিল, টেবিলের ও-প্রান্তে; আগাইয়া আসিয়া হাতে একটা কড়া ঝাঁকানি দিয়া হাতটা মুষ্টিবদ্ধ রাখিয়াই মীরার পানে চাহিয়া নালিশের সুরে বলিল, "কিন্তু আমি আপনাকে কোন মতেই ক্ষমা করতে পারব না মিস্ রায়, এ-হেন লোককে এত দিন আমাদের কাছে অপরিচিত রাখবার জন্যে।"

শেক্‌হ্যাণ্ডের সঙ্গে একটা মানানসই কথা বলাও দরকার। সেটা সংগ্রহ না হওয়ায় নিশীথ এতক্ষণ হাত বাড়ায় নাই, এইবার নীরেশের কাছ থেকে হাতটা প্রায় ছিনাইয়া লইয়াই খানিকটা মৃগাঙ্কের কথা, খানিকটা নীরেশের কথা একত্র করিয়া বলিল, "আসুন হাত মিলিয়ে নেওয়া যাক্, এইবার থেকে এই কাটখোট্টা হাত দিয়েও কবিতা বেরুবে ফরফরিয়ে।...সত্যি মিস্ রায়, আপনাকে আমরা ক্ষমা করতে পারব না, কখনও না, নেভার..."

মীরা হাসিয়া বলিল, "বাঃ, আমায়ই কি উনি বলেছেন নাকি কখনও? আমি নিজে আবিষ্কার করলাম এই সেদিন "কল্লোলে" ওঁর একটা লেখা দেখে।'

নীরেশ নিজের সীটে না বসিয়া আরও এদিকে দীপ্তির চেয়ারের পাশটাতে দাঁড়াইল, তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "আপনি শৈলেনবাবুর লেখা পড়েন নি মিস্ মল্লিক?"

বেশ বুঝিলাম দীপ্তি একটু ফাঁপরে পড়িয়াছে। ও যেন ভয়ে ভয়েই ছিল এই রকম গোছের একটা প্রশ্ন এদের মধ্যে কেউ না কেউ এই করিয়া বসিল বলিয়া! অপরাধীর মত কুণ্ঠিত ভাবে একটা রগ টিপিয়া বলিল, "ঠিক্ মনে হচ্ছে না, তবে নিশ্চয় পড়ে থাকব।"

"নিশ্চয় পড়েছেন;—শৈলেন—শৈলেন..."

মীরা সাহায্য করিল, "শৈলেন মুখার্জি।"

তর্জনী দিয়া বিলাতী কায়দায় তিন বার কপালে আঘাত করিয়া নীরেশ বলিল, "ডিয়ার মি! পদবীটা পেটে আসছিল, মুখে আসছিল না। ঠিক্, শৈলেন মুখার্জি —শৈলেন মুখার্জি। ওঁর লেখা তো প্রায়ই চোখে পড়ে, এই সেদিনও তো 'প্রবাসী'তে একটা চমৎকার কবিতা পড়লাম...।"

যে-সময়ের কথা, তখন 'প্রবাসী' আমার স্বপ্নেরও অতীত। তাহার মাস-আষ্টেক পূর্বে আমার দুইটি কবিতা 'অঞ্জলি' নামক একটি মাসিকে উপরি-উপরি দুইবার প্রকাশিত হয়, তৃতীয় মাসে কাগজটি উঠিয়া যায় বোধ হয় সেই গুরুপাপেই। তাহার পর 'মানসী' ও 'কল্লোলে' গুটি দু-এক গল্প বাহির হইয়াছে।...এই অল্প পুঁজির উপর এ রকম রাশীকৃত যশের চাপে আমি গলদ্‌ঘর্ম হইয়া উঠিতেছিলাম।

মীরা বোধ হয় বিশ্বাস করিল কথাটা, একটু অভিমানের সুরে বলিল, "বাঃ, কই, আমায় তো বলেন নি শৈলেনবাবু?"

যশের মোহ অথচ তাহার মিথ্যার গ্লানি,—আমি আমতা-আমতা করিয়া চুপ করিয়া গেলাম।

নিশীথ প্রতিধ্বনি তুলিল, "কেন, আমিও তো সেদিন ইয়েতে ওঁর একটা প্রবন্ধ পড়লাম; আমাদের মধ্যে কত

ডিস্কাশন হয়ে গেল সেই নিয়ে। কি আর্টিকলটার নাম মিস্টার মুখার্জি ?”

যেমন অসহ্য, স্বীকার করিয়া লইলে তেমনি বিপজ্জনক। আমি বিনীতকণ্ঠে নিবেদন করিলাম, “কই, আর্টিকল্ তো আমি লিখি নি কোথাও।”

নিশীথ চায়ের পেয়ালাটা নামাইয়া চেয়ারে সোজা হইয়া বসিল, টেবিলে একটা ঘুসি মারিয়া বলিল, “লিখেছেন; আমি নিজে পড়েছি, এখানেও ‘না’ বললে শুনব ? আত্ম-গোপন করা তো স্বভাব আপনাদের সাহিত্যিকদের !”

এমন বিপদেও মানুষে পড়ে ! আমি নিরুপায় লজ্জার সহিত কথাটা মানিয়া লইয়া বিনয়োচিত মৃদুহাস্য করিতে লাগিলাম।

উদ্ধার করিল শোভন। লোকটা ক্রমাগত চুরুট টানিতে টানিতে সামনের ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করিতে থাকে, কথা কয় কম। তবে যেটুকু বলে তাহাতে স্পষ্টতার ছাপ থাকে। আমার সহিত করমর্দনের সৌভাগ্য হইতে ঐ একটি লোক নিজেকে বঞ্চিত রাখিয়াছে এখন পর্যন্ত। এদের অভিমত শোভন একটু দেমাকী।

চুরুট টানার ফাঁকে ফাঁকে বলিল, “মিস্টার মুখার্জিকে পাওয়া তো আমাদের খুবই সৌভাগ্য, তোমার আর্টি-কেলের কথাও তো উনি শেষ পর্যন্ত মেনে নিলেন নিশীথ; কিন্তু কি করা হবে তোমাদের ওঁকে নিয়ে সেটার একটা ঠিক ক'রে ফেল।”

“করা—মানে...” নিশীথ মীরার পানে চাহিল, অর্থাৎ কি সে মূল প্রস্তাব যাহার সে প্রতিধ্বনি করিবে ?

মীরা টেবিলের উপর আঙুলগুলি সঞ্চালিত করিতে করিতে বলিল, “আমি বলছিলাম শৈলেনবাবুকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের একটা সাহিত্যবাসর গ'ড়ে তুললে কেমন হয় ?...তুমি কি বল সরমাদি ?”

সরমা বলিল, “খুবই ভাল হয় তো; খাঁটি এক জন সাহিত্যিককে পাওয়া...”

সরমার কথার দাম অন্য রকম; আমি প্রকৃতই লজ্জিত ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম।

নীরেশ বলিল, “তা হ'লে ওঁকে কেন্দ্র করার মানে...”

মৃগাঙ্ক সমর্থনের জন্য মীরার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, “কেন্দ্র করা মানে মীরা দেবী মীন্ করছেন সভাপতি করা আর কি।”

মীরা বলিল, “ওই তো ওঁর প্রকৃষ্ট আসন। আমি প্রস্তাব করছি আজ এখন থেকেই আমাদের সভা প্রতিষ্ঠিত ক'রে দেওয়া যাক না কেন—শৈলেনবাবুর সভাপতিত্বে।

“হিয়ার হিয়ার” বলিয়া সকলে সমর্থন করিতে গিয়া হঠাৎ মীরার পানে চাহিয়া থামিয়া গেল। মীরা উদ্বিগ্ন ভাবে সোজা হইয়া বলিল, “কিন্তু কি ক'রে হবে ? ভাগ্যিস্ মনে পড়ে গেল। আপনার তরু কোথায় মাস্টার মশাই ? আমরা দিব্যি নিশ্চিন্ত ভাবে ব'সে আছি। তার বিকেলে বেড়াতে যাওয়া যে নিতান্ত দরকার। ডাক্তার বোস বিশেষ ক'রে ব'লে রেখেছেন। আপনাকে তো সে-কথা বলেওছি মাস্টার মশাই, দেখছি আজকের গোল-মালে আপনিও ভুলে ব'সে আছেন।...মাস্টার মশাইকে আমরা সবাই পার্টিতে খুবই মিস্ করব, কিন্তু ওঁর যা আসল কাজ...”

মীরা যেন নিরুপায় ভাবে একবার সবার পানে চাহিল। এক মুহূর্তে সভার মূর্তি বদলাইয়া গেল। আবার চারি দিক হইতে প্রতিধ্বনি উঠিল—“ও ইয়েস্, মিস্ করব বইকি; কিন্তু ডিউটি ইজ্ ডিউটি...আচ্ছা, মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে আবার আলাপ হবে এ-বিষয়ে ·· সাহিত্যচর্চার সময় তো আর চলে যাচ্ছে না, কিন্তু কর্তব্য তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না...শি ইজ্ এ স্টার্ণ মিসট্রেস্ (বড় কড়া মনিব)।

কে এক জন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের একটা কবিতা থেকে উদ্ধার করিয়া বলিল—“Stern daughter of the voice of God।”

শিখর হইতে পতন যে কি, সেই দিন বুঝি। উঠিবার সময় যেন স্বপ্নে তাড়া খাওয়ার মত পা মুড়িয়া যাইতেছিল। সৌভাগ্যক্রমে আর কাহারও মুখের পানে দৃষ্টি যায় নাই, গিয়াছিল শুধু একবার সরমার মুখের দিকে, সত্য আহত হইল কিনা দেখিবার কৌতূহলে।

সে আরক্তিম মুখে দৃষ্টি নত করিয়া বসিয়া ছিল।

ক্রমশঃ

শিবনাথ শাস্ত্রী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

বিজ্ঞানীর চোখে জীবনটা 'হেরেডিটি' আর 'এনভায়রনমেণ্ট' দিয়ে গড়া। পিতৃপুরুষের উত্তরাধিকারলব্ধ শক্তি ও প্রবণতা এবং সেই সঙ্গে পরিস্থিতির প্রভাব—এই দুই উপাদানে জীবমাত্রই ক্রমাভিব্যক্তির পথে আপনার বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে চলেছে বংশপরম্পরায়। কেবল মানুষের জীবনে দেখি, অপরাপর জীবের সঙ্গে সে নৈসর্গিক এই দুই নিয়মের বশবর্তী হয়েও, স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে আত্ম-প্রচেষ্টায় নিজ ব্যক্তিত্বের মূলধনটি চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়িয়ে চলেছে এবং সেই সঙ্গে পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলটিকেও আত্মসৃষ্টির অনুকূল করে গড়ে তুলেছে। মানুষের মধ্যে নরোত্তম যাঁরা, তাঁদের জীবনে এই আত্মসৃজনলীলা বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট। আপনাকে ভেঙেচুরে নতুন ক'রে গড়ে তোলবার অতন্দ্রিত সাধনায় শিবনাথ ছিলেন স্বয়ংস্রষ্টার একজন। কঠোপনিষদে একটি বচন আছে,

> বিজ্ঞানসারথি র্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
> সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

শিবনাথ সারথির মত আপনার মনকে জ্ঞান ও ধর্মের পথে প্রবর্তিত করেছিলেন দুর্জয় ইচ্ছাশক্তির বলে, যে-পথ সাধককে উপনীত করে ব্রহ্মচরণে।

কবি শিল্পী আত্মপ্রকাশ করেন নিজের রচনায়। এই রচনার ক্ষেত্র শুধু কাব্যশিল্পে আবদ্ধ নয়। প্রতিদিনের কর্মে আচরণে, স্বজনে নির্জনে, অন্তরের সংগোপনে, এর উদার প্রসার। অনেকের জীবনেই এটা পতিত জমি হয়েই পড়ে থাকে, কেউ কেউ সোনার ফসল ফলান। শাস্ত্রীমহাশয় জ্ঞানে প্রেমে কর্মৈষণায় ও আত্মোৎসর্জনে জীবনটিকে ফলিয়ে তুলেছিলেন সেই সোনার ফসলে।

তিনি আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন। আশৈশব তাঁকে পেয়েছিলাম। তাঁকে কাকাবাবু বলে ডাকতাম। তিনি আমার পিতৃব্য ও গুরুতুল্য ছিলেন।

ছেলেবেলায় ছিলাম দুরন্ত আর লেখাপড়ায় ছিল না বিতৃষ্ণার অন্ত। শাসনে হ'ত উল্টো ফল। শাস্ত্রীমহাশয়ের কাছে পেতাম স্নেহের অনুশাসন। এক দিনের জন্যেও খাই নি কখনও বকুনি। ভোরবেলায় সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছেন কতদিন প্রাতর্ভ্রমণে। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ব্রাহ্মপাড়া থেকে কোন দিন হাওড়ার পোল পর্যন্ত, কোন দিন বা ইডেন গার্ডেনে, ঘোড়দৌড়ের মাঠে। পথে চলতে চলতে গল্প হ'ত, প্রশ্নোত্তরের ভিতর দিয়ে আমার অজ্ঞাতসারে কত শিক্ষা ও প্রবর্তনা দিতেন। আমার প্রায় প্রত্যেক জন্মতিথিতে তিনি এসে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বসতেন ব্রহ্মোপাসনায়। উপাসনান্তে দিতেন উপদেশ, অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। শুধু ভাবাবেগে ত জীবন গঠিত হয় না। চাই সজাগ আত্মদৃষ্টি, নির্মম আত্ম-শাসন, অক্লান্ত সাধনা। এ সংসারে কেউ কারু হিতসাধন করতে পারে না, স্বয়ং ভগবানও হার মানেন, যদি আত্মোন্নতির চেষ্টা অন্তর থেকে না জাগে। বাহিরের আনুকূল্যে প্রয়োজন আছে, কিন্তু সেটা হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় হ'লেও চলে, যদি অন্তঃপ্রকৃতি স্বেচ্ছায় তার বশবর্তী হয়। জীবনে যা ব্যর্থ হয়েছে আত্মাপরাধে, সে-কথা বলবার স্থান এ নয়..., কিন্তু জীবনে যে অমূল্য দান পেয়েছি আচার্যদেবের কাছে সে-কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করলে এ মৌখর্য্যে কোন প্রত্যবায় হবে না।

লোকের কথা বা পুঁথিগত বিদ্যা মনের উপর দিয়ে অধিকাংশ সময়েই ভেসে যায়, ভিতরে বড় একটা তলায় না। ব্যক্তিবিশেষের সংস্পর্শের একটা আশ্চর্য প্রভাব আছে, তার স্মৃতি অমর হয়ে থাকে অন্তস্তলে। শাস্ত্রী-মহাশয়ের সঙ্গে যাঁর দুদণ্ডের জন্যে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল এমন অনেকের সঙ্গে এই দীর্ঘজীবনে আমার কথাবার্তা হয়েছে। দিখেছি, এঁরা কেউ তাঁকে শুধু ভুলতে পারেন নি তা নয়, শিবনাথের ব্যক্তিত্বের যে বৈশিষ্ট্য, তারও একটা ছাপ এঁদের মনে রয়ে গেছে। সেটা এক

কথায় বলতে গেলে, বোধ করি তাঁর স্বচ্ছ সরল প্রকৃতির অকৃত্রিমতা, এবং আত্মঘোষণাশূন্য নিষ্কাম প্রেমের চৌম্বক-শক্তি।

মনে পড়ে একবার কৈশোরে গিয়েছিলুম ভোলাগিরির দর্শনে, প্রেসিডেন্সী কলেজের কতগুলি ছাত্রের সঙ্গে। তাঁদের একজনকে দাদা বলে ডাকতাম, তিনিই আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। স্বামীজী বড়বাজারের গলির ভিতর এক শিষ্যের বাড়ী আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তখন হ্যারিসন রোড তৈরী হচ্ছে, অনেক ইমারতের ধ্বংসস্তূপ ভেদ ক'রে। তিনতলার একটি লম্বা ঘরের প্রান্তে সন্ন্যাসীঠাকুর ব'সে আছেন। হাস্যোজ্জ্বল মুখশ্রী, পরনে একটা সাদা আলখাল্লা, গেরুয়া নয়। আমরা প্রণাম করে তাঁর কাছে বসলাম। সহজ সুবোধ্য হিন্দিতে তিনি আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, উপদেশের ছিটেফোঁটা নেই তাতে। এমন সময় দেখি, একটি জটাগৈরিকধারী সাধুবাবা তাঁর পাশে করজোড়ে ব'সে আছেন এবং থেকে থেকে একটু অধীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে বলছেন, "গুরুজি কুছ উপদেশ দিজিয়ে।" ভোলাগিরি তার কথায় কর্ণপাত না করে আমাদের সঙ্গে নানা প্রশ্নোত্তরের মালা গেঁথে চলেছেন, বারবার উক্ত সাধুবাবার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে বিচলিত হয়ে একবার তার দিকে চকিত কটাক্ষপাত করে বললেন, "আরে বাবা! মন গেরুয়া করুনা।" গৈরিকবেশীকে মন গেরুয়া করার কথাটা, সেই গৈরিক বহির্ধ্বজার উপর নির্বাপণী এক কলসী জলধারার মত পড়ল। লোকটার পাংশুমুখের ছায়ায় তার লাল্‌চে গেরুয়াটা হয়ে গেল ছাইমাখা আমাদের চোখে। উপদেশটা কিন্তু হয়েছিল মোক্ষম। ফিরে আসবার পথে আমার মনে হয়েছিল আচার্য শিবনাথের কথা। সত্যই তাঁর মনটা ছিল বৈরাগ্যে গৈরিকরঞ্জিত, বাহিরে ছিল না তার চিহ্ন-লেশ। মহাদেবের মতই শিবনাথ ছিলেন ভোলানাথ। সাংসারিকতার নির্মোক সহজেই খসে পড়েছিল তার বহির্জীবনে, আপনার অজ্ঞাতসারেই করতেন আত্মদান। রূপসী তার রূপ হারায় প্রসাধনের আতিশয্যে, আত্মবিঘোষণায় জাগে নটীপনা। পণ্ডিত পাণ্ডিত্যের অভিমানে যখন হারান বিদ্যার শ্রেষ্ঠ মাধুর্য বিনয়, তখন লোকের চক্ষে হন মূর্খাধম। ধর্মাভিমানীর আত্মবিজ্ঞপ্তি ভগবৎ-প্রসঙ্গে জাগায় বেসুর। শাস্ত্রীমহাশয়ের উপাসনায় উপদেশে বক্তৃতায় উৎসারিত হ'ত তাঁর অন্তর্গঙ্গোত্রীর মুক্তধারা—অনাবিল স্বচ্ছ, অমৃতময়।

সামান্য ক্ষুদ্র একটি আচরণে ফু্‌টে ওঠে মানুষের আসল স্বরূপটি।* একটি ঘটনা আমার মনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমার পিতৃদেবের মৃত্যুর পর আমরা কিছুদিন মাণিকতলায় একটি বাড়ীতে থাকতাম। শাস্ত্রীমহাশয় প্রায়ই আসতেন আমাদের খোঁজখবর নিতে, অন্ততঃ দুচার মিনিটের জন্যে। এক দিন সকালে এসে উপস্থিত। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। আমাদের পৈত্রিক আমলের বৃদ্ধা বামনঠাকুরাণী ও ঝি দুইজনেরই জ্বর। মা রান্নাঘরে আমাদের জন্যে রান্না চড়িয়েছেন। শাস্ত্রীমহাশয় বললেন, "ছেলেরা আজ কী খাবে?" আমরা দুই ভাই অল্প দিন আগেই খুব ভুগে উঠেছি, মাছের ঝোল ভাত তখন পথ্য। মা বললেন, "ওদের জন্যে ভাতে-ভাত করে দিচ্ছি, ঝি ত বাজার যেতে পারবে না।" রান্নাঘরের বাহিরের বারাণ্ডায় ছিল বাজারের চুপড়ি আর থলি। শাস্ত্রীমহাশয় হেসে বললেন, "আমি এক্ষুনি বাজার করে আনছি।" এই বলেই পায়ের প্যানেলা জুতোজোড়টা চট্‌ ক'রে পায়ের সাহায্যেই খুলে ফেলে থলি-চুপড়ি নিয়ে বাজারে রওনা হলেন। মা ত রান্নাঘর থেকে বাইরে ছুটে এসে ওঁকে

---

* লেখক শাস্ত্রীমহাশয়ের "আসল স্বরূপে"র দ্যোতক যে আচরণের উল্লেখ করিয়াছেন, শাস্ত্রীমহাশয়ের জীবনে এইরূপ আচরণের দৃষ্টান্ত অনেক দেখা গিয়াছিল। তাঁহার "আত্মচরিত" গ্রন্থে এরূপ কোন কোন ঘটনার উল্লেখ আছে। শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রেরণায় তাঁহার সহাধ্যায়ী বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বিধবাবিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে যোগেন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন ও তাঁহার উপরে ভয়ানক নির্যাতন আরম্ভ হয়। এই সময়ে "আমার গুরুতর শ্রম আরম্ভ হইল। যোগেন তাঁহার ভগ্নহৃদয়া মাতা ও আত্মীয়স্বজনকে লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন; ঈশানেরও পাঠ ও নাইটডিউটির হাঙ্গামাতে অবসরাভাব হইল। এদিকে চাকরচাকরাণী নাই; সুতরাং আমাকেই বাজার করা, তিন তলাতে কাঁধে করিয়া জল তোলা প্রভৃতি সমুদয় গৃহকর্ম্ম করিতে হইত। এই সকল স্মরণ করিয়া এখন আনন্দ হয়" (আত্মচরিত, শিবনাথ শাস্ত্রী পৃ. ১২৪ ।—প্রবাসীর সম্পাদক

বলতে চান, কিন্তু কে শোনে কার কথা? কিছুক্ষণ পরেই শাস্ত্রীমহাশয় ফিরে এলেন, খালি পায়ে, বাঁ কাঁধে ধামা, ডান হাতে মাছের থলি। মা একটি কথাও বলতে পারলেন না। দর দর করে তাঁর চোখে জল পড়তে লাগল, ঘোমটা টেনে চোখ মুছলেন।

শাস্ত্রীমহাশয় ছিলেন সদানন্দ পুরুষ ও কৌতুকপ্রিয়। বাবা আমাদের দুই ভাইএর নাম রেখেছিলেন নেপোলিয়ন আর গারিবল্ডি। দীর্ঘ অসুস্থতার পরে আবার সবল হয়ে দুই ভাই যখন উঠানে ছুটাছুটি করতাম, কাকাবাবু তামাসা করে বলতেন, "ওই দেখ দুই বীরপুরুষ, 'যাই-যাই সিং' আর 'এখন-তখন সিং'।"

মনে পড়ে আমাদের পরমাত্মীয় স্বর্গীয় রামব্রহ্ম সান্যাল মহাশয়ের আলিপুরস্থ চিড়িয়াখানার ভবনে শাস্ত্রীমহাশয় বসেছেন মধ্যাহ্ন ভোজে। গ্রীষ্মের ছুটি তখন, আমরাও এসেছি সেই নিমন্ত্রণে। ভূরিভোজনান্তে শাস্ত্রীমহাশয়ের পাতে মাসীমা মস্ত একটি আম দিলেন। আমটি নিটোল শ্যামচিক্কণ, সহজেই মনকে লোভাতুর করে। শাস্ত্রীমহাশয় এক টুকরো আম মুখে তুলেই ত সেটি ফেলে দিয়ে বললেন—ও হেমন্তের মা, এ যে টকের বাবা! এবং তৎক্ষণাৎ এই ছড়াটি কাটলেন—(এই আমের প্রশস্তিতে)

"কাক দেশান্তর, বাঁদর বোবা,
হিঁদু রাম রাম, মুসলমান তোবা!"

আর তাঁর সেই অট্টহাস্য! পশুপক্ষী ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সেই আম্রফলটির অম্লরসের প্রভাব বর্ণনা শুনে আমরা সকলেই হেসে আকুল।

এদেশে ব্রহ্মবাদ কিছু নূতন তত্ত্ব নয়। উপনিষদের যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে মধ্যযুগের রামানন্দ কবীর দাদূ প্রভৃতি সকলেই অমূর্ত ব্রহ্মের উপাসনা ও অধ্যাত্মযোগের কথা প্রচার করেছেন এবং সাধনরাজ্যের গভীরতম প্রদেশে উত্তীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু যে কারণেই হোক, সে-প্রসঙ্গের আলোচনা অত্র নিষ্প্রয়োজন, সর্বভূতে যাঁরা ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, 'ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকোবিষ্ণুঃ' মোহমুদ্গরের এই গদাঘাতের শব্দেও তাদের বংশধরদের মোহনিদ্রা ভাঙে নি। জাতিভেদের খড়্গাঘাতে তারা ভারতবর্ষকে কিমামাংসে পরিণত করেছে, দেবমন্দিরের দ্বার তথাকথিত হরিজনদের জন্য হয়েছে অর্গলিত। তার ফল যা, সমস্ত হিন্দুস্থান তা আজ হাড়ে হাড়ে ভোগ করছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা এমন ক-জন বেপরোয়া পুরুষ, যাঁরা অশাস্ত্র-শাসিত ও আচার-নিষ্পিষ্ট এই দেশে সর্বস্ব পণ করে গৃহপরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে ভারতের সনাতন উচ্চ আদর্শগুলিকে হাতেকলমে ফুটিয়ে তোলবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। এটা তাঁদের হাতে হয়েছিল একটা experimental farm—পরখ ক'রে দেখবার ক্ষেত্র। এ পরীক্ষায় ব্রাহ্মসমাজ উত্তীর্ণ হতে পারুন না পারুন, নব্য ভারতে, এই এই 'ভাজি-উচ্ছে-বলি-পটোলে'র দেশে আদর্শগ্রস্ত সত্যসন্ধ দু-চারটি মরিয়া লোকের কল্যাণে, মতের সঙ্গে আচরণের ঐক্যস্থাপনের এই নির্ভীক সংঘবদ্ধ প্রয়াসই ব্রাহ্মসমাজের বৈশিষ্ট্য। শাস্ত্রীমহাশয় সেই সর্বত্যাগী অকুতোভয় যোদ্ধাদের একজন ছিলেন। তাঁর প্রচারক-জীবনে গভীর অধ্যাত্মযোগের সঙ্গে কর্মযোগের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। হিমাদ্রিশিখরে যে তুষার সম্ভার পুঞ্জিত হয় অন্তরীক্ষের প্রাণরস ঘনীভূত ক'রে, সেই হিমরাশি বিগলিত হয়ে নেমে আসে সহস্র ধারায় ঊষরভূমিকে উর্বরতা দান করবার জন্যে। গ্রামারে দেখি আগে Verb 'to be' তার পরে Verb 'to do'—হওয়া আগে, করাটা পরে। আমরা অনেক সময়ে 'ভূ' ধাতুটাকে এড়িয়ে 'কৃ' ধাতুটাকে আশ্রয় করি, তাতে ধর্ম কর্ম দুইই হয় পণ্ডশ্রম। নিয়তি হেসে বলেন, "মজালে রাক্ষসকুলে মজিলা আপনি।" যুদ্ধকাণ্ডের আগে থাকে উদ্যোগপর্ব, এ-কথাটা ভুলে যখন যাই তখন তিনি মনে করিয়ে দেন সব্যসাচীকে দ্রোণাচার্যের অস্ত্রপরীক্ষার আসরে, যাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত ছিল শরব্য শকুন্তের অক্ষিবিন্দুতে—আর সব থেকেও ছিল না সেই একাগ্র দৃষ্টির সম্মুখে।

ব্রাহ্মসমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর সেবায় শিবনাথ প্রাণপাত করে গেছেন। আমাদের অযোগ্যতায় শুষ্কতায় পঙ্কবাহুল্যে ব্রাহ্মসমাজ যদি আজ মরা গাঙে পরিণত হয়ে

থাকে, সে ব্যর্থতা শুধু আমাদেরই, কিন্তু সে ধারা নূতন খাতে আপনার পথ কেটে নিয়ে অগ্রসর হবেই হবে। হচ্ছেও তাই। জাতিভেদের নিরাকরণ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, বাল্যবিবাহের উচ্ছেদ প্রভৃতি যে-সকল সামাজিক সংস্কারের উদ্বোধন হয়েছিল এই বাংলা দেশে ব্রাহ্ম-সমাজের মুষ্টিমেয় সত্যাগ্রহীর প্রাণপণ প্রযত্নে, আজ সেই সাড়া জেগেছে সারা হিন্দুস্থানে রাজনৈতিক উদ্দীপনায়, শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যবৃন্দের অপ্রমত্ত সেবাব্রতে, শ্রীঅরবিন্দের অন্তর্মুখী অধ্যাত্মসাধনার অনুপ্রাণনায়।

শাস্ত্রীমহাশয়ের অত্যন্ত প্রেমপ্রবণ ও অসাম্প্রদায়িক হৃদয় ছিল। কর্মক্ষেত্রের সংকীর্ণ সীমানার মধ্যে বাধ্য হয়ে আবদ্ধ থাকলেও বিশ্বমৈত্রী ছিল তাঁর মজ্জাগত। যেখানে সদ্‌গুণ দেখেছেন জাতিসম্প্রদায় নির্বিশেষে তাদের বরণ করেছেন উদার প্রেমের অঙ্গীকারে।

১৮৮৮ সালে তিনি স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাসের সঙ্গে মাস ছয়েকের জন্যে বিলাতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে বক্তৃতায় আলোচনায় গল্পে ইংরেজ জাতির সদ্‌গুণাবলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন। তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। বিলাতের ভদ্র গৃহস্থ কন্যারা কিরূপ শ্রমশীলা, শুদ্ধচরিত্রা, আত্মরক্ষায় অটল এবং পুরুষের শক্তিরূপিণী বলতে বলতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতেন। সে-কথাগুলির প্রতিধ্বনি আজও আমার মনে জাগে। আপামর সাধারণের সময়ানুবর্তিতা, সততা, মিতভাষণ, আচরণের সংযম, জীবনে স্ফূর্তির প্রাচুর্য প্রভৃতি গুণের কথা তাঁর মুখে অনেক শুনেছি। মন্দ নেই কোথায়? সে-সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করতেন এবং আমাদের সতর্ক হতে বলতেন, যেন পাশ্চাত্য বহিশ্চাকচিক্য ও বিলাসোপকরণে বিভ্রান্ত না হই।

যথার্থ দেশপ্রেমিক ছিলেন তিনি। কিন্তু দেশসেবার বনেদ যে সত্যনিষ্ঠা ও চরিত্রের উপর সে সম্বন্ধে তাঁর বাণী অবিনশ্বর। তাঁর "পুষ্পমালা" গ্রন্থে "উৎসর্গ" শীর্ষক একটি কবিতা আছে। স্বদেশপ্রেমের এই অপূর্ব্ব কবিতাটি বাংলা ভাষায় অতুলনীয়। কবি শিবনাথের পদলালিত্য, মর্ম্মবাণী, ভগবৎপ্রেম, স্বদেশপ্রীতি ও নৈতিক আদর্শ এর ছত্রে ছত্রে। দু-একটি অংশ উদ্ধৃত করি।

চাই না সভ্যতা চাষা হয়ে থাকি,
দাও ধর্ম্মধন প্রাণে পূরে রাখি।
হায় জন্মভূমি! পুণ্যভূমি তুমি
দাও পুণ্যবারি দগ্ধ প্রাণে মাখি।
তুমি যার তরে খ্যাত এ সংসারে
আন সে বিশ্বাস তাই লয়ে থাকি।
সভ্যতা সভ্যতা ক'রে লোকে ধায়
কই তাতে সুখ, মরীচিকা প্রায়
প্রতি পদে দূরে ওই যায় স'রে
তোমার সন্তানে ওই দিল ফাঁকি।

* * *

দেখে হাসি পায় ভারতের জয়
গাইলেন কবি,—নবোৎসাহময়,
না ফুরাতে গান পশুর সমান
আবার নরকে নিলেন আশ্রয়।
ওরে বঙ্গবাসি তোদিগে জিজ্ঞাসি
এরূপে কি হবে ভারতের জয়?
ছাড় সে কল্পনা, তাহাতে হবে না,
বৃথা কেন কর সে সুখ বাসনা!
ইন্দ্রিয়ের দাস যেবা বারমাস
দেশের উদ্ধার তার কর্ম নয়।
ওরে, পতিব্রতা বিধবা হইয়ে
যেরূপেতে থাকে ব্রহ্মচর্য্য লয়ে,
আয় সে প্রকার থাকি শুদ্ধাচার
মৃত স্বাধীনতা ধনে উদ্দেশিয়ে।
যদি দিন আসে তবে রে উল্লাসে
নাচিব গাইব সকলে মিলিয়ে।
যত দিন নাহি সেই দিন আসে,
থাক অমানিশি ভারত-আকাশে;
আশার সলিতা রাবণের চিতা
জ্বালায়ে সকলে থাকি রে বসিয়ে।

আমি বড় দুঃখী তাতে দুঃখ নাই,
পরে সুখী ক'রে সুখী হতে চাই।
নিজে ত কাঁদিব কিন্তু মুছাইব
অপরের আঁখি, এই ভিক্ষা চাই।

সত্য।—ধনমান চাহে না এ প্রাণ—
যদি কাজে আসি তবে বেঁচে যাই;
বহু কষ্টে পূর্ণ আমার অন্তর,
এই আশীর্বাদ কর হে ঈশ্বর!
খাটিতে বাঁচিব খাটিয়া মরিব
এই বড় আশা, পূর্ণ কর তাই।

জীবনের গভীরতম অনুভূতিগুলিকে প্রকাশ করবার তাগিদে মানুষ তার ভাষাকে দিয়েছে ছন্দ এবং সুর, যাদের আনুকূল্যে অনির্বচনীয় ফোটে বচন-মাধুর্যে, বাক্য উত্তীর্ণ হয় বচনাতীতে। শিবনাথ জন্ম কবি। স্মৃতি শৈশবেই তাঁর কবি-প্রতিভার উন্মেষ হয়। তাঁর উৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" সতের বৎসর বয়সে লিখিত। তাঁর কাব্য ও উপন্যাস বঙ্কিম-যুগের। সম-সাময়িক রচনায় শিবনাথের কাব্যবৈদগ্ধ্য কত উচ্চে ছিল সে-কথা বঙ্কিমচন্দ্র লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর বঙ্গদর্শনে। শিবনাথের আজীবনের ঐকান্তিক বাসনা তাঁর "পুষ্পাঞ্জলি" পুস্তকের "এ মোর কামনা" শীর্ষক কবিতায় বাণীমূর্ত্তি নিয়েছে এবং আমরণ আপনাকে বিকশিত করেছে "রেডিয়ামে"র স্বতোনিষ্যন্দী অভ্রভ্র বৈদ্যুত কণার বদান্য বিতরণে। এই কবিতাটির থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করে আমার বক্তব্য শেষ করি।

আমি হব মধু বিন্দু; জগৎ খাইবে;
অণু অণু করি বিলাইবে;
হারায়ে মিশায়ে যাব, নিজে না সন্ধান পাব
বন্ধুজনে খুঁজে বেড়াইবে;
ঘরে ঘরে দেখিতে পাইবে।

মিছরির কুঁদো হব; তিল তিল করে
দশে লয়ে যাবে ঘরে ঘরে;
সুত্র মাত্র সার হয়ে, রহিব এ দেহ লয়ে,
যত শক্তি শরীরে অন্তরে,
সব যাবে জগতের তরে।

আমি রে চন্দন হব; জগৎ আমায়
পিষে চূর্ণ করিবে শিলায়;
কঠিন রব না আর হইব তরলাকার
হৃদে তুলে লবে যে আমায়
তার যেন পরাণ জুড়ায়।

আতরের শিশি হব; লইয়া আমারে
আছাড়িয়া ভাঙিবে বাজারে;
শিশু দলে কোলাহলে তিলে তিলে লবে তুলে
চুলে চুলে যাব দ্বারে দ্বারে,
গন্ধভার বিতরি সংসারে।

তালডাঙা

শ্রীকানাই সামন্ত

সারি সারি শুধু তালগাছ
জটলা করেছে হেথা। তাদের পাতার নাই নাচ
এ প্রদোষে উতলা নিশ্বাসে
বাতাসের। ঘিরিয়া রয়েছে চারি পাশে
সুবিপুল ম্লান দিগ্বলয়।
একমাত্র তারার উদয়
স্বর্লোকসুষমাভাস আনে
ধূলিময় ধরিত্রীর প্রাণে।
আবছায়াছবি-হেন সাঁওতাল পুরুষ ও মেয়ে
গেছে ভাঙা খোয়াইডাঙার পথ বেয়ে
দিনশেষে গৃহোৎসুক অক্লান্ত হৃদয়।
শুষ্ক তৃণ বিকীর্ণকণ্টকগুল্মময়
এ বিজনে শুধু তালগাছ
সারি সারি দাঁড়াইয়া। তাদের পাতার নাই নাচ।
গূঢ় হর্ষস্রোত বয়
অহর্নিশ অবিচল ঋজু দেহময়।
মুখে নাই বাণী।
ধরেছে মস্তক পেতে
শুভ্র আকাশের ছাদখানি।

অসমতল

শ্রীকমলচন্দ্র সরকার

সমতল দেশের সঙ্গে জায়গাটার দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়তাও নেই। পাহাড়ের প্রায় শুদ্ধ সংস্করণ—মাটির উপরে ঢেউয়ের পর ঢেউ হঠাৎ যেন নিশ্চল হয়ে থেমে পড়েছে। লালমাটি গায়ে মেখে এখানকার পৃথিবীর অবস্থা দেবমন্দিরের ভৈরবীর মতন—যেমন গৈরিক, তেমনি নিঃস্ব। গাছপালার প্রচলন তো এখানে একটা কুসংস্কার। মাঝে মাঝে অবশ্য দু-একটা কেলু ও পাইন গাছকে একত্র জটলা করতে দেখা যায়, কিন্তু লোকের বসতি থেকে তারা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছে।

গাছপালা বা পাহাড়-পর্ব্বতের সংযম অতিশয় বেশী—কলমের উচ্ছ্বাসে ওরা সম্পূর্ণ অবিচলিত থাকে, এবং ঘোরতর অনাদরেও অসন্তোষ নেই। কাজেই শহরতলীর এই বর্ণনার মধ্যে ওদের আসন অনিশ্চিত; কিন্তু প্রবাসের এই মুষ্টিমেয় বাঙালীর মধ্যে রায় সাহেব কে. ডি. গুপ্ত, এম. এল. এ.র চায়ের মজলিস এতবড় উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে, তাকে বাদ দিলে রায় সাহেব কেন, এই জায়গাটার প্রতিই অবিচার করা হবে।

রায় সাহেব স্বনামধন্য পুরুষ। এঁর খ্যাতি এবং এঁর অর্থ কখনও কোনও কারণে বিবাদ করে নি। এঁর বাড়ীতে পাউরুটির সতীর্থ হিসাবে বর্ত্তমান কলাকে মাঝে মাঝে যদি বা দেখা যায়, আতপ চাল তো চোখেই পড়ে না। শঙ্খরবের চাইতে পিয়ানোর টুংটাংটাই শোনা যায় বেশী; ধূপধুনোর গন্ধ দরকার হয় না, কেন না মিসেস্ গুপ্ত ও তাঁর কন্যাই কক্ষ সুরভিত ক'রে রাখেন। এতগুলি প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও লক্ষ্মীঠাকরুণটি এখানে যে কেমন ক'রে বাঁধা পড়লেন, এটা একটা ভাববার কথা। কারণটা এমন হ'তে পারে, যে দেবীটির আজকাল রুচি-পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

যাই হোক, সুখের কথা এই যে, প্রচুর অর্থ সত্ত্বেও এই পরিবারটি সুখী। অবশ্য সুখের আদর্শ কি, এ-সব অতি কূট ও ব্যক্তিগত ব্যাপার। ও-আলোচনা বাদ দিয়েও এইটুকু বলা যায় যে, এঁদের স্বামী-স্ত্রীর যা জীবনের আকাঙ্ক্ষা, তা সফল হয়েছে। সরল, পরিপাটি জীবন, এক ভাবে এক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়—কোথাও সংশয় নেই, কোথাও হঠাৎ থেমে-পড়া নেই, কোথাও মনের সূক্ষ্মতম কারুকার্য্যের জঞ্জাল নেই। 'গুপ্ত লজে'র ড্রয়িংরুমে কাউচ-সোফাগুলো যেমন জ্যামিতিক পারিপাট্যে সাজানো, এক চুল সরে বসবার যেমন তাদের হুকুম নেই, এঁদের জীবনও তেমনি বাঁধাধরা পথ বেয়ে চলে। সকালটার ভার নিয়েছে সংবাদপত্র, দ্বিপ্রহরে কর্ম্মস্থল অথবা দিবানিদ্রা তো আছেই, সন্ধ্যাবেলায় হয়তো রেডিওটা একটু বাজে, নয় সম্মিলিত আগন্তুকের মজলিস বসে। শনিবার সন্ধ্যেটা কাটে প্রেক্ষাগৃহে আর রবিবার থাকে মজলিসের আয়োজন অথবা নিমন্ত্রণ। গৃহস্বামী, গৃহকর্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের এই একই জীবনের ধারা। তাতে ক্ষতি হওয়ার চাইতে বরং সংসারের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়েছে।

এমনি ভাবে বেশ দিন কাটছিল, কিন্তু রায় সাহেবের ভাইপো প্রসাদ কিছুদিনের জন্যে বেড়াতে আসায় একটু গোলযোগের আভাস দেখা দিল। প্রসাদ ছেলেটি কিছু অদ্ভুত। ঘরে চায়ের আসরের প্রলোভন ছেড়ে সে যে কিসের লোভে ধুলো ও কাঁকরে ভরা পাহাড়ে পথে ঘুরে বেড়ায়, তা বোঝা দায়। তার চোদ্দ বছরের খুড়তুত বোন বেবীর নৃত্যসম্বলিত গানে যখন অতিথি-অভ্যাগতের দল প্রশংসামুখর হয়ে উঠেছে, তখন সে যে কেন নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে গিয়ে বারাণ্ডায় বই নিয়ে বসে তা সেই জানে। ছেলেটির সামাজিক আচার-আচরণে কিছুই শিক্ষা হয় নি আর কি! বি. এ. পাস করবার আগে পর্য্যন্ত যে মফস্বলে কাটিয়েছে, তার কাছ থেকে আর বেশী কি আশা করা যায়?

প্রসাদের কিন্তু সাহস আছে! এখানকার হালচাল কিছু দিন দেখবার পর হঠাৎ সে আকারে-ইঙ্গিতে কতকগুলো দুরূহ প্রশ্ন তুলে বসল। যেমন, আসবাব ও সামাজিকতার পিছনে এ অকারণ অর্থব্যয় কেন? শুধু চায়ের লোভে যারা সন্ধ্যেবেলা এসে ভিড় করে, তারা কেমনধারা বন্ধু? বেবীর অত নাচ শেখবার দরকার কি? অবশ্য প্রসাদ এমন ছেলেই নয় যে কাকা বা কাকীমার মুখের উপর এই সব প্রশ্ন করে বসবে। কিন্তু তাহলেও তার হাবভাবে অস্পষ্টভাবে স্বামী-স্ত্রীর মনে হ'ল যে প্রসাদের মতে তাদের জীবনযাত্রায় কোথায় যেন একটা গলদ আছে।

* * *

এক দিন বিকেলে আকাশ বড় অন্ধকার হয়ে এল। পাহাড়ের কোলে জমল ধূসর মেঘ। শান্তপ্রকৃতি কেলুগাছ ঝড়ের দাপটে বড় বেশী কথা কইতে লাগল। পাহাড়ী মেয়ের দল কাঠের বোঝা পিঠে নিয়ে দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে ফিরল। দিনের প্রখর আলোয় যে-স্থান ছিল সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, মেঘে ও রঙে, বাতাসে আর পাতার মর্ম্মরে তা হয়ে উঠল রহস্যঘন।

প্রসাদ বাইরে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ বড় খুশী হয়ে সে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলে, ছেলেমানুষের মতন উচ্চৈঃস্বরে ডাকলে—কাকীমা, ও কাকীমা।

কাকীমা তখন দিবানিদ্রার শেষ পরিচ্ছেদে মগ্ন। আধজাগা অবস্থায় উত্তর দিলেন—এই যে আমি এখানে। কি বলছিস?

—বাইরে কেমন চমৎকার ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়েছে, চল না কাকীমা, সকলে মিলে একটু বেড়িয়ে আসি।

জানলার মধ্যে দিয়ে আকাশের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল। সেই দিকে চেয়ে মিসেস্ গুপ্ত বললেন—এই দুর্য্যোগে? কোথাকার পাগল রে!

—দুর্য্যোগ কোথায়? বিষ্টি মোটেই হবে না, তুমি দেখে নিও। লক্ষ্মীটি কাকীমা, চল বেরিয়ে পড়ি।

—চল্ বাপু কোথায় নিয়ে যাবি। সোফারকে গাড়ী বার করতে বল্।

প্রসাদ অবাক হয়ে তার কাকীমার মুখের দিকে তাকাল—গাড়ী? গাড়ী কি হবে?

মিসেস্ গুপ্ত ততোধিক বিস্মিতকণ্ঠে বললেন—তবে? হেঁটে যাব নাকি? কথাটা তাঁর নিজের কানে এতই অসম্ভব ঠেকল যে খানিকক্ষণ পরে তিনি হেসে ফেললেন।

—তা তোরই বা দোষ কি বল? এখানকার হালচাল জানবার তো সুযোগ পাস নি। আমাদের হয়েছে আবার মুশকিলের উপর মুশকিল—শহরে বোধ হয় এমন একটা লোক নেই যে না আমাদের চেনে। এক দিন গাড়ী না নিয়ে বেরলে রক্ষে আছে? রাস্তার লোককে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণ যাবে। "ড্রাইভার বুঝি ছুটি নিয়েছে", "নতুন গাড়ী কিনছেন বুঝি" এমনি কত শত প্রশ্ন যে লোকগুলো করে!

মা যখন ছোট ছেলের উপর বিরক্ত হয়ে বলে, "তোকে নিয়ে আর পারি না", তখন কেউই সে-কথায় বড় একটা কান দেয় না; কারণ সকলেই জানে যে ও-কথা-গুলোর আদ্যোপান্ত স্নেহসিক্ত। মিসেস্ গুপ্তর কথাগুলিও এই জাতীয়। তাঁর নিজের গাড়ী এবং তার সম্বন্ধে পাঁচ জনের মন্তব্য কোন কোন সময়ে হয়তো সত্যিই বিরক্তিকর। কিন্তু গাড়ীটা যদি না থাকত, কিংবা গাড়ীটা থাকা সত্ত্বেও যদি কোনও লোকেই কিছু না বলত, তাহলে সেটা যে আরও বিরক্তিকর হ'ত, সেটা বেশ আন্দাজ ক'রে নেওয়া যায়। প্রসাদ এটুকু বুঝতে পারলে, পেরে বললে—তাই চল কাকীমা, গাড়ীতেই চল। বেবী আর যূথিকা যাবে তো?

—যূথীর আর গিয়ে কাজ নেই। উনি আসবেন এখনি—এসেই চা চাইবেন। রাত্তিরে দুটি ভদ্রলোককে খেতে বলা হয়েছে, তারও হাঙ্গাম আছে। ও আর-এক দিন যাবে'খন।

এখানে যূথিকা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন, যদিও তার সবচেয়ে বড় পরিচয় এই যে, তার সম্বন্ধে বলবার কিছু নেই। এ-বাড়ীতে সে একটা ইঙ্গিত মাত্র—অতি অস্পষ্ট, অতি ক্ষীণ। কবিত্ব করতে গেলে বলতে হয়, সে প্রতিপদের চাঁদ—'গুপ্ত লজের' দীপ্তি তার যে সামান্য অংশটুকুতে পড়েছে সেইটুই লোকের চোখে পড়ে, কিন্তু বিপদ এই যে তাকে ভালো ক'রে আয়ত্ত করবার আগে সে হয়ে যায় অদৃশ্য। মিসেস্ গুপ্তের অতি দূরসম্পর্কীয়

এক আত্মীয়ের মেয়ে সে; তার না আছে অলৌকিক রূপ, না পেয়েছে সে সরস্বতীর আশীর্ব্বাদ। অনেক কষ্টে সে শুধু শিখেছে নিজেকে আড়ালে রাখতে।

যাই হোক্, মিসেস্ গুপ্ত যা বললেন, তাতে মনে লাগবার মতন কিছু ছিল না, আর থাকলেও এ-ধরণের কথা যূথিকার মনের উপর কখনও রেখাপাত করে নি। কিন্তু আজ কি হ'ল, দোরের আড়াল থেকে এই সামান্য ক'টি কথা শুনে তার মুখখানি বিষণ্ণ হয়ে এল, ঠোঁট দুটি উঠল কেঁপে। যার পর্ব্বত অতিক্রম করবার কথা ছিল সে হঠাৎ শুক্‌নো মাটির কঠিনতায় কাতর হয়ে পড়ল। অথচ তার প্রতি মিসেস্ গুপ্ত অথবা রায় সাহেবের স্নেহের সম্বন্ধে যে কোনও প্রশ্নই ওঠে না, এ-কথা যূথিকার চেয়ে আর কেউ ভালো জানে না। দুঃখের সংসার থেকে নিয়ে এসে এই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে রাখা, তাকে এ-বাড়ীর এক জন ব'লে বাইরের লোকের কাছে পরিচয় দেওয়া বড়দিন প্রভৃতি উপলক্ষ্যে প্রায় তিন টাকা সাড়ে তিন টাকা দামের শাড়ী কিনে দেওয়া—এর কোনটাই তো তাঁদের স্নেহের বিরুদ্ধ সাক্ষী নয়, তবে যূথিকার এ ভাবাবেগ কেন?…

সেদিন বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারে লাভ হ'ল এই যে, প্রসাদ যথেষ্ট পরিমাণে সাবধান হয়ে গেল; এবং শুধু সাবধান হওয়া নয়, কথায়-বার্ত্তায়, আচারে-ব্যবহারে সে এমন ভাব দেখাতে লাগল যে তার কাকীমার মতের পৃষ্ঠপোষকতা করতে তার জুড়ি নেই। কাকীমা যা বলেন, তাতেই সে সায় দিয়ে যেতে লাগল, বেবী যা করে তাতেই সে প্রচণ্ড উৎসাহে বাহবা দিতে সুরু করলে। তার কারণ এ নয় যে, সে তাদের আন্তরিক সমর্থন করত; কারণটা হ'ল এই যে, প্রসাদ অতিশয় শান্তিপ্রিয় লোক। নিজের মত সত্যি হ'লেও সেটা প্রতিষ্ঠিত করতে যাওয়ায় বিপদ আছে। তার চেয়ে সংসারে যাতে শান্তি থাকে, সেই চেষ্টাই করা ভালো নয় কি?

কিন্তু এত ক'রেও কিছুই ফল হ'ল না। প্রসাদ যে আসলে একেবারে বন্যপ্রকৃতির এবং ভদ্রসমাজে সে যে একেবারেই অচল, এ-কথা প্রকাশ হয়ে পড়তে দেরী হ'ল না। কেমন ক'রে তাই বলছি।

* * *

এক দিন সকালে প্রসাদের সবে ঘুম ভেঙেছে, এমন সময় বেবী হঠাৎ সেজেগুজে তার ঘরে ঢুকল।

—দাদা, শীগ্‌গির একবার মাথাটা তোল, প্রণাম করবো।

প্রসাদ ভাল ক'রে চোখ চাইলে—বলিস কি? হঠাৎ এত ভক্তি?

—ভক্তি আবার কি? আজ আমার জন্মদিন, মা বললে, তাই—

—ও:, মা বললেন তাই! মা না বললে বোধ হয় আসতিস্ না, না রে বেবী? তা ও-কথা যাক্: এই সকালে অত ভীষণ ভালো জামাকাপড় পরে চললি কোথায়?

—তুমি তো আমায় কেবল ভয়ানক ভালো কাপড় পরতে দেখ। এ জর্জ্জেট শাড়ী তো আজকাল যে-সে মেয়ে পরে। এই তো আমাদের পাশের বাড়ীর প্রমীলা —তার বাবা মোটে আশী টাকা মাইনে পায়—তারও একখানা এই রকম কাপড় আছে। আমার আর কিছু নেই ব'লেই না—

বেবীর গলাটা ধরে এল এবং কথাটা অসমাপ্ত রেখেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রণাম করার কথাটা—

কথাটা হয়তো সে ভুলেই গিয়েছে, কিন্তু তাতে আর এমন কি দোষ? হাজার হোক, সে ছেলেমানুষ।…

বিছানা ছাড়বার পর প্রসাদ মিসেস্ গুপ্তের কাছে গেল।

—হ্যাঁ কাকীমা, বেবীর নাকি আজ জন্মদিন? কই আমাকে তো কিছু বল নি?

—বলিস কি, পনরো দিন আগে থেকে তোকে বলছি যে! আচ্ছা ভুলো মন তোর যা হোক।

প্রসাদ কিছুক্ষণ ভাববার চেষ্টা ক'রে বললে—না:, কিচ্ছু যদি মনে থাকে। আচ্ছা, আজ বুঝি অনেক লোক আসবে?

—বিস্তর, জন পনেরো তো হবেই। বেবীর বন্ধুই তো প্রায় গুটি আষ্টেক দশ। তা ছাড়া মিঃ মিত্র আছেন, ডাক্তার চৌধুরী আছেন। মিঃ আর মিসেস্ তালুকদারকেও বলব ভাবছি। সুতরাং তুই যে আজ দুষ্টুমি ক'রে

পালিয়ে বেড়াবি সেটি হবে না, দস্তুরমত কাজে লাগতে হবে।

—বেশ তো, বল না কোন্ কাজ বাকী? বাটনা বাটা? উনুনে আগুন দেওয়া?

যূথিকা কিছু দূরে দাঁড়িয়ে হাসি চাপবার চেষ্টা করছিল, আর পারলে না। মিসেস্ গুপ্তও হেসে উঠলেন।

—ও-সব কাজ যে প্রসাদ ভয়ানক ভালো পারে, তা সবাই জানে, কিন্তু আজকের দিনটা রেহাই দে। তুই বরং ড্রয়িংরুমটা একটু সাজিয়ে রাখ্—কবি-মানুষদের ঐ কাজই ভালো।

—কোন্ মতে? বৈদিক, না আধুনিক, না—

—তোর সঙ্গে কথায় পারি না বাপু; নে, আর আমায় জ্বালাস্ নে। যেমন খুশী তেমনি ভাবে সাজাগে যা। হ্যাঁ, তাই বলে ভারী কাজ কিছু করতে যাস নে যেন। আমি বৈজনাথকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—এই তো সামান্য ব্যাপার, এর জন্যে আবার বৈজনাথকে—

বৈজনাথ—অর্থাৎ এঁদের চাকর—বোধ হয় কাছাকাছি কোথাও ছিল। মিসেস্ গুপ্ত তাড়াতাড়ি মুখে হাত দিয়ে প্রসাদকে চুপ করবার ইঙ্গিত জানালেন। তার পর ফিসফিস ক'রে বললেন—ওদের সামনে খবরদার এ-সব কথা বলিস নে। দয়া দেখালেই ওরা মাথায় চ'ড়ে বসে। মুখে লাগাম দিয়ে না খাটিয়ে নিলে, ওরা নিজে থেকে কোনও কাজ করবে না।

* * *

প্রসাদের ঘর সাজানো দেখে সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করলে। বাস্তবিক, এই সব বিষয়ে তার যে একটা বিশিষ্ট রুচি আছে একথা স্বীকার না ক'রে উপায় ছিল না। এমন কি, মিসেস গুপ্তও যথেষ্ট খুশী হলেন, সবে দু-একটা সামান্য ত্রুটি তাঁর চোখে পড়ল, যেমন—

—এ তো চমৎকার হয়েছে, কিন্তু শোন, আজকের এই উৎসব যখন বেবীর জন্মদিন উপলক্ষ্য ক'রে হচ্ছে, তখন আমি বলি কি, দোরের ঠিক সামনে ওর সেই 'সর্পনৃত্যে'র বড় ফটোটা দেওয়া ভাল। বুদ্ধদেবের ছবিটা ওখান থেকে সরিয়ে বরং এক পাশে দে। আর বেবীর ঐ মেডেলগুলো ভালো ক'রে 'ব্রাসো' দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে এই ম্যাণ্টলপিসটার উপর রাখ। ওগুলো আজ অনেকেই দেখতে চাইবে। তখন এক-শ বার আলমারি থেকে বার করা এক হাঙ্গামের ব্যাপার।

* * *

যাই হোক, এই ভাবে ঘর সাজানোর পর্ব্ব তো শেষ হ'ল, কিন্তু ঘরের লোক সাজানোও যে এ ধরণের উৎসবের একটা প্রধান অঙ্গ, সে-কথা মিসেস্ গুপ্ত ভোলেন নি। অবশ্য এই বিষয়ে এক প্রসাদ ছাড়া আর সকলের সম্বন্ধেই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। কাপড়-জামা সম্বন্ধে বেবীর রুচি অসাধারণ—তিনি না দেখলেও সে তার নিজের এবং অপরের পছন্দমত কাপড়খানি নির্ব্বাচন করতে পারবে। ওদিকে রায় সাহেব সুট্ পরে থাকবেন, আর যূথিকা সম্বন্ধে তো কোনও কথাই ওঠে না, কারণ সে অধিকাংশ সময় থাকবে রান্নাঘরে। কিন্তু অতিথি-অভ্যাগতের সামনে প্রসাদ যদি তার স্বভাবমত একটা টুইলের শার্ট পরে বার হয়, তাহ'লে লজ্জার আর সীমা-পরিসীমা থাকবে না। অতি সঙ্কোচের সঙ্গে মিসেস গুপ্ত প্রসাদকে ডাকলেন।

—আজকের দিনটা তোর জামা-কাপড় পছন্দের ভার আমার উপর দিতে হবে। ওঁর একটা গরদের পাঞ্জাবী বার ক'রে রেখেছি—তোর গায়ে ঠিক হবে। যূথীকে একখানা দিশী কাপড়ও দিয়েছি, সে এতক্ষণে নিশ্চয় কুঁচিয়ে রেখেছে। বিকেলবেলায় লোকজন আসবার আগে ঐগুলো পরিস, কেমন?

আগে হ'লে এ-কথায় প্রসাদ অবাক হ'ত বা রেগে উঠত, কিন্তু এখন সে জেনেছে যে, এখানে তার একমাত্র পরিচয়—সে রায় সাহেবের ভাইপো। প্রসাদ ব'লে বা একটা আলাদা মানুষ হিসেবে কেউই তাকে চেনবার ও বোঝবার চেষ্টা করবে না। সে যেন এক অখ্যাত গ্রহ—লোকে তার অস্তিত্বের খোঁজ রেখেছে শুধু এই কারণে যে, সূর্য্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে। সুতরাং 'গুপ্ত লজে'র পরিচিত লোকের সামনে বেরতে হ'লে ঐ বাড়ীর যে মর্য্যাদা তা রক্ষা করতেই হবে।

নিমন্ত্রিতের দল যখন দু-এক জন ক'রে আসতে সুরু করেছে, তখন হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল যে, প্রসাদ ঘরে নেই, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যূথিকাও অন্তর্দ্ধান করেছে। প্রসাদের কথা না-হয় না-ই ধরলুম, কিন্তু যূথিকা? সে কি ব'লে কাজের দায়িত্ব ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারে? এমন স্বভাব তো তার কখনও ছিল না। কার প্রভাবে তার এই পরিবর্ত্তন—

সে-কথা এখন থাক্—রাগ করবার এ সময় নয়। বৈজনাথকে ডেকে তাদের খোঁজে পাঠালে হয়, কিন্তু তাহলে আবার সংসারের কাজ আটকায়। অথচ যূথিকা না এসে পড়লে স্বয়ং মিসেস্ গুপ্তকে চা তৈরীর ব্যাপারে হাত লাগাতে হয়—সেটা কোনও কাজের কথা নয়। এই উভয়-সঙ্কটের মধ্যে বেবীর আবির্ভাব হ'ল।

—হ্যাঁ রে, প্রসাদ আর যূথীকে দেখেছিস?

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বেবী জবাব দিলে—যে তোমার কোনও কথা রাখে না, তাকে কিছু বলতে যাওয়া কেন?

—কে কথা রাখে না? কার কথা বলছিস্?

এ-প্রশ্নেরও সোজা উত্তর এল না।

—পিছনের মাঠে গিয়ে দাদার কাণ্ড একবার দেখে এস। অমিতা আর লাবণ্যের সঙ্গে হঠাৎ ওদিকে গিয়ে প'ড়ে পালিয়ে আসতে পথ পাই না। ছি ছি, ওরা কি মনে করলে—লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল।

ঠিক এমনি একটা গোলমালই মিসেস্ গুপ্ত আশঙ্কা করছিলেন। হাতের কাজ ফেলে তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লেন এবং পেছনের মাঠে গিয়ে মোটামুটি যে দৃশ্য দেখলেন তা হচ্ছে এই:

মাঠের যে-অংশটায় সামান্য একটু সবুজ জীবন দেখা গিয়েছে, সেইখানে অকুণ্ঠিতচিত্তে এবং অতিশয় নিঃসঙ্কোচে প্রসাদ শুয়ে পড়েছে। ছি ছি, যে-ঘাসের মধ্যে খালি পায়ে যেতে পর্য্যন্ত ঘৃণা হয়, সেখানে যদি শোবার ইচ্ছেই হয়েছিল, আর কিছু না হোক্, অন্ততঃ একটা সতরঞ্চি পেতে নিলেও ভদ্রতা বাঁচত। সে-সব কিছুই তার দরকার ব'লে মনে হয় নি। এমন কি, গায়ে তার সামান্য একটা গেঞ্জি ছাড়া অন্য কোনও ভদ্র আবরণ পর্য্যন্ত ছিল না। কিছুদূরে দাঁড়িয়ে যূথিকা—তার আঁচলভরা পাহাড়ী ফার্ণ।

অবশ্য পরে জানা গেল যে ওরা দুজন বাইরের ঘর সাজানোর জন্য ফার্ণ সংগ্রহ করতেই গিয়েছিল; কিন্তু বিপদের কথা এই, অমিতা ও লাবণ্য ওদের ঐ অবস্থায় দেখেছে—তাদের মুখ বন্ধ করা সহজ হবে না। কাল বিকেলের মধ্যে এদের এই একান্ত জংলী ও নোংরা প্রকৃতির কথা সপল্লবে মেয়েদের মুখে মুখে ঘুরবে। প্রতিবেশীরা এই নিয়ে দেবে উপদেশ, জিজ্ঞাসা করবে অসম্ভব প্রশ্ন। সারা শহরতলীর মধ্যে যে 'গুপ্ত লজ' উন্নত রুচির জন্ম ও আদর্শস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেইখানেই সে-রুচির এতবড় অপমৃত্যু ঘটবে এ কি কেউ সুদূরতম কল্পনাতেও আনতে পেরেছিল? আসন্ন লজ্জা ও অপবাদের ভয়ে মিসেস্ গুপ্ত কণ্টকিত হয়ে উঠলেন।...

পৃথিবীতে সমতল ক্ষেত্র কতটুকু? দূরের আকাশে ঐ যে বালি ও পাথরের স্তূপ মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওরা কেউ তো সমতল নয়—কারও সঙ্গে কারও নেই মিল। মানুষের মনের সম্বন্ধে হয়তো এই একই কথা খাটে।

প্রমথ চৌধুরীর গল্প*

শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী

আশ্চর্য্য হয়ে বাংলার মূর্ত্তি দেখি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের ছোটো গল্পে। বাংলা দেশ দুর্গতির জালে জড়িয়ে নির্জ্জীব, বাঙালির বুদ্ধি সূক্ষ্ম কিন্তু শরীর-মন তেজালো নয়, আধুনিক এবং প্রাচীনের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে বাংলার গতি দ্বিধাগ্রস্ত, শহুরে বাংলা দশের করায়ত্ত এবং গ্রামের বাংলা গৃহবিচ্ছেদে অনশনে রোগে মুমূর্ষু—এই সব কথা আমরা এতই মেনে নিয়েছি যে, মরণদশার মানস আমাদের গল্পে কাব্যে আলোচনায় ছেয়ে গেল। প্রাণের ধারাটা কোথায় বইছে, তার খোঁজও প্রায় নেই সাহিত্যে। প্রাগ্রসর রচনা ক্ষোভে, বিদ্রোহে, সিমেণ্ট-বন্দী ভদ্রলোকিত্বের নানা দুঃখে জটিল; পুরোনো-ঘেঁষা সাহিত্য ছন্দে শিথিল, কল্পনায় তৃতীয় সংস্করণ, শ্যাওলা-ভরা দীঘির ধ্যানময়, ভাষায় অচল। সমগ্র ফ্রান্সের সমান বাংলা দেশ তার শক্ত চাষী, বিচিত্র বর্ণসঙ্কর সভ্যতা, গোলদিঘির উদ্ধতবুদ্ধি ছেলেমেয়ে, পূর্ব্ববঙ্গের কর্ম্মঠ জাগরুকের দল নিয়ে লুপ্তির ছায়ায় বিলীয়মান, এমন তত্ত্ব মানতে হলে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ অনস্তিত্বকে মানতে হয়।

দুর্দ্দশার সব তথ্যই প্রমথবাবু জানেন; বাঙালি-মনের ক্ষুব্ধ বিপ্লবান্বিত কল্পনাপ্রবণতা এবং বাঙালি-জীবনের নানা ডিগ্রি অনশন অপমানের দৈনিক ইতিবৃত্ত জেনেও তিনি বাংলার প্রাণকে অস্বীকার করেন নি। তাঁর গল্পে খাঁটি বাংলা মরে নি, নূতন শক্তি লড়ছে পুরোনো ডাঙায়, পুরোনো কলজ্জার আভিজাত্য বজায় রেখে। সেখানে আজও ঈশ্বর পাটনির দুহাত-লাঠিখেলা, লাঠিলকড়িশকড়ি-ধরার জোর দ্রষ্টব্য। "অণুকথা সপ্তক" বইখানিতে বাঙালির মর্য্যাদা আছে এবং রয়েছে শক্ত হাড়ের পরিচয়, যা দেখতে পাই তাঁর অন্য ছোটো গল্পে, "আহুতি" জাতীয় সংগ্রহে। মাছের ঝোল, মিহি গান, বেতারে লড়াইয়ের বাজি নিয়ে মত্ত বাঙালি বাবুই সবখানি বাংলা নয়। ক-জন সাহিত্যিক দেখিয়েছেন সাবলীল, সংগ্রামী, সাত-আগুনে পোড়া মেজাজী বাংলার মনকে? পল্লীর ঝিল্লি-গান, করুণ খোড়ো ঘরে অভিমানিনী, কলাগাছের বেড়া, পচা পুকুর, সাংঘাতিক গ্রাম্য চক্রান্ত এবং দিবান্তে শেয়ালের কোরাস্ নিয়ে চিত্রিত হয়েছে বিশেষ একটি দৃষ্টির সংস্কার।

বাংলার শক্ত শাক্ত পরিচয় খোঁজো "অণুকথার" 'মন্ত্রশক্তি' গল্পটিতে। তৃতীয় গল্পে চিনিবাস "দেবতাও নয়, পশুও নয়—শুধু মানুষ।" অর্থাৎ দোষে গুণে সে জ্যান্ত বাঙালি। "পথের পাঁচালী" গ্রন্থে আমরা পেয়েছি গ্রামপ্রান্তের নিরালা মর্ম্মান্তিক কাহিনী, সুন্দর কিন্তু সান্ধ্য; প্রমথবাবুর গল্পে দুপুরের রোদটাও বাদ পড়ে নি। মাণিকবাবুর 'পদ্মানদীর মাঝি' জোরালো ছন্দে বাঁধা, মনকে ঘা দেয়, যদিও 'পথের পাঁচালী'র পরিণত সার্থকতা সেখানে খোঁজা অন্যায়। তারাশঙ্করবাবু বীরভূমের একটা আশ্চর্য্য দিক দেখিয়েছেন। তাঁর মানুষজন পরিচিত কাল্পনিক প্যাটার্ণের ছায়া নয়। কিন্তু নূতন নিছক বাংলা গল্প সুরু হতেই প্রমথ বাবুর কলমে বেরিয়েছে। যাকে নিতান্ত আধুনিক বলা হয়, সেই পরিচ্ছন্ন মননসৃষ্টিশীল শিল্প 'সবুজ পত্রে' এবং তারও পূর্ব্বে তিনি ব্যবহার করেছেন। তাতে মিলেছে ভারতীয় উৎকর্ষধারার আভিজাত্য, যা কোনো বিশেষ কালের নয়—হয়তো সাম্প্রতিক সাহিত্যে তার পরিচয় স্বল্পতর। প্রমথবাবুর লেখার তুলনা নেই, কেননা ভাষায় এবং ভাবে তিনি সহজাত শক্তির অনুসরণ করছেন যা কেবলমাত্র নূতন নয়, অভিনব। স্বকীয়তা লাভ করেন শিল্পী দীর্ঘ সাধনার ফলে; প্রমথবাবুর রচনা কিন্তু বিশিষ্ট হয়েই দেখা দিয়েছে এবং মনে হয় যেন তার মধ্যে পরিণতির ইতিহাস নেই, পরিণতির বৈচিত্র্য আছে।

বাংলা জীবনের মজ্জায় প্রবেশ করে প্রমথবাবুর ছোটো গল্প এমন সারালো ধারালো এবং পুরোপুরি বাস্তব। মিছু সর্দ্দার, মণিরুদ্দি, নায়েব বাবু, ঠাকুরদাস কামারকে দেখুন। হিন্দু মুসলমান মিলিয়ে এই বাংলার সমাজ। প্রমথবাবু 'ভোগের দালানের ভগ্নাবশেষে'র সমুখে এদের দাঁড় করিয়েছেন। ভোগ শেষ হয়েছে ভালো, ভরসা জাগে চণ্ডীমণ্ডপে জমায়েত এরা ভোগের চেয়ে আহারকে মানবে। ভাঙা দালান ধ্বসে যাক্, নূতন চাষির বাড়ি উঠুক্। এই চাষিরা হাতের এবং মনের জোর রাখে, 'অণুকথার' পাঠক তা ভুলতে পারবেন না।

"পশ্চিমে শিবের মন্দির, যার পাশে বেল গাছে একটি ব্রহ্মদৈত্য বাস করতেন, যাঁর সাক্ষাৎ বাড়ীর দাসীচাকরানীরা কখনো কখনো রাত দুপুরে পেতেন—ধোঁয়ার মত যার ধড়—আর কুয়াসার মত যার জটা। আর দক্ষিণে পূজোর আঙিনা—যে আঙিনায় লক্ষ বলি হয়েছিল বলে একটি কবন্ধ জন্মেছিল। একে কেউ দেখেন নি, কিন্তু সকলেই ভয় করতেন।"

এই ভূতুড়ে, বলিতে-পাওয়া বাংলাকে প্রমথবাবু লুকোন নি, কিন্তু 'ভোগের দালানে'র ভগ্নাবশেষের মতো এর পরমায়ু গতায়ু। অদৃষ্টক্রমে যে-বাঙালি লেঠেলি জাত-ব্যবসা ছেড়ে লগি ঠেলে' মজুরি করে দুপয়সা কামাচ্ছে, তার মধ্যে আগুন নেবে নি—এইটেই জানবার। ঈশ্বর পাটনি যখন উঠে দাঁড়ালে, তখন দেখি সে আলাদা মানুষ। 'তার চোখে আগুন জলছে

* অণুকথা সপ্তক—প্রমথ চৌধুরী। মূল্য এক টাকা। প্রকাশক, ভারতী ভবন, কলিকাতা।
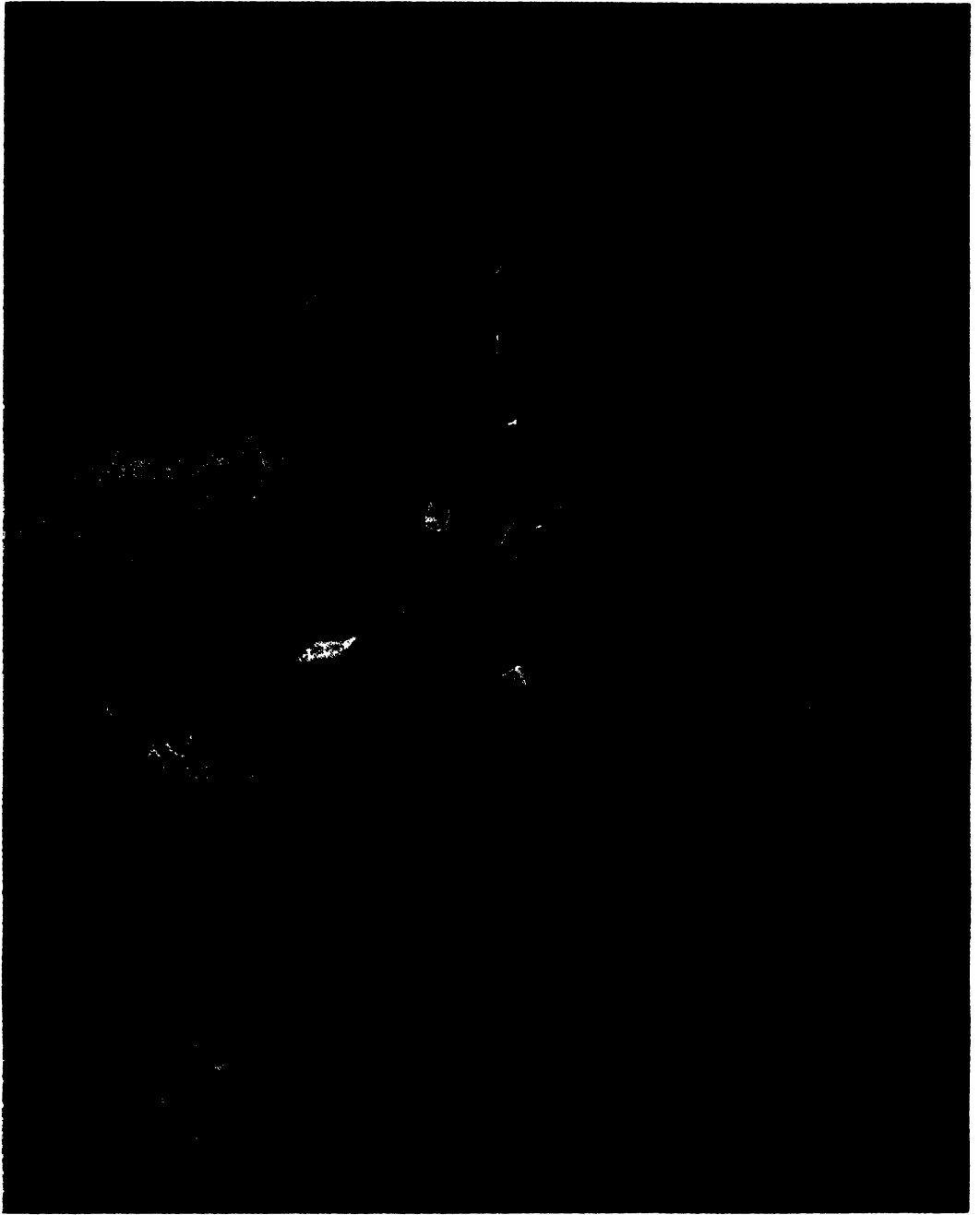
উৎকণ্ঠিতা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীতারাপদ বিশ্বাস

আর শরীরটে হয়েছে ইস্পাতের মত।' বঙ্গ-সাহিত্যিক যখন গলি-বিহারী উগ্র অবসন্ন সমাজের বিরুদ্ধে জাগেন, তাঁদের জানা উচিত বাংলার প্রাণ তাঁদেরই সহায়। গাঁয়ের লেঠেলরা সহজে মরবে না এবং তারা সংখ্যায় যথেষ্ট। তাদের ডাক পড়বে ভাঙবার নয়, গড়বার কাজে। সতেজ, নির্ভীক, গ্রাম্য হিন্দু মুসলমান বাঙালির কাছে সাহিত্যের খোরাক আছে; শুধু সমাজের ভবিষ্যৎ নয়, আর্টের নূতন শক্তি সেইখানে বাঁধা।

"যখ" গল্পটি ধন নিয়ে আধুনিক রূপকথা। ছোটো ছেলের মন ভুলবে অথচ বিজ্ঞানরসিক দেখবেন বিদ্রূপের ইস্পাতী ঝলক; গল্পের ছলে ধরা দিয়েছে ধনের প্রতীক নিয়ে মানুষের জটিলতা। Bank of France পাতালে সোনা রাখে যান্ত্রিক কৌশলে, যখ তার সন্ধান পায় নি। (নাৎসীরা পেয়েছে কিনা, সেটা আরো আধুনিক প্রসঙ্গ।) এদিকে সোনার ঘড়াকে আগলে বসে আছে যখ-রূপী ধনহীন বাঙালির কল্পনা। ঐশ্বর্য্যের লোভ এবং ভয় জড়িয়ে গল্প বানিয়েছিলেন আমাদের যখ-স্রষ্টারা, নূতন পটে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠল "অণুকথার" আখ্যানে।

"যখ" গল্পে পাড়াগাঁয়ের জীর্ণ পল্লীশ্রী শ্যাওলা এবং ম্যালেরিয়া নিয়ে আবির্ভূতা। রোগ, বিছানা, কবিরাজি লঙ্ঘন এবং পাঁচন নরম বাঙালিত্বের প্রসঙ্গে সমাশ্রিত। রমা ঠাকুর আছেন, একা খোড়ো ঘরে। যখ দেখেছিলেন ইনি। "তিনি (রমা ঠাকুর) ইংরাজী পড়েন নি, সুতরাং যা দেখতেন, যা শুনতেন তাতেই বিশ্বাস করতেন। আমার কথা আলাদা। আমি ইংরেজী পড়েছি, সুতরাং যা দেখি শুনি তাতে বিশ্বাস করি না।" এইখানে গল্পের ভিৎ। ঘুম না সত্য? যা ঘটল তা আর যাই হোক্—খাঁটি গল্প।

মধ্যে থেকে নন্দীগ্রামে যাওয়া হল বিল পেরিয়ে, মাঠ ভেঙে। কোজাগর পূর্ণিমা। খঞ্জনা নদী। "খঞ্জনা কখনো দেখেছেন? চমৎকার নদী। রসি দু-তিনের চাইতে বেশী চওড়া নয়—কিন্তু বারোমাসে তাতে জল থাকে, আর সে জল বারোমাস টল্ টল্ করছে, তক্ তক্ করছে।" এই জলের ধার দিয়ে যাত্রা। বাঘ? "ভয় অবশ্য বাঘের আছে। কিন্তু তারাও আমাদের মত গরীব ব্রাহ্মণকে ছোঁয় না।...বাঘরাও মানুষ চেনে, অর্থাৎ কে খাদ্য আর কে অখাদ্য।" তা ছাড়া সিদ্ধির মাহাত্ম্য আছে।

"কোজাগর পূর্ণিমার রাত...আলোকলতায় ছাওয়া কুলের গাছগুলো...যেন সোনার তারে জড়ানো।" এইবার যক্ষের দৃষ্টি। গল্পটা পড়ুন। গল্পের শেষে পাবেন এক বাটি পাঁচন। বলছিলাম বাঙালি-জীবনের আরেকদিক। এই গল্পে দু-ই আছে। কবিত্ব এবং কবিরাজিত্ব।

সঙ্গে সঙ্গে পড়া চাই "ঝোট্টন ও লোট্টন।" এই গল্পের উপাদান শুক্‌নো ডাঙা, প্রাচীন কাল, দুর্দ্দশায় মর্ম্মাহত কিন্তু কঠিন মনুষ্যত্ব। "গিয়ে দেখি আস্তাবলে গাড়িখানার মেঝেয় দুটি লোক বসে আছে। দুজনেই সমান অস্থিচর্ম্মসার, আর দুজনেই মুমূর্ষু। রোগেই হোক, উপবাসেই হোক, তারা শুকিয়ে মুকিয়ে আমচুর হয়ে গেছে।" এরা হিন্দুস্থানী। অনটনের স্রোতে যেখানে এসে ঠেকেছে, সেটা বাংলাদেশের যাকে বলে মফঃস্বলের একটি সহর। ধানের ক্ষেত-অলা জমিকে হাত করে ধনিকেরা তুলেছিলেন হাতাওয়ালা বাড়ি—সেকালের দিনে। পড়ে আছে বাড়ির খোলস, লুপ্ত বিলাসের সাক্ষ্য দিচ্ছে ভেঙে-পড়া আস্তাবলের বহর। "...বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি-গোছ একটা মস্ত আস্তাবল ছিল...সে আস্তাবলে ছিল মস্ত একটা গাড়ি-খানা, তার দু'পাশে দু'টি ঘোড়ার থান, আর তার ওপাশে সইস-কোচমানদের সপরিবারে থাকবার ঘর।" গল্পের এই কলিযুগে ঘোড়া মানুষের বদলে আস্তাবলে ছুঁচো টিকটিকির সফর। ছিল তাজা ধানের ক্ষেত, উঠল উদ্ধত কোঠা বাড়ি, দুদিনেই বেরোলো তারও হাক্-বের-করা দুর্দ্দশা; জমির এবং জমিদারের এই সংক্ষেপ ইতিহাস কারো অবিদিত ঠেক্‌বে না। সোনার বাংলার এই পরিবেশে দুটি মুমূর্ষু হিন্দুস্থানীর আবির্ভাব—বোধ হয় নোক্‌রির চেষ্টায়। জমে উঠল দুই "দেশকা ভাই"কে জড়িয়ে তীব্র নাট্য। বুকে ধক্ করে ওঠে। অভ্রান্ত তুলির আঁচড়ে ফুটেছে রৌদ্ররস ছবি।

"ফার্ষ্ট ক্লাশ ভূত" আধুনিক লৌহরথে ভ্রাম্যমাণ। ইঙ্গ-বঙ্গ যুগের বাঙালি তাকে চিন্‌বেন। মজার মানুষ সারদা দাদা—গল্প বলছেন তিনি। গল্পের সাম্‌নে তাঁকে দেখতে পাওয়া, তাঁর গলার আওয়াজ, ভাবভঙ্গী ও অদ্ভুত মেজাজ গল্পেরই সমান উপভোগ্য। প্রমথবাবুর অনেক গল্পে দেখি যিনি বলবেন তাঁকে নিয়ে স্বতন্ত্র গল্পের সূচনা, সেইখানে আবহাওয়ার সৃষ্টি এবং অনেক সময়ে ঘটনারও গ্রন্থি বাঁধা। ঘোষালকে পুনর্ব্বার দেখতে পাওয়া বা তার মুখের একটি কথা শোনাই গল্পের খোরাক। সারদা-দাদাটি কে? "কি হিসেবে আমার দাদা হতেন, তা আমি জানিনে। তিনি আমাদের জ্ঞাতি নন, কুটুম্বও নন, গ্রাম সম্বন্ধে ভাইও নন। তাঁর বাড়ী আমাদের গ্রামে নয়।...তিনি সংসারে ভেসে বেড়াতেন। আমাদের অঞ্চলে সেকালে উইয়ের ঢিবির মত দেদার জমিদারবাবু ছিলেন, আর তাঁদের সঙ্গে তাঁর একটা না একটা সম্পর্ক ছিল। সে সম্পর্ক যে কি, তাও কেউ জানত না; কিন্তু এর-

ওর বাড়ীতে অতিথি হয়েই তিনি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতেন। …তিনি একে ব্রাহ্মণ তার উপর কথায় বার্ত্তায় ও ব্যবহারে ছিলেন ভদ্রলোক। …দাদা হোন, মামা হোন…সকলেই তাঁকে অতিথি করতে প্রস্তুত ছিলেন। টাকা তিনি কারও কাছে চাইতেন না।"

সারদা-দাদার সঙ্গে কথা কয়ে সুখ। "কলকাতায় আমাদের কোন আত্মীয়স্বজনও ছিল না, কোন বন্ধুবান্ধবও ছিল না… সেকেলে কলকাতাই ছেলেদের কথাবার্ত্তার রস কলকাতার দুধের মতই ছিল নেহাৎ জলো।" (শুনতে পাই একালে জলের চেয়ে ভেজালই বেশি।)

এই বারে গল্প। "সারদা দাদা শুধু সেই সব ভূতের গল্প বলতেন, যাঁদের তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। আমি তাঁকে একদিন জিজ্ঞেস করলুম—আপনি ত শুধু পাড়াগেঁয়ে ভূতের গল্প করেন, আপনি কি কখনো সাহেব ভূত দেখেন নি?

"সারদা-দা উত্তর করলেন—দেখবো কোত্থেকে?—সাহেবরা ত আর এদেশে মরে না। না মরলে তারা ভূত হবে কি করে? * * * তবে দু-চার জন সাহেব যে মরে না, এমন কথা বলছিনে। কিন্তু যারা মরে ভূত হয়, তাদের দেখা আমরা পাইনে।

"কেন? এদেশে তারা গাছেও থাকে না, পায়ে হেঁটেও বেড়ায় না। তারা ট্রেনের ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ীতে চ'ড়ে বেড়ায়। আর ফিরিঙ্গি ভূতরা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীতে। তবে একবার একজনের দেখা পেয়েছিলুম, তা আর বলবার কথা নয়।…"

ট্রেনের ফার্ষ্ট ক্লাশ যাত্রী মানুষ, না ভূত? "অণুকথা"র ৩৩ পৃষ্ঠায় গাড়ি চড়ুন।

ছোটো গল্প ছোটো হওয়া চাই এবং গল্প হওয়া চাই—শ্রেষ্ঠ এই সংজ্ঞা প্রমথবাবু দিয়েছেন। আর স্বরচিত গল্পে তার চরম দাবী মিটিয়েছেন। "স্বল্পগল্প" পড়লে ঠাহর হয় গুটি কয়েক পৃষ্ঠায় কী ভাবে আখ্যানের দানা বাঁধতে পারে—যদি কলমের জাদু থাকে। কুমার বাহাদুর "যে ঘটনার উল্লেখ করলেন, আর যার নায়ক স্বয়ং তিনি, সে ঘটনা এতই অকিঞ্চিৎকর যে, তা অবলম্বন করে একটি ছোট গল্পও গড়ে তোলা যায় না।" কিন্তু তিনি মনের কথাটি এমন করে বলেছিলেন যে "আমার মনে সেটি গেঁথে গিয়েছে।"

ছোটো গল্পের রহস্যই এই মনে গেঁথে যাওয়ায়। এতটুকু ঘটনার পর্দ্দা তুলে জীবনের দৃষ্টি পাই সেরা ছোটো গল্পে। তার মধ্যে জটিল অভিজ্ঞতার ব্যবধান নেই, অব্যবহিত রূপ আছে—কথাবার্ত্তার হঠাৎ ঝলকে, আকস্মিক উল্লেখে, আনা-গোনার সংসারে রচিত হচ্ছে "অণুকথা"; পুরোপুরি গল্পে প্রবেশ ক'রে অজানা মানুষের সঙ্গে কখন যুক্ত হয়েছি আমরা ধরতে পারি না। প্লট বেঁধে বড়ো গল্প জীবনে সচরাচর আসে না, অনেকগুলি ছোটো গল্পের মধ্য দিয়ে আমরা বাঁচতে থাকি। ছোটো গল্পের সম্পূর্ণতাগুলি জড়িয়ে বড়ো সমগ্রতা গাঁথা হয় সংসারে—সেইখানে আমরা উপন্যাসের অঙ্গ—কিন্তু অতীতের ভাণ্ডার খুললেই জীবনের দীপ্ত খণ্ডগুলি বেরিয়ে পড়ে। এমনিতর ভাণ্ডারের সন্ধান আছে প্রমথবাবুর গল্পে; তার একটা কারণ, বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা আধার পেয়েছে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ সুদৃঢ় ভাষায় এবং সমস্তকে আলোকিত করেছে একটি প্রসন্নতা যাকে অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রসাদগুণ বলা হয়।

"স্বল্প গল্প" এবং "প্রগতি রহস্য" শ্লেষাত্মক, তাজা কথার ছুরি গিয়ে পৌঁছয় সমাজের মর্ম্মে। অথচ কোথাও ব্যক্তিগত বা দলগত ঝাঁজ নেই। প্রমথবাবুর এপিগ্রামের পিছনে থাকে করুণ উজ্জ্বল প্রাজ্ঞতা; কোনোখানে হৃদয়বৃত্তির বাহুল্য নেই কিন্তু দুটি গল্পেই রসিকতার মূলে রয়েছে সমবেদনা। "জনৈক পল্টনী" সাহেবের সংসর্গে পড়ে প্রথম গল্পটি জমে উঠেছে রেল-গাড়ির কামরায়, আমরা চলেছি কার্সিয়ঙে। দৃশ্যের বর্ণনায় তুলির টানের সঙ্গে মিলেছে নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যঞ্জনা। অথচ কত সহজ। জানলার বাহিরে চেয়ে দেখ। "চারিপাশে কুয়াসার খদ্দরে ঢাকা; তাই পাহাড়ের দৃশ্য আমার চোখে পড়ল না। যদিচ এ পথটুকুর চেহারা অতি চমৎকার। রাস্তার দুধারে প্রকাণ্ড গাছ, যাদের একটিরও নাম জানিনে; অথচ দেখতে বড় ভাল লাগে। পৃথিবীতে অনেক জিনিসেরই নামই তার রূপ দেখতে দেয় না।" কার্সিয়ং ষ্টেশনে গাড়ি থামতেই কাণ্ড। নাম-রূপের রহস্য ঠেকল সহযাত্রীর সিগারেট কেস্-এ। চুরি-করা সিগারেটের ধোঁয়ায় জটিল হল মনস্তত্ত্ব। গল্পের ধোঁয়া কখন কেটে গিয়ে সংসারে ফিরেছি তা শেষ অবধি বোঝা কঠিন।

"প্রগতি রহস্যের" মজা সাংঘাতিক—প্রগতির নেশাখোরের পক্ষে। গল্পের পরিচয় দিতে গেলে সবটাই উদ্ধৃত করা চাই, কেননা "অণুকথাকে" অনীনতর করবার উপায় নেই। কিন্তু বীজ-মন্ত্রস্বরূপ দু-চারটে কথা উদ্ধার করি।

"তিনি বললেন Brandy। Brandy না খেলে মুরগী খাওয়া যায় না, আর মুরগীর পিঠপিঠ আসে আর সব প্রগতি। Brandy পান করলে নেশা হয়, অর্থাৎ কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত হয়। তখন মুরগী নির্ভয়ে খাওয়া যায়। আর সেই সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের জাতিভেদ থাকে না। মুরগী খেতে হলেই মুসলমানের

হাতে খেতে হয়। তার পরেই স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজন হয়। কেন না, অশিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা ওরূপ পান-ভোজনে মহা আপত্তি করে; শিক্ষিত হলে করে না। আর স্ত্রী-শিক্ষার পিঠপিঠ আসে স্ত্রী-স্বাধীনতা। তারা লেখাপড়া শিখবে আর অন্দরমহলে আটকে থাকবে,—এ হতেই পারে না। এর থেকেই দেখতে পাচ্ছ প্রগতির মূল হচ্ছে Brandy, ইংরেজী শিক্ষা নয়।"

এই ছুরি-খেলা দূর থেকে দ্রষ্টব্য, বেশি কাছে যাওয়া প্রগতি অ-প্রগতি কোনো দলের পক্ষেই নিরাপদ নয়। খেলার শেষে দু-চারটে প্রশ্ন দর্শকের মনে জাগবে যা দিবানিদ্রার অনুকূল নয়।

প্রগতির বিষয়ে আরেকটু শোনা ভালো। কথাটা সাময়িক।

"কোনও বড় জিনিসের কোনও ছোট অর্থ নেই, যা দু'কথায় বোঝানো যায়; আর অনেক কথায় তার ব্যাখ্যা করতে গেলে, লোকে সে কথায় কর্ণপাত করবে না। প্রগতির প্রমাণ এই যে, আমি যদি বলি প্রগতি হয় নি, তবে লোকে বলবে—তুমি অন্ধ, আর না হয় ত তুমি সেকেলে কূপমণ্ডুক। দেখতে পাচ্ছ না যে, আমাদের কাব্যে ও চিত্রে, নৃত্যে ও গীতে কি পর্য্যন্ত প্রগতি হয়েছে ও হচ্ছে? তুমি প্রমথ চৌধুরী দেখছ যে, আমরা আজও পরাধীন ও পরবশ; কিন্তু ভুলে যাচ্ছ যে, আমাদের পরাধীনতাই আমাদের সকল প্রগতির মূলে, আর তুমি ঐ প্রগতির জোয়ারে খড়কুটোর মত ভেসে চলেছ।"

প্রাগ্রসর তত্ত্ব শুনুন অন্য প্রসঙ্গে। কথাটা উঠেচে psalm-কে pasalma-য় রূপান্তরিত করার বিরুদ্ধে; ইংরেজি উচ্চারণের যুক্তি চাই সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে।

"বাঞ্ছারাম বাবু বললেন,—তিনটি Vowel না জুড়ে দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ ছেঁটে দিতে পারতে, তাহলেই ত উচ্চারণ ঠিক হ'ত। এটি মনে রেখো যে, ইংরেজরা লেখে এক, বলে আলাদা, এবং করেও আলাদা। এই হচ্ছে তাদের অভ্যুদয়ের কারণ।"

এর মধ্যে যা আছে তা উচ্চারণতত্ত্বের চেয়ে বেশি।

বাংলা মনের আশ্চর্য্য নিপুণ বিশ্লেষণ আছে প্রমথবাবুর গল্পে এবং বিশেষ ক'রে "অণুকথা"য়—এইটে বলতে চেয়েছিলাম। শেষের গল্পগুলি বাংলার গ্রাম্য পরিবেশ থেকে নিয়ে এল সহরে, যদিও শহরের প্রসঙ্গ পূর্ব্বে অনেক জায়গাতেই আছে। বিদেশী আকস্মিকতার দোকান আপিস উদ্ধত ধনী-পাড়া এবং বহুতর ব্যবসায়ী বাধা ঠেলেও বাংলার আভিজাত্য কলকাতা শহরে প্রকাশ পেয়েছে; যদিও সেই প্রকাশের ক্ষেত্র কথায় এবং কলমে—কাজ অবধি পৌঁছয় কম। প্রমথবাবুর লেখায় কোনো দিক বাদ পড়ে নি। প্রগতির জোয়ার, জমিদারীর ভাটা, ভুতুড়ে প্রহসন, গ্রাম্য প্রহেলিকার আড়ালে বাংলার তেজ—সব জড়িয়ে বিশিষ্ট বাঙালিত্ব। এবং যে-বিশিষ্ট বাঙালি দৃষ্টিতে সমস্তখানি উদ্ভাসিত তা সৃষ্টিশক্তিমান, উদার, নির্ভীক এবং হাস্যোজ্জ্বল। পড়তে পড়তে মনে হয় বাংলার যথার্থ গরিমার সন্ধান পেলাম যা কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ বাঙালি প্রতিভার সম্পদ নয়, প্রচ্ছন্নভাবে বাংলা দেশে পরিব্যাপ্ত। "অণুকথা"র গল্পগুলি লক্ষণাক্রান্ত; বাংলা দেশের কারুণিক, চিত্তবান পরিচয় বহন ক'রে যুগের এবং যুগসম্ভবপরতার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

"মেরি ক্রিস্‌মাস" বইয়ের চতুর্থ গল্প—কিন্তু এর স্থান একটু আলাদা, তাই শেষ উল্লেখের জন্যে রেখেছি। শুভ্র বেদনা ফুটেছে মাধুরীভঙ্গিকায় অথচ যথাযথ জীবনের নির্ম্মম আকাশকে জড়িয়ে। "চার-ইয়ারী কথা"-র সঙ্গে এর তুলনা; সুন্দর, কঠিন, লীলায়িত চারুনির্ম্মাণ শিল্পে জীবনের একটি গভীর মুহূর্ত্ত ধরা পড়েচে। চারিদিকে পড়েছে হাসির আলো, কিন্তু এই হাসির মর্ম্মস্থলে আছে বেদনা।

..."অন্তরের মনসিজ ভস্ম হয়ে গেলেও, সেই ছাইয়ের অন্তরে কিঞ্চিৎ উষ্ণতা বাকী আছে। আমরা হিন্দুরা হলে বলতুম, দগ্ধসূত্রে সূত্রের সংস্কার থাকে। আমার মনে ঐ জাতীয় একটা ভাব ছিল। কখনো কখনো গোধূলি লগ্নে যখন ঘরে একা বসে থাকতুম, তখন তার ছায়া আমার সুমুখে এসে উপস্থিত হত, তার পর অন্ধকারে মিলিয়ে যেত।"

এই গল্পের বাঙালি বিদেশের স্মৃতি দিয়ে অনবধান মুহূর্ত্তের মানসরচনা করেছেন। গল্পটি পুরোপুরি রোম্যান্টিক, কিন্তু এর রিয়ালিজ্‌মও সহজ নয়। শিল্পব্যাপারে সংজ্ঞার ব্যর্থতা যে কতখানি তা বোঝা যায়; জাগ্রত গুণান্বিত লেখায় বহু ধর্ম্মের যোগেই স্বধর্ম্ম।

"প্রেমের ফুল...নভেলে বিবাহের ফলে পরিণত হতে পারে, কিন্তু জীবনে প্রায় হয় না। জীবনটা romance নয়, তাইত romantic সাহিত্যের এত আদর।"

এই গল্প যে-দরের কল্পনা জাগায় তাতে চৈতন্যের সতর্ক দৃষ্টি আছে, এবং দেখা দেয় খোলা চোখের বিশ্ব। সিনেমার অবকাশে কোন্ রিয়ালিটি মনকে অধিকার করল? ঘটনাকে জয় ক'রে মানুষ কী লাভ করে যা মানুষের চরম সান্ত্বনা?

..."এখন আমি সুখদুঃখের বাইরে চলে গিয়েছি। আবার যখন দেখা হবে সব কথা বলব।

"—আবার দেখা কোথায় ও কবে হবে?

"—কবে হবে জানি নে। তবে কোথায় হবে জানি। আমি এখন যেখানে আছি, সেখানে। সে দেশে ঘড়ি নেই। কালের অঙ্ক সেখানে শূন্য—অর্থাৎ অনন্ত। সে হচ্ছে সুধু কথার দেশ।"

জয়ন্তীর মর্ম্ম্ম চলেছে বঙ্গদেশে। প্রমথ-জয়ন্তী করতে হলে গঙ্গার জলে গঙ্গাপূজো বিধেয়। অর্থাৎ আমাদের দায়িত্ব তাঁর সমস্ত ছোটো গল্পগুলিকে একত্র ক'রে তাঁকে দেওয়ার উপলক্ষ্যে বাংলা সাহিত্যকে উপহার দেওয়া।

কংগ্রেস-পূর্ব্ব যুগে বঙ্গের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

রাজা রামমোহন রায় ভারতবর্ষে জাতীয়তামূলক রাজনীতি-চর্চ্চার পথপ্রদর্শক। তিনি বহু সরকারী বিধানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ১৮২৩ সনে প্রেস আইন বিধিবদ্ধ হইলে ইহার প্রতিবাদে 'মিরাৎ-উল্ আখ্‌বর' পত্রিকা বন্ধ করিয়া দেন। এদিক দিয়া বিবেচনা করিলে ভারতবর্ষে রামমোহন রায়ই প্রথম অসহযোগী। পার্লামেণ্টে ও ইংরেজ-রাজের নিকট পর্য্যন্ত তিনি প্রেস আইনের বিরুদ্ধে আবেদন-পত্র পেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার এ-কার্য্যে সঙ্গী ছিলেন চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও হরচন্দ্র ঘোষ। রামমোহনের বিলাত প্রবাসকালে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নূতন সনন্দ লাভ করে। তিনি এই সময় ভারত-শাসন ব্যবস্থার সংস্কারে বিশেষ ভাবে যত্নবান্ হন। ইহাতে যে তিনি কতকাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রমুখ সে-যুগের যুবক উগ্রপন্থীরাও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

রামমোহন প্রায় পনর বৎসর যাবৎ কখনও একক ভাবে, কখনও বন্ধুদের সহযোগে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন পরিচালনা করেন। গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে হিন্দু কলেজের নূতন শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণও রাজনীতি চর্চ্চা আরম্ভ করেন। কিন্তু রামমোহনের মৃত্যুর তিন বৎসর পরেই ১৮৩৬ সালে রীতিমত ভাবে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি সভা প্রথম স্থাপিত হইল, আর দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ রায়চৌধুরী, রামলোচন ঘোষ, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ প্রভৃতি রামমোহনের সহকর্ম্মী ও অনুরক্ত শিষ্যগণ এই সভা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইলেন। ইহার নাম 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা'।* 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, 'পূর্ণচন্দ্রোদয়' সম্পাদক-হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মুন্‌শী আমীর, দুর্গাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন ও আরও অনেকে ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিলেন। নীতি ও রাজকার্য্যাদি সংক্রান্ত বিষয়—যাহার সঙ্গে ভারতবর্ষের ইষ্টানিষ্টের সম্পর্ক বিদ্যমান তাহার আলোচনা, এবং রাজদ্বারে আবেদন ও অন্য উপায়ে যাহাতে দেশের অনিষ্ট নিবারণ হয় তাহার উদ্যোগ-আয়োজন এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য হয়। ভারতবর্ষে সঙ্ঘবদ্ধ রাজনীতি আলোচনার আয়োজন এখানেই সর্ব্বপ্রথম হয়। ধনী ও জমিদার ছাড়া সাধারণ লোকেরাও শেষে ইহার সভ্য হইয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ আছে। এই সময়ে সরকার তরফে নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ আরম্ভ হয়। সভা প্রথমে ইহার বিরুদ্ধেই আন্দোলন পরিচালনা করিতে অগ্রণী হন। ব্রহ্মসভা ও ধর্ম্মসভার মধ্যে দলাদলি থাকায় এ সভাটি বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই।†

জমিদার-সভা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৮, ১৯শে মার্চ্চ তারিখে। ইহার প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন প্রধানতঃ দ্বারকানাথ ঠাকুর। শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষার জন্য গঠিত হইলেও সাধারণ শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কেও এখানে আলোচনা হইত। দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ইহার অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়।

জমিদার-সভা প্রতিষ্ঠার পাঁচ বৎসর পরে, ১৮৪৩, ২০শে এপ্রিল তারিখে কলিকাতায় বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠার একটু ইতিহাস আছে। রামমোহন-বন্ধু একেশ্বরবাদী উইলিয়াম এডাম বিলাতে বসিয়া ১৮৩৯ সালে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামে একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য—ভারতবর্ষের কল্যাণ চিন্তা ও বিলাতে

* শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'—২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৯-২৯১ ও ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৩, ৩১৫।

† 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'—২য় খণ্ড, ২৯১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৪২, ২রা মার্চ্চ) পত্রের উক্তি দ্রষ্টব্য।

ভারত-কথা প্রচার। প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও পার্লামেণ্ট সদস্য জর্জ্জ টমসন ইহার সভ্য হন। দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথম বার বিলাত ভ্রমণকালে জর্জ্জ টমসনের সঙ্গে পরিচিত হন ও ফিরিবার সময় তাঁহাকে ভারতবর্ষে লইয়া আসেন। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রগণ—তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা স্থাপন করিয়া ১৮৩৮ সন হইতেই সংস্কৃতিমূলক বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৮৪২ সনের প্রথমে 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' নামে একখানা কাগজ বাহির করিয়া তাঁহারা নিয়মিত ভাবে রাজনীতি চর্চ্চা করিতেও আরম্ভ করেন। জর্জ্জ টমসনের আগমনের পর এই অগ্রণী দল তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করিলেন। পাঁচটি প্রস্তাবে সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়। ইহার মধ্যে প্রধান কথা ছিল, রাজানুগত্য স্বীকারপূর্ব্বক সমগ্র ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য ভারতবাসীদের তৎপর হওয়ার অঙ্গীকার। বিভিন্ন রাজবিধির আলোচনা, প্রতিবাদ, আবশ্যক হইলে কোন কোন অন্যায় বিধির বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা ইহার কার্য্য হইল। সাবালক মাত্রেই ইহার সভ্য হইতে পারিতেন, অধ্যয়নরত ছাত্রদের সভ্য করা বিধিবহির্ভূত ছিল। রামমোহন-শিষ্য তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এই দলের নেতা হইলেন। 'ইংলিশম্যান,' 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। তাঁহারা এই দলকে 'চক্রবর্ত্তী ফ্যাক্‌শন' বা 'চক্রবর্ত্তী চক্র' এই বিদ্রূপাত্মক নামে অভিহিত করিতেন। 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির মুখপত্র ছিল। এই সোসাইটিও কিন্তু দুই-তিন বৎসরের অধিক কাল স্থায়ী হইল না।

কলিকাতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫১, ৩১শে অক্টোবর। ইহার সভাপতি ছিলেন সনাতনপন্থী বর্ষীয়ান্ রাজা রাধাকান্ত দেব ও সম্পাদক প্রগতিবাদী ব্রাহ্ম যুবক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং সভ্যদের মধ্যে ছিলেন রামমোহনপন্থী, সনাতনী ও হিন্দু কলেজের নবশিক্ষালব্ধ যুবকগণ। এক দিকে ভারতবাসীদের সমানাধিকার দানে চিরবঞ্চিত করিয়া রাখিবার জন্য ভারত-প্রবাসী ইউরোপীয়দের জোট ও অন্য দিকে কোম্পানীর সনন্দের মেয়াদ অন্তে নূতন সনন্দ লাভের সময় আসন্ন হওয়ায় ভারতবাসীরা বাদ-বিসম্বাদ ও দলাদলি ভুলিয়া তখন ঐরূপ একতাবদ্ধ হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা ঔপনিবেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের ('Colonial Governments') আদর্শে ভারত-শাসন সংস্কারের প্রস্তাব করিয়া পার্লামেণ্টে এক আবেদন প্রেরণ করেন। সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতের মুখপাত্র স্বরূপ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মত একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। মান্দ্রাজে এসোসিয়েশনের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়, ও বোম্বাইয়ে দাদাভাই নৌরজী ও নৌরজী ফিরদুনজি একটি স্বতন্ত্র সভা এই সময় স্থাপন করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বহু বৎসর সমগ্র-ভারতের মুখপাত্র রূপে বিভিন্ন রাজবিধির সমালোচনা ও প্রয়োজনবোধে বিরুদ্ধ আন্দোলনও করিয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহের পরেও কিছুকাল এই সভা স্বাধীন সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হয়। কিন্তু পরে ইহা ক্রমশঃ সরকার-ঘেঁষা হইয়া পড়ে। জমীদার সভায় পরিণত হইয়া ইহা এখনও অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কৃষ্ণদাস পাল, ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজা দিগম্বর মিত্র, রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজা রমানাথ ঠাকুর, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ প্রভৃতি বিখ্যাত বঙ্গ-সন্তানগণ কোন-না-কোন সময়ে ইহার সভ্য ছিলেন।

'হিন্দু মেলা,' 'চৈত্র মেলা' বা 'জাতীয় মেলা' নামে কলিকাতায় একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় ইংরেজী ১৮৬৭ সনে। এই বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে ইহার অনুষ্ঠান সুরু হয় ও পরবর্ত্তী বহু বৎসর এই দিনে এই অনুষ্ঠান হইতে থাকে। রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, কুস্তী, অস্ত্রচালনা প্রভৃতি জাতীয় উন্নতির সহায় বিভিন্ন বিষয়ের আয়োজন ও আলোচনা এই মেলায় হইত।

এখানে স্মরণীয় যে, তখনও ভারতে অস্ত্র-আইন বিধিবদ্ধ হয় নাই, এ কারণ অস্ত্রচালনা শিক্ষা বা অস্ত্র-ব্যবহার তখন বে-আইনী ছিল না। হিন্দু মেলার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র মহাশয়, আর তাঁহার প্রধান প্রবর্ত্তক, উৎসাহদাতা ও সহায় হন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দ্বয়। মনস্বী রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুর অবস্থান কালে ১৮৬১ সনে 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনারায়ণের মতে নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই সভার আদর্শে হিন্দু মেলার সূচনা করেন্। মেলার কার্য্য উক্তরূপ বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত ছিল, এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের লইয়া স্বতন্ত্র মণ্ডলী গঠন করিয়া এ-সকল পরিচালনার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'মিলে সব ভারত-সন্তান, একতান মনঃপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান' হিন্দু মেলা উপলক্ষেই রচিত ও এখানে প্রথম গীত হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, রজনীকান্ত গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (তখন বালক মাত্র) বিভিন্ন অধিবেশনে কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। হিন্দুমেলার মূল উদ্দেশ্য ইহার দ্বিতীয় অধিবেশনে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, "আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য নহে, কোন বিষয় সুখের জন্য নহে, কোন আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য, ইহা ভারতভূমির জন্য।"..."যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়— ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।" হিন্দু মেলার অনুষ্ঠাতৃগণ ও সমর্থকগণ সমগ্র ভারতভূমিকেই মাতৃভূমি জ্ঞান করিতেন। বঙ্গ-সন্তানগণ এ সময় 'নেশনাল' বা 'জাতীয়' কথাটির বড়ই ভক্ত হইয়া পড়েন। নবগোপাল মিত্র মহাশয় সকল প্রচেষ্টার সঙ্গেই 'নেশনাল' কথাটি জুড়িয়া দিতেন। এই জন্য সে-যুগের লোকেরা 'নেশনাল নবগোপাল' বা 'নেশনাল মিত্র' নামে তাঁহাকে অভিহিত করিতেন।

ইণ্ডিয়ান লীগ ও ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন অল্পকাল ব্যবধানে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইণ্ডিয়ান লীগ স্থাপনে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়। ইহার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৭৫, সেপ্টেম্বর। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার প্রথম সভাপতি হন। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীমোহন দাস, রেভাঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সে-যুগের বহু বিখ্যাত ব্যক্তি ইহার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। লীগ অল্প দিন মাত্র স্থায়ী হয়। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'এই অল্পদিনের মধ্যেই ইহা দেশের মঙ্গলকর কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছিল।' ১৮৭৬ সনে কলিকাতা করপোরেশন সংক্রান্ত যে নূতন আইন বিধিবদ্ধ হয়, তাহার মূলে ইণ্ডিয়ান লীগ তথা শিশিরকুমার ঘোষের অনেকখানি হাত ছিল। এই আইনবলে সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা করপোরেশনে সাধারণ নির্ব্বাচন-প্রথা অনুসৃত হয়। পাছে সাধারণ লোক ভোটাধিকার প্রাপ্ত হইয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করে এই ভয়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ইহার বিরোধিতা করে। শিশির কুমারের কর্ম্মনৈপুণ্যে এসোসিয়েশনের এই বিরোধিতা ব্যাহত হয় ও কলিকাতায় প্রতিনিধিমূলক স্বায়ত্তশাসনের সূচনা হয়।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত-সভার স্থাপনা কাল ১৮৭৬, ২৬শে জুলাই। আনন্দমোহন বসু, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ভারতবাসী জনসাধারণকে রাজনীতিক শিক্ষা দান, সরকারী বিধিসমূহের আলোচনা, অমঙ্গলকর আইনসমূহের বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী আন্দোলন পরিচালনা ভারত-সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 'হিন্দু ব্যবস্থা দর্পণ' প্রণেতা শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় ইহার প্রথম সভাপতি, আনন্দমোহন বসু প্রথম সম্পাদক ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রথম সহকারী সম্পাদক। প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, রাজনারায়ণ বসু, দুর্গামোহন দাস, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিগণ ইহার কার্য্যকরী সভ্য হন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস্ পদ হইতে অপসারিত হওয়ায় সরকারের সুনজরে ছিলেন না। এই জন্য, সভার কার্য্যে আরম্ভেই কোন রকম বিঘ্ন ঘটিতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া কর্ম্মকর্ত্তৃ-সভার কোন পদ তিনি

গ্রহণ করেন নাই। তবে তিনিই ছিলেন ভারত-সভার অন্যতম প্রধান কর্ম্মী। ইণ্ডিয়ান নেশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেকার দশ বৎসরে ভারত-সভাই সমগ্র ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনে অগ্রসর হন। সুরেন্দ্রনাথের ভারত-পরিক্রমা উত্তর ও দক্ষিণের অধিবাসীদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনার উন্মেষে বিশেষ সহায়তা করে। উত্তর-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভারত-সভার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দশ বৎসরে ভারত-সভার প্রধান কার্য্য ছিল—(১) বিলাতে আই-সি-এস্ পরীক্ষার প্রার্থীদের উচ্চতম বয়স যে উনিশ বৎসরে কমান হয় তাহার বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতব্যাপী আন্দোলন, মিউনিসিপালিটি ও বোর্ডগুলিতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা, ভূমিতে প্রজার স্বত্ব নিরূপণ, খোলা ভাটি প্রথার উচ্ছেদ সাধন, আসাম চা-বাগিচার শ্রমিকদের দুরবস্থা দূরীকরণ। ১৮৮৫ সনে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই গবর্ণমেণ্ট ইহার কোন কোন বিষয়ে (যেমন, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, ভূমি-স্বত্ব নিরূপণ প্রভৃতি) ভারতবাসীদের তুষ্টি বিধানের জন্য আইন প্রণয়নে মনোযোগী হন। আবার কোন কোন বিষয়ে কংগ্রেস আন্দোলন সুরু করিলে তবে গবর্ণমেণ্ট সে-সব সম্বন্ধে বিবেচনা করা সমীচীন মনে করিয়াছিলেন। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন,—

"আজ [১৯১০] কংগ্রেস সমগ্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় শক্তিকে সংহত করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছে, চৌত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ভারত-সভাই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বপ্রথমে সেই চেষ্টার সূত্রপাত করে।"*

* চরিত-কথা, পৃ. ৫২।

ভারত-সভা প্রতিষ্ঠার প্রায় দশ বৎসর পরে নেশনাল কংগ্রেসের আরম্ভ।

পরিশিষ্ট

সম্প্রতি 'দেশহিতার্থী সভা' (The National Association) নামে ইংরেজী ১৮৫১ সনে প্রতিষ্ঠিত একটি রাজনীতিক সভার সন্ধান পাইয়াছি। নামে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান হইতে স্বতন্ত্র বটে, তবে বস্তুতঃ ইহাই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসেসিয়েশন কি-না এখনও অনুসন্ধান-সাপেক্ষ। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত ১৮৫১, ১৩ই ডিসেম্বরের 'সমাচার দর্পণে' ইহার একটি বিদ্রূপাত্মক বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই বিবরণটি হইতে আবশ্যক অংশ এখানে দিলাম,—

"পূর্ব্বে দেশহিতার্থী সভার বৃত্তান্ত দর্পণে প্রকাশ হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় এই এতদ্দেশীয় লোকেরা গবর্ণমেণ্ট ও ইঙ্গলণ্ড দেশীয় পার্লিমেণ্টের নিকটে আপনারদের অভীষ্ট ও অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। অধুনা উক্ত সভার অভিপ্রায় ও স্থাপনের নিয়ম এবং কার্য্যের বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিদ্বক্তব্য। ঐ সভা স্থাপক মহাশয়েরদের প্রকাশিত অভিপ্রায় প্রশংস্য বটে সভাস্থ মহাশয়েরা এতদ্দেশীয় লোকেরদের মুখস্বরূপ হইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন তাহাতে রাজস্বদায়ি ব্যক্তিরা আপনারদের যেমত প্রকাশ করিতে অক্ষম তাহা তাঁহারা প্রকাশ করিবেন। পরন্তু দৃষ্ট হইতেছে যে তাঁহারা কেবল জমীদারদের প্রতি হিতৈষিতা প্রকাশ করিতেছেন যেহেতুক উক্ত সভাতে কোন প্রজা-লোকের সমাগম হয় না এবং হওনেরও কোন লক্ষণ দেখা যায় না। বিশেষতঃ গোপাল চাসা উক্ত সম্ভ্রান্ত সভায় উপস্থিত হইয়া যদি সর্ব্ব বিষয়ে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করে তবে উপহাসেরই পাত্র হইত।"

রবীন্দ্র-দৈনিকী

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ এখনো অসুস্থ। কিন্তু তাঁর মন পূর্বের মতই সক্রীয়। ভাব এবং রস নিয়ে তাঁর কারবার। এই কারবারে যেমন এক দিক দিয়ে তিনি বিশ্বকে দিয়েছেন অমূল্য উপহার তেমনি দিয়েছেন ছোট ছোট ছড়া চার দিকে ছড়িয়ে যেগুলি শিশিরকণার মতন উজ্জ্বল, যার ঝকঝকানিতে ঝিলিক দেয় রবীন্দ্রপ্রতিভা বিচিত্র রশ্মিতে। যদি কোনো সময়ে এগুলিকে গুছিয়ে মালা গাঁথা যায় তবে তা মণিমালার মতই হবে সুন্দর এবং মোহন। রবীন্দ্রনাথের রোগ-কক্ষ তাঁর হাল্কাভাব-পুতুলখেলার ঘর। অবসরের বেলা কাটে তাঁর রঙ-বেরঙি ভাবের পুতুল নিয়ে খেলায়, সে-খেলায় আশি বছরের বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের আনন্দ তাঁর একার নয়, সে-আনন্দ তাঁদের সকলের যাঁরা থাকেন তাঁর আশেপাশে। তাঁর ভাব পুতুলের এই সব খেলনাগুলি যার যখন ঘটে সুযোগ সে-ই নেয় কুড়িয়ে, রাখে তুলে যত্নে। সেই সব কুড়িয়ে-নেওয়া খেলনার কয়েকটি এই ছোট নিবন্ধে সাজিয়ে দিলাম।

তোমার বাড়ি

ঐ দেখা যায় তোমার বাড়ি
　　চৌদিকে মালঞ্চ ঘেরা;
অনেক ফুল তো ফোটে সেথায়
　　একটি ফুল সে সবার সেরা।
নানা দেশের নানা পাখি
করে হেথায় ডাকাডাকি
একটি সুর যে মর্মে বাজে
　　যতই গাহুক বিহঙ্গেরা।
যাতায়াতের পথের পাশে
কেহ বা যায় কেহ আসে,
বারেক যে জন বসে হেথায়
　তার কভু আর হয় না ফেরা।
কেউ বা এসে চা করে পান,
　গ্রামোফোনে কেউ শোনে গান,
　অকারণে যারা আসে
　ধন্য যে সেই রসিকেরা। ১৩।১২।৪০

এইটি একটি ছোট্ট গানের সুরে রাঙা পরিহাস, এর উপলক্ষ্য তাঁর পরম স্নেহের পাত্রী, নাতনী নন্দিতা। বৃদ্ধ দাদামহাশয়ের সেবাশুশ্রূষার অধিকাংশ কর্তব্যের ভার তিনি নিয়েছেন পরমানন্দে। এর মধ্যে লক্ষ্য করবার প্রধান বিষয় রোগ-গৃহের মধ্যে ওষুধ-বিষুধের বিশ্রী ভাব ও স্বাদের এক পাণ্টা জবাব, তীব্ররসপূর্ণ শিশি-বোতলের রাজ্যে এ ছড়াগুলি সুমধুর রস-বর্ষণের ধারা। একেই বলে রবীন্দ্রনাথের রোগগৃহের বিশেষত্ব। এই কবিতাটির প্রথম লাইন সুপরিচিত একটি পুরাতন গান অবলম্বনে রচিত। ঐটুকুকে অবলম্বন করেই এই রসের সৃষ্টি।

হারাম

কখনো সাজায় ধূপ
　　কখনো বা মাল্য,
গ্ল্যাক্সো-ধারায় মনে
　　এনে দেয় বাল্য।
সরিষার তেলে দেহ
　　দেয় কসে' মাজিয়া
নিয়মের ত্রুটি হলে
　　করে ঘোর কাজিয়া,
কোথা হতে নেমে আসে
　　বকুনির ঝাঁক তার,
তর্জনী তুলে বলে
　　ডেকে দেব ডাক্তার।
এই মতো বসে আছি
　　আরামে ও ব্যারামে,
যেন বোগদাদে কোন্
　　নবাবের হারামে। ১৫।১২।৪০

এটি একটি পরিহাস-রস-টুকরো, নাতনী নন্দিতার উদ্দেশে মুখে মুখে বলে যাওয়া ছড়া। এই ছড়াই ছড়া-তৈরীর কারণকে পুরাপুরি ব্যক্ত করে। নাতনীও যখন দেখেন বৃদ্ধ দাদামশায় রোগীর পালনীয় কোনো

নিয়মের হেরফের করবার জন্য জিদ ধরে বসেছেন, তখন তিনিও কিঞ্চিৎ জবরদস্তি করবার চেষ্টা করেন, তাতেও যখন রোগীকে বাগ মানানো দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে তখন বাধ্য হয়েই তিনি ডাক্তারের দোহাই পাড়েন। ১২।১২।৪০ তারিখের কথা। সকালবেলা উভয়ে যখন কথা কাটাকাটি চলছিল সে-সময় কাছে উপস্থিত ছিলাম। আমার দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "আচ্ছা একে কী বলে বল তো?" আমি বললাম, "এ-রকম ঝগড়াকে দাদামশায় আর নাত্‌নীর কলহ ব্যতীত আর কী বলা চলে?" কবি হেসে বললেন, "ঠিক, এই কথাই বলছ।" সেইদিনই প্রত্যূষে রবীন্দ্রনাথ মনে মনে কতগুলি ধাঁধা-জাতীয় প্রশ্ন করে আমাদের বেশ হাসিয়েছিলেন। প্রথমেই প্রশ্ন করলেন "আচ্ছা বল দেখি, সামাজিক কোন্ ক্রিয়া থেকে কী বাদ পড়লে সবটা একেবারে বরবাদ হয়।" অনেকে অনেক রকম জবাব দিলেন কিন্তু কোনটাই ঠিক জবাব হ'ল না। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন "ঠকিয়েছি। সামাজিক একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে বিয়ের অনুষ্ঠান, ঐ অনুষ্ঠান থেকে বর বাদ দিলে সবটাই বরবাদ হয় কিনা বল?" এই জবাবে আমরা সবাই হেসে উঠলুম। তারপর তিনি ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে বললেন, "এখানে কোথায় বাঁদর আছে দেখাও তো?" অবশ্য গৃহে মর্কটজাতীয় কোন জন্তুই ছিল না। যখন কবি দেখলেন আমাদের মধ্যে কেউ জবাব দিচ্ছে না, তিনি ঘরের দুটি দরজার মধ্যে যেটি তাঁর বাঁ দিকের দোর সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন "এটিকে বাঁদোর বলবে তো?" ঘরে উঠল আবার হাসির শব্দ। সেদিন সকালটা কাটল এমনি হাসাহাসিতে।

সুস্থ থাকলে অনেক সময়েই রবীন্দ্রনাথ খুব সকালেই গান, কবিতা ইত্যাদি লেখেন। লেখার কাজ শেষ হলেই ডাক পড়ে সেই পূর্ববঙ্গীয় ব্যক্তিটির, যিনি কবি সুধীরচন্দ্র কর ব'লে পরিচিত। ইনি রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনার রক্ষক। এঁর কাছে সযত্নে থাকে সব জমা। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশক্রমে ঐ তহবিল থেকে গান কবিতা খরচের হিসেবে চলে যায়, এক-একটি কাগজে, পাঠকসমাজের কাছে। এক্ষেত্রে একটু বলে রাখা ভালো যে, এই হিসাবী ভাণ্ডারী এই জমা-খরচের কারবারে জমার অঙ্কে রসসামগ্রীর ঘাটতি পড়লেই, অমনি কবিকে তাগিদ দিয়ে জমার ঘরে নূতন রচনা সংগ্রহ করে নেন। এঁর উদ্দেশেই "বাঙাল" শীর্ষক ছড়াটি রবীন্দ্রনাথ তৈরী করেছিলেন যা ইতিপূর্বে "দেশ" পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য সেটি এখানে উদ্ধৃত করি।

বাঙাল যখন আসে
মোর গৃহদ্বারে,
নূতন লেখার দাবী
লয়ে বারে বারে ;
আমি তারে হেঁকে বলি
সরোষ গলায়—
শেষ দাঁড়ি টানিয়াছি
কাব্যের কলায়।
মনে মনে হাসে,
তবুও সে ফিরে ফিরে আসে।
তারপর এ কী?
সকালে উঠিয়া দেখি
নির্লজ্জ লাইনগুলো যত
বাহির হইয়া আসে গুহা হতে নির্ঝরের মতো।
পশ্চিম-বঙ্গের কবি দেখিলাম মোর
বাঙালের মতো নাই জেদের অপ্রতিহত জোর।

২রা ডিসেম্বর, ১৯৪০

১৬।১২।৪০ তারিখের কথা, এঁকে উদ্দেশ ক'রেই মুখে মুখে ছড়া তৈরী হ'ল,

সুধীর বাঙাল গেল কোথায়
সুধীর বাঙাল কৈ?
সাতটা থেকে আমার মুখে
নেই কথা এই বৈ।

ঐদিন সকালবেলা একটা গান তৈরী করেন এবং দুর্বল কম্পিত হাতেই কোনো রকমে সেটি তাঁর খাতায় লিখে ফেললেন। সেটির একটি প্রতিলিপি করার দরকার অনুভব হওয়ায় সুধীরবাবুর খোঁজ পড়েছিল। ডাকা মাত্র তাঁকে পাওয়া যায় নি, কার্য্যান্তরে তিনি ছিলেন অন্যত্র। এই না-পাওয়াকে উপলক্ষ করে তৈরী হ'ল চার লাইনের ছড়া মুখে মুখে। সামনে ছিলাম আমি, তাঁর মুখের কথাকে তুলে নিলেম কাগজে, লিপির শৃঙ্খলে দিলেম তাকে বেঁধে। তাঁর অনেক এই রকমের ছড়িয়ে দেওয়া রস-সামগ্রীকে সুযোগ পেলেই কুড়িয়ে তুলে নিই, কিন্তু রাখি না বাক্সে বন্দী করে, দিই রবীন্দ্র-ভক্ত পাঠকসমাজে সাহিত্যের আসরে পরিবেশন করে, যেমন করে পরিবেশন করে দিলুম আজকে সেই সব ছড়া। এটা আমার উঞ্ছবৃত্তি।

রবীন্দ্রনাথের 'তিন সঙ্গী'*

শ্রীপরিমল গোস্বামী

আধুনিক বাংলা গল্পসাহিত্যের পটভূমি খুঁজতে গেলে রবীন্দ্রনাথকেই স্মরণ করা ছাড়া উপায় নেই। অর্থাৎ তুলনার কথা উঠলে রবীন্দ্রোত্তর গল্পসাহিত্যের কথাই তুলতে হয়। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা গল্প বিশুদ্ধ গল্প হিসাবে একটা অপূর্বতা লাভ করেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ গল্পে আমরা যে-সব শিক্ষিত নরনারীর দেখা পাই তাদের সুমার্জিত রূপটি আজও পর্যন্ত কেউ ঠিকমতো ফোটাতে পারেন নি—এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া। শিক্ষিত বা সংস্কৃতিসম্পন্ন ব'লে যাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় তাদের কথায় বা ব্যবহারে শিক্ষা বা সংস্কৃতির উজ্জ্বল রূপটি থাকে না। হৃদয়ের সঙ্গেই তারা বেশি সম্পর্কিত, চিত্তের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কম। এই হৃদয় হচ্ছে হৃদয়-প্রবণতা। সংকীর্ণ ক্ষেত্রে তাদের মানসিক আবেগমাত্র প্রকাশ পায়। তাদের পৌরুষ এই হৃদয়-প্রবণতার অতি দুর্বল। তাদের কথা শস্তা ভাবোচ্ছ্বাসের বাহন। দুজন শিক্ষিত লোকের দেখা হ'লে তারা এমন একটি কথা বলে না যার মধ্যে চিত্তপ্রকর্ষের কিছুমাত্র আভাস ফুটে ওঠে। তাদের কথায় এমন সৌন্দর্য থাকে না যা তাদের মার্জিত বুদ্ধি রুচি এবং রসের পরিচয় বহন করে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশেই সে-রকম শিক্ষাদীপ্ত চরিত্র অত্যন্ত বিরল। আদৌ আছে কি না সেই বিষয়েই সন্দেহ হয়। আর তারা যে শুধু বাইরে বিরল তাই নয়, লেখকের কল্পনাতেও তাদের স্থানাভাব। আধুনিক বাংলা গল্প-লেখকের এইটেই হচ্ছে ট্র্যাজেডি। এর মানে অবশ্য এ নয় যে নায়ক-নায়িকা সাধারণ কথা না ব'লে সর্বদা বড় বড় পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দেবে। এ সম্পর্কে পাণ্ডিত্যের কথাটাই ত্যাজ্য। সাধারণ কথা তাদের মুখে অত্যন্ত সাধারণের কথার সীমা ছাড়াতে পারে না এইটেই পরিতাপের। অ্যাকাডেমিক আলোচনা হয় তো তারা করতে পারে, কিন্তু তার বাইরে এলেই তাদের কথার এমন চেহারা দাঁড়ায় যাকে বলা যায় ভাল্‌গার। তার কারণ হচ্ছে তাদের মানসিক বৃত্তি এবং প্রবৃত্তিগুলোকে তারা শিক্ষালব্ধ সৌন্দর্যের রসে রসায়িত ক'রে প্রকাশ করতে শেখে নি। এক কথায় তারা অ্যাকাডেমিক শিক্ষাকে জীবনের অলংকার করতে পারে নি। যে শিক্ষা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলে সেই শিক্ষা আমাদের দেশে দুর্লভ। অর্থাৎ কাল্‌চার দুর্লভ।

এই কাল্‌চারের রূপ কি হওয়া উচিত তার একটি পরিকল্পনা আছে রবীন্দ্রনাথের মনে। বুদ্ধিদীপ্ত সুমার্জিতরুচি শিক্ষিত তরুণ-তরুণী কি রকম দেখতে তা একমাত্র তিনিই তাঁর গল্পের ভিতর দিয়ে আমাদের দেখিয়েছেন। গল্পরচনায় এই জাতীয় চরিত্রসৃষ্টি অপরিহার্য এমন কথা কেউ বলবে না, আমি শুধু আমাদের গল্পে এর অভাবের কথাটা উল্লেখ করছি।

গল্পের এক অঙ্গ প্লট, আর এক অঙ্গ ভাষা। ভাষা হচ্ছে প্রকাশ-রূপ অর্থাৎ গল্পের প্রাণ। গল্প যখন রচনা হিসাবে আর্টের সীমানায় পৌঁছয় তখনই ভাষার একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি আমরা দাবী করি। গল্পের ক্ষেত্রে লেখকেরা আমাদের এই দাবী মিটিয়ে চলেন দুভাবে। এক শ্রেণীর লেখক গল্পের মাঝখানে আর আমাদের বিশ্রামের সুযোগ দেন না, দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যান গল্পের পরিণতির দিকে। তাঁদের ভাষা সরল রেখায় চলে—ভাষা তাঁদের গৌণ। আর এক শ্রেণীর লেখক গল্পের পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার পথে প্রতি মুহূর্তে আমাদের উপভোগের আয়োজন ক'রে দেন। পড়বার সময় আমাদের মন এবং বুদ্ধি একসঙ্গে সজাগ হ'য়ে ওঠে। এঁদের ভাষার গতি জ্যামিতিক নয়—শিল্পের বিশেষ রীতিতে তরঙ্গায়িত। এই শ্রেণীর লেখক রবীন্দ্রনাথ একা, অর্থাৎ তিনি একাই এই শ্রেণী রচনা করেছেন। তিনি তাঁর গল্পের সম্পূর্ণতার বাইরেও আমাদের আনন্দ দেন—এই অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর একারই আছে বাংলা গল্পলেখকদের মধ্যে। রসসৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি শুধু গল্পের পরিণতির জন্যেই অপেক্ষা করেন না। গল্প যে মুহূর্ত থেকে আরম্ভ হ'ল, সেই মুহূর্ত থেকে তাঁর প্রকাশ-ভঙ্গি একটা অপূর্ব দীপ্তিবিকিরণকারী ক্ষমতালাভ করে। এতে গল্পের গতি কিছুমাত্র শিথিল না হয়েও গল্প দুদিক দিয়ে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। কাজেই প্লটের দিক দিয়ে গল্প শেষ হ'লেও রসের দিক দিয়ে শেষ হয় না। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের গল্প একবার পড়ে পরিণতি কি হ'ল জানলেই গল্প পড়া শেষ হয় না। বার-বার পড়তে ইচ্ছা করে। তার যেন একটা ছন্দ আছে, একটা সুর আছে, মনকে তা অধিকার করে থাকে—সেই ছন্দ, সুর, মনের মধ্যে গুঞ্জন ক'রে ফেরে।

যে-জিনিসটি ছোটগল্পের পক্ষে অনাবশ্যক বলে পরিহার করা আধুনিক লেখকের সংস্কার সেই জিনিসটি আধুনিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রকাশরূপের পক্ষে অপরিহার্য ক'রে তোলেন। তাঁর গল্পের চরিত্রগুলোকেও তিনি অসাধারণত্ব দান করেন। তাদের কারোই যাত্রা মধ্যপথে নয়। বুদ্ধির পথেও চরম, হৃদয়ের পথেও চরম। ট্র্যাজিক চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর একটা স্বকীয়তা আছে। তাঁর

---

* রবীন্দ্রনাথের আধুনিক তিনটি গল্পের সমষ্টি। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ, পৌষ, ১৩৪৭। মূল্য কাগজের মলাট দেড় টাকা, কাপড়ে বাঁধাই দুই টাকা।

প্রতিপক্ষ চরিত্র কোথাও দুর্বল নয়। দুদিকেই তাঁর নিরপেক্ষতা। 'তিন সঙ্গী' সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে এইটুকু ভূমিকার প্রয়োজন হ'ল।

'রবিবার' নামক গল্পের অভীক অসাধারণ। বুদ্ধির পথে সে জীবনের সার্থকতা খুঁজতে বেরিয়েছিল। এবং সেটা সুবুদ্ধি নয়। হৃদয় ছিল তার কাছে গৌণ। সেটা ছিল অন্তরালে। বুদ্ধির কঠিন আবরণে হৃদয়ের তারল্যকে সে একেবারে মুড়ে রেখেছিল—ছাড়া পেত না কোন দিকে। যে উত্তাপে অন্তর্নিহিত তরল বস্তুটি আবরণ বিদীর্ণ ক'রে বেরিয়ে আসতে পারত সেই উত্তাপ তার হৃদয়ে লাগে নি কোন দিন। বাইরে তার ছিল বোহেমিয়ান-বৃত্তি—আর সেটা বেশির ভাগই 'বেহায়া-মিয়ান'। পৈত্রিক বিষয়বুদ্ধি আর আচারনিষ্ঠা এই দুই বিষয়ের যৌগিক মিলনে তার চরিত্রকে এই দুইয়ের বহু ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়েছিল। সে ছিল সকল সামাজিক রীতির বাইরে। পাপকে গঙ্গাজলে ধুয়ে ফেলার দলে সে ছিল না। তার একটিমাত্র সাধনা ছিল—সেখানে সে ছিল স্রষ্টা, সে ছিল শিল্পী। এই শিল্পের সম্পর্কে তার একটি বিশেষ প্রকাশ দেখি বটে, কিন্তু তার শিল্পের সঙ্গে তার জীবনের লেশমাত্র পার্থক্য ছিল না। কাজেই নিজের বাইরে তার আকর্ষণ ছিল কম। একটি ব্যক্তি উগ্র ব্যক্তিত্বের জন্যে যখন কোন দিকেই কোন বাঁধন মানে না, জীবনে ধ্রুব ব'লে কিছুকে স্বীকার করে না তখন সেই ব্যক্তিই হয় নৈর্ব্যক্তিক। অভীককেও বলা চলে নৈর্ব্যক্তিক। তার শিল্প যেমন সাধারণের প্রশংসা পাবার জন্তে নয়—তার জীবনটা তাই। দুটোই ছিল প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম অর্থাৎ সৃষ্টি-ছাড়া। অভীকের আশা ছিল ভবিষ্যৎ কালে কোন দিন অকস্মাৎ কোন গুণী তার শিল্পের মূল্য দেবে। তার জীবন-শিল্পের মূল্য কিন্তু সে সমসাময়িক কালের হাতেই পেতে চেয়েছিল—বিভার মারফৎ। কিন্তু বিভা যেমন অভীকের চিত্রশিল্পের সমঝদার নয়, তেমনি সে তার জীবন-শিল্পেরও সমঝদার নয়। তা ছাড়া তার পিছনে ছিল তার পিতার ইচ্ছার ছায়া। সেই ছায়া থেকে জোর ক'রে উগ্র আলোয় বেরিয়ে এসে জীবনের মূল্যে জীবন কিনবে সে সাধনা বিভার নয়। সেটা হয়তো বিভার পক্ষে ভালই। বিভা নারীজাতির প্রতিনিধি। তার কাজ হচ্ছে কেন্দ্রচ্যুত না হওয়া। তা হ'লে আর সে পুরুষকে টানতে পারবে না। পুরুষমাত্রেই হচ্ছে অভীকধর্মী—অভীক পুরুষের চরম সংস্করণ। তাকে টানায় বিপদ আছে। তাছাড়া নারীর সঙ্গে মিলনের জন্তে পুরুষকে যে-পরিমাণে নেমে আসতে হয় অভীক সেজন্তে প্রস্তুত ছিল না। তার বিশ্বাস ছিল বিভা উপরে উঠে এসে তাকে আবিষ্কার করবে। কিন্তু সেটা যে তার ভুল বিশ্বাস সে-কথাটা সে পরে বুঝতে পেরেছিল। তাই সে শেষ পর্যন্ত ভালোবাসার বৃহত্তর পটভূমিতে মিলন কামনা করতে পারল। কাছে থেকে সে বুদ্ধির যে-বাধা অনুভব করেছিল, দূরে যেতে সে-বাধা গেল কেটে, অভীক পেল বিভাকে সম্পূর্ণ ক'রে, সত্য ক'রে। চেতনার মধ্যে, উপলব্ধির মধ্যে পাওয়াই সত্য পাওয়া। বিভার কাছে সে রেখে গেল তার ছবি। তার বিশ্বাস ছিল সে দূরে গেলে এ-ছবির দীপ্তি এক দিন হঠাৎ ঝলকিত হয়ে উঠবে বিভার মনের মধ্যে।

এই ছবিই অভীকের সত্তা।

গল্পটি বাইরের কোনো ঘটনার মধ্যে শেষ নয়। এর পরিণতি অভীকের বেদনাময় উপলব্ধির মধ্যে। এই বেদনাকে সে যতদিন সত্য ব'লে মানে নি, যতদিন এড়িয়ে গেছে, ততদিন সে নিজেকেই খুঁজে পায় নি। নিজের জীবনকে নিয়ে সে যে-ছবি এঁকেছিল তার পটভূমিতে এই সত্যবস্তুটির অভাব ছিল।

'শেষ কথা' গল্পটি অন্য দুটো গল্পের মধ্যবর্তী হয়েও মধ্যপন্থী নয়, একেবারে স্বতন্ত্র। প্রথম থেকেই এর সুর জমে উঠেছে। সমস্ত গল্পটি যেন কাব্য-প্রেরণা থেকে জন্মলাভ করেছে। 'রবিবার' গল্পের আরম্ভে আছে ভূমিকার পাহাড়। আস্তে আস্তে আমরা সেখানে উঠেছি। পৌঁছেছি শুভ্র তুষারমণ্ডিত শিখরে হঠাৎ এক মুহূর্তে সূর্যের আলো লেগে সে তুষার যেন জ্বলে উঠল। তারপর চিত্তবিভ্রান্তকারী বর্ণের ছটা। সূর্যের আলো নিয়ে এল উত্তাপ। উত্তাপে গলতে লাগল তুষার। তখন জাগল প্রাণের সাড়া। তুষার চলতে লাগল। দুর্বার বেগ লাগল তার চলায়। পাষাণের বাধা কেটে বেরিয়ে এল স্রোত, বহু আঘাতের পথ উত্তীর্ণ হয়ে মিশল গিয়ে মহাসমুদ্রে। একটা বিরাট আবর্তনের ইতিহাস। কিন্তু 'শেষ কথা'র শুরু ও শেষ সমতল ভূমিতে। 'রবিবারে' পাঠকের ভাগে ছিল আরোহণ-পর্ব, 'শেষকথা'র আছে অবরোহণ-পর্ব। গল্পটি যে-স্তরে চলাফেরা করেছে সেই স্তর খুঁড়ে নীচে নামতে হবে। স্তরটি বেশি পুরু নয়—একটুখানি খুঁড়লেই অতলস্পর্শী ঐশ্বর্য। প্রকৃতি বহু-বর্ণের ছটায় তাকে লুকিয়ে রেখেছে নিজের অন্তরতম প্রদেশে।

'শেষ কথা' সহজ গল্প। একটিমাত্র কথার ভিতরে, একটি অতি-চঞ্চল মুহূর্তের মধ্যে তার ক্লাইম্যাক্স।

বর্ষার নদী যেখানে অতি গভীর, উচ্ছ্বাস সেখানে নেই বললেই চলে। অতি-আলোড়ন নেই—আছে শুধু নীরব আবর্ত। অচিরার মনে যে গভীর বেদনার সমুদ্র ছিল

বাইরে থেকে তা বোঝা যায় নি। মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে যে বৈজ্ঞানিক ভূগর্ভস্থ গুপ্তধন খুঁজে বেড়াচ্ছে, ভাগ্যবিড়ম্বনায় সে শুরু করলে মানুষের মন খোঁড়ার কাজ। আশা ছিল মন-ভরানো রত্ন মিলবে। মাটির কার্পণ্য ঘোচাবে মানুষের দাক্ষিণ্য। শূন্য ভাণ্ডার হবে পূর্ণ। চেষ্টা তার সফল হ'ল, পেল সে ঐশ্বর্য, কিন্তু ভোগ করা চলল না। বুঝতে পারল তা তার স্পর্শের অতীত। এই আবিষ্কার তার বৈজ্ঞানিক জীবনের এক মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি। কিন্তু অচিরা মনের ক্ষেত্রে বড় বৈজ্ঞানিক। সে কিন্তু বাইরে থেকেই নবীনমাধবকে আবিষ্কার করতে পেরেছিল।

এক দিকে ব্যক্তিত্বহীন ভালবাসার আদর্শ আর এক দিকে ব্যক্তিত্বহীন জ্ঞানের তপস্যা। নিজের পথ ছেড়ে কারো চলবার উপায় নেই। তপস্বী অচিরার এই ব্যবস্থা। ভালোবাসার আদর্শ যে তার কাছে সত্যবস্তু, সেই আদর্শে পৌঁছনোর জন্যে কোনো ব্যক্তিকে আর প্রয়োজন নেই। এর জন্যে দুঃখের রুক্ষ পথে তাকে যাত্রা করতে হয়েছে—কিন্তু সেটা স্বেচ্ছাকৃত ব'লেই দুঃখের দহন তাকে দুর্বল করে নি—করেছে তাকে মহৎ।

নবীনমাধবের মনেও একটা আদর্শ ছিল। তার বৈজ্ঞানিক শিক্ষা আর মানসিক চর্যার মধ্যে বিরোধ ছিল না। সেই জন্যেই তার পক্ষে এত বড় ট্র্যাজেডিটা নীরবে মেনে নেওয়া সম্ভব হ'ল। অচিরার সম্পূর্ণ পরিচয় পেয়ে সে আত্মহত্যা করতে গেল না—অচিরার জীবনদর্শনের প্রতি সে শ্রদ্ধায় নত হ'ল। যে-শক্তি থাকলে এটা সম্ভব হয় সে-শক্তি ছিল নবীনমাধবের মনে।

এই দুই ব্যক্তির পটভূমি রচনা করেছে শুধু অরণ্যপ্রকৃতি নয়—তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে বৃদ্ধ প্রফেসর। সেও প্রকৃতির মতোই সরল, উদার এবং বিস্তীর্ণ। এই বৃদ্ধের ট্র্যাজেডি জড়িয়ে আছে অচিরার ট্র্যাজেডির সঙ্গে। এই বৃদ্ধকে কেউ আড়াল করতে পারে নি, না নবীনমাধব না অচিরা। এই বৃদ্ধও কাউকে আড়াল করে নি। চরিত্রগুলো একটা অনির্বচনীয় মহিমা লাভ করেছে এই গল্পটির ভিতর। এত বড় ট্র্যাজেডি অথচ গোড়া থেকে সবটাই প্রায় প্রচ্ছন্ন। সরল কথাবার্তা আর ঘটনার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ গল্পের চরম মুহূর্তটি কখন এসে পড়ল, তার জন্যে আগে থেকে প্রস্তুত থাকা প্রায় অসম্ভব ছিল। এল এমন অনিবার্য রূপে! মনের উপর অকস্মাৎ যেন বেদনার আঘাত মেরে একটা প্রকাণ্ড নিশাচর পাখী শূন্যে মিলিয়ে গেল। অপূর্ব রচনাকৌশল! বাংলা ভাষার এ-রকম উঁচু সুরে বাঁধা নরনারীর চরিত্রসৃষ্টি একমাত্র রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই সম্ভব। এত অল্প আয়োজনে, এমন অনায়াসভঙ্গিতে একটা বিরাট দুঃখের ইতিহাস—অথচ কোথায়ও কোনো অভাব বোধ হ'ল না, না ঘটনার, না ঘটনা-মধ্যবর্তী অংশের!

'ল্যাবরেটরি' গল্পটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। ল্যাবরেটরির আবহাওয়ায় কতকগুলো মানবচরিত্র নিয়ে লেখক স্বয়ং বৈজ্ঞানিকের খেলা খেলেছেন। তিনি এই গল্পের নরনারীকে নিয়ে ল্যাবরেটরিতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করেছেন। আচারহীন পাত্রে বুদ্ধি, আচারের সংকীর্ণ পাত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আর বিজ্ঞানের পাত্রে তরল চরিত্র ঢেলে নীচে জ্বালিয়ে দিয়েছেন বুন্‌সেন বার্ণার। ফুটন্ত চরিত্রগুলোকে একসঙ্গে মেশানো হ'ল। রাসায়নিক বস্তুগুলি পরস্পর পরস্পরকে কেবল আঘাত করতে লাগল, মিলতে পারল না।

প্রত্যেকটি চরিত্র অতি প্রখর ভাবে জীবন্ত কিন্তু অতি নিষ্ঠুর ভাবে ট্র্যাজিক। তারা পরস্পরকে কেবল অপমান ক'রে চলেছে। লেখক এদের উপর বিদ্রূপ বর্ষণ করেছেন অযাচিত ভাবে। এই বিদ্রূপ শিক্ষার আবরণযুক্ত কালচারহীন নরনারীর প্রতি। লেখককে নিষ্ঠুর হ'তে হয়েছে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। সবগুলো চরিত্রই এখানে মিলেছে হয় বিশুদ্ধ বিষয়-বুদ্ধির ক্ষেত্রে না-হয় বিশুদ্ধ স্বার্থের ক্ষেত্রে। মাঝে মাঝে আচার-নিষ্ঠার বুলি থাকলেও কারো মনকেই কোনো আদর্শ টেনে রাখতে পারে নি। শিক্ষা জীবনের অলংকার না হ'লে শিক্ষা হয় ব্যর্থ। এই ময়্যালটা গল্পের কোথাও ব্যক্ত নয় প্রচ্ছন্ন আছে। তা বোঝা যায় এই থেকে যে এই চরিত্রগুলো গল্পহিসাবে বাস্তব হ'লেও মানুষ হিসাবে মহৎ নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত প্রকৃষ্টচিত্ত নর-নারীকে সকল ক্ষেত্রেই মহৎ ক'রে তুলেছেন। তারা জীবনের সকল অবস্থাতেই শ্রদ্ধেয়। জ্ঞানের পথেই হোক বা হৃদয়ের পথেই হোক চলার পথ তারা যেন আলোকিত ক'রে তোলে। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের যে-সব চরিত্র অমর হ'য়ে আছে তারা ফুটে উঠেছে দুঃখের পটভূমিতে। এই দুঃখ হতভাগ্যের আর অসহায়ের দুঃখ নয়—দুঃখ তাদের জয়যাত্রার পাথেয়। দুঃখকে তারা স্বেচ্ছায় মেনে নেয় ব'লেই দুঃখকে তারা অতিক্রম ক'রে পূর্ণ মনুষ্যত্বের আকাশে মাথা তুলে দাঁড়ায়। তাই 'ল্যাবরেটরি' যখন পড়ি তখন তার মধ্যেকার চরিত্রগুলো গল্পের বিচারে সফলতা লাভ করায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উগ্র ভাবেই কিন্তু কোন মতেই আমাদের মনে অনুকম্পা জাগায় না। মানবজীবনের পূর্ণ চাঞ্চল্য নিয়েও তারা যেন মনুষ্যত্বের বিকার। একমাত্র রেবতীর মধ্যে কিছু সম্ভাবনা ছিল কিন্তু সে অভীক নয়। সে তৃণখণ্ড মাত্র। স্রোতে ঘুরপাক খেয়ে ভেসে বেড়াল এবং শেষ পর্যন্ত পিসিমা-রূপ অতীত যুগের অতি-পরিচিত খোলসে গা ঢাকা দিয়ে বেঁচে গেল।

গান্ধি মহারাজ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান্ধি মহারাজের শিষ্য
কেউ বা ধনী কেউ বা নিঃস্ব,
এক জায়গায় আছে মোদের মিল,—
গরিব মেরে ভরাই নে পেট,
ধনীর কাছে হই নে তো হেঁট,
আতঙ্কে মুখ হয় না কভু নীল।
ষণ্ডা যখন আসে তেড়ে
উঁচিয়ে ঘুষি ডাণ্ডা নেড়ে
আমরা হেসে বলি জোয়ানটাকে,
ঐ যে তোমার চোখ-রাঙানো
খোকাবাবুর ঘুম-ভাঙানো,
ভয় না পেলে ভয় দেখাবে কাকে।
সিধে ভাষায় বলি কথা,
স্বচ্ছ তাহার সরলতা,
ডিপ্লম্যাসির নাইকো অসুবিধে;
গারদখানার আইনটাকে
খুঁজতে হয় না কথার পাকে,
জেলের দ্বারে যায় সে নিয়ে সিধে।
দলে দলে হরিণবাড়ি
চল্‌ল যারা গৃহ ছাড়ি
ঘুচল তাদের অপমানের শাপ,
চিরকালের হাতকড়ি যে
ধুলায় খসে পড়ল নিজে,
লাগল ভালে গান্ধীরাজের ছাপ॥

উদয়ন
১৩ ডিসেম্বর, ১৯৪০
সন্ধ্যা

মহিমার্ণব

শ্রীমনোজ বসু

উত্তর-বাংলায় যেবার বন্যা হয়, আমি আর সুশীল এক নৌকায় লোকের বাড়ি বাড়ি চাল-কাপড় বয়ে বেড়িয়েছি। সেই সূত্রে খুব মাখামাখি হল। সুশীল তখন বি-এসসি পড়ে, আমি পড়ি আইন।

কিন্তু বছর খানেক পরে কি রকম উলট-পালট হয়ে গেল। সুশীল হঠাৎ কোথায় ডুব দিল, মোটে আর পাত্তা নেই। খোঁজ করে এক দিন তার থিয়েটার রোডের বাসায় গিয়ে শুনি, ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়েছে, একেবারে কলিকাতাই ছেড়েছে। আমারও এই সময়টা বাবা মারা গেলেন, মা ত অনেক আগেই গেছেন, ভাইবোনগুলির সকল ভার কাঁধে চাপল, মহা মুশকিলে পড়ে গেলাম। পরীক্ষা দিলাম, কিন্তু জুৎ হ'ল না। একটা পেপারে ফেল ক'রে অবশেষে দেশে গিয়ে উঠলাম। সেখানে বিষয়সম্পত্তি নিয়ে নানা রকম গণ্ডগোল; মামলা-মোকদ্দমায় সদর-মফস্বল ক'রে দু'টা বছর কোন্ দিক দিয়ে কেটে গেল টের পেলাম না।

এ-রকম বাড়ি ব'সেও সংসার চলে না। আবার কলিকাতায় এসেছি। হ্যারিসন রোডের একটা মেসে আমার মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে এক সিটে থাকি, আর চাকরির খোঁজখবর নিই। এমনি সময়ে শিয়ালদহের মোড়ে হঠাৎ একদিন সুশীলকে দেখলাম। বগলে এক তাড়া খাতাপত্র, হন-হন ক'রে সে উত্তরমুখো চলেছে।

আমি উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠি—সুশীল!

সে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরল।

মেসে টেনে নিয়ে এলাম। ঘণ্টা তিনেক ধরে কত কি গল্প…তারপর কাশীপুরের দিকে এক ভগ্নীপতি না কার বাড়ি চলে গেল। আমিও তেমন চাপাচাপি করলাম না, বড়লোক—মেসে-টেসে থাকা অভ্যাস নেই ওদের, কেন মিছে কষ্ট দেওয়া!

পরদিন বারাণ্ডায় বসে দাঁতন করছি, ঘ্যাস করে একখানা ট্যাক্সি দরজার সামনে থামল। তিন সিঁড়ি এক-এক লাফে ডিঙিয়ে সুশীল উপরে এল। বলে—ঠিক হয়ে গেছে বিকেলেই আমার সঙ্গে যাবে একগাড়িতে।

—কোথায়?

—হাতীপোতা—সেখানে আমার বাড়ি। আমার স্ত্রীর নামে নতুন ইস্কুল করেছি যে—সুরমা হাইস্কুল। তুমি হবে অ্যাসিস্টাণ্ট হেডমাস্টার—বুঝলে?

আমার পাশে বেঞ্চিখানার উপর সে বসে পড়ল। বলে—দেখ, ক'দিন থেকে মনটা ভাল ছিল না, এত খরচ করে একটা জিনিষ গড়তে যাচ্ছি—কে চালাবে এ-সব, তেমন মানুষ কোথায়?… কাল রাত্রে—তোমরা বিশ্বাস করবে না এ-সব—কিন্তু একেবারে প্রত্যক্ষ ব্যাপার—আড়াইটে তিনটের সময় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, শিয়রের ধারে বসে সে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, ভাল করে চোখ রগড়ে দেখি, সত্যিই সে-ই—মুখের উপর সেই আঁচিলটি পর্য্যন্ত। বলল—অত ভাবছ কেন, আমার কাজ করবার মানুষ আমিই খুঁজেপেতে আনব। আর ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই তোমার সমস্ত কথা মনে এল। সকাল হ'তে-না-হ'তে তাই ছুটে এসেছি। আচ্ছা, হঠাৎ এই রকম একটা যোগাযোগ—এর মূলে অদৃশ্য শক্তি রয়েছে, তুমি বিশ্বাস কর না কি?

কিন্তু আমার দিক দিয়ে উৎসাহের লক্ষণ না দেখে সে একটু মুষড়ে যায়। বলে—বড়বাজারে যাব এখন। তোমার কেনা-কাটার কিছু থাকে ত চলো বেরিয়ে পড়ি। আজই ধরে নিয়ে যাব—শুনব না—

একটু ইতস্তত করে বললাম—সে কি করে হয়?

—হয় না? কেন হয় না শুনি। সুশীল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। বলে—ওঃ, অ্যাসিস্টাণ্ট হতে চাও না। কিন্তু হেডমাস্টার যে আর-একজনকে করতে হবে। এফ-এ পাস— গ্রাজুয়েট নন, এই হুকুম নেবার জন্য আজ দু'হপ্তা কলকাতায় বসে কর্ত্তাদের বাড়ি বাড়ি ধন্না

দিয়ে বেড়াচ্ছি। হুকুম হয়ে যাবে ঠিক। তিনি হচ্ছেন আমার ছেলেবেলার টিউটর, মাস্টারি ছাড়া আর কোন কাজ তাঁর পছন্দ নয়, পারেনও না। আর এই বয়সে এ-ও যে কতটা পারবেন, তাতে সন্দেহ আছে। তোমার কাছে বলতে কি—ইস্কুল করছি, এর একটা উদ্দেশ্য বুড়ো-মানুষটার গতি ক'রে দেওয়া।

সুশীলের 'পরে শ্রদ্ধায় মন ভরে গেল। কবে কোন্ শৈশব-দিনে কার কাছে পড়েছে, সেই ঋণ ভুলতে পারে নি আজও। তাড়াতাড়ি বললাম—না ভাই, তার জন্য কি…তোমার মাস্টার মশাই—তাঁর নীচে থাকতে আমার অপমান হবে! কি যে বল তুমি—

—তবে?

—ওখানে যেতে মন লাগছে না। অভাব আমার খুবই আছে, তবু তোমার কাছে চাকরি করা…ধরো, তোমার হয়ত কোন জরুরি দরকার হয়েছে—মুখ ফুটে হুকুম করতে পারবে না, কি রকম মুশকিল হবে ভাবো—

সুশীল হো-হো করে হেসে ওঠে, কথা শেষ করতে দেয় না। বলে—চাকরি করতে যাবে কেন? সুরমা নেই, তার নামটা রাখবার জন্য তুমি এত খাটবে, আমিই ত তোমার চাকর হয়ে থাকব। হুকুম-টুকুম যা করতে হয় আমাকেই কোরো, নিঃসঙ্কোচে কোরো।

বলতে বলতে তার স্বর গাঢ় হয়ে ওঠে। আমার হাত দু'খানা জড়িয়ে ধরে বলে—আমার আর কেউ নেই, ভাই—বিশ্বাস করো। চাটুজ্জে মশায় হেডমাষ্টার হবেন, কিন্তু এক রকম অথর্ব্ব মানুষ, না আছে আইডিয়া, না আছে কাজের শক্তি। সেই বন্যার সময় দেখেছি তোমার গড়ে তুলবার ক্ষমতা। ইস্কুলের ভার তোমাকেই নিতে হবে, সুরমা আমায় বলে দিয়েছে।

এর পরে আপত্তি চলে না। আর সেই সেবারও দেখেছি, সুশীলের হাত এড়ানো শক্ত কথা। সারাদিন খেটেখুটে ক্যাম্প-খাটের উপর একটু চোখ বুঁজেছি, সুশীল দুই কাঁধ ধরে সোজা দাঁড় করাত। কি না—আবার তখনই চালের পোঁটলা কাঁধে করে ছুটতে হবে; ভদ্রলোকেরা প্রায় কেউ দিনমানে সাহায্য নিতেন না, রাতের বেলা আমরা চুপি চুপি দিয়ে আসতাম।

যাই হোক, সেদিন অবশ্য যাওয়া হ'ল না, দিন সাতেক পরে এক অপরাহ্ণে ওদের স্টেশনে পৌঁছলাম। স্টেশন থেকেও হাতীপোতা আট মাইল, প্রকাণ্ড মোটর অপেক্ষা করছিল। চওড়া পাকা রাস্তা। শুনলাম, সে-ও সুশীলের কীর্ত্তি। আধ ঘণ্টা গাড়িতে ছিলাম, সুশীলের প্রশংসা ড্রাইভার লোকটার মুখে আর ধরে না।

—আসুন, আসুন।

গাড়ি থামতে ছিপছিপে এক ভদ্রলোক মহা আড়ম্বরে অভ্যর্থনা করলেন। পরিচয় দিলেন, তিনি সুশীলের প্রাইভেট সেক্রেটারি। গ্রামের সীমানায় কোনখানে একটা বাঁধ মেরামত হচ্ছে, সুশীল সেখানে গেছে। অহোরাত্র এই সব নিয়েই সে আছে। তারপর সেক্রেটারি ডাকতে লাগলেন—চাটুজ্জে মশাই, শুনছেন—এই যে এসে গেছেন যদুবাবু…

নীচু গলায় ভদ্রলোক বলতে লাগলেন—রকমটা দেখুন। অথচ ঘরের মধ্যেই হাতবাক্স কোলে ক'রে বসে রয়েছেন। এই লোক করবেন হেডমাস্টারি—হয়েছে আর কি! বাবুর যেমন কাণ্ড, দেশের মধ্যে মানুষ মিলল না—

ঘরে ঢুকে দেখি, মাথা-ভরা পাকাচুল গোঁফ-দাড়ি-কামানো চাটুজ্জে মশায় ঘাড় নীচু করে খস খস শব্দে কি লিখে যাচ্ছেন। আমরা দু-দুটো লোক গিয়ে দাঁড়ালাম, তা পর্য্যন্ত হুঁশ নেই।

সেক্রেটারি বললেন—এত চেঁচামেচি করছি, মোটে কানেই গেল না।

চাটুজ্জে মুখ না তুলে জবাব দিলেন—কানে গেলে কি হবে, দুর্গানাম লিখছিলাম যে!

খপ করে কাগজটা তুলে সেক্রেটারি কয়েকটা লাইনই পড়ে ফেললেন—

মহামহিম মহিমার্ণব হুজুরের আদেশক্রমে জানাইতেছি, আমাদের বিদ্যালয়ের পুষ্করিণী খনন সম্পর্কে মহাশয় আগামী পরশ্ব মহিমার্ণবের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তাহা হইলে তৎ-প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া—

তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন।

—তিন লাইনে যে দুর্গানাম এক-শ আটবার হয়ে গেছে।

চাটুজ্জে আড়চোখে একবার আমার দিকে চাইলেন, তারপর একগাল হেসে বললেন—তা মিছে কথা কি বলুন··· খাইয়ে পরিয়ে বাঁচাচ্ছেন—ঠাকুর-দেবতা, মনিব-মহাজন যা কিছু সমস্ত ত এই। কি বলেন মশায়?

বুড়ার চেহারা সৌম্য গোছের, কিন্তু এই রকম চাটুকারিতায় মন খারাপ হয়ে গেল। এ লোক আণ্ডার-গ্রাজুয়েট, পেটে একটু-আধটু ইংরাজি ঢুকেছে—কথাবার্ত্তা শুনে ত সে রকম মনে হয় না। সেক্রেটারি একবার আমার দিকে চোখ টিপে বলতে লাগলেন—দুর্গানামের ফল ত ফলে গেছে চাটুজ্জে মশায়, মিনিট কতক আপাতত মুলতুবি থাক না। যদুবাবু যদুবাবু করছিলেন, ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়ে আছেন—পা ধোবার জলটুকু পান নি।

—আপনি? সে-কথা বলেন নি কেন—খাতাপত্র ফেলে চাটুজ্জে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। বলেন—আপনার থাকবার জায়গা হয়েছে আমার বাড়ি। এই একটুখানি পথ। চলুন, চলুন। হুজুর বলেছেন—দেখবেন কোন রকম যেন অসুবিধা না হয়।

চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করি—সুশীল আপনার ছাত্র, তাকে 'আপনি' বলছেন, 'হুজুর' বলছেন—

চাটুজ্জে বললেন—হোক ছাত্র, তা বলে মানীর মর্য্যাদা যাবে কিসে? সাপ ছোট হলে তার বিষ কিছু কম হয়, বলুন? আমরা বেড়াল-কুকুর, ওঁদেরই এঁটোকাঁটা খেয়ে বেঁচে আছি। আমাদের মহিমার্ণবের মতো মানুষ এই কলিযুগে হয় না।

একতলা পরিচ্ছন্ন বাড়িখানা। বাইরের ঘরে আমার থাকবার জায়গা, পরিপাটি করে গোছানো। মন আবার প্রসন্ন হয়ে উঠল। রাত্রে সুশীলের ওখানে একবার গেলাম। সে বলে—কেমন জায়গা হয়েছে বলো। গোড়ায় ঠিক ছিল, আমার সঙ্গে থাকবে। কিন্তু চাটুজ্জে মশায় বারবার বলতে লাগলেন, তাঁর ওখানে থাকলে দু'জনে ইস্কুল সম্বন্ধে নানা রকম শলাপরামর্শ করতে পারবে, কাজ-কর্ম্মের সুবিধা হবে। আমিও ভেবে দেখলাম, সেকথা ঠিক। আমার কি—আমি ত কেবল টাকা দিয়ে খালাস। গড়ে তুলতে হবে তোমাদেরই।

বললাম—জায়গা ত ভাল, কিন্তু তোমার সঙ্গ পাব না।

সুশীল হেসে উঠল। বলে—যা পাবার এমনি পাবে। এখানে থাকলে পেতে বুঝি? তাও ভেবেছি। আমার ত অস্থিত-পঞ্চক অবস্থা—ঠাকুর-চাকরের দয়ায় বেঁচে আছি। রাতদিন দশ কাজে থাকি, কখন খেলাম কখন খেলাম না, মনেই থাকে না। ওখানে তবু দু'বেলা দু'মুঠো জুটবে, তার আর সন্দেহ নেই। কোন রকম অসুবিধা হ'লে তক্ষুনি জানাবে। বুঝলে?

শুয়ে শুয়ে সুশীলের কথা ভাবি। চাটুজ্জে মশায়ের কথাগুলো আর তেমন বিসদৃশ লাগে না। পাড়াগাঁয়ের সরল মানুষ, মনের কথা বলে ফেলেছেন। যা দেখে এলাম, এই রাতে এখনও সুশীল হয়ত তার বারাণ্ডার খাটিয়াখানার উপর শুয়ে শুয়ে আগামী দিনের মতলব ঠিক করছে, তার চোখে ঘুম নেই।

সকালবেলা চা-জলখাবার নিয়ে একটি মেয়ে ঘরে ঢুকল। একবিন্দু আড়ষ্টতা নেই, আশ্চর্য্য লাগে। এসেই প্রথম কথা—

আপনার এখনো মুখই ধোয়া হয় নি। ও, কলকাতার লোকের ন'টায় সকাল হয় যে!

চায়ের বাটিটা ঢাকা দিয়ে রেখে একটা চেয়ার টেনে সে বসে পড়ল। আমি বললাম—কলকাতার লোকের 'পরে আপনার ত খুব উঁচু ধারণা দেখছি।

সে হেসে ফেলে। বলে—একদম জানি নে কিনা, তাই। বিশ্বাস করুন, কলকাতায় কখন একটা রাতও কাটাই নি। এই যেমন ধরুন, আপনি ত আমায় জানেন না—দেখেন নি কখনো—নিশ্চয় শুনে এসেছেন, যোগেশ চাটুজ্জে মশায়ের মেয়ে নির্ম্মলা লোক ভাল নয়। সুশীলবাবু নিশ্চয় সাবধান করে দিয়েছেন, দেন নি?

—আপনি লোক ভাল নন বুঝি?

—নিশ্চয় নই। তার নমুনা দেখিয়ে দেব, যদি আপনি এই রকম 'আপনি' 'আপনি' করেন। চায়ের

সঙ্গে লঙ্কা গুলে দিয়ে যাব, ঠোঁট ফুলে উঠবে, মুখ দিয়ে আর 'আপনি' বেরবে না। দেখুন দিকি অন্যায়টা...আমি ছোট বোনের মতো—আপনি এত বড় পণ্ডিত মানুষ, এত বড় লেখক—

—দুর্নামটা এদ্দূর অবধি এসে গেছে?

নির্ম্মলা বলে—আসে নি? চাঁদ উঠলে কি পিদ্দিম জ্বেলে দেখিয়ে দিতে হয়, আপনাআপনি টের পাওয়া যায়। আপনাকে এ-বাড়িতে আনল কে জানেন?

—চাটুজ্জে মশায়—

—হ্যাঁ, বাবা বুদ্ধি করে আনবেন—তবেই হয়েছে। তাঁর ধারণা, বঙ্কিমবাবুর পরে বাংলা দেশে কলম ধরে নি আর কেউ। বাবাকে পাখী পড়াবার মতো করে শিখিয়ে শিখিয়ে পাঠিয়েছি। শেষকালে সুশীলবাবুকে নিজে এক-খানা চিঠি লিখে পাঠালাম, তখনই তিনি রাজি হলেন।

একটুখানি চুপ করে থেকে সে বলতে লাগল—দেখুন, ছেলেবয়স থেকে দু-বোনে বাইরে বাইরে কাটিয়েছি। জ্যেঠামশায় মারা গেলে এখানে আটকা পড়ে গেলাম। একটা কথা বলার মানুষ পাই নে। বাবা ত ঐ এক রকম—দিদি ছিল, সে লিখত-টিকত চমৎকার। সে-ও মরে গেল।

আমি বললাম—তুমি লেখ না কি?

—লিখি নে? এই এতো এতো খাতা লিখে ফেলেছি। ধোপার হিসাব, মুদির হিসাব—সমস্ত। তিরিশ টাকা মাসে জমা, আশী টাকা খরচ, একপয়সাও দেনা হবে না—পারেন এ-রকম জমা-খরচ লিখতে? আমি পারি।

খিল খিল করে নির্ম্মলা হেসে উঠল।

মাস-চারেক কেটে গেল। বেশ আছি। নির্ম্মলার মাকে মা বলে ডাকি, ওঁরা খুব আদর-যত্ন করেন। এ রকম যত্ন নিজের বাড়িতে পাই নি কোন দিন। কথায় কথায় এক দিন মা বললেন—একটা কথা বলি, কিছু মনে ক'রো না, বাবা। তুমি যে আপনার লোক নও, এ-কথা ভাবতেই পারি নে। কিন্তু কোন্ দিন উড়ে পালাবে—

একটুখানি থেমে তিনি বলতে লাগলেন—তাই কর্ত্তাকে বলছিলাম, একটা পাকা রকম বাঁধনে বেঁধে ফেলা যাক— পালাতে না পারে। আর আমার নির্ম্মলাও কিছু মন্দ মেয়ে নয়—

—মন্দ মেয়ে নয়, বলেন কি মা?

মা যেন একটু চমকে গেলেন। বলতে লাগলেন—রং তেমন ফর্সা না হোক, কিন্তু কটা চামড়াই ত সব নয়—

আমি হাসতে হাসতে বললাম—তর্কে কাজ কি মা, ওকে ডেকেই জিজ্ঞাসা করা যাক না। নির্ম্মলা, এই নির্ম্মলা—

কাছে কোনখানে ছিল, ঘরে ঢুকে বলল—কি?

—শোন, গোলমাল বেধেছে। মা বলছেন, নির্ম্মলা দুষ্টু মেয়ে, খারাপ মেয়ে—ওকে বাড়ি থেকে বিদেয় করা যাক। আমি বলছি, তা নয়—খারাপ হবে কেন, তবে মিথ্যেবাদী। প্রথম দিনই আমায় মিথ্যে কথা বলেছে, সে ভাল লোক নয়। অথচ সাঁকোর উপর সেদিন আছাড় খেয়ে এলাম, তিন ঘণ্টা ধরে নূনের সেঁক দিল। এখনও কোন দিন ঘুম থেকে উঠতে দেরি হ'লে সমস্ত বেলা ধরে কথার সেঁক দেয়। তাই বলছি, বিদেয় যদি করেন মা, আমার বাড়িতে নিয়ে যাই। তা তুমি কি বলতে চাও—বলো—

তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমাদের হাসি নিবে গেল। সারা মুখে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। বলে—কারও বাড়ি যাব না আমি। আপনার ব'লে নয়, কোনো-খানে না। বিদায় যদি হই, দিদির পথে যাব। ও-ই আমাদের সব চেয়ে ভাল রাস্তা।

মুখে আঁচল টেনে সে বেরিয়ে গেল। চেয়ে দেখি, মার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। এর বড় বোন বিষ খেয়ে মরেছিল। মা বলতে লাগলেন—বিয়ে-থাওয়ার সম্বন্ধ হচ্ছিল, কিন্তু কি যে হ'ল বাবা, এক দিন সকালে উঠে দেখি—দোর খোলা, অনিলা নেই। তারপর দেখি, উ-ই যে বকুলগাছটা দেখা যাচ্ছে, ওরই তলায় মেয়ে আমার শুয়ে রয়েছে। কি চেহারা ছিল...গায়ের রং হত্তেলের মতো, প্রাণ নেই...তা মনে হচ্ছে যেন রাজ-রাজ্যেশ্বরী ঘুমিয়ে আছে।

অনেকক্ষণ ধরে বসে রইলেন মা। কাঁদেন আর মাঝে মাঝে চোখ মুছে দু-একটা কথা বলেন। বললেন—ঐ যে ওঁকে দেখছ, উনি কি ঐ রকম ছিলেন, সেই একটা দিনে একেবারে পঞ্চাশ বচ্ছর বুড়িয়ে গেলেন।...কিন্তু মানুষ একটা বটে তোমার বন্ধু সুশীলবাবু। নিজের পেটের ছেলে এ রকম করে না। কত জন্মের যে সুহৃৎ আমাদের, এক-শ বছর পরমায়ু হোক বাছার। সত্যি বলছি বাবা, আমার পেটের মেয়ে কিন্তু এদের মতিগতি একবিন্দু বুঝতে পারি নে। ভাসুর-ঠাকুরের সঙ্গে মেয়ে দুটো দিল্লী-সিমলা করে বেড়াত। ইনিও, ত কোনদিন ঘর-সংসারে মন দিলেন না, চিরটা কাল দশের কাজ নিয়ে এ-গ্রাম সে-গ্রাম ক'রে বেড়ালেন। ভাবতাম, যাকগে—মেয়ে দুটো আছে ত ভাল, তা হ'লেই হ'ল।

—আপনার ভাসুর বড় চাকরি করতেন ?

মা বলতে লাগলেন—করলে হবে কি, বাবা। মারা গেলে দেখা গেল, কিচ্ছু নেই, রাশীকৃত দেনা। অনিলা নির্ম্মলা দেশে এল। ওমা, মেয়ে ত এক-এক রত্তি—কিন্তু অভিমান পর্ব্বত-প্রমাণ। মেয়েমানুষের এ-রকম হ'লে চলে ? তাই ত বুক কাঁপে, একটি চলে গেছে—ওটি কার হাতে পড়বে, কি করে বনবে। জানাশুনো ছেলে না হ'লে বিয়ে দেব না, মেয়ে তাতে চিরকাল আইবুড় থাকে থাকুক।

ক-দিন আর আলাপ হয় নি নির্ম্মলার সঙ্গে। ইচ্ছে ক'রেই করি নি। দেখা হ'লে পাশ কাটিয়ে যাই, কাজকর্ম্মে বাইরে বাইরে থাকি। আর কাজের চাপও পড়েছে ভয়ানক। ইস্কুলের নূতন বিল্ডিং হয়েছে, মহকুমা-হাকিম দ্বারোদ্ঘাটন করবেন, মস্ত বড় সভা হবে। দিন-রাত আয়োজন হচ্ছে। এক দিন কিন্তু আর পারা গেল না. নির্ম্মলা হাসতে হাসতে দু-হাত দিয়ে দরজা আটকে বলে—যেতে দেব না ; যান দিকি কেমন !

—না, সরো—বড্ড কাজ—

—কাজ আছে ত বয়ে গেল। আপনি আমার উপর রাগ করেছেন—না ?

আমি বললাম—না, ভয় করি তোমাকে। হাসি-ঠাট্টার মধ্যে ঐ রকম আগুন হয়ে উঠলে—

—নির্ম্মলা অনুতপ্ত কণ্ঠে বলল—আমার অন্যায় হয়ে গেছে, মাপ করুন।

এ-রকম করে বললে আর রাগ থাকে না, মায়া আসে। বলতে লাগল—বিয়ের কথা শুনলে আমার কি রকম মাথা খারাপ হয়ে যায়, সত্যি বলছি।

—বিয়ে হয় না ব'লে নাকি ?

—তাই যদি হয়···মিথ্যে কি ! বিয়ে হ'ল না ব'লে দিদি ত বিষ খেয়ে বসল।

আমি বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকালাম।

নির্ম্মলা শান্তভাবে বলল—শুনবেন ? আমি ছাড়া কেউ জানে না। দিদি কোন দিন কিছু আমাকে গোপন করে নি, শেষের একটা কথা ছাড়া। আমি যদি বিষ খাই, কেউ কিছু জানতে পারবে না। আপনারা লিখিয়ে লোক—শুনে রাখুন, হয়ত কাজে আসবে।

আগে থেকেই সন্দেহ ছিল, অনিলার বিষ খাওয়ার মধ্যে ভালবাসা-ঘটিত কিছু আছে। ব্যাপারটা তাই। এতকাল পরে সমস্ত কথা মনে নেই···তবে শুনতে শুনতে সেই কোনদিন-না-দেখা অভাগী মেয়েটা যেন স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে বেড়াতে লাগল। গল্পটা একটু গুছিয়ে-গাছিয়ে বলছি।

স্নানের জন্য ছেলেটি কলতলায় ঢুকেছে, এমন সময় টেলিগ্রাম এল—বাপের সাংঘাতিক অসুখ, শীঘ্র বাড়ি এস।

স্নান হ'ল, খাওয়া আর হ'ল না। দেশের স্টেশনে নেমে উদ্বিগ্নভাবে সে কোচোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে—বাবার অসুখ কেমন ?

কোচোয়ান বিহ্বলের মতো চেয়ে থাকে।

ছেলেটির চোখে জল এসে পড়ে আর কি !

—খুব খারাপ নাকি ?

—আজ্ঞে, বাঁধা-দীঘিতে মাছ ধরা হচ্ছে। কর্ত্তাবাবু সকাল থেকে সেইখানে।

অতএব বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা। ছেলেটি ভ্রূ কুঞ্চিত

করে ভাবে। বাড়ি পৌঁছে দেখে, বাপের দিবানিদ্রা তখনও শেষ হয় নি। টাক-মাথা ধবধবে পাঞ্জাবি-পরা এক প্রবীণ ভদ্রলোক বৈঠকখানায় একাকী গড়গড়া টানতে টানতে পাঁজির পাতা উল্টাচ্ছিলেন। সবিনয়ে প্রণাম ক'রে ফরাসের এক পাশে সে বসে পড়ল।

মুখ তুলে ভদ্রলোক বললেন—তুমি কি…

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি আমাকেই দেখতে এসেছেন। তাড়াতাড়ি দেখে নিন। আমাকে আবার এক্ষুনি ফিরতে হবে, কাল এগজামিন।

নির্মলাকে জিজ্ঞাসা করলাম—ছেলেটি কে?

—এখানকারই।

—নাম কি?

সে আগুন হয়ে ওঠে।—কি হবে পরিচয় জেনে? আপনি তাকে জানেন না, কেউ জানে না, সে আর নেই।

নির্মলা আবার বলতে লাগল।

খানিক পরে চোখ-মুখ লাল করে ব্যাগ হাতে ছেলেটি বেরিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় অনিলার সঙ্গে তার দেখা। অনিলা বলে—এক্ষুনি চললে যে বড়। ভদ্রলোক এসেছেন, সন্ধ্যার পর গ্রামের আরও দশ জন আসবেন।

—আসবেন, খেয়েদেয়ে ফূর্তি ক'রে চলে যাবেন। আমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কেউ ত আসছেন না।

অনিলা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে।—তোমার সঙ্গে না হোক, জ্যেঠাবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে আসছেন। উপযুক্ত ছেলে—বাপের মুখ উজ্জ্বল করবে বইকি! ঘরে যাও—বাহাদুরি দেখাতে হবে না।

তাড়া খেয়ে আবার সে বাড়ি ঢুকল।

সন্ধ্যাবেলা অনিলা তাদের ওখানে গিয়ে দেখে, চিলে-কুঠুরিতে চুপচাপ সে শুয়ে আছে। কোমল কণ্ঠে অনিলা ডাকল—এমন করে রয়েছ যে!

ছেলেটি অভিমানাহত ভাবে বলে—এতেও দোষ হচ্ছে? তা কি করব বলো। শাঁখ বাজানো, চন্দন ঘষা, উলু দেওয়া—সে-সব কাজে তোমরাই ত সব এসেছ।

অনিলা চপল হাসি হেসে ওঠে।—তুমি আজ খালি ঝগড়া করবে নাকি? এমন একটা দিন—নীচে গিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করবে,—তা নয়, এই রকম মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছ—

সে বিছানার উপর উঠে বসে। বলে—আমোদের দিন—না? আমার এবং তোমারও। আচ্ছা, নীচে যাই তবে—

তার ভাবভঙ্গি দেখে অনিলার ভয় করে। সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল—শোন, শুনে যাও,…কি বলছ তুমি? তোমার আর আমার…এ-সব কথার মানে কি বল?

ছেলেটি স্তব্ধ হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। শেষে বলল—এখনও বোঝ নি? না বুঝে থাক ত বুঝিয়ে দেব এক দিন—

কি এক অঘটন ঘটবে বলে অনিলার ভয় করতে লাগল। তবু শুভ ক্ষণে আশীর্ব্বাদ হয়ে গেল। বিয়ের দিন বৈশাখের ছাব্বিশে। কলেজ বন্ধ, সেই সময়টা সব দিকে সুবিধা।

গোলমাল একটা বাধল, ফাল্গুনের শেষাশেষি। মেয়ের বাপই বেঁকে বসলেন, নাঃ—কাজ নেই। ছেলেটি ঈস্টারের ছুটিতে আবার বাড়ি এসেছে। ছিপ-বঁড়শি নিয়ে খুব মাছ ধরে আর ফুটবল খেলে বেড়ায়।

অনিলা বলে—কোত্থেকে কি হয়ে গেল, ভাবনা-চিন্তে নেই—তুমি ত বেশ দিব্যি আছ—

—থাকব না? কি বাঁচা বেঁচে গেছি রে, অনি। শিঙে দড়ি বেঁধে গোয়ালে ঢুকিয়েছিল আর কি!

অনিলা বলে—আচ্ছা, এ-রকম কথা কোন্ শত্রু লিখে পাঠালে বল ত?

—যে-ই লিখুক, কথা যখন মিথ্যে নয়—শত্রু হ'ল কি করে?

—মিথ্যে নয়? অনিলা আশ্চর্য্য হয়ে গেল।—তুলো কি, বিয়ে তোমার সত্যি হয়ে গেছে! আমরা কেউ কিছু জানতে পারলাম না—

ছেলেটি মুখ টিপে টিপে হাসে। বলে—তোমাদের

চোখ কানা, কান কালা—জানবে কি ক'রে? ঢোল-সানাই বাজবে যেদিন, সেদিনই কেবল জানতে পারবে। আমার মনে মনে বিয়ে হয়ে গেছে।

অনিলা বলে—তা হ'লে ঐ বেনামী চিঠি তুমিই ছেড়েছ—ও ঠিক তোমার কাজ, আর কারও নয়। কিন্তু কে সে ভাগ্যবতী···বলো না, বলো শুনি ।

—দেখতে চাও?

—চাই বই কি?

—আজই? এখনই?

অনিলার বুক কাঁপতে লাগল, কথা বলতে পারে না। কেবল ঘাড় নাড়ল।

আলমারিতে লাগানো বড় আয়না—সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলে—ঐ দেখ···মুখ ফিরিয়ে দেখ চেয়ে।

অনিলা বলে—তার মানে?

—আয়নায় দেখতে পাচ্ছ না কাউকে? তুমি কিচ্ছু বোঝ না, অনি। বড্ড বোকা।

দিন দুই পরে অনিলার দেখা পাওয়া গেল জামরুল-তলার কাছে। সে পুকুরঘাট থেকে ফিরছে, পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল, ছেলেটি পথ আটকে দাঁড়াল।

—সরো।

—জীবনের পথ থেকেও?

অনিলা বলে—বড্ড তাড়া এখন, নির্ম্মলা জ্বর থেকে উঠেছে, অন্নপথ্যি করবে।

—আমারও ভয়ানক তাড়া, অনিলা। বেনামী চিঠির সম্বন্ধে তুমি যা বললে বাবারও ঠিক সেই সন্দেহ। রেগে টং হয়ে আছেন। বেশ···অন্নপথ্যি হয়ে যাক—যদি বল তার পরে এসে জিজ্ঞাসা করব।

অনিলা মুখ নীচু ক'রে নখ খুঁটতে থাকে। বলে—কি জিজ্ঞাসা করবে, আর কি বলব। কর্ত্তা-জ্যেঠা ঐ রকম করছেন—আমার বাবাও যখন শুনবেন সমস্ত কথা···ছি ছি ছি, কি হবে বলো ত!

ছেলেটি ক্রুদ্ধ স্বরে বলে—তোমার মতো অন্ধ কষে ভালবাসা আমার নয়···বেশ বুঝলাম—কেবল বাড়ি থেকে নয়, জগৎ থেকেই পালাতে হবে আমায়।

—শোন, শুনে যাও—

কিন্তু সে শুনল না, একরকম ছুটে চলে গেল। সকাল-বেলা শোনা গেল, ছেলেটি নিখোঁজ হয়েছে।

কলিকাতার বাসার ঠিকানা জানত অনিলা, ক'দিন পরে চিঠি পৌছল—কোথায় তুমি, এসো—তোমার পায়ে পড়ি ফিরে এসো।

সে ফিরে এল, কিন্তু ব্যাপার তুমুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাপ বললেন—তুমি কুপুত্র, তোমার মুখ দেখলে পাপ হয়। আমার কথা না শোন ত যা ইচ্ছে করতে পার—

সমস্ত শুনে অনিলা কান্নায় ভেঙে পড়ে। বলে—আমার মনের মধ্যে কি রকম হচ্ছে কি করে বলি তোমায়। কর্ত্তা-জ্যেঠা যা বলেন, তাই তুমি কর।

—তোমার কষ্ট হবে না?

—মেয়েমানষের কষ্ট! আর নিতান্ত যদি অসহ্য হয়—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ছেলেটি বলতে লাগল—নদীতে জল রয়েছে, গোয়ালে গরুর দড়ি আছে, আরও বিশ রকম উপায় আছে—এই ত? মেয়েরা চিরকাল ঐ একটা পথ চিনে রেখেছে। আমি তা হ'তে দেব না। শেষ পর্য্যন্ত যা হয়—দু'জনের এক গতি হবে। আমায় অবিশ্বাস কোরো না অনি, শোনো আমার কথা—

অনিলা অবিশ্বাস করে নি, সেই পথের ধূলার উপর উপর প্রাণভরে তাকে প্রণাম করল।

গল্প বলতে বলতে নির্ম্মলা হঠাৎ চুপ করে যায়। একটুখানি অপেক্ষা করে আমি জিজ্ঞাসা করি—তারপর?

নির্ম্মলা ম্লান হেসে বলতে লাগল—তারপর গণ্ডগোল আর বিশেষ কিছু নয়। বোশেখ মাস পড়ল, বিয়ের দিন ঘনাতে লাগল। আত্মীয়-কুটুম্বে ঘরবাড়ি ভর্ত্তি। সে বাড়িতেই আছে···এক রকম নজরবন্দী বলা যায়। স্টেশন কতদূরে জানেন ত? কর্ত্তাবাবু লোকজনকে সব টিপে দিয়েছেন। দিদির সঙ্গেও দেখা হয় না বড়···একদিন কেবল হয়েছিল, খুব লুকিয়ে চুরিয়ে। কেবল এই কথাটা বলে নি আমায় দিদি—

—তবে তুমি জানলে কি করে?

—চিঠিতে। মেয়েমানষের সেই চিরকেলে পথই নিল দিদি, বিষ খেল—পটাশিয়াম সাইনাইড। ও বিষ যেখানে-সেখানে মেলে না···খোঁজ—খোঁজ—চিঠি পেলাম, সে-ই চিঠি পাঠিয়েছে, আর পাঠিয়েছে বিষ। চিঠির খবর কেউ জানে না, কাউকে বলি নি। কি হবে বলে? দিদির সরল বিশ্বাসকে লোকে বলবে বোকামি। মরে গেল, তার উপর কলঙ্কের ঢাক বাজিয়ে আর লাভ কি!

আমি শিউরে উঠলাম।—চিঠিতে বিষ খাবার কথা বলেছিল নাকি?

নির্ম্মলা বলল—বলে নি? আর কত কবিত্ব! আগের দিনে দেখা হয়েছিল সেই সব কথা! সময় ঠিক করে দিয়েছিল, দু'জনে এক সময়ে বিষ খাবে···এপারে মিলন হল না, ওপারে হবে। দিদি যখন বিষ খেল সে-ও তখন বিষের শিশি হাতে জ্যোৎস্নার আলোয় ছাতের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার কাছে স্বীকার করেছে, স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

—সে খেয়েছিল নাকি?

—না। দরকার কি···বিয়ের দিন আসন্ন—সদরবাড়ি রসুনচৌকির ঘর উঠেছে। বিষ সে খায় নি, পাছে দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে খেয়ে বসে, সেই আতঙ্কে শিশিসুদ্ধ ছাদ থেকে ফেলে দিল। একথা সে নিজের মুখে স্বীকার করেছে। সে ভেবেছিল, দিদিও খাবে না। চিঠিতে যাই থাক, মানুষে সত্যি সত্যি কি এমন করতে পারে?

আমি বললাম—স্কাউণ্ড্রেল—

—না, বড়মানুষ—পুরুষ-বাচ্চা। একটা মেয়ে মরে গেল···যখন শিকারে যান, কতই ত বক-তিতির মারেন ওঁরা। কি যায় আসে!

খানিকক্ষণ গুম হয়ে থাকে নির্ম্মলা। তার পর যখন কথা বলে যেন আর এক মানুষ, কণ্ঠস্বরে এক বিন্দু উত্তাপ নেই। বললে—বড়মানুষের পরে আমাদের ভক্তি অগাধ। দিদির ছিল, বাবার আছে—মারও আছে। দেখুন, মেয়েমানুষ হয়েছি যখন, বিয়ে করতেই হবে; কিন্তু আপনি ও-সব কথা তোলেন কি হিসাবে? আপনার কি আছে···ইস্কুলের মাস্টার—আপনার যে বউ হবে, সে ত ধান ভেনে উপোস করে মরবে।

সে প্রগল্‌ভ হাসি হেসে উঠল।

এতক্ষণে নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য মেয়ে, এত সব কথার পরে হাসতে পারে। আমি লঘু কণ্ঠে বললাম—তা হলে নিজের কথা ছেড়ে দিয়ে এবার কোমর বেঁধে ঘটকালিতে লেগে যাই। কি বলো?

নির্ম্মলা বলে—এই ত কাজের লোকের কথা। আপনি এত স্নেহ করেন—তা এক কাজ করুন দিকি। সুশীল-বাবুকে বলে কয়ে—তাঁরও ত গৃহ শূন্য···আপনার উপকার চিরদিন আমি মনে রাখব।

আমি বললাম—চিরদিন ভুলেই থেকো। বরঞ্চ তার বদলে কমিশন বাবদে যদি টাকাটা-সিকেটা নগদ ধরে দিতে পার, তাতে মুনাফা বেশি।

—বেশ তাই।

হাসিতে সে ফেটে পড়ল।

ইস্কুলের নূতন বিল্ডিংএর দ্বারোদ্ঘাটন হয়ে গেল, খুবই জাঁকজমক হল। আট-দশ ক্রোশ দূর থেকে পর্য্যন্ত লোক এসেছে। মালার উপর মালা এত পড়েছে যে সুশীলের মুখ ঢেকে যাবার জোগাড়। লম্বা বারাণ্ডায় সুরমাদেবীর অয়েলপেন্টিং—সিঁদুরের বড় ফোঁটা-পরা ফুটফুটে তরুণী, আজিকার সভাক্ষেত্রের দিকে চেয়ে চেয়ে প্রশান্ত হাসি হাসছেন। অনেক বক্তৃতা করলেন, আমিও দু-চার কথা লিখে নিয়ে গেছি। সেটা নাকি অতি চমৎকার হয়েছিল। কি বলেছিলাম, ভাল মনে নেই। তাজমহলের উপমা দিয়েছিলাম, আগরার তাজ পাথরে গড়া, প্রাণহীন—এ হ'ল জীবন্ত স্মৃতিমন্দির··· বছরের পর বছর ছেলেরা জীবনের পাথেয় নিয়ে যাবে ঐ স্বর্গীয়ার স্মৃতিতে। এমনি কত কি কথা! খুব হাততালি পড়ল। সভাপতির টেবিলের বাঁ-দিকে মেয়েদের জায়গা, তার মধ্যে নির্ম্মলাকেও একনজর দেখলাম। বাড়ি গিয়ে বললাম—শুনলে ত···কি রকম হ'ল বলো—

নির্ম্মলা মুখ টিপে হেসে বলে—মাইনে বেড়ে যাবে।

—তার মানে? আমি খোশামুদি করেছি, তাই বলতে চাও?

—নইলে এত মিথ্যে বলেন কি করে?

ভারী রাগ হ'ল, রাগ ক'রে বললাম—কোন্‌টা মিথ্যে শুনি? তুমি বিশ্বনিন্দুক, ইতর-ভদ্র সবাই প্রশংসা করল—

নির্ম্মলা বলে—স্তুতিটা আমায় দিয়ে লিখিয়ে নিলেন না কেন। আরও ভাল হ'ত, চাই কি সুশীলবাবু নিজেই কাঁধে তুলে নাচতেন। নতুন মানুষ—ক'টা কথা বা জানেন। এক কথা ফেনিয়ে ফেনিয়ে লিখলে কি আর জুৎ হয় তেমন!

আঘাত করবার লোভ সামলাতে পারলাম না, বললাম—তা সত্যি। বড্ড ভুল হয়ে গেছে। তোমাকে না হোক তোমার বাবাকে দিয়ে মহিমার্ণবের ইতিহাসটা লিখিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। এতকাল ধরে সুশীল যা-যা ক'রে এসেছে—

নির্ম্মলা বলে—বাবার চেয়েও বেশি জানি আমি। সব চেয়ে বেশি জানত যে সে আর নেই—

আকাশে মেঘ করেছিল, ঝুপ-ঝুপ করে এই বার বৃষ্টি এল। বিছানার উপর চেপে বসে বললাম—কি জান তুমি, বলো ত।

নির্ম্মলা ভালমানুষের মতো বলে—এবারে ত হয়েই গেল, আর তাড়া কি! আবার যখন সভা-টভা হবে, আগে থাকতে বলবেন। না হয় আমাকেই দাঁড়িয়ে দু-কথা বলতে দেবেন না! আজকাল কত মেয়েই ত বক্তৃতা করে থাকে। নাঃ—বকে বকে আপনার মুখ শুকিয়ে গেছে, খান-দুই পাঁপর ভেজে এনে দিই আগে! দাঁড়ান—

পরদিন সকালে উঠে সভার রিপোর্ট তৈরি করতে লেগেছি, নির্ম্মলা চা নিয়ে এসেছে আমার ঘরে, এমন সময় বলে উঠল—ঐ যে সুশীলবাবু যাচ্ছেন···ও সুশীলবাবু, শুনুন—শুনুন—আসুন না এক বার গরীবের বাড়ি।

আমিও দরজার কাছে গিয়ে ডাকলাম—এসো, এসো···তোমার কথাগুলো ঠিক-ঠিক লেখা হল কিনা এক বার দেখে দিয়ে যাও।

—বড় ব্যস্ত যে। একটু ইতস্তত করে সুশীল ঘরে এসে বসল।

নির্ম্মলা বলে—চা আনি? খেয়েই বেরিয়েছেন? তা আর এক কাপ এনে দি। বিষ তো নয়—চা।

খিল-খিল করে হেসে যে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। সুশীল গম্ভীর মুখে রিপোর্ট পড়তে লাগল। চা নিয়ে এসে নির্ম্মলা বলে—দেখুন সুশীলবাবু, আপনার কত টাকা, কত বড় বাড়ি, আমাদের আপনি কত ভালবাসেন! বাসেন না—বলুন? সেই কথা বলছিলাম দাদাকে। উনি বিশ্বাস করেন না। বলছিলাম, ঘটকালিতে লেগে যান—মোটা রকম কমিশন দেব, তা সাহস কচ্ছেন না।

রিপোর্ট ছেড়ে সুশীল তার দিকে তাকাল। আমি তাড়া দিয়ে উঠি—কি হচ্ছে, নির্ম্মলা?

নির্ম্মলা বলে—আপনি আর ক'দিন এসেছেন—কি-ই বা জানেন? মিথ্যে বলছি না এক বর্ণ। কি বলেন সুশীলবাবু?

নির্ম্মলা ভিতরে গেলে বললাম—মেয়েটা আস্ত পাগল।

সুশীল কিন্তু অবাক করে দিল। বলে—আমি রাজি আছি ভাই। সম্ভব যদি হয়, চেষ্টা করে দেখ—

—তুমি? এই মাস চারেক তোমার স্ত্রী গিয়েছেন। কালকে নতুন বিল্ডিং খোলা হল—

সুশীল বলে—দৃষ্টিকটু হবে, না? তা হলে দেরি হোক কিছু। এই ফাঁকে কথাবার্ত্তা পেড়ে রাখ।

সেদিন আর নয়, পরের দিন চাটুজ্জে মশায়ের কাছে কথা তুললাম। বিস্ময়ে তিনি খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে রইলেন। বললেন—ঐ যে মহিমার্ণব বলে থাকি, দেখলে ত? ও সমুদ্রের শেষও নেই, তলও নেই। তা তুমি চেষ্টা কর—

চেষ্টা কোথায় করতে হবে, জানি। নির্ম্মলাকে বললাম—তোমার ঠাট্টা সুশীল কিন্তু সত্যি ভেবে নিয়েছে।

নির্ম্মলা বলে—ঠাট্টা ত করি নি।

—ঐ তোমার মনের কথা?

নির্ম্মলা বলতে থাকে—আমার ভাগ্যের কথা, দাদা! অত বড় বাড়িতে থাকব, অত বড় গাড়ি চড়তে পাব, অত বড় নাম-করা মানুষটার পায়ের নীচে বাঁদী হয়ে থাকব—

আমি বললাম—কেন বাজে বকছ নির্ম্মলা, ঐ রকম যাদের মতিগতি তুমি সে-দলের নও।

নির্ম্মলা বলে—হয়ত ছিলাম না। কিন্তু পৃথিবীতে থাকতে হলে এ ছাড়া উপায় নেই। পৃথিবীর যাঁরা মালিক, আপনার-আমার মতো মানুষকে তাঁরা কি সহজে থাকতে দেন?

—কিন্তু প্রস্তাব তুলেছ তুমি।

—এবং দয়াময় তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেছেন।

আমার অসহ্য রাগ হল। বললাম—তোমায় অনুরোধ করি নির্ম্মলা, সুশীলকে তুমি আর দশজনের মতো দেখো না। তার মতো ত্যাগী—

নির্ম্মলা স্বরের অনুকৃতি করে বলতে লাগল—ত্যাগী, মহিমার্ণব, মহাযশস্বী, দেশের হুজুর—হঠাৎ যেন তার কণ্ঠে আগুন ধরে যায়, বলতে লাগল—তিনি রাজি হয়েছেন, কৃতার্থ করেছেন। কেন করেছেন জানেন? আমার কাছে সেই চিঠি রয়েছে, মৃত্যুবাণ। ঐ সেই বকুলগাছটা, দাদা। দিদি যখন বিষ খেলে আপনাদের মহিমার্ণব তখন ছাদের উপর পায়চারি করছেন।

—কি বলছ নির্ম্মলা, তোমার গল্পের নায়ক সুশীল? তুমি বলেছিলে, সে আর নেই।

নির্ম্মলা বলে—নেই-ই ত। কে বিশ্বাস করবে আজ ঐ কথা? বলবে, কলঙ্কিনী মেয়েটা মহাপুরুষকে মজাতে চেয়েছিল—পারে নি। কিন্তু গল্পটার আরও শেষ আছে। সেই বিয়ে ভাঙে নি, দিনও পেছোয় নি—ছাব্বিশে বোশেখই শুভকর্ম্ম হ'ল। সেই বউ সুরমা। মারা গেল, এত ঐশ্বর্য্য ছেড়ে গেল—এমন অবিবেচনার কাজ যে কেন করল বউটা!

সে চুপ করল। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। টেনে টেনে সে ব্যঙ্গের সুরে আবার বলে—আর কি ভালবাসাই যে জন্মে গিয়েছিল ইতিমধ্যে, তার নামে দশ হাজার খরচ করে ঐ প্রকাণ্ড ইস্কুল হচ্ছে।

আমি আস্তে আস্তে বললাম—ভালবাসা মানুষের মধ্যে পরেও ত জন্মাতে পারে। কি জানি?

নির্ম্মলা বলে—মানুষের পারে, মহিমার্ণবদের নয়। সব ভালবাসা ওঁদের নিজের উপর। সুরমা মরে গিয়ে যশের সিঁড়ি বানিয়ে দিচ্ছে। আমি জানি দাদা, শা-জাহান হবেন ব'লে তাজমহল গড়ছেন···সুরমা কে? আমি যদি বিয়ে করি, মানুষটা বাদ দিয়ে বিয়ে করব ব্যাঙ্কের পাশ-বই, গয়না-পত্র, মোটরগাড়ি—এই সমস্ত। করুন না ঘটকালি।

হাসির উচ্ছ্বাস আর থামতেই চায় না।

অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় হয়, ১৩২০ সনের মাঘ মাসে। পরিচয় করাইয়া দেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয়। আমি তখন তাঁহার প্রধান ছাত্র, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে পড়িতেছিলাম। ইহার পূর্ব্বেও অবশ্য চিঠিতে পরিচয় সুরু হইয়াছিল। দেখিবার জন্য আমার ছবি তাঁহাকে বুকপোষ্টে পাঠাইয়া দিতাম; তিনি ছবির উল্টা পিঠে "মন্দ নয়," "নৌকা দুটো বিলাতী করিলে কেন?" ইত্যাদি মন্তব্য লিখিয়া আবার ডাকে ফেরত পাঠাইয়া দিতেন।

মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনের গানের দল প্রতি বৎসর জোড়াসাঁকোতে আসিত; আমি সেই দলের সঙ্গে আসিয়াছি। প্রথম পরিচয়টা হইল রাত্রে, খুব খুশী হইলেন। রাত্রে আর ছবি দেখান হইল না। পর-দিন ভোরে তাঁহার বাড়ীতে ছবি আঁকার জায়গায় ছবি লইয়া দেখা করিলাম; ছবি আঁকার জায়গা মানে "স্টুডিও" ঘর নয়, যার উত্তর দিক খোলা থাকিবে, ছাদে স্কাইলাইট থাকিবে ইত্যাদি। চওড়া খোলা বারান্দায় ছোট্ট একখানা ক্যানভাসের চেয়ারে বসিয়া ছবি আঁকেন, ড্রয়িং-বোর্ডের একটা কোণ চেয়ারের হাতলে স্ক্রু দিয়া আঁটা, ছবি আঁকার সময় কোলের উপর ঘুরাইয়া লন। আমাকে অনেক পরে এক বার পাশ্চাত্য "স্টুডিও" সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ওদের একটা কুসংস্কার—নর্থ লাইট না হ'লে চলবে না। আলোর আবার নর্থ কি? আমার ছবিতে পূব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ সব দিক থেকেই আলো এসে পড়ছে।"

সঙ্গে আমার খানকয়েক ছবি ছিল; যেমন নদী, বোলপুরের মাঠের দৃশ্য; 'ডাকঘর'-এর অমল—অমল জানলার শিক ধরিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে, আর দইওয়ালা আসিয়াছে; এক জন ওস্তাদ সেতারের কান মোচড়াইতেছে ইত্যাদি। আমার ছবির সমালোচনা করিলেন, কি হইলে ভাল হইবে বুঝাইয়া দিলেন। সেতারওয়ালার ছবিতে খোলা জানালা আঁকিয়াছিলাম, তাহাতে শিক আঁকিয়া দিলেন। ইহার ব্যাখ্যা দিলেন,--সেতার হইতে যেমন সুর বাহির হইতেছে, তেমনই এই বদ্ধ গৃহ হইতে সেতারীর মন মুক্তি চাহিতেছে।

অবনীন্দ্রনাথ পরে আমাকে বুঝাইলেন, রেখার সামঞ্জস্যে, মিল গতি এবং ছন্দ। বুঝাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এ-সব কথা কাউকে শেখাই নি, এমন কি অসিত-নন্দলালকেও না, শেষে গুরুমারা বিদ্যে শিখে ফেলবে।"

অবনীন্দ্রনাথ অতি সহজেই সকলকে আত্মীয় করিয়া লইতে পারেন, ইস্কুলের বালক বলিয়া তাঁহার কোনো তাচ্ছিল্য নাই। যাহার ভিতরে কোনো সম্ভাবনা দেখিয়াছেন, তাহাকেই উৎসাহ দিয়াছেন, প্রেরণা দিয়াছেন; চতুর্দ্দিকে তিনি এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন যে, যে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহার মন সৌন্দর্য্যরসে আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি মাস্টার সাজিয়া কাহারও উপর বোঝা-স্বরূপ চাপিয়া থাকেন নাই।

অধুনা অবনীন্দ্রনাথের চিত্র-সংগ্রহ অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। তখন সেগুলি তাঁর বৈঠকখানা-ঘরে টাঙান থাকিত; অজন্তার বড় বড় প্রতিলিপি ছিল—যাহা নন্দলালবাবু এবং অসিতবাবু গুহা হইতে নকল করিয়া আনিয়াছিলেন। মোগল-রাজপুত চিত্রের ভাল ভাল নিদর্শন ছিল। এ-সব দেখার সুযোগ হইল। অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার ছাত্র-জীবনে আঁকা পুরাতন ছবি দেখাইলেন। কালিকলমের কাজ, প্যাস্টেলের কাজ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণের জন্য অঙ্কিত চিত্র প্রভৃতি। এ-সব কাজ তিনি করিয়াছেন প্রাচ্য চিত্রকলা অথবা নূতন

শিল্পী শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রথম যৌবনে অঙ্কিত চিত্র

কালি-কলমে আঁকা ছবি।
"রাধাকৃষ্ণ" (উপরে, বাম দিকে) ও অন্যান্য দু-একটি ছবি ১৮৯৪-৯৫ সালে আঁকা।
[ফটোগ্রাফগুলি শ্রীমুকুলচন্দ্র দের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

১৮৯২-৯৫ সালে আঁকা কালি-কলমের ছ

কালি-কলমে আঁকা স্কেচ।

"সারেঙ্গীবাদিকা" ছবিটি (উপরে, দক্ষিণে) ১৮৯৪-৯৫ সালে আঁকা

জল-রঙের স্কেচ। "কষ্টহারিণীর ঘাট", মুঙ্গের (মধ্যে) এবং কালি-কলমের স্কেচ। ১৮৮৬-১৮৯৪

ধারা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে; তখন তিনি পাশ্চাত্য প্রথা অনুসারেই আঁকিতেন।

অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষক প্রথমে ছিলেন এক জন ইটালীয় চিত্রকর, সিনর গিলহার্ডি। তাঁহার কাছে শেখেন লাইফ-ড্রয়িং, আর জল-রঙের কাজ শেখেন ইংরাজ চিত্রকর মিঃ পামারের কাছে। ইউরোপীয় শিল্পীদের মত এক জন হইবেন এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা; ভারতীয় চিত্রকলা বলিয়া উচ্চাঙ্গের কিছু যে থাকিতে পারে এ-ধারণা তখন তাঁহার ছিল না। এক দিন দ্বারকানাথ ঠাকুরের লাইব্রেরিতে একটি সচিত্র মুসলমানী পুঁথি দেখিতে পাইলেন; সূক্ষ্মকারুকার্য্যভরা চিত্র। অন্ধকারের ভিতর যেন আলোকরশ্মি দেখা গেল; তিনি যেন এক নূতন জগতের খবর পাইলেন, ভারতীয় চিত্রের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন। নূতন পদ্ধতিতে তাঁহার ছবি আঁকা সুরু হইল, প্রথম আঁকিলেন "কৃষ্ণলীলা" সিরিজের ছবি। শিক্ষক মিঃ পামারকে এ চিত্র দেখাইলে তিনি বলিলেন, "যাও, তোমার শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে; আমি তোমাকে আর কিছু শিখাইতে পারিব না।"

রাজা রবিবর্ম্মা তখন ভারতীয় শিল্পীদের মুকুটহীন রাজা। কলিকাতায় তিনি এক বার শেষবয়সে আসিয়াছিলেন। সিনর গিলহার্ডির সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল; যুবক শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের কথা তিনি তাঁহার কাছে শুনিতে পান। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিয়া রাজা রবিবর্ম্মা তাঁহাকে উৎসাহিত করেন। রবিবর্ম্মা নাকি অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "The young man is ambitious."

ছাত্রাবস্থায় প্রতি মাঘোৎসবে কলিকাতায় আসিয়াছি, এবং অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করিবার সুযোগ হইয়াছে। বৎসরের দুই-তিনটা দিন এ জন্য আশা করিয়া থাকিতাম। পূর্বে কখনো ভাবিতে পারি নাই, কোনোদিন তাঁহার সঙ্গে পরিচয় হইবে। প্রায় গোড়া হইতেই আমাদের বাড়ীতে 'প্রবাসী' রাখা হইতেছে; কাজেই আমি গ্রামে থাকিতেই 'প্রবাসী'র সহায়তায় অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম; বহু পূর্ব্বে

যৌবনে অবনীন্দ্রনাথ

তাঁহার আঁকা "বুদ্ধ ও সুজাতা" ও "পদ্মাবতী" ছবি দেখিয়াছিলাম। চিত্র সম্বন্ধে কোনো শিক্ষা হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই 'প্রবাসী'র আনুকূল্যে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছিল। কাজেই অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হওয়াতে নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়াছিলাম।

এক বার মাঘোৎসবের সময় জোড়াসাঁকোতে "বিচিত্রা"-গৃহে নীচের হল-ঘরে একটা ডিনার-পার্টি হয়। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়, নাটোরের মহারাজা প্রভৃতি এই পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন। প্রাচ্য রীতিতে ঘরের সাজসজ্জা হইয়াছিল। দেওয়ালে ছিল গোলাপ-ফুলের মালা; মেঝেয় আলপনা আঁকা হইয়াছিল, মাঝখানে ছিল একটা গরুড়স্তম্ভ, তার চতুর্দ্দিকে সাজানো ছিল অনেকগুলি মাটির প্রদীপ।

ভোজনশালায় আমার আলপনা দেখিয়া অবনীন্দ্রনাথ

খুব খুশী হইয়াছিলেন। পর-দিন বলিলেন, তোমার কাছে আলপনা দেওয়া শিখব। দোতলায় তাঁহার কাজের জায়গায়, মেঝের উপর আবীর লইয়া দেখাইয়া দিতে লাগিলাম, কি করিয়া রঙের গুঁড়া আঙুল হইতে ছাড়িতে হয়। তিনি চেয়ার হইতে নামিয়া মেঝের উপরেই বসিয়া পড়িলেন, এবং নিজে আবীর লইয়া চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যেখানেই শিল্পের কিছু সম্ভাবনা দেখিয়াছেন, সেখানেই তাঁর উৎসাহের বিরাম নাই; এবং অন্যকেও উৎসাহ দিতে কোনো কার্পণ্য নাই।

কার্ডে ছোট ছোট ছবি আঁকিয়া তিনি ছাত্রদের উপহার দিয়া উৎসাহ দিতেন। টিকিট লাগাইয়া অনেক সময় ডাকেও পাঠাইয়া দিতেন। আমি এক বার রূপক চিত্র আঁকিয়াছিলাম, নাম দিয়াছিলাম "মানব-জীবন"। প্রথম, মানুষ জীবনতরী বাহিয়া সংসার-সমুদ্রে চলিয়াছে, টাকাকড়ি আঁকড়াইয়া। দ্বিতীয়, আত্মসমর্পণ—"মন-মাঝি তোর বৈঠা নে রে আমি তো আর বাইতে পারি না।" তৃতীয়, অন্তিম নিদ্রা। এ-সব চিত্র অবশ্য বাল্যকালেই আঁকা সম্ভব হইয়াছিল। তৃতীয় চিত্র দেখিয়া অবনীন্দ্রনাথ বলিলেন, মানুষটা মরলে, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বে কেন? পিঠের দিকে চিৎ হয়ে নৌকার গলুইয়ের উপর পড়বে। আমার ছবির অন্য পিঠে একটা পেন্সিল ড্রয়িং করিয়া দেখাইয়া দিলেন। পরদিন ভোরে একটি ছোট্ট কার্ড উপহার পাইলাম, পিছনে লেখা, "মণি গুপ্তকে · মাঘোৎসবের দিনে।" আমার আঁকা বিষয়ে একটা ছোট্ট রঙীন ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন। নৌকার অর্দ্ধেক জলের ভিতরে নিমজ্জমান; গলুইয়ের উপর একটা মানুষ চিৎ হইয়া আছে। জলরাশির ঢেউ উদ্বেল হইয়া আকাশের দিকে উঠিয়াছে, আকাশ ঘন নীল।

অবনীন্দ্রনাথ ইস্কুলমাস্টারের মত শিক্ষা দেন নাই, তিনি ছাত্রদের প্রেরণা জোগাইয়াছেন। অধিকাংশ স্থলেই তিনি ছাত্রদের সঙ্গে আর্টের নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিজের কাজ চলিতে থাকে; ছাত্রেরা তাঁহার কাজ দেখিয়া শিক্ষা পায়। খুব কম স্থলেই তিনি ছাত্রদের কাজের উপর সংশোধন করিয়া দেন। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় আমাকে বলিয়াছেন, তাঁহার খুব কম কাজেই অবনীন্দ্রনাথের হাত আছে। তাঁর পুরাতন চিত্র "কৈকেয়ী"তে অবনীন্দ্রনাথের হাত আছে; পিছনে জানালা দিয়া দেখা যাইতেছে, মন্থরা চলিয়া যাইতেছে, এ-মুখখানা অবনীন্দ্রনাথের আঁকা। বহু পরে কলাভবনে যোগ দেওয়ার পর নন্দলাল বাবু নেপালী কাগজে গেরিমাটি (ইণ্ডিয়ান রেড) দিয়া এক রেখাচিত্র আঁকিয়াছিলেন; বিষয়, "বসন্ত", শালবনে বসন্তের ছোঁয়া লাগিয়াছে, প্রচুর পুষ্পভারে অবনত শালের শাখা; পুরাতন শুকনা পাতা ঝরিয়া পড়িয়াছে, সরু ডালে নূতন পাতার উদ্গম, কতকগুলি ময়ূর বনে চরিতেছে। অবনীন্দ্রনাথকে এ-ছবি দেখাইলে, তিনি ইহাতে রং চাপাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অসিতবাবু আমাকে এ-চিত্র সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "নন্দদার ছবির উপর কখনো তিনি হাত লাগান না, এবার দেখছি হাত দিয়েছেন।"

১৯১৬ সনে জোড়াসাঁকোতে মহাসমারোহে "ফাল্গুনী" অভিনীত হয়। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের লইয়া কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম অভিনয়।

ফাল্গুনী নাটকে আমার কোন অংশ ছিল না। ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটির চিত্রপ্রদর্শনীতে এইবার প্রথম আমার আঁকা ছবি ছিল, প্রদর্শনী দেখিবার জন্য নাটকের অভিনেতা-ছাত্রদের সঙ্গেই কলিকাতা চলিলাম।

ফাল্গুনীতে আমার অংশ যদিও ছিল না, তবুও অবনীন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে যাবে, ছাতি লাঠি কুশাসনটা সঙ্গে নিয়ে যাবে, আসনটা পেতে দেবে।" অবনীন্দ্রনাথ লইয়াছিলেন শ্রুতিভূষণের অংশ। আমাকে শ্রুতিভূষণের চেলা সাজিতে হইয়াছিল।

আমার কথা বলার অংশ ছিল না; কিন্তু শ্রুতিভূষণ যখন আসন ত্যাগ করিয়া কুশাসন তুলিবার জন্য হাত দিয়াছেন, তখন মাথায় কথা আসিয়া গেল, বলিয়া ফেলিলাম, "গুরুদেব আপনি নিচ্ছেন কেন, আমি নিয়ে যাব।" অবনীন্দ্রনাথ আমার উপস্থিত-বুদ্ধির জন্য খুব খুশী হইয়াছিলেন। স্টেজের বাহিরে আসিলে, আমাকে পুরস্কার দিয়াছিলেন। তাঁর হাতে ছিল কটকী থলে। থলের ভিতর হইতে এক মুঠো জিনিস বাহির করিয়া দিলেন, দেখি অনেক চকোলেট।

অবনীন্দ্রনাথ
হাঙ্গেরীয় শিল্পী শ্রীমতী এলিজাবেথ ব্রানার অঙ্কিত চিত্র হইতে

ফাল্গুনী অবলম্বন করিয়া অবনীন্দ্রনাথ অনেক চিত্র আঁকিয়াছিলেন। একটি ছিল অন্ধ বাউল, রবীন্দ্রনাথ সাজিয়াছিলেন। "ধীরে বন্ধু ধীরে, চল তোমার বিজন মন্দিরে," এই গান গাহিয়া অন্ধ বাউল চলিয়াছে।

শান্তিনিকেতন হইতে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলাম। দেশে যাওয়ার পথে, অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলাম, "আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে এসেছি।" তিনি বলিলেন, "কি মণি গুপ্ত, এখন কি করবে?" আমি বলিলাম, "ঢাকাতে কলেজে পড়ব।" "কলেজে পড়বে? শেষে ল' পাস করে উকীল হবে, না? কলেজে কি কিছু পড়া হয়? কলকাতায় থাক, private study কর, আমার লাইব্রেরির বই তোমাকে পড়তে দেবো। আর আমি তোমাকে ছবি আঁকতে শেখাব।"

চারি বৎসর ইহার পর ঢাকায় কাটিল। ইতিমধ্যে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। ছবি আঁকার এখানে তেমন আবহাওয়া ছিল না। নিজে নিজেই যতটা পারি করিতাম। ঢাকাতে চিত্রপ্রদর্শনী হইয়াছে; দুই বৎসর সেখানে ছবি দিয়াছি। ইতিমধ্যে বিশ্বভারতী স্থাপিত হইল, কলাভবনে চিত্র শিক্ষার বন্দোবস্ত হইয়াছে, অসিতবাবু অধ্যক্ষ। তিনি আমাকে লিখিলেন "একটি স্বতন্ত্র দোতলা বাড়ী হয়েছে আমাদের কলাভবন। আর্টের বইও যথেষ্ট আছে ও আনানো হচ্ছে। নন্দলালবাবু প্রতি শনিবারে এখানে আসেন।" বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, কিন্তু মন পড়িয়া আছে ছবি আঁকার দিকে। কোনো রকমে গুরুজনের অনুমতি লইয়া কলাভবনে যোগ দিলাম। নন্দবাবু এবং অসিতবাবু অধ্যাপক। ওরিয়ে-

ণ্টাল আর্ট সোসাইটির প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে কলিকাতায় অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হইত এবং ছবি সম্বন্ধে অনেক আলাপ-আলোচনা হইত। তখনকার দিনে কাজে কি উৎসাহ ছিল! ছবি আঁকা শিখিয়া পরে কি হইবে, কি ভাবে অর্থ উপার্জ্জন করিব. কখনো ভাবি নাই। কাজ করাটাই ছিল তখন প্রধান উদ্দেশ্য।

কলাভবনের লাইব্রেরিতে ফরাসী ভাষায় লিখিত অনেক আর্টের বই ছিল। তাহার একখানি অবলম্বনে "জাপানী চিত্রকলার যৎকিঞ্চিৎ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখি। অবনীন্দ্রনাথ আমার এই লেখা পড়িয়া খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া আমাকে একটি চিঠি লিখিয়াছিলেন।

ওগো গুপ্ত শিল্পি, সোমবার

জাপানী চিত্র সম্বন্ধে তোমার প্রবন্ধটি পাঠ করে গোটা কয়েক প্রশ্ন মনে উদয় হয়েছে সেগুলি শিল্পের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন হিসাবে লিখে পাঠাচ্ছি গুরু-শিষ্য সবাই মিলে জনে জনে নিজের নিজের নাম সই করে প্রশ্নের সদুত্তর সত্বর আমার কাছে পাঠাবে যেন অন্যথা না হয়।

প্রশ্ন

১। গাছের গুঁড়ির উপরে একটা ফড়িং এবং গাছের গুঁড়ি হেলান দিয়ে একটা মানুষ এ দুটোকেই চিত্র হিসাবে একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য বলা ভুল না ঠিক?

২। প্রাকৃতিক দৃশ্য Landscape, Nature study ইত্যাদি জীবযুক্ত হলেই কি নিছক Landscape হয়, না জীবকে বাদ দিয়ে Landscape আছে এ বিষয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

৩। "ভারতীয় চিত্রে কোথাও দৃশ্যচিত্রের স্থান নাই" এই কথা ভুল না ঠিক লিখিয়া জানাও।

৪। "আমাদের [চিত্রে] মানুষ সামনে, প্রকৃতি পিছনে; আর জাপানীদের প্রকৃতি সামনে মানুষ পিছনে" এই উক্তির সত্যাসত্য প্রমাণ কর লিখিয়া এবং প্রকৃতি বলতে কি বোঝায় তাও নির্দ্দেশ কর।

৫। "পিউ বলল, মহারাজ অন্যেরা বীণা বাজাতে ব্যর্থ হয়েছে" এই ছত্রটিতে ভুল কোথায় আছে সংশোধন করে লেখ এবং প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন লিখিবার সময় কোথায় কোথায় বানান ভুল করেছেন সেটাও ধরে দাও।

৬। Landscapeর প্রতিশব্দ, দৃশ্যচিত্র না অপর কিছু হবে—চিত্র মাত্রেই তো দৃশ্য?

বিশেষ প্রশ্ন

একটা ছবি চীনের কি জাপানীর কি ভারতবাসীর অথবা মিশরবাসী কিম্বা সাহেবের আঁকা এটা যে সহজেই ধরা পড়ে দেখবামাত্র তাহার কারণ অনুসন্ধান কর। প্রাচীনকালেই শিল্পের মধ্যে ভিন্নজাতি হিসেবে যে রূপের ভিন্নতা হয়ে গেল এটা মানব-মনের কোন্ গোপনীয় রহস্য ব্যক্ত করছে তা বিচারপূর্ব্বক লিখে জানাও।

আজকালের দিনে জাতীয় শিল্প বলে একটা শিল্প উদ্ভব হতে পারে কিনা এ-বিষয়ে তোমার মতামত জানাও। ইতি—

প্রশ্নকর্ত্তা
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

এই চিঠির আমি একটা দীর্ঘ উত্তর দিই, এবং অনুমতি প্রার্থনা করি যে, চিত্র সম্বন্ধে এই আলোচনা কাগজে ছাপিতে চাই। তিনি ছাপার অনুমতি দেন। আমার চিঠিতে লিখিয়াছিলাম, আপনি আমার প্রবন্ধে ভুল বাহির করিয়াছেন, আপনার চিঠিতে আমি এখন কতকগুলি ভুল উল্লেখ করিতেছি। আমার চিঠির উত্তরে লেখেন—

"প্রিয় মণীন্দ্র সোমবার

আমার প্রশ্নের জবাব তুমি সহজে বেশ পরিষ্কার করেই দিয়েছ দেখে আনন্দ হ'ল তোমাকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে ধরা গেল। প্রশ্নের যদি তোমার হারও হ'ত তাতেও আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিতেম এবং কবির ভাষায় যে হার স্বীকারের কথা বলা হয়েছে সেই কথাই স্মরণ করতে বলতেম।

"তোমার সাথে বারে বারে
হার মেনেছি এই খেলাতে।"

যে artist হারতে ভয় পায় সে কোন দিন কিছু জিতে নিতে পারে না এটা তোমার সহপাঠীদের জানিয়ে দিও।

প্রশ্ন এবং উত্তরগুলো ছাপাতে চাও তো আমার আপত্তি নেই তবে আমার বানানভুলগুলো শুধরে ছাপিও।

Landscapeর ঠিক প্রতিশব্দ হল "স্থানচিত্র" আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রে কয় রকম চিত্রের কথা বলা হয়েছে

যথা (১) চিত্র (২) বন্ধ চিত্র (৩) আকার চিত্র (৪) গতি চিত্র (৫) স্থান চিত্র (৬) বর্ণ চিত্র (৭) স্বর চিত্র তোমাদের ওখানে যিনি পণ্ডিত আছেন তাঁর কাছে এই কটা রকম চিত্রের হিসেব জেনে নিও। নয়তো এখানে যখন আসবে তখন আমি বুঝিয়ে দেবো।

গরমে তোমাকে ভাবিয়েছি বলে মনে করো না। চিন্তামণি যাতে পাও তারি চেষ্টায় আছি জেনো।

সবাইকে আমার আশীর্ব্বাদ দিও।

তোমারি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমরা এইরূপে নানা ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। আমাদের সকলেরই আগ্রহ ছিল, তিনি একবার শান্তিনিকেতনে পদার্পণ করেন। বিশ্বভারতীর নিমন্ত্রণে একবার অবনীন্দ্রনাথ আসিলেন, রবীন্দ্রনাথ আম্রকুঞ্জে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন; শান্তিনিকেতনের ছাত্র শিক্ষক সকলে উপস্থিত ছিলেন। সম্বর্দ্ধনার উত্তরে অবনীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন "নন্দলাল, আমার গুরুদক্ষিণা চাই।" নন্দলালের গুরুদক্ষিণা নিশ্চয়ই শোধ হইয়াছে।

অবনীন্দ্রনাথ আর একবার শান্তিনিকেতনে আসেন, সে-বার কোনো খবর না দিয়াই আসিয়া পড়েন। স্টেশনে

বহু বৎসর পরে আজ এ-সব চিঠি প্রকাশ করিতেছি। এমন অনেক স্নেহপূর্ণ চিঠি অবনীন্দ্রনাথের নিকট হইতে লাভ করিয়াছি, সব হারাইয়া গিয়াছে, দুটি মোটে রক্ষা করিয়াছি। সবগুলি রাখিতে পারিলে এখন সম্পদ বলিয়া গণ্য করিতাম। কলাভবনে কাঠখোদাইয়ের কাজ আরম্ভ হইলে সে-সব অবনীন্দ্রনাথের কাছে পাঠানো হয়। তিনি আমাদের উৎসাহ দিয়া এক চিঠি দিয়াছিলেন, উডকাটের শাদা কালোর চিত্র অবলম্বনে একটি ছোট গদ্য কবিতা লিখিয়া দিয়াছিলেন।

কলাভবনে চিত্রের সঙ্গে কিছু কারুকর্ম্ম শিক্ষা করার ব্যবস্থা ছিল। আমি পোর্টফোলিও তৈরি করা শিখিয়াছিলাম। খুব চিত্রবিচিত্র করিয়া একটা পোর্টফোলিও তৈয়ার করিয়াছিলাম। কলাভবনের হাতের কাজের প্রদর্শনী একবার কলিকাতায় হয়। অবনীন্দ্রনাথ আমার পোর্টফোলিওটি হাতে লইয়া বলিয়াছিলেন, "এটি আমি নেব, এর মধ্যে আমার লেখা থাকবে।"

পারস্য—রাজকুমারী শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত

কেহ যায় নাই এবং গাড়ী পাঠান হয় নাই। সে-গাড়ীতে শান্তিনিকেতনের এক জন ছাত্র আসিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি করিয়া আসিয়া খবর দিল, অবনবাবু এসেছেন, স্টেশনে কেউ নেই। আমরা তৎক্ষণাৎ গাড়ী লইয়া রওনা হইলাম। মাঝপথে দেখা হইল, দেখিলাম বোলপুরের ধূলিধূসরিত পথে এবং অপরাহ্নের তীব্র রৌদ্রে একা আসিতেছেন, দ্বিজেন্দ্রনাথের ভৃত্য মুনীশ্বর ছাতা ধরিয়া সঙ্গে আসিতেছে। অবনীন্দ্রনাথ গাড়ীতে আর উঠিলেন না, আমাদের সঙ্গেই হাঁটিয়া চলিলেন। প্রথমে নিচুবাংলায় গিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিলেন। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "জ্যেঠা-মশায়, আমি এসেছি, আমি অবন।" দ্বিজেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "অবন এসেছিস, কি করে এলি, গাড়ী গিয়েছিল?" "এই তো মুনীশ্বর গিয়েছিল, ছাতা ধরেছে।"

কলাভবনের ছাত্রদের কাছে অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করেন, সিংহলের অনুরাধাপুরের বুদ্ধের মুর্ত্তি দেখাইয়া বলেন, ভারতীয় শিল্পের এটি একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ভারতীয় শিল্পের আদর্শ এই মূর্ত্তির গঠনে এবং রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সিংহকটি, নাসাগ্রদৃষ্টি, যোগাসনে উপবিষ্ট, ক্রোড়ের উপর দুই হাত ন্যস্ত, নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় ঋজুদেহে ধ্যানের মহিমা সমুজ্জ্বল—অনুরাধাপুরের শ্যামল অরণ্যে এই মূর্ত্তি পরে আমি দেখিয়াছি।

কলাভবনে অধ্যয়ন করিবার সময় সিংহলে শিল্প-শিক্ষকের কাজ লইয়া যাই। তিন বৎসর পরে সেখান হইতে ফিরিবার সময় বন্ধুবান্ধবদের বিতরণ করিবার জন্য কতকগুলি স্মারক চিহ্ন সিংহল হইতে লইয়া আসিয়াছিলাম। এক প্রকার ঘাস রং করিয়া চিত্রবিচিত্র ডিজাইন করিয়া মনি-ব্যাগ ও থলে প্রস্তুত করা হয়। দুই আনা হইতে আরম্ভ করিয়া দুই টাকা দামের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ব্যাগ ছাড়া কয়েকটি রঙীন ছড়িও আনিয়াছিলাম। অবনীন্দ্রনাথ একটি রঙীন ছড়ি ও একটি ব্যাগ উপহার গ্রহণ করিয়াছিলেন, বলিলেন, এই ব্যাগের মধ্যে আমার চুরুট থাকবে। আমার কতকগুলি ছবিও আনিয়াছিলাম, দেখাইবার জন্য। একখানা উঠাইয়া বলিলেন, "এটি আমি নেব, বল দাম কত নেবে।" আমি বলিলাম, "দাম নেবো না, আপনার আঁকা একখানা ছবি আমার চাই।" একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, কাল এস, প্যাস্টেলে তোমার একটা পোর্ট্রেট এঁকে দেবো।"

চিত্রচর্চ্চা এখন চলিয়াছে নানা খাতে, নানা পরীক্ষণের ভিতর দিয়া। ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটির উদ্যোগে আমার ছবির একক প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে কতকগুলি জল-রঙের চিত্র ছিল, যাহা বিলাতী প্রথায় spot-এ বসিয়া আঁকা। এ ছবিগুলির অঙ্কনপদ্ধতিতে কিছু অভিনবত্ব ছিল। অবনীন্দ্রনাথ এ ছবি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "মণিগুপ্ত, ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহ করছ, কিন্তু তোমার চাক কোথায়?" এ-কথার অর্থ হইল, তোমার চিত্রে নানা রকম পদ্ধতির প্রভাব রহিয়াছে; নিজের পদ্ধতি কোথায়?

আমার এ-বিষয়ে বক্তব্য শিল্পীর এক্সপেরিমেণ্ট বা পরীক্ষণের প্রয়োজন আছে। এই পরীক্ষণের ভিতরেই স্বকীয় ধারা বাহির হইবে।

দূর স্মৃতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নির্জন রোগীর ঘর। খোলা দ্বার দিয়ে
বাঁকা ছায়া পড়েছে শয্যায়।
শীতের মধ্যাহ্নতাপে তন্দ্রাতুর বেলা
চলেছে মন্থরগতি
শৈবালে দুর্বল স্রোত নদীর মতন,
মাঝে মাঝে জাগে যেন দূর অতীতের দীর্ঘশ্বাস
শস্যহীন মাঠে।
মনে পড়ে কত দিন
ভাঙা পাড়িতলে পদ্মা
বর্ণহীন প্রৌঢ় প্রভাতের
ছায়াতে আলোতে
আমার চিত্তের ধারা ভাসাইয়া চলে
ফেনায় ফেনায়।
স্পর্শ করি শূন্যের কিনারা
জেলে ডিঙি চলে পাল তুলে।
যূথভ্রষ্ট শুভ্র মেঘ পড়ে থাকে আকাশের কোণে।
সমস্ত দিনের পটে
অতি ক্ষীণ চিহ্ন দেয় কর্মের চিন্তার রেখাগুলি,
পরক্ষণে মুছে যায়।
স্বচ্ছ আনন্দের রূপ শুদ্ধ হেরি অন্তরে বাহিরে
প্রসারিত পাণ্ডু নীল আকাশের তলে।

হেথায় চাহিয়া দেখি বিরস প্রান্তর
সংসারের দায়হারা
তপ্ত শয্যাশায়া
অকর্মণ্য রোগী সম।
সঙ্গীহীন ছায়াহীন তালগাছ শূন্যে চেয়ে থাকে
দোখ সেই কৃপণের মাঝে
দীর্ঘ দিনে আপন নিরর্থক ভাবনার ছবি।

২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৪০
উদয়ন [দেশ

দিদিমণি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিদিমণি
অফুরান সান্ত্বনার খনি।
কোনো ক্লান্তি কোনো ক্লেশ
মুখে চিহ্ন দেয় নাই লেশ।
কোনো ভয় কোনো ঘৃণা কোনো কাজে কিছুমাত্র গ্লানি
সেবার মাধুর্যে ছায়া নাহি দেয় আনি'।
এ অখণ্ড প্রসন্নতা ঘিরে তারে রয়েছে উচ্ছলি',
রচিতেছে শান্তির মণ্ডলী;
ক্ষিপ্র হস্তক্ষেপে
চারিদিকে স্বস্তি দেয় ব্যেপে;
আশ্বাসের বাণী সুমধুর
অবসাদ করি দেয় দূর।
এ স্নেহ-মাধুর্যধারা
অক্ষম রোগীরে ঘিরে আপনার রচিছে কিনারা;
অবিরাম পরশ চিন্তার
বিচিত্র ফসলে যেন উর্বর করিছে দিন তার।
এ মাধুর্য করিতে সার্থক
এতখানি নির্বলের ছিল আবশ্যক।
অবাক হইয়া তারে দেখি
রোগীর দেহের মাঝে অনন্ত শিশুরে দেখেছে কি।

উদয়ন
২রা জানুয়ারি, ১৯৪১ [দেশ

প্রশ্ন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অলস মনের আকাশেতে
প্রদোষ যখন নামে
কর্মরথের ঘড়ঘড়ানি
যে মুহূর্তে থামে

এলোমেলো ছিন্নচেতন
টুক্‌রো কথার ঝাঁক
জানিনে কোন্‌ স্বপ্নরাজের
শুনতে যে পায় ডাক,
ছেড়ে আসে কোথা থেকে
দিনের বেলার গর্ত,
কারো আছে ভাবের আভাস
কারো বা নেই অর্থ
গোলা মনের এই যে সৃষ্টি
আপন অনিয়মে
ঝিঁঝির ডাকে অকারণের
আসর তাহার জমে।
একটুখানি দীপের আলো
শিখা যখন কাঁপায়
চারদিকে তার হঠাৎ এসে
কথার ফড়িং ঝাঁপায়
পষ্ট আলোর সৃষ্টি পানে
যখন চেয়ে দেখি
মনের মধ্যে সন্দেহ হয়
হঠাৎ মাতন এ কি?
কালস্রোতের তীরে ব'সে
কে দেয় আকাশ নিংড়ে,
এই যে কী সব লাফিয়ে আসে
এরা কি উচ্চিংড়ে?
বাইরে থেকে দেখি একটা
নিয়মঘেরা মানে,
ভিতরে তার রহস্য কী
কেউ তা নাহি জানে।
খেয়াল-স্রোতের ধারায় কী সব
ডুবছে এবং ভাসছে,
ওরা কী যে দেয় না জবাব
কোথা থেকে আসছে।

আছে ওরা এই তো জানি
বাকিটা সব আঁধার,
চলছে খেলা একের সঙ্গে
আর-একটাকে বাঁধার।

বাঁধনটাকেই অর্থ ব'লে
বাঁধন ছি তারা
কেবল পাগল বস্তুর দল
শূন্যেতে দিক্‌হারা।

ঐ তো হোথায় গাছ উঠেছে
ঐ যে পাখি ওড়ে,
মানুষ করে হানাহানি
এ ওর ঘাড়ে প'ড়ে।
যুগান্ত যেই মেলবে কবল
ঢুকবে বিরাট ফাঁকে,
কোথাও কিছু র'বে কি না
প্রশ্ন করব কা'কে॥

২১ পৌষ, ১৩৪৭

[শনিবারের চিঠি

সহপাঠিনী

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিস্তীর্ণ পদ্মার বুকের উপর দিয়া "গুর্খা" ষ্টীমার চলিয়াছে।

মহকুমা হাকিম সপরিবারে কর্ম্মস্থলে যাইতেছিলেন। ফার্স্ট ক্লাসের ডেকের উপরে ইজিচেয়ারে বসিয়া উভয়ে পদ্মার শোভা দেখিতেছিলেন বলা যায় না, হাতে একখানা মাসিক পত্রিকাও ছিল—যেমন করিয়াই হউক সময় কাটাইয়া দিতেছিলেন এই পর্য্যন্ত।

মিসেস্ রায় সহসা প্রশ্ন করিলেন—এই গল্পটা পড়েছ?

মিষ্টার ভবানী রায় জবাব দিলেন—ও, হ্যাঁ ওটা পড়েছি।

—এ গল্পটা কেমন লাগলো?

—ভালই।

—এর লেখক কে জান?

—না।

মিসেস রায় হাসিয়া, সম্ভবতঃ একটু গৌরবের সঙ্গেই বলিলেন—একে আমি চিনি, আলাপ আছে।

—কেমন ক'রে?

—বলছি। গল্প পড়ে লোকটা সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয়?

ভবানীবাবু পত্নীর জেরায় একটু চিন্তিত হইয়া জবাব দিলেন—লোকটা রসিক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। হিউমার-গুলি বেশ চোখা-চোখা, লেখাপড়া কিছু করেন, মানে কন্টিনেন্টাল সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান আছে।

—আর?

ভবানীবাবু আর কি বলিতে পারেন ভাবিয়া পাইতে-ছিলেন না। মিসেস রেবা রায় হাসিয়া বলিলেন—ভাল অভিনয় করতে পারেন, ছবি আঁকতে পারেন, ইংরিজি, বাংলা উভয় ভাষায় বেশ বক্তৃতা করতে পারেন—খুব স্মার্ট।

ভবানীবাবু হাসিয়া বলিলেন—আর?

রেবা রায় হাসিয়া বলিলেন—কি যে পারেন না তা বলা কঠিন।

—কিন্তু এত সংবাদ তুমি জান্‌লে কি ক'রে?

—আচ্ছা, দেখতে কেমন?

ভবানীবাবু ব্যঙ্গোক্তি করিলেন—আমার চেয়ে ভাল নিশ্চয়ই।

—না, দেখতে মোটেই ভাল নয়। আচ্ছা এর সঙ্গে পরিচয় কি ক'রে বলছি। বি. এ. পাস ক'রে স্বাবলম্বী হব মনে ক'রে কিছু কাল বি. টি. পড়তে গিয়েছিলাম ইউনিভারসিটিতে তা বোধ হয় জানো, সেই সময় তোমার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব চলছে। এই ভদ্রলোকও মাস্টার, তিনি আমার সহপাঠী, তিনিও বি. টি. পড়তে এসেছিলেন। প্রথম একদিন সোশ্যালে একটি কবিতা পাঠ করবেন 'ইস্কুল মাস্টার'—তাঁকে প্লাটফরমে উঠতে বলা হ'ল, তিনি নিজের দৈর্ঘ্য ও উপরে ঘূর্ণায়মান পাখার দিকে একবার ইঙ্গিত ক'রে বুঝিয়ে দিলেন মাথায় ঠেকে যেতে পারে।

ভবানীবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

—আমরাও সব হো হো ক'রে হেসে উঠলাম। কবিতাটিও বেশ সুন্দর হয়েছিল, সেই দিন থেকে তিনি প্লাটফরমে উঠলেই সকলে হাসত—তাঁর কবিতা নিয়ে মেয়েদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। তাঁর শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার একটা কবিতা আমিই চেয়ে নিয়েছিলাম—এমন সুন্দর হিউমারাস সে কবিতাটা—প্রিন্সিপাল পর্য্যন্ত তার একটা কাপি চেয়েছিলেন।

ভবানীবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—তার পর?

—আমাদের ছবি আঁকবার বা মডেলিং করবার জন্যে একটা ঘর ছিল, এক দিন গিয়ে দেখি তিনি বসে বসে বেশ সুন্দর একখানা ত্রিবর্ণ ছবি এঁকে ফেলেছেন। সেদিনই আমার সঙ্গে প্রথম আলাপ। আমিই প্রথম

প্রশ্ন করলুম—আপনি ত বেশ ছবি আঁকতে পারেন। আগে আঁকতেন বুঝি? তিনি বললেন—না। তবে বাল্যকালে লংক্লাম্প দিয়ে একটা কলারবক্স পুরস্কার পেয়েছিলাম, তা দিয়ে বিচিত্র বহু চিত্র এঁকেছিলাম, সেই আমার প্রথম ও শেষ অভিজ্ঞতা।

ঝড়ের মত বাতাসে রেবার কপালে একরাশ চুল আসিয়া জড়ো হইয়াছিল। রেবা সেগুলিকে খোঁপার মাঝে গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল—তার কথা বলবার ভঙ্গিই এমন যে না হেসে উপায় নেই। আমি হেসে বলেছিলাম—তবুও আপনার সাহস আছে তুলি ধরবার মত। তিনি বললেন—ভয়ের কি আছে? পরের রং, পরের কাগজ, ছবি না হয় ফেলে দিয়ে সোজা বাড়ী চলে যাব। আর বঙ্গদেশে জন্মে যদি পরের রং তুলিও কিছু না খরচ করতে পারি ত জীবনই ব্যর্থ।

ভবানীবাবু বলিলেন—এই ত প্রথম পরিচয়, তার পর ঘনিষ্ঠতা হ'ল কি ক'রে?

কথাটার মধ্যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপকে লক্ষ্য না করিয়াই রেবা বলিল—ঘনিষ্ঠতা কোন কালেই হয় নি। তার পর শোন—আমরা প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে কথা বলতুম, তিনি গম্ভীর ভাবে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বক্তব্য বলতে সুরু করতেন। কি রকম স্মার্ট জানো? এক দিন সোশ্যালে ফাঁকি দিয়ে তিনি ত আমার কাছ থেকে দুই-তিনটা প্লেট খেয়েছেন; আমি বললুম—রোজ রোজ সোশ্যাল হ'লে মন্দ হ'ত না—না? তিনি চট্ ক'রে বললেন—আপনারা যদি ছুটির পর থাকেন আমরা রোজই সোশ্যাল করতে প্রস্তুত আছি। আমি পুনরায় ব্যঙ্গ করলুম,—আপনাদের ভারি সুবিধে হ'ত, না? তিনি কি জবাব দিলেন জান?

ভবানীবাবুর কৌতূহল বাড়িয়াছিল, তিনি বলিলেন—কি?

—আপনাদেরও খুব অসুবিধে হ'ত বলে মনে হচ্ছে না।—রেবা আপন মনেই হাসিয়া উঠিল।

বেয়ারা চা দিয়া গেল।

ভবানীবাবু চা'র পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া প্রশ্ন করিলেন—তার পর?

রেবা আবার বলিয়া চলিল—কলেজে থিয়েটার হ'ল একটা কমিক বই, তাঁর প্রধান পার্ট অভিনয়ের রাত্রে তিনি হাসিয়ে হাসিয়ে সকলের পেটে খিল ধরিয়ে দিলেন। সকলেই একবাক্যে তাঁর অভিনয়ের তারিফ করলে—আমিও তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে এলাম। সোশ্যালে কখন তিনি কিছু বলবেন, ডিবেটে কি বলবেন এই জন্যে সকলে আগ্রহে প্রতীক্ষা করত—শুধু তাই নয়, তাঁর প্রস্তাব সকলেই একবাক্যে সমর্থন করত। কি ছেলেরা কি মেয়েরা সকলেই তাঁর সঙ্গ সাগ্রহে আহ্বান করতো—

রেবা চা-এর পেয়ালাটায় শেষ চুমুক দিয়া বলিল—আদিত্যবাবুর ওই গল্পটা সত্যিই খুব ভাল লাগল আর কি মনে হ'ল জান?

—কি?

—কলেজের সেই কয়েক দিনের পরিচয়ের কথা ভেবে মনে হ'ল, ভগবান্ যাকে দেন তাকে এমনি করেই দেন, যাকে দেন না তাকে কিছুই দেন না।

কি একটা স্টেশনে স্টীমার ভিড়িয়াছিল। রেবা রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতেছিল। সরু তক্তাখানির উপর মানুষ, বাক্স, পোঁটলা-পুঁটলি ভীড় করিয়া তুলিয়াছে—আগে আসিয়া স্টীমারের ডেকে একটু স্থান সংগ্রহ করিবার জন্যই এত ব্যস্ততা।

ভবানীবাবু পাশে দাঁড়াইয়া কহিলেন—তোমার সেই স্মার্ট সহপাঠীর গল্প শেষ করলে না?

রেবা ভীড়ের মধ্যে কি যেন নিবিষ্ট মনে দেখিতেছিল। সে জবাব দিল না।

ভবানীবাবু পুনরায় বিদ্রূপ করিলেন—তুমি কি কেবল তাঁর গুণগ্রাহী মাত্র?

ভীড়ের মাঝে এক ভদ্রলোক দুই হাতে দুইটি বড় সুটকেস লইয়া উঠিতেছিলেন, তাঁর পিছনে একটি মহিলা, কোলে একটি ছেলে, হাতে একটা পোঁটলা। ভদ্রলোক সুটকেসের ভার বহন করিতে আর পারিতেছেন না, নিরুপায়ের মত সে দুটি রাখিবার জন্য আর একটু স্থান করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

রেবা সাগ্রহে বলিল—ওই যে ওই ভদ্রলোক সুটকেস হাতে, ওই আদিত্যবাবু—

ভবানীবাবু বলিলেন—যাও, তাও কখনও হয়, তুমি ভুল করেছ।

—না, নিশ্চয়ই নয়—আচ্ছা দেখো, উপরে আসুন—

ভবানীবাবু বলিলেন—বেশ ত, তোমার সহপাঠীর সঙ্গে পরিচয় করে ধন্য হব আর তোমার এই গুণগ্রাহিতার কথা তাঁকে জানাবো—কিন্তু ও ভদ্রলোক লেখক কিছুতেই নয়?

ষ্টীমারের যে-স্থানটা দিয়া চোঙা উঠিয়াছে তাহার আশেপাশে খুব গরম, এই জন্য বিশেষ কেহ সেখানে বসে নাই। অন্য সব স্থানেই বেশ ভিড়; ভিড় না হইলেও যে যতখানি পারিয়াছে জায়গা দখল করিয়া রাখিয়াছে।

কথিত আদিত্যবাবু চোঙার নিকটে সুটকেস্ টুটিকে রাখিয়া, অতি দ্রুত একখানা ছেঁড়া এক টাকার কম্বল বিছাইয়া ফেলিলেন। মহিলাটি সম্ভবত তাঁহার স্ত্রী, বিছানার কোণে পোঁটলাটা রাখিয়া বসিয়া পড়িলেন। দুটি ছেলেমেয়ে তাঁহাদের পিছনে—অর্দ্ধস্খলিত ইজের, গায়ে অতি সাধারণ জামা।

আদিত্যবাবু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন—তাঁহার স্ত্রী হাসিয়া কি যেন উত্তর দিলেন। সম্ভবতঃ এই জায়গাটুকু অপ্রত্যাশিত ভাবে পাইয়া তাঁহারা খুশী হইয়াছিলেন। পোঁটলা খুলিয়া ছেলেমেয়েদের কোঁচড়ে কিছু মুড়িমুড়কি বাহির করিয়া দিয়া তাঁহার স্ত্রী কোলের শিশুটির দিকে মন দিলেন। ছেলেমেয়ে দুইটি ষ্টীমারের আপাদমস্তক দেখিতে দেখিতে এক মনে মুড়ি চিবাইয়া যাইতেছে।

ভবানীবাবু ও রেবা উভয়েই তাঁহাদিগকে দেখিতেছিলেন। ভবানীবাবু বলিলেন—তোমার আদিত্যবাবুকে ডাকি—আদিত্যবাবুই ত?

রেবা বলিল—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আদিত্যবাবু, ডাক না—

ভবানীবাবু বেয়ারাকে ডাকিতে আদেশ দিলেন। রেবা সংশয়ের সহিত বলিল—দেখ আমি যা বলেছি তা মিথ্যা নয়। তবে সাত-আট বছর আগের কথা!

ভবানীবাবু বলিলেন—সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপ ক'রে একটু ধন্য হ'তে হবে বই কি!

আদিত্যবাবু আসিলেন।

উড়িয়া চাকরে যেমন করিয়া 'দণ্ডবৎ' করে, তেমনি বিনয়ের সঙ্গে তিনি নমস্কার করিলেন।

ভবানীবাবু বলিলেন—বসুন, বসুন।

আদিত্যবাবু বসিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, রেবা বলিল—বসুন। আদিত্যবাবু অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া চেয়ারের এক কোণে জড়োসড়ো হইয়া বসিয়া পড়িলেন। রেবা চাহিয়া দেখিল—মাথার চুল অনেকগুলিই পাকিয়া গিয়াছে, মুখে দারিদ্র্য ও কৃচ্ছ্রসাধনার একটা সুস্পষ্ট ছাপ, গায়ে সাবানকাচা একটা পাঞ্জাবী, জুতার চেয়ে তার তালিই স্পষ্টতর।

ভবানীবাবু বলিলেন—আপনি আমাকে চেনেন?

আদিত্যবাবু সবিনয়ে বলিলেন—আজ্ঞে, হুজুর আপনাকে কে না জানে?

—কে বলুন ত?

—আজ্ঞে, আপনি আমাদের মহকুমা হাকিম। আপনাকে কে না জানে

—আপনার নাম?

—আজ্ঞে, আদিত্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

—কি করেন?

—এখানে একটা স্কুলে মাস্টারি করি, হুজুর আপনিই আমাদের প্রেসিডেণ্ট।

ভবানীবাবু রেবার মুখের দিকে চাহিয়া, একটু বিদ্রূপের হাসি বর্ষণ করিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—আপনি লেখেন?

আদিত্যবাবু মহা অপরাধীর মত মাথা চুলকাইয়া, ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—আজ্ঞে—

ভবানীবাবু আদিত্যবাবুর সামনে মাসিক পত্রিকা খুলিয়া বলিলেন—এ আপনার লেখা?

আদিত্যবাবু একটা অজুহাত দিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন—সামান্য মাইনে পাই—তাই—

ভবানীবাবু উচ্চহাস্যে সকলকে সচকিত করিয়া দিয়া

বলিলেন—কেন লেখেন তা' ত জিজ্ঞাসা করি নি, আর লেখাটা ত অপরাধ নয় কিছু?

—আজ্ঞে হেঁ।

রেবা এতক্ষণ শুনিয়া শুনিয়া ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে রাগ ও অভিমান পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল—রাজ্যের দৈন্য আর বিনয় এই লোকটির মধ্যে আজ বাসা বাঁধিয়াছে! অকস্মাৎ সে প্রশ্ন করিল—আপনি আমাকে চেনেন?

আদিত্যবাবু ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—আজ্ঞে হেঁ।

—কে বলুন ত?

—আজ্ঞে, মিস্ রেবা—জিব কাটিয়া নিজেকে সংশোধন করিলেন—মিসেস্ রেবা রায়।

—আমাকে কোথায় দেখেছেন মনে আছে?

—আজ্ঞে বি. টি. ক্লাসে।

রেবা ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—'আজ্ঞে' বলাটা কি আপনার মুদ্রাদোষ?

আদিত্যবাবু কোন জবাব না দিয়া চুপ করিয়াই রহিলেন। রেবা আবার প্রশ্ন করিল—সঙ্গে উনি কি আপনার স্ত্রী?

—হ্যাঁ।

—আপনারই ছেলেমেয়ে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভবানীবাবু পুনরায় হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে" বলাটা আপনার মুদ্রাদোষই আদিত্যবাবু—আদিত্যবাবু ভবানীবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া আবার নীরব হইলেন।

রেবার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক, সে পুনরায় প্রশ্ন করিল—কত মাইনে পান?

—পঞ্চাশ টাকা।

রেবা লক্ষ্য করিল, আদিত্যবাবু দুইখানি শীর্ণ শির-ওঠা হাত জোড় করিয়াই আছেন, যদিও এই বিনয় ও দৈন্য বা চাটুকারিতা এখানে প্রয়োজনীয় নয়, সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। রেবা প্রশ্ন করিল—এখন কোথায় যাচ্ছেন?

—গরমের বন্ধ শেষ হয়েছে তাই আবার ইস্কুলে যাচ্ছি।

ভবানীবাবু প্রশ্ন করিলেন—আপনি ছবি আঁকতে পারেন?

—আজ্ঞে না।

রেবা প্রতিবাদ করিল—কেন বি. টি. পড়ার সময় আপনি ত ছবি এঁকেছিলেন—সেই সময়ই আপনার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়।

—আজ্ঞে তখন একটু চেষ্টা করেছিলাম, আঁকতে আমি কোন দিনই পারি না।

—সে ছবি ত আপনার বেশ হয়েছিল।

আদিত্যবাবু একটু ম্লান হাসিয়া বলিলেন—আজ্ঞে সে কি আর ছবি!

ভবানীবাবু বলিলেন—যা হোক্, এখনও লেখেন তা হ'লে নিয়মিত?

—আজ্ঞে না, টিউসনি করতে হয়, আর লেখারও কিছু খুঁজে পাই না, তাই কদাচিৎ—

—এখন থিয়েটার অভিনয় করেন না?

আদিত্যবাবু ম্লান হাসিয়া নীরব রহিলেন, কোন জবাব দিলেন না। ক্ষণিক পরে একটু মৃদু দীর্ঘশ্বাস নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিয়া বাহিরের দিকচক্রবালের দিকে উদাস দৃষ্টিতে একবার চাহিলেন মাত্র।

—আপনাকে ডেকে এনে এমনি প্রশ্ন করায় আপনি কিছু মনে করেন নি ত?

আদিত্যবাবু হাত দুইটি একসঙ্গে করিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—না, না তা কখনও হয়, এ আমার পরম সৌভাগ্য।

—আপনারই গল্প পড়তে পড়তে আপনার প্রসঙ্গ আলোচনা হচ্ছিল, ইতিমধ্যে আপনিও ভাগ্যচক্রে এসে উপস্থিত। ইঙ্গিতে পত্নীকে দেখাইয়া বলিলেন, ইনি ত আপনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিলেন, তাই আলাপ করবার আগ্রহ দমন করতে পারি নি।

অকস্মাৎ ষ্টীমারের বাঁশী বিকট স্বরে বাজিয়া উঠিল। আদিত্যবাবু চমকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রেবা মনে মনে পরাজয়ের বেদনা বোধ করিতেছিল, সে বলিল—আপনার প্রশংসা ক'রে আমি অন্যায় করি নি নিশ্চয়ই—বহু দিন পরে হঠাৎ দেখা হ'ল।

আদিত্যবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিয়া বলিলেন—এই স্টেশনেই নাম্‌তে হবে, যদি—

নমস্কার করিয়া তিনি বিদায় লইলেন।

আবার আদিত্যবাবু সস্ত্রীক পোঁটলাপুটলি বাঁধিতে লাগিয়া গেলেন। রেবা অনিচ্ছাকৃত ভাবে সেই দিকে চাহিয়া ছিল। আদিত্যবাবুর স্ত্রী পিছন ফিরিয়া কি যেন দেখিলেন। আধ হাত ঘোমটা টানিয়া দিয়া কি যেন একটা বলিলেন।

রেবার মনে পড়ে, কলেজে থিয়েটারের দিনে আদিত্য বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিবে বলিয়া সে তাঁহাকে লইয়া আসিতে অনুরোধ করিয়াছিল। এক দিন এই মহিলাটির সম্বন্ধে কি কৌতূহলই ছিল!

ভবানীবাবু বলিলেন—তোমার আদিত্যবাবু যদি এই হয়, তবে বলতে হবে এ তার প্রেতাত্মা!

রেবা ভাবিতেছিল—আট বৎসর পূর্ব্বে কলেজ ছাড়িয়া আসিবার পর কোন দিনই ত এই লোকটির কথা কোনও প্রসঙ্গে তাহার মনেও পড়ে নাই তবুও তাঁহারই জন্যে এই সহানুভূতি, এই করুণা তাহার মনের কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশে সঞ্চিত হইয়াছিল! এই জগৎ কি এতই নিষ্ঠুর যেখানে এমনি পরিবর্ত্তন হওয়াও সম্ভব!

আবার ষ্টীমার ভিড়িয়াছে। সরু তক্তার রাস্তাটির উপর আবার ভিড় হইয়াছে,—যাত্রী, কুলি, বাক্স-পেটরা, মাল সব একত্রে মিশিয়া পথটুকুকে দুর্লঙ্ঘ্য করিয়া তুলিয়াছে। আদিত্যবাবু আবার দুইটি স্যুটকেস্-হাতে চলিয়াছেন, পিছনে তাঁহার স্ত্রী শিশু-কোলে ও পোঁটলা-হাতে। পিছনে অর্দ্ধনগ্ন পুত্র-কন্যা—ভিড়ের মধ্যে অসহায়ের মত মাঝে মাঝে এদিক ওদিক চাহিতেছে।

রেবা আবার তাহাই দেখিতেছিল।

একটা কুলি আদিত্যবাবুর হাতের স্যুটকেস দুইটি লইতে চাহিল, আদিত্যবাবু অত্যন্ত বিরক্তির সহিত তাহাকে দাঁতমুখ খিঁচাইয়া ধমক দিলেন। মায়ের আঁচল ধরিয়া ছেলেমেয়ে দুটি বিকৃত ভয়ার্ত্ত মুখেই চলিয়াছে।

ভবানীবাবু একটা সিগারেট ধরাইয়া ব্যঙ্গ করিলেন—কি তোমার স্মার্ট সহপাঠীর প্রস্থান দেখছ?

সহানুভূতিই হউক, করুণাতেই হউক, বা ব্যঙ্গেই হউক রেবার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। স্বামীর প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়াই সে তাড়াতাড়ি ক্যাবিনে গিয়া ঢুকিল।

যে সুধা পিয়েছি

শ্রীমমতা ঘোষ

যে সুধা পিয়েছি প্রথম মিলন-রাতে
তোমায় আমায় পুলকেতে দুজনাতে।
সে মদির নেশা গেছে আজি টুটে জানি;
দাও ভ'রে দাও আবার পেয়ালাখানি।
সোহাগ-প্রদীপ এখনি নিবাতে হবে?
মোহের আগুন জ্বালাও জ্বালাও তবে।

তৃষিত হৃদয়ে এখনো জাগিয়া আছি,
থাকিতে চাহি যে আজো সেই কাছাকাছি।
তোমার মাঝারে ডুবে থাকা সব ভুলে,
আপনারে দেওয়া প্রিয়ের চরণ-মূলে।
এখনো যায় নি জীবনের মধুমাস,
প্রাণবধূ সাজে করিয়া মিলন আশ।

হাতটি বাড়ায়ে খুঁজি বৃথা হাত তব,
এ-আঁধার মাঝে কত কাল আর রব?
বন্ধ আজিকে মুখোমুখি চেয়ে থাকা,
মরমের কথা নয়নে না রহে আঁকা।
অন্তরে খুঁজি, খুঁজি বাহিরেতে দূরে,
সবখানে খুঁজে ফিরি প্রিয় বন্ধুরে।

মাথার উপর স্তব্ধ আকাশখানি,
তারায় তারায় চলে শুধু কানাকানি।
এখনো তো বলা হয় নাই সব কথা,
তারি লাগি মনে জাগে মোর ব্যাকুলতা।
হৃদি-মঞ্জুষা ভরিয়া সুরভি মধু
জাগিয়া স্বপন দেখিছে মুগ্ধা বধূ।

আভিজাত্য

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

১

গুড়ুম্! গুড়ুম্! গুম্!

মধ্যাহ্ন-আহারের পর তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে বন্ধুর সহিত গল্প করিতেছিলাম। বন্দুকের শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম, "হঠাৎ বন্দুকের শব্দ কেন?"

বন্ধু বলিলেন, "ঘাব্‌ড়ো না, ভাই! তোমরা সাহিত্যিক, সাংবাদিক, পাড়াগাঁয়ে এ রকম বন্দুকের শব্দ শুনলে চমকে ওঠ কেন? জমিদারবাবুর গৃহিণী আমাদের বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পদধূলি দিয়েছেন, তাই সকলকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।"

প্রায় দুই যুগ দেশ ছাড়া, সুতরাং দেশের পরিবর্ত্তনের বিশেষ সংবাদ রাখিতাম না। কিন্তু বাল্যকালে বা কৈশোরে গ্রামের জমিদারবাবুদের দেখিয়াছি। প্রবল-প্রতাপ জমিদারের অনেক কীর্ত্তিকাহিনীর সহিত পরিচিতও ছিলাম, কিন্তু নিমন্ত্রণরক্ষায় জমিদার বা জমিদার-গৃহিণীর আগমনে—অবশ্য অনেকে রূপার থালা গেলাস বাটি প্রভৃতি সঙ্গে আনিলেও—এমন বন্দুকের শব্দ শুনিবার সুযোগ কখনও হয় নাই। এরূপ ব্যবস্থার প্রচলনের সংবাদও কখনও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

কৌতুকপূর্ণ স্বরে বলিলাম, "কত দিন থেকে এমন ব্যবস্থা চলেছে?"

বন্ধু বলিলেন, "নতুন জমিদার রাজপাটে বসবার কিছু দিন পরেই এই ব্যবস্থা। কেন, কলকাতার বাড়ীতেও এই রকম প্রথা চলে আসছে। তুমি ত শ্রীযুত বলাইচন্দ্র চৌধুরী বাবুকে চেন! কখনো তাঁর বাড়ীতে যাও নি কি?"

জমিদার বলাই চৌধুরীকে আমি চিনিতাম। আমার অপেক্ষা বয়সে তিনি ছোট। আমার সাংবাদিক পদের খ্যাতি ও সাহিত্যিক প্রতিপত্তির জন্য তিনি আমাকে খাতিরও করিতেন। নিমন্ত্রণের মজলিসে বার-কয়েক তাঁহার সহিত আমার দেখাশুনাও হইয়াছে; কিন্তু কোন নিমন্ত্রণ-গৃহে তাঁহার শুভাগমন-সংবাদ বিঘোষিত করিবার জন্য বন্দুকের শব্দ কখনও শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

বন্ধুকে সে-কথা বলিলাম।

তিনি বলিলেন, "না, না, বলাই চৌধুরী সেদিকে খুব হুঁশিয়ার। কলকাতার বাড়ী থেকে বেরোবার সময় বা ফিরে আসবার সময়ই চোপদার বন্দুক ছোঁড়ে। বড় বড় লোকের বাড়ী গিয়ে সে ধৃষ্টতা প্রকাশ করবার সাহস হয় না। কিন্তু গ্রামে তিনি মহাপ্রতাপান্বিত জমিদার। এখানে নিজের পদমর্য্যাদা দেখানোর লোভ তিনি সংবরণ করতে পারেন না!"

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে—যখন নূতন করিয়া মানবসমাজের ব্যবস্থা ও অবস্থার পরিবর্ত্তনের প্রচেষ্টা চারি দিকে চলিতেছে, সেই সময় এক জন সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত বাঙালীর এই প্রকার হাস্যকর মনোবৃত্তির পরিচয়ে সত্যই মন অত্যন্ত বিরূপ হইয়া গেল। শ্রীযুক্ত বলাই চৌধুরী কংগ্রেসের দলভুক্ত বলিয়াই জানিতাম। কংগ্রেসের ছাড়েই তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এক জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার সামাজিক জীবনে এই প্রকার সম্ভ্রম প্রকাশের ব্যবস্থায় যে নির্লজ্জতার পরিচয় প্রকট হইয়া উঠে, তাহা বুঝিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি তাঁহার থাকা উচিত। তিনি নিজেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি পাইয়াছেন।

বন্ধুর পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে গ্রামে না আসিয়া পারি নাই। শুধু বাল্য-বন্ধু নহে, আমার সতীর্থ এবং দীর্ঘ-কালের সঙ্গী। কিন্তু গ্রামের অবস্থা দেখিয়া সুখী হইতে পারি নাই। দুই যুগ পূর্ব্বে গ্রামের যে শ্রী-সম্পদ দেখিয়াছিলাম, তাহা নাই। আমাদের মহকুমার মধ্যে আমাদের এই গ্রামই বিশেষ সম্পন্ন ও শ্রীবৃদ্ধিশালী ছিল। অসংখ্য

দ্বিতল অট্টালিকা গ্রামের শোভা বর্দ্ধিত করিত। কয় বৎসরে তাহাদিগের অধিকাংশই নষ্ট-শ্রী হইয়া গিয়াছে। বলাই চৌধুরীর প্রপিতামহ কলিকাতা হইতে আমাদের গ্রাম পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত পথ তৈয়ার করিয়া দিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে রাজা উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, আজ তাহা শ্রীভ্রষ্ট। গ্রামে মিউনিসিপ্যালিটি আছে, কিন্তু তথাপি প্রকাণ্ড গ্রামখানির অনেক স্থানই জঙ্গলাকীর্ণ।

প্রবাদ আছে, বলাই চৌধুরীর প্রপিতামহ ইংরেজ-আমলের প্রথম যুগে রাজদরবারে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধির সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। এক বার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তিনি লক্ষ টাকার বিনিময়ে নাকি প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

মনের মধ্যে প্রাচীন কাহিনীগুলি চলচ্চিত্রের ছবির মত দেখা দিয়া গেল। মনে পড়িল, বলাই চৌধুরীর পরলোকগত পিতা আমাদের বাসায় আসিয়া এক বার আমাকেই হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিয়া কানের ব্যথা সারাইয়া দিয়াছিলেন। সে-যুগের জমিদারদিগের আচার-ব্যবহারের সহিত বর্ত্তমান কালের শিক্ষিত জমিদারদিগের ব্যবহারের পার্থক্য মনকে পীড়িত করিয়া তুলিল।

বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবুদের অতিথিশালায় এখন অতিথি আসে?"

বন্ধু সবিস্ময়ে বলিলেন, "অতিথিশালা!—সে ত অনেক দিন বন্ধ হয়ে গেছে। বলাইবাবু বাজে ব্যয় একেবারে তুলে দিয়েছেন। অতিথিশালা এখন চাবিবন্ধ। মাঝে স্কুলের ছেলেরা সেখানে থেকে পড়াশোনা করত। সে পাঠও এখন নেই। আগে এখানকার বাড়ীতে দশ-বারটি গরীবের ছেলেকে অন্নদান ও বিদ্যাদানের ব্যবস্থা ছিল। এখন ও সকল বাজে খরচ বন্ধ করা হয়েছে।"

চমৎকার!

প্রশ্ন করিলাম, 'বলাইবাবুর জমিদারীর আয় এখন কত?"

মৃদু হাসিয়া বন্ধু বলিলেন, "শুনতে পাই লাখ-দেড়েক। এও কানে আসে যে, তাতে তাঁর নাকি কুলোয় না।"

গুড়ুম্, গুড়ুম্, গুম্!

বন্ধু বলিলেন, "জমিদার-গৃহিণী চলে যাচ্ছেন! জনসাধারণকে সতর্ক ক'রে দেওয়া হচ্ছে!"

বলিয়া ফেলিলাম, "বারুদের জন্য যে বাজে ব্যয় হয়, সেটা বন্ধ ক'রে দিলে ত কিছু খরচ বাঁচে?"

বন্ধু হাসিয়া বলিলেন, "ওটা আভিজাত্যের খাতে খরচ। ও কি বন্ধ করা চলে? তুমি কি রকম সাহিত্যিক হে? সহজ কথাটা বুঝতে পার না!"

নাঃ, নির্ব্বাক থাকিতেই হইল।

২

জামাতা বাবাজীবন পশ্চিমে থাকেন। সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন। শহরতলীতে পূর্ব্বপুরুষের এক খণ্ড জমি আছে। জমিদার শ্রীযুক্ত বলাই চৌধুরীর পূর্ব্বপুরুষরা জামাতা বাবাজীবনের পিতাকে সেই জমিখণ্ড দান করিয়া যান। দলিলপত্র সবই ঠিক আছে। এবার জমির দখল লইয়া তথায় একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করাই জামাতা বাবাজীবনের অভিপ্রেত। তিনি কয়েক বার জমিদার মহাশয়ের কলিকাতার বাড়ীতে হাঁটাহাঁটি করিয়াছেন, কিন্তু জমিদারবাবুর দেখা পান নাই। ম্যানেজার সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, শুধু জমিদারবাবুর বাচনিক আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

বিজনবিহারী বলিলেন, "আপনি যদি একবার আমার সঙ্গে যান, তা হ'লে বলাইবাবুর সঙ্গে দেখা হ'তে পারে। শুনেছি, আপনাকে তিনি জানেন এবং খাতিরও করেন।"

বলিলাম, "কোন আপত্তি নেই। চল আজই যাই। এখন ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন নেই, দেখা হ'তে পারে।"

যথাসময়ে জমিদারবাবুর প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় প্রবেশ করিলাম। সেরেস্তায় দেওয়ানজী অথবা ম্যানেজারবাবু কর্ম্মচারিবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হইয়া কাজ করিতেছিলেন। আমার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি চান?"

শ্রীযুক্ত বলাইবাবুর সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন আছে বলিলাম। বিজনবিহারী তখন বাহিরে কাহার সহিত কথা কহিতেছিল।

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া দেওয়ানজী বলিলেন, "এখন ত বাবুর সঙ্গে দেখা হবে না। এ সময় তিনি বাইরের কারও সঙ্গে দেখা করেন না। এখন তাঁর পড়াশোনা আর অন্তরঙ্গদের সঙ্গে আলাপ করবার সময়।"

বিরক্তি গোপন করিয়া বলিলাম, "তাঁর সঙ্গে কখন দেখা হ'তে পারে? একটু বৈষয়িক কাজ আছে।"

কাগজপত্রের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেওয়ানজী বলিলেন, "ও-বেলা—সেই তিনটের সময়। ৩টা হ'তে ৪টা পর্য্যন্ত তিনি নীচে নামেন। সেই সময় সরকারী কাজ তিনি দেখেন তাও এসেম্ব্লী থাকলে বন্ধ।"

বিজনবিহারী এই সময় আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

দেওয়ানজী মুখ তুলিয়া চাহিতেই, বিজনবিহারী তাঁহাকে ক্ষুদ্র নমস্কার করিল।

দেওয়ানজী বলিলেন, "এই যে বিজনবাবু এসেছেন। কিন্তু ক'দিনের মধ্যে বাবুর সঙ্গে দেখা করেই উঠতে পারি নি।"

গম্ভীর ভাবে পকেট হইতে একখানা কার্ড বাহির করিয়া লইয়া বলিলাম, "অনুগ্রহ ক'রে এখানা একবার বলাই বাবুর কাছে পাঠিয়ে দেবেন?"

অপ্রসন্নমুখে দেওয়ানজী হাত বাড়াইয়া কার্ডখানি লইলেন।

অকস্মাৎ তাঁহার মুখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। চেয়ার ছাড়িয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন, "ওঃ! আপনি অবিনাশবাবু! বসুন, বসুন!" বলিয়া একখানা কেদারা আগাইয়া দিলেন।

আমি যে প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজ করিতাম, তাহার নাম ও পদবী কার্ডে মুদ্রিত ছিল।

স্পষ্টবক্তা বলিয়া চিরদিনই আমার দুর্নাম ছিল। সুযোগ বুঝিয়া তাহার প্রয়োগে বিন্দুমাত্র কৃপণতা করিলাম না। বলিলাম, "আপনাদের সেরেস্তার নিয়ম, মানুষ বুঝে শিষ্টাচার প্রকাশ করতে হয় বুঝি?"

বিরলকেশ মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে দেওয়ানজী বলিলেন, "না, না, কি বলছেন, অবিনাশবাবু। আপনি আমাদের দেশের এক জন স্বনামধন্য—"

বাধা দিয়া বলিলাম, "আমার সময় বড় অল্প। অনুগ্রহ ক'রে কার্ডখানা বাবুর কাছে পাঠিয়ে দিন।"

শশব্যস্তে দেওয়ানজী ডাকিলেন, "ওরে রামা!—না থাক্, আমি নিজেই যাচ্ছি।"

লম্বোদরবাবু মুহূর্ত্তমধ্যে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

কাছারির আমলারা সবিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে দেওয়ানজী মহাশয়ই দ্রুতপদে নামিয়া আসিয়া সমাদরে আমাকে আহ্বান করিলেন।

বিজনবিহারীকে আমার অনুবর্ত্তী হইতে ইঙ্গিত করিলাম। দেওয়ানজীর ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়া বলিলাম, "এটি আমারই জামাতা।"

সুসজ্জিত, সুপ্রশস্ত কক্ষে উপস্থিত হইবা মাত্র জমিদার রায় বলাইচন্দ্র চৌধুরী সুখসেব্য আসন ত্যাগ করিয়া আমাকে সমাদরে আহ্বান করিলেন।

"কি সৌভাগ্য! অবিনাশবাবু, আপনি এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন—ভারি আনন্দ হচ্ছে।"

"কিন্তু ধুলো পায়েই বিদায় নেবার ব্যবস্থা হচ্ছিল, বলাইবাবু!"

দেওয়ানজী মহাশয় মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

বলাইবাবু বলিলেন, "কেন বলুন ত?"

"শুনলাম, বেলা ৩টার আগে কোন বৈষয়িক কাজেই আপনি মন দেবার অবকাশ পান না। কিন্তু আমাদেরও ত কাজ আছে। সাধারণের সেবক আমরা।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়! আপনারা দেশের মহৎ কাজে মাথা দিয়েছেন। আপনাদের সময়ের দাম আছে বইকি! কি দরকার বলুন ত?"

প্রয়োজনের কথা বলিলাম।

কুণ্ঠিতভাবে বলাইবাবু বলিলেন, "বিজনবাবু আপনার জামাই তা ত জানতাম না! বেশ! দেওয়ানজী মশাই, ওঁদের জমিটা আজই পিলপেবন্দী ক'রে আলাদা ক'রে দেবেন। আর ফেলে রাখবেন না, বুঝেছেন?"

"যে আজ্ঞে!" বলিয়া দেওয়ানজী মহাশয় সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন।

"অবিনাশবাবু, দয়া করে যখন এসেছেন, একটু চা—"

হাসিয়া বলিলাম, "আমরা চা-পর্ব্ব শেষ করেই এসেছি। এখন আর ওসব হাঙ্গামা করবেন না।"

পারিষদবর্গ—হ্যাঁ। বন্ধুর দল নহে, স্তাবকের দলই বটে। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "সে কি হয়! বাবুর বাড়ী এসেছেন, শুধু মুখে—"

হাসিয়া বলিলাম, "আপনারা পাঁচ জন আছেন, সে ত্রুটি আপনারা অনায়াসে সংশোধন করে নিতে পারবেন।"

কথার মোড় ঘুরাইয়া বলাইবাবু বলিলেন, "আজকাল আপনার কোন নতুন বই বেরুল?"

"গত বড়দিনের সময় একখানা বেরিয়েছে। আগামী পূজায় আর একখানা বেরোতে পারে। আচ্ছা বলাইবাবু, ঐ বাড়ীটা আপনাদের অতিথিশালা ছিল না, আর পাশের বাড়ীতে স্কুলের ছেলেরা পড়ত না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। বাবার আমল পর্য্যন্ত সে ব্যবস্থা ছিল।"

"এখন বুঝি তুলে দিয়েছেন? দেশের বাড়ীতেও সেই ব্যবস্থা হয়েছে দেখে এলাম।"

পারিষদবর্গের মুখের দিকে তাকাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলাইবাবু বলিলেন, "যে দিনকাল পড়েছে, অবিনাশবাবু তাতে অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। ছেলেরা লেখাপড়া শিখে খালি হুজুগ নিয়ে থাকবে—অসহযোগ করবে! সে-জন্য অর্থ ব্যয় করার মানে অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া।"

"খুব সত্য কথা। আর এই সব স্কুল-কলেজের ছেলেরাই কংগ্রেসের মেরুদণ্ড। আপনি ত কংগ্রেস দলেরই একজন না? তা বেশ করেছেন। দৃষ্টান্ত আপনারা না দেখালে কে দেখাবে বলুন!"

বলাইবাবু বোধ হয় বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, আমার কথাগুলি আন্তরিকতাপূর্ণ, না উপহাস। কথার মোড় ঘুরাইয়া লইয়া বলিলাম, "আপনার বাবার আমলে একখানা ব্রুহামগাড়ী ছিল দেখেছি। সেটা বুঝি নেই? ওহো! ঐ ত গ্যারেজ দেখা যাচ্ছে। মোটর করেছেন বুঝি?"

মৃদু হাসিয়া বলাইবাবু বলিলেন, "এটা গতির যুগ। ঘোড়া এখন মোটরের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না।"

"খুব খাঁটি কথা। তিনখানা মোটর রেখেছেন দেখছি। বেশ! বেশ!"

কুণ্ঠিতভাবে বলাইচন্দ্র চৌধুরী বলিলেন, "একখানা ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজে নিয়ে যায়, একখানা গৃহিণীর আর বাকিখানা আমার নিজের জন্য।"

অতিকষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিয়া বলিলাম, "ভারী চমৎকার ব্যবস্থা। অর্থ ও সময়ের মূল্য যারা বোঝে, তারা আপনাকে প্রশংসা করবে। আচ্ছা, আজ তবে আসি।"

৩

গুরু পরিশ্রমে শরীর ও মন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামের অবসর খুঁজিতেছিল। মাসখানেক দেওঘরে বেড়াইতে যাইব বলিয়া ব্যবস্থা করিতেছিলাম। যত দিন বাঁচিব কাজ আমাকে রেহাই দিবে না। সুতরাং নানাবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও নিশ্বাস ফেলিবার অবসর খুঁজিয়া লইতেই হইবে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে দেওঘরে পুরণদহের ভাড়াবাড়ীতে উঠিলাম। পূর্ব্বে আরও কয়েক বার দেবগৃহের উদার উন্মুক্ত আকাশতলে অবসর-জীবন যাপন করিয়া গিয়াছি। সাঁওতাল-পরগণার এই স্থানটি আমার কাছে খুবই ভাল লাগে।

প্রথম দিনটি বাজারহাট করিতেই কাটিয়া গেল—বেড়াইতে যাওয়া হইল না। পাণ্ডা হরিমোহন ঠাকুর অনেক বিষয়ে সাহায্য করিলেন। তিনিই আমাদের জন্য বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন।

পরদিবস প্রভাতে চা পানের পরই গৃহিণীকে লইয়া নন্দনপাহাড়ের দিকে চলিলাম। পাহাড় তাহাকে বলা যায় না—টিলা বলিলেই চলে। কয় বৎসরে বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। নন্দনপাহাড়ের দিকে ধূ ধূ যে-মাঠ ছিল তাহার মধ্য দিয়া প্রশস্ত পথ। পথের দুই ধারেই অনেকগুলি সুদৃশ্য অট্টালিকা।

শীতের বাতাস খুব মধুর লাগিতেছিল। গৃহিণীর সহিত পুরাতন দৃশ্যের আলোচনা করিতে করিতে চলিতেছিলাম।

সহসা পার্শ্বের একটি ছোট বাড়ীর দ্বারপথ হইতে কে ডাকিল, "কাকাবাবু! কাকাবাবু!"

সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম রাজকুমার দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

বলিলাম, "তুই এখানে, রাজকুমার?—এই বাড়ীতে?"

রাজকুমার আমার পিসতুত ভ্রাতার পুত্র। তাহার স্ত্রী মাধুরী আমার বাল্যবন্ধুর কন্যা।

উভয়েই থমকিয়া দাঁড়াইলাম। দ্বারপ্রান্তে মাধুরীর চেহারাও আবির্ভূত হইল।

রাজকুমার আমার ও গৃহিণীর পদধূলি লইয়া বলিল, "আজকাল এই বাড়ীতেই আছি, কাকাবাবু। আপনি কবে এলেন?"

"কাল এসেছি। তোরা এখানে আছিস জানলে ভালই হ'ত। আমি ত শুনেছিলাম, মাধুরীর খুব অসুখ, তোরও শরীর ভাল নয়। তোরা পশ্চিমে ঘুরে বেড়াচ্ছিস। তা, এ বাড়ীতে কেন? তোদের 'শ্রীভিলা' ছিল না?"

বিষণ্ণ করুণ মুখে রাজকুমার বলিল, "ছিল, কিন্তু আর নেই। কাকীমা, ভিতরে একটু বসবেন চলুন—সব বলছি।"

রাজকুমারের সে কন্দর্পকান্তি নাই দেখিয়া মন অত্যন্ত বিরূপ হইয়া গেল। তাহার ঋজু দেহ কুব্জতায় ন্যুব্জ হইয়া পড়িয়াছে। প্রসন্ন আননে অত্যন্ত করুণ বেদনার চিহ্ন।

গৃহিণীকে লইয়া ছোট বাসার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। মাধুরী উভয়েরই পদধূলি লইয়া বলিল, "আপনারা কাল এসেছেন বুঝি জ্যেঠামশাই?"

রাজকুমারের কাছে আমি কাকাবাবু, আর মাধুরী-মার কাছে এখনও আমি জ্যেঠামশায়!

মাধুরীরও তপ্তকাঞ্চন গৌরবর্ণ আর নাই। দীর্ঘকাল পশ্চিমের জল-বায়ুতে উভয়ের কাহারও স্বাস্থ্য ভাল হয় নাই। রাজকুমারের কাছে শুনিলাম, মাধুরী-মার বাঁচিবার আশা ছিল না। বহু অর্থব্যয়ে তাহার জীবন রক্ষা হইয়াছে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা সে এখন অনেক ভাল আছে। তবে রাজকুমারকে হাঁপানিতে ধরিয়াছে। তাই ডাক্তারের উপদেশ—তাহাকে শুষ্ক স্থানে থাকিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে অল্প অর্থে সাঁওতাল-পরগণা ছাড়া অন্যত্র বাস করার সুবিধা তাহাদের নাই।

সত্যই বিস্মিত হইলাম। আমার পিসতুত ভ্রাতা ছোট-খাট জমিদার ছিলেন। বিষয়ের মুনাফা পাঁচ-ছয় হাজার টাকা। দেওঘরেও "শ্রীভিলা" নামক বিশ-বাইশ বিঘা জমির উপর বাগান ও অট্টালিকা। তাহা ছাড়া অন্যান্য অনেক কিছু সম্পদ তাঁহার ছিল।

প্রকৃতপ্রস্তাবে দীর্ঘকাল আমি দেশে যাই নাই। একই গ্রামে আমাদিগের বাড়ী। নিজের কাজের ঝঞ্ঝাটে কাহারও সন্ধান লইতে বড় একটা পারিতাম না। বছর-দশেকের মধ্যে রাজকুমারদের সঙ্গে এক বার মাত্র আমার কলিকাতায় দেখা হইয়াছিল। আমাদের বাড়ীতেই সে সস্ত্রীক সে-বার উঠিয়াছিল। তখন পীড়িতা মাধুরীকে লইয়া ডাক্তারের উপদেশে সে কাশ্মীর যাইতেছিল। তাহার পর বিরল চিঠিপত্রে তাহাদিগের যতটুকু সংবাদ পাইয়াছিলাম, তাহাতে জানিয়াছিলাম, স্বাস্থ্যের জন্য দীর্ঘকাল তাহাদিগকে পশ্চিমে থাকিতে হইবে।

রাজকুমার সংক্ষেপে যাহা বলিল, তাহাতে বুঝিলাম, কিছু কাল পূর্ব্বে একটা ব্যবসায় উপলক্ষে তাহার বহু অর্থ ক্ষতি হইয়াছিল। তাহার ফলে মোটা টাকার ঋণ তাহার উপর চাপিয়া বসিয়াছিল। মাধুরী-মার কঠিন পীড়ার জন্য পরে জমিদারী প্রভৃতি বন্ধক রাখিয়া বলাইচন্দ্র চৌধুরীর নিকট অনেক টাকা সে লইয়াছিল। জ্ঞাতি সরিক অসময়ে তাহাকে টাকা ধার না দিলে সে মাধুরীর জন্য অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য চিকিৎসার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিত না। এজন্য সে বলাইবাবুর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

সুদে-আসলে ঋণের অঙ্ক চক্রবৃদ্ধির হারে বর্দ্ধিত হইয়া গেলে বলাইবাবু তাহাকে ঋণের দায় হইতে মুক্তি দিয়াছেন। তবে তাহার সমগ্র জমিদারীর সওয়া পাঁচ আনার মালিকানী স্বত্ব বলাইবাবুকে বিক্রয় করিতে হইয়াছে। অবশ্য তখন মহাজনী আইন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হয় নাই। ঋণসালিসী বোর্ডের প্রতিষ্ঠাও হয় নাই। সেই সঙ্গে দেওঘরের "শ্রীভিলা"ও বলাইবাবুর ঐশ্বর্য্য সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। তবে দেশের পৈতৃক ভিটাবাড়ীটা তিনি ছাড়িয়া দিয়াছেন। সেই সঙ্গে সমগ্র জমিদারী প্রভৃতির বিনিময়ে সে নগদ তিন হাজার টাকাও পাইয়াছিল। সেই টাকায় সে দেওঘরের এই ছোট

বাড়ীটা তৈয়ার করিয়াছে। দুইটি অংশের এক ভাগে তাহারা বসবাস করিতেছে। অপর অংশটি হইতে যে ভাড়া পাওয়া যায় তাহাতে তাহাদের ক্ষুদ্র সংসার কোন মতে চলিয়া যায়। ছোট দুইটি ছেলে ও একটি মেয়ে দেওঘরের বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিতেছে।

স্তব্ধভাবে রাজকুমারের কাহিনী শুনিয়া ক্ষোভে দুঃখে অন্তর পূর্ণ হইল। দেশের স্বনামধন্য জমিদার, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, দেশভক্ত সুশিক্ষিত কংগ্রেস সেবক বলাইবাবু তাঁহার জ্ঞাতির সর্ব্বস্ব এত অল্পমূল্যে গ্রাস করিয়া যে-কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, সেজন্য নিজের জন্মভূমি এবং স্বজাতীয় এক জন বাঙালীর জন্য নিজেকেই ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হইল।

বলিলাম, "সম্প্রতি ফ্লাউড কমিশন জমিদারীর যে মূল্য নির্দ্ধারণ করেছেন, তা নিতান্ত অসঙ্গত হলেও, তোমার সমগ্র ঋণের পরিবর্ত্তে তিন হাজারের স্থানে অন্ততঃ পঁচিশ হাজার টাকা তোমার সঙ্গত প্রাপ্য ছিল।"

ম্লান হাসি হাসিয়া রাজকুমার বলিল, "তা জানি কাকাবাবু। কিন্তু আমার রুগ্ন শরীর নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা করা অসম্ভব। বিশেষতঃ বলাইবাবুর বাঁধা উকীল এটর্ণীদের সেরেস্তার সঙ্গে পাল্লা দেবার মত শক্তিও আমার নেই। তাই পিতৃপুরুষের সর্ব্বস্ব বলাইবাবুকে নামমাত্র মূল্যে অর্পণ ক'রে ভগবানের বিচারের উপরই নির্ভর ক'রে আছি।"

গৃহিণীও নীরবে এই করুণ কাহিনী শুনিতেছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এ-যুগে ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানই বহে বেড়ান। অভাগার বোঝার দিকে কেউ চায় না।"

মিথ্যা, অসত্য, জুয়াচুরি, ভণ্ডামি ও দম্ভের সাফল্য-লাভের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দৃষ্টির সম্মুখে জলজল করিতেছিল; কিন্তু মন তথাপি তাহাতে সায় দিতে চাহে না। চিরন্তন সংস্কার ও বিশ্বাস গৃহিণীর সিদ্ধান্তকে মানিয়া লইতে চাহিল না। তথাপি বলিতে হইল, "তাই ত দেখছি!"

রাজকুমারকে প্রশ্ন করিলাম, "শ্রীভিলা কি এখন চাবিবদ্ধ?"

সে বলিল, "না কাকাবাবু। বলাইবাবুরা এখন ওখানে এসেছেন। আজকাল এসেম্ব্লীর বৈঠক বন্ধ কি না।"

নন্দনপাহাড়ে আর বেড়াইতে যাওয়া হইল না। ভারাক্রান্ত মন লইয়া বাসায় ফিরিলাম।

৪

বহুসংখ্যক বাঙালী ইদানীং দেওঘরে বসবাস করিতেছেন। বাঙালী যুবকরা এখানে একটি পুস্তকাগার এবং সাহিত্য-সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছেন। পরিচালকরা এক দিন আমায় ধরিয়া বসিলেন—তাঁহারা আগামী রবিবার একটি সাহিত্য-সভার অধিবেশন করিবেন, আমাকে তাহার পৌরোহিত্য করিতে হইবে। উপায়ান্তর না দেখিয়া উৎসাহী যুবকদিগকে কথা দিলাম।

বিদ্যাপীঠের প্রাঙ্গণে সভার অধিবেশন হইবে। মহিলাদিগের জন্যও স্বতন্ত্র স্থান হইয়াছিল। বহু বাঙালী দর্শক সমবেত হইলেন।

প্রসিদ্ধ জমিদার, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র চৌধুরী "শিক্ষা ও বর্ত্তমান অবস্থা" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিবেন স্থির হইয়াছিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে বলাইবাবু মোটরে করিয়া সভা-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। কয় বৎসরে দেবগৃহের সরল গ্রাম্যশ্রী শহরে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। রাজপথে বিদ্যুতের আলো, মোটর বাস, ট্যাক্সী, মোটর গাড়ী, সবাক্ চলচ্চিত্র—এবার আসিয়া কিছুরই অভাব দেখি নাই। সুতরাং কলিকাতা হইতে হাওয়া খাইতে আসিয়া বলাইবাবু যে মোটর সঙ্গে আনিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের অবকাশ কোথায়? গতির যুগে বাঙালীর চরণের শক্তি আত্মহত্যা করিয়া থাকিলে তাহাতে চমৎকৃত হইবার কোন কথাই উঠা সঙ্গত নহে। উহা আভিজাত্যের লক্ষণ।

উদ্বোধন-সঙ্গীত, সভাপতি-বরণ প্রভৃতি মামুলী অনুষ্ঠানগুলি শেষ হইবার পর বলাইবাবুর বক্তৃতার পালা আসিল। শ্রোতৃবৃন্দকে সংক্ষেপে বলাইবাবুর বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়া তাঁহাকে বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম।

বলাইবাবুর বক্তৃতা করিবার শক্তি ছিল। বিপুল

করতালি-ধ্বনির মধ্যে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তিনি বক্তব্য বিষয়টিকে সুখশ্রাব্য করিবার চেষ্টা করিলেন।

আধুনিক শিক্ষার দোষ-ত্রুটির ফলে দেশের যুবসমাজ কেমন করিয়া বেকার অবস্থায় উপনীত হইতেছে—শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কিরূপে ব্যর্থ হইতেছে, সাহিত্য মানুষ তৈয়ার করিতে কিরূপে ব্যর্থকাম হইয়া পড়িতেছে, এইরূপ অনেক মামুলী কথা বলাইবাবু ওজস্বিনী ভাষায় বলিয়া যাইতে লাগিলেন। বাংলা দেশের সাময়িক ও সংবাদ পত্রসমূহে দীর্ঘকাল হইতে এই সকল বিষয়ে যে ভাবে আলোচনা চলিয়া আসিতেছে, তাঁহার বক্তৃতায় তাহারই চর্ব্বিত চর্ব্বণ ছাড়া কোন নূতন কথা তিনি বলিতে পারিলেন না। অবশ্য তাঁহার নিকট হইতে নূতন কথা কিছু শুনিতে পাওয়া যাইবে, এমন আশা আমি এতটুকু করি নাই।

দেশগঠনের জন্য কংগ্রেস হইতে যে-সকল প্রস্তাব মাঝে মাঝে সংবাদপত্রের মারফতে প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে—জাতিগঠনের জন্য যে-সকল পরিকল্পনা বড় বড় দেশনেতার মুখ হইতে নির্গত হইতেছে, বলাইচন্দ্র চৌধুরী সে সকলেরও আভাস তাঁহার বক্তৃতায় প্রকাশ করিলেন।

অপরাহ্ণের সভা বেশ জমিয়া উঠিল।

তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে আমি সমবেত ভদ্রলোক-দিগকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ সম্বন্ধে আর কেউ কিছু বলবেন কি?"

এক জন যুবক উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার প্রতিভা-প্রদীপ্ত ললাট আমাকে আকৃষ্ট করিল।

যুবকটি বলিলেন, "আমার একটা প্রশ্ন আছে। অবশ্য এটা বিতর্ক-সভা মনে করেই আমি প্রশ্ন করবার কৌতূহল দমন করতে পারছি না। সভাপতি মহাশয় অনুমতি করলে আমি প্রশ্নটা তুলতে পারি।"

বলিলাম, "সকলেরই প্রশ্ন করবার স্বাধীনতা আছে। আপনি স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন।"

যুবক সহাস্য বদনে বলিলেন, "সাহিত্যের আলোচনার সঙ্গে রাজনীতির ঘনিষ্ঠ সংযোগ এ-যুগে উপেক্ষা করা যায় না। আমাদের দেশে যাঁরা নেতৃস্থানীয়—যেমন বলাইবাবু—তাঁরা মানুষের সঙ্গে মানুষের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক বজায় রাখবার কি পন্থা স্থির করেছেন?"

বলাইবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আপনার বক্তব্যটা আরও একটু বিশদ ক'রে বলুন।"

যুবক বলিলেন, "আমি এখন ভারতের ৩৬ কোটি লোকের কথা ভাবছি না। আমাদের বাংলা দেশের পাঁচ কোটি লোকের কথাই বলছি। এদের শতকরা পঁচানব্বই জন বর্ণজ্ঞানহীন, দরিদ্র, একাহারী এবং উৎপীড়িত। এরা যে মানুষ, এদের যে পৃথিবীর বুকে মানুষের মত বেঁচে থাকবার স্বাভাবিক অধিকার আছে, তা যাঁরা শিক্ষিত, শক্তিমান আর নেতৃস্থানীয়, তাঁরা কি ভাবে তাদের বুঝিয়ে দিতে চান বলতে পারেন?"

সকলেরই দৃষ্টি যুবক বক্তার দিকে নিক্ষিপ্ত হইল। বলাইচন্দ্র চৌধুরীর মুখে বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি কোনও উত্তর দিলেন না।

যুবক তেমনই প্রশান্ত ভাবে বলিলেন, "শিক্ষিত, শক্তিমান এবং প্রবল, দুর্ব্বলকে পীড়ন করেই চলেছে, এ-সত্যকে ত অস্বীকার করা যায় না! নেতারা আন্তরিকতার সঙ্গে যদি চেষ্টা করতেন, তা হ'লে দুর্গতদের দুঃখ অনেক কমে যেত। কিন্তু অনেকের মিথ্যা আভিজাত্য-গৌরব এবং ব্যক্তিগত হীন স্বার্থ শতকরা পঁচানব্বই জনের সামনে বিরাট্ ব্যবধানের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলে ধরেছে। তার ফলে—"

দূর হইতে এক জন দর্শক বাধা দিয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তার ফলে এই রকমের বর্ণচোরা দেশনেতারা দুর্ব্বল আত্মীয় জ্ঞাতিরও সর্ব্বস্ব অপহরণ ক'রে নিজেরা মোটর চড়ে বেড়ান!"

সে কণ্ঠস্বর আমার পরিচিত। দেখিলাম, বলাইবাবুও প্রদীপ্ত নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া আছেন। কিন্তু স্বল্প আলোকে বক্তার চেহারা সুস্পষ্ট দেখা গেল না।

অপ্রীতিকর অবস্থার অবসানকল্পে আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। যুবক বক্তাকে বসিতে অনুরোধ করিয়া আমি সংক্ষেপে সভাপতির বক্তব্য প্রকাশ করিয়া বলিলাম। যেসব কথা বলিলাম, তাহা শ্রোতৃবর্গের হৃদয় স্পর্শ করিল কি না বুঝিলাম না। তবে ঘন ঘন করতালি-

ধ্বনির সহিত আমার নিরপেক্ষ মন্তব্য সকলে উপভোগ করিতেছে বুঝিলাম। দেশের বর্ত্তমান অবস্থার যথাযথ চিত্র অঙ্কিত করিয়া সে-দিনের মত সভার অধিবেশন বন্ধ করিলাম।

বলাইবাবু নীরবে আমার কথা শুনিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখে আত্মশ্লাঘার দীপ্তি তখন নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল।

বহু অনুসন্ধানেও রাজকুমারকে বিদ্যাপীঠ-প্রাঙ্গণে আর দেখিতে পাইলাম না।

৫

জ্যৈষ্ঠ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র চৌধুরীর পুত্রের শুভ বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র পাইলাম। ধনীর দুলাল-দিগের অধিকাংশই—বিশেষতঃ যদি তাঁহারা জমিদার হয়েন—সাধারণ আত্মীয়স্বজন বা গ্রামবাসীদিগকে স্বয়ং নিমন্ত্রণ করিবার পরিশ্রম বড়-একটা স্বীকার করিতে চাহেন না। দরিদ্র জ্ঞাতিবর্গের কাহারও মারফতে সামাজিক নিয়ম পালন করিয়া সকলকে কৃতার্থ করিয়াই থাকেন। অবশ্য সমপর্য্যায়ের ধনী আত্মীয় বন্ধুদিগের সম্বন্ধে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। উহা যুগধর্ম্ম, সুতরাং আক্ষেপ করিবার কারণ কোথায়? মোটর জুড়ির অধি-কারীরা সমগোত্রীয়। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা, তাহা কখনই পাদচারী বা ট্রামবাসচারী সম্বন্ধে প্রযুক্ত হওয়া শোভন নহে।

আমরা বলাইবাবুর স্বগ্রামবাসী। সেজন্যও বটে এবং অন্য কারণও কিছু ছিল। তাই বলাইবাবু নিমন্ত্রণপত্রের এক কোণে লাল কালিতে লিখিয়া দিয়াছিলেন, "আপনার উপস্থিতি অন্ততঃ বৌভাতের দিন অত্যন্ত কাম্য।"

সাধারণতঃ ইন্দিরার পোষ্যপুত্রদিগের নিমন্ত্রণ রক্ষায় আমার বড় স্পৃহা ছিল না। সুযোগ পাইলে প্রায়ই পত্র-যোগে নিমন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করিতাম। এজন্য অনেকেই আমার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। কিন্তু সামাজিক মানুষ হিসাবে, সামাজিক শিষ্টাচারের অভাব আমাকে অত্যন্ত পীড়িত করিত। তাই সহজ পন্থা বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতাম।

শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র চৌধুরীর পুত্রের বিবাহে অনুরূপ ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু যখন কানে আসিল, বলাইবাবু বর্ত্তমান ১৩৪৭ সালেও সমাজ-শাসনের মানদণ্ডে ওজন করিয়া স্বগ্রামবাসী এবং আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তখন সাংবাদিকের কর্ত্তব্য হিসাবে ব্যাপারটা দেখিবার কৌতূহল দমন করিতে পারিলাম না।

সন্ধ্যার পরেই বলাইবাবুর প্রকাণ্ড অট্টালিকার আলোকদীপ্ত প্রশস্ত প্রাঙ্গণে পৌছিলাম। বহু পরিচিত আত্মীয়-বন্ধু এবং সাংবাদিক ও সম্পাদকের দেখা পাইলাম। বলাইবাবুর আদর-আপ্যায়নের বহর নিন্দনীয় নহে।

অনুসন্ধানে জানিলাম, স্বগ্রামবাসী এবং স্বসমাজভুক্ত আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যাহাদিগের পরিবারে কোন-না-কোন সূত্রে সাগরপারের দোষ স্পর্শ করিয়াছে, বলাইবাবু তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন নাই।

তাহা হইলে জনরব অমূলক নহে? বাংলার ঐতিহ্য, বাঙালীর বৈশিষ্ট্য, বাঙালীর সমাজ-জীবনের বহু ব্যবস্থার আমি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলাম, এ-কথা সত্য; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে কোন শিক্ষিত বাঙালী, কোন কংগ্রেসসেবক এবং দেশনেতার গৌরবলিপ্সু কোন ভদ্র বাঙালী যে সাগরপারের অস্পৃশ্যতাকে এমন অশোভন ভাবে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিতে পারে, ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়াই মনে করিতাম।

সংবাদটি অভ্রান্তরূপে সত্য জানিয়া অন্তর জ্বলিয়া উঠিল।

"এই যে অবিনাশবাবু, আপনি কতক্ষণ?"

চাহিয়া দেখিলাম, পার্শ্বে অবনীবাবু দাঁড়াইয়া। তিনি শুধু আমাদিগের গ্রামবাসী নহেন, এক জন বিশিষ্ট ব্যবহারজীব।

"মিনিট-পনর এসেছি, কিন্তু না এলেই হয়ত ভাল হ'ত।"

সবিস্ময়ে অবনীবাবু বলিলেন, "কেন, কি হয়েছে, অবিনাশবাবু?"

"যাঁরা দেশসেবক ব'লে পরিচয় দিয়ে কেবল ভণ্ডামি করে বেড়ান, তাঁদের আচরণ সত্যই অসহ্য!"

আমার দক্ষিণ করতল চাপিয়া ধরিয়া ঔৎসুক্যভরে অবনীবাবু বলিলেন, "ব্যাপার কি বলুন ত ?"

"আচ্ছা, বলুন ত অবনীবাবু, আপনাদের হিন্দু মিশন অনেক খ্রীষ্টান ও মুসলমানকে হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত করছেন। এই সব নবাগত নরনারী হিন্দু সমাজে পাংক্তেয়, না অপাংক্তেয় হয়ে থাকবে ?"

দৃঢ়স্বরে অবনীবাবু বলিলেন, "নিশ্চয় তারা হিন্দু সমাজে স্থান পাবে। অন্ততঃ আমরা কখনই তাদের অপাংক্তেয় ক'রে রাখব না।"

হাস্য সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিলাম, "ধাবা— যে-সকল হিন্দু বিদ্যালয়ের জন্য সাগরপারে যাচ্ছেন বা সাগরপার হ'তে ফিরে এসেছেন, তাঁরা কি খ্রীষ্টান বা মুসলমান ধর্ম্মত্যাগী নূতন হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিতদের চেয়েও হীন ? তাঁদের কি আপনারা সমাজে অপাংক্তেয় ক'রে রাখবেন ?"

করতলে ঈষৎ চাপ দিয়া অবনীবাবু বলিলেন, "এতক্ষণে আপনার বক্তব্য বুঝতে পেরেছি। বলাইবাবুর এটা পাগলামি।"

"কিন্তু এই রকম স্বার্থসর্ব্বস্ব পাগলকেই আপনারা সমাজের চূড়ামণি ক'রে রেখেছেন।"

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া অবনীবাবু বলিলেন, "বলাই বাবুকে মালাচন্দন দিয়ে সমাজপতি ক'রে রাখা হয়েছে। ওঁরাই সমাজকে দুর্ব্বল ক'রে তুলেছেন। এখন একতার দরকার, তা না, ওঁদের ব্যবহারের দোষে স্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠেছে। আপনি ঠিকই বলেছেন। এ সব ধরণের লোককেই অপাংক্তেয় ক'রে রাখা দরকার।"

হাসিয়া বলিলাম, "এই সব আভিজাত্যবিলাসীদের নিয়ে স্বরাজ অর্জ্জন করা চলবে ভাবেন ? অসম্ভব!"

"এই যে, অবিনাশবাবু! আপনি এসেছেন দেখে ভারী সুখী হয়েছি।"

বলাইবাবুর নমস্কার ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম, "কিন্তু আমি খুশী হ'তে পারি নি।"

সবিস্ময়ে বলাইবাবু বলিলেন, "কেন, কেন ?"

"আপনার ব্যবস্থা এ-যুগের উপযোগী ত নয়ই—বরং ঘোর অকল্যাণকর, অশোভন!"

আরক্ত-আননে বলাইবাবু বলিলেন, "কেন, আমার ব্যবস্থার কি কোন ত্রুটি হয়েছে ?"

"নিশ্চয় ত্রুটি হয়েছে—ভীষণ দোষ হয়েছে। আপনি দেশের অনেক কৃতবিদ্য, মানী, গুণী আত্মীয়স্বজনকে সাগরপারের দোষ দিয়ে বর্জ্জন করেছেন। এ-যুগে এটা অপরাধ।"

স্খলিত কণ্ঠে বলাইচন্দ্র চৌধুরী বলিলেন, "কিন্তু সমাজপতি হিসেবে তাঁদের বাদ দিতে আমি বাধ্য।"

"কিন্তু তাঁদের অপরাধ ? বিলেতে গেলেই যদি মহাপাতক হয়, তা হ'লে বাংলা দেশের মুকুটমণিদের অনেককেই শাস্তি দেবার জন্য বর্জ্জন করতে হয়। কিন্তু আপনি ত তা পারেন নি!"

তখন আমাদিগের পার্শ্বে আরও কয়েক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক সমবেত হইয়া সকৌতুকে আমাদিগের আলোচনা শুনিতেছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে আমার শিষ্যস্থানীয় অনিলচন্দ্র ছিলেন। তিনি একখানা বিশিষ্ট দৈনিকের সম্পাদক।

অনিলচন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "অবিনাশ-দা, যা বললেন তা খুব ঠিক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র, কর্ত্তৃপক্ষস্থানীয় আরও কয়েক জন ত সাগরপারের দোষে অপরাধী। তাঁরাও এসেছেন দেখছি। হাইকোর্টের অনেকগুলি ব্যারিস্টার, ব্যবস্থাপক সভার হোমরা-চোমরা সদস্যও ত অনেক এসেছেন। সকলেই ত কালাপানি পার হয়েছিলেন।"

বিকৃত মুখে বলাইবাবু বলিলেন, "ওঁরা আমাদের সমাজের ত নন!"

কোন মতেই বিদ্রূপের হাস্যবাণকে সংযত করিয়া রাখিতে পারিলাম না। বলিয়া ফেলিলাম, "ওঃ! যত দোষ সব আমাদের সমাজের লোকের ? চমৎকার যুক্তি আপনার, বলাইবাবু! সাধু! সাধু!"

অবনীবাবু বলিলেন, "আভিজাত্যের মোহই আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ।"

বলাইবাবু বলিলেন, "কিন্তু আমার মধ্যে আভিজাত্যের কি লক্ষণ দেখলেন ?"

আমি বলিলাম, "আগাগোড়া। আপনাদের মত যাঁদের মনোবৃত্তি, রাগ করবেন না বলাইবাবু, তাঁদের শুধু প্রজার শোষণ ও আত্মপোষণ ব্যাপারেই মগ্ন থাকা ভাল। দেশের কাজে আপনারা না এলেই মঙ্গল। আচ্ছা, বলাইবাবু, আজ তবে আসি।"

"সে কি! একটু মিষ্টিমুখ—"

"ক্ষমা করবেন বলাইবাবু। যাঁদের আপনি বাদ দিয়েছেন, তাঁদের বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্মে অনেক বার ডান হাতের ব্যাপার সমাধা ক'রে এসেছি। কাজেই সংস্পর্শ-দোষ আমাতেও আছে। আমি তাঁদেরও শ্রদ্ধা করি, সুতরাং আপনার এখানে মিষ্টিমুখ ক'রে আপনার ও তাঁদের অসম্মান করতে পারি না।"

অনিলচন্দ্র ভারী তুষ্ট। তিনি বলিলেন, "দাদা, একটা প্যারা দেখতে পাব ত ?"

হাসিয়া বলিলাম, "তোমার কাছেও দেশের লোক একটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ না হোক্, ছোট একটা প্যারাও ত প্রত্যাশা করে।"

উচ্ছ্বসিত হাস্যরোলের জের থামিলে বলাইবাবুকে আর সেখানে দেখা গেল না।

প্রকৃতির ব্যথা

শ্রীহেমলতা দেবী

প্রকৃতির পাশ ছিঁড়িবার আশ
করেছি কত,
কেন সে আমারে করে বারে বারে
বেদনাহত।
যখনই পরশ পেয়েছি তাহার
গিয়েছি কাছে,
দেখেছি জড়ের জনম-যাতনা
জড়ায়ে আছে
জঠরে তাহার; রাশি রাশি জড়ে
জনম দিয়া,
অন্ধ আবেগে রহে সে আঁকড়ি
অনমনীয়া।
ধাপে ধাপে ব্যথা জড়াইয়া সেথা
অচল বাধা,
জড়ের কবলে বেদনার জালে
জটিল ধাঁধা।
যুগ যুগ ধরি গুমরি গুমরি
বেদনা ফিরে
আছাড়ি পিছাড়ি ভাঙ্গে সে দুধারি
যাতনা ঘিরে।
সপ্ত রথীর বাণাহত বীর
ব্যূহের ফাঁদে,
পড়িল যখন ভরিল গগন
আর্ত্তনাদে।
নিশ্বাস রোধি বিষের জলধি
উঠিল ফাঁপি
তরুণ বয়ান তরুণ সে প্রাণ
মারিল চাপি।
ব্যথা ভাঙি পড়ে প্রকৃতির ক্রোড়ে
মরণ মথি,
চাপা পড়ে যায় হায় হায় শত
জীবন-নথি।
চাপা বুকে জপা ছিল সে কী নাম
অস্ফুট ভাষে
রন্ধ্র বিদারি আলোক বিথারি
আকাশে ভাসে।

প্রথম বাংলা সংবাদপত্র

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথমে সংবাদপত্র স্থাপন ও পরিচালনের কৃতিত্ব রামমোহনের আত্মীয় সভার উৎসাহী সদস্য হরচন্দ্র রায় ও তদীয় বন্ধু গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যেরই বলিয়া এই সেদিন পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি ঐতিহাসিক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কৃতিত্বটুকু শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টিয়ান মিশনারীদেরই প্রাপ্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার "বাংলা সাময়িক পত্র" পুস্তকের তিনের পৃষ্ঠায় বলিতেছেন যে,

"এখানে সংক্ষেপে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এপর্য্যন্ত যাহা জানা গিয়াছে, তাহার ফলে 'সমাচার দর্পণ'কে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বলিলে অসঙ্গত হইবে না।"

ব্রজেন্দ্রবাবুর এই অভিমত ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' নামক শ্রীরামপুরের মিশনারীদের পরিচালিত পত্রিকার একটি উক্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত, যদিও ব্রজেন্দ্রবাবু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে,

"এই উক্তির বিরুদ্ধে সে যুগের দুই জন বিখ্যাত সাংবাদিকের অভিমত আছে। 'সমাচার চন্দ্রিকা' সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং আরও কেহ কেহ বলেন যে 'বাঙ্গাল গেজেটি' 'সমাচার দর্পণে'র অগ্রজ। তবে 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'র উক্তি সর্ব্ব পুরাতন; পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিলেও তাহা অবিশ্বাস্য মনে হয় না।"—বাংলা সাময়িক পত্র, পৃ. ১৯

এই সামান্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ব্রজেন্দ্রবাবুর মত এক জন লোকের পক্ষে প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে 'সমাচার দর্পণ'কেই প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের মর্য্যাদা দিয়া কয়েক জন বাঙালীর ন্যায্য প্রাপ্য সম্মান হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করা উচিত হয় নাই।

রামমোহন সম্পর্কিত তথ্যসংগ্রহ-প্রচেষ্টায় পুরাতন কাগজপত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে আমি এমন প্রমাণ পাইয়াছি যাহাতে **'বাঙ্গাল গেজেটি' যে 'সমাচার দর্পণ'-এর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল** তাহাতে সংশয়ের অবকাশমাত্র থাকে না।

লণ্ডন শহর হইতে প্রকাশিত 'এশিয়াটিক জার্ণাল' পত্রিকার ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি সংখ্যা কাগজের ৫৯ পৃষ্ঠায় কলিকাতা নগরী হইতে প্রকাশিত 'ওরিয়েণ্টাল স্টার' নামক পত্রিকার ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখের পত্রিকা হইতে একটি সংবাদ উদ্ধৃত আছে। 'ওরিয়েণ্টাল স্টার' লিখিতেছেন যে, "কলিকাতা নগরীতে যে সমস্ত প্রগতিমূলক কার্য্য দেখা যাইতেছে তন্মধ্যে আমরা একটি বাংলা ভাষার লিখিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া সন্তোষ বোধ করিতেছি। এদেশীয়দের মধ্যে সাধারণ জ্ঞানের প্রচার মঙ্গলের আকর হইবে; পূর্ব্বোল্লিখিত সংবাদপত্রটি সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকিলে ইউরোপীয় এবং ভারতীয়দিগের মধ্যে যোগাযোগ সহজসাধ্য হওয়ার ফলে বহুবিধ হিতসাধনের সেতুস্বরূপ হইবে।"*

এই সংবাদপত্রটি নিশ্চয় 'সমাচার দর্পণ' নহে, কারণ ১৬ই মের পূর্ব্বে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয় নাই; উহার প্রকাশ তারিখ ২৩শে মে, ১৮১৮। প্রথম সংখ্যা সমাচার দর্পণে ঐ তারিখই দেওয়া আছে। কাজেকাজেই এই পত্রিকাটি যে 'বাঙ্গাল গেজেটি' তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

১৮১৮ সনের ১৪ই মে তারিখে 'গবর্ণমেণ্ট গেজেট'

---

* Amongst the improvements which are taking place in Calcutta, we observe with satisfaction that the publication of a Bengalee newspaper *has been commenced.* The diffusion of general knowledge and information amongst the natives must lead to beneficial effects; and the publication allude to, under proper regulations, may become of infinite use, by affording the more ready means of communication between the natives and European residents.—(Italics mine).

নামক সাপ্তাহিক পত্রের একটি বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায় যে, 'বাঙ্গাল গেজেটি' পত্রিকা বাহির **হইবে**। এবং ১৬ই মে তারিখের 'ওরিয়েণ্টাল স্টার' পত্রিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে উহা বাহির **হইয়াছে** ("has been commenced."), সুতরাং 'বাঙ্গাল গেজেটি''র প্রকাশ তারিখ ১৪ই হইতে ১৬ই মে'র মধ্যে, অর্থাৎ শ্রীরামপুর মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে। বাংলা ভাষার এই সর্ব্বপ্রথম পত্রিকার প্রথম বৈশিষ্ট্য, ইহা সম্পূর্ণ রূপে দেশীয় লোকের দ্বারা, বিদেশীর সম্পর্কহীন ভাবে প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা; এবং দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, ইহার সহিত রামমোহন রায়ের যোগ এবং ইহার সংস্কারমূলক প্রকৃতি।

এই 'বাঙ্গাল গেজেটি' পত্রেই যে রামমোহনের সতীদাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তিকাটি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া আমি পৌষ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে অনুমান করিয়াছিলাম, তাহা যে ঠিক তাহারও প্রমাণ ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের এশিয়াটিক জার্নালের জুলাই সংখ্যার ৬৯ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। ঐ পত্রিকা লিখিতেছেন যে,

"যে ব্রাহ্মণটির মতামত সম্প্রতি অত্যন্ত চাঞ্চল্যজনক উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছে, সতীদাহ বিষয়ে একটি পুস্তিকা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়া গেজেট বলিতেছেন যে, আমরা অবগত হইলাম যে কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে সম্পূর্ণ এদেশীয়গণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত যে পত্রিকাখানি প্রচারিত হইতেছে তাহাতে এই ছোট পুস্তিকাখানি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এ সম্পর্কে রামমোহন রায়ের পরিশ্রমের যে ফল তাহার প্রচারের এই অধিকতর ব্যাপ্তি মঙ্গলজনক না হইয়া থাকিতে পারে না। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে এই কাগজের পরিচালকবর্গ স্থির করিয়াছেন, যে প্রসিদ্ধ হিন্দু প্রাজ্ঞ সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, ওলাদেবীর পূজা ভিন্ন ওলাউঠা রোগের প্রতিকার সম্ভব নহে তাঁহার অনাবশ্যকরূপে কাঁপানো গুরুগম্ভীর রচনা অপেক্ষা এই শ্রেণীর লোকহিতকর প্রবন্ধ তাঁহারা ছাপিবেন।*

*A Brahmin, whose desertations have excited a vivid sensation, published some time since, a little tract on *Suttees.*

বাঙ্গালীদের দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্র ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে একটিমাত্র ছিল এবং তাহা হইল, 'বাঙ্গাল গেজেটি'। কাজেকাজেই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইল যে, রামমোহনের সতীদাহ প্রবন্ধ এই পত্রিকায় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দেই পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

ইণ্ডিয়া গেজেট হইতে উদ্ধৃত মন্তব্যটি আর একটি কারণে উল্লেখযোগ্য। ব্রজেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন যে, 'বাঙ্গাল গেজেটি'র বিষয়-বিন্যাস কিরূপ ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু উল্লিখিত মন্তব্যটি হইতে জানা যায় যে, 'বাঙ্গালা-গেজেটি'র পরিচালকবর্গ কি শ্রেণীর রচনার পক্ষপাতী ছিলেন। মহাপ্রাজ্ঞরূপে পরিচিত এক জন গোঁড়া পণ্ডিতের গোঁড়ামিপূর্ণ রচনা না ছাপিয়া তাঁহারা সতীদাহের বিরুদ্ধে রামমোহনের রচনা ছাপিবার পক্ষপাতী ছিলেন। আত্মীয়সভার উৎসাহী সভ্য হরচন্দ্র রায় যে-পত্রিকার এক জন কর্ণধার, সে-পত্রিকা যে সংস্কারপন্থী হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর সংখ্যা এশিয়াটিক জার্ণালের ৪৮৫-৬ পৃষ্ঠায় মান্দ্রাজের সরকারী গেজেটের ১৬ই এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত এক সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ সংবাদটি সংবাদপত্র-বিষয়ক নহে, তবে রামমোহন রায় সম্পর্কিত বলিয়া এই স্থানে তাহার উল্লেখ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট গেজেট বলিতেছেন যে, তাঁহাদের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই রামমোহনের জনকল্যাণকর কার্য্যের সহিত সুপরিচিত এবং সেজন্য তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সম্ভবতঃ

The India Gazette says, "We have been informed that this little work has been republished in a newspaper, which for sometimes past has been printed and circulated in the Bengalee language and character, under the sole conduct of natives. This additional publicity which the labours of Rammohun Roy will thus obtain, cannot fail to produce beneficial consequences; and we are happy to find, that the conductors of the Bengalee Journal have determined to give insertion of articles that are likely to prove more advantageous to their countrymen, than the pompous and inflated productions of a most learned Hindoo, who, we understand, has declared that cholera morbus can never be overcome, until a general pooja shall be performed, to conciliate the angry deity by whom this affliction has been occasioned!"—*Asiatic Journal,* July, 1819, p. 69.

এই 'learned Hindoo'-টি কে তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। প্র.স.]

তাঁহার রচনাবলী ক্রয় করিতে উৎসুক; কিন্তু তাহা বিক্রয় করিবার কোনও ব্যবস্থা না থাকাতে সে সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। এ সম্পর্কে গেজেট পত্রিকার অনুযোগ পাঠ করিয়া কলিকাতা ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশনের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মহাশয় রামমোহন রায়কে তাঁহার পুস্তিকাগুলির কয়েক সংখ্যা মিশন পুস্তকালয়ের মধ্যস্থতায় বিক্রয় করিতে দিতে সম্মত করাইয়াছেন। এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ সমস্ত টাকাই 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি'র সাহায্যার্থ প্রদত্ত হয়।*

রামমোহন নিজ রচনা বিক্রয়ের পক্ষপাতী ছিলেন না, অথচ পাঠকের আগ্রহ দেখিয়া বিক্রয়ার্থ পুস্তকগুলি দিতে তাঁহাকে সম্মত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু বিক্রয়লব্ধ অর্থ তিনি গ্রহণ না করিয়া তাহা কলিকাতা স্কুল সোসাইটির সাহায্যার্থ দান করিলেন। শিক্ষা প্রচারে ও সৎসাহিত্য প্রচারে তিনি যে সর্ব্বদাই যত্নবান্‌ ছিলেন, ইহা তাহার আর একটি প্রমাণ।

৯-১-১৯৪১

* Most of our readers are well acquainted with the praiseworthy exertions of Baboo Ram Mohun Roy for the improvement of his countrymen, and no doubt unite with us in ardent wishes for success. We, in common with many others, considering the English version of his publications what would prove highly interesting to our friends in Europe, have frequently regretted that they were not procurable by purchase; and we therefore feel great pleasure in announcing, that for the future any or all of them may be obtained at the Baptist Mission Press, Circular Road. The Superintendent of this establishment, it appears, partaking in the feelings of regret we have expressed, has induced the Baboo to forward a few copies of all his works for this object; they consist, as we are informed, of translations of the Vedant; of three chapters of different Veds; two defences of the Monotheistical system, with this gentleman conceives to be included in the Veds; two conferences between an advocate and opponent of the practice of burning widows alive; and a selection of the moral discourses of our Lord, entitled, the Sayings of Jesus, the Guide to Peace and Happiness." Altogether they form 10 pamphlets, which will be disposed of at a low rate, *and the entire proceeds to be applied to the funds of that useful institution, the Calcutta School Society.* (Italics mine)—*Mad. Gov. Gaz. April 6*, quoted in the *Asiatic Journal*, Nov. 1820, pp. 485-6.

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তর

মানুষের পক্ষে ভ্রম-প্রমাদ স্বাভাবিক এবং প্রাচীন বা আধুনিক যে-কোনও ব্যাপারের গবেষণায় এক জনের পক্ষে সমস্ত জ্ঞাতব্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আহরণ করা সম্ভব নয়। আমি আমার ব্যক্তিগত অভাব-অসঙ্গতির সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সজাগ। কোনও বিষয়ে চরম কিছু আবিষ্কার করিয়াছি এরূপ ধারণা আমি কোন দিনই পোষণ করি না। মাতৃভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু কিছু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি; সবই যে নিঃশেষে সংগ্রহ করিয়াছি এমন কথা বলিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। যাহা পাইয়াছি এবং চোখে দেখিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। জানিয়া-শুনিয়া তথ্য গোপন অথবা না-জানিয়া জানিবার ভান করি নাই।

প্রভাতবাবু আমার সত্যনিষ্ঠায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমাকে এই প্রতিবাদ লিখিতে হইতেছে। প্রভাতবাবুর ইঙ্গিত এই যে, আমি বাংলা সংবাদপত্র পরিচালন ব্যাপারে বাঙালীর প্রাপ্য গৌরব অস্বীকার করিয়া অন্যায় ভাবে মিশনরীদের গৌরব প্রচার করিয়াছি। এ ইঙ্গিত ভ্রান্ত এবং কল্পনা-দোষদুষ্ট। প্রভাতবাবু তাঁহার নিবন্ধে যাহা প্রচার করিতে চাহিয়াছেন তাহা যদি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতে পারিতেন তাহা হইলে আমা অপেক্ষা কেহ অধিক সুখী হইত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রভাতবাবুর বক্তব্য শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াও 'বাঙ্গাল গেজেটি' যে 'সমাচার দর্পণে'র অগ্রজ সে-বিষয়ে আমি নিঃসংশয় হইতে পারিলাম না।

যাঁহারা বাংলা-সাহিত্যে পুরাতন বস্তু লইয়া কারবার করেন তাঁহারা স্মরণ করিতে পারিবেন, আমিই এক দিন —এই 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায়* 'বাঙ্গাল গেজেটি'কে সর্ব্বপ্রথম বাংলা সংবাদপত্রের সম্মান দিয়াছিলাম। কিন্তু পরে নানা কারণে আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্র' গ্রন্থে আমি লিখি যে, যাঁহারা ১৮১৮ সনের এপ্রিল্ মাসে সর্ব্বপ্রথম বাংলা মাসিকপত্র 'দিগ্দর্শন'

* 'প্রবাসী', ফাল্গুন ১৩৩৬; বৈশাখ ১৩৩৮।

প্রকাশ করেন, সেই শ্রীরামপুর মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ'কে "প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বলিলে অসঙ্গত হইবে না।" আমার এই **অনুমানের** পক্ষে নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি বর্ত্তমান।

(ক) ১৮২০ সালে সেপ্টেম্বর সংখ্যা ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া' পত্রে সম্পাদক-মহাশয় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য সম্বন্ধে লেখেন :—

" . . . . within a fortnight after the publication from the Serampore press of the Sumachar Durpun, the first Native Weekly Journal printed in India, he [Gunga Kishore] published another, which we hear has since failed."

'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া' স্পষ্ট বলিতেছেন, 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হইয়া যাইবার এক পক্ষ মধ্যে 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮২০ সনে যখন এই উক্তি প্রকাশিত হয় তখন 'বাঙ্গাল গেজেটি'র দুই জন পরিচালক —গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ও রামমোহন রায়ের আত্মীয় সভার সভ্য হরচন্দ্র রায় জীবিত, কিন্তু তাঁহারা কেহ এই উক্তির কোন প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার জানা নাই।

ইহা ছাড়া, 'বাঙ্গাল গেজেটি' যে 'সমাচার দর্পণে'র দিন-পনর পরে প্রকাশিত হয়—"কিন্তু কদাচ পূর্ব্বে নহে", 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক মার্শম্যানের এরূপ একটি দৃঢ় উক্তি আছে। প্রভাত বাবুর অবগতির জন্য সেটিরও উল্লেখ প্রয়োজন। 'সমাচার দর্পণ' লেখেন :—

"ইহাতে আমারদের এই উত্তর যে আমারদের প্রথম সংখ্যক দর্পণ' প্রকাশ হওনের দুই সপ্তাহ পরে অনুমান হয় যে বাঙ্গাল গেজেটনামে পত্র প্রকাশ হয় **কিন্তু কদাচ পূর্ব্বে নহে।** চন্দ্রিকার পত্র প্রেরক মহাশয় যদ্যাপি অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ বাঙ্গাল গেজেটের প্রথম সংখ্যার তারিখ আমারদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন তবে দর্পণের প্রথম সংখ্যার সঙ্গে ঐক্য করিয়া ইহার পৌর্ব্বাপর্য্যের মীমাংসা শীঘ্র হইতে পারে। যদ্যাপি তাঁহার নিকটে ঐ পত্রের প্রথম সংখ্যা না থাকে তবে ১৮১৮ সালের যে ইঙ্গলণ্ডীয় সম্বাদ পত্রে তৎপত্রের ইশ্‌তেহার প্রকাশ হয় তাহাতে অন্বেষণ করিতে হইবে। যেহেতুক **ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গ ভাষায় যে সকল সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয় তন্মধ্যে দর্পণ আদি পত্র ইহা আমরা স্পষ্ট জ্ঞাত হইয়া তৎসম্ভ্রম অনিবার্য্য প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলে অমনি কদাচ উপেক্ষা করা যাইবে না।**

—'সমাচার দর্পণ', ১১ জুন ১৮৩১।

মার্শম্যানের এই দৃঢ় উক্তির কোন প্রতিবাদ ১৮৩১ সালের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হয় নাই।

আমার অনুমানের বিপক্ষে প্রভাত বাবু ১৮১৯ সনের জানুয়ারি সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্ণালে'র ৫৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখের 'ওরিয়েণ্টাল স্টার' পত্রিকার একটি সংবাদ দাখিল করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন :—

"১৮১৮ সনের ১৪ই মে তারিখে 'গবর্ণমেণ্ট গেজেট' নামক সাপ্তাহিক পত্রের একটি বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায় যে, 'বাঙ্গাল গেজেটি' পত্রিকা বাহির **হইবে**। এবং ১৬ই মে তারিখের 'ওরিয়েণ্টাল ষ্টার' পত্রিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে উহা বাহির **হইয়াছে** ("has been commenced"), সুতরাং 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রকাশ তারিখ ১৪ই হইতে ১৬ই মে'র মধ্যে, অর্থাৎ শ্রীরামপুর মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে।"

বস্তুতঃপক্ষে উদ্ধৃতিটি আমার নিকট নূতন নয়। 'বাংলা সাময়িক-পত্র' পুস্তক প্রকাশিত হইবার কিছু দিন পরে 'এশিয়াটিক জর্ণালে'র এই উদ্ধৃতিটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু এটিকেই আমি এ-বিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া মনে করিতে পারি নাই। আরও বলবৎ প্রমাণের অপেক্ষায় আছি। আমার সংশয়ের কারণ বলিতেছি।

১৪ই মে তারিখে 'গবর্ণমেণ্ট গেজেটে' 'বাঙ্গাল গেজেটি' "বাহির হইবে" বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে এবং 'ওরিয়েণ্টাল স্টারে'র ১৬ই মে তারিখের সংবাদে দেখা যাইতেছে—"the publication of a Bengalee News-paper has been commenced," অর্থাৎ ১৪ই হইতে ১৬ই মে তারিখের মধ্যে উক্ত সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। অবশ্য ১৪ই তারিখে হয় নাই, অথচ ১৬ই তারিখের পূর্ব্বে হইয়াছে—সুতরাং ১৫ই মে তারিখে সংবাদপত্রটি নিশ্চয়ই প্রকাশিত হইয়াছিল ধরিতে হইবে। এখন বিবেচ্য, ১৪ই মে তারিখের 'গবর্মেণ্ট গেজেটে' "বাহির হইবে" বিজ্ঞাপন দিয়া পরদিনই—১৫ই তারিখে কাগজ বাহির করা সে-যুগের পক্ষে সম্ভব কি না। বর্ত্তমান "বৈদ্যুতিক মেশিনযন্ত্রে"র যুগেও এ-জাতীয় তৎপরতা দুর্লভ। সে-যুগের ছাপাখানা ও সংবাদপত্র পরিচালন ব্যাপারে

যাঁহাদের জ্ঞান আছে, তাঁহারাই বুঝিবেন ইহার মধ্যে কোন গলতি থাকা সম্ভব। যাঁহারা ১৪ই তারিখে "intends to publish" বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন তাঁহারা ১৫ই তারিখে কাগজ বাহির করিয়া বসিলেন, এবং ১৫ই তারিখে 'ওরিয়েণ্টাল স্টারে'র সাহেব সম্পাদক সেই পত্রিকা দৃষ্টে সেই দিনই তাহার উপর মন্তব্য লিখিলেন ও তাহার পরের দিন অর্থাৎ ১৬ই তারিখে সেই মন্তব্য প্রকাশিত হইল—সহজে আমি ইহা মানিয়া লইতে পারি নাই। আমার বিশ্বাস, এই সংবাদের মধ্যে 'ওরিয়েণ্টাল স্টারে'র কিছু ভবিষ্যদ্বাণী আছে; "আয়োজনকে" তাঁহারা "ঘটনা"র মর্য্যাদা দিয়াছেন; "publication… has been commenced" শব্দের দ্বারা সম্পাদক মহাশয় হয়ত ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

আপাতদৃষ্টিতে যাহা অসম্ভব তাহাকে মানিয়া লইতে সাহস হয় নাই বলিয়াই আমি 'এশিয়াটিক জর্ণালে'র উদ্ধৃতিটির উপর নির্ভর করিতে পারি নাই। তা ছাড়া 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া'র উক্তি ও 'সমাচার দর্পণে'র চ্যালেঞ্জের কোন প্রতিবাদ নজরে পড়ে নাই। অথচ ১৮২০ সালে 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া' যখন মন্তব্য করেন তখন 'বাঙ্গাল গেজেটি'র সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা, সকলেই বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং আমি ভরসা করিয়া 'বাঙ্গাল গেজেটি'কে সর্ব্বপ্রথম সংবাদ-পত্রের সম্মান দিতে পারি নাই। প্রভাত বাবুর গবেষণায় যদি এ-বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইলে বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতি তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে বলিয়া আমি মনে করি। আশা করি, এই জবাবদিহির পর প্রভাত বাবু আমাকে মতলব-পোষণের ইঙ্গিত হইতে রেহাই দিবেন।

৩০।১।৪১

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রত্যুত্তর

ব্রজেন্দ্রবাবু "সমাচার দর্পণে"র সম্পাদক মার্শম্যানের "দৃঢ় উক্তি"র কথার উল্লেখ করিয়াছেন। সেই দৃঢ় উক্তিতে তিনি (মার্শম্যান) "বাঙ্গাল গেজেটের প্রথম সংখ্যার তারিখ নির্দ্দিষ্ট" করিয়া দিতে প্রতিপক্ষকে আহ্বান করিয়াছেন। এই তারিখ সম্পর্কে তাঁহার স্পষ্ট জ্ঞান থাকিলে সেই তারিখ তিনি নিজেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া "দর্পণ" যে আদি সংবাদপত্র তাহা নির্দ্দেশ করিলেন না কেন? ইহা হইতে কি এই অনুমান সঙ্গত নহে যে "গেজেটি"র ঠিক প্রকাশকাল তাঁহার নিজেরই জানা ছিল না এবং "আদিপত্র" সম্পর্কে "জ্ঞাত" থাকা ও "তৎসম্ভ্রম অনিবার্য্য প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলে অমনি কদাচ উপেক্ষা" না করিবার যে চেষ্টা তাহা নিজেদের কৃতিত্বকে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই লিখিত। কাজে কাজেই মার্শম্যানের এই দৃঢ় উক্তির কোনও প্রতিবাদ ১৮৩১ সালের "সমাচার দর্পণে" প্রকাশিত না হইলেই কি প্রমাণ হয় ঐ উক্তি সত্য? ব্রজেন্দ্রবাবু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে এই উক্তির বিরুদ্ধে "ভবানীচরণ" ও প্রভাকর-সম্পাদকের উক্তি আছে ('বাংলা সাময়িক-পত্র' পৃষ্ঠা ১৯)। ভবানীচরণের চন্দ্রিকা বাহির হয় ৫ই মার্চ্চ ২২শে ফাল্গুন ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ও প্রভাকর বাহির হয় ২৮শে জানুয়ারী ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে। কাজে কাজেই মার্শম্যানের উক্তির বর্ষ "১৮৩১" খ্রীষ্টাব্দেই অন্ততপক্ষে "প্রভাকর" দৃঢ় উক্তির বিরুদ্ধে লিখিয়াছিলেন। "সমাচার দর্পণ" নিজ উক্তির বিরুদ্ধে উক্তি বা যুক্তি না ছাপিলেই তাহা সত্য হইয়া উঠে না।

"ওরিয়েণ্টাল ষ্টার" ১৬ই মে তারিখে শুধু "has been commenced" বলেন নাই, সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন "We observe with satisfaction"। নিজে না দেখিয়াই "ষ্টার"-সম্পাদক "observe" বা পর্য্যবেক্ষণের কথা বলিবেন কেন? ব্রজেন্দ্রবাবু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে ১৫ই মে তারিখ শুক্রবার ছিল এবং "গেজেটি" প্রত্যেক শুক্রবার বাহির হইত, কাজে কাজেই ১৪ই মে গবর্ণমেণ্ট গেজেটের প্রকাশ কাল ও ১৬ই মে "ষ্টার"এর প্রকাশকালের মধ্য "গেজিটির" প্রকাশ এতই অসম্ভব কেন?

ব্রজেন্দ্রবাবু বলিতেছেন যে ১৪ই তারিখে বিজ্ঞাপন দিলেন "intends to publish" আর ১৫ই মে কাগজ বাহির করিয়া বসিলেন, ইহা তিনি বিশ্বাস করেন না। কিন্তু ব্রজেন্দ্রবাবু কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, ঐ বিজ্ঞাপনের নিম্নে "১২ই মে" এই তারিখ যে দেওয়া আছে তাহা তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। ('বাঙ্গলা সাময়িক-পত্র', পৃষ্ঠা ১৭)। ১২ই তারিখে প্রকাশ ইচ্ছা যখন জ্ঞাপন

করিলেন তখন প্রকাশ বিষয়ে কতকটা অগ্রসর হইয়াই হরচন্দ্র ঐ বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। এরূপ অনুমান করিলে ১২ই হইতে ১৫ই এই তিন দিনের ব্যবধানে কাগজ বাহির করা অসম্ভব কেন? এই অসম্ভবতা প্রমাণ করিতে "ষ্টার"-সম্পাদককে "ভবিষ্যদ্বাণী" করিয়া "আয়োজন"কে ঘটনার মর্য্যাদা দিয়াছেন এরূপ কষ্টকল্পনারই বা প্রয়োজন কি এবং তিনি না দেখিয়াই "observe with satisfaction" লিখিলেন কেমন করিয়া? এই বৈদ্যুতিক যন্ত্রের যুগে কাগজের পাঁচ-সাতটি সংস্করণ প্রত্যহ বাহির যেখানে হয়, সেখানে কাগজের অনেকটাই পূর্ব্ব হইতে কম্পোজ করা থাকিলে একটি ছোট প্যারা সংযোজন করিয়া এক দিন পরে হস্তচালিত যন্ত্র হইতে কাগজ বাহির করা কি অসম্ভব? মনে রাখিতে হইবে এখনকার দিনের মত পঞ্চাশ-ষাট হাজার সংখ্যা পত্রিকা তখন মুদ্রিত হইত না, অধিকাংশ পত্রিকার মুদ্রণ কয়েক শততেই পর্য্যবসিত ছিল।

সে যুগে তৎপরতার সহিত সংবাদপত্র প্রকাশের সম্ভাব্যতা ব্রজেন্দ্রবাবু কেন মানিয়া লইতে পারিতেছেন না বুঝিতে পারিতেছি না। সে যুগেই এই পত্রিকা বাহির হওয়ার ১০।১৫ বৎসরের মধ্যেই দৈনিক পত্রিকা হস্তচালিত যন্ত্রে মুদ্রিত করিয়া প্রতিদিন প্রকাশ করা যখন সম্ভব হইয়াছে তখন তিন দিনের ব্যবধানে "বেঙ্গল গেজেট" মুদ্রণ ও প্রকাশ এবং এক দিনের মধ্যে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় 'ওরিয়েণ্টাল স্টার' পত্রিকায় প্রকাশ করা অসম্ভব কেন?

ব্রজেন্দ্রবাবু এই প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন যে, "ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া"র উক্তির কোন প্রতিবাদ তাঁহার নজরে পড়ে নাই কিন্তু 'বাঙ্গলা সাময়িক-পত্রে' তিনি নিজেই লিখিয়াছেন যে "এই উক্তির বিরুদ্ধে সে যুগের দুই জন বিখ্যাত সাংবাদিকের অভিমত আছে। "সমাচার চন্দ্রিকা"-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও "সংবাদ প্রভাকর"-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং আরও কেহ কেহ বলেন যে "বাঙ্গাল গেজেটি" সমাচার দর্পণের অগ্রজ।" নিজের লেখার কথাও কি ব্রজেন্দ্রবাবুর স্মরণে নাই? এই ভাবে খৃষ্টিয়ান পাদ্রীদিগকে বাঙ্গালীর প্রাপ্য গৌরব দিতে তাঁহাকে এখনও চেষ্টা পাইতে দেখিলে তাহার প্রতিবাদ করা কি "মতলব পোষণের ইঙ্গিত" করা? আমার প্রবন্ধে আমি কোনও মতলবের কোনও ইঙ্গিত করি নাই, কেবলমাত্র বলিয়াছি যে একমাত্র পাদ্রীদের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া যে গৌরব গঙ্গাকিশোরকে বহু বাঙালী সাংবাদিক দিয়া আসিয়াছেন তাহাকে অস্বীকার করা ব্রজেন্দ্রবাবুর ঠিক হয় নাই। আমি ইঙ্গিত-বিশারদ নহি। পূর্ব্বে যে সকল ক্ষেত্রে মনে করিয়াছি ইচ্ছা করিয়া তথ্যবিকৃতি বা তথ্যবিলোপ করা হইয়াছে, যেমন রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কিত বহু ব্যাপারে, তখন তাহা স্পষ্ট ভাবেই উল্লেখ করিয়াছি। অথবা যেখানে মনে করিয়াছি যে, উৎসাহের আতিশয্যে একের কৃতিত্ব অপরের স্কন্ধে আরোপ করা হইয়াছে, যথা কাশীনাথ নাম দৃষ্টে বারো বৎসর বয়স্ক কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননকে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকতা করিতে অথবা কাশীনাথ তর্কবাগীশের পুস্তক কাশীনাথ শর্ম্মণঃ রচিত দেখিয়া কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের লিখিত বলিয়া প্রকাশ করিবার কালে আমার অভিযোগ স্পষ্টই ছিল।

ব্রজেন্দ্রবাবু কি "বাঙ্গাল গেজেটি"র ঠিক প্রকাশকাল বলিতে পারেন? তাঁহার গবেষণার নির্ভরযোগ্য প্রমাণে খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের দাবী প্রমাণ হইলে আমিও তাহা নতমস্তকে স্বীকার করিব, কিন্তু বাঙ্গালীর প্রাপ্য গৌরবকে খর্ব্ব করিবার জন্য আয়োজনকে "ঘটনা" বলিয়া 'স্টার'-সম্পাদক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন এরূপ কষ্টকল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিতে আমি প্রস্তুত নহি। ব্রজেন্দ্রবাবুর অপরিসীম ভরসায় তাহা সম্ভব হইলেও আমার এতটা ভরসা নাই। ব্রজেন্দ্রবাবু বলিতেছেন যে "বস্তুতঃ পক্ষে উদ্ধৃতিটি তাঁহার পক্ষে নূতন নয়, 'বাংলা সাময়িক-পত্র' পুস্তক প্রকাশের কিছু দিন পরে এই উদ্ধৃতিটির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছিল।" "সাময়িক-পত্র" প্রকাশকাল 'মাঘ ১৩৪৬', এখন 'মাঘ ১৩৪৭' পার হইতে চলিতেছে, এই এক বৎসরের মধ্যে এই বিষয়টি লইয়া আলোচনা করা এবং ইহার উপর যে নির্ভর করা চলে না, ইহা কি তাঁহার মত ঐতিহাসিকদিগের বলা উচিত ছিল না? অবশ্য তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়া থাকিলে ইহা "আবিষ্কারে"র গৌরব তিনি গ্রহণ করুন, আমি কোনও মহা আবিষ্কারের দাবী রাখি না, এ বিষয়ে আলোচনা হয় ইহাই চাহিয়াছি মাত্র। ব্রজেন্দ্রবাবু ও আমার বক্তব্য প্রকাশ হইল, কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য সুধীজনসমাজ তাহা বিচার করিলে সুখী হইব।

৫।২।৪১

আদি নারী

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

স্বষ্টির যজ্ঞের উৎসব-তলে বসি বিশ্বের ভগবান চাহিলেন রঙ্গে,
আনন্দ-বেদনায় মন তাঁর চঞ্চল উচ্ছ্বাস নেচে ওঠে গগনের অঙ্গে।
অন্তর-তলে তাঁর যত কিছু সুন্দর রূপগুণগৌরব লুকানো সে বিত্ত,
সব দিয়া রচিলেন আপনার অনুরূপ নরদেহ অপরূপ ঢালি সব চিত্ত।
স্বষ্টির খেয়ালের উৎসবলীলা তবু হয় নি কো পূর্ণ যে রইল অতৃপ্তি,
স্বষ্টির মহাবীণ বাজল না তবু যে রে এ নিখিল পেল নাকো তবু যে রে দীপ্তি।
স্বষ্টির সেরা তাঁর মানব যে অপরূপ ধরণীর হৃদি তবু পেল না যে কান্তি,
সারা বিশ্বের হৃদি কেঁদে বলে—দয়াময়, আরো দাও হয় নি কো শান্তি।
সীমাহীন চিত্তের সব ব্যথা হর্ষে গো অন্তরে তাই তাঁর ফুটেছিল পদ্ম,
পাপড়ির তল থেকে সব রূপ জয় করি নরজয়ী নারীদেহ জেগেছিল ছদ্ম।
সেই দিন ঝরল যে যত রসঝর্ণা গো নারীদেহ হিল্লোলি দেখা দিল ছন্দে,
সারা স্বষ্টির বীণ হঠাৎ যে সেই দিন ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে রূপে-রসে-গন্ধে।
বিস্ময়ে মহাকাল তাঁর নীল বুক চিরে আনন্দ ঢেলে ঢেলে দিল অভিনন্দন,
সূর্য্য ও গ্রহতারা দিল নমি বন্দনা মর্ত্ত্যের সব মাটি হ'ল হরিচন্দন।
ঈশ্বর-পদে নমি' নির্ম্মল হাস্তেতে বিশ্বের মেরু 'পরে দাঁড়াইল নগ্না,
অঙ্গেতে পুলকিত লাবণ্য হিল্লোল রসে হ'ল ঢল ঢল চিত্ত নিমগ্না।
অপরূপ স্বষ্টির নারী হেরি বিস্ময়ে ভগবান বলিলেন—হ'নু আজ ধন্য,
সুন্দরী মম-মন-মন্থিতা ধন মোর, এ সৃজন সার্থক আজি তোরই জন্য।
অনন্ত রূপ মোর আজ থেকে সাকারেতে নর মাঝে নারায়ণ রূপে হ'নু ছদ্ম,
নরে দিনু গদা আর চক্রের ঝনঝনি তোরে দিনু শঙ্খ গো মোর প্রিয় পদ্ম।
নর মোর রূপ থেকে রূপ নিল বিশ্বে গো, তুই মোর রস থেকে পেলি মধু কান্তি,
স্বষ্টির যাগ আজি হ'ল মোর পূর্ণ গো বিশ্বের কোলাহল পেল চিরশান্তি।
হে আদিম সুন্দরি, ভগবৎ তনুরসে নিষ্পাপা ধরণীর তুমি আদি কন্যা,
নিষ্পাপ আদি নর মিলি তোর সঙ্গে গো ধন্য যে হ'ল আজ তুমি হ'লে ধন্যা।
সব দেওয়া ছন্দের মোর সব রসে আজ অয়ি নারী জয়গানে ওঠো তুমি ছন্দি,
বিশ্বের ভগবান আমি রসদৃপ্তে গো আজ থেকে তোরি মাঝে হইলাম বন্দী।
আজ থেকে নিখিলের সব মধুযাত্রা যে যাত্রার সাথে তব সুরু হবে রঙ্গে,
আনন্দে চিরদিন জীবনের হিন্দোলে ছন্দের মত হয়ে রব তোরি সঙ্গে।
সুন্দরি, তব ওই সুন্দর পয়োধরে মোর সেরা স্বষ্টির আঁকা র'ল চিহ্ন,
চিত্তের তল তব অসীম রহস্তেতে আজ থেকে মোর সাথে রইল অভিন্ন।
হৃদয়ের কেউ তব পাবে নাকো সন্ধান মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ো এই দিনু বর গো,
পাপে যদি এ ধরণী হয় কভু পূর্ণ গো তুমি তবু তার মাঝে হয়ে রবে স্বর্গ।
ঈশ্বর-পদে নমি' বিশ্বের পথে নারী যৌবন দোলাইয়া নেচে চলে ছন্দি,
পথে-ঘাটে ফুটে ওঠে স্বষ্টির জৌলুস জয় নারী জয় জয় ওঠে সবে বন্দি'।

বানরজাতীয় প্রাণীদের বুদ্ধিবৃত্তি

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বুদ্ধিবৃত্তি, আচার-ব্যবহার ও অঙ্গসংস্থান প্রভৃতি বিষয়ে মানুষ ও বানর জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে গুরুতর বৈষম্য থাকিলেও আপাতদৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আহার্য্য সংগ্রহের কৌশল, হর্ষ ও বিষাদের অভিব্যক্তি, হাতের ব্যবহার, খেলাধুলা ও সন্তান প্রতিপালন প্রভৃতি অনেক ব্যাপারে ইহাদের আচরণ অনেকটা মানুষেরই মত। অবশ্য এই সাদৃশ্য হইতেই উহাদের সঙ্গে আমাদের জ্ঞাতিত্ব-সম্বন্ধ প্রমাণিত হয় না। সম্ভবতঃ বিভিন্ন ধারায় পাশাপাশিভাবে অথবা পরস্পর নিরপেক্ষভাবেই এই উভয় জাতীয় জীবের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, দৈহিক সাদৃশ্য হেতু এই উভয় জাতীয় জীবের সম্বন্ধ বিষয়ে মানুষের কৌতূহলের অন্ত নাই। সাদৃশ্য যতই থাকুক, উৎকর্ষ বা অপকর্ষের বিষয় বাদ দিয়া, মানসিক বৃত্তির তুলনামূলক বিচারে এই সম্বন্ধ নির্ণয়ের পথ অধিকতর সুগম হইতে পারে। বানর-জাতীয় প্রাণীদের বুদ্ধিবৃত্তি ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অতি অল্পদিন মাত্র সুনিয়মিত গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে। বিগত মহাসমরের কিছুকাল পূর্ব্বে কোয়েলার নামক এক জন জার্ম্মান শরীরতত্ত্ববিদ এ-সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম গবেষণা আরম্ভ করেন। বানরজাতীয় প্রাণীদের মধ্যে দৈহিক গঠন, শক্তিসামর্থ্য ও অন্যান্য বিষয়ে লাঙ্গুলবিহীন গরিলা, শিম্পাঞ্জী, ওরাংওটাং প্রভৃতি প্রাণীরাই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। গরিলাই ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাধিক উন্নত। কিন্তু গরিলা একরূপ দুষ্প্রাপ্য বলিলেই হয়। বিশেষতঃ বন্দী অবস্থায় ইহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখাও দুষ্কর। তা ছাড়া ইহারা ভয়ানক হিংস্র ও উগ্র প্রকৃতির জানোয়ার। আফ্রিকার পশ্চিমাংশে কয়েকটি মাত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে ইহারা বাস করে। তথাকার আদিম অধিবাসীরাও কদাচিৎ ইহাদের সাক্ষাৎ পায়। আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের একটা দৃঢ় ধারণা আছে যে, বড় বড় দুর্দ্দান্ত নিগ্রো সর্দ্দারদের প্রেতাত্মারা গরিলার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গভীর জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায়। শারীরিক শক্তিতে বাঘ অথবা সিংহেরা ইহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। কাজেই ইহাদিগকে বশীভূত করিবার প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়া ওঠে না। শিম্পাঞ্জীরা কিন্তু গরিলা অপেক্ষা অনেক নিরীহ প্রকৃতির জানোয়ার এবং সহজেই বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকে। এই জন্যই এবং বিশেষতঃ মানুষের সহিত অধিকতর সাদৃশ্যসম্পন্ন বলিয়াও কোয়েলার প্রথমতঃ শিম্পাঞ্জী লইয়াই পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। পরে তিনি বেবুন প্রভৃতি অন্যান্য জাতীয় বানর লইয়া পরীক্ষাক্ষেত্র প্রসারিত করেন। তৎপরে অবশ্য আমেরিকান ও রুশীয় বৈজ্ঞানিকেরা এ সম্বন্ধে ব্যাপকতর পরীক্ষা আরম্ভ করেন। শিম্পাঞ্জী, ওরাংওটাং, বেবুন প্রভৃতি বিভিন্ন বানরজাতীয় প্রাণীদের আমোদ-প্রমোদ, খেলাধুলা, হর্ষবিষাদ ও অন্যান্য অনেক ব্যাপারেই মানুষের আচার-ব্যবহারের সহিত যথেষ্ট সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি ঈর্ষা, দ্বেষ, সন্দেহ প্রভৃতি জটিল অনুভূতির ব্যাপারগুলিতেও ইহারা অনেকটা মানুষের মতই আচরণ করিয়া থাকে। দুই-একটা দৃষ্টান্ত হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

কিউবার এক মহিলার পরীক্ষাগারে শিম্পাঞ্জী, ওরাংওটাং, বেবুন ও অন্যান্য অনেক জাতীয় বানর সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একটি বেবুন কোন পুরুষমানুষকে তাহার খাঁচার নিকট আসিতে দেখিলেই সঙ্গিনীকে আড়ালে লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিত। কোন স্ত্রীলোক দেখিলে কিন্তু সেরূপ কিছুই করিত না। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহিলাটি এক দিন এক ধর্ম্মযাজককে তাহার খাঁচার নিকট লইয়া আসিলেন। মনে করিয়াছিলেন, ধর্ম্মযাজকের গাউনের মত পোষাক দেখিয়া বেবুন তাহাকে পুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিবে না।

কিন্তু পোষাক দেখিয়া সে মোটেই প্রতারিত হয় নাই। তাহাকে দেখিবামাত্রই বেবুন তাহার সঙ্গিনীকে লুকাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কয়েক দিন যাবৎ তিনি পরীক্ষাগারের একটি বয়স্ক পুরুষ-শিম্পাঞ্জীর গতিবিধির অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে ছিলেন। অনুসন্ধানে দেখিতে পাইলেন, তাহার খাঁচা হইতে রান্নাঘরের ভিতরে সব দেখিতে পাওয়া যায়। একটি সুশ্রী দাসী রান্নাঘরে কাজ করিত। একস্থানে মুখ বাড়াইয়া জানোয়ারটা প্রায়ই তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। ব্যাপার বুঝিয়া তিনি রান্নাঘরের দরজায় পর্দ্দা টাঙ্গাইতে আদেশ দিলেন। যে লোকটি পর্দ্দা খাটাইয়াছিল তাহার সঙ্গে শিম্পাঞ্জীটার খুব ভাব ছিল। কিন্তু পর্দ্দা খাটাইবার পর হইতেই সে লোকটার উপর ভয়ানক খাপ্পা হইয়া উঠিল এবং সুযোগ পাইয়া এক দিন তাহাকে ভয়ানক ভাবে আক্রমণ করিয়া প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছিল।

কতকগুলি কৌশল আয়ত্ত করাইবার জন্য পরীক্ষাগারে একটি অপরিণতবয়স্ক ওরাংওটাংকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল। নৈরাশ্যবশতঃ কেহ কেহ যেমন কপালে করাঘাত করিয়া বা দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া থাকে এই বাচ্চা ওরাংটির স্বভাব ছিল কতকটা সেইরূপ। তাহাকে কোন জটিল কাজ দেওয়া হইলে প্রথমতঃ মনোযোগ সহকারে সে তাহা করিতে চেষ্টা করিত; কিন্তু অসাধ্য হইলেই হতাশভাবে মেঝের উপর কপাল ঠুকিতে আরম্ভ করিত। যত বার এইরূপ পরীক্ষা করা হইয়াছে তত বারই সে প্রবল ভাবে কপাল ঠুকিয়াছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন জাতের অসংখ্য বানর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকে চৌর্য্যবৃত্তিতে বা আহার্য্য সংগ্রহে, কেহ কেহ সন্তান পালনে, কেহ বা খেলাধুলায় যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়, আবার কতকগুলি বিষয়ে তাহারা চূড়ান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়ও দিয়া থাকে।

আমাদের দেশে অনেক অঞ্চলেই হনুমান ও মর্কট জাতীয় অসংখ্য বানর দেখা যায়। ইহারা দল বাঁধিয়া বিচরণ করে। অধিকাংশ দলেই একটি মাত্র পুরুষ-বানর থাকে। অবশ্য সময়ে সময়ে কোন কোন দলে একাধিক পুরুষ-বানরও দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষ-বানরই দলের সর্দ্দার। সময় সময় দুই দলে ভয়ানক লড়াই বাধিয়া যায়। ক্রমাগত কয়েক দিন পর্য্যন্ত এই লড়াই চলে। পরাজিত হইলে বানরীরা বিজেতার পরিবারভুক্ত হয়। কেহ কেহ বা পলাইয়া যায়। ইহা ছাড়া আর এক রকমের দল দেখিতে পাওয়া যায়। এই দলে কেবল পুরুষ-বানরই থাকে। ইহারা সন্ন্যাসীর দল নামে পরিচিত। পুরুষ-বানরেরা ভয়ানক ঈর্ষাপরায়ণ। বড় হইয়া নিজের দল অধিকার করিতে পারে এই আশঙ্কায় সর্দ্দারেরা মায়ের কোল হইতে পুরুষ বাচ্চাদের ছিনাইয়া লইয়া মারিয়া ফেলে। মায়ের কৌশলে কোন গতিকে পুরুষ-বাচ্চাগুলি বড় হইতে পারিলেও দলের মধ্যে তাহার স্থান হয় না। হয় তাহাকে নিজের ক্ষমতায় দল গঠন করিতে হয় নচেৎ সন্ন্যাসীর দলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপেই ক্রমশঃ সন্ন্যাসীর দল গড়িয়া ওঠে। শোনা যায় সর্দ্দার-বানরের হাত হইতে বাচ্চার প্রাণরক্ষার জন্য সময় সময় বানরীরা গৃহস্থের ঘরে ঢুকিয়া আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করে, এমন কি কখনও কখনও লোকজনের সমক্ষে আসিয়া তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতেও ইতস্ততঃ করে না। কোন কারণে বাচ্চা মরিয়া গেলেও কিছুতেই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে চাহে না। সর্দ্দারের দ্বারাই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক বাচ্চা অপসারিত হইলে কিছুক্ষণ একটু খোঁজাখুঁজি করে মাত্র; কিন্তু শীঘ্রই সব ভুলিয়া যায়। বাচ্চার অনুরূপ কোন কিছু দেখিলেই তাহার মন আবার স্নেহার্দ্র হইয়া ওঠে। এই জন্যই বোধ হয় অনেক সময় দেখা যায়—সন্তানহারা বানরীরা সুযোগ পাইলেই গৃহস্থের ছোট ছোট বিড়ালছানা চুরি করিয়া লইয়া যায় এবং বুকে চাপিয়া রাখে। কিছু দিন পরে না খাইতে পাইয়া বাচ্চাটা মরিয়া গেলেও পচিয়া গলিয়া নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ফেলিয়া দিতে চাহে না।

কোন এক পল্লীগ্রামের এক বৃদ্ধার নিকট শুনিয়াছিলাম —কিছু দিন আগে তাহাদের পাড়ারই কোন এক গৃহস্থের বাড়ী হইতে একবার কয়েকটি বানর মিলিয়া ৩।৪ মাসের

ম্যাঙ্গাবি

একটি শিশুকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল। উঠানে ছোট একটি মাদুরের উপর শিশুটিকে ঘুম পাড়াইয়া তাহার মা ঘরের ভিতর কোন কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সুযোগে বানরেরা মাদুরসমেত শিশুটিকে উঠানের কিছু দূরেই একটা প্রকাণ্ড প্রাচীন আমগাছের নিকট টানিয়া লইয়া যায়। ইতিমধ্যে শিশুটির কান্না শুনিয়া মা বাহিরে আসিয়া দেখে—বানরেরা মাদুর সমেত ছেলেটাকে গাছের উপর উঠাইবার চেষ্টা করিতেছে। বলা বাহুল্য, মায়ের চীৎকারে ভীত হইয়া বানরগুলি চম্পট দিতে বাধ্য হয়।

পল্লী-অঞ্চলে একবার একটা ঘটনা নজরে পড়িয়াছিল। সে-অঞ্চলে মর্কটজাতীয় বানরের তখন বড়ই উপদ্রব। এক গৃহস্থবধূ ডেক্‌চিতে করিয়া চাউল ধুইবার জন্য পুকুরঘাটে আসিতেই একাকী পাইয়া চাউল ছিনাইয়া লইবার জন্য বানরেরা তাহাকে আক্রমণ করে। বধূটি এই ভাবে আক্রান্ত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে ভয়ে জলে নামিয়া পড়ে। বানরগুলিও জলে নামিয়া তাহার হাত হইতে ডেক্‌চি কাড়িয়া লয়। পুকুরঘাটটা বাড়ী হইতে কিছু দূরে। চীৎকার শুনিয়া আসিতে আসিতেও আমাদের কিছু দেরী হইয়াছিল। আসিয়া দেখি, বৌটি কোমর জলে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে। আমাদিগকে দেখিয়া দুই গালে যথেষ্ট চাউল পুরিয়া কয়েকটা বানর লাফাইয়া গাছে উঠিল। প্রায় নিমজ্জমান ডেক্‌চি হইতে তখনও একটা বানর মুখ উবুড় করিয়া দুই হাতে মুখে চাউল গুঁজিতে-ছিল। সেটার বুকের সঙ্গে একটা বাচ্চা আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। উবুড় হইয়া চাউল খাইবার ফলে বাচ্চাটা যে জলের নীচে ডুবিয়া রহিয়াছে সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপও নাই।

এক বার এক দল হনুমান রাস্তার পাশেই একটা গাছের উপর লাফালাফি করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একটা হয়তো বেকায়দায় লাফাইতে গিয়া রাস্তার বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে আসিয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তার পর সেই দল বা অন্য দলের স্থানীয় হনুমানদের

দেখিয়াছি—বৈদ্যুতিক তারের কায়দায় ফলবান বৃক্ষের আশে-পাশে তার খাটাইয়া রাখিলে হনুমানেরা সেদিকে আনাগোনা করিতে মোটেই ভরসা পায় না। আবার এও দেখিয়াছি—একটা হনুমান ঘরে ঢুকিয়া ভুল করিয়া এক খাবলা চুন খাইয়া দুই দিন পর্য্যন্ত সেই ঘর হইতে

বাহির হইল না। তৃতীয় দিন নেহাৎ ভালমানুষটির মত স্বস্থানে প্রস্থান করিল। তার পর দইয়ের ভাঁড় উন্মুক্ত স্থানেও রাখিয়া দেখা গিয়াছে, সে বা তাহার দলের অন্য কেহই তার ত্রিসীমানায় পদার্পণ করে না।
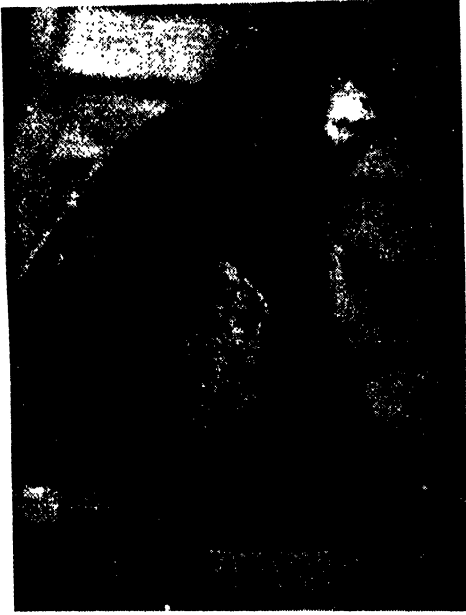
এক দিন একটি লোক শহরের রাস্তা দিয়া গলায় শিকল বাঁধা একটা হনুমান লইয়া যাইতেছিল। হনুমানটা দুই-এক পা যায় আর শিকলটাকে দুই হাতে টানিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়ে। টানাহেঁচড়া করিয়াও লোকটি বিশেষ সুবিধা করিতে পারিতেছিল না। একে তো লোকে বড় একটা হনুমান পোষে না, তাহাতে সে ওই লোকটির সঙ্গে যাইতে নারাজ দেখিয়া তামাসা দেখিতে একে একে লোক জুটিয়া গেল। এক জন জিজ্ঞাসা করিল—মশাই, হনুমানটা কি আপনার? উত্তরে লোকটি জানাইল যে, সেটি তারই পোষা হনুমান। আর এক জন তখন বলিল—ওটা যদি আপনারই পোষা হয়ে থাকে তবে অমন করছে কেন? লোকটি তখন তাহার জামার পিছন দিক্‌টা দেখাইয়া বলিল—মশাই, বলব কি—ও ক্রোশখানেক রাস্তা আমার কাঁধের উপর চড়েই এসেছে। দেখুন রাস্তার ধুলাকাদায় জামাটার কি অবস্থা ক'রে দিয়েছে। এখন আর হাঁটতে চাইছে না, ফের কাঁধে চড়বার মতলব। তাই অমন করছে।

আমাদের দেশের কোন কোন তীর্থস্থানের বানরেরাও যাত্রীদের নিকট হইতে খাবার আদায় করিবার জন্য সময় সময় বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়।

জনৈক বিদেশী মহিলা সিমলা পাহাড়ের এক জাতের বানর সম্বন্ধে তাহার অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার ছোট্ট কুকুরটি বানরগুলিকে দেখিলেই তাড়া করিত। অবশ্য মালিক সঙ্গে থাকিলেই এ-বিষয়ে তাহার সাহস ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাইত। এক দিন কুকুরটি একটি গাছের পাশ দিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ গাছের গুঁড়ির আড়াল হইতে একখানি লোমওয়ালা হাত তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই একের হাত হইতে অন্যের হাতে চালিত হইতে লাগিল। কুকুরটির চীৎকার ও বলপ্রয়োগ সত্ত্বেও দেখিতে দেখিতে বানরেরা তাহাকে হাতে হাতে চালান করিয়া পাহাড়ের একটি উচ্চ স্থানে তুলিয়া সেখান হইতে নীচে নিক্ষেপ করিল।

সিয়েরা লিওন, গিনি প্রভৃতি অঞ্চলে সাদা নাকওয়ালা এক জাতীয় বানর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বেশ শান্ত প্রকৃতির এবং সর্ব্বদাই আমোদ-প্রমোদ ও খেলাধুলায় মত্ত থাকে। কিন্তু ইহাদের এমন একটি স্বভাব আছে যে, যাহা মানুষের মধ্যেই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ ইহাদিগকে ভেংচি কাটিলে অথবা তাহাদের চালচলনের ভঙ্গী অনুকরণ করিয়া বিদ্রূপ করিলে ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া অনর্থ ঘটাইয়া বসে। প্যাটাস্ নামে এই জাতীয় আর এক রকমের লাল বর্ণের বানর দেখিতে পাওয়া যায়। দেশের অভ্যন্তরস্থ নদীনালার ভিতর দিয়া কাহাকেও নৌকা বাহিয়া যাইতে দেখিলেই নদীর পাড় ধরিয়া তাহারা দলে দলে নৌকার অনুসরণ করিতে থাকে এবং হাতের কাছে যাহা পায়, কাঠ, পাথর, মাটির ডেলা, ফলমূল ইত্যাদি নৌকার প্রতি অবিশ্রান্ত ছুড়িয়া মারিতে থাকে। দেশের অভ্যন্তরভাগ পরিদর্শনে গিয়া ভ্রমণকারীরা অনেকেই তাহাদের হাতে এই ভাবে লাঞ্ছিত

হইয়া থাকে। ইহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত অনেককেই ইহাদিগকে গুলি করিয়া দলে দলে মারিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

উত্তর-আফ্রিকা, জিব্রাল্টার প্রভৃতি স্থানের বার্ব্বারি বা ম্যাগট নামক বানরেরা সাধারণতঃ নিরামিষভোজী হইলেও টিকটিকি, কাঁকড়াবিছা ও বিবিধ কীটপতঙ্গ উদরসাৎ করিয়া থাকে। কাঁকড়াবিছার অত্যুগ্র বিষ সম্বন্ধে উহারা খুবই সচেতন। কাঁকড়াবিছা দেখিবামাত্র চক্ষের নিমেষে তাহার লেজটাকে ধরিয়া হুলসমেত বিষের গ্রন্থিটি মোচড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলে এবং বিছাটাকে তখন ধীরে ধীরে মুলার মত কচ্‌মচ্‌ করিয়া চিবাইয়া খায়।

ম্যাকক্

ডায়না

দক্ষিণ-আফ্রিকার চাক্‌মা বেবুনরা সুরক্ষিত বাগান হইতে ফলমূল চুরি করিবার সময় বিশেষ বুদ্ধি-কৌশলের পরিচয় দেয়। ইহারা দলবদ্ধভাবে বিচরণ করে। বাগান হইতে ফলমূল চুরি করিবার সময় বাগানের বাহিরে কিছুদূর হইতেই ইহারা একের পর একে সারি বাঁধিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে যেন পাহারাদার কুকুর-গুলি কোন মতেই টের না পায়। দুই-একটি বানর মাত্র বাগানে প্রবেশ করে এবং ফলমূল সংগ্রহ করিয়া তাহাদের নিকটবর্ত্তী সাহায্যকারীর হাতে তুলিয়া দেয়। সে আবার তাহার পরবর্ত্তী আর এক জনের হাতে চালান করে। এইরূপে লুণ্ঠিত দ্রব্য হাতে হাতে লাইনের শেষ প্রান্তে আসিয়া জমা হয়। শৃঙ্খলাভঙ্গ না করিলেও হাতে হাতে চালান করিবার সময়ে বাছা বাছা কিছু জিনিস প্রত্যেকেই গালে পুরিয়া রাখে। যদিও বা প্রহরীদের নজরে পড়িয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয় তথাপি কেহই রিক্তহস্তে ফিরে না।

স্থানীয় অধিবাসীরা কৌশলে এই বেবুন-শিশুদিগকে বন্দী করিয়া প্রতিপালন করে। বালুকা-অভ্যন্তরে কোথায় জল পাওয়া যাইতে পারে এই বেবুনরা তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারে। ওই সব স্থানে জলের খুবই অভাব। কাজেই বেবুনদের সাহায্য না পাইলে এরূপ স্থানে মানুষের বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। তৃষ্ণা বাড়াইয়া জল অনুসন্ধানে অধিকতর আগ্রহশীল করিবার নিমিত্ত চাক্‌মা বেবুনকে জলের পরিবর্ত্তে কেবল লবণসংযুক্ত আহার্য্য দেওয়া হয়। ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে তাহারা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নির্ভুলভাবে জলের অবস্থান-স্থল নির্ণয় করিয়া থাকে।

সুমাত্রা ও বোর্ণিও প্রভৃতি অঞ্চলের ম্যাকক্ নামক বানরেরা দুষ্টুমি করিতে গিয়াও বেশ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেয়। কোনও দুষ্কার্য্য করিবার মতলব আছে—তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া পূর্ব্ব হইতে কিছু বুঝিবার উপায় নাই। একবার এক মহিলা খাঁচায় আবদ্ধ একটি ম্যাককের নিকট যাইতেই তাহার টুপির সাদা পালকগুলির উপর বানরটার লোভ পড়ে; কিন্তু তাহার নিরীহ হাবভাব দেখিয়া মহিলাটির কোন সন্দেহ হওয়া দূরে থাক বরং সহানুভূতির উদ্রেক হয়। তিনি তাহাকে কয়েকটি বাদাম ছুড়িয়া দেন। ভাল বাদামগুলি খাইয়া বানরটা খারাপগুলি তাহার দিকে ছুড়িয়া মারিল। কৌতুক অনুভব করিয়া মহিলাটি খাঁচার খুব নিকটে গিয়া উবুড় হইয়া আরও কতকগুলি বাদাম দিতেছিলেন। এমন সময় বানরটা হঠাৎ

ম্যাণ্ড্রিল

ছোঁ মারিয়া তাহার টুপি হইতে একটি পালক ছিনাইয়া লইয়া খাঁচার পিছনে চলিয়া গেল। মেঝেতে বসিয়া বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে বার বার পালকটিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল। তার পর দুই-এক বার শুঁকিয়া এক টুকরা ছিঁড়িয়া লইয়া দাঁতে কামড়াইয়া পরীক্ষা করিল। অবশেষে পালকটিকে কানের পাশে গুঁজিয়া গর্ব্বিতভাবে ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

গিবন, সিয়ামাং প্রভৃতি বানরদের মধ্যেও খাদ্য-সংগ্রহ, খেলাধুলা প্রভৃতি ব্যাপারে যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কিছু দিন পূর্ব্বে চিড়িয়াখানায় সিয়ামাং জাতীয় একটা বানর দেখিয়াছিলাম। ঘরের মত একটা আলাদা খাঁচায় সে থাকিত। কেহ কিছু খাবার না দিয়া খাঁচার কাছে দাঁড়াইলেই সে কলের কাছে গিয়া, যেন জল খাইতেছে এইরূপ ভান করিত এবং মুখে যথেষ্ট পরিমাণ জল লইয়া ফোয়ারার মত করিয়া তাহার গায়ে ছিটাইয়া দিত।

ডায়েনা ও এক জাতীয় সাকি বানরের শারীরিক সৌন্দর্য্যবোধ অপরিসীম। প্রসাধনে ইহারা অনেক সময় কাটাইয়া দেয়। উভয়েরই বেশ লম্বা দাড়ি গজায়। দাড়ির কদরই এদের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। দাড়িতে জল লাগিয়া নষ্ট হইবার আশঙ্কায় ডায়েনা জলপান করিবার সময় এক হাতে দাড়িটিকে এক দিকে সযত্নে ধরিয়া রাখে। সাকিরা আবার তারও উপর যায়। উবুড় হইয়া জল পান করিতে গেলে দাড়ি ভিজিয়া যাইতে পারে এই ভয়ে তাহারা হাতে করিয়া অল্প অল্প করিয়া জল মুখে দেয়। এতদ্ব্যতীত ওয়াণ্ডারু, ম্যাণ্ড্রিল, সাদা গিবন, গেরেজা, ম্যাঙ্গাবি, কেপুচিন, লেমুর, গ্যালাগো, মার্ম্মোসেট, নাকেশ্বরী প্রভৃতি বানরদের বুদ্ধিবৃত্তির অসংখ্য দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই সকল দৃষ্টান্ত হইতেই এ-কথা প্রমাণিত হয় না যে, সর্ব্বক্ষেত্রেই ইহারা অতীত অথবা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মানুষের মত বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে। অপেক্ষাকৃত নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেও এরূপ যথেষ্ট বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ অপেক্ষাকৃত উন্নততর শিম্পাঞ্জী, ওরাংওটাং প্রভৃতি জানোয়ারদের বুদ্ধিবৃত্তির পরীক্ষায়

আরবদেশের বেবুন

দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের স্মৃতিশক্তি মোটেই প্রখর নহে; কিন্তু অনুকরণ-প্রবৃত্তির প্রাবল্য বশতঃ এমন অনেক কাজ করিয়া থাকে যাহাতে স্বভাবতই আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। কলা প্রভৃতি ফল উচ্চস্থানে ঝুলাইয়া খাঁচার মধ্যে লাঠি রাখিয়া দেখা গিয়াছে, শিম্পাঞ্জী ফল পাড়িবার জন্য লাঠির ব্যবহার করিতে চেষ্টা করে।

লাঠির পরিবর্ত্তে কতকগুলি খালি বাক্স দেওয়া হইলে বাক্সগুলিকে উপর্য্যুপরি সাজাইয়া ফল আহরণ করিয়া থাকে। কিন্তু ঠিকমত সাজাইতে না পারায় অনেক সময়েই বাক্সগুলি হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া যায়। খাঁচার মধ্যে মই দিয়া দেখা গিয়াছে—মই লাগাইয়া ফল পাড়িবার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু দেওয়ালের সঙ্গে খাড়াভাবে লাগাইবার ফলে প্রত্যেক বারই অনর্থ ঘটিয়াছে। মইটাকে একটু হেলান দিয়া রাখিবার বুদ্ধি মাথায় আসে না। একগাছা দড়ি কিছুর সঙ্গে দুই ফেরতা জড়াইয়া দিলে খুলিতে পারে; কিন্তু তিন ফেরতা জড়াইলেই বিপদ। সমস্ত বুদ্ধিশুদ্ধি ঘোলাইয়া যায়।
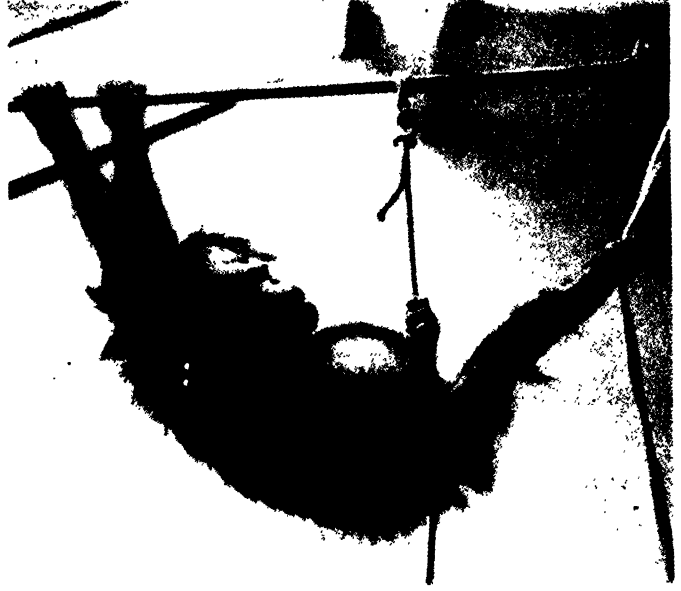
ওরাং ওটাং

তাছাড়া বিভিন্নজাতীয় বানরেরা এমন কতকগুলি কাজ করিয়া থাকে যাহা মোটেই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে এবং সেই সকল কাজ তাহারা বংশানুক্রমে বরাবর একই ভাবে করিয়া আসিতেছে। মাত্র দুই-একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। আফ্রিকার কোন কোন আদিম অধিবাসীরা অল্পবয়স্ক শিম্পাঞ্জীর মাংস পছন্দ করে। কিন্তু সম্মুখ-যুদ্ধে শিম্পাঞ্জীকে আয়ত্ত করা সহজ নহে বলিয়া ফাঁদের সাহায্য গ্রহণ করে। অন্ধকারে কুকুর লেলাইয়া দিয়া তাহাদিগকে ফাঁদের দিকে তাড়া করে। ফাঁদের জালে হাত-পা জড়াইয়া গেলে লগুড়াঘাতে তাহাদের জীবনলীলার অবসান ঘটায়। শিম্পাঞ্জী-শিকারে বরাবর তাহারা একই কৌশল অবলম্বন করিতেছে এবং বরাবরই শিম্পাঞ্জীরা জালে পড়িতেছে।

বানরজাতীয় প্রাণীরা অনেকেই বোধ হয় উত্তেজক পানীয়টা পছন্দ করে। কোন কোন আদিম অধিবাসীরা পাত্র ভর্ত্তি করিয়া যথেষ্ট পরিমাণ উত্তেজক পানীয় রাত্রি-বেলায় শিম্পাঞ্জীদের বাসস্থানের আশেপাশে রাখিয়া দেয়। ভোরবেলায় দেখা যায়, শিম্পাঞ্জীরা অনেকেই সুরার প্রভাবে অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। চেতনা ফিরিয়া আসিলেই দেখিতে পায়—তাহারা হাত-পায়ে উত্তমরূপে রজ্জুবদ্ধাবস্থায় অসভ্যদের উৎসবক্ষেত্রে নীত হইবার অপেক্ষায় রহিয়াছে।

সুমাত্রা দ্বীপের আদিম অধিবাসীরাও বানরের মাংস খায়। বানর ধরিবার জন্য তাহারা অদ্ভুত কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে। বানরের হাত গলিতে পারে, ডাব-নারিকেলের মুখে এরূপ ছোট ছিদ্র করিয়া তাহাতে কিছু চিনি পুরিয়া বানর-অধ্যুষিত স্থানে রাখিয়া দেয়। কিছু দূরে লোকগুলি আত্মগোপন করিয়া থাকে। চিনির লোভে বানরেরা প্রত্যেকে দুইটি হাত দুইটি ডাবের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়। উপযুক্ত সময়েই লোকগুলি বিকট চীৎকার করিয়া তাহাদিগকে তাড়া করে। বানরগুলি পলাইতে চেষ্টা করে কিন্তু চিনি ছাড়িয়া দেয় না। নারিকেলের মধ্যে হাত মুঠা করিয়া চিনি ধরিয়া থাকে। কাজেই হাতও বাহির হয় না। এই অবস্থায় দুই হাতে দুইটা নারিকেল লইয়া তারা না পারে গাছে চড়িতে, না পারে ছুটিতে। সুতরাং অতি সহজেই ধরা পড়িয়া যায়।

ঐ দ্বীপের ম্যাকক্ বানরেরা বড়ই অনুকরণ-প্রিয়। এই অনুকরণপ্রিয়তার সুযোগ লইয়া মানুষ ইহাদের দ্বারা যথেষ্ট কাজ করাইয়া লয়। যখন ইহারা উঁচু গাছে অবস্থান করে তখন ইহাদের প্রতি ঢিল ছুড়িলে প্রত্যুত্তরে ইহারা অজস্র ফল ছুড়িয়া মারিতে থাকে। সুমাত্রাবাসীরা নারিকেল পাড়িবার জন্য ইহাদেরই সাহায্য লইয়া থাকে। অন্যান্য অনেক দেশে উঁচু গাছ হইতে ফল পাড়িবার জন্য এইরূপে বানরের সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে।

দ্বন্দ্ব

শ্রীসুশীলকুমার দে

আসিনু যখন তব বন্ধ দ্বারে,
জানি না কোথায় ছিলে অন্ধকারে ;
তখনো তিমির-তীরে চন্দ্র
জাগে নি গগনে নিস্তন্দ্র,—
বনের বেদনা ভাসে গন্ধভারে।

মনের চেতনা ছিল দীপ্তিহীনা
আপনি আপন-মাঝে তৃপ্তিলীনা ;
কে জানে কোথায় রহে স্বর্গ,
ধূলায় লুটায় সব অর্ঘ্য,—
জাগে না জাগরসুরে সুপ্তি-বীণা ?

দিবস রজনী মিশে দ্বন্দ্বাভাসে
নীরব নিথর দূর সন্ধ্যাকাশে ;
তোমার প্রাণে কি তারি ছন্দ
ছায়া আর আলোকের দ্বন্দ্ব,
মৌন-মাধুরী মধুচ্ছন্দা ভাসে ?

কখনো সুদূর তব ছায়ার বীথি
শোনে নি মধুর কোনো মায়ার গীতি ?
আলোর আঘাত বুকে দীপ্ত
করে নি মহিমা মুখে লিপ্ত ?
জাগে নি কায়ার মাঝে কায়ার প্রীতি ?

কে জানে কাহার মন ! চিত্ততলে
এনেছি আমার যাহা নিত্য জলে,—
নাহি আর কিছু অতিরিক্ত,
আছে অশ্রুর সুখসিক্ত
মমতা-মণিটি শুধু বিত্তছলে।

মধুমাস গেল, এল বৃষ্টিধারা,
মনের আঁধারে মন সৃষ্টিহারা ;
প্লাবনের বেগে হল ক্লান্ত
শ্রাবণের প্রান্তর-প্রান্ত,—
দৃষ্টিতারাটি মাগে দৃষ্টিতারা।

ফুটেছে ঝটিকা তবু তুচ্ছ করি'
ফুলটি মলিন দিনে গুচ্ছ ধরি' ;
লহ যাহা আছে ভালমন্দ,
যেটুকু রয়েছে মধুগন্ধ,—
এখনি ত পড়িবে যা' উচ্চ ঝরি' !

অকালে ত ফুলে ফুলে তরু না ভরে,—
কৌতুক বুঝি তাই অরুণাধরে ?
অশ্রুরেখায় ক্ষীণবর্ণ
জীর্ণ জীবন-তরু-পর্ণ,—
চক্ষে তোমার তবু করুণা ঝরে !

তাই মনোমন্দিরে নন্দিতারে
ছন্দের নন্দনে বন্দি তারে ;
হয়ত সরিবে ভেদ ধন্দ,
হয়ত ধরিবে বাহুবন্ধ
বক্ষের স্পন্দনে ছন্দিতারে।

আঁধার নামিছে বনভূর্জ্জশিরে,
দেরি নাই, ঢেকে দিবে সূর্য্যটিরে ;
একা ঘরে কোথা তুমি মগ্ন,
এস এস, কেটে যায় লগ্ন,—
হে তাপসী, লহ তব ধূর্জ্জটিরে !

ব্যবসায়ে বাঙ্গালী—বর্ম্মা সেল অয়েল কোম্পানীর এজেণ্ট শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসু প্রণীত। পৃ. ২০২। মূল্য এক টাকা।

লেখক খুলনা জিলার বড়দল নামক বন্দরে জীবনের প্রথম দিকে কেরোসিন তৈলের এজেন্সী লইয়া অর্থাগমের সোপান রচনা করেন। কিসে ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর উন্নতি হইবে ইহা বহু আলোচিত বিষয়। লেখকও সেই আলোচনা করিয়াছেন। বাঙ্গালীরা কেন ব্যবসায়ে হটিতেছে তাহার কারণ তিনি দেখাইয়াছেন। সে সকল আজ পুরানো কথা হইয়াছে। লেখক পথ দেখাইতে ইচ্ছুক। যে-পথের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে-পরিকল্পনা তিনি বাঙ্গালী ভদ্রযুবকের সম্মুখে রাখিয়াছেন তাহা হইতেছে কলিকাতায় আড়তদারীর জন্য একটি লিমিটেড কোম্পানী করা। গ্রাম হইতে কাঁচা মাল সেখানে আসিয়া বিক্রীত হইবে। এই কথাই প্রথমে। জাতীয় চরিত্র না বদলাইলে যে বাঙ্গালী লিমিটেড কোম্পানী চালাইতে পারিবে না, এ-কথা পুস্তকের শেষ দিকে খুব জোরের সহিত বলা হইয়াছে। এই বইখানা পড়িলেই বাঙ্গালীর চরিত্র বদলাইবে এমন বিশ্বাস যাহার নাই তাহার পক্ষে লেখকের স্কীমের কোনই মূল্য থাকে না।

লেখক বুঝিয়াছেন এবং পাঠককেও বুঝাইয়াছেন যে, বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিই বাঙ্গালীর ব্যবসায়ে অকৃতিত্বের জন্য দায়ী। তাঁহার বেলা সৌভাগ্যক্রমে দারিদ্র্য ও অসুস্থতার সংযোগে তিনি তের বৎসর বয়সেই পড়া ছাড়িয়া দেন এবং নিজের পায়ে দাঁড়াইবার চেষ্টা তখন হইতে করাতেই তাঁহার সৌভাগ্য-সোপান রচিত হইয়াছিল। আচার্য্য রায়ের লেখা হইতেও সমর্থক গল্প তুলিয়া দিয়াছেন যাহার মর্ম্ম এই যে, যদি ব্যবসায়ে প্রবেশ করিতে চাও তবে ১৪ বৎসর বয়সে কারবারীর শিক্ষা-নবীশ হও। এই স্থানে তিনি সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন বলিব। কিন্তু ইহার পর যদি তিনি বর্ত্তমানে বিত্তশালী হওয়ার পরও তাঁহার পোষ্যদিগকে কেতাবী শিক্ষার পথ হইতে ছাড়াইয়া কারবারীর শিক্ষানবীশীতে নিযুক্ত করিয়াছেন তাহার পরিচয় দিতেন, এজন্য তাঁহার উপর পারিবারিক সঙ্কট আসিয়া থাকিলে তাহার পরিচয় দিতেন, তবে বাংলাকে একটা খাঁটি জিনিস দিয়াছেন বুঝিতাম। তিনি নাম-ধাম সহিত অনেকের ব্যবসায়ে কৃতকার্য্যতা বা অপটুতার কথা আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু নিজ পোষ্য বা পরিবারস্থ শিক্ষার্থীদের জন্য যে তিনি গতানুগতিক পথ ত্যাগ করিয়া, চৌদ্দ বৎসর বয়সেই পাঠশালা ছাড়াইয়া গদীতে নিযুক্ত করিয়াছেন তাহার পরিচয় দেন নাই। এই জন্য এই লেখা বহুলাংশে নিরর্থক হইয়াছে।

দুঃখের বিষয় বহিখানির নানা স্থানে অবাঙ্গালীর প্রতি দ্বেষভাব ব্যক্ত হইয়াছে। উহা বড় অশোভন ও অহিতকর। কলিকাতার আমড়াতলার কচ্ছী-গুজরাটি বেপারীরা মশলার বেপারে কোটি কোটি টাকা যে উপার্জ্জন করিয়াছে তাহা লেখকের মতে বাংলার চাষাকে শোষণ করিয়া। কিন্তু লেখকের মত খুলনার বড়দলে বিলাতী সিগারেট বিক্রয় করিয়া কোটি না হউক হাজার হাজার রোজগার করিলে তাহাতে চাষাকে পোষণ করা হয় এ-কথাই বা কেমন করিয়া মানিব? লেখক মহাশয় যাঁহাদের সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট সেই বর্ম্মা অয়েল কোম্পানী ব্রহ্ম ও ভারতকে যে-পরিমাণ শোষণ করে তাহার তুলনায় কচ্ছী ভাইরা বেশী শোষণ করে না। আমি ত বলি আদৌ শোষণ করে না। অন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য আদান-প্রদানের ভাবেই চলা উচিত।

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

ছন্দ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

১৩২১ সাল থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ছন্দ, এবং বিশেষ ভাবে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যত কিছু আলোচনা করেছেন, সেই সমস্ত প্রবন্ধ সঙ্কলন করে 'ছন্দ' নামক একখানি বই কিছুকাল পূর্ব্বে বিশ্বভারতী প্রকাশ করেছেন। ছন্দের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করার পারদর্শিতা যাঁদের আছে, সেই ছন্দোবিৎ পণ্ডিতগণই বইখানির সম্পর্কে বিচারের ভার গ্রহণ করবেন। কিন্তু এই অনধিকারচর্চ্চা না করেও সাহিত্যের সাধারণ পাঠকদের তরফ থেকেও বইখানি সম্বন্ধে বলবার কথা অনেক আছে।

একদা রবীন্দ্রনাথই প্রথমে বাংলা সাহিত্যে ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা প্রবর্ত্তন করেন। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ ক'রে পরে আরও অনেকে এদিকে অগ্রসর হয়েছেন এবং বাংলা ছন্দ বিশ্লেষণ ক'রে তার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের রূপ আজ তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করছেন। কিন্তু প্রথম-পথপ্রদর্শকের গৌরবমাত্র লাভ ক'রেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে এ-ক্ষেত্রে ঔদাসীন্য অবলম্বন ক'রে পরবর্ত্তীদের নব নব আবিষ্কারের জ্যোতিতে ম্লান হয়ে গিয়েছে, এমন নয়। ছন্দের বিচারে কবি রবীন্দ্রনাথ আজও বাংলা সাহিত্যে পুরোধা; এখনও তাঁর মতামত যে এ-ক্ষেত্রে নূতন আলোকসম্পাত দ্বারা দিক-নির্ণয়ে সহায়তা করে এবং আধুনিক কালের ছান্দসিক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন ও শ্রীযু অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিদের সঙ্গে আলোচনায় তাঁর বিচারের প্রবীণতা যে অগ্রগণ্য, একথা 'ছন্দ' বইখানি এবং বিশেষভাবে 'ছন্দের মাত্রা' ও 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধগুলি পড়লেই নিঃসংশয়ে বোঝা যায়। বাংলা ছন্দের অতি আধুনিক জ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম ক'রে যাওয়ার গৌরব অর্জ্জন করতে পারে নি।

বাংলা দেশে ছন্দের বৈজ্ঞানিক আলোচনা ইদানীং বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অন্ততঃ দু-চার জন ব্যক্তি যে নিজেদের কার্য্যক্ষেত্রকে গণ্ডীবদ্ধ ক'রে নিয়ে সেই সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে অখণ্ড মনোযোগ ও চিন্তাশক্তি নিয়োগ করছেন এবং ছন্দ সম্বন্ধে তন্ন তন্ন ভাবে খুঁটিয়ে বিচার করে গভীর নৈপুণ্যলাভের জন্য তৎপর হয়েছেন, এটা আশার কথা। বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ ও বিচারের ফলে বাংলা সাহিত্যে ছন্দের আলোচনা দিন দিনই সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে এঁদের মত বিশেষজ্ঞ

বলা চলে না এবং এইখানেই যে তাঁর বিশেষত্ব, 'ছন্দে'র মধ্যে তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞ একটা বিষয় নিয়েই আজীবন ব্যাপৃত থাকেন ব'লে স্বকীয় ক্ষেত্রে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা এবং প্রগাঢ়তা বাড়ে, কিন্তু সেই জন্যই তার প্রসার কমে যাওয়ারও যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা একটা সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করতে চায়, তাই সমগ্রতার সঙ্গে মিলিয়ে পরিপূর্ণ হওয়ার পথে অনেক সময়ই বাধা জন্মায়। ছন্দের প্রকৃতি, রূপভেদ, সৌন্দর্য্য, আঙ্গিক ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের কাছে অনেক কিছু আমরা জানতে পারি, কিন্তু আমাদের এই ভাষাগত ছন্দ যে বৃহত্তর সর্ব্বব্যাপী বিশ্বগত ছন্দের সঙ্গে সংযুক্ত এবং তারই একটা বিশেষ প্রকাশ, এই মূল কথাটি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এমন সুন্দরভাবে আর কে বলতে পারতেন জানি না। আমাদের কাব্যজগতের ছন্দকে প্রকৃতির নটরাজের বিচিত্র ছন্দোলীলার পটভূমিকায় দাঁড় করিয়ে দেখবার প্রশস্ত দৃষ্টি একমাত্র তিনিই দিতে পারতেন এবং সৌভাগ্যবশতঃ তিনি তা দিয়েছেন। 'ছন্দের অর্থ', 'বাংলা ছন্দের প্রকৃতি', 'গদ্যছন্দ' প্রভৃতি প্রবন্ধ থেকে আমরা সেই দৃষ্টি লাভ করতে পারি। এই প্রবন্ধগুলি থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

"পৃথিবী ঠিক চব্বিশ ঘণ্টার ঘূর্ণিলয়ে তিনশো পঁয়ষট্টি মাত্রার ছন্দে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেও যেমন কৃত্রিম নয়, ভাবাবেগ তেমনি ছন্দকে আশ্রয় করে আপন গতিকে প্রকাশ করবার যে চেষ্টা করে, সেও তেমনি কৃত্রিম নয়।"

"ছন্দ কবিতার বিষয়টির চারদিকে আবর্ত্তন করছে। পাতা যেমন গাছের ডাঁটার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে তাল রেখে ওঠে, এও সেই রকম। গাছের বস্তু-পদার্থ তার ডালের মধ্যে গুঁড়ির মধ্যে মজ্জাগত হয়ে রয়েছে, কিন্তু তার লাবণ্য, তার চাঞ্চল্য, বাতাসের সঙ্গে তার আলাপ, আকাশের সঙ্গে তার চাউনির বদল, এ সমস্ত তার পাতার ছন্দে।"

"ছন্দ মানেই ইচ্ছা। মানুষের ভাবনা রূপগ্রহণের ইচ্ছা করেছে নানা শিল্পে, নানা ছন্দে। কত বিলুপ্ত সভ্যতার ভগ্নাবশেষে বিস্মৃত যুগের ইচ্ছার বাণী আজও ধ্বনিত হচ্ছে তার কত চিত্রে, জলপাত্রে, কত মূর্ত্তিতে। মানুষের আনন্দময় ইচ্ছা সেই ছন্দোলীলার নটরাজ, ভাষায় ভাষায় তার সাহিত্যে সেই ইচ্ছা নব নব নৃত্যে আন্দোলিত।"

"বিশ্ব চলেছে প্রকাণ্ড ভার নিয়ে বিপুল দেশে নিরবধি কালে সুপরিমিতির ছন্দে। এই সুপরিমিতির প্রেরণায় শিশিরের ফোঁটা থেকে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত সুগোল ছন্দে গড়া। এই জন্যই ফুলের পাপড়ি সুবঙ্কিম, গাছের পাতা সুঠাম, জলের ঢেউ সুডোল।"

ছন্দের ফিলজফি অত্যন্ত সহজ ও সরস ভাষায় চমৎকার-ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তাই ছন্দ-শিক্ষার ভূমিকা হিসাবে বইখানি শিক্ষার্থীদের পক্ষে নিঃসন্দেহ অপরিহার্য্য।

বাংলা সাহিত্যে 'মুক্তছন্দ' বা 'গদ্যছন্দে'র প্রবর্ত্তন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই গদ্যছন্দের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য এবং রূপ নির্দ্দেশ করে তিনি যে কয়টি প্রবন্ধ লিখেছেন, ছন্দ-জিজ্ঞাসুদের পক্ষে যে সেগুলো অবশ্যপাঠ্য, তা বলাই বাহুল্য।

বইখানির একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতে বসেও কবি আপনার পরিচয় কিছুতেই গোপন রাখতে পারেন নি। শুষ্ক, দুরূহ বৈজ্ঞানিক আলোচনাও যে রস-সাহিত্যের মত উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে, 'ছন্দ' তারই একটা বিশিষ্ট নিদর্শন।

আর একটি বিষয়ে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। বিভিন্ন প্রকার ছন্দের রূপভেদ দেখাবার জন্য অনেকগুলি উদাহরণ তাঁকে দিতে হয়েছে। অনেকে মনে করতে পারেন যে, নিজেরই সঞ্চিত বিশাল কাব্যভাণ্ডার থেকে হয়ত আবশ্যকমত দৃষ্টান্ত তিনি সংগ্রহ করেছেন। অন্য কেউ হ'লে নিশ্চয়ই এই সহজ পন্থা অবলম্বন করতেন, কিন্তু স্বভাবকে অতিক্রম ক'রে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কবিতা-রচনার একটুখানি সুযোগও পেলে তিনি যে তা উপেক্ষা করে যাবেন, এ-কথা বোধ হয় তাঁর কোষ্ঠিতে কোন কালেই লেখে না। তাই বৈজ্ঞানিক রবীন্দ্র-নাথের পাশাপাশি বসে কবি রবীন্দ্রনাথও মনের আনন্দে কবিতার পর কবিতা রচনা ক'রে গেছেন। ফলে, ছন্দের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে প্রায় একশোটি নূতন কবিতা রচিত হয়ে "ছন্দে" স্থানলাভ করেছে, এগুলি আর কোথাও প্রকাশিত হয় নি। তার মধ্যে অন্যের কবিতার পদ্যানুবাদ আছে, 'লেখনে'র মত অনেক ছোট ছোট কবিতা আছে। এমন কি, এক-একটি সুসম্পূর্ণ বড় কবিতারও অভাব নেই। বলা বাহুল্য, ছন্দের দৃষ্টান্তস্বরূপে ব্যব-হৃত হওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্যে রচিত হ'লেও কাব্যসৃষ্টির দিক থেকে এই কবিতাগুলিতে যে কিছুমাত্র ত্রুটি থাকবে, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তা সহ্য করা অসম্ভব। তাই এই কবিতাগুলিও তাঁর অন্যান্য কবিতার মতই উপভোগ্য। শুষ্ক বৈজ্ঞানিক আলোচনার শ্রান্তি দূর করবার জন্য এরা যেন পথে পথে আমাদের জন্য আনন্দের বাণী সঞ্চিত করে রেখেছে। ভয় হয়, ছন্দতত্ত্বের আড়ালে পড়ে এই কবিতাগুলি না সাহিত্যামোদীদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। এগুলির কাব্যপরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা এখানে অসম্ভব হ'লেও দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়ত অবান্তর হবে না।

'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল' এই নিছক খবরটিকে ছন্দের মন্ত্র ছুঁয়ে কি করে কাব্যসাহিত্যের দরবারে এনে রসসৃষ্টি করা যেতে পারে, তাই দেখাতে গিয়ে চলল কবির কাজ—

"বিদ্যুৎ-লাঙ্গুল করি ঘনতর্জ্জন
বজ্রবিদ্ধ মেঘ করে বারি বর্জ্জন
তদ্রূপ যাতনায় অস্থির শার্দ্দূল
অস্থিবিদ্ধগলে করে ঘোর গর্জ্জন।"

ছন্দের গতিবেগের কথা বলতে গিয়ে একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করতে হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার অনুবাদ—

"শ্রাবণ মেঘে তিমির-ঘন শর্ব্বরী,
বরিষে জল কাননতলমর্ম্মরি'।

জলদরব-ঝঙ্কারিত ঝঞ্ঝাতে
বিজন ঘরে ছিলাম সুখ তন্দ্রাতে,
অলস মম শিথিল তনু-বল্লরী।
মুখর শিখী শিখরে ফিরে সঞ্চরি'।"

একটি ছোট্ট কবিতা—

"তারাগুলি সারারাতি কানে কানে কয়,
সেই কথা ফুলে ফুলে ফুটে বনময়।"

একটু বড় একটি কবিতার নমুনা দেওয়া যাক—

"বিজুলী কোথা হতে এলে,
তোমারে কে রাখিবে বেঁধে।
মেঘের বুক চিরি গেলে
অভাগা মরে কেঁদে কেঁদে।
আগুনে গাঁথা মণি-হারে
ক্ষণিক সাজায়েছ যারে
প্রভাতে মরে হাহাকারে
বিফল রজনীর খেদে।"

চার লাইনের একটি ছোট কবিতা দিলেও যেখানে ছন্দ-আলোচনায় বক্তব্য অনায়াসে পরিস্ফুট হতে পারে, সেখানে ছন্দের নূপুর পায়ে পরাতেই কবিতা কখন যে নেচে নেচে আপন আনন্দে বেরিয়ে পড়ে এবং কখন যে চার লাইনের আবশ্যক গণ্ডী অতিক্রম করে চলে যায়, কবির সেদিকে খেয়ালই থাকে না। ফলে কতকগুলি বেশ বড় বড় কবিতাও আমরা এখানে পাই। কিন্তু এ বিষয়ে এখানে আর বেশি কিছু লেখা সমীচীন হবে না জেনে ক্ষান্ত দিতে হ'ল। তবে আমাদের আশা আছে যে, রসজ্ঞ পাঠক সহজেই সেগুলির সন্ধান নিতে পারবেন।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

মধু-সন্ধান—শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

সূচীপত্র অনুসারে গ্রন্থটিকে মাত্র উনিশটি কবিতার সংগ্রহ বলিলে ভুল বলা হইবে, কারণ 'রাগিণীর রূপ' 'প্রেমপত্র' 'বিবিধ পত্র', এবং 'যৌবন' ইহারা সমধর্ম্মী কতকগুলি কবিতার গুচ্ছ। 'রাগিণীর রূপ' ও 'যৌবনে'র কয়েকটি ছোট কবিতায় মধুর সন্ধান কিছু পাওয়া যায়।

"আমি, তৃণদল সম শিহরি শিরায়
প্রভাত বায়ুর পরশনে;
তরুসম কাঁদি মুক বেদনায়
নব জলধারা বরষণে।"

অনুভূতির এইরূপ কিছু স্বচ্ছন্দ প্রকাশ, অথবা

"শ্রান্ত দিনদেব মৃগয়া বেলা শেষে
অস্তপার-দেশে থামালো রথ তার।
ছড়ানো রাঙামেঘে রচিত নিকেতনে
হেরিল কি নয়নে, হারালো পথ তার।
সন্ধ্যা-রাজবালা ছিল সে নিদ্রিত
মণির সেজ পরে বসন বিগলিত,
নয়ন আধখোলা অধর আধস্মিত,
শয্যা বেয়ে পড়ে আকুল কেশভার।"

এই ধরণের রূপকথার রঙীন ছবি চকিতে কখনো চোখে পড়িলে ভাল লাগে।

রবীন্দ্রনাথের 'আজি হ'তে শতবর্ষ পরে' কবিতাটির প্রত্যুত্তরে রচিত কবিতাটি রসরচনা হিসাবে সম্পূর্ণ সার্থক না হইলেও,

"এ হেন সিনেমা ছাড়ি কাব্যের সমুদ্রে পাড়ি
দিবে বল কোন্ মূর্খ জন"
"রবিহীন এ সংসারে অজ্ঞানের অন্ধকারে
ডুবে তারা রবে চিরন্তরে।"

প্রভৃতি পংক্তিতে আগামী যুগের সমাজ-জীবনে রুচি ও রসহীনতার সুনিশ্চিত সম্ভাবনার প্রতি যে শ্লেষ করা হইয়াছে তাহা উপভোগ্য।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পৃথ্বীপরিচয়—শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। রবীন্দ্রনাথ লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। মূল্য বার আনা।

বিশ্বভারতী হইতে যে লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা প্রকাশিত হইতেছে, এখানি তাহার তৃতীয় খণ্ড। আলোচ্য বইখানিতে অল্প কথায়, অল্প শিক্ষিত পাঠকের বোধগম্য করিয়া কতকগুলি জটিল বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সুকঠিন cosmography, Geology ও Prehistoric Zoology সম্বন্ধে এ রকম একখানি বই আগে কখনও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদ হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর উদ্দেশ্য অল্পশিক্ষিত পাঠক সাধারণের জ্ঞানার্জ্জনের সহায়তা করা। বইখানি যে শুধু সেদিক দিয়া অসামান্য সাফল্যলাভ করিয়াছে তাহা নহে, বিজ্ঞানপ্রিয় সকল পাঠকের নিকটেই বইখানি উপাদেয় হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বর্ত্তমান বিজ্ঞান গত ৫০ বৎসরের মধ্যে যে উচ্চ স্তরে আরোহণ করিয়াছে, একখানি এক শত পৃষ্ঠার বইয়ে তাহা এমন সহজ সরল ভাষায় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা কম কৃতিত্বের পরিচয় নহে। বইখানি অনুসন্ধানী সকলেরই পড়া কর্ত্তব্য।

বইখানির ভাষা অতি ঝরঝরে, এবং লেখার গুণে দুরূহ বিজ্ঞান উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক।

শ্রীআর্য্যকুমার সেন

রোমাঞ্চক রাশিয়ায়—ডক্টর সত্যনারায়ণ। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, পৃ. ৩৮৪। মূল্য ২৷৷০ টাকা।

এখানি উপন্যাস। উপন্যাস বলিয়া ইহার সবটাই কাহিনী নয়। বইখানিতে লেখকের সোভিয়েটরাষ্ট্রপ্রবাসের অভিজ্ঞতার পরিচয় পরিস্ফুট। রোমাঞ্চক রাশিয়া নামের মধ্যে একটা রোমান্সের ভাব আছে। তাহা নিরর্থক হয় নাই। তথ্যের সহিত কল্পনা, কামনার সহিত অনুভূতি এবং ঘটনার সহিত রোমান্স মিশাইয়া অভিজ্ঞতার পটে লেখক চিত্র আঁকিয়াছেন। তাই তিনি উপন্যাসখানিকে 'ছবি' নামেই অভিহিত করিয়াছেন। বাঙালী না হইয়াও বাংলা উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করিতে লেখকের লেখনী কুণ্ঠিত হয় নাই। অবাঙালী সাবলীলভাবে বাংলা লিখিতেছেন, ইহা আনন্দের কারণ, আশ্চর্য্যের কথা নয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, বাংলার মত ঐশ্বর্য্যশালী ভাষার ভিতর দিয়া প্রতিবেশী প্রদেশগুলির যথেষ্টসংখ্যক গুণী ব্যক্তি এখনও পর্য্যন্ত মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিলেন না কেন? অথচ বাংলায় তাঁহারা একান্ত অনভিজ্ঞ এমন নয়। বাংলার অনুবাদে কোন কোন

প্রদেশের সাহিত্যে যথেষ্ট সমৃদ্ধি আসিয়াছে। "রোমাঞ্চক রাশিয়া" পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। খণ্ডগুলিতে তাওয়ারিশ, ডোন কোজাক, লীজা, বেলা, খোখোল প্রফেসর, ভোল্‌গা, মস্কো, নাস্তা, নবীন জগৎ, লেনিনগ্রাদ, শুভ্র রজনীর সঙ্গীত প্রভৃতি একুশটি অধ্যায় এবং নয়খানি চিত্র আছে। প্রায় সকল অধ্যায়গুলিই স্বসম্পূর্ণ। লেখকের গল্প বলিবার ভঙ্গীটি ভাল। ভ্রমণবৃত্তান্তে আমরা বিদেশের বাহ্য সংবাদ পাই। উপন্যাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাশিয়ার অন্তরের কাহিনী ফুটাইতে ডক্টর সত্য-নারায়ণ সমর্থ হইয়াছেন। বিদেশীর দৃষ্টিতে তিনি রাশিয়াকে দেখেন নাই। সোভিয়েট মনোভাবকে লেখক নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন। নূতন সমাজ ও নূতন রাষ্ট্র গঠনের নব নব আনন্দ রাশিয়ার পরিচয় প্রদানে তাই ক্ষণে ক্ষণে ঝলকিত হইয়া উঠিয়াছে। খোখোলে প্রফেসর ও বেলার চরিত্র চমৎকার। বর্ণনায় অথবা চরিত্র-চিত্রণে বর্ণের অতিরেক হয়ত কোথাও কোথাও আছে, তাহাতে সমগ্র উপন্যাসের অঙ্গশ্রী ব্যাহত হয় নাই। ডক্টর সত্যনারায়ণ নূতন লেখক। তিনি উপন্যাসে নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। এ অবস্থায় ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক কিন্তু ধর্তব্য নহে। তাঁহার গুণপনা প্রশংসার্হ। উপন্যাসখানি নানা দিক দিয়া উপভোগ্য।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

স্বায়ত্ত চিকিৎসা—শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন। বর্দ্ধিত সংস্করণ। প্রাপ্তিস্থান ১৩৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ৪২৬। মূল্য তিন টাকা।

এই গ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদ মতে প্রত্যেক রোগের কারণ, তাহার চিকিৎসা-কৌশল ও ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালী অতি সুন্দর ভাবে লিখিত হইয়াছে। চিকিৎসক ভিন্ন সাধারণেও যাহাতে সহজে বুঝিতে সমর্থ হন তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লেখক সকল বিষয়েই প্রাঞ্জল ভাষায় পরিষ্কার ভাবে লিখিয়াছেন। স্বর্গীয় কবিরাজ মহাশয় প্রায় ৬০ বৎসর যাবৎ চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি গ্রন্থের প্রথমে যে 'উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপনীয়াধ্যায়' লিখিয়াছেন, তাহাতে লিখিয়াছেন যে, "বহুপরীক্ষিত শতাধিক স্থলে প্রয়োগ করিয়া যাহার সুফল উপলব্ধি করিতে পারিতেছি তাদৃশ যোগই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অপরীক্ষিত একটি যোগও এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয় নাই।" স্বর্গীয় কবিরাজ মহাশয়ের ন্যায় অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা এইরূপ ভাবে তাঁহাদের সুদীর্ঘ কালের চিকিৎসার অভিজ্ঞতার ফল যদি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া যান তাহা হইলে তদ্দ্বারা দেশের প্রভূত উপকার হইতে পারে। সেই হিসাবে এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া লেখক যে কেবল আয়ুর্ব্বেদের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা নহে, সাধারণের ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক-সমাজের বহু কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়। ইহাতে লিখিত ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধাদির দ্বারা সাধারণেও বহু রোগের চিকিৎসা চিকিৎসকের বিনা সাহায্যে নিজেরাই করিতে পারিবেন।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন

রামায়ণিকা—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত। এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড ব্রাদার্স, ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা পৃ. ৫১।

রামায়ণের গল্পের সহিত বালকবালিকাদের মোটামুটি পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য এই বইটি লিখিত হইয়াছে। বইখানি, স্বল্প আয়তনের মধ্যে যত দূর সম্ভব, সুলিখিত ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

স.

বঙ্গীয় শব্দকোষ—শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, এবং শান্তিনিকেতন হইতে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত। প্রতি খণ্ডের মূল্য আট আনা।

এই বৃহৎ অভিধানখানির ৭২তম খণ্ড শেষ হইয়াছে। ইহার শেষ শব্দ "ভূয়িষ্ঠ" এবং শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক ২২৯২। ইহা আরও আঠার খণ্ডে সমাপ্ত হইবে, এইরূপ অনুমান হয়। ইহার আরও অধিক ক্রেতা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জ্ঞানভারতী—বা সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ। প্রথম খণ্ড অ—ঋ। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোং, কলিকাতা। প্রবাসীর পৃষ্ঠা অপেক্ষা কিছু লম্বা এবং চওড়ায় প্রায় তাহার সমান ৪৭৯ পৃষ্ঠা। সুমুদ্রিত। বাঁধাই মজবুত ও সুদৃশ্য। ছবিগুলি স্পষ্ট ও সুমুদ্রিত।

ইহার সম্পাদকের "নিবেদন" পড়িলে এই গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নরনারী, ভারতীয় ও অন্যান্য দেশের দেবদেবী, নানা বিজ্ঞানের অনেক হাজার তত্ত্ব ও তথ্য, ইত্যাদি বর্ণমালা বর্ণানুক্রমে দেওয়া হইয়াছে। এই দুই খণ্ডে ১০০০০-এর অধিক বিষয় সম্বন্ধে বিবৃতি দেওয়া আছে। তৃতীয় খণ্ডটি হইবে গেজেটিয়ার বা ভূকোষ। এই অংশে পৃথিবীর মহাদেশ, দেশ, নদনদী, বন্দর, শহর ও রাষ্ট্রসমূহের তথ্য আছে। তিন খণ্ডেই বাংলা দেশের বিবিধ বিষয়ের উপরই বেশি ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে। বাঙালীর জন্য অভিপ্রেত বাংলা বহিতে তাহাই উচিত ও স্বাভাবিক।

"বাংলার বিশিষ্ট লোক, বাংলার সাহিত্যিক, বাংলার কবি, বাংলার গাছপালা, বাংলার মাছ, বাংলার জীবজন্তু বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ও পৃথিবীর সর্বদেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জীবনী ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক, গাণিতিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনীতিক পরিভাষাসমূহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। * * * হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ও জৈনদের ধর্ম ও সাহিত্য সংক্রান্ত বিশিষ্ট শব্দগুলি আলোচিত হইয়াছে।" "বাংলা দেশ সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। বাংলার থানা, মহকুমা, জেলা, নদনদী, মেলা, তীর্থস্থান, শিল্পস্থান, বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের অন্তর্গত জেলাগুলি; দেশীয় রাজ্যসমূহ সম্বন্ধে বহু তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক দেশের ইতিহাস, ভাষা, শাসনপ্রণালী, জনসংখ্যা, ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা সম্বন্ধে তথ্য দিয়াছি। মোট কথা এ শ্রেণীর এক খণ্ডের গেজেটিয়ার বাংলায় ইতিপূর্বে সংকলিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।" আমাদেরও জানা নাই। এই গেজেটিয়ারটিতে "৫০০০-এর উপর স্থানের বর্ণনা আছে।"

রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"জ্ঞানভারতীর সম্পাদনায় শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমারের অধ্যবসায় সার্থক হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের শব্দভাণ্ডারে এই গ্রন্থের সংগ্রহ আদরণীয়।"

মৈত্রী-সাধনা—শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা। প্রবাসীর পৃষ্ঠার অর্ধেক আকারের ৮৫/০+৭৫ পৃষ্ঠা।

এই ছোট বহিখানি আট আনায় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা ইহার আর্থিক মূল্য মাত্র; প্রকৃত মূল্য অপরিমেয়। আজকাল "অহিংসা" শব্দটির প্রয়োগ খুব প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার দ্বারা কেবল অভাবাত্মক কিছু বুঝায়—হিংসা না থাকিলেই বলা যায় অহিংসা আছে। কিন্তু মৈত্রীর অর্থ অহিংসার অর্থ অপেক্ষা সমধিক গুরুত্বসম্পন্ন। ইহা ভাবাত্মক, গভীর ও ব্যাপক।

"মৈত্রীর মৌলিক অর্থ স্নেহশীলতা। পিতা মাতা প্রভৃতির স্নেহ যেমন তাঁহাদের স্নেহের পাত্রের উপর স্বতই বর্ষিত হয়, কাহারও প্রতি সেইরূপ স্নেহবর্ষণের নামই তাহার প্রতি মৈত্রী করা। সংস্কৃতে, বিশেষ বৌদ্ধ সাহিত্যে, এই মৌলিক এবং ব্যাপক অর্থেই প্রায় মৈত্রীর প্রয়োগ দেখিতেছি।"

গ্রন্থকার মৈত্রী সম্বন্ধে উপদেশের বাণী বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে এই পুস্তকে সঙ্কলন করিয়াছেন। যথা অথর্ববেদ, আপস্তম্বসংহিতা, ঋগ্বেদ, গীতা, ছান্দোগ্যোপনিষদ, ধম্মপদ, পাতঞ্জল যোগদর্শন, বোধিচর্যাবতার, ভাগবত, মনুস্মৃতির, মহাভারত, মহাযান সূত্রালংকার, মৈত্রেয়োপনিষৎ, যজুর্বেদ, যোগবাশিষ্ঠ, বিষ্ণুপুরাণ, বিসুদ্ধিমগ্‌গ, শিক্ষাসমুচ্চয়, সুত্তনিপাত, হিতোপদেশ।

উদ্ধৃত সমুদয় বচনের বাংলা অনুবাদ দেওয়ায় বাংলা-জানা সকলেরই ইহা ব্যবহার্য হইয়াছে। মৈত্রীর সাধনা সকলেরই করা উচিত। কংগ্রেসের সভ্যদিগকে বিশেষ করিয়া অহিংসার সাধনা করিতে বলা হইয়া থাকে। অতএব, তাঁহারাও এই পুস্তকখানির পাঠক হইবেন, আশা করি।

ড.

আলোচনা

সাম্প্রদায়িক ভাষা ও সাম্প্রদায়িক ইতিহাস

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গত মাঘ মাসের "প্রবাসী"তে প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধে কিছু ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। সেজন্য আমি দুঃখিত।

প্রথমতঃ, ৫৪৮ পৃষ্ঠার পাদটীকায়—"প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩৯" এইরূপ আছে। উহা "প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪১, পৃঃ ১০৩" এইরূপ হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ৫৫০-৫৫১ পৃষ্ঠায় মক্তবের ইতিহাস সিলেবাস সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহার সম্বন্ধে আরও কিছু বলা দরকার। ১৯২৪ সালের ৮ ডিসেম্বর তারিখের সরকারী বিজ্ঞপ্তি (Notification No. 3730 Edn. dated 8-12-1924) দ্বারা মক্তবের যে পাঠ্যবস্তু নির্দেশ করা হয় তাহাতে তৃতীয় শ্রেণীর (Class iii) ইতিহাসে এই বিষয়গুলি থাকার কথা:—

Social and political life of early Hindus. Stories of some of the chief Hindu Kingdoms. The story of Buddha and the spread of his religion. Alexander's invasion. A diologue about the social and political condition in India just before the Muhammadan invasion. A dialogue about the social and political Kingdom of Ghazni and Ghor. Pathan Empire, its rise and decline. Timur's invasion.

এই পাঠ্যতালিকা ১৯২৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত হয়। সাধারণ প্রাইমারি স্কুলে যে পাঠ্য বিষয় (syllabus) ১৯২৫ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে প্রবর্তিত হয় (Notification No. 1665 Edn. 16th Nov. 1920), তাহার মধ্যে ইতিহাসের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এইগুলিও ছিল:—

A dialogue about the society, religion and learning of the Aryan Hindus. The story of Mahavira and the Jainas. The story of Bijoy Singha. Chandra Gupta, Asoka, Vikramaditya, Harshavardhan. . . . Pal and Sen kings of Bengal.

দুইটি সিলেবাস তুলনা করিলেই মক্তবী ইতিহাসের বিশেষত্ব বুঝা যায়। উক্ত সিলেবাস উঠিয়া গিয়া ১৯৪১ সাল হইতে যে নূতন নিয়ম হইয়াছে, তাহাতে মক্তব ও প্রাইমারি স্কুলের পাঠভেদ 'দূর করা' হইয়াছে। ইতিহাস-পুস্তক থাকিবে না, তবে সাহিত্যের মধ্যে (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর) কতিপয় নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক ব্যক্তির গল্প থাকিবে।

আমি কয়েকখানি "সাহিত্য" পুস্তক (১৯৪১ হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য অনুমোদিত) দেখিয়াছি। ঐগুলিতে আরঙ্গজেব ও শিবাজীর চরিত্রাঙ্কনে ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত করার চেষ্টা আছে। অন্য রাজাদের কথা না-ই বলিলাম।

তৃতীয় শ্রেণীর প্রত্যেক পুস্তকেই খাজা মৈনুদ্দিন চিশ্‌তির গল্প আছে। আমি তিন-চারখানি মুসলমান লেখকের পুস্তক দেখিয়াছি (কবি গোলাম মুস্তাফার বই উহার মধ্যে) যাহাতে 'খাজা সাহেব'কে বড় করিতে গিয়া দেশের জন্য প্রাণোৎসর্গকারী মহাবীর পৃথ্বীরাজের প্রতি বিশেষ অসম্মান ও অবিচার করা হইয়াছে। মক্তবের জন্য কতকগুলি 'বিশেষভাবে লিখিত' পুস্তক পাঠ্য হওয়ায়, মক্তবী বাংলাও বজায় থাকিল।

প্রবাসীর সম্পাদকের মন্তব্য। বাংলা দেশের পাঠশালা, বিদ্যালয়, ইস্কুল, মক্তব ও মাদ্রাসায় ভারতবর্ষের ও বাংলা দেশের কোন ইতিহাস বা তাহার ইতিহাস-ঘটিত প্রবন্ধ বা গল্প পঠিত না-হওয়া বরং ভাল, কিন্তু বিকৃত অসত্য ইতিহাস পঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

স্বপ্ন

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মরণের কালো সাগরের জলে জীবন-নদী
একদা মিলাবে—তার আগে, ভাই, পাই রে যদি
পল্লী-মায়ের নিভৃত অঙ্কে একটু ঠাঁই,
মাথার উপরে সুনীল আকাশ সর্ব্বদাই,
ঘরের সীমানা পার হয়ে গেলে বিলের ধার—
নির্ম্মল জল কাক-চক্ষুরে মানায় হার।
সবুজ ঘাসের মখমলে ঢাকা কোমল তীর,—
তারই কূলে কূলে শালুক ফুলেরা করেছে ভীড়;
জলচর পাখী কলরব তুলে সাঁতার খেলে,
মানুষ দেখিলে নিমেষে আকাশে পক্ষ মেলে;
চম্‌চমে রোদে হাসে সারাবিল, আসে দুপুর,
দেখে মনে হয়—সবুজ ফ্রেমেতে ঝলে মুকুর।

নারিকেল আর সুপারির বনে নিরালা ঘর।
বেণুবন হ'তে আসে কপোতের করুণ স্বর;
সিমুর মাথায় কোলাহল করে টেঁয়ার ঝাঁক;
তার সাথে মেশে শঙ্খচিলের তীক্ষ্ণ ডাক;
আম্র-কাননে কোকিল কাহারে ডাকিয়া মরে!
দখিনা বাতাসে সজিনার ফুল নীরবে ঝরে,
বকুল-পাতার আড়ালে কোথায় লুকায়ে থাকি
সারাটা সকাল শিস্ দিয়ে চলে দোয়েল পাখী।

এমনি একটি কুটীরে যদি রে থাকিতে পাই—
দিগ্বিজয়ীর যশ-সৌরভ চাহি না, ভাই।
সঙ্গী রহিবে বাছা বাছা পুঁথি কয়েক খান—
দুঃখ-নিশায় আনন্দ যারা করেছে দান,
পথের আঁধার জ্ঞানের আলোয় করেছে দূর,
শোনাইবে তারা অলকাপুরীর বেণুর সুর।
সাঁঝের বেলায় আসিবে বন্ধু দু-এক জন—
কথোপকথনে দেবে অমৃতের আস্বাদন।

সুখের পেয়ালা পূর্ণ করিতে রহিল বাকী
শুধু একজন—নব-ওমরের নবীনা সাকী।
সে হবে একটি সুন্দরী নারী—নারী না হ'লে
হৃদয়-লতায় কাব্য-কুসুম কখনো দোলে?
রমণীরে যবে লাগে সুন্দর মুগ্ধ চোখে—
মর্ত্ত্য—সে হয় রূপান্তরিত স্বর্গলোকে!
ঘুমন্তবন বিহঙ্গ গীতে সহসা জাগে;
কালো দিগন্ত রাঙা হয়ে ওঠে অরুণ-রাগে;
অমরাবতীর জ্যোতি ঝলে প্রতি ধূলিকণায়—
ভালোবাসা যবে ঝঙ্কার তোলে প্রাণ-বীণায়।
চিত্ত যেখানে তৃপ্ত প্রেমের পূর্ণতায়
বিশ্ব সেখানে সুন্দর হয়ে দীপ্তি পায়।

ডানা-কাটা পরী না যদি হয় সে—নাহিকো ক্ষোভ;
নারী-হৃদয়ের প্রেমের মধুতে কবির লোভ।
টক্‌টকে লাল সাড়ীটি পরিয়া এলায়ে চুল
সকাল বেলায় সাজিতে ভরিবে পূজার ফুল।
দেবদারু-বনে বাদুড়-পাখায় রাত্রি নামে,—
দিগন্তপারে অরুণ-রথের চক্র থামে,—
সাথীর নিকটে বিদায় মাগিছে চক্রবাক—
এ হেন সময় প্রেয়সীর হাতে বাজিবে শাঁখ।
কবরীতে রাঙা করবীর মালা, ললাটে টিপ,
তুলসীতলায় রাখিবে সে ধীরে সন্ধ্যাদীপ,
সেই দীপালোকে স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুখটি তার
চুরি ক'রে রোজ দেখে নেবে কবি বারম্বার।
তপ্ত ভালে সে রাখিবে স্নিগ্ধ পরশখানি,
দুঃখের দিনে শোনাবে শ্রবণে মধুর বাণী,
গৃহেতে আমার গৃহদীপ হয়ে জ্বলিবে নিতি,
মাঘের নিশায় ফাগুন-উষার শোনাবে গীতি,
সত্যের পথে চলিতে চিত্তে শক্তি দেবে,
পড়ে যাই যদি হাতটি ধরিয়া তুলিয়া নেবে,
প্রিয়া হয়ে রাতে হৃদয় ঢালিয়া বাসিবে ভালো,
দেবী হয়ে প্রাতে চলার পথে সে দেখাবে আলো।

সেন্সাসের আবশ্যকতা কি?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

এই বৎসর ফাল্গুন মাসে মানুষ গণনা হইবে; ইহার মধ্যেই প্রাথমিক গণনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বাড়ীতে বাড়ীতে আলকাতরা দিয়া নম্বর দেওয়া, কোন্ বাড়ীতে কয়খানা ঘর, কোন্ বাড়ীতে কয়জন বয়স্ক লোক আর ছেলেপুলে কয়জন ইত্যাদি কার্য্য শেষ হইয়াছে। চূড়ান্ত গণনা আরম্ভ হইবে। তবে এইবারে অন্যান্য বারের ন্যায় এক রাত্রিতে চূড়ান্ত গণনা শেষ হইবে না। পনর দিন ধরিয়া চূড়ান্ত গণনা হইবে। গণনা যাহাতে সঠিক হয়, কেহ বাদ না পড়ে; কেহ যাহাতে লোকসংখ্যা বাড়াইয়া না বলে তাহার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। সরকারী চেষ্টা ত চলিতেছেই; বে-সরকারী ভাবে নিখিলবঙ্গ সেন্সাস বোর্ড ইস্তাহার বিলি করিয়া, প্রচারক পাঠাইয়া, কাগজে লিখিয়া যথোচিত চেষ্টা করিতেছেন। গত ইংরেজী ১৯৩১ সালের মানুষ গণনার সময়ে কংগ্রেসের আদেশে বহু হিন্দু নিজ নিজ নাম বা পরিবারবর্গের নাম লেখান নাই; ফলে হিন্দুর সংখ্যা খুব কম দেখান হইয়াছে। এই কলিকাতা শহরের মধ্যে বড়বাজার অঞ্চলে প্রায় ৩৮,০০০ হাজার লোক বিনা কারণে (সেন্সাস কর্ত্তৃপক্ষও কোন কারণ দেখাইতে পারেন নাই) কমিয়া গিয়াছে। আর এই কমতি অল্প নহে, বড়বাজারের লোক সংখ্যার শতকরা ৩৩ ভাগ। এবারে কিন্তু কংগ্রেস সেন্সাস বয়কট করিতে ত বলেনই নাই; অধিকন্তু মহাত্মা গান্ধী, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ লোক-গণনার কার্য্যে সাহায্য করিতে দেশবাসীকে অনুরোধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট নেতারাও লোক-গণনার কার্য্যে হিন্দুদিগকে আহ্বান করিয়াছেন ও যাহাতে তাঁহাদের সংখ্যা যথাযথ ভাবে লিখিত হয় তাহার চেষ্টা করিতে বলিয়াছেন।

প্রশ্ন উঠিতে পারে লোক-গণনার দরকার কি? আমাদের দেশে যখন প্রথম লোক-গণনা হয়, গ্রামের মাতব্বর পাঁচু মণ্ডল উমাচরণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ উমোচরোণ! ত্রিবুবর্ সাহেব (Mr. Trevor) এসে যে হিন্দী ক'রে বলে গেল মানুষ গুনতে হবে—কেন? ধরে নিয়ে গিয়ে বেগার খাটাবে না ত?" উমাচরণ বাবু যতই বলেন যে না গবর্ণমেণ্টের সে-সব কোন উদ্দেশ্য নাই, পাঁচু মণ্ডল ততই মাথা নাড়ে। শিরোমণি মহাশয় গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন—কথাটা তাঁহার কানে উঠিল। তিনি বলিলেন, "পাঁচু! আসল কথাটা কি কেউ খুলে বলে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে রুশিয়ার জারের তর্ক উঠিয়াছে কে বড় রাজা? যার যত প্রজা আছে সেই তত বড় রাজা। তাই মানুষ গোনা হচ্ছে। ঠিক ঠিক ভাবে মানুষ গুনিও—যাহাতে মহারাণীর জয় হয়।"

যেবারে কলিকাতায় গঙ্গার উপর ভাসা পুল তৈয়ারী হয়, সেবারে মানুষ গণনার সময় গরীব লোকেদের মধ্যে বিশ্বাস হয় যে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কালিঘাটে মা-কালীর নিকট ১০৮ নরবলি দিবে। অনেকে কলিকাতা ছেড়ে দেশে পালিয়ে গেল। সরকারী সেন্সাস রিপোর্টে লিখিত আছে যে ৯৮টি ঘরবাড়ী খালি পড়িয়াছিল।

তারকেশ্বরে যাইতেছি গান্ধী ক্লাসে চড়িয়া। কোন্নগর স্টেসনে দুঃখীরাম পাল এক পাল ছেলেমেয়ে, ৭টি বিধবা, ৬টি সধবা ইত্যাদি লইয়া গাড়ীতে উঠিল। উঠিতেই তাহার দু-মিনিট সময় লাগিল—বসিবার আগেই সকলে গাড়ীতে উঠিয়াছে কিনা গুনিয়া দেখিতে লাগিল। দুঃখীরামের দিদি রাগিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "দেখ দুঃখে! অলুক্ষণ করিস নি। ছেলেপুলে-দের গুনবি নি।"

আমাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে একটি অন্ধ কু-সংস্কার আছে যে মানুষ গুনিলে, বিশেষ করিয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গুনিলে তাহারা

মরিয়া যায়। অনেকে এই অন্ধ কু-সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ছোট ছোট ছেলেদের নামে মানুষ গণনার সময় লিখায় না। এটি খুব দোষের। মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের মধ্যে যে শিশুর সংখ্যা কম, তাহার আংশিক কারণ সব হিন্দু-শিশুর সংখ্যা যথাযথভাবে লিখিত হয় না।

মানুষ গণনার আবশ্যকতা কি? এই সম্বন্ধে আমরা সামান্য দুই-চারিটি কথার আলোচনা করিব। ইংরাজী Encyclopædia Britannica নামক সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বকোষগ্রন্থে লিখিত আছে যে:—"Census Statistics are the common tools and materials of the business of Government * * *; they are equally indispensable to the direction of State policy" অর্থাৎ সেন্সাসের তথ্যগুলি শাসনকার্য্যের নিত্য ব্যবহার্য্য যন্ত্রপাতি; এবং সরকারী বা রাষ্ট্রীয় কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিবার জন্য উহা একান্ত দরকার। সামাজিক স্বাস্থ্য, সামাজিক কল্যাণের জন্য উহা একান্ত দরকার।

(১) আমাদের দেশে কয়েক বৎসর আগে বিবাহের কোন বয়সের বাঁধাবাঁধি ছিল না। যে যে বয়সে ইচ্ছা হইলেই বিবাহ করিতে বা দিতে পারিত। যখন সারদা আইনের কথা উঠে, তখন অনেকে বিলাতের নজীর দেখাইয়া বলেন যে সুসভ্য ইংলণ্ডেও যখন পুরুষে ১৪ বছর উত্তীর্ণ হইলে বিবাহ করিতে পারে, তখন আমাদের এই গরম দেশে ১৮ বছরের আগে পুরুষে বিবাহ করিতে পারিবে না, এ কি রকম কথা? বিলাতে আইন ঐরূপ ছিল বটে (সম্প্রতি ইংলণ্ডেও আইন বদলান হইয়াছে), কিন্তু গত ৩০০ বছরের মধ্যে এক রাজা দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে আর্ল অব্ আউন্‌স্‌লো ছাড়া আর কোনও পুরুষ ১৪ বছর উত্তীর্ণ হইতে-না-হইতে বিবাহ করিয়াছে এরূপ কথা ইতিহাস লিখে না। আর আমাদের দেশে ইংরেজী ১৯২১ সালের সেন্সাস অনুসারে দেখিতে পাই যে ৫ বৎসরের কম ১১১,০০০, ৫ থেকে ১০ বৎসরের ৭৫৭,০০০ ও ১০ থেকে ১৫ বৎসরের ২৩,৪৪,০০০ পুরুষ বিবাহিত। আর বিবাহ হয়েছিল বউ মরে গিয়েছে ১০ থেকে ১৫ বছরের এরূপ পুরুষের সংখ্যা ১,০৯,০০০ হাজার।

আইন যাহাই হউক, পুরুষদের মধ্যে অল্প বয়সে বিবাহ প্রচলিত কি না, এ কথার জবাব আইন নজীর থেকে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় সেন্সাস থেকে—মানুষ গণনা থেকে।

(২) পঞ্জাবে, রাজপুতানায় ও যুক্ত প্রদেশে কয়েকটি জাতির মধ্যে কন্যা-শিশু মারিয়া ফেলার প্রথা ছিল। ইহার জন্য ভারত-সরকার আলাহিদা একটি আইন করেন—যাহাতে এই কু-প্রথা বন্ধ হয়। আইনটি কিরূপ কার্য্যকরী হইয়াছে দেখা যাউক। শিক্ষা প্রচারের ফলে এই কু-প্রথা লোপ পাইয়াছে কি কমিয়া গিয়াছে দেখা যাউক। নিম্নে আমরা পঞ্জাবের কয়েকটি জাতি, যাহাদের মধ্যে কন্যা-শিশু মারিয়া ফেলিবার প্রথা ছিল, তাহাদের মধ্যে সর্ব্ব বয়সের স্ত্রীলোকের ও পাঁচ বৎসরের কম বয়সের কন্যা-শিশুর অনুপাত প্রথমে দিলাম। পরে তাহাদের সহিত তুলনা করিবার জন্য ঐ পঞ্জাবেরই অপর কয়েকটি জাতি, যাঁহাদের মধ্যে কন্যা-শিশু মারিয়া ফেলিবার প্রথা কখনও ছিল না, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্ব বয়সের স্ত্রীলোকের ও পাঁচ বৎসরের কম বয়সের কন্যা-শিশুর অনুপাত দিলাম। দেশের আবহাওয়ার প্রভাব বা দেশে প্লেগ প্রভৃতির আক্রমণ উভয় সম্প্রদায়কেই সমান ভাবে আক্রমণ করিবে বা প্রভাবান্বিত করিবে। যেটুকু পার্থক্য দৃষ্ট হইবে তাহা কেবলমাত্র শিশু-কন্যা মারিয়া ফেলিবার জন্য। আর উপর্য্যুপরি কয়েকটি সেন্সাসের অঙ্ক হইতে আমরা বুঝিতে পারিব যে এই কু-প্রথা কমিতেছে কি না। নিম্নে অঙ্কগুলি দিলাম।

পঞ্জাব

১,০০০ পুরুষে স্ত্রীলোকের অনুপাত

জাতি	১৯২১		১৯১১		১৯০১	
	সর্ব্ব বয়স	০-৫ বৎসর	সর্ব্ব বয়স	০-৫ বৎসর	সর্ব্ব বয়স	০-৫ বৎসর
যাহাদের মধ্যে কন্যা-শিশু-হত্যা প্রথা ছিল।						
জাঠ (হিন্দু)	৭৮৯	৯২২	৭৭৪	৯০৪	৭৯৫	৮৩৯
ক্ষত্রি	৮১১	১,০৪১	৮০২	১,০২২	৮০৮	৯১৪
রাজপুত (হিন্দু)	৭৯৬	৯৩৮	৭৫৬	৮৩৬	৮২২	৮৬৯
গুজার	৭৭৮	৯০২	৭৬৩	৮৮২	৭৯৯	৮৬৮
যাহাদের মধ্যে কন্যা-শিশু-হত্যা প্রথা নাই।						
জাঠ (মুসলমান)	৮২০	৯৪২	৮০৭	৯৩৬	৮৫৯	৯৪০
রাজপুত (ঐ)	৮৬৪	৯৫৭	৮৪১	৯৭০	৮৮৩	৯৫১
ব্রাহ্মণ	৮২১	৯৭৭	৮১১	৯৬২	৮৪১	*
চামার	৮৪৫	৯৭৬	৮৪৬	৯৬৪	৮৭১	*
কানেও	৯৩৬	১,০৩৮	৯৪৭	১,০৩৭	৯২৪	*
আরাঁই	৮৩০	৯৪৮	৮০৭	৯৬৩	৮৭৭	*

* সংখ্যা পাওয়া যায় না।

দেখিতে পাইতেছি যে হিন্দু জাঠ ও রাজপুতদের মধ্যে বিশ বৎসরে শিশু-কন্যার অনুপাত হাজার-করা ৮৩ ও ৬৯ বাড়িয়াছে। অর্থাৎ এই কু-প্রথা ক্রমশঃই লোপ পাইতেছে। এ-কথা বলিলে চলিবে না যে স্বাভাবিক কারণে বা সাময়িক অন্য কোন কারণে শিশু-কন্যার অনুপাত বাড়িয়াছে। কারণ মুসলমান জাঠ ও রাজপুত-দের মধ্যে ঐরূপ শিশু-কন্যার অনুপাত বিশ বৎসরে বাড়িয়াছে মাত্র হাজার-করা ২ ও ৬ জন করিয়া। সেন্সাসের অঙ্কগুলি না থাকিলে আমরা জোর করিয়া বলিতে পারিতাম না যে শিশু-কন্যা হত্যার প্রথা দ্রুত কমিতেছে।

(৩) আমরা কথায় কথায় বলি যে বাঙালী জাতি, বিশেষ করিয়া বাঙালী হিন্দু মরিয়া যাইতেছে, বিদেশ হইতে লোক আসিয়া বাঙালীর স্থান পূরণ করিতেছে। কথাটা কিয়দংশে সত্য হইলেও সর্ব্বাংশে সত্য নহে। বাংলার বাহিরে জন্ম, যাঁহারা সেন্সাসের সময় বাংলা দেশে ছিলেন, এরূপ লোকের সংখ্যা গত ৩টি সেন্সাসে ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। নিম্নে আমরা সংখ্যাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

সেন্সাসের বৎসর	বাংলার বাহিরে জন্ম বাংলায় আগত লোকের সংখ্যা	কমতি
১৯১১	১৮,৩৯,০১৬	...
১৯২১	১৮,১৭,৭৭৫	২১,২৪১
১৯৩১	১৭,২৬,৩৭০	৯১,৪০৫

বিহার হইতে আগত লোকের সংখ্যা ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে, পক্ষান্তরে মান্দ্রাজ হইতে আগত লোকের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। কেন এইরূপ হইতেছে ইহা চিন্তার বিষয়। নিম্নে আমরা বিহার ও মান্দ্রাজ হইতে আগত লোকের সংখ্যা দিলাম :—

সেন্সাস বৎসর	বিহার ও উড়িষ্যা হইতে আগত	কমতি	মান্দ্রাজ হইতে আগত	বাড়তি
১৯১১	১২,৪৮,৪০১	...	১৪,২৪০	...
১৯২১	১২,২০,৪২৬	২৭,৯৭৫	৩১,২৭০	১৭,০৩০
১৯৩১	১১,২৭,১০২	৯৩,৩২৪	৪২,৪৩৭	১১,১৬৭

বাংলা দেশে বাংলা ভাষাভাষী লোকের অনুপাত গত ১৯১১ হইতে ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। প্রতি ১০,০০০ হাজারে ইং ১৯১১ সালে বাংলা ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা ছিল ৯,১৯২। ইং ১৯২১ সালে বাড়িয়া হইল ৯,১৯৭—বৃদ্ধির পরিমাণ অতি সামান্য, দশ হাজারে মাত্র সাত জন। কিন্তু ইং ১৯৩১ সালে এই অনুপাত বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ৯,২২৬এ। অর্থাৎ গত সেন্সাস দশকে বৃদ্ধির পরিমাণ হইয়াছে দশ হাজারে ২৯ জন।

পক্ষান্তরে হিন্দী বা উর্দ্দু ভাষাভাষীদের অনুপাত ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। ইং ১৯১১ সালে তাঁহাদের অনুপাত ছিল প্রতি ১০,০০০ হাজারে ৪১৪ জন; ইং ১৯২১ সালে দাঁড়াইল ৩৮০ জন; আর ইং ১৯৩১ সালে হইয়াছে ৩৭০ জন।

উপরে যাহা বলিলাম তাহা আংশিক সত্য। বিদেশ হইতে হিন্দী ভাষাভাষী লোকের প্রচুর আমদানী হইয়াছিল। ফলে হিন্দী ভাষাভাষীদের অনুপাত কিরূপ বাড়িয়া গিয়াছিল আর বাংলা ভাষাভাষীদের অনুপাত কি রকম কমিয়াছিল তাহা নিম্নের তালিকায় দেখাইলাম। এখন কিন্তু স্রোত উল্টা দিকে বহিতেছে।

প্রতি ১০,০০০ হাজারে

সেন্সাস বৎসর	বাংলা ভাষা-ভাষী	হিন্দী ভাষা-ভাষী	হিন্দীর বৃদ্ধি (+) বা কমতি (—)
১৮৮১	৯,৫৩৬	২০৪	—
১৮৯১	৯,৩৬৩	২৯৫	+৯১
১৯০১	৯,২৯৮	৩৪৭	+৫২
১৯১১	৯,১৯২	৪:৪	+৬৭
১৯২১	৯,১৯৭	৩৮০	—৩৪
১৯৩১	৯,২২৬	৩৭০	—১০

সমস্ত কথা তলাইয়া বুঝিবার জন্য তথ্য চাই। সেন্সাস হইতে আমরা এইরূপ বহু তথ্য পাই। সেন্সাসকে বয়কট করা—তাহা যে কোন কারণেই হউক না কেন, নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আমরা আশা করি এবারকার সেন্সাসে সকলেই যথাযথ ভাবে সাহায্য করিবেন ও নিজ নিজ নাম ও পরিবারবর্গের নাম লিখাইবেন। কর্ত্তৃপক্ষ-গণকে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করিবেন ও যাহাতে কোনও সম্প্রদায় মিথ্যা উক্তি করিয়া নিজ সংখ্যা না বাড়ান, সে-বিষয়ে তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন।

পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশেই সেন্সাসের আবশ্যকতা স্বীকৃত হইয়াছে। তবে অর্থাভাবে বা অন্য কোন কারণে মানুষ গণনা করা সম্ভব হয় নাই। পণ্ডিতগণের মতে পৃথিবীর বর্ত্তমান লোকসংখ্যা ২১৩ কোটী ৬০ লক্ষ। ইহার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ২৭ কোটী ২০ লক্ষ, আর মুসলমানের সংখ্যা বড় জোর ২৪ কোটী কি ২৫ কোটি। পৃথিবীর বারো আনার উপর লোক সেন্সাসে গণিত। বাকী চারি আনা এখনও মাথা গুণতি হিসাবে গুণিত হয় নাই। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে পৃথিবীতে ৬০০ কোটী লোক ধরিতে পারে। যে-হারে লোক সংখ্যা বাড়িতেছে তাহাতে ২১০০ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর লোকসংখ্যা ৬০০ কোটীতে দাঁড়াইবে।

ঐ

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

পুজোর ছুটি ফুরোলো
দেখতে-দেখতে তিরিশটা দিন মেয়াদটুকু পুরোলো।
কাজে এসে যোগ দিয়েছি মাসকাবারে নিই বেতন,
খাই দাই আর চেষ্টা করি ঘুম যাতে হয় নিশ্চেতন।
আজকে রাতে পড়ছি ব'সে তোমার চিঠির পাঠটা,—
গোড়ায় শুধু "ঐ" লিখেছ,—ঠাট্টা?—না,—এটা ঠাট্টা?
আধুনিকের কাব্য যেমন সব সেরে দেয় ইশারায়,
দেয় নড়িয়ে মনের তলা একটুকু ঠেশঠিশারায়,—
দূরেই থেকে' দূরেই রেখে ডাকাডাকির ঐ ভাষা,—
ডেকে ডেকে চাও বোঝাতে—কই বাড়ি আর কই বাসা?
বাড়ি রেখে এলাম, যেন মান উঁকি দেয় আভাসে!
তারপরে আর যা ই লিখেছ যায় না অত ভাবা সে!
—আবার ভ্রাতার স্কুলের বেতন, আবার ছেলের হাঁপানি!
—করব কী আর,—ঠিক করেছি, করব বিয়ে জাপানি।
কালচক্রে লাট-বা হব, মিলবে সবই সপ্তাতে,
এখন যারা দেয় না আমল, তখন হবে পস্তাতে!
তুমি বলবে,—"কাব্য রাখো, রাখো তোমার মস্করা!"
তুমিই বলো, কাউকে কি যায় সাদা কথায় বশ করা?
জানাই যদি সাদা কথা মন যে বাঁকে তোমারি,—
বন্ধু হারাই, তারা ভাবে কার তবিলে ছোঁ মারি!
মোদ্দা কথা, তেলের অভাব দেহে মনে ল্যাম্পোতে;
তাতে ব'সে স্যাঁৎস্যাঁতে এই একতালারি ড্যাম্পোতে!
সবটা চিঠি হয় না পড়া, তেল কিনে কাল পড়ব সে,—
ঘরের এ সব সাদা কথাই দেই রঙিয়ে ছন্দে গো—
রসায় যদি মৌতাতে মন, (যদি না হয় সন্দে গো,—
সাম্‌নে বজেট, জন্মে যেটা এমনি চেয়ে পাই নে—)
—দরাজ হয়ে পাঁচজনা সে বাড়ায় যদি মাইনে!—
সেই ফিকিরেই ঘামাই মাথা, তেল কিছুটা তাই পোড়ে;
যা লিখছি তা শোনাই ধ'রে বড়োবাবুর ভাইপোরে!

তুমি বলবে—"চেষ্টা বৃথা, হয়নি এটা কাব্য,—"
এ না হোলে, উপায় তবে! —এমনি শীতে কাঁপব?
অফিস-ঘরে তবিল ফাঁকা, পূজার-সে পথ-খরচা—
যাক্ দুটো দিন, ঘাটতি সারি, এড়াই লোকচর্চা!
—তা নয়, তুমি, বলতে কাজে পাঠালে এক ফর্দ!
চিরাচরিত আবার ঘানি টান্‌ছি বলীবর্দ,—
—যদিই বা তেল চোঁয়ায় কিছু! —কিন্তু এহ বাহ্য!
সার কথা রয় এসব কথার সাথেই অবিভাজ্য,—
বেঁচে থাকুন বড়োবাবু, বাঁচুক অফিস, বাড়িও,—
তোমায় বলি, ইচ্ছামতো ফর্দ তুমি বাড়িয়ো!
অফিস দিয়ে চল্‌ছে বাড়ি, চল্‌ছি তারি দৌলতে;
বাড়ির থেকে যা পাই সেটা যায় কি পারা তৌলতে!
দুঃখ আছে জানি তবু থাক্ জাপানি এবারে,—
করব কী আর! —যায় না ভোলা বঙ্গবধূর সেবারে!
পূজোর ছুটির মধ্যে যত ঘটেছে এই কাণ্ড!
যাক্‌গে যা হয়! —দুঃখ সুখেই চল্‌ছে এ ব্রহ্মাণ্ড!
আজকে যদি বীরভূমে রই কাল বদলি পাবনায়,
অফিস, অভাব, অসুখবিসুখ বাড়ির নানা ভাবনায়
সত্য বটে এই জীবনটা মূর্তিমান এক্ ঝক্‌মারি,—
কিন্তু আরো সত্য তোমার রান্নার সেই রক্‌মারি!
এ ব্রহ্মাণ্ডে আমি আছি তেমনি আছ তুমিও!
—এই জেনো আর, খেয়োদেয়ো, সময়মতো ঘুমিয়ো!
মাঝে মাঝে চিঠি দিয়ো, থাক্ না কথা অভাবের,—
—বাড়ির চিঠি!—ভাগ্যে যা নেই দিল্লীয়ালা নবাবের!
নাই তো তাদের বাসা-বাড়ি, নাই তো অভাব অভিযোগ,
নাই যে তাদের পূজোর ছুটি, বিয়োগ কী আর, সবি যোগ!
বুঝবে না এর মর্ম কিছু দেবদেবীরা স্বর্গেতে!
কোনোই মহাকাব্যে কোথাও নেই তা কোনো সর্গেতে!
ছোটোবাবু বড়োবাবু বুঝবে সারা এ-বঙ্গই,—
পূজার ছুটির পরে এসে বাড়ির চিঠি এবং "ঐ"।

জীবন-সায়াহ্নে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীবিশ্বাধর বর্মা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারত-সচিবের পুরাতন বুলির পুনরাবৃত্তি

মাঘের "প্রবাসী" বাহির হইবার পর ভারত-সচিব পার্লেমেণ্টে দুই বার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন। দুইবারই প্রশ্নের উত্তরে। যে-সকল জাতি রাষ্ট্রনীতিতে পাকা, তাহাদের ভাষায় ধরাছোঁওয়া না-দিয়া অনেক কথা বলা যায়। ইংরেজরা সেইরূপ একটি জাতি এবং ইংরেজী সেইরূপ একটি ভাষা। বাঙালীরা সেরূপ জাতি ও বাংলা সেরূপ ভাষা নহে। এই জন্য ইংরেজ রাজ-পুরুষেরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা বলেন, শুধু তাহার বাংলা অনুবাদ দিলে তাঁহাদের মনের ভাবের ঠিক আভাস দেওয়া হয় না। সেই কারণে পার্লেমেণ্টে দুই বার যে প্রশ্নোত্তর হইয়াছে, ইংরেজীতে তাহা দিতেছি। ৩০শে জানুয়ারী পার্লেমেণ্টে যে প্রশ্নোত্তর হয়, তাহার কেবল সেই অংশটি এখানে দিতেছি যাহার সহিত ভারতবর্ষের স্বরাজের দিকে অগ্রগতির সম্পর্ক আছে।

LONDON, Jan. 30.

In the House of Commons asked by Mr. Sorensen whether he had any further statement to make respecting the political conditions in India, Mr. Amery said that he had nothing to add to the reply given to two similar questions on January 21.

"The British Government have clearly set out their policy for constitutional advance in India and that policy still holds the field," declared Mr. Amery in reply to a question by Mr. R. A. Cary who asked whether in view of the cessation of discussions between the Viceroy and Indian leaders, he would state the immediate practical steps which would be taken to improve the political situation in India.

Mr. Amery added: "I do not think that immediate practical steps can be taken as far as His Majesty's Government are concerned to secure a basis of agreement among Indians which will enable effect to be given to it."

Mr. Cary: Will he consider the desirability of sending a goodwill mission from this country in the hope of achieving some improvement?

Mr. Amery replied: "I doubt whether any mission could create that goodwill among Indians which is prerequisite."

ভারত-সচিবকে মিঃ কেরি জিজ্ঞাসা করেন, ভারতবর্ষে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতির জন্য কার্যতঃ গবন্মেণ্ট কি করিবেন ভারত-সচিব তাহা বলিবেন কি? তাহাতে ভারত-সচিব বলেন, "আমাদের পলিসি পরিষ্কার ভাষায় বলা হইয়াছে এবং তাহা এখনও বলবৎ আছে।" তিনি আরও বলেন, "ভারতীয়দের মধ্যে যে-ঐক্য স্থাপিত হইলে আমাদের পলিসি অনুসারে শাসনবিধি সংস্কার করা যাইতে পারে, সেই ঐক্যের ভিত্তি স্থাপন করিবার নিমিত্ত সম্রাটের গবন্মেণ্ট কোনো কিছু করিতে পারেন বলিয়া আমার মনে হয় না।"

ঠিক্ কথা! ঐক্য যাহাতে দুর্ঘট, এমন কোন কোন অবস্থা ও ব্যবস্থার জন্য বিলাতী ও এদেশী ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট দায়ী। অন্ততঃ সেই সেই অবস্থা ও ব্যবস্থার উচ্ছেদ যদি তাঁহারা করিতেন, তাহা হইলে ঐক্যের নিমিত্ত বাকী যাহা করণীয় তাহা দেশের লোকেরা করিতে পারিত। কিন্তু ইংরেজরা তাঁহাদের করণীয়টুকু করিবেন না, অথচ আমাদিগকে এক হইতে বলেন। অবশ্য এই সব বাধা সত্ত্বেও আমাদের এক হইবার চেষ্টা করা উচিত।

মিঃ কেরি এদেশে বিলাতী শুভইচ্ছা মিশন প্রেরণের বাঞ্ছনীয়তা ভারত-সচিবকে বিবেচনা করিতে বলেন। উত্তরে মিঃ এমারি ঠিকই বলিয়াছেন যে, সেরূপ মিশনের দ্বারা ভারতবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক শুভইচ্ছার আবির্ভাব হইবে না। কারণ, পারস্পরিক অশুভইচ্ছার উদ্রেক যত সহজে ও যে যে উপায়ে করা যায় ও গিয়াছে, শুভইচ্ছা সেরূপ সহজে ও সেরূপ কোন উপায়ে উৎপাদন করা যায় না।

গত ৬ই ফেব্রুয়ারি পার্লেমেণ্টে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আর এক দফা প্রশ্নোত্তর হয়। তাহা নিম্নলিখিত রূপ।

LONDON, Feb. 6.

"A more positive policy for India was sought by Mr. R. A. Cary in questions to Mr. Amery in the House of Commons. Mr. Cary asked if it is to be accepted as the Government policy that not until Indian leaders arrive at an agreement among themselves is any forward step to be taken for constitutional reform; further that the form of agreement must have the approval of His Majesty's Government."

Mr. Amery: "I do not feel that I can do more than refer Mr. Cary to the statement of policy by the Government on August 8, and November 20."

Mr. Cary: "Is India to continue indefinitely in the present political status? Surely India deserves a more positive policy."

Mr. Amery: "No. The policy which I referred to is a very positive policy marking very great advance."

Mr. Sorensen: "I take it that he does not repudiate the principle of at least sympathetic consideration and implementing of any majority decision of any democratic elected body."

Mr. Amery: "That depends on the area over which the election takes place and the amount of consent therein. Naturally our whole sympathy is for establishment of Self-Government in India."

Mr. T. E. Harvey: "Is he prepared at all times to use his good offices to promote understanding among the people of India?"

Mr. Amery: "My good offices will always be available."—*Reuter.*

মিঃ কেরি চান, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ব্রিটেন কোন অধিকতর পজিটিভ্ পলিসি অবলম্বন করেন। পজিটিভের মানে এখানে রেলেটিভের উল্টা। এখন যে পলিসি কায়েম আছে তার মানে, আগে ভারতীয়েরা নিজেদের মধ্যে কোন একটা চুক্তি করিয়া ঐক্যবদ্ধ হউক, তার পর ব্রিটেন কিছু করিবেন। অর্থাৎ ব্রিটেনের কিছু করা ভারতীয়দের উল্লিখিত রূপ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সর্তসাপেক্ষ। মিঃ কেরি যে পজিটিভ্ পলিসি চান, তাহা ভারতীয়দের কিছু করা ও হওয়ার সর্তসাপেক্ষ নহে।

তাই তিনি প্রশ্ন করেন যে, ইহাই কি ব্রিটিশ পলিসি যে, ভারতীয়েরা আপনাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন না করিলে ব্রিটেন তাহাদিগকে স্বরাজের দিকে অগ্রসর করিবার উদ্দেশ্যে কিছুই করিবেন না?

তিনি আরও জিজ্ঞাসা করেন,

ঐক্যবদ্ধ হইবার নিমিত্ত ভারতীয়েরা যদি নিজেদের মধ্যে কোন সর্ত বা চুক্তি স্থির করে, তাহা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক কি না?

উত্তরে ভারত-সচিব বলেন,

গত ৮ই আগষ্ট ও ২০শে নবেম্বর গবর্মেণ্ট নিজ পলিসি সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন, মিঃ কেরিকে সেই বিবৃতি দেখিতে বলার অধিক তিনি আর কিছু করিতে পারেন না।

মিঃ কেরি—"ভারতবর্ষকে কি অনির্দিষ্ট কাল বর্তমান রাজনৈতিক দশায় থাকিতে হইবে? নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ ইহা অপেক্ষা পজিটিভ্ (অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত কোন প্রকার সর্তনিরপেক্ষ) পলিসির যোগ্য।"

মিঃ এমারি—"না। আমাদের পলিসিতে ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রনৈতিক পথে খুব অগ্রসর করিয়া দিবার ব্যবস্থাই আছে।"

সেই জন্য ভারতীয়দের মধ্যে কোন দলই ঐ ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য মনে করে নাই। তাহারা এমনই নিজেদের হিতজ্ঞানবিহীন।

মিঃ সোরেনসেন—"আমি কি এইরূপ ধরিয়া লইতে পারি যে, গণতান্ত্রিক রীতিতে নির্বাচিত কোন প্রতিনিধিসমষ্টির অধিকাংশের নির্ধারণ অন্ততঃ সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিবার এবং তাহা কার্যতঃ চালু করিবার নীতি তিনি (ভারত-সচিব) অস্বীকার করেন না?"

'গণতান্ত্রিক রীতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিসমষ্টি' শব্দগুলি মিঃ সোরেনসেন প্রাদেশিক আইন সভাগুলির, অথবা কেন্দ্রীয় আইন-সভার অথবা কংগ্রেসের উদ্দেশে ব্যবহার করিয়াছেন, ঠিক্ বুঝা যাইতেছে না। ভারত-সচিবের নিম্নলিখিত উত্তরও সেই জন্য এবং সেইরূপ দুর্বোধ্য।

মিঃ এমারি—"তাহা নির্ভর করে যে (অথবা যে-যে) ভূখণ্ডে নির্বাচন হয় তাহার বিস্তৃতির উপর এবং তাহাতে সম্মতির পরিমাণের উপর। ভারতবর্ষে স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠার প্রতি স্বভাবতঃ আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।"

তা বটেই ত। ভারত-সচিবের উত্তরের মানে কি এই যে, যে-যে ভূখণ্ডগুলি পাকিস্তানের ম্যাপের মধ্যে পড়ে, তাহার অধিকাংশ লোকের সম্মতি অনুসারে নির্বাচিত অধিকাংশ প্রতিনিধির নির্ধারণ গবর্মেণ্ট মানিবেন? আমরা ত স্পষ্ট কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

মিঃ টী ঈ হারভী—"ভারতীয়দের মধ্যে মনের মিল বাড়াইবার নিমিত্ত নিজ কল্যাণ-প্রচেষ্টা সর্বদা চালাইতে তিনি (ভারত-সচিব) প্রস্তুত আছেন কি?"

মিঃ এমারি—"এ বিষয়ে আমার শুভপ্রচেষ্টা সর্বদাই লভ্য।"

অতএব, এখন ভারতীয়েরা স্বরাজ-স্বর্গ লাভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন।

—

সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর আকস্মিক অন্তর্ধান তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের এবং তাঁহার দলভুক্ত অগণিত লোকের ও তাহার বাহিরেরও অনেকের উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। সমুদয় ব্যাপারটি রহস্যাবৃত। তিনি কি কারণে, কি উদ্দেশ্যে কোথায় গিয়াছেন বা আছেন, সে-বিষয়ে নিশ্চিত কিছুই জানা যায় নাই। নানা প্রকার কল্পনা-জল্পনা চলিতেছে বটে, কিন্তু সেগুলার কোন মূল্য নাই।

যদি কোন ব্যক্তি বা কোন কোন ব্যক্তি জানেন যে, তিনি কোথায় গিয়াছেন এবং কোথায় ও কেমন আছেন, তাহা হইলে একমাত্র তিনি বা তাঁহারাই উদ্বেগশূন্য থাকিতে পারেন। কিন্তু সেরূপ মানুষেরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ্য করিয়া যদি তাঁহার দলের লোকেরা বিপক্ষের প্রতি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে কোন প্রকার দোষারোপের চেষ্টা করেন, তাহা গর্হিত হইবে। আবার যদি বিপক্ষেরাও তাঁহার বা তাঁহার দলের প্রতি কোন প্রকার সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ আক্রমণ চালান, তাহাও গর্হিত হইবে।

সুভাষবাবুর অন্তর্ধানের কয়েক দিনের মধ্যেই একটি ইংরেজী দৈনিকে দেখিলাম, বাংলার আইনসভার এক জন সদস্য এইরূপ একটা বাজে কথার উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, সুভাষবাবু কারারুদ্ধ হইবার ভয়ে সরিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার বিপক্ষ বা শত্রুরা আর যাহাই বলুন, তাঁহাকে যাঁহারা জানেন বা তাঁহার জীবন-কথার সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা এমন অপবাদ সত্যভাষিতার সহিত দিতে পারেন না। কারাদণ্ডের বা অন্যবিধ বন্দীদশার ভয়ে কিছু করিবার লোক তিনি নহেন। তিনি কি কারণে কি উদ্দেশ্যে অন্তর্হিত হইয়াছেন জানি না। কিন্তু এই অন্তর্ধানের ফলে গবর্মেণ্টের পক্ষে, তিনি আদালতের বিচারে দোষী বিবেচিত হইলে, তাঁহাকে জেলে আটক করা সম্ভব হইল না বলিয়াই তাঁহার মনুষ্যত্ব বা পৌরুষ সম্বন্ধে সন্দেহ উত্থাপন করা অসঙ্গত।

কেহ যদি জেলে থাকা অপেক্ষা নিজের সময়ের ও জীবনের উচ্চতর ব্যবহার ও উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে করেন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সম্ভাবিত-কারাদণ্ড এড়ান, তাহা হইলে তাঁহার অভিপ্রায় ও আচরণকে আমরা মন্দ মনে করিতে পারি না।

শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের জীবনচরিতের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন, তিনি যখন অন্তর্হিত হন (ও পণ্ডিচেরি যান), তখন অন্তর্হিত না হইলে খুব সম্ভবতঃ তাঁহার বিরুদ্ধে সরকারী মোকদ্দমা হইত এবং সম্ভবতঃ তাহার ফলে তাঁহাকে দীর্ঘকাল বা অনির্দিষ্ট কাল জেলে থাকিতে হইত। এরূপ ঘটনা ঘটিতে না দিয়া তিনি যে পণ্ডিচেরি গিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ও আছেন এবং অপর অনেকেরও সাধনার প্রবর্তক ও সাধনমার্গে গুরুস্থানীয় হইয়াছেন, তজ্জন্য কেহই তাঁহাকে ভীরু বলে না। যাহারা তাঁহাকে ভীরু বলে না, তাহারা যে সকলে তাঁহার মতাবলম্বী তাহাও নহে।

তাঁহার পণ্ডিচেরি যাইবার আগে তাঁহার জীবনের গতি যে-দিকে ছিল, পরে তাহা অন্য দিকে গিয়াছে। সুভাষবাবুরও জীবনের গতির পরিবর্তন অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ তিনি বৎসর দুই আগে মডার্ণ রিভিয়ুতে "আমার রহস্যাবৃত ব্যাধি" ("My Strange Illness") শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ইহার আভাসও ছিল। তিনি তাহাতে লিখিয়াছিলেন, যে, ত্রিপুরীতে খ্যাতনামা নেতা অনেককে ক্ষুদ্রমনা ও অসঙ্গতসন্দেহপরায়ণ দেখিয়া এবং তথাকার নৈতিক-দিক-দিয়া-পীড়াজনক বা ঘৃণাকার-জনক হাওয়ায় (morally sickening atmosphereএ) দুঃখ পাইয়া রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িয়া হিমালয়ের কোন নিভৃত স্থানে চলিয়া যাইবার একটি প্রেরণা তিনি অনুভব করেন। কিন্তু রোগশয্যায় থাকিয়া স্বদেশবাসী বহু পরিচিত ও অপরিচিত লোকের সহানুভূতি ও মৈত্রীর প্রমাণ পাওয়ায় তাঁহার সে বিরক্তির ভাব চলিয়া যায় ও মানব-প্রকৃতির উপর তাঁহার আস্থা ফিরিয়া আসে। সেই জন্য তিনি হিমালয়ের নিভৃত ক্রোড়ে আশ্রয় না-লইয়া কর্মক্ষেত্রেই থাকিয়া যান। তাঁহার উল্লিখিত প্রবন্ধ হইতেই ইহা জানা যায় ও অনুমিত হয়।

বাস্তবিক তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার নিমিত্ত হিমালয় গিয়াছেন কিম্বা ভারতবর্ষের অন্য কোন সাধনানুকূল স্থানে গিয়াছেন, সে বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যায় না। এই শীতের সময় হিমালয়ের কোথাও যাওয়া অবশ্য স্বাভাবিক মনে হয় না।

তাঁহার সম্বন্ধে মানুষের কল্পনা নানা দিকে দৌড়িতেছে। এরূপ কল্পনাও হইয়াছে যে, তিনি কলিকাতাতেই আছেন! আবার এমন আশ্চর্য্য কল্পনাও হইয়াছে যে, তিনি স্থলপথে নেপাল ও তিব্বত অতিক্রম করিয়া কোথাও গিয়াছেন,

অথবা স্থলপথে ব্রহ্মদেশ অতিক্রম করিয়া অন্যত্র গিয়াছেন !! সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত কল্পনা এই যে, কোন অ-নামিত স্থানে একটা এরোপ্লেন নামিয়া তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে !!!

তিনি যেখানেই থাকুন, তাঁহার সর্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনীয় এবং কোন-না-কোন প্রকারে দেশের কল্যাণ সাধন করিয়া তিনি সুখী হউন, ইহাই কাম্য।

—

শিবাজী ও সুভাষবাবু

এক নিঃশ্বাসে শিবাজীর ও সুভাষবাবুর নাম করা নিশ্চয়ই অসঙ্গত বটে। আমরা জানি, আধুনিক কোন ভারতীয়ই শিবাজীর সহিত তুলনীয় নহেন। সেই যুগ-স্রষ্টার সহিত ক্ষুদ্রতর কাহারও তুলনা হয় না। এখন মোগল শক্তি নাই, শিবাজীও নাই। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, একদা মুটিয়ার মাথার উপরিস্থিত ঝুড়ির সাহায্যে মোগল শক্তিকে শিবাজী ব্যাহত করিয়াছিলেন বলিয়া এখন যেমন কেহ তাঁহাকে ভীরুতার অপবাদ বা অন্য কোন অপবাদ দেয় না, সেইরূপ সুভাষবাবু যদি সম্ভাবিত জেলের বা নিশ্চিত ভারত-কারাগারের মায়ার শিকল কাটিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা ভবিষ্যতে নিন্দিত হইবে না, ইহা অসম্ভব নহে ;—ইহা হইতেও পারে।

—

মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের প্রতিবাদ

মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের প্রতিবাদ এখনও নানা স্থানে হইতেছে এবং পরেও হইবে। যত দিন পর্য্যন্ত ইহা পরিত্যক্ত না-হইতেছে, তত দিন ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রবলবেগে চালাইতে হইবে। যদি বিরোধিতা সত্ত্বেও ইহা আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে ইহার মধ্যে দেশের যে অনিষ্ট করিবার অভিসন্ধি রহিয়াছে তাহা ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত যে দেশব্যাপী শিক্ষাপরিকল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিতে হইবে, তাহাও প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। তাহা অবশ্য জনাকীর্ণ বৃহৎ সভার কাজ নহে ; তাহা কমীটিতে করিতে হইবে।

—

শিক্ষাসঙ্কোচ মন্ত্রীদের অভিপ্রেত কি না

মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের সমালোচনা উপলক্ষ্যে লেখায় ও বক্তৃতায় ইহা অনেক বার বলা হইয়াছে যে, মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্কোচ সাধন ইহার একটা উদ্দেশ্য ; এবং এই উক্তির সমর্থনার্থ মিঃ জেঙ্কিন্স যে কেবল চারি শত উচ্চ বিদ্যালয় রাখিবার একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। গবর্মেণ্ট-পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, সরকারের সেরূপ কোন উদ্দেশ্য নাই এবং মিঃ জেঙ্কিন্সের পরিকল্পনাটা সরকারী কোন সঙ্কল্প নহে। পরচিত্ত অন্ধকার ; সুতরাং সরকারী কোন চিত্ত থাকিলে তাহার মধ্যে কি মৎলব আছে তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রের যে-অংশটির উপর সরকারী ক্ষমতা নিরঙ্কুশ, তাহাতে সরকারী ক্ষমতার ব্যবহার কিরূপ হইয়াছে, তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে শিক্ষার উচ্চতর ক্ষেত্রে ঐ ক্ষমতা নিরঙ্কুশ হইলে তাহা কি ভাবে প্রযুক্ত হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী ক্ষমতা নিরঙ্কুশ। সেই ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সংখ্যা ক্রমাগত কমিতেছে। নীচের তালিকা দেখুন।

বৎসর।	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা।	হ্রাস।
১৯৩৪-৩৫	৬৪৩০৯	—
১৯৩৫-৩৬	৬২১৫০	২১৫৯
১৯৩৬ ৩৭	৬১১৫৭	১০০৭
১৯৩৭-৩৮	৬০০৭৪	১০৮৩
১৯৩৮-৩৯	৫৫৪৫২	৪৬২২

অর্থাৎ উল্লিখিত পাঁচ বৎসরে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা ৮৮৭১টি কমিয়াছে। এই সকল বিদ্যালয়ে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সব ছেলেমেয়ে পড়িতে পারে। এই সব বিদ্যালয় কমিয়াছে। কিন্তু ১৯৩৭-৩৮ সালে মুসলমানদের নিমিত্ত মাদ্রাসা বাড়িয়াছিল ১২৫টি এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে তাহাদের নিমিত্ত মাদ্রাসা বাড়িয়াছিল ৪১০টি।

ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা কি অযৌক্তিক হইবে যে, জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল ছাত্রছাত্রীর ব্যবহার্য্য উচ্চ বিদ্যালয়গুলির উপর গবর্মেণ্টের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ হইলে, সেগুলিরও সংখ্যা কমিবে, কিন্তু কেবল মুসলমানদের ব্যবহার্য্য উচ্চ মাদ্রাসা বাড়িবে ?

—

এখন উচ্চ বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা গবর্ন্মেণ্ট ইচ্ছা করিলেই কমাইতে পারেন না। সেগুলি অনুমোদন করা না-করার ক্ষমতা আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসনীয় ঝোঁক আছে শিক্ষাপ্রসারণের দিকে। তাহার ফলে উচ্চ বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা বাড়িতেছে এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও বাড়িতেছে।

মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের একটি ধারায় এই ব্যবস্থা আছে যে, এখন যতগুলি উচ্চ বিদ্যালয় আছে, তাহার সবগুলি বিলটা আইনে পরিণত হইবার পর কেবল মাত্র দুই বৎসর কাল অনুমোদিত থাকিবে। তাহার পর সবগুলিরই অনুমোদন বাতিল হইবে, এবং প্রত্যেকটিকে নূতন করিয়া অনুমোদন লইতে হইবে। যদি বিদ্যালয়-গুলির সংখ্যা হ্রাস করিবার অভিপ্রায় গবর্ন্মেণ্টের না-থাকিত, যদি শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি সাধনের ইচ্ছাই গবর্ন্মেণ্টের থাকিত, তাহা হইলে উল্লিখিত ধারাটা এইরূপ হইত যে, বর্তমানে অনুমোদিত সব বিদ্যালয়ই দুই বৎসর অনুমোদিত থাকিবে; তাহার পর যে-যেগুলির শিক্ষা-ব্যবস্থা সন্তোষজনক নহে, সেগুলিকে নিজ নিজ ব্যবস্থা সন্তোষজনক করিবার নিমিত্ত সতর্ক করিয়া দেওয়া হইবে, এবং তাহা সন্তোষজনক করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত সময় ও আবশ্যক মত সাহায্য দেওয়া হইবে। তাহা সত্ত্বেও যেগুলির অবস্থা যথেষ্ট ভাল হইবে না, কেবল সেইগুলিই উঠিয়া যাইবে।

জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল বালকবালিকা যে-সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়িতে পারে, তাহার সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় মুসলমান সম্প্রদায়েরও যে অসুবিধা ও ক্ষতি হয়, তাহা সম্প্রতি কলিকাতার একটি মুসলমান সভার প্রস্তাব হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস করিবার সরকারী নীতির প্রতিবাদ করা হইয়াছে। তাহাতে বাখরগঞ্জ জেলার কথা বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ জেলায় আগে ৭০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। তাহার মধ্যে ৩৮০০ উঠাইয়া দেওয়ায় বাকী আছে ৩২০০, প্রস্তাবটিতে এইরূপ বলা হইয়াছে।

উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের সংখ্যা কমাইয়া দিলেও এইরূপ সকল সম্প্রদায়ের লোকদেরই অসুবিধা ও ক্ষতি হইবে। বঙ্গের মুসলমানেরা বেশীর ভাগ গ্রাম-অঞ্চলের অধিবাসী। গ্রাম-অঞ্চলের স্কুলগুলিই উচ্চশিক্ষাসংকোচ নীতির ফলে আগে উঠিয়া যাইবে। তাহার ফলে সকল সম্প্রদায়ের গ্রাম্য লোকেরাই অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

—

পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের সংবর্ধনা

পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় ৮৬ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য নানা দর্শনের তাঁহার জ্ঞান গভীর ও বিস্তৃত। তিনি কেবল যে অধ্যয়ন দ্বারা এই সকল দর্শনের জ্ঞান লাভ করিয়া পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন, তাহা নহে; স্বাধীন মননশক্তির প্রয়োগে নিজের স্বতন্ত্র মতও গঠন ও প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বাংলা ও ইংরেজী কয়েকটি দার্শনিক ও ধার্মিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কয়েকটি উপনিষদের ভাষ্য এবং বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ-সম্বলিত সংস্করণও তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল বিদ্যালয়ের সাধারণ ও প্রধান শিক্ষকের কাজ করিয়াছেন এবং বহু বৎসর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যের কাজ করিয়া জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দ্বারা উপাসকমণ্ডলীর হিতসাধন করিয়াছেন। শ্রীহট্ট সম্মিলনী সর্ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের সভাপতিত্বে সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া, যে-কর্তব্য বঙ্গের ও ভারতবর্ষের শিক্ষিত সকল লোকের করা উচিত, তাহা সাধন করিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

—

প্রণবানন্দ স্বামী

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ প্রণবানন্দ স্বামীর অকালমৃত্যুতে দেশের, বিশেষ করিয়া হিন্দুদের, বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৫ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তাঁহার নেতৃত্বগুণে, অপরকে চরিত্র, দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা প্রভাবিত করিবার ক্ষমতা-প্রভাবে, ভারত সেবাশ্রম সংঘ সামান্য অবস্থা হইতে বর্তমান শক্তিশালী অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। নানা জেলায় ইহার মিলনমন্দিরগুলি এবং রক্ষী ও অন্যবিধ সেবকদলগুলি তাঁহার নেতৃত্বগুণের পরিচয় দিতেছে।

—

প্রয়াগে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণ উচ্ছেদের সংকল্প

প্রয়াগ নামটি প্রাচীন। উহার এলাহাবাদ নাম দেওয়া হয় মোগল রাজত্বকালে। এই নগরের লোকসংখ্যা মোটামুটি পৌনে দুই লক্ষ। পাঁচ-ছয় বৎসরের শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া বুড়াবুড়ী পর্য্যন্ত ইহার অধিকাংশ লোক নিরক্ষর। যেখানকার অধিকাংশ লোক নিরক্ষর, সকল দিকে উন্নতি করা, মানুষের মত মানুষ হওয়া, সেখানকার লোকদের পক্ষে অসম্ভব। তাই প্রয়াগের একজন বিশিষ্ট নাগরিক লালা সঙ্গমলাল আগরওআলা সংকল্প করিয়াছেন, তিন বৎসরের মধ্যে প্রয়াগের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মধ্য হইতে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণ দূর করিবেন, সকলকে লিখিতে পড়িতে শিখাইবেন। তিনি কি একা এত বড় কাজ করিবেন? এলাহাবাদের বিস্তর শিক্ষিত লোক—উকীল ব্যারিস্টার অধ্যাপক শিক্ষক ছাত্রছাত্রী প্রভৃতি তাঁহার সাহায্য করিবেন। কাজটি কেমন করিয়া চালাইতে হইবে, তাহার একটি বিস্তারিত কর্ম্মসূচী ও পদ্ধতিও তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন। নীচের ঠিকানায় তাঁহাকে চিঠি লিখিলে তাহা পাওয়া যাইবে:—

লালা সঙ্গমলাল আগরওআলা, এম্. এ, এল্‌এল্‌, বী,
ভাইসচ্যান্সেলার, প্রয়াগ মহিলা-বিদ্যাপীঠ,
এলাহাবাদ।

এই প্রয়াগ মহিলা-বিদ্যাপীঠ তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তখন ইহা সামান্য বিদ্যালয় মাত্র ছিল। এখন ইহা মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। লালা সঙ্গমলাল কৃতী পুরুষ। এক কৃতিত্বকে একটা ধাপের মত ব্যবহার করিয়া তিনি ব্যাপকতর অন্য এক কৃতিত্বে উপনীত হইতে চাহিতেছেন। তিনি যে এলাহাবাদে নিরক্ষরতা দূর করিতে সমর্থ হইবেন, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

লালা সঙ্গমলাল বড় একটি নগরে যাহা করিবেন বলিয়া আশা ও সাহসে বুক বাঁধিয়াছেন, বাংলা দেশের ছোট কোন একটি গ্রামেও কি এমন কেহ নাই যিনি এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা রক্ষা করিতে পারিবেন যে, তিন বৎসরে তিনি গ্রামের পাঁচ-ছয় বৎসরের অধিকবয়স্ক প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে লিখিতে ও পড়িতে সমর্থ করিবেন?

—

বাংলা-সরকারের প্রপূরক বজেট

বাংলা-সরকারের সপ্লেমেণ্টারি অর্থাৎ প্রপূরক বজেট গত সপ্তাহে রাজস্ব-মন্ত্রী আইন-সভায় পেশ করেন। আসল বজেটে মন্ত্রীরা অনেক কোটি টাকার মঞ্জুরী লইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাদের খরচ কুলায় নাই। সেই জন্য তাঁহারা আবার ১,৬৭,১৯,০০০ (এক কোটি সাতষট্টি লক্ষ উনিশ হাজার) টাকার নূতন মঞ্জুরী লইলেন।

—

ঘাটতি ও বাড়তি একসঙ্গে!

যদিও মন্ত্রীদের অনটন ঘটায় এই ১,৬৭,১৯,০০০ টাকার অতিরিক্ত মঞ্জুরী লইতে হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা আবার এত হিসাবী যে বাংলা দেশের জলসেচন, শিল্প, কৃষি ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের বরাদ্দের থোক ৫০ লক্ষ টাকা খরচই করিতে পারেন নাই! বাংলা দেশ সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলা, সারা বৎসর জলে থৈ থৈ করে। সুতরাং জলসেচনের নিমিত্ত বরাদ্দ ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা কেমন করিয়া মন্ত্রীরা খরচ করেন বলুন? বাংলা দেশে চাষবাসের অবস্থা এত ভাল এবং সাধারণ চাষাভূষা মজুর হইতে আরম্ভ করিয়া সবাই এমন পেট ভরিয়া খাইতে পায় যে, কৃষির জন্য বরাদ্দ ১৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকাও মন্ত্রীরা খরচ করিবার উপায় খুঁজিয়া পান নাই। বাংলা দেশের তন্তুবায়, কর্ম্মকার, সূত্রধর, কুম্ভকার প্রভৃতি শিল্পীদের ও তাহাদের বৃত্তির অবস্থা এত উন্নত যে, শিল্পের বরাদ্দ ১৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা খরচ করাও সম্ভবপর হয় নাই। আর স্বাস্থ্যের কথাই বা বলেন কেন? বাংলা দেশে বিনা চিকিৎসায় কেহ ভোগে বা মরে, এমনটি বলিবার জো নাই। কাহারও কোন ব্যারামই হয় না। রাস্তা ঘাট নর্দ্দমা খানা ডোবা পুকুর দীঘি বিল খাল নদী—সমুদয়ের অবস্থা এত ভাল যে, অসংখ্য ডাক্তার কবিরাজ বেকার বসিয়া আছে। রোগই যখন নাই, তখন

জনস্বাস্থ্যের জন্য বরাদ্দ ১৩ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা কি প্রকারে খরচ হইতে পারে ?

এই সব টাকা খরচ হইতে বাঁচিয়া গিয়া কোথাও যে লোহার সিন্দুকে সঞ্চিত আছে, তাহা নহে। কতক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, কতক বা আবার বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে।

পব্লিক একাউণ্ট্‌স্‌ কমীটির রিপোর্ট হইতে এই সকল অপূর্ব তথ্য জানিতে পারা যায়।

—

ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস-স্মৃতি-উৎসব

শান্তিপুরের নিকটবর্তী ফুলিয়া গ্রামে রামায়ণ-রচয়িতা মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্ম হয়। গত বার বৎসরের অধিক কাল হইতে এখানে তাঁহার স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। বর্তমান বৎসরেও গত ২৭শে মাঘ সভা হইয়াছিল। সভাস্থলে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ, কবির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন, কৃত্তিবাস স্মৃতিস্তম্ভে মাল্য-প্রদান, কৃত্তিবাস এবং তাঁহার রামায়ণ সম্পর্কে বঙ্গের অনেক সাহিত্যিক ও সুধীর প্রবন্ধ ও কবিতাপাঠ এবং বক্তৃতা প্রভৃতি হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

আগেকার বৎসরের মত কৃত্তিবাস-স্মৃতি বিদ্যালয়ে একটি রামায়ণ-প্রদর্শনীও হইয়াছিল। তাহাতে রামায়ণের অনেক দুষ্প্রাপ্য পুরাতন মুদ্রিত বহি ও আধুনিক মুদ্রিত বহি প্রদর্শিত হয়। প্রবাসীর সম্পাদকের প্রদত্ত জাভার প্রাম্বানান্‌ মন্দিরের পাষাণ-প্রাচীরগাত্রে উৎকীর্ণ রামায়ণের বহু গল্পের আলেখ্যের ফোটোগ্রাফ হইতে প্রস্তুত অনেক ছবিও প্রদর্শিত হইয়াছিল।

—

বেহুলার স্মৃতিসভা

বর্ধমান জেলার কসবা চম্পাইনগর গ্রামে, মনসামঙ্গলে যে বেহুলা সতীর পূত চরিতগাথা গীত হইয়াছে, তাহার স্মৃতিসভা গত ২৭শে মাঘ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে হইবার বিজ্ঞাপন পাইয়াছিলাম। এখনও কোন বৃত্তান্ত খবরের কাগজে দেখি নাই।

কৃত্তিবাস-স্মৃতিসভার সহিত বেহুলার স্মৃতিসভার প্রভেদ আছে। কৃত্তিবাস ঐতিহাসিক ব্যক্তি। বেহুলা নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক, এরূপ বলা যায় না। তিনি সম্পূর্ণ কবিকল্পনা-সৃষ্টও হইতে পারেন।

কিন্তু এই প্রভেদে কিছু আসিয়া যায় না। বেহুলার চরিত্রে যে আদর্শ সকলের সমক্ষে ধরা হইয়াছে, তাহার প্রভাব বঙ্গনারীবৃন্দ যত অনুভব করিবেন, ততই মঙ্গল।

—

বাখরগঞ্জ জেলা হিন্দু সম্মেলন

অন্য কোন কোন জেলার মত বাখরগঞ্জ জেলাতেও, বরিশালে, হিন্দু সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। তাহার সভাপতি শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ওজস্বিনী ভাষায় একটি দীর্ঘ সারবান বক্তৃতা করেন। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করিয়া এবং যে কারণে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার মাদুরা অধিবেশনে বিশেষ স্মরণীয় প্রস্তাবাবলী গৃহীত হইয়াছে, তাহার বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচনাপূর্বক এক দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদানের পর ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

"মাদুরায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভা সম্মেলনে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া এই সম্মেলন জনসাধারণকে অনুরোধ করিতেছেন যে, মাদুরায় বিঘোষিত দাবীসমূহ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার যদি কোন প্রকার উত্তর প্রদান না করেন এবং বাংলার সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন মন্ত্রিমণ্ডলীর বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল ও জাতীয়তা-বিরোধী নীতি সম্পর্কে যদি কোন প্রকার প্রতিকার করা না হয়, তাহা হইলে জনসাধারণকে কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদের নির্দেশ অনুসারে কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে।"

—

"প্রথম বাংলা সংবাদপত্র"

"প্রথম বাংলা সংবাদপত্র" সম্বন্ধে প্রবাসীর বর্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যাহা লিখিয়াছেন, সে বিষয়ে আমার সামান্য কিছু বক্তব্য আছে। আমি স্থানান্তরে থাকায় তাহা যথাসময়ে যথাস্থানে লিখিতে পারি নাই, এখানে লিখিতেছি।

১। যে মার্শম্যান সাহেবের "দৃঢ় উক্তি" ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রধান প্রমাণ, তিনি স্বয়ং তাঁহার উক্তিটিকে "অনুমান" বলিয়াছেন।

২। তিনি স্বয়ং "সমাচার-দর্পণে"র সম্পাদক এবং তাহাকেই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বলিয়াছেন; সুতরাং কোন্ বাংলা কাগজটি সর্বাগ্রে বাহির হইয়াছিল, এ প্রশ্নের মীমাংসা সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি নিরপেক্ষ ব্যক্তির উক্তি বলিয়া গৃহীত না হইতেও পারে। অবশ্য তিনি জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা বলিয়াছিলেন, এরূপ কোন ইঙ্গিত আমি করিতেছি না। কিন্তু নিজের জিনিষটির প্রতি কিছু স্নেহ ও পক্ষপাতিত্ব মানুষের মনের মগ্নচৈতন্যের স্তরে (subconscious mindএ) থাকা অস্বাভাবিক নহে।

৩। অন্য দিকে, প্রভাতবাবু যে-যে কাগজের যে-যে উক্তির উপর নির্ভর করিয়াছেন, তাহাদের কোনটিই কোন বাংলা কাগজের প্রথম প্রকাশের তারিখ লইয়া তর্কবিতর্ক করিতে গিয়া ঐ কাগজগুলি করেন নাই। সুতরাং ঐ উক্তিগুলির নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কারণ নাই।

এই সকল কারণে এবং প্রভাতবাবু তাঁহার প্রত্যুত্তরে যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিলে এই রূপ মনে হয় যে, "বাঙ্গাল গেজেটি"ই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র।

—

তিন প্রদেশে প্রাপ্তবয়স্কদিগের শিক্ষা

বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে শতকরা লিখনপঠনক্ষম ব্যক্তি-দের সংখ্যা অন্য অনেক প্রদেশ অপেক্ষা কম ছিল। এই জন্য তথাকার কংগ্রেস গবন্মে‍র্ণ্টদ্বয় শিক্ষাবিস্তারের খুব চেষ্টা আরম্ভ করেন। সেই চেষ্টা এখনও চলিতেছে। এই চেষ্টা বিদ্যালয়ে যাইবার বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে আবদ্ধ নহে, নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্কদিগকেও লিখনপঠনক্ষম করিবার চেষ্টা হইয়া আসিতেছে। তাহার ফলে ঐ দুই প্রদেশে কয়েক লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষর লোক লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে। বিহার গবন্মে‍র্ণ্ট তাঁহাদের এই সঙ্কল্প প্রচার করেন যে, নিরক্ষর লোকদিগকে আর চৌকিদারি পদে নিযুক্ত করা বা রাখা হইবে না। তাহার ফলে নয় হাজার চৌকিদার লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে। বিহারে নিরক্ষর কয়েদীদিগকেও লিখনপঠনক্ষম করিবার চেষ্টা হইতেছে এবং এরূপ অনেক কয়েদী লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে।

বঙ্গের মন্ত্রীরা জেলের বাহিরের প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষর লোকদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন নাই বটে, কিন্তু একটা সরকারী সংবাদপত্র-জ্ঞাপনীতে (প্রেস নোটে) দেখিলাম, কোন কোন জেলে নিরক্ষর কয়েদীদিগকে লিখিতে পড়িতে শিখান হইতেছে। ইহা খুবই সান্ত্বনার কথা যে, বঙ্গের নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরা বুদ্ধি খাটাইয়া ঐ ঐ জেলে বন্দী হইতে পারিলে বিনা বেতনে সরকারী ব্যয়ে লিখিতে-পড়িতে শিখিতে ত পারিবেই, অধিকন্তু বিনা ব্যয়ে গ্রাসাচ্ছাদন ও বাসগৃহও পাইবে। আইনানুগ অপেক্ষা আইনভঙ্গকারীদের প্রতি মন্ত্রীদের এই কৃপা অতি সুসঙ্গত।

—

বঙ্গে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ

বঙ্গে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ যে-প্রকারে করা হইতেছে বা হইবে, তাহার সমালোচনা এখানে করিব না। আমরা এখন কেবল এই একটা কথা বলিতে চাই যে, কোন কোন অঞ্চলে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের একটুও প্রয়োজন নাই;—যেমন বাঁকুড়া জেলায়। এই জেলায় সামান্য যে পাটচাষ হইয়া থাকে, তাহা গৃহস্থেরা পাটশাক তরকারি রূপে ব্যবহারের জন্য করে এবং নিজেদের আবশ্যক মত দড়িদড়ার নিমিত্তও কিছু পাট আর্জায়। যে-সব ভাল সোল জমিতে পাটের চাষ হইতে পারে, তাহা ধানচাষের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয় এবং তাহা হওয়া আবশ্যকও বটে। বাঁকুড়ায় উঁচু কঙ্করময় জমির পরিমাণ বেশি বলিয়া এখানে অধিবাসীদের খাদ্যের জন্য যথেষ্ট ধানও জন্মে না। তাহার উপর যদি ধানচাষের উপযুক্ত কতক জমিতে পাটের চাষ করিতে বলা হয়, তাহা হইতে উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ আরও কমিয়া যাইবে, অথচ পাটও ভাল হইবে না।

অতএব বাঁকুড়া জেলায় ও তাহার মত অন্যান্য অঞ্চলে লোকেরা স্বেচ্ছায় যতটুকু জমিতে পাটের আবাদ করে, তাহাই তাহাদিগকে করিতে দেওয়া ভাল।

—

যুদ্ধে ব্রিটেনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইংরেজরা প্রথম প্রথম বলিতেছিলেন তাঁহারা

পৃথিবীতে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছেন, সাম্রাজ্যবৃদ্ধির নিমিত্ত নহে। সাম্রাজ্য বৃদ্ধির নিমিত্ত যে তাঁহারা যুদ্ধ করিতেছেন না, এখনও প্রশ্ন করিলে সে উত্তর তাঁহাদের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে। তবে কি জানেন, যদি সাম্রাজ্য বাড়াইবার ইচ্ছা না থাকিলেও তাহা বাড়িয়া চলে, তবে তাঁহারা নাচার। এক জন মৌলবী কোন কারণে নিরামিষভোজী হইয়াছিলেন, কিন্তু সুরুআটা খাইতেন, এবং যদি সুরুআটার সঙ্গে ২।৪ টুকরা মাংস আসিয়া পড়িত, বলিতেন, জো আপ্‌সে আয়া উস্কো রহনে দো। ইংরেজরা ইটালীর সহিত যুদ্ধ করিতেছে। ইটালিয়ানরা হারিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহাদের আফ্রিকাস্থিত সাম্রাজ্য ইংরেজদের পাতে আসিয়া পড়ে, তাহার জন্য কি তাহাদিগকে দোষ দেওয়া উচিত ?

—

বিজ্ঞানে ভারতনারী ও বঙ্গনারী

গত জানুয়ারি মাসে বারাণসীতে যে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে ভারতীয় মহিলারা যে-সকল গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন, ফেব্রুয়ারি মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে এক জন লেখক তাহার একটি তালিকা দিয়াছেন। তালিকাটিতে একুশটি প্রবন্ধের নাম ও লেখিকাদিগের নাম আছে। একটি প্রবন্ধও কোন বাঙালী মহিলা লেখেন নাই। ইহার আগেকার বৎসরে মহিলাদের লিখিত পনরটি (১৫) প্রবন্ধ ছিল। তাহারও একটিও কোন বাঙালী মহিলার লিখিত ছিল না।

বাঙালী মহিলাদের বিজ্ঞানবিমুখতার কারণ কি ?

বাঙালী ছাত্রীদের মধ্যে যাঁহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বিজ্ঞানের শ্রেণীতে ভর্তি হন, তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম। ছাত্রীদের বিজ্ঞান শিখিবার যথেষ্ট সুযোগ না-থাকা যদি ইহার কারণ হয়, তাহা হইলে কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের ও কলেজসমূহের কর্তৃপক্ষদের ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত।

উচ্চশিক্ষিতা বাঙালী মহিলাদের মধ্যে খুব অল্প মহিলাই যে বিজ্ঞান শিখেন এবং সামান্য যে কয়জন শিখেন তাঁহারাও যে প্রায়ই বিজ্ঞানের চর্চা রাখেন না, সুযোগের অভাব ছাড়া হয়ত রুচি ও প্রবৃত্তির অভাবও তাহার অন্যতম কারণ। এই অরুচি ও অপ্রবৃত্তির কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে, রবীন্দ্রনাথের 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা'র ভূমিকার কথা মনে পড়ে। কাব্য উপন্যাস গল্প রবীন্দ্রনাথ অবশ্য অনাবশ্যক বা মূল্যহীন বা অল্পমূল্য মনে করেন না। কিন্তু তিনি ঐ ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

> "গল্প এবং কবিতা বাংলা ভাষাকে অবলম্বন ক'রে চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়েছে। তাতে অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মনে মননশক্তির দুর্বলতা এবং চরিত্রের শৈথিল্য ঘটবার আশঙ্কা প্রবল হ'য়ে উঠছে। এর প্রতিকারের জন্যে সর্বাঙ্গীন শিক্ষা অচিরাৎ অত্যাবশ্যক। বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্যে প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার।"

বাংলা সাহিত্যের গল্প ও কবিতা পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা বেশী পড়েন। সুতরাং বিজ্ঞানচর্চায় অপ্রবৃত্তি বাঙালী পুরুষদের চেয়ে বাঙালী মেয়েদেরই বেশী হইবার কথা। অবশ্য, বাঙালী পুরুষদেরও যে বিজ্ঞানে যথেষ্ট রুচি আছে তাহা নহে। বিজ্ঞান-কংগ্রেসে বাঙালী পুরুষ গবেষকদের প্রাচুর্য লক্ষিত হয় না।

—

"মননশক্তির দুর্বলতা এবং চরিত্রের শৈথিল্য ঘটবার আশঙ্কা"

বাংলা সাহিত্যে গল্প ও কবিতার আপেক্ষিক আধিক্য অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত এবং বহু তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত বাঙালী পুরুষ ও নারী উভয়েরই মনে মননশক্তির দুর্বলতা এবং চরিত্রের শৈথিল্য ঘটাইবার আশঙ্কা জন্মাইয়াছে। এই আশঙ্কার অন্য কারণও আছে।

চিত্রাঙ্কনাদি ললিতকলাসমূহের অনুশীলনের, অভিনয় করিবার ও দেখিবার শুনিবার, এবং চলচ্চিত্র দেখিবার শুনিবার সর্বব্যাপক নিন্দা কোন বিবেচক ব্যক্তি নির্বিচারে করিতে পারেন না। কেন-না, গীতবাদ্য নৃত্য চিত্রাঙ্কন অভিনয় চলচ্চিত্র মাত্রেই অনাবশ্যক বা অনিষ্টকর নহে; ইহাদের প্রত্যেকটিরই প্রকারবিশেষের স্থলবিশেষে উপযোগিতা আছে। কিন্তু কোনটিরই অবিচারিত প্রাদুর্ভাব বাঞ্ছনীয় নহে। সেরূপ প্রাদুর্ভাব হইলে মননশক্তির দুর্বলতা এবং চরিত্রের শৈথিল্য ঘটিবার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়।

আমাদের অনুমান, এই আশঙ্কা অন্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাংলা দেশে অধিক। এই অনুমানের কেবল একটা কারণ বলিতেছি; অন্য কারণও আছে। আমাদের নিকট মান্দ্রাজ, নাগপুর, বোম্বাই, পাটনা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, লাহোর ও করাচীর অনেক দৈনিক কাগজ আসিয়া থাকে। কলিকাতার ত আসেই। কলিকাতার দৈনিকগুলিতে সিনেমার সচিত্র ও অচিত্র বিজ্ঞাপন-বাহুল্য যতটা দেখা যায়, অন্য কোন ভারতীয় নগরের কোন দৈনিকে তাহা দেখা যায় না। অথচ আমরা অন্য প্রদেশের লোকদের চেয়ে দরিদ্র।

নারীজাতীয়া সিনেমা-উপগ্রহদের ছবির বাহুল্যে বঙ্গে প্রকৃত ও উৎকৃষ্ট চিত্রকলাসম্মত চিত্রের আদর নাই, অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এ কথাটাও এখানে বলা আবশ্যক। ইহাদিগকে স্টার বলা হয়, কিন্তু উপগ্রহ (satellites) বলিলে অপেক্ষাকৃত ঠিক্ বলা হয়।

—

বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের কার্য

বাঁকুড়ার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ যে কয় প্রকার জনহিতকর কাজ করিয়া থাকেন, তাহার মধ্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার কাজটি প্রধান। এই মঠে গত ১৯৪০ সালে মোট ৯০৫৬৩ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছিল। গড়ে প্রত্যহ ২৪৮ জন চিকিৎসিত হয়। যে-সকল দুঃস্থ রোগী দূর হইতে আসে, সাময়িকভাবে তাহাদের আশ্রয়ের নিমিত্ত একটি বড় বাড়ীর প্রয়োজন। ইহার জন্য মঠ সর্বসাধারণের নিকট সাহায্য পাইবার যোগ্য। মঠ একটি আদর্শ ছাত্রাবাস ও একটি সাধারণ পাঠাগারও চালাইয়া থাকেন।

বর্তমানে রোগীদিগকে বেঙ্গলনাগপুর রেলওয়ে এবং বাঁকুড়া-দামোদর-নদ রেলওয়ের লাইন পার হইয়া আসিতে হয়। ইহাতে অসুবিধা এবং বিপদাশঙ্কা আছে। তালডাংরা রাস্তা হইতে মঠ পর্যন্ত একটি রাস্তা মাঠের মধ্য দিয়া প্রস্তুত করাইয়া দিলে সুবিধা হয়। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি প্রার্থনীয়।

—

শ্রীনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসবে পঠিত মন্ত্র

বিশ্বভারতীর পল্লীসংগঠন বিভাগ সুরুল গ্রামের শ্রীনিকেতনে অবস্থিত। এই বিভাগের দ্বারা কৃষির উন্নতি, স্বাস্থ্যের উন্নতি ও চিকিৎসা, পল্লী-কুটীর-শিল্পের উন্নতি, প্রভৃতি নানাবিধ জনহিতকর কাজ হইয়া থাকে। গত মাঘ মাসের শেষ সপ্তাহে শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ বৃহৎ দৈনিক কাগজগুলিতে বাহির হইলে দেশের উপকার হইবে। বিশ্বভারতী যাহা করিতেছেন, তাহা লোকে জানিতে পারিলে বীরভূম জেলা ভিন্ন অন্যত্রও উদ্যোগী দেশহিতৈষী লোকেরা সেইরূপ চেষ্টা করিতে পারেন। শ্রীনিকেতনের কর্তৃপক্ষ উৎসবের আনুপূর্বিক বিস্তারিত বিবরণ, পঠিত রিপোর্ট ও প্রবন্ধগুলি, বক্তৃতাগুলির তাৎপর্য, এবং সমুদয় নির্ধারণ (resolution) প্রকাশ ও প্রচার করিলে ভাল হয়।

আমরা এখানে কেবল উৎসবে পঠিত কতকগুলি বৈদিক মন্ত্র বাংলা অনুবাদ সমেত মুদ্রিত করিতেছি। আমাদের জাতীয় জীবনে, এবং সমগ্র মানবজাতির জীবনেও এইগুলির উপযোগিতা আছে। ইহা বিস্ময়ের বিষয় যে, অতি প্রাচীন কালে বৈদিক ঋষিগণ বর্তমান অবস্থারও উপযোগী এই সকল মন্ত্র আত্মায় লাভ করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

যথা দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ।

আকাশ ও পৃথিবী যেমন কিছুতেই ভয় পায় না ও কোনো বিঘ্নেই বিপন্ন হয় না, তেমনি হে আমার প্রাণ, ভয় পাইও না।

যথাহশ্চ রাত্রী ন চ বিভীতো ন রিষ্যতঃ
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ।

দিন ও রাত্রি যেমন কিছুতেই ভয় পায় না, ও কোনো বিঘ্নেই বিপন্ন হয় না, তেমনি হে আমার প্রাণ, ভয় পাইও না।

যথা ভূতং চ ভব্যং চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ।
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ।

যেমন ভূত ও ভব্য কিছুতেই ভয় পায় না, ও কোনো বিঘ্নেই বিপন্ন হয় না, তেমনি হে আমার প্রাণ, ভয় পাইও না।

ইমা যাঃ পঞ্চ প্রদিশো মানবীঃ পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ।
বৃষ্টে শাপং নদীরিবেহ স্ফাতিং সমাবহান্।

বর্ষান্তে নদী যেমন জলপ্রবাহ (একত্র) লইয়া চলে, তেমনি এই যে পঞ্চ (সকল) প্রদেশ ও পঞ্চ (সর্ব) জাতীয় মানব আছে, তাহারা এই খানে তাহাদের ঐশ্বর্য্য আনিয়া মিলিত করুক।

সং সং স্রবন্তু পশবঃ সমশ্বাঃ সমু পূরুষাঃ।
সং ধান্যস্য যা স্ফাতিঃ সংস্রাব্যেণ হবিষা জুহোমি।

সকল পশু, অশ্ব ও মানব দলে দলে এখানে আসিয়া মিলিত হউক। সর্ববিধ শস্যসমৃদ্ধি এখানে আসিয়া একত্র হউক। সকলকে মিলিত করিবার এই আহুতি করিতেছি।

সং বো মনাংসি সং ব্রতা সমাকূতীর্নমামসি।
অমী যে বিব্রতা স্থন তান্ বঃ সং নময়ামসি।

এখানে তোমাদের যাহাদের মন বিরুদ্ধ ও বিচ্ছিন্ন (বিব্রত), তাহাদিগকে প্রণয়ের দ্বারা এক সংকল্পে এক আদর্শে একভাবে একব্রত ও অবিরোধ করিতেছি; তাহাদিগকে সংনত করিয়া ঐক্যপ্রাপ্ত করিতেছি।

অহং গৃভ্ণামি মনসা মনাংসি মম চিত্তমনু চিত্তেভিরেত।
ইহেদসাথ ন পরো গমাথের্যো গোপাঃ পুষ্টপতির্ব আজত্।

মন দিয়া তোমাদের মন লইব, তোমাদের চিত্ত আমার চিত্তের অনুকূল হউক। যিনি বেগবান্ গতিমান্ চালক, যিনি ঐশ্বর্যপতি ও পোষক, তিনি তোমাদিগকে একত্র করুন। অন্যত্র নানা দিকে (বিচ্ছিন্ন হইয়া) গমন করিও না।

সহৃদয়ং সাংমনস্যমবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ।
অন্যো অন্যমভি হর্য্যত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা।

(হে বিব্রত মানবগণ) তোমাদিগকে পরস্পরের প্রতি সহৃদয়, সংপ্রীতিযুক্ত ও বিদ্বেষহীন করিতেছি। ধেনু যেমন স্বীয় নবজাত বৎসকে প্রীতি করে, তেমনি তোমরা পরস্পরে প্রীতি কর।

মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্মা স্বসারমুত স্বসা।
সম্যঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদত ভদ্রয়া।

ভাই যেন আর ভাইকে দ্বেষ না করে, । যেন আর ভগ্নীকে দ্বেষ না করে।. একসত্যে ও আনন্দে একগতি ও সব্রত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে কল্যাণবাণী বল।

সধ্রীচীনান্ বঃ সংমনস্কৃণোম্যেকশ্নুষ্টীন্‌ৎসংবননেন সর্ব্বান্।
দেবা ইবামৃতং রক্ষমাণাঃ সায়ংপ্রাতঃ সৌমনসো বো অস্তু।

মধুর বিনয় বচনে আমি তোমাদিগের সকলকে সমান উৎসাহে এক ব্রতে অনুপ্রাণিত করিতে চাই। চিত্তে মনে আনন্দে ও ভোগে এক করিতে চাই। দিনরাত্রি যেমন পরস্পরে প্রীতিযুক্ত দেবতারা স্বর্গের অমৃত রক্ষা করেন, তোমরাও তেমনি প্রীতিযুক্ত হও।

স্বস্তি মাত্র উত পিত্রে নো অস্তু স্বস্তি গোভ্যো জগতে পুরুষেভ্যঃ।
বিশ্বং সুভূতং সুবিদত্রং নো অস্তু দেবঃ স নঃ সুভূতমেহ বক্ষৎ।

মাতার এবং পিতার কল্যাণ হউক, গোসকলের কল্যাণ হউক, সকল মানবের ও বিশ্বজগতের কল্যাণ হউক, আমাদের বিশ্বশোভন ঐশ্বর্যও কল্যাণময় ("সুভূত") ও শোভন জ্ঞানযুক্ত হউক। সেই জ্যোতির্ময় দেবতা আমাদিগকে এই শুভ উদ্দেশ্যে পরম কল্যাণ প্রেরণ করুন।

পৃথিবী শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তি র্দ্যৌঃ
শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ
শান্তির্বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে মে দেবাঃ
শান্তিঃ সর্ব্বে মে দেবাঃ শান্তিঃ
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিভিঃ।
তাভিঃ শান্তিভিঃ সর্ব্বশান্তিভিঃ
শময়ামোহং যদিহ ঘোরং
যদিহ ক্রূরং যদিহ পাপং তচ্ছান্তং
তচ্ছিবং সর্ব্বমেব শমস্তু নঃ।

—

লৌলাড়ার রাধাচরণ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

মানভূম জেলার লৌলাড়া গ্রামের আনন্দ আশ্রমে রাধাচরণ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় নাম দিয়া যে-বিদ্যালয়টি স্থাপিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা ঐ জেলার অনেক-ক্রোশব্যাপী একটি অঞ্চলের লোকদের শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হইবে। বিদ্যালয়টি স্বাস্থ্যকর স্থানে কয়েক জন শিক্ষাদানোৎসাহী শিক্ষিত যুবকের উদ্যোগে স্থাপিত হইয়াছে ও পরিচালিত হইতেছে। উহা হইতে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশ্যন পরীক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে পাঠাইবার নিমিত্ত শীঘ্র ব্যবস্থা করা হইবে। উহার প্রধান দাতার নাম অনুসারে উহার নাম রাখা হইয়াছে। বাহিরের ছাত্রেরাও অল্প ব্যয়ে উহার ছাত্রনিবাসে থাকিতে পারে। এই সুবিধার নিমিত্ত ছাত্রনিবাসের প্রত্যেক ছাত্রকে মাসে আধ মণ চাউল ও নগদ ১৫৹ (সাত সিকা) মাত্র দিতে হয়। ইহা খুব কম। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে হইলে প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরিহর মুখোপাধ্যায়কে গ্রাম লৌলাড়া, ডাকঘর পুঞ্চা (Puncha), জেলা মানভূম, ঠিকানায় পত্র লিখিতে হইবে।

অল্পবিত্ত গৃহস্থদের ছেলেদের জন্য অভিপ্রেত এই বিদ্যালয়ের খুব অর্থ-সাহায্য আবশ্যক। প্রধান শিক্ষক হরিহর বাবুকে তাহা সকলে পাঠাইলে মানভূম জেলার বিশেষ উপকার হইবে।

—

স্বাধীনতা-দিবসের প্রতিজ্ঞা

কংগ্রেস যে ১৯২৯ সালে লাহোরের অধিবেশনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাকেই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক লক্ষ্য ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং পূর্ণ-স্বরাজ লাভে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিবার ও করাইবার নিমিত্ত প্রতি বৎসর ২৬শে জানুয়ারী "স্বাধীনতা-দিবস" অনুষ্ঠিত হয়। এবার সেই দিনে যে প্রতিজ্ঞা উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা আগেকার প্রতিজ্ঞা অপেক্ষা দীর্ঘতর। কিন্তু ভারতীয়েরা কেন স্বাধীনতা চায়, তাহার বিবৃতি আগেকার মত আছে। যথা—

> অন্য কোন জাতির মত ভারতীয়দেরও স্বাধীনতায় অবিচ্ছেদ্য অধিকার, তাহাদের শ্রমের ফল ভোগ করিবার অধিকার এবং বাড়িবার পূর্ণ সুযোগ পাইবার নিমিত্ত জীবনের আবশ্যক দ্রব্য লাভ করিবার অধিকার আছে, আমরা ইহা বিশ্বাস করি।
>
> আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, কোন গবর্ন্মেণ্ট কোন জাতিকে এই অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত করিলে ও তাহাদিগের উপর অত্যাচার করিলে, তাহার পরিবর্ত্তন বা বিলোপ সাধন করিবার অধিকার তাহাদের আছে। ভারতে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ভারতীয়দিগকে শুধু যে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু জনসাধারণকে সকল প্রকারে নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপায় করিয়া এই প্রক্রিয়াকেই নিজের ভিত্তি করিয়াছে এবং ভারতবর্ষের আর্থিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ধ্বংস সাধন করিয়াছে।
>
> অতএব, আমরা বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষকে ব্রিটেনের সহিত সম্পর্ক ছেদন করিতে এবং পূর্ণ স্বরাজ লাভ করিতে হইবে।

গত ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষের অনেক গ্রামে ও নগরে "স্বাধীনতা-দিবস" অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অন্য কোন কোন দেশে যে স্বাধীনতা-দিবসের উৎসব হয়, তাহা তাহাদের স্বাধীনতা লাভের দিনের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব। আমাদের "স্বাধীনতা-দিবস" তাহা নহে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে লাহোরে যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তাহাতে স্থির হয় যে, পূর্ণস্বরাজ বা স্বাধীনতাই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্য। উহা ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে ঘোষিত হয়। ঐরূপ ঘোষণা তদবধি প্রতি বৎসর ঐ তারিখে হইয়া আসিতেছে। ইহা স্বাধীনতা-লাভের দিনের স্মারক উৎসব না হইলেও ইহার গুরুত্ব আছে। এমন সময় ছিল যখন, ভারতবর্ষ যে আবার স্বাধীন হইতে পারে, তাহা অগণিত লোকে কল্পনা করিত না, আশা করিত না, বিশ্বাস করিত না। এখন যে তাহা করে, ইহা কম কথা নয়। সাহস করিয়া বিশ্বাস ও আশা সহকারে যে তাহারা বলে, স্বাধীনতা চাই-ই চাই, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবেই, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবই, নতুবা নিশ্চিহ্ন হইতে হয় হইব, ইহা কম কথা নয়। তাহা অপেক্ষাও ভরসার কথা এই যে,

স্বাধীনতার জন্য হাজার হাজার নরনারী সর্ব্ববিধ দুঃখ বরণ ও ভোগ করিয়াছেন, অনেকে মরণান্ত দুঃখ বরণ ও ভোগ করিয়াছেন।

অতএব "স্বাধীনতা-দিবস" অনুষ্ঠানের আমরা পূর্ণ সমর্থন করি।

—

ভারতীয়েরা কেন স্বাধীনতা চায়

অন্য সকল জাতির মত ভারতীয়দেরও যে স্বাধীনতার অনুচ্ছেদ্য অধিকার আছে, তাহাদের স্বীয় শ্রমের ফল ভোগ করিবার অধিকার আছে, জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্য আবশ্যক সব কিছু পাইবার অধিকার আছে—যাহাতে তাহারা বাড়িবার পূর্ণ সুবিধা পায়, এই অতি যথার্থ ও অতি সহজ কথা স্বাধীনতা-প্রতিজ্ঞায় আছে। ইহাও তাহাতে বলা হইয়াছে যে, যদি কোন গবর্ন্মেণ্ট কোন জাতিকে এই সব অধিকার হইতে বঞ্চিত করে ও তাহাদের উপর অত্যাচার করে, তাহা হইলে সেই জাতির সেই গবর্ন্মেণ্টের পরিবর্ত্তন বা বিলোপ সাধন করিবার অধিকার আছে। ইহাও স্বতঃসিদ্ধের মত সত্য।

তাহার পর, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের দ্বারা ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ দিকে অনিষ্ট হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, "সেই হেতু আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারতবর্ষকে ব্রিটেনের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে হইবে এবং পূর্ণস্বরাজ বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে।"

ইহার পর প্রতিজ্ঞাপত্রে পূর্ণস্বরাজ লাভের উপায় ও পন্থা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—বলপ্রয়োগ, হিংসা, সে-পথ নহে; ভারতবর্ষ শান্তিপূর্ণ ও বৈধ প্রণালীর অনুসরণ করিয়া শক্তি ও আত্মনির্ভর লাভ করিয়াছে ও স্বরাজের দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে এবং এই পন্থা অবলম্বন দ্বারাই আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করিবে। আমরাও ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া মনে করি—যদিও ইহা একমাত্র পথ নহে।

—

স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছার কারণ

বিদেশের কোন জাতি যদি অন্য কোন জাতির দেশ অধিকার করিয়া আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিতে থাকে এবং অধিকন্তু অধিকৃত দেশের লোকদের উপর অত্যাচার করে, তাহা হইলে পরাধীন জাতির মনে স্বাধীন হইবার ইচ্ছা স্বভাবত ও সহজেই আসে। দীর্ঘকালের পরাধীনতার ফলে যদি সেই জাতির মনে স্বাধীনতার ইচ্ছা ও আশা ক্ষীণ হইয়া লুপ্তপ্রায় হয়, তাহা হইলে তাহা জাগাইয়া তুলিবার সকলের চেয়ে সহজ উপায়, তাহাদের যে-সকল অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাদের প্রতি যে-সব অত্যাচার হইয়াছে, তাহাদের যে-সকল ক্ষতি ও অনিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের যে অপমান ও লাঞ্ছনা হইয়াছে, এবং তাহাদের পূর্ণ উন্নতির পক্ষে যে-সকল বাধা বিদ্যমান আছে সেই সমুদয়ের কথা জনগণকে পুনঃ পুনঃ বলা ও স্মরণ করাইয়া দেওয়া। এই জন্য, "স্বাধীনতা-দিবস" উপলক্ষ্যে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের দোষত্রুটির উল্লেখ আবশ্যক।

কিন্তু যদি এরূপ হইত যে, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ব্রিটেনের স্বার্থসিদ্ধি না করিয়া কেবল ভারতবর্ষেরই মঙ্গল চাহিত, যদি ব্রিটিশ শাসনে কোন অত্যাচার না-হইত, এবং যদি ব্রিটিশ শাসনের ফলে দেশের ধনের হ্রাস ও স্বাস্থ্যের অবনতি না হইয়া ধন বৃদ্ধি পাইত এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি হইত, জনগণের জ্ঞানও বাড়িত, তাহা হইলে কি স্বাধীন হইবার কোনও প্রয়োজন থাকিত না? তাহা হইলে কি আমরা কেহই স্বাধীনতা চাহিতাম না? নিশ্চয়ই চাহিতাম। কেন চাহিতাম?

চাহিতাম এই জন্য যে, মানুষ **মানুষ,** গৃহপালিত পশুর মত নহে। মানুষে ও গৃহপালিত পশুতে একটা প্রভেদ এই যে, গৃহপালিত পশুর যাহা আবশ্যক তাহা তাহার মালিকরা দেয় এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও স্বাস্থ্যের জন্য যাহা করা দরকার তাহা মালিকরা করে, কিন্তু মানুষ নামের যোগ্য মানুষেরা নিজেদের সব ব্যবস্থা নিজেরাই করে। যদি ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য আবশ্যক সব ব্যবস্থা ইংরেজরা করিত এবং যদি আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতাম, তাহা হইলে আমাদের নাম "ভারতবর্ষীয় মহাজাতি" না হইয়া "ইংরেজদের দ্বারা পালিত নরাকার ভারতীয় গোরুদের সমষ্টি" হইত। এখনও সেই নাম দিলে কতকটা ঠিকই হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ ঠিক হয় না এই কারণে যে, ভারতবর্ষের অনেক লোক মনুষ্যত্বলাভ সম্বন্ধে সচেতন এবং সেই নিমিত্ত স্বাধীনতা লাভের জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। স্বকার্য্য সাধনের সামান্য কিছু অধিকারও ভারতীয়েরা পাইয়াছে।

"স্বাধীনতা-দিবস" উপলক্ষ্যে পঠিত প্রতিজ্ঞাপত্রে যদি এই মর্ম্মের কথাও থাকিত যে, ব্রিটিশ শাসন যদি উৎকৃষ্ট হইত, তাহা হইলেও আমরা স্বাধীনতালাভে যত্নবান হইতাম, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞাটি পূর্ণাঙ্গ হইত।

ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষের যে-যে অনিষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাই। তাহাতে স্বাধীনতার আবশ্যকতাবোধ বিন্দুমাত্রও কমিবে না।

—

ব্রিটিশ রাজত্বে ভারতের আর্থিক অবস্থা

ব্রিটিশ-শাসনকালে ইংরেজরা ভারতীয় জনগণের শ্রম ও ধনোৎপাদন-শক্তি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সাহায্যে

ধনী হইয়াছে, এবং ভারতবর্ষীয় জনগণ দরিদ্রতর হইয়াছে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ-বিষয়ে ভারতীয়দের পক্ষ হইতে দাদাভাই নওরোজী, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি বড় বড় বহি এবং অন্য অনেকে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতীয়দের পণ্যশিল্পসমূহের ও বাণিজ্যের অবনতির স্বরূপ ও কারণ মেজর বামনদাস বসু তাঁহার তদ্বিষয়ক Ruin of Indian Trade and Industries নামক উৎকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ পুস্তকে লিখিয়াছেন।

দারিদ্র্যে বিশেষ করিয়া পল্লীগ্রামসকলের মহা অনিষ্ট হইয়াছে। তাহা শুধু অন্ন, বস্ত্র, বাসগৃহ ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নহে। গ্রামগুলি শ্রীহীন হইয়াছে—সেখানে শোভা ও আনন্দ নাই। কারখানা-শিল্পের দ্বারা গ্রামগুলির এই অনিষ্টের প্রতিকার হইতেছে না; কুটীরশিল্পের উন্নতি ও বিস্তৃতি দ্বারা পরোক্ষ ভাবে হইতে পারে।

পণ্যশিল্পের কারখানা ব্রিটিশ রাজত্বে বাড়িয়াছে। কিন্তু তাহার অধিকাংশ বিদেশীর হাতে। পণ্যদ্রব্য স্থলপথে ও জলপথে, দেশের মধ্যে ও বিদেশে আনয়ন ও প্রেরণ প্রধানতঃ বিদেশীদের ও বিদেশী গবর্মেণ্টের হাতে গিয়াছে। তাহাতেও দেশ দরিদ্রতর এবং এ-বিষয়ে সামর্থ্যহীন ও পরমুখাপেক্ষী হইয়াছে।

—

ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা

ব্রিটিশ শাসনের ঠিক পূর্ব্বে ভারতবর্ষ এই অর্থে স্বাধীন ছিল যে, দেশের ভি ভিন্ন অংশে যে হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি নৃপতিরা প্রভুত্ব করিতেন, তাঁহারা ভারতবর্ষেরই মানুষ, ভারতবর্ষই তাঁহাদের জন্ম ও নিবাসের ভূমি—তাঁহারা বিদেশী ছিলেন না। দেশের উন্নতি করিবার ইচ্ছা থাকিলে তাহা তাঁহারা স্বয়ং করিতেন ও করিতে পারিতেন।

ব্রিটিশ শাসনের প্রাক্‌কালে ও প্রথম যুগে ইংরেজের অনধিকৃত অনেক অঞ্চল ইংরেজের অধিকৃত অঞ্চল অপেক্ষা সমৃদ্ধতর ছিল।

ব্রিটিশ শাসনে প্রভেদ এই হইয়াছে যে, সমগ্র ভারতবর্ষে বিদেশী ইংরেজের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে, দেশী রাজ্য নামে অভিহিত অংশগুলিতেও বিদেশী ইংরেজের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে; সমগ্র ভারতবর্ষে চূড়ান্ত ক্ষমতা কোন ভারতীয় মানুষের হাতে নাই। আমরা ইচ্ছা করিলেও রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতির নিমিত্ত কোন রাষ্ট্রবিধি প্রণয়ন করিতে পারি না। এই এই অর্থে ইহা সত্য যে, ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক সর্বনাশ হইয়াছে (it has ruined India··· politically)। ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রাক্‌কালে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রনৈতিক যে সচেতনতা বা জাগৃতি ছিল না, এখন তাহা হইয়াছে বটে; কিন্তু ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ইচ্ছাপূর্ব্বক এই জাগরণ ঘটায় নাই, তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বে ইহা ঘটিয়াছে। ব্রিটিশ কিংবা অন্য কোন জাতির অধীন না হইয়াও স্বাজাতিক এইরূপ সচেতনতা তুরস্কে, ইরানে, আফগানিস্থানে, চীনে, জাপানে জন্মিয়াছে। ইহা যুগধর্মের প্রভাবে হইয়াছে।

—

ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় সংস্কৃতি

সংস্কৃতি (culture) শব্দটির একটি সম্পূর্ণ সংজ্ঞা দিবার চেষ্টা করিব না। এখানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে দেশের সাহিত্য, শিক্ষা, ললিতকলা, সংগীত, নৃত্য, শিল্প প্রভৃতি উহার অঙ্গীভূত।

স্বাধীনতা-দিবসের প্রতিজ্ঞাপত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট সংস্কৃতির দিক্ দিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ করিয়াছে ("has ruined India···culturally") ইহা নিঃসন্দেহ যে, ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষের বহু পণ্যশিল্পের ও অন্যবিধ শিল্পের খুব অবনতি এবং কোন কোনটির ধ্বংস হইয়াছে। ইহাও সত্য যে, বঙ্গের (ভারতবর্ষের অন্য সব অংশের বিষয় ভাল করিয়া জানি না) স্বকীয় যাত্রা গান নৃত্য ইত্যাদির অবনতি বা রূপান্তর ঘটিয়াছে। পল্লী-সমূহের সাহিত্য গীতি প্রভৃতি লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। তাহা বহু পরিমাণে দেশের দারিদ্র্যবশতঃ। আমরা কিন্তু যত বৎসরের কথা জানি, তাহা ব্রিটিশ আমলের অন্তর্গত। ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপিত হইবার ঠিক আগে সংস্কৃতির এই সকল অঙ্গের অবস্থা কিরূপ ছিল জানি না।

সংস্কৃতির যে-অঙ্গ শিক্ষাবিষয়ক এবং সাহিত্যিক, সে-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, কোম্পানীর আমলের প্রথম দিকে বঙ্গে যত টোল ছিল এখন নিশ্চয়ই তত নাই, এবং সেইগুলি থাকায় দেশে সংস্কৃতের যতটা বিস্তৃত ও গভীর চর্চ্চা হইত, এখন ততটা হয় না। অন্য দিকে ইহাও সত্য যে, সংস্কৃত-সাহিত্যে ও পালি-সাহিত্যে যত গ্রন্থ আছে এবং তাহাতে যে ভাবসম্পদ ও চিন্তাসম্পদ সঞ্চিত আছে, তাহার জ্ঞান ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার ঠিক্ আগে যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা এখন অনেক বেশী হইয়াছে। ইংরেজ-রাজত্বকালে বহুসংখ্যক সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়ায় সাধারণ বিদ্যার্থীদেরও অধিগম্য হইয়াছে। এই অবস্থা পূর্ব্বে ছিল না। এ-বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের কোনই কৃতিত্ব নাই, বলা যায় না। কিঞ্চিৎ আছে।

ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ইংরেজ আমলের আগেকার চেয়ে এখন

অধিক। এই জ্ঞানবৃদ্ধিবিষয়ে ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট খুব কৃপণতা করিলেও কিছু করিয়াছে।

সংস্কৃত ও পালির পরবর্ত্তী নানা ভারতীয় ভাষার যে-সাহিত্যকে মধ্যযুগের সাহিত্য বলা হয়, তাহার সম্বন্ধে জ্ঞান ও তাহার অনুশীলন বাড়িয়াছে কি না বলিতে পারি না; কিন্তু বোধ হয় বাড়িয়াছে, কমে নাই।

ভারতীয় নানা ভাষার আধুনিক সাহিত্যসম্পদ এখন ইংরেজ-আমলের আগেকার চেয়ে যে অধিক হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। বস্তুতঃ আধুনিক বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই বলিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিদ্যা ও সংস্কৃতির সহিত সংস্পর্শে ও তাহার সংঘাতে ইহার উৎপত্তি, উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ইহা ইংরেজ-আমলে ঘটিয়াছে।

সংগীতের চর্চা ইংরেজ-আমলে ঠিক আগেকার চেয়ে এখন বেশী কি না বলিতে পারি না। ভদ্রশ্রেণীর নারীদের মধ্যে সংগীত ও নৃত্যের চর্চা এখন যতটা হইয়াছে, ইংরেজ-রাজত্বের ঠিক আগে তদপেক্ষা কম বা বেশী ছিল কি না, তাহা জানিবার চেষ্টা হওয়া উচিত।

যত দূর জানা যায়, মৃত ও জীবিত গান-রচয়িতাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সর্বাপেক্ষা অধিক গান রচনা করিয়াছেন। সেগুলি ইংরেজ-আমলেই রচিত হইয়াছে। তিনি "গানের রাজা।" সুতরাং সংস্কৃতির এই অঙ্গের সর্বনাশ হইয়াছে বলা যায় না।

নূতন নূতন নৃত্যেরও উদ্ভাবন হইতেছে।

ভারতীয় চিত্রাঙ্কনের নানা পদ্ধতির পুনর্জন্ম হইয়াছে। নূতন পদ্ধতির আবির্ভাবও হইয়াছে। মূর্ত্তিগঠন-শিল্পের অবনতি হইয়া আবার উন্নতি হইতেছে।

সুকুমার শিল্পের মধ্যে বোধ হয় ভারতীয় স্থাপত্যেরই অবনতি ও ক্ষতি ইংরেজ-আমলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। এ-বিষয়ে পাশ্চাত্য প্রভাব অতিক্রম করিয়া ভারতীয় পুরাতন ও নবোদ্ভাবিত নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা (লেখা, পড়া ও হিসাব রাখা) এখনকার চেয়ে আগে অর্থাৎ প্রাগ্‌ব্রিটিশ যুগে ও ইংরেজ-আমলের গোড়ার দিকে অধিক বিস্তৃত ও সহজলভ্য ছিল। কিন্তু আধুনিক বিস্তার ও তাহাতে উচ্চ শিক্ষার আরম্ভ ও বিস্তৃতি ব্রিটিশ রাজত্বে হইয়াছে। কিন্তু তাহা সামান্য। একমাত্র লণ্ডন কাউণ্টি কৌন্সিল শুধু প্রাথমিক শিক্ষার নিমিত্ত যত খরচ করে, ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট সর্ববিধ শিক্ষার জন্য সমগ্র ভারতে তত খরচ করেন না।

আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চা ব্রিটিশ আমলের ঠিক্ আগে ভারতে ছিল না। এখন সামান্য কিছু হয়।

অতএব, মোটের উপর এ-কথা বলা যায় না যে, ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির **সর্ব্বনাশ** করিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নতি ইহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বা আছে, ইহাও বলা যায় না।

—

ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা

"স্বাধীনতা-দিবসে"র প্রতিজ্ঞাপত্রে ইহাও আছে যে, ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট আধ্যাত্মিকতা-ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ করিয়াছে ("has ruined India···spiritually")। এই মন্তব্যের সম্পূর্ণ বা আংশিক সত্যতার বিচার করিতে হইলে ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রাক্‌কালে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা জানা আবশ্যক। সে-জ্ঞান আমাদের নাই। তবে ইংরেজ-রাজত্বকালে দেশের আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায়, তাহা হইতে সংক্ষেপে দু-একটা কথা বলা যাইতে পারে।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবার আগে কোম্পানী বাহাদুর অনুসন্ধান ও বিবেচনা করিয়াছিলেন। ঐ শিক্ষা চালাইলে শিক্ষিত লোকদের রুচিপরিবর্ত্তনহেতু বিলাতী নানা পণ্যদ্রব্যের (ও তন্মধ্যে মদ্যের) কাট্‌তি বাড়িবে কি না, তাহাও জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল। মেকলে ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন; তাঁহার মতে একটা আলমারীর একটা তাকে রক্ষিত ইউরোপীয় পুস্তকসমূহে যত জ্ঞান সঞ্চিত আছে, সমগ্র প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে তাহা নাই। ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের ফল তিনি এই রূপ হইবে আশা করিয়াছিলেন যে, তদ্দ্বারা এরূপ কতকগুলি ভারতীয় মানুষ প্রস্তুত করা যাইবে যাহাদের মনটা হইবে ইংলণ্ডীয়, কেবল গায়ের রং ও বাহ্য চেহারাটা হইবে ভারতীয়; সেই জন্য তাহারা ও তাহাদের বংশধরেরা বিদ্রোহী না হইয়া চিরকাল ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যভুক্ত থাকিবে। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তন দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের উচ্ছেদ ও খ্রীস্টীয় ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইবে বলিয়াও অনেক ইংরেজ আশা করিয়াছিলেন।

অতএব ইংরেজী শিক্ষা ও চাল-চলনের প্রবর্ত্তন দ্বারা ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা বিনষ্ট না হউক, কতকটা আক্রান্ত ও পরাভূত হইবে, ইহা কোম্পানীর আমলে অনেক ইংরেজ অনুমান করিয়াছিলেন। তবে এ-বিষয়ে তখনকার ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের এবং ১৮৫৮ সালের পরবর্ত্তী ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি কি ছিল তাহা নির্ণয় করা সুসাধ্য নহে, বিশেষতঃ সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা। কিন্তু ফল কি হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে।

রেলওয়ে ও স্টীমারের সুবিধা পাওয়ায় এখন আগেকার

চেয়ে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা খুব বাড়িয়াছে। ইহা আধ্যাত্মিকতা-বৃদ্ধি প্রমাণ করে কি না, সে-বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে।

ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ ও থিয়সফিক্যাল সমিতি ইংরেজ-রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং ইহাদের কাজ এখনও চলিতেছে। মুসলমানদের মধ্যে ওআহাবি প্রচেষ্টা এবং আহমদিয়া প্রচেষ্টাও ইংরেজ-আমলে উৎপন্ন; তন্মধ্যে আহমদিয়া প্রচেষ্টা এখনও চলিতেছে। যুক্ত-প্রদেশে যে রাধাস্বামী-সম্প্রদায়ের পীঠস্থান আগ্রার দয়াল-বাগে, তাহারও উদ্ভব ইংরেজ-আমলে। পরমহংস রামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ তাঁহার শিষ্যবৃন্দ যে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রবর্ত্তক ও প্রাণস্বরূপ, তাহারও আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা ইংরেজ-রাজত্বকালে। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা ও প্রচারের জন্য রাধাকান্ত দেব প্রমুখ নেতাদের দ্বারা যে ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা কোম্পানীর আমলে। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যেরা এই যুগেই হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা ও প্রচারের চেষ্টা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ধর্ম্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র, প্রচার (মাসিক পত্র) যে ধর্ম্মান্দোলনের অঙ্গীভূত, তাহা এই সময়কার। এই সময়ে ভারতধর্ম মহামণ্ডল, ব্রাহ্মণসভা, সনাতন ধর্ম্মসভা, বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ পণ্ডিচেরীতে এই যুগে তাঁহার আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীকে যেমন শিক্ষা-আয়তন, সেইরূপ একটি আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানও বলা যাইতে পারে। খ্রীস্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একাধিক স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও অন্যবিধ উপায়ে খ্রীস্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকে ভারতীয় রূপ দিবার চেষ্টা একটি আধ্যাত্মিক নবোদ্যম বলা যাইতে পারে। "স্বাধীনতা-দিবস" উপলক্ষ্যে পঠিত প্রতিজ্ঞা-পত্র যাঁহার প্রেরণায় বা যাঁহারই দ্বারা রচিত, সেই মহাত্মা গান্ধী রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতার প্রভাবের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত-স্থল।

ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি দ্বারা অনেক লোকহিতসাধক প্রতিষ্ঠান ও সমিতি স্থাপিত হইয়াছে ও পরিচালিত হইতেছে।

এমন লোক কংগ্রেসের মধ্যে ও বাহিরে আছেন যাঁহারা আধ্যাত্মিকতা মানেন না এবং তাহাকে মূল্যহীন মনে করেন। কিন্তু যাঁহারা তাহাকে অলীক ও মূল্যহীন মনে করেন না, যাঁহারা তাহাকে মূল্যবান মনে করেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকে উপরে উল্লিখিত কতকগুলি বা অন্ততঃ কোন একটি প্রচেষ্টাকে ও প্রতিষ্ঠানকে নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক মনে করিবেন। তাহা যদি মনে করেন, তাহা হইলে ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকে বিনষ্ট করিয়াছে, তিনি বলিতে পারিবেন না। তাঁহাকে বলিতে হইবে যে, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকে বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা যদি ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের থাকিয়াও থাকে (ছিল বা আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না), তাহা হইলেও সে-উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। কারণ কোন-না-কোন আকারে, কোন-না-কোন প্রচেষ্টার মধ্যে তাহা বাঁচিয়া আছে।

—

দুই সংস্কৃতির সংঘর্ষে কি হয়

ব্রিটিশ রাজত্বকালে ভারতীয় সংস্কৃতির অবস্থা ১৩৪৫ সালে আলোচনা করিবার সময় ডাকে চৈনিক সংবাদ-দান কমীটি (China Information Committee) কর্তৃক প্রেরিত তিনটি বুলেটিন পাইয়াছিলাম। তাহার একটি বুলেটিনে একটি প্রবন্ধ ছিল, যাহার নাম 'চীনের সাংস্কৃতিক সমস্যা' (The Cultural Problem of China)। তাহা হইতে প্রথম প্যারাগ্রাফটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"When two entirely different cultures meet and clash, two things may happen to the one which emerges second best from the contest. First, it may cease to grow and perhaps even go out of existence, or it may reorientate itself and carry on to a greater future. The latter process requires a great deal of cultural vitality and an abundance of willingness to unlearn and learn."

তাৎপর্য। যখন দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত সংস্কৃতির সাক্ষাৎকার ও সংঘাত ঘটে, তখন এই যুদ্ধে যেটি দ্বিতীয়-স্থানীয় হয়, তাহার সম্বন্ধে দু-রকম ঘটনা ঘটিতে পারে। প্রথম, ইহা আর বাড়ে না কিংবা হয়ত লোপ পায়; কিংবা ইহা নূতন পরিবেশের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে থাকে এবং মহত্তর ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়। শেষোক্ত পন্থার অনুসরণের জন্য অধিক পরিমাণে সাংস্কৃতিক জীবনী শক্তি এবং ভুলিবার ও শিখিবার ইচ্ছার প্রাচুর্য্য আবশ্যক।

আমাদের মনে হয় ভারতীয় সংস্কৃতির এই প্রাণশক্তি এবং ভারতীয়দিগের মধ্যে অনেকের ভ্রম বর্জ্জন ও জ্ঞান অর্জ্জনের স্পৃহা যথেষ্ট পরিমাণে আছে বলিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি মরে নাই, এবং সম্ভবতঃ ইহা মহত্তর আকারে পুনরুত্থানের দিকে অগ্রসর হইতেছে বা হইবে।

ইহা যে কেবল আধুনিক সময়েই ঘটিতেছে, তাহা নহে। মধ্যযুগে মুসলমান দেশসকলের সংস্কৃতি ভারত-বর্ষে আসিয়া পড়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির মৃত্যু হয় নাই,

বরং তাহা নবজীবন ও নবশক্তি লাভ করিয়াছিল। তদ্দ্বারা কতকটা প্রভাবিতও হইয়াছিল। সেই সময়কার বহু সাধু সন্ত ও সংস্কারকের জীবনে ও বাণীতে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। প্রাচীনতর যুগে গ্রীক সংস্কৃতির সংস্পর্শে ভারতীয় সংস্কৃতি বিনাশ না পাইয়া নূতন শক্তি পাইয়াছিল, যদিও প্রভাবিতও হইয়াছিল বটে।

বস্তুতঃ, এমার্সনের উক্তি, "He who wrestles with us strengthens us," "যিনি আমার সঙ্গে কুস্তি লড়েন তিনি আমার বল বৃদ্ধি করেন," দেহমনআত্মা সর্বত্র সত্য।

—

সংস্কৃতির সংস্পর্শ ও সংঘর্ষ

[শ্রীক্ষিতিমোহন সেন]

প্রায়ই দেখা যায় একটি ধর্ম সভ্যতা বা সংস্কৃতি যখন পুরাতন হইয়া জীর্ণ ও দুর্বল হইয়া আসে তখন যদি নূতন কোন ধর্ম সভ্যতা বা সংস্কৃতির সঙ্গে তার পরিচয় হয়, তবে সে আবার নূতন শক্তি লাভ করে। অবশ্য পুরাতন সংস্কৃতি অতিশয় দুর্বল হইলে তাহার ব্যতিক্রম কখনও কখনও দেখা যায়। তখন কোনও কোনও ক্ষেত্রে নূতন সংস্কৃতির সঙ্গে যোগের সময় শুভ ফলের পরিবর্তে ফল হয় অশুভ। যেমন বায়ুর বেগে ক্ষীণ-শিখা-প্রদীপ নিবিয়া যায় যদিও সাধারণ হিসাবে বায়ুই অগ্নির প্রাণপোষক। হৃৎপিণ্ড অতি দুর্বল হইলে খাইতে গিয়া প্রাণ যায় এমন দেখা গেলেও কেহ একথা বলিবেন না যে খাদ্য প্রাণের বিরোধী।

দুইটি নদী যদি খুব শক্তিশালী না-ও হয় তবু তাহাদের সংযোগস্থলের কাছে জলের ভয়ঙ্কর বেগ ও শক্তি হয়; তাই মাঝিরা মোহনার কাছে খুব সাবধানে নৌকা চালায়। কোন ধর্ম বা সংস্কৃতি যদি বাহিরের কোনও সংস্কৃতি বা ধর্মের পরিচয় না পায় তবে যেমন তেমন করিয়া পুরাতন সব জীর্ণ মত ও আচার লইয়া দীন ভাবেই দিন যাপন করিতে পারে। কিন্তু আর একটি ধর্ম বা সংস্কৃতি যদি হঠাৎ আসিয়া পড়ে এমন কি প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেও আসে তখন উভয় ধর্ম বা সংস্কৃতি তাহার নিজ নিজ উচ্চতম আদর্শ ও সত্য খুঁজিয়া বাহির করিয়া নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে চায় এবং এমন স্থলে নিজেদের যে-সব মহত্ব পূর্বে নিজেরা এতকাল উপলব্ধি করে নাই তাহাও তখন নূতন করিয়া উপলব্ধি করে এবং সেই নব উপলব্ধ মহত্ত্বের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া নিজের শক্তিকে উন্নততর করিয়া তোলে। এই কারণেই মধ্যযুগে মুসলমানদের আসিবার পর মহাপ্রাণ ভারতীয়গণ নিজেদের পুরাতন ভক্তি ও মহত্তর সাধনার সব বিস্মৃত অধ্যায় আবার নূতন করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং তাহার দ্বারা নিজেদের লজ্জা রক্ষা করিয়া জগতে টিকিয়া থাকিবার যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিলেন। প্রতীচ্য ও প্রাচ্য সংস্কৃতির মিলনেও সেইরূপই হওয়া চাই।

আমরা অনেক সময় ঘরে জীর্ণ ও মলিন বসন পরিয়া থাকি। তখন শত্রু মিত্র যে-ই ঘরে আসুক দায়ে পড়িয়া আমাদের সমাজের যোগ্য বেশ-ভূষা বাহির করিতে হয়। এই জন্যই নব নব অভ্যাগতের সঙ্গে যোগ না ঘটিলে আমাদের গ্রাম্য দীন ভাব ঘুচিয়া মহত্তর সামাজিক জীবন কিছুতেই আসিতে চাহে না। বাড়ীতে যে-শিশুটি একলা নিতান্ত উৎসাহহীন ভাবে পড়াশুনা করে, কি উদ্যমহীন হইয়া খেলা করে, সেও যদি বিদ্যালয়ে যাইয়া নূতন সঙ্গী পায় তবে তাহাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিলেও তাহার পড়াশুনায় এবং খেলা-ধূলায় একটা নূতন উদ্যমের সঞ্চার হয়। জীর্ণশক্তি অভিজাত ও পুরাতন ধারার গাছের সঙ্গে জংলী গাছের জোড়কলম বাঁধিলেও তাহাতে পুরাতন গাছের আভিজাত্য নষ্ট না হইয়া নবশক্তির অভ্যুদয় ঘটে।

ভারতে এক এক বার যুদ্ধে ক্ষত্রিয়াদি জাতি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, তার পর শক হূণ প্রভৃতি বাহিরের প্রবলতর ও সংস্কৃতিতে অনগ্রসর সব জাতি ভারতীয় সমাজের মধ্যে যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহাতে ভারতের প্রভূত লাভ হইয়াছে। উচ্চতর আরও সব জাতির মধ্যে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে।

এই রকম ক্ষেত্রে যদি মিত্র ভাবে যোগ না হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুর মতও যোগ হয়, তবু তাহাতে উভয়ের লাভ হয়। উভয়েই নিজেদের সব প্রাচীন অনমুভূত সম্পদ খুঁজিয়া বাহির করে এবং নিজের সব সুপ্ত সম্ভাবনা-কে জাগ্রত জীবন্ত করিয়া তোলে। আসল কথা বাধাকে অতিক্রম করার মধ্যেই শক্তি বৃদ্ধি। কুস্তী বা ব্যায়ামে আমরা যে ক্রমাগত বাধা ও ভারকে অতিক্রম ও উত্তোলন করিতে প্রয়াস করি তাহাতেই আমাদের দেহের পেশীগুলি সবল হয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বাধার বিরুদ্ধে এইরূপ আত্মপ্রয়োগে নিজেদের শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে।

আমাদের দেশে যাঁহারা জলাশয়ে মাছ পোষেন, তাঁহারা জানেন যে মাছগুলি যদি শুধু খাদ্য ও আরাম পায়, তাহা হইলে সেগুলি কিছুতেই বাড়ে না। তাই তাঁহারা এমন কতকগুলি শিকারী মাছও জলাশয়ে পালন করেন যাহা অন্য মাছকে গিলিয়া খাইতে না পারিলেও তাড়া করিয়া বেড়াইতে পারে। ইহাতে সাধারণ মাছগুলির যথেষ্ট শ্রম হওয়ায় শরীরের ও শক্তির বৃদ্ধি ঘটে। য়ুরোপ

ও আমেরিকার মৎস্য-ব্যবসায়ীরাও এই তত্ত্বটা জানেন। তাই তাঁহারাও ছোট রকমের শিকারী মাছ জলাশয়ে পালন করেন।

সংস্কৃতিগত জীবনেও এমন সব বাধা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকা প্রয়োজন যাহাতে সংস্কৃতিটির সম্পূর্ণ মৃত্যু না ঘটে অথচ যথোপযুক্ত উদ্যম ও শ্রমের প্রয়োজন হয়। সেরূপ বাধা ও দ্বন্দ্ব না থাকিলে সংস্কৃতির উন্নতি ও পরিপোষণ ঘটে না। জীবনের ধর্ম্মই এই, দ্বন্দ্ব ও উদ্যম বিনা জীবনী শক্তি ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসে।

—

ভারতের কারখানাসমূহ কোথায় বসিবে ?

গত ৩০শে জানুয়ারী পার্লেমেণ্টে যে প্রশ্নোত্তর হয়, তাহার রাজনৈতিক অংশ ও তাহার উপর কিছু মন্তব্য আগেকার কোন কোন পৃষ্ঠায় ছাপিয়াছি। সেদিন পণ্যশিল্প সম্বন্ধেও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ হইয়াছিল। তাহা নীচে দিলাম।

Sir George Schuster asked Mr. Amery whether, in view of the great expansion in the Indian manufacturing industry which was likely to take place during the war and the desirability of ensuring a location of industries in India, which would, as far as possible, avoid the creation of unwieldy urban concentrations and permit industrial workers continuing to live in rural areas, he would request the Government of India and the Provincial Governments to give special attention to the location of the new factories in consultation with unofficial Indian representatives. Mr. Amery replied that he would gladly ask the authorities in India to consider this important suggestion.

Sir Stanley Reed asked whether Mr. Amery did not agree that the rapid diffusion of electrical energy in the Madras area and western India generally offered a magnificent opportunity for the location of these new industrial populations under sub-tropical conditions. Mr. Amery entirely agreed.—*Reuter.*

কাঁচা মাল হইতে নানাবিধ পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত অনেক কারখানা যুদ্ধের ফলে স্থাপিত হইয়াছে ও হইবে। সেগুলি এরূপ স্থানে যাহাতে স্থাপিত হয় যে মজুর ও কারিগরেরা যেন গ্রাম-অঞ্চলেই থাকিয়া কাজ চালাইতে পারে, সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার নিমিত্ত ভারত-গবর্মেণ্টকে ও প্রাদেশিক গবর্মেণ্টগুলিকে ভারতসচিব অনুরোধ করিবেন কিনা, তাঁহাকে ইহাই জিজ্ঞাসা করা হয়। বিরাট কারখানার কর্মীদের জন্য বৃহৎ শিল্পনগর স্থাপন না করিয়া গ্রামে থাকিয়াই যাহাতে লোকেরা কাজ চালাইতে পারে, তাহারই জন্য এই আগ্রহ।

ভারতসচিব উত্তর দেন, তিনি সানন্দে ভারতবর্ষের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে এই গুরুত্বপূর্ণ দ্যোতনাটি বিবেচনা করিতে বলিবেন।

আর এক জন পার্লেমেণ্ট-সদস্য বলেন, যে, মান্দ্রাজে ও সাধারণতঃ পশ্চিমভারতে বৈদ্যুতিক শক্তি সর্বসাধারণের প্রাপ্য করিবার ব্যবস্থা বিস্তৃত ভূখণ্ডসমূহে দ্রুত করা হইতেছে, সুতরাং ঐ সকল স্থানের গ্রামসমূহে মজুর ও কারিগরদিগকে রাখিয়া পণ্য উৎপাদনের খুব সুবিধা হইবে, ভারতসচিব কি তাহা মনে করেন না? ভারতসচিব সম্পূর্ণ ঐকমত্য জ্ঞাপন করেন।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সরকারী ও বে-সরকারী ইংরেজরা মানবহিতৈষণার নামে এমন অনেক প্রস্তাব করেন, যাহার আসল উদ্দেশ্য ইংরেজদের স্বার্থসিদ্ধি এবং সুতরাং ভারতবর্ষের লোকদের স্বার্থহানি।

আমরা নিশ্চয়ই চাই যে, গ্রামের লোকেরা গ্রামেই থাকিয়া মজুরী ও কারিগরী দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। ইহা কুটীরশিল্পের আবশ্যক মত উন্নতি ও বিস্তৃতি দ্বারা হইতে পারে, কিম্বা জনবহুল কয়েকটি করিয়া গ্রাম বাছিয়া লইয়া তাহাদেরই মধ্যে বড় কারখানা স্থাপন করিয়া হইতে পারে। কিন্তু কোন ব্যবস্থাই খুব সোজা নয়।

ভারতবর্ষে এ-পর্য্যন্ত যত বড় বড় কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ ইংরেজদের। সেগুলার কাছে কুলিমজুর কারিগরের বড় বড় আড্ডা বস্তি আছে। পার্লেমেণ্টে যাহা চাওয়া হইয়াছে, তাহা ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু এই যেগুলা বিদ্যমান, সেগুলা কি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে? নিশ্চয়ই না। কেন না সেগুলা অধিকাংশই ইংরেজদের। ভবিষ্যতে যত কারখানা হইতে পারে, তাহার সবগুলা না হইলেও অনেকগুলা ভারতীয়েরা স্থাপন করিবে। তাহা যাহাতে সহজে স্থাপিত না হইতে পারে, পার্লেমেণ্টের আপাত-নিরীহ দ্যোতনাটার উদ্দেশ্য কি তাই?

এমনও হইতে পারে যে, ইংরেজরা ভারতবর্ষে বড় বড় কারখানা অনেক স্থাপন করিয়াছেন, এখন কুটীরশিল্পগুলাও হাত করিবার মতলব তাঁহাদের আছে; এই জন্য

ভারতবর্ষের শ্রমিকদের প্রতি প্রেম তাঁহাদিগকে প্রেরণা দিতেছে।

—

যুদ্ধান্তে 'ইয়োরোপে' নূতন জীবনধারা রাষ্ট্রব্যবস্থা সমাজব্যবস্থা

যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে মানুষের সমাজ, রাষ্ট্র, জীবন নূতন যে ধরণে গঠিত হইবে, তাহাকে হিটলার ও ব্রিটিশ জাতি উভয়েই নিউ অর্ডার বলিতেছেন। ব্রিটিশ জাতি কি চান, তাহা একাধিক ইংরেজ রাজপুরুষ বলিয়াছেন। তাহার একটা নমুনা নীচে দিতেছি। বার্তা-সরবরাহ বিভাগের পার্লেমেণ্টারি সেক্রেটরি (Parliamentary Secretary to the Ministry of Information) মিঃ হ্যারল্ড নিকলসন গত ২৮শে জানুয়ারী লণ্ডনে একটা বক্তৃতায় বলেন :

> The new order will be based on the liberation and not enslavement of Europe, and must have the will to defend its own community and the unselfish to combine with similarly-minded countries to make its defence effective.
>
> There will be no slave States but a community of free peoples each working out its problems in accordance with its temperament and traditions. It will be a union of peoples each ready to sacrifice something of its political and economic independence.—*Reuter.*

লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই যে ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা, ইহা ইয়োরোপের নিমিত্ত। বলা হইয়াছে, এই ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হইবে **ইয়োরোপের মুক্তির উপর**, ইয়োরোপের দাসত্বপাদনের উপর নহে। ইয়োরোপের লোকেরা পরস্পরের সহযোগিতা দ্বারা আত্মরক্ষা করিবে।

ইয়োরোপের মুক্তি সম্বন্ধে ব্রিটেনের এই যে সদাশয়তা, তাহার কারণ বুঝা সোজা। ইয়োরোপের কোন দেশ ইংরেজের মানব-গোশালা (human-cattle farm), ইংরেজের খামার, ও ইংরেজের বিরাট কারখানাসমষ্টি নহে। সুতরাং ইয়োরোপের মুক্তিতে ইংরেজের কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ, জার্মেনী যাহাদিগকে দাস করিয়াছে তাহাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিলে পুণ্যকর্মের আনন্দ আছে এবং তদতিরিক্ত আছে জার্মেনীকে কাবু করার সুখ।

বলা হইয়াছে, ইয়োরোপের কোন রাষ্ট্র দাস-রাষ্ট্র হইবে না থাকিবে না। সবাই স্বাধীন লোকদের সমষ্টি-রূপে আপন আপন ধাতু স্বভাবচরিত্র ও ঐতিহ্য অনুসারে আপন আপন সমস্যার সমাধান করিবে। তাহারা এমন একটি জাতি-সংঘ হইবে যাহার অন্তর্ভূত প্রত্যেক জাতি সংঘবদ্ধতার খাতিরে নিজেদের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কিঞ্চিৎ ত্যাগ করিতে রাজী হইবে।

এই সমস্ত ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্বাণী ইয়োরোপের নিমিত্ত, আফ্রিকা ও এশিয়ার জন্য নয়—ভারতবর্ষের জন্য ত নহেই।

যে-সকল জাতি আপন আপন রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা কিয়ৎপরিমাণে বলি দিয়া স্বাধীন জাতিসংঘে পরিণত হইতে পারে, ভারতবর্ষ বাস্তবিক তাহাদের মধ্যে একটা হইতে পারে না; কারণ কিঞ্চিৎ বলি দিবার মত তাহার রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কিছুই ত বাকী নাই—তাহার **সমস্ত** স্বাধীনতাই গিয়াছে। যাহার ওগুলার সবই বলিদান হইয়া গিয়াছে, সে কিঞ্চিৎ বলি কোথা হইতে দিবে?

—

যুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত কাহারা জিতিবে

হিটলারের আস্ফালন ও ব্রিটেনকে ভয় প্রদর্শন খুব চলিতেছে। ব্রিটেনের পক্ষেও বলা হইতেছে যে, ব্রিটেনেরই জয় হইবে। যাহারা ব্রিটিশ নহে, জার্ম্যানও নহে, তাহারা নিরপেক্ষ ভাবে বলিতে পারিত যুদ্ধ কাহাদের জয়ে কাহাদের পরাজয়ে শেষ হইবে যদি তাহা নিশ্চিত রূপে বলিবার উপায় থাকিত। কিন্তু সেরূপ কোন উপায় নাই। এ পর্য্যন্ত ব্রিটেন কিম্বা জার্মেনী কেহই কেবলই হারে নাই। ইটালী হারিতেছে বটে। কিন্তু জার্মেনী ত প্রথম প্রথম একাই লড়িতেছিল, ইটালী তখন যুদ্ধে নামে নাই। ইটালী যখন যুদ্ধে নামিল, তখনও জার্মেনী তাহার সাহায্য বিশেষ কিছু লয় নাই। সুতরাং ইটালীর ক্রমাগত পরাজয়ে জার্মেনীর পরাজয় সূচনা করে না।

জার্মেনী এরোপ্লেন-আক্রমণ দ্বারা ব্রিটেনের অনেক ক্ষতি করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহায় আত্মরক্ষার শক্তি ও সাহস এবং শত্রুকে আক্রমণ করিবার শক্তি ও সাহস

কমাইতে পারে নাই। টর্পেডো, মাইন এবং সাবমেরীন আক্রমণ দ্বারাও জার্মেনী ব্রিটেনের প্রভূত ক্ষতি করিলেও ব্রিটেনের বাণিজ্যতরী ও রণতরীর সমষ্টি এখনও অনতিক্রান্ত। হিটলার খুব আস্ফালন করিলেও ভবিষ্যতেও ব্রিটেনের সমুদ্রে প্রবল থাকিবারই সম্ভাবনা। কারণ, নূতন নূতন ব্রিটিশ জাহাজ নির্মিত হইতেছে এবং আমেরিকা ব্রিটেনের সহায় আছে।

জার্মেনী ইয়োরোপে ৬।৭টা দেশের মালিক হইয়া তাহাদের সম্পদের অধিকারী হওয়ায় তাহার সুবিধা হইয়াছে বটে। কিন্তু ইংলণ্ডের আছে ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ এবং আফ্রিকায় ইটালীর সাম্রাজ্য তাহার হস্তগত হইতেছে।

মোটের উপর আমাদের অনুমান ব্রিটেনই জিতিবে। জার্মেনীর জয় অপেক্ষা ব্রিটেনের জয়েই মানবজাতির কল্যাণ অধিকতর হইবে।

—

যুদ্ধান্তে ভারতবর্ষের কি হইবে?

যুদ্ধান্তে ভারতবর্ষের কি সুবিধা অসুবিধা হইবে, সে বিষয়ে আমাদের যাহা অনুমান তাহা আগে বলিয়াছি। আবার বলিতেছি।

যুদ্ধ চলিতে চলিতে যদি ভারতবর্ষ অহিংস কোন প্রকার চাপ দিয়া ব্রিটেনের নিকট হইতে ডোমীনিয়ন স্টেটস্ অর্থাৎ স্বরাষ্ট্রিক পূর্ণ স্বশাসন ক্ষমতা আদায় করিতে পারে, কিম্বা তাহার প্রতিশ্রুতি **পার্লেমেণ্টের নিকট হইতে** আদায় করিতে পারে, তাহা হইলে যুদ্ধান্তে তাহার রাজনৈতিক অবস্থা উন্নততর হইবে; নতুবা নহে। পার্লেমেণ্টের প্রতিশ্রুতির কথা বলিয়াছি এই জন্ম যে, পার্লেমেণ্টের ক্ষমতাই চূড়ান্ত এবং অন্ত কাহারও প্রতিশ্রুতি মানিতে পার্লেমেণ্ট বাধ্য নহে।

যুদ্ধে জয় না-হওয়া পর্য্যন্ত ব্রিটেন ভারতবর্ষের দাবী-দাওয়া সম্বন্ধে যদি বা কিছু বিবেচনা করে, যুদ্ধ জিতিবার পর তাহা করিবে না; কারণ তখন সে বেপরোয়া হইবে। অতএব স্বরাজের নিমিত্ত যত কিছু অহিংস উপায় অবলম্বন তাহা এখনই করিতে হইবে।

যুদ্ধে ইংলণ্ডের ব্যয় ও ঋণ কল্পনার অতীত রকম হইতেছে। ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক সম্পদ এখন এত বেশি নাই যাহাকে ধনে পরিণত করিয়া ইহা শোধ করা যায়। তাহাকে ধন আহরণ করিতে হইবে তাহার সাম্রাজ্য হইতে—অর্থাৎ প্রধানতঃ ভারতবর্ষ হইতে। সুতরাং যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে ইংরেজদের কারখানা ও বাণিজ্য যাহাতে ক্রমবর্ধমান ও নিরঙ্কুশ ভাবে চলে, তাহার নিমিত্ত পূরা রাজনৈতিক ক্ষমতা তাহার হাতে থাকা চাই। অতএব, ভারতীয়দের এখনই যতটা সম্ভব ভারতীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্র ও পণ্যশিল্পের ক্ষেত্র দখল করা উচিত। ইহা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।

ভারতে পূরা রাজনৈতিক ক্ষমতা ইংরেজদের নিজের হাতে রাখিতে হইলে ভারতীয়দের অহিংস স্বরাজসংগ্রাম চালাইবার সুযোগ ও ক্ষমতা যুদ্ধের পর আইন দ্বারা কমান আবশ্যক হইবে। অতএব বর্ত্তমান সমুদয় সুযোগ ও ক্ষমতার অহিংস ব্যবহার এখনই পূর্ণমাত্রায় করা উচিত।

—

ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ও পরিচালনায় ব্যক্তিগত সত্যগ্রহ চলিতেছে। কংগ্রেসের অনেক শত পুরুষ ও মহিলা সভ্য কারাবরণ করিয়াছেন এবং আরও অনেকে তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। এই সত্যগ্রহ আরম্ভ হইবার সময়ে মহাত্মাজী যেরূপ বলিয়াছিলেন, এখনও সেইরূপ বলিতেছেন যে, তিনি ইচ্ছা করেন না যে, ইহা গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সত্যাগ্রহ করিয়া জেলে যাওয়াই দেশসেবার একমাত্র পন্থা নহে; কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজ করাও দেশসেবা।

—

শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু

শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর অকাল মৃত্যুতে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তিনি ছাত্র থাকিতে থাকিতেই জলন্ত উৎসাহের সহিত দেশের কাজ করিতে প্রবৃত্ত হন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে এবং স্বদেশী প্রচেষ্টায়, এণ্টি-সার্কুলার সোসাইটির সভ্যরূপে, তিনি এক জন প্রধান

কর্ম্মী ছিলেন। তাঁহার বাগ্মিতা মানুষকে মাতাইয়া তুলিত। সেকালে এমন মানুষকে গবর্ন্মেণ্ট স্বভাবতই জেলের বাহিরে রাখিতে চান নাই। তাই কৃষ্ণকুমার মিত্র অশ্বিনীকুমার দত্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রভৃতির মত তিনিও নির্বাসিত হইয়াছিলেন। তিনি ভারতসভার সহকারী সম্পাদক ভারতীয় সাংবাদিক সভার ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট ও নারীরক্ষা-সমিতি, নারীকল্যাণ-আশ্রম প্রভৃতির অন্যতম প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। তিনি "ব্যবসা ও বাণিজ্য" নামক মাসিক কাগজের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক ছিলেন। দেশের লোকেরা যাহাতে অধিক পরিমাণে শিল্পকার্য্যে ও বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয়, সে-বিষয়ে তিনি চেষ্টিত ও উৎসাহী ছিলেন।

—

সেন্সস

সেন্সসে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই যাহাতে নির্ভুল শুমারি হয়, নিজ নিজ সুযোগ ও শক্তি অনুসারে সাবালক প্রত্যেকেরই তাহা করা উচিত।

—

বঙ্গের বাহিরে বাঙালীদের গণনা

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি সর্ লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গের বাহিরের সমুদয় বাঙালীকে, তাঁহারা সেন্সসের গণনাকারীদের প্রশ্নের উত্তর যে ভাষাতেই দিন্ না কেন, তাঁহাদের মাতৃভাষা যে বাংলা তাহা স্পষ্ট করিয়া জানাইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। মধ্যপ্রদেশের ও যুক্তপ্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে "বাঙ্গালী" (Bangali) নামক একটি অবাঙালী উপজাতি আছে। এই Bangali ও Bengali যাহাতে এক বলিয়া ভ্রম না হয়, সেই জন্যও বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের মাতৃভাষাটি স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক।

—

হিন্দুমহাসভার আন্দোলন

বঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সর্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি হিন্দু নেতারা যে আন্দোলন চালাইতেছেন, হিন্দু-সমাজকে দুর্ব্বলতা ও ক্ষতি হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহা একান্ত আবশ্যক। মুসলমান সমাজের কোনও অনিষ্ট করা ইহার উদ্দেশ্য নহে।

প্রত্যেক হিন্দু জা'তের মানুষের মনুষ্যোচিত মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিবার ও রাখিবার দিকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখিলে হিন্দু-সমাজ শক্তিশালী হইতে পারিবে। নতুবা তাহা হইবে না।

—

চীন জাপান

চীন ক্রমশঃ প্রবল ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ইহা চীনের, এশিয়ার ও পৃথিবীর পক্ষে কল্যাণকর। জাপানের পক্ষেও বটে।

—

আবিসীনিয়ার স্বাধীনতা

আবিসীনিয়ার সম্রাট স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন এবং তাহার অনেক অংশে ইটালীর আর প্রভুত্ব নাই। সমগ্র দেশটি স্বাধীন হইলে ও অন্য কোন জাতির হস্তগত না হইলে সন্তোষের বিষয় হইবে।

—

বঙ্গীয় উন্মাদ-আশ্রম

বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রম প্রথমে লিলুয়ায় (হাওড়া) স্থাপিত হয়। ইহার উদ্বোধন করেন মাননীয়া শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা। তথায় কয়েক বৎসর থাকিবার পর উক্ত আশ্রম সম্প্রতি দমদমে (ঈষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের গোয়ালন্দ ও খুলনা লাইনের সংযোগস্থলে) স্থানান্তরিত হইয়াছে। স্থানান্তরের পূর্ব্বে হাসপাতালে মহিলা বিভাগ ছিল। স্থানান্তরের পর উক্ত বিভাগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়। সম্প্রতি পুনরায় উহা খোলা হইয়াছে। মহিলা বিভাগে ২৪টি বেড আছে এবং আরও ১০টি বেড বৃদ্ধি করার জন্য গৃহনির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। মহিলা বিভাগটি পুরুষ বিভাগ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক-ভাবে রাখা হইয়াছে এবং এই বিভাগের রোগিণীদের সর্ব্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের যথোচিত চেষ্টা করা হইতেছে। হাসপাতালের উন্নতিকল্পে হাসপাতাল সংলগ্ন প্রায় ৫০ বিঘা জমি লওয়া হইয়াছে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কবিরাজ শ্রীঅতুলবিহারী দত্ত।

—

তুরস্কের রূপান্তর

শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক

তুরস্কের জাতীয় জীবনে আজ একটি চরম পরীক্ষার দিন উপস্থিত। ইতালো-গ্রীক যুদ্ধের প্রারম্ভে ইউরোপের মহাসমর যে-দিন তুরস্কের প্রান্তদেশে আসিয়া উপনীত হইল, তখন তাহার জাতীয় প্রাণে একটি গভীর আতঙ্কের ছায়াপাত হইয়াছিল। কিছু দিন পরে যখন মলোটভ মিশন জর্ম্মন্ রাজধানীতে পদার্পণ করিল, আঙ্কারার সরকারী মহলে একটি ক্ষুব্ধ নৈরাশ্যের তরঙ্গ বহিয়া গেল। জার্ম্মেনী ও রুশিয়ার মধ্যে তুরস্কের জাতীয় পরিণতি সম্বন্ধে কোন গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল না ত? ইহারই অনুসন্ধানের জন্য তুর্কী-পররাষ্ট্রসচিব মস্কৌতে ছুটিল। সৌভাগ্যবশতঃ গ্রীকসেনার অদ্ভুত সমর-কৌশল এবং অপ্রত্যাশিত সাফল্যের জন্য তুরস্কের আতঙ্ক এবং নৈরাশ্য হয়ত সাময়িক ভাবে কিছু লাঘব হইয়া থাকিবে, কিন্তু বলকান জনপদের গুপ্ত গহ্বরে যে চতুর ষড়যন্ত্রের জাল রচনা হইতেছে, তুরস্ক তাহার প্রতি উদাসীন থাকিতে পারে কি না সেই সম্বন্ধে তুর্কী রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে কোন মতদ্বৈধ নাই। যে-সাম্রাজ্যবাদী সমরে এশিয়া এবং আফ্রিকা জড়িত, সেখানে তুরস্কের ভৌগোলিক অবস্থিতির মূল্য কত বেশী, তাহা সহজেই অনুমেয়। পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরে তুরস্কের বন্ধুত্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে যেমন সাহায্য করিতে পারে, তুরস্কের বিরুদ্ধতা উত্তর-আফ্রিকা, সুয়েজ এবং প্যালেস্টাইনে ইংরেজকে ততখানি বিব্রতও করিতে পারে। অন্য দিকে শত্রুপক্ষ যদি তুরস্ক অধিকার করে তবে এশিয়ার পশ্চিম সীমান্তের বিভিন্ন জনপদে ইংরেজের সামরিক সমস্যা

তুর্কী জাতীয়তার প্রতীক কামাল আতাতুর্ক

তুর্কী আধুনিকা—হাসপাতালে নার্সের কাজ করিয়া থাকে

আজ তুরস্কের জাতীয় জীবনে কামাল পাশার নেতৃত্বের অভাব সহজেই অনুভূত হওয়া স্বাভাবিক। অনেকের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইবে যে কামাল পাশা আজ বাঁচিয়া থাকিলে বর্ত্তমান মহাসমরে তিনি কি পদ্ধতি অবলম্বন করিতেন। এই প্রশ্নের জবাব পাইতে হইলে তুরস্কের আধুনিক সমগ্র রূপান্তরের আসল বৈশিষ্ট্যটিকে বোঝা দরকার। কামাল তুরস্ককে যে সমগ্র ভাবে আধুনিক রূপ দান করিয়াছিলেন তাহার পশ্চাতে ছিল তাঁহার জাতীয়তাবাদী আদর্শ। তুরস্কের রূপান্তরের পিছনে রহিয়াছে আধুনিক পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের চিন্তা এবং কর্ম্মকৌশল। কামাল পাশা ব্যক্তিগত ভাবে হয়ত খানিকটা স্বৈরাচারী ছিলেন, কিংবা তাঁহার উদারপন্থী জাতীয় সংস্কারের সফলতার জন্য নিজের হাতে প্রচুর ক্ষমতা ধারণ করিবার হয়ত আবশ্যক ছিল, কিন্তু কামাল পাশা আধুনিক তুরস্কের যে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর গোড়াপত্তন করিয়া তাহাকে একটি বিরাট সৌধে পরিণত করিয়া গিয়াছেন তাহাতে স্বৈরাচারী কিংবা প্রভুত্ববিলাসী নেতৃত্বের স্থান নাই। তুর্কী নরনারী ইচ্ছামত তাহাদের রাষ্ট্রনায়ক নির্ব্বাচন করিতে পারে। যে কোন জাতীয় পদ্ধতিতে কিংবা ব্যবস্থায় তুর্কী জনসাধারণের অনুমতি প্রয়োজন। যৌবনে কামাল পাশা যখন আবদুল হামিদের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন তখনও তাঁহার আদর্শ ছিল জাতীয় স্বাধীনতার উদ্ধার করা। কামাল পাশার মতে তুরস্কের সুলতানগণ জনসাধারণের স্বাধীনতা হরণ করিয়া দেশের ব্যাপক স্বার্থ ভুলিয়া গিয়া ক্ষমতা-বিলাসী ব্যক্তিগত প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। দেশের

বাড়িবে ছাড়া কমিবে না। কিন্তু তুরস্কের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী প্রতিবেশী সোভিয়েট রুশিয়ার স্বার্থ তুর্কী স্বাধীনতার সঙ্গে বিশেষ অন্তরঙ্গ ভাবে জড়িত। কাজেই দেখা যাইতেছে তুর্কীদের নিরপেক্ষতার পিছনে দুইটি বৃহৎ শক্তির সতর্ক দৃষ্টি সর্ব্বদাই নিবদ্ধ রহিয়াছে। বলকানের ষড়যন্ত্র যতই রহস্যময় হইয়া উঠুক, এই দুইটি শক্তির বিপরীত স্বার্থের সমন্বয় রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলে তুর্কী নরনারী তাহাদের জাতীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে এই ভরসা করা যাইতে পারে।
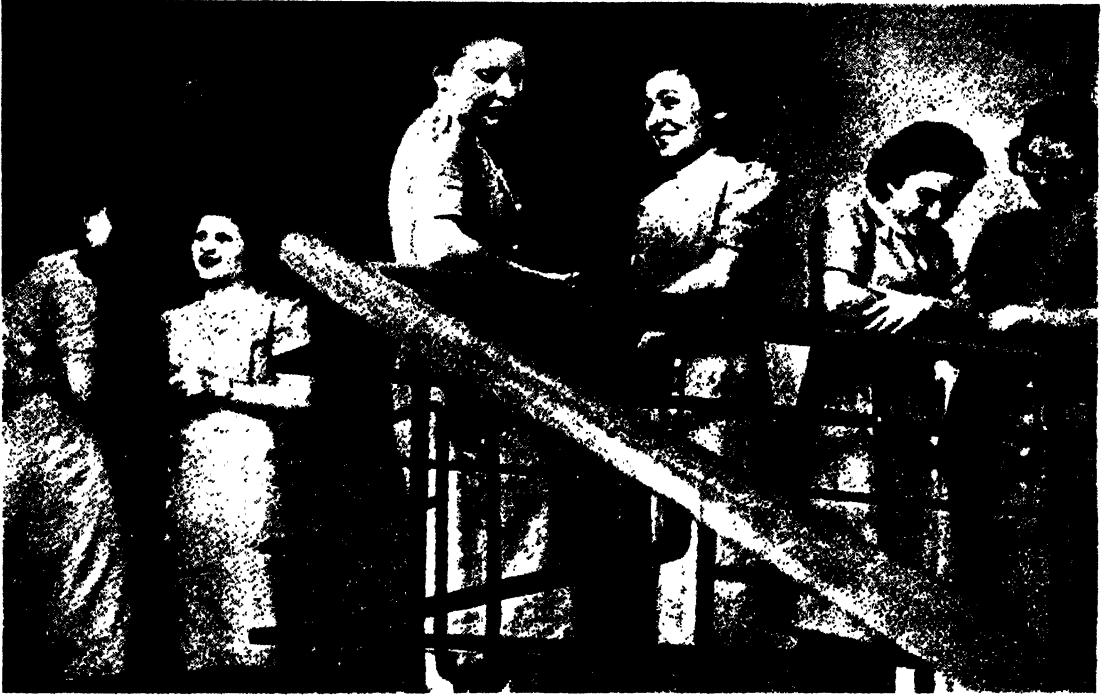
আধুনিক তুর্কী নারী পর্দ্দার অন্তরাল পরিত্যাগ করিয়া সমাজসেবার শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে   একটি নার্সিং স্কুলের দৃশ্য

ইস্তাম্বুল বন্দরের একটি দৃশ্য
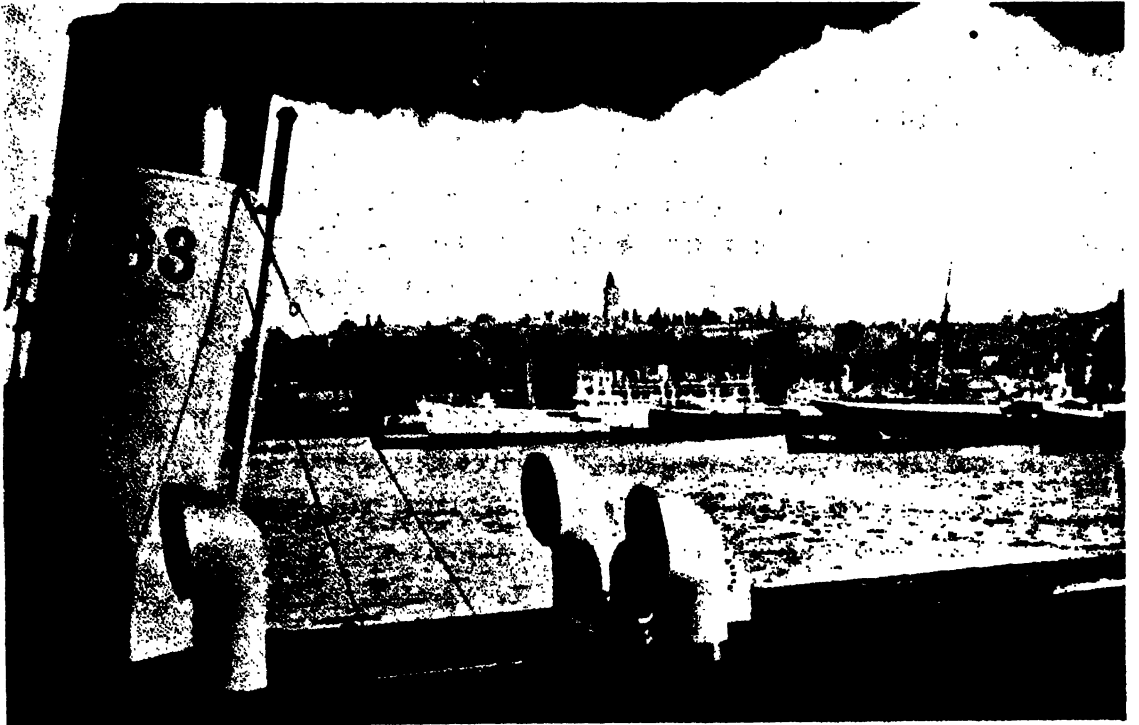
চাষী এবং খবরের-কাগজ-ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশে আধুনিক তুর্কী গোয়েন্দা পুলিস

রাজনৈতিক কিংবা আর্থিক ব্যবস্থায় জনসাধারণের কোন মতামতের অধিকার ছিল না, সামাজিক ব্যবস্থায় তুর্কী নরনারীর কোন হাত ছিল না। এই ভাবে জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়া তুর্কী সুলতানগণ বিদেশী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া, বিদেশী বাণিজ্য বিস্তারের সহায়তা করিয়া নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখিত। সেই জন্য প্রয়োজন হইলে প্রজাদিগকে অতিমাত্রায় শাসন করিতেও তাহারা পশ্চাৎপদ হইত না। মুসলমান ধর্ম্মের অন্যতম প্রধান নায়ক খলিফার পীঠস্থান ছিল ইস্তাম্বুলে। খলিফার কারবার ছিল সমস্ত দেশের মুসলমান সম্প্রদায়গুলিকে লইয়া, কাজেই কেবলমাত্র তুর্কী জাতীয় স্বার্থের: দিকে নজর দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুলতান এবং খলিফার সম্মিলনে তুরস্ক খুব বেশী মাত্রায় বিদেশী প্রভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কামাল পাশা সেই জন্য তুরস্কের জাতীয় অভ্যুত্থানের পথে এই দুইটি প্রধান বিঘ্নকে একে একে অপসারিত করিলেন। যে-সমস্ত কুসংস্কার তুরস্কের সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া আচ্ছন্ন করিয়া মুক্তির পথ, উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, কামাল একে একে সেইগুলিকে আক্রমণ করিলেন এবং জনসাধারণের সাহায্যে বিদূরিত করিলেন। সুলতানের সিংহাসন এবং খলিফার তক্তপোষের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের অবগুণ্ঠন আর ছেলেদের ফেজ চিরকালের জন্য তুরস্ক হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। ইস্কুলে কলেজে কোরাণের চেয়ে আধুনিক বিজ্ঞান এবং দর্শনের চর্চ্চার উপর জোর পড়িল বেশী। চিক্-দেওয়া জানালার অন্তরাল এবং ঘোমটার অবরোধ অতিক্রম করিয়া মেয়েরা উপস্থিত হইল ছেলেদের সমকক্ষ হিসাবে দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার বিভিন্ন কেন্দ্রে--বিদ্যালয়ে, খেলার মাঠে, হাসপাতালে, সমাজসেবার আড্ডাগুলিতে। তুরস্কের নারীজাতি আজ আচার-ব্যবহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে ইউরোপের আধুনিক দেশগুলির মেয়েদের সমকক্ষ হইয়া দেখা দিয়াছে। মেয়েরা ঘাঘরা ছাড়িয়া স্কার্ট ধরিয়াছে। ছেলেরা ফেজ ফেলিয়া হ্যাট পরিয়াছে। কেউ কেউ বলেন যে মাটিতে কপাল ঠেকাইয়া নমাজ পড়িবার প্রথাটাকে কামাল পাশা পছন্দ

আনাতলিয়ায় জলপ্রপাত

পামুকালেতে উষ্ণ-প্রস্রবণ
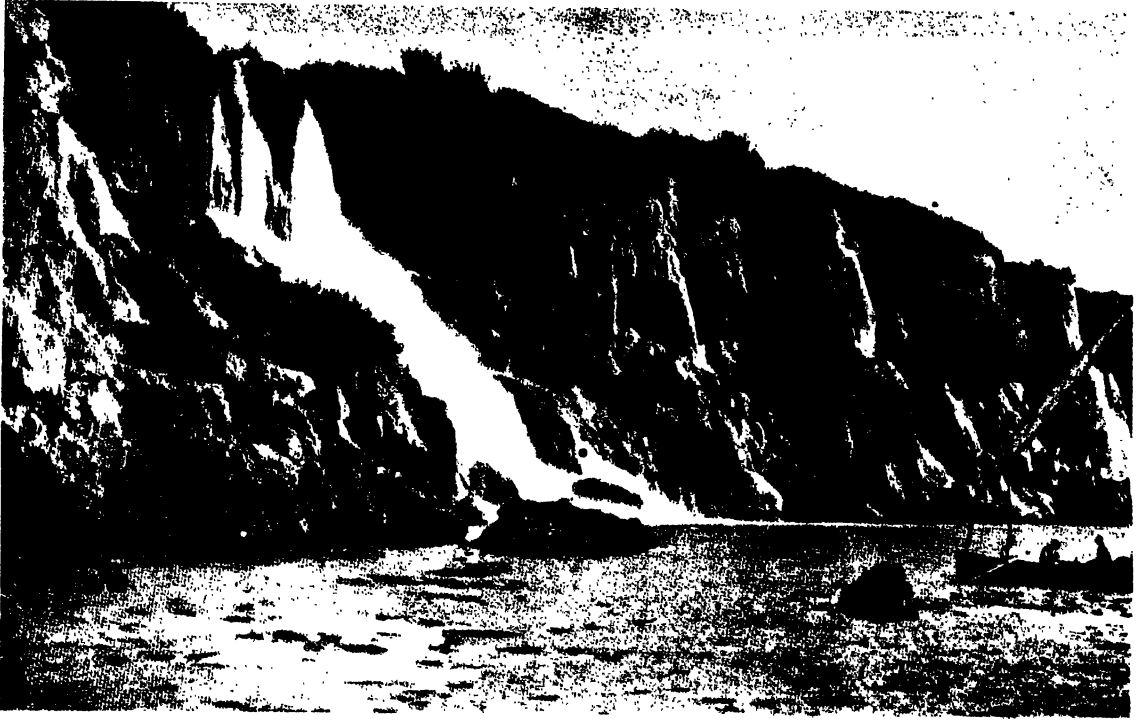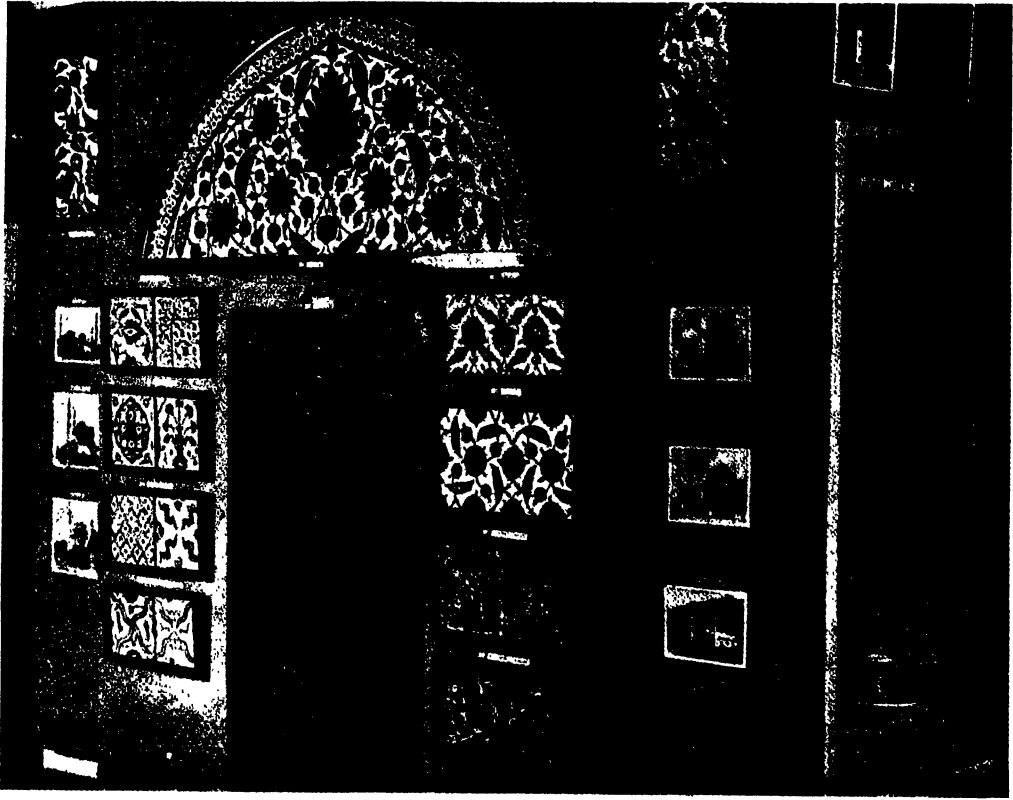
ইস্তাম্বুলের জাতীয় প্রদর্শনীতে ষোড়শ শতাব্দীর তুর্কী শিল্পের নিদর্শন

করিতেন না বলিয়া ফেজ-এর স্থানে হ্যাট-এর প্রচলন করাইলেন, কারণ হ্যাট পরিয়া ঐ ধরণের নমাজ-পড়া হাস্যকর ব্যাপার। কিন্তু কামালের উদ্দেশ্য হয়ত আরও গভীর জাতীয়তার আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। তুর্কী রাজ্যের অধীনে অনেক অ-মুসলমান প্রজা বাস করিত। তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল গ্রীক খ্রীষ্টিয়ান। উহারাই তুরস্কের শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়াছিল। ইহাদের সঙ্গে তুর্কী মুসলমান অধিবাসীদের সঙ্গে ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন বিরোধের সৃষ্টি না হয়, তুর্কী জাতীয়তার একত্ব একটি সাম্প্রদায়িক কারণে লাঞ্ছিত না হয়, হয়ত কামাল সেই জন্যই ফেজের তিরোধানের আদেশ দিয়াছিলেন। বিগত মহাযুদ্ধের পরে তুরস্ক এবং গ্রীসের মধ্যে পরস্পর যে লোকসংখ্যা বিনিময় হয় তাহাতে বেশীর ভাগ অ-মুসলমান তুর্কী প্রজা গ্রীসের চতুঃসীমানার মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছে এবং এই হিসাবে তুরস্কের জাতীয় ঐক্য-সাধনার সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু গ্রীক-সম্প্রদায় তুরস্ক হইতে চলিয়া যাওয়ার পর তুর্কী ব্যবসা-বাণিজ্যে কিছু কালের জন্য মন্দা আসিয়াছিল। তুর্কীরা কোনকালেই ব্যবসা-বাণিজ্যে তেমন উন্নত ছিল না। মধ্য-এশিয়ার যে বিশেষ সম্প্রদায়টির বংশধর ইহারা, কৃষিকার্য্যে এবং রণক্ষেত্রে তাহাদের দক্ষতা যতটা ছিল ততটা আর কোন বিষয়ে ছিল না। মধ্যযুগে ইউরোপে এবং এশিয়ায় যে বিরাট অটোম্যান সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার প্রতিষ্ঠায় সুলতান-অধিকৃত খ্রীষ্টিয়ান প্রজাদের সন্তান-সন্ততির দান অকিঞ্চিৎকর ছিল না। এই "জ্যানিসারি"র দল যে-সব যুদ্ধক্ষেত্রে যোগদান করিয়াছে তাহাতে তুর্কীর জয় একরূপ অবশ্যম্ভাবী ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সমস্ত বলকান জনপদ এক দিন তুর্কী সাম্রাজ্যের

পল্লী-দৃশ্য
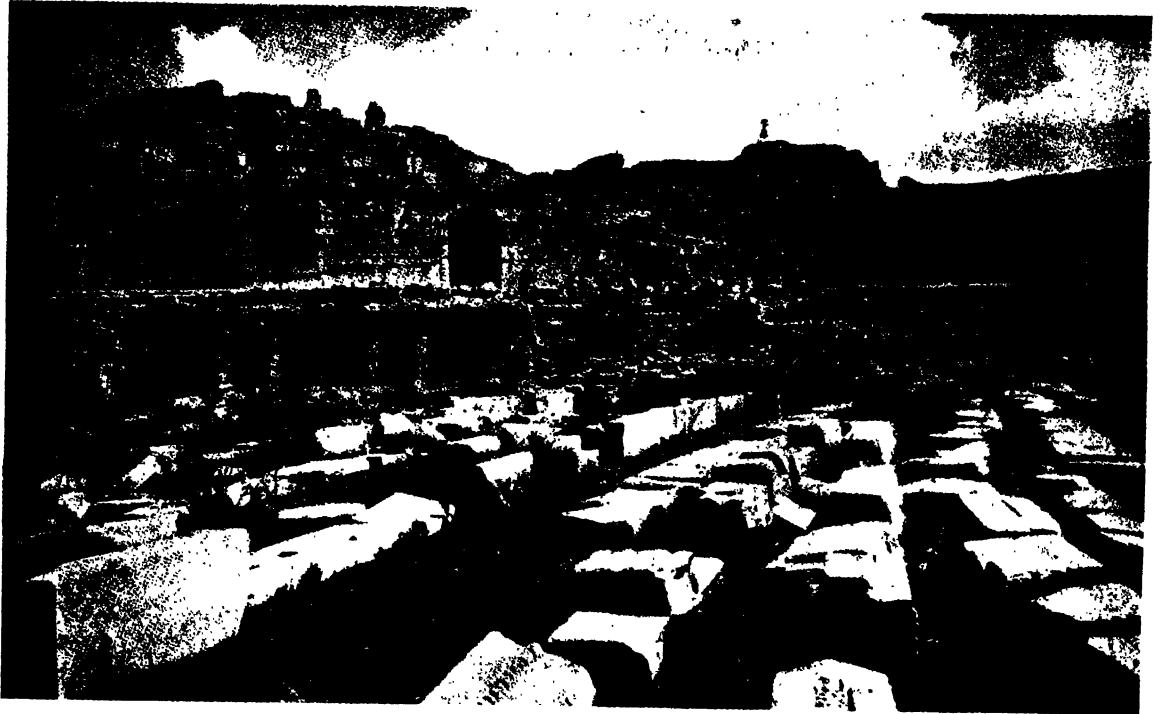
সোকে-তে ঐতিহাসিক ভগ্নাবশেষ
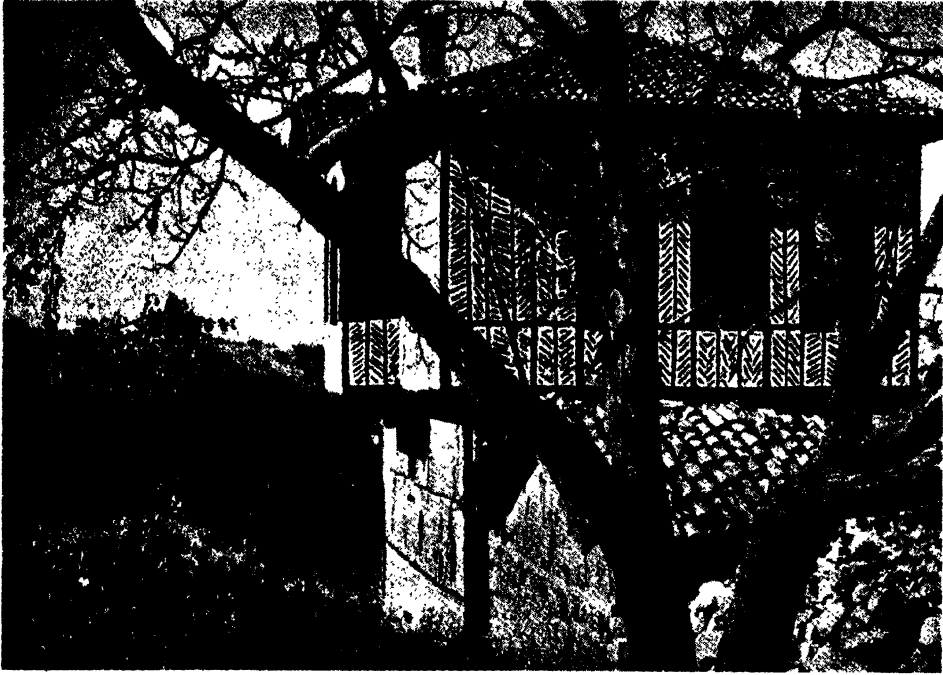
আঙ্কারার নিকটবর্ত্তী আধুনিক তুর্কী বাসগৃহ

অন্তর্গত ছিল। সুলতানের বিজয়-অভিযান ভিয়েনা বুডাপেষ্টের সিংহদ্বারে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল। একাধিক শতাব্দী ধরিয়া ইতিহাস প্রসিদ্ধ গ্রীস তুরস্কের শাসনাধীন ছিল। কিন্তু সর্ব্বত্রই তুরস্ককে ক্রমশঃ পরাজিত হইয়া আপন ঘরে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। তাহার কারণ, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের পিছনে তুর্কীর বিরুদ্ধে সমগ্র খ্রীষ্টিয়ান রাজ্যগুলির ধর্ম্মগত এবং জাতিগত ঘৃণা ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গ্রীসের সঙ্গে তুরস্কের যুদ্ধ অনেকটা দ্বিতীয় ক্রুসেডের আকার ধারণ করিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তুরস্কের রাজনৈতিক অবনতির যে অন্যতম কারণ ছিল, ইসলাম ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকতা তাহা কামাল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কোন রাষ্ট্র যদি একটি বিশিষ্ট ধর্ম্মের প্রচার করে তবে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী রাষ্ট্রগুলি তাহাকে সন্দেহের চোখে দেখিবে ইহা বুঝিয়াই কামাল তুরস্কের রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ধর্ম্মের অনুশাসন হইতে মুক্ত করিলেন। তিনি ব্যক্তিগত ধর্ম্মবিশ্বাসে কোন হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু রাষ্ট্রের একটা ধর্ম্ম থাকিবে ইহা তাঁহার কাছে অসঙ্গত মনে হইল। ধর্ম্মের যোগ বিবেকের সঙ্গে, রাষ্ট্রের ত কোন বিবেক নাই। বিবেক আছে ব্যক্তির। কাজেই নব্য তুর্কীর কোন রাষ্ট্র-ধর্ম্ম থাকিবে না ইহাই কামাল সিদ্ধান্ত করিলেন। অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিল এই আইন প্রবর্ত্তনের ফলে জাতীয়তাবাদী তুর্কী এমন আঘাত পাইবে যে কামালের নেতৃত্ব বজায় থাকিবে না। কিন্তু কামালের আদর্শ দেশ গ্রহণ করিল। সুলতানের স্বৈরাচার এবং খলিফার প্রভুত্ব তুরস্ক হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নব্য তুর্কী যে সংস্কার সাধনায় প্রবৃত্ত হইল, তাহার প্রতিবাদ আসিল জাতীয়তাবাদী নব্য ভারতের পক্ষ হইতে। তুরস্কের জাতীয়তার আদর্শনিষ্ঠ সংস্কারের

ইস্তাম্বুল হইতে ষাট মাইল দক্ষিণে বসুরাতে আমির-সুলতান মসজিদ

তুরস্কের পার্ব্বত্য অঞ্চলে পল্লীগৃহ

চাষীর ঘর
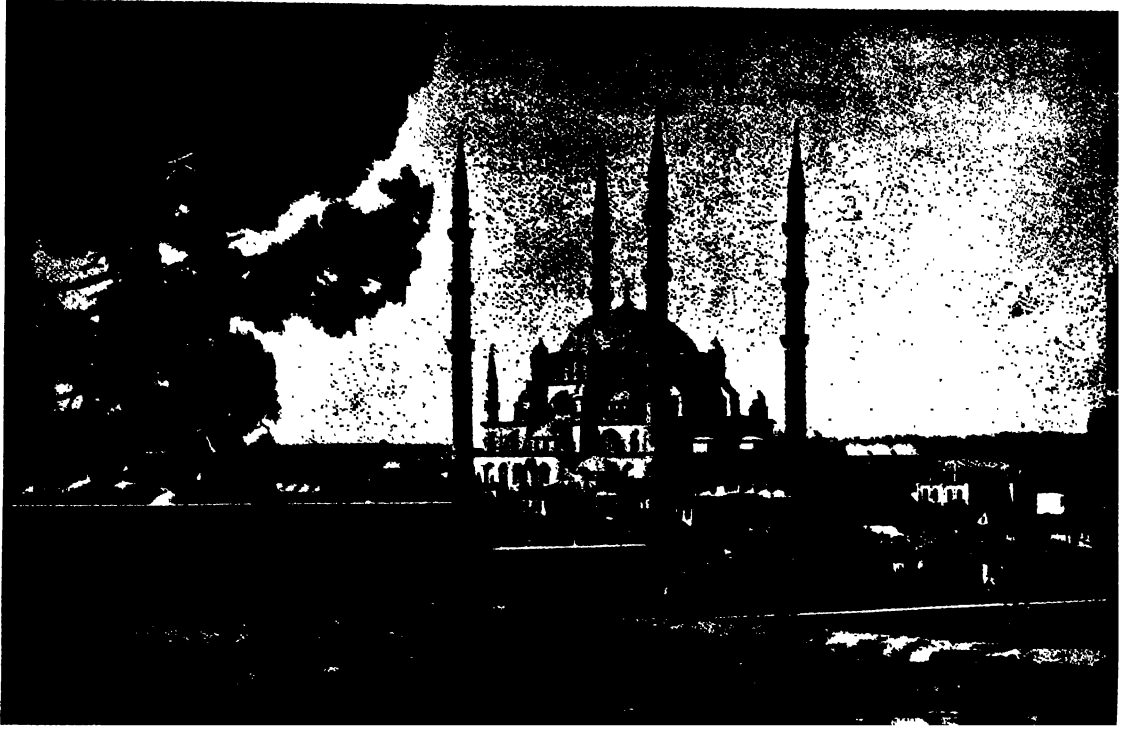
এদিনে-তে সোলিমিয় মস্‌জিদ

তুরস্কে গ্রীক স্মৃতি—মিলাস্‌-এ স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ

আনাতলিয়ার পল্লীদৃশ্য

একটি আধুনিক পুল

বিরুদ্ধে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় যে খেলাফৎ-আন্দোলন সুরু করিল ভারতের কংগ্রেস-আন্দোলন তাহার সমর্থন করিয়া ভারতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের পথ প্রতিষ্ঠা করিবে মনে করিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কামাল তাহার রাজনৈতিক কূটবুদ্ধি এবং সামরিক অভিজ্ঞতা দ্বারা ভবিষ্যৎ তুর্কীর যে জাতীয় মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন ভারতবর্ষের জাতীয় নেতারা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। এশিয়ান্ জাতীয়তার গৌরব নব্য তুর্কীকে পরাধীনতা-লাঞ্ছিত ভারতের জাতীয়তা অস্বীকার করিল, বিদ্রূপ করিল। তুরস্কের জাতীয় রূপান্তরের এই গূঢ় তথ্যটি অসহযোগ আন্দোলনের নেতারা ধরিতে পারিলেন না।

তুর্কী তরুণীগণ কারখানায় কাজ করিতেছে

তুরস্কের জাতীয় রূপান্তরের আরও কয়েকটি বিশিষ্ট দিক আছে। মুসলমান সমাজে যে বহুবিবাহের প্রচলন আছে তাহা ধর্ম্মসম্মত, আইনসম্মত। কিন্তু কামাল পাশা এই বহুবিবাহ-প্রথার নিরোধ করিলেন। কোরাণ তুর্কী ভাষায় অনূদিত হইল; রোমান্ অক্ষরে তুর্কী ভাষা লিখিত হইল; জাতীয়-শিক্ষা ধর্ম্মের প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইল; জনসাধারণের ছেলে-মেয়ে একই বিদ্যালয়ে একসঙ্গে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতে আরম্ভ করিল, এবং তুর্কী সমাজে ইউরোপীয় আইন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হইল। ফলে তুরস্কের চেহারা বদলাইয়া গেল, একটি পঙ্গু দাম্ভিক সুলতান-ক্লিষ্ট অর্দ্ধ-বর্ব্বর রাজ্য হইতে তুরস্ক একটি অতি-আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হইল। তুরস্ক আজ মিশর এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য ইসলামধর্ম্মী দেশগুলিকে জাতীয়তার উৎকর্ষে, আর্থিক অবস্থায় এবং সামাজিক ব্যবস্থায় অনেক দূর অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

অন্যান্য দেশের মত তুরস্কের ইতিহাসেও দেখা গিয়াছে যে রাষ্ট্রীয় জাতীয় আন্দোলনের প্রাণ একটি পূর্ব্ববর্তী সাহিত্যিক আন্দোলন দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। যেমন বোহেমিয়ায়, ইতালিতে, গ্রীসে এবং ভারতবর্ষে, তেমনি তুরস্কেও জাতীয় আন্দোলনের প্রারম্ভে সাহিত্যে জাতীয়তাবাদ বিশেষভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আসলে তুর্কী জাতীয়তার জন্মদাতা ছিলেন জিয়া গক্ আলপ্ (Ziya Gok Alp, 1875-1925)—গাজী মুস্তাফা কামাল নহে। ইনি এবং ইঁহার সহকর্ম্মিগণ তুর্কী ভাষাকে সহজপাঠ্য করিয়া সাধারণের নিকট পরিবেশন করিলেন এবং সংবাদপত্রের মারফতে স্বদেশী প্রচার সুরু করিলেন। দেখিতে দেখিতে জনসাধারণের মধ্যে একটি জাতীয় ভাব এবং প্রেরণা জাগিয়া উঠিল,

আধুনিক তুর্কী কিশোরী

এবং ক্রমশঃ তাহারা প্রতিবেশীদের সঙ্গে একটি একক স্বার্থের বন্ধন অনুভব করিতে লাগিল। এই প্রচারের ফলে ১৯০৮ সালে তুরস্কে প্রথম জাতীয়তাবাদী প্রজা-বিদ্রোহ হইল। তুরস্কের শিক্ষিত সমাজ পিছন ফিরিয়া তাকাইল, তাহাদের অনুন্নত সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ কায়েম করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। এই জাতীয় সাহিত্যিক আন্দোলনে যাঁহারা পৌরোহিত্য করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ-যোগ্য: আলি জানিব, ওমর সাইফেদ্দিন এবং মহম্মদ এমিন। ইহাদেরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ইস্তাম্বুলে প্রতিষ্ঠিত "তুর্ক দেনে'ই" সভা এবং সালনিকায় প্রতিষ্ঠিত "জেনি লিসান্‌জিলর" সভা সাধারণ্যের মধ্যে আধুনিক চলতি ভাষার প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল।

আধুনিক তুরস্কের জাতীয় শিক্ষা-পদ্ধতিতে সাম্যবাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ে কোন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ভেদাভেদের ধারণা প্রবেশ না করে সেই জন্য কর্ত্তৃপক্ষ সর্ব্বদাই যত্নবান। ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক অবস্থা পরস্পরের মধ্যে অজ্ঞাত থাকে; শুধু ছাত্রছাত্রীগণ এবং কর্ত্তৃপক্ষ ছাড়া আর কোন তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে তাহা জানা সম্ভবই নহে। পরীক্ষার ফলাফলও শুধু অভিভাবকদের জানান হয়; ক্লাসে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি স্থান কাহারা অধিকার করিল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তাহা অজ্ঞাত থাকে।

রাষ্ট্রিক এবং সামাজিক ব্যাপারে তুরস্কের জাতীয় জীবনের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহার আর্থিক অবস্থা এখনও খুব সমৃদ্ধিশালী হইতে পারে নাই। আইনের সাহায্যে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সংস্কারসাধন করা যত সহজসাধ্য, আর্থিক উন্নতির ব্যাপারে ততটা নহে। তুরস্কের সরকারী আয়ের একটি সুবৃহৎ অংশ সমর-বিভাগের জন্য ব্যয়িত হয়। তুরস্কে যে-সব দ্রব্যের চাষ হয় তাহার উন্নতি ব্যয়-সাপেক্ষ। তেমনি তুরস্কে কয়লা, মাঙ্গানিজ এবং লিগনাইটের যে খনি আছে তাহারও প্রভূত উন্নতি হওয়া আবশ্যক। তুরস্কের মৎস্য-শিল্প এখনও শৈশব অবস্থাতেই আছে। মসুল ইরাকের অন্তর্গত হইয়া যাওয়ায় তুরস্ক একটি অত্যাবশ্যক পেট্রোলের খনি হারাইয়াছে, কিন্তু যত তেল উৎপাদিত হয় ইরাক তাহার শতকরা দশ ভাগ তুরস্ককে কর দেয়। ইহা হইতেই বোঝা যাইবে যে তুরস্কের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য তাহার শান্তির প্রয়োজন। আজ যদি তুরস্ককে ইউরোপীয় যুদ্ধে যোগদান করিতে হয় তবে তাহার উন্নতিশীল রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং বিশ বছরের জাতীয় প্রচেষ্টা হয়ত ব্যর্থ হইতে বসিবে। তুর্কী নিরপেক্ষতার ইহাই প্রধান কারণ। আজ কামাল পাশা বাঁচিয়া থাকিলেও এই নিরপেক্ষতার সমর্থন করিতেন; কারণ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে তুরস্কের কোন স্বার্থ নাই। এই কারণে সাম্রাজ্যবাদী এন্‌ভারকে কামাল গত মহাযুদ্ধে তুরস্কের অধঃপতনের জন্য দায়ী করিয়াছিলেন।

নব্য তুরস্কের জাতীয় রূপান্তরের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিলে হয়ত মনে হইতে পারে যে তুরস্ক পাশ্চাত্য সভ্যতার বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে। বাহ্যিক আচার-ব্যবহারের দিক হইতে ইহা সত্য হইলেও তুর্কী নরনারীর অন্তরের দিক হইতে ইহা সত্য নহে। ইস্তাম্বুল বন্দরের প্রবেশ-পথে কামাল আতাতুর্কের যে প্রস্তরমূর্ত্তিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতেই ইহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। সেখানে নব্য তুর্কীর জন্মদাতার দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া আছে সূর্য্যোদয়ের দিকে, এশিয়ার দিকে। এই রূপকের মধ্য দিয়া তুর্কী সাহিত্যিক এবং শিল্পীরা বলিতে চায় যে তাহাদের সাধনা এশিয়ার রক্তে পরিপুষ্ট, এশিয়ার ভাবধারায় সমৃদ্ধ; একটি প্রতিবেশী অর্দ্ধ-বর্ব্বর শক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহারা একটি আধুনিকতার ছদ্মবেশ পরিয়াছে মাত্র। তুরস্কের জাতীয় প্রাণ তাহাদের আদিম বাসস্থানকেই জন্মভূমি বলিয়া স্বীকার করে, শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে।

বাংলা সাহিত্য ও কেশবচন্দ্র সেন

শ্রীঅবনী নাথ রায়

আজ ১৯শে নবেম্বর। আজ থেকে ১০২ বৎসর আগে এই তারিখে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই কারণে আজিকার তারিখটি জাতির পক্ষে স্মরণীয়। কেন-না জাতির পরিচয় তার অগণিত লোকসংখ্যার দ্বারা নয়, জাতির পরিচয় তার মহৎ সন্তান প্রসবের দ্বারা; সেই জাতি তত প্রাণশক্তিতে শক্তিমান যার প্রাচুর্য থেকে মহতের অভ্যুদয় হ'তে পেরেছে, সেই জাতিকে সভ্য জগৎ স্মরণ করতে এবং স্বীকার করতে বাধ্য যে-জাতি মহাপুরুষদের জন্ম দিয়ে জগতের জ্ঞান, রস বা আনন্দ ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করতে পেরেছে।

অনেক গ্রন্থকার এই বলে দুঃখ করেছেন যে বাংলা সাহিত্যে কেশবচন্দ্রের যে অপূর্ব দান আছে তা যথেষ্ট ভাবে আলোচিত হয় নি এবং যথাযোগ্য ভাবে স্বীকৃত হয় নি। এ অনুযোগ মিথ্যা নয়। তবে এর কারণ অনুমান করাও শক্ত নয়। এর কারণ হচ্ছে এই যে কেশবচন্দ্রের বিরাট মনীষার দান মুখ্যতঃ ধর্ম এবং সংস্কৃতিগত, গৌণতঃ সাহিত্যগত। তাঁর প্রতিভা প্রধানতঃ ধর্মতাত্ত্বিক, সাহিত্যিক নয়। কিন্তু তাঁর নব নব চিন্তাধারা ভাষার সাহায্যে স্রোতস্বতীর মত বেরিয়ে এসেছিল—সুতরাং তাঁর অজ্ঞাতে আপনা আপনি ভাষার সংস্কার সাধন হয়ে গিয়েছিল। সেই সংস্কারের পরিমাণ কতটা সে-বিষয়ে আমাদের দেশের লোকের সজ্ঞান হওয়া প্রয়োজন।

বাংলা ভাষার ইতিহাসে কেশবচন্দ্রের দানের সঠিক
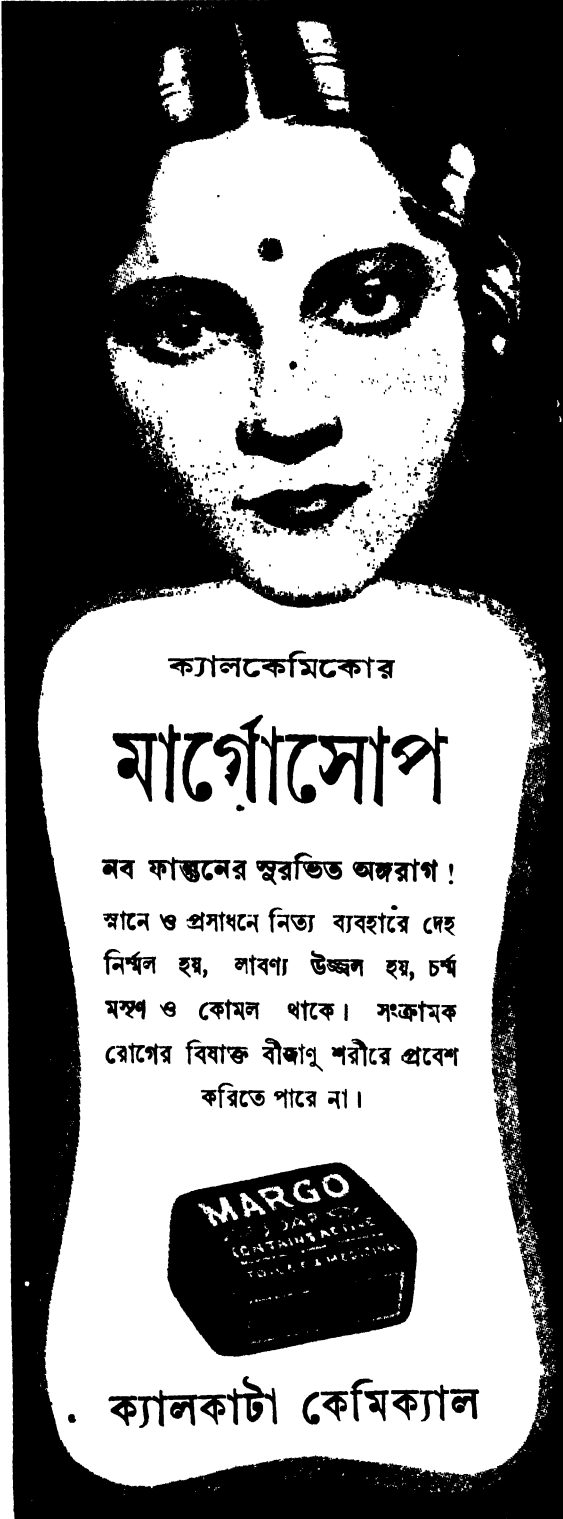
পরিমাণ কি বুঝতে হ'লে আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের বাংলা ভাষার নমুনা স্মরণ করতে হবে। কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত করলেই পাঠক-পাঠিকারা তুলনা করে পার্থক্য বুঝতে পারবেন।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে রামরাম বসু "প্রতাপাদিত্য-চরিত" লেখেন। তার ভাষা এইরূপ ছিল :—

"আপনার ভ্রাতৃ সহিত মন্ত্রণা করিয়া মহারাজকে ডাকিয়া নিভৃতে কহিলেন বাপুরে শ্রীহরি এদিকে আইস এবং আমার পরামর্শ শুন ও পরিগ্রহ কর তাহা। এই যে দাউদকে দেখিতেছ এখন ইহাকে দুর্বুদ্ধি আক্রমণ করিয়া দুর্বৃত্তি আচরণ করাইলেক। রাজ্যগর্ব ধনগর্ব সৈন্যগর্ব মদে ইহাকে মত্ত করিয়া অতি অহঙ্কৃত করিয়াছে. অতএব ইহার নিষ্পত্তি হইতে পারে না। অল্পকালে ইহার পতন হইবে। দেখ দিল্লির বাদশাহ একবারে যাহাকে হেন্দোস্থানে না মানে এমত লোক নাহি ইনি গড় চিতোর প্রভৃতি সমস্ত রাজগণের মান্য তাহারা ইহার করতলা।"

বলা বাহুল্য উপরোক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে কমা, সেমি-কোলান প্রভৃতি বিরামচিহ্নের কোন বালাই নেই এবং 'পরিগ্রহ' প্রভৃতি শব্দের অর্থও বদ্‌লে গেছে।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে "ইতিহাস মালা" ছাপা হয়। তার ভাষার নমুনা এই রকম :—

"ধন্যমান্য গুণিগণাগ্রগণ্য বদান্য দীনশরণ্য প্রজাপালনতৎপর করুণাসাগর বিবিধ ধনধাম বীরসিংহ রাজা নদীতীরে দামিনী নামক নগরে বাস করিতেন। একদিন রাজা প্রভাত সময়ে অত্যুন্মত্ত মাতঙ্গোপরি আরোহণ করিয়া কোটি কোটি গজবাজি রথরথী অতিরথী অর্দ্ধরথী ইত্যাদি নানা প্রকারে সৈন্যেতে পরিবৃত হইয়া মৃগয়াতে গমন করিয়া কত কত নদ নদী নগর গিরি গহন ভ্রমণ করিয়া নিজ রাজ্য হইতে অন্য রাজার রাজ্যেতে উপস্থিত হইলেন।"

উপরোক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে সংস্কৃতের প্রভাব লক্ষ্য করবার বিষয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্ব্বপ্রথম বাংলা ভাষাকে স্বাতন্ত্র্য দান করলেন এবং তার মধ্যে মিষ্টত্ব সঞ্চারিত করলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্রের "বেতাল পঞ্চবিংশতি" ছাপা হয়। তার ভাষার নমুনা নীচে দিলাম :—

"যিনি, এই জগন্মণ্ডল প্রলয় পয়োধি জলে নিলীন হইলে মীনরূপ ধারণ করিয়া ধর্ম্মমূল অপৌরুষেয় বেদের রক্ষা করিয়াছেন, যিনি বরাহমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা প্রলয় জলমগ্ন মেদিনীমণ্ডলের উদ্ধার করিয়াছেন, যিনি কূর্ম্মরূপ অবলম্বন করিয়া পৃষ্ঠে এই সসাগরা ধরা ধারণ করিয়া আছেন··· ইত্যাদি।"

ঈশ্বরচন্দ্রের পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয়। বঙ্কিমচন্দ্রের

প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বেই কেশবচন্দ্র সাহিত্যসেবা সুরু করেছিলেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র আদি ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য হয়েছিলেন এবং তখন থেকেই তিনি বাংলা ভাষায় উপদেশ দিতে সুরু করেন এবং সেগুলি মুদ্রিত হ'তে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র এবং কেশবচন্দ্র দু'জনেই ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং দু'জনে সতীর্থ ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' ছাপা হওয়ার অনেক আগেই কেশবচন্দ্রের নাম তাঁর অসাধারণ বক্তৃতা-শক্তির জন্য দেশ-বিদেশে বিখ্যাত হ'য়ে পড়েছিল।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র ইংরেজিতে "Young Bengal, this is for you" নামক পুস্তিকা লেখেন। পরে এই পুস্তিকা বাংলা ভাষায় "বাঙালী যুবক, ইহা তোমরই জন্য" নাম দিয়া তর্জমা করা হয়। এই পুস্তিকায় তিনি লেখেন,

"মানসিক উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে যদি ধর্মোন্নতি হইত এবং আমাদের দেশের লোকেরা ধর্মের জীবন্ত সত্যগুলি যদি গ্রহণ করিতেন তাহ হইলে স্বদেশ হিতৈষণা কেবল বক্তৃতা ও প্রবন্ধ রচনায় বদ্ধ থাকিত না, কার্যে পরিণত হইত।"*

কেশবচন্দ্রের বাংলা বইগুলির নাম :—(১) ব্রহ্মগীতোপনিষৎ (২) সঙ্গীত (৩) জীবন-বেদ (৪) মাঘোৎসব (৫) সাধু-সমাগম (৬) সেবকের নিবেদন (৭) আচার্যের উপদেশ (৮) ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ (৯) দৈনিক উপাসনা (১০) দৈনিক প্রার্থনা (১১) প্রার্থনা (ব্রহ্মমন্দির) (১২) অধিবেশন (১৩) নবসংহিতা (New Sanhita-র অনুবাদ) (১৪) যোগ (Yoga—Subjective and Objective-র অনুবাদ) (১৫) বিশ্বাস ও ভক্তিযোগ।

এখানে কেশবচন্দ্রের রচনা থেকে তাঁর ভাষার নমুনা দেখানোর জন্যে কিছু কিছু তুলে দিচ্ছি :—

"অধীনতা পাপ, অধীনতা অনিষ্টের হেতু, অধীনতা ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা।" "স্বাধীনতাই হইল আদি শব্দ। অধীন হইব না, এই সঙ্কল্প ব্যতীত এ-ভাব হইতে আর কি ফল ফলিতে পারে? এই স্বাধীনতা হইতেই অনেক গুরুতর কার্য প্রসূত হইয়াছে।" "স্বাধীনতার জয়পতাকা উড়াইয়া অধীনতার দুর্গকে চূর্ণবিচূর্ণ করিতে হইবে।"—"জীবন বেদ"।

"নবসংহিতা" থেকে কয়েক বাক্য উদ্ধৃত কচ্ছি :—

"৩। প্রভু কি সেবা করিবে? ভৃত্যই কেবল সেবা করিয়া থাকে—দাম্ভিক হৃদয়ের এইরূপ যুক্তি। ৪। নিশ্চয় প্রভুও সেবা করে, তাহা ভৃত্যের অপেক্ষা ন্যূন নহে। সেবা না করিলে কেহ প্রভু হইতে পারে না। ৫। যিনি পৃথিবী ও স্বর্গের অধিপতি, তিনিও সেবা করিয়া থাকেন। এমন কি, প্রতিদিন তিনি আপনার গৌরবের সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া নিজের দুঃখী নীচতম সেবকদিগের সেবা করেন।"

কেশবচন্দ্র যে-সব সংবাদপত্র স্থাপন করেছিলেন, সেগুলির কথা পরে বলছি। ১২৭৭ সালের ২৯শে অগ্রহায়ণের "সুলভ-সমাচার" পত্র থেকে নীচে কিছু উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি :—

"পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে কতকগুলি লোকে চাষ, বাণিজ্য, চাকরী ও অন্যান্য ব্যবসায় করিয়া দিন যাপন করে, আর কতকগুলি লোকে তাহাদের উপর রাজত্ব করে। এই দুই প্রকার লোককে রাজা ও প্রজা বলিয়া আমরা জানি। প্রজারা খাজনা ও ট্যাক্স দিতেছে, রাজা যাহা আজ্ঞা করেন তাহা ইচ্ছা হউক অনিচ্ছা হউক তাহারা পালন করিতেছে, এবং রাজা সেই

* কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ১০৮ পৃ.

টাকা এবং লোকদিগকে লইয়া বড়মানুষী করিতেছেন। এইমাত্র সম্বন্ধ উভয়ের সঙ্গে, রাজা আপনার ঘরে বসিয়া হুকুম করিলেন, আর প্রজার হাড়ের মজ্জা হইতে টাকা আসিতে লাগিল। সে টাকা এখন তিনি মদ খাইয়া উড়াইয়া দিন, কিম্বা বাইনাচ প্রভৃতি বাবুগিরিতেই খরচ করুন, কাহারও কিছু বলিবার নাই।

"প্রজারা কত সময় মুখের অন্নগ্রাস পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া রাজাকে কর দান করে, তিনিও কত সময় প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া আপনার উদর পূরণ করেন। এ অধিকার তাঁহাকে কে দিয়াছে? রাজার সঙ্গে প্রজার কি সেইরূপ সম্বন্ধ, যেমন বিদেশী পথিকের সহিত বোম্বেটের সম্বন্ধ? কেবল নেওয়া ভিন্ন কি রাজার আর কোন কাজ নেই?…"

১৭৯৪ শকের ১৬ই মাঘের "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্র থেকে কয়েকটি বাক্য তুলে দিচ্ছি:—

"এদেশে অনেক সামান্য লোক আছেন, তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি করে এমন লোক অতি অল্প। ছোট লোক বলিয়া সকলেই ইঁহাদের ঘৃণা করেন। কিন্তু রেলওয়ে কোম্পানীকে জিজ্ঞাসা কর তাঁহাদের যে এত টাকা তাহা কে দিতেছে—প্রথম শ্রেণীর লোক, না দ্বিতীয় শ্রেণীর, না তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর? যাহারা নিতান্ত গরিব ও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে যায়, অতি সামান্য লোক, তাহাদেরই টাকাতে রেলওয়ে কোম্পানীর এত ধন। হিমালয় পর্ব্বতকে জিজ্ঞাসা কর, হিমালয় তুমি যে এত উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ, কিসের উপর তুমি আছ? উচ্চ শিখরগুলি তোমার আশ্রয়? না নীচে যে প্রকাণ্ড প্রশস্ত আয়তন আছে, তাহাই তোমার অবলম্বন? সেইরূপ এ দেশের দুই-পাঁচটি ধনী মানী এবং জ্ঞানীর উপর দেশের মঙ্গল নির্ভর করে না, কিন্তু সামান্য লোকদিগের উপর।"

বাহুল্য ভয়ে আর বেশি উদ্ধৃত করলাম না। এখানে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে কেশবচন্দ্রের বাংলা ভাষার সঙ্গে আজকের দিনের বাংলা ভাষার মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই এবং আজকের দিনেও বোধ হয় অনেকে ঐ ধরণের বাংলা লিখতে পারলে গৌরব বোধ করবেন।

শুধু পুস্তক রচনায় নয়, সংবাদপত্র সেবায়ও কেশবচন্দ্রের দান অতুলনীয়। তিনি ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে "ধর্মতত্ত্ব" নাম দিয়ে একখানি পত্রিকা প্রচার করেন। এই পত্রিকা আজ পর্যন্ত বেঁচে রয়েছে।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে (বাংলা ১লা অগ্রহায়ণ ১৭৯২ শক) প্রথম সংখ্যা "সুলভ-সমাচার" প্রকাশিত

হয়। এই কাগজের দাম করা হয়েছিল মাত্র এক পয়সা। সস্তা সংবাদপত্র প্রচারের ইতিহাসেও এই চেষ্টা অভিনব। এর ফল ফল্‌তেও দেরি হয় নি। কি সহরে কি পল্লী-গ্রামে, কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, কি নারী কি পুরুষ সকলের হাতেই "সুলভ-সমাচার" শোভা পেতে লাগলো। "প্রবাসী"-সম্পাদক স্বীয় অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন যে তাঁদের বাল্যকালে বাঁকুড়া শহরে "সুলভ-সমাচারে"র কি রকম কাট্‌তি ছিল। "সুলভ-সমাচারে" সর্বপ্রথম সহজ এবং সরল ভাষার রচনা প্রচলিত হয়। ঐ কাগজে বিলাতের জ্ঞাতব্য যত বিষয় আছে সেই সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র স্বয়ং প্রবন্ধ লিখতেন। এই সব প্রবন্ধ এবং সুরুচিসম্পন্ন গল্প প'ড়ে তৎকালের লোকের রুচির ধারা বদ্‌লে গিয়েছিল।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি "ইণ্ডিয়ান মিরার" সংবাদপত্রকে দৈনিক কাগজে পরিবর্তিত করা হয়। এর দশ বছর পূর্ব থেকে "ইণ্ডিয়ান মিরার" সাপ্তাহিক কাগজ হিসাবে চল্‌ছিল। দৈনিক কাগজ হিসাবেও সেই যুগে "ইণ্ডিয়ান মিরার" শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল।

দেশ-বিদেশের কথা

হিন্দুস্থান রবার ওয়ার্কস

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কর্ত্তৃক উদ্বোধন

গত ১২ই জানুয়ারী বিকাল ৪৷৹টার সময় কমলালয় (এক্সপোর্টস) লিমিটেড পরিচালিত 'হিন্দুস্থান রবার ওয়ার্কস-এর প্রতিষ্ঠা ২৪৩।১, বালিগঞ্জ কসবা রোডে অনুষ্ঠিত হয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ইহার দ্বার উদ্ঘাটন সম্পন্ন এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বহু জনসমাগম হইয়াছিল।

মিঃ এ. কে. সেন এক্সপার্ট, (রবার টেকনোলজিষ্ট) ও প্রচার সম্পাদক মিঃ এস্. এন. দত্ত উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে কারখানার মধ্যে ঘুরাইয়া কি ভাবে ও কি প্রণালীতে রবারজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কর্ত্তৃক হিন্দুস্থান রবার ওয়ার্কসের উদ্বোধন

ভ্রম-সংশোধন

বর্ত্তমান সংখ্যার ৫৮০ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের "চিরস্মরণীয়" কবিতাটির দ্বিতীয় পংক্তিটি এইরূপ পড়িতে হইবে :—

"যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায় বারম্বার কেঁপে"

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে
শ্রীরমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পদ্মিনী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
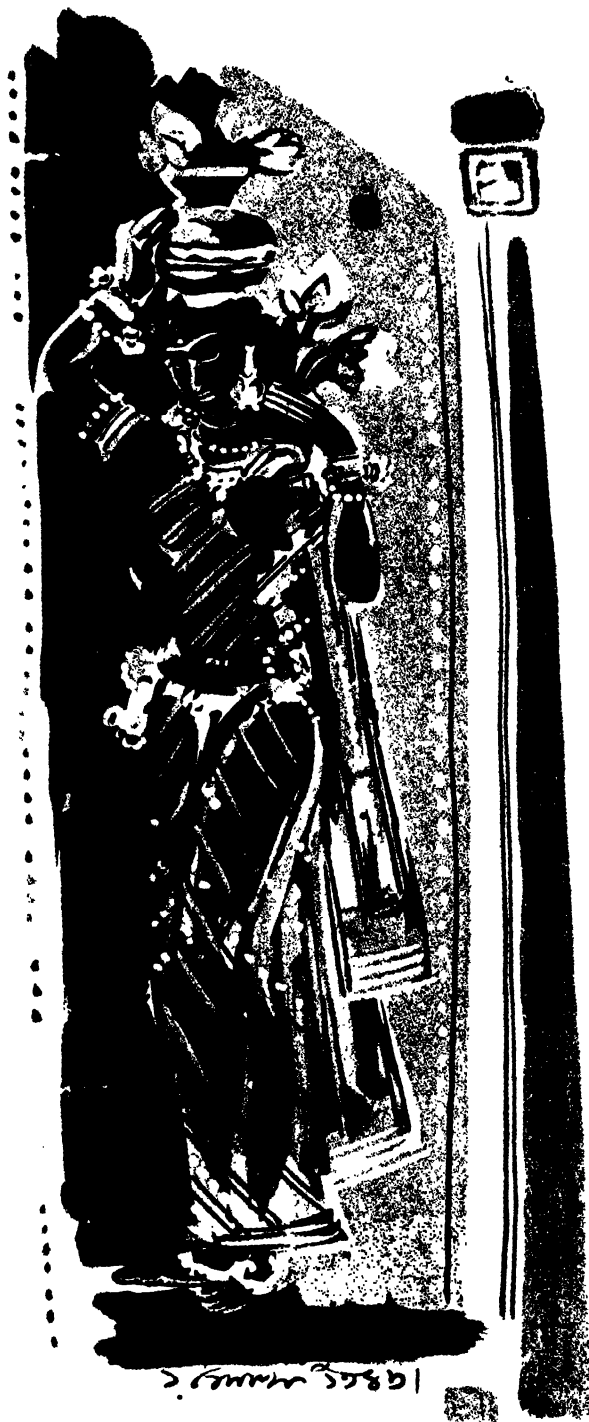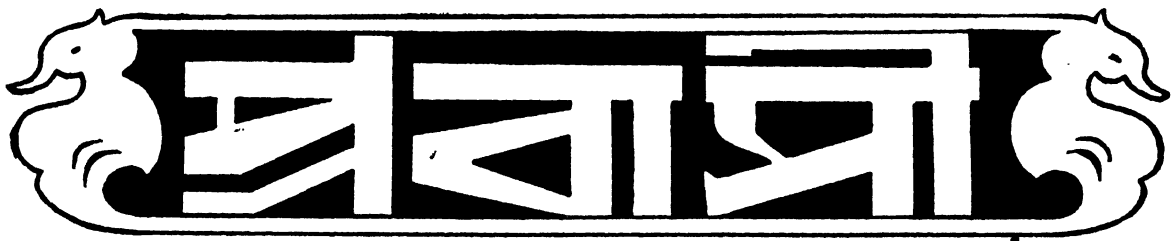
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪০শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৪৭

৬ষ্ঠ সংখ্যা

আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনে ভাবিতেছি যেন অসংখ্য ভাষার শব্দরাজি
ছাড়া পেল আজি,
দীর্ঘকাল ব্যাকরণ-দুর্গে বন্দী রহি
অকস্মাৎ হয়েছে বিদ্রোহী,
অবিশ্রাম সারি সারি কুচ্‌কাওয়াজের পদক্ষেপে,
উঠেছে অধীর হয়ে ক্ষেপে।
লঙ্ঘিয়াছে বাক্যের শাসন,
নিয়েছে অবুদ্ধি-লোকে অবদ্ধ ভাষণ,
ছিন্ন করি' অর্থের শৃঙ্খল-পাশ
সাধু-সাহিত্যের প্রতি ব্যঙ্গ হাস্যে হানে পরিহাস।
সব ছেড়ে অধিকার করে শুধু শ্রুতি,
বিচিত্র তাদের ভঙ্গী বিচিত্র আকৃতি।
বলে তারা, আমরা যে এই ধরণীর
নিঃশ্বসিত পবনের আদিম ধ্বনির
জন্মেছি সন্তান
যখনি মানব-কণ্ঠে মনোহীন প্রাণ
নাড়ীর দোলায় সদ্য জেগেছে নাচিয়া,
উঠেছি বাঁচিয়া।

শিশুকণ্ঠে আদি কাব্যে এনেছি উচ্ছলি
অস্তিত্বের প্রথম কাকলী।
গিরি-শিরে যে-পাগল ঝোরা
শ্রাবণের দূত, তারি আত্মীয় আমরা
আসিয়াছি লোকালয়ে
সৃষ্টির ধ্বনির মন্ত্র ল'য়ে।
মর্ম্মর মুখর বেগে
যে-ধ্বনির কলোৎসব অরণ্যের পল্লবে পল্লবে,
যে ধ্বনি দিগন্তে করে ঝড়ের ছন্দের পরিমাপ,
নিশান্তে জাগায় যাহা প্রভাতের প্রকাণ্ড প্রলাপ,
সে ধ্বনির ক্ষেত্র হতে হরিয়া করেছে পদানত
বন্য ঘোটকের মতো
মানুষ শব্দেরে তার জটিল নিয়ম সূত্রজালে
বার্তা বহনের লাগি অনাগত দূর দেশে কালে।
বল্গাবদ্ধ শব্দ অশ্বে চড়ি'
মানুষ করেছে দ্রুত কালের মন্থর যত ঘড়ি।
জড়ের অচল বাধা তর্ক-বেগে করিয়া হরণ
অদৃশ্য রহস্য-লোকে গহনে করেছে সঞ্চরণ,
ব্যূহে বাঁধি শব্দ-অক্ষৌহিণী
প্রতিক্ষণে মূঢ়তার আক্রমণ লইতেছে জিনি'।
কখনো চোরের মতো পশে ওরা স্বপ্নরাজ্য তলে
ঘুমের ভাঁটার জলে
নাহি পায় বাধা,
যাহা-তাহা নিয়ে আসে, ছন্দের বাঁধনে পড়ে বাঁধা,
তাই দিয়ে বুদ্ধি অন্যমনা
করে সেই শিল্পের রচনা
সূত্র যার অসংলগ্ন স্খলিত শিথিল
বিধির সৃষ্টির সাথে না রাখে একান্ত তার মিল;
যেমন মাতিয়া উঠে দশ বিশ কুকুরের ছানা,
এ ওর ঘাড়েতে চড়ে কোনো উদ্দেশ্যের নাই মানা,
কে কাহারে লাগায় কামড়
জাগায় ভীষণ শব্দে গর্জ্জনের ঝড়,

সে কামড়ে সে গর্জনে কোনো অর্থ নাই হিংস্রতার,
উদ্দাম হইয়া উঠে শুধু ধ্বনি শুধু ভঙ্গী তার।
মনে মনে দেখিতেছি সারা বেলা ধরি'
দলে দলে শব্দ ছোটে অর্থ ছিন্ন করি',
আকাশে আকাশে যেন বাজে
আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে॥

গৌরীপুর ভবন
কালিম্পং
২৪।৯।৪০

আরামবাগ-পরিচয়

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

দেশের সর্বত্র অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট। কষ্ট-লাঘবের উপায়-চিন্তার পূর্বে এক এক দেশের বর্তমান অবস্থার পরিচয় আবশ্যক। আরামবাগ দুস্তর পঙ্কে নিমগ্ন। আমি আরামবাগের পরিচয় করিতেছি। দ্বিতীয় প্রবন্ধে উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিব।

আরামবাগ! আরামবাগ কোথায়? কেহ বলে, হাঁ জানি মেলেরিয়ার খনি। কেহ বলে, পাণ্ডব-বর্জিত দেশ, সে দেশে ভদ্রলোক যায় না।

হুগলী জেলা দক্ষিণ রাঢ়ের মাথা। সেই হুগলী জেলায় তিনটি মহকুমা আছে। হুগলী প্রথম, শ্রীরামপুর দ্বিতীয়, আরামবাগ তৃতীয়। আরামবাগ মহকুমা হুগলী জেলার পশ্চিমে এক-তৃতীয়াংশ স্থান। অতএব আরামবাগে মুনসফ, ডেপুটি, পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর, হাসপাতাল, ডাক ও টেলিগ্রাফ আপিস, শতাবধি উকীল মোক্তার, ইংরেজী হাই-ইস্কুল ইত্যাদি সবই আছে। আরামবাগ মুনসিপালটিও বটে। হুগলী-চুঁচুড়া ও শ্রীরামপুর ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে, আরামবাগ নগর দ্বারকেশ্বরের পূর্ব তীরে। ইহার পূর্ব-নাম জাহানাবাদ ছিল। গয়া জেলায় এক জাহানাবাদ আছে। সেই কারণে হুগলী জেলার জাহানাবাদের নাম আরামবাগ রাখা হইয়াছে। জাহানাবাদের এক পাড়ার নাম আরামবাগ ছিল।

উক্তি দুইটি সত্যও বটে। তিন পুরুষকালেও সেখানকার মেলেরিয়ার আকর নিঃশেষ হয় নাই। শীত কি, গ্রীষ্ম কি, বর্ষা কি, সে দেশে এক রাত্রি বাস করিলেই হাতে হাতে প্রমাণ পাইবেন। সেখানে যাহারা বাস করিতেছে, তাহারা মেলেরিয়ার বীজ লইয়া জন্মিয়াছে। তথাপি যদি এক মাস দাঁড়ায়, এক মাস পড়ে। আর নিমোনিয়া হইলে পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। ৬০।৬৫ বৎসরের মানুষ কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

দেশটি অগম্যও বটে। অথবা চতুর্দিকে পথ। উত্তরে বর্দ্ধমান, পশ্চিমে বাঁকুড়া, দক্ষিণে মেদিনীপুর, পূর্বে হুগলী ও কলিকাতা। যে দিকে ইচ্ছা সেই দিক হইতেই যাইতে

পারা যায়। উত্তর-দক্ষিণে বর্দ্ধমান-মেদিনীপুর পথ আছে, পশ্চিম-পূর্বে বাঁকুড়া-কলিকাতা পথ আছে।

তথাপি শুনি বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা হইতে, এমন কি জেলার প্রধান নগর হুগলী হইতে উচ্চপদস্থ রাজ-পুরুষেরা কদাচিৎ আরামবাগ পরিদর্শন করিতে আসেন। এক ইংরেজ মেজিস্ট্রেট অশ্বারোহণে আরামবাগে আসিয়া-ছিলেন। এই সকল রাজপুরুষ কুইনীনের দুই চারিটা বটিকা সেবন করিয়াও আসিতে পারিতেন।

তাঁহারা কেহ আসুন না আসুন, হুগলী নগর হইতে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বারদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের নিমিত্ত আসা উচিত। কারণ তাঁহারাই জেলার পথ-ঘাট-নির্মাণের ও স্বাস্থ্য-রক্ষণের কর্তা। শুখনা দিনে নয়, জলকাদার দিনেই পথ-নিরীক্ষণ ও স্বাস্থ্য-পরীক্ষণ কর্তব্য। আষাঢ় হইতে কার্তিক, এই পাঁচ মাসের মধ্যে ইঞ্জিনিয়র ও ডাক্তার সঙ্গে লইয়া তাঁহারা যদি বৎসরে দুই এক দিন আরামবাগ নগরে অধিষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তদ্দেশবাসীর দুঃখ দূর হইতে পারিবে। দেশ স্বয়ং পরীক্ষা না করিলে কার্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ আরামবাগের পশ্চিম প্রান্ত হইতে হুগলী নগর বহু দূরে, ঋজু রেখায় ৬০ মাইল। কাগজে লিখিত বৃত্তান্ত অন্তরে প্রবেশ করে না।

কয়েক বৎসর পূর্বে মেদিনীপুর নগর হইতে কয়েক জন বিদ্বান্ ও উচ্চ-পদস্থ পুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মস্থান-দর্শনে আসিয়াছিলেন। এক জন আমায় বলিতেছিলেন, তিনি অনেক দেশ দেখিয়াছেন, কিন্তু রাঢ়দেশ যে বর্ষাকালে অগম্য, তাহা তিনি জানিতেন না। তাঁহারা মেদিনীপুর হইতে খীরপাই মোটরে আসিয়াছিলেন, আর মনে করিয়া-ছিলেন সেখান হইতে আড়াই মাইল দূরে বীরসিংহ গ্রামে গো-যানে কিম্বা হাঁটিয়া যাইবেন। তাঁহারা ভুলিয়াছিলেন জুতা পায়ে দিয়া তীর্থযাত্রায় কিছুমাত্র ফল হয় না। সে কারণেই তাঁহাদিকে আইলে আইলে আসিতে কোথাও হাঁটুজল, কোথাও হাঁটুপাঁক ভাঙ্গিতে হইয়াছিল। আর এক জন এক সভায় পথক্লেশ বর্ণনা করিয়াছিলেন। এমন কাদা যে কলসী কলসী জল ঢালিলেও ছাড়ে না। তাঁহারা দেশ ও কাল চিন্তা না করিয়া কষ্ট পাইয়াছিলেন।

পূর্বকালে পুরী-রক্ষার্থে ষড়্‌বিধ দুর্গ নির্মিত হইত। বর্ষাকালের কর্দম-দুর্গ সপ্তম। পূর্বকালে অজ্ঞাত ছিল। রথ চলিবে না, হস্তী চলিবে না, অশ্ব চলিবে না, কষ্টে পদাতিক শনৈঃ শনৈঃ চলিতে পারে। খীরপাই ও বীরসিংহ গ্রাম ঘাটাল মহকুমায় অবস্থিত। ঘাটাল মেদিনীপুর জেলার উত্তরস্থিত মহকুমা। পূর্বকালে ইহা হুগলী জেলার অন্তর্গত ছিল। বীরসিংহের যে অবস্থা, আরামবাগ মহকুমার সেই অবস্থা। পথ নাই, গোরুর গাড়ী চলে না, শুখনা দিনেও চলে না। গ্রামের বাহিরে পথ নাই, গ্রামে প্রবেশের পথ নাই, ভিতরেও নাই।

সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে দামিন্তার কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী দেখিয়াছিলেন, লোকে বলদের পিঠে ছালায় করিয়া ধান বহে। তিনি লিখিয়াছেন, গুজরাট নগরে বৈশ্যের মধ্যে "কেহ বৃষে ধান্য বয়।" অদ্যাপি তাহারা বৃষপৃষ্ঠে মাঠ হইতে গ্রামে ধান আনিতেছে, বৃষপৃষ্ঠে ধান, চাল, কলাই হাটে বিকিতে লইতেছে। মহাজন বৃষপৃষ্ঠে পিতল কাঁসার বাসন ও কাপড় লইয়া গঞ্জে যাইতেছে। পাথুরিয়া কয়লা, সিমেন্ট মাটি, চুন প্রভৃতি দ্রব্য বৃষপৃষ্ঠে চলিয়াছে।

শুনিলে বিশ্বাস হয় না। কারণ দুইটি বলদ তিন মণ পর্যন্ত ভার বহিতে পারে, দুই খানা চাকা পাইলে কাঁচা রাস্তাতেও পনর মণ পারে, পাকা রাস্তা পাইলে পঁচিশ মণ পারে। সেই দুইটি বলদ ও একটি মানুষ পাঁচগুণ কাজ করিতে পারে। বহনি খরচ পাঁচগুণ কমে। আর, একই বলদকে কখনও পিঠে ভার বহিতে কখনও কাঁধে লাঙ্গল টানিতে হয় না। লাঙ্গল টানা ও গাড়ী টানা একই কর্ম। বলদের কর্মশক্তি বাড়িয়া যায়। একই কর্ম করিতে বলদেরও ক্লেশ হয় না।

মানব কৃষ্টির কোন্ অতীত যুগে চক্র-যন্ত্র উদ্‌ভাবিত হইয়াছিল, অদ্যাপি সে কাষ্ঠময় চক্র অজ্ঞাত রহিয়াছে। প্রথমে কাষ্ঠপট্টের চক্র ছিল, পরে নাভি অর নেমির চক্র হয়। পরে নেমিতে লৌহবলয় বসে। এখন শুনিতেছি রবরের শূন্যগর্ভ বলয় পরাইতে হইবে, নচেৎ পথপৃষ্ঠ ক্ষয় পায়।

বর্তমানে আরামবাগ মহকুমায় কয়টি রাস্তা ও কেমন রাস্তা আছে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। (মানচিত্র পশ্য) ইং ১৯৩২ সালের হুগলী জেলার

বৰ্দ্ধমান
দামোদর নদ
কৃষ্ণপুর
কুলিয়া
রায়না
জামালপুর
উচালন
আরামবাগ
তারকেশ্বর
চাঁপাডাঙ্গা
চন্দ্রকোণা
খানাকুল
পাকা রাস্তা
কাঁচা রাস্তা
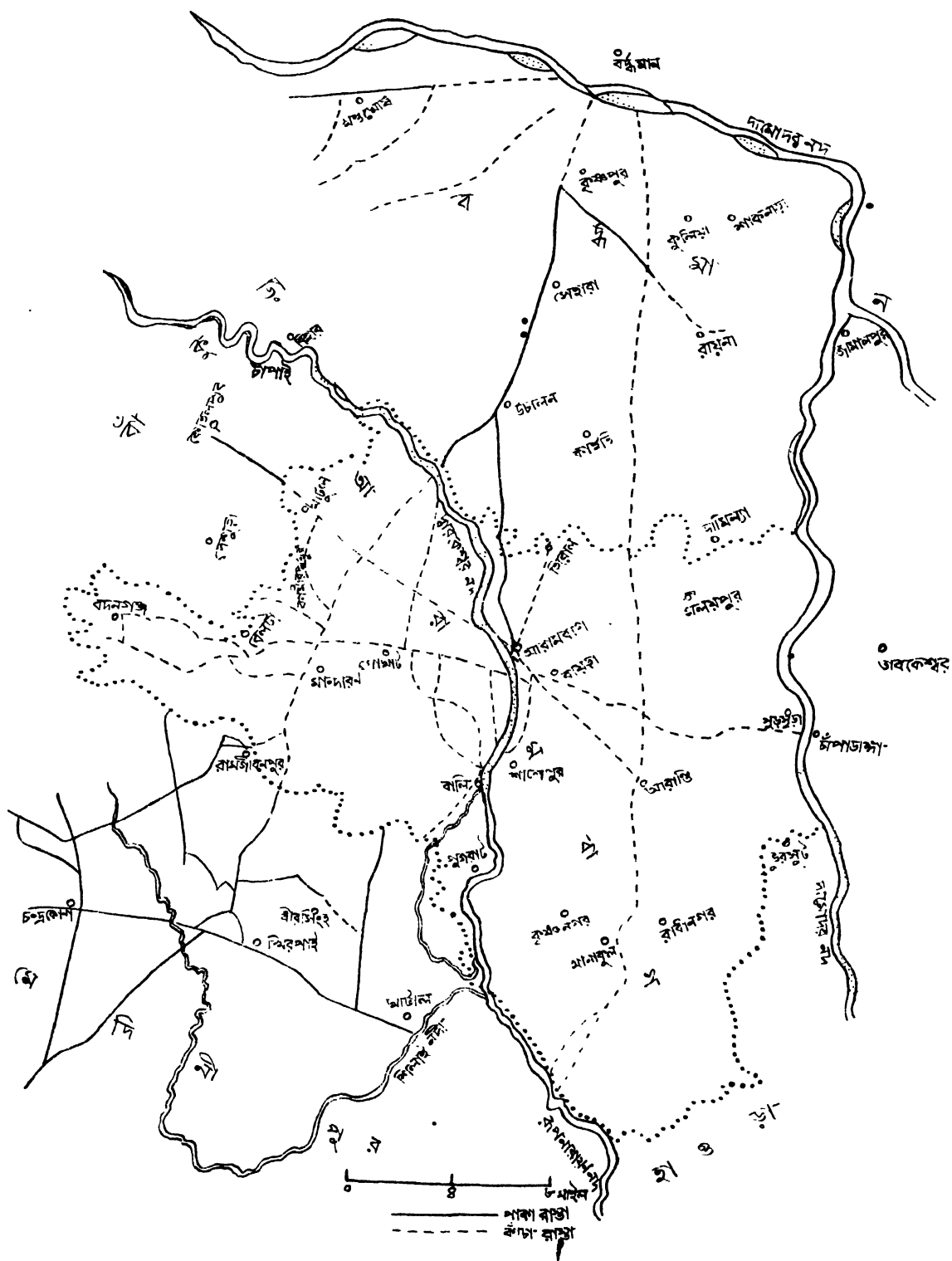
মানচিত্রে দেখিতেছি, বাঁকুড়া হইতে বিষ্ণুপুর, কোতলপুর, আরামবাগ, পুড়সুড়া ও চাঁপাডাঙ্গা হইয়া পূর্বাভিমুখে কলিকাতা পর্যন্ত এক রাস্তা গিয়াছে। রাস্তাটি অহল্যাবাঈ-সড়ক নামে খ্যাত। বাঁকুড়া হইতে কোতলপুর পর্যন্ত বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত। এই অংশ পাকা, মোটর চলিতেছে। তাহার পর হুগলী জেলায় প্রবেশ করিলেই কাঁচা রাস্তা। বর্ষাকালে এঁটেল মাটির কাদা ও দঁকে গোরুও চলিতে পারে না। কোতলপুর দিয়া বাঁকুড়ার সীমা হইতে আরামবাগ ১০ মাইল মাত্র, উচ্চভূমিও বটে। এরূপ ভূমিতে রাস্তা পাকা না হইবার কারণ বুঝিতে পারা যায় না। কয়েক বৎসর হইতে এই রাস্তায় মাটির জাঙ্গাল হইতেছে। শুনিতেছি, এই রাস্তা পাকা করা হইবে। যথোচিত সেতু রাখা হইতেছে কি না, জানি না। কিন্তু শুনিয়াছি আরামবাগ মহকুমার পশ্চিম সীমায় খাটুল গ্রামে তিনটি দঁকের সঙ্কট আছে। গোরুর গাড়ীর চাকা অর্ধেক ডুবিয়া যায়, মহিষ নামিতে চায় না। বোধ হয় এই তিন স্থানে রাস্তার নিম্ন দিয়া জলস্রোত চলে, সেই কারণে দঁকের উৎপত্তি।

আরামবাগ হইতে পুড়সুড়া ১২ মাইল, তার পর দামোদর, ওপারে চাঁপাডাঙ্গা। চাঁপাডাঙ্গা হইতে হাওড়া পর্য্যন্ত এক সরু রেল-লাইন আছে। দ্বারকেশ্বর ও দামোদর বর্ষার পাঁচ মাস নৌকায় পারাপার, অন্য সাত মাস তক্ত-পথ। সে পাঁচ মাস আরামবাগ হইতে পুড়সুড়া পথের ছয় মাইল অগম্য। বার মাস গোরুর গাড়ী চলিতে পারে, এমন রাস্তা হইলেও সে দেশে বাহিরের আলোবাতাস ঢুকিতে পারে। পথের অভাব হেতু বর্ষাকালে কলিকাতা হইতে আসিতে হইলে অনেকে নদীপথে আসেন। কলিকাতা হইতে কোলাঘাট পর্যন্ত রেলে, তার পর রূপনারাণে ষ্টীমার, তার পর দ্বারকেশ্বরে পানসী। এই পথে কোলাঘাট হইতে আরামবাগে আসিতে প্রায় ২৪ ঘণ্টা লাগে, ব্যয়ও অনেক হয়।

উত্তর-দক্ষিণে বহুকালের পুরাতন দণ্ডপথ* বালেশ্বর, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান হইয়া উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে। মেদিনীপুর জেলার উত্তর সীমায় রামজীবনপুর পর্য্যন্ত পাকা। কিন্তু যেমন হুগলী জেলায় পড়িয়াছে অমনই কাঁচা। এই রাস্তা বর্দ্ধমান জেলার উচালন নামক স্থানে মিশিয়াছে। ইং ১৯১৭ সালের মানচিত্রে আরামবাগ হইতে বর্দ্ধমান ২৪ মাইল পথটি পাকা দেখান হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকল অংশ পাকা ছিল না। এটিকে মোটর রথ্যা করা হইতেছে। পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া কাজ চলিতেছে, এই বৎসর আরামবাগ পর্যন্ত পঁহুছিতে পারে। এই পাঁচ ছয় বৎসর বর্ষাকালে গোরুর গাড়ী যাইতে আসিতে পারে নাই। কাজটি শীঘ্র শেষ হইলে তদ্দেশবাসীর দুর্গতির শেষ হইবে।

মানচিত্রে আর একটি দীর্ঘ কাঁচা রাস্তা দেখিতেছি। ইহা দ্বারকেশ্বরের পূর্ব দিকে অবস্থিত এবং উত্তরে দামোদর হইতে দক্ষিণে রূপনারাণ পর্যন্ত দীর্ঘ। বর্ষাকালে এই রাস্তার কি অবস্থা হয়, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়।

উপরে পূর্ব-পশ্চিমে ও উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ দণ্ডপথের উল্লেখ করিয়াছি। দুইটাই পুরাতন। কিন্তু ইহাদের শাখা-প্রশাখা নাই, দণ্ড নাম ব্যর্থ হইয়াছে। আরামবাগ মহকুমায় চারিটি থানা, দ্বারকেশ্বরের পশ্চিমাংশে গোঘাট ও বদনগঞ্জ, এবং পূর্বাংশে খানাকুল ও পুড়সুড়া আরামবাগের সহিত পথদ্বারা যুক্ত আছে। তদ্দ্বারা পুলিশের সুবিধা হইয়াছে, সাধারণের পূর্ব-পশ্চিমে গমনাগমনের সুবিধা হয় নাই। আরামবাগ ও ঘাটাল, দুইটা মহকুমা নগর, কিন্তু পথ দ্বারা যুক্ত নয়। পশ্চিমাংশে এক এক স্থানে নিকটে নিকটে অনেক রাস্তা দেখিতেছি, অন্য স্থানে নাই। মনে হয় যিনি যেমন ধরিয়াছেন, তিনি তেমন পথ করাইয়া লইয়াছেন। ইং ১৯১৭ সালের মানচিত্রে এত পথ নাই। কিন্তু প্রকল্পহীন পথ দ্বারা বহু লোকের সুবিধা হয় নাই। দণ্ডের সমকোণে পথ-নির্মাণে দৈর্ঘ্য কমে, ব্যয় কমে।

সুগম পথ নির্মাণের নিমিত্ত ভারত-গবর্মেণ্ট বাঙ্গালা-গবর্মেণ্টকে বৎসর বৎসর ১৬ লক্ষ টাকা দিতেছেন। প্রথম কয়েক বৎসর এত টাকা খরচ হইতে পারে নাই।

* যে বিস্তৃত দীর্ঘ পথ হইতে দুই পাশে শাখা পথ থাকে, তাহার নাম দণ্ড। মেদিনীপুরে দণ্ডেশ্বর শিব এই পথ রক্ষা করিতেছেন। এই পথ হেতু মেদিনীপুর অঞ্চল দণ্ডভুক্তি নাম পাইয়াছিল। পরে 'জয়ানন্দ' টিপ্পনী পশ্য।

সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম এখনও পূর্ব পূর্ব বৎসরের ৩৫ লক্ষ টাকা জমা আছে। ভারত-গবর্মেণ্টের প্রদত্ত টাকা হইতে বর্দ্ধমান-আরামবাগ ও কোতলপুর-আরামবাগ রথ্যা নির্মিত হইতেছে। উচালন-চন্দ্রকোণা রথ্যা হইবে কি না, জানি না। বড় বড় দামী দামী বহিতে প্রকল্প লিখিত রহিয়াছে, কিন্তু কোন্ বহিতে কোথাকার পথ তাহা লিখিত নাই। ফলে সে সকল বহি সরকারী ইঞ্জিনিয়রদের জন্য হইয়াছে, দেশবাসী ঠিকাদারের কাছে শুনিবে! বিস্তারে না গিয়া কোথায় কোথায় পথ হইতেছে ও পথের প্রবন্ধ হইয়াছে, তাহার চিত্র ছাপাইয়া থানায় থানায় হাটে হাটে বিতরণ করিলে লোকে বুঝিবে তাহারাও মানুষ, তাহাদেরও জানিবার ইচ্ছা হয়। সুখের দিন আসিতেছে ভাবিয়া তাহারা আহ্লাদিত হইত, গবর্মেণ্টের কাজের প্রশংসা করিত।

এঁটেল মাটির রাস্তাকে কি উপায়ে বর্ষাকালেও সুগম করা যাইতে পারে, তাহার পরীক্ষা হইয়াছে কি না জানি না। ইটের খোআ দিয়া পাকা করিলে গোরুর গাড়ীর চাকায় অচিরে অদৃশ্য হয়। এঁটেল মাটির ঝামার খোআ বিছাইয়া দিলে বহুকাল টিকিবে। এঁটেল মাটির ঝামা ভাঁগা ব্যয়সাধ্য। কিন্তু এঁটেল মাটির ছোট ছোট ডেলা পোড়াইয়া ঝামা করিয়া লইলে ভাঙ্গিবার খরচ লাগে না, ইটও গড়িতে হয় না। কোতলপুর হইতে আরামবাগ রাস্তাটি পাকা হইয়া গেলে বিষ্ণুপুর হইতে পাথুরিয়া কয়লা বহিয়া লইতে গাড়ীভাড়া বেশী পড়িবে না।

লোকে বলে পথকর দিতেছি, কিন্তু পথ কই? পথের অভাবে আরামবাগবাসী কূপমণ্ডুক হইয়াছে। সে কূপে বাহিরের আলো ঢুকে না, বাহিরের বাতাস বহে না। তারকেশ্বরের পূর্বভাগ বরং ভাল, চাঁপাডাঙ্গা নিকটে, মৃত্তিকাও উর্বরা; কয়েকটি ইংরেজী ইস্কুল আছে। কিন্তু পশ্চিম ভাগে ইংরেজী ইস্কুল একটিও নাই! পশ্চিমপ্রান্তে বদনগঞ্জে একটি ইস্কুল নামে আছে, কভু থাকে, কভু থাকে না। এক শত বর্গমাইল দেশে ইংরেজী ইস্কুল নাই। কারণ অর্থ নাই। মধ্য ইস্কুলে ছেলে পড়াইবার খরচও কম নয়। কত বই চাই, পয়সা কোথায়।

দেশটি নগণ্যও ছিল না। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব কামারপুখুর গ্রামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আরামবাগ হইতে কামারপুখুর ৮ মাইল পশ্চিমে। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে তাঁহার ভক্তেরা তীর্থদর্শনে আসেন। চাঁপাডাঙ্গা পর্যন্ত রেলে আসেন, তাহার পর দামোদর উত্তীর্ণ হইয়া বর্ষাকাল হইলে আরামবাগ ১২ মাইল জল নয়, স্থল নয়, অতিক্রম করেন। ইহার পর আরও ৮ মাইল অনেক ঘুরিয়া কাঁচা রাস্তা ধরিয়া আসেন। কেহ কেহ বর্দ্ধমান-উচালন পথে ঘুরিয়া আসেন। পরমহংস-দেব এই জল কাদার পথ দিয়া কলিকাতা যাতায়াত করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও জলকাদা গ্রাহ্য করিতেন না। তাঁহার সময়ে চাঁপাডাঙ্গা রেল হয় নাই, তারকেশ্বর রেলও তাঁহার যৌবনকালে ছিল না। তাঁহার চরিত-পাঠকেরা দেখিয়াছেন, তিনি দামোদরের বন্যাকেও ডরাইতেন না। আরামবাগ হইতে বীরসিংহ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ঋজুরেখায় চৌদ্দ মাইল। তাঁহার বাল্যকালে ঘাটাল মহকুমা হুগলী জেলার অন্তর্গত ছিল। বীরসিংহে তাঁহার মাতুলালয় ছিল। তাঁহার পিতৃনিবাস আরামবাগ হইতে ছয় মাইল পূর্ব-উত্তরে মলয়পুর গ্রামে। এখন সে গ্রাম দামোদরের বন্যায় বর্ষে বর্ষে প্লাবিত হয়। তাঁহার জ্ঞাতিরা অন্য গ্রামে চলিয়া গিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগর আরামবাগ হইতে পূর্ব-দক্ষিণে বার-তের মাইল। বোধ হয় তিনিও পুড়সুড়া ঘাটে দামোদর পার হইয়া কলিকাতা যাইতেন। এই যে তিন ধর্মবীর ও কর্মবীর দেশের গতানুগতিকতা ভঙ্গ করিয়া নূতন পথ দেখাইয়াছিলেন, তাঁহাদের আবির্ভাব দুর্গম দেশেই হইয়াছিল। আরও এক বীরের নাম করা যাইতে পারে। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ডি. উপাধি-পত্র ছিন্ন করিয়া নূতন পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃ-নিবাস আরামবাগ হইতে ছয় মাইল পূর্ব-দক্ষিণে আরাণ্ডি গ্রাম। সেখানে অদ্যাপি তাঁহার পৈতৃক দেবসেবা হইতেছে। মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণও এই দেশের কবি। দামিন্যা (দামিন্ ্যা) গ্রাম মলয়পুরের চারি মাইল উত্তরে।

দেশটি শাক্ত। খানাকুল কৃষ্ণনগরে চৈতন্যদেবের

পার্ষদ অভিরাম গোস্বামীর ও আরামবাগের পশ্চিমস্থ এক গ্রামে চৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতা জয়ানন্দের জন্ম* হইলেও চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

আরামবাগের নিকটবর্ত্তী তিরোলের কালী ও বিক্রমপুরের বিশালাক্ষী প্রসিদ্ধ। অপরাপর স্থানে কালী ও দুর্গা নামে চণ্ডীর পূজা হয়। নানাস্থানে ধর্মরাজের পূজা হইত ও এখনও হয়। ধর্মরাজ নিত্য নিরঞ্জন হইলেও শাক্ত ভাবে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে এবং তাঁহার নিকট পশু-বলিদান হয়। কয়েক জন ধর্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। আরামবাগের উত্তরে কাইতি শ্রীরামপুরে রূপরাম রায়, বর্দ্ধমানের দক্ষিণে কৃষ্ণপুরে ঘনরাম ও আরামবাগের পশ্চিমে বেল্‌টা গ্রামে মাণিক গাঙ্গুলী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মাণিক গাঙ্গুলীকে দেশড়ার মাঠে ধর্মরাজ দর্শন দিয়াছিলেন। চাঁপাইর (দ্বারকেশ্বর) কূলে 'বিহারে' বৌদ্ধ মঠ ছিল, প্রত্নৈষীর খনিত্র স্পর্শ করে নাই।

বর্দ্ধমানের পূর্ব-দক্ষিণস্থিত শাকনাড়া গ্রামকে প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ "রাঢ়াসু গাঢ় গরিমা" বলিয়াছিলেন। তাঁহার বহু পূর্বে একাদশ খ্রীষ্ট শতাব্দে "প্রবোধ-চন্দ্রোদয়" কর্ত্তা ভূরিশ্রেষ্ঠী (বর্তমান নাম ভুরসুঠ, আরামবাগ হইতে পূর্ব-দক্ষিণে ১২ মাইল) গ্রামের বর্ণনায় দম্ভপূর্বক লিখিয়াছিলেন, "গৌড়ং রাষ্ট্র মনুত্তমম্ নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী।" গৌড় অত্যুত্তম, কিন্তু রাঢ়ার উপমা নাই। রাঢ়া ও রাধা শব্দের একই মূল। অর্থ, সিদ্ধি। তাঁহার শতবর্ষ পূর্বে "ন্যায়-কন্দলী" কর্ত্তা শ্রীধর এই ভূরিশ্রেষ্ঠী গ্রামে তর্ক করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আসীদ্ দক্ষিণ রাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্মণাম্। ভূরিসৃষ্টি রিতিগ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠিজনাশ্রয়ঃ।"—ভূরিসৃষ্টি গ্রামে ভূরিকর্ম দ্বিজের ও

---

* জয়ানন্দের নিবাস কোথায় ছিল? তিনি লিখিয়াছেন, চৈতন্যদেব নীলাচল হইতে গৌড়ে প্রত্যাবর্তন কালে

ছাড়িয়া দেব সরণ প্রবেশিলা মান্দারণ
বর্দ্ধমানে দিলা দরশন।
জ্যৈষ্ঠ মাসের তাতে তপত সিকতা পথে
তরুতলে করিলা শয়ন।
বর্দ্ধমান সন্নিকটে ক্ষুদ্র এক গ্রাম বটে
আমাইপুরা তার নাম।
তাহে যে সুবুদ্ধি মিশ্র গোসাঞির পূর্ব্ব শিষ্য
তার ঘরে করিলা বিশ্রাম।
তাহার নন্দন গুআ জয়ানন্দ নাম থুঞা
রোদনী রান্ধিল তার লঞা।
রোদনী ভোজন করি চলিলা নদীয়া পুরী
বায়ড়ার উত্তরিলা গিঞা।
বায়ড়া গ্রামে বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য।
ধন্য মাতা ধন্য পিতা বংশ ধন্য রাজা।
সে রাত্রি বঞ্চিঞা প্রভু পলাইয়া গেলা।
কুলিয়া গ্রামেতে প্রভু পাতিলেন খেলা।

জয়ানন্দের মাতা মৃতবৎসা ছিলেন। জয়ানন্দের নাম গুইআ রাখিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব জয়া-(জইআ) নন্দ রাখিয়াছিলেন। জয়ানন্দের পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র বন্দ্যঘটীয় অর্থাৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। মান্দারণের নিকট চতন্যদেব দেব-সরণ, দেবপথ, দণ্ডেশ্বর শিবরক্ষিত পথ ছাড়িয়া বর্দ্ধমানে উপনীত হইলেন। এই বর্দ্ধমান, বর্দ্ধমান নগর হইতে পারে না। কারণ মান্দারণ হইতে বর্দ্ধমান নগর ষোল ক্রোশ। বর্দ্ধমান ভুক্তিতে উপনীত হইলেন। নিকটে আমাইপুরা নামক ক্ষুদ্র গ্রামে সুবুদ্ধি মিশ্রের নিবাস ছিল। (এই নামে এখন আর গ্রাম নাই। আমাইপুরা বড় গ্রামের সহিত যুক্ত হইয়া থাকিবে। আমি আমদপুর ও অমরপুর গ্রামে অনুসন্ধান করিয়া পূর্বকালের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের অস্তিত্ব পাই নাই।) সে গ্রামে মধ্যাহ্নভোজন করিয়া চৈতন্যদেব অপরাহ্নে বায়ড়া গ্রামে বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্যের গৃহে রাত্রিযাপন করেন। প্রত্যুষে নদীয়া যাত্রা করেন এবং কুলিয়া গ্রামে সন্ধ্যাকালে উপস্থিত হন। মানচিত্রে মান্দারণ, বায়ড়া, কুলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। বায়ড়ার রাজা রণজিৎ রায় ব্যতীত অন্য কেহ হইতে পারেন না। তাঁহার সহিত অভিরাম গোস্বামীর প্রীতি ছিল। রাজা শাক্ত ও বিশালাক্ষী দেবীর উপাসক হইলেও বৈষ্ণবের সমাদর করিতেন। এই হেতু জয়ানন্দ তাঁহাকে 'ধন্য রাজা' বলিয়াছেন। জয়ানন্দের মতে চৈতন্যদেব বিংশতি বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু নীলাচলে কয় বৎসর ছিলেন, তাহা লেখেন নাই। যদি কবিরাজ গোস্বামীর মতে ২৪+৬ বৎসর ধরি, তাহা হইলে চৈতন্যদেব ৩০ বৎসর বয়সে আমাইপুরা গ্রামে আসিয়াছিলেন। তখন জয়ানন্দ শিশু, ছয় হইতে দশ বৎসরের। ১৪০৭ শকে চৈতন্যদেবের জন্ম।

ভূরিশ্রেষ্ঠীর বাস ছিল। পণ্ডিত শ্রীক্ষিতিমোহন সেন লিখিয়াছেন, শ্রীধর "অদ্বৈতসিদ্ধি" গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অতএব সহস্র বৎসর পূর্বে রাঢ়াপুরী বেদবিদ্যায় ও ধনধান্যে বিখ্যাত ছিল।

এই অঞ্চলের অধিকাংশ গ্রামের নাম সংস্কৃত অথবা সংস্কৃতমূলক। আর এই অঞ্চলের ভাষাই বাঙ্গালা ভাষা। রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বের মুকুন্দরামের ও জয়ানন্দের ভাষা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে এই ভাষা আধুনিক নয়। ভাগীরথীর পূর্ব দিকে যেমন গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগর, পশ্চিম দিকে তেমন খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজস্থান নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই অঞ্চলেই সর্বাধিকারী বংশের ও রাষ্ট্রচিন্তক ৺ভূপেন্দ্রনাথ বসুর জন্ম।

রাজা মানসিংহের সময়ে এই রাঢ়াভূমি বিধর্মীর করায়ত্ত হইয়াছিল। ইহার পূর্বে কোথায় কোন্ রাজার অধিকার ছিল তাহার অনুসন্ধান হয় নাই। আরামবাগের পশ্চিম-দক্ষিণে মান্দারণের উচ্চ প্রাকার দাঁড়াইয়া আছে। ভিতরে আমোদর কূলে মর্কট প্রস্তরের স্তূপ পড়িয়া আছে। অদ্যাপি কেহ খনন করে নাই। লোকে বলে ইহার বাহিরেও আর এক গড় ছিল। অদ্যাপি তাহার নাম বাহিরগড়। দক্ষিণ-পশ্চিমে রাঙ্গামাটি গ্রাম। এই বৃহৎ দুর্গ যেমন তেমন রাজার নির্মিত বোধ হয় না। গৌড়েশ্বর রামপালের সামন্ত চক্রের মধ্যে কোটাটবীর, অপরমন্দারের, ও দণ্ডভুক্তির অধিপতি ছিলেন। দণ্ডভুক্তি মেদিনীপুর, কোটাটবী বিষ্ণুপুরের পূর্ব দিকের কোটেশ্বর, এবং অপরমন্দার, এই মান্দারণ মনে হয়। প্রাচ্যবিদ্যার্ণব ৺নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও এই অনুমান করিয়াছিলেন। পূর্বদিকে দামোদর তটে ভূরিশ্রেষ্ঠী নাম অকারণ হয় নাই। এই গ্রামে ভূরি বহু, শ্রেষ্ঠী মহাজনের বাস ছিল। প্রচুর বাণিজ্য না থাকিলে এক স্থানে নানাবিধ কলার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। বোধ হয় সেখানে এক বিক্রমশালী রাজা ছিলেন। তৎকালে, সহস্র বৎসর পূর্বে, দেশটি নিশ্চয় জলাভূমি ছিল না। বায়ড়ায় রণজিৎ রায়ের গড় বর্তমান আছে। আরামবাগ নগরের দক্ষিণে দ্বারকেশ্বর কূলে শালেপুর গ্রামে গড়ের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন চিহ্ন আছে। লোকে বলে শালিবাহন রাজার গড়।* আরও কিছু দক্ষিণে দ্বারকেশ্বর-কূলে কবিকঙ্কণের গুজরাট নগর। তাঁহার মতে এই গুজরাট কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল। কবিকঙ্কণ কালকেতুকে ব্যাধরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বহুপূর্বকালের কথা। তৎকালে রাঢ়াভূমির দক্ষিণে বিশাল অরণ্য ছিল। তাহার দক্ষিণে ও পশ্চিমে কলিঙ্গ। গুজরাট, এই নাম পরে প্রদত্ত। গুর্জর-প্রতিহার জাতির বাস হেতু এই নাম হইয়া থাকিবে। বঙ্কিমচন্দ্র গড় মন্দারণ দেখিয়া "দুর্গেশনন্দিনী" লেখেন, এবং উচালনের দীঘি দেখিয়া "ইন্দিরায়" কালাদীঘি আনিয়াছেন। লোকে বলে এই দীঘি অসুরের খনিত। এই দীঘির ঘাটে অসুর-আনীত পাথর আছে। সে অসুর কোথায় গেল?

* আটদশ বৎসর পূর্বে আরামবাগের নিকটস্থ পারুল গ্রামের শ্রীতীর্থপদ রায় আমাকে জানাইয়াছিলেন, তিনি অনেক গড়ের সন্ধান পাইয়াছেন, কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রাও সংগ্রহ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এ যাবৎ তিনি তাঁহার অনুসন্ধানফল প্রকাশ করেন নাই।

নীলাঙ্গুরীয়

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১৬

আমার ডায়েরির সেই দিনের পাতায় মাত্র দুইটি কথা লেখা আছে,—"সাবাস মীরা।" কেন লিখিয়াছিলাম মনে আছে।

মীরা নিপুণ শিল্পী; যাহা ফুটাইতে চাহিতেছে তাহা কিসে ফুটিবে, অর্থাৎ যাহাকে শিল্পীর সেন্স্ অব্ এফেক্ট বলে মীরার সেটা পূর্ণ আয়ত্তে। পার্টিতে সরমার আসার পর হইতে, বিশেষ করিয়া আমি তাহাকে প্রশংসা করিবার পর হইতে মীরা মনে মনে সংকল্প করিয়াছিল আমায় নামাইবে, মনে করাইয়া দিবে ওরা প্রশ্রয় দেয় তাই, নহিলে আমি কত নগণ্য। নামাইলই সে, তাহাতে আমার বা দর্শকদের মধ্যে যাহাতে কোন সন্দেহ না থাকে সেই জন্য প্রথমে উর্দ্ধে তুলিয়া দিয়া তাহার পর নামাইল; শূন্যে একটা স্পষ্ট, সুদীর্ঘ রেখা অঙ্কিত করিয়া অতলে বিলীন হইয়া গেলাম আমি।

কিন্তু কেন নামাইল মীরা? আমার অপরাধটা কি ছিল? আগাগোড়া একটু অনুধাবন করিয়া দেখা যাক্।

ব্যাপারটার সূত্রপাত হয় সরমাকে লইয়া, যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিয়াছি;—সরমাকে সেদিন পরিচিত করাইবার সময় অপর্ণা দেবী বলিলেন, "এমন চমৎকার মেয়ে দেখা যায় না শৈলেন।" সরমা হাসিয়া বলিল, "এমন চমৎকার কাকীমা দেখা যায় না শৈলেনবাবু, মিছিমিছি এত প্রশংসা করতে পারেন!"

আমি বলিলাম, "যোগ্যের প্রশংসায় মস্ত বড় একটা আনন্দ আছে কিনা সরমা দেবী···"

কথা লঘুভাবেই বাড়িয়া যায় এবং সরমাকে আমি আরও খানিকটা বাড়াইয়া দিই। এতে মীরার নিষ্প্রভ হাসির কথা উল্লেখ করিয়াছি। পছন্দ হয় নাই মীরার। পৃথিবীতে এত লোক থাকিতে আমি সরমাকে অর্থাৎ সরমার মত সুন্দরীকে প্রশংসার এত যোগ্য ঠাহর করিতে গেলাম কেন? মীরার যে এটা ভাল লাগে নাই তাহাই নয়, এই ভাল না-লাগার ব্যাপারটা যে আমি ধরিয়া ফেলিয়াছি সেটা মীরা টের পাইয়াছিল। ব্যাপারটা এইখানে শেষ হইলে সামলাইয়া যাইত, কিন্তু তাহা না হইয়া আরও বাড়িয়াই গেল; মীরার কটু লাগিতেছে জানিয়াও আমায় আবার এই দ্বিতীয় বারে বলিতে হইল যে, সরমা আমাদের মধ্যে আসিয়াছে বলিয়া আমরা সবাই কৃতজ্ঞ। মীরার ঈর্ষাকে কোথায় ঠাণ্ডা করিব, না, উদ্রিক্ত করিয়া তুলিলাম। কিন্তু কোন উপায় ছিল না; ওইটুকু না বলিলে ঘোরতর অন্যায় হইত।

মীরা চা ঢালিতেছিল, ঠিক এই সময়টিতে তাহার হাত হইতে ছলকিয়া খানিকটা চা ক্লথের উপর পড়িয়া যায়। ইহার পরই মীরার প্রতিশোধ আরম্ভ হয়, অনাড়ম্বর, কিন্তু অব্যর্থ।

একটু পরেই, কতকটা অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই যেন মীরা সাহিত্যচর্চার কথা তুলিল; আমার পরিচয় দিল।··· আমি স্বীকার করিতেছি মীরার এই হঠাৎ দিকপরিবর্তনে আমার সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পারি নাই। নিজেকে দোষ দিব না।—অবশ্য মীরার উপগ্রহদের প্রশংসার কথা ধরি না; কিন্তু মীরার নিজের মুখের দুটো প্রশংসার কথায় যে কি সুধা আছে, তাহা দুইটা মসির আঁচড়ে আপনাদের কি করিয়া বুঝাইব?··· আমি তাই সতর্ক থাকিতে পারি নাই; আমি আমার এ মোহের সাজা পাইয়াছি।

আমি বুঝিতে পারি নাই যে, প্রশংসার আড়ালে আড়ালে মীরা আমার জন্য নিদারুণ অপমানকে আগাইয়া আনিতেছে। সভাপতি কবিবার প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গেই সে আমায় জানাইয়া দিল—সভাপতি হইব কি, আমার এদের সভায় এদের পার্টিতে বসিবারই অধিকার নাই। কাণ্ডটা যে উদ্দেশ্যে করা, তদনুরূপ ভাষার প্রয়োগ করিলে

দাঁড়াইত—'যে কাজের জন্য মাইনে দিয়ে রাখা, তাই করুন গিয়ে। বাড়ীতে পার্টি হচ্ছে তো আপনার কি সম্পর্ক তার সঙ্গে? আর সভাপতি যখন হবেন, হবেন; আপাতত সে সব বড় কথা ছেড়ে তরুকে বেড়িয়ে নিয়ে আসুন।'

পূর্বে বোধ হয় বলিয়াছি মীরার এ আক্রোশ একটা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই মিথ্যার এক দিকে আমার যেমন দারুণ লজ্জা, অপর দিকে তেমনই সুনিবিড় তৃপ্তি। লজ্জা এই জন্য যে, মীরা ভাবিল আমি সরমার প্রতি অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছি, তাই এত লোক থাকিতে সরমার যোগ্যতার দিকে আমার এত দৃষ্টি, তার উপস্থিতির জন্য এত কৃতজ্ঞতার ছড়াছড়ি।—এত বড় লজ্জা জীবনে বোধ হয় আমার কমই ঘটিয়াছে। আমি সরমার বিষয় যাহা শুনিয়াছি, এ-বাড়ীতে তাহার যে প্রতিষ্ঠা, তাহার জন্য তাহার প্রতি আমার একটা অপরিসীম শ্রদ্ধা আছে। আমার বিশ্বাস যে, যে সরমার তিল তিল করিয়া আত্মোৎসর্গের কথা জানিবে না, সে ওকে না ভালবাসিয়া পারিবে না; যে জানিবে, সে তাহার পরও যদি বাসনা দিয়া সরমার বায়ুমণ্ডল কলুষিত করিতে চায়, বিশেষ করিয়া এই বাড়ীতেই থাকিয়া, তো তাহার মনুষ্যত্বে সন্দেহ হইবারই কথা।

এই একই মিথ্যার অন্য দিকে আছে চরম তৃপ্তি।—মীরা যদি ধরিয়াই লইয়া থাকে আমি সরমার পক্ষপাতী তো তাহাতে তাহার কি?—ঈর্ষা? যদি তাহাই হয় তো কোথায় সে ঈর্ষার উৎস?—আমার আর মীরার মাঝে নূতন করিয়া সরমা আসিল—এর মধ্যেই নয় কি?

কিন্তু এ-সব কথা যাক্।

তখনকার সব চেয়ে বড় কথা যা মনের সামনেই ছিল তা এই যে মীরাদের বাড়ীতে আমার এই শেষ দিন। মীরা আমায় কয়েক বারই খুব নিকটে টানিয়া আবার দূরে ঠেলিয়াছে, কিন্তু আজ চরম। তীব্র অপমানে শরীরটা কি ভারী করিয়া দেয়!—পার্টির মধ্য হইতে বাহির হইলাম যেন সমস্ত মাটি তিল তিল করিয়া মাড়াইয়া চলিয়াছি। পা উঠিতেছে না যেন—আমার অদ্ভুত চলার দিকে সবাই যেন চাহিয়া আছে—প্রত্যেকটি চক্ষুতে যেন ব্যঙ্গের কটাক্ষ—আমি এদের স্তরের এক জন মেয়েকে ভালবাসিতে গিয়াছি···স্পর্দ্ধা!

তরুকে লইয়া তাড়াতাড়ি মোটরে বাহির হইয়া গেলাম।

মাঠের পর গঙ্গার ধার, তাহার পর স্ট্রাণ্ড রোড অতিক্রম করিয়া ব্যারাকপুর রোড—আশ মিটিতেছে না, ইচ্ছা করিতেছে দূর—আরও দূর যাই, যেখানে আজকের অপরাহ্ণের স্মৃতি আর পঁহুছিতে পারিবে না। ড্রাইভারকে আদেশ দিয়া শুব্ধভাবে বসিয়া আছি, তরু প্রশ্ন করিয়াছে, এক-আধটা উত্তরও দিয়া থাকিব, কিন্তু কি প্রশ্ন আর কি উত্তর একেবারে মনে নাই। শুধু একটা কথা মনের মধ্যে ক্রমেই দৃঢ় হইয়া উঠিতেছে—কালই, তার বেশী আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। কাজ তো গৃহশিক্ষক, বাড়ীর এত বড় একটা উৎসবের মধ্যেও তিলমাত্র স্থান নাই বলিয়া মীরাই জানাইয়া দিল,—তার জন্য আবার নোটিস দেওয়া কি?

ফাঁকা রাস্তা, মোটরের হুড নামাইয়া দিয়াছি; হু হু করিয়া বাতাস আসিয়া মুখে চোখে সর্বাঙ্গে লাগিতেছে। তবুও ড্রাইভারকে মাঝে মাঝে বলিতেছি, "আরও একটু জোর দেওয়া যায় না জগদীশ?"

সমস্ত শরীর যেন উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে।

* * *

ফিরিবার সময় মাথাটা অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়াছে। বেশ একটু রাত হইয়াছে কিন্তু তখনও আমরা কলিকাতার বাহিরে। রাত্রির প্রশান্তির মধ্যে চিন্তার ধারা বদলায়। প্রতিজ্ঞা এরই মধ্যে একটু শিথিল হইয়াছে। অল্পে অল্পে, নিঃসাড়ে একটা প্রশ্ন আসিয়া মাথায় জাঁকিয়া বসিয়াছে—মীরার দোষ কোথায়?

—আমি গৃহস্থ সন্তান; ঠিক তাহাও নয়, দরিদ্র সন্তান। পড়িব এই উচ্চাশা লইয়া ট্যুইশ্যন করিতেছি, তাহাতে ভগবান্ আমায় আশার অতিরিক্ত সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। ফলও পাইতেছি;—সর্বপ্রকার সুবিধা এবং নিশ্চিন্ততার মধ্যে পড়াশুনা করিতে পাওয়ায় আমি এখন এম-এ ক্লাসের এক জন বিশিষ্ট ছাত্র। আমি আর এর বেশী কি আশা করিতে পারি? কিন্তু এই অচিন্তনীয়

সফলতাকেও অতিক্রম করিয়া আমার বাসনা মাথা চাড়া দিয়া উঠিল,—আমি চাই মীরাকে—আমার মনিবের সুন্দরী, সুশিক্ষিতা, অসাধারণ তীক্ষ্ণধী কন্যা মীরাকে, যে যে-কোন এক রাজকুমারেরও পরম কাম্য ধন!

না মীরার দোষ নাই। মীরা আমার উপকার করিয়াছে। আমি দিশাহারা হইয়াছিলাম, মীরা বন্ধুর মতই আমায় আমার নিজের জায়গাটিতে ফিরাইয়া আনিয়াছে। বোধ হয় ব্যাপারটা বেশ সুমিষ্টভাবে করে নাই; ভালই করিয়াছে, রুচিকর করিয়া করিতে গেলে আমার চেতনা হইত না।

না, নিজের স্বার্থের জন্য থাকিতে হইবে, থাকিতে হইবে নিজের গণ্ডী সম্বন্ধে সচেতন হইয়া।

মনে রাখিতে হইবে—আমার গণ্ডীর মধ্যে আছে মাত্র তরু, আর সবাই, সব কিছুই গণ্ডীর বাহিরে।

বাসায় যখন ফিরিলাম তখন আমার প্রতিজ্ঞা একেবারে শিথিল হইয়া গিয়াছে। অথবা এমনও বলা চলে, প্রতিজ্ঞাটার আকার পরিবর্তিত হইয়াছে এবং সেটা আরও দৃঢ় হইয়াছে। অর্থাৎ থাকিতে হইবে।

সরমার প্রতি কৃতজ্ঞতার কথা ভুলিয়া গিয়াছি; মনটা মীরার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া আসিতেছে।

১৭

ফিরিতে বেশ রাত হইয়া গেল। পড়ার হাঙ্গাম নাই, তরু উপরে চলিয়া গেল।

দেখি ইমানুল আমার দুয়ারের কাছে বারান্দাটিতে দাঁড়াইয়া আছে, আমারই অপেক্ষায় যেন। পার্টির সময় যে-সুটটা পরিয়াছিল, এখনও ছাড়ে নাই।

আমি সামনে আসিতে একটু অপ্রতিভ ভাবে হাসিয়া বলিল, "বড় লেট হয়ে গেল বাবু আজকে আপনাদের।"

এ-বাড়ীতে ইমানুল, ক্লীনার সকলেরই একটু-আধটু ইংরেজী বলিবার ঝোঁক আছে। ওরা যে ব্যারিস্টার-সাহেব-বাড়ীর চাকর, অন্য কোথারও নয়, এক-আধটা বুকনি দিয়া বোধ হয় সেইটে সূচিত করে, সবাই অন্ততঃ সাত-আটটি করিয়া কথা জানে; অবশ্য রাজু-বেয়ারা একটা স্কলার।

আমার দৃষ্টিটা হঠাৎ ইমানুলের শান্ত মুখের উপর যেন নিবদ্ধ হইয়া গেল। আমার যেন মনে হইল এত দিন একটা কৃত্রিম উচ্চতায় আরোহণ করিয়া ইমানুলকে ভাল করিয়া বুঝি নাই, আজ নিজের স্থানটিতে ফিরিয়া আসিয়া ইহাকে বেশ বোঝা যাইতেছে, চেনা যাইতেছে। ইমানুল আমার স্তরের মানুষ, আর একটু বোধ হয় নীচে—তা এমন নীচেই বা কি? ওর ভাই আছে, ভাজ আছে, ছোট ছোট ভাইপো আছে, অভাবগ্রস্ত দরিদ্র গৃহস্থের সংসারের মধ্য হইতে তাহারা বোধ হয় ওর দিকে চাহিয়া আছে। ইমানুল বাহিরে আসিয়াছে, পৃথিবীকে ভাল করিয়া দেখিতেছে, শিখিতেছে, উপার্জন করিতেছে; কোন এক সময়ে ফিরিবেই বা না, বাড়ী ছাড়িয়া কেহ কি চিরদিন থাকিতে পারে? বাড়ীর জন্যই তো উপার্জন করা, নিজেকে বড় করিয়া তোলা মানুষের···।

সব দিক দিয়া আমার সঙ্গে ইমানুলের একটা নিবিড় সাম্য আছে।···মীরা যেন আরও দূরে চলিয়া গেল।

কেমন অদ্ভুত কাণ্ড, ভুলের মধ্যেও ইমানুলের সঙ্গে আমার একটা সাদৃশ্য রহিয়াছে! আমি চাই মীরাকে, ইমানুল চায় মিশনরী সাহেবের যুবতী ভ্রাতুষ্পুত্রীকে। ইমানুল শুনিয়াছি মাহিনা লয় না; মিষ্টার রায়ের নিকট মাসে মাসে দশ টাকা করিয়া তাহার মাহিনা জমা হইতেছে। চার বৎসর হইয়াছে। হিসাব না-জানার কল্যাণে ইমানুল মনে মনে সঞ্চিত টাকাটার যে আন্দাজ করিয়া রাখিয়াছে সেটা আমাদের অঙ্কশাস্ত্র মত প্রায় চার হাজারের কাছাকাছি।···অর্থাৎ ইমানুল আমার চেয়েও মজিয়াছে।

ইমানুলকে বাঁচাইতে হইবে। আমার মোহ ভাঙিয়াছে মীরা, ইমানুলের যে মোহিনী সে কি তাহার মোহ ভাঙিতে আসিবে? না, ও-কাজটা আমায়ই করিতে হইবে, আমরা পরস্পরকে না দেখিলে দেখিবে কে? এই গৃহস্থরা, এই দরিদ্ররা?···

আমায় ঠায় চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া ইমানুল লজ্জিতভাবে মাথা নীচু করিল একটু, সঙ্গে সঙ্গেই আবার আমার মুখের পানে চাহিয়া, চক্ষুপল্লব কয়েক বার দ্রুত

স্পন্দিত করিয়া বলিল, "তাহ'লে যাই এখন, দেরী হয়ে গেছে আপনার ; এই বটন্-হোলটা নেন।"

দুঃখের আঘাতে এত কাছে আসিয়া পড়িয়াছি, ইমানুল মালীর সঙ্গে একটু ঠাট্টা করিবারও প্রবৃত্তি চাপিতে পারিলাম না। বটন্-হোলটা নিজের নাকের কাছে ধরিয়া হাসিয়া বলিলাম, "আহ্, বেশ চমৎকার! থ্যাঙ্ক ইউ মিষ্টার ইম্যানুয়েল বোরান্।"

ইমানুল হাসিয়া আবার মাথা নত করিল। আমি হাসিয়া প্রশ্ন করিলাম, "কিন্তু ব্যাপারখানা কি বল দিকিন, চিঠি লিখতে হবে ?"

ইমানুল মাথা নত করিয়াই বলিল, "কালই আসব তখন, মাষ্টার বাবু, আজ রাত হয়ে গেল আপনার··· মিছেই লেখা বোধ হয় বাবু, তবে টাকা অনেক জমিয়েছি, ফাদার চাইল্ড যদিই শোনে···"

কেমন এক ধরণের মূঢ় আশার হাসি হাসিল একটু।

আমি ইমানুলকে নিরস্ত করিব ঠিক করিয়াছিলাম, ওর মুগ্ধতা দেখিয়া প্রাণ সরিল না। কি হইবে মোহ ভাঙিয়া ? থাক না ; মোহই তো জীবন। ফাদার চাইল্ডের ভ্রাতুষ্পুত্রী তো জন্মে আসিবে না উহার কাছে, ও নির্ভয়ে করুক না পূজা।···মীরা সে আমার জীবন থেকে চলিয়া যাইতেছে, সুখী কি আমি সেজন্ত ? ওর ভ্রান্তি যদি কখনও আমার মত আপনি আপনিই ঘোচে, ঘুচিবে। তত দিন তাই থেকেই জীবনের রস নিঙড়াইয়া নিক না।

বলিলাম, "বলা যায় না ইমানুল, তুমি যেমন চাইছ, সেও তো তোমায় সেই রকম চাইতে পারে, তাহলে মাঝে থাকবে শুধু ফাদার চাইল্ডের মতটুকুর অপেক্ষা। তার জন্তে তো স্যাথেনিয়াল রয়েছেই, চেষ্টা করবেই। নাঃ, তুমি কাল নিশ্চয় এস।"

ইমানুল কৃতকৃতার্থ হইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় রাজু বেয়ারা আসিয়া উপস্থিত হইল। ইমানুলের পানে চাহিয়া বলিল, "জুটেছে সেই পোষ্টকার্ড নিয়ে মহাভারত লিখতে তো ?···ওঃ, আজ আবার রাজবেশ!"

ইমানুল লজ্জিত ভাবে সরিয়া গেল।

রাজু ঘরে ঢুকিয়া লাইটটা জ্বালিয়া বলিল, "আপনাদের রাত হয়ে গেল আজ, দিদিমণি কবার জিগ্যেস করলেন।"

আমার মুখ দিয়া আপনিই বাহির হইয়া গেল, "রাগ করেছেন নাকি ?"

আজ বিকালের আগে পর্যন্ত এমন কথা বলিতাম না। এই সন্ধ্যার পর থেকে হঠাৎ আবার মনিবের সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে মীরার সঙ্গে। যাহা বলিয়া ফেলিলাম আজকালকার মনোবিশ্লেষণের ভাষায় তাহাকে বলা যায়—অবচেতনার খেলা।

রাজু কোটটা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, "নাঃ, তেনার শরীরে রাগ নেই, সে রকম স্বভাবই নয়। আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন মাষ্টার মশা।"

এই আশ্বাসে আমার গা'টা যেন ঘিন ঘিন করিয়া উঠিল, কত নামিয়াছি আজ। রাজু আশ্বাস দেয়! ওকে জানাইয়া ফেলিয়াছি আমি শঙ্কিত।

রাজু হঠাৎ টেবিল ঝাড়া বন্ধ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "একটা কথা শুনেছেন মাষ্টার-মশা ?—হাইকোর্টে অরিজিনাল সাইডে এবার রেকর্ড নম্বর কেস!"

আজ পার্টিতে ব্যারিস্টার মহলে শোনা কথা।··· তরু চোখ বড় করিয়া বলে, "মাস্টার মশাই, কি নেশা রাজুর! তেমন তেমন বড় কথাগুলো আবার তক্ষুনি গিয়ে বাংলায় লিখে নেয়—তার পর মুখস্ত ক'রে ফেলে!"

আজকের পার্টিতে ইংরাজীর ফসল সংগ্রহ হইয়াছে বেশ মোটা রকম ; অকারণে আসবাব ঝাড়িতে ঝাড়িতে ওর মুখের ভাব দেখিয়া স্পষ্ট বোঝা যায় পরিচয় দিবার জন্ত রাজুর পেট ফুলিতেছে। আবার একটা ওজন-দুরন্ত বোঝা নামাইতে যাইবে, উপর হইতে বিলাস ঝিয়ের গলা শোনা গেল, "রাজু, মীরা দিদিমণি শীগ্গির তোমায় ডাকছেন, যেমন আছ চলে এস।"

বিলাস সিঁড়ির অর্ধেকটা নামিয়া আসিয়া খবরটা দিয়া আবার উঠিয়া গেল। বিলাস ঝি হোক, কিন্তু একটা রাজবাড়ীর প্রতিনিধি—একটু পর্দানসীন্। বনেদী ঝি,—আজকালকার আয়া নয় তো!

রাজু বেচারার মুখটা ফ্যাকাশে হইয়া গেল—'ঐ যাঃ ভুলেই গেছলাম'—তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়া একটা মুখসাঁটা খাম আমার হাতে দিয়া হন্তদন্ত ভাবে বাহির হইয়া যাইতেছিল, আবার উপর হইতে তাগাদা হইল—এবার খুব ত্রস্ত—"রাজু শোন,—একটু শীগ্‌গির এস।"

এবার সিঁড়ির মাথা থেকে। ডাকিতেছে স্বয়ং মীরা। কণ্ঠস্বর খুব বেশী রকম উদ্বিগ্ন!

আমি শঙ্কিত কৌতূহলে বাহির হইয়া আসিলাম; কিন্তু মীরা তখন আবার নিজের ঘরে চলিয়া গিয়াছে; দেখিতে পাইলাম না।

ডাকের চিঠি নয়, মাত্র শুধু নামটা লেখা, তাও বাংলায়। চিঠি কে দেয়?…চিন্তার মধ্যেই খামটা খুলিয়া ফেলিলাম।

ঠিক চিঠি-জাতীয় কিছু নয়, নিতান্ত সংক্ষিপ্ত দুটি কথা—

"মাস্টার মশাই, সরমা আমার প্রবাসী দাদার বাক্‌দত্তা।"

মুহূর্তের মধ্যে আমার সামনের বিজলী বাতি, ঘরের আসবাবপত্রসমেত যেন একটা আকস্মিক অন্ধকারের বন্যায় ডুবিয়া গেল। সমস্ত মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়া এক সূচীভেদের তীক্ষ্ণ জ্বালা, তাহার পর যেন নিজের অস্তিত্ব অনুভবই করিতে পারিলাম না।

কখন বসিয়া পড়িয়াছি, কতক্ষণ বসিয়া আছি জানি না। নিজেকে আবার অনুভব করিলাম রাজুর কথায়। রাজু হাঁপাইতেছে, মুখটা শুকাইয়া গিয়াছে, যেন কত দূর থেকে প্রাণপণে ছুটিয়া আসিয়াছে। বলিল, "মাস্টার মশা, সেই চিঠিটা—এক্ষুনি যে দিয়ে গেলাম?…"

সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বর এলাইয়া পড়িল; ছিন্ন খামের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে দীর্ঘ টানের সঙ্গে হতাশভাবে বলিল, "যাঃ, ছিঁড়ে ফেলেছেন?"

আস্তে আস্তে ফিরিয়া গেল, শুনিতেছি—সিঁড়ির ধাপে ওর মন্থর পদধ্বনি ধীরে ধীরে উঠিতেছে।

*　　　*　　　*

একটা অসহ্য রাত্রি গেল, সৃষ্টির আদিম অন্ধকারের মত দীর্ঘ। সে দিনের—সেই অপরাহ্নের উপযোগী একটা রজনী।

আমি মনে প্রাণে এই বাড়ী ছাড়িয়াছিলাম, আবার ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। স্থির করিয়াছিলাম থাকাই।—স্বার্থ। দরিদ্র যদি প্রতিজ্ঞা আঁকড়াইয়া থাকে তাহ হইলে তাহাকে আরও একটা জিনিস চিরদিনের জন্য আঁকড়াইয়া থাকিতে হয়,—সে-জিনিসটা দারিদ্র্য। তাই ফিরিয়াছিলাম। অদৃষ্ট আবার চরণকে বহির্মুখী করিল।…উপায় নাই; এই চিঠি, এই কুৎসিত সন্দেহের পরও থাকিলে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিবার সবই ছাড়িয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া থাকিতে হয়। স্বার্থের জন্য একেবারে নিঃস্ব হইয়া থাকিব কি না সেই বিনিদ্র রজনীতে শুধু সেই কথাই ভাবিলাম।

১৮

পরের দিন প্রভাতের রৌদ্র ছিল মলিন, সমস্ত বাড়ীটা থম্ থম্ করিতেছে। হয়তো আসলে এ রকম নয়, আর সব প্রভাতের মতই এটাও, শুধু আমার মনের ছায়া পড়িয়া এমনটা বোধ হইতেছে।

মীরা এদিকে রোজ সকালে বাগানে আসে। আমাদের অভিবাদনের বিনিময় হয়। আজ নামে নাই।

বেলা প্রায় নয়টা। তরু লক্ষ্মীপাঠশালা থেকে ফিরিয়া আসে নাই। মিস্টার রায় সকাল সকাল বাহির হইয়া গেলেন। আমি শ্রান্ত চরণে গিয়া মীরার ঘরের সামনে দাঁড়াইলাম। কাল তাহার চিঠি পাওয়ার পর থেকেই আহত মর্য্যাদার একটা তেজ অনুভব করিতেছি, সেই আমায় ঠেলিয়া আনিয়াছে, সেই আমায় মুক্তি দিবে।…কিন্তু কি অপরিসীম ক্লান্তি! মুখ দিয়া যেন কথা বাহির হইতেছে না!

তাহার পর চেতনা হইল—এমন ভাবে মীরার ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া থাকাটা কেহ দেখিয়া ফেলিতে পারে। ঠিক শোভন নয়।

নিজে বেশ বুঝিতেছি—একটা বিকৃত স্বরে প্রশ্ন করিলাম, "মীরা দেবী আছেন?"

উত্তর হইল, "কে···আসুন।"

আমি পর্দা উঠাইয়া ভিতরে গিয়া দাঁড়াইলাম।

মীরার ঘরটি একেবারে বিলাতী কায়দায় সজ্জিত। দেয়ালটা হালকা সবুজ রঙে রঙান। মেঝেয় সেই রঙের মোটা কার্পেট, তাহার উপর কৌচ, সেটি, চেয়ার, কারুমণ্ডিত ছোট ছোট টেবিল, সবগুলাই ঈষৎ গাঢ় থেকে হালকা সবুজ রঙে সুসমঞ্জসিত। এক দিকে একটা দেরাজ-সুদ্ধ মাঝারি সাইজের টেবিল। তাহার পাশে দুইটি সুদৃশ্য আলমারী, ঝকঝকে করিয়া বাঁধান বইয়ে ঠাসা। দেয়ালের ছবিগুলি প্রায় সব বিদেশী—র‍্যাফেল, মাইকেল এ্যাঞ্জেলো থেকে আরম্ভ করিয়া রেনল্ড্‌স্‌, টার্ণার, মিলে প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের চিত্রকরদের আঁকা; দেশীর মধ্যে কলিকাতার আর্ট এক্‌জিবিশনের পুরস্কারপ্রাপ্ত ইউরোপীয় পদ্ধতিতে আঁকা তিন-চার খানি ছবি।

ঘরটি সাজানর মধ্যে রুচির পরিচয় আছে, তবে একটু যেন বাহুল্য-ঘেঁষা; দু-চারখানা আসবাবপত্র ও খানকতক ছবি কম থাকিলে যেন আরও ভাল হইত।···মীরার রুচি আছে, তবে সেই সঙ্গে আধিক্যপ্রিয়তার একটা ছেলে-মানুষিও আছে; অবশ্য মেয়েছেলের মন একটু ছেলেমানুষি-ঘেঁষাই লাগে ভাল, অন্তত আমার তো ভাল লাগে।

মীরার ঘরে দেবদেবীর ছবি নাই, এই দিক দিয়া মায়ের সঙ্গে আড়াআড়িটা খুব স্পষ্ট।

অন্য কেহ ভাবিয়া মীরা স্বর শুনিয়াই "আসুন" বলিয়া দিয়াছে, আমি আসিব মোটেই এটা ভাবে নাই। এই প্রথম আসাও আমার। টেবিলের উপর একটা কৌচে হেলান দিয়া পড়িতেছিল মীরা, অন্তত আমি যখন প্রবেশ করিলাম তাহার পাশেই একটা ছোট টেবিলে একটা খোলা বই ওল্টান পড়িয়া ছিল, এবং তাহার উপর মীরার হাতটা ছিল।

কিন্তু একি চেহারা মীরার! আমি আসিবার সময় বারান্দার হ্যাট-ষ্ট্যাণ্ডের গোল আর্শিটাতে আমার নিজের চেহারার প্রতিচ্ছায়া হঠাৎ দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিলাম; মাত্র একটি রজনীর জাগরণ আমার; মীরা যেন ক' রাত্রি ঘুমায় নাই! মুখটা শুকাইয়া যেন লম্বাটে হইয়া গেছে, চোখে রাজ্যের শ্রান্তি!

আমি ভিতরে আসিতেই মীরা বিস্মিত হইয়া মুহূর্ত মাত্র আমার পানে চাহিয়া রহিল, পরক্ষণেই সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, "ও!···আপনি?"

আমি বলিলাম, "একটু দরকার পড়ে গেল, আসতে হ'ল, ইন্‌ট্রুড্‌ করলাম কি?"

আর সময় দিলাম না; বিনয়টুকু প্রকাশ করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে বলিলাম, "কাল রাত্রে রাজু আমায় একটা চিঠি দিয়ে আসে···"

মীরা ভদ্রতার খাতিরে উঠিয়া দাঁড়াইতে যাইতেছিল, যেন ভুলিয়া গেল। আমার পানে চাহিয়া থাকিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, তাহার দৃষ্টি নত হইয়া গেল। আমি বলিলাম, "আর জিজ্ঞাসা করবার অত দরকার দেখি না, তবু আত্মতৃপ্তি বা স্পষ্টভাবে অতৃপ্তির জন্য আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি মীরা দেবী—চিঠিতে যে কথাটার সঙ্কেত আছে সেটা কি সত্যই আপনি বিশ্বাস করেন?"

মীরা নিজের উপর সংযম হারাইতেছে, স্ত্রীলোকই তো? তাহার উপর সেই স্ত্রীলোক যে ভালবাসিয়াছে। ভালবাসা দুর্বল করে; পুরুষকেও করে, স্ত্রীলোককেও করে; কিন্তু স্ত্রীলোককে যতটা করে পুরুষকে তার শতাংশের এক অংশও করে না বোধ হয়। এই দুর্বলতায় স্ত্রী পুরুষের চেয়ে ঢের বেশী শক্তিশালিনী। মীরা যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িল, আমার মুখের উপর শঙ্কিত দৃষ্টি তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "কি সঙ্কেত—সঙ্কেত কি? আমি তো শুধু···" শেষ করিতে পারিল না। এক দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে, আর অন্য দিকে উত্তর নিষ্প্রয়োজন বলিয়া নির্বিকার দৃষ্টিতে আমরা উভয়ে উভয়ের দিকে একটু চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর আমি বলিলাম, "সরমা দেবী যে আপনার দাদার বাগ্‌দত্তা সেটা আমি অনেক আগে থেকেই জানি মীরা দেবী। আর জানার পর থেকে ওঁকে যতটুকু দেখতে বা বুঝতে পেরেছি তা দিয়ে ওঁর সম্বন্ধে আমার খুব একটা বিস্ময়ের বা শ্রদ্ধার ভাব আছে। আমি এ-সম্বন্ধে বেশী কিছু বলব না, কেন-না, খুব গভীর অনুভূতি আর উপলব্ধি সম্বন্ধে বেশী বলা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। কথা জিনিসটা নিজেই হালকা ব'লে মনে হয়, উপলব্ধিটাকেও হালকা

ক'রে ফেলবে। আমার এত কথা বলবারও ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু এসে পড়ল। আসলে এ প্রসঙ্গটা তোলবারই ইচ্ছে ছিল না আমার; আমি বলতে এসেছিলাম অন্য কথা।"

মীরা দৃষ্টি নামাইয়া লইয়াছিল, আবার তুলিয়া আমার মুখের পানে চাহিল। আমি বলিলাম, "আমি বলতে এসেছিলাম—আপনি আপনার বাছাই সম্বন্ধে নিরাশ হয়েছেন, এটা আমি বেশ অনুভব করছি। এই তরুর টিউটার বাছাই সম্বন্ধে।"

মীরা সচকিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "সে কি!"

আমি ওর কথার উত্তর না দিয়া বলিলাম, "এটা যে হবেই আমার বরাবরই এ-রকম একটা আশঙ্কা ছিল—যে-রকম বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করেই, পরিচয় না নিয়েই আপনি আমায় কাজে নিয়োগ ক'রে নিলেন। আমি অনেক বার দেখেছি আপনার চেহারায় অনুতাপের ভাব ফুটেছে; যেন আপনি ঠকেছেন, যেন অন্য রকম টিউটার রাখা উদ্দেশ্য ছিল আপনার।"

মীরা বেশ ভাল করিয়া সোজা হইয়া বসিল; বেশ বুঝিলাম সরমার ব্যাপার থেকে আমার যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রসঙ্গে আসিয়া পড়ায় সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। একটা মানুষের দৈনন্দিন রুটিনের কাজ লইয়া আলোচনা করাটার মধ্যে সূক্ষ্মতার কোন বালাই নাই—বেশ মোটা একটা ব্যাপার—প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করুন বা নিন্দা করুন, কেহ মনস্তত্ত্বের চুলচেরা বিচার করিতে যাইবে না, কেহ আপনার মনের গবাক্ষপথে উঁকি মারিতে যাইবে না।···মীরা এতক্ষণে বেশ সপ্রতিভ হইয়া জোরের সহিত বলিল, "না, ও-কথা ব'লে আপনি আমার প্রতি অবিচার করছেন শৈলেনবাবু, আপনাকে রাখার জন্য মোটেই অনুতপ্ত নই আমি। আপনি যে খুব ভাল এক জন শিক্ষক, মা, বাবা থেকে নিয়ে বাড়ীর সবাই একথা স্বীকার করি আমরা। আমার মুখে এ ব্যাপার নিয়ে···"

আজ আমি চলিয়া যাইতেছি, সুতরাং সঙ্কোচের আর প্রয়োজন কি অত? অবশ্য স্পষ্টভাবে মীরাকে আমি পাই নাই, তাই স্পষ্টভাবে কিছু বলার কথা উঠিতেই পারে না, তবু মন তো দু-জনের দু-জনেই আভাসে জানি? আভাসেই একটু বলা যাক্ না, কাল থেকে দু-জনের তো দুই পথ।

মীরাকে শেষ করিতে না দিয়া বলিলাম, "মীরা দেবী, আমার কাজ তরুর মাস্টারি, তাতে আমি যথাসাধ্য করিই—এ আত্মপ্রত্যয়টুকু আমার আছে। আর, একটা মানুষের সবচেয়ে বড় প্রশংসা এই যে, সে যথাসাধ্য করছে। কিন্তু মাস্টারির অতিরিক্ত আর একটা কথা আছে।"

মীরা আমার পানে চাহিয়া বলিল, "বলুন।"

আমার একটু দ্বিধা আসিল, সেটা কাটাইয়া লইয়া বলিলাম, "সে-কথাটা এই যে একটা মানুষ আমাদের আশেপাশে থাকলে তার সঙ্গে আমাদের কাজের সম্বন্ধ ছাড়া আরও অনেক সম্বন্ধ এসে পড়ে···"

মীরা দৃষ্টি নত করিয়া বাম অনামিকার আংটিটা ধরিয়া ধীরে ধীরে ঘুরাইতেছিল, এইখানে হঠাৎ থামিয়া গেল, মনে হইল তাহার মুখটাও যেন রাঙা হইয়া উঠিল। আমি মুহূর্ত মাত্র একটু থামিয়া আবার বলিয়া চলিলাম, "কিছু না হোক্, এক জন সঙ্গীও তো সে? কথাটা ঠিক সঙ্গী নয়, ইংরেজীতে যাকে বলে নেবার (neighbour) অর্থাৎ যার সঙ্গে আত্মীয়তা না থাকলেও খুব কাছে কাছে থাকার হেতু একটা নিবিড় পরিচয় আছে। আমার মনে হয়, এই নেবার হিসেবে—তরুর মাস্টার নয়—পরিচিত এক জন মানুষ হিসেবে আমি আপনাকে নিরাশ করেছি।"

মীরা আমার পানে তার সেই নিজস্ব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চাহিল, যেন ক্ষণমাত্র কি-একটা ভাবিল, তাহার পর বলিল, "যখনই আপনার সাহায্য চেয়েছি, একটুও বিরক্ত না হয়ে আপনি আমায় সাহায্য করেছেন; আপনি না থাকলে এই পার্টিটা যে কি হ'ত! এর পরেও আমি মনে করব আপনাকে নিয়োগ করা আমার ভুল হয়েছে? আমায় এত ছোট মনে করলেন কেন আপনি?"

এর পরে কথাটা বলিতে কষ্ট হইল, কিন্তু উপায় ছিল না বলিয়াই বলিলাম, "আমি ঠিক ওকথা বলতে চাইছি না। সামান্য কি একটু করেছি না-করেছি সে নিয়ে আপনি লজ্জা দেবেন না আমায়। আমি কথাটা অন্য

বহুকালের পুরাতন, ১৩৪৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত অযোধ্যা নগরীর ভগ্নস্তূপ হইতে পবিত্র শঙ্খ আবিষ্কার

'ই-নাও' নাটকের একটি দৃশ্য
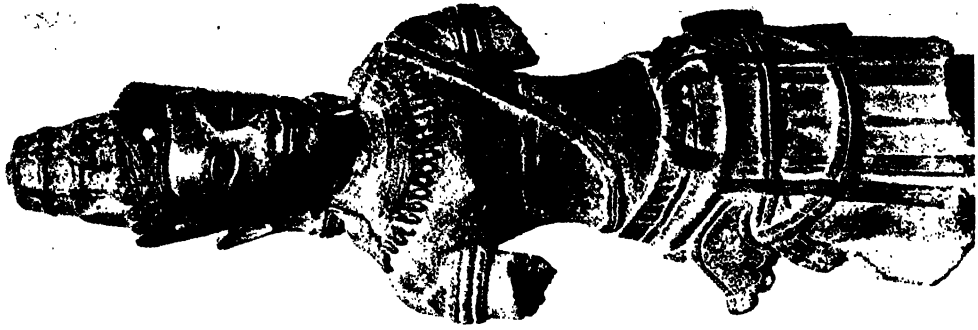
ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি (অযোধ্যা

ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত শিবমূর্ত্তি (অযোধ্যা
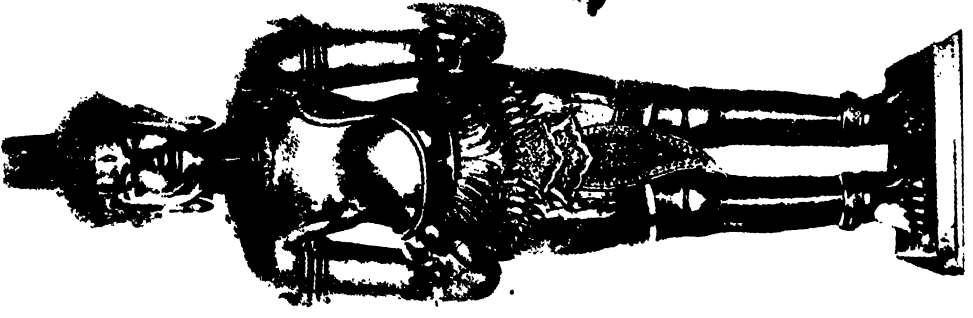
ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত শিবমূর্ত্তি (অযোধ্যা
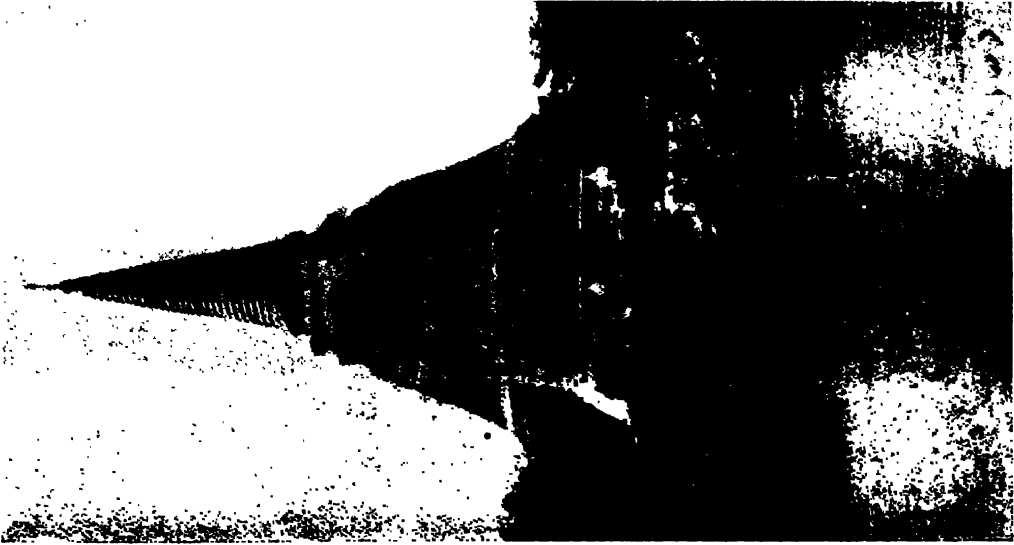
পটমে ৩৮০ ফুট উঁচু স্তূপ। রাজা মংকুট
৫১-১৮৬৮) ইহার সংস্কার ধন করেন।
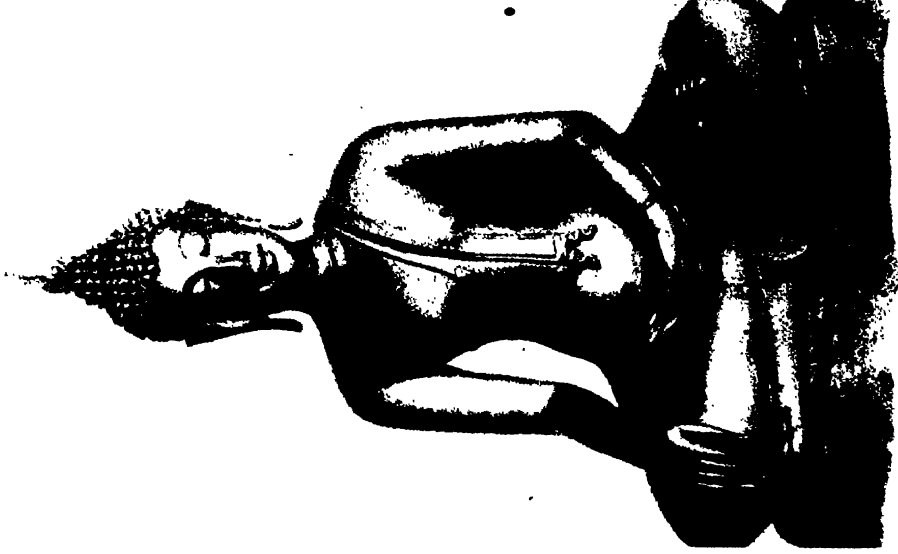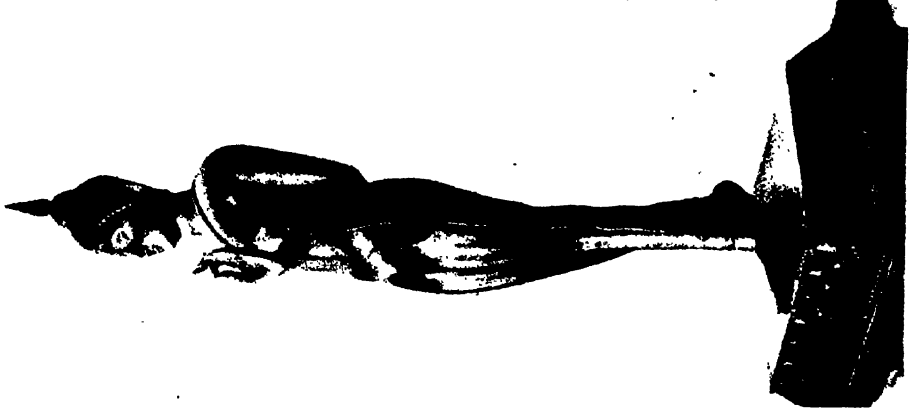
ব্রোঞ্জ-নির্মিত বুদ্ধমূর্তি

ব্রোঞ্জ-নির্মিত বুদ্ধমূর্তি

নানের বৌদ্ধ মন্দিরে চিত্রাঙ্কিত দ্বার

লাম্‌পাং লুয়াঙের বৌদ্ধ বিহার

বিহারের পশ্চাতে স্তূপ

উত্তর-শ্যামের বৌদ্ধ পুরোহিতগণ

ভাবে বলছিলাম—ধরুন, আপনার এই নেবার তো এমনও হ'তে পারে যে আপনার দাদার বাগ্‌দত্তার সম্বন্ধেই একটা অনুচিত মনোভাব পোষণ করতে পারে…"

ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই সরমার কথা! চিঠির প্রসঙ্গটা চাপা পড়ায় মীরা যেন পরিত্রাণ পাইয়াছিল, এবারে কি করিবে, কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া ধীরে ধীরে সোফায় এলাইয়া পড়িল। হাত দুইটা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মুখের উপর জড় করিয়া একটু মৌন রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার মুখের রেখাগুলা কঠিন হইয়া উঠিল, নাসিকা-প্রান্তের সেই কুঞ্চন জাগিয়া উঠিল। ধীর অথচ একটু রূঢ় কণ্ঠে বলিল, "পারে বইকি, মাস্টার-মশাই।"

আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। কেমন করিয়া স্পষ্টস্বরে কথাটা বলিতে পারিল মীরা! আমি বেশ ভাল করিয়া বুঝিতেছি, ও যাহা বলিল তাহা বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করিবেই তো রাজুকে দিয়া চিঠিটা ফিরাইয়া আনিতে গিয়াছিল কেন? ওর এটা বিশ্বাস নয়, পরন্তু সরমার সৌন্দর্য সম্বন্ধে একটা আতঙ্ক, যাহা অযথাই ওর মনে একটা ঈর্ষা আনিয়া দিয়াছে। এই ঈর্ষাটা এই জন্য নয় যে আমি সরমাকে ভালবাসিয়া থাকিতে পারি, পরন্তু এই জন্য যে মীরা আমায় ভালবাসে।…মীরা কি রকম মেয়ে আমি ভাল রকম জানি, —যদি ওর বিশ্বাস হইত যে আমি সরমার অনুরাগী, ও ওর প্রবাসী ভাইয়ের এ অপমান কোন মতেই সহ্য করিত না। চিঠি ফেরত লওয়া তো দূরের কথা; চিঠি লিখিতই না, অন্যভাবে এবং অবিলম্বে এ-বাড়ীর সঙ্গে আমার সংস্রব ছেদন করিত।

সে-ছেদনে যদি তাহার নিজের মর্মই রক্তাক্ত হইত তো মীরা গ্রাহ্য করিত না।

অবশ্য এখন যে উত্তরটা দিল সেটা আমার তর্কে কোণঠাসা হইয়া মরিয়া হইয়া; তবুও আমার মনটা এমন বিষাইয়া গিয়াছে যে আমি মার্জনা করিতে পারিলাম না। বলিলাম, "এত বড় অন্যায় আমি আজ পর্যন্ত জীবনে পাই নি, মীরা দেবী; আর, সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, আপনি বোধ হয় মন থেকে বিশ্বাস না করেও এ-অপবাদটা আমায় দিলেন, কেন-না পার্টিতে যে-ব্যাপারটুকু হয়েছিল—অর্থাৎ সরমাকে যে বারদুয়েক প্রশংসা করেছিলাম বা কম্‌প্লিমেণ্ট্‌ দিয়েছিলাম—যা উপলক্ষ ক'রে এতটা ব্যাপার, তার আসল হেতুটা আপনার মত বুদ্ধিমতী একজন যে বুঝতে পারেন নি, এটা আমি কখনই বিশ্বাস করব না। কিন্তু যাক্‌, সেটা আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কথা, ভুল হ'তেও পারে। তাই আমায় ধ'রে নিতে হবে আপনি পারেন নি বুঝতে কারণটা, সুতরাং নিজেকে ক্লীয়ার করবার জন্যে আমার বুঝিয়ে দেওয়াই ভাল। সরমা দেবী সম্বন্ধে কাল আমি দুবার দুটো কথা বলেছিলাম,—একবার আপনার মায়ের সাক্ষাতে। আপনার মা সরমা দেবীকে আমার কাছে পরিচিত করার প্রসঙ্গে বললেন, 'এমন চমৎকার মেয়ে হয় না শৈলেন'… সরমা দেবী প্রশংসায় লজ্জিত হয়ে হেসে বললেন—'এমন চমৎকার কাকীমা হয় না শৈলেনবাবু, শুধু শুধু এত প্রশংসা করতে পারেন।'—আমার শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের কথা ছেড়েই দিন, একজন নবপরিচিতা মেয়ে সম্বন্ধে বলা হচ্ছে কথাটা, সে-হিসেবেও অপর্ণা দেবীর প্রশংসাটা সমর্থন করা উচিত ছিল আমার। তাই আমি বলি, 'যোগ্যের প্রশংসায় মস্ত বড় একটা আনন্দ আছে সরমা দেবী।…' তার পর প্রসঙ্গ ধ'রে আরও একটুখানি প্রশংসা করতে হয়।—আমার এই হ'ল প্রথম অপরাধ।"

মীরা তেমনই কঠিন হইয়া বসিয়া আছে; চুপ করিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আবার দৃষ্টি নত করিল।

আমি বলিতে লাগিলাম, "দ্বিতীয় অপরাধ,—চায়ের টেবিলে আমরা সবাই যখন ব'সে, তখন কথাপ্রসঙ্গে আমি জানাই যে সরমা দেবী আসায় আমরা সবাই কৃতজ্ঞ।"

এইবার আঘাতটা একটু ব্যাপক ভাবে দেওয়ার জন্য আমার মনটা যেন মাতিয়া উঠিল;—একটা আঘাত দিব যাহা ব্যারিস্টারের কন্যা আর তাহার স্তাবকদের একসঙ্গে গিয়া লাগিবে। আর তো যাইতেছি,—কিসের দ্বিধা বা সঙ্কোচ?

বলিলাম, "মীরা দেবী, আমি গরীব, পার্টিতে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য এবং সুযোগ আমার স্বভাবতই এর আগে পর্যন্ত হয় নি। কিন্তু একটা জিনিস জানি—তা এই যে, আমাদের পার্টি জিনিসটা—শুধু পার্টি কেন, স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সারা ব্যাপারটাই ইংরেজদের নকল। তা যদি হয় তো নকলটা ঠিক মতই হওয়া উচিত, আধা-খ্যাঁচড়া হ'লে বড় বিসদৃশ হয়ে ওঠে। আমি মেয়ে-ছেলেদের কথা বলছি না, কিন্তু আমাদের টেবিলে আজ যে-ক'টি পুরুষ বসেছিলেন, তাঁদের দেখে মনে হ'ল যে তাঁরা টাই-বাঁধা, কাঁটা-চামচে ধরা, কি কাপে নিখুঁৎ ভাবে চুমুক দেওয়ার কায়দা রপ্ত করতেই এত বেশী সময় দিয়েছেন যে ইংরেজরা যেটাকে নিতান্ত মামুলী ভদ্রতা ব'লে জ্ঞান করে সেটার দিকে পর্যন্ত নজর দেওয়ার অবসর পান নি।—দু-জন মহিলা একসঙ্গে বসে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে এক জনকে,—বিশেষ ক'রে সেই এক জনকে যিনি হোস্টেস্ (নিমন্ত্রণকর্ত্রী)—প্রশংসায় কম্‌প্লিমেণ্টে বিপর্যস্ত ক'রে অপর জনের সম্বন্ধে নীরব থাকা কোন ইংরেজ কস্মিন্ কালেও ভাবতে পারে না। অথচ ঠিক এই জিনিসটি হয়েছিল কাল, নিশ্চয় আপনার চোখ এড়ায় নি। আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম ওদের প্রশংসার স্রোতটা একবার একটুখানিও সরমা দেবীর অভিমুখী করতে, আশা করেছিলাম কারুর না কারুর নজর এই ত্রুটিটুকুর দিকে পড়বেই, শেষে একেবারেই নিরাশ, নিরুপায় হয়ে আমাকেই সেটুকু সংশোধন ক'রে নিতে হ'ল। তাও আমি কখন করলাম, না, নীরেশবাবু যখন হোস্টেসের প্রশংসায় এতটা মেতে উঠেছেন যে সরমা দেবী একটা কথা বলছিলেন, তাঁকে থাবা দিয়ে নিজের কথা এনে ফেললেন।"

মীরা শেষের দিকে স্থির নয়নে আমার মুখের পানে চাহিয়া কথাগুলা শুনিতেছিল—একটু বিস্মিত—আমার মত স্বল্পবাক্ লোক যে এত কথা বলিবে, আর এত স্পষ্টভাবে, ও যেন ভাবিতে পারে নাই, বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।

আমি ওর মনের কথা ধরিয়াই বলিলাম, "আমার এত কথা বা এসব কথা বলবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু প্রয়োজন হয়ে পড়ল, কেন না, আপনার বিশ্বাস আপনাদের বাড়ীর টিউটার আপনার দাদার বাগ্‌দত্তা সম্বন্ধে একটা অনুচিত মনোভাব রাখতে পারে, এবং সে কাল সরমা দেবী সম্বন্ধে যা কিছু বলেছে তার মূলে ঐ অনুচিত মনোভাব।"

মীরার মুখের সেই কঠিন ভাবটা অনেকটা নরম হইয়া আসিয়াছে। ধীরে, একটু যেন অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল, "'রাখতে পারে"—বলেছি শৈলেনবাবু, মাত্র একটা সম্ভাবনার কথা, 'রেখেছে'—এ কথা তো বলি নি। আপনি উত্তেজিত হয়েছেন।...আমারও ভুল দেখুন—আপনাকে বসতেই বলা হয় নি!...বসুন আপনি, দাঁড়িয়ে কেন?"

একটু হাসিয়া বলিলাম, "না, বসার বিপদ এই যে, বসলেই দাঁড়াতে একটু দেরি লাগে; আমার সময় খুব অল্প। থাক্, ধন্যবাদ।...হ্যাঁ, আমি সেই কথাই বলতে এসেছি—এই সম্ভাবনার কথা,—অর্থাৎ সরমা দেবীকে অন্য নজরে দেখা হয়তো আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে পড়তে পারে এক দিন। সেই সম্ভাবনার মূলই আমি নষ্ট ক'রে দিতে চাই। আপনারা আমার প্রতি অশেষ দয়া দেখিয়েছেন। এখন আমি যাতে আপনাদের অনুগ্রহের এবং আতিথেয়তার অপমান না ক'রে বসি, সেই জন্যে বিদায় নিতে এসেছি। তরুর একটু ক্ষতি হবে লোক ঠিক না হওয়া পর্যন্ত, কিন্তু আমি আর কোন মতেই দেরি করতে পারছি না। এক কথায় রাখতেও আপনার দয়া প্রকাশ পেয়েছিল, যাবার সময় ঠিক সেই দয়াটুকু আবার দেখাতে হবে। আমায় আজই ছেড়ে দিন...।" ক্রমশঃ

সভ্যতা (civilisation) এবং সংস্কৃতি (culture)

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সভ্যতার সঙ্গে সংস্কৃতির পার্থক্য আছে। সভ্যতা হ'চ্ছে বাহিরের দেহ, সংস্কৃতি হচ্ছে সেই দেহের ভিতরে প্রাণ। সভ্যতার প্রকাশ রাজনীতির ক্ষেত্রে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে, যন্ত্র-শিল্পের ক্ষেত্রে—সংস্কৃতির প্রকাশ ললিতকলায়, সাহিত্যে, ধর্ম্মে, নীতির অনুশাসনে। আমরা যা, তাই হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি--আমরা যা প্রয়োজনে লাগাই তাই হচ্ছে আমাদের সভ্যতা। ম্যাকিভারের (MacIver) ভাষায়, Our culture is what we are, our civilisation is what we use. কল-কারখানার জন্য আমরা কল-কারখানা চাই নে। আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি পেতে হ'লে কল-কারখানার আশ্রয়-গ্রহণ ব্যতীত উপায় নেই। সেই জন্যই আমরা তাদের চাই। কল-কারখানার আশ্রয় না নিয়ে আমাদের দরকারী জিনিষগুলি পাওয়া যদি সম্ভব হ'ত যন্ত্রশিল্পের আমরা কোনো ধারই ধারতাম না। সংস্কৃতির বেলায় কিন্তু স্বতন্ত্র কথা। তার মধ্যে আমাদের জীবনের পরিপূর্ণতা। বেটোফেনের সঙ্গীতকে আমাদের কোনো প্রয়োজন মেটানোর বাহন হিসাবে আমরা ব্যবহার করিনে; সঙ্গীতের নিজস্ব একটা মূল্য আছে যার জন্য গানের এত কদর। রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতাকে অথবা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিকে আমাদের স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসাবে আমরা কাজে লাগাই নে। কবিতার জন্যই কবিতাকে আমরা ভালোবাসি। উচুদরের কবিতার মধ্যে এমনই একটা অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য আছে যে তার সঙ্গে পরিচয় আমাদের চিত্তকে আনন্দরসে পূর্ণ ক'রে ফেলে। আমাদের চিত্ত আনন্দের পিয়াসী। স্থূলপ্রবৃত্তির চরিতার্থতায় আনন্দ আছে—কিন্তু তার স্থায়িত্ব অল্পই। বন্যপ্রবৃত্তির পরিণতি সুখের সমাধিতে। কিন্তু সৌন্দর্য্যের সান্নিধ্যে আমরা যে আনন্দ অনুভব করি তা যেমন গভীর, তেমনই স্থায়ী। আর্টের মধ্যে সুন্দরের প্রকাশ। সেই জন্য উচ্চস্তরের কোনো শিল্পীর রচনা সরাসরি আমাদের চিত্তকে এমন একটি রসলোকে উত্তীর্ণ ক'রে দেয় যেখানে বিশুদ্ধ আনন্দের উপলব্ধিতে আমাদের জীবন ধন্য হয়ে যায়। রেল-গাড়ীর বেলায়, টেলিফোনের বেলায় অথবা পার্লামেন্টের বেলায় এটি খাটে না। প্রয়োজনের দিক দিয়ে তাদের মূল্য নেহাৎ কম নয়—কিন্তু তাদের মধ্যে নেই আমাদের মনের গভীরতম কামনার পরিতৃপ্তি। আর্ট, সাহিত্য, ধর্ম—এরাই অন্তরকে দিতে পারে সেই তৃপ্তি। আমাদের মধ্যে যা গভীরতম সত্য—সংস্কৃতির মধ্যে তারই অভিব্যক্তি।

সভ্যতার সঙ্গে সংস্কৃতির তফাৎ বিস্তর। সভ্যতার জয়যাত্রায় পৃষ্ঠপ্রদর্শনের কোনই প্রশ্ন ওঠে না—নিত্য নূতন উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে, নব নব আবিষ্কারকে আশ্রয় ক'রে তার উত্তরোত্তর পুষ্টিসাধন চলেছেই। পুরাতন নূতনকে স্থান ছেড়ে দিয়ে পথিপার্শ্বে স'রে দাঁড়াচ্ছে—নূতনের স্থান অধিকার করছে আবার নূতনতর কোনো আবিষ্কার। সভ্যতার অভিধানে পূর্ণচ্ছেদ ব'লে কোনও শব্দ নেই। আকাশের দিকে ক্রমাগত উঠছে তার ইমারত। যুগের পর যুগ আসছে--পাথরের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে পাথর—ইমারতের কলেবর এবং উচ্চতা চলেছে সমানে বেড়ে। সুতার কল, টাইপ-রাইটার, রেলগাড়ী প্রথম যখন আবিষ্কৃত হোলো তখন তাদের রূপ ঠিক যেমনটি ছিল, এখন আর তেমনটি নেই—অনেক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে তারা বর্ত্তমানের উন্নত অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই উন্নতি এক দিনে সাধিত হয় নি—ক্রমশঃ হয়েছে। সভ্যতার দানকে যেমন আমরা অতি সহজে পাই অতীতের হাত থেকে—সংস্কৃতির উপরে আমাদের অধিকার অত সহজে প্রতিষ্ঠিত হয় না। সংস্কৃতিকে যুগে যুগে নূতন ক'রে অর্জন করবার প্রয়োজন আছে। সভ্যতার বেলায় আমরা দেখতে পাই, অতীতের তুলনায় বর্ত্তমান অধিকতর সমৃদ্ধিশালী। গ্যালিলিও অথবা নিউটন যা আবিষ্কার করেছেন তাকে ভিত্তি ক'রে বিজ্ঞানের জয়রথ

পরবর্তীকালে অনেকদূর আগিয়ে গেছে। সংস্কৃতির বেলায় আমরা কিন্তু জোর ক'রে বলতে পারি নে— অতীতকে বর্তমান ছাড়িয়ে যাবেই। আর্টের রাজ্যে গ্রীকেরা যে ঔৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছে—পরবর্তীযুগগুলি সে ঔৎকর্ষের পরিচয় দিতে পারে নি। মাইকেল এঞ্জেলো ভাস্কর্যে যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন—আজ পর্যন্ত তা অতুলনীয় হ'য়ে আছে। নাট্যজগতে আজও সেক্সপীয়রের জুড়ি মিললো না। সঙ্গীতের জগতে এমন একটা প্রতিভার আজও আবির্ভাব হোলো না যাকে আমরা বেটোফেনের পাশে অসঙ্কোচে স্থান দিতে পারি। কালিদাসের চেয়ে বড় কবি ভারতবর্ষে আর জন্মালো কোথায়? এমন কথা বলছি নে যে মানুষ সংস্কৃতির দিক দিয়ে সামনের দিকে একটুও আগায় নি। অবশ্যই আগিয়েছে—কিন্তু সভ্যতার জয়যাত্রায় যেমন পিছু-হটার ব্যাপার আদৌ ঘটে নি—সংস্কৃতির বেলায় সে রকম নয়। সংস্কৃতির জয়যাত্রা চলেছে পাহাড়ে পথের ওঠা-নামার মধ্য দিয়ে। সেখানে কখনো 'চড়াই', কখনো 'উৎরাই'। অন্ধকারের যুগের পরে এসেছে আলোর যুগ। সেই আলোর যুগ আবার ঢাকা পড়ে গেছে বর্ব্বরতার অন্ধকারে। সংস্কৃতির যাত্রাপথ আলো-ছায়ায় বৈচিত্র্যময়।

সংস্কৃতির উপরে অধিকার যে সহজ-লভ্য নয়, তার কারণ, তার মধ্যে মানুষের অন্তরাত্মার সহজ অভিব্যক্তি। কবি যা রচনা করেন তা সকলের পক্ষে বোধগম্য হওয়া সম্ভব নয়—তার মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারে তারাই যাদের অন্তর কবির উপাদানে তৈরি। রসস্রষ্টা যে—তার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি সকলের জন্য নয়, কেবল রসিক জনের জন্য। রসিক মানুষ যেখানে নেই সেখানে উলুবনে মুক্তা ছড়ানোর মতোই রসসৃষ্টি একটা বিড়ম্বনা মাত্র। অরসিকের কাছে রস নিবেদন এই জন্যই শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। যেখানেই আর্টের সোনালি ফসল—সেখানেই দু-জন আর্টিস্টের অস্তিত্ব আমাদের স্বীকার ক'রে নিতে হবে—এক জন আর্টিস্ট হলেন রসের স্রষ্টা—আর এক জন আর্টিস্ট হলেন আর্টের সমজদার। যেখানে দুটো মানুষের মনের তার এক সুরে বাঁধা নয় সেখানে আর্টের অভিব্যক্তি মাঠে মারা যেতে বাধ্য। কবির কাব্য শুধু কবিরই জন্য—শিল্পীর ছবির আদর কেবল শিল্পীরই কাছে। কবির সৃষ্টি সম্পর্কে যে-কথা সত্য—এঞ্জিনীয়ারের সৃষ্টি সম্পর্কে কিন্তু সে-কথা সত্য নয়। এঞ্জিনীয়ার যে ব্রিজ নির্ম্মাণ করে—সে কেবল আর দশ জন এঞ্জিনীয়ারের জন্য নয়—রামা-শ্যামা-যদু-মধু সকলেরই জন্য। কবির কাব্য বুঝতে গেলে নিজের মধ্যে এক জন কবি থাকা চাই। সেই কবিত্ববোধ যার মধ্যে নেই তার জন্য কবির কবিতা নয়। এঞ্জিনীয়ারের তৈরি ব্রিজের উপর দিয়ে চলতে গেলে এঞ্জিনীয়ারী বিদ্যের সঙ্গে কিন্তু পরিচয় থাকার কোনই প্রয়োজন হয় না। বিজ্ঞানের জটিল রহস্যের সঙ্গে বিন্দুমাত্র পরিচয় নেই—এমন লক্ষ লক্ষ মানুষ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুযোগ প্রতিনিয়ত গ্রহণ করছে। আমাদের যুগ বুদ্ধির দিক দিয়ে কতখানি অগ্রসর হয়েছে—অন্যান্য যুগের সঙ্গে তার পার্থক্য কতখানি—এর একটা সঠিক ধারণা পেতে গেলে যন্ত্রশিল্পের উন্নতিকে বিচারের মাপকাঠি করলে চলবে না। পার্লামেণ্ট, কর্পোরেশন, ইন্সিওরেন্স কোম্পানী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কষ্টিপাথরে ঘ'ষে প্রগতির পরিমাণ নির্ণয় করতে গেলেও আমরা বিফল হব। আমাদের এই বিংশশতাব্দী প্রগতির পথে কতখানি অগ্রসর হয়েছে—জ্ঞানের দিক দিয়ে, বুদ্ধির দিক দিয়ে আমাদের এই যুগ অতীতকে কতখানি ছাড়িয়ে গেছে—তার যথার্থ পরিচয় পেতে হ'লে বর্ত্তমান যুগের লেখকেরা কি রকম বই লেখে এবং পাঠকেরাই বা কি ধরণের বই পড়ে, জনসাধারণ যে-সব আদর্শ মনের মধ্যে পোষণ করে তাদের রূপ কেমন, যে-সব আনন্দের পিছনে তারা ছুটে বেড়াচ্ছে তাদের ধরণটাই বা কি, যে-সকল ধর্ম তারা আচরণ করছে কি রকম তাদের প্রকৃতি—এই সব দিয়েই আমাদের বিচার করতে হবে। মানুষটা কোন্ স্তরের—তা জানতে গেলে সে কি বই পড়ে, কোন্ আদর্শের পূজারী, আনন্দকে কোন্ পথে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে—এই সব জানাই দরকার। এগুলোর মধ্যেই পাওয়া যাবে তার সত্যিকারের পরিচয়। গঙ্গার ধারে ধারে কতগুলো পাটের কল গজিয়ে উঠেছে—তার সংখ্যা গণনার মধ্যে আধুনিক বাংলার সত্যিকারের পরিচয় মিলবে না। তার প্রাণের পরিচয় আমরা খুঁজে পাবো বাংলার সাহিত্যে, সঙ্গীতে, সাধনায়।

একটা জাত আর একটা জাতের কাছ থেকে তার সভ্যতা ধার করতে পারে কিন্তু একের সংস্কৃতি অপরের পক্ষে অনুকরণ করা সম্ভব নয়। ম্যাঞ্চেস্টারের কলকারখানাকে অনুকরণ ক'রে আমেদাবাদে অথবা বোম্বাইতে কাপড়ের কল বসানো—এটা নেহাৎই নকল করার ব্যাপার। বিলেতের সৈনিকদের অনুকরণ ক'রে ভারতের রংরুটদের পক্ষে রাইফেল চালানো শেখা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। এক দেশের সভ্যতাকে আর এক দেশ সহজে আত্মসাৎ করতে পারে ব'লেই নিউ ইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারিস, কলিকাতা, টৌকিও—এই সব শহরের চেহারাগুলো সব এক-রকমের—সবগুলোকে মনে হয় একই ছাঁচে ঢালাই করা। কিন্তু এক দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে আর এক দেশের সংস্কৃতির যে পার্থক্য—তাকে লুপ্ত ক'রে দেওয়া একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। যেখানে একটা জাত আর একটা জাতের উপর তার কালচারকে জোর ক'রে চাপাতে গিয়েছে—সেখানে অনর্থ ঘটেছে। সেখানে হজমের পরিবর্তে ঘটেছে বদহজম—পুরান আদর্শগুলো গিয়েছে ভেঙে অথচ তার স্থান অধিকার করতে পারে নি কোনো মহত্তর নূতন আদর্শ—চলেছে হীন পরানুকরণ-প্রিয়তার পালা—কারণ পুরানোকে ভাঙা সহজ—নতুনকে গড়া কঠিন। একটা দেশের কালচারকে আর একটা দেশ যখন অনুসরণ করতে যায়, তখন তার মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা থাকে যথেষ্ট।

নতুন ব'লেই তো একটা জিনিষ বরণীয় হ'তে পারে না—যেমন কোন আদর্শ পুরাতন ব'লেই তাকে বর্জ্জন করতে হবে—এর কোন মানে হয় না। একটা জাতের নৈতিক আদর্শ ব্যাঙের ছাতার মত হঠাৎ গজিয়ে ওঠে না। অনেক মানুষের অনেক কালের বিপুল অভিজ্ঞতা থেকে তারা জন্ম নেয়। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়ে তাদের বুঝতে পারি নে ব'লেই যে তারা বর্জ্জনীয়—এটা যুক্তির কথা নয়। আমাদের ব্যক্তিত্ব যখন বিকাশ পেতে আরম্ভ করে, নিজের মন দিয়ে আমরা যখন ভাবতে শিখি তখন সমাজের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ঘনিয়ে ওঠে। আদিম মানুষের কাছে তার দলই যথাসর্ব্বস্ব। নিজেকে খুঁজে পায় নি ব'লেই দলের মাঝে সে তলিয়ে থাকে। দলকে ছেড়ে তার কোন অস্তিত্ব নেই। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য মানুষকে যূথভ্রষ্ট হবার প্ররোচনা দেয়। একথা সত্য যে যাদের আমরা মহাপুরুষ ব'লে থাকি তারা কেউ দলের মানুষ নয়—সবাই দল-ছাড়া মানুষ। সমাজের প্রচলিত আদর্শের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তারা চলতে পারে নি এবং সেজন্য তাদের দুঃখও সইতে হয়েছে বিস্তর। কিন্তু তাই ব'লে যূথভ্রষ্ট হওয়াই যে সব সময়ে প্রতিভার লক্ষণ অথবা কল্যাণের পথ—একথা মনে করবার কোন কারণ নেই। ব্যষ্টির কল্যাণ এবং সমষ্টির কল্যাণ—এরা পরস্পর বিরোধী নয়। সমাজের মধ্যেই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা। জীবনের অর্থ আমাদের কাছে যত বেশী পরিস্ফুট হয়ে ওঠে সমাজের বৃহত্তর জীবনের মধ্যে আমরা তত বেশী ক'রে প্রবেশ করি। ম্যাকিভারের (MacIver) ভাষায়, There is no opposition between the growth of personality and the security of the community but the reverse. যেখানে আমাদের ব্যক্তিত্বের সবেমাত্র জাগরণ আরম্ভ হয়েছে সেখানে নতুন-শিং-ওঠা বাছুরের মত সমাজ-জীবনকে আঘাত করবার প্রবৃত্তি অত্যন্ত উগ্র হয়ে প্রকাশ পায়। আমাদের ব্যক্তিত্ব যত বেশী পূর্ণ হয়ে ওঠে, সমাজ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন হবার আশঙ্কা তত বেশী কমে যায়—বৃহত্তর সমষ্টি-জীবনের মধ্যে আপনাদের সার্থকতা তত বেশী ক'রে আমরা উপলব্ধি করি। সংঘ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যে দুর্ভাগ্যের কথা, এ-বিষয়ে কি সন্দেহ আছে? প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড থেকে জলন্ত কাঠকে যখন সরিয়ে আনি তখন তার শিখা ম্লান হ'তে হ'তে শেষে নিবে যায়। এই জন্যই নতুনের মোহ জাতির সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের বন্ধনকে যখন শিথিল করবার উপক্রম করেছে, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির যখন বিচ্ছেদ ঘটাতে বসেছে তখন ব্যষ্টির এবং সমষ্টির মঙ্গলের দিকে চেয়ে জাতির যাঁরা চিন্তাবীর তাঁরা আশঙ্কা-সূচক সঙ্কেতধ্বনি করেছেন। তাঁরা পরানুকরণপ্রিয়তার বিপদ্ থেকে আমাদের মুক্ত করতে চেয়েছেন। পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিকে অনুকরণ করবার আগ্রহ এঁদের

কারও মধ্যে আমরা দেখতে পাই নে। সে আগ্রহ যদি এঁদের থাকতো—ভারতবর্ষ জাপানের মতো পশ্চিমের আর একটি এঁচোড়ে পাকা শিষ্য হ'য়ে উঠ্‌তো। কিন্তু বাস্তবিকই এক জাতির সংস্কৃতিকে আর এক জাতি অনুকরণ করতে পারে না, অনুকরণ করতে চায়ও না। জাতিতে-জাতিতে এই সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য থাকবেই। কিন্তু বৈশিষ্ট্য থাকবে ব'লে জাতিতে-জাতিতে যে মিলন হবে না—একথা ভাবা ঠিক নয়। আন্তর্জাতিক মিলন জাতির সাধনার বৈশিষ্ট্যকে লোপ ক'রেই বা দেবে কেন? আমাদের সকলেরই ব্যক্তিগত চরিত্রের মধ্যে কিছু-না-কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সমাজের আর দশ জন লোকের সঙ্গে মিশতে গিয়ে আমরা কি সেই বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলি?

সভ্যতার সঙ্গে সংস্কৃতির আর একটা বড়ো পার্থক্য হচ্ছে—সভ্যতা মানুষের প্রয়োজন মেটাবার উপকরণ নিয়ে। উপকরণের সঙ্গে উপকরণকে যুক্ত ক'রে সভ্যতার পরিমাণকে আমরা উত্তরোত্তর বাড়িয়ে যেতে পারি। যেখানে দশটা কাপড়ের কল আছে সেখানে একশোটা কল করতে পারি—যেখানে পাঁচ হাজার মাইল রেলপথ আছে সেখানে পঁচিশ হাজার মাইল রেলপথ তৈরি করা শক্ত নয়। যোগের আর গুণের প্রক্রিয়াকে আশ্রয় ক'রে সংস্কৃতির পরিমাণকে বাড়ানো, কিন্তু, সম্ভব নয়। লাখ টাকার সঙ্গে লাখ টাকাকে যুক্ত ক'রে দেশের সম্পদকে আমরা বাড়িয়ে দিতে পারি—জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানকে যুক্ত করলে এক জন সক্রেটিস্ হয় না। হাজার জন মানুষের দুর্ব্বল সংকল্পকে জড়ো ক'রে আমরা বজ্রের মতো একটা দৃঢ় সংকল্প বানাতে পারি নে। লাখো রামা-শ্যামাকে এক করলেও আমরা এক জন সেক্সপীয়র অথবা একজন বুদ্ধকে পাইনে।

একটা ভয়ানক কোনো দুর্ঘটনা না ঘটলে সভ্যতার মার নেই। তার জয়যাত্রা উন্নতির শিখর থেকে উচ্চতর শিখর পানে অবারিত বেগে চলেছে। সভ্যতার অভিধানে 'পশ্চাদ্বর্ত্তন' ব'লে কোনো শব্দ নেই। যে-যন্ত্রশিল্পকে মানুষ একবার করায়ত্ত করেছে—তা হাত-ছাড়া হবার কোনোই সম্ভাবনা নেই। সংস্কৃতির বেলায় একথাটা খাটে না। তার ইতিহাস জোয়ার-ভাঁটায়, আলো-ছায়ায়, উত্থান-পতনে বৈচিত্র্যময়। তার উত্থান-পতনের কারণ নির্দ্দেশ করাও কঠিন। একটা যুগে মানুষ কেনই বা সংস্কৃতির দিক দিয়ে এতখানি আগিয়ে গেল - পরবর্ত্তী যুগে কেনই বা তার ইতিহাসে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো—ঠিক ক'রে বলা বড়ো শক্ত। সংস্কৃতির অভিধানে স্থৈর্য্য ব'লে কোনো শব্দ নেই। তার মধ্যে জীবনের প্রকাশ, জীবনের মতোই তাই সে পরিবর্ত্তনশীল। যুগে যুগে বিচিত্র পথে তার প্রকাশের বৈচিত্র্য অব্যাহতগতিতে চলেছে। সংস্কৃতির মধ্যে মানুষের সৃজনীশক্তির প্রকাশ। সেই সৃষ্টির মধ্যে কোথাও বিরাম নেই—যা আছে তা বৈচিত্র্য।

ধর্ম্মযুদ্ধ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

আছে অস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজন এই দেহে, যবে পচে গলে
ব্যাধিবীজদুষ্ট মাংস; সে বিষ ছড়ায়ে যায় দাবানল সম
সর্ব দেহে দ্রুতবেগে; ভুজঙ্গের কালকূট হয় উপশম
তূর্ণ যদি তাগা বাঁধি রক্তস্রাবে নিষ্কাশিত কর সে গরলে
সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে, অথবা সে দুষ্ট অঙ্গ ছিন্ন কর যদি
হয় তবে প্রাণরক্ষা, মৃত্যু হ'তে শ্রেয় রক্তক্ষয় অঙ্গহানি।
ধরণীর অন্তর্জ্বালা ভূকম্পে উদ্গীর্ণ করে বহ্নিঘন নদী,
অনাবৃষ্টিদগ্ধ ধরা বাঁধভাঙা বন্যাজল বক্ষে লয় টানি।

হিংসার বিকৃতিবশে করুণা সততা প্রেম সভ্যনর যবে
হারায় আপন দোষে, সহজ প্রাণের ধর্ম আত্মরক্ষিবারে
তাহারে জাগ্রত করে ধর্ম্মযুদ্ধে; যুগান্তের সে মহাআহবে
অর্জুনসারথি হন নারায়ণ, উভপক্ষে হয় নির্বিচারে

শক্তিক্ষয়, জনার্দ্দন পক্ষে যার অবশেষে লভে সে বিজয়,
আবার নূতন করি ধ্বংসোপরি নবযুগে আবির্ভূত হয়।

গৃহিণী

শ্রীসুহাসিনী দাস

সংসারে গৃহিণীর দায়িত্ব গৃহকর্ত্তা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নয়, বরং অনেক সময় ছোট বড় খুঁটিনাটি এত বিষয় গৃহিণীকে চিন্তা করিতে ও খবর রাখিতে হয় যে, তাহা হিসাব করিলে বোধ হয় গৃহকর্ত্তা অপেক্ষা গৃহিণীর কর্ত্তব্যাংশ অনেক বেশী হইয়া পড়িবে। সংসারে পুত্রকন্যা, পোষ্যবর্গের ভরণপোষণ, শিক্ষাদীক্ষা, চিকিৎসাদির সুব্যবস্থা, তজ্জন্য চিন্তা এবং এই অর্থসঙ্কটের দিনে অর্থোপার্জ্জনের পরিশ্রম, এই প্রধান দায়িত্বগুলি কর্ত্তার কর্ম্মবিভাগ। আর সন্তান লালনপালন, তাহাদের সুস্বভাব, সুশিক্ষা, শরীর মনের স্বাচ্ছন্দ্য দান করা, গৃহস্থালীর যাবতীয় কাজকর্ম্ম, অতিথি-অভ্যাগতের ন্যায্য সমাদর, সম্মানিতদের প্রতি সশ্রদ্ধ ব্যবহার, স্নেহাস্পদের প্রতি যথোচিত স্নেহ, দাস-দাসীদের পরিচালনা, পরিবারস্থ সকলের নির্দ্দোষ আমোদ, তাহাদের পরিমিত বিশ্রামের ব্যবস্থা, সাংসারিক আয়ব্যয়ের হিসাব এবং সকলকে মিতব্যয়ী করা, পাড়া-প্রতিবাসী সকলের অভাব ও অসুবিধা সাধ্যানুসারে মোচন করা ও সমস্ত পরিবারের ধর্ম্মজীবনের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখা—এইগুলি সমস্তই গৃহিণীর কর্ত্তব্যের অঙ্গ। সুগৃহিণী হইতে হইলে নিজে সর্ব্ববিধ সদ্‌গুণ ও সদভ্যাসগুলি সযত্নে আয়ত্ত করিয়া গৃহে সকলের আদর্শ হইবেন। সাংসারিক কার্য্যাদি সুন্দর করিয়া করিবেন, কোনও কার্য্যে অবহেলা বা অগ্রাহ্য করিবেন না। গৃহকর্ম্মের মধ্যে ও অবসরে সদাসর্ব্বদা বাটীস্থ সকলের সহিত সদালোচনা করিবেন, আর এই সব আলোচনা যাহাতে সরস ও সুন্দর হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখিবেন, তাহাতেই সুফলের বিশেষ সম্ভাবনা; একঘেয়ে নীরস আলোচনা বা উপদেশ পরিজনবর্গ কেহই পছন্দ করিবে নাও—তাহার উপকারিতাও অল্প। গৃহিণীপনার মধ্যে গাম্ভীর্য্যের যথেষ্ট প্রয়োজন থাকিলেও আত্মীয়-স্বজন, পরিবারবর্গের সহিত সময় ও সম্পর্কোচিত রহস্যালাপ করিয়া তাহাদের আনন্দবর্দ্ধন করা নিশ্চয় কর্ত্তব্য; এ-সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। সুতরাং সুগৃহিণী এ-বিষয়েও অবহিত হইবেন। আর পরচর্চ্চা করিতে হইলে, পরের গুণের, বিদ্যাবুদ্ধির, দুঃখের কথা লইয়া আলোচনা করিবেন; পরের ধন, ঐশ্বর্য্য, স্বভাব-চরিত্রের দোষ এসব আলোচনা একেবারে বন্ধ করিবেন। ইহাতে সময় নষ্ট করা ছাড়া বিশেষ কিছু উপকার নাই; যদি আনন্দ কিছু থাকে তাহা অতি হীন। জগতে সৎ আনন্দের বস্তু অপর্য্যাপ্ত রহিয়াছে, নির্ব্বাচন করিয়া লইলেই হয়। অনেক পিতামাতাকে দেখা যায়, তাঁহারা সন্তান-বাৎসল্যে এরূপ মুগ্ধ যে পুত্রকন্যাদের বয়সোচিত কর্ত্তব্য করিবার সুযোগ ও শিক্ষা দেন না, মনোমত কার্য্য হইবে না বলিয়া তাহাদের কোন কার্য্যে ফরমাস্ করেন না, ইহাতে তাহাদের কর্ম্ম করিবার শিক্ষা ও অভ্যাস হইতেই পায় না। ক্রমে ইহার ফলে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত নিজেরা ঘরে বাহিরে খাটিয়া হয়রান হন, আর উপযুক্ত পুত্রকন্যা, বধূরা (তাহারাও পিতৃগৃহ হইতে ঐরূপ শিক্ষাই লইয়া আসে) হেলিয়া দুলিয়া বেড়াইয়া, সিনেমা দেখিয়া, বাজে গল্প করিয়া, নাটক নভেল পড়িয়া দিব্য সময় কাটাইতেছে। ইহা অতি অশোভন ব্যাপার, ইহা যাহাতে না ঘটে, তজ্জন্য সুগৃহিণী প্রথম হইতেই সতর্ক থাকিবেন। আলস্য, বিলাসিতা, স্বেচ্ছাচারিতা, দাম্ভিকতা, উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় কিছুতেই দিবেন না। শৈশব হইতেই তাহাদিগকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য শিক্ষা দিতে হইবে। আধুনিক অনেক পিতামাতা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ছাড়া অন্য যাহা কিছু বয়স হইলে আপনিই শিখিবে বলিয়া ভুল করেন; কিন্তু কোমল মৃত্তিকাতেই বীজ অঙ্কুরিত হয়, সর্ব্ববিধ শিক্ষার বীজ শিশুকালেই বপন করিতে হইবে। আজকাল অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের পুরুষদের সহিত একত্র কার্য্য করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে

প্রয়োজনানুরোধে অনেকে তাহা করিতেছেনও, কিন্তু তাই বলিয়া বিনা-প্রয়োজনে বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের যে কোন বন্ধুবান্ধবীদের, (দূর বা নিকট) আত্মীয়, স্বজনদেরও সহিত অবাধে মিশিতে দেওয়া উচিত নয়। ইহার কুফল সকল সময় সুস্পষ্ট না হইলেও যথার্থতঃ ইহা অতি মন্দ। মনের পবিত্রতার চরিত্রের দৃঢ়তার মূল ইহাতে শিথিল হইয়া যায়। এই দৃষ্টান্ত আমাদের সমাজের পক্ষে একেবারেই অনুকূল নয়। আরও সুগৃহিণী পুত্রকন্যাদের লজ্জাশীলতার এবং গুরুজনের প্রতি সম্মানবোধের দিকে লক্ষ্য রাখিবেন, এ-বিষয়ে আজকাল ছেলেমেয়েরা বিশেষ শিথিল দেখিতে পাওয়া যায়। সকল রকম গৃহকর্ম্মের প্রারম্ভে গৃহিণী অতি প্রত্যূষে বিনাড়ম্বরে (সাড়ম্বর পূজার আজকাল বহু অসুবিধা) ভগবৎ পূজা, প্রার্থনা করিবেন, এবং সকলকে করিতে শিখাইবেন, ঈশ্বর যে এক জন আছেন, তাঁহার সহিত আমাদের নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, তাঁহাকে আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ করা উচিত, এ কথাটি প্রতিদিন সর্ব্বাগ্রে আমাদের পুত্রকন্যাদের শিখাইতে হইবে। ইহাতে তাহারা অভ্যস্ত হইলে আর কোনও সময়েও তাঁহাকে ভুলিতে পারিবে না এবং তাঁহারই অভিপ্রেত কর্ম্ম করিবার জন্য ব্যগ্র হইবে। পণ্ডিতেরা রাজত্বের সহিত গৃহের তুলনা করিয়াছেন; সুপরিচালিত রাজ্য ও গৃহ উভয়ই মানবসমাজে তুল্য হিতকারী। রাজ্যে রাজার ক্রটিতে বহু অনিষ্ট, বিশৃঙ্খল উপস্থিত হয়; সেইরূপ গৃহিণীর যোগ্যতার অভাবে গৃহ সমস্ত অকল্যাণের আকর হইয়া উঠে। এ বিষয়ে প্রচলিত শ্লোকটি সকলেই শুনিয়া থাকিবেন, "রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট, গিন্নির পাপে গৃহ নষ্ট" ইহা অতি সত্য কথা। গৃহের সমষ্টি সমাজ, সমাজের সমষ্টি দেশ, এই দেশের প্রতি গৃহের পুত্রকন্যারা যদি আমাদের পূর্ব্বাপর মনীষীবর্গের মহান্ আদর্শে সুগঠিত হয়, তবে তাহাপেক্ষা দেশের মঙ্গল আর কি হইতে পারে? এই গৌরবময় মহৎ কার্য্যের অধিকারিণী একমাত্র সুগৃহিণীরা। তাঁহারা যদি এ-বিষয়ে যত্নশীলা হন, নিশ্চয় সফলমনোরথ হইবেন; দেশকে সুসন্তান উপহার দিয়া ভগবৎকৃপা লাভে নিজেরাও ধন্য হইবেন।

সুন্দরের ফাঁদ

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

মৃত্যু আসি ভাঙি দিল ক্ষণিকের নীড়
যেথায় অযুত চিত্ত করেছিল ভীড়
ক্ষণিকের তরে; যেথা সুন্দরের খেলা
উঠে পড়ে, ভাঙে গড়ে নিত্য দুই বেলা।
সুন্দর পাতিল যেথা আনন্দের ফাঁদ
হাতে তুলে দিবে ব'লে ক্ষণিকের চাঁদ
মুগ্ধ মন লুব্ধ হয়ে তারি পিছু ধায়,
ফাঁদে ফেলি সে সুন্দর আপনি লুকায়।

ফেল না ফেল না ফাঁদে, জড়ায়ো না জালে
জটিল ক'রো না পথ রহি অন্তরালে;
স্বপন-জড়িত চোখে দিও নাকো দোলা,
আধো আঁখি মুদি যেথা আধো আঁখি খোলা,
জাগ্রত আলোক—নাহি ক্ষণ-ছায়া-পাত
সুন্দর, তোমারে সেথা লভিব সাক্ষাৎ।

কেরাণীর কপাল

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

১

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের বৈদ্যবাটী ষ্টেশন হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে অবস্থিত হাসানপুর গ্রামের বিনয় বাঁড়ুয্যে কলিকাতার টমাস ডেভিড্‌সন্ কোম্পানির বুক ডিপার্টমেণ্টে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে কেরাণীগিরি করেন। অল্প বেতন, কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকিবার ক্ষমতা নাই, সেই জন্য বাটী হইতে প্রত্যহ কলিকাতায় যাতায়াত করেন। কলিকাতার চতুর্দ্দিকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইলের মধ্যে যে সকল রেল-ষ্টেশন আছে, সেই সকল ষ্টেশনের সন্নিহিত জনপদ হইতে প্রত্যহ হাজার হাজার লোক বিনয়বাবুর মত ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করিয়া কলিকাতায় চাকরি বা ব্যবসায় করিয়া বাসগ্রামে সংসার চালাইয়া থাকেন।

বিনয়বাবুর বয়স বোধ হয় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হইবে। তাঁহার সংসারে প্রৌঢ়া বিধবা জননী, পত্নী মাধুরী এবং দুই পুত্র ও একটি কন্যা। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নির্ম্মল বৈদ্যবাটী স্কুলে, সেকালের থার্ড ক্লাসে—অর্থাৎ একালের ক্লাস এইটে পড়ে, বয়স চৌদ্দ বৎসর। তার পর কন্যা মালতী বয়স নয় বৎসর, মালতীর পর পাঁচ বৎসর বয়স্ক শিশু বিমল। মালতী বাড়ীতে মাতা ও পিতার কাছে "কথামালা" পড়ে। বিমল তাহার দিদির কাছে "অজ" "আম" পড়ে। বিনয়বাবুর পোষ্যের মধ্যে এই পাঁচটি পরিজন ব্যতীত একটি সবৎসা গাভী, একটি শালিখ পাখী, একটি বিড়াল ও "ভোঁদা" কুকুর আছে। তাঁহার ভূসম্পত্তির মধ্যে আছে প্রায় দুই বিঘা বাগানের মধ্যে একটি একতলা ছোট পাকা বাড়ী, একটা চালাঘর, খিড়কীতে একটি ছোট পুষ্করিণী এবং হাসানপুরের মাঠে বার বিঘা ধান-জমি। ধান-জমি এক জন কৃষককে ভাগে জমা দেওয়া আছে। সেই জমি হইতে যে ধান ও খড় পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাদের এবং গাভীর সম্বৎসরের খোরাক হইয়াও প্রতি বৎসর পঁচিশ-ত্রিশ টাকায় ধান ও খড় বিক্রয় হয়। তাহার উপর চল্লিশ টাকা বেতন, সুতরাং বিনয়বাবুর সংসার সচ্ছলেই চলে। বাটীতে দাস-দাসী নাই, বিনয়বাবুর জননী পুত্রবধূকে লইয়া সংসারে সমস্ত কার্য্যই করেন।

প্রত্যহ প্রাতে সাড়ে নয়টার মধ্যে বিনয়বাবু স্নানাহার শেষ করিয়া একখানি ঝাড়ন, একটি হারিকেন লণ্ঠন ও একটা ছাতা লইয়া বাটী হইতে বাহির হয়েন, ষ্টেশনের কাছে, হাসানপুরের দীন সাঁতরার একখানা দোকান আছে, সেই দোকানে লণ্ঠনটি রাখিয়া বিনয়বাবু কলিকাতায় যান, অপরাহ্ণে আপিস হইতে ফিরিবার সময় ঘৃত, আটা, চিনি, ময়দা, আলু, পটোল, কপি, মাছ প্রভৃতি কিনিয়া আনেন। প্রতি শনিবার, দুইটার সময় আপিস বন্ধ হয়, বিনয়বাবু প্রতি শনিবারেই শেওড়াফুলি ষ্টেশনে নামিয়া হাটে যান এবং হাটে দ্রব্যাদি কিনিয়া পরের ট্রেনে বৈদ্যবাটীতে যান। রাত্রিতে নির্ম্মলকে পড়া বলিয়া দেন। ইহাই বিনয়বাবুর নিত্য কর্ম্ম; ডেলি-প্যাসেঞ্জার কেরাণীর জীবনযাত্রার বাঁধাধরা রুটিন।

বৈদ্যবাটী ষ্টেশনের পূর্ব্ব দিকে, গঙ্গার তীরে অনেকগুলি চটকল আছে। সেই সকল চটকলের ইংরেজ কর্ম্মচারীরা প্রায় প্রত্যহই কলিকাতায় যাতায়াত করেন। তাঁহারা প্রথম শ্রেণী বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন, বাঙালী ডেলি-প্যাসেঞ্জারেরা হয় মধ্যম শ্রেণী, না-হয় তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করেন। সেই জন্য বাঙালী ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের সহিত ইংরেজ ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের আলাপ-পরিচয়ের বড় সুবিধা হয় না, তবে প্রত্যহ যাতায়াতের জন্য পরস্পরের মুখ চেনা থাকে।

এক দিন প্রাতে কলিকাতায় যাইবার সময় বিনয়বাবুর একটু বিলম্ব হইয়াছিল। সাধারণতঃ তিনি ট্রেনে আসিবার পাঁচ-সাত মিনিট পূর্ব্বে প্লাটফরমে উপস্থিত হয়েন, সেদিন

কি একটা কারণে তাঁহার বিলম্ব হইল, তিনি প্লাটফরমে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ট্রেন প্লাটফরমে উপস্থিত হইয়াছিল। তিনিও প্লাটফরমে উপস্থিত হইলেন, গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল। তিনি দেখিলেন, এক জন বৃদ্ধ ইংরেজ এঙ্গাস কোম্পানির চটকলের ম্যানেজারের ঘোড়ার গাড়ী হইতে নামিয়া ট্রেন ধরিবার জন্য প্লাটফরমে উঠিয়াই ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। ট্রেন তখন ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিনয়বাবুও গাড়ীতে উঠিবার জন্য খুব দ্রুতপদে যাইতেছিলেন। ডেলি-প্যাসেঞ্জারগণ মৃদু গতিশীল গাড়ীতে উঠিতে অভ্যস্ত। গাড়ী যেরূপ গতিতে যাইতেছিল, তাহাতে বিনয়বাবুর দৌড়াইবার প্রয়োজন ছিল না। বৃদ্ধ ইংরেজটি প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিবেন বলিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে বিনয়বাবুকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইলেন, কিন্তু বিনয়বাবুকে পশ্চাতে ফেলিয়া দুই পদ যাইতে-না-যাইতেই পদস্খলিত হইয়া ট্রেনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। বিনয়বাবু তাহা দেখিবা মাত্র সাহেবকে একটা ধাক্কা দিয়া গাড়ীর বিপরীত দিকে ঠেলিয়া দিলেন, কিন্তু স্বয়ং টাল সামলাইতে না পারিয়া প্লাটফরমের ধারে পড়িয়া গেলেন, যদি আর তিন চারি ইঞ্চি পার্শ্বে পড়িতেন, তাহা হইলে তিনি প্লাটফরম ও গতিশীল ট্রেনের মধ্যে পড়িয়া বোধ হয় পিষ্ট হইয়া যাইতেন। মুহূর্ত্তমধ্যে এই ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

গার্ড সাহেব, বৃদ্ধ ইংরেজকে ভূপতিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামাইবার জন্য লাল নিশান দেখাইলেন। স্টেশন-মাস্টার ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসিলেন। ট্রেন হইতে যে সকল যাত্রী এই দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা "গেল গেল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বিনয়বাবু উঠিয়াই সাহেবকে ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, "বেশী আঘাত পাইয়াছেন ?"

সাহেব বলিলেন "ধন্যবাদ। সামান্য আঘাত পাইয়াছি, তুমি আমার অপেক্ষা বেশী আঘাত পাইয়াছ।"

গাড়ী থামিয়া গিয়াছিল। সাহেব ধীরে গিয়া প্রথম শ্রেণীর কামরায় প্রবেশ করিলেন, বিনয়বাবুও একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় আরোহণ করিলেন।

প্রথম শ্রেণীর কক্ষে একজন শ্বেতাঙ্গ পূর্ব্ব হইতে উঠিয়া বসিয়া ছিলেন। তিনি বৈদ্যবাটীর একটা কলের সহকারী ম্যানেজার। তিনি একজন বৃদ্ধ ইংরেজকে প্লাটফরমে দৌড়াইতে দেখিয়া নিজের কক্ষের দ্বার খুলিয়া ফুটবোর্ডে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ সাহেবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। বৃদ্ধ নিকটে আসিলে তাঁহাকে টানিয়া গাড়ীতে তুলিবেন, এইরূপ মনে করিয়াই তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠিলে তিনি বলিলেন, "কোথাও গুরুতর আঘাত পাইয়াছেন ?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "ধন্যবাদ। বিশেষ লাগে নাই। ঐ বাবুটি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন।"

দ্বিতীয় সাহেব বলিলেন, "নিশ্চয়ই। নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া। আপনাকে প্লাটফরমে দৌড়াইতে দেখিয়া আমি আপনাকে ভিতরে তুলিয়া লইবার জন্য দ্বার খুলিয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম। এমন সময় আপনি পতনোন্মুখ হইবা মাত্র ঐ বাবু আপনার ও ট্রেনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আপনাকে দূরে ঠেলিয়া দিলেন, কিন্তু নিজে প্লাটফরমের কিনারায় পড়িয়া গেলেন। উনি আপনাকে রক্ষা করিয়াছেন, ঈশ্বর উঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন।" উভয়ের মধ্যে আলাপ-পরিচয় ও কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। বৃদ্ধ বলিলেন, "আমি মাত্র দুই দিন হইল কলিকাতায় আসিয়াছি। এঙ্গাসের কলের ম্যানেজার আমার বন্ধু, আমি কাল সন্ধ্যার সময় তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম। আজ ফিরিবার সময় এই দুর্ঘটনা।"

বিনয়বাবু ট্রেনে উঠিলে তাঁহার পরিচিত এক জন বাবু বলিলেন, "খুব বেঁচে গেছেন। আর একটু হলেই চাকার নীচে পড়ে মারা যেতেন।"

এক জন বৃদ্ধ প্যাসেঞ্জার বলিলেন, "রাখে কৃষ্ণ মারে কে ? বিনয়, তোমার কনুইটা ছ'ড়ে গিয়ে রক্ত পড়ছে যে। জামাটাও ছিঁড়ে গেছে।"

বিনয়বাবুর কনুইটা জ্বালা করিতেছিল, উহা হইতে যে রক্ত পড়িতেছিল, বিনয়বাবু তাহা লক্ষ্য করেন নাই। একজন প্যাসেঞ্জার বলিলেন, "শেওড়াফুলি ষ্টেশনে একখানা রুমাল জলে ভিজিয়ে কনুইয়ে বেঁধে দিয়ো।"

ট্রেন হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হইলে যাত্রীরা ফটকের দিকে যাইতে লাগিলেন। প্রথম শ্রেণীর সেই দুই জন

শ্বেতাঙ্গ ফটকের দিকে না গিয়া বাঙ্গালী যাত্রীদিগের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। বিনয়বাবুকে ভীড়ের মধ্যে দেখিতে পাইয়া বয়ঃকনিষ্ঠ ইংরেজ ভদ্রলোক বলিলেন, "ঐ সেই বাবু।"

বৃদ্ধ ইংরেজ বিনয়বাবুর কাছে গিয়া বলিলেন, "আমাকে বাঁচাইতে গিয়া তুমি নিজে আহত হইয়াছ। কোথাও লাগিয়াছে কি?"

"বিশেষ কিছু নহে, বাঁ হাতের কনুইটা সামান্য ছড়িয়া গিয়াছে।"

"বাবু তোমার নাম জানিতে পারিলে সুখী হইব।"

বিনয়বাবু বলিলেন, "বিনয়কুমার ব্যানার্জ্জি।"

"তুমি কি কর?"

"আমি কলিকাতায় টমাস ডেভিডসন কোম্পানীর আফিসে চাকরি করি।"

"টমাস ডেভিডসন আফিসের নাম আমার অজানা নহে। কোন্ ডিপার্টমেণ্টে কাজ কর?"

"বুক ডিপার্টমেণ্টে।"

সাহেব বলিলেন, "ধন্যবাদ।" এই বলিয়াই তিনি গেটের দিকে চলিয়া গেলেন, বিনয়বাবুও অন্য দ্বার দিয়া প্লাটফরম হইতে বাহির হইলেন।

২

বেলা ১১টার সময় বিনয়বাবু আফিসে উপস্থিত হইলে, বুক ডিপার্টমেণ্টের অন্যতম কেরাণী রমেশবাবু বলিলেন, "কি হে বিনয়? ব্যাপারটা কি? জামার হাতা ছেঁড়া, কাপড়ে ধুলো, কোথাও পড়ে গেছলে নাকি?"

বিনয় বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, স্টেশনে তাড়াতাড়ি ট্রেন ধরতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলেম।"

রমেশবাবু বলিলেন, "তোমাদের ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের ঐ কেমন স্বভাব, কখনও ট্রেনের পাঁচ মিনিট পূর্ব্বেও তোমরা স্টেশনে আসবে না, ট্রেন প্লাটফরমে ঢুকবে, আর তোমরাও পথ থেকে মরিবাঁচি ক'রে ছুটতে ছুটতে এসে প্লাটফরমের বেড়া ডিঙিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে লাফিয়ে লাফিয়ে গাড়ীতে উঠবে। আমি সেদিন হুগলী গিয়েছিলেম আসবার সময় দেখি, সব স্টেশনেই ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের একই স্বভাব, গাড়ীর শব্দ শুনে এক পোয়া পথ থেকে ছুটে আসবে তাও স্বীকার, তবু পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে স্টেশনে আসবে না। পাঁচ-সাত মিনিট আগে বাড়ী থেকে বেরুলেই ত হয়, প্রাণ হাতে ক'রে ছুটোছুটি করতে হয় না।"

রমেশবাবু বিনয়বাবু অপেক্ষা বয়সে বড়, পদেও বড়, তিনি সত্তর টাকা বেতন পান। বিনয়বাবুকে তিনি একটু স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন, বিনয়বাবুও বয়োবৃদ্ধ এবং উপরিতন কর্ম্মচারীদিগকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তিনি বলিলেন, "আপনারা কলকাতায় থাকেন, আপিসের সময় পাঁচ মিনিট অন্তর দোরগোড়ায় ট্রাম পান। আমাদের ত তা নয়, পাড়াগাঁয়ে থাকি, প্রায় দুই মাইল পথ হেঁটে স্টেশনে আসতে হয়। ন'টায় ট্রেন ধরবার জন্য আটটার সময় খেতে বসতে হয়। এই শীতকালের ছোট বেলায় আটটার সময় কলকাতায় অনেক লোক লেপের মায়া কাটাতে পারে না। আমাদের বাড়ীর মেয়েদের পাঁচটার সময় অন্ধকারে উঠে বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ঘর পরিষ্কার করে রাঁধতে হয়। আমি ভোরবেলা উঠে গরুর সেবা, স্নান, ঠাকুরপূজা সেরে আটটার সময় খেতে বসি। দৈবাৎ কোন কারণে দু-পাঁচ মিনিট দেরি হলেই ট্রেন ধরবার জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে হয়।

রমেশবাবু বলিলেন, "কেরাণীর কপাল ভায়া, ছ্যাগড়া গাড়ীর ঘোড়ার কপালেরও অধম।"

বিনয়বাবু বলিলেন, "আবার কেরাণীকে যদি ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করতে হয়, তা হ'লে ত সোনায় সোহাগা।"

রমেশবাবু বলিলেন, "আজ হার্ভি সাহেবের মুখে শুনলেম, আমাদের বিলেতের বড়সাহেব সার টমাস ডেভিড্সন আজ আপিস দেখতে আসবেন। তাই হার্ভি সাহেব সব ঘরের বড়বাবুকে ডেকে, বেশ মন দিয়ে শুভ্ বয় হয়ে কাজ করতে বলেছেন।"

বিনয়বাবু বলিলেন, "বড়সাহেব কলকাতায় কবে এসেছেন, আমরা কিছু শুনি নি ত?"

রমেশবাবু বলিলেন, "আমরা ত চুনো পুঁটি, হার্ভি সাহেবই কি জানত? হার্ভি সাহেব আজ সকালে ম্যানেজার সাহেবের মুখে শুনেছে। বড়-

সাহেব কলকাতায় দিন পাঁচ-ছয় থেকে কাশী, আগ্রা, দিল্লী বেড়িয়ে বোম্বাইয়ে গিয়ে ষ্টীমারে চড়বেন।”

আর বাক্যব্যয়ে কালক্ষেপ না করিয়া বাবুরা নিজ নিজ কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

সার টমাস ডেভিড্‌সনের কলিকাতায় এবং বোম্বাইয়ে আপিস আছে। আপিস নিতান্ত ছোট নহে। কলিকাতার আপিসে দশ-পনর জন ইংরেজ এবং সত্তর-আশী জন বাঙালী কর্ম্মচারী কার্য্য করেন। আপিসে পাঁচ-ছয়টি বিভিন্ন বিভাগ আছে, প্রত্যেক বিভাগের ভার এক এক জন ইংরেজ কর্ম্মচারীর উপর অর্পিত, তাঁহারা সেই বিভাগের ‘বড়সাহেব’ নামে অভিহিত। বড়সাহেবের সহকারী ইংরেজ হইলে ‘ছোটসাহেব’, আর বাঙালী হইলে বড়বাবু নামে অভিহিত হয়েন। সকল বিভাগের হিসাব-নিকাশ বুক ডিপার্টমেণ্টে হয়, সেই জন্য বুক ডিপার্টমেণ্টে কর্ম্মচারীর সংখ্যা অন্যান্য বিভাগ হইতে অধিক। বুক ডিপার্টমেণ্টে তিন-চারি জন ইংরেজ এবং কুড়ি-পঁচিশ জন বাঙালী আছেন। এই বিভাগের বাবু রসিকচন্দ্র দত্ত বড়বাবু, তিনি পাঁচ-শ আশী টাকা বেতন পান, হার্ভি সাহেব তাঁহার নিম্নপদস্থ, তাঁহার বেতন চারি শত টাকা। সকল বিভাগের উপর ম্যানেজার সাহেব, তাঁহার বেতন আড়াই হাজার টাকা।

সার টমাস ডেভিড্‌সন বিলাতে থাকেন। তিনি পার্লামেণ্টের মেম্বার, অনেক সভা-সমিতির পৃষ্ঠপোষক অথবা সভাপতি। তিনি আট-দশ বৎসর অন্তর এক বার করিয়া ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসিতেন। এবারে আসিয়াছেন বোধ হয় বার বৎসর পরে। আপিসের বাবুরা মনে করিয়াছিলেন যে বড়সাহেব ম্যানেজার সাহেবকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যেক বিভাগ পরিদর্শন করিতে আসিবেন। কিন্তু তাঁহাদের এই অনুমান ব্যর্থ হইল। বেলা চারিটার সময় আপিসের বাবুরা সংবাদ পাইলেন যে, তিনটার সময় বড়সাহেব আপিসে আসিয়া ম্যানেজারের আপিসে বসিয়া আছেন, প্রত্যেক বিভাগের বড়সাহেব, ছোটসাহেব ও বড়বাবুরা ম্যানেজারের আপিসে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আসিতেছেন। আপিসের পুরাতন কর্ম্মচারীরা বলিল, “এই বড়সাহেব পূর্ব্বে বারে আসিয়া আপিসের প্রত্যেক কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, এবারে আসিয়া এমন কুনো হইয়া বসিলেন কেন?”

বৃদ্ধ হরনাথবাবু বলিলেন, “সাহেব কি আর আগেকার মত জোয়ান আছে নাকি? বয়স যে সত্তর পার হ’ল, ইংরেজ হ’লে কি হয়? বুড় সব দেশেই সমান।”

রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, “তা নয় চক্কোত্তি মশাই, তা নয়। আপনি শোনেন নি, বড়সাহেবের কে এক জন জ্ঞাতিভাই ট্রান্সভালে একটা সোনার খনির মালিক ছিল? শুনেছি সেই জ্ঞাতি মারা যাওয়াতে বড়সাহেব নাকি ক্রোর টাকার মালিক হয়েছেন। এখন কি উনি কেউকেটা এক জন? আজকাল যে উনি এক জন ধন-কুবের।”

বিনয়বাবু বলিলেন, “টাকাতেই টাকা টানে। বড়-সাহেবের জ্ঞাতিভাই মরে ওকে ক্রোর টাকার মালিক করে গেল, আমাদের কোন খুড় জ্যাঠার কাছ থেকে কখনও নগদ দুটো পয়সা পাই নি।”

রমেশবাবু বলিলেন, “কপালঃ কপালঃ কপালঃ মূলঃ ভায়া যার কপালে মুলো, তাকে কে সন্দেশ খাওয়াবে? শুনেছি গেল বারে বড়সাহেব কলকাতায় এসে আপিসের বাবুদের সব এক মাসের ক’রে মাইনে বোনাস দিয়ে-ছিলেন। আমি তখনও আপিসে আসি নি, আমার শোনা কথা।”

হরনাথবাবু বলিলেন, “সে ত সেদিনের কথা। তার আগেও বড়সাহেব এসে বোনাস দিয়েছিল, সে আমার চোখে দেখা।”

রমেশবাবু বলিলেন, “তা হ’লে এবারেও দিতে পারেন। সাহেবেরা বোধ হয় চলে গেল, চল আমরাও দুর্গা শ্রীহরি করি।”

৩

ছয় বৎসর পরের কথা। এই ছয় বৎসরে বিনয়বাবুর সংসারে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নির্ম্মল তিন বৎসর পূর্ব্বে বৈদ্যবাটী স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস হইয়া শ্রীরামপুর কলেজে আই. এ. পড়িয়াছিল। আই. এ. পরীক্ষাতেও সে প্রথম

বিভাগে পাস করিয়া এখন ঐ কলেজে বি. এ. পড়িতেছে। বিনয়বাবুর বেতন চল্লিশ টাকা হইতে সত্তর টাকা হইয়াছে। তাঁহার বাটীতে দুইখানি মাত্র শয়নকক্ষ ছিল, তিন বৎসর হইল আরও দুইটি কক্ষ বাড়িয়াছে, একটি বাটীর ভিতরে আর একটি বাহিরে বৈঠকখানা। পুরাতন গৃহের বারান্দা ও গোশালায় খড়ের চাল ছিল, এখন রাণীগঞ্জের টালির ছাদ হইয়াছে। পূর্ব্বে গোশালারই এক পার্শ্বে একটু স্থান ঘিরিয়া পাকশালা ছিল, এখন টালি-ছাওয়া একটি পৃথক্ রন্ধনশালা হইয়াছে। এই সকল কার্য্যে মোট প্রায় দুই হাজার হইতে আড়াই হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। গৃহনির্ম্মাণের জন্য বিনয়বাবুকে ঋণ করিতে হয় নাই, প্রতি বৎসর তিনি পোষ্ট আপিসে সেভিংস ব্যাঙ্কে কিছু কিছু করিয়া টাকা জমাইতেন, সেই টাকার পরিমাণ প্রায় তিন হাজার হইয়াছিল। কন্যার বিবাহের জন্য তিনি টাকা জমাইতেছিলেন, কিন্তু গৃহের অভাবে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সেই টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। পুরাতন শয়নকক্ষ দুইটির অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, উহার সংস্কার না করাইলে আর চলিত না।

এক বৎসর হইল মালতীর বিবাহ হইয়াছে। বিনয়বাবুর বৈবাহিক সুরেশ চাটুয্যের বাটী শ্রীরামপুর। তিনি কলিকাতার একটা ব্যাঙ্কে মাসিক এক শত ত্রিশ টাকা বেতনে চাকরি করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অবনীমোহন, আই. এ. ফেল করিয়া পিতার আপিসেই পঁয়ত্রিশ টাকা বেতনে একটা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। অবনীমোহনের বয়স চব্বিশ বৎসর। সুরেশবাবু ও তাঁহার পুত্রও ডেলি-প্যাসেঞ্জার এবং এই ডেলি-প্যাসেঞ্জারি সূত্রেই বিনয়বাবুর সহিত সুরেশবাবুর আলাপ-পরিচয় ছিল। মালতী বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিলে বিনয়বাবু ট্রেনে তাঁহার পরিচিত বন্ধুবান্ধবগণের নিকটে তাঁহার কন্যার জন্য পাত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে এক দিন শ্রীরামপুরের এক জন প্যাসেঞ্জার বিনয়বাবুকে বলিলেন, "বিনয়বাবু, আপনি মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজছেন, সুরেশবাবুকে ধরুন না। ওঁর বড় ছেলে, বাপের ব্যাঙ্কেই চাকরি কচ্ছে, বয়স বাইশ-তেইশ বছর হবে, দেখতে মন্দ নয়, স্বভাবচরিত্রও ভাল শুনেছি। তবে সুরেশবাবুর ঠিকুজী-কোষ্ঠীর উপর বড় ঝোঁক, যদি ঠিকুজীর মিল হয়, সুরেশ বাবু রাজী হ'তে পারেন।"

ঠিকুজীর মিল হইল—একেবারে রাজযোটক। সুরেশ বাবু এক দিন দুই জন বন্ধুকে লইয়া মালতীকে দেখিয়া আসিলেন, পাত্রীর রূপ দেখিয়া তিনি প্রশংসা করিলেন। দেনা-পাওনার কথা উঠিতে বিনয়বাবু বলিলেন, "আপনিও কেরাণী, আমিও কেরাণী। কেরাণী মাত্রেরই অবস্থা সমান। তবে আমার ঐ একটি মেয়ে, আমার যেমন সাধ্য আমি তেমনি দিব।"

অনেক দর-কষাকষি টানাটানির পর স্থির হইল—নগদ আট শত টাকা, হাজার টাকার গহনা এবং ফুলশয্যা প্রভৃতি বাবদে তিন শত টাকা মোট একুশ শত টাকা। বিনয়বাবু অগত্যা সম্মত হইলেন। এই বিবাহের জন্য বিনয় বাবুকে প্রায় দেড় হাজার টাকা ঋণ করিতে হইল। তিনি পূর্ব্বে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে কন্যার বিবাহ না দিয়া তিনি গৃহের জীর্ণ সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু পরে তাঁহাকে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কারণ পুরাতন কক্ষ দুইটির অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়াছিল, তাহাতে যে কোন বর্ষায় অতিরিক্ত বৃষ্টিতে সেই গৃহ ভূমিসাৎ হইবার আশঙ্কা ছিল। তাহার পর কন্যার বিবাহ হইলে জামাতা আসিলেই বা গৃহের সঙ্কুলান হইবে কিরূপে? তাঁহারা সেই ভগ্ন গৃহে কোনরূপে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু কন্যা জামাতাকে কি সেই ঘরে থাকিতে দিতে পারা যায়? এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া বিনয়বাবু জননী ও পত্নীর সহিত পরামর্শপূর্ব্বক কন্যার বিবাহের পূর্ব্বেই গৃহ-নির্ম্মাণে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার জননী তাঁহাকে এই বলিয়া ভরসা দিয়াছিলেন যে, মালতীর বিবাহের পর নির্ম্মলের বিবাহ দিলে ত কিছু টাকা পাওয়া যাইবে, সুতরাং মালতীর বিবাহের জন্য যদি কিছু দেনা করিতেই হয়, তবে সে দেনা পরিশোধ করিতে কতক্ষণ?

মালতী একটি মাত্র কন্যা, তাহাকে সৎপাত্রে সমর্পণ করিতেই হইবে, তার পর যা থাকে অদৃষ্টে। মালতী সৎপাত্রেই পড়িয়াছিল। অবনীমোহন দেখিতে সুশ্রী, শারীরিক সৌন্দর্য্যে মালতীর অযোগ্য হয় নাই। বিশ-

বিদ্যালয়ের উপাধিধারী না হইলেও অশিক্ষিত ছিল না, কলেজে দুই বৎসর পড়িয়াছিল। আর বি. এ., এম. এ. পাস করিলেও শেষ পরিণতি ত সেই চাকরি? বৃথা দুই বৎসর বা চারি বৎসর সময় নষ্ট ও পিতার অর্থব্যয় না করিয়া এখন হইতে চাকরিতে প্রবৃত্ত হওয়াতে তাহার ক্ষতি কিছুই হয় নাই। যে কয় বৎসর সে কলেজে পড়িত, সেই কয় বৎসর চাকরিতে অর্থাৎ আপিসের কাজে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই বিনয়বাবু অবনীমোহনকে সৎপাত্র বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন।

কিন্তু মালতীর বিবাহের পর একটা বিষয়ে বিনয়বাবু একটু মনঃপীড়া পাইয়াছিলেন। মালতীর শ্বশুর যেরূপ অমায়িক ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী, মালতীর শাশুড়ী ঠিক সেরূপ ছিলেন না। তিনি পাত্রের মাতা হিসাবে সুবিধা পাইলে একটু আধটু মেজাজ দেখাইতে ছাড়িতেন না। তবে সুখের বিষয় এই যে, তিনি পুত্রবধূকে খুব ভালবাসিতেন, মালতীর সহিত কখনও রূঢ় ব্যবহার করিতেন না বা তাহাকে বাক্য-যন্ত্রণা দিতেন না। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, বিনয়বাবু ইচ্ছা করিলে কন্যার বিবাহে আরও অর্থব্যয় করিতে পারিতেন, কেবল কৃপণ স্বভাব বশতঃ করেন নাই। সুরেশবাবু তাহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "বেয়াই যদি আরও টাকা খরচ করতে পারতেন, তাহ'লে তোমার আই-এ ফেল কেরাণী ছেলের হাতে মেয়ে দিতে যাবেন কেন? তিন-চার হাজার টাকা খরচ করতে পারলে, উকীল ডাক্তার জামাই আনতে পারতেন।"

মালতীর শাশুড়ীর কুটুম্বের প্রতি এই বিমুখতা ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিয়াছিল। কারণ বিনয়বাবু সর্ব্বদাই জামাতার বাড়ীতে বাগানের ফল বা পুষ্করিণীর মৎস্য পাঠাইয়া দিতেন। বিনয়বাবু যদি কোন দরিদ্র প্রতিবেশীর দ্বারা ঐ সকল দ্রব্য পাঠাইতেন তাহা হইলে সুরেশবাবুকে সেই ব্যক্তির পাথেয় ও কিছু পারিশ্রমিক দিতে হইত; কিন্তু বিনয়বাবু নির্ম্মলের দ্বারাই ঐ সকল দ্রব্য পাঠাইয়া দিতেন। শ্রীরামপুর স্টেশন হইতে কলেজে যাইবার পথের পার্শ্বেই সুরেশবাবুর বাটী। নির্ম্মল কলেজে যাইবার সময় মাছ, ফল, বা তরকারি সুরেশবাবুর বাটীতে দিয়া কলেজে যাইত। নির্ম্মল পল্লীগ্রামের দরিদ্র গৃহস্থের সন্তান, কলেজে পড়িলেও একালের কলেজের ছাত্রসুলভ অভিমান তাহার ছিল না। এইরূপে বাগানের আম, জাম, লিচু, জামরুল, সজিনা খাড়া, লাউ, কুমড়া, কাঁকরোল, ঝিঙে প্রভৃতি, মাছ এবং মধ্যে মধ্যে বাটীর দুধের ক্ষীর, চন্দ্রপুলি প্রভৃতি পাইয়া মালতীর শাশুড়ী আর প্রতিবেশিনীদিগের নিকটে বৈবাহিকের উল্লেখ করিবার সময় "কিপ্পিন মিন্সে" না বলিয়া "বেয়াই" বলিয়া উল্লেখ করিতেন।

মালতী যখন শ্বশুরবাটীতে থাকিত, তখন বিনয়বাবু প্রায় প্রতি শনিবারে আপিস হইতে বাটী ফিরিবার পথে শ্রীরামপুরে নামিয়া মালতীকে দেখিয়া আসিতেন এবং মালতী পিত্রালয়ে থাকিলে তিনি প্রায় প্রতি শনিবারেই জামাতাকে সঙ্গে করিয়া নিজের বাটীতে লইয়া আসিতেন। তিনি যখন শ্রীরামপুরে মালতীকে দেখিতে যাইতেন, তখন কখনও শুধুহাতে যাইতেন না, মাছ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে যে মালতীর শাশুড়ীর ধারণার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

৪

বিনয়বাবুর সংসার একরূপ নিশ্চিন্তেই চলিতে লাগিল। কন্যার বিবাহের জন্য তাঁহার দেড় হাজার টাকা ঋণ হইয়াছিল বটে, তাহার মধ্যে পাঁচ শত টাকা আপিস হইতে লইয়াছিলেন, তাহার সুদ লাগিত না, অবশিষ্ট হাজার টাকার সুদ দিতে হইত। আপিসের বড়বাবু বিনয়-বাবুকে স্নেহ করিতেন, তিনিই সাহেবকে বলিয়া আপিস হইতে টাকা ঋণ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি বিনয়বাবুকে বলিয়াছিলেন—"ওহে বাঁড়ুয্যে, আপিসের দেনার জন্য চিন্তা নাই। যে টাকাটার সুদ দিতে হবে, আগে সেইটা পরিশোধ ক'রে তার পর আপিসের টাকা কিস্তিবন্দী হিসাবে মাসে মাসে কিছু কিছু ক'রে দিলেই চলবে। সাহেবকে সে-কথা বলা আছে।" টমাস্ ডেভিডসন কোম্পানীর দেশীয় কর্ম্মচারীরা প্রতি

বৎসর পূজার সময় এক মাসের করিয়া বেতন 'বোনাস্' হিসাবে পাইতেন। এই বোনাসের ব্যবস্থা কেবল ভারতীয় কর্ম্মচারী ও দ্বারবান বেহারা দপ্তরী প্রভৃতির জন্য ছিল, সাহেব কর্ম্মচারীরা পাইতেন না। বড়সাহেব শুনিয়াছিলেন যে, পূজা উপলক্ষে প্রত্যেক হিন্দুকে পুত্র-কন্যা এবং আত্মীয়-স্বজনকে নববস্ত্র উপহার দিতে হয়। এই উপহারের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্যই বড়সাহেব এই বোনাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি এক দিন বিনয়বাবু আপিসে গিয়া সংবাদ পাইলেন যে, বিলাতে বড়সাহেব সার টমাস ডেভিডসন সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। বড়সাহেবের মৃত্যুসংবাদ তারযোগে ম্যানেজার সাহেবের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। ম্যানেজার আপিসে আসিয়াই শোক প্রকাশের জন্য সেদিনের মত আপিস বন্ধ রাখিবার আদেশ প্রদান করিলেন। আপিসের বাবুদের সহিত বড়সাহেবের প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকিলেও বাবুরা সাহেবের মৃত্যুসংবাদে ম্রিয়মাণ হইলেন। ভবিষ্যতে আপিস থাকিবে কি না, থাকিলেও আফিসের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা লইয়া বাবুদের জল্পনাকল্পনা চলিতে লাগিল।

বিনয়বাবু বাটীতে আসিয়া পত্নী ও জননীর নিকটে বড়সাহেবের মৃত্যুসংবাদ দিয়া বলিলেন, "আপিসসুদ্ধ সকলকে বড় ভাবিয়ে তুলেছে। আপিস থাকবে কি উঠে যাবে, কিছুই ঠিক নেই।"

তাঁহার জননী বলিলেন, "যিনি জীব দিয়েছেন তিনিই আহার দিবেন, তুই ভেবে কি করবি?"

বিনয়বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "চাষের ধান থেকে মোটা ভাত মোটা কাপড় হয়ে যাবে, সেজন্যে ভাবনা নেই, ভাবনা দেনার জন্যে। আপিস থেকে যে পাঁচ-শ টাকা ধার নিয়েছ, আপিস উঠে গেলেও কি সাহেবেরা সে টাকা নেবে?"

বিনয়বাবু বলিলেন, "পাওনা টাকা কি কেউ ছাড়ে?"

বিনয়বাবুর মা বলিলেন, "তোর বেয়াইকে ব'লে রেখে দে, তার আপিসে যদি নির্ম্মলের একটা কাজ জোগাড় ক'রে দিতে পারে।"

"তা তো বলতেই হবে। শুধু বেয়াইকে কেন? আরও পাঁচ জনকে ব'লে রাখতে হবে।" সে-রাত্রিতে দুশ্চিন্তায় কাহারও সুনিদ্রা হইল না।

পরদিন বিনয়বাবু আপিসে গিয়া দেখিলেন, "ইংলিশম্যান", "ডেলি নিউজ" প্রভৃতি ইংরেজী দৈনিক কাগজে সার টমাস ডেভিড্‌সনের মৃত্যুসংবাদ ও সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। মৃত্যুকালে তিনি প্রায় এক কোটি টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ টাকারও অধিক তিনি স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতিতে দান করিয়া গিয়াছেন। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। তাঁহার একমাত্র কন্যা মিসেস ডোরথি হ্যামিল্টন সার টমাসের উত্তরাধিকারিণী।

আপিস উঠিয়া গেল না, যেমন চলিতেছিল সেইরূপ চলিতে লাগিল। আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাস কাটিয়া গেল। ১০ই অক্টোবর দুর্গাপূজা। দুর্গাপূজা উপলক্ষে সওদাগরি আপিস সপ্তমী হইতে দশমী পর্য্যন্ত চারি দিন বন্ধ থাকে। প্রতি বৎসর মহালয়ার পূর্ব্বদিন আপিসের বাবুরা বোনাস পাইয়া পরদিন মহালয়ার বন্ধে, আত্মীয়স্বজনের জন্য নূতন জামা কাপড় প্রভৃতি কিনিয়া থাকেন। এ বৎসর মহালয়ার পূর্ব্বদিন বোনাস বাহির হইল না, বাবুরা বুঝিলেন যে, বড়সাহেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের বোনাস বন্ধ হইল। তা হউক, চাকরি বজায় থাকিলেই তাঁহারা নিশ্চিন্ত। মহালয়ার পর দিন যথারীতি আপিস খোলা হইল, কাজকর্ম্ম চলিতে লাগিল।

বেলা একটার সময় বড়বাবু ম্যানেজার সাহেবের কক্ষ হইতে হাসিমুখে বাহির হইয়া সকলকে বলিলেন, "আজকার ডাকে বড়সাহেবের মেয়ে মিসেস হ্যামিল্টনের পত্র আসিয়াছে। তিনি ম্যানেজারকে লিখিয়াছেন যে, কলিকাতা এবং বোম্বাই আপিসের, ইংরেজ ও ভারতীয় নির্ব্বিশেষে ছোট বড় সকল কর্ম্মচারীকে যেন ছয় মাসের বেতন দান করা হয়। কর্ম্মচারীরা তাঁহার পিতার আত্মার মুক্তি কামনা করুন, ইহাই তাঁহার অনুরোধ।"

বড়বাবুর কথা শুনিবামাত্র কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে একটা যেন আনন্দের তরঙ্গ বহিয়া গেল। কোথায় এক মাসের বেতন বোনাস না পাওয়ায় নৈরাশ্যের পর সহসা

ছয় মাসের অতিরিক্ত বোনাস প্রাপ্তির সংবাদ! কর্ম্মচারীদের এই আনন্দে সার টমাসের আত্মার কি তৃপ্তি হয় নাই ?

এক ঘণ্টার মধ্যেই বাবুরা অক্টোবর মাসের বেতন ও ছয় মাসের বেতন বোনাস পাইলেন। তাঁহারা এতই বিচলিত হইয়া পড়িলেন যে, কেহই আর আপিসের কাজে মন লাগাইতে পারিলেন না। বড়বাবুও দেখিলেন যে, সেদিন তাঁহাদিগকে আর ধীর ভাবে কাজ করিতে বলা বৃথা। বোনাস পাইয়া বিনয়বাবু মনে করিলেন যে, বোনাসের চারি শত কুড়ি টাকা হইতে অন্ততঃ সাড়ে তিন শত টাকা পরদিনই ঋণ পরিশোধ করিবেন।

বেলা সাড়ে তিনটার সময়, ম্যানেজার সাহেবের চাপরাশি আসিয়া বড়বাবুকে বলিল, ম্যানেজার সাহেব সেলাম জানাইয়াছেন। শুনিবা মাত্র বড়বাবু চাপরাশির সঙ্গে প্রস্থান করিলেন। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে, সেই চাপরাশি আবার আসিয়া বিনয়বাবুর হাতে এক টুকরা কাগজ দিল। সেই কাগজে লেখা আছে—"বিনয়, ম্যানেজার সাহেব তোমাকে ডাকিতেছেন, শীঘ্র এস।"

বিনয়বাবু উহা পাঠ করিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ম্যানেজার ? আমাকে ? কেন রে বাবা !"

চাপরাশি বলিল, "তা ত জানি না বাবু। সাহেব আপনার নাম ক'রে বড়বাবুকে কি বললে, তাই বড়বাবু আপনার কাছে এই স্লিপ পাঠালে।"

রজনীবাবু বলিলেন, "কি হে বিনয়, ব্যাপার কি ?"

"মা দুর্গাই জানেন। আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।"

বিনয়বাবু ম্যানেজারের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সকল বিভাগেরই বড়সাহেবরা সেখানে উপস্থিত। বড়বাবুও ম্যানেজারের কাছে একখানা চেয়ারে বসিয়া আছেন, নিকটে আর একখানা শূন্য চেয়ার রহিয়াছে। বিনয় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া অবনত হইয়া ললাট স্পর্শ পূর্ব্বক সকলকে সেলাম করিলে ম্যানেজার গম্ভীরভাবে শূন্য চেয়ার দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ চেয়ারে ব'স।"

সাহেবের আদেশে বিনয়বাবু কম্পিত চরণে ধীরে ধীরে চেয়ারের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, ম্যানেজারের সম্মুখে চেয়ারে বসিতে সাহস হইল না। ম্যানেজার তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "ব'স।"

অগত্যা বিনয়বাবু চেয়ারে আড়ষ্ট হইয়া বসিলেন।

ম্যানেজার বলিলেন, "তোমার নাম ?"

"বিনয়কুমার ব্যানার্জ্জি।"

"বাড়ী কোথায় ?"

"বৈদ্যবাটী। জেলা হুগলী।"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "জেলা হুগলী তাহা জানি। তুমি কখনও কোন ইংরেজ ভদ্রলোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলে ?"

বিনয়বাবু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "মনে ত পড়ে না।"

"ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। বৈদ্যবাটী স্টেশনে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া—"

বিনয়বাবু বলিলেন, "হাঁ মনে পড়িয়াছে। পাঁচ-ছয় বৎসর পূর্ব্বে এক জন বৃদ্ধ ইংরেজ ট্রেন ধরিবার জন্য ছুটিতে ছুটিতে প্লাটফরমে পড়িয়া যান। আমি তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া দূরে সরাইয়া দিই, কিন্তু নিজে পড়িয়া যাই।"

"সেদিন তুমি যাঁহাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিয়াছিলে, পরে তাঁহাকে কোথাও দেখিয়াছিলে ?"

"হাঁ, সেইদিনই হাওড়া স্টেশনে দেখিয়াছিলাম। তিনি আমার নাম ও ঠিকানা জিজ্ঞাসা করাতে আমি নাম ও আপিসের ঠিকানা বলিয়াছিলাম।"

"তিনি কে, তাঁহার নাম কি জান ?"

"না। আমি অনাবশ্যকবোধে তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই।"

"তাঁহার নাম সার টমাস ডেভিড্‌সন। সেদিন এঙ্গাসের চটকলের ম্যানেজারের সহিত দেখা করিয়া ফিরিবার সময় স্টেশনে ঐ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি তাঁহার পকেট-বুকে তোমার নাম লিখিয়া লইয়াছিলেন। তিনি অকৃতজ্ঞ ছিলেন না, তাঁহার জীবনদাতাকে ভুলিয়া যান নাই। তিনি তাঁহার উইলে তোমাকে কুড়ি হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ এখনকার হিসাবে তিন লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার উইলে লেখা আছে যে, তাঁহার মৃত্যুর পরদিন হইতে ঐ টাকায় শতকরা চারি টাকা

হিসাবে সুদ চলিবে। সে টাকা আমাদের কলিকাতার ব্যাঙ্কে আসিয়াছে। ৩১শে জুলাই তারিখে সার টমাসের মৃত্যু হইয়াছে, ১লা সেপ্টেম্বর হইতে সেই টাকা তোমার হিসাবে জমা হইয়া আছে। তিন লক্ষ টাকার সুদ শতকরা চারি টাকা হিসাবে বৎসরে বার হাজার টাকা অর্থাৎ মাসে হাজার টাকা করিয়া হয়। তুমি ইচ্ছা করিলে কালই আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের সুদ দুই হাজার টাকা লইতে পার। তোমার আত্মীয় ও বন্ধুরা এই সংবাদ শুনিলে, নিশ্চয়ই তোমার নিকট একটা বড় ভোজ দাবী করিবেন। আপিসের বাবুরাও তোমাকে ছাড়িবেন না।"

বুক ডিপার্টমেন্টের বড়সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "আমরাই ছাড়িব নাকি?" এই বলিয়া বিনয়বাবুর করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ কর।" তাঁহার দেখাদেখি সকল সাহেবই বিনয়বাবুর সহিত করমর্দ্দন করিয়া শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন।

ম্যানেজার সাহেব বড়বাবুকে বলিলেন, "দত্তবাবু, তুমি আজ ইহাকে একাকী বাড়ী যাইতে দিও না, আপিসের এক জন বেয়ারাকে ইহার সঙ্গে দাও, সে ব্যানার্জ্জিকে বাড়ীতে পঁহুছিয়া দিয়া আজ রাত্রে বা কাল সকালে চলিয়া আসিবে। আজ উহার মাথার ঠিক নাই, পথে ঘাটে বিপদ ঘটিতে পারে। ব্যানার্জ্জি, তোমার মাথা ঠাণ্ডা ও বুদ্ধি স্থির করিবার জন্য এক সপ্তাহের ছুটি দিলাম। তোমার মানসিক চাঞ্চল্য হ্রাস পাইলে আমার সঙ্গে আসিয়া দেখা করিও, আমি তোমাকে ব্যাঙ্কে লইয়া গিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিব। আজ তোমার পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-বন্ধুদের জন্য কিছু মিষ্টান্ন কিনিয়া লইয়া বাড়ী যাও।"

এই বলিয়া বিনয়বাবুর সহিত করমর্দ্দন করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বাঙালীরা বড়ই মিষ্টান্নপ্রিয়। নহে কি?"

প্রণতি

শ্রীশান্তি পাল

অরুণোজ্জ্বল মুখমণ্ডল
পঙ্কজ-চারু-লোচনা,
অয়ি সকল-দুঃখ-মোচনা!
ক্ষণকাল তুমি সম্মুখে রহ
পঙ্কিল যাহা নিঃশেষে দহ
পবিত্র কর নিশ্বাসে তব
নির্ম্মল কর রচনা,
অয়ি পঙ্কজ-চারু-লোচনা!

তুমি সুন্দর নিরুপম,
সিন্দুর তব উজ্জ্বল হোক
গোধূলি-আকাশ সম।
তুমি আছ তাই আছে এ ধরায়
সংসারটুকু সব এক ঠাঁই,
তোমার পুণ্য পরশ লভিয়া
কুৎসিতও মনোরম।
তুমি তুমি সুন্দর নিরুপম!

দেবি, ঘনায় সন্ধ্যা যবে,
গৃহ-প্রাঙ্গণ উচ্ছল হয়
তোমারি শঙ্খরবে।
স্বর্গ হইতে অমৃত ছানিয়া
তুমি যে বিশ্বে দিয়েছ আনিয়া;
বেদের মন্ত্রে মুখরিত করি
কল্যাণ আনো ভবে,
দেবি, ঘনায় সন্ধ্যা যবে।

অরুণোজ্জ্বল মুখমণ্ডল
পঙ্কজ-চারু-লোচনা,
অয়ি সকল-দুঃখ-মোচনা।
দূর হ'তে পায়ে জানাই প্রণতি,
তোমার মহিমা কি গাহিব সতী?
শঙ্কর শুধু জেনেছে ধেয়ানে
তোমারি তত্ত্ব-সূচনা
অয়ি, পঙ্কজ-চারু-লোচনা!

আলোচনা

"সাপের শত্রু"

শ্রীপ্রদ্যোতকুমার চক্রবর্ত্তী

মাঘ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে "সাপের শত্রু" শীর্ষক আলোচনা পাঠ করিয়া একটি কথা না জানাইয়া পারিতেছি না। আশা করি বিষয়টি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

সাপ ও নকুলের মধ্যে লড়াইয়ের যে বর্ণনা এই আলোচনাতে দেওয়া হইয়াছে, তদনুরূপ একটি লড়াই এখানেও হইয়াছিল। তিন-চার বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। আমার পরিচিত একটি কাঠুরিয়া শ্রীহট্ট শহরের উপকণ্ঠে বনে কাঠ কাটিতেছিল। নিকটবর্ত্তী ঝোপের আড়ালে কিছুক্ষণ ধরিয়া সে ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনিতে পাইতেছিল। প্রথমে সে ইহাতে ততটা মনোযোগ দেয় নাই। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কৌতূহলপরবশ হইয়া সেখানে উপস্থিত হয় এবং একটি সর্প ও বেজীকে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখে। প্রতিবারই সর্পদষ্ট হইয়া বেজীটি নিকটবর্ত্তী একটি গাছের নিম্নভাগে কামড় দিয়া বিদ্যুৎ গতিতে ফিরিয়া আসিতেছিল যাহাতে ইত্যবসরে সর্পটি সরিয়া পড়িতে না পারে। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর নকুলটি জয়লাভ করে। শ্রীযুক্ত নারায়ণবাবুর কথিত ব্যক্তিগণ 'লতার ডগাটি' সংগ্রহ করিতে পারেন নাই বটে; কিন্তু এক্ষেত্রে কাঠুরিয়া বিশেষভাবে গাছটি লক্ষ্য করিয়া রাখিয়াছিল, এবং যুদ্ধশেষে উহা তুলিয়া আনিয়া আমাকে দেয়। নকুলের দংশনে গাছটির কাণ্ড ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। ইহা এক প্রকার গুল্ম। পাতা এবং শাখা তিক্ত আস্বাদযুক্ত। এতদঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ঐ ঘটনার পরই আমি বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজার মহাশয়কে লিখি যে তিনি ইহা কোন কাজে লাগাইতে পারেন কি না। কিন্তু সেখান হইতে কোন সাড়া পাই নাই, এবং নানা কার্য্যব্যপদেশে ব্যস্ত থাকাতে আমিও এত দিন ইহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে দেখিয়া বিষয়টা সাধারণের গোচরে না আনিয়া পারিতেছি না। যদি কেহ এই গাছ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহেন, আমাকে লিখিলে আমি সানন্দে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিতে পারি। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় যদি ইহাতে সর্প-বিষঘ্ন কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয়, তবে জনসাধারণের যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্রত্যুত্তর

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

গত বৈশাখের 'প্রবাসী'র সাপের শত্রু বিষয়ক প্রবন্ধে বেজী সম্পর্কিত মন্তব্য উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র চন্দ মহাশয় মাঘের 'প্রবাসী'তে সাপ ও বেজীর লড়াই সম্বন্ধে এক জন প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতার অতীব কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু নারায়ণবাবুর বর্ণনা হইতে বেজীর সর্পবিষঘ্ন ঔষধ জানা সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় কি না তাহা বিবেচ্য। কারণ প্রত্যক্ষদর্শী ভদ্রলোক যখন সাপটাকে বেজীর পিঠের উপর ছোবল মারিতে দেখেন, তাহার বেশ কিছুক্ষণ পূর্ব্ব হইতেই যে লড়াই চলিতেছিল—বর্ণনায় তাহাই বুঝা যায়। সাপটা পূর্ব্বে আরও কয়েক বার ছোবল মারিয়াছিল কি না (মারাই হয় ত সম্ভব) এবং যদি মারিয়াই থাকে তবে সেই আঘাত মাটি বা অন্য কিছুর উপর দিয়াই গিয়াছিল কিনা? যদি সেরূপ কিছু ঘটিয়া থাকে তবে পূর্ব্বেই বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে অথবা বিষও নিঃশেষিত হইয়া থাকিতে পারে। 'সাপের শত্রু' প্রবন্ধে সাপ ও গোসাপের লড়াই বর্ণনায় এরূপ একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছি। কাজেই আঘাত করিলেও তাহার শরীরে বিষ প্রবেশ করিয়াছিল কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

সর্পাঘাতের পরই বেজীটা ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছিল। ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে লতাটা চিবাইয়া খাইল, কি লতার রস-সিক্ত জিহ্বা দ্বারা ক্ষতস্থান চাটিয়া ফেলিল, তাহা কেহই লক্ষ্য করে নাই। তা ছাড়া বেজী যদি সর্পবিষের এমন অব্যর্থ ঔষধেরই সন্ধান জানে, তবে সাপের দংশন এড়াইবার জন্য কৌশল অবলম্বন করে কেন? এ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধাদের পরীক্ষালব্ধ তথ্যসমূহ উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। কেবলমাত্র ম্যাক্টন সাহেবের পরীক্ষার কথা ভাবিলেই বিস্মিত হইতে হয়। তিনি সর্পবিষ সম্বন্ধে বিবিধ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছাড়াও সাপে বেজীতে লড়াই বাধাইয়া যে-সকল পরীক্ষা করিয়াছেন তাহা অতি অদ্ভুত। মোটের উপর সাপে বেজীতে লড়াই বাধিলে বেজী প্রথমে একটু তফাতে থাকিয়া সাপকে উত্তেজিত করে এবং সাপটা ক্রোধের বশে বারম্বার দংশন করিতে থাকে। ফলে হয় তাহার বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া যায় নয় ত বিষ নিঃশেষিত হইয়া যায় এবং সাপটাও ক্রমশঃ নিস্তেজ হইতে থাকে। তখন সুযোগ বুঝিয়া বেজী তাহাকে আক্রমণ করিয়া খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলে। অবশ্য পরীক্ষার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপও দেখা গিয়াছে যে, আবদ্ধ স্থলে লড়াইয়ের উপক্রম হইতেই সাপ ফণা তুলিয়া দংশন করিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বেজী বিদ্যুৎ-গতিতে আক্রমণ করিয়া তাহাকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে। এস্থলে বেজীর মনস্তত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতে পারে; কিন্তু তদুত্তরে একথা বলা যায় যে, বেজী যদি বিষঘ্ন ঔষধ সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে পারে তবে তাহার খাঁচায় আবদ্ধ অবস্থাটা সম্বন্ধে সচেতন না থাকিবার কোন কারণ নাই।

তাছাড়া বিষক্রিয়া আরম্ভ হয় রক্ত অথবা স্নায়ুসূত্রের উপর।

তৎপরে শ্বাসযন্ত্রের উপর বিষের প্রভাব বিস্তৃত হয়। পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে—অন্ত্রে ক্ষত না থাকিলে সাপের বিষ উদরস্থ করিলেও শরীরে বিষক্রিয়া লক্ষিত হয় না। চিনির দানার মত হরিদ্রাভ দুইটি উগ্র বিষের দানা সামান্য একটু ময়দার মধ্যে ভরিয়া একবার আমাদের পরীক্ষাগারের একটি ইঁদুরকে খাওয়াইয়া দিয়াছিলাম। ইঁদুরটির কোনই অনিষ্ট হইতে দেখি নাই। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, বেজীটা লতার খানিকটা অংশ চিবাইয়া খাইয়া বাকীটুকু মুখে করিয়া লইয়া আসিয়াছিল তথাপি স্বভাবতঃই এই কথা মনে হয় যে, গোখুরা সাপের বিষের মত উগ্র বিষ, যাহার এক গ্রেনের বারো ভাগের এক ভাগ মাত্র পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইতে যথেষ্ট, তাহা একবার রক্তের সহিত মিশ্রিত হইতে পারিলে অতিদ্রুত বিষক্রিয়া সুরু হইয়া যায়, তাহাতে বিষঘ্ন ঔষধ পৌষ্টিক নালীর ভিতর দিয়া প্রবেশ করিলে শরীরে শোষিত হইয়া তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে যথেষ্ট সময় লাগিবারই কথা। বিশেষতঃ বিষ যখন যথেষ্ট পূর্ব্বেই শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে।

বিড়াল কুকুরও তাহাদের কোন কোন রোগ নিরাময় করিবার ঔষধ জানে। অনেকেই হয়ত দেখিয়া থাকিবেন—অসুস্থ হইয়া পড়িলেই তাহারা বাছিয়া বাছিয়া কোন কোন ঘাস চিবাইয়া উদরস্থ করিয়া থাকে। কিন্তু সেই ঔষধ খাইয়াও কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারা রোগমুক্ত হইতে পারে নাই—ইহা দেখিয়াছি। নকুলের বেলায়ও যে সেরূপ কিছু ঘটে না, ইহা নিশ্চিত বলা যায় কি

সকল সাপের বিষই উগ্র বা মারাত্মক নহে। জীব-শরীরের উপর বিভিন্ন জাতীয় সাপের বিষের ক্রিয়া বিভিন্ন। হয়ত শরীরে বিষ প্রবেশ করে নাই অথবা বিষ প্রবেশ করিলেও তাহা মারাত্মক বিষ নহে—এরূপ ক্ষেত্রেও বেজী, বিড়াল কুকুরের ন্যায় সংস্কারবশে সর্পদষ্ট হইলেই কোন পাতা চিবাইতে পারে। সে ক্ষেত্রে সে পাতা চিবাইলেও বাঁচিবে, না চিবাইলেও বাঁচিবে। মারাত্মক বিষ শরীরে প্রবেশ করিবার পর ঔষধের গুণে দীর্ঘ সময় বাঁচিয়া রহিয়াছে এরূপ কোন পরীক্ষামূলক প্রমাণ না পাওয়া গেলে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকিয়া যায়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও পলাইয়া যাইবার পর, সর্পদষ্ট বেজীটা বাঁচিয়াছিল কি মরিয়া গিয়াছিল সে খবর কেহ রাখে নাই।

বলা যাইতে পারে যে, লতার গন্ধ শুঁকিয়াও ত বিষক্রিয়া দূরীভূত হইতে পারে। কিন্তু তাহা কেবল তর্কের কথা মাত্র। কারণ প্রকৃত তথ্য যে কি তাহা কাহারও জানা নাই। সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে ইহার সম্ভাব্যতা যে কতটুকু তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

নকুলের সর্পবিষঘ্ন ঔষধ জানা সম্বন্ধে আমাদের দেশে প্রবাদ-বচনের মত প্রচলিত অনেক অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়াছি, কিন্তু সবই শোনা কথা। কেহই তাহা নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ বলিয়া দাবী করিতে পারেন নাই। অবশ্য নারায়ণবাবুর বর্ণিত ঘটনার মত অন্যান্য অভিজ্ঞতার বিষয় পূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু আমার তাহা নজরে পড়ে নাই।

অপর পক্ষে বিদেশীরা এ সম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পরীক্ষামূলক পর্য্যবেক্ষণের ফল বলিয়াই গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করিয়াছি। কিন্তু তাহাই যে এ সম্বন্ধে শেষ কথা এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে হয়ত আরও অনেকের অনেক কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রহিয়াছে; এই ভাবে তাহা প্রকাশিত হইলে প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ে যথেষ্ট সহায়তা হইবে।

পুনশ্চ। এ বিষয়ে আলোচনার পর শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চিঠি দেখিতে পাইলাম। তিনিও নারায়ণ-বাবুর বর্ণিত ঘটনার অনুরূপ সর্প ও নকুলের লড়াইয়ের একটি বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। তবে তাঁহার বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, তিনি সেই ঔষধের গাছটি প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট হইতে চিনিয়া লইয়াছেন। যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক তিনি সেই গাছটি আমাকে বোস্ রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট, ৯৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইয়া দিতে পারেন তবে খুবই ভাল হয়। গাছটি পাইলে অথবা ইহার বৈজ্ঞানিক এবং বিভিন্ন দেশে প্রচলিত নাম জানিলেও তাহার বিষপ্রতিষেধক গুণাগুণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সুযোগ পাওয়া যাইবে।

"রামমোহন ও বাংলা গদ্য"

শ্রীমনোমোহন ঘোষ, এম্. এ., পিএইচ. ডি.

গত পৌষ মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 'রামমোহন ও বাংলা গদ্য' শীর্ষক প্রবন্ধের (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪১) যে চমৎকার পরিপূরক রচনা করেছেন তার জন্যে তিনি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। এ প্রসঙ্গে তিনি আমাদের প্রবন্ধ সম্পর্কে যে সৌজন্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তার জন্যেও তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁর লিখিত তথ্যনিচয়ের কয়েকটি আমারও চোখে পড়েছিল, তবে ভ্রমক্রমে সেগুলির উল্লেখ করি নি। কিন্তু এখন মনে হয় সে উল্লেখ না করা ভালই হয়েছিল। আমাদের প্রবন্ধে এত বিস্তারিতভাবে সে সকল তথ্য বর্ণন করা যেত না (১)। তবে প্রভাত-

(১) প্রভাতবাবুর উল্লিখিত ব্রজমোহন মজুমদার 'তথ্য প্রকাশ' নামে একখানা পুস্তকও লিখেছিলেন (১৮৪২)। এর প্রতিপাদ্য বিষয় মূর্ত্তি পূজার অসারতা প্রতিপাদন। লঙ (Rev. J. Long) বলেন যে পাদরী মর্টন (Rev. Morton) ১৮৪২ সালে এর এক সটীক সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। এ উক্তির তারিখটা নির্ভুল মনে হয় না। তবে বইখানি যে মিশনারীদের আদর লাভ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। কারণ ইয়েট্‌স্ (Dr. Yates) কৃত পাঠ সংকলনেও (১৮৪৭, ২য় সংস্করণ) এ পুস্তক ব্যবহৃত হয়েছে। ১৮৪৩ সালে 'পৌত্তলিক প্রবোধ' মুদ্রিত হয়। এর আখ্যাপত্রে 'ব্রজমোহন মজুমদার' নাম 'ব্রজমোহন দেব' রূপে উল্লিখিত আছে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম. এ. মহাশয়ের সৌজন্যে আমি এ বিষয়টি এবং 'তথ্যপ্রকাশে'র রচয়িতার নাম জানতে পেরেছি।

বাবু যা যা লিখেছেন সে সকল ছাড়াও রামমোহনের গদ্য সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য ছিল, কিন্তু পরে সুবিধা মত বলব বলে সে সকল বিতর্কসঙ্কুল কথা তখন প্রবন্ধভুক্ত করি নি। বর্ত্তমান সুযোগে সে-গুলির উল্লেখ করছি। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত (অধুনা 'ডক্টর') সুশীলকুমার দে মহাশয়ের লেখা থেকে জানা যায় যে, সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশিত (১৮০১) বাংলা গদ্য পুস্তক 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' রচয়িতা রামরাম বসুর জীবনের উপর রামমোহনের সুগভীর প্রভাব ছিল। রামমোহনই তাঁর সাহিত্যিক প্রচেষ্টার রূপ দান করেছিলেন; রামবসুর গদ্য রচনার প্রথম ইচ্ছাও তাঁর প্রেরণা থেকে এসেছিল এবং তিনি তার প্রথম গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রামমোহন রায়ের দ্বারা সংশোধিত করিয়ে নিয়েছিলেন(২)। কিন্তু পরবর্ত্তী কোন কোন লেখকের মত এই যে এ-বিষয়ে সুশীলবাবুর অবলম্বিত প্রমাণ নির্ভরযোগ্য নয়, অতএব তাঁর উক্তি গ্রহণের অযোগ্য(৩) সম্প্রতি সুশীলবাবুর অনুসৃত প্রমাণের মূল খুঁজে আমরা এর গুণাগুণের পুনরালোচনা করেছি এবং এর ফল প্রেক্ষাবান্ পাঠকের সামনে উপস্থিত করা যাচ্ছে।

সুশীলবাবুর ব্যবহৃত প্রমাণের মূলে আছেন সুপরিচিত ঐতিহাসিক স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায়। তাঁর সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রকাশিত (১৩১৩ বাং) 'প্রতাপাদিত্য' পুস্তক (পৃ. ৮৫-১৮৮) অবলম্বনে সুশীলবাবু তাঁর রামরাম বসু এবং রামমোহন সম্পর্কীয় মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। এ বইখানি আর সাধারণ বইয়ের মত ক্রয়লভ্য নয়, এ জন্যে সুশীলবাবুর প্রমাণের বলাবল বিচার সাধারণের পক্ষে কষ্টসাধ্য। খুব সম্ভব সে কারণে এ পর্য্যন্ত সুশীলবাবুর উক্তির বিরোধী মন্তব্য নিয়ে কেউ কিছু বলতে পারেন নি। সম্প্রতি নিখিলনাথ রায়ের পুস্তকখানি আমাদের হস্তগত হয়েছে এবং তার সাহায্যে বর্ত্তমান আলোচনা সম্ভবপর হ'ল। 'রেবরেণ্ড কেরী মহোদয়ের যে সকল অমুদ্রিত কাগজ-পত্র শ্রীরামপুরের পাদরী মহাশয়গণের পুস্তকালয়ে সযত্নে রক্ষিত আছে, তারই উপর নির্ভর করে নিখিলনাথ রায় রামরাম বসু ও রামমোহন রায়ের সাহিত্যিক সংযোগের কাহিনী লিখেছেন; এ প্রসঙ্গে নিখিলনাথ বলেন, "বসু মহাশয়ের এ-সকল ভাষা (ফারসী আরবী ও সংস্কৃত) শিক্ষার জন্য তিনি রাজা রামমোহন রায়ের নিকট পরিচিত হন। রাজা রামমোহন তাঁহার ষোড়শ বর্ষ বয়সে একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে যে বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন তাহাই পাঠ করিয়া বাঙ্গালা গদ্য রচনায় প্রবৃত্তি হয় (৫)।...তিনি ফারসী রচনাতেও পারদর্শী ছিলেন, এই ফারসী রচনাও তিনি রাজা রামমোহন রায়ের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি রাজার নিকট হইতে ফারসী ভাষাও শিক্ষা করেন।...রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র লিখিত হইলে তিনি গুরুকল্প রাজা রামমোহন রায়ের নিকট উক্ত পুস্তক লইয়া উপস্থিত হন, এবং তাঁহার দ্বারা স্বীয় গ্রন্থ আনুপূর্ব্বিক সংশোধন করাইয়া লন।...বসু মহাশয় স্বীয় জীবনে অনেক বদান্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কেরী সাহেব বলেন যে, তাঁহার এই বদান্যতা শিক্ষাও রাজা রামমোহন রায়ের নিকট হইয়াছিল।...কেরীর লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, বসু মহাশয়ের জীবনে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিবিম্ব অল্পবিস্তর স্থান পাইয়াছিল। তাঁহার প্রকাশ্য ও দৈনন্দিন জীবন রাজার আদর্শে গঠিত হইয়াছিল।" (পৃঃ ১৮৫—১৮৮)।

এ প্রসঙ্গে অর্থাৎ রাম বসুর চরিত কাহিনী বলতে গিয়ে নিখিলবাবু স্থানে স্থানে কেরীর অপ্রকাশিত কাগজপত্র থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃতও করেছেন। যেমন, রাম বসুর চরিত্রের এক বৈশিষ্ট্য বর্ণন করতে গিয়ে কেরী লিখছেন:—He was of a peculiar turn of mind. Though amiable in manners and honest in dealings, he was a rude and unkind Hindoo if any body did him wrong (১৮৭ পৃষ্ঠার ১ম ফুটনোট)। এ জাতীয় উদ্ধৃতিকে (quotation নিখিলনাথ রায়ের স্বকপোলকল্পিত ভাববার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না। তাঁর রচিত 'প্রতাপাদিত্য' আমরা বেশ ধৈর্য্যসহকারে পাঠ করেছি। এর পদে পদে উচ্চ শ্রেণীর গবেষক-সুলভ শ্রম-স্বীকার এবং সত্যনিষ্ঠার পরিচয় রয়েছে। এজন্য তাঁর আলোচ্য উক্তিকে আমরা সর্ব্বাংশে বিশ্বাসযোগ্য মনে করি। কেরীর অপ্রকাশিত যে সকল কাগজপত্রের প্রমাণ তিনি তাঁর বইতে ব্যবহার করেছেন সে সকল তাঁর সময়ে বর্ত্তমান ছিল বলেই মনে হয়। গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে যদি সে সকল কাগজপত্র নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তবে তাতে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে নিখিলবাবুর পুস্তক রচনার কালে সে সকলের অস্তিত্বই ছিল না।(৬) অতএব আমরা ধরে নিতে পারি যে রামরাম বসুর সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত (১৮০১) বাংলা গদ্য পুস্তক 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র পাণ্ডুলিপি রামমোহনের দ্বারা সংশোধিত হয়েছিল এবং নানা দিক দিয়ে রামরাম বসুর জীবনের উপর রামমোহন রায়ের সুগভীর প্রভাব ছিল।

---

(২)...Rammohan Ray...exercised great influence on Ram Basu's life and character and moulded his literary aspirations...the influence of Rammohan's unpublished work, which Ram Basu is said to have taken as his model *can never be disputed* and it was from the learned Raja that Ram Basu got the first impulse to write in Bengali...Ram Ram took the manuscripts of his first work...to Rammohan, and got it thoroughly revised by him. (See History of Bengali Literature in the 19th Century, p. 160.) *Italics are ours.*

(৩) যথা ১৩৪৩ (বাং) সালে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা পৃ. ২৲। এই ভূমিকায় সুশীলবাবুর নাম বা তাঁর পুস্তকের উল্লেখ নেই। তবে ভূমিকাকার যে তাঁহার মতকেই লক্ষ্য করে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন এ বিষয়ে সন্দেহ করা শক্ত মনে হয়।

(৪) পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সৌজন্যে উক্ত পুস্তকখানি ব্যবহার করতে পেরেছি।

(৫) মনে হয় এস্থলে নিখিলবাবু ভ্রম করেছেন (১৮৪, পৃ ফুটনোট) কেরীর মত এই যে রামমোহন ১৭৯৮ সালে একেশ্বরবাদ নিয়ে এক বই লিখেছিলেন কিন্তু সেখানি রামমোহনের ষোড়শ বর্ষে রচিত কি না তিনি সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। কাজেই এ পুস্তককে রামমোহনের ষোড়শবর্ষের রচনা মনে করলে ভুল হতে পারে। খুব সম্ভব এ গ্রন্থ তাঁর পরবর্ত্তী কোন এক রচনা।

(৬) তৃতীয় ফুটনোটে উল্লিখিত পুস্তকের ভূমিকালেখক বলেন:—"শ্রীরামপুর মিশনে বর্ত্তমানে কেরীর অপ্রকাশিত কাগজপত্র কিছু নাই। কোন দিন ছিল কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে" (পৃঃ ২৲) এ উক্তির পোষকতায় ভূমিকালেখক যে সকল যুক্তির অবতারণা করেছেন সে সকল একান্ত দুর্ব্বল এবং নির্ভর করবার অযোগ্য বলে মনে হয়।

"অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষের গুহা"

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

'প্রবাসী'র গত ভাদ্র সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ চৌধুরী রূপনাথ গুহা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আমার একটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমি একজন খাসীয়া পথপ্রদর্শকসহ রূপনাথ গুহার ভিতরের প্রায় সমগ্র অংশ পরিভ্রমণ করিয়াছি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে আমি একথা বলিতে পারি যে, রূপনাথ গুহা সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান বলিয়া গণ্য হইতে পারে। প্রতি বৎসর বাংলা দেশের নানা স্থান হইতে অনেকে শ্রীহট্ট-শিলং মোটর রাস্তা দিয়া শিলঙে যান। তাঁহারা শ্রীহট্ট হইতে ২৬ মাইল দূরে (২০।২১ মাইল নয়) জৈন্তাপুরে নামিয়া ইচ্ছা করিলে জৈন্তা পাহাড়ে (রূপনাথ পাহাড় নয়) অবস্থিত এই গুহাটি দেখিয়া যাইতে পারেন। জৈন্তা পাহাড়ের 'সণ্ডাই' পুঞ্জীর ধনসিং নামক জনৈক খাসীয়াই রূপনাথ গুহার গাইড হইবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি, দর্শনীও বেশী নয়, বারো আনা মাত্র। প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন যে, এদেশের গুহাগুলিকে সাধারণের দর্শনযোগ্য করিয়া রাখা হয় নাই। কিন্তু রূপনাথ গুহা সম্বন্ধে একথা খাটে না। প্রতি বৎসর শিবরাত্রি উপলক্ষে শ্রীহট্ট জেলার নানা স্থান হইতে বহুসংখ্যক স্ত্রীপুরুষ এই গুহাটির বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক দৃশ্য দেখিতে যান। কিন্তু, সাময়িক পত্রিকাদিতে এই গুহাটির সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা না হওয়াতে, শ্রীহট্টের বাহিরের লোকেরা ইহার বিবরণ অবগত নহেন। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'যখের ধন' নামক শিশুপাঠ্য উপন্যাসে এই রূপনাথ গুহার বর্ণনা আছে। আমি গুহাভ্যন্তরস্থ Stalagmite ও Stalactite পাথরের কতকগুলি ছবি তুলিয়া 'প্রবাসীতে' পাঠাইয়াছিলাম কিন্তু তাহা প্রকাশিত হয় নাই। এই গুহাগুলি যে Stalagmite ও Stalactite পাথরের, প্রবন্ধে সে খবর না দিলেও ছবিতে তাহা উল্লেখ করিয়াছিলাম।

এ প্রসঙ্গে এ কথাও বলা আবশ্যক যে, গুহার অনতিদূরে রূপনাথ শিবের একটি মন্দির আছে। মন্দিরটি ভগ্ন, জীর্ণ, পরিত্যক্ত, দেবতাহীন। শিবলিঙ্গ মন্দিরের নিকটবর্ত্তী একটি পর্ণকুটীরে স্থাপিত। প্রতি বৎসর খাসীয়ানীরা বন্য লতাপাতা দিয়া রূপনাথের কুটীরখানা ছাইয়া দেয়। রূপনাথ না কি এই মন্দিরের উপর বিরূপ হইয়া পর্ণকুটীরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। এ সম্বন্ধে কোনো পৌরাণিক উপাখ্যান প্রচলিত আছে কি ?

"বঙ্কিমচন্দ্র ও ইতিহাসের একটি বিস্মৃত অধ্যায়"

শ্রীযুত দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমাদিগকে এই মর্ম্মে জানাইয়াছেন, যে, গত আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী'র ৭৭৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত "A common memory and common ideal…" এর লেখক রেনাঁ নহেন, ইহা ফরাসী লেখক Delisle Burns-এর উক্তি; তাঁহার "Political Ideals" পুস্তক (৪র্থ সংস্করণ) দ্রষ্টব্য।

দ্বীপময় ভারতে বাঙালী বিদ্বান্*

শ্রীমনোমোহন ঘোষ এম. এ., পি-এইচ. ডি.

ভ্রমণকাহিনীতে আধুনিক সাহিত্যের এক বিশিষ্ট প্রকাশ। ইংরেজী, ফরাসী প্রভৃতি পাশ্চাত্য সাহিত্যের এ অঙ্গটি বেশ পরিপুষ্ট। আমাদের সাহিত্যে, অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতো, এ বিষয়েরও প্রেরণা এসেছে পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে। কিন্তু সর্ব্বপ্রথম শিক্ষিত ভারতীয় রামমোহন রায়ের বিদেশ যাত্রার (১৮২৯) পর থেকে আজ পর্য্যন্ত শতাব্দের বেশি সময়ের মধ্যে অনেক যোগ্য ব্যক্তি প্রবাস পর্যটন করলেও আমাদের সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য ভ্রমণকাহিনী খুব কমই রচিত হয়েছে। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সুপাঠ্য হয় মুখ্যত দুই কারণে:—এক, এর সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যের জন্যে, আর তথ্যমূলক চিত্তাকর্ষকতার জন্যে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্রাদিতে বিদেশ দর্শনের যে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন তার প্রধান আকর্ষণ কবিগুরুর অনবদ্য বর্ণনভঙ্গী। ভ্রমণকালে যে সকল ঘটনা তাঁর চোখে পড়েছে সেগুলি তাঁর লোকোত্তর কবিকল্পনা ও মনীষার দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়ে পাঠকের নিকট যেন এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব দেশকালের বার্ত্তা বহন করে আনে। এতে তথ্যের পরিমাণ বিপুল না হলেও পাঠক এ দুর্লভ রচনার মধ্য থেকে স্বীয় রসবোধ ও জ্ঞানতৃষ্ণা উভয়কে যুগপৎ পরিতুষ্ট করবার উপাদান পেয়ে কৃতার্থ হন।

এ রকম কাব্যগুণসম্পন্ন রচনা ছাড়াও আর এক শ্রেণীর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আছে যা এর চেয়ে কম মূল্যবান নয়। ভ্রমণকারী চলতে চলতে যা কিছু দেখতে বা শুনতে পান সে সকলেরই যথাসম্ভব নিখুঁত ও সরস বর্ণনা তাঁর পর্য্যটন কাহিনীকে অনেকটা সুলিখিত উপন্যাসের মতো চিত্তাকর্ষক এবং শিক্ষাপ্রদ করে তোলে। কিন্তু এ শ্রেণীর ভ্রমণ-কথা রচনা করাও খুব সহজ ব্যাপার নয়। লেখার মধ্য দিয়ে দৃশ্য বা ঘটনা-পরম্পরা যদি কেবল নির্ব্যক্তিক ভাবে বর্ণিত হতে থাকে তবে তা অগভীর ভূগোলবৃত্তান্ত বা দৈনিক কাগজে মুদ্রিত খবরের আকার ধারণ করে। এ রকম ভ্রমণবিবরণের অন্য যতই মূল্য থাক সাহিত্য হিসাবে এ সকল নিতান্ত মূল্যহীন। অবশ্য ভ্রমণবৃত্তান্ত নামধেয় যে সব মামুলি প্রবন্ধ সচিত্র কার্ডের প্রতিলিপি সহ আজকাল নানা মাসিকে প্রকাশিত হয় তার অধিকাংশই এ জাতীয় দিনান্তজীবী রচনা।

অন্তরে যে সুগভীর মানবপ্রীতির অনুভব (human interest) বর্ত্তমান থাকলে ভিন্ন দেশ বা ভিন্ন জাতির লোকজন, আচার ব্যবহার শিল্প বাস্তুকলা ইত্যাদি দর্শকের অন্তর্‌ দৃষ্টির কাছে তার দৈনন্দিন তুচ্ছতা ছাড়িয়ে দেশকালাতীত এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এবং জ্ঞানের অধিষ্ঠানভূমি রূপে প্রতিভাত হয়। উল্লিখিত প্রবন্ধগুলির লেখকগণের

---

* 'দ্বীপময়-ভারত' (সচিত্র) —শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত প্রকাশক—বুক কোম্পানি, কলিকাতা, ১৯৪০, পৃঃ ডবলক্রাউন অষ্টাংশিত ।৴০+৬৬৯, দাম চার টাকা।

অধিকাংশেরই সে জাতীয় অনুভূতি নেই। কিন্তু দর্শকের অন্তরে মানবতার প্রতি অকৃত্রিম দরদ থাকলেই যে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত সর্ব্বোত্তম পর্য্যায়ে পড়বে তা জোর করে বলা যায় না। কারণ যে সকল বহু বিচিত্র দৃশ্য, ব্যক্তি বা ঘটনাবলী ভ্রমণকারীর চোখে পড়বে সেগুলির নানা বিষয়িণী মূল্যবত্তা যথাযথরূপে উপলব্ধি করার মতো অভিজ্ঞতা ও সুশিক্ষা তাঁর থাকা চাই তবেই, দর্শনান্তে তিনি যা লিপিবদ্ধ করবেন তা সাহিত্যপদবাচ্য হবে; তা পড়ে লোকে আনন্দ ও শিক্ষা যুগপৎ লাভ করবে।

বঙ্গভাষায় উল্লিখিত শ্রেণীর ভ্রমণকাহিনী নিতান্ত সুলভ নয়। যতদূর মনে হয় চন্দ্রশেখর সেন কৃত 'ভূপ্রদক্ষিণ', ও স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'পরিব্রাজক' নামে গ্রন্থদ্বয় ভালো ভাবে এই পর্য্যায়ে পড়ে। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থদ্বয় অতি স্বল্পায়তন। এ দুখানি বইতে স্বামীজীর বিরাট ভ্রমণ-বৃত্তান্তের অতি অল্প অংশই লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাঁর বিভিন্ন বন্ধু ও শিষ্যাদিকে লিখিত 'পত্রাবলী'র মধ্যে দিয়েও সময়ে সময়ে তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা চমৎকার ভাবে প্রকাশলাভ করেছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে স্বামীজী তাঁর লোকদুর্লভ স্বদেশানুরাগ, জ্ঞাননিষ্ঠা ও মানবপ্রীতি নিয়ে বিদেশের নরনারী ও তাদের শিক্ষা সভ্যতা সম্বন্ধে যে সকল অমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন সে সকল একত্র সংগৃহীত হবার আগেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তার ফলে বাংলা সাহিত্য যে এদিক দিয়ে খুব দৈন্যগ্রস্ত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। সম্প্রতি এ দৈন্য দূর হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে বাংলা ভাষায় এমন কয়েকখানি ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়েছে যা তথ্যমূলক হয়েও লেখকদের ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য এবং লিপি-কৌশলের ফলে সরস আখ্যায়িকার স্থান অধিকার করেছে। এদের মধ্যে একখানির নাম 'দ্বীপময়-ভারত'। স্বনামপ্রসিদ্ধ বাঙালী বিদ্বান্ অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৯২৭ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রীরূপে যে মালয়, সুমাত্রা, যাভা, বলি ও শ্যাম প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে এসেছিলেন তারি বিস্তারিত ও সচিত্র বিবরণ এ পুস্তকে নিবদ্ধ হয়েছে। পূর্ব্বে (১৩৩৪-১৩৩৮ সাল, বাংলা) এ গ্রন্থ 'প্রবাসী' পত্রিকায় চব্বিশ কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন এ ভ্রমণবৃত্তান্তে বহুপাঠক দীর্ঘস্থায়ী আনন্দ লাভ করেছিলেন। কি কারণে বর্ণিত বৃত্তান্তটি বহু ব্যক্তির উপর এমন প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল আজ সাত বৎসর পরে ভ্রমণকাহিনীটির সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রণ উপলক্ষে তা আলোচনার যোগ্য। এ সাত বছরে 'প্রবাসী' যে অনেক নূতন পাঠকপাঠিকা লাভ করেছে বিশেষ করে তাঁদেরই জন্যে এ আলোচনা। আর পুরানো পাঠকপাঠিকারাও এর থেকে নিজেদের স্মৃতিকে প্রবুদ্ধ করে পুনর্ব্বার আনন্দ পেতে পারেন।

নাটক উপন্যাস জাতীয় বইয়ের সঙ্গে সুলিখিত ভ্রমণকাহিনীর সাধর্ম্ম্য এইখানে যে উভয় শ্রেণীর গ্রন্থপাঠেই আমরা স্থানে স্থানে অপ্রত্যাশিত বিষয় বা ঘটনার জ্ঞান লাভ করে আনন্দিত হই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভ্রমণকাহিনীর বিশেষত্ব এই যে, যা কিছু জানা যায় তা বস্তুগত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—কাল্পনিক নয়। তাই ভ্রমণকাহিনী পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস, ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজবিধি, শিল্পকলা, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে পাঠকের জ্ঞানবৃদ্ধি ঘটতে পারে। আলোচ্য পুস্তক এ জাতীয় ভ্রমণকাহিনীর একখানি উত্তম আদর্শ (type)। এ গ্রন্থ পাঠে যে কথাটি আমাদের মনে সর্ব্বাগ্রে জাগে সে হচ্ছে দ্বীপময় ভারতের সভ্যতা বিকাশে প্রাচীন ভারতের সুস্পষ্ট প্রভাব। এ প্রভাব এত সুগভীর যে যবদ্বীপের মুসলমানেরা মক্কা থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পরেও তাদের হিন্দুপূর্ব্বপুরুষদের' কৃতিত্ব বা সভ্যতাকে অস্বীকার করে না, বরং তা নিয়ে যথেষ্ট গৌরব করে। হিন্দু আচার পালনেও তাদের অবহেলা নেই, এখনও তারা মন দিয়ে রামায়ণ মহাভারত শুনে এবং রামায়ণাদির কাহিনী অবলম্বনে যে পুতুলনাচ আর যাত্রাভিনয় হয় সারারাত জেগে তাই দেখে এবং ছেলেমেয়েদের বড় বড় সংস্কৃত নাম দিয়ে থাকে।

কি পদ্ধতিতে অতীতের হিন্দুগণ সুদূর ও সাগরবেষ্টিত জনপদের লোকসমূহকে এমন সুচিরস্থায়ী ভাবে নিজেদের সভ্যতার ছাপ দিতে পেরেছিলেন তা ভাবলে বিশেষ বিস্মিত হ'তে হয়। আলোচ্য পুস্তকে এ ব্যাপারের রহস্যভেদের চেষ্টা আছে। দ্বীপময় ভারতের লোকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, শিল্পকার্য্য, ধর্ম্মচর্য্যা, আমোদপ্রমোদ ইত্যাদি দেখে গ্রন্থকার এমন নিপুণভাবে সে সবের বর্ণনা করেছেন যে তার থেকে অনায়াসেই বুঝতে পারা যায় প্রাচীন ভারতের প্রাণশক্তি কোন্ মহান্ আদর্শের মধ্যে বিধৃত ছিল। বর্ত্তমান জাতীয় দুর্দ্দিনে এই মহৎ বস্তুটির কথা বিশেষ ভাবে চিন্তনীয়।

এ সকল মন্তব্য থেকে কেউ যেন মনে না করেন, আলোচ্য পুস্তকখানি পড়ে কেবল ইতিহাস-রসিকেরাই আনন্দ পাবেন। সাধারণ পাঠকের জন্যও এ গ্রন্থে কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ও দৃশ্যাদির বর্ণনা রয়েছে বিস্তর। কিঞ্চিদধিক তিনমাসব্যাপী ভ্রমণের মধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পদে পদে, বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন দেশ ও সম্প্রদায়ের নরনারীর কাছে কি অজস্র ও আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা লাভ করেছেন তার বেশ হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা এ পুস্তকের চিত্তাকর্ষকতা বাড়িয়েছে। দেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞানী ও গুণীকে বাইরের জগতের কাছে বিপুলভাবে সম্মানিত ও সম্বর্দ্ধিত হ'তে দেখে প্রত্যেক বাঙালী সন্তান (হিন্দু মুসলমানাদি নির্ব্বিশেষে) মনে মনে স্বাজাত্যাভিমানসুলভ গর্ব্ব অনুভব করবে। সুদূর কুআলালম্পুরে যে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেখানে পরমহংস দেবের জন্মোৎসব হয় একথা জেনেও বাঙালীর আত্মগৌরব এবং আত্মপ্রসাদ লাভ ঘটবে। এ-জাতীয় গর্ব্ব ও গৌরব যে অবস্থাবিশেষে বাঙালীর সংস্কৃতিমূলক আত্মবিকাশের বেশ সহায় হ'তে পারে তাতে সন্দেহ নেই। আধুনিক রাষ্ট্রনীতির ছাত্রের পক্ষেও বর্ত্তমান গ্রন্থখানি নানা মূল্যবান তথ্যে পরিপূর্ণ। যেমন ওলন্দাজ বা ডাচদের ঔপনিবেশিক (তথা সাম্রাজ্য সংস্থাপন) নীতির নানা প্রয়োগকৌশল। এ সকলের মধ্যে সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে ডাচদের মধ্যে জাতিবিদ্বেষের (racial hatred) অল্পতা। এরা যবদ্বীপের মেয়ে বিয়ে করে এবং দেশী স্ত্রী ডাচ সমাজের নিমন্ত্রণসভায় বিলাতী মেমের মতই সম্মান পায়। ডাচ সমাজে মিশ্র ফিরিঙ্গী মেয়েপুরুষ বেশ অবাধে মেলামেশা করে। দ্বীপময় ভারতের দেশভাষায় লেখা সাহিত্যের সংরক্ষণ এবং প্রচার বিষয়েও ডাচদের আন্তরিক চেষ্টা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক ডাচদের শাসন ইংরেজদের ভারত শাসনের চেয়ে ভাল বলেই মনে করেছেন। এ-বিষয়ে সকলে তাঁর সঙ্গে একমত না হ'য়েও ডাচদের সাম্রাজ্য শাসনের যে কতকগুলি খুব প্রশংসনীয় দিক আছে তা স্বীকার না করে পারা যায় না। বেলা এগারটা থেকে চারটে পর্য্যন্ত আপিস আদালত ও দোকানপাট বন্ধ রাখার ব্যবস্থা তাদের অন্যতম। এ দেশেও ইংরেজ অধিকারের গোড়ার দিকে সকাল বিকাল আপিস বসত। দুপুরবেলা লোকের বিশ্রামের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। উল্লিখিত ব্যবস্থাদির খবরের পরেই চোখে পড়ে লোকাচারের তথ্য। মালয় দেশের মুসলমান ইস্লামের ধর্ম্ম অঙ্গীকার ক'রেও শূকর-মাংস ভক্ষণে দ্বিধা বোধ করে না এবং এ-বিষয়ে কুক্কুটমাংস পক্ষপাতী সংশোধিত (reformed) হিন্দুর মতোই উদার। আর বলিদ্বীপের কোনও কোনও হিন্দু যে গোমাংস অভক্ষ্য বিবেচনা করে না তা ঠিক এ জাতীয় তথ্য

কি না বলা যায় না ; কারণ বৈদিক যুগের ঋষিরাও আতিথির সম্মানার্থ গোসংহার করতেন আর 'গোমেধ' নামক যজ্ঞের কথাও সংস্কৃত সাহিত্য থেকে জানা যায়। বলিদ্বীপের 'পদণ্ডে'রা (ব্রাহ্মণস্থানীয়) যে মুনি ঋষিদের কাছ থেকে তাঁদের ধর্ম্মের অভ্যাগম কল্পনা করেন, দেশে প্রচলিত গোমাংস ভক্ষণের বিধিকে তার প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করতে পারা যায়। এ সকল চিত্তাকর্ষক সমাজতাত্ত্বিক তথ্য ছাড়াও আলোচ্য ভ্রমণবৃত্তান্তখানি অন্যান্য ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য তথ্যে ও বর্ণনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু তথ্যবাহুল্য কদাপি এই সুবৃহৎ পুস্তকের চিত্তাকর্ষতার হানি করে নি। ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রায় ১৪০ খানি ছবি বর্ণিত বিষয়সমূহকে স্ফুটতর করে তাদের আকর্ষণ বাড়িয়েছে। এ-সকল ছবির অধিকাংশই লেখকের সহযাত্রীদের ক্যামেরায় গৃহীত। আর মাঝে হাস্তরসের প্রক্ষেপ থাকায় বর্ণিত ভ্রমণকাহিনীর বিপুল দৈর্ঘ্য কখনও ক্লান্তিদায়ক হয়ে ওঠে নি। পাঁচ মিশেলি যাত্রী ও ঔপনিবেশিক ফৌজে ভরতি ফরাসী জাহাজের বর্ণনার মধ্যে 'আধা-ফরাসী' আনামী সৈন্যটির মদ্য বিরহের সকরুণ খেদোক্তি বড়ই কৌতুকপ্রদ ও হাস্যজনক। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী ধূর্ত্ত-চূড়ামণি তামিল চেট্টী মহাশয়ের কাহিনীও এ ধরণের হাস্য সৃষ্টির সাহায্য করে। 'খদ্দর পাগল' (khaddar-maniac) যে যুবকটি 'তাই পিঙে' কবিগুরুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল সেও এ বিদূষক পর্য্যায়ভুক্ত। কিন্তু এই হাস্যরসের এক বিশেষ বিকাশ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জনৈক খ্রীষ্টান পাদরীর আলাপের বেলায়। তিনি কবিগুরুকে ধর্ম্মবিষয়ে নিজেদের দলে টানতে গিয়ে আলোচ্য গ্রন্থের লেখকের হাতে যেমন নাকাল হয়েছিলেন তা বেশ উপভোগ্য। হাস্যের মত করুণ রসও আছে এ-ভ্রমণকাহিনীর স্থানে স্থানে। যে ভারতীয় শ্রমিকের শ্রমের ফলে মালয় উপদ্বীপ স্বর্ণপ্রসূ হয়ে উঠেছে তাদের দুর্দ্দশার কথা প'ড়ে স্বাজাত্যবোধসম্পন্ন সহৃদয় ভারতীয় মাত্রেই ব্যথা অনুভব করবেন।

এরূপ নানা রসে ও তথ্যে পরিপূর্ণ পুস্তকখানি যে বাঙালা পাঠক-সমাজে সর্ব্বোচ্চ সমাদর লাভ করবে এবং স্থায়ী সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করবে নিঃসঙ্কোচে সে-বিষয়ে আশা পোষণ করা যেতে পারে। বুক কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ বর্ত্তমান অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে এ মূল্যবান পুস্তক প্রকাশ ক'রে বাংলার পাঠকসমাজের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

গুরুদেবের ওখানে

শ্রীসত্যনারায়ণ

ঘর থেকে পালিয়ে এখানে হাজির হয়েছি। এখন আপন পর সকলেরই উপর আমার একটা গভীর বিরক্তি। সামনে যত লোক পড়ে, সকলেরই মুখে দেখি কেবল স্বার্থ, কপটতা আর ক্রুরতার বীভৎস রূপ।

পরদিন বেশ ভোরে ঘুম ভাঙতেই একটা নতুন রকমের গুন্ গুন্ শব্দ আসতে লাগল কানে। আগে যত রকমের গান শুনেছি, এ যে সে সকলের চেয়ে ভিন্ন। এর তাল, এর লয়, এর সুর সব যে নিজস্ব, সবই যে অপরূপ। মন আর হৃদয়ের যে-সব কোমল, বেপথুমান্ তন্ত্রীগুলোকে বৈজ্ঞানিক সঙ্গীত-শাস্ত্র অবহেলা করতে দেখেছি, সেগুলোর সঙ্গেই যে এ সুরের মধুর মিতালি। এ যে আমায় স্পষ্ট দেখিয়ে দিল,—সুরেরও একটা মূর্ত্তি আছে, তারও আছে একটা হাসি-মুখ। এই স্মিত হাসি যে চ'লে যায়, ঝরণার মতো বন্ধনহীন, কল্-কল্, ছল্-ছল্, সাবলীল নৃত্যের ছন্দে।

সৌন্দর্য্য যে আছে,—বিশ্বাস না ক'রে তো উপায় নেই। সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে দেখার আমার চোখটাও যে বদলে যেতে লাগল। আমায় স্বীকার করতেই হ'ল,—যদিও আমি এই সৌন্দর্য্যটা দেখায় বঞ্চিত রয়ে গেছি, কিন্তু আর সন্দেহ নেই যে, সংসারে সৌন্দর্য্যেরও একটা অস্তিত্ব আছে।

গুরুদেবের সুরের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়।

২

কিছু দিন পরে সেই পরিচিত গুন্-গুনের সুরে একটা গান শুনি—

"বক্ষে তোমার বাজে বাঁশি
সে কি সহজ গান?"

প্রথম প্রথম গলাটা কাঁপছিল ; ধীরে ধীরে সুরে দৃঢ়তা আসতে লাগল। পরের পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে মনে হ'ল, এ গান তো মানুষের মাথা থেকে বেরোয় নি, এ যে হৃদয়ের অবাধ উচ্ছ্বিতি। হৃদয়টার খুলে ফেলা

সময় যেন একটু 'কিন্তু', একটু সঙ্কোচ,—আর, তার প্রভাব পড়েছে ওই সুরটার উপর। পরক্ষণেই সুর উঁচু পরদায় উঠে পড়ল—

"সেই সুরেতে জাগবো আমি
দাও মোরে সেই কান।"

সুর ধাপে ধাপে চড়তে লাগল,—সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে যেন একটা ব্যাকুলতা—

"ভুলবো না আর সহজেতে
সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে--"

এখন এসে পড়েছে স্বাভাবিক উন্মুক্ত সুর। হৃদয় একেবারে খুলে গেছে। পরের পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে মুখ তাঁর থম্-থম্ করতে লাগল; আর, সুর ও ভাব একাকার হয়ে উঠল—

"মৃত্যু-মাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন…(প্রাণ)"

শেষ শব্দটা পর্য্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে সুর মিলিয়ে গিয়ে হ'ল শান্ত নীরব।

হৃদয়ের অনবদ্য আকৃতি, প্রাণের পরিপূর্ণতা।

এই ছিল আমার কাছে গুরুদেবের প্রথম গান।

৩

কিছু দিন পরে গেলুম সেখানে পড়বার জন্যে। চাই জার্মান পড়তে। যেমনি আমি সুরু করেছি, "দের-দী-দস্," অমনি ছোট ছোট আশ্রমবাসী ছেলেরা এসে বলল,—"পড়া করো বস্!" শুকনো ব্যাকরণের চেয়ে অনেক সরস ছিল তাদের কাকলি। নতুন অপরিচিত জার্মান ভাষার চেয়ে অনেক পরিচিত, অনেক প্রিয় গুরুদেবের গান। আনন্দে সেই গান শুনতে শুনতেই কাটতে লাগল দিন। সে দিনগুলোকে গুণে রাখার তো কখনও দরকার মনে হয় নি। আজও হয় না।

গুঁড়ি গুঁড়ি এল বৃষ্টি। উৎসব করতে আমরা বেরিয়ে পড়লুম অনেক দূর। পা-থেকে মাথা পর্য্যন্ত ভিজে টিপ-টিপে বৃষ্টিতে আসছি ফিরে। দেখি, উত্তরায়ণের বারান্দায় ব'সে গুরুদেব তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে। একটি বন্ধু গাইছিল—

"বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা
ঝরছে র'য়ে র'য়ে!"

গুরুদেবের দিকে গেল আমার দৃষ্টি। দেখি, যেন মাথা নেড়ে নেড়ে বলছেন—"ঠিক! হাঁ, বন্ধনহীন জীবন! তোমরা ঠিক বুঝেছ আমার সুর, আমার কবিতা!"

৪

এগার বছর ধ'রে বন্ধনহীন ভ্রমণের পর আবার এক দিন পৌঁছলুম ওখানে। এবার হাতে আছে আর এক ছেলেমানুষি, গুরুদেবের জন্যে 'রোমাঞ্চক রাশিয়ায়'-এর নমস্কারী কপি। তাঁকে প্রণাম করবার এই এক ছুতো।

রয়েছেন সেঁউতির বাড়ীতে। দুয়ারের ভিতর পা রাখতেই অনেক দিনের পরিচিতের মত জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হে, তুমি তো খুব ঘুরে আসছ?"

পণ্ডিতজী আগেই তাঁকে খবরটা দিয়েছিলেন। চাপা গলায় বলতে গেলুম। গুরুদেবের কাছ পর্য্যন্ত আওয়াজটা পৌঁছল না। তিনি অন্য কথা পাড়লেন। ওদিক থেকে পণ্ডিতজীর ইশারা হ'ল। আরও একটু জোরে বলতে লাগলুম।

গুরুদেব হাসলেন। তাঁর চোখ দুটো পরীক্ষা করতে লাগল, আমি তাঁর শ্রবণ-শক্তির উপর তো সন্দেহ করি নি? আমার কয়েকটা কথা শুনে হাসলেন। নিজের মধ্যে কোন রকম সঙ্কোচ রাখা মনে হ'ল অন্যায়। নিজের বাংলায় অবিশ্বাস কিংবা সে-বিষয়ে ভয় খাওয়ার কোন দরকারই মনে হ'ল না।

"এখানে তো গুরুদেবের সামনে এসেছি"—মনে হ'ল, অতি সাধারণ কথা। সেই "বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা"র দিনের তাঁর মুখ পড়ল মনে। এই এগার বছরে সেই মুখে কিছু পরিবর্ত্তন এসেছে। সেখানকার রেখাগুলো আগের চেয়ে কিছু বেশী স্পষ্ট আর গভীর; কিন্তু কপালের উপর মুখের সমস্ত চমকটা উঠেছে কেন্দ্রীভূত হয়ে। কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য গেছে অনেক বেড়ে। স্বভাব সেই আগেকার, বালকের মত।

মহান্ রুশীয় শিল্পী নিকোলাঈ রোরিকের কথা মনে প'ড়ে গেল। তাঁর বড় ইচ্ছা ছিল, একই পটে তিনি টলস্টয় আর গুরুদেবের একখানি সুন্দর ছবি

কমলবা মাতঙ্গ

শ্রীবিশ্ব বর্ম্মা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

থাকেন। নগ্গর থেকে আসার সময় তিনি আমাকে দিয়ে গুরুদেবকে তাঁর নমস্কার পাঠিয়েছিলেন। গুরুদেবের কাছে সেই নমস্কার নিবেদন করলুম। রোরিকের কলা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলাপ চলতে লাগল। মনে মনে ভাবলুম,—চিত্রে রোরিক যে সৌন্দর্য্য-লোককে ফুটিয়ে তুলতে চান, গুরুদেবও তো সেই লোকেরই মানুষ। নইলে, সমস্ত জগৎকে সৌন্দর্য্যের সেই অপূর্ব্ব রসের আস্বাদন করান কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল!

তার পর আলোচনা হ'ল যুদ্ধের। এ সম্বন্ধে তিনি যে ভাব ব্যক্ত করতে লাগলেন, তার মধ্যে কি গভীর গোপন বেদনা! স্পষ্ট বোধ হ'তে লাগল, বিভিন্ন রণাঙ্গনে হতাহত সমস্ত লোকের দুঃখ ও ব্যথা যেন তাঁরই হৃদয়ে আঘাত করছে। তাঁর সেই স্বল্পপরিমিত কথা-গুলির মধ্যে একটা উদাস ভাব। তাঁর এত চেষ্টাতেও এই নরহত্যা বন্ধ করা গেল না। এই জন্যেই কি তাঁর হতাশ হৃদয়ের এই উদাস বেদনা? সঙ্গে সঙ্গে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল,—তাঁর ভাব, তাঁর বিচার মানবিকতার কি উচ্চ সুরে খেলা করছে। তাঁর কথায় ছিল না রাজনীতি কিংবা অন্য কোন সমস্যা সম্বন্ধে দার্শনিক মতভেদ। সে কথায় ছিল,—রক্তারক্তির ভাবনায়-কোঁদা হৃদয়ের উপর স্নিগ্ধ প্রলেপ লাগাবার একটা তীব্র ক্ষীণ চেষ্টা।

এই ভাবটা ব্যক্ত করার সময় তার মুখের যে করুণ রূপ ফুটে উঠছিল, সে রূপ একবার দেখলে, মানুষ নামের যারা দাবি করে, তাদের প্রত্যেকেরই মনে হবে—"যদি কবিগুরুর চেষ্টা সফল হ'ত, তা হ'লে জগৎ হ'ত কত সুখের, কত আনন্দের, কত সুন্দর।"

কিন্তু আজ তো জগতের সামনে কবির সৌন্দর্য্য-কল্পনার পরিবর্ত্তে চলেছে বীভৎস রক্ত-পিপাসার তাণ্ডব নৃত্য, আর, তারই পদতলে উঠছে কোটি কোটি মানবের হাহাকার। গুরুদেবের কথায় কেন না হবে এই উদাস ধ্বনি?

৫

গত অক্টোবরের ব্যাধি থেকে গুরুদেব কতকটা মুক্ত হ'লে, আবার তাঁকে দর্শন করতে যাই। এবার শরীর ক্ষীণ, কিন্তু সেই পরিমাণে অনেক অধিক কাজ করছিল তাঁর মানসিক শক্তি।

"আমার অসুখ ভাল হ'তে বেশী দেরি লাগে না", —তিনি বললেন, শিশুর মত সরল হাসি হেসে। সত্য সত্যই তাঁর মানসিক বলই রোগকে দূরে সরিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে।

"আমি বেঁচে থাক্‌বো,"—তিনি বললেন। তাঁর এই কথায় ছিল রোগের উপর বিজয় পাওয়ার তাঁর অমোঘ মানসিক শক্তির বিজয়-ধ্বনি। আজ জগতে যে মানবিকতার কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে, তাকে বাঁচাবার জন্যে গুরুদেবের মত মহৎ প্রাণ যে একটা বড় সম্পদ, ও বড় আশা।

সাহস ক'রে বললুম, "আপনার নিজের জন্যে না হ'লেও আপনাকে বাঁচতে হবে,—আমাদের জন্যে, আর জগতের নষ্টপ্রায় সৌন্দর্য্য ও মানবিকতাকে বাঁচাবার জন্যে।"

"তোমাদের নিরাশ ক'রবো না! না,—না, তোমাদের নিরাশ ক'রবো না!"

এ স্বর আর কারও মুখে সম্ভব নয়।

দার্জিলিং

'ভাস্কর'

১

দার্জিলিং।

বার্চহিল রোডের পাশে একখানি সুদৃশ্য ছোট বাড়ী—ঠিক যেন একখানি ছবি। রাস্তার ধারে একটি ছোট গেট। গেট পার হইলেই দুই দিকে দুইটি লাল কাঁকর-বিছানো পথ। পথ দুইটি পুনরায় বাড়ীর সিঁড়ির সম্মুখে গিয়া মিশিয়াছে। পথের এক পাশে গাঁদাফুলের সারি, অপর পাশে ক্রিসান্থিমামের ঝাড়। ছোট মাঠটির মাঝখানে অনেকগুলি ডালিয়া গোল করিয়া সাজানো। সিঁড়ির দুই পাশে দুইটি বড় রডোডেনড্রন গাছ; গোটাকয়েক বড় কুঁড়ি হইয়াছে, এখনো ফুল ফোটে নাই। সিঁড়ির পাশ হইতে আরম্ভ করিয়া বারান্দার পাশ দিয়া দুই দিকে দুই সারি ক্ষুদে-গোলাপের গাছ। বারান্দার উপরে দুই দিকে অনেকগুলি নানা আকারের এবং নানা শ্রেণীর অর্কিড ঝুলিতেছে; নীচে নানা প্রকার ফার্ণের টব সাজানো রহিয়াছে। বাড়ীখানির দুই পাশে দেওয়ালের গায়ে ঘন আইভিলতা বাড়িয়া উঠিয়াছে।

ছোট্ট পরিচ্ছন্ন বারান্দার মাঝখানে একখানি গোল বেতের টেবিল; দুই পাশে দুই খানি বেতের চেয়ার। পিছনেই ড্রইংরুমে ঢুকিবার দরজায় একটি হালকা রঙীন পরদা ঝুলিতেছে।

বিকাশবাবু পরদাটা একটু সরাইয়া ড্রইংরুমে ঢুকিলেন। ঘরের সমস্ত মেঝেটাই পুরু কার্পেটে মোড়া। মাঝখানে একখানি কাশ্মীরী সূক্ষ্ম-কাজ-করা টেবিল। তার উপরে একখানি জয়পুরী পিতলের থালা। তার মাঝখানে একটি পিতলের ফুলদানিতে কয়েক প্রকার সিজন্-ফ্লাওয়ারের একটি তোড়া। ঘরের চারি পাশে অনেকগুলি সোফা এবং ঈজিচেয়ার সাজানো রহিয়াছে। একটি জানালার ভিতর দিয়া কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরিশ্রেণীর অপূর্ব শোভা দেখা যাইতেছে।

বিকাশবাবু যখন ঘরে ঢুকিলেন, তখন ঘরে মাত্র আর একজন ছিলেন। বিকাশবাবু সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়াই খোলা জানালাটি সম্মুখে রাখিয়া একখানি সোফার এক পাশে বসিলেন এবং গৃহস্বামী মিঃ ভট্টাচারিয়ার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

মিঃ ভট্টাচারিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ, ধনবান্, উদারপ্রকৃতি, মহাশয় ব্যক্তি। তিনি যে শুধু বিলাত-ফেরত-সুলভ বাহ্য উদারতার আড়ম্বর লইয়াই তৃপ্ত তাহা নহে; তাঁহার চিন্তা, তাঁহার বাক্য, তাঁহার কার্য, তাঁহার সামাজিক মত, তাঁহার পারিবারিক ব্যবস্থা প্রভৃতি সবই একটা উদার বিশ্বজনীন নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত। এই কারণেই তিনি সমাজের প্রায় সকল স্তরের এবং সকল সম্প্রদায়ের কাছেই শ্রদ্ধা এবং ভক্তি অর্জন করিতে পারিয়াছেন।

একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন সন্নিকট। এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করিবার জন্য মিঃ ভট্টাচারিয়াকে অনুরোধ জানাইতে এবং তাঁহার সম্মতি লাভ করিতেই বিকাশবাবু এখানে আসিয়াছেন।

বেলা প্রায় সাতটা। বেয়ারা জানাইয়া গেল, সাহেব আর একটু পরেই আসিবেন।

বিকাশবাবু মিঃ ভট্টাচারিয়ার নাম শুনিয়াছেন বহু পূর্বে এবং বহুমুখে কিন্তু কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে কি বলিবেন এবং কি ভাষায় কেমন করিয়া বলিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে বিকাশবাবু ঘরের দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে কয়েক বার নিরীক্ষণ করিয়াছেন। লোকটি বাঙালী নহে। পায়ে বার্নিস-করা জুতা, পরনে মালকোঁচার মত পরা ধুতি এবং লম্বা গলাবন্ধ কোট। দুই কানে দুইটি সরু মাকড়ি। মাথা খালি, একটি কাল গোল টুপি পাশেই রহিয়াছে। দেখিলে সহজেই বোঝা যায় লোকটি

কাপড়ের ব্যবসা করে; হয়তো মিঃ ভট্টাচারিয়ার নিকট জামা-কাপড়ের অর্ডার লইতে আসিয়াছে। পাশে একখানি খবরের কাগজের কয়েক পাতা আধখোলা অবস্থায় পড়িয়া আছে; একখানি পাতা তাহার কোলে—বোধ হয় মার্কেট রিপোর্ট।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর মিঃ ভট্টাচারিয়া আসিলেন। পায়ে ভেলভেটের চটী, পরনে ঢিলা পাজামা, গায়ে ড্রেসিং গাউন, মুখে বর্মা-চুরুট। মুখ দেখিলেই বোঝা যায়, সদাশিব মানুষ। সমস্ত দেহ-মন যেন এ পৃথিবী ছাড়িয়া অন্য কোন লোকে বিরাজ করিতেছে। সাক্ষাৎ হইতেই বিকাশবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কিন্তু ঠিক যেমন বসিয়া ছিলেন, তেমনই বসিয়া রহিলেন। মিঃ ভট্টাচারিয়াও সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য করিলেন বলিয়া মনে হইল না।

উভয়ে পুনরায় উপবিষ্ট হইবার পর বিকাশবাবু তাঁহার বক্তব্য নিবেদন করিলেন। মিঃ ভট্টাচারিয়া স্বাভাবিক বিনয়ের সহিত বিকাশবাবুর প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। আরও দু-একটি সাধারণ ভদ্রালাপের পর মিঃ ভট্টাচারিয়া গৃহের তৃতীয় ব্যক্তিটিকে দেখাইয়া বলিলেন, এঁকে বোধ হয় আপনি চিনতে পারেন নি।

—আজ্ঞে, না।

—এঁর নাম গরমলাল শীতলরাম, আমার মেজ জামাই।

আকস্মিক এবং অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত বিস্ময় বহু কষ্টে দমন করিয়া বিকাশবাবু শীতলরামবাবুকে নমস্কার করিলেন। শীতলরামবাবু বলিলেন—নমস্কার, রাম রাম।

বিকাশবাবু মিঃ ভট্টাচারিয়াকে নমস্কার জানাইয়া চলিয়া আসিলেন।

২

সমস্ত দিন বিকাশবাবুর নানা কাজে কাটিল। সভা-মণ্ডপ নির্মাণ, শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিমন্ত্রণ, কার্য-সূচী প্রণয়ন, উদ্বোধন-সঙ্গীতের ব্যবস্থা, বক্তৃতার ব্যবস্থা, আলোর ব্যবস্থা প্রভৃতি বহুবিধ কাজে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যাপৃত রহিলেন।

সভার কার্য আরম্ভ হইল। উপস্থিত ভদ্রমহোদয় এবং মহিলাবৃন্দের মধ্যে বিকাশবাবুর স্ত্রী এবং ভট্টাচারিয়া মহাশয়ের জামাতাও উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে শীতলরামবাবুও উঠিয়া মারোয়াড়ীসুলভ বাংলা ভাষায় একটি ছোট বক্তৃতা করিলেন। মারোয়াড়ীর বাঙালী-প্রীতি দেখিয়া অনেকেই করতালি দিলেন।

সভার কার্য শেষ হইলে যথারীতি বিদায়-সম্ভাষণের পর সভাপতি মহাশয় শীতলরামবাবুর সঙ্গে সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন। অন্যান্য সমবেত জনমণ্ডলী ক্রমশঃ স্ব-স্ব গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বিকাশবাবু পথ চলিতে চলিতে স্ত্রীকে বলিলেন—চল, বাড়ী গিয়ে তোমাকে একটা অদ্ভুত সংবাদ দেব।

স্ত্রী বলিলেন—চল, বাড়ী গিয়ে আমিও তোমাকে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখাব। সমস্ত দিন নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে তোমাকে দেখাতে পারি নি।

বিকাশবাবু বলিলেন—জিনিসটা কি, বল না?

—বাড়ী চল, তার পরে বলব। সেটা কানে শোনবার চেয়ে চোখে দেখাটাই ভাল হবে। তোমার অদ্ভুত সংবাদটা কি, শুনি?

—সেটাও বাড়ী গিয়েই শুনো।

৩

ভীষণ শীত। বিকাশবাবু এবং তাঁহার স্ত্রী বাড়ী ফিরিয়াই মুখ হাত ধুইয়া, অল্প কিছু আহারাদি করিয়া বসিবার ঘরে আসিয়া আগুনের পাশে বসিয়া পড়িলেন। সারা দিনের ক্লান্তির পর আর এক মুহূর্তও কাহারও বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। কিন্তু উভয়েই উভয়ের যে কৌতূহল উদ্রেক করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা চরিতার্থ না হওয়া পর্যন্ত কেহই শুইতে রাজি নহেন। বিকাশবাবু বলিলেন—নাও, এইবার বের কর তোমার অদ্ভুত জিনিস।

—তোমার অদ্ভুত সংবাদটা আগে বল।

—না, তুমি আগে।

—না, তুমি আগে।

—নাঃ, তোমার সঙ্গে আর পারি নে। নেহাৎ আজ

ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, নইলে—। যাক্ শোন তবে। ঐ যে একটা মারোয়াড়ী সভায় বক্তৃতা করল—

—হ্যাঁ, তা কি? লোকটা বেশ বাংলা বললে কিন্তু।

—ও হচ্ছে আমাদের সভাপতি মিঃ ভট্টাচারিয়ার মেজ জামাই।

—অ্যাঁ—, ওই নাকি সেই—?

—সেই, মানে? তুমি ওকে চেন নাকি?

—না, আমি চিনি না। আমি যে অদ্ভুত জিনিসটার কথা তোমাকে বলছিলাম, এই নাও দেখ।

বিকাশবাবুর স্ত্রী তাঁহার স্বামীর হাতে একখানি এন্‌ভেলপ দিলেন। বিকাশবাবু এন্‌ভেলপের ভিতর হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

৪

ভাগলরাম হাউস,
লুধিয়ানা।

ভাই মিলি,

বহুকাল পরে আজ তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি। আমার কথা তোমার মনে আছে কি না, তাই বা কে জানে! তবু আশা করি, এ-চিঠিখানা পেলে নিশ্চয়ই মনে পড়বে।

মনে আছে বোধ হয়, বি-এ. পাস করবার পর যখন আমরা হোস্টেল ছেড়ে এলাম, তখন আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে অন্ততঃ মাসে একবার ক'রে আমরা আমাদের সুখদুঃখের কথা পরস্পরকে জানাব। বিয়ের আগে পর্যন্ত আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলাম। তুমি অবশ্য বিয়ের পরেও দু-তিনখানা চিঠি লিখেছ, কিন্তু আমিই বোধ হয় আমাদের এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য দায়ী। আমার বিয়েটা যখন যে-ভাবে হয়ে গেল, আর তার পরে আমার যে জীবনযাত্রা সুরু হ'ল, তাতে চিঠিপত্র লেখার আগ্রহ আর অভ্যাস কিছুই রইল না।

এত দিন পরে চিঠি লিখছি কেন? আমার মনে হয়, আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে, অর্থাৎ মানুষ যে জন্য বেঁচে থাকে, তার কিছুই আমার আছে ব'লে মনে হয় না। কাজেই আমার এ চিঠি আমার প্রেতাত্মার চিঠি ব'লেও মনে করতে পার। আমার এ ব্যর্থ জীবনের দীর্ঘশ্বাস অন্ততঃ এক জন মরমীর কাছে পৌঁছে দিতে পারলেও যেন একটু শান্তি পাব।

নাচ, গান, হাসি, রসিকতার জন্য যে মেয়ে কলেজের সকলের কাছে প্রশংসা পেয়ে এসেছে, বন্ধুবান্ধবের কাছে যে কোন দিন কোন কারণেই মুখভার করে নি, তার কাছ থেকে এমন কথা শুনে নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য হচ্ছ! আচ্ছা, তবে একটু গোড়া থেকেই বলি—ধৈর্য হারিও না কিন্তু। এইখানাই আমার শেষ চিঠি। তোমাদের সহজ সুন্দর জীবনযাত্রার মাঝে আমার জীবনের করুণ কাহিনী যদি একটু অশান্তির সৃষ্টি করে, তবে ক্ষমা ক'রো।

হোস্টেল থেকে বেরিয়ে যখন বাড়ীতে এলাম, বিয়ের সম্বন্ধ হ'তে লাগল। মা ও বাবার আত্মীয়, অনাত্মীয়, পরিচিত ও অপরিচিত অনেকের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। চা খাওয়া, গান গাওয়া, ব্রীজ খেলা, টেনিস খেলা, পিক্‌নিক্, বেশ চলতে লাগল, কিন্তু বিয়ের ফুল ফুটল না। যারা আসত, যেত, বিয়ে করার দিকে বিশেষ ঝোঁক তাদের ছিল ব'লে মনে হ'ত না। আসত যেন একটু সময় কাটাতে, একটু আমোদ করতে। মা আমাকে বকতেন, আমি কেন ওদের সঙ্গে একটু বেশী ঘনিষ্ঠতা করি নে। প্রথমটা আমার অত্যন্ত খারাপ লাগত, একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে মিশতে। কিন্তু, উপায় কি? ঘটকের মারফৎ পাত্র খুঁজে, আর সেজেগুজে পাত্রের আত্মীয়-স্বজনের সামনে রূপ-গুণের পরীক্ষা দিয়ে বিয়ে করাটা তো আর আমাদের বাড়ীতে সম্ভব নয়! ভাল না বেসে তো বিয়ে করা যায় না! অথচ ভালবাসি কাকে?

এখন মনে করলে হাসি পায়, কিন্তু সত্যিই এক বার ভাল বেসেছিলাম। মার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়, ডাক্তারি পাস ক'রে মেডিক্যাল কলেজে হাউস-সার্জ্জন হয়েছিল। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনই স্বভাব, আমার তো খুব ভাল লেগে গেল। কথাটা যখন একটু জানাজানি হ'ল, মাসিমা এসে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'ডাক্তারি একটা পাস করলেই তো হয় না। অমন দু-টাকার ডাক্তার

কলকাতার অলিতে-গলিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। চাল নেই, চুলো নেই—' কথাগুলো আকারে ইঙ্গিতে তাঁকেও বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল। তাঁর সঙ্গে আমার দেখাশুনাও শেষ হ'ল। মনটা কিছু দিন খুবই খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু মন খারাপ ক'রে ব'সে থাকলে নভেল নাটকের নায়িকাদের চলতে পারে। বাস্তব মানুষের চলে না।

হাসি, গান, সিনেমা, পার্টি, পিক্‌নিক্‌ চলতে লাগল। উকিল, ব্যারিস্টার, প্রফেসর, ব্রোকার, অনেকের সঙ্গেই আলাপ হ'ল। এদের প্রায় সকলেই একে একে ঘটক-প্রভাবিত, পিতামাতা-নির্ব্বাচিত, বন্ধুবান্ধব-মনোনীত পত্নীকেই ভালবাসা সমীচীন মনে করলেন। অপর কয়েক জন পবিত্র কৌমার্যব্রত অবলম্বন ক'রে কুমারীদের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে বেড়াতে লাগলেন। আর দু-এক জন যে আমাকে পছন্দ করলেন না, একথা অবশ্য আমি বলছি নে, কিন্তু আমি তাদের পছন্দ করতে পারলুম না।

এমনি ক'রে কয়েক বছর কেটে গেল। কয়েক দিনের অসুখে মা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আমি যেন একেবারে অবলম্বনশূন্য হয়ে পড়লাম। বাবা চিরকালই সদাশিব মানুষ। বাইরের ঝড়-বাতাসে সহজে ব্যাকুল হন না। তিনিও যেন কেমন গম্ভীর নিরানন্দ হয়ে গেলেন। আমার মাসিমা প্রায়ই আসতেন আমাদের বাড়ীতে। সংসারের মোটামুটি তত্ত্বাবধানটা তিনিই করতে লাগলেন। খুঁটিনাটির ভার পড়ল আমারই উপর।

এমনি সময়ে আমার ভাগ্যাকাশে উদয় হলেন আমার ভাবী স্বামী। এঁর বাবার সঙ্গে আমার বাবার আলাপ হয়েছিল ব্যবসায় সূত্রে। ইনি বি. এ ক্লাসে উঠেই পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে পিতার ব্যবসায়ে যোগ দেন। পরে ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়েই ইউরোপ এবং আমেরিকা যান এবং প্রায় সাত-আট বৎসর পরে দেশে ফেরেন। আমার সঙ্গে আলাপ খুব সহজেই হ'ল। খুব স্মার্ট, খুব অমায়িক, খুব আলাপী। সর্ব্বদা স্যুট পরেই আসতেন আমাদের বাড়ীতে। জানই তো, আধুনিক বাঙালীর কাল্‌চারের সঙ্গে পেন্টুলনের সম্পর্কটা যেমন ঘনিষ্ঠ, তেমনি পুরাতন। তাঁর সঙ্গে মিশবার সময়ে মনেই হ'ত না, কোন বিজাতীয় লোকের সঙ্গে মিশছি। বাংলা, ইংরেজী দুটোই ইনি খাসা বলতেন। কিছু দিন আলাপের পর মাসিমা এক দিন বাবাকে বললেন, 'ডলিকে শীতলের সঙ্গে বিয়ে দিলে কেমন হয়?' বাবা খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে পরে বললেন, 'আচ্ছা, ডলিকে এক বার জিজ্ঞেস করে দেখো তো এক সময়ে।'

মাসিমা এক দিন সত্যিই আমাকে আমার মত জিজ্ঞেস করলেন। আমি পড়লুম ভারি মুশকিলে। শীতলবাবুকে আমার ভালই লাগত। তাছাড়া, অর্থ, সম্পত্তি, বাড়ী, গাড়ী, সামাজিক উদারতা, কাল্‌চার, কিছুরই অভাব তখন ছিল না। অথচ, উনি যে বাঙালী নন, শুধু এই কথাটাই মনের মধ্যে খোঁচা দিতে লাগল। মাসিমাকে বললুম, 'আচ্ছা ভেবে দেখি।'

ভাবতে লাগলুম। আমার মা বেঁচে থাকলে হয়তো এক মিনিটেই সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু আমার তা হ'ল না। একে সমস্ত দিনটা আমার একেবারে ফাঁকা—আমার জীবনেরই মত। তার পর, বছরের পর বছর আমার বন্ধুদের যে ব্যবহার, যে-রুচি, যে-দায়িত্বজ্ঞান, যে-উদারতা দেখে এসেছি, সে-সব মনে হ'লেই মনটাকে যেন কিছুতেই স্থির করতে পারতুম না। এখন এই বয়সে জীবনের সমস্যাগুলিকে যে-মনে যে-চোখে দেখি, তখন তো সে চোখ ছিল না, সে মনও ছিল না। সে বয়সে মানুষ জীবনের মাধুর্য্যের দিক, আশার দিক, কল্পনার দিকটাই বড় করিয়া দেখে: তিক্ততার দিক, নৈরাশ্যের দিক, বাস্তবের দিকটা তেমন চোখে পড়ে না। আমি ভাবতে লাগলুম, শুধু বাঙালী নন, এই সামান্য কথাটা ভুলতে পারব না? এই একটা কথা ভুলতে পারলেই তো সব সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে যায়!

ভুলতে না পারলেও মনে মনে ঠিক করলুম, ভোলা উচিত। মন ঠিক ক'রে মাসিমাকে জানালুম, মাসিমা বাবাকে বল্‌লেন। বাবা কিছু বল্‌লেন না। তাঁর মৌনকে সম্মতিলক্ষণ ব'লে ধরে নিয়ে মাসিমা বিয়ের উদ্যোগ করতে লাগলেন। বাবা বাধা দিলেন না। আমিও বুঝলুম, বাবার মত আছে।

'বিয়ে হয়ে গেল। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, পরিচিত

প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ খুশী হলেন, কেউ দুঃখিত হলেন, কেউ কিছুই হলেন না। আমি? বোধ হয় খুশীই হয়েছিলাম। যাক্, নূতন জীবন সুরু হ'ল। কয়েক বছর বেশ কাটল। এঁদের মস্ত বাড়ী। অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের চালচলন, বেশ-ভূষা, কথাবার্তা অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হ'লেও আমার বিশেষ ক্ষতি হ'ত না। আমি আমার মত থাকতাম। আমার নিজের পরিচিত ও আত্মীয়মহলে আমার স্থান আগের মতই রইল। এঁদের বাড়ীর লোকের কাছে 'বাঙালী বিবি' আখ্যা পেলেও আমার তাতে এসে যেত না। কারণ মনে মনে তারা আমাকে শ্রদ্ধা করত।

কিন্তু অদৃষ্টের চাকা ঘুরল। এঁদের ব্যবসায়ে এবং পারিবারিক ব্যবস্থায় একটা বিপর্যয় উপস্থিত হ'ল। সব খুঁটিনাটি লিখে কোন লাভ নেই। মোট কথা, অবস্থা দাঁড়াল এই যে, এঁদের ব্যবসায় আর এঁদের বাড়ীর সঙ্গে আমার স্বামীর একটা স্থায়ী বিচ্ছেদ উপস্থিত হ'ল। দারিদ্র্যের বিভীষিকা মনকে একটু বিচলিত করেছিল বটে, কিন্তু তার চেয়েও বেশী উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়লাম এই ভেবে যে হয়তো বাধ্য হয়ে কল্‌কাতা ছাড়তে হবে। বাবাও খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমার স্বামীও খুব চেষ্টা করতে লাগলেন, কল্‌কাতাতেই ব্যবসা গুছিয়ে নেবার।

কিন্তু হ'ল না। লুধিয়ানায় আমার স্বামীর পিসতুত ভাইয়ের একটা বড় কারবারে একজন দক্ষ লোক আবশ্যক হওয়ায় তাঁরা অনেক ব'লে ক'য়ে আমার স্বামীকে সম্মত করালেন। মনে মনে আমার যতই আপত্তি থাক, প্রায় নিঃসম্বল স্বামীকে এমন সুযোগ হারাতে অনুরোধ করতে পারলুম না। স্বামীও আমার মনের কথা বুঝলেন। বললেন, 'এখন তো যাই। তার পর কিছু সঞ্চয় ক'রে নিয়ে আবার কল্‌কাতায় ফিরে আসা যাবে।' আমরা কলকাতা ছাড়লুম। বাবা একেবারে ভেঙে পড়লেন।

এখানে এসে অবধি প্রতিদিন প্রতিক্ষণে বুঝতে আরম্ভ করলুম, আমার বাঙালীত্বটাকে ভোলা কত কঠিন। এখানে এসে একেবারে একা হ'য়ে পড়লুম। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই। আমাকে এখান থেকে মনে প্রাণে মারোয়াড়ী হবার সাধনা করতে হ'ল। মানুষের দাম্পত্য-জীবনে একটা সময় শীঘ্রই আসে, যখন তাদের নিজেদের চিন্তা, কার্য, স্নেহ-মমতা, কর্তব্যবুদ্ধি প্রভৃতি সবই দুই জনের ছোট গণ্ডী পার হয়ে পরিবারে, সমাজে, দেশে, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের মনের এই মহতী প্রেরণা থেকেই বর্তমান সময়ের পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শ গড়ে উঠেছে। বুঝি সবই। কিন্তু পারি কই? এদের পরিবারের সঙ্গে, এদের সমাজের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে তো পারলুম না।

প্রতি দিনের প্রতি কাজে আমার বহু জন্মার্জিত সংস্কারের সঙ্গে এখানকার খাপছাড়া প্রথা, অভ্যাস, ব্যবহার, কথাবার্তা, পারিবারিক আদর্শের সংঘাত চলতে লাগল। আমার শাশুড়ী আমার সঙ্গেই এখানে এসেছিলেন। তিনি আমাকে খুবই ভালবাসতেন। কিন্তু বিভিন্ন সংস্কারের সংঘাত যে কত ভীষণ হ'তে পারে, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না।

একটি ছোট্ট খোকা এল, ঘর আলো ক'রে। তার খাওয়া, শোওয়া, জামা-পরা সব প্রথমত আমার মতেই চলল। কিন্তু একটু বড় হতেই, এরা তাকে মারোয়াড়ী ক'রে তুলতে আরম্ভ করল, মারোয়াড়ীর ছেলে মারোয়াড়ী হবে, এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু আমার পেটের ছেলের মারোয়াড়ী রূপ দেখে আমার অন্তরাত্মা যে গুমরে কেঁদে উঠতে লাগল। সে যে বই পড়তে লাগল, তার এক বর্ণও আমি বুঝি নে। আমার ছেলেকে আমি অ, আ, ক, খ পড়াতে পারবো না, এত বড় শাস্তি আমায় পেতে হবে, তা তো আগে ভেবে দেখি নি। আমার কাছে সে বাংলা বলতে শিখল বটে, কিন্তু দিনের অধিকাংশ সময় সর্বত্র সে তো এদের ভাষাই শিখতে লাগল। এদের অভ্যাস, এদের আচার-ব্যবহার ক্রমেই সে আয়ত্ত করতে লাগল। আমার যে কি মনে হ'তে লাগল, তা অন্তর্যামীই জানেন!

এখন মনে পড়ে আইরিনের কথা। আমার পিস্‌তুত ভাই রমেশ-দাকে বোধ হয় দেখেছ। ম্যাঞ্চেস্টার থেকে আইরিনকে বিয়ে ক'রে নিয়ে এলেন কলকাতায়। আমাদের সঙ্গে মিশতে তার কত কষ্ট হ'ত। কত চেষ্টা ছিল তার, নিজেকে বাঙালী ক'রে ফেলতে। কত ঠাট্টা ক'রেছি তার চালচলনের। তবু তো আমাদের চালচলন

ইউরোপীয়দের চালচলনের কত কাছাকাছি আইরিনের ছেলেটি বাংলা, ইংরেজী দুই ভাষাতেই কথা বলত। আমরা চাইতাম তাকে বাঙালী ক'রে নিতে, তার মা চাইত—অবশ্য মনে মনে—তাকে ইংরেজ করতে। এই দোটানায় পড়ে বেচারী আইরিনের যে কি অবস্থা হয়েছিল, তা এখন বুঝছি মর্মে মর্মে। ইংলণ্ডে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, ভারতবর্ষেও তার সত্তা সার্থক হ'তে পারে নি। আমিও তাই ভাবি, বাংলাকে যখন ছেড়েছি, তখনই আমার সত্তা লোপ পেয়ে গেছে।

স্বামী-স্ত্রীর জীবনটা তো শুধু স্বামী-স্ত্রীতেই শেষ নয়! তা যদি হ'ত, তাহ'লে আমার মনের এ দ্বন্দ্ব, এ নৈরাশ্যের কোন কারণই ছিল না। মানুষের সম্বন্ধ তার সন্তানসন্ততির সঙ্গে, তার পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে, ভৃত্য-পরিচারিকার সঙ্গে, প্রতিবেশীর সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, অগণিত ধনী, দরিদ্র, দাতা, ভিক্ষুক, সুস্থ, রুগ্ন, সৎ, অসৎ নরনারীর সঙ্গে। গাছ যেমন তার চারিদিকে বিস্তৃত অগণিত শিকড় দিয়ে রস সংগ্রহ ক'রে ফলে, ফুলে, পাতায় সমৃদ্ধ হয়, তেমনি মানুষের মনও সমাজের বিভিন্ন আবেষ্টনী থেকে ভাব-রস সংগ্রহ ক'রে সমৃদ্ধ হয়—সার্থক হয়। যখনই আমাকে বাংলার মাটি থেকে উপড়ে আনা হয়েছে, তখনি আমার জীবনের পনর আনা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

বাংলার ধুলো, বাংলার কাদা, বাংলার মাঠ, বাংলার নদী, বাংলার গাছ, বাংলার লতা, বাংলার বন, বাংলার আকাশ, বাংলার বাতাস, বাংলার নদী, বাংলার পাহাড়, বাংলার ফল, বাংলার ফুল, বাংলার ধান, বাংলার মাছ, বাংলার কথা, বাংলার ভাষা, বাংলার হাসি, বাংলার গান, বাংলার মা, বাংলার ভাই, বাংলার বোন, বাংলার সই, বাংলার সুখ, বাংলার দুঃখ, বাংলার আশা, বাংলার নিরাশা,—এই সব দিয়েই তো গড়া আমার দেহমনের প্রতি অণু-পরমাণু। এদের বাদ দিয়ে আমার আর থাকল কি?

তুমি হয়ত বলবে, তুমি তো ইচ্ছে ক'রেই মারোয়াড়ী হয়েছ। কেন আমার এ ইচ্ছে হ'ল, সে তো আগেই বলেছি। এ ইচ্ছে আমার হয় কেন? আজ আমার অভিমান মিঃ রাম, মিঃ শ্যাম বা মিঃ যদুর 'পরে নয়, আমার অভিমান সমগ্র বাংলার ছেলেদের 'পরে। কেন তারা বাংলার মেয়েকে নির্বাসিত করে? রূপের অজুহাতে, গুণের অজুহাতে, বংশের অজুহাতে, কোষ্ঠীর অজুহাতে, পিতামাতার অজুহাতে, আয়ের অজুহাতে এবং বিনা অজুহাতে তারা বাংলার লক্ষ্মীপ্রতিমা-গুলিকে কেন বিসর্জন দেয়? বীরত্বের বড়াই তো খুব শুনি! বাংলা কাগজ একখানা রেখেছি—বাংলার খবর তাতে পাই। আমার এই প্রবাসের কয় বৎসরের মধ্যেই তো কয়েক শত নির্যাতিতাদের খবর পড়লুম। কোন বীর পুরুষের গায়ে একটু আঁচড় লেগেছে বলে তো খবর পাই নি।

মাঝে মাঝে শুনি, ছেলেরা ভয় পায়, আমাদের খরচ ওরা কুলোতে পারবে না। কেন? আমরা কি এতই খাই, এতই পরি? অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করলেই হয়। যার আয় এক-শ টাকা, সে জজসাহেবের মেয়ে বিয়ে করবার জন্য ক্ষেপে কেন? যে-দেশের বউয়ের দু জোড়া শাড়ি আর দুটো সেমিজে তিন মাস চলে, আর তার সঙ্গে দু-বেলা দুটো খাওয়ার বিনিময়ে যারা সকাল থেকে দুপুর রাত্রি পর্যন্ত মুখ বুজে খাটে, পরিবারের কল্যাণ-প্রচেষ্টা ছাড়া যারা অন্য কোন কর্তব্য জানে না, তাদেরও যারা অনাবশ্যক এবং দুর্মূল্য মনে করে, তাদের পৌরুষকে ধিক্! শহরের দু-চারটে হঠাৎ ধনী, হঠাৎ-কালচার্ড শিকল-ছেঁড়া মেয়েদের চালচলন দেখেই বাংলার মেয়েদের ভাগ্য-বিচার করা কতখানি অন্যায়, তা হয়তো এই ছেলেগুলো ভেবে দেখে না। আর মেয়েদের অস্বাভাবিক উচ্ছৃঙ্খলতা শিখিয়েছে কারা? ওরাই তো দু-চার দিন এদেশ-ওদেশ ঘুরে এসে মনে করে, দুধের চেয়ে পেট্রল দরকারী বেশী, স্বামীর নিরাড়ম্বর প্রেমের চেয়ে ড্রইং-রুমের ইয়াকি লোভনীয় বেশী, ছেলেমেয়ের ঝঞ্ঝাটের চেয়ে সিনেমা হোটেলের আকর্ষণ বেশী।

যাক্ গে, চিঠি লম্বা হ'য়ে যাচ্ছে। লম্বা লম্বা বক্তৃতা ক'রে তোমায় বিরক্ত করতে চাই নে। আমার অভিশপ্ত জীবনের একটু পরিচয় তোমায় দিলুম, কিছু মনে ক'রো না। আমার যা হবার, তা হ'য়ে গেছে। কিন্তু ছেলেটাকে কিছুতেই ছাড়তে পারছি নে। যদি ওকে

বাঙালী ক'রে যেতে পারি, এ ব্যর্থজীবনের শেষে একটু সান্ত্বনা হয়তো পাব। অনেক ব'লে ক'য়ে, অনেক বুঝিয়ে, অনেক সাধ্যসাধনা ক'রে ওঁকে পাঠিয়েছি বাংলা দেশে—আমার সাধের বাংলা দেশে—যদি আবার কলকাতায় একটা ব্যবসার কিছু সুবিধে করতে পারেন। ওখানে গিয়ে যদি আমায় দু-বেলা রেঁধে খেতে হয়, তাতেও আমি দুঃখ করবো না। খোকাকে আমি বাঙালী করতে চাই। আমি মরেছি, কিন্তু খোকাকে আমি বাঁচাতে চাই!

বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে। আজ আর না। বিকাশবাবুকে আমার নমস্কার জানিও। তুমি আমার—কি বলবো?—অনেক দিন আগেকার হোস্টেলের কথা মনে হচ্ছে—না থাক্—তুমি হাসবে! আমার হাসার বা হাসাবার দিন ফুরিয়ে গেছে। ইতি

তোমাদের ডলি।

পত্র পড়া শেষ হইলে বিকাশবাবু বলিলেন—শুনলে?

—হ্যাঁ।

—কি করা যায় বল তো?

—যেমন করে হোক, ডলিকে কলকাতায় আনতেই হবে।

—দেখি চেষ্টা ক'রে। কালই শীতলবাবু আর মিঃ ভট্টাচারিয়ার সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে।

—আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

—বেশ, যেও।

শিল্পী নন্দলালের সঙ্গে কথোপকথন

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

সব কথাবার্ত্তাই কথোপকথন নয়। প্রশ্ন করলেই জবাব আসে কিন্তু তার সঙ্গে মন আসে না সব সময়ে। কথোপকথন তখনই সত্যিকার কথোপকথন হয় যখন কোন মানুষ প্রশ্নের জবাবে শুধু মাপাঝোপা উত্তর দেয় না—দেয় এমন উত্তর যার মধ্যে স্বতস্ফূর্ত্ত হয়ে ওঠে তার বিশ্বাস ও ধারণা, মত ও আদর্শ। যখন তিনি নিজেকে উন্মুক্ত ক'রে দেন, আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে যখন তাঁর হৃদয়ের এক প্রান্ত। এমন অবস্থার জন্য চাই মনের বিশেষ মেজাজ। সাধারণ অবস্থায় মানুষ এ-ভাবে অপরকে নিজের নিবিড় সান্নিধ্যে টানতে পারে না। এবারকার ছুটিতে হঠাৎ নন্দলালকে পেলুম সেই মেজাজে। তিনি শান্তিনিকেতন কলাভবনের অধ্যক্ষ। ছুটির দীর্ঘ অবসরে ছাত্রদের নানা সমস্যার ভাবনা তখন তাঁর ছিল না। এমনি সময়ে—দিনের পর দিন ধরে একটানা কাজের ব্যস্ততার হঠাৎ অবসানে স্বভাবতঃ মানুষ নিজের মধ্যে নিজেকে বেশী করে পায়। নন্দলাল চিন্তাশীল। ভিতরের স্বাভাবিক প্রেরণায় তিনি শুধু ছবি আঁকেন না। শিল্প সম্বন্ধে নানা সমস্যা নিয়ে তিনি ভাবেন, মনের মত করে তাদের বোঝাবার চেষ্টা করেন। তিনি তাত্ত্বিক নন, তত্ত্বের জন্য তত্ত্বের বিচারে তাঁর খুব উৎসাহ নেই। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষত্ব এই যে, সাধারণতঃ তিনি বিচ্ছিন্ন ঘটনা থেকে সাধারণ তত্ত্বে পৌছবার চেষ্টা করেন। বেশী কথার মানুষ নন, তবু তাঁর কথা এসে একেবারে পৌছয় হৃদয়ের কোণে। তাঁর ভাষা শুধু এক জনের চিন্তাকে বহন ক'রে আনে না, আর এক জনের মনে চিন্তার আগল খুলে দেয়। এক দিন সুযোগ বুঝে তাঁকে শিল্প সম্বন্ধে কয়েকটা প্রশ্ন করেছিলুম।

বিকাল বেলা। শান্তিনিকেতনের কলাভবনের পাশে এসে তিনি বসেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন দুজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত বিনোদ মুখোপাধ্যায় এবং মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত। একজন কলাভবনের অধ্যাপক, আর একজন কলকাতার গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যাপক,

দুজনেই কলাভবনের পূর্বতন ছাত্র। দেখা হতেই তাঁর মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসি। এমনি হাসি দিয়ে প্রায় তিনি পরিচিতদের অভ্যর্থনা জানান। দু-একটি কথার পর জিজ্ঞাসা করলুম, "আচ্ছা মাষ্টারমশাই, যখন কোন ছবিতে হাত দেন তা আঁকার প্রেরণা কি হঠাৎ আসে?"

"হঠাৎ বই কি।" তিনি জবাব দিলেন, চোখে ভেসে উঠল তন্ময়তা। বলতে লাগলেন: "কখন আসবে তার কোন ঠিকানা নেই। তবে এক ভাবে আসে না। তোমাকে বলি কার্য্যতঃ কি কি ভাবে আসে, শোন। সেই যে ল্যাণ্ডস্কেপগুলো* করেছিলুম, তা এসেছিল ছাত্রদের শেখাতে শেখাতে। তাদের ল্যাণ্ডস্কেপ দেখাতুম, আঁকতে শেখাতুম। দেখতে দেখতে নিজেই করে বসলুম অনেকগুলো।

"অনেক সময় এমন হয়, কোথাও যাচ্ছি হঠাৎ একটা গাছ দেখে ভাল লাগল। কেন ভাল লাগল জানি না। মনের মধ্যে সেটা রয়ে গেল। ভাল লাগল বলেই আবার হয়ত তা দেখতে গেলুম। তার পর সেটাকে আঁকার হয়ত চেষ্টা করলুম, কিন্তু পারলুম না। খানিকটা স্কেচ করেই ছেড়ে দিলুম। হঠাৎ আর এক দিন যেতে যেতে আবার সেই গাছটা চোখে পড়ল, আবার দেখলুম। তার পর নানা কাজে হয়ত হাত দিয়েছি। কিন্তু মনে মনে সেই গাছটা রয়ে গেছে। হঠাৎ আর কোন ছবি আঁকতে আঁকতে সেই গাছটা আঁকার প্রেরণা এল। হাতের কাজ ফেলে গাছটা এঁকে ফেললুম।

"এছাড়া আরও এক রকম হয়। মনে একটা ভাব হয়—কষ্ট বা আনন্দ বা আর কিছু। তখন সেই ভাবটা প্রকাশ করবার জন্যে মনে মনে সাবজেক্ট খুঁজি। হয় যাদের দেখছি তাদের মধ্যে না-হয় মিথলজির মধ্যে,—যেমন করে হোক তা প্রকাশ করার একটা সাবজেক্ট চাই। একটা আমার জীবনের ঘটনা বলি, তাহলে বুঝতে পারবে। 'উমার প্রত্যাখ্যান' ছবিখানা কি ভাবে এঁকেছিলুম। তখন আমি শান্তিনিকেতনে এসেছি। এখানেই কাজ করি। কলকাতার এক্সহিবিশনে একখানা ছবি এঁকে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। অবনীবাবু তা দেখে খুব অখুশী হলেন, বললেন, কিছু হয় নি। শান্তিনিকেতনে গিয়ে তোমার এ কি হল! তাঁর কথা শুনে মনে বড় ধাঁধা লাগল, খুবই কষ্ট হ'ল।"

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালের গুরু—তাঁর কাছেই তিনি ছবি আঁকা শিখেছিলেন। এঁদের দুজনের সম্বন্ধ এমন গভীর এবং নিবিড় যে গুরুশিষ্যের সাধারণ বিশেষণ দিয়ে তার পরিচয় দেওয়া যায় না। অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সাক্ষাৎ আলাপে কোন দিন শিষ্যের সম্বন্ধে কথা শোনার সৌভাগ্য আমাদের হয় নি কিন্তু নন্দলালের মুখে গুরুর সম্বন্ধে বারবার নানা কথা শুনেছি। তার মধ্যে উচ্ছ্বাস নেই—উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা নন্দলালের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কিন্তু গুরুর সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অসামান্য। গুরুর মতামত ও ধারণায় তাঁর একান্ত আস্থা।

তিনি বলে চললেন: "অবশ্য অবনীবাবু পছন্দ করেন নি বলেই হয়ত সেই ছবিখানা ওঁর ভাই সমরবাবু কিনে নিলেন। সেখানা এখনো তাঁর কাছে আছে। যাক্‌, বাড়ী ফিরে এলুম। কিন্তু মনের কষ্ট ভুলতে পারি নে। ইচ্ছে হ'ল, একটা কষ্টের ছবি কিছু আঁকব। মনের ভাব নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি হঠাৎ এক দিন চোখে পড়ল, শান্তিনিকেতনের একটি মেয়ে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে, তার ঘাড়ের বেণ্টটা দেখতে পেলুম। বাস্‌। যা চাইছিলুম পেয়ে গেলুম। তার পর সাবজেক্ট খুঁজতে আরম্ভ করলুম। 'উমার প্রত্যাখ্যান'-এর চেয়ে আর কি কষ্টের বিষয়বস্তু হ'তে পারে? আমার বেশ মনে আছে, প্রথমেই ঘাড়ের বেণ্টটা করেছিলুম তার পর ধাঁ ধাঁ করে পুরো ছবিটা হয়ে গেল।"

"উমার প্রত্যাখ্যান" ছবিখানা নন্দলালের প্রতিভার একখানি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সেখানা এখন আছে প্রফুল্লনাথ

* কয়েক বছর আগে নন্দলাল কয়েকখানি ল্যাণ্ডস্কেপ পেন্টিং করেছিলেন। সেগুলি তাঁর নিজের কাছে আছে। তার কয়েকটি প্রবাসীতে ছাপা হয়েছিল।

ঠাকুরের বাড়ীতে। তিনি চুপ করলে জিজ্ঞাসা করলুম, "গাছটার সম্বন্ধে যে বললেন, কোন গাছ বা কিছু ভাল লাগলে মনের মধ্যে থেকে যায়। কি ভাবে তা থাকে? হুবহু ফটোগ্রাফের ছবির মত না শুধু একটা ভাব হিসেবে?"

তিনি সুরু করলেন, "ফটোগ্রাফের ছবির মত মোটেই না। একটা দৃষ্টান্ত দিই। গেষ্টহাউসের পুকুরের ওপারে পাহাড়ের ওপর যে বটগাছটা আছে, ওটা আমার খুব ভাল লেগেছে—এক দিন ওটাকে হয়ত আঁকব। আঁকার আগে এসব কথা প্রকাশ করা শিল্পীদের উচিত নয়। সাধারণতঃ, কারোকে বলিও না। তবে তুমি বুঝতে পারবে বলে কথাটা ফাঁস করলুম। আচ্ছা, ঐ গাছটা আমার ভাল লেগেছে—কেন ভাল লেগেছে জানি না। হয়ত ঐ জায়গাটার সিচুয়েশন বা এসোসিয়েশনের জন্য। যখনই ওখান দিয়ে যাই, গাছটার দিকে চেয়ে থাকি। কি দেখি? পাতা, না, ডাল? কিছুই দেখি না। একমনে শুধু চেয়ে দেখি—মনের মধ্যে একটা বেদনা জাগে। হঠাৎ এক দিন আঁকতে সুরু করে দেব। তখন হয়ত দেখব, পাতাটা ঠিক হচ্ছে না, ডালটা যেমন চাই তেমন হয় নি। আবার বারবার যাব। কখনও হয়ত পাতা দেখব, কখনও হয়ত ডাল দেখব। নয় তো ওর চেয়ে অন্য কোন ভাল একটা বট গাছের পাতা বা ডাল দেখে ছবিটায় লাগিয়ে দেব। দেখ, সব আর্টিষ্টের মধ্যেই আছে একজন ক্রিটিক। আঁকবার সময় সে কেবলই বলে, না এটা হ'ল না। কি যে হ'লে ঠিক হয়, কেমন করে তা করা যায়, সে-সব কথা বলতে পারে না। কিন্তু হচ্ছে না যে তা ঠিক বলে দেয়। তখন আবার ছবিটা বদলাই, হয়ত গিয়ে গাছটা আবার দেখি।

"এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা পরিষ্কার করে বলি। গাছ দেখে যে প্রেরণা জাগল তার জন্যে যে শিল্পী গাছই আঁকবে তার কোন ঠিকানা নেই। অন্য আকারে তা প্রকাশ করতে পারে। হয়ত গাছ দেখে যে ভাব জাগল মানুষের ফিগার দিয়ে তা বেরিয়ে পড়ল। যেমন ভারতের শিল্পীরা হিমালয় পর্ব্বত দেখে শিব, বুদ্ধ, ইলোরার মন্দির ইত্যাদি গড়েছেন। হিমালয় দেখলেই আমাদের মন বড় হয়ে ওঠে, তার বিস্তার হয়। আমরা তার ভাবে অনুপ্রেরিত হই এবং গড়বার সময় সে ভাব আপনি এসে পড়ে।

"আবার ছবি থেকেও ছবির প্রেরণা আসে। বিখ্যাত আর্টিষ্টদের ছবি দেখতে দেখতে মনে ভাব জাগে—আলো হ'তে আলো জ্বালার মত। পেট্রিক গেডিস বলে একজন সাহেব কলকাতা শহরের প্ল্যান করবার জন্যে এসেছিলেন। আমাদের কলাভবনের তখন বিশেষ কিছুই জমে ওঠে নি, শান্তিনিকেতনের যেটা এখন পুরণো কলেজ হোষ্টেল তার দোতলায় সামান্য ভাবে কাজ আরম্ভ হয়েছে। তখনও ফ্রেস্কো আঁকার মালমশলা সম্বন্ধে কিছুই হদিস পাই নি। তার ঢের পরে ফ্রেস্কোর কাজ সুরু করি। ঘরের দেয়ালে খেয়ালমত শুধু দু-একটা ছবি আঁকা হয়েছিল। গেডিস এসে তা দেখতে পান। জিজ্ঞাসা করলেন, এ-রকম দু-একটা করেছ কেন? সারা আশ্রমের দেয়াল ভরে দাও না। বললুম, ছবিগুলো বেশী দিন থাকে না যে, উঠে যায়। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, না-ই বা চিরদিনের জন্যে থাকল। ঠিক রং যদি না পাও কয়লা দিয়ে আঁক। উঠে গেলে আবার আঁকবে। তবু দুদিনও তো থাকবে। তার মধ্যে দু-চারজনও দেখতে পাবে। তা দেখে তাদের মধ্যে আবার প্রেরণা জাগবে, তাদের মনে সৃষ্টি করবার সুর লেগে যাবে।—সেই তো শিল্পের সার্থকতা। গেডিসের কথাটা মানি। ভাল ছবি দেখতে দেখতে অনেক সময় নতুন ছবি করার প্রেরণা জাগে। অবনীবাবুকে দেখেছি, ছবি আঁকছেন সামনে বিখ্যাত পারসিক শিল্পীদের ছবি রেখে। একে অনুকরণ করা বলে না। ছবিখানা যখন শেষ হ'ল তখন দেখা গেল তার মধ্যে সস্তা নকলের গন্ধ নেই, তা সম্পূর্ণ অবনীবাবুর নিজস্ব হয়ে গেছে। হয়ত যে ছবিখানা সামনে রেখে এঁকেছেন তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছবি হয়েছে সাবজেক্ট ও আঁকার পদ্ধতির দিক থেকে। আর ছবিটা বেশ উঁচু দরের হয়েছে।"

একটু থেমে তিনি আবার সুরু করেন, "দেখ কোন ছবির কাজ যখন করি, তখন সারাদিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে মনে ঐ কথাই বাজে। কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ভাবনা যায় না। ছবি করার সময় এত ভাল লাগে যার জন্যে অনেক সময় রাত্তিরে বিছানা থেকে উঠে ছবিখানা দেখতে হয়। বেশ মজার জিনিস।" কথা বলতে বলতে মুখে তাঁর ভেসে উঠল আত্মসচেতনতার এক টুকরো নিঃশব্দ হাসি। হয়ত অনেক দিনের এমন অনেক অবস্থার স্মৃতি তাঁর মনে হয়েছে যা সাধারণ সংসারীর চোখে কৌতুককর। সে-কথা ভেবে তিনি এখন নিজের সম্বন্ধে হয়ত নিজেই হাসছেন।

প্লেটোর সময় থেকে আরম্ভ করে সাহিত্য এবং শিল্পের ইন্সপিরেশন তত্ত্ব নিয়ে পৃথিবীতে তর্কবিতর্কের শেষ নেই—হয়ত ভবিষ্যতেও তাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা এ-সমস্যার শেষ করতে পারবেন না। শিল্প-রসিকেরা আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীর নিজের অভিজ্ঞতার এই বিবরণে হয়ত অনেক কিছু প্রশ্নের মীমাংসা পাবেন। মনে হয়, অভিজ্ঞতাই মানুষের জীবনে সত্যিকার মীমাংসা আনে—শুকনো তর্ক তাকে ঠেলে দেয় দূর থেকে দূরে।

পাঠ-প্রচয়। সম্পাদক ক্ষিতীশ রায়, অধ্যাপক, বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতী পাঠভবন কর্তৃক ষষ্ঠ ক বর্গের (অন্যান্য বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর) জন্য পাঠ্যরূপে মনোনীত। মূল্য লেখা নাই।

'প্রবাসী'তে সাধারণতঃ বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকসমূহের পরিচয় দেওয়া হয় না। এই বহিটি সম্বন্ধে এই রীতির ব্যতিক্রম করিবার প্রধান কারণ, বহিখানি 'কথিত' বাংলায় লেখা, কেতাবি বাংলায় নয়। অপ্রধান একটি কারণ, এর অনেক ছবি ছাত্রছাত্রীদের আঁকা। 'কথিত' বাংলা পুস্তকে চালান উচিত কি না, সে বিষয়ে অনেক তর্কবিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। তাহার জের এখানে টানা চলিবে না। অন্য সব দেশে যেমন বঙ্গেও তেমনি, 'কথিত' ভাষা দেশের সর্বত্র এক নয়। কিন্তু শিক্ষিত ভদ্রসমাজে রাজধানী ও তাহার আশেপাশের 'কথিত' ভাষাই কথাবার্তায় ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে প্রচলিত হইতেছে। দেখা যাইতেছে, তাহা চিন্তা ও ভাব প্রকাশের নিমিত্ত অযথেষ্ট নয়। এই 'কথিত' ভাষার সহিত বাল্যকাল হইতেই পরিচিত হওয়া সুবিধাজনক।

এই বহিখানির পাঠগুলি মনোহারী। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানগুলি ইহার বৈশিষ্ট্য সাধন করিয়াছে। গানগুলি ছেলেমেয়েরা শুধু পড়িবে না, না গাইয়া ছাড়িবে না।

পল্লীসেবক উপেন্দ্রনাথ। শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। সচিত্র। মূল্য দশ আনা।

ইহা রায় বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ সাউ মহাশয়ের জীবনচরিত। ইহা পড়িয়া বাঙালী মাত্রেই প্রীত ও উপকৃত হইবেন। বাঙালীর হৃদয়ের যে সকল সদ্‌গুণ আমরা আমাদের জাতির স্বাভাবিক সম্পদ মনে করি, সাউ মহাশয়ের চরিত্রে তাহার প্রাচুর্য ছিল। আবার আমরা আজকাল যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি যে বাঙালীর ব্যবসাবুদ্ধি কম এবং বাঙালী ব্যবসা বাণিজ্যে কৃতী হইতে পারে না, সে ভ্রান্ত ধারণার নিরসনও হয় তাঁহার জীবনচরিত পড়িলে।

পুস্তকটির 'সূচনা' ও সাউ মহাশয়ের বাল্যকালের বিবরণের পর, তাঁহার যৌবনে গ্রামের সেবা, গ্রামে শিক্ষাবিস্তার, চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, তাঁহার প্রভূত দান, কলিকাতায় ব্যবসাকার্য, চরিত্রপ্রসঙ্গ প্রভৃতি আছে।

উপেন্দ্রনাথের হিতৈষণা জাতিধর্ম আদি কোন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না।

বহিখানির ভাষা সরল।

বঙ্গীয় মহাকোষ। পরলোকগত পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড, অষ্টাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

এই মহাকোষের পরিচয় আগে অনেকবার দিয়াছি। এই খণ্ডের প্রথম শব্দ 'অনুরাধপুর', শেষ শব্দ 'অনুশাসন'।

উৎসবের প্রণতি, ১ম ও ২য় খণ্ড; **নবযুগের শিক্ষা ও সাধনা**, প্রথম খণ্ড; **জীবনবীণার বিচিত্র সুর** (লণ্ডনপ্রবাসী বিদ্যার্থীর দৈনিক প্রার্থনা), প্রথম খণ্ড; **ছেলেমেয়েদের প্রার্থনা।** এই পাঁচখানি পুস্তক শ্রীহট্টস্থিত মুরারিচাঁদ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ (লণ্ডন) প্রণীত। শিলংস্থিত 'শান্তিকুটীর' ভবনে প্রকাশক পণ্ডিত সুবোধচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, বি এ-র নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য যথাক্রমে ।৵০, ।০, ৵০, ।০, ।০ আনা।

"উৎসবের প্রণতি" দুই খণ্ডে লেখক মহাশয়ের কয়েক বৎসরের ডায়েরির কোন কোন দিনের লিপি উদ্ধৃত হইয়াছে। রচনাগুলি ধর্মভাবপূর্ণ ও ভক্তিরসাপ্লুত।

"নব যুগের শিক্ষা ও সাধনা" বহিটির ভূমিকা শ্রীযুক্ত অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন। বহিটিতে আছে—শিক্ষকের আদর্শ, নববর্ষের সাধনা, শিশুর জন্মোৎসব, শিশুর হাতে খড়ি, শিক্ষাসেবকের স্বাগতপত্র, শিক্ষকের অধিকার ও কর্তব্য, শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষক ও অভিভাবক, জীবনের মহত্ত্ব, চরিত্রগঠন, প্রশ্নোত্তর, শিক্ষা ও সাহিত্য।

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন, "লেখক এই সকল বিষয় সুনিপুণভাবে চিন্তা করিয়াছেন, চিরজীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা তিনি যে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, দেশের কল্যাণে, জাতির হিতকামনায় তাহাই তিনি জনসাধারণকে উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার এই গভীর চিন্তাপ্রসূত নিবন্ধগুলির মধ্যে ভাবিবার, জানিবার, শিখিবার অনেক জিনিষ আছে।"

ইহা অতীব সত্য কথা।

"জীবনবীণার বিচিত্র সুর" লেখকের দৈনিক প্রার্থনা-মালার চয়নিকা। ছাত্ররূপে লেখক যখন লণ্ডনে ছিলেন, সেই সময়কার এই প্রার্থনাগুলি হইতে বুঝা যায়, তিনি কিরূপ উচ্চ আদর্শ পোষণ করিতেন এবং ভগবদ্বিশ্বাসীর জীবন যাপন করিতে চেষ্টা করিতেন।

যাঁহারা দৈনিক গার্হস্থ্য উপাসনায় বালকবালিকাদের উপযোগী প্রার্থনার বহির অভাব বোধ করেন, তাঁহারা এই পুস্তিকাটি হইতে সঙ্কেত ও সাহায্য পাইবেন।

ড.।

সত্যের আলো—শ্রীসুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ভরদ্বাজ পাবলিশিং হাউস্, ১১, মোহনলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

বৈদিক যুগের পটভূমিতে রচিত নাটক। সে যুগ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অতি অস্পষ্ট। তথাপি সেই সুদূর অতীতের কথা ভাবিলে মনে উন্মাদনা আসে। গতানুগতিক বিষয়বস্তু ছাড়িয়া লেখক নূতন বিষয়ের সন্ধান করিয়াছেন, এজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। বৈদিক ভারতের বিচিত্র জীবন-চিত্র লেখক নিষ্ঠার সহিত আঁকিয়াছেন। এক দিকে যুদ্ধবিগ্রহ এবং ভোগবিলাস, অন্য দিকে সাধনা ও সংযম; এক দিকে আর্য্য-অনার্য্য বিরোধ, অন্য দিকে তাহাদের মিলনের চেষ্টা সুন্দরভাবে প্রকটিত হইয়াছে। অনার্য্য বলিতে লেখক অসভ্য বুঝেন নাই। "আর্য্যপূর্ব্ব ভারতে বন্যজাতি হইতে সন্ন্যাসবাদী পর্য্যন্ত বহু প্রকারের মানব ছিলেন" (ভূমিকা)। নাটকের শেষভাগে দেখান হইয়াছে, সত্যের আলো প্রকাশ পায় প্রেমে, হৃদয়ের আবরণ-মোচনে। গ্রন্থের আদর্শ সুন্দর এবং রচনাভঙ্গী প্রশংসনীয় যদিও ঐতিহাসিক বা বা পৌরাণিকের কষ্টিপাথরে ইহার সম্যক্ পরিচয় না আসিতে পারে।

ক. চ.

আশীষ (কাব্যগ্রন্থ)—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী, এম্-এ বি-এল্। প্রকাশক—শ্রীশৈলেশকুমার সেন এম্-এ। "কল্পনাবাস", কুমিল্লা। দাম আট আনা।

এই কাব্যগ্রন্থে ২০টি কবিতা আছে। কবিতাগুলি ভাল লাগিল। সরলতা ও আন্তরিকতা আছে। কবি আধুনিকতাপন্থী নহেন। 'খড়গপুর' কবিতাটির ছন্দ ভাল—পড়িতে ভাল লাগে। কবির ছন্দে হাত আছে। আমাদের পরিচিত গৃহসংসারের সুখ-দুঃখের কথাই কবি ছন্দে গাঁথিয়াছেন। কবি যোগেশচন্দ্র চৌধুরী রবীন্দ্রপ্রতিভামুগ্ধ এবং তাঁহার অনুগামী বলিয়া মনে হইল।

বিদেশীর বিপদ (গল্পের বই)—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল। দাম এক টাকা। প্রকাশক—শ্রীশৈলেশকুমার সেন, এম্-এ, কল্পনাবাস, কুমিল্লা।

বইখানিতে পাঁচটি গল্প আছে। গল্পগুলি চিত্তাকর্ষক, বিষয়বস্তু অনৈসর্গিক। সাধারণ পাঠকের গল্পগুলি পড়িতে ভালই লাগিবে। সহজ কথায় যাহাকে আমরা ভূতের গল্প বলি, লেখক তাহাই একটু নূতন ধরণে লিখিয়াছেন। মন্দ নয়।

গীতিকাঞ্জলি (গানের বই)—শ্রীকেশবলাল দাস। প্রাপ্তি-স্থান, 'বনগাঁ', রেলবাজার, যশোর এবং কলিকাতার প্রসিদ্ধ গ্রন্থালয়সমূহ। দাম দুই টাকা।

লেখক রবীন্দ্র ভঙ্গীতে গান রচনা করিয়াছেন। কোন কোন গানে রবীন্দ্রের ভাষা পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। বোধ হয় ইহা তাঁহার অজ্ঞাতসারেই হইয়াছে। তবু, তাঁহার গানগুলিতে আন্তরিকতা আছে। যেমন,

"এই ধরা মাঝে তুমি অধর চাঁদ
বিশ্বযোড়া পাতা তব প্রেমের ফাঁদ
প্রেমবিন্দু দানে পুরাও মনোসাধ
করি আশা মনে।
এই আমি চাই পাই যেন ঠাঁই
যুগল চরণে।"

বাণীর চরণে 'অন্তিম অর্ঘ্য'—শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল রচিত।

দার্শনিক বিষয়ের প্রবন্ধের বই। ভূমিকা লইয়া ইহাতে ৮টি প্রবন্ধ আছে। ভূমিকাটি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত। মূল্যবান ভূমিকা। "কুবল" গ্রন্থ রচয়িতা শ্রীনলিনী-মোহন সান্যাল এম্-এ বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতনামা। তাঁহার শেষ বয়সের লেখা এই অন্তিম অর্ঘ্য বঙ্গসাহিত্যে পূর্ব্বগ্রন্থের ন্যায় সমাদর লাভ করিবে বলিয়া মনে হয়। বেদ, পুরাণ, যোগ, অধ্যাত্ম দর্শনই তাঁহার এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধটি সুন্দর। তাহার নাম 'লুকোচুরি'।

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী—তৃতীয় ভাগ। শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী প্রণীত, কিষণপুর, পোঃ রাজপুর, দেরাদুন হইতে গ্রন্থকর্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।০

আলোচ্য গ্রন্থে যুক্তেশ্বরী মাতা আনন্দময়ীর দেহাশ্রিত লীলার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উক্ত লীলা সকল মায়ের বাহ্য পরিচয়, ইহাতে মায়ের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। মা এক জন শ্রেষ্ঠ সাধিকা। তাঁহার জীবন-ধারায় এমন সকল ব্যাপার ঘটিতে দেখা যায়, যাহা বুঝা কঠিন। আলোচ্য গ্রন্থে মায়ের অনেক ভাবের ছবি সংযুক্ত করা হইয়াছে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত। উদ্বোধন কার্য্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা। মূল্য চৌদ্দ আনা।

মার্কণ্ডের চণ্ডীর এই মনোরম সংস্করণখানিতে মূল সংস্কৃত, উহার আক্ষরিক অন্বয়ার্থ এবং সরল বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। পাদটীকায় প্রয়োজনীয় পাঠভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং অনুবাদ বিশদ ভাবে বুঝিবার সুবিধার জন্য বিভিন্ন টীকা ও অন্যান্য নানা গ্রন্থ হইতে বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্ধৃত ও অনূদিত হইয়াছে। প্রারম্ভে ও শেষে স্তবকবচাদি চণ্ডীর ষড়ঙ্গ ও ধ্যানমাহাত্ম্য প্রভৃতি অনুবাদসহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই সংস্করণের সাহায্যে চণ্ডীসম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য জানিতে পারিবেন এবং চণ্ডীর প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণে ইহা তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। মুদ্রাণাদির সৌষ্ঠব নিবন্ধন গ্রন্থের বাহ্যিক সৌন্দর্য ইহার গৌরব ও আদর বৃদ্ধি করিবে সন্দেহ নাই।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

পৃথিবীর ইতিহাস—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রণীত। প্রকাশক মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ২৩২, মূল্য ১।০।

পৃথিবীর ইতিহাস বলিলে কোনও জাতিবিশেষের বিচ্ছিন্ন ইতিহাস নহে—সমগ্র মানব-সমাজের অগ্রগতির ধারাবাহিক ইতিহাস বুঝায়। সেই আদিম গুহাবাসী মানব হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত মানবের প্রতিনিয়ত স্বীয় অবস্থার উন্নতির প্রয়াস, ইহাই পৃথিবীর ইতিহাস। এই ইতিহাস অপূর্ব্ব, মনোরম ও শিক্ষাপ্রদ। আলোচ্য পুস্তকখানিতে স্বল্পপরিসরের মধ্যে সরল ভাষায় এই ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। মুখ্যতঃ অল্পবয়স্কদিগের জন্য লিখিত হইলেও যাঁহাদের ইংরেজী বহি পড়িবার সুবিধা নাই এরূপ বয়স্কেরাও বহিখানি পাঠে উপকৃত হইবেন। মুদ্রিত চিত্রগুলি বহিখানির অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে

চারণী—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত। মিত্র এণ্ড্ ঘোষ; ১০।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

লেখক দার্শনিক, কাব্য যেন তাঁহার অবসর-বিলাস। কিন্তু কাব্য-ক্ষেত্রে তিনি অনধিকারী নহেন। ভাষার এবং ছন্দের উপর তাঁহার অধিকার আছে। কেহ দার্শনিক হইলেই কবি হইবেন না, কিংবা কবি হইলেই দার্শনিক হইবেন না—এরূপ ধারণা যে সব স্থলে সত্য নহে, তাহা রবীন্দ্রনাথের বাংলা ও ইংরেজী গদ্য ও পদ্য রচনাবলী হইতে বুঝা যায়। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তও আর এক দৃষ্টান্ত। তাঁহার অনেক কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব লক্ষিত হয়। 'শরৎ-রবীন্দ্র', 'বর্ষাবিলাস', 'বিক্রুতি' এবং 'শক্তি'—কবিতাচতুষ্টয়ের গম্ভীর ধ্বনিঝঙ্কার উপভোগ্য। দ্বিতীয়োক্ত কবিতায় সংস্কৃত শব্দরাজির মধ্যে 'আছাড়ি পাছাড়ি'—সুপ্রযুক্ত মনে হইল না।

একটি কুসুম—শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ খান। শ্রীধরিত্রী দেবী কর্ত্তৃক ৫।৬ সেবক বৈদ্য ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲।

ইহা প্রেমের কথা লইয়া লেখা একখানি আখ্যানকাব্য। 'গাথা'র বৈশিষ্ট্য সরল প্রকাশভঙ্গী। আমরা আধুনিক শিক্ষিত কবিরা প্রায়ই সে বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখিতে পারি না; বর্ত্তমান কবিও পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার ভাষা মধুর এবং ঈষৎ ভাবালুতাযুক্ত হইলেও কাহিনীটি উপভোগ্য।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রাঙ্গামাটির পথ—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। কলিকাতা। পৃ. সংখ্যা ২৮৭। মূল্য আড়াই টাকা।

"রাঙ্গামাটির পথ" যখন সাপ্তাহিকে ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইতেছিল তখন আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি। সবচেয়ে যাহা মুগ্ধ করিত তাহা এর সচলতা। যে-স্তরের জীবন লইয়া বইখানি লেখা সে-সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের জন্য উপন্যাসের গতিবেগ কোথাও ক্ষুন্ন হয় নাই। সৌরীনবাবুর ষ্টাইল সম্বন্ধে বেশী কথা বলিবার দরকার নাই, কেন না তিনি সুপরিচিত। তাঁহার গল্প অগ্রসর হয় বেশীর ভাগ পাত্র-পাত্রীদের সংলাপের মধ্য দিয়া। এই রীতির একটা চমৎকারিত্ব এই যে পাত্র-পাত্রীদের চেনা যায় খুব অল্পে, তাহারা যেন সঙ্গে সঙ্গে নিজেই নিজেদের প্রকাশ করিয়া চলে। যেটুকু বাকী থাকে, লেখক সেটুকু মাঝে মাঝে নিজের মন্তব্য দিয়া পূরণ করিয়া দেন। এ অংশ-গুলি স্বল্প, সংযত, ঘটনা বা চরিত্রগুলিকে ফুটাইয়া তুলিয়াই নিরস্ত হয়, ক্লান্তি আনে না।

উপন্যাসের মূল পরিকল্পনাটি একটি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের চার ধারে গড়িয়া উঠিয়াছে—

> গ্রামছাড়া ঐ রাঙ্গামাটির পথ
> আমার মন ভুলায় রে।
> * * *
> ও যে কোন্ বাঁকে কি ধন দেখাবে,
> কোনখানে কি দায় ঠেকাবে,
> কোথায় গিয়ে শেষ মেলে যে
> ভেবেই না কুলায় রে!

এই রাঙ্গামাটির পথ শহরের প্রলোভনের পথ। চিরকালই তাই, তবে আজ,—যখন মেয়েকেও অন্নসমস্যায় পুরুষের মতই পথে বাহির হইয়া পড়িতে হইতেছে, সে সময় প্রলোভন আরও তীব্র, স্খলনের সম্ভাবনা আরও বেশী। নায়ক বিমল কিন্তু বাঁচিয়া গেল। সে বাঁচিল এই জন্য যে বিপদই তাহার কাছে সম্পদ হইয়া দেখা দিল। অলকা—সিনেমার অভিনেত্রী অলকা, যে বিমলকে রাঙ্গামাটির পথে টানিল, সেই তাহাকে নিজের চরিত্রের দৃঢ়তায় বাঁচাইলও—অবশ্য নিজেকে আহুতি দিয়া।

রাঙ্গামাটির পথে এই জিনিসটি আকস্মিক। তাই মনে হয় এই আকস্মিকতার জন্য উপন্যাসের মূলসূত্রটি একটু দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। কেননা যাহা নিয়ম তাহার মধ্যে আকস্মিকতা আনিয়া ফেলিলে নিয়মের মূল উদ্দেশ্য ফুটিতে পায় না। অর্থাৎ আলোচ্য বইখানিতে রাঙ্গামাটির পথের আভাস আছে কিন্তু পরিণতি নাই।

সে যাহাই হোক, বইখানি খুব সুখপাঠ্য হইয়াছে, বিশেষ করিয়া অলকার চরিত্র লেখক এত জীবন্ত করিয়া আঁকিয়াছেন যে সে সামনে আসা মাত্রই নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়া মনকে স্পর্শ করে। শেষ করিয়া বই মুড়িয়া রাখিবার পরও তাহার জীবনের কারুণ্য মনকে বহুক্ষণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ক্রম-বিকাশের পথে—তৃতীয় ভাগ। গীতার পুরুষোত্তম (শক্তি অংশ) ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ প্রণীত। শরৎকুমারী সংস্কৃত বিদ্যাশ্রম, ৬ নং গোদৌলিয়া, বেনারস সিটি। মূল্য ১ এক টাকা।

গ্রন্থকার একজন শক্তিশালী সাধক। তিনি তাঁহার সাধনলব্ধ জ্ঞান এই গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছেন। মানুষ কি করিয়া স্তরে স্তরে উৎকর্ষলাভ করিয়া পূর্ণ পরিণতিতে উপস্থিত হইতে পারে, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহাই আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে প্রত্যেক জীব যাহাতে আত্মকেন্দ্র বিকাশ করিতে পারেন কর্ম্মের বিজ্ঞান অংশ আলোচনা করিয়া তাহাকে সেই পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি সকলকে উপদেশ দিয়াছেন যেন কেহই আপন আপন কর্ম্মক্ষেত্র ত্যাগ না করেন।

গ্রন্থের শেষে গ্রন্থকার শক্তি স্তরের বিকাশের কথা বলিয়াছেন এবং মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থকার বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিয়াছেন, যাহাতে কর্ম্মিগণ সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিয়া কর্ম্ম-তত্ত্ব বুঝিতে পারেন।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

নীলকণ্ঠ

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

নীলকণ্ঠ আমি—
আকণ্ঠ করেছি পান তীব্র হলাহল,
দেবতার অপেয় গরল ;
নিঃশেষে মন্থন করি ক্ষীর পারাবার
ধরিত্রীর মর্ম্মস্থল হ'তে যে বিষ-উদ্গার
উঠিয়াছে রাত্রিদিন পীযূষ পিয়াসী দেবলোকে
ঝলকে ঝলকে—
অমৃতের সে দক্ষিণা রাশি
সঞ্চিত হয়েছে আজি মোর কণ্ঠে আসি।
মৃত্যুঞ্জয়ী দেববালা সবে
সে সুধা-উৎসবে
বাসুকির শেষ অর্ঘ্যখানি
মোর পাত্রে ঢালিয়াছে আনি।
আমি চাহি নাই সুধা, অমরত্ব করি নি কামনা ;
পৃথিবীর দ্বারপ্রান্তে বসি' ছিনু অন্যমনা
শ্মশানের চিতাভস্ম ল'য়ে,
ডমরুর তালে র'য়ে র'য়ে
গাহিয়া ববোম্ বোম্—উন্মাদের লয়হীন গান ;
অট্টহাস্যে জাগাইয়া নিঃশব্দ শ্মশান।
জীবনের সুধাভাণ্ড মোর তরে শূন্য চিরকাল ;
পঙ্কিল জঞ্জাল—
যত ক্লেদ, যত কিছু গ্লানি,
জানি—
সিঞ্চিত হয়েছে অলক্ষিতে
দেবতার অস্পষ্ট ইঙ্গিতে
দীন এই মর্ত্ত্যবাসী তরে,
আসমুদ্র কৈলাস-শিখরে।
দেবতার প্রয়োজনে লাগিবে না যাহা,
তাহা—
অঞ্জলি ভরিয়া তুমি করিয়াছ দান—
ওগো ভগবান!
মানুষের লাগি ;
যুগে যুগে যে মানুষ লইয়াছে মাগি
ভিক্ষা সম তোমার আশীষ,
কণ্ঠে তারি দিয়াছ ঢালিয়া দেবতার অপেয় সে-বিষ।
আমি শিব, মানুষের অমূর্ত্ত প্রতীক,
সে গরল কণ্ঠে ধরি মানুষেরে করেছি নির্ভীক।

আমি সৃষ্টিছাড়া—
সৃষ্টির দুরন্ত নেশা কাঁদে আত্মহারা
প্রতি লোমকূপে মোর সীমাহীন কাল,
মৃত্যুক্লিন্ন ধরণীর ধূসর মরুতে মহাকাল
শ্মশানে রচিয়া স্বর্গ মৃত্তিকার প্রাণহীন বুকে—
স্মিত পদ্মমুখে,
গাহিয়া চলেছি মর্ত্ত্যে অমৃতের গান ;
ফেনিল মরণ-নীল বিষ করি পান।
অঙ্গে অঙ্গে কেঁদে মরে যৌবনের মত্ত মাদকতা,
তারি ব্যাকুলতা
দিকে দিকে হানে করাঘাত ;
বিলাসিনী প্রকৃতি তোমার ভিক্ষু সম বাড়াইয়া হাত
মাগে সৃষ্টি মোর পাশে ;
তবুও সন্ত্রাসে—
ভীরু অনঙ্গের অঙ্গ থর থর কাঁপে মোর ডরে,
তোমারই সৃষ্টির মাঝে সৃষ্টির দেবতা পুড়ে মরে।
আমি শিব, অশিবেরে করিয়াছি জয় ;
আমারই ইঙ্গিতে বিশ্ব আপনারে করি নিত্য ক্ষয়
মিটায় তোমার লিপ্সা ওগো ভগবান,
পীযূষ-বঞ্চিত জীব হাস্যমুখে করে প্রাণ দান,
প্রাণের সৃজন লাগি,
যারা ভিক্ষা মাগি

বিধাতার কাছে পায় অপেয় গরল ;
রুদ্ধ করে শ্বাসবায়ু তীব্র হলাহল।

আমি মৃত্যুঞ্জয়,
রোগ নাই, শোক নাই, নাই মোর ভয়।
সর্ব্বত্যাগী উমানাথ মৌলী কুলহীন,
উজ্জ্বল কর্পূরঘন অঙ্গে মোর সর্ব্বলোক হয়েছে বিলীন ;
স্তিমিত নয়ন-প্রান্তে জাগরণে ঘুমন্ত স্বপন,
বামাচারী পিশাচ শরণ !
তবু মোর তরে
কাঞ্চন বরণা গৌরী মহাব্রত উদ্‌যাপন করে,
সে কঠোর তপস্যায় হিমগিরি হিমাচল হয় বিচলিত।
পতিতপাবনী গঙ্গা হয়ে বিগলিত
নেমে আসে ঝর ঝর ধারে,
স্বর্গ হ'তে পৃথিবীর দ্বারে—
প্রস্তর-আঘাত ভয়ে বেড়ি মোর জীর্ণ জটাজাল,
ভগীরথ তপঃতুষ্ট নীলকণ্ঠ আমি মহাকাল।
কালের প্রবাহ-স্রোত বাধা-বন্ধ টুটি
চলিয়াছে ছুটি
অনাদি সে কোন্ কাল হ'তে,
চূর্ণ করি তারি খরস্রোতে
বিধাতার ক্রীড়নক ভঙ্গুর সৃষ্টির ভেলাখানি ;
আমি শূলপাণি,
মোর পদপ্রান্তে আসি নিয়তিও জানায় প্রণাম ;
শান্ত সমাহিত, তবু বিশ্বে মোর মহারুদ্র নাম।

আমি যে শঙ্কর !
আত্মভোলা ভোলানাথ, তবু ভয়ঙ্কর।
আমারে ঘিরিয়া নাচে তাণ্ডব ভৈরব,
অপার্থিব মরলোকে যা কিছু বৈভব
সে নৃত্যের তালে তালে দেয় করতালি
স্পর্শে মোর লজ্জানতা হয় মহাকালী।
উৎপীড়িত দেবতা অমর
তোমার পরশে যারা লভিয়াছে মৃত্যুহীন বর,
প্রাণভয়ে তাহারাও মাগে ভিক্ষা ওগো ভগবান !
মানুষের কাছে ; যারে তুমি করেছিলে দান
বিষপাত্র—দেবতার অপেয় গরল,
অগ্নিময় তীব্র হলাহল।

আমি নটরাজ,
প্রলয় নাচন ছন্দে আপনার মনে
নাচি যবে মহা ঝঞ্ঝাস্বনে,
পদতলে পৃথ্বী ওঠে দুলি ;
মরণের সিংহদ্বার খুলি
উচ্ছ্বসিত প্রাণস্রোত বয়ে যায় লোকে-লোকান্তরে,
শঙ্কিত অন্তরে—
চেয়ে থাকে দেবতার দল ;
শুভ্র অশ্রুজল
ঘনাইয়া আসে ধীরে ধীরে
শোকাকুলা ধরিত্রীর আঁখিপদ্ম ঘিরে ;
কেঁপে ওঠে হিমাদ্রি পাষাণ,
শঙ্কাহীন তুমি ভগবান !
তুমি শুধু চেয়ে থাকো মানুষের পানে,
করুণার দানে—
কণ্ঠে যার দিয়াছ ঢালিয়া দেবতার অপেয় গরল,
তীব্র হলাহল।
আমি শিব, মানুষের অমূর্ত্ত প্রতীক,
সে গরল কণ্ঠে ধরি মানুষেরে করেছি নির্ভীক।
আমি নিঃস্ব ভিখারী ভৈরব পশুপতি,
বিশ্ব মোরে ভালবাসে, তাই জানায় প্রণতি।

ঔষধ প্রয়োগে অতিকায় ফুল ও ফল উৎপাদন

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিধাতার সঙ্গে পাল্লা দিয়া যিনি নূতন সৃষ্টি প্রকরণে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, নারিকেলের মত অপূর্ব্ব ফল নাকি সেই অদ্ভুতকর্ম্মা বিশ্বামিত্রেরই সৃষ্টি। কি উপায়ে তিনি এ অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয় না। তার পর শোনা যায়, বেণরাজার কথা। ঘোড়া, গাধার সংযোগে খচ্চর উৎপন্ন হইতে দেখিয়া তিনি নাকি মনুষ্যসমাজে বর্ণসঙ্কর উৎপাদনে উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী যুগের শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয় সমাজবিজ্ঞানের দিক দিয়া এবিষয়ে অনেকটা অগ্রসর হইলেও বংশানুক্রমের মূল তত্ত্বানুসন্ধানে কেহই আগ্রহান্বিত হন নাই। যাহা হউক, পুরাকালের কথা বাদ দিয়া, সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের প্রকৃত রহস্য অবগত হইবার জন্য বর্ত্তমান কালের মনীষিগণের ধারাবাহিক অক্লান্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও তাহাতে অসাধারণ সাফল্যের বিষয় চিন্তা করিলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া থাকিতে হয়। ডারুইন, লামার্ক, ডি-ভ্রিস্, মেণ্ডেল প্রমুখ মনীষিগণের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে সৃষ্টি-বৈচিত্র্য ও বংশানুক্রম সম্বন্ধে প্রকৃতির অনেক গুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে। তবে এই সকল মনীষীর কর্ম্মপ্রচেষ্টা মুখ্যতঃ অভিনব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্ত্তীকালে কোন কোন বিষয়ে এই নবলব্ধ জ্ঞান ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইলেও তাহা কতকটা গতানুগতিকতাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ উদ্ভাবনী শক্তি সাহায্যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইলে তাহার যে কত দূর উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে ব্যবহারিক বিজ্ঞানে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ম্যাক্সওয়েলের তড়িত্তরঙ্গের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। হার্টজ্ কর্ত্তৃক ম্যাক্সওয়েল তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইবার পর সর্ব্বশেষে মার্কণি যখন অপূর্ব্ব সফলতার সহিত তাহা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইলেন, সমগ্র জগৎ তখন বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া গেল। সেইরূপ, উদ্ভিদ ও জীববিষয়ক অজ্ঞাত রহস্যসমূহ অধিগত হইবার পর উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এমন এক ব্যক্তি আবির্ভূত হইলেন, যিনি তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি-নৈপুণ্যের ফলে "উদ্ভিদের যাদুকর" রূপে চিরকাল সকলের চিত্তপটে জাগরূক থাকিবেন। এস্থলে তাঁহার অদ্ভুত কর্ম্মদক্ষতার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

এই উদ্ভিদ যাদুকরের নাম লুথার বার্বাঙ্ক। ছেলেবেলা হইতেই উদ্ভিদের উপর বার্বাঙ্কের বিশেষ একটা আকর্ষণ লক্ষিত হইত। পাঠ্যাবস্থায় সহপাঠীরা যখন খেলাধুলায় ব্যাপৃত হইত তিনি তখন উদ্ভিদ তথ্যানুসন্ধানে মনোনিবেশ করিতেন। পাঠ্যাবস্থা অতিক্রম করিবার পর কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াও অবসর পাইলেই তিনি গাছপালা লইয়া সময় কাটাইতেন। হঠাৎ এক দিন নজরে পড়িল—একটা গোল-আলুর গাছে ফল ধরিয়াছে। ফলটি পরিপক্ক হইলে তিনি তাহা যত্ন করিয়া রাখিয়া দিলেন। পর বৎসর সেই বীজ রোপণ করিয়া উৎকৃষ্টতর ফসল উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলেন। সেই সময়ে রোগবীজাণুর ও অন্যান্য কারণে উৎকৃষ্ট নমুনার গোল আলু উৎপাদনে নানা প্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইতেছিল। অবশেষে প্রকৃত প্রস্তাবে গোল আলুর দুর্ভিক্ষই দেখা দিল। সেই সময়ে বার্বাঙ্ক তাঁহার নূতন আলুর বীজ ১৫০ ডলার মূল্যে বিক্রয় করিয়া দেন। সেই বীজ হইতে ক্রমশঃ উৎকৃষ্টতর গোল আলুর চাষ আমেরিকার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। তাহার পরে তিনি অপূর্ব্ব উদ্ভাবনী শক্তিবলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এক জাতীয় গোল আলু উৎপাদন করেন। ইহাই বর্ত্তমানে 'বার্বাঙ্ক-পোটেটো' নামে সর্ব্বত্র পরিচিত। ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তিনি কার্য্যে ইস্তফা দিয়া কালিফোর্ণিয়ায় গমন করেন। সেখানে কতকটা জমি সংগ্রহ করিয়া নানা প্রকার গাছ-গাছড়া লইয়া পরীক্ষা

কলচিচিন-মিশ্রিত জলে চারাগাছটিকে ডুবাইয়া পরে রোপণ করা হইবে।

আরম্ভ করেন। এখানেই তিনি গাছের কলম উৎপাদনের অভিনব ব্যবস্থা করিয়া যথেষ্ট সুনাম ও অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। আর্থিক অবস্থা পরিবর্ত্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নূতন ধরণের ফল ও ফুল উৎপাদনে মনোনিবেশ করেন। সৃষ্টি-বৈচিত্র্য ও বংশানুক্রম সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিয়া তিনি কৃত্রিম উপায়ে পরাগনিষেক-প্রক্রিয়ার সাহায্যে উদ্ভিদের বিবিধ বর্ণসঙ্কর উৎপাদনে কৃতিকার্য্য হন। সমগোত্রীয় এক রকম ফুলের সহিত অন্য রকম ফুলের পরাগ সঙ্গম ঘটাইয়া তিনি এমন কতকগুলি ফুল ও ফল উৎপাদন করিলেন, পৃথিবীতে পূর্ব্বে যাহার কোন অস্তিত্বই ছিল না। আমরা যাহাকে "প্রকৃতির খেয়াল" বলি উদ্ভিদ-জগতে সেরূপ দৃষ্টান্ত প্রায়ই নজরে পড়ে। "প্রকৃতির খেয়ালে"র এই অদ্ভুত নমুনা হইতে নির্ব্বাচন-কৌশলে বার্বাঙ্ক এমন সকল গাছপালা, ফলমূল উৎপাদন করিলেন যাহারা আজও বংশানুক্রমে একই ভাবে উৎপাদিত হইতেছে।

তাঁহার কৃতকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ বিখ্যাত কার্ণেগী ইনষ্টিটিউট ১৯০৫ সাল হইতে পরীক্ষা কার্য্যের সহায়তার জন্য তাঁহাকে বার্ষিক একটা মোটা টাকার বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। নিরুদ্বেগে তখন তিনি পরীক্ষাকার্য্য চালাইতে থাকেন। সেকালের বিশ্বামিত্র একমাত্র নারিকেল ফলই সৃষ্টি করিয়াছিলেন আর এই কলির বিশ্বামিত্র প্রায় লক্ষাধিক নূতন ফলমূল সৃষ্টি করিয়া বিধাতারও বোধ হয় তাক্ লাগাইয়া দিয়াছেন। ৩০,০০০ বিভিন্ন জাতীয় কুল, ৬০,০০০ রকমারি পিচ ও অমৃতফল, ৫০০০ রকমারি বাদাম, ৭০ রকমের বিভিন্ন জাতীয় আপেল ও ন্যাসপাতি এবং হাজার হাজার সুদৃশ্য ফুল ও গাছপালা সৃষ্টি করিয়া তিনি খোদার উপর খোদকারী করিয়াছেন। এক সময়ে আমেরিকায় মনসা-গাছ, বিষাক্ত কাঁটার জন্য মানুষ বা জীবজন্তুর কোন উপকারে লাগা দূরে থাক, কেবলমাত্র একটা বিপজ্জনক পদার্থ বলিয়া বিবেচিত হইত। নির্ব্বাচন প্রক্রিয়ায় বার্বাঙ্ক তাহা হইতে এমন এক প্রকার মনসা গাছ উৎপাদন করিলেন যাহার গায়ে একটি মাত্রও কাঁটার চিহ্ন নাই। এই কাঁটাশূন্য মনসা-

হাত-পাম্পের সাহায্যে রঞ্জন ফুলের গাছে কলচিচিন প্রয়োগ করা হইতেছে।
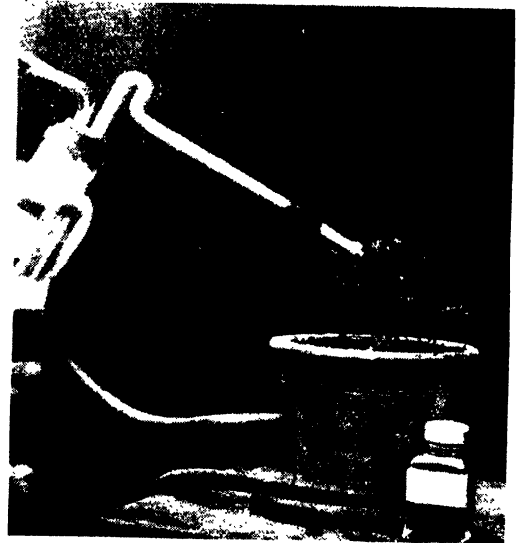
গাছ এখন গৃহপালিত পশুদের খাদ্যরূপে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। কুল ও বাদাম জাতীয় গাছের ফুলে

ট্রপিওলামের পাতায় জলমিশ্রিত কলচিচিন প্রয়োগ করা হইতেছে।

কৃত্রিম উপায়ে পরাগনিষেক করিয়া—কুলও নয় বাদামও নয় অথচ উভয় জাতীয় ফল অপেক্ষা অধিকতর সুস্বাদু, আঠীশূন্য বৃহদাকৃতির এক প্রকার ফল উৎপাদন করিয়া তাহার নাম দিয়াছেন--Plumcot অর্থাৎ Plum+Apricot=Plumcot. এইরূপ আরও যে কত কিছু অভিনব পদার্থ উৎপাদন করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

কলম বাঁধিবার অভিনব পন্থা, নির্ব্বাচন কৌশল ও কৃত্রিম উপায়ে পরাগনিষেক প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সাহায্যে বার্বাঙ্ক তাঁহার অভিনব সৃষ্টিকার্য্যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন; কিন্তু বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকেরা বৃক্ষদেহে ভেষজ প্রয়োগ করিয়া আরও সহজ উপায়ে ফুল ফলের আকৃতি, প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বার্বাঙ্কের অভিনব সৃষ্টি পূর্ব্বাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহের দিক হইতে কোন নূতন রহস্য নহে। ইহা পূর্ব্বাবিষ্কৃত তথ্যসমূহের পরিপূরক মাত্র। বার্বাঙ্ক অপূর্ব্ব সাফল্যের সহিত বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া তাঁহার কার্য্যকুশলতায় জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন; কিন্তু সামান্য মাত্রায় ভেষজ প্রয়োগে কি উপায়ে বৃক্ষদেহে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়া থাকে, তাহা বৈজ্ঞানিকদের নিকট এক জটিল রহস্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে।

যাঁহারা গাছপালা উৎপাদনে ব্যাপৃত আছেন তাঁহারা জানেন, সাধারণ গাছপালা, লতাপাতা, ফুল-ফলের উৎকর্ষ সাধন করিতে কত ধৈর্য্য, সতর্কতা ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়। হয়ত একটা জমিতে কতকগুলি ফুলের গাছ লাগান হইয়াছে। গাছগুলি মোটের উপর কমবেশী সকলেই প্রায় একই রকম। কিছু দিন পরে হয়ত অতগুলি গাছের মধ্যে একটা গাছকে অসম্ভবরূপে বড় হইতে দেখা গেল। তার ডাঁটা, পাতা, ফুল, ফল সকলই প্রায় দ্বিগুণ বড় হইল। আণুবীক্ষণিক পরীক্ষাতেই প্রমাণিত হইবে, তাহাদের আভ্যন্তরীণ কোষগুলিও দ্বিগুণিত হইয়াছে। কাজেই আভ্যন্তরীণ জৈবসূত্রের বৈশিষ্ট্য উৎপাদক পদার্থগুলির শক্তিও বর্দ্ধিত হইবার কথা। উদ্ভিদবিদেরা আকস্মিক

কলচিচিনের প্রভাবে বাম দিকের সিঙ্গল্ ডালিয়ার গাছ হইতে ডান দিকের বৃহদাকৃতি ডালিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে।

উদ্গত এইরূপ বৃক্ষ সংগ্রহ করিয়া, তাহার বীজ হইতে পুনরায় বৃক্ষ উৎপাদন করিয়া, বাছাই করিতে করিতে ক্রমশঃ উৎকৃষ্টতর নমুনা আহরণের ব্যবস্থা করেন। উদ্ভিদ-

তত্ত্ব সম্পর্কিত নিয়মানুযায়ী বাঁধা-প্রদর্শিত উপায় অনুসরণই একার্য্যে সাফল্য লাভের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু তাহা খুবই দক্ষতা ও সময় সাপেক্ষ। কাজেই প্রায় বছর চারেক পূর্ব্বে যখন এ কথা প্রকাশিত হইল যে, কলচিচিন নামে এক প্রকার বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগে বৃক্ষদেহে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় তখন উদ্ভিদ-উৎপাদকদিগের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গেল। কার্ণেগী ইনষ্টিটিউটের (ওয়াশিংটন) উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ডাঃ ব্লেকস্লি কতকগুলি পরীক্ষার ফলে দেখিতে পান—অতি সামান্য মাত্রায় কলচিচিন নামক ভেষজ প্রয়োগ করিলে উদ্ভিদের মৌলিক জৈব উপাদানের প্রকৃতির অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। উদ্ভিদ ও জীবকোষের অভ্যন্তরে এক প্রকার আণুবীক্ষণিক সূক্ষ্ম সূত্রবৎ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রী পুরুষ ভেদে এই সূত্র সংখ্যার নির্দ্দিষ্ট তারতম্য লক্ষিত হয়। এই অদৃশ্য সূত্রবৎ পদার্থগুলি ক্রোমোসোম্‌স্ বা জৈবসূত্র নামে পরিচিত। ক্রোমোসোম্‌স্-এর অভ্যন্তরস্থ জিন্‌স্ এর মধ্যেই পিতামাতার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের বীজ অন্তর্নিহিত থাকে। এই ক্রোমোসোম্‌স্ তথা জিন্‌সের সাহায্যেই পিতামাতার বৈশিষ্ট্য সন্তানে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কল্‌চিচিন বাহ্যিক ভাবে প্রযুক্ত হইলেও ইহা ধীরে ধীরে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ক্রমোসোম্‌স্‌গুলিকে এমন ভাবে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয় যে তাহাদের আর পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইবার উপায় থাকে না এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষদেহের সঞ্চিত তেজ যেন আত্মপ্রকাশের নিমিত্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। তাহার ফলে উদ্ভিদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসম্ভব রূপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ফুল-ফলগুলিও বৃহদাকৃতি পরিগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। মোটের উপর, কলচিচিন উদ্ভিদ-শরীরে এক প্রকার উত্তেজক পদার্থ রূপে ক্রিয়া করে মাত্র। নচেৎ ইহাতে বৃক্ষদেহের পরিপুষ্টির জন্য কোন সার বস্তুও নাই অথবা ইহা বৃদ্ধির পরিপোষক কোন উপাদানও যোগায় না।

কলচিচিন ঈষৎ হরিদ্রাভ এক প্রকার গুঁড়ার মত পদার্থ। বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই ইহা ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। অতি সতর্কতার সহিত কলচিচিন ব্যবহার করিতে হয় কারণ ইহা সাংঘাতিক বিষ। শরীরের কোন স্থানে অতি সামান্য মাত্রায় লাগিলেই তৎক্ষণাৎ ধুইয়া না ফেলিলে ভয়ানক যন্ত্রণা উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে বিপজ্জনক অবস্থা সংঘটিত হওয়াও আশ্চর্য্য নহে। আঠালো পদার্থে মিশ্রিত অথবা জলমিশ্রিত কল-

কলচিচিনের প্রভাবে সাদা এষ্টার অতিকায় এষ্টারে পরিণত হইয়াছে।

চিচিন, চারা গাছ, বীজ অথবা গাছের বাড়ন্ত স্থানে প্রয়োগ করিলে দেখা যায়—যে গাছ লম্বায় সাধারণতঃ এক হাতের বেশী উঁচু হইত না, তাহা বাড়িয়াছে প্রায় তিন হাত। যে ফুল সাধারণতঃ এক ইঞ্চি চওড়া হইত, সে ফুল চওড়ায় হইয়া যায় পাঁচ ইঞ্চিরও উপর। এক পাপড়িওয়ালা ফুল কলচিচিনের প্রভাবে অসংখ্য পাঁপড়ি সমন্বিত হইয়া বৃহদাকার ধারণ করে।

অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন—একই জাতীয় গাছ বিভিন্ন পরিবেষ্টনীর মধ্যে বর্দ্ধিত হইলে পরস্পরের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য আত্মপ্রকাশ করে। জীব ও উদ্ভিদ জগতে এইরূপ পার্থক্য অহরহই ঘটিতেছে। কিন্তু এই পার্থক্য অস্থায়ী। কারণ পরিবর্ত্তন পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরই নির্ভরশীল। বিশেষতঃ পার্থক্যের বৈশিষ্ট্য বংশধরদের মধ্যে সংক্রামিত হয় না। কিন্তু ইহাদের

মধ্যেই মাঝে মাঝে ক্বচিৎ এমন দুই-একটা পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় যে, তাহা সম্পূর্ণ স্থায়ী ভাবেই আত্মপ্রকাশ করে এবং সেই বৈশিষ্ট্য সন্তানসন্ততিদের উপর সংক্রামিত হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে তাহার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ
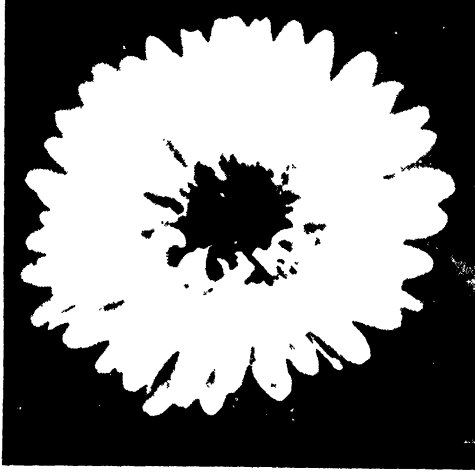
বেগুনী এষ্টার কলচিচিন প্রয়োগে বৃহদাকৃতি ধারণ করিয়াছে।

ঘটিতে পারে কিন্তু মূল বৈশিষ্ট্যটি অক্ষুণ্ণই রহিয়া যায়। ইহাকেই বলে 'মিউট্যাণ্ট'। এই 'মিউট্যাণ্ট' হইতেই পৃথিবীতে নূতন নূতন গাছপালার আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। কল্‌চিচিন প্রয়োগে উদ্ভিদদেহে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, প্রথমে তাহাকে অস্থায়ী পরিবর্ত্তন বলিয়া মনে হইয়াছিল। কারণ যাহাকে ঔষধ প্রয়োগ করা হইবে কেবল তাহারই পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। তাছাড়া দেখা যায় অর্জ্জিত কোন প্রকার বৈশিষ্ট্য সন্তানসন্ততিতে সঞ্চারিত হয় না। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, এই নবলব্ধ বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমেই সঞ্চারিত হইতেছে। কলচিচিন যে উদ্ভিদের মৌলিক জৈবসূত্রের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে এ কথা কাহারও মনে হয় নাই। উদ্ভিদ-বিদেরা কলচিচিনের এই অদ্ভুত ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া নূতন নূতন ফুল-ফল উৎপাদনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য হইল—কলচিচিন প্রয়োগে ফুল-ফলের নবলব্ধ বৈশিষ্ট্যকে বংশানুপরম্পরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা। কি উপায়ে তাহা করা যাইতে পারে তাহার একটু আভাস দিতেছি। একটা ফুলের গাছে কোমল অবস্থায় ৪৪% মাত্রার জল মিশ্রিত কলচিচিন প্রয়োগ করার ফলে যে ফুল উৎপাদন করিবে তাহার আকার অসম্ভব রূপে বাড়িয়া যাইবে। তাহার বর্ণ ও গন্ধের পরিবর্ত্তন ঘটিতেও পারে। কোমল তুলি বা পালকের সাহায্যে তাহার রেণু সংগ্রহ করিয়া ঐ জাতীয় সাধারণ কতকগুলি ফুলের সঙ্গে তাহার পরাগ নিষেক করিতে হইবে। তাহাদের বীজ সংগ্রহ করিয়া আলাদা আলাদা ভাবে গাছ উৎপাদন করিবার পর ফুল ফুটিলেই বুঝা যাইবে, পূর্ব্বোক্ত কলচিচিন প্রভাবিত অতিকায় ফুলটির ক্রোমোসোম্‌সের সঙ্গে সাধারণ ফুলগুলির কোন কোনওটির ক্রোমোসোম্‌সের মিল হওয়ার ফলে অতিকায় বর্ণসঙ্কর উৎপাদিত হইয়াছে। কিন্তু সবগুলি ফুল অতিকায় নয়, হয়তো একগাছে দশটি ফুলের মধ্যে তিনটি অতিকায় আর বাকীগুলি সাধারণ ও মধ্যম। সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফুলগুলির বীজ রাখিয়া অবশিষ্টগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে। বড় ফুলগুলির বীজ হইতে পুনরায় গাছ উৎপাদন করিয়া উপরোক্ত নির্ব্বাচন-প্রক্রিয়ায় স্থায়ীগুণ বিশিষ্ট সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফুল উৎপাদন করা যাইতে পারে।

উদ্ভিদ্‌বেত্তা ডেভিড্‌ বার্পি গাঁদাফুলের গাছে কলচিচিন প্রয়োগ করিয়া অতিকায় গাঁদাফুলের সৃষ্টি করিয়াছেন। গাছগুলি বংশানুক্রমে নূতন ধরণের অতিকায় ফুল উৎপাদন করিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। তিনি ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন—শীঘ্রই আরও উৎকৃষ্টতর রকমারি ফুলের নমুনা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবেন। কলচিচিন প্রয়োগে অতিকায় ফুল উৎপাদন করিয়া তিনি প্রচলিত সাধারণ ফুলের সঙ্গে কৃত্রিম উপায়ে পরাগ নিষেক-প্রক্রিয়ায় তাহাদিগকে স্থায়ী বংশানুক্রমিক করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ফেরি-মোর্স নামক বিখ্যাত উদ্ভিদ-উৎপাদক প্রতিষ্ঠান কলচিচিন প্রয়োগে জিনিয়া, গাঁদা প্রভৃতি ফুল হইতে কয়েক জাতীয় অতিকায় ফুল উৎপাদন করিয়া ব্যাপকভাবে তাহার চাষ করিতেছেন। 'বোজার' নামে বৃক্ষ উৎপাদক প্রতিষ্ঠানও কলচিচিনের সাহায্যে স্বাদে, গন্ধে লোভনীয়, নূতন ধরণের অনেকগুলি অতিকায় ফল ও ফুল উৎপাদন করিয়াছেন। শীঘ্রই

নাকি তাঁহারা আরও অনেক অতিকায় গাছপালা, ফুলফল বাজারে বাহির করিবেন। মোটের উপর, তাঁহারা কেবল পরীক্ষামূলক ভাবে এ ব্যাপারে সাফল্য অর্জ্জন করেন নাই, প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে ইহার ব্যাপক প্রয়োগ করিতেছেন। ইউনাইটেড ষ্টেটসের কৃষিগবেষণাগারের বৈজ্ঞানিকেরা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কলচিচিন প্রয়োগে বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করিয়া তামাক, তুলা, রবিশস্য ও বিভিন্ন জাতীয় গাছপালা হইতে অল্পায়াসে প্রচুর পরিমাণ ফসল উৎপন্ন করা সম্ভব হইবে। বিভিন্ন প্রদেশের পরীক্ষাগারে কলচিচিন প্রয়োগে উৎকৃষ্টতর ফল-মূল উৎপাদনের নিমিত্ত অক্লান্ত চেষ্টা চলিতেছে। নিউইয়র্কের কৃষিগবেষণাগারে কলচিচিন প্রয়োগে অতিকায় ফলমূল উৎপাদনের চেষ্টা তো চলিতেছেই, অধিকন্তু ফল ফুলের রং, স্বাদ, গন্ধ পরিবর্ত্তনের জন্যও বিবিধ পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। কলচিচিন প্রয়োগবিধিও অতি সাধারণ। জলমিশ্রিত কলচিচিন হাত-পাম্পের সাহায্যে উদ্ভিদের বাড়ন্ত স্থানে ছিটাইয়া দেওয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রয়োগের জন্য হোস্ পাইপেরও সাহায্য লওয়া হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গাছকে কলচিচিন মিশ্রিত জলে ডুবাইয়া পুনরায় রোপণ করিলে অধিকতর সুফল লাভের সম্ভাবনা। মোটের উপর এই ঔষধ প্রয়োগে অতিকায় গাঁদা, জিনিয়া, কেলেণ্ডুলা, এষ্টার, কসমস্, পিটুনিয়া, স্ন্যাপড্রাগণ, ডালিয়া প্রভৃতি ফুলগুলি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হইতেছে। তাছাড়া কেবল পরীক্ষামূলক ভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছে এরূপ অনেক কিছুরই নাম করা যাইতে পারে। ডালিয়া সাধারণতঃ চার-পাঁচ ইঞ্চি চওড়া হইয়া থাকে—কলচিচিনের প্রভাবে আজকাল ১০ ইঞ্চি চওড়া ডালিয়া ফুটিতেছে এবং গাছ গুলিও তদনুরূপ বৃহদাকৃতি ধারণ করিয়াছে। উচু মই ছাড়া তাহা হইতে ফুল সংগ্রহ করা অসম্ভব। এক ইঞ্চি কি দেড় ইঞ্চি এষ্টার এখন তিন হইতে ছয় ইঞ্চি চওড়া হইয়াছে। বৃহদাকৃতির দরুন গাছগুলিকেও সহজে চিনিবার উপায় নাই।

কলচিচিনের এই অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় অবগত হইবার পূর্ব্বে কিছুকাল হইতেই বৃক্ষদেহে অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগে অদ্ভুত ফল দেখা যাইতেছিল। এই সকল রাসায়নিক পদার্থ লইয়া এখনও অক্লান্ত গবেষণা চলিতেছে। কোন কোন রাসায়নিক পদার্থ উদ্ভিদকে অতিদ্রুত বাড়াইয়া তোলে আবার কেহ কেহ তাহাদের বৃদ্ধি অতিমাত্রায় কামাইয়া দেয়। তবে এই জাতীয়

অতি অল্পমাত্রায় কৃত্রিম হরমোন প্রয়োগে আমগাছের ডাল হইতে শিকড় গজাইয়াছে।

রাসায়নিক পদার্থগুলির প্রধানতঃ একটি ক্ষমতা দেখা যায় যে, ইহারা উদ্ভিদের কর্ত্তিতস্থান হইতে দ্রুতগতিতে শিকড় উৎপাদন করিয়া থাকে।

মনুষ্যশরীরে এণ্ডোক্রাইন গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হরমোন নামে এক প্রকার অদ্ভুত পদার্থের কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। বৃক্ষদেহেও বৃদ্ধি উত্তেজক এক প্রকার পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহাকে উদ্ভিদ-হরমোন নামে অভিহিত করা হয়। প্রায় নয়-দশ বৎসর পূর্ব্বে ইহা উদ্ভিদদেহ হইতে নিষ্কাশন করিয়া দানাদার পদার্থরূপে পরিণত করা হয়। এই সফলতা লাভের পর

হইতেই উদ্ভিদ-হরমোনের অনুরূপ কোন পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা যায় কিনা তাহার জন্য রাসায়নিকেরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তাহার ফলেই ইনডোল্ য়্যাসেটিক য়্যাসিড্, ইনডোল্ ব্যুটিরিক য়্যাসিড্, ন্যাপথালিন্ য়্যাসেটিক য়্যাসিড্ ও অন্যান্য কতকগুলি পদার্থের সন্ধান

একই সময়ে রোপিত সমজাতীয় দুইটি "জিপ্‌সি ফ্লাওয়ারে"র গাছ। বাম দিকের গাছটিতে রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

পাওয়া যায়। বৃক্ষদেহে ইহাদের প্রক্রিয়া স্বাভাবিক হরমোনের অনুরূপ। এই কৃত্রিম হরমোনসমূহের একটা প্রধান কার্য্যকারিতা এই যে, ইহার প্রয়োগে উদ্ভিদের কর্ত্তিত স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে শিকড় উদ্গম হইয়া থাকে। কাজেই অন্যত্র রোপণ করিলে বৃদ্ধির আধিক্যবশতঃ কর্ত্তিত অংশ অতি সত্বর পত্রপল্লবে সুশোভিত হইয়া ওঠে। এই রাসায়নিক পদার্থগুলিকেও অতি অল্প মাত্রায় প্রচুর জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অথবা আঠালো পদার্থ সহযোগে বৃক্ষের কর্ত্তিত স্থানে প্রয়োগ করা হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, এক আউন্স রাসায়নিক হরমোন ১০,০০০,০০০,০০০ নূতন শিকড় উৎপাদনে সক্ষম। যখনই দেখা গেল কৃত্রিম হরমোন অসম্ভব দ্রুতগতিতে শিকড় উৎপাদনে সক্ষম তখন হইতেই উদ্ভিদ উৎপাদকেরা প্রচুর পরিমাণে ইহার ব্যবহার সুরু করিয়াছেন। এখন তো প্রায় সর্ব্বত্রই উদ্ভিদ-হরমোন ব্যবহার একটা রেওয়াজ হইয়া গিয়াছে। ফলের ভারে যাহাতে ডাল ভাঙ্গিয়া না পড়ে এজন্য এক জাতীয় হরমোন প্রয়োগে গাছকে শক্ত করিয়া তোলা হইতেছে। কোন কোন কৃত্রিম হরমোন প্রয়োগে গাছের অজস্র ডালপালা গজাইতেছে। কোন কোন স্থানে অতিরিক্ত তুষারপাতে গাছের ফল অকালে ঝরিয়া পড়ে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য হরমোন প্রয়োগে এমন এক জাতীয় গাছ উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে যাহা অনেক বিলম্বে ফলবতী হইয়া থাকে। কাজেই তুষারপাতে ফল নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। কৃত্রিম হরমোন প্রয়োগে পরীক্ষামূলক ভাবে বীজশূন্য লঙ্কামরিচ, শশা, বেগুন, তরমুজ আরও অন্যান্য অনেক ফল উৎপাদন করা হইয়াছে। পরাগ নিষিক্ত না হইলে কোন ফলই পূর্ণাঙ্গ পরিণতি লাভ করিতে পারে না। পরাগ বা ফুল-রেণুর পরিবর্ত্তে রাসায়নিক হরমোন প্রয়োগ করিয়া উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজ্ঞেরা বীজশূন্য ফল উৎপাদনে সফলতা অর্জ্জন করিয়াছেন। আমাদের দেশেও কোন কোন স্থানে বৈজ্ঞানিকেরা এই কৃত্রিম হরমোনের পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন। আমগাছে সাধারণ গুলকলম তৈয়ারী করা যায় না। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে উদ্ভিদতাত্ত্বিক মিঃ দত্ত ও মিঃ ঠাকুরতা কৃত্রিম হরমোন প্রয়োগে আমগাছেও গুলকলম উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা হরমোন প্রয়োগে বীজশূন্য ফলোৎপাদনের চেষ্টাও করিতেছেন। উদ্ভিদের বৃদ্ধি দ্রুততর করিবার জন্য সম্প্রতি ভিটামিন বি-১ এর আশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা জানা গিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে এই সম্বন্ধে আরও অদ্ভুত কথা শুনিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

বাংলার বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি ও অর্থব্যবস্থা

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

আমাদের দেশের শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে অন্য দেশের শিক্ষা-পদ্ধতির তুলনা করিলে দেখা যায় এদেশের শিক্ষা-পদ্ধতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। দেখা যায় প্রায় প্রত্যেক সভ্য দেশেই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সেই বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যয়ভার সরকারী তহবিল হইতে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মত যে আমাদের দেশে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে যে-সম্বন্ধ বর্ত্তমান, ঠিক সে সম্বন্ধ প্রায় অন্য কোনও দেশেই নাই। আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে উচ্চতর শিক্ষার যোগ এক দিক্ দিয়া অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং আর এক দিক্ দিয়া অত্যন্ত কম। বহু পূর্ব্বে স্যাডলার কমিশন এবং তাহার পর আরও অন্যান্য চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বলিয়াছিলেন আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার নিজস্ব কোনও উদ্দেশ্য নাই, তাহার একমাত্র লক্ষ্য ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ দেওয়া। প্রাথমিক শিক্ষার বেলায়ও সেই অবস্থা; প্রাথমিক শিক্ষার পর মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করা ছাড়া হাতে-কলমে শিক্ষা বা অন্য কোনও রূপ শিক্ষা লাভের সুবিধা বর্ত্তমানে নাই। কাজেই এই দিক্ দিয়া পরস্পরের যোগ যেমন ঘনিষ্ঠ অপর এক দিক দিয়া যোগসূত্র তেমনই শিথিল। কারণ অন্যান্য বহু দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক প্রভৃতি বিভিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ পর্য্যায়ে ভাগ করা হয় নাই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ধরণের শিক্ষার সম্পর্ক থাকে—এবং একটিকে বাদ দিয়া কেবল মাত্র অপর একটির সংস্কার সাধন করার কল্পনা সেই জন্যই সম্ভব হইয়া উঠে না। কাজেই এই দিক্ দিয়া অপর দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের শিক্ষা-পদ্ধতির যেমন একটি বড় পার্থক্য রহিয়াছে তেমনই অপর দেশের শিক্ষার আদর্শের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষার আদর্শের যথেষ্ট বিভেদ রহিয়াছে। যখন প্রথম এই শিক্ষার প্রচলন হয়, তখন জাতীয় উন্নতির প্রথম সোপান হিসাবে শিক্ষার প্রচলন হয় নাই—হইয়াছিল সেকালের সরকারী প্রয়োজনে; এবং যদি বা সেকালের কর্ত্তৃপক্ষের মনে কাহারও কাহারও জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল এই শতাব্দীর গোড়া হইতে সে লক্ষণ আর পাওয়া যায় নাই। ক্রমশঃ শিক্ষা-ব্যবস্থা রাজনীতির অঙ্গীভূত হইতে চলিয়াছে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যখন যে-দলের হস্তগত হইতেছে তখন সেই দলের প্রয়োজন হিসাবেই শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। ফলে অনেক সময়েই আমরা জাতীয় উন্নতির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র দলাদলির নিদর্শন বেশী পাইতেছি এবং সেই জন্যই আজও বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী মুসলমান বা তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের মাত্র একটি ক্ষুদ্র অংশের তুষ্টি সাধনের জন্য ব্যগ্র হইলেও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা সংস্কার এবং তাহার জন্য জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমান অর্থ ব্যবস্থা করার জন্য আগ্রহশীল নহেন। এই জন্য আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি কি এবং তাহার জন্য কি কি অর্থব্যবস্থা আছে, তাহা আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দিক দিয়া কত দূর ন্যায়-সঙ্গত, আমাদের জাতীয় প্রয়োজন তাহাতে কত দূর সাধিত হইতে পারে—এই প্রশ্নগুলির একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

বাংলার শিক্ষা-ব্যবস্থা ও সরকারী সাহায্য

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের দেশে অন্যান্য স্বাধীন দেশের মত শিক্ষাবৈচিত্র্য নাই এবং বর্ত্তমান অবস্থায় বোধ হয় সম্ভবও নহে। এইজন্য ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, রুশিয়া বা আমেরিকায় জাতীয় প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ নানামুখীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে আমাদের

দেশে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। এই কারণে আমাদের প্রত্যেক প্রদেশের শিক্ষা-বাজেটে প্রতি বৎসরই অনুরূপ কয়েকটি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে তিনটি প্রধান বিভাগ—প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা। ইহা ছাড়া বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা কিছু কিছু থাকে; শিক্ষকদের শিক্ষার ব্যবস্থাও সামান্য পরিমাণে থাকে। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে গঠিত এই বিদ্যালয়গুলির মধ্যে দুইটি বড় বিভাগ—সরকারী ও বেসরকারী। সরকারী বিদ্যালয়গুলি সংখ্যায় অতি সামান্য—তাহাদের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার সরকার বহন করেন। বেসরকারীগুলির মধ্যে, কতকগুলি সরকারী তহবিল হইতে কিছু কিছু সাহায্য পায় এবং বাকী বেসরকারী বিদ্যালয়গুলি সম্পূর্ণভাবে জনসাধারণের অর্থে চলে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান হইতে কিছু কিছু সাহায্য পাওয়া গেলেও অস্বীকার করা চলে না, বাংলার শিক্ষার ব্যয়ভারের প্রধানতম অংশ বাংলার জনসাধারণই বহন করে—অন্যান্য প্রদেশেও প্রায় অনুরূপ অবস্থা।

কিন্তু আমাদের প্রত্যেক প্রদেশের শিক্ষাপদ্ধতি ও অর্থব্যবস্থা প্রায় একই প্রকারের হইলেও বাংলার একটু বিশেষত্ব আছে। আমাদের প্রাদেশিক সরকারেরা শিক্ষার জন্য যাহা সাহায্য করেন তাহা কোনখানেই যথেষ্ট নয়—কিন্তু বাংলা-সরকার তাহার মধ্যে প্রায় সর্ব্বপশ্চাতে। দেখা গিয়াছে মাদ্রাজে প্রাদেশিক সরকার মোট শিক্ষা-ব্যয়ের ১৫'৮% অংশ বহন করেন, বোম্বাইয়ে ১৩'০%, যুক্ত-প্রদেশে ১৬'৮%, বিহারে ১৭'৭% পঞ্জাবে, ১৫'১%,—কিন্তু বাংলায় মাত্র ১২'০% !

অর্থবণ্টনে অসঙ্গতি

কিন্তু অন্যায় শুধু যে আমাদের প্রাদেশিক সরকার অন্য প্রদেশের তুলনায় শিক্ষার জন্য ব্যয়ে পরাঙ্মুখ হওয়াতেই তাহা নহে। দেখা গিয়াছে, আমাদের যেটুকু অর্থ বর্ত্তমানে বরাদ্দ আছে শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগে তাহার সুষ্ঠু বণ্টন হয় নাই। ১৯৩৮-৩৯ সালে শিক্ষার জন্য মোট কি ব্যয় হইয়াছিল এবং তাহার কত অংশ কিসের জন্য ব্যয় হইয়াছিল, ইহার কয়েকটি বিষয়ের হিসাব নিম্নে উদ্ধৃত হইল, ইহা হইতে আমাদের শিক্ষা-বিভাগের রীতিনীতির একটা মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া যাইবে।

১৯৩৮-৩৯ সালে শিক্ষার জন্য সরকারী ব্যয়

মোট খরচ—১,৪৪,২৮,০০৬

		মোট ব্যয়ের শতকরা হিসাব
১।	বিশ্ববিদ্যালয়	৭'৯
	(ক) কলিকাতা	৩'৪
	(খ) ঢাকা	৪'৫
২	সরকারী আর্টস কলেজ	১১'৩
৩	বেসরকারী আর্টস কলেজ	২'৭
৪	সরকারী professional কলেজ	২'৫
৫	সরকারী মাধ্যমিক স্কুল	১৩
৬	বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল	১৮'৬
৭	সরকারী প্রাথমিক স্কুল	'০৩
	বেসরকারী প্রাথমিক স্কুল	২'৪
৯।	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য জেলাবোর্ড ইত্যাদিতে সাহায্য	২০'১
১০।	সরকারী বিশেষ (special) বিদ্যালয়	৭'৮
১১।	বেসরকারী বিশেষ বিদ্যালয়	৩'১
১২।	শিক্ষা বিভাগ পরিচালন ব্যয়	১'৫
১৩।	পরিদর্শন	৮'১
১৪।	ছাত্রবৃত্তি	২'৫

ইহার মধ্যে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয় ছাত্রদের শিক্ষার ব্যয় ধরা হয় নাই। উপরে উল্লিখিত বিষয় ছাড়া সরকারের শিক্ষাব্যাপারে আরও দুই একটি সামান্য খরচ আছে—সেগুলি উল্লিখিত হয় নাই। আরও কয়েকটি খরচ—যথা, P. W. D. কর্তৃক বিদ্যালয়গুলির বাড়ী নির্ম্মাণ বা মেরামত—তাহাও ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে।

উপরিউক্ত হিসাব হইতে অর্থ বণ্টন ব্যবস্থার কয়েকটি অসঙ্গতি স্পষ্ট ধরা পড়ে। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা মুষ্টিমেয় হইলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বহুবিধ প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রদত্ত সাহায্যের চেয়ে বেশী। একথা অবশ্য বলা চলে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অপেক্ষা কম এবং সেহেতু সরকারী প্রয়োজনও বেশী। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে,

ঢাকার মুষ্টিমেয় ছাত্রসংখ্যার কথা ছাড়িয়া দিলে সমগ্র বাংলা ও আসামের শিক্ষার ভার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত। এই দিক্ দিয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে সরকার ঢাকা জিলার অংশবিশেষের জন্য যেটুকু ব্যয় করিতে প্রস্তুত, বাকী সমগ্র বাংলার জন্য সেটুকু অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত নন্—সে হিসাবে কেবলমাত্র ঢাকার অংশবিশেষের প্রাপ্য সমগ্র বাংলার জন্য মোট খরচের অর্দ্ধেকেরও বেশী হইয়া দাঁড়ায়। স্বতঃই প্রশ্ন উঠে ঢাকার প্রতি এই পক্ষপাতের উদ্দেশ্য কি কেবলমাত্র জাতীয় শিক্ষার উন্নতি না, ইহার অন্য কোনও কারণ আছে? এই যে স্থানবিশেষে ক্ষমতাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হইলেও সমগ্র দেশের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে অর্থের সংস্থান নাই, ইহাতে জাতির উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে কি?

এই অর্থবণ্টন ব্যবস্থায় আরও কতকগুলি বিশেষ অন্যায় সহজেই ধরা পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে:—

(১) সরকারী মাধ্যমিক স্কুলগুলির জন্য সরকার যে পরিমাণ অর্থব্যয় করেন, বে-সরকারী স্কুলগুলিতে সরকারী সাহায্য তাহার তুলনায় নিতান্তই কম। বিশেষতঃ সরকারী স্কুলগুলির ছাত্রসংখ্যা বে-সরকারী স্কুলগুলির ছাত্রসংখ্যার তুলনায় বহু কম এবং সরকারী স্কুলগুলি একেবারেই সংখ্যালঘিষ্ঠ।* ১৯৩৬-৩৭ সালে বালকদের জন্য সরকারী মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ৪৫। জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫১, কিন্তু মধ্য বাংলা ও মধ্য ইংরেজী ও উচ্চ ইংরেজী এই তিন প্রকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে বে-সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৯৮৩। কিন্তু অধ্যাপনার উৎকর্ষ কেবল যে সরকারী বিদ্যালয়গুলিরই একচেটিয়া ছিল তাহা নহে, বরং সরকারী বৃত্তিগুলির অধিকাংশই বে-সরকারী স্কুলের ছাত্রেরা পায়। সেই জন্য অধ্যাপনার উৎকর্ষের জন্যও সরকারী বিদ্যালয়গুলি এই অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের দাবী করিতে পারে না। ইহা ছাড়া সরকার এই সমস্ত বিদ্যালয় পরিদর্শনে যে ব্যয় করেন তাহা কম নয়—এমন কি বে-সরকারী স্কুলে যে-সাহায্য দেওয়া হয় তাহার প্রায় অর্দ্ধেক। অথচ পরিদর্শনের জন্য এত ব্যয় থাকা সত্ত্বেও মাধ্যমিক শিক্ষা বিলে অনুযোগ করা হইয়াছে আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির যথেষ্ট পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ নাই।

(২) প্রাথমিক শিক্ষার বেলাতেও যে এই অসঙ্গতি দেখা যায় না তাহা নয়। সরকার নিজেদের শিক্ষায়তনগুলির জন্য মোট বরাদ্দের শতকরা '০৩ অংশ ব্যয় করেন—সে-স্থলে বে-সরকারী স্কুলগুলির সাহায্যের পরিমাণ শতকরা ২'৪। আপাততঃ এই হিসাবগুলি ততটা অসঙ্গত না হইলেও বাস্তবিক পক্ষে তাহা নয়। কারণ দেখা যায় ১৯৩৬-৩৭ সালে পল্লী-অঞ্চলে বালকদের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ৪৭টি, ছাত্রসংখ্যা ২৩৫৪—অথচ তাহার জন্য খরচ হইয়াছিল ১০৫৮২ টাকা। কিন্তু বে-সরকারী (জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটী পরিচালিত নহে) স্কুলের সংখ্যা ছিল ৩৮০৫১, ছাত্রসংখ্যা ১,৬০১,৭৮০, সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ৩,৯২,৭১৯ টাকা। সে-হিসাবে সরকারী স্কুল প্রতি খরচ প্রায় ২২৫৲ টাকা, ছাত্র প্রতি খরচ প্রায় ৪।০; সেই স্থলে বে-সরকারী স্কুল প্রতি সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ন্যূনাধিক ১০৲ মাত্র। ছাত্র প্রতি সাহায্যের পরিমাণ কিঞ্চিদধিক চার আনা। অথচ মজার কথা এই যে, সরকার তাঁহাদের নিজস্ব লোকেদের ভরণ-পোষণে তৎপর হইলেও প্রকৃত শিক্ষা-বিস্তারে আগ্রহশীল নন্, কারণ এখনও সরকার প্রাথমিক শিক্ষার মোট ব্যয়ের মাত্র ৩২'৯ বহন করেন এবং জনসাধারণের প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ মোট ব্যয়ের ৩০'৭। এখনও সরকার তাঁহাদের নিজস্ব স্কুলগুলির মোহ কাটাইয়া ঐ অর্থ জনসাধারণের হাতে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হন নাই।

(৩) বাংলা-সরকারের এই স্বজন-তোষণ নীতির আর একটি জলন্ত উদাহরণ শিক্ষা বিভাগে বড় চাকুরীয়া নিয়োগ ব্যাপারে দেখিতে পাওয়া যায়—দেখিতে পাওয়া

* এই স্থলে ও পরবর্ত্তী হিসাবগুলির জন্য সংখ্যাগুলি মুখ্যতঃ 9th Quinquennial Review of the Progress of Education in Bengal (1932-37) এবং 11th Quinquennial Review of the Progress of Education in India (1932-37) হইতে গৃহীত।

যায় সরকার শিক্ষার প্রসারের চেয়ে মুষ্টিমেয় চাকুরীয়াদের মোটা মাহিনার পক্ষপাতী। All-India Review এর ৪০ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায় বাংলার প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগে প্রথম শ্রেণীর চাকুরীয়া (Provincial Educational Service Class 1) মোট ৫৪ জন (ইহার মধ্যে I. E. S. চাকুরীয়াও আছেন)। কিন্তু বোম্বাইয়ে মাত্র ৫০ জন, যুক্ত প্রদেশে ২২ জন, পঞ্জাবে ২১ জন এবং মাদ্রাজে একজনও নাই। কাজেই ডাঃ জেন্‌কিন্স যখন বলেন মাদ্রাজে যদি ৩৭২টি উচ্চ ইংরেজী স্কুল থাকিলে চলে বাংলায় এত বেশী স্কুল না থাকিলে চলিবে না কেন, তখন আমরা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে পারি কি যে মাদ্রাজে যদি আই-ই-এস লোক দূরের কথা, Provincial Educational Service Class 1—একটিও না থাকিলে চলে তবে বাংলাতেই বা এতগুলি মোটা মাহিনার চাকুরীয়ার প্রয়োজন কি? যদি স্কুলগুলির সংখ্যা লাঘবই তাঁহার অভিপ্রেত হয় তবে চাকুরীগুলির বিলোপসাধন অত্যন্ত সমীচীন হইলেও তাহা ডাঃ জেন্‌কিন্স ও তাঁহার গোষ্ঠীর পক্ষে রুচিকর হইবে কি?

(৪) ইহা ছাড়া আর একটি বিষয়ের উল্লেখ অবশ্য প্রয়োজনীয়। বাংলায় অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয় ছাত্রদের শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র একটি বোর্ড আছে। সেই বোর্ডের জন্য যাহা খরচ হয় এবং এই বোর্ডের অধীন স্কুলগুলিকে যে পরিমাণ সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়, সে খরচ পূর্ব্বোল্লিখিত হিসাবের অন্তর্ভুক্ত নয়। যদিও বাংলার জনসাধারণের প্রদত্ত রাজস্ব হইতেই এই সমস্ত খরচ নির্ব্বাহ হয়, এবং এই জনসাধারণের মধ্যে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয়দিগের সংখ্যা মুষ্টিমেয়—তবুও সে বোর্ডে বাংলার জনসাধারণের কোনও প্রতিনিধি নাই—তাহাদের কোনও বক্তব্য সেখানে গ্রাহ্য হয় না। আর এই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয় ছাত্রকে শিক্ষার জন্য যে কি অতিরিক্ত ব্যয় হয় তাহার কোনও কল্পনা করা যায় না। দেখা গিয়াছে, ১৯৩৮–৩৯ সালে মোট খরচ হইয়াছিল সরকারী তহবিল্ হইতে ১০,৯০,২৭৫ টাকা। কিন্তু মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৬৩। তাহার মধ্যে ২৪টি মাধ্যমিক, ১৮টি প্রাইমারী। মোট ব্যয়ের পরিমাণ ও মোট স্কুলের সংখ্যার অনুপাত কসিলে দেখা যায় স্কুল প্রতি সরকারী বরাদ্দের পরিমাণ প্রায় ১৭৩০৬ টাকা। তের হাজারের কম ছাত্র ও ছাত্রীর জন্য এই সমস্ত বরাদ্দ। এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে এই বোর্ডের তত্ত্বাবধানে শিক্ষয়িত্রীদের বিশেষ ট্রেনিং, বাণিজ্যবিষয়ক শিক্ষা, অল্পবুদ্ধি বালক-বালিকার শিক্ষা প্রভৃতি বিশেষ ব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শিক্ষা-বিভাগে সাম্প্রদায়িকতা

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, আমাদের সরকার শিক্ষা সম্বন্ধে অন্য প্রাদেশিক সরকারের মত ব্যয় করিতে ইচ্ছুক বা সমর্থ নন্ এবং বাংলায় শিক্ষাবিস্তারের জন্য সরকারী তহবিল হইতে যেটুকু সাহায্য পাওয়া যায়, সেটুকুও সুষ্ঠুভাবে বণ্টিত হয় না। কিন্তু ব্যাপারটির এইখানেই শেষ নয়, কারণ বিভিন্ন বিষয়ে যেটুকু অর্থ বণ্টিত হয় সেটুকুর মধ্যেও সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি সর্ব্বনাশসাধন করিতেছে। এই বিষয়টির সংক্ষিপ্ত আলোচনা যথেষ্ট নয়। প্রাথমিক শিক্ষা হইতে উচ্চতম শিক্ষা অবধি প্রত্যেক দিকে এই সাম্প্রদায়িক বিষ প্রবেশ করিয়াছে। অর্থ সাহায্যের পরিমাণ, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক নিয়োগের নিয়ম, পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন, স্কুল কলেজগুলির উপর সরকারী চাপ, স্কুলগুলির স্থান নির্ব্বাচন—ইত্যাদি নানা ভাবে এই সাম্প্রদায়িক বিভেদ প্রসারলাভ করিতেছে। এবং শুধু যে এই বিভেদ প্রসার লাভ করিতেছে তাহাই নহে, একটি সম্প্রদায়ের প্রতি অহেতুক অবিচার কিরূপ সাংঘাতিক হইয়া উঠিতেছে তাহার পরিচয় পাওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এখানে স্থানাভাবে মাত্র কয়েকটি দিক্ আলোচিত হইবে।

অধুনাতন সরকারী নীতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় সরকারের অর্থ-বণ্টন ব্যাপারে এই সাম্প্রদায়িক নীতি প্রবল হইয়া উঠিতেছে। মাত্র কিছুদিন আগে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা হইতে জানিতে পারা যায়, বাংলার কোনও কোনও জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা আইনের অপব্যবহারের ফলে হিন্দুদিগের ন্যায়সঙ্গত দাবী ও অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে :—

নোয়াখালিতে শিক্ষাকর আদায়

বোর্ড নং	ধার্য্যকরের মোট পরিমাণ	হিন্দু	মুসলমান
৪নং বোর্ড (থানা রায়পুর)	৮৯০৲	৮১২৲	৭৮৲
১নং বোর্ড (থানা রামগঞ্জ)	৮২।০	৭৪৸০	৭।০
২নং বোর্ড "	৫৬৸০	৪৮৸০	৮৲
৩নং " "	৩৪৷০	২৮৲	৬৷০

কয়েক স্থলে সচ্ছল অবস্থার কয়েক জন হিন্দু এইভাবে ধার্য্য করের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে আপীল করেন। কিরূপ অন্যায়ভাবে কর ধার্য্য হইয়াছিল তাহা দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত নিম্নলিখিত সংখ্যা হইতে বুঝা যাইবে :—

	ধার্য্য করের পরিমাণ	আদালত কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত পরিমাণ
গোপালচন্দ্র পাল, রায়পুর	১০০৲	২০৲
নবদ্বীপ পণ্ডিত, রায়পুর	১০০৲	১৮৲
শশিকুমার ঘোষ, ,,	২২৷০	০

কিন্তু শুধু ট্যাক্সের বেলায় নয়, সরকারী সাহায্য বণ্টনের সময়েও এইরূপ বৈষম্যমূলক অবস্থা দেখা গিয়াছে। প্রথমতঃ সরকার মুসলমান সংস্কৃতির জন্য বিশেষ করিয়া যে প্রতিষ্ঠানগুলি সেগুলির জন্য যত আগ্রহশীল, কেবল হিন্দু-সংস্কৃতির ব্যাপারে ততটা উৎসাহী নন্। এ কারণে মাদ্রাসা, পুরানো আইনের মক্তব হইতে সুরু করিয়া ইসলামিয়া কলেজ প্রভৃতির নাম বাজেট বক্তৃতায় যেরূপ ঘন ঘন পাওয়া যায়, টোল পাঠশালা বা সংস্কৃত কলেজের নাম তাহার তুলনায় বহুগুণে কম। সরকারী রিপোর্টের বর্ণনা হইতে বুঝা যায় আপাততঃ বাংলায় মুসলমানদিগের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—(১) ইসলামিয়া কলেজ ;(২) কলিকাতা মাদ্রাসার আরবী ও পারসী বিভাগ ; (৩) ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিরাজগঞ্জে তিনটি ইণ্টারমিডিয়েট মুসলমান কলেজ (হুগলী মাদ্রাসাটিকেও এই ভাবে কলেজে পরিণত করার পরিকল্পনা হইয়াছে) ; (৪) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লা হল ; (৫) মাদ্রাসাগুলি —মোট সংখ্যা ৮০৫ ও মোট সরকারী সাহায্যের পরিমাণ সাড়ে ছয় লক্ষ টাকার অধিক ; (৬) কোরাণ স্কুল ; (৭) মুয়াল্লিম ট্রেনিং স্কুল ; (৮) বহু মক্তব এবং তাহার জন্য মোট সরকারী সাহায্য ৯,৮৩,০০০ টাকা। (৯) ইহা ছাড়া প্রত্যেক সরকারী ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ বা স্কুলে বিশেষ বৃত্তি ইত্যাদি নানারূপ সুবিধার ব্যবস্থা আছে। যদিও ইহার মোট খরচের সঠিক হিসাব খুঁজিয়া পাওয়া সহজসাধ্য নয়, তবুও মোটামুটি বলা চলিতে পারে এইগুলির জন্য সরকারী তহবিল হইতে মোট খরচ প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকার অধিক।

দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমানে ফ্রি প্রাইমারী স্কুল ও মক্তবে কোনও পার্থক্য না থাকায় সরকার বলিয়াছেন মক্তবের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে—অর্থাৎ সেগুলির নাম মক্তব না থাকিয়া সেগুলিকে ফ্রি প্রাইমারী আখ্যা দেওয়া হইতেছে। ফলে মক্তবের সংখ্যা কমা দূরের কথা বাস্তবিক পক্ষে সেগুলির সংখ্যা অসম্ভব রূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। শিক্ষাবিভাগের পরিচালকের সর্ব্বশেষ রিপোর্ট হইতে দেখিতে পাওয়া যায় মক্তবগুলির নাম ফ্রি প্রাইমারী হইলেও তাহাতে বিশেষ ধর্ম্মগত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, এবং এই শিক্ষা বহুক্ষেত্রে মুসলমান শিক্ষাই। হিন্দু বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্য কোন ব্যবস্থাই নাই। সেই জন্য একথা বলার বোধ হয় সময় আসিয়াছে এই ফ্রি প্রাইমারী স্কুলের নামে সরকার যত অর্থ ব্যয় করিতেছেন তাহা সমস্তই বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের জন্য, এবং সেই সঙ্গে শুধু যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা নাই তাহাই নহে, মক্তবে বর্ত্তমান বৎসরে যে ৭২০০০ হিন্দু ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে তাহাদের স্বতন্ত্র অধিকারের দাবী ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, এই বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদিগের জন্য যে বিদ্যালয়গুলি আছে সেগুলিতে সরকারী নীতির ফলে মুসলমানের সংখ্যা কয়েক বৎসরে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেখা যায় ১৯৩৮-৩৯ সালে নর্ম্মাল ও ট্রেনিং স্কুলগুলির পুরুষ ছাত্র সংখ্যার মধ্যে হিন্দু ৯৬০ জন, তপশীলভুক্ত ২৭৭, মুসলমান ১৩৯৮। ইহার ফলে ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষক বলিয়া প্রকারান্তরে শিক্ষকদিগের মধ্যে মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা হইবে শুধু তাহাই নহে—ইহা ছাড়া আরও একটি ভাবিবার বিষয় আছে। বাংলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ২১ হাজারেরও অধিকসংখ্যক স্কুলে মাত্র এক জন শিক্ষক। কাজেই এই ক্ষেত্রে মুসলমান শিক্ষক সংখ্যা বেশি হইলে আমাদের স্বতঃই আশঙ্কা হয় বিশেষ

করিয়া এই একটি শিক্ষক-সম্বলিত স্কুলগুলিতে সরকার ইচ্ছা করিলেও অমুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগত বা অন্য কোনও বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না—এবং সে হিসাবে যদিও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অর্থ সাহায্য এ বিষয়ে অত্যন্ত বেশি তবুও তাহাদের যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না।

চতুর্থতঃ, এই নীতির প্রসারের ফলে নূতন বৃত্তি ব্যবস্থা, পরিদর্শক নিয়োগ ইত্যাদি প্রত্যেক ব্যাপারেই ভেদমূলক ব্যবস্থার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। ১৯৩১-৩২ সালে মুসলমান পরিদর্শকের শতকরা অনুপাত ছিল ৫২·৬, কিন্তু মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাহা ৫৭·৮-এ গিয়া দাঁড়াইয়াছে। বৃত্তি প্রদানের নিয়মের কিছুদিন পূর্ব্বে যে-পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে এই সাম্প্রদায়িকতার বিভেদ দেখা দিয়াছে এবং যোগ্যতাই বৃত্তিলাভের একমাত্র হেতু নাই।*

ইহা ছাড়া প্রত্যেক বৎসর বাজেটে মুসলমান প্রতিষ্ঠান-গুলির জন্য বিশেষ বরাদ্দের পরিমাণ যথেষ্ট। এই বিশেষ বরাদ্দের যে কোনও সময়ে বিশেষ কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় তাহাও নহে—পর্দ্দা কলেজ (লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজ) স্থাপনা ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এইরূপ অহেতুক অর্থব্যয়ের আর একটি সুন্দর উদাহরণ বজবজে বিস্তৃত জমির উপর ইসলামিয়া কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা। ১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ বিশেষ বরাদ্দগুলির তালিকাটি সেই জন্য আলোচনা করিতেছি। এই বৎসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক সাহায্যের উপর ১,০২,৩৪৬ টাকা অতিরিক্ত সাহায্য দেওয়া হইয়াছিল। ঢাকায় আর একটি মুসলিম হল নির্ম্মাণের মোট খরচার (২,৫০,০০০) মধ্যে ১ লক্ষ টাকার বরাদ্দ করা হইয়াছিল। এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে চট্টগ্রাম কলেজের বহু কালের হিন্দু হোস্টেলের বাড়ীটি জীর্ণ হওয়ায় তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সে বাড়ী মেরামত বা নতুন বাড়ী নেওয়ার কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। ইহা ছাড়াও মুসলমানদের শিক্ষার জন্য নিম্নলিখিত অর্থ সাহায্য করা হইয়াছিল:—(ক) মুসলমান ছাত্রদের বৃত্তির জন্য বাড়তি ১,১০,০০০ (খ) হুগলী মাদ্রাসাকে কলেজ করার পরিকল্পনা (গ) মাদ্রাসাগুলির জন্য অতিরিক্ত এবং প্রতি বৎসরে দেয় ৫০,০০০ টাকা (ঘ) প্রধানতঃ মুসলমান ছাত্রীদের জন্য লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজ—তাহার জন্য বাড়ী, জমি ইত্যাদির সমস্ত খরচ। অথচ এই বৎসর সংস্কৃত টোলগুলির জন্য সর্ব্বসমেত ১০,০০০৲ টাকা অনুমোদিত হয়। মনে রাখিতে হইবে ইতিপূর্ব্বে মুসলমানদিগের জন্য যে যে বিশেষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার জন্য সরকার প্রতি বৎসর যে খরচ করেন তাহার সঙ্গে ইহার কোনও সম্পর্ক নাই—এ সমস্ত খরচ পূর্ব্বোল্লিখিত খরচ ছাড়া প্রতিবৎসর স্বীকৃত হয় এবং প্রতিবৎসরই এই খরচের পরিমাণ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহা ভিন্ন শিক্ষামন্ত্রীর নিজ গ্রামের কলেজ ও মুসলমান প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য স্কুল ও কলেজ সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্বের দৃষ্টান্তও স্বভাবতঃই মনে আসিবে।

ইহা ছাড়া পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন, বিদ্যালয়গুলির উপর সাম্প্রদায়িক কারণে সরকারী চাপ ইত্যাদি বহু বিষয়ের উল্লেখ এখানে সম্ভব নয়।

এই সম্পর্কে আমাদের একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। বাংলায় প্রকৃত উন্নতির জন্য যাঁহারা আগ্রহশীল তাঁহারা কখনও মনে করিতে পারেন না, আমাদের দেশের একটি বৃহৎ সম্প্রদায় অশিক্ষিত থাকিলে দেশের উন্নতি হইতে পারে। সেজন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য অর্থব্যয় হইলেই আমাদের কোনও আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমানে যেভাবে সম্প্রদায় বিভেদ করা হইয়াছে তাহাতে প্রকৃত শিক্ষার প্রসার অপেক্ষা সম্প্রদায়গত পার্থক্য ভাল করিয়া স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে। আমাদের প্রথম আপত্তি শিক্ষায় এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের মনে রাখিতে হইবে, সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে (non-denominational institutions) মুসলমান ও হিন্দু উভয়েরই প্রবেশাধিকার আছে; তাহার উপরে এই সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতেও সরকার মুসলমান-দিগকে বিশেষ প্রবেশাধিকার ও বিশেষ বৃত্তি ইত্যাদি নানা প্রকার সুবিধা দিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও সন্তুষ্ট না

*Third year of Provincial Autonomy in Bengal, p. 18

হইয়া সরকার মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্ত বিশেষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, যদিও অমুসলমান সম্প্রদায়-গুলির জন্ত অনুরূপ কোনও ব্যবস্থা হয় নাই; ইহার উপরে সরকার প্রতি বৎসর হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত রাজস্ব হইতে অকারণে বহু লক্ষ টাকা কেবলমাত্র মুসলমানদিগের জন্য ব্যয় করিতেছেন, যদিও রাজস্বের পরিমাণের অনুপাতে অমুসলমান সম্প্রদায়-গুলির জন্ত কোন ব্যয় করা হয় না। কিন্তু ইহার উপরে সরকার বর্ত্তমান সাধারণ বিদ্যালয়গুলিকে প্রকারান্তরে মুসলমানদিগের বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে চান, তখন কি অন্যান্য অমুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে বলা উচিত হইবে না যে মুসলমানদিগের এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সরকার শিক্ষার প্রত্যেক বিভাগে অসাম্প্রদায়িক-মনোবৃত্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীগুলিকেও একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের আদর্শ অনুসারে শিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারা যে শুধু শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন তাহাই নহে, তাঁহারা বাংলার সমস্ত অমুসলমান সম্প্রদায়ের এবং বাস্তবিক পক্ষে বাংলার জনসাধারণের প্রকৃত জনমতকে উপেক্ষা করিতেছেন? তাঁহাদের কি প্রশ্ন করা উচিত হইবে না, সরকার একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে স্বীয় মতানুসারে শিক্ষালাভের যে সুযোগ ও স্বাধীনতা দিয়াছেন, অন্যান্য সম্প্রদায়গুলিকে সেই সুযোগ ও স্বাধীনতা অস্বীকার করার কি অধিকার সরকারের থাকিতে পারে? ইহাই কি 'জনপ্রিয়' সরকারের শাসনপদ্ধতি বলিয়া পরিগণিত হইবে?

আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য

আমরা পূর্ব্বে যে যে বিষয়গুলি আলোচনা করিয়াছি তাহা হইতে দুটি জিনিষ স্পষ্ট হইয়া উঠে। প্রথম কথা, শিক্ষা বিভাগে যে নীতি সরকার বর্ত্তমানে অনুসরণ করিতেছেন, তাহাতে শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। তাহার প্রধান কারণ বাংলা-সরকার উপযুক্ত পরিমাণে অর্থব্যবস্থা করিতে ইচ্ছুক নন্—হয়তো সমর্থও নন্; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যেটুকু অর্থ আছে তাহার বণ্টন-ব্যবস্থাও সঙ্গত নয় এবং যদি বা এই বণ্টন-ব্যবস্থাতেও শিক্ষায়তনগুলির কিছু কিছু সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিত, সাম্প্রদায়িকতার কল্যাণে সে সম্ভাবনাটুকুও বিনষ্ট হইতেছে। সেই জন্ত শিক্ষা সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা ইহা বর্ত্তমানে আর শিক্ষানীতির দ্বারা পরি-চালিত নয়, ইহার অন্তর্নিহিত নীতি বাংলার প্রধান ক্ষমতাপন্ন দলের নীতি মাত্র, তাহার সঙ্গে জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কোন সম্বন্ধ নাই। কাজেই আমাদের শিক্ষা ব্যাপারে যদি কোন সুব্যবস্থা করিতে হয় তাহা শুধু শিক্ষা-ব্রতীদের কাজ নয়, তাহার জন্ত যে যে রাজনৈতিক দল আমাদের দেশের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী তাঁহাদের একত্র হওয়া প্রয়োজন।

বলা বাহুল্য, শিক্ষা ব্যাপারের রাজনৈতিক দিক্ সম্বন্ধে কোনও আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নয়—এমন কি কেবল মাত্র শিক্ষার দিক্ দিয়া কি প্রয়োজন তাহার সম্পূর্ণ আলোচনাও সম্ভব নয়। আবার আমাদের সমাজগঠন ও জাতীয় প্রয়োজনের দ্রুত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-নীতিও পরিবর্ত্তিত হইতে বাধ্য। সেই জন্য এ বিষয়ে কোনও চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাহা না হইলেও কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে যতক্ষণ আমাদের শিক্ষার জন্য অধিকতর অর্থের ব্যবস্থা না হইবে ততক্ষণ বিশেষ কোনও উন্নতির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সে অর্থ ব্যবস্থা হইবার পূর্ব্বে বর্ত্তমানে শিক্ষার জন্ত যাহা বরাদ্দ আছে তাহারই সুসঙ্গত বণ্টন-ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে এই বণ্টন-ব্যবস্থার মধ্যে যে অসঙ্গতি, অন্যায় ও অবিচার আছে তাহা কিছু কিছু দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি—তাহার পুনরুল্লেখ এখানে সম্ভব নহে। তার প্রত্যেকটির বিরুদ্ধেই আমাদের আপত্তি করিতে হইবে।

ইহা ছাড়া ভারতবর্ষে সমাজগঠন ও রাষ্ট্রগঠন যে দ্রুতগতিতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহাতে আমাদের শিক্ষানীতির মূলগত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন দরকার হইয়া পড়িয়াছে। ইংলণ্ড ও অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের শিক্ষা-পদ্ধতি ও অর্থ-ব্যবস্থা আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া

যায় সরকার সাধারণতঃ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভারের সমস্ত অংশই বা অধিকাংশই বহন করেন; বিশেষ বিষয় শিক্ষার ভার প্রধানতঃ সরকারেরই। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার ভার সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের থাকে না—জেলা বোর্ড, কাউন্টি কাউন্সিল প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সভাগুলির উপর ন্যস্ত থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সরকারী সাহায্য যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও সরকারী নিয়ন্ত্রণ খুবই কম এবং শিক্ষানীতির পরিচালনা শিক্ষাব্রতীদের উপরই বহু সময় ন্যস্ত থাকে। ইংলণ্ডের কথা আলোচনা করিলে দেখা যায় সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার দুই ধরণের স্কুল আছে—এক সাহায্যপ্রাপ্ত, অপর, আংশিক সাহায্যপ্রাপ্ত। প্রথমগুলির সমস্ত খরচ সরকারের—দ্বিতীয়গুলির ব্যয়ের অংশ মাত্র সরকার বহন করেন। শিল্প শিক্ষা বা বিশেষ শিক্ষার অধিকাংশ ব্যয়ভার সরকারের। মাধ্যমিক শিক্ষার ভার প্রধানতঃ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সভাগুলির উপরে—কিন্তু যদিও তাহাদের আয় হইতেই এই সব স্কুলগুলিকে সাহায্য দেওয়া হয়, তবুও সে সভার বিশেষ কোন কর্তৃত্ব নাই। কারণ আইনের বলে প্রত্যেক সভার একটি শিক্ষা কমিটি গঠিত আছে এবং কেবলমাত্র করের হার নির্দ্ধারণ করা ছাড়া শিক্ষা সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যবস্থা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার বোর্ড অব্ এডুকেশনের নির্দ্দেশসাপেক্ষে সেই কমিটির উপরেই ন্যস্ত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বাৎসরিক সাহায্য এই কারণেই শিক্ষাবিভাগের হাতে না রাখিয়া অর্থবিভাগের হাতে রাখা হইয়াছে। আমেরিকায় আবার অন্য ব্যবস্থার প্রচলন আছে। সেখানে শিক্ষার মোট ব্যয়ভারের শতকরা ১% আসে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল হইতে; ১৭% রাষ্ট্রগুলি হইতে এবং বাকী অংশ স্থানীয় সমিতিগুলিই বহন করে। কিন্তু স্কুলগুলির সাহায্যের বরাদ্দ কোনও সম্প্রদায়গত নীতি অনুসারে হয় না। কোন ক্ষেত্রে স্কুলগুলির ছাত্রসংখ্যা অনুসারে, কোথাও বা সেই অঞ্চলের ছয় হইতে একুশ বৎসর পর্য্যন্ত বালকদের মোট সংখ্যা অনুসারে, কোথায়ও বা স্কুলে মোট ছাত্রদের প্রাত্যহিক উপস্থিতির হিসাব অনুসারে, কোথায়ও বা শিক্ষকদের বেতনের হার অনুসারে অর্থ বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। কোথায়ও বা যে জেলা হইতে যে টাকা আদায় হয়, সেই জেলাকে সে টাকা সম্পূর্ণ ফিরাইয়া দেওয়া হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন নূতন পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা করার ব্যাপারে ইংলণ্ডে বোর্ড অব্ এডুকেশন ও শিক্ষায়তনগুলি পরস্পরকে সাহায্য করে—আমেরিকায় সে ভার সম্পূর্ণরূপে শিক্ষাব্রতীদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তেমনই আমাদের দেশেও শিক্ষার ক্ষেত্রে কি বিষয়ের শিক্ষার কি কি বিশেষ প্রয়োজন সেই বুঝিয়া সরকারী সাহায্য বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হইবে, শিক্ষাক্ষেত্রে যাহাতে নূতন নূতন পরিকল্পনা উদ্ভবের প্রচেষ্টা জনসাধারণের মধ্যে আসে তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে।

ইহা ছাড়া আমাদের বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থার জন্য যে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন সেগুলির বিষয় চিন্তা করা অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য দেশে দেখা যায়, প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং এমন ব্যবস্থাও আছে যে প্রাথমিক শিক্ষার পর কিছুদিন হাতে-কলমে শিক্ষা করিয়া সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করা চলিতে পারে, বা মাধ্যমিক শিক্ষার পর হাতে-কলমে শিক্ষালাভ, পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার পক্ষে বাধা জন্মায় না। আমাদের দেশে এই বিষয়ে কি কতটুকু সম্ভব হইতে পারে তাহার আলোচনা অবিলম্বে প্রয়োজন। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও প্রয়োজন এই হাতে-কলমে শিক্ষালাভের পরিণতি কত দূর দাঁড়াইবে সে বিষয়ে চিন্তা করা, কারণ Report on Vocational Education in India (Abbott Wood Committee Report)এর মতে—capable and ambitious men will not devote themselves to acquiring this special knowledge and skill, unless they see a reasonable prospect of exercising it and gaining a decent livelihood thereby. দেশের শিল্পোন্নতির সহিত ও নানা কারিগরীবৃত্তির প্রসারের সহিত এইরূপ শিক্ষার অঙ্গাঙ্গী যোগ স্বীকার করিতেই হইবে।

পরিশেষে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। বাংলা-সরকারকে একটি বিষয়ে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে তাঁহারা জনসাধারণ প্রদত্ত অর্থ

ব্যয় করিবার সময় প্রকৃত জনমতকে উপেক্ষা করিলে শুধু যে জনমত ক্ষুব্ধ হইবে তাহাই নয়, শিক্ষার অগ্রগতি একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে—এমন কি সরকারের প্রাণপণ চেষ্টা সত্বেও তাহার অগ্রগতি সম্ভব হইবে না। কারণ মনে রাখিতে হইবে আমাদের দেশের মোট শিক্ষা-ব্যয়ের অধিকাংশই জনসাধারণ বহন করে, সরকারী সাহায্য শতকরা ১২·০% এর বেশী নয়। কাজেই যদি শিক্ষাব্যাপারে কিছু করিতে হয়, জনসাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য ছাড়া অগ্রসর হওয়ার উপায় নাই। এই কারণেই স্যাডলার কমিশন বার-বার জনমতের গুরুত্ব সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। স্যাডলার কমিশন স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন :—

We ourselves entertain no doubt that a greatly increased expenditure upon education, an expenditure to which public funds and private liberality should contribute, is necessary in the interests of Bengal and that, if wisely directed, it will be remunerative. But, as a first condition to the effectiveness of such expenditure, we would emphasise the need for a reconstruction of the existing system of educational administration upon lines which will encourage public opinion to co-operate more closely with the Government and will enable consideration to be given to the needs of national education as a whole.

স্যাডলার কমিশনের এই সাবধান বাণী অগ্রাহ্য করার কি বিষময় ফল এবং ইহার প্রতিকারের কি উপায়, সে বিষয়ে চিন্তা করার দিন আসিয়াছে।

বিদায়-বাণী

শ্রীকমলরাণী মিত্র

বিদায়-বাণী নয়কো আমার
নয়ন-জলে প্রিয়,
বিদায়'খনে জানাই শুধু,
"আবার আসিও!"

আবার এসো হাসিমুখে
খুশী হয়ে পরম সুখে;
এমন ক'রেই এসে আবার
হৃদয় ভরিও॥

যেটুক্ রেখে গেলে আমার
এটুক্ জীবনে,
জমা হয়ে রইলো হে মোর
পরম স্মরণে!
রইলো আমার দিনের কাজে,
রাতের ঘুমে, তন্দ্রামাঝে;
রইলো আমার গানে গানে
অনির্বচনীয়!
বন্ধু আমার এমন করেই
আবার আসিও॥

অন্তরালে

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

কিছু দিন হইল এ পাড়ায় আসিয়াছি। শহরে কোন স্থায়ী আস্তানা নাই। এ পাড়া আর সে পাড়া। কোথাও স্থিতিলাভ ঘটিল না।

বিবাহ করিয়াছি। আর এক বোঝা। মনকে প্রবোধ দিই…বোঝার উপর শাকের আটি। এই এক সান্ত্বনা—নইলে জীবনভার অসহনীয় হইয়া পড়িত। স্ত্রীটি সুন্দরী নয় কিন্তু তাকে আমি ভালবাসি। তার রূপহীনতার জন্য তাকে কোন দিন দুঃখ করিতে শুনি নাই। ইহা লইয়া মনে আমার গর্ব্বের অন্ত ছিল না।

দিনমানে দশটা পাঁচটা চাকরি করি—সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহে ফিরি। ছোট ছোট ভাইবোনদের লইয়া খানিক হৈ চৈ করি…ফাঁকে ফাঁকে স্ত্রীর সহিত চোখে চোখে খানিক কথা হয়। প্রকাশ্যেও যে না হয় এমন নয়, কিন্তু চোখের ভাষায় মাদকতা বেশী। বলে, চা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। এটুকু ওর ছলনা। নইলে চা যে এইমাত্র দেওয়া হইল এ কথা ত শ্রীমতীই বেশী করিয়া জানেন। তা হোক…

এর পরে খানিক অবসর। আমার নীরব সাধনার প্রকৃষ্ট সময়। বলিতে ভুলিয়াছি, আমি সাহিত্যচর্চ্চা করি। সূচনায় বহু লাঞ্ছনা এবং অপমান সহিয়াও আজিও অভ্যাস ছাড়িতে পারি নাই। আকাশের নীলিমায় বর্ণ-চ্ছটা খুঁজি, শুভ্র মেঘের পুঞ্জে পুঞ্জে শাড়ীর আঁচলের সন্ধান পাই। এমনি আরও কত কি—

চুড়ির শব্দ কানে আসিল। বুঝিলাম তিনি আসিতে-ছেন। অপেক্ষা করিতে লাগিলাম—মুদিত নেত্রে। মন্দার সস্নেহ পরশটুকুর লোভ আমি সম্বরণ করিতে পারি না। এ খেলা আমার নিত্য রোজের। জানি আমি এর পরে দুখানি পেলব বাহু আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আনত কণ্ঠে বলিবে—"সখি জাগো"…সখি জাগিবে না…জাগিতে সে পারেনা…এইখানেই তার পাওয়া শেষ হয় নাই যে…তার পর? তার পর এমন বিশেষ কিছুই নহে…চির পুরাতনকে নূতন করিয়া উপভোগ করা।

এই শোন? মন্দার কণ্ঠে কত রাজ্যের মধু…কিন্তু শুনিবে কে? যার শুনিবার কথা সে শুনিতে চায় না যে। এর চেয়ে চুপ করিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে উপভোগ করায় তৃপ্তি ঢের বেশী। কিন্তু ইহার পরের অধ্যায়টা আমার জানা। প্রিয়ার হাতের মিষ্টি শাসন। উহুহু…লাগে যে …ছাড়।

মন্দা হাতের মুঠির চুলগুলি ছাড়িয়া দিয়া খিল খিল করিয়া ওঠে। মিথ্যার ভান করার শাস্তি বুঝেছ মশাই… বিলক্ষণ বুঝিয়াছি তবুও হাসিয়া বলি—আধুনিক সতীসাধ্বীর পতিভক্তির নমুনা বুঝি? মাথায় বার-কয়েক হাত বুলাইয়া পুনরায় কহিলাম—তোমাদের শ্রীচরণে…কথাটা শেষ করিতে পারি না। মন্দা দ্রুতহস্তে আমার মুখ চাপিয়া ধরে, বলে—ভাল হবে না বলছি। একটু থামিয়া পুনরায় বলে, কথার একটা শ্রী থাকা উচিত। এর পরে আর এ ঘরেই আসব না।

ইহা ভয়ের কথা সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মন্দার কাছে অকপটে তাহা স্বীকার করিলাম। সে হাসিয়া ফেলিল। আমি বাঁচিলাম। নির্ভয়ে তাহাকে কাছে টানিয়া লইলাম।

এমনি করিয়া নানা ঘটনাচক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া উঁচু নীচু নানা খাদে আমাদের দাম্পত্য জীবনের গোটাকয়েক বছর বেশ নিরুপদ্রবেই কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজিও অতীত এবং বর্ত্তমান আমাদের কাছে হাত-ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অখণ্ড সবুজ। কোথাও রং এতটুকু ফিকা হয় নাই।

কিছুক্ষণ নীরব ছিলাম। মন্দা কথা কহিয়া উঠিল, নিতান্তই খাপছাড়া ভাবে কহিল—তোমার গল্পটা কত দূর?

পূজারতা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

কুমারী আইরিস খাঁ

কহিলাম—লেখা আমি ছেড়ে দেব মন্দা। ওরা তোমাকেও আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়।

মন্দা ধীরে ধীরে তার হাতের আঙুলগুলি আমার চুলের মধ্যে চালাইয়া দিল। কোন কথা কহিল না।

ডাকিলাম—মন্দা!

উত্তর পাইলাম—কি!

কহিলাম—হঠাৎ তোমার গল্পের কথা মনে হ'ল কেন?

মন্দা আঙুল দিয়া পাশের বাড়ীর পুরু ক্যানভাসের পর্দাগুলি দেখাইয়া দিয়া কহিল—ওর রহস্য উদ্ঘাটন করবে বলেছিলে যে।

বলিয়াছিলাম সত্য। পর্দার অন্তরালে যে কণ্ঠস্বর প্রায়ই ধ্বনিত হয়, তাহা এক কথায় বলিতে গেলে সত্যই অদ্ভুত। মানুষের কণ্ঠস্বরে যে এমন মাদকতা থাকিতে পারে তা ইতিপূর্ব্বে আমার জানা ছিল না। কিন্তু ঐ কণ্ঠস্বর পর্য্যন্তই। বিগত কয়েক মাসের মধ্যে ও বাড়ীর একটি ছায়ারও দর্শন মেলে নাই। শুধু কল্পনায় ঐ কণ্ঠস্বরের সহিত সমতা রাখিয়া একটি আদর্শ মানবীর রূপ দান করিয়াছি।

মন্দা বলে অদ্ভুত। কথাটা আমিও অস্বীকার করি না তাই ভাষায় আমি পর্দান্তরালবাসিনীকে রূপ দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। কথাটা মন্দা পুনরায় আমায় স্মরণ করাইয়া দিল।

খাতা টানিয়া কলম তুলিয়া লইলাম। মন্দা সরিয়া গেল। কিন্তু লিখিতে গিয়া থামিতে হইল। কানে আসিল—বৌ দরজাটা খুলে দাও।

দরজা খুলিল এবং বন্ধ হইল শুনিলাম। উৎকর্ণ হইয়া উঠিলাম সেই কণ্ঠস্বরে, আজ এত দেরি হ'ল কেন তোমার?

উত্তরটাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার কানে আসিল, দেরি—না দেরি ত হয় নি আমার—

পুনরায় প্রশ্ন শুনিলাম, শুয়ে পড়লে বুঝি? মুখ হাত পা ধুয়ে কিছু খেয়ে নাও। কুসুমকে খানকয়েক লুচির কথা বলেছিলাম। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বোধ হয়…এত দেরি ক'রে এলে আর হবে না।

উত্তরটাও কানে আসিল, মিছে বিরক্ত করো না। ভালও লাগে না। এর পরে সব স্তব্ধ। আর কোন সাড়া নাই। কিন্তু আমার মাথার মধ্যে তখন চিন্তার তাড়াহুড়া লাগিয়াছে। লোকটা বর্ব্বর। কোন্ প্রশ্নের কি উত্তর।

পুনরায় গৃহকর্ত্তার কণ্ঠস্বর কানে আসিল। এবারকার প্রশ্ন বাড়ীর ঝি কুসুমকে, তার অনুপস্থিতিতে গৃহিণী কোন প্রকার নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছে কিনা? আন্দাজ করিলাম প্রশ্নটা বাড়ীর আব্রু সম্বন্ধে এবং আমি যে ভুল করি নাই সে প্রমাণও কিছুক্ষণের মধ্যেই পাইলাম। ইহা লইয়া কিছুক্ষণ যাবৎ উত্তেজিত কথাবার্ত্তাও চলিল। সব কথা ভাল বুঝিলাম না। কিন্তু তবু মন আমার প্রশ্নে চঞ্চল হইয়া উঠিল। রহস্য সত্যই আছে এবং আপাততঃ তাহা ঘন হইয়া উঠিয়াছে।

মন পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। আমার গল্পের নায়িকার রূপ দানে আমি ভুল করি নাই। অন্তরাল-বর্ত্তিনী সুন্দরী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কলমটা তুলিয়া লইলাম। ভাব এবং ভাষায় গল্পের গতি বেগবান্ হইয়া উঠিল।

কিন্তু আজ বুঝিতেছি যে, গল্পে আমি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারি নাই, শুধু দূর হইতে মানুষকে চিনিতে যাওয়ার ভ্রান্তি এবং পণ্ডশ্রমটাই বড় হইয়া উঠিয়াছে। সেই কথাই বলিব—

ও-বাড়ীর পুরু ক্যানভাসের পর্দা লইয়াই প্রথম পর্ব্বের সূচনা। সূচনা হয় প্রথমে আমার এবং শ্রীমতী মন্দার মধ্যে। ও বাড়ীর কর্ত্তা-গৃহিণীর আবছা-আবছা দুই-চারিটা কথার টুকরা লইয়া আমরা কল্পনায় কত কিছুই রচনা করিয়াছি। কিন্তু পরিচিত হইবার সুযোগ যেদিন আসিল সেদিনে উহাদের অদ্ভুত জীবনযাপন-প্রণালী আমাকে শুধু বিস্মিতই করিল না—কতকটা বিহ্বলও করিল।

এই মাত্র কর্ম্মস্থল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। সারা দেহে এবং মনে প্রচুর ক্লান্তি।

মন্দাকে যথাসম্ভব সত্বর একটু চায়ের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম। এ পাড়ায় আসিবার পূর্ব্বে জনবিরল স্থানের উপর আমার

একটা আকর্ষণ ছিল, কিন্তু ইদানীং নির্জ্জনতার পক্ষপাতিত্বটা তেমন আর নাই। অল্পক্ষণের মধ্যেই মন্দা আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার মুখের প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, শরীর খারাপ নয়ত। আমার কপালের উপর একখানা হাত রাখিল। আমাকে হয়ত খুবই ক্লান্ত দেখাইতেছিল।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলাম।

মন্দা কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়া কহিল—জান আজ ও-বাড়ীর বউকে দেখলাম। অদ্ভুত…

আমি এতক্ষণে সোজা হইয়া বসিয়াছিলাম। মন্দাকে অর্দ্ধপথে থামাইয়া দিয়া কহিলাম—অদ্ভুত সুন্দরী এই কথা ত! এ হতেই হবে…অমন যার কণ্ঠস্বর।

মন্দা আমার বাক্যস্রোতে বাধা দিয়া কহিল—উহু… কুৎসিত। এত কুৎসিত যা চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না।

আমার গল্পের পাণ্ডুলিপিখানি তখনও আমার চোখের সম্মুখেই ছিল। বড় আঘাত পাইলাম।

মন্দা পুনরায় কহিল—ভদ্রলোকের কত না নিন্দা করেছি না জেনে শুনে। যে মানুষ অমন স্ত্রী নিয়ে ঘর করতে পারেন, তিনি কিন্তু নিন্দা-সুখ্যাতির উর্দ্ধে।

আমার গর্ব্বে আঘাত লাগিল। মন্দাকে বাধা দিয়া কহিলাম—তুমি হয়ত ভুল করেছ। বাড়ীর ঝিও হ'তে পারে।

মন্দা অবিচলিত কণ্ঠে কহিল, এত বড় ভুল সে করিতে পারে না।

ভুল যে মন্দা করে নাই তাহা সেই রাত্রেই টের পাইলাম নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে।

গভীর রাত—মন্দা অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। আকাশে অজস্র জ্যোৎস্না। জানালার ফাঁকে ঘরের মধ্যেও তার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। আমি নিঃশব্দে শুইয়াছিলাম। পাশের বাড়ীতে ব্যস্ততার আভাস পাইলাম। উঠিয়া জানালার পাশে গিয়া দাঁড়াইতে বিস্মিত হইলাম। ও-বাড়ীর পুরু ক্যানভাসের পর্দ্দাগুলি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। দুই-চারিটা কথার টুকরাও কানে আসিল। কোন ডাক্তারের সহিত সম্ভবতঃ কথা হইতেছিল। আমার সেইরূপই মনে হইল এবং আমার ধারণা যে মিথ্যা নয় তাহাও কয়েক মুহূর্ত্তেই টের পাইলাম। ভদ্রলোক সত্যই বড় অসুবিধায় পড়িয়াছেন। পাশের বাড়ীতে থাকি, তাছাড়া কৌতূহলও আছে—

এর পরে পরিচিত হইতে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইল না। ভদ্রলোক বহু অগ্রিম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া আমার সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। মন্দাকে আমি জানাইলাম না। কতক্ষণেরই বা ব্যাপার। নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলাম। উহাকে নিরর্থ ব্যস্ত করিয়া লাভ কি! ঘুমাইতেছে—

ঔষধপত্রের ব্যবস্থা আমিই করিলাম এবং এই ধরণের রোগিণীকে একাকী রাখিয়া ডাক্তারের খোঁজে বাহির হইবার জন্য অল্পক্ষণের পরিচিত হইলেও তাহাকে খানিক অনুযোগ দিলাম। কহিলাম—পূর্ব্বে ডাকিলেও ত পারিতেন। ভদ্রলোক কেমন এক প্রকার হাসিয়া কহিলেন—তা পারতাম বটে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—এ-অবস্থা কত দিন? কতকটা উন্মত্ত অবস্থা বলেই ত মনে হচ্ছে।

ভদ্রলোক ম্লান কণ্ঠে কহিলেন—আজ। আমি আপিস থেকে ফেরবার পর থেকে। এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী আমি নিজেই। জেনেশুনেই এতটা ঘটতে দিলাম। সব সময় সামলে চলতে পারি না। এ এক আমার মস্ত দোষ।

তিনি একটু থামিয়া পুনশ্চ কহিলেন—একটা কথা আজকাল আমার প্রায়ই মনে হয়। মানুষের অতি কিছুই ভাল নয়। আমার এক দিনের হিংস্র জয়ের আনন্দ আজ আমার কপালে পরাজয়ের টীকা এঁকে দিয়েছে। নইলে আজ যা দেখছেন, পাঁচ বছর পূর্ব্বের সঙ্গে তার কোন তুলনাই হয় না। বিগত দিনের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে চলেছি বর্ত্তমানে। ওপরওয়ালার হিসাবের খাতায় বাকীর কারবারের স্থান নেই কি না।

ভদ্রলোক থামিলেন এবং কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় কথা কহিয়া উঠিলেন—আমার স্ত্রীকে দেখে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আপনি শিউরে উঠেছিলেন—

কথাটা মিথ্যা নহে—আমি লজ্জিত হইলাম। তিনি তেমনি মৃদু অথচ শান্ত কণ্ঠে বলিয়া চলিলেন—আপনাকে

অনুযোগ দিচ্ছি না বরং এইটেই যে স্বাভাবিক এ-কথাটা বড় বেশী ক'রে জানি বলেই ত ওঁকে চতুর্দ্দিক থেকে এমন ক'রে ঢেকে রাখা। চোখে খুব ভাল দেখতে পায় না, আর চেহারা ত দেখতেই পাচ্ছেন, কিন্তু শ্রবণশক্তি ওঁর বড় প্রবল। ওঁর রূপহীনতার দৈন্যই হ'ল প্রবল ব্যাধি যা ওঁকে অধিক পাগল ক'রে রেখেছে, তার উপর কমলের পরম দুর্ব্বল স্থানে আজ আমি করেছি আঘাত। সইতে পারে নি ভেঙে পড়েছে। কি বলছেন? এসব কথা থাকবে? না না, শুনতে পাবে না—ওর জ্ঞান নেই। তা ছাড়া আমিও মানুষ, একাকী নীরবে ব'য়ে চলবার একটা শেষ আছে।

পর্দ্দার অন্তরালে জীবনের যে-অংশটা এত দিন ধরিয়া নিঃশব্দে বহিয়া চলিয়াছিল, প্রকাশ্য পৃথিবীর আলোয় আজ তাহা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আমি থাকিয়া থাকিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িতেছিলাম।

তিনি পুনরায় আরম্ভ করিলেন—কমল এক সময় সুন্দরী ছিল। সত্যকারের সুন্দরী যাকে বলে। ওঁকে ঘিরে আমার উন্মত্ত গর্ব্বের সীমা ছিল না। কমল বহুদিন অনুযোগ দিয়ে বলেছে, ছিঃ তুমি যেন কি! লোকে বলবে কি? তাকে থামিয়ে দিয়ে উন্মাদের মত হেসে আমি বলতাম, আঃ সেই তো আমি চাই…তারা মনে করুক তুমি কোহিনুর আর তার একমাত্র অধিকারী আমি। তার পর—

তিনি মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া পুনরায় কহিলেন—কিন্তু আজ কোথায় আমার সমস্ত উক্তি। এর জন্য দুঃখ করবার মত কিছুই থাকত না যদি অতীত দিনের কমল আমার বেঁচে থাকত। আমি ওর স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির কথা বলছি। কিন্তু ভগবান্ আমাকে সব দিক থেকে রিক্ত ক'রেছেন।

একটু অবাক্ হইলাম। আজ দৈবাৎ অন্তরাল হইতে ভদ্রলোকের স্ত্রীর যে কটা কথা কানে আসিয়াছিল তাহাতে অজ্ঞানতার কোন আভাসই আমি পাই নাই, তবুও নীরব রহিলাম।

তিনি পুনরায় কথা কহিয়া উঠিলেন, কিন্তু তবুও আমি দমি নি। যে এক দিন আমার সারা বুক জুড়ে ছিল, আকস্মিক একটা দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে তাকে আমি মন থেকে মুছে ফেলতে পারি নি। বরং আমার ভালবাসা একটা অনির্ব্বচনীয় অনুকম্পার সঙ্গে মিশে গিয়ে আমায় আরও সজাগ ক'রে তুলেছে। অবুঝ ও ত, আমার মনের সব কথা জানে না।

ঘড়িতে একটা বাজিল। রাস্তায় কোন দ্রুতগামী মোটরের তীব্র হর্ণ বাজিয়া উঠিল। আশেপাশে কোথাও কোন ছোট ছেলের অস্ফুট কান্নার শব্দ কানে আসিল। তিনি একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া কহিলেন—এক ঘণ্টা পর পর ঔষধ দিতে হবে—সময় হয়েছে। তিনি উঠিলেন এবং স্ত্রীকে ঔষধ খাওয়াইয়া পুনরায় আমার পাশে আসিয়া বসিলেন এবং কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়া পুনরায় বলিতে সুরু করিলেন—মায়ের অনুগ্রহে কমল তার সৌন্দর্য্য হারিয়েছে—মায়ের অনুগ্রহ…

তিনি কেমন এক প্রকার হাসিলেন। তার পরে পুনরায় বলিতে লাগিলেন—কিন্তু এই হারান যে কত বড় হারান তা প্রথম নিজের চোখে দেখে ও জ্ঞান হারাল, তার পরে আর স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে আসে নি। অথচ সব চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, আমার সম্বন্ধে জ্ঞান ওর ষোল আনাকেও ছাপিয়ে যায়। একটা অদ্ভুত অনুভূতি ওকে যেন জাগিয়ে তোলে। মাঝে মাঝে নিজের চেহারা সম্বন্ধে আমায় প্রশ্ন করে; বলে, তুমি আমায় ঘেন্না ক'রো না। ও আমি সইতে পারি না। আমি চমকে উঠি—এ ত জ্ঞানহারার কথা নয়। কমলকে বুকে জড়িয়ে ধরি—মাথায় ওর ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিই। কমল চোখ বুজে আচ্ছন্নের মত প'ড়ে থাকে। ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি, তুমি বেঁচে থাকলেই আমার সব হবে কমল। কথাটা মিথ্যে নয়, নইলে আজ পাঁচ বছর ওকে নিয়ে আমি কাটাতে পারতাম না। মন মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠতে চায়—কিন্তু বিবেক আমাকে কষাঘাত করে। আমার মনুষ্যত্ব ওর অস্তিত্বটুকুই চায়।

তিনি থামিলেন এবং কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া যেন আত্মগত ভাবেই পুনরায় কথা কহিয়া উঠিলেন—কিন্তু আমার সাবধানতা আজ ব্যর্থ হয়েছে, আমার এত দিনের যা-কিছু সব নিরর্থক হয়েছে। জেনে শুনে ওঁর সবচেয়ে

দুর্ব্বল স্থানে আমিই করেছি মর্ম্মান্তিক আঘাত। নিজের চেহারার সমালোচনা কমল সইতে পারে না, অথচ যে কোন সহজ মানুষই ওঁকে দেখলে আতঙ্কিত হয়ে উঠবে। নিছক সহানুভূতির ছলেও দুটো প্রশ্ন করবে। কিন্তু এতটুকুও কমল সইতে পারে না। কি ক'রে দিন কাটাই বলুন ত?

আমি যে বহুক্ষণ যাবৎ নীরব আছি, ইহা হয়ত এতক্ষণে তাঁর দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি যেন একটু কুণ্ঠিত কণ্ঠেই কহিলেন—রাত দুপুরে বাড়ীতে ডেকে এনে প্রলাপ বকতে সুরু ক'রে দিয়েছি। আমায় ক্ষমা করবেন।

এই ধরণের কথার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তথাপি বাধা দিয়া কহিলাম—আপনি ক্ষেপেছেন নাকি?

এতক্ষণে তাঁর মুখে একটু হাসি দেখিলাম, তিনি কহিলেন—না ক্ষেপি নি, যদিও সেইটেই স্বাভাবিক। নইলে বিয়ের পূর্ব্বের স্বপ্ন যেদিন সত্য রূপ নিয়েছিল সেদিনের আর আজকের দিনের প্রভেদটাই ত আমাকে পাগল ক'রে তোলার পক্ষে যথেষ্ট।

বহুদিনের অবরুদ্ধ আবেগ মুক্তি পাইয়া এক মুহূর্ত্তে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, ইহাকে বাধা দিয়া আমি কি করিব···অকস্মাৎ সজাগ হইয়া উঠিলাম, সেই কণ্ঠস্বর···যাকে কেন্দ্র করিয়া এক অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি আমার কল্পনার রাজ্যে প্রতিনিয়ত ঘুরিয়া ফিরিয়াছে। যাহাকে লইয়া কত দিন কত রাত আমি এবং মন্দা কল্পনার জাল বুনিয়াছি। কিন্তু আজ যখন কল্পনা সত্য রূপ ধরিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন নিজেকে বড় অসহায় বলিয়াই মনে হইল।

ভদ্রলোক অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাঁর স্ত্রীর সন্নিকটে অগ্রসর হইয়া গেলেন, কহিলেন—কিছু ব'লছ তুমি আমায়?—

কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

পুনরায় তাঁর কণ্ঠস্বর ভাঙিয়া পড়িল—কমল কথা কইছ না কেন?

এতক্ষণে উত্তরটাও মিলিল—তুমি আমায় ক্ষমা করো আর তোমার অবাধ্য হবো না।

তিনি অবরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিলেন—কমল

সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া পাওয়া গেল, উ—ডাকছ আমায়—দুখানি হাত বাড়াইয়া দিয়া কমল পুনরায় কথা কহিয়া উঠিল, কোথায় তুমি? নির্ভরতায় কণ্ঠ যেন তার গভীর হইয়া উঠিল। ভদ্রলোক পরম স্নেহে কমলের হাত দুখানি নিজের কাঁধের উপর তুলিয়া লইলেন। কহিলেন—এই যে আমি তোমার কাছেই কমল—

অভিভূতের ন্যায় বসিয়া ছিলাম। নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমারই ভুল হইতেছিল। ঘরে যে তৃতীয় ব্যক্তি আছে এ কথাটা হয়ত তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। ইচ্ছা হইতেছিল উঠিয়া যাই কিন্তু কৌতূহল অনড় করিয়া রাখিয়াছে। হয়ত ইহা ভদ্রতাবিগর্হিত, কিন্তু মনে আমার ক্লেদ ছিল না।

পুনরায় সেই কণ্ঠস্বর—তুমি আমায় দুঃখ দিও না··· আমি সইতে পারি না।

ভদ্রলোক এ কথার কোন জবাব দিলেন না, শুধু নিঃশব্দে স্ত্রীর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। হয়ত এই নীরব স্পর্শের ভিতর দিয়া তার মনের কথা কমলের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। বহুক্ষণ আর কোন সাড়াশব্দ মিলিল না।

আমি ভাবিতেছিলাম কমলের কথা, যে এত বোঝে তাহাকে উন্মাদ বলা চলে কেমন করিয়া? না যে-আঘাত এক দিন তাঁর বুদ্ধিভ্রংশের কারণ হইয়াছিল আজ আবার সেই আঘাতই উহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিয়াছে? আমার মনের কথা অন্তর্যামী জানেন, কিন্তু এবারে উঠিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলাম। উঠিয়া দাঁড়াইলাম। হয়ত প্রয়োজন ছিল না কিন্তু তথাপি দুই-চারিটা উপদেশ বর্ষণ করিতে ভুলিলাম না। তাঁর মুখে শুধু প্রশান্ত হাসির রেখাই অনুভূত হইল কোন প্রতিবাদ আসিল না, কিন্তু আমার সাহায্যের জন্য বার-কয়েক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে ভুলিলেন না।

আমি ফিরিয়া আসিয়াছি কিন্তু মনের মধ্যে এতক্ষণের ঘটনাগুলি জাঁকিয়া বসিয়া আছে। ভাবিতেছিলাম কেমন করিয়া ভদ্রলোক এত বড় আঘাতটা বুক পাতিয়া লইয়াছেন। ভাবিতেছিলাম মানুষ নিজের বুদ্ধির সহিত

রং চড়াইয়া কত সম্ভব অসম্ভব কল্পনাই না প্রতিনিয়ত করিয়া চলিয়াছে। ইহা লইয়া আবার কত গর্ব্ব, কত না কথার বর্ণচ্ছটা।

জানালা-পথে ও বাড়ীর দিকে চাহিলাম—আজ আর ওখানে কোন রহস্য নাই। শুধু আমার কল্পনাকে ব্যঙ্গ করিতে ক্যানভাসের পর্দ্দাগুলি অন্তর্হিত হইয়াছে।

মন্দা তখনও ঘুমাইতেছে। চাহিয়া দেখিলাম। মন্দা সুন্দরী নহে। তাহাকে লইয়া আমার গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই। আমি যাহাকে পাইয়াছি তাহাকে লইয়াই খুশী—যাহা পাই নাই তাহা লইয়া আপশোষ নাই কিন্তু তাই বলিয়া—আঃ এসব আমি কি ভাবিতেছি···নিজেকে নিজে ধমক দিলাম।

অত্যন্ত আলগোছে শয্যার উপর উপবেশন করিলাম। মন্দার ঘুমন্ত মুখের প্রতি চাহিলাম—কত নির্ভরতা ঐ মুখে। পরিপূর্ণ নিরুদ্বেগ একখানি মুখ। একই শয্যায় কত দিন কত রাত আমাদের অতিবাহিত হইয়াছে। গল্পে ··ভবিষ্যৎ কল্পনায় এমন কত রাত আমাদের মুখর হইয়া উঠিয়াছে। কত কানে কানে কথার বিনিময়··· কত উচ্ছ্বাসের নিঃশব্দ উল্লাস...সবই কি ঐ নারীদেহের কয়েকটি রেখাবৈচিত্র্যকে ঘিরিয়া প্রাণরসে পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, আর কিছুই কি নাই?

ভাবিতেছিলাম···কিন্তু কেন ভাবিতেছিলাম জানি না। কমলের বীভৎস চেহারা দেখিয়া কি আমি ভয় পাইয়াছি? শিহরিয়া উঠিলাম। মন্দার মুখের প্রতি পুনরায় চাহিলাম...তেমনি নীরবে ঘুমাইতেছে। একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া মন্দার মুখের কাছে ঝুঁকিলাম। ওর ঘুম ভাঙিয়াছে—চোখ চাহিয়া একটুখানি হাসিল, অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, অসভ্য···কিন্তু দুখানি বাহু আলগোছে আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল।

আঃ মনের বোঝা আমার নামিয়া গিয়াছে। আমার এতক্ষণের প্রশ্নের সমাধান হইয়াছে। মন্দাকে গভীর ভাবে আলিঙ্গন করিলাম। মন্দা আমার নিজেরই অঙ্গ-বিশেষ। অন্ততঃ আজ এই মুহূর্ত্তে একথা আমি অকপটে স্বীকার করি।

মন্দা বলে, ছাড়—তোমার আজ হয়েছে কি?

আমার কি হইয়াছে তাহা মন্দাকে কেমন করিয়া বুঝাই। কিন্তু আমার দুখানি বলিষ্ঠ বাহু তাহাকে আরও নিবিড় ভাবে বক্ষসংলগ্ন করিয়া রাখিল। আমার সমস্ত অন্তরাত্মা বলে, এর ব্যতিক্রম হ'তে পারে না। কোন-ক্রমেই না।

মন্দাকে বলিলাম—তোমাকে আমি সত্যই ভালবাসি—

মন্দা বলে, থাক রাত দুপুরে আর কবিত্ব করতে হবে না। বলিয়াই হঠাৎ সে মুখ বাড়াইল···

আমার প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। ভালবাসা অন্ধ।

রোগশয্যায়*

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের নূতন কাব্য "রোগশয্যায়" গত পৌষ মাসে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই কাব্যগ্রন্থখানি পাঠকালে যাহা প্রথমেই চোখে পড়ে তাহা হইতেছে ইহার অসাধারণ সরল সুন্দর প্রকাশভঙ্গী। সুগভীর আত্মপ্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই স্বচ্ছ শুভ্র সরল বাণীই খুঁজিয়া আসিতেছেন। অন্তরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুভূতির, জীবনের পরম মুহূর্ত্তের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান অভিজ্ঞতার, প্রত্যক্ষ প্রকাশের সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক রূপটিকেই অন্বেষণ করিয়াছেন। প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে সহজ স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গীর যে ক্রমবিকাশ দেখা যায় তাহা যথার্থই বিশেষ সযত্ন আলোচনার যোগ্য। এখানে শুধু এইটুকুই বলিতে চাই যে, কবির প্রকাশভঙ্গী ক্রমেই অপূর্ব্ব অভিনব স্বাভাবিক সরল সৌন্দর্য্য লাভ করিতেছে। ভাবের চারিদিকে যত কিছু কৃত্রিম বাঁধন ছিল প্রায় সবগুলিকেই কাটিয়া ফেলিয়া অন্তরের বাণী আজ বাহিরে আসিতে পারিয়াছে। বিশেষ করিয়া এই কাব্যগ্রন্থটিতে কবির হৃদয়ের ভাব একটি অপূর্ব্ব অকপট রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোথায়ও কৃত্রিমতা নাই, বাহুল্য নাই, বিকৃতি নাই। এখানে বিশ্বচৈতন্য, বিশ্বপ্রাণ, বিশ্বআত্মার সহিত কবির জীবন যেন মিলিয়া গিয়াছে। অসীম নির্ম্মল আকাশের আনন্দে তাঁহার হৃদয় আজ ভরপুর।

> যাহা কিছু চেয়েছিনু একান্ত আগ্রহে
> তাহার চৌদিক হতে বাহুর বেষ্টন
> অপসৃত হয় যবে
> তখন সে বন্ধনের মুক্তক্ষেত্রে
> যে চেতনা উদ্ভাসিয়া উঠে
> প্রভাত-আলোর সাথে
> দেখি তার অভিন্ন স্বরূপ।
> শূন্য তবু সে তো শূন্য নয়।
> তখন বুঝিতে পারি ঋষির সে বাণী—
> আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি
> জড়তার নাগপাশে দেহমন হইত নিশ্চল।
> কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
> যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।
>
> (রোগশয্যায়, ৩৬, ৩ ডিসেম্বর, ১৯৪০)

'রোগশয্যায়' কাব্যগ্রন্থটিতে দেখিতে পাই কবি একটি অপরূপ আনন্দময় বিশ্বদৃষ্টিই পাইয়াছেন। প্রসন্ন প্রাণের নিমন্ত্রণ তাঁহাকে "নূতন চোখের বিশ্বদেখা"ই দিয়াছে।

> প্রভাত-আলোয় মগ্ন ঐ নীলাকাশ
> পুরাতন তপস্বীর
> ধ্যানের আসন,
> কল্প-আরম্ভের
> অন্তহীন প্রথম মুহূর্ত্তখানি
> প্রকাশ করিল মোর কাছে;
> বুঝিলাম এই এক জন্ম মোর
> নব নব জন্মসূত্রে গাঁথা।
> সপ্তরশ্মি সূর্য্যালোক সম
> এক দৃশ্য বহিতেছে
> অদৃশ্য অনেক সৃষ্টিধারা।
>
> (রোগশয্যায়, ২৩, ২৫শে নভেম্বর, ১৯৪০)

দুঃখশোক ও রোগযন্ত্রণা কবির চিত্তে আজীবন গভীর আনন্দই আনিয়া দিয়াছে।

এই কাব্যগ্রন্থখানি রোগশয্যাতেই রচিত, কিন্তু ইহাতে অসুস্থতার কোন স্পর্শ নাই। ব্যাধির যন্ত্রণা কবির অন্তরকে দুর্ব্বল করিতে পারে নাই। বরং ইহার ছত্রে ছত্রে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণশক্তিই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে নবজন্মেরই জয়ধ্বনি, নবজীবনের অমর বিশ্বাস, নূতন প্রাণের আশা আনন্দ উল্লাস।

> রুগ্ন যদি রোগেরে চরম সত্য বলে,
> তাহা নিয়ে স্পর্দ্ধা করা লজ্জা ব'লে জানি
> তার চেয়ে বিনা বাক্যে আত্মহত্যা ভালো।
>
> (রোগশয্যায়, ২৪, ২৬শে নভেম্বর, ১৯৪০)

আজ সমস্ত বিশ্বজগৎ কবিকে ভালবাসিয়াছে, তাঁহাকে প্রেম নিবেদন করিতেছে, তাঁহার জীবনে ইহাই সকলের চেয়ে বড়ো সত্য।

> খুলে দাও দ্বার,
> নীলাকাশ করো অবারিত,
> কৌতূহলী পুষ্পগন্ধ কক্ষে মোর করুক প্রবেশ,
> প্রথম রৌদ্রের আলো
> সর্ব্বদেহে হোক সঞ্চারিত শিরায় শিরায়,
> আমি বেঁচে আছি তারি অভিনন্দনের বাণী
> মর্ম্মরিত পল্লবে পল্লবে আমারে শুনিতে দাও;
> এ প্রভাত

---

* রোগশয্যায়—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲ ও ৪৲ টাকা।

আপনার উত্তরীয়ে ঢেকে দিক্ মোর মন
যেমন সে ঢেকে দেয় নবশষ্প শ্যামল প্রান্তর।
ভালোবাসা যা পেয়েছি আমার জীবনে
তাহারি নিঃশব্দ ভাষা
শুনি এই আকাশে বাতাসে
তারি পুণ্য অভিষেকে করি আজ স্নান।
সমস্ত জন্মের সত্য একখানি রত্নহাররূপে
দেখি ঐ নীলিমার বুকে।

(রোগশয্যায়, ২৭। ২৮ নভেম্বর, ১৯৪০)

অসীম বিশ্বের ঈশ্বর মানুষকে ভালবাসিয়াছেন। তিনিও মানুষের ভালবাসাই চান। অসীম বিশ্বের অসীম ঐশ্বর্য্যই তাঁহার প্রেমের উপহার। মানুষের হৃদয় জয় করিবার জন্যই এতদিকে এত আয়োজন। তাহাতেই ইহার সার্থকতা, তাহাতেই ইহার পরম মূল্য। মানুষের ভালবাসা পাইবার জন্যই বিশ্বেশ্বর অনাদি অনন্তকাল ধরিয়া মানুষের দিকে আসিতেছেন। তাঁহার অন্তরের আনন্দ, তাঁহার হৃদয়ের প্রেমই চরাচর জগতে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

সকল আত্মার পরম আত্মীয় যেমন আমাদের কাছে আসিতেছেন, মানবের আত্মাও তেমনি অসীম প্রেমের অভিসারে তাঁহার দিকেই অগ্রসর হইয়া চলিতেছে, সে যে চিরপথিক। "যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন", সেই আনন্দ-সঙ্গীত "রোগশয্যায়" কাব্যখানিতে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। কবি সেই মহাযাত্রার অপূর্ব্ব ছবিই আমাদের কাছে ধরিয়াছেন। কি বিরাট সেই চিত্র, কি অসাধারণ স্বচ্ছশুভ্র সেই দৃশ্য; মহাবিশ্বের সমগ্রতার উজ্জ্বল আলোতে সমস্ত কাব্যটি উদ্ভাসিত। অখণ্ড সত্য এখানে কি এক মধুর সৌন্দর্য্যেই মণ্ডিত। আমরাও ধন্য, আমরাও এই মহাজ্যোতির একটু আভাস পাইলাম।

রোগদুঃখ রজনীর নীরন্ধ্র আঁধারে
যে আলোকবিন্দুটিরে ক্ষণে ক্ষণে দেখি
মনে ভাবি কী তার নির্দেশ।
পথের পথিক যথা জানালার রন্ধ্র দিয়ে
উৎসব-আলোর পায় একটুকু খণ্ডিত আভাস,
সেই মতো যে রশ্মি অন্তরে আসে
সে দেয় জানায়ে
এই ঘন আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশপারাবার,
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান
যেথায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদ্বুদের মতো
উঠিতেছে ফুটিতেছে,
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি,
চৈতন্যসাগর-তীর্থপথে।

(রোগশয্যায়, ২০, ২৪ নভেম্বর, ১৯৪০, প্রাতে।)

ইহার পরবর্ত্তী কবিতাটিতেও সমগ্র বিশ্বেরই আনন্দরূপের একটি পরিপূর্ণ প্রকাশ :—

আমি কবি তর্ক নাহি জানি,
এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে,
লক্ষ কোটি গ্রহতারা আকাশে আকাশে
বহন করিয়া চলে প্রকাণ্ড সুষমা,
ছন্দ নাহি ভাঙে তার সুর নাহি বাধে,
বিকৃতি না ঘটায় স্খলন,
ঐ তো আকাশে দেখি স্তরে স্তরে পাপড়ি মেলিয়া
জ্যোতির্ময় বিরাট গোলাপ।

(রোগশয্যায়, ২১, ২৪ নভেম্বর, ১৯৪০)

ইহারই অনুরূপ চিত্র আমরা ইতিপূর্ব্বে কেবল "পূরবী" কাব্যেই দেখিয়াছি। এ ধরণের সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, সমগ্র বিশ্বের পরিপূর্ণ সুষমার বিরাট স্বরূপের সংহত বর্ণনা আধুনিক সাহিত্যে একান্তই বিরল,

হের গগনের নীল শতদলখানি
মেলিল নীরব বাণী।
অরুণপক্ষ প্রসারি সকৌতুকে
সোনার ভ্রমর আসিল তাহার বুকে
কোথা হ'তে নাহি জানি।

(পূরবী, প্রভাতী, পৃঃ ১১২)

অন্ধকারের পরপারে যে জ্যোতিঃসমুদ্রে অসংখ্য সূর্য্যচন্দ্রগ্রহতারকা স্নান করে, তাহার কি অসাধারণ সত্য সুন্দর ছবিই কবি এই "রোগশয্যায়" কাব্যে আঁকিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে 'ধর্ম্ম' গ্রন্থে "দিন ও রাত্রি" প্রবন্ধের এই অংশটি :—

"আমাদের রজনীর উৎসব সেই নিভৃত নিগূঢ় অথচ বিশ্বব্যাপী জননী কক্ষের উৎসব। এখন আমরা কাজের কথা ভুলি,...বলি, জননি...আমি তোমার কাছে এখন আর হাত পাতিব না—কেবলমাত্র তুমি আমাকে স্পর্শ কর, মার্জ্জনা কর, গ্রহণ কর। তোমার রজনী-মহাসমুদ্রে অবগাহন-স্নান করিয়া বিশ্বজগৎ যখন কাল উজ্জ্বলবেশে নির্ম্মলললাটে প্রভাত-আলোকে দণ্ডায়মান হইবে, তখন যেন আমি তাহার সঙ্গে সমান হইয়া দাঁড়াইতে পারি।" "রোগশয্যায়" কাব্যখানি পাঠ করিবার সময় মনে পড়ে "পূরবী" কাব্যের সেই ছবিটি,

সেই বিশ্বচিত্তলোকে, যেথা সুগম্ভীর বাজে
অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সঙ্গীত-ধারায়
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্যে তারায় তারায়।

মনে পড়ে,

হে চিরনির্ম্মল, তব শান্তি দিয়ে স্পর্শ করো চোখ,
দৃষ্টির সম্মুখে মম এইবার নির্বারিত হোক
আঁধারের আলোকভাণ্ডার।
নিয়ে যাও সেইখানে নিঃশব্দের গূঢ় গুহা হ'তে
যেখানে বিশ্বের কণ্ঠে নিঃসরিছে চিরন্তন স্রোতে
সঙ্গীত তোমার।

কঠিন ব্যাধির আক্রমণ, করাল মৃত্যুর ছায়া অমৃতলোকের দ্বারই

উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছে। কবি আজ অনন্তের বীণাধ্বনিই শুনিতে পাইতেছেন। অরূপ রূপবন্যার তরঙ্গে তাঁহার চোখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যেন একটু আভাস পাইয়াছেন, "কোথা হইতে এই নিঃশেষবিহীন প্রাণের ধারা লোকে লোকে প্রবাহিত হইতেছে, কোথা হইতে এই অনির্ব্বাণ চেতনার আলোক জীবে জীবে জ্বলিয়া উঠিতেছে, কোথা হইতে এই নিত্য সঞ্জীবিত ধীশক্তি চিত্তে চিত্তে জাগ্রত হইতেছে, এই পুরাতন জগতের ক্লান্তি কোথায় দূর হয়, জীর্ণ জরার ললাটের শিথিল বলিরেখা কোথায় কোন্ অমৃত করস্পর্শে মুছিয়া দিয়া আবার নবীনতার সৌকুমার্য্য লাভ করে—কণাপরিমাণ বীজের মধ্যে বিপুল বনস্পতির মহাশক্তি কোথায় কেমন করিয়া প্রচ্ছন্ন থাকে; জগতের মধ্যে এই যে আবরণ, যে আবরণের মধ্যে জগতের সমস্ত উদ্‌যোগ অদৃশ্য হইয়া কাজ করে—সমস্ত চেষ্টা বিরাম লাভ করিয়া যথাকালে নবীভূত হইয়া উঠে, ইহা প্রেমেরই আবরণ, সুপ্তির মধ্যে এই প্রেমই স্তম্ভিত। মৃত্যুর মধ্যে এই প্রেমই প্রগাঢ়, অন্ধকারের মধ্যে এই প্রেমই পুঞ্জীকৃত।"

এই নিঃশেষবিহীন প্রাণের ধারায় কবির চিত্তও নিত্যস্নান করিতেছে,

অনিঃশেষ প্রাণ
অনিঃশেষ মরণের স্রোতে ভাসমান,
(রোগশয্যায়, ২)

অস্খলিত ছন্দসূত্রে অনিঃশেষ সৃষ্টির উৎসবে।
(রোগশয্যায়, ২৮)

বিশ্বের যেখানে যাহা কিছু আছে সকলকেই কবি স্থির শান্ত-চিত্তে গ্রহণ করিতেছেন। সকলেরই সহিত তিনি এক হইয়া মিলিয়া গিয়াছেন। অসীম জীবনের স্পর্শ তাঁহাকে এই অতি সুগভীর অনুভূতিই দিতেছে।

আমাদের কবি অন্তহীন দেশকালে পরিব্যাপ্ত সত্যের মহিমাকে অখণ্ডরূপেই দেখিতে পাইয়াছেন। সুকঠিন রোগের আক্রমণের পর নবজীবনের পরিপূর্ণ আনন্দউচ্ছ্বাস তাঁহাকে সমগ্র বিশ্বের প্রেমামৃতরসধারায় অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছে। এই অভিনব অভিজ্ঞতার অনুভূতি কি অসাধারণ মাধুর্য্যেই প্রকাশ পাইয়াছে! অসীম প্রাণধারার মধ্যে একটি প্রাণের সহজ সরল অস্তিত্ব, ইহাই ত যথেষ্ট। সৃষ্টির জীবনলীলার সহিত একটি জীবনের সম্পূর্ণ ঐক্যসাধন, ইহাই কি অসামান্য স্বচ্ছ শুভ্রতায় প্রকাশ পাইয়াছে,—

প্রভাতে প্রভাতে পাই আলোকের প্রসন্ন পরশে
অস্তিত্বের স্বর্গীয় সম্মান
জ্যোতিস্রোতে মিশে যায় রক্তের প্রবাহ,
নীরবে ধ্বনিত হয় দেহে মনে জ্যোতিষ্কের বাণী।
'বহি আমি দু'চক্ষুর অঞ্জলি পাতিয়া
প্রতিদিন ঊর্দ্ধ্বপানে চেয়ে।
এ আলো দিয়েছে মোরে জন্মের প্রথম অভ্যর্থনা'
অস্তসমুদ্রের তীরে এ আলোর দ্বারে
র'বে মোর জীবনের শেষ নিবেদন।
(রোগশয্যায়, ৩২, ১ ডিসেম্বর, ১৯৪০)

যে চৈতন্যজ্যোতি
প্রদীপ্ত রয়েছে মোর অন্তরগগনে
নহে আকস্মিক বন্দী প্রাণের সংকীর্ণ সীমানায়,
আদি যার শূন্যময় অন্তে যার মৃত্যু নিরর্থক,
মাঝখানে কিছুক্ষণ
যাহা কিছু আছে তার অর্থ যাহা করে উদ্ভাসিত;
এ চৈতন্য বিরাজিত আকাশে আকাশে
আনন্দ অমৃত রূপে,
আজি প্রভাতের জাগরণে
এ বাণী উঠিল বাজি মর্মে মর্মে মোর,
এ বাণী গাঁথিয়া চলে সূর্য গ্রহতারা
অস্খলিত ছন্দসূত্রে অনিঃশেষ সৃষ্টির উৎসবে।
(রোগশয্যায়, ২৮, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৪০)

এই বইখানির অধিকাংশ কবিতাই "প্রাতে" রচিত। একটি কবিতা বিশেষ ভাবে পাঠককে আকৃষ্ট করে—"ওগো আমার ভোরের চড়ুই পাখী"; সে অপরের কাছে বকৃশিশ পায় না,

বসন্তেরি বায়না-করা
নয়তো তোমার নাট্য,
যেমন-তেমন নাচন তোমার,
নাইকো পারিপাট্য।
(রোগশয্যায়, ৬)

তথাপি আমাদের কবির কাছে এই পাখীটিই সহজ প্রাণের বাণী আনিয়াছে। তাই তাঁহার কাছে এত বেশী প্রিয়,

অনিদ্রাতে যখন আমার কাটে দুখের রাত
আশা করি দ্বারে তোমার প্রথম চঞ্চুঘাত।
অভীক তোমার চটুল তোমার
সহজ প্রাণের বাণী
দাও আমারে আনি,
সকল জীবের দিনের আলো
আমারে লয় ডাকি,
ওগো আমার ভোরের চড়ুই পাখী।
(রোগশয্যায় ৬, ১১ই নভেম্বর, ১৯৪০, প্রাতে)

প্রাণের উৎসধারার তরঙ্গে কবির প্রাণকে সে সঞ্জীবিত করিয়া দিয়াছে, ইহাই তাহার গৌরব। বিশ্বের আলোকের এই অগ্রদূত, কবিকে বিশ্বের সভাতে ডাকিয়া লইতেছে। তাহার এই সহজ প্রাণের প্রেমের আহ্বান সত্যই অনুপম। বহু বৎসর পূর্ব্বে আর একটি ভোরের সরলপাখী কবির কাছে এই আশার বাণীই লইয়া আসিয়াছিল:—

চক্ষু মেলি পূবের পানে
নিদ্রাভাঙ্গা নবীন গানে

অকুণ্ঠিত কণ্ঠ তোমার
উৎসসমান ছুটে।
কোমল তোমার বুকের তলে
রক্ত নেচে উঠে।
এত আঁধারমাঝে তোমার
এতই অসংশয়!
বিশ্বজনে কেহই তোরে
করে না প্রত্যয়।
তুমি ডাক—"দাঁড়াও পথে,
সূর্য্য আসেন স্বর্ণরথে,
রাত্রি নয়, রাত্রি নয়,
রাত্রি নয় নয়!" (উৎসর্গ)

প্রভাতের আবির্ভাব চিরদিনই কবির চিত্তকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিয়াছে, প্রাণে নির্ম্মল আনন্দ জাগাইয়াছে। "রোগশয্যা" হইতেও কবি তাহাকে প্রাণের অভিনন্দন জানাইতেছেন। প্রভাতের বাণী তাঁহার এই কবিতাগুলিতে খুবই উদার গম্ভীর শান্ত সুরেই ধ্বনিত হইয়াছে, এই গুলিতেই তাঁহার অনেক মর্ম্মের কথা আমাদেরও মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে। অনেক দিক দিয়াই এগুলি অতুলনীয়,

প্রত্যূষে দেখিনু আজ নির্ম্মল আলোকে
নিখিলের শান্তি-অভিষেক,
তরুগুলি নম্রশিরে ধরণীর নমস্কার করিল প্রচার।
যে শান্তি বিশ্বের মর্ম্মে ধ্রুব প্রতিষ্ঠিত
রক্ষা করিয়াছে তা'রে
যুগযুগান্তের যত আঘাতে সংঘাতে।

(রোগশয্যায়, ২৪)

"রোগশয্যায়" বইখানিতে অনেক সুরই আসিয়া মিলিয়াছে। তবে সব কয়টি সুরকে ছাপাইয়া এই বাণীই সবার উপরে উঠিয়াছে, "এ বিশ্বেরে ভালোবাসিয়াছি"। সেই বহুপুরাতন ও চিরনূতন কথাই এখানে অভিনব মধুর রাগিণীতে ধ্বনিত হইয়াছে। এখানে প্রেমের প্রকাশ অবর্ণনীয়রূপে সরল সত্যের আলোকে উজ্জ্বল। প্রাণের অন্তরতম অন্তর হইতে যে কথা বাহির হইয়া আসিতেছে তাহার প্রকাশ ত এইরূপই স্পষ্ট। সেখানে ত আর কিছুই থাকিতে পারে না।

আমার বিশ্বাস আপনারে।
দুই বেলা সেই পাত্র ভরি'
এ বিশ্বের নিত্য সুধা
করিয়াছি পান।
প্রতি মুহূর্ত্তের ভালোবাসা
তার মাঝে হয়েছে সঞ্চিত।
দুঃখভারে দীর্ণ করে নাই
কালো করে নাই ধূলি
শিল্পেরে তাহার।

আমি জানি যাব যবে
সংসারের রঙ্গভূমি ছাড়ি'
সাক্ষ্য দেবে পুষ্পবন ঋতুতে ঋতুতে
এ বিশ্বেরে ভালোবাসিয়াছি।
এ ভালোবাসাই সত্য, এ জন্মের দান।
বিদায় নেবার কালে
এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে করিবে অস্বীকার।।

(রোগশয্যায়, ২৬, ২৮ নবেম্বর, ১৯৪০, প্রাতে)

প্রাতঃকালে কবির সকল শক্তিরই উৎস তিনিই যিনি আমাদের সৌরজগতের সমস্ত জীবনীশক্তিরই একমাত্র কেন্দ্র। "পূরবী" কাব্যগ্রন্থে "সাবিত্রী" কবিতায় যে স্তব উচ্চারিত হইয়াছিল তাহারই সংহতরূপ এইখানে,

হে প্রভাতসূর্য
আপনার শুভ্রতম রূপ
তোমার জ্যোতির কেন্দ্রে হেরিব উজ্জ্বল,
প্রভাতধ্যানেরে মোর সেই শক্তি দিয়ে
করো আলোকিত,
দুর্ব্বল প্রাণের দৈন্য
হিরণ্ময় ঐশ্বর্য্যে তোমার
দূর করি' দাও
পরাভূত রজনীর অপমানসহ।

(রোগশয্যায়, ১৫)

রবীন্দ্রনাথ এই "রোগশয্যায়" গ্রন্থখানির মধ্যেও আবরণ-উন্মোচনের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইয়াছেন। রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে ব্যথিত প্রাণ আরও পূর্ণতর, আরও উজ্জ্বলতর জীবনীশক্তির স্পর্শের জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছে। এই অধীর আগ্রহের একটি চিত্র তিনি নিজেই অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছেন, "রোগশয্যায়" গ্রন্থটির পাঠকের মনে সে ছবিটি স্বতঃই উদিত হয়। "একজন আধুনিক জাপানী রূপদক্ষের রচিত একটি ছবি আমার মনে আছে। সেটি যতবার দেখি আমার গভীর বিস্ময় লাগে। দিগন্তে রক্তবর্ণ সূর্য্য—শীতের বরফ-চাপা শাসন সবে-মাত্র ভেঙ্গে গেছে, গ্রাম-গাছের পত্রহীন শাখাগুলি জয়ধ্বনির বাহু-ভঙ্গীর মতো সূর্য্যের দিকে প্রসারিত, শাদা শাদা ফুলের মঞ্জরীতে গাছ ভরা। সেই গ্রাম-গাছের তলায় একটি অন্ধ দাঁড়িয়ে তা'র আলোকপিপাসু দুই চক্ষু সূর্য্যের দিকে তুলে প্রার্থনা করছে।

(যাত্রী)

"রোগশয্যায়" কাব্যখানির কেবল কয়েকটি দিক দেখিলাম, ইহার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইল না। রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুরাগী মাত্রেই এই বইখানিতে সত্য আনন্দ-মাধুর্য্য-সৌন্দর্যের খনি পাইবেন। সকলকেই এই বইখান পাড়তে অনুরোধ করি।

বঙ্গের বাহিরে বাঙালীদের দ্বারা স্থাপিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেব

পৌষের প্রবাসীতে বঙ্গের বাহিরে বাঙালীদের কৃতি সম্বন্ধে আমার যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার শেষে কতকগুলি প্রশ্ন আছে। আমার জ্ঞাত কতকগুলা তথ্য ঐ প্রশ্নাবলীর উত্তরদাতাদের নিমিত্ত উদাহরণস্বরূপ দিতেছি; আমার বিবরণ সম্পূর্ণ নহে। অনেক কিছু আমার বন্ধুবর স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অমূল্য গ্রন্থ "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।* যাহা আমার স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছি, সে-গুলাতে অনেক ভুলচুক থাকিতে পারে, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা সংশোধন করিয়া দিলে বাধিত হইব।

আমার অভিজ্ঞতা যুক্ত প্রদেশে, বিশেষতঃ এলাহাবাদ ও তাহার নিকটস্থ দুই চারিটা শহরে আবদ্ধ। বিহার, যুক্ত প্রদেশের অন্যান্য অংশ, উড়িষ্যা, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব, রাজপুতানা ইত্যাদিতে বাঙ্গালীদের সমাজহিতকর কার্য্যের কাহিনী সবিস্তারে লিখিত হওয়া আবশ্যক। আশা করি সমস্ত বাঙ্গালীর নিকট হইতে আমাদের এই আহ্বানের প্রাণভরা সাড়া পাওয়া যাইবে।

শিক্ষালয় ও শিক্ষাবিষয়ক দান—বাঙ্গালী সর্ব্বদা ও সর্ব্বস্থানেই শিক্ষার বিষয়ে অগ্রণী। তাহার শিক্ষা-বিস্তারের প্রচেষ্টার ভারতে তুলনা নাই। উহার জন্য সে বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। যে-স্থানে ১০।১৫ ঘর বাঙ্গালী নীড় বাঁধিয়াছে সেই স্থানেই তাহারা ছেলেমেয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা প্রথমেই করিয়াছে ও সে প্রদেশের বালক-বালিকারাও উহার সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

প্রয়াগেই বাঙ্গালীদের স্থাপিত ও পরিচালিত ৮টা স্কুল কলেজ আছে।

১। **কর্ণেলগঞ্জ হাইস্কুল**—রায় বাহাদুর ক্ষেত্রনাথ আদিত্য ও যদুনাথ হালদার দ্বারা ১৮৭৩ সালে স্থাপিত। এলাহাবাদে বাঙ্গালীদের স্থাপিত ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বিদ্যালয়। এখন উহাতে প্রায় ৫০০ ছেলে পড়ে। দুই-তৃতীয়াংশের অধিক অন্য সম্প্রদায়ের। জস্টিস্ ৺সর্ প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার পুত্র জস্টিস্ ৺ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আজীবন উহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জস্টিস্ লালগোপাল মুখোপাধ্যায়, ডাঃ নীলরতন ধর ও ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মল্লিক এককালে উহার কমীটির সভাপতি পদ সুশোভিত করিয়াছিলেন। এখন জস্টিস্ ইস্মাইল উহার সভাপতি। আমরা যে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি প্রণোদিত নহি, ইহা তাহার একটি প্রমাণ।

২। **য়্যাংলো-বেঙ্গলী ইণ্টারমীডিয়েট কলেজ**—বাঙ্গালী বালকদের জন্য ১৮৭৬ সালে খোলা হয়। এখন ছাত্র-সংখ্যা ৬০০।৭০০। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী সকলেই শিক্ষা পায়। প্রতিষ্ঠাতা মধুসূদন মৈত্র ও শীতলপ্রসাদ গুপ্ত। রায় বাহাদুর ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওহদেদার, ডাক্তার শিবপ্রসাদ রায়, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদাস মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, রায় বাহাদুর হেমচন্দ্র গাঙ্গুলী উহার সম্পাদক পদ শোভিত করিয়াছেন। যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী, জস্টিস প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময়ে উহার সভাপতি ছিলেন। বর্ত্তমান সভাপতি জস্টিস লালগোপাল মুখোপাধ্যায়। ডাঃ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও ডাঃ সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায় উহার বাটী, বোর্ডিং হাউস্ ও বিজ্ঞান বিভাগ নির্ম্মাণের জন্য বহু অর্থ দান করিয়াছেন। উহার পুরাতন ছাত্রবৃন্দ ইণ্টারমীডিয়েট ক্লাসে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রায় ১৬০০০ টাকা তুলিয়াছেন। তাঁহারা বিশ হাজার টাকা তুলিতে মনস্থ করিয়াছেন।

৩। **ইণ্ডিয়ান গর্লস স্কুল**—১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা

---

* অনেক স্থানে তাঁহার ভাষা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছি। প্রত্যেক বার সে ঋণ স্বীকার করা অসুবিধাজনক। এই জন্য বন্ধুবরের স্বর্গীয় আত্মার নিকট এই স্থানে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম।

জানুয়ারী রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসু উহা স্থাপন করেন। ইহার স্থাপনকার্য্যে তিনি এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটির তাৎকালিক ভাইস-চেয়ারম্যান পরলোকগত চারুচন্দ্র মিত্রের সাহায্য পাইয়াছিলেন। চারুবাবু মিউনিসিপালিটি হইতে মাসিক এক শত টাকা সাহায্য মঞ্জুর করান। উহার নিজস্ব পাকা দোতলা বাটী আছে। উহা হাই স্কুলে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছে। উহার সম্পাদক ডাঃ চণ্ডীচরণ পালিত, ডি-এসসি। হিন্দুস্থানী ও বাঙালী বালিকারা ইহাতে শিক্ষা পায়।

৪। **জগৎ-তারণ গার্লস হাইস্কুল**—মেজর বামনদাস বসু প্রভৃতি দ্বারা স্থাপিত হয়। ২৭০টি বাঙালী ও হিন্দুস্থানী বালিকা এখানে শিক্ষা পায়। সর্ লালগোপাল মুখোপাধ্যায় উহার সভাপতি ও শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মল্লিক ব্যারিস্টার য়্যাট-ল উহার সম্পাদক। মেজর বসুর ভগিনী স্বর্গতা শ্রীযুক্তা জগৎমোহিনী দাস ও তাঁহার স্বামী স্বর্গত শ্রীযুক্ত তারণচন্দ্র দাসের নাম অনুসারে এই বিদ্যালয়টির নাম রাখা হয়। মেজর বসু উহাতে ৪০০০৲ টাকা দান করেন। তদ্ভিন্ন তিনি ইহার বিল্ডিং ফণ্ডে ৫০০০৲ টাকা দিয়া গিয়াছেন।

৫। মহামহোপাধ্যায় আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য দ্বারা স্থাপিত সংস্কৃত পাঠশালা। উহা তাঁহার পিতৃদেবের নামে উৎসর্গীকৃত।

৬। ভাগ্যকুলের রায়েদের দ্বারা স্থাপিত "সৌদামিনী সংস্কৃত পাঠশালা"। উহার নিজের পাকা বাড়ী আছে।

৭। **ঝাঁসীর রুর‍্যাল ট্রেনিং কলেজ**—লক্ষ্ণৌ ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ কুমারচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের চেষ্টায় স্থাপিত। উহার বাটী নির্ম্মাণের জন্য ইণ্ডিয়ান প্রেসের শ্রীযুত হৃষিকেশব ঘোষ ও তাঁহার ভ্রাতারা ৫।৬ সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন। ঐ ভিত্তির উপর আরও চাঁদা সংগ্রহ হয়, গবর্ণমেণ্টও সাহায্যদান করেন।

৮। মিওর সেণ্ট্রাল কলেজের প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সারদাপ্রসাদ সান্যাল মহাশয় এলাহাবাদ ইন্সটিটিউট (Allahabad Institute) নামক সাহিত্য সভায় উপস্থিত করেন। প্রস্তাব গৃহীত হইলে সারদা বাবু "এলাহাবাদে একটি কলেজের নিমিত্ত দানের তালিকা" ("Donations for a College at Allahabad") শীর্ষক এক খণ্ড কাগজ সভ্যবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত করেন। বাবু নীলকমল মিত্র তৎক্ষণাৎ এক সহস্র টাকা দান করিলেন, প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামেশ্বর চৌধুরী মহাশয়েরা এক এক সহস্র টাকা স্বাক্ষর ও দান করেন। এইরূপে এক ঘণ্টার মধ্যে ৫০ সহস্র মুদ্রা স্বাক্ষরিত হইল। সভা হইতে দাতাগণের নাম সহ সর্ র্‌বিলিয়ম মিওর (Sir William Muir) ছোট লাটের নিকট এক আবেদন প্রেরিত হইল। বিদ্যানুরাগী সর্ র্‌বিলিয়ম আবেদন গ্রাহ্য করিয়া একটি উচ্চ শিক্ষার কলেজ ও মেডিকেল কলেজ স্থাপনের অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। ইহাই মিওর কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। প্যারীমোহন বাবু তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মিওর কলেজ অট্টালিকানির্ম্মাণ কমীটির (Muir College Building Committeeর) সম্পাদক ছিলেন। মিওর কলেজ বাঙ্গালীদের প্রচেষ্টারই ফল বলিতে হইবে।

৯। এলাহাবাদে ও গাজীয়াবাদে হরিজন বিদ্যালয় "মহানন্দ মিশন" দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে।

এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটির একটি মহিলা শিল্প বিদ্যালয় আছে। তাহাতে নানাবিধ সেলাইয়ের কাজ ও অন্য নানা রকম গৃহশিল্প শিখান হয়। অধ্যাপক অমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী শ্রীমতী প্রভা দেবী ইহার প্রধান উদ্যোগিনী ও সম্পাদিকা।

কায়স্থ কলেজের শিক্ষার ভিত্তি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অধ্যক্ষতায় সুদৃঢ় হয় ও উহা উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। স্বদেশপ্রেম, দেশসেবা ও সুনীতির যে উচ্চ আদর্শ তিনি তাঁহার ছাত্রদের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছিলেন, তজ্জন্য কেবল উহারা বা তাঁহার সহকর্ম্মীরাই নহে, অধিকন্তু যুক্তপ্রদেশের অধিবাসীরাও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

এলাহাবাদে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা ও তাহার স্থাপন যে সহজসাধ্য, সারদাপ্রসাদ সান্যাল মহাশয়ই তৎকালীন লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর সর্ আলফ্রেড লায়েলকে তাহা বুঝাইয়া দেন। তাহার একটা চিত্তাকর্ষক কিম্বদন্তী আছে। প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া সারদাবাবু প্রায় লাট সাহেবের প্রাসাদের ফটকের নিকট সাঁকোর উপর বসিয়া

তন্ময় হইয়া হিসাব করিতেন। লাটসাহেবও সেই সময় প্রাতঃসমীরণ সেবনে বাহির হইয়া প্রতিদিনই ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোককে একমনে কিছু লিখিতে দেখিতেন। কৌতূহল-পরবশ হইয়া এক দিন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, একমনে বসিয়া আপনি কি লিখেন? সান্যাল মহাশয় উত্তরে বলেন, আপনাকে আমার হিসাব বুঝাইতে কিছু সময় লাগিবে। লাটসাহেব সারদাবাবুকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলেন। সেই সাক্ষাতের ফল এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়।

জস্টিস্ প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময়ে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন। ইউনিভারসিটীর একটি বৃহৎ দ্বিতল হস্টেল প্রমদাবাবুর নামে আখ্যাত হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রারম্ভে এলাহাবাদের আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য, কাশীর বীরেশ্বর মিত্র ও প্রমদাচরণ মিত্র, লক্ষ্ণৌর জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, জয়পুরের সঞ্জীবন গাঙ্গুলী ইত্যাদি উহার সদস্য ছিলেন। ইঁহাদের পরামর্শ ও উপদেশদ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় উপকৃত হয়।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র ঘোষ প্রায় ৩০ বৎসর মিওর সেণ্ট্রাল কলেজে গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার উইল অনুসারে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর মৃত্যুর পর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক সহস্র মুদ্রা গণিতের গবেষণার জন্য পাইবে।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বাঙ্গালীই মেডেল ও পুরস্কারের জন্য অর্থ দিয়াছেন, প্রায় ১৬০০০৲ টাকা। দাতাদের নাম :—

(১) ডাঃ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
(২) ডাঃ মহেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী
(৩) ডাঃ কালিদাস নন্দীর স্ত্রী
(৪) রামমোহন দের স্ত্রী
(৫) নলিনীনাথ বসু
(৬) মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্ত্রী
(৭) চিন্তামণি ঘোষ
(৮) প্যারীমোহন স্মৃতি (মেডেল) কমীটি
(৯) নীলকমল মিত্র
(১০) উষালতা মুখোপাধ্যায়
(১১) ভূদেব মুখোপাধ্যায়

অন্যান্য প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালীদের দানের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইবে।

১০। **কাশী** জয়নারায়ণ কলেজের জন্য ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল বহু সহস্র টাকা দান করেন।

১১। **কাশীর য়্যাংলো-বেঙ্গলী ইণ্টারমীডিয়েট কলেজ** চিন্তামণি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আজীবন পরিশ্রমের ফল। উহা তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

১২। **কাশীর বাঙ্গালীটোলা হাইস্কুল**, বহু পুরাতন বিদ্যালয়; বাঙ্গালীদের দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত।

১৩। **বাণী বালিকা বিদ্যালয়**, হাইস্কুলে উন্নীত হইয়াছে।

১৪। বেনারস কলেজের প্রবেশদ্বার কাশীর রাজা রাজেন্দ্র মিত্রের অর্থে প্রস্তুত হয়।

কাশীতে বাঙ্গালীদের আর কি কি শিক্ষা-অনুষ্ঠান আছে তাহার তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে।

কাশীর সংস্কৃত কলেজের প্রায় সকল বিভাগে এক কালে বাঙ্গালী অধ্যাপক ছিলেন।

ন্যায় শাস্ত্র, ষড়দর্শন, সাংখ্য, বেদান্ত, কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র, অলঙ্কার, সাহিত্য ইত্যাদি শিক্ষা দিবার জন্য এক সময়ে ১৩।১৪টি বাঙ্গালীস্থাপিত চতুষ্পাঠী ছিল। সেখানে ভারতের সকল প্রদেশের ছাত্রেরা শিক্ষা প্রাপ্ত হইত। এখন অবস্থা কিরূপ তাহা জানা আবশ্যক।

সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে দেখিলাম কাশীতে আর একটি বালিকা বিদ্যালয় বাঙ্গালীদের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। তাহার বিবরণ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক।

১৫। **কানপুর**। কানপুর বালিকা বিদ্যালয় ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের চেষ্টায় ও অর্থে স্থাপিত হয়। এখন উহা ইণ্টারমীডিয়েট কলেজ। শীঘ্রই প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হইবে।

(১৬) কানপুরের সনাতন ধর্ম্ম কলেজের জন্য ইণ্ডিয়ান প্রেসের শ্রীযুক্ত হরিকেশব ঘোষ ও তাঁহার ভ্রাতারা ৩০০০৲ টাকা দিয়াছেন।

(১৭) কানপুর গবর্ণমেন্ট হাইস্কুল শুনিয়াছি গবর্ণমেন্ট স্কুলে পরিণত হইবার পূর্ব্বে বাঙালীদেরই ছিল।

[কানপুরের শ্রীযুক্ত ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় আমাদের চিঠির উত্তরে সেখানকার বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতির যে ইতিবৃত্ত পাঠাইয়াছেন, তাহা নীচে উদ্ধৃত হইল। তিনি নিজের কৃতি যথাসম্ভব গোপন করিয়াছেন। —প্রবাসীর সম্পাদক।]

"১৯০৩ সালে কানপুরে মেয়েদের শিক্ষার জন্য কোন সর্ব্বসাধারণের নিমিত্ত বিদ্যালয় (public school) ছিল না, কেবল একমাত্র ক্রাইষ্ট চার্চ মিশনের প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় ছাড়া। তাহাতে অধিকাংশ বাঙালী মেয়েরাই পড়িত, কারণ তখন এ-প্রদেশের লোকেরা স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী ছিল না। বিধর্মী হওয়ার ভয়ও অন্যতর কারণ। কোন বাঙালী পরিবারের একটি বাল-বিধবা শাশুড়ীর নির্যাতনের তাড়ায় পালিয়ে গিয়ে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ইহাতে অত্রস্থ বাঙালী সমাজ খুবই বিচলিত হ'য়েছিল। কিন্তু ৺মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকটি উৎসাহী বাঙালী মহোদয় সম্যকরূপে উপলব্ধি করেন যে, **মেয়েদের শিক্ষা নিজেদের হাতে রাখাই সমীচীন**। এই সদুদ্দেশ্য সাধনকল্পে তাঁহারা এই বালিকা বিদ্যালয়ের পত্তন করেন। নয়টি বালিকা ও এক জন কাশী হইতে আনীত পণ্ডিত লইয়া ২রা এপ্রিল ১৯০৩ সালে ইহা স্থাপিত হয়। প্রথমে ইহা অবৈতনিক বিদ্যালয় ছিল। খরচের সঙ্কুলান না হওয়াতে, শিশু বালকদেরও নেওয়া হয়েছিল, যাহারা বেতন দিত। এতদ্দেশীয় লোকদের মন আমাদের এই সুপরিচালিত বিদ্যালয়টি দেখিয়া আকৃষ্ট হয় এবং তাঁদের মেয়েদের ভর্ত্তি করিবার আগ্রহও বাড়িতে লাগিল। বিদ্যালয়ের পরিচালকেরা কেবল বাঙালী ছিলেন। এদেশীয় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা ক্রমশঃ উহার সদস্য হইতে লাগিলেন এবং ইহার উন্নতির জন্য ধন মন দিয়া চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যখন দেখিলেন যে বাঙালীরা সমদৃষ্টিতে তাঁহাদের কন্যাদের শিক্ষার জন্য চেষ্টা ক'রছেন। যদিও গোড়ায় তাঁহারা "আরে, ইয়ে তো বঙ্গালিওঁকা স্কুল হয়" বলিয়া তাচ্ছিল্য করিতেন বটে, কিন্তু আমাদের নীতির বশীকরণ শক্তির প্রভাবে তাঁহাদের বৈরীভাবের পরিবর্ত্তে শ্রদ্ধা ও ভালবাসাই পেয়ে আসছি। তবে মহাশক্তিশালী গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের কূটনীতির জন্য আমরা বাংলা শিক্ষার সুবিধা আমাদের মনের মত করিয়া গড়িতে পারিতেছি না। উপস্থিত ৫৩৬ জন ছাত্রীর মধ্যে বাঙালী মেয়ে ১৩০ জন। বালিকা বিদ্যালয় সোসাইটির সদস্যগণের মধ্যে ৪।৫ জন ব্যতীত সকলেই মৃত। মেয়েদের সংখ্যা অধিক হইলে, অভিভাবকদের অনুরোধে উহা বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদীজী উহার নাম রাখেন বালিকা বিদ্যালয়।

"আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয় কেবল বাঙালীর দ্বারাই পরিচালিত। অবশ্য মিউনিসিপালিটি ও এখানকার ধনীরাও সাহায্য করেন। বালিকা বিদ্যালয়ে ছেলেরা স্থান পাইল না দেখিয়া পণ্ডিত সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় সেই সকল ছেলেদের লইয়া অন্য স্থানে আমাদের লাইব্রেরি গৃহে উক্ত স্কুলটির পত্তন করিলেন। উহাই আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয়, এখন হাইস্কুল হইয়াছে। নিজের বাড়ীও হইয়াছে।

"এখানকার গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলটি প্রথমে বাঙালীদের উদ্যোগেই স্থাপিত হয়, ক্রমে হিন্দুস্থানীরাও উহাতে যোগ দেন। মিউটিনির পর যখন যুক্তপ্রদেশের বড় বড় শহরে গভর্ণমেণ্ট দ্বারা পরিচালিত এক-একটি হাইস্কুল খোলা আবশ্যক বিবেচিত হয় তখন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের নিকট হইতে এই স্কুলটি চাহিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহারাও স্বইচ্ছায় দিয়াছিলেন।"

শিমলা, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি নগরে বাঙালীরা প্রভূত শ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া যে-সকল বালক-বালিকাদের বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিল, পাঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানী সদস্য মহাশয়েরা নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া স্কুলগুলি নিজ হস্তে লইয়াছেন। বাঙালীদের পুনরায় ঐ সকল স্থানে নূতন স্কুলের পত্তন করিতে হইয়াছে।

১৮। **লক্ষ্ণৌ কুইন্‌স্ য়্যাংলো-সংস্কৃত স্কুল**— ক্যানিং কলেজের অধ্যাপক শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উহা

স্থাপিত করেন। এখন উহার পরিচালন-ভার এক হিন্দুস্থানী কমীটির হস্তে।

(১৯) **জুবিলী গার্লস হাইস্কুল**—বাঙালীদের দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত।

(২০) লক্ষ্ণৌ ব্বার্ডস ইনষ্টিটিউশন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের কীর্ত্তি। এখন উহা বোধ হয় তালুকদারস্ স্কুলে পরিণত হইয়াছে।

(২১) লক্ষ্ণৌর বালিকা বিদ্যালয়, যাহা এক কালে বাঙালীদের প্রতিষ্ঠান ছিল, এখন হিন্দুস্থানী কমীটির হস্তগত। উহা প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হইয়াছে।

এই বিদ্যালয়গুলির বিবরণ ও অন্যান্য বাঙালী স্থাপিত বিদ্যালয়ের ইতিহাস আবশ্যক।

(২২) **বেরেলী এডবার্ড মেমোরিয়াল স্কুল**—রায় শ্রীশচন্দ্র বসু বাহাদুরের ঐকান্তিক চেষ্টায় স্থাপিত হয়।

(২৩) **দেহরাদুনের** পাবলিক স্কুল এস. আর. দাস মহাশয়ের একনিষ্ঠ পরিশ্রমের ফল। দুঃখের বিষয় তিনি উহার উদ্‌ঘাটন দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

২৪। গাজীপুর হাই স্কুল ও ঝাঁসী ম্যাক্‌ডনেল হাই স্কুলের বাটী নির্ম্মাণে যদুনাথ চৌধুরী (এঞ্জিনীয়ার) মহাশয় অনেক সাহায্য করেন। এই শেষোক্ত স্কুলে গিরীশচন্দ্র দেব ২০০০৲ দান করেন।

২৫। মোরার (গ্বালিয়র) **য়্যাংলো-ভরনাকুলর স্কুলের** স্থাপয়িতা যদুনাথবাবুই। এখন হয়ত' উহা হাই স্কুলে পরিণত হইয়াছে।

২৬। **আলীগড়** কলেজে* 'ল' ক্লাস খুলিবার জন্য সবজজ্ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ই সইয়দ অহমদ সাহেবকে প্রণোদিত করিয়াছিলেন। উহা খোলা হইলে তাঁহারই অনুরোধ যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ আলীগড়ের উকীলগণ ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে আইন শিক্ষা করান। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রকে পদক দান করেন।

যুক্ত প্রদেশের বাঙালী স্থাপিত শিক্ষালয়ের আরও সংবাদ আবশ্যক।

এ্যানী বেসান্টের সেণ্ট্র্যাল হিন্দু কলেজ স্থাপনের সময় উপেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বাঙালী বন্ধুরা তাঁহাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন। উহা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে মিলিত হইবার পর মহামহোপাধ্যায় আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য কিছুকালের জন্য উহার ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। উপেনবাবু বহু বৎসর উহার অবৈতনিক অধ্যাপক ছিলেন।

হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে পণ্ডিত আদিত্যরাম মালবীয়-জীকে পরামর্শ দান দ্বারা অনেক সাহায্য করেন। তাঁহার পুত্র বহুকাল উহার অবৈতনিক অধ্যাপক ছিলেন। শ্যামাচরণ দে অনেক বৎসর উহার অবৈতনিক অধ্যাপক ও রেজিষ্ট্রার ছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শৈশবাবস্থায় উহার সহিত সর যদুনাথ সরকার ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের যোগ থাকায় উহার খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, সর্ রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি উহাতে অনেক টাকা দান করেন। প্রমথনাথ চৌধুরী তাঁহার সমস্ত ফরাসী লাইব্রেরী উপহার দেন।

অন্যান্য বাঙালী দাতাদের নাম চাই।

বিহারের রাজধানী পাটনায় অঘোরকামিনী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (Girls' High School) বালিকাদের একমাত্র শিক্ষার কেন্দ্র ছিল।

বিহারের কোন কোন নগরে টি, কে, ঘোষের একাডেমি ও বাঙালীদের স্থাপিত অন্যান্য স্কুল আছে; যেমন বাঁকিপুরের রামমোহন রায় সেমিনারি।

বিহার সরকার পঞ্চাশ বৎসর পর সম্প্রতি একটা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়াছেন।

রাঁচীতে বাঙালীদের তিন চারটা বালিকা বিদ্যালয় আছে। ঐ সকল শিক্ষালয় হইতে মেয়েরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়। তন্মধ্যে একটি স্বর্গীয়া কমলা বসু (রমেশ দত্তের কন্যা প্রমথনাথ বসুর পত্নী) দ্বারা স্থাপিত।

রাঁচী, পাটনা বাঁকীপুর, ভাগলপুর, মুঙ্গের ও বিহারের অন্যান্য জেলায় বাঙালীরা শিক্ষার জন্য কি করিয়াছেন তাহার বিবরণ আবশ্যক।

পাটনার ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল স্কুল, যাহা এখন বিহার এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হইয়াছে, গুরুপ্রসাদ সেনের চেষ্টায় স্থাপিত হয়।

পাঞ্জাবের উত্তরকোণে, কাশ্মীরের সীমান্তে, রাওলপিণ্ডীতে শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় ডেনিস্ হাই স্কুল স্থাপন করেন ও বহু সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া উহার পাকা বাটী তৈয়ার করিয়াছেন।

শ্রীনগর স্কুল কাশ্মীরের অশেষ কল্যাণসাধক ডাক্তার আশুতোষ মিত্র দ্বারা স্থাপিত হয়।

অন্যান্য প্রদেশেও বাঙালীদের স্থাপিত শিক্ষালয়ের বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে।

* উহা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। এই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করিতে অনেক হিন্দু রাজা মহারাজা ও ধনী বহু অর্থ দান করেন। কিন্তু মানুষের স্মৃতিশক্তি অতি ক্ষীণ ও ধর্ম্মান্ধতার নিকট কৃতজ্ঞতার কোন স্থান নাই।

দিদি

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

মায়ার বয়স আট বৎসর, তার ভাই মুকুলের বয়স সবে চার—পিঠাপিঠি দুই ভাই বোন। তাছাড়া আর কেউ নাই—তবু দুই জনে ঝগড়া মারামারি দিন-রাত লাগিয়াই আছে। মায়া তাহার চারি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে মায়ের কোলে চড়িয়াছে, বুকের দুধ পর্য্যন্ত খাইয়াছে—প্রথম সন্তান তাই বাপ আর মায়ের সকল আদর একা একা নিঃশেষে ভোগ করিয়াছে। কিন্তু হঠাৎ মুকুল আসিয়া তাহার ভাগীদার হইয়া দাঁড়াইল। মায়া প্রথম প্রথম ইহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিত না। মা সব বুঝিতেন, মায়াকে ডাকিয়া কাছে বসাইতেন, আদর করিয়া খোকাকে তাহার কোলে তুলিয়া দিতেন, বলিতেন—বল্ তো মায়া খোকন তোর কে হয়?

মায়া মুখ বাঁকাইয়া জবাব দিত—কেউ না।

মা হাসিয়া বলিতেন—দূর পাগলী—ছোট ভাই।

মায়া রুখিয়া উঠিয়া বলিত—ইস্, ভাই না ছাই।

তার পর হয়ত সহসা দুই হাতে তুলিয়া খোকাকে মায়ের কোলে ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইত—মুকুল ঝাঁকুনি খাইয়া কাঁদিয়া উঠিত।

মা রাগিয়া গালাগালি পাড়িতেন—"পাজি মেয়ে, বাঁদর মেয়ে, লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে।" কিন্তু মায়া তাহা কানেও তুলিত না। মায়ার বাবা সব দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেন, বলিতেন—একটু বুদ্ধি হলে, দেখো সব সেরে যাবে। তাহার মা কিন্তু রীতিমত চিন্তিত হইয়া উঠিতেন, বলিতেন—না, না, হাসির কথা নয়—খোকন যেন ওর দু-চোখের বিষ।

এমনি করিয়া দুই জনে বড় হইতে লাগিল। বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইতে লাগিল ঝগড়া মারামারি—বাপ মায়ের শত চেষ্টাতেও তাহা কমিল না, বরং দিন দিন বাড়িয়াই চলিল।

বাবা আপিস হইতে আসিলে মুকুল গিয়া নালিশ করে—দেখেছ বাবা—মায়া আমার সব পুতুল ভেঙে ফেলেছে।"

বাবা বলেন—মায়া কি?—দিদি না?

মুকুল হাত ঘুরাইয়া বলে—ইস ভারী তো দিদি!

বাবা হাসিয়া বলেন—ছি ছি, ওকথা কি বলতে আছে, দিদি হয় যে।

—দিদি হয় ত পুতুল ভাঙে কেন?

মায়া হয় ত নিকটেই ছিল—ছুটিয়া বাবার কোলের কাছ ঘেঁষিয়া আসিয়া বলিল—ও, ককখনো আমায় দিদি বলে না বাবা—কেবল দিন রাত মায়া—মায়া!"

বাবা মায়াকে কোলের মধ্যে টানিয়া বলিলেন—কিন্তু, তুই তাই ব'লে ওর পুতুল ভাঙবি নাকি?

—মিথ্যে কথা—সব মিথ্যে কথা বাবা!

—তোর কি কি পুতুল ভেঙেছে রে মুকুল?—বাবা জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু মুকুল এক পাশে গাল ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া থাকে—কথার জবাব দেয় না।

বাবা বুঝিতে পারেন—তাহাকে কোলে লওয়া হয় নাই—তাই অভিমান। তাড়াতাড়ি মুকুলকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুমুতে চুমুতে মুখ ভরিয়া দিয়া বলেন—কি পুতুল তোর ভেঙেছে বললি নে? এতক্ষণে মুকুলের মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠে।

—আমার কুকুরের পা ভেঙেছে—মটর আর চলে না—খোকনের হাত ভেঙেছে—

—ইস্ মিথ্যেবাদী—দেখেছিস্ তুই? মায়া গর্জ্জিয়া উঠে।

—না দেখলে কি হ'ল? দেখেছ বাবা ঐ তাকের উপরে ছিল—ও, ওখানে হাত পায়।

মায়া পুনরায় চেঁচাইয়া উঠিল—ইস হাত দিয়ে পেলেই হ'ল—কেন বাবাও তো পায়—মা পায়—নন্দর মা পায়—তারাও ত ভাঙতে পারে। মায়ার মা কি যেন একটা

কাজে এই ঘরে আসিয়াছিলেন। দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ ছেলেমেয়ের কথা-কাটাকাটি শুনিতেছিলেন। এবার মায়াকে একটা ধমক দিয়া বলিলেন—তবে রে পাজি মেয়ে পুতুল আমরা ভেঙেছি না? দুপুর বেলা ও-ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে কি হচ্ছিল শুনি?

মায়ার বাবা হাসিয়া বলিলেন—কেন, তোমাকে ত আসামী ফরিয়াদী কোন পক্ষ থেকেই সাক্ষী মানা হয় নি। মায়া ত ঠিকই বলেছে—আরও যখন অনেকে নাগাল পায় তখন একা ওরই বা দোষ হবে কেন?—আমরাও ত ভাঙতে পারি। সন্দেহের ফল আসামীর প্রাপ্য!

২

সেদিন সারা বাড়ীতে মায়াকে খুঁজিয়া না পাইয়া বাড়ীর ঝি নন্দর মা পথে আসিয়া দেখে, মায়া সেখানে আসিয়া নির্ব্বিবাদে লোকজন গাড়ী ঘোড়ার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নন্দর মা তাহার হাত ধরিয়া বলিল—শীগ্‌গির বাড়ী চল খুকী, তোমার ভয় করে না?

মায়া নির্ব্বিকার ভাবে জবাব দিল—কিসের ভয়?

—কেন, গাড়ী ঘোড়া?

—ইস্ ভারী ত গাড়ী, ভারী ত ঘোড়া—ঐ ত যাচ্ছে সব—ভয় আবার কি?

—যদি ঘাড়ের উপরে এসে পড়ে?

—কেন, চোখ নেই ওদের—পড়লেই হ'ল?

নন্দর মা বুদ্ধি করিয়া বলিল—কিন্তু যদি ছেলেধরা আসে?

—হুঁ, যত সব মিথ্যে কথা তোমার। দূরগ্রাম হইতে বৃদ্ধ ডাক-হরকরা ব্যাগ ঘাড়ে করিয়া বড় পোষ্ট-আপিসে যাইতেছিল, তাহাকে দেখাইয়া নন্দর মা বলিল—ঐ দেখ।

মায়ার সব বীরত্ব এবারে একেবারে শেষ হইয়া গেল—এক দৌড়ে গিয়া বাড়ীর ভিতরে ঢুকিল।

বিকালবেলা রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া নন্দর মা বাটনা বাটিতেছিল, নিকটে আর কেহ ছিল না, মায়া চুপি চুপি তাহার পিঠের কাছে গিয়া বসিয়া ডাকিল—নন্দর মা!

নন্দর মা জবাব দিল—কেন রে খুকী?

—আচ্ছা তখন ঐ যাদের কথা বললে, সত্যিই কি ওরা ছেলে ধরে?

নন্দর মা হাসি দমন করিয়া জবাব দিল—নয়ত কি? যারা সব দুষ্টু ছেলেমেয়ে তাদের ধরে ঐ পিঠে-ঝুলান বস্তার মধ্যে ক'রে নিয়ে যায়।

—মুকুলটা বড্ড দুষ্টু, নন্দর মা। মা'র কাছে আমার নামে মিথ্যে করে লাগিয়ে মার খাওয়ায়।

নন্দর মা হাসিয়া জবাব দিল—বটে! আর তুমি?

—আমি কি করলাম? সেই যে তুমি রাস্তায় বেড়াতে মানা করলে—আর আমি অমনি বাড়ীর ভিতরে চলে এলাম। মুকুল কি তোমার কথা শোনে? রাতদিন আমার সঙ্গে ঝগড়া করে, মারামারি করে। মা-ও ত আমায় দেখতে পারে না ওরই জন্যে—মা কি আর আমায় আগের মত আদর করে, না ভালবাসে?

তার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আরও গলা খাটো করিয়া বলিল—আচ্ছা নন্দর মা, তুমি যদি আমার একটা কাজ করে দাও—তোমায় অনেক পয়সা দেব।

নন্দর মা'র কৌতূহল বাড়িয়া চলিল—কত পয়সা?

—সে অনেক—পাঁ-চ-টা।

—ও, তা হ'লে আর কম কি! কিন্তু তোমার কাজটা কি খুকু?

এবার মায়া কয়েকটা ঢোক গিলিয়া লইয়া বলিল—আচ্ছা, মুকুলকে ছেলে-ধরাদের কাছে ধরিয়ে দিলে হয় না?

—ওমা, কি হিংসুটে মেয়ে গো—সবুর কর মাকে সব বলে দিচ্ছি।

মায়া আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়াইল না। একেবারে ছুটিয়া নীচে নামিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে নন্দর মা নীচে আসিয়া দেখে—মায়া তাহার ঘরের এক কোণে বসিয়া চোখ রগড়াইয়া রগড়াইয়া কাঁদিতেছে। নন্দর মা মায়াকে কোলে তুলিয়া লইয়া চোখ মুছাইয়া বলিল—ছিঃ, কাঁদছিস কেন খুকী।

মায়া তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া বলিল—তুমি মাকে বলে দিও না, নন্দর মা—মা তা হ'লে আমায় মারবে।

—হেঁ, তাই আমি বলতে গেলাম আর কি? তুমি আর কেঁদ না। মুকুল একটুও ভাল নয়—কথা শোনে না—শুধু ঝগড়া করে, মারামারি করে। কাল দেব ওকে চুপি চুপি ছেলেধরার কাছে ধরিয়ে। যাও তুমি এখন খেলা করগে।

রাত বারটা বাজিয়া গিয়াছে। ওঘরে মায়ার মা, বাবা ও মুকুল সকলে একসঙ্গে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নীচের ঘরে নন্দর মা-ও শুইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ দরজার কাছে খট্ করিয়া একটি শব্দ হইতেই নন্দর মা'র ঘুম ভাঙিয়া গেল। রাস্তার বাতির আলো ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল—তাহারই আধ-আলো আধ-অন্ধকারে নন্দর মা দেখিল তাহার ঘরে যেন কে আসিয়া ঢুকিল। নন্দর মা অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিজলী বাতির 'সুইচ' টিপিল। বাতির আলোয় চাহিয়া দেখে, মায়া অপরাধীর মত তাহার বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া আছে।

নন্দর মা তাহাকে হাত বাড়াইয়া টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি রে খুকী, তুই এ-সময়ে এখানে কেন?

মায়া কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া ঢোক গিলিয়া বলিল—একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলাম নন্দর মা।

—এত রাত্রে কি কথা, শুনি?

—আচ্ছা, ঐ ওরা ছেলে ধরে নিয়ে গিয়ে কি করে বলতে পার?

নন্দর মা হাসিয়া বলিল—এই কথা জিজ্ঞেস করতে এত রাত্রে ছুটে এসেছ? ধন্যি মেয়ে বাপু! ওরা ছেলে ধ'রে নিয়ে গিয়ে আঁধার ঘরে বন্ধ করে রাখে।

—খেতে দেয় কি?

—কিচ্ছু না।

—রাত্রে শোয় কোথায়?

—কেন মাটিতে।

মায়া আর কোন প্রশ্ন না করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তার পরে বলিল—তবে কাজ নেই নন্দর মা।

—কিসে কাজ নেই?

—মুকুলকে কাল ধরিয়ে দিও না।

—কেন, ও যে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে, মারামারি করে, দেখতে পারে না।

—তা ত করে। কিন্তু ওরা যে অন্ধকার ঘরে বন্ধ ক'রে রাখে, খেতে দেয় না, রাত্রে মাটিতে শুতে দেয়।

—তাতে তোর কি?

—মুকুল যে অন্ধকার ঘরে শুতে ভয় পায়—একবেলা খেতে না পেলে কেঁদে ভাসায়—মার 'কাছ ছাড়া কোন দিন শোয় না।

—সেই তো ভাল—যেমন দুষ্টু তেমন শাস্তি হোক।

—মা যে তা হ'লে কাঁদবে—আমারও যে কান্না পাবে। বলিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া মায়া কাঁদিয়া ফেলিল। নন্দর মা তাহার গালে চুমু খাইয়া বলিল—বেশ তাই হবে—এই না লক্ষ্মীমেয়ের মত কথা।

৩

ইহার মাসখানেক পরে, এক দিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া মায়া ও মুকুল একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। মায়ের রাত্রি হইতে যেন পেটে কিসের একটা বেদনা হইয়াছে—তিনি যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছেন। এক জন ডাক্তার আসিয়া মাকে পরীক্ষা করিতেছেন। নন্দর মা স্টোভ ধরাইতেছে মায়ের পেটে গরম জলের সেক দিতে হইবে। তার পর ডাক্তারখানা হইতে কত রকমের ঔষধ আসিল—আরও দুই-এক জন আত্মীয়-স্বজন মাকে শুশ্রূষা করিতে আসিলেন, কিন্তু সারাটা দিনের ভিতরে মায়ের পেটের বেদনা একটুও কমিল না। মায়া ও মুকুল কেহই আর ভয়ে মায়ের কাছে ঘেঁষিতে সাহস করিল না। মায়ের মুখ-চোখ এই একটা দিনে একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। তিনি না-পারিতেছেন শুইতে, না-পারিতেছেন বসিতে।

আরও বড় ডাক্তার আসিল—নূতন নূতন ঔষধ আসিল—কিন্তু কোনই ফল হইল না। শেষটায় সন্ধ্যা-বেলা ঠিক হইল ঔষধে কিছু হইবে না—মাকে হাসপাতালে যাইতে হইবে—পেটে অস্ত্র করিতে হইবে।

সন্ধ্যাবেলা মোটর গাড়ী দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল—বাবা ও আরও কয়েক জন একখানি 'স্ট্রেচার' লইয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন—মা যাইবেন।

অসহ্য যন্ত্রণার ভিতরেও তিনি একবার মুকুলকে বুকে টানিয়া লইলেন—মুকুল ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল। তার পর মায়ার পিঠের উপরে হাত রাখিয়া বলিলেন, "ভাল হয়ে থাকিস্ মা—মুকুলকে দেখিস্, ও ছোট ভাই—ওকে মারিস নে—আদর করিস, ভালবাসিস। কেমন বাস্‌বি ভাল?"

মায়া কোন রকমে মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল—তার পর হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে কোন প্রকারে 'স্ট্রেচারে' চড়িয়া, মোটরে মা চলিয়া গেলেন। বাবা মায়ের সঙ্গে গিয়াছিলেন—বাসায় আর কেহ নাই—এক নন্দর মা। এমন যে দুরন্ত মুকুল, সেও আর একটা কথা কহিতেছে না—বিছানার এক পাশে গুম্ হইয়া বসিয়া আছে। মায়া ভাবিতেছে—মা কাল সন্ধ্যাবেলাও তো দিব্যি ভাল ছিলেন—তাহাদিগকে নিজ হাতে খাওয়াইয়াছেন—ঘুম পাড়াইয়াছেন—আর হঠাৎ এই এতটুকু সময়ের মধ্যে তাঁহার এমন কি একটা হইয়া গেল! নন্দর মা তাহাদিগকে খাওয়াইয়া দিল। মুকুল আজ খাইবার সময় একটুও কাঁদিল না, একটুও আপত্তি করিল না—দিব্যি গ্রাসে গ্রাসে ভাত খাইয়া গেল। মায়া তাহাকে নিজের কোলের মধ্যে করিয়া শুইয়া, পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে উভয়ে ঘুমাইয়া পড়িল।

৪

সকালে মায়া আর মুকুল একসঙ্গে ঘুম হইতে উঠিল, আজ রাত্রে তাহাদের ঘরে নন্দর মা শুইয়াছিল। বাবা এখনও হাসপাতাল হইতে ফেরেন নাই। সারা বাসাটি আজ একেবারে নিস্তব্ধ—নন্দর মা কেবল এদিক-ওদিক ঘুরিতেছে—ঠাকুর এখনও রান্না চড়ায় নাই। মায়া শোবার ঘরে চুপচাপ বসিয়া ছিল—হঠাৎ পাশের ঘর হইতে মেঝের উপরে কি যেন সব পড়িয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া শব্দ হইল। মায়া ছুটিয়া গিয়া দেখে মুকুল তাকের নিকটে চেয়ারের উপরে দাঁড়াইয়া আছে, আর তাকের উপর হইতে তাহার খেলার বাক্স সমস্ত পুতুল-সমেত মেঝেয় পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে।

যাঃ, বড় চীনামাটির পুতুলটির গিয়াছে গলা ভাঙিয়া—আলুর খোকাটির একখানি হাত একেবারে দুমড়িয়া গিয়াছে! ক্ষতির পরিমাণের দিকে তাকাইয়াই মুকুলের প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল, তার পর মায়াকে দরজার কাছে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া একেবারে ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—আমি ফেলি নি—অমনি অমনি পড়ে গেল।

মায়া তাহার নিকটে আসিয়া বলিল—তা থাক্ গে। তুই নেমে আয় চেয়ার থেকে—পড়ে যাবি।

মুকুল ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিল। মায়া পুতুলগুলি সব কুড়াইতে কুড়াইতে বলিল—ছি, ছি, করলি কি দেখ ত—বড় পুতুলটার গলা একেবারে ভেঙে গেছে। পুতুল চাস্ তা আমায় বলিস্ নি কেন? নে এই বাক্সসুদ্ধ সব পুতুল তোকে দিয়ে দিলাম।

মুকুল একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল—মায়া তাহাকে একটুও মারিল না—এমন কি গালাগালিটি পর্য্যন্ত করিল না, বরং বাক্সসমেত তাহার সমস্ত পুতুলগুলি তাহাকে দিয়া দিল!

মুকুল ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করিল—তুই আর পুতুল খেলবি না মায়া?

মায়া হাসিয়া বলিল—না রে আর পুতুল খেলবো না, আমি যে বড় হয়েছি।

—কত বড় হয়েছিস?

—অনেক বড়।

তার পর মুকুলকে কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিল—একটা কথা ভাই—আজ থেকে আমাকে দিদি ব'লে ডাকবি, কেমন ডাকবি ত?'

মুকুল মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। চীনামাটির খোকনের মাথাটি মুকুলের পায়ের কাছে গড়াগড়ি যাইতেছিল, সেটি তুলিয়া লইয়া বলিল—ইস্, খোকনের মাথাটি ভেঙে গেল!

মায়া বলিল—কেন আমাকে আগে বললি নে—ওটাও ত তোকেই দিয়ে দিতাম।

সকাল-বেলা আহারে বসিয়া মুকুলের মায়ের কথা মনে পড়িয়া গেল। নন্দর মা, মায়া দুজনে মিলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া তবে মুকুল

থামিল। খাওয়া হইয়া গেলে মায়া চুপি চুপি নন্দর মাকে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা হাসপাতাল কোথায় নন্দর মা?

নন্দর মা অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল—ঐ গঙ্গার ওপারে। গঙ্গার ওপারে কেবল সারি সারি বড় বড় বাড়ী আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে—মায়াদের বারান্দা হইতে স্পষ্ট দেখা যায়। মায়া কিছুক্ষণ সেই দিকে বিহ্বলের মত তাকাইয়া রহিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। বেলা গোটা-দশেকের সময় বাবা বাড়ী আসিলেন; মুকুল ও মায়াকে কাছে ডাকিয়া আদর করিলেন—তার পর আবার তখনই স্নান-আহার করিয়া হাসপাতালে রওনা হইলেন।

নন্দর মা বলিল—রাত্রেই নাকি মায়ের পেটে অস্ত্র করা হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞান তাঁহার এখনও ফিরিয়া আসে নাই—সেই রাত্রি হইতে এখন পর্য্যন্ত অসাড়ে ঘুমাইতেছেন। মায়া বারান্দার রেলিং ধরিয়া গঙ্গার ওপারের বাড়ীগুলার দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল—সে যদি কোন প্রকারে একবার হাসপাতালে যাইতে পারিত—দেখিয়া আসিত মা কেমন করিয়া পড়িয়া আছেন। আজ তাঁহার মুখ চোখ হয়ত আরও শুকাইয়া গিয়াছে। কাল সে বাবাকে বলিয়া নিশ্চয় তাঁহার সহিত গিয়া মাকে দেখিয়া আসিবে।

পরের দিন সকালে নন্দর মা বারান্দায় বসিয়া কাঁদিতেছিল। মায়া ও মুকুল কাছে আসিতেই সে তাহাদের কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া ক্রন্দনের বেগ বাড়াইয়া দিল। নন্দর মা বহু পুরাতন ঝি—মাকে সত্যই ভালবাসিত। মায়া কি মুকুল কেহই কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

মায়া জিজ্ঞাসা করিল—কাঁদ্‌ছ কেন নন্দর মা?

—মা যে ছেড়ে গেছেন খুকী—আহা কি হবে গো—তোদের কে দেখবে গো!

মায়া তবু বুঝিতে পারিল না—ছেড়ে কোথায় গেছেন নন্দর মা?

—মা যে একেবারে ছেড়ে গেছে রে—মরে গেছে।

মায়ার এই আট বৎসর বয়সে, সে মরিতে কাহাকেও দেখে নাই। মরিয়া যাওয়া যে কোথায় যাওয়া তাহা সে কেমন করিয়া বুঝিবে?

মাঝে মাঝে রাত্রে শুইয়া মা তাহাকে প্রশ্ন করিতেন—আচ্ছা আমি যদি মরে যাই খুকু, তুই কার কাছে থাকবি? সে অমনি জবাব দিয়াছে—কেন বাবার কাছে। তুমি আবার দু-দিন পরেই ফিরে আস্‌বে ত? মা কিছু না বলিয়া শুধু মুখ টিপিয়া হাসিতেন। মায়া হয় ত পুনরায় বলিয়া উঠিত—তুমি বুঝি সে-বারের মত মামার বাড়ী যাবে—আমাকে সঙ্গে নেবে না? সে কক্ষনো হবে না মা—আমি তোমার সঙ্গে যাব। কিন্তু এবারও কি মা হাসপাতাল হইতে ভাল হইয়া মামার বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন? কিন্তু নন্দর মা কাঁদে কেন? বাবা না কি রাত্রে বাসায় আসিয়াছিলেন—তিনিই নন্দর মাকে সব বলিয়া গিয়াছেন।

—বাবা কোথায় গেলেন নন্দর মা?

—তিনি যে মাকে শ্মশানে নিয়ে গেছেন।

—সেখানে কেন?

—শেষ কাজ করতে হবে যে।

—শেষ কাজ কি?

—মায়ের দেহ পোড়াতে হবে যে।

—পোড়াতে হবে? লাগবে না?

—মরে গেলে আর একটুও লাগে না।

—মা কি আর ফিরে আস্‌বে না নন্দর মা?

—আর কি কখনও ফিরে আসে রে পাগলী।

মায়া ভাল করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না, কিন্তু নন্দর মার কোলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। মুকুল শুধু বড় বড় চোখ করিয়া একবার মায়ার দিকে, আবার নন্দর মার মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। কতক্ষণ পরে নন্দর মা নীচে গিয়াছে। মায়া আজও বারান্দায় রেলিং ধরিয়া ওপারের বাড়ীগুলার দিকে চাহিয়া আছে। মা আর আসিবে না, তাহাদের একেবারে ভুলিয়া থাকিতে পারিবে! মুকুল যে মাকে ছাড়া এক দণ্ড থাকিতে পারে না! তাহার কথা, মুকুলের কথা একটি বারের জন্যও কি মায়ের মনে পড়িবে না!

পিছন হইতে মুকুল ডাকিল—দিদি।

মায়া তাহাকে দুই হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল—কেন রে!

—মা কোথায় গেছে দিদি!

মায়া দুই-এক বার ইতস্ততঃ করিয়া ওপারের দিকে আঙুল তুলিয়া দেখাইল—ঐ দিকে।

—আমি মার কাছে যাব দিদি।

মায়া তাহার কাঁধের উপর মুকুলের মাথাটি রাখিয়া বলিল—ছিঃ ভাই, ওকথা বলতে নেই। মুকুল ততক্ষণ ফুলিয়া ফুলিয়া কান্না সুরু করিয়া দিয়াছে। বাবা কখন নিঃশব্দে আসিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন—মায়া ও মুকুল জানিতেও পারে নাই।

শ্যামের বিভিন্ন জাতীয় অধিবাসী

থাইল্যাণ্ড ও পূর্ব্ব-এশিয়া

শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক

দুনিয়ার একমাত্র স্বাধীন বৌদ্ধ-রাষ্ট্রে অহিংসাপন্থী নরনারীর প্রাণে হিংসার বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কিছু দিন যাবৎ থাইল্যাণ্ড এবং ইন্দোচীনের মধ্যে একটি সীমানা-সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব্ব-এশিয়ায় এক ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে। এই আয়োজনে থাই জাতীয়তা ও ব্রিটিশ ফরাসী এবং জাপানী রাজনীতির তাৎপর্য্য কি, এই প্রবন্ধে তাহার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

একটি বৌদ্ধ মন্দির

থাইল্যাণ্ড নামটি নূতন, এই দেশটির পুরাতন নাম ছিল শ্যামরাজ্য। এই শ্যাম নামটির সঙ্গে আমাদের বৈষ্ণব-সাহিত্যের কোন যোগাযোগ নাই, ইহার জন্মকথার ইতিহাস সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। এই দেশটির নাম পরিবর্ত্তনের জন্য দায়ী এখানকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে আধুনিক জাতীয়তাবাদের প্রচলন। থাই নামে একটি জাতি এই জনপদে প্রাচীন কাল হইতে বসবাস করিয়া আসিতেছে, তাহাদেরই নাম অনুসারে এই দেশটির নাম থাইল্যাণ্ড হইয়াছে।
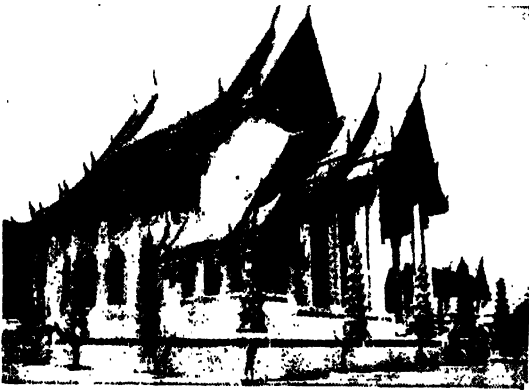
দীর্ঘকাল যাবৎ ফরাসী ইন্দোচীন এবং শ্যামরাজ্যের মধ্যে সীমানা লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদ চলিয়া আসিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্যাম এবং ইন্দোচীনের মধ্যে এই ব্যাপার লইয়া একাধিক বার যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আজ এই দুইটি প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, এক দিক হইতে তাহা কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণের সঙ্গে জড়িত। সেই হিসাবে তাহার নূতনত্ব কিছুই নাই, কারণ ফরাসীর কাছে শ্যাম তাহার যে-প্রদেশগুলি হারাইয়াছিল আজ সুযোগ বুঝিয়া তাহা পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছে।

শ্যামের নর্ত্তক

কিন্তু নূতনত্ব এইখানে যে, বর্ত্তমান কলহের মীমাংসার জন্য মধ্যবর্ত্তিতা করিতেছে জাপান। ফ্রান্স যখন জার্ম্মেনীর হাতে পরাজিত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যখন আসন্ন মহাযুদ্ধের প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্ন এবং আত্মরক্ষার আয়োজনে ব্যাপৃত, ঠিক সেই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় শ্বেতাঙ্গ-শাসিত জনপদগুলির কেন্দ্রস্থলে সাম্রাজ্যবাদী জাপানের এই মধ্যবর্ত্তিতার জন্য উৎসাহের পশ্চাতে কোন গোপন স্বার্থ লুকাইয়া রহিয়াছে কি না তাহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা হইতে পারে। খবরের কাগজের সংবাদে কিছু দিন যাবৎ প্রকাশ হইতেছে যে, হিটলার যখন আগামী বসন্তকালে ইউরোপে তাহার সমর-অভিযান সুরু করিবে, সেই সময়ে এশিয়ায় জার্ম্মেনীর বন্ধু জাপান ইংরেজ, ফরাসী এবং আমেরিকা দ্বারা শাসিত এবং রক্ষিত প্রদেশগুলিতে যুদ্ধ বাধাইবে এবং শত্রুপক্ষীয় শক্তিগুলিকে বিব্রত করিয়া তুলিবে। উদ্দেশ্যটি এই যে, ইউরোপের যুদ্ধে আমেরিকা ইংরেজকে যে সাহায্য করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে, প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধ হইলে আমেরিকা তাহা করিতে পারিবে না, কারণ দক্ষিণ-এশিয়ায় আমেরিকার স্বার্থকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার নিজেরই একটা বৃহৎ সামরিক প্রয়াসের আয়োজন করিতে হইবে। ইহা হয়ত জার্ম্মেনীর অভিপ্রায়। জাপানের অভিপ্রায় স্বতন্ত্র। জাপান হয়ত মনে করিতে পারে যে, ইংরেজ যখন আত্মরক্ষার জন্য নিজের সমস্ত শক্তিটুকু ইউরোপ, আফ্রিকা এবং মধ্য-প্রাচ্যের যুদ্ধে নিয়োজিত করিবে, সেই সুযোগে সুদূর প্রাচ্যে এবং দক্ষিণ-এশিয়ার ইংরেজের আধিপত্যকে অপসারিত করিয়া আপন আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ হইবে। জাভা, সুমাত্রা, মালয়, ব্রহ্মদেশ এই সব কয়টি প্রদেশের দিকেই জাপানের দৃষ্টি রহিয়াছে। মালয় ও জাভার রবার এবং টিন, ব্রহ্মদেশের পেট্রোল এবং সমস্ত অঞ্চলটির বিভিন্ন প্রকারের খনিজ সম্পদের প্রতি জাপানের লোভ অতিমাত্রায় বেশী, কারণ আধুনিক যে-কোন মহাশক্তিই এই সব অত্যাবশ্যক কাঁচা মাল ব্যতিরেকে তাহাদের সামরিক প্রাধান্য কিংবা শিল্প-প্রচেষ্টার অগ্রগতি বজায় রাখিতে পারে না।

একটি কুটীর

ল্যাণ্ডের অধীনে চলিয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, ইন্দোচীনের বিভিন্ন অঞ্চলে জাপানী সামরিক প্রয়োজন উপযোগী কয়েকটি ঘাঁটি ছাড়িয়া দিতে হইবে। এইরূপ সর্ত্তে ইন্দোচীন স্বীকৃত হইলে তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করা ভবিষ্যতে কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। অন্য দিকে সন্ধির সর্ত্তে রাজী না হইলে জাপানী নৌ-বাহিনী এবং বিমান-বাহিনীর আক্রমণে ইন্দোচীনের অস্তিত্ব হয়ত লোপ পাইতে পারে। এই প্রবন্ধ ছাপার হরফে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই হয়ত ইন্দোচীনের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, চীনের যুদ্ধে ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া ইংরেজ চীনের যে সাহায্য করিতেছে, জাপান তাহার প্রতিরোধ করিতে চায়। চীনযুদ্ধের পরিসমাপ্তির জন্য এবং দক্ষিণ-এশিয়ায় অভিযানের জন্য জাপানের একান্ত প্রয়োজন ইন্দোচীন এবং থাইল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত করা। থাইল্যাণ্ড এবং ইন্দোচীনের যুদ্ধে জাপানী মধ্যবর্ত্তিতার তাৎপর্য্য এইটুকু। আজ পর্য্যন্ত (৫ই মার্চ) যতটুকু খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, ভিশিতে ফরাসী-কর্ত্তৃপক্ষ যদি সন্ধির সর্ত্তগুলি গ্রহণ করিয়া না লয় তবে ৭ই মার্চ মধ্যরাত্রির পরে জাপান এবং থাইল্যাণ্ড তাহাদের আপন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিবে। সন্ধির সর্ত্তগুলি কি তাহা এখনও সঠিক জানা যায় নাই, কিন্তু তাহা মানিয়া লইলে ইন্দোচীনের স্বাধীনতার উপর যে অনেকটা হস্তক্ষেপ করা হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ, ইন্দোচীনের পশ্চিম সীমান্তে কম্বোজ প্রদেশের খানিকটা জায়গা থাই-

এই ত গেল জাপানী পদ্ধতির কথা। কিন্তু থাইল্যাণ্ড জাপানী পদ্ধতির সঙ্গে সহযোগিতা করিতেছে কেন, সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে। ফরাসীকে শ্যামরাজ্য কখনও মিত্র ভাবে দেখিতে পারে নাই তাহা সত্য, কারণ ইন্দোচীনের সঙ্গে শ্যামের আধুনিক বিবাদ-বিসম্বাদ বস্তুতঃ ফরাসীদের জন্যই। অবশ্য বহু শতাব্দী পূর্ব্বেও, বণিক্ শ্বেতাঙ্গদের এশিয়ার উপকূলে পদার্পণ করিবার অনেক

লাও-নারী

আগে, শ্যাম, কম্বোজ এবং আন্নাম প্রদেশের বাসিন্দাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। প্রাচীন অযোধ্যার (থাইল্যাণ্ডের অন্তর্গত) রাজবংশের সঙ্গে কম্বোজের নৃপতিদের যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই ছিল। এই যুদ্ধে প্রাচীন শ্যাম এবং কম্বোজের ইতিহাসের প্রচুর

শ্যামের মানচিত্র

নিদর্শন এবং তথ্য চিরকালের মত ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আজও তাই শ্যামের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ত্তমান নাই, কিম্বা গবেষণার দ্বারাও কখনও তাহা উদ্ধার পাইবে কিনা বলা শক্ত। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে ওলন্দাজ এবং পর্ত্তুগীজ বণিক্‌রাই প্রথম শ্যামরাজ্যে পদার্পণ করিয়াছিল। ক্রমশঃ ইংরেজ এবং ফরাসী উপনিবেশের অগ্রদূত এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্যামের রাজা ইংলণ্ডের রাজার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিল। সেই সময় (প্রথম জেমস্‌-এর আমল) হইতে অনেক ইংরেজ ক্রমশঃ শ্যামরাজ্যে সরকারী দপ্তরে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হইতে থাকে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে কাহারও কাহারও হিংসার উদ্রেক হয়। ফলে ঈষ্ট

ফায়া থাই প্রাসাদ, ব্যাঙ্কক

ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেনা শ্যামদেশ আক্রমণ করে। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মেরগুই শহরে থাই সৈন্যের দ্বারা যে হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় তাহা এই আক্রমণের প্রত্যুত্তর হিসাবে নৃশংস। ইহার পর হইতে শ্যামরাজ্য এবং ইংরেজদের মধ্যে অনেক কাল পর্য্যন্ত সদ্ভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। প্রভূত চেষ্টার পরে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ইংরেজদের সঙ্গে শ্যামের সন্ধি স্থাপিত হয়। অতঃপর ফরাসীরা যখন ইন্দোচীন দখল করিল তখন ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে শ্যামে প্রভুত্ব বিস্তার করিবার জন্য প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং পরস্পরের আধিপত্যের সীমানা নির্দ্দিষ্ট হয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীর সঙ্গে শ্যামের যে চুক্তি হয় তাহাতে কম্বোজ এবং বাটাম্বাঙ ইন্দোচীনকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং তাহার পরিবর্ত্তে ক্রাচ্ এবং ডান্‌সাই প্রদেশগুলি শ্যামের অধীনে আসে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্যাম জার্ম্মেনী এবং অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আধুনিক কালে শ্যাম বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে; তন্মধ্যে এই কয়টি প্রধান—আমেরিকা (১৯২০),

শ্যামের অরণ্যানী। কয়েকটি হাতীর সাহায্যে বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড টানিয়া লওয়া হইতেছে

জাপান (১৯২৪), ডেন্‌মার্ক, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, পর্ত্তুগাল এবং স্পেন (১৯২৫)। ১৯২৫ সনে জার্ম্মেনী এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সম্প্রতি রুশিয়ার সঙ্গেও শ্যামের একটি বাণিজ্যচুক্তি কায়েম হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, থাইল্যাণ্ড সকল দেশের সঙ্গেই মিত্রতা স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং তাহাদের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

থাইল্যাণ্ডে ইংরেজ, ফরাসী এবং জাপানী প্রতিযোগিতা প্রধানতঃ আর্থিক। এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ এবং খনিজ সমৃদ্ধি প্রচুর। এখানে কয়লা, লোহা, টিন, দস্তা, টাঙ্গষ্টেন, সোনা, রূপা ও মণিমুক্তার খনি আছে। ইহা ছাড়া এখানে প্রচুর পরিমাণে ধান এবং সেগুন কাঠ উৎপন্ন হয়। অনেক বিদেশী বণিক্ কোম্পানী এখানে আমদানী-রপ্তানির কারবার করিতেছে, চাষের কাজের জন্য জমি ইজারা লইয়াছে এবং শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য কলকারখানা খুলিয়াছে। তন্মধ্যে ইংরেজদের সংখ্যা অল্প নয়। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায় বর্ত্তমান জাপানী রাষ্ট্রের আর্থিক পদ্ধতি সুনিশ্চিত। তাহারা এই অঞ্চল হইতে শ্বেতাঙ্গের প্রভাবকে বিদূরিত করিতে চায়, নিজেদের সুবিধার জন্যই। চীনে যাহা হইয়াছে, ইন্দোচীনে, থাইল্যাণ্ডে, মালয়ে এবং অন্যান্য দেশেও যে তাহা হইতে পারিবে না তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। থাইল্যাণ্ড জানে যে জাপানের বিরুদ্ধে তাহার যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা নাই, ক্ষমতা থাকিলেও যুদ্ধে জয়ী হইবার ভরসা কম। সেই কারণে হয়ত থাইল্যাণ্ড জাপানের সঙ্গে মিত্রতার সম্বন্ধ রাখিতে চায়। দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক থাইল্যাণ্ডে জাতীয়তাবাদের আদর্শগুলি জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই আদর্শবাদ বিদেশ হইতে ধার করা হইলেও থাইল্যাণ্ডের আধুনিকতায় বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছে। থাইল্যাণ্ডের অধিবাসিগণ মঙ্গোল-জাতীয়; সেই কারণে হয়ত তাহারা পূর্ব্ব-এশিয়ায় জাপানের নেতৃত্ব মানিয়া লইতে চায়, কিংবা শ্বেতাঙ্গ-নেতৃত্ব অপেক্ষা বেশী পছন্দ করে। অথচ প্রকাশ্য ভাবে থাইল্যাণ্ড ইংরেজের সঙ্গেও কোন প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদের পক্ষপাতী নয়।

শ্যামদেশের কারেন-অধ্যুষিত পল্লী। এই সব পল্লীতে বাঁশের ঘর প্রচুর

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান বালক-রাজা আনন্দ মহী-দলের পিতা প্রজাধিপক যখন তাঁহার সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গিয়া প্রবাসী হন, তখন তাহার সঠিক কারণটি কি তাহা লইয়া অনেক জল্পনা-কল্পনা হইয়াছিল।

সেই কারণটি আজও নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। তবে ইহা সত্য যে প্রজাধিপক ব্রিটেনের খুব বন্ধু ছিলেন। তিনি বিলাতে তাঁহার ছাত্রজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি তেমন অত্যাচারী নৃপতি ছিলেন বলিয়াও জানা যায় না। কিংবা তাঁহার রাজত্বকালে কোন তীব্র প্রজা-বিদ্রোহ হয় নাই। সুতরাং তাঁহার সিংহাসন বর্জ্জন করার উপযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অনেকে বলেন যে, সেনা-বিভাগের সহিত তাঁহার মতদ্বৈধ হইয়াছিল, এবং থাইল্যাণ্ডে সেনা-বিভাগের নেতাদের ক্ষমতা এত বেশী যে

ঙ্কি বাং টঙের জলপ্রপাত

তাহাকে উপেক্ষা করিয়া যে-কোন রাজার পক্ষেই প্রভুত্ব করা সহজ নহে। থাইল্যাণ্ডের সেনা-বিভাগের সঙ্গে জাপানী সমর-বিভাগের কোন যোগাযোগ আছে কি না এবং থাকিলেও তাহা কি ধরণের জানা যায় না।

থাইল্যাণ্ড আমাদের প্রতিবেশী হইলেও আমাদের খুব পরিচিত নহে। তোকিও কিংবা পেইপিং-এর নগরবাসী আমাদের কাছে ব্যাঙ্ককের নগরবাসী অপেক্ষা বেশী পরিচিত। অথচ থাইল্যাণ্ডের অধিবাসী হিন্দুস্থানের

শ্যামের নদীতে মৎস্য ধরা হইতেছে

অধিবাসীদের অনেক বেশী আত্মীয়। ভারতবর্ষের ইতিহাস থাইল্যাণ্ডের ইতিহাসের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত, এবং একে অন্যকে খুব গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। এক কথায় পণ্ডিতগণ থাইল্যাণ্ডকে বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ও ভাষা, প্রাচীন ভাবধারা, বৌদ্ধধর্ম্ম, শ্যামের সংস্কৃতি এবং জাতীয় জীবনে যে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার সহস্র নিদর্শন শ্যামের জাতীয় সাহিত্যে, শিল্পকলায়, চিত্রে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। সামাজিক রীতিনীতিতে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে সর্ব্বত্রই ভারতবর্ষের প্রতিভা শ্যামের সংস্কৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে গৈরিক-বেশধারী বৌদ্ধ যাজক-সম্প্রদায় যে-দিন মেকং নদীর শস্যশ্যামল তীরে উপনীত হইয়া তাহাদের ধর্ম্মের বাণী উচ্চারণ করিল, শ্যামের ইতিহাসে সেই দিন হইতে একটি নূতন যুগের সূচনা হইল। তাহার পরে কত যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে; সিংহল, ব্রহ্মদেশ, জাভা, বালি তাহাদের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে নাই, কিন্তু শ্যাম আজও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিনিধি হিসাবে দক্ষিণ-এশিয়ায় নিজের প্রাধান্য বজায় রাখিয়াছে। শুধু যে বৌদ্ধধর্ম্মই

শ্যাম ভারতবর্ষ হইতে পাইয়াছে তাহা নয়, হিন্দু ধর্ম্মেরও বহু প্রভাব তাহার আচার-ব্যবহারে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে, সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্যামের এক কোটি লোক সংখ্যার মধ্যে ৩৮ লক্ষ থাই, ৩৬ লক্ষ লাও, ৫ লক্ষ চীনা, আর ৪ লক্ষ মালয়, কম্বোজ ও ব্রহ্মদেশীয়। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছাড়াও অন্য সম্প্রদায়ের লোক থাইল্যাণ্ডে রহিয়াছে; মালয়-দেশীয়রা অধিকাংশই মুসলমান; খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ও একটি রহিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম শ্যামের সংস্কৃতিতে, চিন্তায়, এবং জাতীয় ভাবধারায় গভীর ভাবে প্রবেশ করিয়া থাকিলেও গ্রাম্য অঞ্চলে এখনও কুসংস্কারাচ্ছন্ন নরনারী দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ পল্লী-অঞ্চলে, বিশেষতঃ যেখানে রেলগাড়ী কিংবা আধুনিক যানবাহনের প্রচলন নাই সেখানে এখনও ভূতপ্রেতের পূজা হইয়া থাকে। শ্যাম-অধিবাসীরা যাহাকে ফাই বলে, তাহার হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। ভগবান্ বুদ্ধের বাণী তাহাদের কানে যে পৌঁছায় নাই এমন নহে, কিন্তু সে সব হইল বড় বড় কথা; দৈনন্দিন ব্যাপারে, সাংসারিক শুভাশুভের প্রয়োজনে "ফাই"-কে চাই। ঘটা করিয়া "ভাটে" যাইয়া বুদ্ধের শ্রীচরণে ভক্তি জানাইতে কোন বাধা নাই, কিন্তু "ফাই" হইল ঘরের দেবতা, তাহার সন্তোষ-অসন্তোষের উপর গ্রামের, সংসারের ভালমন্দ নির্ভর করে। থাই পল্লীতে তাই ভূতের ভয় আর প্রেতের প্রেম তথাগতের হাত ধরিয়া চলে।

থাইল্যাণ্ডের চীনা-সম্প্রদায়টি খুব পরিশ্রমী এবং কষ্টসহিষ্ণু। বিভিন্ন শিল্প-প্রচেষ্টায় তাহারা থাইল্যাণ্ডের আর্থিক সম্পদ বাড়াইয়া দিতেছে। কিন্তু সরকারী কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে বেশী পছন্দ করে না, কারণ তাহাদের কতকগুলি গুপ্ত সমিতি আছে যাহার সাহায্যে তাহারা শ্রমিক আন্দোলন এবং বিদ্রোহের বাণী আমদানী করিয়া থাকে। চীনাদের শাসন করা শ্যামের পক্ষে খুব সহজসাধ্য কার্য্য নয়।

থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা প্রচুর, ইহা

লাও শিকারী

শুধু আমরাই দাবী করি না, থাইরাও স্বীকার করে। অথচ যদি ইন্দোচীনের ব্যাপার লইয়া কিংবা জাভা-মালয় সম্পর্কে জাপানের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তবে থাইল্যাণ্ড ও ব্রহ্মদেশের সীমান্তে একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। সেই যুদ্ধে আর কিছু হউক আর নাই হউক, বৃহত্তর ভারতের দুইটি শান্তিপ্রিয় উন্নত জাতি যে পরস্পরের ধ্বংসসাধনে উন্মত্ত হইয়া উঠিবে ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। আমরা ভরসা করি পূর্ব্ব-এশিয়ায় কোন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সহায়তা না করিয়া আধুনিক, উন্নত, বৌদ্ধ থাইল্যাণ্ড একটি মহত্তর কল্যাণকর জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা-আন্দোলনের অগ্রদূত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবে।

বুলগার পদাতিক সৈন্যের কুচ-কাওয়াজ

বলকানে রোম-বার্লিনের নূতন সহযোগিদ্বয়

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বুলগারিয়া বা তাহার সামরিক শক্তির কোনও অস্তিত্বই ছিল না। গ্রীস ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করে। সার্ব্বিয়ায় ও রুমানিয়ায় যথাক্রমে ১৮৩০ ও ১৮৫৬ খ্রীঃ স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৭৮ ও ১৮৮১ খ্রীঃ ঐ দুই দেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়। কিন্তু বুলগারিয়ায় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগের পূর্ব্বে স্বাধীনতার আলোকের ক্ষীণতম রশ্মিও পড়ে নাই। ঐ সময় বুলগারিয়ায় শাসনতন্ত্র প্রথমে দেশবাসীর হাতে আসে, কিন্তু ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে সম্পূর্ণ স্বাধীনতালাভ ঐ দেশের ভাগ্যে ঘটে নাই। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে নৃপতি (তখন রাজকুমার) ফার্ডিনাণ্ড নিজেকে স্বাধীন নৃপতি রূপে বুলগার জাতির "জার" বলিয়া ঘোষণা করেন।

ঐ দেশের ভৌগোলিক পরিস্থিতিই তাহার স্বাধীনতার প্রধান অন্তরায় ছিল এবং সেই জন্যই উহা তাহার প্রতিবেশীদিগের বহু পরে তুর্ক শাসন-শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়। বুলগারিয়ার উত্তর অঞ্চল ইস্তাম্বুল (তখন কনস্টান্টিনোপল্) নগরীর অতি নিকট এবং উহার দক্ষিণ অঞ্চলের বিস্তৃত সমতলভূমি "গেরিলা" যুদ্ধের গুপ্ত

ছদ্মবেশে বুলগার সাঁজোয়া যুদ্ধরথ।

অভিযানের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এবং এই দুই কারণে তুর্কগণ অতি সহজেই বুলগার হাইডুকগণের বিদ্রোহ কয়েক বারই

দৃঢ়ভাবে দমন করিতে পারে। ঐ বিদ্রোহ ইউরোপীয় তুর্ক সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই প্রথম হয় এবং কঠোর শাসন ও প্রবল দমননীতি চালিত হওয়া সত্ত্বেও বিদ্রোহের আগুন জ্বলিতে থাকে। এই বিদ্রোহ চালনায় যে সকল জননেতার পৌরুষ ও অটল সংকল্পের ফলে দেশে বহু ছোট-বড় বিদ্রোহীর দলস্বাধীনতার সংগ্রাম সচল রাখে তাঁহাদের মধ্যে রাকোভস্কি, পানিয়ো ও কবি বোটেভের নাম অমর খ্যাতি লাভ করে। অশেষ বাধা-বিপত্তি, ভীষণ পরাজয় ও হত্যাকাণ্ড কোন কিছুতেই ইঁহাদের লোক-জাগরণের কার্য্যে উৎসাহ বা স্বাধীনতার জন্য অদম্য চেষ্টাকে শেষ করিতে পারে নাই। এইরূপে ১৮৭৫ খৃঃ বস্‌নিয়া ও হেরজেগোভিনা অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন প্রবল ভাবে জ্বলিয়া উঠিলে তুর্কগণ তাহার দমনে এরূপ বর্ব্বরতার সহিত বুলগার জনসাধারণের উপর লুণ্ঠন ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করে যে সমস্ত ইয়োরোপ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন প্রতিবাদ জানান, রুষ সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার কেবল মৌখিক অসন্তোষ জ্ঞাপনেই ক্ষান্ত না হইয়া ১৮৭৭ খৃঃ তুর্কির বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান করেন। এই যুদ্ধ ঘোষণায় রুমানিয়া যোগদান করে এবং পর বৎসর (১৮৭৮) রুমানিয় নগর প্লোয়েষ্টিতে রুষ অধ্যক্ষতায় প্রথম বুলগার সেনাদল গঠিত হয়।

ছাউনিতে বুলগার সৈন্য অস্ত্র ঠিক করিতেছে

বুলগার নৃপতি বোরিস্ যুদ্ধপতাকা চুম্বন করিতেছেন

ঐ বুলগার "ওপালচেন্ত্রী" (স্বেচ্ছাগঠিত সেনাদল) অর্দ্ধশিক্ষিত ও অতি সামান্য যুদ্ধ শস্ত্র সজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও সমরাঙ্গনে—বিশেষ সিপ্‌কা এরূপ অসাধারণ শৌর্য্যের পরিচয় দেয়—যে বুলগার সৈনিক সেই সময় হইতেই যুদ্ধক্ষম বলিয়া পরিচিত হয়।

রুষ জার আলেকজাণ্ডার বুলগার সেনাদল গঠনে সাহায্য করেন এবং বুলগারিয়ায় স্বাতন্ত্র্যের সূচনা করিবার জন্য তাঁহারই এক সেনাধ্যক্ষ বাটেনবার্গ রাজকুমার আলেকজাণ্ডারকে বুলগার অধিপতি রূপে প্রতিষ্ঠিত

করেন। ইনি জাতিতে জার্ম্মান ছিলেন কিন্তু রুষ সমরবিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই আলেকজাণ্ডার বুলগার সেনাদল গঠনে ও দেশ-শাসনে বিশেষ তৎপরতা দেখান। কিন্তু কিছুকাল পরে রুষ জার ইহার উপর অসন্তুষ্ট হওয়ায় রাষ্ট্র পরিচালনকার্য্যে নানা বাধাবিপত্তি আরম্ভ হয়। রুষ-সম্রাটের ইচ্ছা ছিল না যে বুলগারিয়া একেবারে স্বাধীন রাষ্ট্র হয়, সুতরাং তিনি রাজকুমার আলেকজাণ্ডারকে বাধা দিবার জন্য প্রথমে বুলগার সেনাদল হইতে শিক্ষক রুষ-সেনানায়কগণকে লইয়া আসেন। পরে তাহাতেও ফল হয় নাই দেখিয়া তিনি রাজকুমার আলেকজাণ্ডারকে ধরিয়া রুষ দেশে আনেন। আলেকজাণ্ডার পলাইয়া বুলগারিয়ায় ফেরেন কিন্তু এবার রুষ-সম্রাট এরূপ বিদ্বেষ দেখাইতে আরম্ভ করেন যে আলেকজাণ্ডারকে সিংহাসন ছাড়িতে বাধ্য হইতে হয়।

বুলগারিয়া। গ্রাম্য রমণী অশ্বারোহী সৈনিককে জল খাওয়াইতেছে

রুমানিয় এন্টি-এয়ারক্রাফট কামানশ্রেণী

নায়কহীন অবস্থায় বহুদিন চলিবার পর প্রতিবেশী সার্ব্বিয়া ১৮৮৫ খ্রীঃ সুবিধা বুঝিয়া বুলগারিয়া আক্রমণ করে কিন্তু বুলগারগণ অশেষ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া সার্ব্বগণকে পরাস্ত ও বিতাড়িত করে। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সাক্সেকোবার্গ নামক জার্ম্মান রাজকুলের কুমার ফার্ডিনাণ্ড বুলগারিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন বুলগারদিগের শৌর্য্য-বীর্য্য জগদ্বিখ্যাত, কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষায় বা আধুনিক যুদ্ধোপকরণে তাহাদের অবস্থা হীন ছিল। বিশ বৎসরের অদম্য চেষ্টায় ও দেশবাসীর অশেষ স্বার্থত্যাগের ফলে ফার্ডিনাণ্ড দেশকে আধুনিক সমর উপযোগী শিক্ষা ও শস্ত্রসজ্জা দান করিতে সমর্থ হন এবং ফলে ১৯০৮ সালে বুলগারিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন দেশ বলিয়া ঘোষিত হয়। ইহার কিছুকাল পরে বলকান যুদ্ধে বুলগারিয়া তাহার সমর-দক্ষতার বিশেষ পরিচয় দেয় কিন্তু বিশ্বাসঘাতক "মিত্র" দলের চক্রান্তে যুদ্ধের লাভ বণ্টনের সময় তাহার ভাগ্যে কেবলমাত্র দুঃখকষ্ট ও ক্ষতিই জোটে। সমরক্ষেত্রে বুলগার সৈন্য তুর্কসেনার পরাজয়ে প্রধান অংশ লইয়াছিল এবং সেই কারণে ক্ষতিও বুলগারদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। যুদ্ধের শেষে বুলগারগণ নূতন কিছু ত পাইলই না, বরঞ্চ, প্রাচীন বুলগারিয়ার কিছু অংশ তাহার বিশ্বাসঘাতক বন্ধুদের দিতে হইল।

পার্ব্বত্য কামানের ব্যাটারী চলিতেছে

"মোল্ডাভিয়া ও ভালাখিয়া যুক্তরাষ্ট্র" স্থাপিত হয়। একুশ বৎসর পরে এই ভূমিখণ্ডদ্বয়ই রুমানিয়া রাজ্যে পরিণত হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নৃপতি আলেকজাণ্ডার কুসা এই দুই দেশের সৈন্যদল এক করিয়া এক সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করেন। তিনি কার্য্যের আরম্ভ মাত্র করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া রুমানিয়া রাজ্য বিকাশের দিন আসে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে। খ্রীঃ ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ইয়োরোপে মোল্ডাভিয়া ও ভালাখিয়া সামন্তরাজগণের প্রতিপত্তি যথেষ্টই ছিল। ইঁহাদের সৈন্যবল ও লোকবল পর্য্যাপ্ত থাকায় তখনকার ইয়োরোপের ঐ অঞ্চলের রাষ্ট্রনৈতিক সকল ব্যাপারে ইঁহাদের প্রতিপত্তি ছিল। পরবর্ত্তীকালে তুর্ক সাম্রাজ্যের বিস্তারে রুষ ও অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের রাজ্যলোলুপতায় ক্রমে এই সকল সামন্ত রাজ্যের শক্তি ও প্রতিপত্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। প্রুসিয়ার অভ্যুত্থানের পর এই সকল বিরাট্ শক্তির চালে পোলাণ্ড তিন অংশে বিভক্ত হইবার পর মোল্ডাভিয়া ও ভালাখিয়ার পূর্ব্বগৌরবের স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট থাকে। সামন্তরাজ আলেকজাণ্ডার কুসা অতিশয় দক্ষতার সহিত ছয় বৎসর রাজত্ব করিবার পর তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা প্রথম কারোলকে রাজ্যশাসনের জন্য বিশ হাজার সৈন্য এবং পঞ্চাশ হাজার সশস্ত্র সান্ত্রী ও রক্ষীদল দিয়া যান এবং সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সকে "মুরুব্বী" রূপে দাঁড় করাইয়া তাহার সাহায্যে নিজ দেশে শক্তি সঞ্চয়ের ব্যবস্থা রাখিয়া যান। তখন ঐ সৈন্যদলের অধ্যক্ষগণ ফ্রান্সে শিক্ষা পাইত, এমন কি ফ্রান্সের বৈদেশিক অভিযানেও (যথা মেক্সিকোতে) উহারা যোগদান করিয়াছে।

প্রথম কারোল জার্ম্মান রাজকুলোদ্ভব ছিলেন এবং নিজে প্রুসীয় সৈন্যদলে শিক্ষালাভ করায়, প্রুসীয় যুদ্ধপদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রান্সের

এই হৃত সম্পত্তির উদ্ধারের লোভে গত মহাযুদ্ধে বুলগারিয়া জার্ম্মানির সঙ্গে যোগদান করে। তাহার পরিণামে আরও লোকক্ষয়, অর্থনাশ তো হয়ই, উপরন্তু দেশের কয়েকটি অংশ রুমানিয়া যুগোস্লাভিয়া ইত্যাদিকে দিতে হয়। ১৯৩৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বুলগারিয়ার সৈন্যদল অতি দীনহীন অবস্থায় পরিচালিত হয়। ১৯৩৮ সালের পর সালোনিকিতে বলকান আঁতাত সন্ধি হইবার পর জার্ম্মানির সাহায্যে বুলগারিয়া তাহার সৈন্য ও রাষ্ট্র শক্তির পুনর্গঠনের কার্য্যারম্ভ করে।

বুলগারিয়া এখন প্রায় চারি লক্ষ সৈন্য, ৫০০ এরোপ্লেন, অনেকগুলি 'ট্যাঙ্ক' ও অন্য প্রকার "সাঁজোয়া" যুদ্ধরথ, ছোট বড় কামান ইত্যাদি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত করিতে পারে। তবে সৈন্যদলের অধিকাংশেরই শিক্ষা অল্পদিনের, সুতরাং শস্ত্র ব্যবহারে তাহাদের দক্ষতা কিরূপ তাহা জানা নাই। যুদ্ধের উপকরণ এবং আধুনিক যুদ্ধের শিক্ষা তাহারা জার্ম্মানির নিকট হইতে পাইয়াছে সন্দেহ নাই।

বুলগার সেনাদল গঠনের সূত্রপাত রুষগণ করে এবং এখনও এই সেনাদলে প্রাচীন রুষ সেনার ছাপ সুস্পষ্ট আছে। জার্ম্মানির সহিত পুরাতন যোগ পুনঃস্থাপিত হওয়ার কি ফল হয় তাহা অল্পদিনেই দেখা যাইবে।

* * *

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস কংগ্রেসে ফ্রান্সের চেষ্টায়

টেলিফোনবাহী রুমানিয় সৈন্যদল

পরাজয়ের পর কারোল সম্পূর্ণভাবে প্রুশীয় ধরণে সেনাদল সংস্কারে প্রবৃত্ত হয়েন এবং দেশে বাধ্যতামূলক যুদ্ধশিক্ষা ইত্যাদির প্রচলন করেন। তখন সৈন্যদলের অবস্থা ভাল ছিল না এবং তাহাদের যুদ্ধোপকরণ নানা দেশের পাঁচ মিশালী ছিল। তাহা সত্ত্বেও ১৮৭৭ খ্রীঃ রুষ-তুর্ক যুদ্ধে ইহারা বীরত্বের সহিত তুর্কদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ইহার পর পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরিয়া সেনাদল গঠন ও সংস্কার চলে কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহে ইহারা কোনই অংশ লয় নাই।

রুমানিয় পদাতিক সৈন্যের লক্ষ্য ভেদ শিক্ষা

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বলকান যুদ্ধের শেষে রুমানিয়া বুলগারিয়া আক্রমণ করে। বলকান যুদ্ধে রুমানিয়া কিছুই করে নাই কিন্তু যুদ্ধের শেষে জয়ের ফললাভের দাবী করে। বুলগারিয়া তাহাতে আপত্তি করায়, রুমানিয়া গ্রীস ও সার্বিয়ার সহিত চক্রান্ত করিয়া বুলগারিয়াকে আক্রমণ করে। তুর্কদিগের সঙ্গে যুদ্ধে বুলগারিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লড়িয়াছিল এবং সেই কারণে তাহার সৈন্যদল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত ও ক্লান্তও ছিল। রুমানিয়ার বিরাট সেনাবাহিনী অক্ষতবল থাকায় বুলগারিয়া এই তিন বিশ্বাসঘাতক প্রতিবেশীর নিকট পরাস্ত হয়। কিন্তু তাহাতেও রুমানিয়াকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়, যাহার ফলে ১৯১৪ সালে রুমানিয় সেনাদলের পুনঃ সংস্কারের ব্যবস্থা হয়। ফ্রান্স, ইটালি, জার্ম্মানি ও অষ্ট্রিয়ায় বহু যুদ্ধসামগ্রী ক্রয়ের ব্যবস্থা হয় কিন্তু মহাযুদ্ধ আরম্ভের ফলে তাহার অতি সামান্যই রুমানিয়ায় পৌঁছায়। পুনর্ব্বার ইটালি, সুইজারল্যাণ্ড, স্পেন ও আমেরিকায় যুদ্ধ-

রুমানিয় সৈন্যদলের নৌকাসেতু নির্ম্মাণ
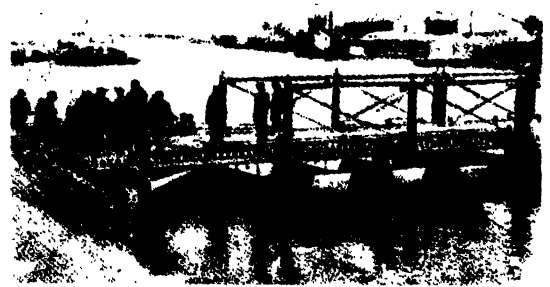
সম্ভার সংগ্রহের চেষ্টা চলে কিন্তু সে সামগ্রী রুমানিয়ায় লইয়া যাওয়া তখন কঠিন, কেন না তখন একমাত্র রুষ রেলপথ ও রুষ সমুদ্র বন্দরের সহিত রুমানিয়ার যোগ ছিল। রুষ তখন দাবী করে যে রুমানিয়াকে মিত্রশক্তি দলের সহিত যোগ দিতে হইবে। ১৯১৬ সালের আগষ্ট মাসে রুমানিয়া মিত্রদলের সহিত যুক্ত হয় কিন্তু যুদ্ধের যাবতীয় উপকরণ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই জার্ম্মান সেনাদল প্রবলবেগে রুমানিয়া আক্রমণ করিয়া দেশ বিধ্বস্ত করিয়া রুমানিয়াকে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করে। রুমানিয় কৃষক-সেনা শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে থাকে এবং প্রধান সেনাদল পরাজিত হইবার পরেও পাহাড়ে বনে জঙ্গলে ঐ কৃষক সেনাদল যুদ্ধ চালাইতে থাকে।

মিত্র দলের জয়ের ফলে রুমানিয়া তাহার কৃতিত্বের
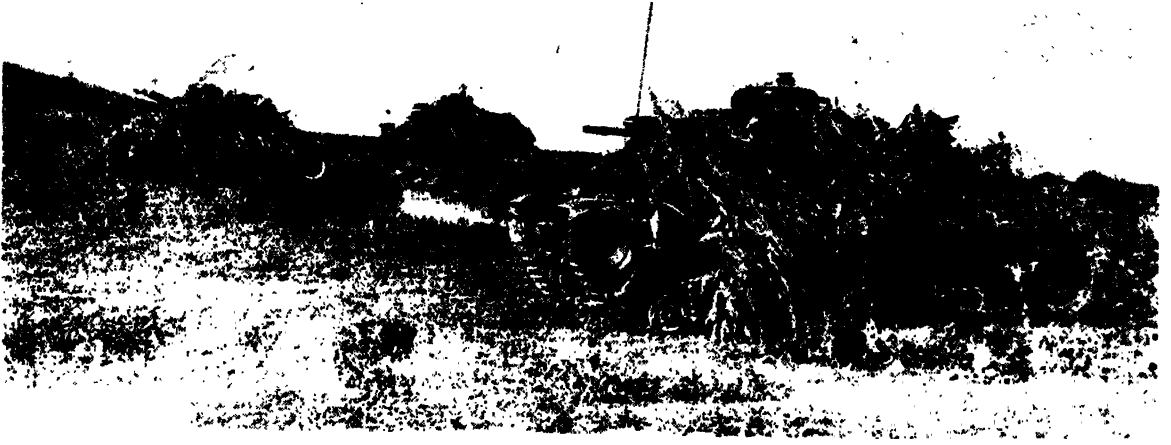
রুমানিয়ার "ট্যাঙ্ক" ছদ্মবেশে নকল যুদ্ধে চলিয়াছে

শত গুণ অধিক লাভ করে। হাঙ্গেরী, রুষ ও বুলগারিয়া হইতে বিস্তৃত ভূমিখণ্ড সকল কাটিয়া রুমানিয়াকে দান করা হয়। এখন আবার রুমানিয়ায় বিপ্লব ও মাৎস্যন্যায় চলিয়াছে। তাহার সৈন্যদল এখন কি ভাবে ও কাহার অধীনে আছে তাহা স্থির করা দুরূহ। রুমানিয়ার সহিত জার্ম্মানির যোগ পূর্ব্বকালে ছিল না এবং এখন তাহা হইলেও যে রুমানিয় সেনাদল তাহাতে উৎসাহ দেখাইবে তাহা মনে হয় না। তবে রুমানিয়ার ইতিহাসে দলাদলি ও চক্রান্ত প্রতি পৃষ্ঠায় আছে, সুতরাং কোন্ দল কোন্ দিকে যাইবে বলা কঠিন। যাহাই হউক, বুলগার ও রুমানিয় এই অহি-নকুলদ্বয়কে একদিকে ও এক সঙ্গে চালিত করা অতি অসম্ভব ব্যাপার বলিয়াই ইতিহাসের সাক্ষ্য।

ভ্রম-সংশোধন

প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৪৭—৬০৬ পৃষ্ঠার সম্মুখস্থিত রঙীন চিত্র 'উৎকণ্ঠিতা'র চিত্রকর 'শ্রীতারাপদ বিশ্বাস' স্থলে শ্রীতারাপ্রসাদ বিশ্বাস পাঠ করিতে হইবে।

বুলগার সৈন্যের বিমান-আক্রমণ নিরোধ-শিক্ষা

রুমানিয়ার মোটরটানা বৃহৎ কামান

নৃপতি কারোল (ভূতপূর্ব্ব) কর্ত্তৃক যুবরাজের সহিত রুমানিয় মোটর-সৈন্য পরিদর্শন

রুমানিয়ার কামানবাহিনী

ডানিউব নদে রুমানিয়ার কামান-তরীর বহর
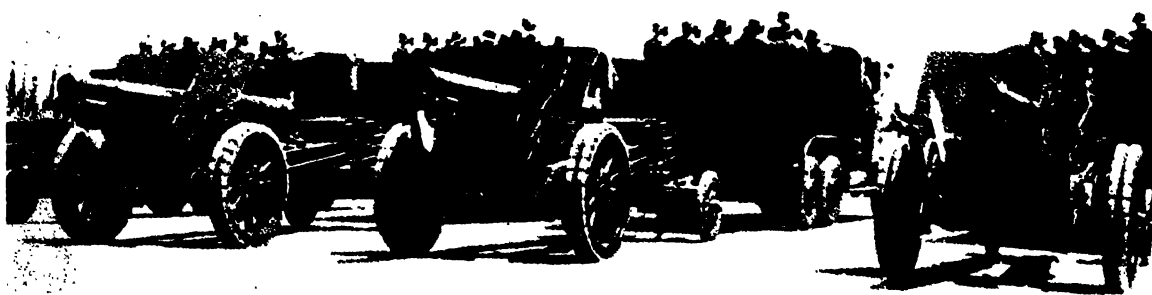
বিবিধ প্রসঙ্গ

"প্রবাসী"র চত্বারিংশ বর্ষ পূর্তি

বাংলা সন ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে প্রয়াগ (এলাহাবাদ) হইতে "প্রবাসী"র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বর্তমান চৈত্র সংখ্যা প্রকাশের সহিত ইহার চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইল।

—

বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে "প্রবাসী"র জন্মস্মৃতি

বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে কোন কোন স্থানে "প্রবাসী"র জন্ম ও কার্য্য স্মৃত হইবে।

—

"প্রবাসী"র গ্রাহক ও পাঠকদের সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন

এখন যাঁহারা "প্রবাসী"র গ্রাহক ও পাঠক, কিংবা গ্রাহক না হইলেও নগদ কিনিয়া বা সাধারণ পাঠাগারে যাঁহারা ইহা পাঠ করেন, তাঁহাদের মধ্যে এমন কেহ কেহ আছেন কি না জানিতে ইচ্ছা হয় যাঁহারা ইহার প্রথম সংখ্যা হইতে ইহা পড়িয়া আসিতেছেন। কেহ যদি প্রথম বৎসর হইতে গ্রাহক আছেন, তাহাও জানিতে কৌতূহল হয়।

—

"প্রবাসী"র প্রথম সংখ্যার লেখকবর্গ

চল্লিশ বৎসর পূর্বে "প্রবাসী"র প্রথম সংখ্যার জন্য নিজ নিজ রচনা দিয়া যাঁহারা সম্পাদককে অনুগৃহীত, উৎসাহিত ও কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম,—কমলাকান্ত শর্ম্মা (কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন), জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায়। ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইঁহাদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এখন পরলোকগত।

—

"প্রবাসী"র কয়েকটি বিশিষ্টতা

"প্রবাসী"র কয়েকটি বিশিষ্টতা নীচে লিখিত হইল।

১। ইহা কোন বৎসর বন্ধ না হইয়া প্রত্যেক বৎসর পুরাপুরি বাহির হইয়াছে।

২। ইহা এই প্রকারে পূর্ণ চল্লিশ বৎসর নিয়মিত রূপে বাহির হইয়াছে।

৩। চল্লিশ বৎসর ইহা এক জন সম্পাদকের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে।

এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে চৌত্রিশ বৎসর তিন মাস সেই সম্পাদককে "মডার্ণ রিভিয়ু" নামক একখানি ইংরেজী মাসিক কাগজও নিয়মিত রূপে সম্পাদন ও প্রকাশ করিতে হইয়াছে।

"প্রবাসী"র বিশিষ্টতা না হইলেও ইহার সম্বন্ধে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। বহু পূর্বে বা অধুনালুপ্ত অনেক বাংলা মাসিকপত্রের সম্পাদকেরা সাহিত্যিক প্রতিভাশালী ছিলেন। সুখের বিষয়, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন। এখন যে-সকল মাসিক পত্র চলিতেছে, সেগুলিরও কোন কোনটির সম্পাদকের সাহিত্যিক প্রতিভা আছে। "প্রবাসী"র সম্পাদকের সাহিত্যিক প্রতিভা নাই। তথাপি তাহা চল্লিশ বৎসর অবিচ্ছেদে বাহির হইয়া আসিতেছে, যাহা অন্য কোন বাংলা মাসিক হয় নাই। অতএব, যাঁহারা সাহিত্যিক প্রতিভাহীনতায় "প্রবাসী"র সম্পাদকের মত, তাঁহারাও ইচ্ছা বা যথাযোগ্য চেষ্টা করিলে মাসিক পত্র সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন বিশ্বাস করিয়া উৎসাহিত হইতে পারেন।

৪। "প্রবাসী" বঙ্গের বাহিরে বাঙালীদের নানা কৃতির প্রতি এবং তাঁহাদের জীবনের নানা সমস্যার প্রতি বঙ্গের বাঙালীদের ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। এই কাজ ইহা এখনও করিতেছে। এই কাযে স্বর্গগত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় ইহার প্রধান সহায় ছিলেন।

বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের সংবাদ কয়েক বৎসর হইতে বাংলা দৈনিক কাগজগুলিও ছাপিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

৫। যাহাকে ইণ্ডিয়ান আর্ট বা ভারতীয় চিত্রকলা বলা হয়, "প্রবাসী" প্রথম হইতেই তৎসম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজের কৌতূহল উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, এবং তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে জ্ঞানলাভে সমর্থ করিতেছে।

ইহার প্রথম সংখ্যাতেই সম্পাদকের লেখা অজন্টা গুহাচিত্রাবলী সম্বন্ধে সচিত্র প্রবন্ধ ছিল। আমরা যত দূর জানি, তাহার পূর্বে বঙ্গের শিক্ষিত সমাজেও অজন্টার নাম ও তাহার গুহাস্থিত বিস্ময়কর চিত্র স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ঐশ্বর্যের বিষয় অল্প লোকেরই জানা ছিল।

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার বহু শিষ্য-প্রশিষ্যের আঁকা ছবি ছাপিয়া "প্রবাসী" শিক্ষিত সমাজে উপহাসাস্পদ হইয়াছিল, ইহাও তাহার একটি বিশিষ্টতা।

প্রধানতঃ দেশী এবং কখন কখন দুই-একটি য়ুরোপীয় উৎকৃষ্ট চিত্রের প্রতিলিপি নানা বর্ণে "প্রবাসী"তে মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে। এইরূপ ছবি নিয়মিত রূপে প্রকাশ করিবার রীতি এই মাসিক প্রবর্তিত করে।

চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশের কাজও "প্রবাসী" করিয়া আসিতেছে।

৬। যে-সকল রাষ্ট্রনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক শৈক্ষিক প্রভৃতি ঘটনা ঘটে ও সমস্যার আবির্ভাব হয়, মাসে মাসে তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় আলোচনা ও মন্তব্য প্রকাশ "প্রবাসী" নিয়মিতরূপে করিয়া আসিতেছে।

৭। "পঞ্চশস্য," "বেতালের বৈঠক", "কষ্টিপাথর," "মহিলা মজলিস," "ছেলেদের পাততাড়ি," "আলোচনা" প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগ "প্রবাসী"তে কোন-না-কোন সময়ে প্রকাশিত হইত; এখনও কোন কোনটি হয়। বর্তমানে মাসিকে অনাবশ্যক বোধ হওয়ায় কোন কোনটি বাদ দেওয়া হইয়াছে।

৮। আমাদের এক জন শ্রদ্ধেয় বন্ধু একবার বলিয়াছিলেন যে, পূর্বে মাসিক পত্রসমূহের পশ্চাদ্দেয় এবং অগ্রিম এই দুই প্রকার মূল্যের হার ছিল; গ্রাহক মাত্রকেই অগ্রিম মূল্য দিয়া গ্রাহক হইতে হইবে "প্রবাসী"র সম্পাদকের দ্বারা এই রীতি প্রবর্তিত হয়। ইহা কত দূর সত্য বলিতে পারি না। তবে, ইহা সত্য বটে যে, আমাদের সম্পাদিত "দাসী", "প্রদীপ" ও "প্রবাসী"র মূল্য প্রথম হইতেই কেবলমাত্র অগ্রিম দেয়ই হইয়া আসিতেছে।

"প্রবাসী"র পূর্বে যে-সকল মাসিক কাগজ ছিল এবং তাহার সমকালিক যে-সব মাসিক পত্র আছে, সেগুলিতে প্রকাশিত প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতির মত পদ্য ও গদ্য রচনা "প্রবাসী"তেও প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন কাগজে প্রকাশিত রচনার তুলনামূলক মূল্য নির্ধারণ করা আমাদের অভিপ্রেত নহে।

—

"প্রবাসী"র মূল্য ও প্রভাব

আমরা "প্রবাসী"র যে-সকল বিশিষ্টতার কথা লিখিলাম, তাহা বাহ্য। ইহাতে প্রকাশিত রচনাসমূহের সাহিত্যিক মূল্য ইহার সম্পাদক অপেক্ষা অন্যেরাই নিরপেক্ষ ভাবে নির্ধারণে সমর্থ। সেইগুলির দ্বারা বাংলা সাহিত্য ও জাতীয় জীবন এবং বাঙালীর চিন্তার ধারা প্রভাবিত হইয়াছে কি না, ও হইয়া থাকিলে কি পরিমাণে হইয়াছে, তাহাও তাঁহারা স্থির করিতে পারিবেন।

ইহার সম্পাদকীয় আলোচনা ও মন্তব্য সমূহের যদি কোন মূল্য থাকে, তাহা হইলে তাহা কিরূপ তাহাও অন্যেরাই নির্ণয় করিতে পারিবেন। এইগুলির দ্বারা চল্লিশ বৎসরে বাংলা সাহিত্য, বাঙালী সমাজ, ও বঙ্গের জাতীয় জীবন প্রভাবিত হইয়াছে কি না, এবং যদি হইয়া থাকে তাহা হইলে কি ভাবে ও কি পরিমাণে হইয়াছে, তাহাও তাঁহারাই বলিতে পারিবেন; তাহা বলিতে আমরা অসমর্থ।

—

মৌলবী ফজলল হকের প্রলাপ

বাংলা প্রবাদে বলে,

"পাগলে কী না বলে? ছাগলে কী না খায়?"

"নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।"

কিন্তু মৌলবী ফজলল হককে 'পাগল' বলা চলে না, 'নীচ'ও বলা চলে না। কেন না, তিনি এখন বাংলার

প্রধান মন্ত্রী, মুসলমানদের একটা দলের নেতা; ইহার পূর্বে তিনি কলিকাতার মেয়র ছিলেন এবং তখন ও তাহার পূর্বে ওকালতী দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন; ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহার কোন কোন সদ্‌গুণের কথাও শুনিয়াছি।

তথাপি, তাঁহাকে 'পাগল' বা 'নীচ' বলা না চলিলেও, তিনি যে অব্যবস্থিতচিত্ত, অসংযতবাক্ এবং সত্যমিথ্যা-বিচারবিহীন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এ রকম মানুষ কোন কথা বলিলে তাহাতে বিচলিত হইবার কোন কারণ ঘটিত না, যদি তিনি উচ্চ পদে আসীন না থাকিতেন—যদি তিনি বাংলার প্রধান মন্ত্রী না-হইতেন। এই পদই তাহার অতি বড় সুস্পষ্ট মিথ্যা কথাকেও গুরুত্ব প্রদান করে। নতুবা ও-রকম একটা লোক কী বলে না-বলে, তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইত না।

প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলল হক হিন্দুদের সম্বন্ধে বার বার অনেক মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। তাহার মধ্যে সাম্প্রতিক ও ব্যাপক দুটা উক্তি নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

"আজাদ", ২রা মার্চ্চে—বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন এস্‌লাম আশা করে যে, প্রত্যেক মুসলমান তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া যাইবে। ভাই সব! আপনাদের বিরুদ্ধে আতঙ্কগ্রস্ত ও বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিগণের কি বিপুল বাহিনী গঠিত হইয়াছে, তাহা একবার অবলোকন করুন। পুরুষ, নারী, রাজনৈতিক, উকীল, বৈজ্ঞানিক, প্রোফেসার, বক্তা, জমিদার, ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ ও অ-ব্রাহ্মণ সকলেই আদমসুমারীতে আপনাদের সংখ্যা কমাইবার জন্য একযোগে কাজ করিতেছেন। এমত অবস্থায় কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভার মিথ্যা ও অসত্যের খোলস লোক-সমাজে প্রকাশ করিয়া দেওয়া আপনাদের একান্ত কর্ত্তব্য। আপনারা সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করুন, আপনাদের সঠিক সংখ্যা গণনা করান। সমাজের সেবার জন্য জীবনে আর কখনও এমন সুযোগ পাইবেন কি না সন্দেহ। যদি এখন আপনারা স্ব স্ব কর্ত্তব্য-পালনে অবহেলা করেন, তবে মুসলমান জাতি চিরদিনের তরে নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। সমাজের জন্য হৃদয়ের রক্ত দান করুন, ফলাফলের জন্য ভীত হইবেন না।

বাংলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলল হক্ পুনরায় এই দ্বিতীয় বিবৃতিতে বলেন :—

আমি যখন দেখিতে পাই, যাঁহারা সারা জীবন শিক্ষাকার্য্যে যাপন করিয়াছেন, মিথ্যা বিবৃতি দিতে তাঁহাদেরও বিবেক বিন্দুমাত্র বাধা প্রদান করে না এবং মুসলমানের সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য তাঁহারাও অম্লানবদনে চুরি, জুয়াচুরি ও জালিয়াতি করিতে পারেন, তখন আমি কি আশা করিতে পারি? যদি তথাকথিত আদমসুমারীকে বাংলা দেশের লোক-সংখ্যার সঠিক হিসাব বলিয়া গণ্য করা হয়, তাহা হইলে আমাকে পাকিস্থান গঠনের জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিতে হইবে। বন্ধুরা তখন বুঝিতে পারিবেন যে, আমি জয়লাভ করিতে পারিব কি না।

প্রথম উক্তিটাতে বাংলার সমুদয় হিন্দুনরনারীকে মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছে, কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভাকে মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছে; ইহারা সকলে লোকসংখ্যা-গণনাটাকে নির্ভরের অযোগ্য ও অসত্য করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলা হইয়াছে দ্বিতীয় উক্তিটাতে বিশেষ করিয়া শিক্ষক ও অধ্যাপকদিগকে আক্রমণ করা হইয়াছে।

বাংলার প্রধান মন্ত্রীর বেতন সকল সম্প্রদায়ের দেওয়া ট্যাক্স হইতে দেওয়া হয়। সকল সম্প্রদায়ের ভৃত্য প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা। কোন ব্যক্তি প্রধান মন্ত্রীর পদে থাকিয়া উল্লিখিত রূপ কথা বলিলে বিক্ষোভ স্বাভাবিক ও অনিবার্য।

অতএব, ঐরূপ উক্তির ফলে কলিকাতার টাউনহলে সর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে মহতী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, মৌলবী ফজলল হককে প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে অপসৃত করিবার সেই সভায় ব্যক্ত দাবী সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত। ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট এই দাবী অগ্রাহ্য করিলে অগত্যা ইহাই মনে করিতে হইবে যে, বাঙালী হিন্দুদের উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের রাগ এত বেশী যে, বাঙালী হিন্দুদের সকল মিথ্যা অপবাদই, তাহাদের উপর সকল অত্যাচারই, তাহারা উপযুক্ত শাস্তি মনে করে।

বঙ্গের অশিক্ষিত মুসলমানেরা সহজেই হিন্দুদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়। "সমাজের জন্য হৃদয়ের রক্ত দান করুন, ফলাফলের জন্য ভীত হইবেন না," এইরূপ অনুরোধ তাহাদিগকে করিলে তাহার ফল কিরূপ ভয়ানক হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। অথচ এই কথাই বঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর মুখ হইতে বাহির হইয়াছে।

—

১৯৩১ সালের সেন্সসের ভুল

১৯৩১ সালের সেন্সসের ভুল কয়েক বৎসর ধরিয়া 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু'র বহু সংখ্যায় দেখান হইয়াছে।

সম্প্রতি কোন কোন দৈনিক কাগজেও তাহা দেখান হইয়াছে। বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ও অন্য কোন কোন মুসলমান বলিয়াছেন যে, ১৯৩১ সালের সেন্সসে ভুলের কথা সর্বৈব মিথ্যা—তাহাতে কোন ভুল নাই। অথচ আমরা ও অন্য কাগজওআলারা আমাদের কাগজগুলিতে ভুলের যে সকল দৃষ্টান্ত ছাপিয়াছি, তাহা যে ভুল নহে, তাহা এ পর্যন্ত কেহই দেখাইতে পারে নাই।

—

১৯৪১ সালের সেন্সস

১৯৩১ সালের সেন্সসে, কংগ্রেসী অনেক হিন্দু উহা বয়কট করায় এবং হিন্দুদের সংখ্যা কম করিয়া দেখাইবার চেষ্টা হওয়ায় হিন্দুদিগের সংখ্যা বাস্তবিক তখন যত ছিল, সেন্সস রিপোর্টে তাহা অপেক্ষা কম লেখা হয়—বিশেষ করিয়া বঙ্গে। হিন্দুদের সংখ্যা ১৯৪১ সালের সেন্সসেও যাহাতে ঐরূপ কম লেখা না-হয় তাহার চেষ্টা এবার হিন্দুদের পক্ষ হইতে হইয়াছে। এই চেষ্টাকে ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত এই মিথ্যা কথা বলা হইয়াছে যে, হিন্দুরা নিজেদের সংখ্যা বেশী করিয়া এবং মুসলমানদের সংখ্যা কম করিয়া লিখাইবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করিয়াছে ও চেষ্টা করিতেছে!

আমি সম্প্রতি এলাহাবাদ গিয়াছিলাম। যুক্তপ্রদেশেও মুসলমানদের সংখ্যা বেশী করিয়া লিখাইবার চেষ্টার কথা শুনিয়া আসিয়াছি।

—

মুসলমানদের সংখ্যা সম্বন্ধে ভারতসচিবের অত্যুক্তি

ভারতসচিবের গত কয়েক মাসের একাধিক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে মুসলমানদের সংখ্যা ৯ (নয়) কোটি। শেষ যে বক্তৃতাটিতে তিনি এই কথা বলেন তাহা রেডিওর সাহায্যে গত ২৩শে ফেব্রুয়ারি লণ্ডন হইতে তিনি শুনান। রয়টারের তাহার সংক্ষিপ্ত রিপোর্টে আছে, "**Mr. Amery referred to the great Mohammedan community of 90 millions in India,**" "মিঃ এমারি ভারতবর্ষের ৯ কোটি পরিমিত বৃহৎ মুসলমান সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেন"। ভারতসচিব যখন যখন যে-যে বক্তৃতায় এই সংখ্যা নির্দেশ করেন, তখন ১৯৪১ সালের সেন্সস গৃহীত হয় নাই, এবং এখনও এই সেন্সসের ফল জানা যায় নাই। ভারতসচিব ১৯৩১ সালের সেন্সস অনুসারেই সংখ্যা নির্দেশ করিয়াছিলেন। তখনকার গণনা অনুসারে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৭,৭৬,৭৭,৫৪৫। এই মোটামুটি পৌনে আট কোটি লোককে নয় কোটি বলিলে শতকরা ষোল জন বাড়াইয়া বলা হয়। অবশ্য ১৯৩১ সালে মুসলমানেরা ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা সংখ্যায় যত ছিল এখন তাহা অপেক্ষা বেশি হইয়াছে; কিন্তু কত বেশি হইয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই। এ অবস্থায় বিশেষ কোন একটি সম্প্রদায়ের লোকদের সংখ্যা পৌনে আট কোটির জায়গায় নয় কোটি বার বার বলা ঠিক্ হয় নাই।

ভারতসচিব শেষ যে-বক্তৃতায় মুসলমানদের সংখ্যা নয় কোটি বলিয়াছেন, সেই বক্তৃতাতেই তিনি বাংলা, পঞ্জাব, আসাম ও সিন্ধু প্রদেশের লোকসংখ্যা বলিয়াছেন আট কোটি আশি লক্ষ ("eighty-eight millions")। ১৯৩১ সালের সেন্সস অনুসারে এই চারিটি প্রদেশের লোকসংখ্যা আট কোটি আশি লক্ষের চেয়ে কিছু বেশি, কিন্তু আট কোটি আশি লক্ষ বলিলে মোটামুটি ঠিক্ হয়।

সে যাহাই হউক, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ভারত-সচিব মুসলমানদের সংখ্যা বলিবার বেলায় শতকরা ষোল জন বাড়াইয়া বলিয়াছেন এবং চারিটি প্রদেশের লোক-সংখ্যা বলিবার বেলায় ঠিকই বলিয়াছেন কিম্বা কিঞ্চিৎ কমাইয়া বলিয়াছেন!

ইহা হইতে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে অনেকে এবং ইংরেজ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কেহ কেহ যদি এই রকম অনুমান করে যে, ১৯৪১ সালের সেন্সসে সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলমানদের সংখ্যা অন্ততঃ নয় কোটি দেখাইতেই হইবে, ভারতসচিব ইহা চান, তাহা হইলে তাহা আশ্চর্যের বিষয় হইবে না!

—

ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষার আবশ্যকতা

সিন্ধু দেশের রাষ্ট্রভাষা সম্মেলন সম্বন্ধে নিম্নমুদ্রিত সংবাদটি দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে।

HYDERABAD (SIND), Mar. 3.

"I have sent Kaka Kalelkar. What better message could I give? I am confident of the success of your mission."

This was the message from Mahatma Gandhi to the Sind Provincial Rashtra Bhasha Sammelan.

Dr. Rabindranath Tagore in a message said: "A common national language for all Indians, without ousting the mother-tongue, builds a bridge of communication between persons from different parts of India and helps to free us from exclusive dependence on a foreign medium, is one of the greatest necessities of a truly national India. Those who are working towards such a fulfilment will be gratefully remembered by posterity."

In his presidential address, Kaka Kalelkar stressed the need of one language for India. He was sure that this would contribute to the growth of unity between Muslims and Hindus. The question of religion, he said, must be kept distinct from the question of language.

Even the Bengalis, including Dr. Tagore, had agreed that the common language of India must be Hindustani, for the language should be such which should be understood by the common people of the whole of India. The language should be such as should obliterate all differences between castes and creeds. The fusion of culture and literature would contribute to the increase in their strength to attain Swaraj.

In conclusion, he suggested to both Hindus and Muslims to learn both Devnagri and Urdu scripts. They could write Sindhi in Devnagri script.—*U. P.*

ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মাতৃভাষাগুলিকে চাপা না দিয়া বা স্থানচ্যুত না করিয়া যদি সমগ্র ভারতের একটি সাধারণ দেশী ভাষা প্রচলিত হয়, তাহাতে যে অনেক সুবিধা হয় এবং সেরূপ হওয়ার যে প্রয়োজন আছে, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সহিত কোন বাঙালীর মতভেদ আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। কিন্তু কোন্ ভারতীয় ভাষাটি সেই সাধারণ ভাষা রূপে গৃহীত হওয়া উচিত, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কাকা কলেলকর যে বলিয়াছেন যে, "এমন কি বাঙালীরাও" ("even the Bengalis") "রবীন্দ্রনাথ সমেত" ("including Tagore") হিন্দুস্থানীকে ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা করিতে সম্মত, ইহা সত্য নহে। অনেক বাঙালী—তাহারা সবাই নগণ্য নহে—এই মত পোষণ করে যে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা বাংলাই হওয়া উচিত। তার পর হিন্দুস্থানীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করা উচিত, এমন কথা রবীন্দ্রনাথ কখনও বলিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে পড়িতেছে না। যে-ভাষায় ভারতবর্ষে সকলের চেয়ে বেশী লোকে কথা বলে, তাহাই ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা হওয়া উচিত, এই রকম মত তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন মনে পড়িতেছে। কিন্তু হিন্দুস্থানী সেই ভাষা, এমন কথা তিনি কখন্ বলিয়াছেন? হয়ত তিনি হিন্দীকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার উক্ত মত প্রকাশ করিয়াছিলেন (যদিও তিনি তাহা করিয়া থাকিলে খুব বেশীসংখ্যক বাঙালীর সে বিষয়ে তাঁহার সহিত মতভেদ আছে)। কিন্তু হিন্দী, উর্দু ও হিন্দুস্থানী সমার্থক শব্দ নহে। হিন্দুস্থানী নামক একটি কৃত্রিম খিচুড়ী ভাষা গান্ধীবাদী অবাঙালী কংগ্রেসওআলারা তৈরি করিবার চেষ্টায় আছেন। তাহাতে সংস্কৃত শব্দ যাহাতে খুব কম থাকে, আরবী-ফারসী যথেষ্ট থাকে, তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। এ বিষয়ে সলাপরামর্শ ঢের হইতেছে, শতকরা কত শব্দ সংস্কৃত বা তদ্ভব হইবে, কত আরবী-ফারসী হইবে, তাহার সম্বন্ধেও নাকি ফতোআ মজুদ আছে। কিন্তু এ বিষয়ে হিন্দীভাষী ও উর্দুভাষীরা একমত নহে। রবীন্দ্রনাথ এহেন একটি কৃত্রিম ভাষার পক্ষপাতী, ইহা আমাদের কাছে নূতন খবর।

কাকা কলেলকর মনে করেন, হিন্দুস্থানী দ্বারা হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য স্থাপিত হইবে। বস্তুতঃ কিন্তু ইহা হিন্দু-মুসলমান অনৈক্যের আর একটা কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যাহাদের মাতৃভাষা হিন্দী বা উর্দু বা হিন্দুস্থানী তাঁহাদের তাহাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার চেষ্টা করিবার অধিকার আছে। বাঙালীদেরও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার চেষ্টা করিবার অধিকার আছে। কিন্তু মিথ্যা কথা দ্বারা সেরূপ কোন দাবী সাব্যস্ত হইবে না। আগে হিন্দীভাষীরা বলিতেন, ভারতবর্ষের পনর কোটি লোক হিন্দীভাষী, তাহার পর বলিতেন বাইশ কোটি, এখন বলিতেছেন পচিশ কোটি! অথচ অ-হিন্দীভাষী প্রদেশগুলির কথা দূরে থাক্, হিন্দীভাষী বলিয়া কথিত খাস বিহার প্রদেশেই মৈথিলী যে একটি আলাদা ভাষা, তাহা কাশী, কলিকাতা ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে।

কাকা কলেলকর বলেন, সকলেরই নাগরী ও আরবী-ফারসী দুই লিপিই শিখা উচিত। তাহার উপর মাতৃভাষার লিপি (যেমন তামিল, তেলুগু, কন্নাড) আছে, ইংরেজীও

না শিখিলে নয়। সুতরাং লিপিই চারিটা শিখিতে হইবে! সোজা ব্যবস্থা বটে।

আমরা বাঙালীদের হিন্দী শিখার খুবই পক্ষপাতী ও সমর্থক। কারণ, ইহাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হয় এবং ইহাতে মধ্যযুগের বহু সাধুসন্তের বাণী জানিবার বুঝিবার উপায় হয়।

মডার্ণ রিভিয়ুতে আমরা হিন্দী বা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা সম্বন্ধে অনেক বাধার কথা লিখিয়াছিলাম। অধ্যাপক মুরলীধর, এম-এ, মহাশয়ও একাধিক প্রবন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার বা আমাদের কথার কোন জবাব দেন নাই।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্য কোন্ ভারতীয় ভাষাটি, তাহার আলোচনা সংক্ষেপে করা যায় না। সুতরাং তাহার চেষ্টা এখানে করিব না। কিন্তু বাঙালী শিক্ষিত লোকেরা সকলেই যে হিন্দুস্থানীকেই তাহা করিবার সপক্ষে নহেন, বস্তুতঃ অনেকে বিপক্ষে, তাহার একটি প্রমাণ এই যে, গত ১লা ২রা মার্চ প্রয়াগে যে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে বহুভাষাবিৎ অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দেব বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করিবার সপক্ষে একটি মূল্যবান্ প্রবন্ধ পড়েন।

রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম বর্ষ পূর্তি উৎসব

আগামী ১৩৪৮ সালের বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথের জীবনের অশীতিতম বৎসর পূর্ণ হইবে। সেই উপলক্ষে কলিকাতায় এবং বঙ্গের অন্য নানা স্থানে উৎসব হইবে। বাংলা দেশের বাহিরেও হইবে। শুধু বাঙালীরাই যে এই উৎসব করিবেন তাহা নহে, অন্য ভারতীয়েরাও করিবেন। যাঁহারা ভারতীয় নহেন, তাঁহারাও কেহ কেহ উৎসবে যোগ দিবেন। কারণ, তিনি পৃথিবীর কবি।

> "আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
> আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি।
> এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক,
> রয়ে গেছে ফাঁক।
> কল্পনায় অনুমানে ধরিত্রীর মহা একতান
> কত না নিস্তব্ধ ক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ।"

কবির ৭০ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর যেরূপ উৎসব করিতে পারা গিয়াছিল—পৃথিবীর নানা দেশ হইতে বহু মনীষীর লিখিত কবি-প্রশস্তি সংগ্রহ করিয়া যেরূপ একটি অপূর্ব গ্রন্থ প্রকাশ করা গিয়াছিল, এবার ক্রমবর্ধমান যুদ্ধের জন্য সেরূপ কিছু করিতে পারা যাইবে না। তথাপি উৎসব যথাসাধ্য করা হইবে। তাহার প্রস্তুতি কলিকাতার বাহিরেও হইতেছে। প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দুই দিনের অধিবেশনের পর এই প্রস্তুতির অংশ স্বরূপ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজিয়ানাগ্রাম হলে "প্রবাসী"র সম্পাদক কর্তৃক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। এলাহাবাদ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি সর্ লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহাতে সভাপতির কার্য করেন।

আইন-সভায় "নিষ্কাম কর্ম"

কেন্দ্রীয় আইন-সভায় এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক আইন-সভায় নির্বাচিত সদস্যগণের মধ্যে যাঁহারা বর্তমানে গবন্মেণ্টের বিপক্ষ দলভুক্ত তাঁহারা সরকারী নানা বিলের এবং বজেটের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করিয়া থাকেন; সংশোধক প্রস্তাবও তাঁহারা উত্থাপন করেন। যে-যে সমালোচনা ও প্রস্তাবে গবন্মেণ্টের অভিপ্রায়ে বাধা জন্মিতে পারে, সেগুলি সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়। এই মন্তব্য বাংলা দেশের আইন-সভা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য।

কেন্দ্রীয় আইন সভায় ত বার বার দেখা গিয়াছে যে, নির্বাচিত সদস্যেরা যুক্তির ও ভোটের জোরে যে ব্যয় বা যে নূতন ট্যাক্স বা পুরাতন ট্যাক্সের যে বৃদ্ধি নামঞ্জুর করিলেন, বড়লাট দেশ শাসনের এবং দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত অত্যাবশ্যক বলিয়া নিশ্চয়-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া (অর্থাৎ সার্টিফিকেশ্যন দ্বারা) তাহা মঞ্জুর করিয়া দিলেন।

অতএব, কেন্দ্রীয় আইন-সভায় এবং বাংলা দেশের মত আইন-সভায় সরকারবিরোধী দলের সদস্যেরা সমালোচনাআদি যাহা করেন, তাহা কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচায়ক বলিয়া প্রশংসনীয় হইলেও, তাহা গীতায় উপদিষ্ট নিষ্কাম কর্মের অন্যতম দৃষ্টান্ত। তাঁহারা যাহা

করেন তাহা করিবার অধিকার তাঁহাদের অবশ্যই আছে, কিন্তু ফলে অধিকার কখনও নাই—"মা ফলেষু কদাচন।"

—

সেন্সসী কলহের কারণ সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা

ভারতবর্ষের—বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের, আর্থিক অবস্থা এরূপ যে, শস্য ও অন্যান্য সম্পত্তির উৎপাদন আরও না বাড়াইলে এখন যত মানুষ আছে তাহাদেরই যথেষ্ট গ্রাসাচ্ছাদনের উপায়ের অভাব আছে; সুতরাং কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি সেদিক দিয়া উল্লাসের কারণ হইতে পারে না। কারণ, বর্তমান আর্থিক অবস্থার উন্নতি না-হইলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির মানে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বেকারসমস্যা উৎকটতর হওয়া। তথাপি হিন্দু মুসলমান ও অন্য কোন কোন সম্প্রদায় চাহিতেছে যে, এ-বৎসরের সেন্সসে যেন তাহাদের সংখ্যা খুব বাড়িয়াছে এইরূপ প্রমাণ হয়। তাহার কারণ, তাহা হইলে মুসলমানেরা আইন-সভায় আরও বেশী আসন এবং সরকারী আপিস আদালতে আরও বেশী চাকরী দাবী করিতে পারিবে এইরূপ মনে করে এবং এই দুই বিষয়ে হিন্দুদের প্রতি যে অবিচার হইয়াছে হয়ত বা তাহার কিছু প্রতিকার হইতে পারিবে, এইরূপ দুরাশা তাহাদের আছে। সাম্প্রদায়িক তথাকথিত রোয়েদাদ (so-called communal "award") এবং ভারতশাসন আইন তাহাকে ভিত্ত করিয়া রচনা, সেন্সস ঘটিত সমুদয় কলহ ও অনর্থের মূল। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল ভারতীয় সমান নাগরিক, সমান পৌরজন, এইরূপ সত্য মতের ভিত্তির উপর দেশের শাসনবিধি রচিত হইলে এই অনর্থ ঘটিত না। এখন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সব ব্যবস্থা হয়; সম্প্রদায়ের লোকদের মাথা গুন্তি দ্বারা বন্দোবস্ত হয়—মাথাগুলার ভিতরে কি আছে না-আছে, তাহা বিবেচিত হয় না।

—

কমলা নেহরু স্মারক হাসপাতাল

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর স্বর্গগতা পত্নী শ্রীমতী কমলা নেহরুর স্মৃতিরক্ষার্থ রোগিণীদের নিমিত্ত এলাহাবাদে যে হাসপাতালের দ্বারোদ্ঘাটন মহাত্মা গান্ধী গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী করিয়াছেন, তাহা সকল দিক দিয়া শ্রীমতী কমলার উপযুক্ত হইয়াছে। হাসপাতালটি বৃহৎ ও সুদৃশ্য এবং বিস্তৃত হাতার মধ্যে খোলা জায়গায় অবস্থিত। এই হাতায় পরে মনোরম উদ্যান রচিত হইতে পারিবে। মহাত্মাজী হাসপাতালটি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যে, ইহাতে রোগিণীদের আরাম, চিকিৎসা ও শুশ্রূষার নিমিত্ত যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা মহারাণীদের পক্ষেও লোভনীয়, কিন্তু তিনি ইহার পরিচালকদিগকে বিশেষ করিয়া ইহা মনে রাখিতে বলিয়াছেন যে, ইহা দরিদ্রদের জন্যই সর্বাপেক্ষা অধিক অভিপ্রেত।

ইহার দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষ্যে ৭০,০০০ টাকা সংগৃহীত হয়। তাহার মধ্যে এলাহাবাদের লোকেরাই ১৫০০০ দেন। তাহা উহার মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রনাথ বসুর মারফৎ প্রদত্ত হয়। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, অধ্যাপক ও অন্যান্য শিক্ষকবর্গ এবং ছাত্রেরা ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অমরনাথ ঝা মহাশয়ের মারফৎ ৫০০০ টাকা দেন।

হাসপাতালটির ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার শ্রীযুক্তা সত্যপ্রিয়া মজুমদার। সুযোগ্য হস্তেই এই ভার অর্পিত হইয়াছে।

—

প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

এই বৎসরের অর্থাৎ প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন গত ১লা ও ২রা মার্চ তথাকার সঙ্গীত পরিষদের হলে হইয়া গিয়াছে। অধিবেশনের উদ্বোধন করেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলর পণ্ডিত অমরনাথ ঝা মহাশয়। তিনি বাংলা সাহিত্যের রসজ্ঞ, বাংলা সাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং বাংলা কথাবার্তা বুঝিতে পারেন। কিন্তু সচরাচর বাংলা বলার অভ্যাস না থাকায় তাঁহার অভিভাষণ রচনা ও পাঠ করিয়াছিলেন ইংরেজীতে। ইহা এপ্রিল মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে মুদ্রিত হইবে। পাঠকেরা দেখিবেন যে, তিনি ইহাতে বঙ্গের মুসলমান কবিদের এবং বঙ্গের বাহিরের বাঙালী কবিদের সম্বন্ধেই কিছু বলিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের অলিগলির (by-ways এর) সম্বন্ধেই

তিনি কিছু বলিবেন বলিয়া তিনি অভিভাষণটি আরম্ভ করেন।

যাহারা খেলায় বা যুদ্ধে ব্যাপৃত, তাহাদের চেয়ে দর্শকেরা অনেক সময় বেশী কিছু দেখিতে পায়। সেই হিসাবে ঝা মহাশয়ের নিম্নমুদ্রিত মন্তব্যটি শিক্ষিত বাঙালীদের প্রণিধানের ও স্মরণ করিয়া রাখিবার যোগ্য।

"*In view of the attempts now being made to dislodge Bengali from its position as the only language of the province of Bengal,* one may draw attention to the notable contributions of non-Hindus to Bengali poetry. Bengali is the common language of all the natives of the province, Hindus, Muslims and Christians alike."

কয়জন বাঙালী জানেন বা অনুভব করেন বা সন্দেহ করেন যে, জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল বাঙালীরই সাধারণ ভাষা বাংলাকে তাহার সেই স্থান হইতে চ্যুত করিবার একটা চেষ্টা চলিতেছে? ঝা মহাশয় কিন্তু বঙ্গের বাহির হইতে তাঁহার নিরপেক্ষ সূক্ষ্মদর্শিতা ও দূরদর্শিতার সাহায্যে তাহা ধরিতে পারিয়াছেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে যে সকল বাঙালী বাংলাকে আপনাদের সাধারণ মাতৃভাষা মনে করেন, তাঁহারা সকলে সাবধান হউন, এবং এই উচ্চ অধিকার রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন ও সজাগ থাকুন। পাঁচ-ছয় কোটি মানুষের একই ভাষা একই সাহিত্য কত বড় আনন্দ ও শক্তির আকর, তাহা আমরা অনেক সময় ভাবিয়া দেখি না।

ঝা মহাশয়ের অভিভাষণটি পড়িবার সুযোগ মডার্ণ রিভিয়ুর পাঠকেরা পাইবেন। আমরা এখানে কেবল তাহার আর একটি অংশের কথা কিছু বলিব। প্রায় দুই বৎসর পূর্বে তাঁহার উৎসাহপ্রদানের ও সহযোগিতার ফলে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা শিখাইবার ক্লাস খোলা হইয়াছে। এই ক্লাসের অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষা হিন্দী বা উর্দু। যে-যে শিক্ষিত বাঙালী যুবক এই ক্লাসে পড়ান, ঝা মহাশয় তাঁহাদের প্রশংসা করেন, কিন্তু বলেন যে, বাংলা শিখাইবার একটি অধ্যাপকের স্থায়ী পদ সৃষ্ট হওয়া উচিত এবং যাঁহারা বাংলা ভাষা ভালবাসেন, টাকা তুলিয়া এইরূপ অধ্যাপকতা প্রতিষ্ঠিত করা তাঁহাদের কর্তব্য। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যথেষ্ট বাংলা পুস্তক ও বাংলা সাময়িক-পত্র নাই। তিনি তাহাও উপহার চান। আমরা তাঁহার এই উভয় অনুরোধের সম্পূর্ণ সমর্থন করি। ইহা আমাদেরই, বাঙালীদেরই, কাজ—আহ্লাদের সহিত আমাদের করা উচিত। আমরা ঝা মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ।

প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত-বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক অমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সারগর্ভ অভিভাষণটি কলিকাতার অন্ততঃ একটি দৈনিক ("ভারত") প্রকাশ করিয়াছেন। অন্য কোন কোন দৈনিকেও বাহির হইয়া থাকিবে। সভাপতি "প্রবাসী"র সম্পাদকের অলিখিত মৌখিক বক্তৃতার কোন রিপোর্ট রাখা হয় নাই।

সভাস্থলে কয়েকটি ভাল প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে বাংলা ভাষার রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা সম্বন্ধে লিখিত অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দেব মহাশয়ের প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

—

প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কয়েকটি প্রস্তাব

প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কয়েকটি নির্ধারণ নীচে মুদ্রিত হইল।

প্রথম প্রস্তাব

"যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে স্কুলের ছাত্র এবং ছাত্রীদিগকে উর্দু এবং হিন্দী ভাষার সাহায্যে প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখিতে হইবে; স্থান এবং অবস্থা বিশেষে অবশ্য ইংরাজি ভাষার সাহায্যে প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখিবার অনুমতি দেওয়া হইবে। যুক্তপ্রদেশে বাঙালীরা সংখ্যালঘিষ্ঠ। সংখ্যালঘিষ্ঠের ভাষা এবং সংস্কৃতির উপর হস্তক্ষেপ না হয় ইহা গবর্ণমেণ্টের নীতি। তদনুসারে এই সম্মেলন দাবী করিতেছে যে যুক্তপ্রদেশের স্কুলসমূহের বাঙালী ছাত্র ও ছাত্রীদিগের পক্ষে তাহাদের মাতৃভাষা বাংলা অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় করা হউক এবং সেই ভাষার সাহায্যে তাহাদের পরীক্ষা গৃহীত হউক। যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট যদি কোন কারণে ইহা প্রতিপালনে অক্ষম হন, তাহা হইলে বাঙালী ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে হিন্দী, উর্দু অথবা ইংরাজি—এই তিন ভাষার মধ্যে যে কোন ভাষার সাহায্যে প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখিবার অনুমতি দেওয়া হউক।"

প্রস্তাবক—ভূতপূর্ব হাইকোর্ট জজ স্যর্ লালগোপাল মুখোপাধ্যায়

সমর্থক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক „ কিরণচন্দ্র সিংহ

দ্বিতীয় প্রস্তাব

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর পণ্ডিত অমরনাথ ঝা মহাশয় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষা
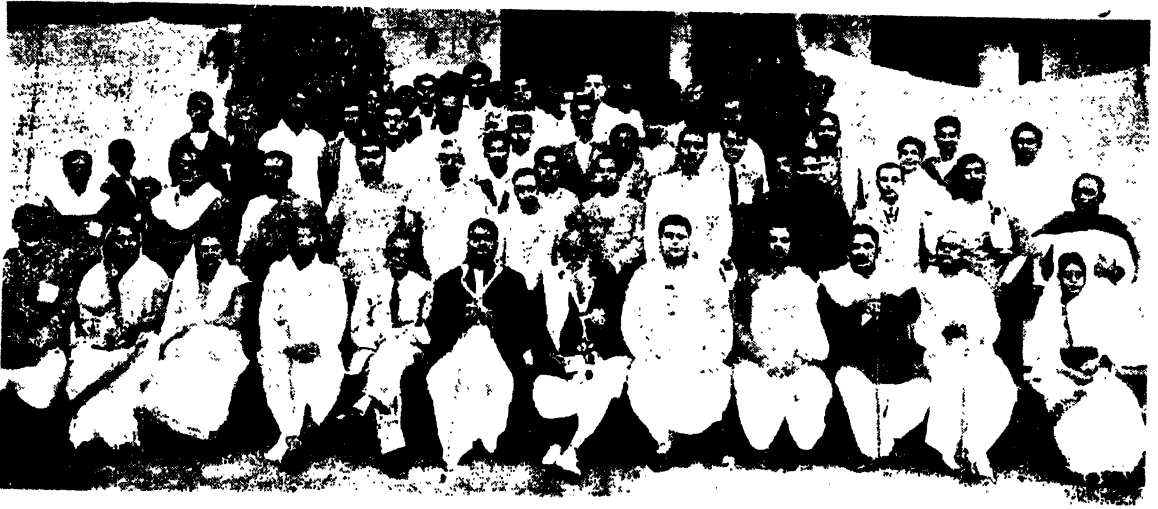
প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন
(উপবিষ্ট) বাম দিক্ হইতে পঞ্চম, সর্ লালগোপাল মুখোপাধ্যায় ;
ষষ্ঠ, পণ্ডিত অমরনাথ ঝা ; অষ্টম অধ্যাপক অমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

দিবার ব্যবস্থা করায় এই সম্মেলন তাঁহার কার্যের প্রশংসা করিতেছে এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে ।

প্রস্তাবক—শ্রীঅবনীনাথ রায়
সমর্থক—অধ্যাপক মোহিতকুমার ঘোষ

তৃতীয় প্রস্তাব

"এলাহাবাদ বহু বিশিষ্ট ও স্বনামধন্য বাঙ্গালীর জননী ও কর্মক্ষেত্র। শুধু এই দেশে নয়—দেশ দেশান্তরে তাঁহাদের অনেকেরই নাম পরিচিত। ইঁহাদেরই উদ্যম ও পরিশ্রমে এলাহাবাদ নব রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটি ইঁহাদের কয়েক জনের নামানুসারে রাস্তা এবং পার্কের নামকরণ করিয়া ইঁহাদের স্মৃতিরক্ষা করিবার ব্যবস্থা করায় এই সম্মেলন সন্তোষ প্রকাশ করিতেছে এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে। এই সম্মেলন এই উপায়ে আরও কয়েক জন মনীষীর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটিকে অনুরোধ করিতেছে :—মেজর বামনদাস বসু, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য, ডাঃ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য ও প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (fighting Munsiff)।

প্রস্তাবক—অধ্যাপক অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সমর্থক—অধ্যাপক পরমানন্দ চক্রবর্তী

চতুর্থ প্রস্তাব

বঙ্গ সাহিত্য এবং ভাষার সেবায় যে সকল প্রবাসী সাহিত্যিক ব্রতী আছেন তাঁহাদের রচিত এবং প্রকাশিত পুস্তক এবং সাময়িক পত্র প্রবাসের বঙ্গভাষাভাষী সকলকে ব্যক্তিগত ভাবে এবং লাইব্রেরি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্রয় করিতে এই সম্মেলন অনুরোধ করিতেছে।

প্রস্তাবক :—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী চন্দ্র
সমর্থক :—শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার সেন

পঞ্চম প্রস্তাব

বঙ্গ সাহিত্যের এবং ভাষার শক্তিবৃদ্ধির জন্য এই সম্মেলন প্রত্যেক বাঙালীকে অনুরোধ করিতেছে যে,

(ক) তাঁহারা নিজেদের মধ্যে দৈনন্দিন কথাবার্তায় সর্বদা বাংলা ভাষা ব্যবহার করিবেন এবং আত্মীয়স্বজনের নিকট পত্র রচনায় বাংলা ভাষা প্রয়োগ করিবেন।

(খ) তাঁহারা যথাসাধ্য প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সদস্য হউন এবং বাংলা ভাষাকে প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে জীবন্ত এবং শক্তিসম্পন্ন করিবার জন্য প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন পরিচালিত "প্রবেশিকা" এবং "বিশারদ" পরীক্ষায় সর্বতোভাবে সহযোগিতা করুন।

প্রস্তাবক—রায় সাহেব অধ্যাপক দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক—অধ্যক্ষ ভূপেন্দ্রনাথ কর

ষষ্ঠ প্রস্তাব

নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে যে অভিযান চলিতেছে তাহাতে ব্যক্তিগতভাবে বা কোন প্রতিষ্ঠানের সহযোগে যথাসাধ্য সাহায্য করা প্রয়াগবাসী বাঙালী শিক্ষিত নরনারীর কর্তব্য।

প্রস্তাবক—অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
সমর্থক—অধ্যাপক নলিনবিহারী মিত্র

প্রস্তাবগুলির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি অধ্যাপক অমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে যে-সকল প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা করেন, তাহার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। সম্মেলনে আলোচনার জন্য "বঙ্গের বাহিরে বঙ্গসাহিত্য" বিষয়ে প্রবন্ধ আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আশানুরূপ প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই। বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের আপনাদের মধ্যে মিত্রতা স্থাপনের এবং দলাদলির উচ্ছেদের উপায় চিন্তা একান্ত আবশ্যক। "বাঙালী যেখানেই বাস করুন, সেইখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে যেন মৈত্রীর অভাব না ঘটে।" অমিয়বাবু বঙ্গের বাহিরের বাঙালী ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বাংলার মধ্য দিয়া হইবার আবশ্যকতার উপর খুব জোর দেন। বলেন যে, প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দ্বারা প্রবর্তিত বাংলা পরীক্ষা দুটিরও যেন সাহায্য লওয়া হয়। বাংলা সাহিত্যের চর্চা না করিলে বঙ্গের বাহিরের ছেলেমেয়েরা বাঙালীর সংস্কৃতি (culture) হইতে বঞ্চিত হইবে।

"এই প্রসঙ্গে প্রবাসী বাঙালী ছাত্রগণকে এই অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন মাতৃভাষা বিশেষ করিয়া শিক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় প্রাদেশিক ভাষাও অন্ততঃ সাধারণ ভাবে শিক্ষা ও ব্যবহার করিতে বিশেষ যত্নবান্ হন। বাঙালী ও অবাঙালী ছাত্রবৃন্দের মধ্যে সদ্ভাব ও মৈত্রী অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে দুই দলেরই পরস্পরের ভাষা শিক্ষা করা অতীব আবশ্যক।"

ছাত্রছাত্রী ব্যতীত অন্য বাঙালীরাও যে-প্রদেশেই বাস করুন, তথাকার ভাষা শিক্ষা ও ব্যবহার করা তাঁহাদের কর্তব্য।

অমিয়বাবুর মতে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্ঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল ভাবে রচিত হওয়া উচিত এবং বাংলা ও হিন্দীর পরিভাষা যথাসম্ভব এক হওয়া উচিত।

"বাঙালীর ছেলেমেয়েদের ব্যায়াম শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা বিশেষ প্রয়োজন। সিনেমা ও রেডিওর প্রয়োজনীয়তা আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু এক বিষয়ে এই দুইটির হানিকর প্রভাব বাড়িয়া চলিয়াছে। দিবসের মধ্যে যে-সময়ে বালকবালিকাদের ব্যায়াম কিংবা স্বাস্থ্যকরী ক্রিয়ার প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়, সে সময়টা যদি অবরুদ্ধ ঘরে বসিয়া সিনেমা দেখিতে কিংবা রেডিও শুনিতে অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের স্বাস্থ্যের হানি হওয়াই সম্ভব। তাঁহারা অনেক সময় ভুলিয়া যান যে, সুস্থ সবল দেহেই সবল প্রাণ ও সতেজ মন থাকা সম্ভব। অনেক সময় তাঁহারা কেবল দর্শকরূপে হকি ক্রিকেটাদি ম্যাচে উপস্থিত হন এবং ক্রীড়কদের বাহবা দিয়াই এই সকল ক্রিয়ার প্রতি মৌখিক অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া ক্ষান্ত হন। অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক বালকেরা এই সকল স্বাস্থ্যকরী ক্রিয়া ও ব্যায়ামে প্রবৃত্ত হন।

"অনেক সময় ইহা লক্ষ্য করিয়াছি যে, যদি কোনও স্থানে এক প্রসিদ্ধ সিনেমা star বা অভিনেতা আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে তাঁহার হস্তলিপি বা স্বাক্ষর লইবার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ দেখা যায়। অনেক সময় তাই মনে এই প্রশ্ন উঠে, প্রসিদ্ধ অভিনেতা হওয়াই কি সুকুমারমতি বালকবালিকাদের একমাত্র চরম আদর্শ? কই, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, জনসেবক বা ধর্ম-প্রচারক এইরূপ শ্রদ্ধার অংশী হন না ত?"

খবরের কাগজে ক্রমাগত সিনেমা-স্টারদের ছবি দিয়া কাগজওআলারা ছাত্রছাত্রীদের মাথা খারাপ করিয়া দিয়াছে।

—

"বঙ্গের বাহিরে বাংলা সাহিত্য" রচনায় ভাগলপুরের প্রাধান্য

প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায় সম্মেলনে বলেন যে, বাংলা সাহিত্য রচনায় বঙ্গের বাহিরে ভাগলপুর সর্বপ্রধান।

অন্য কোন স্থান এই প্রাধান্যের দাবীদার থাকিলে তাহার দাবী বিবেচিত হইতে পারিবে।

—

ভারতবর্ষ হইতে অভিজ্ঞতার বহির্গমন

দাদাভাই নওরোজীর সময় হইতে ইহা ব্রিটিশ রাজত্বের একটি অনিষ্টকর ব্যাপার বলিয়া সমালোচিত ও নিন্দিত হইয়া আসিতেছে যে, ইংরেজ গবন্মেণ্ট সামরিক ও অসামরিক বিস্তর সরকারী কাজে ইংরেজ নিযুক্ত করায় তাহাদের বেতনের কতক অংশ এবং পেন্সানের সবটা ভারতবর্ষ হইতে বাহিরে চলিয়া যায়। ভারতবর্ষে যে-সব ইংরেজ ও অন্য বিদেশীরা নানা ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারখানার কাজ চালায় তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের লাভ এবং বেতনের অনেক অংশ ও সঞ্চয় বিদেশে চলিয়া যায়।

এই প্রকারে সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজরা ভারতবর্ষের ধন বাহিরে পাঠাইয়া বা লইয়া গিয়া প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের কারণ হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু তাহাদের দ্বারা কেবল যে ভারতবর্ষের অর্থই বাহিরে নীত হইতেছে, এমন নয়। রাজকার্য্যে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে ও নানা শিল্প কলকারখানায় অর্জিত অভিজ্ঞতাও তাহাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাহিরে যাইতেছে। ভারতবর্ষের সব সরকারী কাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্য যদি ভারতীয়দের হাতে থাকিত, তাহা হইলে ভারতবর্ষে অর্জিত অর্থ ও অভিজ্ঞতা এই দেশেই থাকিয়া তাহাকে ক্রমাগত সমৃদ্ধতর করিতে পারিত।

—

অভিজ্ঞতা বাহির হইতে আনা ও রাখা

ব্রিটেন যে যুদ্ধে রোজ ১৬ কোটিরও অধিক টাকা খরচ করিয়াও দেউলিয়া হয় নাই, তাহার কারণ ইংরেজরা নানা প্রকারে বাহির হইতে কয়েক শত বৎসর ধরিয়া এবং এখনও অর্থ আনিতেছে।

তাহারা শুধু অর্থ আনিতেছে না, বাহির হইতে রাষ্ট্রনৈতিক ও দেশশাসন সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারখানা সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা বিদেশে অর্জন করিয়া স্বদেশে আনিতেছে।

ভারতবর্ষ যদি এইরূপে ভারতীয়দের দ্বারা বিদেশে অর্জিত অর্থ ও অভিজ্ঞতা আনিতে পারিত, তাহা হইলে তাহারও উভয়বিধ সমৃদ্ধি বাড়িত। কিন্তু তাহা বাড়িতেছে না।

—

লীগ অব্ নেশ্যন্সে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা রক্ষা ও ব্যবহার

লীগ অব নেশ্যন্স যত দিন কাজ করিতেছিল, তত দিন জেনিভা পৃথিবীর নানাবিধ রাষ্ট্রিক ও অন্য নানা প্রকারের অভিজ্ঞতার একটা কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। লীগে ভারতবর্ষ বহু লক্ষ টাকা বৎসর বৎসর চাঁদা দিয়াছে। ইহার চাঁদাদাতা অন্যান্য রাষ্ট্রের অনেক লোক লীগের আফিসে ও তাহার ইণ্টারন্যাশ্যন্যাল লেবার আফিসে বড় বড় কাজ করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। লীগ এখন ভাঙিয়া যাওয়ায় সেই সব লোক সুযোগ-মত নিজের নিজের দেশে গিয়া স্ব স্ব দেশকে সেই অভিজ্ঞতার সুবিধা দিতেছেন।

—

লীগ অব নেশ্যন্সের অভিজ্ঞতাবিশিষ্ট ডক্টর দাস

অতি অল্প ভারতীয়ই লীগের কাজ করিতেন। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ডক্টর রজনীকান্ত দাস। তিনি কারখানার, চা-বাগানআদি আবাদের এবং কৃষিক্ষেত্রের শ্রমিকসমূহ সম্বন্ধীয় সমুদয় বিশেষের এক জন বিশেষজ্ঞ।

ডক্টর রজনীকান্ত দাস

কৃষি সম্বন্ধেও তিনি বিশেষজ্ঞ। এই সব বিষয়ে তাঁহার অনেকগুলি প্রামাণিক ইংরেজী গ্রন্থ আছে। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। ভারত-গবন্মেণ্ট, কিম্বা কোন প্রাদেশিক গবন্মেণ্ট, কিম্বা কোন উন্নতিশীল দেশী রাজ্য তাঁহাকে যথাযোগ্য পদে অধিষ্ঠিত করিলে ভারতবর্ষ তাঁহার অভিজ্ঞতার ফলভাগী হইবে।

—

ভারতবর্ষের সরকারী বজেটে ঘাটতি

১৯৪১-৪২ সালে ভারতবর্ষের আনুমানিক আয়ব্যয়ের হিসাব কেন্দ্রীয় আইন-সভায় পেশ করা হইয়াছে এবং

সেই সঙ্গে ১৯৪০-৪১ সালের সংশোধিত হিসাবও দেখান হইয়াছে। এ বিষয়ে তর্কবিতর্ক চলিতেছে। ১৯৪০-৪১ সালের হিসাবে ৮ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪১-৪২ সালের আনুমানিক আয়ব্যয়ের হিসাবে ২০ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখান হইয়াছে। বর্তমান কয়েকটি ট্যাক্সের হার বাড়াইয়া এবং নূতন একটি ট্যাক্স বসাইয়া ৬ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে অনুমিত হইয়াছে, এবং তাহাতে ঘাটতি কমিয়া ১৩ কোটি ৮৫ লক্ষ হইবে। এই ঘাটতি ঋণ করিয়া পূরণ করা হইবে।

১৯৪১-৪২ সালের মোট আনুমানিক ব্যয় ১২৬ কোটি ৮৫ লক্ষের মধ্যে "দেশরক্ষা"র ব্যয় অর্থাৎ সামরিক ব্যয় ৮৪ কোটি ১৩ লক্ষ এবং অ-সামরিক ব্যয় ৪২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। গণতান্ত্রিক স্বাধীন দেশসকলে "দেশরক্ষা"র ব্যয়ের অর্থ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার ব্যয়। পরাধীন অ-গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে "দেশরক্ষার"র অর্থ ভারতবর্ষের উপর ব্রিটেনের প্রভুত্ব রক্ষা এবং ভারতবর্ষের ইংরেজাধীনতা রক্ষা। ভারতবর্ষকে আপনার অধীন রাখিয়া ব্রিটেন প্রভূত অর্থ ও অন্যবিধ সুবিধা লাভ করিয়া আসিতেছে। অতএব এদেশের উপর নিজের প্রভুত্ব রক্ষার জন্য যত ব্যয় হয়, সমস্তই ব্রিটেনের বহন করা উচিত ছিল এবং এখনও উচিত। ব্রিটেন তাহা করিলে এ পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজস্বের কয়েক হাজার কোটি টাকা বাঁচিয়া যাইত।

আলোচ্য বৎসরের যুদ্ধব্যয় খুব বেশী দেখা যাইতেছে। যুদ্ধে যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার ব্যয়ও তাহাকে দিতে হইবে, ইহা খুব ন্যায্য কথা। ব্রিটেন যুদ্ধে নামিয়াছে, এবং ব্রিটেনের অধিবাসীরা তাহাদের প্রতিনিধি-সমষ্টি পার্লেমেণ্টের সম্মতিক্রমে তাহাতে নামিয়াছে। সুতরাং ব্রিটেনের গবন্মেণ্ট ও লোকেরা যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করিবার নিমিত্ত সকল রকম উপায় অবলম্বন ও দায়িত্ব স্বীকার করিতেছে।

ভারতবর্ষের বিদেশী গবন্মেণ্ট ভারতবর্ষকে যুদ্ধে নামাইয়াছে। সুতরাং তাহাকেও যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত নানা উপায় অবলম্বন করিতে হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের লোকদিগকে এবং তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদিগকে, ভারতবর্ষ যুদ্ধে নামিবে কি না, সে বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই—তাহাদের মত জিজ্ঞাসা করা যে ন্যায়তঃ উচিত, তাহা স্বীকারই করা হয় নাই। সুতরাং ব্যয়ের টাকা দিবার বেলা তাহাদের মত জিজ্ঞাসা করা অসঙ্গত। ভারতবর্ষকে "যুদ্ধরত" বলিয়া ঘোষণা করিবার পূর্বে তাঁহাদের মত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, শুধু এই কারণেই যুদ্ধের ব্যয় মঞ্জুর করিতে অসম্মত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত। জার্মেনী ও ইটালীর দোষ বিচার না-করিয়াও যুদ্ধের ব্যয় মঞ্জুর করিতে অসম্মত হইবার অধিকার তাঁহাদের আছে।

অবশ্য, ব্রিটেনের জার্মেনী ও ইটালীর সহিত যুদ্ধ করিবার ন্যায্য কারণ আছে। আমেরিকা যেমন তাহাকে স্বেচ্ছায় সাহায্য দিতেছে ও দিবে, অন্যদেরও তাহাকে সেইরূপ সাহায্য দেওয়া উচিত; কিন্তু **এই সাহায্য স্বেচ্ছাপ্রদত্ত হওয়া চাই, বাধ্যতামূলক নহে।**

গবন্মেণ্ট ভোটে হারিয়া গেলেও তাহার কোন ক্ষতি নাই; কেন-না না-মঞ্জুরকে মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা বড়লাটের আছে। কিন্তু কংগ্রেসী সদস্যেরা কেন্দ্রীয় আইনসভার কাজে যোগ না-দেওয়ায় ভোটে পরাজয়ও সরকারপক্ষের হইবে না।

—

আসামের আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়

আসাম যখন একটা আলাদা প্রদেশ, তখন তাহার যেমন একটা আলাদা হাইকোর্ট হওয়া উচিত, সেইরূপ একটা আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়ও হওয়া উচিত—অবস্থা-বিচ্ছিন্ন ভাবে শুধু তর্কের দিক দিয়া ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু একটি আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয় নামের যোগ্য আকারে স্থাপন করিয়া সেই নামের যোগ্য ভাবে চালাইতে হইলে যত টাকা আবশ্যক আসাম গবন্মেণ্টের তত টাকা নাই। আসামের যে-সকল অধিবাসী আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় চান, সস্ত সস্ত ঘরবাড়ী নির্মাণের জন্য টাকা, একটি ভাল লাইব্রেরির পুস্তক কিনিবার টাকা, একটি ভাল মিউজিয়ামের সামগ্রী সংগ্রহের টাকা ও কয়েক রকম বিজ্ঞান শিখাইবার নিমিত্ত আবশ্যক যন্ত্রসম্ভার প্রভৃতি কিনিবার জন্য টাকা তাঁহারা

এককালীন দান করিলেও, তাহার পর এইগুলি ভাল অবস্থায় রাখিবার নিমিত্ত বার্ষিক ব্যয়, যাহা কালক্রমে নষ্ট হইবে তাহার পরিবর্তে নূতন সামগ্রী ক্রয় করিবার ব্যয়, এবং অধ্যাপক প্রভৃতির বেতন ইত্যাদি আসাম গবর্মেণ্ট দিতে পারিবেন কি না, বিবেচ্য।

বে-সরকারী ও সরকারী এককালীন ও বার্ষিক অর্থ-সাহায্য ঐরূপ পাওয়া যাইবে কি না, সন্দেহস্থল। কিন্তু শুধু টাকা পাইলেও চলিবে না। আসামে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত করিবার মত যথেষ্টসংখ্যক উচ্চাঙ্গের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে কি? বিশ্ববিদ্যালয় চালাইবার মত বিদ্বন্মণ্ডলী আসামে আছে কি? এই সকল কথা বিবেচ্য।

আসাম প্রদেশ নামে আসাম হইলেও ইহার অধিবাসীদের মধ্যে বাংলাভাষী লোকদের সংখ্যা অন্য প্রত্যেক ভাষাভাষী লোকদের সংখ্যার চেয়ে বেশী—অসমিয়া ভাষীদের প্রায় দ্বিগুণ। আসাম প্রদেশের বাংলাভাষী লোকেরা শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে এবং সার্বজনিক কর্মোৎসাহে তথাকার অন্য কোন শ্রেণীর লোকদের পশ্চাদ্বর্তী নহে। আসামে যদি বিশ্ববিদ্যালয় হয়, তাহা হইলে তাহাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এবং বঙ্গীয় সংস্কৃতির স্থান অন্য কোন ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নিম্নস্থানীয় করিলে চলিবে না। আসাম-প্রদেশবাসী বাঙালীরা তাহাদের সংখ্যা এবং শিক্ষার বলে প্রাদেশিক আইন-সভায় এবং সরকারী অন্য সব প্রতিষ্ঠানে ও বিভাগে যে স্থান, ক্ষমতা ও প্রভাবের ন্যায্য অধিকারী, রাজনৈতিক ফন্দী প্রসূত ১৯৩৫ সালের ভারত-গবর্মেণ্ট আইন দ্বারা তাহাদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। ঐরূপ ফন্দী দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও যদি বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে এবং শিক্ষিত বাঙালীদিগকে সেই প্রকারে বঞ্চিত করা হয়, তাহা হইলে তাহা অত্যন্ত অন্যায় এবং গভীর অসন্তোষের বিষয় হইবে।

ইতিমধ্যেই শ্রীহট্টের ও সুরমা উপত্যকার অধিবাসীরা এবং শ্রীহট্টের আইনজীবীদিগের সভা আসামে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহারা এই বিরোধিতার যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাইয়াছেন এবং অধিকন্তু বলিয়াছেন যে, ১৮৭৪ সালে যখন বঙ্গের শ্রীহট্ট জেলাকে আসাম প্রদেশভুক্ত করা হয় তখন ভারত-গবর্মেণ্ট এই সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, শ্রীহট্ট জেলা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিধা হইতে কখনও বঞ্চিত হইবে না। এই প্রতিশ্রুতির কি কোন মূল্য নাই?

—

"বঙ্গীয় শব্দকোষ"

শান্তিনিকেতনের পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক সংকলিত "বঙ্গীয় শব্দকোষ" প্রকাশিত হইয়া চলিতেছে। ইহার ৭৩তম খণ্ড শেষ হইয়াছে। তাহার শেষ শব্দ "মতিলাল" এবং শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক ২৩২৪।

—

বিহার প্রদেশবাসী বাঙালীদের কৃতি

'প্রবাসী'তে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দেব বঙ্গের বাহিরের সমুদয় বাঙালীদের কৃতির বৃত্তান্ত সংগ্রহের নিমিত্ত যে প্রশ্নাবলী প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদনুযায়ী বৃত্তান্ত বিহারপ্রদেশবাসী বাঙালীদের সম্বন্ধে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা বিহারের বাঙালী সমিতির পক্ষ হইতে করা হইতেছে। এই বিষয়ে সমুদয় তথ্যাদি শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার (সম্পাদক, বেহার হেরাল্ড ও প্রভাতী), "পাটলিপুত্র", কদমকুয়া, পাটনা, ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

—

বাঁকুড়া জেলায় অন্নকষ্ট বা দুর্ভিক্ষ

রায় বাহাদুর মন্মথনাথ বসু বঙ্গীয় কৌন্সিলে গত ২৭শে ফেব্রুয়ারি জিজ্ঞাসা করেন, বাঁকুড়ায় যথাসময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় যথেষ্ট ধান্য উৎপন্ন হয় নাই ইহা মন্ত্রী মহাশয় (সর্ বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়) জানেন কি না, তিনি তথায় ব্যাপক বা আংশিক দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করেন কি না, এবং তিনি তাহা করিলে বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ কি করা হইতেছে?

উত্তর এইরূপ দেওয়া হইয়াছে যে, কোন কোন স্থানে আংশিক অজন্মা হইয়াছে, ১৫০০০৲ টাকা সাধারণ কৃষি-ঋণ দেওয়া হইয়াছে এবং ৫০০০৲ টাকা জমির উন্নতি-

সাধনার্থ ঋণ দেওয়া হইয়াছে। তদ্ভিন্ন সেণ্ট্র্যাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ২৪১৯২৲ টাকা শস্যঋণ (crop loans) দিয়াছে; বঙ্গীয় পুষ্করিণী উন্নতি আইন অনুসারে কাজ করাইবার চেষ্টা হইতেছে এবং যখন যেমন যেমন আবশ্যক হইবে, তখন তদনুযায়ী ব্যবস্থা করা হইবে।

ইহা যথেষ্ট কি না, বাঁকুড়া জেলার অধিবাসীরা বলিতে পারিবেন।

চাকরীপ্রার্থী বাঙালী যুবকদের সিমলায় শিক্ষার সুযোগ

সিমলার বঙ্গীয় সম্মিলনী সেই শৈলনিবাসে সাহিত্যচর্চা বিনোদন ইত্যাদি করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন তাঁহারা অতঃপর কিছু সেবার কাজেও হাত দিবেন।

"তাঁরা অল্প নিয়ে আরম্ভ করতে চান। এখানে ভারত-সরকারের আপিসে নানা কাজে লোক নেওয়া হয়—কোনটি পরীক্ষান্তে, কোনটি সোজাসুজি। অনেক বাঙালী অভিভাবক সব কাজের খোঁজ রাখেন না, রাখাও সম্ভব নয়। আর, কাজের জন্য কি ধরণের যোগ্যতার প্রয়োজন, তারও কোন ধারণা তাঁদের নেই। স্থির হয়েছে, ঠিক যে ধরণের শিক্ষা (Traning) প্রয়োজন, তার জন্য পরিমিত আয়োজন করা হবে। কয়েক জন অভিজ্ঞ কর্মচারী (বাঙালী) স্বেচ্ছায় এই শিক্ষা দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। আরম্ভে অল্প বেতনের কাজগুলির জন্য প্রস্তুত করা হবে; পরে প্রতিষ্ঠানটি আরও বড় করবার ইচ্ছা আছে, যাতে সমগ্রভারতীয় চাকরী (All India Services) গুলোর জন্যও কিছু কিছু সহায়তা বাঙালী ছেলেরা পায়। এ-বিষয়ে কোন ছাত্র বা অভিভাবক যদি কিছু জানতে চান, তবে সিমলা বঙ্গীয় সম্মিলনীর সম্পাদককে, গোল মার্কেট, নিউ দিল্লী, ঠিকানায় লিখলেই সব খবর পাবেন। দরখাস্তের যে ফরম হয়েছে, তাও তাঁর কাছে পাওয়া যাবে। কোন ফী নেওয়া হবে না।"

এই বিষয়টি খুব দরকারী। বাঙালী শিক্ষিত বেকার যুবকদের এবং তাঁহাদের অভিভাবকদের ইহার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

"সুলভ সমাচার"এর অনুকরণে পঞ্জাবে "পয়েসা অখবার" স্থাপনের বৃত্তান্ত

বঙ্গের বাহিরে নানা প্রদেশে ও দেশী রাজ্যে যে-সকল বাঙালী সেই সেই অঞ্চলের উন্নতির নিমিত্ত সফল ও সার্থক পরিশ্রম করিয়াছেন, পঞ্জাবের স্বর্গত নবীনচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে প্রধান একজন মনীষী। তাঁহার সমুদয় কাজের বৃত্তান্ত এখানে বর্ণনীয় নহে। বঙ্গে "সুলভ সমাচার" প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তিনি পঞ্জাবে তাহারই মত যে একটি খবরের কাগজ প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী চৌধুরী মহাশয়া যেরূপ লিখিয়াছেন, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"তিনি (নবীনচন্দ্র রায় মহাশয়) সে সময় পঞ্জাবের লোকদের জ্ঞানোন্নতির জন্য বিশেষরূপে খাটিয়াছিলেন, তাহা অনেকে জানেন। তাঁহার সমকালীন ও সহযোগী ৺পণ্ডিত ভানু দত্ত মহাশয় তাঁহার পঞ্জাবের কাজের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, আমি তাঁহার পত্র হইতে সংক্ষেপে তাহার একটি বৃত্তান্ত অনুবাদ করিয়া লিখিতেছি:

'কলিকাতায় সুলভ সমাচার নামক বাঙ্গালা এক পয়সা মূল্যের সুলভ পত্র প্রকাশিত হইলে, বাবু নবীনচন্দ্র তাহা দেখিয়া পঞ্জাবীদের জন্যও সেইরূপ একখানা সুলভ সমাচার-পত্র "পয়েসা অখবার" নাম দিয়া প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। পণ্ডিত মুকুন্দরামকে উর্দ্দুতে এক পয়সা মূল্যের পত্র 'পয়েসা অখবার' সম্পাদনের ও মুদ্রণের ভার দিলেন। তাঁহার পুত্র গোবিন্দরামের উর্দ্দু হাতের লেখা অতি সুন্দর ছিল। বাবু নবীনচন্দ্র স্বয়ং সমস্ত বিষয় রচনা করিয়া গোবিন্দরামের দ্বারা লিখাইতেন। তাহার লিথোগ্রাফ হইত। (গোবিন্দরাম যত দিন বাঁচিয়াছিলেন, তিনি উক্ত পত্র প্রকাশ করিয়া বিস্তর লাভবান্ হইয়াছিলেন।)

'নবীনচন্দ্র উক্ত পত্র সম্পাদন করিতেন এবং নানাবিধ সংবাদ লিখিতেন, আয় ও ব্যয়ের জন্য পণ্ডিত মুকুন্দরাম দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। যত দিন নবীনচন্দ্র পঞ্জাবে ছিলেন, উক্ত পত্রে লিখিতেন। এক শুক্রবারে বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ হইল, পরের সোমবারে

(অর্থাৎ ৩য় দিনে) প্রাতঃকালে লাহোরের দোকানে, কাছারীতে এবং বাজারে নানা স্থানে সকলের হাতে "পয়সা অখবার" দেখিতে পাওয়া গেল। সর্ব্বসাধারণ এত অল্প মূল্যে এরূপ চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ ও সংবাদ পাঠে বড়ই আনন্দিত হইলেন। ক্রমে "পয়সা অখবারে"র প্রায় লক্ষাধিক গ্রাহক হইল। শুনা যায় মুকুন্দরাম ও তাঁহার পুত্র বহুকাল ঐ অখবার পরিচালন করিয়া পরে নিজেদের অসমর্থতাতে পত্রের স্বত্ব প্রায় লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিয়াছিলেন। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল "পয়সা অখবার" পঞ্জাবের নানা স্থানে, নগরে, গ্রামে, পল্লীতে প্রচারিত হইয়াছিল।'

"ইহার পরে আমার পিতা পঞ্জাবীদের সমাজসংস্কার-বিষয়ে উর্দ্দুতে "Social Reformer" সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি বাল্যকালে সর্বপ্রথম বাঙ্গলা "সুলভ সমাচার" পত্র পাঠ করিয়াছিলাম। পূজায় "সুলভ সমাচার" নানা হাসির গল্পে ও ছবিতে সুসজ্জিত হইয়া প্রকাশ হইত, আমি তাহা পড়িয়া আমার সমবয়সী বালকবালিকাদের শুনাইয়া আনন্দ দিতাম। তখনও বালকবালিকাদের জন্য কোনও মাসিকপত্র প্রকাশ হয় নাই।"

হেমন্তকুমারী চৌধুরী। খামগাঁও (বেরার)

—

রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী

মধ্যপ্রদেশের পরলোকগত রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী মহাশয় সম্বন্ধে আমরা নিম্নমুদ্রিত সংক্ষিপ্ত বিবরণটি পাইয়াছি।

"রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী সম্প্রতি ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে জন্মগ্রহণ করেন। সুরেন্দ্রনাথ মধ্যপ্রদেশে ইরিগেশন বিভাগে ২৪ বৎসর একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের পদে নিযুক্ত ছিলেন, এবং কর্ম্মনৈপুণ্যে ও চরিত্রগুণে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। এখানকার কয়েকটি জেলায় বড় বড় ট্যাঙ্ক বেগুলি প্রস্তুত করিতে এক একটিতে প্রায় ১৫২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং আমোলা মিডা ট্যাঙ্কটি চিরদিনের জন্য দুর্ভিক্ষের কবল হইতে চাঁদা জেলাকে মুক্ত করিয়াছে, সেই ট্যাঙ্কগুলি ইঁহার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া মধ্যপ্রদেশে ইঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত এত প্রজেক্ট তিনি তৈয়ারী করিয়া গিয়াছেন যে ৫০ বৎসরেও সে কাজগুলি সম্পন্ন হওয়া কঠিন।

"১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি গোয়ালিয়রে চীফ এঞ্জিনীয়ারের পদলাভ করেন। তথায় বর্ত্তমান মহারাজা জিয়াজী রাওএর পিতা মাধোরাও

স্বর্গগত সুরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী

সিন্ধিয়া বাহাদুরের স্মৃতিমন্দির (ছত্রী), গোয়ালিয়রে ওয়াটার ওয়ার্কস্, উজ্জয়িনীতে পার্ব্বতী ব্রীজ, শিপ্রীতে বহু মন্দিরাদি রাজপথ নির্ম্মিত করাইয়া কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন এবং বর্ত্তমান মহারাজার প্রিয়পাত্র হন।

"চিরদিন প্রবাসী হইয়াও তিনি দেশের ব্যবসায় ও প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত অন্তরের যোগ রাখিয়াছিলেন, তিনি পুত্রদের জন্য বেকালাইটের কারখানা, একটি চালের কল ও একটি কম্বলের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি দানে মুক্তহস্ত ছিলেন, কত জনহিতকর অনুষ্ঠান ও কত দুঃস্থ আত্মীয় দীন ভদ্র পরিবার গোপনে তাঁহার সাহায্যলাভ করিত তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা একজন কর্ম্মোৎসাহী মহানুভব জনপ্রিয় ব্যক্তিকে হারাইলাম।"

—

প্রবাসীর ৪০ বৎসরের লেখক-তালিকা

গত চল্লিশ বৎসরে যাঁহারা প্রবাসীতে লিখিয়া সম্পাদককে ঋণী করিয়াছেন, তাঁহাদের একটি তালিকা বর্ত্তমান সংখ্যার শেষে মুদ্রিত হইল। তালিকাটি সম্পূর্ণ নহে। কিছু নাম বাদ পড়িয়া থাকিতে পারে।

—

সিবিলিয়ানী ও উজীরী বাংলার আয় ও অবস্থা

বাংলা দেশের সিবিলিয়ানী শাসন শেষ হয় ১৯৩৮-৩৭ সালে এবং উজীরী আমল আরম্ভ হয় ১৯৩৭-৩৮ সাল

থেকে। সিবিলিয়ানী আমলের শেষ বৎসরে এবং উজীরী আমলের চারি বৎসরে বাংলা দেশের সরকারী আয় কত হইয়াছিল, তাহা নীচের তালিকায় দেখান হইয়াছে। সিবিলিয়ানী আমলের শেষ বৎসরের চেয়ে তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বৎসরে আয় কত বেশি হইয়াছিল, তাহাও এই তালিকায় দেখান হইয়াছে।

বৎসর	টাকায় আয়	সিবিলিয়ানী শেষ বৎসরের চেয়ে বেশি
১৯৩৬-৩৭	১২১৪০০০০০	....
১৯৩৭-৩৮	১৩০০০০০০০	৮৬০০০০০
১৯৩৮-৩৯	১২৭৬০০০০০	৬২০০০০০
১৯৩৯-৪০	১৪৩১০০০০০	২১৭০০০০০
১৯৪০-৪১	১৩৮২০০০০০	১৬৮০০০০০
	চারি বৎসরে মোট বেশি আয়	৫৩৩০০০০০

চারি বৎসরে মন্ত্রীরা শুধু যে এই পাঁচ কোটি তেত্রিশ লক্ষ টাকাই বেশি পাইয়াছেন, তাহা নহে। সিবিলিয়ানী আমলে সন্ত্রাসনপন্থীদের দমন ওজুহাতে গবর্মেণ্ট প্রতি বৎসর মোটামুটি ষাট লক্ষ টাকা খরচ করিতেন। এই চারি বৎসর উজীরদের সেই ষাট লক্ষ করিয়া মোট ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা খরচ হয় নাই। তা ছাড়া সিবিলিয়ানী আমলে বাংলা-গবর্মেণ্টকে মোটামুটি আঠার লক্ষ টাকা ভারত-সরকারকে সুদ দিতে হইত। উজীরী আমলে সেই সুদটা মাফ হওয়ায় চারি বৎসরে তাঁহারা ৭২ লক্ষ টাকা রেহাই পাইয়াছেন। অতএব, গত চারি বৎসরে উজীররা সিবিলিয়ানদের চেয়ে মোট আট কোটি পঁয়তালিশ লক্ষ টাকা বেশি পাইয়াছিলেন বাংলা দেশের লোকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য স্বাস্থ্য শিক্ষা আদির ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত।

কিন্তু বাংলা দেশের লোকেরা কি আগেকার চেয়ে বেশি ও ভাল খাইতে পায়? তাহাদের ঘর বাড়ী কাপড় চোপড় বাসন কোসন কি আগেকার চেয়ে ভাল হইয়াছে? দেশে কি বেশি শস্য উৎপন্ন হইতেছে? অন্য আয় কি বাড়িয়াছে? দেশে স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা কি উৎকৃষ্টতর হইয়াছে? রোগ কি কম হয়? রোগে চিকিৎসার ব্যবস্থা কি উৎকৃষ্টতর হইয়াছে? শিক্ষা কি বেশি ছাত্র ছাত্রী পাইতেছে ও উৎকৃষ্টতর শিক্ষা পাইতেছে? যদি এ বিষয়ে কিছু উন্নতি হইয়া থাকে, তাহা কি সরকারী চেষ্টার ফল?

—

বঙ্গের ১৯৪১-৪২ সালের বজেট

বঙ্গের ১৯৪১-৪২ সালের বজেটে দেখা যাইতেছে যে, আনুমানিক আয়ের চেয়ে অনুমানিক ব্যয় এক কোটি চৌত্রিশ লক্ষ টাকা বেশি। এই বজেটটার যা কিছু দোষ আছে এবং মন্ত্রীরা যে-সব অপকর্ম, অকর্ম ও অবহেলার দোষে দোষী, তাহা মন্ত্রীদের বিরোধী দলের লোকেরা তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইতেছেন।

আয় হয় বিস্তর, খরচও হয় বিস্তর, কিন্তু দেশ যে-তিমিরে সেই তিমিরে। অপব্যয় খুবই হয়। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা মাসে ৫০০ টাকা বেতন লইতেন। আমাদের উজীরদের নজর বড়। তাঁহারা দুই আড়াই তিন হাজারের কমে কথা কন না। তাহার উপর রাহা খরচ, ভাতা ইত্যাদি নানা রকম উপরি পাওনা (অবশ্য "আইন"সঙ্গত!) আছে। যাঁহারা আইন-সভার সদস্য, তাঁহাদেরও এই উপরি পাওনা কম নয়। ন্যায্য যা, তা যাঁরা লইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে কোন দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু কেহ কেহ এমন স্বধর্মনিষ্ঠ ও ওস্তাদ যে, যদিও তাঁদের স্থায়ী আড্ডা কলিকাতায়, তথাপি পৈত্রিক 'দেশ' হইতে যাতায়াতের রাহা খরচটা এবং কলিকাতায় থাকিবার প্রাত্যহিক ভাতাটা তাঁহারা আদায় করিয়া থাকেন। লাটসাহেবের বেতন ও ভাতা একটা বৃহৎ ব্যয়।

—

বঙ্গের লাটসাহেবের বেতন ও ("আইন"সঙ্গত) উপরি (?)

অনেকে মনে করে বঙ্গের লাটসাহেব বৎসরে ১,২০,০০০ টাকা বেতন পান এবং তার থেকে বিরাট ব্যয় বাদে যৎকিঞ্চিৎ যা বাঁচে সেইটাই বাড়ী পাঠান, কিম্বা এখানেই সঞ্চয় করেন। তা নয়। তাঁহার যত রকম ব্যয় হওয়া সম্ভব তাঁহাকে তাহা আলাদা দেওয়া হয়; ১২০০০০ টাকা থেকে তাঁর আধ পয়সাও খরচ করা আবশ্যক হয় না। প্রাসাদ ত পান বিনি পয়সায়, আর সবও বিনি

পয়সায়। তিনি যা দান করেন, তাও বঙ্গের রাজস্ব থেকে দেওয়া হয়। আগে আগে আমরা বজেটের বই একখানা পাইতাম এইরূপ মনে পড়িতেছে, কিন্তু আজকাল তা আর পাই না। উজীররা 'ভয়ঙ্কর' মিতব্যয়ী হইয়া পড়িয়াছেন। সেই জন্য আমরা লাটসাহেবের সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ভাতার ফর্দ টা একখানি দৈনিক কাগজ ("ভারত") থেকে উদ্ধৃত করিতেছি। "ভারত" লাটসাহেবের ভাতাকে বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীজ বলিয়াছেন, কিন্তু বীজটা কাঁকুড়টার চেয়ে বাস্তবিক ছয় গুণেরও বেশি।

"এই বিপুল বরাদ্দ একটা বিভাগের অনেকগুলি লোকের জন্য নয়, স্বয়ং বাঙ্গলা দেশের লাটসাহেবের জন্য। ভারত-শাসন আইন অনুসারে লাটসাহেবের বেতন ও ভাতা সম্বন্ধে ব্যবস্থা-পরিষদের ভোট লওয়া তো চলেই না, এই বরাদ্দের কোনরূপ আলোচনা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। এই পৌনে নয় লক্ষ টাকা করদাতাগণকে মুখটি বুজিয়া গণিয়া দিতে হইবে, ভারত-শাসন আইনের ইহাই বিধান।

বরাদ্দটা নিম্নলিখিতরূপ :—

১।	বেতন, বার্ষিক	১২০০০০	টাকা
২।	সামচুয়ারী এলাউন্স	২৫০০০	,,
৩।	লাটসাহেবের বাড়ীর জন্য বরাদ্দ :		
(ক)	কর্ম্মচারীর বেতন	৮৯৭২০	,,
(খ)	কেরাণী ভৃত্য প্রভৃতির বেতন	১১৪,৪৪৪	,,
(গ)	কর্ম্মচারীদের ভাতা	৩২০৩৮	,,
(ঘ)	কন্টিঞ্জেন্সি	১০১২১৪	,,
(ঙ)	দান	১৮০০	,,
৪।	গবর্ণরের সেক্রেটারীবৃন্দ :		
(ক)	কর্ম্মচারীদের বেতন, বার্ষিক	৬৪৬০০	,,
(খ)	কেরাণী প্রভৃতির বেতন	৪৩০০০	,,
(গ)	ইহাদের ভাতা	১৬২০০	,,
(ঘ)	কন্টিঞ্জেন্সি	১৩৫০০	,,
৫।	কনট্রাক্ট এলাউন্স হইতে ব্যয়	১১০০০০	,,
৬।	ভ্রমণ-ব্যয়	১৪২৫০০	,,

এইবার আরও একটু পরিষ্কার করিয়া দেখা যাক। লাটসাহেবের বাড়ীর জন্য যে বরাদ্দ ধরা হইয়াছে তাহা ব্যয় হইবে নিম্নোক্তরূপে—

১।	মিলিটারী সেক্রেটারী বার্ষিক	১১৫০০০	টাকা
২।	ডাক্তার	২৪০০০	,,
৩।	ব্যাণ্ড		
৪।	দেহরক্ষী	১০০৯০০	,,
৫।	আসবাবপত্র চকচকে রাখিবার জন্য	৪৯০০০	,,

—

বঙ্গের আবগারি আয়ের ক্রমিক বৃদ্ধি

বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ও অন্য কয়েক জন মন্ত্রী মুসলমান; বাকী মন্ত্রীরা হিন্দু। মুসলমানদের কোরান অনুসারে মদ হারাম, হিন্দুদের মনুস্মৃতি অনুসারে মদ্যপান মহাপাতক। এই জন্য মুসলমান ও হিন্দু মন্ত্রীরা মিলিয়া মদ খাওয়া ও অন্যান্য নেশা করা উত্তরোত্তর এমন অধিকতর ব্যয়সাধ্য করিয়া তুলিতেছেন, যে, আবগারি আয় বাংলা দেশে বাড়িয়াই চলিয়াছে। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বুদ্ধি কম; তাঁহারা মদ্য উৎপাদন বিক্রয় ও পান নিষিদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। তার চেয়ে বাংলার মন্ত্রীদের বুদ্ধি ও ব্যবস্থা ভাল—বেশ দু-পয়সা আয় হয়।

১৯৩৭-৩৮, ১৯৩৮-৩৯, ১৯৩৯-৪০, ও ১৯৪০-৪১ সালে বঙ্গের আবগারি আয় হইয়াছিল যথাক্রমে ১৫৪৫৬০০০, ১৫৯৩৫০০০, ১৬৫২৮০০০, এবং ১৭৫০০০০০ টাকা।

—

মক্তবে হিন্দু ছাত্র সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর একটি প্রশ্নের যে উত্তর প্রধান মন্ত্রী দেন, তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে, বঙ্গে মক্তবে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে। প্রধান মন্ত্রী তাঁহার উত্তরে জানান যে ১৯৩৮ সালে বঙ্গের মক্তবগুলিতে ৩২১৩৯টি হিন্দু ছাত্র ছিল, এই সংখ্যা বাড়িয়া ১৯৪০ সালে ৭৪৫০৮ অর্থাৎ দ্বিগুণেরও অধিক হয়। কোন্ জেলায় কি পরিমাণ বাড়িয়াছে তাহা নীচের তালিকা হইতে জানা যাইবে।

জেলা	মক্তবে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা। বৎসর ১৯৪০	১৯৩৮
২৪-পরগণা	২২১৯	৭৪৮
নদীয়া	২৩১২	৮২৫
মুর্শিদাবাদ	১৪৮৬	৬৮৩
যশোহর	৩২১৬	৭৩১
খুলনা	৮২৯	২৭৩
বর্দ্ধমান	২৪৩৭	১৬৫৮
বীরভূম	১১৭৭	১১৮২
বাঁকুড়া	২৬৩	১৭২
হুগলী	১৫৬১	৭০৫৫
হাবড়া	১১৬	২৬২
মেদিনীপুর	২১৯০	১৮৯১

ঢাকা	৯৫৭৬	১৮৫৪
মৈমনসিং	৩৪৩৬	৩৮৪৯
ফরিদপুর	২৫৩৬	১০০১
বাখরগঞ্জ	৫৯৭৬	৪৩৯১
চট্টগ্রাম	৬৫৬১	৩৩০৬
নোয়াখালি	৭৩৮৮	২৪৬২
ত্রিপুরা	০	১৩৭
রাজশাহী	১০১৭	৬৯৫
দিনাজপুর	১৬৫৪	১৪৮৭
রঙ্গপুর	১৫৬৯০	৯৬০
জলপাইগুড়ি	২৫২	৫১৭
বগুড়া	১৪৫৫	৭৫৭
পাবনা	৬১২	৯২৩
মালদহ	৫৪৭	৬৩০
মোট	৭৪৫০৬	৩২১৪৯

দেখা যাইতেছে যে, অধিকাংশ জেলাতেই মক্তবে হিন্দু ছাত্র বাড়িয়াছে, অল্প কয়েকটিতে কমিয়াছে, এবং বাঁকুড়া মেদিনীপুর প্রভৃতির মত হিন্দুপ্রধান জেলাতেও মক্তবে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা বাড়িয়াছে।

এই সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ ইহা নহে যে, মক্তবগুলিতে সাধারণ পাঠশালা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিক্ষা দেওয়া হয়; কারণ এই যে, যে-যে জেলায় মক্তবে হিন্দু ছাত্রদের সংখ্যা বাড়িয়াছে সেই সেই জেলায় যথেষ্টসংখ্যক সাধারণ পাঠশালা নাই। হিন্দুরা তাহাদের ছেলেমেয়ে-দিগকে সাধারণ পাঠশালাতে পাঠায় কিন্তু তাহা না থাকিলে তাহারা লেখাপড়া শিখাইবার নিমিত্ত মক্তবেই পাঠায়—কারণ বিশেষ করিয়া হিন্দুদের জন্ম কোন পাঠশালা নাই যেমন মুসলমানদের নিমিত্ত মক্তব আছে।

মক্তবে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা আধুনিক যুগের পক্ষে মুসলমান বালকবালিকাদেরও উপযোগী নহে। মক্তবসমূহের বাংলা পাঠ্যপুস্তক কদর্য বাংলায় লিখিত, যেরূপ বাংলা শ্রেষ্ঠ মুসলমান লেখকেরাও ব্যবহার করেন না। তদ্ভিন্ন, মক্তবের শিক্ষায় জ্ঞান ও মানসিক শক্তিবৃদ্ধি এবং চারিত্রিক উন্নতি অপেক্ষা ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাই বাড়ে।

বলা বাহুল্য, মক্তবী শিক্ষা হিন্দু ছেলেমেয়েদের বিন্দুমাত্রও উপযোগী নহে। অথচ সরকারী শিক্ষানীতি এরূপ যে, যথেষ্ট সাধারণ পাঠশালা স্থাপন না করিয়া তাহা পরোক্ষভাবে হিন্দু ছেলেমেয়েদিগকে মক্তবে পড়িতে নতুবা নিরক্ষর হইয়া থাকিতে বাধ্য করিতেছে।

হিন্দু সমাজের এ বিষয়ে ঔদাসীন্য এত অধিক যে, হিন্দু নেতারা যথেষ্টসংখ্যক সাধারণ পাঠশালা স্থাপন করিতে গবন্মেণ্টের উপর চাপ দেন নাই, কিম্বা নিজেরাও যথেষ্টসংখ্যক সাধারণ পাঠশালা স্থাপন করেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহাদের খুব বেশী পরিমাণে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক ও উচিত।

—

বঙ্গে কম-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব

সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার ভিত্তির উপর প্রণীত ভারত-শাসন আইন বঙ্গে মুসলমান প্রভুত্ব (অবশ্য ব্রিটিশ প্রভুত্বের অধীন ভাবে) স্থাপন করিয়াছে। অথচ বাঙালী মুসলমান-সমাজ শিক্ষায় হিন্দুসমাজের অনেক নীচে।

গত বৎসর বঙ্গের কলেজগুলিতে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৭৩৭৯; হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ২৭২৭৭, মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ৫৮১৮।

গত বৎসর মোট ১৭৯৯৫ জন হিন্দু ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিল; মুসলমান পরীক্ষার্থী ছিল ৪১৬৩ জন।

—

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্ ইনসিওরেন্স সোসাইটি

গত ১৯৪০ সালে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওর্যান্স সোসাইটি লিমিটেড দুই কোটি চুয়াত্তর লক্ষ টাকার নূতন বীমার কাজ করিয়াছেন। এরূপ দুর্বৎসরে এত টাকার কাজ করা প্রশংসার্হ।

—

ভৌগোলিক প্রদর্শনী ও ভূগোল শিক্ষা

কলিকাতায় একটি ভৌগোলিক প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর পরীক্ষা-গুলিতেও ভূগোল শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ভূগোল সম্বন্ধে অজ্ঞতা মানুষকে

কূপমণ্ডুক থাকিতে সাহায্য করে। বাংলা দেশের পথ-ঘাটের অবস্থা এরূপ যে, কলিকাতা হইতে নবদ্বীপ শান্তিপুর কৃষ্ণনগর যাইতে হইলেও ট্রেন বদলাইতে হয়, যদিও বোম্বাই মান্দ্রাজ দিল্লী লাহোর পেশাওয়ার হইতে সোজা কলিকাতা আসা যায় এবং সোজা সেই সব জায়গায় যাওয়াও যায়। ইহার উপর যদি আমরা ভূগোল না-জানি, তাহা হইলে আমাদের শরীরটা যেমন ঘরকুনো হইয়া আছে, মনটাও সেইরূপ ঘরকুনো হইয়া থাকে।

আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি পৃথিবীর সকল মহাদেশে গিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, পৃথিবীকে জানিবার তাঁহার আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই। আশী বৎসর বয়সে তিনি লিখিয়াছেন :—

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী,
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত না অজানা জীব, কত না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে—
যেথা পাই চিত্রময় বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।"

—

প্রসিদ্ধ বহুভাষাবিৎ ডক্টর গ্রিয়ার্সন

বিখ্যাত বহুভাষাবিৎ ডক্টর গ্রিয়ার্সনের একানব্বই বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ভারতবর্ষের সমুদয় ভাষা ও উপভাষার সহিত পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার Linguistic Survey of India তাঁহার প্রসিদ্ধ কীর্তি।

—

বাণিজ্যিক ভূগোল শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

আমাদের সমুদয় বিদ্যালয়ে, কলেজে, ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যিক ভূগোল বিশেষ করিয়া শিখান উচিত। কোন্ কাঁচা মাল ও কোন্ তৈরি জিনিষ বাংলা দেশের কোথায় উৎপন্ন ও প্রস্তুত হয় বা কোথা হইতে আনীত হয়, আমদানী-রপ্তানির পথ ও উপায় কি কি—এই সব শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কমার্শ্যাল মিউজিয়মের শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষের পুস্তকগুলির খুব বেশি পাঠক জুটা আবশ্যক।

—

ব্রিটেনকে সাহায্য দিবার আমেরিকান আইন

"ইজারা ও ঋণদান বিল" নামক ব্রিটেনকে সাহায্য দিবার আমেরিকান বিলটি আইনে পরিণত হইয়াছে, ইহা সন্তোষের বিষয়। আমেরিকার সাহায্য পাইলে ব্রিটেনের যুদ্ধে জয়লাভ অধিকতর নিশ্চিত হইবে। আমরা ব্রিটেনের জয় চাই। তাহা অবশ্য পৃথিবীর সর্বত্র স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সমর্থক হইবে না, কিন্তু জার্মেনী ও ইটালীর জিৎ অপেক্ষা তাহা পৃথিবীর পক্ষে ভাল হইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং নাৎসীবাদ-ফাসিস্টবাদ উভয়ই মন্দ; কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ উভয়ের মধ্যে ভাল, ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের জয় মন্দের ভাল।

আমেরিকা যদি এরূপ ভান করে যে, সে পৃথিবীতে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটেনকে সাহায্য করিতেছে, তাহা হইলে তাহা মিথ্যা দাবী হইবে। আমেরিকার কোন কোন মহামনা নাগরিক—বিশেষ করিয়া ডক্টর সাণ্ডার্ল্যাণ্ড, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র কখনও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য টুঁ শব্দও করে নাই; এবং কোন ব্যক্তি, জাতি বা রাষ্ট্র যদি বলেন যে, তিনি পৃথিবীর স্বাধীনতার পক্ষে অথচ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য কিছুই করেন না, তাহা হইলে সে-কথা সত্য নহে; কারণ, পৃথিবীতে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সর্বাগ্রে ও সর্বপ্রধান দরকার ভারতে স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠা। তাহা ভিন্ন পৃথিবীতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ব্রিটেন যে মানবজাতির এক-পঞ্চমাংশ মানুষকে অধীন রাখিয়া লাভবান ও শক্তিশালী হইয়াছে, ইহাই অন্যান্য জাতিকে সাম্রাজ্য স্থাপনে প্রলুব্ধ ও প্রবৃত্ত করিয়া আসিতেছে।

আমেরিকার "ইজারা ও ঋণদান বিল" আইনে পরিণত হইবার পর রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট অতঃপর যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা কংগ্রেসের নিকট মঞ্জুরী চাহিবেন ৭০০,০০,০০,০০০ (সাত শত কোটি) ডলারের অর্থাৎ মোটামুটি ২১০০ কোটি টাকার। এই নগদ অর্থ দ্বারা ব্রিটেনকে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য, জাহাজ, এরোপ্লেন, যুদ্ধাস্ত্র প্রভৃতি সরবরাহ করা হইবে।

—

জার্মেনীর নূতন যুদ্ধোদ্যম

জার্মেনী ইয়োরোপের আরও কোন কোন দেশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—যেমন বুলগেরিয়ায়, এবং অনেকটা জুগোস্লাভিয়াতেও। এখন সে গ্রীসকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত ধাওয়া করিয়াছে। গ্রীস কিন্তু মৃত্যুপণ করিয়া স্বাধীনতা রক্ষায় দৃঢ়সঙ্কল্প। গ্রীস ও ব্রিটেনের দ্বারা ইটালী নাজেহাল হওয়ায় ইটালীতে ইতিপূর্বেই জার্মেনীর প্রভুত্বের কাছাকাছি কিছু প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

জার্মেনী নবোদ্যমে আকাশপথে ব্রিটেন আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। এখন তাহার বিশেষ চেষ্টা হইবে, ব্রিটেনের ও ব্রিটেনের মিত্রদের জাহাজ ডুবাইয়া ব্রিটেনে খাদ্যদ্রব্যের ও যুদ্ধসম্ভারের আমদানী বন্ধ করা। ইতিমধ্যেই এক সপ্তাহে ব্রিটেনের ও তাহার মিত্রপক্ষের খুব বেশী জাহাজ জার্মানী ডুবাইয়া দিয়াছে। কিন্তু ব্রিটেন দমিতেছে না—আমেরিকাও দমিবে না। ব্রিটেন নিজে এবং কানাডার ও যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে নূতন নূতন জাহাজ নির্মাণ করিতেছে এবং আকাশপথে ও জলপথে জার্মেনীকে পাল্টা আক্রমণ করিয়া তাহার আক্রমণশক্তি নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে।

—

বঙ্গের লাট-প্রাসাদে নেতাদের কন্‌ফারেন্স

বঙ্গের গবর্ণর ভিন্ন ভিন্ন হিন্দু মুসলমান ও কংগ্রেসী দলের নেতাদিগকে নিজ প্রাসাদে আহ্বান করিয়া সাম্প্রদায়িকতাবিষে কলুষিত বঙ্গের রাজনৈতিক বায়ুমণ্ডলের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া খবর বাহির হইয়াছে। এই চেষ্টায় ব্যাধির উপসর্গ যদি কিছু কমে ত ভালই; কিন্তু সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার সমূলে উচ্ছেদ ব্যতিরেকে ব্যাধি ও তাহার বীজ নষ্ট করা অসম্ভব।

—

বোম্বাইয়ে নেতাদের কন্‌ফারেন্স

বোম্বাইয়ে নানা দলের নেতাদের কন্‌ফারেন্সে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উৎকর্ষবিধান ও তথাকথিত "অচল" অবস্থার অবসানের চেষ্টা হইতেছে। চেষ্টা ভাল। কিন্তু এক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার উচ্ছেদ ব্যতিরেকে কোন স্থায়ী ফল হইবে না বলা যাইতে পারে।

—

রবীন্দ্রনাথের শীঘ্র প্রকাশ্য গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। তিনি সম্প্রতি মোটরে শান্তিনিকেতন আশ্রম পরিদর্শন করিয়া বেড়াইয়াছেন।

তাঁহার নবরচিত কতকগুলি কবিতা শীঘ্র "আরোগ্য" নাম দিয়া পুস্তকের আকারে বাহির হইবে।

ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত তাঁহার ছোট-গল্পের একটি বহিও প্রস্তুত হইতেছে।

—

বিক্রয়-কর আইন

বহু সমালোচনা এবং হিন্দু-মুসলমান দোকানদার ব্যবসাদারদের হরতাল সত্ত্বেও নিজেদের দলের এবং, যাহাদের গায়ে আঁচড় লাগিবে না, সেই 'ইউরোপীয়'দের ভোটের জোরে মন্ত্রীরা বিক্রয়-কর বিল আইনে পরিণত করিয়াছেন। ইহাতে দেশের লোকদের উপর ট্যাক্সের বোঝা বাড়িবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের অসুবিধা হইবে; কিন্তু মন্ত্রীদের অপব্যয় করিবার সামর্থ্য বাড়িবে। এই কর স্থাপন যে আবশ্যক ছিল না, তাহা অনেকে দেখাইয়াছেন।

—

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের বাংলার বজেট বিশ্লেষণ

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বঙ্গের রাজস্বসচিব ছিলেন এবং তাহার আগেও কেজো অর্থনৈতিক ব্যাপারে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতায় তাঁহার প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি বাংলার বজেট বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, বিক্রয়-কর আইন দ্বারা নূতন ট্যাক্স বসাইবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। "আর্থিক জগৎ" বজেটের উপর তাঁহার বক্তৃতার যে চুম্বক দিয়াছেন, তাহার প্রধান অংশ নীচে উদ্ধৃত হইল।

"অর্থসচিব সুরাবর্দ্দী দেশের উপর বিক্রয়কর ধার্য্য করিবার অপরিহার্য্যতা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে বাজেটে হিসাবের যে মারপ্যাঁচ খেলিয়াছেন, শ্রীযুক্ত সরকার তাহা অতি সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেশবাসীকে এই ফাঁকি ধরাইয়া দিয়াছেন। অর্থসচিব বাজেট বক্তৃতায় এরূপ জানাইয়াছেন যে চলতি বৎসরের সমস্ত খরচপত্র চালাইয়া বৎসরের শেষে গবর্ণমেণ্টের হাতে মাত্র ৩৩ লক্ষ টাকা অবশিষ্ট থাকিবে এবং আগামী এপ্রিল মাস হইতে যে সরকারী বৎসর আরম্ভ হইবে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের ১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। কাজেই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বিক্রয়কর ধার্য্য করা ছাড়া আর কোন উপাই নাই। শ্রীযুক্ত সরকার বলেন যে, চলতি বৎসরের শেষে উদ্বৃত্ত টাকা এবং আগামী বৎসরের ঘাটতি সম্বন্ধে যে বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছে তাহার কোনটাই ঠিক নহে। প্রত্যেক বৎসরই দেখা যায় যে সংশোধিত হিসাবে কোন বৎসরের খরচের যে আনুমানিক হিসাব দেওয়া হয় শেষ পর্য্যন্ত খরচ তাহা অপেক্ষা শতকরা ২।৩ টাকা কম হইয়া থাকে। এবার খরচ শতকরা ২ টাকা কম হইবে বলিয়া ধরিলেও শেষ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের ৩০ লক্ষ টাকা বাঁচিয়া

যাইবে। কাজেই চলতি বৎসরের শেষে মজুদ তহবিলের পরিমাণ ৩৩ লক্ষ টাকা না হইয়া ৮৩ লক্ষ টাকা হইবে। দ্বিতীয়তঃ বাঙলা সরকারের বাজেটে গত ১৯৩৭-৩৮, ১৯৩৮-৩৯, এবং ১৯৩৯-৪০ সালে বিভিন্ন বিভাগের জন্য যে টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল শেষ পর্য্যন্ত তাহা হইতে যথাক্রমে শতকরা ৫, ৭, ৬, ও ৮·৫ ভাগ কম খরচ হইয়াছে বলিয়া দেখা গিয়াছে। চলতি বৎসরে মঞ্জুরীকৃত টাকার শতকরা ৪ ভাগ কম ব্যয় হইবে বলিয়াও যদি ধরা হয় তাহা হইলেও গবর্ণমেণ্টের ৬০ লক্ষ টাকার মত বাঁচিবে। এরূপ অবস্থায় চলতি বৎসরের শেষে গবর্ণমেণ্টের হাতে মজুদ তহবিলের পরিমাণ হইবে ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। তার পর আগামী বৎসরের বাজেটে ফসলের জামিনে ঋণদান বাবদ ৬০ লক্ষ টাকা এবং কৃষিঋণ বাবদ ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। উহা খরচা নহে—দাদন মাত্র। এই টাকা চলতি আয় হইতে প্রদান না করিয়া এখনই উহা অনায়াসে ঋণ গ্রহণ করিয়া সংগ্রহ করা যাইতে পারে। অধিকন্তু গবর্ণমেণ্টের হাতে পৃথক্ ভাবে যে ৪৭ লক্ষ টাকার সিকিউরিটি মজুদ আছে তাহার বর্ত্তমান বাজার মূল্য ৪০ লক্ষ টাকা ধরিলেও প্রয়োজনমত উহা গবর্ণমেণ্ট ব্যয় করিতে পারেন। এই দুইটি বিষয় বিবেচনা করিলে চলতি বৎসরের শেষে গবর্ণমেণ্টের মজুদ তহবিলের পরিমাণ দাঁড়ায় ২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। উহার উপর গবর্ণমেণ্টের হাতে গত বৎসরের ক্রীত যে পাট রহিয়াছে তজ্জন্য অন্ততঃ ২০ লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্ট পাইতে পারেন। অক্টোবর মাস হইতে যে পেট্রল ট্যাক্স বসিবে তাহার ফলেও গবর্ণমেণ্টের মজুদ তহবিলের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা বাড়িবে। এই সমস্ত ধরিলে আগামী বৎসরের শেষে গবর্ণমেণ্টের হাতে মজুদ তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াইবে আড়াই কোটি টাকা অপেক্ষাও বেশী। এত বড় মজুদ তহবিল লইয়া কাজ চালাইতে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোনরূপ অসুবিধা হইবারই কারণ নাই।

"আগামী বৎসরের ঘাটতি সম্বন্ধেও এই সব কথা অনেকটা প্রযোজ্য। আগামী বৎসরে যে ব্যয়বরাদ্দ ধরা হইয়াছে, প্রকৃত ব্যয় তাহা হইতে শতকরা ৪ ভাগও যদি কমিয়া যায় তাহা হইলে ঘাটতির পরিমাণ ৬০ লক্ষ টাকার মত কমিয়া উহা ৭৫ লক্ষ টাকায় পরিণত হইবে। দ্বিতীয়তঃ আগামী বৎসরের বাজেটে একসঙ্গে পেন্সন প্রদান বাবদ ৬ লক্ষ টাকা এবং হাইকোর্টের নিকটস্থ জমি খরিদ করিবার জন্য ৮ লক্ষ টাকার যে ব্যয়বরাদ্দ ধরা হইয়াছে তাহা রাজস্ব হইতে সংগ্রহ না করিয়া ঋণ করিয়াই সংগ্রহ করা উচিত। মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব প্রদেশে এই ধরণের খরচা ঋণ করিয়াই সংগ্রহ করা হইতেছে। এই সব বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত সরকার বলেন যে আগামী বৎসরে গবর্ণমেণ্টের ৬০ লক্ষ টাকার বেশী ঘাটতি হইবার কোন আশঙ্কা নাই। যেখানে গবর্ণমেণ্টের মজুদ তহবিলের পরিমাণ আড়াই কোটী টাকার মত, সেখানে ৬০ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইলেই নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করা অপরিহার্য্য বলিয়া প্রমাণিত হয় না এবং এজন্য জাতিগঠনমূলক কাজ বন্ধ হইয়া যাইবার আশঙ্কা উপস্থিত হয় না—উহাই শ্রীযুক্ত সরকারের অভিমত।"

বিলাতী "নিউ স্টেট্স্‌ম্যান"-এর একটি প্রবন্ধ

আজকাল বিলাতী ও অন্যান্য বিদেশী কাগজ বড় বিলম্বে পাওয়া যায়। সেই জন্য গত ১৪ই ডিসেম্বরের "দি নিউ স্টেট্স্‌ম্যান এণ্ড নেশ্যন" নামক বিখ্যাত কাগজটির "জয়লাভে ভারতের অংশ" ("India's Part in Victory") শীর্ষক প্রবন্ধটির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ দিতে পারিলাম না। ইহার ২।১টি অংশ এখন পুরাতন ইতিহাসের পর্য্যায়ে পড়িয়া গেলেও সবটির মূল্য এখনও আছে। যাহা হউক, দুই একটি অংশের কিছু পরিচয় দিতেছি।

ভারতসচিবের ও বড়লাটের পক্ষ হইতে ভারতবর্ষকে যাহা দিবার প্রস্তাব গত আগস্ট ও নবেম্বর মাসে হয়, তাহার দ্বিতীয় প্রধান অংশে এই কথা ছিল যে, যুদ্ধের পর প্রধানতঃ ভারতীয়দিগের দ্বারাই ভারতবর্ষের ডোমীনিয়ন কন্সটিটিউশান স্থিরীকৃত হইবে। কিন্তু তাহার সঙ্গে এমন একটি সর্ত্ত জুড়িয়া দেওয়া হয় যাহাতে অঙ্গীকারটার মূল্য নষ্ট হইয়া যায়। সর্ত্তটা এই যে, যদি কোন প্রধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা শ্রেণী ঐ কন্সটিটিউশানটাতে আপত্তি করে, তাহা হইলে গবর্ন্মেণ্ট তাহা গ্রাহ্য করিতে উহাদিগকে বাধ্য করিবে না, তাহাদিগকে উহা গ্রহণ করাইতে তাহাদের উপর জুলুম করা হইবে না। কিন্তু ইহা দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের ইচ্ছাকে ব্যাহত করিবার, তাহাদের দ্বারা রচিত শাসনবিধি নাকচ করিবার, ক্ষমতা যে-কোন সংখ্যালঘু সমষ্টিকে দেওয়া হইয়াছে। স্বরাজের দিকে অগ্রসর হইবার পথে ইহা একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। গবর্ন্মেণ্টের এই সঙ্কেতটা এই অর্থেই মুসলিম লীগ, দেশী রাজ্যের রাজারা, ও ইউরোপীয়েরা বুঝিয়াছে। গোড়াতেই এই প্রকারে ব্যাহত হইয়া কংগ্রেস (যাহার পশ্চাতে শতকরা ৭০ জন নির্বাচক রহিয়াছে) গবর্ন্মেণ্টের প্রস্তাব অসার ও মূল্যহীন বলে। "কোন সংখ্যালঘু সমষ্টিকে জোর করিয়া কোন কন্সটিটিউশান গ্রহণ করাইতে যে-আমাদের বিবেকে বাধে, সেই-আমরা কোন দ্বিধার চিহ্ন-মাত্রও না দেখাইয়া সংখ্যাগরিষ্ঠদিগের উপর জুলুম করিতেছি।"*

---

*"The other half of the offer was that the future constitution of an Indian Dominion shall be determined immediately after the war mainly by Indians themselves. That sounded promising, though the method was not defined with any precision. But there followed at once a qualification which, in the circumstances that face us today, destroyed the value of the offer. His Majesty's Government gave an undertaking that if any considerable minority took exception to the form of constitution that emerged, it would not be required to accept it, and need not fear that it will be "coerced." Now it may be that in such a case coercion would be morally unjustifiable.

"নিউ স্টেট্স্ম্যান" উপরোক্ত মর্মের যে-সব কথা বলিয়াছেন, আমরাও সেইরূপ কথা অনেক বার মডার্ণ রিভিয়ু ও প্রবাসীতে লিখিয়াছি।

পঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যে মুস্লিম লীগের সভ্য ও প্রভাব বিশেষ কিছু নাই, অন্ততঃ কিছু দিন আগে পর্য্যন্ত ছিল না, নিউ স্টেট্স্ম্যান তাহাও ধরিয়াছেন। তাহার পর, আমরা যাহা মডার্ণ রিভিয়ু ও প্রবাসীতে আগে লিখিয়াছি, ঐ কাগজটি গবন্মে‍র্ণ্টকে মুসলিম লীগের পেট্রন অর্থাৎ মুরুব্বি বলিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, তাহাতেই ইহা শক্তিশালিতায় কংগ্রেসেরই দ্বিতীয় স্থানীয় হইয়াছে।

("Under the distinguished patronage of the Viceroy it has become, after the Congress, the greatest political power in India.")

'নিউ স্টেট্স্ম্যানে'র প্রবন্ধটিতে আরও অনেক প্রণিধান-যোগ্য কথা আছে, যাহা আমরা অনেক বার বলিয়াছি। তাহার মধ্যে কেবল একটি কথা এখানে উদ্ধৃত করিব।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোকেরা যুদ্ধের পর ডোমীনিয়ন স্টেটাসের প্রতিশ্রুতি বড়লাট বা ভারতসচিবের বা উভয়ের নিকট হইতে চাহিয়াছেন। আমরা মডার্ণ রিভিয়ুতে বার বার, এবং প্রবাসীতেও, দেখাইয়াছি যে, পার্লেমেণ্টের আইন বা প্রতিশ্রুতি ছাড়া কাহারও—এমন কি ইংলণ্ডেশ্বরেরও, প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য নাই। সেই জন্য আমরা অনেক বার বলিয়াছি যে, যাঁহারা যুদ্ধের পরে প্রদেয় ডোমীনিয়ন স্টেটাসের প্রতিশ্রুতি দাবী করেন, তাঁহাদের এই দাবী করা উচিত যে, একটি পার্লেমেণ্টারী আইন দ্বারা বা, অন্ততঃ, একটি পার্লেমেণ্টারী নির্দ্ধারণ ("resolution") দ্বারা এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া আবশ্যক। নিউ স্টেট্স্ম্যান বলিতেছেন যে, গত আগষ্ট ও নবেম্বরে যে "অফার" ("offer") ভারতীয়দিগকে করা হইয়াছিল, তাহাতে এখন চলিবে না, নূতন একটি "অফার" করা চাই। তাহার খসড়াও এই কাগজটি দিয়াছে। তাহার চতুর্থ দফার গোড়ার দুটি বাক্য এই :—

(4) The pledge to grant Indians the right to determine their own constitution immediately after the war should be embodied in a resolution to be passed at once by Parliament. The test of it must satisfy reasonable Indians before publication."

"নিউ স্টেট্স্ম্যান" প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদের যোগ্য আর একটি প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহা এই যে, কারারুদ্ধ সমুদয় কংগ্রেসীকে বিনা সর্ত্তে খালাস দেওয়া হউক নূতন রাজনৈতিক অবস্থাবেষ্টনী সৃষ্টির নিমিত্ত ("To make a new atmosphere we should at once release all the Congress prisoners unconditionally".)

—

লাহোরে হিন্দু-সংখ্যালঘু প্রদেশগুলির কন্‌ফারেন্স

লাহোরে হিন্দু-সংখ্যালঘু প্রদেশগুলির যে কন্‌ফারেন্স বর্ত্তমান মার্চ মাসের গোড়ায় হইয়া গিয়াছে, তাহা সাতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। তাহার সমুদয় প্রস্তাবগুলি ভারতবর্ষের সমুদয় হিন্দুদের মন দিয়া পড়া উচিত। বাংলা, পঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হিন্দুদের ত খুবই মনোযোগ সেগুলিতে করা উচিত।

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এই কন্‌ফারেন্সের সভাপতি নির্বাচন করিয়া উদ্যোক্তারা ঠিক কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা সারগর্ভ ও উদ্দীপনাপূর্ণ হইয়াছিল। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রাজা নরেন্দ্রনাথ পঞ্জাব ও কাশ্মীরের অতি সম্ভ্রান্ত-বংশীয় ব্যক্তি। তিনি সুশিক্ষিত, এবং নিজ যোগ্যতার বলে নিম্নপদ হইতে পঞ্জাবের একটি ডিবিজনের কমিশনার হইয়াছিলেন। তিনি যেমন অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ, তেমনি স্পষ্টবাদী; পেন্স্যান-ভোগী হইয়াও গবন্মে‍র্ণ্টের ভয়ে কখনও ন্যায্য ও সত্য কথা বলিতে পশ্চাৎপদ হন না। তাঁহার বক্তৃতা খুব উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

কন্‌ফারেন্সে অনেকগুলি অতি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

রায় বাহাদুর লালা দুর্গাদাস কন্‌ফারেন্সের ভিত্তিগত প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করেন। এই প্রস্তাবের দ্বারা কন্‌ফারেন্স খাঁটি স্বাজাতিকতাতে ("pure nationalism"এ) তাহার দৃঢ় বিশ্বাস স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করে এবং ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কন্সটিটিউশ্যন হইতে সাম্প্রদায়িকতা এবং পার্থক্যপ্রবণতার ("separatism-এর) বহিষ্কার দাবী করে।

এখানে কেবল আর একটি প্রস্তাবের উল্লেখ করিব। তাহা ভাই পরমানন্দ উপস্থাপিত করেন। তাহাতে বলা হয় যে, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের হিন্দুদের সমস্যা পরস্পরের সহিত জড়িত; অতএব সকলেই যেন সর্বত্র এরূপ প্রতিনিধি নির্বাচন করেন, যাঁহাদের দ্বারা সকল স্থানের

But to say this with such solemnity in advance was to place in the hands of each of these minorities a right of veto over the will of the majority. Here was a barrier against any further progress towards self-government. The signal was understood in this sense by the Muslim League, Princes and the European community. Overruled in this way from the start, Congress which has 70 per cent. of the electorate behind it, pronounced the offer worthless. Too scrupulous to coerce a minority, we are now coercing the majority without a sign of hesitation."

হিন্দুদেরই অধিকার রক্ষার চেষ্টা হইতে পারে। প্রস্তাবটি এই :—

Bhai Paramanand, M.L.A. (Central), moved a resolution declaring that the problems of Hindus of all the provinces were so inter-linked that unless they decided to act together the existence of Hindus in the minority provinces was in great danger.

The conference therefore urged upon the Hindus of those provinces where they were in majority to return such members to the Assemblies and other local bodies as can protect their rights not only in their own provinces but also in the provinces where the Hindus are in minority.

এই প্রসঙ্গে লাহোরে খান্ আবদুল গফ্ফার খানের নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সম্মেলনের অধিবেশন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহাতে পাকিস্থান পরিকল্পনা; স্বাজাতিকতাবিরোধী ও দেশদ্রোহী বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। সিন্ধুতে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন ও তাহার দ্বারা আজাদচুক্তির সমর্থনও উল্লেখযোগ্য।

—

থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোচীনের বিবাদ মিটমাট

জাপানের মধ্যস্থতায় থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোচীনের বিবাদের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে বলিয়া খবর আসিয়াছে। নিষ্পত্তির সর্ত্ত অনুসারে থাইল্যাণ্ড (শ্যামদেশ) ইন্দোচীনের কিয়দংশ পাইল। উহা বোধ হয় পূর্ব্বে থাইয়ের অংশ ছিল। তাহার অধিবাসীরা থাইয়ের অধিবাসীদের সমান রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইবে। থাইয়ের সহিত সংযুক্ত অংশটির অ-সামরিকতাপাদন ("demilitarization") করা হইয়াছে। তাহার মানে কি এই যে, ঐ অংশে কোন পক্ষেরই সৈন্য থাকিবে না? তাহা অবশ্য জাপানের পক্ষে সুবিধাজনক। থাইয়ে জাপানের প্রভাব খুব বেশী।

এই নিষ্পত্তি দ্বারা জাপান বলশালী হইল। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যভুক্ত ব্রহ্মদেশের ঠিক পাশেই থাইল্যাণ্ডে জাপানের প্রভাব বৃদ্ধি ইংরেজের পক্ষে অসুবিধাজনক হইবে।

—

কবি ঈশ্বর গুপ্ত

গত ২৫শে ফাল্গুন তারিখে কাঞ্চনপল্লীতে কবি ঈশ্বর গুপ্তের স্মৃতিসভার অধিবেশন উপলক্ষ্যে সেখানে গিয়াছিলাম। কাঁচড়াপাড়া সুবৃহৎ রেলওয়ে কারখানার জন্য বিখ্যাত; কিন্তু এক কালে সমৃদ্ধ কাঞ্চনপল্লী গ্রাম এখন পরিত্যক্ত বলিলেও চলে। দেখিয়া মন বিষাদভারাক্রান্ত হইয়াছিল। কবির বাস্তভিটায় এখন কেবল বৈঠকখানার নগ্ন ইষ্টক প্রাচীরগুলি দাঁড়াইয়া আছে।

কবির গ্রন্থাবলীর একটি উৎকৃষ্ট প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। তাঁহার "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকার এখনও যে-যে সংখ্যা সংগৃহীত হইতে পারে, তাহা হইতে একটি চয়নিকা সংকলিত ও প্রকাশিত হইলে কবির সাংবাদিক কীর্ত্তিরও কিছু পরিচয় সর্বসাধারণে পাইতে পারিবেন। তাঁহার বৈঠকখানাটি মেরামত করিয়া তাহাতে একটি পুস্তকাগার ও পল্লীসংগঠক হিতসাধনমণ্ডলী স্থাপন করিলে কবির প্রতি স্থায়ী সম্মান প্রদর্শিত হইবে। ইটাচোনা, সিঙ্গুর, বীরনগর ও ধান্য-কুড়িয়ায় যাহা হইয়াছে এবং বীরভূম জেলার সুপুর গ্রামের নিমিত্ত বিশ্বভারতী যাহা করিতেছেন, তাহাতে কাঞ্চনপল্লী গ্রামের পুনরুজ্জীবন অসম্ভব মনে করা যায় না।

ঈশ্বর গুপ্তের স্মৃতিসভা যে হয়, তাহার জন্য রাণাঘাট-সাহিত্য-সংসদ ধন্যবাদার্হ।

—

"গ্রামে ফিরিয়া যাও", "শহরে যাও"

সম্প্রতি ডক্টর মেঘনাদ সাহা একটি বক্তৃতায় "গ্রামে ফিরিয়া যাও" রবের ("Back to the village" slogan এর) বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং "শহরে চলিয়া আইস" এই আহ্বানের সমর্থন করিয়াছেন, খবরের কাগজে এইরূপ দেখিলাম। বস্তুতঃ গ্রামগুলি এখন যে-অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় সেগুলিতে ফিরিয়া যাইতে কেহ পরামর্শ দিতে পারে না। গ্রামগুলিকে স্বাস্থ্যকর না করিলে এবং শহরে সভ্য জীবনের যে-সকল উপকরণ ও আনন্দের আয়োজন আছে গ্রামেও তাহার ব্যবস্থা না করিলে মানুষ সেখানে থাকিতে চাহিবে না। গ্রামের লোকেরা কৃষি দ্বারা যাহা উৎপাদন করে, উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহা আরও বেশি উৎপাদন করিতে হইবে এবং তথাকার কুটীর শিল্পসকলের উন্নতি করিতে এবং বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ দ্বারা তৎসমুদয় অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য করিতে হইবে। আবার শহরের বা শহরতুল্য গ্রামের বৃহৎ কারখানা সংসৃষ্ট বস্তিগুলি স্বাস্থ্য ও সুনীতির অনুকূল করিয়া সেইগুলিতে নানাবিধ পণ্য উৎপাদনও করিতে হইবে। গ্রাম বা শহর, কোনটিই বর্জনীয় বা একমাত্র বরণীয় নহে। সংক্ষেপে বিষয়টির সম্যক্ সমালোচনা করা যায় না।

—

বঙ্গে সাম্প্রদায়িক কুশাসন

বঙ্গে সাম্প্রদায়িক কুশাসন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আগে একাধিক সত্য বিবৃতি প্রচার করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি এই প্রদেশে—বিশেষতঃ নোয়াখালি জেলায়, এই কারণে হিন্দুদের দুঃখ দুর্গতি বর্ণনা করিয়া একটি বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে ১৭ দফা গুরুতর অভিযোগ আছে। তিনি গবর্মেণ্টের

কাছে একটি নিরপেক্ষ স্বাধীন কমিশন দ্বারা এই সকল অভিযোগের তদন্ত দাবী করিয়াছেন। এই দাবীর সমর্থন বাংলা দেশের অবস্থার সহিত পরিচিত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রেই করিবেন।

—

হিন্দু মহাসভার ওআর্কিং কমীটির সিদ্ধান্ত

বোম্বাইয়ে হিন্দু মহাসভার ওআর্কিং কমীটিতে স্থির হইয়াছে যে, হিন্দু জাতির সামরিকীকরণ সম্পাদন করিতে হইবে; অর্থাৎ শিখরা যেমন সামরিক সম্প্রদায়, হিন্দুদিগকে সেইরূপ করিতে হইবে। সামরিকীভবন চরম ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ নহে, কিন্তু চরম ও শ্রেষ্ঠ আদর্শে উপনীত হইতে হইলে হিন্দুদিগকে যোদ্ধৃতার পথ দিয়াই বোধ হয় যাইতে হইবে।

বোম্বাই, ১১ই মার্চ

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভা ওয়ার্কিং কমিটির তিন দিনের অধিবেশন অদ্য সন্ধ্যার শেষ হয়। এতৎসম্পর্কে সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিবৃতিটি প্রচার করা হইয়াছে :—

"হিন্দু মহাসভা ও বড়লাটের মধ্যে যে পত্রালাপ হইয়াছে, মহাসভা ওয়ার্কিং কমিটি তাহা বিবেচনা করিয়াছেন। ইহার পর ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও আলোচনা করা হইয়াছে। কমিটি এক্ষণে স্থির করিয়াছেন যে, মাদুরা প্রস্তাব অনুসারে বড়লাটের পত্রালাপ সম্পর্কে ৩১শে মার্চ্চের পর কমিটি সরকারকে তাহার 'শেষ কথা' জানাইয়া দিবেন। ইত্যবসরে কমিটি সমর-পরিষদগুলিকে আইন-অমান্য আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলিয়াছেন।"

ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, অদ্য বড়লাট নাকি তাঁহার পত্রে বলিয়াছেন যে, ব্রিটেন যেখানে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত রহিয়াছে, সেখানে পাকিস্থান পরিকল্পনা লইয়া মাথা ঘামাইবার অবসর সরকারের নাই।

বড়লাট নাকি আরও জানাইয়াছেন যে, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার কবে দেওয়া হইবে, তৎসম্পর্কে কোন নির্দ্দিষ্ট সময় জানান অসম্ভব; তবে, যুদ্ধ শেষ হইবার পর যত শীঘ্র সম্ভব ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার দেওয়ার ইচ্ছা সরকারের আছে। —ইউনাইটেড প্রেস

নূতন কি জানা গেল?

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবারকার সমাবর্ত্তনে ডাঃ সর্ নীলরতন সরকার মহাশয়কে সম্মানসূচক ডক্টর অব্ সায়েন্স উপাধি দেওয়া হয়, যাহা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারিত, এবং বোম্বাইয়ের ডাক্তর রাঘবেন্দ্র রাও মহাশয়কেও ঐ উপাধি দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয়কে কমলা স্বর্ণপদকভূষিত করা হয়।

এবারকার প্রধান বিশেষত্ব সর্ তেজবাহাদুর সপ্রুর মত বিদ্বান ও বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞকে সমাবর্ত্তনের অভিভাষণ দিতে আমন্ত্রণ। তিনি তাঁহার সুগ্রথিত অভিভাষণটির গোড়ার দিকে বলেন :—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। ৫০ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে আমি যখন আগ্রায় অধ্যয়ন করিতেছিলাম তখন দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক নূতন স্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল। জাতীয় জীবনে এই নূতন চিন্তা-প্রবাহের কেন্দ্র ও উৎস ছিল কলিকাতা। আমি এই চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলাম। আমার অধ্যাপকদের মধ্যে কয়েক জন বাঙ্গালী ছিলেন। বস্তুতঃ একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তৎকালে বাঙ্গালীরা কেবলমাত্র যুক্তপ্রদেশের চিন্তাজগতে রূপান্তরই আনয়ন করেন নাই ঐ ক্ষেত্রে তাঁহারা অপ্রতিহত আধিপত্যও বিস্তার করিয়াছিলেন। আমার নিজ প্রদেশের যুবকগণ তখন রাজা রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেনের দৃষ্টান্ত হইতে সমাজ সংস্কারের প্রেরণা লাভ করিত। তাহা ছাড়া সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি, লালমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু ও কালীচরণ ব্যানার্জ্জির অপূর্ব্ব বাগ্মিতা তাঁহাদের মধ্যে এক বিপুল রাজনৈতিক উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিল। ১৮৮৭ সনে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বাঙ্গলা ও যুক্তপ্রদেশের এই যোগসূত্রে বাহ্যতঃ এক বিচ্ছেদের সূচনা হইলেও কলিকাতার প্রভাব যুক্তপ্রদেশের উপর অনেক দিন পর্য্যন্ত সমভাবেই বিদ্যমান ছিল। বর্ত্তমানে যুক্তপ্রদেশে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েই অনেক বাঙ্গালী অধ্যাপক আছেন। কৃতী বাঙ্গালী অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, বিচারক, আইনজীবী, সাংবাদিক, ভাইসচ্যান্সেলার ও রাজনীতিজ্ঞদের প্রতি যুক্তপ্রদেশের সর্ব্বত্র বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করা হয়। ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে বাঙ্গালীদের ন্যায় আমরাও গৌরব অনুভব করি। দুর্ভাগ্যবশতঃ রবীন্দ্রনাথের মূল কবিতাগুলির ভাষার মাধুর্য্য উপলব্ধি হইতে আমরা বঞ্চিত থাকিলেও তাঁহার কাব্যের অপূর্ব্ব ভাব-সম্পদের সহিত আমরা অপরিচিত নহি। অবশ্য আমাদের কোন ঐতিহ্য ছিল না একথা আমি বলি না। একথা সত্য যে দুইটি সংস্কৃতির ধারা সম্মিলিত হইয়া যুক্তপ্রদেশের নিজস্ব সংস্কৃতির উন্নয়নে সহায়তা করিয়াছিল। ইহার মধ্যে একটির কেন্দ্র ছিল কাশী এবং অপরটির কেন্দ্র ছিল দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ। কিন্তু ইহাও আমি নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করি যে বাঙ্গলার নিকট আমাদের ঋণ কম নয় এবং ইহা নিশ্চিত যে অন্য কোন প্রদেশ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বাঙ্গলার নিকট আমাদের ঋণই সমধিক।

—

প্রবাসীর লেখকবর্গ

গত চল্লিশ বৎসরে যে-সকল লেখক-লেখিকা 'প্রবাসী'তে লিখিয়াছেন তাঁহাদের নামের একটি তালিকা দেওয়া হইল। এই তালিকা সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ নহে।

১। দেবেন্দ্রনাথ সেন
২। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
৪। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
৫। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
৬। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
৭। শ্রীরজনীকান্ত গুহ
৮। শ্রীসুবোধচন্দ্র মহলানবিশ
৯। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়
১০। অবিনাশচন্দ্র দাস
১১। ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী
১২। দীনেশচন্দ্র সেন
১৩। রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
১৪। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার
১৫। জগদানন্দ রায়
১৬। শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ
১৭। বামনদাস বসু
১৮। প্রিয়নাথ সেন
১৯। নগেন্দ্রনাথ সোম
২০। শিবনাথ শাস্ত্রী
২১। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
২২। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
২৩। শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী
২৪। যোগীন্দ্রনাথ সরকার
২৫। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৬। শ্রীশচন্দ্র বসু
২৭। শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়
২৮। ,, সুরেন্দ্রনাথ দেব
২৯। ,, দীনেন্দ্রকুমার রায়
৩০। ,, সরলা দেবী
৩১। বীরেশ্বর গোস্বামী
৩২। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
৩৩। শ্রীহরিহর শেঠ
৩৪। যোগীন্দ্রনাথ বসু
৩৫। সখারাম গণেশ দেউস্কর
৩৬। শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
৩৭। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল
৩৮। মহেশচন্দ্র ঘোষ
৩৯। শ্রীযদুনাথ সরকার
৪০। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বার-অ্যাট-ল
৪১। সারদাচরণ মিত্র
৪২। রামলাল সরকার
৪৩। যতীন্দ্রমোহন সিংহ
৪৪। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৫। রমণীমোহন ঘোষ
৪৬। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪৭। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
৪৮। শ্রীইন্দিরা দেবী
৪৯। রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য
৫০। শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচি
৫১। পৃথ্বীশচন্দ্র রায়
৫২। রামপ্রাণ গুপ্ত
৫৩। শ্রীভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৫৪। ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী
৫৫। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
৫৬। ব্রজসুন্দর সান্যাল
৫৭। অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত
৫৮। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫৯। শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
৬০। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
৬১। ইন্দুমাধব মল্লিক
৬২ শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক
৬৩ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬৪ শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী
৬৫ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য
৬৬ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
৬৭ শ্রীসন্ত নিহাল সিংহ
৬৮ ,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
৬৯ ,, পঞ্চানন নিয়োগী
৭০ যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার
৭১ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
৭২ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
৭৩ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
৭৪ দ্বিজদাস দত্ত
৭৫ শ্রীবিনয়কুমার সরকার
৭৬ চিত্তরঞ্জন দাশ
৭৭ শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার
৭৮ ,, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৭৯ ,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ
৮০ ,, আমোদিনী ঘোষ

৮১। শিবরতন মিত্র
৮২। শ্রীক্ষিতিমোহন সেন
৮৩। বিপিনচন্দ্র পাল
৮৪। বিপিনবিহারী গুপ্ত
৮৫। যাদবেশ্বর তর্করত্ন
৮৬। রজনীকান্ত সেন
৮৭। শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়
৮৮। „ শরৎচন্দ্র রায়
৮৯। „ সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৯০। „ হেমেন্দ্রকুমার রায়
৯১। হরগোপাল দাস কুণ্ডু
৯২। শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়
৯৩। „ কালিদাস রায়
৯৪। প্রিয়ম্বদা দেবী
৯৫। প্রফুল্লময়ী দেবী
৯৬। প্রতুলচন্দ্র সোম
৯৭। শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়
৯৮। „ সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত
৯৯। „ হেমলতা দেবী
১০০। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু
১০১। মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা
১০২। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১০৩। সুকুমার রায়
১০৪। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
১০৫। „ বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ
১০৬। „ হরিদাস পালিত
১০৭। „ সরলাবালা দাসী
১০৮। „ বনমালী বেদান্ততীর্থ
১০৯। অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী
১১০। নিখিলনাথ রায়
১১১। শ্রীঅমলচন্দ্র হোম
১১২। „ নরেন্দ্র দেব
১১৩। „ অসিতকুমার হালদার
১১৪। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১১৫। পূরণচাঁদ নাহার
১১৬। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল
১১৭। শ্রীশান্তা দেবী
১১৮। „ শিশিরকুমার মিত্র
১১৯। „ সীতানাথ তত্ত্বভূষণ
১২০। „ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত
১২১। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
১২২। „ নিরুপমা দেবী
১২৩। „ কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত
১২৪। স্যর নীলরতন সরকার
১২৫। শ্রীশৈলবালা ঘোষ
১২৬। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
১২৭। শ্রীবীরেশ্বর সেন
১২৮। „ শচীন্দ্রনাথ মজুমদার
১২৯। „ সীতা দেবী
১৩০। „ অমৃতলাল শীল
১৩১। „ প্যারীমোহন সেনগুপ্ত
১৩২। „ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
১৩৩। অতুলপ্রসাদ সেন
১৩৪। কামিনী রায়
১৩৫। নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
১৩৬। কাশীপ্রসাদ জয়স্বাল
১৩৭। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
১৩৮। „ মতিলাল রায়
১৩৯। রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
১৪০। শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী
১৪১। „ নলিনীকান্ত গুপ্ত
১৪২। হরিহর শাস্ত্রী
১৪৩। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
১৪৪। „ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
১৪৫। „ পরমেশপ্রসন্ন রায়
১৪৬। „ মণীন্দ্রলাল বসু
১৪৭। „ সত্যচরণ লাহা
১৪৮। „ সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত
১৪৯। „ সুরেন্দ্রনাথ সেন, পি-এইচ. ডি
১৫০। নজরুল ইস্‌লাম
১৫১। জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫২। শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা
১৫৩। „ সুন্দরীমোহন দাস
১৫৪। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
১৫৫। শ্রীকালিদাস নাগ
১৫৬। „ রমেশ বসু
১৫৭। „ সুকুমার সেন
১৫৮। উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন
১৫৯। শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত
১৬০। „ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ
১৬১। „ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ("বনফুল")
১৬২। „ বিনোদবিহারী রায়
১৬৩। „ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬৪। „ বিমলাচরণ লাহা
১৬৫। „ বিমলাচরণ দেব
১৬৬। „ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

১৬৭। এণ্ডার্সন, জে. ডি.
১৬৮। রাখালরাজ রায়
১৬৯। শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী
১৭০। দেবকুমার রায়চৌধুরী
১৭১। দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী
১৭২। শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
১৭৩। „ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
১৭৪। „ দিলীপকুমার রায়
১৭৫। „ পুলিনবিহারী দাস
১৭৬। „ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
১৭৭। „ বিমানবিহারী মজুমদার
১৭৮। „ মোহিতলাল মজুমদার
১৭৯। „ রজনীকান্ত দাস
১৮০। „ শৈলজা মুখোপাধ্যায়
১৮১। „ সজনীকান্ত দাস
১৮২। „ কান্তিচন্দ্র ঘোষ
১৮৩। „ কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৮৪। „ নন্দলাল বসু
১৮৫। „ নিশিকান্ত সেন
১৮৬। „ প্রমথনাথ বিশী
১৮৭। „ প্রেমেন্দ্র মিত্র
১৮৮। „ হুমায়ুন কবীর
১৮৯। „ অশোক চট্টোপাধ্যায়
১৯০। „ প্রবোধচন্দ্র সেন
১৯১। „ মাণিক ভট্টাচার্য্য
১৯২। „ বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়
১৯৩। „ ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
১৯৪। „ প্রেমাঙ্কুর আতর্থী
১৯৫। „ প্রমথ চৌধুরী (বীরবল)
১৯৬। „ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৭। „ শ্রীনাথ সেন
১৯৮। „ কিরণশঙ্কর রায়
১৯৯। „ চুণীলাল বসু
২০০। মহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌
২০১। শ্রীঅনাথনাথ বসু
২০২। „ নীহাররঞ্জন রায়
২০৩। „ প্রবোধচন্দ্র বাগচী
২০৪। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র
২০৫। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
২০৬। „ সুশীলকুমার দে
২০৭। „ রাধাগোবিন্দ বসাক
২০৮। „ মণীন্দ্রমোহন বসু
২০৯। „ নীরদচন্দ্র চৌধুরী
২১০। ফণীন্দ্রনাথ বসু
২১১। শ্রীতারকনাথ দাস
২১২। „ গিরীন্দ্রশেখর বসু
২১৩। „ গোপাল হালদার
২১৪। „ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
২১৫। „ রাজশেখর বসু (পরশুরাম)
২১৬। „ প্রবোধকুমার সান্যাল
২১৭। „ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
২১৮। „ অন্নদাশঙ্কর রায়
২১৯। „ বুদ্ধদেব বসু
২২০। „ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
২২১। „ হেমচন্দ্র বাগচী
২২২। „ হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন
২২৩। „ রাজেন্দ্রপ্রসাদ
২২৪। „ শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা
২২৫। „ হারাণচন্দ্র চাকলাদার
২২৬। „ মেঘনাদ সাহা
২২৭। „ নির্ম্মলকুমার রায়
২২৮। „ বটকৃষ্ণ ঘোষ
২২৯। „ ভবানী ভট্টাচার্য্য
২৩০। „ চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
২৩১। „ হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য
২৩২। „ প্রিয়রঞ্জন সেন
২৩৩। „ রামপদ মুখোপাধ্যায়
২৩৪। „ কালিকারঞ্জন কানুনগো
২৩৫। „ সহায়রাম বসু
২৩৬। „ হরিপদ মাইতি
২৩৭। „ অনুরূপা দেবী
২৩৮। „ অনিলবরণ রায়
২৩৯। „ দীননাথ সান্যাল
২৪০। „ পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর
২৪১। „ প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়
২৪২। „ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়
২৪৩। „ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
২৪৪। „ সুহৃৎচন্দ্র মিত্র
২৪৫। „ ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২৪৬। „ সত্যভূষণ সেন
২৪৭। „ সুধীরচন্দ্র কর
২৪৮। „ দীনেশরঞ্জন দাশ
২৪৯। „ নির্ম্মলকুমার বসু
২৫০। „ নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত
২৫১। „ প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
২৫২। „ বিরজাশঙ্কর গুহ

২৫৩। শ্রীমনোজ বসু
২৫৪। ,, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
২৫৫। ,, শিবনারায়ণ সেন
২৫৬। ,, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ
২৫৭। ,, শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
২৫৮। ,, সুধীরকুমার লাহিড়ী
২৫৯। ,, অমূল্যকুমার দাসগুপ্ত (সম্বন্ধ)
২৬০। ,, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
২৬১। ,, প্রমথনাথ তর্কভূষণ
২৬২। ,, বসন্তরঞ্জন রায়
২৬৩। কালীমোহন ঘোষ
২৬৪। শ্রীনলিনীকান্ত সরকার
২৬৫। ,, পারুল দেবী
২৬৬। ,, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
২৬৭। ,, যোগেশচন্দ্র বাগল
২৬৮। ,, অজরচন্দ্র সরকার
২৬৯। ,, কানাইলাল গাঙ্গুলী
২৭০। ,, চারুচন্দ্র রায়
২৭১। ,, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
২৭২। ,, প্রবোধকুমার মজুমদার
২৭৩। ,, রমেশচন্দ্র মজুমদার
২৭৪। ,, জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ
২৭৫। ,, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
২৭৬। ,, ধীরেন্দ্রমোহন সেন
২৭৭। ,, অনাথগোপাল সেন
২৭৮। ,, গুরুসদয় দত্ত

২৭৯ শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ
২৮০ ,, রাধারাণী দেবী
২৮১ ,, মৈত্রেয়ী দেবী
২৮২ ,, বনারসীদাস চতুর্ব্বেদী
২৮৩ ,, নলিনীরঞ্জন সরকার
২৮৪ ,, সরোজকুমার রায়চৌধুরী
২৮৫ ,, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়
২৮৬ ,, যোগীশচন্দ্র সিংহ
২৮৭ ,, শশধর রায়
২৮৮ ,, উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
২৮৯ ,, প্রমথনাথ রায়
২৯০ ,, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়
২৯১ ,, লক্ষ্মীশ্বর সিংহ
২৯২ ,, সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়
২৯৩ রেজাউল করীম
২৯৪ শ্রীরাহুল সাংকৃত্যায়ন
২৯৫ ,, মণীশ ঘটক
২৯৬ ,, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য
২৯৭ ,, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত
২৯৮ ,, বিভূতিভূষণ গুপ্ত
২৯৯ ,, পরিমল গোস্বামী
৩০০ ,, নীলরতন ধর
৩০১ ,, ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
৩০২ ,, নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়
৩০৩ ,, অতুলচন্দ্র গুপ্ত
৩০৪। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০৫। শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
৩০৬। ,, মণীন্দ্রমোহন মৌলিক
৩০৭। ,, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র
৩০৮। ,, সরোজেন্দ্রনাথ রায়
৩০৯। ,, আশালতা সিংহ
৩১০। ,, নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ
৩১১। ,, অবলা বসু
৩১২। ,, মায়া সোম
৩১৩। ,, সুধাংশুকুমার হালদার
৩১৪। ,, পুলিনবিহারী সেন
৩১৫। ,, সুশীলরঞ্জন ভানা
৩১৬। দ্বিজদাস দত্ত
৩১৭। শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ
৩১৮। ,, সরোজনাথ ঘোষ
৩১৯। শ্রীপিনাকীলাল রায়
৩২০। অমৃতলাল গুপ্ত
৩২১। শ্রীহেমলতা ঠাকুর

৩২২। শ্রীলালতুদাই রায়
৩২৩। ,, দেবেশচন্দ্র দাশ
৩২৪। ,, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
৩২৫। ,, বিধায়ক ভট্টাচার্য্য
৩২৬। ,, যোগানন্দ দাস
৩২৭। ,, শান্তি পাল
৩২৮। ,, জীবনময় রায়
৩২৯। ,, নলিনীমোহন সান্যাল
৩৩০। ,, রামনাথ বিশ্বাস
৩৩১। ,, অবনীনাথ রায়
৩৩২। ,, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য
৩৩৩। শরৎচন্দ্র ঘোষাল
৩৩৪। শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী
৩৩৫। শ্রীজগদীশ গুপ্ত
৩৩৬। ,, ভ্রমর ঘোষ
৩৩৭। ,, কুমুদবন্ধু সেন
৩৩৮। ,, কুসুমকুমারী দাস

৩৩৯ শ্রীমুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়
৩৪০ ,, আর্য্যকুমার সেন
৩৪১ ,, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৩৪২ ,, দেবপ্রসাদ ঘোষ
৩৪৩ ,, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
৩৪৪ ,, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য
৩৪৫ ,, বিমলচন্দ্র সিংহ
৩৪৬ ,, অমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪৭ ,, যতীন্দ্রমোহন দত্ত
৩৪৮ ,, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
৩৪৯ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৫০ শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৩৫১ শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
৩৫২ মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা
৩৫৩ শ্রীকমলরাণী মিত্র
৩৫৪ ,, মনোমোহন ঘোষ

হিন্দু-ধর্ম—মানব-ধর্ম

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

হিন্দু-ধর্ম মানব-ধর্ম। এই কারণে ইহা সার্বজনিক। কোন দেবতা এই ধর্ম প্রেরণ করেন নাই, কোন ঋষি প্রতিষ্ঠা করেন নাই। অপর প্রাকৃতিক পদার্থের মত ইহা প্রাকৃতিক। এই হেতু ইহা সনাতন। ঋগ্বেদে আছে, মনুর শাসন ঔষধের তুল্য হিতকর। এক সমিতি আর্যসমাজের ব্যবস্থাপক ছিলেন। সে-সমিতিতে কয়েক জন ঋষি, রাজা ও সেনাপতি ও অপর কয়েক জন মান্য লোক থাকিতেন। সে-সমিতির অধিপতির নাম মনু ছিল। সমিতি সমাজের সুখ ও শান্তির ব্যবস্থা করিতেন। সেই ব্যবস্থাই মনুর শাসন। আর্যসমাজ কত কালের পুরাতন, কেহ বলিতে পারে না। এত পুরাতন যে, অনাদি বলিলেও চলে। এক মনু বৈবস্বত মনু নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন। পরবর্তী কালের আরও কয়েক জনের নাম ঋগ্বেদে পাওয়া যায়।

আচার ও ব্যবহার দ্বারা সমাজ ব্যবস্থিত হয়। এই অতিশয় দীর্ঘকালে আচার ও ব্যবহারের পরিবর্তন ও পরিবর্জন হইয়াছে। কত নূতন নূতন ব্যবস্থার যোজনা হইয়াছে, কিন্তু ধারাভঙ্গ হয় নাই। সেই ধারার দুইটি লক্ষণ চিরদিন বর্তমান আছে। সকল মানুষ সমান নয়, নর-নারী সমান নয়। ইহা প্রত্যক্ষ। যদি নয়, তাহার কারণ অবশ্য আছে। আধুনিক বিজ্ঞান তাহার কারণ বলিতে পারে না। অভিব্যক্তি-বাদ নিরুত্তর। এক পিতা-মাতার সন্তান সকলে সমান হয় না। ইহা প্রত্যক্ষ। যাহা কার্যের পূর্ববর্তী, তাহাই কারণ। অতএব পূর্বজন্ম স্বীকার করিতে হইতেছে। তৎসহ সুকর্ম-কুকর্ম, সুকৃতি-দুষ্কৃতি আসিতেছে। কর্মের ফলের ধ্বংস নাই। এই জন্মের কৃতকর্মের ফলের ধ্বংসও নাই। অতএব পরজন্ম স্বীকার করিতে হইতেছে। কাল অনন্ত। ইহার আদি নাই, অন্তও নাই। মানুষের জীবৎকাল সেই অনন্তকালের নিমেষের কোটি কোটি অংশও নয়। তাহার সম্মুখে অনন্তকাল পড়িয়া আছে। তাহার সুখভোগের নিমিত্ত ত্বরাও নাই। যাহারা মনে করে এই জীবৎকালেই ভোগের পরিসমাপ্তি, তাহারাই ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। পাশ্চাত্য দেশে এই অবস্থা চলিতেছে। সে দেশে দেহের পূজা যত বাড়িতেছে, দেহী তত দূরে চলিয়া যাইতেছে। এই যে অবিরাম ছুটাছুটি—কিসের জন্য? দ্রুতগতিই কি কাম্য?

সকল মানুষ সমান নয়। অতএব সকলের অধিকারও সমান হইতে পারে না। এইটি স্বীকার করিয়া লইলে, কলহ থাকে না। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও পরীক্ষা, এই তিন উপায় দ্বারা এক হইতে অন্যকে প্রভেদ করিয়া থাকি। যদ্দ্বারা যাহাকে বিশেষ করি, তাহাই তাহার ধর্ম। এই কারণে হিন্দু-ধর্মের আচারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। সদাচার ও শিষ্টাচার বর্জিত লোক হিন্দু হইতে পারে না।

শৌচ ও বিনয়, ইহার প্রধান লক্ষণ। শুধু বাহ্য শৌচ নয়, নিজের দেহ, ভোগ্য, পানীয়, বস্ত্র, অলঙ্কার, গৃহপ্রাঙ্গণ, প্রতিবেশ শুচি হইলেই সদাচারী হইতে পারা যায় না। আভ্যন্তর শৌচ, মনের পবিত্রতা, সৎকর্মে উৎসাহ, কুৎসিৎ কর্মে নিবৃত্তি, কাম, ক্রোধ, লোভের দমন ইত্যাদি দ্বারা আভ্যন্তর শৌচ নিষ্পন্ন হয়। এই জন্য দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে হয়। অভীষ্টদেবের স্মরণ দ্বারা দেবঋণ, জ্ঞান-আলোচনা দ্বারা ঋষিঋণ ও পিতৃমাতৃগণের তর্পণ দ্বারা পিতৃ-ঋণ পরিশোধিত হয়। তর্পণ শব্দের অর্থ সতিল জলাঞ্জলি প্রদান নয়। পিতামাতা পুত্রের অভ্যুদয় কামনা করেন। পুত্র তাঁহাদের কামনা সিদ্ধ করিলেই তাঁহারা তৃপ্ত হন। তাহাতে পুত্রের মঙ্গল, তাঁহাদের নয়। গার্হস্থ্য আশ্রমে এই ঋণ পরিশোধ করিতে পারা যায়। সে আশ্রমে থাকিলে ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ সাধিত হয়।

অধিকারভেদ স্বীকার করাতে হিন্দুসমাজের সাজাত্য হয় নাই। একদিকে ইহার দ্বারা হিন্দুসমাজ দুর্বল হইয়াছে, অন্যদিকে গুণের উৎকর্ষের পথ মুক্ত হইয়াছে। তুমি গুণী হও, বিদ্বান্ হও, সদাচারী হও, জ্ঞানবান্ হও, তোমার অধিকার আপনিই আসিবে। যে বাহ্যাভ্যন্তরে শুচি, তাহার আসন সর্বত্র সমান। এই শৌচ-লাভের জন্য তপস্যার অনুষ্ঠান চাই। দেবদেবীর পূজায় সে অনুষ্ঠান। উপবাস, ইন্দ্রিয়সংযম ও অভীষ্টলাভের সঙ্কল্প তপস্যার প্রথম সোপান। শৈশব হইতে অভ্যাস করাইলে বালক-বালিকার দৃঢ়চিত্ততা হয়। বড় হইলে তাহারা বলিতে পারে, "না এ কর্ম করিব না।" যে ধর্মে থাকিয়া ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা টলে নাই, লক্ষ্মণের দাস্যভাব শিথিল হয় নাই, যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ পার্থের সারথি হইয়াছিলেন, কর্ণের তুল্য দাতা ছিল না—সে ধর্মের জয় নিশ্চিত; যে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত, তিনি বাঙ্গালী ছিলেন।

মানুষ প্রথমে পশু ছিল। কাম, ক্রোধ, লোভ, প্রতিহিংসা পশুর প্রকৃতি। ক্রমে ক্রমে কাহারও হৃদয়ে সে সব প্রবৃত্তি প্রচ্ছন্ন হইল। কাহারও হৃদয়ে রূপান্তরিত হইয়া ক্ষমা, তিতিক্ষা, দয়া, কারুণ্য আকারে প্রকাশ পাইল। তিনি উচ্চভূমিতে দেখিলেন, "তোমাতে আমি আছি, তুমি আমি এক, তোমার দুঃখ নয়, আমার দুঃখ। আমার জন্যই দেবালয়, জলাশয়, বিদ্যালয়, বৃক্ষ, আরাম প্রতিষ্ঠা করিতেছি। তোমার উপকার না, আমার উপকার। তোমাতে আমাকে দেখি বলিয়াই পুণ্যানুষ্ঠান করি।" আরও ঊর্ধ্বে উঠিয়া দেখিলেন, "সর্বভূতেই আমি। আমি ছাড়া কিছুই নাই।" জড়বিজ্ঞান নূতন নূতন আবিষ্কার করিতেছে, কিন্তু শান্তির সন্ধান পায় নাই। [প্রবর্তক]

সাহিত্য

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী মানুষের সভ্যতার দুই মূর্ত্তির প্রতীক। পৃথিবীর অন্য সব জীব-জন্তুর মত শরীর ও মন নিয়ে মানুষ এবং তাদের মতই মানুষের মনের বড় অংশ ব্যয় হয় শরীরের প্রয়োজনে। আমরা যাকে সভ্যতা বলি তার বেশীর ভাগ, এবং অনেক সভ্যতার প্রায় সমস্তটা, শরীরের প্রয়োজন ও বিলাসের দাবী মেটাবার কৌশল।...সভ্যতার এই কাত্যায়নী মূর্ত্তি তার সমগ্র চেহারা নয়। পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব আজও অজ্ঞাত রহস্য। তার চেয়ে গূঢ় রহস্য প্রাণীর শরীরে মনের বিকাশ। প্রাণের রক্ষা ও পুষ্টিতে মন যে পরম সহায়, এবং সে কাজে তার চেষ্টা যে ব্যাপক ও বিচিত্র এ অতি স্পষ্ট। এবং মনকে প্রাণের যন্ত্রমাত্র কল্পনা ক'রে জটিলকে সহজবোধ্য করার প্রলোভনও স্বাভাবিক। কিন্তু এ তথ্যও স্পষ্ট যে প্রাণের কাজে ব্যয় হয়েই মন নিঃশেষ হয় না। মানুষের এই অবশেষ মন শরীর ও প্রাণের প্রয়োজনে নয়, অন্য এক প্রেরণায় এক শ্রেণীর সৃষ্টি ক'রে চলেছে, যার লক্ষ্য মনের নিজের তৃপ্তি ও আনন্দ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রাণ ও শরীরের যা প্রয়োজনে লাগে তাই যদি হয় লৌকিক, মনের এ সৃষ্টি অলৌকিক। সে প্রয়োজন মেটাবার যে চেষ্টা তাই যদি হয় কাজ, মনের এ সৃষ্টি খেলা মাত্র। লীলা নাম দিলে হয় ত ভদ্র ও গভীর শোনায়, কিন্তু স্বরূপের বদল হয় না।

খেলাই হোক আর লীলাই হোক সভ্যতার এই মৈত্রেয়ী মূর্ত্তি তার অন্য মূর্ত্তির মতই স্বাভাবিক।...আমরা যাকে সাহিত্য বলি তা সভ্যতার এই মৈত্রেয়ী মূর্ত্তির এক দিক। যেমন তার অন্য নানা দিক ছবি, ভাস্কর্য্য, সঙ্গীত, কর্ম্মগন্ধহীন শুদ্ধ জ্ঞানের চর্চ্চা।...

হিতকে মনোহারী করাই কাব্য ও সাহিত্যের লক্ষ্য। কিন্তু মনোহরণের কৌশলটা খুব সার্থক হ'লে তার জোরেই রচনা কাব্য ও সাহিত্য ব'লে চলে যায়; মধুর আধিক্যে ভিতরে যে ঔষধ নেই সে দিকে লক্ষ্য থাকে না। এই হিতবাদ যাদের বলে প্রাচীন-পন্থী তাদের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। হিতবাদী যদি সামাজিক ব্যাপারে হন স্থিতির পক্ষপাতী তাঁর আদর্শ সাহিত্যের নাম সৎ-সাহিত্য, আর তিনি যদি হন পরিবর্ত্তন বা গতির পক্ষে তাঁর আদর্শ সাহিত্যের নাম প্রগতি-সাহিত্য। কিন্তু স্থিতিবাদী ও গতিবাদী সাহিত্য বিচারে দুজনার দৃষ্টি-ভঙ্গী এক। যার লক্ষ্য ও ফল সামাজিক মঙ্গল নয় তা যথার্থ শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নয়।...

লৌকিক ও সামাজিক জীবনই সাহিত্যের সৃষ্টির উপকরণ। সুতরাং সাহিত্যিক সৃষ্টি চলে লৌকিক মন ও সামাজিক জীবনের পাশাপাশি এবং সে সৃষ্টির প্রভাব যে মন ও জীবনের উপর মাঝে মাঝে পড়বে তা স্বাভাবিক। ভারতবর্ষের হিন্দুর সামাজিক মনের উপর রামায়ণের কাহিনী ও চরিত্রের প্রভাব অস্বীকার করা চলে না। এ যুগের শিক্ষিত বাঙালী নর-নারীর মন ও সমাজের উপর রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রভাব স্বীকার করতে হয়। এবং সাহিত্যিকরা কেবল সাহিত্যিক নন, তাঁরাও সামাজিক মানুষ। সমাজের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা উপকরণ রূপে তাঁদের সাহিত্যিক মনকেই কেবল উদ্বুদ্ধ করে না, তাঁদের সামাজিক মনকেও নাড়া দেয় এবং এই সামাজিক মনের প্রভাব অনেক সাহিত্যে ও কাব্যে তার ছাপ রেখে যায়। যাদের মনের সাহিত্য-বোধ প্রখর নয়, এবং যাদের মনের সামাজিকতা অত্যন্ত প্রখর তারা সাহিত্যের এই সব গৌণ ফলকেই তার মূল লক্ষ্য মনে করে। যে সাহিত্য থেকে এই সামাজিক ফল-লাভের সম্ভব নেই অবসর-বিনোদনের সাহিত্য নাম দিয়ে প্রমাণ করে জিনিষটা হাল্কা। অবসর বস্তুটা কেন খারাপ, আর তার বিনোদন কেন দোষের কাজের লোকের সে প্রশ্ন মনে আসে না।...

সমাজ ও সাহিত্যের এই যোগাযোগ সাহিত্য বিচারে অনেক বিপত্তির সৃষ্টি করে। আধুনিক কালে সাহিত্য সমালোচনায় একটা কথা চলতি হয়েছে—escapism, যার বাংলা অনুবাদ হয়েছে 'পলায়নী বৃত্তি'। বর্ত্তমান সমাজের দুঃখ-দৈন্য অসঙ্গতিতে পীড়িত হয়ে, এবং তার প্রতিকারে হতাশ হয়ে অনেক কবি ও সাহিত্যিক নাকি এমন সাহিত্য তৈরি করেছেন মানুষের সামাজিক মন ও জীবনের সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই, যার উপকরণ সম্পূর্ণ তাঁদের কল্পনা। সামাজিক জীবনের মাটি তাঁরা ছুঁচ্ছেন না, আশ্রয় নিয়েছেন কল্পনার হস্তীদন্ত সৌধে অর্থাৎ ivory towerএ। এ রকম পলায়ন যে ভীরুতা escapism নামের মধ্যে আছে সেই বিচার। কিন্তু এ বিচার কবির সামাজিক মন ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির বিচার না তাঁর কাব্যের বিচার সব সময় বোঝা যায় না।...Escapism যদি সাহিত্যিক দোষ হয় তবে তার কারণও সাহিত্যিক, সামাজিক নয়। লৌকিক মন ও জীবন থেকে যে সাহিত্য বিচ্ছিন্ন তার ধারা হয় ক্ষীণ। সাহিত্যের ভাগীরথী মানুষের লৌকিক সুখ-দুঃখের খাত ছাড়া বয় না। এই জন্য পৃথিবীর যা বড় সাহিত্য মানুষের লৌকিক মন ও জীবন তার উপকরণ।...শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে সামাজিক জীবনের এই বিচিত্র উপকরণ সম্ভার বিভ্রম জন্মায় যে সাহিত্যের লক্ষ্য সমাজ ও জীবনে প্রভাব বিস্তার। সামাজিক জীবন সাহিত্যের উপকরণ সামাজিক প্রেরণায় নয়, সাহিত্যিক প্রয়োজনে। যে কবির কাব্য escapist তার মূল কারণ নয় বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় কবির বিতৃষ্ণা ও হতাশা। তার কারণ এর বিশাল ও জটিল উপকরণে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রতিভার অভাব, অথবা অন্য রকম সৃষ্টির দিকে প্রতিভার ঝোঁক। শক্তিতে যা কুলোয় না তার চেষ্টা না করা ভীরুতা নয় সুবুদ্ধি, কি জীবনে কি সাহিত্যে। Espacist কাব্য যদি ivory towerএ উঠেও কাব্য হয় তবে তা সার্থক, হোক না তার ধারা শীর্ণ। বড় চেষ্টার ব্যর্থতা যে ছোট সাফল্যের চেয়ে বড় সাহিত্যে সে কথা বলা চলে না। আর সাহিত্যের চেহারা ত এক নয়, সে বহুরূপী। লক্ষ্মী কেন দশভুজা হ'লো না এ আপসোস বৃথা।...

[রূপ ও রীতি

বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর কৃতি

মধ্যপ্রদেশ, নাগপুর

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মধ্যপ্রদেশের লোকেদের শিক্ষার জন্য অনেক বাঙালীই হয়ত একটু আধটু চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সব চেষ্টার সহিত তাঁহাদের অনেকেরই নাম আজ বিস্মৃতির গর্ভে নিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়া এবং উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জ্জন করিয়া যে মনীষী তাঁহার নাম এই প্রদেশের বাঙালী-অবাঙালী-নির্ব্বিশেষে বহু ব্যক্তিরই মনের মধ্যে জাজ্বল্যমান করিয়া রাখিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছেন তিনি পরলোকগত বিপিনকৃষ্ণ বসু। আমার প্রণীত 'প্রেম-রেখা'য় বিপিনকৃষ্ণের জীবনী ও এতদ্বিষয়ক প্রচেষ্টাবলীর আভাস পাওয়া যাইবে।

মরিস্ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপকদ্বয় স্বর্গগত সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেশচন্দ্র রায়ের নাম শিক্ষা-সংক্রান্ত কাগজে অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। স্বর্গগত তড়িৎকান্তি বক্সী মহাশয়—ইনি জব্বলপুর গবর্ণমেণ্ট কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন—অতিশয় সরলচিত্ত ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। ছাত্রদের শিক্ষার জন্য ইনি মুক্তহস্তে দান করিতেন।

শ্রীযুক্ত মাখনলাল দে এই প্রদেশের একাধিক কলেজে অধ্যাপকতা করিতে করিতে শেষজীবনে সায়েন্স কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়াছিলেন। এখন ইনি অবসর গ্রহণ করিয়া বাংলায় চলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেনগুপ্ত মরিস্ কলেজের অধ্যাপক হইতে প্রিন্সিপাল হইয়াছিলেন এবং সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের ডি. পি. আই. পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন।

এ প্রদেশের যুবকদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য ইঁহারা সকলেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন বলিতে পারা যায়। কিন্তু স্বার্থত্যাগের মাহাত্ম্য ও পরোপকারের ঔদার্য্য তড়িৎকান্তির মধ্যেই অতিমাত্রায় লক্ষিত হইত।

হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় এবং রায়সাহেব শ্রীযুক্ত বি. ভি. গুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

য়্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুত নলিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ত্রিধারা' নামে যে পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই গল্প। গল্পগুলির অধিকাংশ বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পগুলির অনেকগুলি ভাবালুতায় পূর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেকগুলিই শিক্ষাপ্রদ।

'চিন্তা-রেখা' ও 'প্রেম-রেখা' নামে আমার লেখা দুইখানি বই এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ ইংরেজীতে কতকগুলি প্রবন্ধ রচনা এবং দীননাথ স্কুলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন; কিন্তু এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

এ প্রদেশের সর্ব্বপ্রথম মাসিক পত্রিকার নাম 'মধ্য-ভারতী'। ইহা রায়পুর হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন রায়পুরের য়্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র-

নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর্থিক কারণে ইঁহার পত্রিকা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীযুত প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্ত্তমানে বিলাত ফেরত এবং গভর্ণমেণ্ট প্রেসের য়্যাসিষ্টেণ্ট সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট) অনেক বৎসর পূর্ব্বে নাগপুর হইতে একখানা ইংরাজী দৈনিক কাগজ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাঙালীদের মধ্যে এ বিষয়ে ইনিই প্রথম চেষ্টা করেন, সাফল্যও লাভ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ সাফল্য চিরস্থায়ী হয় নাই। নাগপুরের ছাত্রেরা মধ্যে মধ্যে হাতের লেখা সাময়িক কাগজ বাহির করে।

এখানকার বাঙালীদের হাটে বাজারে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হিন্দী বলিতেই হয়। কেহ কেহ মরাঠীও বুঝিতে ও বলিতে পারেন। তবে এই প্রদেশের প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য কোনও বাঙালী চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া জানি না।

মধ্যপ্রদেশে সরকারি চাকরিতে অনেক ডাক্তার সিভিল সার্জ্জন পর্য্যন্ত হইয়াছেন। নাগপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পদ্মবাবু) স্বাস্থ্য-বিভাগের উচ্চ পদে কাজ করেন। রাসায়নিক বিশ্লেষণ বিভাগে ইনি সর্ব্বপ্রধান।

বি. এন. আর-এর ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং বুটি হাসপাতালের ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার এম্. সি. দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। দাস মহাশয় উড়িষ্যাদেশবাসী হইলেও বাংলা জানেন এবং এখানে বাঙালীদের সঙ্গে মেশেন। অবসর গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে ডাঃ দাস যদিও প্রাইভেট প্রাক্‌টিস্ করিতেছেন, তথাপি বহু গরীব লোককে ইনি বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেন।

নাগপুরের বাঙালী যুবকদের ভিতর মধ্যে মধ্যে ব্যায়াম-চর্চ্চার সাড়া জাগে। কিন্তু এ বিষয়ের সুষ্ঠু চেষ্টা কার্য্যকরী ভাবে স্থায়িত্ব লাভ করে না।

সেণ্ট জন হাই স্কুলের একমাত্র বাঙালী শিক্ষক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, বি-এ মধ্যে মধ্যে নিকটবর্ত্তী অনুন্নত পল্লীসমূহে গমন করিয়া নিজের ছাত্রদের ও গ্রামবাসীদের সাহায্যে নর্দ্দমা প্রভৃতি আবর্জ্জনাপূর্ণ ময়লা স্থান পরিষ্কার করিয়া দিয়া আসেন। গ্রামবাসীদের মধ্যে কাপড়-কাচা ও গা-ধোয়া সাবান বিতরণ করেন। ছায়াচিত্রের সাহায্যে অবশেষে স্বাস্থ্যবিষয়ক বক্তৃতা দিয়া শৈলেনবাবু গ্রামবাসীদের নিঃস্বার্থভাবে যে শিক্ষা দিয়া আসেন তাহাতে তাঁহারই ভিতরকার মনুষ্যত্ব ক্রমশঃ পরিস্ফুট ও বিকশিত হইতেছে।

নাগপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের শ্রীমৎ স্বামী নিখিলেশ্বরানন্দ মহারাজের সংসার-আশ্রমের নাম সুধীশচন্দ্র দত্ত চৌধুরী। বি-এল পাস করিবার পর ইনি অল্পকাল মাত্র ওকালতি করিয়াছিলেন।

বৈরাগ্যের প্রভাব ইঁহার জীবনকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়। প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের মুখপত্র 'প্রবাসী-সম্মেলনী'তে প্রসঙ্গক্রমে ইঁহার জীবনী আমি অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। ইনি স্বয়ং পড়াশুনা ও চর্চ্চা করিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা এমন আয়ত্ত করিয়াছেন যে, চিকিৎসা-কার্য্যে ইনি ভূয়সী প্রশংসা পাইয়া থাকেন। উক্ত আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয় ইঁহারই দ্বারা পরিচালিত।

এক জন নিঃস্বার্থ নীরব বাঙালী কর্ম্মী এই রামকৃষ্ণ-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। জি. এ. জি. পি. টি. আপিসে কেরাণীগিরি করিয়া সারা জীবনে এই চিরকুমার বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন চৌধুরী যে তিন-চার হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার সমস্ত ব্যয় করিয়া তিনি আশ্রমের জন্য জমি খরিদ করেন এবং আশ্রমের সূচনা করেন। পরে যখন তিনি এই আশ্রমটি বেলুড়-রামকৃষ্ণ-মিশনকে দান করিয়া দেন, তখন হইতে বেলুড়-মঠ-প্রেরিত শ্রীমৎ স্বামী ভাস্করেশ্বরানন্দ মহারাজ এই আশ্রমটির অধ্যক্ষতা করিতেছেন।

সরকারি পি. ডব্লিউ. ডি. চাকরিতে অনেক বাঙালী নিযুক্ত আছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রাধিকা-প্রসাদ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

এ দেশের লোকের জন্য পুস্তকালয়, সভা-সমিতি প্রভৃতি এক বিপিনকৃষ্ণই করিয়া গিয়াছেন। তবে নিজেদের জন্য বাঙালীরা "সারস্বত সভা" লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সারস্বত সভায় শুধু বাংলা পুস্তক থাকে।

দুই-একটি ছোট দোকান করিয়া নাগপুরের দুই-এক জন বাঙালী জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন। উল্লেখযোগ্য মুদীখানা-সমন্বিত মনোহারী দোকান—'বিবেকানন্দ ভাণ্ডার', 'কমলালয়'।

নাগপুরে বাঙালীদের দুইটি হোটেল ও মিঠাইয়ের দোকান আছে; যথা—'ক্যালকাটা হোটেল', 'আনন্দ ভাণ্ডার'।

তিনটি জীবনবীমা কোম্পানীর নাগপুর কেন্দ্রে প্রধান কর্ত্তা বা ম্যানেজার বাঙালী। হিন্দুস্থান ইন্সিওর্যান্স অফিসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সুধেন্দুকুমার ঘোষ (এস. কে. ঘোষ); ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ অফিসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু রায় (এন্. কে. বোস রায়); ইণ্ডিয়া ইকুইটেব্‌ল ইন্সিওর্যান্স অফিসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ সেন (এ. সি. সেন)।

সম্প্রতি নাগপুরে বাঙালীদের ব্যাঙ্কিং বিজনেস আরম্ভ হইয়াছে। যথা,—ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড।

ক্যালকাটা কেমিক্যালের একটা শাখাও এখানে আছে।

ফটো-আর্টিস্ট শ্রীকিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অ-বাঙালী মহলে খ্যাতিমান্।

বর্ত্তমানে সরকারী চাকরিতে যিনি মধ্যপ্রদেশের ডাইরেক্টর অব্ ইণ্ডাস্ট্রিজ্ তিনি একজন বাঙালী—শ্রীযুক্ত করুণাদাস গুহ (কে. ডি. গুহ)

সম্প্রতি শ্রীবিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একটি যুবক কলিকাতা হইতে নাগপুরে ইলিস মৎস্য প্রভৃতি সরবরাহ এবং নাগপুর শহরে সাইকল-রিক্সা প্রচলনের প্রয়াস পাইতেছেন।

এক জন স্বর্ণকার কিছু কিছু গয়না-গাটি তৈরি করিয়া দিয়া বাঙালী মহলে কিছু উপার্জ্জন করিতেছেন। এক জন বাঙালী ব্রাহ্মণ যুবক ঘড়ি মেরামত করিতে জানেন, কখনও নিজে দোকান করেন, কখনও ঘড়ির দোকানে চাকরি করেন। দুই-এক জন বাঙালী যুবক দর্জ্জিগিরি করিয়া পয়সা রোজগার করেন। কোন কোন বাঙালী যুবক বাটা কোম্পানীর জুতার দোকান চালাইতেছেন। প্রত্যেক বৎসর দুর্গাপূজার পূর্ব্বে ঢাকা হইতে এক জন বাঙালী নাগপুরে আসিয়া কয়েক মাস ধরিয়া থাকেন এবং রাস্তায় রাস্তায় ফিরি করিয়া প্রচুর বস্ত্র-সম্ভার বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট পয়সা রোজগার করিয়া যান।

দুর্গাপূজা ও কালীপূজার সময় স্থানীয় বাঙালীরা—বিশেষতঃ তরুণেরা যে এ্যামেচার থিয়েটার করে তাহাতে সঙ্গীত নৃত্যকলা প্রভৃতির কথঞ্চিৎ চর্চ্চা হয়।

অথিন (অতীন ?) ভট্টাচার্য্যের বেহালায় বড় সুন্দর হাত।

সাধারণতঃ এখানকার বাঙালীরা প্রায় সকলেই সরকারী চাকরি করেন। কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদের পক্ষে রাজনীতির চর্চ্চা করা সম্ভব হয় না। তবে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন। সুদীর্ঘ ছয় বৎসর কারাবাস ভোগ করিবার পরে সে পুনরায় পড়াশুনা আরম্ভ করে এবং কৃতিত্বের সহিত বি-এল পাস করে। এখন এম-এ ও ল পড়িতেছে। ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে "অল ইণ্ডিয়া ষ্টুডেন্টস্ ফেডারেশ্যানের" যে অধিবেশন হইয়া গেল, তাহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিল ভূপেন।

বিচারাসনে স্বর্গগত বিপিনকৃষ্ণ ও বর্ত্তমানে তৎপুত্র ডি. ডি. এন. বসুর নাম স্মরণীয়।

ডাঃ শশীন্দ্রচন্দ্র ধর, এম-এ, ডি-এসসি (ক্যাল) নাগপুর সায়েন্স কলেজের গণিতের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক। ইনি কিছুদিন পূর্ব্বে বিলাত গিয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পরেই এডিনবরা হইতে ইনি আর একটি ডি-এস-সি ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন।

ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস, এম-বি, নাগপুর মেয়ো হাসপাতালের য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন। ডাক্তার দাসও বিলাত গিয়া পি-এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করিয়া আসিয়াছেন।

অ-বাঙালীরা প্রখ্যাত বাঙালী সাহিত্যিকদের উপন্যাসাদি নিজ নিজ ভাষায় অনূদিত করিয়াছেন। এখানকার সেণ্ট জন হাই স্কুলের এক জন শিক্ষক মিঃ শাস্ত্রী শরৎচন্দ্রের উপন্যাস মরাঠীতে অনুবাদ করিয়াছেন। আরও অনেক অ-বাঙালী এ-বিষয়ে অবহিত।*

* ১৩৪৭ সালের পৌষের প্রবাসীতে "বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর কৃতি" প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেব, এম-এ, যে প্রশ্নগুলি করিয়াছেন, এগুলি তাহার যথাযথ উত্তর না হইলেও সংক্ষেপে তাহারই প্রয়াস।

লক্ষ্ণৌ 'বাঙালী ক্লাব ও যুবক সমিতি'—

স্বর্গীয় অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় কর্ত্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই বেঙ্গলী ক্লাবে লাইব্রেরী, রঙ্গমঞ্চ, ব্যায়াম, স্বেচ্ছাসেবী প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ আছে। যুবকদের বিশেষ উদ্যমে খেলাধূলা ও ব্যায়াম বিভাগ বিশেষ পুষ্টি লাভ করিয়াছে। এই বিভাগের সভ্যগণ এতদঞ্চলের নানা প্রদর্শনীতে ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

যুবকের কৃতিত্ব—

কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতার স্কাউট দলভুক্ত শ্রীযুত বিষ্ণু মোদক শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে এক জন মহিলা ও এক জন পুরুষকে নিমজ্জিত অবস্থায় উদ্ধার করিয়া তাঁহাদের প্রাণরক্ষা করেন।

লক্ষ্ণৌ বেঙ্গলী ক্লাবের ব্যায়াম-বিভাগ

শ্রীবিষ্ণু মোদক
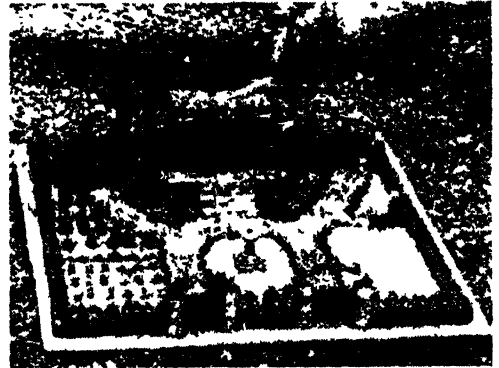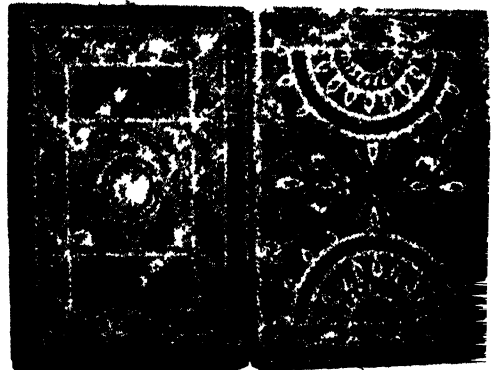
বাড়ী-চিত্র

মশলার চিত্র—

স্বর্গীয় গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা শ্রীমতী সুজাতা দেবী মশলার বাড়ী ও পিঁড়ি চিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। এখানে বাড়ী ও পিঁড়ির চিত্রের একটি করিয়া প্রতিলিপি দেওয়া হইল।

পিঁড়ি-চিত্র